পশমের জামাকাপড়ের কোমল ধোয়ার জন্যে 'জেণ্টীল'

genteel

পশমের জামাকাপড়—কার্ডিগন, পুলওভার কিম্বা শাল—এসব খুব সূক্ষ্ম জিনিষ। তাই এসব ধোয়ার জন্যে খুব যত্ন নিতে হয় আর একমাত্র জেণ্টীলেই তা সম্ভব। জেণ্টীল পশমের জামাকাপড়ের স্বাভাবিক ফুরফুরে ভাব নষ্ট করেনা, আর সেগুলো বেশ নরম, মোলায়েম ক'রে রাখে।

আপনি যেসব জামাকাপড় পরতে ভালবাসেন—যেমন পশম, রেশম, সিন্থেটিক—সেসব ধোয়ার জন্যে জেণ্টীল বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী। জেণ্টীল হাল্কা ভাবে ময়লা তুলে দিয়ে জামাকাপড় পুরোপুরি পরিষ্কার করে। আপনার কাপড়জামা নতুনের মত মোলায়েম, ঝরঝরে আর উজ্জ্বল করে। এসব জেণ্টীল দিয়ে নিরাপদে বাড়িতেই কেচে নিন। এখন জেণ্টীল নতুন সুবিধাজনক চুঙ্গীর মত ঢাকনা সমেত বোতলে পাওয়া যাচ্ছে।

নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়িতে ধোয়ার জন্যে

Shilpi D M 52 A/77 BEN

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পাঞ্চজন্য ১৬৲

মহাভারতের পৃষ্ঠপটে শ্রীকৃষ্ণ জীবন এক অনন্য উপন্যাসের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে শুরু করে দ্যূত ক্রীড়ায় পাণ্ডবদের পরাজয় ও বনগমন পর্যন্ত মহাভারতের যে অংশ বর্ণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। চরিত্র বা ঘটনা কোনটাই কাল্পনিক নয়, পুরাণের অলৌকিকত্ব বা অবিশ্বাস্য ঘটনা নেই কোথাও — এর শ্রীকৃষ্ণ মানুষই; দূরদর্শী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, উচ্চাশাকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তিধারণ করেন—এবং সত্যকার কূটনীতিক। তিনিই এ পৃথিবীর প্রথম এবং খাঁটি সাম্যবাদী। ধনগর্বিত ও শস্ত্র গর্বিত ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করে সাধারণ দরিদ্র মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। তাই তিনি দরিদ্র বঞ্চিত পাণ্ডবদের বেছে নিয়েছিলেন, তাই তিনি রাজসূয় যজ্ঞে অভ্যাগতদের পা-ধোওয়াবার ভার নিয়েছিলেন, তাই তাঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। সাবলীল রসঘন রচনা, উপন্যাসের মতো রুদ্ধনিঃশ্বাস ঘটনাবিন্যাস অথচ এমন বাস্তব বর্ণনা যে মনে হবে আপনি সেই যুগেই বিচরণ করছেন, এসব ঘটনার আপনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-৭৩

—— ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ——

উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
পাঞ্চজন্য ১৬৲

আশাপূর্ণা দেবী
পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি ৯৲

জরাসন্ধ
তৃতীয় নয়ন ৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
মধুমতী থেকে ভাগীরথী ১৬৲
উল্কা ১০৲

প্রমথনাথ বিশী
বঙ্গভঙ্গ ১৪৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সরাইখানা ৮৲

বিমল কর
কালের নায়ক ১১৲

প্রশান্ত চৌধুরী
টুকরো কাঁচের ছবি ৯৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র ৮৲

নারায়ণ সান্যাল
হংসেশ্বরী ১০৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
রোটারিয়ান ৭৲

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲

নিমাই ভট্টাচার্য
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ৬৲

সুমথনাথ ঘোষ
সুদূরের পিয়াসী ৮৲

জ্যোতিষী কালপুরুষ
কালপুরুষের ডায়েরী ১৫৲
(সত্য ঘটনা)

জ্যোতিষ

ভৃগুজাতক
১৯৭৮ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতকের পঞ্জিকা ৪৲

ভ্রমণ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কৈলাস ও মানস সরোবর ২০৲

বিমল মিত্র
চলতে চলতে ১৬৲

শঙ্কু মহারাজ
পঞ্চবটী ৮৲

পেপার ব্যাক ও পকেট বই

বিমল মিত্র
সাহেব বিবি গোলাম ১২·৫০

প্রমথনাথ বিশী
লালকেল্লা ১২·৫০

সুমথনাথ ঘোষ
রক্তগোলাপ ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
আমি কান পেতে রই ১২·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গণদেবতা ৭·৫০

রচনাবলী

তারাশঙ্কর রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) ২০৲
বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (৫ম খণ্ড) ২০৲
সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৮ম খণ্ড) ২০৲
বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ (১ম খণ্ড) ২০৲
বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ (২য় খণ্ড) ২০৲
(এই সুলভ সংস্করণ দুটি রচনাবলী কেবলমাত্র গ্রাহকদের জন্য)

প্রবন্ধ

প্রমথনাথ বিশী
গান্ধী জীবনভাষ্য ৭৲

সুখরঞ্জন রায়
রবীন্দ্র কথাকাব্যের শিল্পসূত্র ১৭৲

ধর্মগ্রন্থ

মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী
সত্যং প্রসঙ্গ (নবস্তবক) ১০৲

কিশোর সাহিত্য

সীতা দেবী
নিরেট গুরুর কাহিনী ও অন্যান্য গল্প ৬৲

এ বছরের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি ২৮৲

একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

এই একাদশ মুদ্রণের এক সহস্র কপিতে লেখিকার স্বাক্ষরিত একটি প্রতিকৃতি থাকিবে। এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র এই মুদ্রণের জন্যই করা হইল।

চিঠিপত্র

বর্ণে বর্ণে

সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয়ের "বর্ণে বর্ণে" প্রসঙ্গে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন শ্রীপ্রতাপকুমার রায়।

সন্তোষবাবুর সময়োচিত আলোচনার জন্য ধন্যবাদ। বানান ও বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ভাষাবিদ ও বর্ণতাত্ত্বিকদের আলোচ্য বিষয়। আমি ছাপাখানার ছাপোষা মানুষ হলেও মুদ্রণ শুধু আমার জীবিকাই নয়, জীবনও। বাংলা মুদ্রণের সমস্যাদি নিয়ে আমি প্রায় দুই যুগ ধরে চিন্তা করে আসছি এবং চিন্তার ফসল বিভিন্ন সময়ে সুধীজনের দরবারে পেশ করেছি। এই সুবাদে কয়েকটি কথা আপনার পত্র-মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

পত্রলেখক প্রতাপবাবু বলেছেন, 'লাইনো আমাদের লিপির সংস্কার করেনি, অঙ্গহানি করেছে। সে অঙ্গহানি আমাদের সয়ে গেছে (দেশ ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪)।'

প্রতাপবাবু আরও বলেছেন, 'আমরা যেহেতু মেশিন তৈরি করি না, তাই আমাদের লিপিকে মেশিনের দাসী হতে হয়।' সর্বশেষে 'বাংলা লাইনো টাইপের লিপি সুন্দর ও সহজপাঠ্য হয়েছে কি না' সে সম্বন্ধেও সংশয়-বিদ্ধ প্রতাপবাবুর বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে।

প্রতাপবাবুর এই তিনটি মন্তব্যই আপত্তিকর। আমাদের মনে হয়, বর্ণমালার নবীকরণ প্রসঙ্গে লাইনোর অবদানের উল্লেখ করে সন্তোষবাবু যা বোঝাতে চেয়েছেন প্রতাপবাবু তা বুঝতেই পারেননি। অথচ লক্ষণীয়, সুরেশচন্দ্রের যুগান্তকারী সংস্কারকে নস্যাৎ করার হাস্যকর ছেলেমানুষি দেখাতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি।

বর্ণমালার নবীকরণ প্রসঙ্গে সন্তোষবাবুর মন্তব্য, 'লাইনো খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখেছিল, যেটুকু বাকি আছে সেটুকুকে ষোলকলা করে দেখে মনো'। এই বক্তব্যে বিন্দুমাত্র খাদ নেই। তবে প্রসঙ্গ যখন তুললেনই, আরো বিশ্লেষণ করে বিষয়টা তুলে ধরলেই ভাল হতো। কথাটি সন্তোষবাবুর বোঝা উচিত ছিল। একটু খোলসা বলতে কী বাধা ছিল?

বর্ণবিন্যাস বা টাইপোগ্রাফী মানে কী? টাইপ কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'টাইপোস্' থেকে যার বাংলা অর্থ হল, 'ধারণা'। গ্রাফী কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'গ্রাফো' থেকে। যার বাংলা মানে হচ্ছে, 'লিখন'। তা হলে বর্ণবিন্যাস মানে দাঁড়াচ্ছে 'ধারণার লিখন'। প্রতিটি বর্ণ হচ্ছে এক একটি সংকেত। প্রতিটি সংকেতের নিজস্ব চরিত্র আছে। সংকেত লিখতে যদি চরিত্রহানি না ঘটে তবে বুঝতে হবে বর্ণবিন্যাস বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে।

সুতরাং লাইনো কী করেছে তা জানতে হলে প্রতাপবাবুকে একটু গভীরে যেতেই হবে।

অতীতকালে বাংলার জন্য ৯৭৩টি হরফের দরকার হতো। বর্তমানে হ্যান্ড কম্পোজের ক্ষেত্রে যথাযথ মুদ্রণের জন্য ৫০৭টি বিভিন্ন হরফ বা ক্যারেক্টারের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে প্রচলিত স্বরবর্ণ এগারটি (দীর্ঘ-ঋ, হ্রস্ব-দীর্ঘ ৯-বর্ণের ব্যবহার বাংলায় নেই), ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি, স্বরচিহ্ন, যতিচিহ্ন ও সংখ্যাবাচক হরফ ছাড়া বাকি সবই যুক্তাক্ষর।

বাংলা বর্ণমালার বিশালত্ব তথা হরফচরিত্রের সংখ্যাধিক্য দ্রুত মুদ্রণের প্রধান অন্তরায়—এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই বিশালত্বকে বশে আনতে হবে এবং বাংলা বর্ণমালার মৌল চরিত্র হনন না করে কৌশলের দ্বারা স্বল্পসংখ্যক ক্যারেক্টারের মধ্যে সেগুলিকে সীমায়িত করাটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

বলা বাহুল্য, লাইনো বাংলা চাবি-পাটাতনের প্রবর্তক সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও শিল্পী যতীন্দ্র-কুমার সেন মহাশয় একটি অনবদ্য পদ্ধতির প্রয়োগ করে বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বর্ণের বিভাজন রীতি এতই সুসমঞ্জস হয়েছে যে, হরফ জুড়ে, জুড়ে নিষ্কলংক যুক্ত-বর্ণ রচনা সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, বর্ণের বিভাজনরীতিকে কেন্দ্র করে সে যুগের কিছু কিছু গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী বানানবাদের ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বঙ্গাক্ষরের চরিত্র সুরেশচন্দ্রের হাতে নিখুঁতভাবেই সুরক্ষিত ছিল সেহেতু লাইনো-বাংলায় ব্যবহৃত হরফ চারিত্রিক দৃঢ়তার বলেই অন্যায় আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পেরেছে। তাই আজ শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে লাইনো বাংলা হরফের সশ্রদ্ধ সমাদর।

আদিকালে অযৌক্তিকভাবে যেসব যুক্তবর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল, সুরেশচন্দ্রের হাতে পড়ে তার রূপ পরিশীলিত ও বাস্তবানুগ হতে পেরেছে।

এই সংস্কার করতে গিয়ে সুরেশচন্দ্রের মনেও সংশয় ছিল—এটা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রতিবাদ ও বিদ্রূপের ঝড় যে একটা অপতাণ্ডব শুরু করতে পারে সে আশংকাও সুরেশচন্দ্র করেছিলেন। এইজন্যেই বোধ হয় হরফমালার চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে তিনি যথাযথ কঠোর হতে পারেন নি। ৫০৭টি বাংলা ক্যারেক্টারকে তিনি ২৯২টি চরিত্রে সীমায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাত্র। অর্থাৎ নিন্দুকের ভয়ে তিনি অনেকগুলি বিকল্প ক্যারেক্টারকে জিইয়ে রেখেছেন। বিকল্প হরফচরিত্রের অনাবশ্যক প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর প্রবর্তিত কী-বোর্ডে উপকরণ লেগেছে বেশী এবং তার ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হতে পারছে না। সে যাই হোক, সুরেশচন্দ্র যা করে গিয়েছেন তার ফলে বাংলা মুদ্রণ অন্তত একশ' বছর এগিয়ে গিয়েছে—এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন।

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। উ-কার স্বরচিহ্নের প্রয়োগ ও চেহারা ছিল হরেকরকমবা,

—
ক্‌+ব=ক্ব, ব্‌+ব=ব্ব, শ্‌+ব=শ্ব, হ্‌+ব=হ্ব প্রভৃতি।

সুরেশচন্দ্রের হাতে এইগুলির …ারা দাঁড়িয়েছে ক্ব, ব্ব, শ্ব, হ্ব। …র এই বিন্যাসে বাংলা বর্ণের চরিত্র …ঙ্কিত হয়েছে, না নির্মল হয়েছে?— …াপবাবুকে এই প্রশ্ন করতে স্বতঃই … চায়। সুরেশচন্দ্রের হাতে ব্ধ …েছে ব্দ, হ্ম হয়েছে হ্ম, আর ষ্‌+থ= … না হয়ে হয়েছে ষ্থ, ক্‌+ত=ক্ত না … হয়েছে ক্ত এবং স্‌+থ=স্থ না হয়ে …েছে স্থ।

এরকম কত উদাহরণ দেব? …নোতে ছাপা বাংলা পত্র-পত্রিকা …উ মন দিয়ে পড়লেই প্রতাপবাবু …রেশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভার …ল পাবেন।

উপসংহারে নিবেদন, এই বিজ্ঞান-…ত পদ্ধতির নিন্দার মধ্যে সার্থকতা …থায়? সায়েবদের অপটু হাতের … সানন্দে গ্রহণ করতে তো আমরা …ধা করিনি! সুরেশচন্দ্র সায়েব …লেন। না—এটাই কি তাঁর অপরাধ? … শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের ত্রুটি-…্যুতির নিন্দা তো বাঙালীর মুখে …চে না! ইংরেজীর ছকে ফেলে …লা অক্ষরমালা আবিষ্কার করে তাঁরা … প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। …ন, a স্থানে অ, b স্থানে ব, c …নে ক, d স্থানে দ, m স্থানে ম, … স্থানে ন, y স্থানে য, h …নে হ। গোটা লোয়ার কেসটাই … ইংরেজীর নকল। ইংরেজী আর …লা বর্ণমালা কি এক, না এই দুটো-…ার ধ্বনি এক? বাংলা অক্ষরমালার …স্কারের কথা তো কেউ বলছেন না! …ড, লাইনোয় ব্যবহৃত নিষ্কলঙ্ক …ক্টারির নিয়ে কত হইচই। সজনী-…ন্ত দাসের একটি কথার উল্লেখ করার …ভ সংবরণ করতে পারছি না। …নীকান্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন, …হারা চক্ষুপীড়ার অজুহাত দেখাইয়া …ক্তিহীন পুরাতনকে আঁকড়াইয়া …কবার পক্ষপাতী, তাহাদের কাছে …াদের নিবেদন এই যে, এই অজুহাত …ান্তই ভিত্তিহীন।"

সুরেশচন্দ্র যে পথ দেখিয়েছেন, …জন প্রদর্শিত সেই পথ ধরে বাংলা …মালায় আরও সংস্কার সম্ভব। …মরা মনে করি, মাত্র ১৪০টি হরফ-…ত্রের সহায়তায় একটিমাত্র যুক্তবর্ণ …ন না করেও বাংলায় দ্রুততর ও …র্থক মুদ্রণ হতে পারে। এ বিষয়ে …র্ঘকাল গবেষণা করে আমি এবং …বপুর প্রিন্টিং টেকনোলজির অধ্যাপক …শঙ্কর সেন মনোটাইপের জন্য …নসম্মত ছক তৈরি করেছি। …শীর্ষ এই গবেষণা-প্রবন্ধটি পশ্চিম-…ল মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের …খপত্র 'প্রিন্টার্স ভয়েস' ১৯৭৫ …লে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

…সেন দত্ত
…লকাতা-৩৩

…ঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ধারণা

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের লেখা …ারতের নবজাগরণে বঙ্কিম, …বেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ" বেরিয়ে-ছিল। সেই লেখাটি নিয়ে আমার দু-চার কথা বলার আছে।

প্রবন্ধকার বলেছেন, "জাতিপ্রেম ও গোষ্ঠীপ্রেম যেখানে দেশপ্রেমের নাম ভাঁড়িয়ে বাজীমাৎ করতে চায়, এই তিন মহাপুরুষের কেউই সেই দেশ-প্রেমের মেকি প্রতিমাকে দেবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি।' এ বলে তিনি ভবানন্দের উক্তি ব্যবহার করেছেন তাঁর যুক্তির সমর্থনে। কিন্তু এই উপন্যাসেরই অন্যত্র বঙ্কিম বলেছেন (চিকিৎসকের মুখ দিয়ে)—"তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর এখন কোন কার্য নাই।" বলেছেন—"ইংরাজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, পুণ্যবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরাজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।....যার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে।"

অর্থাৎ বঙ্কিমের সুস্পষ্ট বক্তব্য, ইংরেজের পক্ষপুটে থেকে হিন্দুরা ইংরেজের পদলেহন করে গৌরবময় হয়ে উঠবে। এবং তাঁর দেশপ্রেম হিন্দুপ্রেম ও ইংরেজ শ্রদ্ধা কেন্দ্রিক। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—"...পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। পরজাতির অমঙ্গলসাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব।" (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী বসুমতী সংস্করণ। প্রথম ভাগ পৃ ৮৭)। এজন্য রবীন্দ্রনাথের যে ভারতকল্পনা ছিল—"India of no politics, India of no nation,"
সে ভারতকল্পনা বঙ্কিমের কাছে India of Hindu তাহলে তাঁর দেশপ্রেম কি গোষ্ঠীপ্রেমের ঊর্ধ্বে।

প্রবন্ধকার বলছেন— "বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক নীতি সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা, তাঁর দৃষ্টি ছিল ধনতান্ত্রিক ও অভিজাত সমাজ-কেন্দ্রিক।" এরপর তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি হাজির করেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রবন্ধকার সম্ভবত ভুলে গেছেন বঙ্কিম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত ঘৃণ্য, কুখ্যাত প্রথাকে খারাপ বলে বর্ণনা করেও সে প্রথার বিরোধিতা করেন নি। কারণ তিনি চাননি ইংরেজরা "প্রজাবর্গের অবিশ্বাসভাজন হয়েন"। অর্থাৎ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো উষ্মা নেই—আছে অকুণ্ঠ সহানুভূতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে যে তিনি খারাপ বলে-ছিলেন তা শুধুমাত্র কিছু সন্দেহ-বাতিক, বেয়াড়া গোছের লোকের কাছে ভাল থাকার জন্য। এই বঙ্কিমই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন—"আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি"। এই বঙ্কিমেরই পরিষ্কার উক্তি—"ইচ্ছা-পূর্বক বৃটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানি পাইয়া অবধি এ পর্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার মঙ্গল হইবে ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়।" (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, ১ম ভাগ, পৃঃ—৮৭)। ভারতের মসলিন শিল্প ধ্বংস, নীলচাষীদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা, শ্রমজীবীদের ইংরেজ ও দেশীয় জমিদারদের শোষণে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া—এগুলো সবই ঘটেছিল ইংরেজরা সাধারণ প্রজার হিত করতে চেয়েছিল বলে—তাই না? এরপরেও নাকি বলতে হবে তাঁর দৃষ্টি ধন-তান্ত্রিক ও অভিজাত সমাজকেন্দ্রিক ছিল না।

প্রবন্ধকার সিদ্ধান্ত করেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীনতা, যে গণ-তন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা প্রধানত রাজনৈতিক এবং সমাজ ও ধর্মনৈতিক।" তারপর তিনি যোগ করেছেন—"তিনি চেয়েছিলেন, বিজ্ঞান প্রবুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ।" অর্থাৎ বঙ্কিম সাম্যের গান গেয়েছেন, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছেন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুরলহরীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। সন্ন্যাসীবিদ্রোহের অন্যতম নেতা দেবীচৌধুরানীকে করেছেন তিন স্ত্রীর অধিকারীর প্রথমা স্ত্রী। (সেজন্য অবশ্যই বীর!) ব্রজেশ্বর-এর স্ত্রী যার ক্ষুরধার বুদ্ধির ফলে "ব্রজেশ্বরের নতুন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল।" হায়! —যে নেতা কৃষকদের হয়ে অস্ত্র ধরেন, সংগ্রাম করেন সে নেতাই কৃষক শোষণ করে জমিদারী বাড়ান।

বিদ্যাসাগর এবং রামমোহনের যেখানে জীবন সম্পর্কে অনেকটাই বলিষ্ঠ, স্বচ্ছ প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র অস্বচ্ছ, সংকীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কুঁয়োয় পড়ে হাবুডুবু খেয়েছেন। তাই শিষবৃক্ষের সূর্যমুখী যে চিঠি লিখতে স্পর্ধা দেখায় তা হল—"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র নন কিন্তু) নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মূর্খ, কারণ তিনি বিধবা বিবাহ চেয়েছেন। সাম্যবাদী, গণ-তান্ত্রিক, স্বাধীনতাপ্রেমিক বঙ্কিমের সব মনন, সব বুদ্ধি কি গুলিয়ে গিয়েছিল? বঙ্কিম হিন্দু জমিদার-শাসিত, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন— বিজ্ঞানপ্রবুদ্ধ, সমাজ-তান্ত্রিক ভারতবর্ষ নয়।

আসলে বাংলায় নবজাগরণের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের তাঁবেদারির মাধ্যমে জমিদার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ভিত অটুট রাখা এবং ইংরাজসৃষ্ট নতুন সমাজের নেতৃত্ব লাভ। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়কার সাহিত্যিকদের প্রতিভূ। সামন্ততান্ত্রিক বঙ্কিমকে সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক বলে জাহির করলেও আখেরে লাভ কিছুই হবে না, মিছে আত্মপ্রতারণাই হবে।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য
বালী, হাওড়া।

মুকুন্দ দাস

'দেশ' পত্রিকায় রাজ্যেশ্বর মিত্র-মহাশয়ের মুকুন্দদাস রচনা "জাতীয় জাগরণের প্রণেতা মুকুন্দদাস" পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম ও সেই সঙ্গে আমার মনে জেগে উঠল বিস্মৃতপ্রায় কিছু স্মৃতি।

মুকুন্দদাসের যাত্রাভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে বরিশালের মাখনবাবুর দলের যাত্রাগান আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি। মাখন-বাবু খুব সম্ভবত ১৯৩৭—৪১ সালের মধ্যে কোন একসময় তাঁর দল নিয়ে আমাদের গ্রামে (নদীয়া নাকাশীপাড়ার দাদুপুর গ্রামে) আসেন ও একমাসকাল ধরে যাত্রাগান করেন আমাদের গ্রামে ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে।

মুকুন্দদাসের মৃত্যুর পরেও তাঁর যাত্রাগানের ধারাটি বজায় রেখেছিলেন মাখনবাবু ও তাঁর দলটি। সুশিক্ষিত গৌরবর্ণ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মাখনবাবুর চেহারা ছিল ভারি সুন্দর। তিনি মুকুন্দদাসের মতই সাজ-পোশাক পরে ও গলায় মেডেলের মালা ঝুলিয়ে আসরে নামতেন। তিনিও মুকুন্দদাসের রীতিতেই উদাত্ত ও সুরেলা কণ্ঠে গান করতেন। তাঁর গাওয়া গানগুলি সে সময়ে গ্রামের মানুষের মুখে খুবই শোনা যেত কিছুদিন পর্যন্ত। সব গান এখন আমার মনে পড়ে না, তবে ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু গানের কথা আমার মনে পড়ছে। যেমন,

ওকে ধর না, ধর না
ধর না কখন।
ওকে ধরিলে হারাবে জীবন।
"ছেলে পাশ করেছে বি-এ,
ছেলে পাশ করেছে বি-এ;
ছেলের মাথায় টেরি,
চোখে চশমা, ওই দুঃখে মরি।"

"কলিকালের ছেলে
মানে না মা-বাপ,
গুরুজন বলে।"

এই দলটিকে লোকে বলত 'স্বদেশী যাত্রার দল' ও এই দলের গাওয়া পালাগুলি সে সময় আমাদের গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। একই পালা একাধিকবার গীত হতে দেখেছি। মাখনবাবু আমাদের গ্রামে "মাতৃপূজা" পালাটি করেন নি। তবে একরাত্রিতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাটুলী কিংবা বাউডাঙায় পালাটি আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু পুলিস খবর পেয়ে যায় ও সে আসর ভেঙে দেয়। মাখনবাবু ধৃত হন।

মুকুন্দদাসের 'মাতৃপূজা' নাটক বিনষ্ট করে দেওয়া হলেও তার কপি অবশ্যই তাঁর কাছে ছিল। নতুবা মাখনবাবু কি করে ঐ নাটক করতেন?

মুকুন্দদাসের ধারাটিকে যাঁরা বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাঁদেরও খোঁজ হওয়া দরকার।

অজিতেন্দ্র সিংহ
নতুন দিল্লি-৩

॥ ২ ॥

গত ১৪ই জানুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজ্যেশ্বর মিত্রের জাতীয় জাগরণের প্রণেতা মুকুন্দদাস

...। উক্ত চারণ কবির জীবনের সম্বন্ধে দু-একটি কথা আমার পাঠকবর্গকে জানাতে চাই।

চারণকবির জন্ম ঢাকায় বানারী ... (১৮৭৮ খৃঃ)।' তাঁর পিতার নাম গুরুদয়াল দে—পিতামহ ছিলেন ...র মাঝি। পিতা বরিশালে এক ...টির আদালতে কাজ করতেন। ... পরিবারটি বরিশালে চলে যায়। ...দাস শৈশবে বিভিন্ন স্কুলে ...ও প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েন ...। পিতার মুদির দোকানে বসা ও পাড়ার অশান্ত ছেলেদের নিয়ে ...বাজী করা তার প্রধান কাজ। ...রিশালের তৎকালীন নায়েব নাজির ...রিশ্বর গুহের কীর্তনের দলে ১১ ...বয়সে যোগ দেন। ক্রমে নিজেই একটি দল গঠন করেন। ১৯০২ ...রসানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামে ... আগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'মুকুন্দদাস' নাম গ্রহণ করেন। মুদী দোকানের দুরন্ত যুবককে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে চারণ কবিতে পরিণত করেন বরিশালের অদ্বিতীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও তাঁর সাধন সংগীতে শ্যাম ও শ্যামার অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হননি। কালী ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সঙ্গে মুসলমানদের জন্য মসজিদের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। বিভিন্ন দেশ-পূজ্য নেতা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে চমৎকৃত হন। তাঁর মাতৃপূজা যাত্রা পালাটি যুবকদের মনে উত্তেজনা আনে। বিদেশী বর্জন আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত মাতৃপূজা গীত সঙ্কলন মুকুন্দদাস রচিত "ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা"—এই সংগীতের জন্য তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। কারাবাসের সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনন্য রচনার মধ্যে সাধন সংগীত, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, পথ, সাথী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি। এই কবি সারা জীবনে ৭০০ মেডেল ও বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর দেওয়া চারণকবি নামেই তিনি সবার মধ্যে বেঁচে আছেন। মৃত্যু ১৯৩৪ সাল।)

সুনীলকুমার নিয়োগী
আসানসোল
(আপকার গার্ডেন)

রামমোহনের দুই ভৃত্য

১৪ জানুয়ারি ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রামমোহনের দুই ভৃত্য' শীর্ষক রচনাটির প্রথম দুই অনুচ্ছেদ পড়ে খটকা লাগল। ওই দুই অনুচ্ছেদে আছে : 'না, মোটেই আহামরি চাকরি নয়। তবু পৈতৃক নামটার ওপরেই কোপ পড়ল প্রথম। চাকরিদাতা দেওয়ান রামমোহন রায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, "বাবু হে, এই রকমই আমি করে থাকি। তোমার নাম আজ 'শম্ভুচন্দ্র' নয়। তোমার নাম দিলাম 'রামরত্ন', কাগজে-[illegible] এখন থেকে এ নামই [illegible] হাত [illegible] করে [illegible] শম্ভুচন্দ্র [illegible] কণ্ঠে বলল : হুজুরের যা ইচ্ছে। আজ থেকে এই রামরত্ন নামেই আমি পরিচয় দেব।" এই কথোপকথন থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহনের পাচকের পৈতৃক নাম ছিল একটাই এবং তা হচ্ছে শম্ভুচন্দ্র, চাকরি দেবার সময় রামমোহন সেই নাম পালটে নতুন নামকরণ করেন 'রামরত্ন'। কিন্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় চৈত্র ১৩৩৬ সংখ্যায় 'রামমোহন ও রাজারাম' বিষয়ক যে প্রত্নতত্ত্বমূলক আলোচনা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লেখা রামরত্ন বা রামরতন মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ পত্রাংশে দেখা যায়, রামরত্ন বা রামরতন নিজেই স্বীকার করছেন যে তাঁর 'শম্ভুচন্দ্র' ও 'রামরত্ন' বা 'রামরতন' দুটো নামই ছিল পৈতৃক —শম্ভুচন্দ্র তাঁর ডাকনাম, আর রামরত্ন/রামরতন তাঁর পোশাকী নাম। এই স্বীকারোক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, রামমোহন স্বনামপ্রীতির বশে পরিচিত অনেককেই রামনামাঙ্কিত করেছেন বটে, কিন্তু শম্ভুচন্দ্রকে পাচক নিযুক্ত করার সময় তার নতুন নামকরণের প্রয়োজন বোধ করেননি, কারণ তার পৈতৃক নামান্তরটি ছিল রামরত্ন তথা রামনামাঙ্কিত।

আমার খটকা এইখানেই। বৈদ্যনাথবাবুর রামমোহন বলছেন যে, তিনিই শম্ভুচন্দ্রের নাম পালটে রামরত্ন রেখেছেন এবং বৈদ্যনাথবাবুর রামরত্ন সেই নতুন নামকরণকে শিরোধার্য করে বলছেন 'হুজুরের যা ইচ্ছে' ইত্যাদি। কিন্তু ব্রজেনবাবুর উদ্ধৃত পত্রাংশের রামরত্ন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলছেন :

'With regard to the second query on the subject of my name, I beg to submit that the name which I hold now is what I received since the day of my unnoprashana, or first sacrament of the Hindus, a name by which I have been always known and by which our countrymen perform their Brahmanical ceremonies. It should, however, be stated here for your information and that of the Sadar Board of Revenue that I was also called in my boyhood by Shambhu Chunder by my very near relations and particularly by my father as a mark of his tender regard for me. But as this lutter name is only given to me in token of affection, I held every situation as well as received introductions and recommendations private and public from the late much lamented Raja, as well as from my friends, both European and Native, in my real name Ram Rutton by which I am commonly known and in which I held my present situation.' (Board of Revenue Proceedings, 20 February 1838 No. 160).

এছাড়া, আর একটি কারণেও বৈদ্যনাথবাবুর রামমোহন ও রামরত্নের উক্তিতে সংশয় জাগে। সেটি হলো রামমোহনের সঙ্গীদের বিলাত যাত্রার অনুমোদনপত্র (দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। এই অনুমতিপত্রে দেখা যায় রামমোহনের দুই ভৃত্যের নাম হিসেবে Ramrutton Mookerjee এবং Hurichuran Doss-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ রামমোহন ব্যক্তিগত জীবনে ভৃত্য-পরিজনদের নামান্তর করলেও কাগজে-কলমে বা সরকারী নথিপত্রে তাদের পৈতৃক নামই ব্যবহার করেছেন। এই অনুমান সত্য হলে বোঝা যায় যে ভৃত্য হিসাবে রামহরির নামান্তর হলেও রামরত্নের নামান্তর হয়নি। অনুমতিপত্রে রামহরি যে হরিচরণ, তার কারণ 'হরিচরণ'-ই তার পৈতৃক নাম আর রামরত্ন যে রামরতন, তার কারণ রামরত্ন বা রামরতনই তার পৈতৃক নাম। রামরত্নের পূর্বোদ্ধৃত স্বীকারোক্তি এই অনুমানের সমর্থক। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, নামকরণের ব্যাপারে কে ঠিক কথা বলছেন? বৈদ্যনাথবাবুর রামরত্ন না স্বীকারোক্তির রামরত্ন? বৈদ্যনাথবাবু স্বয়ং এ ব্যাপারে আলোকপাত করে আমার সংশয়-কুহেলী অপনোদন করলে অনুগৃহীত হব।

পরিশেষে আমার ছোট্ট অতৃপ্তির কথা উল্লেখ করি। আলোচ্য রচনায় রামমোহনের একটি বহুপরিচিত প্রতিমূর্তি মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই দণ্ডায়মান রামমোহন প্রতিমার তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেলাম না। এর বদলে যদি দুই ভৃত্যের ছবি, হস্তাক্ষর ইত্যাদি ছাপা হত, তবে তা প্রবন্ধের পরিপূরক হতে পারত। প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'প্রবাসী'-র অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সংখ্যায় রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের ছবি (পৃঃ ২২০), 'শ্রীরামরত্ন মুখর্য্যে' ও 'রামহরি দাসষ্য' ইংরেজি ও বাংলা স্বাক্ষর (পৃঃ ২২২) এবং স্টেপলটন গ্রোভের ছবি (পৃঃ ২২১) ছাপা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো একালের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত নয়।

নির্মল দাস
কলকাতা-৫০

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় রাজা রামমোহনের দুই ভৃত্য প্রসঙ্গে শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এক ভৃত্য রামহরি? (রামদাস হবে) যিনি বাগানের কাজে শান্তিনিকেতনে এলেন এবং শান্তিনিকেতনে বাগান তৈরী করলেন। ১৯০১ সালের ১৩ অক্টোবর UNITY AND MINISTER নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'PILGRIMAGE OF SANTINIKETAN OF BOLPUR' শীর্ষক রচনায় ইতিহাস ও বর্ণনাস্থলে যা লিখিত হয়েছে ১৮২৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিবরণে আছে—

.....'মহর্ষিদেব কলকাতার হট্টগোল ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে তাঁবু ফেলে শান্তিনিকেতনের ডাঙ্গায় নির্জন বাসে কাটাতেন। ঐ ডালিম গাছ দুটোর তলা ছিল তাঁর অন্যতম আরাধনার নিকেতন। ক্রমে ক্রমে জমি কেনা হল, গাছপালা পোতা হয়ে একটি বাগান হল। একজন মালী এল এর পরিচর্যায়। মালীর একটু পরিচয় আছে। শান্তিনিকেতনের বাগান যে মালীর হাত দিয়ে—সে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের পরিচারক। তাঁর নাম রামদাস। প্রভুর মৃত্যু হলে সে দেশে আসে এবং বর্ধমানের মহারাজার গোলাপ বাগানে কাজে নিযুক্ত হয়। খবর পেয়ে মহর্ষি তাকে নিয়ে এসে লাগান শান্তিনিকেতনের বাগান তৈরীতে।

UNITY & MINISTER-এর ভাষায়
'It is a noteworthy fact that the Gardener by 'Ramdas', who laid the Shantiniketan Garden had at first been in the employment of Raja Rammohan Roy who took him to England, and after the death of the master he returned to India and was engaged by the Burdwan Maharaj to his famous "Golap-Bag" garden. The Maharshi, whose taste in these matter is princely, had engaged this man for doing good work'.

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

ডাঃ দেবসেনের বিদেশ যাত্রা

মঞ্জীতা দেবসেন লিখিত "ডাঃ দেবসেনের বিদেশ যাত্রা" পড়লাম। এতে তিনি শিশুর ছবিদার পদেদের বিদেশ যাত্রার একটা বাস্তব চিত্র দিয়েছেন জানিয়েছেন। বেশ ভাল লাগল। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে কারো কারো বা কয়েকজনের বিদেশে entry formalites, customs, baggage ঠিক সময়ে না আসা ইত্যাদি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে বলে সকলেরই যে এমন হয় তা হয়ত নয়। বিশেষ কয়েকজনের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। উচিতও নয়।

অভিজ্ঞমহলের মতে বিদেশ যাবার আগে দেশ থেকেই যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন entry permit, medical certificate) ঠিক করে নেওয়া দরকার। গন্তব্য দেশ ছাড়াও মধ্যে কোন দেশে যাবার সম্ভাবনা থাকলে সেই দেশের কনসুলেট বা এমব্যাসির সঙ্গে আগেই সমস্ত নিয়মকানুন জেনে entry permit ইত্যাদি ব্যবস্থা করে নেওয়া দরকার। এছাড়া ভাল ট্রাভেল এজেন্ট-এর মাধ্যমে গেলে এঁরাই প্রায় সব ব্যবস্থা করে দেন। এই ট্রাভেল এজেন্টরা দিনরাত বিদেশ যাত্রীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেন বলে অনেক কিছু জানেন বা আগে থাকতে যাত্রীকে সাবধান করে দেন। এ-সম্পর্কে কয়েকটি মজার ঘটনা বলি—ভাল লাগতে পারে। আমার এক আত্মীয়া একবার তাঁর কন্যার জন্য নিউইয়র্কে কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে যেতে বলেছিলেন। আর একবার আমার এক পরিচিতা ভদ্রমহিলা তাঁর পুত্রের জন্য লণ্ডনে আমসত্ত্ব পাঠাতে চেয়েছিলেন। দুবারই আমার ট্রাভেল

সাপ্টে বন্ধু বারণ করলেন। বললেন নিয়ে নেবেন না। ওদের দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুন খুব কড়া। ফলমূলের বীজ, ফল বা খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে অনেক সময় নানারকম জীবাণু আসে। সেজন্য আইনত ঐসব জিনিস নিয়ে যাওয়া যায় না। তবে অনেকে নিয়ে যায়—কিছু হয় না। তা সত্ত্বেও যা বেআইনী—ধরলে ঝামেলায় পড়তে হবে"। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার এক বন্ধুর কথা। তিনি তাঁর নিউ জার্সি'র বাড়ির পিছনে চাষ করবেন বলে কিছু দেশী শাকসবজীর বীজ নিয়ে যাচ্ছিলেন। নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে কাস্টমস সেটা ধরে এবং তিনি এ নিয়ে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন।

আমেরিকার কাস্টমসের সঙ্গে আমার তিনটি মজার ঘটনা ঘটে তিনবার। একবার ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দরে আমার কিছু হোমিওপ্যাথ গ্লোবিউল ওষুধ নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের জানাই যে ঐ সাদা সাদা ছোট ছোট গুলি গুলি আসলে নির্দোষ হোমিওপ্যাথ ওষুধ। তাঁরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না—যতদূর মনে হয় ভাবছিলেন ওগুলোর মধ্যে LSD বা ঐজাতীয় কোন কিছু আছে। শেষে প্রত্যেকটি শিশি থেকে কিছু কিছু গ্লোবিউল রেখে দিলেন পরে পরীক্ষার জন্য পাঠাবেন বলে। আমার ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিয়ে ছেড়ে দিলেন। অন্য একবার একজোড়া ডুগি তবলা নিয়ে যাচ্ছিলাম নিউ জার্সি'র বাঙালী সংঘ প্রতিষ্ঠানের জন্য। যথারীতি কাস্টমস জানতে চান জিনিসটা কি। জানালাম Indian drums। তিনি আমাকে এখন ওগুলো খুলতে বললেন। বললাম "এটা খোলার জন্য pro-fessional লোক দরকার আমি এটা খুলতে জানি না। তা ছাড়া এটা যদি কোনরকমে খোলা হয়ও আবার যন্ত্রমত বাঁধা বা tune-up করা সম্ভব নয়। ফলে জিনিসটা নষ্ট হবে।" এতে কাস্টমস অফিসার খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি জানালেন যে এগুলো না খুললে তিনি পরীক্ষা করবেন কি করে। আমিও আমার অক্ষমতা ও অসহায় অবস্থার কথা জানালাম। এটা চলল কিছুক্ষণ। এর মধ্যে তিনি একবার ডুগি তবলা দুটি শুঁকছেন, একবার টিপছেন, একবার ঝাঁকাচ্ছেন ইত্যাদি নানাভাবে পরীক্ষা করলেন এবং দেখলেন গাঁজা-চরস জাতীয় কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কিনা। আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে ছেড়ে দিলেন। পাশের যাত্রীরা দেখি আমাদের দুজনের এইসব বেশ কৌতুকের সঙ্গে দেখছেন।

নিউইয়র্ক ঢোকার সময় আর একবার যথারীতি গম্ভীরভাবে কাস্টমস অফিসার আমার জিনিসপত্র দেখতে চাইলেন। দেখে এটা ওটা প্রশ্ন করলেন। তারপর আমার পাসপোর্ট দেখে হঠাৎ জানতে চাইলেন, "আপনি বোলিং গ্রীন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন?" জানালাম "হ্যাঁ"। তারপর দেখি তাঁর গম্ভীরভাব অনেকটা কমে গেল। বললেন, "আমি ঐখানকার প্রাক্তন ছাত্র।' এর পর আমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ গল্প করলেন—বললেন, "ইউনিভার্সিটির দিনগুলি মাঝে মাঝে মনে পড়ে—বেশ ছিলাম।" ইউনিভার্সিটি হকিদল আজকাল কেমন খেলছে, হাউস বারে শনিবার রাত্রে কেমন ভীড় হয়, এখন গ্র্যাজুয়েট ডীন কে ইত্যাদি অনেক কিছু জানতে চাইলেন। বলা বাহুল্য কাস্টমসের কোন ঝামেলা সেবার হল না। অবশ্য আমার কাছেও আপত্তিকর কিছু সেবার ছিল না।

সুকুমার দানা
চুঁচুড়া

কবিতার ছবি

শক্তির কবিতা এবং পূর্ণেন্দুর ছবি। সোনায় সোহাগা। দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র-নন্দলালের পরে আবার এতদিনে কিছুকাল ধরে ইতস্তত কবিতা ও ছবির এই মাথামাথি চোখে পড়ছিল বাংলায়। বিদেশে বেশ পুরনোই। কিন্তু দেশ পত্রিকা তাকে বিশেষ মর্যাদাজনক স্বীকৃতি দিল। এতকাল আমরা বাঙালী গল্পকাররা একচেটিয়া দাপটে এটা ভোগ দখল করছিলাম। ঈষৎ ঈর্ষা হয় বই কি! তাহলেও কবিতা পাঠক হিসেবে যে চাপা অতৃপ্তি ছিল, মিটল। আর শক্তির কবিতার সঙ্গে পূর্ণেন্দুর ছবি কতৃত এক দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতা। শক্তির কবিতার দুর্দান্ত বেগকে তুলির রেখায় স্থিরতা দেওয়া আপাত চিন্তায় দুঃসম্ভব—অথচ দুঃসাহসী পূর্ণেন্দু তাকে ছাঁচবন্দী করে ফেলেছেন। এমন কি শক্তির বাঁকা ও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক হাসিও তাঁর রেখার লক্ষ্যভেদ ঘটিয়েছে। পূর্ণেন্দুর আরেক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

......নিচে নামা গড়াতে গড়াতে যেভাবে পাথর নামে, গাছ নামে, মানুষও নামে/ভয় পেয়ে নয়, শুধু তাড়া আছে বলে ...' পড়ার সময় আবার নতুন করে টের পেলাম দুরন্ত শক্তির দার্শনিক কলজেটি কোন বক্ষ-পঞ্জরে সংলগ্ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ? সম্ভবত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : Robert Lowell-এর 'Near the Ocean কবিতাগুচ্ছের 'Waking Early Sunday Morning' দীর্ঘ কবিতাটি। অন্তত একটি পঙক্তি "উদ্ধৃত করার" লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

'O to break loose, like the chinook|Salmon jumping and falling back|Nosing up to the impossible|stone and bone-crushing waterfall — |Raw-jawed, week-fleshed there, stopped by ten|steps of the roaring ladder, and then|to clear the stop on the last try| alive enough to spawn and die|....' Stop, back off......

এই যন্ত্রণার্ত গ্রহের দুই পিঠের দুই কবি সময়ের একই অনিবার্য পতনে আক্রান্ত হয়েই পতনকে 'গমনে' বিন্যস্ত করেছেন। শক্তির এতদিনকার কবিতায় সেই নিরন্তর গমনকেই পেয়েছি—'to break loose!' এবার পেলাম নতুন এক বোধ—......'নেমে যায়, ধাক্কা খেতে হবে বলে এই ভয়ে/চুরমার হতে হবে এই ভয়ে, থমকে, নেমে পা তুলে দাঁড়ায়/........সম্ভবত শক্তির একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। কিন্তু এ কদাচ নয় লোয়েলের পশ্চাদপসরণ, কিংবা বিট-সুলভ আত্মমোক্ষণ বা স্বমেহন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, 'Near The Ocean'-ও চিত্রিত কবিতার বই। ছবি এঁকেছেন সিডনি নোলান। ক্যাপশানে কবিতার লাইন প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ছবিও অসাধারণ এবং লোয়েলের কবিতাকে এক রহস্যময় শরীর দিয়েছে। কিন্তু নোলানও কবি কি না জানি না, পূর্ণেন্দু তো কবিই। তাই তাঁর তুলি শক্তির কবিতাকে যে-শরীর দিয়েছে, তা আরও মনোমুগ্ধকর।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

সিরাজদ্দৌলা

১৪ জানুয়ারি, '৭৮ তারিখের দেশে শ্রীহরিপদ ভৌমিকের সিরাজদ্দৌলা বিষয়ক আলোচনায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। হরিপদবাবু আমাকে 'একটু কষ্ট করে' নবীন সেনের আমার জীবন পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁকে সবিনয়ে জানাই, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত আমার 'নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতি' গ্রন্থ রচনাকালে আমি কষ্ট করে নয়, সানন্দে নবীনচন্দ্রের সমগ্র রচনা ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা একাধিকবার পড়েছিলাম এবং এখনো পড়ি। আমার দুর্ভাগ্য, আমার চিঠিতে 'কাব্য' কথাটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও হরিপদবাবু নাকি ঐ চিঠি পড়ে বুঝতে পেরেছেন—'নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ ইতিহাস'। অবশ্য আমার সৌভাগ্য এই যে আমার চিঠিতে 'পলাশির যুদ্ধের' সঙ্গেই উল্লিখিত গিরিশ ঘোষের ও শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক দুটিকেও তিনি ইতিহাস বলে ধরে নেননি। যা হোক, কেন যে চিঠিতে ঐ কাব্য ও নাটকের উল্লেখ করেছিলাম, তা হরিপদবাবু ধরতে পারেননি বলে আবার একটু বিশদভাবে বলছি। প্রসঙ্গটি ছিল সিরাজের ব্যক্তিচরিত্র অঙ্কন নিয়ে। বহু পূর্বে (১৮৭৫ সালে) মার্শমেন প্রভৃতি ইংরেজ লেখকের সম্পূর্ণ ইতিহাস অবলম্বনে নবীন সেন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজ-চরিত্র কলঙ্কিতভাবে অঙ্কনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৮৯৭ গ্রন্থে। আবার গিরিশ ঘোষ (১৯০৬ সালে) এবং শচীন সেনগুপ্ত (১৯৩৮ সালে) অক্ষয় মৈত্রেয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকদ্বয়ে সিরাজকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। ঐ কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই ভার-সাম্যের অভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য লক্ষণীয়।

"The portrait of Siraj, depicted as a villain by poet Nabinchandra Sen in his work Palasir Yuddha is as exaggerated, as that of the historian Akshoy Kumar Maitra and the dramatist Girish Chandra Ghosh who depicted him as a patriotic and noble monarch." (History of Mediaeval Bengal, P. 118.

হরিপদবাবু অক্ষয় মৈত্রেয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাটুকু উদ্ধৃত করার আগেই আমার চিঠিতে আমি বলে-ছিলাম, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের সপ্রশংস সমালোচনা করেও রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মশাইএর সিরাজ-চরিত্র উপ-স্থাপনা সম্পর্কে কিছু সংশয়সূচক মন্তব্য করেছিলেন এবং তা উদ্ধৃতও করে দিয়েছিলাম। হরিপদবাবু সেই মন্তব্য সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। অপরদিকে তাঁর চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ থেকেই এমন একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যা সিরাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই সিরাজের ইংরেজ-বিরোধিতা সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করে থাকেন। সে তো সিরাজ-চরিত্রের রাজনৈতিক দিক।

কিন্তু প্রথম থেকেই হরিপদবাবুর মূল আলোচ্য তো ছিল সিরাজের ব্যক্তিগত চরিত্র, যার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে বলে তিনি 'বাংলার ইতিহাস' রচয়িতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্য ও মন্তব্যে আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন, এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভিত্তি করেছিলেন অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা'। মৈত্রেয় মশাই-এর সিরাজ-চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পর্কে শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায় ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু প্রতিকূল মন্তব্য আমি উদ্ধৃত করেছিলাম, সে সম্পর্কেও হরিপদবাবু নীরব থেকে গেছেন। এবারে ডঃ রমেশ মজুমদারের মন্তব্যও যোগ করলাম। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল সরকারের 'ইংরেজের জয়' গ্রন্থটি কি কখনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বলে গৃহীত হয়েছিল? বরং পরের বছরে (১৮৯৭) প্রকাশিত অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা'ই ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছিল বেশী, যদিও দুটিরই মূল বক্তব্য এক। কিন্তু মনে রাখতে হবে—সিরাজ-চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা সেখানেই থেমে যায়নি, অগ্রসর হয়েছে ইদানীংকাল পর্যন্ত পুরাতন তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্য-সম্ভার নিয়ে। পক্ষ-প্রতিপক্ষ অনুকূল-প্রতিকূল উভয় তরফের সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে সিদ্ধান্তে আসা অন্যতম ঐতিহাসিক রীতি ও পদ্ধতি। সুতরাং সিরাজের শত্রুপক্ষের স্তূপীকৃত সাক্ষ্যই একমাত্র সম্বল না করে সিরাজের বন্ধুস্থানীয় কারো সাক্ষ্য ভিত্তি করে সিরাজ-চরিত্রের সত্যরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা ইংরেজ বা ভারতবাসী যিনিই করুন, তাঁকে সাধুবাদ দিতে হবে। সেই হিসাবে Monsieur Jean Law. যাঁর সম্পর্কে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন—

"a gentleman who was prepared to risk his own life in

..der to defend Siraj against the English troops".

..র বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়, যদিও তা ..রাজের অনুকূলে যায়নি বলে হরি-..দবাবু ক্ষুব্ধ। তাঁর মন্তব্য থেকে ..নে হয়—পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ..ত্যতা যাচাই না করেই মঁসিয়ে ল-র ..নামা কিম্বদন্তী' (?) অবলম্বন করেই চলেছেন। আমার চিঠিতে আমি সিরাজ-চরিত্র সম্পর্কে ডঃ যদুনাথ সরকার ও ডঃ রমেশ মজুমদারের যে দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম তাঁতে মঁসিয়ে ল-র সাক্ষ্যই ছিল প্রধান। হরিপদবাবু কি মনে করেন—এই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-দ্বয় নির্বিচারে ল-র সাক্ষ্যকে ভিত্তি করেছিলেন? যদি তাই হয় তবে তিনি সেই উদ্ধৃত মন্তব্যদুটি সম্পর্কে মৌন থেকে গেলেন কেন? সত্যসন্ধীর দৃঢ়তা নিয়ে বলতে পারতেন—তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। হরিপদবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁকে আমি কার কথা গ্রহণ করতে বলবো। আমার অনুরোধ — সিরাজের ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে প্রায় আশী বছর পূর্বে প্রকাশিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই চরম ..লে আঁকড়ে ধরে না থেকে পরবর্তী ..কালের সুধী ঐতিহাসিকদের গবেষণা-..লব্ধ সিদ্ধান্ত ও বিবেচনা করে দেখুন, ..গ্রহণযোগ্য মনে না হলে যুক্তি ও তথ্য ..দিয়ে নাকচ করে দিন। আর সেই ..জন্যেই ডঃ যদুনাথ সরকারের History of Bengal, Vol. II, ..ডঃ রমেশ মজুমদারের History of Mediaeval Bengal, ..ডঃ কালীকিঙ্কর দত্তের Siraj-ud-Daulah তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ..পলাশির যুদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ ..পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

..সুবোধরঞ্জন রায়
..দার্জিলিং।

অজয় ভট্টাচার্য

দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৪-এ ..দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত চাঁদ ..রহে, চামেলি সো প্রবন্ধে অজয়কুমার ..ভট্টাচার্য সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে ..(৩৬ পৃষ্ঠা)

"ঈশ্বর পাঠশালার অতি মেধাবী ছাত্র অজয়কুমার। এখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পান। পরে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এ-তে ৩১তম স্থান। এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ..হলেন।"

এই প্রসঙ্গে জানাইতেছি—ঐ অংশে ..কয় তথ্যগত ভুল আছে। অজয়কুমার ভট্টাচার্য ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা হইতে ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই-এ নয়—আই এস-সি পাশ করিয়া-ছিলেন, স্থান ৭২তম (72nd) ..সংলার লেটার (V) দ্রষ্টব্য।

The Calendar for the year 1924 Calcutta University Part II Supplement 1925 & 1926. Page 238, I.Sc. Result 1925 First Division.

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অজয়কুমার ভট্টাচার্য বাংলায় এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ হইয়াছিলেন—প্রথম ..হে। দ্রষ্টব্য

The Calcutta Gazette, October 10, 1929 Part IB (Educational).

নির্মল চন্দ্র নিয়োগী
কলকাতা-৩৩

বিজ্ঞান

৩রা ডিসেম্বরের 'দেশ' সংখ্যায় 'বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয় লিখেছেন যে ইনস্যুলিনের অভাবে ডায়াবেটিজ বা বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে ডায়াবেটিজ রোগ দু-রকম—১। ডায়াবেটিজ ইনসিপিডাস (Diabetes insipidus) বা বহুমূত্র রোগ এবং ২। ডায়াবিটিজ মেলিটাস (Diabetes mellitus) বা মধুমেহ রোগ। পশ্চাৎ পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে অ্যান্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন (Antidiuretic hormone) এর নিঃসরণ ব্যাহত হলে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়, ইনস্যুলিনের অভাবে নয়। আর অগ্নাশয়ের ল্যাংগারহান্স কোষপুঞ্জের বিটা কোষ থেকে ইনস্যুলিনের ক্ষরণ ব্যাহত হলে যে রোগের উৎপত্তি ঘটে তাহা হল মধুমেহ রোগ বা ডায়াবিটিজ মেলিটাস।

অঞ্জনকুমার পাল
কলকাতা

আশাপূর্ণা

আশাপূর্ণা দেবীর ওপর নবনীতা দেবসেনের লেখাটি পড়ে ভালো লাগল। আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য কৃতিত্বকে নেহাত মেয়েলী ও অনাধুনিক পর্যায়ে ঠেলে ফেলে রাখার প্রবণতা অনেক তথাকথিত বিদগ্ধজনের মধ্যেই লক্ষ করেছি।

শ্রীমতী দেবসেনের সঙ্গে আমিও একমত যে চরিত্রের তথাকথিত 'বিচ্ছিন্নতা' যদি আধুনিকতার লক্ষণ হয় তবে আশাপূর্ণা দেবী নিশ্চয়ই আধুনিক। তাছাড়া যে জীবন-জিজ্ঞাসা, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি অথচ সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি থাকলে সাহিত্যকে আধুনিক বলা যায় আশাপূর্ণা দেবীর রচনাতে তো তা যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত। আধুনিকতা তো শুধু বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনাভঙ্গি ও ভাষা যথেষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন নয় একথাও অনেকে বলে থাকেন। আমার তো মনে হয় যে তাঁর অনর্থক বাগাড়ম্বর ও বাকচাতুরী নেই, রচনাভঙ্গীতে চেষ্টাকৃত ধোঁয়াটে ভাব নেই—এগুলো তাঁর রচনাভঙ্গির গুণ, দোষ নয়।

মীরা বালসুব্রহ্মনিয়ম
কলিকাতা-২৯

মুখোশ ও ছো নাচ

বিগত ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৮ সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে শ্রীরাজকল্যাণ চেল লিখিত 'মুখোশ' ও ছোনাচ' শিরোনামায় এক পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে 'বাগমুণ্ডি ও চোঁড়িদা কোনওখানেই ছো-নাচের উদ্ভব-ভূমি নয়।' এই বিষয়ে তিনি একটিমাত্র যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা এই যে, 'ভাষাগতভাবে ছো-শব্দটি উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জিলা ও তার পাশাপাশি কয়েকটি স্থানে প্রচলিত। কিন্তু এই কথা যদি সত্য হইত, তবে ময়ূরভঞ্জের নৃত্যকে ছো-নৃত্যই বলিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ময়ূরভঞ্জের সর্বত্র এবং উড়িষ্যায় সরকারীভাবেও এই নৃত্যকে ছৌ নৃত্য বলা হয়, কদাচ কিংবা কোথাও ছো নৃত্য নয়। এই সম্পর্কে উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জের অধিবাসী নৃত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীজীবন পাণি লিখিত Chhau Theatre in Eastern India (স্মারক গ্রন্থ তৃতীয় পূর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ভুবনেশ্বর, ১৯৭৬—উড়িষ্যা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত- এবং 'মার্গ' পত্রিকার (বোমবাই, ১৯৬৮) 'ছৌ' বিশেষ সংখ্যায় শ্রীসুনীল কোঠারী রচিত "Chhau Dance of Purulia" প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ময়ূরভঞ্জের বারিপদাতে এই নৃত্যের অনুশীলনের জন্য সরকারী সাহায্যে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত আছে, তাহার নাম 'ময়ূরভঞ্জ ছৌ নৃত্য প্রতিষ্ঠান'। সেরাইকেলায় মহারাজকুমার সেরাই-কেলায় এই নৃত্য বিষয়ে যে প্রামাণ্য গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম Chhau (১৯৭৩)। ছৌ নৃত্যের উদ্ভব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের দাবি যে উপেক্ষণীয় নহে, সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত Chhau Dance of Purulia গ্রন্থখানির The Origin of Chhau Dance অধ্যায়টিও দ্রষ্টব্য। পুরুলিয়া জিলায় শব্দটির উচ্চারণ কোথাও ছৌ কোথাও ছো,, কোথাও ছ'।

আশুতোষ ভট্টাচার্য কলকাতা-৩৪

পুরুলিয়া

৭ই জানুয়ারি, '৭৮ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপার্থসারথি চৌধুরীর 'পুরুলিয়া—বঙ্গের ঘরে সাবালক' নিবন্ধটি পড়ে সবিশেষ আনন্দ পেলাম।

বস্তুত পুরুলিয়া বঙ্গের ঘরে পুনর্জন্মলাভ করে বয়সের হিসেবে সম্প্রতি সাবালকত্ব অর্জন করেছে সত্য, কিন্তু তার যৌবন এখনও বিলম্বিত, সেটা অপুষ্টি এবং উপেক্ষাজনিত কারণে। তাছাড়া এই রুগ্ণ ভূখণ্ডের উপর তথাকথিত গবেষকদের অপরিসীম উৎসাহও অপর একটি বিড়ম্বনা।

বাংলায় এবং বাইরের বহু তথা-কথিত নৃতাত্ত্বিক-ভূতাত্ত্বিক-সমাজ-তাত্ত্বিক এবং অন্যান্যরা পুরুলিয়াকে গবেষণায় গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করছেন।

পুরুলিয়া নিয়ে যারা যথার্থই গবেষণা করেছেন, আমরা, পুরুলিয়া-বাসীরা, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু এই-রূপ গবেষকদের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে অল্প।

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত
সাকতোড়িয়া, বর্ধমান

প্রকাশিত হল

রূপদর্শীর

রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য দাম ৮.০০

'রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য' আসলে রূপদর্শী কমিশনের রিপোর্ট। এই কমিশন কোনও সরকার-নিযুক্ত নয়, মানবতা ও বিবেকবোধ-নিযুক্ত। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান নয় এই কমিশনের বিচার্য ; এর বিচার্য আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত—দেশব্যাপী সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। গত আট-ন' বছর থেকেই এর রিপোর্টগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সমকালীন রাজনীতিতে ইদানীং কালে যে অকল্পনীয় ভণ্ডামি, অসাধুতা এবং অনাচারের তাণ্ডব চলেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে নির্ভীক সাংবাদিক-লেখক রূপদর্শী সেগুলির বীভৎস নগ্ন রূপ পাঠকসাধারণের কাছে উন্মোচন করে আসছেন তাঁর এই অনবদ্য রচনাগুলির মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় এগুলিই সম্ভবত সর্বপ্রথম সার্থক রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-রচনার সূত্রপাত ঘটায়। উপরন্তু, এর কোনও-কোনও-টিতে ভবিষ্যৎ এমনভাবে আভাসিত হয়েছে যে, তা শুধু পরম বিস্ময়করই নয়, দূরপ্রসারী লক্ষ্যও। বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে প্রসারিত হওয়ার এই যে ক্ষমতা—একেই বলে কাল-জয়িতা। 'রূপদর্শীর সংবাদ-ভাষ্য' নিঃসন্দেহে সে গুণে গুণবান ॥

এই লেখকের আর একটি বই :

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬.০০

কয়েকটি উপন্যাস

গৌরকিশোর ঘোষের

আমরা যেখানে

দাম ৫.০০

প্রতিভা বসুর

বেলা-অবেলার গান

দাম ৬.০০

সুবোধ ঘোষের

বাসরদত্তা

দাম ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহর

খেলা যখন

দাম ৬.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

একা এবং কয়েকজন

দাম ৩০.০০

সমরেশ বসুর

মানুষ শক্তির উৎস

দাম ৮.০০

রমাপদ চৌধুরীর

অ্যালবামে কয়েকটি ছবি

দাম ৫.০০

বিমল করের

সান্নিধ্য

দাম ৫.০০

দিব্যেন্দু পালিতের

সন্নিকর্ষণ

দাম ৪.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

পারাপার

দাম ১২.০০

মতি নন্দীর

দুঃখের বা সুখের জন্য

দাম ৫.০০

বিমল মিত্রের

রাজা বদল

দাম ৭.০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

গল্প-সংকলন

লোকরহস্য দাম ৫.০০

'লোকরহস্য' এক দক্ষ চিত্রীর সযত্ননির্বাচিত চিত্ররাজির এক অমূল্য অ্যালবাম যেন। বর্ণময় পরিপ্রেক্ষিতের ভূমিকাহীন স্বল্প কিছু রেখার টানে সুপরিস্ফুট এবং দীপ্ত কয়েকটি অনুপম রেখাচিত্রের অ্যালবাম ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

অনুবাদ-উপন্যাস

প্রেম দাম ৫.০০

'প্রেম' একটি পূর্ণযুবতী বিবাহিতা মেয়ের উদ্দাম অবৈধ প্রেমের গল্প। নিকোলাই সেমোনোভিচ লেসকফ-এর এই ভয়ংকর-সুন্দর প্রেমের কাহিনীটি বিশ্বসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সূর্যসাক্ষী দাম ২০.০০

বিচিত্র মানসিকতার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল সুবৃহৎ উপন্যাস 'সূর্যসাক্ষী'তে লেখক তাঁর গভীর উপলব্ধির সঙ্গে ন্যায়-নীতি মূল্যবোধের কয়েকটি জটিল জিজ্ঞাসা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন ॥

সুশীল রায়ের

যুগল-কাহিনী

সামান্য-অসামান্য

দাম ৫.০০

সামান্য দুটি রমণী—জন্ম এবং জীবন যাদের মর্যাদাময় ছিল না, বরঞ্চ পাতিত্য এবং বহুবল্লভতার গ্লানিতে ছিল ঘৃণ্য, তাদের অসামান্যতার মর্মদাহী জীবনসংগীত ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন [illegible]

কয়েকটি উপন্যাস

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিশীথ ফেরী

দাম ৫.০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

দিনরাতের খেলা

দাম ১০.০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সাক্ষী বালুচর

দাম ৪.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

আঁধার পেরিয়ে

দাম ৩.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

দেহ নয় মন

দাম ৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

গাছের পাতা নীল

দাম ১০.০০

বুদ্ধদেব বসুর

বিপন্ন বিস্ময়

দাম ৮.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

ঝড়

দাম ৮.০০

শংকর-এর

বোধোদয়

দাম ৭.০০

বনফুল-এর

অসংলগ্না

দাম ৪.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নুনের পুতুল সাগরে

দাম ১০.০০

রেবন্ত গোস্বামীর

কিশোর-উপন্যাস

অরুমিতুদের কথা

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রকাশিত হল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রচনাবলী

শরদিন্দু অম্নিবাস

অষ্টম খণ্ড ॥ দাম ২৫.০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'বিষের ধে —যার হিন্দী চিত্ররূপ 'ভা লেখককে সিনেমা-জগতে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং বো সিনেমা-জগতে লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা 'ছায়াপথি উপন্যাস দুটি সহ মাত্র প দিনে লেখা পেশাদার রঙ্গ অভিনীত ও গ্রামোফোন রেকর্ডে রূপায়িত কৌতুব নাট্য 'ডিটেকটিভ' ও তিন বিখ্যাত চিত্রনাট্য 'পথ বে দিল', 'অভিসার' এবং 'য যুগে' 'শরদিন্দু অম্নিবা এর অষ্টম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এ রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য হল এগুলি সবা সামাজিক কাহিনী। ইতিহাস... ও ব্যোমকে কাহিনীর রচয়িতা হিসে যিনি সমধিক জনপ্রিয়, ত অন্যতর এক সাহিত্যিক পরিচয়—সম্ভবত শ্রেষ্ঠতর পরিচয়—এই কাহিনীগুলি উদ্ভাসিত ॥

'শরদিন্দু অম্নিবাস'-এর অন্যান্য খণ্ড :

প্রথম খণ্ড ২৫.০০ দ্বিতী খণ্ড ৩০.০০ তৃতীয় খণ্ ৩০.০০ চতুর্থ খণ্ড ২০. পঞ্চম খণ্ড ২৫.০০ ষষ্ঠ ২৫.০০ সপ্তম খণ্ড ৩০.

৪৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যা
২১ মাঘ ১৩৮৪

পত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

নারায়ণ দত্তর প্রবন্ধ
ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি
সমীর রক্ষিতের গল্প
কালান্তর
মিহির মুখোপাধ্যায়ের গল্প
দেয়পুর

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

বিশ্বকল্যাণে সৌরশক্তির প্রয়োগ

প্রাচীন ভারতের সাধকীয় উপলব্ধির বাণীতে, এবং কাব্যিক অনুভূতিরও বাণীতে আকাশের ওই সূর্যকে শুধু-এক মহান বিস্ময়ের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন বলে নয়, নিখিল জীবনের প্রাণাধার বলে বন্দিত হয়েছে। আধুনিকতম বিজ্ঞানীও অবশ্য স্বীকার করবেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সেই বাণী বস্তুতত্ত্বের প্রত্যক্ষ গবেষণার কোন সিদ্ধান্তের কথা না হয়েও একটুও অতিশয়োক্তি অথবা অবাস্তব ধারণার বাণী নয়। নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনশত বিদেশী বিজ্ঞানী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আলোচনা ও বিবেচনার যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে, সে অনুষ্ঠান যেন সৌরশক্তিকে বিশ্ব-জীবনের একটি আত্যন্তিক মহদভীষ্টের জন্য আবাহন। আজ পর্যন্ত মানবীয় প্রয়োজনে স্বার্থে ও কল্যাণে যে-সব পদার্থ ও বস্তুসত্য 'শক্তি' হিসাবে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, তারা তাদের প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অফুরান মেয়াদ বহন করে না। তারা এক-একটি সীমিত সম্বল কাঠ, কয়লা, পেট্রল, বিদ্যুৎ ও পরমাণু-শক্তি; সবারই পরিণাম তাদের পরিমাণের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বিধৃত। জীব-জীবনের জন্য উত্তাপের যোগান দেবার কর্তব্যে এদের ভূমিকা চিরকালীন সত্য নয়। কিন্তু মানবীয় ভবিষ্যতের এই উদ্বেগ আজই প্রশমিত হতে পারে, যদি সূর্যের উত্তাপ বিদ্যু-শক্তির মত যান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা মজুদ করে রাখবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞানীর আগ্রহ সৌরশক্তিকে এইরকম প্রযত্নে আশ্রিত করে রাখবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যবহারিক সৌরশক্তি মানবীয় ভবিষ্যতের জন্য অভিনব কল্যাণের উপহার নিয়ে একদিন সর্বজনীন সমানাধিকারের সম্পদে পরিণত হবে।

পরিবেশের বিকার মানবীয় আয়ু স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির নিরাপত্তাকে ব্যথিত ও বিচলিত করে যে কঠোর সমস্যা সৃষ্টি করেছে, সৌরশক্তি জনজীবনের প্রয়োজনে উত্তাপের সম্বল হিসাবে ব্যবহারিক প্রয়োগের অনুগত হলে সেই সমস্যার ভয়ালতা দূরীভূত হবে। বলা চলে, সমস্যাই প্রতিহত হয়ে ফুরিয়ে যাবে। সৌরশক্তি মানবীয় প্রয়োজনে শক্তি ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হলে পরিবেশ দূষিত হবে না। জল-বাতাস কলুষিত হবে না। যেদিন আদিম মানুষের আদিম বিজ্ঞান-বুদ্ধি আগুন জ্বালতে শিখে কাঁচা মাংসকে পুড়িয়ে খাওয়ার সভ্য সংস্কারের প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল, সেদিন পোড়া কাঠের ধোঁয়ায় পৃথিবীর শুদ্ধ বাতাসের মধ্যে প্রথম বিকার সঞ্চারিত হয়েছিল। তারপর থেকে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পরিবেশের বিকার ক্রমেই বেড়েছে এবং ভয়াবহ প্রকারও পেয়েছে। নদীজল তো বটেই, সমুদ্র জলেরও শুদ্ধতা বিনষ্ট হতে চলেছে। সহরের জীবন এবং কারখানা-সঙ্কুল বাণিজ্যিক পৃথিবীর জীবন প্রত্যহ যে বিপুল পরিমাণের রাসায়নিক ক্লেদ নদীজল ও সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে চলেছে, তার সমূহ পরিণাম হিসাবে জীব-জীবনের প্রাকৃতিক সৌষ্ঠব এবং প্রাণেরই স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদারুণ এক বিপর্যয় সম্ভাবিত হতে চলেছে। সৌরশক্তি যদি মানবিক প্রয়োজনে প্রধান শক্তির ইন্ধন হয়, তবে এই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থেকে বিশ্বের বিপন্ন ভাগ্য পরিত্রাণ লাভ করবে। মানুষের ইতিহাসের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রসন্নতায় নিশ্চিন্ত হবার যুক্তি এই যে, সূর্যের শক্তি অফুরাণ।

বিশ্বের রাজনৈতিক মেজাজ এবং ভৌগোলিক মানচিত্রের চেহারা যে বিশেষ একটি ঘটনায় বার বার উত্তেজিত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে, সেটা মানব জাতির পক্ষে একটি স্বস্তিহীন দুশ্চিন্তার হেতু হয়েছে। পেট্রলিয়াম বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌভাগ্যেরর দান। সব দেশে এই ইন্ধন নেই, অথচ সব দেশেরই জনজীবনের প্রয়োজনে এই ইন্ধনের অবাধ সরবরাহ কামনা করা হয়ে থাকে। বিচার ও তুলনা করলে এ সত্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজের জীবন যেন এক ভাগ্য-বৈষম্য খণ্ডিত হয়ে আছে। যাদের আছে তারা ভাল আছে, যাদের নেই তারা বড়ই বিপন্ন বোধ করে থাকেন। তেল-প্রধান ক্ষুদ্র দেশও এক্ষেত্রে অন্য বৃহৎ দেশের শিল্পশক্তি বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার প্রশস্ত স্বাচ্ছন্দ্যে দুঃসহ এক অচলতা ঘটিয়ে দিতে পারেন। আরবীয় তৈল নিয়ে বাদ-বিসম্বাদের আন্তর্জাতিক কোলাহল মাঝে মাঝে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা মুখরিত করেছে। সৌরশক্তি মানবীয় সংসারের ব্যবহারিক শক্তির ও জ্বালানির প্রধান সম্বল হলে পেট্রলের গরবে গরবিত জাতিক অথবা আঞ্চলিক কোন অহমিকা রাজনীতিক অশান্তি ঘটাবার সুযোগ পাবে না। ঘটাবার প্রয়োজনই হবে না।

সৌরশক্তির পক্ষে কোন জাতির বিজ্ঞানবুদ্ধির কাছে একচেটিয়া সম্বল হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং উপলব্ধি করতে হয় যে সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্বজীবনে সুপ্রচলিত হলে মানুষ জাতির নৈতিক প্রকৃতির ভাগ্যটাও নতুন এক উৎকর্ষের শুভ সংস্পর্শে নতুন রূপ লাভ করবে। 'দেব অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে, নাহি চাহে মন মোর তাহে নিন্দিবারে, তরুরাজ!' কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বটবৃক্ষের বন্দনায় যে কথা বলেছেন, সে কথা লক্ষ গুণ বাড়িয়ে আকাশের সূর্য সম্পর্কে বলা যায়। সূর্যের উত্তাপ বস্তুত পরম এক 'স্নেহরস', যার দ্বারা অভিষিক্ত হতে পেরেছে বলেই বসুন্ধরা সুন্দর হতে পেরেছে। ভবিষ্যতের সেই অবধারিত কৃতিত্বের দিনে সাধারণের কাছে সেই আনন্দ দেবে, এখন শুধু আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে যে আনন্দ প্রত্যক্ষীভূত হয়ে থাকে।

জনতা পার্টি

কজন আধুনিক
বদেশীর চোখে
ারতবর্ষ 'অন্যরকম'

দবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

প্রতীচীর কাছে আমরা যে শুধু আধুনিকতার দীক্ষাই পেয়েছি, এ কথা সত
য়; সেই সঙ্গে পেয়েছি আরো একটা জিনিস, খুব বড়ো জিনিস : আত্মপরিচয়।
ই পরিচয় আমাদের কখনো কখনো খর্ব করেছে সত্য, কিন্তু গর্ব করবার সামগ্রীও
য়তে পেয়েছি প্রচুর। দুটোই আমাদের জানা দরকার; কারণ নিজের সত্য পরিচয়
জের চোখে সব সময় ধরা পড়ে না; তার জন্য দূরত্ব প্রয়োজন; ভৌগোলিক
বং মানসিক, দুই-ই। এই জন্যই মাঝে মাঝে প্রতীচীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে
খবার প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন : নতুন করে আত্মপরিচয়।

এমনই একজন দ্রষ্টা—আধুনিক এবং পাশ্চাত্য : মাক্সিমিলিয়ান ফন রূগিস্টর।
ধশতকের পরের দশকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই বিদগ্ধ এবং বিশিষ্ট জর্মন
র্যটক। রবীন্দ্রনাথের গোরার মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন একটি "সত্য" ভারত-
র্ষের অস্তিত্বে। সেই সত্য ভারতবর্ষ আধুনিক নয়, প্রাচীন। সেই "প্রাচীন
ারতের আত্মা"র (der alt indische Geist) অন্বেষণই তাঁর ভারতবর্ষে
াগমনের মূল প্রবর্তনা। হের রূগিস্টের-এর দৃঢ় বিশ্বাস—"প্রাচীন ভারতের আত্মা"
াজও বিদ্যমান, যদিও তার অস্তিত্ব আধুনিক ভারতে প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যক্ষ না
লেও, তা অন্তর্হিত হয়নি; প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এবং আছে, বলেই ভারতবর্ষ
াজও মরেনি; আর যদি না থাকতো, যদি ঐ "প্রাচীন ভারতের আত্মা" সম্পূর্ণ
ুপ্ত হয়ে যেতো। তা হলে হাজার উন্নতি এবং ঐহিক অভ্যুদয় ঘটলেও সত্য
ারতবর্ষের মৃত্যু হত। তার জায়গায় সৃষ্টি হত অন্য এক দেশ, যা শুধু নামেই
ারতবর্ষ ; আসলে প্রতীচীরই এক প্রত্যন্ত।

নিজের সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয়, সম্পূর্ণ "অন্য রকম" একটি প্রাচীন সভ্যতা
িনি সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ভারত-
রিক্রমায়। সেই সাক্ষাৎ পরিচয়েরই বৃত্তান্ত : "ভারতবর্ষ অন্য রকম" (Indien
t Anders)। পৃথুলায়তন (৫০০ পৃষ্ঠার বেশি), বিচিত্র—কখনো কখনো রোম-
র্ষক—ঘটনার সন্নিবেশে উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থটি ১৯৬৬তে প্রকাশিত
লেও, ইংরেজী ভাষায় আজও অনূদিত হয়নি। ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সাম্প্রতিক

র রূগিস্টের-এর গুলিতে নিহত লাংড়া শের-এর মৃতদেহ

ালে অনেকেই লিখেছেন; তার মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনার ভাষা ইংরেজী নয়,
র্মন কিংবা ফরাসী। কিছু কিছু ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে; কিছু আজও
য়নি; যেমন এই "ইন্ডিন্ ইশ্ট্ আণ্ডের্স।"

॥ ২ ॥

বোম্বাই-পদার্পণের কিছু দিন পরেই একটা জিনিস হের র (=রূগিস্টর) ঠেকে
খেছিলেন। সেটা এই : তাঁর ভারত-ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্যটি যত্র তত্র প্রকাশ্য নয়;
রণ, উপহসিত হবার সম্ভাবনা। "যোগ" এবং "যোগী"দের সম্পর্কে তাঁর তীব্র
সুক্য তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন,
ই প্রসঙ্গটি উঠলেই এ'রা হয় এড়িয়ে যান, নয় হেসে উড়িয়ে দেন। উপর্যুপরি
রকটি অভিজ্ঞতা থেকে বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর নব্য-ভারত-পরিক্রমার
ঙ্গী যাঁরা—সেই শিক্ষিত, সপ্রতিভ, সাম্প্রত্য-দৃপ্ত তরুণ ভ্রমণ সহচরগণ—
রা এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে অসমর্থ; শুভার্থীরূপে অনেকেই তাঁকে
র্ক করে দিয়েছেন, বার বার অনুরোধ করেছেন এই মরীচিকার ব্যর্থ অনুসরণ
ক বিরত হতে।

স্বভাবতই অতঃপর র তাঁর হৃদগত অভিপ্রায় চট করে কাউকে খুলে বলতেন
না; ভ্রমণ সহচরগণের অভিলষিত বিষয়েই আলাপ করতেন সাধারণত। এখানে
বলা দরকার, যে কোনো বিষয়েই তিনি আলাপ করতে প্রস্তুত ছিলেন, সবতাই তাঁর
সমান দক্ষতা, এবং প্রতীচীসুলভ ঔৎসুক্য। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে কপটতার
লেশমাত্র ছিল না। কারণ, এই বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে আধুনিক প্রতীচীর চিত্ত-

পর্বত শীর্ষে প্রার্থনা পতাকা। ভোরের আবছা আলোয় দূরে তিব্বত দেখা যাচ্ছে

প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান : মানবজীবন এবং বিশ্ব ব্যাপারের
সর্বত্র মুক্ত চিত্তের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার।

গ্রন্থের বেশ বড়ো একটা অংশ জুড়ে আছে শিকার-কাহিনী। লেখক মধ্যপ্রদেশ
এবং মহারাষ্ট্রের দুর্গম অরণ্যে অসামান্য সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে শিকার করে-
ছিলেন একটি নয়, তিনটি দুর্ধর্ষ বাঘ। একটু অসতর্ক বা অপটু হলে মৃত্যু
হতে পারতো। শিকারী হিসেবে তাঁর দক্ষতা দেখাবার জন্য তিনি এটা করেননি,
ত্রস্ত, শরণাগত গ্রামবাসীদের ত্রাণ করবার জনাই তীর্থযাত্রার মাঝে মাঝে এই
যোদ্ধৃবেশে অবতরণ। তাছাড়া, একটি দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে আছে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য
অরণ্যে আদিবাসীদের সঙ্গে দিনের পর দিন যাপন, তাদেরই একজন হয়ে।

তথ্যগুলি উল্লিখিত হল এইটা দেখাবার জন্যে, যে এই জর্মন পর্যটক প্রতীচীর
প্রতি বীতশ্রদ্ধ, প্রাচী এবং প্রাচীনের প্রতি অহেতুক মোহগ্রস্ত—এবং সেই সঙ্গে
হয়তো কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত এবং অপ্রকৃতিস্থ—ছন্নমতি একজন ভবঘুরে নন ; একজন
সুস্থ, স্বাভাবিক, আধুনিক মানসতা—এবং মনীষা-সম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ। তা যদি
না হত, তাহলে পুরাতনের প্রতি এই আত্যন্তিক অনুরক্তি অন্ধভক্তি—এবং অজ্ঞতা-
প্রসূত বলে আমাদের অনেকের কাছে উপহসিত হত।

প্রাচীন ভারতের প্রতি আধুনিক প্রতীচীর এই আগ্রহ আজ এ দেশে অনেকের
কাছেই দেশকালে দূরবর্তীর প্রতি মানুষের সহজাত মোহ বলে ঈষৎ উপহসিত।
এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন দেশে সদ্যোলব্ধ
আধুনিকতা সম্পর্কে মোহ এবং মত্ততা—দুই-ই অত্যন্ত প্রবল। অথচ, মজা হচ্ছে
এই যে, আধুনিকতার জন্মভূমি যে প্রতীচী, সেখানে সাম্প্রত্য-প্রীতি এতটা উগ্র
এবং উদ্ধত নয়। নবাস্বাদিত বলেই বোধ হয় আধুনিকতার রস আমাদের কাছে,
এমন মাদকতাময়।

তা হোক, তাতে ক্ষতি নেই ; আর লাভ যে প্রচুর তা তো প্রাত্যহিক জীবনে

প্যারেড-এ পাবেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোন ও ডিটারজেন্টে কাপড় ধোয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে তার "পি এইচ লেভেল"-এর ওপর :

কিছু ডিটারজেন্ট এতো নরম হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।	অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো খস্খসে হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।	নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটা খুব নরমও নয় আবার খুব খস্খসেও নয়। এই ডিটারজেন্ট সঠিক ও গুণাগুণসম্পূর্ণ।

SUPER DETERGENT WASHING POWDER

NEW Parade

THE IDEALLY BALANCED FORMULATION
■ WASHES WHITEST AND BRIGHTEST
■ PROTECTS CLOTHES

Godrej

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় দারুণ সাদা, দারুণ উজ্জ্বল করে।

আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর যে বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা কখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ঘন ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।

ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, ক্ষার জল বা পরিষ্কার জল সব জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ঘন ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যার ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

বিনামূল্যে !

৫০ গ্রাম সিন্থল—
২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে
৭০ গ্রাম সিন্থল—
৭০০ গ্রাম ও ১০০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে

শুভ্রতা ও ঝলক্, চোখের পড়েনা পলক্
—নতুন প্যারেড-এর চমক্

CHAITRA-G-17 BEN

দর্শন্য এবং সর্বত্র প্রকট। ভুলটা হয় তখনই, যখন আমরা ধরে নিই, আমাদের আধুনিকতার কাঁকালাতা পাশ্চাত্যের মানুষকে চমৎকৃত করে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় হল "গুরু-মারা" বিদ্যে।

আমাদের এই ধারণা যে কত বড়ো ভুল, কত বড়ো মূঢ়তা, সেটা বোঝবার জন্যে এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। গুরু-মারা বিদ্যে দিয়ে যে কখনো কখনো গুরুকে তাক লাগানো যায় না তা নয়, কিন্তু তার জন্য দরকার ঐ বিদ্যায় অন্তত গুরুর সমকক্ষতা অর্জন। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রণেতা শুধু প্রতীচীর নন, প্রতীচীর এমন একটি দেশের সন্তান যা আধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যায় বিশ্বের প্রায় শীর্ষস্থানীয় : জর্মনি। যন্ত্রকুশলতার ইন্দ্রজাল দেখিয়ে এমন একটি দেশের মানুষকে চমৎকৃত করে দেওয়া শক্ত। অথচ সেইটাই করা হয়েছে বার বার, এই সোজা কথাটা ভুলে গিয়ে যে বিদেশে আমরা যখন যাই—সাংসারিক প্রয়োজনে নয়, উৎসুক দর্শকরূপে—তখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ হয় সেই সব বস্তু যা আমাদের নেই। হের র-কে যে সব বস্তু সাগ্রহে দেখানো হত তা প্রধানত আধুনিক প্রতীচীর অনুকৃতি। অবশ্য, ইংরেজীতে একটা কথা আছে : অনুকৃতিই হচ্ছে সব চেয়ে ভালো স্তুতি। এতে অনুকৃত ব্যক্তির অহমিকা তৃপ্ত হয় সন্দেহ নেই; কিন্তু এই ধরনের আত্মপ্রসাদ র মোটেই চান নি; তিনি চাইছিলেন সেই জিনিস যা একান্ত এবং বিশুদ্ধভাবে—ভারতীয়। তাঁর ভাষায়, সেই বস্তুটি হল : ডের "আল্ট্-ইণ্ডিশে গাইস্ট" (প্রাচীন ভারতের আত্মা)।

॥ ৩ ॥

কথাটা স্পষ্ট হবে একটি উদ্ধৃতি থেকে। বম্বে থেকে হের র গিয়েছিলেন এলিফাণ্টা গুহার ভাস্কর্য দেখতে। খুব ভালো লেগেছিল। একটি স্মরণীয় বর্ণনার শেষে লিখছেন, এই "আল্ট-ইণ্ডিশে গাইস্ট"-এর প্রসঙ্গে : "এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ যত আছে আমি পড়েছি। তা থেকে অল্পই জেনেছি। এ সব গ্রন্থে ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাতে—এটা সর্বদাই অনুভব করেছি—কিছুটা বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। আমি দেখেছি, পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে ভারতীয় ভাবনার বিশুদ্ধ রূপটিকে আর পাওয়া যায় না; সেটা হয়ে পড়ে একটা ব্যামিশ্র সত্তা, অর্ধ সত্য।...ভারতবর্ষের এই আন্তর সত্তা—যা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় অত্যন্ত স্ববিরুদ্ধ এবং বিভ্রান্তিকর—অপাবৃত হতে পারে তার কাছেই যে সেটিকে ধরতে পেরেছে একেবারে তার মূলে গিয়ে।" এই মূলে পৌঁছতে হলে যেটা দরকার সেটা হল—"কিছু না খুঁজে, কিছু না চেয়ে শুধু নিজেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিমুখে মেলে ধরা, শুধু তাদের নিজের কাছে আসতে দেওয়া। (auf mich Zukommen lassen)। ভারতবর্ষকে আমি ধরতে চেয়েছি এইভাবে।"

অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে বুঝতে হবে নিজেকে ভুলে গিয়ে, পূর্বার্জিত সমস্ত মজ্জাগত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে; সক্রিয়, সচেতন সমালোচকের মন দিয়ে নয়। লৌকিক ব্যাপারে তাঁর চিত্ত অতন্দ্রিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক; কিন্তু অধ্যাত্ম ভাবনার ক্ষেত্রে ঠিক উলটো; সেখানে বুদ্ধির উদ্ধত প্রখরতা নেই : কেবল উন্মুখ, বিনম্র চিত্তের শান্ত উন্মীলন।

চিত্তকে এইভাবে সচেতন প্রযত্ন হতে মুক্ত করে শিথিলভাবে মেলে ধরা—এটা কি রকম, একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। র একবার মহীশূরের রাজপ্রাসাদে কিছুদিন ছিলেন সম্মানিত অতিথিরূপে। একদিন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল এক মঠে। সেখানে দেখলেন ব্যাঘ্রচর্মে সমাসীন এক তরুণ সন্ন্যাসী। সরল অথচ ধীদীপ্ত মুখমণ্ডল। তারপর—"আমি তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতিতে নমস্কার করলাম; তিনিও তাই করলেন। তাঁর সামনেই বসে পড়লাম মেঝেতে। দু'একটি কথা হল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার দু'একটি কথা। বেশির ভাগ সময়ই কাটলো নীরবতায়। আমাদের পরস্পর সংযোগ ঘটল কথা নয়, স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে।" তারপর মন্তব্য করেছেন—নৈঃশব্দ্যের এই রহস্যময় শক্তির প্রমাণ তিনি পেয়েছেন বার বার, যখনই সম্মুখীন হয়েছেন কোনো যথার্থ যোগীর। এই 'দর্শন' আর 'ইন্টারভিউ' (ইংরেজী শব্দটিই ব্যবহার করেছেন) এর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই প্রসঙ্গে র-এর একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য : "যদি কেউ ভারতবর্ষে আসেন এই ভেবে যে, কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে 'ইন্টারভিউ' থেকে তিনি "ভারতীয় সংস্কৃতি"র স্বরূপ বুঝে ফেলবেন, তা হলে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে থাকলেই ভালো করতেন। তিনি অবশ্য তাঁর প্রশ্নাবলীর উত্তর পেয়ে যাবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা (ডের ইণ্ডিশে গাইস্ট) তাঁর কাছে আগের মতোই অজ্ঞাত থেকে যাবে।"

॥ ৪ ॥

এদিক থেকে র-এর ভারত-পর্যটনকালের স্মরণীয়তম ঘটনা—শৃঙ্গেরিমঠাধীশ শ্রীশংকরাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। প্রাচীন ভারতের যে অন্তরাত্মার সন্ধানে তিনি এ দেশে এসেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার আভাস কচিৎ কোথাও পেয়ে থাকলেও—যেমন পূর্বোক্ত তরুণ যোগীর সান্নিধ্যে—এমন নিবিড় এবং পরিপূর্ণভাবে আর কোথাও অনুভব করেন নি। এই কারণেই তাঁর কাছে ঘটনাটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অতি গভীর।

বি ভি রামন—একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং জ্যোতিষী প্রথম র-কে শৃঙ্গেরি যাবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং মঠের পরিচালকের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে একটা চিঠি লেখেন। উত্তর এল দ্রুত, স্বাগত জানিয়ে এবং সেই সঙ্গে এটাও যে, মঠাধীশ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়েছেন।

সূচনা তো বেশ ভালোই হল; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ব্যাঙ্গালোরে যে বড়ো হোটেলে র উঠেছিলেন, সেখানে যাকেই জিজ্ঞেস করেন সেই বলে—শৃঙ্গেরি মঠের কথা তাঁরা অনেক শুনেছেন, কিন্তু জায়গাটা যে ঠিক কোথায় সে বিষয়ে কারুরই কোনো ধারণা নেই। হোটেলের ডিরেক্টর তাঁকে বললেন, গাইড-বুক দেখতে। সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শৃঙ্গেরির নাম পাওয়া গেল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল র-এর। বসে আছেন হলে; হঠাৎ কানে এল একটা নাম : "মেয়ো" একজন সদ্য-আগত বিদেশী। পরিচয় জানতে গিয়ে র আবিষ্কার করলেন, এই ইংরেজ ভদ্রলোকের এক নিকটাত্মীয়ার সঙ্গে তাঁর মার লণ্ডনে পরিচয় হয়েছিল। আলাপ-পরিচয়ের ফাঁকে র হঠাৎ বললেন, তিনি শৃঙ্গেরি যেতে চান। মিঃ মেয়ো লাফিয়ে উঠে বললেন : "আমি এইমাত্র সেখান থেকেই আসছি।" তারপর বলে দিলেন কিভাবে যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোর থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে উঠলে পরের দিন বিকেলেই পৌঁছনো যায়।

দু দিন বাদেই হের র যাত্রা করলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে। মিঃ মেয়োই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল ভোর ৪টের সময় তারিকেরে স্টেশনে গার্ড তাঁকে তুলে দেবেন। ওখান থেকে ৮টায় কপ্পা যাবার বাস ছাড়বে, যেখানে শৃঙ্গেরি যাবার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁর জন্য। সব ব্যবস্থাই সুসম্পন্ন।

শেষ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেন থামতেই দরজা খুলে গেল। স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং কামরায় প্রবেশ করলেন : বললেন, র অবতরণ না করা পর্যন্ত ট্রেন

ঝর্নার পাশের সেইসব রমণীরা যারা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল

ছাড়বে না। যথা সময়ে বাসে 'কপ্পা'য় পৌঁছলেন। মিঃ মেয়োর ওয়াগন দাঁড়িয়েই ছিল। শৃঙ্গেরি পৌঁছলেন।

পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হলেন বিদেশী অভ্যাগত। মঠাধীশ শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট হল সে দিনই, সন্ধ্যা ৬টায়। ইতিমধ্যে স্বামীজী সম্পর্কে র অনেক কিছু শুনলেন : তাঁর কঠোর তপশ্চর্যা, সুদীর্ঘ নির্জনবাস, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানতন্ময়তা। সাক্ষাৎকারের পূর্বে মঠের সেক্রেটারি তাঁকে পই পই করে শিখিয়ে দিলেন, কিভাবে অভিবাদন করতে হবে স্বামীজীকে; হাতে একটি ডাব দিয়ে দেখালেন কিভাবে ফলটি অর্পণ করে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মহড়া চলল এই নিয়ে; হাসাহাসিও হল প্রচুর, দুপক্ষেই।

স্বামীজীকে দেখেই র আকৃষ্ট হলেন : ওজস্বী, পৌরুষ-দৃঢ় মুখ, যা স্বভাবত গম্ভীর অথচ মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শিশুর মতো অনাবিল সরল হাসিতে। নারিকেল অর্পণ করে র সদ্য-অনুশীলিত প্রণিপাত-পদ্ধতিটির প্রয়োগে উদ্যত হতেই স্বামীজী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, এ সবের কোনো দরকার নেই। স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীজীর সামনেই মেঝেতে বসে পড়লেন র।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঠিক এইটাই চাইছিলেন র। তাঁর ভাষাতেই বলি : "স্তব্ধ হয়ে আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছিলাম এই নির্বাক মানুষটিকে।" ছোট্টো একটা স্লেট ছিল কাছেই। সেটাতে কি যেন লিখে সেক্রেটারির হাতে দিলেন। সেক্রেটারি বললেন, স্বামীজী একাধিক ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলেও ইংরেজী জানেন না। কথাটা র-এর ভালো লাগল; মনে হল, এতদিনে এমন একজনকে পেয়েছেন, যিনি যথার্থই "প্রাচীন-ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি"। স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন কোনো য়োরোপীয় ভাষা তিনি শেখেন নি কেন। স্লেটে উত্তর এল (সেক্রেটারির মধ্যস্থতায়) : "এতে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে পারে, তাই।"

র প্রশ্ন করবার জন্য ব্যগ্র নন মোটেই; স্বামীজী কিন্তু নিজেই তাঁকে কথা বলতে উৎসাহিত করলেন। ঘণ্টা দুই ধরে 'ইন্টারভিউ' চলল; দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল প্রশ্নোত্তর; তাল রাখতে বেচারা সেক্রেটারি হিমসিম খাচ্ছেন, উত্তর এত দ্রুত আসতে লাগল যে ভাষান্তরণে হাস্যকর রকমের কয়েকটি ভুলই করে বসলেন। "স্বামীজী এটা বুঝতে পারলেন; আমিও; অবশেষে হো হো করে হেসে উঠলুম আমরা দুজনেই।" ঘটনাটির সকৌতুক বিবৃতির শেষে র-এর মন্তব্য : "যোগীদের সংস্পর্শে এসে প্রায়ই লক্ষ করেছি, যোগশক্তির মধ্যে প্রকট হয়েছে গর্ব; স্বামীজীর মধ্যে এর আভাসমাত্র নেই। আলাপের মাঝখানেই হঠাৎ কখন আপনা হতেই তলিয়ে যাচ্ছেন গভীর ধ্যান-তন্ময়তায়; তখন স্তব্ধ হয়ে পান করতে লাগলুম সেই নিবিড় মৌন।"

'ইন্টারভিউ' শেষ হল। র উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীজী তাঁর হাতে কিছু ফল দিলেন। যাবার আগে বললেন, "আবার এসো, যখনই ইচ্ছা হবে।"

র-কে তাঁর শোবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকার নেমে এসেছে। টেবিলের ওপর একটা পাত্রে কিছু ফল; একটু তুলে নিয়ে খেলেন। এতক্ষণে ক্লান্তি এবং ক্ষুধা—দুটোই প্রবল হবার কথা, অথচ কোনোটাই বোধ করছেন না দেখে বেশ আশ্চর্য হলেন। ভাবতে লাগলেন—শরীরের এই লঘুতা এবং মনের এই প্রফুল্লতা এর কারণ কি স্বামীজীর প্রভাব, না এই নিভৃত কক্ষের স্তব্ধ প্রশান্তি?

অন্ধকার, স্তব্ধ রাত্রি। জানলায় বাইরে কয়েকটি আম গাছ; তাদের মাথা দিয়ে চাঁদ উঠছে; আলো চিকচিক করছে পাতায়। র শয্যায় গভীর চিন্তায় মগ্ন। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, ভারতবর্ষের আন্তর সত্তার যথার্থ স্বরূপটি কি। কর্ম? পুনর্জন্ম? হাঁ এ সবই সত্য, কিন্তু "ভারতীয় সংস্কৃতির" প্রাণকেন্দ্র আরো, আরো গভীরে। কী সেই প্রাণকেন্দ্র, সেই অন্তরতম সত্তা যেখানে প্রতীচীর থেকে সে স্বতন্ত্র?

এই চিন্তায় যখন গভীরভাবে মগ্ন—স্পষ্ট, যেন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলেন স্বামীজীর মূর্তি; অনেকক্ষণ ধরে, জানলার বাইরে, চাঁদের আলোয় ঝলমল আম্রপল্লবের ফাঁকে। পদ্মাসনে সমাসীন, মাথার ওপর দিয়ে জড়ানো চাদর, যার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে অধ্যাত্মভাব-স্নিগ্ধ, দৃঢ়-বলিষ্ঠ, সমস্ত-পার্থিবভারমুক্ত সেই পরিচিত মুখ। চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একটি মুখ—রদ্যাঁর 'মনীষী': বলিষ্ঠ, পেশল, অধ্যাত্মভাবলেশহীন অপ্রশস্ত ললাট। সবটা মিলিয়ে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। পাশাপাশি আর একটি মূর্তি—স্বামীজীর: স্নিগ্ধ, সংসার-বিবিক্ত; ভারতাত্মার মূর্ত রূপ। সেই "রূপ"টি কি? উত্তর হের র-এর কাছে একটাই : "যোগ"।

॥ ৫ ॥

সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি শব্দ আছে যারা বহুশ্রুত, এবং ভূরি ব্যবহৃত, অথচ যাদের অর্থ হয় ধূমাবৃত, নয় বিকৃত। যেমন—"যোগ"। এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কেবল প্রতীচীতেই নয়, ভারতবর্ষেও বিরল। বরং প্রতীচীর কোনো কোনো ভারত-তত্ত্ববিদ এর রচনায় এই দুরূহ বিষয়টির বিবৃতিতে যে স্বচ্ছতা ও গভীরতার পরিচয় পাই তাতে আশ্চর্য বোধ হয়।

বক্ষ্যমান জর্মন গ্রন্থটির অন্যতম আশ্চর্য—"যোগ" সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘ মন্তব্য। হ্রস্ব বিবৃতিতে ঠিক বোঝানো যাবে না, কেন; তবু চেষ্টা করবো কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে। এই প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা খুব দামী কথা বলেছেন লেখক। সেটা এই : "যোগ" হচ্ছে নির্বস্তুক জ্ঞান, অর্থাৎ চিত্তের এমন একটি অবস্থা যাতে (চিত্তের) অবলম্বনরূপে কিছুই থাকে না। চিত্তের এই সম্পূর্ণ নিরালম্ব অবস্থাই হচ্ছে "মিস্টিক" সাধনার পরাকাষ্ঠা। অতঃপর প্রতীচীর মিস্টিক ভাবনার সঙ্গে তুলনা করে বলছেন, সেখানে অনুভবের চরম হল দিব্য সত্তার সঙ্গে সাযুজ্যবোধ। র-এর মতে, এটা খুব উচ্চ অবস্থা হলেও ধ্যানের বিষয়রূপে এখানেও কিছু থাকে। অর্থাৎ প্রতীচ্য অধ্যাত্মভাবনা আদ্যন্ত বিষয়মুখী, ধ্যানের সর্বোচ্চ স্তরেও চিত্ত একেবারে নির্বস্তুক নির্বিষয় হয়ে যায় না। ভারতবর্ষের যোগমার্গের কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কারণ, যোগের চরমাবস্থায় চিত্তের ধ্যেয়রূপে কিছুই থাকে না, এমন কি ভগবানও না। ভগবত সত্তার সঙ্গে তন্ময়ীভাব—যা পাশ্চাত্ত্য মিস্টিক অনুভবের শেষ কথা—সমাধির শেষ অবস্থায় এও থাকবে না, কারণ, পূর্বেই বলেছি, যোগের চরম লক্ষ হল "নির্বিষয় জ্ঞান"।

এই 'যোগ'—যার পর্যবসান 'নির্বীজ' অথবা "অসম্প্রজ্ঞাত" সমাধি—হল র-এর চোখে প্রাচীন ভারতের আন্তর সত্তার যথার্থ স্বরূপ। এই কারণেই তিনি প্রথম থেকেই একান্তভাবে চাইছিলেন যথার্থ "যোগী"র সান্নিধ্য; কথাবার্তা নয়, প্রশ্নোত্তর নয়, কেবল "দর্শন" এবং সান্নিধ্য। দুএকটি ঘটনা থেকেই তাঁর এই নিশ্চিত প্রতীতি হয়েছিল—যথার্থ যোগী সান্নিধ্যমাত্রেই অনুভবগম্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর কাছে এর সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ—শৃঙ্গেরিমঠাধীশ শংকরাচার্য।

র-এর হিতৈষী ভারতীয় বন্ধুগণ ধরে নিয়েছিলেন—স্বভাবতই যে, আলোকিত প্রতীচীর এই বরণীয় প্রতিভূ সবচেয়ে খুশি হবেন তাঁদেরই সান্নিধ্যে যাঁরা তাঁরই

একজন ভিক্ষুকের মুখচ্ছবি সন্ত মার্ক-এর মূর্তি স্মরণ করিয়ে দেয়

মতো 'ইন্টেলেকচুয়াল'। তাই, র-এর সঙ্গে যাঁদের 'ইন্টারভিউ'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাঁরা প্রধানত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী এবং 'বুদ্ধিজীবী'। এঁদেরই অন্যতম ডাঃ ভগবান দাস : পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, এবং অধ্যাত্মচেতনার দুর্লভ সমাবেশ। কোনো ভারতীয় মনীষীর সঙ্গে এইটাই তাঁর সব চেয়ে দীর্ঘ আলাপ। প্রথমেই তাঁকে স্পর্শ করল যীশু খৃস্টের প্রতি এই সৌম্যদর্শন মনীষীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং এই দুই ধর্মের—হিন্দু ধর্ম এবং খৃস্টীয় ধর্ম—প্রতি উদার সমদৃষ্টি। হৃদয়ের দিক থেকে এই উদারতা তাঁর কাছে আদরণীয় হলেও সত্য হিসেবে নয়। কারণ যেটি গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য—ভারত এবং প্রতীচীর মধ্যে ভাবনার পার্থক্য একেবারে মজ্জাগত; দু-এর মধ্যে যথার্থ সমন্বয় কিছুতেই সম্ভব নয়। বারাণসীতে জনৈক মার্কিন পর্যটক যখন তাঁকে 'সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়'-এর বাণী শোনাচ্ছিলেন, তিনি শুনে যাচ্ছিলেন মাত্র, বক্তার এই উদার আগ্রহে সাড়া দিতে পারেন নি; তাঁর কাছে এটা এক ধরনের ভাববিলাস মাত্র, ধর্মীয় 'এস্পেরান্তো'।

অতএব র যে দুর্লভ বস্তুটি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অধীর আগ্রহে, ভগবান দাস তার হদিস দিতে পারেন নি। শুধু ভগবান দাস নন, আধুনিক অর্থাৎ বিগত এবং বর্তমান শতকের—ভারতের কোনো বরণীয় পুরুষই এটা পারেননি—একজন ছাড়া। কেবল আধুনিক-চেতনাবান "বুদ্ধিজীবী"রাই তাঁকে হতাশ করেন নি; ধর্মজগতের আচার্যগণও এদিক থেকে ব্যতিক্রম নন—ঐ একজন ছাড়া (কে, পরে দেখবো)।

॥ ৬ ॥

বিগত শতকের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রধান নায়কগণ সকলেই আলোচিত হয়েছেন এই গ্রন্থে : রামমোহন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ। তিনজনই যে এক গোত্রের এ কথা র বলেন নি; কিন্তু "প্রাচীন ভারতের আত্মা"র বিশুদ্ধ রূপটি এঁদের একজনের মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে নি। রামমোহন যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত পুরুষ নন, এটা সহজেই অনুমেয়; এবং প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ সত্ত্বেও দয়ানন্দও তা নন, কারণ সেখানেও "যে প্রেরণা সক্রিয়, সেটা পাশ্চাত্ত্য।"

বিবেকানন্দের কথা একটু আলাদা। পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হয়েও যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এবং সেটা প্রতীচীতেই—আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ, এটা কম কথা নয়, বিশেষ করে সে যুগে। প্রতীচীর চিৎপ্রকর্ষকে মুক্ত কণ্ঠে স্বাগত জানিয়েও তিনি এ কথাটা সগর্বে বলতে পেরেছিলেন, যে অধ্যাত্মভাবনায় ভারতবর্ষ অনেক বড়ো। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার "বৈজ্ঞানিকতা" প্রতিপন্ন করতে তিনি যে ব্যগ্র হয়েছিলেন, এটা র-এর ভালো লাগে নি; কারণ, তাঁর মতে, ওটা আদৌ সম্ভব নয়; এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

বস্তুত, আমরা যাকে "রেনেসাঁস" বলে থাকি, তার সঙ্গে—র-এর মতে—"প্রাচীন ভারতের আত্মা"র প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই; কারণ, ভারতের এই নবজাগরণ আধুনিক প্রতীচীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। আধুনিক ভারতের স্বাজাত্যবোধও তা-ই; এরও মূলে ঐ একই প্রেরণা, যার মধ্যে প্রাচীন ভারতের স্থান নেই।

এ দিক থেকে গত শতকের খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য ভারতবিদ্যা-বিশারদগণও নিরাপদ নন; স্বয়ং ম্যাক্স্ মূলারও। তিনিও অসামান্য মনীষা সত্ত্বেও "প্রাচীন ভারতের আত্মা"টিকে ঠিক ঠিক ধরতে পারেননি; প্রাচীন এবং অর্বাচীন তাঁর রোমান্টিক কল্পনায় একাকার হয়ে গেছে। (এই প্রসঙ্গে একটা নতুন কথা তিনি আমাদের গোচর করেছেন, প্রমাণ দিয়ে। সেটা হল : গত শতকের বিশ্ববিশ্রুত জর্মন দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীন-ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপটি যিনি সবচেয়ে স্পষ্ট এবং যথার্থ করে বুঝেছিলেন তিনি শপেনহাউএর নন, হেগেল।)

ভারতীয় বিদ্যার চর্চায় প্রতীচীর প্রভাব যে এখনো কতটা সক্রিয় তার একটি কৌতুকাবহ প্রমাণ : শুধু যে প্রতীচী থেকে পণ্ডিতরা এ দেশে ভারত-বিদ্যা শেখাতে আসেন তাই নয়; তার চেয়েও মজার কথা, ভারতীয় ছাত্র এবং গবেষকরা তাঁদেরই দেশের কথা জানতে ছোটেন পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। এঁরা এটা বোঝেন না, যে আধুনিক প্রতীচ্য ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার যে দুটি প্রধান অস্ত্র, ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ব, তা দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষকে কোনো দিনই বোঝা যাবে না, যেতে পারে না।

বর্তমান শতকের প্রতিপত্তিশালী ভারতীয় মনীষী এবং চিন্তানায়কগণ সকলেই এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন (ডঃ ভগবান দাস-এর কথা আগে বলেছি)। এঁদের মধ্যে আছেন : জওহরলাল নেহরু, রাধাকৃষ্ণন্, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী। স্পষ্টতই নেহরু তাঁর অন্বিষ্ট পুরুষ নন। তাঁর "আত্মচরিত" থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, মানসতায় তিনি প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত। আশ্চর্য মনে হবে, এ দিক থেকে রাধাকৃষ্ণন্ও মোটেই আশাপ্রদ নন। তাঁর উক্তি হতে ছুরি ছুরি প্রমাণ তুলে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, তাঁর বিষয় প্রাচীন ভারতীয় দর্শন হলেও দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণন্ পুরোপুরি আধুনিক এবং প্রতীচী-প্রভাবিত। যেমন, যুবা বয়সেই রাধাকৃষ্ণন একবার বলেছিলেন, ভারতের পরাধীনতার অন্যতম কারণ—"বাস্তব জীবনে হিন্দু ধর্মের অক্ষমতা"। পরবর্তীকালে এক জর্মন অধ্যাপকের (Otto Wolf) সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : "বহু শতাব্দীর জড়তা কাটিয়ে এত দিনে হিন্দুধর্মের এক নূতন, যথার্থ সৃষ্টিশীল অধ্যায় শুরু হল। আমাদের পুরাতন ধারণাগুলিকে এইবার নতুন চোখে দেখতে শিখছি। পুনরুজ্জীবনের কাজ আরম্ভ হ'ল।"

উত্তরে হের র-এর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ : "বাস্! আর কি চাই! আধুনিক ভারতীয়গণ তাঁদের সেকেলে ধারণাগুলিকে নতুন করে দেখতে শিখছেন পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে! আসলে ঐ "পুনরুজ্জীবন" ব্যাপারটাই হল পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে তাৎপর্য-সন্ধান।"

রবীন্দ্রনাথও র-এর চোখে "প্রাচীন ভারতের আত্মা"র বিশুদ্ধ প্রতিভূ নন। স্বল্প উল্লেখ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় অল্পই ছিল। শেষে উদ্ধৃত করেছেন আলবের্ট শুহ্বাইটসার-এর একটি শিথিল তর্কাধীন উক্তি : "রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বময় আত্মসত্তা'র ভাবনায় ধ্বনিত হয়েছে, উপনিষদ্ নয়, য়োরোপীয় রেনেসাঁস এবং পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।"

এই প্রসঙ্গে যাঁর সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘতম, তিনি মহাত্মা গান্ধী। এটাই

গৌড় রমণীরা ভুলে গেছে তাদের স্বাভাবিক সংস্কার

াবিক এবং প্রত্যাশিত; কারণ, র, ভালো ভাবেই জানতেন, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ানের চোখে গান্ধীজী ছিলেন শুধু নেতা নন, "প্রাচীন ভারতের আত্মা"র মূর্ত ্, এবং এদিক থেকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নেহরুর সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব াংশয়ে ধরে নিতে পারি। "প্রাচীন" ভারতের শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রতীচীর এই র্শ মানুষটি এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছেন তাঁর ঈপ্সিত পুরুষ, তাঁর মনের মানুষ। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে যতটা নিঃসংশয়, হের র, মোটেই তা নন। কেন নন, কারণ কয়েকটি অখণ্ড্য বিরুদ্ধ প্রমাণ। সংক্ষেপে, প্রমাণগুলি এই।

১। ভগবদ্ গীতার সঙ্গে গান্ধীর প্রথম পরিচয় মূল সংস্কৃতে নয়, ইংরেজি বাদে। ২। তাঁর আত্মচরিতে সনাতন ভারতীয় ভাবনার একটি মৌল তত্ত্ব 'বাদ"-এর যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, তা প্রতীচ্য ধারণায় অনুপ্রাণিত। যেমন, ্র অমোঘ বিধান সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "এমন কি ঈশ্বরও এখানে হস্ত- ্ করতে অক্ষম। কর্মের এই বিধান তিনিই করেছেন, সত্য; কিন্তু তার পরই ন নিজেকে গুটিয়ে নেন।" এ বিষয়ে র-এর তীব্র মন্তব্য : "এটা সম্পূর্ণ রতীয়, প্রতীচ্য এবং খৃস্টীয়।" ৩। গান্ধীর সবচেয়ে বড়ো প্রেরয়িতা যে জন মনীষী, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতীচীয় : রাস্কিন, থোরো, তলস্তয়।

লক্ষণীয়, গান্ধী যে নিজেকে একাধারে হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদি এবং পার্শি বলে ণা করেছিলেন, সেটাতে র-এর আপত্তি নেই, কারণ, তাঁর মতে, দৃষ্টির এই

মী রামদাস

র্ষ সনাতন ভারতীয় ধারার সম্পূর্ণ অনুগত। সেই ধারা হতে গান্ধী ভ্রষ্ট য়েছেন এখানে নয়, অন্যত্র, যেখানে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে তিনি অর্চনা করেছেন। ই অর্চনা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, অর্বাচীন প্রতীচীর অনুকৃতি। অতএব, ান্ধীও র-এর অন্বিষ্ট পুরুষ নন; এবং নেহরুর সঙ্গে প্রতি তুলনায় তাঁকে যতটা শুদ্ধ ভারতীয় ব'লে মনে হয়, বস্তুত তিনি তা নন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এই শতকের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় লোকনায়ক এবং নীষীদের মধ্যে একজনও র-এর চোখে "প্রাচীন ভারতের আত্মা"র যথার্থ প্রতি- নিধি নন; এমন কি গান্ধীও নন। এমন কি গৌরবোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতকেও তিনি ্খুঁজে পান নি তাঁর মনের মানুষ, ধর্মাচার্যদের মধ্যেও;—একজন ছাড়া, নাম না রলেও যাঁর উল্লেখ ইতিপূর্বে দুবার করেছি।

কে এই পরম দুর্লভ মানুষটি, যিনি এই একের পর এক প্রত্যাখ্যাত আধুনিক ভারতের প্রখ্যাত পুরুষদের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় ব্যতিক্রম? উত্তর : রামকৃষ্ণ পরমহংস। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ ছিলেন—বর্তমান ভারতেও—নির্জন গুহা কিংবা অরণ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে; এঁদের অদৃশ্য সত্তায় নঃসন্দিগ্ধ হলেও, ইতিহাসের প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যাঁরা প্রকটিত হয়েছেন, যাঁদের জীবন ও বাণীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন গ্রন্থের মাধ্যমে, তাঁদের মধ্যে এক- মাত্র এই মানুষটির মধ্যেই র প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর বহু-অন্বেষিত সেই প্রাচীন ভারতের আত্মা" der alt-indische Geist। শুধু প্রত্যক্ষ করেন নি, নিবিড়- ভাবে অনুভব করেছেন এই মহাপুরুষের প্রতিটি আচরণ এবং উক্তির মধ্যে, যার একটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন বিশুদ্ধ প্রাচীন-ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে। সেটা হল—শম্ভু মল্লিকের প্রতি ঠাকুরের সেই বিখ্যাত

শৃঙ্গেরি মঠ

ব্যঙ্গমিশ্রিত ভর্ৎসনা : "ভগবানের সঙ্গ দেখা হলে তুমি কি তাঁর কাছে হাস- পাতাল ডিসপেনসারি—এই সব চাইবে?"

আর সাক্ষাৎ পরিচয়ে যাঁদের জেনেছিলেন যাঁদের মধ্যে কেবল মনীষী নয়, যোগীও ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কোথাও কি পেয়েছিলেন তিনি যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন? হাঁ; একজন : শৃঙ্গেরি-মঠাধীশ স্বামী অভিনব বিদ্যাতীর্থ। ভারত-পর্যটন কালে ঘুরে ফিরে বার বার তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছে এই মানুষটির মুখচ্ছবি, তাঁর নির্মল সহাস্য স্নিগ্ধ কৌতুক, এবং সকল মৌখিক (বা লিখিত) বিনিময় অতিক্রম করে সেই আশ্চর্য সান্নিধ্য, নীরবতায় যার আনন্দময় অনুভব নিবিড়তর হয়ে ওঠে; সেই অনির্বচনীয় প্রশান্তি যা প্রায় ত্রিশ বছর আগে অনুভব করেছিলেন পল ব্রান্টন, রমন মহর্ষির সান্নিধ্যে : শুধু স্পন্দহীন স্তব্ধতা, আর সেই স্থির স্নিগ্ধ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

শান্তি এবং আনন্দের এই যে নিবিড়, নিঃশব্দ সঞ্চার, আগেই বলেছি এই-ই ছিল র-এর কাছে যোগশক্তির যথার্থ এবং অব্যর্থ লক্ষণ। আর এই "যোগ"ই হল "প্রাচীন ভারতের আত্মা"র নিগূঢ় স্বরূপ, যার অব্যবহিত লক্ষ্য—চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধ, এবং যার পর্যবসান—আত্মজ্ঞান।

এই "যোগ"—যা প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক ভাবনারই শুধু নয়, অধ্যাত্মভাবনারও অগম্য—প্রাচীন ভারতের দান। প্রাচীন ভারতকে ছেঁটে ফেলার অর্থ, ভারতবর্ষের চিৎপ্রকর্ষের এই মহত্তম অভিব্যক্তির অপলাপ। প্রগতিশীল আধুনিক ভারতের পক্ষে সেটা হবে আত্মঘাতের শামিল—এটাই র-এর নিশ্চিত, দৃঢ় প্রত্যয়।

॥ ৭ ॥

একটা আপত্তি এখানে উঠতে পারে। সেটা এই : কোনো সভ্যতাই যে তার অতীতকে বাদ দিয়ে নয়—এটা কোনো নতুন কথা নয়। তা-ই যদি হয়, তাবৎ সভ্যতার ক্ষেত্রে অতীতের অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব যতটা স্বীকার্য, ভারতবর্ষের বেলাতেও ততটাই, তার বেশি নয়।

হের র কিন্তু এ কথা মানতে রাজি নন। কেন নন, সেটা বোঝাতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ধরা যাক, কোনো ভারতীয় য়োরোপে গেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপটিকে ধরবার জন্য। তিনি যদি এই উদ্দেশ্যে অহোরাত্র প্লেটো, আরিস্টটল, কিকেরো এবং সেনেকার রচনাবলীর মধ্যে ডুবে থাকেন, তা হলে প্রতীচ্য সংস্কৃতি তাঁর অগোচরেই থেকে যাবে। কারণ, প্রতীচ্য সংস্কৃতি এমন এক বস্তু যা নিত্য নূতন পরিণতিশীল, অতএব "আদি"তে পৌঁছে একে পাওয়া যাবে না। ভারতীয় সংস্কৃতির বেলায় কিন্তু এ কথা খাটবে না, কারণ, এখানে "আদি"কে জানলে প্রায় সবটাই জানা হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, "আদি" এখানে সভ্যতার উন্মেষ মাত্র নয়, তার সর্বোচ্চ প্রকাশ—শীর্ষবিন্দু ইতিহাসের প্রতি ভারতবর্ষের অনীহার এইটাই অন্যতম কারণ

র-এর দৃঢ় অভিমত—এই "ঐতিহাসিক দৃষ্টি"—যা সম্পূর্ণ আধুনিক প্রতীচীর দান—দিয়ে ভারতবর্ষকে কোনো দিনই বোঝা যাবে না; কারণ, এই আধুনিক-মানসতা-সঞ্জাত "ঐতিহাসিক দৃষ্টি"র মূল তত্ত্বটি হল ক্রম-পরিণাম; আর ভারতীয় সভ্যতার নিগূঢ় সত্যটি হল অপাবরণ। দু'এর মধ্যে ব্যবধান এতটাই দুস্তর যে সেতুবন্ধন কিছুতেই সম্ভব নয়। পার্থক্য যেখানে একেবারে মূলগত, সেখানে-অভিপ্রায় মহৎ হলেও জোর করে মেলাতে গেলে বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। এ পার্থক্য সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার ক'রে নিয়েই প্রতীচীর মানুষকে বুঝতে হবে ভারত- বর্ষকে—সেই যথার্থ, সত্য ভারতবর্ষকে, যা আধুনিক নয়, অতি প্রাচীন; কেবল প্রতীচীর মানুষ নয়, প্রতীচী-প্রভাবিত আধুনিক-মানসতা-সম্পন্ন ভারতবাসীকেও; কারণ, দৃষ্টির বাধা উভয়ের ক্ষেত্রেই যে সমান, এবং সমানভাবে দুরতিক্রমণীয়—এই সত্যটিই এই প্রজ্ঞাবান অথচ তীক্ষ্ণধী জর্মন পরমার্থসন্ধানীর ভারত-পর্যটনের সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং বেদনাদায়ক উপলব্ধি।

গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা

দিনেশ দাস

কপিল মুনিই জ্ঞান-গঙ্গার সাগর—
গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী-গোমুখে
পর্বতে আকাশ-অভিযানে
হঠাৎ চকমকি ঠুকে
চমকে-দেওয়া কান্ড সেই
হিল্যারির জেট-বোট "গঙ্গা" নয়।

আমি শুনি পুরোনো দিনের গ্রামোফোন—
প্রাচীন কালের সেই গঙ্গানদী কোন্
সৃষ্টির প্রথম থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
আদিশিশু হ'তে আজও তোমাকে আমাকে,
যার কুলুকুলু স্বর কালো মাটি আলো করে
পৃথিবীকে ভাল লাগে মাটিতে, কাঁকরে।

অধুনা স্থবির আমি নিশ্চল ছড়ির মত থাকি গৃহকোণে,
এখন ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘোরে :
পৃথিবীর সব অভিযান
সমুদ্র-মোহনা থেকে উৎসের সন্ধান।
যদিও জেনেছি এই আকাশ অরণ্য নদী সমুদ্রবলয়
আমার মনের মানচিত্র ছাড়া আর কিছু নয়,
তবুও দেখেছি ভরা কোটালের বানে
গঙ্গার উলঙ্গ বুকে ঢল নামে—ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে।

গঙ্গা তো নদী নয় শুধু,
গঙ্গা নদীর দেহ জলে আর সময়েতে গড়া,
সময়ের অন্য নাম নদী
সময় নিজেই এক অন্তহীন নদী—অতল অথই,
যার স্রোতে ভেসে যায়, মিশে যায়
তোমার আমার মুখ জলের মতই।

বোধ'য় আমিও এক নদী—
কঠিন পাথর হ'তে উৎসারিত হ'য়ে
ছুটে যেতে চাই মহাসাগর অবধি,
আমার বহতা স্রোতে কাছে কাছে
উপলখণ্ডের মত সন্তানসন্ততি সব মাথা তুলে আছে
সমারোহে, বাধা হ'য়ে।
আমি নদী হয়তো বা খণ্ডিত সময়,
আমার সময় নিজে চলে নাকো, ঠেলে দিতে হয়।

গঙ্গা নদী বনস্পতি যেন—যুক্ত-মুক্ত সহস্র শাখায়
মাটির নাড়ীতে উপশিরায় শিরায় :
আকাশ বাজিয়ে চলে সূর্যের কাঁসর
ঝকঝকে অগ্নি-আলো জলে-স্থলে কাঁপে থরথর,
মাঠে মাঠে গাছে গাছে নতুন পাতায়
আগুনের রং লাগে--দিকে দিকে বসন্ত গজায়,
ঘাসের সবুজ জিভ কথা বলে সাদা কুয়াসায়
অস্ফুট ভাষায়।

গঙ্গার দু'পারে কত গ্রাম, জনপদ,
বাতাসে সন্ন্যাসী পাখি, বনে বনে হিংস্র শ্বাপদ,
তারা আর থাকে না কো আকাশের স্নেহের ওড়নায়
স'রে যায় একে একে যুগের প্রাচীন অন্ধকারে
নক্ষত্র অথবা দূর-চিতাগ্নির ন্যায়।
তবুও সচ্ছল জলে ভেসে ওঠে অস্থির উন্মুখ
তোমার আমার মত কত শত মুখ,
পিতা-পিতামহদের আদি কণ্ঠস্বর
স্বচ্ছ স্রোতে চলে তরতর :
চলে নদী সুদূর সাগরে
তুলো-তুলো ভোরে,
আবার বিকেলে দেখি পাখির মতই ফেরে মেঘ হ'তে হ'তে—
গঙ্গাসাগর হ'তে যোশীমঠে, আকাশে পর্বতে।

গঙ্গা-মা, তুমি কি শুধু নদী
মা তুমি জলের ঘোমটা খোলো,
তুমি অপরূপ
তোমার মুখের আয়নায়
দেখাও আমাকে তুমি আমার স্বরূপ
জীবনের সূর্যাস্তের বছরগুলিতে।
আমি তো অনেকবার দেখেছি চকিতে
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী—
শত সৌম্য দেবীর ভিতরে তুমি সুন্দরী শাশ্বতী,
জলভরা প্রাণভরা ভালবাসা বুকে—
তোমাকে যতই দেখি তত ভালবাসি যে তোমাকে।
বল দেবী! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিতে
তোমাকে আমার মত
কেউ ভালবেসেছে বল তো?
আমার অবোধ ভালবাসা—ভাবনা, কল্পনা,
বিছায়ে দিলাম এই জলের ওপর—
জলের ওপরে এক জলের আলপনা।

করতল

সুশীল রায়

নাও এই করতল, দিলেম স্বচ্ছন্দে উপহার।
গ্রহণ করেছ যদি, করো এর পূর্ণ-পাঠোদ্ধার :
অসংখ্য সরল-বক্র স্থূল-সূক্ষ্ম রেখায় মণ্ডিত
এ এক বিচিত্র লিপি রহস্যজনক।
নদীর সহস্র ধারা দিয়ে মানচিত্র বুঝি চিত্রিত। তুমি কি
অর্থ এর কিছু জানো? করো যদি সামান্য প্রয়াস
ব'লে দিতে পার সব—অকস্মাৎ এ দৃঢ় বিশ্বাস
প্রবেশ করেছে মর্মে। তাই মৃদু পা-টিপে পা-টিপে
সন্তর্পণে আগমন তোমার এ নিভৃত সমীপে।
মুক্তহস্তে করতল দিলেম সম্পূর্ণ উপহার,
স্থির নত নেত্রে চেয়ে করো এর পূর্ণ-পাঠোদ্ধার।
কোন্ রেখা কী-যে বলে, চেয়ে-চেয়ে দেখে অপলক
জীবনের ওঠা-পড়া, পার যদি, করো তা পরখ।
রেখায় টংকার দাও, তারযন্ত্রে দেয় যে-রকম
দ্যাখো-তো বাজে কি শব্দ সেই স্পর্শে ও' শান্তি ওঁ।
মন্ত্রের গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে যদি সে ওঙ্কার-ধ্বনিটি, এবং
বলে, যা একত্র ছিল হল এক, হল একাকার—
সেটুকু তো সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার।

সেরেল্যাক দিয়ে আপনার শিশুকে সুস্থ, সবল ও দীপ্তিমান করে তুলুন

আপনার বাচ্চার তিনমাস বয়সের পর থেকেই দরকার দুধ ছাড়া আরও কিছু। তখনই তার দরকার সেরেল্যাক। কারণ সেরেল্যাকে আছে খাঁটি ঘন দুধ, খাদ্যশস্য আর চিনি। এর ফলে, সেরেল্যাক সবরকমে পুষ্টিকর। তাছাড়া, সেরেল্যাক খেতেও চমৎকার। এর স্নেহজাতীয় পদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট আপনার শিশুকে সুস্থ করে গড়ে তোলে, এর প্রোটিন তাকে সবল করে এবং এর ভিটামিন ও লৌহ উপাদানে সে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে।

তৈরি করা সহজ, আপনাকে শুধু মেশাতে হবে একটু জল।

আগে থেকে ফোটান জলে সেরেল্যাক মিশিয়ে নিন

ভাল করে মিশিয়ে নিন

শিশুদের খেতে দিন

শিশুদের জন্য প্রথম সুষম শক্ত আহার

CLC-CAS-1/78 BEN
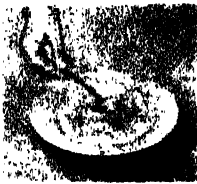
বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যত চিঠি লিখেছিলেন তার সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার। শরৎচন্দ্রের চিঠির সংখ্যা হাজার খানেক। সেই হিসাবে যত দূর জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি মাত্র তিন শ'র মত। এই তিন শ'র মধ্যে প্রায় অর্ধেক হবে তাঁর নিজের বাড়ির লোকদের কাছে লেখা। বাকিগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালে সাহিত্যের প্রধানতম দিকপাল হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা তাঁর চিঠির সংখ্যা এই যে এত কম, তার কারণ, প্রথমত—তাঁর বন্ধু সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয়ত—তিনি সহজে বড় একটা কাকেও পাত্তা দিতেন না। তৃতীয়ত—তিনি অত্যন্ত রাশভারি প্রকৃতির মানুষ (কারও কারও মতে অহঙ্কারী বা দাম্ভিক) ছিলেন বলে লোকেও তাঁর কাছে সহজে যেতে সাহস করতেন না।

দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু ও জগদীশনাথ রায় এইরূপ মাত্র কয়েকজন ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি যে সহজে কাকেও বড় একটা পাত্তা দিতেন না বলেছি, সে সম্পর্কে দুএকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পরে যারপর নাই স্নেহ করলেও প্রথমে কিন্তু তাঁকে সমাদর করেন নি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখে গেছেন—'একবার হাওড়ায় যখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে, বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।'

রবীন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র যদি অন্তত কিছুটাও সমাদরের সহিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতেন, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবার সময়, অযাচিতভাবে যাওয়ার জন্য এবং নিজেকে নিতান্ত অর্বাচীন ভেবে, রবীন্দ্রনাথের মনে যে লজ্জা বোধ হয়েছিল, তা আর তাঁর মনেই আসত না। তা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যথাসাধ্য চেষ্টাও করতে হয়েছিল।

(২) রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। এঁর সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক লিখেছেন। অথচ এই অক্ষয়বাবুই প্রথম সাক্ষাতের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই প্রয়োজনে একটা কাজ করতে গিয়েও আদৌ পাত্তা পান নি। এ সম্পর্কে অক্ষয়-বাবুর নিজের লেখাটাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

'৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সাব রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন। আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ি দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ি ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম, জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটা ঠিকা চাকরকেও রাখিয়া দিলাম। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যের গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুতরাং, কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে এই সকল কার্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন। শুনিলেন যে, আমি গুহবাসী গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র, বি এল পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ি দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল। আমরা তিনজন ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম। বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম। বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া গাড়ি করিয়া তিনি বাসায় গেলেন। আমি গাড়ি করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়ে দিলাম। হায়রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে এখনও বুক ফাটে। এ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না। অধীনের প্রতি কপাল-কুণ্ডলাকারের করুণা কটাক্ষ হইল না।

......কাছারীর ফেরতা পিতাপুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা অসুবিধা কত দূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু 'আসুন' বলিয়া পিতাকে সম্বর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল। বঙ্কিমবাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল। আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিম-বাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুএক কথায় টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। '...কাদা মাখা সার হল মো মাছ ধরা হল না।'—বঙ্কিম প্রসঙ্গ

(৩) দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' নামক আত্মজীবনী লিখে গেছেন—তিনি একবার তাঁর দেশ কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসে বঙ্কিম চন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি যাওয়া সময় বঙ্কিমচন্দ্রের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুর লেখা একটি পরিচয় পত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরিচয় পত্রটি দেখেও দীনেশবাবুকে আদৌ পাত্তা দেননি। দীনেশবাবু লিখেছেন—'যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে কথা এড়াইয়া ধানাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন।...তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক, সুতরাং লাঙ্গল, ফাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কেউ অহঙ্কারী বা দাম্ভিক বলতেন বলেছি। এঁদের

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

লেখা থেকেই এ সম্পর্কেও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখানে শুধু একটার কথাই বলছি—

পূর্বোক্ত নবজীবন-সম্পাদক চুঁচুড়া নিবাসী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়িতে একবার তাঁর বন্ধু হুগলী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কলকাতা হাইকোর্টের জজ দ্বারক নাথ মিত্র প্রভৃতি যান। সন্ধ্যার সময় এঁদের গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের সখ হবে একটা নৌকা ভাড়া করে সকলে চুঁচুড়ার কাছে গঙ্গায় বেড়াতে থাকেন। এই সম নিকটে গঙ্গাবক্ষেই একটা নৌকার মাঝিরা রান্নাবান্না করার জন্য নৌকার খোলে শিলে নোড়া দিয়ে মশলা থেঁতো করছিল। এতে যে গুম্ গুম্ শব্দ হয়, সে শব্দ শুনে অক্ষয়বাবুদের দলের একজন বললেন—কোথা থেকে এই গুম্ গুম্ শ আসছে বলতো?

সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকানাথ মিত্র বলে উঠলেন—ঐ তো চুঁচুড়ার ওপারে নৈহাটি কাঁটালপাড়া। কাঁটালপাড়ার চার ডেপুটি বুট পায়ে গ্যাট্ গ্যাট্ করে গঙ্গার ধা
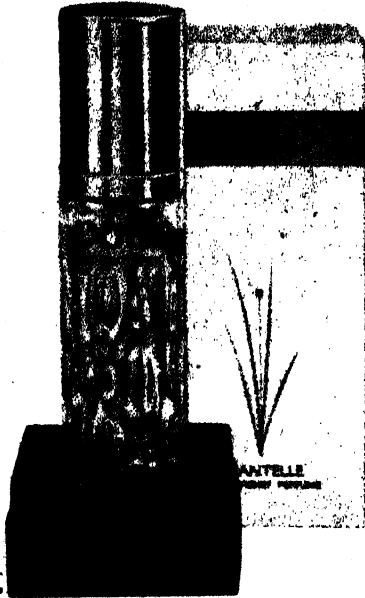
হাঁটছেন। তারই ঐ শব্দ।

এই কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এঁদের মতে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, তাঁর অপর তিন ভ্রাতাও দাম্ভিক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতারা যখন সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেন, তখন সরকারের শাসন বিভাগে শিক্ষিত বাঙালীর সর্বোচ্চ চাকরি ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা শাসকের চাকরি তখন ইংরাজ ভিন্ন কোন বাঙালী পেতেন না। পরে প্রথম বাঙালী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি এস। বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন বলেও বটে, আর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেও বটে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তাঁর অপর ভাইদের গর্ব হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইদের কথাই বা বলি কেন, তাঁদের পিতা যাদবচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তো বটেই, অপর পুত্রদের জন্যও গর্ব বোধ করতেন। অবশ্য তিনি নিজেও সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায়, বড় লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রথম যে চারজন ভারতীয়কে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাদবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। বিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'নায়ক' পত্রিকার একটা পুরাতন সংখ্যায় পড়েছিলাম, পাঁচকড়িবাবু যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'দক্ষিণবঙ্গে রায়বাহাদুর বলিতে একমাত্র যাদব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেই বোঝায়।'

যাদবচন্দ্রের পুত্র-গর্বের একটা গল্প এখানে বলছি—যাদবচন্দ্র তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সেই সময় একবার তিনি কলকাতায় যাওয়ার জন্য বাড়ির নিকটেই নৈহাটী স্টেশনে এসেছেন। ট্রেন এলে একটা কামরায় যাত্রী কম দেখে সেইটায় উঠতে যাবেন কি, এমন সময় ভিতর থেকে একজন ভদ্রবেশী তরুণ বাধা দিয়ে যাদববাবুকে বললেন—এটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের স্পেশাল কামরা। এটায় উঠবেন না।

যাদবচন্দ্র এই শুনে একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—এটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের। তা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বাবাদের কামরা কোন্‌টা বল তো বাবা! তা হলে সেইটায় গিয়ে উঠি।

এই সময় অপর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাদবচন্দ্রকে চিনতে পেরে, সাদরে তাঁকে নিজেদের কামরায় তুলে নিলেন।

গাড়িতে উঠে যাদবচন্দ্র সকলকে বললেন—বঙ্কিমের সঙ্গে তোমাদের কারও পরিচয় থাকলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বাবাদের কামরা যে বলেছি, এ কথা তাকে বলো না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কেন সহজে লোককে পাত্তা দিতেন না, এ সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলতেন—চাকরিতে এক তো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তার উপর প্রতিদিন রাত্রি ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত পড়ি ও লিখি। আমার সময় কোথায় যে লোকের সঙ্গে বসে গল্প করব? লোককে আমল দিলে, এত লোক আসতে থাকবে যে, আমি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাব না। তার চেয়ে লোকে আমাকে অহঙ্কারী বলে বলুক!

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যত চিঠি সংগ্রহ করতে পেরেছি বা চিঠির হদিস করতে পেরেছি, সেগুলিকে আমি চারটি ভাগে ভাগ করেছি। যথা—বাংলা চিঠি, ইংরাজী চিঠি, পত্রাংশ ও লুপ্ত পত্র। কারও কারও লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন পুরা চিঠি না পেয়ে চিঠির দুচার লাইন বা অংশ বিশেষ করে পেয়েছি। সেগুলি সংগ্রহ করে, তার সঙ্গে প্রসঙ্গ কথা দিয়ে, পত্রাংশ অধ্যায় করেছি। আর অনেকের লেখায় চিঠির অংশ বিশেষও নয়, শুধু কেন বা কি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বা অন্যকে চিঠি লিখেছিলেন, তার উল্লেখ মাত্র পাচ্ছি। সে চিঠি আজ আর নেই। কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। এই উল্লেখিত, অথচ না পাওয়া চিঠির কাহিনীগুলো নিয়ে করেছি লুপ্তপত্র অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ইংরাজী চিঠির কথা এখন বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী চিঠির কথা যা জানা যায়, তারও সংখ্যা খুবই কম। বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters নামে একটা বই প্রকাশ করেন। তাতে সম্পাদকদ্বয় নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র ১৯টি ইংরাজী চিঠি ছেপেছেন। এই ১৯টির মধ্যে ১৩টি মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা, বাকি ৬টির মধ্যে ৩টি কবি নবীন সেনকে ২টি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে এবং একটি জগদীশনাথ রায়কে লেখা।

এগুলি ছাড়া হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ৩টি ইংরাজী চিঠি আছে। গ্রন্থকার লিখেছেন—এগুলি রামদাস সেন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা। হেমেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বলে যে চিঠিটি ছেপেছেন, সেটি কিন্তু অক্ষয় সরকারকে লেখা নয়, সেটি কবি নবীন সেনকে লেখা। নবীন সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাঁকে লেখা বলেই এই চিঠিটি ছেপে গেছেন। ব্রজেনবাবুরাও তাঁদের বইয়ে এটিকে নবীন সেনকে লেখা বলেই দিয়েছেন। তা ছাড়া, চিঠিটি পড়লেও বোঝা যাবে যে, এটি নবীন সেনকেই লেখা। চিঠির প্রথমাংশের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

Chinsurah,
July 15, '80

My dear Nati,

I have read through your delightful poem—and I was detaining it for the purpose of giving it a second perusal. As, however, the publication is being delayed, the second perusal

ay stand over till it is the property of the public.

The dedication of it would be an honour to any Bengali—nd it is an honour which I certainly have done nothing to eserve. But as undeserved honours are the order of theday, do not see why I should scruple to receive my share.

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনকে নাতি বলে সম্বোধন করতেন। নবীনচন্দ্র তাঁর ঙ্গমতী' কাব্যটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট। সেই সময় তিনি এই চট্টগ্রামে থাকাকালেই 'রঙ্গমতী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ রেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী 'রাঙ্গামাটি' এই নামানুসারে তিনি তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন 'রঙ্গমতী'। পাঁচ বৎসর রে নবীনচন্দ্র মাদারীপুরে থাকার সময় তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির রচনা শেষ করেন। ন্থটি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছিলেন। তাই তিনি কাব্যটির চনা শেষ করে, এটি উৎসর্গ করলে বঙ্কিমচন্দ্র তাতে সম্মতি দেবেন কিনা জানতে য়ে ঐ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং পিতা ও দাম ভ্রাতার উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় গিয়ে বাস করছিলেন। ঙ্গমতীর পাণ্ডুলিপি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন চুঁচুড়া থেকে নবীনচন্দ্রকে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে জগদীশনাথ রায়কে লেখা যে চিঠিটি ছেপেছেন, টি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পুরো চিঠি নয়। একটি চিঠির অংশ বিশেষ। এ'রা এটি

ভূদেব মুখোপাধ্যায়
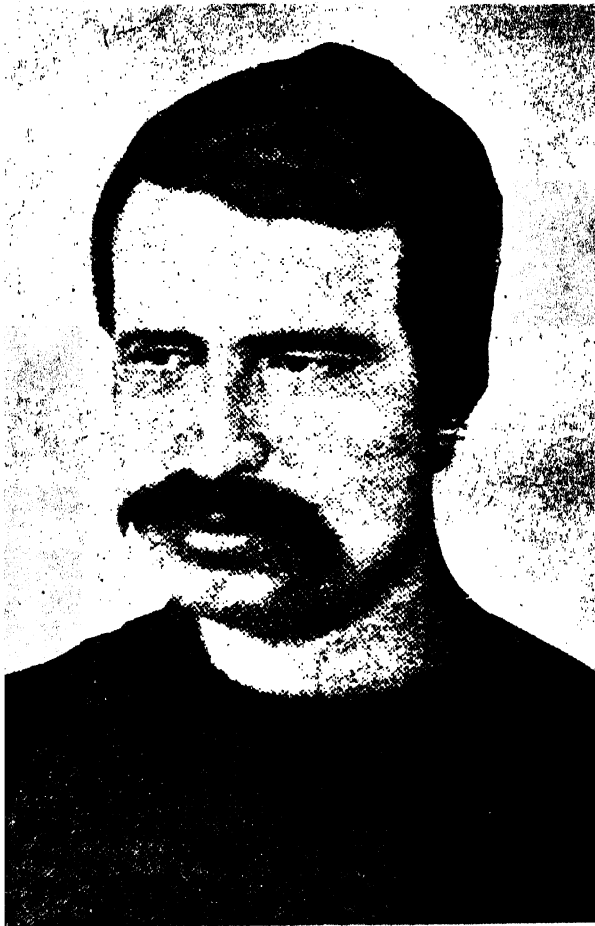
বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু চিঠিটির কোনও প্রসঙ্গ কথা দেননি।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের য দুটি ইংরাজী চিঠি ছেপেছেন, সে দুটির সঙ্গেও লেখার হেতু বা প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। শুধু চিঠি দুটি ছেপে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুকে কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন, আর ভূদেববাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে কিরূপ স্নেহ করতেন, সে কথা আগে বলেছি। এখন এই চিঠির প্রসঙ্গেই একটা কথা বলছি—

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা বই যেমন ভূদেববাবুকে শ্রদ্ধা সহকারে উপহার দিতেন, ভূদেববাবুও তেমনি তাঁর রচিত বই বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিতেন। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বইটি প্রকাশিত হলে, তখন তিনি ঐ বই একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডাকে এই জন্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় উড়িষ্যার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বইটি পেয়ে তখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কয়েকদিন ছাড়া পর পর দুটি চিঠি লিখেছিলেন। শেষ চিঠিটির শেষে তিনি লিখেছিলেন—

I had not space enough in my last letter to write of the delight with which I found that the পারিবারিক প্রবন্ধ had been written in a style suited to all, and the price low enough to be within the means of most....It enables a man to makes his life sweeter to himself and to others at the cost of eight annas only.

১৩৬৩ সালের শারদীয়া দৈনিক বসুমতীতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা বলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি বেশ ভাল করে ছাপা হয়েছে। সম্পাদক বলেছেন—এটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠির অনুবাদ, মূল চিঠিটি পাওয়া যায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পারিবারিক গ্রন্থাগারে। চিঠিটি বসুমতীতে এইভাবে ছাপা হয়েছে—

বহরমপুর, ২৭শে মার্চ ১৮৭২

প্রিয় মহাশয়,

আমার পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মত ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে সফলতা যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজী পত্রিকার জন্য আমি আপনাকে উপন্যাস, গল্প, নক্সা সরবরাহ করিতে পারি। আপনার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ও দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কবিতা পর্যন্ত সব কিছুই আমি চালাইতে পারি। লেখা হয়তো লাভ হইবে না, তবে আপনার জন্য আমি যথাসাধ্য করিব। উপন্যাস আমার নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া মনে হয় কারণ মূলের প্রতি লক্ষ রাখিয়া সমস্ত ঘটনাবলী ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য অখণ্ড মনোযোগের দরকার হয়।

পত্রিকাটি মাসিক হইলেই ভাল হয়। বর্ষার পূর্বে কলিকাতা যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইতি

ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটারজি

এই চিঠিটি কিন্তু আদৌ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা নয়। এটি মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা। এই চিঠিটি প্রথমে

সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল টীকা সহ Bengal : Past and present-এ ছাপেন, পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে সঞ্জীববাবুর বই থেকে উদ্ধৃত করেন। এঁদের বইয়ে প্রকাশিত ঐ ইংরাজী চিঠিটি হল এই—

Berhampore
March 27, '72

My dear Sir,

Many thinks for your kind offer of assistance in regard to my journal. Such a coadjutor as yourself would be invaluable, and if men like you took an interest in it, there can to no doubt that I shall succeed.

For the English Magazine, I can undertake to supply you with novels, tales, sketches and squibs. I can also take up political questions as you wih. Malicious fortune has made me a sort of jack of all trades and I can turn up any kind of work, from transcendental metaphysics to verse making. The quality of course you can't expect to be superior, but I will do all I can for you. The Novel isto me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.

I do not approve of Tara Prasad's suggestion that the Magazine should be a quarterly. I prefer monthly publication.

I don't think of going to Calcutta till the rains, or till at least it is a little cooler and railway travelling becomes possible. When I do go however I will make it a point to call upon you.

Hoping this will find you all serene, I am,

Yours truly,
Bankim Ch. Chatterji

দেখা যাচ্ছে বসুমতীতে শুধু চিঠি প্রাপকের নামেই ওলটপালট হয়নি, অনুবাদেও কিছু ভুল এবং ছাড় হয়েছে।

এই চিঠির তারাপ্রসাদ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু ও বঙ্গদর্শনের লেখক তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। মুখার্জি ম্যাগাজিন ঐ সময় মাসিকও ছিল না বা ত্রৈমাসিকও ছিল না। বছরে তখন ১০টি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার মালিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র দেব মানিক্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে গেলে ১৮৭৬-এর শেষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক বসুমতীর আর এক সালের শারদীয়ায় 'সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী' বলে ৬টি বাংলায় লেখা চিঠি ছাপা হয়েছে। এগুলি কিন্তু আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলায় লেখা চিঠি নয়। এগুলি তাঁর ইংরাজী চিঠিরই বাংলা অনুবাদ। আর এই ৬টি চিঠির মধ্যে ৫টি চিঠি এর আগে অন্তত দুটি বইয়ে Bengal : Past and present এবং সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters-এ টীকা সহ প্রকাশিত হয়েছে।

বাকি একটি চিঠি যা এই শারদীয়ায় ছাপা হয়েছে, সেটি অন্য কোথাও আগে প্রকাশিত হতে দেখিনি। তবে সেটিও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠিরই অনুবাদ করে ছাপা এবং চিঠির প্রথমাংশের অনুবাদটা অন্তত রীতিমতই ভুল অনুবাদ। কেন তা বলছি—

কলকাতার সাদার্ন এভিনিউয়ের বিড়লা মিউজিয়মে একবার একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কয়েকটি চিঠির পাণ্ডুলিপিও প্রদর্শিত হয়েছিল। ঐ চিঠিগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ছিন্ন চিঠি ছিল। আমি প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চিঠি দুটি নকল করে এনেছিলাম। আমার ঐ নকল করা একটি চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, বসুমতীর চিঠিটি এরই অনুবাদ। বসুমতীতে চিঠিটি যা প্রকাশিত হয়েছে, তা এই—

৫ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, ২৬ মে

প্রিয় শম্ভুবাবু,

আপনার ১৮ তারিখের পত্রে আমাদের পারিবারিক বিপদে আপনি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার ভ্রাতা এবং তারাপ্রসাদের (যাহাকে আমার ভ্রাতার ন্যায়ই ভালবাসিয়া আসিয়াছি) তাঁদের উদ্দেশে আপনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষেই সম্ভব।

আমার জীবনে উভয়েই গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। সাহিত্য-জননীর আমি যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে যতটুকু সফলতা অর্জন করিয়াছি তাহার মূলে তাঁহাদের স্পর্শ যে কতখানি ছিল তাহা বর্ণনাতীত। সেই সহযোগিতার গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। আমাদের এই শোকের দিনে আপনার ন্যায় খ্যাতনামা এবং হৃদয়ধর্মী বন্ধুর সমবেদনা লাভ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইলাম।

আপনার
বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী

আমি যে বলেছি, এই অনুবাদের প্রথমাংশে রীতিমত ভুল আছে, সেই ভুলটা এবার দেখাচ্ছি। মূল ইংরাজী চিঠির প্রথমাংশটা হল এই—

Accept my sincere acknowledgement for the sympathy and feeling with which you notice my recent domestic misfortune of the 18th instant. The....you pay to the memory of my deceased broher and of Taraprosad, whom I loved as a brother, is worthy of you. Their o-operation was most favourable....

এই ইংরাজী চিঠিতে যে ১৮ তারিখে পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা আছে, তা হল, ঐ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর কথা। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে। তাই ইংরাজী চিঠিতে 18th instant থাকায় বসুমতীর চিঠির মাথায় যে ২৬শে মে আছে, সেটা ২৬শে এপ্রিল হবে বলেই মনে হয়। আমার নকল করা চিঠিটায় দেখছি, কোন তারিখেরই উল্লেখ নেই। হয় চিঠিটা ছিন্ন হওয়ার জন্য তারিখ পাইনি, নয়তো তারিখটা তুলতে ভুলেছি বা এমনভাবে প্রদর্শনীতে ছিল যাতে তারিখটা চাপা পড়েছিল। যাই হোক, বসুমতীর চিঠিতে যে 'আপনার ১৮ তারিখের পত্র' আছে, তা সম্পূর্ণ ভুল।

আমি বিড়লা মিউজিয়মের প্রদর্শনী থেকে আর একটা যে চিঠি নকল করে আনি, সেটা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে ছাপা হয়েছে। তবে মূল চিঠির নকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, সাহিত্য পরিষদের বইয়ে একটা বাক্যে একটু বদল হয়েছে। যেমন—সাহিত্য পরিষদের বইয়ে আছে—

I have had a relapse and am still unable to do my usual amount of work.

এই বাক্যটাই মূল চিঠিতে আছে—

I have had a relapse and am quite unable to do my usual amount of work.

ব্যক্তি বিশেষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটা ইংরাজী চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কলকাতার খিদিরপুরের বিখ্যাত দার্শনিক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখা। এগুলি বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর 'বঙ্কিম-প্রতিভা' গ্রন্থে ছেপেছেন। এগুলি ঠিক ব্যক্তিগত চিঠি নয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যোগেন্দ্রবাবুর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধাকারে এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। এগুলির নাম দিয়েছিলেন—Letters on Hinduism।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও চারটি বিখ্যাত ইংরাজী চিঠির কথা জানা যায়। এই চিঠিগুলি কলকাতার জেনারেল এসেমব্লি ইনস্টিটিউটের (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড হেস্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধে লেখা। এই চিঠি চারটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবু তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে এই চিঠি ছেপেছেন। এখানে হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ মসীযুদ্ধ বা চিঠি লেখার ইতিহাসটা সম্বন্ধে শুধু সংক্ষেপে একটু বলছি—

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে ঐ বংশের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের তিন দিন পরে ২০শে সেপ্টেম্বর ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, রাজবাড়ির গৃহদেবতা গোপীনাথজীকে রূপার সিংহাসনে শ্রাদ্ধসভায় রাখা হয়েছিল।

গোপীনাথজীকে এই শ্রাদ্ধসভায় রাখার কথা পড়েই মূলত রেভারেন্ড হেস্টি

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ইত্যাদি নিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে ২২ সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যান পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলমে এক চিঠি প্রকাশ করেন। চিঠির হেডিং বা শিরোনাম দেন, 'The most striking Facts of the Shradh' পরদিন অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান পত্রিকায় হেস্টির আবার একটি চিঠি অর্থাৎ দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির হেডিং দেন, 'The supposed necessity of Idolatry'। এর তিন দিন পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর হেস্টির আবার তৃতীয় চিঠি প্রকাশিত হল। চিঠির নাম দিলেন—'The Alleged Harmlessness of Idolatry।'

হেস্টির দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে হেস্টির বিরুদ্ধে ও পক্ষে কয়েকটি চিঠি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি জাজপুর থেকে স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'The Modern St, Paul' নামে হেস্টির চিঠির বিরুদ্ধে একটি চিঠি দিলে, সেই চিঠি ৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের নাম না দিয়ে 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে চিঠিটি লেখেছিলেন।

রামচন্দ্রের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর দিনই ৭ই অক্টোবর তারিখে এর উত্তরে হেস্টির চিঠি 'The Modern Ramchandra' প্রকাশিত হল। এর আগে হেস্টি তাঁর কোন প্রতিপক্ষের লেখার কিন্তু উত্তর দেননি। কয়েক দিন পরে ১৪ই অক্টোবর 'The challenge Renewed' নামে হেস্টির আর একটি চিঠি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

এবার রামচন্দ্রের দ্বিতীয় চিঠি 'European Versions of Hindu Doctrines' ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই পরদিন ১৭ই তারিখে হেস্টির 'রামচন্দ্র রেডিভিভাস' নামে আবার উত্তর প্রকাশিত হল।

এর উত্তরে রামচন্দ্রের তৃতীয় চিঠি 'দি ইনটেলেকচুয়াল সুপিরিয়ারিটি অব ইউরোপ' প্রকাশিত হয় ২৮ অক্টোবরের কাগজে। হেস্টি আবার 'দি ইনটেলেকচুয়াল ইনফিরিয়রিটি অব ইনডিয়া' নামে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এটি ৩০, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বরের স্টেটসম্যানে ছাপা হয়।

এই সময় ১৪ই নভেম্বর তারিখে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি রিসেন্ট কনট্রোভার্সি' নামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা কৃষ্ণমোহন এবং হেস্টিও তাঁর শেষ চিঠি লেখার সময় জানতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, ২২শে নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ চিঠি অর্থাৎ ৪র্থ চিঠি 'দি রিসেন্ট কনট্রোভার্সি' নামে কৃষ্ণমোহনের চিঠির উত্তরে প্রকাশিত হল এবং এই

92 Bow Bazar St
May 31/82

My dear Bhuban Babu
Excuse my not replying to you earlier. I do not know anything & about my going to Hooghly, though for aught I know the thing may happen.
Trusting you are all well
Yours lovingly
Bankim Ch Chatterji

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠি

চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র আর রামচন্দ্র নাম না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী হিসাবেই চিঠির শেষে নাম সই করেছিলেন।

রেভারেন্ড হেস্টি বা কৃষ্ণমোহন আর উত্তর দিলেন না। এইভাবে এইখানেই এই মসীযুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

রেভারেন্ড হেস্টি ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মসীযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধের ফলে তখন একটা বড় সুফল হয়েছিল এই যে, বহু ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু স্বধর্মে দৃঢ় আস্থা ফিরে পেয়েছিলেন।

চন্দননগরের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক হরিহর শেঠের কাছে একদিন শুনেছিলাম, তাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছোট ইংরাজী চিঠি আছে। তিনি একজনের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেন। সেদিন তিনি চিঠিটি দেখাতে পারেন নি।

শ্রীরামপুরের সাহিত্যিক অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় হরিহরবাবুর কাছ থেকে ঐ চিঠিটি নিয়ে তার একটি প্রতিলিপি নিজের কাছে রেখে দেন। অমিয়বাবু আমাকে ঐ প্রতিলিপিটি দিলেও, কাকে লেখা বা কি প্রসঙ্গে লেখা তা কিছুই বলতে পারলেন না। হরিহরবাবুও আজ আর নেই। তিনি হয়তো জানাতেন। যাই হোক, চিঠির পাঠোদ্ধার করে যেটুকু বুঝেছি, সেটি সহ চিঠির প্রতিলিপিটিও দিলাম। একটা শব্দে সন্দেহ হওয়ায় (?) দিয়েছি।

চিঠিটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে কলকাতার ৯২ নং বৌবাজার স্ট্রীট (বর্তমান নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) থেকে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন এবং আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আলিপুরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ১৮৮২র জানুয়ারিতে। এর আগে তিনি বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে চার মাস কলকাতায়, তার আগে আট মাস হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হাওড়ায় আসার আগে তিনি হুগলীতে একটানা কয়েক বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিঠিটি বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী বেড়াতে যাওয়া নিয়েই, ওখানকার তাঁর পরিচিত কোন এক ভুবনবাবুকে লেখা। চিঠিটি এই—

92, Bow Bazar Street
May 31|82

My dear Bhuban Babu,

Excuse my not replying to you earlier. I do not know any thing about my going to Hooghly, though for aught I know the thing may happen.

Trusting you are all well.

I am yours loving(?)
Bankim Ch. Chatterji

চিঠির প্রতিলিপিতে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র আই ডু নট নো এনি থিং লিখে এর পর অব দিয়ে কি একটা লিখতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা না লিখে অব কেটে দিয়ে অ্যাবাউট লিখে অন্য কথা বললেন। ক্রমশ

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ১৬ ॥

ক্রিলিলিং ক্রিলিলিং। দাউদ আবারও সাইকেলের ঘণ্টি বাজাল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই ভিতর থেকে। সে হতাশ হ'ল। ঘামতে লাগল। ভাবল চলে যাই। মৌলভী ছাহেব বাড়ি নেই, জানা কথা। সেই সুন্দর লাজুক ছেলেটাও নিশ্চয় নেই। থাকলে সেও এতক্ষণ বেরিয়ে আসত। আসলে এটা জেনেই একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল দাউদের মনে। হয়ত সেই মুখখানাকে তাহলে একবার দেখা যাবে সেই আশাতেই দাউদ সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে যাচ্ছিল। এখন হতাশ হ'ল। না, আর এখানে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। দাউদের দিনটা কেমন এক ধরনের বিস্বাদে যেন ভরে যেতে লাগল। একবার ভাবল, সইফুল হয়ত বাড়ি নেই। তাই কোনও সাড়া পাচ্ছে না তার। এই চিন্তায় সে তবু কিছুটা স্বস্তি পেল। সাইকেলের মুখটা ঘোরাতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়াল। সে কেন ধরেই নিচ্ছে, সইফুল তার সঙ্গে দেখা করবে? বরং সইফুল কি উলটোটাই প্রমাণ করেনি? আবার সে দেলের ভিতরে পিঁপড়ের কামড়ের মত একটা ব্যথা টের পেল। সে কি পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও সইফুল তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়নি? হয়ত সে যে দাউদ, এই পরিচয়টা শুনেই সইফুল তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কিছু না বলেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তুমি দাউদ! সর্বনাশ! তোমাকে আমরা চিনি।

বাড়িতেই আছে সইফুল। নিশ্চয় আছে। সে দাউদ বলেই সাড়া দিচ্ছে না। তার মানে তার স্বভাব চরিত্রের কথা সইফুলও জানে। ছবি বলেছে নিশ্চয়ই। নিশ্চয় বলেছে যে দাউদ তার বিবি ফুটকিকে মোকামে নিয়ে যাবার নাম করে চাচার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাইতির কসবীটাকে নিয়ে ভেগে পড়েছিল। এবং সেই জন্যই ফুটকি গলায় কলসী বেঁধে পুকুরের পানিতে ডুবে মরেছে। তার মুখটা ক্রমশ একটা তেতো স্বাদে ভরে যেতে লাগল। কী ক'রে এ সাহস পেল ফুটকি? চিরকালই ঘাড়-ত্যাড়া মেয়ে! আমাকে সাজা দিবার জন্যিই এই কাজটা করে বসিছে। সবাই ফুটকির জন্যিই চোখির পানি ফেলতিছে। আমার কথাডা কেউই শুনতি চায় না। আমি তো আসামী!

নাঃ সইফুল সাড়া দেবে না। দাউদ সাইকেলের মুখটা ঘুরোলো। দিলে ভাল করত সইফুল। দাউদ তার কৈফিয়ৎটাও শোনাতো তাকে। শুনিয়ে হালকা হতে পারত। দাউদ প্যাডেলে ভর দিয়ে সাইকেলে উঠতে যাবে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এল।

বলল, "বাজান রে খুঁজতিছেন?"

দাউদের উৎসাহ ফিরে এল। বলল, "হ্যাঁ। কী নাম তোমার?"

"জামিলা খাতুন।"

"বাঃ! বাঃ!" দাউদ বলল, খুব ভালো তো তুমার নামডা। তা আমি তুমার বাজানরে খুঁজতিছি, ইডা তুমারে কলো কিডা?"

"বড় বু। বড় বু কলো, ছবি বুরে ভাইরি কয়ে আয় বাজানরে সন্ধ্যেবেলায় আলি পাবেন।"

জামিলা ছুটে ভিতরে চলে গেল। দাউদ ভাবল, সইফুল জানে যে সে এসেছে। এই ঘটনাটা কেন জানিনে তার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করল। তবে সে সাড়া দিল না কেন? মুহূর্তে নিবে গেল দাউদ। সে সাইকেলের উপর উঠল। তারপর ক্রিলিলিং করে ঘণ্টি বাজালো। তারপর জোরে প্যাডেল ক'রে খান বাহাদুরের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল।

খোন্‌কার ছাহেবের বাড়িতে দাউদ ঢোকামাত্র তার ঠিকেদারীর পারটনার, খোন্‌কার ছাহেবের ভাতিজা খোন্‌কার মতিউর রহমান বা মতি মিয়া তাকে দেখে আগেই সালাম জানাল। তারপর এগিয়ে এসে "আইয়ে, তশ্‌রীফ্‌ লাইয়ে মিয়া সাব্‌" বলে অভ্যর্থনা জানাল। এইতেই দাউদ বড় অবাক হল। জামাই মেয়ের কথা ঠেলতে না পেরেই খোনকার ছাহেব যে ওকে আমল দিয়েছেন, সে বিষয়ে দাউদের কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাকে ঠিকেদারী করার পরামর্শ দিয়েছে তাঁরই বড় জামাই। কোনোই সন্দেহ নেই পরামর্শটা তার পক্ষে খুবই হিতকারী হয়েছে। এবং কাজটা ওর এতই ভাল লেগেছে যে প্রাণপাত পরিশ্রমে এই কাজের প্যাঁচঘোঁচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে অনেকটা রপ্ত করে ফেলেছে। এবং এরই মধ্যে সে ডিস্‌ট্রিক্‌ট বোর্ডের কন্‌ট্রাকটর হিসেবে নাম কিনে ফেলেছে। আরও সে এগুতে পারত, যদি তার নিজের টাকা থাকত এবং যদি না এই অপদার্থ মতি মিয়াটাকে তার ঘাড়ে চাপাতেন ডিস্‌ট্রিকট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান। মতি মিয়া তাদের ব্যবসায়ে এককড়ার উপকারে আসে না। কিন্তু তার বাদশাহী মেজাজের দাপটে দাউদ থেকে আর সবাই সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। মিয়ার কথাবার্তার ধরনও এমন যে সবাই যেন তার বাপের চাকর। একমাত্র চাচার সামনেই মতি মিয়া কেবল মেকুরের মতই মিঁউ মিঁউ করতে থাকে। সেই মতি মিয়া তার দেখা পাওয়া মাত্র দু হাত বাড়িয়ে "আইয়ে আইয়ে মিয়া সাব্‌ তশ্‌রীফ লাইয়ে" বলে একেবারে উরদু জবানে খাতির করতে লাগল দেখে দাউদ, সত্যি বলতে কি একটু ঘাবড়েই গেল। একে-বারে মিয়া সাব্‌! ব্যাপারডা কী?

"আপ্‌ কহাঁ থে?" মতি মিয়া দেখি উরদু আর ছাড়ছে না!

"জে, এই দিকি আসব বলেই তো বেরোই-ছিলাম।" দাউদ সালাম জানিয়ে বলল, "পথে এটটু কাজ সা'রে তবে আলাম। দেরি তো অ্যামন বিশেষ কিছু হয়নি। তা আজ যে অ্যাত তাড়া?"

"চাচাজীনে," মতি মিয়া উরদুর স্রোত খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করল, "আপনার ইন্তেজারে ব'সে আছেন। বহোৎ জরুরী। আপনার বাসা মে ভি লোক ভেজা গয়েছিল। আপনার লোক বলল কি, আপনি এখানেই রওয়ানা দিয়েছেন।"

"মতি!" খান সাহেবের খাস কামরা থেকে ডাক ভেসে এল।

"জে!" মতি মিয়া দৌড় দিল।

চাচা ছাহেবের দরকার। খাতিরের কারণটা বোঝা গেল। ভাবল দাউদ। কিন্তু কী এমন দরকার যে বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন খান বাহাদুর। মতি মিয়া হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল।

"খান ভাইসাব্‌ যান, চাচাজী আপনার ইন্তেজার করছেন।"

একটু চিন্তিত মনেই খান বাহাদুরের খাস-কামরায় ঢুকল দাউদ।

"আচ্ছালা-মু আলায়কুম্‌।"

খান বাহাদুরও ছালাম জানালেন। যথারীতি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসেই। এবং চাচার মতই আলবোলার কারুকার্য করা দীর্ঘ নলটাতে আলতো আলতো টান দিচ্ছিলেন খোন্দকার ছাহেব।

বললেন, "দাউদ! তারপর তোমার কাজ কাম কেমন এগুচ্ছে? পি ডবলিউ ডি'র কনট্রাক্‌ট পেয়ে গিয়েছ?"

এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য খোন্দকার তাকে এমনজরুরী তলব পাঠিয়েছেন! দাউদ অবাক হল। তবে কি মতি মিয়া কিছু নালিশ করেছে? কী নালিশ করতে পারে মতি মিয়া? সে তো তার পাওনার বেশীই ঘরে তুলে নিচ্ছে। এবং কিছু না করে।

দাউদ বলল, "জে, চলতিছে টুকটাক। পি ডবলিউ ডি'র অ্যাকটা কাজই পাইছি। সে পেরায় কিছুই না।"

"কোন্‌ কাজডা পেয়েছ? যশোর খুলনা রোডের?"

"জে না।" দাউদ বলল, ঐ কাজডা পালি তো কাজের কামই হত। উডা যতীন সাহাবাবু পায়ে গেছেন। আমরা কোটচাদপুরির অ্যাকটা ছোটখাটো কাজ পাইছি।"

"যশোর-খুলনা রোডের কাজ তোমরা পাওনি! তাজ্জব! খান বাহাদুর আশ্চর্য হ'লেন। সুপারিন-টেনডিং ইনজিনিয়ার ভট্টাচার্য প্রমিস্‌ করে গেল! তাজ্জব! তো ঠিক হ্যায়। ফিক্‌র মত্‌ করো। কাম আ যায়েগী।"

দাউদের মনে হচ্ছিল, এটা ভূমিকা। খান বাহাদুর আসল কথা শুরু এখনও করেন নি। সে কোনও কথা না বলে চুপ করে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল।

খান বাহাদুর আলবোলার নল টেনেই চললেন একেবারে আয়েসী ভংগীতে। যেন ওঁর কোনও তাড়া নেই। চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, "শোনো দাউদ। আমি বোরডে ফাইট্‌ করে শৈলকুপো, ঝিনেদা এবং মাগরোর দিকে প্রায় আড়াই লাখ টাকার কাজ স্যাংশন্‌ করিয়েছি। সব রিপেয়ারের কাজ। এসব রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে নেগলেকটেড্‌ হয়ে পড়েছিল। তোমার কি ধারণা, তুমি যদি কাজটা পাও তিন মাসের মধ্যে কাজটা তুলে দিতে পারবে? ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কাজ তুলে দিতেই হবে।"

"জে, কাজটা অ্যাক জায়গায় হলি কতি পার-তাম।" দাউদ বলল, "জায়গায় জায়গায় কাজ। কী রকম কাজ, চোখি দেখলি কওয়া সহজ হয়।"

খান বাহাদুর বললেন, "ডিস্‌ট্রিকট বোরডের রাস্তা রিপেয়ার। এর এত দেখাদেখির কী আছে?"

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "জে, খালি তো আর আর্‌থ্‌ ওয়ারক্‌ নয়। পাকা রাস্তার যা কাজ সবই তো করতি হবে। জলদি শেষ করতি হলি, সব জায়গায় না হলিউ, পিরায় জায়গার কাজই অ্যাকসঙ্গে শুরু করতি হবে। মাটির কাজ হয়ে যাতি পারে। ফ্যাকড়া বাধবে সোলিং-ই। অ্যাত ইঁট ঠিক সুমায় ওই সব জায়গায় জুগার করা যাবে কিনা? আর ফ্যাকড়া বাধবে রোলার পাওয়া যাবে কি না, তাই নিয়ে। বোরডের অ্যাত রোলার নেই।"

"আমি যদি পি ডবলিউ ডি'র রোলার জোগাড় করে দিই?" খান বাহাদুর বলে উঠলেন।

"জে, তা'লি অ্যাকটা ফ্যাকড়া গ্যালো।" দাউদ বলল।

"কোন্‌ ফ্যাকড়াটা তাহলে তোমার থাকল?" খান বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেল।

"জে, ইঁটির ফ্যাকড়া।"

খান বাহাদুর চুপ করে গেলেন। এবং চুপ করে

আলবোলায় সুগন্ধি ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। দাউদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "জে ডিসেমবরের মধ্যি কাজটা তুলে দিতে হবে ?"

খান বাহাদুর অন্যমনস্কভাবে বললেন, "ডিসেমবরের মাঝামাঝি। কাজটা তুলে দিতেই হবে দাউদ। খুব আরজেনট।

দাউদ বোকা বনে গেল। আজ সেপটেমবরের মাঝামাঝি। সবে বর্ষা শেষ হল। মাটিতে এখনও জল। আর দিন সাতেক পরেই রমজান। অকটোবরের তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাবে। তাহলে হাতে থাকল অকটোবরের অ্যাক, নভেমবরের চার আর ডিসেমবরের দুই, মোট সাত সপ্তাহ।

"জে, রিপেয়ার কত জায়গায় হবে ?"

খান বাহাদুর চটকা ভেঙে বললেন, "অাঁ, রিপেয়ার ?"

তারপর হাঁক দিলেন, "মতি !"

মতি মিয়া মুহূর্তে হাজির হয়ে বললেন, "জে ?"

"এস ও বাবুকো বোলাও।"

একটু পরেই মতি মিয়ার সঙ্গে সাব্ ওভারশিয়ার করালীকান্ত কুণ্ডু কোটের উপর কোঁচানো চাদর গলায় বেঁধে ঢুকল। তারপর আভূমি মাথা ঝুঁকিয়ে "হুজুর" বলে উঠে দাঁড়াল। করালীবাবুর গাল দুটো বসা। চুলে কলপ। নাকের নিচে ঝাঁটার মত গোঁফ। এই বুড়ো বয়সে, একগাদা ছেলেপুলে থাকতেও তৃতীয় পক্ষ করেছে। তাই পোশাকে আসাকে বেশ ফিটফাট। দাউদ দেখছিল। ঘুষ খাবার যাশু, এই করালী। ঘুষ ছাড়া কথা নেই।

খান বাহাদুর সোজা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তো রিটায়ারমেনটের সময় হয়ে এসেছে ?"

করালীবাবুর মুখ শুকিয়ে এল।

করালী বলল, "হ্যাঁ হুজুর। এই ডিসেমবরেই হিসেব মত আমার সারভিস শেষ।"

"তা আরও কিছুদিন কাজ করার ইচ্ছে আছে, না কাশী বাস করাই সাব্যস্ত করেছেন ?"

করালী বলল, "হুজুরেই তো অ্যাখন ভোরসা। দয়া না করলি ছেলেপুলে নিয়ে শুকোয়ে মরতি হবে হুজুর।" বিনয়ের অবতার! পাঁচ-সাত খানা বাড়ি শালার এই শহরে। ইসটিশনের দিক্‌ জমি কিনে রাখিছে। ধান ভানার কল বসাইছে। ব্যাটা ছিনে জোঁকের রক্তমখানা দ্যাখ। দাউদ বসে বসে লক্ষ্য করছিল।

খান বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে নতুন কাজ বের হল, ক জায়গায় রিপেয়ার হবে ?"

করালী বলল, "আজ্ঞে শৈলকুপের দিক নয় আর এগার মাইলির মধ্যি পচানব্বুই চেন, ভগবাননগর আর কাজীপাড়ার মধ্যি সাতাশি, এগার আর সাড়ে তেত্রিশ চেন্। তারপর গে ধরেন ঝিনেদা টু মাগুরো, মধুপুরির কাছে—"

খান বাহাদুর অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "আহা, ডিটেলস্ কে জানতে চাইছে। খুঁটিনাটি নিয়ে আপনি ঠিকেদার এই দাউদ মিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। কোনো রকম বাগড়া দেবেন না। আপনার আপাতত দু'বছরের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। শুধু একটা শর্তে। এই দাউদ মিয়াকে তাড়াতাড়ি কাজ তুলে দিতে মদত দেবেন। মেজারমেনটের ফ্যাকড়া ট্যাকড়া বেশী তুলবেন না।"

করালীকান্ত বিগলিত হয়ে বলল, "হুজুর মা বাপ যামনভাবে চলতি কবেন তেমনিই চলব।"

"ঝিনেদা আর মাগুরো সাব ডিভিশনের ডি বি রোডের কটা জায়গায় কাজ হবে আর কী কী কাজ হবে ?"

করালীকান্ত বলল, "সতেরটা জায়গায় মেজর রিপেয়ার হুজুর, তা ছাড়া প্যাচ্ রিপেয়ার—"

"কাজ কী হবে, তাই বলুন ?"

"সবই হবে হুজুর, আরথ্ ওয়ার্ক, বকস্ কাটিং বার ফুট করে সিংগিল সোলিং ঝামা মেটালিং, গ্রাইনডিং উইথ্ ঘেস্, রোলিং—"

"ঠিক আছে," খোন্দকার বললেন, "দাউদ মিয়া বুঝিয়ে দেবেন। এখন যান।"

"আদাব হুজুর" বলে করালী বেরিয়ে যাচ্ছিল, খোন্দকার ডাকলেন।

"শুনুন, এই কাজটা কে পাচ্ছে দু'কানেও যদি ফাঁস হয়—"

করালী বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর, নিজির পায়ে কি কুড়ুল মারতি পারি ?"

করালী বেরিয়ে যেতেই চাকর এসে চিলিম্ বদলে দিয়ে গেল। খান বাহাদুর আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ আলবোলা টানলেন। তারপর মুখ থেকে নল সরালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর ?"

দাউদ, "জে, সত্যিকারের কাজের সুমায় পাওয়া যাবে সাত কি আট হপ্তা। মাঠের ধান না উঠলি এদিকির মজুর পাওয়া যাবে না। যাক, মাটি কাটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার মানে একই সঙ্গে অনেক জায়গায় কাজ শুরু করতি হবে। আর ঐ সঙ্গে আমরা যদি কাজের সাইটে পাঁজা পুড়িয়ে নিই, ইঁটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

দাউদকে বাধা দিয়ে খান বাহাদুর বললেন, "ব্যস ব্যস, তবে তো হয়েই গেল। আর কিছু বলার আছে ?"

"জে, এতো অনেক টাকার ব্যাপার।"

দাউদ বলল, "যত টাকা গুড়ার দিকি ঢালতি হবে, তা তো নেই।"

"আহ্‌হা," খান বাহাদুর বললেন, তুমি কেবল কাজ তুলে দেবার কথা ভাব, টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে অ্যাডভানস করব। এবার হল তো ?"

হঠাৎ কী হল ? দাউদের সাহস বেড়ে গেল। বলল, "জে, আমার উপর আপনার যখন অ্যাতই মেহেরবাণী তালি অ্যাকটা কথা কই। হয় এই

জেতা আমারে পুরো আক্কা করতি চান, লাভ-
কেসান সব আমার, আর নয় মতি মিয়ার উপরেই
রো ছাড়ে দ্যান, লাভ-লুকসান পুরো উনার।
পনার মর্জি হলি যদি আমি এই কাজটা পাই
লি আমি মতি মিয়ারে পি ডবলিউ ডির কাজডা
ড়ে দেব। তারপর যার কিছুমত যেখানে যারে
য়ে যায়।"

খান বাহাদুর স্থিরদৃষ্টিতে দাউদের দিকে
ইলেন।

তারপর বললেন, "মতি মিয়ার সংগে তোমার
হে না মনে হচ্ছে।"

দাউদ শুধু বলল, "জে।"

খান বাহাদুর চুপ করে আলবোলা টানতে
গলেন। একবার বাঁ হাতটা মুখে বুলিয়ে নিলেন।
রপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। কিছুক্ষণ
রে আবার মাথায় মুখে হাত বোলালেন।

তারপর বললেন, "মতি মিয়াকে দিয়ে ঠিকেদারী
ব না। তুমি আলাদাই কর। শুধু একটা কথা
ন রাখবে ডিসেমবরের পনেরোই হচ্ছে শেষ তারিখ।
র যত আগে কাজ তুলে দিতে পারবে, তত ভালো।
, আর কোনো কথা নেই তো ?"

"জে না!" দাউদ বলল, 'আপনার মদত আর
াব মর্জিতে কাজ উঠোয়ে দিতি পারব আশা
রি।"

"শোনো দাউদ!" খান বাহাদুর বললেন।
তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ঈমানদার
ুসলমান।"

আমি ঈমানদার! দাউদ হাসবে না কাঁদবে ?

"মনে হচ্ছে, তোমার উপর বিশ্বাস রাখা যায়।"

চাচা একথা বলবে না। এক আধলা দিয়ে চাচা
ার বিশ্বাস করবে না।

"যা কাউকে বলি নি, তাই তোমাকে বলছি।"

দাউদের শরীরটা শিউরে উঠল। বিশ্বাস! খান
াহাদুর আমারে বিশ্বাস কত্তিছেন। আমারে
শ্বাস করা যায়!

দাউদ কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল।

"জানুয়ারি মাসে ইলেকশন হবে। আমি ইউ-
াইটেড মুসলিম পারটির মনোনয়ন পেয়েছি।" খান
াহাদুর, জাঁদরেল উকিল, শহরের সেরা শরীফ,
খান্দকার বজলুর রহমান, খাস কামরায় যখন আর
কউ নেই, শুধু সে, কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন
অসহায় শিশু হয়ে গেলেন।

"আমাকে তোমাদের ওদিক থেকেই দাঁড়াতে
বে। আমাকে মদত দিতে হবে বাপ। কেন না
শোর সদরের সীটে আমাদের বিরুদ্ধে সৈয়দ
ওশের আলি সাহেব দাঁড়াবেন। ওঁকে এঁটে ওঠা
ক্ত হবে। মুসলিম লীগ বলেছে, আমার হয়ে যা
রবার লীগের ভলানটিয়াররাই করবে। কিন্তু শুধু
লীগের উপর ভরসা করে থাকা যায় কী ? নিজের
লাক না হলে চলে ? তুমি আমার নিজের লোক।
তামার উপর আমি আমার ইলেকশনের তদারকির
ারও পুরো ছেড়ে দিতে চাই। বুঝলে দাউদ।
তুমি ওদিককার লোক। ওদের তুমি অনেক বেশী
চেন।"

ফুটকি! ফুটকি! তুই ক্যান্ আর কড়া দিন
বুর করলি নে। আমার ভুলই তোর কাছে আত
ড় হলো ?

"লীগের কাজ লীগ করবে। করুক তারা।
কন্তু তুমি দাউদ হবে আমার প্রতিনিধি। আমার
চাখ আর কান। সত্যি কথা বলাই ভালো।
তোমার সংগে আমার খুব বেশী দিনের পরিচয়
নয়। আমি উকিল মানুষ। লোক চরিয়ে খাই।
লোক দেখে, কাকে বিশ্বাস করা যায় কাকে যায় না,
সম্পর্কিতর বুঝতে যে একেবারে পারিনে তা নয়।
তোমাকে দেখে মনে হয়েছে, এই কাজে তোমার উপর
নির্ভর করা চলে।"

মাইতিদা একথা বলবে না, চাচা একথা বলবে
না। চাচা আমার উপর নির্ভর করেছিল, মাইতিদা
আমাকে বিশ্বাস করেছিল। ওরা ঠকেছে।

"তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে দাউদ,
তোমার একটা যন্ত্রণাদায়ক অতীত আছে।"

হঠাৎ দাউদের বুকের মধ্যে একটা তোলপাড়
শুরু হল। সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল।
রাখতে চেষ্টা করতে লাগল।

"আমি তোমার অতীত জানতে চাইনি। আমি
তোমার কাজ দেখেছি। আর আমি তাতে সন্তুষ্ট
হয়েছি। ইলেকশনের কাজের জন্য অনেক টাকা
তোমার হাতে দেবো। তুমি যদি সব টাকা মেরেও
দাও আমার কিছুই করার থাকবে না। ইলেকশনে
এই জন্যেই বিশ্বস্ত লোকের এত দরকার। আমি
জিততে চাই দাউদ। জেতার জন্য সব কিছু করব।
এবং হারলে খুব দুঃখ পাবো। কিন্তু যার উপর
বিশ্বাস রেখেছি সে যদি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে,
তবে দুঃখের মধ্যেও একটা বড় সান্ত্বনা পাবো।"

ছবি, আমার চাচাতো বুন আমারে কয় খুনে।
সইফুল মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দ্যায়, বাড়িতে
থাকলেও সাড়া দেয় না খান বাহাদুর। আমি কি
বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব ?

"তুমি ভেবে দ্যাখ, দাউদ, তুমি এই দায়িত্ব নিতে
রাজী আছ কিনা। আমার দিক থেকে বলতে
পারি তোমার হাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে জান মাল
ছেড়ে দিতে পারি।"

দাউদ মুখ নিচু করে বসে রইল। এবং ভাবতে
লাগল, এও কিছমতের খেল। কেউ তাকে দেখা
মাত্র দরজা বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ তার ঈমান-
দারীর উপর পুরো ভরসা করে তার উপর
নিজের তকদীরকে সঁপে দিতে চায়। আল্লার
দুনিয়ায় সবই সম্ভব। দাউদ এখন কী করবে ?
হঠাৎ দাউদের মনে হ'ল, আল্লা তাকে একটা সুযোগ
দিচ্ছেন, মানুষ হবার জন্য। সে এই সুযোগটা
নেবে। সে মানুষ হবে। তখন কি সইফুল মুখ
ফিরিয়ে থাকতে পারবে। দাউদ আল্লাহর পথ ছেড়ে
দিয়েছিল বলে ফুটকির মত মেয়েকে হারিয়েছে।
এখন আল্লাহর পথে ফিরে এলে সইফুলকে কি সে
পাবে না ? আল্লাহ!

দাউদ অবশেষে খান বাহাদুরের দিকে চাইল। খান
বাহাদুরও ওর চোখের দিকে চাইলেন।

দাউদ কিঞ্চিৎ ভারী গলায় তাকে বলল,
"আল্লাহর মরজি হলি আমি ঈমান রাখতি পারব।
আপনি যা আমারে কলেন অ্যাত বড় কথা আজ
পয্যন্ত কেউ আমারে কয়নি। তাগের কারুরি
দোষ দিইনে। আমিই কিনারের কাছে আসে নৌকো
ডুবোয়ে ফেলি। আপনি খোদার কাছে আমার
হয়ে দোওয়া মাঙেন আর য্যান্ অ্যামন না হয়।
ইনশাল্লা আপনি কামিয়াব হোন।"

দাউদ আর কোথাও গেল না। সোজা বাড়ি
এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে এখন একা থাকতে
চাইছিল। সে ভেবে দেখতে চাইছিল কোন
সম্ভাবনার মুখে এসে সে দাঁড়িয়েছে। সম্ভাবনা
বিপুল কিন্তু তার চেহারাটা অস্পষ্ট।

কাতলা এসে বলল, "জে, হঠাৎ আসে শুয়ে
পালেন যে। তবিয়ত ঠিক আছে তো ?"

"আছে।"

"আপনারে—"

"খান বাহাদুরের বাড়ির থে ডাকতি আইছিল।
এই তো কবা ?"

"জে।"

"আর কতি হবে না। আমি জানি। আর
দ্যাখো কানের কাছে বকবক না করে, যাও তো বাপ
নিজির কাম কর গে।"

"জে। তালি একটু শির দাবায়ে দিই।"

"ক্যান্, এছাড়া কি তুমার আর কোনও কাম
নেই ?"

"জে না। আপাতক নেই।"

"ক্যান্, খানদা পাকানো কি হয়ে গেছে ?"

"জে। আমার মতো পাকায়ে নিছি।"

তুমার মতো পাকায়ে নেছ! আমি কি তালি
বুড়ো আঙুল চোষবো।" বিরক্ত হল দাউদ।

"জে না। মৌলভী জমিরুদ্দী ছাহেবের বাড়ি
দুপর বালায় আপনার দাওয়াত আছে।"

"কার বাড়িতি দাওয়াত আছে কলি!" দাউদ
বিছানার উপরে উঠে বসল।

"জে মৌলভী জমিরুদ্দী ছাহেবের বাড়ি।"
কাতলা বলল। "ঐ যে যে-বাড়িতি আজ সকালে
নাস্তা খাতি গিছিলেন। তারপর আরেকবার যায়েও
ফিরে আইছেন। মৌলভী ছাহেব বাড়ি ছেলেন না।"

কাতলার বলবার ধরনে দাউদের মুখ গরম হয়ে
উঠল। কিন্তু সে কাতলাকে আর কিছু বলল না।
আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। খান বাহাদুর যে
পরিমাণ কাজ ওকে দিতে চাইছেন, এখন বোঝা গেল,
ইলেকশনের আগেই কেন সেগুলো শেষ করা
দরকার। খান বাহাদুরের ভোট পাওয়ার সুবিধে হবে।
কিন্তু দাউদের সুবিধেই বা কম কী ? আড়াই লাখ
টাকার কাজ তিনি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন, তার
ব্যবসা থেকে তার অপদার্থ ভাইপোকে সরিয়ে
নিচ্ছেন, আর তার চাইতেও বড় কথা, তার উপর
ন্যস্ত করছেন অনন্ত বিশ্বাস। দাউদ বিস্মিত, দাউদ
হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এসেছে বাসায়। আর বাসায়
এসে দেখে বিস্ময়ের আরেক ধাক্কা তার জন্য অপেক্ষা
করছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়াত করে গিয়েছেন মৌলভী
জমিরুদ্দী। মৌলভী কি নিজের থেকেই দাওয়াত
করতে এসেছিলেন, না এর পিছনে অন্য কারও হাত
আছে ? সইফুল পাঠায়নি তো ?

সইফুলকে সকালে ফটিক ভাইএর বাড়িতে
দেখার পর থেকে দাউদ কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।
যদি না সইফুল ওর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে
দিত, তাহলে কি সইফুলের কথা এত মনে হ'ত
দাউদের ? যদিও সে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল
তবু দাউদ সেই বিষণ্ণ শিউলির মত মুখখানার উপর
রাগ করতে পারেনি। বরং ঐ আবার দেখবার পিপাসা
জেগে উঠেছে দাউদের মনে। আল্লাহ্ সেই খাইস্
পুরোবার জন্যই এই দাওয়াত পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই
তাই।

দাউদের মনে হচ্ছে, আল্লাহ তার বরকত তাকে
উজাড় করে ঢেলে দিতে চাইছেন। দাউদ পুরানো ভুলে
আর জড়িয়ে পড়বে না। তাকে আড়াই লাখ টাকার
কাজটা সময়ে তুলে দিতে হবে, সাব্ ওভারসিয়ার
ব্যাটা এখন আর বাগড়া দেবে না। কালই সাব্
ওভারসিয়ারবাবুর সংগে সাইট্ দেখতে বেরিয়ে যাবে
দাউদ। আর এবার সে নিজেই ইঁট পোড়াবে। খান
বাহাদুর বলেছেন, টাকার জন্য আটকাবে না। খান
বাহাদুর তাঁর ওঠার পথে দাউদের সাহায্য চাইছেন
তার বদলে তিনি দাউদের উন্নতির সুযোগও করে
দিচ্ছেন। খান বাহাদুর যত উঠবেন, দাউদের উন্নতির
পথও তত প্রশস্ত হবে। খান বাহাদুর ডিস্ট্রিক্ট
বোরডের ভাইস্ চেয়ারম্যান আছেন বলেই না তার
নির্বাচন কেন্দ্রের রাস্তা মেরামতের জন্য আড়াই লাখ
টাকার ঠিকে তাকে দিতে পারলেন। কাজেই খান
বাহাদুরের তরক্কির জন্য তাকেও জান লড়িয়ে দিতে
হবে। বোরড্টাকে হাতের মুঠোয় রাখতে পেরেছিলেন
বলেই না খান বাহাদুরের পক্ষে বিনা টেন্ডারে
তাকে এত টাকার কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
মুরুব্বীদের পজিশন মজবুত করতে হবে। খান
বাহাদুর ভোটে যাতে জেতেন, সে গরজ দাউদেরও
বড় কম নয়। খোন্দাকার তার মুরুব্বি। যে কাজটা
তিনি ওকে হাতে তুলে দিলেন, এই কাজটা হাসিল
করে দিতে পারলে দাউদের হাতে কিছু পয়সা জমে
যাবে। এক সময় কাজকে ভয় করত দাউদ। নিকিরির
ছাওয়াল হয়ে মাছের ব্যবসাটাও করতে পারেনি।
কিন্তু কি হল কয় মাসের মধ্যে, দাউদের আক্কেল
খুলে গেল। সে ঠিকেদারি শুরু করল। আর কালা-
জিরেরই পরামর্শে। ঢাকার এক সাহা বড় ঠিকেদার,
তার কাছেই কাজের হাতে খড়ি। কালাজিরেই কী
করে সাহাবাবুকে জোগাড় করেছিল। দাউদ কাজ
শুরু করতে না করতেই ডুবে গেল কাজে। সে পথ
পেয়ে গেল। এই কাজটা তার মনের মত কাজ। সে
দাঁড়াবে। এই কাজ ধরেই সে দাঁড়াবে, যখন তার

আত্মবিশ্বাস এই স্তরে এসে পৌঁছালো, তখনই তাকে সর্বস্বান্ত করে সাহাবাবুর সংগে ভেগে পড়ল কালোজিরে। গহনা দেখেই বোঝা উচিত ছিল দাউদের। এত গহনা কালোজিরে পায় কোথা থেকে।

সাহাবাবু দ্যায়।

ক্যান্ দ্যায় সাহাবাবু?

ওকি ওর বাপের টাকার থে দ্যায়? তুমি রক্ত জল ক'রে ওর হয়ে খাটবা আর ও তুমারে হাত ঝাড়ানি জল দিলিই আমরা তুষ্ট হয়ে যাব। আমারে তুমি তেমনি মেয়ে পাইছ না। আমি তুমার মত মেনি মুখো নই। আমি সাপ্প পোরে ক'য়ে দিছি। ওরে যদি ঐ কটা টাকা দ্যান তা'লি ওরে আর কাজে পাঠাব না। সা'বাবু তখন ক'লো, ঠিক আছে, ও যা পাচ্ছে পাক, বাকিটা দিয়ে আমি তুমার গয়না গড়ায়ে দিচ্ছি। চাপ না দিলি কিছু পাওয়া যায় না।

তারপরই তার শরীরটা এগিয়ে দিয়ে কালোজিরে দাউদের মনের সব সন্দেহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিত। সেটা যে কালোজিরের ছল দাউদ ধরতেই পারেনি। কালোজিরে ওকে সর্বস্বান্ত করে চ'লে যাবার পর দাউদের চৈতন্য হল এবং সে দ্রুত যেন সাবালক হয়ে উঠল।

চাপ না দিলি কিছু পাওয়া যায় না। কালোজিরে কথাটা বলেছিল কিন্তু বড় ভাল। সে আজ চাপ দিয়েছিল বলেই খান বাহাদুর মতি মিয়াকে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলেন। আরেকটা উপকারও কালোজিরে তার করে দিয়েছে। তাকে ঠিকেদারির পথে সেই নামিয়েছে।

এত বড় কাজ ডিস্ট্রিক্ট বোরডে এর আগে আর বের হয়নি। অ্যাখন খান বাহাদুরই ধরতে গেলে বোরড। এককালের দোর্দণ্ড প্রতাপ চেয়ারম্যানবাবু বৈদ্য নাথ সরকার এখন ধরতে গেলে ভাইস চেয়ারম্যানের হাতের পুতুল। এর আগে পর্যন্ত বোদে সরকারই ছিল দলে ভারি। হিন্দু মহাসভার জেলা প্রেসিডেন্ট বোদে সরকারের দলই তখন মেজরিটি। তারপর বোদে সরকার হলেন জেলা কংগ্রেসের নেতা। তখনও তার বেশ রবরবা। হিন্দুগেরও পোয়াবারো। চাকরি বলো, ঠিকেদারি বলো, সব কিছু হিন্দুগের একচেটে। গোলাম মিয়া বলছে দাউদকে। তারপরই পাশার দান উলটে গেল। অসহযোগ নিয়ে কংগ্রেসে দলাদলি চরমে উঠল। বোদে সরকার খান বাহাদুরের সংগে গোপনে পরামর্শ করে ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট হয়ে গেলেন এবং চেয়ারম্যান রয়ে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাকে সমর্থন জানাল না। খান বাহাদুরের প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই বোদে সরকার ডিস্ট্রিক্ট বোরডের চেয়ারম্যান হয়ে রইলেন। কিন্তু এতদিন পরে বোরড এসে গেল খোন্‌কার বজলুর রহমানের মুঠোয়। বোদে সরকার, শোনা যাচ্ছে, হিন্দু মহাসভার ক্যান্‌ডিডেট্ হয়ে জেনারেল সীটে কাউন্‌সিলের ইলেক্‌শনে দাঁড়াবেন। খান বাহাদুর দাঁড়াবেন একটা মুসলিম সীট থেকে। ইউনাইটেড মুসলিম পারটির প্রার্থী। দাউদকে তারই পটভূমি তৈরি করতে হবে।

আচ্ছা, সইফুলের শাদী হয়ে যায়নি তো? ঝপ করে দাউদের মনে চিন্তাটার উদয় হল। অমন ভালো মেয়ে মৌলভীর ঘরে এতদিন শাদী না হয়ে বসে থাকে না কি? দাউদের মনটা বিষন্ন হয়ে উঠল। এইটেই তো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা দাউদের মাথায় আসেনি! আশ্চর্য! আসলে সইফুলের বিষন্ন মুখটাই দাউদের মনে এত জোরে আঁকা হয়ে গিয়েছে যে সে কেবল সইফুলের মুখখানা দেখবার কথাই ভেবেছে। অন্য কোনও কথা ওর মনেই হয়নি। এখন যতই সে ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে, সইফুল বিবাহিতা। এবং যতই সে একথা ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে, সে যেন এক মস্ত বড় বঞ্চনার শিকার। এবং ততই সে কেমন বিষন্ন হয়ে উঠছে। সইফুলের শাদী হোক বা না হোক, তাতে দাউদের কী! এই কথাটাই সে তার মনকে বোঝাতে পারছে না কেন?

আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

তুমি না কইছিলে, কালোজিরেই তুমার শেষ। আওরাতের খুয়ে আর মাথা মুড়োবা না।

না না, খুদা কছম্, এই বয়পারডা মানে এই সইফুলির ব্যাপারডা অ্যাকেবারে অন্য রকম। কালোজিরের মতো অ্যাকেবারেই না।

বুঝে দ্যাখ দাউদ, অ্যাখন তুমি খোদার ফজলে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নেছো। আবার কোনও ফাঁদে পা দিয়ে ইডাও নষ্ট করো না।

পাগল্ হইছ। আমি খুব সাবধানে আছি। আমি ইবার উঠে দাঁড়াবো। আল্লাহ্ রাস্তা খুলায়েই দেছেন। আমি যে ভাবেই পারি, এই কাজডা উঠোয়েই দেব। কুণ্ডুবাবুর সংগে কথা হয়ে গেছে, সাইট্ দেখতি কাল সকালেই বেরোয়ে পড়ব।

তাই যাও। আর কোন ফাঁদে প'ড়ো না।

ফাঁদ! ও সইফুল? সইফুল ফাঁদ না, ফাঁদ না।

দাউদ উঠে পড়ল। কাতলাকে বারান্দায় এক বালতি পানি দিতে বলল। কাতলা বারান্দায় পানির বালতি তুলে এনে কাছে একটা জল চৌকিও রেখে দিল। তারপর আড় চোখে তার মিয়ার ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগল।

মিয়া দেখি অ্যাকখান নতুন সাবান বা'র করে আনলেন। মুখি চোখি সাবান ঘষা মিয়ার যে আ'জ শেষই হতি চায় না। মুখ ধুয়ে মুখ মুছে ঘরে যায়ে ঢোকলেন। উঁ! আবার যে দেখি শিস্ দিয়াও চলতিছে। মানে মনে খুব ফুর্তি হতিছে। মৌলভীর বাড় যাতি ফুর্তি তো দেখিতিছি উপছোয়ে পড়তিছে! কাতলা পেয়ারা গাছের ডগার দিকে চেয়ে দেখল বাড়ির উঠোনটায় ফিকে হলুদ রঙের বিস্তর প্রজাপতি উড়ছে।

দাউদের সেই বিষন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস হল, সইফুলের এখনও শাদী হয়নি। তাই যদি হবে, আল্লাহ তা'লি আজ সকালে সইফুলের সংগে তার দ্যাখা করায়ে দেবেন ক্যান্?

আয়নায় নিজের মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিল। ও মুখে অতীতের গ্লানির কোনও চিহ্ন নেই। যেন মেঘ ঝরে যাওয়া আশ্বিনের আকাশ। কোথাও কোনও মলিনতা নেই। দাউদ শিস্ দিতে লাগল।

তোমার সঙ্গে আমার অ্যাত দেরীতি দ্যাখা হ'ল ক্যান্ সইফুল?

আয়নার দিকে চেয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে মুখের পাউডার ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিতে লাগল দাউদ।

ফুটকির সংগে শাদী হবার আগেই তুমার সংগে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিল।

দাউদ গেঞ্জিটা খুলে মেঝের [illegible] দিল। তারপর শিস্ দিতে দিতে আলনা থেকে ফর্সা একটা স্যান্‌ডো গেঞ্জি বেছে নিয়ে গায়ে পাউডার ছড়িয়ে সেটা পরল।

তা'লি আর আমারে কেউ খারাপ কত্তি পারতো না।

সুন্দর একটা চেক্ দেওয়া লুংগি আর মলমলের একটা ক'লদার চিকণের কাজ করা পাঞ্জাবি পরল। সুরমা পরব? আতর? নাঃ! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তারপর সাইকেলটা বের করে তাতে চড়ে বসল দাউদ। মনে মনে আন্তরিকভাবে বলল, খোদা কছম সইফুল তুমারে পালি কেউ আমারে খারাপ কত্তি পারতো না।

ক্রিলিলিং। দাউদ আশা করেছিল কোনও একটা জানালা খুলে যাবে। খুলল না। সে হতাশ হল। ক্রিলিলিং। ক্রিলিলিং। তার তৃষিত চক্ষু বদ্ধ জানালাগুলোর উপর দিয়ে বৃথায় ঘুরে এল। দড়াম করে বাইরের ঘরের দরজা খুলে গেল।

মহা উৎসাহভরে মৌলভী জয়নুদ্দী বলে উঠলেন, "আচ্ছালা-মু আলাইকুম।"

"ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম্!" দাউদের স্বরে খানিকটা চাপা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। (ক্রমশ)

অলীক যে আন্তরিক

বলরাম বসাক

সুজিতেশ অসময়ে বাড়ি ফিরেছে অফিস থেকে। লক্ষ করল গেটের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। ভেজানো ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর আরেকটা দরজা। সেটাও বন্ধ নয়। ভেজানো রয়েছে। ঠেলে ভেতরে ঢুকে দুটো অপরিচিত চটি জুতো চোখে পড়ল। একি! রুণির সঙ্গে একটি ছেলে। রুণিকে বুকে আঁকড়ে ছেলেটি মুখ নীচু করে কী করছে? সুজিতেশকে দেখে ছেলেটা তাড়াতাড়ি রুণিকে ছেড়ে দিল। স্প্রিং-এর পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ সুজিতেশের পাশ দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার মানে ছেলেটা এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে চটাস চটাস শব্দ নেমে গেল। দড়াম শব্দে গেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সুজিতেশ স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে ধীরে ধীরে রুণির কাছে এসে দাঁড়াল। কী করবে, কী বলবে ভাবল। রুণিকে কী কিছু জিজ্ঞেস করবে? জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যাবে? কাঁধে হাত রাখল আলতো করে। একটু ভাবল। বলল, 'ছেলেটা কে?'

রুণি ড্যাবড্যাবা চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটো নরম, মিনতি-মিনতি ভাব। চোখের সাদা ডিমে লালচে শিরাগুলোও যেন সুজিতেশের দিকে তাকিয়ে আছে। কোথা থেকে জল আসছে চোখের মধ্যে। শিরাগুলো ভিজে যাচ্ছে। ভিজুক।

চোয়াল একটু শক্ত করল সুজিতেশ।

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে এবারে রুণির গলা দু হাত দিয়ে চেপে ধরল।

চেপে ধরল তবে চাপ দিল না, 'ছেলেটা তোমাকে ভালবাসে?'

রুণি তাকিয়েই থাকল। ঠোঁট বোধ হয় একটু নড়ল। কিন্তু চোখের ডিম একটুও নড়ল না। শিরাগুলো জলের মধ্যে ডুবে গেছে। এরকম তরতর করে চোখের জল বেরুনো আর চোখের ডিমের লাল নীল শিরাগুলোর ক্রমে ক্রমে ডুবে যাওয়া—কী সুন্দর লাগছে দেখতে—এ যদি ক্যামেরায় তুলে রাখা যেত। একে সুন্দর মুখ তার চোখের জল। খুন চেপে গেল সুজিতেশের। কিন্তু হাসতে লাগল।

তক্ষুণি গলায় চাপ দিয়ে সুজিতেশ চিৎকার করে উঠল, 'চুপ করে আছ কেন? প্রেম করছ? প্রেম?' বলতে বলতে ঝাঁকুনি দিতে লাগল রুণিকে। কিন্তু এ সবই সে করল মনে মনে। আসলে সে কিছুই করল না। চিৎকারও করল না। ঝাঁকুনিও দিল না। ইচ্ছে করলে চড় কষাতে পারত, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারত। কেমন যেন মেয়েটা পাখি-পাখি। টুক করে টিপে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু কী করতে কী হয়ে যায়। কিছুই না বলে গলা থেকে হাত দুটো তুলে নিল তাড়াতাড়ি এত নরম গলা, পাছে দম আটকে খুন হয়ে যায়।

সোফায় কিছুক্ষণ বসে থেকে সুজিতেশ আঙুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে জুতোর ফিতের গিঁট খুলল। বেশিক্ষণ এভাবে বসে থাকলে চলবে না। বসে থাকলে বিপদ। সুজিতেশের এখন প্রচণ্ড তাড়া। জুতো খোলার পর উঠে দাঁড়িয়ে টাই খুলল। জামা খোলার জন্যে একটা একটা করে বোতাম খুলতে লাগল। জানালায় ছলছে পর্দায় বাইরে ফুর ফুর করে হাওয়া বইছে। ঝুরঝুরে করে পাতা নড়ছে। বোগেনভেলিয়ার পাতা। কাঁপছে। কী আশ্চর্য, সুজিতেশ লক্ষ করল তার আঙুল-গুলিও কাঁপছে। তাড়াতাড়ি হাত তুলে ঘড়ি দেখল। এখন বেজেছে আড়াই আর আছে হাতে দু ঘণ্টা। তারপর হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে আধ ঘণ্টার মধে রানীগঞ্জ যেতে হবে অফিসের ইনস্পেকশন গ্রুপের সঙ্গে। অনেক ক ইনস্পেকশন গ্রুপে একটা চান্স পেয়েছে সুজিতেশ। এ সুযোগ হাতছাড়া ক চলবে না। 'জাহান্নমে যাক আমার বউ।' নেকসট প্রমোশনের পর কাঁচা রোজগ এত বেড়ে যাবে তখন অমন বউ কত জুটবে।

বাথরুমের বেসিনটা কী নোংরা। মুখ কী করে ধোওয়া যায়, যা গন্ধ আসছে তাকের ওপর ফিনাইলের বোতল। ইচ্ছে করলেই ঢেলে দেওয়া যায়। 'বেসিনে ঝাঁজরিটা একটু ভেঙে গেছে। একটা বাথটব থাকলে ভাল হত। ঠাণ্ডা জ শুয়ে থাকা যেত। মাথা ডুবিয়ে রাখা যেত মাঝে মাঝে। বাথরুমের জানাল সবুজ পর্দা লাগালে মন্দ হয় না। মুখ মুছতে মুছতে সুজিতেশ দেখল, আকা কালো মেঘের পেছনে সূর্য ধড়ফড় করছে। সুজিতেশের হাসি পায়। আবার মু চোখে জল ছেটাতে থাকে। কিন্তু হাসা উচিত নয়। প্রচণ্ড ধারে জল পড় বেসিনে। সুজিতেশের জ্যাঠামশাই নাকি রাগী ছিলেন। তাঁর আলমারির তা নাকি একটা চাবুক থাকত। আচমকা বেসিনটা খুলে পড়ে গেল। চৌচির।

বাথরুম থেকে বেরুতেই সুজিতেশ দেখল রুণি ডাইনিং টেবিলের একধা বসে আছে। শুধু বসে থেকে নেই, ঝরঝর করে কাঁদছে। "আমি তো তোমা মারিও নি ধরিও নি—। আমার হাতে অত সময় নেই। তুমি জাহান্নমে যে চাইছ, যাও। আমি এক্ষুণি রানীগঞ্জে চলে যাচ্ছি।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুজিতেশ বুঝতে পারল, দাড়ি কামানো দরকা ঘড়িতে তিনটে বেজেছে। জেনারেল ম্যানেজার খান সাহেব সঙ্গে যাচ্ছেন বলে এই গ্রুপের সঙ্গে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। সুজিতেশের র‍্যাঙ্কের আরও দুজ যাচ্ছেন। মুখুজ্যে ও মজুমদার। দুজনেই অয়েলিং-এ এক্সপার্ট। দেখা যাক-সুজিতেশও খান সাহেবকে এমন কমফার্টের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবেন...। রানীগ ওর নখদর্পণে। বুকে পিঠে পাউডার ঢালতেই রুণির নাকের শব্দ একটু জো শুনতে পাওয়া গেল। ছিহরি বোধ হয় পানের দোকানের কাছটাতে ঠাকু চাকরদের আড্ডায় তাস খেলছে। ছিহরিকে ডাকা দরকার। ছোট্ট সুটকেসটা একটা করে এক্সট্রা প্যান্ট সার্ট আর গেঞ্জি ভরে ফেলতে হবে। আর একটা বেড কভার। বেডকভারের মধ্যে করে নিয়ে গেলেই চলবে। তিনটে বোতলে কি চলবে—বেডকভারে পেঁচিয়ে সুটকেসে পুরলে...। রুণিকে একা বাসায় রেখে যেতে হবে আর সেই ছেলেটাও সুযোগ বুঝে আসবে। এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক সুজিতেশ। 'আমার গিয়ে কাজ নেই।......আমাদের বংশে কখনো কোনদিন কে ব্যাভিচারী হয় নি।' চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। হয়তো হয়েছিল। 'আ পারব না। আমি যাব না। আমি সারাদিন বাড়ি থাকব। আমি সারা রাত বা থাকব।' সুজিতেশ মনে মনে বলতে থাকল, 'আর ঐ ছেলেটা এলে আমি তা কুচি কুচি করে কাটব। কেটে সবগুলো টুকরো একত্র করে ঝুলিয়ে রাখব।'

আর রুণি? তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে...। সুজিতেশ রুণির দিকে তাকায়। কেঁ কেটে চোখ লাল করে ফেলেছে। নাহ্ রুণিকে সুজিতেশ কিছু করবে না। ও

হরলিক্‌স

Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যে আপনাকে এত বেশী. পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সৎগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

মারবে না। খুন করবে না। কিছু করবে না। বড় সুন্দর দেখতে। বড় মায়া হয়। চুমু খাবে না। থুতুও ছুঁড়বে না। ওর গা ছোঁবে না। কিছু করবে না। চোখ মেলে দেখবে না। হ্যাঁ দেখবে। মুখখানা কী মিষ্টি, কী নরম তাকানো—বড় মায়া হয়। ছেলেটার খপ্পরে পড়ে গেছে। ছেলেটাকে একবার পেলে হয়। সুজিতেশ ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়। এত গরম লাগছে। সারা গায়ে ঘামের বিন্দু। মাথাটা, না মাথা নয়, কপালের কোনখানে। যেন একটা রগ উত্তপ্ত দপ দপ করছে। ফ্যানের রেগুলেটরের প্লাগটা প্রচণ্ড জোরে ঘোরাতেই তিনটে ব্লেড খুলে বেরিয়ে এল। ঘুরতে ঘুরতে দেয়ালে ছিটকে, তিনটে ব্লেড্ তিন দিকে ঝর ঝর করে পড়ে গেল। রুণি চমকে উঠে চোখ বড় বড় করে দেখল। ঘরের দেয়ালটা আস্তে আস্তে ফেটে গেল। সুজিতেশ আর রুণি দুজনেই সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এত তাড়াতাড়ি দেয়াল ফেটে গেল।

রুণি চা করে এনেছে। টোস্ট্, ডিম ভাজা তার সঙ্গে নারকেল-কুচোর বরফি-বড়া যেটা সুজিতেশ ভীষণ পছন্দ করে।

সুজিতেশ কিছু বলল না। কিছুই ধরল না।

আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখল টিউব্ লাইট ফট্ করে ফেটে—বিছানার ওপর কাচ ছড়িয়ে পড়ল। রুণি ভীতু ভীতু চোখে একবার সেদিকে তাকাল। তারপর সুজিতেশের দিকে তাকিয়ে, চুপসানো ছোট্ট মুখে, বড় বড় চোখ করে, ঠোঁট একটু ফাঁক করে আস্তে আস্তে বলল, 'খাও।'

'রানীগঞ্জ যাচ্ছি।' আরেকবার বলবে কিনা সুজিতেশ! না, আর বলবে না। আর বলার দরকার নেই। বরং চা-টা কিংবা তার আগে ডিম ভাজাটা, সবচে ভাল নারকেল-কুচোর বড়াটা—ওটাতেই আগে দাঁতের কামড় বসিয়ে—নাহ্, কী যে করা যায়। হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিতেই বমি করে ফেলল সুজিতেশ। পেটের আধহজম ভাত আর হলদে জল, সাদা ফেনা টেবিল ভাসিয়ে দিল। সেখান থেকে মেঝের ওপর গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

রুণি ছুটে এসে সুজিতেশকে জাপটে ধরল। ওপরে সিলিংএর দিকে তাকাল, ফ্যান তো নেই। 'হিহরি-হিহরি' বলে কয়েকবার হাঁক পাড়ল। সুজিতেশকে ঠেলে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর মুখ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। 'তোমার অসুখ করেছে। আমাকে বলো নি।' গেলাস তুলে জল এগিয়ে দিল।

'অসুখ করে নি৷' সুজিতেশ জল খেতে খেতে একবার ঘড়িটার দিকে তাকাল।

'তোমাকে যেতে দেব না।'

'যেতে হবে, অফিসিয়াল ডিউটি।'

'শুনব না।'

'ছাড়।'

'আমি একা একা থাকতে পারব না।'

'ছেলেটা আসবে না?'

এবারে রুণি সুজিতেশের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। সুজিতেশেরই চেয়ারের গায়ে মাথা ঠুকল। 'আর করব না। আমাকে মাপ কর।'

মাথা তুলে ঠোঁট ফোঁপাল, 'রোজ রোজ দুপুর বেলা এসে দরজায় ঠক্ ঠক্ করে। কোনদিন দরজা খুলিনি। আজ আর থাকতে পারি নি। আমাকে তুমি—'

সুজিতেশ আর স্কোপ্ দিল না। সুটকেশ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে বেরুবার সময় দরজায় হাত দিতেই, একি! দরজাটা খুলে যায়-যায়। ঘরের দেয়ালে হাতে রাখতেই দেয়ালের কয়েকটা ইট নড়ে উঠল। দেয়ালের ইট কী করে এত তাড়াতাড়ি নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। দরজা কেন খুলে আসছে। সুজিতেশ তাড়াতাড়ি গট্মট্ করে নীচে নেমে গেটের দরজা সশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। সারা বাড়ি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

রুণি আছাড় খেয়ে বিছানার ওপর পড়ল। বুকের মধ্যে কাচ ফুটল। থুতনিতে আর হাতেও কাচের আঁচড় লাগল। টিউব লাইটটা ফেটে গিয়েছিল। কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক ফ্যানের ব্লেড্। বাথরুমের দরজাটা খোলা। বেসিনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। চারদিকে থই থই জল। ঘরের মেঝের খানিকটায় সাদা সাদা আধ হজম ভাত তার সঙ্গে হলদে-সবুজ জল ছড়িয়ে আছে। বমির গন্ধ। ঘরের দরজাটা থর থর করে কাঁপছে। দরজার পাল্লাটা আলগা হয়ে গেছে। দেয়াল ফেটে চৌচির। রুণি কী করবে? রুণি চোখের জলে মুখখানা অল্প ভিজিয়ে, হাত থুতনি আর বুক অল্প বিস্তর রক্তাক্ত করে, নিঃসাড় পড়ে থাকল বিছানার ওপর।

আর উঠতে ইচ্ছে করল না। খেতে ইচ্ছে করল না। ঘরটাকে পরিষ্কার করতে ইচ্ছেও করল না।

সুজিতেশ ফিরে এসে দেখুক কী অবস্থা।

এইভাবে পড়ে থাকবে চিরকাল।

বুকের ভেতর দুক্ দুক্ শব্দ হচ্ছে রুণির।

॥ ২ ॥

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে? রাত কেটেছে না ভোর হয়েছে না কি দুপুর হয়েছে না কী হয়েছে—! রুণির বুকের মধ্যে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছে। কে যেন বুকটাকে ঠুকছে।

কখনো হয়ত একবার উঠেছিল রুণি। ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়েছিল পেট ভরতি। কখনো মনে হয়েছিল মাঝরাতের তারা একটা দপ্ দপ্ করছে। তাই দেখেই বোধ হয় ঘুম এসেছিল। কখনো মনে হয়েছিল বেশ কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট্ খেয়ে মরে গেলে হয়। তাই খেয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না। এখন মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে কেউ ঠুকছে। ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে। বুকে হাতে, থুতনিতে জ্বালা। কাচ ফুটে যাবার ক্ষত। ঐ যে ঠক্ ঠক্ শব্দ। সত্যি বুকের মধ্যে হচ্ছে নাকি। বুকের ভেতর একটা দরজা আছে। হয়ত সেই দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে। শব্দটা কানে এসে লাগছে।

অনেকক্ষণ ধরে ঠুকছে।

রোজ দুপুর বেলা ঐ রকম ভাবে দরজা ঠোকে। রুণি আস্তে আস্তে উঠে বসে। কাল কখন যেন গেটের দরজাটা বন্ধ করে এসেছিল মনে পড়ছে না। চারদিকে তাকাল। ভোলা-ঝিটা সুযোগ বুঝে ফাঁকি দিল। হিহরি কি পালিয়ে গেল? দেশে কাটল?

রোজ দুপুর বেলা যখন সুজিতেশ বাড়ি থাকে না, যখন অন্নদা বাড়ি চলে যায়, যখন 'হিহরি' ঠাকুর-চাকরদের আড্ডায় তাস খেলতে যায়, যখন রুণিই একমাত্র একা থাকে, তখনই দীপন এসে দরজায় শব্দ করে। অনবরত শব্দ করে, ঠক ঠক ঠক ঠক।

রুণি উঠে দাঁড়ায়। এ সময় রুণি কীরকম হয়ে যায়। কত চেষ্টা করে, কত প্রতিজ্ঞে করে, কত দিব্যি দেয়—'আর ওসব করব না।' কিন্তু দরজা ঠোকার শব্দ শুনলেই রুণি কী রকম যেন হয়ে যায়। ছুটে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

রুণি আজ ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। দরজা খুলেই চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। 'না, আসতে হবে না, আর এস না। চলে যাও।'—এরকম একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু বলল না। দীপনকে ঢুকতে দিল।

শোবার ঘরে দরজার পাল্লায় হাত রাখতেই 'উরে বাসরে' বলে দীপন মাথা নীচু করে ফেলল। কপাটটা আলগা হয়ে পড়ো-পড়ো হয়েছিল। কিন্তু পড়েনি।

ঘরের অবস্থা দেখে দীপনের ঘরে ঢুকতে সাহস হল না। চারদিকে ফ্যানের ব্লেড, টিউব লাইটের কাচ, নোংরা চটচটে, বমির গন্ধ। বাথরুমে জল থই থই করছে। বেসিনের সাদা টুকরোগুলো করোটির টুকরোর মত লাগছে। দীপন এদিক ওদিক তাকায়। দেয়ালের দিকে চোখ পড়ে। একদিকের দেয়াল কী বিচ্ছিরিভাবে ফেটে গেছে।

'তোমাকে মেরেছিল?'

এতক্ষণে রুণির চোখ ফাটল। ঠোঁট একটু ফুলে উঠল। 'একটুও মারেনি।'

'গালাগাল দিয়েছে।'

রুণি নাক টানতে লাগল। মাথা নাড়তে লাগল। একটুও না।

'হেভি চটেছে দেখছি। জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে।'

রুণি খাটের ওপর উবু হয়ে বসল, মাথা নাড়তে লাগল 'না'।

দীপন উবু হয়ে ফ্যানের একটা ব্লেড তুলে ধরল, 'তাহলে এগুলো ভাঙল কী করে?'

'এমনি এমনি ভেঙে পড়ল।'

'ভ্যাট্, এমনি এমনি কখনো ভাঙে?'

'না ভাঙে না, কত জানে!' রুণি মুখ বেঁকিয়ে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে ভেংচোল, মরাখেকো কোথাকার, আস কেন? কে আসতে বলে?'

'রাখ রাখ। বাজে বকো না।'

'ইহ্। কী বাজে বকেছি। তোমার জন্যেই তো সব ভেঙে পড়ল।'

মুখ গুম্ করে দীপন একটা একটা করে ব্লেড তুলে নিল, খাটের ওপর তিনটে ব্লেড সাজিয়ে রাখল। ভাল করে উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে দেখল। খাটটা মাঝখানে টেনে তার ওপর টেবিল রেখে, তার ওপর চেয়ার রেখে তাতে চড়ে দাঁড়াল। ফ্যানে একটা একটা করে ব্লেড লাগাল। লাগানো হয়ে গেলে সুইচ টিপে দিল। ফ্যানটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফ্যানের হাওয়া খেল। দেখল রুণির চুল হাওয়ায় উড়ছে মুখের চারদিকটা ঘিরে।

পলিথিনের লাল টুকটুকে বালতিটি ছিল রান্নাঘরে। সেটা বের করে জল ভরতি করে নিয়ে এল। ঘরের একদিকটা মাছি কিলবিল করছে, শুকিয়ে থাকা বমির নোংরা জমে আছে। দীপন ওর মধ্যে জল ঢেলে দিতে লাগল, 'ইস্ এর মধ্যে থাকলে কী করে, রুণি?'

রুণিও শাড়ির আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর দুই হাত পেছনে নিয়ে চুলগুলো এক করে একটা বড়োসড়ো গিঁট লাগাল। 'শরীর খারাপ তবু রানীগঞ্জে গেল।' মুখ চুপসিয়ে বলল। কোথা থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে এল। ফরশা টুকটুকে হাতে কালো বিচ্ছিরি মুড়োঝাঁটায় জল, কাচ সব কেঁটিয়ে ঘর থেকে বার করতে লাগল। মাঝে মাঝে দীপনের সঙ্গে একটু আধটু খুনসুটিও করল। মাঝে মাঝে খিলখিল করে হাসল।

দীপন বাথরুমের কল বন্ধ করে দিল। বেসিনের টুকরোগুলো পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে এককোণে জমিয়ে রাখল। তারপর ওরা হাত পা ধুয়ে শোবার ঘরে এল।

'আমাদের বাসায় একটা বেসিন এমনি অনেকদিন পড়ে আছে কয়লা ঘরে।' দীপন হাত মুছতে মুছতে বলল, 'কোন কাজে লাগছে না, ওটা নিয়ে এলে হয়।'

'কাল এনো। আজ আর নয়। এবারে চলে যাও।' বলতে বলতে রুণি ওর হাত ধরে ওকে টেনে খাটে বসাল। কিন্তু পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাই, কাচ কাচ, ওঠো ওঠো।'

বিছানা থেকে দুটো একটা খুদে খুদে কাচের টুকরো খুটে খুটে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

'রুণি বেডকভারটা পাল্টে ফেলল।'

রুণি সোজা হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখে এখন অদ্ভুত হলুদ রঙ। জানালার হলদে পরদাটা দুলছে। 'শুধু বেডকভার পাল্টালেই কি চলবে?' রুণি

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। দুটি চোখের সাদা দিয়ে সেই হলদে ছায়া পড়ছে, তার মধ্যে লাল নীল শিরাগুলো চক্ চক্ করে উঠছে। উন্মুখ হয়ে উঠছে। যেন হলুদ আলো দেখছে। যদি জানালার হলদে পর্দাটা পাল্টিয়ে সবুজ পর্দা লাগানো যায়, তাহলে সবুজ পর্দাটাও ওমনি করে দুলবে। সবুজ আলোয় তার চোখের ঐ সাদা ডিম, ঐ লাল নীল শিরাগুলো, কী করবে তখন? কী আছে সবুজ রঙে? রুণি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দীপনকে। ওর জামায় ভরতি লাল আর সবুজ রঙের চৌকোণ। কালো ডুরে বেলবটস প্যান্টের সঙ্গে এক গুচ্ছ কালো কচি গোঁফ বেগুনি ঠোঁটের ওপর। সিগারেটে বেগুনি ঠোঁটদুটো বাচ্চাদের মত কচি কচি। ঐ ঠোঁটদুটো নেড়ে কেমন কায়দায় যেন কথা বলে।

'তোমার এখন শুধু দরকার একটা টিউব লাইট। তাই না?' দীপন হাসতে থাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রুণি বলল, 'ওটা আমি কিনে নেবখন।'

'কিনবে কেন? কালীপুজোয় পাড়ায় এত্তো এত্তো টিউবলাইট জ্বলছে। একটা ঠিক ঝেড়ে নিয়ে আসব?'

'এ-বাবা! কী বলছে?' রুণি খিল খিল করে হেসে উঠল। দুলে উঠল, 'আর ঐ দেয়ালটা যে ফেটে গেছে।'

'কোথায়? ও। ফেটে গেছে তাই না,' দীপন দেয়ালের ফাটা অংশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, 'এক কাজ করলে হয়, তিলককে ডেকে ওখানে খুব সুন্দর একটা ডেকরেশন করে দিলে হয়। তিলক চমৎকার আর্ট করে। ওকে একটু গ্যাস খাওয়ালে ফুল-পাখি-লতা-প্রজাপতি এঁকে এমন কায়দায় ফাটা দাগ বুজিয়ে দেবে...।' রুণি শুনতে শুনতে একটিও কথা বলতে পারে না। হলদে আভা উপছে পড়ছে সারা মুখে। নরম ফর্সা রঙের টলটলে ভাবটাকে উজ্জ্বল করে তুলছে। বুকের ভেতর রক্ত ঝিমঝিম করছে। কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না, কী একটা যেন অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ইচ্ছে করছে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে। আস্তে করে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আর দরজাটা?'

'ও দরজাটা, তাইতো,' দীপন লাফিয়ে উঠল, 'কপাটটা আলগা হয়ে গেছে, তাই না?' আলগা আলগা দুলছে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দীপন কপাটটা পরীক্ষা করল। নীচে নেমে সিঁড়ির তলায় কয়লা ঘরে ঢুকে, কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা নিয়ে এল। কোথায় কী যেন ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে হাতুড়ি ঠুকল। আপাতত দরজাটার পড়ো-পড়ো ভাবটা কেটে গেল। কেবল কপাটটা ভেজিয়ে দেবার সময় ক্যাচ করে একটা শব্দ হয়।

আবার ছুটে এসে ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ে। রুণিও দীপনের পাশে ধপাস করে বসে, 'এই, আজ আর নয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।'

উঠবার নাম করে না দীপন, কেবল হাসতে থাকে, 'গেছেন তো রানীগঞ্জ, আজ কি ফেরার কথা?'

'কিছুই বলে যায়নি।' রুণি ওর কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু তক্ষুণি দীপন দুম করে শুয়ে পড়ে। ওর বুকখানা এক্ষুণি কেমন বিশাল আর চওড়া হয়ে গেল। অমন বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল রুণির। ভয় করতে লাগল।

'কাল একটা খেলা দেখবে?' শুয়ে শুয়ে বলতে লাগল, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে, 'প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ। সারাদিন লাইন দিয়ে দুটো টিকিট পেয়েছি। অনেক হাঙ্গামা করেছি।'

'কোথায় খেলা?'

'স্টেডিয়ামে। তুমি তো ফুটবল বোঝ না। ফুল বোঝ।'

খিল খিল করে হেসে উঠল রুণি। দুলতে লাগল। ওর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

'বেশ তো না হয় স্টেডিয়াম দেখবে।'

'আমি তো ফুল দেখি, স্টেডিয়াম কি ফুল?'

'হ্যাঁ ফুল।'

'যাহ্'

'হ্যাঁ। ফুল।' সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে রুণির দিকে তাকাল, 'স্টেডিয়াম দেখেছো? স্টেডিয়াম ভরতি মানুষ দেখেছো? লাল নীল প্যান্টে শার্টে যা দেখায় না, ঠিক যেন থোকা থোকা ফুলের রেণু...।' শুনতে শুনতে রুণি অন্যদিকে তাকায়। জানালার দিকে। আলতো বলে ফেলে, 'হ্যাহ্।' জানালার হলদে পর্দা ছাড়িয়ে, বোগেনভালিয়ার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুপসানো মুখে তাকিয়ে থাকে।

'হ্যাহ্ কি? স্টেডিয়ামটাকে যদি মুঠোর মত ছোট্ট করে দেখো, দেখবে ঠিক ফুলের মত লাগছে।'

রুণি আর থাকতে পারে না। দীপনের বুকে হাত রাখে। 'ইস কী দারুণ বললে, দারুণ লাগছে।' বলতে বলতে মুখখানা মুখের কাছে নিয়ে এল। দীপন ওর মুখখানা দেখতে থাকে। থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে দেয়, 'একি কাটলে কী করে? তোমাকে মেরেছিল না কি?'

'মারেনি।' মুখ সরিয়ে নিল রুণি। উঠে বসল দীপন।

কাটল কী করে। কোথা থেকে বোরোলিন আঙুলে তুলে রুণির থুতনিতে—যেখানটায় কেটে গেছে—সেখানটায় লাগিয়ে দিল। আচমকা রুণি উষ্ণ দুটি ঠোঁটে আঙুলটা কামড়ে ধরল। বোরলিন শুদ্ধ আঙুলটা চুষতে লাগল। ওকে দু হাতে টেনে বসাল। আস্তে আস্তে ওর বুকে শরীর ঢেলে দিয়ে কাঁধে মাথা রাখতে গেল। ও রুণির মুখখানা দু-হাতে ধরে একটা চুমু খেতে গেল। দেখল দরজার সামনে দরজা ভরতি করে একটা বিশাল শরীর দাঁড়িয়ে আছে। সুটকেস হাতে সুজিতেশ। তক্ষুণি রুণিকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পালাবার রাস্তা নেই। সুজিতেশ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপন হক্‌চকিয়ে যায়। কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারে না। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ করে দেয়। সুজিতেশ ছুটে এসে বাথরুমের ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। রুণি প্রথম থতমত খায়। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সুজিতেশের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'না-না ওকে কিছু বল না।' সুজিতেশ রুণিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

রুণি ফের ছুটে আসে। এবারে জোরে ধাক্কা দিয়ে কোথায় যেন ঠেলে ফেলে দেয় রুণিকে। সুটকেসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের মেঝের ওপর, সশব্দে। চশমাটা খুলে টেবিলে রাখে।

'দ্যাখো ওকে কিছু বলো না। ও আজ অনেক কাজ করে দিয়েছে।' রুণি আবার ছুটে এল, 'বিশ্বাস কর। সত্যি বলছি।'

সুজিতেশ ঘড়িটা খুলতে লাগল।

'অই যে দ্যাখো। ওপরে তাকাও ফ্যানটা ঘুরছে দেখছো। ব্লেডগুলো সব খুলে গিয়েছিল মনে নেই। সব ও-ই লাগিয়ে দিয়েছে। খাটের ওপর টেবিল রেখে তার ওপরে চেয়ার—বিশ্বাস কর। করছ তো—?'

সুজিতেশ আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'সারা ঘর পরিষ্কার করেছে। বাথরুমের বেসিনটা ভেঙে পড়েছিল। মনে আছে তো। ও-ই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে পরিষ্কার করেছে। ওকে কিছু বলো না। প্লীজ। প্লীজ। সব আমার দোষ।'

সুজিতেশ তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে টাই খুলতে লাগল। তখন আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপল।

'একটা বেসিন এনে দেবে বলেছে। নিজের থেকে এনে দেবে। একটা টিউব লাইটের বালবও এনে দেবে। কালী পুজোর হাজার হাজার টিউব লাইট জ্বলে।'

সুজিতেশ টেবিলের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ার খুলে চাবি বের করল।

'ঐ যে দ্যাখো দরজাটাও সারিয়ে দিয়েছে।'

সুজিতেশ সেই চাবি দিয়ে টেবিলের সব চেয়ে নীচের ড্রয়ার খুলল।

'দেয়ালের ঐ ফাটা দাগও থাকবে না। ওর বন্ধু তিলককে ডেকে ফুলপাতার আর্ট—।' স্তম্ভিত হয়ে গেল রুণি। আর কোন কথা বলতে পারল না। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সাইকেলের চেন বের করে সুজিতেশ, টেবিলের নীচের ড্রয়ার থেকে। ঠাস্ ঠাস্ করে টেবিলটাকে চাবকাল।

বাথরুমের দরজা খুলল। বাথরুমের ভেতরে ঢুকল।

ঠিক তার পরের সেকেন্ডেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। দুটো বড় বড় চোখ নিয়ে বেরুল বিস্ময়ে। হাতের সেই জং-রঙা চেন কাঁকড়াবিছার লেজের মত থর্-থর্ করে কাঁপছে, 'কোথায় গেল?'

'মানে—।'

'গেল কোথায় ছেলেটা?'

'কী বলছ?'

'কী বলছি বুঝতে পারছ না?'

'বাথরুমে নেই?'

কপাল গোঁজ করে সুজিতেশ উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। বার বার বাথরুমে ঢুকে তন্নতন্ন করে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। বার বার বলতে লাগল, 'কোথায় গেল।' শোবার ঘরেও খুঁজল। খাটের তলা দেখল। রান্নাঘর দেখল। ঘরের বাইরে সিঁড়িতে, সিঁড়ির তলায়, কয়লা ঘরে—কোথাও নেই। একি ম্যাজিক! একি হাত সাফাই-এর খেলা। রুণি তো সব সময় সুজিতেশের কাছেই ছিল। বাথরুমের ছিটকিনিটাতো সুজিতেশ নিজের হাতেই লাগিয়ে রেখেছিল। আর সে অবস্থায় ওটা চোখের সামনেই ছিল। রুণিও চোখের সামনেই ছিল। একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ওকে। তখনই শুধু দু-তিন মিনিট ও একটু অন্যদিকে ছিল। কিন্তু তখন তো বাথরুমের দিকে যায়নি। মাত্র দু-তিন মিনিটের মধ্যে কিছু অঘটন ঘটে গেল! ছেলেটা কি ম্যাজিক জানে? চোখে ধুলো দিয়ে অন্য দিকে লুকিয়েছে?

'তুমি ঠিক জান কোথায় গেছে ছেলেটা?' কপাল গোঁজ করে রুণির সামনে দাঁড়াল। দুটি বড় বড় চোখে রুণি শুধু বিস্ময়ে ভরতি করতে লাগল। অল্প মাথা নাড়ল। 'সত্যি জানি না।'

তবু সুজিতেশ কীরকম যেন ভাবভঙ্গি করল। যেন বিশ্বাস করছে না কথাটা। সাইকেলের চেন্‌টা একটু একটু দোলাল। 'তুমি ঠিকই জান।' সুজিতেশ রুণির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এরকমভাবে তাকালে রুণির ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। বুক ধড়াস ধড়াস করে। বলতে ইচ্ছে করে, 'হ্যাঁ ঠিকই জানি, কিন্তু সত্যিই কি কিছু জানি?' কিছুই বলল না শুধু খাটের ডান পাশে আলমারির দিকে তাকাল। আলমারির দিকে তাকাচ্ছে কেন রুণি? তাহলে ছেলেটা কি আলমারির মধ্যে? তক্ষুণি সুজিতেশ আলমারির দরজা টান মেরে খুলে ফেলল। আলমারিটা হা-হা করতে লাগল।

'কোথায়?' সুজিতেশ রুণির দিকে তাকাল। রুণি বুঝতে পারে না কোনদিকে তাকাবে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকাল। সুজিতেশ চেন নিয়ে আয়নার দিকে ছুটে গেল। আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে পেল। মাথা নাড়তে নাড়তে আবার রুণির সামনে এসে দাঁড়াল, 'কোথায়, কোনদিকে?'

চেন হাতে নিয়ে চোয়াল শক্ত করল। রুণির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। রুণি ভয়ে ভয়ে আর কোন দিকে তাকাল না। শুধু ড্যাবড্যাবা চোখে সুজিতেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। আচমকা সুজিতেশ উবু হয়ে দেখল, ছেলেটা রুণির চোখের মণির মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবি : সুনীল শীল

সন্ধান সঙ্কর্ষণ রায়

॥ তিন ॥

বিভূতিভূষণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বন-পাহাড়ের মধ্যে আমার পরিক্রমায় আর আপত্তি করেন না আমার অধ্যাপক। বিভূতিভূষণে অনুভূতির মধ্যে প্রাকৃতিক রহস্য যে অনির্বচনীয় ঝঙ্কার তুলেছিল, তাতে সুর মেলাতে উৎসাহিতই করতে শুরু করেন তিনি আমাকে। ঘাটশিলা ত্যাগের আগে তিনি আমাকে বললেন, এখানকার বন-পাহাড়ের রহস্যের ঢাকনা সরিয়ে যে সত্যের সন্ধান বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, চেষ্টা কর তাকে খুঁজে বের করতে...

অধ্যাপকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, বিভূতিবাবুর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে তা হলে আপনি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করছেন না?

—না। অধ্যাপক জবাব দিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে ভূ-বিজ্ঞানকে বেঁধে রাখা যে কতোখানি ভুল তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। বিভূতিবাবুর সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, কাজেই প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে বিজ্ঞানের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল তা আমি এখন বুঝতে পারছি...

অধ্যাপকের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে নতুন উদ্যমে বিভূতিবাবুর প্রিয় জায়গাগুলোতে আমি পর্যটন শুরু করলাম।

সিদ্ধেশ্বর ডুংরি, চাপরি, তামাপাহাড় প্রভৃতি বননীল শৈলশ্রেণী একটানা প্রসারিত হয়েছে সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র বরাবর। একটার পেছনে একটা, তার পেছনে আর একটা, থইথই করছে শুধু পাহাড়। পাহাড়ের তলায় বন বিভাগের রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে একদিন যাদুগুড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। বনের মধ্যে রাস্তা এমনি ডুবে গেছে যে, তাকে পায়ে পায়ে চিনে নিতে হয়। বড় বড় শাল, আমলকি, করম, বীজা, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ চিহোড়, আতংডী প্রভৃতি লতার জটিল জালে আচ্ছন্ন হয়ে বনকে দুষ্প্রবেশ্য করে তুলেছে। পথ এখানে একটা সুঁড়িপথের আকারে এঁকেবেঁকে পাহাড়কে বেষ্টন করেছে। এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যেও বুঝতে পারছি নে কোথায় এসেছি।

এক জায়গায় একটা কাটাবনের পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার পাশের লতাঝোপটা নড়ে উঠল।

বাতাস বইছে না, গাছের পাতাগুলো সব নিস্পন্দ হয়ে আছে। বনময় স্থিরচিত্রের মধ্যে এই হঠাৎ আলোড়ন আমার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে তুলল। বোধ হয় কোন বন্য জন্তু ওত পেতে আছে ওখানে। থমকে দাঁড়াই। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, আত্মরক্ষার জন্য ছুটে পালানো বা গাছে চড়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় নড়ে ওঠা লতাঝোপটি একটি মানুষের আকার নিল।

দুর্গম পর্বত গাত্রে খনিজের খোঁজে ড্রিলিং

খাকী পোশাক-পরা লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি যেন মূর্তিমান বনদেবতা। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে যৌবন যেন উপচে পড়ছে। তাঁর কাঁধে রাইফেল ও ক্যামেরা, হাতে পাথর ভাঙার হাতুড়ি এবং কোমরের চামড়ার বেল্টে লাগানো বুলেটের ব্যাগ ও 'ব্রানটন' কম্পাস। তাঁর সঙ্গে আছে একজন সাঁওতাল যুবক। তার পরনে খাটো কাপড়, কাঁধে এক হাতে টাঙ্গি ও অন্য হাতে বাক্সের আকারের কী একটা যন্ত্র। সে বোধ হয় এই খাকী পোশাক-পরা ভদ্রলোকটির পথপ্রদর্শক।

—হ্যালো জিয়োলজিসট! আমার কাঁধে হাত রেখে বাজখাঁই গলায় হুংকার ছাড়লেন এই ভদ্রলোক, কী করছ তুমি এই সাংঘাতিক জঙ্গলের মধ্যে। সঙ্গে বন্দুকটন্দুক কিছু তো নেই দেখছি—ভয় করে না?

—না। আমি জবাব দিলাম।

—এখানকার বুনো জন্তুদের সঙ্গে তোমার অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে নাকি?

—ওরা বোধ হয় বোঝে যে আমি ওদের কোন ক্ষতি করব না, তাই কিছু বলে না আমাকে।

—কী করছ তুমি এখানে বললে না তো?

—তামাটামা ছাড়া আর কিছু আছে কি না খুঁজছি।

—তাই নাকি! ভদ্রলোকের চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : কিন্তু এই "আর কিছু"র খবর কে দিল তোমাকে?

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হলেও সহজাত জ্ঞান ছিল তাঁর এই সব পাহাড়-বন সম্বন্ধে।

—এই "আর কিছু" আমিও খুঁজছি হে। মনে হয় খুঁজে পেয়েছি।

—খুঁজে পেয়েছেন! কী খুঁজে পেয়েছেন জানতে পারি কী?

ভূতাত্ত্বিকের ক্যাম্প

[illegible] স্যার, তবে তার আগে আমার জানা দরকার তুমি কে। আমার পরিচয় হল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন জিওলজিস্ট, আমার নাম খেদকর। সম্প্রতি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এর অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন-এর অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে এখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাচ্ছি—আমার তত্ত্বাবধানে এখানে, মানে সিংভূমের এই তামা অঞ্চলে আটজন জিওলজিস্ট কাজ করছে।

—মহারাষ্ট্রীয়ান হয়েও এমন চমৎকার বাংলা বলছেন আপনি! খেদকর-এর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম আমি।

—মহারাষ্ট্রীয়ান হলেও আমি বাঙালী। মৃদু হেসে বললেন খেদকর। কারণ, আমার স্ত্রী বাঙালী—কলকাতা শহরে বসবাস করছি। আমার কথা অনেক হয়েছে এবার তোমার কথা বল।

দিলাম আমি আমার পরিচয়। শুনে খুশী হয়ে খেদকর বললেন, তুমিও লেগে যাও না আমার কাজে। বিভূতিবাবুর "আর কিছু" খোঁজার কাজে আমাদের সংগে সহযোগিতা করে যেতে পার।

আমি বললাম, এই "আর কিছু"র খোঁজ তো পেয়ে গেছেনই বলছিলেন! কী খুঁজে পেয়েছেন দেখাবেন আমাকে?

—নিশ্চয়ই। এখনই, এখানেই দেখিয়ে দিচ্ছি। চোখে অবশ্য দেখতে পাবে না...

—চোখে না দেখেও দেখতে পাব! আপনি কী হেঁয়ালি করছেন আমার সংগে?

—না। চোখে তাকে দেখতে না পেলেও এই যন্ত্রটির মধ্যে তার উপস্থিতি ধরা পড়বে।

বলে তাঁর পথপ্রদর্শকের হাত থেকে বাক্স আকারের যন্ত্রটি নিয়ে খেদকর একটি শিলাখণ্ডের ওপরে বসালেন। শিলাখণ্ডটি ফিলাইট-এর স্তরের একটি খণ্ডিত অংশ। তার মধ্যে চ্যালকোপাইরাইট ও পাইরাইট-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন টুকরো ছাড়া হলুদ ও সবুজ রঙের কয়েকটি ছোপ চোখে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ দৃষ্টে শিলাখণ্ডটি পরীক্ষা করে তার মধ্যে অন্য কোনও খনিজ দেখতে পেলাম না।

শিলাখণ্ডটির ওপরে যন্ত্রটি বসিয়ে তার সুইচ টিপে দিলেন খেদকর। সংগে সংগে ঘটল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। যন্ত্রটির কাঁটা ঘুরে গিয়ে চরম মাত্রা নির্দেশক অঙ্ককে স্পর্শ করল।

হতবুদ্ধির মত যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, ব্যাপার কী স্যার! যন্ত্রের কাঁটাটা ওরকম ঘুরে গেল কেন? ওর ভেতর থেকে ওরকম কট্‌কট্‌ করে আওয়াজই বা বেরোচ্ছে কেন?

—ঐ পাথর থেকে বেরিয়ে আসা তেজস্ক্রিয়তা যন্ত্রটাকে উত্তেজিত করে তুলছে যে! খেদকর জবাব দিলেন।

—তার মানে এই যন্ত্রটিই তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র, মানে গাইগার-মুলার কাউণ্টার?

—হ্যাঁ। পাথরের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয়তা থাকলেও তা এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই পাথরের মধ্যে যে তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-অ্যাকটিভিটি আছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। তেজস্ক্রিয়তা বেরিয়ে আসছে তেজস্ক্রিয় খনিজ, অর্থাৎ য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়ামযুক্ত খনিজ থেকে।

আপনি কী বলতে চান যে, এই পাথরের স্তরের মধ্যে য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়াম আছে?

—আমার যন্ত্রটিই বলতে চাইছে এ কথা—আমি নয়!

বলে গাইগার-মুলার কাউণ্টার যন্ত্রটি শিলাখণ্ডের ওপর থেকে তুলে নিয়ে তার গায়ে সযত্নে হাত বোলাতে থাকেন খেদকর।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, কিন্তু ডান্ সাহেব তাঁর মেমোয়ারে যে লিখে গেছেন, সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়ামের কোন অস্তিত্বই নেই। ই এফ ও মারে নামে একজন ভূতাত্ত্বিক তাঁর কাছে এক টুকরো য়ুরেনিয়ামযুক্ত টরবারনাইট নিয়ে আসাতে তাঁর মনে হয়েছিল বুঝি তা অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছে।

—ডান সাহেবের যাই মনে হোক না কেন, ঐ পাথর থেকে যে রেডিও অ্যাকটিভিটি বেরিয়ে আসছে তার প্রমাণ [illegible]

অ্যাকটিভিটিকে অনুসরণ করে আমরা সিংভূমের তামার ক্ষেত্রে য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার পেয়ে যাব। যে আটজন জিওলজিস্ট আমার সংগে এ কাজে সহযোগিতা করছে, তারা এই তামার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে গাইগার-মুলার কাউণ্টার যন্ত্রের সাহায্যে য়ুরেনিয়ামের সন্ধান নিয়ে চলেছে।

খেদকর-এর কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি। এখানকার বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে বিভূতিভূষণ কী এই তেজস্ক্রিয়তাকেই অনুভব করেছিলেন? পরমাণুসম্ভূত এই পরমাশক্তিই কী রোমাঞ্চিত করেছিল তাঁর দেহমনকে?

আমাকে হতবুদ্ধির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খেদকর বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন জিওলজিস্ট? রেডিও-অ্যাকটিভিটি তোমার শরীরকে অসাড় করে দিয়েছে নাকি?

—না, তা নয়। আমি বললাম, আমি ভাবছিলাম বিভূতিবাবু কী এই রেডিও-অ্যাকটিভিটির হদিস পেয়েছিলেন?

—তা হতে পারে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল খেদকর-এর মুখ: গাইগার-মুলার কাউণ্টার-এর সাহায্য ছাড়া আমিও অনুভব করেছি এখানকার রেডিও-অ্যাকটিভিটি। এ কথা অবশ্য কাউকে বলি নি আমি এ পর্যন্ত, কারণ কেউই বিশ্বাস করবে না আমার কথা।

তারপর আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে খেদকর বললেন, বিভূতিভূষণ যা অনুভব করেছিলেন, তাকে তোমার চোখের সামনে দেখে কেমন লাগছে মিস্টার জিওলজিস্ট?

—অদ্ভুত লাগছে! অভিভূত স্বরে বললাম আমি।

—তোমার কী ইচ্ছে করে না এটাকে 'ফলো আপ' করতে? মানে এই রেডিও-অ্যাকটিভিটিকে 'ফলো' করে রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেলস-এর ডিপোজিটগুলো খুঁজে বের করতে?

—নিশ্চয়ই করে। আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, তেজস্ক্রিয় খনিজের গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করব—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কী হতে পারে!

আমার একটি হাত তাঁর দু হাত দিয়ে চেপে ধরে খেদকর বললেন, তা হলে লেগে যাও এই কাজে। আমি আমার 'স্টক' থেকে তোমাকে একটা গাইগার-মুলার কাউণ্টার 'লোন' দেব, সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো...

পাহাড়ের নীচে মোসাবনীর রাস্তায় অপেক্ষা করছিল খেদকরের জীপ। সেই জীপে করে খেদকরের সংগে তাঁর ক্যাম্পে এলাম। একটি আনকোরা নতুন গাইগার-মুলার কাউণ্টার আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি বললেন, দেখ বাপু, এই যন্ত্রটির যত্রতত্র ঠেকিয়ে পরীক্ষা করতে কার্পণ্য করো না। রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল চিনতে হবে রেডিও-অ্যাকটিভিটি মেপে। যেখানেই রেডিও-অ্যাকটিভিটি, সেখানেই রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল—চোখে দেখতে না পেলেও। অনেকটা ভগবানের মত—আছেন, অথচ চোখে দেখে না কেউ।

গাইগার-মুলার কাউণ্টার যন্ত্রটি নিয়ে শুরু করলাম তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান। ঘাটশিলার দক্ষিণে পাহাড়ে পাহাড়ে পাথরের স্তরের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করি। যে কোনও পাথরে যন্ত্রটা ঠেকিয়ে তাকে চালু করে দিই। চোখে দেখা যায় না, বা দেখেও চেনা যায় না সচরাচর, কাজেই তেজস্ক্রিয়তা দিয়েই চিনে নিতে হবে তেজস্ক্রিয় খনিজকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কী।

যে কোনও মৌল বস্তুর সূক্ষ্মতম অবস্থা হল পরমাণু। পরমাণুর চেয়ে সূক্ষ্মে উপনীত হতে চাইলে বস্তুর সীমাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করলে বস্তুর বাঁধন যায় ঘুচে, মুক্তি পায় দুর্বার শক্তি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এই শক্তি প্রকাশ পায়। বস্তুর মধ্যে এমনিতে অবশ্য সংহত হয়ে আছে এই শক্তি—এই সংহতিই বস্তুর বাস্তব সত্তার ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আঘাত হেনে তার বাস্তব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট করা কঠিন কিন্তু সব বস্তুই বাস্তব সত্তার অচলায়তনের মধ্যে বন্দ নয়। বাস্তব সত্তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তেজস্ক্রিয় ধাতুগুলির মধ্যে— তেজ বিকীর্ণ করে তাদের বস্তুসত্তা সতত‌ই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সব তেজ বিকীরণকারী ধাতুগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়াম, বিভিন্ন খনিজের রূপে পাথরের স্তরে স্তরে তাদের প্রচ্ছন্ন অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না। দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকলেও অবশ্য "রয় না গোপনে", তাদের মধ্যে থেকে বিকীর্ণ অদৃশ্য তেজ উত্তেজিত ও সোচ্চার করে তোলে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রকে। য়ুরেনিয়ামযুক্ত যে সব খনিজ শিলাস্তরে অবস্থান করে, তাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল পিচব্লেন্ড (pitchblende), য়ুরানিনাইট (uraninite), অটোনাইট (autunite), টরবারনাইট (torbernite) প্রভৃতি। থোরিয়ামযুক্ত খনিজ-গুলোর মধ্যে মোনাজাইটই (monazite) প্রধান। মোনাজাইট-এর বিশেষত্ব হল তার রাসায়নিক ক্ষয় নিরোধের ক্ষমতা, যার দরুন পাথরের স্তর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তা মোনাজাইট-এর বালি সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বৃহত্তম 'মোনাজাইট বালি'র ভাণ্ডার রয়েছে কেরালার সমুদ্র তীরে। তামিলনাড়ু ও ওড়িশার সমুদ্র উপকূলও মোনাজাইট-এর বালির ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বহু পাহাড়ী নদী-নালার বালির মধ্যে মোনাজাইট আছে। তা চোখে পড়ার মত না হলেও তেজস্ক্রিয়তা-মাপনী যন্ত্রের মধ্যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

তেজস্ক্রিয় খনিজগুলো সম্বন্ধে জানার পর যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে তা হচ্ছে এই সব খনিজের খোঁজ কোথায় কোথায় করা উচিত? এ প্রশ্ন আমি খেদকরকে করাতে তিনি বললেন, সর্বত্র খুঁজবে—যে কোনও রকম পাথরের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় খনিজ পাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব, পাথর দেখামাত্র তার ওপরে বসাবে তোমার যন্ত্র।

—যে কোনও পাথর, মানে কয়লার মধ্যেও কী তেজস্ক্রিয় ধাতু পাওয়া যেতে পারে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই। খেদকরের উত্তর: ভগবান যেমন সর্ব-ভূতে বিরাজ করছেন, তেমনি য়ুরেনিয়াম-থোরিয়ামও সব রকম পাথরে থাকতে পারে। কাজেই কয়লার স্তরের মধ্যে য়ুরেনিয়াম-থোরিয়ামের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলা চলে না।

সর্বত্র যা আছে, তাকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন, কাজেই যেখানে সহজলভ্য বলে বোধ হয়, অনুসন্ধান সেখানেই প্রথমে চালাব ভাবলাম।

বিভূতিভূষণ ও খেদকরের অন্তর্দৃষ্টি যে অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জের আভাস পেয়েছে, প্রথম তার দিকেই নজর দিই। তাম্রক্ষেত্রজোড়া বনাকীর্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে তেজস্ক্রিয়তা মাপতে মাপতে সুদূরপ্রসারী তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেলাম। কন্যালুকা, রাখা মাইনস, তামা পাহাড়, বাদুগড়া, ভাটিন, নারওয়া পাহাড়, তুরামডি ও কেরুয়াডুংরি পাহাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার আমার তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রকে উত্তেজিত করে আমাকে উত্তেজিত করে তোলে।

সিংভূমের তাম্রক্ষেত্রের তেজস্ক্রিয়তা আমার মত কজন ভূতাত্ত্বিককে উত্তেজিত করে তুলেছিল জানি না, তবে বিভূতিভূষণ ও খেদকরের স্বপ্ন ক্রমশ সফল হয়ে ওঠে। শুরু হয় পাহাড়ে পাহাড়ে, পুঞ্জীভূত তেজঃ-পুঞ্জকে বিদীর্ণ করার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি। ড্রিলিং করে স্তরে স্তরে য়ুরেনিয়ামযুক্ত অটোনাইট, টরবারনাইট এবং সবার নীচে য়ুরানিনাইট আবিষ্কৃত হয়।

য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের পরিমাপ করা হয় বাদুগড়া ও নারওয়া পাহাড়ে। বাদুগড়াতে খনি এবং খনির পাশাপাশি য়ুরেনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা গড়ে তোলা হয়। খননের আয়োজন হয় নারওয়া পাহাড়ে।

এমনি করে সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র ক্রমশ য়ুরেনিয়ামের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। (ক্রমশ)

লেবাননের দুই রূপ

তপন কবিরাজ

আরবদের মক্ষীরানী লেবানন। চার পাশে গোঁড়া মুসলমানদের রাজত্ব। যার কোন কোন দেশে এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর আইন-কানুন প্রচলিত রয়েছে। চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হবে। মহিলাদের প্রকাশ্যে ঘোমটা অনিবার্য, বাড়ির মধ্যে এখনও দুই মহল, বাহির এবং অন্দর মহল, মদ আইনত বেআইনী, খুনের আসামীর এখনও রাজধানীর চৌমাথায় সমবেত জনতার মাঝখানে প্রকাশ্য দিবালোকে দাঁড় করিয়ে অবলীলায় মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়, তখন তারই পাশে হাস্যে লাস্যে মদিরায় চঞ্চল চটুল লেবানন। বর্ষার ফাঁপা-না নদীর মত। ভরা যুবতীর উদ্দাম যৌবন নিয়ে কোন কিছু তোয়াক্কা না করে কূলে ভাংগা জীবন কাটাচ্ছে। আরবরা তাই একে আদর করে বলে আমাদের মক্ষীরানী, যৌবনের তীর্থস্থান।

ছোট্ট লেবাননের আরও ছোট্ট রাজধানী বেইরুত। তার প্রসিদ্ধ রাস্তা হামরা স্ট্রীট। খ্রীষ্টমাসের এবং নতুন বছরের আগমনীতে এখন সরগরম। বিরাট বিরাট অট্টালিকা থেকে আলোর মালা নামতে নামতে রাস্তার বুক ছুঁয়ে আবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। মালার মধ্যে মধ্যে বাহারি ফুলের ঝাড় জ্বলছে নিবছে। এই রকম একটার পর একটা সার বেঁধে চলে গেছে রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। রেস্তোরাঁর লাগোয়া ফুটপাথে থরে থরে রঙ্গীণ চেয়ার টেবিল বিছানো। চেয়ার টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে টবে ফুলের গাছ। গাছের খাঁজে খাঁজে নরম আলো।

পথিকরা যেতে যেতে হঠাৎ বসে পড়ছে। এক কাপ কফি অথবা একটু বিয়ার সংগে কিছু আলু ভাজা নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আড্ডা দিচ্ছে, রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করছে। আবার খেয়াল-খুশী মত পয়সা দিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে। মদের দোকানের SEXY BAR কোথাও লেখা Enjoy your night in underground bar with candle light only. তার পাশেই হয়তো টাকা ভাংগানোর দোকান। পানের দোকানের মত একটা গুমটিতে কাঁচের শো-কেসের নিচে রাখা পৃথিবীর তাবৎ দেশের কড়কড়ে নোট থরে থরে সাজানো। কোন বাধা নিষেধ নেই যে কোন দেশের টাকার বিনিময়ে-যে-কোন দেশের টাকা পাওয়া যাবে। তার পাশেই সিনেমা হল। ছবির বিজ্ঞাপনের পাশে আরও দু লাইন উত্তেজক বিজ্ঞাপন—পশ্চিম দুনিয়ার মনমাতানো আনসেনসরড ছবি দেখুন—'Lost-tango' 'So-sweet' 'so-dead' ইত্যাদি ইত্যাদি। বুড়োবুড়ি, ছোঁড়াছুড়ি টপাটপ টিকিট কিনছে, টুকটাক হলের ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

একই সময়ে একটু দূরে থেকে গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি গম্ভীরভাবে প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছে কখনও বা তার পাশেই মসজিদ থেকে ভেসে আসছে সমবেত ভক্তের ডাক আল্লাহো আকবর......। সবাই পাশাপাশি থেকে যে যার নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, একের অপরের দিকে তাকাবার অবসর নেই, পরের ব্যাপারে নাক গলাবার প্রয়োজনও নেই, একেবারে চূড়ান্ত সহাবস্থান।

লেবাননের এক গাদা কুচোকাচা ট্রাভেল এজেন্সির অন্যতম ট্রাভেল এজেন্ট লেবন ট্রাভেলস।

এদের আধবেলার ভ্রমণসূচীর মধ্যে পড়ে লেবানন শহর, যাদুঘর, লোকসভা ভবন, বন্দর ইত্যাদি কয়েকটা দ্রষ্টব্য স্থানের পর অতি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকা ছাড়া বহির্বিশ্বে আমেরিকার এইটাই সর্ব বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। সমুদ্র উপকূলে কয়েক মাইল জুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় নানান দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যার্জনের

বাইব্লোস-এর একটি প্রাচীন তোরণদ্বার।

অন্যতম কেন্দ্রস্থল। গাছের ছায়ায় ছোট ছোট ঘরের সমাবেশে এক একটা বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ নিখুঁতভাবে পশ্চিমী কায়দায় সাজানো। ছেলে-মেয়ের দল একসাথে শিক্ষকের সংগে মিলে মিশে আলোচনার মাধ্যমে পড়াশুনা করে। শিক্ষক আসেন পৃথিবীর বহু প্রান্ত থেকে, নিজেদের দেশের কথা, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা উজাড় করে দেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। বহু জাতির এবং বর্ণের সমন্বয়ে এবং পারস্পরিক হৃদ্যতায় এই বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে জ্ঞানার্জনের এক নির্মল নিকেতন।

বেইরুতের মাত্র ষাট কিলোমিটার দূরে যখন আরব ইস্রায়েলের মরণপণ যুদ্ধ চলেছে তখনও এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত কলহ কচকচির ঊর্ধ্বে থেকে আপন মনে নিজের কাজ চালিয়ে গেছে।

'এবার কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল, ঐতিহ্যময় আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম বন্ধ। কথাটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চুপচাপ দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, আমার সহকর্মী আবদুল রহিম ওথমান। লেবানন ছেড়ে চলে এসেছি অনেক দিন। আরব ইস্রায়েলের যুদ্ধও থেমে গেছে অনেককাল কিন্তু তারপরই শুরু হয়েছে লেবাননের গৃহযুদ্ধ। হাজারো রকম পার্টির হাজারো রকম ধোঁয়া, লক্ষ্য কিন্তু সবার একটাই। যেভাবে হোক গদী দখল কর, অতএব পৃথিবীর ইতিহাসে যা যুগ যুগ ধরে হয়ে এসেছে, এখানেও তাই শুরু হয়েছে, প্রবলের দৌরাত্ম্যে নিরীহ প্রাণের রক্ত গংগা বয়ে চলেছে, কখনও থেমে থেমে কখনও কলকলিয়ে।

বাস্তুহারা হলেও ওমর আবদুল আজিজ-এর রক্তের টান রয়েছে লেবাননের ওপর। ওমরের বাবা, বউ এবং পরিবারের অন্যান্য সবাইকে যুদ্ধে খুইয়ে প্যালেস্টাইন ছেড়ে লেবাননে চলে এসেছিলেন ১৯৪৭ সালে। তারপর আর প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন নি। ওমরের কৈশোর, যৌবন কেটেছে লেবাননে, কিন্তু মনে শান্তি পাননি। তার কারণ লেবানন খ্রীষ্টান প্রধান দেশ। মুসলমানরা এখানে সংখ্যা লঘিষ্ঠ। খ্রীষ্টানদের চাপে মুসলমানরা অবহেলিত, সময় বিশেষে নিপীড়িত। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাংগা লেগে যায়। ওমর মুসলমান, এঞ্জিনীয়ার হয়েও ভালো চাকরি কপালে জোটেনি। ভাগ্যান্বেষণে তাই দেশ ত্যাগ করে পেট্রোডলারের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। দেশ ছাড়ার পর দেশের ওপর টান বেড়েছে কিন্তু লেবাননের গৃহযুদ্ধ দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে দেশে ফিরে যাবার আশা তত ক্ষীণ হয়ে আসছে। মনের ক্ষোভে তাই শ্রোতা পেলেই বকতে থাকে 'এ যুদ্ধ কি আজকের রে ভাই, এই ধিক ধিক আগুন জ্বলা শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে যেদিন ফ্রান্স লেবাননকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেছিল, সেই-দিন থেকে। প্রথমদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ অর্থাৎ মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের অত্যাচার চুপচাপ সহ্য করত, কিন্তু লেবাননের খ্রীষ্টানদের কপাল পুড়ল যখন ১৯৪৭-৪৮ সালে ইহুদীরা আরবদের প্যালেস্টাইন ছাড়তে বাধ্য করল। কাতারে কাতারে আরব যাদের অধিকাংশই মুসলমান পাশের দেশ লেবাননে এসে আশ্রয় নিল। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি সংগে সংগে শুরু হয়ে গেল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত বলতে গেলে সেই তখন থেকেই। অতীতেও হয়েছে এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে।'

এখন নাইট শিফট। নাম মাত্র লোকজন কারখানায় রয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় ফাঁকা। চার পাশে বোবা মেশিনের চাপা গর্জন, তারই মধ্যে ওমরের কথাগুলো 'অতীতেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে' দৈববাণীর মত শোনায়। ওমরের কথা তার অন্তরের কথা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তন্বী, সুন্দরী লেবানন, পঁচিশ হাজার মানুষ মানুষীর কাটা মুণ্ড গলায় ঝুলিয়ে,

বৃহস্পতি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

এখন হয়েছে রক্ত পিপাসু চামুণ্ডা।

'আমার একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল।' মনে মনে ওমরের কাছে চলে গেছিলাম কথাগুলো শুনে আবার বর্তমানে ফিরে এলাম, হাত দুটো মাথার পিছনে রেখে টান টান হয়ে বসে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে আবদুল করিম। আজ চার বছর ধরে ওকে আমি চিনি। দুই ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েও, শিফট ডিউটি করেও ও সমানে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ছুটিতে নিজের দেশে অর্থাৎ ঈজিপ্টে না গিয়ে প্রতি বছর সেই ছুটিতে নিজের কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে বেইরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। পড়াশুনোর জন্যে প্রমোশন না নিয়ে কারখানায় একটেরে পড়ে আছে আজ পাঁচ বছর। তিন বছর পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, এই বছর চতুর্থ বছর অর্থাৎ ডিগ্রী কোর্সের শেষ বছর। পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে খবর এল, এ বছর পরীক্ষা হবে না লেবাননের অবস্থা বর্তমান সরকারের আয়ত্তের বাইরে, অতএব অনির্দিষ্টকালের জন্য আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রইল।' মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে ওর দুঃখী চোখ আমার দিক থেকে ফিরে আবার দূরে সমুদ্রের পথে চাইল। যেখানে এখন গভীর অন্ধকার কেবল তার গর্জন এত দূরেও ভেসে আসছে। গভীর শ্বাস ছেড়ে হতাশ গলায় আবদুল করিম স্বগতোক্তি করল—'যাকেই জিজ্ঞেস করি, সবাই একই জবাব দেয়, লেবানন, ওরে বাবা, খবরদার যেও না, ওখানে এখন আগুন জ্বলছে।'

সারাদিনের ভ্রমণসূচীর মধ্যে পড়ে বালব্যাক এবং আঞ্জার বেইরুত থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে বালব্যাকে আজ থেকে দু হাজার বছর আগেকার রোমানদের তৈরী বৃহস্পতির মন্দিরের ভগ্নস্তূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রোমানরা যখন লেবাননের বালব্যাকে রাজত্ব করেন তখন এই মন্দির তৈরি করা হয়। কথিত আছে এই মন্দির তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২৫০ বছর এবং পর্যায়ক্রমে

শ্রমিকের সংখ্যা ছিল তিনশ' হাজার আদের মধ্যে নানান দুর্ঘটনায় প্রায় একশ' হাজার শ্রমিক প্রাণ হারান।

বর্তমান রাস্তার বেশ কিছুটা নিচে থেকে বিরাট পাথরের দরজা পেরিয়ে এই মন্দিরের ওপরে ওঠার ব্যবস্থা। লম্বা লম্বা মোটা মোটা পাথরের চাংড়া কেটে কেটে একটার খাঁজে আর একটা বসিয়ে তৈরী সিঁড়ি বহুদূর পর্যন্ত ওঠার পর মন্দিরের প্রথম ভাগ। বর্তমানের গাইডরা মন্দিরকে সহজভাবে দেখানোর জন্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমেই মন্দিরে ঢোকার রাস্তা এবং সিংহ দরজা। চুনাপাথরের তৈরী প্রতিটি থাম্বায় রোমানদের নানান কারুকার্য, কোথাও সিংহের প্রকাণ্ড মূর্তি, কোথাও লতাপাতা দিয়ে নানান ফুলের সমাবেশ, কোথাও বা ভেনাসের মূর্তি।

দ্বিতীয় ভাগে মন্দিরের কেন্দ্রস্থল। চারিদিকে ছোট ছোট ঘর দিয়ে ঘেরা এক উন্মুক্ত বেদী। এই সব ঘরে রাজা উপাসক এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা আসন গ্রহণ করতেন। পাশের এক সুড়ঙ্গ দিয়ে সদ্যস্নাত ছাগ এবং মেষ এনে দেবীর উদ্দেশ্যে এই বেদীমূলে বলিদান করা হত।

তৃতীয় অংশে মন্দিরের মূল ভাগ। এখনও যেখানে ছয়খানা থাম্বা দাঁড়িয়ে থেকে অতীতের বিজয় ঘোষণা করছে। পাথরের তৈরী সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ১৫০ ফুট ওঠার পর এক বিরাট পাথরের চাতাল। এই চাতালের চার পাশে প্রায় দুশো ফুট উঁচু এবং তার ওপরে পাথরে খোদাই করা লতা-ফুলের মাঝে সিংহ মূর্তি সহ ২৫০ থাম্বা ছিল। বহু পরে এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলে এই বৃহস্পতির মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এখন সুউচ্চ এই স্তম্ভের সংখ্যা মাত্র ছয়। যা অতীতের সাক্ষী হয়ে এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পাশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মন্দিরের অন্যান্য অংশ। বৃহস্পতির মন্দিরের পাশেই সূর্য মন্দির। আকারে ছোট হলেও দেখতে অনেকটা বৃহস্পতির মন্দিরের মতই, শুধু মন্দিরের গায়ে কারুকার্যের সংখ্যা অনেক কম। ভূমিকম্পে সূর্য মন্দিরের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। এর প্রায় অর্ধেকটা এখনও বর্তমান এবং সযত্নে রক্ষিত।

দুপুরের খাওয়া ট্রাভেল এজেন্ট-এর তরফ থেকে। একটা বিরাট হল ঘরে অনেকগুলো টেবিল একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে সবার একসাথে খাবার ব্যবস্থা।

সাইপ্রাস থেকে আগত ইংরেজ মহিলা ডান পাশে যুবতী মেয়েকে রেখে, বাঁ পাশে ফরাসী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে রেখে সামনের চেয়ারে মুখোমুখি বসা ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন আদিখ্যেতা শুরু করলেন, সেও এক উপভোগ করার মত দৃশ্য। আবার পাশের আর্মেনিয়ন ভদ্রলোক যখন আমার দিকে কটাক্ষ করে তীক্ষ্ম গলায় হঠাৎই প্রশ্ন করে বসলেন—'আচ্ছা বলুন ত বাংলাদেশ কি খুবই গরীব ?' তখন হাল্কা পরিবেশ আবার গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর পরিবেশ হাল্কা করার জন্য আমার সদ্য পরিচিত 'উইনি' শুরু করে গ্রীসের স্নোম্যান-এর কথা। পয়লা জানুয়ারী ছুটির দিন, অত্যন্ত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও গ্রীকরা কিভাবে সারাদিন বাইরে কাটিয়ে দিনের শেষে বাড়ি ফেরার সময় বরফের তৈরী মানুষ অর্থাৎ স্নোমান তৈরী করে গাড়ির ছাতে বসিয়ে নিয়ে হই-হই করতে করতে বাড়ি ফেরে তার বর্ণনা। জর্মন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বললেন, তাঁদের তুর্কীর অভিজ্ঞতার কথা। তুর্কী ভাষার এক অক্ষর না জেনেও ইংরেজী না জানা এক হোটেলে একটা পুরো দিন এবং রাত্রি কিভাবে ছবি এঁকে এঁকে বেয়ারাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার কথা। এমন সময়—'আপনি কিছু বলুন' মাথা তুলে দেখি কথাটা আমার দিকে ছুঁড়েছেন টেবিলের ওপারে বসে থাকা ফরাসী ভদ্রমহিলা। (এই ফরাসী মহিলা বাসে আসার সময় আমার পাশেই বসেছিলেন এবং সেই সুবাদে অল্প আলাপ এবং ইংরেজ মহিলা যখন হুমড়ি খেয়ে ওঁর স্বামীর ওপর পড়ছিলেন তখনও লক্ষ করেছি, এই মহিলা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ইংরেজ মহিলার রঙ্গ উপভোগ করছিলেন। মাতৃসমান এই মহিলা বাসে আলাপের অল্প পরেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খুব ত বাবু সেজে এসেছ, ব্যালব্যাকে যাচ্ছো, ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা, হাত ব্যাগে গরম জামা আছে তো ?') কথাটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একটা কিছু বলতেই হয়, কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললাম আমার অভিজ্ঞতা অতি অল্প এবং যে দেশে চাকরি করছি তাদের সম্বন্ধে আহামরি করে বলার বিশেষ কিছুই নেই। তবে যদি আজ্ঞা করেন ওখানের একটা মজার গল্প বলতে পারি।
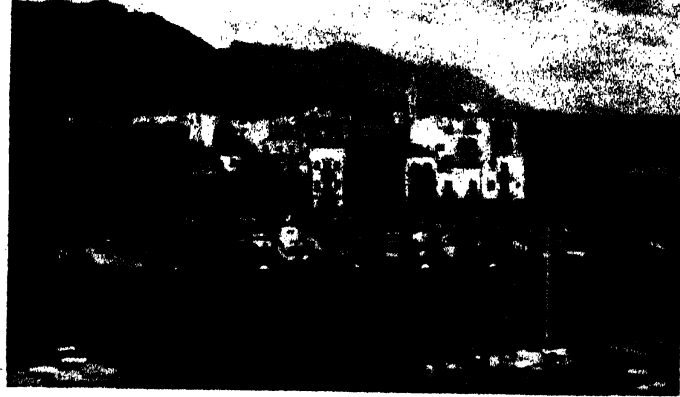
নাইস, ভেরী গুড। উই উই দিয়ে সবাই সম্মতি জানাল — শুরু করলাম—

বিশ্বমেলা বসেছে অ্যামেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এবং সেই মেলার বিশেষ আকর্ষণ মানুষের ঘিলু অর্থাৎ Human brain একটা ছোট্ট দোকানে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতা একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে হাত মাইক নিয়ে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে, মানুষের ঘিলু, মানুষের ঘিলু, মেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিনিস, বাড়িতে রাখার অপ্রচলিত সামগ্রী, একেবারে নতুন চিন্তাধারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এশিয়ান ব্রেন ১০০ ডলার একসেপট জাপানীজ, জাপানী ব্রেন ২০০ ডলার।

ইয়োরোপীয়ানস ৩৫০ ডলার, অ্যামেরিকানস ৩৭৫ ডলার অ্যাণ্ড আরব ব্রেনস ৪৫০ ডলার।

দোকানের সামনে প্রচণ্ড ভীড়। হঠাৎ এই ভীড় ঠেলে জনৈক খরিদ্দার এক আজব প্রশ্ন করে বসলেন দোকানীকে—কি মশাই এশিয়ান ব্রেন না হয় বাদ দিলাম ওরা বরাবরই সস্তা। কিন্তু যেখানে ইয়োরোপীয়ান ব্রেন ৩৫০ ডলার, এমন কি বিশ্ব শ্রেষ্ঠ অ্যামেরিকান ব্রেন ৩৭৫ ডলার সেখানে রাতারাতি তেলের পয়সায় বড়লোক হওয়া আরব ব্রেন ৪৫০ ডলার ? দোকানী মাথা নিচু করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কেন ? জানেন না ? প্রশ্নকর্তা জবাব দিলেন—না মশায়, জানি না।

দোকানদার আগের মতই হাত মাইক নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, আরব ব্রেন আর মাচ কস্টলি, কসটলিয়ার দ্যান অল আদার ব্রেনস, বিকজ, বিকজ, ইট ইজ ব্র্যাণ্ড নিউ অ্যাণ্ড নেভার ইউজড।

ব্যালব্যক থেকে আঞ্জার, রোমানদের আবাসস্থল, যা বর্তমানে এক বিরাট ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে আছে, দেখে সন্ধ্যা নাগাদ আবার বেইরুতের মুখে রওনা হওয়া। সারা দিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত। বাস চলেছে একটা গ্রামের রাস্তা ধরে। শীতের ফসলে ক্ষেত ভরে আছে। আমি উইনি এবং পেট্রীকা পরের দিনের ভ্রমণসূচী তৈরি করছি, সামনে বসে সেই আর্মেনিয়ন যুবক। রাস্তার ধারে তাকিয়ে বেশ জোরে মন্তব্য করল—'দেখে মনে হচ্ছে এরা খুব গরীব।' দু একজন ঈষৎ ঘাড় তুলে তাকাল কিন্তু ভদ্রলোক কোন সায় পেলেন না। আশা ভঙ্গ হয়ে

উপরে বা দিকে : মনোরম সমুদ্র উপকূল ... ব্যাল বাক-এ সূর্যমন্দিরের ভগ্নস্তূপ। ডানদি... নীচে : সূর্য মন্দিরের ওপরে যে ছয়টি থাম ...

দ্র বিহারের যাবতীয় ব্যবস্থা। মাঝখানে ঃ আজার – অতীতে রোমানদের আবাসস্থল অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।
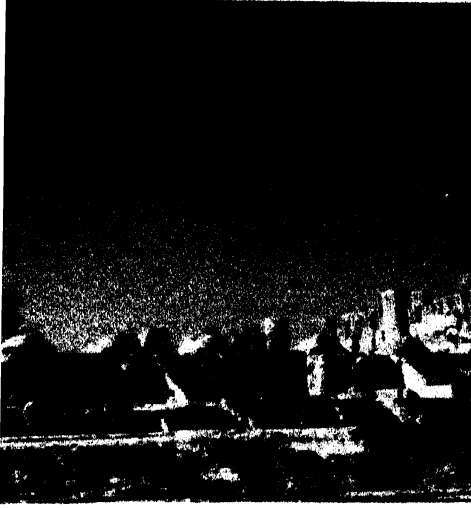
আমার দিকে ত্যাড়চা চোখে তাকিয়ে আবার মন্তব্য করলেন—'আমি জানি বাংলাদেশ খুব গরীব। ওখানের লোক দু বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। কথাগুলো আমাকে ঘেসে গেলেও চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম, শুধু ভদ্রলোকের এই অকারণ গরীব গরীব করে অসহিষ্ণু হবার কারণ বুঝতে না পেরে আমরা তিনজনেই উইনি, পেট্রীবা এবং আমি, মুখ টিপে হাসলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বেইরুতও এসে গেল। হঠাৎ সেই ভদ্রলোক ঘাড় বেঁকিয়ে সোজাসুজি আমাকে প্রশ্ন করেছেন—আচ্ছা আপনাদের দেশ ত খুব গরীব। শুনেছি ওখানের লোকেরা নাকি আধপেট খেয়ে থাকে।

এবার আর থাকা গেল না—সোজা উঠে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা আপনাদের দেশ আর্মেনিয়া কি স্বাধীন রাষ্ট্র? ভদ্রলোক থতমত খেয়ে উত্তর দিলেন—না, এখনও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।'

আমি তেতে পুড়ে বলে উঠলাম—'একটা কথা মনে রাখবেন পরাধীনভাবে মাথা নিচু করে সারা জীবন পরের খবরদারীতে কাটানোর চেয়ে একবেলা খেয়ে স্বাধীন জীবন কাটানো অনেক শ্রেয়।'

বেইরুতের সবচেয়ে আকর্ষণকারী এবং অবশ্য দ্রষ্টব্য জিনিস ক্যাসিনো ডি লিবান অর্থাৎ লেবাননের প্রসিদ্ধ নাইট ক্লাব। পেট্রীকা উইনি এবং আমি তখন একটা ছোট দলের মত হয়ে গেছি। ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রির অর্থাৎ খ্রীষ্টমাসের স্পেশাল শো-এর টিকিট কাটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম—টিকিটের দাম মাত্র চারশো টাকা। মাথা ঝাঁকিয়ে উইনিকে বললাম, 'না ভাই আমার দ্বারা হবে না, বড্ড দাম, আগামীকাল রোজকার শো দেখব, আজ তোমরা ঘুরে এস।'

টিকিটের দাম শুনে উইনিও থমকে দাঁড়িয়েছে, বেচারা পেট্রীকার মুখপানে তাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত পেট্রীকাই সমাধান করল, 'না ভাই অত পয়সা নেই আগামীকালই যাব।' উইনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পরের দিনের টিকিট কেটে (একটার দাম ১৫০ টাকা) ঠিক হল সকালবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে বিকেল বেলায় আধবেলার ভ্রমণসূচী কেবল কার এবং জিয়াপ্পা বা গ্রোটো দেখতে যাওয়া হবে।

ছুটির দিন, সবাই দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। বেইরুতের এই সমুদ্রের ধারই সবচেয়ে মনোরম জায়গা। ফুর ফুর করে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনতে সমুদ্রের বেশ কিছুটা ভেতরে বড় বড় ড্রাম খাড়া করে তার ওপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরছে, ছোট নৌকো নিয়ে এই শীতেও বৃটিশ মহিলা ডুবুরীর পোশাক পরে বারে বারে ডুব দিচ্ছে। আর কি তুলে আনছে ভগবানই জানেন। বেড়াতে বেড়াতেই দেখি আমাদের দলের অন্য দু জন যাত্রী, ছেলে অ্যামেরিকান স্ত্রী জর্মন,—আমাদের দিকেই আসছে। সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আজ তাহলে স্পেশাল শো ক্যাসিনো ডি লিবানে যাচ্ছেন?

ভদ্রমহিলা আঁতকে উঠলেন, ওরে বাব্বা টিকিটের যা দাম করেছে, রক্ষে কর বাপু, তার চেয়ে কালকেই যাব।

আমি জানতাম এঁরা বেইরু
প্রসিদ্ধতম হোটেল হলিডে ইন-এ উ
ছেন। সাহস করে বলেই ফেললা
আপনাদের আবার কি ভাবনা,
হোটেলে উঠেছেন। তাতে টিকি
দাম ত হাতের ময়লা।

ভদ্রলোক হেসেই মন্তব্য করলে
উঠেছি কি আর সাধ করে, ও
হয়েছে। কাজ করি এয়ার লাইনস
বাতাস টিকিট পেয়েছি বিনে পয়
হোটেল পেয়েছি কনসেনস-এ, প
পয়সা খরচ করতে হলে আম
আপনার মত নিউ হামরাতেই উঠত
ভদ্রলোকের স্ত্রী, উইনি, পেট্
সবাই দেখি ঘাড় দুলিয়ে ভদ্রলো
সমর্থন করছে। আমি বললাম—
কি, শুনেছি আপনাদের কাঁড়ি ক
টাকা, খরচ করার জায়গা নেই।"
শেষ করার আগেই ভদ্রলোকের
ফোঁস করে উঠলেন—"ঐ সব শু
থাকবেন। দুজনে রোজগার করি,
গেলে বেশ মোটা টাকা হাতে আ
কিন্তু হলে কি হবে, যেভাবে খরচ
সাথে পাল্লা দিয়ে জিনিসপত্রের
বাড়ছে তাতে সংসার চালানোই

সূর্য মন্দিরের গাত্রে সিংহমূর্তি এবং অন্যান্য কারুকার্য।

"হয়ে উঠেছে।" কথা শুনে উইনি এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেছে, "আপনারা তাও দুজনে চাকরি করেন, আমার তো একার কাঁধে জোয়াল। তার ওপর একটা ছোট বাচ্চাও আছে, দেশে রেখে এসেছি।" উইনির কথা ওর বউ প্যাট্রীকার গা ছুঁয়ে গেছে। সেও ছাড়বার পাত্রী নয়—সুতরাং "লজ্জা করে না, মাস্টার কোর্স করার সময় যখন দিন রাত্রি বই মুখে গুঁজে পড়ে থাকতে তখন কে সংসার চালিয়েছে? তোমার জ্বালায় তো আমার স্কুলিংটাও হল না। এবার দেশে গিয়ে আবার স্কুলে ভর্তি হব।"

"আপনার কি ধারণা আমরা সবাই মিলিয়নিয়ার?" মুখ খুলেছেন এয়ার লাইনসের ভদ্রলোক—"সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা সারাজীবন দুজনে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী চাকরি করে, ভাড়া বাড়িতে থেকে জীবন কাটায়। বুড়ো বয়সে খুব বেশী হলে একটা ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরোয়। ফেরার পর যদি পয়সা থাকে গ্রামে বাড়ি কিনে নইলে সোজা ওল্ড হোমে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এমন কি মরার আগে নিজের কবরের জমি, কফিন, কবর দেবার জন্য যাবতীয় খরচ জমা দিয়ে তবে একটু স্বস্তিতে মরে থাকে, নইলে মরেও শান্তি নেই। করপোরেশন-এর লোক টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কোথায় পুঁতে দেবে কে জানে!" হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পারে কফি হাউসে কফি খাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। জেটির মত সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূরে যাওয়ার পর তার ওপরে পাটাতন রেখে খোলা আকাশের নিচে বড় বড় রঙীন ছাতার তলায় চেয়ার টেবিল বিছানো। জোড়ে জোড়ে সব বিয়ার, মদের বোতল বা কফি নিয়ে বসে আছে। পায়ের তলায় গাঢ় তুঁতে রঙের নীল সমুদ্র, মাথার ওপরে পরিষ্কার নীলাকাশ, সামনে এই দুই চির বিস্ময়ের গগনচুম্বী ফারাক আর একটু দূরেই চোখের দৃষ্টির সীমানার মধ্যেই তাদের অঙ্গাঙ্গী মিলনের অপূর্ব দৃশ্য। কফি পানের পরও একটু বসে থাকার ইচ্ছে ওদের, আমি উঠে পড়ে, বিনীত আর্জি পেশ করলাম, "অপরাধ যদি না নেন তবে একটু ঘুরে আসছি।"

ওখান থেকেই রেলিং টপকে একটা ছাতের ওপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি। সামনের দৃশ্য দেখে মনে হল নিচে সুইমিং ক্লাব। সুইমিং পুলে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, একজন আরব ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরেছে, একটু হকচকিয়ে গেছি। আমার ধারণা ছিল বারোয়ারি ছাতের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। যে আমাকে জাপটে ধরেছে, তার বৃত্তান্ত শুনে এবং চকিতে পাশের দৃশ্য দেখে আমার অবস্থাও কাহিল। পলকেই দেখতে পেলাম দুজন পুলিশ আমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। দেরী না করে ঝটিতি ভদ্রলোকের হাতধরা ছেড়ে অন্য পথে সুইমিং ক্লাবে ঢুকে পড়লাম। বারোয়ারি ক্লাব নয়; মেম্বারদের ক্লাব, তবে টুরিস্টদের ঘণ্টা দুই তিনের জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না। নামমাত্র কাপড় গায়ে রেখে পরীর দল হেলানো চেয়ারে চোখ বুজে মিঠে রোদে গা এলিয়ে পড়ে আছে। কারো মাথার কাছে রঙীন ছাতা, মুখে রোদ না লাগার ব্যবস্থা, কারো চোখে রঙীন চশমা শুধু চোখ দুটো রোদ থেকে বাঁচানো, কারো কাছে ছোট্ট টীপয়-এর ওপর সিগারেটের বাক্স, কফির ফ্লাস্ক, অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ রোদে পড়ে থাকার বাসনা। প্রশস্ত চাতালে পুরুষের দল জাঙ্গিয়া বা ছোট প্যান্ট পরে গায়ে অলিভ অয়েল লাগিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে, আর একপাশে উঠতি ছোকরা-ছুকরী এই শীতেও জলকেলিতে মত্ত। দর্শক সম্বন্ধে সবাই নির্বিকার যে যার খুশিমত সময় কাটাচ্ছে। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দৌড়চ্ছিলেন তাঁকেই দাঁড় করিয়ে ক্যামেরাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম—"একটা ছবি তুলে দেবেন?"

"ও— সিওর"— ছোটা থামিয়ে প্যান্টে ঘাম-তেল হাত মুছে ক্যামেরা নিয়ে ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাকগ্রাউন্ড কি নেবে? সুইমিং ক্লাব, না সমুদ্র না কি ঐ সব? যেদিকে আঙুল বাড়ালেন

কবি খলিল জিব্রান-এর প্রিয় কেন্নাদিসা গিরিখাত।

সেদিকটায় থরে থরে প্রায় উলঙ্গ মহিলারা রোদে পুড়ছে।

আমি হেসে জবাব দিলাম—"না, সমুদ্রই ভাল।"

"ও-কে—অ্যাজ ইউ লাইক।"

ছবি তোলা শেষে ক্যামেরাটা ফেরত দিয়ে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন—"দুটো তুলেছি, একটা তোমার আর একটা ঐ সখীদের।"

বেশ হাসি খুশী দেখে সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা এটা তো আপনাদের প্রাইভেট ক্লাব। অথচ আমি বিদেশী যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ কিছু আপত্তি করে না? বিশেষ করে আপনার তথাকথিত ঐ পরীর দল?"

ভদ্রলোক একই জায়গায় লাফাতে লাফাতে বলতে লাগলেন, "আমাদের আপত্তির কিছু নেই, আর ঐ সখীর দল? ওরা তো দেখাতেই চায়। এখানে আর কি দেখছো ভায়া রাত্রে নাইট ক্লাবে যেয়ো, চোখ ভরে দেখে নিও। যদি মানে মানে দেখলে ত ভালো নইলে দেখানোর জন্যে ওরা তোমার প্রাণান্ত করে ছাড়বে।"

ওঁর মুখে শব্দ করে ছড়ানো হাসি। আমি আরও একটু ঘুরে ফিরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সমীর মারে, আমারই বয়সী, সহকর্মী। প্ল্যান্ট (PLANT) বন্ধ, ছুটিতে আড্ডা জমেছে। বহু মেয়ের সঙ্গে সহবাস করে সমীর মারে এখন বিয়ের জন্য পাগল। পকেটে এক্তার পেট্রো ডলার, সঙ্গে নতুন গাড়ী, সিরিয়ায় জমি কিনে প্যালেস্তাইন উদ্বাস্তু সমীর মারে এখন ছুটির দিনে কেবল বিবাহযোগ্যা মেয়ে খুঁজে বেড়ায়।

কয়েকদিন পরেই হই-হই ব্যাপার, সমীর মারে কন্যা পেয়ে গেছে। বাবা, মা রাজী, তবে একটাই অসুবিধা লেবাননে গিয়ে মেয়ে দেখে আসতে হবে এবং পছন্দ হলে ওখানেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে। সমীরের আর তর সয় না। মেয়ের ছোট্ট একখানি রঙীন ছবি পকেটে নিয়ে ঘোরে আর স্বপ্নের জাল বোনে। রূপসী মেয়ে, বয়স কুড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। বার বার ছবিটা দেখে, বন্ধুদের দেখায় আর নিজের মনে নিজেই হারিয়ে যায়। কাজে মন নেই। সাত দিনের ছুটি নিয়ে হাওয়া—টিকিট কেটে সমীর ছুটল লেবাননে মেয়ে দেখতে। সাতদিনের জায়গায় মাত্র দু দিন পরেই সমীর ফিরে এল কাজে। সারা মুখে বিমর্ষ ভাব। বন্ধু বান্ধবরা ঘিরে ধরল, কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সমীর পকেট থেকে একটা ছোট চিরকুট এগিয়ে দিল সবার উদ্দেশ্যে।

কন্যা নিজের হাতে তার বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছে—

"বাবা, গত পরশু রাস্তা লড়াইয়ে দাদা প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ওর ফেলে দেওয়া রাইফেলটা, আমি তুলে নিয়েছি। আমার বিয়ের কথা ভুলে যেও। লেবানন জ্বলছে, আমি সেই আগুনে ঝাঁপ দিলাম। মরণ বাঁচন খোদাতাল্লার হাতে।"

শুঁয়ো পোকার মত বাসটা অনেকখানি অন্ধকার গিলে, একটা অত্যুজ্জ্বল গোলাকার আলোকিত অট্টালিকার সামনে ঝুপ করে থমকে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে দেখলাম পাহাড়ের কোলে এক সমতল জমি। বাস থেকে নামতেই শীত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার সঙ্গে পাহাড়ী তাজা হাওয়া। কোনদিকে না তাকিয়ে যাত্রীরা টুপটাপ কাঁচের ঘেরা বারান্দার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন, ভেতরটা শীত নিয়ন্ত্রিত। গাইড সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—শো শুরু হবে রাত্রি দশটায়, এখনও আধঘণ্টা সময় আছে যদি জুয়া খেলতে চান খেলতে পারেন। ক্যাসিনো ডি লিবানের একতলায় জুয়ার আসর। দশটাকা দিয়ে দর্শকের টিকিট কেটে চলে গেলাম জুয়া খেলা দেখতে। সরকার অনুমোদিত জুয়ার আসর, চোট্টামির বালাই নেই। একতলার এই প্রকাণ্ড হলঘরে জায়গায় জায়গায় টেবিল পাতা, টেবিলের সামনে ছোট্ট একটা বোর্ডে খেলার ন্যূনতম অঙ্ক লেখা। যার যেরকম রেস্ত সে সেইরকম টেবিলে গিয়ে ভীড় করছে, হারছে, জিতছে। খেলুড়ীর চেয়ে দর্শকের সংখ্যাই বেশী। ভাল লাগল না, একটু ঘুরে দেখার পর বেরিয়ে এলাম। দোতলায় হলঘরে কোনরকম সীটের ব্যবস্থা নেই, রেস্তোরাঁর মত টেবিল চেয়ার সাজানো। টিকিট দেখাতেই দরোয়ান আমাদের টেবিল দেখিয়ে দিল। চেয়ারে বসতে না বসতেই দু পেগ ড্রিংকস হাজির, এর পয়সা এরা টিকিটের সঙ্গেই নিয়ে নেয়। হলঘরের আর এক পাশে ডিনারের ব্যবস্থা অর্থাৎ শো দেখতে দেখতে খাওয়া অথবা খেতে খেতে শো দেখা। ঢং ঢং করে রাত্রি দশটায় ঘোষণা হল, সঙ্গে সঙ্গে আলো কমে গিয়ে হলঘরটা মৃদু আলোয় ভরে গেল।

চি-চিং ফাঁক। পর্দা খুলছে, খুলছে ত খুলছেই, পিছনের সারা অংশ জুড়ে এক অতিকায় মঞ্চ। অর্ধ বৃত্তাকারের মঞ্চ তিনভাগে ভাগ করা। তিনটি ভাগই জিমনাসিয়ামের বাচ্চা মেয়েদের মত পলকেই ঘোরে, ফেরে, দোমড়ায়, মোচড়ায়, ওঠে, বসে। তবে কোন সময়েই রোমান সার্কাসের যেমন তিনটে রিং-এ একসাথে খেলা হয়, এখানে সেরকম হয় না। কারণ তাতে দর্শকদের অসুবিধা হয়। এক সময়ে মঞ্চের যে কোন একটা ভাগে অনুষ্ঠান হয়। মাঝের মঞ্চে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে আরবী ঘোড়া ছুটে যেতে না যেতেই ডান পাশের মঞ্চ থেকে স্পুটনিক বেরিয়ে এসে দর্শকদের মাথার ওপর চক্রাকারে উড়ান দিয়ে বাঁ পাশের মঞ্চে মিলিয়ে গেল। যেমন তার আগুনের হলকা ছোটানো তেমনি তার গর্জন। স্পুটনিক মেলাতে না মেলাতেই চারিপাশে ঝম ঝম বৃষ্টি। দর্শকরা বৃষ্টির মধ্যে বসে দেখছে এক জাদুকর বেহালা বাজাচ্ছে, বিনা ছড়ে। হাত বাড়িয়ে দেখলাম সত্যি বৃষ্টি কি না। না, আলো আর শব্দের কারসাজি। জাদুকর দর্শকদের মঞ্চে ডেকে এনে নাকানি চোবানি খাইয়ে দেবার পরই, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক গোলাকার বিরাট বরফের চাতাল। তার ওপরে নৃত্যরত দুই যুবক-যুবতী, আইস স্কেটিং। আইস স্কেটিং শেষ হতেই প্যালেস্তাইনদের গেরিলা যুদ্ধ। সবই মঞ্চের ওপরে। পরিবেশ সৃষ্টিতে এত দক্ষতা, এত স্বাভাবিকতা যে ক্ষণিকের জন্য দর্শকদের তুলে নিয়ে যায় সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই এক কোনা থেকে বেলি ডান্সারের আবির্ভাব। কোনা থেকে এগিয়ে আসছে ত আসছেই আলোর বৃত্ত ওকে অনুসরণ করছে এখন চারপাশ অন্ধকার, এক গোলাকার আলোর মধ্যে এক পরী, একেবারে দর্শকদের মাঝখানে, ওর কটিবাস হাত-নাগালের ভেতর, পরীর শরীরের দোলায় দর্শকবৃন্দ দোদুল্যমান। নাচনী দর্শকদের ছেড়ে যেতে না যেতেই হাততালির রেশ শেষ হতে না হতেই পপ সঙ। সারা মঞ্চ জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক গায়ক-গায়িকার হলঘর ভরিয়ে উদাত্ত গলায় গান। এঁদের সর্বশেষ আকর্ষণ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রসিদ্ধ নাচ এক একদিন করে দেখানো। শেষের নাচ হল তুর্কীদের সমবেত নাচ। পোশাক, পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা সংগীত এবং সবার ওপরে নাচিয়াদের রূপ এবং দ্রুত লয়ের নাচ এক কথায় অপূর্ব। দু-দুটি ঘণ্টা দর্শকরা স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে থাকে।

শো শেষ হতেই আবার ফেরার পালা, তার মধ্যে যে যার মন্তব্য করে। অনেক ক্লাসের ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত। প্রশংসা করে বলে ওঠেন, প্যারী নাইট ক্লাবের জন্য বিখ্যাত কিন্তু ওখানেও এই ধরনের পাঁচমেশালি জিনিস পাবে না। কেবল নাচ আর নাচ। এরা যেন সব কটি বর্ণকে খুশী করতে চায়, তাই এত বিভিন্ন আয়োজন।

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, "আমি কোনরকমে খেয়েছি, আমার বউ ত খেতেই ভুলে গেছে। হোটেলে গিয়ে আবার ডিনার নিতে হবে।

আমি উইনিকে চাপা গলায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ হে, মেয়েছেলে দেখলাম না তো। শুনেছি নাইট ক্লাবে মেয়েরা নাকি মাছির মত ভন ভন করে, আর একলা থাকলে ত কথাই নেই একেবারে গায়ে চেপে বসে।

পেট্রীকা ছিল পাশে, চুপচাপ মেয়ে হলেও ও থাকতে পারেনি। ফিচ করে বলে উঠল—"তোমার সব সময় খালি ঐ এক চিন্তা।"

উইনি বাসের দিকে এগোতে এগোতে বলল—"নাইট ক্লাব বলতে সাধারণত যা বোঝায় এটাকে ঠিক তা বলা যায় না। এটা একটু ভিন্ন স্বাদের। এখানে শো আছে, মিউজিক আছে, অ্যাকটিং আছে, সেক্স আছে, কিন্তু নোংরামি নেই। ট্যালেণ্ট আছে এবং অবশেষে আছে অ্যাটমোসফিয়ার। অন্যান্য নাইট ক্লাবে তুমি পর পর কয়েকবার যাও তোমার একঘেয়ে লাগবে, এখানে তুমি রোজ আসো, তোমার ভালো লাগবে কারণ এরা প্রত্যেক দিন নতুন নতুন প্রোগ্রাম রাখে অ্যান্ড অ্যাবাভ অল দেয়ার ইজ নো টিজিং। মেয়েই বল আর দালালই বল, বিরক্ত করার কেউ নেই। কত পরিচ্ছন্ন ভদ্র পরিবেশ। অনায়াসেই পুরো পরিবার অর্থাৎ বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানে আসা যায়।

আধবেলার ভ্রমণসূচীর মধ্যে পড়ে কেবলকার এবং জিয়াম্দা বা গ্রোটো। আজকের দিনে কেবলকার খুব একটা আকর্ষণী বস্তু নয়। মোটা মোটা স্টীলের তারের ওপর চারজন বসার উপযোগী ছোট ছোট লাল, সবুজ রং-এর কেবলকারগুলো তার বেয়ে মাটি থেকে উঠতে উঠতে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পলকের জন্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে আবার পরপারে তার বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে আসছে। আধঘণ্টার মধ্যেই যাত্রীরা মাটি থেকে সোজা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, সেখানে লেডী অফ লেবাননের পাথরের মূর্তির আশেপাশে ঘুরে, দু-চারটে ছবি টবি তুলে চোখ ভরে পাহাড় থেকে সমস্ত বেইরুতের দৃশ্য দেখে আবার সো সো করে নিচে নেমে আসছে।

এরপর জিয়াম্দা বা গ্রোটো। বিকেল ছাড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চারিদিকে অন্ধকার বেশ জমজমাট তারই মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা নদীর পাড়ে বাসটা এসে দাঁড়াল।

একটু ওপরে পাহাড়ের মুখেই এক প্রকাণ্ড দরজা। ঢোকার আগে দরোয়ানের একটি মাত্র সাবধানবাণী ছিল ভেতরে শতকরা একশ ভাগ জলীয় বাষ্প, কষ্ট হলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে ঢোকার মুখেই উইনির চশমা পুরো জলে ভরে গেল, বেচারা কিছু দেখতে না পেয়ে চশমা খুলে মুছতে শুরু করেছে, এমন সময় ওর বউ-এর হাঁপি —"হেই, হি কান্ট সি-ই-"-

সুড়ঙ্গ পেরিয়েই সবাই অবাক, একেবারে বাকরুদ্ধ। সেই অনেকটা আলিবাবার গল্পের মত। পাহাড়ের মুখেই প্রকাণ্ড দরজা আর দরজার ওপারেই সোনা, মণি, মানিক্য।

বহু বহু আগে এক খরস্রোতা নদী এই পাহাড়ের তলা দিয়ে পাথর মাটি কাটতে কাটতে এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং জলে পাথর কেটে কেটে পাহাড়ের ভেতরের কি অবস্থা হয়েছে, কি ভয়ঙ্কর তার রূপ তারই দেখানোর ব্যবস্থা এখানে।

কথিত আছে ১৯৫০ সালে জনৈক আমেরিকান তরুণ নেহাৎ খেয়ালবশত এই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং দেখে প্রায় মাইল-খানেক লম্বা এই পাহাড়ের ভেতরটা ফাঁপা। ভেতরে চারপাশে নদীর জলে কেটে যাওয়া অসংখ্য পাহাড়ের গর্ত, খাঁজ, বটগাছের ঝুরির মত শক্ত চুনা-মাটির হাজারো লালচে ঝুরি, নিচ অনেক নিচে, কাঁকর বালি এবং স্পষ্টতই নদী বয়ে যাওয়ার চিহ্ন। ভ্রমণকারীদের আকর্ষণকারী দ্রষ্টব্য বস্তু হিসেবে লেবানন সরকার এর প্রভূত উন্নতি করেন। এখন ভেতরে বিজলী বাতি, দুর্গম জায়গায় রেলিং, যাতায়াতের জন্য ছোট ছোট সেতু, একেবারে নিচে নামার বা ওপরে ওঠার জন্য বাঁধানো সিঁড়ি।

নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত চষে বেড়িয়ে, পাথরের ঝুরিকে আলতো আদর করে, আরব্য উপন্যাসের দুর্গম স্থান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন রাত হয়ে গেছে।

একপাশে সুড়ঙ্গ পাহাড়, মাঝখানে বনানী আর এক পাশে খর-স্রোতা নদী, রাত্রিবেলা, ঠাণ্ডা তাজা বাতাস, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক তাছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম।

আমি আবেগে একটু গুন গুন করতেই উইনি মৃদু হেসে বলল "তোমার খুব ভাল লাগছে না?"

আমার ছোট্ট জবাব "নিঃসন্দেহে। মরুভূমিতে কাজ করি, কতদিন নদী পাহাড় দেখিনি, খুব দেশের কথা মনে পড়ছে।"

উইনি পেশায় প্রফেসর, একটু ভাবুকের মতই বলল—"আমার কিন্তু মনটা খুব খারাপ লাগছে।"

আমি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—"সেকি, এত সুন্দর পরি-বেশ মন খারাপের কি হল?"

"জানো! আসবার সময় আমার বছর চারেকের মেয়েটি আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, পেট্রীকার খুবই ইচ্ছে ছিল মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, রাস্তায় অসুবিধা হবে বলে আমিই ওকে আসতে দিলাম না। এখন মনে হচ্ছে ভীষণ ভুল করেছি। এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, এত ভালো ভালো জায়গা আমরা দুজনে চুটিয়ে দেখছি, উপভোগ করছি আর ও বেচারী কিছুই দেখতে পেল না। এখন হয়ত দেশে আমাদের না পেয়ে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে, নয়ত বা মুখ শুকনো করে আয়ার হাতে রুটি চিবুচ্ছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের বলে উঠল—"স্বার্থপরের মত নিজেদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে মেয়েটাকে না এনে খুব অন্যায় করেছি।" উইনি আমার পাশেই বলতে গেলে এই সরু পাহাড়ী রাস্তায় আমার গা ঘেঁষেই চলেছে তবুও মনে হল ও তখন নিজের মধ্যে নেই, এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে ও চলে গেছে হাজার মাইল দূরে আমেরিকার মেস ইউনি-ভার্সিটির প্রোফেসার্স কোয়ার্টার, ওর ছেলের কাছে।

কাজ শেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে টাক্সি করে বাড়ি ফিরছি। ড্রাইভার হেসে ইংরেজীতে বলল—"আমার নাম সাঈদ।" ঝিমুনি কেটে গেল, ড্রাই-ভারের ইংরেজী উচ্চারণ বেশ ভাল এবং এতক্ষণ লক্ষ করলাম লোকটির সারা শরীরে একটা আভিজাত্যের ছাপ।

মার মুয়ানের কাছে সাপ্তাহিক হাটে চিত্রিত মৃৎপাত্রের সম্ভার।
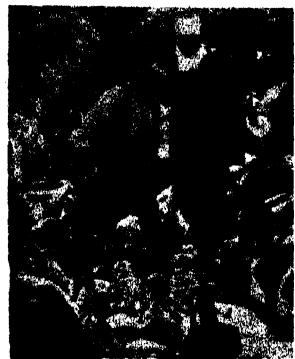
নিয়মমাফিক হাত মিলিয়ে বললাম—"আপনি বেশ ভাল ইংরেজী বলেন ত।"

সাঈদ বেশ খুশী হয়েই বলল, "ধন্যবাদ, আমি বেইরুতে টুরিস্ট অফিসে কাজ করতাম, গাইড কাম ড্রাইভার। দিন পনের হল এখানে চলে এসেছি।"

লেবানন ছেড়ে এসেছি, অনেক কাল, তবুও নাম শুনে একটু নড়ে চড়ে বসতেই হল। অভদ্রতা হলেও সোজা-সুজি প্রশ্ন করলাম—"বেইরুতের মত জায়গা ছেড়ে মরতে এই মরুভূমিতে ট্যাক্সি চালাতে এসেছেন কেন?" একটি মাত্র চাপা উত্তর—"আই লস্ট মাই এভরিথিং।"

১৯৭৭ মডেল-এর সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঢাউস ইম্পালার যাত্রী আমি মাত্র একজন। ইঞ্জিনের শব্দ এত অল্প যে ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাস আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারল না। কিছু না বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, সাঈদ স্বগতোক্তির মত বলতে লাগল—"আমরা দাদা পরদাদার আমল থেকে বেইরুতে আছি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব ওখানেই কেটেছে। খেটেছি, বাড়ি করেছি, শাদী করেছি, দু ছেলের বাপ হয়েছি সবই বেইরুতে। তবু দেখ কেমন কপা[illegible] আমার, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়[illegible] বাস্তুহারা হয়ে এখন ট্যাক্সি চালাচ্ছি।

ট্যাক্সিটা রাস্তার লাল আলো দেখে থামল। আমি সাঈদ-এর দিকে আরো ভাল করে দেখলাম। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স ওর, আমাদে[র] দেশের পঁচিশ বছরের যুবককেও হা[র] মানায়। সুঠাম স্বাস্থ্যের ওপ[র] যৌবনের ঘাম তেল, রূপ পিছলে পড়ছে। গাড়ি চলতেই আবার সাঈদ এর কথা, যেন বুকের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে বেরুচ্ছে—"ত্রিশ বছরে[র] বউ আমার, পাশের বাড়িতে দুটি শিশুসন্তানকে রেখে বাজারে গেছিল সকালবেলায়। স্টেন গান, ব্রেন গা[ন] নিয়ে বিপক্ষ দল এসে বাজার চড়াও করল। শত্রুপক্ষের বাজার অতএ[ব] নির্বিচারে শেষ গুলিটি পর্যন্ত চালিয়ে যাও। শিশু, স্ত্রী, পুরু[ষ] কোন কিছু দেখবার দরকার নেই হত্যা শুধু নির্মম হত্যা। বউ আমা[র] আর ফিরে আসেনি।"

রাস্তায় অন্ধকার নেমে এসেছে, সাঈদ-এর শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একটা থমথমে পরিবেশ। তবু বললাম, "তারপর?"

তারপর—সাঈদ একবার আমাকে দেখে নিয়েই চিবিয়ে চিবিয়ে জবা[ব] দিল, "রাত্রি বেলায় বাড়িতে বোম পড়তেই, ছেলে দুটোকে নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এলাম। আমি একটা কাপুরুষ ভীতু, প্রতিশোধ না নিয়ে লেড়ী কুত্তার মত পালিয়ে এলাম।"

ওর লোমশ হাত দুটো স্টিয়ারিং-এর ওপর চেপে বসেছে চোখ জ্বলছে ধক ধক করে, গাড়ি[র] গতি দ্রুত বেড়ে চলেছে, দেখে ওকে সাবধান করে দিলাম "একটু আস্তে চালাও"। সাঈদ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, গাড়ির গতি কমিয়ে গলার স্ব[র] খাদে নামিয়ে নিজের মনে নিজে[ই] জবাবদিহি করতে লাগল—"লেবানন এখন শ্মশানের আগুন জ্বলছে, কখনও ধিক ধিক, কখনও দাউ দাউ দু-দুটো কচি বাচ্চাকে নিয়ে [illegible] আগুনে ঝাঁপ দেবার মত বুকের পাটা নেই আমার, তাই বাধ্য হয়েই সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।"

ওর হাবভাবে ওর কথাবার্তায় স্পষ্ট বুঝতে পারছি সমস্ত ঘটনা ওকে দিনরাত্রি কুরে কুরে খাচ্ছে। শুধু ছেলেদুটোর জন্য নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছে। বাড়ি এসে গেলাম নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে বললাম "দেখো এসব এবার সব বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি আবার দেশে ফিরে যাবে।"

আমার কথা শুনে ও পালটা প্রশ্ন করে বলল—"শ্মশানে মানুষ কখনো যায় সাহাব?"

আমি বেসুরো গলায় জবাব দিলাম—"একেবারে শেষে।"

আমি নেমে পড়েছি, সাঈদ গাড়ি চালাতে চালাতেই জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে গলায় বলে উঠল —"আমি বোধ হয় তখনই যাব স্যার।"

রঙীন চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

গুলির শব্দে ছুটে পালাচ্ছে জেবরা, জিরাফ, হরিণ, বাঘ, সিংহ.....

... চঞ্চল হয়ে উঠেছে জঙ্গলের দুটি পোষা প্রাণীও (সলোমন ও নেফারতিতি)...

আক্রমণকারীরা এবারে কিন্তু আক্রান্ত!
কে ওই উন্মাদ লোকটা?
অরণ্যদেব!
উঃ, কী নিশানা!

শূন্যপথে নদী পার হচ্ছেন অরণ্যদেব।...
হরিণশিশুটিকে ওরা মেরেছে!

এখানকার পোষা বাঘ-সিংহ রক্তের স্বাদ পেলেই সর্বনাশ!
গর্‌র্‌
গর্‌র্‌
গর্‌র্‌
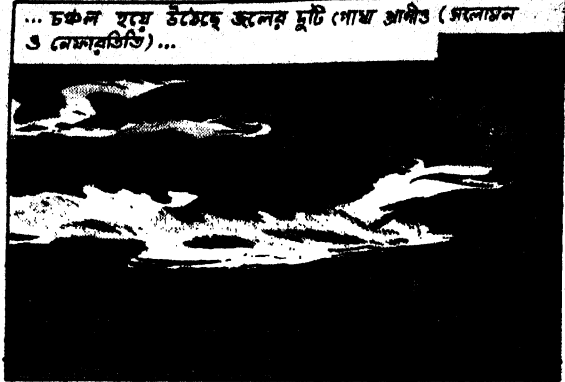
বাপরে, কী টিপ..
আয় গুলি চালিয়ে লোকটাকে খতম করি!
না!

6/19
ফিরে যা... ফিরে যা এখান থেকে...

কিন্তু পোষা বাঘ-সিংহ রক্তের গন্ধ পেয়েছে... তারা আর বাধ্য নয় ...
ফিরে যা... ফিরে যা বলছি...!
চলবে

কণ্টকিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৩৬ ॥

১৯৪২ সালে 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আগে আমার জন্যে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটি মেসে ঘর নেওয়া হয়। পঞ্চুদার মতে (ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়), আমার জেলে যাওয়া বা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা অনুচিত হবে। কিন্তু পঞ্চুদার কথায় তো ইংরাজের সাম্রাজ্য চলতো না। অতএব আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নামে ওয়ারেন্ট বার হয়ে পড়েছিল। আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কারণ, আমি তো বাস করতুম কংগ্রেস অফিসে। কলকাতার ঐ মেসে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত আরম্ভ করি। এবং যেসব জায়গায় আন্দোলন হচ্ছিল সেইসব জায়গার সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মেসবাড়িটি যে ভদ্রলোকের তিনি তেতলায় থাকতেন, একতলা ও দোতলা নিয়ে মেস। আমি স্বনামেই ছিলুম, আর একখানি ভাল আলোবাতাসযুক্ত ঘরও পেয়েছিলুম। কালক্রমে আমার নাম বিশেষ কেউ জানতো না, সকলেই দাদা বলেই ডাকতো। মেসে দু-তিনজন আমার প্রকৃত পরিচয় জানতেন। আর বাকি সকলের ধারণা ছিল— আমি শরীর খারাপের জন্য আছি, আর কলকাতায় ব্যবসা উপলক্ষে কিছু কাজকর্ম আছে। সাধারণত রাত্তিরে বেরোতুম না। আমাদের ধারণা ছিল—দিনের বেলা কলকাতায় লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়ায়, অতএব পুলিসের নজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল কম। সন্ধ্যের পর ছিল মেসের লোকেদের তাস-দাবার আড্ডা, আর সকালে ছিল কিছু ছাত্রদের পড়াশুনোর জায়গা। দুপুর আর বিকেলে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত লোকেরা আসতেন। তবে তাঁরা ভিড় করে আসতেন না। সেইজন্য কারোর মনে কোনরূপ সন্দেহ হয়নি। এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল, মধ্যে হয়তো তিন-চার মাস জেলও খেটে এসেছেন। মেসে সকলেই ছিলেন প্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। আমার শরীর অসুস্থ, কিন্তু কোনও দিন সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি হয়নি।

ঘোরাঘুরিও বেশ ছিল। জামশেদপুরে গিয়েছিলুম টাকা তুলতে। আন্দোলনের কাজে হুগলী জেলার বহু জায়গায় এবং বর্ধমান, মালদহ ও বাঁকুড়া জেলাতেও যাতায়াত ছিল। ঐসব জেলায় গিয়ে যাঁদের বাড়ি উঠতুম তাঁদের আতিথেয়তায় কোনও দিন কার্পণ্য দেখিনি। বিপদের সম্ভাবনা জেনেও তাঁদের মনে কোনও দিন কুণ্ঠা বা ভীতি লক্ষ করিনি। কলকাতায় মানিকতলা বাজারের ওপরের একটা ঘর থেকে নিয়মিত বুলেটিন ছাপা হত। এ কাজের দায়িত্ব ছিল বন্ধু, অখিলেশ (ভট্টাচার্য) ও অপরেশের (ভট্টাচার্য) ওপর। কিছু দিন বাদেই বুলেটিন ছাপার স্থান বদলাতে হয়। কাছেই একটা বাড়িতে আমার স্ত্রী তখন বাস করতেন। সেই বাড়ি থেকেই বুলেটিন ছাপা আরম্ভ হয়। একদিন আমি হাওড়া স্টেশন থেকে বরাবর ঐ বাড়িতে আসি। বাড়িতে দু দিক দিয়েই আসা যেতো—সারকুলার রোড দিয়ে এবং বিডন স্ট্রিট দিয়ে। আমি বিডন স্ট্রিট দিয়ে ঢোকবার সময় মনে হল পুলিসের নজরে পড়েছি। বাড়িতে ঢুকেই একটি ছেলেকে দেখতে পাঠানো হল। সে এসে বললে যে, দু দিকেই পুলিস বসেছে—সারকুলার রোডের দিকে এবং বিডন স্ট্রিটের দিকে। আমার পুলিসের বুদ্ধির ওপর অসীম শ্রদ্ধা (?) ছিল, সেজন্য আমি কিছু বাদে সারকুলার রোডের দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যা ভেবেছিলুম তাই। আমি বিডন স্ট্রিট দিয়ে ঢুকেছিলুম বলে সেই দিকেই পুলিসের নজর, আর সারকুলার রোডের পুলিসেরা বেশ নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল। আমি নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলুম। অপরেশ প্রভৃতি তখন সাইক্লোস্টাইল মেশিন সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে সময় জেলে যাওয়ার লোক পাওয়ার অসুবিধা ছিল না, কিন্তু সাইক্লোস্টাইল মেশিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বন্ধুদের বাড়ির একজন পুরোনো চাকর যমুনা বস্তায় করে প্রথমে নিয়ে গেল ঘুঁটে, তারপর নিয়ে গেল গুল, তারপর নিয়ে গেল সাইক্লোস্টাইল মেশিন। পুলিস প্রথমটা টিপেটাপে দেখেছিল ; ঘুঁটে আর গুল দেখে কিছু বলেনি। দেখা গেল যে, আওরঙ্গজেবের সময় প্রহরীরা যেমন বুদ্ধিমান (?) ছিল, '৪২ সালে ইংরাজের পুলিসরা তাদের চেয়ে কিছু কম বুদ্ধিমান নয়। সে গিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজী, এ গেলেন সাইক্লোস্টাইল মেশিন। আকাশপাতাল তফাৎ। কিন্তু পদ্ধতিটা এক।

১৯৪২ সালের ৭ই।৮ই আগস্ট বোম্বাই শহরে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটিতে অনান্য বিষয়ের মধ্যে থাকে—

'The peril of today, therefore, necessitates the independence of India and the ending of British domination. No future promises or guarantees can affect the present situation or meet that peril. They cannot produce the needed psychological effect on the mind of the masses. Only the glow of freedom now can release that energy an enthusiasm of millions of people which will immediately transform the nature of the war.

The A.I.C.C. therefore repeats with all emphasis the demand for the withdrawal of the British Power from India. On the declaration of India's independence, a Provisional Government will be formed and Free India will become an ally of the United Nations, sharing with them in the trials and tribulations of the joint enterprise of the struggle for freedom.'

প্রস্তাবে আরও থাকে—

"The committee appeals to the people of India to face the dangers and hardships that will fall to their lot with courage and endurance, and to hold together under the leadership of Gandhiji, and carry out his instructions as disciplined soldiers of Indian freedom. They must remember that non-violence is the basis of this movement. A time may come when it may not be possible to issue instructions or for instructions to reach our people, and when no Congress Committees can function. When this happens, every man and woman, who is participating in this movement must function for himself or herself within the four corners of the general instructions issued. Every Indian who desire freedom and strives for it must be his own guide urging him on along the hard road where there is no resting place and which leads ultimately to the independence and deliverence of India.'

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জওহরলাল এবং সমর্থন করেন সর্দার বল্লভভাই। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট হয় কমবেশী চারশ' এবং বিপক্ষে তেরো। এই তেরোজনের মধ্যে বারোজন কমিউনিস্ট এবং এদের সঙ্গে আর একজন যিনি ভোট দেন তাঁর ছেলে কমিউনিস্ট। বিতর্কে উত্তর দিতে গিয়ে জওহরলাল তীব্র ভাষায় কমিউনিস্টদের যুক্তি খন্ডন করে বলেন যে, কমিউনিস্টদের পেছনে কোনও জনসমর্থন নেই। প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

'With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace amongst ourselves and with all nations.'

তিনি আরও বলেন,'I take up my task of leading you in this struggle, not as your commander, not as your controler, but as the humble servant of you all and he who serves best becomes the chief among them. I am the chief servant of the Nation that is how I look at it, I want to share all the shocks that you have to face.'

গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেন,

'I have pledged the Congress and the Congress will do or die.'

সরকারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে রাখা হয় পুনায় লেডি থ্যাকার্সের বাড়িতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এবং বহু এ আই সি সি-র সদস্য গ্রেপ্তার হন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের রাখা হয় আহম্মদনগর ফোর্টে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সমস্ত প্রদেশ এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি ও বহু মহকুমা এবং তালুক কংগ্রেস কমিটি বেআইনী ঘোষিত হয়। বোম্বাই থেকে ফেরবার পথে অনেকে গ্রেপ্তার হন। যাঁরা বোম্বাই যাননি, স্ব স্ব ক্ষেত্রেই তাঁদের ধরা হয়। এবং যাঁদের পাওয়া যায়নি তাঁদের 'ফেরার' বলে ঘোষণা করে তাঁদের নামে হুলিয়া জারি করা হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার ও নির্যাতনের বন্যা শুরু হয়ে যায়। দুটি নমুনা দিলেই যথেষ্ট হবে। বাংলা অ্যাসেম্বলীতে তৎকালীন চিফ মিনিস্টার স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, মেদিনীপুর জেলার কন্টাই এবং তমূলুক মহকুমায় ১৯৩টি কংগ্রেসীদের বাড়ি-বাড়ি সমস্ত তৈজসপত্র সহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় পন্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তরে স্যার এলান হাটলে লিখিত উত্তরে বলেন,

নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে এরোপ্লেন থেকে জনতার ওপর মেশিন গান চালানো হয়েছে—(১) পাটনা জেলার বিহার শরিফ থেকে বারো মাইল দূরে গিরিয়াক, (২) ভাগলপুর জেলার সাহেবগঞ্জ রেলের লাইনের ওপর, (৩) নদীয়া জেলার রানাঘাটের কাছে, (৪) মুঙ্গের জেলার হাজিপুর থেকে কাটিহার লাইনের ওপর, (৫) তালচের শহর থেকে দু-তিন মাইল দক্ষিণে। সরকারের লিখিত স্বীকারোক্তি এই। তা ছাড়া বেত মারা, গুলি করা ছিল প্রাত্যহিক কাজ। এসবই ঘটেছিল ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালের মধ্যে, অর্থাৎ এক মাস পাঁচ দিন।

কয়েকমাস বাদে গ্রেপ্তার হলুম। ধরা পড়ার দু দিন আগে অবশ্য খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু তখন শরীরের যা অবস্থা আর গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। প্রথমে নিয়ে গেল লালবাজার। সেখান থেকে ইলিসিয়াম রো, বর্তমান লর্ড সিনহা রোড। সেখানেই গোয়েন্দাদের সব জিজ্ঞাসাবাদ করার জায়গা। অবাক কাণ্ড—আমায় কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসাও করলে না, কাছেও এলো না। নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমন সময় একদিন বিকেলে বদুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। আমি দূর থেকে বদুকে দেখে খুব উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বললুম, 'বদু, এয়েচিস? আয় অনেক কথা আছে।' অফিসাররা আমায় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ওকে চেনেন?' উত্তরে বললুম, 'চিনি মানে? ওর বাবা আমার বন্ধু যাকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, মামা আমার সহকর্মী। আমি তো অনেক দিন বাড়ি ছাড়া—আমার পরিবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ওঁরাই বহন করেন। ভালই হয়েছে ওকে এনেছেন, অনেক কথা বলবার আছে, তারপর তো আপনারা ওকে ছেড়েই দেবেন।' সেই অল্প বয়সেই বদু অনেক কাজ করতো। বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিয়ে আসতো, আর বুলেটিন বার করবার পুরো দায়িত্ব ছিল। পরে শুনলুম সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বদুকে ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে যেদিন আমাকে কোর্টে হাজির করলো, আমি বিচারকের কাছে অভিযোগ করলুম, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, অনর্থক আটকে রেখে দিয়েছে। আমি ওঁদের কত ডাকাডাকি করি, ওঁরা কাছেই আসেন না।' বিচারক একবার মুখ তুলে চাইলেন। পুলিসের পক্ষ থেকে কিছু একটা বললো। উত্তরে বিচারক বললেন যে, ওঁর নামে যখন আরামবাগ, শ্রীরামপুর ও হুগলীর ওয়ারেন্ট আছে, আমি ওঁকে শ্রীরামপুরে পাঠাবার অর্ডার দিচ্ছি। শ্রীরামপুরে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন আটটা বেজে গেছে। শ্রীরামপুরের বন্ধুবান্ধবরা খবর পেয়েছিলেন। পুলিসের অনুমতি নিয়ে সেইখানেই খেয়ে নিলুম, তারপর সাব-জেলে গেলুম। সাব-জেলের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবরা তখন সঙ্গের সার্জেন্টকে বললেন, আপনারা ওঁর জন্য এস ডি ও-র অনুমতি নিয়ে আসুন, নইলে তো সাব-জেলের দরজা খুলবে না। সার্জেন্ট একটু দোনামনা করছিলেন। সঙ্গের পুলিসরা ওঁকে বোঝালো—যদি জেলখানার ঢুকতে না দেয় তো সারা রাত পুলিসের গারদখানায় থাকতে হবে, সে বড় কষ্টকর। এস ডি ও-র বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন নটা বেজে গেছে। খবর পেয়ে এস ডি ও বেরিয়ে এলেন। নামটি ভুলে গেছি—লম্বা ছিপছিপে চেহারা। সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন, আই সি এস—তখনও গায়ে কলেজের গন্ধ। তিনি সব শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক বাদে বললেন, এখন জেলখানায় খুব অসুবিধা হবে বিছানাপত্তরের ; যাই হোক আমি ব্যবস্থা করছি। উনি সাব-জেলে খবর পাঠিয়ে দিলেন, আর আমার বন্ধুবান্ধবদেরও বিছানা দেওয়ার অনুমতি মিললো। সাব-জেলে যখন আবার এলুম তখন অন্যরকম অভ্যর্থনা। একটা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আছে—জেলের দুখানি কম্বল পাতা। খানিক বাদে বাইরে থেকে বিছানাও এসে গেল। রাতটা তো কেটে গেল। সকালবেলা একটু বেলা হতেই এস ডি ও সাহেব এসে হাজির। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা, কয়েকখানি টোস্ট ও ডিম। বললেন যে, তোমার বন্ধুবান্ধবদের অনুমতি দিয়েছি তোমার কাপড়চোপড়, বই ও তিনবার খাবার দিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুও রোজ দুবার করে আসবেন। এটাও জানালেন যে, তিনি তার পরদিন আবার আসবেন।

কোনবারই গ্রেপ্তার হবার পর কেস ডিফেণ্ড করা হয়নি। এবারে আমার শরীরের কথা ভেবে আমার বন্ধুবান্ধবরা ঠিক করলেন যে, মামলা চালানো হবে। প্রায় দু মাস শ্রীরামপুর সাব-জেলে ছিলুম। আভাস (বন্দ্যোপাধ্যায়) তিন বেলা খাবার নিয়ে আসতো—তা ছাড়াও মাঝে মাঝে বই ও কাপড়চোপড়। আর এস ডি ও সাহেব তো রোজ আসতেন। সাব-জেলে তো খবরের কাগজ নেওয়া হত না। আর পলিটিকাল প্রিজনার মাত্র আমি একা। এস ডি ও সাহেব নিজের কাগজটি রোজ পাঠিয়ে দিতেন। মামলায় আমার পক্ষে দাঁড়ালেন শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মশাই। সব নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন কিন্তু আমার মামলায় নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ জেরায় সাক্ষীরা নাস্তানাবুদ। সব সাক্ষী যে মিথ্যা বলছে তা প্রমাণিত হল। অনেকে মনে করলেন যে, আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রায়ের আগের দিন এস ডি ও সাহেব বলে গেলেন যে, তোমাকে তো ছাড়তে পারবো না, জেল দিতেই হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে ধন্যবাদ জানালুম। সত্যই এই তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটটি আমার পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন। জেলখানার নিয়মমত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হতেই হত। কিন্তু তা ছাড়া যতরকম সুবিধে দেওয়া যায় সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীরামপুর থেকে আলিপুর জেলে। সেখানে সপ্তম দণ্ডাজ্ঞা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডি আই আর।

াগৈতিহাসিক ভারতের রবাড়ি ও নগর পরিকল্পনা

্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

নব্যপ্রস্তরযুগে মধ্যপ্রাচ্যে যে যুগান্তকারী বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ও তার লে যে সভ্যতার সেখানে উন্মেষ ঘটেছিল তা সম্ভবত অনেকেরই জানা আছে।

সাম্প্রতিকালে জার্মো, জেরিকো ও চাতাল হুয়ুকে যে সমস্ত খনন কার্য লানো হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে সেসব জায়গায় সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব বম সহস্রক থেকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে বস্থিতিলাভ করেছিল। তারপরেও কিভাবে এই সভ্যতা প্রথমে ইরানের মালভূমি পরে মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করে সে সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই, যে মনে হয় সিয়াল্ক ও জেতুনে এই সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রকে ছড়িয়ে ড়ে। পরে এই সভ্যতার রেশ কি করে ও কখন ইরাণের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল তার কাহিনী এখনও স্বল্পজ্ঞাত। ই সব স্থানের সভ্যতার সময় নির্ধারিত হয়েছে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রক থেকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত। উপর্যুক্ত স্থানগুলিতে শহর বা নগর স্থাপিত হয়েছিল উঁচু ঢিবি বা টিলার উপরে, কেন না নুষ সাধারণত প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য উঁচু জায়গা ছে নিত এবং স্বভাবতই বসতিস্থলের চারিপাশে একটা প্রতিরক্ষা প্রাকার বা চীর তুলে দিত। বালুচিস্তান সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের প্রাক-হরপ্পা যুগের পনিবেশ বা বসতি ও তার সংগে যুক্ত বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে মাদের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ, কিন্তু হড়প্পাযুগের এবংবিধ বিষয় সম্বন্ধে মাদের জ্ঞান বেশ ব্যাপ্ত। এই সময়ে জনবসতি বাড়ার সংগে সংগে নতুন নতুন পনিবেশ গড়ে উঠতে লাগল ও এর ফলে অনেক গ্রাম ও কিছু শহর গড়ে ঠল। শহর গড়ে ওঠার সংগে সংগে নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটল।

প্রাচীন ভারতীয় ভূখন্ডে সব চেয়ে পুরানো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গয়েছে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত দক্ষিণ বালুচিস্তানের কিলি গুল হম্মদের একটি ঢিবি থেকে। এই স্থান কোয়েটা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে। খানকার প্রথম পর্বে ঘরবাড়ির কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে অদগ্ধ বা রৌদ্রে শুকানো ইঁটের প্রাকার পাওয়া গিয়েছে। উত্তর ও ক্ষিণ বালুচিস্তানের রানাঘুন্ডাই, আঞ্জিরা, ও সিয়াজম্ব, ডাম্বসাদাৎ, নাল ন্দেয়া, কুল্লি, মেহি, ডাবারকোট ও সুতকাগেনডোর প্রভৃতি স্থানে খননকার্য ভৃতির ফলে অনেক স্থাপত্যকীর্তি ও পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি ঃসন্দেহে কিলি গুল মহম্মদের মত প্রাক-হড়প্পা যুগের। রানা ঘুন্ডাইতে থম পর্বে পাওয়া গিয়েছে শুধুমাত্র চুল্লী, দ্বিতীয় পর্বে তলায় নুড়ি দিয়ে ড়ি ও তৃতীয় পর্বে এমন বাড়ি যা তিনবার তৈরী হয়েছে। াঞ্জিরার দ্বিতীয় পর্বে বড় বড় নুড়ি বা পাথরখন্ড দেওয়া াড়ির দেওয়াল পাওয়া গিয়েছে। কিলি গুল মহম্মদ থেকে মান্য দূরে ডাম্বসাদাতে তিনটি পর্বেই ঘরবাড়ির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে— দের মধ্যে তৃতীয় পর্বে ইঁটের প্রাচীর দেওয়া বড় বড় বাড়ির নিদর্শন পাওয়া য়েছে। নালে খননকার্য করে ১৭′×১১′ ও ৫′×৫′ মাপের ঘর ও উঠান মেত বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া এখানে নুড়ি বা পাথরখন্ড বসানো উঠান ঘরের মেঝে দেখা গিয়েছে। এছাড়া এখানে নানা ঘরে বিভক্ত বাড়ি ও উঠান বিষ্কৃত হয়েছে। এই ঘরগুলির কোনও কোনওটি আবার ১৫′×১৫′ মাপের। ল্লিতে ঘরবাড়ির নানা চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এখানকার ঘরগুলি সাধারণত ২′×৪′ থেকে ৪′×৬′ মাপের। এখানে নুন্দেয়ার মত জানলা-দরজাবিহীন

ন রাজপথ—মহেঞ্জোদাড়ো

ভগ্ন সোপান—মহেঞ্জোদাড়ো
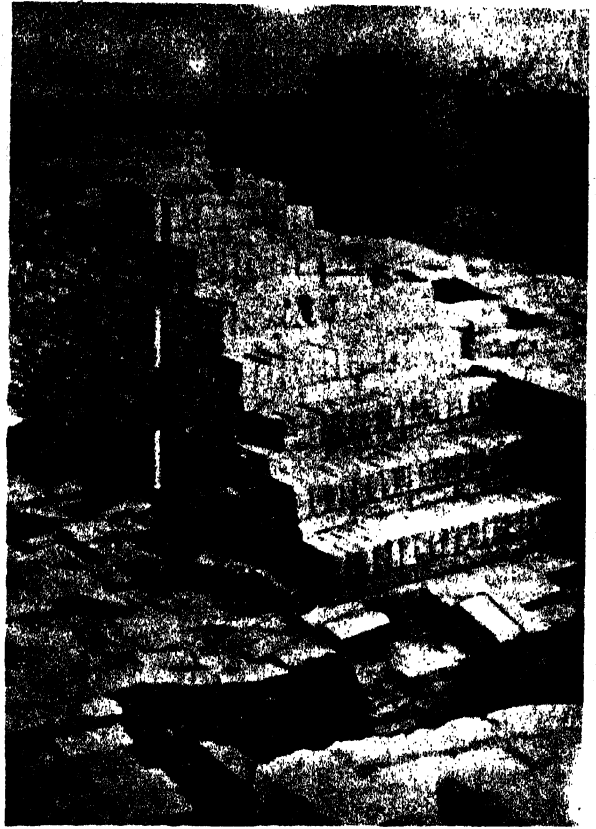
কুঠরিও পাওয়া গিয়েছে। একটি কুঠরির মেঝে আবার কাঠের ছিল। এছাড়া এখানে এমন একটা পাথরের সিঁড়ির সন্ধান মিলেছে, যা থেকে মনে হয় এটি সমতল ছাদের উপরে বা উপরের তলে যাবার জন্য নির্মিত হয়েছিল। মেহিতে বাড়ি তৈরী হত পাথর ও অদগ্ধ ইঁটের সহযোগে। শাহীটুম্প দুটি স্তরে ঘরবাড়ি চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে নীচে পাথর ও উপরে ইঁটের ব্যবহার হয়েছিল। টোজি ও মাজিনাডাম্বে ঘরবাড়ির পাশে একটা বেষ্টনী প্রাচীর পাওয়া গিয়েছে।

বালুচিস্তানের সংস্কৃতির সংগে আফগানিস্তানের সংস্কৃতির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে অর্গনদব নদীর একটি শুষ্ক শাখানদীর উপরে অবস্থিত মুন্ডিগাকে খননকার্য করার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে। এখানে প্রথমপর্বের গোড়ার দিকে মাটির চাপড়া দিয়ে দেওয়াল তৈরীর নিদর্শন দেখা যায়, পরে অবশ্য শেষের দিকে এখানে অদগ্ধ ইঁটের দেওয়াল তৈরী হয়েছিল। দ্বিতীয়পর্বে বাড়িগুলি আরও ভাল করে তৈরী হয়েছিল। একটি বাড়ির মধ্যে ইঁটের বাঁধানো কুয়া দেখা গিয়েছে। অনেক বাড়ির মধ্যে চুল্লী দেখা যায়। তৃতীয় পর্বের নানা স্তরে বাড়ি তৈরীর নিদর্শন দেখা যায়। চতুর্থ পর্বে এখানকার উপনিবেশ ধীরে ধীরে একটি শহরে রূপান্তরিত হয় ও তার ফলে শহরের চারিদিকে অদগ্ধ ইঁটের প্রাচীর ও একটি বর্গাকৃতি দুর্গ নির্মিত হয়। এখানকার প্রধান ঢিবিটির উপরে একটি বিরাট প্রাসাদ দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত আর একটি ছোট ঢিবির উপরে একটি মন্দিরও দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত মন্দির ও পাথরের মূর্তি দেখে অনেকে এর সংগে (মহেঞ্জোদাড়োর হড়প্পা পর্বের) একটি মিল খুঁজে বার করেছেন। প্রাসাদটির ইঁটের প্রাচীরের গায়ে ছিল আয়তাকার স্তম্ভ বা থাম। শহরটি দুবার ধ্বংস হয়ে যায় ও দুবার পুনর্নির্মিত হয়। ডাবারকোট ও সুতকাগেন ডোরে পোড়া ইঁটের ঘরবাড়ির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ধারোর মত সুতকাগেনডোরেও একটি সুরক্ষিত উপনিবেশ বা শহর গড়ে উঠেছিল।

ভূপ্রকৃতির দিক থেকে সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাব, বালুচিস্তান থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। এই সব জায়গায় আবহাওয়া বালুচিস্তানের মত অত রুক্ষ নয়। তাই পূর্বোক্ত দুই প্রদেশে সিন্ধুনদ ও তার উপনদীগুলির অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল প্রাক-হড়প্পা ও হড়প্পা যুগের নানা সংস্কৃতি কেন্দ্র। সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত আমরির প্রথম পর্বের প্রথম অর্ধপর্বে ঘরবাড়ির কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধপর্বের দুটি স্তরে অদগ্ধ ইঁটের বাড়ির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে যেরূপ মাপের ইঁট ছাড়া পাথরও ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে এক ধরনের খুপরি দেখা গিয়েছে যেগুলি মাপে মাত্র এক বর্গগজ। এগুলি সম্ভবত বাড়ি তৈরীর ভিত বা প্রথমতল হিসাবে

ব্যবহৃত হয়েছে। খাম্রো ও কোটরাস ব্যথতে সংলগ্ন ... উপ-নিবেশ বা শহরের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। শেষের জায়গাটিতে অসংখ্য বড় ও ছোট ঘরের এবং স্নানঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর চারপাশে ছিল দুসারি দুর্ভেদ্য প্রাকার। এই প্রাকারের গায়ে চারটি বুরুজ ও প্রবেশপথের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। আমরি থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে কোটডিজি অবস্থিত। এখানে বন্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চারদিকে পাথরের বেষ্টনী দেওয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বন্যা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হড়প্পা, মহেঞ্জোদাড়ো ও কালিবঙ্গানেও দুর্গ উঁচু ঢিবির উপরে স্থাপিত হয়েছিল ও তাদের চারিপাশে ছিল মাটির বাঁধ ও তার উপরে অদগ্ধ ইঁটের প্রতিরক্ষা প্রাকার। কোটডিজিতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় মাটির নীচের শক্ত পাথরের উপরে। আর এর ঠিক উপরেই পরবর্তী যুগের ঘরবাড়ির মেঝে পাওয়া গিয়েছে। এই সব ঘরবাড়ি একটি প্রাকারবেষ্টিত ছিল। এই প্রাকারের তলদেশে নুড়ি বা ছোট ছোট পাথর দিয়ে ও উপর অদগ্ধ ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছিল। এই প্রাকারে আবার বুরুজের মত অংশ ছিল—স্থানে স্থানে তা প্রায় বার ফুট থেকে চোদ্দ ফুটের মত উঁচু ছিল। বাড়ির দেওয়াল ছিল পাথর ও অদগ্ধ ইঁটের। এই সব স্থানে প্রাক-হড়প্পা যুগে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাক-হড়প্পা যুগে কালিবঙ্গানে যে উপনিবেশটি প্রাচীন সরস্বতী বা ঘগ্‌গরা নদীর বাঁকের মুখে স্থাপিত হয়েছিল তা প্রাকার দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। শুধু প্রাকার নয়, সে সময়কার বাড়িগুলিও অদগ্ধ ইঁট দিয়ে তৈরী হত। পোড়াইঁট সাধারণত ব্যবহৃত হত না, শুধু একটি নর্দমাতে এর ব্যবহার দেখা গেছে। বাড়িগুলি ছিল একতলা ও তিন-চার কামরার। প্রত্যেক বাড়িতে উঠান ও ঘরের মেঝেতে চুল্লী বা উনান থাকত। এছাড়া প্রতি বাড়িতেই জল ধরে রাখার জন্য মাটির নীচে চৌবাচ্চা নির্মিত হত। আরও খননকার্য হলে মহেঞ্জোদাড়ো ও হড়প্পা থেকেও প্রাক-হড়প্পা যুগের বসতির নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

ভারত মহা-উপদেশে এ যাবৎ মহেঞ্জোদাড়ো ও হড়প্পা ছাড়াও হড়প্পা যুগের বহু শহর ও প্রত্ন-স্থল আবিষ্কৃত হয়েছে; এদের মধ্যে চান্‌হুদাড়ো, লহুমজোদাড়ো, জুডেইর্জোদাড়ো, সান্ধানীওয়ালা, কোটডিজি, রূপড়, লোথল, কালিবঙ্গান, রোজাড়ি, ভগত্রাব, আলমগীরপুর, দেসলপুর বায়থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির স্থান পাকিস্তানে ও বাকীগুলি ভারতে অবস্থিত। এদের মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বাকী সব স্থানেই খননকার্য চালানো হয়েছে। কোটডিজি ও কালিবঙ্গানে প্রাক-হড়প্পা যুগের সংস্কৃতির নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে সিন্ধু উপত্যকায় হড়প্পা যুগে যে সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল তা স্থাপত্যরীতি, নগর পরিকল্পনা, ধর্ম, শিল্প (মৃৎপাত্র, মূর্তি, তামার ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি), ভাষা (লিপি ও চিত্রসংবলিত সীল) ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা উপকরণের বিচারে একই মূল সভ্যতার অঙ্গীভূত। অনেকে তাই হড়প্পা সংস্কৃতির নানা কেন্দ্রকে একত্র করে একটা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁদের মতে হড়প্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো ছিল হড়প্পা সাম্রাজ্যের দুটি রাজধানী। লোথল ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্যতম একটি বন্দর।

বিগত ৫৫ বছর ধরে হড়প্পা সভ্যতার অঙ্গীভূত প্রত্নস্থলসমূহে খননকার্য করে অনেক কিছু তথ্য অবগত হওয়া গেছে ও এদের মধ্যে একটা সংস্কৃতিগত মিল বা ঐক্যও লক্ষ্য করা গেছে। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই মিল বা ঐক্য লক্ষ্য করার মত। এই সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্রে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল—পশ্চিম-দিকে, একটি বিরাট দুর্গ ও পূর্ব দিকে, তার নীচে, মূল শহর। বিরাট দুর্গাঞ্চলে বাস করতেন 'সাম্রাজ্যের শাসনকর্তারা বা পুরোহিতেরা (এ বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি), আর মূল শহরে বাস করতেন জনসাধারণ বা সাধারণ প্রজারা। দুর্গ ও মূল শহর উভয়েই প্রাচীর বা প্রাকার বেষ্টিত থাকত। মূল শহরটি আকৃতিতে অনেকটা বর্গক্ষেত্রের মত হত। মূল শহরের মাঝে ছিল দাবার ছকের মত সাজানো নক্সায় ঘরবাড়ী (ব্লকে বা খণ্ডে বিভক্ত) ও রাস্তা।

হড়প্পাযুগের শহরগুলিতে, বিশেষত মূল শহরের বিন্যাসরীতিতে একটা একঘেয়ে ধরনের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এখানে যে সব স্থাপত কীর্তির নিদর্শনাদি দেখা গিয়েছে সেগুলি হয় পোড়া ইঁটের আর নয়তো অদগ্ধ ইঁটের তৈরী ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে অদগ্ধ ইঁট সাধারণত পূরক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত, কিন্তু হড়প্পাতে এগুলি পোড়া ইঁটের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহৃত হত। কালিবঙ্গানে আবার পোড়া ইঁট কেবল কুয়া, নর্দমা ও স্নানাগার তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হত। এখানে ব্যবহৃত ইঁটের মাপ ছিল ১১ ইঞ্চি×৫-৫ ইঞ্চি× ২·৭৫ ইঞ্চি। স্নানাগারের জন্য নক্সাকাটা ইঁট ও কুয়ার জন্য কীলকাকৃতি ইঁট ব্যবহৃত হত। বাড়ীর মেঝে হত মাটি পিটিয়ে বা অদগ্ধ ইঁটের বা পোড়া ইঁটের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্নানাগারের মেঝেতে চুন ও সুরকীর প্রলেপ দেওয়া হত। প্রকৃত খিলানের প্রচলন ছিল না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে খাঁজকেটে ও ধাপে ধাপে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে খিলানের মত করা হত। স্থাপত্যকার্যে পাথরের ব্যবহার সীমায়িত ছিল যদিও কিছু নকশাযুক্ত পাথরের থামের অংশ মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়েছে। ছাদ সম্ভবতঃ সমতল হত ও তাতে কাঠের কড়িবরগার ব্যবহার হত। অন্য ধরনের বাড়ী তৈরীর ব্যাপারেও কাঠের ব্যবহার হত।

দুর্গে ও মূল শহরে নানা ধরনের বাড়ী ছিল। মহেঞ্জোদাড়োর দুর্গাঞ্চলে বড় স্নানাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমিতি গৃহ, শস্যাগার, মন্দির

প্রভৃতি ছিল, আর মূল শহরে ছিল নানা ধরনের বাড়ী, স্নানাগার, নর্দমা, কুয়া ও কুলি ব্যারাক। হড়প্পাতেও শস্যাগার, মন্দির প্রভৃতি ছাড়াও সাধারণ লোকের বাড়ী, স্নানাগার, নর্দমা, কুয়া ও কুলি ব্যারাক ছিল। বাড়ীঘর নানা রকমের ও নানা আকারের হত—এক কামরাওয়ালা বাড়ী থেকে বারো কামরাওয়ালা বাড়ী হত ও তার মাঝে উঠান থাকত। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার কারোর বেশী কামরা ও একাধিক উঠানযুক্ত বাড়ীও পাওয়া গিয়েছে। বাড়ীগুলি অনেক সময় আবার একাধিক তলবিশিষ্ট হত ও তাতে উপরে উঠবার জন্য সিঁড়িও থাকত। প্রতি বাড়ীতেই স্নানাগার, নর্দমা, কুয়া ও চুল্লী থাকত। স্নানাগার ও বাড়ীর নর্দমার সঙ্গে রাস্তার বড় নর্দমার যোগ থাকত একটা নালির সাহায্যে। এছাড়া কিছু কিছু পায়খানারও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির পরিকল্পনা বা নক্সা খুব দক্ষতার সঙ্গে করা হত ও সবচেয়ে চওড়া রাস্তাগুলি দুর্গ থেকে মূল শহরের দিকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। অবশ্য রাস্তা যে সব সময়ে টানা চলে যেত তা নয়, মাঝে মাঝে বাড়ী ইত্যাদি থাকার জন্য এর বিচ্যুতি হত। রাস্তার প্রস্থ বিষয়ে একটা ঐকামত্য লক্ষিত হয়। অনেক সময়ে বাড়ীর প্রবেশ পথ ছিল গলির দিকে আর এই গলিগুলি বড় রাস্তার সমকোণে অবস্থিত ছিল। নালি ছাড়া রাস্তার দিকে বাড়ীর আর কিছু থাকত না, এমন কি কোনও নক্সার কাজও না। সময়ে সময়ে বাড়ীগুলি একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত, আর পাশাপাশি বাড়ীগুলির মধ্যে খানিকটা করে ব্যবধান বা ছাড় থাকত। অনেক রাস্তা ও গলির ইঁটের নালি বা নর্দমা দেখা যায়। এদের উপরে হয় ইঁট আর না হয় পাথর খণ্ড চাপা থাকত। এই নালির সঙ্গে বাড়ির নালির যোগ থাকত। অনেক বাড়ির নালির জল রাস্তায় রাখা শোষক গর্ত বা নালিতে পড়ত। এই সব ময়লা জল নিষ্কাশনের ও আবর্জনা পরিষ্কারের বন্দোবস্তও ছিল। এইসব কাজ তদারকের জন্য সম্ভবতঃ একটি পৌর প্রতিষ্ঠানও ছিল।

হড়প্পা যুগের শহরগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মহেঞ্জোদাড়ো সম্বন্ধে বলতে হবে। তারপরে আসবে হড়প্পা, কালিবঙ্গান ও লোথলের কথা।

মহেঞ্জোদাড়ো—এখানকার নগর পরিকল্পনায় একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত ও তা হল পশ্চিম দিকে একটি বিরাট দুর্গ ও পূর্ব দিকে তার নীচে মূল শহর। এখানকার বিরাট দুর্গটি একটি বিরাট ঢিবির উপরে অবস্থিত। ঢিবিটির উপরে একটি বৌদ্ধস্তূপ থাকায় এটি স্তূপের ঢিবি নামে পরিচিত। ঢিবিটি দেখতে অনেকটা সামন্তরিক ক্ষেত্রের মত। এর উত্তর-দক্ষিণের বাহুটি প্রায় ১২০০ ফুট লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমের বাহুটি প্রায় ৬০০ ফুট চওড়া। আশপাশের জমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট। দুর্গটি প্রায় ত্রিশ ফুট বা তার চেয়েও বেশী উঁচু একটি আয়তাকার অদগ্ধ ইঁটের উপরে অবস্থিত ছিল। এর উপরে ছিল কতকগুলি অদ্ভুত নক্সার বাড়ী, যেগুলির ভিতরের দিক অদগ্ধ ইঁটের তৈরী আর বাহিরের দিক পোড়া ইঁটের তৈরী ছিল। দুর্গের চারদিক একটা মাটি ও অদগ্ধ ইঁটের ৪৩ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা প্রাকার দিয়ে ঘেরা ছিল ও এর মাঝে ছিল আয়তাকার বুরুজ ও বড় বড় দরজা।

মহেঞ্জোদাড়ো শহরের নক্সা থেকে জানা যায় যে, এখানে ছকে বাঁধা কয়েকটা বড় বড় রাস্তা ছাড়াও বেশ কিছু ছোট ছোট রাস্তা ও গলি ছিল। বড় রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। রাস্তাসমেত শহরটিকে প্রায় সমানভাবে সাতটি আয়তাকার ব্লক বা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল। দুটি প্রধান রাস্তা সমকোণে অবস্থিত ছিল ও তৃতীয়টি কিছু পূর্বে ও পূর্বোক্ত প্রধান দুটির মধ্যে একটি রাস্তার সমান্তরালে ছিল। নক্সা থেকে শহরের পরিসীমা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ না করা গেলেও এটা বোঝা যায় যে, শহরটি প্রায় এক বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল ও এর মাঝে ছিল বারোটি প্রধান গৃহ খণ্ড বা ব্লক যেগুলি আবার পূর্ব-পশ্চিমে চারটি করে তিনটি সারিতে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খণ্ডের মাঝে নানা ছোট রাস্তা ও গলি

সিঁড়ি—মহেঞ্জোদাড়ো

গলিপথ—মহেঞ্জোদাড়ো
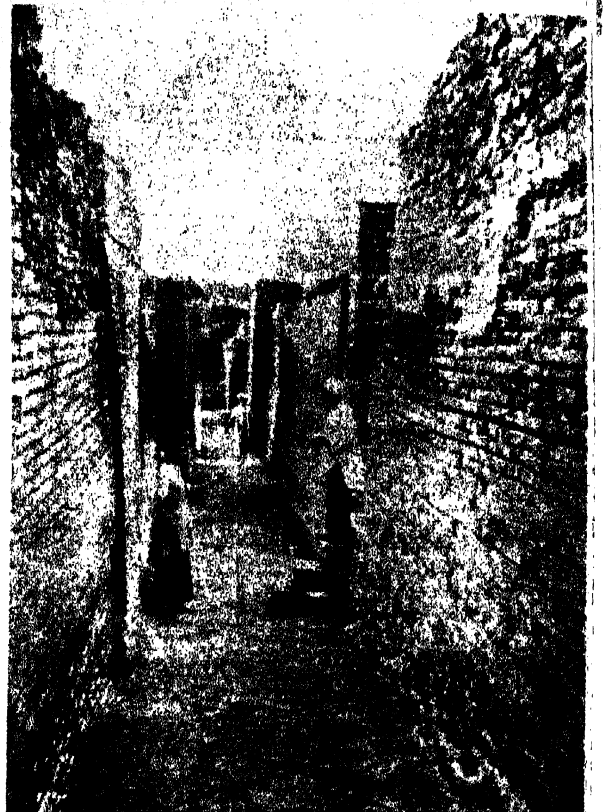
প্রভৃতি ছিল। এর পাশেই ছিল সাধারণের বাড়ী। এই নক্সার কেন্দ্রস্থলে যে খণ্ডটি দেখা যায় তার কিছু পশ্চিমে ছিল দুর্গ। প্রধান ঢিবিটির উপরে দুর্গাঞ্চলে যে সব বাড়ী ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একটি জলাশয় বা স্নানাগার। এটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ছিল যথাক্রমে ৩৯ ফুট, ২৩ ফুট আট ফুট। জলাশয়ে নামবার সুবিধার জন্য দুধারে সিঁড়ি ছিল, তার সিঁড়ির দুধারে ছিল রেলিং। এর গাত্রকে বা দেওয়াল 'বিটুমেন' ও 'জিপসাম' দিয়ে নিশ্ছিদ্র করা হয়েছিল। এর জল আসতো একটা বড় কুয়া থেকে। এর পশ্চিম কোণে একটা খিলানকাটা নালি ছিল যেখা দিয়ে দরকার মত বদ্ধ জল বার করে দেওয়া হত। সম্ভবতঃ কোনও ধর্মীয় প্রয়োজনে এটি নির্মিত হয়েছিল। জলাশয়ের পাশে ছিল বারান্দা বা দালান এক সারি ঘর বা কুঠরী ও উপরতলায় যাবার জন্য সিঁড়ি। জলাশয়ের ঠিক পশ্চিম দিকে ইঁটের তৈরী সাতাশটি বায়ুছিদ্রযুক্ত কুঠরি ছিল। এই কুঠরিগুলি একটি বিরাট শস্যাগার বা গোলাঘরের অংশস্বরূপ ছিল। যে ইঁটের পাটাতনের উপরে এই গোলাঘরটি অবস্থিত ছিল, সেটি আয়তনে ১৫০ ফুট × ৭৫ ফুট ছিল। এর নীচে ছিল ইঁটের তৈরী শস্য বোঝাই-এর স্থান দুর্গের অধিবাসীদের জন্য সম্ভবতঃ এই শস্য রাখা হত। এর ঠিক দক্ষিণ দিকে বাইশ ফুট চওড়া একটা বড় সিঁড়িকে দুর্গের দিকে উঠে যেতে দেখা যায়। এটি বোধ হয় কোনও ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শস্যাগারের উত্তর ও পূর্ব দিকের কয়েকটি বড় বড় বাড়ীতে সম্ভবতঃ শাসনকর্তারা বা পুরোহিতেরা বাস করতেন। দুর্গাঞ্চলে এছাড়া আরও কয়েকটি বড় বড় বাড়ী বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছে যেগুলিকে সভাকক্ষ, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গৃহ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। সভাকক্ষটি আয়তাকার ছিল। এর ভিতরে চার সারিযুক্ত চারটি থামের তলদেশ পাওয়া গিয়েছে। তলদেশটি ইঁটের হলেও উপরিভাগ কাঠের ছিল বলে মনে হয়। সভাকক্ষের মেঝে বেশ ভাল ভাবে কাটা ইঁটের তৈরী। পশ্চিম দিকের ঘরগুলির একটির মধ্যে পাথরে তৈরী একটি বসে থাকা পুরুষ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর কাছেই পাওয়া গিয়েছে অনেকগুলি গোলাকৃতি পাথরের খণ্ড। এসব থেকে ধারণা হয় যে, এই ঘরটি একটি মন্দিরের অংশ ছিল। মূল শহরেও মন্দির ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়ীটির আয়তন ছিল ২৩০ ফুট×৭৮ ফুট—এর মধ্যে উঠান ছাড়া অনেক ঘরও ছিল। সমিতি গৃহটি প্রায় আশি ফুট×আশি ফুট মাপের। এর ছাদ প্রায় কুড়িটি আয়তাকার থামের উপরে স্থাপিত ছিল। এছাড়া দুর্গাঞ্চলে আরও কয়েকটি বাড়ী ছিল যাদের সঙ্গে মূল শহরের কিছু বাড়ীর মিল দেখা যায়।

মহেঞ্জোদাড়োর মূল শহরে নানা রাস্তা গলি, দোকান ও বাড়ী ছিল

শহরটি একটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা ছিল। এখানে সাধারণ অধিবাসীরা থাকত। দোকান বা ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানার মধ্যে কুমোরের শোপ, কামারশাল, শাঁখারীর দোকান, পুঁতির মালার দোকান, ধোপা বা রংকরের জাঁট প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এখানকার বাড়ী ও দোকানগুলির আকৃতি ও বাড়ী তৈরীর উপাদানের দিকে নজর দিলে এদের মালিকদের সংগতি বা অসংগতির ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারা যায়। অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ী বেশ ভালভাবে পোড়ানো ইঁট (১১ ইঞ্চি×৫-৫ ইঞ্চি×২-৭৫ ইঞ্চি) দিয়ে ও দেওয়াল বেশ মজবুত করে করা হত। দেওয়ালের উভয় দিকেই মাটির আস্তর থাকত। অবশ্য যেখানে নক্সাকাটা ইঁটের ব্যবহার হত সেখানে এরূপ আস্তর থাকত না। প্রাচ্যের অধিকাংশ প্রাচীন শহরের মত এখানেও রাস্তার সম্মুখীন বাড়ীগুলির বাহিরের দিকে দরজা ছাড়া আর কিছুই থাকত না। এই দরজাগুলি চওড়ায় মাত্র তিন ফুট চার ইঞ্চি হত। চৌকাট কাঠের হত। বাড়ীর দেওয়ালে জানলা ফোটাবার রীতি ছিল না, শুধু বায়ু চলাচলের জন্য বেশ উঁচুতে ছোট ছোট পাথরের ঝাঁঝরি বসানো হত। অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর ও মাঝে উঠান থাকত, কিন্তু প্রবেশ পথ থাকত গলির দিকে। অনেক সময়ে প্রবেশ পথের পাশেই থাকত প্রহরীর থাকবার বা পাহারা দেওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা। উঠানের দু-তিন দিকে বা চার পাশে নানা আকারের ঘর ও স্নানাগার থাকত। ঘরের ও নর্দমার মেঝে ভাল পাকা ইঁটের হত। প্রত্যেক বাড়ীতে নর্দমা থাকত ও তার জল বাইরের সাধারণ বড় নর্দমায় পড়ত। বাড়ীর আবর্জনা একটা নালিযুক্ত গর্তের সাহায্যে বাড়ীর বাহিরে রাখা ডাস্টবিনে ফেলা হত। ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা ছাড়াও বড় বড় গর্ত বা জালার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার নর্দমা পরিষ্কারের জন্য রাস্তার স্থানে স্থানে ইঁটের তৈরী মানুষের ঢোকবার উপযুক্ত নর্দমার দরজা থাকত। আবর্জনা পরিষ্কার ও ময়লা জল নিষ্কাশনের কাজ তদারকের জন্য একটি পৌর প্রতিষ্ঠান এখানে ছিল বলে মনে হয়। ঘরে আগুন পোহাবার জন্য নির্দিষ্ট কোনও স্থান ছিল না, তবে লোকে এক রকম ছিদ্রযুক্ত পাত্রে কাঠ কয়লা জেলে আগুন পোহাত। সমতল ছাদের উপরে বা উপরের তলে যাবার জন্য সিঁড়ি ছিল। বাড়ীর ছাদের নীচে যে কাঠের কড়িবরগার ব্যবহার হত তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় এখানকার কিছু বাড়ী একাধিকতলবিশিষ্ট ছিল। বাড়ীর মধ্যে কাঠের থাম ছাড়াও পাথরের থামও ব্যবহৃত হত। বাড়ীর সমতল ছাদের উপরে অনেক সময়ে ছেঁচা বাঁশ বা নল খাগড়ার তৈরী পাটির আবরণ থাকত। তার উপরে থাকত মাটির প্রলেপ।

এখানকার HR এলাকার উত্তর পশ্চিম কোণে এক ঘরবিশিষ্ট ব্যারাকের মত বাসস্থল দেখা যায়। এগুলি নিঃসন্দেহে মজুর বা অনুরূপ দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। প্রায় একই আকারের ঘর-(২০ ফুট×১২ ফুট) ষোলটি দুসারিতে বিভক্ত ঘরে এরা বাস করত। এই গুলির প্রত্যেকটি আবার দু ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ব্যারাকের এক পাশে একটা সরু গলি ও অন্য পাশে একটা রাস্তা ছিল। এখানে পানীয় জল সরবরাহ হত একটা বড় কুয়া থেকে। শহরে এরূপ অনেক কুয়া ছিল। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার।

হড়প্পা—এর প্রধান ঢিবিটির আকৃতি ও আয়তন মহেঞ্জোদাড়োর প্রায় সমান। ভাল খননকার্য না হওয়ার জন্য এখানকার মূল ঢিবি ও দুর্গ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। আশপাশের জমি থেকে মূল ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট। মহেঞ্জোদাড়োর মত এর দুর্গটিও মাটি ও অদগ্ধ ইঁটের পাটাতনের উপরে অবস্থিত। এই সামন্তরিক দুর্গটির মাপ হচ্ছে ১২০০´×৬০০। দুর্গটির চারিধার একটি প্রতিরক্ষা প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। মাটি ও অদগ্ধ ইঁট দিয়ে তৈরী হলেও এর বাহিরের দিক পোড়া ইঁট দিয়ে মজবুত করা হয়েছিল। প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু এই প্রাকারের নীচের দিকটা প্রায় ৪০ ফুট চওড়া ছিল। প্রাচীরের নীচের দিকে একটা মাটির বাঁধ ছিল। প্রাচীরের উত্তরে ও পশ্চিমে দুটি দরজা ছিল—এর মধ্যে প্রথমটিই প্রধান ছিল। পশ্চিমের প্রবেশ পথের কাছে একটা সমতল স্থান, সিঁড়ি ও রাস্তা ছিল। কোনও ধর্মীয় বা লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এগুলির যোগ থাকা বিচিত্র নয়। প্রাচীরের গায়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে ও অন্যত্র আয়তাকার বুরুজ ছিল। এই প্রাচীর দুবার মেরামত করা হয় ও স্থানে স্থানে পোড়া ইঁট দিয়ে মজবুত করা হয়। পশ্চিমের প্রবেশ-পথটি হয় একেবারে আর না হয় আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ-কাজ সম্ভবতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্য হয়। হড়প্পার প্রতিরক্ষা প্রাচীর ও ঘরবাড়ি থেকে পরবর্তীকালে অনেক ইঁট চুরি গিয়েছে, সে জন্য এখানকার অধিকাংশ বাড়ীর নক্সা ও আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট।

দুর্গের প্রধান ঢিবি ও পুরানো নদীর খাতের মাঝখানে ছিল একটি ইঁটের পাটাতন। এর উপরেই ছিল গোলাঘর বা শস্যাগার। দু সারিতে বিন্যস্ত মোট বারোটি খুপড়ি বা কুঠার (প্রত্যেকটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট×কুড়ি ফুট মাপের) নিয়েই এই গোলাঘর তৈরী হয়েছিল। এর ঠিক দক্ষিণ দিকে ইঁটের একটি গোল পাটাতন (দশ ফুট ব্যাসের) পাওয়া গিয়েছে। এখানকার মেঝের ফাটল থেকে গম ও যবের তুষ এবং মেঝেতে একটি অর্ধপ্রোথিত উদূখলের অংশ পাওয়া যাওয়ায় এই পাটাতনটি শস্যাদি মাড়াই-এর কাজে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়।

হড়প্পা নগর পরিকল্পনা মহেঞ্জোদাড়োর অনুরূপ ছিল। এখানে মোটামুটিভাবে চৌদ্দটি বাড়ি ও একটি দুসারির কুলিব্যারাকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া আছে দোকানঘর ও রাস্তা। মহেঞ্জোদাড়োর মত এই শহরটিও প্রতিরক্ষা প্রাকার দিয়ে ঘেরা ছিল। এখানকার ঘরবাড়ী পাকা ইঁট দিয়ে তৈরী

প্রবেশপথ—হড়প্পা

হয়েছিল। বাড়িতে একাধিক ঘর, উঠান, স্নানঘর, নর্দমা, কুয়া ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। মেঝে ইঁটের হত। এখানকার বাড়িতেও কাঠের কড়ি, বরগা ও চৌকাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল।

দুর্গের উত্তরদিকে মূল শহরে কুলি ব্যারাকটি অবস্থিত ছিল। এই ব্যারাকের ঘরগুলি দুসারির ও এককামরা বিশিষ্ট। এর সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর কুলিব্যারাক ও পরবর্তীকালের তেল-এল-অমার্নার কারিগর ও ভৃত্যদের বাসার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কালিবঙ্গান—হড়প্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর মত কালিবঙ্গানেও নগর পরিকল্পনার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এখানেও যথারীতি দুর্গ ও মূল শহর দেখা যায়। প্রাক-হড়প্পা যুগের ধ্বংসস্তূপের একাংশের উপরে এই দুর্গের অবস্থান ও দুর্গ থেকে সামান্য দূরে মূল শহর। দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাকার অদগ্ধ ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছিল। প্রাকারের গায়ে সম্ভবত প্রাচীর পলেস্তারা ছিল। দুর্গাঞ্চলের উত্তরদিকে বাস করতেন সম্ভবত শাসনকর্তারা বা পুরোহিতেরা। এখানে ১৩২′ দীর্ঘ একটি রাস্তাও পাওয়া গিয়েছে। দুর্গের দক্ষিণে কয়েকটি পাটাতন দেখা যায়। এই সব পাটাতনের উপরে বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি ছিল বলে অনুমান করা যায়। হড়প্পার যুগের লোকেদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল তা বলা কঠিন তবে কালিবঙ্গানের দুর্গাঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পাটাতনের উপরে কুয়া, অগ্নিবেদী ও জন্তুর হাড়সহ একটি চতুষ্কোণ গর্ত ইত্যাদি জিনিস থেকে বোঝা যায় যে সে সময়ে আর্যদের মত যজ্ঞ ও পশুবলি হত। লোথালেও এইরূপ জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

দুর্গের মত মূল শহরটিও অদগ্ধ ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। পূর্বদিকে অবশ্য প্রাচীরের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। শহরটি উত্তর ও দক্ষিণ এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি প্রবেশ পথ বা দরজা ছিল। এখানকার রাস্তাগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল—এদের মধ্যে চারটি উত্তর-দক্ষিণ মুখী ও তিনটি পূর্ব-পশ্চিম মুখী। শহরের উত্তরাংশে আরও কয়েকটি রাস্তা ছিল বলে মনে

নগরীর ধ্বংসাবশেষ—কালিবঙ্গান

হয়। এই সমান্তরাল রাস্তাগুলির সংযোগের ফলে শহরটি যেন কয়েকটি ব্লক বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলে মনে হয়। রাস্তাগুলি ছয় ফুট থেকে সাড়ে তেইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। রাস্তাগুলি প্রায়শই পাকা হত না। শহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য উত্তরে ও পশ্চিমে দুটি রাস্তা ছিল। নাগরিকেরা দুর্গে যাতায়াতের জন্য পশ্চিমের রাস্তাটি ব্যবহার করত। উত্তরদিকের রাস্তাটিতে সম্ভবত গাড়ীঘোড়া চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও সম্ভবত এই রাস্তাটি ব্যবহৃত হত। এছাড়া গলিও ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত এই সব গলি ব্লকের মধ্যেকার বাড়িগুলির মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়েছিল। সমান্তরাল রাস্তাগুলির দুপাশে গৃহনির্মাণের ফলে শহরটির নক্সা অনেকটা একটা দাবার ছকের আকৃতি নিয়েছিল। প্রতিটি বাড়িই কম পক্ষে দুটি রাস্তার সুযোগ পেত। প্রতি বাড়িতে ছটি-সাতটি করে ঘর থাকত ও সেগুলি দুই বা তিন দিকে সন্নিবদ্ধ থাকত। এছাড়া প্রতি বাড়িতে নর্দমা, উঠান ও কুয়া থাকত। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে উঠান দিয়ে বা ভিতরের দালান দিয়ে যেতে হত। কোনও কোনও বাড়ির বাইরের চতুষ্কোণ পাটাতন রাস্তার একাংশের উপরে প্রসারিত হত। নর্দমার নোংরা জল জমা হত রাস্তার তলায় বসানো বড় বড় মাটির জালায়। এখানে পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমা চোখে পড়ে না। হড়প্পাযুগের আগেও এদেশে যে চাষ হত তার প্রমাণও কালিবঙ্গান থেকে পাওয়া গিয়েছে।

লোথাল—লোথাল বন্দর ছিল বলে এর নগর পরিকল্পনা হড়প্পা-মহেঞ্জোদাড়োর নগর পরিকল্পনা থেকে পৃথক। বন্দরটির আকৃতি ছিল প্রায় আয়তাকার ও এর বড় বাহুটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এর চারধারে
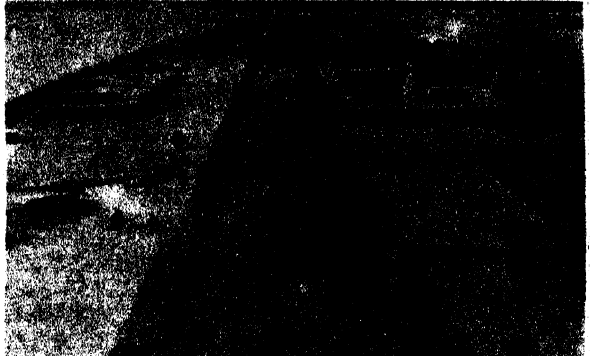
রাজপথ দুইপার্শ্বে গৃহাদির ভিত্তি—লোথাল

একটা ইঁটের প্রাচীর ছিল। সম্ভবত বন্যার হাত থেকে বন্দরকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এটি নির্মিত হয়েছিল। পোতাশ্রয়টি পূর্বদিকে ছিল ও হড়প্পা-যুগে এটি নিকটতম নদীর সঙ্গে একটি খালের দ্বারা যুক্ত ছিল। পোতাশ্রয় ছাড়া একটি বিরাট জেটিঘাটও এখানকার সারা পূর্বদিক জুড়ে রয়েছে। এই বন্দরনগরীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশটি এই পোতাশ্রয়ের একেবারে ধারে অবস্থিত। এই অংশটি মোট আয়তনের ⅓ খণ্ড। এটি প্রায় তের ফুট উঁচু ও দেখতে অনেকটা মাটি ও ইঁট দিয়ে গঠিত পাটাতনের মত। এটি অনেকাংশে হড়প্পা-মহেঞ্জোদাড়োর দুর্গাঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়। এটি সম্ভবত এর উপরে স্থাপিত শস্যাগার বা গোলাঘরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য বন্যার হাত থেকে গোটা বন্দরকে রক্ষার জন্য বা শাসকবর্গের সম্মানের জন্যও এটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। এই উঁচু পাটাতনের কিছু অংশের উপরে ইঁটের এমন সব ছোট ছোট পাটাতন আছে যেগুলি বায়ু চলাচলের ছিদ্রতে বিভক্ত। এগুলি নিঃসন্দেহে অন্যান্য হড়প্পীয় শহরের গোলাঘরের সঙ্গে তুলনীয়। এই পাটাতনের মোট আয়তন ছিল একশো ষাট ফুট×একশো পঞ্চাশ ফুট। এর উপরে গোলাঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরবাড়ী, স্নানাগার (বারটি) ও নর্দমাও ছিল। বন্দর নগরীর বাকী ⅔ অংশে বাস করত জনসাধারণ। এই অংশে নানা রাস্তা ও গলি ছিল। রাস্তাগুলি বার ফুট থেকে সাড়ে উনিশ ফুট পর্যন্ত ও গলিগুলি সাড়ে ছয় ফুট থেকে নয় ফুট দশ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রধান রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এই অংশে তাম্রকার, স্বর্ণকার প্রভৃতির দোকান ও পুঁতির মালার কারখানা অবস্থিত ছিল। ইঁটের পোতাশ্রয়টি উল্লেখ করার মত। এটি লম্বায় সাতশো বার ফুট ও চওড়ায় একশো কুড়ি ফুট ছিল। এর পারে যে ইঁটের প্রাচীরটি ছিল তা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ ফুট উঁচু ছিল। পোতাশ্রয়ের কৃত্রিম খালে যাতে বন্যার অতিরিক্ত জল না ঢোকে ও যাতে ঐ খাল জলের অভাবে শুকিয়ে না যায় সে জন্য এর প্রবেশপথে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এখান থেকে এক ধরনের ছিদ্রযুক্ত পাথরখণ্ড পাওয়া গেছে যেগুলি সম্ভবত জাহাজ বা নৌকা নোঙর করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

বিঃ দ্রঃ—মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা, কালিবঙ্গান ও লোথালের অবস্থান ও তারিখ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলা হয়নি, কেননা এই সব জায়গার অবস্থান ও তারিখ প্রায় সকলেরই জানা আছে।

এমন কাউকে জানেন কি যিনি শীঘ্রই ভারতে বসবাস ক'রতে আসছেন?

যেসব ভারতীয় ভারতে থাকেন না আর ভারতীয় বংশোদ্ভব যাঁরা স্বদেশে চিরকালের জন্যে বসবাস ক'রতে আসছেন, তাঁদের আনা বৈদেশিক মুদ্রার ২৫% আগামী ১০ বছরের জন্যে এই সমস্ত কারণে ব্যবহার করা যাবে:

বিদেশ সফরের খরচ মেটাতে
আগামী ১০ বছরের মধ্যে পরিবারের যে কেউ যেকোন সময়ে বিদেশে যেতে পারেন— বেড়াতে, ব্যবসায়ের কাজে বা চিকিৎসা করাতে বা কোন ব্যক্তিগত কারণে।

ছেলেমেয়েদের বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখাতে
বিদেশের কোন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেকে বা মেয়েকে পড়িয়ে তার পছন্দমতো বিষয়ে তাকে যোগ্য বা বিশেষজ্ঞ ক'রে তুলতে কে না চায়? এই তো তার সুযোগ।

বিদেশে আত্মীয়স্বজনকে উপহার হিসেবে টাকা পাঠাতে
তাঁদের জন্মদিনে বিয়েতে বা বিবাহবার্ষিকীতে যে উপহার তাঁদের মনে পড়িয়ে দেবে আপনার কথা— এনে দেবে ঘরের সুখস্মৃতি।

বিদেশ থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনাতে
পেশাদারী লোকেদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক। ভারতে ফিরে কোন ক্লিনিক খুলতে পারেন। কিম্বা ধরুন কোন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলতে পারেন। ফলে, সাফল্যের রাস্তা খুলে যাবে।

বিনা পয়সায় পুস্তিকা পেতে হ'লে আমাদের লিখুন। আপনার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁরা বিদেশে থাকেন তাঁদের ঠিকানা আমাদের জানালে, আমরা আপনার শুভেচ্ছা সহকারে তাঁদেরও এই পুস্তিকা পাঠিয়ে দেবো। দি জেনারেল ম্যানেজার ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০১২১ বোম্বাই ৪০০ ০২১। ভারত।

স্টেট ব্যাঙ্ক

CHAITRA-SBI-277 BEN

শংকর

॥ ৮৭ ॥

আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—বিপদ আসন্ন। কলকাতার উঁচু মহলে গোপনে অনেকদিন রাজত্ব করার পরে শ্রীমতী পপি বিশোয়াস এবার সত্যিই গোলমালে জড়িয়ে পড়ছেন। এবং সেই সঙ্গে আমার মাথার ওপরেও ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগানের খাঁড়া বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে।

অথচ মিসেস পপি বিশোয়াস এখনও ভেঙে পড়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে রাজী নন। এই গভীর রাতে অপরিচিত আলাপকেন্দ্রে যাবার আগে কেমন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন : "আমার নামও পপি বিশোয়াস!"

নিশ্চিত বিপদের মুখেও যারা এমনভাবে সাহস সঞ্চয় করতে পারে, তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তেও যারা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাদের আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। সংসারের সর্বক্ষেত্রে বার বার অপমানিত ও পরাজিত হয়ে আমি এই মনোবল বহুদিন আগেই হারিয়েছি—এখন আমার মেনে নেবারই সময়। জীবন-পরীক্ষার প্রায় সব সাবজেক্টেই যে ফেল করে বসে আছে অবশিষ্ট একটা বিষয়ে সফল হয়ে সে কী করবে? পরাজয়কে মেনে নেবার মানসিকতায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তখন মিসেস পপি বিশোয়াসের মনোবলকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। অজান্তেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

আজ আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘরে ফিরে এসে ঠাণ্ডা বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। চোখ বুঁজে থেকেও ঘুমের পাত্তা নেই—সমস্ত দিনের ঘটনাগুলোই ছায়াছবির মতো চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে।

মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছি মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসকে। যা সোজাসুজি সামনা-সামনি করবার মতো সাহস নেই, তা গোপনে করতে গিয়ে আপনি দুজন নিরপরাধ মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনলেন, মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস। আপনি তো জাতির জনকের আহ্বানে একদিন দেশজননীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তবু কেন সব দুর্বলতা স্বীকার করে নেবার মতো মনোবল আপনার হলো না?

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার ঘরে টোকা দিচ্ছে।

হুড়মুড় করে উঠে পড়ে দরজা খুলে দেখলাম মিসেস পপি বিশোয়াসই ফিটফাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "বেশ মশাই! আলো জেলে রেখেছেন, অথচ দরজা বন্ধ করেছেন।"

মিসেস বিশোয়াস ততক্ষণে আমার বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়েছেন। বললেন, "চুপি চুপি ফিরে এসে নিজের ঘরে বিছানায় ঝপাং করে শুয়ে পড়বো ভাবছিলাম। কিন্তু দূর থেকে দেখলাম, আপনার ঘরে আলো জ্বলছে। বুঝলাম, বেচারা মিস্টার শংকর নিশ্চয় আমার ফিরে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই সোজা এখানেই চলে এলাম। ভগবান আজ রাত্তিরের ঘুমটা আমার এবং আপনার খাতায় বরাদ্দ করেন নি।"

পপি বিশোয়াস আমার অবস্থাটা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "আহা! দুষ্টু ঘুম চোখের পাশেই ঘুর ঘুর করছে অথচ ধরা দিচ্ছে না—এই অবস্থাটা আমারও জানা। খুব খারাপ লাগে তখন—অথচ কিছু করবার থাকে না। আমি তো ওই অবস্থায় একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাই। সিংগল মেয়েমানুষের সব সময়ের বন্ধু বলতে এই সিগারেট ছাড়া আর কী আছে বলুন?"

পপি বিশোয়াস এবারও সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন এবং অনেকখানি ধোঁয়া একসঙ্গে ছেড়ে নিজেকে শান্ত করলেন।

পুলিস হাজতে অথবা থানায় চেনস্মোকারদের যে বিশেষ দুর্গতি হবার আশঙ্কা, তা একবার মিসেস বিশোয়াসকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে উত্তেজনা বাড়িয়ে ফেলবার ঝুঁকি নিতে চাই না। হাজতের নাম শুনে মিসেস বিশোয়াসের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে তার ঠিক নেই। হয়তো এইখানেই কাঁদতে বসবেন।

"কারও সঙ্গে দেখা হলো?" এবার আমি মিসেস বিশোয়াসকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হবে না মানে?" ফোঁস করে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। "লুকিয়ে লুকিয়ে গেস্ট হাউস রাখবে, গোপনে গোপনে ভি আই পিদের ডেকে এনে তাদের মাথা চিবোবে, আর বিপদের সময় দেখা করবে না বললে তো চলবে না!"

"আজকাল কিছুই বলা যায় না", আমি মৃদু প্রতিবাদ জানালাম। মিসেস বিশোয়াসের মনে রাখা উচিত তিনি জেঠমালানির মতো বিজনেসম্যানের সঙ্গে কাজকর্ম করছেন।

"খুব বলা যায়। না এসে দেখুক না। তারপর কী হয় হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে," বিষধর সর্পিনীর মতো ফোঁস করে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আর একবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। এবং পূর্ববর্তী মন্তব্যের সূত্র ধরেই বললেন, "ওখানে গিয়ে কাউকে না দেখলে কী করবো তা তো ঠিক করেই রেখেছিলাম।"

"সোজা মিস্টার জেঠমালানির লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে চলে যেতেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আমার বয়ে গেছে ওঁর বাড়িতে ধর্না দিতে। সঙ্গে কয়েন নিয়ে গিয়েছিলাম। টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টী কর্নারের পাবলিক ফোন থেকে মিস্টার জেঠমালানিকে জানিয়ে দিতাম : "আমি চললাম থানায়।"

আমি বিস্ময়ে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মিসেস, বিশোয়াস বললেন, "আমাকে ভেবেছ কী?" আমি কী ভিখিরি? আমি সঙ্গে সঙ্গে থানায় চলে গিয়ে প্রতুল বিশ্বাসের কেস সম্বন্ধে যা-যা জানি, তার প্রতিটি অক্ষর নিজ থেকে লিখিয়ে দিয়ে আসতাম। যদি ওরা জিজ্ঞেস করতো এ-সব কথা আগে তুমি বলোনি কেন, তা হলে স্রেফ বলতাম মিস্টার জেঠমালানির ভয়ে।"

একবার ভাবলাম মনে করিয়ে দিই, মিসেস বিশোয়াস নিজেই বলেছিলেন, ক্লায়েন্টকে তিনি কখনও বিপদে ফেলতে চান না।

মিসেস বিশোয়াস কিন্তু আমি মুখ খোলবার আগেই বলে ফেললেন, "যে ক্লায়েন্ট নিজের দায়িত্ব পালন করেন না—তাঁর যতটুকু করবার তা করতে রাজী থাকে না, তিনি আবার ক্লায়েন্ট কী? ভেবেছিলুম আপনাকেও বলবো না, কিন্তু আপনি জানেন এই কেসটার জন্যে এখনও পেমেন্ট পাই নি?"

আবার একটু ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "ক্যাশ পেমেন্ট ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সবাই আজকাল কোম্পানির নামে আনসান খরচ দেখিয়ে ভাউচার সই করাতে চায়, বিশেষ করে মিস্টার জেঠমালানি। টাকা দেবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুনিমজীর দেওয়া ছাপানো রসিদে সই করিয়ে নেবে—হয়তো লেখা থাকবে মাল বিক্রির কমিশন কিংবা......" এবার নিজের হাসি চেপে রাখতে পারলেন না মিসেস বিশোয়াস।

বেশ কিছুটা হেসে নিলেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "উঃ মরণকালেও আমার হাসি যায় না! যাবে কী করে? যা সব কাণ্ড মিস্টার জেঠমালানির! লাস্ট দু' মাস ভাউচার কী অ্যাকাউন্টে ছিল জানেন? ইনটিরিয়র ডেকরেশন! আমার কী? আমিও পি মজুমদার বলে সই করে টাকা নিয়ে নিলাম।"

হাসতে হাসতে মিসেস বিশোয়াস জানালেন, "আমি মিস্টার জেঠমালানিকে বলেছিলাম, ধন্য আপনার ব্রেন। কোথায় আপনার পপি বিশোয়াস আর কোথায় ইনটিরিয়র ডেকরেশন।' মিস্টার জেঠমালানি কিন্তু মোটেই লজ্জা পেলেন না। বললেন, বম্বের মিস্টার মানসুখানির কাছ থেকে আইডিয়াটা পেলাম। মেয়েদের পিছনে খরচটা অনেকে ইনটিরিয়র ডেকরেশন অ্যাকাউন্টেই শো করে। ভুল কী বলুন? আপনাদের মতো বিউটিফুল লেডিরা কোম্পানির ডেকরেশন ছাড়া কী? শুধু বলতে পারেন, এক্সটিরিয়র ডেকরেশনের খরচটা ইনটিরিয়র ডেকরেশনে দেখাচ্ছি। এই বলে মিস্টার জেঠমালানি নিজেই একটু হেসে ফেলেছিলেন।"

আসল সমস্যার ওপর মিসেস বিশোয়াস কিন্তু কোনো রকম আলোকপাত করছেন না। ওঁর কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ও-বিষয়টা তিনি কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। উনি নিজে থেকে কথা না তুললে আমি এই মুহূর্তে কোনো রকম উদ্বেগ দেখাতে চাই না। যা হবার তা তো হবেই।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলার পরে সেই তো বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলুম পায়ে হেঁটেই চলে যাবো। কিন্তু ওমা! ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটে যে এতো নেড়ি কুত্তা আছে তা কেমন করে জানবো। একটা কুকুরও বোধ হয় এ পাড়ায় রাত্তিরে ঘুমোয় না। সব দল বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

মিসেস বিশোয়াসের চোখ দুটো এবার বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো। "আপনি বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার শংকর। কলকাতার শহরের কুকুররাও মেয়েদের ওপর স্পেশ্যাল নজর দেয়। রাস্তায় পুরুষ-মানুষের ছড়াছড়ি—সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমনি শাড়িপরা আমাকে অসময়ে রাস্তায় দেখলো, অমনি আমাকে ফলো করতে শুরু করলো। আর কী ডাক! শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়।"

মিসেস বিশোয়াসের চোখ আরও বড়ো হয়ে উঠছে। "ওই ডাক শুনে সদর স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীটের কুকুরগুলোও বোধ হয় পাড়া ছেড়ে আমাকে দেখতে ছুটে এলো।"

"প্রথমে ভাবলাম, আসছে আসুক। মানুষে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে—তার থেকে কুকুর ভাল। কিন্তু তারপর কুকুরগুলোর কাণ্ড-কারখানা দেখে ভরসা কমে গেল। যা সময় খারাপ যাচ্ছে! পুলিসে কামড়াবে বলে দাঁত বার করে আছে; এর ওপর যদি আবার রাস্তার কুকুরে কামড়ায় তা হলে উদ্ধার নেই। চোদ্দটা না চব্বিশটা ইনজেকশন নেবার জন্যে ছোটাছুটি করতে হবে—আর যা মোটা ছুঁচ না, আমাদের বুটিকের একটা মেয়ের কাছে তার বর্ণনা শুনেছি। বেচারা তিন মাস লাইনে আসতেই পারে নি।"

"বুঝলাম নিজের পায়ে হেঁটে চলবার স্বাধীনতা কলকাতা শহরে মেয়ে-মানুষদের নেই। ভাগ্যে সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু ততক্ষণে রাজ্যের রিকশওয়ালা ঠুন-ঠুন আওয়াজ করতে আরম্ভ করেছে। তাদের ইচ্ছে আমি রিকশতেই চড়ি। কিন্তু মিস্টার শংকর, রিকশ আমার দু' চোখের বিষ! বরেনে অনেকদিন থেকে এসেছি তো—মানুষের ঘাড়ে চেপে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।"

আমি মুখ বুজে মিসেস পপি বিশোয়াসের কথা শুনে যাচ্ছি। কোনো মন্তব্য করছি না।

একটা সিগারেটের আগুন থেকে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "রিকশওয়ালারা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে, আমার মতলব ট্যাক্সি চড়ার। একজন ততক্ষণে গাড়ি তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। লোকটা বোধ হয় আমাকে চেনে। সেলাম-ফেলাম করলে আমাকে। বললে, মাইজী আপনি তো ঠাকরে ম্যানসনে থাকেন?"

ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পপি

আমূলে বিকাশের পথ

ASP/AB-1A

ঠিক পথে পা বাড়ান
আমূলস্প্রে
দিতে শুরু করুন

মনে রাখবেন, মায়ের দুধই বাচ্চার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যদি কোন কারণে ওকে সেই দুধ খাওয়াতে না পারেন তাহ'লে বাচ্চাকে আমূলস্প্রেই দিন।

আমূলস্প্রে কেন ?

- মজাদার
- হজম করা সহজ
- ভিটামিনে ভরপুর
- সহজে গুলে যায়
- পুরো মাত্রায় সুষম
- আরো বেশী মায়েরা বাচ্চার অন্য কোন খাবার দুধের চেয়ে আমূলস্প্রে'ই দিচ্ছেন

আমূলস্প্রে—মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

দিন

(৩ মাসের পর আমুলস্প্রে'র সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার প্রথম শক্ত খাবার)

বাচ্চার পুরোপুরি বেড়ে ওঠা—তার বিকাশের জন্য যত কিছু প্রয়োজন সবই সুস্বাদু বালআমুলে র'য়েছে—আর র'য়েছেও বেশী ক'রে।

- অন্য যেকোন ব্র্যাণ্ডের শস্য-আহারের থেকে ২৫% বেশী প্রোটিন
- বেশী ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং 'সি'
- সহজে হজম হয়। আগে থেকেই দুধে রান্না করা
- অন্য যেকোন খাবারের সাথে খুব ভালভাবে মিশে যায়, যেমন, ডাল, পিষে নেওয়া ফল, পুডিং প্রভৃতি
- অন্য যেকোন ব্র্যাণ্ডের শস্য-আহারের চেয়ে বালআমুলে আপনার পয়সার দ্বিগুণ দাম উশুল করাবেন

এইজন্যে আজকাল আরো বেশী ডাক্তারেরা বাচ্চার পুষ্টির চাহিদা মেটাবার জন্যে বালআমুল'ই বেশী ভাল ব'লে মনে করেন!

আমূলস্প্রে মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

বালআমুলে বিকাশ
আপনি প্রতি পদেই দেখতে পাবেন

বিনামূল্যে: আরও বিশদ বিবরণের জন্যে আমুল পুস্তক ও বালআমুল পুস্তিকা চেয়ে নিন—একদম বিনামূল্যে। এই ঠিকানায় লিখুন : পোষ্ট ব্যাগ নং ১০১২৪ বোম্বাই ৪০০ ০০১। আপনার পুরো ঠিকানা লিখে ৬০ পয়সার ডাকটিকিটের সঙ্গে পাঠান।

বাজারে ছেড়েছেন :
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ

বিশোয়াস আবার চলতে আরম্ভ করেছেন। লোকটা যে তাঁকে চেনে সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

"লোকটা নাছোড়বান্দা। বললো, 'উঠে বসুন মাইজী।' কলকাতার যেখানে যেতে চাইব, সেখানে ফটাফট পেঁছে দেবে। তবু আমি ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে চলেছি দেখে রিকশওয়ালা আমাকে শুনিয়ে দিলো, মেয়েদের পক্ষে ট্যাক্সির চেয়ে রিকশ অনেক নিরাপদ। মাঝরাতের ট্যাক্সির নাকি অনেক বদনাম আছে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। "রিকশওয়ালা যা বলছে তা ডাহা মিথ্যা নয়। কলকাতার এই জঙ্গলে রিকশই যে সবচেয়ে নিরাপদ তা আমারও জানা। কিন্তু রিকশ চড়ে এই রাত্রে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টি কর্ণারের সামনে নামলে হোটেলের দারোয়ান গোলমাল বাধাবে। রিকশর ওপরে ওদের জাতক্রোধ। ট্যাক্সির ওপরে সন্দেহ অনেক কম—আর প্রাইভেট গাড়ি হলে তো কথাই নেই, খুন করে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে গেলেও ওরা সেলাম ঠুকবে।"

মিসেস বিশোয়াস এবার চামড়ার দম্ভ-থলিকাটির গায়ে হাত বোলালেন। আমাকে বললেন, "জেনে-শুনেই আমি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। একলা বেরোতে হয় বলেই তো ফরেন থেকে এই ভ্যানিটি ব্যাগ এসেছে। যতক্ষণ ব্যাগ আছে, ততক্ষণ কোনো চিন্তা নেই আমার।"

ভ্যানিটি ব্যাগের ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক ঠেকছে। দস্যু দমনে এই ব্যাগের কী মন্ত্রশক্তি থাকতে পারে, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মিসেস পপি বিশোয়াস মৃদু হেসে বললেন, "হাত দিয়ে দেখুন না একবার।"

মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে! ভগবান আমার মাথায় থাকুন!

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "বেশ বাবা বেশ! ভিতরে হাত ঢোকাবার অনিচ্ছা থাকলে, অন্তত একবার তুলে দেখুন।"

চামড়ার দম্ভ-থলিকা তুলতে গিয়ে আমার শিক্ষা হলো—আলতোভাবে এই ভ্যানিটি ব্যাগ তোলা সম্ভব নয়। ব্যাগের ওজন কত হবে তা আন্দাজ করা শক্ত।

এবার হেসে ফেললেন মিসেস পপি বিশোয়াস, "কী হলো? তুললেন না কেন?"

আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় মাথা চুলকোচ্ছি। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "ভেবেছিলেন মেয়েদের কসমেটিক্‌সের কত ওজন হবে! তাই না?"

আমি আবার মাথা চুলকোচ্ছি। মিসেস বিশোয়াস সরলভাবে বললেন, "শুধু ফ্রেঞ্চ কসমেটিকস্‌ পোরা ফেদারওয়েট ভ্যানিটি ব্যাগও আমার আছে—ফরেন গেস্টরা সন্তুষ্ট হয়ে প্রেজেন্ট করে গিয়েছেন। সে-সব আমি ইভনিং-এ ম্যাচিং শাড়ির সঙ্গে নিয়ে গেস্টদের রিসিভ করবার জন্যে নিজের ঘরে বসে থাকি।"

ধোঁয়ার রিং ছুড়ে দিলেন শূন্যে মিসেস বিশোয়াস। তারপর নিজেই চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দিলেন। "আপনি যখন হাত ঢুকিয়ে দেখবেন না, তখন আপনাকেই আমি দেখাচ্ছি।"

ব্যাগের মধ্য থেকে সুগন্ধি কসমেটিকসের বদলে যা বার হলো তাতে আমার চোখ চড়কগাছ! টেনিস বল-সাইজের চকচকে স্টেনলেস স্টিলের কয়েকটি বল মিসেস পপি বিশোয়াসের হাতে শোভা পাচ্ছে। এক একটির ওজন বোধ হয় সেরখানেক হবে। বল নিয়ে খেলতে-খেলতে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "একবার এক ট্যাক্সিওয়ালাকে ভ্যানিটি ব্যাগের ঝাপটা ঘা দিয়েছিলাম না! অসভ্যতা করতে গিয়ে পাঞ্জাবের নাক জাপানী নাক হয়ে গেল! ব্যাটাকে পুলিসের হাতেও দেওয়া যেতো, কিন্তু তার অনেক হাঙ্গামা। আমাদের লাইনে কার এতো সময় আছে, মিস্টার শংকর? জানেনই তো, আমাদের প্রফেশনে টাইম ইজ মানি।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "সবচেয়ে দুঃখের কী জানেন? এইসব স্পেশ্যাল সেফটি ইকুইপমেনট কলকাতা শহরে পাওয়াই যায় না—অথচ প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেরোবার আগে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হওয়া। যদি আমাকে এই লাইন ছাড়তে হয়, তা হলে ভাবছি ছোটখাট একটা দোকান করবো যেখানে শুধু মেয়েদের আত্মরক্ষার জিনিসপত্তর বিক্রি হবে।"

মাথা ফাটাবার মতো ভারি বলগুলো ব্যাগে অদৃশ্য গহ্বরে ঢুকিয়ে দিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন, "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টী কর্ণারে তো হাজির হলাম। এবার আমার সঙ্গে ছেলেখেলা করা হয়! মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি স্বয়ং এক কাপ কোল্ড কফি নিয়ে ঘরের এক কোনে বসে আছেন।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! আমার যা বলবার সব হুড়হুড় করে মিস্টার জেঠমালানিকে শুনিয়ে দিলাম।"

উনিও চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনে গেলেন। মিসেস বিশোয়াস তার বর্ণনা অব্যাহত রাখলেন। "হাত জোড় করে আমি মিস্টার জেঠমালানিকে বললাম 'ফর গডস্‌ সেক' আমার কাছে আর খাদি ভি-আই-পি পাঠাবেন না, আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।"

মিস্টার জেঠমালানি নাকি তখনও মিটমিট করে হাসছেন। বললেন, "শখ করে কি আর পাঠাই মিসেস বিশোয়াস—না-পাঠিয়ে উপায় থাকে না যে! লোয়ার লেভেলে ছোটাছুটি করে অনেক ঠকেছি, মিসেস বিশোয়াস। শুনলাম, ক্যালকাটাতেই আমরা ওইরকম বোকামি করি—ডেল্লি, বম্বেতে টপ বিজনেসম্যানেরা উঁচু লেভেলেই যোগাযোগ রাখেন।"

আমার দিকে তাকিয়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমার তখন ওসব কথা শোনবার মতো মেজাজ নেই। বললাম, আমি নাক কান মলেছি—পপি বিশোয়াস আর খাদি ভি-আই-পিদের কাজে পাবেন না। আপনি দয়া করে অন্য ব্যবস্থা করুন, মিস্টার জেঠমালানি—কলকাতা শহরে মেয়ের অভাব নেই। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'"

"কী উত্তর দিলেন মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি?"

"সেই এক উত্তর। কথাটা মুদ্রাদোষের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে—'ফিকর মাত কীজিয়ে।' আমিও তেমনি। কফির কাপটা তেড়েমেড়ে সরিয়ে দিয়ে ঘর

ঝামটা দিয়ে বললাম, এখনও ফিকর করবো না তো কখন করবো?"

বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টোলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। 'তখন শোনালাম, কাল সকালেই তো পুলিশ এসে হাজির হবে।' তাতেও ফল হচ্ছে না দেখলাম। জেঠমালানিজী পকেট থেকে এলাচি বার করে নিজের মনেই চিবোচ্ছেন। তখন সোজাসুজি শুনিয়ে দিলাম, আপনাকে আর আড়ালে রাখা সম্ভব হবে কি না জানি না। পুলিশ বোধ হয় ইতিমধ্যেই আপনার নামটাও সন্দেহ করছে। যে লোক পুলিসকে উড়ো টেলিফোন করছে, সে যে আপনাকেও সে রাত্রে দেখেনি তার গ্যারান্টি কী?"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এবার এলাচি চিবনো বন্ধ হলো। মিস্টার জেঠমালানি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত দুপুর, কিন্তু উপায় নেই। এখনই একবার তিনি প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন।"

একটু থামলেন "মিসেস বিশোয়াস। ওর চোখমুখে উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠছে। "কী যে বলে লোকটা, কিছুই বুঝি না। ঘরে ফিরে যেতে বলে আবার সেই মন্তর আওড়ানো—ফিকর মাত কীজিয়ে!"

কিন্তু আরে বাপ, কাল সকালে পুলিশ এলে কী বলবো?" বিরক্তভাবে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "হাবভাব দেখে মনে হলো ঘণ্টাখানেক পরে উনি নিজেই আমাকে টেলিফোন করবেন। কারণ আমাকে ঘরে থাকতে বললেন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "তা হলে তো আপনার এবার ঘরে ফেরা দরকার। টেলিফোন এসে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।"

কাতর কণ্ঠে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ঘরে ফেরা তো দরকার—কিন্তু আমাদের কী হবে, মিস্টার শংকর?"

এ-প্রশ্নের কী উত্তর দেবো আমি? আমি নিজেই তো নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি—কেন অকারণে এই কুৎসিৎ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম?

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমার খুব ভয় করছে, মিস্টার শংকর। পুলিসের লক-আপে আমি একটা দিনও বাঁচব না। নরক বলে আমি ভাল পুলিস লক-আপের তুলনায়।"

যা আমি বলতে পারছি না, মার্ডার কেসে জামিনও মিলবে না, লক-আপেই থাকতে হবে সন্দেহের নায়ক-নায়িকাদের।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "নেপালে পালালে কেমন হয়, মিস্টার শংকর? ওখানে আমার এক অ্যাডমায়রার আছেন। কলকাতায় এসে কতবার হাতে পায়ে ধরেছেন নিজের প্যালেসে নিয়ে যাবার জন্যে। আমিই পাত্তা দিই নি—এই ক্যালকাটা সিটি ছেড়ে কে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে মুণ্ডপাত করবে? কিন্তু এখন..."

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়লেন।

আমার সন্দেহ হলো, সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। আগামী সকালে মিসেস পপি বিশোয়াসের দর্শন না মিললে আমার ভূমিকা কী হবে? পুলিস এখানে হাজির হলে আমি কী বলবো?

আজ যেন সময় বড়ই দ্রুত বয়ে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি ভোর না হলেই যেন ভাল হতো। সকাল মানেই তো সমস্যা।

ভোরের প্রথম পর্বেই আমি মিসেস পপি বিশোয়াসের দরজার সামনে হাজির হয়েছি। উনি এখনও থ্যাকারে ম্যানসন থেকে উধাও হন নি। বললেন, "কোথায় আর যাবো? যা-হয় হবে।"

জেঠমালানিজীর সেই বহুপ্রতীক্ষিত টেলিফোন সম্বন্ধে খোঁজ করতে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "হ্যাঁ, ফোন করেছিলেন। কিন্তু সেই এক বুলি—ফিকর মাত কীজিয়ে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝবার আগেই লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর যা হয় তুমি সামলাও"—মিসেস বিশোয়াসের স্বরে সন্দেহের বিষ ঝরে পড়লো।

তখন আমারও মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু জেঠমালানিজীর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গেল।

সকাল আটটার থানায় ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য পুলিস আসবার আগেই আমি স্বেচ্ছায় সব বক্তব্য গণেশ সরকারের কাছে নিবেদন করবো। কিন্তু কোথায় গণেশ সরকার? তিনি একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন।

আমার উদ্বেগ আরও বেড়েই চলেছে। তখন দশটা। গণেশ সরকারের আবির্ভাব আসন্ন। আমি উত্তেজনায় ছটফট করছি। গণপতিবাবুকে খবর দেব কিনা ভাবছি। গণপতিবাবুকে ফোন করলাম—কিন্তু এ সময়ে উকিলপাড়ায় তিনি আসেন না। বেয়ারাকে বললাম, গণপতিবাবু আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করেন।

এবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম। পুলিস আসবার আগেই আমি পুলিসকে সব বলতে চাই।

থানায় ঢুকবার আগেও ভাবছি, আজ আমার সঙ্গে গণেশ সরকারের সম্পর্কটা কী রকম হবে? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে আমার। হে ঈশ্বর, হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলের কপালে এই দুঃখ তুমি কেন লিখে রাখবে?

এখন আর দ্বিধার সময় নয়। বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কাছে বিদায় নিয়ে আমি থানার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গণেশ সরকার নিজের টেবিলে বসে জলযোগ সারছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "আরে বসুন বসুন। নগেন, সায়েবকেও চা-টোস্ট দাও।"

আমি তখন ও'র সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি। "কী হলো আপনার? বসুন—বসুন।" গণেশ সরকার এখনও পুরনো দিনের মতোই আমাকে আপ্যায়ন করছেন। "মুখ চোখ অমন হয়ে আছে কেন? থ্যাকারে ম্যানসনে কোনো ট্রাবল আছে নাকি?" সরলভাবে কথা বলে যাচ্ছেন গণেশ সরকার।

কান্নায় আমার গলা জড়িয়ে আসছে। কীভাবে আমি প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুরু করবো?

গণেশ সরকার আমার হাবভাব লক্ষ করলেন না। বললেন, "আগে চা টোস্ট খান তারপর আপনার কথা শুনবো।"

আমি নিজের অবসন্ন দেহটাকে টুলের উপর বসিয়ে দিলাম। গণেশ সরকার এখনও আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছেন। জিজ্ঞেস করছেন, গণপতিবাবু কেমন আছেন? গণপতিবাবু যে একটু পরেই আমার খোঁজ নেবার জন্যে এখানে হাজির হতে পারেন তা এখনই বলতে পারছি না গণেশ সরকারকে।

"আপনার তো আজ সকালে আমাদের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল?" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে এবার প্রসঙ্গের উত্থাপনা করলাম।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে গণেশ সরকার আমার দিকে তাকালেন। "আপনি ওই প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারটা বলছেন? আজ সকালে একটু পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো। হাই পলিটিক্যাল [illegible] থেকে আমাদের সায়েবের কাছে ফোন এলো মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের পবিত্র নাম যেন নোংরা না হয়। আমাকে সায়েব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সায়েব বললেন, সরকার তুমি ওই ইনভেস্টিগেশন ড্রপ করো। আফটার অল একটা উড়ো টেলিফোনের ওপর নির্ভর করে এতো বড়ো জননেতার পার্সোনাল লাইফে ঢোকবার চেষ্টা করা পুলিসের পক্ষে উচিত হবে না। ডু ইউ এগ্রি?"

গণেশ সরকার বললেন, "আমি ১১০% এগ্রি করে নিজের আপিসে ফিরে এসেছি। ছোট ছোট লোক আমরা, বড় বড় ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে চাকরিটা খোয়াবো? ওই কেস ড্রপ হয়ে গিয়েছে—আমি খাতা ক্লোজ করে দিয়েছি।"

ব্যাপারটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার সমস্ত শরীরে বিপদমুক্তির আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। গণেশ সরকার বললেন, "আমি স্যারি, শংকরবাবু। এই ব্যাপারে আপনাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করেছি। আজ যে এনকোয়ারিতে যাবো না তাও আপনাকে জানানো উচিত ছিল। আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।"

জগদীশ জেঠমালানির আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ভেবে আমি স্তম্ভিত। [ক্রমশ]

জন্মের ভূমিকা

রাণীব্রত চক্রবর্তী

রায়চৌধুরী হাউসের বাগানে একটি হরিণ শাবক। পেয়ারা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। হরিণটির গায়ের রঙ ফিকে গেরুয়া। তার ওপর সাদা সাদা বুটি। চোখ দুটি চমৎকার, যেন কাজলপরা। চড়ুইপাখিরা তার পিঠে বসছে, কিচিরমিচির করে ডাকছে আবার ফরফর করে উড়ে যাচ্ছে। রায়চৌধুরী হাউসের দালানের সিঁড়িতে বসে আছে নীলু। জমিদারবাবুর সেজো মেয়ের ছেলে। ইমারতের উঁচু উঁচু খিলানের ফাঁকে গোলাপায়রারা থাকে। তারা সারাদিন বকবকম্ করে, পাখা ঝাড়ে, পালক ছড়ায়, তারা ওড়ে, তারা দালান নোংরা করে। দালানের দেওয়াল জুড়ে এককালে ছিল পঙ্খের কাজ, দশমহাবিদ্যার ছবি। এখন এখন তা খুবই অস্পষ্ট, ঝাপসা, ফিকে। এটা এখনকার কথা নয়। এই বালক নীলু, হরিণশাবক আর পায়রা ভর্তি রায়চৌধুরী হাউসের স্তব্ধ খিলান ও গম্ভীর ইমারতের ছবিটি আজকের নয়। সম্ভবত সেটা উনিশশো সাঁইতিরিশ আটতিরিশ সাল। সেই সময় নীলুর ছেলেবেলাটা কটকের এই মামার বাড়িতে কাটছিল। লর্ড কর্নওয়ালিশের পার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্টের দৌলতে রায়চৌধুরীদের তখনো সুদিন। নীলুর দাদামশায়কে মোটেই জমিদার বলে মনে হতো না। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন। তারপর আইন পাশ করে কটকের কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করতেন। তাঁর পড়ার ঘর ভর্তি আইনের বই। আর মক্কেলদের ভিড়। অবসরে ভদ্রলোক বেহালা বাজাতেন। ন্যাড়া ছাদে মাদুর পেতে বসে দাদু বেহালা বাজাচ্ছেন। কটকের আকাশে চাঁদ আর জরির ফুলের মতন নক্ষত্র। নীলুর ছেলেবেলার এই সময়টা দিব্যি মনে আছে। দাদুর মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মাঝখানে সিঁথি। জ্যোৎস্না তাঁর দাড়িতে এসে পড়েছে। দাদামশায়ই নীলুর নামকরণ করেছিলেন। ডাক নাম নীলু, ভালো নাম নীলমণি।

অথচ বড় মামাকে দেখে নীলুর মনে হত সত্যিই তিনি জমিদার বাড়ির ছেলে। গিলে করা ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি কিংবা সিল্কের মসৃণ পাঞ্জাবি, চুনোট করা ধুতি, পায়ে চকচকে নিউকাট, রুমালে আতরের গন্ধ। বড় মামার পকেটে সিগারেট আর চকোলেটের ঠোঙা। বিকেল বেলায় রাজ্যের হনুমান এসে হাজির হতো মামার বাড়িতে। বাগানে, ছাদে, আলসে কার্নিশ সর্বত্র হনুমান। ছেলেবেলা থেকেই নীলু রুগ্ন, সর্দির ধাত, আকাশ গাছপালা জীবজন্তু পাখির প্রতি ঝোঁক। দিদিমা বলতেন, আমাদের নীলুটা বড্ডো হাঁ করা। বিকেলবেলায় বড়ো মামার হাত ধরে নীলু নদীর ধারে বেড়াতে যেতো। নদী একটা নয় দুটো। কাঠজুড়ি আর মহানদী। নদীগুলির ধারে মন্দির। পুণ্যার্থীরা ঝুলন্ত ঘন্টার দড়ি ধরে টান দিলে ঘন্টার শব্দ মন্দিরে এবং বাইরে নদীর ধারে ছড়িয়ে পড়তো। পাথরের ধবল ষাঁড় হাঁটু গেড়ে বসে আছে, মহাবীরের লাল টকটকে মূর্তি এবং নদীতে খড়বোঝাই নৌকো ভেসে যাচ্ছে এ সব নীলমণির স্পষ্ট মনে আছে।

মাঝ রাতে নীলমণির ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। কাঁচের শার্সি দিয়ে রাস্তার হাল্কা আলো বিছানায় এসে পড়েছে। ফ্যান মোটে এক পয়েণ্টে ঘুরছে। বিছানার পাশেই চৌকো টেবিল। সেখানে কয়েকটা ওষুধের শিশি, এক জাগ্ জল, সিগারেট দেশলাই। পেপার ওয়েট চাপা কয়েকটা চিঠিপত্র, একটা কলম, খুচরো পয়সা আর অ্যাশট্রে। নীলমণির মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পায়ের দিকের দরজা খোলা। ছাই রঙের ভারি পর্দাটা দেওয়ালের মতন স্থির। নীলমণি বিছানা থেকে নেমে ঘরের আলো জ্বালল। তারপর বারান্দায় যায়। বারান্দায় একটা চেয়ার পাতা থাকে। সে চেয়ারে বসে প্রথমেই দেখলো রাত্তিরের আকাশ। তারা নেই চাঁদ নেই এ কেমন আকাশ? আকাশ জুড়ে মেঘ। অসহ্য গুমোট। ঘরে ফ্যানটা ঘুরছে। তার কপালে ঘাম, মাথার পাতলা চুলে ঘাম, গেঞ্জিও ঘামে ভিজে গেছে। রগের দুপাশ দপ্‌দপ্ করছে। নীলমণি আবার ঘরে ফিরে এল। ওষুধ খেল। বুঝতে পারল আজ আর তার ঘুম আসবে না। একটানা ছ' সাত ঘণ্টা ঘুম সে আজ কতোদিন ঘুমোয়নি। নীলমণির মেরুদণ্ড দিয়ে আস্তে আস্তে স্থায়ী ভয়টি উঠে আসে। ক্রমশ তার শরীরের কলকব্জাগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে গেল। পারল না। স্বয়ং ডঃ মিত্র নীলমণির কানের কাছে যেন মুখ এনে নিষেধ করলেন, 'না, আর সিগারেট খাবেন না নীলমণিবাবু।' দেওয়াল আয়নার দিকে মুখ তুলল সে। তার মাথার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকনো, বোঝাই যায় সে চশমা ব্যবহার করে। নাকের নিচে পেন্সিলের দাগের মতন অতি মিহি গোঁফ। ঘরের আলো পাখা অফ্ করে সে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখন আকাশ কিছুটা পরিষ্কার। এখানে ওখানে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে। আকাশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে নীলমণির মনের একটা সম্পর্ক আছে। আকাশের মেঘ কিংবা ঝড় তাকে বিপন্ন দুঃখী আর বিরক্ত করে। সব সময় আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক এটা সে চায়। এ ছাড়া অতিরিক্ত শীতও নীলমণিকে অপ্রসন্ন করে, বিরক্ত করে। সত্যি কথা বলতে কি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে ঝড়ে শীতে তার কান্নাই পায়। নীলমণির মনে হয় এই সব আবহাওয়া খুব তাড়াতাড়ি তাকে শেষ করে দিতে পারে।

ডঃ মিত্র নীলমণিকে শুয়ে পড়তে বললেন। নীলমণি সেই অপরিসর শয্যাটিতে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকাল। কড়িকাঠের ঝুল কতোদিন ঝাড়া হয়নি? পার্টিশানের ওপাশে কম্পাউণ্ডারবাবু ওষুধ তৈরি করছেন। ডঃ মিত্র নীলমণির তলপেটে ব্যথাকে খুঁজতে শুরু করলেন। 'লাগছে?' ডঃ মিত্র প্রশ্ন করেন। প্রত্যুত্তরে ঘাড় নাড়ে নীলমণি। অতঃপর তিনি নীলমণিকে জিব দেখাতে বললেন। ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে সে জিবটা অ্যা অ্যা করতে করতে দেখায়। ডঃ মিত্র ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁর হাতে একটা পেন্সিল টর্চ। টর্চের আলো নীলমণির মুখের ভেতর। টন্‌সিল, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত, অপরিষ্কার জিবের দিকে মনোযোগী দৃষ্টিতে ডঃ মিত্র তাকিয়ে

প্রশাসনিক কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে তাঁর পক্ষে এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তাঁর ওপর চাপের মত হয়ে দাঁড়ায়, কখনও যা পীড়ন।

*

আমরা আশা করেছিলাম, বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয়, যাকে বলা হচ্ছে 'ফোকাল থিম', তার ওপর বিজ্ঞানীরা আগ্রহ নিয়ে বিষদ আলোচনা করবেন বেশী। এ কথা কেউ বলবেন না, স্বাধীনতার পর দেশের বিজ্ঞানীরা ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। বরং গত তিরিশ বছরে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি ঘটেছে তা দেখে পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশ রীতিমত স্তম্ভিত। ফ্যাসাদ এই। বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটলেও জনসাধারণের যতটা উপকার হওয়ার কথা তুলনায় তা যেন বড়ই কম।

কেন কম? সুখের কথা 'ফোকাল থিম' শীর্ষক কিছু কিছু অধিবেশনে সে সম্পর্কে নানা রকম সমস্যা এবং তাদের সমাধানের উপায় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হল এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে। যেমন ধরুন এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব সম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু তাঁর 'বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান'-এর ওপর বক্তৃতায়। অধ্যাপক বসুর বক্তব্য : স্বাধীনতার পর থেকে গত তিরিশ বছর আমরা ভারী শিল্প এবং অতিকায় অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছি সবচেয়ে বেশী। যাঁরা পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন কম তাঁদের জন্যে, যাঁদের স্থান লাঙলের পেছনে, যন্ত্রের পশ্চাৎভূমি যারা তাঁদের প্রয়োজনে। দীর্ঘ তিরিশ বছর শিক্ষাখাতে যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয়েছে শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষায়। যে শিক্ষা লাভ করেছে একমাত্র মধ্য এবং উচ্চবিত্তের ছেলে-মেয়েরা, যাদের বাস শহরে। ভারতের ষাট কোটি মানুষের মধ্যে ৪৩ কোটিরই বাস গ্রামে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে কতটুকু উপকৃত হয়েছেন তাঁরা? কলেজে পড়িয়ে আমরা প্রযুক্তিবিদ তৈরি করেছি দশ লক্ষ। তুলনায় গ্রামের টিউবওয়েল বা অনুরূপ যন্ত্রপাতি মেরামতের মত কত জন দক্ষ মিস্তিরি তৈরি করতে পেরেছি আমরা?

অধ্যাপক বসু পরিচালিত এক আলোচনা সভায় গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল দেখলাম। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন কৃতী শিক্ষা বিজ্ঞানী। তাঁদের বক্তব্য, কয়েকটি মৌলক্ষেত্র, যেমন সেচ, মাটি পরীক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মানুষকেই প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। স্কুল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতিকে সুষ্ঠু-ভাবে গঠন করে এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে হবে।

ফোকাল থিমের উপর আর যে সব আলোচনাচক্র বসেছিল তাদের পরিচালনা করেন শ্রী আর বি চক্রবর্তী, অধ্যাপক এস ভি কালে, অধ্যাপক হৃষীকেশ রানা, ডঃ বি কে বেহুরা, ডঃ এ বি দাশ-গুপ্ত প্রভৃতি। ভূগোল, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা অথবা চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে জনশিক্ষা প্রসারিত করা যায়, বক্তারা এই সব অধিবেশনে বিভিন্ন দিক থেকে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সব আলোচনা সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। দেখে-শুনে এটাই মনে হয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমরা কি পুঁথিগত বিজ্ঞানীর সংখ্যাই বাড়িয়ে যাচ্ছি? যাঁরা সুবোধ বালকের মত পুঁথির মধ্যেই বাস করেন শুধু, যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং তৎপরতা বিজ্ঞানকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ করে তুলতে পারে যাঁদের মধ্যে তাদের একান্তই অভাব?

অনেক বিজ্ঞানীর মন্তব্য, আমাদের দেশে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীর অভাব নেই। অভাব সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং যথা-যথ কাজের ব্যাপারে মূল্যবোধ। ফোকাল থিমের ওপর আলোচনাচক্রে [illegible] বিজ্ঞানীর অনুপস্থিতির এটাই অন্যতম কারণ।

কয়েকজন বললেন, মশায়, আমাদের কাজ গবেষণা করা। প্রশাসনে বা পরিচালনায় বেশি মাথা ঘামালে, গবেষণার কাজ মার খাবে না কি? এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। তবে দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই হয়ত যথেষ্ট হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। গবেষণা, প্রশাসন এবং পরিচালনায় তাঁরা যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার পরও কি ওই কথা বলা চলে?

*

'বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের কার্য-সূচীর পরিবর্তন দরকার।' এ মন্তব্য অনেকের। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু মনে হয়েছে পরি-বর্তন হয়ত এইভাবে আনা যেতে পারে।

এক। তথাকথিত অ্যাকাডেমিক আলোচনার নাম করে বিভিন্ন বিভাগের সভায় যে সব পেপার পড়া হয়, সেটা বন্ধ করা হোক। এ কাজ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমিতির ব্যবস্থাপনায় আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সারা যেতে পারে। এতে করে পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ বেশি করে পাওয়া সম্ভব।

দুই। বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রতিদিন একটি অথবা দুটি সাধারণ সভার ব্যবস্থা করা হোক। কোনটি পদার্থ বিজ্ঞানের সভা, কোনটি প্রাণী বিজ্ঞানের সভা, ইত্যাদি। এই সভায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্ত প্রতিনিধির যোগ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। সভার জন্যে তৈরি করা হবে বক্তার প্যানেল। মোট চার বা পাঁচ জন বক্তা থাকবেন এই প্যানেলে। এঁদের কাজ হবে স্লাইড বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে গত এক বছরে সারা দেশে এক একটি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে যে সব উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে তা রিপোর্ট করা। দরকার হলে প্রসঙ্গক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম যে সব গবেষণা হয়েছে তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে করে বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানী নিজের এবং অপর ক্ষেত্রে কি কি ঘটছে সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবরাখবর পেতে পারেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রই এখন একক অদ্বিতীয় নয়। ইনটার-ডিসিপ্লিনারি। একের সঙ্গে অপরের যোগ নিবিড়। অতএব এ ধরনের সভায় অনেকে লাভবানই হবেন।

আর একটা দিক। শুধু জনসাধারণই নয়, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশে কোথায় কি হচ্ছে, কতটা অগ্রগতি, অনেক বিজ্ঞানীও সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন কম। এই অধিবেশন সেই অভাব দূর করতেও সাহায্য করবে। যা অজ্ঞতাজনিত হীনমন্যতা দূর করার ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে।

তিন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রকল্পের ওপর রাজনীতিবিদরা অনেক সময় এমন এমন মন্তব্য করেন যা শুনে বিজ্ঞানীরাই যে শুধু অসন্তুষ্ট বা বিভ্রান্ত হন তা নয়, জনসাধারণও বিভ্রান্ত হয়। দেশের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সমিতি হিসেবে এ সব ব্যাপারে স্বচ্ছ অবস্থাটি যাতে তুলে ধরা যায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁদের সাধারণ অধিবেশনে তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

চার। বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণা, কর্মসংস্থান প্রভৃতির ব্যাপারে এখনও সমস্যার অন্ত নেই। আমরা বলছি, যে সব বিজ্ঞানী বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরা দেশে ফিরে আসুন। অনেকে এসেওছেন। এবং অনিশ্চিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এঁদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারেও আলোক-পাত করতে পারে বিজ্ঞান কংগ্রেস। এতে সরকারও লাভবান হতে পারবে। বিজ্ঞানী সমাজেও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজ সহজতর হবে।

সমরজিৎ কর

গৃহ-ভারতীতে শরৎচন্দ্র

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে গৃহ-ভারতীর কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

ভাগলপুর শহরের মাইল ষোলো দক্ষিণে একটি গ্রাম আছে—নাম রামচন্দ্রপুর। স্থানীয় লোকদের ভাষায় 'রামচনপুর'। ভাগলপুর থেকে সেখানে যাবার দুটি পথ আছে। একটি পথে ষোলো মাইল হেঁটে বা গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়। মাইল তিন-চার ছাড়া সমস্তটাই কাঁচা রাস্তা, এক হাঁটু ধুলো। মধ্যে একটা স্বচ্ছ জলের ছোট নদীও পড়ে। বর্ষার ছাড়া অন্য সময়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। অন্য পথটি ভাগলপুর থেকে বৌঁসী যাবার পাকা সড়ক 'বাস' চলে। মাইল দশেক বাস-এ গিয়ে জগদীশপুর নামতে হয়—সেখান থেকে উত্তর-মুখে মেঠো রাস্তা ধরে মাইল ছয়েক হাঁটতে হয় বা গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়। এই দিক দিয়ে রামচন্দ্রপুরে যাবার আর একটি উপায়ও আছে। ভাগলপুর স্টেশন থেকে মন্দার হিল-এর ট্রেনে চড়ে টিকানি স্টেশনে নেমে মাইল ছয়েক মেঠো রাস্তায় উত্তর মুখে হেঁটে বা গোরুর গাড়ীতে গেলে রামচন্দ্রপুরে পৌঁছনো যায়।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভাই অঘোরনাথ ১৯০৬-৭ সালে রামচন্দ্রপুরের কাছে শ'খানেক বিঘে ধান জমি কেনেন। অঘোরনাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথ (শরৎচন্দ্রের মণিমামা) এই জমি দেখাশোনা করতেন। সে সময়ে তিনি নিজে ত মাঝে মাঝে সেখানে যেতেনই—কখনো কখনো শীতকালে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী সুদ্ধ সকলকে সেখানে নিয়ে যেতেন এবং সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ভাগলপুরের বাড়ীতে ফিরে আসতেন। উদার অনন্ত নীল আকাশের নীচে দিগন্তপ্রসারী বিশাল উন্মুক্ত মাঠ। দূরে দূরে কিছু কিছু গাছপালা দেখা যায়। এখানে ওখানে দু-একটা অশত্থ কিংবা বটগাছ চোখে পড়ে। গ্রামবাসীদের বাড়ীগুলি মাটির, ছাউনি খড়ের। আশেপাশে কাছে দূরে আরো গ্রাম অছে, বাড়ীগুলি দেখা যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি শীর্ণ নদী বয়ে চলেছে ঝির ঝির করে; বর্ষার গেরুয়া রঙের জলের ঢল নামে সেই নদীতে। জায়গাটির এক এক ঋতুতে এক এক রকম রূপ।

মণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মেজভাই সুরেন্দ্রনাথের ওপর এই ধান জমি দেখাশোনার ভার পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীপন্থী। তাঁর দুঃসাহসিকতাও ছিল একটু বেশী। ভাগলপুরের স্বনামখ্যাত আইন ব্যবসায়ী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী ছেলে-মেয়েদের জন্যে তাঁর বাবা ও মা'র নামে পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—ছেলেদের জন্যে দুর্গাচরণ এম ই স্কুল আর মেয়েদেব জন্যে মোক্ষদা গার্লস স্কুল। দুর্গাচরণ এম ই স্কুলকে বাংলা স্কুল বলা হত। শরৎচন্দ্র এক সময়ে এই স্কুলে পড়েছিলেন। যখনকার কথা বলছি তখন সুরেন্দ্রনাথ এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পরে তিনি তাঁর স্কুলে চরকা কাটার ক্লাশ খোলেন, তাঁত বসান, এবং দেশলাই তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গানের দুটি পঙ্‌ক্তি মনে আসছে : মধুগুঞ্জন মনোরঞ্জন কমলার প্রিয় সাথী/চরকা তোমারে যেই রাখে ঘরে, দুয়ারে বাঁধে সে হাতী। ইংরেজ শাসকদের তখন রক্তচক্ষু ও উগ্রমূর্তি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভ্রুক্ষেপ করেননি। গান্ধীজী সে সময়ে একাধিকবার ভাগলপুরে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।*(১)

কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ রামচন্দ্রপুরে গিয়ে বসবাস ও চাষবাস করার সংকল্প করেন এবং সেখানে গ্রাম থেকে একটু তফাতে, কাঁচা ইটের একটা বাসযোগ্য বাড়ী তৈরী করিয়ে একদিন ভোরে ভাগলপুরের বাড়ী থেকে সপরিবারে গোরুর গাড়ীতে করে রামচন্দ্রপুরে চলে যান।

সুরেন্দ্রনাথের অনেক পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে একটি হল—'গৃহ-ভারতী' নামে রামচন্দ্রপুরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এ কাজে তখন তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন স্বার্থলেশহীনা এক ভদ্রমহিলা, নাম মনোরমা রায়। তিনি মোক্ষদা গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস ছিলেন। সে-কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি গৃহ-ভারতীতে যোগ দেন।

গৃহ-ভারতীর আর একটা পরোক্ষ পরিচয়ও আছে। বিপ্লবীদের আত্মগোপনের আদর্শ স্থান ছিল গৃহ-ভারতী। তখনকার বাংলার বেশ কিছু বিপ্লবী গৃহ-ভারতীতে গিয়ে দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকতেন। মনে আছে, শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্যকে আমি একবার গৃহ-ভারতীতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সম্ভবত কোনো বিপ্লবীর সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে গিয়েছিলেন। * কোনো কোনো সাহিত্যিকও সেখানে গিয়ে থেকে এসেছেন। 'কালি-কলমে'র সম্পাদক মুরলীধর বসু তাঁদের মধ্যে একজন।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের (রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বেদানন্দ) মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। স্থান পরিবর্তনে তাঁর শোক কিছু প্রশমিত হতে পারে এই ভেবে সুরেন্দ্রনাথ সামতাবেড়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গৃহ-ভারতীতে নিয়ে আসেন।

আমি তখন ভাগলপুরে আমাদের বাঙালীটোলার বাড়ীতে (শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী) থাকি। সুরেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে আমি তাঁদের আসবার দিন সকালে ভাগলপুর স্টেশনে গেলাম। হাওড়ার গাড়ী এল। একটি সেকেন্ড ক্লাশ কামরা থেকে শরৎচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ নামলেন। শরৎচন্দ্রের হাতে একটা ছোট গড়গড়া, তাতে বেত দিয়ে বোনা একটা ছোট সটকা লাগানো। দেখলাম, শরৎচন্দ্রের সফরের সঙ্গী তাঁর ভোলা চাকর তাঁর সঙ্গে আসেনি।

আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে প্রথম যে কথা সেদিন আমাকে বলেছিলেন তা আমার আজো পরিষ্কার মনে আছে।

তিনি বললেন—ছোড়দার ছেলে 'পাপি'কে গুলি করে মারলে, আর তোরা কিছু বললি না?

তাঁদের ছোড়দা ছিলেন শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ ওরফে রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোড়দা শরৎচন্দ্র মজুমদার এবং আমাদের প্রতিবেশী। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এলে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং দু-জনে গল্প গুজবও বহুক্ষণ হত।

পাপি ছিল আমাদের বাড়ীর কুকুর—সাধারণ দেশী কুকুর, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। ভাগলপুরে এলে শরৎচন্দ্র পাপিকে খুবই আদর-যত্ন করতেন; তাকে সাবান মাখিয়ে স্নান করাতেন, দু-বেলা নিজের খাওয়ার পর তাকে নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতেন। পাপিও তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেত না, দিন-রাত তাঁর কাছে কাছেই থাকত। পাপিকে কেউ বকলে বা মারলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পাপির অযত্ন-অনাদরও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। এই নিয়ে তাঁর কাছে আমরা অনেক বকুনি খেয়েছি। তাঁব সেই আদরের পাপির মৃত্যু হয়েছে বন্দুকের গুলিতে, এ খবর শুনে অবধি তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। খুব সম্ভবত ট্রেনে আসতে আসতেই তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে এই দুঃসংবাদ শোনেন—কেননা তখনো পর্যন্ত তাঁর খুবই উত্তেজিত অবস্থা।

তাঁর অভিযোগের উত্তরে আমি বললাম—আমরা কি বলব বলুন?

তিনি বললেন—আমি সেখানে থাকলে আমার রিভলবার নিয়ে গিয়ে তাকেই গুলি করে মারতাম।

তিনি প্ল্যাটফর্মে অশান্তভাবে পায়চারি করতে করতে তামাক খেতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পায়চারি করার পর তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দু চোখে জল। বললেন—কি করেছিল পাপি?

—ওদের কম্পাউন্ডে ঢুকেছিল।

—ব্যস্? এই অপরাধে তাকে গুলি করে মারলে?

—হ্যাঁ

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি বললেন—তারপর? তাকে শকুনিতে খেলো?

—না। খবর পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম। পাপি তখন মরে গেছে। তাকে নিয়ে এসে আমরা গঙ্গার ধারে মাটি চাপা দিলাম।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সুরেন পাপিকে রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ?

সেখান থেকে পাপি পালিয়ে এল?

—হ্যাঁ, সেইদিনই, ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে

তিনি উৎসুক হয়ে জিগেস করলেন—কি রকম?

আমি বললাম—ভোরবেলা মেজকাকা তাকে দড়ি দিয়ে গোরুর গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গেলেন। পাপি কিছুতেই যাবে না—দড়ি টানাটানি করে, কেঁদে-কেটে, চেঁচামেচি করে নানাভাবে আপত্তি জানাতে লাগল। তবু তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হল—মেজকাকা বললেন, সেখানে একটা কুকুরের দরকার। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পাপি আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় ছিল। ভাগলপুরের বাড়ীটা সে আগলাতো। তার ভরসায় বাড়ীর সদর দরজা খোলাই থাকত, সেটা লাগাবার কথা আমাদের মনেই পড়ত না। যেদিন ভোরে মেজকাকা তাকে নিয়ে গেলেন, সেইদিনই সন্ধ্যার পর আমরা সবাই খেতে বসেছি। পাপি নেই, কারুরই ভাল লাগছে না। হঠাৎ ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে ঝড়ের মত পাপি এসে উপস্থিত। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা, এখানে ওখানে অন্য কুকুরের কামড়। বাড়ী পৌঁছে আনন্দে সে পাগলের মত লাফালাফি চেঁচামেচি করতে লাগল। মা বললেন—ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে। আহা, সারাদিন হয়ত কিছু খেতে পায়নি। ওকে আগে খেতে দি। পরে শুনলাম—সত্যিই তাই। রামচন্দ্রপুরে পৌঁছে ওর বাঁধন খুলে দিতেই ও বাড়ী মুখো ছুটতে শুরু করে। এক চুমুক জল পর্যন্ত সেখানে খায়নি। ওঁরা অনেক ডাকাডাকি করেছেন—ও ফেরেনি। ষোলো মাইল পথ চিনে, অন্য কুকুরের কামড় খেয়ে ঠিক বাড়ী ফিরে এসেছে।

চোখের জল সামলে শরৎচন্দ্র বললেন—কত ভাল কুকুর ছিল পাপি দেখছিস? তাকে গুলি করে মেরে ফেললে? মানুষ এমন পারে?

মন্দার হিল-এর ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল। গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ সে গাড়ীর সেকেন্ড ক্লাশ কামরায় তাঁদের জিনিসপত্র তোলাচ্ছিলেন।

আমি শরৎচন্দ্রকে বললাম—আপনি সোজা রামচন্দ্রপুরে চলে যাচ্ছেন। আমাদের বাঙালীটোলার বাড়ীতে ত আজকের দিনটা থাকতে পারতেন। আপনার অত প্রিয় গঙ্গা ত এখনো বাড়ীর পাশ দিয়েই বইছে।

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—নারে, বাড়ীতে গিয়ে পাপিকে দেখতে পাব না, সে ভারি কষ্ট হবে।

সুরেন্দ্রনাথ এসে বললেন—চল শরৎ, গাড়ী এবার ছাড়বে।

* (১) গান্ধীজীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন তার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি ছিল—গুর্জর দেশ রতন প্রদীপ সারা দুনিয়ার আলো/মসী মাখা এই আঁধার আকাশে অমলিন দীপ জ্বালো।

* অবশেষে পুলিশ একথা জানতে পেরে একদিন আচমকা গৃহ-ভারতীতে হানা দেয়। রক্ষে যে তখন কোনো বিপ্লবী সেখানে লুকিয়ে ছিলেন না।

গার্ড সাহেব যাচ্ছিলেন তাঁর কামরার দিকে। শরৎচন্দ্র বললেন—মিস্টার গার্ড, আমি সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার, টিকানি স্টেশনে নামব। সংগে জিনিসপত্র অনেক আছে—গাড়ী একটু বেশীক্ষণ থামিও।

গার্ড সাহেব সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। গাড়ীতে উঠে বসে শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন, তুই কবে আসছিস ?

—কাল

গাড়ী ছেড়ে দিল।

শরৎচন্দ্র যখন গৃহ-ভারতীতে গিয়েছিলেন, গৃহ-ভারতীর তখন সবেমাত্র শৈশবকাল চলেছে। সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনার প্রায় কিছুই তখনো রূপায়িত হয়নি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রামচন্দ্রপুর ও তার আশ-পাশে গ্রামের যে পরিবেশ ছিল, সেই পরিবেশে, অল্প সময়ের মধ্যে, সেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা খুবই কঠিন ছিল। অর্থ-বল থাকলে হয়ত কিছুটা অগ্রগতি করা সম্ভব হত ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের তা ছিল না। উপরন্তু, শিক্ষার ব্যাপারে সেখানকার গ্রাম্যমানুষ তখনো প্রায় উদাসীন মনোভাবাপন্ন ছিল। কাজেই সুরেন্দ্রনাথের গৃহ-ভারতীর অগ্রগতি মন্থর হওয়া অস্বাভাবিকও নয়, আশ্চর্যেরও নয়, সেখানকার অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী ও একান্তভাবে কৃষি নির্ভর এবং চরম দরিদ্র। চাষবাস ছাড়া জগতে যে আর কিছু করবার আছে বা থাকতে পারে, তা তাদের চিন্তায় আসত না। পুরুষ পরম্পরায় তারা চাষ-বাসের কাজই করে আসছিল। তাদের ধারণা ছিল, লেখাপড়ার ব্যাপারটা শহুরে বাবুদের জন্যে, তাদের জন্যে নয়। তাদের কাজ কেবল চাষ করা। ফসল ভাল হলে খাওয়া, না হলে পেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা। তাছাড়া ছিল তাদের নানা রকম কুসংস্কার। পাহাড়ের মত বিপুল পরিমাণ এই উদাসীনতা ও কুসংস্কারের মধ্যে দিয়ে পথ করে তাদের হৃদয়ে পৌঁছতে সময় লাগার কথা। সুরেন্দ্রনাথ সেই চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছিলেন। গুটিকয়েক ছেলে গৃহ-ভারতীতে পড়তে আসত। তাদের ভাষা ছিল গ্রাম্য হিন্দি ; সুতরাং সে ভাষায় তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র অবশ্য গৃহ-ভারতীর অগ্রগতি দেখতে সেখানে যাননি। তিনি কি জন্যে সেখানে গিয়েছিলেন সেকথা আগে বলেছি।

তিনি গৃহ-ভারতীতে যাবার পরদিন সকালে আমি সেখানে পোঁছে দেখি, হাতের শূন্য জল-পাত্রটা টুং টাং করে বাজাতে বাজাতে এবং গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে তিনি মাঠ থেকে ফিরছেন। সেখানে মাঠে প্রাতঃকৃত্য সারতে হত।

সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে রবি আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে বললাম—শরৎদা ত বেশ খুশী দেখছি, রবি ?

রবি বললে—হ্যাঁ, এখানে এসে ওঁর মন বেশ ভালই আছে। জায়গাটা ওঁর ভাল লেগেছে। কাল টিকানি স্টেশন থেকে ছ' মাইল পথ হেঁটেই এসেছেন, যদিও ওঁর জন্যে গোরুর গাড়ীর ব্যবস্থাও ছিল। উনি বললেন—গোরুর গাড়ী কি হবে ? এ-টুকু পথ আমি খুব হাটতে পারব। সত্যিই, স্বচ্ছন্দে হেঁটে এলেন। এখানে এসে সব ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন—বাঃ, বেশ খোলামেলা জায়গা ত! কুকুর পুষেছিস ? নইলে পাগলা শেয়ালে কামড়াবে যে।

আমি হেসে বললাম—প্রথমেই কুকুরের খোঁজ ?

রবি বললে—হ্যাঁ। চারটে কুকুর আছে শুনে খুব খুশী। কাল দু-বেলাই নিজের খাওয়ার পর তাদের ডেকে ডেকে খাওয়ালেন।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে এসে পোঁছলেন।

আমাকে বললেন—এসেছিস্ ? কখন্ বেরিয়েছিলি ?

বললাম—আলো ফোটবার আগে

—হেঁটে এলি ?

—হ্যাঁ।

—গাড়ীতে এলি না কেন ?

—গাড়ী অনেক দেরীতে ছাড়ে, পোঁছতে দেরী হয়ে যেত।

—যা, চা-টা খেগে যা।

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রবি বললে—শরৎদা কয়েতবেলতলায় বসে লিখবেন।

—কয়েতবেলতলায় কেন ?

—জায়গাটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে, বলেছেন—ঐখানেই ওঁর বসবার ব্যবস্থা করে দিতে।

বাড়ী থেকে শ'খানেক গজ দূরে কয়েকটা কয়েতবেল গাছে ঘেরা খানিকটা জায়গা ছিল। জায়গাটি নির্জন ও মনোরম। শরৎচন্দ্রের তাই ভাল লেগেছিল জায়গাটি।

আমি বললাম—ওঁর ত মুহুর্মুহু চা আর তামাক চাই। তার কি ব্যবস্থা হবে ? ও'র ভোলা চাকর ত আসে নি এবার।

রবি বললে—গোরাকে (রবির পরের ভাই) উনি তামাক সাজতে শিখিয়ে দিয়েছেন। গোরা তামাক সাজবে। আমরা বাড়ী থেকে চা নিয়ে যাব।

যতদূর মনে পড়ে শরৎচন্দ্র সে সময়ে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব লিখছিলেন। মনে হয় তাঁর কমললতার জন্ম গৃহ-ভারতীর সেই নির্জন ও মনোরম কয়েত-বেলতলায়। তিনি সেখানে থাকতে আমি আরো কয়েকবার গৃহ-ভারতীতে গিয়ে দেখেছি, সেই কয়েতবেলতলায় মাদুর পেতে বসে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে তিনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন।

শরৎচন্দ্র গৃহ-ভারতীতে মাসখানেকের ওপর ছিলেন। বিপ্লবীদের আনাগোনা তখনো সেখানে শুরু হয়নি। স্থানীয় গ্রাম্য লোকদের আসা-যাওয়া অবশ্য লেগেই থাকত, কিন্তু সেটা সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্রের আকর্ষণে নয়, বাঙালীবাবুদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে তাদের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। শরৎচন্দ্র কে এবং কি' তাঁর মূল্য, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাদের ছিল না, থাকবার কথাও নয়। বাইরে থেকে যাবার মধ্যে আমি যেতাম আর যেতেন আমাদের একজন ভগিনী-পতি প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি সে সময়ে সাবোরে ছিলেন। সাবোর রামচন্দ্রপুরের মাইল সাতেক উত্তরে অবস্থিত। পরিষ্কার দিনে গৃহ-ভারতী থেকে সাবোর কলেজের গম্বুজ দেখা যেত। প্রফুল্লকুমার শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শরৎচন্দ্রও তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। 'ভুলের বোঝা' নামে প্রফুল্লকুমারের একখানি ছোট গল্পের বই শরৎ-চন্দ্রের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বছর তিন-চার আগে শরৎচন্দ্র একবার ভাগলপুরে এলে প্রফুল্লকুমার তাঁকে আমন্ত্রণ করে সাবোরে নিয়ে যান এবং সেখানে এক সভায় সেখানকার বিশিষ্ট বাঙালীরা শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এবারেও প্রফুল্লকুমারের ইচ্ছে গৃহ-ভারতী থেকে শরৎচন্দ্রকে একদিন তিনি সাবোরে নিয়ে যাবেন। সে ইচ্ছে প্রকাশ করে একদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—এত কাছে যখন এসেছেন শরৎদা তখন একদিন আপনাকে সাবোরে যেতে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন, সাবোরে ত আমি একবার গিয়েছিলাম। তুমিই ত আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে।

প্রফুল্লকুমার বললেন—সে ত বছর তিন-চার হয়ে গেল। আপনি এখানে এসেছেন শুনে সবাই আমাকে ধরেছে আপনাকে আর একবার নিয়ে যাবার জন্যে। আপনি রাজী হলে আমি সব ব্যবস্থা করি।

খানিকক্ষণ তামাক টানার পর শরৎচন্দ্র বললেন—আমাকে এবার বাড়ী ফিরতে হবে প্রফুল্ল। সাবোরে যাওয়া এবারে আর হবে না। আবার যদি আসি ত দেখা যাবে।

প্রফুল্লকুমার তবু চেষ্টা ছাড়লেন না, বল-লেন—সাবোর হয়েও ত আপনি হাওড়ায় ফিরতে পারেন। এখান থেকে সাবোরে গিয়ে একদিন সেখানে থেকে পরের দিন হাওড়ায় চলে যাবেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে খুব সুবিধের হবে না প্রফুল্ল। সাবোরে ট্রেন বড় কম সময় দাঁড়ায়, ভাগলপুরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। ভাগলপুর হয়ে যাওয়াই সুবিধের হবে ; সংগে অনেক জিনিসপত্তর আছে কিনা!

প্রফুল্লকুমার শেষ চেষ্টা করলেন, বললেন—সাবোরে ট্রেন যাতে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় সে ব্যবস্থা আমি করব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—না প্রফুল্ল, সাবোর এবার থাক। আমি এখান থেকেই ফিরে যাব।

শরৎচন্দ্রের জীবনযাত্রা খুবই অনাড়ম্বর ও সাদা-সিদে ধরনের ছিল। তাই অতি সহজেই তিনি গৃহ-ভারতীর জীবনযাত্রার সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। মাছ মাংস ডিম সেখানে পাওয়া যেত না, নিরামিষ খেতে হত। টাটকা শাকসবজি ফলমূলও সেখানে নিত্য পাওয়া যেত না, হাটের দিন দূরের কোনো গ্রাম থেকে বা ভাগলপুর শহর থেকে আনাতে হত। কিন্তু এ সব অসুবিধে তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। অবশ্য দুধ, দই, ঘি-এর সেখানে প্রাচুর্য ছিল। তাঁর নেশার জিনিসগুলি অর্থাৎ চা, তামাক আর আফিম ঠিকমত পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। এগুলি আনতে হত ভাগলপুর থেকে।

সকালে বেলা করে ওঠা তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। গৃহ-ভারতীতেও তাঁর সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হত না, যদিও সেখানে গাছ-পালা বাড়ীঘর না থাকায় সূর্য ওঠার প্রায় সংগে সংগেই চড়চড়ে রোদ উঠে যেত। শয্যাত্যাগ করার পর চা-তামাক খেয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এবং সামান্য জলযোগ করে তিনি সাধারণত চলে যেতেন কয়েতবেলতলায়। সেখানে বসে লিখতেন প্রায় একটা-দেড়টা অবধি। দুপুরে স্নানাহারের পর ঘুমের অভ্যাস তাঁর কোনোদিনই ছিল না। সে সময়টা সাধারণত তিনি ঘরে বসে বই পড়তেন। বিকেলে চা-এর পর একটু বেড়াতেন। সন্ধ্যায় পর চলত আলোচনা বা গল্প। গল্প বলতেন তিনি নানা রকমের—বেশীর ভাগই তাঁদের ছেলেবেলার ও রাজুর গল্প। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অনিয়মের রাজা। নিয়ম মেনে চলা তাঁর ধাতে সইত না। সেটা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। নিয়ম ভাঙ্গাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সুতরাং তাঁর গৃহ-ভারতীর দিনগুলি যে ঠিক এক নিয়মেই কাটত তা নয়। কোনোদিন হয়ত তিনি কয়েতবেলতলায় যেতেনই না, লিখতেনও না সারাদিন, কিছু গল্প করেই কাটিয়ে দিতেন সমস্তদিনটা। আবার কোনোদিন হয়ত সকাল থেকে বাগান নিয়েই মেতে থাকতেন, লেখবার পড়বার কথা মনেই পড়ত না। এক-একদিন তাঁর খেয়াল যেত গানবাজনার দিকে। সেদিন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে বসতেন, তাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শেখাতেন।

অবশেষে তাঁর গৃহ-ভারতী ছেড়ে চলে যাবার দিন এল। চোখের জলে আমরা তাঁকে বিদায় জানালাম। কুকুরগুলো অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর সংগে সংগে গেল।

ভাগলপুরেব বাড়ীতে সেবারে তাঁর যাওয়া হয়নি। তার বেশ কয়েক বছর পরে, ১৯৩৭ সালে তিনি দেওঘর থেকে শেষবারের মত ভাগলপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

গৃহ-ভারতী আজ আর নেই। গৃহ-ভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও শেষ পর্যন্ত সফলতার পথে আর এগোয়নি। এক রাত্তিরে সেখানে এক ভয়াবহ ডাকাতি হওয়ার পর পুলিসের পরামর্শে সুরেন্দ্র-নাথকে ভাগলপুরে ফিরে যেতে হয়।

গৃহ-ভারতী নেই, কিন্তু সেখানকার মাটি আর সেই কয়েতবেলতলা শরৎচন্দ্রের পূতস্পর্শ ও স্মৃতি নিয়ে অমর হয়ে আছে।

গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন

প্রাণেশ চক্রবর্তী

প্রত্যেক নদীর জন্ম গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ থেকে। আর হিমবাহের জন্ম চিরতুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ ও গিরিশ্রেণী থেকে। নদীর প্রবহমান জলধারার মত হিমবাহের বরফও সর্বদা নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তবে তার কোন স্রোত নেই, নেই কোন গর্জন। আপাতদৃষ্টিতে স্থির ও অচঞ্চল মনে হলেও হিমবাহের বরফের গতি আছে যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। বছরে অন্তত দু-তিন ইঞ্চি কি তারও কিছু বেশী এর গতিবেগ। ভূ-প্রকৃতির গঠন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর তা নির্ভর করে।

তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের ওপরে ঠিক সেখানেই হিমবাহের বরফ গলে জল হয়। ভূতত্ত্ববিদদের ভাষায় 'টার্মিনাল মোরেন' বা প্রান্তিক গ্রাবরেখায় সাধারণত সৃষ্ট হয় বরফের গহ্বর (স্নাউট)। এই গহ্বরের ভেতর দিয়ে অবিরাম গতিতে বেরিয়ে আসে অনন্ত জলরাশি। নদীর উৎসমুখ এটাই।

ভারতের প্রাণপ্রদায়িনী বিগলিত করুণা গঙ্গার উৎস হচ্ছে গোমুখ। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত উত্তরকাশী জেলায় বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র গাঙ্গোত্রী। এর বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বারো হাজার সাতশ' সত্তর ফুট উঁচুতে গোমুখের উৎপত্তি। যে বিপুল পরিমাণ জল দিনের পর দিন বছরের পর বছর অক্লেশে গঙ্গাকে জল যুগিয়ে চলেছে, সেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ হিমালয়ে অন্যতম হিমবাহ। প্রায় ষোল মাইল লম্বা এবং তিন মাইল চওড়া এই হিমবাহের দুদিকে রয়েছে অজস্র পর্বতশৃঙ্গ। এদের মধ্যে চৌখাম্বা ১, ২, ৩ এবং ৪ (উচ্চতা যথাক্রমে ২৩,৪২০ ফুট, ২৩,১৯০ ফুট, ২২,৮৮০ ফুট ও ২২,৪৮৫ ফুট) স্বচ্ছন্দ, (২২,০৫০ ফুট), খটাকুণ্ড (২১,৬৯৫ ফুট), কীর্তিস্তম্ভ (২০,৬৯০ ফুট), কেদারনাথ (২২,৭৭০ ফুট), কেদারনাথ ডোম (২২,৪১০ ফুট), মেরুপর্বত (২১,৮৫০ ফুট), অন্যতম। এই সমস্ত পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন ছোটবড় হিমবাহই আজও গঙ্গোত্রী হিমবাহকে বরফপুষ্ট করে চলেছে। গঙ্গাকে করে রেখেছে সতেজ ও প্রাণবন্ত।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ চৌখাম্বা পর্বতমালার কুড়ি হাজার ফুট উঁচু থেকে নেমেছে। প্রথম পর্বে পুবদিকে এবং পরে দীর্ঘ প্রায় সাত মাইল পথ এই হিমবাহটি দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। অপর দুটি হিমবাহ—চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও কমপক্ষে পনেরটি ছোট-বড় হিমবাহ পরোক্ষভাবে গঙ্গোত্রী হিমবাহ তথা গঙ্গাকে জল সরবরাহ করে চলেছে। এই হিমবাহগুলি হল—মান্দানী, স্বচ্ছন্দ, গোর্নাহিম কীর্তি, মেরু, কালিন্দী, শ্বেতা, খালিপেট, সুরালয়, সুন্দর, বাসুকি, নীলাম্বর, পিলাপানি, শ্বেতবরণ ও থেলু।

অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মতে গঙ্গার অপর্যাপ্ত জলরাশির মূলে যে শুধুমাত্র গঙ্গোত্রী হিমবাহ তা কিন্তু আসলে ঠিক নয়। হিমালয়ের অন্য আরেকটি নদী—অলকানন্দাও প্রকৃতপক্ষে গঙ্গাকে নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করে থাকে। শুধু তাই নয়, কুমায়ুন হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে সৃষ্ট আরও বহু নদ-নদী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গঙ্গার জলরাশিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এদের মধ্যে পিণ্ডারী গঙ্গা নন্দাকিনী, ধৌলী ইত্যাদি অন্যতম। অলকানন্দার উৎপত্তি অলকাপুরী পর্বতমালা ও বদ্রীনাথের অনতিদূরে সতোপন্থ হিমবাহ থেকে। এই নদীটি হরিদ্বার থেকে ঊনষাট মাইল দূরে দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে (গোমুখ থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথী নামে সুবিদিত)।
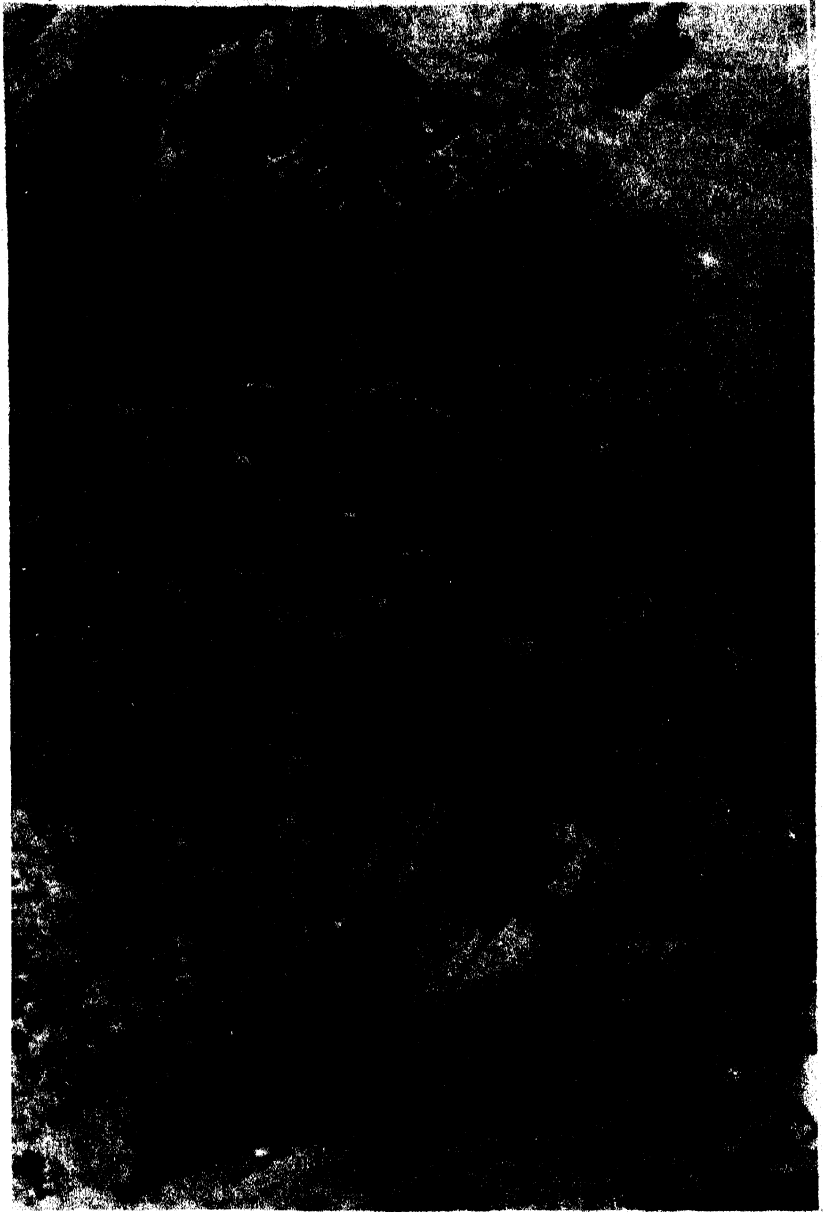
গঙ্গার উৎস গোমুখ

সে যাই হোক, ইদানীং প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় ভারতের প্রাণদাত্রী পুণ্যতোয়া গঙ্গার জল ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, যে সমস্ত হিমবাহের বরফগলা জলে পুষ্ট গঙ্গা, সেই হিমবাহগুলি নাকি তিল তিল করে শুকিয়ে যাচ্ছে। ১৯৩৯ সালে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ মিঃ জে বি অডেন গঙ্গার উৎসমুখ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন গত ত্রিশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ তখনই দু ফার্লং পিছিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা হিমবাহটি শুকিয়ে সংকুচিত হয়ে উত্তরদিকে সরে যায়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোমুখের ঠিক নিচে বর্তমান প্রশস্ত সমতল স্থানটি।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের সমীক্ষার কাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৮ সালে তিনি 'গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষা সমিতি'র সতোপন্থ শৃঙ্গ অভিযানকালে ঐ অঞ্চলে নানা রকম সমীক্ষা করেছিলেন। এই নিবন্ধের লেখকেরও সেবারে ঐ অভিযাত্রী দলে থাকার সুযোগ হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তিনি তাঁর রিপোর্ট-এ বলেছেন—গোমুখ থেকে ভূজবাসা গ্রাম পর্যন্ত আজকের প্রশস্ত উপত্যকাটি প্রকৃতপক্ষে হিমবাহেরই রূপান্তর। গঙ্গোত্রী হিমবাহ এক সময় সুদূর ঝালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সংকুচিত গঙ্গোত্রী হিমবাহ যদি গঙ্গার জল কমে যাওয়ার মূল কারণ হয়ে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গা হয়ত একেবারেই শুকিয়ে জলশূন্য হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, গঙ্গা সত্যি সত্যিই শুকিয়ে গেলে ভারতবর্ষের চেহারা কি ভয়ানক হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ডঃ মুখোপাধ্যায় বোধ করি সে কথা ভেবেই
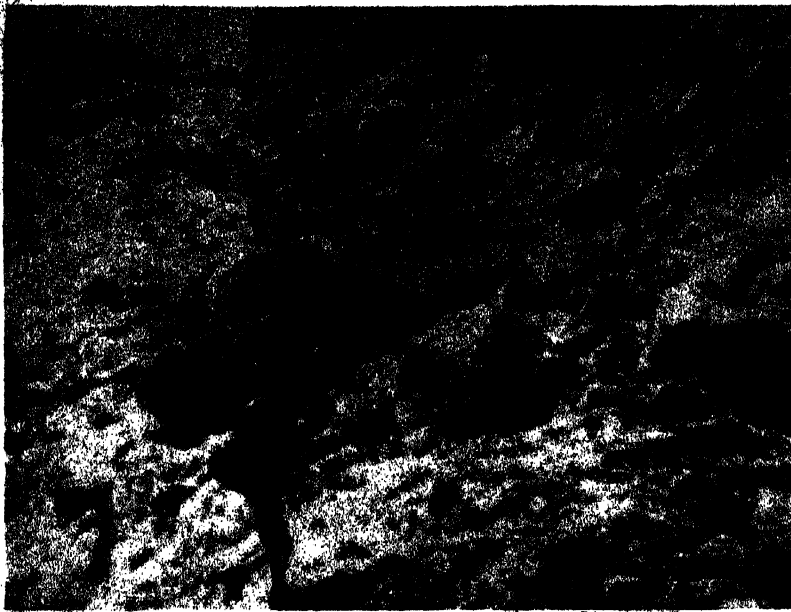
গঙ্গোত্রী হিমবাহ

তিনি তাঁর রিপোর্ট-এ মন্তব্য করে থাকবেন—মোর ওয়ার্ক শুড বী ডান অন দি জিওমরফোলজি অব দি সুককী রিজিয়ন টু আরাইভ এ্যাট এ ট্রু কনক্লুশন।........

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে অবশ্য গত কয়েক বছর ধরেই উক্ত হিমবাহ অঞ্চলে ব্যাপক সমীক্ষার কাজ চলেছে। উপর্যুপরি কয়েক বছর আমি ঐ অঞ্চলে গিয়ে লক্ষ করে দেখেছি গোমুখ ক্রমশই চৌখাম্বা পর্বতের দিকে সরে যাচ্ছে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব বারো মাইল ছিল। হিমবাহ পিছিয়ে যাওয়ায় ফলে এখন সেই দূরত্ব প্রায় সাড়ে বারো মাইল-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত পাঁচ-ছ' বছরে এই পরিবর্তন রীতিমত অভাবনীয়।

কয়েকদিন আগে নন্দাদেবী অভিযান থেকে ফেরার পথে প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক, এভারেস্ট-শীর্ষারোহী সি পি ভোরার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। তিনি বেশ কিছুদিন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—হ্যাঁ, গঙ্গার উৎস গোমুখের দ্রুত স্থান পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গোমুখের উচ্চতা ছিল বারো হাজার সাতশ সত্তর ফুট। স্থান পরিবর্তনের ফলে এখন সেটি দাঁড়িয়েছে তের' হাজার সাতশ সত্তর ফুট-এ। পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে এক হাজার ফুট পেছিয়ে পড়া রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবং তা ভাবনার বই কি!

গঙ্গার মত অলকানন্দার জলও কি কমে যাচ্ছে? এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা নেই। গঙ্গার জল সরবরাহকারী সতোপন্থ এবং অন্যান্য হিমবাহগুলিও 'রিসিড' করছে কি করছে না এবং করলে কেন করছে, তার কারণ অনুসন্ধান করা আজ একান্ত প্রয়োজন। কেন না গঙ্গোত্রী হিমবাহের মত এই সমস্ত হিমবাহগুলিও 'রিসিড' করতে থাকলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত মারাত্মক। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই প্রাণপ্রবাহিনী তাহলে হয়ত নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। সুতরাং সময় থাকতে থাকতে মানবিক কল্যাণের খাতিরেই আজ এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার।

মর্তবাসীর কল্যাণের জন্য সুধন্য তপস্বী ভগীরথ অনেক তপস্যাবলে একদিন গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে এনেছিলেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য আজ সেই গঙ্গাকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব এ-যুগের ভগীরথদের।

খেলা

খেলাধুলায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় কলকাতার পরেই বাংলার আর যে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, সেটি হল বর্ধমান। বিশ্ববিদ্যালয়টিব বয়স মাত্র সতেরো। অথচ খেলাধুলোর ব্যাপারে জন্মের পর থেকেই য়ুনিভার্সিটিটি আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ধীরে ধীরে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর বিভিন্ন বিভাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তার পরিধিও বিস্তৃত করেছে। পেয়েছে সাফল্যও। সেই সাফল্যের বর্ণনার আগে আমরা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাই। তার অতীত ইতিহাস একটু জানার চেষ্টা করি।

বর্ধমান য়ুনিভার্সিটির দুটি ক্যাম্পাস। একটি রাজবাটীতে, অপরটি গোলাপবাগে। বর্ধমানের শেষ মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি ক্যাম্পাসই দান করেন। রাজবাটী থেকে অফিসের কাজকর্ম চালানো হয়। উপাচার্য রেজিস্ট্রার প্রভৃতিও এখানে বসেন। তার পাশে একটি নতুন বাড়ি সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক আগেই দাঁড়িয়ে আছে উদয়চাঁদ উইমেনস কলেজ। তার পিছনেই রানী অধিরানী গার্লস হাই স্কুল। পর পর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ-আমলের এই সুদৃশ্য, নয়নমনোহর প্রাসাদোপম বাড়িগুলো যে-কোন আগন্তুককে আজও মুগ্ধ করে। অতীতের জীবন্ত সাক্ষী ওই সব প্রাসাদ। সেই আমলের প্রাকৃতিক পরিবেশও এখন অক্ষুণ্ণ—নানা বৃক্ষরাজির সন্নিবেশ আজও রাজবাটীর শোভাবর্ধন করছে।

গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে য়ুনিভার্সিটির পড়াশুনার কাজ চলে। মহারাজার আমলে গোলাপবাগ ছিল বাগান। বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর সেরা সেরা নানা বর্ণের গোলাপ গাছের চারা বাগানে লাগাতেন। তাই জায়গাটার নাম গোলাপবাগ। সেখানে রাজাদের একটি বাড়ি তো ছিলই, পরে য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সময় তার পাশে গড়ে ওঠে নতুন বিল্ডিং। সেখানেই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হয়। এ ছাড়া মহারাজা চারটি বড় পুকুরও দিয়ে যান, যা থেকে বছরে য়ুনিভার্সিটির বেশ কিছু টাকা আয় হয়।

বর্ধমান য়ুনিভার্সিটিতে খেলাধুলো শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। ফুটবল ও অ্যাথলেটিকসকে কেন্দ্র করেই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলো শুরু হয়। '৬৭ থেকে আরও নানা খেলায় বর্ধমান যাত্রা শুরু করে। সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় বর্ধমান এ-যাবৎ সবচেয়ে বড় গৌরব পেয়েছে ফুটবলের দৌলতেই। '৭৪-এ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা রায়পুর থেকে স্যার আশুতোষ মুখার্জী ট্রফি নিয়ে আসে। য়ুনিভার্সিটির খেলাধুলোর ইতিহাসে এত বড় কৃতিত্ব বর্ধমান আর কোন দিন অর্জন করতে পারেনি। ৭৫-এ বর্ধমান নিজের উদ্যোগে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রানার্সের সম্মান পায়। সেবার এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বর্ধমানের ফুটবলানুরাগীদের মনে বিশেষ সাড়া জেগেছিল। এবং কলকাতা ও বর্ধমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল ফাইনালে যে উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল—এই লেখক তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে কোন গৌরব না পেলেও সি এ বি পরিচালিত "অজয় ঘোষ" মেমোরিয়াল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বর্ধমান গতবার রানার্সের সম্মান পেয়েছিল। হকিতে য়ুনিভার্সিটি গত তিন বছর ধরে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু কোন গৌরব পায়নি।

'৭২-এ ভলিবলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়নের গৌরব লাভ করেছিল। '৭৩-এ ছিনিয়ে নিয়েছিল বাস্কেটবলে পূর্বাঞ্চল বিজয়ীর সম্মান। অ্যাথলেটিকসে ওদের গৌরব বুদ্ধদেব দাস ৭৪-৭৫ ও ৭৫-৭৬-এ সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে হাই জাম্পে প্রথম হয়ে য়ুনিভার্সিটির মুখ উজ্জ্বল করেছিল। এ ছাড়া ভারোত্তোলনেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গৌরবময়। টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, কবাডি প্রভৃতি খেলায় বর্ধমান এখনও পর্যন্ত উল্লেখ্য কিছু করতে পারেনি। সাঁতারটা অতি সম্প্রতি য়ুনিভার্সিটি খে[লাধ]ুলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

খেলাধুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের ভূ[মিকা] গৌণ। ওরা বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, ব্যাডমি[ন্টন] এবং অ্যাথলেটিকস ছাড়া এ যাবৎ আর কোন খে[লায়] অংশ নেয়নি। এর মধ্যে সাফল্য বলতে একব[ার] উত্তরাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল প্র[তি]যোগিতার গ্রুপ ফাইনালে উঠেছিল। এ ছাড়া অ[্যাথ]লেটিকসে মেয়েদের ভূমিকা মোটামুটি মাঝারির মধ্যে বাঁধা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫৫টি ক[লেজ] রয়েছে, যার মোট ছাত্র সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের ম[তো।] বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং হু[গলী] জেলার কিছুটা অংশ য়ুনিভার্সিটির অন্তর্গ[ত।] ৫৫টির মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫টি কলেজ প্রতি ব[ছর] য়ুনিভার্সিটির বিভিন্ন আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগ[িতায়] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মোটামুটিভাবে ফুটবল, ক্রি[কেট,] অ্যাথলেটিকস, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, ভলি[বল,] ব্যাডমিন্টন, কবাডি, হকি, ভারোত্তোলন, বডি বি[ল্ডিং] এবং সাঁতার—এই খেলাগুলি আন্তঃ কলেজ প্র[তি]যোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবার এই খেলাগু[লি] শুরু হয় জুলাই মাসে, সমাপ্ত হয় পরের বছ[র] মার্চে। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে কম-বেশী হাজার চা[র] ছাত্রছাত্রী নিয়মিত খেলাধুলোয় নিয়োজিত থাকে।

গোড়ার দিকে য়ুনিভার্সিটির খেলাধুলো চালা[তেন] বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট অফিসার। ৬৭-[তে] স্পোর্টস বোর্ড হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজি[স্ট্রার] বিভাগে কর্মরত ক্রীড়ানুরাগী প্রফুল্ল গড়াই স্পো[র্টস] বোর্ডের হয়ে খেলাধুলো পরিচালনা করতেন। [৭০] সালে স্পোর্টস অফিসার পদটির সৃষ্টি হয় এবং দীপ্তি কুমার ঘোষ সেই থেকে ওই পদে সাফল্যের স[ঙ্গে] কাজ করছেন। রাশিয়া থেকে তিনি ফিজিক্যাল এ[ডু]কেশনের স্নাতকোত্তর শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। বর্তম[ানে] দীপ্তিবাবু মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে দু-বছরের এ[কটি] ট্রেনিং কোর্স সম্পূর্ণ করতে গেছেন। বিশ্ববিদ্যাল[য়ের] ফুটবল ও বাস্কেটবলের এন আই এস কোচ রথ[ীন] ভট্টাচার্য তাঁর জায়গায় এখন স্পোর্টস অফিসারের ক[াজ] চালাচ্ছেন। রথীনবাবু এখানকার ছাত্র ছিলেন। আ[ন্তঃ] বিশ্ববিদ্যালয় খেলায় বর্ধমানের প্রতিনিধিত্বও করেছে[ন।] ৭২-এ সম্পূর্ণ সময়ের কোচ হিসাবে তিনি নি[যুক্ত]

১৯৭৪-এর সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্যার আশুতোষ ট্রফি বিজয়ী বর্ধমানের [illegible]

হন। তার আগে থেকেই য়ুনিভারসিটির স্পোর্টস বিভাগের সঙ্গে রয়েছে তার সংযোগ।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি রেজিস্ট্রার, সেখানকার স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারীও তিনিই হন। বর্ধমান য়ুনিভারসিটির প্রথম রেজিস্ট্রার-কাম-সেক্রেটারী ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলায় নতুন গতির সঞ্চার করে। বর্তমানের উপাচার্য রমারঞ্জন মুখার্জিও একজন সত্যিকারের ক্রীড়াপ্রেমী। এছাড়া অশোককুমার চৌধুরী, এখনকার রেজিস্ট্রার ভবেশকুমার গুহ প্রভৃতির ঐকান্তিক অবদানও য়ুনিভারসিটির খেলাধুলার অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এখন ফিজিক্যাল এডুকেশনের একটি কলেজ খোলারও চেষ্টা করছে।

৭৫-এ ফুটবল ছাড়াও বর্ধমান উত্তরাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ৭৩-এ পূর্বাঞ্চল বাস্কেটবল এবং ৭৪-এ পূর্বাঞ্চলীয় ও সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতাও বর্ধমানের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বর্ধমানেও খেলাধুলার সফল ছাত্রছাত্রীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় যে সব ছেলে য়ুনিভারসিটিকে সাফল্য এনে দেয়, তাদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হয় ব্লেজার। আর যারা বিভিন্ন খেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের দেওয়া হয় মনোগ্রাম্ বা সার্টিফিকেট। বর্ধমানের বেশ কিছু ছাত্র পরবর্তীকালে কলকাতায় গিয়ে বিভিন্ন খেলায় সুনাম কিনেছে। এদের মধ্যে ফুটবলে প্রথম ডিভিসনের বেশ কিছু পরিচিত খেলোয়াড়ের নাম লক্ষণ বেলেল, অমর্ত্য ঘোষ, প্রবীর ব্যানার্জি, স্বপন পলসাই, শিবু দাস, অশোক বারুই, দীপক চ্যাটার্জি প্রভৃতি। বলবার কথা, আজকের জনপ্রিয় সুরজিৎ সেনগুপ্তও বর্ধমান য়ুনিভারসিটির অধীনস্থ হুগলী মহসীন কলেজের ছাত্র ছিল।

ক্রিকেটে এবার যে ছেলেটি মোহনবাগানের প্রতিশ্রুতিবান ব্যাটসম্যান সেই প্রবাল ঘোষ বর্ধমানেরই ছাত্র। য়ুনিভারসিটির আর এক ছাত্র সতীন্দ্র নন্দী ভি জি ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার সুযোগ লাভ করেছিল।

দেবব্রত চক্রবর্তী, চপল শেঠ, সুশান্ত চ্যাটার্জি প্রভৃতি ভলিবলে বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরব দান করেছে। আবার বাস্কেটবলের উল্লেখ্য খেলোয়াড়রা হল অজয় কুন্ডু, সৌরেন কুন্ডু, আশিস বটব্যাল, হরেরাম পাল। টেবল টেনিসে য়ুনিভারসিটিকে সমৃদ্ধ করেছে সুশান্ত বক্সী, আশিস দত্ত, অপূর্ব দাশগুপ্তেরা। অ্যাথলেটিকসের গর্ব বুদ্ধদেব দাসের কথা আগেই লিখেছি। কবাডির শেখলাল, গোলাম নবী, ভারোত্তোলনের বিজয় সাহা, পর্বতারোহণের নিধি পাল প্রভৃতিরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের পথে রয়েছে অবদান। খেলাধুলায় য়ুনিভারসিটির মেয়েদের এমন কিছু কৃতিত্ব নেই, যাতে তাদের কাউকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবু এর মধ্যে অনুশ্রী পালের নামটি উল্লেখ করা যায়, অ্যাথলেটিকস ও বাস্কেটবলে যার কিছু দক্ষতা প্রতিভাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন খেলায় প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কয়েকজন ফুল-টাইম এন আই এস কোচ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ফুটবল-কাম্-বাস্কেটবলের কোচ রথীনবাবুর কথা পূর্বেই উল্লিখিত। ফুটবলের জন্য সুবোধ চ্যাটার্জি নামে আরও একজন প্রশিক্ষক আছেন। ক্রিকেটে আছেন শান্তনু দাশগুপ্ত, অ্যাথলেটিকসে আব্দুল রহিম। পুরো সময়ের জন্য না হলেও ভারোত্তোলনে পার্ট-টাইমার কোচ হিসাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্বপন ঘোষ।

য়ুনিভারসিটির একটিই মাত্র ফুটবল মাঠ আছে—তার নাম মোহনবাগান মাঠ এবং সেটি মহারাজারই দান। সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট এবং অ্যাথলেটিকস হয়। বাস্কেটবল ও ভলিবলের জন্য দুটো স্বতন্ত্র মাঠ আছে—একটি ছেলেদের, অপরটি মেয়েদের। কবাডি খেলার জন্য রয়েছে একটি আলাদা মাঠ। জিমন্যাসিয়াম হলে টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভারোত্তোলন এবং বডি বিল্ডিং হয়।

বর্ধমানের নিজস্ব কোন সুইমিং পুল নেই। অথচ দান করা চারটি বড় পুকুর বর্তমানে য়ুনিভারসিটিরই সম্পত্তি। একটি পুকুরে অবশ্য ডাইভিং বোর্ড তৈরী হয়েছে। ফুটবল মাঠে একটা কংক্রিট গ্যালারী তৈরী করে ছোটখাটো স্টেডিয়ামে পরিণত করার ইচ্ছা স্পোর্টস বোর্ডের আছে, যাতে সেখান থেকেই বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালিত করা যায়। খেলাধুলার পরিধি অনুসারে আরও একটি মাঠ পেলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা হয়।

সি এ বি পরিচালিত "অজয় ঘোষ" মেমোরিয়াল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছাড়া বর্ধমান গতবার বেনারসে সারা ভারতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত কয়েক বছর আই এফ এ শীল্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গতবার বর্ধমানও সেই ইচ্ছায় আই এফ এ-র কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ৭৮-এর শীল্ডে হয়তো বর্ধমানকে খেলতে দেখা যেতে পারে।

খেলাধুলার ব্যাপারে য়ুনিভারসিটি প্রতি বছর আশি হাজার টাকার বেশী খরচ করে। এবং কর্তৃপক্ষ খেলাধুলার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে স্পোর্টস বোর্ডের সব কাজে সাধ্যমত সহায়তা করেন। হয়তো স্পোর্টস অফিসার বোর্ডের কোন কাজে উপাচার্যের কাছে গেছেন দেখা করতে। উপাচার্যের নানা ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু স্পোর্টস অফিসারকে এতটুকুও অপেক্ষা করতে হয় না। কারণ, অনেক কাজের চেয়ে খেলাধুলাকে তিনি অগ্রাধিকার দেন তাই স্পোর্টস অফিসার কাজ করার উৎসাহ পান অনেক বেশী।

কেবলমাত্র আদিবাসীদের খেলা

প্রবীর ঘোষ

ভোর (রাত) চারটেয় উঠলাম। ট্রেন ধরতে হবে। সঙ্গে আছেন পথ-প্রদর্শক যুবক কৃষ্ণ কাজুরী। যথাসময়ে স্টেশনে এলাম। ট্রেন 'লেট'। ট্রেন এলো। সরু কংসাবতী নদীর উপর দিয়ে প্রথম এসে থামলো টামনা স্টেশনে। ট্রেন লাইন বেশ নীচুতে। দু পাশে মাঝে-মধ্যে বেশ উঁচু জমি বা মাটি। রাস্তার এক পাশে মাটির বাড়ী বেশী। খোলা বা খাপড়ার চাল। ইউক্যালিপটাস, পলাশ, শালগাছ দু-পাশে। মধ্যে-মধ্যে প্রায়-ই ছোট-বড় পাথর—মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। একদিকে কুমারী নদী। উল্টোদিকে বাগমুণ্ডি পাহাড়, তার পেছনে বিখ্যাত অযোধ্যা পাহাড়। বরাভূম স্টেশনে এসে গেলাম। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে।

নেমেই দেখতে পেলাম দূরে বড় একটি মাঠে একদল তরুণ ফুটবল খেলছেন। কিছুটা কাছে আসতেই দেখলাম, একজন নেপালী কোচ তাদের খেলাচ্ছেন, যাকে আমরা বলি প্রশিক্ষণ। পুরুলিয়ার নেহরু যুবক কেন্দ্র এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। বলরামপুর সবুজ সংঘ, মিলন সমিতি, কিরণ সংঘ, রাজস্থান ক্লাব, হিন্দ স্টুডেণ্টস্ ক্লাব, বয়েজ ক্লাব, ডি এফ সি ক্লাব এবং রয়্যাল ক্লাব এই প্রশিক্ষণে যোগদান করেছেন।

এই ক্লাবগুলির ছেলেদের সাথে কথা বলতে বলতে জানলাম, রয়্যাল ক্লাব বা বলরামপুর রয়্যাল স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশন কেবলমাত্র উপজাতি তফসিলী সম্প্রদায়ের ছেলেদের নিয়ে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ছেলেকে এই ক্লাবের সদস্য করা হবে না। এই রয়্যাল ক্লাব খেলাধুলোর জন্য পুরুলিয়া জেলায় বিখ্যাত। বিশেষভাবে ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি ও অ্যাথলেটিকস্-এ রয়্যাল ক্লাবের হেড-অফিস বলরামপুরের রাঙ্গাডিতে। হেড-অফিসের সদস্য সংখ্যা—৫৩; যার মধ্যে ৪২জন সিডিউল ট্রাইব এবং ১১জন সিডিউল-কাস্ট। এদের মধ্যে অনেকেই সাঁওতাল ও সর্দার। এই ক্লাবের ৭টি ব্রাঞ্চ বা শাখা আছে। সেই সাতটি স্থানের নাম (১) জুড়ি (২) সুপুষ্ঠি (৩) বিরামডি (৪) পাথরডি (৫) হুঁরো (৬) দোরবেড়া ও (৭) চাতরমা। এই সাতটি ব্রাঞ্চও কেবলমাত্র উপজাতি-তফসিলী সম্প্রদায়দের নিয়ে। প্রত্যেক ব্রাঞ্চে প্রায় ৭০/৭৫ জন সদস্য আছেন।

ক্লাবের সম্পাদক সুখেন্দু বিশ্বাস আদিবাসী ছেলেদের নিয়ে যৌথ সমবায় বা খামার করেছেন। প্রায় দুশো বিঘা জমি আছে রয়্যাল ক্লাবের। কিন্তু তার মধ্যে সামান্য জমিতেই চাষবাস করা হয়। বাকী জমি সব পড়ে থাকে, আর্থিক অভাবের জন্যই তাতে চাষবাস করা সম্ভব হয় না। এই জমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। সাহায্য পেলে পড়ে থাকা জমিতে এরা 'সোনা' ফলাতে পারেন; পোল্ট্রী, পিগারী, ডেয়ারী করতেও এরা প্রস্তুত বলে সম্পাদক মহাশয় জানালেন।

খেলাধুলো এদের সবচেয়ে আদরের ও প্রিয়। কেবলমাত্র খেলার জনাই এই ক্লাব, খেলার জন্য এরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন। সকালে, সন্ধ্যায় দু-বার প্র্যাকটিস করে। খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঝামেলাই নেই। এদের খুবই অভাব। নুন ভাত বা ফ্যান ভাত পেট ভরে পেলেই আনন্দ। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, জল, শীত এই সব আদিবাসী ছেলেদের কাছে কোনো বাধাই নয়। দেশ-বিদেশে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হওয়া না হওয়ায় এদের কোনো উৎসাহ-আগ্রহ নেই। এদের শরীরে প্রবল শক্তি আছে। এরা যে কোনো কাজই পারেন। বিভিন্ন ধরনের সাঁওতালী নাচ, গানও জানেন।

নিজেদের যৌথ খামারে নিজেরাই ধান, শাক-সব্জী চাষ করেন। একটি ছোট হাটও খুলেছেন এরা। উৎপন্ন ফসল বিক্রী করে জীবিকা-নির্বাহ করেন, খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম কেনেন। ছোট লাইব্রেরীও করেছেন একটা, রাত্রে সেখানে পড়াশুনা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়দের নিয়ে এই ক্লাব বলে, অনেকে তাদের অবহেলা করে, উপেক্ষা করে। এসব কথা শুনলাম, ঐ ক্লাবের-ই সাগর হেম্বরোম, শিবোরাম মাঝি, লক্ষ্মণ সিং সরদার, চন্দ্রমোহন সিং সরদার প্রমুখদের কাছে। এরা এখনও খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন না।

খেলাধুলোয় সত্যিকারের উন্নতি করতে হলে, এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম উন্নতির প্রধান সোপান—এবং এ দুটোই পূর্ব-পুরুষাগত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যমান্। এখানকার একটি মাত্র মাঠ বলরামপুর ফুলচাঁদ, উচ্চতর মাধ্যমিক (জুনিয়র কলেজ) বিদ্যালয়ের মাঠেই এই উপজাতীয় তফসিলী সম্প্রদায়রা খেলাধুলো করেন। অথচ ঐ মাঠটিকে 'সুপার মার্কেট' করার কথা হচ্ছে বলে জানালেন কথিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনচন্দ্র মাহাতো। তা যদি হয়, তাহলে এইসব গ্রামের খেলাপ্রাণ ছেলেরা খেলাধুলো করবেন কোথায়? খেলাকে বিলাসের পণ্য হিসাবে এইসব ছেলেরা গ্রহণ করেননি। এইসব উপজাতীয় তফসিল সম্প্রদায়দের প্রতি একটু সুনজর পড়লেই কিছু ভালো খেলোয়াড় সহজেই আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

পুরুলিয়ার নেহরু যুবক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই উপজাতি তফসিলী সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়। ছবিতে প্রশিক্ষক সহ তাঁদের দেখা যাচ্ছে।

পরিচ্ছন্ন ফুটবল শিল্পী হরজিন্দার সিং

কলকাতায় জাতীয় ফুটবলের প্রথম দিকের কয়েকটি খেলা দেখে অতীত দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী বলছেন পাঞ্জাবের হরজিন্দার সিংয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কোন খেলায় সে ম্যাচ উইনারের ভূমিকা নিতে পারে।

সত্যি কথাই। ভারতে বর্তমানে হরজিন্দারের মত স্কিলফুল খেলোয়াড় বেশী নেই। শুধু স্কিলফুল খেলোয়াড়ই নয়, এমন পরিচ্ছন্ন খেলা এবং শুটিং ট্র্যাপিং ও পাসিংয়ে এমন পরিমার্জন আর ক'জনেরই বা আছে? এই ধরনের ট্যালেন্টেড ফরোয়ার্ডরাই ম্যাচ উইনারের ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন আমাদের কলকাতার শ্যাম থাপা বা সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

শ্যাম ও সুরজিতের সঙ্গে হরজিন্দারের অবশ্য পার্থক্য আছে। সুরজিৎ বেশী ফাস্ট, শ্যাম বেশী পিছল। খুবই স্লিপারি। ডাইনে বাঁয় দেহ দুলিয়ে রবারের মত শ্যামের দেহটা বিপক্ষের বাধা ডিঙিয়ে কীভাবে যে বেরিয়ে যায় হদিস পাওয়া শক্ত। হরজিন্দারের প্রতিটি মুভমেন্ট কিন্তু সুপরিকল্পিত এবং পরিচ্ছন্ন। মনে হয় বল নিয়ে কী করবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। দর্শকদের সামনে সেই পরিকল্পনাটাই মেলে ধরল ফুটবলের শিল্প ও সুষমা মিশিয়ে। যেহেতু হরজিন্দার খেলে একটু ধীর লয়ে সেহেতু পায়ের কাজ এবং শটের কায়দা দর্শক চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এমনিতে কিন্তু যথেষ্ট ফাস্ট। ক্ষিপ্র গতিবেগ ছাড়া কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে হরজিন্দারের ফুটবলে গতির চেয়ে গীতির গরিমা বেশী, চমকের চেয়ে চাতুর্য লক্ষণীয়।

হরজিন্দার বাঁয়া খেলোয়াড়। অর্থাৎ বাঁ পায়েই জোর বেশী। শট, ডজ, ট্যাকল সবই করে বাঁ পায়ে। ডান পা থাকে সাহায্যকারী হিসাবে। খেলার ধারা অনেকটা অতীতের অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত খেলোয়াড় পাগসলের মত। প্রধানত বাঁ পায়ের উপর নির্ভর করে যাঁরা খেলে তাঁদের অনেকের কথাই মনে পড়ছে। অতীত দিনের নায়ার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাকিস্তানী খেলোয়াড় মাসুদ ফকরি এবং এখনকার লিংকম্যান প্রসূন ব্যানার্জী। লীগে এক মরসুমে বেশী গোল করায় নায়ার আজও রেকর্ডের অধিকারী। ফকরির পায়ে ছিল বুলেটের মত অব্যর্থ শট। প্রসূন ব্যানার্জী নিঃসন্দেহে ভারতের সবচেয়ে স্কিলফুল লিংকম্যান। এদের বাঁ পায়ে এত বেশী কাজ যে ডান পায়ের দুর্বলতা সহজেই ঢেকে দিতে পারে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, চল্লিশের দশকে একবার সরযূ কাপের ফাইনাল খেলার সুযোগ ঘটেছিল আমাদের অফিস টিমের। খেলা ছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া দলের সঙ্গে। জিওলজিক্যাল সার্ভে তখন দুর্ধর্ষ টিম। বলতে গেলে তখনকার ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের চেয়েও ছিল শক্তিশালী। কারণ জিওলজিক্যাল সার্ভের ডঃ ওয়েস্ট নামে ফুটবল-পাগল এক ডিরেক্টর মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি ক্লাবের সব নামী খেলোয়াড়দের চাকরি দিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে জড় করেছিলেন। শৈলেন মান্না, গোকুল, রবি দাস, নায়ার প্রভৃতি তখন থেকে ওখানে রয়ে গেছেন। অনেক নামী খেলোয়াড় পরে ছিটকে গেছেন এদিক ওদিকে। যাই হোক আমাদের বিরুদ্ধে জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম দল খেলেনি। খেলেছিল দ্বিতীয় দল। তবু আমরা জানতাম ওরা আমাদের আনন্দবাজার দলকে গোলের মালা পরিয়ে ছাড়বে। অবশ্য পরায়নি। বোধ হয় তিনটি গোল করেছিল। আমরা কিন্তু লড়েছিলাম কয়েঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে পণ করে। আমাদের দলেও ছিল তিন-চারজন প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, নায়ারের ডান পা তো 'কাঠের পা'। বাঁ পায়েই যত কেরামতি। সুতরাং এমনভাবে ওর বাঁ পা গার্ড করবো যাতে কিছুতেই বল নিয়ে বের হতে কিংবা শট করতে না পারে। কিন্তু আমার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল নায়ারের স্কিলের কাছে। কীভাবে যে বার বার আমাকে বোকা বানাল বুঝতেই পারলাম না। তবে বাঁ পায়ের উপরই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। সে আমাকে খেলাচ্ছিলও বাঁ পায়ে কিন্তু ছোট বড় টান ও ডজের

সঙ্গে ডান পায়ের আলতো ছোঁয়া মিশিয়ে। মনে হয়েছিল ফুটবলের জাদুকরী বিদ্যায় তার ডান পায়েরও ভূমিকা আছে। মূক অভিনেতার ভূমিকায় মত্ত।

হরজিন্দার সিংয়ের খেলার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এত কথা বলার প্রয়োজন হল। আন্দাজ করতে পারি হরজিন্দার অনেক খেলোয়াড়কে ওই নায়ার বা পাগসলের মতই ফাঁকি দেয় ডান-বাঁয়ের দ্বৈত দক্ষতায়। তবে ডান পায়ের কাজ চোখে পড়ে না। দেহের ভারটা ডান পায়ের উপর রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বাঁ পায়ের কলা-চাতুর্যে কিস্তি মাত করে। প্রয়োজনে আলতোভাবে ডান পাকে কাজে লাগায়, বেহালার হাতের কাজের মত। হরজিন্দার যেন ন্যাটা তবলচি। তবলার কাজে চমক সৃষ্টি প্রকৃতির বাহার বাঁয়ার মৃদু কাজে।

হরজিন্দারের খেলার আর এক বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে একটি বলও মারে না। একটি বলও ভুল পাস করে না। ভুল হয়তো হয়ে যায়। কিন্তু চেষ্টা থাকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে বল পাস করা। খেলার ধারা অনেকটা পাগসলের খেলার মত। পাগসলেও তার বাঁ পায়ের চাতুর্যে পুরো দলটিকে খেলাতেন। প্রয়োজনে গোল করতেন। আবার ওই ডান পা—বাঁয়া খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় কাঠের পা —সেই পায়েও গোল করতেন। অবশ্য কচিৎ কদাচিত। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে করেছিলেন।

চুনী গোস্বামীর কথাতেই আবার ফিরে আসি। এবার পাটনার জাতীয় ফুটবলে হরজিন্দার তো ম্যাচ উইনার খেলোয়াড় হতে পারেনি। হরজিন্দারই ছিল পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক। তবু, আগের সপ্তাহে লিখেছি, কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের তিনটি খেলাতে পাঞ্জাব হেরে গিয়েছিল বাংলা, গোয়া ও মহারাষ্ট্রের কাছে। এ বছরের তুলনায় গতবারের পাঞ্জাব দল ছিল বেশী শক্তিশালী। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কয়েক জন নামী খেলোয়াড়—জাগির সিং, কেশোরপাল সিং, আজাইব সিং, মানজিৎ সিং ও নন্দকিশোর এবার দলে নেই। এ বারের পাঞ্জাব দলও অবশ্য শক্তিশালী। তবু যদি বিপর্যয় ঘটে হরজিন্দারের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে না, কোন ম্যাচে যদি ভাল নাও খেলতে পারে।

হরজিন্দার জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের খেলোয়াড়। জন্ম কিন্তু চণ্ডীগড়ে। এক বর্ধিষ্ণু অভিজাত পরিবারের ছেলে। সেখানে দয়ানন্দ আয়ুর্বেদিক স্কুলে পড়ার সময় থেকে ফুটবলের নেশা। অবশ্য নেশা ধরার অন্য কারণ বাড়ির গোড়াতেই ছিল প্রকাণ্ড ফুটবল মাঠ, যেখানে খেলা দেখেছে হাঁটি হাঁটি পা-পা করার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৬৯ সালে চণ্ডীগড়ে খেলতে আসে লীডার্স ক্লাব, গুরু গোবিন্দ সিং প্রতিযোগিতায়। সেখানে ইন্দার সিংয়ের খেলা উচ্চাভিলাষী হরজিন্দারকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। মনে মনে ভাবে ফুটবল যদি খেলতে হয় তবে ওই ইন্দার সিংয়ের মতই খেলতে হবে। তখন থেকে শুরু হয় একলব্যের সাধনা ইন্দারকে গুরু দ্রোণাচার্য জ্ঞানে। হরজিন্দারের নিজের কথা :

"আমাকে ফুটবলার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার মূলে অনেকেরই অবদান আছে। যেমন এন আই এস কে পুরুষোত্তম বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন জলন্ধর স্পোর্টস কলেজে। সেখানে তালিম পেয়েছি উজাগর সিংয়ের কাছে। বিখ্যাত খেলোয়াড় জারনেল সিংয়ের জন্যই ১৯৭৩-এ যেতে পেরেছিলাম তেহরানে, এশীয় যুব ফুটবলে ভারত দলের খেলোয়াড় হয়ে। তিনি আমাকে কোচিং ক্যাম্পে যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন? নিরলস প্রশিক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন আমার কম জোরি ডান পায়ে জোর বাড়াতে। এবং আমার খেলাকে ত্রুটি মুক্ত করতে। কিন্তু আমার আদর্শ খেলোয়াড় হিসাবে মনের মধ্যে আঁকা ছিলেন ইন্দার সিং। তাঁর বল কন্ট্রোলিং, ট্র্যাপিং, ছোট একটু চাল প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেবার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি সব সময়। ১৯৭৩-এ লীডার্স ক্লাবে এসে যখন ইন্দার সিংয়ের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেলাম তখন খুব কাছ থেকেই লক্ষ করেছি কী অসাধারণ তাঁর ক্রীড়া ভঙ্গি। আমাদের লীডার্স এক দারুণ দলে পরিণত হয়েছিল। ইন্দার সিং, জাগির সিং এবং গুরুদেব সিং দল ছেড়ে যাবার পর আমরা বেশ দুর্বল হয়ে পড়ি।"

হরজিন্দার ফুটবলে প্রথম নাম করে ১৯৭১-এ আসামের গোলাঘাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে হরিয়ানার পক্ষে লেফট আউটে খেলে। ১৯৭৪-এ ব্যাংককে জুনিয়র এশীয় ফুটবলে বিজয়ী ভারত দলে বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিল। ভারতের ছয়টি খেলার মধ্যে একটিও গোল করতে পারেনি হরজিন্দার কিন্তু এত ভাল খেলেছিল যে, ভারতের যে দুজন অলস্টার এশীয় যুব দলে নির্বাচিত হয়েছিল তার একজন ছিল হরজিন্দার। অপরজন কেরলের সি জেকব। ১৯৭৩ থেকে হরজিন্দার সিনিয়র জাতীয় ফুটবলে পাঞ্জাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। আন্তর্জাতিক ফুটবলে —মারডেকা, পার্ক কাপ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৬ থেকে। স্মরণীয় অনেক খেলার মধ্যে ১৯৭৪-এর জাতীয় ফুটবল ফাইনালে বাংলার বিরুদ্ধে খেলাটি অন্যতম, যে খেলায় পাঞ্জাব ৬—০ গোলে বাংলাকে হারিয়েছিল। মাঠের খেলার মত হরজিন্দারের চোখের চাহনিতে এবং কথাবার্তায়ও ভদ্রতা আছে, যদিও অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত খেলোয়াড়!

মুকুল

এখন পাবেন ২টি সুগন্ধে ঃ
লেবুর সুগন্ধ
ফুলের সুগন্ধ
LEMON SCENTED
FACIAL QUALITY
Anne French
HAIR REMOVER
CREAMS HAIR AWAY FROM FACE LEGS ARMS & UNDERARMS
75g

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

জগদীশ গুপ্তের গল্প। সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী। অরুণ, ৭০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম আঠারো টাকা।

জগদীশ গুপ্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' নামক একটি গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—"বর্তমানের নগদ মূল্য যথাযোগ্যভাবে তিনি পাননি; ভাবীকাল তার ক্ষতি-পূরণ করবে অনুশোচনায়, এমন আশ্বাস দেবার সাহসও আমাদের নেই।" সম্ভবত সাহসের সেই অভাব-বশতই এই ধরনের একটি অতি আকস্মিক এবং অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখে কিছুটা বিস্ময় জাগে। জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবিতকালে কিছু বরেণ্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র পেলেও সাধারণভাবে তাঁকে উপেক্ষিত লেখকই বলা চলে। বর্তমান পাঠকের কাছে তিনি কেবল উপেক্ষিত নন, লুপ্ত। আরো আক্ষেপের কথা, শুধু পাঠকদের কাছেই লুপ্ত নন, বাংলা উপন্যাস-বিষয়ক প্রথম ধারাবাহিক আলোচনা-গ্রন্থের বিপুল কলেবরেও তিনি অদৃশ্য।

জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে সমালোচকদের ঔদাস্যে সামান্য ফাটল ধরতে শুরু করে আজ থেকে বছর কুড়ি আগে। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায় (২৭শ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা), লেখক অশোক গুহ। ১৯৬১ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে এক দীর্ঘ এবং সুচিন্তিত অধ্যায় রচনা করেন। পরের বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রিকায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দু' বছর পরে শুকসারী পত্রিকার শীত সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা সারস্বত পত্রিকায় সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেন। শেষোক্ত লেখক উল্লিখিত পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জিও প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁর সম্পাদনাতেই জগদীশ গুপ্তের এই নির্বাচিত গল্পসংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে।

গ্রন্থটি বিভিন্ন কারণে মূল্যবান। এই গ্রন্থে কেবল যে জগদীশ গুপ্তের বারোটি ভিন্ন মেজাজের গল্প সংকলিত হয়েছে তাই নয়, এতে আছে সুচিন্তিত ভূমিকা, জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনাদির অংশবিশেষ, একটি পরিশ্রমী গ্রন্থপঞ্জি এবং লেখকের একটি আলোকচিত্র। বিভিন্ন আলোচনায় এবং সম্পাদকীয় ভূমিকায় জগদীশ গুপ্তের বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকের কাছে জগদীশ গুপ্তের মানসভূমি একান্ত অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তরূপে না দেখে তদ্‌গতভাবে দেখাই যথার্থ আধুনিকতা। সেই অর্থে জগদীশ গুপ্ত যথার্থ আধুনিক, কারণ তাঁর পরিচিত বিশ্বকে তিনি তদ্‌গতভাবেই দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টি একেবারেই অনাসক্ত। সম্ভবত এটাই তাঁর মুখ্য পরিচয়। জীবন যেরকম হলে আদর্শ হতো মানুষ যেরকম হলে সার্থক ও সুন্দর হতে পারতো, জীবনের ছক যেমন হ'লে শুনতে ভাল লাগতো সেসব নয়—জীবন প্রকৃতই যেরকম, মানুষ প্রকৃতই যা—তারই চিত্র উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন জগদীশ গুপ্ত। এ সম্পর্কে ভাবাবেগের অণুমাত্রও তাঁর নেই, প্রায়শই তিনি অতিমাত্রায় রূঢ়, কঠোর এবং নির্মম—অনেকটা তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পসংগ্রহ 'বিনোদিনী'র প্রচ্ছদে অংকিত কাপালিকের মত। তাঁর গল্পের মানুষগুলি অতিমাত্রায় দেহকেন্দ্রিক, তাদের অনেকেরই মনের কথা 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সুন্দরীর মত—"পাপপুণ্য বলতে শরীরের সুখই সব—মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে।" অথচ প্রায়ই দেখা যায় অ-দৃষ্ট

'ভবিষ্যৎ' নির্মমভাবে মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করার জন্য সক্রিয়। কবিতায় তিনি এটি স্পষ্ট করে বলেছেন—

> "অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে,
> ব্যাহত এই জগৎ
> পরাঙ্মুখীকৃত, তাকে পরিপূর্ণ সুখে
> পৌঁছে যেতে দেওয়া হয় না.
> এবং ভবিষ্যৎ
> অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে।"

এই অমোঘ নিয়তিচেতনা জগদীশ গুপ্তের গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীও অভিনব, একেবারে সংবাদ পরিবেশনের ভাষা—কাটা-ছাঁটা, বাহুল্য এবং উচ্ছ্বাসবর্জিত। অথচ নির্মোহভাবে সব কিছু দেখবার জন্য তার মধ্যে সর্বদাই যেন এক কৌতুক প্রচ্ছন্ন। 'দিবসের শেষে' গল্পে আছে—"রতির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ।" 'সত্যাশিবের বিয়ে ও বৌ' গল্পে পাই—"বৌটার জল মাটিতে পড়িল—আবিষ্কৃত হইল মাধ্যাকর্ষণ কিরণের হাত পায়ে চৌম্বক দুর্লীলা-সুন্দরীর—আর তাঁর মাথার আসিল পুত্রবধূ আনয়নের সুবৃহৎ চিন্তা।"

বর্তমান সংকলনে জগদীশ গুপ্তের যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে তাতে মোটামুটিভাবে তাঁর মানসিকতা এবং রচনাভঙ্গী পরিস্ফুট হতে পেরেছে। অনেকগুলি গল্পই প্রথমে পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—পত্রিকা এবং গ্রন্থ, দুইই এখন দুষ্প্রাপ্য। যথা, কালিকলম পত্রিকায় এই সংকলনের তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল—"** পয়োমুখম্ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) চন্দ্রসূর্য যতদিন (কার্তিক ১৩৩৩), আদিকথার একটি (শ্রাবণ, ১৩৩৪)। পরে প্রথম গল্পটি 'বিনোদিনী'তে এবং পরের দুটি গল্প 'রূপের বাহিরে' গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। বর্তমান সংকলনের প্রথম গল্প 'দিবসের শেষে' জগদীশ গুপ্তের 'বিনোদিনী' নামক প্রথম গল্প-সংকলনেরও প্রথম গল্প ছিল। এখানে সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন করা যায়। Bizzare-জাতীয় গল্প জগদীশ গুপ্তের কলমে আরো অনেক সুন্দরভাবে অন্যত্র ফুটেছে। কেবল 'হাড়' গল্পই বা কেন, প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপলক্ষ' গল্পটিও গ্রহণ করা যেতে পারতো। সংকলনের দ্বিতীয় গল্প 'পয়োমুখম্' মানুষের জঘন্য অর্থলিপ্সার এক অনাবৃত চিত্র। কিন্তু এখানেও একটি বক্তব্য আছে। কালি-কলম পত্রিকা এবং 'বিনোদিনী'তে গল্পটি "** পয়োমুখম্"—এইভাবেই ছাপা হয়েছিল, সম্ভবত 'বিষকুম্ভ' শব্দটির লোপ বোঝাবার জন্য। এখানে সেটুকু বাদ গেল কেন ঠিক বোঝা গেল না। 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' 'অপহৃত আকাশ-কুসুম', 'তরল হইতে তরলে'—এই তিনটি গল্পে জগদীশ গুপ্ত সার্থকভাবে উপস্থিত। প্রত্যেকটি গল্পেই কাহিনী-ভাগ অতি সামান্য—কেবল লেখকের বিশেষ বক্তব্য বিশেষ মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠেছে। 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' এবং 'অরূপের রাস' গল্প দুটি মনস্তাত্ত্বিক—দ্বিতীয় গল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের স্পষ্ট প্রতি-ফলন আছে। শেষাংশের অসংগতি সত্ত্বেও 'আদিকথার একটি' গল্পটি জৈবিক দেহলালসার এক অপরূপ বাক্‌প্রতিমা। নারীব্যক্তিত্বের উন্মোচন জগদীশ গুপ্ত একেবারে নিজস্ব রীতিতে শুনিয়েছেন 'শঙ্কিত অভয়া' এবং 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্প দুটিতে। 'চার পয়সার এক আনা' গল্পে দারিদ্র্যের প্রতিফলন অতি স্পষ্ট, জগদীশ গুপ্তের নির্মোহ কৌতুকে তা আরও নির্মম। 'আঠারো কলার একটি' ভিন্ন স্বাদের গল্প।

সম্পাদকের নির্বাচন সত্ত্বেও, কিন্তু কিছু প্রস্তাব বোধ হয় দেওয়া যায়। জগদীশ গুপ্তের গল্প প্রায় সবই দুষ্প্রাপ্য, তবু বসুমতী সংকলন এবং স্বনির্বাচিত গল্প চেষ্টা করলে এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর অনেক ভাল গল্প প্রবর্তক, উত্তরা, বঙ্গশ্রী, বিজলী, খেয়া, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—যার অনেক-গুলি এখনও বোধ হয় কোন সংকলনে স্থান হয়নি। গল্পগুলিকে উদ্ধার না করলে এগুলি একেবারেই লুপ্ত হয়ে

যাবে। এমন কল্প উপহারের প্রয়োজনীয়তাও আছে। সম্পাদকীয় ভূমিকায় 'লবঙ্গনূর' সম্বন্ধে এবং বেশ্যাজাতীয় নারী সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তর মনোভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু এই সংকলনে ঠিক সে ধরনের কোন গল্প দেওয়া হয়নি। উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঠিকানায় বুধবার' গল্পটি একটি সুন্দর নির্বাচন হতে পারতো।

সংকলনে জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উল্লিখিত হয়েছেন, এ সম্পর্কে তাঁর ভূমিকা আরো বিশিষ্ট বলে বিবেচনা করি। দ্বিতীয়, জগদীশ গুপ্তর জীবনী-সংক্রান্ত একটিমাত্র সংকেত আছে— তিনি 'গুপ্তের গল্প' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আসলে তিনি অনেক কিছুই করেছেন— Jagoo's Ink নামে লেখার কালি প্রস্তুত পর্যন্ত। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনী বোধ হয় তাঁকে বুঝতে সাহায্য করতো। পরিশেষে একটি কথা, এই সংকলনে জগদীশ গুপ্তর গল্পে অ-কারান্ত ক্রিয়াপদগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ও-কারান্ত রূপ ধারণ করেছে, যথা—যাইতো, বসিলো, বলিলো, গেলো, দিলো, করিলো, আসিলো প্রভৃতি। পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্পে এই জাতীয় বানান পাওয়া যায় না। ক্রিয়াপদে এই ধরনের বানান ব্যবহার করলে জগদীশ গুপ্তর অভ্যস্ত পাঠক কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

তবে এগুলি গুরুতর কিছু নয়। সম্পাদক এবং প্রকাশককে এই জাতীয় একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য সাধুবাদ জানাই।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

নজরুল গীতি অন্বেষা। সম্পাদনা: কল্পতরু সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। দশ টাকা।

নজরুল সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর ধরে বহু বই বেরিয়েছে। সঙ্গীত-সাহিত্যে নজরুল রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রতিষ্ঠিত। এত আলোচনা আর কোনও সুরকারকে ঘিরে রচিত হয়নি। বর্তমানে নজরুল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সুরকার। যখন তিনি নিজে সঙ্গীতজগতে তাঁর ভাস্বর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত ছিলেন তখনও তাঁকে ঘিরে আজকের মত সাহিত্যরচনা হয়নি। তাঁর একাধিক জীবনী পাঠ করেছি কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটির মত নজরুল সঙ্গীতের উপলব্ধিগত বিচার বিশ্লেষণ অন্যত্র দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গ্রন্থটি কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি; লেখকগোষ্ঠীতে আছেন—দিলীপকুমার রায়, কমল দাশগুপ্ত, আব্বাসউদ্দিন আহমদ, নিতাই ঘটক, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ইন্দুবালা দেবী, আঙ্গুরবালা দেবী, সুপ্রভা সরকার, ফিরোজা বেগম, নীহারবিন্দু চৌধুরী, কাজী অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ চৌধুরী। ভূমিকা লিখেছেন সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত। গ্রন্থারম্ভে কাজী সাহেবের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকে অবলম্বন করে একটি অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত রচনা রয়েছে। কাজী সাহেব তাঁর নিজের গান সম্বন্ধে কোথাও কিছু লিখে গেছেন কি না জানি না, থাকলে এই প্রবন্ধের পরিবর্তে সেই ধরনের রচনা সংযোজিত করলেই ভাল হত; কারণ অপর আলোচনাগুলির পরিবেশে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। নজরুলের সঙ্গীতরচনাকে যাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে চান এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি তাঁদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখক বা লেখিকা ব্যক্তিগতভাবে কবির সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে থেকে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে বর্তমানে কত গান যে ভুলক্রমে নজরুলের নামে পরিচিত হচ্ছে তার উল্লেখ করেছেন। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে কিছু না কিছু জানবার বিষয় আছে, বিশেষ করে কমল দাশগুপ্তের লেখাটি অসম্পূর্ণ হলেও অতিশয় উপভোগ্য। নিতাই ঘটকের প্রবন্ধটিও বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ।

নজরুলের গান সম্বন্ধে বর্তমানে একটি অভিযোগ যে, শিল্পীরা কবির সুরকে অতিমাত্রায় বিকৃত করছেন, অথবা তার স্টাইল পালটে দিচ্ছেন। অপর পক্ষের বক্তব্য—নজরুল নিজেই তাঁর গানে সে সুযোগ রেখে গেছেন, অতএব স্বকীয়তা কোনক্রমেই দূষণীয় বলে গণ্য হতে পারে না। আব্বাস-উদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে বলছেন—

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে অপরের সুর দেওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমাদের বাঙালী গায়কেরা গানের কাব্যসৌন্দর্যই শুধু চান না, তাঁরা চান সেই গানে মনোমত সুর বিস্তার করে সেই সুরের পাখায় ভর করে বথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে। নজরুলই এনে দিয়েছিলেন সেই সুযোগ। গায়ক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নজরুল-গীতির মধ্যে সুর পরিবর্তন, পরিবর্জন, এমন কি ইচ্ছামত সুরও দিতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে তা হওয়ার উপায় নেই। আমাদের গায়কদের সামনে আধুনিক বাঙলা গানের নতুন সিংহ-দুয়ার খুলে গেল—গায়করা খুঁজে পেল নতুন সৃষ্টির পথ। সঙ্গীতের এই মুক্তি এনে দেবার ফলে নজরুল হারিয়ে যাননি এবং সকলেরই কাছে আরো নিবিড়তর হয়েই রইলেন।"

কথা হচ্ছে, উক্ত সিংহদুয়ার দিয়ে সিংহের প্রবেশ কি আদৌ ঘটেছে? পক্ষান্তরে অদম্য উৎসাহগ্রস্ত শৃগাল-দের প্রবেশ ঘটলে তাদের নিবৃত্ত করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ কোনও অনুপ্রবেশের অনুমোদন যদি না করে থাকেন। তা হলে তাঁর আত্ম-রক্ষার অধিকারটুকু দূষণীয় বলে গণ্য করাটা যুক্তিসম্মত বোধ হয় না। এর পরবর্তী প্রবন্ধে বহু সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন করে নিতাই ঘটক বল-ছেন—"অনেকে বলতে পারেন যে, পূর্বেও তো নজরুল ইসলামের গানের সুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তবে কেন বর্তমানে আমরা তা করতে পারবো না। এর উত্তর হচ্ছে—সে সময় গানের সুর অদলবদল করে কবির সম্মতিক্রমে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হতো কিন্তু বর্তমানে তা করা সম্ভব না। আমাদের এখন উচিত কবির সৃষ্ট গানগুলির প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে, অবিকৃত অবস্থায় সেগুলি পরিবেশন করা, মূল কাঠামো

...ক রেখে বিচার বিবেচনা করে, তাতে ...দু রঙ করানো যেতে পারে, কারণ ...বির এ বিষয়ে কোন দিন আপত্তি ছিল ...। কিন্তু বর্তমানের মত খোল-...নকে পাল্টানোতে সকলের আপত্তি ...াছে।"

বইটিতে নজরুলগীতি ও স্বরলিপির বই-এর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। নজরুলগীতির আংশিক তালিকা, যাতে ১৮০১টি গানের নাম, ...াগ এবং বই-এর উল্লেখ রয়েছে, সেটিও বিশেষ প্রয়োজনীয় সংযোজন। বইটির গ্রন্থন, মুদ্রণ প্রভৃতি সুন্দরভাবে চিত্তাকর্ষক।

...রেশ্বর মিত্র

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চিত্রকলা**

অসীম কালের যে হিল্লোলে

জন কনস্টেবলের (১৭৭৬-১৮৩৭) দ্বি-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃটিশ কাউন্সিলে একটি প্রতিচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয় (৭-১৪ ডিসেম্বর)। অঙ্কন, তৈলচিত্র, জলরঙের প্রতিচ্ছবি। সু নির্বাচিত এবং সুন্দর গ্রন্থনা।

প্রধানত নিসর্গচিত্রী হিসাবেই কনস্টেবলের নাম। ইংলণ্ডের সমতলভূমির বৈচিত্র্য, গাছপালা ফুলন্ত বৃক্ষ, নদী নালা, গ্রাম গির্জা এবং সমুদ্র তাঁর ছবির বিষয়। তাঁর ছবির আকাশ জুড়ে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্মের জলপূর্ণ এবং নির্জলা, ঘন, পাতলা, সাদা এবং বহুবর্ণ মেঘের সমারোহ। আর আশ্চর্য শীত অনুপস্থিত। অথচ ইংরাজ কবিরা সেখানকার শীতের

শ্বেতশুভ্র সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। কনস্টেবল আসলে বসন্তের চিত্রকর। গাছপালা যখন নতুন পাতায় ফুলে সাজে, বরফের সাদা ওভারকোট খুলে যখন ধরিত্রী নগ্নিকা রূপ তুলে ধরে তখন কনস্টেবল তন্ময় হয়ে যান। নবজন্ম, পুনরুত্থান—ধর্মভীরু কনস্টেবলের মনে বসন্ত এবং গ্রীষ্ম নতুন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

কনস্টেবলের ছবি দেখতে দেখতে কোলরিজের দুটি চরণ মনে আসে—

So will I build my alter in the fields,
And the blue sky my fretted dome shall be ....
(To Nature)

কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'প্রেলিউড'-এর পঙক্তি—

To every natural farm rock, fruit or flower
Even the coarse stones that cover the highway
I gave a moral life.

কনস্টেবল জাত রোমান্টিক। ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের সগোত্র। তাঁর জীবিতকালে বিরাট সব সামাজিক পরিবর্তন হয়। শিল্পোন্নয়ন এবং ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। অথচ অভিজাত এবং ভদ্রলোক (squires)-

দের আসন তখনও টলে ওঠেনি। পুরনো নতুনের অদ্ভুত সহবস্থান চলেছে। তাই তিনি নির্ভাবনায় গেছেন প্রকৃতির কাছে। মিষ্টি মিষ্টি ছবির কাজ করে লবেনচুষের মতো দর্শকের মুখে তুলে দেবার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। তাই জীবিতকালে ফরাসী দেশে তাঁর ছবির সমাদর হয়েছিল কিন্তু নিজের দেশে ছিলেন পরবাসী। ছবি বিক্রী হয়েছে। রয়েল আকাদমীর সদস্য হয়েছেন কিন্তু তাঁর সমকালীন সমাজের পক্ষে ছিলেন বিপ্লবী। হয়তো আরও পরে জন্মালে পারতেন। তাঁর স্বজাতি টার্নারের মতো তিনিও ইম্প্রেসেনিস্টদের যথার্থ পূর্বসূরী। আলো হাওয়া খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে সূর্যের রঙের খেলা আবিষ্কার করে তাঁরা ইম্প্রেসেনিস্টদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন।

কনস্টেবলের তুলি চালানো পুরুষের মতো। মিলিয়ে মিলিয়ে রঙ না লাগিয়ে মোটা করে ঘন চাপিয়ে স্পেচুলা দিয়ে নানা কারিকুরি করেছেন। সূর্যের ঝলকানি লাগা রঙ অনেক বেশি শুদ্ধ। ছায়ের ব্যবহার মনোজ্ঞ। ছায়ারও রঙ আছে। বুনোটের মধ্যে নানারকম সূক্ষ্ম কাজ। টার্নার প্রকৃতির ওপর নিজের মনকে আরোপ করতেন। তাঁর ছবিতে আবেগ আর উদ্বেগ। কনস্টেবল প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির প্রাণ-মন আছে যেন। এইখানে ইম্প্রেসেনিস্টদের কাজের সংগে তাঁর ছবির মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ ইম্প্রেসিনিস্টদের কাছে প্রকৃতি সর্বেশ্বরবাদের আধার নয়। লীলাময়ের লীলা ক্ষেত্র নয় কিন্তু যান্ত্রিক। সেখানে বস্তুতান্ত্রিক নিয়মের রাজত্ব। তাছাড়া ইম্প্রেসেনিস্টরা ক্যামেরার প্রতিযোগী হয়েছিলেন যা কনস্টেবল-টার্নার হননি। ইম্প্রেসেনিস্টরা ও'র কাছে কলা-কৌশলটুকু ধার করেছিল।

কনস্টেবলের সংগে মানসিকতার দিক দিয়ে বরং ভ্যান গঘের অনেক বিষয়ে মিল। বিশেষত উভয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট, ধার্মিক এবং যৌবনে পাদ্রী হতে হতে হননি। প্রকৃতির মধ্যে দুজনেই ভাঙ্গা-গড়ার নানা খেলা, দ্বন্দ্ব সংঘাত, সৃষ্টি লয়ের আবর্তন দেখতে পেয়েছেন। কনস্টেবল অবশ্য রক্ষণশীল, ভ্যান গঘ আধুনিক মানসিকতায় আক্রান্ত। বিচ্ছিন্নতা প্রত্যয়হীনতা এবং নৈরাশ্য ভ্যান গঘের মতো কনস্টেবলকে দলিত করেনি। অমিলের কারণ তাঁরা ভিন্ন সময়ের মানুষ ছিলেন।

কনস্টেবল কিন্তু বড় শিল্পী। পুসা থেকে দেলাক্রোয়া এবং পরবর্তীকালের ইম্প্রেসেনিস্টদের তিনি নাহলে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। প্রতিচিত্র তবুও আকাশের মেঘ, সমুদ্র এবং তেপান্তর দেখতে দেখতে আবেগে আবেশে মনটা দুলে দুলে ওঠে।

সন্দীপ সরকার

ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়মের শিল্প-প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়মের সংগে যুক্ত বারোজন শিল্পীর যে প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে ম্যুজিয়মের নিজস্ব গ্যালারীতে, তাতে ভালো, মন্দ, মাঝারি সব রকম শিল্প নমুনাই আছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অধিকাংশ প্রদর্শনী দেখলেই প্রায় এই একই অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে যা আমাকে ঈষৎ বিস্মিত করেছে, তা হ'লো এই : তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক নরেন রায় যেখানে কয়েকটি কাঁচা এবং শিশুতোষ তেলরঙের নিসর্গচিত্র এঁকেছেন, সেখানেই প্রদর্শনীর কনিষ্ঠতম শিল্পী, পঁচিশ বছরের তাপস সরকার অত্যন্ত পরীক্ষামূলক কিছু ড্রইং এবং ভাস্কর্যের নমুনা উপহার দিয়েছেন। একই প্রদর্শনী-কক্ষে এরকম মেরুপৃথক শিল্পসামগ্রী সহজে চোখে পড়ে না। তাপস সরকারের কালি-দিয়ে-আঁকা অর্ধ-বিমূর্ত 'কম্পোজিশনগুলি' অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময়। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য তাঁর ভাস্কর্য। টেরাকোটার দুটি কাজ বাদ দিলে, রিলিফ্গুলি এবং প্লাস্টারে করা তাঁর ভাস্কর্যগুলি শিল্পীর কল্পনাশক্তি এবং সুন্দর শৈলীর পরিচয় দেয়—বিশেষত 'পুরুষ-প্রকৃতি' এবং 'প্রিমিটিভ' ভাস্কর্য দুটি।

ফুলচাঁদ পাইনের ভাস্কর্যও উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি অপেক্ষাকৃত পরিচিত (এবং সেই অর্থে, প্রবীণ) শিল্পী, কিন্তু তাঁর কাজে কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা চরিত্রলক্ষণ চোখে প'ড়লো না। তাঁর প্লাস্টারে-তৈরী 'পোর্ট্রেট' অত্যন্ত বাস্তবানুগ রীতিতে রচিত, আবার তাঁর 'ট্রি অ্যান্ড ইটস ফ্রুটস' (গাছ হচ্ছেন জননী, এবং ফলসম্ভার হ'লো সন্তানসন্ততি) ঈষৎ অন্য রীতিতে তৈরী।।।

অনিল সেনের ভাস্কর্য-নমুনার মধ্যে কাঠের 'বোভাইন ম্যান' বিমূর্ত সরলতায় সুন্দর উদাহরণ। তাঁর প্লাস্টারে-তৈরী বস্তুপ্রতিম 'কাপল' আমাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে।

আমি যে 'মাঝারি' শিল্প-নমুনার কথা আলোচনার প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম, তার উদাহরণ হচ্ছে রথীন রায়ের তৈলচিত্র। আটটি তৈলচিত্রের মধ্যে, সবচেয়ে উৎরে যাওয়া ছবি হ'লো 'এক্সটাসি'—ঘনসন্নিবিষ্ট দুই নরনারীর ছবি, এবং ছবির বিষয়বস্তুতে যে তীব্র কামনা আমাদের চোখে পড়ে তার সমানুপাতিক রঙ-ও ব্যবহার করতে পেরেছেন শিল্পী। সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক হ'লো 'ফোরলোর্ন'—একটি নিঃসঙ্গ রমণীর ছবি। নিঃসঙ্গতার বেদনা বোঝাতে হ'লে ঈষৎ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়—হয় না কি? মেয়েটির কোলের ওপরে রাখা হাঁসটি একেবারেই হাস্যকর।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী

গত ২০শে ডিসেম্বর সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের প্রদর্শনী প্রতিবারের মতো এবারেও যথারীতি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছে।

কারুকর্মের বিভাগ অন্যান্যবারের তুলনায় একটু নিষ্প্রভ মনে হলো। ম্যুরালের কয়েকটি কাজ আমার বেশ ভাল লেগেছে, কিন্তু আলোর ঠিকমতো ব্যবস্থা না-থাকায় এর অনেকগুলি ভাল কাজ মার খেয়েছে।

ভাস্কর্য বিভাগে অদিতি মজুমদারের একটি দণ্ডায়মান নগ্নিকা মূর্তি খুব ভাল লেগেছে। কাজটা ছোট হলেও তার মধ্যে মনুমেন্টাল কোয়ালিটি রয়েছে এবং এর অঙ্কনও ভাল হয়েছে। রচনা এবং প্রতিকৃতি অন্যান্যবারের তুলনায় দুর্বল।

ভারতীয় বিভাগের কাজ দেখে একটা জিনিস আমার মনে আসল, পৌরাণিক এবং দেবদেবী ছাড়া সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনো কথিকাই লিপিবদ্ধ হয়নি। আর তাছাড়া কোনো পরীক্ষামূলক কাজ চোখে পড়ল না। তবে স্বপন বিশ্বাসের "বাঁদর" ছবিটা বেশ চোখে পড়ার মতো হয়েছে।

আর্ট কলেজে জলরঙের কাজ এক সময় ভারত বিখ্যাত ছিল এবং এবারের প্রদর্শনীতে ঠিক সেই উচ্চমান বজায় থাকেনি। শুধু শ্যামলেন্দুবিকাশ সিংহ এবং দেবব্রত ঘোষের দু' একটা কাজ মোটামুটি মন্দ লাগে নি। ছাপাই বিভাগে চন্দন দাসের কাঠখোদাই এবং সুচরিত বসুর দুটো এচিং-ই আমার ভাল লেগেছে।

তৈলচিত্র বিভাগে কোনো বলিষ্ঠ প্রতিকৃতি নেই। নগ্ন শরীরের ভাল স্টাডি নেই। রচনার মধ্যে ডাডা এবং স্যুররিয়ালিজমের প্রকোপটা একটু বেশি। বলিষ্ঠ রূপবন্ধ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা অনুশীলনের বিশেষ আয়োজন দেখলাম না। তবে এদের মধ্যে স্বপন দাস, অলোক সোম, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুমীর দাস, পার্বতী চক্রবর্তী, সুস্মিতা সিংহ, সোমেন চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী, বীজেন্দ্র বৈদ্য—এঁদের দু-একটি কাজের মধ্যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রয়েছে।

কমার্শিয়াল বিভাগটা এবার চোখে পড়ার মতো হয়েছে।

দেবাশীষ দেবের কার্টুন ডিসপ্লেটা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

এই সব প্রদর্শনীর আয়োজন আরও যত্নসহকারে করা উচিত। এবং ক্যাটালগের দিকেও নজর দিলে ভাল হয়।

রথীন মৈত্র

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **সংগীত**

বিলায়েৎ খাঁর আসর

সেতার যন্ত্রে কত রকম মীড় বাজানো যায় এবং মীড়ের কাজে কত বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে মজার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (রবীন্দ্র সদন জানুয়ারি ৭) ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ তা আবার নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সাজগিরি রাগে আলাপে। তন্ত্র মীড়ের মাধুর্য বা দীর্ঘ রেশের

বিষয় নতুন করে কিছু বলা অপ্রয়োজনীয় কিন্তু কিছু কিছু মীড়ের শ্রোতাকে চমকে দেওয়ার যে ক্ষমতা ছিল তার বিষয় কিছু বলতেই হয়। এক একটি মীড় অতি মন্থর গতিতে শুরু হয়ে হঠাৎ দ্রুতগতিতে তিন-চারটি স্বর ছুঁয়ে ফিরে আসছিল, আবার কিছু কিছু মীড় অতি ক্ষীণ ভাবে শুরু হয়ে শেষাংশে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রবলতার সংগে গর্জে উঠছিল। এর ওপরে ছিল এমন কিছু মীড় যা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত স্বরে গড়িয়ে গিয়ে শ্রোতাকে অবাক করেছিল। ছোট ছোট মীড়খন্ড ও কাটা স্বরের কাজ দিয়ে শিল্পী যেভাবে তাঁর সব চেয়ে চমকপ্রদ মীড়গুলির জন্য ভিত তৈরী করে নিয়েছিলেন তার থেকে বোঝা গেল তিনি পরিবেশন তথ্য নিয়ে কত গভীর চিন্তা করছেন।

স্বরপ্রস্তাবের কাঠামো আলাপের প্রথম ও শেষ অংশে (অর্থাৎ মন্দ্র ও মধ্য ষড়জের মধ্যে এবং মধ্য পঞ্চম ও তার ষড়জের মধ্যে) সুগঠিত হলেও মধ্যাংশে একটু এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ, ন ঋ গ, ঋ গ হ্ম ও গ হ্ম প সংগতির যথেষ্ট বিস্তার হয়নি। অবশ্য দুই মধ্যমের নিপুণ ব্যবহার এই অভাবটিকে খানিকটা ঢেকে রেখেছিল। অন্তরার ষড়জের জন্য শ্রোতার মনে তীব্র ক্ষুধা জাগানো হয়েছিল ধ্রুপদী কায়দায় বিচক্ষণ সঞ্চারী বর্ণের কাজের মাধ্যমে। কাজেই শিল্পী যখন অবশেষে এই স্বরটি লাগালেন তখন প্রেক্ষাগৃহে একটি প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছড়িয়ে গেল।

জোড়টিও ছিল অতি সুপরিকল্পিত এবং এতে জুড়ীর গমকের কাজ ও ছন্দের কাজ সবই উচ্চাংগের হয়েছিল। জোড়ের মধ্যভাগে শিল্পী গ, ম, হ্ম ও প স্বরগুলির 'ক্রম্যাটিক' সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে কয়েকটি আশ্চর্য নকশা সৃষ্টি করেছিলেন এবং এতে সেই শাস্ত্রবর্ণিত বস্তু—রাগের তিরোভাব—হয়েছিল। শিল্পী এই নকশাগুলির শেষে একটি লম্বা মীড় জুড়ে রাগের স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়ে দিলেন। কাজেই রাগের তিরোভাব ও আবির্ভাব দুইই হল প্রথাগতভাবে। এ জিনিস আজকাল বিশেষ শোনা যায় না। জোড়ের শেষ অংশে শোনা গেল অপ্রত্যাশিত মোড় বা বাঁকে পরিপূর্ণ গায়কী অংগের তানকারি। মন্দ্র নিষাদ পর্দা থেকে টেনে বাজান একটি লম্বা তানগুচ্ছ ছিল এর মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বস্তু।

মধ্য-দ্রুত ত্রিতাল গৎটিতে বক্রমুখড়া-ঝাট ও মুখড়া-তেহাই, উচ্চাংগের দুনি তানকারি, তবলীয়া শংকর ঘোষের কয়েকটি বোলের সেতারে নিপুণ জবাব, অতীত -সাথের খেলা ও সুরে ভরপুরে অতিদ্রুত ঝালা সবই আনন্দদায়ক হয়েছিল।

সারগিরির প্রসংগ ছেড়ে যাওয়ার আগে একটি কথা পরিষ্কার ভাবে বলে যাওয়া দরকার—ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এই রাগে খালি শুদ্ধ ধৈবৎ ব্যবহার করেন কিন্তু সারগিরিতে যে কয়েকটি ধ্রুপদ পাওয়া যায় তাতে শুদ্ধ এবং কোমল দুই ধৈবতেরই ব্যবহার আছে। সকল পন্ডিতই দুই ধৈবতের প্রয়োগের পক্ষপাতী। শিল্পী কেন কেবল শুদ্ধ ধৈবতের প্রয়োগের পক্ষপাতী তা আমার জানা নেই।

বিরতির পরে বিলায়েৎ খাঁ খম্বাজে আওচার ও একটি বিলম্বিত ঠুমরী বাজিয়ে ও গেয়ে শোনালেন। তারপর শোনা গেল মাড় রাগে একটি বন্দেশ। শিল্পীর কন্ঠ ও সেতারের মধ্যে যে যুগলবন্দী সেদিন চলেছিল তার থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল ঠুমরীর সূক্ষ্ম কাজ কি আশ্চর্যভাবে তাঁর যন্ত্রে ফুটে ওঠে। পঞ্চমসে পিলুর রূপায়ণের এই একই জিনিস লক্ষ্য করলাম এবং শিল্পী এই রাগে নিবন্ধ 'শাওন আসিল ফিরে' নজরুল গীতির একটি কলিও গেয়ে ও বাজিয়ে শোনালেন। এরপর যথাক্রমে শোনা গেল, 'রাজা মোরে তীর না মারো' গানটি ও এক দরবারী কানাড়ার মধ্যলয় বন্দেশকে কেন্দ্র করে রাগমালিকা। রাগমালিকার কেন্দ্র মাঝপথে সেই বিখ্যাত বিহারী গৎটি হয়ে দাঁড়ায় এবং তিলক কামোদ অংশে কিছু উচ্চাংগের তানকারি শোনা যায়। শিল্পী

ভৈরবী বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সংগে সংগে কিছু শ্রোতা দরবারী কানাড়া রাগে পূর্ণাংগ আলাপের দাবী করে। কাজেই অনুষ্ঠানের শেষে পনের মিনিটের দরবারী আলাপই শোনা গেল এবং ছোট হলেও এটি অতি উচ্চাংগের হয়েছিল।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

সধবার একাদশী

কালস্য কুটিলা গতি। একদা পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' নামে যে প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন তৎকালীন সমাজকে তিনি তীব্র ব্যংগ জর্জরিত করিয়াছিলেন, সেই দিন বিগত হইয়াছে। সেই ইয়ংবেংগল সমাজের নবাবযুবানাও নাই, সুরাপান নিবারণী সভাও নাই। এখন ট্রামে, বাসে সর্বত্র যুবসমাজ নিঃসংকোচে মদ্যপান লইয়া আলোচনা করে, স্বল্প পান করিয়াই যে উন্মত্ত হয় সে সর্বসমক্ষে উপহাসিত হয়। যে সব অশ্লীল শব্দ অকুতোভয়ে যুব সম্প্রদায় উচ্চারণ করে, সেই বাক্যনিচয় দীনবন্ধুরও অপরিচিত। সভ্যতা অগ্রগতির সংগে সংগে আমরা অনেক

নূতন নূতন ইতর বিশেষণে মাতৃ-ভাষার ভান্ডারকে বর্ধিষ্ণু করিয়াছি। নারীপ্রগতি আমাদের গর্ব। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের অভিজ্ঞতাজাত অসূর্যম্পশ্যা নারী-সমাজ আজ বাতুলতা। তাঁর সৃষ্ট অটল আজ বিপথগামী হয়, কারণ কাঞ্চনরা এখন শুধু বিশেষ পল্লীতে বাঁধা নাই, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং নিষিদ্ধ ফলভক্ষণের জন্য নিষিদ্ধ পল্লীতে যাওয়া এখন আর বিশেষ অপরাধ বিবেচিত হয় না। তবুও মিত্র মহাশয়ের নাটক যুগোপযোগী নয় যেমন নির্দ্বিধায় বলা যায় তেমনি নিশ্চিত-ভাবে বলা যাইতে পারে 'সধবার একাদশী' অভিনয়োপযোগী।

সাধারণত ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে প্রাচীন নাটকের অভিনেয় চরিত্র যুগে যুগে ক্ষমতাবান শিল্পীদের আকর্ষণ করিয়াছে, এবং অনেক নাটকে পাত্রপাত্রী পরিবেশ প্রাচীন হইয়াও বর্তমান সমস্যার অনুরূপ, সেই সব নাটকও প্রযোজকদের উৎসাহিত করিয়াছে। এতদ্দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', অলীকবাবু, ব্যাপিকা বিদায় আবুহোসেন, ভূতের বেগার ইত্যাদি অনেক ঊনিশ শতকীয় নাটক পুনরা-বিষ্কার করিয়াছি, সচেতন, সম্পাদনা অভিনয় ও আঙ্গিক নৈপুণ্যে। এই সব সুপ্রযোজিত নাটকে শতাব্দীর ব্যবধান দুরতিক্রম্য বাধা হয় নাই। কিন্তু শুধু তরবারি শাণিত হইলেই হয় না, সেনাপতির ক্ষমতাও ক্ষুরধার হওয়া চাই, নচেৎ সেই ফাঁকই প্রকট হইয়া ওঠে, যাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

নটরঙ্গ নিবেদিত 'সধবার একাদশী' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুনর্মূল্যায়ন নহে, তবে কিংবদন্তীর মত প্রাচীন নাটকের আশ্রয় লইয়া অভিনয়-ক্ষমতা প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও থাকিতে পারে। কয়েকটি দৃশ্য পর্যন্ত অভিনয়ের জড়ত্বে, সংলাপের সরসতা অস্পৃশ্য ছিল। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়, দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটকে সহর্ষ দর্শক-কুলের পরিবর্তে প্রেক্ষাগৃহে শোকসভার নীরবতা বিরাজমান। পরবর্তী অধ্যায়ে অবশ্য অনেকেই সপ্রতিভ হইলেন, বিশেষত এক সঙ্গে নিমচাঁদ ভূমিকাভিনেতা-নির্দেশক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লুপ্তপ্রায় রসের চাবিটি ফিরাইয়া দিলেন। সুব্রত বসু, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সুদীপ চক্রবর্তী চরিত্রানুগ অভিনয় করিলেও রামমাণিক্যের ভূমিকায় মনোজ চট্টো-পাধ্যায় অসহনীয়। প্রমাণিত হইল মেলোড্রামা করিতেও শক্তির প্রয়োজন। যিনি অভিনয়েই অক্ষম, তিনি অতি অভিনয়ে পারঙ্গম হইবেন কিরূপে? মহিলা চরিত্রে শিপ্রা সাহা তৎকালীন সমাজের গৃহবধূ কিন্তু পুরুষ অভিনেতাদের তুলনায় অনেকে সাবলীল অনীতা অধিকারীও যথেষ্ট সপ্রতিভা, অপিচ তাঁহার দক্ষিণহস্তের তর্জনী সর্বক্ষণ চালনা একটি মুদ্রাদোষ। কাঞ্চনের ভূমিকাভিনেত্রী ইন্দ্রাণী লাহিড়ীও যথার্থ সচতুরা ও সুরসিকা। তথাপি কাঞ্চনের ঊনিশ শতকীয় সংলাপে ভূমিকাভিনেত্রীর একটি বিশশতকীয় পরিমার্জনা ছিল, যাহাকে ইংরেজীতে সফিস্টিফিকেশন বলা হইয়া থাকে। দীপংকর চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত দুটি গানই ইন্দ্রাণী লাহিড়ী অপূর্ব গাহিয়াছেন, যাহা ইতাকার অভ্যাসমত কোনক্রমে মঞ্চে কাজ চালানো গোছের গান নহে।

একটি ঊনিশশতকীয় প্রহসন উপস্থাপনায় নটরঙ্গের সযত্ন প্রয়াস নিশ্চয়ই সাধু প্রচেষ্টা, কিন্তু যে অভিনয় ক্ষমতা এই নাটককে উপভোগ্য করিতে পারে, তাহার অভাবই প্রযোজনাকে শ্লথ করিয়াছে। কুশীলবরা যেথায় অবস্থান করেন তথা হইতে সঞ্চরন করেন না, তাই সবকিছুই স্থানু হইয়া যায়। পিন্টু বসুর আলোক পরিকল্পনা আধুনিক হইলেও, অভিনেতাদের নৃত্যভঙ্গিমার মত মুদ্রা সহযোগে সংলাপ উচ্চারণ প্রাচীন প্রথা। মঞ্চসজ্জায় দেবাশিস রায় যথাযথভাবে যুগকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। এবং রূপসজ্জায় রবি ঘোষ পাত্রপাত্রীদের যথার্থ রূপায়ণ ঘটাইয়াছেন। আবহ সময় বিশেষে পরিবেশ রক্ষা করিয়াছে, বহুলাংশে ব্যর্থও হইয়াছে। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য অযথা কালক্ষেপ অনেক ভদ্র-মহোদয়ের বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছে।

এতদ্দেশে বর্তমানে মঞ্চের উপরে মদ্যপান দৃশ্য দেখাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। সম্ভবত আজিকার প্রযোজকগণ সুরা 'খায় না, পানায়'। কয়েক বৎসর পূর্বে একখান মঞ্চে একজন অভিনেতা বলিলেন, 'আমায় একটু জিন দাও।' প্রথামত একটি গেলাস কোকাকোলা বা চায়ের লিকার আনা হইল, দর্শকগণ হাসিয়া উঠিলেন, প্রযোজক হতবাক। বেচারি তিনি ওই রসে বঞ্চিত ছিলেন, জিনের বর্ণ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। 'সধবার একাদশী'তে অনেক সুরাপান দৃশ্য আছে, এবং বহুপ্রকার সুরার নাম উচ্চারিত, কিন্তু গেলাসে পানীয়ের বর্ণ এক, অনেকটা জলসা পরি-বেশিত 'পাইনাপেলের' মত।

পূর্বেও বলিয়াছি, যে-কোন লুপ্তরত্ন উদ্ধারের প্রয়াস মাত্রেই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রযোজনার মেরুদণ্ড হইল অভিনয়-ক্ষমতা, যাহার অভাবে অনেক আভরণ সত্ত্বেও বৈধব্য প্রকট হয়। নটরঙ্গ নিবেদিত নাটক অনেক প্রযত্নে পরিবেশ রচনা করিতে সক্ষম হইলেও, অভিনয়-ক্ষমতার অভাবে সধবার একাদশীকে বিধবার মহরম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

রজনী

বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী"-কে মোটা-মুটি অক্ষত অবস্থাতেই মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন লাইফ থিয়েটার। কাহিনীর শাখা-প্রশাখা অন্য দিকেই বিস্তৃত হোক না কেন "রজনী" আসলে গভীর ভালবাসারই কাহিনী। একটি ভালবাসা রজনীর, অপরটি লবঙ্গলতার। নাটকেও (নাটক ও নির্দেশনা: দেবু বসু) সেই ভাল-বাসার দিকটিতেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। রজনী ও লবঙ্গর চরিত্রে যথাক্রমে বুলবুল চৌধুরী ও শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষ অভিনয় ওই ভালবাসার গভীরতা প্রকাশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। নাটকের গতি সাবলীল ছোট ছোট সংলাপগুলিও হৃদয়গ্রাহী। তবে ঘটনার অগ্রগতিতে কিঞ্চিৎ বাধা সৃষ্টি করেছে নদীতীরের দৃশ্য এবং সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ। কিছু গুরুগম্ভীর সংলাপ এবং প্রাসঙ্গিক সংগীত সহযোগে শেষোক্ত দৃশ্যটিকে প্রাণবন্ত করার প্রয়াস নির্দেশকের অবশ্যই ছিল কিন্তু শচীন্দ্রনাথ চরিত্রের মানসিক যন্ত্রণা যেহেতু শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে পারেননি সেহেতু দৃশ্যটি কেমন যেন, অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। এছাড়া ওই দৃশ্যের দৈর্ঘ্যও কিঞ্চিৎ বেশী। আর নদীপথের দৃশ্যটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠল না উপ-স্থাপনার দোষেই। ওই দৃশ্যের প্রয়োগে অনেক বেশী তৎপরতার প্রয়োজন। এছাড়া দৃশ্যান্তরেও কিছু বেশী সময় লেগেছে। সেট-প্রপ তো এমন কিছু বেশী অথবা জটিল নয়, তবে এত সময় লাগে কেন?

এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও লাইফ থিয়েটারের "রজনী" বেশ জমে গেছে। শিল্পীদের চমৎকার অভিনয়ের গুণে নাটক বেশ জমকালো মনে হয়েছে। অন্ধ রজনীর দুঃখ বেদনা প্রেম এবং অসহায়তা চমৎকার ফুটিয়েছেন বুল বুল চৌধুরী। ওই চরিত্রে অভিনয় খুবই শক্ত সন্দেহ নেই। একমাত্র কণ্ঠস্বরই প্রকাশের মাধ্যম। শ্রীমতী চৌধুরী কন্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর বেদনা এবং আনন্দ দর্শক-আসন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন অনায়াসে। লবঙ্গলতার চরিত্রে শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় তাঁর কৈশোর-প্রেমের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এবং বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি স্নেহমিশ্রিত ভালবাসার আনুগত্য চমৎকার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অমরনাথের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে যে তেজ এবং আভি-জাত্যের প্রয়োজন ছিল ওই চরিত্রের সেটি তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি। এছাড়া চমৎকার অভিনয় করেছেন অমরনাথের চরিত্রে গোরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামসদয়ের চরিত্রে জগদীশ বন্দ্যো-পাধ্যায়। প্রথমোক্ত শিল্পী অভিনয়ে যে অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করার মত। কোন সময়েই ও'র অভিনয় অভিনয় বলে মনে হয়নি। রামসদয় চরিত্রের আভিজাত্য, সততা এবং স্নেহশীলতা সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন শিল্পী। হীরালালের ছোট্ট চরিত্রে নির্দেশক দেবু বসু ওই ক্ষণিক অবকাশেই একটা অন্য আবহাওয়া তৈরী করে দিয়ে গেছেন। ও'র অভিনয়ে একটু হয়তো অতিরিক্ত ব্যাপার আছে, কিন্তু ওই চরিত্রে তা বেশ খাপ খেয়ে গেছে। বরং কিছুটা নিরাশ করেছেন শচীন্দ্র-নাথের চরিত্রে দীপঙ্কর চক্রবর্তী। শিল্পীকে চরিত্রের আরও অনেক গভীরে যেতে হবে। একালীন যুবকের চঞ্চলতা এবং চপলতা সর্বাংশে পরিত্যাগ করতে হবে। নতুবা তিনিও ডুববেন, নাটককেও ডোবাবেন। অন্যান্য চরিত্রে তপেন বসু, সুব্রত রায়, স্বপন চক্রবর্তী, অমল মান্না আশুতোষ রায় ও অজিত মিত্র চরিত্রানুগ। গান ও আবহসংগীত (অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) নাটককে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। নাটক ও সংগীত সমতালে চলার ক্ষেত্রে যেটুকু বিচ্যুতি আছে তা আরও দু-একটি অভিনয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। গানগুলি নেপথ্যে গেয়েছেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায় রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ রায়।

রবি বসু

বুলবুল চৌধুরী

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

পিল্‌ পোচখানাওয়ালা

অধুনা ভারতীয় ভাস্কর্যে দুজন মহিলার অসামান্য অবদান আছে—পিলু পোচখানাওয়ালা এবং মীরা মুখোপাধ্যায়। এমন কি 'মহিলা' শব্দটি তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে অবান্তর প্রসঙ্গ। তাঁদের কাজের বিরাটত্ব, বৈচিত্র্য এবং সাফল্য অনেক ভাস্করের পক্ষে ঈর্ষণীয়।

পিলু পোচখানাওয়ালা নিজের বয়স প্রভৃতি ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে কিছু বলতে চান না। ভারতীয় ভাস্কর্যের নৈর্ব্যক্তিক সাক্ষ্য তাঁর নিজের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হোক এটাই তাঁর কাম্য।

'জীবন মানেই অনবরত অভিজ্ঞতার ধারা। এর কিছু মস্তিষ্কে আলোড়ন তোলে আর কিছু বা দেহ-মনে সাড়া জাগায়। এসবই ব্যক্তি মানুষকে ভেঙে নতুন করে গড়ে পিঠে নেয়। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ধারা যখন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নান্দনিক নিয়মানুবর্তিতার দিকে যখন তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তখনই সৃজনশীল ক্ষেত্রে ফলে সোনা ধান। মনের ত্রিবিধ অবস্থায় আমি ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকেছি—একঘেয়েমি, বিরক্তি এড়াতে। আর আনন্দে আপ্লুত হয়েছি বলে।' ধাতু, কাঠ, পাথর, যন্ত্রপাতি জোড়া দিয়ে ঝাল দিয়ে তিনি নানা রকম আকার গড়ে তুলেছেন। তাঁর ভাস্কর্যে নাগরিক যন্ত্র সভ্যতার ছাপটা প্রকট। আবার কখনো আদিম ভাস্কর্যের রূপবন্ধের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের 'উর্পাবিষ্ট মূর্তিতে' তিনি ভারতীয় নারীদের বসার ভঙ্গীর মধ্যে ধরেছেন আত্মস্থ স্থৈর্যকে। যেন এই সব মূর্তি বলতে চেয়েছে, 'আমরা তো কিছুই আশা করি না, তাই কখনো নিরাশ হই না।' ভাগ্যকে মেনে নেবার ব্যাপার থেকে পিলু সরে গেছেন ক্ষয় এবং মৃত্যুর অনিবার্যতার দিকে। তাঁর 'প্রলয়ঙ্কর সময়', 'অতীত', 'ক্ষয়' জাতীয় কাজে প্রালয়িক চেতনাই ক্রিয়াশীল। কিন্তু মূলত তিনি আশাবাদী। সুতরাং ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যের ধারা অনুসরণে নৃত্যের বিমূর্ত ছন্দময়তা ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'কথাকলি' 'বধূর ছন্দ' 'ভারতনাট্যম' প্রভৃতি কাজে আনন্দই স্বপ্রকাশ। আবার 'অনুভূমিক নকশা', 'আরোহণ' এবং 'স্ফুলিঙ্গ' প্রভৃতি কাজে রূপবন্ধ এবং শূন্যতার অবসরের মধ্যে ছন্দবন্ধন আরও সূক্ষ্ম। তারপর তিনি নানা রকম বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। প্রতিটি মাধ্যম নতুন সমস্যা এবং সম্ভাবনার দ্বারদেশে নিয়ে যায় তাঁকে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের রূপময়তা এক সময় তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য এর অকল্যাণকর দিকটা তাঁর ভাস্কর্যে এল। বোম্বাইয়ের স্থাপত্যের কুৎসিত দিকটার ভার লাঘবের বিষয় ভাবতে ভাবতে নতুন রূপবন্ধ গড়েছেন। পর্বত থেকে নুড়ি পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের গায়ে

কাল এবং আবহাওয়া নানা রকম আঘাতের ক্ষয়ের চিহ্ন আঁকে—নাটকীয় নানা ইতিহাস। এই সব ভাবা পিলু তাঁর শেষের দিকের ভাস্কর্যে অঙ্গীভূত করেছেন।

তিনি বোম্বাইতে পাঁচটা এবং দিল্লিতে চারটে একক প্রদর্শনী করেছেন। তা ছাড়া নানা যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। 'আজকের কমনওয়েলথের শিল্পকলা' (লণ্ডন ১৯৬৩), বেলগ্রেড, ব্যংকক, টোকিও (১৯৬৭)। প্রথম ত্রিয়ানালে (নতুন দিল্লি ১৯৬৮)। সাওপাওলো বিয়ানালে (১৯৬৯.৭১)। তিনি বোম্বাইয়ের অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানীর জন্যে ২৮ ফুট এবং বোম্বাই সিটি স্কোয়ারের জন্যে শহরের বিদ্যুৎ এবং যানবাহন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ৩০ ফুট ভাস্কর্য করেছেন। বর্তমানে সিট টাওয়ারের জন্যে ব্রোঞ্জের বড় কাজ কাজ করছেন। ১৯৭০-এ ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণক্রমে ব্রিটিশ ভাস্করদের সঙ্গে পরিচিত হতে বিলাতে গিয়েছিলেন। বহু বার পুরস্কৃত হয়েছেন। নাটকে দলের জন্যে মঞ্চসজ্জা করতে ভালবাসেন।

'ভাস্কর্য এরী-এক' (অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য ধাতু ৬ ফুট × ৪ ফুট × ২ ফুট)—খাড়া উঠে গেছে দুটি মোটা খণ্ড। মাঝখানে আছে সূর্য। নীচে চাঁদের আকার—দুটি খণ্ডকে জোড়বার জন্যে। দুটি খণ্ডের মধ্যে নাঙ্গা তরওয়ালের মতো দুটি আকার রচনাকে ভারসাম্য দিয়েছে। আর পাহাড়ের মতো ভাস্কর্যের গায়ে কাল যেন এঁকেছে বলিরেখার জটিল ইতিহাস।

নতুন!
আমূল-এর তৈরী
মিল্ক-কোকো পানীয়
নিউট্রামূল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!
আমূল নিবেদন্ করছেন শক্তিবর্ধক নিউট্রামূল
দারুণ স্বাস্থ্যকর পানীয়, যা আগে কখনও পাননি।
ঘন আমূল দুধ। বিশুদ্ধ মল্ট। প্রোটিন।
ভিটামিন। খনিজ পদার্থ। প্রতি কাপ নিউট্রামূলে
গড়ে তোলে স্বাস্থ্য, বেড়ে যায় জীবনীশক্তি।
আর এর স্বাদ। আহা অপূর্ব। অনেক বেশী
কোকো। অনেক বেশী দুধ। ঘন ক্রীমেভরা দুধ
ও কোকোর সবগুণই এতে পাবেন।
নিউট্রামূল উৎপাদন হয় আমূল-এর নতুন
ডেয়ারী ও ফুড প্রসেসিং কেন্দ্রে—যা জগতের
একটি আধুনিকতম উৎপাদন কেন্দ্র।
প্রতি টিনে পাবেন ৫০০ গ্রাম নিউট্রামূল। তার
মানে, অন্যান্যদের চেয়ে ৫০ গ্রাম
(অর্থাৎ ৫ কাপ) বেশী।
নিউট্রামূল—আজই খান।
Nutramul
AMUL'S NOURISHING DRINK
500g Net
প্রতি টিনে ৫০ গ্রাম বেশী
বাজারে ছেড়েছেন:
গুজরাট
কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিমিটেড,
আনন্দ, গুজরাট
daCunha/Nutra/1 U. Ben

REGD. NO. WB|CC|164|74

ব্লু ডিটারজেন্ট ওয়াশিং
পাউডার যার মধ্যে আছে
দারুণ কার্যকরী
উজ্জ্বলকর উপাদান

খাঁটি প্রমাণ

ল্যাবোরেটারিতে বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটাই সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নতুন দারুণ কার্যকরী কী দিয়ে ধোওয়া কাপড় হয় ধবধবে সাদা ও উজ্জ্বল। এর কারণ, কী এর ঘন ফেনা অত্যন্ত ময়লা দাগও ধুয়ে একদম সাফ করে দেয়। এর উপাদানের মধ্যে আছে এক বিশেষ কার্যকরী উজ্জ্বলকর পদার্থ।

তাজা, সুন্দর সুগন্ধে ভরা

বাড়ীতে কাপড়-জামা ধোওয়ার জন্যে সবসময়ে এই সুন্দর সুগন্ধে ভরা কী ব্যবহার করুন। কী গরম জল বা ঠাণ্ডা জলে, এমনকি লোনা জলেও সুন্দরভাবে গুলে গিয়ে প্রচুর ঘন ফেনার সৃষ্টি করে।

কী-এর কোমল ফেনা আপনার কাপড়-জামা বা আপনার হাতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়

কী-এর প্রচুর ঘন ফেনা কাপড়-জামা ধোওয়া খুব সহজ করে দেয়। এর কোমল ফেনায় আপনার হাতের কোনও ক্ষতি হয় না আর কাপড়-জামার কোনও ক্ষতি না করে সমস্ত ময়লা ধুয়ে একদম সাফ করে দেয়—প্রতিবারেই কাচার পর কাপড় হয়ে ওঠে সাদা ধবধবে ও উজ্জ্বল।

৫০ গ্রাম ও ২০০ গ্রামের পিজবোর্ডের বাক্সে এবং ৫০০ গ্রাম ও ১ কিলোগ্রাম পলিথিনের প্যাকে পাওয়া যায়।

গোদরেজ-এর
উৎপাদন

CHAITRA-G-59 BEN

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি

১৪ই জানুয়ারীর "দেশ" পত্রিকায় দেবাশিস দাশগুপ্ত লিখেছেন যে তার মনে পড়ে যে শিশিরকুমার এক সভায় রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শোনার পর বলেছিলেন যে "এ-রকম একটা আবৃত্তি শোনার পর চলন্ত মোটরের তলায় প্রাণ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে"। আজকের দিনে যাঁরা এই প্রসঙ্গের সবটুকু জানান না তাঁদের মনে হবে এ কী উদ্ভট কথা! আবৃত্তি যত মনোহরই হোক তা শোনার পর প্রাণ বিসর্জন দেবার ইচ্ছা হবে কেন? যে আবৃত্তির উল্লেখ করেছেন দেবাশিসবাবু তা হয়েছিল কবি সত্যেন দত্তর মৃত্যুর (২৫শে জুন, ১৯২২) অনতি পরে রামমোহন রায় হলে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায়। রবীন্দ্রনাথ প্রাণ ঢেলে তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন সেই বিখ্যাত কবিতা—

> বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর
> পূর্বদ্বারে,
> বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি দিবে
> না সাড়া তারে
> তোমার নবীন ছন্দে?...

সেই স্মরণীয় সভায় বহু বিদগ্ধজনের ভিতর ছিলেন শিশিরকুমার ও পরিমল গোস্বামী। একশত পঙক্তির দীর্ঘ শোকগাথা আবৃত্তির শেষে সভা সম্মোহিত। পরিমলবাবুর লেখায় পড়েছি যে ধীরে ধীরে সভার বাইরে এসে সারকুলার রোডের চলন্ত গাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে শিশিরকুমার বলেছিলেন যদি জানতাম আমার মৃত্যুর পরেও এই রকম আর একটি মহৎ কবিতা লিখবেন রবীন্দ্রনাথ তা হলে আমি এক্ষুণিই ঐ গাড়ির নীচে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। এবার আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা প্রকাশের অর্থ পাওয়া যায়। শিশিরবাবু তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সত্যেন দত্তর মত স্মরণীয় হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন।

শান্তিদাশংকর দাশগুপ্ত
কলকাতা-৬০

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধটি আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উক্ত প্রবন্ধটির সূত্রে আমরা ঘরোয়া মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ করে খুঁজে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংসারিক আবর্তে পড়ে 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র কখনও অভিমানী পুত্র, কখনও ঘোরতর বিষয়ী অভিভাবক, আবার কখনও স্নেহশীল পিতৃব্য।

সাধারণভাবে পত্রসাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝে থাকি এগুলি ঠিক সে রকমের নয়, কিন্তু এর বিন্যাস, বক্তব্য প্রকাশের চারুত্ব পাঠকের সমীহ আদায় করে নেয় অনায়াসেই। আলোচ্য পত্রগুলির সাহায্যে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে—শুধু সাহিত্য গগনে নয়, চাকুরীজীবনে নয়—সাংসারিক পরিমণ্ডলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপ [illegible] ... পূজ্য বিরচিত 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও এই পত্রগুলি তেমন করে গ্রথিত হয়ে উঠেনি না। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় দীর্ঘকাল পরে নিঃসন্দেহে এক অনালোচিত বিষয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

শ্রীযুক্ত রায়কে সবিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রাখছি।

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র নামে লেখক এ পর্যন্ত যা প্রকাশ করেছেন তার সবকটিই কি সত্যই অপ্রকাশিত? আমার মনে হয় অপ্রকাশিত নামটি সঠিক হয়নি। বলা উচিত অনালোচিত।

(খ) ২৮শে জানুয়ারী সংখ্যায় (৫ম কিস্তি) লেখক লিখেছেন (পৃঃ ১৯) রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থ সংখ্যা ৬৯। এই ভুল তালিকা তিনি কোথায় পেলেন? সাহিত্য সাধক চরিতমালায় তাই না?

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ রায়কে পত্র দিয়েছিলেন তার তারিখ ৭ই আগস্ট ১৮৮৮। এটা 'সাহিত্য সাধক চরিতমালায়' পেয়েছি। আর চিঠিটা ওখানেই উদ্ধৃত আছে। তবে সবটা নয়। লেখক কি সবটা উদ্ধার করতে পেরেছেন?

প্রসূন মুখোপাধ্যায়
নদীয়া

বিজ্ঞান

পূর্বাঞ্চলের বিলুপ্ত-প্রায় বনপ্রাণী সম্পর্কে সমরজিৎ কর মহাশয় যে আলোচনা (৭ জানুয়ারী ১৯৭৮) করেছেন সেটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হলেও সময়োচিত এবং মনোজ্ঞ। সত্যি, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের পাখি মোতিলাল বা ট্র্যাগোপানের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আমরা অনেকেই অনবহিত। 'গ্যালিফর্মেস' বর্গের (অরডার) অন্তর্গত 'ফেজিয়ানিডেই' গোষ্ঠীর (ফ্যামিলি) অন্তর্ভুক্ত পাঁচ প্রজাতির (স্পেসিস) ট্র্যাগোপানের মধ্যে বর্তমানে তিনটি প্রজাতিই (যথা, পশ্চিমা মোতিলাল বা ট্র্যাগোপান মেলানোসেফালস, ব্লাইথের মোতিলাল বা ট্র্যাগোপান ব্লাইথিয় এবং ক্যাবোটের মোতিলাল বা ট্র্যাগোপান ক্যাবোটি) বিলুপ্ত-প্রায়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে কাশ্মীর, অরুণাচল, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পশ্চিমা মোতিলালদের আর চোখেই পড়ছে না। বাকি দু' প্রজাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পূর্বাঞ্চলে দু'চার জোড়া মাত্র চোখে পড়ে। ইংল্যাণ্ডের নরফোকে ফেঝাণ্ট পালন কেন্দ্রে অবশ্য ক্যাবোটে মোতিলালকে পোষ মানিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটানো গেছে। কিন্তু বেশ বড় মোরগের মত পালকের 'শিঙ' (ঝুঁটিও বলা যায়) ও গলকম্বল ('বিব') ওয়ালা চটকদার রঙের পশ্চিমা মোতিলালদের কিন্তু ঐভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটানো যাচ্ছে না। তাই পালন কেন্দ্রে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে আবার স্বাভাবিক আরণ্য পরিবেশে যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে সে পরিকল্পনাটিও কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই ব্লাইথের মোতিলালের মত এই সুন্দর, বনচর পাখিটির ভবিষ্যৎও রীতিমত অনিশ্চিত।

[illegible] পাখি; [illegible] থাকতে ভালবাসে। নির্জন দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে ওরা চরে খায়। জঙ্গল সংকুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যেমন বিপন্ন হয়েছে প্রায় ১৪টি প্রজাতির ফেজ্যান্ট পাখি; যাদের এখন চিড়িয়াখানা বা পালন কেন্দ্র ছাড়া স্বাভাবিক বাস্তু সংস্থানে (হ্যাবিট্যাট) আর দেখা যাবে না। সুস্বাদু মাংসের লোভেও যে তিতির লাল মেরে মেরে আমরা প্রায় তাদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছি। ডোডো ট্র্যাজেডির মত তাই ট্রা:প.প্যান-ট্র্যাজেডিও প্রায় অনিবার্য।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা

ডাক্তারী বনাম ইঞ্জিনিয়ারিং

চিঠিপত্র বিভাগে, ২১ জানুয়ারী, শ্রীদেবাশিস বসু লিখেছেন টোকাটুকি বহুদিন ধরে চলে আসছে। "ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এর সমারোহ অনেক বেশী ছিল। সেখানে সেমিস্টার সিস্টেমে পাশ করা এমন কি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অনেক সহজ।" মেডিক্যাল ছাত্রদের পক্ষে লিখতে বসে লেখক ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং সেই কলেজে এখনও সেমিস্টার প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য কোন স্তরের ছাত্ররা পরীক্ষা দেয়, তা পত্রলেখক খোঁজ করলেই, ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া বিস্ময়কর মনে হবে না। প্রবেশ-পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীরা যে-হীনমন্যতায় ভোগেন এটাও অনস্বীকার্য নয়। লেখকের মিথ্যা উক্তি, ঘৃণার সহিত বর্জন করা যেত, কিন্তু দেশ পত্রিকাকে তিনি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন বলে প্রতিবাদ না করলে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

অমূল্যধন দেব
কলিকাতা-৫৪

চা শিল্প

মানসবাবুর লেখার ওপর কোন সমালোচনা করছি না। কেবল আমি এ প্রসঙ্গে চা শিল্পের সৃষ্টি ও স্রষ্টাদের নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

ডুয়ার্সের প্রথম বাঙ্গালী চা বাগান ১৮৭৯ খৃঃ'র মোগল কাটা চা বাগান। চায়ের ইতিহাস পড়লে যেমন R. D. Marrison-এর লেখা Tea, UKERS-এর All about Tea এবং History of the growth and development of the Industry by the Indians of Jalpaiguri-তে দেখতে পাই যে The tea industry in the district began in the year 1874-75. The first leases were issued to 22 gardens in 1877. তারপর সেই দলিলে আরও লেখা আছে যে, The total area comprised in them is 139751 acres. Eleven of the gardens belong to native companies and individuals and are worked exclusively by native agency. The remaining gardens belong to European capitalists mostly formed into companies".

১৮৭৪-৭৫ সালে ঠিক নয়—প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম চা বাগান গড়ে ওঠে ১৮৭১ খৃঃ। মিঃ পিলাচের সাহেবের চেষ্টায় ইংরাজের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে "কুলবাড়ী চা-বাগান।" তার অনেক আগেই অবশ্য ১৮৩৯ সালে ইংরাজের হাতে গড়ে উঠেছিল চা'এর প্রথম আবাদ আসাম টী কোম্পানীতে। অবশ্য শোনা যায় ভারতে প্রথম চা আবিষ্কার করেন "রবার্ট ব্রুস" নামে এক মেজর আপার আসামে ১৮২৩ খৃঃ? আবার প্রাচীন লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ বলে গেছেন, "ভারতবর্ষে প্রথম চা আবিষ্কার করেন আমাদেরই দেশবাসী।" আসামের মনিরাম দেওয়ানই সেই চারা মেজর রবার্ট ব্রুসকে দেন। দুঃখের কথা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা খুললে মনিরামের নাম দেখা যায় না। এও শোনা যায় প্রথম চা-বীজ চারা চীন দেশ থেকে এসেছিল। ১৮৩৪ খৃঃ লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে চায়ের গবেষণা ও চা চাষ প্রবর্তনের জন্য পরিষদ গঠিত হয়।

সুনীলকুমার নিয়োগী
আসানসোল।

মুকুন্দ দাস

রাজেশ্বর মিত্র লিখিত প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি তথ্য মনে এলো। তাই এই চিঠি।

"স্বদেশ, স্বদেশ করিস তোরা" গানটির চার লাইন উনি উদ্ধৃত করেছেন। গানটি সম্পূর্ণ আমি শুনিনি, কিন্তু যতদূর জানি, লাইনগুলো এই-রকম :—

"স্বদেশ, স্বদেশ করছো কারে
এদেশ তোমার নয়
এই যমুনা, গঙ্গা নদী,
তোমার ইহা হতো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে;
জাহাজ কেন বয়।"

এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রকাশিত তথ্য জানাই। আমার পরলোকগত পিতার নিকট এটি শুনেছিলাম। একবার মুকুন্দ দাস পূর্ণিয়া শহরে এসে ছিলেন। ভাট্টাবাজারে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে উনি স্বদেশী গান পরিবেশন করেন। আমার পিতা রাজভক্ত সরকারী কর্মচারী হলেও উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করতেন, দেশপ্রেমের অভাব ছিল না।

মুকুন্দ দাস সেই সময়ে ভাট্টাবাজারে আমাদের গৃহে আসেন। সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী সতুদা (বিখ্যাত লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী)। মুকুন্দ দাস তাঁর রচিত একটি গান ও কবিতার খাতা সঙ্গে আনেন এবং উৎসাহের সঙ্গে আমার পিতার রচিত গানের খাতা দেখেন ও আলোচনা করেন। হঠাৎ স্থানীয় পুলিস অফিসের এক পরিচিত কর্মচারী পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিছুক্ষণ পরে মুকুন্দ দাস, সতীনাথ আমার পিতার সঙ্গে অন্দর-মহলে আহারের জন্য প্রবেশ করেন

[illegible] ... তাঁর নিজের এসে দেখেন [illegible] সঙ্গে থাতা দ্টিও উধাও হয়ে গেছে। মুকুন্দ দাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, কিন্তু পুলিসের গোয়েন্দার পেছনে ছোটা নিরর্থক জেনে পিতা তাঁকে নিরস্ত করেন। মুকুন্দ দাসের কতো গান ও কবিতা নানাভাবে হারিয়ে গেছে। সাহিত্য-প্রেমী কোন গবেষক, লেখক কি মুকুন্দ দাসকে জাতীয় জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসবেন না?

সুবল গাঙ্গুলী
পাটনা-১৩

তেনজিং

বিনোদন সংখ্যাতে আমার লেখা তেনজিং-এর কাহিনী সম্পর্কে শ্রীশিশির ঘোষের সমালোচনায় (দেশ, ২১শে জানুয়ারী) প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অজ্ঞাত এক শেরপার অসামান্য সম্মান লাভের কাহিনী রচনাতে আমি ১৯৫৩ সালের দেশের ও বিদেশের সংবাদপত্র থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি। তেনজিং-এর সঙ্গে যোগাযোগের কোন প্রয়োজন বোধ করি নি এবং যোগাযোগ করেছি বলে কোন ইঙ্গিতও দেই নি। এ সম্পর্কে শ্রীঘোষের বক্তব্য একেবারেই নিরর্থক।

শ্রীঘোষ আমার তথ্য সমূহে [illegible] বলে অভিযোগ করেছেন। আমি কেবল তারই উল্লেখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে তথ্য পেশ করছি। অন্য কোন প্রকার বিতর্কের ইচ্ছা আমার নেই। শ্রীঘোষের পয়েন্টগুলি অনুসারেই আমি বলছি:

(১ ও ২) তেনজিং-এর প্রথমে ভারতে আসা সম্পর্কে পালিয়ে আসা এবং মা-বাবার অনুমতি নিয়ে আসা, এ দুটি কাহিনীই প্রচলিত আছে। Ramsay. Ullman.. 'Man of Everest' পালিয়ে আসার কাহিনী গ্রহণ করেছেন। শ্রীঘোষ আমার লেখাতে উক্ত পুস্তকের প্রভাব অনুভব করলেও আমি সে বই থেকে কোন তথ্য নেই নি। আমার তথ্য লণ্ডন টাইমস, স্টেটসম্যান অমৃতবাজার পত্রিকা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। শ্রীঘোষ এবং তেনজিং যতই নিগূঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হোন, হিমালয়ের বুকে তেনজিং এবং ল্যাম্বার্ট নিশ্চয়ই অনিষ্ঠতর। সেই Raymond Lambert লিখেছেন:—

At 20 he (Tenzing) moved (not ran away) to Darjeeling. There he worked as a coolee until the Himalayan Club noticed him.

(অমৃতবাজার, ১৩-৬-৫৩) তাই আমার কাহিনীতে তেনজিং মা-বাপের অনুমতি নিয়ে ভারতে এসেছিলেন বলে বলেছি।

(৩) (ক) শ্রীঘোষ বলছেন, তেনজিং ও শিপটনের মধ্যে তেমনভাবে পরিচয়ই ছিল না। হয়ত তাই। কিন্তু Statesman (৩-৬-৫৩) বলছেন—

Mr. Eric Shipton sent congratulations to his old friends, Mr Hillary and Tenzing." Shipton বলেছেন—old friends; শ্রীঘোষ বলেছেন, তাঁরা পরিচিতই নন।

(খ) হাণ্ট সম্বন্ধে (৭৪ পৃষ্ঠাতে) আমি কোন কটাক্ষ করি নি। আমার সে যোগ্যতা নেই, ধৃষ্টতাও নেই। হাণ্টের সংগঠনের রূপায়ণে তামাম দুনিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ কি না জানি না। তবে বক্রোক্তি করেছিলেন শিপটন। Statesman (4.6.53) লিখেছিলেন—

"Eric Shipton expressed the view today that the climb owed its success to two causes. First, the Southern route and secondly the development of portable oxygen apparatus of considerable capacity."

(গ) ঘোড়ার মুখ থেকেই নাকি শ্রীঘোষের সব খবর শোনা। তিনি বলেছেন যে, হাণ্ট যেদিন আটাশ হাজার ফুট উঁচুতে নবম শিবির স্থাপন করেছিলেন, সেদিন ইচ্ছা করলেই তাঁরা এভারেস্টে উঠতে পারতেন। এখানে শ্রীঘোষ তার গুরুর নাম না করলেই ভাল করতেন। সেদিন হাণ্টের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। সে ঘটনা সম্বন্ধে হাণ্ট নিজেই বলেছেন—

"From here (South-east ridge) we continued painfully slowly to the foot of the steep rise at the top of which I hope to pitch a tent. But we were both fairly well spent and I therefore, decided to dump the stores — Oxygen. food and fuel etc at that part, I calculated the height to be 27,500 ft." (Statesman, 7.6.53.)

হাণ্ট শিবির স্থাপন করেন নি। অক্সিজেন ইত্যাদি জেবোচিন্তে রেখে আসেন নি ছেড়ে এসেছিলেন এবং ক্যাম্পে ফিরে সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন।

(৪) (ক) শ্রীঘোষ লিখেছেন—"তেনজিং ওই অভিযানে সদস্য অথবা একজন সাধারণ শেরপা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল, তা আজও একটা ধাঁধা। গবেষণাবাবু এ তথ্য কার কাছ থেকে জেনেছেন, তা আমাদের জানালে বাধিত হব।"

নিশ্চয়ই জানাব, জানানো আমার কর্তব্য এবং আনন্দ। এ তথ্য জানিয়েছেন দলনেতা হাণ্ট স্বয়ং। তিনি নিজে বলেছেন—

"Tenzing was a full member of the party but he was at no stage a "guide". Different members were assigned different jobs; Tenzing's was to organise the Sherpas and handle the transportation." (Statesman, 16.6.53.)

(খ) তেনজিং অভিযানের গাইড ছিলেন এ-কথা আমি কোনখানেই

যান নি। আমি বলেছি, 'সেদিন তেনজিং গাইডের কাজ করেছিলেন। আজ তিনি কেবল শেরপা সর্দার।' (৭৮ পৃষ্ঠা) এ প্রসঙ্গে আমি স্টেটসম্যানে প্রকাশিত লণ্ডন টাইমসের নিজস্ব সংবাদের উল্লেখ করছি। সে সংবাদে বলা হয়েছিল—

"Tenzing is one of the only two men who have personal knowledge of the route above South col." Statesman (28.5.53)

এটি ছিল শৃঙ্গজয়ের পূর্বের খবর। শৃঙ্গজয়ের পর লণ্ডন টাইমস লিখেছিলেন—

"A number of newspapers in both India and Pakistan are now implying that the final victory was Tenzing's alone — that he cut the road, broke the trail and finally handed Hillary to the summit as the rope." (Statesman 17.6.53)

তাই আমি লিখেছি, 'তেনজিং সেদিন গাইডের কাজ করেছিলেন।'

বাকী রইল এভারেস্টের নাম। শৃঙ্গ বিজিত হবার পর Statesman (2.6.53) লিখেছিলেন—

"Many alternative names for the peak have been urged by various authorities — Devadhunga, Gauri Shankar, Chomo Kakas and Chouma Lungmo."

কিন্তু তেনজিং-এর কাছের লোক গ্রীফেথের 'সাগর-যাত্রা' নামের কোন উল্লেখ আমি পাই নি।

পরেশ নন্দী
কলিকাতা-১৪

মুদ্রণ প্রমাদ

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার ২১শে জানুয়ারী '৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কিন্নরী লোকসঙ্গীতে সমাজ-জীবন' রচনার ১০ম পঙক্তির (১ম কলম, পৃঃ ৩৩) 'দবে' শব্দের জায়গায় 'দচে', ৪৭তম পঙক্তির (ঐ) 'সেমঙ্গা' শব্দের স্থলে 'সিমলা' এবং ৩য় পঙক্তির (১ম কলম, পৃঃ ৩৪) 'কোবি' শব্দের জায়গায় 'কাঠি' পড়তে হবে।

কিরণশঙ্কর মৈত্র
নিউ দিল্লী

ফুটবলের স্বাধীনতা সংগ্রাম

দেশ বিনোদন ১৩৮৪ সংখ্যাটি হঠাৎ হাতে পড়ল। বড় আগ্রহ করে কয়েকটি রচনা পড়লাম। পড়লাম রাখাল ভট্টাচার্যের "ফুটবলের স্বাধীনতা সংগ্রাম" (পৃঃ ১৮২-১৮৬)।

১৮৫ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে "এর-পর ১৯২৪-এ দ্বিতীয় বিভাগ লীগে ইস্টবেঙ্গল হল তৃতীয়। চ্যাম্পিয়ন পুলিসের প্রথম বিভাগে ওঠা ও আসল কাজে গাফিলতি হবে বলে পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেল না। ক্যামেরন্স আপ ক্যামেরন 'বি'কে আইনত ওঠানো যায় না।'

সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্যে এত ভুল তথ্য থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ইংলিশম্যান (৩-৭-২৪) থেকে ১৯২৪ সালের দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দিলাম।

	খে	জ	ড্র	প	পঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ক্যামেরন 'বি'	২৪	১৫	৭	২	৩৭	৬	৩৭
ইস্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৫	৩	৩১	৯	৩৭
ই বি আর	২৪	১৪	৫	৫	৩৪	১৬	৩৩
পুলিস	২৪	১২	৭	৫	৩৪	১৬	৩১

মুকুট নন্দী
কলকাতা-৭১

দুটি ভুল

প্রণবেন্দু দাসগুপ্তের 'সুন্দরবন' কবিতায় একটি ভুল আছে। যাঁরাই সুন্দরবনে ঘুরেছেন তাঁদেরই এ-অভিজ্ঞতা আছে যে হেঁতাল হলো খুব ছোট খেজুরগাছের মতো চেহারার যার কাণ্ডের ব্যাস আড়াই-তিন ইঞ্চির মতো এবং ডালপালাহীন। সুতরাং হেঁতালের [illegible]

সাহিত্য বিভাগে শঙ্খ ঘোষের পরিচিতি প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন: 'শিকড়ের ডানা' শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ-গ্রন্থ হিসেবে। এ-প্রসঙ্গে জানাই, 'শিকড়ের ডানা' দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ-কর্ম, শঙ্খ ঘোষের নয়। তবে দেবীপ্রসাদের এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন এ-বছরের আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষ। বইটি স্প্যানীশ-কবি হিমেনেথের কবিতার অনুবাদ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
কাকদ্বীপ ২৪ পরগণা

নিকোলাস রোএরিখ ও রবীন্দ্রনাথ

৭ই জানুয়ারী 'দেশে' রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রোএরিখ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ পাঠ করে আবিভূত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে মনীষী কেদারনাথ দাশগুপ্তের উল্লেখ ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলার অন্যতম এই সুসন্তান যিনি League of Neighbours তথা League of Nations এর প্রবক্তা তাঁর সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা বাঙালীরা জানতাম। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের—Nation in the

3651 BEN

making-এর কোনরূপ সম্বন্ধে উক্তি "My friend, philosopher and guide"।

সুদূর চট্টগ্রাম থেকে যে অধ্যায়ের শুরু তা নানা বিবর্তনের মধ্যে নিউ-ইয়র্কে শৈল্পিক জ্ঞানভাবনা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দর্শনে বিধৃত। যাঁর সহচর্য, শিল্পবোধ বিশ্বের মানব শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-নাথকে প্রভাবিত করেছিল, এ ইতিহাস প্রকৃত গবেষকের হাতে পড়া উচিত, তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির ও রবীন্দ্র প্রতিভার এক নূতন দিকের আলোক-পাত হবে।

জিঞ্জীর সরদার
ডুয়ার্স

'থিয়েটার '৭৭''

দেবাশিস দাশগুপ্তের নিবন্ধ (দেশ ২৮শে জুন) 'থিয়েটার ১৯৭৭' রসোত্তীর্ণ না হলেও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ এক বছরের কলকাতার মঞ্চ 'পরিক্রমায় যে সমস্ত ভাল নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে তার বিস্তৃত চিত্র আমরা কিন্তু পাইনি—অবশ্য শত শত নাটকের সে হিসাব স্বল্প পরিসরে দেওয়াও সম্ভব নয়। আমার মনে হয় নিবন্ধের শীর্ষনাম হওয়া উচিত ছিল কলকাতার থিয়েটার ১৯৭৭' কারণ গ্রামবাংলা তো দূরের কথা শহরতলীর (নৈহাটি, ইছাপুর, শ্রীরামপুর) মূল্যবান প্রযোজনাগুলির কথাও নিবন্ধে অনুচ্চারিত।

লেখক এক জায়গায় লিখেছেন গ্রুপ থিয়েটারগুলি প্রায় সর্বদাই লোকসানে নাটক প্রযোজনা করেন। হয়ত কথাটা নিদারুণ সত্য—তবু আমার দুটি অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে আমাকে পরস্পরবিরোধী দুই মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। আমাদের অঞ্চলে একটি পুরনো মঞ্চ সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে আমরা কলকাতার কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখি। তিনটি গ্রুপের মধ্যে দুটি নামকরা সংস্থা তাদের তৎকালীন দুটি প্রযোজনার জন্য এমন পরিমাণ অর্থ দাবি করে বসেন যে টাকা আমাদের এই অনুন্নত মফস্বলে টিকিট বিক্রি করে তোলা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে অত্যন্ত সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন প্রতি-ষ্ঠিত দুটি দল। প্রথমোক্ত দলগুলিকে 'পেশাদারী গ্রুপ থিয়েটার' বললেই সবচেয়ে ভাল বলা হয়। আমাদের গ্রামের ও মফস্বলগুলিতে স্বল্প খরচে তাদের মূল্যবান প্রযোজনাগুলি মঞ্চস্থ করতে কলকাতার সমস্ত গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে অনুরোধ জানাই। পরিশেষে বলি, কলকাতার অন্যতম গ্রুপ শুভময়ের 'ক্যাকটাস' ডিসেম্বরে মঞ্চস্থ হয়েছে—এই দলটির নামোল্লেখ প্রয়োজন ছিল।

অনির্বাণ আচার্য
শান্তিপুর

প্রকাশিত হল

রেবন্ত গোস্বামীর

কিশোর-উপন্যাস

অরুমিতুদের কথা

দাম ৪.০০

অরু আর মিতু—ছোট্ট দুটি ভাইবোন। এক দুর্ঘটনায় শহরের পথে হঠাৎই একদিন মারা গেলেন ওদের বাবা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওদের মা পড়লেন অকূল পাথারে। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে এবং সন্তান দুটিকে মানুষ করার তাগিদে গ্রামের বাড়িঘর বেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে হাজির হলেন কলকাতা শহরে। তারপর শুরু হয় এক অসহায়া বিধবা রমণী আর দুটি পিতৃহীন বালক-বালিকার বেঁচে থাকার, মানুষের মত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার দুরূহ সংগ্রাম। 'অরুমিতুদের কথা' সেই বাস্তব সংগ্রামের নির্মম কাহিনী—যা অহরহ চলছে আমাদের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে নগরে জনপদে—প্রতিটি মুহূর্তে। কাল্পনিক রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর কৃত্রিম রোমাঞ্চ-উত্তেজনা নয়, নয় রূপকথার কল্পনা-বিলাস—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর বাস্তবতার নিষ্করুণ ছবি এই রচনা, যা স্বাদে এবং চরিত্রে সাম্প্রতিক বাংলা কিশোর-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম ॥

বনফুল-এর

নতুন রীতির উপন্যাস

অসংলগ্না

দাম ৪.০০

চমকপ্রদ কোনও কাহিনীবৃত্ত রচনা নয়, উজ্জ্বল কতকগুলি চরিত্রসৃষ্টিও নয়—বিমূর্ত কতকগুলি ভাব ও কল্পনাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে সেগুলি অবলম্বনে সৃষ্ট এই অভূত-পূর্ব উপন্যাস ॥

শুভ্রাংশু গুপ্তের

বিশিষ্ট উপন্যাস

মহাকরণ

দাম ৪.০০

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর অভ্যন্তরে আমলা-কেরানী-কর্মচারীদের যে আলাদা জগৎ এবং জীবন বহমান, সেই অজ্ঞাত জীবনের কাহিনী এই চাঞ্চল্যকর উপন্যাসে বিধৃত ॥

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

ছোটদের মজার বই

ম্যাজিকের মত মজা

দাম ৫.০০

মোট চল্লিশটি হতবুদ্ধিকর মজার ব্যাপার এ বইয়ে আছে। তার কয়েকটি চোখের ধাঁধা, কিছু বুদ্ধির খেলা, কয়েকটি অঙ্কের ম্যাজিক এবং বেশ গুটি কয় বৈজ্ঞানিক মজা ॥

পাপু-র

ছবি ও ছড়ার বই

পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া

দাম ৫.০০

পাপুর আঁকা ছবির সঙ্গে বাংলা দেশের আটত্রিশজন নামজাদা সাহিত্যিকের লেখা ছড়া আর রূপকথার মিলনে তৈরী বাংলা সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য এক বই 'পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া' ॥

প্রকাশিত হল

রূপদর্শীর

রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য

দাম ৮.০০

'রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য' আসলে রূপদর্শী কমিশনের রিপোর্ট। এই কমিশন কোনও সরকার-নিযুক্ত নয়, মানবতা ও বিবেকবোধ-নিযুক্ত। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান নয় এই কমিশনের বিচার্য ; এর বিচার্য আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত—দেশব্যাপী সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। গত আট-ন' বছর থেকেই এর রিপোর্টগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

সমকালীন রাজনীতিতে ইদানীং কালে যে অকল্পনীয় ভণ্ডামি, অসাধুতা এবং অনাচারের তাণ্ডব চলেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে নির্ভীক সাংবাদিক-লেখক রূপদর্শী সেগুলির বীভৎস নগ্ন রূপ পাঠকসাধারণের কাছে উন্মোচন করে আসছেন তাঁর এই অনবদ্য রচনাগুলির মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় এগুলিই সম্ভবত সর্বপ্রথম সার্থক রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-রচনার সূত্রপাত ঘটায়। উপরন্তু, এর কোনও-কোনও-টিতে ভবিষ্যৎ এমনভাবে আভাসিত হয়েছে যে, তা শুধু পরম বিস্ময়করই নয়, দূরদৃষ্টিসুলভও। বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে প্রসারিত হওয়ার এই যে ক্ষমতা—একেই বলে কাল-জয়িতা। 'রূপদর্শীর সংবাদ-ভাষ্য' নিঃসন্দেহে সে গুণে গুণবান ॥

এই লেখকের আর একটি বই :
ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬.০০

কয়েকটি উপন্যাস

সমরেশ বসুর
মহাকালের রথের ঘোড়া
দাম ১০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমিই সে
দাম ৭.০০

রমাপদ চৌধুরীর
যে যেখানে দাঁড়িয়ে
দাম ৫.০০

বিমল করের
অসময়
দাম ১২.০০

বুদ্ধদেব গুহর
বাতিঘর
দাম ৪.০০

মতি নন্দীর
নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান
দাম ৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দর্শকের ভূমিকায়
দাম ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেণীসংহার
দাম ৫.০০

কালকূট-এর
কোথায় পাবো তারে
দাম ৩৫.০০

বিমল মিত্রের
হাতে রইলো তিন
দাম ৬.০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
লোকারণ্য
দাম ৪.০০

বুদ্ধদেব বসুর
গোলাপ কেন কালো
দাম ৫.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ঘুণপোকা
দাম ৬.০০

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের দুটি কাহিনী

ফেলুদা এণ্ড কোং

দাম ৮.০০

ফেলুদার দুটি নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে 'ফেলুদা এণ্ড কোং'-এ। দুটি অ্যাডভেঞ্চারেই, বলা বাহুল্য, ফেলুদা বিজয়ী। তার এই জোড়া-জয় তার জোড়া-অনুচর তোপসে-জটায়ুর মতো নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করবে তার অজস্র অনুরাগী পাঠককে ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
ফটিকচাঁদ ৮.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০ আরো এক ডজন ১০.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০ বাক্সরহস্য ৫.০০ সোনার কেল্লা ৬.০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০ এক ডজন গপ্পো ১০.০০ বাদশাহী আংটি ৫.০০ বিষয় চলচ্চিত্র ১০.০০

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার আর একটি রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

জয় বাবা ফেলুনাথ

দাম ৬.০০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

দেশ ৪৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যা
২৮ মাঘ ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধ
শান্তি কোথায় মোর তরে হায়
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
পক্ষীনিবাসে সারাদিন
অমল মুখোপাধ্যায়ের গল্প
এক বিন্দু উত্তাপের জন্য

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

ইতিহাসে তথ্যের মর্যাদা

সম্প্রতি কয়েকটি ইতিহাস-গ্রন্থের সম্পর্কে সরকারের যে আচরণ ও মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে, সেটা অনেকের কাছে রহস্যের মতো অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন একটা সিদ্ধান্তের ক্রিয়া বলে বোধ হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার কী বলতে চান, কিংবা বলতে চান না সেটা উৎসুক জনের পক্ষে বোধগম্য নয়। সংবাদে প্রচারিত তথ্যের উল্লেখ অনুযায়ী ধারণা করতে হয় যে, ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবেষণে কুণ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে বলে কোন কোন গ্রন্থ সরকারের চিন্তায় ও বিচারে অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এবিষয়ে সরকারী বক্তব্যেরও প্রকাশ এমনই এক কুণ্ঠার কুহেলিকায় ঢাকা পড়ে আছে যে, উৎসুক জনসাধারণ স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারছে না, সরকারের কাছে প্রকৃত অভিযোগের বিষয়টি কী?

বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্ররোচিত করবার প্রত্যক্ষ উত্তেজনা বহন করে এমনতর কোন পুস্তকের বহুল প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব করে দেবার অধিকার সরকারের আছে। সেটা সরকারের পক্ষে অবশ্যপালনীয় একটি কর্তব্যের অধিকার। কিন্তু অনেকের কাছে বস্তুত একটা বিচিত্র বিস্ময়ের ব্যাপার বলে বোধ হবে, যদি দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের আঘাত-সংঘাতের কোন ঘটনার উল্লেখের মধ্যে বাস্তব তথ্যকে কিছুটা কম করে দেখান হয়। কিন্তু বিস্মিত হলেও প্রশ্ন দেখা দেয়, বাস্তব তথ্যকে কম করে কিংবা বড় করে দেখান তো ঐতিহাসিকের সততার কর্তব্য নয়। সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যসম্মত বিবরণও নয়।

বিষয়টি খুবই জটিল। দেশের জনজীবনে শান্তি মৈত্রী ও স্বস্তি রক্ষা করবার প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত, অর্থাৎ দেশের সরকার; তাঁদের পক্ষে নীতি হিসাবে কোন্ কর্তব্যের গুরুত্ব বেশি, সেটা উপলব্ধি করতে অসুবিধে নেই। ঐতিহাসিক সততা তথা ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবেষণে নিরপেক্ষ বিচার এবং সততার মর্যাদা যতই মহৎ বলে বিবেচিত হোক না কেন, সে-সব তথ্যের উল্লেখ বর্ণনা ও পরিবেষণ যদি জনজীবনের উপর বিদ্বেষের ক্রিয়া জাগ্রত করে, এবং তার প্রভাব যদি সহজে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠবার মতো কোন উত্তেজক প্রক্রিয়া হয়, তবে সরকারের পক্ষে গ্রন্থের ও লেখকের স্বাধীনতার নীতি সম্বন্ধে সাবধান হতেই হয়। অতীতের দিল্লিতে নাদির শাহের নির্মম ও নিদারুণ কতল-এ-আম গণহত্যা অনুষ্ঠানের বাস্তবোচিত অথচ নির্মম বর্ণনা কোন গ্রন্থে থাকে, তবে সেটা গ্রন্থ-লেখকের সততারই পরিচয় বলে স্বীকার করতে হয়। অন্যথা হলে শুধু গ্রন্থের মর্যাদাকে নয়, লেখকেরও সততার মর্যাদাকে নিপীড়িত করা হয়। বুঝতে অসুবিধা নেই, এক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্যের সততাও দোটানা অবস্থায় নিপীড়িত।

ভারতে অনেক সমালোচকের মন্তব্যে একটি কৌতুকপ্রদ অথচ সামাজিক জীবনের সত্য হিসাবে চমকপ্রদ তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের ব্রিটিশ সম্রাটের দরবারে আসন ও উপবেশনের আগু-পিছু পার্থক্যের প্রশ্ন নিয়ে মারাঠা ও রাজপুত মহারাজাদের মধ্যে প্রবল মান-অভিমান আলোড়িত হতো। প্রকাশ্য দাবীর কলহও দেখা দিত। এটা মারাঠা ও রাজপুতের অতীত সংঘর্ষকালের সঞ্জাত বিদ্বেষের জের। লক্ষ্য করতে হয়; ঘটনার প্রথাটা কবেই মরে গিয়েছে, ঘটনাজাত সেই বিদ্বেষের জেরটা আজও জাগ্রত আছে।

এ সত্য অনেক অনুসন্ধানী সমালোচকের জানা আছে যে, ব্রিটেনের কোন ইংরাজের লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থে নেপলিয়নের সামান্য কোন গুণের সপ্রশংস উল্লেখ ব্রিটিশ জনতা এবং সরকার উভয়েরই কেউ সহ্য করতে পারতো না। ব্রিটিশ-বর্ণিত ও ফরাসী-বর্ণিত ওয়াটারলু যুদ্ধের রূপ একই রকম নয়। দুই-ই দু'রকমের অতিশয়োক্তি ও অল্পোক্তির দ্বারা দূষিত। এটা যেমন ঐতিহাসিক সত্যতার দিক দিয়ে একটি অবাঞ্ছিত অনাচার, তেমনই কোন ইতিহাস লেখকের পক্ষে মোগল ঔরংগজেবের আচরণে হিন্দুবিরোধী কোন উগ্রতার সামান্য প্রমাণ না পাওয়া অবশ্যই শোচনীয় এক মিথ্যাসক্তির ক্রিয়া বলে অভিযুক্ত হবে।

সবচেয়ে দুরূহ প্রশ্নটি এই যে, যদি অতীতের ভস্মীভূত বিদ্বেষের মধ্যে এখনও আগুনের স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে থাকে, তবে ইতিহাসের বক্তব্য সম্বন্ধে একটা শাসন বিহিত করবার প্রয়োজন কি হয় না? সতীদাহের একটি করুণ ও নিষ্ঠুর ঘটনার তথ্য আহরণ করে তার দৃশ্য ভূমিকার উপর একটি চমৎকার কাহিনী অঙ্কিত করলে আজকের লেখকের মধ্যে সামাজিক ভ্রূকুটি এবং সরকারী নিষেধের সম্মুখীন হতে হবে না। এমন কাহিনী সতীদাহপ্রথার পক্ষে জনজীবনের কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ সেই ঘটনার শাণিত অবস্থাটা কবেই তেজ হারিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উগ্র ঘটনা সম্বন্ধে এমনতর নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাহিনী অথবা ইতিহাস রচনা করবার সুযোগ থাকলেও সেটা সমুচিত বলে মনে হবে না। এটা ঠিক গ্রন্থের বৈধতা অথবা অবৈধতার প্রশ্ন নয়। বস্তুত সামাজিক জীবনের শান্তি স্বস্তি ও কল্যাণের প্রতি গ্রন্থের একটি প্রত্যক্ষ যোগ্যাযোগ্যবিনিময়ের প্রশ্ন। বর্তমান সামাজিক জীবনের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করে লেখার লেখকতার ও তথ্য পরিবেষণের স্বাধীনতা অবশ্য সীমিত করবার দরকার হয়। প্রকৃত তথ্যের উগ্র অবাধ উল্লেখ পাণ্ডিত্যে ও গবেষণার গ্রন্থে থাকুক। কিন্তু সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে নয়। এটা ইষ্টানিষ্টবিনির্ণয়ের প্রশ্ন

ভারতের যত মুখ্যমন্ত্রী এক হউক!
কেন্দ্রের শিকল আমাদের বিকল করতে পারবে না!

ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি

নারায়ণ দত্ত

আজ থেকে শ' দুই বছরের আগেকার ত্রিবেণী। অষ্টাদশ শতকের সূর্য তখন ঢলে পড়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তখনও বসেনি। সুদূর কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এই মাত্র কয়েকমাস হল নেমেছেন লর্ড ওয়েলেসলি। কলকাতার নয়া 'আকবর বাদশা' ব্রিটিশ ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল—দণ্ডমুণ্ডের একচ্ছত্র মালিক। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে কলকাতার আমজনতা। কেল্লা থেকে একুশবার তোপ পড়েছে বুম্‌বুম্‌ শব্দে। কাঁপিয়ে তুলেছে নতুন শহরের মাটি। কিন্তু ভাগীরথীর উজানে হুগলী পেরিয়ে তার কোনই প্রতিধ্বনি হয়নি ত্রিবেণীর বুকে। হয়নি বোধহয় কেবল দূরত্বের জন্য নয়। বাঙলাদেশ তখনও কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি। কলকাতা আর তার নায়ক এক নয়। গ্রামগঞ্জের মানুষ তখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কোন নায়কের আবির্ভাব হল, আর কেই বা কুর্নিশ করে যবনিকার অন্তরালে মিলিয়ে গেল, তার কোন হিসেব রাখত না। তাদের মঞ্চ চরিত্র, তারাই ঠিক করে নিত। সে কথা বিশেষ করে সত্য বোধ হয় গঞ্জ ত্রিবেণী সম্বন্ধে। সেখানকার অবিসংবাদী নায়ক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সুবিশাল মহীরুহের মত। তাঁর সূর্যের মত দীপ্তিতে রাঢ়-বারেন্দ্রের বাঙলাদেশ ভাস্বর। গ্রাম-বাঙলা তাঁর দিকে চেয়ে। তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত। অন্য কারও ঠাঁই কোথা?

কিন্তু যেদিনের কথা হচ্ছিল। ত্রিবেণী তখন খুবই বড় জমজমাট গঞ্জ। নামকরা। সকাল না হতেই পথঘাট তার লোকে লোকারণ্য। মানুষজন অধিকাংশই খালি পা। কারও কাঁধে, কারও মাথায় বাঁধা গামছা। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দর আবার গঙ্গাস্নানের হিড়িক। কারও গলায়-বা স্তব-মন্ত্রের সুর। গঞ্জের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। দূর থেকে মস্ত টোলের এক-রাশ ছাত্রের স্তবপাঠের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে ঐকতান জমিয়েছে আশেপাশের গাছ-গাছালিতে নানা পাখির কলকাকলি। সারা রাত বিশ্রামের পর ভাটায় ভাসান নৌকায় মাঝির দরাজ গলার গান। মালবোঝাই নৌকায় কেউ-বা সোরা, কেউ-বা মসলিন, গড়া কাপড় বোঝাই করে চলেছে সুতানুটী, ডিহিকলকাতা, গোবিন্দপুর। আসছে কেউ-বা পাটনা, কেউ-বা রাজমহল, মুর্শিদাবাদ বা কাশিমবাজার থেকে। নূতন সূর্য দিকচক্রবালের রাঙা কার্পেটে পা দিতেই অপেক্ষমাণ সদাজাগ্রত পৃথিবী যেন উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালে। টোলের ছাত্রদের কোলাহলে যেন তারই প্রতিধ্বনি।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক ঢুকল টোলে। কালো রঙ। লম্বা চওড়া বেশ পেটাই চেহারা। নিয়মিত শাস্ত্র চর্চা করে—সেটা দেখলেই বোঝা যায়। একমাথা বাবরি চুল। তার ওপর লাল গামছা জড়িয়ে বাঁধা। মালকোচা মারা কাপড়। সামনেই যে পড়ুয়াকে পেলে জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরমশায় উঠেছেন নাকি? ছেলেটা হাসলে, বললে, নতুন বুঝি এ-দেশে? জানো না, তর্কপঞ্চাননের নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাঁর গঙ্গাস্নান, জপ-আহ্নিক সব সারা হয়ে যায়। লোকটার মুখের কোন বৈকল্য হল না। নিজের অজ্ঞতায় অপ্রতিভ হল না। হাসলে বরঞ্চ; বললে, শুনেছি বই কি ঠাকুরমশায়, তবে চোখে দেখিনি ত। আজ যাচাই হয়ে গেল। তা একটু ডেকে দেবার আজ্ঞে হোক। বোঝা যায়, লোকটা ধূর্ত। তার চঞ্চল কালো চোখে কেমন যেন একটা রহস্য খেলা করে গেল। পড়ুয়াটি আর কোন কথা বাড়ালে না। একটু ভ্রূকুটি করে চতুষ্পাঠীর ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ং তর্কপঞ্চানন বেরিয়ে এলেন। মানুষটা গোরা নয়। কালো। কিন্তু নয়ন-রঞ্জন কালো। নববর্ষার মেঘের মত কালো। উর্বর জমির বুক আলো করা ডগমগ নতুন ধানগাছের মত কালো। উজ্জ্বল নয়নসুখ শ্যাম। দেহ সুগঠিত। লোমশ। আজানুলম্বিত বাহু। উন্নত নাসা। প্রশস্ত ললাট। আয়তচক্ষুর মণি দুখানি হীরকখণ্ডের মত দ্যুতিমান—বুদ্ধি, মেধা, পাণ্ডিত্যে। বয়স যথেষ্টই কিন্তু না মুখে, না দেহে জরার কোন লক্ষণ আছে। না আছে মনীষায়। কণ্ঠে মেঘগর্জনের মত গাম্ভীর্য—যেন ঈশ্বরের কোন প্রত্যাদেশের মত সঘনে ঝঙ্কৃত হয়।

লোকটা পরিচয় দিলে। লুকালো না। বললে, ঠাকুরমশায়, আমি ডাকাত। ডাকাতি করেই খাই। কাছেই বাড়ি। বাগাটিতে। নাম শ্যাম সর্দার। আমার একটা বিধান চাই। লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কিনা? শ্যাম কোন দ্বিধা করলে না। পণ্ডিত-

হেস্টিংসের মূর্তির পাশে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের মূর্তি

মশায়ের মুখের দিকে চেয়ে সেখানে কোন ভাববিকার হয়েছে কিনা, তাও পর্যবেক্ষণ করলে না বিন্দুমাত্র। যথোচিত দক্ষিণা দিলে তর্কপঞ্চাননের চরণতলে। প্রণাম করলে, আবার বললে, 'আমি বিধান চাই ঠাকুরমশায়।'

শ্যামসর্দার তর্কপঞ্চাননের মুখের দিকে তাকায়নি। বোধ হয় সাহস পায়নি। তাকালে দেখত মুহূর্তে সেই কূট প্রশ্ন নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বাগাটির ডাকাত সর্দারের কাছে হয়ত এটা টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব। তার প্রাপ্তিযোগের ব্যাপার। স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্ন। কিন্তু সেই দিকপাল পণ্ডিতের কাছে এটা ন্যায়ের জিজ্ঞাসা। আছে কি নেই? ন্যায় কি বলে? যুক্তি দিয়ে কি এটা গ্রাহ্য। নবন্যায়ের শাণিত মননে এই প্রশ্নকে চিরে চিরে বিচার করতে লাগলেন তর্কপঞ্চানন।

এবং ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্যাম মল্লিকের এই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা হলেও তিনি ডাকাতি করে লুঠ করা দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব স্বীকার করেছিলেন। ব্যবস্থাটি তিনি দিয়েছিলেন কিছু ধর্মোক্তের বচনের উল্লেখ করে। সেটি এই:

"পাশ্বিক দ্যূত চৌর্যাদি প্রতিরূপক সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্‌ ॥"

এই বচনের উল্লেখ করে বিধান দেওয়া হয়েছে: "স্মৃতি বচনেন চৌর্যস্য স্বত্বজনকত্বম। অতএব তদ্দ্রব্যস্য ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চৌরিত্য দ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি" মানে এই বচনের দ্বারা চোরের স্বত্ব বা অধিকার জন্মায়। অতএব সেই দ্রব্য ঋণ দিয়ে তা থেকে যা বৃদ্ধি বা সুদ হয় তার দ্বারা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানদ্বারা কিছু ফল হয়। পিতৃপুরুষের প্রসাদে চুরি করা দ্রব্যে চোরের স্বত্ব স্বীকার করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটা তর্কপঞ্চাননের দক্ষিণালোভী মনেরই পরিচয়। শ্যাম ডাকাতের দক্ষিণার লোভ সামলাতে না পেরেই তিনি এই বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু এর চেয়ে অবিচার বোধ-করি আর হয় না। হয় না যে তার প্রমাণ এই বিধানটি তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ন্যায়ের বিচারই যদি তাঁকে উদ্বুদ্ধ না করত তাহলে কি এই কাজ তিনি করতেন? অবশ্যই না।

কিন্তু বিধানদান এখানেই শেষ হলেও এই নাটকের যবনিকা এখানে পড়েনি। এই বিধানের ফল হাতে হাতে পেতে হয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে। সে দৃশ্যটা জমে উঠল কিছুকাল পরে গঞ্জ ত্রিবেণীর এক নিশুতি রাতে। তিথিটা বোধহয় অমাবস্যাই ছিল। রাত্রির অন্ধকারের ওপর অমানিশার নিজস্ব আর এক আস্তরণ আঁধার তামসী নিঃশব্দ নিশিকে গভীরতর, ভীষণতর করে তুলেছিল। দূরে গঞ্জের সীমানার বাইরে শেয়াল ডেকে রাত্রির তৃতীয়যাম ঘোষণা করে গেছে অনেকক্ষণ। এমন সময় সেই গুঁড়ি গুঁড়ি আঁধার কেন মূর্তি ধরে কতকগুলি শ্মশান কিঙ্করের মত বেরিয়ে এল হা রে রে-রে শব্দ করে। হাতে তাদের জ্বলন্ত মশাল অন্ধকারকে প্রজ্বলিত ত্রিশূলের মত বিঁধছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাকা কোঠায় সেদিন ডাকাতি হয়ে গেল। হতভম্ব জগন্নাথ অসহায়ের মত শুধু চেয়ে থেকে থাকবেন। যার শ' দুই সনের তারপাদে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করে নিজেই লিখেছেন: 'আমাদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পড়িয়া কাগজপত্রাদি ও পুস্তক অনেক ভস্মরূপ হইয়াছে'। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই ঘটনার পরেই বিচারপতি জোন্স নিজে বেতন দিয়ে লোক রেখে ত্রিবেণীতে জগন্নাথের বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এ ত অনেক পরের কথা। গোড়ার কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ত্রিবেণীতে রঘুনাথ তর্ক বাচস্পতির চতুষ্পাঠীর কাছে ভগবতী তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে বাস করতেন। বামনীকে রঘুনাথ ডাকতেন 'ভগী' বলে। 'ভগী' একদিন তাঁর ছেলেকে তর্কবাচস্পতির টোলের উনুন থেকে আগুন আনতে পাঠান। বাচস্পতি কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিলেন বোধহয়। একহাতা কাঠের আগুন এনে ছেলেটির সামনে ধরতেই, ছেলেটি কোনরকম দ্বিধা না করে একমুঠো ধুলো হাতে নিয়ে তার ওপর আগুন দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে। এই ছেলেটিই ভাবীকালের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। এই কাহিনীটি শুনিয়েছেন রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'নবচরিতে'।

রুদ্রদেব বাচস্পতির ছেষট্টি বছরের ছেলে জগন্নাথ। এই কেতাবে আছে জগন্নাথের জন্ম হয় ইংরাজী ষোলশ পঁচানব্বই সালে। তিথিনক্ষত্র বিচার করে দীনেশ ভট্টাচার্য মশায় তাঁর 'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চায়' দেখিয়েছেন জগন্নাথের জন্মকাল সেপ্টেম্বরের তেরই। সালটা খৃষ্টীয় ষোলশ' চুরানব্বই। সে যাই হোক, বাবার বেশী বয়সের ছেলে, কাজেই আদরও খুবই বেশী। বেশী দুরন্তপনাও। রজনীকান্ত এমনই একটা গল্প বলেছেন। বাঁশবেড়ের পঞ্চানন ঠাকুরের

সময়ে কারণে অকারণে নানা লোকের নামেতের পাঁঠা পড়ে। একবার তরুণ জগন্নাথ পান্ডাদের কাছে একটা পাঁঠা চান। পান্ডারা প্রথমে গররাজী। কিন্তু পরে যখন জগন্নাথ ঠাকুরকে নিয়ে জলে ফেলে রেখে দেন, পান্ডারা প্রতি বছর একটা করে পাঁঠা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে অব্যাহতি পান। ঠাকুরও ফেরত পান।

এই সব অত্যাচারের কথা একদিন পিতা রুদ্র-দেবের কাছে পেশ করল পাড়াপ্রতিবেশীরা। ছেলেকে রুদ্রদেব ধমকালেন খুব। বললেন : পড়াশুনা কিছুই করছ না। করছ কেবল বদমায়েশি। জগন্নাথ সব শুনলেন। পরে পাঠশুন্তকমুলি সব গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন। রুদ্রদেব তো থ'। হতভম্ব অভিযোগকারী পাড়াপ্রতিবেশীরাও। এই গল্পও রজনীকান্তের।

কিন্তু জগন্নাথের পড়াশুনা শুরু কোথায়? প্রথমত বাপের কাছে। তাঁর কাছে মুখে-মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া পরে কয়েকখানি সাহিত্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।' কিন্তু দুরন্তপনা দিনের পর দিন বেড়েই চলল। এদিকে আট বছর বয়সে আবার মা মারা গেলেন। কাজেই মা-মরা ছেলের আদর আরও বেড়ে গেল। মাসীর কাছে মানুষ হতে থাকেন জগন্নাথ। কিন্তু পড়াশুনাও সমান তালে চলল। বাবার কাছে শাস্ত্রপাঠে হাতেখড়ি করে নিয়ে ত্রিবেণীর ছেলে জগন্নাথ চললেন বাঁশবেড়ের ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের টোলে। ভবদেব রুদ্রদেবের দাদা। এবং সেই অল্পবয়সেই সেখানে স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করে যথেষ্ট নাম করে ফেললেন। ভবদেবের টোলের একটা মজার গল্প বলেছেন রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'গোষ্ঠী-কথায়'। একদিন ভবদেব তাঁর পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পন্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির প্রসিদ্ধ 'দ্বৈতনির্ণয়' পড়াচ্ছিলেন তাঁর এক স্মৃতির ছাত্রকে। 'দ্বৈতনির্ণয়' সেকালের ভারী নামকরা স্মৃতিগ্রন্থ। এখন হয়েছে কি, পড়াতে পড়াতে ত এক জায়গায় বিষম ঠেকে গেছেন। কিছুতেই আর সে জায়গাটার সহজ মানে করতে পারছেন না! অনেকক্ষণ মাথা চুলকে শেষ-বেশ টিকি নেড়ে বললেন, নাঃ এই জায়গাটা ভালো বুঝতে পারেননি জ্যাঠামশায়। একপাশে বসে পড়ছিলেন জগন্নাথ। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, মহাশয়ের জ্যাঠামশায় ঠিকই বুঝেছিলেন, বুঝতে পারেননি আমার জ্যাঠামশায়। এই কথা বলে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের কূট বিষয়ের মীমাংসা গ্রন্থের সেই জায়গাটা জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলেন। তখন জগন্নাথের বয়স বার।

কিন্তু তখনও তিনি তাঁর আসল ক্ষেত্রে এসে পৌঁছাননি। জগন্নাথ ন্যায় পড়েন প্রতিবেশী রঘুনাথ বাচস্পতির কাছে। কিন্তু তার আগেই মেড়ে গাঁয়ে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। বিয়ের পরই বাঁশবেড়ের টোল ছেড়ে তিনি ত্রিবেণী চলে আসেন, এবং রঘুনাথের টোলে ন্যায় পড়তে থাকেন। তাঁর আশ্চর্য মনীষার অল্প সময়েই ন্যায়েতেও তাঁর অসাধারণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটা চিত্তাকর্ষক গল্প শোনা যায়। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। রঘুনাথের টোলের পড়াশুনা শাস্ত্র চর্চায় বেশ একটু ঢিলে পড়েছে। অনেকেই পাকের আয়োজন করতে ব্যস্ত। রঘুনাথ নিজেও স্নানাহারের জন্য অন্তঃপুরে গেছেন। এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসার মত একজন নৈয়ায়িক পন্ডিত এসে হাজির। ক্রুদ্ধ মার্তন্ডের মত তিনিও রক্তচক্ষু। মুখে একটিই বাক্য : রণং দেহি। নব্যন্যায়ের তর্কবিচার হবে। আগন্তুকের নাম রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত টীকাকার লোকপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র। ইনি শিখা সোজা করে বললেন, যুদ্ধং দেহি।

বিচারের ত আর কালাকাল নেই। সেই দারুণ দ্বিপ্রহরেই বিচার শুরু হল এবং একে একে সবাই— সকল ছাত্রই পরাজয় বরণ করলেন। শিখা নামিয়ে দিলেন। আর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল রামবল্লভ আতিথ্যের জন্য আর দাঁড়ালেন না। সোজা নবদ্বীপ ফেরত চললেন। এবং নিজের জয়ধ্বজা উড়িয়ে সেদিন নবদ্বীপে ফিরেই যেতেন যদি না মাঝপথে একটি তরুণ এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াত। এবং তাঁর শিখাও উন্নত। তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি।

—কি চাই? বিজয়োন্মত্ত রামবল্লভ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করে থাকবেন।

—আমি রঘুনাথ বাচস্পতির টোল থেকে আসছি। তরুণ পরিচয় দিয়ে থাকবে।

—রঘুনাথের টোলের সকলে আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। রামবল্লভের জবাব।

—সবাই নয়। আপনি যখন গিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম না। আমি মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করতে গিয়েছিলাম গৃহে। কাজেই আপনার এই জয় আমার ওপর প্রযোজ্য নয়। আমি আপনার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে এসেছি। আপনি অনুমতি করুন।

উপায় নেই রামবল্লভের। এই প্রগল্ভ তরুণের গগনচুম্বী স্পর্ধা তাঁকে স্তম্ভিত করে থাকবে এবং অনতিবিলম্বেই তার রণসাধ ঘুচিয়ে দেবার দৃঢ় বিশ্বাস

প্রস্তরখন্ডের এক দিকের ছবি

বোধহয় রামবল্লভকে তাঁর বিনা দ্বিধায় আবার তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। যুদ্ধ একটু এগুতেই রামবল্লভ বুঝলেন, এ বড় শক্ত ঠাঁই। এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল রামবল্লভ সেই তরুণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সূক্ষ্ম তর্কজালের মধ্যে পড়ে এমন হাবুডুবু খাচ্ছেন যে তাঁর পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় নেই। ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পন্ডিত এই তরুণেরই নাম জগন্নাথ। তাঁর বয়স তখন ষোল। এবং পরাজিত রামবল্লভের সেদিন রঘুনাথের টোলে আতিথ্য গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না!

কিন্তু তখনও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হননি। সে আরও অনেক পরের কথা। রুদ্রদেব মারা গেলেন নব্বই বছর বয়সে। জগন্নাথের তখন চব্বিশ। সর্বস্ব বিক্রয় করে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এবং জিনিসপত্র বেচেই তিনি তাঁর পিতার চতুষ্পাঠীটি চালাতে লাগলেন। শেষকালে সেটাও অচল হয়। এই সময়েই, রজনীকান্ত গুপ্ত বলছেন, তিনি 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি পান তাঁর অধ্যাপকের কাছে।

কিন্তু নানা কষ্ট স্বীকার করেও পিতৃ-আবাস ত্যাগ করেননি তিনি। ত্রিবেণীতেই তিনি একটি টোল খোলেন এবং এই টোল থেকেই অচিরে তাঁর সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক ধনী-মানীরা মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। জমিজায়গা দিলেন অনেকেই। এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের। তিনিই জগন্নাথের খুড়ে ঘর কোঠা করে দেন। শোনা যায়, এক বিপুল জমিদারীও তাঁকে লিখে দিতে চান। কিন্তু জগন্নাথ তাতে রাজী হন না। তাঁর ভয়, ছেলেরা জমিদারী পেলে আর শাস্ত্রব্যবসায়ে রাজী হবে না! অবশ্য শুধু রাজা নবকৃষ্ণ নন, বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ, মহারাজা নন্দকুমার, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র—সকলেই তাঁকে সাহায্য করেন, কেউ-বা জমিদারী দেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁর নন্দকুমারের জীবনীতে লিখেছেন— 'ত্রিবেণীর অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে যখন জগতের বড় কেহ চিনিত না, মহারাজ তখনই তাঁহার বিদ্যায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন।' এবং এ গল্পও বাজারে চালু আছে যে কলকাতায় মেয়রস কোর্টের দোতলায় যখন নন্দকুমারের বিচার চলছিল তখন মহারাজ তাঁর কয়েদের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেন জেলে এবং তাঁর অভিযোগ ছিল এই কয়েদ অবস্থায় অনাহার করলে তাঁর জাতিচ্যুতি হবে—জগন্নাথ মহারাজার এই অভিমত সমর্থন করে হেস্টিংসের অপ্রিয়ভাজন হন। হেস্টিংসের ক্রোধের তোয়াক্কা করেননি তর্কপঞ্চানন। এই ঘটনা কতটা সত্য, সে কথা বলার উপায় নেই; তবে এটা ঠিক কয়েদ অবস্থায় মহারাজ অনা-হার করলে জাতিচ্যুত হবার কারণ নেই বলে যে একদল পন্ডিত বিধান দেন, অবশ্যই হেস্টিংসের নির্দেশে, সেই গড্ডলিকা প্রবাহে ছিলেন না তর্ক-পঞ্চানন! সেদলে জগন্নাথের নাম নেই।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে অনেক বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন জগন্নাথকে, সেকথা বলেছেন রামতনু লাহিড়ী। কিন্তু ঐকথা নিঃসংশয়ে সত্য যে জগন্নাথের সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে বেশ তীব্র কলহ উপস্থিত হয় এবং সে ঝগড়ায়ও হার মানেননি জগন্নাথ। শোনা যায় এই লড়াইয়ে নন্দকুমার জগন্নাথকে সমর্থন করেন। জগন্নাথের এই তেজস্বিতার গল্প শুনিয়েছেন উমাচরণ ভট্টাচার্য। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিতান্ত সামান্য ভাবেই। এক গরীব বামুনকে শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলেছিলেন জগন্নাথ। এই সম্বন্ধে তাঁর বিধানই শেষ কথা। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে কোন কারণেই হোক সেই গরীব বামুনকে শিক্ষা দিতে চাইছিলেন। ভেবেছিলেন, জগন্নাথও তাঁর দেওয়া জমি ভোগ করে, কাজেই তিনি কি আর তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করবেন? এই ভেবেই একটা লোকও পাঠিয়েছিলেন জগন্নাথের কাছে। কিন্তু জগন্নাথ তখন সমাজপতি। স্মৃতির নির্দেশ মেনে চলবেন, রাজার নির্দেশ নয়। কাজেই কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় অনুরোধ তিনি মানবেন কেন? খবর শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত আস্ফালন করতে লাগলেন। তাছাড়া আর কীই বা করবার ছিল তাঁর?

তবে রাজার নাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। এর শোধ নিতে তিনি বদ্ধপরিকর। কিছুদিন পরেই তিনি পনের দিনব্যাপী বাজপেয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সারা বাঙলার সকল পন্ডিতের আমন্ত্রণ হল সেখানে, কেবল জগন্নাথ ছাড়া! খবর সবই পেলেন তিনি। এবং যজ্ঞের পঞ্চম দিনে একশত ছাত্র নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে হাজির হলেন। সামনাসামনি পড়ে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। কিন্তু সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রাজবাড়ীর পাশেই নিজ বাসে থাকতে লাগলেন তিনি।

এমনি করে একদিন যজ্ঞ শেষ হল। রাজা জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, যজ্ঞ কেমন হল?

জগন্নাথ অগ্রজ্যে প্রধান ছিলেন, যে যজ্ঞে জগন্নাথ ব্রতাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি? অগ্নিহোত্র—এটি ব্রাহ্মভুক্তি—এই জগন্নাথ অর্থ স্বয়ং ভগবান। ঈশ্বর ছাড়া কোন যজ্ঞ সম্পূর্ণ? উমাচরণ লিখেছেন—'পরে জগন্নাথের সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে গলদেশে কুঠারবন্ধনপূর্বক জগন্নাথের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।'

রাজা নবকৃষ্ণের সঙ্গে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সদ্ভাব ছিল এত বেশি যে অনেকেই তাঁকে রাজার সভারত্ন রূপে বর্ণনা করেছেন। এন এন ঘোষ মশায় তাঁর 'মেমরার্স অব মহারাজ নবকৃষ্ণ'তে লিখেছেন, 'জগন্নাথ নবকৃষ্ণের সভা অলঙ্কৃত করতেন।' জগন্নাথ যে বছরে লক্ষ টাকা আয়ের তালুক নিতেই চাননি, সে গল্প ত আগেই বলা হয়েছে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার তাঁর 'মানব মালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভার যে ছবি এঁকেছেন, সেটা এই রকম :

তাঁর ছিল নবরত্ন ইন্দ্রের সে রূপ।
সভান্বেষর কিবা কব নিজে বিদ্যারূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নিজে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চানন রূপে ভুবনে বিখ্যাত॥
মহাকবি বানেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পশপুরে স্মার্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে রাম গোঁসাই ভট্টাচার্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥

শোনা যায়, নবাব সিরাজোদ্দৌলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তর্কপঞ্চাননের এবং একটি নবাবী আংটি পেয়েছিলেন সম্মান-চিহ্ন হিসেবে। রজনীকান্ত গুপ্ত কিন্তু বলছেন মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে একটি শীলমোহর দেন। তাতে লেখা ছিল : 'সুধীবর কবি বিপেন্দ্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য।' জগন্নাথ নাকি তাঁর সকল ব্যবস্থাপত্রে এই শীলমোহর এঁকে দিতেন।

তবে জগন্নাথের সম্মান শুধু দেশী রাজা-মহারাজ জমিদার নবাবদের কাছেই নয়। তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেকালের ইংরাজ সরকারও। এবং সেই কথা বলতে গেলে তাঁর কালোত্তর রচনা 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব'-এর কথা এসে পড়ে। অবশ্য তাঁর রচনা সবই সংস্কৃতে। তবে তাঁর সাহিত্যকৃতি শুরু নাট্যকার হিসেবে, যদিও তাঁর প্রথম ও একমাত্র নাট্যরচনা 'রামচরিতের' কোন হদিশই নেই। তবে তাঁর আসল মনীষা এই হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র—'বিবাদ ভঙ্গার্ণবেই' স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। চার বছর ধরে এই অমূল্য গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু এই গ্রন্থ রচনা যখন সমাধা করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় আটানব্বুই। খ্রীষ্টাব্দ সতেরশ' বিরানব্বুই। জন কোম্পানীর ব্যবসার তখন তুঙ্গকাল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনটা বছর পাঁচেক হ'ল কিড সায়েব স্থাপন করেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ তখনও ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তার বছর খানেকের মধ্যেই তিনি প্রথমবারের জন্য বিলেত চলে যান। অবশ্য পুনরাগমনায় চ।

কিন্তু 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' রচনার গল্পটা একটু সবিস্তারে বলার অপেক্ষা রাখে। কেননা, এটার সঙ্গে ইংরেজদের ভারতীয় ব্যবস্থায় এদেশের লোকেদের বিচার করার প্রচেষ্টার ছবিটি ধরা পড়ে। এবং ঐ গল্প বলতে গেলে সেই লোকটারই কথা বলতে হয়, যাঁকে নিয়ে অনেক অখ্যাতি অনেক অনভিপ্রেত কেচ্ছা ছড়িয়ে আছে। অবশ্য ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইনি কিছু ধোয়া তুলসী ছিলেন, তবে এ কথাও সত্য তাঁকে যতটা শয়তান হিসেবে কালো রঙে আঁকা হয়েছে, ততটা কালো উনি নন। ভুললে চলবে না, এই লোকটাই আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীর' অনুবাদ করিয়েছেন; মহাভারতের নল-দময়ন্তীর প্রেমোপাখ্যান শুনে প্রাণের মেরিয়ানকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পত্র লিখেছেন; ভাগবতগীতার অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। এই হতভাগ্য ব্যক্তিটিরই নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। হিন্দুদের যে সব আপাতঃ-

ওয়ারেন হেস্টিংসের মর্মরমূর্তি। তাঁর একপাশে দণ্ডায়মান এক ব্রাহ্মণ ও অপর পাশে উপবিষ্ট পাঠরত এ
আলতী

বিরুদ্ধ প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ আছে তা থেকে একটা 'ব্যবস্থা পুস্তক' রচনার দিকে প্রথম নজর দেন ইনি। এবং সেকালের তাবড় তাবড় এগার জন পণ্ডিতদের তিনি এই কাজের ভার দেন। এই এগার জন পণ্ডিত ছিলেন—রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত। এটা হেস্টিংসের চাঁদপাল ঘাটে নামবার বছরখানেক পরের ঘটনা। তখনও অবশ্য তিনি গভর্নর জেনারেল হননি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের আইনের বলে। সতেরশ' তেয়াত্তর। মে মাস।

পণ্ডিতরা এই কাজ করতে দুই বছর সময় নেন। কিন্তু রচনাটা চাই ইংরিজিতে। সে সময় খুব কম ইংরেজ জজ সংস্কৃত জানতেন। কোর্টে-কাছারিতে তখন ফারসীরই জোর চলন। কাজেই বইটিকে ফারসীতে অনুবাদ করা হ'ল। কিন্তু ইংরিজি করার কি হবে? হাতের কাছে কোম্পানীর কর্মচারী হ্যাল্‌হেড সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনিই ত কয়েক বছর পরে ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণ ছাপিয়ে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করে খুবই সুনাম কিনেছিলেন। এঁরই ব্যাকরণে বাঙলা টাইপ প্রথম ব্যবহার হয়, সে খবর ত অনেকেরই জানা। যাই হোক, এই ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড সাহেবকেই এই কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। তিনি আবার বছর দুই পরে—সতেরশ' পঁচাত্তরের মার্চ মাসে, এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজটি শেষ করলেন। পাণ্ডুলিপি তাড়াতাড়ি জাহাজে করে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হল। সতেরশ' ছিয়াত্তর সালে বইটি ছাপা হয়ে বেরুল : 'এ কো[ড] অব জেনটু লস'।

কিন্তু কলকাতার কোর্টে যাঁরা এই বইয়ে[র] সাহায্যে বিচার করছিলেন, তাঁদের সব গোলমাল হ[য়ে] যাচ্ছিল। হবার কথাও। কেননা, একে বিদেশ[ী] ব্যাপার; তার ওপর এমনি ভাষান্তরণে ভাবের অনে[ক] সময় গোলমাল হবার আশঙ্কা থাকে। এটার ওপ[র] আবার পরপর দুবার ভাষা পাল্টানর আড়ংধো[লাই] পড়েছে। বিষয়বস্তুর কাপড় অনেক জায়গাতে ছিঁড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই সময় এক দিকপা[ল] জজ এলেন কলকাতার বিচারাসনে। তাঁর নাম স[্যার] উইলিয়ম জোন্স। সাহেবদের মধ্যে তিনি এক[টু] ভিন্ন ধরনের। এই পোড়াদেশের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা, এ[দেশের] সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর মমতার কথা কে ন[া] জানে। কলকাতার এক নম্বর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটা তাঁর কীর্তির কথা অনাগতকালকে অমর অক্ষ[রে] বলে বেড়াবে, সন্দেহ নেই। যাই হোক, জজসাহে[ব] বুঝলেন এই 'কোডে' হবে না। নতুন 'কোড' চাই। এই সময়ে অবশ্য কলকাতার গভর্নর বদল হ[য়ে] গেছে। প্রায় বছর তের রাজত্ব করে ওয়ারে[ন] হেস্টিংস বিলেত গেছেন। মধ্যে মাস কুড়ি ক[াজ] চালিয়েছেন 'ভেরি গুড হিউমারড ফেলো' এব[ং] 'মোস্ট কনডেমড গভর্নর' স্যার জন ম্যাকফারসন; এবং তাঁর পরে এসে পৌঁচেছেন আর্ল কর্নওয়ালিশ; আইন বই-এর বাঙলা অনুবাদ আরম্ভ হয়েছে; জোনাথন ডানকানের দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধি সঙ্কলন—'রেগুলেশনস ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ[ব] জাস্টিস ইন দি কোর্টস অব দেওয়ানী আদালত'। বেরিয়ে গেছে। এডমনস্টোন সাহেবের কো[...]

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারী আদালতের কার্য-বিধির বাংলা অনুবাদ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কলকাতার কন্ট্রাক্টরের 'কর্নওয়ালিশ কোড' তখন কোথায় কি। এই সময়ে—উনিশে মার্চ। সতেরশ' অষ্টআশি—জোন্স সাহেব একটা চিঠি লেখেন লর্ড কর্নওয়ালিশকে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এই চিঠি পত্রের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। চিঠিটার প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ এই :

'হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থা সমূহ যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী—এই দুই কঠিন ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিখিবে, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহাদের কোন পার্থিব লাভ হইবে না। অথচ বিচার-সম্পর্কে যদি আমরা কেবল দেশীয় ব্যবহারজীবী ও পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না।

জাস্টিনিয়ানের (রোম সম্রাট) আদেশে সংকলিত, রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা দেশীয় বিজ্ঞব্যবহারজীবিদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সংকলিত করাই এবং তাহার নির্ভুল ও যথাযথ ইংরাজী অনুবাদ এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টে রাখিয়া দিই তাহা হইলে প্রয়োজনমত বিচারকেরা এই গ্রন্থ দেখিতে পারিবেন; ফলে পণ্ডিত ও মৌলভীরা আমাদিগকে ভুল পথ দেখাইতেছেন কিনা তাহা ধরা সহজ হইবে। আমরা কেবল উত্তরাধিকার এবং চুক্তি সংক্রান্ত আইনগুলি সংকলন করাইতে চাই, কেননা এই দুই শ্রেণীর মামলাই বেশী হয়।'

কর্নওয়ালিশ রাজী হয়ে গেলেন। এই বই ছাপার ও সংকলন করার সকল ব্যয়ভার সরকারী রাজকোষ বহন করবে। আর সব কিছু কাজ হবে জোন্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। কাজ শুরু হল। হিন্দু আইনের একটা গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য যে দুজন পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন তাঁরা হচ্ছেন—রামকান্ত শর্মা আর সবর বা সর্বরী ত্রিবেদী। শেষোক্তজন পাটনার লোক। সেখানে কাজিদের কাজ করতেন।

কিন্তু জোন্স পাকা লোক। তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, কেবল এঁদের দিয়ে হবে না। অপার শাস্ত্র সমুদ্র মন্থনের মত এই বিরাট যজ্ঞের নতুন পুরোহিত চাই। এবং একদিন জজ সাহেবের পালকী খোদ গভর্নর জেনারেলের বাড়ির হাতায় গিয়ে ঢুকল। সেখানে কথাবার্তাও হল অনেকক্ষণ। এবং সেই কথাবার্তার পর জোন্সের চিঠি নিয়ে আর একটা পালকী চলল, কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। গ্রামের নাম ত্রিবেণী। জোন্সের এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতরূপে চাই—আর কাউকে নয়—জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে। তাঁকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উইলিয়াম জোন্স।

সতের শ' অষ্টআশি। বাইশে আগস্ট। ঐ তারিখের রেভিনিউ কনসালটেশনের যে রেকর্ডপত্র আছে তাতে লর্ড কর্নওয়ালিশ লিখেছেন : 'এই কাজের জন্য (গ্রন্থ রচনা) পূর্বে যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক ব্যক্তিকে নেবার জন্য স্যার উইলিয়ম তাকে বিশেষ করে বলেছেন। এঁর বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর মতামত, পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরাই সর্বোচ্চ ধারণা।' কর্নওয়ালিশ আর এক জবর যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর সাহায্য পেলে, বা বই-এ তাঁর নাম থাকলে কেউই আর বইটার মতামত সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা করার ধৃষ্টতা দেখাবে না। বইটার প্রামাণিকতা ও খ্যাতি বাড়বে। সরকারের সুবিধা হবে।

এই কাজের জন্য জগন্নাথের মাইনে হয় তিনশ' টাকা করে। তাঁর সহকারীরা পেতেন একশ' টাকা করে। এরকমই সুপারিশ করেছিলেন জোন্স। সরকার তাই মেনে নেন। 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' সম্পাদনা করতে জগন্নাথের সময় লেগেছিল বছর তিন-চার। এবং শেষকেশ কাজটা তিনি কারও সাহায্য না নিয়ে একাই করেছিলেন। সতের শ' বিরানব্বই-এর ফেব্রুয়ারির এক দিনে আটশ' পাতার এই বইটার পাণ্ডুলিপি জগন্নাথ স্যার উইলিয়ম জোন্সের হাতে দেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে এর একটা প্রতিলিপি ছিল। কখনও ছাপা হয়নি। জোন্সের ইচ্ছে ছিল, এর ইংরাজী অনুবাদের কাজ তিনি নিজেই করেন। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর ইংরিজি অনুবাদ—'স্যাটাল রিঙ' করে তাঁর নাম হয়েছিল! কাজেই এই দুরূহ কাজটা তিনি নিজের কাঁধেই নেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তা হবার নয়। বছর দুই না ঘুরতেই সতেরশ' চুরানব্বই-এর সাতাশে এপ্রিল তিনি মারা যান। তাঁকে কবর দেওয়া হয় পয়লা মে। রবিবার। বিরাট শোভাযাত্রা হয় শোকসন্তপ্ত নাগরিকদের, সে কি বিপুল সমাগম। সুপ্রিমকোর্টের সব বিচারপতি, অ্যাটর্নি, ব্যারিস্টার, কোম্পানীর কর্মচারীরা, কলকাতার দেশী-বিদেশী রহিস লোক, কেউই প্রায় বাদ যায়নি সেই শোক শোভাযাত্রায়। গড়ের বাদ্যিতে 'ডাস্ট পোস্টে'র সুর বেজেছিল।

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' অনুবাদ করবে কে? খোঁজ খোঁজ। ততদিনে কর্নওয়ালিশ বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। এসেছেন নবি গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর। তাঁরই হুকুমে সুদূর মির্জাপুরের জেলা আদালতের জজ এইচ টি কোলব্রুককে খুঁজে বার করা হল। কোলব্রুকের এই

প্রস্তরখণ্ডের আর এক দিকের ছবি

কাজে সময় লেগেছিল দু বছরের কিছু বেশি। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পনেরো হাজার টাকা। 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' রচনা করেছিলেন জগন্নাথ, আর মিথিলার সর্বরী ত্রিবেদীও আলাদা একটা বই লিখেছিলেন—'বিবাদ সারার্ণব'। এ ছাড়া হেস্টিংসের সময়ে এই বিষয়ে লেখা বইখানা—'বিবাদার্ণব সেতু' তো আছেই।

বই তো শেষ হল, কিন্তু বই-এর গল্প শেষ হল না। বরঞ্চ উপসংহারে আর একটা নাটক জমে উঠল। সেটাও কম বিচিত্র নয়। 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব'-এর পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েই স্যার জন শোর জগন্নাথের মাসোহারার টাকাটা বন্ধ করে দিলেন। স্বভাবতই জগন্নাথ রুষ্ট হলেন। তিনি গভর্নর জেনারেলকে একটা আবেদন করলেন। তাতে বললেন, হেস্টিংসের আমলে তাঁর কাছে এই বই লেখার অনুরোধ আসে। এসেছিলেন রাজা রাজবল্লভ। হেস্টিংসেরই আদেশে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। তখন এগারোজন পণ্ডিতকে দিয়ে এই কাজ করান হয়। কিন্তু এ কথা তো কোম্পানীর অজানা নয় যে সে কাজটা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। কাজেই গুণের কদর করবে না কেন কোম্পানী? তাঁর পেন্সন বন্ধ করা কি গুণগ্রাহিতা?

এই চিঠিতে কাজ হয়েছিল। কোম্পানীর চোখের তখনও একটা পর্দা ছিল। তারা পেন্সন দিতে থাকে। জগন্নাথ যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন নিয়মিত এ টাকা আসতে থাকে। তবে তঁার মৃত্যুর পরই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এই নিয়ে তাঁর নাতি কাশীনাথ লর্ড মিণ্টোর দরবারে আবেদন করেন। কিন্তু কাজ হয় না। প্রথমত কোম্পানী বলে, কাশীনাথ ঠাকুর্দার প্রতিভার কিছুই পায়নি। তা ছাড়া, উত্তরাধিকারসূত্রে কাশীনাথের যেসব জমিজায়গা আছে, তাও কম নয়। কাজেই তাঁর অভাব নেই এবং সেই কারণে কাশীনাথের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। জোন্স সাহেবই বা কেন জগন্নাথের এত বড় গুণগ্রাহী হয়ে পড়লেন? তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্যে? দীনবন্ধু তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' যার কথা বলেছেন : 'অপূর্ব স্মরণ শক্তি ধরিত ধীমান,/শুনিয়ে ইংরাজী কথা বলা যাহার প্রমাণ।' সেই জন্যে? সপরিবারে জোন্স কেন কলকাতা ছেড়ে ত্রিবেণী যেতেন নিত্যানিত্য? অভিজ্ঞান শকুন্তলম—যা নাকি মুখস্থ ছিল আগাগোড়া জগন্নাথের —তার অনুবাদ 'স্যাটাল রিঙ' লেখবার জন্যে? শুধু তিনি কেন? জজ হ্যারিংটন কেন যেতেন ত্রিবেণী। কোন অনুপপত্তি ঘটলেই? কি সেই লোকোত্তর প্রতিভা যা বিদেশী রাজপুরুষদের, পণ্ডিতদের মুগ্ধ করেছিল? তাঁর বিপুল মনীষা, ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে রাজা রামমোহন তাঁর প্রবন্ধাবলীতে এক জায়গায় লিখেছেন : 'জগন্নাথ ছিলেন তাঁর কালের সর্ববাদিসম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা এবং তাঁর বিধান ও তাঁর অধিকার প্রায় রঘুনন্দনের বিধানের সমতুল।' বলা দরকার এই মন্তব্য সেই কাল সম্বন্ধে যখন বাংলার বিদ্যারণ্যে মহীরুহের অভাব ছিল না। তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ মহিমায় ভাস্বর। কিন্তু তবু এই পর্বতশ্রেণীর মাঝে নগাধিরাজের মত শোভা পেতেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই। কি দেশী লোকেদের কাছে, কি বিদেশীদের কাছে। এই প্রসঙ্গে একটা নতুন খবর দিয়েছেন ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন। সেকালের বিষয় সম্বন্ধ নিয়ে বড় বড় মামলায় একপক্ষে থাকতেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রপিতামহ—মাণিক্য তর্কভূষণ, অপরপক্ষে জগন্নাথ। জগন্নাথ সেকালের দিকপাল কৌঁসুলী। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী।

প্রশ্ন শুধু জগন্নাথের খ্যাতি নিয়ে নয়। তাঁর মৃত্যুকাল নিয়েও। মিশনারী ওয়ার্ডের মতে, তিনটি সাল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত একটা চিঠির কল্যাণে এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়, আঠারশ' সাত খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলার বারশ' চৌদ্দ সাল। বিজয়া দশমীর দিন বিজয়া দেখে জগন্নাথ আর বাড়ি ফেরেন নি। ঐদিন গঙ্গাবাস করে আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়ায় তিনি গঙ্গালাভ করেন। তারিখটা চৌঠা কার্তিক। ইংরাজী উনিশে অকটোবর। সোমবার। জগন্নাথের আত্মীয় উমাচরণ এবং জ্যোতিষ বিচার করে দীনেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায়—উভয়েই ঐ তারিখটা জেনে নিয়েছেন।

কিন্তু তর্কপঞ্চাননের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নটা থেকেই যায়। বহুকাল যাবৎ তাঁর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর ছিল না। সেই দুর্লভ সামগ্রীটির আবিষ্কারকও শ্রদ্ধেয় গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ। তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আঠার শ' চৌষট্টি সালের এগারই জানুয়ারির 'সোমপ্রকাশ'-এ গাজীপুর থেকে পাঠান এক পত্রপ্রেরকের 'প্রেরিত' চিঠির উল্লেখ করেছেন। পত্রপ্রেরকের কোন নাম নেই। সেকালের কাগজে এই ধরনের নামহীন 'প্রেরিত' পত্রের অবশ্য যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। তবে 'সোমপ্রকাশ'-এ ছাপা সব চিঠিই যে পত্রপ্রেরকের নামহীন, তা কিন্তু নয়। চিঠিটা দীর্ঘ। এবং কিঞ্চিৎ 'ফিচার' ধর্মী। তাতে গাজীপুরের প্রাকৃতিক শোভা, তার ইতিকাহিনী এবং নানা দ্রষ্টব্য স্থলের কথা আছে এবং জায়গাটির নানা 'ল্যাণ্ডমার্কে'র কথা প্রসঙ্গেই লর্ড কর্নওয়ালিশের সমাধিস্থলের কথা এসে পড়েছে। এমন ধারণা যেন কখনো না হয় যে পত্রপ্রেরক জগন্নাথের প্রতিমূর্তি খুঁজে

সেজেই উত্তেজিত হয়ে এই চিঠি লিখেছেন সুদূর গাজীপুর থেকে চাড়ুরিপেত্রতার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে। পাঠকদের বিচারের জন্যে এই সুদীর্ঘ চিঠিটার প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলে দেওয়া হল। চিঠিটা শুরু হয়েছে এইভাবে : 'যিনি কখন এই অঞ্চলে আসিয়াছেন, তিনি অবশ্য প্রকৃতির সুন্দর ছবি দেখিয়া যে কি প্রকার তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্য ব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন না। যখন সুদূরবর্তী পর্বতমালা আমাদিগের নয়নপথে মেঘমালার ন্যায় উদিত হয়, তখন মনে যে অননুভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সেই মনের অধিপতি অন্তরাত্মাই জানেন। এখানকার সকল পদার্থই যেন জগদীশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে। এখানের সকলেই স্ফূর্তি বিশিষ্ট। *** এখানে গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ এক মহান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। *** পূর্বে এখানে কাশিম আলি খাঁ নামে এক নবাব বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। ***' এই সব কথা বলার পর পত্রলেখক কর্নওয়ালিশের মনোরম সমাধিগৃহের প্রসঙ্গে এসেছেন—'সেদিন মৃত মহাত্মা মার্কুইস কর্নওয়ালিশ সাহেবের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সমাধিস্থানটি যে কেমন রমণীয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। উহার দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী, উত্তরে ইংরাজদের উপাসনা মন্দির (গির্জা) এবং পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। সমাধি গৃহটা অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রস্তর রচিত। উহার মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরময় মঞ্চে মৃত মহাত্মার মুখাকৃতি ক্ষোদিত আছে, এবং তাহার এক পার্শ্বে জগন্মান্য পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ও অপর পার্শ্বে একজন মৌলভীর পূর্ণ প্রতিকৃতি ক্ষোদিত রহিয়াছে। *** গাজীপুর।" এই চিঠিটার ওপর ভিত্তি করেই ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ল্যাক্সম্যান ক্ষোদিত এই ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্তিকে জগন্নাথের বলে সনাক্ত করে তাঁর গ্রন্থে ছেপে দিয়েছেন।

ওই একই কাজ করেছেন পণ্ডিতবর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা'য়। তিনি এই প্রস্তরমূর্তি তৈরির ইতিহাসও দিয়েছেন। লিখেছেন : 'লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৮০৫ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরে পরলোকগমন করেন। কলিকাতার সাহেবরা সভা করিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে গাজীপুরে তাঁহার সমাধিমন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে কর্নওয়ালিশের প্রস্তর ক্ষোদিত দক্ষিণাভিমুখী মুখাকৃতির (medallion bust) সম্মুখে এক ব্রাহ্মণের ও পশ্চাতে এক মুসলমানের দণ্ডায়মান অধোমুখ পূর্ণ প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে এই ব্রাহ্মণই বাঙালী শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ক্ষোদিত লিপিতে কিংবা সরকারী কাগজপত্রে ব্রাহ্মণ ও মৌলভীর পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই বটে, কিন্তু সেসময় প্রকাশে এক পত্রলেখক নিঃসন্দিগ্ধবাক্যে উহা জগন্নাথের মূর্তি বলিয়া লিখিয়াছেন।'

দেখা যাচ্ছে এই মূর্তিটিকে জগন্নাথের বলে সনাক্ত করার একমাত্র সাক্ষ্য এই নামহীন পত্রকারের চিঠিখানি। চিঠিখানির কিছু কিছু অংশ আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে। সেটা পড়ে এমন একটা ধারণা হয়ে যায়, পত্রলেখক গাজীপুরে বেড়াতে গিয়ে কর্নওয়ালিশের সমাধি মন্দির দেখতে যান এবং সেখানে হঠাৎ তাঁর পরিচিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মূর্তিটি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু সেটা কি ঠিক? জগন্নাথের মহাপ্রয়াণের কাল আঠার শ' সাত। সে ঘটনার সাতাশ বছর পরে এমন একজন পরিচিত ব্যক্তি আসেন কি করে? দীনেশচন্দ্র এই ফাঁকটা ঢাকা দেবার জন্যেই যেন লিখেছেন—'চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে' এই প্রতিমূর্তিটি জগন্নাথের। পরে অবশ্য সাক্ষী হিসেবে এই পত্রকারের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—দীনেশবাবুর এই চিরন্তন প্রবাদ কোথা থেকে এল? জগন্নাথ সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা আলোচনায়—যার বেশ কিছু তাঁর আত্মীয়স্বজন করেছেন—কেউই ত এই প্রবাদের কথা বলেননি। মায় ব্রজেন্দ্রনাথ পর্যন্ত না। তবে দীনেশচন্দ্র এ কথা লিখলেন কি হিসেবে?
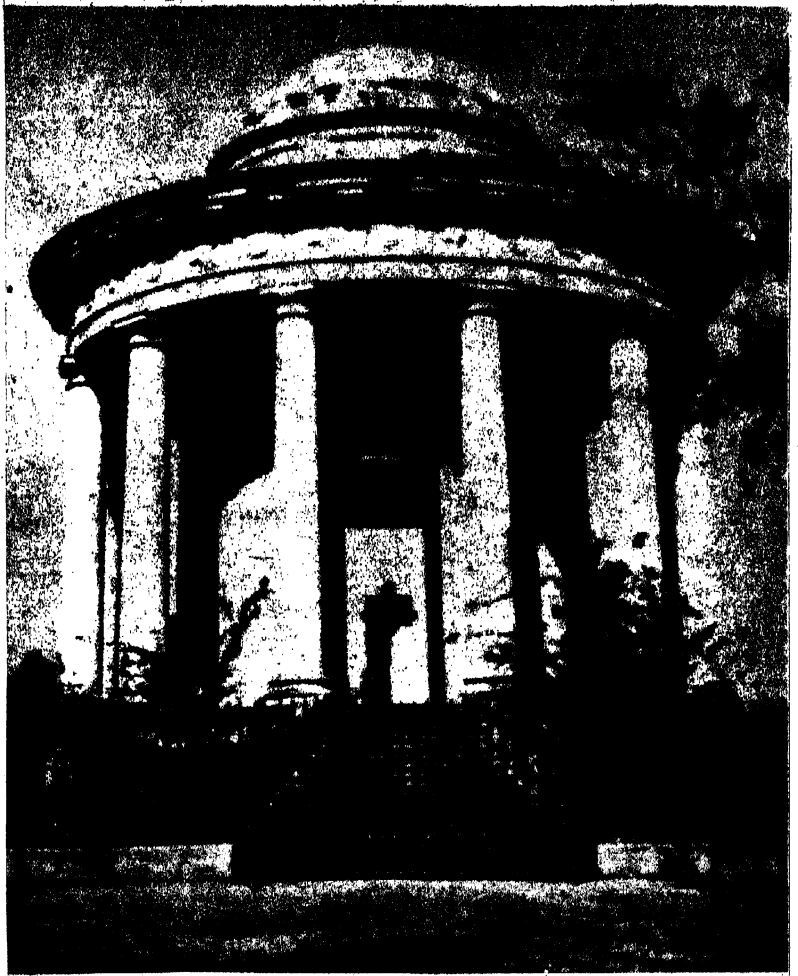
তা ছাড়াও কথা আছে। লর্ড কর্নওয়ালিশ দুবার গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন কলকাতায়। প্রথমবার আসেন সতের শ' ছিয়াশি সালের সেপ্টেম্বরে। থাকেন বেশ দীর্ঘকাল। প্রায় বছর সাতেক। 'তিরানব্বই সালের অক্টোবর মাসে সার জন শোরকে রাজপাট বুঝিয়ে দিয়ে বিলেত চলে যান। এই সময়ে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি হয়। সেটা স্থাপনা হয় টাউন হলে। এটি তৈরি করবার কথা ছিল জন বেকনের। কিন্তু তিনি মারা গেলে তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। জন বেকন—জুনিয়ার।' 'কলিকাতার কথা'য় প্রমথ মল্লিক মশায় এই সম্বন্ধে লিখেছেন : '১৭৯৩ খৃস্টাব্দে অক্টোবর মাসে লর্ড কর্নওয়ালিশ স্বদেশে চলিয়া যান ও সেখানে উচ্চ মারকুইস উপাধিতে মণ্ডিত হন। তাঁহার প্রতিমূর্তি স্থাপনের সময়ে লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কলকাতার টাউন হলে সর্বপ্রথম তাঁহারই মূর্তি স্থাপিত হয়। তাঁহার মূর্তি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে খোলা জায়গায় রাখিলে পাছে উহা জলে রৌদ্রে খারাপ হইয়া যায় লোকের সেই চিন্তা হইয়াছিল।' বহু দিন পরে এই মূর্তিটিই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানান্তরিত হয়।

এই মূর্তিটি সম্বন্ধে এইচ-ই-এ কটন তাঁর 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যান্ড নিউ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'ড্রেসড ইন রোমান কস্টিউম অফ দি ক্ল্যাসিক এজ উইথ এ লরেল রাঞ্চ ইন হ্যান্ড, কর্নওয়ালিশ কনফ্রন্টস অল ইন এ ম্যাজিস্টিক অ্যাটিটিউড হুইচ ইভন দি ইনকনগ্রুইটি অফ হিজ গার্ব ক্যাননট ডেস্ট্রয়। অন আইদার সাইড সিটস এ ফিমেল অ্যালিগরিক্যাল ফিগার; দি ওয়ান গ্র্যাসপস এ মিরর, দি আদার এ সারপেন্ট'...

অর্থাৎ, এখানে প্রাচীন কালের রোমান পরিচ্ছদ পরে হাতে নিয়ে লরেল শাখা কর্নওয়ালিশ আমাদের সাম আসীন এমন এক রাজকীয় মহিমায় যা তাঁর পোশাকে বৈসাদৃশ্যও হরণ করতে পারেনি। তাঁর উভয় পাশে একটি করে প্রতীকী নারী মূর্তি—একজন ধরে আছে একটি আয়না, অপর জনের হাতে একটি সাপ। এই খবর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে সেকালের লাট সাহেবদে মূর্তির দু' পাশে দুটো প্রতীকী মূর্তি দেওয়ার একট রেওয়াজ ছিল।

রেওয়াজ যে ছিল তার আর একটা উদাহরণ হচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা ওয়ারেন হেস্টিংসে একটি দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। এটি তৈরি করেন সার রিচার্ড ওয়েস্টম্যাকট। এখানেও ওয়ারে হেস্টিংসের দু পাশে দুই ব্যক্তির প্রতিমূর্তি। একটি দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের যাঁর উদ্ধত শিখা, চিন্তিত আনন ঝোলানো উত্তরীয়, হস্তধৃত বিধানপুঁথী—সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অপরটি উপবিষ্ট পাঠরত মৌলভীর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাটালগে এই মূর্তি দুটি সম্বন্ধে বল হয়েছে : দি টু অ্যাকোমপ্যানিইং ফিগারস আর টেসটিমনি টু হেস্টিংসস এনকারেজমেন্ট টু ওরিয়েন্টাল লার্নিং'। অর্থাৎ সঙ্গের দুইটি প্রতিমূর্তি প্রাচ্য বিদ্যা চর্চায় হেস্টিংসের উৎসাহ দানের স্বীকৃতি।

এ ছাড়াও কথা আছে। প্রথমত যেটা লক্ষণীয় কর্নওয়ালিশের রাজপাটের প্রথম পর্বে তাঁর যে প্রতি মূর্তি তৈরি করা হল তাতে কিন্তু জগন্নাথের কো সংস্রব নেই, যদিও এই সময়েই কর্নওয়ালিশের পরো সংস্পর্শে আসেন জগন্নাথ। লাটসাহেব জোন্স সাহেবে

গাজীপুরে কর্নওয়ালিশের সমাধিগৃহ

কর্নওয়ালিশের কোদিত প্রতিমূর্তির এক পাশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অপর পাশে মৌলভী

প্রকৃত এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সুবিপুল মনীষার পরিচয় পান। আঠার শ' পাঁচ সালে দ্বিতীয়বার যখন তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং গাজীপুরে মারা যান, তখন জগন্নাথের সংস্পর্শে আসার কোন রকম কারণ নেই কর্নওয়ালিশের। কাজেই এই সময়ে তাঁর যে মূর্তি হল তার সঙ্গে জগন্নাথকে জড়ানর সহজবোধ্য কি কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে? দ্বিতীয়ত, জগন্নাথের বলে কথিত মূর্তিটির সঙ্গে হেস্টিংসের সামনে দণ্ডায়মান মূর্তির পার্থক্য কি খুব বেশী? আসলে, কি কলকাতা—কি গাজীপুর—সর্বত্রই সেই একই কথা। এই মূর্তিগুলি আর কিছুই নয়—বিদ্যোৎসাহী ব্রিটিশ সরকারের দাক্ষিণ্যপুষ্ট ব্রাহ্মণ ও মুসলিম বিদ্যাচর্চার প্রতীক। অন্য কিছুই নয়।

অন্য কিছু যে নয়, সেটা গাজীপুরের সমাধিটি একটু খতিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে। কর্নওয়ালিশের 'বাস্টের' যেদিকে ব্রাহ্মণ ও মৌলভীর গোটা মূর্তি আছে, তার অপর দিকে দেখা যায় দু পাশে আগ্নেয়াস্ত্র নিম্নাভিমুখী (reversed arms) করে' রাখা দুজন সৈনিকের প্রতিমূর্তি। একজন ভারতীয়, অপর জন ব্রিটিশ। বলা বাহুল্য, তাঁরা সমরনায়ক গভর্নর জেনারেলের স্মৃতির প্রতি প্রথাগত সম্মান দেখাচ্ছেন। এঁরা অবশ্যই তৎকালীন ভারতীয় সমরবাহিনীর দুই অংশের প্রতীকমাত্র। তাদের পরিচয় নির্ণয় করতে যাওয়া, এই সব পাথরের ছবি সনাক্ত করতে যাওয়া কি বাতুলতা নয়? অবশ্য এ ছাড়াও আর একটা কথা—এইভাবে যাঁরা জগন্নাথকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, তাঁরা প্রকারান্তরে সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিতকে কি ছোট করেননি? কর্নওয়ালিশের 'বাস্টের' সামনে এভাবে দাঁড়ানর ছবিটা কি বিসদৃশ লাগে না?

কিন্তু এসব ছাড়াও আরও একটা বাধা আছে পাথরের ছবিটিকে জগন্নাথের বলে গ্রহণ করতে। মূর্তিটির ক্ষোদিক বলে স্বীকৃত জন ফ্ল্যাক্সম্যান (১৭৫৫—১৮২৬) সেকালের এক নামকরা ভাস্কর। তাঁর নানা জীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি কখনও কলকাতায় আসেননি। এ দেশেতেও নয়। কাজেই, ছোট্ট প্রশ্ন, জগন্নাথের ছবি তিনি আঁকলেন কি দেখে? এই মূর্তিটির পাদপীঠে লেখা আছে: 'দিস মনুমেন্ট ইরেকটেড বাই দি ব্রিটিশ ইনহ্যাবিট্যান্টস অফ ক্যালকাটা'—অর্থাৎ কলকাতার ব্রিটিশ বাসিন্দারা এই সমাধিগৃহটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাই বা জগন্নাথ সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন কেন?

জগন্নাথের অনেক ছাত্র রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বার্তিক মালায়' গুরু বন্দনা করেছেন এই ভাবে:
"বিদ্যাচিন্তায়ঃ কুলাদি বিভবৈঃ খ্যাতোহ দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং
শশ্বদ যের গুণো গুণাকরো গুণামাসীৎ ত্রিবেণীপুরে।
শ্রেয়ঃ শ্রেণি বিধান সাধনো জগন্নাথেন নাম্নাপিচ।
শ্রী পঞ্চাননা সোদরো দ্বিজয়ো বস্তর্ক পঞ্চাননঃ ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান, ধনরাশি এবং কুলমর্যাদা প্রভৃতি সদ্গুণে যিনি বিখ্যাত ও অদ্বিতীয়, যাঁর গুণ সকলে নিত্যকীর্তন করত এবং নরগণের মধ্যে যিনি গুণের আকর সদৃশ এবং মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থার যিনি কারণ ছিলেন এবং যিনি ভগবান পঞ্চানন সদৃশ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও তর্ক পঞ্চানন উপাধিযুক্ত, তিনি ত্রিবেণীপুরে বাস করেন।

রামচন্দ্র তাঁর গুরুবন্দনায় সব কথাই বলেছেন মোটামুটি। শুধু আর একটি ব্যাপারে তাঁর গুরুদেবের অসাধারণত্বের কথাটা উল্লেখ করেননি। সেটি জগন্নাথের অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন। তিনটি শতাব্দীর মধ্য দিয়ে যা উত্তারিত। সপ্তদশ শতকের অন্ত্যকাল থেকে যা ঊনবিংশ শতাব্দীর অরুণোদয় অবধি স্পন্দমান। তিনটি শতাব্দীর ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁর জীবনবেলা পুণ্যময়। তার চেয়েও অবশ্য কম বিস্ময়কর নয় তাঁর জীবৎকালে তাঁর বংশে একই সঙ্গে পাঁচটি পুরুষের বর্তমানতা। মৃত্যুর বছর চারেক আগে তাঁর দেওয়া নিজ সম্পত্তির অংশীদারদের ফিরিস্তি থেকে দেখা যায় তিনি ছাড়া তখন তাঁর এক পুত্র, দশটি পৌত্র, পনেরজন প্রপৌত্র ও তিনজন বৃদ্ধ প্রপৌত্র রয়েছেন। তাই নাকি তাঁদের শ্রাদ্ধে, উপনয়ন বা বিবাহে আত্মীয়ের শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হত না। একটি বিরাট পরিবারের 'প্যাট্রিয়ার্ক' হিসেবেই জীবন শেষ করেন জগন্নাথ। তাঁর বাড়িতে এক বেলায় তিন শ' করে পাত পড়ত। এবং বাড়ির পৌত্রবধূরা পালা করে এই রান্না রাঁধত। তা ছাড়া তাঁর বিরাট টোল ত ছিলই। সেটা ত তখন একটা মহাবিদ্যালয়ের সদৃশ। ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্বেদ—কোন্ না বিষয় সেখানে পড়ান হত? যদিও ন্যায়ের ছাত্রই সবচেয়ে বেশি আসত, আসত দূর দূরান্তর থেকে; তবু বেদ-বেদান্ত সাংখ্য বা পাতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর মত অধ্যাপক সেকালে খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। সে যেন এক হিমালয়ের মত প্রতিভা। তার থেকে কত যে নদী বেরিয়েছে, অলকানন্দা ধারায় জ্ঞানের উপত্যকা অভিসিঞ্চিত করেছে, তার হিসেব রাখে কে? এবং সেই 'ফল্গু ধারায়' মত প্রতিভায় কোনদিন কোন জং ধরেনি। তাঁর দেহত্যাগের মাত্র এক মাস আগে নাকি তিনি অধ্যাপনায় বিরত হন। যদিও তখনও তিনি দৈনিক তিন-চার মাইল হাঁটতেন।

এই টোল নিয়ে এক মজার গল্প শুনিয়েছেন জগন্নাথের এক চরিতকার। তাঁর টোলের এক পড়ুয়া দুপুরের আহারের সিধায় চাউল ছাড়া একটা পোকা-ধরা বেগুন পেয়েছিল। সেটা পোড়াতে দিয়েছিল সে উনানে। কিন্তু 'হা হতোস্মি মন্দভাগ্য'। জগন্নাথ দিলেও হুতাশন সেটি তাকে খেতে দেয়নি। সেটা একেবারে দগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সেই কথাটি সে কাঠকয়লা দিয়ে টোলের দেওয়ালে লিখে দিয়েছিল: 'কীটা কুলিত বার্তাকু বেকাবদ্ বৃষণোপমা। পঞ্চাননাদ্বিনিষ্কান্তোন নিষ্কান্তঃ হুতাশনাৎ।' কালীময় ঘটকের গল্প এটি।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা দিক দেখবার। বিদ্যার সঙ্গে সমান্তরালভাবে কি বিপুল বিত্তই না তিনি অর্জন করেছিলেন। রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, জগন্নাথ পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিলেন একটি পিতলের জলপাত্র, দশ বিঘা নিষ্কর জমি ও একটি কুঁড়ে ঘর। পরে পিতার মৃত্যুকাল বরাবর সেগুলিও নাকি হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং একটি হর্তুকি ফল সম্বল করে তিনি টোল খুলেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে রেখে যান তিনি নগদ এক লক্ষ টাকা, বছরে চার হাজার টাকা আয়ের নিষ্কর জমি। নগদ টাকা যে কি রেখে গিয়েছিলেন সেটা ত অন্য সূত্রে মিলিয়ে দেখার উপায় নেই, কিন্তু সরকারী সূত্রে এটা দেখা যাচ্ছে, রজনীকান্তের হিসেবের দ্বিগুণ ছিল তাঁর নিষ্কর জমি। লর্ড মিন্টোর কাছে জগন্নাথের নাতি কাশীনাথ ঠাকুর্দার 'পেনসন'টা তাঁকেও দিয়ে যাবার যে আবেদন করেন, সেই দরখাস্তের ওপর একটা 'এনকোয়্যারি' হয়। সেটা করেন হুগলীর তৎকালীন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট টি-এইচ আরনেস্ট সাহেব। তাঁর হিসেব মত তর্কপঞ্চাননের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন আট শ' বিঘা নিষ্কর জমির মালিক। তার আয় বছরে আট হাজার টাকা। কাজেই 'পেনসন' আর হয়নি। সে গল্প ত আগেই বলা হয়েছে। তবে পেনসন না দিলেও জগন্নাথের এক প্রতিভাধর পৌত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌমকে কোলব্রুক সাহেব জজ-পণ্ডিত করে দেন।

অবশ্য একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বুনো রামনাথের ঐতিহ্যে বাঁকা দৃষ্টিতে টুলো পণ্ডিত জগন্নাথের এই বিপুল ঐশ্বর্য আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও ঊনবিংশ শতকের নবযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিদ্যার সঙ্গে বিষয়-বৈভবের এই রাজর্ষি মণিকাঞ্চনযোগ সেযুগে দুর্লভ নয়। ওটা সেই বিস্ময়কর প্রতিভার বৈচিত্র্য, স্ফূর্তিমাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্যস্নাত বুদ্ধিস্নাত বাঙালী মনীষার চিত্ত-আকাশে নানা রঙের রামধনু মাত্র। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মশায় বলেছেন: তাঁর প্রখর বাস্তব চেতনা ও ব্যক্তিত্ববোধ থেকেই এই আধুনিক বুর্জোয়া জাগতিক বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের এই material স্তম্ভটিকে মজবুত রাখবার জন্যেই কোনদিন তিনি মধ্যযুগীয় বৈরাগ্য বা সাংসারিক উদাসীনতায় প্রশ্রয় দেননি। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর টিপিক্যাল নবযুগের মানুষ'। শুধু বিদ্যাসাগর কেন, সেই একই চেতনা কি রামমোহন হতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথে প্রবাহিত নয়? জগন্নাথ এই চেতনার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ নবযুগের সন্ধ্যা উজ্জ্বল আকাশে তিনিই ত ভোরের শুকতারা।

আমেরিকা—নভেম্বর '৭৭

রাজলক্ষ্মী দেবী

চকচকে বাস্, গাড়ি, বাংলো—
তকতকে রাস্তাঘাট
ভাগে ভাগে দাগ কাটা কাটা।
প্রতি পদে ঝকঝকে সবুজ চাকতি,
মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর, ফিলাডেল্ফিয়া।
আমেরিকা পড়ে থাকে, যেন পুতুলের
খেলাঘর
উল্লাসে পরমাণু কেঁপে,—
ফেঁপে,—
হ'য়ে গেছে বিশ্বচরাচর।

শীতের প্রকোপে তার অসংখ্য গাছের
শীর্ণ রিক্ত শাখা
ঊর্ধ্ববাহু আঙুল মট্কায়। তবু
এই সব বিপন্ন সন্ন্যাস
ভেসে যাবে রৌদ্রে, পেট্রোলের গানে,
স্টীলের গার্ডারে।
আমেরিকা পড়ে থাকে,—যেন নারী।
বীরভোগ্যা ধন,
বস্ত্রহীন, কুণ্ঠাহীন,—দৃপ্ত আমন্ত্রণ।

যোগ্যতা প্রত্যাশা করে। আকাঙ্ক্ষা জাগায়,
কাছে ডাকে,—দূরে ঠেলে দেয়।
সমপরিমাণ প্রেম, ঘৃণা, দুই হাতে
নিয়ে, পৃথিবীর দিকে দু'বাহু বাড়ায়।
আমেরিকা,—এই নাও ভালবাসা।
আমেরিকা, এই নাও
ঘৃণা, ভয়, হাহুতাশা।
আমেরিকা,—স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গের মিশ্রণ।
আমেরিকা,—অর্ধ-স্মৃতি, অর্ধ-বিস্মরণ।
আমেরিকা,—সৃষ্টি-প্রলয়ের দুল-দোলন।

আমেরিকা,—অসময়ে দ্বারে আগন্তুক।
দেয় না দেয় না ধরা
উত্তপ্ত ফ্লোরিডা,—হিমশীতল বোস্টন।
বরফে আচ্ছন্ন নায়াগারা?
আমেরিকা,—দেখা হবে আরবার
রুদ্ধ সিন্ধুতীরে?
আমেরিকা,—দেখা হবে বারবার—
চিত্তের গভীরে॥

সৌর-ভণিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

পঙ্ক্তিবদ্ধ, অবিরল বৃষ্টিপাত
গাছ থেকে শূন্যে ঝরায় পাতা ;
সব পাতা শূন্যতারই দিকে আসে ঝেঁপে।

ঘনিয়ে উঠলে তুমি ; এই দিকদিগন্ত ছাপিয়ে আলেখ্যটি
যখন ফুটবে, তার কনকচাঁপার মধ্যে কালো—
সেই স্বচ্ছ গাছটির অবদান মনে পড়বে কি ?

মনে-পড়া, বৃষ্টি না-পড়ার মতো বিরোধে গম্ভীর
অম্বরে, দেখতে চায় অক্ষর, অর্থাৎ ধ্বনি, আদ্যন্ত মিলিয়ে
আর অন্য স্মৃতিবিস্মৃতির কাছে তোমার কোমল।

কেবল উপছে ওঠে এক-দুই-তিন লহমার গুঞ্জনে
আঙ্গিকসর্বস্বতা ;
এইসব সৌর-ভণিতা যাক ঝ'রে।

মুখর যে, সে ঐ বৃষ্টির শাদাকালোর ভিতরে
গিয়ে, গোপনীয়তায়—হাত ধরেছে অস্ফুট।
ওর স্পর্শ-রাঙা

ডৌলটি দিয়েছিলেন একজন পেন্সিলে এঁকে ;
অমন রঙিনতর পেন্সিল-সীস
আর তো দেখিনি।

খেলার ভেতরে নষ্ট হবে ঘর

পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান

যে কোন খেলার ভেতরে আরো কিছু খেলা থাকতে পারে
প্রিয় খেলাটিকে মেনে নিয়ে যেতে রাজি অরণ্যে নতুবা জলে
আমি তো কাক নই, উঠোনে চেঁচিয়ে-চিল্লে ছড়াতে পারি না ধান
আমি তো ডহরের উদ্ নই, পারিনা মাছের সঙ্গে সাঁতরাতে সারারাত
ভালো লাগে উপভোগ্য খেলার শৃঙ্খলা
তা বলে বন্ধন! আড়বাঁশির ফুৎকারে ছিঁড়ে দিতে চাই
রীতি-নীতি, গোলাপের ঝাড়

যে কোন খেলার ভেতরে কিছু কলকব্জা তাও থাকতে পারে
হিম ভেজা কামনায় বসতি গড়তে আমি চাই
তোমার কী মতামত ?
একদিকে নিরক্ষীয় বনভূমি, ভিন্নদিকে ঘুড়ির আকাশ
খেলার ভেতরে খেলা, পালা করে ঘুমাবো জ্যোৎস্নায়

নতশিরে বাঁচতে চাই না আমি—মানুষের স্বাদে গন্ধময়
শীত যাবে, গ্রীষ্ম তাপহীন
যে কোন খেলার ভেতরে ভেঙে ভেঙে নষ্ট হবে জরদ্গবের ঘর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ৭ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত ইংরাজী চিঠি কলকাতার কুন্তল মজুমদারের কাছে পেয়েছি। চিঠিটি কাকে লেখা এবং কি প্রসঙ্গেই বা লেখা সে সম্বন্ধে কুন্তলবাবু কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোন এক উকিলকে লেখা।

চিঠিটি কোথায় কিভাবে পেলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কুন্তলবাবু বললেন—আমার বাবা উকিল ছিলেন। তিনি সম্ভবত তাঁর কোন আইন ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি এটি পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি যে একজন আইন ব্যবসায়ীকে লেখা, চিঠিটি পড়লেই তা অনুমান করা যায়। আর চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যার কথা থাকায় তাঁর কন্যার সম্পর্কেই যে লেখা তাও বোঝা যায়। তবে কন্যার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কিন্তু নয়। যা নিয়ে চিঠিটি লেখা তার ইতিহাস অতি করুণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সকলেরই দুঃখ ও বেদনা এর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত।

এ সম্পর্কে যা জানি তা বলছি। তার আগে সমস্ত চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

5 Pratap Ch. Chatterji Lane
Jany. '87

My dear Muralee Babu

I have been in Calcutta since the last few days and will see you shortly.

In the meantime I send you draft of a letter which I wish you to address to the grand-father-in-law of my deceased daughter, if you approve of it. Of course make such alterations as you consider necessary.

Yours Sincerely
Bankim Ch. Chatterji

এবার এ সম্পর্কে যা জানি, তা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর বিয়ে দিয়ে ছিলেন কলকাতার বাঁশতলা গলির বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের মতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের সময় হয় মতীন্দ্রর পিতা জীবিত ছিলেন না, নয়ত পুত্রের বিয়ের অল্প দিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তবে মতীন্দ্রর পিতামহ দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

পিতৃহীন মতীন্দ্র বৃদ্ধ পিতামহকে গ্রাহ্য না করে বিয়ের পর থেকে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতে থাকে। ঐ সময় সে বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের দলে মিশে নটীদের সঙ্গে আলাপ জমায়। কোন কোন রাত্রে সে বাড়ি না ফিরে নটীর বাড়িতেই কাটাত।

উৎপলকুমারী এই নিয়ে তাঁর স্বামীকে বহু নিষেধ করেছেন, কান্নাকাটি করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

মতীন্দ্র শুধু দুশ্চরিত্রেরই ছিল না, সে আরও একটা ব্যাপারে সর্বদাই উৎপলকুমারীকে জ্বালাতন করে মারত। সে ব্যাপারটা হল এই—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর হাজার বার টাকার গহনা উৎপলকুমারীর কাছে জমা রেখেছিলেন। এ খবরটা মতীন্দ্র জানত। জেনে ঐ গহনাগুলোর উপর তার লোভ

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারী দেবী
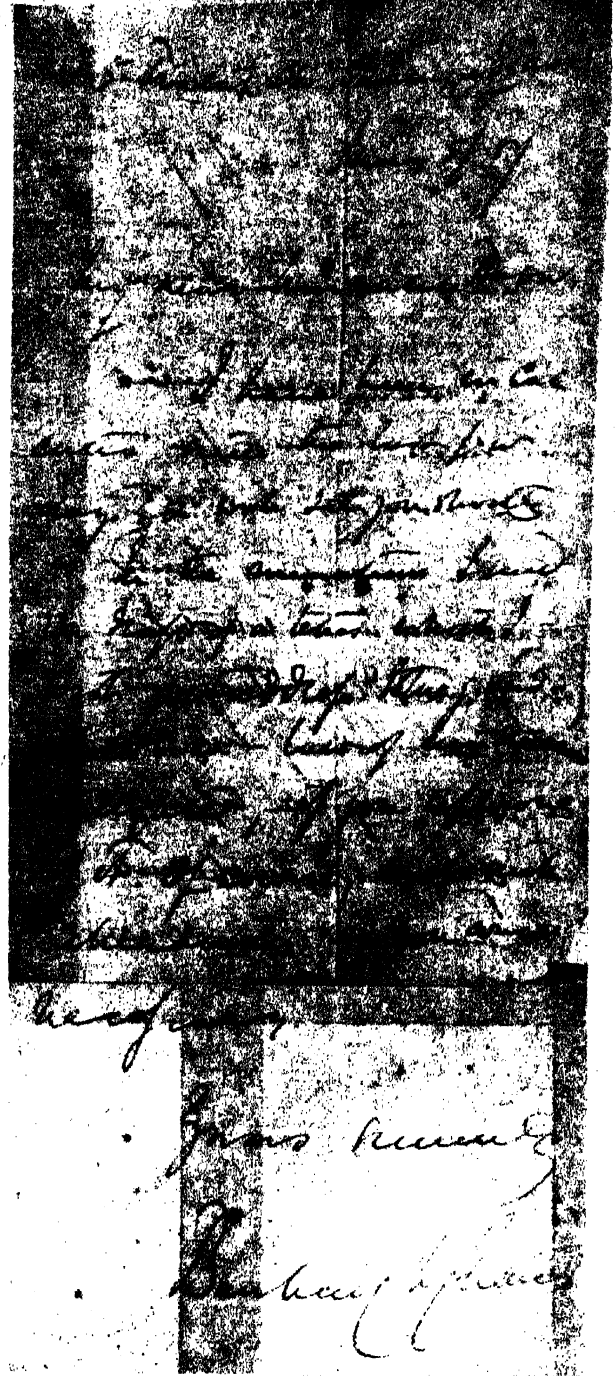
বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজি চিঠি

হয় এবং ঐগুলো পাওয়ার জন্য সর্বদাই স্ত্রীর উপর জুলুম করত। কিন্তু কিছুতেই গহনা আদায় হয় না দেখে, এবং নিজের উচ্ছৃংখল জীবনকেও বাধাহীন করবার জন্য, একবার উৎপলকুমারীর সামান্য অসুখ করলে, ওষুধের নাম করে তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এবং গলায় কাপড় বেঁধে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রেখে সকলকে জানায় উৎপলকুমারী আত্মহত্যা করেছে।

১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে। পরদিন সকালে মতীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে উৎপলকুমারী আত্মহত্যা করেছে, বলে সংবাদ পাঠায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় ছিলেন না। তিনি তখন সপরিবারে তাঁর কর্মস্থল মেদিনীপুর শহরে ছিলেন। কলকাতার বাড়িতে তাঁর ভৃত্য, দরোয়ান প্রভৃতি
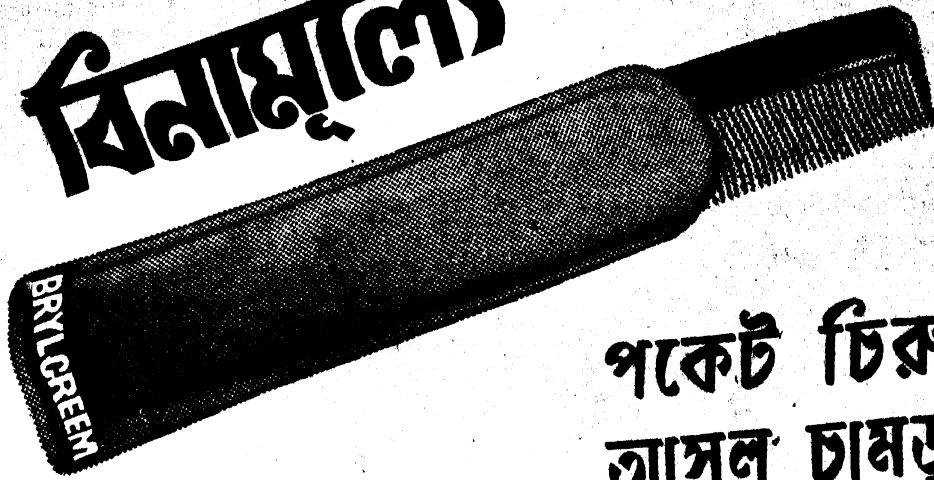
চিঠির লেখা প্রায় ... হয়ে এসেছে। ঐ চিঠি থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

সেজকাকা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পলার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে জানিতে। তিনি শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন। ঐদিন বাবা বাড়ি আসিয়াছেন। সেজকাকা আবার শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়াছেন। ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। পলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই। সে মরার পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া তাহাকে কাটিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পর উহার পেটের নাড়ী ও মাথার খুলি কাটিয়া হাসপতালে লইয়া যায়। তাহাতে ধরা পড়ে যে সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বিষ কিরূপে খাইল, কে আনিয়া দিল তদারক হয়। তাহাতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, উহাদের বাটীর নিকট কে বিনোদ ডাক্তার আছে, তাহার নিকট হইতে মতীন্দ্র বিষ লইয়া যায়। পরে ঔষধ বলিয়া পলাকে খাওয়াইয়া দেয়। পরে যখন দেখিল যে তাহার মৃত্যু উপস্থিত তখন ঐ বৃন্দাবনের কাপড় গলায় বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। সেজ খুড়ি ১২ হাজার টাকার গহনা পলার নিকট রাখিয়া যান। ঐ সকল গহনা মতীন্দ্র পলার নিকট হইতে চাহিত। সে তাহা দেয় নাই। তজ্জন্য মতীন্দ্র বলিয়াছিল যে, আমার পুত্র হয় নাই। আমি তো সেজবাবুর কিছুই পাইব না। অতএব ঐ সকল গহনা আমাকে দাও। পরে সে পলাকে গহনা দিতে নারাজ দেখিয়া ঐ বন্ধুর চাতুরিতায় পরে পলাকে বিষ খাওয়ায়।

পলা ও মতীন্দ্র মেদিনীপুরে যায়। পরে মতীন্দ্র সেখানে উহাদের বাসার নিকট গৃহস্থের বাড়ি কুচরিত্র দেখায়। ঐ জন্য সেজকাকা উহাকে বাসা হইতে বাহির করিয়া দেন। ঐ সঙ্গে পলাও চলিয়া আসে।

কৃষ্ণ বাঁকুড়া হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছে। বাবা মেদিনীপুর হইতে যখন

জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি চিঠি

য়েকজন ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃসংবাদ সঞ্জীবচন্দ্রকে জানাল। সঞ্জীব-ন্দ্রও মতীন্দ্রর কথা বিশ্বাস করেই ঐ নিদারুণ সংবাদ নিয়ে তখনই মেদিনীপুরে ঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলেন।

পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের এই সময়কার দুটি চিঠি এই—

াণাধিকেষু,

হঠাৎ আমায় মেদিনীপুরে আসিতে হইয়াছে। মতীন্দ্রর দুশ্চরিত্রের বিষয় ানিয়া পলা দুই একবার সহ্য করিয়াছিল। শেষ বার সহ্য করিতে না পারিয়া রশু রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং আমার এ সময় বঙ্কিমের নকট দুই চারি দিন থাকা প্রয়োজন, তাহাই আসিয়াছি। এইমাত্র আসিয়া পঁহুছিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে ফিরিয়া যাইব। তোমার বাটীর সংবাদ লিখিতে বপিনকে লিখিয়া আসিয়াছি। আমি শেষ রাত্রে চলিয়া আসিয়াছি। কাহাকে কান কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই।...

াণাধিকেষু,

অদ্য তোমার পত্র পাই নাই। মেদিনীপুরে আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা খানে ফেরত আসিয়াছে। তোমার সেজকাকা আশ্চর্য মানসিক ক্ষমতা দেখাইয়া-ছন। বোধ হয় আমি উপস্থিত থাকায়, শোক করিতে পারে নাই। তাহাই আমি রিয়া আসিয়াছি। তোমার সেজ খুড়ির অবস্থা বড় মন্দ।......

উৎপলকুমারীকে তাঁর বাপের বাড়ির সকলেই পলা বলে ডাকতেন। এখানে থম চিঠির বিপিন হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র। খা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন মেদিনীপুরে গিয়েই, আর বতীয় চিঠিটি লিখেছিলেন মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ফিরে এসে। জ্যাতিশচন্দ্র ঐ সময় নদীয়া জেলার মেহেরপুরে পুলিশ ইনসপেকটর ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র যেমন পুত্রকে পলার মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিলেন, জ্যোতিশের ীও তেমনি তখন জ্যোতিশকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে পলার মৃত্যু সংবাদ ত্যাদি লিখেছিলেন। এঁর ঐ দীর্ঘ চিঠি থেকে পলার মৃত্যু সম্বন্ধে আরও অনেক থা জানা যায়। চিঠিটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আজও আছে।

জ্যোতিশকে লেখা তাঁর পত্নীর চিঠি

[illegible] তখন ঐ সকল গহনা বলাই দত্তের নিকট রাখিয়া আসেন। ঐ জামাই আনিয়া যে কোথায় ফেলিয়াছেন, তাহা এ পর্যন্ত কোন মতে পাওয়া গেল না। জ্যোতিষ যে আমায় কি যন্ত্রণা পাইতেছেন, তাহা বলিবার নহে।'

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, পিতার শাসন না পাওয়ায় মতীন্দ্র একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র জামাতাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে, মতীন্দ্রের আদেশে নিরুপায় পলাকেও তার সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হতে হয়েছিল। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসেই মতীন্দ্র ঐ কাণ্ড করেছিল।

এই চিঠির কৃষ্ণ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র। পলার মৃত্যু সংবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সকলেই খুব মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়েও বাড়ি এসেছিলেন।

চিঠিতে যে বলাই দত্তর কথা আছে, তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু। এ'র বাড়ি ছিল কলকাতায় বৌবাজারে দুর্গাচরণ পিতুরি লেনে। চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র পলার মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য কলকাতায় এলে, সেই সময় মতীন্দ্রর পিতামহ পলার নিকট জমারাখা অলংকারগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসায় ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর যাবার সময় সেই সব অলঙ্কার নিয়ে যান। আবার সেইগুলি সঞ্জীবচন্দ্র চলে আসার সময় তাঁর হাতে পাঠিয়ে দেন।

জ্যোতিশের স্ত্রী জ্যোতিশকে লিখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছ মাসের ছুটি চেয়ে ছ মাসের ছুটি পেয়েছেন। কিন্তু তা নয়। ঐ সময়কার সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায়, কয়েকদিনের ক্যাজুয়াল লীভ্ ছাড়া তিনি ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃঃ) থেকে ৩ মাস ২০ দিন বিনা বেতনে ছুটি পেয়েছিলেন। বিনা বেতনে এইজন্য যে, এর আগের বছর অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মাস এবং ব্যক্তিগত কাজে ১৯শে নভেম্বর থেকে ৬ মাস সবেতন ছুটি নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নিয়ে সপরিবারে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। পলার মৃত্যু নিয়ে তখন কলকাতার করোণার কোর্টে বিচার হয়েছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রও আহূত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ভেবেছিলেন, মতীন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা

জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের আর একটি চিঠি

বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ ও বলরাম

খুলে বলে, আদালতের বিচারে তাকে শাস্তি দেওয়াবেন। কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত মতীন্দ্রর প্রাণ রক্ষারই চেষ্টা করেছিলেন। ফলে বিচারে পলার আত্মহত্যাই সাব্যস্ত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য, মুরলীবাবুকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটিতে পলার দাদাশ্বশুরের নামে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মুশাবিদা চিঠির কথা আছে, সেটি মনে হয় মতীন্দ্রের এই মামলা সংক্রান্তই। মতীন্দ্রের পিতামহের বিশেষ অনুরোধেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মুশাবিদাটি লিখেছিলেন।

এবার একটি অন্য কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি চিঠি লেখার তারিখ দিয়েছিলেন ৫ই জানুয়ারী ১৮৮৭। এটা তিনি ভুল করে ১৮৮৮র জায়গায় ১৮৮৭ লিখেছিলেন। চিঠির প্রাপক মুরলীবাবু চিঠির শেষ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের ৫।১।৮৮ তারিখের চিঠি ৬।১।৮৮ তারিখে পেলেন বলে লিখে রেখেছিলেন। তাছাড়া জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠি দুটিতে কোনও তারিখ না থাকলেও, যেটি পোস্ট কার্ডে লেখা, তাতে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে জানা যায়, ২০শে নভেম্বর ১৮৮৭। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ৫ই জানুয়ারীর চিঠি হবে ১৮৮৮ সালের।

বঙ্কিমচন্দ্র এক তো কাকেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতেন না, তার উপর ঐ সময় কন্যার মৃত্যুর জন্য মন মেজাজ খারাপ নিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। নতুন বছরে ৫ই জানুয়ারীর আগে বোধ হয় কাকেও কোন চিঠি লেখেন নি। তাই আগের বছরে সারা বছর ধরে চিঠিপত্রে, মামলার রায়ে প্রভৃতিতে ১৮৮৭ লিখে লিখে, সেইটাই অভ্যাসবশত ৫ই জানুয়ারী লেখার সঙ্গে ১৮৮৮ না লিখে ১৮৮৭ লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির শেষ পৃষ্ঠায় চিঠিটি যে উৎপলকুমারী দেবী সংক্রান্ত এ কথাও মুরলীবাবু লিখে রেখেছিলেন।

কন্যার মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তখন অন্তত দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। (১) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বরাবরের যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তা এই সময় থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যে কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়লেই জানা যায়। কোষ্ঠী বিচারের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাই তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে লিখেছিলেন, সীতারাম শ্রীকে বলছেন—

'তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন, মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু বড় সুন্দর বলিয়া আমার মা জিদ্ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়িতে একজন দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতা ঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতাঠাকুরকে শুনাইল। সেইদিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্য হইলে।

শ্রী—কেন?

সীতা—তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী—তাহা হইলে কি হয়?

সীতা—যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয় প্রাণহন্তী হয়। (স্বাধ্বী মন্দসা প্রিয়প্রাণহন্তী)।'

বঙ্কিমচন্দ্র উৎপলকুমারীর বিয়ে দেবার সময় পাত্র-পাত্রী উভয়ের কোষ্ঠী নিজে তো বিচার করেছিলেনই, তাছাড়া ভাল জ্যোতিষীকে দিয়েও বিচার করিয়ে দেখেছিলেন, ঐ বিবাহ শুদ্ধ ও মঙ্গলময় হবে। কিন্তু তা না হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। কন্যার মৃত্যুর কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশকে এক চিঠিতে তাই প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গৃহজামাতা করে বাড়িতে রেখেছিলেন এবং রাখালকে কাজে নিযুক্ত রাখবার জন্য তাঁকে সম্পাদক করে 'প্রচার' পত্রিকা বার করেছিলেন। প্রচার কিছুদিন চলার পর রাখাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার বন্ধ করে দেন।

কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র আবার প্রচার প্রকাশ করেন এবং মনে কিছুটা শান্তি পাবার জন্য প্রচারে পুনরায় গীতার আলোচনা শুরু করেন।

এই শান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তখন জানুয়ারি মাসে কাটালপাড়ার বাড়িতে গিয়ে পিতার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রীতিমত খরচ করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তখন জ্যোতিশের স্ত্রী জ্যোতিশকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার
উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না।
আমি উহার অনেক পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে
বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি

'ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাটালপাড়ার ব্রাহ্মণ খাইয়াছে। স সমেত দেড়শত ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। লুচি, ছোলার ডাল, কপি, বেগুন ভাজা, মিষ্টা রসগোল্লা, ছানাবড়া, পান্তুয়া, গুড়ে সন্দেশ, ক্ষীর, বরফি পাঁপর; ক্ষীর; দধি ভাটপাড়ার বৈদিকগুলি সমস্তই খাওয়ান হয়। তাহাদের ছানা ফল ফুলারি প্রভৃ হয়।'

এই চিঠিতে যে ভাটপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণদের কেবল ছানা ও ফল খাওয়ানো কথা আছে, তার কারণ, তখনকার দিনে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অত্যন্ত গোঁ ও সাত্ত্বিক বিবেচনা করতেন বলে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও ভাত, লু এমন কি পাক করা হয়েছে বলে সন্দেশ, রসগোল্লাও খেতেন না। রাঢ়ীদের বাড়ি খেতে হলে এঁরা শুধু ছানা ও ফল খেতেন।

উৎপলকুমারীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদার একদি বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। সেদি কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুকে বলেছিলেন—'শ্রীশ, কুন্দনন্দিনীকে দি বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। সে অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার আপ মেয়ে।'

এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত আলিপুর কোর্টের এক উকিল চন্দ্রভূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন—মশায়, আপনি যে সব ব লিখেছেন, তাতে দেশের কত মঙ্গল হবে!

তাকেও উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—ছাই লিখেছি। আমিই কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়ে মেরেছি। আর আমার অদৃষ্টেই, আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও জানতেন, উৎপলকুমারী স্বেচ্ছায় বিষ খায় নি। তাকে জানিয়েই বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। তবুও যেহেতু আদালতের রায়ে বিষপা মৃত্যু বলা হয়েছিল, সেইজন্য তিনিও সাধারণত লোকের কাছে কন্যার বিষপা মৃত্যুর কথাই বলতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী সকলেই জানেন—গোবিন্দপুরে জমিদার নগেন্দ্র দত্ত অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আনলে তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী পিতৃগৃহে দাসীপুত্র তারাচরণের, সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বি... কিছুদি পরেই কুন্দ বিধবা হয়ে নগেন্দ্রর বাড়িতে ফিরে আসে এবং উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। এই দেখে নগেন্দ্রর স্ত্রী সূর্যমুখী অভিমানে তার স্বামী সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঘটনাক্রমে সূর্যমুখী আবার বা ফিরে এলে, তখন কুন্দ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নিজের সৃষ্ট কুন্দনন্দিনীর পরিণতির সঙ্গে নিজে কন্যার ভাগ্যেরও কিছুটা মিল দেখে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন এইরূপ দুঃখ করতেন।

উৎপলকুমারীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেব আরও বেশী মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। সেটা স্বাভাবিকই। তাই সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশকে লিখেছিলেন—তোমার সেজ খুড়ির অবস্থা বড় মন্দ।

রাজলক্ষ্মী দেবী স্বামীর সঙ্গে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় চলে এ স্থির করেন—কাটালপাড়ায় গিয়ে বাড়িতে থেকে কিছুদিন গৃহদেবতা রাধাবল্লভে সেবা করে কাটাবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এতে কোন আপত্তি না করে কাটালপাড়া বাড়িতে বহু আপন জন থাকায় রাজলক্ষ্মী দেবীকে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। সম্পর্কে জ্যোতিশের স্ত্রী তখন জ্যোতিশকে চিঠি লিখে যা জানিয়েছিলে তা এই—

'সেজখুড়ি কলিকাতায় আসিয়াছেন। পিসিমা গিয়াছিলেন। চলিয়া আসিয়াছেন সেজখুড়ি বুধবার দিন আসিবেন। তিনি নিজে দুই মাস থাকিয়া রাধাবল্লভে সেবা করিবেন।'

এই চিঠির 'পিসিমা' হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দিদি নন্দরানী দেবী। ইনি পৈতৃ বাস্তুভিটার নিকটেই পিতৃদত্ত বাড়িতে স্বামী ও পুত্রদের নিয়ে বাস করতেন।

গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী উভয়েরই গভী আস্থা ছিল। তাই রাজলক্ষ্মী দেবী তখন রাধাবল্লভের সেবা করে হয়ত কিছু মানসিক শান্তিও লাভ করেছিলেন।

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ১৭ ॥

সাজ্জাদ, কেবল গোটা কয়েক ভাতের গ্রাস মুখে দিয়েছে, দ্যাখে ফটিক ঢুকছে। সে বিস্মিত হল। আবার খুশীও। চাঁদ বিবি পাকের ঘরে গিয়েছিল ছালুন আনতে। ছালুন নিয়ে বেরিয়েই দেখে ফটিক।

চাঁদ বিবি ছালুনের বাটি মাটিতে রেখেই ধপ্ করে বসে পড়ল। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

"বাপ ফটিক, তুই ক'নে ছিলি বাপ! তোর বাপেরে যে গারদে পুরে রাখিছিল বাপ্!"

সাজ্জাদ ধমক দিল, "চুপ কর! ছাওয়াল তা'তে ঘুরে বাড়ি আ'লো, আর উনার শোক উথলোয়ে উঠল। আগে একটু জিড়োক, ঠাণ্ডা হতি দে, তারপর যা কবার কো'স।"

চাঁদবিবি ধমক খেয়ে গলা নামালো। কিন্তু কান্না থামলো না। ছালুনের বাটি সাজ্জাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল।

"আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি অ্যামন হ'ত না। আপনারে নিয়ে যাতি পারতো না। আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি আপনারে উরা চোর ডাকাত-দের সংগে আপনারে ফাটকে পুরে রাখতো না। আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি—"

চাঁদবিবির প্যানপ্যানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সাজ্জাদ।

বলল, "আমারে রাজা ক'রে দিতো। নে অ্যাখন থামেক তো।"

সাজ্জাদ দেখল ফটিকের মুখ কালো হয়ে গেল। সাজ্জাদ বুঝল তার কথায় ব্যথা পেয়েছে ফটিক। সে অপ্রস্তুত হ'ল। আসলে সে ফটিককে আঘাত দেবে বলে কথাটা বলেনি। চাঁদবিবিকে থামিয়ে দেবার জন্যই কথাটা বলেছিল। সাজ্জাদ নিজেও কষ্ট পেল।

ফটিক অপরাধীর মত বাপকে সালাম করে কিন্তু কিন্তু করে বলল, "পরশু রাত্তিরে খবরটা পেলাম।"

সাজ্জাদ নরম আওয়াজে বলল, "যাও বাপ, ঘরে যাও। একটু জিড়োয়ে নিয়ে হাতে মুখে পানি দ্যাও। তারপর গোছল করো। খাও। তারপর কথা হবে। আজ থাকবা তো?"

ফটিকের মনে পড়ল ছবি বার বার বলে দিয়েছিল, সন্ধ্যের বাসে ফিরে যেতে। বলেছিল, একা থাকতে ভাল লাগে না ছবির। একা থাকতে ভয় করে তার। ফটিককে জড়িয়ে ধরে কেমন নির্ভুর ঘুমুলো! ফটিক ছবির কাতর প্রার্থনা শুনে সন্ধ্যের বাসেই ফিরবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল। সাজ্জাদের "আজ থাকবা তো?" এই প্রশ্ন ফটিককে খুব বিপদে ফেলে দিল। ভাবল, না বলা উচিত হবে না।

ফটিক সংগে সংগে বলল, "জে। থাকবো।"

"বাস্. ভালি কথা বাত্তারার সুমায় ঢের পাওয়া যাবে। অ্যাখন হাতে মুখে পানি দ্যাও গে।"

ফটিক কৈফিয়তের সুরে বলল, "পরশু রাত্রে যখন খবর পেলাম, তখন আর বাস ছিল না। তাই কাল প্রথম বাসেই ঝিনেদায় এসে পেঁচেছি।"

"আমার ছাওয়াল," চাঁদবিবি আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আমার ছাওয়াল খবর পালি ছুটে আসবে, এ আমি কইনি? কইনি? কন?"

সাজ্জাদ বিব্রত বোধ করতে লাগল।

"হইছে, হইছে," সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বাপেরে একটু জিড়োতি দে দিহি অ্যাখন?"

ফটিক কৈফিয়ত দিল, "তা আপনার বিয়াই বললেন, আপনারা পরশু বিকেলেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন।"

সাজ্জাদ বলল, "আল্লার দরগায় হাজার শুকুর্ যে অ্যামন বিয়াই আমি পাইছি। আমাগের জামিনি খালাস ক'রে আনার জন্যি দুদিন ধ'রে যা করিছেন, নিজির ভাইর জন্যিও আ'জকা'ল তা কেউ করে না।"

চাঁদ বিবির চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করল। সে বারবার আঁচলের খুট দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। আর মিনমিন করতে লাগল, "আল্লার দয়ায় বিয়াই তো ভালো পাইছি আল্লার দয়ায় অ্যাকটা বুঝমান বিয়ান পাইছি আল্লার দয়ায় অ্যাকটা হাছিনা বিটি পাইছি আল্লারে কই আল্লা আমরা তো তুমার পথেই চিরকাল আছি চিরকালই থাকবো তুমি এগের ভালো রাখো আর আমাগের আর কত কষ্ট দিবা আল্লারে জিজ্ঞেস করি তোর বাপ সন্ধ্যের পর আ'সে কল, দ্যাখ্ অ্যাখনই ঝিনেদায় যাচ্ছি দারোগা সাহেব ডাকিছে—"

সাজ্জাদ এবার ধমক দিল, "তোর সাপের মন্তর থামা দিন। কান্না থামা! আচ্ছা জ্বালা! বাপরে ঘরে যাতি দে। জামা কাপড় ছাড়ুক। এট্টু জিড়োয়ে নিক। তারপর তোর যা কওয়ার আছে ক'স্। আমারে দুটো ভাত দে।"

চাঁদ বিবি তাড়াতাড়ি করে চোখ মুছে বলল, "হ্যাঁ বাপ, ঘরে যা। আমি তোর বাপরে খাতি দিয়ে আসতিছি। বিটির খবর কী?"

"এখন তো একটু ভালোই দেখলাম।"

"বিয়াই বিয়ান ভালো আছেন তো?"

ফটিক ঘরে যেতে যেতে বলল, "তা আছেন।"

"আল্লা তাগের খুশি খুশালি রাখেন।"

অনেকদিন পরে ফটিক আবার তার ঘরে ঢুকল। ওদের খাটের উপর যে বিছানাটা ছবি পরিপাটি পেতে রেখে গিয়েছিল, সেটা তেমনই আছে একটা সুজনি ঢাকা। বিছানার উপর খড়কুটো। চড়াই পাখির কাণ্ড। চালের বাতায় মাকড়শার জাল। যখন এসে ওরা ঘর পেতেছিল, যখন ছবি ছিল, এই ঘরটাই কী আশ্চর্য এক উজ্জ্বলতায় ভরে উঠত। ছবি এবার আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বারণ করাতে আর উচ্চবাচ্য করে নি। কিন্তু প্রথমবার ছবি কী জিদ্‌ই না ধরেছিল! কেউ রুখতে পারেনি তাকে। তাকে ঘর দোর পরিষ্কার করারও সুযোগ দেয়নি। কিন্তু এবার ফটিক যেই বলল, তোমার এই অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয়, ডাক্তারবাবুর বারণ আছে, ক্ষতি হতে পারে। অমনি ছবি চুপ।

ছবি এখন বাচ্চার কথা ভাবছে। জামা খুলতে খুলতে ফটিক ছবির কথা ভাবতে লাগল। ওকে কথা দিয়ে এসেছিল ফটিক আজ সন্ধ্যের ফিরে যাবে। ছবি অপেক্ষা করবে। ভয় পাবে। কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠাতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু আব্বা যদি জানতে পারে তবে ফটিককে যেতেই বলবে। সে জানে তার উপর তার বাজানের কেমন একটা অভিমান আছে। তেমনি সে আবার এও জানে যে সাজ্জাদ মোল্লার বিবেচনা বোধ অতি প্রখর সেটাই ফটিকের অস্বস্তির কারণ।

ফটিক পাট করা একটা লুংগি বের করে পরল। তারপর আদুড় গায়ে বদনাটা তুলে নিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেল। মুখে হাতে পানি দিতে দিতে ফটিক ভাবছিল, ছবির স্বপ্ন ছিল ফটিকের রোজগারে সে এই বাড়িটাকে তার বাপের বাড়ির আদলে গড়ে তুলবে। এক পোতায় দুখানা ঘর তাদের। তার শ্বশুর শাশুড়ির ঘরের লাগোয়াই যে তার ঘর, এতে ছবি খুব অস্বস্তি বোধ করত। বিশেষত রাতে। গলা নিচু করে কথা কইত তারা, এত নিচু যে প্রথম প্রথম ছবির কথা শুনতেই পেত না ফটিক। পরে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল সে। ছবির কথা ভাবতে ভাবতে ফটিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল এবং বদনার পানি মুখে ঢেলে কেবল কুল্লিই করে যেতে লাগল।

ছবির ধারণা তাদের ফিস্‌ফিস্ কথাও বুঝি শ্বশুর-শাশুড়ির কানে গিয়ে ঢুকছে। ওদের কথার আর বিরাম ছিল না। এক একদিন ভোর হয়ে যেত। ছবির হাউস ছিল, ফটিকের হাতে পয়সা হলে প্রথমেই তাদের জন্য নতুন পোতায় একখানা চৌরী ঘর তুলবে। বেশ বড় হবে ঘরখানা। শ্বশুরের ঘরটাও বড় করে তৈরি করে দিতে হবে। তারপর আরও পয়সা হ'লে ছবি টিন দিয়ে চাল ছাইবে। তারপর? তারপর মজবুত একটা বিশাল খাট করিয়ে নেবে। তাতে নক্‌শাকাটা থাকবে। আয়না থাকবে। না, না, পরক্ষণেই মত বদলেছিল ছবি। আয়না নয়। আয়না থাকবে না। ওর বাপের বাড়ির ছত্রি লাগানো খাটের শিথেনে এবং পথেনে দুটো ছোট আয়না লাগানো ছিল। একদিন বেজায় লজ্জা পেয়েছিল ছবি। তারপর ছোট্ট দুটো পর্দা করে ঢেকে দিয়েছিল। ছবি তাদের দাম্পত্য দিল্লাগীর কোনও রকম সাক্ষী রাখতে চায় না। তাই সে বলেছিল, তার এবাড়ির খাটে সে নানা রকম নক্‌শা করিয়ে নেবে কিন্তু আয়না বসাতে দেবে না। কিন্তু এখন কী করবে ফুটকি? কী করে তাদের দিল্লাগীর সাক্ষ্য চেপে রাখবে? তুমি না মা হতে চলেছ? ফটিকের হাসি পেল। এটাকে কী দিয়ে ঢাকবে ছবি!

চাঁদ বিবি ছাওয়ালের কাণ্ড দেখে অবাক। সেই তখনের থে পানি নিয়ে নিয়ে মুখি পুরতিছে আর কেবল কুল্লি করতিছে।

"ও বাপ!" চাঁদ বিবি ডাকল। "খাবা না?"

ফটিক মায়ের ডাকে তার দিকে ফিরে চাইল।

"কী ভাবতিছ, মনি!" উদ্বিগ্ন হয়ে চাঁদ বিবি জিজ্ঞেস করল। "গোছল করবা না? ব'সে ভাবলিই প্যাট ভরবে? শরীর তো দেহি আ'ধখান হয়ে গেছে।"

ফটিক তার দিকে চেয়ে হাসতেই চাঁদ বিবির বুকটা হালকা হয়ে এল। ছাওয়ালের মন তালি ভালোই আছে।

ফটিক বলল, "গোছল করেই বেরিয়েছি। তুই খেতে দে।"

"তুই খেতে দে," কথাটা শুনে চাঁদ বিবির প্রাণে সুখের ঢল নামল। তার ফটিক তার ফটিকই আছে। চাঁদ বিবির চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। ছাওয়াল কত দূরে থাকে। কত রকম চিন্তা হয়। ভয় হয়। ভাবে কাছে এসে থাকতে বলে। বুড়ো হয়ে গ্যালাম বাপ, তুই দূরি দূরিই যদি থাকবি তবে ছাওয়াল নিয়ে বউ নিয়ে ঘর করার সুখ কবে পাবো? চিরডা কালই কি অ্যামন অ্যাকা অ্যাকাই কাটবে? ভাবে, ছাওয়ালকে কথাটা বলে চাঁদ বিবি। কিন্তু বলে না। ছাওয়াল উকিল হইছে, ভাত বাড়তে বাড়তে নিজেকেই বুঝ দিতে লাগল চাঁদ বিবি, অ্যামন ছাওয়াল এই দিগরের মোছলমানদের মধ্যি আর অ্যাকটাও নেই। কোর্ট-কাছারি কি গিরামে থাকে যে ছাওয়াল বাড়িতি থাকবে? কোর্ট-কাছারি যেখেনে আছে ছাওয়ালও সেইখেনেই থাকে। তা অ্যাখন করা

হরলিক্‌স

Horlicks

THE IDEAL FOOD DRINK

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যো আপনাকে অতি বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

যাবে কী? রাত্রি অ্যাজন নছিবও ছুটিতে অ্যাকবার দিন কয়েকের জন্যি ছাওয়াল আর বউ বাড়ি আইছিল। পেরথমে আসেই এ বাড়িতি উঠিছিল। দুদিন থাকতি না থাকতিই বিয়াই আসে মেয়েরে নিয়ে গ্যালেম। বিয়াইর মার বাড়াবাড়ি অসুখ। তা ছাওয়াল এ বাড়িতি থাকবে আর বউ ও বাড়িতি থাকবে, আর বাড়ি যখন গিয়ায় এ পাড়া আর ও পাড়া, এ আবার হয় না কি? ফটিকির বাপ কলো, ছাওয়ালরে ও বাড়ি যাতি ক। ফটিক ছুটিটা পুরো ও বাড়ি কাটায়ে কেবল যাওয়ার আগের দিন আ'সে এ বাড়িতি থাকে গ্যালো। ভালো করে ছাওয়ালডারে বউডারে খাওয়াতিও পারলো না চাঁদ বিবি। তা অ্যাখন করা যাবে কী? কর্তাবিবি ঠিক ঐ সুমায়ই অসুখ বাধায়ে বসলেন। যার যামন নছিব।

তবে চাঁদ বিবি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তো। অ্যাখন একটুক্ষণ ঢেঁকিতি পাড় দিলিই চাঁদ বিবির হাঁফ ধরে। শীতির সুমায় কাজ কর্তি বড় কষ্ট হয়। তখন খালি ইচ্ছে হয় বউডা কাছে থাক। ছমছম করে এঘর ওঘর ঘুরুক ফিরুক। তার সংগে দুটো কথা বলুক। ওতিই চাঁদ বিবির শান্তি। আর কিছু সে চায়ও না। তা অ্যাখন করা যাবে কী? ছাওয়াল উকালতি করবে শহরে, আর বউডা প'ড়ে থাকবে এখেনে, তা আবার হয় না কি? সবই বোঝে চাঁদ বিবি। এত বোঝে বলেই কাউকে কিছু বলে না। প্রত্যেকের পাওনাই সে কড়াক্রান্তিতে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু সেও তো আর সকলের মতই মানুষ, মাও তো বটে। তারও তো কিছু পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কই, সেটা তো মেটে না। যা মিটছে না বলে তার যে বড় কষ্ট হয়, একথা তো কেউ বোঝে না। এইসব সময় তার চোখ দিয়ে খালি পানি ঝরে। আল্লাহ্! আল্লা আমি আর কিছু জানিনে, শুধু তুমারে জানি। তুমি আমারে ফটিকির ম'তো অ্যাত ভালো অ্যাকটা ছাওয়াল দেছো, তারে উকিল করিছো আবার ছবি বিবির মতো অ্যামন ভালো অ্যাকটা বউ দেছো, তবু তুমার কী মর্জি; ছাওয়াল বউ নিয়ে ঘর করার সুখটা আমারে দিলে না!

ফটিক ডাক দিল, "আম্মা খাতি দিবি নে?"

চাঁদ বিবির খেয়াল হয়, ছাওয়াল বসে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে যাবার জন্য লজ্জা পায় এবং নিজেকে ধিক্কার দেয়, খালি নিজির চিন্তা!

"যাই বাপ।" চাঁদ বিবি সাড়া দেয় তারপর দ্রুত ভাতের থালা নিয়ে হাজির হয়। খালি ভাত আর কুমড়োর ছালুন। ছোট বয়সে কত কি খেতে ভালবাসত ফটিক। এখন হুট হুট করে আসে। ঘরে প্রায় কিছুই থাকে না। যা পায় তাই খায়। নিজের থেকে আজকাল কিছুই খেতে চায় না। এইটে হ'ল চাঁদ বিবির বড় দুঃখ। উকিল হলি মানুষ বদলায়, না বয়েস হয়ে গেলি বদলায়, চাঁদ বিবি কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। এলেমদার ছাওয়ালের মনের নাগাল পাতি গেলি মায়েরও এলেম লাগে। কিন্তু চাঁদ বিবির কিছুমাত্র এলেম নেই। বুকভরা শুধু ভালোবাসা আছে। আর আছে খোদা।

ফটিক খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, "আব্বা-জানদের খবর কেন?"

"তা আমি কী ক'রে কবো।" চাঁদ বিবি উত্তেজিত চাপা স্বরে বলল। "সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সারাদিন ধান ভানছি। নছিফা সব গুছোয়ে নিয়ে চলে গেছে। আমি আসে গরুরি জাবনা দেবো। তোর বাপ ঢুকল। কয় অ্যাখনই ঝিনেদায় যাবো। ফিরতি রাত হবে। সাবধানে থাকিস্। আমি কলাম, ক্যান্ অ্যাত রাত্তিরি ঝিনেদায় ক্যান্? তোর বাপ ক'লো দারোগা ডাকিছে? আমি কলাম, দারোগা তো আপনারে কখনও ডাকে না, তা আজ যে আপনারে বড় ডাকলো। তোর বাপ কলো, তা আমি কবো কী করে? আমি কি দারোগার প্যাটে নল বসায়ে কানে ঠ্যাকায়ে রাখিছি। তোর বাপের য্যান্ একটু বিরক্তির ভাব। আমার মনে হ'লো তোর বাপ ক্যান্ ব্যাপারডারে ভালো চোখি দেখতিছে না। আমি তোর বাপেরে কলাম, তা ডাকিছে কি আপনার অ্যাকারে? তোর বাপ কলো, না বাঁশির, খাদু, জমিরুদ্দী, গয়া এগোরেও ডাকিছে। উরাও যাতিছে। এই কথা শুনে আমার ধড়ে পিরান আলো। আমি কলাম, তালি ভাতি খায়ে যান। তোর বাপ ক'লো, দারোগা হাওলাদার ক্যাছবরে পাঠায়ে দেছে। খাতি গেলি, দেরি হয়ে যাবে। তুই বরং কিছু চিঁড়ে আর শুকনো গুড় যদি ঘরে থাকে তা'লি গামছায় বাঁধে আমারে দিয়ে দে। খিদে পা'লি তাই ফাকাতি ফাকাতি যাবা নে। আমি তাই করলাম। পিরানডা দিতি গ্যলাম, তা নেলে না। তা মন্দ সেই যে গ্যালো, আর ফিরার নাম নেই। সে রা'ত গ্যালো, বাড়িতি আমি অ্যাকা মেয়েমানুষ। ভয়ে ঘুমোতি পারিনে। তোর বাপ বাড়ি নেই, আমি শাদী হ'য়ে নয় বছরের মেয়ে এই বাড়িতি আইছি, কুনুদিনও এই ঘটনা হয়নি। আমি তো ভয়ে মরি আর আল্লারে ডাকি। আল্লা! আমরা তো কুনুদিনও তুমার রাস্তা ছাড়িনি ভয় ক্যান—"

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "আমমা, তারপর?"

চাঁদ বিবি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, "রা'ত গ্যালো, দিন গ্যালো লোকটার কুনু খবর নেই। বাঁশরির বিবি, জমিরির ছাওয়াল, খাদুর ভাতিজা সবাই আ'সে জিজ্ঞেস করে খবর কী? কনে গ্যালো উরা, কী হ'লো ওগের? আমি কি জানি কিছু যে কাউরি ক'বো? এদিকি আমার দেলে যে কী হতিছে, তা কাবল আমিই জানি। উরা সব চলে গেলি, আমি মনে মনে আল্লারে ডাকি আর ঢেঁকী পাড় দিই। ঢেঁকীতি পাড় দিই আর কই আল্লা আমরা তো তুমার রাস্তা ছাড়িনি, তা'লি তুমি—"

ফটিক বলল, "আম্মা একটু ছালুন আন্।"

"আনি বাপ," বলে চাঁদ বিবি উঠে গেল। তারপর কড়াইটা সুদ্ধু নিয়ে এল। হাতায় ক'রে খানিকটা ছালুন ফটিকের পাতে ঢেলে দিতে দিতে চাঁদ বিবি বেহেস্তের সুখ যেন অনুভব করতে লাগল। ফটিক, তার ফটিক সেই আগের দিনের মত তার কাছে আবার ছালুন চেয়ে খেল। আল্লা আজ তার ছাওয়ালরে অনেক দিনের পর তার কাছে ফেরত এনে দিলেন যেন।

"আরেকটু ছালুন নিবি, বাপ?" চাঁদ বিবি টলটলে চোখে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ফটিকের দিকে চেয়ে রইল। সর্বদাই ভয় এই বুঝি না বলে।

ফটিক একবার মায়ের মুখের দিকে চাইল। আম্মা কাতর চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। ওর মনটা টনটন করে উঠল।

হঠাৎ ফটিক পুরনো দিনের খেলা শুরু করে দিল।

বলল, "কড়াই দেখা আগে। দেখি তোর জন্য কতটা আছে?"

খুব খুশী হয়ে কেঁদে ফেলল চাঁদ বিবি। সংগে সংগে সামলে নিয়ে মুখে আবার ম্লান হাসিও ফুটিয়ে তুলল।

বলল, "নাই বা থাক'লো আমার জন্যি কিছু। তোর যদি খাতি ইচ্ছে করে খা। আমি তো রোজই খাই। কিন্তু তোরে তো আর রোজ পাবো না।"

ফটিক বাধা দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চাঁদ বিবি কড়াইএর সবটুকু ছালুন ওর পাতে ঢেলে দিল।

ফটিক জানে তার মা আজ শুধু ভাত খাবে, অবিশ্যি ভাত যদি থাকে। নাহলে অন্য কিছু খাবে, তা না হলে উপোস দেবে। কিন্তু ফটিককে এই ছালুন খাইয়ে যে তৃপ্তি পাবে তার মা আর কোনও কিছু দিয়ে ফটিক তার ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। তাই মায়ের মুখের গ্রাস খেয়ে নিল বলে সে বেশ কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও বিনা বাক্যব্যয়ে সে খেতে শুরু করে দিল।

চাঁদ বিবি কড়াইটা রান্না ঘরে রেখে এসে ফটিকের কাছে বসল। তারপর একবার নিজের ঘরের দিকে চাইল।

তারপর ফটিকের দিকি সরে চাপা স্বরে বলতে লাগল, "বিয়াই বিকেলের মোটরে খবর পাঠালেন ঝিনেদার থে লোক দিয়ে। তখন জানলাম তোর বাপেরে আর অন্য সবাইরি কয়েদ ক'রে রাখিছে দারোগা। কিছুতিই নাকি ছাড়বে না। শুনে আমার দেল এই ধড়ফড় তো এই ধড়ফড়। শরীলি এই ঘাম তো এই ঘাম। হাত পা সব থর্‌থর থর্‌থর ক'রে কাঁপতি লাগলো। নছিফা, আর জন্মে আমার বিটি ছিল নিশ্চয়, পানি খাওয়ায়ে, পাখা অ্যানে বাতাস ক'রে, বুকে জল দিয়ে দিয়ে তবে আমারে চাঙ্গা করে তোলে। নছিফা সেই রাত্তিরি আমার কাছে আ'সে শুয়েও ছিল। রাত্তিরি আর ঘুম অ্যসে না বাপ। সারা রাত মনে মনে অ্যাকবার তোরে ডাকি, আর অ্যাকবার আল্লারে ডাকি। অ্যাকবার তোরে ডাকে কই, ফটিক ফটিক বাপ আমার, তোর বাপেরে কয়েদ ক'রে রাখিছে, তুই তো বাপ উকিল হইছিস্। তবে আর বাপ, বাপেরে ছাড়ায়ে নিয়ে আয়। আর অ্যাকবার আল্লারে ডাকি। কই আল্লা ফটিকির বাপ চিরকাল তুমার পথে থাকিছে। কুনুদিন ঈমান নষ্ট করেনি, তা'লি তুমি তারে ক্যান কয়েদে পুরলে? সে নির্দুষী। তবু তুমি তার উঁচু মাথাডা নিচু করে দিলে ক্যান? তুমি না মেহেরবান!" চাঁদ বিবি আঁচলের খুঁট্ দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

ফটিক বলল, "আম্মা, আর কাঁদিস নে।"

চাঁদবিবি বলল, "আমি মেয়েমানুষ, এলেম নেই, দুনিয়ার কিছু বুঝিনে। খালি তোর বাপেরে বুঝি, তার অ্যামন হ'লো। আর তোরে বুঝি। তা তোরে পাবো কনে। যদ্দিন তুই ছোট ছিলি ততদিন তোরে কাছে কাছে পাইছি। ততদিন দেলখান যান্ ভরা ছিল। তোর গায় হাত বুলোয়ে কত সুখ পাইছি। কত কথা তখন কইছিস্। ফকিরির কাছে যা শিখতিস আমারে ক্যাবল তা শুনোতি। অ্যাখন কত বড় হয়ে গিছিস, কত এলেম শিখিছিস। কত কথা কওয়ার লোক পাইছিস। তোর মারে আর তো দরকার লাগে না। তোরে আর পাইনে। দেল বড় ফাঁপর ফাঁপর করে বাপ্। বড় কষ্ট লাগে। তোরে কাছে পাইনে বাপ, তোর বাপেরে কাছে পাইনে, দুদিনির জন্যি বিটি আ'সে বাড়িডারে জাগায়ে দিয়ে গ্যালো। অ্যামন সোন্দর বউ, অ্যামন সোন্দর কথা, আম্মা বলে ডাকলি পিরানডা জুড়োয়ে যা'তো। সে ডাক অ্যাখনও শুনি আর চোখে পানি আ'সে যায়। বিটির কাছে পাবার জন্যি দেলডা উস্‌খুস্ কুস্‌খুস্ করে চোখে পানি আ'সে যায়। তা আমি করব কী? নছিফা ছাড়া বাড়িতি অ্যাকটা কথা কওয়ার মানিষ্যি নেই। তা সন্ধের পর সেও নেই। আমি অ্যাকা। আল্লা য্যান্ কেন্ যেই আমার আর দুনিয়ার মধ্যি পাঁচিল তুলে দেছে। কেন্ যেই য্যান্ আমারে অ্যাকা ক'রে দেছে। সেই পাঁচিলির একধারে ক্যাবল আমি অ্যাকা আর অন্যদিকি বাপ তুই তোর বাপ, দুনিয়ার সগলে। আমার কাছে কী গুনাহ্ করিছি বাপ যে অ্যামন হতিছে? তুমি তো এলেমদার হইছ। কও। ক'য়ে দ্যাও।"

চাঁদবিবি আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলতে লাগল।

ফটিকের মনটা টনটন করতে লাগল। এই তার মা। যার জন্য ফটিক আজ ফটিক। তার জীবনে এমন এক সময় ছিল যখন মা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। মা ছিল সব কিছুর আশ্রয়। অর্থ খরচ করে তাকে উৎসাহ দিয়েছে তার এই মা। কী কষ্টে তাকে মানুষ করেছে! ফটিক সব জানে। কিন্তু একথা আজকাল কি তার মনে পড়ে?

ফটিক ভেবে দেখল, না সব সময় তো মনে পড়ে না। কখনও কখনও মনে পড়ে। ফটিক কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। আব্বুর সংগে তার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কোনোদিন মারেন নি, কোনোদিন বকেন নি। তবু বাজানকে সে ভয় পেতো। এবং দূরে দূরে থাকত। সে দূরত্ব আজও আছে, কিন্তু তার মায়ের সংগে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে আরও। সে নিজের মনের দিকে চেয়ে খুবই অবাক হল। সত্যিই আম্মা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছে, তার জীবনে এখন প্রায় পিছনের সারিতে। বরং আব্বু সেই তুলনায় দু-এক ধাপ এগিয়েই এসেছেন বলতে হবে। ফটিক চুলচেরা বিচার করতে বসল। চিরে চিরে দেখতে লাগল তার মনটা।

সে খেয়ে উঠল। মুখ ধুলো। নিজের ঘরে গিয়ে সেই বিছানাটায় অনেকদিন পরে গা এলিয়ে দিল। কিন্তু তার মায়ের করুণ মুখটাকে মুছে ফেলতে পারল না। একাকীত্বের হাহাকারটাও ক্রমাগত তার কানের পর্দায় ঝড়ের বেগে আছড়ে

পড়তে লাগল।

ফটিক দেখল, এক সময় সে আর তার আম্মা, এই দুটো অস্তিত্ব এক হয়ে ছিল। এর ভিতরে এমন ফাঁক ছিল না যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সেখানে ঘটতে পারে। ক্রমে বয়েস বাড়তে লাগল তার। তার ও আম্মার মধ্যেকার ভালোবাসার সেই লাখেরাজ জমিনে ধীরে ধীরে ভাগীদার জুটতে লাগল। যেদিন বাইরে পা দিল ফটিক, সেই দিন থেকেই। তার গোরু চরানোর বন্ধুরা, ইশকুল-কলেজের সহপাঠীরা, শিক্ষকরা, সেই সব মুরুব্বিরা যাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কর্মজীবনের অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা, পরিশেষে তার বিবি এবং আরও আরও। ফটিক দেখল ভাগীদারদের মিছিলের যেন শেষ নেই। মায়ের প্রতি তার ভালোবাসার যে অবাধ ক্ষেত্র ছিল তা আজ ভাগ হয়ে গিয়েছে বহুজনের মধ্যে। মা তাই আগের মত আর একেশ্বরী নেই। ভাগীদারদের ভিড় তার জীবনে যত বেড়েছে, বেচারী আম্মা ততই পেছিয়ে পড়েছে, উভয়ের দূরত্ব ততই বেড়ে গিয়েছে। ফটিক দেখল জীবনের এই গতি ঠেকানো যায় না। তার আম্মার জন্য খুব কষ্ট হতে লাগল তার। কীই বা পেয়েছে এই সর্ব বিষয়ে বঞ্চিতা নারী এই জীবন থেকে! সারা জনম তার মা ভারা ভেনেই চলেছে। চাঁদ বিবি আর ঢেঁকী, ফটিক চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করলে, এ দুটোকে কখনোই অবিচ্ছেদ্য দেখতে পায় না। এইভাবেই সে ফটিকের সব আবদার রক্ষা করেছে। তার বাপকে বুঝিয়ে ফটিককে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছে। ফটিক উকিল হয়েছে। কিন্তু ফটিকের মা? সেই ভারা ভানানী আজও। এই বৈপরীত্য, এই বিরাট ব্যবধান, এই দূরত্ব ফটিকের মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে এই বিভাজন লক্ষ্য করছিল। এমনকি একই পোতায় বাঁধা ঘর দুটো পর্যন্ত যেন একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ওরা যখন এ-বাড়ি ছেড়ে যশোর যায় রোজগারের ধান্ধায় তখন ছবি তাদের পুরনো বিছানা নিয়ে যায়নি। হাজী ছাহেব মেয়ের জন্য নতুন বিছানা দিয়ে দিয়েছিলেন।

ছবি তাদের বিছানা ঢাকবার জন্য একটা সুজনি ফটিককে দিয়ে কিনিয়ে এনেছিল। ছবি যাবার সময় তাদের বিছানাটা পেতে তার উপর নকশা-কাটা সুজনিটা বিছিয়ে রেখে গিয়েছিল। এখন তারই উপর শুয়ে আছে ফটিক। ভাবছে। এখন কেউ যদি তার বাপের ঘরটায় আগে ঢুকে তারপর ফটিকের ঘরে ঢোকে, তবে তার স্পষ্টই মনে হবে যে সে একটা সাধারণ চাষার ঘর থেকে বেরিয়ে গরিব কোনও ভদ্র গৃহস্থের ঘরে ঢুকেছে। চাষার বিছানায় তেল-চিটে একখানা কাঁথা এলোমেলো করে ছড়ানো। কোনও ছিরিছাঁদ নেই ঘরে। পাশের গরীব ভদ্র গৃহস্থের বিছানার উপরে একটা সুজনি পরিপাটী করে পাতা। গরীব চাষার ঘরটায় এখানে হাঁড়ি, ওকোণে ঠিলে, কোনওখানে শিকেয় ঝোলানো এটা ওটা সেটা। গরিব ভদ্র গৃহস্থের ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা, কোন আসবাবই নেই বলতে গেলে, তবু একটা পুরনো টেবিল একটা চেয়ার, আর একদিকে ইঁট পেতে একটু উঁচু জায়গার উপর বসানো রয়েছে ফটিকের অনেকদিনের সঙ্গী টিনের সুটকেসটা। যার মধ্যে ঠেসে রেখে গিয়েছে ছবি তার টুকিটাকি যত অকেজো জিনিস। এ ঘরের সব কিছুই গোছানো। সব ছিমছাম। এ যেন দুটো আলাদা ধরনের ঘর নয়। দুটো আলাদা জগৎ।

ফটিক আর তার আম্মা এই দুটো আলাদা জগতে আজ দাঁড়িয়ে আছে। ফটিক তার মায়ের জন্য দুঃখ বোধ করতে পারে কিন্তু এই দুই বিপরীত জগতের ব্যবধান সে কেমন করে কমাবে? জীবনই সেই নিষ্ঠুর আমীন, ফটিক ভাবল, যে চেন মেপে এই সীমা সরহদ্দ ঠিক করে দিচ্ছে। তার রায় আমাদের পীড়িত করে, যন্ত্রণার কারণ হয়, কিন্তু সেই রায় পালটাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। তার মা একা! তার মা একা! যত অবচ্ছিন্ন এই কথা, ফটিক ততই কষ্ট পাচ্ছিল। কিন্তু তার আরও কষ্ট এই কথা ভেবে যে তার মায়ের এই যন্ত্রণার কোনও দাওয়াই ফটিকের হাতে নেই। সে একটা দীর্ঘ... ফেলল।

ফটিক চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে এই ভাবনা ভাবছিল। চোখ খুলতেই সে দেখল আ... বাঁশে একটা তক্ষক। তার দিকে চেয়ে আ... আবার ছবির কথা মনে পড়ল। ছবি তক্ষককে ... ভয়ই না পায়। তক্ষকের ভয় আজও কাটল... ছবির।

ছবি মা হবে। ফটিকের সন্তান কার কো... মানুষ হবে? ছবির মায়ের কোলে, না ফটিকে... মায়ের কোলে? দাবী তো আম্মারই কম নয়? ... সব সমস্যার ভালো কোনও সমাধান মেলে না ফটিক... মানুষের সংসারকে আজকাল বড় জটিল বলে ম... হয় ফটিকের। হঠাৎ তার মনে হ'ল আম্মাকে ... নিয়ে যাবে তার বাসায়। হ্যাঁ, সেই ভালো। ছবি... বাচ্চা হলে মায়ের হাতেই ছেড়ে দেবে তাকে। দাদী... কোলেই মানুষ হবে সে। তাহলে আর আম্... নিজেকে পরিত্যক্ত বঞ্চিত মনে করবে না। মা... মাঝে নানা নানী তাদের বাচ্চাকে দেখতে আসবে... মাঝে মাঝে নানা নানী তাকে নিয়ে যাবে। কিছুদি... রাখবে নিজের কাছে। কিন্তু কোথায় সে বড় হবে... তার বাপের কর্মক্ষেত্রে, ভাড়াটে বাসায়? না... দাদা-দাদীর ভাঙা বাড়িতে? না কি নানা-নানী... কোঠাবাড়িতে? যে বাড়ি বানাচ্ছে তার নানা কিনে... দায়? কার আদর্শে মানুষ হবে সে? তা... আজা সাজ্জাদ চাষীর? তার নানা হাজী আব্বা... ব্যাপারীর? না তার বাপ ফটিক উকিলের?

চাঁদ বিবি খেয়ে দেয়ে, সকড়ি টকরি সাফ করে... পড়ন্ত বেলায় ছাওয়ালের ঘরে ঢুকল।

কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "বাপ কি... ঘুমোতিছে?"

ফটিক তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসে... বলল, "আম্মাজান এদিকি আয়।"

চাঁদ বিবি ছাওয়ালের কাছে এগিয়ে এল... মুখে একটু খুশীর ভাব।

ফটিক বলল, "আম্মা, তোরে আমি নিয়ে চলে... যাবো।"

চাঁদ বিবি অবাক হয়ে ছাওয়ালের মুখের দিকে... ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ যাবৎ চেয়ে রইল।

তারপর বলল, "আমারে নিয়ে যাবি! কনে?"

ফটিক আগ্রহভরে বলল, "আমি যেখেনে... থাকি। আমার যশোরের বাসায়। তোকে আমি আ... এখেনে ফেলে রেখে যাবো না। এই বয়সে আ... তোকে ভারা ভেনে খেতে হব না।"

চাঁদ বিবি হাসল। তার ছাওয়াল সেই আগের... মত পাগলাই আছে। হঠাৎ হঠাৎ অ্যামন অ্যামন কথ... কয় যার কোনও মানে হয় না। এ যেন সেই ছোট... ফটিক, যেন মাঠের থে গোরু চরায়ে সন্ধের বাড়ি ফি... তারে কচ্ছে, আম্মাজান আমি এরেমে শহরে বে... জেগুন বিবির শাদী করব। "আম্মাজান আমি... তোরে নিয়ে চলে যাবো।" এটাও ঐ রকম খাম-খেয়ালের কথা।

চাঁদ বিবি বলল, "তোর বাপ কি তার বাপ-দাদার ভিটে ছাড়ে নড়বে? আর তোর বাপ ন... গেলি, আমি কি যাতি পারি? তোর বাপরে ফেলে... তোর বাপদাদার ভিটে ফেলে আমি কি কুথাও যাতি... পারি বাপ? তোর বাপ মাঝে মাঝে আমারে কয়... দ্যাখ, এই ভিটের বসতি তোর আর আমারই শেষ... আমরা দুজনে যৌত হলি এই ভিটের শিয়ালকাঁটার... বন গজাবে। আমি আগে মলি তুই আমার... লাশডারে এই উঠোনে কবর দিবি আর পাশে তোর... কবরের জায়গা রাখে দিবি। তুই আগে মলি... আমিউ তাই করব। এ ভিটে তোগো হাতছাড়া হবে... না। এ ভিটে ছাড়ে আমরা কনে যাবো বাপ!"

ফটিক হতাশ হল। একটু ভাবলো। তারপর... বলল "আম্মাজান, তোর বউ মা হবে।"

চাঁদ বিবি একটুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ফটিকের... দিকে চেয়ে রইল। তারপর "আল্লাহ্" বলে বুক-ফাটা ডাক ছাড়ল। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে... কাঁদতে পরিত্রাহি ডাকতে লাগল, "ও ফটিকির বাপ... ও ফটিকির বাপ! ও ফটিকির বাপ?"

(ক্রমশ...)

কালান্তর

সমীর রক্ষিত

যেন-বা এক নাট্যমঞ্চ; অন্ধকার। চারদিকে পাথরের নিরেট দেয়াল। মাথার ওপরে পাথরের ছাদ, পায়ের তলায় পাথরের মেঝে। কিন্তু এখন ব্যাপ্ত অন্ধকারের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নেই। সীমাহীন কালো। পরের মুখ দূরের কথা নিজেকেই চোখে পড়ে না।

অবশ্য মঞ্চে যেমন হয়ে থাকে, এরপরে জোনাল লাইট জ্বলে ওঠে। লম্বা তার জড়ানো টিনের চৌকোণো খাপের ভেতরে বিজলি বাতি জ্বলে। দুটি লোক, নিজেরা অদৃশ্য সে আলো নিয়ে ছোটাছুটি করে গুহার ভেতরে। আলো এসে পড়ে দেয়ালে স্তম্ভে সিলিংয়ে। ফুটে ওঠে পুরানো প্রাচীন ছবি।

অজন্তার বৌদ্ধ চিত্রাবলী।

ছবি তো নয় যেন অতীত জেগে ওঠে। দীর্ঘ বিস্মরণের পর ঘুমভাঙা চকিত জাগরণ। অতীত যেন-বা কথা বলে। ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-লাঞ্ছিত মানুষের এই জীবন। শোকসন্তাপ দুঃখময় সে জীবন দেখেন আর বিচলিত হন এক যুবা রাজপুত্র। সুখ সম্ভোগ ঐশ্বর্য তাঁকে কাঁটার মত বেঁধে। অস্থির বিভ্রান্ত সিদ্ধার্থ অবশেষে মুক্তির অন্বেষণে ত্যাগ করে যান রাজপ্রাসাদ। সেই মহা-নিষ্ক্রমনের কালে শুধু একবার দেখে যান নিদ্রিতা স্ত্রী যশোধরা আর সদ্যোজাত পুত্র রাহুলকে। সে রাতে ঝড় উঠেছিল।

তারপর বোধিবৃক্ষমূলে কঠিন দীর্ঘ তপশ্চর্য। অতঃপর বোধিলাভ। নির্বাণতত্ত্বজ্ঞানে সমুদ্ভাসিত সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ। অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের সন্ধান পেলেন তিনি। সারনাথ মৃগদাবে প্রথম উচ্চারিত হল তাঁর সেই অমৃত-বাণী। আবর্তিত হল ধর্মমহাচক্র।

সেই বুদ্ধের জীবনের, আর তাঁরই পূর্বজন্মের বহু জাতককাহিনীর চিত্র-রূপ গুহায় গুহায়। নিষ্করুণ কালের হাতের ছোঁয়ায় সে ছবি কোথাও বিবর্ণ; কোথাও, সে-সুষমা আজো অবিকৃত। গুহার ভেতরে আবদ্ধ হাওয়ায় পুরানো গন্ধ। প্রাচীন সৌরভ। গাইড সুদক্ষ সূত্রধার। তার কন্ঠস্বরের ওঠানামায়, স্বরক্ষেপণের নাটকীয়তায় প্রাণ পায় খন্ডচিত্রের মূক কুশীলব।

যদিও অস্পষ্ট, তবু গাইড বলে না দিলেও সঠিক চেনা যায় দীর্ঘদেহী বুদ্ধকে। তার শরীরে পীত অজিন, মাথার পেছনে বৃত্তাকার আলোর আভা. তাঁর ডান হাতে কালো ক্ষুদ্র এক ভিক্ষাপাত্র। কার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী তিনি? তাঁরই সেই পরিত্যক্তা স্ত্রী যশোধারা যার দুহাত তার পুত্র রাহুলের কাঁধের ওপর বিন্যস্ত। বিস্ময়াবিষ্ট বালক রাহুলের দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ। মাতাপুত্রের ঊর্ধ্বগ দৃষ্টি বুদ্ধের মুখমন্ডলে স্থির। যশোধারা বিষাদ-প্রতিমা। অস্পষ্ট বুদ্ধদেবেও কী সে-বিষাদ সংক্রামিত?

—আহা! সম্ভবত সুধার কন্ঠস্বর।

—ব্রিলিয়ান্ট! অন্ধকারে চিন্ময় উচ্ছ্বসিত। সঙ্গে সঙ্গে তার ফিলাডেল-ফিয়ায় কেনা ম্যামিয়া ফ্লেক্স্ ক্যামেরার ফ্ল্যাশগানে বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে।

সে-চকিত বিদ্যুতে প্রতাপ চমকে ওঠেন। চমকে ওঠার মতো ব[...] অবশ্য হয়েছে তাঁর। সত্তর পেরোচ্ছে বোধ হয়। উনিশ শ সাতে জন্ম [...] তবু বয়েসের ভারে কাবু নন প্রতাপ। এখনো তাঁর শিরদাঁড়া ঋজু। শ[...] মজবুত। শুধু চোখের দৃষ্টি খানিকটা প্রতারণা করে। প্রতারণা করে অ[...] স্মৃতিও। ভুলে যাওয়া পুরানো দিন পুরানো মানুষ পুরানো জীবন যত [...] হানা দিয়ে যায়। সামনের দিন যখন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে তখন অতী[...] সামনে এসে দাঁড়াবে এ আর বিচিত্র কী! বিশেষ করে এই পুরানো গু[...] অলীক আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে!

সুধা বলেন—দেখতে পাচ্ছ তো?

দুচোখ সরু, প্রতাপ বলেন—পাচ্ছি না?

সদ্য ঘুমভাঙা কিম্বা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মতো কন্ঠস্বর প্রতাপে[...] মুখখানা সামান্য নামিয়ে বলেন—বাবাকে দেখছি মনুর মা।

সুধা ভাবেন প্রতাপ হয়তো বা বুদ্ধদেবের কথা বলছেন। কিন্তু প্র[...] দেখেন তার জন্মদাতা পিতাকে। দীর্ঘকায় হরিদ্রাভ বুদ্ধের মূর্তির ও[...] আড়াআড়ি ছড়িয়ে আছে তার বাবার শরীর। ছিন্নমুন্ড। অস্ত্রাঘাতে ক[...] বিক্ষত। রক্তাক্ত। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিহত রক্তাপ্লুত জগদীশ রায়।

ফ্ল্যাশগানের আলো নয়, চৌকোণো খোপে বিজলি বাতি নয়, সার [...] মশাল যেন জ্বলে ওঠে আক্রান্ত অন্ধকারে। উন্মত্ত মানুষের পশুকন্ঠের কো[...] হল স্পষ্ট কানে বাজে। থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রতাপ। আলো ঘুরে যা[...] যাত্রা, অবশেষে পরাভূত রাক্ষসীদের আত্মসমর্পণ। সিংহল অবদান।

এ-আলেখ্য কী বিবর্ণ? নাকি তীব্রভাবে আজো বর্ণোজ্জ্বল?

বাতি নিভে যায়। সবার আগে গাইড বেরিয়ে যায়। দরজার ক[...] আলোর আভাস।

উঁচু বেদীর মতো মেঝে থেকে নামতে গিয়ে আনমনা প্রতাপের প[...] হোঁচট লাগে। উদ্বেগে সুধা বলেন, দেখে হাঁটো।

চাপা কৌতুকের গলায় প্রতাপ বলেন, সারা জীবন তো দেখেই হাঁটল[...] মনুর মা, তবু কী কম হোঁচট খেলাম? কী বলো!

—ইস্ কী কথা! কথায় গুরুঠাকুর! সুধা কৃত্রিম কোপে ঝলসে ওঠে[...]

প্রতাপ এখনো উদাসীন কিম্বা স্মৃতিবিড়ম্বিত। ছেলেকে বলেন, হ্যাঁ[...] চিনু, সাতচল্লিশে আমরা যে দেশ ছেড়ে চলে আসি সেকথা তোর মনে আছে?

চিনু, তোর বাবাকে জিগ্যেস করতো ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি[...] সুধা হাসির শব্দ গোপন করতে পারেন না, বলেন, তোমার কী মনে নেই চিন[...] জন্ম সাতচল্লিশে, পেট্রাপোলে?

বিব্রত প্রতাপ বলেন, কী জানি, আমার তো মনে হয় ক্ষণ-পরশুর ক[...] চিনুরা সবাই—

চিন্ময় ছন্দার দিকে গর্বিত মুখে তাকায়, বলে, আমার জন্ম উনিশ শ' সাতচল্লিশে জানো তো? তাই না মা?

সুধা মাথা হেলান।

ছন্দা গোপনে কটাক্ষ হানে, মধুর গ্রীবাভঙ্গী করে খুব আস্তে বলে, এ কথাটা এত বুক ফুলিয়ে বলার কী আছে?

সামনে অবারিত রোদ। পাহাড়ের কাঁধের ওপর সূর্য টলমল করছে। যে-কোন মুহূর্তে ওপাশে পিছলে পড়বে। গুম্ফবীথিতে সব অপরাহ্ণ আসে বিষাদের হাত ধরে। নিষ্প্রভ হলদে রোদ মানুষের দীনতার মতো।

চিন্ময় লাফ মেরে পোর্টিকো থেকে নেমে যায়। হাত উঁচিয়ে বলে তোমরা প্লিজ দাঁড়াও, একটু ক্লোজ হও—

সুধা প্রতাপ ছন্দা গায়ে গায়ে। চিন্ময়ের চোখ ভিউ ফাইন্ডারে।

প্রতাপের চোখে ভীষুর পর ভীষু। ওগুলো পাহাড়, দিগন্ত জুড়েছে। দূরে বাস স্ট্যান্ড। কোলাহল, বাসের হর্ন নতুন যাত্রীরা নামছে, পুরোনোরা উঠছে। তুমুল কলরব করে একদল কিশোর কিশোরী গুহায় ঢুকে যায়।

প্রতাপের চোখে ভাসে পেটরাপোলের উদ্বাস্তু শিবির। গায়ে গায়ে মানুষ। ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘশ্বাস, শিশু-নারীর কান্না স্পষ্ট শোনা যায়।

—রেডি। চিন্ময়েরই চীৎকার, তবু কেমন অচেনা মনে হয়। মনে হয় পুরাগত আর্তনাদ।

শাটার টেপে চিন্ময়—ক্লিক্। বলে, ও-কে!

সিঁড়ির মুখে প্রতাপের হাত ধরে ছন্দা বলে, আসুন বাবা।

ছন্দার এই ডাকটা মনে মনে পছন্দ করেন প্রতাপ। ভালো লাগে তার সিঁথি ছোঁয়া ঘোমটাটুকুও। আজকাল এটুকুও পুরানো হতে হতে উঠে যাচ্ছে। ছন্দার মাথায় এটুকু না থাকলেও অবশ্য প্রতাপ কিছুই মনে করতেন না। কত কী পাল্টে যাচ্ছে। ছন্দাকে প্রতাপ ডাকেন কখনো বৌমা, কখনো বৌটা ছেঁটে দেন, তখন শুধু মা। বহু আগে প্রতাপ রেণুকে ডাকতেন মা বলে। সে ডাক আর ডাকতে হয় না বহু দিন। রেণুর কথা মুখে আনাও পাপ। সুধা প্রতাপ কখনো সে-নাম আর মুখে আনবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু মানুষের মন কোন প্রতিজ্ঞার ধার ধারে না। মন রেণুর কথা বলে। তিন বছর আগে ছন্দা যখন বৌ হয়ে এল তখনো প্রতাপ ছন্দার মুখের ওপর রেণুর মুখ দেখলেন। যেমন স্থির ছিল ছন্দাও চিন্ময়ের সঙ্গে চলে গেল বিদেশে। তিন বছর পর ফিরে এলো মাস দেড়েক আগে। প্রতাপের মনে হল রেণু ফিরে এল যেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। থাকগে, সে-বড়ো পুরানো কথা।

প্রতাপ বলেন, দেখতো মা, একটা নাতি-নাতনী থাকলে কত সুবিধে হত আমার; তোমারও কষ্ট হত না।

ছন্দা সঙ্কুচিত, ঠোঁট চেপে সে বলে, কষ্ট আবার কী?

প্রতাপ হেসে বলেন, আজকালকার মেয়েরা মা হতে বড় ভয় পায়, তোমার বয়েসে তোমার মা বোধ হয় দুই সন্তানের....

ছন্দা যথার্থই আড়ষ্ট, সে মুখ নীচু করে।

প্রতাপ টের পান, বলেন, যাকগে! কেমন দেখছ বলো?

ছন্দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, বলে, খুব ভালো। চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না—

কী করে বিশ্বাস হবে বলো? প্রতাপ বলেন, আমরা তো সব ভুলে বসে আছি। ভারতবর্ষ—

ঠিক এ সময় গাইড তাড়া লাগায় ভাঙা বাংলা আর সরল হিন্দীতে, যার মর্মার্থ—তাড়াতাড়ি চলুন, এর পরের গুহায় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ দৃশ্য; সুন্দর ভাস্কর্য। দেরী হলে অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুধা বলেন, আজ আর পারব না বাবা, অনেক হেঁটেছি।

—তবে আজকের মতো থাক। বলে চিন্ময় তার গাঢ় নীল কাউবয় জিন্সের পকেট থেকে পার্স বের করে গাইডকে ডাকে, ইধার আইয়ে।

প্রতাপ বলেন, দেখছি আর ভাবছি মা, পুরানো ভারতবর্ষ একদিন কী ছিল!

সুধা খানিকটা এগিয়ে এসে বলেন, কী তখন থেকে বকবক করে বৌমার কানের মাথা খাচ্ছ?

—এতদিন তোমার কানের মাথা খেয়েছি—প্রতাপ ছন্দার হাত ধরে এক পাথরের বেদীর কাছে টেনে নিয়ে যান, বলেন, এখন না হয় বৌমার ওপর দিয়ে যাক। তুমি বিশ্রাম নাও। প্রতাপ বসে পড়েন।

সুধাও এগিয়ে আসেন—কী কথাই বলতে পারো। সারা জীবন শুধু কথাই বলে গেলে।

—শুধু কথা বলেছি? তোমাকে কষ্ট দেইনি? প্রতাপ সুধার হাতে তার প্রিয় প্রসঙ্গটি তুলে দেন।

সুধা একবার বিরক্ত চোখে ছন্দার মুখটা দেখেন, বলেন, দিয়েছ তো, দাওনি?

প্রতাপ সরল বালকের মত হা হা করে হেসে ওঠেন, তা দিয়েছি।

প্রতাপ মজলিসী ভঙ্গিতে বসেন, পাশে বসান ছন্দাকে। উদ্ভাসিত মুখে বলেন, শোনো মা, তখন আমাদের যৌবনকাল, চারিদিকে বিষম ডামাডোল কী? না, দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে—কে বাঁচিতে চায়? সে এক মহাউত্তেজনা, আমিও চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখন আমরা সব গান্ধীমহারাজের শিষ্য বুঝলে, অহিংসার নিরস্ত্র সৈনিক। মুখে বন্দেমাতরম্, সত্যাগ্রহ হরতাল ধর্মঘট করি। গ্রামগঞ্জ শহর বন্দর চষে বেড়াই। পুলিসের লাঠি খেলে বুক চওড়া হয়ে যায়

জেল খাটলে তো কথাই নেই, রীতিমত বীরের মালা, উদু শাঁখ। আমার জীবন লোভ জেলে যাব। প্রতাপ দীপ্ত মুখে ছন্দার দিকে তাকান, বলেন—হ্যাঁ, একবার আমি জেলে গেলাম। খুব খুশী। কিন্তু পরের দিনই ছেড়ে দিল। মন খারাপ হয়ে গেল। তাছাড়া বাবা এসব পছন্দ করেন না। ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকে তো আমি অবাক, বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—সাবাশ! জেতো! তখন ঠিক বুঝতে পারিনি এত ঘটা কেন। বুঝলাম কাঁদন বাদে, শুনি—আমার নাকি বিয়ে। আগুনের মতো জ্বলে উঠলাম, ছুটলাম বাবার কাছে—দেখি গম্ভীর মুখ। আমার হাতে-পায়ে ঘাম জমছে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বললাম—আপনার শরীর কেমন আছে? দুদিন বাদে বিয়ে হয়ে গেল আমার। কিন্তু বাবার ওপরে ভয়ানক রাগ—

—আমার ওপরে না? সুধা বাঁকা হাসেন।

—তোমার ওপরেও যে ছিল না, তাই বা বলি কী করে?

—বললেই শুনব আমি? বিয়ের পরে হাড়ে কালি ফেলে দাওনি? চোখের চশমাটা নামিয়ে কাপড়ে মোছেন সুধা; তাঁর চোখের তলায় গাঢ় কালি, দৃষ্টি নিষ্প্রভ, বলেন—তোমরা মেয়েদের ভাবতে হাতের পুতুল, তাদেরও যে সুখসাধ আছে, তাদেরও যে মন বলে একটা....সুধার স্বরটা কেঁপে যায়।

অদূরে ঝকমকে পোশাকের তিন-চার জোড়া সাহেবমেম এসে দাঁড়ায়, একটি যুবতী ছোটাছুটি করে মুভি ক্যামেরায় অবিরাম ছবি তুলে যায়। প্রতাপদেরও—হয়তো সেলুলয়েডে তুলে নিচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফ্যামিলি। চিন্ময় ওদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ওদের কীসব বলছে।

প্রতাপ যেন ভুবসাতার থেকে ভুস্ করে ওঠেন, স্তিমিত গলায় বলেন—সবার ওপর রাগ করে আরো বেশী করে আন্দোলনে জড়িয়ে গেলাম—সত্যাগ্রহটহ জেলহাজতটাজত তখন ভালভাত হয়ে গেছে।

—আর দেড় বছরের মাথায় আমার কোলে এসে গেছে একজন। সুধা ফের চশমা মোছেন।

প্রতাপ একটুও বিব্রত না হয়ে ছন্দার মুখ দেখেন, বলেন—মা হওয়া কী খারাপ?

সুধা খানিকটা রূঢ়স্বরেই বলেন—মা-বাবা কোনটা হওয়াই খারাপ না। কিন্তু হলেই তো হল না, মা-বাবারও দায় থাকে—

প্রতাপ যেন একটা খোঁচা খেয়ে সিধে হয়ে বসেন, হাসি-হাসি মুখে বলেন—ওপারে যতদিন বাবা ছিলেন, ততদিন কিছু করিনি ঠিক কিন্তু এপারে এসে আমার দায়িত্ব তো ঠিক পালন করেছি, না মনুর মা?

—করেছ, কেন করবে না। পেট্রাপোল থেকে ভেড়ার পালের মতো সবাইকে টেনে কলকাতা এনেছ, জমি জবরদখল করেছ, সবাইকে লোন পাইয়ে দিয়েছে, নেতাগিরি করেছ! কত কাজ!

—তবে! তুমিই বলো বউমা! প্রতাপ ছন্দাকে সাক্ষী মানেন—সারা জীবন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছি, সেতো দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল। এপারে এসে দেখি সবাই হাল ছেড়ে দিচ্ছে। সরকারও উদাসীন। সে যে কী দুর্দশা! রাইটার্সে ঘোরাঘুরি করি, এপারের দু-একজন সহকর্মী যাদের দাদা কলতায় তখন মন্ত্রী। ধরলাম, সুরাহা কিছু হল না। ওদিকে পেট্রাপোল ক্যাম্প নরক হয়ে উঠেছে। চেনাশোনা সবাইকে নিয়ে কলকাতা এলাম। যাদবপুরের দক্ষিণে শেয়াল খাটাশ তাড়িয়ে জলজঙ্গল জবরদখল করতে গেলাম। জমিদারের গুণ্ডা এল, মন্ত্রী-দাদাদের পুলিস এল—মারপিট দাঙ্গা রক্তারক্তি। তবু ঠাঁই তো হল, এখনো তো সেখানেই শিকড় গেড়ে—

—তারপরে তো যে যার তাল গুছিয়ে নিয়েছে, তুমি কী করেছ? সুধা খুব কষ্ট করে নিজেকে সংযত রাখেন।

—আমি সবার জন্য যা করেছি নিজের জন্যও তাই। নিজের জন্য কোনদিন আলাদা কিছু করিনি মনুর মা।

—তুমি যুধিষ্ঠির সেজেছ। এদিকে ছেলেগুলোকে আমি কী করে মানুষ করেছি সে আমি ছাড়া—

ছন্দা রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। এ-আলোচনায় তার কিছু বলার নেই অথচ বসে থাকতেও অস্বস্তি। চিন্ময় সাহেবদের হাত-পা নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে—এদিকে এলে তো পারে?

প্রতাপ রীতিমত গর্বিত ভঙ্গিতে বলেন—তুমি খুবই কষ্ট করেছ মনুর মা, আমি জানি। কিন্তু এখন? দেখতো তোমার চিন্ময় সেই কোথায় ফিলাডেলফিয়ায় চাকরী করছে, বিরাট মাইনে, নিউ জার্সিতে বাড়ি করেছে, গাড়ি। আর তোমার রামগড় কলোনীর বাড়িও পাকা হচ্ছে। এই-যে কত তীর্থ তুমি—

চিনু হ্যাঁ চিনু করছে। সুধা মুখ তুলে বলেন—কিন্তু তুমি বলতো চিনুর জন্য তুমি কী করেছ? চিনু এসময় হাসতে হাসতে এসে ছন্দার দিকে জলের বোতল চায়ের ফ্লাস্ক এগিয়ে দেয় বলে—নাও চা খাওয়াও দেখি। তোমরা বেশ জমে গেছ মনে হচ্ছে?

সেকথা শুনেও শোনেন না সুধা, বলেন—নিতান্ত চিনু নিজের মাথার জোরে যাদবপুরে ইনজিনিয়ারিং পড়তে পেল, ধরা না ধরি না। আর বাড়ির ভাত খেয়ে পড়া, নয়তো তাও হত না। পাশ করে ও-দেশে যাবে তা তোমার কী অমত! রাগারাগি!

—সেই সব পুরনো কথা! চিন্ময় হেসে বলে—সত্যি বাবা, ভাগ্যিস গেছিলাম। এ-দেশে পড়ে থাকলে তো এতদিনে—

ছন্দা ফ্লাস্কের মুখ খুলতে গিয়ে ভ্রূকুটি করে, চিন্ময় চকিতে থেমে যায়।

প্রতাপ আস্তে বলেন—তুমি যদি নিজে সুখী হয়ে থাক তবে—

—তুমি ওরকম বাঁকা কথা বলো নাতো! সুধার বিরক্ত ভঙ্গি—তোমার এই-

তবু কথায় কথায় এলাই মনুটার এত রাগ। ছেলেটা শেষপর্যন্ত ঝুট-ঝামেলা নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, সে শুধু তোমার জন্য—

প্রতাপ হাসেন—মনু আমাকে ভুল বুঝেছে, আমার ওপর বিনাকারণে রাগ করলে আমি কী করব বল ?

—বিনা কারণে ? সুধা সোজা হয়ে বসেন বলেন—আজকাল ব্যবসা, কনট্রাকটারি করে সবাই লাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার এত চেনাশোনা, সেই জন্যে থেকে মনু তোমাকে বলছে—

—আমি নিজের বা ছেলেদের জন্য কারোর কাছে কোনদিন হাত পাতিনি মনুর মা। প্রতাপ ছন্দার এগিয়ে দেওয়া চা নেন, চা চলকে ওঠে, স্পষ্টতই তার হাত কাঁপছে।

চিন্ময় বলে—দাদার যে কী কমপ্লেকস বুঝি না। আমার টাকা নেবে না। নিজের ভাইয়ের—

সুধাকে চা এগিয়ে দিতে দিতে ছন্দা মৃদু গলায় বলে—এসব কথা এখন থাক না। এই একটু আগে আমরা এত সুন্দর সুন্দর ছবি—

—কেন, বেশ তো হচ্ছে মা। প্রতাপ চায়ে চুমুক দিয়ে হাল্কা গলায় বলেন—এও তো ছবিই। আমাদের জীবনের ছবি। তবে কিনা আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমাদের এসব ছবি তো কেউ কোনদিন কষ্ট করে আঁকবে না। আমরা বরং নিজেরাই নিজেদের ছবি দেখি!

আহ্! এটা বাবা, তুমি দারুণ বলেছ। চিন্ময় চায়ে একটা লম্বা টান দেয়। আড়চোখে ছন্দার দিকে তাকায় বিজয়ীর মতো। ছন্দা ভ্রূকুটি করে চায়ে চুমুক দেয়।

সুধা হেসে বলেন—তোমার বাবা চিরকালই ওরকম দারুণ দারুণ কথা বলেন। এইসব কথা শুনে শুনেই তনুটার বারটা বেজেছে।

কৌতুকের গলায় প্রতাপ বলেন—তনুর জন্যও আমি দায়ী নাকি ?

সুধা আড়চোখে তাকিয়ে আস্তে বলেন—ভেবে দ্যাখো তো! তোমার রক্ত না ওর গায়ে ?

এই রক্তের কথাটা শুনে প্রতাপ কেমন স্তব্ধ হয়ে যান। পেছনের কথা বড় বেশী সামনে এসে পড়ছে। নিজেকে সামলে নেবার জন্য তিনি সামনে চেয়ে থাকেন। যারা এসেছিল গুহা দেখতে এখন ক্লান্ত পায়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আলোর আভা মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের ওপরে 'ভিউপয়েন্ট' লেখাটা এখন ঝাপসা। পাহাড় এদিকে ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে, রাস্তার পরেই খাদ নেমে গেছে নীচে, পাহাড়ের পা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে বাঘোরা নদী। এখানে একদিন, কে জানে হয়তো এমনি সাঁঝবেলায় মুণ্ডিত মস্তক অজিন-ধারী ভিক্ষুদের কণ্ঠে উচ্চারিত হত বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি....

—সত্যি তনুটা যদি হুজুগে না যেত। চিন্ময় আপনমনে বলে—প্রেসিডেন্সির পড়াটা শেষ হলেই ভেবেছিলাম ওকে আমি ডাক্তারিতে দেব, এতদিনে ও ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে যেত।

প্রতাপ দেখেন পাখিরা ফিরছে, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ মানুষের দুশ্চিন্তার মতো।

—আচ্ছা বাবা। চিন্ময় বলে ওঠে—তোমাদের আন্দোলনেও তো স্কুল-কলেজ বর্জন ছিল, না ? অধ্যাপক মাস্টার ছাত্র, উকিল ব্যারিস্টার সবাই তো—

প্রতাপ যেন জেগে ওঠেন, সোজা হয়ে বসে বলেন—নিশ্চয়ই। সেসব কী দিন গেছে। মহাত্মাজী ডাক দিলেন—সবকিছুর ওপরে স্বরাজ, দেশের স্বাধীনতা। স্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারি বয়কটের ধুম লেগে গেল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে দেশে বান ডাকল—আমরা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, পথ পেয়ে গেলাম। অহিংসার মন্ত্রে পেয়ে গেলাম আমাদের ভারতবর্ষকে—বুদ্ধ অশোক চৈতন্যের দেশ এই....

—তনুরাও তাই করেছে। চিন্ময় হেসে বলে—অবশ্য ওরা তোমাদের স্বরাজকে স্বরাজ বলেই মানে না, আর অহিংসাকেও—

—ওরা ভুল করছে চিনু। প্রতাপ বিষণ্ণমুখে বলেন—এই ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসার দেশ। বেদ উপনিষদ—

—এসব খুব পুরানো কথা বাবা। সময় পাল্টে গেছে না ? মানুষ পাল্টে গেছে না ? চিন্ময় খুব বিনীত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে।

—পুরানো! সবাই আজকাল এই এক কথা বলে। সময় পাল্টাচ্ছে। কিন্তু চিনু—হাতটা প্রতাপ এগিয়ে দেন চিন্ময়ের দিকে, কিছুটা ক্ষুব্ধ ব্যাকুলভাবে বলেন—তুই তো বিজ্ঞানের ছাত্র, এঞ্জিনীয়ার। তুই বলতো চিনু, সত্য কখনো পুরানো হয়! এই চন্দ্র সূর্য—

চিন্ময় প্রতাপের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকে। তার কপালে রেখা ফোটে। আস্তে করে চিন্ময় বলে—পরিপূর্ণ সত্য বলে কিছু আছে কিনা জানি না বাবা, মনে হয় সব সত্যই বোধহয় আপেক্ষিক সত্য। চিন্ময় তার জিনসের একটা ছেঁড়া সুতো টেনে টেনে বের করে ফেলে দেয়। তারপর একসময় নীরবতা ভেঙে দিয়ে বলে—থাকগে, আমি তোমাদের মতো এসব বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না। শুধু এটুকু বুঝি তনু এই যে ছ-সাতটা বছর কলেজ ছেড়ে দিয়ে শুধু হুজুগে করল, জেলখেল খেটে এল, এতে আর কিছুই হল না, শুধু ওর কেরিয়ারের একটা বিরাট ওয়েস্টেজ হল। প্রতাপ নীরবে নিশ্চুপে দূরে তাকিয়ে থাকেন, 'ভিউপয়েন্ট' লেখাটা এখন অন্ধকারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

চিন্ময় বলে—কী বাবা, ঠিক বলিনি এ কটা বছর ওর স্রেফ ওয়েস্টেজ হল না ?

প্রতাপ খুব সংযত গলায় বলেন—আমি ঠিক একে ওয়েস্টেজ বলব নারে চিনু, ওর পথটা আমি মানি না ঠিক কিন্তু ওর মতটাকে তো আমি—

—জানতাম বাবা। চিন্ময় যেন লাফিয়ে ওঠে—আমি জানতাম তুমি ঠিক এই কথাটাই বলবে। কিন্তু বাবা, আমার কাছে এটা স্রেফ ওয়েস্টেজ। আমি বুঝি সবাইকে খাটতে হবে, কাজ করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আলসেমিটা ছাড়তে হবে আমাদের, সবাইকে উপার্জন করতে হবে আর জীবনটাকে সর্বদিক দিয়ে উপভোগ করবার একটা ইচ্ছাকে জাগিয়ে...বলতে বলতে চিন্ময় দম করে নিচ্ছে যায়। ছন্দা অবশ্য তাকে ভ্রূকুটি করেনি। কিন্তু সে টের পায় তার কথায় বাবার কোন মনোযোগ নেই। খানিকক্ষণ নীরব থেকে ক্ষুব্ধ গলায় চিন্ময় বলে—কী বাবা, তুমি কিছু বলছ না যে ?

মুখ ফিরিয়ে প্রতাপ বলেন—খাটতে চাইলেই কী চিনু খাটা যায়, আর চাইলেই কী কাজ পাওয়া যায় ? আর জীবনটাকে উপভোগ করবার কথা বলছিস ? সেও হচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষ ঠিক...যাকগে। কিন্তু চিনু, তোর কথাগুলো তো তনুও মানবে না ?

মৃদু উত্তেজনায় চিন্ময় বলে—মানবে কী করে ওর মাথায় তো ভূত ঢুকেছে। এজন্যই ওর সঙ্গে তর্ক বেধে যায়, সেদিন এমন ঝগড়া হল যে ওকে সঙ্গে আসতে বললাম তো—

ছন্দা কাপগুলো সব জড়ো করে জলে ধুয়ে নেয়। সুধা উঠে গিয়ে রাস্তার ধারের রেলিং ধরেন। অন্ধকার স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রতাপ তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবীর হাতাটা নামিয়ে এনে বোতাম আটকান আড়মোড়া ভেঙে বলেন—চল চিনু, এবারে ওঠা যাক।

ছন্দা সোৎসাহে বলে—সেই ভাল।

চিন্ময় কিন্তু হেসেই বলে—বাবা, তুমি কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ।

অবাক হয়ে প্রতাপ বলেন—এড়িয়ে যাচ্ছি মানে!

চিন্ময় আর হাসে না, বলে—একটা কথা বলো আমি ঠিক বুঝতে পারি আমার ব্যাপারটা তুমি মনেপ্রাণে কিছুতেই মেনে নিতে পারো না। এই যে আমি বিদেশে গিয়ে চাকরী করছি, উপার্জন করছি বাড়ি গাড়ি করেছি—

প্রতাপ যেন ছেলেমানুষের মতো হেসে ওঠেন—শেষপর্যন্ত তুইও চিনু তোরও অভিযোগ!

—এটা অভিযোগ না বাবা, ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করে নিতে চাই। চিন্ময় বলে—আমিও তো তোমারই ছেলে আমিও কারুর কাছেই ছোট হয়ে থাকতে পারি না।

—ছোট ? তুই নিজের কাছে নিজে ছোট না হলে কেউ তোকে ছোট করতে পারে চিনু ? মানুষের বিবেকটাই—

—বিবেক টিবেক বুঝি না বাবা শুধু চাই তোমাদের আমি সুখী করব। জীবনে অনেক কষ্ট করেছ তোমরা। চিন্ময়ের মুখটা বাধিত দেখায়—কিন্তু কী তোমার ব্যাপারে ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা—

ক্ষণকাল নীরব গম্ভীর হয়ে থাকেন প্রতাপ। তারপর প্রায় নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—সুখ! চিনু তুই একটা দারুণ কথা বললি। এত বয়েস হল, সুখ যে কী ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝেছি—অর্থ বলিস ঐশ্বর্য বলিস ভোগ বলিস—এসবে সত্যি সুখ নেইরে চিনু।

—কেন থাকবে না ? চিন্ময় যেন বিমূঢ় বোধ করে, সে জোর দিয়ে বলে—আমি যে-দেশে আছি বাবা, সে-দেশে দারিদ্র্য নেই, লোকে কাজ বোঝে কাজ করে, সবচেয়ে ধনী ওরা তবু কাজ ছাড়া কিছু জানে না। আবার কাজের পর তেমনি চুটিয়ে জীবনটাকে ভোগ করে, নাচে গায়—গাড়ি নিয়ে ছুটে বেড়ায়। কই ওদের তো অসুখী মনে হয় না!

ছন্দা বিরক্ত হয়ে চিন্ময়ের মুখের দিকে তাকায়, বলে—ওদের কথা আর বলো না, ভীষণ আত্মসুখী ওরা, আত্মকেন্দ্রিক। জীবনে ভোগ ছাড়া—

আসলে মানুষ হিসেবে ওদের ভেতরটা কী ফাঁপা ফাঁকা হয়ে যায়নি? প্রতাপের মনে পড়ে দুটি হিপি যুবক-যুবতীকে দেখেছেন খানিক আগে ধূলিমলিন রুক্ষ চেহারা, নিঃস্ব ভঙ্গি। কিন্তু সেকথা বলেন না প্রতাপ বলেন—ওদের দেশে তো শুনেছি এখন কৃষ্ণ-সমিতি চৈতন্য-সমিতি কত কী হচ্ছে ?

চিন্ময় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে—ওরা মুষ্টিমেয়, এক্সেপশনাল আসলে ওটা একটা হুজুগ। ওরা নতুন কিছু একটা না করলে পারে না—

প্রতাপ হাসেন, ধীরভঙ্গিতে বলেন—ব্যতিক্রমটাই তো চিনু বুঝিয়ে দিচ্ছে

[illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু ভোগে তো শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি নেই। [illegible] বলেছেন—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখ আর ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন দুটোই ভুল, [illegible]

[illegible] জানাই জানকাল জানছি বাবা। চিন্ময় নিজের হাতে হাত চেপে [illegible] এই দুরবস্থা। সংযমের নামে অলস ভীরু নিষ্কর্মা সব মানুষ [illegible]। পশুর মতো এ দেশের মানুষের সহায়তা—

[illegible] বলেন—তোর কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক চিন্ময়, আমাদের দেশে [illegible] মানুষই বড় বেশী সহ্য করে যায়। কিন্তু এর উল্টো পথটাও ঠিক [illegible] ব্যক্তিগত ভোগ—

[illegible] চোখে শাসন ফোটান কিন্তু চিন্ময় গ্রাহ্য করে না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে —তাহলে তোমাদের কীসে সুখ আমাকে বলতে পারো বাবা ?

প্রতাপ বিব্রত বোধ করেন। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন, দূরে —একটা আলো জ্বলে উঠছে। প্রতাপ বলেন—মানুষ কী সত্যি ঠিকঠাক সুখী [illegible] পারে ? জানি না। তবে বোধহয় চেষ্টা করতে পারে ; দশজনের সুখ-[illegible] ভাগ নিয়ে দশজনের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে চলতে হয়তো পারে। বুদ্ধ [illegible]ছেন, আমি নিজের মুক্তির সন্ধানে নির্বাণ লাভ করব না। আমাদের শাস্ত্রে [illegible]—আত্মমোক্ষং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ—সবার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে [illegible] নিতে হবে। তবুও তো এসব কথাই বলে—

চিন্ময় নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে বড় [illegible] ক্ষুব্ধ বোধ করে। সে চাপা গলায় বলে ওঠে—এসব পুঁথির কথা। ভাল [illegible] কথা বাবা। কিন্তু কলতো, তোমরাও তো অহিংসা করেছ, সত্যাগ্রহ করেছ, [illegible]য়ের গালভরা কথা বলছ, কিন্তু কী করতে পেরেছ তোমরা ?

ঠিক এমনি কথা, এমনি অভিযোগ তনুরও। প্রতাপের সঙ্গে তারও [illegible]টোকাটি হয়। কেউ কাউকে বোঝাতে পারেন না, উত্তেজনা বাড়ে। তবু [illegible] ক্ষুব্ধ হয়ে যখন অভিযোগ করে তখন প্রতাপের বুকটা যেন খানিক [illegible] হয়ে যায়। নয়তো নিজেদের হাতেগড়া এই দেশটার দিকে তাকিয়ে বুক [illegible] হয়ে ওঠা ছাড়া আর কী হয় ?

প্রতাপ মলিন মুখে বলেন—সে রামরাজত্বের স্বপ্ন চিনু, স্বপ্নই রয়ে [illegible]। জানিস, যা করতে চেয়েছি তা পারিনি, যা চেয়েছি তা পাইনি। কে জানে [illegible] ভুল ছিল কিনা, শুধু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন [illegible] কী সম্ভব ? জানি না মন্দ লাগে, কিন্তু তবু ভারতবর্ষকে আমরা [illegible] জেনেছি সেটাও যে ভুল, একথা মানতে বড়—

—কষ্ট হয়, না ? চিন্ময় দাঁড়িয়ে পড়ে, হাত বাড়িয়ে ছন্দার এগিয়ে-[illegible] জলের বোতল সাইডব্যাগ নেয় একটা একটা করে। বলে—তোমরা [illegible]জীবন ধরে নিজেদেরই নিজেরা শুধু ঠকিয়েছ। বড় বড় আদর্শ—

[illegible] ফেরেন, বলেন—হয়েছে, এবারে চলতো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

প্রতাপ ক্লান্ত হাঁপাতে উঠে দাঁড়ান, চিন্ময়কে বলেন—সব কেমন যেন [illegible] যায় রে চিনু, অহিংসা করেছি অথচ নিজের বাবাকে খুন হতে দেখেছি। [illegible] কী একলা আমার বাবা ? দুপারে দুদিকেই কত মানুষ খুন হল, এখনো [illegible] নানাভাবে। মানুষের মোটা ভাতকাপড় দুরের কথা, শুধু বেঁচে থাকার [illegible] মানুষ কী না করছে ? দুর্নীতি, সত্য-অসত্য অন্যায় বলে আর কিছু [illegible], যারা স্বাধীনতার নাম করে এখন, তারাও আর খদ্দর পরে না, টেরিলিন। [illegible] তাদের না নেই। মানুষ কত নেমে যাচ্ছে। প্রতাপ দুপা এগোন [illegible] ছন্দা, প্রতাপ বলেন—এই জীবন কী সত্যি আমরা চেয়েছি চিনু ? আমরা [illegible] যেন রেণুর মতো করে বেঁচে আছি, যা চাইনি তাই নিয়ে শুধু—

রেণুর প্রসঙ্গ উঠতেই সুধার মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে যায়। একটা [illegible] ধমক দিয়ে বলেন—ঢের হয়েছে, এখন চলতো !

সুধা এগোন, ছন্দার হাত ধরে বলেন—চলো বউমা, তুমি আমি হাঁটি [illegible] ওরা আসবে না। দ্বিধাগ্রস্ত ছন্দা সুধার সঙ্গে এগিয়ে যায়।

প্রতাপও কেন-বা বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছেন এমন অপরাধী মুখে বলেন—[illegible] চিনু।

কিন্তু চিন্ময় নড়ে না। রেণু এই শব্দটা তাকে চুম্বকের মতো আটকে [illegible]। ছেলেবেলা থেকে গাঢ় রহস্যের মতো কানাঘুষো শুনে আসছে সে। [illegible] করেও তেমন কিছু জানতে পারেনি। শুধু বুঝেছে কোথাও একটা যা [illegible] গোপনে।

চিন্ময় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—রেণু কে বলতো বাবা ?

প্রতাপ পা বাড়ান, বিব্রত হাঁপাতে বলেন—সে তোর শুনে কাজ নেই [illegible] সেসব পুরোনো কথা। প্রতাপ হাঁটেন ধীর পায়ে।

—বাবা ! গম্ভীর অভিমানী গলায় চিন্ময় বলে—তুমি তো কোনদিন সত্যি [illegible] বলতে ভয় পাওনি ? কোনকিছু গোপনও করনি কোনদিন ?

এখন অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। পথ চলতে চোখের ওপর জোর পড়ছে। কিন্তু [illegible] চেয়ে বেশী বুকটা ভার লাগছে প্রতাপের। সব সত্য কথা সহজে বলা যায় [illegible] পাঁজরের খাঁচে কোন কোন সত্য মুখ ফুটে বলতে বুক ভেঙে যায়। রেণু [illegible] প্রথম সন্তান। এপারে যখন এলেন প্রতাপ, রেণুর তখন চোদ্দ পনের। [illegible]পেলে উদ্বাস্তু শিবিরে তখন নরকের জীবন। প্রতাপের এক সহকর্মী [illegible] একদিন এক মহিলাকে নিয়ে, নারীকল্যাণ এক সমিতি-টমিতি তাদের। [illegible] তারা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, লেখাপড়া করান, হাতের কাজ [illegible]। রেণুর লেখাপড়ায় আগ্রহ। কিছুটা জোর করেই প্রতাপ মেয়েকে দিয়ে [illegible]। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায় না। বহুদিন বাদে বহু চেষ্টায় [illegible] খবর আসে রেণু গণিকালয়ে চালান হয়ে গেছে। রেণুর মতো [illegible]কে।

প্রতাপের গলা ভাঙা ভাঙা শোনায়।

চিন্ময় যে রেণুকে কোনদিন চোখের দেখাও দেখেনি তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে এমন ভাবপ্রবণ নয় সে, তবু কেন তার পায়ের তলায় মাটিতে একটা জোরালো লাথি মারতে ইচ্ছা হয় ? অন্ধকারে মুখ ঘুরিয়ে চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলায় চিন্ময় বলে—কে একজন এসে চাইল অমনি তুমি তোমার মেয়েকে দিয়ে দিলে বাবা ?

—কে একজন নয়, আমার সহকর্মী। তাকে কী করে আমি অবিশ্বাস করি ? প্রতাপের ক্লান্ত ভগ্ন কণ্ঠস্বর—তাছাড়া তখন কী আমার মাথার ঠিক ছিলরে চিনু ? দাঙ্গা দেশভাগ চোদ্দপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে এসে পথে দাঁড়িয়েছি—

—মাথা খারাপ না হলে এ কাজ কেউ করে ? তীব্র ঝাঁঝালো কথাগুলিও চিন্ময় যথাসম্ভব সংযত স্বরে উচ্চারণ করতে চায়।

প্রতাপ সহসা ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে চিন্ময়ের একটা হাত ধরে ফেলেন, বলেন—তুই আমাকে আরো জোরে আরো কড়া কথায় গালাগাল কর চিনু, আমার বুকটা একটু হাল্কা হোক। বুকের মধ্যে কী পাথর জমিয়ে রাখা যায় ?

—ওসব সেন্টিমেন্টাল কথা বলে কোন লাভ নেই। চিন্ময় একগুঁয়ে গলায় বলে—কলকাতায় ফিরে এবার ওর খোঁজ করব আমি।

ভীষণ অবাক হয়ে প্রতাপ বলেন—তুই রেণুকে খুঁজে বের করবি চিনু ?

—নিশ্চয়ই। চিন্ময় জেদী গলায় বলে—যদি পাই তো ওকে ফিরিয়ে আনব।

প্রতাপের মুখটা জল-গড়িয়ে-যাওয়া কাচের ওপর ছায়ার মতো বিকৃত দেখায়। অস্পষ্ট গলায় প্রতাপ বলেন—কী হবে ও-পাপকে খুঁজে বের করে ?

চিন্ময় ক্ষুব্ধ বিস্ময়ভরা গলায় বলে—তোমার মতো লাভলোকসান আমি বুঝি না বাবা, ওকে পেলে ফিরিয়ে আনব দশজনের মতো ও আবার স্বাভাবিক জীবন।

চিন্ময়ের কথা শেষ হতে না হতেই প্রতাপ বলেন—স্বাভাবিক জীবন ? কোথায় স্বাভাবিক জীবন দেখছিস তুই চিনু ? চারিদিকে কী কোথাও তুই স্বাভাবিক কিছু—

—বাবা, প্লিজ তোমার এই বড় বড় কথা আর বলো না। সারা জীবন ধরে একটার পর একটা ভুল করেছ তুমি আর বড় বড় কথা বলে সেই ভুল—চিন্ময়ের কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যেন তার ধৈর্যের শেষ পাথরটিও খসে পড়ে। সে তীক্ষ্ম গলায় বলে—তুমি শুধু নিজেরই সর্বনাশ করনি, একটা ফ্যামিলিকে ডুবিয়েছ, তোমরা সবাই মিলে গোটা দেশটার সর্বনাশ করেছ। থাকগে....হয়তো তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না কিম্বা তুমি আমাকে ঠিক— বলতে বলতে পা ছিটকে সামনে এগিয়ে যায় চিন্ময় উত্তেজনায়। তার পায়ের চাপে ধুলো ওড়ে। পেছনে প্রতাপ। কিন্তু একবারও পেছন ফিরে আর তাকায় না চিন্ময়। হনহন করে এগোয়।

প্রতাপ স্থির অপলক চোখে দেখেন। ঝাপসা অন্ধকারে চিন্ময় এগিয়ে যায়। প্রতাপ নুয়ে-পড়া শরীরটাকে টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান, তারপর দুপা এগিয়ে গিয়ে বলেন—সর্বনাশ করেছি ? হয়তো তাই কিন্তু চিনু, তুই শুনে রাখ, সেটা যদি হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই অজান্তে ভুলে হয়েছে, হয়তো সে ভুল একদিন কেউ শুধরে নেবে। কিন্তু মনে-প্রাণে দেশের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করতে চাইনি আমরা কোনদিন। আর যা কিছু করেছি দলের জন্য করেছি। কোনদিন নিজে সুখী হব, নিজে ভোগ করব, নিজের উন্নতি করব, একথা কোনদিন ভাবিনি। কথাগুলো সামান্য রূঢ় যেন ঠিক প্রতাপের মতো নয়। এক-মুহূর্ত অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায় চিন্ময়, কিছু একটা বলতে যায় সে কিন্তু কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। শুধু তার দু ঠোঁট বেঁকে যায়। আরো জোরে অন্ধকারে সে সামনে হনহনিয়ে এগিয়ে যায়।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন প্রতাপ স্থানুর মতো। যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই। ভয়ঙ্কর নির্জনতা। দীর্ঘদিন ধরেই টের পাচ্ছিলেন প্রতাপ সুধা মনু চিনু আর তনুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সেতুগুলো বড় বেশী নড়বড় করছে। এখন টের পান সেতু বলে আর কোন কিছু নেই। [illegible] মতো একলা নিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ। পুরোনো সমবয়সীরা অনেকেই চলে গেছে চিরদিনের জন্য। বাকিরা দিন গুনছে। তাঁর সামনের পথটাও ক্রমে ছোট হয়ে আসছে।

অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না এখন। যেন বা এক নাটমঞ্চ। পেছনে ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে পাহাড়, গুহায় গুহায় অন্ধকার আরো গাঢ়তর হয়েছে। এই মুহূর্তে শুধু চোখে পড়ছে দীর্ঘদেহী বুদ্ধকে, হাতে যার কালো ভিক্ষাপাত্র — সামনে যশোধারা আর বালকপুত্র রাহুল। আকাশের কোণে পাহাড়ের মাথায় জ্বলে উঠছে খণ্ড চাঁদ। দু-চারটি মিটমিটে তারা। কিন্তু পুরানো চোখের দৃষ্টি জোরালো করতে গিয়ে শুধু ঝাপসা দেখায় সবকিছু। মাথাটা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে বুকের মধ্যে ঝুলে পড়ে।

এমন নির্জন, এমন একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় ভয় হয়। নিজের কাছে নিজেকেই ভারী অসহ্য লাগে। ধূলি-পাথরময় পথের ওপরে শরীরটা টান করে নেন প্রতাপ তারপর প্রবল শক্তিতে, যৌবনকালের মতো দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যান। অন্ধকারে ঝাপসা দেখায় অদূরে কয়েকটি চলমান ছায়ামূর্তি। স্থির দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় হাঁকেন প্রতাপ—তোমরা দাঁড়াও।

স্থবির পাহাড় তাঁর উচ্চারিত সেই হাঁক প্রতিধ্বনি তুলে আস্তে ফিরিয়ে দেয়—দাঁড়াও।

প্রস্তরময় পাহাড় একমাত্র এমনিভাবেই চিরকাল মানুষের কথায় জবাব দিয়ে এসেছে।

ছবি : সুনীল শীল

সন্ধান সঙ্কর্ষণ রায়

॥ চার ॥

খেদকর মনে করতেন, সিংভূমের তাম্রক্ষেত্র শুধু নয়, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা-দস্তা, কাদাপাথর, চুনাপাথর, অভ্র প্রভৃতি খনিজের ক্ষেত্রের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে। য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডার—যে কোনও খনিজের সঙ্গে তিনি 'য়ুরেনিয়াম' নামটি জুড়ে দিতে বলতেন।

য়ুরেনিয়াম নামটি জুড়ে দিলেই তা য়ুরেনিয়াম-এর ভাণ্ডার হয়ে ওঠে না, রীতিমত অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন য়ুরেনিয়ামকে চিনে নেওয়ার দরকার। কিন্তু খেদকরের কল্পনা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারে না, কাজেই তাঁর কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খনিজের মধ্যে য়ুরেনিয়াম সন্ধানের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় নি।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সিংভূমের তামার ক্ষেত্রের মধ্যে য়ুরেনিয়ামের প্রচ্ছন্ন অবস্থানের বিষয়ে কল্পনা করতে গিয়েও খেদকর বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা ও পরিহাসের পাত্র হয়েছিলেন। তখন রীতিমত জোর-জবরদস্তি করে তাম্রক্ষেত্রের মধ্যে য়ুরেনিয়াম অনুসন্ধানের কাজ চালু করেছিলেন তিনি। যে আটজন ভূতাত্ত্বিক তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদেরও এক রকম জোর করেই তিনি এই কাজের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, সিংভূমের তাম্রক্ষেত্রে য়ুরেনিয়ামের ভাণ্ডারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও খেদকরের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসেনি কেউ—কাজেই অন্যান্য খনিজের মধ্যে য়ুরেনিয়াম সন্ধানের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের সমর্থন না পেলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভূতাত্ত্বিকের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন খেদকর, যার দরুন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কল্পনা-অনুপ্রাণিত ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি।

কয়জন ভূতাত্ত্বিক ওপরওয়ালাদের বিরূপতাকে উপেক্ষা করে খেদকরের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। খেদকরকে খুব উচ্চ স্তরের ভূবিজ্ঞানী মনে না করেও তাঁকে আমি বড়ো ভূবিজ্ঞানী মনে করতাম, তার কারণ তাঁর ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাকে পরিপুষ্ট করত প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রকৃতিকে ভালবেসে অবৈজ্ঞানিক বিভূতিভূষণের মধ্যেও ভূবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এসে গিয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবর্জিত অনেক প্রকৃতি প্রেমিক তাঁদের কল্পনা

তিস্তা নদীর খাত

কাঞ্চনজঙ্ঘায় কাঞ্চনরাগ

ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বহু উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈজ্ঞানি রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমি নিজে এ ধরনের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি, যার আছে "মাটির কাছাকাছি", তাদের মধ্যেও দেখেছি প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা যেন প্রকৃতি রহস্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

খেদকরের প্রেরণায় আমি তখন ভারতীয় পার মাণবিক শক্তি সংস্থার "পারমাণবিক খনিজ (Atomic Minerals) বিভাগে শিক্ষানবিশের কা নিয়েছি এবং বিহারের অভ্রক্ষেত্রে অভ্রযুক্ত পেগ্মে টাইট-এর (pegmatite) মধ্যে পিচব্লেণ্ড, সামার কাইট (samarskite), কোলাম্বাইট (columbite মোনাজাইট প্রভৃতি য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়ামযু খনিজের খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু একটার পর এক পেগমেটাইট পাথরের শিরা (vein) পরীক্ষা করে গিয়ে দেখি যে এই সব খনিজ কোয়ার্টজ ফেলস্পার-এর (feldspar) আবরণ দিয়ে এমনিভা পরিবৃত রয়েছে যে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের মধ্যে কোন সাড়া জাগছে না, তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর আবরণ ভে করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কাজেই প্রতি পেগমেটাইটেই তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের কাঁটা অন হয়ে থাকে। ব্যাটিয়া, বানরচুয়া, কুড়ওয়া, বামদা, চাক প্রভৃতি অনেক জায়গায় ঘুরে পরীক্ষা-নিরীক্ষ

...—কিন্তু কোথাও পেগমেটাইট-এর মধ্যে তেজ-...র কোন আভাস পেলাম না।

নানা জায়গায় নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর শেষ ...ক কোনঝি নামে একটি গ্রামে গিয়ে পেঁছিলাম। ...নে এসেও একই অভিজ্ঞতা হল আমার। প্রায় ...চিশটি পেগমেটাইট-এর শিরা পরীক্ষা করলাম—...একটি অভ্রখনির মধ্যে নেমেও যন্ত্র বসালাম—কিন্তু ...ন ফল হল না।

শেষ পর্যন্ত যখন আমার হাল ছেড়ে দেবার ...ম হয়েছে, তখন একজোড়া বিহারী দম্পতি এল ...মার কাছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে স্ত্রীটিই বেশী চটপটে। ...ল আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, তোহার ...শিনোয়া লাকর কুছু নাহি মিলল বাবু?

মিষ্টি গলার স্বর—কিন্তু প্রশ্নটি খোঁচা মারা। ...ই রুষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, না মেলে নি—কিন্তু ...তে তোমার কী?

মেয়েটির চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সে ...লে, হামার মিল গইস। রামুয়া গাঁইতা দেকে ...ড্ঢা বনাইস—গড্ঢাসে আচ্ছা আচ্ছা সব পাথ্থল ...কল গইস।

সকৌতুকে বললে, কী পেলে দেখি।

স্বামীকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বললে, এ রামুয়া, ...তার তোহার আংগোছা।

স্বামীটি তার কাঁধে ঝোলানো গামছা দিয়ে বাঁধা পুঁটলিটি নামাল। গ্রন্থি উন্মোচন করতেই ঝিক-...ঝিকিয়ে উঠল কয়েকটি কালো-পাথরের পিণ্ড। অনু-...মান করলাম যে ওগুলো সামার্সকাইট এবং কোলাম্বাইট। আমার অনুমানকে যান্ত্রিকভাবে যাচাই করে নিলাম তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের সাহায্যে।

—কোথায় পেলে এগুলো? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

—অভ্র কোয়াকা খাদানমে। মেয়েটি জবাব দিল, ...হা তু তিন চার রোজসে মেশিনোয়া লগাকর ...ঢুঁঢল......

সে কী! সেখানে যে আমি এক ফোঁটাও রেডিও-অ্যাকটিভিটি পাইনি।

মেয়েটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠে বললে, রেডিও নাহি তো কা। রামুয়া গাঁইতি দেকে কাঢ়কে নিকাল দিহিন। জগা হাম বতাইস—রামুয়া খালি গড্ঢা বনাইস।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিন্তু তোমরা চিনলে কী করে?

—এইসেই। মুখ টিপে হেসে মেয়েটি জবাব দিল।

—এদের মধ্যে কোন্টা কী বলতে পার?

—জরুর।

বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়ে পাথরগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করে ফেলে বললে, ইয়ে কোলাম্বাটিয়া, আর ওয়াহ্ সামারকাটিয়া।

আমার মুখে আর কথা জোগায় না।

এর পর ওদের দুজনের সাহায্য নিই আমার সমীক্ষার কাজে। ওদের সাহায্যে কয়েকটি পেগ-মেটাইট-এর শিরার মধ্যে সামার্সকাইট ও মোনাজাইট-এর সন্ধান পেয়ে যাই। খেদকর এবং আমার ডিপার্ট-মেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তারা মানলেন, এ আমারই আবিষ্কার—আমাদের বিভাগীয় কার্য বিবরণীতেও রইল লেখা এ কথা। কারণ, ভূবিজ্ঞানে অজ্ঞান নিরক্ষর মাটির মানুষদের সাহায্যে দুর্লভ খনিজ খুঁজে বের করার মত বিস্ময়কর ব্যাপারটাকে স্বীকৃতি দেবার মত সৎসাহস আমাদের কারুরই ছিল না।

সমীক্ষায় রত তিনজন ভূতাত্ত্বিক

বিহারের অভ্রক্ষেত্রের মত অভিজ্ঞতা আমার হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরেও হয়েছিল। খেদকর বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্য বহু খনিজ সম্পদের মত পরমাণু শক্তির উৎসও লুকোনো আছে হিমালয়ের গিরিমালার গুপ্ত ভাণ্ডারে।

"......ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বত শিখর অন্ত-হীন যুগযুগান্তর"......

রবীন্দ্রনাথের কবি চিত্তের এই অনুভূতির সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল খেদকরের মন। তাঁর মত আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে নগাধিরাজ হিমালয় অপরিমেয় সম্পদের আধার। এই বিশ্বাসের প্রেরণায় আমি চলে যাই সিকিমে। সেখানে শৈলতটে তাঁবু খাটিয়ে থাকি এবং ঘুরে বেড়াই চড়াই-উৎরাই বেয়ে। আমার হাতে হাতুড়ি, কোমরের বেল্টে কম্পাস এবং আমার নেপালী পথ প্রদর্শকের কাঁধে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র ও স্যাম্পল রাখার ঝুলি। দুরারোহ চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে দূরে শুভ্র হিমরেখাঙ্কিত কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখতে পাই। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শিখর থেকে প্রতিফলিত কাঞ্চনরাগ আমার চারপাশের বননীল পাহাড়গুলোকে রাঙিয়ে দিত—মনে হত পাহাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে পুলকিত হয়ে উঠে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রটা হাতে নিয়ে পাথরে পাথরে শুরু করতাম আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু পাহাড়ে যত রঙিন প্রতিশ্রুতি হীরে-চুনী-পান্নার মত ঝলসে উঠুক, তেজস্ক্রিয়তা-মাপনী যন্ত্রটি থাকত অসাড় হয়ে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও পারমাণবিক বিকীরণের আভাস পাওয়া যেত না। মনে হত কোথাও বুঝি তেজস্ক্রিয়তার ছিটেফোঁটাও নেই।

'নেই' বলে নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে মন সরে না, তাই মনে করি, তেজস্ক্রিয়তাকে চাপা দিয়ে

ভূতাত্ত্বিকদের মাটির পরীক্ষা

রেখেছে অতেজস্ক্রিয় পাথরের আবরণ, যাতে এমন কোনও ফাটল বা ফাঁক নেই যার মধ্য দিয়ে তেজস্ক্রিয়তা' গলে বেরিয়ে আসতে পারে।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিই। সেদিন শেষবারের মত কয়েকটি শিলাখণ্ড পরীক্ষা করার পর ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি, খাড়া উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছে যেন দু পাশের পাইনের বন নিশ্চল সবুজ বন্যার মত নিঃশব্দ ঢলের আকারে নেমে যাচ্ছে। এমন সময় একজন ভুটানী লামা আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। আমার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, পর পর কদিন ধরে দেখছি ঐ মেশিন দিয়ে কী যেন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছ। কোন রকম গুপ্ত ধনের হদিস পেয়েছ নাকি?

—না পাই নি। ম্লান হেসে আমি জবাব দিলাম, তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

—এই সব পাথরের মধ্যে কোন অমূল্য সম্পদ পাবার আশা রাখ তুমি? লামা মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করলেন এমন কী আছে পাথরের আড়ালে যার অদৃশ্য উপস্থিতি তোমার যন্ত্রে ধরা পড়ছে?

পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, আমাদের অনুসন্ধান ও সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার যেন আমরা পুরোপুরি গোপন রাখি, কাজেই লামার প্রশ্নের জবাব আমি দিই না। কিন্তু লামা নাছোড়বান্দা, তিনি আমার চোখে চোখ রেখে চাপা গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমালয় পর্বত হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের সাম্রাজ্য, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এখানে কোথায় কী আছে জানার অধিকার আমার রয়েছে। কাজেই জবাব দাও আমার প্রশ্নের।

আমতা আমতা করে আমি বললাম, কোথায় কী আছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই জানাতাম আপনাকে। কিন্তু—

—তার মানে তোমার মেশিন দিয়েও তুমি বুঝতে পারছ না পাথরের মধ্যে কী আছে!

—না। মেশিনটা একেবারে অসাড় হয়ে আছে।

——কিসে তোমার মেশিনে সাড়া জাগে বল আমাকে। হুকুমের সুরে বললেন লামা।

একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, পাথরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় খনিজ থাকলে তার তেজস্ক্রিয়তা এই যন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। মেশিনে কোন সাড়া জাগছে না, কাজেই ধরে নিতে হয় যে—

—যন্ত্রের ওপরে অতটা নির্ভরশীল হয়ো না।
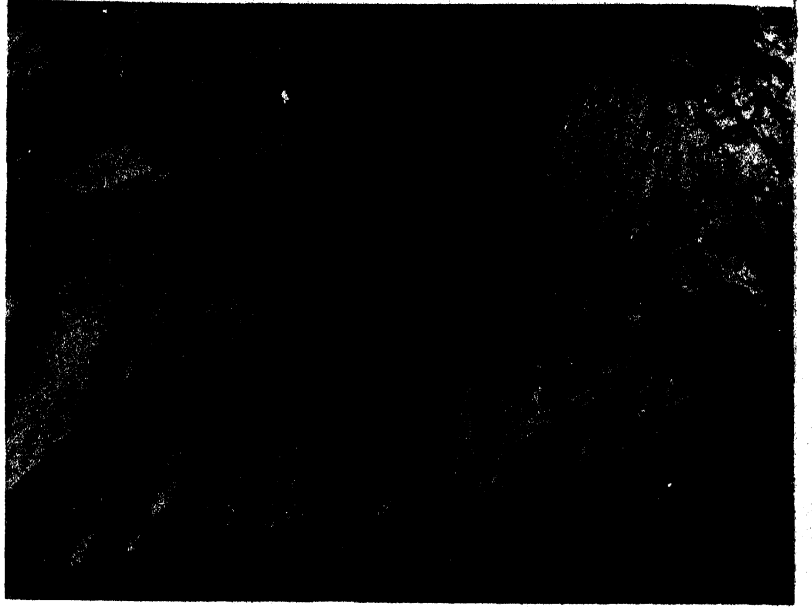
হিমালয়ের শিলাস্তরে গহ্বর

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লামা বললেন, ভগবান বুদ্ধের শরণ নাও—তিনিই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

বলে তিনি আমার কাছে এসে তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রটিকে স্পর্শ করলেন। তারপর মৃদু মন্দ হাসতে হাসতে বললেন, এইবার যন্ত্রটিকে চালু কর...

যন্ত্রের সুইচটা 'অন্' করে দিতেই ঘটে এক বিস্ময়কর ব্যাপার—যন্ত্রটির তেজস্ক্রিয়তা সূচক কাঁটা এক লাফে যন্ত্রের ডায়াল-এর চরম অঙ্ককে স্পর্শ করে।

—এ কী! আমি চমকে উঠে বললাম, এ কী করে হল!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে লামা বললেন, এ কী করে হল বুঝতে পারছ না। এখানকার মাটি ও পাথরের যাবতীয় তেজ ভগবা বুদ্ধের কৃপায় শুষে নিয়েছি—এখন গুম্ফায় গি তাঁর চরণে তা সমর্পণ করব......

লামার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের পরদিন খেদকর এলেন আমার ক্যাম্পে। সব কথা শুনে আমা মুখের ওপরে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তিনি বললে তুমি একটা বোকা—ঐ লামাটি নিশ্চয়ই তা পোশাকের মধ্যে রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল লুকি রেখেছিল—এই অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করেছিল হয়তো

—কিন্তু রেডিও-অ্যাকটিভ মিনারেল দিয়ে লামা করবেন কী! আমি অবাক হয়ে বললাম।

—কী করবে তার খোঁজ নাও স্থানীয় লোকদে সাহায্যে।

কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি যে লামাদে ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে খোঁজ নেবার মত দুঃসাহ স্থানীয় লোকেদের নেই।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একজন জর্মন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী এই রহস্যময় ব্যাপারটির ওপরে আলোক পাত করলেন।

সন্ন্যাসিনী তীর্থভ্রমণে এসেছেন এই দেশে। তিব্বত থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন সিকিমে—এখান থেকে যাবেন বৌদ্ধ গয়া। তিনি বললেন যে এখানকার একটি গুম্ফায় বুদ্ধমূর্তির পাশে তেজস্ক্রিয় পাথরের স্তূপ সাজানো হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের পরমা শক্তিই নাকি পাথরকে তেজস্ক্রিয় করে তুলেছে—কাজেই বুদ্ধের সঙ্গে পাথরে পুঞ্জীভূত তেজঃপুঞ্জকে পুজো করা হয়।

জর্মন সন্ন্যাসিনীর কাছে এই খবরটা পেলেও ঐ গুম্ফার মধ্যে ঢুকে ব্যাপারটা নিজের চোখে যাচাই করতে পারি নি গুম্ফার বিধিনিষেধের দরুন। ঐ লামার দেখাও পাই নি কাজেই জানা হয় নি তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে, যার সাহায্যে তিনি এখানে তেজস্ক্রিয় পাথর খুঁজে পেয়েছেন।
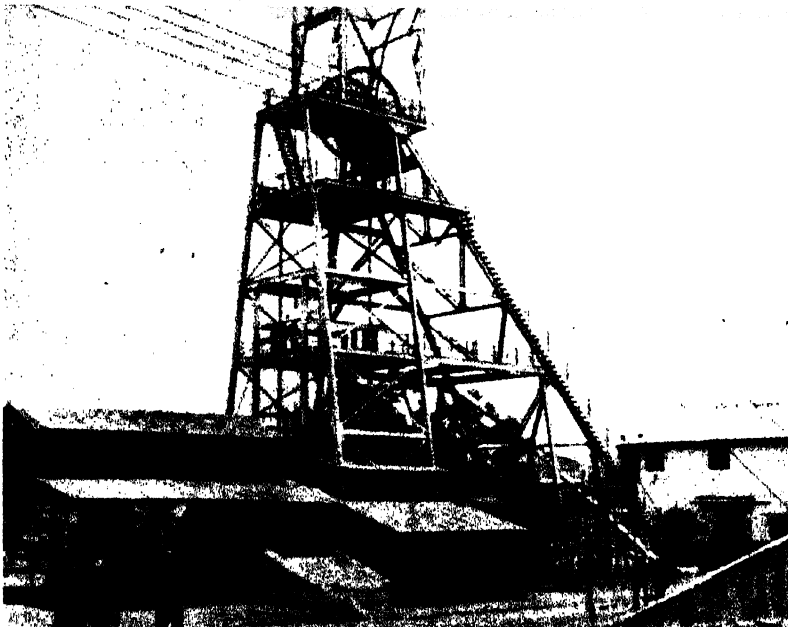
বিভূতিভূষণ, খেদকর, হাজারিবাগ জেলার দেহাতী দম্পতি ও সিকিমের লামা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ভূবিজ্ঞানই যে যথেষ্ট নয় তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। বিজ্ঞান যত শক্তিশালী হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ব্যাপ্ত চৈতন্যজ্যোতি থেকে সম্ভূত মানুষের মন যে তার চেয়ে শক্তিশালী বার বার তার প্রমাণ পেয়েও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভিমানে তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে আমরা অপারগ।

আলোকচিত্র : অভিজিৎ মুখার্জী, অজিতকুমার ব্যানার্জী কল্যাণ গুপ্ত

মোসাবনীর তামার খনি

শার্টিং ★ স্যুটিং

গঙ্গাসাগর

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

'ইসমে মের সফর হোতা হ্যায়, পাও কি ক্রিয়া তি হোতা হ্যায়।' —পদ্মাসনে বসে থাকতে থাকতে সম্ভবত পা ধরে গিয়েছিল, তাই তীর্থযাত্রার সুফল বর্ণনা করতে করতে সাধু মহারাজ নিজের ডান পাখানি আসন মুক্ত করে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন। ধুনিতে আঁচ বেশ গনগনে। ওই আঁচে মনে হল কালো কুন্ঠি পাদপদ্মের ঈষৎ আরাম হল। ডান হাতের মুঠোর গাঁজার কলকে। চোখজোড়া প্রায় নিমিলিত। তীর্থে ভক্তের অভাব হয় না, বিশেষ করে গাঁজার সন্ধান মিললে। তুলোর কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত কাইজারী গোঁফওয়ালা হিন্দুস্থানী বয়স্ক ভক্তটি মহারাজের পাখানি নিজের কোলে তুলে নিয়ে সেবা শুরু করল। মহারাজ স্বয়ং নাঙ্গাবাবা, বিধিদত্ত গাত্রচর্মের অতিরিক্ত ওই দেহে আবরণ বলতে শুধু ধুনির পোড়া কাঠ ও গুলের খানিকটা ছাই। আরো দুটো দিন শেষ পৌষের এই মারাত্মক শীতে সমুদ্রের পাড়ে স্রেফ বালির বিছানায় কাটাতে হবে। কাল রাত পোহালে মকর সংক্রান্তির স্নান। পুজো সেরে মোক্ষকামী তীর্থযাত্রীরা কোচড় থেকে চিমটের মত আঙুল দিয়ে একটি একটি করে দু পয়সা তুলে পথের দু ধারের কাঙাল ভিখিরী ও উত্তেজিত সাধুদের উদ্দেশে ছুড়তে ছুড়তে ঘরের দিকে পা বাড়াবে। ওই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় সাগরমেলার বিশাল বালিয়াড়ি জুড়ে সমবেত হাজার পঞ্চাশেক ভিখিরী ও সাধুর সঙ্গে এই বিষ্ণুগিরিমহারাজও এখন দমবন্ধ করে রয়েছেন। কপাল ভাল হলে কিছু না হোক এক বেলাতেই এক মাসের খোরাকির ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে—তাই না এত কষ্ট করে শ্রীশ্রী ১০৮ সারদানন্দ গিরির চেলা বিষ্ণুগিরি পায়ে হেঁটে সেই কাশী থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছেন। অথচ মাত্র পাঁচ বছর আগেও ওই কাশীতেই হনুমানঘাটের ধারে বিষ্ণুগিরির দোতলা বাড়ি ছিল। ছিল রমরমে বই-এর দুকান থাম্রা বুক স্টল। কিছু না হোক মাস গেলে আয় ছিল দু-আড়াই হাজার টাকা।

বিষ্ণু থাম্রার বিষ্ণু গিরিতে রূপান্তরণের গপ্পো না হয় পরে ধরা যাবে তার আগে বলি সাগরমেলায় পৌঁছেই কেন থাকার একটা আস্তানা

আর খুঁজে, পেটপুজোর ধান্ধা না করে, নাঙ্গাবাবাদের আস্তানে গিয়ে ভিড়লাম। বারোই জানুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার। সাত সকালে বেরিয়েছি, যাব গঙ্গাসাগর ভায়া নামখানা।

ড্রাইভার রাউথের হাতখানা বড় খাসা। বেহালার শিরিগঞ্জে ভিড়ই হোক বা ভি আই পি রোড মারফা ডায়মনড হারবার রোডের অংশ বিশেষের কাকপক্ষী-হীন চওড়া রাহাজানী ভেকই হোক, বিশাল ভ্যানখানা ঠিক পি সি সরকারের ম্যাজিকের মত কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য করে নামখানার জেটিঘাটের ধারে গিয়ে যখন ভেড়াল তখন ভুতেমারে বেলার দুপুর। প্রায় পৌনে একশ মাইল ঘণ্টা তিনেকেই কাবার করে দিয়েছে রাউথ। আসতে আসতে দেখলাম রাস্তার দুধারে খানিক অন্তর অন্তর ফাস্ট ড্রাইভিং-এর শেষ পরিণতি সূচক মাইল স্টোনের মত ধানক্ষেতে পিঠ ঠেকিয়ে আহ্লাদে আটখানা আট চাকা, চার চাকা ও তিন চাকারা সূর্য বন্দনায় মৌনী। ওই মৌনীবাবাদের সাক্ষী রেখেই যাত্রী বোঝাই বাস, ট্রাক ও টেম্পো টপ স্পিডে ছুটছে নামখানার দিকে। উলটো দিক থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসের মত নন স্টপ বিনিযাত্রীর গাড়িগুলি দৌড়চ্ছে কলকাতার দিকে। হাত দেখালেও পাঞ্জাবী ড্রাইভারের হাত এখন কাঁপবে না, মোচে তা দিতে দিতে সব দেখেও কনডাকটাররা নির্বিকার। খুচরো ভাড়ায় এখন মন নেই। চলো আউটরাম ঘাট। তোলো সওয়ারী। জয় বাবা কপিলমুনি। এক পিঠের তেলের দাম মারা যায় যাক, অপর পিঠে ছাগল বোঝাই যাত্রীদের কাছ থেকে দ্বিগুণ মাশুল তুলতে পারলেই চৌগুণ মাফা। তোফা ব্যবস্থা। দিনে চারটে ট্রিপ দিতেই হবে।

আসতে আসতে এসব নিজের চোখে দেখেছি বলেই নামখানায় নেমেই ছুটলাম সরকারী হাসপাতালে খুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রাস্তার দুধারে ধানকাটা মাঠের মধ্যে সার দিয়ে উঠেছে দরমা ও হোগলার ছাউনী। যাত্রীদের অস্থায়ী আস্তানা। ঠিক যেন মিনি সাগরমেলা। নামখানার হাতানিয়া-দোয়ানিয়া খালের ধারে ফি বছর গঙ্গাসাগরের আগে ও পরে সাত দিন ধরে চলে এই মেলা। রাজস্থান, হরিয়ানা, ইউ পি, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র থেকে রিজার্ভ করা সব বাস যাত্রীদের এই মাঠে উগরে দিয়ে দিন দুই বিশ্রাম নেয়, আবার সাগরমেলা শেষ হলে যাত্রী নিয়ে যে যার ঘরে ফেরে। অবিশ্যি সবাই ফেরে না ফিরতে পারে না।

হাওড়া স্টেশন ও আউটরামঘাট থেকে এখানকার বাসওয়ালারা যাত্রীদের নিয়ে এসে নামায় এই মাঠে। নামিয়েই আবার ছুটে যায় উজানে। এত যাত্রী, ড্রাইভার, কনডাকটরদের খানাপিনা ও অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে রাস্তার গায়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য অগুন্তি দোকান। কোন চালায় বিক্রি হচ্ছে চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা, মশলাপাতি। কোন চালায় সওদা হচ্ছে আনাজ তরকারী। কোন দোকান সেরেফ মুড়ি আর তেলেভাজার। কেউ বা বেচছে মাটির মালসায় পুজোর ডালি। কারো বা বেসাতি বেতের ঝুড়ি, রঙীন খেলনা। কারো বেসাতি থালা বাটি ঘটি। কেউ বা এসেছে কয়েক শ' মাটির হাড়ি কলসী নিয়ে। কেউ বা বেচছে কলসী বোঝাই তালের রস—দুপুরের গনগনে রোদের আঁচে সেই রস এখন তেতেপুড়ে একেবারে সোমরস।

ওই মিনিমেলার ধারেই মাঠের মধ্যে চার-পাঁচ কামরার একখানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোণের ঘরটায় খুঁজে পেলাম ডাক্তার বিমল খাস্তগীরকে। গাঁয়ের রোগভোগে, বিশেষ করে সাগরমেলার, রীতিমত অভিজ্ঞ বিমল ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, হবে না, খাচ্ছে তো ওই তেলেভাজা-মুড়ি আর হাড়ি হাড়ি তাড়ি। ঢুকছে এসে এই হাসপাতালে। একদিনেই পেটের রোগ সারাতে এসেছে তিনশ জন। তবে এখানে আর কি দেখছেন। যাচ্ছেন তো সাগরে, দেখবেন গিয়ে সেখানে সাধুবাবাদের কাণ্ডকারখানা।

খোঁজ নিয়ে জানলাম সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালের কর্তা ডাক্তার সুকুমার পাল রেডিওগ্রামে কলকাতায় এত্তেলা পাঠিয়েছেন—যত পারুন নিও-

স্টিকমিন ইনজেকশন পাঠান। ওষুধটা নাকি গাঁজা-ধুতরোর বিষের যম। শীত এড়াতে প্রাণখুলে সব গাঁজা খাচ্ছে আর খেতে খেতে ক্ষুধার্ত শীর্ণ দেহগুলি তাল সামলাতে না পেরে চোখ উলটিয়ে বালির ওপর এলিয়ে পড়ছে। বেশ ঘণ্টাখানেকের টেমপোরারি সমাধি। কিন্তু মেলার ভলানটিয়াররা ছাড়বেন কেন। গণশা-ঘোতনা-গোরাচাঁদরা যেমন শিবপুরের গংগার ঘাটে পুণ্য স্নানের দিনে একটাও জলে ডোবা কেস না পেয়ে শেষে হতাশ হয়ে পুণ্যার্জনের তাগিদে দিদিমা-হারা নাতনীকে উদ্ধার করতে গিয়ে শেষে "ম্যান ট্রেডমারক উত্তম্যান" দিদিমার খপ্পরে পড়েছিল তেমনি মেলার এই সাধুবাবারাও পড়ছেন মেলার স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে। আর ধরা পড়লে রেহাই নেই। সোজা নিয়ে যাচ্ছেন সুকুমার ডাক্তারের খড় ও হোগলার চালায়। ওখানে সুঁই ফুঁড়িয়ে জ্ঞান ফেরানোর পাকা ব্যবস্থা রয়েছে।

বেলা গড়িয়ে আসছে। এবার তাড়াতাড়ি লঞ্চ ধরতে না পারলে সাগরে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। এদিকে নামখানা জেটিঘাটের ভিড় সামলানোর অধিকর্তা ডায়মনড হারবারের এস ডি পি ও রছপাল সিং বললেন, চলুন দাদা একটু চা খেয়ে নেবেন। সঙ্গে নামখানার ও সি রণেন ব্যানার্জি। যাওয়ার পথে দু লাখ আর আসার পথে দু লাখ, চার লাখ যাত্রীর নিরাপদ পারাপারের দায় যে দুটি মানুষের ঘাড়ে তাদের ঘাড়ের বয়স গড়ে পঁয়ত্রিশ। রছপাল আরো ছোট। ধর্মে পাগড়ী বাঁধা শিখ রছপালের ওপর দু লাখ হিন্দুর জীবন পদ্মপাতার জলের মত টলটলে, অথচ সিংজী নির্বিকার। বললেন, একশ তিনখানা লঞ্চ আর দুশ তেষট্টিখানা দিশী বড় নৌকা যাত্রী পারাপার করছে। লঞ্চঘাটায় গিয়ে দেখি পর পর তিনটি জেটিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে লঞ্চ। পুলিস ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবীরা হাতে ধরে যাত্রীদের লঞ্চে তুলে দিচ্ছেন। ভিড় আছে ঠিকই তবে সুশৃংখল। অথচ কোন জোরজবরদস্তি নেই। বাঁশের বেড়া দিয়ে ভিড়কে সাইজ করে রাখা হয়েছে। জেটিঘাটের ঠিক ওপরেই ওয়াচ টাওয়ার। টাওয়ারের মাইকে লঞ্চগুলিকে কোথায় কোন জেটিতে কখন কার পরে দাঁড়াতে হবে, ছাড়তে হবে তার নির্দেশ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। কোন লঞ্চের সাধ্য কি যে সেই নির্দেশ অমান্য করবে। করলেই পঞ্চনদের তনয় রছপাল সেই লঞ্চকে তখুনি দেবে বসিয়ে। লাভ করতে এসে তখন লঞ্চওয়ালাদের গাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে ফিরতে হবে ঘরে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে এসে নামলাম চেমাগুড়িতে। গঙ্গাসাগরের তিন দরজার একটি এই চেমাগুড়ি, সাগরমেলা থেকে আট কিলোমিটার। বাকি দুটির একটি কচুবেড়িয়া, মেলা ক্ষেত্র থেকে তিরিশ কিলোমিটার। বাস আছে, আছে রিকসা ভ্যান তবু সবাই চায় পায়ে হাঁটতে, তাই সর্টকার্ট রুটের সিংদরোজা চেমাগুড়ি লঞ্চঘাটাই সবার পছন্দ। তৃতীয় দরজা খোদ সাগর। জলে জলেই মেলাক্ষেত্রে পৌঁছোনো যায় ঠিকই, তবে লঞ্চ যে ডাঙায় ভিড়তে পারে না। আবার নৌকো করে আসতে হয়।

চেমাগুড়ি থেকে যাচ্ছি সাগরমেলার গাড়িতে। সাগর সরণি ধরে। মাঝে মাঝে রাস্তায় আলো জ্বলছে আবার খানিক বাদেই ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। গাড়ি চলবে কি হেড লাইটের আলো দু ফুট দূরে পৌঁছোতে পারছে না। রাস্তা জুড়ে শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ। পায়ে হেঁটে সব চলেছে। যাদের সামর্থ্য বেশি, পুণ্যার্জনের তাগিদ ঈষৎ কম তারা উঠেছেন রিকসা ভ্যানে। ভ্যান মানে সাইকেল রিকসার ওপর সেরেফ একটা চওড়া পাটাতন। আইন মাফিক চারজন ওঠার কথা। উঠেছে ছজন সাতজন। লাভ রিকসাওয়ালার। ক্ষতি যাত্রীর। কারণ সাইকেল রিকসার সাইক্লিং বন্ধ। সেও হেঁটেই চলেছে। মানুষ ও বোঁচকা-বুঁচকি সমেত। অন্ধকার আকাশে অগুন্তি তারা। দুপাশের ন্যাড়া মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। ষাট, সত্তর হাজার যাত্রী নীরবে রাস্তা ভাঙছে। সেই সঙ্গে রিকসাভ্যান। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাগর সরণির নামটা রিকসা সরণি রাখলেই বুঝি ভালো ছিল।

"জয় বাবা কপিল মুনি" "কপিল মুনি কী জয়"—ধ্বনি উঠতেই হাজার হাজার মুখে জয়ধ্বনিতে মাঠঘাট কেঁপে উঠতেই নজরে পড়ল কালো কম্বলের চাঁদোয়ার নীচে কে বা কারা সামনে কালীপুজোর বাজি পোড়াতে শুরু করেছে। আলো, আলো, আলো লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ও নিয়নের ধোঁয়াটে-সাদা আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ এই আলোর মেলায় ঢুকতেই গাটা একটু গরম হয়ে উঠল। গাড়ি ছেড়ে নেমে এলাম রাস্তায়। রাস্তা কোথায়! পা যে হড়কে যায়। পায়ের তলায় মাটি নেই, আছে বালি। স্যানডেলের ভেতর ঢুকছে। বাবা, কি ঠাণ্ডারে!

সামনেই খাবার জলের ট্যাংকি। তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। পাশ দিয়ে সরু বেলে-রাস্তা সটান চলে গিয়েছে ওই আলোর মেলায়। হাফহাতার ওপর ফুলস্লীভ সোয়েটারখানা চড়িয়ে নিলাম। ওই দূরে ওই সবুজ নিয়নে ভাসানো বাড়িটা কিসের?

...ল মেজের ...ঘ্যের ...এবং কপিল বাবার মন্দির। ...র ভাবজে এসে গেছি।

সেই থেকে ঘুরছি এই মেলার বুকে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, গভীর রাতে। এক এক সময় মেলার এক এক রং, এক এক রূপ। দিনের ক্যাট-কটে আলোয় যাকে লাগে ম্যাড়মেড়ে, রাতেই তার ...ক মৌলুস।

তিনশ বিঘা জুড়ে এই মেলা। এক প্রান্তে কপিল মুনির মন্দির। সাগরের জল থেকে ভরা ...র রেহাই পাওয়ার জন্য প্রায় একতলা বাড়ির ...মান উঁচু ভিতের ওপর থামওয়ালা একতলা এক-...না বাড়ি। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ওই বাড়িরই ...লি ফেরানো হয়েছে। চারধারে ভিড় ঠেকানোর জন্য ...ন্দির ঘিরে বাঁশের ও শালখুঁটির বেড়া। রাতে ...বুজ নিয়নের বন্দোবস্ত। অন্য যে কোন হিন্দু ...ন্দিরের চেয়ে এ মন্দিরের দেবদর্শন অনেক সহজ। ...রণ এখানে কোন গর্ভগৃহ নেই। নেই কোন গুহা ...অন্ধকার ঘর। সামনের বারান্দাতে পুণ্যার্থীদের ...চোখের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ...াথর। বাঁ থেকে ডাইনে লাইন দিয়ে—বীর হনুমান, ...গীরথ কোলে মা গঙ্গা, একগাল দাড়ি নিয়ে কপিল ...নি, থলথলে মোটা দাঁড়িঝুরি সগর রাজা, সিংহ-...হিনী আটহাতি বিশালাক্ষী এবং ইন্দ্রদেব ও ...মকর্ণ ঘোড়া। সব মেটে সিঁদুরের গোলায় ...াপাদমস্তক চর্চিত।

...ঝরা গুলির মত পুজোর ডালি এসে পড়ছে ...ই দেব-দেবীদের চরণতলে। সঙ্গে সোনাদানা, ...কা, পয়সা। একটু বেসামাল হলেই পূজারীদের ...পাত অনিবার্য। তার একহাতে মুখ ঢেকে, অন্য ...তে কোদাল নিয়ে তাবৎ অর্ঘ্য কাচিয়ে নিয়ে ...ন্দিরের ভেতরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বসে ...বিশ ঘণ্টা তিন শিফটে দুজন করে অযোধ্যার ...রোহিত টাকা পয়সা, ফলমূল গুনে গেঁথে, থরে ...রে সাজিয়ে রাখছেন। মেলা শেষ হলে ছালায় ভরে ...শে নিয়ে যাবে।

আভূমি নত হয়ে পুজারী জনার্দন দাসকে ...ণাম করে সবিনয়ে বললাম—বাবা কবে এসেছেন? ...ণামে ও বিনয়ে তুষ্ট ও তৃপ্ত পুজারী হিন্দিতে ...ললেন, অযোধ্যা থেকে ওরা পনেরোজন গত ২৫ ...ডসেমবর কলকাতায় এসেছেন। সেখান থেকে নশো ...কা ভাড়া কবুল করে একখানা বড় বজরা নিয়ে ...াঁচ রাত জলে কাটিয়ে ওরা জানুয়ারির পয়লা ...প্তায় এসেছেন সাগরে। ফিরতে ফিরতে আরো এক ...প্তা। বাবার বয়স বললেন উনপঞ্চাশ। পরনে খেটো ...তির ওপর একটা তুলোর কম্বল। শাবলের মত ...ক্ত সবল চেহারা। মুখ ভরতি খোঁচা খোঁচা বাসী ...াড়ি। নজর দেখলাম ফুল ফল এড়িয়ে টাকা পয়সার ...জরানার দিকে। চোখের চাউনীতে জেলখাটা ...াসামীর সতর্কতা। ঘন ঘন প্রশ্ন করছি দেখে ...বড়ে উঠলেন: কি করা হয়? বললাম: কাজ ...রি। কী কাজ? বললাম: এই লেখাপড়ার। ...তক্ষণে অন্যান্য সেবায়তদের চোখের ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ...লসে উঠেছে। জনার্দন দাসও খনখনে হিন্দিতে ...টান প্রশ্ন করলেন: লেখাপড়া কি আখবরে? ধন্য ...াবা কপিলমুনি, তোমার মতই তোমার সেবায়েত-...ও সব ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ!

ঘুরছি। আপন মনে। ঘুরতে ঘুরতে চলে ...লাম মেলার এধারে। সার দিয়ে পুজোর ডালির ...দাকান। ওই দোকানের মিছিলেই অনুকূল দাসের ...টল। ছোট, বড়, মাঝারি সব মাটির মালসায় ...াজানো ডালি। বিশ, পঞ্চাশ ও একশ এপঁচাশ ...য়সার। দাম বেশি দিলে গাঁদা ফুল, সিঁদুরের ...মোড়ক ও সাদা বাতাসার সঙ্গে একটা করে মেদিনীপুরের কচি ডাব মেলে। গতবার ব্যবসা ভাল ...য়নি। অনুকূল মাত্র ১২০০ ডালি বেচেছিল। ...ার আগের বার আড়াই হাজার। এবার একটা মাঝা-...রি রফা নিজের সঙ্গে করে নিয়েছে—দেড় হাজার ...ালি স্টক করেছে। কলকাতার ফুলের অর্ডার ...দয়েছে—পঁচাত্তর টাকার গাঁদা ফুল। থাকে ওই ...াগর দ্বীপেই। মেলা থেকে চার মাইল দূরে ...রুদ্রপুরে। ঘরে আছে বাবা, মা, ছোট ভাই, স্ত্রী ও দুই মেয়ে আর দেড় বিঘা জমি। মেলার পরের দুটি মাস কোন রকমে চলে যায়। তবে এবার ভিড় বেশি দেখেও ওর মন ওঠেনি। ইজারাদার ওকে স্টল দিয়েছে একেবারে একটেরেয়। বলুন বাবু এতদূরে এসে কে আর ডালি কিনবে? অথচ এই স্টলের জায়গাটার ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা—ছাউনী-টাউনী সব নিজেদের।

দুপুর বেলা মেলার একধারে ত্রিপলের তাঁবুর ভেতরে ইজারাদার ঘুমুচ্ছিলেন। একমাস ধরে ধকল চলছে। দিনে, রাতে বিশ্রাম বলতে কিছু নেই। সর্বক্ষণের সঙ্গী শুধু দুশ্চিন্তা। চার বন্ধু মিলে গতবারের চেয়ে ন হাজার টাকা বেশি দর হেঁকে এবার মেলার ইজারা নিয়েছে। এখন ওই পঁচিশ হাজার টাকা উঠলে হয়।

উলটো দিকেই মেলার বিজলী-ঠিকাদার ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্যের আস্তানা। ত্রিশ বছরের যুবক। ফুল প্যান্ট আর একটা তোয়ালে গেঞ্জি পরে গোটা মেলাটা চষে বেড়াচ্ছে। কোথায় নিয়ন টুসে গিয়েছে, কোথায় সাগর পাড়ে ফ্লাড লাইটটা ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে—হাজারটা দুশ্চিন্তা। সরকারী কর্তাদের সময়-অসময়ের হাজারটা ফরমাস।

কোন দুশ্চিন্তা নেই শুধু যাত্রীদের। স্রোতের মত শুধু আসছে আর আসছে। লোকে বলে কল-কাতায় ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লাখ লোক, দশ লাখ লোক কি বিশ লাখ লোকের জনসভা। গোটা ময়-দানের আয়তন তো জানি হাজার বিঘা। তাহলে ব্রিগেড বড় জোর একশ বিঘা। তাও ওই সব মিলিয়ন স্ট্রং মিটিংগুলোর মাঝে মাঝে টেনিস কোরটের মত অনেক জায়গা খালি থাকে। শ্রোতারা যে যার জায়গায় বসে ওই ফাঁক ও ফাঁকির ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। কিন্তু এখানে শুক্রবার অর্থাৎ তেরো তারিখ রাত একটায় দেখি একটু যে হাঁটব সে রকম পা ফেলার জায়গা নেই। কেউ একটু বিচালী বিছিয়ে, মাথায় হোগলার ছাউনী ঢাকা দিয়ে আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে পড়ে—কেউ বা কপিল মুনির ভরসায় বরফের মত ঠাণ্ডা বালির ওপরে খোলা আকাশের নীচে পৌষের শীতে হিমের ঝরনায় স্নান সারছে।

তখনো গাঢ় অন্ধকার। বালি আর আকাশের মাঝে মাঝে, মনে হয় হাত বাড়ালেই আঙুলে লেগে যাবে, পেঁজা তুলোর মত কুয়াশা উড়ছে। দূরে অসংখ্য লণ্ঠন জ্বলছে—সব দিশী নৌকায়। অসংখ্য বাতি—সব লনচের। সাতাশীটা ফ্লাড লাইট জ্বলছে পাড় ধরে। জোয়ার আসছে। ভাঁটায় সরে যাওয়া

জল এখন মন্দিরের দিকে ছুটে আসছে। উলটো দিক থেকে আর একটা স্রোত সাগর স্রোতকে হার মানিয়ে ছুটে চলেছে দেখে থমকে দাঁড়ালেম। কোন্ বিশ্বাস, কোন শক্তিতে মানুষ এই ভাবে নিজেকে জয় করতে উদামী হয়?

উত্তর যে জানে, সে জানে। আমি জানি, আমি দেখেছি সেই শনিবার সকালে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের স্নান। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। যারা বলেন কুম্ভ মেলার কাছে সাগর মেলা তুচ্ছ, বলেন কুম্ভে পঞ্চাশ লাখ লোক আসে। আমি বলি সে তো দু মাস ধরে। এক সকালে পৃথিবীর কোথাও কি কেউ পাঁচ লাখ মানুষকে বরফগলা জলে স্নান করতে দেখেছেন? কেউ কি দেখেছেন গোটা ভারত গঙ্গা-সাগরের ঘোলা জলে ডুব দিয়ে আশ্চর্যভাবে এক ও অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে? কোটিপতি মাড়োয়ারীর পাশে, তিরু-পতি মন্দিরের ভিখিরি বালিকা পাশাপাশি স্নান করে? এ দৃশ্য দেখেছি। দেখেছি ওই মেলার সুইস কটেজের ও ভি আই পি কোয়ারটারের বাসিন্দা সব মন্ত্রী ও আমলার সঙ্গে নাঙ্গা হয়ে কুষ্ঠরোগীরাও সূর্যবন্দনা করছে।

বাবা তুমি স্নান করবে না? —অনেক কষ্টে চোখ খুলে বিষ্ণু মহারাজ বললেন—না বাবা। কেন? একটু হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, পুণ্য কিনতে তো আসিনি। বউ ছিল মরে গেল, ছেলে ছিল সেও গেল, সবশেষে গেল মা। তখন আমি বেনারস জেলার সবচেয়ে বড় শতরঞ্জ খেলোয়াড়। রইস আদমীরা ধরে নিয়ে গিয়ে সরাব পিলায়, শতরঞ্জ খেলে। আমি নেশায় ছিলাম। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা, তখন খদ্দের নেই দোকানে, একা বসে বসে বিবেকানন্দর বই পড়ছিলাম। হঠাৎ মনে হল—এ কী করছি? সব ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গরীব প্রতিবেশীকে দুকান, মকান বিলিয়ে দিলাম। নেমে এলাম রাস্তায়। সেই থেকে ঘুরছি। গোটা ভারত সফর করেছি। বড় জবর সফর—এ যে নেত্র সফর। এ সফরে যে আনন্দ, সুখ, তার চেয়ে কী ওই স্নানে বেশী সুখ, তুমিই বলো?

কী জবাব দেবো জানি না। দেখি বাবার আসনের সামনে পাতা একটা চাদরে পয়সা পড়ছে, জমে উঠছে। জ্ঞানী বাবা মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা বন্ধ করে পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ধুনির গর্তটার মধ্যে গুঁজে রেখে আবার খালি চাদরটা পেতে রাখছেন যত্নভরে। যাত্রীরাও পুজোর শেষে এখন ঘরের পথে। সেই পথে আমরাও। কসুর মাফ কিজিয়ে কপিলবাবা—এই শীতে আমিও স্নান করতে পারিনি, তাই পুজোটাও বাকি থেকে গেল।

স্বর্ণোদ্যানে সবাই অবাক হয়ে গেছে...
?
?
?
?

...শিকারীরাও হতভম্ব!
লোকটা বাঘ-সিংহের থাবায় মারা পড়বে!
শ, শ, শ

স্বর্ণোদ্যানে... আহত হরিণশিশু... বাঘ আর সিংহ..!
রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘ-সিংহ হিংস্র হয়ে উঠছে...

ক্ষিপ্র হাতে অরণ্যদেব তাদের সরিয়ে দিলেন...
গররররর
গররর

ভাগ এখান থেকে।

ভাগ্!
গুলি করার চেয়ে এটাই ভাল!

এখুনি এটাকে দ্বীপ থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার।
6/26

লোকটাকে মারবার এই সুযোগ...
চালা গুলি!
খবর্দার...!
চলবে

কষ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৩৭ ॥

১৯৩৬এর প্রথম দিকে। আরামবাগ মহকুমায় ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছলুম কামারপুকুরের পাশে ইন্দিরা গ্রামে। কবিরাজ অবনীপতি সেনগুপ্তের বাড়ি। তাঁর বাড়িতেই কংগ্রেস অফিস এবং তিনিই ওখানকার নেতা। সেখানে অনেক লোক দেখে জিজ্ঞেস করলুম যে, ব্যাপারটা কি ? শুনলুম তাঁরা আমার কাছেই এসেছেন, কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী যাতে পালিত হয়। গ্রামবাসীরা খুব ক্ষুব্ধ। মিশন থেকে আগে নাকি ঘোষণা করা হয়েছিল, শতবার্ষিকী উৎসব ওখানেই পালিত হবে; কিন্তু পরে সেটা নাকচ হয়ে স্থির হয়েছে যে, সেটা জয়রামবাটীতেই পালিত হবে। আমি তত আমল দিলুম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের একটা গ্রামে মিটিং করতে চলে গেলুম। যাবার সময় বলে গেলুম যে, এটা মিশন এবং গ্রামবাসীদের নিজস্ব ব্যাপার, এর সংগে আমরা লিপ্ত হতে চাই না। রাত্রে ফিরে এসে দেখি, গ্রামবাসীরা অভুক্ত অবস্থায় সেই-ভাবেই বসে আছেন। আমি খুব বিপদে পড়লুম। আমাদের পরিবারের সংগে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। আমার ভগিনীপতি শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, যিনি পরে ভবানীপুর মিত্র ইনসটিটিউশন স্কুলের হেড মাস্টার হয়েছিলেন, তিনি দীক্ষা নেন সারদা দেবীর কাছে। আমার দিদি, আমার স্ত্রী—সকলেই মিশনে দীক্ষা নিয়েছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ মিশনের সংগে কোনো আলোচনা না করে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করা খুবই দুরূহ বলে মনে হল। অন্য অসুবিধাও ছিল। মাঝে এক দিন সময়, অর্থাৎ ছত্রিশ ঘণ্টা বাদেই উৎসব আরম্ভ করতে হবে। এক দিকে রামকৃষ্ণ মিশন, অন্য দিকে রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর ও আশেপাশের অধিবাসীরা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এবং কামারপুকুরের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। ঐ মানুষটিকে নানা দিক দিয়ে ভেবেও বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। প্রায় অর্ধ শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু বহু শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ তাঁর কাছে মাথা নত করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এ'রা তো সব দিক্‌পাল ছিলেন। আর কত গল্প! জন্মবৃত্তান্তও অদ্ভুত। জন্মাবার পর গিয়ে পড়লেন ধান সেদ্ধ করবার উনুনের মধ্যে। আরও কত কাহিনী প্রচলিত আছে। ছেলেবেলায় পাশের গ্রাম আনুড়ে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে গেছেন। সেখানে গিয়ে প্রথম ভাবসমাধি হল। তারপর দক্ষিণেশ্বরের কথা। ভৈরবী এলেন, তোতাপুরী এলেন ; সাধনার আর শেষ নেই। বহু পণ্ডিত আসতেন। তাঁদের সংগে শাস্ত্রীয় আলোচনা হত—একদম সাধারণ কথা। এসব যাঁরা দেখেছেন এবং লিখে গেছেন, তাঁদের কথা অবিশ্বাস করবার মত নয়। ইতিহাসে লেখা আছে যে, বাবর হুমায়ুনের রোগ নিজের শরীরে নিয়েছিলেন। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা আছে—মথুরবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী যোগমায়া দেবীর অসুখ নিজের শরীরে গ্রহণ করেন এবং তাতেই যোগমায়া দেবীর রোগমুক্তি হয়। নৌকা করে যাচ্ছেন গংগা দিয়ে। হঠাৎ পিঠে হাত দিয়ে 'উঃ উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখা গেল পিঠে যেন কেউ চাপড় মেরেছে—পাঁচ আঙুলের দাগ। অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারা গেল যে ঠিক সেই সময়ে গংগাবক্ষে একজন মাঝির পিঠে একজন চাপড় মেরেছে। বিশ্বাস করা যায়, অবিশ্বাসও করা যায়। তবে যুক্তি দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন ঘটনা অনেক ঘটতে দেখা যায়। আমি নিজেই এ জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি। আমার এক বন্ধু পা ভেঙে আরামবাগে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ির একটি ছেলে আট বছর আগে আমেরিকা যায়। সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত, কিন্তু পা ভাঙার খবর পায়নি। কোনরকমেই তার জানবার কথা নয়। হঠাৎ একদিন ক্যালি-ফোর্ণিয়া থেকে আমার বন্ধুর কাছে ফোন এল। সেই ছেলেটি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'জেঠু, তোমার শরীর কি খারাপ ?' তাকে জিজ্ঞেস করায় জানা গেল, তার হঠাৎ মনে হয়েছে যে, তার জেঠু অত্যন্ত অসুস্থ এবং সেইজনাই সে ফোন করেছে, যদিও সে কখনও ফোন করে না। সেইজন্যই এসব ঘটনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিশেষত্ব ছিল, তিনি সাধারণ মানুষের মত বাস করতেন এবং সেই জীবনযাপনের মধ্যেই এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে অবিশ্বাসীর মাথাও আপনা-আপনি ওঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। এ একটা অপরূপ জীবন। তাঁর জন্য মন্দির হয়েছে, তাঁকে ভগবান বলে পূজা করবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এসবই বাহ্য। মানুষ নিজের সাধনায় যে একটা অসাধারণ অবস্থায় পৌঁছতে পারে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওঁর জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সেটা ওঁরই সাধনার ফল। পরে হয়তো দৈব শক্তি আরোপ করা হয়েছে। সাধারণত তাই হয়ে থাকে। যীশু খৃষ্টের বেলায় তাই হয়েছে। তাঁর পরম পণ্ডিত শিষ্যরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে গেছেন যে, তাঁর মধ্যে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। আমার মনে হয় ওগুলো না করলেও যীশু খৃষ্ট যীশু খৃষ্টই থেকে যেতেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। ডঃ সুশীল দে 'Chaitanya & Baishnabism' বইয়েতে দেখিয়েছেন যে, চৈতন্যদেবের শিষ্যরা মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের কোনো পাণ্ডিত্য ছিল না বললেই হয়। আমি মনে করি, এতে কিছু এসে যায় না। এখনও যে গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে সন্ধ্যের পর নানাভাবে সংকীর্তন হয়, সেটা চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই।

আমাদের মনে একটু খটকা লাগে। খৃষ্টকে ভগবানের পুত্র বলা হয় এবং তাঁকে দেবতা হিসেবেই ভজনা করা হয়। আমার এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। ভগবান কোথায়

আছেন; তা জানি না এবং তাঁকে খোঁজ করবারও চেষ্টা করিনি। যাঁরা মনে করেন যে, ভগবান আছেন, তাঁদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু 'Vatican', প্রাসাদে খ্রীষ্টকে বসাতে মন কিছুতে চায় না। মনে হয় এ যেন একটা অসঙ্গতি। এ যেন তাঁকে উপেক্ষা করে তাঁর নাম গ্রহণ করা। ঠিক, তেমনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঠিক মনে অনুরূপ একটা অনুভূতি জাগে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বুঝতে পারি। তাঁর নিজের হাতে তৈরী পঞ্চবটী বনের মধ্যেও তাঁকে মানায়। রানী রাসমনির রাজৈশ্বর্য এই পঞ্চবটী বন তৈরি করে দেয়নি। নিজেরাই গাছ লাগিয়ে-ছিলেন, দড়ি-বাঁশেরও সংস্থান জোটেনি। গঙ্গার বানে দড়ি বাঁশ সব ভেসে এল, তাই দিয়েই পঞ্চবটীর জায়গাটা ঘেরা হল। এই শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বেলুড়ের বিশাল মন্দিরের মর্মর-বেদীতে ঠিক স্থাপন করতে পারছি না। প্রশ্ন উঠতে পারে—আমি কে স্থাপন করবার। বড় বড় পন্ডিত এবং শ্রদ্ধেয় সাধকরা এ কাজ করেছেন। আর এখন আমার চারদিকে যারা আছে—আমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং আমার এক বন্ধুর পুত্র ও পুত্রবধূ, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মতোই এবং তাদের মেয়েরা, যাদের আমার পৌত্রী বলে অনেকে মনে করেন—তারা সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সেইজন্যই ভয়ে ভয়ে এসব কথা লিখছি। অনধিকারচর্চা হলেও যে কথাগুলো অনেকের মুখে শুনেছি এবং নিজেও মনে করি, তাই লিখে ফেললাম। শ্রীরামকৃষ্ণ রানী রাসমণির গালে চড় মেরে-ছিলেন—এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। মনে হয়, রক্তমাংসের শরীর—আমার একান্ত আপন। ভগবান ভাবলেই ভয় হয়; মনে হয় অনেক দূরের জিনিস।

এইসব খ্যাতনামা লোকদের জন্মস্থান হয়ে একসময় হুগলী জেলার বেশ নাম হয়েছিল। আরামবাগ মহকুমার দুই প্রান্তে দুই মহারথী। গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে যুগপ্রবর্তক রামমোহন। আর এই রাধা-নগরের পাশের দুখানি ছোট্ট গ্রামে একটিতে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আর একটিতে সর্বাধিকারীরা—প্রসন্নকুমার, দেবপ্রসাদ, সুরেশ-প্রসাদ। এঁদের মাঝখানে আরামবাগ থানার আরান্ডি গ্রামে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ি। গঙ্গার ধার ধরে যদি যাওয়া যায়, দীনবন্ধু লিখেছিলেন, 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।' শ্রীরামপুরে গোপীনাথ সাহা, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে ডি ঘোষের বাড়ি কোন্নগরে, চন্দননগরে কানাইলাল দত্ত, চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হুগলীতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আবার চুঁচুড়া থেকে স্টেশনের তলা দিয়ে তিন মাইল গেলেই সুগন্ধ্যা, যেখানে স্যার তারকনাথ পালিতের জন্মভূমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের জন্য এঁর দান অবিস্মরণীয়। হন্যান গ্রামে ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, বলাগড়ে স্যার আশুতোষ, হরিপালে গিরিশচন্দ্রের পিতৃভূমি, সেখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে গুপ্তিপাড়া গ্রামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার তার পাঁচ মাইল দূরে বাগান্ডায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈকালায় চন্দ্রনাথ বসু—যাঁর সঙ্গে এককালে রবীন্দ্রনাথের মসিযুদ্ধ হয়েছিল। সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে পানিসিয়ালায় হাইকোর্টের জজ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় সভাপতি শ্রীসারদা-চরণ মিত্র, বাহির গড়ায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পিতৃভূমি, আর শ্রীরামপুরে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মভূমি ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, যাঁর সুযোগ্য বংশধর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এককালীন রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায়, গুড়াপে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রামগোপাল ঘোষ এবং রেভারেন্ড কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে।

আর এক দিকেও হুগলী জেলার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলকে বহু উত্থানপতন দেখতে হয়েছে। সপ্তগ্রাম রাজধানী ছিল—তার আর এখন কোনো চিহ্ন নেই। হুগলীর ব্যান্ডেলে পর্তুগীজ চার্চ পর্তুগীজ-দের চিহ্ন বহন করছে। হুগলী শহরে থাকতেন মোগল সম্রাটের সুবেদার। চুঁচুড়ায় ডাচ, চন্দননগরে ফরাসী, গরুটিতে ইংরাজদের কুঠি। শ্রীরামপুরে দিনেমার—এই সব শক্তির আনাগোনায় গঙ্গার ধারে একটা অদ্ভুত সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

কামারপুকুর যাতায়াত আগে দুর্গম ছিল। এখন অবশ্য কামারপুকুর এবং দেড় মাইল দূরে সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী কলকাতা থেকে সহজেই যাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে যখন আমাদের রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী পালন করতে বলা হল তখন যাতায়াতের কোনো পথই ছিল না অথচ ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে করতে হবে। প্রথমে জলের ব্যবস্থা করা হল—নিকটবর্তী আমোদরের খালকে কেটে মন্ডপের জায়গায় আনা হল। সারা রাত এবং সকালের খানিকক্ষণ সময় বাঁশ বনে বাঁশ কেটে ত্রিশ হাজার লোকের মত মন্ডপের বাঁশ সংগ্রহ হল। আরামবাগ মহকুমার সর্বত্র কর্মীরা চলে গেলেন সাইকেলে খবর দিতে, অনেকে আবার শ্রীরামপুর এবং হুগলীতেও খবর দিতে গেল। রাত্রের মধ্যে ত্রিশ হাজার লোকের খাবার উপযুক্ত চাল, ডাল, তরিতরকারি আসতে শুরু করল। তার সঙ্গে সঙ্গে শতরঞ্জি, পাতা, আলো এবং রান্নার বাসন। বিকেলে জয়রামবাটীর রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে স্বামীজীদের আমন্ত্রণ করে এলুম যে, তাঁদের কাজ তাঁরাই এসে পরিচালনা করবেন। তাঁরা সকলেই এসেছিলেন। মহামর্যাদায় রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী উদযাপিত হল। ত্রিশ হাজার লোক প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সে প্রায় এক রাজসূয় যজ্ঞ। আমার সঙ্গে দুর্গা (চক্রবর্তী), কালী (সিংহ), শান্তিমোহন (রায়), বেণীমাধব (রায়) প্রমুখ আরামবাগের প্রথম সারির কর্মীরা ছিলেন বলেই কামারপুকুর গ্রামের সর্ব-সাধারণের সহযোগিতায় এ-কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।
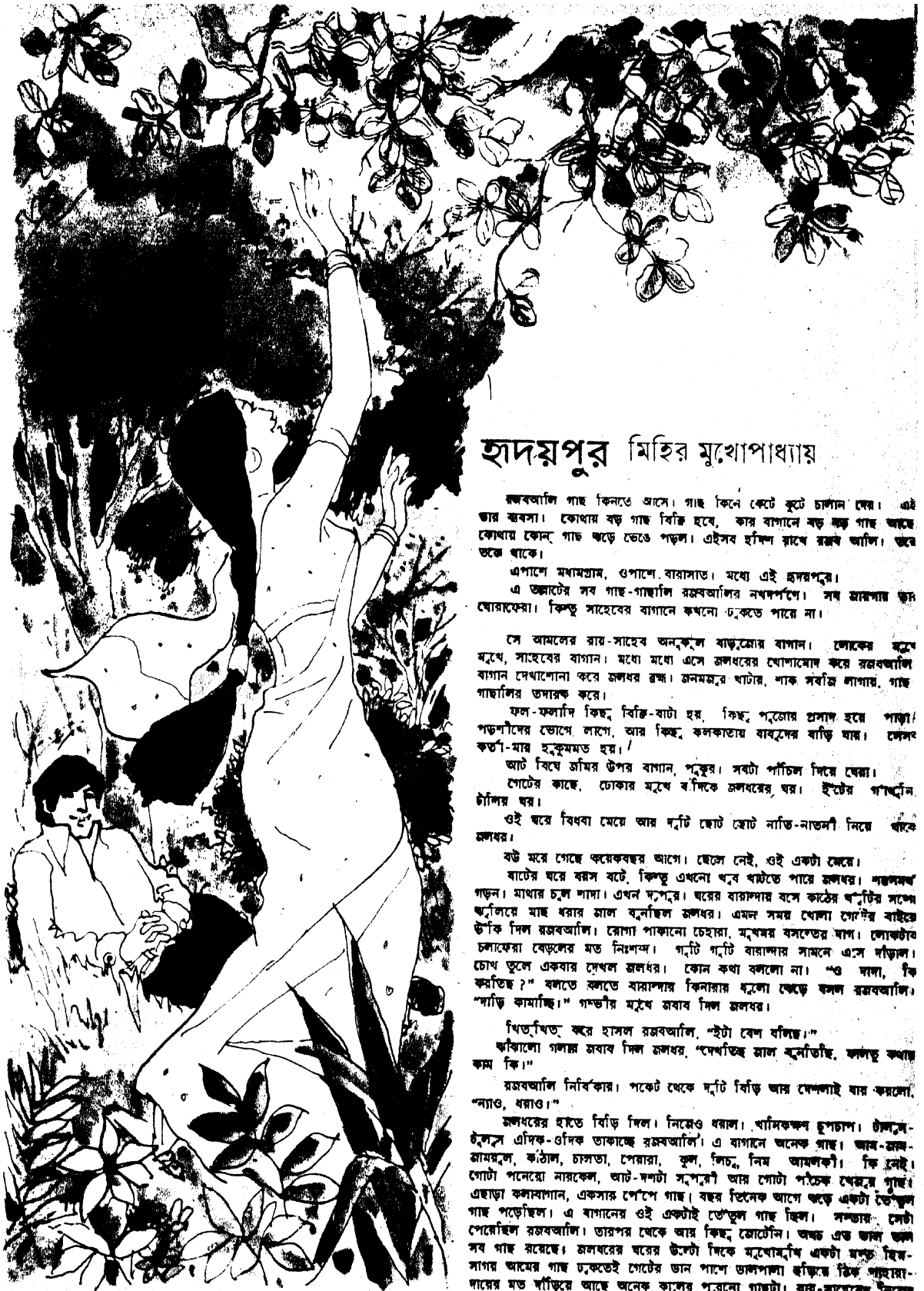
হৃদয়পুর মিহির মুখোপাধ্যায়

রজবআলি গাছ কিনতে আসে। গাছ কিনে কেটে কুটে চালান দেয়। এই তার ব্যবসা। কোথায় বড় গাছ বিক্রি হবে, কার বাগানে বড় বড় গাছ আছে কোথায় কোন্ গাছ ঝড়ে ভেঙে পড়ল। এইসব হদিশ রাখে রজব আলি। তক্কে তক্কে থাকে।

এপাশে মধ্যমগ্রাম, ওপাশে বারাসাত। মধ্যে এই হৃদয়পুর।

এ অঞ্চলের সব গাছ-গাছালি রজবআলির নখদর্পণে। সব জায়গায় তার ঘোরাফেরা। কিন্তু সাহেবের বাগানে কখনো ঢুকতে পারে না।

সে আমলের রায়-সাহেব অনুকূল বাড়ুজ্যের বাগান। লোকের মুখে মুখে, সাহেবের বাগান। মধ্যে মধ্যে এসে জলধরের খোশামোদ করে রজবআলি বাগান দেখাশোনা করে জলধর বৃদ্ধ। জনমজুর খাটায়, শাক সব্জি লাগায়, গাছ গাছালির তদারক করে।

ফল-ফলাদি কিছু বিক্রি-বাটা হয়, কিছু পুজোর প্রসাদ হয়ে পাড়া-পড়শীদের ভোগে লাগে, আর কিছু কলকাতায় বাবুদের বাড়ি যায়। যেমন কর্তা-মার হুকুমমত হয়।

আট বিঘে জমির উপর বাগান, পুকুর। সবটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

গেটের কাছে, ঢোকার মুখে বাঁদিকে জলধরের ঘর। ইঁটের গাঁথুনি, টালির ঘর।

ওই ঘরে বিধবা মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট নাতি-নাতনী নিয়ে থাকে জলধর।

বউ মরে গেছে কয়েকবছর আগে। ছেলে নেই, ওই একটা মেয়ে।

ষাটের ঘরে বয়স বটে, কিন্তু এখনো খুব খাটতে পারে জলধর। শক্তসমর্থ গড়ন। মাথার চুল সাদা। এখন দুপুর। ঘরের বারান্দায় বসে কাঠের খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে মাছ ধরার জাল বুনছিল জলধর। এমন সময় খোলা গেটের বাইরে উঁকি দিল রজবআলি। রোগা পাকানো চেহারা, মুখময় বসন্তের দাগ। লোকটার চলাফেরা বেড়ালের মত নিঃশব্দ। গুটি গুটি বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে একবার দেখল জলধর। কোন কথা বললো না। "ও দাদা, কি করতিছ ?" বলতে বলতে বারান্দার কিনারায় ধুলো ঝেড়ে বসল রজবআলি। "দাড়ি কামাচ্ছি।" গম্ভীর মুখে জবাব দিল জলধর।

খিত্‌খিত্‌ করে হাসল রজবআলি, "ইটা বেশ বলিছ।"

ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল জলধর, "দেখতিছ জাল বুনতিছি, ফালতু কথায় কাম কি।"

রজবআলি নির্বিকার। পকেট থেকে দুটি বিড়ি আর দেশলাই বার করলো, "ন্যাও, ধরাও।"

জলধরের হাতে বিড়ি দিল। নিজেও ধরাল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। ঢুলুঢুলু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রজবআলি। এ বাগানে অনেক গাছ। আম-জাম-জামরুল, কাঁঠাল, চালতা, পেয়ারা, কুল, লিচু, নিম আমলকী। কি নেই। গোটা পনেরো নারকেল, আট-দশটা সুপুরী আর গোটা পাঁচেক খেজুর গাছ। এছাড়া কলাবাগান, একসার পেঁপে গাছ। বছর তিনেক আগে ঝড়ে একটা তেঁতুল গাছ পড়েছিল। এ বাগানের ওই একটাই তেঁতুল গাছ ছিল। সস্তায় সেটা পেয়েছিল রজবআলি। তারপর থেকে আর কিছু জোটেনি। অথচ এত ভাল ভাল সব গাছ রয়েছে। জলধরের ঘরের উল্টো দিকে মুখোমুখি একটা মস্ত হিমসাগর আমের গাছ ঢুকতেই গেটের ডান পাশে ডালপালা ছড়িয়ে ঠিক পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে আছে অনেক কালের পুরনো গাছটা। রায়-সাহেবের নিজের
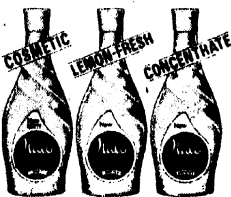
হাতে নাকি লাগানো কলমের গাছ। অনেকদিন ধরেই এই গাছটার উপর লোভ রজবআলির। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না।

ওদিকে চোখ রেখেই আস্তে আস্তে বললো, "এ গাছটার ফলন তো ধরে এল।"

"তাতে কি হয়েছে।" আলবোনার দিকে চোখ রেখেই বললো জলধর। মুখে বিড়ি।

"আমারি দ্যাও না, মোটমাট দুশো টাকা দিতাম, ঠিক বলতিছি।"

"নিজের কাজে যাও মিঞা," বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল জলধর. "কত্তা-মা দেখতি পেলি গালাগালি দেবেন।" কত্তা-মা অর্থাৎ মন্দাকিনী দেবী। রায়-সাহেবের ছেলের বউ। আশীর কাছে বয়স। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। পাকা কদমছাঁট চুল। বয়সের ভারে সামান্য সামনে ঝুঁকে লাঠি ঠুক ঠুক করে হাঁটেন। তিন ছেলে, দুই মেয়ের মা।

বড়ছেলে হাইকোর্টের উকিল। মেজছেলে ডাক্তার। এরা একসঙ্গে কলকাতার বাড়িতে থাকে। ছোট ছেলেটি রেলের অফিসার। বদলীর চাকরি। আপাততঃ আছে জামালপুরে। মেয়েরা, যে যার শ্বশুরবাড়ি। অর্থাৎ এখানে, এই হৃদয়পুরের বাড়িতে কেউ থাকে না। এখানে মন্দাকিনী একা। একজন রাঁধুনী আর জলধর, জলধরের মেয়ে কুসুম। এদের ভরসায় মন্দাকিনী থাকেন। জলধরের কথা শুনেও নড়ল না রজবআলি। দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগল।

হঠাৎ হুস্ করে একটা গাড়ি এসে গেটের বাইরে দাঁড়াল। হর্ণ দিল। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে জলধরের ঘরের সামনে দাঁড়াল। কালো রঙের ঝকঝকে ফিয়াট। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে উনিশ-কুড়ি বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে বললো "ও জলুদা, কেমন আছো?" তাড়াতাড়ি উঠে এল জলধর. একগাল হেসে বললো, "ছোড়দিমণি, অনেকদিন পরে এলেন।" পাশের ছেলেটিকে বললো মেয়েটি, "অরূপ, এ হচ্ছে আমাদের জলুদাদা।" মাথা নিচু করে নমস্কার দিল জলধর। গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল অরূপ।

সামান্য মাথা নোয়াল। পঁচিশ-ছাব্বিশের সুঠাম চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো, মোটা জুলপি, কালো চশমা। রজবআলির দিকে চোখ পড়ল মেয়েটির। জলধরের পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। "এ কে?" জিজ্ঞেস করল। জলধর কিছু বলার আগেই সেলাম ঠুকে সামনে এল রজবআলি, সোজাসুজি আরজি পেশ করলো, "আজ্ঞে আমার নাম রজবআলি, গাছ কেনা-বেচার ব্যবসা করি, এ মুলুকে সবাই চেনে, ওই আমগাছটা কিনতি চাই, আপনি যদি দয়া করে কত্তা-মাকে বলে দ্যান্।"

বেশ বিরক্ত হল জলধর খেঁকিয়ে উঠল, "আরে থামো দিকি, দিদিমণি বেড়াতি আসিছেন, তোমার ওইসব বাজে কথা শুনতি যাবেন কি জানি।"

রজবআলি আর জলধরের কথাবার্তা শুনে, ধরন-ধারণ দেখে কেন যেন হাসি পেল মেয়েটির! মুখে রুমাল চাপা দিয়ে রজবআলিকে বললো, "আচ্ছা, বলবো ঠাকুমাকে," তারপর জলধরকে লক্ষ্য করে, "কেমন আছেন, ঠাকুমা?"

"ভালই আছেন, যাও না, ভেতরে যাও।" জলধরের জবাবের পর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গাড়িটা।

সামনে পুকুর। পুকুরের ওপারে পুরনো ধাঁচের দোতলা দালান। বাঁধানো ঘাট।

সুরকির রাস্তাটি দুভাগ হয়ে পুকুরের দুপাশ দিয়ে ঘুরে ওই দালানের সামনে গিয়ে মিশেছে। ডানদিকের রাস্তা ধরল অরূপ। রাস্তার পাশে পাশে পুকুরের ধারে নারকেল-সুপুরীর সারি। আবার বাঁয়ে ঘুরল। এবার বাঁয়ে পুকুর, ডাইনে ছিমছাম ছোট একটি মন্দির। সিঁড়ি বারান্দা সব পাথরে বাঁধানো। রাধামাধবের মন্দির। মন্দিরের আশে পাশে কয়েকটি ফুলগাছ। গাছগুলি চেনে না অরূপ। কিন্তু চারপাশ দেখতে দেখতে বললো, "চমৎকার জায়গা।"

"তোমার ভাল লেগেছে?" মেয়েটির মুখে তৃপ্তির হাসি।

'চমৎকার' অরূপের মন্তব্য, তারপর প্রশ্ন, "ওগুলি কোন্ ফুলের গাছ?"

"ও দুটো কাঞ্চন, ওটা গন্ধরাজ।" আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটি। গাড়ি আবার বাঁয়ে ঘুরল। দালানের সামনে এসে বকুলগাছের ছায়ায় দাঁড়াল। গাড়ির শব্দ পেয়ে একটি মধ্যবয়সিনী বিধবা বেরিয়ে এল। তারপরই তাড়াতাড়ি ভেতরে যেতে যেতে, "ও কত্তা-মা, দেখুন, কে এসেছে।" এর নাম বাসন্তী। রান্নার কাজ করে। গাড়ি থেকে নামল মেয়েটি। আঁচলটা গুছিয়ে নিল। গাড়ির পেছনের সিটে প্লাস্টিকের বাজার-ব্যাগে কয়েকটি আপেল আর সন্দেশের বাক্স। নিজেই বার করে নিল। অরূপও ততক্ষণ নেমে এসেছে।

"কে, ফুলু এলি, আয় দিদিভাই, এদ্দিনে বুড়ির কথা মনে পড়লো।" বলতে বলতে লাঠি ঠুকঠুক করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মন্দাকিনী দেবী। পুরু কাঁচের চশমায় বড় বড় চোখে তাকালেন। ছোট করে ছাঁটা সাদা মাথা। সাদা থান, শেমিজ। ফুলো ফুলো পায়ে মোজা আর কাপড়ের চটি। সিঁড়ির পাশে স্যান্ডেল ছেড়ে বারান্দায় উঠল মেয়েটি, পায়ের ধুলো নিল, আড়চোখে একবার অরূপকে দেখল, তারপর বললো, "আমাকে তুমি ওই নামে ডেকো না,

ঠাকুমা আমার নাম তো মধুমিতা, বাড়িতে সবাই ডাকে মিতা, মিতু, তুমি ডাকতে পারো না, ফুলু নামটা বিচ্ছিরি, কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো, জেঠুমণির দেয়া নাম মধুমিতা, কেমন সুন্দর।"

মন্দাকিনী বললেন, "আমি তোর নাম রেখেছিলুম ফুলমালা, কেন আমার দেয়া নামটি কি খারাপ, আমি তোকে ফুলুই ডাকবো।"

ততক্ষণে বারান্দার উঠে এসেছে অরূপ। হাসিমুখে বললো, "ফুলমালা নামটি চমৎকার, তবে আমি শুনেছিলুম, চিড়িয়াখানার একটি হাতির নাম ছিল ফুলমালা, চমৎকার নাম" বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠল।

"এই হাসবে না।" চোখ পাকাল মধুমিতা, মুখ ভেংচে বললো, চমৎকার নাম, ওই একটা কথাই শিখেছো, চমৎকার।" তারপর ঠাকুমাকে লক্ষ্য করে, "ঠাকুমা, এ হচ্ছে অরূপ, ওর গাড়িতেই এসেছি।" প্রথমে দুই হাত তুলে নমস্কার দিল অরূপ, পরে এক মুহূর্তে ইতি-উতি করে পায়ের ধুলো নেবার জন্য সামনে ঝুঁকল। "থাক্ ভাই থাক।" মন্দাকিনী এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মধুমিতা বললো, "আগে জুতো খোল, তারপর বারান্দায় উঠো।"

বারান্দায় গোটা তিনেক বেতের চেয়ার ছিল, একটা গোল বেতের টেবিল। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মধুমিতা। চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে ফিতে খুলতে লাগল অরূপ।

মন্দাকিনীর পেছন পেছন খালি পায়ে শোবার ঘরের দরজার সামনে এল মিতা। স্যান্ডেল জোড়া বাইরে সিঁড়ির ধাপে। প্রথমে মন্দাকিনী দেবী একটি ছোট কাঁসার ঘটি থেকে খানিকটা গঙ্গাজল নিয়ে নাতনীর গায়ে ছেটালেন। এটাই এখানকার নিয়ম। জুতো পায়ে তো নয়ই, বাইরের জামাকাপড় নিয়েও হুটপাট কেউ মন্দাকিনীর শোবার ঘরে ঢুকতে পারে না।

সেকেলে কারুকাজ করা মস্ত পালঙ্কে পুরু জাজিমের বিছানা। গোল নেটের মশারি, ধপধপে চাদর। মাথার বালিশ, পাশ-বালিশ, পায়ের কাছে মোটা তাকিয়া—সবটা সুজনি দিয়ে ঢাকা। বারান্দা আর ঘরের মেজে দাবার ছকের মত শাদাকালো পাথরে বাঁধানো। পালঙ্কের শিয়রে গোল শাদা পাথরের টেবিল। শাদা পাথরের গেলাসে জল ঢাকা রয়েছে। পাশে রূপোর পানের ডিবে। সন্দেশের বাক্সে গঙ্গাজল ছেটানো হল। আপেল কটি গঙ্গাজলে শোধন হয়ে পাথরের রেকাবিতে পাথরের টেবিলে জায়গা পেল। বাসন্তী সব ধুয়ে-মুছে রাখল। পাশে বাসন্তীর ঘর। তারপর রান্না আর ভাঁড়ার ঘর। বাড়িটি দোতলা বটে, কিন্তু দোতলার সব ঘরগুলি তালাবন্ধ। দোতলায় ওঠানামার কষ্ট বলে একতলায় এই চারখানি ঘর নিয়ে থাকেন মন্দাকিনী। এই চারখানি ঘরে বড় কড়াকড়ি। এছাড়া একতলায় সোফাসেট সাজানো একটি বেশ বড় বসবার ঘর, এবং আরো দুটি শোবার ঘর আছে। শোবার ঘর দুটি তালাবন্ধ থাকলেও, বসবার ঘরটি খোলা। বাড়ির ভেতরে লম্বা রোয়াক, বাঁধানো মস্ত উঠোন—সমস্তটা জলধরের মেয়ে কুসুম রোজ ঝাঁটপাট দেয়, ধোয়া-মোছা করে। উঠোনের পাশে টিউবওয়েল, বাথরুম ইত্যাদি।

তবে এই চারখানি ঘরের ধোয়ামোছা সব বাসন্তীর হাতে। বাসন্তী বামুনের মেয়ে। কুসুম কায়স্থ বটে, কিন্তু মন্দাকিনী ওকে খাবার জল ছুঁতে দেন না। কুসুম আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরে, বাইরের কাজে সারা বাগান চষে বেড়ায়, কাপড়-চোপড় ঠিকমত পয়-পরিষ্কার রাখে না। তাছাড়া ওর ছেলেমেয়ে দুটো নোঙ্‌রা। সুতরাং মন্দাকিনীর মহলে কুসুমের ঢোকার উপায় নেই। শুধু এঁটো বাসন, হাঁড়ি-কড়াই মাজে। তা-ও সাবধানে সারতে হয়। মন্দাকিনীর থালা বাটি গেলাস সব শাদা পাথরের। কুসুমের পর বাসন্তী জলে ধুয়ে নেয়, তারপর মন্দাকিনী নিজেই আবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেন। ঘরে এসে প্রথমেই নাত্‌নীকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই ছেলেটি কে?"

"আমার বন্ধু।" বেতের মোড়া টেনে খাটের পাশে বসল মধুমিতা।

"বন্ধু! বন্ধু কি রে!" পুরু কাঁচের চশমায় মন্দাকিনীর চোখ দুটি আরো বড় বড় দেখাল।

সহজভাবেই জবাব দিল মধুমিতা, "অরূপ আসলে দাদার বন্ধু, দাদা বিলেত যাবার পর আমার বন্ধু হয়েছে।"

"ধিঙ্গি মেয়ে, ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, লজ্জাও করে না, এরকম কটা বন্ধু আছে তোর?" ঠাকুমার কথা শুনে এবার খিলখিল করে হেসে উঠল মিতা। হাসতে হাসতে বললো, "এরকম বন্ধু আর একটাও নেই, য়ুনিভার্সিটিতে যাদের সঙ্গে পড়ি, তাদের সঙ্গে কফি-হাউসে আড্ডা দিই, ওই পর্যন্ত, ঘোরাঘুরি করি না, বাইরে কেনাকাটা, দু'একটা সিনেমা দেখা, এসব ইদানীং অরূপের সঙ্গে, তা-ও বেশীদিন নয়, সাত-আট মাস বলতে পারো।"

"ছেলেটি কি করে?"

মন্দাকিনীর জিজ্ঞাসার জবাবে বললো মিতা, "চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট, সে তুমি বুঝবে না, বড় কোম্পানীতে বড় চাকরি করে, অনেক টাকা মাইনে পায়, কলকাতায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে।"

"ওরা কি জাত?"

"তার মানে?"

"মানে, বামুন না কায়েত?"

"তাতো জানি না।"

"পদবী কি?"

"রায়, অরূপকুমার রায়।"

রায় পদবীতে কিছুই বোঝা যায় না। বামুন হতে পারে, কায়েত হতে পারে আবার বদ্যি হওয়াও আশ্চর্য নয়। নাতনীর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন মন্দাকিনী.

"তোর ইচ্ছেটা কি? ওর সঙ্গে বিয়ে বসবি?"

"যোহ",

আবার হেসে উঠল মধুমিতা, "বিয়ে বসবো কি? বিয়ে বলা যাকে বি কথায় কথায় অমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসিস্ না, হাসির কথা কি বল আমি তো জানি, মেয়েরা বিয়ে বসে, আর ছেলেরা বিয়ে করে।"

মন্দাকিনী গম্ভীর।

"ওসব সেকেলে বুলি ছাড়ো তুমি," হাসিমুখেই বললো মিতা, আমি এ বিয়েই করবো না, আগে এম-এ পাশ করবো, তারপর আইন পাশ করে জেঠুর সঙ্গে হাইকোর্টে বেরোব।"

"উকিল হবি তুই!" মন্দাকিনীর চোখ প্রায় কপালে উঠল, মেয়ে-উ আমার বাপের জন্মে দেখিনি, কানেও শুনিনি।"

"তুমি শুনবে কি করে, হাইকোর্টে গিয়ে দেখে এসো, কত মেয়ে উ শুধু উকিল নয়, এই তো কিছুদিন আগে দু'জন মেয়ে হাইকোর্টের হা হয়েছে, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, জেঠুমণিকে জিজ্ঞেস করো।"

মিতার কথা শুনে বললেন মন্দাকিনী, "আমার আর জিজ্ঞেস কাজ নেই, ওই জেঠুমণিই আদর দিয়ে তোমার মাথাটি খাচ্ছে, এত বড় মে বাপ-জেঠার কোন হুঁশ আছে!"

এ মন্তব্যের কোন জবাব দিল না মিতা। শুধু হাসছিল।

এমন সময় বাসন্তী এল, তোমরা খাবে তো দিদিমণি, রান্না চাপিয়ে দি চটপট হয়ে যাবে।"

"না, না, আমরা খেয়ে এসেছি, এখন কিছু খাবো না, বরং বিকেলে খাব।" মিতার কথা শুনে বললেন মন্দাকিনী, "আম-কাঁঠালের সময় এলি এখন কি দেব তোদের, পেঁপে আর পেয়ারা ছাড়া কিছু নেই।" বাসন্তী ব বলল, "আর ডাব আছে, ডাব কেটে দিই।" অরূপ তখন বারান্দায় বসেছি সামনে পুকুর। ঘন গাছপালা ঘেরা চমৎকার জায়গাটি। কলকাতার এত কা এমন বিউটি-স্পট, ভাবাই যায় না: গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। গাছপ ভেজা-ভেজা। আশ্বিনের আকাশ চক্‌চকে নয়। মধ্যে মধ্যে মন্থর মে আনাগোনা। একটা দোয়েল পুকুরঘাটে বসে লেজ নাচাল কয়েকবার। তার উড়ে ওপারে চলে গেল। একটা প্লেটে কাটা পেঁপের টুকরো নিয়ে এল বাসন্ত টুকরোগুলির গায়ে কয়েকটি টুথ-পিক গোঁজা। পেছনে মধুমিতা। বে গোল টেবিলটা কাছে টেনে প্লেট রাখল বাসন্তী।

মিতা বললো, "এটা খেয়ে নাও, তারপর চলো, তোমাকে বাগান ঘু দেখাই।"

অরূপ বললো, "এত পেঁপে কে খাবে?"

"কেন তুমি।"

"তুমি কিছু নাও!"

"পেঁপে নয়, আমি ডাঁসা পেয়ারা খাব, চলো তাড়াতাড়ি।"

"ওটা কি পাখি?" আঙুল তুলে দেখাল অরূপ।

"কোথায়?" অরূপের পাশে চেয়ারে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল মিতা।

ওই যে বকুল গাছের ডালে, একটা নয়, দুটো, ওই যে উড়ে গেল।"

"ও দুটো বুলবুলি।"

পাখি-টাখি তেমন চেনে না অরূপ। কলকাতা শহরের প্রধান পাখি কা মধ্যে মধ্যে কিছু পায়রা আর চড়ুই চোখে পড়ে। এছাড়া আকাশে চিল উড় দেখেছে, ওই পর্যন্ত।

পাখি আছে চিড়িয়াখানায়। কিন্তু সেখানে যাবার সময় কোথায়?

অফিস, বাড়ি, সন্ধ্যের পর ক্লাবের আড্ডা। কখনো দু'একটি সিনে কিংবা থিয়েটার। পাখি অথবা গাছপালা চেনার সময় কখন। আম কা কুলের গাছ চিনল অরূপ। বুলবুলি আর দোয়েল দেখল। দোয়েল চে পাখি। কিন্তু 'বুলবুলিটির মুখটি কালো', ছোটবেলায় পড়েছে বটে, ত কখনো মনোযোগ দিয়ে দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

পেঁপের টুকরো ক'টা শেষ হতে মিতা বলল, "চলো বাগানে যাই।"

কিন্তু তার আগে সিগারেট চাই। গাড়িতে দেশলাই আর সিগারেটের কৌ ছিল। সিগারেট ধরাল অরূপ। তারপর বললো, "চলো, কোথায় যাবে।"

আগে আগে যেন নাচতে নাচতে চললো মিতা। খুব খুশি। ওর আঁচ উড়ছে, বেণী দুলছে, কোমর দুলছে। বাগানের একপাশে কাছাকাছি ছড়ানো প্র দশ-বারোটা ছোট-বড় পেয়ারা গাছ। ডালে ডালে প্রচুর পেয়ারা। মধুমি হাততালি দিল, "দ্যাখো, দ্যাখো।" হাততালির শব্দে একটি উজ্জ্বল হলুদ রঙে পাখি পেয়ারা পাতার আড়াল থেকে উড়ে পালাল। কিছু দূরের একটা কাঁঠা গাছের ডালে গিয়ে বসল। মাথা কালো, ঠোঁট লাল।

"ভারী সুন্দর তো, কি পাখি ওটা?" অরূপ জানতে চাইল।

এক নজর দেখে মুখ ঘুরিয়ে হেসে বললো মিতা, "ওর নামটা ভালো নয়

"ভালো নয় কি রকম, কি নাম?"

মুখে আঁচল তুলে চোখ নামিয়ে জবাব দিল মিতা, "গেরস্তের খোকা হোক

হা-হা করে হেসে উঠল অরূপ, "অদ্ভুত নাম, সরকারের উচিত এই পাখি গুলিকে সব ধরে ধরে মিসায় আটকে রাখা।" বলতে বলতে সিগারেটে শেষ টা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

মিতা তখন নিচু একটা ডালের পেয়ারা ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল। গোড়ালি উঁ করে ডালটা ছুঁয়েছে বটে, কিন্তু পেয়ারার নাগাল পাচ্ছে না। ডালটা টেনে নামা অরূপ। কোন রকমে দুটি পেয়ারা ছিঁড়তে পারল মিতা। আঁচলে মুছে একটা কামড় দিল। আরেকটা এগিয়ে দিল অরূপের দিকে।

"না, আমি খাবো না, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, না ধুয়েই মুখে দিলে।"

"গাছ থেকে টাটকা ছিঁড়ে খাবার আনন্দই আলাদা, কলকাতায় এ জিনিস পাবে?"

কিন্তু ভাল ভাল পেয়ারা সব নাগালের বাইরে। অরূপও হাতে পেল না। এমন সময় জলধর দু' হাতে দুটি কাটা ডাব নিয়ে এল। পেছনে বাসন্তীর হাতে দুটো কাচের গেলাস।

মিতা বললো, "জলুদা, একটা আঁকশি এনে দাও।"

"আমি পেড়ে দিচ্ছি, কত পেয়ারা খাবে তুমি।"

"না, আমি নিজে নিজে পাড়ব।" মিতা বললো। এদিকে ডাবের জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিল অরূপ। তারপর ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

"এমা, এভাবে শুয়ে পড়লে কেন?"

"ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে, চমৎকার।"

পেয়ারা গাছের ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ। আকাশে আকাশে শেষ দুপুরের রোদ। কিছু দূরে বাঁশবাগানের ভেতর থেকে থেমে থেমে একটা ঘুঘু ডাকছিল।

চমৎকার! চমৎকার! একটা ছুটির দুপুর এভাবে কাটানো ভাবাই যায় না।

মিতা তখন আঁকশি নিয়ে দশ-বারোটা পেয়ারা মাটিতে ফেলেছে। আরো উঁচুতে একটা আধপাকা পেয়ারার নাগাল পাবার চেষ্টা করছিল। অরূপ উঠল। আস্তে আস্তে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে দুপাশ দিয়ে হাত নিয়ে ওর মুঠোর মধ্যে আঁকশিটা আরো উঁচুতে তোলার চেষ্টা করল। অরূপের বুকের মধ্যে মিতা। অরূপের নাকে ওর চুলের গন্ধ।

পেয়ারাটা মাটিতে ফেলার পর মিতা বললো, "এই ছাড়ো, কি হচ্ছে, জলুদা দেখছে না।"

কাছে-পিঠে কেউ নেই। আঁকশিটা এনে দিয়ে চলে গিয়েছিল জলধর। অরূপের হাত ঠেলে সরে দাঁড়াল মিতা। তারপর মাটিতে ছড়ানো আট-দশটি পেয়ারা দুজনে মিলে কুড়িয়ে নিল। আগের জায়গায় এসে বসল অরূপ। পাশে মধুমিতা। কাঁচাপাকা পেয়ারায় কামড় দিয়ে বললো, "আহ, কি ভালো, তুমি একটা নাও।"

"না, তুমিই খাও, তবে অতগুলো নয়, পেট কামড়াবে।" হাসি মুখে মিতার দিকে তাকিয়েছিল অরূপ।

"হাসছো কেন?"

"তোমার ছেলেমানুষি দেখে, বাচ্চা মেয়ের মতো পা ছড়িয়ে বসে পেয়ারা খাচ্ছো, তোমার কলকাতার বন্ধুরা এ দৃশ্য দেখলে কি বলবে।"

"কি আবার বলবে, ছোটবেলা স্কুলে পড়ার সময় এখানে এসে কত ছুটো-ছুটি করেছি।"

"তোমার বন্ধুদের নিয়ে এখানে পিকনিক করতে আসতে পার তো, সামনের শীতে আমরা সবাই আসবো।"

"এখানে পিকনিক!" কুলকুল করে হেসে উঠল মিতা, "খাবে কি?"

"কেন, সেবার বোটানিকসে যা হয়েছিল, ভাত মাংস হবে, নিজেরাই রান্না করে নেব, সেবার মাংসটা চমৎকার হয়েছিল, মনে আছে।"

"এখানে মাংস চলবে না", মিতা জবাব দিল, "মুরগী তো দূরের কথা, কোন রকম মাংসই এ বাগানে ঢুকতে পারবে না, পেঁয়াজ-রসুনও নয়, ঠাকুমার হুকুম।"

"তাই নাকি!" একটু যেন দমে গেল অরূপ, "তোমার ঠাকুমা খুব গোঁড়া বুঝি।"

"ভীষণ গোঁড়া, শুচিবায়ু বলতে পারো, যে জন্য মা-জেঠিমার সঙ্গে একদম বনে না, কলকাতার বাড়িতে ঠাকুমা এক বেলাও থাকতে চান না, আমরা মুরগী খাই, টেবিল চেয়ারে বসে ভাত খাই, খাবার সময় বাঁ-হাতে জলের গেলাস ধরি, উচ্ছিষ্ট বিচার নেই, আমাদের ঘরে বিলিতি কুকুর ঘুরে বেড়ায়, ঠাকুমার এ সব ভীষণ অপছন্দ।" বলতে বলতে আবার হেসে উঠল মিতা।

অরূপ হাসল না, হাসতে পারল না। আস্তে আস্তে বললো, "হাসছো কেন, এতে হাসির কি আছে, আমার ঠাকুমাকে দেখিনি, হয়তো তিনিও এরকম হতেন, এরকম মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না, এরা একটা আলাদা যুগ, আলাদা জগতের মানুষ, এ সব মানুষ আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।"

অরূপের কথার ধরনে মিতার হাসি থামল। থেমে থেমে বললো, "আমরা, জেঠুমণি কিংবা কাকামণির ছেলেমেয়েরা, আমরা আটজন নাতি-নাতনীরা সবাই ঠাকুমাকে খুব ভালবাসি, উনিও আমাদের ভালবাসেন, আমাদের কাছে পেতে চান, কিন্তু কি করবো, অত আচার-বিচার মেনে তো আর চলতে পারি না।"

"তা ঠিক, সেই জন্যই বুঝি উনি এখানে একা থাকেন।" অরূপ বললো, "তা হলে তোমরা কি করো, এখানে এলে সবাই কি নিরামিষ খাও?"

"প্রায় তাই", জবাব দিল মিতা, "তবে মা-জেঠিমা কখনো এলে, আলাদা হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে আসেন, আলাদা রান্নাঘর আছে, সেখানে পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া মাছ রান্না হয়।"

সামান্য ভেবে বললো অরূপ, "আমরা তাহলে নিরামিষ পিকনিকই করবো, খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, চাটনি, দই-মিষ্টি দিয়ে পুষিয়ে নেব।" এবার দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

তাড়াতাড়ি রোদ ঘুরে যাচ্ছে। সেই হলুদ পাখিটি আর ফিরে এল না।

একজোড়া বুলবুলি ওড়াউড়ি করছিল। নারকেল গাছের গায়ে একটা কাঠ-ঠোকরা গাছটার গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছিল। কিছু দূরে সার সার বেগুন, টম্যাটো আর লঙ্কার চারা লাগানো হয়েছে। দুই সারির ফাঁকে জল ঢালার নালি। সেই নালায় অল্প অল্প জলের পাশে এক ঝাঁক চড়ুই নেমেছে। কিচিরমিচির শব্দে জলে পাখা ঝাপটে স্নান সারছিল।

পুকুরের পাশে একটি শান্ত বক। কাছেই একজোড়া শালিক খুঁটে খুঁটে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল। অরূপের চোখের সামনে এই সব দুর্লভ দৃশ্যাবলী।

মিতা বললো, "কুঁড়ের মত বসে থেকো না, চলো ঘুরে বেড়াই।"

"কুঁড়েমি করতে ভাল লাগছে।" অরূপের নড়ার ইচ্ছে নেই। মিতা ওর হাত ধরে টানল, "ওঠো, ওঠো বলছি।" অগত্যা উঠতে হল। দুজনে পাশাপাশি ঘুরে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ।

কামিনী, কাঞ্চন, টগর, গন্ধরাজ ফুলের গাছ চিনল অরূপ। এ সব গাছে এ সময়টা তেমন ফুলের সমারোহ থাকে না। কিছু কাঞ্চন, দু'চারটে গন্ধরাজ ফুটেছিল।

আর একটা গাছ এখানেই প্রথম দেখল। বাগানের কোণে একটি তমাল গাছ।

এর আগে কয়েকবার শীতকালে বোটানিকস-এ গেছে অরূপ। সেখানে অনেক লোক, অনেক বন্ধুবান্ধব। হইচই, হুল্লোড়, উচ্ছ্বাস। সেখানে এমন নিরিবিলি, এরকম নির্জনতা ছিল না। শরতের শেষ দুপুরের এই গাছপালার মধ্যে পাখ-পাখালির ডাকাডাকি যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অরূপকে, মিতাকে। দুজনের কেউই আর বেশি কথা বলছে না।

পুকুর ঘাটে এসে বসল দুজনে। দেখতে দেখতে দুপুর ফুরিয়ে বিকেলের ছায়া নামল।

জলধরের মেয়ে কুসুম এসে ডাকল, "দিদিমণি, কত্তা-মা ডাকতিছেন।"

যেন ঘোর কাটল অরূপের, মধুমিতার। মিতা বললো, "হ্যাঁ, চলো।"

হাতঘড়ি দেখল অরূপ, চারটে বাজে। ওরা এসেছিল বেলা একটা নাগাদ। তিনটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। বারান্দায় উঠতে উঠতে লুচি ভাজার গন্ধ নাকে এল।

বারান্দায় বসল অরূপ। ভেতরে গেল মিতা। সেকেলে কড়ি-বরগায় ছাদ, মোটা মোটা থামওয়ালা উঁচু ভিতের বারান্দা। লোহার জাফরি দেওয়া রেলিঙ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অরূপ।

কি চমৎকার জায়গাটি! এই আশ্বিনের উজ্জ্বল দিনে সে যেন পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে এসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গেল। খানিক বাদে লুচি-বেগুন ভাজা সন্দেশের সঙ্গে চায়ের পর্ব মিটল।

এবার যেতে হবে। মন্দাকিনী দেবী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

মধুমিতা বললো, "চলি ঠাকুমা, আবার আসবো।"

"আবার কবে আসবি, আসতে পারবি, কে জানে, তোরা সব শহুরে হয়ে গেছিস, পাড়াগাঁয়ে আসতে কি আর ভাল লাগে।"

এ জায়গাটা অরূপের ভাল লেগেছে, আমরা অনেকে মিলে সামনের শীতের সময় এখানে পিকনিক মানে চড়ুইভাতি করতে আসবো, তোমার আপত্তি নেই তো।"

"আপত্তি কিসের, ওই মুখেই বলে যাচ্ছিস, আসিস না তো কোনবার।"

"এবার ঠিক আসবো, দেখো।" একটু থেমে আবার বললো মধুমিতা, "আমরা নিরামিষ রান্না করবো, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ-মাংস বাদ, অরূপই বলেছে, খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, চাটনি, দই, মিষ্টি হবে। তোমার আপত্তি করার কিছু থাকবে না।"

"আচ্ছা, আগে আয় তো, তখন দেখা যাবে।" ম্লানভাবে হাসলেন মন্দাকিনী।

অরূপ ততক্ষণে গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখেছে। ঠাকুমাকে প্রণাম করে সিঁড়ি ধরে নামার সময় চোখে পড়ল মিতার, পুকুরের ওপারে গেটের কাছে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

কি যেন নাম বলেছিল লোকটা। গাছ কিনতে চায়। এতক্ষণ গেটের কাছে বসেছিল নাকি। ওর কথা মধুমিতা ভুলেই গিয়েছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে ঘুরে দাঁড়াল, "ঠাকুমা, ওই লোকটা গাছ কেনার কথা বলছিল, ওই আমগাছটা কিনতে চায়, তোমাকে বলতে বলেছিল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে নাকি?"

"কোন লোকটা?" ওপারের দিকে তাকালেন মন্দাকিনী। তেমন কিছু নজরে এল না। তথাপি আন্দাজে বললেন, "ওই ছুঁচোটা আবার এসেছে বুঝি, প্রায়ই আসে, জলুকে আমি পই-পই করে বলেছি, ওকে এ বাগানের সীমানায় আসতে দিবি না, এই জলু জলু—"

তাড়াতাড়ি বললো মিতা, "জলুদার কোন দোষ নেই, সে বারণই করেছিল, ওই লোকটা আমাকে বলেছিল, তাই বললুম তোমাকে।"

"আমি মরলে পর সব উড়েপুড়ে যাবে জানি, তোর বাপ-জেঠা কি আর এসব রাখবে, রাখবে না। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে হবে না, আমার শ্বশুরের হাতে পোতা গাছ, ছুঁচোটা কোন্ সাহসে বলে।" সামান্য দম নিয়ে সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো নাতনীকে লক্ষ করে আবার বললেন, "আমি মরলে পর ওই আমগাছটা আমার সঙ্গে যাবে, তোর জেঠুমণিকে বলিস, ওই আম কাঠে আমার আগুন হবে।" শেষ কথা ক'টি শুনে অরূপ আর মিতার মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। গাড়িতে উঠল ওরা। মন্দাকিনী দেবী তখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আস্তে আস্তে পুকুরের পাড় ঘুরে গেটের কাছে এল গাড়িটা। সেখানে দাঁড়িয়েছিল রজবআলি। গাড়ির জানালা দিয়ে বললো মধুমিতা, "ঠাকুমা গাছ দেবেন না, খুব রেগে গেছেন, আপনি চলে যান, নয়তো জলুদা বকুনি খাবে।"

গাছপালা ঘেরা বাগানের নির্জনতা পেছনে ফেলে সুড়কির রাস্তা ধরে ওরা এগিয়ে চললো। কিছু দূরে যশোর রোড। বাঁক ঘোরার সময় দুজনেই একবার পেছনে তাকাল।

গেটের পাশে প্রহরীর মত দাঁড়ানো বিশাল হিমসাগর আমগাছটার মাথায় শেষ বেলার রোদ। যশোর রোডে উঠে কলকাতার দিকে মুখ ঘোরাল অরূপ।

সন্ধ্যের আগেই ওরা শহরে ফিরে যাবে।

ছবি : সুধীর মৈত্র

শংকর

॥ ৮৮ ॥

গণেশ সরকারকে মনে হলো যেন স্বর্গের দূত। আমি সবিস্ময়ে কতক্ষণ তাঁর দিকে বোকার মতো তাকিয়েছিলাম খেয়াল নেই। গণেশ সরকার নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো মশাই? ওইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?"

আমার এক-পা যে জেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল এবং এমন সহজ মুক্তি যে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না তা গণেশ সরকারকে বলি কী করে?

গণেশ সরকার কিন্তু আমার নীরবতার অন্য অর্থ করে বসলেন। তিনি বললেন, "আপনি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এতো বড় কেসটা আমি এক কথায় বন্ডা-বন্দী করে ফেললাম কেন?"

"না করে উপায় ছিল না, মিস্টার শংকর," নিজেই উত্তর দিলেন, গণেশ সরকার। "প্রাতঃস্মরণীয় ভি-আই-পিদের ইদানীংকার কীর্তিকাহিনীর দিকে নজর দিলে হাজতে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। কিন্তু আমরা মশাই সামান্য কর্মচারী, পেটের দায়ে এই পুলিসের চাকরি করতে এসেছি। যেখানে-সেখানে হাত বাড়াতে গিয়ে কি গোখরো সাপের ছোবল খাবো? হায়ার অথরিটি ইনিয়ে বিনিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের যা বলেন তা শুনে মানিয়ে গুছিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আমি নিজে প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে এমনভাবে জড়িত যে সাধারণ মানুষের মতো মন্তব্য করতে পারছি না। চুপ করে কথাবার্তা শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

গণেশ সরকার বললেন, "আমারই বোকামি হয়েছিল—সামান্য একটা টেলিফোনের ওপর ভরসা করে মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে এনকোয়ারি আরম্ভ করে দিলাম। এখন কে কে আমার ওপর পার্মানেন্টলি চটলেন তার ঠিক নেই।"

চিন্তিত গণেশ সরকার আমাকে জোর করে চায়ে আপ্যায়ন করলেন। তারপর বললেন, "ওই ভদ্রমহিলা—কী যেন নাম?"

"মিসেস পপি বিশোয়াস?"

"হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে, আমার হয়ে অ্যাপলজি চেয়ে নেবেন। অকারণে ওঁকে ডিসটার্ব করার জন্যে আমি দুঃখিত। উনিও যে অর্ডিনারি উয়োম্যান নন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"

থানা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো বুকের ওপর থেকে দশ মণ ওজনের ভারি পাথরখানা সরে গেল।

এসব কত দিন আগেকার কথা। কিন্তু প্রতি বছর প্রতুল বিশ্বাসের জন্মদিবসে তাঁর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয় তা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনা করে তোলে এবং থ্যাকারে ম্যানসনে দুঃসহ অন্ধকার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিসেস পপি বিশোয়াসকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার। কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকে বুঝলাম আসল খবর তাঁর কাছে এসে গিয়েছে।

মিসেস বিশোয়াসের ঘরের মধ্যে কলকালি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি একগাল হেসে হেসে নির্দেশ দিচ্ছেন, "যাবে আর আসবে—এক মিনিট দেরি করবে না কিন্তু, বাবা কলকালি।"

কলকালি যে আজ্ঞা পালনে কোনোরকম শৈথিল্য দেখাবে না তা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল।

মিসেস বিশোয়াস আমাকে দেখেই বললেন, "কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর। আপনার পারমিশন না নিয়েই এ-বাড়ির লোককে আমি কাজে লাগাচ্ছি। তবে যে-কাজে পাঠাচ্ছি তাতে আপনি না বলতে পারবেন না!"

কলকালি তখন ফিক ফিক করে হাসছে। সকালে কলকালির কিছু জরুরী ডিউটি থাকে সেসব কাজের কী হবে তা আমার জানা দরকার।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এর থেকে জরুরী কাজ আর থাকতে পারে না, মিস্টার শংকর আমি আপনার লোককে কালিঘাটে মায়ের পুজো দিতে পাঠাচ্ছি।"

টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে কলকালি এবার বিদায় নিলো। এবং মিসেস বিশোয়াস চোখ বন্ধ করে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন, "দেখো মা! তোমার দয়া ছাড়া এই অভাগিনী পপির আর কী আছে? বড় জোর রক্ষে করেছো এবার।"

চোখ খুলে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনার নামেও পাঁচ টাকা পুজো পাঠিয়ে দিয়েছি মিস্টার শংকর। একটু আগেই মিস্টার জেঠমালানি ফোন করেছিলেন, বললেন, ঠিক জায়গায় কলকাঠি নাড়া হয়ে গিয়েছে, আর কোনো হাঙ্গামা হবে না।"

আমি এবার থানায় গণেশ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করলাম। মিসেস বিশোয়াস বললেন, উঃ! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মিস্টার শংকর। আমি ভাবছিলাম, থানা কি অত সহজে ছাড়বে? যদিও মিস্টার জেঠমালানি বলে দিলেন, যদি পুলিশ আসে তা হলে অফিসারের নামটা জেনে নিয়ে ওঁকে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পাঠিয়ে দিতে।

মিসেস বিশোয়াস এবার আশা করি থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিয়ে আমাকে শান্তি দেবেন।

কিন্তু সে রকম কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না তাঁর হাবভাবে। গম্ভীর হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবার আমার আসল কাজ আরম্ভ হবে।"

কীসের কাজ? এতোদিন তাহলে নকল কাজ হচ্ছিল?

মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "আমাকে ডোবাবার জন্যে যে লোক ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল তাকে এবার আমি সুদে-আসলে শায়েস্তা করবো।"

রাগে গুমরে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "ভাবছেন, আমি ধরতে পারবো না, কে পুলিশের কানে প্রতুল বিশ্বাসের খবরটা তুলেছিল? আমি সব জেনে ফেলেছি—পপি বিশোয়াস ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না।"

পপি বিশোয়াসের এই অগ্নিমূর্তি দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ওঁর মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "নামটা এখন আপনার কাছে ফাঁস করবো না। তবে জেনে রাখুন, শত্রু নিকটেই আছে। নিরপরাধ পপি বিশোয়াসকে যখন বিপদে ফেলতে গিয়েছো তখন তোমার মুক্তি নেই!" আমাকে সাক্ষী রেখে অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে পপি বিশোয়াস যেন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

যে যেখানেই যুদ্ধ ঘোষণা করুন আমি আর কোনো লড়ায়ে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহী নই। মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে অকারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনের কাজকর্ম বেশ পিছিয়ে পড়েছি, কালিঘাটের কালীকে প্রণাম জানিয়ে এবার আমি নিজের কাজে মন দিতে চাই।

থ্যাকারে ম্যানসনে আমার স্বল্পপরিসর কর্ম-জীবনের ইতিবৃত্ত চলচ্চিত্রের মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই প্রাচীন প্রাসাদের কোটরে কোটরে সংসারের যে বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে, তার কিছুটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি—কিন্তু এ বাড়ির টেমপোরারি ম্যানেজার হিসেবে আমি নতুন কিছুই করতে সক্ষম হইনি। পুরনো সেই ট্রাডিশন, বহুদিনের জীবনধারা ঠিক আগের মতোই এখানে নিজের খেয়ালে বয়ে চলেছে। রামসিংহাসনের শাসনই এখানে অপ্রতিহত।

এক এক সময় আমি কত স্বপ্ন দেখেছি। সামান্য যে সুযোগ পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করে এই থ্যাকারে

'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে

সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা,
ডেটের সাদা

ম্যানসনে আমি লক্ষ্মী ফিরিয়ে আনবো; বহুদিনের যেসব পাপ এই প্রাচীন বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়েছে তার কিছুটা পরিষ্কার করবো এবং এমনি আরও কত পরিকল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে থেকেছে।

অফিস ঘরে ফিরে এসে আজ আমি হিসেব-নিকেশে মন দিয়েছি। এই থ্যাকারে ম্যানসনকে ইচ্ছে করলেই আমরা কত সুন্দর করে তুলতে পারি।

আমার মনে পড়লো, এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ এগোয়নি। এমন কি, আইনের শরণ নিয়ে বহু চেষ্টায় যে তিনখানা ফ্ল্যাট খালি করা হয়েছে তারও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। অথচ আজকালকার দরে নতুন ভাড়াটে আমদানি করলে এই তিনখানা ফ্ল্যাট থেকেই বিলাসিনী দেবীর উপার্জন অনেক বেড়ে যেতে পারে। সেবার বিলাসিনী দেবী থ্যাকারে ম্যানসনের বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু আমার পক্ষে বেশী দিন হাত-পা গুটিয়ে এমনভাবে বসে থাকাটাও নীতি-সম্মত নয়। বিলাসিনী দেবীকে এ-বিষয়ে অবহিত করবার মতো সময় অবশ্যই আবার এসেছে।

এই সব চিন্তায় যখন বিভোর হয়ে আছি তখন ঘরের মধ্যে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন গণপতিবাবু।

গণপতিবাবু চিৎকার করে বললেন, "কী খবর? কী হলো তোমার?"

চেয়ারে বসে পড়ে গণপতিবাবু জানালেন, "সাত সকালে খুব আর্জেন্ট কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটু আগেই অ্যাটর্নিপাড়ার বুড়ী ছুঁতে গিয়ে বেয়ারার কাছে শুনলাম তুমি ফোন করেছিলে।"

চোখ বুজে বিচক্ষণ গণপতিবাবু বললেন, "কাজের প্রেসার খুব। কিন্তু টু প্লাস টু করে মনে হলো তোমার সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করা দরকার।"

গণপতিবাবুর দূরদৃষ্টি সত্যিই অদ্ভুত। একটা খিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, "আপিসের বেয়ারার কাছে শুনলাম তুমি স্পেশাল কিছু বলোনি। কিন্তু আমি ভাবলাম, এতো সকালে আমি যে আইন পাড়ায় আসি না তা তো শংকরের জানা। তবু সে কেন এই অসময়ে খোঁজ করলো? নিশ্চয় কোনো আর্জেন্ট দরকার। তাই ছুটে চলে এলাম।"

গণপতিবাবুকে কী উত্তর দেবো ভাবছি। যে-বিপদ থেকে অলৌকিকভাবে একটু আগে উদ্ধার পেয়েছি তার কথা যথাসময়ে অবশ্যই গণপতিবাবুকে নিবেদন করতে হবে। কিন্তু এখনই তাঁকে কী খবর দেবো?

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বিশেষ ভাবতে হলো না। গণপতিবাবু নিজেই বললেন, "যাক! আমার হিসেব যে ভুল সে তো তোমার মুখ দেখেই আন্দাজ করছি। বুঝতে পারছি, এমনিই খোঁজখবর করেছিলে। অথচ আমি ধরে নিয়েছিলাম এস-ও-এস?"

হাল্কা মেজাজে গণপতিবাবু হুকুম করলেন, "এসেই যখন পড়েছি তখন চা জলখাবারের ব্যবস্থা লাগাও। ক'দিন ধরে শান্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়াও করবার ফুরসতও মিলছে না।"

চায়ের দোকানের বয় ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। গণপতিবাবু বললেন, "লক্ষ্মীসোনা আমার, রিপন স্ট্রীটের মোড়ে বটগাছের তলা থেকে গরম সিঙাড়া খান আষ্টেক নিয়ে আয়; আর মুড়ি নিবি মারকুইস স্ট্রীট-ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড় থেকে।"

গণপতিবাবু কোনো কথাই শুনলেন না। মুড়ি ও সিঙাড়ার পয়সা নিজের পকেট থেকে বার করে ছেলেটির হাতে দিলেন। বললেন, "তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হরি উকিলের বাড়িতে কত মুড়ি সিঙাড়া খেয়েছি। তোমার বাড়ি-ঘরদোর হোক, তখন আবার গিয়ে হইচই করে মাছের ঝোল ভাত দই সন্দেশ খেয়ে আসবো।"

আমার অফিসে বসে গণপতিবাবুর জলখাবারের পয়সা দেওয়াটা তবু ভাল লাগছে না। হাসতে হাসতে গণপতিবাবু বললেন, "ছোটখাট ব্যাপারে এতো মাথা ঘামিও না, শংকর। একদিন রাহাখরচ এবং জলখাবার বাবদ যা পকেটে এসেছে তার সিকিভাগও খরচ হয়নি। পরের অ্যাকাউন্টের ওই সব পয়সার একটা গতি করতে হবে তো?"

গণপতিবাবু বললেন, "ক'দিন যা এমার্জেন্সি ঘোরাঘুরি হচ্ছে!"

মুড়ির আগেই প্রথম কাপ চা এসে গিয়েছে। গণপতিবাবু বললেন, "আগে লোকে বলতো মরার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। কিন্তু এ যুগে হাই-সোসাইটিতে তা আর সত্যি নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাজকর্ম শেষ। আজকাল, বড়লোকের ওয়ারিসনদের শ্মশান থেকে ফিরেই প্রচন্ড ছোটাছুটি করতে হয়। এক মুহূর্ত দেরি করবার উপায় নেই। যত দেরি হবে তত গোলমাল বাধবে!"

গণপতিবাবু হাসছেন এবং আমি বোকার মতো ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। গণপতিবাবু বললেন, "কার যে কী আছে তা আজকাল চোখের দেখা দেখে বলা মোটেই সম্ভব নয়। এই আমার লেটেস্ট কেসটার কথাই ধরো না।"

গণপতিবাবু চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিলেন "ভদ্রলোককে জনসভায় দেখেছি—গান্ধী আন্দোলনে লেকচার শুনেছি—কাগজে কত ছবিও দেখলাম। কিন্তু কিছুই বুঝিনি।"

আমার শরীর সিরসির করছে। ঘুরে-ফিরে গণপতিবাবুও কী একই প্রসঙ্গে চলে আসছেন?

আমি এবার মুখ খুললাম। "আপনি কী মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের কথা বলছেন?"

বিস্মিত হলেন গণপতিবাবু। "হরি উকিলের ছেলেই বটে তুমি! কী করে বুঝে ফেললে তুমি? খাসা ব্রেন তোমার! তোমাকে উকিল করা উচিত ছিল আমার।"

গণপতিবাবুকে কী করে বোঝাই মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ভূত আমার স্কন্ধে সারাক্ষণ চেপে রয়েছেন।

গণপতিবাবু চাপা গলায় জানালেন, "প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার অন্য রকম আইডিয়া ছিল। মনে হতো

খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু মৃত্যুর পরেই ও'র ভাইপোকে নিয়ে হাজির হলেন তোমাদের ওই বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেক্টর মিস্টার ভরত সিং। আমার কর্তাও ফোনে বলে দিলেন, যতটা পারো, মিস্টার সিংকে হেল্প কোরো।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু বললেন, "তারপর আর কী? মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের বেনামে অনেক কিছু সম্পদ চারদিকে ছড়ানো আছে। তার একটা গোপন লিস্টি ভাইপো বাবাজীবনের হাতে এসে পড়েছিল ঠিক সময়ে। তাই কুইক অ্যাকশন নিতে হলো।"

অ্যাকশনের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন না গণপতিবাবু। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "অর্ডিনারি লোকদের সঙ্গে মহাপুরুষদের কী তফাৎ বলো দিকি?"

অর্ডিনারি লোকদের সব কিছুই অর্ডিনারি এবং গ্রেটম্যানদের সব কিছুই গ্রেট, আমি আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম।

"আগে আমিও ওই রকম ভাবতাম। কিন্তু স্বাধীনতার পর কয়েকটা ভি আই পি স্পেশালি হ্যান্ডেল করে আমার ভুল ভেঙেছে। আমি বুঝেছি—অর্ডিনারি লোকরা যা নিজের নামে করেন, মহাপুরুষরা তাই বেনামে করেন। প্রতুল বিশ্বাসের শুধু সোনাদানা হীরে জহরতই ছিল না; অনেক সম্পত্তিও আছে। সেসব ঠিক মতো ভাঙিয়ে খেতে পারলে, বিশ্বাস মশায়ের ভাইপোর তিনপুরুষে কোনো কষ্ট হবে না।"

আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন গণপতিবাবু। বললেন, "মরবার পরেই ভাইপোকে আমার সঙ্গে একটু যা ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। বেনামা হীরে জহরত বিষয় সম্পত্তির ওইটাই অসুবিধে—চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষকরা ভক্ষক হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গণপতি সামন্তর মতো এক্সপার্ট তম্বিরকারক থাকলে হজমের কাজটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।"

"প্রতুল বিশ্বাসের অনেক সম্পত্তি বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তা ভগবানের দয়ায় এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মন্দ ম্যানেজ করেননি বিশ্বাসমশাই। বিশেষ করে যদি মনে রাখা যায় যে বিশ্বাসমশাই নিজেই গর্ব করে বলতেন যে তাঁর কোনো অসটেনসিবল মিন্‌স্‌ অফ লাইভলি হুড নেই!"

গণপতিবাবু এবার হেসে ফেললেন। বললেন, "আপাতত কোনো উপার্জনের পথ নেই, অথচ কেউ বেশ সুখে বসবাস করছে এটা কিন্তু একটা অফেন্স। আমাদের জাহান আলী বিশ্বাসকে ওই গ্রাউন্ডেই তো পুলিস অ্যারেস্ট করে থানায় পুরে রেখেছিল।"

গণপতিবাবু এবার কপালে হাত ঠেকালেন। বললেন, "যাকগে যাক, আমাদের ছোট মুখে ওসব বড় কথা মোটেই মানায় না। শুধু এইটুকু দেখছি, মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের অনেক ওয়েল-উইশার আছেন। বরুণা প্রপার্টিজের মিস্টার ভরত সিং যেভাবে বিশ্বাসমশায়ের ভাইপোকে হেল্প করছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। উনি পিছনে না থাকলে অত সহজে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতোগুলো বেনামা সম্পত্তি নিজের দখলে আনা ভদ্রলোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না।"

দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের এই পরিপূর্ণ চিত্রটি পেয়ে আমি সার্থকভাবে কৃতার্থ বোধ করলাম। এই মহান নেতার জীবন সম্পর্কে এখন আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আমি আর এ বিষয়ে গণপতিবাবুর সঙ্গে আলোচনাও করতে চাই না—নতুন কথা থেকে আবার নতুন কী খবরের আলোকে প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাস উদ্ভাবিত হয়ে উঠবেন তার ঠিক নেই।

আমি এবার গণপতিবাবুর সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। থ্যাকারে ম্যানসনে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব—অনাগত কোনো বিপদের অস্পষ্ট ইঙ্গিতও যেন দূর দিগন্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই অবস্থায় চন্দ্রোদয় ভবনের বিলাসিনী দেবীর সমস্ত খবরাখবর আমার বিশেষ প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে একমাত্র গণপতিবাবুই আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।

কিন্তু গণপতিবাবু আর ... ও হাতে-গরম সিঙাড়ার ওপর ... পড়েছেন। কোনো সিরিয়াস ব্যাপারে তিনি ... নাক গলাতে এখন প্রস্তুত নন।

মুড়ি চিবোতে-চিবোতে গণপতিবাবু উপদেশ দিলেন, "প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে যা বললাম সব ভুলে যাও। আমি হচ্ছি সম্পত্তির ডাক্তার—যত রোগ পেলে তার চিকিৎসা করি। কেন রোগ হলো তার নৈতিক দিক নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের উচিত নয়।"

আরও একখানা সিঙাড়া মুখে পুরে দিলেন গণপতিবাবু। বললেন, "তা ছাড়া উপায় নেই, ভাই। ন্যায়-অন্যায়ের অঙ্কে জড়িয়ে পড়লে এ-লাইন থেকে বিদায় নিয়ে বনবাসী হওয়া ছাড়া গণপতি সামন্তর কোনো উপায় থাকবে না।"

গণপতি এবার দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকালেন। মুড়ি খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে দিয়ে বললেন, "এতো কাছাকাছিই যখন এসে গিয়েছি তখন একবার মিস্টার ভরত সিং-এর খোঁজ করি। ও'র সঙ্গে কিছু জরুরী আলাপ আলোচনা আছে।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং লোক এই মিস্টার ভরত সিং", টেলিফোনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করবার আগে মন্তব্য করলেন গণপতিবাবু।

ডায়াল করতে করতে গণপতিবাবু বললেন, "জার্মান ক্ষুরের মতো ধারালো বুদ্ধি। এই ক'দিন একসঙ্গে কাজ করেই কিছু কিছু নমুনা পেলাম।"

"হ্যালো, হ্যালো মিস্টার ভরত সিং? আমি গণপতি বলছি। ...হ্যাঁ, আমি আপনার খুব কাছে থেকেই ফোন করছি—থ্যাকারে ম্যানসন।"

"হ্যালো, হ্যালো আমি পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আপনার ওখানে চলে যেতে পারি। ...হ্যালো, কী বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ মিস্টার শংকর, ও'র অফিসেই আমি বসে আছি। ...ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। তবে কোনো দরকার ছিল না।"

গণপতিবাবু এবার টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন "এই সব বুদ্ধিমান লোকের মতলব বোঝা মুশকিল। থ্যাকারে ম্যানসনের নাম শুনে বললেন, তিনি নিজেই গাড়ি নিয়ে আসছেন। আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। আমি আপত্তি করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।"

গণপতিবাবু বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান এই ভরত সিং। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের থেকেও মালিকের প্রতি বিশ্বস্ত। নাগরচাঁদ সুরজলালের এই বরুণা প্রপার্টিজ ভরত সিং ছবির মতো চালিয়ে যাচ্ছেন; এবং অন্য নতুন দায়িত্বও টপাটপ নিচ্ছেন।"

"প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপো খুব লাকি— এমন পার্টির সাহায্য পেয়ে যাচ্ছেন," মন্তব্য করলেন গণপতিবাবু।

গণপতিবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "এদের কাজের ধারাই আলাদা। প্রতুল বিশ্বাসের প্রপার্টির জন্যে সব কিছুই করছে, কিন্তু কখনও স্টেজে অ্যাপিয়ার করছে না। আমরা কারুর জন্যে কিছু করলে, তা সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র রটিয়ে বেড়াই। কিন্তু মিস্টার ভরত সিং-এর মুখে যেন গোদরেজের অটোমেটিক চাবি লাগানো আছে—একটি দরকারি খবর অসাবধান মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বার চান্স নেই।"

"মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের প্রতি এমন সহৃদয়তার কারণ কী?" আমি এবার গণপতির কাছে জানতে চাই।

"নিশ্চয় অনেক উপকার করে গিয়েছেন—না হলে, মৃত্যুর পর এইভাবে ভাইপোকে ও'রা সার্ভিস দিয়ে যাবেন কেন?" গণপতিবাবু নিজের বিদ্যেবুদ্ধিমতো উত্তর দিলেন।

এবার একটু মাথা চুলকোলেন গণপতিবাবু। বললেন, "শুধু পাস্ট টেন্স নিয়ে মাথা ঘামালে বিজনেসম্যান হওয়া যায় না। ফিউচার টেন্সের কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন গণপতিবাবু। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমাদের অফিস ঘরের পাশেই মোটরের হর্ন বেজে উঠলো।

[ক্রমশ]

শ্রীকাকুলম

অমিতাভ ভট্টাচার্য

"শ্রীকাকুলম! মানে, যেখানে খুব নকশাল?" হ্যাঁ, সেই শ্রীকাকুলম। তবে এই লেখা সেই পরিচিত শ্রীকাকুলমের কথা নয়। সে তো আপনারা সবাই কম-বেশী কিছু না কিছু জানেন। এখানে বলব সেই জায়গার কথা, এর প্রাকৃতিক পরিবেশ, এর লোকজন, এখানকার বন-ঝোপ-ঝাড়, নদী-সমুদ্র-পাহাড়ের কথা। আমার সঙ্গে শ্রীকাকুলমের পরিচয় বেশী দিনের নয়, বছর দেড়েকের মাত্র। তবে সময় অল্প হলে কি হবে, এর মধ্যেই এর সাথে আমার আত্মিক যোগ হয়ে গিয়েছে অনেকটা। এ তারই গল্প।

শ্রীকাকুলমে আসার দিনটা মনে পড়ে। এপ্রিলের

শ্রীকাকুলমের সমুদ্রসৈকত

মাঝামাঝি। মাদ্রাজ মেলে চড়ে সেই আমার দক্ষিণ-ভারতের পথে প্রথম যাত্রা। রেল-স্টেশনের অতি-পরিচিত "চায়, চায় গরম"-এর জায়গায় ঘুম ভাঙালো "কফি, ইডলী"র ডাক। বুঝলুম দক্ষিণে ঢুকেছি। শ্রীকাকুলম রোড স্টেশন থেকে মাইল সাতেক দূরে শ্রীকাকুলম শহর। রাস্তাঘাট, দুপাশের কুঁড়েঘর, বাড়ি—সবেতেই চূড়ান্ত দারিদ্র্য ছড়ানো অপর্যাপ্তভাবে। সার্কিট-হাউসে যখন পৌঁছলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। নানা কর্মব্যস্ততায় দিন গেল কেটে। সন্ধ্যার সময় আবার ফিরে এলুম সার্কিট হাউসে। স্নান-টান সেরে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, হঠাৎ-হয়ে জমে গেল মনে। ঠিক পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে কলকল করে জলের ধারা, শুকনো নদীর এক ধার দিয়ে। বিরাট চওড়া নদী, হলুদ বালুতে ভরা।

নদীর ওপারে ছোট্ট কটি টিলা আর তাল গাছের বন। বহু দূরে নদী দিয়ে হেঁটে পার হচ্ছে কত লোকজন মোষের পাল আর মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ি। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় এই ভীষণ সিলহুট। ঝোড়ো হাওয়া বইছিল সারাদিন। কাছাকাছি চেনাশোনা কেউ নেই, অ্যাটেন্ডার চেন্নায়া ছাড়া। সেই মুহূর্তে আমি পৃথিবীতে অসহায় একা। হঠাৎ মনটা হু হু করে উঠলো। আমার আবাল্য লালক কলকাতা ছেড়ে এ কোথায় এলুম? যে অদৃশ্য তিলক আমার কপালে পরিয়ে পথের দেবতা আমায় ঘরছাড়া করে এনেছে সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অভিজ্ঞতা তো এখনও আমার হয়নি। সন্ধ্যার বিষন্ন পরিবেশ, দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন, ঝোড়ো হাওয়ায় তাল-গাছের উথাল-পাথাল—তখন সবই অসহ্য লাগতে লাগল। হঠাৎ দেখি কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ছাই-হলদে ছোপের একটি সাপ—কয়েক হাত দূরে। চেন্নায়া লাঠি হাতে তাড়ালো ওটিকে—তারপর নির্বিকারভাবে বললে "পামু"। প দিয়ে তাই শুরু হল আমার তেলুগু বর্ণমালার শিক্ষা!

*

ওড়িশা পেরিয়ে অন্ধ্রের প্রথম জেলাই শ্রীকাকুলম। বয়সে শ্রীকাকুলম স্বাধীন ভারতবর্ষের চাইতে বছর তিনেকের ছোট। ভিশাখাপট্টনম জেলার একাংশ নিয়ে, প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে, ১৯৫০ সালে শ্রীকাকুলম আলাদা জেলার মর্যাদা পেল।

শ্রীকাকুলম-কে, আদর করে বোধ হয়, অনেক বাঙালী নানা নামে ডাকে। মুসৌরীর এক অধ্যাপক আমাকে লেখা চিঠির ঠিকানায় সব সময় লিখতেন শ্রীকাকাকুলম। প্যারিস থেকে আমার বন্ধু লিখত "তোমার কাকুলামের এখন কি অবস্থা?" শ্রীকাকুলম নামটা বোধ হয় এসেছে শিকাকোল কিংবা শিখাখোল থেকে। পুরোনো কাগজপত্রে দেখি এ জায়গার নাম ছিল chicacole।

জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় আঠাশ লক্ষের কাছাকাছি। এবং এর প্রায় ৮.২ শতাংশই হল আদি-বাসী। ওড়িশার লাগোয়া বলে এখানে ওড়িয়াদের সংখ্যাও বেশ ভালরকম। তিনটে রেভেনিউ ডিভিশন—শ্রীকাকুলম, পার্বতীপুরম এবং টেক্কালী—নিয়ে এই জেলা। তার মধ্যে টেক্কালী এবং শ্রীকাকুলম হল কোস্টাল ডিভিশন—অর্থাৎ সমুদ্রের লাগোয়া। প্রায় একশো পঁচানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ এই জেলার সাগরতীর। আর আছে পূর্বঘাট পর্বতমালা। পর্বতের ওপর হেলান দিয়ে সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে শ্রীকাকুলম। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য বৈচিত্র্য এবং বর্ণসম্ভারের তুলনা তাই ভারতবর্ষের বেশী জায়গায় নেই।

বেশ কটি নদী বয়ে গিয়েছে এর মাঝ দিয়ে। পূর্বঘাট পর্বতের থেকে এদের উৎপত্তি, তারপর গিয়ে মিলেছে বঙ্গোপসাগরে। বর্ষাকাল ছাড়া এতে জল থাকে না বিশেষ। এদের ভরাযৌবন অতি অল্পদিনের তারপরই জীর্ণ বুড়ী। বংশধারা, নাগাবলী, জনপদ তনয়া, বহুধা বেগবতী আর সুবর্ণমুখী হল এখানকার প্রধান নদী। শ্রীকাকুলম শহরের দু পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে নাগাবলী আর বংশধারা। সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তারা পাঁচ-ছ কিলোমিটার দূরে। চূড়ান্ত গ্রীষ্মেও তাই এই শহরে বয়ে চলে ঝোড়ো বাতাস। অনেকে সে জন্য শ্রীকাকুলম শহরকে ডাকে "গরীবলোকের উটি" বলে। শহরটুকু ছাড়া বাকি সব জায়গায় আবহাওয়া অবশ্য এ রকম নয়। আমাদের এক দক্ষিণ-ভারতীয় অধ্যাপক বলতেন—সাউথে তিন রকমের ওয়েদর, হট, হটার এবং হটেস্ট একেবারে সত্যি।

এখানে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ষাকাল চলে প্রায় ডিসেমবর মাস পর্যন্ত। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারপর আবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর। ডিসেম্বরে খরিফ ধান কাটা হয়। তারপর নভেম্বর ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে ভরা নানা ইরিগেশন ট্যাঙ্ক-এর জল নিয়ে জমি তৈরি করা হয় রবি শস্যের চাষের জন্য। তবে এখানে খুব অল্প পরিমাণ জমিতেই ইরিগেশন ট্যাঙ্ক কিংবা নদী থেকে কাটা চ্যানেলের জলের সুবিধে আছে। বংশধারা নদীতে তৈরী হচ্ছে বিরাট ব্যারাজ—এর কাজ সম্পূর্ণ শেষ হতে লাগবে আরো ক' বছর। কাজ শেষ হলে এর দ্বারা উপকৃত হবে কয়েক লক্ষ একর জমি। শ্রীকাকুলমের চেহারা যাবে একেবারে পালটে। পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা জেলার মত শ্রীকাকুলমও হয়ে উঠবে তখন সোনার ফসলে ভরপুর।

ধান, আখ, মেস্তা, জোয়ার, বজরা, ছোলা এবং মটরের ডাল, বাদাম প্রভৃতি হল এখানকার প্রধান উৎপন্ন শস্য। গমের চলন এখনও হয়নি বিশেষ। ত

কুত্তাপল্লীতে আদিবাসীদের জন্য নির্মিত কলোনী

তামাক-পাতা এবং কফির বাড়তি উৎপাদনের জন্যে হয়েছে। এ ছাড়া, সমুদ্রের পারের কাছে হয় কল আর 'কাজু বাদামের চাষ। এখানকার প্রতীরবর্তী উদ্যানমু অঞ্চল নারকেলের জন্য এবং পসা বিখ্যাত কাজু বাদামের জন্য।
জেলার প্রায় দুশো কিলোমিটার দীর্ঘ সাগরতীরে রয়েছে বহু জেলেদের গ্রাম। সমুদ্রের চিংড়ি ধরে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারী াগের নানা সমবায়-সমিতির মাধ্যমে সারাদিনের শ্রমের ফসল বিক্রী করে এদের এখন যা অর্থ র্জন হয়, তা নিতান্ত মন্দ নয়। ক' বছর আগেও দালালদের একাধিপত্য। ঋণভারে এই দরিদ্র জীবীদের ডুবিয়ে অত্যন্ত নগণ্য দামে ওরা কিনে সমস্ত মাছ, তারপর প্রচুর লাভে বিক্রী করত লব বিদেশে রপ্তানির জন্য। তবে আজ আর সে নেই। সরকারী সাহায্য এবং ব্যাংক কিংবা সমবায় তিগুলোর পক্ষ থেকে অতি অল্প ঋণে, এদের া হচ্ছে নাইলনের জাল এবং মাছ ধরবার অন্যান্য তীর আধুনিক সরঞ্জাম। সরকারী সাহায্যে পুষ্ট াম সমিতি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ ই সেই মাছ ন্যায্য মূল্যে কিনে নেওয়া হচ্ছে কাংশ ক্ষেত্রে একেবারে সমুদ্রের পার থেকেই।
সাধারণভাবে এখানকার সমুদ্র তীরবর্তী মৎস্য-ীদের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় কতটা হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। মুশকিল হ একটা, আপনি আমি সেই অতি স্বাদু চিংড়ির ল পাবো না। একটা মাঝারি গলদা চিংড়ির দাম এক টাকা।

*

একদিন সকালে ক্যাম্প অফিসে বসে কাজ ছ। নভেম্বরের শেষাশেষি। বিকেল বেলা, ছুটির আলতো শীতের চুমু। আর জায়গাটা হল ড় জঙ্গলের মধ্যে এক আদিবাসী-অধ্যুষিত ল। ক'জন লোক এসে আমাকে জানালে যে ওদের গ্রামে আগের রাত্তিরে একটি দশ-বারো বছরের মেয়েকে বাঘে মেরে ফেলেছে। পরের দিন সকালে মেয়েটিকে না পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারপর কিছু দূরে হঠাৎ এক জায়গায় প্রচুর রক্ত দেখতে পেয়ে, রক্তের ফোঁটা ধরে ধরে এগিয়ে ফার্লং দুয়েক দূরে এক পাথুরে টিলার ওপর মৃত-দেহটির সন্ধান পায়।

লোকজন সঙ্গে নিয়ে বেলা চারটে নাগাদ রওয়ানা হলুম গ্রামটির দিকে। কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে জীপ থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলুম। সন্ধ্যে হব হব। চারদিকের নিথর ঝোপগুলো দেখে চূড়ান্ত সাহসী লোকেরও মনে ভয় উঁকি মারবে। কিন্তু আমার ভয় পাওয়ার উপায় নেই, তা ছাড়া এমন একটা জায়গায় পেঁৗছে গিয়েছি যখন বিপদ দু দিকেই সমান। তাই বাধ্য হয়ে চরৈবেতি। গ্রামে পেঁৗছতেই সবাই এসে জড়ো হল। গ্রামের বৃদ্ধতম লোকটি আমাকে সব ঘটনা বললে।

গ্রামটি একটি বিরাট পাথুরে পাহাড়ের ঠিক নীচে। যে মাটির ঘর থেকে বাঘটি মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটি গ্রামের এক প্রান্তে পাহাড়ের লাগোয়া। মেয়েটি ঐ গ্রামে এসেছিল ক'দিন আগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। রাত্রে বোনের সাথে মাটির বারান্দায় একটা খাটিয়ার ওপর ঘুমিয়েছে, বাঘটি নিখুঁত চুপিসাড়ে মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনির মাঝা-মাঝি ফুট দেড়-দুয়েকের ফাঁক দিয়ে বারান্দায় ঢুকে, মেয়েটিকে নিঃশব্দে তুলে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাত্রে কেউ টেরও পায় নি। মাটির সিঁড়ির ওপর বাঘের পায়ের ছাপও দেখলুম।

গাঁয়ের লোকেরা আমাকে নিয়ে চলল। কিছুদূরে পর পর দেখি পাথরের ওপর শুকনো রক্তের ছাপ। তারপর বেশ ক'টি বিশাল পাথরের ওপরে, মাটি থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচুতে, এক জায়গায় দেখি প্রচুর ছাই আর শুকনো রক্ত রয়েছে পড়ে। এখানেই দুপুরবেলা গাঁয়ের সবাই মেয়েটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে। এদের এক সংস্কার হল, বাঘে-মারা দেহকে ওরা ছোঁবে না। তাই যেখানে যেখানে রক্তের ফোঁটা পড়েছে মৃতদেহের সন্ধান পেয়েছে সেখানে সেখানেই ওঁরা গাছের ডালপালা জড়ো করে সব পুড়িয়ে ফেলেছে।

ঠিক তার দু দিন পর আবার খবর এল যে ঐ গ্রাম থেকে মাইল দশেক দূরে আবার একটি ন-দশ বছরের ছেলেকে বাঘে মেরে গিয়েছে। যে রাত্তিরে ছেলেটি মারা গেছে তার পরের দিন সকালবেলা খবর পেয়েই সেই গ্রামে ছুটলুম। সে এক বীভৎস করুণ দৃশ্য।

সে গ্রামটিও একটি পাহাড়ের নীচে। অমাবস্যার রাত। রাত আটটা নাগাদ নাকি গ্রামের কিছু লোক ছেলেটির কাতর আর্তনাদ শুনে দেখতে পায় একটি জন্তু দৌড়ে চলেছে গ্রাম ছেড়ে। সেই ভীষণ আঁধার রাতে অসহায় গাঁয়ের লোকের আর কিছু করার ছিল না। গিয়ে দেখি, ছেলেটির বাবা চুপচাপ বসে আছে। ঐ লোকটিরই বাড়িতে নাকি আগের গাঁয়ের বাঘে-মারা মেয়েটি থাকত। একই পরিবার থেকে দুই গ্রামে দুটি ছেলেমেয়ে অপঘাতে মারা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার।

কিছুদূর এগিয়ে দেখি মাঠের ওপর পড়ে রয়েছে একটি কাপড়ের টুকরো—নভেম্বরের শীতের রাতে কচি শিশুটির একমাত্র বসন। তার অল্প দূরেই শিশুটির বিচ্ছিন্ন মাথাটি এবং কনুই পর্যন্ত বাঁ হাত। আর সে হাতের অনামিকায় একটি আংটি। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। সেখান থেকে ফুট পঞ্চাশেক দূরে একটু জঙ্গলের মধ্যে শিশুটির মস্তিষ্কহীন উপুড় করা মৃতদেহ। আর সেই ফ্যাকাশে রক্তহীন শরীর ভরা পিঁপড়ের প্রলেপ।

আমাদের সাধ্যে যতটুকু করার ছিল সব করে ফিরে এলাম। সারাদিন মনটা ছিল বিষণ্ণ। তবে আশ্চর্য লাগছিল একটা কথা ভেবে। সেটি হল গ্রামের লোকে-দের নির্বিকার ভাব, এমন কি মৃত ছেলেটির বাবারও। (দুঃখ এদের জীবনে নতুন নয়।) আদিবাসীদের মধ্যে

।জিহন্দমের বৌদ্ধ স্তূপ

ই নির্লিপ্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জন্ম থেকেই তিকূল পরিবেশের সঙ্গে শুরু হয় এদের লড়াই। দের জীবন তাই নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। দু মুঠো অন্নের চিন্তাই যে প্রধান। আত্মীয়-বিয়োগের ন্য শোকপ্রকাশের এদের অবসর কোথায়?

এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা এবার বলি। ই জেলার তিনটে রেভেনিউ ডিভিশনের প্রধান দুটো, ার্বতীপুরম এবং টেক্কালী, হল আই এ এস অফিসার-দের জন্য। আর সদর ডিভিশনের প্রশাসনিক দায়িত্ব ল ডেপুটি কলেক্টর-এর। প্রত্যেকটি ডিভিশন আবার বভক্ত কয়েকটি তালুকে। তালুকের প্রধানকে বলা হয় হশীলদার বা তালুক ম্যাজিস্ট্রেট। এ জেলাতে সর্ব-মেত রয়েছে দশটি তালুক, শ্রীকাকুলম, চিদ্রুপল্লী, বাম্বলী, সালুর, পার্বতীপুরম, পালকোন্ডা, াতপটনম্, নরসনপেট, টেক্কালী আর সোমপেটা বং একটি স্বনির্ভর সাব-তালুক, ইচ্ছাপুরম্। য়েকটি ফির্কা মিলে এক একটি তালুক এবং প্রত্যেকটি ফর্কা হল বেশ ক'টি গ্রামের সমষ্টি। প্রায় প্রতিটি ামে রয়েছে একজন করে গ্রাম-মুন্সেফ আর একজন রে কর্ণম্। মুন্সেফের প্রধান দায়িত্ব হল গ্রামের াান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি ংগ্রহ করা। আর কর্ণম্-এর কাজ হল জমি এবং াষবাস সংক্রান্ত যাবতীয় রেজিস্টার, নথিপত্র রাখা বং তাতে কার কত জমি, কি ধরনের জমি, তার ার্ভে কিংবা সাব-ডিভিশন নম্বর, তাতে কোন সময় ক ফসল চাষ করা হচ্ছে, তার জন্য কত রাজস্ব দিতে বে, ইত্যাদি সমস্ত কিছুর হিসেব নিকেশ রাখা। গ্রামে খনও তাই মুন্সেফ এবং কর্ণমের প্রতিপত্তি প্রচুর। য়েকটি গ্রাম মিলে যে একটি করে ফির্কা, তার প্রধান ল রেভেনিউ ইনস্পেকটর।

গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য রয়েছে গ্রাম ঞ্চায়েত। নির্বাচনের মাধ্যমে এর প্রধান ঠিক হয়, াকে বলে সরপঞ্চ। অনেক গ্রাম নিয়ে একটি পঞ্চায়েত মিতি বা ব্লক। আর পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর ওপর ল জেলা-পরিষদ। এ জেলায় রয়েছে তিন হাজারেরও শী গ্রাম এবং তার জন্য চব্বিশটি পঞ্চায়েত সমিতি। তিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে থাকে একজন করে বি.ডি ও এবং একজন নির্বাচিত সমিতি-প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে যেহেতু কোন সমিতি-প্রেসিডেন্ট নেই, তাই ব্লকে ব্লকে রয়েছে একজন করে স্পেশাল অফিসার। গ্রাম পঞ্চায়েত-গুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তমানে এক্সিকিউটিভ অফিসারের। এবং জেলার প্রধান, জেলা শাসক এবং কলেক্টর হলেন জেলা পরিষদের স্পেশাল অফিসার। আগামী পঞ্চায়েতী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই আরো কমাস চলবে।

এই চব্বিশটি সমিতির মধ্যে তিনটে, বদ্রাগিরি, সীতমপেটা এবং পাচিপেন্টা হল ট্রাইবাল এজেন্সি ব্লক। এখানে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য কতগুলো বিশেষ আইনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া, বর্তমানে আদিবাসীদের জন্য অন্যান্য প্রচুর সুযোগ সুবিধেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা আশ্রম স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। এখানে থাকা, খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখা-পড়া—সব কিছুর খরচই সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করে থাকে। জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের সংগ্রহ করে আনা নানান দ্রব্য ন্যায্য দামে কেনার জন্য জায়গায় জায়গায় রয়েছে সরকারের গিরিজন কো-অপারেটিভ কর্পোরেশনের ডিপো। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে ডেইলী রিকোয়ারমেণ্ট শপ, সংক্ষেপে ডি আর শপ, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় পণ্যাদি, চাল, ডাল, চিনি, কেরোসিন তেল প্রভৃতি ন্যায্য দামে বিক্রী করা হয়। এর ফলে, দালাল-দের উৎপাত এখন প্রায় নেই বললেই চলে।

এ ছাড়া আদিবাসীদের আর্থিক নানা সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার জন্য জেলাতে রয়েছে গিরিজন ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সী, অনুন্নত গরীব চাষীদের জন্য স্মল ফারমার্স ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সী বা এস এফ ডি এ, এবং সিডিউলড কাস্ট কর্পোরেশন, ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ কর্পোরেশন প্রভৃতি। গত কয়েক বছরে এ জেলাতে সরকারের বিশেষ নজর পড়ায়, সামগ্রিক-ভাবে এর বেশ উন্নতি শুরু হয়েছে। গত ক' বছরে বিশেষ করে ভূমি-সংস্কারের কাজও হয়েছে ভালো। তবে এখনও প্রচুর কাজ বাকি। এখনও এ জেলা চূড়ান্ত অনুন্নত।

বছর খানেকের আগে একটি গ্রামের এক অর্থ-নৈতিক রিপোর্ট আমি তৈরি করেছিলুম। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার ওপর ভিত্তি করে সেই রিপোর্ট আমি লিখেছিলুম। ছোট্ট এই গ্রামটির লোকসংখ্যা মাত্র ছ'শ চৌত্রিশ। তার মধ্যে দুশো একত্রিশ জনের মাথাপিছু বার্ষিক গড়পড়তা আয় দুশো টাকার নীচে, একশো তিরানব্বই জনের আয় বছরে দুশো থেকে সাড়ে চারশো টাকার মধ্যে, বার্ষিক

মুখলিঙ্গম মন্দির

আয় সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে আটশোর মধ্যে হল একশো দু' জনের এবং সমস্ত গ্রামে মাত্র আটাত্তর জনের মাথাপিছু গড়পড়তা বার্ষিক আয় সাড়ে আটশো টাকার ওপরে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বি এস মিনহাস-এর মতে ১৯৬০-৬১-র দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী মাথাপিছু বছরে দুশো টাকা আয় হল গ্রামীণ দারিদ্র্য রেখার পরিমাপ। আমার গ্রামে, শ্রীমিনহাসের হিসেব মতোই, প্রায় শতকরা বাহাত্তর জন লোক গ্রামীণ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে কারণ আমি যে আয়ের কথা লিখেছি সেটা ১৯৭৬ সালের। তাই অর্থনীতিবিদদের হিসেব মত যদি দেশের শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, শ্রীকাকুলমের এই বিশেষ গ্রামটির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এবং এ জেলায়, এরকম গ্রামের সংখ্যাই যে বেশী সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ নেই।

রিপোর্টটি থেকে আরো পেয়েছি যে গ্রামের মাত্র পঁচিশ শতাংশ লোক কোন না কোন ভাবে বছরের কোন না কোন সময়ে কাজকর্ম করে থাকে, বাকী সব একেবারে শুধু বেকার। এই গ্রামের একশ-ত্রিশটি পরিবারের পঞ্চান্ন শতাংশের কোন জমি নেই এবং মাত্র তিন-শতাংশের জমি আছে পাঁচ একরের বেশী করে। এবং গ্রামের প্রায় নব্বই শতাংশ চাষের জমিই হল অন্য জায়গার ভূস্বামীর দখলে। অর্থনৈতিক অবস্থা এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

গ্রামের লোকসংখ্যার মধ্যে দুশো অষ্টাশী জনের বয়েস ষোল বছরের নীচে, একশো বাষট্টি জনের বয়েস ষোল থেকে বত্রিশের মধ্যে, একশো ন' জনের বয়েস হল বত্রিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে এবং মাত্র পঁচাত্তর জনের বয়েস আটচল্লিশের ওপর। অর্থাৎ গ্রামের প্রায় একাত্তর শতাংশের বয়েস বত্রিশ বছরের নীচে। এবং মাত্র বারো শতাংশের বয়েস আটচল্লিশের বেশী। এর থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যের মোটামুটি আন্দাজ করা যাবে।

এ জেলাতে রয়েছে ছ'টি ডিগ্রী কলেজ, এগারটি জুনিয়র কলেজ আর প্রচুর সংখ্যায় হাই-স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুল। প্রতিটি তালুকে আছে একটি করে সরকারী হাসপাতাল, এ ছাড়া জেলাতে আছে বেশ কিছু প্রাইমারী হেল্‌থ্ সেন্টার এবং সমিতি ডিসপেন্সরী। শ্রীকাকুলমের জেলা হাসপাতাল মোটামুটি-ভাবে আধুনিকভাবে সজ্জিত। প্রায় বাইশ শতাংশ গ্রামে, ১৯৭৫-এর হিসেব অনুযায়ী, পেঁৗছে গিয়েছে বিদ্যুৎ।

খনিজ সম্পদের সম্ভারও এ জেলায় খুব কম নয়। গরিভিডির কারখানায় বছরে উৎপন্ন হয় প্রায় বাইশ হাজার টন ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ অ্যালয়। ম্যাঙ্গানীজ ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় অভ্র আর গ্রাফাইট।

*

এখানে মন্দিরের সংখ্যা অগুন্তি। রাস্তায় যেতে যেতে দু' ধারে দেখতে পাবেন ছোট এবং মাঝারী ধরনের মন্দির প্রচুর। প্রধান মন্দির হল তিনটে, অরসভেল্লী, শ্রীকূর্মম্ এবং শ্রীমুখলিঙ্গম। প্রত্যেকটি মন্দিরেই আছে চমৎকার ভাস্কর্যের নিদর্শন। ওড়িশার নিকটবর্তী বলে এগুলোতে ওড়িশার মন্দিরের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট। অরসভেল্লীকে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সূর্য মন্দির হিসেবে অনেকে বলে থাকেন। শ্রীকূর্মমে রয়েছে কূর্মনাথস্বামীর বিগ্রহ—ঠিক এই ধরনের মন্দির নাকি দেশের আর কোথাও নেই। শ্রীমুখলিঙ্গম হল শিবের মন্দির। প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে জমায়েত হয় প্রচুর পুণ্যার্থীর দল, সোমেশ্বরকে পুজো দেওয়ার জন্য। বংশধারা নদীর পারে এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে। এ মন্দিরের গায়ে খোদিত আছে রামায়ণ, মহাভারতের নানা কাহিনী। মন্দিরের দেওয়ালে অন্যান্য মূর্তির মধ্যে খাজুরাহোর প্রভাব বেশ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া, কলিঙ্গপট্টনমের কাছে সালিহুন্দম বিখ্যাত হল তার বিশাল বৌদ্ধ এবং জৈন স্তূপের জন্য।

সাধারণভাবে এখানকার লোকেরা বেশ ধর্মপ্রবণ। উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও পাঁজি-পুঁথি দেখে, দিন-ক্ষণ দেখে সব কাজকর্ম করে। বেশীর ভাগ লোকের নামই দেব-দেবীর নামে—সিমহাচলম, নরসিমহম, তিরুপতি, ভেঙ্কটেশ্বর, মুরলীধর, সীতাপতি, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ছড়াছড়ি। অনেকে, বিশেষ করে যারা মাদ্রাজে লেখাপড়া করেছে, আবার তামিলদের মত নামের শেষে 'ন' যোগ করে দেয়। তাই রাম হয়ে যায় রামন্, কৃষ্ণ থেকে কৃষ্ণন, তেমনি রামকৃষ্ণন, রাধাকৃষ্ণন, মাধবন, শঙ্করণ প্রভৃতি।

গণেশ চতুর্থী, দশেরা, গৌরী-পূর্ণিমা, দীপাবলি, কার্তিক পূর্ণিমা, নাগুলা চতুর্থী, পোঙ্গাল, শিবরাত্রি, উগাদি প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎসব। এ ছাড়া নানান লোকাচার। তার প্রধান একটি হল রজস্বলা স্নানম্। কুমারী মেয়েদের পুষ্পোৎসর্গের সময়কার ক'দিন ওদের থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। তারপর, পিরিয়ডের শেষে, স্নান করার দিন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে ডেকে সাধ্যমত আপ্যায়িত করা হয়। তবে প্রথম ব্যাপারটি যদি শুভ দিনে না হয়, তা হলেই মুশকিল। তখন আবার ব্রাহ্মণ ডেকে পুজো করাতে হবে। এই আচার প্রায় সারা দক্ষিণ ভারতেই প্রচলিত। আরেকটি ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি গ্রামে। জানি না সেটি অন্য সব গ্রামে মানা হয় কিনা। সেটি হল, কোন বাড়িতে যদি কেউ অশুভ-দিনে মারা যায়, তা হলে বাড়ির সব লোক কয়েক দিনের জন্য সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। ঐ সময় নাকি অশুভ আত্মা ঐ বাড়িতে ভর করে থাকে।

*

সেদিন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম এ এস সি বোস। ভাবলুম, হয়তো বাঙ্গালী। কিন্তু না, 'এ' হল ভদ্রলোকের পদবীর প্রথম অক্ষর আর 'এস সি বোস' হল সুভাষচন্দ্র বোস। বুঝুন, শুধুমাত্র সুভাষ নামটি না নিয়ে পুরোপুরি সুভাষচন্দ্র বোস-ই নিয়ে নিয়েছে। এখানে তাই দেখতে পাবেন অনেক কে রবীন্দ্রনাথ টেগোর কিংবা বি রামমোহন রায় কিংবা এম চিত্তরঞ্জন দাশ। তা, সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম পুরো সুভাষচন্দ্র বোস নামটি নেওয়ার কি অর্থ? ভদ্রলোক হেসে উত্তর দিলেন যে উনি অনেক কষ্টে নেতাজীটুকু বাদ দিতে পেরেছেন। ওনার এক বন্ধুর নাম হল পি এল বি জি তিলক! 'লোকমান্য'-টুকুও ছাড়েননি।

বিনয়, শিক্ষানুরাগ প্রভৃতি এখানকার লোকেদের বিশেষ গুণ। সাধারণভাবে এঁরা গুণীর সমাদর দিতে জানেন। সেদিন এখানকার সরকারী হাসপাতালে গিয়েছি উপদেষ্টা কমিটির সভায় পৌরোহিত্য করতে। মিটিং-এর শেষে, কমিটির এক সদস্য, স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার আমাকে এসে বললেন, "স্যর, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আই উড প্রেজেণ্ট ইউ এ বুকলেট রিটন বাই মি।" সেটি হল "ফিলসফি অফ টেগোর অ্যাণ্ড অটোবায়োগ্রাফিকাল এলিমেণ্ট ইন সাম অফ টেগোরস শর্ট স্টোরিজ অ্যাণ্ড নভেলস।" লেখক ডক্টর রামা রাও। এরকম পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় এ ব্যাপার আমি কল্পনা করতে পারিনি। টেক্কালীর মত জায়গায় এক ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের লেখার তেলুগু এবং [illegible] অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার ওপর জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখছে—এ ভাবা যায় না। এ রকম দৃষ্টান্ত আরো পেয়েছি। এমনকি আমার বর্তমান অ্যাটেণ্ডার, তিরুপতি রাও শরৎচন্দ্রের, এখানে লোকমুখে পরিচিত শরতবাবু বলে, প্রায় সব উপন্যাস পড়েছে। প্রথমে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি, তারপর যখন বললে যে রবীন্দ্রনাথের 'কান্তি মেরামেরা'ও পড়েছে তখন আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 'কান্তি মেরামেরা' হল 'চোখের বালি'র তেলুগু অনুবাদ।

এ দেশের লোক, তিরুপতি, চেন্নায়া, কিষ্টাম্মা, রেণ্ডু, আপ্পালাসুরী, গণেশ—এদের আর ভালো না লেগে পারা যায় না। সন্ধ্যের সময় দূরের পাহাড়ের পেছনে মেঘ আর আকাশ যখন সূর্যাস্তের হোলি খেলায় মত্ত, ঠিক যখন দেখি মাদ্রাজ-হাওড়া মেল ঝড় তুলে ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে, হঠাৎ নতুন করে বুঝতে পারি :

> পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
> মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
> নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
> সে কথা যে ভুলে যাই
> দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
> পরকে করিলে ভাই।

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

ওয়ার্ক এডুকেশন

চারদিকে চারটে টেলিফোন সাজিয়ে স্বপেশবাবু গম্ভীর মুখে বসে আছেন। যে ভরাট মুখে সদা সর্বদাই হাসি দেখি, আজ সে হাসি কে ইরেজ করে দিলে! একটা টেলিফোনের চাকতি অনবরতই ঘুরিয়ে চলেছেন। নন-স্টপ, লাগাতার। অবশেষে দুম্। শালা। সিগারেট। ঘূর্ণায়মান চেয়ারে চেতল মাছের মত চেতিয়ে পড়লেন। পেটটা একটু টান টান হল। পট্ করে একটা প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে টেবিলের তলায় চলে গেল। বন্ধুর এমত ছিলছেঁড়া অবস্থা উল্টো দিকের চেয়ারে বসে চুপ করে দেখা যায় না। রাজদ্বারে আর শ্মশানেই তো বন্ধুর পরিচয়! এটা শ্মশান নয় রাজদ্বার। বাজার দর যে রকম বেড়েছে তাতে শাসালো বন্ধুবান্ধবদের একটু খবরটবর রাখতেই হয়। চা, সিগারেট ইত্যাদি ন্যূনতম ভদ্রতা। বোকা আত্মীয়স্বজন খুঁজে পেতে বের করতে হয়। ছুটির দিন সকালে, বেশ সপরিবারে, রাজা রাণী, সারি সারি বাড়ে গুটি গুটি হাজির হয়ে যাও। ফ্রায়েড রাইস হে, হে, একটু নতুন গুড়ের পায়েস, নিদেন প্রেসার কুকারে ঝুরঝুরে খিচুড়ি। দু টাকার কমলালেবু ইনভেস্ট করে টু ইস্টু টেন কি টুয়েলভ?

খুব জরুরি ফোন মনে হচ্ছে! প্রায় আধ ঘণ্টা হল এসেছি, এখনো চায়ের অর্ডার গেলো না। কোন্ একসচেঞ্জ! ডবল সেভেন! দিন একবার চেষ্টা করে দেখি। সম্প্রতি আমি টেলিফোন মাদুলি ধারণ করেছি। ভূতঘাটের কাছে এক সিদ্ধ যোগীকে পেয়ে একটু খরচ করে একসেট মাদুলি করিয়ে সর্বাঙ্গে ধারণ করে বসে আছি। টেলিফোন মাদুলি—একবার চাকা ঘোরালেই যাতে লাইন পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিল মাদুলি—দুম করে পিলে চমকানো বিল যাতে না আসে। বাস মাদুলি স্টপেজে দাঁড়ালেই যাতে মোটামুটি খালি একটা স্টেট বাস আসে এবং সে বাস যেন ব্রেকডাউন না হয়ে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত যায়। জল মাদুলি, সকালে কলে যেন স্নানের জল থাকে।

স্বপেশবাবু মাদুলি ফাদুলি তেমন বিশ্বাস করেন না। পুরুষকার! বোম্বেটেদের মত গোঁফ। রিসিভারটা হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন চেষ্টা করে। পাবেন বলে মনে হয় না। বাড়ির লাইন। অফিসে এসে তক চেষ্টা করছি। আমার মাদুলি যশ, স্বপেশের কপাল। টাক্ করে লাইনটা পাওয়া গেল। স্বপেশ বলছেন, কে মহুয়া! কেমন আছে! অ্যাঁ! ফুটো বন্ধ হয়েছে। ঘিলু বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে না। কি করছে। শুয়ে আছে! বেশ বেশ। ফোন শেষ হল। ব্যাপারটা কি!

ওয়ার্ক এডুকেশান। তার মানে! মানে, কর্মশিক্ষা। কাকে, আমার পুত্রের ব্রহ্মতালু ঠুকরে ছেঁদা করে দিয়েছে। সেই ছেঁদা কিছুক্ষণ আগে মোম দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। ওয়ার্ক এডুকেশানের সঙ্গে কাগের কি সম্পর্ক! আছে ভাই আছে। কর্মের সঙ্গে কর্মফলের সম্পর্ক নেই? বলেন কি। কর্মফলে মানুষ কলকাতায় আসে, তারপর সংসারী হয়, ছেলেপুলে হয়। মাতার গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ভর্তির ফর্মের জন্যে লম্বা লাইন লাগাতে হয়। তারপর মহাভারত করতে হয়। মহাভারত করতে হয় মানে! মানে! সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অ্যাডমিশান টেস্টের ব্যূহ ভেদের কৌশল শেখাতে হবে অভিমন্যুকে। রোজ রাতে গর্ভস্থ সন্তানকে অর্জুন অবজেকটিভ টেস্টের তালিম দিয়ে চলে। পাঁচ হাজারে পাঁচ জন হয়তো অ্যাডমিশান পাবে। পঞ্চাশখানা বই। একশো খাতা। সবার ওপরে ওয়ার্ক এডুকেশান। তা এর মধ্যে কাক আসে কি করে? বাঃ আসবে না! কাক আসবে, কোকিল আসবে, চন্দনা, টিয়া আসবে, পেঙ্গুইন আসবে, পেলিকেন আসবে, হরেক রকম প্রজাপতি আসবে, লক্ষ রকম গাছের পাতা আসবে, পাখির বাসা আসবে, বাঘের দুধ আসবে, গণ্ডারের নাক আসবে, সিংহের কেশর আসবে, গুষ্ঠির পিণ্ডি আসবে।

রেগে গেছেন মনে হচ্ছে! রাগলে চলবে [illegible] ভাই। সবে তো কলির সন্ধ্যে। রাগ নয় ভাবনা। অল্প [illegible] বয়েসের ছেলে। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবল। হাত পা লিক লিকে। শরীরের সব পুষ্টি মাথা টেনে নিচ্ছে। মাথায় বুদ্ধির আগুন ঠিক রাখতে উনুনের তলায় গুঁজছি—ছানা, ডিম, মাখন, কড়াপাক, নরম পাক, হোয়াইট মিট, গাজর, বিট। খাদ্যের তালিকায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। শীতের ভোরে বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েই চোখে এক থাবড়া ঠাণ্ডা জল, এক গেলাস গরম দুধ সঙ্গে কৌটোর প্রোটিন, 'মেলো এগ', দুটো বিস্কুটের মাঝখানে মাখমের প্যাচ, মাল্টি ভিটামিন। তারপর একপাশে মা, তার পাশে গ্যাসের উনুন, দুটো বার্নারে দুটো প্রেসার কুকার, হাতে ছুরি, কোলে ফুল কপি, ডান চোখ কপির দিকে, বাঁ চোখ ছেলের অঙ্কের খাতার দিকে। আর এক পাশে বাবা। একগালে সাবান, হাতে সেফটি রেজার, একটা চোখ আয়নার দিকে, আর একটা চোখ খোলা খাতার দিকে। করুন তো মশাই একটা অঙ্ক—দুটো সংখ্যার বিয়োগ ফল ১৪০, সংখ্যা দুটোর লসাগু ৪০৯৫, সংখ্যা দুটো কি! নাওয়া-খাওয়া আমাদের মাথায় উঠে গেছে মশাই। গত সাত দিন ধরে পেছন উলটে ওই সংখ্যা দুটো ধরার চেষ্টা করছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়ার্ক এডুকেশানের পাখি ধরা। চল্লিশ রকমের পাখির পালক সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে খাতার পাতায় সাঁটতে হবে। চা খেতে খেতে চল্লিশ রকমের পাখির একটা লিস্ট তৈরি করে দিন তো, তারপর দেখি, স্বামী স্ত্রী, কিরাত কিরাতী হয়ে আঠা কাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাখি ধরতে। চড়াই, শালিক, গানশালিক, ছাতারে, দোয়েল, কোয়েল, টিয়া, বাবুই, কাক, মাছরাঙা, বক, চিল শকুনি। চড়াই বাড়িতে পাবো, ঘুঘু ভিটেয় পাবো, শকুন ধাপার মাঠে পাবো। কাক ক্যানসেল। সাংঘাতিক পাখি মশাই। বাড়ির পাশে একটা গাছ। গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে ছাদে। ডালে কাকের বাসা। সাত সকালে ছেলে আঁকশি দিয়ে কি কেরামতি করতে গিয়েছিল কত্তা গিন্নি দু জনেই এসে ব্রহ্মতালুতে ঠকাঠক। ক্লিন ছেঁদা। ছেঁদা দিয়ে ব্রেন লিক করছে। পুরোনো কলকাতার হুতোমের আমলের কোনো ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা দেখি, তাহলে হয়তো বুলবুলি আর পায়রা পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা মুরগি কি পাখির মধ্যে পড়বে।

স্বপেশের ফোন আবার খুর খুর করে উঠল। কথা বলতে বলতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাল-ভাঙা-নাবিক যেন সবুজ দারুচিনির দ্বীপ দেখেছেন। বড়ই সুখবর! কি খবর! চিড়িয়াখানার ডিরেকটর এক প্যাকেট পালক রেডি রেখেছেন। যাই পেট্রল পুড়িয়ে নিয়ে আসি। তাহলে চলুন আমিও যাই। আমারও ওয়ার্ক এডুকেশান। আমার অবশ্য পালক নয়। প্রাণীদের দেহ আবরণ যেমন, কচ্ছপের খোল, কাঁকড়া, সাপের খোলোস, মানুষের মুখোস।

ওঠার মুখে স্বপেশের অধস্তন কর্মচারী গোবেচারা নন্দবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার! কোনো মৃত্যু সংবাদ! তার চেয়েও খারাপ। আমার স্ত্রী হাজতে। কারণ! সরকারী উদ্যানে ঢুকে গাছের পাতা ছেঁড়ার অপরাধে। কেন মাথা খারাপ নাকি। আজ্ঞে না। মেয়ের ওয়ার্ক এডুকেশানের গাছের পাতা। আমাকে বলেছিল পালক, কাল অফিসের ফেদার ডাস্টারটা পেট-কাপড়ে করে নিয়ে গেছি? পাতার কথায় মিষ্টির দোকান থেকে শালপাতা আর ছাদের কার্নিস থেকে বটপাতা যোগাড় করে দিয়েছিলুম। এখন বুঝছি স্বামীজী কেন বলেছিলেন চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, চালাকির দ্বারা আর যাই হোক ওয়ার্ক এডুকেশান হয় না। পাপিয়ার মা পুতুল তৈরি করবেন, সুনন্দর বাবা নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে আয়:শালার অশ্বের ছবি আঁকবেন, অলকার দিদি ডিমের খোলে মোম ঢেলে মোম ডিম বানাবে, পটলবাবু পাকা চুল দিয়ে নাগা মুখোস তৈরি করবেন, দিদিমণিরা পরীক্ষা করে ঘরকাটা কাগজে নম্বর বসাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ডিভিসান পাবে। এডুকেশান ইজ দি মেনিফেস্টেসান অফ পারফেকসান অলরেডি ইন ম্যান।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান

অগ্রজ বিজ্ঞানী

কে আর রামনাথন

আমেদাবাদ। ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারি। এই গবেষণাগারেরই আট তলায় ডঃ এইচ এস এস সিন্‌হার কাছে প্রসঙ্গটি তুলতেই তিনি বললেন, এখন কি প্রফেসারকে পাবেন? বিজ্ঞান কংগ্রেস চলছে। এই উপলক্ষে চলছে নানা রকম বৈজ্ঞানিক সভা এবং আলোচনাচক্র। আজ সকালের দিকে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির সভায় ও'কে একবার দেখেছিলাম। তারপর দুপুরের দিকে আপনার জন্যে কয়েকবার ও'র খোঁজ করেছি। পাইনি। আমার মনে হয়, বিকেলে সন্ধান দিতে পারব।

বিকেলে সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ও'র একান্ত সচিব জানালেন, প্রফেসর এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন। আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় আপনার অসুবিধে হবে কি?

আমি জানালাম, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

কথা বললাম টেলিফোনে। ডঃ সিন্‌হারই ঘর থেকে। তিনি বললেন, এখন তো বিকেল সাড়ে চারটে, আর কিছুক্ষণ বসলে হয়ত আজই দেখা পেতে পারেন। পাঁচটার মধ্যে তিনি ফিরে আসবেনই।

বললাম, পাঁচটার পরও একজন বয়স্ক মানুষকে বিরক্ত করব, কি করে ভাবলেন? সারাদিন ছোটাছুটি করছেন। বিশ্রাম তো দরকার?

ডঃ সিন্‌হা মৃদু হেসে বললেন, বিকেল পাঁচটা তো ও'র কাছে কিছুই না। উনি রাত সাতটা পর্যন্তও কখনও কখনও গবেষণাগারে কাটান। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অথবা পড়াশুনা।

বললাম, না। আজ বরং থাক। কাল সকালেই দেখা করব।

ভাল। তবে হ্যাঁ, দয়া করে সময়টা মনে রাখবেন। বললেন ডঃ সিন্‌হা।

সকাল সাড়ে ন'টা। বললাম আমি।

বয়েস হলেও প্রফেসারের সময়ানুবর্তিতায় এখনও ভাটা পড়েনি। আমার দিকে চেয়ে আর একবার মৃদু হাসলেন ডঃ সিন্‌হা।

বললাম, নিশ্চিত থাকুন। আমি ঠিক সময়েই হাজির হব।

সেদিন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারি থেকে ফেরার পথে অবাক হয়েছিলাম। এখন তাঁর বয়েস ৮৫ বছর। অবাক হয়েছিলাম এই পরিণত বয়েসেও একটা মানুষের এতটা তৎপরতা দেখে।

পরদিন দেখা হল। কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে ন'টায় তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দু হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আমার একান্ত সচিব গতকাল আপনার কথা আমাকে বলেছেন। আমার আর বলার কি আছে? গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ আমাকে স্থান দিয়েছেন। আমি কিছুটা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু সেটা সামান্যই ব্যাপার।

বলেই মৃদু হাসলেন তিনি। সরল, উন্মুক্ত মন এবং আত্মস্থ মানুষ।

অধ্যাপক কালপাথি রামকৃষ্ণ রামনাথন। জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩। মুখোমুখী বসে স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন তিনি। আর মাঝে মাঝেই মন্তব্য করলেন: ...ট অ্যাবাউট মি, নট অ্যাবাউট মি। রাইট অ্যাবাউট ...স ল্যাবরেটরি। আই মিন পি আর এল। এ [illegible] ...ব বিক্রম সারাভাই।

খানিকটা স্বগতোক্তির মতই বলে চললেন তিনি: আমার জন্ম কেরালায়। ১৯১১ সালে আমি পালঘাটের চকরভারিয়া কলেজ থেকে আই এস-সি পাশ করি। তারপর চলে যাই মাদ্রাজে। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করলাম ১৯১৪ সালে। আমার প্রধান বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা। বি এ পাশের পর এক বছর আমার নষ্ট হয়। ১৯১৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পদার্থ বিজ্ঞানে এম এ পাশ করলাম।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। অত্যন্ত বিনয়ী এবং মেধাবী এই ছাত্রটিকে চিনে ফেললেন ত্রিবন্দ্রম কলেজের জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক। ছাত্র অবস্থাতেই আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কে রামনাথনের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দেয়। ওই সময় থেকেই পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা যোগানরও চেষ্টা করেন তিনি। এ নিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি ভি রামনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও হয়েছিল। তিনি তাঁকে উৎসাহও দিয়েছিলেন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে।

'ঠিক এই সময় ত্রিবন্দ্রম কলেজের জনৈক অধ্যাপক, আমার পরীক্ষকও বলতে পারেন, আমাকে বললেন, ত্রিবন্দ্রমের মানমন্দিরে চলে এস। আবহাওয়া বিষয়ক কাজ করার এখানে অনেক সুযোগ পাবে।' বললেন ডঃ রামনাথন। অতীতের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা সন্তপ্ত হলেন যেন। 'আমার বাবা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। যথেষ্ট নামডাকও। কিন্তু হলে হবে কি, পয়সা তো নেই। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা যে নেই, এ ভাবনা ছোট বয়েস থেকেই মনটাকে গুমোট করে রাখত। তাই ডাক আসতেই ত্রিবন্দ্রমের মানমন্দিরে যোগ দিলাম আমি। সেখানকার কাজটি অবশ্য অবৈতনিক। তবে কলেজে পড়ানর সুযোগ পেলাম একই সঙ্গে। পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারারের পদ। কিছুটা আর্থিক সুরাহা হল।'

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ কালপাথি রামনাথন

'অধ্যাপক রামনাথন হলেন অন্তরে ভিসুভিয়াস, বাইরে হিমালয়। তাঁর প্রাণশক্তি প্রচণ্ড, এই বয়েসেও এত কর্মক্ষমতা যেন অকল্পনীয় ব্যাপার। তাঁর নিয়মানুবর্তিতা দেখে আমরাই লজ্জা পাই। ভেতরে এত যে ক্ষমতা, বাইরে থেকে বোঝার জো নেই। যদিও মানুষ হিসেবে ও'র হিমালয়কে বুঝে নিতে কারোর ভুল হয় না। আমাদের সবার কাছেই তিনি নমস্য।' এ মন্তব্য ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারিরই জনৈক নবীন বিজ্ঞানীর।

১৯১৮ সালে প্রকাশিত হল প্রথম গবেষণাপত্র বিষয়বস্তু 'মানসুন স্টরম' বা ঝড়-বিদ্যুৎ সহ ঝড় আবহাওয়া বিশেষ এই ঘটনাটিকে নিয়ে গবেষণার দৃষ্টান্ত ভারতে এই প্রথম। অন্যান্য দেশেও বিরল সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমে কাজ করে যাওয়া। যন্ত্রপাতির অভাব। কোন একটা সমস্যা নিয়ে কারোর সঙ্গে যে আলোচনা করবেন, তেমন লোকের সংখ্যাও হাতে গোনার মত। তবু তারই মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল তিনি সি ভি রামন। রামন তখন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক।

রামন রামনাথনের গবেষণাপত্রটি পড়ে মুগ্ধ হলেন রামনের স্বীকৃতি পেয়ে রামনাথনও অনুপ্রাণিত।

'দেখতে দেখতে কয়েকটি বছর কেটে গেল ত্রিবন্দ্রমে। এখানে গবেষণার সুযোগ কম। তারপর ত্রিবন্দ্রমের মানমন্দিরে আমাকে করা হয়েছে অবৈতনিক পরিচালক। ডিরেকটারি করা এক কাজ। প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত থাকা। কিন্তু গবেষণা করতে গেলে দরকার বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট অভিনিবেশ। এই দুই-এর মধ্যে পড়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম এতদিন। ভয়ও পেয়েছিলাম। প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে গবেষণা না মার খায়। কিন্তু আশার আলো যোগালেন অধ্যাপক রামন। তাঁর স্বীকৃতি পাওয়ার পর মনে হল, তা কেন? জীবনের গোড়ায় তিনিও তো ছিলেন প্রশাসনিক। পরে কলকাতার ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়ান্সের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিখ্যাত 'রামন এফেকট' যার জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন, প্রশাসনের অঙ্গন থেকে এসে তেমন কাজ যদি তিনি করতে পারেন, তা হলে আমার পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করায় বাধা কোথায়?' বললেন ডঃ রামনাথন।

১৯২২ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ডকটর অব সায়ান্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন রামনাথনকে। তার আগেই আমন্ত্রণ এসেছিল অধ্যাপক রামনের কাছ থেকে। রামনাথনের গবেষণাপত্র পড়ে রামন লিখলেন, 'কলকাতায় চলে এস।'

রামনাথন ১৯২১ সালে কলকাতায় এলেন। ১৯২১ এবং ১৯২২ এই দুই বছর রামনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চলল আলোর বিচ্ছুরণের ওপর। সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল সংগ্রহ করেন তিনি। তারপর সেই সব জলের নমুনার মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মি কি ভাবে বিচ্ছুরিত হয় সে নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান। এই সময় অধ্যাপক কৃষ্ণণের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। অধ্যাপক কৃষ্ণণও তখন ওই একই বিষয়ের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। বলা বাহুল্য, ডঃ রামনাথনের ডি এস-সি ডিগ্রির গবেষণাপত্রটি এই বিষয়ের ওপরই লিখিত হয়।

'কিন্তু কলকাতাতেও বেশি দিন থাকা সম্ভব হল না। বাবা ছিলেন পণ্ডিত। কিন্তু দরিদ্র। সংসার চালাতে গেলে টাকাও তো চাই। একটা সুযোগ এল। নতুন কাজ। রেঙ্গুনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারারের পদ। মাইনে ভাল। অতএব রেঙ্গুনে চলে গেলাম।'

গেলেন ঠিকই। কিন্তু মন পড়ে রইল ভারতে। মন পড়ে রইল গবেষণায়। রেঙ্গুনে পড়ান শুরু করলেন। সেই সঙ্গে গবেষণার কাজও। এ ব্যাপারে রামন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চললেন। রেঙ্গুনে ছিলেন ১৯২২ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত। এই সময়ে বিভিন্ন অণুর আলোক বিচ্ছুরণের ওপর মোট পাঁচটি গবেষণাপত্র তিনি প্রকাশ করেন।

'স্যার গিলবার্ট ওয়াকার তখন ইনডিয়ান মেটিও-রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেকটর জেনারেল রেঙ্গুনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। আমার গবেষণার কথা শুনে তিনি বললেন, ভারতে চলে আসুন আবহাওয়া দপ্তরে যোগ দিন।

'আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। প্রথম আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করি এ আমার অনেক দিনের

আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়ত, ওই সময় বড় বড় পদ অধিকার করে রয়েছেন বেশির ভাগ ইংরেজ। মুষ্টিমেয় ভারতীয় ভারতে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি। এমন অবস্থায় আমি নিজেও একটা বড় রকমের সরকারী কাজ পাচ্ছি—এতে আনন্দিতই হলাম। তখন সরকারী কাজ নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে সুযোগও মিলত।'

হ্যাঁ, ১৯২৫ থেকে ১৯৪৮ এই দীর্ঘ তেইশ বছর ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরেই কাটিয়ে দিলেন অধ্যাপক রামনাথন। কখনও আবহাওয়াবিদ। কাজ উর্ধ্ব বায়ু-মণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণা। পরে কোলাবা এবং আলিবাগ মানমন্দিরের ডাইরেকটার, কোদাইকানালের জ্যোতি-পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দিরের ডাইরেকটার, আবহাওয়া দপ্তরের সুপারিনটেনডিং মেটিওরোলজিস্ট এবং অবশেষে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের ডাইরেকটার জেনারেল। উল্লেখ্য, ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে রামনাথন আবহাওয়া বিজ্ঞান, ভূ-চৌম্বক এবং ভূ-কম্পন বিজ্ঞানের ওপর মোট ৫০টি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালের পর প্রকাশিত হয় আরও ৪০টি গবেষণাপত্র। শেষোক্ত গবেষণাপত্রের বিষয়বস্তু মুখ্যত : 'বায়ুমণ্ডলের ওজন গ্যাস' এবং আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের আবহাওয়া দপ্তর থেকে অবসর নিলেন তিনি। কিন্তু ডাক পড়ল আবার। পটভূমি অবশ্য আগেই তৈরি হয়েছিল। ১৯৪০ সালে বিক্রম সারাভাই গেলেন ব্যাঙ্গালোরের ইনডিয়ান ইনস-টিটিউট অব সায়ান্সে অধ্যাপক সি ভি রামনের কাছে গবেষক হিসেবে। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'মহাজাগতিক রশ্মি'। এর দু বছর পর তিনি পরি-কল্পনা করতে শুরু করেন আমেদাবাদে একটি গবেষণাগার তৈরি হোক। ভৌত গবেষণাগার। এ বিষয়ে ওই সময় ডঃ রামনাথনের সঙ্গে তিনি কিছুটা আলোচনাও করেন। ১৯৪৬ সালে ডঃ সারাভাই-এর বাবার চেষ্টায় তৈরি হল 'কর্মক্ষেত্র এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন'। উদ্দেশ্য, দেশে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করা। ডঃ সারাভাই-এর নেতৃত্বে তৈরি হল আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি। ডঃ রামনাথনের আবহাওয়া পদার্থবিদ্যা, ভূ-চৌম্বকবিদ্যা এবং সৌর ও ভূ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞান তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অতএব অনুরোধ এল, এই গবেষণাগারের ডাইরেকটারের পদ গ্রহণ করুন।

রাজী হলেন ডঃ রামনাথন। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ ভারত সরকারের আবহাওয়া দপ্তর থেকে অবসর নেয়ার পর আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরে-টারির ডাইরেকটর হিসেবে নতুন কাজে যোগ দিলেন তিনি।

১৯৪৮ এর পর থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট এই গবেষণাগারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ডঃ রামনাথন। সারাভাই-এর নেতৃত্বে এবং তাঁর পরিচালনায় এই গবেষণাগার আবহাওয়া বিজ্ঞান, ভৌতপদার্থ বিজ্ঞান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্ত-র্জাতিক সম্মান অর্জন করে।

দীর্ঘ জীবনে তিনি সম্মান পেয়েছেন অনেক। ১৯৩৯ সালে ইনডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি, ইনডিয়ান অ্যাকাদেমি অব সায়ান্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ১৯৫১-৫৪ সালে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পরিষদের সভাপতি, ১৯৫৪-৫৭ ইনটার ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জিওডেসি অ্যান্ড জিওফিজিকসের সভাপতি, ১৯৬১-৭২ পর্যন্ত ভারতের বেতার গবেষণা কমিটির সভাপতি, এবং এ ছাড়াও তিনি কখনও সভাপতিত্ব, কখনও বা পৌরোহিত্য করেছেন [illegible] গবেষণা কমিটি (১৯৫৬-৬৮), আন্তর্জাতিক [illegible] কমিশন (১৯৬০-৬৭), প্রভৃতিতে। ১৯৬১ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৬০ সালে তিনি রয়েল মেটিওরোলজিক্যাল সোসাইটি, লনডন-এর সাম্মানিক সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারির ডাইরেকটারের পদ থেকে অবসর নিলেও ডঃ রামনাথন এখনও ওই গবেষণাগারের প্রাণকেন্দ্র। এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে এখনও প্রতিদিন তিনি সেখানে আসেন অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতই। ঠিক সকাল সাড়ে ন'টায়। থাকেন সন্ধ্যে পর্যন্ত। এর জন্যে তিনি কোন বেতনও নেন না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ। শুধু কাজ। সম্প্রতি ওই গবেষণাগার মৌসুমী বায়ুর ওপর বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিল। তারও অনুপ্রেরণা ডঃ রামনাথন। প্লাজমা ফিজিকস, এরোনমি, মহাজাগতিক রশ্মি—যিনি যে কাজই করুন, তার খবর রাখেন তিনি। প্রয়োজনে গবেষকরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। মনের দিক দিয়ে এখনও তিনি তরুণ।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজকাল উৎসাহের বড় অভাব। আপনার কি মনে হয়?

একগাল হেসে ডঃ রামনাথন বললেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাবই এর অন্যতম কারণ। তা ছাড়া পরিচালনার মাথায় যাঁরা আছেন তাঁদের আরও বিনয়ী হতে হবে। তা হলেই তরুণদের অনুৎসাহ ভাবটা অনেকটা কেটে যাবে।

ডঃ রামনাথন বললেন, যে কোন কাজ, বিজ্ঞান বা অন্য কিছু—সবার আগে দরকার পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ। তা না হলে কোন কাজে সাফল্য আসে না।

সমরজিৎ কর

মহাগুরু নিপাত
দবাশিস দাশগুপ্ত

মরাচাঁদের আলোয় এত দীপ্তি কে দেখেছে? ভামিত ছিল চৈতন্য, মরাচাঁদের শেষ জ্যোৎস্না প্লাবনে ক্ত কে দিল অপরাধী বিবেককে? ভাঙ্গা বুকের জির দিয়ে নরা ঘরো গড়ে তোলার দৃপ্ত অঙ্গীকার খনও কি নিতে দ্বিধা? হাজার হাজার পাওয়ার াবিত উৎসবে, লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মনেও ড়ে না শিখাটি প্রথম কে জ্বালিয়েছিল—একটি টকীয় পরিসমাপ্তি হয়ত আমাদের বিস্মরণকে কৃতজ্ঞতাকে ধিক্কার দেবে। আধুনিক নাটকের জনক মাদের শেষবারের মত নাট্যশিক্ষা দিয়ে গেলেন। াচাঁদের আলোয় সূর্যের দীপ্তি।

মরাচাঁদের পবন কীর্তনীয়া শুদ্ধ শিল্পের চর্চায় জেকে নিবেদন করেছিল। কিন্তু এই যুগটা তো ত্তক দাসদের। বিজ্ঞাপন, লোকরঞ্জনী প্রক্রিয়া; স্বপ্ন রে বাঁচা মানুষদের আহত করে। স্বপ্ন দেখা নুষদের বড় বিপদ। যে বিরাট ক্যানভাসে সে জীবনকে কতে চায়, সে আঁকা কিছুতেই তৃপ্তি দেয় না

নার বাংলার পাঞ্জী

ল্পীকে, চারিদিকে এত মেকির চটুল পোস্তাযাত্রার ং গোলমাল হয়ে যায়। আমদানী করা অনেক রং- হারী চটকদার পুতুলের মাঝখানে লোকায়ত পটশিল্প ষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবুও শিল্পীকে কাজ রতে হয়, কাজ করতে না পারলে, স্বপ্নকে প্রসারিত, স্তারিত না করতে পারলে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। ই কি মৃত্যুর পূর্বাহ্নে বিজন ভট্টাচার্য আবার াচাঁদে পবন ও কেতক দাসের ভূমিকায়-শেষবারের মত টক আর জীবনকে একাকার করতে অবতীর্ণ লন?

> "নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে
> দিগ্বিজয়ী, ঢুকে গেছো, কিছুতেই বেরুতে
> পারছো না—
> এই ভালো, কাজ নেই; জীবনে ও নাট্যে দুঃখ
> আছে।"
>
> (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

জন্মলগ্ন থেকে বাংলা থিয়েটার ছিল ব্যক্তি ন্দ্রিক। থিয়েটার যে একটা যৌথ শিল্প, সেটা ছিল মাদের অজানা। আরও একটা কথা, থিয়েটার প্রথম কেই বাবুবিলাস, চাষী মজুর নিয়ে নাটক হলেও, দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার বাসনা ছিল না। ১৯৪৪ লের ২৪শে অক্টোবর গণনাট্য সংঘের নবান্ন প্রমাণ ল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিভাবে অচলায়তন ভাঙ্গা , নতুন যুগের সূচনা করা যায়। পরবর্তীকালে যাত্রী অনেকেই প্রতিষ্ঠার শিকার হলেও বিজন চার্য একাই কাজ করে গেছেন, নিঃসঙ্গ কিন্তু দুর্দমনীয়, অসহায় অথচ অনমনীয়।

বিজনদা প্রায়ই বলতেন, 'যা আমি দেখি নি, তা আমি লিখি না'—এই দেখার পরিধিটা বিস্ময়কর। জন্ম ১৯১৭ (রুশ বিপ্লবের বৎসর), কলকাতায় আসেন ১৯৩০ সালে। এই কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত কেটেছে ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রাম এবং বসিরহাট সাতক্ষীরায়। পিতা ক্ষীরোদবিহারী, মাতা সুবর্ণপ্রভা, মাতুল সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গ্রামবাংলার গানবাজনা, কথকতা, বাবাজীদের আখড়া, মালোপাড়া, শোলার কারিগর, সাপুড়েদের জীবন সবই বিজনদার দেখা। শুয়োর কি করে আনতে হয়, কি করে জাগর দেয়, সবই বিজনদার জানা, চাষীদের গায়ের গন্ধটুকুও। কৃষিভিত্তিক জীবনে ক্ষেতের কাজ না থাকলেই সাপুড়েরা সাপের খোঁজে বেরোয়, ওই তিনমাসের অবসর সময়ে মাটির গান, নাচের বিকাশ, 'দ পীপল কমিট দেমসেলভ্স ইন দীজ আর্ট ফর্মস', প্রতি দুমাইল অন্তর ডায়ালেক্ট বদলে যায়, সব ডায়া- লেক্টই বিজনদার রপ্ত। কিষাণদের আন্দোলন, তেভাগাদের মন্বন্তর বিশ্বাসের ভিতটুকু নাড়িয়ে দিল। নিপীড়িত মানুষগুলোর ভাষা, বোধ সবই জানা, তাই গোটা মানুষকে মেলে ধরলেন। প্রথমে আগুন, পরে জবানবন্দী, সবশেষে মাত্র নয় দিনে নবান্ন লেখা শেষ করলেন—দুঃখ বিলাস নয়, আবেগের তীব্রতা না থাকলে, সচেতন শিল্পী মন না থাকলে, পুরো চেহারাটা পালটানো সম্ভব হত না। প্রগতি লেখক সংঘে 'নবান্ন' পড়ার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আপনি তো জাত চাষা'। ছায়াপথ নাটক অভিনয়ের মডেল স্টাডি করবার জন্য ক্যালকাটা থিয়েটারের শিল্পীরা দিনের পর দিন ভিখারীদের আস্তানায় কাটিয়েছেন। শুধু কি মানুষের মুখের ভাষা! "একটা গরু যেমন আদর করে বাছুরের গা চেটে দেয়, ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে গরুটির হাবেভাবে, কি অপূর্ব মাতৃস্নেহের প্রকাশ ঘটছে। ডাস্টবিনে খাবার নিয়ে যখন এক দঙ্গল কুকুর পরস্পর মারপিট করে, কিংবা বিড়াল যখন স্থির পায়ে চুপিসাড়ে শিকারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে লক্ষ করো, জীবনের মশলা খুঁজে পাবে। ভিলেন করতে গেলে কেনই বা চিৎকার আর কেনই বা চোখ

ডিভাসে রামকেশব

ঘুরিয়ে গোলাচো। মনের ভাব ভাব ফোটাতে স্বাভাবিকভাবেই আনতে হয়, কারণ করতে গেলেই সুর কেটে যাবে।" দেবীগর্জনে প্রভঞ্জন সর্দারের ভূমিকায় রায়ার উপর পাশবিক অত্যাচার দৃশ্যে বিজনদা ওই রকম একটি শিকারী বেড়ালের ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে

যুক্তি-তক্কো-গপ্পো

তুলেছেন। ছায়াপথে ভিক্ষেকরা মন্ডামিঠাই খাওয়ার দৃশ্যটা যখন অভিনেতা বিভূতি মুখোপাধ্যায় কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না, তখন বিজনদা দিলেন গুরুমন্তর। আদরের কুকুর জিপসীর খাওয়া দেখ, কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের কথা করে আপন মনে গড়গড় করে খাওয়া, প্রতিপক্ষ কেউ নেই তবু যুদ্ধ করে খাওয়া। জিপসীর চাউনি, আনন্দ রূপ সব প্রতিফলিত হল অভিনয়ে। এই জিপসী প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মনে আসছে। একদিন সকালে বিজনদার ঘরে বসে আছি, চরম দুরবস্থা। একজন প্রযোজক লোক পাঠিয়েছেন, জরুরী দরকার চিত্রনাট্যের ব্যাপারে। বিজনদা বললেন, সময় হবে না, আমার আজকে কুকুরকে ইনজেকশন দিতে হবে। পরে বললেন, "সবাই আমায় ছেড়ে চলে গেছে, ও তো মানুষ না তাই আমায় ছাড়তে পারে নাই। বেচারা মরবেই, আজকে ওকে ইনজেকশন দেওয়ার দিন, আমি কি করে ওকে ফেলে বড়লোক প্রযোজকের মুজরোয় যাই?"

এই ব্যাপক অভিজ্ঞতার জন্য বিজনদার অভিনয় এত বাস্তব। অনেককে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে দ্বিধা প্রকাশ করতে দেখেছি, আসলে অতিকৃত অভিনয় দেখা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস তাই বাস্তবিক অভিনয়ে আমাদের বিভ্রান্তি আসে। এই অনুসন্ধানী দৃষ্টির জন্য বিজনদার নাটকের স্টেজ ডাইরেকশন অন্য রকম। নবান্নের আগে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম কথনীর মধ্যে, অট্টহাস্য, ক্রন্দন, সবেগে প্রস্থান জাতীয় কতকগুলি নির্দেশ। নবান্ন নাটকে সমস্বার্থে দুইজন লোকের অন্তরঙ্গতা বোঝাতে নির্দেশ দেওয়া হল "একজন অন্য- জনের ঘামাচি মেরে দেয়।" অন্য একটি নাটকে "মায়ের স্নেহের মত নীল আলো" এসে পড়ে। কিংবা সর্বশেষ 'হাঁসখালির হাঁস' নাটকের প্রারম্ভিক পর্যায় "এই খানে বসা যায়। তাই বসা। উদ্দেশ্য লোপাট। সামনে নেই, পেছনে নেই। তাই হারা উদ্দেশ। এখানেই যে কিছু খুঁজে পাওয়া গেল তাও নয়। তবু...চৌমাথার মোড়। দুদিকে রাজপথ। ট্রাম বাস, বাস বাস। বড় একটা ন্যাড়া বুড়ো গাছ। একটাও পাতা নেই। উর্ধ্বমুখ হাতের কঙ্কালে হয়তো হাতছানি দেখছে ওরা। গুঁড়িটা মোটা। মড়ে পড়েনি, বাতাসে হেলেনি। ওপরে মস্তখানি, ডালগুলো হয়তো [illegible]

মানুষ দিয়ে বিজনকে ধরে আছে। মাটি ধরেই থাকা। মাটি ধরেই বাঁচা। তাই এখানে বলার কথা মনে হলো। এইখানে বলা যায়। তাই বলা।"

১৯৩০ সাল থেকে কলকাতায়। অধ্যয়ন আশুতোষ কলেজ ও রিপন কলেজে। একই সঙ্গে পড়াশুনা ও শরীর চর্চা। আনন্দবাজারে কাজ পেলেন ৩৮-৩৯ নাগাদ। প্রকাশিত হয় ছোট ছোট স্কেচ, ফিচার। রেবতী বর্মণের লেখা তাঁকে কমুনিস্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট করে। এই রেবতী বর্মণের বইয়ের রিভিউ পড়ে মুজাফফর আহমেদ তাঁকে ডেকে নিলেন। পার্টির সদস্যপদ পেলেন ১৯৪২ সালে। আনন্দবাজারের চাকরী ছেড়ে দিয়ে হোল টাইমার হলেন পার্টির। আক্ষরিক অর্থে হোলটাইমার। প্রচন্ড খাটুনির চাপে স্বাস্থ্যবান বিজন ভট্টাচার্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন। সেই সময়কার যন্ত্রণা, আবেগে ছুটে বেড়ানো বোঝা যাবে তাঁর একটি লেখায় "আমি দ্বিতীয় মহা-

নবান্নর [illegible]-সূচী

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলছি। তখনও ভরাডুবি হয়নি। ধূমাবতীর পদক্ষেপ শোনা গেছে, কিন্তু তখনও মহা মন্বন্তর আসেনি। দেশভাগ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির দ্বিমুখী রাজনীতির অশান্ত চক্রান্তের ফলে রক্তগঙ্গায় চাঁদবেনের স্বাধীনতার সপ্তডিঙ্গা তখনও ভেসে ওঠেনি।...স্বাধীনতার অধিবাস পর্বে কংগ্রেসী সুবক্তার অভিষেকের আড়ালে গোটা দেশটাকে ভাগ করবার যে মুষলী চক্রান্ত চলছিল, তখন স্বজন পুত্র শোকে মুহ্যমান মা সনকাকে আমরা আশ্বাস দিয়ে বলেছি—মাগো তুমি কেঁদো না। মন্ত্র নতুন পরিবৃত্ত—তেজস্ক জাবং বিশল্যকরণীর একমাত্র সন্ধানী মহৌষধির ধন্বন্তরীরা তোমার সহায়। তোমার ভয় কোথায় ?...আগস্ট বিপ্লবে যে মা সনকাকে দেখেছি মেদিনীপুরে, সেই মাকেই দেখেছি পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে কলকাতার রাস্তায় বাটি হাতে কাঁদছে। দাঙ্গার সময় দেখেছি সেই মায়ের ছিন্নমস্তা রূপ। চোখে কোলে মা ষষ্ঠীর দান নিয়ে সেই মাকেই দেখেছি বাস্তু হারিয়ে এসেছেন দেশ ঘর ফেলে শিয়ালদহ স্টেশনে। আবার সেই মা-ই হয়েছেন কাকদ্বীপে

দেবীগর্জন

দুঃখিনী মা দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন উল্কার মত।...মা সনকার সেই নিদারুণ দুঃখ বেদনার কাহিনী ধন্বন্তরীদের আশেপাশে থেকে চারণ হিসেবে রূপ দিয়ে আসছিলাম আমরা অর্থাৎ গণনাট্য সংঘের কর্মীরা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালাকাল থেকে। ...আজও স্বপ্ন দেখি, ঘর পোড়া উষার প্রান্তরের এক কোণে চুপ করে বসে সমুদ্যত সহস্র কাস্তের মুখে ধান কাটার গান শুনি। লে অফ আর লক আউট অভিশপ্ত ফ্যাক্টরী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রমন্দ্রে চৌদুনী উৎপাদনের অর্কেস্ট্রা বাজাই। চারণের আর কি কাজ থাকতে পারে।"

আমৃত্যু চারণ বিজন ভট্টাচার্য। অশক্ত দেহ কিন্তু মনটা ভরে আছে নতুন সৃষ্টির নেশা। পরপর কত অভিনেতা অভিনেত্রী এল, বয়স সকলের বাড়ে, কেউ ছেড়ে চলে যায় কেউ থেমে যায়, বিজনদা আবার নতুনদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। নতুন ছেলেদের আসরে আসেন নিয়মরক্ষার সভাপতি হিসাবে নয়, সক্রিয় কর্মী হিসেবে। কবচ-কুন্ডলের 'আজ বসন্ত' নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত টানা মহড়া তারপর খাওয়া দাওয়ার পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম আবার মহড়া রাত পর্যন্ত। কম-চরিত্রের নাটক, রিহার্সাল হত ইনটেনশিভ্। 'অ্যাকটিং' করো না। নন্ অ্যাকটিং ইজ দি বেস্ট অ্যাকটিং—ইউ ক্যান নট অ্যাক্ট—ইউ ক্যান ওনলি রিঅ্যাক্ট।" মুক্ত অঙ্গনের সামনে মাঝে মাঝে বিজনদাকে হাঁটতে দেখেছি, অসমবয়েসী কারো কাঁধে হাত রেখে, তখন ভেবেছি নাটকের প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্জীবিত হচ্ছে উত্তর কালের নাট্যপ্রেমিকদের মধ্যে "এই দুর্গত দেশের জন্য চাই সত্যিকারের কালচারিস্ট আর্টিস্ট। শিল্পীকে একা একাই বাঁচতে হয়, একা একাই কাঁদতে হয়—সে একা। তার জন্য কেউ নয়, অথচ সবার জন্য সে।... অনেক পড়াশুনা কর, অনেক বেশি দেখ। শুধু বই পড়া নয় মানুষের মুখের অলিখিত ভাষা পড়বার চেষ্টা করো। চাষীর আছে লাঙ্গল, নাট্যকর্মীর হাতিয়ার নাটক। নাটকের সংলাপগুলো বুলেটের মতো ব্যবহার করো। জীবন তো একবারের জন্য, দুবার তো আর জন্মাবে না, যা কিছু বলার যা কিছু লেখার এখনই করো আর সময় পাবে না। আমরা জমি তৈরী করবো আর রাজনৈতিক নেতারা তাতে বীজ বপন করবে—এইভাবেই তো কাজ হবে, কিন্তু হচ্ছে না। এটা দুর্দিন।"

নাটক প্রযোজনার ব্যাপারে বিজনদার কোন কম-প্রোমাইজ নেই। বিশাল চরিত্রলিপি বহু মহিলা—বাচ্চা

যে বিশাল জীবন দেখেছি, তাকে দু চারটি চরিত্রে মধ্যে বাঁধা, কোনমতে কাজ সারা ফাঁকিবাজির আ এক নাম। আজকাল তো দেখি—বেশ চালাকি করে বিরা জনতার কথা বেতার ধারাভাষ্যের মত দুচার জনের মু দিয়ে বলিয়ে জমাট নাটক হচ্ছে, আমি পারি না অল্প চরিত্রের নাটক লিখলেন 'আজ বসন্ত'। কিন্ সেখানে এই ধরনের ফাঁকিবাজী নেই। 'গর্ভব জননী'তে একটি অবিকল মৃতদেহ তৈরী হয়েছি নাটকের প্রয়োজনে। সেই মৃতদেহ মঞ্চে রাখতেই হ —বিজনদার কঠোর নির্দেশ। এদিকে ঠেলাওয়া সেটের মাল নিয়ে আসার সময় পেছন পেছন পাড়া

নবান্নর প্রধান

ছেলেরা ছোটে, কুকুর তাড়া করে। মৃতদেহটি আনতে ঠেলাওয়ালার খুব আপত্তি। একবার মুক্ত অঙ্গনে অভিনয়ের সময় দেখা গেল মৃতদেহটি আনা হয়নি সম্ভবত নিতাকার ঝামেলা এড়াতে ঠেলাওয়ালা সেটি কোথাও ফেলে দিয়ে থাকবে, কিন্তু বিজনদার উদ্‌ভ্রান্

... অভিনয় করতে ... পিছনের পর্দাটা ... আসেন। লাইট ... তারই হ্যারিকেন তুলে ধরে ... করলেন। কোনমতেই নাটককে ... বিজনদার নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার ... পারেন। আধুনিক নাটকে সঙ্গীতের ... কম। সঙ্গীতজগতে অভিপ্রেত কর্মাশিয়াল ... থাকার হয় খুব কম। বিজনদা গীতি- ... জীবন কন্যা—লোকায়ত ফর্মে সংঘের বক্তব্যের ...। কিন্তু বিভিন্ন নাটকে যে নাটক একান্তভাবেই ... তার দোষগুণে সমেত সেখানেও ক্ষণে ক্ষণে ... সাঙ্গীতিক প্রয়োগ আমাদের পুলকিত করে, ... করে। নবান্নের মুশকিল আসান অথবা অন্য ...—জয়চাঁদে বৈষ্ণব দাশের কীর্তন, যেখানে ভাবাবেশে ... মালাটি গিয়ে পড়ে রাধার গলায়—রাধা রেগে চলে ... কেতকদাস বলে, 'একেই বলে শুদ্ধ রূপাত্মিকা ...।' গান প্রায়শই নাটককে মন্থর করে দেয় ... জয়চাঁদের প্রায় পুরো দৃশ্য জুড়ে এই কীর্তনের ... বোধহয় অনেক সংলাপ দিয়েও ছোঁয়া যেত ...। দেবীগর্জনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, শেষে ... নাচের মধ্যে যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা তা অনেক ... মিউজিক কম্পোজিশন থেকে লক্ষ্যভেদী। গর্ভবতী ...তে যে মূল গানটি বারবার ফিরে আসে— ...সে মরিলরে মারিল কংসারি' (?) সুন্দরবনের সেই ...গুলো যারা মাঝে মাঝে দিগ্ভ্রান্তের মত ঘুরে ... তাদের বারমাস্যাকে প্রকট করে তোলে।

দেবীগর্জনের মত এই সমাজে মানুষকেই বাটখারা ... সব কিছু ওজন করা হয়, লাভের খতিয়ান ... হয়। যে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দেখার পর ...কুমার অনুপ্রাণিত হয়ে 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ ..., সেই বিজনদাকে শেষে বলতে হয় 'কি করে চলে, ...ভাবে বেঁচে আছি জানতে চেও না, হাজার হাজার ... যেভাবে একবেলা খেয়ে চুরি ছিনতাই করে

নবান্ন

কোনক্রমে বেঁচে আছে, আমিও তাই। আর্টিস্ট অন্যকে খাওয়াতে হবে বলে খায়। অন্যকে বাঁচাতে হবে বলে নিজে বাঁচে। এটাই নিয়ম। দুঃখ জীবনে আসবেই, দুঃখ পাবে কিন্তু কখনও দুঃখী হয়ো না—ওটা পাপ।' অনেক দিনের কাজের লোক ছিলাম বলে পারা গো, ...। কাজ দেবার নাম নেই কো, সভায় ডেকে মালা পরাচ্ছে'। বিজনদা সাজেশন দেন "কুমড়ো ফুল সজনে ফুল যদি ভেজে খাওয়া যায় তবে চেষ্টা করে দেখ না বাজার দিয়ে রজনীগন্ধা ভাজা যায় কিনা অথবা গোলাপ ফুলের পাপড়ি"। মধ্যবিত্ত সমাজ আমার নাটকের দর্শক কিন্তু যাকে নিয়ে বিড্স সেই ম্যাস আমার নাটক দেখেনি। ফুলচন্দন যা পেয়েছি মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে, কিন্তু যারা অপসংস্কৃতির পরিপোষক তারাই আবার সংস্কৃতির পোষক—এটা কি করে হয়? ...শ্লোগান সব সময় মন্দ নয়।...একমুঠো খেতে না পারলে জান বাঁচে না। কিন্তু একফালি সুর না গজলে প্রাণও তো বাঁচে না। জান জানবে প্রাণের চাহিদা, প্রাণ জানবে জান কতটুকু চায়। জান আর প্রাণ সমান প্রশ্নের।"

রাজদ্রোহী দেখতে গেছি, বিরতির সময় কয়েকজন এসে বললেন, 'বিজনদা খবর পাঠিয়েছেন, শেষ হলে একবার দেখা করবেন।' শেষ হতে দেখা করলাম। অনেক কথার পর আমি বললাম, 'গন্ধর্ব' পত্রিকা আপনার যে সংবর্ধনা সংখ্যা বের করেছে, সেটা খুব ভাল হয়েছে।' বিজনদা বললেন 'আমি ওদের মানা করেছিলাম। বেঁচে থাকতে এসব আবার কি? মরে গেলেই এই সব করার রেওয়াজ, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ। মৃত্যুর পর বার করলে অনেকের হয়ত দরকারে লাগবে, খোঁজ পড়বে।" আপনি নটগুরু, আপনার সব কথাই ফলে যায়, সত্যি সত্যি এইভাবে যে গন্ধর্ব পত্রিকা কাজে লাগবে এত অল্পদিন বাদে, সে কি কেউ ভেবেছিলাম। খোঁজও রাখিনি আপনার, বিদেশী সুর-চাপল্যে আপনার একতারার দিকে ভুলেও তাকাই নি, আজ আপনার নাটকীয় জীবন, অথবা শুধু নাটকের জন্য বাঁচা, আমাদের কিছু শিক্ষা দেবে কি? অনেক স্মৃতিচর্চার স্মৃতিবাসরেই কি আপনার স্বপ্ন অবসিত হবে? জানি না—তবে এটা জানি অনেক বড় কথা বলব, মালার স্তূপ আমরা সাজাবো,—কেননা, দানসাগর আমাদের মহান ঐতিহ্য।

ফুটবলারদের মন বৃন্দাবন

তপন ঘোষ

সেদিন সন্ধ্যায় টেন্টের সদর দরজায় দুই মোহনবাগান কর্মকর্তা মিস্টার "সি" ও "ডি"-কে কথা ছোড়াছুড়ি করতে শুনলাম। ওদের ঘিরে ছোট্ট জটলা। কিছু আগে সন্তোষ ট্রফির খেলায় পাঞ্জাবের সঙ্গে বেশ লড়ে ওড়িশা মাত্র তিনগোলে হার মেনেছে। পাঞ্জাব তারকা মনস্কুর ইন্দর নিজের বুটিতে মাফলার জড়াতে জড়াতে জটলাকে পাশ কাটাচ্ছিল। খুঁত-খুঁতুনির কারণ—স্টাডের মেরামতির গোলমালে তার বুটজোড়া সারা ম্যাচে খুবই ভুগিয়েছে। চলমান ইন্দরের প্রতি বাঁকা চাউনি মেলে মিস্টার "ডি" বললেন—ওদের (ইস্টবেঙ্গলের) ইলেকশনের খবর কী? শ্রীযুক্ত "সি" কেঁদো গলায় জানালেন—শুনছি অজয় শ্রীমানীরাই নাকি জিতছে। বিষণ্ণ কণ্ঠে "ডি" প্রসঙ্গটি শেষ করলেন—তাহলে আবার "ঝামেলা" শুরু হল।

অরুণ ঘোষ

অজয় শ্রীমানী

ওরা এরকম ঝামেলাময় ব্যাপার কিছুদিন হল ঘরোয়াভাবে মুখোমুখি হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে "ঝামেলা" শব্দটি কেমন যেন ধারাল ফলার মত। ফলাটি উদ্যত রয়েছে চলতি দশকের প্রথম ছয় বছরের গৌরবময় ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল কাহিনীর দিকে। পিঠোপিঠি মোহনবাগানকে পরাজয়ের গ্লানি ঝামেলাসহ হজম করতে হয়েছিল। দলগত সংহতি ছাড়াও ক'টি ধুরন্ধরের প্রবল ব্যক্তিগত ভূমিকায় ইস্টবেঙ্গল ওই গৌরব শীর্ষে আরোহণ করে। অজয় শ্রীমানী নামক কর্মকর্তার নামটি ওরই মধ্যে বার বার শোনা যায়। গত '৭৫-এর পর থেকে ক্লাব ইলেকশানে হেরে উনি ক্ষমতার কন্ট্রোল টাওয়ারে ছিলেন না। সদ্য সমাপ্ত ইস্টবেঙ্গলের পরিচালকদের নির্বাচনে ওদেরই সমর্থকরা জিতেছেন। এই ফিরে আসার বহু কারণের মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে—ক্লাব ছেড়ে পর হয়ে যাওয়া ফুটবল প্লেয়ারদের ওই পুরানো কর্মকর্তারা নাকি ফিরিয়ে আনবেন। ফুটবলারদের সঙ্গে দহরম মহরমে অজয়বাবুর জুড়ি মেলা ভার। এই তো কথাচ্ছলে কিছুদিন আগে এক মোহনবাগান কর্মকর্তা সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—"আসুন মোহনবাগানের ফুটবল সেক্রেটারীর হাল ধরুন। অজয়বাবু হেসে জানান, পদ হিসাবে "মোহনবাগানের" জন্য আমার আলাদা কোনও মোহ নেই। ওই সেক্রেটারিশিপ তো ইস্টবেঙ্গলেও চালিয়েছি।"

ফুটবলের সঙ্গে ভাগ্য মাখামাখি হওয়ার জেরে এবার অজয়বাবু ফুটবল সেক্রেটারী না হওয়ায় ওকে কিছুটা বাহাদুর ভাবা অন্যায় হবে। আটাত্তরের মোহন-ইস্ট-এর জার্সি বদল পালার নাটকীয় দুই প্রশ্ন—প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় বাকিটা মোহনবাগান থেকে কোচ পি কে সহ আবার পুরানো ক্লাবে যোগ দেবে, কি দেবে না? এতে অজয় শ্রীমানীসহ ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা কতটা সফল হবেন?

এই ভবল-শঙ্কু প্রশ্নের মুখোমুখি মোহনবাগান মহলের একটাই নিরাপদ দাবি—খামোখা ওই সব কোচ-প্লেয়ারদের সঙ্গে কোনও আড়াআড়িতে জড়িয়ে নেই, তবে ওদের হারাবো কেন? ইতিমধ্যে দুই ক্লাবের ক্ষমতা দখলের নির্বাচনের জন্যই দু-তরফের প্লেয়ার ভাঙানোর চেষ্টাচরিত্রে তেমন আঁচ দেখছিলাম না। আবডালে সবাই শুধু কথা সেরে যাচ্ছিলেন। পরিবেশটা এবার কিছুটা আলাদা। ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্যের বছরগুলিতে দেখা যেত, মোহনবাগান শিবিরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পিন্টু-গৌতমের লিঙ্কম্যান জুড়ি ছোঁ মেরে নষ্ট করে আরও কিছু প্লেয়ার ভাঙিয়ে আনা সম্ভব কি না। একটা সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে পিন্টু গত মরশুমে ছিটকে মোহনবাগানে যায়, ফেরে সাতাত্তরে। গৌতম-সুধীরের ইস্টবেঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার গল্প এতটুকু দুধে-খোকারও জানা। অজয়বাবুর মতে—মিটমাট না করে তুচ্ছ কারণে ওদের উপর ডিসিপ্লিনের চাবুকটা তীক্ষ্ণ জোরে চালানো হয়েছে। এ জন্য আমি দুঃখিত। শাস্তিপ্রাপ্ত প্লেয়ারদের এ নিয়ে একটাই তীব্র জিজ্ঞাসা—"অজয়দারা যদি এতই দরদী, তবে খেদিয়ে দেওয়ার সময়ে একটিবার কেন যেনতেন প্রকারে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেন নি?"

এই দুই জিজ্ঞাসার চুলোচুলির মাঝেই মোহনবাগান মাঠে সন্তোষ ট্রফির খেলার সময় বাংলা দলের দুই ক্লাবের স্টার প্লেয়াররা হাফ-দুশ্চিন্তায় প্র্যাকটিশ সারছিল। টাটকা খবর ছিল—ডেভিড, হরজিন্দর, মনজিৎ ও রণজিৎ থাপা অলৌকিক উপায়ে কলকাতারই দুই টিমে খেলতে পারে। ডেভিড তো থোক কিছু আশ্বাস পেয়ে টুকিটাকি কেনাকাটা করেছে। যত দূর জানি, এ মরশুমে ওদের খেলা সম্ভব নয়। প্রথমে শোনা গেল, হরজিন্দর ও মনজিত মোহনবাগানে চলছে। পরে লাল-হলুদের নতুন কর্তাব্যক্তির গাড়িতে হরজিন্দর কলকাতায় ঘোরাফেরা করেছে। ওদেরই এক ডাক্তারবাবু কর্মকর্তার কাছে বাংলার বিরুদ্ধে গ্রুপের খেলার আগে হরজিন্দর তার ডান-পায়ে পেশীর টানের অসুবিধাটা দেখিয়ে এল। তবু ময়দান মহলের খবর—হরজিন্দর না আঁচালে বিশ্বাস নেই। মোহনবাগান মাঠে প্র্যাকটিশ হলে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ারদের মধ্যে রেষারেষি আড়ষ্টতা স্পষ্ট হয়েছে। একদিন প্র্যাকটিশের সময় প্রসূন গ্যালারির দিকে তাকিয়ে কাকে যেন দরাজ গলায় হুকুম করল—"এই টেন্ট থেকে এক জোড়া বুট নিয়ে আয় তো সুরজিতের জন্য।" ঝটপট বুট এল। আটাত্তরের হবু ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সুরজিত হাসিমুখে দু-পা সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে দিব্যি তার প্রাক্তন ক্লাবের বুটজোড়ায় পা গলাল। মাপসই হয়েছে। গ্যালারিতে কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা প্লেয়ার-ফুসলানোদের দলে আদৌ এই হার্দ্য ঘটনাটি আঁচড় কাটলো না। অনুশীলন শেষে শ্যাম নিজেই বলল, সাত সকালে স্কুটারে প্র্যাকটিশের জন্য ক্লাবে আসার সময় গঙ্গার ধারে কারা ওকে থামিয়ে "ফিরে চল্ শ্যাম" বলে অনুরোধ করেছে। শ্যাম বলেছে—পরে যোগাযোগ করব। ময়দানী ভাষায় একে নাকি—টপ্ দেওয়া বলে। ওই দিন প্র্যাকটিশের ঘণ্টাখানেক বাদে রেড রোড ও ক্যাসুরিনা অ্যাভিনুর ছায়াচ্ছন্ন অচেনা পরিবেশে চাক্ষুষ করলাম—শ্যামের দিবারাত্রের সঙ্গী "রবি"র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের একটি কাঁচ প্লেয়ারকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলোচনা করছে।

পরের দিনই কথা ছিল এই ময়দানের গ্রীন ফ্লোর ক্লশিং নিয়ে তথাকথিত ঝামেলার মুখবন্ধ শ্রীমানীর সঙ্গে দেখা করা। যোগাযোগে সেদিন বিঘ্ন ঘটলেও, ওর সঙ্গে পরের এক প্রস্থ দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। অজয়বাবু পোক্ত কথক। কলকাতা ময়দানের ক্রীড়া-সংগঠনে শ্রীমানীবাবু কেন আলাদা জায়গা পেয়েছেন, তাঁর ক'টি কথায় অব্যর্থ ঠিকানা পেলাম।

গত পঁচাত্তরের পর সময়ের ঢেউ তাবৎ তাঁর চেনা প্লেয়ারের মনে অনেক কিছু যে পালটে দিয়েছে তা উনি স্বীকার করলেন। সদ্য জয়ে ক্লাব পরিচালনার যে দায়িত্ব পেয়েছেন, তাকে উনি 'অজ্ঞাতক' হিসাবে চিহ্নিত করলেন। আটাত্তর সালেই ওরা ক্লাব-সমর্থকদের পুরনো হাসি-ভরা দিনগুলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন, এমন আশাবাদী নন। এ জন্যে সমর্থকদের প্রতি ও অনুরোধ—দয়া করে আপনারা ধৈর্য ধরুন। ক্লাবের পরিবেশকে অনেক পালটাতে হবে। তাজা দল আবার গড়ার প্রয়োজন। ক্লাবের চলে যাওয়া নিজস্ব প্লেয়ারগুলোকে ফেরত আনার দায়িত্বে কতটা সফল হব জানি না। ছেঁড়া বাঁধন জুড়তে বেশ সময় লাগে। এই সময়টা মাস চারেক হলে ভাল হত। তবে ক্লাবের মধ্যে দুই-দুই ভাবটা কমাতে হবে। এ বছর চেষ্টা হবে কীভাবে ওরই মধ্যে ক্লাব সমর্থকদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়। টিমটা মজবুত করতে চাই একটি স্টপার, লিঙ্কম্যান ও একজন বলপ্লেয়ার কাম স্ট্রাইকার।"

এই কথাগুলো মাঝ ফেব্রুয়ারির ট্রান্সফার মরশুম শুরুর প্রায় সাড়ে তিন সপ্তাহ আগে শুনলাম। কয়েক দিন পরেই সাবির আলির অনিশ্চয়তার খবরটি ময়দান তাতিয়ে দিয়েছে। এদিকে মোহনবাগানের অন্যতম আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রের টার্গেট ফ্রানসিস ডি সুজাও একই পথের পর্যটক। অবশেষে গোটা ঝোঁকটা পড়ল সেই লোকাল ট্যালেন্টদের উপরে। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের ২১-১-৭৮ সভায়ও দারুণ গোলমাল শোনা গেল।

বিহার-মহারাষ্ট্র ম্যাচে আমার পাশের দর্শকটি ছিল শ্যাম থাপা। অদ্ভুত কায়দায় ঠোঁট নাড়তে নাড়তে সে

শ্যাম থাপা

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

জানাচ্ছিল—অনেক হয়েছে, আর ক্লাব ছাড়তে ভাল লাগে না। এখানে মোহনবাগানে ঠিকঠাক অ্যাটমোস্ফেয়ার রয়েছে। আর ক্লাবে অমুক প্লেয়ার থাকলে আমি থাকব না, এমন কথা আমি বলব না। নিজের পজিসনে খেলতে পেলেই খুশি। তবে ইস্টবেঙ্গল থেকে যেভাবে আমাকে বলছে তাতে মগজ ঠিক রাখা দায়। আরে আমিও মানুষ। এই তো আমার আর বিদেশকে ওদের ক্লাব থেকে এক জায়গায় দেখা করতে বলেছিল। কি করি, যাব কীভাবে। গেলেই তো আবার মগজ-ধোলাই ও ইস্তি শুরু হবে।

প্রশ্ন—আচ্ছা তোমায় তো জ্যোতিষ গুহ কলকাতায় এনেছিলেন। উনি যদি তোমায় কোন অনুরোধ করেন?

শ্যাম কোনও সাফ জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ বাদে সে গৌতম-সুধীর প্রসঙ্গে বলল—"ওদের সঙ্গেও কথা হয়েছে, ওরা ক্লাব ছাড়বে না। আর কীবা হয়েছে যে ওরা ক্লাব ছাড়বে। আচ্ছা দাদা, এই লেখাটা কবে বেরুবে?" বললাম—"ফেব্রুয়ারির সেকেন্ড উইক।" ও শুনে ঠোঁট উলটে হাসল। জানি, এখন শ্যাম অজ্ঞাতবাসে। ভাবছিলাম, তার আগে চরম নাটক হবে মোহনবাগান মাঠে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার শেষ খেলার দিন। খেলা শেষ হলেই ইস্টবেঙ্গল মাঠ থেকে একটা বিরাট ক্রেন এসে ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ারগুলোকে টপাটপ তুলে নেবে। হয়তো মোহনবাগান সমর্থকরা বিরাট জাল ফেলে অথবা অদৃশ্য বেড়ি পরিয়ে নিজেদের প্লেয়ারগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। শ্যাম বলল—"এই রকম কাল্পনিক টানাহ্যাঁচড়ায় দেখবেন আমার শরীরের উপরের অংশটুকু ক্রেনটা

ছে'চড়ে ছি'ড়ে নেবে, বাকিটুকু থাকবে জালে।"

বিহার-মহারাষ্ট্রের খেলায় তখনো অনেকটা বাকি। শেষ শ্যাম তার সাকরেদকে নিয়ে কংক্রিটের বেঞ্চ টপকে মোহনবাগান টেন্টের দিকে গেল। ও'কে কারা যেন নজরে রেখেছে। একদল প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ারকে হুড়মুড় করে গ্যালারির উপর থেকে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে শ্যামকে ফলো করতে দেখলাম। গ্যালারির সামনে ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একজন বলল—"চল্ শ্যাম, একদিন খাওয়া-দাওয়া হোক।" অমায়িক হাসিতে শ্যাম হ্যাঁ-না কিছুই জানাল না। শেষ সংবাদ—শ্যাম দল-বদলের বাজারে দারুণ খেলা দেখাচ্ছে।

দিন কয়েক বাদে ওই ঝাঁকের প্লেয়ারদেরই একজন অমায়িক অভ্যর্থনা পেল সস্ত্রীক সিনেমা যাওয়ার পথে। ওকে ঘিরে ধরেছে পুরনো ক্লাবের একজন প্লেয়ার, পরিচিত কর্মকর্তা এবং দুজন সরকারী বিশেষ সংস্থার কর্মী। পুরনো প্লেয়ারটি সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সংলাপ শুরু করল—পার্টনার চল, এবার আমরা আবার একসঙ্গে খেলব। এরকম হকচকানি পরিস্থিতিকে একটু সামাল দিয়ে তাড়া খাওয়া প্লেয়ারটি বলল—তুমিও তো একদিন ক্লাব ছেড়ে পালিয়েছিলে। আর ক্লাব যখন আমাদের উপর খড়্গহস্ত হল তখন তুমি এরকম কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলে কেন, সবাই বলে মোহনবাগানে খেললে প্লেয়ার নাকি তার আসল খেলা ভুলে যায়। আমি প্রমাণ করব এটা বাজে কথা। কিছুটা তা করেছিও। আমাদের দুঃসময়ে

শ্যামল ব্যানার্জী

প্রসূন ব্যানার্জী

মোহনবাগান কোল পেতে দিয়েছে। এখন ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে কি করে?

তবু কথায় বলে, খেলোয়াড়ের মন বৃন্দাবন। লীলা বোঝা দায়। এই মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পুরনো ক্লাবের অন্য দুই হোমরাচোমরা কর্মকর্তা আবার সেই "ঘেরাও" হওয়া প্লেয়ারটির বাড়ি ধাওয়া করেছিলেন। অগত্যা উৎপাতগ্রস্ত প্লেয়ারটি চা-মিষ্টি দিয়ে ওদের আপ্যায়িত করেছে। শুধু জানিয়েছে, "এখন বাংলার খেলা নিয়ে ব্যস্ত। পরে আসুন। আপনাদের কথা শুনব।" পরে এলে দেরি হয়ে যাবে না তো? প্লেয়ার-হাইজ্যাকারদের মধ্যে ওই প্লেয়ারটির দিবারাত্রের অপরিহার্যজনও কিছু মতলব এ'টেছে কিনা কে বলতে পারে?

এই সব প্লেয়ার টাগ-অব-ওয়ারের মাঝে একজন কট্টর লাল-হলুদ সেবকের সঙ্গে দেখা। তার যুক্তিটা বেশ বাস্তববাদী। এবং যুক্তিগুলিতে খবরের গন্ধ ম-ম করছে। ওর ভাসা কথা—"এই স্টার প্লেয়ারের ধাক্কায় আমরা বছর কয়েক আগে বারবার ট্রফি পেয়েছি। সেগুলোকে ফিরিয়ে আনা বিশেষ দরকার। কিন্তু একচোখো হরিণের কায়দায় কাজটা করলে ঠিক হবে না। ওদের মন এত অল্প সময়ে ভেজানো মুশকিল। এইভাবে বন্দ হতে গিয়েই শুনছি, আমাদের ভাস্কর, শ্যামল ব্যানার্জি, চিন্ময়, উলাগা নাকি সজ্ঞানে মোহনবাগানের টার্গেট হয়ে আছে। বিশেষ করে উলাগার মন বেশ উড়ু উড়ু। সাবিরও ভেস্তে গেল। বোধ হয় ওকে বাঁচানো যাবে। এত স্টারের পিছু নিলে সুদে-মূলে শেষে সবই যে ঘুচে যাবে। এ সব কথা কিন্তু প্লেয়ার নেশাগ্রস্ত কিছু কর্মকর্তা কেন যে বোঝেন না, ভেবে কূল পাই না। গত মরশুমে ডি সি এম ছাড়া ইস্টবেঙ্গল টিম তো কম খেলেনি। একমাত্র লীগেতেই মোহনবাগান যা কিছু খেলেছে। রোভার্সে একটা গোলমেলে ব্যাক পাস আর ভাস্করের ফুল-স্লিপিংয়ের জন্য মোহনবাগান দু গোলে জিতলেও ইস্টবেঙ্গল ওদেরকে দস্তুরমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সবশেষে ডুরান্ডেও কিছু ভাগ্যদোষে ফিরে আসতে হয়। দামী প্লেয়ার নেওয়া ভালই, কিন্তু ওদের নিতে গিয়ে সব দিক থেকে দেউলিয়া হওয়ার জোগাড় না হলেই ভাল। এরিয়ানের তপন দাসের মত প্লেয়ারকে গড়ে-পিটে নিলে ক্ষতি কি। অথবা অশোক চক্রবর্তী, অশোক চন্দ ও চোরা রেড্ডি হলে কেমন হয়। আমরা ট্রফি-ট্রফি করে অনেক কিছু হারিয়েছি। মোহনবাগান ছ' বছর লীগের মুখ দেখেনি। এতে কি ওদের ক্লাব উঠে গিয়েছিল?"

সাতাত্তরে তিন-তাজধারী মোহনবাগানকেও '৭৮-এ সেই স্টার টিমের দিকেই ঝুঁকতে দেখা যাবে। সন্তোষ ট্রফি শেষ হওয়ার আগেই পাল-তোলা নৌকোর কাণ্ডারীদের ফিসফিস গুজগুজ আলোচনায় জানা গেছে—বিশ্বজিৎ, শিবাজী, দিলীপ পালিত, প্রদীপ, সুব্রত, সুধীর, প্রসূন, গৌতম, শ্যাম, বিদেশ, মানস প্রমুখ সকলের উপরই আটাত্তরের শীলমোহর মেরে ফেলেছে। প্রসূন ক্যাপ্টেন হবে, তাই সে শুধু উইথড্রল ফর্মে সই করতে আই এফ এ অফিসে যাওয়াকে লোক-হাসানো কাজ হিসাবে মনে করে। দিলীপ সরকার, শ্যাম থাপা, শুভঙ্কর সান্যাল এবং সদা-অনিশ্চিত প্রতিভা সুভাষের "বিদায় মোহনবাগান" আর্তনাদটি বেশ কিছুদিন শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে গোলকীপার নিয়ে বাড়তি ধাঁধা। লক্ষ্মণ, বিশ্বজিৎ ও সেই তরুণ বোসকে নিয়ে টানাটানি হবে। মাঝে মাঝে ভাস্করের নাম আলটপকা চলে আসছে। এর সঙ্গে আলুবখরার চাটনি—হায়দরাবাদে হাবিব-আকবরের বড়দা মহম্মদ আজমের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা সেমিফাইনাল পর্যন্ত হয়ে আছে। মাঝে ওদের ওজন বাড়াতে সাবির-ফ্রান্সিসের না আসার খবরটা বিশেষ কাজ করেছে। মোহনবাগান মেসে বসে আকবর এ বিষয়ে টুঁ-হাঁ করতে নারাজ। শুধু জানাল—ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দাদা হাবিবের আসল খবরের ঝুলি কাঁধে কলকাতায় ফেরার কথা। জার্সি-বদল পালায় হের হিটলার হাবিব আই এফ এ শীল্ড খেলে রসগোল্লার টিন নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমায় বলেছিল—ক' বছর যে কলকাতায় খেলব, ঠিক বলতে পারি না। আমি এত দিন খেলেও কলকাতার প্রেমে পড়িনি। এখানকার ক্লাব কর্তারা আমাকে মরশুম শেষে প্রতিবারই পাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করে। কি করি বলুন? দাদার কলকাতায় খেলা সম্পর্কে আকবরের অদ্ভুত থিসিস—"দাদার একটা লেড়কা হলে ও বোধ হয় কলকাতায় খেলতে আসবে না।" হাবিবের দুটি কন্যা রত্ন। হাবিবকে পেতে ময়দানের মহান তিন ক্লাবই এবারও আগ্রহী।

আকছার বাঙালী সেণ্টিমেণ্টের আর এক নমুনা, এককালের স্টার প্লেয়ার এবং একালের স্টার টিমের কোচ—প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দু বছরে প্রশিক্ষকের আত্মীয়তায় বড় ক্লাবের বক্তি সামলাতে পি কে-র মধ্যে ক্ষোভের হালকা মেঘ বেশ কিছু জমা হয়েছে। সেই লীগের পর থেকেই গুজবের ভীমরুল ময়দানে ভোঁ ভোঁ করে চড়কি পরিক্রমা করেছে—পি কে নাকি আবার লাল-হলুদের মশাল হাতে নেবে। এবার অজয়বাবুদের হয়ে সেই সম্ভাবনা অনেকটা তুমিস্ত হব-হব অবস্থায় পৌঁছয়।

অথচ অজয়বাবুই জানালেন—এবার বোধ হয়, ওর পক্ষে পাল্টাপাল্টি সম্ভব হচ্ছে না। ওর ভাই প্রসূন যে এবার মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন!

তবে কি ইস্টবেঙ্গলের কোচ অমল দত্তকে সরিয়ে অরুণ ঘোষই জায়গা নেবেন? পাটের দর জানার মত ঘটনাটি চাপাচুপি দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে। গুজবের এল পি-তে দুই কানাড়ী কোচ কিটু ও শ্বাসাপ্পর নাম শোনা যায়। সন্তোষ ট্রফিতে হেরে বাসা ফিরে যাওয়ার সময় খবরের কল্প-দ্রুম থেকে টুপ করে খবরটি খসে পড়ল—যদি ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ সি আই এল-এর চাকুরিতে বাঙালাই প্লেয়ার অরুণের আবেদন গ্রাহ্য হয় তবে তাকে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে দেখা যেতে পারে। আবার এও ঠিক অরুণবাবু বছর তিন আগে মোহনবাগানের কোচ হয়ে অভিজ্ঞতার চাটুতে মনটি সেঁকে নিয়েছেন। অনেক প্লেয়ারেরই ও'র প্রতি আলাদা শ্রদ্ধা রয়েছে। ময়দানে এটা অজানা থাকাই হিম্মত।

শ্রী বিচিত্র এই কেল্লায় বন্দরে-ভূমি শোভিত কলকাতা ময়দান। গত বছরেও ওরই মধ্যে ট্রফি ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কম-জোরী টিম কাঁধে নেওয়ার জন্য এই পোড়-খাওয়া কোচ অমল দত্তই উচিত ব্যক্তি হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ওর সম্বন্ধে রটনা হয়েছে, প্লেয়ারদের সুখে-দুঃখে উনি মিশে গলে কচু হয়ে যেতে পারেন না, ওর নাকি ব্যক্তিত্বে খাদ আছে।

দুটি প্রসঙ্গের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত। শ্যামঅ্যামেচারের টোপর-পরা আমাদের এই ফুটবল পরিবেশে দুই মহান ক্লাবে কোচ হয়েও যার তিনেক অমল দত্ত দারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অতঃপর উনি হাঁড়ি-কাঠে গলা বাড়াতে নারাজ। আর কোচকে ব্যক্তিত্বের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও ক্লাবের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। বিপরীতে আধ-বুড়ো প্লেয়াররা আস্কারা পেয়ে থাকে। ব্যক্তিত্বের আলপনা-আঁকা ছাতা নিয়ে এমতাবস্থায় কতক্ষণ আর তারের উপর নিজের ইজ্জতের ব্যালান্সের খেলা অমলবাবুদের পক্ষে দেখানো সম্ভব। মূল কথা, কোচকে নিয়ে মাতামাতিতে

উলগানাথন

গৌতম সরকার

ক্লাব কর্তাবাবুদের আখেরের স্তূপটি যদি ছোট হয়ে যায়!

কোচের যথাবিহিত সম্মান নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার মাঝেও প্লেয়ারের কাল্পনিক প্রাপ্তিযোগে কোনও টান পড়ছে না। হাজার টাকার নোট অচল হওয়ার পরেও ময়দানী টরে-টক্কায় কিন্তু কারা বেশ কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশের আওয়াজ তুলছে। গত বছরের ফোলানো ফাঁপানো খবরে কুচকুচে মোতিটির দাম ছিল ষাট হাজার। দরটা শেষে থিতোয়, চল্লিশে। শেষমেষ বকেয়া ছিল। পীতাভ পোখরাজের দাম ছিল ওর চেয়ে পাঁচ বেশি। কেউ আবার ওই অঙ্কটাই ভাল খেলে ফাউ-জুড়ে পেয়েছে। যদিও কথা ছিল তিরিশের। কেউ কেউ স্যুট, শাড়ির ভেটও পেয়েছে। এ সম্পর্কে প্রশ্নের জোড়াসাঁকোটি এই রকম—প্লেয়ারে অনিশ্চিত জীবন ও প্যাকারের পয়সা সার্কাসের প্যাঁকপ্যাঁকানি। দূরে হলেও প্যাকারকে জাপটে ধরা যায়, কিন্তু পেশাদারী ফুটবলের উত্তেজনায় আগুন পোহানো এই অদৃশ্য উৎপাতকে কে জব্দ করবে?

গত ফুটবল মরশুমের শেষাশেষি এক ছুটকো ঘটনার কথা তবে বলি। সেদিন প্র্যাকটিস শেষে নানা কথার মাঝে পি কে প্লেয়ারদের মধ্যে পরমহংসদেবের টাকা-মাটি মাটি-টাকার মূল্যবান ঘটনাটি বলছিলেন। শেষে আসনের নীচে টাকা রেখে ঠাকুরকে পরখ করার ঘটনাও যোগ হল। দেখছি, ধর্মভীরু মহম্মদ হাবিব গো-গ্রাসে ঘটনা দুটি আত্মস্থ করছে। ওর চোখ দুটি যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। কৌতূহল চাপতে না পেরে শেষে সে বলে ওঠে—হুঁ, এইস্যা আদমী!

বিশ্বকাপ ফুটবলে শেষ ষোলটি দেশ

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হতে সাড়ে তিন মাস বাকি। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পাঁচটি শহরে খেলা শুরু হবে পয়লা জুন থেকে।

আমরা জানি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক খেলার পর বিজয়ী দেশগুলিকে নিয়ে যে খেলা হয় তাকেই বলে ফাইনাল পর্যায়ের খেলা বা বিশ্ব কাপের মূল খেলা। ফাইনাল পর্যায় খেলে ১৬টি দেশ। ১৪টি দেশ আসে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে। বাকি ২টি হচ্ছে মূল প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ আর আগেরবারের বিজয়ী দেশ। সুতরাং ১৯৭৪-এর বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী এবং আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনা মূলে খেলবে আগেই ঠিক ছিল। বাকি ১৪টি দেশের ৯টি ইউরোপের, ২টি দক্ষিণ আমেরিকার ১টি উত্তর ও মধ্য আমেরিকার, ১টি এশিয়ার ও ১টি আফ্রিকার। তাহলে পশ্চিম জারমানী ও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে ইউরোপের দলের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০, দক্ষিণ আমেরিকার ৩।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল পর্যায়ের এই কাঠামো। এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চল থেকে একটি করে দেশই ফাইনাল পর্যায় খেলার যোগ্যতা পেয়ে থাকে। একটির বেশী দেশ পায় না। যেহেতু ইউরোপের এবং দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল মান অনেক উন্নত সেহেতু ওই দুই অঞ্চলের বেশী দেশকেই ফাইনাল পর্যায় খেলার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। কীভাবে ১৪টি দেশ আর্জেন্টিনায় খেলার যোগ্যতা পেয়েছে সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে ফাইনালের গ্রুপ সম্পর্কে আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।

গত ১৫ জানুয়ারি আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারসে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি জোয়াও হ্যাভালেঞ্জের চার বছর বয়সী পৌত্র রিচার্ডো টেক্সিরা লটারি প্রথায় কাগজে লেখা নাম টেনে গ্রুপের কাঠামো তৈরী করে। কাঠামো তৈরী হয়েছে এই ভাবে:

এক নম্বর গ্রুপ—আর্জেন্টিনা, ইতালি, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স।

দুই নম্বর গ্রুপ—পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও টিউনিসিয়া।

তিন নম্বর গ্রুপ—ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও সুইডেন।

চার নম্বর গ্রুপ—নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, পেরু ও ইরান।

বলা বাহুল্য, গ্রুপের খেলা হবে লীগ নিয়মে। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে। অর্থাৎ গ্রুপ লীগ থেকে ৮টি দেশ বাদ যাবে, ৮টি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে।

যাতে লটারি প্রথায় শক্তিশালী দেশগুলি এক গ্রুপে পড়ে না যায় সেইজন্য আগে থেকে শক্তিশালী চারটি দেশকে বেছে নিয়ে চারটি গ্রুপের শীর্ষদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তারপর লটারি করে প্রতি দেশের সঙ্গে তিনটি করে দেশ জুড়ে দিয়ে গ্রুপ ঠিক করা হয়।

১৬টি দেশের মধ্যে গ্রুপ শীর্ষ হিসাবে বাছাই করা হয় গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী, তিনবার বিশ্ব ফুটবলে (জুলে রিমে ট্রফি) বিজয়ী ব্রাজিল ও আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনাকে। গোলমাল দেখা দেয় চতুর্থ দেশ বাছাই নিয়ে। গতবারের রানার্স নেদারল্যান্ডস এবং ১৯৭০-এর রানার্স ইতালি গ্রুপ শীর্ষের দাবী জানায়। ইতালি শুধু ৭০-এর রানার্সই নয়, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮-এ জুলে রিমে ট্রফি বিজয়ী। তাছাড়া ফুটবলে দারুণ সমৃদ্ধ। পৃথিবীর নামী প্রোফেশনাল খেলোয়াড় কেনে অঢেল টাকা ঢেলে। কিন্তু আধুনিক ফুটবলে নেদারল্যান্ডসও অসাধারণ শক্তিশালী। তার উপর ৭৪-এর রানার্স। সুতরাং এই দুই দেশের দাবী নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসকে গ্রুপ শীর্ষে রেখে 'ইতালিকে' জুড়ে দেওয়া হয় এক নম্বর গ্রুপে আর্জেন্টিনার সঙ্গে।

গ্রুপ শীর্ষে থাকার দাবী কেন? না, অপেক্ষাকৃত সহজে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথ পাওয়া। কেননা, স্বভাবতই গ্রুপের অপর দলগুলি থাকে কিছুটা কমজোরী এবং গ্রুপ থেকে দুটি দলের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলাও নিশ্চিত।

কিন্তু 'ফিফা'র প্রেসিডেন্টের পৌত্র এমনভাবেই নাম টেনেছে যে, দুটি গ্রুপে শক্তিশালী দলের ভীড় জমেছে, অপর দুটি গ্রুপে অপেক্ষাকৃত কমজোরী দলের সমাবেশ। সংগঠক দেশ আর্জেন্টিনার ফুটবল শক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তার সঙ্গেই রয়েছে ইতালি, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স। পঞ্চাশের দশকে পুসকাস, হিদেকুটি, বসজিক-এর হাঙ্গেরী দল ছিল দারুণ শক্তিশালী। ৫৪-র বিশ্ব কাপ ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে ২—৩ গোলে হেরে গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর কাছে। সেই হাঙ্গেরী নাকি ফুটবলে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দলে অনেক তরুণ ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়ের সমাবেশ। ফ্রান্সও এখন ফুটবলে যথেষ্ট শক্তিশালী। সুতরাং এক নম্বর গ্রুপ থেকে কোন দুটি দেশ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে কেউ আন্দাজ করতে পারছে না।

তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও সুইডেনের শক্তি আন্দাজ করাও শক্ত। অসাধারণ দল ব্রাজিল ৭৪-এ পেয়েছিল চতুর্থ স্থান। যদিও ব্রাজিলের কোচ ও ম্যানেজার ক্লডিও কুটিনহো বলেছেন, তাঁর দেশ সহজেই তিন নম্বর গ্রুপের শীর্ষস্থান পাবে তবু সন্দেহ আছে বই কি? ব্রাজিল কি এখনো সেই অপ্রমেয় ফুটবল শক্তির অধিকারী? কুটিনহো কিন্তু নিজেই স্বীকার করেছেন। অস্ট্রিয়াকে তারা যথেষ্ট সমীহ করেন। স্পেন এবং সুইডেনও যথেষ্ট শক্তিশালী।
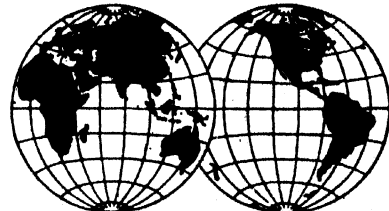
দুই নম্বর গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী ও পোল্যান্ড এবং চার নম্বর গ্রুপ থেকে নেদারল্যান্ডস ও স্কটল্যান্ড হয়তো সহজেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। তবে পেরুকে ডার্ক হর্স বলা যেতে পারে। ৭০-এ মেক্সিকোয় ফাইনাল পর্যায় পেরু খুবই ভাল খেলেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিল ব্রাজিলের কাছে। ৭৪-এ অবশ্য ফাইনাল পর্যায় খেলার সুযোগ পায়নি।

ফাইনাল পর্যায় এবার দুটি নতুন দেশ এশিয়া ও ওশেয়ানিয়া অঞ্চলের ইরান এবং আফ্রিকা অঞ্চলের টিউনিসিয়া। এ দুটি দেশ কোনবার ফাইনাল পর্যায় খেলেনি। ৭৪-এ পশ্চিম জার্মানীতে যে ১৬টি দেশ ফাইনাল পর্যায় খেলেছিল তাদের মধ্যে ৮টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, যেমন ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া, বালগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে, চিলি ও হাইতি, এশিয়া-ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার জাইর। আবার গতবার খেলেনি যারা তাদের মধ্যে ইরান ও টিউনিসিয়া বাদে হাঙ্গেরী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, স্পেন, পেরু ও মেক্সিকো এবার খেলছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ইংলন্ড, রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও পর্তুগালের মত শক্তিশালী দেশগুলির ফাইনাল পর্যায় খেলার সুযোগ না পাওয়া। ইংলন্ড ও রাশিয়া ৭৪-এ পশ্চিম জার্মানীতেও খেলেনি। পৃথিবীর নানা দেশের ফুটবল মান কীভাবে উঠছে নামছে সেটা বোঝাবার জন্যই এত কথা লিখতে হচ্ছে। ব্রাজিলই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যারা কোনবারই ফাইনাল পর্যায়ের আগে বাতিল হয়নি। ১০ বারই মূল প্রতিযোগিতায় খেলেছে। এবার হচ্ছে বিশ্ব কাপের একাদশ প্রতিযোগিতা।

কীভাবে কোন দেশ আর্জেন্টিনায় খেলার অধিকার পেল এবার সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইউরোপ অঞ্চলে প্রাথমিক লীগে খেলেছে ৩১টি দেশ ৯টি গ্রুপে ভাগ হয়ে। গ্রুপে প্রতি দেশ প্রতি দেশের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ খেলেছে, একটি নিজেদের দেশে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর দেশে। বন্ধনীর মধ্যে পয়েন্টের সংখ্যা সহ প্রতি গ্রুপে পর পর দলের নাম দেওয়া হল। এক নম্বর গ্রুপে পোল্যান্ড (১১), পর্তুগাল (৯), ডেনমার্ক (৪) ও সাইপ্রাস (০)। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পোল্যান্ড শুধু একটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে পর্তুগালের সঙ্গে ফিরতি খেলা ১—১ ড্র করে। ৬টি খেলায় গোল করেছে ১৭টি।

দুই নম্বর গ্রুপে ইতালি (১০), ইংলন্ড (১০), ফিনল্যান্ড (৪), লুক্সেমবার্গ (০)। ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমান পয়েন্ট পেয়েও ইতালি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোল পার্থক্যে। গোল সংখ্যা ইতালির ১৮—৪, ইংল্যান্ডের ১৫—৪। ইংলন্ডের কিছুটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। ১৯৬৬-র বিজয়ী ইংলন্ড প্রথম খেলায় ইতালির কাছে ০—২ গোলে হেরে গেলেও ফিরতি খেলায় জেতে ২—০ গোলে। ইংলন্ডের মত দলের যোগ্যতা অর্জন না করার অর্থ মূল প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কিছু কমে যাওয়া।

তিন নম্বর গ্রুপে অস্ট্রিয়া (১০), পূর্ব জার্মানী (৯), তুরস্ক (৫), মালটা (০)। ফুটবলে যে কোন শীর্ষ দেশের মতই শক্তিশালী পূর্ব জার্মানী, যারা গতবারের বিশ্ব কাপের ফাইনাল পর্যায়ের গ্রুপ লীগে বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করেছিল, একটুর জন্য তারা আর্জেন্টিনা যেতে পারল না। চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দুটি ম্যাচই ১—১ ড্র করে। আর একটি ম্যাচ ড্র করে তুরস্কের সঙ্গে ১—১ গোলে। তাও পূর্ব জার্মানীরই মাঠে।

চতুর্থ গ্রুপে নেদারল্যান্ডস (১১), বেলজিয়াম (৬), উত্তর আয়ারল্যান্ড (৫), আইসল্যান্ড (২)। গতবারের রানার্স নেদারল্যান্ডস শুধু উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে একটি ম্যাচ ২—২ ড্র করে একটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

পঞ্চম গ্রুপে ফ্রান্স (৫), বালগেরিয়া (৪), রিপাবলিক আয়ারল্যান্ড (৩)। তিনটি দলই প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল। শেষ খেলায় বালগেরিয়াকে ৩—১ গোলে হারিয়ে বাজি মাৎ করেছে ফ্রান্স।

ছয় নম্বর গ্রুপে সুইডেন (৬), নরওয়ে (৪), সুইজারল্যান্ড (২)। সুইডেন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলেও ফিরতি খেলায় নরওয়ের কাছে হারে ১—২ গোলে।

সাত নম্বর গ্রুপে স্কটল্যান্ড (৬), ওয়েলস (৪), চেকোস্লোভাকিয়া (২)। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন স্কটল্যান্ড প্রথম খেলায় ০—২ গোলে হারে চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে।

অষ্টম গ্রুপে স্পেন (৬), রুমানিয়া (৪), যুগোশ্লাভিয়া (২)। স্পেন রুমানিয়ার কাছে প্রথম খেলায় হেরে যায়।

নয় নম্বর গ্রুপে হাঙ্গেরী (৫), রাশিয়া (৪), গ্রীস (৩)। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরী দুটি পয়েন্ট হারায় রাশিয়ার কাছে, একটি গ্রীসের কাছে। রাশিয়া দুই দেশের কাছেই একবার করে হেরে যায়। ইউরোপ অঞ্চলের খেলায় শুধু গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং হল্যান্ড কোন খেলায় হারেনি। কোন খেলায় না হেরেও বিদায় নিয়েছে পূর্ব জার্মানী।

অন্যান্য গ্রুপ বিজয়ীর কথা আগামী সংখ্যায় লেখা যাবে। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনে অর্থাৎ 'ফিফা'র প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে পাশাপাশি অঙ্কিত পৃথিবীর দুই গোলার্ধ। ফিফা বিশ্ব কাপের খেলাও বেশী জমে দুই গোলার্ধের দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। অর্থাৎ ইউরোপের সঙ্গে ফুটবল সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার লড়াইয়ে। গতবারের মত এবারও শক্তির দিক দিয়ে ইউরোপেরই পাল্লা ভারি।

মুকুল [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি বই
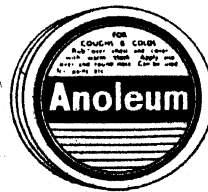
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ : সম্পাদকবৃন্দ : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। গোলপার্ক। কলকাতা—৭০০০২৯। মূল্য, ৩৫ টাকা।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে সন্ন্যাস কথাটির মানে হল ইহলোক থেকে মুখ ফিরিয়ে পরলোকের দিকে তাকানো। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভবত এই সংজ্ঞার এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তিনিই সম্ভবত প্রথম এবং শেষ সন্ন্যাসী যাঁকে পরমাত্মা ও পরলোক যত ভাবিয়েছে, ইহলোক-চিন্তা তার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিয়েছে।

সাংসারিক এমন কোন দিক নেই, যে দিকটিকে তাঁর চিন্তা বা ভাবনা স্পর্শ করেনি। দেশ জাতি মানুষ মুক্তি ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস রাষ্ট্র অর্থনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংগীত শিল্প স্থাপত্য নন্দনতত্ত্ব—এমন কোন দিক নেই যা তিনি আলোকিত করেন নি। অবাক হয়ে যেতে হয় যখন দেখি, সন্ন্যাস জীবনের যাত্রারম্ভে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকাই যে মানুষটির জীবনের পরমতম লক্ষ্য ছিল, তিনিই বলছেন, 'আগে পেট ভরে খাও তারপর ধর্মকর্ম হবে।' তখনই প্রশ্ন জাগে, ভক্ত যাই বলুন না কেন—আসল বিবেকানন্দকে আমরা চিনেছি তো?

ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শনের স্রষ্টা ও প্রবক্তাদের মধ্যে তো বটেই—ভারতবর্ষের মহামানবের তালিকায় বিবেকানন্দ নামটি যত কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ধমনীতে যত আলোড়ন এবং আবেগের জগতে যত প্লাবন জাগায় এবং নির্লিপ্ত বিজ্ঞান বুদ্ধিকে যত ধন্ধ লাগায় এমন সম্ভবত আর কারু সম্পর্কে বলা যায় না।

তাই বিবেকানন্দ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার কোন শেষ নেই। দীর্ঘদিন ধরে হয়ে চলেছে এবং হতে থাকবে। 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' আধুনিক জনমানসের সেই কৌতূহল ও আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত ও প্রকাশিত একটি বিপুল আয়তন প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। ৮৭২ পৃষ্ঠার এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন স্বনামধন্য বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞগণ।

গ্রন্থটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। কতকটা বলা চলতে পারে বিবেকানন্দ বিচার। অর্থাৎ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে তাঁর কাল তথা দেশ দেশীয় আন্দোলন ও বিশ্ব মানবতার যোগসূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। এই পর্যায়ে আছে সাতটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ গুলির বিষয় হল : বিবেকবাণীর উৎস ও গতি, বিবেকানন্দ বিচার, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ, ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান, ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে বিবেকবাণীর তাৎপর্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী।

দ্বিতীয় পর্যায় হল, বিবেকানন্দ অনুধ্যান। এই পর্যায়ে বিবেকানন্দের মানসলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিফলনকে তুলে ধরেছেন গবেষকবৃন্দ। এই পর্যায়ে চৌদ্দটি প্রবন্ধে স্বামীজীর জীবনদর্শন, ধর্মচিন্তা ইতিহাসচেতনা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা, কৃষিচিন্তা গণচেতনা শিক্ষাচিন্তা বিজ্ঞান চেতনা সংগীতভাবনা সাহিত্যচিন্তা, তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান নারীজাগরণের, নন্দনতত্ত্ব, তাঁর অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায় শিল্প ও স্থাপত্য—এই সব মৌলিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়টি হল তুলনামূলক আলোচনা। বুদ্ধদেব এবং বিবেকানন্দ। শংকরাচার্য ও বিবেকানন্দ। রামমোহন ও বিবেকানন্দ। মার্কস ও বিবেকানন্দ। গান্ধীজী ও বিবেকানন্দ। সুভাষচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। একটি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ প্রসঙ্গও এসেছে তুলনামূলকভাবে।

সমস্ত লেখাগুলিই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক বিশিষ্ট লেখকদের দ্বারা রচিত। অনেক লেখকই বিদ্বান, সুপণ্ডিত ও গবেষক বলে পরিচিত। এদের মধ্যে রয়েছেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত সোসাইটির মেরী লুই বার্ক, অধ্যাপক অমলেন্দু বসু, অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সন্ন্যাসী ভক্ত লেখকও রয়েছেন কয়েকজন।

বলাবাহুল্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধ প্রতিটি লেখকের দীর্ঘকালের বিবেকানন্দ চর্চার ফল। ফরমায়েসী প্রয়োজন থেকে লেখাগুলি সৃষ্টি হয় নি। সেই জন্যই প্রতিটি লেখা সুলিখিত, সুবিন্যস্ত ও সুসিদ্ধান্তে উপনীত।

[illegible]
পরিবর্তন [illegible]
গ্রন্থের [illegible] লেখকদের,
স' হল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।
পরিবর্তিত কাল ও সমাজে
কানন্দ যে ধর্মনিরপেক্ষ নির্লিপ্ত
র কাছেও মহান ও বিরাট সেই
ট কেমন যেন উহ্য থেকে গেছে।
হাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই
াটি দেখিয়েছেন তাঁর 'ঐতি-
কের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ'
ধে। তিনি অকপটে বলেছেন,
। বিবেকানন্দকে জনসাধারণ
মকৃষ্ণের মানসপুত্র, সর্বত্যাগী
সী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের
ষ্ঠাতা এবং হিন্দুধর্ম প্রচারক
ই ভক্তি ও পূজা করেন, কিন্তু
ক শুধুমাত্র এইদিক থেকে দেখলে
ন্ধ হস্তীদর্শনের মতই ভুল হবে।
অফুরান স্বদেশপ্রীতি ও প্রগাঢ়
প্রেম—অনুভূতিপূর্ব বাস্তব জীবন
মাজ সচেতনতা থেকে উদ্ভূত।
১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বরে
গোর ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের
কা এতকাল আমাদের অধঃপতিত
সম্মানের পুনরুদ্ধারের আনন্দ ও
-উদ্ভাসিত দৃষ্টিকোণ থেকে
াচিত হয়েছে। এই প্রথম একজন
শিনী মেরী লুই বার্ক 'ঊনবিংশ
ব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্ত্য
কবাণীর তাৎপর্য' প্রবন্ধে একটি
ূর্ণ স্বতন্ত্র দিক থেকে ব্যাপারটাকে
ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ১৯০২
ন লিখিত বারট্রান্ড রাসেলের উক্তি
ার করে দেখিয়েছেন যে সে সময়
রোপ ও আমেরিকাতে বিশ্বাস ও
ধর জগত কী রকম অসহায় হয়ে
ড়িছল। ধর্মমহাসভার বক্তৃতা সেই
স্থার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব
স্তার করতে পারেনি। সেই বক্তৃতা
চাত্ত্য জগতের সঙ্গে স্বামীজীর
চয় করিয়েছিল মাত্র। বরং এরপর
ন বছর ধরে তিনি আমেরিকা ও
লন্ডের অধিবাসীদের কাছে যে বাণী
র করেছিলেন তাই 'পাশ্চাত্ত্য
তের তৎকালীন দুরূহ জটিল সকল
স্যার সমাধান এনে দিল।'
ডঃ অমলেন্দু বসুর স্বামী
বেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব
টি 'আকর্ষণ করবার মত প্রবন্ধ।
বেকানন্দের রচনা চিঠি ও উক্তি
শ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে
লাশের ভাষা, সাহিত্য রচনায়
তীকের ব্যবহার এবং শিল্পতত্ত্ব
ম্পর্কে ধারণা শুধু অভিনবই নয়,
াধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার সমান্ত-
ল আধুনিক ও কাকস্বচ্ছ হয়েও
বাত্মা ও পরমাত্মার চিরআকাঙ্ক্ষিত
লনের লক্ষ্যাভিসারী।
স্বামীজীর তিরোধানের পর
াধীনতা আন্দোলনের যতগুলি পথ
লা হয়েছিল; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি
লেন প্রেরণার উৎসধারায় অধিষ্ঠিত।
াধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার
র্ব শর্ত হল ভারতবর্ষকে চেনা।
শুধু কেতাবী চেনা নয়। মানুষের
কের সঙ্গে বুক লাগিয়ে চেনা।
লের কোণে কোণে গিয়ে মানুষকে
ণাদনায় যে মন্ত্র—সে মন্ত্রের প্রথম
ণ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস-
নের গোড়ার অনুপ্রাণ যে বিবেকানন্দের
[illegible] আহূত হয়েছিল, আজ আর
[illegible] সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়ের এই
সম্পর্কিত লেখাটি একটি ভাল রচনা।

তুলনামূলক আলোচনা পর্যায়টি
এই গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ। এর মধ্যে
স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 'নতুন পৃথিবীর
সন্ধানে মার্কস ও বিবেকানন্দ' একটি
মৌলিক চিন্তাজাত উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ।
এই দুই মহাপুরুষ দুই সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্র কোটির সাধক হয়েও প্রেরণায়
ও চিন্তার ক্রমিকতায় একটি বিশেষ
পর্যায় পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে সহগামী।
এত ভাল একটি প্রবন্ধে একটি বিষয়
আর একটু পরিষ্কার হলে ভাল হত।
প্রকাশের কালানুযায়ী বিবেকানন্দের
সমাজতান্ত্রিক চিন্তা মার্কসীয় চিন্তার
কতটা ব্যবধানে রচিত? ১৮৯৩ সালে
স্বামীজী যখন আমেরিকায় উপনীত,
তখন কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী ইস্তা-
হারের রুশ সংস্করণের ভূমিকা লেখা
সমাপ্ত। এটি তাঁর শেষ লেখা।
স্বামীজী কিন্তু ধর্মমহাসভার বক্তৃতার
পর তিন বছর ধরে আমেরিকা ও
ইংলন্ডের নানা জায়গা পরিভ্রমণ করেন
এবং বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসেন।
এই সময় তিনি কার্ল মার্কসের রচনার
সঙ্গে বা চিন্তার সঙ্গে কোনক্রমেই কি
পরিচিত হননি? যদি না-হয়ে
থাকেন তাহলে স্বামীজীর মৌলিকতা
মার্কস সাহেবের মৌলিকতা অপেক্ষা
উচ্চশ্রেণীর বললে সম্ভবত অত্যুক্তি করা
হবে না। ইউরোপ খণ্ডের সমাজ পরি-
বর্তনের যে অভিজ্ঞতা মার্কস সাহেবের
চোখের সামনে ছিল—রাজা জমিদার
শাসিত ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের সামনে
তার সামান্য বস্তুও জাগেনি।

'মানবতাবাদ : বুদ্ধদেব ও
বিবেকানন্দ' প্রবন্ধটিতে স্বামী
মুমুক্ষানন্দ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়ে-
ছেন যে বিবেকানন্দের মানবতাবোধ
একটি স্থান ও কালের প্রাসঙ্গিকতার
দ্বারা আপাতভাবে আবদ্ধ থাকলেও তা
বুদ্ধদেবের সর্বদেশ ও কালের মানব-
মুক্তির মতই সমস্ত গন্ডী উত্তীর্ণ
হয়ে চিরকালের মানুষের জন্য
প্রবাহিত।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার যথার্থ
দেখিয়েছেন সর্বোদয় চিন্তার ক্ষেত্রে
স্বামীজী ও গান্ধীজীর মতে ঐক্য ও
অনৈক্য দুই-ই বর্তমান। তবে
গান্ধীজী যে স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা
অনেকখানি প্রভাবিত তাতে সন্দেহ
নেই।

ব্রহ্মচারী শঙ্করের 'যুগনায়ক ও
দেশনায়ক : বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র'
প্রবন্ধটি এই দুই মহাপুরুষকে নূতন
করে চিনবার সহায়ক হয়েছে। এই
দুই মহাপুরুষ যেন একই আত্মার দুই
ভারমেনশান। দেশ ও মানুষের মুক্তির
অনির্বাণ আগুনে দুটি মানুষই প্রতি
মুহূর্তে পুড়েছেন। সুভাষচন্দ্রের
প্রেরণার উৎসে আমরা বার বার
স্বামীজীকে দেখতে পেয়েছি। তিনি
নিজেও সে ঋণের কথা অকপটে স্বীকার
করে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

সব মিলিয়ে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট
অব কালচার একটি মহৎ কাজ করে-
ছেন। আগামী দিনে বিবেকানন্দের
উপর গবেষণার দিকচিহ্নটি এই গ্রন্থের
দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করে
[illegible]
রূপরেখাটি [illegible] সুপ্রশস্ত করে
দিয়েছেন। সম্পাদকদের অশেষ ধন্যবাদ।

এই বইকে বাদ দিয়ে বিবেকা-
নন্দ অনুধ্যানে ত্রুটি থাকবে। উৎসাহী
পাঠক, গবেষক ও ভক্ত সে খবর নিশ্চয়
রাখবেন। উপযুক্ত ছাপা ও মজবুত
বাঁধাই বইটির মর্যাদার পরিপূরক
হয়েছে।

অজয় মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চিত্রকলা**

পথের প্রদর্শনী

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের
সংযোগ-স্থলে ফুটপাথের ওপর রেলিং-
ঘেরা কেষ্টদাস পালের দাঁড়ানো মর্মর-
মূর্তি আজও বোধ হয় অদৃশ্য হয় নি।
এইখানেই প্রথম আমি চিত্র প্রদর্শনী
দেখি।...বিকেলবেলা একজন ভদ্রলোক
এই রেলিং-এর ওপর ফ্রেমে-বাঁধা ছোট
ছোট অয়েল পেনটিং সাজাতেন। সবই
ছিল ভূ-দৃশ্য। দাম ৫ থেকে ২৫ টাকা।'
(চিত্রকর : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়)।

এই ভদ্রলোকেরই নাম কিন্তু বিনোদ-
বাবুর মনে নেই। কলকাতার সমকালীন
চিত্রকলার ইতিহাসে আজ থেকে ঠিক
কুড়ি বছর আগে প্রকাশ কর্মকার
মিউজিয়ামের সদর স্ট্রিটের রেলিংএ
তৈলচিত্র করে প্রথম (প্রদর্শনীর) নজির
সৃষ্টি করেন। প্রকাশের পর নিখিল
বিশ্বাসও ফুটপাথে প্রদর্শনী করেন।
কিন্তু বিনোদবাবুর বিবরণই প্রমাণ এই
ব্যাপারে প্রকাশের আগে আরেক জন
ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর নাম
জানি না। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে
অশোক সাহা চতুর্থ ব্যক্তি। প্রায় প্রতি
বছর তিনি কালিকলমের অঙ্কন
প্রদর্শনী করছেন গত তিন চার বছর।
ছবির দাম এক শ টাকা। এবার তিনটে
ছবি বিক্রী হয়েছে। অশোকবাবু স্বল্পে
সন্তুষ্ট। উচ্চাভিলাষী নন। বরং ছবিকে
বোধগম্য করার জন্যে প্রতি ছবির সঙ্গে
ছড়া জুড়ে দিয়েছেন। কাঁচা লেখা এবং
নেহাৎ ছেলেমানুষী! তবু তা হোক।
আকাশের নীচে প্রদর্শনী হকচকিয়ে
দেবার জন্যে করেননি। মাঝারী ধরনের
ছবিতে স্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে তিনি
সাধারণের কাছে আসতে চেয়েছেন
(সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের
রেলিংএ, ৪ঠা—১৪ই জানুয়ারী)।

মোটা রেখা, কিন্তু আঁকিবুঁকি কাটা
আর ভেতরে। সুতরাং স্বচ্ছাস্বচ্ছ। ফলে
পেছনের অদৃশ্য রেখা তিনি সাহস করে
দেখিয়েছেন। ধরুন ঘোড়ার পিঠে দুজন
জকিকে পাশ থেকে দেখানো হয়েছে।
রেখা আধা স্বচ্ছ হওয়ায় একটার ওপর
আরেকটি আরোপ করে একসঙ্গে সামনে
এবং ঢাকা পড়া পেছনের দৃশ্য দেখানো
হয়েছে। অথচ সর্বক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিকতা
বজায় রয়েছে। সেদিক দিয়ে কারদাটা
বেশ ভাল লেগেছে আমার।

ক্ষুধা, বঞ্চনা, শোষণের কথা
চিত্রোপযোগী প্রতীকী ভাষায় তিনি
বলতে চেয়েছেন। একটু ভাবধর্মী এবং
সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার
জন্যে চিত্রগত তর্জমাটা মোটামুটি মাঝে
মাঝে উৎরে গেছে। কাক, ঈগল, পায়রা
ভাল বা মন্দের প্রতীক হিসাবে এসেছে।
এসেছে মানুষজন। কখনো বাস্তব,
[illegible] মনের কাজের মধ্যেও অশোক
সাহা বিকল্প ব্যাপার ঘটাতে পেরেছেন।
সেটুকুই তো কসুরম পারে না।

কুমকুম মুন্সী

এমন এক-একজন আছেন যাঁদের
চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে না। এক-
একজনের ছবিতেও পরিবর্তন খুব
সামান্যই হয়। তাঁদের কাজে ভাঁশা ভাবটা
থেকেই যায়।

আমাদের চিত্র-ঐতিহ্য অধুনা অন্য
[illegible]। যে-সামাজিক পরিস্থিতি, বস্তু
নির্ভর নৈরাজ্যের মধ্যে মার্কিন মুলুকে
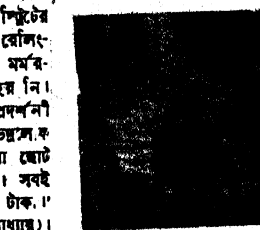
বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের উদ্ভব সে-সবের
কিছুই এখানে নেই। একটা অমানবিক
এবং বিচ্ছিন্নতার দ্যোতক পরিস্থিতিতে
জ্যাকসন পোলক প্রাসঙ্গিক হতে
পারেন। ভিন্ন দেশী অবস্থায় তাঁর
কাজের বহিরঙ্গে অনুকরণ করা গেলেও
অভ্যন্তরীণ প্রাসঙ্গিকতা ছবিতে আনা
খুবই শক্ত। কুমকুম মুন্সীর ছবি দেখে
সে-কথা মনে হলো আরেকবার (৩২
চৌরঙ্গীর ডেকর সার্ভিস গ্যালারী—
১২-২১ জানুয়ারী)।

কুমকুমবাবুর নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার
কোনো সন্দেহ নেই। ভূমিজ রঙ গুঁড়ো
করে গঁদ দিয়ে অস্বচ্ছ জলরঙের
বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন। নানা বর্ণের
ছোপ, আঁচড়, সূক্ষ্ম রেখার জালের
মধ্যে বিধৃত। দ্বিমাত্রিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে
সাদা রেখার সুতো ছেড়েছেন লাটাই
থেকে। রঙের বুনোটের ওপর সাদা
রেখার জাল বিস্তারে বর্ণ রহস্যময়
হয়েছে। কোথাও আবার সাদার কাজ
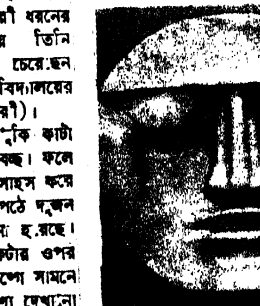
অতিরিক্ত হয়ে গেছে—জেবড়ে গেছে।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ায়
লাভবান হয়েছেন। বিশ্বাসযোগ্যভাবে
নীল, হলুদ, লালের সুমিত বিস্ফো-
রণের মধ্যে পার্বত্য পাথুরে আবহ রচিত
হয়েছে। সাদা মোটা রেখার মধ্যে সরু
সরু চুলের মতো রেখা বসিয়ে মায়া
তৈরী করতে পেরেছেন। কখনো সমুদ্রের
অতলের ভাবটা, কখনো আকাশের বিরাট
অবকাশের সুরটা, কখনো ঢেউয়ের

ফুলশয্যার রাতে

জীবনের পরম দিনটির উৎসব অনুষ্ঠান সব শেষ হয়ে এল। নিমন্ত্রিতরা সব একে একে বিদায় নিলেন। অবশেষে ওরা শুধু দুজন, শুধু দুজনাই, সারাদিনের মধ্যে ওরা এই প্রথম নিভৃত কূজনের সুযোগ পেল।

আনন্দ বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছে, কি যে করবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে ফুলে সাজানো বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে তার নববধূ আড়ষ্টভাবে ব্রীড়াবনত হয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে আছে। নতুন বউয়ের ঘোমটাটা আলতো-ভাবে তুলে দেওয়ার সময় নার্ভাস হয়ে আনন্দর হাতটা একটু কেঁপে উঠলো।

মমতা সত্যিই সুন্দরী, তবে খুব একটা লাজুক বলে আনন্দর মনে হল না। নতুন বউয়ের সঙ্গে কিভাবে কথা আরম্ভ করবে বলে বন্ধুরা এতদিন ধরে যা যা শিখিয়ে ছিল, আনন্দ সব গুলিয়ে ফেললো। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো, তার মুখে কোনো ভাষা নেই।

কিছুক্ষণ বাদে মমতা ভাবলো এই চুপচাপ অবস্থাটা কাটানো দরকার।

সে বলে উঠলো, "সারাদিন খুব ঝামেলা গেল, ক্লান্তি লাগছে, তাই না?"

আনন্দ আন্তরিকভাবে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, সত্যিই খুব ক্লান্তি লাগছে।"

যাক, তবু ভালো, সে বোবা নয়, কথা বলতে পারে।

মমতা একটু মিষ্টি হেসে বললো "কিন্তু দারুণ ভাল-ও লেগেছে।"

আনন্দ সঙ্গেসঙ্গে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

"এবার আমি সব জিনিসপত্তর বার করে সাজিয়ে ফেলি", বলে মমতা তার বড় ট্রাঙ্কটার দিকে এগিয়ে গেল। সে মুখে কথা বলতে বলতে ট্রাঙ্ক থেকে এক-এক করে জিনিস বার করে পাশের টেবিলে গোছাতে লাগলো, "নাইট ড্রেস, চিরুনী, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট···।" তার এই চটপট কাজ করার ক্ষমতা দেখে আনন্দর খুব ভাল লাগলো। মমতা যখন ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জিনিসগুলো সব ঠিক-ঠাক জায়গায় গোছাচ্ছে তখন আনন্দর মনে হ'ল তার বউ শুধু সুন্দরীই নয়, খুব চটপটেও।

আনন্দ ভাবলো তারও কিছু করা উচিৎ। সে হঠাৎ বলে উঠলো, "মশারীটা দাও তো, তুমি যতক্ষণে জিনিস গোছাচ্ছো, সেইফাঁকে ওটা টাঙ্গিয়ে ফেলি।"

মমতা আনমনাভাবে বললো "মশারী, মশারী কি হবে?"

আনন্দ বলে উঠলো "তুমি তো জানো, মশারী না থাকলে সারারাত আমাদের মশায় জ্বালাবে···মা তো বলছিলো, বাঙ্গালী ঘরে প্রত্যেক নতুন বউই বিয়ের পরে মশারী সঙ্গে নিয়ে আসে।" তাকে খানিকটা চিন্তিত দেখালো।

মমতা খুব নিশ্চিন্তভাবে বললো "কিন্তু, আমরা তো কখনও মশারী টাঙ্গাই না।" কথাটা আনন্দর খুব মনঃপূত হল না।

এবার তার মুখ দিয়ে তোড়ে কথা বেরিয়ে আসতে লাগলো···"কিন্তু, তুমি জানো না, এখানে কি সাংঘাতিক মশা। আমি তো মশারী ছাড়া ঘুমুতেই পারি না। এমনকি, আমি যখন শহরের বাইরেও যাই, সঙ্গে মশারী নিই··· এখন কি করা যায়?" সে ভাববার জন্যে একটু থামলো, তারপর বললো "এত রাত্তিরে মাকেও তো ডেকে তোলা যায় না, যায় কি?"

মমতা হেসে উত্তর দিল "তার দরকার হবে না।"

"কিন্তু, তুমি বুঝতে পারছো না··· একটাও মশা থাকলে আমি সারারাত ঘুমুতে পারি না। এখন এমন সুন্দর রাতটা নষ্ট হ'ল" আনন্দ অসন্তুষ্ট স্বরে বলে উঠলো।

মমতা একটা ছোট্ট টিউব বার করে বললো, "শোন, অত চিন্তা করবার কিছু নেই, এই দেখো আমার সঙ্গে ওডোমস আছে।"

"ওডো···কি যে বলো? আমি কোথায় বলছি মশার কথা!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমিও তো ঠিক তাই বলছি। ওডোমস হচ্ছে মশা তাড়ানোর ক্রীম। শুতে যাবার আগে খানিকটা ক্রীম নিয়ে তোমার মুখে, কানের পাশে, হাতে ও পায়ে ঘষে লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো, দেখবে সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুম হবে।"

"তুমি বলতে চাও, সামান্য একটু খানি ক্রীমে···?"

"ওডোমস তোমার ত্বকের চারপাশে একটা সুরক্ষিত বাধার সৃষ্টি করে। এটা ঠিক যেন একটা অদৃশ্য মশারী। শুধু আরও বেশী সুবিধাজনক, আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত। আর যে কোনও জায়গায় সহজেই সঙ্গে নেওয়া যায়। এস না গো, একটু লাগিয়েই দেখো না!"

মমতা একটুখানি ক্রীম তার আঙ্গুলের ডগায় তুলে আনন্দর হাতে মোলায়েম করে ঘষে লাগিয়ে দিল। তারপর আর একটু ক্রীম নিয়ে তার নরম নরম আঙ্গুল দিয়ে আনন্দর মুখে সোহাগভরে মাখিয়ে দিল।

আনন্দ মাথা নেড়ে বললো "মন্দ লাগছে না, ভালই লাগছে", তারপর খানিকটা ক্রীম আঙ্গুলে তুলে মমতার নরম তুলতুলে গালে মাখাতে মাখাতে বললো, তুমি বলছো এতে কাজ হবে?"

মমতা কোনও উত্তর দিলো না, শুধু দুজনে শুতে যাবার সময় মিষ্টি মিষ্টি করে হাসতে লাগলো।

বলা বাহুল্য, তাদের এই সুন্দর স্মরণীয় রাতটা খুব ভালভাবেই কাটলো। সে রাতে তো নয়ই, আর কোনও রাতেই মশা আর কখনও উৎপাত করেনি। আর এরপর তারা নিশ্চয়ই সুখে জীবন কাটাতে লাগলো।
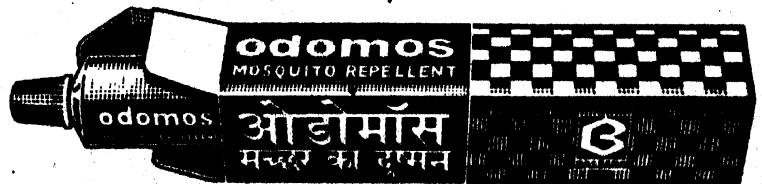
বালক উপজাল এনেছেন। কিন্তু রঙের প্রবল প্রতাপের জন্য এ-সব ছবি বিন্দুকণা পর কর্মী শিবিরের মতো একঘেয়ে লাগে। মন্দিরবান থেকে পোষাক বা ডি কুনিভের মূল ছবি দেখেননি, সুতরাং ভাল বিমূর্ত ছবির ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা নেই। কৃষ্ণকুমারবাবুর সব ছবি শেষ পর্যন্ত আমাদের নান্দনিক প্রত্যাশা পূরণ করে না।

তাঁর কাগজের মণ্ড ছাঁচে ফেলে তৈরী মুখোশের সরলীকরণ, রূপদ্বীপের লৌকিক কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আদিম ভাবটা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। বিশেষত মুখোশের ওপর রঙের যে খেলা—হয়তো হালকা লালের ওপর রুপোলি রঙ বা অন্য কোনো মিশ্রণ। এইসব কাজে উপজাতীয় নান্দনিক অভিজ্ঞতার আধুনিকীকরণ করেছেন—আদিরূপ (archetypes) হিসাবে মুখশগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। মুখোশ উন্নীত হয়েছে ভাস্কর্যে। এই ধরনটা যদি তাঁর ছবিতে আসে, তবে তিনি আমাদের অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্রে নিয়ে যাবেন।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

স্মৃতি এবং অপেক্ষা

শচীনশঙ্করের ব্যালে ইউনিটের নাচ কিছুদিন ধরে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আরটস হলে হয়ে গেল। অ.মার তো বটেই, সাধারণ দর্শকেরও খুব ভাল লাগে শচীনশঙ্করের নাচ। উদয়শংকরের ধারায় একমাত্র উনিই তো নাচ করেন
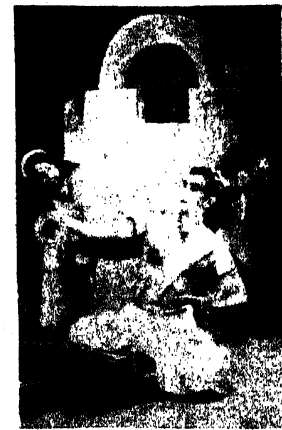
এখন। পূর্বসূরীর নাচের অজস্র ভাব এবং ছাপ তাই লেগে থাকে ও'র প্রত্যাকশনে। এবারে নাচ দেখতে দেখতে সেটাই আরও বেশি করে মনে পড়ছিল। উদয়শঙ্কর নেই এবং সেই উদয়শঙ্করের স্মৃতিতেই শচীনশঙ্কর পেশ করেছিলেন ও'র নাচ 'মেমরি'। মেমরি ছাড়া এবারের অপর সার্থক পরিবেশনা ছিল 'ওয়েটিং'।

মেমরি একটা বিষণ্ণ স্মৃতির বিন্যাস। উদয়শঙ্করের জীবন, তাঁর সুখদুঃখ এবং নাচ নিয়ে মেমরি। কথাকের আঙ্গিকে বাঁধা, পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরের সঙ্গে। রবিশঙ্কর তাঁর সুরগুলো পেশ করেছেন একটা রাগমালার স্টাইলে। কোরিওগ্রাফির কল্পনা খুবই প্রসং-জাতীয়। চেনা প্রশংসা, পূজা, অন্তর্দন্দ্বের এবং বেশ কিছুটা তাও সবটাই যে কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে সুস্ত নয়। আর সেই সঙ্গে দুর্দান্ত নাচ ছিল উদয়শঙ্কর এবং তাঁর দুই সঙ্গিনীর ভূমিকায়।

রবিশঙ্কর দাদার স্মৃতিতে যে সুর নিবেদন করেছেন তাতে ইমন মাজ রাগের চকিত প্রকাশ মন কাড়ে। মন কাড়ে মেমরির বিবাহ দৃশ্যের সেই করুণ-মধুর সিকোয়েন্সে বিসমিল্লা খাঁর প্রসিদ্ধ খাম্বাজ ঠুংরীর স্টাইলে সানাইয়ের ব্যবহার। এবং মন কেড়েছে করুণ ভাও নিবেদনের মাধ্যমে নাচের শিল্পীদের কাজে মূর্ত ছবিটা। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যে ছবিটা উদয়শঙ্করের জীবনের পুরো স্রোতটাকে ব্যাখ্যা করে।

মেমরি ঠিক সুখস্মৃতি নয়। বার্ধক্যে নেমে এসে একটা মানুষের পিছনে ফিরে তাকানো। এবং কিছুটা চেষ্টাও করা সেখানে ফিরে যাবার। সেই যাবার চেষ্টা এবং না পৌঁছানোর বাধা দিয়েই শচীনশঙ্কর মেমরি সাজিয়েছেন। মনে দাগ কাটে সেটা। কিন্তু শিল্পীদের একটা কাপড়ের আড়ালে ঢেকে ঢেকে রাখার দরকার নিশ্চয়ই ছিল না।

'ওয়েটিং' নাচের একটা বিরাট আকর্ষণ সলিল চৌধুরীর সুর। সলিলবাবুর মত বড় সংগীত পরিচালক বেশি জন্মাননি। এত কল্পনাশক্তি ও'র, এবং এত ওরিজিন্যালিটি। উনি ও'র সুরে পূর্ব ইউরোপের অনেক পল্লী সুর মেশান ঠিকই, কিন্তু কীভাবে মেশান! বিস্মিত হতে হয়। ওয়েটিঙেও ও'র হঠাৎ হঠাৎ সুরের মোচড় আমাদের দেড়-দুই দশক পিছনে নিয়ে গেছে।

ওয়েটিং টিপিক্যাল শচীনশঙ্করীয় নাচ...না ভুল বললাম। টিপিক্যাল উদয়শঙ্করীয় নাচ। তবে উদয়শঙ্কর যেখানে পাশ্চাত্যের ব্যালের তাৎপর্য ছবি নিলেও সেই ব্যালের কোন মুভমেন্ট নিতেন না শচীনশঙ্কর সেটা করেন। ও'র ওয়েটিং মানুষের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির কতকগুলো টুকরো টুকরো মেজাজী ছবি। প্রেমিকের জন্য কলেজ-পড়া মেয়ের অপেক্ষা, বাস্কেটবল খেলায় ফলটার জন্য খেলোয়াড়ের অপেক্ষা। মৃত প্রেমিকার জন্য উন্মাদ পুরুষের জীবনভর অপেক্ষা। গ্রামের বউয়ের অপেক্ষা প্রবাসী স্বামীর চিঠির জন্য...এইরকম আর কিছু কিছু টুকরো কথা। টুকরো বাধা দিয়েই ওয়েটিং তৈরী। হরেক রকমের নাচ ছাড়া মূকাভিনয়, কিছুটা কিছুটা সিনেমার ঢঙের ওপর নিবেদনটা দাঁড়িয়ে আছে। মাপা ছকের ওপর সমস্ত মুভমেন্ট বসানো বলে কোন অংশকেই ঠিক স্ফুরিত, চকিত মনে হয় না। সলিলবাবুর সুর প্রত্যেকটা অংশকেই একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রবাহ এবং মূর্তি দেয়। আবার সবগুলো মিলেমিশেও একটা সম্পূর্ণ বৃত্তের সৃষ্টি হয়। যে বৃত্তের কেন্দ্রমণি শচীনশঙ্কর স্বয়ং। তাঁর হাতেই চাবি-কাঠি প্রত্যেকের জীবনের এবং স্বপ্নের। তবে বহুযাকার তালার রূপকটা কিন্তু একটু মেটা আঁচড়ের বলেই ঠেকে। ঘরে বিভ্রাট থেকে চোখের আনন্দটুকু বাঁচিয়ে তোলেন নাচের শিল্পীরা। গোটা নাচটাই তাই একটা সংযমক প্রস্তুতির নিটোল অনুভূতি।

[illegible]

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

রাজা অয়দিপাউস

কিংবদন্তীর মত সমকালীন কোন নাটককে পুনরায় মঞ্চস্থ করা আক্ষরিক অর্থে দুঃসাহস। যে-কোন অফিস ক্লাব বা পাড়ার সরস্বতী থিয়েটার সব সময় মঞ্চ সফল প্রযোজনায় প্রলুব্ধ হতেই পারেন কিন্তু কোন গ্রুপ থিয়েটার সেই দায়িত্ব নিলে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা

হিসাবে মানতেই হয়। শৌভিক প্রযোজিত 'রাজা অয়দিপাউস' হয়ত দুঃসাহস কিন্তু স্পর্ধা নয় কোনক্রমেই, কারণ তাঁরা তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নিষ্ঠারও অভাব ছিল না।

আশা ছিল 'রাজা অয়দিপাউস' যখন পুনঃপ্রযোজিত হচ্ছে তখন কোন পালা বদল ঘটবে। আশা পূরণ হয়নি—শৌভিক প্রযোজিত মঞ্চরূপে বহুরূপী প্রযোজনার জলছবি হয়ে রইল আদ্যোপান্ত। নতুন যা কিছু করার চেষ্টা হয়েছে সেগুলি সার্থক হয়নি। অভিনয়ে অনুকরণে ক্ষতি নেই, কারণ সেই প্রবচনের মত অভিনয় আভিজাত্যকে নকল করলে নিজেদেরই সমৃদ্ধ করা হয়। যা পরবর্তী কালে মূলধন হিসেবে রয়ে যায়। অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে ব্যতিক্রম রানী ইয়োকাস্তের ভূমিকায় মমতা চট্টোপাধ্যায়। সমকালীন বাংলা থিয়েটারের চিহ্নিত অভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায় আর একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, কিন্তু শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বকীয়তার সঙ্গে চরিত্র চিত্রণ করেছেন। ক্রেয়নের ভূমিকায় মুরারি মুখোপাধ্যায় আর একটি বলিষ্ঠ চরিত্র চিত্রণ যদিও পরকীয় অভিনয় রীতি। উল্লেখযোগ্য আর একজন অভিনেতা সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মূল চরিত্রে গৌতম মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উচ্চারণ বিধি, কারিকমুদ্রা অনুকরণে বাড়াবাড়ি করলে সেটা ক্যারিকেচার হয়ে দাঁড়ায়। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সরু, তিনি যখন প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন অথবা প্রতি কথায় হাতের মুদ্রা দেখান (যা প্রায় নাচের সমগোত্রীয়) তখন সমস্ত ব্যাপারটা একই সঙ্গে বিরক্তিকর ও সময় বিশেষে হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

অঙ্গসজ্জায় অনেক যত্নের ছাপ। কিন্তু সমস্ত নিষ্ঠা অবসিত হয় সঠিক প্রস্তুতির অভাবে। প্রায়শই প্রম্পট শোনা যায়, মন্দ . দত্তের মঞ্চ স্থাপত্যে প্রাচীন নাটকের মেজাজ এলেও, অয়দিপাউস হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাসাদের স্তম্ভ নড়ে যায়। শাঁত সেনের মেকআপ ও আশুতোষ বড়ুয়ার আলো প্রযোজনার মর্যাদা বাড়িয়েছে। রাজা অয়দিপাউস যখন মেষপালকের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়েন, তখন যে বিভ্রাট ঘটে তখন সত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উইগস্ সরে গিয়ে রাজার আসল চুল উঁকি দেয়। ধ্বনি প্রক্ষেপণে হিরাংশু পালের কাজ বেশ ভাল।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

নায়িকার নাম নিয়তি

আলোর কেরামতি, ক্লিজের চমক, সঙ্গীতের বাহুল্য এ সব ছাড়াও শুধু-মাত্র অভিনয় দর্শকদের স্নিগ্ধ করে রাখতে পারে তার প্রমাণ রূপচক্রের সাম্প্রতিক প্রযোজনা "নায়িকার নাম নিয়তি"। সম্ভবত 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এই নাটকটি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল।

রূপচক্র নতুন করে প্রমাণ করলেন বছর বিশেক আগের এই নাটকটির আবেদন, আজও কম নয়।

নায়িকা-কেন্দ্রিক নাটক, স্বভাবতই নায়িকা চরিত্রের অবদান এ নাটকে বেশী। মালতীর চরিত্রে কল্পনা মুখার্জী দর্শকদের খুশী করতে পেরেছেন। রায় চ্যাটার্জীর মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষেত্রে আবার লোকনাথের কাছে নিজেকে সমর্পণের দুটি দৃশ্যেই কল্পনা অসাধারণ অভিনয় করেছেন। বিষ-পানের দৃশ্যে একদিকে বাঁচার আকুলতা অপর দিকে অবধারিত মৃত্যু—এই দুয়ের বিপরীত অভিব্যক্তিকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কল্পনা।

মিঃ রায়ের ভূমিকায় প্রভাত বসু গোটা নাটকে এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা এনে

সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কল্পনা মুখার্জী

দিয়েছিলেন। টাইপ চরিত্রে প্রভাত বসুর দক্ষতা অনস্বীকার্য। চ্যাটার্জীর ভূমিকায় নিশিকান্ত ঘোষের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। লোকনাথ চরিত্রে সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের অভিনয়ে রিহার্সালের অভাব প্রকট হয়েছে প্রতি দৃশ্যেই। সঞ্জয় ভোস ও প্রণব বড়াল অল্প অবকাশে দর্শকদের খুশী করতে পেরেছেন।

রঞ্জিৎ বসুর পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় টিমওয়ার্ক। আলো ও সঙ্গীতকে ব্যবহার করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে এ নাটকে। মালতীর বিষপানের দৃশ্যে আলোর যথাযথ সাহায্য পেলে অভিনয় অন্য মাত্রা লাভ করতে পারতো।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

কে জি সুব্রামানিয়ান (১৯২৪—)

সুব্রামানিয়ান নিজেকে নানাভাবে আবিষ্কার করতে ভালবাসেন। কখনো তিনি ছবি আঁকেন। কখনো দেওয়ালচিত্র। কখনো ছাপাই ছবি করেন, আবার কখনো হন তাঁতী। জন্ম কেরেলায়। ছাত্র ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের। শিল্পকলায় পাঠ নেন শান্তিনিকেতনের কলাভবন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লেড আর্ট স্কুলে। ব্রিটিশ কাউন্সিল রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন (১৯৫৫-৫৬)। এই সময় তিনি ফ্রান্স এবং ইটালী পরিভ্রমণ করেন। ১৯৬৬-৬৭-তে রকফেলার থার্ড গ্রান্টে মার্কিন মুলুকে ছিলেন। তাছাড়া প্রাচ্যকলার উৎস সন্ধানে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপান ভ্রমণ করেছেন।

সুব্রামানিয়ান বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা নিকেতনের চিত্রকলা বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক। বর্তমানে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অতিথি অধ্যাপক (১৯৭৭-৭৮)।

বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৬৮-এ নতুন দিল্লির প্রথম ত্রিয়ানালেতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬৫-তে ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার। ১৯৬১-তে সাও পাওলোর বিয়েনালে তাঁর ছবি বিশেষ প্রশংসাপত্র লাভ করে। সেই বৎসর মহারাষ্ট্রের প্রাদেশিক ললিতকলার প্রথম পুরস্কার পান। ১৯৫৭, ৫৯-তে বম্বে আর্ট সোসাইটির প্রথম পুরস্কার।

একক প্রদর্শনী ১৯৫৬, ৬১, ৬৬, ৭০ বোম্বাই। ১৯৫৫, ৫৮, ৬৩, ৬৯, ৭২ দিল্লি। ১৯৬৭ ন্যু ইয়র্ক। এছাড়া নানা যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন, ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৩)। ত্রয়ী শিল্পীর প্রদর্শনী ইংলণ্ড (১৯৫৬)। সাও পাওলো বিয়েনালে (১৯৬১)। টোকিও বিয়েনাল (১৯৬৪)। ভারতীয় শিল্পীদের যৌথ প্রদর্শনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (১৯৬৪-৬৫)। প্রথম ত্রিয়ানালে (১৯৬৮), তৃতীয় ত্রিয়ানালে (১৯৭১) নতুন দিল্লি। সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলা তেহেরান (১৯৭১)। মেন্তো বিয়েনালে ফ্রান্স (১৯৭৬)।

তাঁর কাজ আছে নতুন দিল্লির আই সি সি-র ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট, ললিতকলা আকাদমীতে এবং বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিট্যুট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ও জে জে স্কুল অব আর্টে।

তিনি সর্বভারতীয় প্রযুক্ত শিল্পকলা বিষয়ক কারিগরী শিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলেন (১৯৬১-৬৭)। ললিতকলা আকাদমীর সদস্য (১৯৬৭-৭২, ৭৬—)। গুজরাট ললিতকলার সদস্য (১৯৬১-৬৫, ৬৮—৭৪)। সর্বভারতীয় কারুশিল্প পর্ষদ (১৯৬৭—)। সভা-

পতি ভারতীয় কারুসংঘ (১৯৭৪—)। বিশ্ব কারুসংঘের, পরিচালনা সদস্য (১৯৭৫-৭৬)। আমেদাবাদের জাতীয় নকশানিকেতনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৯৭৪—)।

তিনি ১৯৭৫ বিশ্ব কারুসংঘের এশিয়া সম্মেলনে পরিচালনা সদস্য হিসেবে [illegible] ছিলেন। পরবর্তী কালে বিশ্ব কারুসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মেকসিকোর অকসটেপেকে যোগদান করেন। ১৯৬৭ ফেব্রুয়ারী মার্চে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে মন্ট্রিল, ওটোয়া, হ্যামিলটন এবং টরনটো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা বিষয় বক্তৃতা করেন। সেই বছরের মে মাসের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অতিথি হয়ে লণ্ডনে যান।

সুব্রামানিয়ান নন্দলাল বিনোদবিহারীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। শিল্পকলায় ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়বাদী প্রবক্তা। কুমারস্বামীর মতো তিনি মনে করেন, চারু এবং কারুকলার মূলত পার্থক্য যেটুকু সেটুকু নেহাৎ ব্যবহারিক। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে দৃশ্য, সৌন্দর্যের সনাতন উপস্থিতির সঙ্গে নতুনতর উপস্থাপনা বিষয় তিনি বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করেছেন। সেইখানে তিনি পথিকৃৎ।

'টেরাস' (১৯৭৭—তৈলচিত্র ৬১' বর্গ পট)। যেন ধাপে ধাপে ঘরের পর ঘর জ্যামিতিক আকারে সাজানো মাঝখানের ঘরে সভরঞ্চি এবং তার পাশে বসার জায়গা। বাগান, ফুল গাছ নিশ্চিন্ত শান্তির ছিমছাম মিষ্টি ছবি নানারকম মৌলিক এবং যৌগিক রং শুদ্ধভাবে লাগিয়ে তিনি সুদৃশ ঐকতান রচনা করেছেন।

আপনার বসন্তের ছুটি হতে আর তো সামান্য দেরী

ভারতের প্রতিটি জায়গা আপনার জন্য আনন্দের হাজারো পসরা সাজিয়ে বসে আছে। বিমানযোগে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন।

উত্তর

কাশ্মীর ঃ ফুলে সাজানো নন্দনকানন। মাছ শিকার, পাহাড়ী পথে চলা, নৌকোবিহার, পাহাড়ে ওঠা... সবকিছু। বিমানবন্দর শ্রীনগর।

মথুরা ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক বাড়ী হলিউৎসবের রঙ্গভূমি। নিকটবর্তী বিমানবন্দর দিল্লী।

অমৃতসর ঃ ফসলকাটা ও বৈশাখী উৎসবে বীরনৃত্য "ভাঙ্‌ড়া"য় প্রাণোজ্জ্বল শহর। বিমানপথে ভারতের সব অংশের সঙ্গে সংযুক্ত।

দক্ষিণ

কোডাইকানাল ঃ সুগন্ধি বনফুলের কার্পেটে, মধুচুক্ষির কলরবে মুখর পাহাড়ের কোলে এই শহর। নিকটবর্তী বিমানবন্দর মাদুরাই।

তিরুচিরাপল্লী ঃ পর্বতে খোদাই করা ৮০০ মিটার উঁচু মন্দিরের জন্য বিখ্যাত এই শহরের কাছেই শ্রীরঙ্গমের মন্দির। বিমানবন্দর কাবেরী।

বৃন্দাবন উদ্যান ঃ স্তরে স্তরে সজ্জিত উদ্যানে রয়েছে সদা নৃত্যরত ফোয়ারা, আর আছে রঙীণ আলোর ঘটা। নিকটবর্তী বিমানবন্দর ব্যাঙ্গালোর।

পূর্ব

দার্জিলিং ঃ সেখানে বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার অবর্ণনীয় শোভা দেখা যায়। সেখানে আছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চস্থানে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। নিকটবর্তী বিমানবন্দর বাগ্‌ডোগ্‌রা।

পাটনা ঃ প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী, বর্তমানে দ্রুত বিকাশমান আধুনিক শহর। বিমানপথে ভারতের সব অংশের সঙ্গে সংযুক্ত।
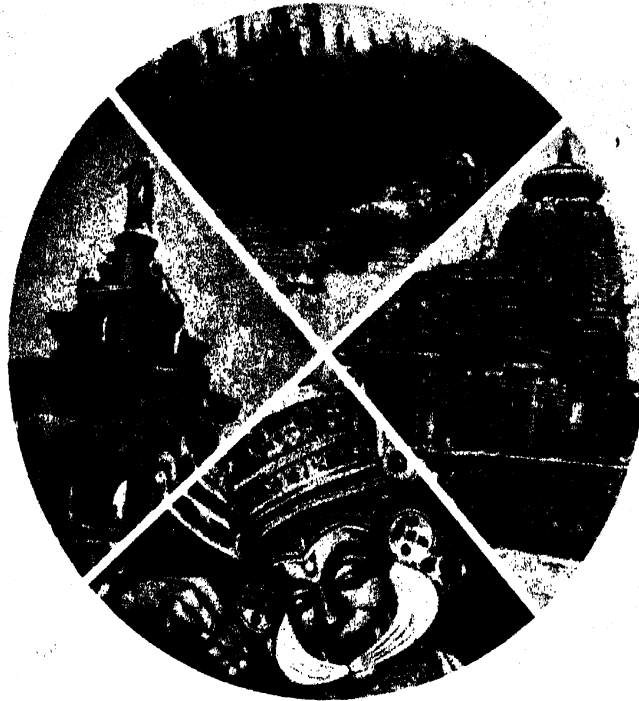
কাজিরঙ্গা ঃ বন্যপ্রানীর অভয়াশ্রমে আপনি হাতীর পিঠে বসে গণ্ডারের ছবি তুলতে পারবেন। কাছেই জোরহাট বিমানবন্দর।

মানস ঃ পোষ-না-মানা প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখ্‌বেন আর দেখ্‌বেন অভয়াশ্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্যপ্রানীর অপূর্ব সমাবেশ। নিকটবর্তী বিমানবন্দর গৌহাটী।

পশ্চিম

কানহা ঃ ব্যাঘ্র, হরিণ, সম্বর ও বাইসনের ন্যাশনাল পার্ক। এই অভয়াশ্রমের কাছেই রাইপুর বিমানবন্দর।

কার্ণালা ঃ পাখীদের এই অভয়াশ্রমে পক্ষী পর্যবেক্ষকগণ বহু নয়নাভিরাম পাখীর সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হবেন। নিকটবর্তী বিমানবন্দর, বোম্বাই।

দ্বারকা ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ব'লে পবিত্র এবং ভারতের অন্যতম একটি তীর্থক্ষেত্র। নিকটবর্তী বিমানবন্দর জামনগর।

যত্র পাড়িতে যেখানে খুশী।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ তার দ্রুত বিমানবহর এবং দেশব্যাপী রুটে আপনাকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে আপনার ট্র্যাভেল এজেন্ট, যাত্রায় আপনাকে করবে সাহায্য।

যেখানে যাবেন আমাদের বিমানে চলুন

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

চিঠিপত্র

সাহিত্য পুরস্কার

কদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় আশাপূর্ণা দেবী প্রসঙ্গে নবনীতার একটি লেখা পড়ে অবাক হয়েছিলাম, হঠাৎ নরসিংদাস পুরস্কারের উল্লেখে। কাল দিল্লি থেকে একটি চিঠি পেয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয় এই পুরস্কার দিচ্ছেন ১৯৭৬ সালের আগে প্রকাশিত বইয়ের জন্য। তবে নবনীতার উল্লেখে একটা ভুল ছিল। পুরস্কারটি, 'বাবরের প্রার্থনা'র জন্য নয়, ওটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' বইয়ের জন্য।

শঙ্খ ঘোষ

সমাজনীতি, অর্থনীতি

শ্রীঅশোক রুদ্র মহাশয় তাঁর প্রবন্ধের উপর লেখা অধিকাংশ পত্র-লেখকের বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমার সম্বন্ধে তিনি সুইডেনের ঠিকানা দেখেই ধরে নিয়েছেন, এর বক্তব্য তো পাশ্চাত্যের মস্তিষ্ক বিধৌত পুঁজিতন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। তিনি লিখেছেন "যন্ত্র-যুগের অনিবার্য" গতিকে স্বীকার করা অর্থে আমি বুঝি সুইডেনের মত দেশ যে সব পণ্য উৎপাদন করে, আমাদের দেশেও তাই করা। আমার নামের শেষে সুইডেনে লেখা ছিল বলেই চট করে যা হোক একটা সিদ্ধান্তে আসা শ্রীরুদ্রের পক্ষে সহজ হয়েছে বলে মনে হয়। আমি বলতে চেয়েছি, ভারত একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মত পরিকল্পনা এখানে না থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্তত যতক্ষণ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি—ততক্ষণ আমাদের যন্ত্রযুগের অগ্রগতিকে স্বীকার করতেই হবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতাও থাকবে। আধুনিক শিল্প আজ এমন অনেক জিনিস তৈরী করছে যা আগামী কাল হয়তো সর্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস। যেমন প্লাস্টিক দ্রব্য, গত দুই দশক আগেও যা ছিল বিত্তবান শহরবাসীর শখের জিনিস আর আজ তা সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ; কারণ ধাতুর তৈরী তৈজস-পত্রের চেয়ে দামেও সস্তা ওজনেও হালকা। তেমনি 'সিনথেটিক' বস্ত্রের এ বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনা আছে—সর্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস বলে গণ্য হওয়ায়। তাই আমি লিখেছি সিনথেটিক বস্ত্রের ভবিষ্যত ভেবেই তার উৎপাদন ও ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তা মোটা কাপড়ের স্থান দখল করবে।

কারণ এর উৎপাদন ভূমিও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। তুলোর উৎপাদন খরচ ভবিষ্যতে বাড়বে এবং উৎপাদনও মাথাপিছু কমবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত যে কোন জিনিসের উৎপাদন-খরচ ভবিষ্যতে কমানোর সম্ভাবনা থাকে। চাহিদা

এতগুলো জাতীয় পরিকল্পনার পরেও আমরা গরিবী কমাতে পারিনি। এক কথায় পরিকল্পনার কোন সুফল পাইনি। তার অন্যতম কারণ বলে আমি বলেছি দুর্নীতি সর্বস্তরে দুর্নীতি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় ব্যর্থতা। এ অবস্থায় কোনরূপ সমাজ ব্যবস্থাই (এমন কি সমাজতন্ত্রও) গরিবী হটাতে পারবে না।

শ্রীরুদ্রের বক্তব্য হলো, ধন-তান্ত্রিক ভারতে কেন গরীবের মোটা ভাত কাপড়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক ফসল ফলছে না। এ তো আমগাছে আমড়া পাবার প্রত্যাশা। যতক্ষণ মূল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের কথাবার্তা সস্তায় বাজিমাত করার মতন। তাতে না আছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা, না আছে বাস্তবের প্রতি স্বীকৃতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীরুদ্র ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রের উপসংহারে যা লিখেছেন তা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি। তিনি আমার এবং সলিলবাবুর মতকে খণ্ডন করার জন্য লিখেছেন—"উন্নত দেশগুলি থেকেই অর্থনীতি-বিদরা, উপদেষ্টারা দুনিয়ার সব অনুন্নত দেশে গিয়ে কিভাবে পরি-কল্পনা করতে হবে তার জ্ঞান বিতরণ করছেন।" অথবা "ন্যূনতম প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিকল্পনার কথা বলছেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এমন কি খোদ মার্কিন মুলুকের বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত।" এর সঙ্গে আমি আরো একটু যোগ করে দিচ্ছি—উন্নত দেশগুলি ঋণ দিচ্ছে—যা ওদের দেশে সাহায্য দান হিসাবে প্রচারিত।

শ্রীরুদ্র কি বলতে চান—এসব কিছু হলো অনুন্নত দেশের লক্ষ কোটি দরিদ্রের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থানের জন্য। দারিদ্র্য দূর করার জন্য ? না কি পৃথিবীব্যাপী ধন-তান্ত্রিক দুনিয়ার শোষণের যে শিকড় ছড়িয়ে আছে তাতে একটু বারি সিঞ্চনের ব্যবস্থা।

যেমন করে আজ ভারতের অগণিত জনসাধারণ মোটা ভাত কাপড় থেকে বঞ্চিত আর মুষ্টিমেয়র পৌষ মাস। তেমনি সারা পৃথিবীর মানচিত্রে (পৃথিবীর সম্পদেও সবার সমান ভোগ অধিকার) সব অনুন্নত দেশগুলিই বঞ্চিত ও শোষিত আর মুষ্টিমেয় উন্নত দেশের পৌষ মাস। সেই পৌষ মাস যাতে বজায় থাকে তার জন্য অনুন্নত দেশে ঋণ আসছে উপদেষ্টা আসছে, অনুন্নত দেশের মাটিতে ঘাটি করে তৈরী করেছে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

শ্রীরুদ্র তার পত্রের উপসংহারে ঐসব অর্থনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করে আমাদের জবাব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধেই রায় দিচ্ছেন না কি ?

আমার পত্র শেষ করার আগে দুঃখের সঙ্গে বলছি—হঠাৎ যাঁরা গরীবের ভাত কাপড়ের জন্য দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সেই দলের লোকেরাই নেতা সেজে মাইনে বাড়ানোর জন্য অফিসে, কারখানায়, কোন ধর্মঘট ঘটায় উৎপাদনে ব্যাঘাত

সাধারণ মোটা ভাত মোটা কাপড় থেকেই বঞ্চিত। তাদের কথা ভাবছি না কেন? যাদের যা হোক একটা আয় আছে, তাদের আয় আরো বাড়ানোর জন্য কেন এতো আন্দোলন। কাদের পৌষ মাসের প্রত্যাশায় সেই গণ-বিক্ষোভ? শ্রীবসুর এতো বড় প্রবন্ধটায় তাদের কথা আলোচনা করেন নি কেন?

গজেন্দ্রকুমার ঘোষ
গথেনবুর্গ, সুইডেন

মার্কো পোলোর কলিকাতা দর্শন

মার্কো পোলোর সহিত শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতা ভ্রমণের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। কিন্তু শ্রীচট্টোপাধ্যায় মার্কোসাহেবকে পুরা-পুরি শহরটি দেখাইয়াছেন এমন প্রমাণ পাইলাম না। যেমন, মার্কোসাহেব আজও জানেন না যে যিনি বাসের মধ্যে টাই-কোট-প্যান্ট পরিহিত যে বাঙালী সাহেব রিজেন্ট সিগারেট টানিতেছেন তিনিই ফুটবোর্ডে ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা কোনও অধমকে আইনভঙ্গের অভিযোগে যে ইংরাজী ইংরাজরা জানেন না সেই ইংরাজীতে গালি দিতেছেন। তিনি আরও জানেন না যে কলিকাতার সরকারী বাসের যাত্রীরা নানা নিয়ম পালন করেন। যথা, একতলা বাসের সম্মুখভাগে সর্বদাই প্রচণ্ড ভিড় থাকে। পক্ককেশ বৃদ্ধকে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত স্থান লইয়া লড়াই করিতে দেখা যায়। কেবলমাত্র তিনিই পিছনের দরজা দিয়া বাসে প্রবেশ করেন যিনি হয় টিকিট কাটিবেন না, নয় স্ত্রীর নিকট অপদস্থ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। গোবি মরুভূমি পার হইবার সময় মার্কো-সাহেবের স্কন্ধ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল কি না জানা নাই, কিন্তু মার্কোসাহেব যদি কলি-কাতার বাসে চড়িয়া ঢাকুরিয়া হইতে শ্যামবাজার যাইতেন (ভায়া শিয়ালদহ অথবা এসপ্ল্যানেড) তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে নিজ মস্তক হারাইতেন।

আশা করা গিয়াছিল যে মার্কো-সাহেব এই বিচিত্র শহরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু জানিবেন। পৃথিবীতে আর কোথাও বোধ হয় বিনা বেতনে পড়িতে থাকা ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কর দিতে হয় না। ফ্রী এডুকেশন ও ডেভেলপমেন্ট ফী এই শহরে হাতে হাত মিলাইয়াছে যেন সাপ আর নেউল কোমর ধরাধরি করিয়া ফক্সট্রট বা ওয়ালজ্‌ নাচিতেছে। এই শহরে বাংলা, ইংরাজী ও বিলাতী মিডিয়ামে ছাত্রছাত্রীকে পড়াইবার জন্য পিতামাতার আগ্রহ অপরিসীম। বাচ্চা পেটে লইয়া তাই মাতৃদেবী ভর্তির কাগজ দখল করিবার জন্য লাইন লাগান। সেই বাচ্চা বড় হইয়া চারি অক্ষরের গালি শিখিয়া ইংরাজ হয়। পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষার জন্যই সে চারি অংকের চাকুরী পায় ও স্কুটারে চাপিয়া জুলফী ও জ্যাকেট উড়াইয়া নারীসমাজের প্রিয়পাত্র হয়।

মীন, যে চলচ্চিত্র পরি[illegible] তাহা নয়—পাড়ার দেওয়ালে [illegible] চলচ্চিত্র রোজ দেখা যায় [illegible] গৃহের বাহিরে সকাল [illegible] রাত্রি বারোটা পর্যন্ত [illegible] কোনও কারণে নহে—[illegible] টিকিটের জন্য। প্রিয় [illegible] তিন ঘণ্টা ধরিয়া পর্দায় দেখিবা[র] জন্য। সে কি ব্যাকুলতা! আহ[ার] ভুলিয়া নিদ্রা ভুলিয়া [illegible] দোকানে লাইন লাগাইতে ভুলিয়া [illegible] যুবক-যুবতী নিত্য হালাহসের উদ্[illegible] করিতেছেন তাহারা কি নিন্দার পাত্[র] সংসারের প্রচণ্ড চাপে আমরা হাসি[তে] ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র এইস[ব] যুবক-যুবতীরা আমাদের নি[illegible] হাসাইতেছেন। ইহারা ধন্য—ইহা[রা] সমাজের এক বিরাট উপকা[র] করিতেছেন।

মার্কোসাহেব যদি জানিতেন [illegible] এদেশের মন্ত্রীরা স্বর্গে বিচরণকা[রী] বাজী খেলেন তাহা হইলে তিনি হয়তো বলিতেন—"ধন্য চট্টোপাধ্যা[য়] কি বিচিত্র এই দেশ।" বিচিত্রতম দে[শ] ভারতবর্ষের বিচিত্রতমা শহর কলিকাত[া] মার্কোসাহেবকে আবার কলিকাত[ায়] আনা হউক। মল ভাসিতে থাকা নর্দম[া] দুই পাশে বিশাল বিজ্ঞাপন-কলিকাতা তিলোত্তমা— তাহা[ই] দেখানো ও বুঝানো হউক। ইহা আমার প্রার্থনা।

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৭০০০৩১।

ভারতীয় দর্শনে মানবতাবাদ

শ্রীশংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভারতীয় দর্শনে মানবতাবাদ' লেখকের নিরপেক্ষ দৃষ্টির যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়। তাঁর বক্তব্য খুবই পরিষ্কার : অধ্যাত্মবাদ মানলে, অমর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলে ভারতীয় দর্শনে মানবতাবাদ রয়েছে; কিন্তু বাস্তবতাবাদ (Realism, positivism) মানলে এখানে মানবতাবা[দ] খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি প্রায় স্পষ্টই বলেছেন, 'মানবতাবাদ বস্তুবাদ-ঘেঁষা মতবাদ' এবং আমার মনে হয় এই স্পষ্টোক্তিই সত্য। মানুষ বলতে একটি অধিজাগতিক সত্তা (আত্মা) চিনলে মানবতাবাদ অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ কামনা-বাসনা-আবেগ ও বুদ্ধি-যুক্তি নিয়ে পরিস্থিতির মুখোমুখি প্রতিক্রিয়া করে এবং সে একশ্রেণীর জীব। মানুষকে মূল তত্ত্ব হিসেবে নিলে বাস্তবিকতাবাদের পাশে মানবতাবাদকে দাঁড়াতে হয়। প্রধান হিন্দু দর্শন-গুলিতে (ভৌগোলিক অর্থে নয়, বেদ-ভিত্তিক অর্থে) নিত্য আত্মার কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে আত্মার কৃতকর্ম-অনুযায়ী মানুষ জীবন গ্রহণ করে। যে যার কর্ম-অনুযায়ী ফলভোগ করে, এতে মানুষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ [illegible] বাইরের নৈতিক শাসক বা নৈতিক শাসনের অধীন তাকে থাকতেই হয়। তা হলে মানুষই মূল তত্ত্ব (স্বনির্ভর-অর্থে) এবং সেহেতু স্বাধীন, একথা স্বীকার করা যায় না। মানুষ যদি অতীত কর্মকারী আত্মা বা বাইরের [illegible]

…রের অগ্রাধিকার স্বীকার করেছে
, কোন সত্ত্ব বা আত্মধর্মের খোঁজে
…) অধীন হবে না মানুষ। সার্ত্র
…র দর্শনকে মানবতাবাদ বলে ব্যাখ্যা
…রেছেন। তাঁর মতে অস্তিত্ব সারধর্মের
…র্বগামী: আগে মানব-অস্তিত্ব, পরে
…র সার: আগে মানুষ বাস্তব, পরে
…রিস্থিতির সামনে তার প্রতিক্রিয়ার
…মে সার গড়ে ওঠে—যাতে সর্ব-
…লীনতাও থাকা সম্ভব। কিন্তু এই
…র অতীত হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যায়:
… না হলে মানুষ স্বাধীন থাকতে
…রে না। ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন,
…াধীনতা আর তার সত্তার মধ্যে কোন
…ভেদ নেই। মানুষ স্বাধীন এই অর্থে
, তার কর্ম অতীত কোন সারের সাথে
…ভাবে সম্পর্কহীন। অতীতের স্থির
…কৃতি বা সার ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ
…র্ধারণ করে না। মানুষ প্রত্যেক
…হূর্তেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির
…ম্মুখীন হয়, নতুন করে নিজেকে
…রি করে। ভবিষ্যৎ রচনার মধ্যেই
…নুষের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়।
…নুষের প্রকৃতি সব সময়েই অনিয়ন্ত্রিত,
…শ্বর বা আত্মা বা কোন সারের
…য়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা সেখানে থাকতে
…রে না। আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্ব-
…দ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবে মানব-অস্তিত্ব
…খন বিপর্যস্ত, তখনই অস্তিত্ববাদী
…ানবতাবাদ প্রকৃত বাস্তবতামুখী হয়ে
…কট রূপ পেয়েছিল সার্ত্রের লেখায়।

এ দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতে
…কমাত্র বৌদ্ধ দর্শনেই মানবতাবাদের
…কৃষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। এই
…র্শনের উৎস ছিল মানবজীবনের বাস্তব
…ুঃখ। সিদ্ধার্থ নিজ অস্তিত্বের স্বগত
…ভিজ্ঞতায় বাস্তবিক মানবতাবাদী
…য়েই গৃহত্যাগ করেছিলেন; বুদ্ধ নাম
…রবর্তীকালের ভক্তদের দেওয়া। কোন
…ত্ত্ব বা সার, অর্থাৎ পরমাত্মা, আত্মা,
…চ্চিদানন্দ, ঈশ্বর ইত্যাদির দ্বারা মানব-
…স্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত হতে তিনি দেখেন
…ন। মানবজীবনের অসহায়তা, দুঃখ
…ত্যাদির সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে
…তিনি তার কারণ, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির
…পন্থার কথা বলেছিলেন। কোন
…রাতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তিনি আগে কিংবা
…রে আক্রান্ত হন নি। দুঃখ এবং মৃত্যুর
…নিবার্যতা দেখে তিনি যে নীতিশাস্ত্র
…চনা করেন তা মধ্যম পথের, যা অতি
…রল বা অতি কঠিন নয়। এই নীতি
…নুযায়ী কর্মের দ্বারা মনুষ্য-সমাজের
…ুঃখ দূর করার বাস্তব প্রয়াস তাঁর
…র্শনকে মানবতাবাদে পরিণত করেছিল।
…কান লৌকিক শাসক বা শাসনের
…পেক্ষা ওখানে ছিল না। অবিনশ্বর
…াত্মার অবিশ্বাস, পঞ্চস্কন্ধবিশিষ্ট
…নুষ—প্রভৃতি ধারণা মানবতাবাদেরই
…নুকূল। কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ তাঁর
…পদেশে ছিল কিনা সন্দেহ হয়:
…নও হতে পারে যে পরাক্রমশালী
…দুবেদান্তের প্রভাবে পরবর্তী-
…লে এই বাদগুলি বৌদ্ধদর্শনে
…নুপ্রবেশ করেছে। এক দীপশিখা
…কে আরেক দীপশিখা জ্বলার মতো
… মনুষ্যজীবন থেকে আরেক মনুষ্য-
…বন আসে—তথাকথিত এই বৌদ্ধ
… মনুষ্যজাতির অবিনশ্বরতা ও
…বমানতাই বোধ হয় প্রকাশ করে।

… … … … … …
…দ্যুতি … আক্রমণ চালিয়ে-
ছিলেন বৌদ্ধধর্মের উপর। বৌদ্ধ ধর্মের
প্রভাব ভারত ছাড়িয়ে চীন, জাপান,
এখনকার সিংহল প্রভৃতি তৎকালের
অনেক মানবতার মুক্তিকামী দেশেই
প্রসার পেয়েছিল। এক কথায়, তখন,
মানুষ বৌদ্ধ ধর্মকে নিজের অস্তিত্ব-
বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।
'লোকেষু আয়ত' যদি 'লোকায়ত' হয়,
তবে, বোধ করি, বৌদ্ধ দর্শনই ভারতের
একমাত্র লোকায়ত দর্শন। হীনযান-
মহাযান ভেদ থেকেও আমরা বুঝি যে,
যে যানে অধিক মানুষ দুঃখ থেকে
মুক্তি পেতে পারবে তা-ই আদর্শ। এই
সেদিনও দেখেছি—বর্বর আমেরিকা দ্বারা
ভিয়েৎনামকে অত্যাচারিত হতে দেখে,
এখানকার বৌদ্ধগণ কিংকর্তব্য হয়ে
আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিল। মার্কস-
বাদী বিশ্লেষকদের কাছে কোন ধর্ম, কোন
বাদই এ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে নি
বিশেষত যেখানে সমষ্টি-মানুষের স্বার্থ
রয়েছে, মানবতার মুখ্য দিক রয়েছে।
তাই বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী বৌদ্ধদের
তেমন আত্মদান করতে হয়েছিল, কিন্তু
এই আত্মাহুতি তাদের মানবতাবাদের
পরিচয় দেয়। আরো কথা, রবীন্দ্রনাথের
মতেই শিল্পসাহিত্য হলো একমাত্র
মানবতাবাদী দর্শন—এ সবে মানব-ঐক্য
বিধৃত থাকে। বৌদ্ধ-প্রভাবেই বিশাল
জাতক-সাহিত্য, দোহা প্রভৃতি বা অজন্তা
ইলোরার মতো পুরাণ-শিল্প (classi-
cal art) সম্ভব হয়েছিল, যা পরবর্তী
ভারতীয় ও অভারতীয় শিল্পী-
সাহিত্যিককে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রেরণা
দিয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে মানবতাবাদ প্রবন্ধে
বৌদ্ধ দর্শনের মানবতাবাদের উপর
সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

প্রভাত মিশ্র .
খড়্গপুর

কবি হেমচন্দ্র বাগচী

কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীসুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধটিতে কয়েকটি তথ্যগত ভুল আছে।

আমার অগ্রজ, কবি হেমচন্দ্র আই এস সি পড়ার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু সেই বৎসরেই আমাদের মাতৃদেবীর মৃত্যু হয় ও আমাদের ঘূর্ণীর (কৃষ্ণনগরের) বাড়ি বন্ধ করে আমরা সকলে গোকুলনগরে গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। তার পরই হেমচন্দ্র কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই এস সি পাস করেন এবং পরে সিটি কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। ১৯৪১ সালে কলিকাতার কয়েকটি কলেজে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার পর হেমচন্দ্র মালদহের আদিনা কলেজে কাজ পান, রাজসাহী কলেজে নয়।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দীপান্বিতা' প্রকাশের পর তিনি নিজে শান্তি-নিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক কপি দীপান্বিতা দিয়ে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে একখানি চিঠি হেমচন্দ্রকে লিখেছিলেন। তার প্রতিটি কথা আজও আমার মনে আছে।

"তোমার দীপান্বিতা পড়েছি।

বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বর্ধন করার ক্ষমতা তোমার আছে।"

এছাড়া কবি মোহিতলালও দীপান্বিতা তাঁকে উৎসর্গ করার পর একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সে লেখার শেষ অংশ আমার মনে আছে।

"আমিও হেরিনি যাহা, তুমি কোন
প্রীতি উপহারে হেরিলে সে রূপ তার,
তব চক্ষে সে কি দীপান্বিতা ?"

আমি মনে করি হেমচন্দ্রের কবি প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন একদিন হবেই, তাঁর অনেক অপ্রকাশিত রচনা যদি আমাদের দেশের অগণিত সাহিত্য অনুরাগী, প্রকাশক ও সুধী সমাজের দ্বারা একদিন প্রকাশিত হয় অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হন তবেই তা সম্ভব হবে।

পরিশেষে প্রবন্ধটি লেখার জন্য শ্রীসুধীর চক্রবর্তী মহাশয়কে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডাঃ দিলীপকুমার বাগচী
কালচিনি।

মুখোশ ও ছো-নাচ : লেখকের উত্তর

'দেশ' ১৯শে কার্তিক সংখ্যার প্রকাশিত আমার 'মুখোশ ও ছো নাচ' শীর্ষক রচনাটির ওপর এযাবৎ চারটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। কথাটি ছো না ছৌ এবং এই নাচের উদ্ভব কোথায় হয়েছিল প্রধানত এই দুটি বিষয়ের ওপরেই পত্রলেখকেরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন পত্রলেখকই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। বস্তুতপক্ষে, ছো অথবা ছৌ-এর কোন্‌টি ঠিক, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভাষাতাত্ত্বিকেরা দিতে পারেন। তবে, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বিশেষ করে পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম এবং বিহারের সিংভূম জেলার ধলভূমগড় ও আশপাশ অঞ্চলে 'ছো' নামটাই জনপ্রিয়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপদা প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা এই নাচকে 'ছো' এবং 'ছৌ' দুইই বলেন একথা জানতে পেরেছি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই নাচ 'ছো' নামে পরিচিত। চিল্কীগড় রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে ছো নাচ হয় সেখানে কাগজের মণ্ডের মুখোশ ব্যবহৃত হতে দেখেছি। ধলভূমগড়ের নরসিংগড় গ্রামে ও তার আশপাশে ছো নাচের অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানেও 'ছো' শব্দটি উচ্চারিত হয়। পুরুলিয়া জেলার বাগ্‌মুণ্ডি, চোড়দা, কাশীপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে ছো শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা (অন্তত যাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছি) জনপ্রিয় এই নাচটিকে ছো নাচই বলে থাকেন। তবে 'ছৌ' শব্দটিও একেবারে অজ্ঞাত নয়। আমার দেখা এই সব স্থানে 'ছো' শব্দটির বহুল প্রচলন লক্ষ করে আমি আমার রচনায় (১৯ কার্তিক, 'দেশ') এই শব্দটি গ্রহণ করেছি। কারও সঙ্গে কোন বাদবিসংবাদে যাওয়া আমার অভিপ্রায় নয়।

আমার রচনায় 'ছাউনি' থেকে ছো শব্দটির উদ্ভব বলে আমি যা বলতে চেয়েছি তা আরও স্পষ্ট করে বললে এই দাঁড়ায় যে বীরধর্মী এই লোক-নৃত্যের সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রাচীন যুদ্ধনৃত্যের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'ছাউনি' থেকে ছো-এর উদ্ভব এটা আমার বক্তব্য নয়। তবে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'উৎসব' শব্দটি থেকে ছো-এর উদ্ভব সম্ভব। (উৎসব—উচ্ছব) উচ্ছউ, আদ্য অক্ষরলোপে ছউ—ছউ। 'ছউকে ছো' বললে 'উ'-এর বিস্বরধ্বনি কিভাবে সিদ্ধ হয় তা ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিচার করবেন। তাই 'ছউ' থেকে 'ছো' কথাটি সিদ্ধ হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দমধ্যস্থিত 'ত্‌স্‌' নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় 'চ্ছ' বা 'ছ'-এ রূপান্তর ভাষাতত্ত্বসম্মত, যেমন—মহোৎসব—মোচ্ছব। আবার আদ্য অক্ষরলোপ ও শেষের অন্তঃস্থ 'ব'-এর সম্প্রসারণও হয়। কিন্তু 'ছো' শব্দটির উদ্ভব বিষয়ে এ ধরনের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা গেলেও মনে হয় 'উৎসব' থেকে 'ছো'-এর সৃষ্টি কতকটা কল্পনার পর্যায়ে পড়ে। মূল সাঁওতালি বা মুণ্ডারী ভাষার এই শব্দটি ঠিক কি তা আমার অজানা। আমি শব্দটি গ্রহণ করেছি লোকব্যবহার দেখে।

শ্রীসুধীর করণ তাঁর পত্রে (২৪শে অগ্রহায়ণ, 'দেশ') সং এবং 'ছো'কে সমার্থক শব্দ বলেছেন। সংয়ের 'আহার্য' বা সাজসজ্জার সঙ্গে ছো'-এর মুখোশ ও সজ্জার মিল থাকলেও মুখোশ ও সাজসজ্জা নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ের জন্যে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। চার প্রকার অভিনয়ের (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) মধ্যে 'বাচিক' ছাড়া বাকী তিনটি ছো নাচে লক্ষ করা যায়। নৃত্যে অভিনয়টা যখন সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল তখন 'আহার্য' বা সাজসজ্জা ও অলংকরণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা (আঙ্গিক অভিনয়) স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিকভাবে পরিস্ফুট করার জন্যে চরিত্রবিশেষের উপযোগী বেশভূষার প্রয়োজন হল। ছো নাচে মুখোশের ব্যবহার এইভাবে হয়েছিল। অবশ্য অভিনয়ে সাজসজ্জা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের [illegible] থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে ছো নাচের গোড়ায় সাজসজ্জা ও মুখোশ ছিল না। তখন নাচটাই ছিল প্রধান। সুনির্দিষ্ট তাল ও লয়ের সাহায্যে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে চরিত্রাভিনয় উপজাতিবংশোদ্ভূত রাজ-পরিবারের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল পরে। বাগমুণ্ডি, ঝালদা, সড়াইকেলা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারের প্রভাব ও আনুকূল্য ছো-এর এই ক্রমবিকাশের জন্য দায়ী। কেরলের 'কথাকলি'র উদ্ভব ও বিকাশে যেমন সেই রাজ্যের রাজপরিবারগুলির দান স্মরণীয় হয়ে আছে, 'ছো'-এর ক্রম-বিকাশের ক্ষেত্রে উপরি উক্ত রাজপরিবার-গুলির দানও উপেক্ষণীয় নয়। ছো নাচে রা মা য় ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনীর অনুপ্রবেশও এক স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীপশুপতিপ্রসাদ মাহাতো তাঁর পত্রে (১৪ মাঘ, 'দেশ') পুরুলিয়ার উ প জা তি স ম্ভূ ত রাজপরিবারগুলির ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে মূল গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন

পোর্তুগিজ ... কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। মুখোশ ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রেও এ সময়ে এক রূপান্তর উপস্থিত হয়। অবশ্য, গোড়ার দিকে কিছু কিছু কাঠের মুখোশ ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে।

ছো নাচের উদ্ভবস্থল সম্পর্কেও জোর করে কিছু বলা যায় না। শ্রীরাজকল্যাণ চেল তাঁর পত্রে (৩০শে পৌষ, 'দেশ') ময়ূরভঞ্জ ও সরাইকেলা থেকে এই নাচ পুরুলিয়া ও বাগমুণ্ডি অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল বলে যে এক গল্পের উল্লেখ করেছেন তার প্রামাণিকতা কোথায়? আজও উপজাতি নৃত্যরূপে চোড়দার ছো-এর বিশিষ্ট স্থান আছে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার নৃত্যে উপজাতিসুলভ ভঙ্গীটি অধিক সুপ্রকট। এখানকার মুড়া উপজাতিরা ছো-এর সার্থক রূপকার এবং পরম্পরানুক্রমে দীর্ঘকাল ধরে এঁদের মধ্যে এই নাচের অনুশীলন হয়ে আসছে। অন্যান্য স্থানের মতো এখানের নৃত্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির চলন এখনও তেমন দেখা যায় না। 'শিক্ষিতপটুত্বের চেয়ে এখানকার শিল্পীদের মধ্যে অশিক্ষিত-পটুত্বেই এ নাচের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। এখানকার নাচ দেখে শিল্পীর জাত শিল্পের কথাই মনে হয়েছে। মুড়া পরিবারের ঘরে ঘরে এই নাচের অনুশীলন হয়। কিন্তু এঁরা এই নাচকে ভালোবাসেন অর্থের বিনিময়ে নয়, স্বাভাবিক প্রেরণাবশত। উদ্ভবস্থল হিসেবে এই স্থানকে চিহ্নিত করার পক্ষে অবশ্য এটা জোরালো যুক্তি না হলেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

শ্রীপশুপতিপ্রসাদ মাহাতো তাঁর পত্রে (১৪ মাঘ) বলেছেন, মুখোশের প্রস্তুতি পর্বের বিভিন্ন ধাপের কথা আমার রচনায় নেই। তাঁর অবগতির জন্যে জানাই, আমার রচনায় (দেশ, ১৯শে কার্তিক) ৩৮ পৃষ্ঠার ৩য় ও ৪র্থ কলমে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে, যদিও প্রস্তুতিপর্বের ধাপের নামগুলি বাহুল্যবোধে উল্লিখিত হয় নি। কিন্তু ধাপগুলির ক্রম অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত দুএকটি ছবির বিবরণী সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে জানাই, যতদূর মনে আছে আলোকচিত্রগ্রহণকালে পরশুরাম ও কার্তিকের ছবি চিহ্নিত করা হয়েছিল নৃত্যের অভিনেতৃ-চরিত্রের প্রতি লক্ষ রেখে। ময়ূরপালকের ছড়াছড়ি দেখে কার্তিকেয়কে চিহ্নিত করা হয় নি।

প্রণব রায়
চুঁচুড়া, হুগলি

গঙ্গার জল

শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য। যখন গঙ্গার জলে বাংলা দেশের দাবি স্বীকার করে কলকাতা বন্দরের স্বার্থরক্ষায় অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে, তখন এর গুরুত্ব আরো বেড়ে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধটি বড় সংক্ষিপ্ত। গঙ্গায় ... এবং পুষ্টি হিমবাহ থেকে হলেও ... এর পুষ্টিতে সাহায্য করে। ... উত্তর প্রদেশে বহু খালের সাহায্যে গঙ্গার জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। ভূতপূর্ব সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও-এর গঙ্গা-কাবেরী পরিকল্পনা কাগজেই রয়ে গেছে। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গার জল থেকে বঞ্চিত তো হতই এবং তারতে উৎপন্ন বিদ্যুতের অর্ধেকই ব্যয় হত পাটনার কাছে 'রিভার লিফট' দিতে। ভারতে প্রতি বৎসরই বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানীদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়, দেশের কাজে হাত লাগাবার জন্যে কিন্তু হাত লাগাবার সুযোগ দেওয়া হয় না।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা ৪৮ ঘণ্টা আগেই ঝড়ের সংকেত দিয়েছিলেন। অন্ধ্র সরকার গ্রহণ করেছিলেন কি? গ্রহণ করলে ঝড় ঠেকানো যেত না কিন্তু সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচান যেত। বহুদিন পূর্বে কয়েকজন ভূ-বিজ্ঞানী নাইনিতালের নিকটবর্তী 'শের-বকভান্ডা' শৃঙ্গের স্থানচ্যুতি সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এর ফলে নাইনি হ্রদকে ধ্বংস তো করবেই, নিম্নাংশে প্রচণ্ড প্লাবনেরও সৃষ্টি করবে। সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর কর্তাব্যক্তিদের হেলিকপটারে প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনেও তখন কোন ফল হবে না। তবু শ্রীচক্রবর্তীকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন। সময় থাকতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৪৭

ছো-নাচ

গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীপশুপতিপ্রসাদ মাহাতো 'ছো-নাচ' সম্পর্কে যে চিঠিখানি প্রকাশ করেছেন, তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি আমার 'বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থটির খণ্ড কিংবা পৃষ্ঠার উল্লেখ না করে কিংবা '...লার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের সংস্করণের কিংবা পৃষ্ঠার উল্লেখ না করে যে বাক্যটি উদ্ধৃত করে আমার নামে চালাতে চাইছেন, তা আমার রচিত বাক্য নয়। তারপর পুরুলিয়া সেন্সাস হ্যান্ড বুক থেকেও যে ইংরেজি বাক্যটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তাও আমার রচিত বাক্য নয়। নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রতিপক্ষের উপর ইচ্ছামত নিজের লেখা চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় পথ যারা অনুসরণ করেন, তাঁদের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাইনে। এই বিষয়ক আমার মতবাদ আমার রচিত আধুনিকতর গ্রন্থ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ছো ড্যান্স অফ পুরুলিয়া কিংবা বাংলার লোক নৃত্য প্রথম খণ্ড গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যাবে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, আমি বিদেশে যে সকল স্থানে ছো নৃত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নানা 'বিকৃত' তথ্য পরিবেশন করেছি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাদের অধিকাংশ স্থানেই আমি কোনো বক্তৃতা দিইনি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৩৪

... গোস্বামীর
... উপন্যাস
...মিতুদের কথা
দাম ৪.০০

অরু আর মিতু—ছোট্ট দুটি ভাইবোন। এক দুর্ঘটনায় শহরের পথে হঠাৎই একদিন মারা গেলেন ওদের বাবা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওদের মা পড়লেন অকূল পাথারে। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে এবং সন্তান দুটিকে মানুষ করার তাগিদে গ্রামের বাড়িঘর বেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে হাজির হলেন কলকাতা শহরে। তারপর শুরু হয় এক অসহায়া বিধবা রমণী আর দুটি পিতৃহীন বালক-বালিকার বেঁচে থাকার, মানুষের মত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার দুরূহ সংগ্রাম। 'অরুমিতুদের কথা' সেই বাস্তব সংগ্রামের নির্মম কাহিনী—যা অহরহ চলছে আমাদের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে নগরে জনপদে—প্রতিটি মুহূর্তে। কাল্পনিক রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর কৃত্রিম রোমাঞ্চ-উত্তেজনা নয়, নয় রূপকথার কল্পনা-বিলাস—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর বাস্তবতার নিষ্করুণ ছবি এই রচনা, যা স্বাদে এবং ...রিতে সাম্প্রতিক বাংলা কিশোর-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম ॥

রাণী চন্দের
অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী
পথে-ঘাটে
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
কয়েকটি উপন্যাস

কয়েকটি উপন্যাস

বিমল করের
প্রচ্ছন্ন
দাম ১০.০০

সমরেশ বসুর
পরম রতন
দাম ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্বর্গের নীচে মানুষ
দাম ৭.০০

রমাপদ চৌধুরীর
পিকনিক
দাম ৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
সময়ের স্তর
দাম ৩.০০

বুদ্ধদেব গুহর
নগ্ন নির্জন
দাম ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শজারুর কাঁটা
দাম ৬.০০

মনোজ বসুর
সেতুবন্ধ
দাম ১২.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
জল দাও
দাম ৩.৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
প্রিয়ামুখচন্দ্রা
দাম ৬.০০

বিমল মিত্রের
চলো কলকাতা
দাম ৫.০০

সুশীল রায়ের
অদ্বিতীয়া
দাম ৪.০০

গৌরকিশোর ঘোষের
লোকটা
দাম ৩.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
জনপ্রিয় উপন্যাস
নুনের পুতুল সাগরে
দাম ১০.০০

জীবনজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক সৎ সাহিত্যিকের আত্মানুসন্ধানের মহান আলেখ্য ধনঞ্জয় বৈরাগীর এই উপন্যাস ॥

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিশিষ্ট উপন্যাস
সাক্ষী বালুচর
দাম ৪.০০

রূপনারায়ণের বিশাল বালুচরকে সাক্ষী রেখে একদিন অভিনীত হয় এক মর্মান্তিক জীবন-নাটক। তারই করুণ কাহিনী ॥

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
অভিনব উপন্যাস
দিনরাতের খেলা
দাম ১০.০০

সার্কাসের খেলোয়াড় এবং রিংবয়, ট্রেনার, ব্যান্ডমাস্টার প্রভৃতি অগণ্য নেপথ্যচারীদের বাস যে সুরহীন আলোহীন জগতে, তার অনুপম উপাখ্যান ॥

শওকত ওসমানের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
জাহান্নম হইতে বিদায়
দাম ৫.০০

পাক অত্যাচারে ওপার-বাংলা থেকে এপার-বাংলায় চলে আসা অসংখ্য নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-প্রত্যাশার নব মহাভারত ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৫২

কয়েকটি উপন্যাস

সমরেশ বসুর
ওদের বলতে দাও
দাম ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কবি ও নর্তকী
দাম ৬.০০

বিমল করের
একা একা
দাম ৫.০০

বুদ্ধদেব গুহর
হলুদ বসন্ত
দাম ৪.৫০

আশাপূর্ণা দেবীর
সেই রাত্রি এই দিন
দাম ৭.০০

রমাপদ চৌধুরীর
পরাজিত সম্রাট
দাম ৭.০০

বিমল মিত্রের
বেগম মেরী বিশ্বাস
দাম ৩০.০০

শংকর-এর
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি
দাম ৮.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তুঙ্গভদ্রার তীরে
দাম ৭.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
প্রেম
দাম ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অমাবস্যার গান
দাম ৩.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সূর্যসাক্ষী
দাম ২০.০০

সুবোধ ঘোষের
বন উপবন
দাম ৬.০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
মহত্তর বক্তব্য ও ভাবনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস
কাগজের বউ
দাম ৮.০০

এই উপন্যাসের নায়ক উপল বেঁচে থাকবার জন্য কি না করতে চেয়েছে। বাস-কন-ডাকটারি থেকে ট্রেন-ডাকাতি সব কিছুই, কিন্তু কোনটাই সেভাবে পারেনি। উপলের ছিল দুরারোগ্য এক খিদে—কুষ্ঠের মতো, ক্যানসারের মতো। সে চেয়েছিল খিদে মেটাবার জন্য কিছু টাকা—জলপ্রপাতের মতো, হ্যান্ডবিলের মতো, কিংবা জ্যোৎস্নার মতো অনায়াস টাকা। যা-ই করতে গেছে উপল, তাইতেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বুড়ো বিবেক আর কানা মামী। শেষ পর্যন্ত টাকা এল এক বিচিত্র পথে। উপলের বন্ধু সুবিনয় যখন তার শ্যালী প্রীতির প্রেমে পড়ল তখন উপলকে লাগাল তার নিজের বউ ক্ষণার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করার কাজে। কোনও কাজই শেষ পর্যন্ত পারে না উপল, তবে এ কাজটা পেরেছিল। কিন্তু রাখতে পারল কি ? শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে বহু বিচিত্র, জটিল এবং সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মেকী, অসার ঠুনকো সভ্যতার অন্তর্লোকটি সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন।

দেশ [illegible] বর্ষ ১৭ সংখ্যা
৪ ফাল্গুন ১৩৯৫

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

সুধীর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ
সঙ্গীতপ্রাণ অমিয়নাথ সান্যাল
নির্মাল্য আচার্যের
বইয়ের মেলা ও বাংলা বই
সুনীল দাশের গল্প
চিতার কাঠ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদ্ধাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে নদী

বিজ্ঞানী শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র আরম্ভিক বাক্যে ভারতের একটি পৌরাণিক কল্পনার কথা স্মরণ করেছেন। 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? নদী কুলকুল স্বরে উত্তর দিল, মহাদেবের জটা হইতে।' নদী গঙ্গা মর্ত্যে প্রবাহিত হবার আগে মহাদেবের জটায় আশ্রিত হয়েছিলেন। এমন ধারণা করবার যুক্তি আছে যে, এহেন কল্পনার অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য হলো গঙ্গাসলিলের উপর বিশেষ পবিত্রতা আরোপ করা। ভারতীয় পুরাতন সংস্কারের ঐতিহ্যে নদী সম্বন্ধে শ্রদ্ধার একটি উদার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সব নদীই গঙ্গা, এবং সব নদীর জলই গঙ্গাজল। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের তৃষ্ণার্তি মোচনে জন্য অর্জুনের শরাহত ভূবক্ষের অন্তরাল হতে যে জলের ধারা উৎসারিত হয়েছিল, সেটা গঙ্গারই জলের ধারা। আধুনিক কালের যে অলৌকিক ঘটনার কথা সাধু নাগ মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্তে উল্লিখিত হয়েছে, এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে-ঘটনাকে মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বলে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন, সেই ঘটনাতেও দেখা যায় যে, গঙ্গার অন্তঃশীল সলিলধারা সাধু নাগ মহাশয়ের গৃহাঙ্গনে উৎস হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পৌরাণিক কল্পনা হোক, কিংবা আধুনিককালের প্রচলিত এমনতর অলৌকিক ঘটনা হোক, দুই-ই প্রমাণিত করে যে, স্বয়ং এক গঙ্গাই পৃথিবীকে সরিস্বরা করে রেখেছে।

ভারতীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে রচিত গঙ্গাবন্দনার সাহিত্যও একটি নিদর্শন, যার মধ্যে গঙ্গাসলিলের পবিত্রতা বন্দিত হয়েছে। আধুনিককালে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এক বা একাধিক কবি গঙ্গার বন্দনায় যে অনুভূতি ও উপলব্ধির আবেগ পরিস্ফুর্ত করেছেন, সেটা প্রাচীন ভারতেরই চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রত্যুচ্চারিত রূপ। যে-দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সংস্কারে গঙ্গার সম্পর্কে এত উদার মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত ছিল, সে-দেশেরই আধুনিককালের দুঃখে এক নির্মম একটি কলুষাক্ত আচরণের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়! বিস্ময়েরও বিষয় বটে। গঙ্গাসলিল এবং সব নদী সম্পর্কে শ্রদ্ধার সংস্কার মনের মধ্যে পরিপোষিত হয়ে থাকতেও দেশের মানুষের আচরণে নদীকে নানা ক্লেদে কলুষিত করবার একটা ব্যবহারবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ ফ্র্যাংক হজেস, যিনি জলের শুদ্ধতার রক্ষাবিধি সম্পর্কে বিশ্বের একজন প্রধান জ্ঞানী কৃতী; তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশে ভারতের নদীজলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতে এসেছেন ও চলে গিয়েছেন। তিনি নদী ও নদীজলের সম্পর্কে ভারতের জাতীয় আচরণের যে ভয়াবহ স্থূলতা ও হীনতার প্রমাণ পেয়েছেন, সেটা আধুনিক ভারতের একটি বিরাট গ্লানিপুষ্ট সাংস্কৃতিক স্থূলতারই পরিচয়। নদীজলের শুদ্ধতা রক্ষা করবার কাজের জন্য নিযুক্ত কোন রাজ্যেরই বোর্ড তথা কর্মপরিষদ কর্তব্যনিষ্ঠ নয়। তারা বস্তুত কোন কাজ করে না। বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক হজেসের মন্তব্যে বিবৃত হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশে নদীজলের অবমাননা সবচেয়ে বেশি। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর প্রদেশের গঙ্গা ও গোমতী শহরের পুরীষ এবং কারখানার রাসায়নিক ক্লেদের দ্বারা সর্বদা কলুষিত হয়ে চলেছে। ভারতে তিন বছর হলো 'জল আইন' প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু নদীজলের উপর দুরন্ত কলুষের নিক্ষেপ ও বিক্ষেপের ক্রিয়া একটুও প্রশমিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের দামোদর নদের জল সম্বন্ধে হজেস-এর মন্তব্য : দুর্গাপুরে কারখানাগুলির নানা প্রকারের ভয়াবহ রাসায়নিক ক্লেদ, সায়েনাইড অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন সালফাইড ও ফিনল দামোদরের জলপ্রবাহের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। এরকমের মানবীয় অনাচারের পুঞ্জীভূত পরিণাম একদিন মানবীয় কল্যাণের ও জীবনের সাধারণ নিরাপত্তারই বিনাশ সম্ভব করবে। বিশেষজ্ঞ হজেস-এর অভিযোগ, ভারতে শিল্পসামগ্রীর উৎপাদনী প্রয়াসের ধারক হয়ে যে অসংখ্য কারখানার পত্তন হয়েছে ও হয়ে চলেছে, তাদের কলুষ-কর্মের উপর কোন শাসন আজও প্রচলিত হয়নি। তারা অবাধে ক্লেদ সৃষ্টি করে ভারতীয় ভূ-নিসর্গের প্রাণরসস্বরূপ নদীজলের বিরাট এক অভিশাপ ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে।

বিস্ময়ের প্রশ্নটিকে আবার স্মরণ করতে হয়, কারণ এটা প্রত্যক্ষ দুর্ভাগ্যের অন্তরালবর্তী মনোগত দুর্ভাগ্যের প্রশ্ন। গঙ্গা নদীকে মহাদেবের জটাশ্রিত বলে এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে নিঃসৃত বলে কল্পনা করে যে জাতির সাংস্কৃতিক মন নদীজলের পবিত্রতা ও শুদ্ধতাকে আত্মার পুণ্যের সম্বল বলে উপলব্ধি করেছিল, সে জাতির বাস্তব ও ব্যবহারিক আচরণে নদীকে কলুষিত করবার অভ্যাস কেন ও কী করে জাগ্রত হলো? গঙ্গাস্নানের জন্য লক্ষ লোকের ভক্তিচালিত ভিড় আজও দেখা যায়। কিন্তু সেটা গঙ্গাজলের শুদ্ধতার জন্য ভক্তিচালিত কোন ভিড় নয়। এহেন ভক্তিচালিত ভিড়ের বিচার এই যে, গঙ্গাজল সহস্র ক্লেদে পুরীষে পরিপ্লাবিত হলেও গঙ্গার জলের 'পবিত্র'তা ক্ষুণ্ণ হবে না। বললে অত্যুক্তি হবে না এ ধরণের কপট বিচারের মনোবৃত্তিই ভারতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য। প্রসঙ্গত আধুনিক ভারতের বিচারবুদ্ধির কথাটি তুলতে হয়। প্রাচীন ভারত অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, গঙ্গা ও নদীসলিলের নৈসর্গিক শুদ্ধতা রক্ষার আদর্শের দিক দিয়ে বেশি অগ্রসর ছিল। এবং বলা চলে সেই তুলনায় আধুনিকেরাই অনগ্রসর
আদর্শের দিক দিয়ে বেশি অগ্রসর ছিল। এবং বলা চলে সেই তুলনায় আধুনিকেরাই অনগ্রসর
এভাবে নদীজলের কলুষিত হবার অর্থ এই যে, পরিণামে একদিন দুই তটের মৃত্তিকা কলুষিত হয়ে উর্বরতা হারাবে।

ব্যঙ্গচিত্র

এত লোক কংগ্রেস থেকে জনতায় যাচ্ছে? তাহলে তো নির্বাচনী লড়াই রেড্ডী কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জনতা কংগ্রেসের মধ্যে!
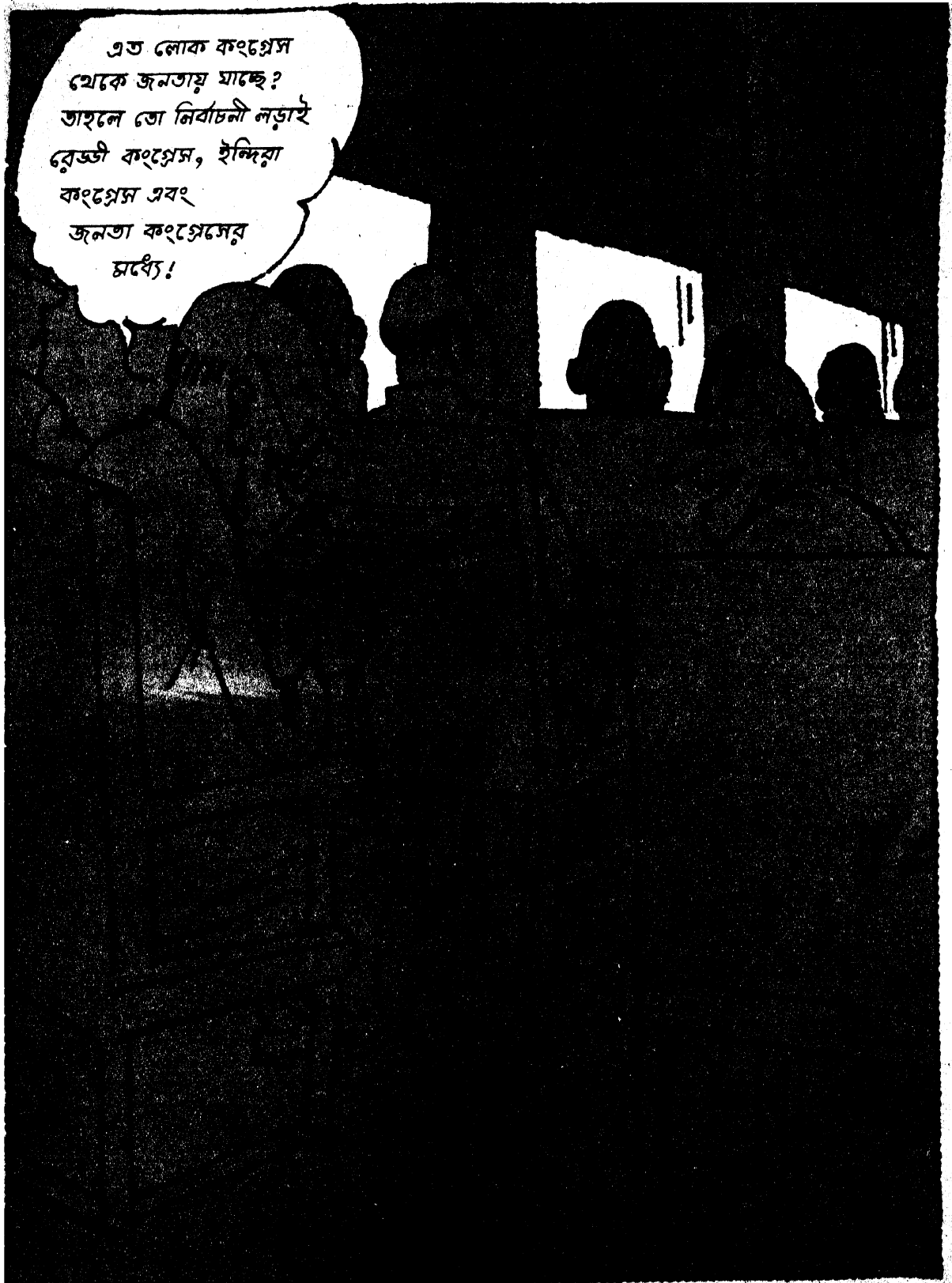
শান্তি কোথায় মোর তরে হায়

আবু সয়ীদ আইয়ুব

যে-সুলিখিত ও প্রায় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনেকখানি সর্বাঙ্গীণ প্রবন্ধটি 'দেশ'-এ (১৯-১১-৭৭) বিকাশ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন তাতে আমি খুশী হয়েছি স্বভাবতই। তবে যে-সম্মানের আসনে তিনি আমাকে বসিয়েছেন তার আমি যোগ্য নই। তবু তাতেও খুশী হয়েছি আমার মানুষী দুর্বলতাবশত। অনুমান করি এ-লেখাটি পড়ে আরও অনেক পাঠক খুশী হয়েছেন। কারণ সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন বিকাশ চক্রবর্তী। কয়েকটির উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন, অন্তত আংশিক উত্তর; কয়েকটি অনুত্তরিত রেখে দিয়েছেন। আমার পক্ষে এই উত্তরদানপর্বে কিছু দূর এগোনো সম্ভব ছিল দু-তিন বছর আগে পর্যন্ত; এখন দন্তাপহারী বিধাতা সেই শক্তিটুকুর বারো আনাই প্রত্যাহরণ করেছেন। তবু একটু চেষ্টা করব। সে চেষ্টার আগে অন্য একটি ছোটোখাটো প্রশ্ন আমি নিজেই তুলতে চাই।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র কাব্যধারার অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সুযোগ্য সমালোচনা করেছেন অন্তত গীতাঞ্জলিপর্ব পর্যন্ত; তার জন্য আমরা সবাই তাঁর কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংশয় ও অমঙ্গলবোধের কথা যথোপযুক্তভাবে কি তিনি বলেছেন কোথাও? হয়ত বলেছেন, তবে সেটা আমার চোখে পড়েনি; হয়ত পড়েছিল কিন্তু আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না। বরঞ্চ মনে পড়ে বিপরীত কথাটাই :

আমার 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ের উপক্রমণিকার শেষের দিকে আমি লিখেছিলাম : শুধু প্রাচীনপন্থীরা নন, আধুনিক মেজাজ ও রীতির প্রধান প্রতিনিধি বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের শুভত্ব বিষয়ে সর্বদা নিঃসংশয় ছিলেন, উপরন্তু গোটে অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথে এ বিশ্বাসের যোজনা অধিকাংশ স্থলেই নির্বন্ধ। ...এবং পাদটীকায় আমি তাঁরই শেষ দিককার লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি যোগ করেছিলাম:

"His verse changed externally as it had many times before, but neither in his attitude to life nor in the use of language did he outgrow himself." (Buddhadeva Bose, Tagore, Portrait of a poet, 1962, p. 25)

আমার বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। তারপরে আরও দুটি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এ যাবৎ বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং কিংবা তাঁর অনুরাগী সুযোগ্য কোনো পাঠক মৌখিক বা লিখিত প্রতিবাদ করেননি। করলে নিশ্চয়ই আমি আমার ভ্রম সংশোধন করতাম।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে বলতে আরম্ভ করি ১৯৬৪ সালে, শেষ করি ১৯৭৭ সালে। এই তেরো বৎসরের মধ্যে আমার মন এবং মতবিশ্বাস কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, আশা করি সমৃদ্ধ হয়েছে, আশঙ্কা করি হয়ত বা বিভ্রান্ত হয়েছে। তার ফলে কিংবা নিছক অনবধানতাবশত কোনো কোনো term-এর ব্যবহারে হেরফের ঘটেছে। শেষ দু বছরে যা লিখেছি তা অত্যন্ত অসুস্থ শরীর, অক্ষম চোখ এবং ক্ষীয়মান স্মরণশক্তি নিয়ে—ইত্যাদি কৈফিয়ত দেওয়া বৃথা, কারণ লিখবার দুঃসাহস যখন করেছি তখন বিকাশের মতো মনোযোগী পাঠকের অভিযোগও মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি।

আমার রবীন্দ্র-আলোচনার একটি key-term হচ্ছে ট্র্যাজিক চেতনা। তবে তার পর্যালোচনার পূর্বে বলে রাখি যে বিকাশ চক্রবর্তীর একটি প্রশংসাবাক্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন যে আমি একটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্যাদর্শ বা সাহিত্যতত্ত্ব রচনা করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। উল্টো করে বলা যায় যে আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারাকে ভালবেসে অনুধাবন করেছি এবং সেখান থেকেই একটি কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে প্রায় সক্ষম হয়েছি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক গদ্য-পুস্তকে এবং কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কিংবা একাধিক কাব্যতত্ত্ব আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় আরও অনেক পাশ্চাত্ত্য কবির পদ্য ও গদ্য রচনা থেকে আমি কাব্যতত্ত্ব আহরণ করেছি।

কিন্তু যে-কাব্যতত্ত্বই আমার মনে স্থান পেয়ে থাক, আমি যখন কোনো কবিতা বিচার করতে গিয়ে দেখি তার অবমূল্যায়ন ঘটছে তখন সে কবিতাটিকে সরাসরি বাতিল করে দিতে পারি না, বিশেষত যখন সে কবিতা যতবার পাঠ করি ততবারই আমার মনকে স্পর্শ করে এবং মনের গভীরে অনুরণন জাগায়। সমর্থন খুঁজি আমার কাব্যরসিক পরিণতবুদ্ধি বন্ধু-বান্ধবের কাছে তথা প্রথমের কাব্য বিচারকদের লেখায়। যদি সমর্থন পাই তবে আমার রচিত বা গৃহীত কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি, সেই তত্ত্বটিকে যথোপযুক্তভাবে সংশোধিত করার চেষ্টা করি যাতে আলোচ্য কবিতাটির মূল্য তার মধ্যে স্থান পায়। এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমার রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেও ঘটেছে।

'ট্র্যাজিক চেতনা' পদটিতে চেতনা শব্দটি আমি ইংরাজি consciousness বা awareness অর্থে ব্যবহার করেছি। 'consciousness' বা 'awareness' শব্দের পর 'of' সম্বন্ধবাচক অব্যয় পদটি অনিবার্যত আসে; অনিবার্যত প্রশ্ন ওঠে 'consciousness of what?' 'ট্র্যাজিক' বিশেষণটি পরোক্ষেই চেতনাকে বিশেষিত করে, সোজাসুজিভাবে বিশেষিত করে চেতনার বিষয়কে, অর্থাৎ কোনো ট্র্যাজিক ঘটনা সমাবেশকে বা পরিস্থিতিকে। সে পরিস্থিতি একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে, দু-তিনজন প্রেমিক প্রেমিকার দুর্লঙ্ঘ্য প্রেমের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে; অর্ধেক পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিংবা cosmic বা বিশ্বজাগতিক হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।

প্রথম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গল্প 'নষ্টনীড়'। দুই ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে এই ট্র্যাজিক বড় গল্পটি রচিত। খুব মনোযোগ সহকারে না পড়লে সঠিক উপলব্ধি করা যায় না কতদিক থেকে কত সর্বনাশা অর্থে এই সুখের নীড়টি নষ্ট হয়ে গেছে। বিরাট বাড়িতে এবং তার প্রশস্ত বাগানে চারুলতা ঘুরে বেড়াবে একেবারে নিঃসঙ্গ, চারিদিক থেকে কেবল নেকড়ে বাঘের মতন তেড়ে আসবে অসংখ্য স্মৃতি, ঠাকুরপো-বউদির মধুর হাস্য-পরিহাস, বাগানকে নূতন করে সাজিয়ে তোলার কত নিভৃত রঙীন জল্পনা কল্পনা। মধুর স্নেহের সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে নিবিড় প্রেমে পরিণত হয়ে উঠছে তা ওরা টের পায়নি, যখন পেলো তখন বড় দেরী হয়ে গেছে, ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। তারপরে সর্বনাশের পালা আরম্ভ। ভূপতি জানতে পেরেছিল যে অমল চারুলতার মন জয় করেছিল সাহিত্য রচনার পথে। সেও সেই চেষ্টা করল। কিন্তু এ চেষ্টা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি হাস্যকর, কারণ সাহিত্যরচনার লেশমাত্র ক্ষমতা ছিল না ভূপতির।

দ্বিতীয় উদাহরণ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বল্পখ্যাত কিন্তু অসাধারণ রসোত্তীর্ণ বড়ো গল্প 'বিকল্প' ('অঙ্গীকার' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত)। এ গল্পটিও তিন জনকে কেন্দ্র করে—এক স্নেহপরায়ণ কিন্তু ঈষৎ স্থূলবুদ্ধি পিতা, তার অনুগত কর্তব্যপরায়ণা উজ্জ্বলপ্রাণা কন্যা এবং তার ছোটো ভাইয়ের জন্য নিযুক্ত গৃহ-শিক্ষক। পিতা যখন টের পেলেন এই অতিদরিদ্র, নিম্নবর্ণের অতি সাধারণ টিউটারের সঙ্গে তাঁর সুন্দরী কন্যার সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি রাগে আত্মহারা হয়ে শিক্ষককে শুধু তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তাকে অন্যান্য সহ-ভাড়াটিয়াদের বখাটে ছেলেদের দিয়ে পেটানোর ব্যবস্থা করলেন। পেটানো একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, টিউটারটি কয়েকদিন পরে জ্বরবিকারে মারা পড়ল। খবর শুনে মেয়েটি একেবারে পাষাণ হয়ে গেল। এই পাষাণ-মূর্তিতে নূতন করে প্রাণসঞ্চার করবার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন বিমূঢ় পিতা শেষ চেষ্টা যা করলেন তা যেমন নিষ্করুণ তেমনি হাস্যকর। তিনি নূতন একজন টিউটারের খোঁজ করতে লাগলেন। মধুর ও করুণরসের গল্পের শেষের দিকে হাস্যরসের ছোঁওয়া দুই গল্পকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বড় গল্পের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় প্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির উদাহরণ দুই দশকের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই নাৎসীদের ইহুদী-নিধন আরম্ভ হয়েছিল ঝটিকা বাহিনীর জঘন্য জয়োল্লাসের মধ্যে। এই দেশেরই প্রকাণ্ড অংশে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত সারা উত্তর ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আকারে ছোটো হলেও ঘৃণ্যতায় প্রচণ্ডতর।

তৃতীয় প্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতিকে বিশ্বজাগতিক বা cosmic বলা যায়। উপল বন্ধুর চড়াই উৎরাই পথে কখনও অগ্রগতি কখনও রুদ্ধগতি কখনও পশ্চাদ্‌-গতি সত্ত্বেও মানব জাতির প্রগতিধারায় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত—আমি লিখেছিলাম, এবং সেই উক্তিটিকে বিকাশ উদ্ধৃতও করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু আমি আরও লিখেছিলাম যে এই প্রগতিধারা চলেছে বিশ্বজাগতিক অবক্ষয়ের উজান বেয়ে। দূর ভবিষ্যতে (বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর পরে) মানব প্রগতির এই ক্ষীণ ধারা একদিন যেন হারিয়ে ফেলবে এবং বিশ্বজাগতিক অবক্ষয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

বিকাশ তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, বিশ্বব্যাপী মঙ্গলবিধানে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন আধুনিক সাহিত্যিকেরা, বিশেষত ডস্টয়েভস্কি ও কাফকা। ব্যাপারটাকে স্পষ্টতর করার জন্য আমি দুই প্রকার বিধানের কথা বলেছিলাম—প্রাকৃতিক বিধান (natural order) এবং নৈতিক বিধান (moral order)। বর্তমান কালে প্রাকৃতিক বিধানে আস্থা আরও দৃঢ়তর হয়েছে আমাদের সকলের মনে, আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির ফলে। তারই প্রতি তুলনায় নৈতিক বিধানের ফাঁক তীব্রতর ভাবে লক্ষণীয় এবং বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে।

বিকাশ লিখেছেন যে বাস্তবজীবনে কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনা পরম্পরা বেদনাদায়ক হতে পারে, মর্মন্তুদ হতে পারে কিন্তু তা ট্র্যাজিক নয়; তাকে অবলম্বন করে কোনো শক্তিমান সাহিত্যিক যখন কাব্য বা গল্প রচনা করেন তখন সে রচনাকেই সংগতভাবে ট্র্যাজিক বলা যায়। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। কোনো বেদনাদায়ক ঘটনা যখন মর্মন্তুদতার একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছয় তখন সেটি ট্র্যাজিক রূপে প্রতিভাত হয় আমাদের সংবেদী হৃদয়ের সম্মুখে। তফাত মাত্রাগত, গুণগত নয়। এবং এই পরিস্থিতির চেতনা বা অবহিতিকেও আমি ট্র্যাজিক বলি। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পীর রচনায় যখন সেটি অভিব্যক্ত হয় তখন আমাদের ট্র্যাজিক চেতনা অনেক বেশী গভীর এবং পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এখনেও ভেদ মাত্রাগত, গুণগত

চিত্ররঞ্জন সম্পাদিত

পূর্ব ভারত টুরিস্ট গাইড

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নেপাল, ভুটান ও সিকিম বেড়াবার টুরিস্ট গাইড।

উত্তর ভারত টুরিস্ট গাইড ৮

পশ্চিম ভারত টুরিস্ট গাইড ৮

দক্ষিণ ভারত টুরিস্ট গাইড ৮৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ১২·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০·০০

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ১১·০০

স্বামী বিদ্যানন্দের স্মরণীয় রচনা

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব

সাধু সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য ১ম ৯·০০ ২য় ৯·০০

আর্থার কন্যান ডয়েল

শার্লক হোমস অমনিবাস

প্রথম দুই খণ্ডে শার্লক হোমসের সমস্ত উপন্যাস থাকছে। প্রতিখণ্ডের দাম মাত্র ১৬৲ টাকা। অগ্রীশ বর্ধন অনূদিত রঙিন শক্ত মলাটে বাঁধাই এই সুবৃহৎ সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বসাধারণকে ১৫% কমিশন দেওয়া হচ্ছে। বাইরের ক্রেতারা v.p. মাধ্যমে এই সুযোগ পাবেন।

জুল ভের্ণ রচনাবলী

৩য় খণ্ড বেরিয়েছে। প্রতি খণ্ডের দাম ১৬৲।
সর্বসাধারণকে ১৫% কমিশন দেওয়া হচ্ছে। বাইরের ক্রেতারা v.p. মাধ্যমে এই সুযোগ পাবেন।

মৃণাল সেন / মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ওকা উরি কথা ৮·০০

মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা

আমি এবং চলচ্চিত্র ৬৲

চার্লি চ্যাপলিন ৮৲

চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যত ৮·০০

নারায়ণ সান্যালের নতুন রহস্য উপন্যাস

ঘড়ির কাঁটা ৮

আজি হতে শতবর্ষ পরে ১৪৲

কুলদীপ নায়ার

দি জাজমেণ্ট ১২·০০

হেরম্যান মেলভিল

মবি ডিক ১০৲

অদ্রীশ বর্ধনের রহস্য উপন্যাস

ব্লু ফিল্ম ১৪·০০

ই. এ. এস. প্রসন্ন

ক্রিকেট খেলার সাতকাহনো বই

ওয়ান মোর ওভার

ভিনু মানকড়

ক্রিকেট খেলা শেখো ৬৲

উল বোনা ৯৲

মমতাজ ...

মাস্টার টেলর এ. কে. দাস

আধুনিক সেলাই কাটিং ১০৲

কিরোর ভাগ্যগণনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

সংখ্যা ও ভাগ্য ৭৲

বছরের প্রতিটি দিন ও ভাগ্য ১২৲

রত্নাচার্যের স্মরণীয় গ্রন্থ

রত্নই আরোগ্য

রত্নই সৌভাগ্য ৪৲

মনোজ বসুর ক্লাসিক উপন্যাস ॥ নতুন মুদ্রণ

মানুষ গড়ার কারিগর ১০

বন কেটে বসত ১৮৲

নিশিকুটুম্ব ২০৲ জলজঙ্গল ৮৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সনাতন পাঠকের চিন্তা ১০৲

চিত্তরঞ্জন মাইতির নতুন উপন্যাস

মোহিনী ১৬·০০

নির্জনে খেলা ১০৲

ফরেস্ট বাংলো ১০৲

এডগার অ্যালান পো

ব্ল্যাক ক্যাট ৮৲

লাল মৃত্যুর মুখোশ

বীরু চট্টোপাধ্যায় দাম ৬·০০

বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনী

শম্ভুনাথ ঘোষের

নজরুল গীতির নানাদিক ৮৲

পরীক্ষার্থী এবং অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস

সুতীর্থ ১৬৲

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

১ম খণ্ড ১২·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
সর্বসাধারণকে ২০% ছাড়। বাইরের ক্রেতা V. P. মাধ্যমে পাবেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

না, অথবা আমরাও পরিস্থিতির কারণে শান্তি সাময়িক তেমন যখন একটা বিশেষ পর্যায়ে ওঠে তখন তা দুর্দান্ত হয়ে পরিণত হয়।

বিবিধ প্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির চেতনা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। একটি ছোট পরিবারের আকস্মিক ট্র্যাজিক পরিস্থিতি অসাধারণ রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' নামক গল্প এবং 'পরিশোধ' নামক কবিতায়। 'মানসী' পর্বে আরও একটু বৃহদাকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন তিনি। আবালবৃদ্ধবনিতাবাহী তীর্থযাত্রী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হল ঈশ্বরের বিধান কোথাও নেই, সবটাই অজ্ঞের রাজত্ব। অথবা মানবভাগ্য নিয়ে শুভের দেবতা এবং অশুভের দেবতার মধ্যে যেন দ্বন্দ্বখেলা চলছে, কে কখন জয়ী হবে কিছুই বলা যায় না। 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত দেখা যায় তাঁর প্রগাঢ় মানবপ্রেম এবং দুর্ভাগা মানুষের প্রতি সমবেদনার সঙ্গে গতানুগতিক ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে তথা মঙ্গলময় বিধাতার আস্থায় ঘাতপ্রতিঘাত। সেটাই 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া ফেলেছে তাঁর কাব্যে। সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবন-দেবতার প্রশ্রয়ে। কিন্তু সেটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার।

বিষাদ ও নৈরাশ্য সবচেয়ে গভীর ছায়া ফেলেছে 'কল্পনা' কাব্যে, বিশেষত তার প্রথম কবিতায়। তবু সেটা তেমন নিরেট নয় যেমন দেখা গেল অনেক পরে রচিত 'বৈকালি' কাব্যে।

নৈরাশ্য ও বিষাদ থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী প্রায় দ্বাদশ বর্ষকালীন, উত্তরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গীতাখ্য তিনখানি গীতিকাব্যে। কিন্তু তার জন্য তাঁকে জনমানবের বিক্ষোভপূর্ণ তীর ত্যাগ ক'রে খেয়া পার হতে হয়েছিল সবুজ ছায়াঘন নির্জনতার প্রশান্ত তীরে। সেখানে বিজন মন্দিরে বসে তাঁর পরাণসখা বন্ধুর সঙ্গে নিরালাপ প্রায় অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে। এই পশ্চিম মহাদেশব্যাপী পরিস্থিতি তাঁর কানে এল মৃত্যুর গর্জন-রূপে। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর বিজন মন্দিরে মধুর সাধনা সমাপ্ত হল, দেখলেন "তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে", বুঝলেন তাঁকে নোঙর তুলতে হবে, নতুন মহাসাগরে পাড়ি জমাতে হবে।

কিন্তু গীতাঞ্জলি পর্বের গোড়ার দিকেই তিনি লিখেছিলেন একটি অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ কবিতা ('প্রস্টলস্ন-আত্মত্যাগ') এবং একটি অর্থঘন প্রতীকী নাটক 'রাজা'। বিকাশ এই নাটক বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, বিশেষত ঠাকুরদার মানসিকতাকে কেন্দ্র করে। তাই আমাকে আবার সেই নাটক সম্বন্ধে দু' কথা বলতে হবে।

পাঁচটি ছেলে পর পর মারা গেল, তার হেতু জিজ্ঞাসা করার মতন বিজ্ঞান চর্চা বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ঠাকুরদার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, এই প্রশ্ন তাঁর মনে কি একেবারেই জাগেনি? স্পষ্ট ভাষায় অবশ্য প্রশ্নটি আমিই করেছি, নাটকে কোথাও করা হয়নি। তবে ঠাকুরদার মনের গভীরে প্রশ্নটি তোলপাড় করছিল। তার উত্তর, বস্তুত পক্ষে উত্তরণ তিনি পেয়েছিলেন নাটকের থীম সঙের মধ্যে—"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে" ...ইত্যাদি। অর্থাৎ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রথম যৌবনে একটি বিরাট ব্যক্তিগত দুঃখ ঘটেছিল নতুন বৌঠানের আত্মহত্যার পর। কিছুকালের জন্য তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, নাস্তির অন্ধকার গহ্বরে ডুবে ছিলেন। কিন্তু বেশী কালের জন্য নয়। এই অন্ধকার পার হয়ে বা ভেদ করে তিনি আলো দেখতে পেলেন নান্দনিক দৃষ্টি লাভ করে। নিজের এবং সব মানুষের জীবনকে তিনি দেখলেন যেন সব দুঃখ সুখের জীবন মৃত্যুর ধারার অনেকটা ওপর থেকে। বিকাশ একে দৈশিক উপমা বলেছেন। দার্শনিকরা একে বলেন, viewing all things and all events sub-specie aeternitatis (under the form of eternity), এই দার্শনিক তর্ক বা বিচার এখানে তুলবার ইচ্ছা আমার নেই।

ঠাকুরদার মুখে আমরা শুনি একটি সুন্দর গান :

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়
বড় উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও॥

কিন্তু হার মানতেই হবে। কারণ খেলাটি দুই অসমান প্রতিপক্ষের মধ্যে; শক্তিতে ও স্বভাবে তাদের বিভেদ অসীম।

তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে আমারও
রঙ বক্ষে নিও

এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাব ঐ উত্তরীয়॥

এই অনুনয় দুখী কাঙ্গাল এবং মর্মস্পর্শী কারণ বিশ্বনাথ নির্মম, তাঁর উত্তরীয় সর্বদাই শুভ্র নিরঞ্জন। ঠাকুরদা এখনও উপলব্ধি করেননি যে তাঁর ব্যাকুল প্রেম প্রেমাস্পদের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারে না, যেমন রক্তের অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ জানলেন শেষ জীবনে সত্য যে কঠিন, অর্থাৎ নির্মম। তবু বললেন, "কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।" গীতাঞ্জলি পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এই ঈশ্বরপ্রেম একতরফা, অনিবার্যত অপ্রতিদত্ত এবং অপ্রতিদানীয়তব (unrequitted and unrequittable)। আশ্চর্য এই যে এই কথাটা গীতাঞ্জলি পর্বের গোড়ার দিকে একটি মূর্খ গ্রাম্য বালিকা জেনেছিল, দেখেছিল যে তার বক্ষের মণিহারের মধ্যমণিটিকে গুঁড়িয়ে থাঁতলে দিয়ে চলে গেল রাজার মূল্যবান স্বর্ণরথ; রক্তবর্ণ মধ্যমণিটি তো তার হৃৎপিণ্ডেরই প্রতীক।

বিকাশ ডস্টয়েভস্কির দোহাই পেড়ে একটা শিশুর কান্নায় প্রশ্ন তুলেছেন। আমিও Brothers Karamazov-এর কথা স্মরণ না করেই একই প্রকার প্রশ্ন করেছিলাম। একটি শিশু যদি রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং তার বিধবা মা-র কোনোরূপ চিকিৎসা করবার সম্বলমাত্র না থাকে অথবা থাকলেও সে রোগের নিরাময় যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হয়—এ নিদারুণ সমস্যা আমাদের সকলের মনকে আলোড়িত করে। এর কি কোনো সমাধান, কোনো উত্তর নেই। আমরা কি বিরাট নিরুত্তরের সম্মুখীন? একটি উত্তর অবশ্য দেওয়া যায়—আমরা মঙ্গলবিধানের (moral order) আশ্রয়ে বাস করছি না, কোনো মঙ্গল বিধাতার অস্তিত্বে আস্থা রাখতে পারি না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটি পাল্টা প্রশ্ন মনে জাগে। প্রশ্ন ঠিক নয়, বরং পরম বিস্ময়। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক, মূলত পদার্থ বৈজ্ঞানিক নিয়মে চালিত এই বিশ্বজগতে মানুষের—যুক্তিনির্ভর, ধর্মাধর্ম-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের—অস্তিত্ব সম্ভব হল কী করে? শতকরা ৯৫ জন মানুষ যদি মূঢ়, দুর্বৃত্ত হিংসাপরায়ণ হয় তবে সেটা খুব বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো গরিলা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির নিকট আত্মীয় ছিল। কিন্তু একজন সক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট, গৌতমবুদ্ধ, শোয়াইটজার, শেক্সপীয়র, বেটোফেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার পরিধির মধ্যে আবির্ভাবটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। শুধু একজন কেন, মাত্র তিন চার দশক পূর্বেই কি আমরা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের প্রাণ তুচ্ছ করা বীরোচিত আচরণের বিবরণ শুনিনি? তার ফলেই তো নাৎসী দানবিক শক্তি মানবিক শক্তির কাছে নতিস্বীকার করল এবং মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে ধূলিবিলীন হল।

যিনি এমনতর প্রশ্ন তুলছেন এবং উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি কি প্রাকৃতিক নিয়মের রাজ্যের ভেতরেই রয়েছেন, নাকি অন্তত খানিকক্ষণের জন্য উপরে উঠতে পেরেছেন? আমাদের অক্ষম মনোবিজ্ঞান যে-মনের চর্চা করে তার পিছনে কি আরেকটা মন আছে? একজন শিশুর রোগযন্ত্রণাজনিত কান্না যেমন মঙ্গলবিধানে আমাদের বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়, তেমনি একজন মহামানবের আবির্ভাব কি প্রাকৃতিক নিয়মের জালকে ছিঁড়ে ফেলে না?' প্রাকৃতের আড়ালে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত বহন করে আনে না? অন্তত আমাদের মনের গভীর তলকে বিস্ময়ে অবাক করে দেয় না কি?

স্বল্পকালীন এই অবাক্যতার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে দীর্ঘকালীন জ্ঞানীরা শিল্পীরা বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের সকলের মনে জ্ঞান ও শিল্পের অঙ্কুর জন্মায়। কিন্তু সেই পর্যন্ত। সে অঙ্কুরটিকে মহীরুহ করে তুলতে পারেন প্রতিভাবানেরাই। শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পকলা কেন, আমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক সৃষ্টির জন্মভূমি এমনতর দুর্লভ মানুষী পরিস্থিতিতেই। এমন কি প্রেমেরও। জান্তব যৌনবৃত্তিকে তো সুন্দর ও মহান প্রেমে উন্নীত করলেন বাল্মীকি থেকে য়েটস্ এবং রবীন্দ্রনাথের মতন মহাকবিরাই।

তাই ট্র্যাজিক চেতনা একটি ক্রমোচ্চ সোপানের প্রথম পদক্ষেপ। ঘোরানো সিঁড়ি বললে উপমাটা আরো লাগসই হতো। জীবন ও জগতের সঙ্গে এমনতর নিদারুণ মোকাবেলায় যাঁর কবিহৃদয় পোড় খায়নি তাঁকে সৎ কবি বলি কেমন করে, মহৎ কবির পর্যায়ে তো তিনি গণ্য হতেই পারেন না—আঙ্গিক সিদ্ধি, ছন্দমিলের কারসাজি, শব্দ চয়নের কারচুপি, অলঙ্কারের চারুতা, তাঁর লেখায় যতই চমকপ্রদ হোক না কেন।

স্পিনোজা ছিলেন মূলত দার্শনিক, যে উপলব্ধিতে তিনি স্থিতিলাভ করলেন নিজের সব সুখদুঃখের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখানে নিজের পথের শেষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর মনে মানবপ্রেম অতিশয় প্রবল ছিল—মানবজাতির উত্থান-পতনের কথা যে তাঁকে বিচলিত করত শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের আত্মক্রন্দনের অনবকাশ তাঁর কবিহৃদয়কে ব্যথিত করত। এই ব্যথিত হৃদয় থেকে যে বিরাট প্রশ্ন আকাশপানে উত্থিত হল, তার কোনো উত্তর মিলল না শূন্য আকাশে—

বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনের গভীর তলে আলোড়িত ছিল গীতাঞ্জলির প্রেমময় আনন্দময় পরাণবঁধুর প্রতি পিছুটান। এরই সঙ্গে আর একটি বিক্ষোভ ছিল তাঁর মনে—কবিরূপে তিনি তবু নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছিলেন কিন্তু কর্মীরূপে পারেন নি।

এই বিবিধ প্রকার হারিয়ে যাওয়া অথবা না পাওয়া লক্ষ্যগুলির মধ্যে টানা-পোড়েন তাঁর শেষ পর্বের কবিতাকে অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য দান করেছে আমার চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়ে অনবগত ছিলেন না। গীতবিতানের প্রথম গানটি অনেকেরই পরিচিত। তবু তার প্রায় সবটাই এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না :

কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা;
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা॥
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাঁধ টুটেছে মনে,
খ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে,

ক্ষণে আমার দিবা নিশার সকল অবকাশ ভরা?
.....শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি-যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা॥

মা গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে নবজাতকের মিষ্টিমুখ দেখবে বলে। সর্বপ্রকার সৃষ্টির নিয়মই তাই। ব্রহ্মা অমৎ সৃষ্টি করেছিলেন আনন্দের মধ্যে এ কথা মহাকালেও আমি মানতে পারি না। সৃষ্টি করেছিলেন যন্ত্রণার মধ্যেই। তাঁর সৃষ্টি এখনো অপূর্ণ, তাই-তো সে-যন্ত্রণা, অগ্রভরা সে বেদনা দিকে দিকে জাগে। সৃষ্টি কোনোদিন কি পূর্ণ হবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও তার উত্তর জানেন না; অথবা জানেন। যে-বিরহী বিরল সাধনা করছে সে তো কোনো মানুষ নয়, স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তাই। বিষ্ণুরূপে তিনি জগৎ পালন করছেন। জগতের দিকে চেয়ে কেউ বলবে না খুব সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন। তাই তো খ্যাপা শিবরূপে তিনি জগৎকে নৃত্যের তালে তালে ধ্বংস ভ্রংশ করে দিচ্ছেন। এমনি করে ধ্বংস হতে ধ্বংসে চলবে সৃষ্টির পালা।

এই প্রাচীন যুগের পৌরাণিক উপদেশবাণীকে কবিকল্পনা মিশ্রিত বলে একটু হালকাভাবে নেওয়া যায়, অন্তত তাতে খুব বেশী বিচলিত না হলেও চলে। কিন্তু নবযুগের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরাও অনুরূপ কথা বলেন। তাঁদের বিশ্ব নিরীক্ষারেও ধরা পড়েছে উক্ত প্রকার চক্রগতি—chaos থেকে cosmos-এ বিবর্তন এবং cosmos থেকে chaos-এ প্রত্যাবর্তন। অবশ্য দুয়েকজন সাম্প্রতিক মহা-বিজ্ঞানী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন—অতি অতি দূর অতীত বা দূর ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলা নাকি পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে অনধিকার-প্রমত্ততা। সে যাই হোক, এরই মধ্যে মানুষ রচনা করেছে আনন্দের কণিকাগুলি, কুড়িয়েছে আনন্দভরা মুহূর্তগুলি—জ্ঞানে, শিল্পসাহিত্যে, চারিত্রমাহাত্ম্যে, প্রেমে।

প্রথম পর্বেও ঈশ্বর ভক্তি এবং মানবপ্রেমের মধ্যে বিপরীতমুখী টান রবীন্দ্র-চিত্তকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করে রেখেছে। আমার ধারণা যে কবি রবীন্দ্রনাথ-এর ভাবে ও ভাষাতে পরিণতি ধীমে লয়ে ঘটেছিল। বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখনই তিনি উভয় দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। কাজেই ঐ সময়ে রচিত 'কল্পনা' কাব্যে উক্ত বিষাদ এবং বিচলতার প্রকাশ এমন রসোত্তীর্ণ হয়ে দেখা দিল। কল্পনার পরে প্রকাশিত হল 'নৈবেদ্য', 'ক্ষণিকা' এবং 'খেয়া'। 'ক্ষণিকা'তে দেখা যায় ট্র্যাজিক, পরিস্থিতি থেকে সাময়িক উত্তরণ। 'নৈবেদ্য'কে আমি বলব পদস্খলন, ঐ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই হয় প্রচারধর্মী, নয় অত্যন্ত উপনিষদ-আশ্রিত। 'খেয়া'তে আমরা আবার দেখতে পাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা। তবে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' এবং 'খেয়া' আমার অতিশয় প্রিয়; আমার বিশ্বাস আমার রুচি অনেক সুধী পাঠকের সমর্থন লাভ করবে। শেষ পর্বে তাঁর ট্র্যাজিক চেতনা অনেক বেশী গভীর ও পরিব্যাপ্ত হল, বিপরীতমুখী টানাটানি আরো জটিল হয়ে উঠল, বিবিধমুখী টানাপোড়েনরূপে তাঁর আন্তরিক বিষাদ ও যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুলল:

স্পিনোজা শান্তিলাভ করেছিলেন নান্দনিক উপলব্ধিতে পৌঁছবার সফল সাধনায়। তাই তিনি হলেন ঔপনিষদিক অর্থে কবি, বিশ্ববরেণ্য (আমার বরেণ্য তো বটেই) দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত, বিশেষত শেষ পর্বে, অশান্তির আঘাতে বিক্ষত হৃদয়ে পৌষ ফাগুনের পালায় দুলতেই থাকলেন, তাই তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য কবি, আধুনিক অর্থে কবি। এখানে কবির অভিধায় কাহিনীকার এবং নাট্যকারও অন্তর্ভুক্ত।

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবিতায় আপন বিশিষ্ট গায়কীতে সুরসংযোজনা করে যা সৃষ্টি করলেন তার তুলনা নেই। প্রতিভার এমনতর যুগ্মতা অত্যন্ত বিরল। শেকস্‌পীয়রের নাটকের কয়েকটি গান অবলম্বন করে প্রায় দুশ বছর পরে মহৎ সংগীত রচনা করলেন বিখ্যাত জার্মান সুরকার শুবের্ট, ইয়েটসের কবিতাকে গান করে তুললেন বেঞ্জামিন ব্রিটেন। বিখ্যাত গীতিনাট্য বা অপেরাগুলিতে বিপরীত অনুক্রমটাই রীতি। মোৎসার্ট বা ওয়াগনার (wagner) মহৎ সঙ্গীত রচনা করলেন তাতে libretto বা কথার জোগান দিলেন যাঁরা তাঁরা অখ্যাতির আড়ালেই রইলেন, খ্যাতিমান হবার মতন কবিপ্রতিভা তাঁদের ছিল না। আজি হতে শতবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়তো খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যেমন আমাদের আজকের চোখে হয়েছে মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলী। সেটাই স্বাভাবিক। তবে চণ্ডিদাসের পদাবলী (আমি সুরের কথা বাদ দিয়ে শুধু কবিতার কথাই বলছি এখানে) এখনো আমাদের মন কাড়ে। দূর অতীতের প্রতি আমাদের এক প্রকার মমতা জন্মায়, সেকালের প্রতিভাবানরা যতটা মহৎ ছিলেন তার চেয়ে তাঁদের মহত্তর বোধ করা এবং প্রতিপন্ন করার প্রবৃত্তি জাগে। নিকট অতীতকে নিয়েই বিড়ম্বনা, অবহেলা এবং অবজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথের বেলাও তাই ঘটেছিল। কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন শক্তিমান কবি ভাবলেন তাঁদের কীর্তি এবং স্বকীয়তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখাবার জন্য প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের সূর্যপ্রতিম দীপ্তিচ্ছটাকে কতকটা ছায়াচ্ছন্ন করা। কিন্তু এ প্রয়োজনবোধ অলীক; তাঁরা রসিক পাঠকের রুচির ও হৃদয়বৃত্তির বিস্তারের উপর ভরসা রাখলেই পারতেন। আমার কিন্তু মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি, বিশেষত শেষ পর্বের কাব্যের প্রতি এ-অবিচার এখন যাওয়ার পথে।

রবীন্দ্রকাব্য যখন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে শতবর্ষ পরে তখনও রবীন্দ্র সঙ্গীত সমানে জ্যোতিষ্মান থাকবে। কারণ আগেই বলেছি, একই ব্যক্তির মধ্যে মহৎ কবি এবং মহৎ সুরকারের এমন বিস্ময়কর যুগ্মতা এক শতাব্দীর মধ্যে কেন অর্ধ সহস্রাব্দীর মধ্যেও একাধিকবার ঘটবে বলে তো মনে হয় না; কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

কণ্টকবিদ্ধ
অতুল্য ঘোষ

॥ ৩৮ ॥

১৯৫০-এ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি র্বাচিত হলুম। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নাম স্তাব করেন এবং নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে । আমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও কাগজ- , ফাইল পাওয়া যায়নি। টেলিফোন লাইন টা, বিল বাকি, ইলেকট্রিক লাইনও তাই। সে ধার ছিল বিশ হাজার টাকা। অফিসটি ল ডঃ রায়ের বাড়ির প্রায় পাশে বললেই ল; পরে ওখানে বি পি এন টি ইউ সি-র ফিস হয়। দোতলায় একটা লম্বা হল আর খানি ঘর—এই ছিল অফিসের আয়তন। দেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় নিয়ে বাংলা শের একটা ঐতিহ্য (?) ছিল। আসাম, হার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাট, ত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব—এসব প্রদেশেই প্রদেশ গ্রেস কমিটির নিজস্ব বাড়ি ছিল। আমাদের দেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন নেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। দেশবন্ধু, সেন- গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র—এঁরা তো ছিলেনই, আরও নেকেই ছিলেন; কিন্তু কেউ কোনও দিন ড়ি করার কথা ভাবেননি। ফলে প্রদেশ গ্রেস কমিটির কার্যালয় প্রায় ভ্রাম্যমাণ ছিল লেই চলে। কিছু দিন ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল ট্রিটে; কিছুদিন ছিল বউবাজারে; আবার ছুদিন মৌলালীতে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভাপতিরূপে অফিস হাতে পেলুম বটে, কিন্তু নও রেকর্ড নেই। আর এক গাদা ঋণের বোঝা। তার ওপর আরও বিপদ হ'ল—কয়েক সের মধ্যেই ডঃ ঘোষ, ডঃ সুরেশ বন্দ্যো- পাধ্যায়, শ্রীদেবেন সেন, শ্রীঅন্নদা চৌধুরী, ডঃ পেন বসু প্রভৃতি অনেকেই কংগ্রেস ছেড়ে ষক মজদুর প্রজা পার্টি করলেন। আমরা থই জলে। জেলার কর্তাদের সঙ্গেও বিশেষ নিষ্ঠতা নেই; অনেক জায়গায় পরিচয়ও কম। ই সময় নদীয়ার তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লদহের সৌরীন্দ্র মিশ্র, মুর্শিদাবাদের শ্যামা- দ ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ির খগেন্দ্রনাথ দাশ- গুপ্ত, বাঁকুড়ার গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বর্ধমানের দেবেন্দ্রনাথ পাঁজা, মেদিনীপুরের নিকুঞ্জ- বিহারী মাইতি, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—এঁরা গিয়ে এলেন। চব্বিশ পরগনায় বিপিনদা, শ্রীপ্রফুল্লনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহৃদয়নাথ চক্র- বর্তী ছিলেন আর কলকাতায় কালীপদ মুখো- পাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীসুরেশ মজুমদার এঁদেরও পাওয়া গিয়েছিল।

বহু জায়গায় জেলা কংগ্রেস অফিস ছিল । কারণ, তার আগেই বাংলা বিভাগের জন্য ড় বড় বয়ে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন য়েছে বটে, পশ্চিম বাংলা যেন খানিকটা শূন্য। দেশবিভাগজনিত সমস্যা তখনই গুরুতর াকার ধারণ করেছে। যদিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশবিভাগ হয়েছিল, কিন্তু তার চাপ পশ্চিমবঙ্গের ওপর যতটা পড়ে আর কোনও প্রদেশকে তার এক শ' ভাগের এক ভাগও সহ্য করতে হয়নি। রাজনীতি- ক্ষেত্রেও তখন কমিউনিস্ট পার্টি খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে। তেলেঙ্গানা অনুসরণে বড়া-কমলাপুর, কাকদ্বীপ, নন্দীগ্রাম ও আরও কয়েকটি জায়গায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যয়'— এ স্লোগান তো ছিলই, তার ওপর লেগে ছিল নানারকম আন্দোলন। ডঃ রায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে জলপাইগুড়িতে মেডিকেল স্কুলের সংলগ্ন ভবনের শিলান্যাস করতে গিয়ে পারেননি, মালদহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ ঘোষ জনসভায় এমনভাবে প্রহৃত হন যে, হাসপাতালে যেতে হয়। এই পটভূমিকায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব আমরা পেলুম। এক বছর বাদেই ১৯৫২এর গোড়ার দিকে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধি- কার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। একটা দিকে খুব সুবিধা ছিল—ডঃ রায়ের অধিনায়কত্বে যে মন্ত্রিসভা তার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সদাসর্বদাই পরামর্শ করে কাজ হত। ফলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এ অবস্থাতেও মাঝে মাঝে উদ্ভব হত গভীর সঙ্কটের।

সাধারণ নির্বাচনের প্রায় ছ মাস আগে কোচবিহারে পুলিসের গুলি চলে এবং ছজন নাগরিক নিহত হয়। চতুর্দিকে খুব উত্তেজনা, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রিসভার মধ্যেও। কুমারসিং হলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভা হল। দু-তিন ঘণ্টা আলোচনার পর সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল যে, পুলিসের গুলিচালনা গর্হিত হয়েছে। প্রস্তাবটি একতরফা হয়েছিল। সরকার পক্ষের যে কিছু বলার থাকতে পারে বা এ নিয়ে সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত করা হোক—এরকম কোনও কথা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না। আমি সভাপতি হিসাবে প্রস্তাবটি আউট অফ অর্ডার করতে পারতুম, কিন্তু তা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লদা, কালীবাবু, তারকদা, অজয়দা, নিকুঞ্জবাবু, পাঁজামশাই এবং আরও আমার চেয়ে বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁদের আলোচনার পর যে সাহস থাকলে প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত করা যায় তা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই ঘটলো। রাত্রে টেলিফোন বাজলো। সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে বেশ পরিষ্কার- ভাবে বললেন, 'অতুল্য, আমি পদত্যাগ করছি।' আমি আমার বাড়িতে বসেই টেলিফোনের সামনে হাত কচলাতে কচলাতে বললুম, 'আজ্ঞে, সভায় সাতজন মন্ত্রী ছিলেন এবং বহু প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আলোচনায় যোগ- দান করেন।' উত্তর এল, 'আমি ওসব জানি না। তুমি তো সভায় সভাপতিত্ব করেছ। তোমরা একবার সরকারের কৈফিয়ত চাইলে না যা তদন্তের যে প্রয়োজন আছে তাও প্রস্তাবে উল্লেখ করনি।' ডঃ রায়ের কথা শুনে মনে হল যে, একটা পথ খুঁজে বার না করলে মহা- বিপর্যয় হবে। ডঃ রায় যেরকম শান্তভাবে বললেন, তাতে মনে হল—এটা হুমকি নয়, সিদ্ধান্ত। অনেক ভেবে কোনও কূলকিনারা পেলুম না। টেলিফোন করে বললুম যে, 'আমাকে তিন দিনের সময় দিন।'

পরদিন সকালে প্রবীণ এবং বয়স্ক নেতা এবং সহকর্মীদের এক জায়গায় জড় করলুম। সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলায় তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন যে, ডঃ রায় যা বলেছেন তা অনুচিত নয়। সিদ্ধান্ত হল যে, পাঁচ দিনের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি জরুরী সভা ডাকা হোক। সেই সভায় সর্ব- সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, সরকারের পক্ষে সর্বদা চেষ্টা করা উচিত যাতে গুলি চালাতে না হয়। গুলিচালনায় কোনও সমস্যা সমাধান হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনু- রোধ করা হ'ল—তাঁরা যেন এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেন। গুলিচালানো সঙ্গত হয়েছিল কি না—এটাও যেন তদন্তের বিষয়বস্তু হয়। আরও অনেক কথাই প্রস্তাবের মধ্যে ছিল, তবে এইটিই হল মোদ্দা কথাটা। গুলিচালনার প্রস্তাব নিয়ে এত বিসংবাদ, এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। ডঃ রায় সহ গোটা ক্যাবিনেটের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ে- ছিল যে, কোনও স্থানে যদি সরকারী কর্মচারী কোনও অসঙ্গত বা গর্হিত কাজ করে তা হলে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রচার ও সত্যাগ্রহ করতে পারবে। প্রস্তাবটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমি জানি না ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সমগ্র মন্ত্রিসভার উপস্থিতিতে এরকম কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কি না। আমার ধারণা—আর কোথাও হয়নি।

সামনেই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্ত- বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পূর্ণ নতুন। আগেকার কোনও নির্বাচনের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। আগে শিক্ষা ও ট্যাক্স দেওয়ার যোগ্যতার ওপর ভোটার হত। আর '৫২ সালের নির্বাচনে কোটি কোটি ভোটার। এ আই সি সি থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করবার জন্যে নানারকম পরামর্শ এসেছিল। সে এক প্রকাণ্ড ফিরিস্তি। আমরা প্রাদেশিক ইলেকশন কমিটিতে স্থির করেছিলুম যে, সাধারণত জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো। ইলেকশন কমিটির কাজ খুবই কঠিন ছিল। এইরকম নির্বাচন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কারোরই ছিল না। সেইজন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির সুপারিশগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হতো। ইলেকশন কমিটির মিটিং সাধারণত সন্ধ্যার পর ডঃ রায়ের বাড়িতে হতো। এবং রাত্রি যত দীর্ঘ হতো, একে একে প্রফুল্লদা কালীবাবু এঁরা চলে যেতেন। শেষ অবধি থেকে যেতুম আমরা দুজন। যখন যে জেলার

সম্বন্ধে আলোচনা হত সেই জেলার সভাপতি ও সম্পাদক ইলেকশন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রার্থীদেরও আসতে বলা হতো। অবশ্য আমরা না ডাকলেও বহু প্রার্থী এবং তাঁদের সমর্থক মিটিং-এর সময় ঠিক হাজির হতেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যই শুনতে হতো। কখনও বিজয়বাবু (নাহার), কখনও বা বিজয়ানন্দ (চট্টোপাধ্যায়) সেইসব সাক্ষাৎকারের নোটও লিখতেন। তারপর সভার অনুমোদন নিয়ে দিল্লীর জন্য প্রার্থী-তালিকা ও তাঁদের পরিচয় ও গুণাগুণ তৈরি করা হতো। এমনও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল যেখানকার জন্য প্রার্থী খুঁজে বার করতে হতো। অবশ্য এমন ক্ষেত্র খুব কমই ছিল। তখন ছিল চোদ্দটি অ্যাসেম্বলী মেম্বারের আসন নিয়ে দুটি লোকসভার আসন। একটি সাধারণ এবং একটি তফসীলভুক্ত। কোথাও কোথাও সাতজন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার নিয়ে একটি লোকসভার আসন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তিনজন লোকসভার সদস্যের জন্য একটি কেন্দ্র ছিল, অর্থাৎ একুশজন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার। একটি সাধারণ, একটি তফসীলভুক্ত এবং একটি ট্রাইবাল। বর্ধমান সদর, আসানসোল মহকুমা নিয়ে দুটি লোকসভার আসন ছিল—একটি সাধারণ ও একটি তফসীল। সাধারণ আসনের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। তিনি নিজেই প্রার্থী ছিলেন। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিসে চুঁচুড়ায় মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হয়। মনোনয়নপত্র দাখিল করবার শেষ দিন সকাল দশটার সময় কলকাতায় শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায় জানালেন যে, তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাজ-কারবার আছে, অতএব তাঁর মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। আমাদের মাথায় তো বজ্রাঘাত হল। তিনটের মধ্যে চুঁচুড়ায় মনোনয়নপত্র পেশ করতে হবে—আর যেসব ভোটার স্বাক্ষর করবেন তাঁরা বর্ধমানের ঐ কেন্দ্রের ভোটার হওয়া চাই। আমি বর্ধমান কংগ্রেস অফিসে ফোন করে দিলুম · যেন একটার মধ্যে চুঁচুড়ায় বারোজন ভোটার পাঠানো হয়। ডঃ রায়ের নির্দেশে আমি চুঁচুড়ায় চলে গেলুম, আর ধীরেনদা (মুখোপাধ্যায়) বেরোলেন প্রার্থী খুঁজতে। আমি তখন হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি। সেখানেই খবর এলো যে, প্রার্থী পাওয়া গেছে—তিনি কলকাতা থেকে বেরোচ্ছেন। আড়াইটা অবধি কেউই এলেন না। ঠিক আড়াইটার পরই কলকাতা থেকে একজন ডঃ রায়ের একটি চিঠি ও একটি ভোটার লিস্ট নিয়ে এলো। ডঃ রায়ের চিঠিতে লেখা, 'তোমার ভোটার লিস্ট পাঠালুম—তুমি ডামি হিসাবে নাম দিয়ে দাও।' আমি মনোনয়নপত্র পেশ করলুম দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। প্রার্থী এসে হাজির হলেন দুটো পঞ্চাশ মিনিটে। তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করা হল; আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

স্ক্রুটিনির দিন দেখা গেল যে, প্রার্থী নির্বাচন-কেন্দ্রের নাম লেখেননি—সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়নপত্র বাতিল। আমি কংগ্রেসের একমাত্র প্রার্থী রইলুম। জহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। জওহরলালের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভাল ছিল না (কণ্টককল্পিত—১৭/১৮)। আমি ভাবলুম, আমি যদি নাম প্রত্যাহার করে নিই, জওহরলাল সাগ্রহে মত দেবেন। জওহরলালের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালুম যে, আমার পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো অসম্ভব; অতএব আমাকে নাম প্রত্যাহার করবার অনুমতি দেওয়া হোক। টেলিগ্রামের কথা শুনে ডঃ রায় ভর্ৎসনা করলেন এবং জওহরলাল টেলিফোনে অসম্মতি জানালেন। আমি নিরুপায়। আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলুম যে, ঐ নির্বাচন-ক্ষেত্রে আমি যেতে পারবো না

নির্বাচনে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে সাধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে যতই বিশ্লেষণ করা যাক, ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক বলা খুব শক্ত '৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। অন্তত অনেক জায়গার চেয়ে যে বেশী—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার খানিকটায় ইংরেজ-রাজ ছিল না বললেই চলে। সেই মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করলো মাত্র ১১টি আসনে আর আরামবাগের অবস্থাও তাই। সেখানে স্বয়ং প্রফুল্লদা পরাজিত হলেন। অথচ কোচবিহার—যেখানে ছ'মাস আগে গুলি চলেছিল, সেখানে কংগ্রেস সব ক'টি আসনে জয়লাভ করেছিল। নির্বাচনে প্রফুল্লদা কালীবাবু, তারকদা, হৃদয় চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরাজিত হলেন পরাজিতদের মধ্যে সাতজন মন্ত্রী। বেশ মনে আছে—জওহরলাল আমায় ধমক দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়েছে বটে, কিন্তু এতগুলো নেতা ও মন্ত্রীর পরাজয়ে কংগ্রেসের বেশ মর্যাদাহানি হয়েছে সে চিঠির উত্তর দেন ডঃ রায় এবং খুব কড়া ভাষায়। চিঠির সারমর্ম হল—পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্যা, অন্য যে-কোনও প্রদেশে [illegible] সমস্যা হলে সেখানে সংখ্যাধিক্য হত না। কেবলমাত্র সংগঠনের শক্তিতে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

'৫২ সালের নির্বাচনে একটা শিক্ষা আমরা লাভ করেছিলুম যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্যাতন ত্যাগ, কারাবরণ—কেবলমাত্র এই মূলধন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না সর্বভারতীয় প্রশ্নও নির্বাচনের সময় এসে পড়ে। স্থানীয় সমস্যাও মাঝে মাঝে জটিলতা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটা খুব ভাল দিক আমাদের কাছে ফুটে উঠেছিল যে, ভোট দেওয়ার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনও সম্পর্ক ছিল না। মুসলমান অধ্যুষিত কেন্দ্রে হিন্দু জয়লাভ করেছে, আবার হিন্দু অধ্যুষিত কেন্দ্রে মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করেছে সাধারণ আসন থেকে তফসীলভুক্ত প্রার্থী জয়লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ৮ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিগুলি পুরো পাওয়া যায়নি, কিন্তু সেগুলির অংশ-বিশেষ পাওয়া গেছে; এখন সেই পত্রাংশগুলি নিয়ে কিছু বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে নিজের ছোটভাইয়ের মত দেখতেন।

চন্দ্রনাথবাবুও নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর রচিত 'শকুন্তলা তত্ত্ব' নামক গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

'বঙ্কিম, তুমি আমাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাস বলিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিতেছি না। তোমার ভারত ভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি বলিয়াই এই গ্রন্থখানি তোমাকে উপহার দিলাম। ইহাতে তোমার ভারতের এবং আমাদের জগতের একখানি অনুপম রত্ন সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা বলিয়াছি।'

—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র স্নেহাস্পদ চন্দ্রনাথকে সময়ে সময়ে যে সব চিঠি লিখতেন, সে সব আজ আর পাওয়া যায় না। মাত্র একটি চিঠির কিয়দংশ চন্দ্রনাথবাবু তাঁর বঙ্কিম-বিষয়ক স্মৃতি-কথায় উদ্ধৃত করে গেছেন। সেই অংশটি এই—

'একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলংকার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধাবল্লভের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা উল্লেখ করে চন্দ্রনাথবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন—'নবমী পূজার দিন প্রাতে গিয়াছি। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি—বঙ্কিমবাবু বলিলেন—তা হবে না, রাধাবল্লভকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বোস। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে খুবই ভালবাসিতেন। বলিতেন—উনি আমাদের বংশের সর্ব প্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন। সব আব্দার রক্ষা করেন। রোগে, শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি। উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' এমন সরলভাবে, এমন ভক্তিভরে রাধাবল্লভের কথা বলিতেন যে, শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত।'

বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। সেই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা তখন সফল হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টার কিছুদিন পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে 'শিক্ষার হেরফের' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু লোকেন পালিত ঐ সময় রাজসাহীর জেলা জজ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নিজেদের জমিদারী দেখাশুনা করতেন। জমিদারীতে গিয়ে তাঁর প্রিয় 'পদ্মা' বোটে করে ঘুরতে ঘুরতে রাজসাহী গিয়েছিলেন। তখন রাজসাহীতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও থাকতেন। তিনি ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যামোদী ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পড়েছিলেন। পরে এই প্রবন্ধটি ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সাধনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পড়ে তখন রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি পাওয়া না গেলেও সেই চিঠির কিছু অংশ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অংশটি এই—

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। ঐ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়া ছিলাম। এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।' কিন্তু কেন যে তাঁহার ক্ষীণ স্বর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হোসের মত সভা। 'অসংখ্য বালক-বলিদান-রূপ মহাপুণ্য বলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকরা সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি বা কর্ণভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উগ্র কর্ণচ্ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা দেশীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করতে এবং আন্দোলন পরিচালনা করতেও পারতেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ইংরাজ গভর্নমেন্ট সরকারী কর্মচারীদের এই অধিকার ক্রমশ হরণ করিতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় এবং মফস্বলে যখন কয়েকটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তখন সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান একরূপ নিষিদ্ধ হয়েই যায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র সেখান থেকেই তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান' বা ভারতবর্ষীয় সভার সদস্য হয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভা বিলাতে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ন্যায় এখানে ইংরাজ সরকারের শাসন ব্যবস্থার আলোচনা করে দোষত্রুটি দেখিয়ে দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনেরও ইঙ্গিত দিত।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬ জুলাই (১২ ভাদ্র, ১২৮৩) কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাতে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে সভার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তখন সভার উদ্যোক্তাদের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই চিঠিটি সভায় পড়েছিলেন। চিঠির শেষাংশটুকু জানা গেছে। সেই অংশটা এই—

'ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।' —সাধারণী, ১৬ই শ্রাবণ ১২৮৩। 'সাধারণী' ছিল নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত আর একটি পত্রিকা।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপই দীনবন্ধু তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ

একাত্মবরেষু।

সোদর সদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকল ভাল দেখা স্বভাব-সিদ্ধ-বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার 'নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী—বসন-ভূষণবিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি নবীন তপস্বিনীর সমাদর হয়, তাহা সাহিত্যোনুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু নবীন, তপস্বিনী সুরূপা হউন, আর কুরূপা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি—

অভিন্নহৃদয়
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন বলে, বঙ্কিমচন্দ্র

দীনবন্ধুর পুত্রদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সর্বদা দীনবন্ধুর পুত্রদের সংবাদ নিতেন এবং আবশ্যক হলে সৎ পরামর্শও দিতেন। তিনিই দীনবন্ধুর রচনাগুলি একত্র করে গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করবার জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদের পরামর্শ দেন এবং ঐ সময় দীনবন্ধুর একটি ছোট জীবনীও লিখে দেন। ঐ জীবনীটি দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ জীবনীটিকে পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাবার জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদের বলেন এবং গ্রন্থের উপসত্বও প্রথম থেকেই তাঁদের দান করেন।

দীনবন্ধুর ঐ জীবনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মত দীনবন্ধুর পুত্ররা পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর ২য় সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদের একটা ইংরাজিতে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির আরম্ভ অংশের কিছুটা মাত্র পাওয়া গেছে। বাকি অংশটা পাওয়া যায় নি। চিঠির আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'I owe it to the memory of your father, that I should give a critical estimate of his writings.'

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদের এই লেখার কথা বিজ্ঞাপনে প্রচার করতেও তখন বলেছিলেন। এবং এই চিঠির কথা অনুযায়ী 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' নামক প্রবন্ধটি লিখে দিয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতিঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেই অসাধারণ মানুষ কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।'

কলকাতার এক জ্যোতিষী এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মুখাবয়ব দেখে, আর এক বার তাঁর হাতের রেখা দেখে গণনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুবারই জ্যোতিষীর নির্ভুল গণনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দুখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি দুটির মধ্যে প্রথমটির মাত্র এক লাইন এবং দ্বিতীয়টির কয়েক লাইন, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করে গেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, কিন্তু হস্তাঙ্ক গণনায় তাঁর অবিশ্বাস, শচীশবাবুর এই মন্তব্য সহ উক্ত পত্রাংশ দুটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

'কলিকাতায় অবস্থান কালে মধ্য বয়সে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন তাঁহার শিক্ষাগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু হস্তাগণনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদা তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বন্ধু সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সেক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন

'(You) succeeded to an extent which surprised me.'

তার কিছুকাল পরে জ্যোতিষী মহাশয় আহূত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। জ্যোতিষী মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটি অপরিচিত ভদ্রলোক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোকদিগের পরিচয় তিনি পরে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা পুরুষ। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার বৈবাহিক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয় ললাট দেখিয়া গণনা করেন নাই। হস্তাঙ্ক দৃষ্টে গণনা করিয়াছিলেন। ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন—

'You (Jyotishi) were correct in what you said of me in regard to certain matters which I am certain are not known to any one but myself.

I state what happened once must not be understood as having yet proved any decided opinion on the subject of Palmistry. What I am convinced of is that you are possessed of either a science or certain powers of mind which I do not yet understand.

জ্যোতিষী গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তবু তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, হস্তরেখা দৃষ্টে ভাগ্য গণনা সম্ভবপর।'

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষ করে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বহু পড়াশুনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Sayings'-এ লিখে গেছেন—

'বরাহমিহির, খনা এবং অন্যান্য গ্রন্থপাঠে এবং ইংরাজি Napoleon, Laplace প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তিনি জ্যোতিষে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। নিজেই সব পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিখিয়া ফেলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে পড়েন।

একদিন ভৃত্য সংবাদ দিল, তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ির গাভীটি একটি কৃষ্ণবর্ণ বৎস প্রসব করিয়াছে। অমনি পঞ্জিকা খুলিয়া জন্ম-সময় ইত্যাদি দেখিয়া নিরূপণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী

তাঁহার গণনায় স্থির হইল যে, গৃহস্বামীর (সঞ্জীবের) খুবই অমঙ্গল হইবে। অবশ্য কি অমঙ্গল হইবে, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। অল্পদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃণালিনী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে জ্যোতিষ গণনার কথা লিখেছেন। এ সব ক্ষেত্রে তিনি জ্যোতিষের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই বলে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর অবশ্য কিছুদিন তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাসহীন হয়েছিলেন।

জ্যোতিষের উপর দীর্ঘকাল ধরে অগাধ আস্থা থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজন মত জ্যোতিষকে বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রনমিকে বিচারের সময়ও কাজে লাগাতেন। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় একবার এক মোকদ্দমায় বাদী বলে—অমুক দিন রাত্রে অমুক সময়ে আসামী লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে এবং প্রহার করে। রাত্রের পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় সে আসামীকে চিনতে পারে।

বাদীর অভিযোগের উত্তরে আসামী জানায়—হুজুর, ঐদিন শুধু রাত্রে কেন, সমস্ত দিনে-রাতেই আমি বাড়িতে ছিলাম না। অভিযোগকারী আমাকে জব্দ করবার জন্য অহেতুক আমার নামে এই নালিশ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাদী এবং আসামী উভয়ের কথা শোনা ছাড়াও উভয়ের সাক্ষীদের কথা থেকেও বুঝেছিলেন—মামলাটি মিথ্যা মামলা। তবুও তিনি নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য এই মামলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ থাকায়, জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়েও বিচার করেছিলেন।

বাদী যে সময়ের উল্লেখ করে বলেছিল, আসামী তাকে লাঠি মারলে সে চাঁদের আলোয় আসামীকে চিনতে পেরেছিল, সেই দিনটা কৃষ্ণপক্ষের অথবা শুক্লপক্ষের প্রায় মাঝামাঝিতে পড়ায় তখন আকাশে চাঁদ ওঠা সম্ভব কিনা, এটা বঙ্কিমচন্দ্র গণনা করে দেখেছিলেন। গণনায় তিনি দেখেন, তখন আকাশে চাঁদ উঠতেই পারে না। সে রাত্রে আরও কিছু পরে চাঁদ ওঠে। এই দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করে দেখেছিলেন, বাদীর কথা মিথ্যা।

ঐ সময় আলিপুর কোর্টে হেমেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক উকিল ছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মামলার রায়

হেমেন্দ্রবাবু আছেন। একদিন হেমেন্দ্রবাবুকে বলেন—আপনি তো জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত। অমুক দিন অমুক সময় আকাশে চাঁদ থাকা সম্ভব ছিল কিনা আমাকে জানাবেন তো।

হেমেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে একটা ঠিক করে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখালে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—না, হেমেন্দ্রবাবু, ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। এখন আমার গণনাটা ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন তো।

হেমেন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গণনা দেখে নিজের ভুলটা ধরতে পারলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গণনাকেই ঠিক বা অ্যাকিউরেট বললেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মামলাটি মিথ্যা মামলা বলে আসামীকে বেকসুর খালাস দিলে, বাদী ধনী ব্যক্তি থাকায় জেদের বশে আবার হাইকোর্টে আপীল করে এবং তখনকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার জ্যাকসন সাহেবকে মামলা লড়বার জন্য নিয়োগ করে।

মামলার শুনানীর সময় জ্যাকসন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের উপর কটাক্ষ করে হেসে বিচারককে বলেছিলেন—এই মামলার বিচার হয়েছে, সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নয়, জ্যোতিষতত্ত্বের উপরে—নট্ অন লিগ্যাল এভিডেন্স, বাট অন অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ক্যালকুলেশন।

হাইকোর্টের জজ অবশ্য সকল দিক বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ই বহাল রেখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই অনেক সময় এইরূপ ছোটখাট মামলা ও চুরির কেস উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে সহজেই বিচার করতেন এবং চোরও ধরতেন। এ সম্পর্কে বহু কাহিনী আছে। এখানে শুধু প্রসঙ্গত একটা ঘটনা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৮৮৬র মে পর্যন্ত যশোহর জেলার ঝিনাইদহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাঝে অবশ্য অসুস্থতার জন্য একবার তিন মাস ছুটি নিয়ে ছিলেন।

এই ঝিনাইদহে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র একবার সেখানকার এক ব্যক্তির অনুরোধে তার বাগানের কলা-চোরকে ধরে দিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত

রাধাবল্লভের মন্দির
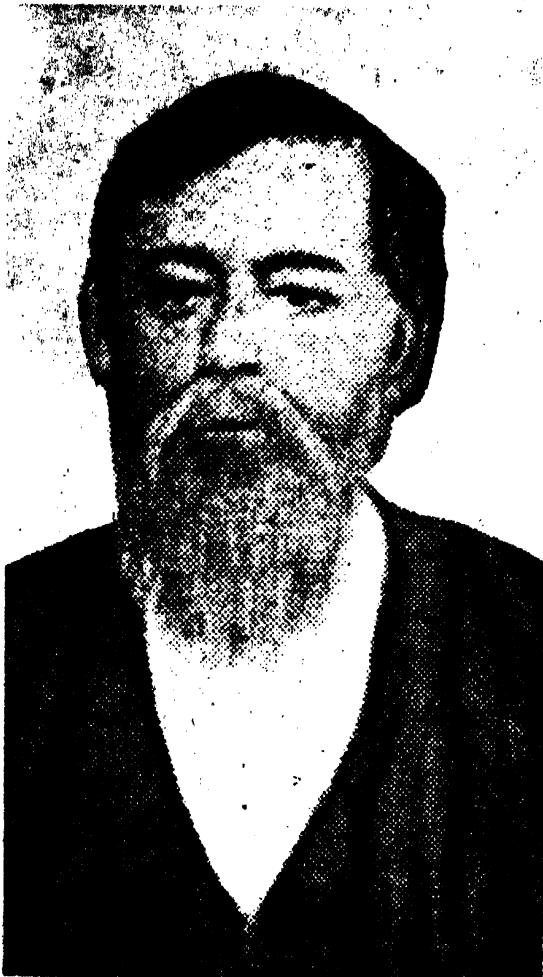
চোর ধরার জন্য নিজেই ঘটনাস্থলে চলে যেতেন। এক্ষেত্রেও অভিযোগকারীর অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র তার কলাবাগানে প্রথমে যান। গিয়ে তিনি দেখলেন, যে কলার কাঁদি কেটেছে, সে নীচে থেকে বাঁ হাত দিয়ে কাটারির কোপ বসিয়ে কেটেছে।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই চুরির ব্যাপারে কোন লোককে তোমার সন্দেহ হয় কি?

অভিযোগকারী একজনের নাম করলে, বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের ভিতরে এসে চৌকিদার দিয়ে সেই লোকটিকে ডাকালেন। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেক মাতব্বর ব্যক্তিও সেখানে এসে গেলেন।

চৌকিদার লোকটিকে নিয়ে এলে, সে ন্যাটা কিনা বঙ্কিমচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি সকলের সামনে নিজেকে ন্যাটা বলেই স্বীকার করল।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র লোকটিকে বললেন ওর কলার কাঁদি বাঁ হাতে কোপ দিয়ে কাটা। নিশ্চয় তুমিই ওর কলার কাঁদি নিয়ে এসেছ।

লোকটি প্রথমে থতমত খেয়ে একটু অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও শেষে সে-ই চুরি করেছে বলে স্বীকার করল।

বঙ্কিমচন্দ্র চুরির মাল আনিয়ে, মালিককে ফেরৎ দিইয়ে, আসামীর সামান্য দণ্ড দিলেন। তারপর তাকে আর ঐরূপ চুরি না করার উপদেশ দিয়ে ফিরে এলেন।

এরপর থেকে ঐ অঞ্চলে এই ধরনের ছোটখাটো চুরি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

এখন আবার বঙ্কিমচন্দ্রের পরাংশের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক—

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করার অভিলাষ জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নবীনচন্দ্রের ঐ চিঠির উত্তরে তিনি তখন ১৫-৭-১৮৮০ তারিখে নবীনচন্দ্রকে যে ইংরাজি চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে প্রসঙ্গত বলেছিলেন, তিনি একটা উপন্যাস শুরু করেছেন।

নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন—কি বিষয়ে নূতন নভেল (উপন্যাস) লিখিতেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি এবং বারবার যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম, এবারও লিখি যে......তিনি যেন দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভক্তি প্রেম—যাহা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ—লইয়া নূতন উপন্যাস রচনা করেন। তিনি উত্তরে লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। এই নূতন উপন্যাসটি ঠিক রঙ্গমতীর পথে যাইতেছে।

It follows exactly the lines of your Rangamati

নবীনচন্দ্রের লেখা থেকে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটির মাত্র একটি ছোট বাক্য পাওয়া গেল।

এখানে একটি বাক্য হলেও, নবীনচন্দ্র তাঁর ঐ 'আমার জীবনে'ই অন্যত্র তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি দীর্ঘ ইংরাজি চিঠির বেশ অনেকটাই উদ্ধৃত করেছেন। এবার সে সম্বন্ধে বলছি—

চন্দ্রনাথ বসু

নবীনচন্দ্র কাব্যাকারে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপনের মানসে [illegible] খ্রীষ্টাব্দে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস'—এই তিনখানি কাব্যের [illegible] লেখেন, রৈবতকের তিন সর্গ লিখে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে এক চিঠিতে তাঁর মনোভাব জানান।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের চিঠি পেয়ে রৈবতকের লেখা তিন সর্গ এবং প্রস্তাবনাটিও দেখতে চান। তখন নবীনচন্দ্র ঐগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবীনচন্দ্রের এই লেখা দেখতে চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সে চিঠি আজ আর নেই। তবে নবীনচন্দ্রের লেখা পেয়ে কয়েক মাস পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে লেখাগুলি ফিরিয়ে দেবার সময় ঐ সঙ্গে নবীনচন্দ্রকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কটকের জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দীর্ঘ চিঠিটির কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে নবীনচন্দ্রের মন্তব্য সহ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পত্রাংশটির কিছুটা এখানে দিচ্ছি—

প্রথমে লেখেন you have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ pus অধ্যাত্ম রামায়ণ It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you excecute with the same grandeur as you have planned, you will perfectly justify your-self. Properly executed the poem of course take its rank as the greatest in the language.

I warn you, however not to be too confident of success of popularity. I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the ninneteenth century.

এরূপে কার্যটি বড় কঠিন বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে উহা আগাগোড়া লিখিতে নিষেধ করেন—

Blank verse is recognised as proper to Epie poetry in English—but it is certainly very unsuited to Bengali Epics. M. S. Dutta alone has been able to make something of it—but even his success has been achieved at a lamantable sacrifice of grammer, idiom and perspicuity. Even in English, it gives to even such a poem as the 'Paradise Lost' a weary uninformity which makes it a very dismal reading...If you continue the poem, my advice is that you should change the ছন্দ at every chapter, and let it generally be rhyme.

প্রথম তিন সর্গ ভিন্ন আর সমস্ত সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা আমারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার পর কাব্যের দীর্ঘতা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া লেখেন—....

'এই বলে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দীর্ঘ চিঠির আবার কিছুটা উদ্ধৃত করেন। এছাড়া 'তাহার পর অভিমন্যুর মৃত্যু লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য লিখিতে নিষেধ করেন।' পত্রের উপসংহারে লেখেন। বলেও নবীনচন্দ্র চিঠি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করেন।

নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উপদেশগুলি তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সে সব উপদেশ আর এখানে দিলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরাজি জানা বন্ধুদের, যেমন—মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে সাধারণত বাঙলায় না লিখে ইংরাজীতেই চিঠি লিখতেন।

সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদার একবার বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিনের কথা প্রসঙ্গে শ্রীশবাবু লিখেছেন—'তারপর তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) ইংরাজী লেখার কথা হইল। বলিলেন, বরাবর বাঙলা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।'

ইংরাজী সহজসাধ্য হবে ভেবেই বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরাজীতে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং Rajmohan's wife উপন্যাসটি লিখেছিলেন। পরে হয়ত মাইকেলের মত নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইংরাজী ছেড়ে মাতৃভাষাতেই সাহিত্যের সেবা করতে প্রবৃত্ত হন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে আদিপর্বে অর্থাৎ ছাত্রজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' বাঙলায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন। এই সময় তিনি বাঙলাভাষায় বেশ কিছুদিন কাব্যচর্চা করলেও পরে ঐ মাইকেল মধুসূদন দত্তর কারণেই এ পথ ত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বিখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখে গেছেন—

'সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্য রচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের তীব্র প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্য রচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।' (ক্রমশ)

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ১৮ ॥

বাবু মিয়ার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল দাউদের। শেষ পর্যন্ত জামিলা এবং তারও ছোট রুকসানার লজ্জাও ভাঙিয়ে দিল দাউদ। জয়নুদ্দী ছাহেবের তো কথাই নেই। ছবি বিবির ভাই যখন, হোক না চাচাতো, তখন সে তো ঘরের ছাওয়াল। আর দাউদের স্বভাবও বড় মিষ্টি। ওতেই বোঝা যায় যে ছবি বিবির ভাই। মৌলভী জয়নুদ্দী দাউদের ব্যবহারে খুব খুশী।

বললেন, "দ্যাখ বাপ তুমারে তুমিই কচ্ছি, তুমি ছবি বিবির ভাই, কিছু মনে করো না।"

দাউদ বলল, "সে কি কথা? আপনি মুরুব্বি, আমি আপনার ছাওয়ালের বয়সী, আপনি তুমি কবেন এতো আপনার মেহেরবাণী। এতে আমার মনে করার কী আছে?"

মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "আল্লাহর রহমত তুমার উপর য্যান সদা সর্বদা পড়ে। আল্লাহ য্যান তুমার রেজেক বাড়ায়ে দ্যান। আজকাল খুব কম ছাওয়ালই মুরুব্বিগেরে মানতি চায়। অ্যামন ডোনট কেয়ার ভাবে চলে যে কথা কতি ভয় লাগে। তা তুমারে দেখে তো আমার বড় ছাওয়াল মনুর মতই মনে হয়। মনুর বয়েস এই ফাল্গুনি তেইশ হবে।"

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "জে আপনার বয়েস অ্যাখন কত হলো?"

"আমার?" মৌলভী জয়নুদ্দী হাসলেন, "তা বয়েস হইছে বই কি? এই ঊনপঞ্চাশ চলতিছে।"

দাউদ বলল, "দেখলি কিন্তু মনে হয় না। আমার বাজানের অ্যাখন অ্যাকান্ন। কিন্তু দেখলি মনে হবে য্যান আপনার চাইতি দশ বছরের বড়।"

মৌলভী জয়নুদ্দী হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "কেউ কেউ থাকে বয়েস চোরা। হাঃ হাঃ হাঃ!"

দাউদও হাসল। এবং সে উৎকর্ণ হয়ে রইল যদি অন্দর থেকে সইফুলের কোনও কথা ভেসে আসে তা শোনবার জন্য। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল এ বাড়িতে বুঝি আর কোনও মানুষ নেই। তবে কি সইফুলের আমন্ত্রণ এটা নয়?

"আমার বড় ছাওয়াল মইনুদ্দী", মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "ঐ মনু, ছিটা আমারে হররখৎ লিখতিছে, বাজান, আপনি বাবুরি আমার এখনে পাঠায়ে দ্যান। এই রেঙ্গুনি মুর্তাজ খুতিরা দু পয়সার মুখ ব্যাখা যায় তা ছাড়া মনে ইজ্জৎ নিয়ে বাস করা যায়। তা আমাগের মন ওঠে না। অ্যাকটা দেছে ঠিক আছে, ঐ দেশেই বিয়ে থা কইরছে, তা করো। ছাওয়াল পাওয়াল হলি তো তারা আর বাঙ্গালী থাকবে না। বাবুর মা এই জন্যি বড় নারাজ।"

দাউদ সইফুলের কথাই ভাবছিল। সব কথা ওর কানে ভালো করে ঢোকেও নি।

তবু বলল, "জে। সে তো ঠিকই।"

জয়নুদ্দী উৎসাহ পেয়ে বললেন, "আমারউ সেই কথা। ছাওয়াল পর হয়ে যাবে, এই কথাডা মনে হলি বড় দুঃখু হয়। খোন্দকার যদি একটু নড়ে বসতেন, মনুর কামড়া হয়ে যাতো। ডিস্ট্রিক্ট বোরডের চাকরিডা যে হিন্দু ছ্যামড়াডা পাইছে তার কোয়ালিফিকেশন নাকি মনুর চাইতি ভালো। ইডা কি অ্যাকটা কথা হলো। কোয়ালিফিকেশন, পাশের নম্বর, এসব দেখে যদি লোক নিতি হয়, তালি কডা মুছলমানের ছাওয়াল চাকরিতি ঢোকবে? হিন্দুরা তো এই লাইনি পাকা ঘুণ হয়ে বসে আছে সেই কবের থে।"

দাউদ বলল, "জে।"

দাউদের মন তার চোখের সঙ্গেই ঘুরতে লাগল। কোথাও যদি সইফুলের দেখা পায়। কখনও সে হতাশ হয়ে পড়ছিল। আবার কখনও কেন জানিনে তার মনে হচ্ছিল সইফুল আছে। কোনও না কোনও দেওয়ালের আড়ালে থেকে সতর্কভাবে তাকে লক্ষ্য করছে। কেন একথা মনে হচ্ছে সে জানে না তবে এই কথা ভাবতেই তার বুকের খুন ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠছে। আর অমনি তার প্রাণে আশা জাগছে। না, সইফুল তাকে নিরাশ করবে না। তার জীবনে যত মেয়ে এসেছে, কেউ তাকে নিরাশ করেনি।

জয়নুদ্দী বললেন, "আরে একথা তুমি আমি বুঝলি হবে কী? আমাগের মুরুব্বি লীডাররা তা কি বোঝেন? সেইডে হলো আসল কথা। কথাডা তাগেরে বুঝতি হবে। আমরা যে হিন্দুগের চাইতি ল্যাখাপড়ায় পিছোয়ে আছি, ইডা তো দিনুর আলোর মত ছাপ। তারপর? এই কথা জানায়েই মুরুব্বি লীডারগের কাজ খতম হয়ে গ্যালো। জনসংখ্যায় এই বাংলায় মোছলমানেরা বেশী। ল্যাখাপড়ায় কম। মানলাম। কম্পিটিশনে হিন্দুগের সঙ্গে পারা যাবে না। মানলাম। হিন্দুরা নিজির থে মুছলমানগের তরক্কীর পথ তৈরি করে দেবে?"

মৌলভী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বুড়ো আঙুল দুটো দাউদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নাচাতে নাচাতে বললেন, "এই কাঁচকলা।"

কে যেন পাশের ঘরে লঘু পায়ে হেঁটে গেল। দাউদের কান শব্দ ধরার জন্য অধীর হয়ে উঠল।

"কিছু করবে না।" জয়নুদ্দী বললেন, "ক্যাবল নিজির কোলে ঝোল টানবে।"

ঠুং। একটা আওয়াজ পেল দাউদ পাশের ঘরে।

"আমাগেরউ অ্যাখন তাই করতি হবে।" মৌলভী বললেন, "হিন্দুগের মতোন নিজির কোলে ঝোল টানতি হবে। কোয়ালিফিকেশন মুটামুটি অ্যাকটা থাকলিই হলো, দেখতি হবে সে মুছলমান কিনা, সেইডেই তার বড় কোয়ালিফিকেশন। ব্যস, তার পরে দ্যাও তারে ঢুকোয়ে। চাকরি বাকরির অন্তত অ্যাদ্দেক এইভাবে মুছলমান দিয়ে ভরে দিতি পারলি, তবে বাংলার মুছলমান বাঁচবে। বুঝিছ?"

"জে।" দাউদ সমর্থন করল।

"কিন্তু এই সুজা কথাডা", মৌলভী বললেন, "খোন্দকার মিয়ার মতোন লীডার বোঝেন না ক্যান?"

"জে, আজকাল বোধ হয় একটু একটু বুঝতিছেন।"

"ক্যান্ কও দিনি?"

"জে?"

মৌলভী বললেন, "এই যে তুমি কলে খোন্দকার আজকাল এট্টু এট্টু য্যান বুঝতিছেন, ক্যান্ তা কতি পারো?"

"ইলেকশান। ইলেকশন আসতিছে তো। অ্যাখন ম্যাথরা, খোন্দকার ছাহেবের হাত খুব দরাজ হবে।"

"খাজান", বাবু এসে বলল, "দাউদ ভাইরি নিয়ে খাতি আসেন।"

"তাই তো তাই তো", মৌলভী ছাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "দ্যাখোদিন, কত বাদ্দো হয়ে গ্যালো। চলো বাপ চলো।"

পাশের ঘরেই দস্তরখান বিছিয়ে চৌকির উপর খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনটে মাত্র পদ। গোরু, আন্ডা আর মুশুরির ডাল। বড় বড় বাটিতে সব সাজানো। পরিবেশনের জন্য হাজির শুধু বাবু আর জামিলা। দাউদের উৎসাহ বেশ খানিকটা নিবে এল। সে দরজার দিকে চাইল। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু উঠোন দেখা যাচ্ছে।

বাবু বলল, "বাইরি পানি আছে দাউদ ভাই। হাত মুখ যদি ধোন—"

দাউদ বাইরে গিয়ে ভিতরের উঠোনটা দেখতে পেল। কিন্তু একেবারে জনশূন্য। শুধু একটা পাতি হাঁস একটি হাঁসীকে উঠোনময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর হাঁস দুটো পরিত্রাহি প্যাঁক প্যাঁক ডাক ছাড়ছে।

বাবু পানি ঢেলে দিতে গেল। দাউদ বদনাটা কেড়ে নিল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে ফেলল।

"তাড়াহুড়োয় তামন কিছু আর করা গ্যাল না।" মৌলভী কৈফিয়ত দিলেন।

দাউদ বলল, "আর বাকি থাকল কী?"

বাবু বলে ফেলল, "ক্যান, মাছ।"

দাউদ হেসে ফেলল, "ধরিছে কটে বাবু মিয়া। আমি নিকিরির ছাওয়াল, নিজি মাছের কারবারও করিছি। তবু দ্যাখ কথাডা আমার মাথায় ঢোকেনি। তাহলি বুঝে দ্যাখ, তুমার মাথায় আক্কেল কত ছাফ!"

মৌলভী বললেন, "ইশকুলিউ তো সবাই কয়, ওর বুদ্ধি খুব ছাফ্। কিন্তু করবে কী বড় হয়ে? আমি তাই ভাবি।"

দাউদ বাবুর লজ্জায় লাল হওয়া মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল। একেবারে সইফুল!

বলল, "মৌলভী ছাহেব, বাবু মিয়া অ্যাখনও বেশ ছোট। না হলি আমিই ওর হিল্লে ক'রে দিতি পারতাম। আপনি বাবুর জন্যি ভাববেন না। ইশকুলির পাশটা ওরে করি দ্যান, আমি ওর অ্যাকটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমি যদি ক'রে খাতি পারি, ইনশাল্লা, বাবু মিয়াও তালি ক'রে খাতি পারবে।"

মৌলভী জয়নুদ্দী ফ্যালফ্যাল করে দাউদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ। ও'র চোখ ফেটে জল এ'সে পড়ল। অতি কষ্টে তা চেপে রেখে নিজেকে সামলে নিলেন।

বললেন, "এই অ্যাকজন মুছলমান দ্যাখলাম এতদিনি যে খাঁটি মুছলমানের মতোন কথা কলো। তুমার উপর বাপ আল্লার হাজার নেয়ামত পড়ুক। তুমি আজ আমারে যা শান্তি দিলে তা আমার বড় পিটা মইনুদ্দীও দিতি পারেনি। তুমি বাঁচে থাকো, তুমি ইমানের পথে থাকো। আল্লাহ তুমারে আরাম তুমারে—ও কি ও কি বাপ অ্যাখনই হাত গুটোয়ে নেলে কী। কিছুই তো খালে না। এই তো খাওয়ার বয়েস। আজ সকালে হুট করে আলে নাস্তাডাও ভালো করে খাওয়াতি পারলাম না। তুমি হুট করে চলে গেলে। যতই ব্যালা বাড়তি থাকলো ততই দেলটা কুক্ কুক্ কত্তি লাগলো। মনে মনে ভাবি ছবি বিবির ভাই হুট করে আলো হুট করে চলেও গ্যালো, ভালো করে খাতিরযত্ন করা হ'লো না। নাঃ, ইডা তো ঠিক নয়। বাবুর মারে কথাডা কলাম। তা তিনি আমারে কলেন, আমার নাকি ভীমরতি ধরিছে।

দ্যুপুরে তুমারে খাতি না কওয়াটা, কামডা ঠিক হয়নি। আমি ছুটলাম তুমারে খুঁজে বার করতি। জামিলে ইনকুল ছুটি ছিল।"

দাউদ ভাবছিল সইফুলকে কি একবারও দেখা হবে না! এ'রা কি খুব পর্দা মানেন? তাই যদি হবে তাহলে অত সকালে সইফুলকে ফটিক ভাই-এর বাড়িতি অমন বেপর্দা দেখা গ্যালো ক্যান?

মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "জামিল, বিটি! তোর দাউদ ভাইরি আন্ডা দে।"

দাউদ "না না" বলে আপত্তি জানাল।

জয়নুদ্দী বললেন, "ক্যান, খাতি কি খারাপ হইছে?"

দাউদ বলল, "জে না। খাতি খুব ভালো হইছে। বাড়ি ছাড়ে আসে ওব্দি আমন খানা খাইনি।"

"তা'লি আর না না ক্যান।" মৌলভী বললেন, "উডা তুমার বাড়িই। যখন খুশি আসবা। যা থাকবে খায়ে যাবা। এই তো খাওয়ার বয়েস। এই বয়েসে লুহা খালিউ মানুষ হজম করে ফ্যালে। আর এতো গুটা কতক আন্ডা। দে জামিল। চুপচাপ দাঁড়ায়ে আছিস ক্যান বিটি। তোর দাউদ ভাইরি দে, আন্ডা তুলে দে।"

প্রচুর ভোজনের পর দাউদ মিয়া ইচ্ছে থাকলেও মৌলভী জয়নুদ্দী ছাহেবের বাড়ি থেকে তক্ষুনি উঠে যেতে পারল না। একটু বিশ্রাম নিতেই হল। বাবু একটা তশতরীতে করে সাজা পান এনে দিল। ছোট ছোট খিলি। দাউদ একটা খিলি হাতে নিয়ে দেখতে লাগল।

মৌলভী ছাহেব ,"আমি এটটু পরে আসতিছি তুমি ততক্ষণে পানটান খাও" বলে উঠে গেলেন।

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "অ্যাত সুন্দর পান সাজল কিডা?"

বাবু বলল, "বুবু সাজিছে।"

দাউদ খুবই উৎসাহিত হয়ে গোটা তিনেক খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। সত্যিই সইফুল পান সাজে ভালো।

দাউদ বলল, "বাবু মিয়া, তুমার বুবুরি কইও, দাউদ ভাইর এই পান খুব ভালো লাগিছে।"

সত্যিই পানগুলো দাউদের ভালো লাগছিল। এই পানটুকুই যে আজ সইফুল আর দাউদের মধ্যে যোগসূত্র, শুধু এই কারণেই নয়, পানগুলোও ভালো। সইফুলের সঙ্গে একবারও দেখা না হবার জন্য দাউদের মনে যে ক্ষোভ এবং যে অভিমান এ বাড়িতে আসা অবধি জমে উঠছিল, এই পানের রস যেন সেগুলোকে সিক্ত করে দিল। দাউদ ভাবল সইফুল তাকে খারিজ করে দেয়নি।

বাবু দাউদের মুখে ওর বড় বুবুর প্রশংসা শুনে খুব খুশী হ'ল। বলল, "দাউদ ভাই, পান আর আনব? খাবেন?"

দাউদ বলল, "থাক, থাক। তুমার বুবুর পান যদি ফুরোয়ে গিয়ে থাকে।"

বাবু বলল, "আপনি খাবেন শুনলি ও খুশি হয়ে বানায়ে দেবে।"

বাবুর কথা শুনে দাউদ খুশী হয়ে বলল, "তা'লি আনতি পারো।"

বাবু ভিতরে চলে গেল। দাউদ একা ঘরে বসে সইফুলের কথা ভাবতে লাগল। সে পান খেতে চাইলে সইফুল খুশী হয়ে বানায়ে দেবে! এটা কি বাবুর কথা? না সইফুলের কথা? বাবুর কথা বলে দাউদের মনে হল না। এ নিশ্চয় সইফুলের কথা। সে এতক্ষণ বৃথাই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। দাউদ ভেবে দেখল সইফুল যা করেছে তাদের সমাজের মেয়ের পক্ষে এইটেই তো স্বাভাবিক। সকালে সে ফটিকের বাড়ির দরজার কড়া নেড়েছিল। সইফুল দরজা খুলে একজন বেগানা পুরুষকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাভাবিক কাজ। তারপর তার বাজানকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ক... তাকে তো উপেক্ষা করেনি? একটা ভালো মেয়ের পক্ষে যা করা দরকার তাই করেছে। সে কেন আশা করেছিল সইফুল উল্টোটা করবে? এর কোনও ভালো উত্তর দাউদ দিতে পারল না এখন। সে কেন আশা করেছিল সইফুলের মত ভালো ঘরের একটা বয়স্থা মেয়ে জানালা খুলে তার মুখখানা দেখিয়ে দাউদকে ধন্য করবে? সে... যা ফাঁক ফোকর দিয়ে এত চাইছিল কেন? আসলে সইফুল দাউদের একটা অহংকারে ঘা দিয়েছে। মেয়েমানুষ মাত্রেই তার আকর্ষণে পতঙ্গের মত ছুটে আসে, এমন একটা অহংকার তার বিভিন্ন মোকামের অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এমন কি... খোন্দকারের বড় মেয়ে জিনাত বেগম, সত্যিই যে আজ তার এই উন্নতির মূল, সেও তার এই আকর্ষণ শক্তিতে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রথমবার সে কোনও রকম প্রশ্রয় আকার ইঙ্গিতেও তাকে দে...নি। মতি মিয়ার এক বিবিও তার প্রতি ঝুঁকেছিল। দাউদ আল্লার রহমতে আর কোনও ফাঁদে পা দেয়নি। আর দেয়নি বলেই হয়ত আল্লার দয়ায় সে সইফুলের মত মেয়ের সন্ধান পেয়েছে। ফুটকির সঙ্গে সইফুলের এক জায়গায় মিল লক্ষ করেছে দাউদ। তার চেহারা এ দুজনের একজনকেও ভজাতে পারেনি। সে-সব দৃষ্টি চেনে দাউদ। মোকামে মোকামে যারা ওর কাছে ধরা দিয়েছে তাদের চোখে প্রথমবারেই সেই দৃষ্টি ঝিলিক মেরে গিয়েছে। কালোজিরের চোখে সে ঝিলিক দেখেছে। দেখেছে খোন্দকার ছাহেবের বড় মেয়ে জিনাতের চোখে, দেখেছে মতি মিয়ার সেজ বিবি শাকিনার চোখে। আগের দিন হলে চরম বোকামী করে ফেলত দাউদ। আল্লাহ্ এখনও তাকে সামলে রেখেছে। তবুও শয়তান লোভ দেখাতে কসুর করে না। খোন্দকারের বড় মেয়েকে ভাগ্যিস সে আমল দেয়নি। তার সঙ্গে দাউদের সম্পর্ক এখন খুবই ভাল। কিন্তু মতি মিয়ার সেজ বিবি শাকিনাকে ফিরিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়নি। তাকে খুব ভয় করে দাউদ। তার ছায়া আর মাড়ায় না। আল্লাহ্ তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলছেন সে বুঝতে পারছে, কিন্তু শরীরের ডাককে বাগ মানানো যে কত কষ্ট তা আল্লাই জানেন। যাক, আল্লাহ্ সহায় ছিলেন বলেই সে সেই পরীক্ষায় কোনও রকমে পাশ করে যায় এবং তার এই প্রথম বিশ্বাস জন্মায় যে সে শয়তানকে তার ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে।

আর দ্যাখ, তারই হাতে হাতে ফল সইফুল। সে নিজেকেই শোনালো।

বাবু পান নিয়ে এল। বলল, "এই ন্যান আপনার পান দাউদ ভাই।"

দাউদ বলল, "তুমার বুবুরি মিছিমিছি কষ্ট দিলাম তো!"

বাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "ও কিছু মনে করেনি।"

তারপর উসখুস করে বাবু মোলায়েম ভাবে বলল "দাউদ ভাই আপনারে অ্যাকটা কথা কব?"

"তোমার বুবু বুঝি কতি ক'য়েছে? দাউদ মনে মনে বাবুকে জেরা করল। সে বেশ উৎফুল্ল।

"কওনা?" দাউদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

"বাজানরে যেন ক'য়ে দেবেন না?"

কী সইফুল দেখা করতে চেয়েছে?

"তমার আমার মধ্যি কথা," দাউদ আল্লার রহমতের কথাই চিন্তা করছিল। এত শীঘ্র তার খায়েশ মিটতে পারে তা সে আশাই করেনি, "আর কাউরি তা কতি যাবই বা ক্যান?"

বাবু তবু ইতস্তত করতে লাগল। এবং তার মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

কী এমন কথা সইফুল বলে পাঠিয়েছে, দাউদ ভাবল, যা বলতে বাবু ইতস্তত করছে? দাউদের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল।

"আরে কওনা বাবু মিয়া, আমি তো ঘরের লোক, আমার কাছে লজ্জা কী?"

"না, এই কতিছিলাম কি, আপনার সাইকেলডায় এট্টু চড়ব ?"

এই কথা! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস দাউদের বুক চিরে বেরিয়ে গেল! আসলে দাউদ সইফুদের কাছ থেকে বড় বেশী আশা করছে। কেন, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

দাউদ চুপ করে আছে দেখে বাবু মিয়ার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

তাই দেখে দাউদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আজ না। আজ একটু তাড়া আছে বাবু মিয়া। এর পর যেদিন আসব, হাতে এট্টু সময় নিয়ে আসব। সেইদিন তুমি সাইকেলডা নিয়ে এক পাক ঘুরে আসো। ক্যামন ?"

বাবু মিয়া খুশী হল। বলল, "জে।"

"দ্যাখদিন তুমার বাজান কনে গ্যালেন ?" দাউদ বলল। "ইবার যে উঠতি হয়।"

বাবু গিয়ে মৌলভী ছাহেবকে ডেকে নিয়ে এল।

দাউদ বলল, "ইবারে যাতি হবে। কাজ পড়ে আছে অনেক। আপনাগের দোয়ায় .শৈলকুপা, ঝিনেদা আর মাগরোর দিক খানিকটা রাস্তা মেরামতির কাজ পাওয়া গেছে। ডিস্ট্রিক্ট বোরডের রাস্তা। মেরামতির কাজ। খোন্দকার ছাহেব আজ ডাকে আমারে কলেন। অ্যাখন বোর্ড্ অফিস যাবো। অরডার বের করায়ে নিতি হবে। যদি আজ অরডার বের করায়ে নিতি পারি তবে কাল এস-ও বাবুরি নিয়ে ছাইট্ দেখতি যাবো। ফিরতি কদিন দেরী হবে। আমি ভাবতিছি, এই সময় মনু মিয়া থাকলি আমার কত উপ্গারই না হ'তো। আমি মুছলমান ছাড়া পারতপক্ষে কাউরি কাজে লাগাতি চাইনে।"

মৌলভী ছাহেব বললেন, "এই তো হ'লো মুছলমানের মত কাজ। আল্লাহ্ তুমার রেজেক বাড়ায়ে দেন।"

দাউদ বলল, "বাবু মিয়া আরউ কয়েক বছরের বড় হলি আমার ঠিকেদারী কাজে লাগায়ে দিতি পারতাম। কিন্তু এখন বয়েস অল্প। বরং ও যাতে ওস্তারপীরারি পাশ হয়ে বেরোতি পারে, আমরা তার চিষ্টা অ্যাখন দেখি। আর বড় জোর চা'র বছর।"

মৌলভী ছা:হবের চোখ আবেগে ছলছল ক'রে উঠল।

বললেন, "যে কথা কাউরি কইনি আজ তুমারে তাই কই। অ্যাকার রোজগারে আর সংসার চলতিছে না। মেয়ের শাদীউ দিতি পারিনি। বড় ছাওয়াল দেবে ভবিষ্যতে যদি কিছু পাঠালো তো পাঠালো। তার উপর আর ভরসা করিনে। দিনার দায়ে অ্যাকখান বাড়ি বাঁধা পড়িছে। ক্যান্ যে আরবী ফারসী পড়াতি গিছিলাম! শোনো বাপ্, বাবুর বয়েস নিতান্ত কম না। তা চোদ্দ তো হ'লোই। ওরে যদি কোনও কাজে অ্যাখন নিয়ে নিতি পারো তো নিয়ে ন্যাও। পরে না হয় পিরাইভেটে ওরে ম্যাট্রিক পাশ করায়ে নেবো। এ ম্যান্ মনে ক'রে না বাপ্ যে এইসব কথা কবো বলেই তুমারে খাতি কইছি। তুমি ছবি বিটির ভাই সকালে আ'লে, কিছু তুমারে খাওয়াতি পারা গেল না, কেবলডা ফুক্ফুক্ কত্তিছিলো। তাই তুমারে দাওয়াত করিছিলাম। কথাডা তুমিই—"

দাউদ বিব্রত হয়ে বলল, "জে, এরকম কথা কলি আর এ-বাড়িতি আ'সি কী করে? আমি আপনার এখেনে আ'সে নিজির অ্যাকটা বাড়ি পালাম, ইডা তো আমারই লাভ।"

"বাস্, তবে আর কথা কী?" মৌলভী ছাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এই হ'লো মুছলমানের মত কথা। তা'লি শোনো, রছুলে-করিম হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আছ্ছালাম্ তো মক্কা ছা'ড়ে আ'সে মদীনায় চলে আ'লেন। সেখেনেই থাকতি লাগলেন। প্রিয় নবীর সঙ্গে তাঁর অনুগত শিষ্যরাও মক্কা ছা'ড়ে মোহাজের হ'য়ে মদিনায় আ'লেন। মদিনার আনছাররা তাঁদের আশ্রয় দেলেন এবং যথাসাধ্য সেবা সাহায্য দিতি লাগলেন। মক্কাবাসী মোহাজের আর মদিনাবাসী আনছাররা ভালোবাসার যে আদর্শ স্থাপন করিছেলেন তার তুলনা আর দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও হজরত রছুলুল্লাহ্ দ্যাখলেন যে আপন করে নিয়ার অ্যাত চিষ্টার মধ্যিও তুলনা যায়নো অ্যাকটা সরু সুতোর মত ফাঁক থাকে যাচ্ছে। আনছারগের সেবাযত্নের মধ্যি থাকে অ্যাকটা সুজনতা, পাছে ত্রুটি ঘটে এই ভাবে সদাসর্বদা আনছাররা কাটা হয়ে থাকেন। আবার মোহাজেরগের ভালাও সেবা নিয়ার মধ্যি থাকে সংকোচের ভাব। কিডা কিছুতিই কাটাতি চায় না। তাই আল্লাহ্'র প্রিয় রছুল অ্যাকদিন মুহম্মানী আর অতিথ্যের ভেদ দূর করার জন্যি সবাইরি ডাকে কলেন, শোনো মদিনাবাসী আনছারগণ, শোনো মক্কাবাসী মোহাজেরগণ! ইছলামের আদর্শ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মুছলমান, প্রত্যেক মুছলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে তুমরা প্রেত্যেকে জুড়ায় জুড়ায় ভাই বনে যাও। প্রেত্যেকেই অন্যাগের মধ্যির যে অ্যাকজনরে ভাই হিসেবে বা'ছে ন্যাও। এইভাবে আনছার আর মোহাজেরগের ভেদ ঘুচে গ্যা'লো। ধর্মভাইরা অ্যা'ক অন্যরে বিষয় সম্পত্তি রোজগারের হিস্যা দিতি লাগল। সা'দ ইব্নে রাবী তো তার দুই বিবির অ্যাক বিবিরি তালাক দিয়ে তাঁর ধর্মভাই সা'দে আবদুর রহমানের সঙ্গে শাদী দিয়ে ভাই-এর প্রতি অগাধ ভা'লোবাসার শক্ত প্রমাণ রা'খে গেছেন। এয়ে কয় মুছলমান! এই হ'ল গে বাপ্ মুছলমানের সাচ্চা আদর্শ! আর আ'জ দ্যাখো? মুখে মুছলমান মুছলমান কলিই কি মুছলমান হওয়া যায়? মুছলমান হতি গেলি ইয়া দরাজ দেল লাগে। তুমার দেল দরাজ আছে বাপ। তুমি একজন সাচ্চা মুছলমান! আল্লাহ্ তুমার হেফাজত করুন।"

দাউদ আর কিছু বলল না। সালাম জানিয়ে সাইকেলে উঠল। তারপর বাড়িটার দি:ক একবার চকিতে চাইতেই দেখল জানলার ফাঁকে দুটো চোখ আর একখানা মুখের অস্পষ্ট আদল। দাউদের বুকের রক্ত তড়াক তড়াক ক'রে লাফাতে লাগল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড্ অফিসে পৌঁছুতেই এস্-ও হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

"আরে মিয়া অ্যাতক্ষণ ছিলে কনে?" কুণ্ডুবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন।

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "ক্যান্, কী ব্যাপার?"

কুণ্ডুবাবু বললেন, "কী ব্যাপার মানে? এই কুণ্ডু না থাকলি আজ তুমার কাজের দফা গয়া হয়ে গিইছিল। ভাইস্ চেয়ারম্যান সাহেবের মত মুরুব্বি পায়েও কাজ ধরতি পারতে না, যদি এই কুণ্ডু না থা'কতো। সাহার পো ঘ্যান্ হাওয়ায় খবর পায়। আসেই অ্যাকেবারে খোদ বড়বাবুরি ধরে পড়িছে। দুটো খাওয়াবার লোভ দ্যাখাইছে। তুমার ভাগির দিন যে বড়বাবু সাহেবের ঘরে ঢুকার আগে আমারে ডাকাইছিলেন। আসলে সাহার কাছ থে কত খাওয়া যাতি পারে তার অ্যাকটা আন্দাজ জানতি চাতিছিলো। আমি বড় বাবুরি বুঝোয়ে কলাম, এর মধ্যি নাক গলাবেন না। বড় গাছে দড়া বাঁধাবাঁধির ব্যাপার এর মধ্যি আছে। খোন্দকার সাহেব কাজটা তাড়াতাড়ি করায়ে দিতি চান। তাই নতুন ভালো আর ছোট কারুরি দিয়ে কাজটা তুলাতি চান। সাহা কোম্পানী বড় ঠিকেদার। বোরডের কাজ নিয়ার সময় চাড় দ্যাখায়, কিন্তু কাজ তুলার ব্যাপারে আর ত্যামন চাড় থাকে না। আমরাও অত বড় অ্যাকজন ঠিকেদারের সঙ্গে আ'টে উঠতি পারিনে। এই সব কথা ভা'বেই চেয়ারম্যান আর ভাইস্ চেয়ারম্যান ঠিক করিছেন, যে ঠিকেদার অ্যাকেবারে বোরডের বশে থাকবে, তারেই এই কাজ দিয়া হবে। আমার মনে হয় উনারা বোধহয় লোক ঠিকউ ক'রে ফেলিছেন। বড়বাবু এতে দমে গেলেন। কলেন, অ্যাঁ লোকউ ঠিক করে ফেলিছেন? আপনি জানেন? ঠিক জানেন? আমি কলাম, সাহার লোকটারে কাজ আসতি কন না? আমিউ ছা-পুষা মানুষ, আপনিউ ছা-পুষা মানুষ। এই বয়সে একটা ফ্যাসাদে জড়ায়ে পড়লি শেষে হাতে হেরিকেন নিয়ে না ঘুরে বেড়াতি হয়। দিনকাল সুবিধের না, বোঝলেন। এই করে তো সাহার লোকরি পরপাঠ আজকের মত বিদায় করা হইছে। অ্যাখন আপনি যান, খোন্দকার সাহেবের কাছে যায়ে আজই

এর আ্যাকটা এমন বিহিত করে আসেন যে আপনার রাস্তা কাজের অরডারটা বেরোয় যায়। দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রং।"

কুন্তুবাবুর কথা শুনে দাউদ প্রাণপণে সাইকেলে ছুটল খোন্দকারের সন্ধানে।

কাজটা খোন্দকারের কথা শুনে যত সহজে পাবে ভেবেছিল দাউদ, শেষ পর্যন্ত তত সহজে পেল না। শেষ বেলায় কিন্তুর ঝামেলা হয়ে গেল। কিন্তুর ছুটাছুটি করে প্রায় হাত ফস্কে যাওয়া কাজটার অরডার বের ক'রে আনতে সমর্থ হ'ল দাউদ। কিন্তু তখন তার গলদঘর্ম অবস্থা। সে বাড়ি ফিরেই গোছলের পানি দিতে বলল। সঙ্গে স'ঙ্গে তাহের মিয়া আর তার বড় ভাই গাজী গোলাম এসে হাজির।

ছালাম বিনিময় করার পরই গাজী গোলাম সরাসরি দাউদকে আক্রমণ করল, "মতি মিয়ার সাথে বেইমানি করা কি আপনার উচিত কাজ হ'লো?"

দাউদের কান মুখ গরম হয়ে উঠল। কিন্তু সামলে নিল। গাজী গোলাম যশোরের নাম-করা ঠ্যাঙ্গাড়ে। মুছলিম লীগের অ্যাকজন পান্ডা। গাজী গোলামকে হাতে রাখবে বলেই সে তার ভাই তাহের মিয়াকে কাজে নিয়েছে। তাহের গাজী গোলামের একেবারে বিপরীত চরিত্র। ভদ্র, লেখাপড়া জানে এবং ঠিকাদারীর কাজে বেশ পোক্ত।

দাউদ বলল, "ভাইর কথার মানেডা বুঝতি পারলাম না। যাক আপনারা আমার নিজির লোক। মানেডা বুঝে নিতি সুমায় লাগবে না। অ্যাখন একটু সুস্থির হয়ে মেহেরবানী করে ব'সেন। আমি আসতিছি।"

দাউদ হাঁক দিল, "কাতলা!"

কাতলা হাজির হল। "জে!"

"চটপট একটু নাস্তা বানা। আর চা পানি বসা।"

দাউদ ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তারপর এক পাঁজা খাতা এনে তাহের মিয়াকে দিল। "বলল, "তাহের ভাই, দ্যাখেন তো আমাগের হিসেব পত্তরের খাতা এই তো সব? না আরও আছে?"

তাহের মিয়া খাতা পত্তর দেখে বললেন, "না এই সব।"

"ভালি ভাই আপনি গুলাম ভাইরি দ্যাখায়ে দ্যান তো, এ পর্যন্ত আমরা যে-সব কাম তুলিছি তার জন্যি মতি মিয়া কত টাকা আমাগের কাজের থে তুলে নেছেন আর তিনি করিছেন কী? গুলাম ভাই, আপনি তাহের মিয়ার বড় ভাই, আপনারে আমিও বড় ভাই ব'লে মানি। আপনি ততক্ষণ হিসেবডা বুঝতি থাকেন, আমি গোছলডা সা'রে আসি। আ'সে আপনার কথাডার জবাব দিতিছি।"

দাউদ ভিতরে গিয়ে বেশ ক'রে গোছল করল। শরীরডা বেশ ঠান্ডা হতেই ভাবল আল্লাহ্ আমারে বেশ বাজায়ে নেছেন। এক সকালেই সইফুলির সংগে দ্যাখা করায়ে দেলেন, নতুন কাজ দিয়ে রেজেক বাড়ায়ে দেলেন আবার মতি মিয়ার মত অ্যাকটা বড় দুষমনও জুটোয়ে দেলেন। মতি মিয়া দুষমন হলিও সে আমার ক্ষতি তামন করতি পারবে না। ক্যান্‌না তার মুরুব্বি অ্যাখন আমার সহায়। গাজী গুলাম নারাজ হলিই চিন্তার কথা। গাজী গুলামরি হাতে রাখার চিন্তা তারে করতিই হবে।

দাউদ চুল আঁচড়িয়ে ধোপদুরস্ত লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বাইরে এল। দেখল তাহের মিয়া খাতা সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছে।

দাউদ বলল, "গুলাম ভাই, কী বোঝলেন?"

গাজী গুলাম বলল, "মিটা দোহি অ্যাকেবারে দুষে খাইছে।"

তাহের বলল, "লীগির চাঁদার জন্যি কোম্পানীর কাছ তিন খেপে আড়াই শ' টাকা নেছে।"

গাজী গুলাম বলল, "অ্যাকটা আযলাও ঠাহরালি। আর আমারে সম্পূর্ণ উলটো কথা কলো। কলো যে আপনি খান বাহাদুরির কানে ওর বিরুদ্ধি যা তা করে কোম্পানীর থে ওরে হটারে দেছেন।"

তাহের বলল, "ভাই উনি ব্যামন করে দুধাতি শুরু করিছেলেন, কোম্পানীর লাটে উঠতি আর দেরী হ'ত না।"

"তাছাড়া আমি উনারে সরাইছি," দাউদ বলল, "এ কথাডাও ঠিক না। খান বাহাদুর আজ আমারে ডাকায়ে নিয়ে যায়ে কলেন, বোরডের কিছু কাজ বেরোইছে, খুব তাড়াতাড়ি সে কাজ উঠোয়ে দিতি হবে। আমরা যদি ঠিক সুমায় সে কাজ তুলে দিতি পারি তবে সে কাজডা আমাগের উনি দিয়ায়ে দেবেন। কথায় কথায় সুবিধে অসুবিধের কথা উঠল। তখন আমি কলাম, আমাগের হাতে পি ডবলিও ডিরও অ্যাকটা কাজ আছে। তখন আমি কলাম, আপনি হয় বোরডের এই কাজডা সম্পূর্ণ আমার নিজির মতোন করে করতি দ্যান, মতি মিয়া পি ডবলিউ ডির কাজটা ওর নিজির মতোন ক'রে করুন, আর না হয় উনি বোরডের কাজডা করেন আর আমি পি ডবলিউ ডির কাজডা করি। যার যার লাভ লুকসান তার তার। তা গুলাম ভাই, ইডা বেঈমানের মতোন কাজ হলো?"

"না না। ইডা তো সাফ সাফ কথা।" গাজী গুলাম বেশ জোর দিয়ে বলল।

দাউদ বলল, "তখন খান বাহাদুর নিজিই কলেন, বুঝতি পারলাম। মতিরি দিয়ে ঠিকেদারী হবে না। ওর জন্যি অন্য কোনও ব্যবস্থা করব। ঠিকেদারী তুমি অ্যাকাই করো। ওরে আমি সরায়ে নিচ্ছি।"

"আসল এইতি মতি মিয়ার দেলে খুব চোট লাগিছে।" গাজী গুলাম বলল।

"তা লাগুক ভাই," তাহের বলল, "টাকার দরকার পড়লি মিয়ার আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। অ্যাকবার লেবার পেমেনটের টাকার থে থাকল মা'রে টাকা নিয়ে চ'লে গ্যালেন। কন্ তো ভাই, অামন করলি ঠিকেদারীর ব্যবসা করা যায়?"

কাতলা নাস্তা আর চা-পানি দিয়ে গেল। ওরা খেতে লাগল।

গাজী গোলাম বলল, "খোন্দকার ছাব ইলেকশনে দাঁড়াতিছেন, জানেন তো?"

দাউদ বলল, "শুনিছি।"

গাজী গোলাম বলল, "আপনাগের ওদিকির থেই তো দাঁড়াবেন। এদিকির থে ছৈয়দ ছাহেব দাঁড়াবেন। উনার সঙ্গে আটে উঠা শক্ত। তা আমরা মদত দিয়ে উনারে উতরোয়ে দিতি পারব। কী কন্?"

দাউদ সরলভাবে বলল, "উনি আমার মুরুব্বি, উনি জেতেন তাই আমি চাই। তবে ইলেকশনে হারা জিতা যে কী করে হয় আমার সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই।"

গাজী গুলাম হাসল। বলল, "ইবার জ্ঞান তালি হবে। খান বাহাদুর আপনার উপর তো খুবই আশা রাখেন।"

দাউদ বলল, "উনি আমারে কইছেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রাস্তার কাজ শেষ করে দিতি হবে।"

"দিতি পারবেন না?"

"দাউদ বলল, কুন্তুবাবুর মুখি যা শুনিছি কাজ যদি সেই রকমই হয় তবে মনে হয় উঠোয়ে দিতি পারব।"

"উঠোয়ে দিতিই হবে।" গাজী গুলাম বলল, "ক্যান্‌না ঐটেই হবে খোন্দকার ছাহেবের তুরুপির তাস। উনি কয়েছেন অ্যাত বচ্ছর কেউ হাতই দ্যায়নি এই সব রাস্তার। খোন্দকার ছাহেব চিয়ারম্যান হয়েই এই অবহেলিত না কি যান্ কয়, খোন্দকার ছাহেব বক্তৃতায় দিয়ায়ই কথাডা কন, খোন্দকার ছাহেব চিয়ারম্যান হয়েই এই পেরথম সেই সব রাস্তা মেরামতের হুকুম দিয়ে দেছেন।"

দাউদ এতক্ষণে বুঝল এইসব রাস্তা মেরামতের জন্যি ক্যান্ অ্যাত তাড়া দিতিছেলেন। কিন্তু গাজী গুলাম খোন্দকার ছাহেবরি চিয়ারম্যান চিয়ারম্যান কচ্ছে ক্যান্। চিয়ারম্যান তো বদিনাথ সরকার। আজই তো খোন্দকারের চিঠির উপর বোরডের চিয়ারম্যান বদিনাথ সরকারের সুপারিশ লিখিয়ে নিয়ে বোরড আফিসে যায়ে কাজের অরডার বের করে আনিছে।

দাউদ বলল, "চেয়ারম্যান তো বদিনাথ সরকার।"

গাজী গুলাম হা হা করে হাসেন।

বলল, "সে তো কাল পর্যন্ত আছে। পরশু বোরডের মিটিং। বোসে উল্টোয়ে যাবে। বোরডে ইবার হিন্দুগের শাসন শেষ। অ্যাখন খোন্দকাররেই চিয়ারম্যান করা হবে। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে।"

দাউদ বিস্মিত হল। কিন্তু এতে সে বিচলিত হল না। যা হয় হোক, বোসেই চিয়ারম্যান থাক আর খোন্দকারই চিয়ারম্যান থাক, তার কী, তার ঠিকেদারী বজায় থাকলেই হল। না না, এ কী বলছে সে? বোসে সরকার চিয়ারম্যান থাকলি তার কী সুবিধে? কিছু না। খোন্দকার মুছলমান, তিনি মুরুব্বি, তিনি চিয়ারম্যান হলি মুছলমানের নিশ্চয়ই সুবিধে।

আজ শুধু ভালো খবরের দিন। রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না। দাউদের মাথায় নানা ভাবনা এসে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ছ' মাস আগের দাউদ আর আজকের দাউদ? দাউদের নিজেরই চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। খোন্দকারের মতোন অত বড় অ্যাকজন সম্মানী মানুষ তার উপর বিশ্বাস করে তাঁর নিজের ভাগ্য সঁপে দিয়েছেন। মৌলভী জয়নুদ্দী, কী সরল আর কী উদার, তাকে সাচ্চা মুছলমান বলে অভিহিত করেছেন। তাকে পুত্রস্নেহে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। সইফুল কি তাকে ফিরিয়ে দেবে?

মৌলভী জয়নুদ্দীর যা বর্তমান অবস্থা তাতে দাউদ যদি সইফুলের সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করতে চায়, সে জানে জয়নুদ্দী হাতে আকাশের চাঁদ পাবেন? কিন্তু সইফুল? সে যদি এই প্রস্তাব খারিজ করে? কিম্বা বাপ মায়ের পীড়াপীড়িতে যদি অনিচ্ছায় সম্মতি দেয়? সে তো আরও খারাপ। কুটীক তাকে খুব চোট দিয়ে গিয়েছে। সইফুল তাকে চোট দিতে পারে, এমন কোনও কাজ করার বাসনা তার আর নেই। এরা সব নেককারিণী মেয়ে, এদের সঙ্গে যে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় দাউদের তা ভালো জানা নেই। এই জন্যই কুটীক অযথাভাবে নিজেকে নষ্ট করে দিল। দাউদ যেন এখন স্পষ্ট দুটো দাউদ। পুরনো দাউদের খোলসটা থেকে নতুন আরেকটা দাউদ বেরিয়ে আসছে। যে তার অতীতকে মুছে ফেলতে চায়। যে শুধু বর্তমানের ভিত্তির উপরেই তার ভবিষ্যতের সুখের মনজিল গড়ে তুলতে চায়।

ভুল যদি সে কিছু করে থাকে, অন্যায় করে থাকে তবে সে তার জন্য তওবা করছে। সে আন্তরিকভাবে মাফ চাইছে আল্লাহ্‌র কাছে। সে পিছনে আর তাকাবে না, পিছনের জীবনে আর ফিরেও যাবে না। এখন থেকে সুমুখে তাকাবে সে। কেন, সে কি বদলায় নি? নিজের দিকে তন্ন তন্ন করে চাইল। হ্যাঁ অনেকটাই বদলেছে। না কিছু কিছু বদলেছে। এখনও কোনও কোনও রাতে নিঃসঙ্গ বিছানায় রমণী সঙ্গের জন্য সে যেন পাগল হয়ে ওঠে। এ-পাশ ও-পাশ ফেরে। কখনও কামনা করে খোন্দকারের বড় মেয়েকে তার বিছানায়, কখনও বা টেনে আনতে চায় মতি মিয়ার সেজো বিবিকে। আবার শরীরের গরম কেটে গেলে সে তার এই অসংযত কামনার জন্য অনুতপ্ত হয়। তওবা করে। এবং তার দেহের ক্ষুধার অসহ্য এই যন্ত্রণার থেকে অব্যাহতি পাবার পরক্ষণেই সে লজ্জা পায়। সে শুধরাতে চায়। কিন্তু সে জানে তার একার পক্ষে শুধরানো সম্ভব নয়। তাকে ঘর বাঁধতে হবে। শাদী করতে হবে এমন মেয়ে যার কাছে দাঁড়ালে সে নিজেকে অপরাধী মনে করবে না, যে তাকে ভালোবাসবে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করবে। এমন একটা মেয়ের সন্ধানেই তার পিপাসিত মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহই মিলিয়ে দিলেন সইফুলকে।

সে সইফুলের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। সইফুলকে সুখে রাখার জন্য সে টাকা রোজগার করবে। পরিশ্রম করবে। কোনও বদখেয়ালে সে আর টাকা ওড়াবে না। দাউদের মন বেশ হালকা হয়ে উঠল।

আমি তুমারে সুখি রাখবো সইফুল। ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে কথা কয়টা বলল দাউদ।

(ক্রমশ)

এক বিন্দু উত্তাপের জন্য

অমল মুখোপাধ্যায়

একটা অসুখ হয়েছে আমার। আমার নিজের।

যদিও আপাতভাবে কোনই কারণ নেই, তবু কেমন একটা দুশ্চিন্তা, একটা দুর্ভাবনা হঠাৎ হঠাৎ বুকের গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তখন দুটো ফুসফুসের কাজ দ্রুত হয়। বুকের ভেতরটা হাল্কা ও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অনেক দিন উপবাসী থাকলে যেমন। অথবা অনেকদিন অসুস্থ থেকে ভাত পথ্য করবার আগের মুহূর্তে যেমন লাগে।

অথচ কাছে পিঠে তেমন কোন কারণ দেখি না। শরীরটা ইদানীং মোটামুটি ভালই যাচ্ছে। মধ্যচল্লিশের অনুপাতে বেশ ভালই বলবো। সকালের ব্যাপার-স্যাপার-গুলো ভালই হয়। খিদে আছে, খেয়ে হজমের অসুবিধে নেই। অবশ্য পছন্দসই জিনিসপত্র আর পাই কই। বাজার দর তো রাগী লোকের মত সব সময় চোখ লাল করে তাকিয়েই আছে। মেয়েটা বেগুন ভাজা ভালবাসে, অথচ রেপসিডে গন্ধ পায়। কত চেষ্টা করলাম, যদি কিলোখানেক খাঁটি সরষের তেল পাই। কো-অপারেটিভ নামধারী তেলকলগুলোর দরজায় ধর্না দিয়েও এক ছটাকও পাইনি। অন্যায় দাম কবুল করেও নয়। এক জায়গায়, দোকানের পেছনের দিকে, দিতে রাজি হয়েছিল। তেলের টিনটা এগিয়ে দিয়ে কি জানি কী মনে হল। দোকানের টিনের উপরকার একটু তেল আঙুল দিয়ে চেটে নিয়ে, নাকে ঠেকালাম। মুহূর্তে বমি পেল। লোকটাকে বললাম, আমি কি বেশী টাকা দিয়ে রান্নার জন্য রেড়ির তেল নিতে এসেছি?

একটু রেগে গিয়েছিলাম। ছোটবেলায় যুদ্ধের সময় গ্রামে যখন লাল কেরোসিনও পাওয়া যেত না, আমি দাদা ছোটবোন উষা—আমরা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তাম। তখন পরাধীন আমল। স্বাধীনতার জন্য চারদিকে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আমাদের ঠিক কে বা কারা বলেছিল মনে নেই—আমরা নাকি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই আলোর কিছুটা তাপ আমি দেশ ভাগের সময় শেয়ালদা ইস্টিশানে এবং পরে মেদিনীপুর জেলার শালবনির এক রিফিউজি ক্যাম্পে পেয়েছিলাম।

লোকটা আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে উঠল। বলল, যেখানে খাঁটি পান যান না। আমি কি আপনাকে পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে এসেছি?

বললাম, তাই বলে আপনি বিষ মিশিয়ে জিনিস বিক্রি করবেন, আমি কিছু বলতে পারব না? এধার ওধার আরও কয়েকজন ক্রেতা জুটে ছিল। তাদের দিকে অসহায়ভাবে তাকালাম। একটা ষণ্ডা মার্কা লোক তেলটা মেপে দিচ্ছিল। একজন বেশ ভদ্র চেহারার ক্রেতা বললেন, অত কথার কাজ কি, আপনার পছন্দ না-হয় আপনি চলে যান। বলে নিজের টিনটা এগিয়ে দিলেন। চৌদ্দ টাকা দরে দু'কিলো লোকটা মেপে দিল।

ঘরের মধ্যে পাঁচজনের সামনে আমার অপরাধ ফুলে ফেঁপে উঠলো। আত্মপক্ষ সমর্থনের করুণ চেষ্টায় আমি বললাম, বাচ্চার জন্য নিতে এসেছিলাম, সেই জন্যই বলেছি। কোনার দিক থেকে একজন বড়লোকের ঝি-মত মহিলা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে সবাইকে শুনিয়েই বললেন,—হেঁহেই ছোক আর [illegible] কোনটা খাঁটি পাচ্ছে! মনে মনে ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো। [illegible] জিনিসটা খাঁটি পাচ্ছে। সর্বত্রই ভেজাল। টিনের আড়ালে আঙুল [illegible] তুলে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। হঠাৎ বিবেকের ভেতরে একটা ধাক্কা [illegible]। অদ্ভুত একটা যুক্তিকে হজম করে, আমি পালাচ্ছি বলে আমার মনে হল। [illegible] বলল প্রতিবাদ করা উচিত। দ্বিতীয় সিঁড়িতে ডান পা পড়তেই [illegible] দাঁড়ালাম। বললাম, সংসারে কোন কিছুই যখন খাঁটি নেই, তখন [illegible] [illegible] কি শেয়াল কাঁটার তেল মেশাতে কাউকে সাহায্য করতে হবে, এমন কোন [illegible]।

ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন, ও মা, আমি আবার কখন ভেজাল মেশাতে সাহায্য করলাম? সব্বনেশে লোক তো মশাই আপনি।

রাগ চেপে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, আমি সর্বনেশে কথা বললাম না আপনি? আমাকে উপলক্ষ্য করে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে একজন বললেন, ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন। মাথাটাতো হয়তো খারাপ আছে।

বলতে বলতেই সেই ষণ্ডা মার্কা লোকটা উঠে এল। তেল চিটচিটে হাতে আমার কলার চেপে ধরলো। আমি ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাকে একটা অশ্লীল গাল দিল। আমি করুণ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হয়তো কিয়ৎক্ষণ পূর্বের অক্ষম উত্তেজনাকে করুণা করে হয়তো বা কিছুটা অনুকম্পাবশতঃ আমার বাপ মা তুলে আর একটা গালি দিয়ে সে যাত্রায় আমাকে ছেড়ে দিল।

মাত্র আর ছ'সাত বছর আগে হলে, আমি মার খেতাম। মার খাওয়ার জন্য আরো অনেক উপক্রম গড়ে তুলতাম। কিন্তু এখন আমার মার খাওয়া পরম দায়িত্ব-হীনতা হবে। এখন আমার মার খাওয়া মানে শুধুমাত্র আমার মার খাওয়া নয়, আশালতা নাম্নী ছয় বছরের পরম আবেগমুখর একটি ফুটফুটে মেয়ের বাবার মার খাওয়া। এই মেয়েটির তেজস্বিতা, আত্মসম্মান বোধ, তার পিতার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি তার অগাধ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং পৃথিবীর নিয়ম নীতি, পাপ পুণ্য, সততা অ-সততা সম্পর্কে একটি সহজ ও সরল ধারণাকে আহত করতে আমার বড় মায়া হয়। মার খাওয়ার কাল্পনিক প্রসঙ্গ, অফিসে অকারণে ধমক খাওয়া, অন্যের কাছে অপমানিত হওয়া—আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য এক অর্থ নিয়ে আসে। আমি এসব নিয়ে স্ত্রীর কাছে মুখ খুলবায় আগে সামনে পেছনে দেখে নিই। আশালতা থাকলে আর প্রসঙ্গই তুলি না। এই পৃথিবীর কোনো জায়গায় তার বাবা পরাজিত, পশ্চাৎপদ, পলায়নপর একথা সে কল্পনায়ও আনতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে পাশের সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ির একটি মেয়ে তাকে বড় আঘাত দিয়েছিল। মেয়েটি তার চেয়ে বছর চারেকের বড়। জগতের নিয়ম কানুন তার অনেক বেশী জানা। সেই জ্ঞান থেকেই সে আশালতাকে বলেছিল, তোর বাবা তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ করে, কখনোই বেশী টাকা পেতে পারে না। প্রচণ্ড প্রতি-বাদ করে মেয়ে আমার বলেছে, গরমেন্টের চেয়ে বড় দেশে কিছুই নেই। তার বাবা যখন সেই গরমেন্টের চাকরী করে, তার মানে সব চাইতে ভাল আর বড় চাকরী করে। সে নিজে চোখে দেখেছে মাসের প্রথম দিকে তার বাবা অনেকগুলি দশ

টাকার চকচকে নোট অফিস থেকে এসে মায়ের হাতে তুলে দেয়। সে অনেক টাকা। এক নিঃশ্বাসে সে বলতে পারেনি কত টাকা তার বাবা নিয়ে আসে। পাশের ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়েটি জুলি ও কে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, তোর বাবা প্রাইভেট ফার্ম বা বড় বড় ব্যাঙ্কের চাকরীর মত অত টাকা পায় না।

শুনে আশালতা চীৎকার করে বলেছে, হ্যাঁ, পায়। অনেক বেশী টাকা পায়।

বুদ্ধিমতী জুলি ওকে জিজ্ঞেস করেছে, বল না কত টাকা পায় তোর বাবা?

আশালতা খুব ভালভাবে একশ পর্যন্ত গুণতে পারে, অথচ হাজার একশ থেকে ঠিক কত বড় সে ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। সে অনেক বোঝাতে একশ শব্দটিই ব্যবহার করে এবং নিতান্ত প্রয়োজন পড়লে কোটি শব্দটিও ঐ একশর সঙ্গে জুড়ে দিতে একটুও দ্বিধা করে না। সেদিন অকপটে বলে ফেলেছে, এক হাজার, দু হাজার।

জুলি ও তার সম্প্রদায় উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে আশালতাকে কোর্ট-কাছারির ফরমানের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে হতেই পারে না। তোর বাবা হয় অনেক কম পায়, নয়তো চুরি করে। আমার মেয়ে বড় বাড়ির উঠান থেকে কাঁদতে কাঁদতে তার দেড়খানা ঘরের ভাড়া বাড়িতে ফিরে এসেছে।

আজো সে আঘাত আশালতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফুলে ফুলে কেঁদেছে। তার বাবার নামে এত বড় মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে জুলির উপর সে শত বজ্রের শাস্তি চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। অথচ যখন সে জেনেছে তার বাবা চাকুরি জীবনের শেষেও হাজার টাকায় পৌঁছুতে পারবে কিনা সন্দেহ সে সত্যও তাকে ঘুমে জাগরণে সমপরিমাণ কুরে কুরে খেয়েছে।

আসলে, সমস্ত অপরাধ আমার। বড় জোর যদি অপরাধের বোঝা লাঘবের জন্য সঙ্গী সাথী কাউকে চাই—একমাত্র পিসীমাকে পেতে পারি। যে বয়সে যে আয়ে বিয়ে হয় না, হওয়া উচিত নয়—সেই বেশী বয়স এবং কম আয়ে পিসিমার জারিজুরিতে আমি বিয়ে করেছি। এই সংসারে টিকে থাকতে গেলে যে পরিমাণ ছল চাতুরী আয়ত্তে থাকা দরকার, আমার স্ত্রী তার কিছুই জানে না। অফিসের কাজে দু' তিন দিন বাইরে থাকলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এই মেয়ে আমার বেশী বয়সের একমাত্র সন্তান।

স্বভাবতই মেয়েটি সম্পর্কে আমি একটু বিশেষ দুর্বল। দুর্বলতার প্রধান কারণ দুটি। ঠিক পুতুলের মত দেখতে একটি মেয়েকে আমি স্বপ্নেও কন্যা রূপে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম সন্তানরূপে এই দেশের প্রথা অনুযায়ী কল্পনায় যাকে সুস্বাগত জানিয়েছি—সে সব সময়ই পুত্র। সন্তান জন্মের অব্যবহিত পূর্বে যে ক'টি নাম স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে পছন্দ করেছিলাম তার চারটি পুত্রের, মাত্র একটি কন্যার। সেটিও সম্ভবত নিজেদের কাছে নিজেদের ফাঁকি ঢাকা দিতে—আকস্মিকতার জন্য প্রস্তুত থাকবার নিমিত্ত।

পিসীমার ইচ্ছা, স্ত্রীর শারীরিক লক্ষণ, সাধভক্ষণে স্ত্রী-আচারের দৈব নির্দেশ—কোনটাই যখন মিলল না, এবং কন্যা হল, আমি অবশ্যই দুঃখিত হইনি। তবে কন্যার জন্মে আমি পুত্র লাভের চেয়ে কম আনন্দিত হইনি এটা বোঝাতে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। তেমন কিছু নয়। এই বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ানো। দু' একজন আত্মীয় পরিজনের বাড়ি সন্দেশ পাঠানো। এই আর কি।

যখন পাঠিয়েছিলাম, তখন মেয়ের দিকে তেমন করে তাকাইনি। তাকালেও সব শিশুকেই জন্মের পর যেমন লাগে তেমনই মনে হয়েছিল।

মাস দুই পরে ব্যাপারটা ধীরে ধীরে অন্য রকম হতে লাগলো। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম, ঘন কালো কোঁকড়ানো একমাথা চুল। সাদা আয়ত দুই চোখের পর্দায় চড়াই পাখির মত চঞ্চল নিকষ কালো বড় বড় দুই তারা। একজন উদাসীন মানুষকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলার মত হাসি, কাকাতুয়ার মত কণ্ঠস্বর, খরগোসের মত নরম শরীর, ফিঙের মত চঞ্চলতা নিয়ে সে বড় হয়ে উঠছে।

তবু যখন সরকারী কাজে মফস্বলে যেতাম, পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত, স্টুডিওতে তোলা একটা ছবিতেই মনটা তৃপ্ত থাকতো। কিন্তু আর [illegible] মাসও কাটল না। মাস দশেক বয়সের মধ্যে সে আমাকে একটি অসহায় পিতাতে পরিণত করে ছাড়লো।

চুলগুলো ততদিনে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে চোখের উপর পড়েছে। কথা ফুটেছে তপ্ত খোলায় খই-এর মত। তোতাপাখির মত সাজানো ঘরে থাকবে না এক দণ্ড। যেখানেই যাই তাকে নিয়ে যেতে হবেই। অফিসটা বুঝেতো—তাই সেখানে যাওয়ার বায়নাটা তেমন ধরেনি। তা ছাড়া সকাল সন্ধ্যা রাত্রি সে কিছুতেই ঘরে থাকবে না। সে রাস্তার কুকুর দেখবে। কুকুর না-থাকলে বাস দেখবে। বাস না-থাকলে রাস্তা দেখবে।

দেড় বছরের মাথায় একদিন মধ্যরাত্রে সে কেঁদে উঠলো। বলল, সিঁড়ি দিয়ে বাইরে যাব। শীতের রাত। তার মা কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারে না। শেষে মেয়ের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছি বলে রাগ করে শুয়ে পড়লো। আমি একথা সেকথা বলি, মেয়ে কিছুতেই ভোলে না। কেবলই বলে, দরজা খুলে বাইরে চল বাবা। আমি তাকে চুলা বুড়ি ও কালোপরীর ভয় দেখাতে সে একটু চুপ করলো। বড় বড় চোখ করে ঘরের আধ-খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি বুঝতে পারলাম কাজ হয়েছে। ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা শুরু করলো, এমন সময় অনেক দূরে দুটো কুকুর তারস্বরে ডেকে উঠলো। আমি বললাম, ঐ দেখ আসছে। শীগগীর ঘুমো মা।

সে বলল, কুকুর দেখবো।

আমি বললাম, অন্ধকার। কুকুর দেখা যায় না।

ওর একটা কবিতা জানা আছে। তার একটা লাইন হল, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। আমি লাইনটা আওড়ে, ওর বোঝার ব্যবস্থাটা সহজ করতে চাইলাম।

ও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললো—তাহলে অন্ধকার দেখবো, বাবা।

স্ত্রী সন্তুষ্ট যে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে বলে ভেবেছিলাম, নড়ে চড়ে লেপটা শরীরে ভাল করে টেনে নিয়ে কাৎ হয়ে শুতে শুতে বললেন—দেখাও এখন অন্ধকার!

তা, সম্ভবত অন্ধকার দেখাবার জন্যই মেয়েটাকে সংসারে এনেছি। বেবী ফুড উধাও হয়ে গেল। যার দোকানে রাত ন'টায় থরে থরে সাজানো বেবীফুড দেখলাম, পরদিন সকালে সে হাসি হাসি মুখে বললো, সাপ্লাই নাই। আমি অবাক হয়ে জানালাম, কাল রাতে দোকান বন্ধ করার সময়ে আপনার তাকে আমি অন্তত দশটা ফুড দেখেছি।

পৃথিবীর পবিত্রতম মানুষের মুখভঙ্গী নিয়ে আমার দোকানদার সাধু সাহা তিনটি শিশু সন্তানের পিতা, চকচকে দাঁত বের করে বললেন, বিক্রি হইয়া গ্যাছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কখন? মধ্যরাতে?

সে খদ্দেরের মালের ঠোঙাটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, হ্যাঁ।

আমি অবাক হয়ে ব্যাখ্যা চাইলাম। আপনারা কি আজকাল মধ্যরাতেও একবার দোকান খোলেন নাকি?

মালটা খদ্দেরের ঝোলাতে তুলে দিয়েই সম্ভবত হুঁস এল। বলল, না খালি কৌটা আছিলো।

খালি কৌটা আছিল মানে? আমি চোখ কুঁচকে তাকাই। বেবী ফুডের খদ্দেররা কি আজকাল ফুড শেষ করে কৌটো দোকানে ফেরৎ দিয়ে যায় নাকি?

চামারমেনের কথার উপর কথা নাই। আমি নীচে দাঁড়িয়ে সে উপরে। সে বিক্রি কর্তা, আমি গেলে খদ্দের। আমাকে গলাধাক্কা দেয়নি। অনেক ভদ্রলোক। আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিনয়ে বলেছে, থাকলে আপনেরে দেই না?

পৃথিবীর ধূর্ততম সম্প্রদায় কোথায় বাস করে, অনেক দিন পৃথিবীতে থেকে নিশ্চিত না-হলেও আমি আঁচ করতে পেরেছি। কাকুতি মিনতি করে বললাম, একদম ফুড নেই—মেয়েটা খেতে পাবে না—কিছু বেশী নেন, একটা অন্তত ফুড আমাকে দেন।

এইবার আমার দোকানদার সাধু বিরক্ত হল। বলল, বকান ক্যান, থাকলে দেই না?

আমিও রাগ রাখতে পারলাম না। বললাম, হ্যাঁ দেন, যখন নিজের দোকানে পচার আশঙ্কা থাকে তখন দুটোও দেন। আবার মাদ্রাজ লাইনে রেলের ব্রিজ ভাঙলে, আমুল মাখনেরও দাম বেশী নেন।

সে আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। যান—যান, মাল বিক্রি করি না।

বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলতেই সেও আমার ওপর ক্ষেপে গেল। প্রথমত ফুড নিয়ে আসতে পারিনি, দ্বিতীয়ত ঝগড়া করে এসেছি। বলল, ওর সঙ্গে তুমি ঝগড়া করে এলে? পাও যদি সাধুর কাছেই পাবে। বেশী দাম নিয়ে অপরিচিত লোককে কোনো দোকানদার মাল দেবে? এখন দেখবো তুমি কোথা থেকে ফুড আন?

আমার আহাম্মুকি আমার কাছে ধরা পড়লো। অনেক আজে বাজে চিন্তা মাথায় আসতে লাগলো। নিজেকে নিজের করুণা করতে ইচ্ছা করলো। অসহায় পৌরুষ কাঁপতে থাকলো—আমার দোষে মেয়েটা যদি খেতে না-পায়, যদি অন্য ফুড খেয়ে পেট খারাপ করে, যদি মেয়েটা......এই সব আজেবাজে চিন্তা করলে আমার বুকের বাঁ দিকের সামান্য উপরে কেমন যেন শির শির করে। হাতে করে তুষ মাখা বরফ গলির বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার শেষটাতে হাতে যেমন সির সির, টন টন করে ঠিক তেমনি।

শেষ পর্যন্ত অন্য ফুডই আনতে বাধ্য হলাম। একটা ফুডের জন্য মিনিস্টার ধরিনি। তা ছাড়া কাউকে বোধ হয় বাদ রাখিনি। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে অন্যটাই নিয়ে এলাম।

স্ত্রী প্রবল আপত্তি তুললো। ঝগড়া বাধালো। চোখে জল আনলো। আমার কেন বিয়ে করবার সাধ হয়েছিল জিজ্ঞেস করলো। এবং নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত শুরু করলো।

পৃথিবীতে কোথাও মরিয়া হতে পারিনি। কেবলই পড়ে পড়ে মার খেয়েছি। এমনিতে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। তার উপর এই। অসহ্য বোধ হল। বললাম, পারব না। যা-পেরেছি অনেক। এর চেয়ে এক বিন্দু বেশী পারব না।

বলে, মেয়েটাকে কাঁধে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখলাম, ঘরে যেমন বাইরে তেমন কোন বিরোধ নেই। শীতের আকাশ নীল। সোনা রঙের রোদটাও উঠেছে বাহারে। গাছপালা গুলোকে বেশ সতেজ ও চকচকে দেখাচ্ছিল। বাড়ির অল্প দূরেই একটা পার্ক। বেশ বড় পার্ক। এই অঞ্চলে পার্কে কেন জানি না খুব কম লোক আসে। আগা গোড়া সবুজ।

আমরা দুজনে সেখানে গিয়ে বসলাম। হাসিতে খুশিতে গানে ছড়ায় মেয়ে আমার পার্কটাকে আরো তাজা করে তুললো। মনে মনে হাসলাম। কত কম আয়োজন, কত অনাদর, কত অবজ্ঞায় বেড়ে উঠছে—অথচ প্রাণশক্তি দেখলে নিজের বুকেও যেন জোয়ার আসে। চোখ বুজে ঈশ্বরকে প্রণাম জানাই। আর বলি, কি দিয়ে সংসারে কি-হয় জানি না। তুমি দেখো।

সেদিন রাতেই মেয়ের পেট খারাপ হল। দিন দুই পরে রক্ত দেখা গেল। স্ত্রী সন্তপ্ত আর্তনাদ করে উঠলো। আমি অপরাধের বোঝা কাঁধে নিয়ে আঁতিপাতি করে কারণ খুঁজতে লাগলাম। সদ্য কেনা ফুডের কৌটো খুলে বুক ভর্তি গন্ধ নিয়ে দেখলাম, খারাপ কিছু নেই। হঠাৎ চোখ গেল কৌটোটার তলার দিকে। অবাক হয়ে দেখি, শিশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের কাল দু বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।

ছুটলাম সি আই টি রোডের নার্সিং হোমে। একদা সপ্তাহে বড় ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা ছিল সেখানে। গিয়ে শুনলাম ডঃ অধিকারী এখানে আর বসেন না। ল্যান্সডাউনে ওর নতুন-কেনা বাড়িতেই চেম্বার করেছেন। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে সেখানে গেলাম। বেশ ভাল এবং নামকরা ডাক্তার। জন্মের পর মাস ছয়েক আশালতাকে উনিই দেখেছিলেন। ভদ্র, শান্ত এবং বিনীত। ফিও নাম মাত্রই নিতেন। দশ টাকা। সবটাই সম্ভবত উনি পেতেন না। নার্সিং হোম-এর যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক, চেয়ার টেবিল ব্যবহার করেন নিশ্চয় ওদেরও কিছু দিতে হয়। সে যাই হোক আমার পক্ষে দশ টাকা বলেই মাসে মাসে দেখানো সম্ভব ছিল।

স্লিপ দিলাম। ঘণ্টাখানেক পর ডাক এল। মেয়েকে দেখে চিনতে পারলেন। ডাক্তারের উপর কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে উঠলাম। দেখলেন ভাল করে। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ওষুধ দিয়ে বললেন, দিন পাঁচেক খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। স্বস্তিতে মনটা ভরে গেল। প্রায় মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিলাম—ডাক্তারবাবু, আপনারাই বোধ হয় ভগবান। সংকোচ থেকে গদ গদ হয়ে বললাম, আপনাকে কত দেব ডাক্তারবাবু?

প্রেসক্রিপশানটা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে, ওষুধের অনুপান বর্ণনা করতে করতে বললেন, বত্রিশ দেবেন।

মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। দিশেহারা ভাব নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। সে অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে। আঘাতটা সামলে, সাহস অবলম্বন করে বললাম, ডাক্তারবাবু সেই মেট্রোপলিটান থেকে আমার মেয়ে আপনার পেসেন্ট। আমাদের একটু কনসেশান না করলে—

কথা শেষ করতে হল না। উত্তর দিলেন, মেট্রোপলিটানের অত রোগীকে সময় দেওয়ার মত সময় আমার নেই। ওখানে দশ টাকা চার্জ ছিল বলে খুব বেশী ভিড় হতো। এখানে বত্রিশ করে দিয়েছি। পেসেন্টরাও অ্যাটেনশান পায়।

একটু কনসেশান না-করলে আমরাও যে পারি না ডাক্তারবাবু, মিনতি মাখিয়ে বললাম। ডাক্তার একটু ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, দিন ত্রিশ টাকা।

আমি শার্টের বোতাম খুলে ভেতরের পকেট থেকে ত্রিশ টাকা বের করে দিতে দিতে ভয় কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ওষুধে না-ধরলে আবার কি মেয়েকে নিয়ে আসবো ডাক্তারবাবু?

একটু ভারি স্বরে বললেন, আনবেন। দেখালে চার্জ লাগবে।

প্রত্যেক বারেই?

হ্যাঁ।

ডাক্তার অন্য রোগীতে মন দিলেন। আমরা বেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

এই সব দেখে শুনে ভেবে, আমার অপ্রকাশ্য অসুখ আরও বেড়ে গিয়েছে। নিজের জন্য ভাবি না। নিজে তো সারা জীবনই কষ্ট করেছি। এখনো হাসি মুখে কষ্ট সইতে রাজি আছি। লোকে যাকে সুখ বলে আমি তার জন্য এতটুকু লালায়িত নই। বাড়ি গাড়ি টিভি ফ্রিজ—আমার বুকে সামান্যতম স্পন্দনও তুলতে পারে না। আমার বুক কাঁপে শুধুমাত্র আমার মেয়ের জন্য। ওর জন্য আমি কি রেখে যাব। বেশী বয়সে চাকরিতে ঢুকেছি। প্রভিডেন্ট ফান্ড কম্পালসারি হল এই তো সেদিন। গ্র্যাচুয়িটি পাব নাম মাত্র। পেনসান—বেঁচে থাকতে পাওয়া কষ্ট—না-থাকলে কে আর বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে। বুকের বাঁ দিকে ঘড়ির কাঁটার শব্দের মত চিড়িক চিড়িক ব্যথা। কবে আছি কবে নেই। কেমন একটা সন্দেহ সন্দেহ লাগে। আর সন্দেহটা গোড়ায় গন্ধ ধূপের মত সরু নালে উঠতে থাকে। তার পর এক সময় শীতের সন্ধ্যায় কয়লার উনানের ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে চায়। আমি এই সংসারে নেই—আশালতার মা আশালতাকে নিয়ে দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। একটু সুপাচ্য চালের জন্য—লালার রেশান দোকানে, একটা ফুডের জন্য—সাধুর দজরায়, একটু চিকিৎসার জন্য—ডাক্তারবাবুর অপেক্ষা-গৃহে—এই সব কাল্পনিক দৃশ্য, ডুব দিয়ে স্নানরত মানুষকে দমের শেষে উপরে উঠতে বাধা দিলে যে কষ্ট হয়, আমার সেই কষ্ট।

তিন বছর বয়সে মেয়েটাকে স্কুলে দিয়ে অবশ্য একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ, বই নিয়ে বসার আগ্রহ দেখে, ভাল লাগছিল। স্কুলের বাসে করেই যাতায়াত করে। আমিই সামনের মোড়ে গিয়ে উঠিয়ে দিয়ে আসি। ফেরার ব্যাপারটা নিয়ে একটা ভাবনা থাকে। যদিও কোন দিন কোন ঝামেলা হয়নি তবুও অফিসের কাজের মাঝে হঠাৎ যদি মনে পড়ে মনটা কেমন উতলা হয়ে পড়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সামান্য খেয়ে-দেয়ে চলে যায়। টিফিন দেওয়া হয় বটে, তবে টিফিন খাওয়া এখনো শেখেনি। যদি কোন কারণে স্কুলের বাস খারাপ হয়, দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত না-খেয়ে মেয়েটা বড় কষ্ট পাবে। বাসের দারোয়ান ভুল করে যদি অন্য মোড়ে নামিয়ে দেয়, মেয়ে আমার কেঁদে আকুল হবে। রাস্তা চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। যদি বাস স্কুলেই ফেলে আসে মেয়েকে......

সেদিন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে যাই। ঘরে ঢুকতেই আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে আশা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর চোখগুলো গোল গোল করে, মুখে একটা থমথমে ভাব এনে বলে, বাবা! আজকে একটা খুব খারাপ খবর আছে।

আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়, খবরের কাগজে?

না—না। আমাদের স্কুলে।

কি হয়েছে?

সরবু মনতানি, যে আমার পাশেই বসে, ওকে-না বাস স্কুলে ফেলে এসেছিল।

বাস ফেলে এসেছিল মানে?

স্কুলের মাঠে খেলা করছিল। আমরা সবাই উঠে গেছি। ও ওঠেনি।

কেন তোমাদের তোলার আগে নাম ডাকে না?

জনগণের

প্রিয়

সেল

খুব স্বাভাবিক। কারণ জীপ ৫০৫ সেল হচ্ছে একমাত্র সেল যা অনেক কাজে লাগে। টর্চ ও ট্র্যানজিস্টার, উভয়ের পক্ষে উপযোগী। কারখানা থেকে সদ্য তৈরী একেবারে তাজা। উন্নত মানের। অত্যন্ত কম খরচ হয়। লক্ষ লক্ষ লোক জীপ ৫০৫ সেলের কাজে সন্তুষ্ট। আপনিও খুশী হবেন।

আপনার টাকার যথার্থ মূল্য লাভ করুন।

জীপ ফ্ল্যাশলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ্ লিমিটেড।

(এ শেরভানি এণ্টারপ্রাইজ)

Sterling/GF/3044

হ্যাঁ জানে। আমাকে দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে বাস চলতে চলতে নাম ডেকেছিল। ওকে না-পেয়ে আবার বাস স্কুলে ফিরে যেতে।

নিশ্চয় খুব কান্নাকাটি করেছে?

হ্যাঁ বাবা। মুখ চোখ ফুলে গেছে। আমরা ফিরে গিয়ে দেখি ওর বাবা মাও এসেছে।

ও'রা জানলো কি করে?

হেড মিস ওদের ফোন করে দিয়েছিল। ওদের গাড়ি আছে বাবা।

টিফিন পিরিয়ডে অফিসের দুশ্চিন্তাটা এমন সত্যি সত্যি ফলে যাবে, ভাবতে পারিনি। কেমন একটা যান্ত্রিক নিয়মে সংসারটা চলছে। কোথাও মায়া নেই মমতা নেই। আমার মত বয়স্করা উপেক্ষা সইতে পারে। অবহেলা সয়। কিন্তু কচি ছেলেমেয়েগুলো? ওরা তো কোনো দোষ করেনি। সংসারের ন্যায় অন্যায় সত্যাসত্যের ওরা কিছুই জানে না। বড় সরল বড় পবিত্র। সব চাইতে অসহায়। অথচ এদেরও কেউ যেন ছেড়ে দেবে না। দয়াহীন মমতাহীন নিষ্ঠুরতা দিয়ে সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু নিঙড়ে নেবে। হায়রে সভ্যতা তোর বলিহারি।

সমস্ত শরীরটা রি রি করতে থাকলো। স্থান কাল ভুলে স্ত্রী কন্যার সামনেই মুখ দিয়ে কতগুলি খারাপ গালাগালি বেরিয়ে গেল।

মেয়েটা এতক্ষণে ঘরের কোণে পুতুল খেলায় মেতেছিল। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে শাসনের সুরে বলল, বাবা—আবার!

আমি লজ্জা পেয়ে ওর কাছে গেলাম। মাথায় একটা চুমু খেয়ে বললাম, সত্যি তুই আমার সাতজন্মের মা।

পাঁচ বছরের মাথায় মেয়েটার কথাবার্তা বোধবুদ্ধিতে যখন আর ভাজ থাকলো না, আবদারে শাসনে তার মুখ দিয়ে যখন কথার ফুলঝুরি ছুটলো—তখন আমি আরো দুর্বল ও অসহায় বোধ করতে শুরু করলাম।

গল্প বললে গল্পের ভেতরে পারতপক্ষে কাউকে মারা যাবে না। নিতান্তই যদি কাউকে মারার দরকার হয়, তাকে প্রথমাবধিই খারাপ হতে হবে। গল্পে হঠাৎ কোন খারাপ কাজের জন্য কাউকে কোন শাস্তির মধ্যে ফেললে চলবে না। পশু পাখি হত্যা সরকারী নিয়ম থেকে অনেক বেশী কঠোরতর নিয়মে ওর গল্পের রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত।

এক গল্পের এক পরম উপভোগ্য অধ্যায়ে শিকারীর হাত দিয়ে একটি বুনো শুয়োরকে শিকার করিয়েছিলাম। গল্পের মধ্যে অভাবিত ও আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় সে ক্ষোভে দুঃখে গল্পের আসরকে ধিক্কার দিয়ে শেষ করে দিতে চায়। আমি অনেক ভাল ভাল কথায় তার মানভঞ্জন করে এবং তোষামোদ করে বোঝাই, এসব পুরনো গল্প। এসব মারামারি আগেকার দিনে চলতো। এখন এসব আর চলে না। সরকারী আদেশে পশুশিকার প্রায় মানুষ হত্যারই সমান দোষনীয়। সে মানে না। মুখ চোখ লাল করে, গালে চোখের জলের দাগ ভরিয়ে বলে—মোটেই না—মোটেই না। তুমি মিথ্যে কথা বলছো। প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে বললো, খবরের কাগজে মা দুদিন দুটো শিকারের ছবি আমাকে দেখিয়েছে। এইবার চোখ দিয়ে মুক্তার মত জল গড়াতে থাকে—একটা বাঘকে তো বাবা কি কষ্ট দিয়ে মেরেছে—বলতে বলতে মৌসুমী সমুদ্রের মত কান্না তার ফুলে ফুলে ওঠে। তুমি জান না বাবা, তখন তুমি অফিসের কাজে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলে। একটা বাঘ না-খেতে পেয়ে মরে গেছে।

একদিন স্কুল থেকে নিয়ে আসতে গিয়ে রিকশায় বসে বসে এই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম পশুপাখির সম্পর্কে অকৃত্রিম বেদনাবোধের সঙ্গে কিছুটা খিদের অস্পষ্ট কষ্টও এই কান্নার মধ্যে মিশে আছে।

আমি জোর দিয়ে বললাম, এখন আর সেই রকম ব্যাপার নেই, এখন শিকারী বনের পশুকে গোপনে গুলি করে মারলে শিকারীকে গুলি করার আদেশ গরমেণ্ট বনপুলিসকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুটা আত্মসম্বরণ করে, প্রতিবুদ্ধিতে একটু ব্যঙ্গের সুর নিয়ে, মেয়ে বলল, সব পশুই কি বনে থাকে? সেদিন হরিশ পার্কের কাছে বস্তিটাতে একটা ছোট্ট কুকুরকে অনেকগুলো ছেলে মিলে ঢিল মারছিল। কই পুলিস তো তাদের কিছু বললো না!

হয়তো পুলিস দেখেনি—ব্যাপারটাকে আমি ঢাকার চেষ্টা করি।

সে ধমকে ওঠে, না, পুলিস দেখেছে।

একটু ধাক্কা দেওয়ার জন্য একটু কঠিন সুরেই আমি বলি, অত ভেবো না। এই শহরে তুমি তো একাই পশুপ্রেমী নও, আরো বহু পশুপ্রেমী মানুষ আছে। কারো চোখে পড়লে সে নিশ্চয় ছেলেগুলোকে শাসন করে দেবে।

কোন কথা কোথায় গিয়ে কি ফল করে জানি না। আমার মেয়ে যেন এই আঘাতের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। বাবার কাছ থেকে এমন শেল সে কল্পনা করেনি। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বাবা আমি কি শুধু পশু পাখিকেই ভালবাসি? আমি কি মানুষকে ভালবাসি না?

আমি প্রায় অপ্রস্তুতের মত তার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খুব কষ্ট হয় মেয়েটার অনুভবগুলির জন্য। বলি, নিশ্চয়, তুমি তো সবাইকেই ভালবাসো।

কান্না গলা সুরে সে বলে যায়, আমি তো মাকে কত ভালবাসি। কিন্তু মা তো আমাকে ভালবাসে না। একটা অঙ্ক একটু ভুল হলে কিংবা একটু কাঁচা তেতুল পেলেই চড় কষিয়ে দেবে।

আমি মুহূর্তে একটি ছোট্ট হৃদয় সমুদ্রের গভীর তলদেশে অতি সূক্ষ্ম, পেলব ও আঘাত কাতর অঞ্চলের সন্ধান পাই। সেখানে আপন হৃদয়ের গোপনতম শক্তিটুকু উজাড় করে প্রলেপ ও উত্তাপ দিতে দিতে হাজার কথার পাকে তাকে প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দেই।

বাড়ি এসে অনাহারে করে মেয়ে আমার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি দেখি একটি পবিত্রতম সূর্যমুখী।

কাজেই এই মেয়েটিকে নিয়ে আমার ভয়। আমার ভাবনা। আমার অশান্ত। এ সব অনুভূতি আমার নিজের একান্ত নিজস্ব। এ সব বিষয়ে আমি কখনো কাউকে কিছু বলি না। এমন কি আমার স্ত্রীকেও নয়। আমি বুঝি এসব কাউকে বলার কথা নয়।

কিন্তু নিজের অসুখটার কথা চেপে রাখা উচিত নয় জেনেও কাউকে কোনোদিন তেমন করে কিছু বলিনি। আজ কষ্টটা যতটা কাল্পনিক ভেবেছিলাম—শেষ পর্যন্ত মনে হল ততটা কাল্পনিক নয়। বুকের বাঁ দিকের ঠিক একটু উপরে, ব্যথাটা ঘন হয়ে দেখা দিল। অফিস থেকে ফিরে সেদিন স্ত্রীকে কথাটা বলেই ফেললাম।

সুতপা আঁৎকে উঠলো। বললো, নিজের ব্যাপারে তোমার এত গাফিলতি, আমার আর সহ্য হয় না। কবে থেকে বলেছি শরীরটা তোমার ভাল যাচ্ছে না, একটু ডাক্তার দেখাও। স্ত্রীর অভিমান ও ভয় মিশ্রিত ভর্ৎসনা মেনে বললাম, এইবার নিশ্চয় দেখাবো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার সময় সুতপা ভারি গলায় বলল, সোনা গয়না অনেক পরেছি, আমার আর দরকার নেই। বুঝতে পারলাম গাফিলতিটা কেন, ওর কাছে সরল হয়ে গেছে। বলল, তুমি ওগুলো বিক্রি করে ভাল নার্সিং হোমে বড় ডাক্তার দেখাও। আমি চুপ করে ছিলাম। আমার খাওয়ার শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না।

বললাম, ওগুলো আশার জিনিস।

সে বলল, মানুষ থাকলে অনেক হবে।

আমি বুঝতে পারলাম সুতপা খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমার চেয়েও বেশী। সন্তান ও স্বামীর ব্যাপারে মা এবং বউরা অনেক বেশী বোঝে। রাডার যন্ত্র যেমন অনেক দূরের বিপদ সহসা ধরা পড়ে।

আমি বললাম, না—না, ভয় পাওয়ার মত তেমন কিছু নয়। শশী ডাক্তারকে দেখিয়েছি। উনি পালস্ প্রেসার দেখে বলেছেন, তেমন কিছু তো দেখছি না। প্রেসারটা সামান্য হাই আছে। মাঝে মধ্যে এক-আধটা হার্ট বিট্ কেমন যেন মিসিং। তা সে নানান কারণে হতে পারে। সময়মত ই সি জি এবং চেক-আপটা করিয়ে নেওয়াই ভাল।

সপ্তাহ কাটল না। বুকের ব্যথায়, অফিসে চেয়ার থেকে পড়ে গেলাম। বেশ কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরতে সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলো, দাদা হাসপাতালে যাবেন না বাড়িতে? আমি বাড়িতে যেতে চাইলাম। আমার আশালতার কথা মনে পড়লো।

সহকর্মীরা বড় ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেল। সেখান থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিল। ও'রাই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিল। বড় ডাক্তার চিঠি লিখে দিলেন, ফারো ইনভেসটিগেশান নেসেসারি।

মাঝখানে একটা দিন সময় নিলাম। ঘর সংসারের কিছু কিছু ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার। ইনভেসটিগেশানে গেলে কত দিন লাগে কে জানে। কি বেরুতে কি বেরোয়। পিসীমাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। যদি পিসীমা এসে কয়েকটা দিন থাকতে পারেন।

খবর পেয়েই পিসীমা চলে এলেন। এসে সুতপাকে এবং আমাকে অনেক বকাঝকি করলেন। গাফিলতির কারণে গোবরডাঙার তাঁর প্রতিবেশীর কি সর্বনাশ হয়ে গেছে—আরো কয়েকজন আত্মীয় পরিজনের সর্বনাশ হতে হতে কিভাবে বেঁচে গেল, সে সব কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। ঐ সব কেসের তুলনায় আমারটা যে অনেক সরল ও অতি প্রাথমিকই হবে—সুতপাকে সে বিষয়ে সান্ত্বনা দিয়ে মায়ের মত অভয় ও আশীর্বাদ দিয়েছেন। আশালতা গল্পের ঠাকুমাকে বাস্তবে দেখে পিসীমার সঙ্গে দারুণ জমিয়ে নিয়েছে।

মাঝখানে একটা দিন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে চলে যাব। বাইরে থেকে কোনো অসুখ নেই। নিজেও স্পষ্ট করে যে কিছু বুঝতে পারছি, তা নয়। একটা ভয় বরাবরই আছে জানি। ডাক্তারী শাস্ত্রে কি সব অসুখের নাম লেখে? ভয়ের অসুখ অথবা অসুখের ভয়, কেমন যেন জড়াজড়ি হয়ে আছে। সমস্তটাই হৃদয়ে। হৃদয়ের অসুখ বড় পাজি অসুখ। সব সময় সব যন্ত্রে ধরা পড়ে না।

একটানা পাঁচ সাত বছর অফিস করেও কোনদিন ছুটি নিয়েছি বলে মনে পড়ে না। নেবার কথা কখনো ভাবিও নি। হঠাৎ ছুটিটা জোর করে আমার ওপর চেপে যাওয়াতে, বৃহস্পতিবারের সকালটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো। আজ আমি আর দুধ আনতে যাইনি। বাজারেও যেতে হবে না। আজ থেকেই আমার ফুল রেস্ট। একটু বেশী বেলা পর্যন্ত শুয়েই ছিলাম।

সুতপা অন্য দিনের চেয়ে অনেক যত্নে সুন্দর একটা কাপে আমাকে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে বিস্কুট দু'খানা। এবং খবরের কাগজটা।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখছিলাম। মন্দ লাগছিলো না। একটু কৌতুকের কথাও মনে আসছিল। মাঝে মাঝে রোগী হলে মন্দ লাগে না। আদর যত্নের বেশ রকমফের হয়ে যায়।

হঠাৎ খবরের কাগজের একটা কোণায় চোখ আটকে গেল। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্কুটার আরোহী স্বামী-স্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত। সমস্ত খবরটা পড়ে আঁৎকে উঠলাম। চল্লিশ বছরের স্বামী ত্রিশ বছরের স্ত্রী ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে পারিবারিক কাজে গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে দুজন দুজনকে নিয়ে ঘরে ফিরবে আট বছরের মেয়ে ও ছয় বছরের ছেলের সঙ্গে এই ছিল কথা। পথ দুর্ঘটনা। দুই হতভাগ্য শিশু তখনো জানে না তাদের বাবা মা তাদের স্কুল থেকে নিয়ে যেতে

আর কোনদিনই ফিরে আসবে না।

খবরটা পড়ে বুকের বাঁ দিকটাতে আবার একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বাতাসে অক্সিজেন কেমন কম কম মনে হতে লাগলো। শরীরটা ওজনহীন লাগছিলো। মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বপ্নের ভেতরে অনেক উঁচু এক বাড়ি থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি।

খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখলাম। মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ বুজে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। পারলাম না। কাগজটাকে আবার টেনে নিলাম। বাকিটুকে পড়ে হাঁফাতে থাকলাম। পুলিস ছেলে মেয়ে দুটিকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিল। দুজনেই বলেছে বাবা মা না-এলে তারা অন্য কারু সঙ্গে যাবে না। অন্য কারু কথা তারা শুনবে না।

মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা দুলছে। ভূমিকম্পে এক্ষুনিই বোধ হয় গুঁড়িয়ে পড়বো। আমি বিছানা আঁকড়ে ধরলাম। ডাকলাম, সুতপা।

সুতপা দৌড়ে এল। ঝুঁকে পড়ে আমাকে ধরলো। আশঙ্কায় বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করলো, কি হল তোমার?

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ইশারায় কাগজটা দেখালাম। রুদ্ধকণ্ঠ ভাবটা খুলে বললাম, পড়ে দেখো।

ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর কাগজটা রেখে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলে বললাম, কাগজটা লুকিয়ে রেখো। আশা যেন না-দেখে।

রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর আশালতা আমার লেপের নীচে আমার বুকের কাছে নিবিড় হয়ে এল। অন্য দিনের তুলনায় সে আজ অনেক কম কথা বলছে। ঠাহর করতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে মামণি কি হল? আজ যে বড় তুই কথা বলছিস না?

যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি এমন ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বাবা এখন ছেলেটা আর মেয়েটাকে কে দেখবে?

আমি আঁৎকে উঠি। কোন ছেলেটা মেয়েটা?

কেন, তুমি জান না? আজ কাগজে বেরিয়েছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বাবা মা দুজনেই অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে?

তুই কোথা থেকে শুনলি?

স্কুলে মিসরা খুব দুঃখ করছিল। আমাদের পাশের স্কুলটাতেই তো মেয়েটা পড়ে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি দ্যাখোনি? কাগজে তো ছবিও বেরিয়েছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাছে নিই। বলি, দেখার লোকের কি অভাব হবে। আত্মীয়স্বজন আছে। গরমেন্ট আছে। তা ছাড়া সংসারে অনেক ভাল লোক আছে। ওদের কোনো কষ্ট হবে না।

গরমেন্ট কি ওদের দেখবে বাবা?

নিশ্চয় দেখবে। যাদের কেউ নেই তাদের দেখার জন্যই তো গরমেন্ট।

সত্যি বাবা? দেখবে তো?

মেয়েটার মাথায় চিবুক লাগিয়ে সোহাগ করি। বলি, তা ছাড়া কত মানুষ আছে যাঁরা এমন ছেলে মেয়ের জন্য সব কিছু করতে চায়। কত লোক বাড়ি বয়ে গিয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে এসেছে। আমি কথার জাল বিস্তার করে ওর মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম। বললাম কত ভাল মানুষ আছে—বাবা মায়ের সঙ্গে শীতের ছুটিতে ওদের বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। কারা যেন চিঠি পাঠিয়েছে শিশু দুটির সাধ পূরণের সব ভার তারা নিতে চায়।

সত্যি বাবা? আশালতার উজ্জ্বল চোখে ও নীচের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখা দেয়। পরম কৃতজ্ঞতায় সে যেন কাউকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ রে সত্যি।

সে অনেকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলো। তারপর আস্তে জিজ্ঞাসা করলো, এতে কি ওদের সব কষ্ট চলে যাবে বাবা?

আমি বললাম, নিশ্চয়। তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই তো এত আয়োজন!

মেয়ের গলার স্বর ভেঙে এল। বলল, তা কখ্খনো হবে না বাবা। ওদের দুঃখ থেকেই যাবে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, না—না, তুমি ভুল বুঝেছ। ধীরে ধীরে ওদের আর কোন কষ্ট থাকবে না।

মেয়ে সজল চোখে আমার চোখের দিকে তাকালো। নীচের ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে চোখের জল গড়ালো, তুমিই ভুল বলেছ বাবা। এখন—এখন ওদের কে ভালবাসবে বল?

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মেয়ের প্রশ্নের আর উত্তর দিতে পারলাম না। ওকে জাপটে ধরে ওর কাছ থেকে নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখলাম।

এখন গভীর রাত। স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক পবিত্রতাকে ম্লান করে দেওয়ার মত পবিত্রতা নিয়ে মেয়ে আমার ঘুমিয়ে পড়েছে। আগামীকাল সকালে আমি হাসপাতালে চলে যাব।

এই মুহূর্তে হৃদয়ের মূলাধার থেকে বিস্ময়াক্রান্ত তেজী একটি সচিৎকার কান্না আমার কণ্ঠনালীতে এসে থর থর করে কাঁপছে। আমি কার কাছে জানতে চাইবো—পৃথিবীর মানুষ অথবা মানুষের গড়া সরকার অথবা অজানিত অচিহ্নিত ঈশ্বর—আমার অবর্তমানে এক বিন্দু উত্তাপের ভিখারী এই আমার ছয় বছরের শিশুকন্যা আশালতাকে ভালবাসবে কে?

ছবি : সমীর সরকার

পক্ষীনিবাসে সারাদিন

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে ছোট্ট পাখিটির ডাকে ঘুম ভাঙলো তাকে ঘুম-জড়ানো ভোর-বেলার ফিকে আলোয় ঠিক চিনতে পারলাম না। জানলার পাশে একটি শিশিরভেজা লতানে গাছের ওপর বসে শিস দিয়ে সে আমার ঘুম ভাঙিয়ে উড়ে গেল বিস্তৃত হ্রদটির দিকে যেখানে কুয়াশা আর জল দারুণ ঠান্ডায় গায়ে না লাগিয়ে এখনো থিতিয়ে আছে। এখনো যে রাত কেটে গেছে এমন বলা যায় না—আকাশ ঢাকা ঘন সবুজ গাছের পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিজে পাতলা একটু আলোর আভাস খাপছাড়াভাবে অন্ধকারকে ডাবের জলের মতো একটু টলটলে করে এনেছে মাত্র। শান্তি কুটিরের বারান্দায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র ঘন সবুজ অরণ্যের গন্ধ আর ফিকে-অন্ধকার হিম-বাতাস চাদরের মতো আমায় জড়িয়ে ধরলো। মনে হল একটি মাত্র নিছক পাখির ঘুম ভেঙেছে, যে পাখিটি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে থিতিয়ে-থাকা হ্রদের বুক চিরে প্রভাতী সাঁতারের জন্যে এই মাত্র উড়ে গেল। চারধারে তাকিয়ে দেখলাম ভরতপুরের পক্ষিনিবাস এখনো আপাদমস্তক শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার ঘড়িতে এখন ভোর চারটে বাজে বাজে।

আমার রাত ভোর হল ভরতপুর পক্ষিনিবাসের রেস্ট-হাউসে। নাম শান্তি কুটির। গত দিনের পড়ন্ত বিকেলবেলায় যখন এখানে এসে পৌঁচেছিলাম, তখন শান্তি-কুটিরের রঙিন ছাতায় ছাতায় উজ্জ্বল উদ্যানে বাসামুখো পাখিদের ক্লান্ত কাকলি আমার শহুরে চেতনার ওপর নরম আরামের মতো মুহূর্তে বিছিয়ে গেছলো। আগ্রা থেকে ভতরপুরের পক্ষিনিবাস মোটরে মাত্র একঘন্টা দশ মিনিটের পথ। বাসে আসতে লাগে ঘন্টা দেড়েক। পথের ধারে অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে
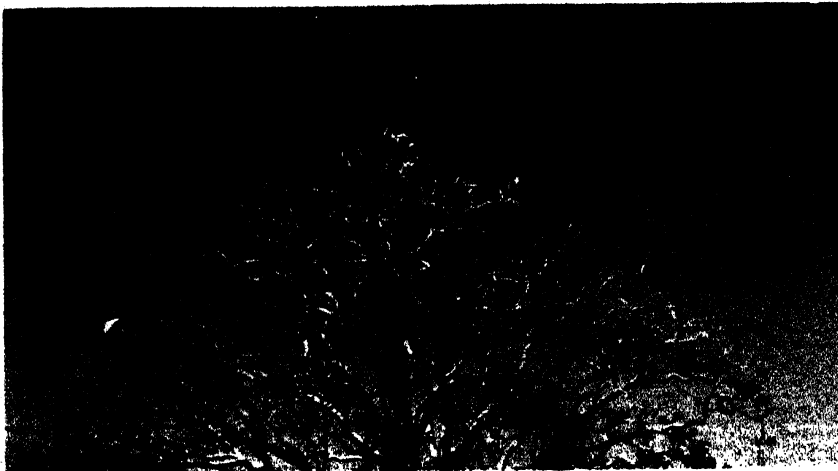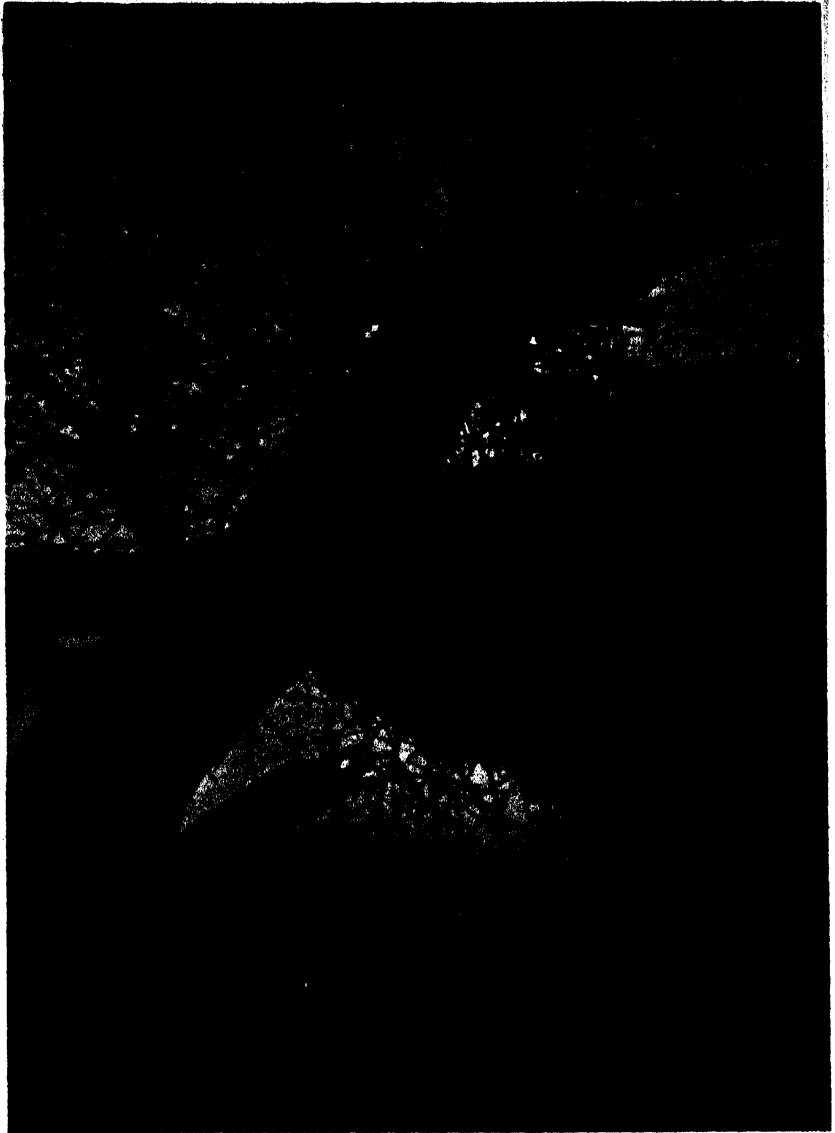
দৌড়ে এলো ফতেপুর-শিকরি। ত পর এক সময়ে পশু-মহল মিলি গেল সুদূর আকাশে, পুরনো পে সিল-লেখার মতো। আমরা এক আকস্মিক মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল রাজস্থানের নাম-না-জানা কয়েক গ্রামের প্রান্ত ঘেঁষে ছুটন্ত হা ওয়েতে। পথের ধারে যেখানেই চো পড়েছে রাজস্থানের গ্রাম, বিশেষ ক জয়পুর থেকে আগ্রার পথে, ম হয়েছে কাটিয়ে গেলে হয় না এখা দু-একটি দিন, এই সব গ্রাম্য স রুক্ষ কঠিন মানুষদের মধ্যে। গাি জানলা থেকে দেখা রাজস্থানের মেে দের চোখ মনে হয় নীল আকাশ কি উজ্জ্বল ছুটির মতো। টুকটুকে ল কিংবা প্রোজ্জ্বল হলুদ রঙের শা পরতে সব চেয়ে ভালবাসে রাজস্থা যুবতী। এদের হাতে-পায়ে-কোমে কন্ঠে বলিষ্ঠ গঠনের চাঁদির অলঙ্ক বাঙালী মেয়েদের কোমল ত্বকের প

নতুন!
আমূল-এর তৈরী
মিল্ক-কোকো পানীয়
নিউট্রামূল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!
আমূল নিবেদন্ করছেন শক্তিবর্ধক নিউট্রামূল
দারুণ স্বাস্থ্যকর পানীয়, যা আগে কখনও পাননি।
ঘন আমূল দুধ। বিশুদ্ধ মল্ট। প্রোটিন।
ভিটামিন। খনিজ পদার্থ। প্রতি কাপ নিউট্রামূলে
গড়ে তোলে স্বাস্থ্য, বেড়ে যায় জীবনীশক্তি।
আর এর স্বাদ! আহা অপূর্ব! অনেক বেশী
কোকো। অনেক বেশী দুধ। ঘন ক্রীমেভরা দুধ
ও কোকোর সবগুণই এতে পাবেন।
নিউট্রামূল উৎপাদন হয় আমূল-এর নতুন
ডেয়ারী ও ফুড প্রসেসিং কেন্দ্রে—যা জগতের
একটি আধুনিকতম উৎপাদন কেন্দ্র।
প্রতি টিনে পাবেন ৫০০ গ্রাম নিউট্রামূল। তার
মানে, অন্যান্যদের চেয়ে ৫০ গ্রাম
(অর্থাৎ ৫ কাপ) বেশী।
নিউট্রামূল—আজই খান।
tram
NOURISHING
500g Net
প্রতি টিনে ৫০ গ্রাম বেশী
বাজারে ছেড়েছেন :
গুজরাট
কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিমিটেড,
আনন্দ, গুজরাট

অহর্নীর হয়তো চিনা জানি না। কিন্তু এই সব মেয়েদের কঠিন কোনো প্রাত্যহিকতায় থাকা সামলাবার উপযোগী এই ধরনের অলঙ্কার, তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামের নাম মহুয়া কিংবা দৌসা কিংবা পাটৌলি এই সব রাজস্থানী গ্রামের মেয়েদের আমি যতই দেখেছি ততই আমার মনছুট হয়ে অন্তত দু-একদিন দিনের জন্যে পিছিয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়েছে। একই সঙ্গে ভালো লেগেছে জয়পুর থেকে আগ্রার পথে দৌসা গ্রামের সিঙাড়া আর জিলিপি। চৌরঙ্গীর সিনেমা-ভাঙা ভিড়ে ঝকঝকে এবং অতি-সচেতন মেয়েদের দেখে আমার যেমন মনে পড়বে কোনো সকালবেলার আলোয় দেখা মহিষ-দোহনে একাগ্র এক বেতের মতো ছিপছিপে নম্র রাজস্থানী মেয়েকে, তেমনি পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাতে চলতে চলতে আমি অনেক দিন পর্যন্ত দেখতে পাব দৌসা গ্রামের পথের ধারে সেই ছোট্ট সবুজ বাড়িটিকে যার সামনে ইতস্তত ছড়ানো সবুজ টেবিল-চেয়ারের যে-কোনো একটিতে বসে আপনি গরম চা আর সিঙাড়া খেলে আপনার পায়ের কাছে এসে ঘুমিয়ে পড়বে একটি, কিংবা একাধিক নিরীহ শুকরশাবক!

যে-কথা বলতে গিয়ে স্মৃতির চোরা-স্রোত আমায় অন্য পথে বেঁকিয়ে দিয়েছিলো তা হলো এই যে, অরণ্য-উদ্যান ঘেরা রোদালো সবুজ রঙের শান্তি-কুটির বড় নিশ্চিন্ত আরামের জায়গা—ছিমছাম, নিঃঝুম, বিশ্রান্ত। ভোরবেলার বাতাসে পাখির মতো ভেসে থাকে শান্তি-কুটিরের বারান্দা। নিচে বিছিয়ে আছে শিশির-ভেজা ঝিলমিলে সবুজ বাগান যেখানে চায়ের টেবিলে উড়ে এসে বসে নাম-না-জানা দূরে বিদেশের পাখি, টুকরো বিস্কুট, রুটি কিংবা কেক-এর প্রত্যাশায়। এই বাগানের এক পাশ ঘিরে পড়েছে একাধিক রঙিন তাঁবু—লাল সবুজ হলদে মানুষের মতো তারা এলোমেলো হাওয়ায় কখনো উঠছে ফুলে, আর কখনো যাচ্ছে মুষড়ে কুঁচকে। পাশে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ট্যুরিস্ট ভ্যান, যার মধ্যে রয়েছে একটি মিনিয়েচার সংসার—একেবারে নিখুঁতভাবে প্রাত্যহিক। এই ভ্যানটিকে অহোরাত্র পাহারা দিচ্ছে এক হলুদ রঙের ডাকাতে-আকারের রোমশ প্রহরী। এতবড় অ্যালসেশিয়ান এদেশে বড় একটা চোখে পড়ে না।' এই রঙিন ফানুষের মতো তাঁবুগুলি, এই সাংসারিকতায় নিখুঁত ট্যুরিস্ট ভ্যানটি এবং এই ভয়ঙ্কর সারমেয়টি—এ সব কিছু একদল বিদেশী পক্ষিবিদের সম্পত্তি। সম্ভবত এঁরা এসেছেন জর্মানি থেকে। দু-একজন মহিলাও রয়েছেন এঁদের মধ্যে। গত কয়েক মাস ধরে এঁরা ক্রমাগত রঙিন ছবি তুলে চলেছেন বিভিন্ন ঋতুতে এখানে যে-সব পাখিরা আসে ভারতীয় পাখিদের সহবাসিতায় একটি সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে যাবার তাগিদে—তাদের। কিন্তু শুধু যে ছবি তুলেছেন এমন নয়—পাখিদের দৈনন্দিন গতিবিধি, স্বভাব, চরিত্র বিষয়ে বিশদভাবে লিখে চলেছেন দলের দু-জন। এক মহিলার হাতে টেপ-রেকর্ডার। তাঁর কাজ সারাদিন শুধু নতুন নতুন পাখির ডাক সংগ্রহ করা। মনে হয় নানা দেশের পক্ষিনিবাসে এঁরা হয়তো বহু বছর কাটাবেন এবং এঁদের সংগৃহীত ছবি, পাখির গান আর তথ্য থেকে ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে একটি অতি মূল্যবান পুস্তক কিংবা এক রঙিন তথ্যচিত্র। কে জানে হয়তো এঁদের মধ্যেই আছেন টমাস রাইমার জোন্স, জেমস ফিশার, কিংবা সেলিম আলির মতো পক্ষিবিদ বা অরনিথোলজিস্ট! শুধু খারাপ লাগে ভাবতে যে, এতদিন ধরে, এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে এতোটাই ব্যাপ্ত আকারে যদি কেউ এদেশে পাখির ওপর একটি ডকুমেন্টারি করতে চান, সরকার থেকে তিনি কিঞ্চিৎ সাহায্য পাবেন মাত্র। হাজার হাজার মাইলের পথ পেরিয়ে এসে আমাদের দেশে পাখির ওপর তথ্যচিত্র তুলছেন মাসের পর মাস ধরে এক বিদেশী দল, আর আমরা? পাখির ওপর একটি তথ্যচিত্রের জন্যে আমাদের দেশে মাত্র তিন কি চারদিনের শুটিং-ই যথেষ্ট—রঙিন ফিলম নিয়ে মাস কিংবা বছরব্যাপী জিজ্ঞাসিতার সরকারী সমর্থন কি এদেশে আশা করা যায়?

শান্তি-কুটিরের সামনে রিসেপশান কাউন্টারের সংলগ্ন একটি ওয়েটিং

রুমের দেয়াল আলমারিতে পক্ষী-বিষয়ক দুটি কি তিনটি পুরোনো বই কোনো প্রকল্পিত পাঠাগারের দিকে হাস্যকরভাবে নির্দেশ করছে মাত্র। ভরতপুরের পক্ষিনিবাসে কোন কোন ঋতুতে কি কি পাখি সাগর পেরিয়ে প্রতি বছর আসে সে-বিষয়ে কোনো সরকারী পুস্তিকা পর্যন্ত কেউ দিতে পারলেন না। রাজস্থানের ট্যুরিস্ট অফিসে ভরতপুরের ওপর যে পুস্তিকাটি পরে হাতে এলো সেটিতে পক্ষিনিবাস বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে মোট সাড়ে দশ লাইনের মধ্যে! আর এই সব পাখিদের ছবি? কপাল ভালো হলে দু-একটি জরাজীর্ণ পিক্চার পোস্টকার্ড জুটে যেতে পারে আপনার। কিন্তু তার বেশি চাইলে আপনাকে চাইতে হবে বিদেশের দিকে, হয়তো খুঁজে-পেতে বার করতে হবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর প্রাচীন কোনো সংখ্যা। আমি সঠিক জানি আমাদের সরকারী উদাসীন্য কাটবার অনেক আগেই ভারতীয় পক্ষিনিবাসগুলির ওপর সঠিক গ্রন্থটি লেখা হবে বিদেশে—তথ্যে ও চিত্রে সমৃদ্ধ, রঙিন, উজ্জ্বল।

আলাপ হলো সুসান ম্যাকভেলার সঙ্গে। সুসান এসেছে লস এঞ্জেলেস থেকে। সাহিত্যের ছাত্রী সুসান-এর শখ বা হবি বার্ড-ওয়াচিং। সে অবশ্য একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে জোহানেসবার্গ-এর ছেলে টেড ম্যাকলিশ। সুসান আর টেড সহবাস করছে সাত-আট মাস হলো, বাট ইট ইজ স্টিল টু আরলি টু থিংক অফ ম্যারেজ। সুসান শুধু পাখি দেখতে ভালবাসে। আর টেড পাখির ডাক বা শিস অনুকরণ করতে ওস্তাদ। শিস দিতে টেড-এর মতো পারদর্শী আর কাউকে আমি জানি বলে মনে হয় না। সুসান আর টেডের সঙ্গে আমরা প্রাতঃরাশ সারলাম শান্তি-কুটিরের উদ্যানে। স্যান্ডউইচের টুকরোর জন্যে দেশি-বিদেশি পাখিদের সোচ্চার প্রতিযোগিতার সব উচ্চারণ ও অনুরণন টেড শিস দিয়ে নকল করে চললো সারাক্ষণ। ফলে খানিক পরে পাখিরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো বলে মনে হয়।

ফরেস্ট রেস্ট হাউস বা শান্তি-কুটির ছাড়া ভরতপুরে থাকবার জায়গা আছে আরো চারটি। শান্তি-কুটিরের চেয়ে মূল্যবান ও বিলাসবহুল হলো ফরেস্ট লজটি। এছাড়া আছে আই-টি-ডি-সি ট্রাভেলার্স লজ, গোপাল বাগ প্যালেস হোটেল এবং একটি ডাক-বাংলো। পক্ষিনিবাসটি ছাড়া ভরতপুরের আর একটি আকর্ষণ সেখানকার কেল্লাটি, ইতিহাসে যার নাম লোহাগড়। ভরতপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ সুরজমল কেল্লাটিও তৈরী করেছিলেন আঠারোশো শতাব্দীতে। এছাড়া ভরতপুর থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে দীগ রাজ্যের সুরম্য প্রাসাদ সারি কিংবা আরও একটু দূরে রয়েছে আলওয়ার-এর অট্টালিকা, প্রাসাদ, বাগান, সুন্দরী মেয়েরা এবং এক আশ্চর্য স্বচ্ছ নীল আকাশ। আর ভরতপুর থেকেই সরাসরি চলে যেতে পারেন সারিসকা-এর আরাণ্যকী জাতীয় ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির আরণ্য আশ্চর্যতায়।

প্রভাতী চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখেই আমরা পক্ষীরাজ্যের আরো অন্তঃপুরে প্রবেশ করার জন্যে তৈরী হলাম। শান্তি-কুটিরের অনতিদূরে যে জলাশয়টি বিছিয়ে রয়েছে তার পরিধি ঊনত্রিশ কিলোমিটার। লেকটির জল একেবারেই গভীর নয়। আর জলের ভিতরে যেন কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ যার ডালে ডালে বাসা বেঁধেছে দেশ-বিদেশের পাখি। ছিপছিপে, বাহারি নৌকোয় এই লেকে ঘন্টাখানেক ঘুরতে পারেন আপনি, প্রতি ট্রিপের ভাড়া দশটাকা। শীত বা পাখির ঠোকরে যাঁদের ভয়, তাঁদের বারো টাকা মূল্যের কাঁচের 'টুপি' পরানো নৌকোও নিতে পারেন। প্রতি নৌকোয় আসন সংখ্যা চার—এবং নৌকোর গতিবিধিও সীমায়িত। ঊনত্রিশ কিলোমিটার-এর এক-চতুর্থাংশ মাত্র নৌকো নিয়ে আপনি বেড়াতে পারেন—বাকি অংশটুকুর পাড় ঘেঁষে গাড়ির পথ আছে। জলাশয়ের এই সব অংশে এমনি ডাল-পালা ছড়িয়ে জট পাকিয়ে আছে একের পর এক জলজ গাছ যে নৌকো যাবার কোনো উপায়ই নেই—এই আলো-ছায়ার ঝিলমিলে এক ভাসমান অরণ্যে পাখিরা সুদূর, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, স্বাধীন।

যেহেতু পাখি বা জলাশয়ের হাড় কাঁপানো শীতকে আমাদের খুব বেশি বিপজ্জনক মনে হলো না আমরা দশ টাকা দামের খোলা নৌকোই বেছে নিলাম পাখির দেশে পাড়ি দেবার জন্যে। এবং খুব শীগগির টের পেলাম যে, আমাদের কান্ডারীটি একটি ছোটোখাটো পক্ষিবিদ। প্রতিটি পাখির চরিত্র-ব্যাখ্যানে সে তৎপর ও অনর্গল। কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়ালো হিন্দি ভাষায় আমার অনন্ত অপটুতা। পাখির বিষয়ে আমার হাজার প্রশ্নকে লাটাই-এর সুতোর মতো আমি গুটিয়ে নিলাম শুধুমাত্র হিন্দিভাষার কলকব্জাগুলোকে আমি কোনো মতে বাগে আনতে পারি না বলে।

ভারতবর্ষে এখন প্রায় পঁচাত্তরটি পক্ষী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পাখি দেখা যায়। এদের আবার প্রায় বারোশো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। এই সব পাখিকে নিয়ে নিয়মিত চর্চা শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কিছু ইংরেজ অফিসারের উৎসাহে। টি সি জারডন -এর দ্য বার্ডস অফ ইন্ডিয়া (১৮৬২-৬৪) থেকেই ভারতবর্ষে পক্ষিচর্চার প্রবর্তন বলা যেতে পারে। এর আগে যে এ দেশে পাখির বিষয়ে বই ছিলো না তা নয়। কিন্তু জারডন -এর মাধ্যমেই এলো দৃষ্টিভঙ্গীর সেই নতুনত্ব যার ফলে পাখিকে আমরা আত্মীয় বা বন্ধুর মতো খুঁটিয়ে চিনতে শিখলুম। ভারতবর্ষে পক্ষিচর্চার বিস্তারের পিছনে অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামের এক বিখ্যাত ইংরেজ পক্ষিবিদের অবদানও কম নয়। এছাড়া এদেশে পাখি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার বিভিন্ন দিক যাঁরা খুলে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিদেশীরা হলেন, ই ডবলু ওটস, ক্লানফোর্ড স্টুয়ার্ট বেকার, এবং হুইসলার। এঁদের পরে ভারতবর্ষীয় লেখক সেলিম আলীর

অবধান অবশ্যম্ভাবী'। [illegible] ভারতীয়
পাখিদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা
চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই যে আমরা কলকাতা থেকে
এত দূরে রাজস্থানের এক অরণ্য
অঞ্চলে শুধুমাত্র পাখি দেখার মনো
এসেছি, এবং এই মুহূর্তে জেগে
বেড়াচ্ছি এমন এক দীর্ঘ জলাশয়
যেখানে লক্ষ লক্ষ পাখি নির্ভয়ে
শান্তিতে বাস করছে—এই আপাত
সামান্য ঘটনাটুকুর পিছনে রয়েছে
ভারতে পাখিচর্চার ক্রমিক বিস্তারের
প্রভাব। ভরতপুরের লেক একদ
পক্ষী-শিকারীদের কাছে ছিলো এব
আকর্ষণীয় তীর্থক্ষেত্র। লর্ড কার্জন-
বোধ হয় ইতিহাসের প্রথম উল্লেখ
ব্যক্তি যিনি এখানে একদিনে শতাধিক
পাখি মারার পর বছর দু-একের মধ্যে
দ্বিতীয়বার পাখিনাশে ব্রতী হয়ে ফিরে
আসেন। এখানে শেষতম পাখি-
নাশকদের অন্যতম হলেন জেনারেল
জয়ন্ত চৌধুরী। আমরা ক্রমাগত যে
ভাবে পক্ষী-রাজ্যের অন্তঃপুরে চলে
এলাম, এবং আমাদের চার পাশে
হাজার হাজার রাঙন পাখায় কোথাও
এতটুকু দ্বিধা, সংকোচ, ভয়ের আভাস
পর্যন্ত চোখে পড়লো না, তাতে মনে
হলো ভরতপুরের পাখিরা মানুষের
সান্নিধ্যকে আর বিপজ্জনক মনে করে
না, মানুষ আইনের চাপে পড়ে শেষ

ত তাদের বিস্ময়ের বোঝা হয়ে পেয়েছে।

যে-ছোট্ট পাখিটি নির্ভয়ে সে আমাদের নৌকোর ওপর বসে বার পুচ্ছ নাচিয়ে পাখার জল ছিটিয়ে উড়ে গেলো তাকে র্শনে রাবিন্ পাখি বলে ভুল আসলে যে নীলকণ্ঠ বা। ইউরোপের পাহাড়ী অঞ্চল এই নীলকণ্ঠ পাখিটি এসেছে ভরতপুরের অভয় অরণ্যে। ন উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে যে শো রকম পাখি দেখা যায়, তাদের প্রায় তিনশো রকম পাখিই শ থেকে উড়ে আসে এখানে টা কাটিয়ে যাবার জন্যে। সাগর য়ে যাবার দুরন্ত সঙ্কল্পে অনেক র সারা রাত উড়ে চলে—অবিশ্রান্ত-। কোনো কোনো পাখি এক-াড়ে উড়ে যেতে পারে আড়াইশো োমিটার পর্যন্ত। ভারতে আশ্চর্য মেরুপ্রদেশের টারন্ পাখির বারা এক বছরের মধ্যে উত্তর থেকে মেরু পর্যন্ত গিয়ে আবার পথ নে বাড়ি ফিরে আসে—অর্থাৎ তাদের ন রাখতে হয় পঁয়ত্রিশ হাজার লোমিটার ব্যাপী এক আকাশপথের ন খুঁটিনাটি!

বিদেশ থেকে যে সব পাখি এখানে সে কিছুদিন কাটিয়ে যায় তাদের
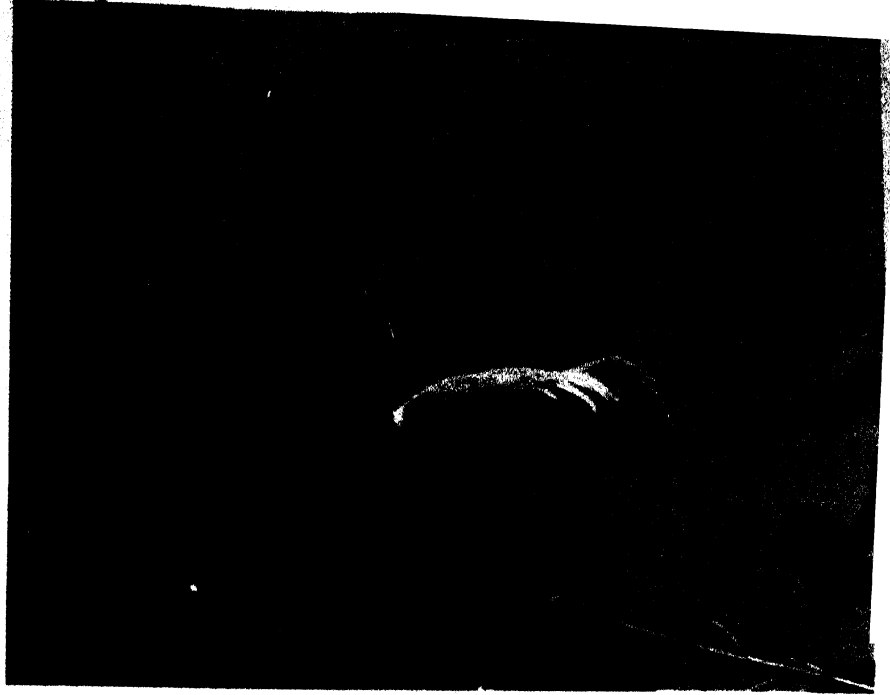
মধ্যে অন্যতম হল পেলিক্যান্, গডউইট, গোল্ডেন প্লভার, সাইবেরীয়া ক্রেন, পচার্ড, পিনটেল্স, গারগানি টিল, ফ্লেমিংগো, শভেলার, ম্যালারড, কুট প্রভৃতি। যে সব ভারতীয় পাখি এদের ঋতুতে-ঋতুতে প্রতিযোগিতা দেয়, তাদের মধ্যে রয়েছে জ্যাকানা, কিং-ফিশার, বুলবুল, আর সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় আইবিস। জ্যাকানা পাখির লম্বা ঠ্যাং, চড়া কণ্ঠস্বর আর চোখের তলা থেকে সাদা দাগ—এ সব কিছু হচ্ছে তাকে চিনে নেবার চিহ্ন। প্রায় ময়না বা চড়াই পাখির মতো খুদে চেহারার কিং ফিশারকে দূর থেকে চোখে পড়ে না, কিন্তু জল থেকে উড়ন্ত অবস্থায় মাছ তুলে নেবার ভঙ্গিটি থেকে কিং-ফিশারকে চিনতে কষ্ট হয় না— মৎস্য শিকারের এমন সাবলীল প্রতিভা আর কোন পাখির আছে বলে জানি না। বিদেশী পাখি কুট-এর সবুজ রঙের পায়ে মনে হয় যেন জলের রঙ লেগে গেছে। কুট সর্বক্ষণ জলেই থাকতে ভালোবাসে। সব চেয়ে জমিয়ে সংসার পেতেছে আইবিস। কচি কচি আই-বিস-এর তারস্বরে চিৎকার শুনে বোঝা গেল সকালবেলায় ওদের খিদের বহর কতখানি।

ভরতপুরের বিস্তৃত পক্ষিনিবাসে ঝিম ধরে দুপুর বেলা। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর পাখিরা একটু ঘুমিয়ে নেয়—নিদেন পক্ষে চুপচাপ বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো মগ্ন হয়ে থাকে। আমাদের নৌকো দ্বিতীয় চক্কর শেষ করে তীরে এসে ভেড়ে। জলাশয়ের ধারেই একটা জায়গা বেছে নিই দুপুর-বেলার খাওয়াটা সেরে নেবার জন্যে। একরাশ চিরপরিচিত গেরস্থ কাক আমাদের ঘিরে প্রত্যাশী হয়ে ওঠে।

ছবিগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

দুটি কবিতা

মানস রায়চৌধুরী

কুয়াশা

কুয়াশা সমস্ত গিলে খায়
ভোরবেলা লাল মোরগের গায় ছবি
মাঠের ওপারে ছিল যে সব সবুজ
তা-ও গেছে কুয়াশার পেটে।

তোমার সুন্দর কাঁধ তরল গড়ন
ভেঙে চুরমার করে যা ছিল কল্পিত
ডালিমের দানা আর শিরার নীলাভ নদী যেন
মূর্ছাহত, পাথর হয়েছে।

আমার সুন্দর ছিঁড়ে তোমার শরীর
তছনছ করে দেয় ছবি
পর্দার ওপারে তুমি যতদিন ছিলে
স্বপ্নে ছিল ওড়ার জাগ্রত ডানা
বিপুল মায়াবী।

শরতের পরে

নীচু মেঘে রৌদ্ররেখা খুলে যায় ফিতে
পৃথিবী কি মনে রাখে কোন্ রমনীর আর্ত বুকে
বসন্ত গিয়েছে তার লাল চুম্বনের দাগ রেখে?
কবিরাই মনে রাখে, মনে রাখে পাখির ডানায়
শব্দহীনতার কিছু অভিমান ছিল
ভাষাহীন অনুষঙ্গে বীজ বেড়ে ওঠে বোধিদ্রুমে।

যা কিছু নির্বাক তা কি মূক ও বধির?
নদীর ওপারে নীচু রৌদ্ররেখা কথাই বলে না
বড়ো মুখ করে আসে পূর্ণিমার চাঁদ
এতো বড়ো—দেখা যায় ভিজে আলজিভ
গাছের গুঁড়িটি ভেঙে বেরিয়ে এসেছে স্বপ্ন সুখ
আকাশের খোলা ভেঙে অদ্ভুত আসক্তিভরা আলো।

খেলার নিয়মে

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

সমস্ত শিশুরা কেন শৈশবে চোর চোর খেলে
তারা তো জানে না চোর দেখতে কেমন
তারা তো জানে না ঠিক চোর কাকে বলে
মাঝে মাঝে কিভাবে যে জুটে যায় সরল পুলিস!

সমস্ত শিশুকালে সবচোর কেন ধরা পড়ে?
হাসিমুখে তারা ফের সাধু হয়ে যায়—
একটি আসল চোর খেলার নিয়মে ঠিক
অন্য সাধুকে ছোঁয়, বলে ওঠে 'চোর!'
এইভাবে, গোপনে বা জ্ঞানে, সবশিশু একদিন চোর হয়ে যায়

জলটুঙ্গি

সমরেন্দ্র দাস

ভাঙা জলটুঙ্গি পড়ে আছে তোমাদের বাগানবাড়িতে এক কোণে
সম্ভ্রান্ত ঘাসের চাদর ঢেকেছে ঘাট, সিঁড়ি খুড়ে খেয়েছে মানুষ
আজ কোন ব্যস্ততা নেই, চুপচাপ গাম্ভীর্য ঢেকেছে বাগান
যত্ন ব্যতিরেকে ফুটে আছে সলমা-চুমকীর মত অজস্র ঘাসফুল
তার কোন গন্ধ নেই, সৌরভে আসেনা মানুষজন কেউ
জলকুক্কুট হিসাব রেখেছে শুধু একা, তার কাজ তামাদি ক্যালেন্ডার যেন

ভাঙা জলটুঙ্গির ভিতরে রয়েছে মরচে পড়া হাত-আয়নার ডাঁটি
খোলা আকাশের নিচে আর সব কিছু অনাবশ্যক হয়ে গেছে এসব
আজ বাগানবাড়ির কোন চরিত্র নেই, পড়ে আছে ব্যক্তিগত স্মৃতি

বাইশ বছর পরে কেন এলে তুমি আজ, ফিরে যাও আত্মসুখী নারী।

সংসার

রবীন্দ্র বিশ্বাস

যেখানেই যাই, ফিরে এসে মুখ দরজা খুলে দেখি
গতানুগতিক মেঝে চিৎ হয়ে পড়ে আছে চুপ,
অভ্যর্থনা নিয়ে চুপচাপ। কুজোভর্তি জলে ভরা
তৃষ্ণার অভ্যাস। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে
সিন্দুকের মতো বসে বউ; নন্দন মুহূর্ত বহু পাটে পাটে
সাজানো গোছানো।
বিপ্লবী পশ্চাৎটান, রোমান্টিক ধুলো,
ট্রেনের মোহন ডাক, দেয়ালে ছবির মধ্যে দোলে।

ঈশ্বরের মতন আদি অন্তহীন

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

শাঁখের মুখ—ভিতরে আসে, বাইরে যায়
হাওয়া।
বুকের মধ্যে শব্দ গড়ে সময়।
ঈশ্বরের মতন আদি অন্তহীন আসা এবং যাওয়া—
মিল দেখাবার প্রধান অন্তরায়ঃ
জমায় আছে খরচ লেখা, খরচ খাতে জমা।
শব্দ কেবল হারিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে হাওয়া।

বুকের মধ্যে শব্দ গড়ে সময়।
যে'পথ দিয়ে এসেছিল, সেপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়
হাওয়া।
শাঁখের মুখে আমার মন, যন্ত্রণায়
মর্মভেদী শব্দময়
চমকানো এক ভাষাতে তর্জমা।
ঈশ্বরের মতন আদি অন্তহীন সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায়।

স্বর্ণোদ্যানের প্রাণীরা মানুষের আচরণ দেখে হতভম্ব...

হিস্....?
হিজ্...?

স্বর্ণোদ্যানে : শিকারীরা
?
চালাও গুলি!
খবর্দার!

তুমি আমাদের তাক করে গুলি চালিয়েছিলে কেন?
তোমরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করে শিকার করছ কেন? এ-দ্বীপ আমার।
কে তুই মুখোশ পরা গুণ্ডা? তোকে খতম করব!

'অরণ্যদেব বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষিপ্র'— অরণ্যের প্রবাদ।
আঃ!
দমাস!

আগেই আমি ওদের সাবধান করে দিয়েছিলাম! ওরা শোনেনি!
কে তুমি?
আঃ!
উঃ...!

আমি ওদের পাইলট।
তীব্র শিস্ দিলেন অরণ্যদেব...

সেই শিস শুনে এগিয়ে আসছে গুহা-মানব আর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী...
??!!
7/3
চলবে

কেঁদুলীর বাউল মেলায়

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্'

জনৈকা প্রেমিকা তাঁর বাঞ্ছিত পুরুষকে কবি জয়দেবের একখণ্ড শ্রীগীতগোবিন্দ উপহার দিয়েছিলেন। শুধু উপহারই দেন নি, টাইটেল পৃষ্ঠায় সযত্নে স্বহস্তে তিনি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন ওই গ্রন্থেরই দশম সর্গের উপযুক্ত অমর পংক্তি দুটি, যার অর্থ তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন—তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্ন। প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার হৃদয়াবেগ প্রকাশের এ ছাড়া আর কী উপযুক্ত পংক্তি হতে পারে? চিরদিনের সাধক-সাধিকা ও দয়িত-দয়িতারা শ্রীগীতগোবিন্দ ছাড়া পরস্পরকে প্রদেয় অনুরাগী উপহার হিসেবে দ্বিতীয় চিন্তা বিনা অতি সহজেই আর কোন্ গ্রন্থ নির্বাচন করতে পারেন যা জয়দেবের ওই অমর কাব্যের সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে?

সেই প্রেমিকা এখন মধ্যবয়সে উপনীতা। একদা যিনি প্রেমিক তিনিই এখন তাঁর স্বামী। বিবাহ-পূর্ব প্রণয়ের দিনগুলিতে ওই উপহারগ্রন্থ সম্প্রদানের ব্যাপারটি ঘটে থাকলেও এখনও সময় পেলে তাঁরা পুরনো সেই বইটি হাতে তুলে নেন, সময় পেলে পড়েন, বারবার পড়েন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রন্থের আকর্ষণ তাঁদের কাছে এতটুকুও ম্লান হয়ে যায় না। প্রণয়ের স্মারকবস্তু হিসেবে তাঁদের কাছে ওই গ্রন্থটির পৃথক মূল্য থাকলেও শ্রীগীতগোবিন্দের কাব্যমূল্য এবং তার আবেদন চিরন্তন বলেই তাঁরা স্বীকার করেন।

কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দের এই সমাদর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হাজার হাজার নরনারী শতাব্দীর পর শতাব্দী কবি জয়দেব ও তাঁর বিশেষ এই গ্রন্থটির অন্তর্গত 'প্রবন্ধ' সংগীতকে হৃদয়ের অকপট

খোলা আকাশের নিচে গান। গাইছেন সুধীর দাস বাউল

ভালোবাসার সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার অন্তর্গত অজয় নদের তীরবর্তী গ্রাম কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী বলেই জনশ্রুতি। এই গ্রামে জয়দেবের স্মরণে পৌষ সংক্রান্তির সময় বেশ বড় একটি মেলা হয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বহু বাউল গায়ক এসে সেখানে সমবেত হন। বাউলদের তীর্থক্ষেত্র কেঁদুলী। বৃদ্ধ বাউল থেকে শুরু করে একেবারে অল্পবয়সী কচি-কাঁচা বাউল পর্যন্ত পৌষসংক্রান্তির সময় ছুটে আসেন এখানে। কেঁদুলী গ্রামের স্থায়ী আখড়াগুলির পাশাপাশি ধানকাটা মাঠের ওপর ত্রিপল বা চট টাঙিয়ে, শিশির-ভেজা মাটির ওপর বিছিয়ে সোনালী খড়, গড়ে ওঠে একাধিক অস্থায়ী আখড়া সেখানে এসে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নেন বাউল, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীরা। বাউলরা সমবেত হন বলেই জয়দেবের গ্রাম কেঁদুলীর এই মেলা আজ বাউলমেলা হিসেবেই জনসমাজে পরিচিত। ধূসর শহরজীবন থেকে অনেক দূরে, মন-কেমন-করা নদীর তীরে খোলামেলা গ্রামীণ পরিবেশে সারা দিন সারারাত ধরে মনপ্রাণ মিটিয়ে বাউল গান শোনার এমন সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। দূর দূর বহু শহর থেকে তাই অজস্র অগণ্য নরনারী এখানে ছুটে আসেন শুধুমাত্র বাউল আর তাঁদের অসাধারণ গানের আকর্ষণে। মেলার কয়েকদিন অজয় তীরের কুশেশ্বর শিবমন্দির, শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ সমন্বিত, পোড়ামাটির অপরূপ কারুকার্য অলঙ্কৃত সুবিখ্যাত নবরত্ন মন্দির, অবধূত কাঙাল ক্ষ্যাপাচাঁদের পঞ্চদশমুখী সিন্ধাসন, কালীর নাট্যশালা কিংবা শ্রীধাম বৃন্দাবনাগত রাধারমণ-ব্রজবাসী নামক জনৈক সাধুর প্রতিষ্ঠিত মঠ প্রভৃতির চেয়েও যেন জলজ্যান্ত নির্ভেজাল বাউল-বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরাই হন উপস্থিত সকলের মনোযোগের প্রধান বিষয়। অনেকে মকর-সংক্রান্তির দিন অজয়ে পুণ্যস্নানের জন্যও এখানে এসে সমবেত হন। অজয়ের জলে এখন হাঁটু, তো দূরের কথা গোড়ালিও ভেজে না। কদমখণ্ডীর সেই ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘাট যেখানে জয়দেব রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি, আজ শুধু ঘোলাজলের মন্থর স্রোতের ক্ষীণ সম্বলটুকু নিয়ে লেপে মুছে যাওয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু যাঁরা পুণ্যার্থী জল ঘোলা বা আবিল হলেও পুণ্যার্জনে তাঁরা পিছপা হন না। কম্বল নদীতীরে কারও কাছে গচ্ছিত রেখে খুব ভোরে লোটা নিয়ে তাঁরা নেমে যান নদীজলে। অবগাহন হয় না, হয় অন্যতর স্নান। সেই সুখেই তাঁরা বিভোর।

এক সময় কেঁদুলী যেতে বেশ সময় লাগত। যাত্রীবাহী পুরনো নড়বড়ে বাস তার অযান্ত্রিক কাণ্ড-কারখানার প্রভূত পরিচয় দিয়ে স্থানে অস্থানে যাত্রী সংগ্রহে বহু সময় খরচ করে অবশেষে গিয়ে পৌঁছত সুদূর কেঁদুলী গ্রামে। এইসব বাসের যাত্রীরা সচরাচর যাত্রার সময় বিষয়ে হন যথেষ্ট নির্বিকার। কোন রকমে বাসে একবার দেহ রাখতে পারলে হল! এর পর তাঁরা শালপাতায় জড়ানো চুটি বা গ্রামীণ কুটীরশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা প্রিয় একটি বিড়ি ধরিয়ে অন্য কোন দিকেই আর মনোনিবেশের প্রয়োজন অনুভব করেন না। সনাতন ভারতীয় জীবনবোধ ও দর্শনের আদর্শে আজন্ম লালিত-পালিত বলে তাঁরা অতঃপর আর ইহকাল পরকাল বিষয়ে জটিল বা কূট কোন চিন্তায় নিবিষ্ট হন না। কোন বিষয়েই অহেতুক ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় না তাঁদের। তাঁদের এই আচরণ যথেষ্টই ফলপ্রসূ হয় তখন যখন দেখা যায় যে, অযান্ত্রিক যান এক সময় বাক্স পেঁটরার মত তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে মেলার আঙিনায়। এ-দেশে পুণ্যার্জনে গাঁটের কড়ি খুব বেশি পরিমাণ খরচের আশংকা থাকে না। তাই হয়ত এইসব মেলায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা হয় অন্যান্য মেলার তুলনায় বেশি। সদাব্যস্ত শহুরে মানুষের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা বলতে হবে। মনে মনে তাঁরা যখন নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন যে কেঁদুলীর মেলায় পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে তখনই তাঁরা পেলেন আরেক নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদ। বীরভূম জেলা বাস কর্তৃপক্ষ এবার বোলপুর, দুবরাজপুর ও সিউড়ি থেকে কেঁদুলীর মেলার জন্য অন্তত ষাটটি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেলাগামী বহিরাগত মানুষ বোলপুর বা দুবরাজপুর স্টেশনে নেমেই এ বার্তা পেয়ে গেলেন। এবং তাঁদের পূর্বলব্ধ যাবতীয় সন্দেহের নিরসন করতে চোখের সামনে ছিল সেই সব অপেক্ষাকৃত বিশেষ যান যার ক্লান্তিহীন, সম্ভাব্য যাত্রীদের অন্বেষণে গোয়েন্দার মত সজাগ কণ্ডাকটর ও ক্লিনারবাহিনী গলার সবটুকু শক্তি সুসংহত করে মুহূর্তে মুহূর্তে ঘোষণা করছিলেন 'খালি গাড়ি, খালি গাড়ি—জয়দেব জয়দেব'। গাড়ি অবশ্যই 'খালি' ছিল না। কিন্তু তবুও উদ্গ্রীব যাত্রীদের কর্ণকুহরে সেই সন্দেশ পৌঁছনোর প্রয়োজন ছিল অতি তীব্র ও জরুরি। তদুপরি বিশেষ বাসের ড্রাইভার গাড়িতে আগে থেকেই স্টার্ট দিয়ে রেখেছিলেন একথা বোঝাতে যে তাঁর যান অবিলম্বে গন্তব্যাভিমুখে রওনা হতে যাচ্ছে। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ নেই। তাঁর 'খালি গাড়িতে' সামান্য একটি ছুঁচ প্রবেশের স্থান না থাকলেও কণ্ডাকটর ক্লিনারদের সুমধুর আহবানে আকৃষ্ট হয়ে যাত্রীরা সেই যন্ত্রযানের ছাদে বা আশপাশে শরীর স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্যামিতিক স্থান-টুকুর সন্ধানে বন্য, সুস্থ, স্বাধীন হরিণের মত চপলগতি হতে দ্বিধা করছিলেন না। মেলার

অজয়ের চরে একতারা হাতে বাউল

কয়েকদিন এভাবে বোলপুর-দুবরাজপুর-সিউড়ীর বাস স্ট্যাণ্ডে অঘোষিত হাণ্ড্রেড মিটার, টু হাণ্ড্রেড মিটার দৌড় ও জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা লেগেই ছিল!

কেঁদুলী সংলগ্ন টিকরবেতা গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল মেলার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। বাস-ট্যাক্সি-ট্রাক-টেম্পো ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে। পর পর কয়েকটি মাঠের আল কেটে পথ এগিয়ে গিয়েছিল আরও কিছুটা। পাশেই মেলা প্রাঙ্গণ। দূরে অজয়ের সাদা বালি। শীর্ণ স্রোত। ওপারের ধোঁয়াটে ঝাপসা দিগন্তে শালবনের রেখা। শীতের দুপুরের মিঠে রোদ। গরুর গাড়ির ছই। মেলার ছাউনি। এপাশে যন্ত্রযানগুলির সাময়িক আস্তানা। ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে মাঠে। মাঠে ছোট গর্ত খুঁড়ে কিংবা ইঁট পেতে খড়কাঠ পুড়িয়ে রান্নার আয়োজন হয়েছে। বাস রিজার্ভ করে দূর-দূর অঞ্চল থেকে যাত্রীরা এসেছেন দলবেঁধে। সঙ্গে শিশু মহিলা এবং প্রায় আপাদমস্তক শৈত্যনিবারণী পোশাক-মোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। রাত্রি জাগরণের পর তাঁরা কেউ মাঠেই সতরঞ্চি বিছিয়ে যতটা সম্ভব নৈশনিদ্রার ঘাটতি পুষিয়ে নিচ্ছেন, কেউবা আবার নিছক আলস্যের কোলে সমর্পণ করেছেন শরীর। দূরে রৌদ্রে ঝিমোচ্ছে রবিশস্যের সবুজ মাঠ। কচি ধনে-সবুজ গমচারা। হেমন্তের ফসল ঘরে ওঠার পর অন্যান্য ক্ষেতের চেহারা রুক্ষ, শূন্য। এই পটভূমি রবিশস্যের মাঠগুলিকে আরও সবুজ করেছে। মাঠের আল ধরে পায়ে পায়ে মেলার দিকে এগিয়ে আসছেন গেরুয়া পোশাক পরা একজন বাউল। রঙের আশ্চর্য কনট্রাস্ট। বাস আস্তানার ওপাশেই ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নানা পোস্টার-সম্বলিত স্টল। সার কর্পোরেশনও একটি স্টল করেছেন ; দেখলাম। ফার্নিচারের দোকান। সেখানে বিক্রি হচ্ছে আধুনিক সোফা সেট, সোফা-কাম-বেড, ল্যামিনেট বসানো খাবার টেবিল। এসবের মাঝেই আবার রাশি রাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে কাষ্ঠনির্মিত নানা দামের ছোট-বড় সিংহাসন। গৃহস্থবাড়িতে এগুলিতে গৃহদেবতা বা আরাধ্য দেবতারা থাকেন। ফার্নিচারের দোকানের পাশেই আবার পাথর ও লোহার বাসন-পত্রের দোকান। গ্রামের মানুষ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখান থেকেই সংগ্রহ করেন। মাঠে জল-সেচের জন্য ডিজেলচালিত পাম্পসেটের ইদানীং খুব কদর হয়েছে। এ-কাজের জন্য এক সময় পাতলা লোহার পাতের 'দুন'-এর খুব ব্যবহার দেখেছি গ্রাম-ঘরে। এবার মেলায় ওই 'দুন' বেশ বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। মাঠে চট বিছিয়ে কিছু দোকানী টিনের পাতের চাল-ধোয়া 'টোকা'র পসরা সাজিয়েছিলেন। কবি জয়দেব তাঁদেরও প্রভাবিত করেছেন দেখা গেল।

অতিথিখ্যাত 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' কথাটি ওইসব 'টোকা' বা 'ঝাঁঝরি'-র ছিদ্র দিয়ে লেখা হয়েছিল। মেলায় কেউ কেউ বাউলদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র গাবগুবি বা গোপীযন্ত্র বিক্রি করছিলেন। কিন্তু বাউলরা সচরাচর ওইসব যন্ত্র নিজেরাই বানিয়ে থাকেন। সহযোগী বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিয়েই তাঁরা মেলায় আসেন, যান গানের আসরে। ফলে মেলায় স্যুভেনির সংগ্রহের জন্য যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন তাঁদেরই ওইসব গোপীযন্ত্রগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা গেল। মেলাতেই দেখলাম আশেপাশের গ্রামের মানুষ তাঁদের নিজের হাতে তৈরি ছিমছাম কাঠের পুতুল বিক্রি করছেন। কেউ কেউ খদ্দেরদের সামনে বসেই রঙ তুলি নিয়ে পুতুলের চোখমুখ আঁকছিলেন। বাউলদের আখড়ার দিকে যেতে যেতে মেলার মানুষ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে অপলকদৃষ্টিতে দেখছিলেন তাঁদের হাতের কাজ আর সহজ সাবলীল তুলির টান। পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে আত্মস্থ শিল্পী কাজ করছেন—এই দৃশ্য দেখা মেলার মানুষের কাছে ছিল উপরি পাওনা। জঙ্গীপুরের হাতি-পায়া লুচি, খাজা আর এক পোয়া আধ সের ওজনের রসগোল্লাও কিছু কম লোক টানেনি।

কিন্তু আগেই বলেছি কেঁদুলী মেলার প্রধান আকর্ষণ বাউল ও বাউল গান। আধুনিক মাইক্রোফোনের কল্যাণে মেলার আকাশ-বাতাস সর্বদাই মুখর হয়েছিল বাউল গানে। সম্প্রতি কেঁদুলী গ্রামে বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে বাউলদের আখড়াগুলিতেও রাতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে দেখা গিয়েছে। ব্যাটারি-চালিত মাইক্রোফোনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এর আগেই। আজকাল আখড়াগুলিতে শ্রোতাদের ভিড় এত বেড়েছে যে অনেকেই মধ্যরাতে প্রখর ঠান্ডায় খোলা মাঠে বসে গান শুনতে বাধ্য হন। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এক-আধবার মাইক বন্ধ হয়ে গেলে বাইরের শ্রোতাদের কানে গান একবর্ণও পৌঁছয়নি। দূর থেকে সঙ্গীতরত বাউলদের দেখে তখন মনে হয়েছে যেন তাঁরা মাইম করছেন। মাইকের ব্যবহারে এইজন্য কোন আপত্তি তোলার কারণ দেখি না। কিন্তু আপত্তিটা অন্যখানে। আখড়াগুলি এত কাছাকাছি অবস্থিত যে অনেকগুলি লাউডস্পীকার শুধু হট্টগোলেরই সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে কোন একটি গান শোনা তখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল বাউল পদকর্তা আশানন্দনের সঙ্গে। হেতমপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। ছোটদের জন্য ছড়া লিখে তিনি বেশ কিছুটা পরিচিতি পেয়েছেন। ছড়া আর কবিতা দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু একান্তভাবে মনে মনে যিনি বাউল তিনি কেন ছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিসরে মিছিমিছি নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। আশানন্দনের পদ আজকাল সব বাউলরাই গেয়ে থাকেন। প্রতি বছর কেঁদুলীর মেলায় আসেন আশানন্দন। এখনকার মেলা সম্পর্কে এই মধ্যবয়সী পদকর্তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। আশানন্দন বললেন, মাইক আসায় গানের আসরে বাউলের চলাফেরার ছন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাউথপিস থেকে সে আর কিছুতেই সরে যেতে পারে না। কোটুর বাবার আশ্রমে নিতাই ক্ষ্যাপার গান শুনেছিলাম। সে অভিজ্ঞতা কোনদিন ভুলতে পারব না। বিদ্যুতের আলো এসে রাত্রির সেই সৌন্দর্যও নষ্ট করে দিয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় বা হ্যাজাগ জেলে যে গান তার সৌন্দর্যটাই আলাদা। অন্ধকারে অজয়ের ওপারে গিয়ে বা দূরের বালির চরে বসেও তখন আমি গান স্পষ্ট শুনতে পেতাম।

কিন্তু মাইক যে এখনও প্রবীণ বাউলদের গান আর নাচের ছন্দ নষ্ট করে দেয়নি আমি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেলাম কয়েকটি আখড়ায়। আখড়াগুলিতে যে-কোন বাউল গিয়ে গাইতে পারেন। বাউলরা আখড়া থেকে আখড়া ঘুরে ঘুরে গান করেন। সব আখড়াতেই সকলের আমন্ত্রণ। কানাই ক্ষ্যাপার আখড়ায় পুরুলিয়া জেলার চিপিদা গ্রামের প্রবীণ বাউল ভূতনাথ গোস্বামীর গান শুনলাম। চোখে পুরু কাচের চশমা। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ধূলিমলিন সাদা পোশাক। আত্মহারা ভূতনাথ গাইছিলেন :

আমার কী ধন আছে সংসারে
যাই কোথায় রাই বল দেখি আমারে॥
ওগো তুই যে আমার প্রাণের রাধা
প্রাণ জুড়ায় তোরে হেরে॥
তোর জন্যে রাই শিখলাম বাঁশরি
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে বাজাই বাঁশরি
তোর জন্যে গিরিধারী নাম
ধরলাম ব্রজপুরে॥
তোর জন্যে রাই নিধুবনে
কালীরূপ ধারণ করলাম তোরই কারণে
তোর জন্যে রাই বাঁশি ছেড়ে
অসি ধরি বাম করে॥
রাধে গো এখন উপায় কী করি
বল দেখি আমারে॥

ভূতনাথ গাইতে গাইতে ভাবাবেগে মাইকের মুখ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিলেন। এক হাতে তাঁর একতারা, অন্য হাতে প্রেমজুরী। মাইকের প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। গান তাঁকে পাগল করেছিল। করেছিল দিব্যোন্মাদ। রাইকে তিনি কখনও 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করছিলেন। কখনও গমকে এসে সুরমাধুর্য হারিয়ে যাচ্ছিল কণ্ঠের। কিন্তু সব মিলে তিনি এমন এক গান পরিবেশন করলেন যা আমাদের মোহিত ও মুগ্ধ করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। মাইক তাঁর ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে হুগলি জেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামের দীনবন্ধু দাস ও বাঁকুড়ার খয়েরবনি গ্রামের বাউল সনাতন গোসাইয়ের গানে। তথাকথিত বিদঘুটে মাইকের উপস্থিতি এই দুই প্রবীণ বাউলের গানে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। স্কাটা গ্রামের অনুরাগী সাঁইয়ের স্মৃতিপূত অনুরাগী সেবাশ্রমে মধ্যমণি হয়ে বসেছিলেন সনাতন গোসাই।

বাউলমেলায় সাবিত্রী দাসী

তাঁর গান শুরু হওয়া মাত্র অন্য এক আখড়া ফেরত আমরা তাঁর সামনে বসে পড়লাম। প্রথমে তিনি বসে বসেই গাইলেন। সামনে তাঁর চায়ের ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের ঢাকনায় নুন। গলা ঠিক রাখার জন্য দু আঙুলের ডগায় সামান্য একটু নুন তুলে নিয়ে গানের সময় মাঝে মাঝে তিনি তা জিহ্বা ও কণ্ঠনালীতে ছড়িয়ে নিচ্ছিলেন। ভাবগম্ভীর চেহারা সনাতন গোসাইয়ের। ভরাট, ভারী গলা। আচার-আচরণে কোন চপলতা নেই। নেই আড়ষ্টতাও। দ্বিতীয় গানের সময় তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। আত্মবিশ্বাসী, অথচ অহংকারী নন তিনি। ধীরে সুস্থে তিনি গান ধরলেন :

দিনদুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো ভার
হল অমবস্যায় পূর্ণচন্দ্র
তাই তের প্রহর অন্ধকার॥
ময়রা মামী কুলের স্বামী বসে রয়েছে
তার গর্ভেতে তিনজনাকার জন্ম হয়েছে
তাই রাজবাড়িতে টাট্টু ঘোড়া
শিং বেরোল দুটো তার॥

এই পদের একাধিক পাঠ আমি পেয়েছি। বিভিন্ন সময়ে অনেক বাউলের কণ্ঠেই শুনেছি এই গান। কিন্তু সনাতন গোসাইয়ের কণ্ঠে এই গান শোনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর কোন কিছুরই তুলনা চলে না। তাঁর নাচের প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্বনির্দিষ্ট। আবেগের বশে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না।

এমনই তাঁর নাচের পদক্ষেপ যে মাইক্রোফোন থেকে কখনই দূরে সরে তাঁকে সরে যেতে হয় না। ও ক্ষ্যাপা মন রে' বলে গানের কোন পংক্তির সূচনায় তিনি যখন সুর করেন, তাঁর একতারা-ধরা হাত প্রসারিত হয়ে যায় আকাশে। বড় মনোরম সে-ভঙ্গি। ইদানীং ওভাবে গাইতে খুব কম সংখ্যক বাউলকেই দেখি।

সেদিন মধ্যরাতে সনাতন যখন গান ধরেছিলেন ভারী সুন্দর এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলাম আমরা কয়েকজন। সনাতন গাইছিলেন—এসে গৌরলীলার বাজারে অবাক যাই হেরে এক ছুঁচের ছিদ্র মজার কথা পার করে গজবরে। অন্যান্য বাউলরা তখন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সংগত করছিলেন। সহযোগী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল মন্দিরা, গোপীযন্ত্র, ডুবকি, বাঁশি, হারমোনিয়ম, খোল ইত্যাদি। গান জমে উঠেছে। এমন সময় পিছনের ভিড় ঠেলে সশব্দে এগিয়ে এলেন আরেকজন প্রবীণ বাউল। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং দীনবন্ধু দাস। সদা হাসিখুশি এই বাউলের হাতে পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার। তিনি ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে একজন বাউলের কাছ থেকে মন্দিরা নিয়ে সংগত করতে লাগলেন। তার আগে অবশ্যই তিনি তাঁর টেপ রেকর্ডারটিকে সক্রিয় করে দিয়েছেন। সনাতনের গান যেন নতুন করে জমে উঠল। প্রবীণ শীর্ষস্থানীয় একজন বাউলের প্রতি আরেকজন প্রধান বাউলের এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান প্রদর্শনের ঘটনায় আমরা সবাই অভিভূত হলাম। এক সময় গান শেষ হল। দীনবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। গুছিয়ে হাতে তুলে নিলেন টেপ। মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, বাউল সনাতন গোঁসাই কী সৌভাগ্য আমার। এরপর ভিড় ঠেলে প্রস্থানোদ্যত দীনবন্ধুকে আমরা ঘিরে ধরে গানের অনুরোধ জানাই। উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমার যন্ত্র ফেলে এসেছি।

বললাম, এখানে তো যন্ত্র আছে নিন না।

এক প্রবীণ বাউল

তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছেন দীনবন্ধু। মুখে সেই হাসি। হাসতে হাসতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন আখড়ার বাইরের অন্ধকারের দিকে। আমাদের দিকে পিছন ফিরে আশ্বাস দিয়ে গেলেন—নিয়ে আসছি, আমার দোতারাটা নিয়ে এক্ষুণি চলে আসছি। গান শেষে কম্বলের উপর বসে আছেন সনাতন। বাউল দীনবন্ধুকেও তিনি জানালেন শ্রদ্ধা। বললেন, বাবা চা পাঠিয়ে দিয়ো।

দুই বাউলের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এই মধুর অভিজ্ঞতা এবার আমি অর্জন করেছি কেঁদুলীর বাউল মেলায়। এ ঘটনা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সনাতনের আসরে আমাদের সঙ্গে শ্রোতা ছিলেন আশানন্দন। সনাতন তাঁকে গড় হয়ে নমস্কার করে সামনে এসে বসার অনুরোধ জানালেন। আশানন্দন অবশ্য আমাদের সঙ্গেই থাকলেন। প্রতি নমস্কারের মাধ্যমে সবিনয়ে তিনি সে-কথা জানিয়ে দিলেন সনাতনকে। এই বিনয়, পরস্পরের প্রতি এই শ্রদ্ধা আমাদের জীবন থেকে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। পরস্পরকে আমরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে শিখছি। একে অন্যের প্রতি আমরা হয়ে পড়ছি অবিশ্বাসী, অমনোযোগী ও ঘৃণাশীল। কিন্তু বাউলরা যেন এই মালিন্যের ঊর্ধ্বে এক অন্য জগতের লোক। তমোগুণ তাঁদের মধ্যে যে থাকে না তা নয়। কিন্তু মাধুর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অন্যান্য গুণরাশির তুলনায় তার পরিমাণ এতই নগণ্য যে সহজেই তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি। বেশ কয়েক বছর আগে সিউড়ী থেকে কলকাতা আসার সময় সাঁইথিয়ার বাউল সুধীর দাস ট্রেনে আমাকে একটি গান শুনিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সেই গানটির কথা মনে পড়ল:

বাউলের আউল কথা বাউল বিনে বুঝবে কে
বাউল হয়েছে যে বাউলের মর্ম বুঝেছে সে॥
রূপসনাতন বাউল ছিল
বাহাম লক্ষ্য ছেড়ে দিল
ব্রজের পথের ধূলি মাথায় নিল
তারা রূপরসে ভাসে॥
যার ঘুচেছে সব আউল
সে চিনেছে ওলের মূল
ঘুচায়ে কুটকুটি গুল
পান করে মধুর রসে॥
যত সব বিষয়-ওল
তাতে আছে গণ্ডগোল
বিষয়-ওল বাদ দিয়ে বাউলের আউল মেশে॥
আমার বাউল হতে ছিল সাধ
মায়াবাদই বিষম বাদ
কৃপা করি দাও প্রসাদ এ মোহন দাসে॥

সব সাধনার মূলে মানুষ—বাউলদের এই বিশ্বাস ও প্রতীতির কথা সেদিন আবার নতুন করে পেলাম সনাতন গোঁসাইয়ের গানে। মানুষের প্রতি এই ভাবভালোবাসাই সব শ্রেণীর মানুষের কাছে বাউলদের প্রিয় করে তুলেছে। সনাতন গাইছিলেন:

আছে মানুষ এই মানুষেতে
মানুষ আছে হুঁশেতে॥
হুঁশ থাকলে হয় সে মানুষ
মানুষ হয় নাকো বেহুঁশেতে॥
মানুষ চণ্ডাল মানুষ দয়াল
মানুষ মনিব মানুষ বাগাল
মানুষ হয়ে নন্দের দুলাল
উদয় হলেন নদীয়াতে॥
মানুষ ইতর মানুষ ভদ্র
মানুষ নরক মানুষ শুদ্ধ
মানুষ মুক্ত মানুষ বদ্ধ
মানুষেরই মায়াতে॥
মানুষ শিক্ষক মানুষ ছাত্র
মানুষ পাত্রী মানুষ পাত্র
মানুষ হয় মানুষের বাধ্য
মানুষেরই প্রেমেতে॥
মানুষ বাঁকা মানুষ সোজা
মানুষই ভূত মানুষ ওঝা
মানুষ রাজা মানুষ প্রজা
এই মানুষে পূজিতে॥
মানুষেই মানুষকে মারে
মানুষেই মানুষকে ধরে
মানুষেই মানুষকে সারে
সারে গো অসারেতে॥
কেউ যদি মানুষ হতে খোঁজ
তবে মানুষ মানুষকেই ভজ
দাস নিত্য বলে নিত্য পূজ
মানুষের চরণেতে॥

সহজ সুরে সহজ ভাষায় বিভিন্নভাবে এই মানুষের কথাই শুনলাম পবন দাস, সুধীর দাস, বিশ্বনাথ দাস, গৌর ক্ষ্যাপা, দীননাথ দাস, লক্ষণ দাস, চক্রধারী প্রভৃতি বাউলের গানে। কেউ কেউ ফিল্মের ঢঙে গান গেয়ে বাউল গানের আবহাওয়াকে কলুষিত করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি অন্য উদাহরণও ছিল যথেষ্ট। সাবিত্রী দাসী, ছায়া দাসীর গান এখনও কানে বাজছে। দশ বারো বছরের মেয়ে ছায়া। বাবা ভক্ত দাস বাউল, মা এবং দিদি সাবিত্রী দাসীর সঙ্গে সে মেলায় এসেছিল। এই বয়সেই তার কণ্ঠে গান যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তা বলার কথা নয়। বাউলের আখড়ায় একের পর এক গান হয়ে যায়। বাউলরা সকলেই একে-একে অংশ গ্রহণ করেন। শহরের জলসার নিয়মকানুন এখানে অচল। বাউলরা মাইকের সামনে এসে গান শুনিয়ে যান। তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয় না। গানের আগে বা পরে উৎসাহী শ্রোতারা তাঁদের নাম জেনে নেন। গান হলে হাততালি দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। নীরবে নিঃশব্দে অ্যাপ্রিসিয়েশনের পালা শেষ হয়। ভালো লাগার অভিব্যক্তি শুধু ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে-মুখে। পরে ঘরোয়াভাবে আত্মীয়-পরিজন মিলে গানের আলোচনা হয়। উপর্যুপরি কয়েকদিন ধরে চলে গানের আসর। প্রায় সব রকমের

কেঁদুলীর রাধাবিনোদ মন্দির

বাউল গানই সেখানে গাওয়া হয়। শ্রোতারা যার যা ভালো লাগে। অজস্র, অঢেল গান শোনার আশায় তাঁরা আসেন। আশা পরিতৃপ্ত করেই তাঁরা বাড়ি ফেরেন। বাউলরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন কেঁদুলীর মেলার জন্যে। পথ খরচ সংগ্রহের জন্য তাঁরা ধারদেনা করতেও পিছ-পা হন না। কিন্তু গান শুনিয়ে যে শ্রোতাদের কাছে তাঁরা পয়সা নেন তা নয়। খুশী হয়ে যদি কেউ কিছু দেয় তাহলে সানন্দে তাঁরা তা গ্রহণ করেন। মেলার কয়েকদিন খাওয়া পরার চিন্তা থাকে না। বিভিন্ন আখড়া ও আশ্রমে বড় বড় ডেকচি, কড়াই ও হাঁড়িতে মচ্ছোবের জন্য রান্না হয়। খিচুড়ি কিংবা ভাত। সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারি, বেগুনভাজা, চাটনি ইত্যাদি। যাত্রীরাও পাতা পেড়ে বসে যান মচ্ছোবে। উষ্ণ ভাত বা সুস্বাদু খিচুড়ির গন্ধে বাতাস ম-ম করে ওঠে। রসনার তৃপ্তি হয় সেই ভোজে। আমরাও সাধু, সন্ত ও বাউলদের পাশাপাশি পাতা সাজিয়ে বসেছিলাম। মচ্ছোবের সময়

সৌন্দর্যের জগতে নতুন আলোড়ন

ল্যাকমে ক্যালামাইন

যা এর আগে আপনি কখনোই ব্যবহার করেন নি।

Lakmé Calamine

কোমল ও ঝলমলে দীপ্তি

আকর্ষণীয় তিন রকম শেড

সুরভিত সুগন্ধ

আর যারা ওদের বাজিয়ে গাইছিলেন :

সাধু সঙ্গ জোটে রে

মহাপ্রসাদ লোটো রে ॥

শ্যামকুণ্ডে মারো ডুব

রাধাকুণ্ডে ওঠো রে ॥

মহোৎসবের সময় আখড়া ও আশ্রমের কর্মকর্তাদের বিনয় ও শিষ্টাচার সকলেরই বিশেষভাবে চোখে পড়বে। তাঁরা আখড়া ও আশ্রমাগত চেনা-অচেনা সব মানুষকেই হাত জোড় করে বলেন—এখানেই দুটি সেবা করে যাবেন। যিনি আরও বিনয়ী তাকে বলতে শোনা যায়—প্রসাদ পেতে আজ্ঞা হোক। মহোৎসবে আমার পাশে খেতে বসা বাউলের পোষাক-ধারী জনৈক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি কি বাউল? দেখা গেল বিনয়ে তিনিও কারও চেয়ে কম যান না। হেসে তিনি উত্তর দিলেন—যা বলবেন।

মেলার কয়েকদিন আগে বৈষ্ণব সাধক, মনীষী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। তাঁর গ্রাম কুড়মিঠা কেঁদুলী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবি জয়দেব, পদ্মাবতী ও 'শ্রীগীতগোবিন্দ' সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাকে বলা হয় 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-এর নবাবিষ্কর্তা। মেলার সময় প্রায়ই তিনি কেঁদুলী আসতেন। মেলায় তাঁর অভাব এবার বিশেষভাবে অনুভব করলাম। জয়দেব অঞ্চল সংস্কৃতি পরিষদ

মেলায় পুণ্যার্থী

তাঁদের 'কুশেশ্বর' পত্রিকার মকরসংক্রান্তি সংখ্যাটিকে প্রয়াত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন।

আমরা কেঁদুলী গ্রামের জনৈক গৃহস্থের খড়ে ছাওয়া একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। বলা ভালো সৌভাগ্যবশত এই ঘরটি আমাদের কপালে জুটেছিল। কয়েক মিনিট দেরি করলে এটিও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। সুখের কথা যে, কেঁদুলীতে ট্যুরিস্ট লজ বা হোটেল নেই। তাহলে বঙ্গীয় বাবুসমাজ সেখানে আরও বেশি সংখ্যায় গিয়ে হামলা করতেন। মাঘে বাঘের হাড় কাঁপানো শীতে সুখের শরীর কষ্ট পাবে ভেবে এঁরা অনেকেই এখনও ওদিকে পা বাড়ান না। আখড়ায় যাঁরা আশ্রয় পান না দেখা গেল তাঁরা অগত্যা কেঁদুলী গ্রামে দুই-এক দিনের জন্য ঘর ভাড়া নেন। হন্যে হয়ে মাথার ওপর যে-কোন রকমের একটু ছাদের সন্ধানে অনেকেই তখন লম্বা পা ফেলে সোজা গ্রামে দৌড়ে আসেন। চাহিদার তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম। বাইরের মানুষ তখন গোয়াল বা ছাগলের ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের পীড়াপীড়ি করেন। গ্রামের মানুষ স্বভাবতই ভদ্র ও অতিথিবৎসল। তাঁরা কোনভাবেই অনুরোধ ফেরাতে পারেন না। ফলে তাঁরা নিজেরা ছেলেপুলে নিয়ে কষ্ট করে একটি ঘরে রাত কাটিয়ে নিজেদের শোবার ঘরও অন্যদের হাতে ছেড়ে দেন। আমার বন্ধু শিল্পী রঞ্জন ঘোষাল সদ্যাতৎপর থেকে আমাদের জন্য একটি ঘর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ঘরটি ছিল ছোট। আমাদের মাথা থেকে পা ঠিক খাপে খাপে এঁটে গিয়েছিল সেই ঘরে। কোন কষ্ট হয়নি আমাদের। শীতের রাতে পরস্পর গা ঘেঁষে শোওয়ার উপকারিতা সেদিন আমি প্রথম টের পেলাম।

মেলায় কেঁদুলীর লোকেদের দোকানপাট বড় কম। বেশির ভাগ দোকানই বাইরের। এই মেলাতেই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কবি দীপক মজুমদারের। দেখা হল অমিত গুপ্তর সঙ্গে। গত কয়েক বছর ধরে তিনি তাঁর পত্রিকা 'শকুন্তলার' জয়দেব সংখ্যা বের করেন এ সময়। পত্রিকাটি ছাপাখানা থেকে বেরুনো মাত্রই তিনি তার বাণ্ডিলগুলি নিয়ে চলে আসেন কেঁদুলীর মেলায়। কদমখণ্ডীর ঘাটের আশে-পাশে অমিতের সহকর্মীদের হাঁক উঠেছে 'শকুন্তলা' বিক্রি করতে দেখলাম। এদিকে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক কমতে শুরু করল মেলায়। দোকানপাট বন্ধ হল একে একে। খোলা থাকল শুধু কয়েকটি পাইস হোটেল, রেস্টুরেণ্ট ও পান বিড়ির দোকান। সব ভিড় তখন আখড়ায়। জমাট গানের আসর সেখানে। মধ্যরাতের মেলায় আমরা কয়েকজন সেদিন ঘুরে বেড়ালাম। খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বহু লোক আপাদমস্তক শুধু ছেঁড়া চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। অন্ধকারে যে-কোন সময় তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার আশংকা। অন্ধকারে ওই শায়িত মানুষগুলিকে দেখে এমনকি বড় পাথর বা কাঠের গুঁড়ি বলে ভ্রম হতে পারে। মেলায় দোকানপাট বন্ধ হওয়ায় ক্রেতাদের আকর্ষণের জন্য দোকানীরা কেউ কেউ যে সব খুচরো মাইক্রোফোন ব্যবহার করছিলেন সেগুলির এখন কণ্ঠরোধ হয়েছে। ওই মাইকগুলিতে অক্লান্তভাবে বেজেছে আধুনিক হিন্দী ও বাংলা গান। আমাদের মত পারমিসিভ আর কে? দেখেশুনে শুধু সে কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। বাউলমেলায় ওই রেকর্ডগুলি বাজার কোন যুক্তি নেই। তবু ওরা বাজে, বেজে যায়। কেননা আমরা কোন আপত্তি করি না। বড় জোর রুটিনমাফিক এক আধবার শুধু বিরক্ত হই।

মেলা ছাড়িয়ে রাতের নীল কুয়াশায় আমরা অজয়ের বাঁধ দিয়ে হাঁটছিলাম। অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি পায়ে-পায়ে। আধো-অন্ধকারে আমাদের চলার কোন লক্ষ্য নেই। পেছনে মেলার আলো। স্তিমিত কলরব। কিন্তু গান আরও মধুর হয়ে কানে এসে পৌঁছচ্ছে। পাগল মন রে আমার, ভোলা মন কিংবা ক্ষ্যাপা-বাউলের এই আপনহারা সম্বোধন আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বের তুচ্ছতা নিঙড়ে হৃদয়ে মনে জাগিয়ে তোলে এমন এক উদাসীনতার অনুভূতি যার তুলনা আর কোন গানের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই করা যেতে পারে না। যে জীবন আমরা পাই না, যে জীবনের স্বপ্ন আমাদের কেজো একঘেয়ে জীবনকে বারবার অস্থির করে তোলে তার আহ্বান বাউল গানকে যেন আরও বেশি করে তাৎপর্যময় করেছে। অনুভূতিপ্রবণ আমাদের অনেকেরই মনের ভিতর ঘুমিয়ে আছে চিরদিনের এক বাউল। আমরাও তো জীবনে-কর্মে-সাধনায় বৈরাগী বাউল হতে চাই। কুয়াশাময় অজয়ের চর, দিগন্তজোড়া রিক্ত শূন্য ধান মাঠ আর দূরের ছায়া-ঘেরা শালবন আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল। বিরাট, বিশাল আর তার ভিতরে লুকোনো অসীমের দ্যোতনাকে আমরা শরীরে-শিরায়-রক্তে অনুভব করলাম। কেমন যেন এক রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে গেল আমাদের স্নায়ু ও মজ্জায়। বেশ কয়েক বছর আগে আমার কৈশোরের দিনগুলোতে বাউল নবনীদাস কেঁদুয়া গ্রামে তাঁর মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসে আমাকে যা বলেছিলেন সেদিন আবার সে কথা মনে পড়ল। নবনী বলেছিলেন, না হল বজ্র—না হলাম যোগ্য। বীরভূমের বাউলদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। কিন্তু স্বর্গীয় এক অতৃপ্তি থেকেই তিনি ও কথা বলেছিলেন। অতৃপ্তির সঙ্গে আমার জীবনে মিশেছে ব্যক্তিগত এক ব্যর্থতার বোধ। হয়ত সব সৃজনশীল মানুষের মনেই এরকম একটা ব্যর্থতার কাঁটা সবসময় জেগে থাকে। আমরা যা হতে চাই, যেভাবে জীবন কাটাতে চাই—পারি না। বাউলরা তা পারেন। আর সেইজন্যই তাঁরা আমাদের নমস্য। আমরা পারি না বলেই রুটিনবাঁধা জীবন থেকে ছুটি নিয়ে বাউলসঙ্গ পেতে চাই বাউলগানে খুঁজে পেতে চাই জীবনের পরমার্থিক চেতনা। তাই টেপরেকর্ডারে ধরে রাখি ওইসব মুক্ত আত্মার গান, যাঁদের টেপরেকর্ডার নেই তাঁরা খুঁজে বসেন নোটবুক আর তুষ্ট হন। দুধের স্বাদ এভাবে ঘোলে মেটাতে হয়। বীরভূমের রাজারপুকুরের গোপালদাস বাউলের একটি উক্তি মনে পড়ল। সিংহের দুগ্ধ কি মাটির পাত্রে ধরে? গোপালদাস বলেছিলেন। আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর ওই উক্তির নিহিতার্থ আজ যেভাবে বুঝতে পারি, এর আগে কোনভাবেই তা পারিনি।

মেলাতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রহপলাতক যুবক রবার্টের সঙ্গে। সে আজ কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একজন প্রকৃত বাউলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন সে বলতে চায়:

আমি একটা পাগল পেলাম না
তাইতে পাগল হলাম না॥
নকল পাগল সকল দেশে
আসল পাগল কয়জনা॥

এই রবার্ট বছর দুয়েক আগে ঘুরতে ঘুরতে একজন 'আসল প্যাগলের' সন্ধান পেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে বাইরে। কিন্তু বিধি বাম। সেই পাগল শয্যাশায়ী। তার মেরুদণ্ড কুরে খাচ্ছে যক্ষারোগের কীট। বাঞ্ছিত মানুষকে খুঁজে পেয়েও তাই রবারটকে হতাশ হতে হল। কিন্তু বছর খানেক আগে সে আবার এক প্রকৃত বাউলের সন্ধান পেয়েছিল এই কেঁদুলীর মেলায়। সেই বাউলের নাম জানে না রবার্ট। বিশাল চেহারার সেই বাউল চাদরে তাঁর বাদ্যযন্ত্র ঢেকে কোন একটি আখড়ায় মানুষের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। সবাই তাঁকে গাইতে বলল। লাজুক বাউল কিছুতেই গাইতে চান না। শেষে চাদরের মোড়ক থেকে তিনি বের করলেন তাঁর একতারা। স্বাভাবিক একতারার চেয়ে আকারে সেটি অনেক বড়। বাউলের গলাও অন্য বাউলের চেয়ে উঁচু তারে বাঁধা। কিন্তু সুরের কোন ঘাটতি নেই সেখানে। সকলকে মুগ্ধ করল তাঁর গান। তিনি আবার তাঁর একতারা সন্তর্পণে ঢেকে মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে চাইলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে আরেকটি গান তাঁকে গাইতে হল। তারপর রবার্ট আর তাঁর কোন হদিশ পেল না। সকলের অগোচরে যেমন তিনি এসেছিলেন, তেমনই আবার সকলের অলক্ষ্যেই হারিয়ে গেলেন। রবার্ট তাঁকে মেলায়, বিভিন্ন আখড়ায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। পায়নি। এবারও মেলায় এসে সে সেই বাউলের সন্ধানে

মধ্যরাতের আখড়ায় বাউল গান

ব্যাকুল। তাকে হতাশ হতে হয়েছে। কিন্তু একেবারে নিরাশ হয়নি রবার্ট। তাঁকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সে এখনও তাঁকে খুঁজে বেড়াবে। এখানে না হলে অন্য কোথাও। যতদিন না সে সেই বাউলের সন্ধান পায় ততদিন চলবে তার এই ব্যাকুল অন্বেষণ। বাউলের তুলনায় সাধুরা রবার্টের কাছে 'ফানি'। সে বাউলকেই চায়। চায় বাউলের জীবনবোধকে নিজের জীবনদর্শন করে তুলতে।

মেলাতেই আমরা তরুণ দেবদাস বাউলকে দেখেছিলাম। সে বীরভূমের রাঙামাটির বাউল সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। দেবদাস বিড়ি খাচ্ছিল। আমার সঙ্গী রঞ্জন তাকে একটি সিগারেট দিতে চাইলে লাজুক হেসে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। ওকে একজন বলে—ওটা রেখে দাও, পরে ধরাবে। দেবদাস উত্তর দেয়—ভবিষ্যতের জন্য আমি কিছুই সঞ্চয় করি না।

এই না বাউল আর এঁদের নিয়েই না কেঁদুলী মেলার গর্ব। মেলায় গিয়ে আমরা অনুপ্রাণিত হলাম। কোন সন্দেহ নেই, তার স্মৃতি আমাদের ক্লান্ত দেহ-মনকে অনেকদিন উজ্জীবিত রাখবে। বাড়ির কাছেই এরকম একটি মধুর অনিয়মের জগত থাকতে আমরা কেন যে অযথা ঘুরে বেড়াই বুঝতে পারি না। বোলপুর স্টেশনে শীতের শেষ বিকেলে দাঁড়িয়ে সেকথা ভাবছিলাম। কলকাতা ফিরে আসছি। ট্রেন যথারীতি লেট। কিন্তু কোন বিরক্তি নেই আমাদের মনে। মন এত ভরে আছে যে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর না দিলেই চলে। প্ল্যাটফর্মের এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটনো অনেক মানুষ। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময় মেলা ফেরত আরেকটা বাস এসে দাঁড়াল স্টেশনের বাইরে। কেঁদুলী মেলার আরও কিছু যাত্রী এখন বাড়ি ফিরছেন। সন্ধ্যে হয়ে এল। ট্রেনের দেখা নেই। হঠাৎই আমার পাশে অপেক্ষারত একজন যাত্রী তাঁর পোঁটলা পুঁটলির ওপর বসে হাতের টেপরেকর্ডারটি চালিয়ে দিলেন। মুহূর্তে পরিবেশ বদলে গেল। 'কৃষ্ণ প্রেম যার অন্তরে লেগেছে, নয়ন দেখিলে যায় চেনা'—এ গানের রেশ ছড়িয়ে গেল স্টেশনে ও স্টেশনের বাইরে। ফেরার পথে ট্রেনেও কয়েকজন টেপ চালিয়েছিলেন। কিছু যাত্রীর সঙ্গে মেলাতেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তাঁদেরও আমরা ট্রেনের একই কামরায় আবিষ্কার করলাম। মেলা থেকে যতই আমরা দূরে যাচ্ছি মেলার অনুষঙ্গ ততই আমাদের পেয়ে বসছে। ট্রেন চলেছে। আমরা যাত্রী। কিন্তু মনের মধ্যে সে কোন বাউল তখন একতারা হাতে গান ধরেছেন—ও মন ঘুমিয়ে রইলি, ঘণ্টা হল টিকিট কই নিলি?

বুঝলাম মনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা এখনও আমরা সারতে পারিনি। রাতের ঘুমের মহাদেশের দিকে ট্রেন আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল আরও অনেকক্ষণ।

শংকর

॥ ৪১ ॥
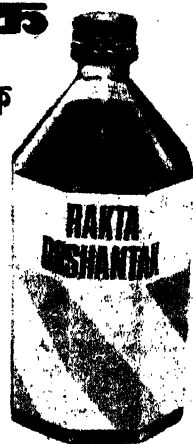
আওয়াজ শুনেই গণপতিবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, "এই স্পেশাল আওয়াজ ভরত সিংজীর গাড়ি ছাড়া হতেই পারে না।"

পরম সমাদরে গণপতিবাবু এই বিশিষ্ট অতিথিকে আমার আপিস ঘরে নিয়ে এলেন। হর্নের প্রশংসা শুনে ভরত সিংজী বহুত খুশী হলেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করলেন, ওঁর গাড়ি কিছু ইস্পেশাল নয়—অর্ডিনারি কার, তবে নিজের পছন্দ মতো মল্লিকবাজারের চোরাই ইস্টক থেকে একটা ইস্পেশাল হর্ন তিনি ফিট করিয়ে নিয়েছেন।

"খুব ভাল কাজ করেছেন, মিস্টার সিং—এ-যুগে ভেঁপুই তো সব," ভরত সিংজীর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করলেন গণপতিবাবু।

এই ইস্পেশাল ভেঁপুর সুর গর্ভধারিণী জননীকে শোনাবার ইচ্ছে ছিল ভরত সিংজীর—কিন্তু তাঁর জীবিতকালে সুযোগাপন্ন হিসেবে রিকশায় পর্যন্ত চড়াতে পারেননি ভরত সিংজী।

গণপতিবাবু এবার আমার সঙ্গে ভরত সিং-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিনয়ে বিগলিত ভরত সিং বললেন, "আমার কী দুর্ভাগ্য, আপনার মতো লোকের সঙ্গে এতোদিন আলাপের সৌভাগ্য হয়নি।"

"আমার ভাইয়ের মতো এই ছেলেটি। দেখবেন একে।" গণপতিবাবু যথারীতি আমার সম্পর্কে ভরত সিংজীর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণের আয়োজন করলেন।

"গণপতিবাবুর ব্রাদার মিনস মাই ব্রাদার"—ভরত সিংজী এবার আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ওঁকে আপ্যায়নের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভরত সিং বললেন, চা কফি পানের ইচ্ছা হলে একবার বরুণা প্যালেসে পদধূলি দিন। টোয়েণ্টি-ফোর আওয়ার টি কর্ণার তো সারাক্ষণই খোলা রয়েছে।

আমরা এখন ওই দোকানে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ভরত সিং পকেট থেকে একখানা ভিজিটিং কার্ড বার করে ফেললেন। বললেন, "এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু পরে যেতেই হবে।"

উনি কখন ওখানে থাকবেন তা জানা প্রয়োজন। কিন্তু হা হা করে উঠলেন ভরত সিং। তাঁর থাকা-না-থাকার ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। ওই কার্ড দেখালেই টোয়েণ্টি-ফোর আওয়ার টী কর্ণারে সব কিছু ফ্রি হয়ে যাবে। ভরত সিং বললেন, একদম আউট ফিকর করবেন না।

গণপতিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন "রেখে দাও। হোটেলেও যে ফ্রি পাশ আছে, এতোদিন বিভিন্ন লাইনে কাজ করেও খবরটা আমার জানা ছিল না।"

অটসট গাঁট্টাগোট্টা লরি-টায়ারের মতো চেহারা থেকে বুদ্ধিমানের হাসি বেরিয়ে এলো। ভরত সিং বললেন, "আপনাকে মিথ্যে বলবো না। আমার কার্ডের সাইজ দেখে বেয়ারা বুঝে নেবে কত খানি আপ্যায়ন করতে হবে। বড় কার্ড হলে, গেস্টকে ওরা বরুণা স্পার্টিজ হোটেলে রুমে ফ্রি থাকবার জন্যে বিছানাবন্দী করবে। মাঝারি কার্ডে ফ্রি লাঞ্চ অর ডিনার উইথ ড্রিংকস, আর ছোট কার্ডে টী অ্যান্ড স্ন্যাকস।"

ভরত সিংজী এবার বিজনেসের কথা তুললেন। "এক্সকিউজ মি, কিছু মনে করবেন না শংকরদাদা, গণপতিবাবুর সঙ্গে কিছু কাজ সেরে নিতেই হবে।"

গণপতিবাবু এবার প্রতুল বিশ্বাসের বেনামা সম্পত্তির তালিকা হুড় হুড় করে বলে যেতে লাগলেন। "এইসব সম্পত্তির ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে—কোনো বেনামদার যাতে টুঁ শব্দটি না করতে পারে তার জন্যে স্পেশাল স্টেপ নেওয়া হয়েছে।

ভরত সিংজী তবুও যেন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। গণপতিবাবু বললেন, "কিছু ভাববেন না। প্রতুল বিশ্বাস মহাশয়ের যা প্রাণের ইচ্ছা ছিল তাই হচ্ছে—প্রিয় ভাইপোটি এখন বংশপরম্পরায় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ওইসব সম্পত্তি ভোগ দখল করবেন এবং আস্তে আস্তে কিছু সম্পত্তি বেনাম থেকে স্বনামে নিয়ে আসবেন।"

ভরত সিং-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্যে গণপতিবাবু বললেন, "কোনো ব্যাটা বেনামের সুযোগে মাথায় চড়ে বসতে পারবে না। প্রতুল বিশ্বাস মশায় দেশসেবার মাঝে মাঝে পাকা কাজ করে গেছেন। যাদের নামে সম্পত্তি করেছেন, তাদের দিয়ে ব্ল্যাংক কাগজে সই করিয়ে রেখেছেন। একটু বেঁকে বসলেই ওইগুলোতে টাকার অ্যামাউন্ট বসিয়ে হ্যাণ্ডনোট করে মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে।" প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাস নিজেই এই মতলব ফেঁদে গিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে গণপতিবাবু বললেন "আধা সন্ন্যাসী মানুষের মাথায় এসব বুদ্ধি যে কী করে এলো ?"

ভরত সিং কোনো রকম মন্তব্য করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "বাহান্ন নম্বরের কী হলো ?"

গণপতিবাবু বললেন, "ওটার এখনও কিছু খবর পাইনি। আজ সকালে যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু এখানে আটকে পড়লাম।"

ভরত সিং ওই বাহান্ন নম্বর প্লট সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়লেন। গণপতিবাবু বলতে গেলেন, "বাহান্ন নম্বরে কিছুই নেই—খানিকটা খালি জমি এবং কয়েকটা ঠিকে মাঠকোঠা। কোনো পাকা বাড়ি পর্যন্ত নেই।"

ভরত সিং এবার গণপতিবাবুকে নিজের গাড়ি চড়ে একবার বাহান্ন নম্বরের খবরাখবর নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "আমরা বসছি, আপনি প্লিজ একবার ঘুরে আসুন। শুধু মেডিসিনের ওপর নির্ভর করবেন না, একটু সার্জারির ব্যবস্থা রাখবেন।"

এখনই আসছি বলে গণপতিবাবু গাড়ি চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এবং আমি মেডিসিন এবং সার্জারির রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভরত সিং আমাকে সস্নেহে বকুনি লাগালেন, "কী রকম 'মেনজার' আপনি, মেডিসিন সার্জারি জানেন না ?" এরপর ভরত সিং ব্যাখ্যা করলেন, মেডিসিন হলো ক্যাশ টাকা। কিন্তু শুধু ঘুষে সব সময় হয় না—তখন সার্জারি অর্থাৎ গুন্ডামি। কাটাকুটি মাথা ফাটাফাটির ভয়ে অনেকে শান্ত হয়ে যায়।

ভরত সিংজী জানালেন তিনি রেগুলার গীতা পড়েন, যখন যে কাম প্রয়োজন তা করতে তিনি দ্বিধা করেন না।

ভরত সিং এবার বললেন, "গণপতিবাবু বড় 'সিমপুল' মানুষ আছেন। পাকা বাড়িগুলোর ওপর স্পেশাল নজর দিয়েছেন, অথচ বাহান্ন নম্বরকে দেখেন নি।"

ভরত সিং হাসতে হাসতে জানালেন, কলকাতা শহরের অঙ্কই পাল্টে গিয়েছে। আগে এখানে মানুষের দাম বেশী ছিল, এবং খালি জমির দাম কম ছিল। এখন মানুষের দাম যত কমছে জমির দাম তত বাড়ছে। গণপতিবাবু বুঝছেন না, বাহান্ন নম্বরের গোটা কয়েক টিনের বাড়ি ভাঙতে পারলেই সব জমি খালি হয়ে যাবে, তখন ওখানে উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি উঠতে পারে, অনেক দাম পাওয়া যাবে। ওই বাহান্ন নম্বরে একখানা দোতলা বাড়ি থাকলে, ভাড়াটে তোলাই যেতো না, সম্পত্তির কোনো বাজার-দর থাকতো না।

ভরত সিং এবার পকেট থেকে একটু খৈনি বার করে দাঁতের মাড়িতে গুঁজে দিলেন। ভাবনগর ম্যানসনের বারোয়ারী জীবনে অনেক উন্নতি

রয়েছেন। কিন্তু পুরনো এই নেশাটি ছাড়তে পারেন না। ভরত সিং বলেন, বড় বড় মিটিংএ বহুক্ষণ সময় কাটাতে ওঁর ভাই খুব কষ্ট হয়। মাঝেমধ্যে বেরিয়ে এসে খৈনি নিতে বাধ্য হন, কিন্তু খৈনিতে মুখ বোঝাই থাকায় মিটিংএ আর কথা বলতে পারেন না—মুখ বুজে শুধু শুনেই যেতে হয়।

ভরত সিং এবার থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হাতে যখন সময় রয়েছে, তখন বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিলেন ভরত সিং। তারপর আফসোস করলেন। পুরনো দিনের বড়-লোকদের কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না। থাকলে, এই জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখে দিতেন, কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসন তুলতেন না।"

মস্ত বড় লোক এই ভরত সিং, নিজের ম্যানেজার থেকে সুরজলাল নাগরচাঁদের রেসিডেন্ট ক্ষমতার জোরে দারোয়ান থেকে ম্যানেজার এবং ডিরেকটর হয়েছেন। কিন্তু কী সব আজগুবি কথা বলছেন তিনি ?

ভরত সিং বললেন, "ফার্স্ট ক্লাশ জমিতে সে-কেলে বাড়ি দেখলেই আমার মেজাজ আজকাল খারাপ হয়ে যায়, শংকরসাব।"

পুরনো শহরে পুরনো বাড়ি তো থাকবে।

কিন্তু ভরত সিং ওসব কথা কানেই তুলতে চান না। তিনি আমাকে এবার একটা শক্ত কোশ্চেন করে বসলেন। "জমির সঙ্গে বাড়ির কী তফাৎ বলুন তো ?"

জমির ওপরেই বাড়ি হয় জানি। হাঁড়ি আর সরা, স্বামী আর স্ত্রী, জমি আর বাড়ি—এরা মেড ফর ইচ আদার।

ভরত সিং ওসব রসিকতায় মন দিলেন না। বললেন, "আপনাকে একটা খুব সিক্রেট কথা বলে দিচ্ছি। এই সিক্রেটের ওপরেই কলকাতায় অনেকে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।"

কী এমন গোপন খবর ? আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ভরত সিংজী খৈনির রস সামলে বললেন, "জমির কখনও বয়স বাড়ে না, কিন্তু বাড়ি বুড়ী হয়ে যায়। বুড়ীকে ভাগিয়ে আবার ছুকরী বাড়ি তোলো, জমি কোন আপত্তি করবে না।"

ভরত সিং-এর শ্রীমুখনিঃসৃত এইসব বাণী আমাদের কাছে অমৃত সমান। দীর্ঘদিন ধরে ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের গহন অরণ্যে গোপনে বিচরণ করে তিনি এইসব অমূল্য সত্য আবিষ্কার করেছেন : ক-মাসের জন্য এই থ্যাকারে ম্যানসনে উড়ে এসে জুড়ে বসে তাঁর বাণীকে উড়িয়ে দেবার আমি কে ?

ভরত সিং খৈনির রস কিছুটা গলাধঃকরণ করে বললেন, "শালা গোরমেণ্ট এবং মামলাবাজ ভাড়াটিয়া না থাকলে ক্যালকাটা সোনার ক্যালকাটা হয়ে যেতো।"

জমিজমা সম্পর্কে ভরত সিং-এর অমৃতবাণী আমি নীরবে শ্রবণ করে যাচ্ছি।

ভরত সিংজী আবার ফার্স্টক্লাশ জমিতে সেকেলে বাড়ির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। "গাড়ি চড়ে কল-কাতার রাস্তা দিয়ে যাবার উপায় নেই। চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়। দু-দিকে ফার্স্ট ক্লাশ জমির ওপর থার্ড ক্লাশ প্রপার্টি। এসব প্রপার্টিতে সোনা ফলা উচিত ছিল—দেখলেই আমার মাথা ধরে যায়, অথচ যাদের সম্পত্তি সেইসব বাঙালীবাবুদের কোনো খেয়ালই নেই।"

ভরত সিং আমাকে অঙ্কটা সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। "ফার্স্ট ক্লাশ জমির ওপর সেকেলে বাড়ি মানেই সেকেলে ভাড়াটে। সেকেলে ভাড়াটে মানেই মান্ধাতার আমলের মাসিক ভাড়া। হাজার হাজার স্কোয়ারফুট জায়গা, দখল করে বসে থাকবে অথচ ঘর রঙ করবার জন্যে পয়সাও বার করবে না। অথচ এরা বাড়ি ছাড়বেও না। ফসলে যেমন পোকা হয়, তেমনি বাড়িতে ভাড়াটে—সোনার সম্পত্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সেকেণ্ড ক্লাশ ফেলেও কোনো দাম থাকে না।"

বিজ্ঞের মতো হাসতে লাগলেন ভরত সিং। "জমির দাম যদি লাখ টাকা হয়, তার ওপরে ভাড়াটে বাড়ি থাকলেই দাম কমে দশ হাজার হয়ে যায়! কখনও কখনও আরও কম—ভাড়াটিয়ার এমনই মাহাত্ম্য। পুরনো ভাড়াটিয়ার নাম শুনলেই যে ভরত সিংজীর পিত্তি জ্বলে ওঠে তা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত খবরাখবরই ভরত সিংজী আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে ফেললেন। আমার প্রত্যাশা, ওঁর কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপ-দেশ পাওয়া যাবে।

ভরত সিং এবার থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকের খবরাখবর নিলেন। বিলাসিনী দেবী সম্পর্কে যত-দূর যা শুনেছি তা অকপটেই আমি বর্ণনা করে গেলাম। বিলাসিনী দেবীর বর্তমান দুঃখের পিছনে যে অবধানি ম্যানসনের ভরত সিং-এর কিছুটা দান আছে তা বোধ হয় ওঁর স্মরণে রাখা উচিত।

ভরত সিং কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। বললেন, "ওঃ! মিস্টার বারিকের কথা বলছেন ? মিস্টার বিপুল বারিক আমার কাছে ভাবনানি ম্যানসনের ছোট রুম চেয়েছিলেন, আমি দিয়েও ছিলাম। কিন্তু ওখানে উনি কী করবেন, কাকে নিয়ে আসবেন তা আমি কী করে জানবো ?" ভরত সিং ব্যাপারটাকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে, চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর খবরাখবর নিতে লাগলেন।

চন্দ্রোদয় ভবন এবং আমার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওই বাড়ির মালিকদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যতটুকু খবর রাখি তা নির্দ্বিধায় ভরত সিংকে জানিয়ে দিলাম।

ভরত সিং এবার হঠাৎ নিজের নির্ধারিত প্রোগ্রাম পাল্টে ফেললেন। একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে আচমকা অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে বললেন, "গণ-পতিবাবুকে আমি মাঝ রাস্তায় ধরে নিচ্ছি, আপনি ভাববেন না।"

গণপতিবাবুকে বোধ হয় ধরা ভরত সিং-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ একটু পরেই ভরত সিং-এর গাড়ি নিয়ে গণপতিবাবু আমার অফিস ঘরে ফিরে এলেন।

ভরত সিং চলে গিয়েছেন শুনে গণপতিবাবু মোটেই আশ্চর্য হলেন না। বললেন, "ওইটাই ওদের স্বভাব। যা বলবে ঠিক তার উল্টো করবে।"

গম্ভীর হয়ে গণপতিবাবু বললেন, "যেভাবে কথাবার্তা বললো তাতে মনে হলো প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। অথচ সারজমিন তদন্ত করতে গিয়ে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বিশ্বাস মশায়ের ভাইপোর ঘাড়ে বন্দুক রেখে ওই বাহান্ন নম্বর প্লটখানা সিংজী নিজেই হজম করতে চাইছেন। একান্ন এবং তিপ্পান্ন নম্বর প্লট ইতিমধ্যেই ওঁরা কিনে রেখেছেন। বাহান্ন নম্বর জমিখানা কোনোক্রমে হাতে এলেই আর কোনো অসুবিধা থাকে না—মনের সুখে বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ি তোলা যাবে।"

গণপতিবাবু বললেন, "আমার কাছে প্রতুল বিশ্বাসও যা সুরজলাল নাগরচাঁদও তাই—ওরা আমার ফি যখন দিচ্ছে তখন কোনো কিছু বলবার নেই। কিন্তু বাবা, একটু ঝেড়ে কাশো, অত চাপা-চাপি দিয়ে, সামনে শিখণ্ডি খাড়া করে রাখলে কী করে অঙ্কটা বুঝবো ?"

গণপতিবাবুর অনুপস্থিতিতে আমার সঙ্গে ভরত সিং-এর কী কথাবার্তা হয়েছে তার বিবরণ শুনে গণপতিবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। গম্ভীর-ভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল করলে না, শংকর। ভিতরের সব কথা ওই ভরত সিংকে বলতে গেলে কেন ?"

কথাবার্তা আমি সরল মনেই বলেছি। কিন্তু গণপতিবাবু সন্তুষ্ট হলেন না। "এসব লোককে মোটেই বিশ্বাস নেই। কোনো কিছু না জেনেই বিপুল বারিক এবং পদ্মাকে সে রাত্রে ওরা ঘর দিয়ে-ছিলেন তা হতেই পারে না। এখন আবার এইসব খবর নিয়ে গেল, কেন কে জানে।"

গণপতিবাবু একটু চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ভরত সিং-এর গাড়িখানা যখন রয়েছে তখন একটু নর্থ ক্যালকাটা ঘুরেই আসি। চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে কয়েকদিন হলো

যোগাযোগ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, গল্পের ব্যাপারটা একটু রঙীন হয়ে উঠেছে। রাজরানী হয়েও বিলাসিনী দেবী সমস্ত জীবন এক বিন্দু শান্তি পেলেন না।"

বিলাসিনী দেবীর খবরাখবর ব্যালকরে গণপতিবাবুর কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভরত সিং-এর ব্যাপারে আমার চিন্তা হচ্ছে। গণপতিবাবুর মতো মানুষ যখন কিছু আশঙ্কা করছেন, তখন ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

কেন আমি বোকার মতো ওঁর সঙ্গে এতো কথা বলতে গেলাম? আমি নিজের নিবুদ্ধিতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

আমি এবার একটু শান্তি চাই। থ্যাকারে ম্যানসনের সীমাহীন সমুদ্রে আমি যেন দিশাহারা নাবিকের মতো ভেসে চলেছি। এ-বাড়িতে কোনো হাঙ্গামায় আমি আর জড়িয়ে পড়তে রাজী নই। আমার একমাত্র লক্ষ এখন বিলাসিনী দেবী। চন্দ্রোদয় ভবনের নির্দেশমালার ওপরেই আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভর করছে—আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু কী কুক্ষণে যে এই শকুন্তলা চাওলা ও মিসেস পপি বিশোয়াসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! এঁরা কিছুতেই আমাকে দুদণ্ডের শান্তি ভোগ করতে দেবেন না।

তেলকালিবাবু একবার আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মাঝবয়সী এই সব মহিলা থেকে শত হস্তে দূরে থাকবেন, স্যার। ভুলেও এদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবেন না।" তখন সেই মহামূল্যবান উপদেশের মর্ম বুঝিনি, এখন অবশ্যই আমাকে তার মূল্য দিতে হবে।

শকুন্তলা চাওলা আমাকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছেন। আমি নানা কাজের অছিলায় সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাচ্ছি। নিমন্ত্রণের আসরে মিসেস শকুন্তলা চাওলা কী প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন তা আমার অজানা নেই।

শ্রীমান মদনাও আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে বলল, "ক্যালকাটার কত টপ লোক আমাদের ওখানে আসছেন। বড় বড় পুলিস অফিসার মিসেস চাওলার সঙ্গে ডিনার করতে পারলে ধন্য হয়ে যান, আর আপনি এ-বাড়িতে থেকেও ডিনারে আসবার সময় পাচ্ছেন না!"

মদনা বলে, "আর ক'টা মাস, স্যার! তারপর আমার কোনো চিন্তাই থাকবে না। ক্যালকাটার সব টপ অফিসারদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যাবে, তখন দিনে ডাকাতি করলেও থানার দারোগাবাবুরা খাপ খুলতে সাহস পাবেন না।"

মদনা এবার ভিতরের খবর দিল। "আপনি স্যার খান-না-খান মেমসায়েবের নেমন্তন্ন রিফিউজ করবেন না। চাওলা মেমসায়েবের খুব প্রেস্টিজজ্ঞান। ওঁর নেমন্তন্ন কলকাতা শহরের কেউ বারবার রিফিউজ করবেন তা উনি ভাবতেই পারেন না। মেমসায়েবের অভিমান, বুঝতেই পারছেন স্যার।"

এদিকে মিসেস পপি বিশোয়াসও বসে নেই। তিনিও সহদেব মারফত দুদিন হাতে-লেখা আহ্বানপত্র পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, "মিস্টার শংকর, পপি এখনও মরে নি। দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেবেন।"

কিন্তু পপি বিশোয়াস থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকতে চাই। এক প্রতুল বিশ্বাসের কেসেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু দূরে থাকবো বললেই সব সময় দূরে দূরে থাকা যায় না। একদিন দুপুরে যখন সামান্য দিবানিদ্রার আয়োজন করছি তখন হুড়মুড় করে মিসেস পপি বিশোয়াস আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

পপি বিশোয়াসের মুখের সেই শুকনো শুকনো ভাব কেটে গিয়েছে। তিনি আবার সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা হয়ে উঠেছেন।

"কী মিস্টার শংকর, পপি কী দোষ করেছে, যে চিঠির উত্তরও দিলেন না?" পপি বিশোয়াস বোধ হয় বুঝেই নিয়েছেন যে [illegible] ডিফেন্স।

আত্মগর্বে গর্বিণী পপি বিশোয়াস বললেন, "মনে হচ্ছে আড়ি করে দিয়েছেন? আমিও তো মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির সঙ্গে সারা জীবনের মতো আড়ি করে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম কই?"

জগদীশ জেঠমালানি যে অসময় পপি বিশোয়াসকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছেন তা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু কীভাবে তিনি কাজ সমাধা করলেন?

পপি এবার মাথা দুলিয়ে বললেন, "জগদীশবাবুকে আমি সেদিন সাফ বলে দিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না, মিস্টার জেঠমালানি। আপনার পার্টিকে এনটারটেন করতে গিয়ে আমাকে ফাঁসির আসামী হতে হচ্ছিল।"

জগদীশবাবুর উত্তরটাও এবার শুনিয়ে দিলেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "খুব চালাক লোক এই মিস্টার জেঠমালানি। একটুও চটলেন না—মেজাজখানা ঠিক কচি শশার মতন, কিছুতেই গরম করতে পারবেন না। জগদীশবাবু বললেন, মিসেস বিশোয়াস, স্বীকার করছি, প্রতুল বিশ্বাসকে এখানে পাঠিয়ে আমি খুব অন্যায় করেছি। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে, মেডিক্যাল এগজামিন না-করিয়ে কোনো গেস্টকে এখানে পাঠাতাম না। কিন্তু আমার হাতে কতটুকু ক্ষমতা বলুন?"

মিসেস বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তবুও মুখ হাঁড়ি করে বসেছিলাম। মিস্টার জেঠমালানি খুবই চালাক লোক। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন, তারপর বললেন, আমারও এই কেসে কম ভোগান্তি হয় নি। একটু প্রাইভেটলি রিল্যাক্সড্ হতে এসে কারুর যে হার্ট-অ্যাটাক হতে পারে তা বিজনেস সার্কেলে কে শুনেছে বলুন?"

মিসেস বিশোয়াসের তবু মানভঞ্জন হয় না। তখন জগদীশ জেঠমালানি বলেছিলেন, "আপনাকে ট্রাবল দিয়েছি, কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলে রেখে পালাইনি। শেষ পর্যন্ত হায়েস্ট মহলে কলকাঠি নেড়ে প্রবলেম সলভ করেছি।"

"এ-কথা আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না, মিস্টার শংকর", এবার মৃদু ব্যঙ্গ করলেন মিসেস বিশোয়াস। "আপনার ওই গণেশ সরকার আর তো হাতকড়া নিয়ে ফিরে আসেনি।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "তখন আমিও মনের যন্ত্রণায় কান মলে বলেছিলাম, আর গাব খাবো না, গাবতলায় যাবো না।" কিন্তু গলায় আটকে যাওয়া গাব নেমে যাওয়ার পরেই রাগ কমে গেল। তখন আবার জেদ ফিরে এলো—গাব খাবো না তো খাবো কী? গাবের মতো আছে কী?" খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমি কিন্তু আর গাবতলায় যেতে চাই না। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার জেঠমালানি অবশ্য বলেছিলেন তেমন দরকার হলে উনি ভাবনানি ম্যানসনে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু হঠাৎ আমারও জেদ চেপে গেলো। যে আমাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল তার প্রতিশোধ না-নিয়ে আমি এই থ্যাকারে ম্যানসন ছাড়ছি না। যে অপমান আমাকে করা হয়েছে তার একটা বিহিত না-করলে আমার নাম পপি বিশোয়াস থাকবে না —আমাকে আপনারা পাঁচি বলে ডাকবেন!"

মিসেস বিশোয়াস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি এখন এখানেই দু'একজন গেস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি। কিন্তু ভয় নেই মিস্টার শংকর —আপনাকে আবার আমার সঙ্গে গাব তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে আমার অন্য কাজ আছে। হাইলি কনফিডেনশিয়াল কিন্তু।"

আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনি আমার গা ছুঁয়ে বলুন, কাকপক্ষী পর্যন্ত একথা টের পাবে না। তবে আমি মুখ খুলবো।" (ক্রমশ)

দিনযাপন

কল্যাণ সেন

চন্দন আর একবার চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভীষণ হাওয়ায় তার কথা সব যেন ভেসে চলে যায়, তার হাত দুটো ঢিলে হয়ে সেই বাতাসে ভাসে, দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলো, পায়ে কোনো জোর নেই, উঠে যাচ্ছে, ক্রমশ হালকা হতে হতে তার শরীরটা পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে .... উঠছে ...., উঠছে মেঘ, মহাশূন্য, অসংখ্য নক্ষত্র, দু-তিন রঙের আলো সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে শিমুলতুলোর বীজের মতন কোথায় চলে যাচ্ছে সে ? নিচে মাটির গেলাসের মতন এক টুকরো পৃথিবী, ওই বিন্দুগুলো কী শহর ? তাহলে গাছ ? নদী ? পাহাড় ? তার বাড়ি, নিজের ঘর ? জলের মাছের মতনই হাওয়ায় সাঁতার কেটে সে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার প্রাণপণ চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না মুখ থেকে, জংলীদের তীরের মতন ভয়ানক বাতাস জমিয়ে দিচ্ছে তার রক্ত শক্ত হয়ে যাচ্ছে জিভ, মনে হলো, ছাইরঙের দুটো হাত যেন তার ঠ্যাং দুটো ধরে টান দিল একটা কোড নম্বর কেউ বলে যাচ্ছে, জিরো টু ওয়ান..সেভেন..জিরো..টু-ওয়ান-সেভেন, মাথার টুপিটার বাদামী আলোটা কী হঠাৎ দপ করে নিবে গেল ? টের পাচ্ছে চন্দন তার ছেঁড়া টুকরো শরীরটা আকাশ থেকে লিফলেট ছড়ানোর মতন আবার নেমে আসছে.... নামছে। আর ঠিক তখন দৃশ্যটা সম্পূর্ণ বদল হয়। এবার চন্দন দেখতে পেল দু-পাশের মাঠ ফেলে রেখে চলে গেছে বাসরাস্তা, যেখানে বাসটা তাকে রেখে চলে গেল, যেখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে একার মনে হয়, দিন শেষ না শুরু বুঝতে পারলো না সে, সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই দেখতে পেল চন্দন, সাবধান, আপনার পাসপোর্ট না থাকলে আর এক পাও এগোবেন না। লাল অক্ষরে বিরাট বোর্ড ঝুলছে সামনে, পেছনে ঘুরেই দেখতে পেল একটা ভাঙা বুদ্ধ মন্দির, মন্দিরের সামনে দু-তিনজন মানুষ কিন্তু তাদের মুখগুলো কুকুরের ; আশ্চর্য। সার্কাসের ক্লাউন নাকি লোকগুলো ? চন্দন মন্দিরের ভেতরে উঁকি দিতেই দেখতে পেল বুদ্ধদেবের কোমল, শান্ত শান্ত মুখ-চোখ থেকে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। এ কোথায় এসে পড়েছি আমি ? বুকের শব্দ লাফিয়ে ওঠে তার, আঙুল যেন বেঁকে যাচ্ছে তার, তারও ঠোঁট ফেটে কী রক্ত পড়ছে এখন ? পালাতে চেষ্টা করতেই ঝাঁক ঝাঁক গুলি এসে ফুটো করে দিল তার বুক, পেট, ফুসফুস, আর সেই রক্তের ভেতর পরিষ্কার সে দেখলো পা ডুবিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে শ্যামলী। শ্যামলীর ঘি-রঙের শরীর, ওর হাত দুটো বোধ হয় এখুনি ডানা হয়ে ভেসে যাবে। শ্যামলী, রক্তে ভেসে যাচ্ছে আমার শরীর, তুমি দেখতে পাচ্ছো না আমাকে ?

ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। চোখ খুলে ময়লা হয়ে যাওয়া মশারিটাকেই সেই অদ্ভুত ঘর বলে মনে হলো এখন। হাত তুলে ঠোঁট ঘষলো, রক্ত লেগে আছে নাকি ? এই প্রথম শীতের সকালেও তার গলার ভাঁজে ঘাম টের পেল, পা দুটো থেকে সত্যিই কোনো হিংস্র কুকুর মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে নাকি। এত কষ্ট হচ্ছে কেন পা তুলতে ? এখুনি কী আবার বাদামী আলোয় ভরে যাবে মশারির ভেতরটা ? চোখ বন্ধ করলেই কী আবার সে দেখতে পাবে বুদ্ধদেবের কোমল শান্ত মুখ-চোখ থেকে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ? স্বপ্ন। বিশ্রী স্বপ্নটা এখনও শরীর জুড়ে আছে ; তার একটা নয়, দু-দুটো আলাদা স্বপ্ন অদ্ভুত এক হয়ে মিশে গিয়েছিল ঘুমের ভেতর। হাসি পেল হঠাৎ, তার রক্তের ভেতর পা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শ্যামলী, এটার মানে কী ? তার মতন শুনলে শ্যামলীও হাসবে ? হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট এনে দেখলো নেই, খালি প্যাকেটে কিছু টোব্যাকোর গুঁড়ো, চাদরের ভাঁজগুলোর মতন করতলের রেখাগুলোর দিকে বিরক্তিতে তাকিয়ে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেললো জানলা দিয়ে। মাথার ভেতরটা যেন ভেজা ফুটবল হয়ে আছে এখন। বাসের চাকাগুলো ঘুরছেই রক্তের ভেতরে, থামছে না। চমকে পেপার-ওয়েট ছুঁড়ে মারলাম স্বপ্নের ভেতরে ?...

আবার চোখ বন্ধ করে হাত দুটো বুকে তুলে এনে চন্দন ভাবলো, ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখলে সে মাকে বলতো সব। মা বলতো, স্বপ্নের কথা জলের কাছে গিয়ে বলতে হয় ; সে কোথায় পাবে সেই জল যে ধুয়ে দেবে এই বিশ্রী স্বপ্নটা ?

পাশের ঘর থেকে রেডিওতে ইংরেজি খবরের মেজাজী গলাটা সে শুনতে পেল। হয়তো সামনে কেউ নেই, তবু চলছে রেডিওটা। আটটা বাজলো বোধ হয়। কিন্তু উঠে পড়ার কোনো জোর পেল না ভেতরে ভেতরে; বালিশটায় কপাল পর্যন্ত ঢেকে আর একবার ঘুমের কথা ভাবলো চন্দন।

না, আর শুয়ে থাকা যায় না। মুখের ভেতরটা কেমন তেতো হয়ে আছে, বাঁ-চোখটায় কী ব্যথা করছে ? তবু শরীরটা 'দ' করে বালিশে মুখ চেপে পড়ে থাকার কথা ভাবছিল সে। চন্দন জানে, দুপুর বারোটা-একটা পর্যন্ত সে এ রকম বিছানায় পড়ে থাকলেও কেউ এসে কিছু জানতে চাইবে না। কোনো দরকার নেই তার সঙ্গে বাড়ির অন্য সকলের। দিন শুরু হয়ে যেমন অশ্লীল অস্থিরতায় ঘড়ির কাঁটা ডিঙিয়ে চলে যায় অন্যদিন, আজও সে রকমই সব চলতে থাকবে, ঘটে যাবে পর পর, অথচ কোনো সুতোর বাঁধনে সে জড়িয়ে নেই সেই সাংসারিক সব অভ্যাসের সঙ্গে। এমন কী ওভারডোজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানাতেই যদি সে শেষ হয়ে যায়, তাহলেও হয়তো তিন-চার ঘণ্টার আগে টেরও পাবে না কেউ। অদ্ভুত। তার শিরাগুলো যেন কুঁকড়ে যায়, মাথার ভেতর যেন আরশোলা ঘুরঘুর করে এ সব কথা মনে হলে, ইচ্ছে হয় দেয়ালটায় লাথি মারি, আয়নাটা ভেঙে ফেলি, ও ঘরে গিয়ে আছড়ে রেডিওটা ভেঙে ফেলে দিই বা মশারিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বলি, দেখো, আমি এখনও এই রকম আগুন হয়ে বেঁচে আছি, আমিও একদিন আঙুলে পৃথিবী নাচাবো আবার, তোমাদের জন্য একদিন তুলে আনবো গোলাভরা সুখ, কেয়াফুলের গন্ধ ঢেলে দেব তোমাদের বিশ্রামে, ঘুমে। এই দ্যাখো সেই জল এনেছি সঙ্গে আমি ধুয়ে দেব তোমাদের সব পরিশ্রম। ধ্যাৎ নিজের জুলপিতে টান মারলো চন্দন। হয় না, কিছুই হবে না এ সব, এ সব ফালতু চিন্তায় শুধু তার রক্তের বেগ বেড়ে যায়। শরীর দু-ভাঁজ করে হঠাৎ উঠে বসে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলো পিঁপড়ের কামড়ের মতন এই সব চিন্তা থেকে। জানলার ফ্রেমে প্রথম শীতের উজ্জ্বল আকাশ সদ্য-কিশোরীর চোখের মতন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। নরম রোদ মুখে মেখে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ, রাস্তার ও-পিঠের তিনতলার বারান্দায় টবে সাদা চন্দ্রমল্লিকা যেন জিজ্ঞেস করছে তাকে—কেমন ঘুম হলো তোমার ? বাজারের ব্যাগ হাতে ফিরছেন এক বুড়ো ভদ্রলোক, লাল-হলুদ স্কুল বাসে উঠছে অন্তু-নন্তুরা, আকাশ থেকে আর এক আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে রোদের খুশির মতন এক ঝাঁক পায়রা, ছবি, জীবনের এই সব সুন্দর, সুন্দর ছবি ফ্রিজ-শট্ হয়ে আটকে যায় তার মাথার ভেতরে। বড় সুসময় এসে গেছে পৃথিবীতে, মানুষের মুখের টান ধরা চামড়া আবার নিটোল হয়ে যাচ্ছে, চন্দন, এখন তুমি কী করবে ? আবার কী

সেই স্বপ্নটা সেই বাদামী আলোর ভেতর পিঁজরো.... উঁ.... উঁ.... ওয়াম... সেভেন...., অদ্ভুত কোড নাম্বারটা ঢেকে ফেলছে তাকে? মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মশারির বাইরে বেরিয়ে এল সে।

একবার আয়নায় নিজেকে দেখলো চন্দন, তার মুখে, কপালে কী দেয়ালের ফাটলের দাগের মতন দাগ এখন? ও-দিকের ঘরে বাজারের হিসেব নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে রোজকার মতই, বৌদির চড়া গলা সে শুনতে পাচ্ছে যে, বোধ হয় ঝি বাসন ভেঙে ফেলেছে আজ, খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে গেছে, দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে ফেলে ছোড়দা ডেটল ডেটল বলে চেঁচাচ্ছে, শান্টু চেঁচিয়ে পড়ে যাচ্ছে, হায়ার-সেকেন্ডারির পড়া, ওষুধ ফুরিয়েছে অথচ কেউ দেখেনি কেন বলে বাবা গলা ফাটাচ্ছেন, এই রকম, এইসব, জুতোর বেরিয়ে আসা পেরেকের খোঁচা হয়ে যেন ঢুকে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরে। ইচ্ছে হয়, ভয়ংকর কিছু একটা সে করে, লাফ দিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রিভলভার হাতে বলে—স্টপ ইট। স্টপ দিস শাউটিং....কিন্তু আমি কোন হরিদাস পাল? আয়নায় নিজেকেই ভেংচি কেটে ভাবলো একবার এখন তো আমি ফুরিয়ে যাওয়া পেস্টের মতন বাতিল হয়ে গেছি। সে সংসারে আছে, যদি চলে যায়, অ্যাক্সিডেণ্টে মরে যায় যদি বা বেপাত্তা হয়ে চলে যায় বাড়ি থেকে, সংসারে একই নিয়মে সব ঘটনাগুলো ঘটে যেতে থাকবে, সেই একই সুখ-দুঃখে এ বাড়ির লোকগুলো ভাসতে থাকবে, হয়তো তার এ ঘরটা তখন শান্টুদের পড়ার ঘর হয়ে যাবে, আবার লাল-হলুদ স্কুল-বাস এলে জলের ব্যাগ কাঁধে অন্তু নন্তুরা সেই বাসে উঠে যাবে, কয়লাওয়ালার সঙ্গে তেমনি তর্ক হবে বড় বৌদির, ইভনিং শো-এর অ্যাডভান্স কাটতে পাঠাবে মেজ বৌদি। হয়তো তার টেবিল, বই-পত্তর ঢাকা দিয়ে রাখা হবে, হয়তো কোনো কোনো দিন হঠাৎ পাহারাওয়ালার লাঠির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে মা প্রায় দৃষ্টিহীন চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে গোপনে চোখ মুছবে। শুধু এই। আর কিছু নয়, টিকটিকির ল্যাজ খসে পালিয়ে যাওয়ার মতন সেও কোনদিকে ছিটকে যাবে।

অথচ ছিল না এ রকম। 'কাপুর অ্যাণ্ড জৈন'-এর চাকরিটা ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত সব অঙ্কের হিসেব মিলে যেত যেন ঠিক ঠিক, তার একদিন মাথায় যন্ত্রণা হলে বড় বৌদি ও-ডি-কোলন মাখিয়ে দিত কপালে, এ রকম বেলা পর্যন্ত সে শুয়ে থাকলে সেজ বৌদি এসে চুল টেনে তুলে দিত জোর করে. সে ভালবাসে বলে মোচার চপ করতো তার জন্যে. তাকে ধরে নিয়ে যেত 'মুক্ত অঙ্গনে' নাটক দেখতে, একসঙ্গে য়ুনিভার্সিটিতে পড়া তার এক সময়ের বন্ধু আর এখন সেজ বৌদি দু বছর আগেও তার জন্মদিনে প্রেজেণ্ট করেছিল দুটো চমৎকার টাই. 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে' শ্যামলীর সঙ্গে আলাপ হলে বাড়ি ফেরার সময় তার পিঠে কিল মেরে বলেছিল, মাকে বলবো এবার? শান্টু আসতো কখনো পড়া বুঝে নিতে, নন্তুর সঙ্গে বুক-ক্রিকেট খেলতো কোনো ছুটির দুপুরে। ছুটি নিয়ে মেজ বৌদিকে তার নিয়ে যেতে হত জামসেদপুরে বৌদির দাদার বাড়িতে। ছাদে এক সময়ের ভাল খেলোয়াড় বড়দার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতে হত মাঝে মাঝে। মাকে বাড়িতে শোনাতে হত অতুলপ্রসাদের গান, যেন ফসলে ভরা গোটা ক্ষেত জুড়ে সে ঈশ্বরের মতন দাঁড়িয়েছিল এক সময়। অথচ মাত্র আট ন' মাসের মধ্যে এক অন্ধকার রাস্তায় একটা ব্রেক-ডাউন বাসের মতন হয়ে গেল। কেন? কেন? শ্যামলীরও কী দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গিয়ে মধ্যরাতে ভয় ছুটে যায় রক্তের ভেতর? ঠিকানাহীন একটা পোস্টকার্ডের মতন তাহলে কোথাও জায়গা নেই তার?

'কাপুর অ্যাণ্ড জৈন' আমি কেন ছাড়লাম? জলের ভেতর নিজের ছায়াটাকে প্রশ্নটা করলো চন্দন। কেন? আমার ভাল লাগছিলো না, শুধু করাচ্ছিল না আমাকে ওই কোম্পানীর হিসেব রাখার অর্থহীন কাজ, প্রতিদিন মনে হত, জানলার কাচে ধুলো জমার মতনই ধুলোতে ঢেকে যাচ্ছে তার ভেতরটা। তার মাথা ঘুরতে থাকে ওই হিসেবের জঞ্জাল ঘাঁটতে। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মুখের সেই বিশ্রী ঠাণ্ডা তেতলার ঘর থেকে জানলা দিয়ে যখন সে দেখতো নিচের জনজনে মাছির মতন মানুষের সহস্র ফেরেববাজির জীবন, বমি উঠে আসতে চাইতো তার, শুধু এই রকম, এই জন্যে বেঁচে আছে, থাকবে সে? এর নাম জীবন? এইভাবে একদিন লো-প্রেসার আর পেটে আলসার নিয়ে জীবন শেষ করে চলে যেতে হবে তাকে? সে বুঝতে পারছিল সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে তার আত্মবিশ্বাস থেকে, তার স্বপ্নগুলো রোদ লাগা কুয়াশার মতন যেন মুছে যাচ্ছে জীবন থেকে। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় সে ঢুকে পড়ছে যেন অন্ধকার খাদে, বাড়ি ফিরছে পিঠে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা আর চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে। টের পেয়েছে ক্রমশ সে দূরে সরে যাচ্ছে তার নিজের জীবন থেকে, দেয়ালের ঝোলানো ফোটো, খাটের ওপরের বেড-কভার আর বড়দির নষ্ট হয়ে যাওয়া তানপুরাটার মতন সে হয়ে গেছে শুধু একটা সাড়ে তিন হাতের অস্তিত্ব মাত্র। কিছু আর ভাবতে পারছে না সে নিজের মতন করে, লিখতে পারছে না একটা লাইনও। কোথায় আগুন, কোথায় আগুন, এ রকম দিশেহারা হয়ে একটা দমকলের মতন খালি অকারণ ছুটে মরছে সে। অ্যাণ্ড দ্যাট সান অফ এ বীচ ছোট মালিক ইন্দ্র জৈন: সব সময় টেনে আছে হারামির বাচ্চা! প্রভোকেশন, এক্সট্রিম প্রভোকেশন.......মানুষের খোলসের ভেতর আগাগোড়া একটা জন্তু লোকটা, ওরই জন্যে অপমানিত হয়ে, লজ্জায় চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল টাইপিস্ট কণা বসে মেয়েটি। সন্তোষ বলতো শালাকে মাল খাইয়ে বেহেড করে ঠেঙিয়ে বেন্দাবন দেখাবো একদিন! জলের ভেতর সেই দিনটা যেন অবিকল দেখতে পেল চন্দন আবার। অডিট চলছিল তখন। কী একটা বিশ্রী কারচুপির কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছিল কোম্পানি, বড় তরপ কাপুর সাহেব নিজে ক'দিন কলকাতায়। জৈন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল নিজের ঘরে। আশ্চর্য! সিগারেট অফার করে হাসি মুখে চেয়ার দেখিয়ে দিয়েছিল তাকে।

—কাপুর সাহেবের সঙ্গে আজ বিকেলের পরে হোটেলে একবার দেখা করবে তুমি।

—কেন?

—য়ু নো অডিট প্যাঁচে ফেলেছে আমাদের, এদিকে আবার গভর্নমেণ্টের চোখ রাঙানি, উই আর ইন ডিপ ওয়াটার নাউ; কিন্তু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ব্যবসা চলবে না, ফলো মী?

—আমাকে কী করতে হবে?

—অডিটের মিঃ লাহিড়ীকে কাপুর সাহেব এণ্টারটেন করতে চান আজ রাতে; হাসছে জৈন; য়ু মাস্ট বী দেয়ার।

—তাতে আমাকে থাকতে হবে কেন?

—শোন, রায়, লাহিড়ীকে টাকা-ফাকা বা অন্য কিছু দিয়ে ম্যানেজ করা যাবে না; শালাকে আরও বড় জিনিস দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে, আর কাপুর চান কাজটা কোম্পানির হয়ে তুমিই করবে।

—মানে?

—প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল; তোমাকে ভাল একটি মেয়েছেলের ব্যবস্থা করতে হবে; ক্লীয়ার?

চন্দনের মনে হয়েছিল ঘরের ফ্যানটার ব্লেডগুলো হঠাৎ ছিটকে তার গায় মাথায় পড়লো, টেবিলের কাচের ওপর ওটা কার ছায়া পড়ছে? কোনো হিংস্র চিতাবাঘের? একটা প্রচণ্ড চড় মেরেও তার শরীরের রক্ত যেন ঘাম হয়ে ঝরঝর করে পড়ছিল; অদ্ভুত! চড়টা রুমাল চাপা দিয়েও হুবহু আগের মতন গলাতেই জৈন কথা বলেছিল, য়ু বেঙ্গলি-পিপল আর ব্যাণ্ডিল অফ সেণ্টিমেণ্টস; কাজটা করে কোম্পানিকে সেভ করলে কাপুরকে বলে আমি তোমাকে দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করে পাঠাতাম; অ্যাণ্ড আই নো, ইট উড হ্যাভ বিন নট এ ডিফিকাল্ট জব ফর য়ু বিকজ হু হ্যাভ এ ভেরি ডিসেণ্ট সার্কেল অফ লেডি ফ্রেণ্ডস; ইয়েস, ইট ইজ... [illegible] মুখ বেরিয়ে আসার মতন মনে হয়েছিল তার, জৈনের পাহাড়ী জানুকের হাতের চাপে আচমকা উঠে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার।

অথচ কাউকে সে একথা বলতে পারেনি। বাড়িতে বলা যায় না; শ্যামলীর সঙ্গে দেখা করছে চায়নি জোর করে।

—তোমার কী হয়েছে, চাকরি ছেড়ে দেবে কেন? শ্যামলীর কপালে ভাঁজ পড়েছে।

—এমনি, ভাল লাগছে না, অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না, আই ফিল সিক।

—সবাই কী মনের মতন কাজ পেয়েছে? তারা চাকরি করছে না? তোমার/এ রকম সৃষ্টি-ছাড়া খেয়াল কেন?

—এটা তর্কের ব্যাপার নয়, আমি পারছি না, সেটাই চূড়ান্ত।

—কেন প্রাইভেট ফার্মের চাকরি করলে লিখতে পারবে না এই ভয়? শ্যামলী কী বিদ্রূপ করছে তাকে?

মাথার ওপরের আলোটা বোধ হয় দুলছে, ঘুরতে থাকা আলোছায়া শ্যামলীর মুখটাকে যেন টেনে টেনে কতদূরে নিয়ে যাচ্ছে, সিগারেটের ছাই চোখে ঢুকে যায় নাকি? শ্যামলীর চোখ ত্রিভুজের আকার নিয়ে এখনও জানতে চাইছে, জেরা করে যাচ্ছে তাকে? টেবিলের কাচ চেপে ধরে থাকে চন্দন, ইচ্ছে হয়, চায়ের কাপটা শব্দ করে ভাঙে, ঠোঁট শক্ত হয়ে ওঠে।

—হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়া একটা প্লেনকে সেফ-ল্যাণ্ডিং করানোর চেয়েও লেখাটা বেশী শক্ত শ্যামলী, তবে একজন যে লিখছে, লিখতে চায়, তাকে বস্তা বস্তা কাগজের ধুলো ঘাটতে হবে কেন?

—মনে হচ্ছে যেন হিট ছবির ডায়লগ বলছো? তাকে ডিঙিয়ে শ্যামলী কী দেয়ালের নরম সবুজে চোখ রাখে? ঠাণ্ডা চোখে দেখে চন্দন ওর নাকের পাশে যেন একটা ভাঁজ পড়েছে এখন, যাতে ভীষণ ঝগড়ুটে মনে হয় শ্যামলীকে; বিরক্ত হয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে ও কী একাই উঠে পড়বে এখন?

মাথার ভেতর ফাটা পাইপ দিয়ে জল পড়ে যায় ঝিরঝির; মনে হয় মুখের চামড়ায় অন্তু-নন্তুরা কাটাকুটির ঘর এঁকে রেখেছে, ক্রমশ সব কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে আরম্ভ করে তারপর; ঘর অন্ধকার করে অসময়ে সে শুয়ে থাকে, এই সময় লিভারের চিনচিন ব্যথা ধরে, রাস্তার গাড়ির হর্ন ইনজেকশনের নিডল হয়ে ঢুকে যায় শিরায়, সে বুঝতে পারে দাঁত আলগা হয়ে যাওয়ার মতন জীবন থেকে সে সরে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, একটা লাইনও আর তার মনে পড়ে না, শুধু জলের ক্লপ ক্লপ...ক্লপ....শব্দ ঢেকে ফেলে তাকে। পরপর বাড়িতে দু-একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ফেলে সে, কী কারণে সে একদিন মেজবৌদিকে অপমান করলে সারা দিন না খেয়ে-দেয়ে সে কাঁদে, হঠাৎ যোল বছরের শান্টুকে একদিন তার কলম নিয়ে লিখেছে বলে থাপ্পড় মারে জোরে, বড়বৌদি চা দিতে এলে কাপটা নিয়ে ভেঙে ফেলে একদিন। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে মাকে খিঁচিয়ে ওঠে সে; বুঝতে পারে চন্দন তার ভেতরে ভেতরে একটা পুরনো দেয়াল ভেঙে পড়ার ঝুরঝুরে শব্দ উঠছে অবিরাম, অথচ দারুণ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে শূন্য মাঠে সে একা, কোথাও আশ্রয় নেই, দাঁড়াবার জায়গা নেই। খবরের কাগজের সিচুয়েশন-ভেকাণ্ট কলমটা মনে হয় একটা মরা মাকড়সা হয়ে লেগে আছে চোখে, ইচ্ছে করে বাড়ি না ফিরতে, বা কোনো রেল-লাইনের পাশে সিগন্যাল যখন সবুজ হয়েছে, তখন ধীরে ধীরে লাইনের ওপর শুয়ে পড়তে; শেষের বাড়িতে এসেছিল কী একটা বই পড়ে ছিল, সেটা ফেরত নিতে সে তার কাছে নেই এ রকম পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলে, শ্যামলীর টেলিফোনের জবাব দেয় না, শিলং থেকে অশোক গল্প চেয়ে চিঠি দিলে সেটা পুরোটা না পড়েই জানলা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে একা সে দাঁড়িয়ে থাকে, ইঁদুরের

ভোরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনতলার জানলায় গ্রীল টেনে মেয়েটির শুয়ে থাকা তাকিয়ে দেখে, এক-ফালি চাঁদ কখন বাতাসার রঙের হয়ে খুলে যায় রাস্তার কুকুরের ঝগড়া, তাদের যৌন উল্লাস সমস্ত রাত জাগিয়ে রাখে তাকে, সে দেখে কত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে নক্ষত্রদের জগৎ, যেন ওখানেই কোনো গোপন লকারে জমা রাখা আছে তার দুঃখ, সব স্বপ্ন, পিঠের গন্ধের মতন এক জীবন, যেখানে এক সময় শাম্মলীর জামরুলের মতন তলপেটে সে ক্লান্ত হাওয়ার মত বিশ্রাম চাইবে, বকুলের গন্ধ পাবে শাম্মলীর নিঃশ্বাসে ; আবার একদিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে রবীন্দ্র সদনে শুনতে যাবে অশোকতরুর গান, মেজ বৌদি তার পছন্দ করা রঙের পুলওভার বানিয়ে দিলে সে প্রমিস করবে পরপর তিনটে সিনেমা দেখানোর ; ছবি, এই সব জলছবি ভেসে যাচ্ছে তার চোখের ওপর দিয়ে, তবু হাত বাড়িয়েও একটাও যেন ছুঁতে পারে না সে। নিজের ছায়াটার ওপর ব্লেড বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, খুব, তিনটে ঘুমের পিল খেয়েও সাদা চোখে মশারির দিকে তাকিয়ে থাকে সে টের পায় তার হাড়ের ভেতর বাসা বাঁধছে ঘুণপোকা, হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে মাকে চেঁচিয়ে ডাকে চন্দন। এভাবেই দিনরাত ঘুরে যায়, বর্ষায় ধুয়ে যায় শহর ভিখিরি ছড়িয়ে পড়ে সব রাস্তায়, টেরিটি-বাজারের সামনে তার পকেটমার হয়ে যায়, ফুটপাথে দগদগে ঘা নিয়ে বসে থাকা পাগল হেসে ওঠে তাকে দেখে, হোটেলের সামনে বিদেশী মহিলার নগ্ন হাঁটুতে লেগে থাকে রোদ, গাছের সব পাতা ঝরে পড়ে একদিন, পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে তিন লক্ষ কিশোরকুমারের গান বাজে। ন্যাশানাল লাই-ব্রেরিতে গিয়ে দুপুর কাটায় সে জ্যোতিষীর বই ঘেঁটে ঘেঁটে, সেন্ট জনস চার্চের মাঠে শুয়ে থেকে সে চড়ুইয়ের রোদমাখা দেখে। বাড়ি ফেরার পথে মনে হয় তার ছেলেবেলার স্কুলের সেই বিশাল বটগাছের অন্ধকার থেকে এক রাক্ষস নেমে এসে যেন ক্রমশ পাথর করে দিচ্ছে তাকে।

বড় রাস্তায় এসে পড়তেই একটা ভিড়, উত্তেজনা পরপর দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্রাম চোখে পড়লো চন্দনের। তারই ভেতর দিয়ে দু-মুখো পিঁপড়ের সারের মতন লোক ছুটছে, কয়েকটি স্কুলের মেয়ে কেমন করুণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় স্কুলে পরীক্ষা চলছে ওদের, অথচ সব বন্ধ, একজন বৃদ্ধ ভিড়ের মধ্যে দিশে পাচ্ছেন না কোনদিকে যাবেন, দু-তিনটে ট্রাম ফেলে দেওয়া হয়েছে রাস্তায়, কয়েকটি লম্বা-চুল ত্রিভঙ্গ মার্কা ছোকরা দখল নিয়ে নিয়েছে সমস্ত রাস্তার, একজন মাঝারী হিরোইন বসে তার গাড়িতে, তার গাড়ির জানলায় গলা বাড়িয়ে যেন জামাকাপড় আর শরীরের সুগন্ধ চাটছে দু-তিনটে থার্ড ব্রাকেটের মতন দেখতে ছেলে, মাথা নামিয়ে দম চেপে বসে আছেন ভদ্র-মহিলা, চলতি বইয়ের গান ছুঁড়ে হিরোইনের হীরো সাজার খেলা চলছে ওদের মধ্যে।

—কী, হয়েছে কী এখানে ? বাস-ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গেল কেন ?

—শালা, সি এম ডি এ সব কুয়ো খুঁড়ে রেখেছে রাস্তায়, আনের সেই গর্তে পড়ে আজ সকালে মারা গেছে একটি মেয়ে !

—তাই বাস-ট্রাম-গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না ?

—দাদা কী বিয়ে করতে বেরিয়েছেন নাকি ?

—না, ইয়ে, দেখুন, মানে কত ছেলেমেয়ের পরীক্ষা, কতো চাকরির ইন্টারভিউ, পেশেন্ট হাস-পাতালের।

—কিন্তু যে মেয়েটি মারা গেল তার লাইফ আপনি দেবেন ?

—ঠিকই, তবে আর পাঁচজনকে ট্রাবল দিয়ে.....

দুটো দলের ঝগড়া চুপ করে দেখতে বেশ মজা লাগে চন্দনের।

এক্ষেত্রে সকালটা একটু অন্য রকম লাগে। চন্দন বুঝতে পারে, এরপর লোকাল এম এল এ-বাবু আসবেন, জ্বালাময়ী ভাষণ দেবেন, যুবকদের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য এক হয়ে লড়বেন, তারপর পুলিসের শ্রাদ্ধ করবেন এবং সমস্ত ঘটনাটার নিরপেক্ষ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যাবেন। ইয়া! হঠাৎ চন্দনের ইচ্ছে করে একটা ট্রামে উঠে পড়তে, তারপর চেঁচিয়ে শুরু করে—আজকে আমাদের সমাজের সর্ব স্তরে যে দুর্নীতি আর অন্যায়....... নাহ্ পেছন থেকে হঠাৎ পুলিসের ভ্যান হর্ন দেয়, চন্দন আবার ফুটপাথ বদল করে হাঁটতে শুরু করে।

সিগারেটের দোকানের আয়নায় নিজের মুখটা খুব ধুলোপড়া মনে হলো চন্দনের, ঠোঁটে যেন একটুও রক্ত নেই আর, গলার শিরাগুলো বড় জাগিয়ে তোলে তাকে; ভেঙে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে যাচ্ছে তার, মাঝে মাঝে খুব মাথা ঘোরে তার, ঠিক বুকের মাঝখানটায় চিনচিন করে ওঠে কখনো, কখনো বাথ-রুমে গিয়ে অনেক সময় টের পায় তার ডানহাতটা কাজ করছে না ঠিক মতো। চন্দন নিজের ছায়াকে চোখ ছোট করে প্রশ্ন করে কেমন আছ কাপুর অ্যান্ড জৈন'-এর দিল্লী অফিসের ভাবী ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার ?

নাহ্ ভাল লাগে না সিগারেট, মুখটা বিস্বাদ হয়ে যায়, রাস্তার ও-পিঠের বাড়ি, দোকান সব যেন একটু একটু দুলতে থাকে মিহিন বৃষ্টির মধ্যে। লো-ব্লাড-প্রেসার। নিজের পিঠেই হাত রেখে সান্ত্বনা দেবে নিজেকে ? ডঃ ঘোষ একটা প্রেস-ক্রিপশন লিখে দিয়েছিলেন, ভিটামিন খাওয়া দরকার তার। আমি হরলিকসের রেডিও-ডাক্তার বলছি— নিজের মনেই হেসে উঠলো সে। এদিকটায় 'বন্ধ' নেই। ট্যাক্সি থেকে একটি সবুজ মেয়ে নামে, কালো চশমায় মুখের সর্বস্ব ঢাকা, উঁচু দেয়ালে বিশাল হোর্ডিং-এ উত্তমকুমার নন্দনকাননের হাসি হাসছেন; নীল আকাশ থেকে শীত নেমে আসে তার শরীরে, একটা প্লেন রোদের ভেতর চলে যাচ্ছে কোনা-কুনি আকাশ ডিঙিয়ে, হঠাৎ মনে পড়লো তার, এ রকম শীতের সকালে অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলে বাবার সঙ্গে সে চণ্ডীতলায় যেত; অনেকটা কালো হয়ে আসা মন্দিরের মাথায় ত্রিশূলটা যেন অবিকল তার মনে পড়ে এখনও, আর সেই কয়েকশ বছরের পুরনো অশ্বত্থগাছ, যার নিচে বসে থাকতেন এক মৌন সন্ন্যাসী; যিনি ইচ্ছে করলেই নাকি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন, শূন্যে ঝুলতে পারতেন আগুন, কৃপা করে যার দিকে চাইতেন, সে নাকি রাজা হয়ে যেত, হঠাৎ চোখ বুজে ফেলে চন্দন, কোথায় কত দূরে সেই চণ্ডীতলা—এখানে মেলা হয় কিনা সেখানে কে জানে, তবু সে পরিষ্কার শুনতে পেল ঢাকের বাজনা, বাবা হাত দিয়ে রেখেছেন তার মাথায়, অ্যাসিট্যান্ট পুরোহিত তার নাম জিজ্ঞেস করে হাতে গুঁজে দিচ্ছে প্রসাদী ফুল, জিলিপীর গন্ধ বাতাসে, ইচ্ছে করে তার সেই মৌন সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, বলুন, আমি রাজা হবো কী না! তাকান আমার দিকে; এই যে এখানে আমি, দেখতে-পাচ্ছেন না আপনি ?

একটা মিনিবাস প্রায় তার শরীর ছুঁয়ে থেমে যায়। চোখ খোলে চন্দন। কেউ কী জানলা দিয়ে তাকে ডাকলো ? কাপুর অ্যান্ড জৈন-'এর গুরু নাকি ? ভাল করে তাকায় চারপাশে, কলকাতার শব্দ, কলকাতার ভিড়, কলকাতার ছুটোছুটি, কলকাতার হরেক ফেরেববাজি, দোকান, বড় বড় বাড়িগুলো মানুষের ছেঁড়া কলাপাতার মতন চেহারা, সব যেন একটু একটু করে পেঁচিয়ে ফেলছে তাকে।

—এখন কোথায় যাব আমি ? জেব্রা-ক্রসিং-এর উপর দাঁড়িয়ে নিজের কাছেই জানতে চাইল চন্দন। বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বো ? সমস্ত দুপুরটা পিঁপড়ের কামড় হয়ে বসে যাবে মাথার ভেতর, রাস্তায় হেঁকে যাবে কেসা .. আ .. আ .. আ.. সি .. শি .. আ .. পু র র র, উঠে জল খাবে, শুনবে রেডিওতে মহিলামহল ? কী রকম কেঁপে ওঠে শরীর, জলের দু-ভাগ হয়ে যাওয়ার মতন সেও কী না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে ? হাঁটবে ? ময়দানের ঘাসের ভেতর লম্বা লম্বা পায়ে দুপুর শেষ করে আনবে ? না কি উঠে পড়বে শহরতলীর কোনো বাসে ? হঠাৎ নেমে পড়বে লাল ধুলোর কোনো পথে; বিশাল ধানক্ষেতের মাঝে নেমে গিয়ে দেখবে পৃথিবীতে কী করে শেষ হয়ে আসে একটি দিন রাক্ষসের মুখ আঁকা বাঁশের মাথায় হাঁড়ি বসানো লাউ মাচার নিচে দেখবে ছোটরা খেলছে কাণামাছি, প্রজাপতি ঘুরছে হলুদ রোদে ছোট্ট পুকুরে স্নান সেরে ভরা শরীর হাত চেপে জলপায়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি গ্রাম্য বউ, ট্রেন চলে গেলে ঝাঁক ঝাঁক পাখি ওড়ে আকাশে, সে কী কোনো দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে চিঠি আছে হে, তোমাদের চিঠি।..........

পাইলিং-এর গুম গুম শব্দটা হঠাৎ যেন ধাক্কা মারল তাকে, নাকি একটা বল গোল-কিকের মতন আবার কেউ প্রচণ্ড শটে ফিরিয়ে দিল তাকে ? ধুলো ওড়ে, কুলিদের ব্যস্ততা, দুটো স্টোন-ক্রাশার ঝিকঝিক শব্দে ঘুরে যাচ্ছে অবিরাম, ঠোঁট চেপে এই সব দেখে সে। কলকাতা কেমন অ্যামবিশন নিয়ে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে তুমি থামবে কলকাতা ? একদিন কী সূর্যকে গিলে খাবে তুমি ? তোমার মাটির নিচে সুখের গাড়ি চলবে কু ঝিক ঝিক, পাঁচ তারার হোটেলে জলের মতন কার্পেটের ওপর বিচার হবে বছরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর। পরীক্ষার হল-এ বোমা ফাটিয়ে যুবকেরা দল বেঁধে ঢুকে যাবে দেবানন্দের ছবি দেখতে। দুর্দান্ত শীতের মধ্যে সদর স্ট্রীটের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলওয়ালা খদ্দের খুঁজতে থাকবে। বড় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছ তুমি কলকাতা; বড় কর্কশ আর রাগী। মনে হয় একদিন কোথাও আগুন জ্বলে উঠবে আর তুমি সেই আগুনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে তোমার ওই সব স্কাই-স্ক্র্যাপার, সব নিওনের বিজ্ঞাপন, দুশ বছরের বাড়ির ইঁট, আর মনের সীমা পেরনো দক্ষিণের দুটো রেল-স্টেশন তারপর ছোট ছোট হাত দাবী করবে কলকাতায় আরও একটা নদী চাই। রাস্তার পাশে চাই আরও মাথা-চূড়া গাছ, অনেক অনেক সূর্যাস্ত আর স্বপ্নের সবুজ রেলগাড়ি, দরজায় দরজায় সেই শীত-বুড়ো রেখে যাবে উপহার, মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সেই লিটল সোয়ালোর।

—কিছু না ভেবেই একটা হলে বায়োটার শো-এ

ঢুকে পড়লো চন্দন।

খানিকক্ষণ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্ধকার হয়ে থাকে। সীটের ভেতর যেন ঢুকে যেতে চায় তার শরীর। ছবি শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ কিছুই ধরতে পারে না চন্দন। শুধু চমৎকার রঙ যেন শুষে নিতে চায় তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছে নায়ক, আমুল-মাখনের মতন নায়িকা মধ্যরাতে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে কাঁদে, ঠিক পরের মুহূর্তেই পাহাড়ের রাস্তায় দুজনে গান গায়, গাছপালা, পাহাড়, ধোঁয়ার মতন মেঘ সব বাজনা হয়ে ঘুরে যায় তাদের সঙ্গে, চন্দন হলের ভেতর অসংখ্য পা নাচানোর শব্দ শুনতে পায়, আর ঠিক তখন উলটো দিক থেকে লাল রঙের গাড়িতে লর্ড ক্যানিং-এর মতন চেহারার ভিলেন এসে নায়কের গাড়ির কাচ গুলিতে গুঁড়ো করে দেয়। ভীষণ মারা-মারি আর ভ্যাঁস্ ভট.... গুলির শব্দে হল গ্যাস-বেলুন হয়ে ফেটে পড়ে, তখন হঠাৎ কিছু না ভেবেই চন্দন উঠে হল থেকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। মধ্য-দুপুর, রোদের ফলা যেন ঢুকে যায় তার চামড়ায়, প্রায় দু-মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখলো সে। আবার কী সে ওই পাহাড় আর ঝরনা আর গানের ভেতর নায়িকার চোখের জলের ভেতর ফিরে যাবে?

পথে রোদ নিয়ে হেঁটে যায় চন্দন। গাছের লম্বা ছায়ায় অফিসের গাড়িগুলো যেন ঘুমিয়ে। দমকল বেরিয়ে যায় তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে, টিফিন-টাইমের জন্য শসা কুচিয়ে রেডি হচ্ছে ঝালমুড়ি-ওয়ালা। গান্ধীজীর নিঃসঙ্গ মূর্তিটি পুড়ছে রোদে, চৌত্রিশ নম্বর একটা ট্রামের গায়ে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে গেঞ্জি গায়ে হাতি। জল তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছে খুব। ইচ্ছে করে কোথাও বসতে। সুপ্রিয়র অফিসে গেলে এখন পাওয়া যাবে ওকে? মাথার ভেতর যেন জল ভাঙার ছল ছল শব্দ ভেঙে যায়, বড় একা মনে হয় তিনমুখো গাড়ি আর মানুষের স্রোত দেখলে। বিজ্ঞাপনে টাঙানো ছবি বদলে ডানলোপিলোর বিছানায় মেয়েটির আধেক বুক চোখে পড়লে টের পায় বড় খারাপ লাগছে শরীর, মুখের ভেতর জমা হয় নোনতা জল। তাহলে আবার কী তার শুরু হবে সেই অনবরত বমির অসুখ? ডিভানের চিত চিত কথায় ফিরে মেরে সে পড়ে থাকবে বিছানায়; মা পিঠে বুকে হাত রেখে বসে থাকবে চুপচাপ? মধ্যরাতে বুকে পেটে খুব যন্ত্রণা হতে থাকলে দেয়ালে কী মৃত্যুর ঠান্ডা চোখ দেখতে পাবে সে?

দাড়িওয়ালা লোকটার সামনে বসে পড়ে হাতটা মেলে দিল চন্দন। লোকটা তার হাতের রেখাগুলোর ওপর পেন্সিল বুলিয়ে যায়। মুখের দিকে তাকায়, কাগজে দু-তিনটে অঙ্ক লেখে চটপট।

—এখন রাহু খুব কষ্ট দিচ্ছে আপনাকে; তার ওপর বিরুদ্ধ-শনি; যা কিছু করতে চাইছেন, সফল হচ্ছে না, মনে শান্তি নেই একদম।

—তাহলে?

—চিন্তা নেই, বৃহস্পতি সহায় আপনার, আর বড় জোর ছ'টা মাস; তারপর দেখবেন ভাগ্য কোথায় পৌঁছে দেয়। আশ্চর্য। লোকটাকে হুবহু টলস্টয়ের ছবির মতন লাগলো চোখে। ইচ্ছে হলো লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, নেচে ওঠে কোমর দুলিয়ে; শ্যামলী, আর ছ'মাস; তারপর টকটো গাড়ি থেকে নেমে তোমার ভি আই পি বাবার মুখোমুখি সোফায় বসে কফিতে চুমুক দিয়ে বলবো, আপনি তো জানেন আপনার মেয়ের ইচ্ছেটা কী? শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই অন্তু নন্তুদের বলবো, যাবি চিড়িয়াখানায়? ছটা মাস। শালা জৈন। ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বো তোমাকে। শিমুল তুলোর বীজ হয়ে রোদে হাওয়ায় যেন ভাসতে থাকলো চন্দন। শিস দিয়ে উঠলো অকারণ, একজন বুড়িকে লিন্ডসে স্ট্রীটের মুখটা পার করে দিল হাত ধরে। তিনমাথায় জানালার এদিকে বসে আছে যে রোগা লোকটি, ... ঢুকে দিল কম পয়সা, ফোনটা ঢুকে ... দিল ..., গ্লাসের নিচে বইয়ের স্টল ... গুলো ভাল বই কিছু এসেছে কী না, ... আলু ভাজা খেতে খেতে একটা হোটেলের দোকা... থেকে ফোন করলো শ্যামলীকে।

—দিদিমণি আছেন?

—ঘুমোচ্ছেন বোধ হয়, আপনি কে ব... বলছেন?

চন্দন বুঝলো সেই বাচ্চা চাকরটা ফোন ধরে... গলাটা একটু গম্ভীর করে বললো, ডেকে দা... একটু, বলো এক ভদ্রলোক কথা বলতে চাইছে... জরুরি।

কেড় মিনিটের মধ্যে চন্দন শুনতে পে... শ্যামলীর গলা; ফোনের ভেতর কী শরী... সুবাসও ভেসে আসে?

—ঘুমিয়েছিলে?

—ওই একটু; তারপর হঠাৎ ফোন এ সময়ে...

—আমি মেট্রোর কাছে একটা দোকান থে... ফোন করছি, খুব দরকার, চলে আসতে পার... এখুনি?

—ব্যাপার কী, মনে হচ্ছে যেন লট... জিতেছো! রিসিভার কাঁপে হাসির চাপা শব্দে।

—এসো না বলছি সব; মেট্রোর বারান্দা... নিচেই ওয়েট করছি আমি; কতক্ষণ লাগবে তোমা... আধঘণ্টা?

—কিন্তু আজ বিকেলে যে অন্য প্রোগ্রাম ছি... আমার; মানে বাসবীর বিয়ে সেটেলড্ তাই ... ওদের বাড়িতে আজ....

—গুলি মারো ওসব। কাটিয়ে চলে এ... আধ ঘণ্টার মধ্যে; ছাড়ছি, কেমন?

চন্দন দেখতে পেলো অনেক মানুষের ভেত...

তোমার এখন শ্যামলী [illegible] পার হচ্ছে। এই রকম বড় দুঃখের। কচি আমপাতার গন্ধের মতন এই সবটুকু চন্দন কোথায় জমা রাখবে। রোদ গাছের পাতা থেকে পিছলে নামছে ওর শরীরে, ভাদুর রঙের কাঁধে কী সুন্দর দেখায় এখন। কনে [illegible] সমস্ত সূর্বাস্ত গায়ে মেখে শ্যামলী এখন আসছে তার কাছে। ওর হলুদ শাড়িতে আগুন ধরে যাচ্ছে যেন।

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ?

—আধ ঘণ্টার অনেক বেশি।

—কী করবো বলো, বোষপুর পার্ক থেকে. দুপুরে ছাই ট্যাকসিও চট করে পাওয়া যায় না। মিনি বাসে এলাম।

কিছুই যেন শোনে না চন্দন। শুধু শ্যামলীর এই সামান্য অস্থির ভঙ্গিটুকুকে চোখ বুজে তুলে নিতে চায় নিজের বুকের ভেতর। আঙুল কাঁপে একটু একটু।

এখন চন্দন দেখতে পায় টেবিলের ঈষৎ নীলাভ কাচে শ্যামলীর উলটোমুখ। ওর সুখী আঙুল চামচ নিয়ে খেলে। দেয়ালের ঠাণ্ডা রঙ কী শুষে নিচ্ছে ওর চোখ ?

—কই বলো; হঠাৎ কী এমন জরুরি কথা তোমার ? চাকরি পেয়েছো নাকি নতুন ?

মাথার ভেতর হঠাৎ যেন চৈত্রের ধুলো ঝড় ঘুরে যায়, সব এলোমেলো লাগে চন্দনের। শ্যামলীর নিশ্বাস তার আঙুলে লাগলে সে বুঝতে পারে না কী সে বলবে, কেন ডেকে আনলো ওকে ? সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ ছেলেমানুষী মনে হল তার। না কি সিনেমার সংলাপ মুখস্থ বলবে—তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করলো, তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করলো খুব তাই....শ্যামলী মুখ তুলে তাকিয়ে আছে, নাকের দুপাশের কোমলতাটুকু আদর করে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে, কাঁধের মসৃণতায় কী ডুবিয়ে দেবে নখ ? তার রক্তকণিকা ফেটে লক্ষ লক্ষ পুরুষ জেগে উঠতে চায় ; বুকের শব্দ কী শ্যামলীও শুনতে পায় এখন ? ওর অলপেটের বেরিয়ে থাকা দু ইঞ্চি মসৃণতায় কী শেষ বিশ্রামের মতন শুয়ে পড়তে চাইছে সে। ওই তো, পেন্সিল কাটলে যে নতুন রঙের কাঠের রঙ বেরিয়ে আসে, সেই রঙের ঠোঁট দুটো মাত্র ক' ইঞ্চি দূরে। একটা সূর্যমুখী ফুল হয়ে সামনে বসে আছে শ্যামলী। আমি কী ভেঙে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলবো সব পাপড়ি, খুঁজবো কোথায় থাকে আসল নারী ? কেন তপ্ত বুক লণ্ডভণ্ড করে দিলেও আঙুল খুঁজে পায় না সেই আশ্রয়, যা তার দীর্ঘ অনিদ্রার ওপর ঘুমের বৃষ্টির মতন নেমে আসবে ? কেন ?

—কিছু বলছো না যে, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না আজ।

—কেন ?

—আমি না গেলে ভী-ষ-ণ ক্ষেপে যাবে বাসবী। তা ছাড়া বাবা মা সবাই যাচ্ছেন ; প্লিজ ; পাগলামি করো না। অন্য একটা ব্যাপারও আছে।

—কী ?

—বলবো কেন ? শ্যামলীর চোখের ভেতর কী নিজের মুখটা হঠাৎ দেখতে পেলো চন্দন ?

—ফোন করে দাও না, হঠাৎ আটকে পড়েছো কোনো কাজে ;

—মা তাহলে কেটে ফেলবে আমাকে। আসলে মার অন্য একটা ইনটারেস্ট আছে ;

—ইন্টারেস্ট ?

—হ্যাঁ, তাঁর মেয়েকেও দেখানো।

—মানে ?

—বাসবীর এক পিসতুতো না মাসতুতো দাদা আসছেন আজ ওদের বাড়িতে, খড়গপুরে আই আই টি-তে পড়ান, পেছনে ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে নিয়ে আসা এক বিখ্যাত ডিগ্রি আছে ভদ্রলোকের, মা তাই ছিপ ফেলে বসে আছেন, যদি টোপ গেলে ; বুঝলে এবার ? শ্যামলীর সুন্দর দাঁত হাসিতে আরও সুন্দর দেখায়।

চামচের শব্দ যেন হঠাৎ ক্রেনের লম্বা হুক হয়ে নিয়ে গেল তাকে ; শ্যামলীর হাসিতে কী শীতের বুড়ো পাতার মতন তার ভেতরটাও ঝুরঝুর করে খসতে থাকে ? শ্যামলীর দিকে তাকায় আর একবার। মনে হয় সাত হাজার মাইল দূরে বসে থাকা এই মেয়েটি সম্পূর্ণ অচেনা তার। ধুলো উড়ে আসে যেন মাথায় ; নিজেকেই বলতে চায় সাবধানে পা ফেলো চন্দন, সামনেই পতন তোমার। কোথাও কী কেউ কলিং বেল পুশ করে ডাকছে এখন শ্যামলীকে ? নাহ্। এবারেও কাটাকুটি খেলায় কোন অদৃশ্য হাত ঘর জিতে নিল। চুপ করে শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আঙুলের সব স্পর্শবোধ সে হারিয়ে ফেলে। কোনো মানে হয় না, এভাবে ওকে আটকে রাখার। শ্যামলী, আমি বুঝতে পারি সব, ডিমের ভেতর গুছিয়ে রাখা ডিমের মতন চমৎকার জীবন তোমার। ম্যাসাচুসেটস-এর ডিগ্রিওয়ালার কাছেই তোমার আসল জায়গা শ্যামলী, কোলের ওপর ছোট বালিশ চেপে সোফায় একটা মার্কিনী পত্রিকা হাতে নিয়ে তুমি কাটিয়ে দেবে সমস্ত দুপুর; কখনো বম্বে রোড ধরে কয়েকমাইল ঘুরে আসবে নিজেদের গাড়িতে। তোমার বাংলোর বাগান থেকে উড়ে যাবে পাখি, অ্যাকোয়ারিয়ামের জল ভেঙে ঘুরবে আদুরে শৌখিন মাছ তোমার আমেরিকান কেতাদুরস্ত স্বামীটি কুকুরটির সঙ্গে ছুটবেন মাঠে, বৃষ্টির অলস সন্ধ্যায় রেকর্ড প্লেয়ারে বাজতে থাকবে বেগম আখতারের গান। ওয়াড্রোব ভর্তি সুখ তোমার ? পাকা ধানের রঙের মতন জ্যোৎস্না যখন শূন্য মাঠে ছড়িয়ে থাকবে, ট্রেন চলে যাবে ঘুম ছিঁড়ে নিয়ে তোমার, তখন একটি নিরাপদ, উষ্ণ বুকের ভেতর তোমার সব ভয় গলে গলে পড়বে একদিন। আমি একটা চাঁদমারির টার্গেট ছুঁতে না পারা বুলেট শ্যামলী, টেরিটিবাজার থেকে বেগবাগান একা একা হেঁটে যাই আমি, মধ্য রাতে কার হাতের পিস্তল গর্জন করে ওঠে—হ্যাণ্ডস আপ। লিভারের বিশ্রি অসুখ আমার, এক-একদিন বাড়ি ফিরবার সময় সিঁড়িটা খুঁজে পেতে গোলমাল হয়ে যায় আমার। একদিন বাথরুমের ঝাঁঝরি দিয়ে ময়লা জলের বেরিয়ে যাওয়ার মতন আমিও হয়তো কোনো পাতালে পৌঁছে যাব, কাপুর অ্যাণ্ড জৈন-এর চাকরি নেই আমার, টের পাই, আমার ভেতরে ভেতরে বাড়ি ভেঙে ফেলার অবিরাম শব্দ...শব্দ; একটা লাইনও লিখতে পারছি না আমি আর, জলের ভেতর আগুন জ্বালানোর খেলা ভুলে যাচ্ছি আমি। তাছাড়া, কে বলবে ফ্লাওয়ার-ভাসের বাসি ফুল তুলে নতুন ফুল রাখার মতনই আমার সঙ্গে এই সবটাই তোমার নিছক এই বয়সের একটা খেলা নয় ? কে জানে ? তুমিও কী জানো শ্যামলী ?

—এই, আমি আর বসতে পারছি না, উঠছি, কেমন ? আর চুপ করে বসেই তো রইলে, বললে না কিছু।

ময়দানের দিকটা কেমন অন্ধকার হয়ে এল। ধুলো মাখা বেড়ালের মতন আকাশ এখন। একটু একটু শীত উঠে আসছে হাত, পায়ে। অফিস ভাঙছে, ভিড়....ভিড় দমবন্ধ হয়ে আসতে চায় তার। কোথায় যাব আমি ? মনুমেন্টের নিচে কোনো সভাটভা হচ্ছে ? দাঁড়িয়ে থাকবো ময়দান-মার্কেটের অশ্লীল চিৎকারের ভেতর ? ঠোঁটে চাপ দিয়ে যেন রক্ত আনতে চাইছে চন্দন। হঠাৎ কী মনে করে দক্ষিণের রাস্তা ধরলো চন্দন।

গেট টপকে নিজের পায়ের শব্দ ভেঙে তিন-তলায় উঠে এল চন্দন। একটা দারুণ মজার খেলা পেয়ে গেছে সে, রুমাল দিয়ে মুখ ঘসে নিল কয়েকবার।

—আচ্ছা, চন্দন রায় এখানে কোন বেডে আছেন বলতে পারেন ? একজন সিস্টারকে মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করলো সে।

—বেড নাম্বার জানেন না ?

—না।

অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখুন তাহলে ; জুতোর শব্দ দূরে সরে যায় ;

—ও ভাই, তুমি বলতে পারো, চন্দন রায়, রোগা, মুখটা সামান্য ভাঙা, কালো রঙের চশমার ফ্রেম, কোন বেডে—

—অসুখটা কী ? আর একজন ট্রে হাতে পিসিমা টাইপের নার্স জানতে চান।

—ঠিক জানি না, মাসে খবরটা পেয়েছি চিঠিতে, বোধ হয় লিভারের, সিরোসিস অফ লিভার হতে পারে....

—তাহলে কার্ডিয়াক ওয়ার্ডে এসেছেন কেন ? এটা তো সার্জিক্যাল : দেখুন নিচে, ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে পেতে পারেন, বেড নাম্বারটাও জেনে আসেন নি ?

বাহ্। কী মজার একটা খেলা এখন নিজেকে খুঁজে বার করবার। চমৎকার কেটে যাচ্ছে তার সময়। সত্যিই একটা খালি বেডে এখন শুয়ে পড়বে সে ? দারুণ উত্তেজনা টের পাচ্ছে ভেতরে ভেতরে, সমস্ত হাসপাতাল ঘুরে দেখছে। খুঁজবো কোথায় শুয়ে আছে অসুস্থ সেই মানুষটি, যার মুখোমুখি সে দাঁড়াতে চায় এখন। কিন্তু নিচের সিঁড়িতে পা রাখতেই ভিজিটিং আওয়ার্স শেষের ঘণ্টা শুনতে পেল চন্দন। আবার পা। ঝাঁক ঝাঁক পায়ের শব্দ তাকে ডিঙিয়ে নেমে যেতে থাকে। লাল অক্ষরের 'অপারেশন থিয়েটার' শব্দগুলো যেন তারই বুকের ভেতর জ্বলতে থাকে। কেমন একটা গন্ধে ঢিলে হয়ে আসতে চাইছে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়।

বাইরে মাঠভর্তি ফিরে যাওয়ার লোকজন। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে, নতুন পেশেন্ট তোলা হচ্ছে ওপরে, একপাশে একখানা খাট, সাদা চাদরে ঢাকা একটি অল্পবয়সের বউ, ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তার শরীর, খাটের চারপাশে কিছু শোকার্ত মানুষ। চন্দন দেখলো দাঁড়িয়ে। কোনো কষ্টের যেন চিহ্ন নেই মেয়েটির মুখে, এই জীবন ফেলে রেখে যেতে কোথাও যেন বাধা পায়নি সে। প্রথম শীতের নিবে আসা আকাশের গভীর শান্তি কী শুধু ওই মৃত মেয়েটিই টের পায় কেবল ? খুব ইচ্ছে করলো তার, সে-ও এই শোকার্ত মানুষ ক'টির সঙ্গে শ্মশানে যায়, দেখে কী করে আগুন মুছে দেয় ওই মুখ থেকে মৃত্যুর নীরব শান্তি।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাইরের রাস্তায় ওপিঠে বাস স্টপ থেকে কেউ কী ডাকলো তাকে ?

রবীন্দ্র সদনের মাঠ থেকে রঙিন জলের ফোয়ারা উঠছে আকাশে। নাটক দেখার আগে সুখী মানুষেরা সিগারেট ধরাচ্ছে, চমৎকার মেয়েরা কী দেয়ালের সুন্দর ছবি থেকে নেমে এল ? তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো, আপনারা সবাই বাড়ি যান, শো বন্ধ করে দিচ্ছি আমি : মাত্র কয়েক পা দূরে এইমাত্র মারা গেল একটি সুন্দর মেয়ে ; মৃতের সেই চোখ নেই আপনাদের দিকে ? যান, মাথা নিচু করে বাড়ি যান সবাই।

চিনচিন যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। আজ কেমন কেটে গেল সারাটা দিন, রাস্তা থেকে রাস্তায় এখন শেকড় উপড়ে ফেলা একটা গাছের শুকনো টান সে টের পাচ্ছে ভেতরে ভেতরে ? নাকি মাথার ভেতর চলছে করাত চালানোর একটানা খিসখিস শব্দ ? বাড়ি ফিরে গেলেই তো হয়।

একটা বাসেও শব্দ নেই, একটা ট্রামেও শব্দ নেই। চারপাশের বাড়িগুলো, রাস্তা একটা গাছের ভাঙা ছায়া, সব ঘুম....ঘুমের শান্তি। বাড়ি গিয়ে কী করবো এখন ? কার সঙ্গে কথা বলবো ? অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজের ভেতরে রেডিওর যান্ত্রিক গোলমালের মতন একটা ঘরর....ঘরর.... শব্দকে শুধু দশ আঙুলে চেপে ধরার চেষ্টা করবো ? কী করছে এখন শ্যামলী ? আইসক্রিমের মতন ঠোঁট শুষে নিচ্ছে ম্যাসাচুসেটস-ওয়ালার পকেটে করে নিয়ে আসা ভালবাসা ? বাহ্। তোমার পেছনে দেয়ালের রঙটা কেমন পালটে যাচ্ছে শ্যামলী, উড়ে যাচ্ছে তোমার ছায়া, কোকাকোলার মতন এই সুখী সন্ধ্যায়....আমি এতদূর থেকে হাততালি দিচ্ছি....ফাইন। লোকটা এবার কী তোমার তাদের

ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করে দিচ্ছে ?

কিন্তু আমার জিভ শুকিয়ে কাঠ, মাথার ভেতর টেলিগ্রাফের তারে বসা পাখির হঠাৎ উড়ে যাওয়ার দুলুনি, নখের রঙ কী সাদা হয়ে যাচ্ছে একদম। একটা প্রকাণ্ড বস্তার ভেতর কেউ টেনে নিচ্ছে আমাকে। অন্ধকার। লাইটপোস্টটা কী বদমাশ কুকুর হয়ে লেগেই থাকবে পেছনে ? নাকি চলে যাব আর্মেনিয়ানদের কবরখানায় ? একটা মাটি হয়ে যাওয়া শরীর বদলে শুয়ে পড়া, কয়েকটা জংলী ফুল, তিন হাজার নক্ষত্র চেয়ে আছে মুখের দিকে, হাওয়া .....হাওয়া আহ ! ঘুম আসছে বৃষ্টির শব্দের মত। অথবা এসব নয়, এরকম নয়, অদ্ভুত বাহারি একটা পোশাক তার গায়ে, থালায় রাখা হয়েছে হৃৎপিণ্ড: কার ? হৃৎপিণ্ডকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে সে, কী সুন্দর রঙ পালটে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ; ভিড়ের মধ্যে শ্যামলীও কী হাসছে জোরে ?

রেলিং জুড়ে উপচে পড়ছে যৌবন। ট্রান-জিসটারে সরু-মোটা গলা, একটা আলোর বিজ্ঞাপনে দুটো অক্ষর জ্বলছে না, তার হাত, পা কী অন্য কেউ পকেটে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে ? চন্দন গোড়ালির ধুলো মুছে ময়দানের অন্ধকার দেখে ; ইচ্ছে করে সমস্ত ময়দানে আগুন লাগিয়ে সে মনুমেন্টের মাথায় বেঞ্চে বসে বেহালা বাজায়।

একটা কড়া গন্ধ তার শরীরে উঠে আসে : মুখ ঘোরাল চন্দন। পলেস্তরা খসে যাওয়া দেয়ালের মতন শুকনো একটা মেয়ে। গালে দুটো ত্রিভুজ হয়ে বেরিয়ে আছে হাড়, রক্ত ঘষছে নাকি ঠোঁটে ? কী লাগিয়েছে চোখে ? মনে হয় আলাদা করে শুধু চোখ দুটোরই যেন জন্ম হয়েছে, কী ভাবছে মেয়েটা তাকে ? খদ্দের ? কায়দা বুঝেই ট্র্যাপ করবে তাকে ? রক্তের ভেতর বীজ থেকে জন্ম নেয় অঙ্কুর, দোষ কী, একটু বাজিয়ে দেখলেই তো হয় ; মেয়েটি তার রোগা পাছা নিয়ে দুলে দুলে আয়নার ভেতর হয়তো দেখাবে মহব্বতের নাচ। ভাবা যায়।

এলোমেলো রাস্তা সরে যায় চন্দনের পায়ের ধাক্কায় ; ফুচকা খেয়ে ফেলে দেওয়া শালপাতারা এবার কী উড়ে আসবে তার গায়ে ? পরিষ্কার পেণ্ডুলাম-ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল সে, একটা দমকল কী বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে ফুটো করে দিয়ে ? নিজের জামার বোতাম আর ছুঁতে পারে না হাত দিয়ে ; সামনেই কী একটা ব্লাইণ্ড লেন ? তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার ভেতরে, ওখানে। রিভলবার হাতে কী দাঁড়িয়ে আছে দ্যাট রাসকেল ইন্দ্র জৈন ?

পেছনে একটা শব্দ এসে ঠিক তার পিঠ ছুঁয়ে থেমে যায়। চন্দন দাঁড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অজিত।

—আরে কবি যে ! এত রাতে এ পাড়ায় ! একা ? না পার্টিফার্টি সঙ্গে কিছু আছে ? সমস্ত রাস্তা, ফুটপাথ, অন্ধকার জুড়ে ওর হাসিটা কাঁপে। চন্দন সরু চোখে দেখে অজিতকে। জামার রঙটা কী নীল ? কয়েক কেজি চুলে ওর মুখটা পলিথিনের বালিশ মনে হয়। বোঝাই যায় ও বেশ রঙে আছে এখন, সিগারেট ধরাতে কী একটু বেশী মনোযোগ দিতে হচ্ছে ওকে ? মুখ থেকে মিষ্টি হালকা মেজাজী গন্ধটা উঠে আসে চন্দনের শরীরে।

—বল কেমন আছিস ?

—ভাল ; তোর খবর ?

—দারুণ : এই তো ঘুরে এলাম জাপান থেকে।

—তাহলে বিজনেস চলছে ভালই :

—মন্দ না ; শালা লাইনটা ধরতে পেরেছি ; এবার দ্যাখ না দুধের স্বাদ কাকে বলে !

—এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

—কোথাও না ; চল না, বসি কোথাও।

—সারাদিন ঘুরেছি, খুব টায়ার্ড ; বাড়ি যাবো এবার :

—তোর বউ এখন কেমন ? একটু বেটার ?

—ধুস শালা ! ওর ভাল হবার কী আছে ; ড্যামেজ হার্ট ; ডাক্তার বারণ করে রেখেছে আমাকে, যেন স্ট্রেন হতে পারে অমন, এমন কিছু......

—মানে কনজুগাল রিলেশন ?...

—আমি ওসব পরোয়া করি না, সাধু সন্ন্যাসি নই ; আমি ঠিক লাইন বার করে নিয়েছি, শাা বাঁচতে হবে তো আগে। বৌও খুব ভাল মে: আমার জন্য চাইনিজ রেঁধে ঠিক বউয়ের মতন ব(থাকে, দারুণ গীটার বাজায়, আমার সঙ্গে জাপানে গিয়েছিল আজ মিসেস গাঙ্গুলি ; ব ভাবছিস আমি একটা কুত্তার বাচ্চা ; ভাট। জয়া স জানে ; আর এটাও জানে ডাক্তাররা যতই ভুজুং দিব আর দু-এক বছরের বেশি বাঁচবে না ; একসা(দু-জনে মরে লাভ কী ? এই তো আমি এখন বেগ বাগানে যাচ্ছি বেবির ফ্ল্যাটে ; ইফ য়ু লাইক, আম স্কুটারের পেছনে উঠে বোস, দেখবি তোর এই দুঃ দুঃখু ভাবটা কেমন ধুয়ে দেবে ও ; কোথায় শালা (ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে আর ক্যাপসুল গিলে গি(মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছে গলা পর্যন্ত, চার পে মাল টেনে বেবির গলায় সুখী চামড়ার ভাঁজে হা দিলে কিছুই মনে থাকবে না।

অজিত বিশ্রি হাসলো, না স্কুটারটা স্টা 'নেওয়ার শব্দ ? চন্দন যেন হঠাৎ ধাক্কা খায়, অন্ধক টেনে নিল অজিতের বিশাল শরীরটা ; হাওয়া কে নীল রঙ কোথায় যায় এখন ? আজ কী বৌকে আমার কথা বলবে ? হঠাৎ চিৎকার করে স্কুটারট পেছনে ছুটতে ইচ্ছে করলো তার ; অজিত, তে সঙ্গে আমি বদল করতে চাই জীবন। তোর মব জোরে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে সুখ-দুঃখের সংসারে তোর বৌকে ভেঙে ফেলে আমারও জানতে ই(করে কোথায় লুকিয়ে থাকে বেঁচে থাকা ; কি দ্যাখ আমার শরীরে ধুলো, লিভারের খারাপ অস আমার, মুখে টক জল জমা হচ্ছে এখন, হয়(এখুনি মাথা ঘুরে আমি পড়ে যাব, সারাটা ি লোকের পায়ে পায়ে গড়িয়ে যাওয়া ইঁটের টুক(হয়ে ঘুরলাম, খুঁজলাম নিজেকে হাসপাতাে বেড়ে, দেখা হলো না ; আমার ভেতরে বিঁধে আ ইন্দ্র জৈনের গালাগাল ; আমি জানি, জামা ি করে দিয়ে চোখের নিচে অল্প ক্রিম ঘসে নীল আলোয় চোখ বুজে একটা ঝাঁঝালো সন্ধ্যার মু এখন ডুবে আছে শ্যামলী ; তাহলে এখন আমি ব কাছে যাবো ? কে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আ এখন ?

—এই যে দাদা শুনুন।

চন্দন মুখ ঘোরায় ;

—আরে, লজ্জা পাবার কী আছে ; আমি লে চিনি ; গত জন্মে আপনিই বিবেকানন্দ ছিলে ওই তো কপাল বলে দিচ্ছে আপনার ; সারা দুনি খুঁজছে আপনাকে, আর আপনি কী না ; মা খবরের কাগজ দিয়ে বানানো লম্বা ... পরা পা না মাকাল লোকটা মাঝ রাস্তায় নেমে হাস(চন্দন কুঁকড়ে যায় ; যেন শীত উঠে আসছে রক্তে না একটু একটু জ্বরে ভুলে যায় তার ফিরে যা ঠিকানা ? কে তার হাত খুলে নিচ্ছে, পা কী প রইল মাঝ রাস্তায় ? অজিত কী সত্যিই পেছ(সীটে বসিয়ে নিয়েছে তাকে ? ওই তো সিঁড়ি, দর আলো, তার ঘরে টেবিলের ওপর রাখা জে গ্লাস ; শব্দ ; পরপর শব্দরা ডিঙিয়ে যাচ্ছে তা(জিরো....টু....ওয়ান....সেভেন জিরো.... টু ওয়ান সেভেন....বুদ্ধদেবের কোমল, শান্ত মুখ চোখ ে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়....

—পাসপোর্ট না থাকলে আর এগোবেন : সাবধান।

শ্মশানে সেই মেয়েটির চিতায় কী জল ঢ হয়ে গেছে এতক্ষণে ? কোথাও কী রেডিও দুর্বোধ্য শব্দ হচ্ছে ; ভয়ংকর জোরে পাগলটা হে যাচ্ছে এখনো ? নিচে, ওই তো কতদূরে পৃথি গন্ধ, তার মা, শ্যামলীর আঙুলের রঙ, সা ফলকের তলায় বিছিয়ে দেওয়া কাঠ-গোলা গন্ধ ; চন্দন বুঝতে পারলো না, সে সামনে না পে কোনদিকে.......

ছবি : সুনীল ।

বিজ্ঞান

হিরোসিমার সেই মর্মান্তিক ঘটনা এবং যে উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি

'সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিট। পারমাণবিক বোমা ছেড়ে দিলাম। ৪৩ সেকেণ্ড পর। তীব্র আলোর ঝলসানি। একটা ঝটকা। শক ওয়েভ। প্লেনটি ঝটকায় কাত হল। নীচে বিরাট মেঘ। কুণ্ডলী পাকিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।'

'সকাল নটা। দূর থেকে মেঘের কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। উচ্চতা ১২০০০ মিটারেরও বেশী।'

বি-২৯ প্লেনটির ফ্লাইট ডায়রীতে এইভাবেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। 'এনোলা গে'। প্লেনটির নাম। আর সেই কুখ্যাত বোমা—পারমাণবিক বোমা— নাম 'লিটল বয়'। এই 'লিটল বয়'কেই হিরোসিমা শহরের ঠিক মাথার ওপর নিক্ষেপ করে যুদ্ধের এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছিল 'এনোলা গে'। সেটা ৬ আগস্ট, ১৯৪৫।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পর পুনরাবৃত্তি। এবারকার লক্ষ্য নাগাসাকি। ৯ আগস্ট, ১৯৪৫। সময় দুপুর ১১টা বেজে ২ মিনিট। নাগাসাকির ওপর নিক্ষেপ করা হল আরও একটি পারমাণবিক বোমা। নাম 'ফ্যাট ম্যান'। এটির বিধ্বংসী ক্ষমতা আরও বেশী। আরও ব্যাপক। 'লিটল বয়'-এ ব্যবহার করা হয়েছিল ৬০ কিলোগ্রামের মত ইউরেনিয়াম-২৩৫। তবে পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল মাত্র ৭০০ গ্রাম। 'ফ্যাট ম্যান'-এ ব্যবহার করা হয় ২০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম-২৩৯। এই প্লুটোনিয়ামের ১·৩ কিলোগ্রাম বিস্ফোরণে অংশ গ্রহণ করে। 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ১২৫০০ টন টি এন টি বা ট্রাই নাইট্রো টলুইন-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান। 'ফ্যাট ম্যান'-এর ২২০০০ টন টি এন টি'র সমতুল্য।

এবং অবশেষে—!

*

৩৩ বছর বয়স্কা সেই গৃহবধূ, নাম ফুতাবা কিতাইয়ামা। 'লিটল বয়'-এর যেখানে বিস্ফোরণ ঘটে, অর্থাৎ মাটি থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ঠিক যে জায়গাটিতে সেই পারমাণবিক বোমাটি তার প্রথম আগ্রাসী থাবা সোচ্চার করল, ভদ্রমহিলা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ১·৭ কিলোমিটার দূরে।

তাঁর নিজের কথা : কে যেন চিৎকার করে বলল, প্যারাস্যুট। প্যারাস্যুট নামছে।

'চিৎকার কানে যেতেই আকাশের দিকে চাইলাম। আর তারপর মুহূর্তেই—এক ঝলক আলো আমার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে দিল।' তীব্র ঝলসানি এবং প্রচণ্ড শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমার পায়ের নিচের মাটি যেন দুলে উঠল। মাটির ওপর আমি সটান পড়ে গেছি। আর পরক্ষণেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর আমি চাপা পড়ে গেছি। অন্ধকার। পিচ কালো অন্ধকার। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর কোন ক্রমে বেরিয়ে এলাম।

'কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে গিয়েই কিসের যেন গন্ধ পেলাম। বাতাসের গন্ধ? হতে পারে। সে গন্ধ যেন সহ্য করা যায় না। পরক্ষণেই আমি চমকে উঠলাম। এ কি? আমার মুখের চামড়ায় অসহ্য জ্বালা। জ্বালা দুই হাত এবং বাহুতেও ছড়িয়ে পড়ল। কনুই-এর পর থেকে নখের ডগা পর্যন্ত ফোসকা। ডান এবং বাঁ হাতের চামড়া দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অদ্ভুতভাবে ঝুলতে লাগল।

'কিছুক্ষণ আগেও মাথার ওপর ছিল নীল আকাশ। এখন অন্ধকার। সূর্যাস্তের সময় যেমনটি দেখায়, সেই রকম। পাগলের মত জঞ্জালের স্তূপের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমি সেতুর দিকে ছুটে চললাম।

'সেতুর নিচে চাইতেই মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা। শত শত মানুষ নদীর জলে কীটের মত দেহ মোচড়াচ্ছে। তাদের মুখ ফুলে উঠেছে, ফ্যাকাসে মেরে গেছে। নদীর জলে মরা কুকুর বেড়ালের মত ভেসে রয়েছে অগণিত মানুষের শব। ছিন্নভিন্ন জামা-কাপড়ের সাজে তাদের উলঙ্গই বলা চলে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শত শত নরনারী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নদীর ধারে অগভীর জলে দেখলাম একটি মেয়ের মৃতদেহ। তার বুক ছিন্নভিন্ন। সেখান থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা।

'গায়ের জ্বলুনি কষ্টকর হয়ে উঠল। আগুনে পুড়লে জ্বালা করে। কিন্তু এ জ্বালা যেন ভিন্ন রকম। এ জ্বালা শরীরের সর্বত্র যেন ছড়িয়ে পড়ছে। আমার হাত দুটি থেকে বেরিয়ে আসছে এক ধরনের হলুদ রস। আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি। আমার পাশে এক দল স্কুলের ছেলে মেয়ে। আমার মত তারাও কুঁকড়ে যাচ্ছে। তারা 'মা, মা' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু কোথায় তাদের মা? একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তারা।

'ক্রমে আমার মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে। গালের ওপর হাত বুলিয়ে মুখের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে হল, আমার মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ ফুলে গেছে। আশ্রয়ের আশায় আমি ছুটতে লাগলাম। আমার দু-পাশে স্ট্রেচারে করে আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ী এবং ট্রাক বোঝাই শবদেহ। আর রাস্তার দু পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে অজস্র স্ত্রী এবং পুরুষ। সবাই যেন দিশা হারা মানুষ।'

*

পর্যবেক্ষকদের মতে, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময় হিরোসিমায় জনসংখ্যা ছিল ৩৫০,০০০। বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যাদের বাস তাদের শতকরা ষাট জনই মারা গিয়েছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। অবশিষ্টের শতকরা ৯০ জন পরবর্তী দশ দিনের মধ্যেই মারা যায়। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ১৯৪৫-এর শেষাশেষি হিরোসিমায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০,০০০। এদের মধ্যে ২০,০০০ সৈনিক।

ডঃ বয়নবাই মনে করেন, এই হিসেবে কিছু গরমিল রয়েছে। ১৯৫০ সালে লোক গণনার সময় অনেকের হদিশ পাওয়া যায়নি। 'তারা গেল কোথায়? এছাড়া ১৯৪৫ সালে যারা বেঁচে ছিল, অথচ পরবর্তী কয়েক বছরে তেজস্ক্রিয়তার দরুণ মারা যান, তাদের হিসেব কে দেবেন? বোমা ফেলার পর প্রথম সপ্তাহে হিরোসিমার বাইরে থেকে লোক গিয়েছিল ৩৭,০০০। তাদের কার কার ভাগ্যে কি ঘটল সে খবরও তো এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি? তা হলে ১৯৬৭ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে যে বলা হয়, হিরোসিমায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট ৭৮,০০০ এ তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

বোমা ফেলার সময় অনেকের ধারণা নাগাসাকির মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮০,০০০। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতে মৃতের সংখ্যা ২৭,০০০। ডঃ বয়নবাই এ তথ্যও অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। নির্ভরযোগ্য মহল মনে করেন, ১৯৪৫-এর শেষাশেষি সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪,০০০। ১৯৪৫ সালের পর যারা মারা যায়, তাদের কোন হিসেব পাওয়া যায় নি। কোনদিন হয়ত আর পাওয়াও যাবে না।

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের দরুণ যে পরিমাণ শক্তি বিমুক্ত হয়েছিল তার অর্ধেক বায়ুস্তরে প্রচণ্ড অভিঘাত সৃষ্টি করে। অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, যেন এক একটি বাতাসের প্রাচীর প্রচণ্ড চাপে এবং বেগে চারদিকে ছুটে যাচ্ছে। এই ছুটে চলার গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশি ছিল। প্রায় ১১ কিলোমিটার যেতে সময় নিয়েছিল মাত্র ৩০ সেকেণ্ড।

এর পরই ঘটল আর একটি ঘটনা। এগিয়ে চলা বায়ুস্তরের সামনের দিকের চাপ বেশি থাকায় অনুপাতে তার পেছন দিকের চাপ গেল দারুণভাবে কমে। ফলে, কিছুক্ষণ সাম্য অবস্থা গেল। তার-

৯ আগস্ট, ১৯৪৫। ফ্যাট ম্যান'-এর গ্রাসে নাগাসাকি

পরই অতিমাত্র তাড়িত বায়ুস্তর যখন বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ওই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সবেগে ছুটে আসতে লাগল বাইরের বাতাস। অর্থাৎ গোড়ায় ঝড় উঠল বিস্ফোরণ কেন্দ্রের কাছে। সে ঝড় ওই কেন্দ্র থেকে ঝটকায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এবার বাইরে থেকে বাতাস ঝড়ের গতিতে ধেয়ে এল ওই কেন্দ্রেরই দিকে। তখন তার গতি সেকেন্ডে সত্তর মিটারের মত। অর্থাৎ ঘন্টায় ২৫২ কিলোমিটার। আর চাপ প্রতি বর্গমিটারে তিন টনের মত। প্রচন্ড এই বাতাসের তোড়ে ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গেল। একই ঘটনা ঘটল নাগাসাকিতেও।

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ শক্তির এক-তৃতীয়াংশ রূপান্তরিত হয় উত্তাপে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয় উত্তপ্ত অগ্নিগোলক। মুহূর্তে যার তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক সেকেন্ডে ওই অগ্নিগোলকের ব্যাস ২৮০ মিটারে পরিণত হয়। গোলকটির বাইরের তলের তখন তাপমাত্রা উঠেছিল প্রায় ৫,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণের পর প্রথম তিন সেকেন্ড যতটা তাপ নির্গত করে তার পরিমাণ সূর্য থেকে নির্গত তাপেরও কুড়ি গুণ বেশি। নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমায় এই পরিমাণ আরও দ্বিগুণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফলে বিস্ফোরণ কেন্দ্রের ৩·৫ কিলোমিটার দূরেও তখন যে সব মানুষ বাস করছিল তাদের গায়ের চামড়া ঝলসে যায়। শুরু হয় প্রচন্ড অগ্নিকান্ড।

হিরোশিমায় তখন বাড়ির সংখ্যা ছিল ৭৬,০০০। প্রচন্ড বাতাসের তোড়ে এবং আগুনে তার শতকরা ৬৮ ভাগই ধ্বংস হয়ে যায় এবং শতকরা ২৪ ভাগ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাগাসাকিতে বাড়ি ছিল ৫০,০০০। তাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ পুরোপুরি ধ্বংস এবং ১১ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া প্রচন্ড উত্তাপে চারদিক দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। কাঠ, গাছপালা, ছাই-এ পরিণত হল। পুকুর, নদী-নালা এবং পোড়া গাছপালা থেকে তৈরি হল জলীয় বাষ্প। এই বাষ্প ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়ে ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, বর্ষাই। কিন্তু এ বর্ষা ভিন্ন জাতের। এই বর্ষার জল প্রচন্ড তেজস্ক্রিয় এবং তৈলাক্ত। বিশেষজ্ঞদের কাছে এই বর্ষার পরিচয় 'ব্ল্যাক রেইন' বা কালো বর্ষা।

*

বোমার বিস্ফোরণজনিত শক্তির ১৫ শতাংশ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হিসেবে বিমুক্ত হয়। এর এক-তৃতীয়াংশ বিস্ফোরণের এক মিনিটের মধ্যেই নির্গত হয়েছিল। যাকে বলা হয় 'ইনিশিয়াল রেডিয়েশন' বা প্রারম্ভিক বিকিরণ। অবশিষ্ট যা, তার নাম 'রেসিডুয়েল রেডিয়েশন' বা অবশিষ্ট বিকিরণ। বিস্ফোরণের পর মাটি, ঘর-বাড়ি, বাতাস—সর্বত্র পারমাণবিক ভস্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময় প্রচুর নিউট্রন কণাও সৃষ্ট হয়। ওই নিউট্রন কণা মাটি বা ঘর-বাড়ির ইঁট-পাথরের বহু সামগ্রীর সঙ্গে আঘাত করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করে। পারমাণবিক ভস্ম এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে নিয়মিত যে বিকিরণ নির্গত হয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে 'রেসিডুয়েল রেডিয়েশন'। এই বিকিরণ জীব-জগতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

কারোর শরীরে কতটা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পড়ল সেটা মাপার জন্যে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের এককের কথা বলে থাকেন। যার নাম 'র‍্যাডস'। অনেকের ধারণা শতকরা ৫০ জন মানুষকে হত্যা করতে হলে ৪০০ র‍্যাডস বিকিরণই যথেষ্ট। অতএব হিরোশিমা এবং নাগাসাকির পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনায়াসেই অনুমান করা যায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, হিরোশিমার বিস্ফোরণ কেন্দ্রের পঁচাশ মিটারের মধ্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা দাঁড়িয়েছিল ৬,০০০ র‍্যাডস এবং নাগাসাকিতে ৮,০০০ র‍্যাডস-এর মত।

এটা গেল তাৎক্ষণিক হিসেব। পরবর্তীকালে রেসিডুয়েল রেডিয়েশনের দরুন সঠিক কত জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা তাদের এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, জানা যায় নি।

অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের স্পর্শে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকের মধ্যেই দেখা দেয় বিকিরণজনিত অসুস্থতার লক্ষণ—গা গোলানো এবং বমি। কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকে রক্ত বমি করতে থাকে। জ্বর এবং উদরাময় অথবা পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়া—। এবং তারপর দশ দিনের মধ্যেই মৃত্যু।

যাদের শরীরে বিকিরণের মাত্রা কম ছিল তাদের মধ্যেও ওই সব উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের দাঁতের গোড়া, নাক এবং জননেন্দ্রিয় থেকে রক্ত পড়তে থাকে। মেয়েদের মাসিকে গোলমাল দেখা দেয়। চুল পড়তে থাকে, তার সঙ্গে জ্বর এবং দুর্বলতা। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। অবশেষে মৃত্যু।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে আসার পর ১৯৪৫ সালের শেষে যারা মরল না, তারা নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে বেঁচে রইল। তাদের মধ্যে দেখা দিল চোখের রোগ, রক্তের রোগ, ক্যানসার এবং মানসিক রোগ। দেখা গেছে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ওই সময় যারা ছিল এবং এখনও বেঁচে রয়েছে তাদের অনেকেই এখন থাইরয়েড, স্তন, ফুস-ফুস, জিহ্বার লালা গ্রন্থি, হাড়, প্রসটেট, মস্ত প্রভৃতির ক্যানসারে ভুগছে। বোমা পড়ার সময় যে সব মায়ের পেটে সন্তান ছিল, তাদের বেশির ভাগই জন্মেছে কোন না কোন অক্ষমতা নিয়ে। কেউ বিকলাঙ্গ—মাথার আয়তন অত্যন্ত ছোট, কেউ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এদের মধ্যে প্রজননগত ত্রুটি ভবিষ্যতে বংশানুক্রমিকও হওয়া সম্ভব। শেষোক্ত এই সম্ভাবনা ইতিমধ্যে নানা রকম সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। পাছে তাদের সন্তান-সন্ততি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায় এই ভয়ে এখনও অনেকে বিয়ে করতে রাজী নয়। মানসিক ভারসাম্য নেই অনেকেরই। অবসাদজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। শ্রম দপ্তরের কাছে যা বড় রকমের একটি সমস্যা।
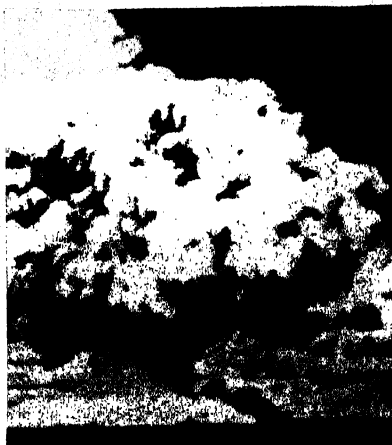
৬ আগস্ট, ১৯৪৫। হিরোশিমার বুকে 'লিটল বয়'-এর আগ্রাসী থাবা

*

হিরোশিমা এবং নাগাসাকির নিষ্ঠুরতম ঘটনা মানব সভ্যতাকে কতটুকু অভিজ্ঞ করে তুলতে সাহায্য করেছে?

করেনি। যদি করত, তা হলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর অস্ত্রাগারে দশ হাজার পারমাণবিক অস্ত্রের জায়গা হত না। এমন কয়েক হাজার অস্ত্র যাদের বিধ্বংসী ক্ষমতা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে সাত লক্ষ গুণ বেশী। এবং এখানেই আশঙ্কা। কারণ, ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে, যুদ্ধরত কোন দেশ তার অস্ত্রাগারের শেষ অস্ত্রটি নিঃশেষ হওয়ার আগে কখনও আত্মসমর্পণ করে না।

ঈশ্বর না করুন। ধরুন, মানব ইতিহাসের সেই বিপর্যয়তম মুহূর্তটি আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না? যুদ্ধ বাধল? আর ওই সব বোমার ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠল? তখন?

সব ক'টি নয়, সঞ্চিত বোমার বড় রকমের অংশ শুধু। তাই যথেষ্ট। স্ফুলিঙ্গের মত পলকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের প্রায় সমস্ত শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু। তারপর এক একটি দিন অতিক্রান্ত হবে যখন, একের পর এক ঘটতে থাকবে অকল্পনীয় ঘটনা। পৃথিবীর বাতাসে পারমাণবিক ভস্মের ছড়াছড়ি। তেজস্ক্রিয় ভস্ম। সেই ভস্ম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আর তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ জীব-কোষের প্রজননগত বিপত্তি ঘটিয়ে তাবৎ প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। অনেকের আশংকা, পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া-মণ্ডলেরও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। তেজস্ক্রিয়তার দরুণ বাতাস আয়নিত হবে। আয়নিত হবে ঊর্ধ্বাকাশের ওজন স্তর। এর ফলে পুরো ওজন স্তরটিই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। তখন সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী রশ্মি বা আলট্রা-ভায়লেট রে'র বর্ষণ বেড়ে যাবে। যা পৃথিবীর জীব জগৎ-এর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

সম্প্রতি হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল। উদ্যোক্তা ইউ-নেসকো এবং জাপানের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির সেই মর্মান্তিক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর গত দীর্ঘ বত্রিশ বছরে জীব জগৎ-এর ওপর তার প্রতিক্রিয়া কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে যথাযথ পর্যালোচনা করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। চৌদ্দটি দেশের চুয়াল্লিশ জন বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম স্টকহোম ইনটারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনসটিটিউটের পরি-চালক ডঃ ফ্র্যাঙ্ক বরনবাই।

সম্মেলনের শেষে ডঃ বরনবাই মন্তব্য করেছেনঃ হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ঘটনা সম্পর্কে এখনও অনেক খবর আমরা জানতেই পারিনি। আমাদের সম্বল তাৎক্ষণিক কিছু বিবরণ। কিন্তু সেই বিস্ফোরণের ফলে বিলম্বিত যে সব ঘটনার উদ্ভব হওয়া সম্ভব তার অনেক কিছু এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। এসব জানা গেলে তার পরই আমরা বলতে পারব, পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতি মানব সভ্যতার কাছে কতটা ক্ষতিকর এবং কতটা সুদূর-প্রসারী।

এত যে সমস্যা, তবু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পৃথিবীর অস্ত্রাগারে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই গেছে। মোট পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা এখন দশ হাজার। আর সেই সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাও যে বাড়ে নি সে কথাও কেউ হলফ করে বলতে পারেন না। তাই যদি হয়, হিরোশিমা এবং নাগাসাকি কি তাহলে মানব সভ্যতাকে কোন শিক্ষাই দিতে পারে নি?

চৌদ্দটি দেশের চুয়াল্লিশ জন বিজ্ঞানী হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বিভিন্ন হাসপাতাল, গবেষণা কেন্দ্র ঘুরে এবং সমাজসেবী এবং পারমাণবিক বোমার করাল গ্রাসকে উপেক্ষা করে আজও যাঁরা জীবিত, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই সব বিজ্ঞানীদের ধারণা, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক ক্ষতির কথা জানতে গেলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত আমরা তাৎক্ষণিক ক্ষতি-টুকুই জেনেছি। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি পৃথিবীর জীব জগৎ এবং পরিবেশের পক্ষে কতটা সুদূরপ্রসারী তা জানার জন্যে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

সমরজিৎ কর

আড্ডাগুরু অমিয়নাথ সান্যাল

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভুবনের নানা ঘাটে জীবনের এই নৌকোটা ভিড়েছে—কোথাও কম তোলা হয় নি কিন্তু কই অন্য ঘাটে খালাস করা হয় নি। যখন যা পেয়েছি যেমনটি পেয়েছি নিয়েছি। না আমি ত নৌকার মালিক নই, মাল খালাস করারও নয়—কোন্ এক অজানা নিয়মে সব কিছু ঘটে যাচ্ছে। তবে আমার কি কোনো ভূমিকাই নেই। আছে, সেটা নিরুপায় দর্শকের। দু চোখ ভরে দেখার—যা দেখতে ভালো লাগে তা ত দেখিই, আর যা ভালো লাগে না তা-ও দেখতে হয়। চোখ বুজব তার উপায় নেই, কে যেন জোর করে দেখিয়ে যাচ্ছে। ভয়, ভাবনা, চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকের চেষ্টা সবই সেখানে বেবাক বিফল। এই দর্শক কেবল খবর রাখে কোথায় কি আছে, আর কি ছিল, এখন নেই।

মোট হিসেবটা কতকটা এই রকম—জমার দিকে আমার ক্ষেত্রে ভালোবাসাই বেশী। জীবন আমার সেদিক দিয়ে খুব বড়লোক, কেন না প্রচুর ভালোবাসা পেয়ে এলাম কিন্তু সে তুলনায় দিতে পারি নি। সে দিক থেকে ঋণী বইকি।

এই চেতনা তখনই বড় হয়ে ধরা পড়ে যখন কোনো প্রিয়জন বিয়োগে অস্তিত্ব দুর্বহ হয়ে উঠতে চায়। প্রয়াত অমিয়নাথ সান্যাল আমাদের সেই প্রিয় মানুষ ছিলেন।

মনে পড়ছে উনিশ'শ পঞ্চাশ দশকের সেই সব দিনের কথা। তার আগে তাঁর নামও শুনিনি। একদিন গৌর এসে বলল, 'দেশ' পত্রিকায় একটা খুব ভালো লেখা বেরুচ্ছে। সকালে আমাদের এই তের নম্বর বাড়ির আড্ডায় তখন শিবনারায়ণ রায়, গৌর, দক্ষিণাদা, নারায়ণ চৌধুরী, নীরেন, বিমল, নরেন মিত্ররা দু ভাই হামেশা জমতেন আর বড়দের মধ্যে তারাশঙ্কর, সজনীকান্তও কখনো কখনো হাজির হতেন। ভুল হল, সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত কখন কে আসবেন আর আসর জমে উঠত তার কোনো নিয়মকানুন ছিল না।

এই রকম আসরেই স্থির হল অমিয়নাথ সান্যাল মশাইএর 'স্মৃতির অতলে' মিত্রালয় থেকে প্রকাশ করার মত বই। এমন সুন্দরভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতের নিখুঁত ছবি আর সেই সঙ্গে সমঝদারীকে একেবারে প্রাণবন্ত করে তোলার অসাধারণ লেখনীশক্তি এর আগে বাংলায় কেউ দেখাতে পারেন নি। চিঠি লেখা চলল কৃষ্ণনগরে। জবাবও পেলাম। বিজয়ার অভিনন্দনের সঙ্গে কিছু সংবাদ : "আমি হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় যেতে পারি। আপনাদের মিত্রালয়ের কাছে একটি পুরোনো আড্ডায় উঠব। যাই হোক—আপনি দুপুরবেলা বা বিকালে কোন সময়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের আখড়ায় (!) থাকেন জানতে পারলে ভাল হয়। কলিকাতায় গেলে আমার গতায়াতের কিছু ঠিক থাকে না, সেজন্য আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করব অর্থাৎ চেষ্টা করব ঠিক করেছি।..."

এর পর ১১-১১-৫২ তারিখে যে চিঠি লিখছেন তাতেও 'মান্যবরেষু' পাঠ দেখছি।..."আমি আবার কবে কলিকাতায় যাব কিছু ঠিক নেই। আপনি একবার এখানে আসুন; নিতান্ত অপরিচিত দেশে আসছেন না। সকালের ট্রেনে এসে এখানে চারটি শাক-অন্ন খেয়ে ১১।৫৪র গাড়িতে বা বৈকালে ফিরে যেতে পারবেন। সকালে আসার অসুবিধে হলে কলিকাতার ১॥টার গাড়িতে রওনা হতে পারেন; সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরে যাবেন। যথার্থ কথা এই—আপনার সাক্ষাতে কথাবার্তা হলে কাজটা পাকাপাকি রকমে বুঝে অগ্রসর হতে পারি। স্নানে খাঁ শেষ হতে আর দেরি নেই। শেষ দেখেও আসতে পারেন। আপনার অসুবিধা হবে না এ কথা বলতে পারি।..."

এর পর না যাওয়ার কোনো পথ নেই। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্শা চলতে শুরু করেছে দেখে কেমন-কেমন লাগল, এর আগে যখন গিয়েছিলাম তখন ঘোড়ারগাড়ির উড়োনো ধুলোয় নিজেকেই খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। ডাক্তার অমিয় সান্যালকে কেউ বড় একটা চেনে বলে মনে হল না। প্যাডেলার বলল,—কি বললেন, হাই স্ট্রীট? হাই স্ট্রীটে একজন ডাক্তার আছেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিও সান্যাল।

ক্রমেই বুঝলাম অমিয়নাথ খুব কম লোকের কাছে পরিচিত হতে পারেন তবে পাঁচুবাবু ডাক্তার বেশ জনপ্রিয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। গানবাজনার আসরের চৌম্বক আকর্ষণে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারপর ভেস্তে ধরলেন বটে, তবে অ্যালোপ্যাথিক পন্থার বদলে হ্যানিম্যানের দর্শনের ওপরই আস্থা স্থাপন করলেন। একটা সময় এসেছিল যখন অ্যালোপ্যাথি পাশ করে চিকিৎসার বাহন হিসেবে প্রতিভাবান যুবক চিকিৎসকেরা হোমিওপ্যাথিই গ্রহণ করতেন।

যাক ওসব কথা।

খবর না দিয়ে হাজির হয়ে ও'দের অবাক করে দিলাম এবং একচোট বকুনিও খেলাম, অতিথির আদর-যত্নের ত্রুটি হবে না। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না, আমার আসল উদ্দেশ্য ত খাওয়াদাওয়া নয়, কৃষ্ণনগরের আশ্রমে

গুরুজীর বৈঠকখানায় ঠাঁই পাওয়ার মতলব। তখনও মাথায় রয়েছে অমিয়বাবুর লেখার কিছু কিছু নক্সা। সেই চালেই বয়সের বাধা ঝেড়ে ফেলে দিতে সাহস জোগালো। বললাম, বই ত আপনার, ঠক আপনার সামনে হাজির—এখন বৈঠক তো হোক, পরে খানা ঠিকই জুটে যাবে। নস্যের টিপ নাকে ঠেলে একচোট হেসে নিলেন। আস্তে আস্তে আলাপ বিস্তার হল। সান্যাল মশাইএর আসরের যে কজনের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বীরুদার কথা তোলা অসম্ভব। বীরুদা না থাকলে আসরের অর্ধেকটাই ফাঁপসা। তিনি ঠিক জায়গায় টোকা দিলে ওস্তাদজীর আসল ঘাটে আওয়াজ ওঠে।

কলকাতায় ফিরে চিঠি দিলাম। দেখেশুনে বুঝে ফেলেছি যে, অমন মানুষকে খোঁচাখুঁচি না করলে কাজ আদায় করা মুশকিল। যদি একবার ঝোঁক ধরে যায় তবে ভাবনা নেই। কিন্তু জুড়িয়ে আসছে বুঝে সময়মতো উসকে দিতে হবে। এই উসকানির কাঠিটা যেন বীরুদা আমায় চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

'দেশ' পত্রিকায় কবে যার প্রসঙ্গ শেষ হলেও লেখকের মন খুঁতখুঁত করছে। মাজাঘষা না করে এই আকারে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। পত্রিকার পাশে জায়গা কম ওতে সংযোজনের অসুবিধে। আমি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, কাগজ সংযোজন করলেই পাণ্ডুলিপি বিস্তার করা যাবে।

আমার চিঠির উত্তরে সম্ভাষণ পরিবর্তিত হয়ে প্রীতিভাজনেষুতে পৌঁছেছে। কিন্তু এ কি চিঠির তারিখ! ৮-১২-৫৯? বাংলা বর্ষ আর ইংরেজী মাস। চিঠি লেখার মধ্যে কোনো কোনো মানুষের অনেক পরিচয়টি মেলে সেটুকু খুবই উপভোগ্য এবং তার বিকল্প হয় না :

"আপনার চিঠি আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছে; বিশেষ করে আপনার নতুন কাকিমাকে। তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আবার কবে আসবে সে?' 'সে' থেকে বুঝলাম আপনি অন্দরমহলে আত্মীয়তার স্থান অধিকার করে ফেলেছেন। অর্থাৎ আপনারই জয়।

"আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন সে বিষয়ে আমি জানাই যে, আমি পাকাপাকি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। (প্রস্তাব অর্থে 'স্মৃতির অতলে' প্রকাশনার স্বত্বাধি) এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আজই আরম্ভ করলাম ময়দার আঠা তৈরি করতে। একেই বলে কাজের আঠা! আশা করি এক সপ্তাহের শেষের দিকে 'স্মৃতির অতলে' তিন গুণীর বিষয়ে ছাপার কপিগুলি প্রস্তুত হয়ে থাকবে। অবশ্য আপনাকে খবর দেব।

"কলিকাতায় গেলে নিশ্চয় আপনার বাড়ি যাব: আপনার সঙ্গেই যাব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। না হয়, আপনাকে আগেই চিঠি লিখে জানিয়ে দেব। আপনার ওখানে গিয়ে যতীনবাবুর সঙ্গেই দেখা করা হবে উপরি পাওনা।

"গৌরবাবুর চিঠি পেয়েছি। ভাবছি শান্তিনিকেতনে গিয়েই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করব, কি না।..."

চিত্রশিল্পী যতীন সেন মশাই সে সময়ে পাইকপাড়ায় আমাদের গলিতেই থাকতেন। পার্শিবাগানে "চোদ্দ নম্বর"এর আড্ডায় অমিয়বাবুর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয়েছিল। পাইকপাড়ায় থাকলেও দেখাসাক্ষাতের ঠিকানা তাঁর রাজশেখর বসুর দোতলার বারান্দা! কেন না, ঝড়বাদল দাঙ্গাহাঙ্গামা যা-ই হোক না যে মুখ একটু খুঁড়িয়ে ঠিক বেলা দুটোর সময়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছেন তিনি আর কেউ নন। সকালে নিজের রান্নাবান্না ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অতএব তখন কি জমিয়ে গল্প করা যায়! যতীনবাবুর আঁকার সঙ্গে যেমন পরশুরামের সাথ-সঙ্গৎ তেমনি বুঝি রাজশেখরের বারান্দায় যতীনের মজলিসের আঠা! কিন্তু একটা মজা দেখেছি, অমিয়বাবু হয়তো কোনো একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন, যতীনবাবু পুরো একটা বাক্য সম্পূর্ণ করে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের জন্য ঠোঁট ফাঁক করছেন, রাজশেখর ঠিক সেই সময়ে চশমার নীচ দিয়ে ভারি আওয়াজ ছাড়লেন—"তুমি থামো যতীন।" যতীনবাবুর অভিব্যক্তির সুইচটা কে যেন 'অফ' করে দিল। তিনি একেবারে বোবা! অমিয়নাথ ছাড়াও ওই দুই বন্ধুর ভুয়েট আজও এই নিয়মের ব্যতিক্রমটা আমাকে আজও বিস্মিত না করে পারে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে এই বন্ধু প্রেক ধমক খাবার জনাই এতখানি পথের ধকল সইতেন। অবশ্য রাজশেখরের স্নেহ কত গভীর তারও একদিন প্রমাণ পেয়েছি যা অপ্রাসঙ্গিক হলেও অবান্তর নয়। তাঁর সম্বর্ধনা সংখ্যার জন্য সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর গ্রথিত করে একটি নিবন্ধ লিখে শোনাতে গিয়েছি। ওই মানুষটি সম্পর্কে শ্রদ্ধা, ভয়, ভালোবাসার একটা জগাখিচুড়ি মনে ছিল কি না। খুঁত থাকে এটা চাই না। সাক্ষাৎকারের সময়ে রাজশেখর বলেছিলেন 'প্রেমচন্দ্রের ছবিগুলো আমি এঁকেছিলাম।' প্রবন্ধেও সেটা লিখেছি কিন্তু উনি অনুরোধ করলেন—'ওটা কেটে দিন।' কেন? আপনিই ত সেদিন বললেন—'। হ্যাঁ, তবে কি জানেন, এতকাল পরে এটা করা ঠিক হবে না। দেখলে যতীন দুঃখু পাবে। ও আমার ছোট ভাই-এর মত।' আমি তাঁর কথা ঠেলতে পারি নি সেদিন কিন্তু ভুলতেও পারিনি।

অমিয়নাথের প্রসঙ্গ ছেড়ে কোথায় সরে এলাম।

ইচ্ছে করেই এসেছি, কেননা ওই মানুষটিও তো এই গুণেরই মহাগুণী, আমি সে তুলনায় তুলাতিতুল। সামান্য ব্যাপারকে নিজের ভাষা ও ভঙ্গির জোরে আশ্চর্য সুন্দরভাবে জমিয়ে বলার আর্টে তিনি সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। সঙ্গীতের অতি গুরুহ, আপাত নিরস, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে, জটিলতার জড় মেরে, এমন জলবত্তরলভাবে বুঝিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি বুঝি বা নেই, অন্তত আমার তো জানা নেই। একেই বোধ হয় রসস্রষ্টা বলে।

জাত-মজলিশী মানুষ বা তো-ও-ম তা-না-না-না' করতে করতে কখন সুরের কিস্তারে মজলিশকে মুঠোর মধ্যে আনতে হবে এটা যাঁর দখলে আছে ধীরে ধীরে এগোতে তাঁর দ্বিধা থাকে না। যখন সামনাসামনি সাক্ষাৎ হল তারপর আর সুরের মেজাজে পেীছতে বাধা কোথায়! ২৫-১২-৫২ তারিখের পোস্টকার্ড 'কল্যাণ-বরেষু' দিয়ে শুরু, তবে তখনও 'আপনি'র পোশাক গায়ে রয়েছে:

"আপনার শনিবারের চিঠি বীরেন্দ্রকে পড়িয়েছি। আমাদের দুজনার মত এই যে—উল্কাপাত ঝঞ্জাবাত যা হয় হোক। আসন্ন শনিবারের প্রাতে, প্রথম যে ট্রেনখানি কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এখান থেকে আমরা সেই ট্রেনে চড়ে বসব; তারপর যা হওয়ার হবে। ধরুন, আপনার সঙ্গে হয়তো শেয়ালদহে ট্রেন থামতেই দেখা হয়ে গেল বেলা ৯৷৷টা আন্দাজ। তাতেও আমরা বিচলিত হব না, অর্থাৎ—আপনি আমাদের সঙ্গে ১৩নং পাইকপাড়া রো'-তে যেতে অস্বীকার করলেও—আমরা আপনাকে অবহেলা করেই সেখানে চলে যাব। কারণ, আমরা কাজের লোক। গন্তব্যস্থলে পেঁাছে কি হবে না হবে সে বিষয়ে আমি আগে থেকে বলতে পারছি নে। হয়তো—শনিবারের রাতটা কলিকাতায় কাটাতে হবে।

"আমার ফটো সম্বন্ধে বলতে পারি, আমার চেহারা থেকেও ভাল ছবি উঠেছে, যার ফলে আমার সন্দেহ হয় যে—হয় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি না হয় যন্ত্রটির মধ্যে কিছু কেরামতি আছে। ছবিখানি কলিকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। আর আমার এম এসও অন্যের দিচ্ছি।..."

কি লিখেছিলাম চিঠিতে তা এতকাল পরে মনে পড়ে না। তবে পাইকপাড়ার আড্ডায় তাঁর জন্য যে বিশেষ আসনটি পাতা হয়ে অপেক্ষা করছে এবং আমরা নতুন যুগের আন্‌পড় আড্ডাবাজ-জগতে হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে জুৎসই গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে আগ্রহী সেটা হয়তো টের পেয়েছিলেন। নইলে একেবারে সোদর না হলেও দোসর বীরেন্দ্রমোহন আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রওনার প্রতিশ্রুতি সম্ভব ছিল না।

পাইকপাড়ার তখ্‌ত-এ-তাউশ অর্থাৎ আমার তক্তপোশ তাঁর হেফাজতে ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে গালিচা পেতে ঘরোয়া বৈঠক। কখনো সৌজন্যহীন, কখনো কৈরাজ কিংবা কালে খাঁ অথবা মাল্‌কাজান আর তাদের মাইকেলের জমজমায় আমাদের ছোট্ট ঘরখানা ভরে ওঠে। কথায় কথায় বীরুদার উসকানিতে সান্যাল মশাইও কিছু সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। পুরোপুরি কোনো গান নয়, সুরের হেরফের কোথায় কিভাবে ঘটানো হয় তার নমুনার সঙ্গে সেদিন একটি কথা বলেছিলেন যে, সঙ্গীতশিক্ষার ইতিহাস ভুগোল দেখিয়ে কসরত করেন যাঁরা ভালো কুস্তিগীর হতে পারতেন, কিন্তু বাপু সুরের সুকুমারকান্তিতে আসরের শ্রোতাকে আপন করে নিতে পারেন যিনি তিনিই তো আসল কালোয়াৎ বা কলাবন্ত!

বৈঠক থেকে ভোজনের আসনেও এই মানুষটি স্বতন্ত্র। সমঝদারির চাল-বোল এখানেও সমানভাবে সুরেলা। শাকসুক্তো থেকে পায়েস পর্যন্ত প্রতিটি পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অলঙ্কার-ঝঙ্কার।

শাকের ক্ষেত্রে যে রাঁধুনীকে অন্নপূর্ণা আখ্যা দিলেন, পায়েসে পেঁাছে তাকেই আন্তর্জাতিক স্টালিন পুরস্কার দিয়ে বসলেন। দিনরাত আমাদের ... জমাট আনন্দের জোয়ারে কেটে গিয়েছিল এটুকু বলাই যথেষ্ট।

নতুন বছরে 'আপনি'র খোলস খসে গেল। ১৯৫৩ সালের দ্বিতীয় দিনে তিনি আমাদের দুজনকে এক খামে আলাদা চিঠি দিলেন। গৌর আর আমাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ পাঠালেন ওঁদের ঘরোয়া আসরে বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য, শেষ ছত্রে লিখলেন: কেবল, একটা শীতনাশক কম্বল আনলে চলবে। কারণ, রাত্রিকালে কুকুরদের আড্ডা, শীত ... অসুবিধা একসঙ্গে ভোগ করতে লোক হয়েছে আমার।...'

সুরূপাকে লিখেছেন দীর্ঘ পত্র। স্নেহা... সহধর্মিণী, নইলে ঈর্ষা ঠেকানো যেত না। ... বিদেশী অনেক রকমের চিঠি দেখেছি কিন্তু এরক... চিঠি? না!

"পার্বতীপ্রতিমাসু বউমা,

তোমাকে কি রকমের পাঠ দিয়ে চিঠি লিখব আ... কীই বা লিখব যা দিয়ে তোমার গুণের যথার্থ সমঝদারি হবে, এসব চিন্তা করতে সময় কে... গিয়েছে। প্রথম উপস্থিত হয়েই তো দেখলাম সাক্ষা... লক্ষ্মী, পরে গৌরীশঙ্করের সঙ্গে তোমাকে দেখে মনে হল তুমি সাক্ষাৎ পার্বতী, কেবল এই লক্ষ্মীছাড়াদে... প্রতি অনুগ্রহ করার ছলেই তুমি লক্ষ্মী হয়ে দেখ... দিয়েছিলে। এর পরে—আমাদের একটা ক্ষুৎপিপাসা... কাতর দুর্বল মুহূর্তে তুমি হয়ে গেলে অন্নপূর্ণা... অর্থাৎ—তোমার কথা মুখে বলে আমার পরিবারে... সকলকে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারলাম না। তাদের ম... এই যে,—হয় লক্ষ্মী, নয় পার্বতী, নয় অন্নপূর্ণা... এঁদের যে কোনও একজনকে এখানে এনে ফেলতে হবে। পরে দেখা যাবে আমাদের লাভলোকসান বিশ্বা... আর অবিশ্বাস। আমাদের বীরেন্দ্রমোহনেরও ঐ এক কথা, এক আশা!

"তুমি চিরকালই হও, গৌরীশঙ্কর পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বলে আমি তোমাকে পার্বতী বলে সম্বোধন করেছি। এমন পাহাড় আর দেখি নি, এমন আড়ালও যে কলকাতায় আছে জানতাম না। আর এমনতর পার্বতীও তো দেখিনি এই হল আমার মনের কথা, যেটা খুলে বলা উচিত মনে করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি এই রকমই থাক চিরদিন। অন্তত—আমি আর বীরু যে কটা দিন আছি, চোখের দৃষ্টিশক্তি আর মনের জোর নিয়ে—সে কটা দিন তুমি যেন ঐ রকম হয়েই বিরাজ করো। আমার পরিবার পাশে বসে টিপ্পনী কাটলেন—পেটের জোরের কথাটাও বলে দেও। পুরুষমানুষেরা লোভী তো কম নয়!" তার উত্তরে আমি বললাম—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেখে এলাম চোখে। ক্ষিদে না পেতেই এই বুড়ো ছেলেকে খাইয়ে দিয়েছেন। আর পাছে না খাই এজন্য অদ্ভুত রকমের রস আর স্বাদ ভরে দিয়েছেন অন্নের মধ্যে।..."

তাঁর অতিশয়োক্তির শেষ উক্তিতে নিজেকে নন্দী আর বীরুদাকে ভৃঙ্গী বানিয়ে ছেড়েছেন। অতি সাধারণ আর তুচ্ছ ঘটনার ওপর বিচিত্র রঙ চড়িয়ে উপভোগ্য করে তোলার এই ক্ষমতাটা উদার মনেরই প্রতিফলন। ছোটখাট খুঁটিনাটিও যার নজর এড়িয়ে পার পায় না সেই জাতের এই মানুষ আজকের দিনে আর কই!

শুধু সঙ্গীত কেন, রসনার ক্ষেত্রেও রুচি-বৈশিষ্ট্য ছিল রীতিমত উঁচু সুরে তাঁর বাঁধা। কথায় কথায় একবার বললেন, 'তোমার বাড়ির চা খুব ভাল, কিন্তু একটা ফর্মুলা বলে দিতে পারি, সেইভাবে যদি চা করেন পার্বতী মায়ী তাহলে আরও চমৎকার হবে। একটা মাটির কলসীতে জল ধরে রাখবে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই জলে চা করলে দেখবে দার্জিলিং চায়ের ষোলআনা গোলাপী গন্ধে মন ভরে যাবে। আসল ব্যাপার কি জান কলের জলে যে ক্লোরিন থাকে সেই গন্ধের ওপর চালে চায়ের গন্ধ চাপা পড়ে। বেশীর ভাগ বাড়িতেই কল থেকে কেৎলীতে জল ভরেই উনুনে চড়িয়ে দেওয়া হয়—টাট্‌কা জলে কখনো চা করবে না। বাসি জলে ক্লোরিনের কড়া মেজাজ থিতিয়ে আসল জলকে পাওয়া যাবে, চাও খুলবে।

তাঁর কথায় ফোড়ন কেটে বললাম—এতকাল জানতাম সবই টাট্‌কা টাট্‌কা ভালো। আপনি পান্তাকে প্রেস্টিজ দিলেন, নতুন থিওরি।

উনি মাথা নাড়লেন—না, না, শঙ্করজী, জায়গা বিশেষে টাট্‌কার চেয়ে বাসি ভাল। মজার ব্যাপার আছে। ধরো তোমাদের মুর্শিদাবাদের আম, এক ঘণ্টার ফারাকে স্বাদের আকাশ-পাতাল ফারাক হয়। আগে খাও টক, লগ্ন পার করে খাও ঝাঁঝালো গন্ধ। আসল কথা হল লগ্নটি লক্ষ রাখা চাই।

আদি রসাত্মক গল্পের রাজা ছিলেন। তবে এমনিতে গম্ভীর ও স্বল্পভাষী। বিশেষ বিশেষ আখড়া এবং মনের মত মানুষ ছাড়া তিনি মুখ খুলতেন না—মুখ মানেই মন। বকুলবাগানের উদ্দেশে চলেছি রাজশেখর সন্দর্শনে, পথিমধ্যে এক ইংরেজিনীকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—শঙ্করজী, তুমি সাবালক, তোমায় জিগ্যেস করা দোষের হবে না!

—কী?

—আচ্ছা ওই মা লক্ষ্মীর ঠোঁটের সিঁদুর কি অক্ষর? যে রকম রক্তরাঙা দেখাচ্ছে তাতে বেচারা হিন্দু যদি বিবাহিত হয় অভিসার সাঙ্গ হলে তবে সে খুব ফ্যাসাদেই পড়বে, বুঝলে বাবাজী!

প্রথমে ব্যাপারটা মগজে যায় নি কিন্তু যখন ঢুকল তখন হাসিতে ফেটে পড়া ছাড়া উপায় কী! উনি এবার গম্ভীর,—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে! এমন আশাও করতে নেই। যাহোক, আমি যতদূর জানি লিপস্টিকগুলো কিস্‌ প্রুফ।

চুম্বন সম্পর্কে তাঁর আরও একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে জুড়ে দিই। উনি যেমন আমায় শঙ্করজী খেতাব দিয়েছেন আমি বামনের মতোই 'আনন্দবর্ধন' আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করেছি। তারিখবিহীন কোনো এক শুক্রবার কৃষ্ণনগর থেকে তিনি লিখছেন : 'আনন্দবর্ধন' নামটি খাসা। বিশেষ সেই দিনটা মনে থাকবে "আনন্দবর্ধন রূপে, গুণে ভাগ্যবান।' চুলোয় যাক। তোমার ছোট গল্পগুলি ও নরেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পগুলি আমরা সন্ধ্যায় পিদিম জেললেই পাঠ করতে লেগে যাই। খুব ভাল লাগছে আমাদের সকলের। তোমার দু-একটি ছোট গল্পের চাতুরী অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে; এমন কি চিন্তাহরণ বাবুরও (* অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী) তোমার লেখার ঢং দেখে মনে হচ্ছে গল্প-নায়িকার গালে হাত বুলোতে বুলোতে কণ্ঠে চুম্বনমাত্র করেই ভোঁ দৌড়। তখন ছুটোছুটি করবে সেই নায়িকা, নিজের গরজে। অর্থাৎ—অন্য নানারকমের গল্প কল্পনায় সে নিজেকে ধরা দিতে যত না বাধ্য তত বা উৎকণ্ঠ। অতঃপর কণ্ঠাশ্লেষ ও পুনঃ পলায়ন। রচনাশৈলীর frigidity ভাঙতে গেলে বোধ হয় এমন তর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমার নিজের কথা ভাবি। ওরকম জ্ঞান যৌবনে দেখা দেয় নি, এখন অনুশোচনা হয়। আমার অদৃষ্টে যে রচনাশৈলী ভর করেছেন তিনি একেবারেই শিলাময়ী পাথুরে আর আন্ধা-তার আমলের। হাতে বুলিয়ে চুমু খেয়ে ভোলাবার মত নয়; হাতুড়ি আর ছেনী দিয়ে যদি কিছু impression করতে পারি! প্রণয়কে আমল দেন না ইনি; প্রবীণতাকে স্বীকার করে নেন কোনও রকমে। যা-ই হ'ক, সবই অদৃষ্টের কথা; দুঃখ করে লাভ কি! দোষ দিই না কাউকে। আমি ত সাহিত্যের সেবা করিনি আগে। এখন অদৃষ্টে যা জুটেছে তাই নিয়েই থাকতে হবে।......"

বস্তুত যিনি অবলীলাভাবে 'উদারা'র গান্ধার থেকে 'তারা'র ধৈবতে নিমেষে কণ্ঠ খেলিয়ে দেখাতে পারেন তাঁর পক্ষেই এরকম বিনয় সম্ভব। আসলে স্নেহের সঙ্গে খুব মোলায়েমভাবে সাহিত্যযশঃপ্রার্থী এই ব্যক্তিটিকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। আর ও'র নিজের ভাষা ত একেবারে নিজস্ব—যাকে রবীন্দ্রনাথ স্টাইল আখ্যা দিয়েছেন, এ হ'ল তা-ই।

আমাকে ও'র বাড়িতে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেতে কোনোদিনই ভাঁটা পড়ে নি। তার জন্য অছিলাও মগজ থেকে বার করতেন বটে।

সরাসরি ত লিখবেন না,—চলে এস। তাই লিখলেন : 'শঙ্করজী! আমি ও বীরু বেশ কিছুদিন থেকে অপেক্ষা করছি। ভাবছি একটা লোক সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়ে, কোন শুভবুদ্ধিতে কবে আমার এখানে এসে হাজির হবে। বলাই বাহুল্য—আমার মেয়ে দুটি অর্থাৎ বৈজু ও মঞ্জু সেই লোকটিকে তাদের হাতের রান্না খাওয়াবে বলে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। এখন—এই প্রতিজ্ঞা পালন করার কি উপায় হবে, এ বিষয়ে তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের কাছে পরামর্শ চাওয়াই হ'ল কথা। এখানে এসে পরামর্শটা দিলে কিন্তু—খুব ভাল হয়। চিঠির পরামর্শটা দায় সারা মনে করব।...'

বৈজু ও মঞ্জু তখন খুবই অল্পবয়সী মেয়ে। দুজনে মিলে শুধু রান্নাই নয় আমার এত আদর যত্ন করেছিল যে পারলে আরও কিছু দিন কাটিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। এই যত্নে বাহুল্য ছিল না, যখন যেটুকু প্রয়োজন ঠিক ঠিক জুগিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ বাহুকণ্টক-শূন্য আদর! সেই সফরে যেটি আমার মুগ্ধ করেছিল তা ওই দুই বোনের খেয়াল, ঠুংরি। সান্যাল মশাই-এর বয়স হয়েছে। নিজে তেমন গাইতে পারেন না তাই এই দুই আধারে অর্জিত সম্পদ গচ্ছিত করে যাবার সাধনায় তিনি প্রাণমন উজাড় করে তালিম দিয়েছেন।

তখন আমরা সবে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পত্তন করেছি। আমি ধরে বসলাম ও'দের কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। ওরা সম্মেলনে গাইবে—বাংলার দুই হীরাবাঈ সরস্বতী বাঈ! সান্যাল মশাই হেসেই উড়িয়ে দিলেন—'পাগলের কথা শোনো। এখন ত সঙ্গীতের স্বরবর্ণটা চিনছে!...

ঘরোয়া বৈঠকের বাইরে নিজের প্রচারে তিনি খুব কুণ্ঠিত ছিলেন—বরং বলা চলে এতই প্রচারবিরোধী ছিলেন যে, Ragas and Raginis-এর মত প্রামাণ্য গ্রন্থের রচনাকালে আমার কাছেও বিন্দুবিসর্গ ফাঁস করেন নি। সেবার সম্মেলনের তরফ থেকেও অরুণ সরকার চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তার উল্লেখ পাচ্ছি। '৫৪ সালের জানুয়ারিতে লিখছেন :

"...আমার নিজের পক্ষেও ত যাওয়া হচ্ছে না। অনিবার্য বাধা রয়েছে। এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্যেও ত যোগদান করতে পারছি না। সেখানেও অলঙ্ঘনীয় বাধা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে, সংস্কৃতির পরিচালকেরা অপর অনেক যোগ্য ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাবেন এবং অবশ্যই সংস্কৃতি সম্মেলন সুচারুতা ও সফলতা লাভ করবে। শ্রীযুক্ত অরুণবাবুর চিঠি পেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি এসব লিখিত কথা তাঁকে জানিয়ে দেও তাহলে বড় ভাল হয়। কারণ তাঁকে আমি ইতিপূর্বেই আমার অক্ষমতার কথা বার বার বলেছি। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অনর্থক অনুরোধ উপরোধ করেছেন। বারে বারে সেই একঘেয়ে না বলতে লিখতে লজ্জা পাই। কতকটা কুন্দনন্দিনীর "না"র মত। যাই হক—বিষবৃক্ষ রোপণ হয়েই গিয়েছে। এর ফল ফলেছে বুঝতে পারছি, অর্থাৎ মাঝে মাঝে তিত্‌কুটে আস্বাদ পাই। সহ্য করে যাই, কারণ সহ্য করতেই হবে।..."

এক কথায় এই মানুষটিকে আপন সংকল্প থেকে নড়ানো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সভাসমিতিতে হাজির হয়ে কিছু বলা তাঁর কাছে সময়ের বাজে খরচ ছাড়া 'কিস্যু নয়' বা 'ফাঁকা আওয়াজ'। সঙ্গীতই বলো আর সাহিত্যই বলো তা একান্ত সাধনার ব্যাপার, তন্ময়ভাবে ভাবিত গোষ্ঠীর আসরের বাইরে লোক দেখানো জাহিরের গড্ডল চকে সওয়ার হতে তিনি নারাজ ছিলেন। বোধ হয় এই একটি কারণে যাকে 'পপুলার' আখ্যা দেওয়া হয় সে জাতের গায়ক তিনি হননি। একদা শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন 'আমরা লিখি তোমাদের জন্যে আর উনি লেখেন আমাদের জন্য'—অমিয়নাথের ক্ষেত্রেও তেমনি বলা যায়। বয়সের একটা স্তরে পৌঁছে কেবল যথার্থ সঙ্গীত-পিপাসু রসিক স্বজনের সামনেই তাঁর কলাবিদ্যার মন্দির মুক্তদ্বার ছিল।

শেষ বয়সে নিজেকে একেবারে আপনার মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। সেই গুহায় নিহিত রসের সন্ধানে যারা যেত তাদের হোঁচট খেয়ে ফিরতে হত। মাস কয়েক আগে আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠিয়েছিলাম—"যাও ঋষিদর্শনের পুণ্য অর্জন করে এস।" শৈশবে বাঁকুড়া ঘরানা থেকে শুরু করে, বলরাম পাঠকের কাছে বছর কয়েক তালিম নেওয়ার পর এক সময়ে অকস্মাৎ আমজেদ হালিম জাফর খাঁয়ের শিষ্যত্ব নিয়ে হালে বোম্বাইতে কাটিয়ে এসে সে নিজেকে বিরাট ওস্তাদ ভাবতে শুরু করেছিল, কাজেই আমি তাকে কৃষ্ণনগরে পাঠালাম—যদি কিছু আক্কেল হয়।

ফিরে এসে সে বলল—"প্রথমে ত দরজাই খুলবেন না। পাত্তাই দিতে চান না। বললেন—'কি চাই।' আমি আপনার কথা বললাম। উনি খুব কাটা কাটা জবাব দিলেন—'ওসব থাক। কে আপনার কি হন, যা না—হন তা জানার দরকার নেই। আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন বলুন।' যত বলি—'আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।' ততই বলেন—'আহা ওটা ত কথার কথা। আপনার উদ্দেশ্য কিছু থাক বলুন। বাজে সময় নষ্ট করবেন না আমার।' খুব ভয় পেয়ে গেলাম, মনে হল বুড়ো মানুষকে বিরক্ত করে কি হবে, তার চেয়ে চলে যাই। কিন্তু তাতেও রাজি নন, বলেন—'এই দুপুর রোদে এতটা পথ এসেছেন, আপনার নিশ্চয় কোনো মতলব আছে, সেটা খুলে না বললে চলে যাবেন এটাই বা কেমন কথা।' এমনি করে যেন আগন্তুকের সোনায় খাদ আছে কি না কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নিয়ে তারপর মনের দরজা খুলে দিলেন।

আমার যদি প্রয়াত সঙ্গীত বিশারদকে চিত্রিত করার মত শক্তিশালী ভাষার হাতিয়ার থাকত তাহলে হয়ত তাঁর বৈঠকী বিহার নিয়ে আরও একটি 'স্মৃতির অতলে' লেখা হয়ে যেত। কিন্তু যা নেই তা নিয়ে আফসোস করে কি হবে, আমার তোলা ফটোগ্রাফ আর টুকিটাকি দিয়েই বিদায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা গেল।

বিশ্বকাপ ফুটবলে শেষ ষোলটি দেশ

॥ ২ ॥

বিশ্ব কাপ ফুটবলে শেষ ১৬টি দেশ সম্পর্কে গত সপ্তাহেই লিখেছি, এশিয়ান জোন থেকে একটির বেশী দুটি দেশের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার অধিকার নেই। শুধু এশিয়ান জোন কেন, এশীয় ও ওসেয়ানিয়া জোন যার মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। একমাত্র বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য এবার এশীয়-ওসেয়ানিয়া গ্রুপ থেকে খেলেছিল ১৭টি দেশ। তার মধ্যে মূলে খেলছে শুধু ইরান। এই অঞ্চল থেকে কোনো দেশ দুবার ফাইনাল পর্যায় খেলার অধিকার পায়নি। ১৯৫৪ সালে খেলেছিল দক্ষিণ কোরিয়া, ১৯৬৬-তে উত্তর কোরিয়া, ১৯৭০-এ ইজরাইল এবং ১৯৭৪-এ অস্ট্রেলিয়া।

এবার ইরান কীভাবে যোগ্যতা অর্জন করল? খেলা হয়েছে ১৭টি দেশকে পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করে। লীগ নিয়মে অনুষ্ঠিত এই পাঁচ গ্রুপের বিজয়ীকে নিয়ে আবার খেলা হয়েছে লীগ নিয়মে। সাব-গ্রুপে এবং শেষ গ্রুপে একইভাবে প্রতি দেশকে প্রতি দেশের সঙ্গে দেশের মাঠে প্রথম এবং বিপক্ষ দেশের মাঠে পাল্টা ম্যাচ খেলতে হয়েছে।

ইরান তার নিজের সাব-গ্রুপে একটি পয়েন্টও না হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়, তারপর ফাইনাল গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় অপরাজিত থেকে। শুধু দুটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে দুটি খেলা ড্র করে।

কলকাতায় আমরা ইরানের খেলা আগেও দেখেছি। ১৯৭১-এ দেখেছি আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ইরানের পাস ক্লাবকে হার স্বীকার করতে। সেই ইরান বিশ্ব কাপের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল আর আমাদের ভারত মারডেকার, সিউলের প্রেসিডেন্ট কাপে এশিয়ান গেমসে পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না।

আফ্রিকা অঞ্চল থেকে যে দেশটি ফাইনাল পর্যায় খেলছে, সেই টিউনিসিয়ার ফুটবল মানেরও কত উন্নতি। বছর কুড়ি-বাইশ আগে টিউনিসিয়া এসেছিল কলকাতা সফরে। প্রদর্শনী ম্যাচে আই এফ এর কাছেই হেরে গিয়েছিল। খেলার মান মোটেই উন্নত ছিল না। অথচ এখন কোথায় পৌঁছে গেছে।

আরব এবং এশিয়ার দেশগুলি কেন ফুটবলে এত এগিয়ে যাচ্ছে সে আলোচনায় পরে আসছি। এশিয়ান গেমসের পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ার দেশগুলির শক্তি সম্পর্কেও আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেন না এ বছর ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য অষ্টম এশিয়ান গেমসে ভারতকে ওই সব দেশের সঙ্গেই লড়তে হবে, যদিও জানি শক্তি ভারতের খুবই সীমায়িত।

হিসেব মিলিয়ে দেখছি এবার বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ে খেলছে ইউরোপের ৩১টি দেশ, আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের ২৬টি, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে এশিয়া-ওসেয়ানীয় অঞ্চলের ১৭টি, উত্তর-মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ১৬টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ৯টি দেশ। মোট ৯৯টি দেশ থেকে ১৬টি দেশ যাচ্ছে আর্জেন্টিনায় ফাইনাল পর্যায় খেলতে। সেখানে আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনা আর গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী তো খেলবেই।

ইউরোপ অঞ্চল থেকে কীভাবে ৯টি দেশ ফাইনাল পর্যায় গেল গত সপ্তাহেই বলা হয়েছে। অন্য অঞ্চলগুলি খতিয়ে দেখা যাক।

দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চল থেকে গিয়েছে ব্রাজিল ও পেরু। গ্রুপ ছিল কিন্তু তিনটি। এক গ্রুপে ব্রাজিল, প্যারাগোয়ে ও কলম্বিয়া। আর এক গ্রুপে বলিভিয়া, উরুগোয়ে ও ভেনেজুয়েলা। তৃতীয় গ্রুপে পেরু, চিলি ও ইকোয়েডর। এই তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, পেরু এবং বলিভিয়া আবার লীগ নিয়মে খেলে। ব্রাজিল প্রথম এবং পেরু দ্বিতীয় স্থান পেয়ে আর্জেন্টিনা যাবার অধিকার অর্জন করে। মোট ৬টি খেলার মধ্যে ব্রাজিল কোন খেলাতেই হারেনি। শুধু কলম্বিয়া ও প্যারাগোয়ের সঙ্গে একটি করে ম্যাচ ড্র করেছে। পেরু দুটি খেলা ড্র করেছে চিলি ও ইকোয়েডরের সঙ্গে, একটি খেলায় হেরেছে ব্রাজিলের কাছে ০—১ গোলে।

উত্তর-মধ্য আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান অঞ্চল থেকে মূলে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে মেক্সিকো। সবসুদ্ধ দেশ ছিল ১৬টি। মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গ্রুপে তিনটি দেশই ৪ পয়েন্ট করে পায়। মেক্সিকো ছিল শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে। প্লে-অফ ম্যাচে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রকে ৩—০ গোলে হারিয়ে ফাইনাল গ্রুপে খেলার অধিকার পায়। যুক্তরাষ্ট্র বাদ বাতিল হয়ে। ফাইনাল গ্রুপে ছিল ৬টি দেশ—মেক্সিকো, হাইতি, এল স্যালভাডোর কানাডা, গোয়েতেমালা ও সুরিনাম। বারবাডোজ ত্রিনিদাদ কিউবা, জামাইকা, নেদারল্যান্ড, অ্যান্টিলিস প্রভৃতি দেশগুলি প্রাথমিকেই বাতিল হয়েছিল। ফাইনাল

জয়, স্বপক্ষে ২০ গোল, ১০ পয়েন্ট। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোই ফুটবলে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এবার নিয়ে বিশ্ব কাপের ফাইনাল পর্যায় খেলবে ৮ বার।

আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের ২৬টি দেশের প্রাথমিক খেলা থেকে ফাইনাল গ্রুপে খেলার অধিকার পায় টিউনিশিয়া, মিশর ও নাইজিরিয়া। চারটি খেলা থেকে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টিউনিসিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। একটি খেলায় ২—৩ গোলে হারে মিশরের কাছে, নাইজিরিয়ার সঙ্গে আর একটি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করে।

এশীয় ও ওসেয়ানিয়া অঞ্চলের ২৬টি দেশ থেকে যোগ্যতা অর্জনকারী ইরানের কথা আগেই বলেছি। এশিয়ার অনেক দেশের খেলার সঙ্গেই আমরা পরিচিত। আমরা মানে আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড় ও কোচরা। কারণ, এশিয়ার নানা প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরই ভারতকে এই সব দেশের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, কোয়েৎ, ইরান প্রভৃতি দেশ ফুটবলে এত এগিয়ে যাচ্ছে কীভাবে? কীভাবেই আরব দেশগুলির ফুটবলে এত রমরমা?

বহু দেশ, বিশেষ করে তেলের দেশগুলি তেল বিক্রি থেকে পাওয়া অঢেল টাকা ঢালে ফুটবলে। বিদেশ থেকে নামী-দামী কোচ আমদানী প্রায় সোনার খনির বিনিময়ে। তাই দিন দিন ফুটবলেও তাদের ঐশ্বর্য বাড়ছে। প্রতিনিয়ত খেলার ব্যবস্থা হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে।

কোয়েৎ-এর কথাই ধরা যাক। দু' বছর আগে কোয়েৎ এশীয় যুব ফুটবলে ... চ্যাম্পিয়ন হয় ইরানের বদলে। তখন নিয়োগ করে ইংল্যান্ডের টট্‌নহ্যাম হটস্পারের প্রাক্তন ম্যানেজার বিখ্যাত ফ্রাঙ্ক ওক্যারেলকে। তারই ফলে পর এশিয়ান গেমসে সোনা জেতেন। জাতীয় সরকার খেলোয়াড়দের অভ্যর্থনা জানায় লাল কার্পেট বিছিয়ে এবং প্রতি খেলোয়াড়কে একখানি করে মোটর গাড়ি উপহার দিয়ে। বিশ্ব কাপের প্রাথমিকের খেলার প্রস্তুতি হিসাবে এশিয়া ও ওসেয়ানিয়া অঞ্চলের দেশগুলিতে ফুটবল সফরে যায় প্রাইভেট জেট বিমানে—ভাড়া করা বিমানে নয়।

কোয়েৎ-এর কাছ থেকে ফ্রাঙ্ক ওক্যারেলকে ছিনিয়ে এনেছে ইরান। তখন কোয়েৎ-এর ম্যানেজার ব্রাজিলের মেরিও জাগালো—যে জাগালো ছিলেন ১৯৫৮ ও ১৯৬২তে বিশ্ব কাপ জয়ী ব্রাজিল দলের লেফট আউট এবং ১৯৭০-এ ব্রাজিল যখন চিরতরে জুলে রিমে ট্রফি জয় করে তখন ম্যানেজার।

শুধু আর্জেন্টিনায় খেলার অধিকার অর্জন করায় ইরান দল পেয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ইউ এস ডলার। অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ৪ কোটি টাকারও বেশী। আমাদের মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের বিশ-পঁচিশ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা শুনে আমরা চোখ কপালে তুলি। কিন্তু ইরানের খেলোয়াড়রা কত পেয়েছে? যদি দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কুড়িজন ধরে নিই, তবে এক একজন পেয়েছে অন্ততপক্ষে কুড়ি লাখ করে টাকা, শুধু আর্জেন্টিনায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এরপর তারা যদি বিশ্ব কাপের মূলে কিছু করতে পারে অর্থাৎ তাদের গ্রুপের হল্যান্ড স্কটল্যান্ড বা পেরুকে পরাজিত করতে পারে তাহলে পাবে আরও অর্থ। ইরানের পক্ষে অপ্রত্যাশিত কিছু করা অসম্ভবও নয়—এ ধারণা মেরিও জাগালোরও। জাগালো বলেছেন, ইংলন্ডে ১৯৬৬-র ফাইনাল পর্যায়ে উত্তর কোরিয়া যেমন চমক সৃষ্টি করেছিল ইরানও তেমন কিছু করতে পারে আর্জেন্টিনায়।

টিউনিশিয়ার খেলোয়াড়রাও কি উপঢৌকন ও উৎসাহ কম পেয়েছে? বিশ্ব কাপের মূলে খেলার অধিকার অর্জন করেই প্রতি খেলোয়াড় পেয়েছে এক হাজার ডলার, একখানা করে মোটর গাড়ি ও একটি করে বাড়ি।

প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিকে বিখ্যাত ডন রনি অ্যালেনের সঙ্গে ১৬ মাসের চুক্তি করেছে সৌদি আরব। পঞ্চাশের দশকে রনি অ্যালেন ছিলেন ইংলন্ডের ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়নের ফরোয়ার্ড। অবসর গ্রহণের পর ম্যানেজারি করেছেন উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের, স্পেনের অ্যাটলেটিকো বিলবাও-এর পর্তুগালের স্পোর্টিং লিসবনের বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যানেজার ও কোচ নিজের পুরনো ক্লাব অ্যালবিয়নেই ফিরে গিয়েছিলেন ম্যানেজার হিসেবে। গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন খেলতে এল সৌদি আরবে। সেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রিন্স ফাহের প্রস্তাব দিলেন রনি অ্যালেনকে। বিপুল অর্থের প্রলোভন ছাড়তে পারেননি অ্যালেন। বিশ্ব কাপ থেকে বিদায় নেবার পর এই চুক্তি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলিতেও ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য কী বিপুল উদ্যোগ চলছে। আমরাই শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

যাই হোক এবার বিশ্ব কাপের প্রাথমিকে খেলেছে ৯৯টি দেশ। ১৯৭৪-এ খেলেছিল ৭৯টি। আগে লিখেছি, ইরান ও টিউনিশিয়া ফাইনাল পর্যায়ে প্রথম খেলবে। অন্য দেশগুলির মূলে খেলার সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল। এক নম্বর গ্রুপে—আর্জেন্টিনা (৬) ইতালি (৯), হাঙ্গেরী (৬), ফ্রান্স (৭)। দুই নম্বর গ্রুপে—পশ্চিম জার্মানী (৯), পোল্যান্ড (৩), মেক্সিকো (৮), টিউনিসিয়া (১)। তিন নম্বর গ্রুপে—ব্রাজিল (১১), সুইডেন (৭), স্পেন (৫), অস্ট্রিয়া (৪)। চার নম্বর গ্রুপে—হল্যান্ড (৪), স্কটল্যান্ড (৪) পেরু (৩)।

মুকুল

খেলা

কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি

—নী গোস্বামী

কলকাতা কলকাতাই! ফুটবলের প্রাণপীঠ। তাই দেখি বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লোকের লক্ষ্য এই কলকাতার ময়দান। দুপুর গড়িয়ে যেতে না যেতেই নানা জল্পনা-কল্পনার ধ্বনি তুলে মানুষের মিছিল চলে গড়ের মাঠের গ্যালারীর দিকে। বাঞ্ছিত দলের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে। এখানে স্থানীয় লীগ শীল্ড ও অন্যান্য টুর্নামেণ্টের পাশাপাশি চলে ভিন্ন শ্রেণী ও স্বাদের ফুটবলের আসর যা সমভাবেই এখানের দর্শককে আকৃষ্ট করে ফুটবলের রস আস্বাদনে। তাই স্বাভাবিক কারণেই আমরা, কলকাতার ফুটবল অনুরাগী মানুষেরা, এ বছর এই শহরে সন্তোষ ট্রফির অনুষ্ঠানে মহাখুশী। বেশ কয়েক যুগ ধরে কলকাতার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দল সারা ভারতের বিভিন্ন ফুটবল ট্রফি জয় করে কলকাতা যে ফুটবলের পীঠস্থান তার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করে আসছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক বার বাংলা দলের জয়লাভের সুবাদে আমি যদি কলকাতাকে "মক্কা অফ ফুটবল" বলি, বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। শুধুমাত্র লীগ ও শীল্ডের খেলা দেখে এই মহানগরীর মানুষের হয়তো মনের খোরাক মিটছিল না। তাই বহুদিন বাদে, প্রায় চব্বিশ বছর পর, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা গত এক মাস ধরে যা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল তা শুধু যে বহুলাংশে মনের খোরাক মেটালো তা নয়, ফুটবলের মানদণ্ডে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থান কোথায়, দক্ষতা কতটা এবং বিশেষ করে ভাষা ধর্ম ও ভাবের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ফুটবল যে সকল রাজ্যেই জনপ্রিয় তা অতি সহজেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। ফুটবল এমনই একটা খেলা যে খেলা শুধুমাত্র উত্তেজনা ও উৎসাহ যোগায় তা নয়, অধিকন্তু শারীরিক পটুতা যে কতখানি প্রয়োজন এই খেলা দেখে সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। তাছাড়া এ কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ফুটবলই আমাদের মত গরীব দেশে একমাত্র উপযোগী যা আমাদের সময় ও অর্থ অপচয় হতে দেয় না।

যাই হোক, এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের বাংলা দল ফাইন্যালের দ্বিতীয় দিনের চূড়ান্ত খেলায় পাঞ্জাবকে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে ৩—১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে একথাই প্রমাণিত করলো যে, বাংলার ছেলেরা সর্বভারতীয় ক্লাবভিত্তিক ও রাজ্য দল হিসেবে আজও ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলায় ছিল বাংলা দলের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেদিনের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাঞ্জাব দল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছিল। ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাস বাংলার বিজয় গৌরবের পথে বাধা হলেও দ্বিতীয় দিনের পুনরনুষ্ঠিত খেলায় বাংলার ছেলেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করে দেয় নিঃসন্দেহে তারা যোগ্যতর। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয় গৌরবের অধিকারী একমাত্র তারাই। ইন্দর-হরজিন্দের তীক্ষ্ণতা এবং গুরুদেবের বলিষ্ঠ বিচক্ষণতা সত্ত্বেও বাংলার প্রতিটি খেলোয়াড় তার নিজস্ব ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে যে সম্মিলিত আক্রমণধারা গড়ে তুলেছিল তার দ্বারা এটাই মনে হচ্ছিল—ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। আক্রমণের চূড়ান্ত মুহূর্তের ব্যর্থতায় বাংলা দল যেমন তার অগণিত দর্শককে উৎকণ্ঠিত করেছে তেমনি আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের শেষ মুহূর্তের সুনিপুণ সাফল্য। পর পর তিন বছরের জয়ে হ্যাট্রিকের সম্মান আনতে বাংলার প্রতিটি খেলোয়াড়কেই বলতে হয় সাবাস। বস্তুত এ রাজ্যে

বাধা দিচ্ছে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ও পাঞ্জাবের ফাইনাল খেলায় সুযোগসন্ধানী শ্যাম থাপা

অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোনটিতেই সন্তোষ ট্রফি বাংলার বাইরে যায়নি। এবারেও সে দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর মত তা ছিনিয়ে রেখেছেন কলকাতার বুকে। কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো। এ জয়ে গৌরব বাংলার প্রতিটি খেলোয়াড়ের। তারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

এইভাবে বাংলা দলের কৃতিত্বের কথা বলতে লিখতে শুনতে ভালো লাগে নিশ্চয়ই। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্টের খেলা দেখে নিশ্চয়ই একথা কখনই বলতে পারি না যে, আমাদের ছেলেরা শুরু থেকে সব কটি খেলাতেই অবিসংবাদিতভাবে অন্যান্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের চেয়ে সর্ব সময়েই সর্বাংশে ভাল। সত্যি বলতে কি, এ বছর বাংলার খেলা গোড়া থেকে তেমন নয়নাভিরামভাবে উতরোয়নি। অবশ্য এর হয়তো অনেক কারণ থাকতে পারে। আমাদের রাজ্য দল যেহেতু শুধুমাত্র মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় দ্বারা পুষ্ট এবং যেহেতু তারা সারা বছর কলকাতার প্রচলিত ও সুপরিচিত

বাংলায় ফুটবলপ্রেমী মানুষ অনেক কিছু আ
করেছিলেন সেই গৌতম ও প্রসূনের কাছে আ
আশানুরূপ কিছুই দেখতে পাইনি। ঠিক তেম
হতাশ করেছেন বিশেষ করে সুরজিত সেনগু
শ্যাম থাপা আর উলাগানাথন। কিন্তু চূড়ান্ত খে
অভূতপূর্ব ভূমিকা নিয়ে সেই ছবি ম্লান করে দ
প্রমাণ করে দিলেন, শেষ ভাল যার সব ভাল ত
যাই হোক নিজেদের খেলোয়াড়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে
আলোচনা করা হয়তো ঠিক হবে না। তাঁদের ক
আগেও পেয়েছি, ভবিষ্যতেও পাবো এই আশা নি
অন্যান্য রাজ্যের দিকে চোখ ফেরাই।

প্রথমেই চোখে পড়ে পঞ্চনদীর তীরে পা
দলটির ওপর। এবারের জাতীয় ফুটবলে স্বাত
যে দলটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছে। যে দল নি
দের রাজ্যের বাইরে (দিল্লী) কোথাও আশানু
খেলতে পারে নি সেই পাঞ্জাব দল এবার, বাং
দর্শকরা যতই বিরূপ সমালোচনা করুন না কে
আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শুধু
রাফ ট্যাকটিস বা কায়িক শক্তি নিয়ে বলপ্রয়ো

গোল বাঁচাচ্ছেন পাঞ্জাবের গোলকিপার সুরজিৎ সিং

লীগ শীল্ড খেলা ব্যতীত অন্যত্রও সদা ব্যস্ত। সেই হেতু বছরের শেষাংশে এসেও তারা ঠিক সমপরিমাণ দক্ষতা দেখাতে ও পরিশ্রম করতে সক্ষম হবে—এটা আশা করা যায় না। তাই কারো কারো মনে হয়তো কিছুটা কিন্তু তবুও থেকে যায়। একথা সত্যি যে, চূড়ান্ত খেলার দুটি দিনেই যেমন প্রতিটি খেলোয়াড় ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে অপ্রত্যাশিত বা আশাতিরিক্ত ক্রীড়ানৈপুণ্যে বাংলার অগণিত মানুষের মন কেড়ে নিয়েছেন, এই প্রতি-যোগিতার শুরু থেকে কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য সব সময়ে না থাকলেও কয়েকজনের কথা উল্লেখ না করলে বিচারে ভুল হবে। যেমন ধরুন শ্যামল ব্যানার্জী (যতক্ষণ সুস্থ ছিলেন), চিন্ময় চ্যাটার্জী, সুব্রত ভট্টাচার্য, দিলীপ পালিত (রক্ষণ ভাগে) আর কিছু অংশে ফরোয়ার্ড লাইনে বিদেশ বসুর কথা বলতে হয়। যে দু-জন খেলোয়াড়ের কাছে আমি ছাড়াও

ওপর নির্ভর না করে গুণগত ক্রীড়াকৌশল দেখি
ছেন এবং আমার স্থির বিশ্বাস দর্শক মনে নি
অভিনন্দন কুড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

পাঞ্জাব প্রসঙ্গে আসতে গেলে সর্বপ্রথম ত
ব্যাক ইন্দর সিং-এর কথাই বলতে হয়। প্রায়
বছর আগে এই ইন্দর সিং বাংলায় প্রথম খেলে
প্রাক অলিম্পিকে ইরানের বিরুদ্ধে অ
অধিনায়কত্বে। তখনকার সেই তরুণ ই
এতগুলো বছর পার করে এসেও আজকের সং
ট্রফি প্রতিযোগিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ব
বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ করে
দফায় সেমি-ফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধে
একটি গোল বহুদিন লোকে মনে রাখবে। ই
ভাল খেলেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সমগ্র টুর্না
পাঞ্জাবের অধিনায়ক গুরুদেব সিং ও তরুণ
জিন্দর সিং চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করে সকল

বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছেন। গুরুদেবের বিপক্ষের মুখে বল রক্ষণের চমৎকারিত্ব যত সুন্দর তত্যোধিক সুন্দর হরজিন্দরের বল পাসিং-এর অভিনবত্ব। পায়ের টানে ছবি এঁকেছেন যেন জাত শিল্পীর নৈপুণ্যে। হরজিন্দর-এর খেলার আকর্ষণীয় দিকটি হল তিনি ঠিক পাঞ্জাবী কায়দায় খেলেননি। পাঞ্জাবী কায়দা বলতে আমি বলতে চাইছি যে 'হিট' অ্যান্ড রান'—একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে যা বোঝায় তা হল, শারীরিক শক্তির সুবিধে নেওয়ার জন্যে সামনের দিকে বল উঁচু করে মেরে সজোরে তার পেছনে ছুটে জায়গা করে নিয়ে খেলা। ঠিক সেই পদ্ধতিতে হরজিন্দর খেলেন না। তিনি স্কিলের ওপর, মানে ডজিং ও ক্লীন পাসিং-এর ওপর বেশী নির্ভরশীল। আর তা হবেই বা না কেন—তিনি জাতিতে পাঞ্জাবী হলেও শারীরিকভাবে তিনি ক্ষীণকায় বাঙালীর মত। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় অবশ্য ইন্দর-হরজিন্দর কেউই তেমন সুযোগমত খেলতে পারেননি। বাংলার প্রদীপ চৌধুরী একা একদিকে যেমন ইন্দরকে পুলিসী প্রহরাধীনে রেখেছিলেন, তেমনি জোনাল ওয়াচ রাখা হয়েছিল হরজিন্দর-এর সুযোগ সন্ধানের ওপর। বন্দীশালার ভেতরেও হরজিন্দর তাঁর শিল্পীসত্তাকে কিন্তু হারাতে দেননি।

কিন্তু যে দল ফাইনালে না এসেও কোন বিশেষ একটি খেলার জন্যে সমস্ত কলকাতাবাসীর মন কেড়ে নিয়েছিল সে দলটি হল কেরালা। ভারতের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এই রাজ্যটির খেলোয়াড়রা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় যে অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল কলকাতার মাঠে বহিরাগত রাজ্য দল হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ৪—৩ গোলের ব্যবধানে পাঞ্জাব জয়ী হলেও স্কিল শুটিং, পাসিং ইন্টারচেঞ্জিং-এ সমস্ত বিচার করলে কেরল দলকেই সেদিন বাংলার দর্শক যোগ্যতর বলে মেনে নিয়েছে। তাদের সেদিনের সেই খেলা বহুদিন এখানকার জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই কেরল দলের চার-পাঁচজনের খেলা বিশেষ করে ফরোয়ার্ড লাইনে জোভিয়ার পায়াস ও নাজিব, হাফব্যাকে হামিদ তাঁদের অসাধারণ ক্রীড়া কৌশলে সকলের বাহবা কুড়িয়েছেন। আশা রাখি আগামী দিনে সুনাম অনুযায়ী তাঁদের বিভিন্ন ভারতীয় দলে দেখতে পাবো।

বল নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিদেশ বসু

এবারের জাতীয় ফুটবলের আসরে আরো অনেক রাজ্য দল যোগদান করলেও পরবর্তী পর্যায়ে মোটামুটি নজরে আসেন বিহার ও সর্বভারতীয় রেলদল। কলকাতার খেলোয়াড়দের দ্বারা পুষ্ট সর্ব-ভারতীয় রেলদলকে আমি কখনই একটি রাজ্যদল হিসেবে মানতে রাজী নই। তারা যে বাংলার ধারানুযায়ী খেলবে এটা কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে দুটি রাজ্যদল থেকে আমরা বহু কৃতী খেলোয়াড়কে দেখতে পেতাম আমাদের সর্বভারতীয় বিভিন্ন দলে সেই কর্ণাটক ও অন্ধ্র (হায়দ্রাবাদ) যেন সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ। এমন একজন খেলোয়াড়কেও আমরা এই দুই দলে দেখতে পেলাম না যিনি দর্শকমনে কোন-রকম প্রতিশ্রুতির ছাপ রাখতে পেরেছেন। যে কর্ণাটকের খেলোয়াড়দের স্কিল ও ডজিং-এর খ্যাতি ছিল মুখে মুখে, আজ তাঁদের সে গুণাবলী নিঃশেষিত প্রায়। বিখ্যাত রহিম সাহেবের হায়দ্রাবাদ আজ তাঁর শূন্যতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরলো। অতীত ঐতিহ্যের অনধ আজ অন্ধ। অনভিজ্ঞ ও উদীয়মান রাজ্যদল হিসেবে মণিপুর ও বিহার এসে পড়ে। তারই মধ্যে বিহার শেষ পর্যন্ত কোয়ালিফাই করতে না পারলেও ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। বিবিধের মাঝে মহামিলনের ক্ষেত্র কলকাতার বুকে সন্তোষ ট্রফির এই হল মোটামুটি রূপ।

•

এরপর ৩৪তম জাতীয় ফুটবল আসরের পরিবেশ ও তার দর্শক সমাজ সম্বন্ধে কিছু না বললে বোধ হয় কিছু বাকী থেকে যাবে। প্রতিযোগী রাজ্য দলগুলির প্রবক্তাদের মত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা এত সুন্দর পরিবেশে ও সুশৃঙ্খলভাবে ইতিপূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতি ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যদলের এই খেলার আসর দেখে মনে হল কলকাতা যেন অগণিত দর্শকের হাতে তুলে দিল একটা নানা রঙের ফুলের তোড়া আর ফুটবল অনুরাগী এখানকার দর্শক উষ্ণ আবেগে তা সাদরে গ্রহণ করে আরেকবার প্রমাণ করে দিল কলকাতা কলকাতাই।

ফটো : তপন দাস
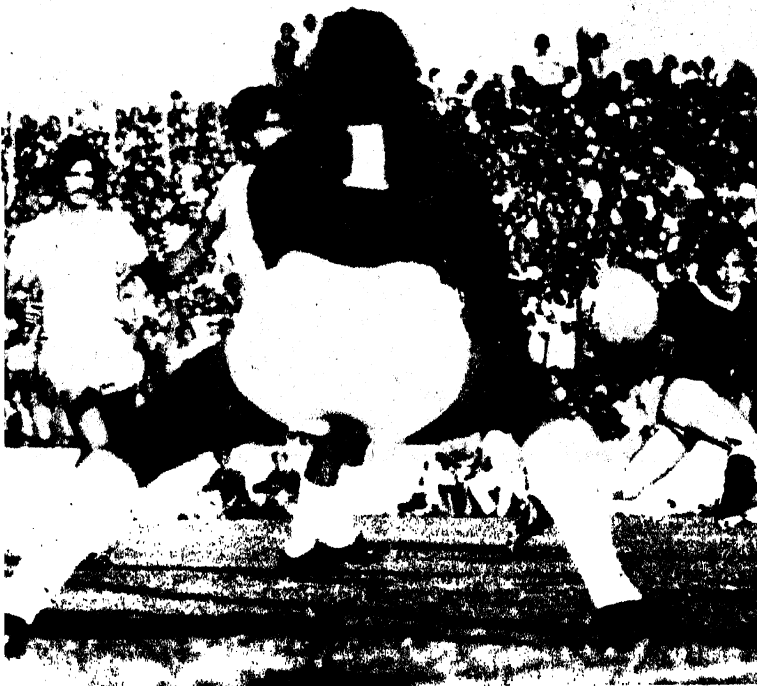
পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাংলার বহু লক্ষ্য-ভ্রষ্ট গোলের একটি

এক নজরে জাতীয় ফুটবলের ফল

প্রাথমিক গ্রুপ লীগ

গ্রুপ 'এ'—(বাংলা, হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাট) ফল—বাংলা ১১ : গুজরাট ০; বাংলা ৯ : হিমাচল প্রদেশ ০; গুজরাট ৩ : হিমাচল প্রদেশ ০; দুটি খেলায় ২০ গোল করে বাংলা গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ 'বি'—(পাঞ্জাব, ওড়িশা ও পণ্ডিচেরী) ফল—পাঞ্জাব ৬ : পণ্ডিচেরী ০; পাঞ্জাব ৩ : ওড়িশা ০; ওড়িশা ২ : পণ্ডিচেরী ০; দুটি খেলায় ৯ গোল করে পাঞ্জাব গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ 'সি'—(কর্ণাটক, মণিপুর ও হরিয়ানা) ফল—কর্ণাটক ১ : মণিপুর ০; কর্ণাটক ৭ : হরিয়ানা ০; হরিয়ানা ২ : মণিপুর ০; কর্ণাটক গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ 'ডি'—(তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর ও সারভিসেস) ফল—সার্ভিসেস ২ : জম্মু ও কাশ্মীর ০; সার্ভিসেস ৪ : তামিলনাড়ু ১; তামিলনাড়ু ৬ : জম্মু ও কাশ্মীর ০; গ্রুপ বিজয়ী সার্ভিসেস।

গ্রুপ 'ই'—(মহারাষ্ট্র, বিহার ও রাজস্থান) ফল—বিহার ২ : রাজস্থান ২; বিহার ১ : মহারাষ্ট্র ০; মহারাষ্ট্র ১ : রাজস্থান ০; গ্রুপ বিজয়ী বিহার। বিহারের কাছে পরাজয়ের ফলেই গতবারের রানার্স মহারাষ্ট্রের বিদায়।

গ্রুপ 'এফ'—(রেলওয়েজ, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম) ফল—রেলওয়েজ ৪ : আসাম ০; রেলওয়েজ ৫ : মধ্যপ্রদেশ ১; আসাম ২ : মধ্যপ্রদেশ ১; রেলওয়েজ গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ 'জি'—(অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও গোয়া) ফল—অন্ধ্রপ্রদেশ ০ : গোয়া ০; অন্ধ্রপ্রদেশ ২ : ত্রিপুরা ০; গোয়া ২ : ত্রিপুরা ১; অন্ধ্রপ্রদেশ ও গোয়া তিনটি করে পয়েন্ট পেলেও গোল পার্থক্যে অন্ধ্র গ্রুপ শীর্ষে স্থান পায়, গোয়া বিদায় নেয়। গতবার গোয়া গোল পার্থক্যে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ থেকে সেমি ফাইনালে উঠতে পারেনি।

গ্রুপ 'এইচ'—(কেরালা, নাগাল্যাণ্ড ও উত্তর-প্রদেশ) ফল—কেরালা ৬ : নাগাল্যাণ্ড ০; কেরালা ৫ : উত্তরপ্রদেশ ০; নাগাল্যাণ্ড ৩ : উত্তরপ্রদেশ ০;

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ—গ্রুপ '১'

বাংলা	৩	:	সারভিসেস	০
বাংলা	০	:	কর্ণাটক	০
বাংলা	১	:	পাঞ্জাব	১
পাঞ্জাব	১	:	কর্ণাটক	১
পাঞ্জাব	১	:	সারভিসেস	০
সারভিসেস	৩	:	কর্ণাটক	২

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বাংলা	৩	২	১	০	৭	১	৫
পাঞ্জাব	৩	১	২	০	৩	২	৪
সার্ভিসেস	৩	১	০	২	৩	৬	২
কর্ণাটক	৩	০	১	২	৩	৭	১

(জাতীয় ফুটবলে পাঁচবার বিজয়ী এবং পাঁচবার রানার্স কর্ণাটকের বিদায় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কর্ণাটক গতবার সেমিফাইনালে হারে মহারাষ্ট্রের কাছে। সারভিসেস গতবার গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় নেয় এবং [illegible] বিদায় নেয় কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ থেকে মহারাষ্ট্র, গোয়া ও [illegible] কাছে তিনটি খেলাতেই হেরে গিয়ে)

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ—গ্রুপ '২'

কেরালা	২	:	অন্ধ্রপ্রদেশ	[illegible]
কেরালা	০	:	রেলওয়েজ	[illegible]
কেরালা	৩	:	বিহার	[illegible]
রেলওয়েজ	০	:	বিহার	[illegible]
রেলওয়েজ	৫	:	অন্ধ্রপ্রদেশ	[illegible]
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬	:	বিহার	[illegible]

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
কেরালা	৩	২	১	০	৫	১	[illegible]
রেলওয়েজ	৩	১	২	০	৫	০	[illegible]
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩	১	০	২	৩	৯	[illegible]
বিহার	৩	০	১	২	৩	৬	[illegible]

(অন্ধ্রপ্রদেশ গতবার সেমি ফাইনালে উঠেছিল গোল পার্থক্যে বিহারের উপরে থাকায়। গতবার কেরালা কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে দুটি খেলায় বিহার ও কর্ণাটকের কাছে হেরে শেষ স্থান পায়। রেলওয়েজ বিদায় নেয় গ্রুপ লীগ থেকে পাঞ্জাবের কাছে হেরে গিয়ে)

সেমি ফাইনাল

বাংলা	১	:	রেলওয়েজ	[illegible]
বাংলা	১	:	রেলওয়েজ	[illegible]
পাঞ্জাব	৪	:	কেরালা	[illegible]
পাঞ্জাব	২	:	কেরালা	[illegible]

ফাইনাল

বাংলা	০	:	পাঞ্জাব	[illegible]
বাংলা	৩	:	পাঞ্জাব	[illegible]

বাংলার শ্যাম থাপা বল সমেত গোলের জালে ঢুকে পড়েছেন। ফটো : [illegible]

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

বৈষ্ণব পদ নৈবেদ্য ঃ ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী ও ডক্টর শিবচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত। দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী। দাম কুড়ি টাকা।

আজ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর অনেকগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তবুও এই সংকলন প্রকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন দুই সম্পাদক, কারণ, আগেকার কোনো সংকলন অতি সংক্ষিপ্ত, কোনোটি বা প্রত্যেক শতাব্দীতে পদসৃষ্টির বিশেষত্ব নির্ণয়ে মনোযোগী, কোনোটির বিন্যাসরুচি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণির লীলারসবিন্যাস মনে রেখে তিনশো দশটি পদের এই সংকলন তৈরী করা হয়েছে। দুটি পর্যায়ে এই সংকলিত পদগুলি বিভক্ত। চৈতন্যপূর্ব রাধাকৃষ্ণ পদাবলী এবং চৈতন্য সমকাল ও পরবর্তীকালের পদাবলী। জয়দেব, ক্ষেমেন্দ্র, বড়ু চণ্ডীদাস, রায়পণ্ডিত, গুণরাজ খান ইত্যাদির পদ প্রথম পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে। যশোরাজ খানের বিখ্যাত পদ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। বোধ হয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিতে লেখা বলেই। বিদ্যাপতিকে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। চণ্ডীদাসের পদও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। বিদ্যাপতিকে দ্বিতীয়পর্যায়ভুক্ত করার যুক্তি ঠিক বোধগম্য নয়।

যাই হোক, পর্যায় নিয়ে সংশয় হলেও এই সংকলনের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক পদের যথাসম্ভব পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে। তার থেকে পাঠক ইচ্ছে মতো পদগুলির অর্থগত নানা মাত্রায় পৌঁছোতে পারেন। তাছাড়া দেওয়া আছে বাঙলায় লেখা নয় এমন পদগুলির অর্থ। প্রত্যেকটি পদের শেষে—যেখানে প্রয়োজন—টীকা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে ইতিহাস, কাব্য ও তত্ত্বের তাৎপর্য স্পষ্ট করার চেষ্টা আছে। এই চেষ্টাটি ইতিপূর্বে সংকলিত কোনো বইতে দেখা যায় নি। এই চেষ্টার মধ্যে সংকলক দুজনের সাহিত্যবোধ, উৎসজ্ঞান ও তুলনীয় অন্য কাব্য-সাহিত্যের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিতির প্রমাণ আছে। বৈষ্ণবকাব্যের বহু উপমা, চিত্রকল্প, বর্ণনাভঙ্গি এবং রূপস্থাপনা সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ থেকেই নেওয়া। যথেষ্ট সাহিত্যবোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পদগুলির সঙ্গে এই সাহিত্যিক অনুষঙ্গগুলি জুড়ে দুই সম্পাদক আমাদের মতো বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধারণ পাঠকদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটটি বেশ স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। পূর্বেকার সংকলনগুলিতে কোনো কোনো পদ কোন্ রসপর্যায়ভুক্ত আছে, কোন্ অভ্যন্তরীণ প্রমাণে বিশেষ পদকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায় বা কোন্ কালে ফেলা যায় সেগুলিরও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আলংকারিক ত্রুটি সম্পর্কেও মন্তব্য আছে। সব ক্ষেত্রে গ্রহণীয় না হলেও এই সব মন্তব্য যে-ক্ষেত্রে সন্দেহবোধ-সম্পন্ন পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু অনুশোচনামূলক 'শোচক' পদ কোন্ অর্থে 'সূচক' পদ হতে পারে তা স্পষ্ট নয়। গুরু গোস্বামীর মুখেও এই-গুলি কি সূচনা বা জ্ঞাপন-স্বরূপ গাওয়া হতো?

সংকলনের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট শব্দার্থসূচী অত্যন্ত মূল্যবান, এবং পদান্তর, টীকা, শব্দার্থসূচী—এই তিনটি প্রসঙ্গই এই সংকলনটিকে স্থায়িত্ব দেবে বলে আশা করি। ভূমিকায় অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ 'বৈষ্ণবসাহিত্যে গৌর-গৌরব', স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিরূপ' মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'রস প্রস্থান', হরিপদ চক্রবর্তীর 'হৃদি বৃন্দাবনে যদি', শিবচন্দ্র লাহিড়ীর দুটি প্রবন্ধ 'বিপরীত বলিয়া একটি কমল' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী ঃ শতাব্দীভিত্তিক পরিচয়' সংকলনটির ক্রিটিক্যাল মূল্য অবশ্যই বাড়িয়েছে। তবু মনে হয়েছে, এই সাহিত্য বিচারে তত্ত্বদৃষ্টি অপরিহার্য হলেও সাহিত্যদৃষ্টির আরও একটু ব্যাপক ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। অবশ্য অধ্যাপক লাহিড়ীর প্রথম প্রবন্ধটিতে সেই দৃষ্টির কিছুটা দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংকলনে শ্যামাপদ চক্রবর্তী ও সুকুমার সেনের সাহিত্য-মূল্য বিচার এ ক্ষেত্রেও বার বার মনে পড়ে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রকাশক ঃ ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা—১২, দাম সতের টাকা।

খুবই কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। কিন্তু অতি জটিল এবং বিপত্তিকর। বিপত্তিকর এই অর্থে যে, ধর্মীয় ভাবাবেগ ও সংস্কার সতত পশ্চাদ্ধাবনকারী। তাদের রুদ্ধ গর্জন একটুতেই শোনা যায় এবং গবেষকের তাই সাহসী ও সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। ডঃ ভট্টাচার্য অবশ্য একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস এবং স্কলাস্টিক দর্শনের ছত্রছায়ায় থেকেই 'দেবদেবীর স্বরূপ আলোচনায়' ব্রতী হয়েছেন। পাঠক একথা মনে রেখে বইটি পড়লেই ভাল হয়। তাহলে তাঁর আলোচনা কেন স্থিতিস্থাপকতার টানে আচ্ছন্ন এবং নতুন বা চমকপ্রদ কোন সিদ্ধান্ত কেনই বা অন্তিমে ফণা তুলে ফোঁস করে না, বোঝা যায়।

যে কোন দেশের বা জাতের উপাস্য দেবদেবীর উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় দুটি পরিপ্রেক্ষিত অন্তত শিরোধার্য করে এগোনো উচিত। সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক এবং তুলনামূলক মিথলজির পরিপ্রেক্ষিত। সেই সংগে সার্বিক ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতটি থাকলে তো সোনায় সোহাগা। বিশেষ করে পুরনো সভ্যতা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় এগুলি আবশ্যিক। ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনায় প্রথম ও তৃতীয় পরিপ্রেক্ষিতটি দেখি না এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তুলনামূলক মিথলজি অতি সামান্যই এসেছে। এলেও সেটা অন্যের মতামত বা আলোচনার উদ্ধৃতি-সূত্রে। কিন্তু তিনি এক কথায় হ্যাঁ-না করে পাশ কাটিয়ে গেছেন। যেমন ঋগ্বেদের বল নামক অসুর প্রসঙ্গ। ফিনিশীয় মিথলজিতে 'BAAL' এবং আসিরীয় ব্যাবিলনীয় উপাস্য 'বেলে'র (Bel) সংগে চমৎকার আলোচনার অবকাশ ছিল। সুমেরের নিপ্পুর শহরের উপাস্য এনলিল ছিলেন পবনদেব। পরে ব্যাবিলনের মারদুক নামে উর্বতার দেবতার সংগে মিলিয়ে তিনি নতুন নাম পান 'বল' বা বেল (Bel)। আবার আসিরীয়দের জাতীয় দেবতার নাম ছিল অসুর (Asshur)। অসুর বানিপালের গ্রন্থাগারে পোড়ামাটির ফলকে লেখা 'সৃষ্টির মহাকাব্যে' এঁদের কীর্তিকথা আছে। অন্তত খৃস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দ থেকে এ সভ্যতার শুরু। ঋগ্বেদের বলাসুরের সংগে সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক নয়—কারণ ভারত থেকেই আর্যদের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার ম্যাক্সমুলারীয় তত্ত্ব অধুনা পরিত্যক্ত। পরিত্যক্ত তাঁর প্রিয় সোলার মিথও। মুলারের জীবিতাবস্থাতেই তাঁর এ সব তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল (এ্যানড্রু ল্যাং, জর্জ উইলিয়াম কক্স, রবার্ট ব্রাউন, জন ফিসকে আনজেলো দ্য গুবারনাটিস প্রমুখের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সমস্যা এটাই যে, আর্যদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অবজেকটিভ (পুরাতাত্ত্বিক) প্রমাণ বলতে শুধু ওই ভাষাগত নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নেই। না কোন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, মৃৎশিল্প সীলমোহর—কোন কিছু। এমন কি আর্য লিপি বলতেও কিছু নেই। তাহলেও অধুনা পুরাতত্ত্ব-নৃতত্ত্বের ভাষাগত নিদর্শন তথা মিথলজি-ফোকলোর অন্যতম মুখ্য উপাদান বলে বিবেচ্য। ভারতীয় আর্যদের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক কুলজী নিরূপণে তাই নির্ভয়ে এগোনো যায়। মিশর, সুমের, গ্রীক, ইরানীয় (জেন্দা অভেস্তা) মিথলজির সংগে তুলনামূলক আলোচনাও জরুরী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাকে তো অস্বীকার করাই যায় না। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবিবর্তনের ছকটিও সামনে রাখার দরকার হয়। ডঃ ভট্টাচার্যের বইটিতে অল্পবিস্তর ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এগুলি — কিন্তু সর্বাঙ্গীণ আলোচনা নেই। ফলে আমরা প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীদের 'স্বরূপ নির্ণয়' যতটা পাই, ততটা তাদের উদ্ভবের কোন সুস্পষ্ট সূত্র পাই না। কিংবা, যেটুকু পাই তা সেই ম্যাক্সমুলারেরই 'ন্যাচারাল ফেনোমেনন' তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করে মাত্র। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে এককথায় কোন বিতর্কিত সূত্রকে তাঁর নস্যাৎ করে দেওয়ার ঝোঁকটি ব্যথিত করে। (যেমন, সিন্ধু সভ্যতা তাঁর মতে আর্য সভ্যতার প্রাচীনতর নয়।) আবার তাঁর আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের উল্লেখও গুরুতর পুরাতাত্ত্বিক বিষয়কে সাহিত্যের বাষ্পে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এলোপাথাড়ি অজস্র উদ্ধৃতি কিছুটা প্রাসঙ্গিক

হলেও চিত্রনাট্যের [illegible] তা সত্ত্বেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসাজনক প্রচেষ্টা। ডঃ ভট্টাচার্য একটি চমৎকার চলচ্চিত্র এঁকে দিয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

একটি বার্ষিক প্রদর্শনী

বিড়লা আকাদমীর বার্ষিক প্রদর্শনী শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। বাইরের শিল্পীরাও করেন। কিন্তু তাঁরা মূলত বাঙ্গালী। ক্যাটালগে প্রকাশ কর্মকারের পাশে 'এলাহাবাদ' লিখলে তিনি কোন মতেই হিন্দুস্থানী হয়ে যান না। স্পষ্ট বোঝা যায় এইভাবে প্রদর্শনীটা সর্বভারতীয় চরিত্র দেবার চেষ্টার পেছনে আছে আকাদমী অব ফাইন আর্টসের ছায়া-ছায়া উপস্থিতি। একথা কলকাতার শিশুরাও জানেন, আকাদমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ভিন প্রদেশী সব তরুণ শিল্পী যোগদান করেন অনেক বেশি। নানা বয়সী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী শিল্পীদের অনেকেই তা থেকে দূরে থাকেন, একথা 'দেশ'-এর পাতায় শুধু আমি বলিনি, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তও ইতিপূর্বে বলেছেন। এই ধরনের রেষারেষির কথা প্রকারান্তরে প্রকাশ করে বিড়লা আকাদমী ছেলেমানুষী করেছেন।

সর্বস্তরের শিল্পীদের মধ্যে কিছু অসন্তোষও রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ মনোনীত বিচারকদের কর্তৃপক্ষ আলোচনাচক্রে বসে কাকে পুরস্কৃত করা হবে তা স্থির করতে দেন না। প্রত্যেক বিচারককে একা ছবি দেখে হাতের কাগজে নামের পাশে নম্বর বসিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। চারজন বিচারকের কাছে ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং ছাপা ছবি বিভাগে যাঁরা বেশি নম্বর তুলতে পারেন তাঁরাই বিজয়ী হন। নম্বর যোগ দেবার সময় বিচারকরা উপস্থিত থাকেন না এবং সেইটাই শিল্পীদের সন্দেহজনক মনে হয়েছে। যেখানে দু হাজার টাকার চারটে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, সেইখানে এই ধরনের সন্দেহ যাতে শিল্পীদের মনে না উঁকি দেয় সেটা দেখা দরকার। বিচারকদের একসঙ্গে বসতে দেওয়া হোক। তাঁরা স্থির করুন কারা পুরস্কার বিজয়ী। তারপর সেই নামগুলো কাগজে লিখে, তাঁরা সই করে কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিন। সেই কাগজ নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিলে অন্তত ছবির বিচার সম্বন্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠবে না।

এই প্রদর্শনী মোটামুটি উচ্চমানেরই হয়। যদিও চাউস পুজো সংখ্যার মতো কিছু দোকানদারীর ব্যাপার যে না থাকে তা নয়। এবার জলরঙ বিভাগে বেশ কিছু চোখজুড়ানো কাজ ছিল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রেখাধর্মী অঙ্কনপ্রধান 'তুসু'-তে সামান্য রঙ ব্যবহার করেও [illegible] শীত বসন্তের 'আমরা' [illegible] জন্মী সময়, ছবিতে [illegible] সুন্দরী প্রতিমার মুখ বর্ণ [illegible] চমৎকারই বে মনোরম—আমার ব্যক্তিগত মত অজয়ের পুরস্কার পাবার দাবি ছিল এই কাজটির বেশি। কালন্দুরী দাশগুপ্তর 'শান্তিপল্লী'— বিস্তৃত প্রান্তরে শুয়ে থাকা নর-নারীর দেহ। একপাশে কামড়ানো আপেল। কাজটিও ভাল। মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় 'ফুলবনে' প্রজাপতির আবেশ তৈরি করেছেন। অভিজিৎ বসুর বসন্ত তেরঙা সেতু দিয়ে পটভূমি বিস্তার এবং আলোকের "বর্ণধারা" মনের ভেতর সুর তোলে। মধুমিতা ভট্টাচার্যের ক্যানভাসে শেকে জাহাজ-ঘাটার পরিবেশ মূর্ত। বিভূতিভূষণ শিকদার আকাশ এবং উত্তাল সমুদ্র নানা ঘোর এবং উজ্জ্বল রঙে এঁকে, তার মধ্যে নৌকো ছেড়ে দিয়ে দারুণ জমিয়েছেন। গণেশ হালুই-এর 'সুবর্ণরেখা' খুবই সংবেদনশীল কাজ।

টেম্পারা বিভাগে কিছুকাল হলো মিষ্টি মিষ্টি গ্রীটিং কার্ডধর্মী কল্পচিত্র চলছে। এর মধ্যে গৌতম বসুর ছবিটা একেবারে অন্য ধরনের। একটা জানালার ঈষৎ ফেঁপে ওঠা খয়েরী পর্দা। ওপরে ফাঁকা জায়গাটার জানালার শিক আকাশ এবং একটি দেখতে না-পাওয়া গাছের কয়েকটি পাতা। তারপর বলতে হয় দীপালি ভট্টাচার্যের কথা—যদিও গণেশ হালুই-এর ঘরানা তবু তাঁর নিজস্ব কিছু আছে। একটা পুরানো বাড়ির সাবেকী কারুকাজ করা টেবিল, ফুলদানি, একটি মেয়ে যার কোমর পর্যন্ত ছবি হয়ে আছে দেওয়ালে, বাকীটা ফ্রেমের বাইরে (জকেশ সান্যালের "শেষ মুখল" কাজটির প্রভাবও যথেষ্ট)। নীলিমা দত্তের 'বধূ' সাদামাঠা কাজ হলেও উল্লেখ্য। মনোজ দত্ত 'ভাগ্যের পরিহাস' ছবিতে খাটে শায়িত মৃত লোকটি, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং ডাক্তার আঁকতে শিশুচিত্রের রূপারোপের ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে।

কিছু কিছু অংকনের কাজ ছিল খুব ভাল। প্রথমেই মনে পড়ে রেবা সরকারের ফেলটপেনের রেখাচিত্র 'বাচ্চা মেয়ের কোলে বাচ্চা'। রেকস গোস্বামী এবং অশোক ভৌমিক অঙ্কনের মধ্যে খুবই ব্যক্তিগত প্রতীকী চিত্রকল্প ব্যবহার করছেন। ছাপা ছবির ক্ষেত্রেও কিছু কাজ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জয়কৃষ্ণ আগরওয়াল ডিম্বাকৃতি পাথর একটি পেডাস্টালের ওপর রেখে তান্ত্রিক বহরগুলোর আবহ রচনা করেছেন। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এনগ্রেভিং-১'এ বুলোটের নানা মজা আছে। লালুপ্রসাদ দ' 'Graphic I 77'-এ ভূমি বণ্টনে যথেষ্ট মুনশীয়ানা দেখিয়েছেন। হরেন দাস 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-এ নানা জন্তু জানোয়ার নিয়ে যে রামরাজ্য তৈরী করেছেন তা অনেক বেশি আলোড়িত করে অন্তত আমাকে। বস্তুত ছাপাই ছবির মাঝে কলাকৌশলের চর্চা বেড়ে গেছে। এর মধ্যে শুভাপ্রসন্নের 'আমা' ভাবীকাল ফুলদানিতে শুকনো ফুল নিয়ে কবিতা তৈরী হয়েছে।

তৈলচিত্র বিভাগে নানা ব্যক্তিগত

...কিছু উত্তরণ... শিল্পীরা পরিশ্রম করেছেন। ... 'কাব্য' সাইরেনের ... বিশ্রামকালীতে আবাহন ... পড়েছেন না তাও নয়। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি, নব্য ধনিক শ্রেণীর রুচি ...কিন ছবি এবং পত্রিকার প্রভাবে তাঁরা ...রূপ বিভ্রান্ত। তবু ডুবতে ডুবতে তাঁরা ...ড়া ধরে ভাসছেন। কেউ কেউ কূলে ...ঠেছেন। পরীক্ষাও চালাচ্ছেন।

নির্মল দত্তের 'কলিকা'-এর রাইটির ...ঙ্কর ভঙ্গী বিচিত্র কারিকুরির মধ্যে ...ন্দর। প্রকাশ কর্মকারের দুর্ধর্ষ রঙের ...লেটের মধ্যে একটা মেয়ের মুখ ...শার অনুরণন তোলে। সুনীল দাস ...র বিরাট (৮ ফুট × ৮ ফুট) কাজে ...লনশীল এবং পতনশীল ঘোড়ানো ...শ্যা দেহ নানা উক্ত উদ্দীপক বর্ণের ...ধ্যে ধরেছেন। তুলি চালনা, ফর্ম গঠন, ...ঙ্কন এসবের আশ্চর্য মুনশীয়ানা। ...খে বোঝা যায় যে যদি তিনি ছবির ...স্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র আরেকটু ...দ্ধভাবে উচ্চারণ করেন তবে ভারত-...র্ষে অন্যতম প্রধান চিত্রকর হতে তাঁর ...ছুই লাগবে না। তরুণতর শিল্পীদের ...ধ্যে অলোক ভট্টাচার্যের 'উদাসীন ...দ্রলোক' প্রথাসিদ্ধ বাস্তব কাজ। ...লাসই নাদুসনুদুস এক ভদ্রলোক ...লি গায়ে একটা চেয়ারে বসে ...আছেন। পাশে তাঁর কুকুর। ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক পারি-...পার্শ্বিকতা রচিত হয়েছে। অলোকের ...মতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই ...বং ছবি সম্বন্ধে নিষ্ঠা এবং যত্ন ...চণ্ড। এই সব প্রতিশ্রুতিময় শিল্পী-...দের পুরস্কৃত করলে ভাল হয়। শিব-...সাদ করচৌধুরী নীলচে ধূসর পট-...মিতে সাদা কালো একটি কাঠপুতুলী ...নুষ তৈরী করে নাগরিক বিচ্ছিন্নতার ...তুন প্রতীক এবং প্রতিমার খোঁজ কর-...ছেন। এবার কাঞ্চন দাশগুপ্তের কাজ ...নেক পরিমাণে ম্লান। বিষয়বস্তু বা ...চিত্রভাষা—কোনটার আনুগত্য স্বীকার করবেন এটাই তাঁকে কিছু পরিমাণে বিচলিত করছে। শ্রীলা সেনের 'স্টিল লাইফ'-এর উদ্ভট বিকৃতকরণ এবং ধোঁয়াটে তেলরঙ ব্যবহার ভালোই লাগে। ঋতু সিংহের 'সোনালী' নামে একটি বাচ্চা মেয়ের সংবেদনশীল প্রতিকৃতি দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। মনোজ সরকারের 'রচনা'-র মধ্যে নীরক্ত রঙ এবং জ্যামিতিক আকার দিয়ে রূপ-গন্ধের অনুসন্ধান চলেছে, যদিও তিনি তাঁর সৃজনীশক্তির ওপর শামুকের ধীরগতি খোলস চাপাচ্ছেন বলে মনে হলো। সলিল ভট্টাচার্যের আলোকিত অথচ কুণ্ডলী পাকানো পরিবেশের মধ্যে 'নিদ্রিতা' মেয়ের মুখের আভাস ঘুমের আমেজটা ধরেছে। বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের বিকৃত এবং দীর্ঘায়িত উড়ন্ত নৌকা পটের মাঝামাঝি উপস্থাপিত। নীচে সমতল রঙ। ওপরে তিনটে মুখ। কাজটা জমাটি। অমিত পালের 'বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি' কাজটিতে বিমূর্তভাবে অবয়বী বিষয়কে ব্যবহার করার কায়দাটা ভাল। নীল সবুজ ঘাসের মতো কলজিরাজী মাঠ এবং তার মধ্যে নানা মুখী বৈদ্যুতিক দণ্ড এবং তার নৈর্ব্যক্তিক জ্যামিতিকে আরোপ করেছে। চমৎকার আধুনিক এবং চাক্ষুষী চিত্রকলা।

... কাজটি প্রায় ... হতে হতে শুরু হয়েছে। নিরঞ্জন প্রধানের খণ্ডিত 'রূপকথা' নিতাঁর আকার মুকাভির বিস্তার এবং দৃঢ় ধরেছে। মানিক তালুকদার বোধ হয় অকালের এমন পর্যায়ে নেমেছেন যে সৃজনীকর্মে মনোযোগ দিতে পারছেন না। বিমান দাশের পদভূজা'র ইঙ্গিত-ময় রূপবন্ধে ভাস্কর্যগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অন্যান্য বারের তুলনায় ভাস্কর্য বিভাগে প্রচুর কাজ ছিল কিন্তু তেমন উল্লেখ্য কাজের পরিমাণ ছিল কম যদিও রামশংকরের পুরস্কৃত কাজটি একটু ভিন্ন স্বাদের।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা: শিল্প সংক্রান্ত **সংগীত**

হীরাবাঈ ভূয়ালকা পুরস্কার পেলেন

কিরাণা ঘরাণার প্রখ্যাত খেয়াল গায়িকা হীরাবাঈ বরোদেকরকে ১৯৭৮ সালের ভূয়ালকা পুরস্কার দিলেন সৌরভ সংগীত শিক্ষায়তন গত ২৮শে জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। অবসরপ্রাপ্ত গুণীদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই পুরস্কারের অংক দশ হাজার টাকা এবং গত বছর এই পুরস্কার পেয়েছিলেন স্বর্গীয় উদয়-শংকর।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) পুরস্কারটি দেওয়ার আগে বলেন, সংগীত

উৎকৃষ্টতম তপস্যা, কাজেই হীরাবাঈয়ের মত এক মহৎ তপার পাশে বসবার সুযোগ পেয়ে তিনি কৃতার্থ। হীরাবাঈ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, এই পুরস্কার দিয়ে উদ্যোক্তারা সঙ্গীতকেই সম্মানিত করেছেন তাঁকে নয় এবং তিনি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তা সঙ্গীতেরই তরফ থেকে। তিনি আরও বলেন যে, এই পুরস্কারের কোনো তুলনা তিনি এই যুগে খুঁজে পান না —রাজা-রাজড়াদের যুগে অনেক ইনাম পাওয়া যেত, কিন্তু সে যুগ তো চলে গিয়েছে।

সৌরভের সম্পাদিকা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়, পুরস্কার কমিটির চেয়ার-ম্যান ভি জি যোগ (প্রখ্যাত বেহালা-বাদক), এই কমিটির সদস্য ওস্তাদ মুনওয়ার আলি খাঁ (প্রখ্যাত খেয়াল গায়ক) ও শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ প্রভৃতিও ভাষণ দেন। মাদ্রাজের ভারত নাট্যম্ শিল্পী এম কে সরোজার নৃত্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

নীলাক্ষ গুপ্ত

নজরুল গীতির প্রচার সম্বন্ধে অভিযোগ

নজরুলগীতির শিল্পী ফিরোজা বেগম সংবাদপত্রের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর দুটি বক্তব্য নিবেদন করেছেন। একটি প্রয়াত সুরকার কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত নজরুল রচিত গানের সাম্প্রতিক রেকর্ডগুলিতে সুরকারের নাম উল্লিখিত থাকছে না, যদিচ পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলিতে এই উল্লেখ থাকত; দ্বিতীয়টি নজরুলের গানে কবির প্রতিষ্ঠিত সুরের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য করা হচ্ছে এবং ইচ্ছাপূর্বক যাতে এই বিকৃতিসাধন না ঘটে এই জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রথম অভিযোগটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড কোম্পানীগুলির যুক্তি কি এবং সে বিষয়ে তিনি কোনও অভিযোগ তাঁদের কাছে করেছেন কিনা জানতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে কিছুই জানতে পারা গেল না। উক্ত সাক্ষাৎকারে তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়নি কেন—এ প্রশ্নেরও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে বলা বাহুল্য যে, আমাদের পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে অবহিত আছেন আশা করি।

রাজেশ্বর মিত্র

আলোচনা: শিল্প সংক্রান্ত **চলচ্চিত্র**

একস্‌অরসিসট

এমন দিন ছিল যখন কোনো কোনো মহিলার প্রয়োজন হতো অ্যামোনিয়া ক্যাপসুল-এর ভ্যান গ-এর চরিত্রে কার্ক ডগলাসকে তাঁর কানটি কেটে ফেলতে দেখে। অ্যালফ্রেড হিচকক আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বলবান করেছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের স্নায়ুর সহনশক্তি, এতে সন্দেহ নেই। আমাদের মেয়েরাও আজকাল বার্ডস্ কিংবা সাইকোর মতো ছবি অনায়াসে ক্যাপসুল ছাড়াই গ্রহণ করতে পারেন। বিদেশে মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য এ ধরনের ছবির মানসিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে গভীরভাবে আলোড়িত সন্দেহ নেই। ইদানীং-কালের বেশ কিছু বিদেশী ছবিতে যেন এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও দুঃস্বপ্নের পাল্টা জবাব দিতে ভয়, সেকস ভায়োলেন্স-এর একটা উলটো স্রোতও বইছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ঠিক কতোটা ভয়, বীভৎসতা ও খোলা-খুলি নগ্নতা আমরা সহ্য করতে শিখেছি, ঠিক কইশ পুরু কড়া পড়েছে আমাদের মনে, যেন সে-সবেরই একটা পরীক্ষা নিয়েছেন উইলিয়াম

লিন্ডা ব্লেয়ার, এলেন বার্স্টিন

ফ্রিডকিন তাঁর একসঅরসিসট ছবিটিতে। এই পরীক্ষার মাপে মাপে অনেকটাই নিজেদের তৈরি করে নিতে পেরেছেন আমেরিকা - ইউরোপের আধুনিক দর্শকেরা। কিন্তু আমাদের দেশে একসঅরসিসট-এর মতো ছবি এই প্রথম। ফলে আমাদের অনেকের পক্ষেই ভয়, সেক্স, ভায়োলেন্স-এর এতটা বাড়াবাড়ি অসহনীয় মনে হতে পারে। অনেককেই দেখলাম নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ছবির মাঝ পথেই অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে যেতে। আমার সামনের আসনের মেয়েটি প্রায় সারাক্ষণ পাশের ছেলেটির বুকে মুখ গুঁজে রইলো। আমার এক আত্মীয়া ছবিটি দেখার পর সন্ধেবেলা লোডশেডিং হলে স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অলৌকিক দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন। এতে অবশ্য লজ্জা পাবার কিছু নেই। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রসমালোচক পলিন কেল এ-ছবিতে নারকীয়জনক ঘটনা ও সেকস-এর বাড়া-বাড়ি নিয়ে যে তীব্র সমালোচনা করে-ছেন তাতে বরং আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারি। একটা কথা এখানে বলে রাখি, যাঁরা আসছেন ষোলো উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁরাই বিপদে পড়ছেন সবচেয়ে বেশী, কেননা চার-অক্ষরী স্যাকসন শব্দটি এখনো এদেশে নিষিদ্ধ। তবে ওদেশে এ ছবি গডফাদারকে বক্স-অফিসে হারিয়েছে। কলকাতাতেও যে ছবিটি জমজমাট বাজার পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা, ছবিটি স্থূলভাবে আমাদের কতকগুলি আদিম বৃত্তিকে নাড়া দেয়—অপার্থিবের ভয় ও যৌনতা এই হচ্ছে একসঅরসিসট-এর ঘনঘোর বিষয়বস্তু। সুতরাং জলার-এর অ্যাভালানচ-এ যে ছবিটি চাপা পড়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রেগ্যান-নামের একটি বারো বছরের শয়তানে-পাওয়া মেয়ে হচ্ছে ছবিটির মূল চরিত্র। এ চরিত্রে অভিনয় করেছে লিনডা ব্লেয়ার নামের একটি বছর বারোর মেয়ে যাকে খুঁজে পেতে ফ্রিডকিনকে অডিশন দিতে হয়েছিল পাঁচশো মেয়েকে। মেয়েটির মার চরিত্রে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো অভিনয় করেছেন ইলেন বারস্টিন—ভয়, ঘৃণা, পাপ-বোধ, অনুশোচনার প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁর অভিনয়ে সম্পূর্ণ ও নিটোলভাবে চেনা যায়। শয়তানে-পাওয়া রেগ্যান-এর কাজকর্ম শুধু যে আমাদের ক্রমাগত শিরার মধ্যে টান ধরায় তা নয়, কিছুক্ষণ পর থেকে আমাদের গা ঘিন-ঘিন করতে থাকে। দেয়ালের মধ্যে

শব্দ ... করবার ... অলৌকিক করাল ; টেবিল-চেয়ার-বিছানার সশব্দ চলাফেরা, ঘরের মধ্যে শূন্যের নীচে চলে-যাওয়া তাপমাত্রা—এসব কিছুকে বিশ্বাস্যভাবে তৈরি করতে ফ্রিডকিনের অনন্য প্রতিভা যে কিভাবে কাজ করেছে সেটাই বিস্ময়কর। কিন্তু এর সঙ্গে যখন এসে মেশে মেয়েটির উলপেটে লেখা বেরোনো, ঘা গা কেটে বা বেরোনো কিংবা তার একেবারে পিছনে ঘাড় ঘুরে যাওয়া বা অস্বাভাবিক বমি ও প্রস্রাব করার দৃশ্যগুলি, তখন মুখ-চোখে হাত চাপা দিয়ে ফ্রিডকিনের প্রতিভাকে আমরা এক গলা ঠাণ্ডা ঘাম নিয়ে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই। এবং হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করি যে এ-দেশের শুচিবায়ুগ্রস্ত সেনসর ক্লিনিক্কস-এর সঙ্গে রেগান-এর মাসটারবেশন-এর দৃশ্যটি ছেঁটে দিয়েছেন। তবে শয়তানের প্রভাব যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে আত্মরতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই ইঙ্গিতটা ঘুরে ফিরেই আসে।

ছবিটিকে খুব উচ্চ পর্যায়ের সিনেমা বলতে আমি অন্তত দুবার ঢোক গিলবো। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে সেলুলয়েডের ভাষাটি ফ্রিডকিন-এর সম্পূর্ণ আয়ত্তে। সাইকোর মতো একসঅরসিসট-এরও প্রথম দিকে বিশেষ কিছু ঘটে না। উল্লেখ্য যে, ছবিটি করার আগে ফ্রিডকিন 'সাইকো' ছবিটি তিরিশ বার দেখেন এবং এ ছবিতে অলৌকিক ভয়ের আবহাওয়া তৈরির ব্যাপারে তিনি হিচকক-এর প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে প্রতি তুলনায় যে ছবিটির কথা খুব মনে পড়ে সেটি হল পোলানস্কির রোজমেরির বেবি। ফ্রিডকিন ও পোলানস্কির ছবি দুটির মধ্যে বর্ণের পার্থক্য। এবং ফ্রিডকিন-এর মধ্যে যা খুঁজে পেলাম না তা হলো পোলানস্কির বাঁধুনি, সংহতি।

এ ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ক্যামেরা আর সাউণ্ডট্র্যাক। শুধু ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের পরিবর্তন ও আলো-ছায়ার সূক্ষ্ম ব্যবহারে যে কিভাবে একটি অলৌকিক ভয়ের আবহাওয়া আসতে আসতে গড়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে চূড়ান্তভাবে এ ছবিতে, বিশেষ করে বেডরুম দৃশ্যগুলিতে। আর শব্দের মাধ্যমে যে ছবির মেজাজটাকে কতদূর তৈরি করে নিতে পারেন একজন পরিচালক সেটাও বোঝা যাবে এখানে। বিদেশে এ ছবির জন্যে সিনেমা হলের ফেডারসগুলিকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে নেয়া হয়। আমার মনে হলো, কলকাতাতেও যতখানি সম্ভব ফেডারস বাড়ানো হয়েছে—ফলে মূল সাউণ্ড-ট্র্যাকের অনেকটাই পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত দুটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এক, শেষ দৃশ্যে শয়তানের মর্মভেদী চিৎকার কশাইখানায় শুয়োরের চিৎকার থেকে রেকর্ড করা। দুই, রেগ্যান-এর মুখে শয়তানের কথায় কণ্ঠ দিয়েছেন মিস মারসিডিজ ম্যাককেমব্রিজ। অবশ্যই ইনি অরসন ওয়েলস এর লেডি ম্যাকবেথ। ওঁর নিজের ... ওঁর ... কণ্ঠ-বিকৃতিতে একে ... করে-ছিলো।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

রক্তকরবী

"রক্তকরবী" মঞ্চস্থ করছে শুনে যতটা বিস্ময় বোধ করেছিলুম, তার চেয়ে কম বিস্মিত হলুম না ফুড স্পেশালিটিজ রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক এই জটিল রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চ-উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে। জটিল বলছি এই কারণে যে, প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা বহুরূপী কর্তৃক এই নাটকের অবিস্মরণীয় প্রযোজনার আগে বা পরে, "রক্তকরবী" মঞ্চস্থ করবার শখ বা দুঃসাহস খুব কম নাট্য গোষ্ঠীরই হয়েছে—কোন অফিস ক্লাব তো দূর স্থান, কারণ বাজার-চলতি নাটক নিয়ে এঁদের অধিকাংশের অভিনয় প্রয়াস নিদারুণভাবেই সীমায়িত।

অবশ্য নেসলে রিক্রিয়েশন ক্লাব (বর্তমানে যার নামান্তর ঘটেছে) রবীন্দ্রনাথ ও বাদল সরকারের নাটক মঞ্চস্থ করে ইতিপূর্বেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের এবারকার প্রযোজনা "রক্তকরবী" সব দিক দিয়ে তাদের পূর্বখ্যাতি অতিক্রম করেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে যক্ষপুরীর পরিচয় পাওয়া যায়—যার রাজা থাকেন সকলকার দৃষ্টির বাইরে জালের আড়ালে, আর ভূগর্ভ থেকে সোনার তাল খুঁড়ে এনে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে যারা তারা থাকে প্রাণরসে বঞ্চিত মনুষ্যেতর জীবের মতন—একটি মাত্র ত্রিস্তর সেটের মাধ্যমে এক নজরে তার সুন্দর আভাস ফুটে ওঠে। সেই বদ্ধ পরিবেশে নন্দিনী আনে মুক্ত বায়ুর স্নিগ্ধতা। তার প্রাণোজ্জ্বল চঞ্চলতা

রাশু বসু

যক্ষপুরীর নিয়মের নিগড়ে ফাটল ধরায়। বন্দী রাজাকে সে জালের আড়াল থেকে টেনে বার করতে চায়। শেষ পর্যন্ত করেও। রবীন্দ্রনাথের নিজের

[illegible] : "[illegible] এলো পড়লো [illegible] উপর [illegible] আঘাত করতে লাগলো [illegible] বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারী-শক্তির প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগার ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে অব্যাহত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো"—তাই নিয়ে "রক্তকরবী" নাটক।

কুশীলবদের অভিনয়কুশলতার ওপর এই ধরনের নাটকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেদিক দিয়েও ফুড স্পেশালিটিজ রিক্রিয়েশন ক্লাব আশাতীত নৈপুণ্য দেখিয়েছে। আরো প্রশংসার কথা—বাইরে থেকে ভাড়া-করা আর্টিস্ট আমদানি না করে অফিসকর্মী ও তাঁদের স্বজনবর্গের দ্বারায় এরা নিজেদের চাহিদা মিটিয়েছে। অফিস ক্লাবের নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি অনুকরণীয় ব্যতিক্রম।

সব চেয়ে চমক দিয়েছে নন্দিনীর মত বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রে পাদপ্রদীপের আলোকে সম্পূর্ণ নবাগতা এক কিশোরীর অভিনয়। বয়সে টীন-এজার হলেও রাণু বসুর নন্দিনী প্রাণরসের স্বতস্ফূর্ততায় সমৃদ্ধ। উন্নতির অবকাশ অবশ্যই আছে, বিশেষ করে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে। তবুও বলতে বাধা নেই, এই কিশোরী অভিনেত্রীর প্রথম অভিনয়েই যে প্রতিশ্রুতির আভাস মিলেছে তা-সচরাচর দেখা যায় না।

জালের ভিতরকার রাজার হয়ে যিনি কণ্ঠদান করেছেন তাঁর সংলাপ সর্বত্র শ্রুতিগোচর হয় নি—সম্ভবত প্রক্ষেপণ যন্ত্রের বিফলতায়। যেখানে শোনা গেছে সে সব জায়গায় নেপথ্যশিল্পীর ভাষণে বন্দী রাজার দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

পাগলবেশী বিশুর ভূমিকায় তরুণ তপন মিত্র গানে ও অভিনয়ে সকলকে মাতিয়ে দিয়েছেন। নিমাই বসুর সর্দার, অশোক দে'র গোঁসাই, প্রণব চট্টোপাধ্যায়-এর ফাগুলাল এবং অঞ্জনা সেনগুপ্তের চন্দ্রা পার্শ্ব চরিত্রগুলির উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ। শিল্পীদের দলগত নৈপুণ্যও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

ক্লাবের কর্ণধার ও সভাপতি নিমাই বসু নিজে একজন দক্ষ অভিনেতা ও পরিচালক। "রক্তকরবী"র প্রযোজনা ও পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার নির্দর্শন সর্বস্তরে সুপরিস্ফুট—মঞ্চ পরিকল্পনা (সুরেন চক্রবর্তী) ও আলোকসম্পাত (কণিষ্ক সেন) থেকে আরম্ভ করে, সঙ্গীত (তুষার ভঞ্জ), নৃত্য (আদিত্য মিত্র), আবহ রচনা (দীনেশ চন্দ্র) সকল বিভাগেই একটি সুসংবদ্ধ ছন্দোময়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত।

অফিস ক্লাবগুলির নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে ফুড স্পেশালিটিজের 'রক্তকরবী'র সামগ্রিক শিল্প-সৌন্দর্য অবশ্যই একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

[illegible]

জীবন চরিত

কোনও ব্যক্তি বিশেষের জীবনচরিত নয়, হয়তো বা কোন বিশেষ শ্রেণীর জীবন চরিত। অথবা আরও একটু এগিয়ে বলা যায়, আবহমানকালের মানুষের জীবনচরিত। জীবন কোন ছকে বাঁধা নিয়মে চলে না, কিন্তু নাটক ছকে বাঁধা নিয়মে বাঁধা হয়। নাট্যকার নির্দেশক অচিন্ত্য এই জীবন চরিত সাজাতে গিয়ে অনেক কিছু এনেছেন, যা শুধু নিয়মানুগ নয়, অনেক পরিচিত নাটকের ছায়াপাতও বটে। তার উপর সহজ সরল খেটেখাওয়া মানুষের জীবন চরিত, জীবন সংগ্রাম বোঝাতে অনেক প্রতীক, অনেক জটিল প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তাই শেষ পর্বে মাইম একাদেমির বিদগ্ধ দর্শকও বিচলিত হন, সূত্র সন্ধানে অপারগ হয়ে। সারাক্ষণ কথা বলে, যদি গল্প না বোঝানো যায় তখন অধিকন্তু মারপ্যাঁচ কাহিনীকে আরও ঘোরালো করে তোলে।

রুদ্রাক্ষ নিবেদিত জীবনচরিত প্রযোজনার মূল সমস্যা নাটক নিয়ে, অথচ এই স্বল্প পরিচিত সংস্থার কয়েকজন শিল্পীর অভিনয় বিস্ময়কর। প্রথমেই ধরা যাক ম্যানেজারের ভূমিকায় সমর দাশের কথা। একটি অবিশ্বাস্য চরিত্রকেও তিনি বিশ্বাস্য করে তোলেন তাঁর অভিনয় দক্ষতায়। চরিত্রের গঠনই এমন, যে কোন সময় কমিক হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কখনই সমর দাশ ম্যানেজারকে কমিক রিলিফ হতে দেন নি। ভোলার ভূমিকায় অচিন্ত্যের স্বাভাবিক অভিনয়ও যথেষ্ট সমাদর পাবে। অন্যান্য ভূমিকায় নিশীথ কাঞ্জিলাল, কানু দত্ত, সৌমেন শূর প্রত্যেকেই দক্ষ অভিনেতা। শিবাজী দাশগুপ্তের সফিস্টিকেশন অনেক সময় চরিত্র চিত্রণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চিন্ময় কুশারী, বিশ্বজিৎ মিত্র দুজনের ভিলেন যথেষ্ট সংযত কিন্তু রঞ্জন ব্যানারজির নয়। তুলনায় মহিলা শিল্পী মঞ্জু দাশ ও নন্দিনী রায় অনেক দুর্বল। আশা রাখি এত সম্ভাবনাময় শিল্পীগোষ্ঠী কোন ভাল নাটক প্রযোজনা করে নিজেদের আসন স্থায়ী করবেন।

একালে যাঁদের নিয়ে নাটক করা হয় তাঁদের দেখানো হয় না সার্কাসের শিল্পীর মনের আনন্দবেদনার পিছনে অবহ [illegible] যদি [illegible] নিতি নৃত্যে' অথবা নজরুলের 'পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা বাজানো হয় বা গাওয়া হয় তার রস গ্রহণ করতে পারে ইনটেলেকচুয়াল সমাজ অর্থাৎ সমস্ত পরিকল্পনার ভঙ্গিটাটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যাঁদের জীবনচরিত নিয়ে নাটক তাঁরা অস্পর্শ্যই থেকে যায়। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় রুদ্রাক্ষ একটি পরিশ্রমী এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গোষ্ঠী যাঁরা বয়সে নবীন হলেও কাজ করেন প্রাজ্ঞজনের মত।

চলছে চলবে

নতুন সরকার একটি বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়েছেন। এ পর্যন্ত যাঁদের সম্পর্কে সরকারীভাবে কোনদিন চিন্তা করা হয়নি, সেই গ্রুপ থিয়েটারগুলির সহায়তায় সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্ধ্র তামিলনাড়ুর দুর্গতদের সাহায্যার্থে একটি বিরাট নাট্যসম্মেলন হয়ে গেল। বাংলা নাটক লোকরঞ্জন উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর সহায়তায় এই নাট্যানুষ্ঠানে কলকাতার প্রায় সব কটি দলই উপস্থিত। যদিও অনেকে তালিকাভুক্ত হননি, কারণ নাট্য সম্মেলন যদি তিন মাস ধরে চালানো যেত তবে হয়তো সকলের স্থানসংকুলান হত। কোন সময়েই প্রত্যেকের সন্তুষ্টি সম্ভব নয়। তবুও অনেকের অন্তর্ভুক্তি যেমন বিস্মিত করে তেমনি সমগোত্রীয় অনেক বেশী নাট্যশিল্পে নিবেদিত কিছু সংস্থার অনুপস্থিতি, সামান্য বিভ্রান্তি আনে। এই নাট্য সম্মেলনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সকলকে একই লক্ষ্যে সমবেত করা। এই সম্মেলন যদি সর্বতোভাবে আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা করে তবে এই সম্মেলন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কোন রকম স্বজনপোষণ নীতি নয়, দলমতনির্বিশেষে সকলকে সমবেত করা দরকার, শুধু কলকাতা নয়, মফঃস্বলের নাট্য প্রযোজনার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। এই সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধিত হল, শোনা যাচ্ছে একপক্ষকাল ধরে 'শিশির মঞ্চে' বিভিন্ন সংস্থা যে সুযোগ পেয়েছেন, ভবিষ্যতেও সেই সুযোগ পাবেন।

এই সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ব্যবসার জন্য কোনভাবেই তারকা সমন্বয় ঘটান নি। অনেক

সাংস্কৃতিক সম্মেলনেই দেখা যায়, এক দিন জনপ্রিয় ফিলমের শিল্পীদের নিয়ে, নাটক নামানো হয়, যেখানে প্রযোজনার প্রতি কোন নিষ্ঠা থাকে না, অভিনয়ের প্রতি থাকে না বিশ্বস্ততা। এই সম্মেলনে তাঁদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন কেউবা পঁচিশ বছর ধরে কেউবা এক বছর দুই বছর ধরে। বয়স নয়, নিষ্ঠাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। মাঝে মাঝে নাটকের আগে বক্তব্য রেখেছেন নাট্যকর্মীরা (যদিও অনেক সময় সঠিকভাবে বিজ্ঞাপিত হয়নি) নাটকের আগে বক্তৃতা হয়তো লোকরঞ্জনী নয়, কিন্তু এই ধরনের সম্মেলনে সেটা আবশ্যিক, উদ্যোক্তারা সাহসের সঙ্গে এই পরিকল্পনা যুক্ত করেছেন।

এই নাট্য সম্মেলনের সঙ্গে তথ্য কেন্দ্রে 'কলকাতার নাট্য দলের কর্মকাণ্ড' নামে একটি প্রদর্শনী হয়েছে। সুন্দর ভাবে সাজানো, এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য, প্রযোজনাসূচী, ছবি ও মডেল সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রদর্শনী বিষয়ে মনে হয়, কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং দলগুলি নিজেদের কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় কোন পরিকল্পনা সম্ভবত এই প্রদর্শনীর পিছনে ছিল না, তাই প্রদর্শনীটি সুন্দরভাবে সাজানো বড়দরের বিজ্ঞাপন হয়েই রইল, ইতিহাস হয়ে সাধারণ লোকের সামনে তুলে ধরা গেল না, কি প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে, কত ধাপ পার হয়ে আজকের গ্রুপ থিয়েটারের কর্মকাণ্ড!

১৯ জানুয়ারি বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর জানা গেল, বিজন ভট্টাচার্য আধুনিক থিয়েটারের জনক ছিলেন। এই প্রদর্শনীতে বিজন ভট্টাচার্যের কোন উল্লেখ ছিল না (গন্ধর্ব পত্রিকার একটি প্রচ্ছদ ছাড়া) ক্যালকাটা থিয়েটার ও কব কুণ্ডলের প্রযোজনা অভিনয় সূচিতে ছিল না, প্রদর্শনীতেও তাঁদের কর্মসূচি ছিল না, সুতরাং কেউ দায়িত্ব বোধ করেননি বিজন ভট্টাচার্যের মূল্যায়নের। বহুরূপী প্রযোজনার ছবির মধ্যে অবশ্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বা গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ পূর্বসূরীদের ছবি আছে। প্রবেশ পথে শহীদ প্রবীর দত্তের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক নাটকের জন্য চরমতম কষ্টের মধ্যে যাঁর জীবন ফুরিয়ে গেল সেই মহম্মদ ইজরাইলের কথা বহুরূপী বা রূপকার কেউ স্মরণ করেননি। উল্লেখ নেই তুলসী লাহিড়ীর এবং অনেকের যাঁদের স্মরণ করে নিজেরাই গর্ব বোধ করতে পারতাম। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেননি শৌভনিক। অথচ আধুনিক থিয়েটারের প্রাথমিক পর্বে শৌভনিক গণ-রঙ্গমহল অনুষ্ঠান অথবা মুক্তাগন মঞ্চ, কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। উল্লেখ নেই লিটল থিয়েটার গ্রুপের। কে অস্বীকার করবে মিনার্ভার সেই কল্লোলিত দিনগুলি? উল্লেখ নেই প্রসেনিয়াম ভেঙে বাদল সরকারের আঙ্গন মঞ্চের। থিয়েটার সেণ্টার তাঁদের কর্মসূচিতে জানান, ১৯৫৮ সালে তাঁদের নাট্যোৎসবে বহুরূপী, পি এল টি শচীন লস্করের অংশ গ্রহণের কথা। যদি উৎপল দত্ত পরিচালিত পি এল টির কথা বলা হয়ে থাকে, তবে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, ১৯৫৮ সালে পি এল টির জন্ম হয়নি, তখন ছিল লিটল থিয়েটার গ্রুপ। নিজেদের ইতিহাস আজ নিজেরাই ভুলে যাচ্ছি। 'নবান্ন' বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বিশেষ ধরনের নাটকের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেই বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটার বিস্মৃত।

সকলেই সমাজ সচেতন নাটকের কথা বলেছেন, কিন্তু কোন্ সমাজ? কে কোথায় অভিনয় করেছেন তার সুবৃহৎ তালিকা আছে এমনকি বিদেশেরও, কিন্তু কোন্ গ্রামে, বা কৃষক সম্মেলনে নাটক পৌঁছে দেওয়ার খবর নেই। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র সদনের উৎফুল্ল দর্শকের ছবি আছে, কিন্তু কৃষক সম্মেলন বা নির্বাচনী সভায় (যা অনেকেই পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে করেছেন) বিস্ফারিত হাজার হাজার মানুষের ছবি নেই। অনেকের বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম দূরদর্শনের উল্লেখ। বেতারেও অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার কোন উল্লেখ নেই। আসলে দূরদর্শন ইদানীং গ্ল্যামারের মাধ্যম বেতার সেকেলে হয়ে গেছে।

প্রত্যেকেই ঘোষণা করেছেন গণতান্ত্রিক সোপানের কথা। কিন্তু অনেকের শো কার্ডে দলের শিল্পীদের নাম নেই। আলোকশিল্পীর নাম থাকলেও, সহকারীদের নেই। ধ্বনি নিয়ন্ত্রকের নাম কয়েক জায়গায় উল্লেখিত। সঙ্গীত পরিচালকের নাম থাকলেও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের নাম কোথাও নেই। (যেখান থেকে শুরু সেই 'নবান্ন' নাটকে কিন্তু আবহ-শিল্পীদের নাম ছিল) অবশ্য সাম্প্রতিক কালের কোন কোন নির্দেশক ভাবেন, পরিচালকই সব, অন্য সকলের সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে ফেলা মানে মুড়ি মিছরির একদর হয়ে যাওয়া। সাধু সংকল্প। তবে কথায় আর কাজে এই ভণ্ডামী আর সহ্য হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখলাম সাম্প্রতিকতম প্রযোজনার উল্লেখ নেই, আবার অনেকে এমন প্রযোজনার ছবি দিয়েছেন, যা তাঁদের দল করেননি।

বেশ কিছুদিন আগে পর পর কয়েকটি নাটকের প্রদর্শনী হয়ে গেছে। সেখানে সাজানো ভাল হয়নি, কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী আয়োজক ছিলেন। একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রদর্শনীতে পুরোনো দিনের গান বাজতে দেখেছি, যা অন্য পরিবেশ রচনা করেছিল, এখানেও সে রকম করা যেত। কিন্তু হয়নি কারণ, কেন্দ্রীয়ভাবে কেউ চিন্তাই করেননি বিচ্ছিন্নভাবে দলগুলি প্রদর্শনী খুব ভালভাবে সাজিয়ে গেছে। সকলে মিলে করেছেন তাই আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত ছিল, একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি পত্রিকা বা একটি শিল্পায়তন আয়োজিত প্রদর্শনীতেও যেমন ঐকান্তিকতা থাকে সর্বাঙ্গীন প্রকাশের জন্য এখানে তা হয় নি। অধিক সন্ন্যাসী সর্বপেক্ষা স্বাগত কিন্তু গাজন নষ্ট হলেই ক্ষোভ

জানি না এই সব ত্রুটি পরবর্তী কালে সংশোধিত হবে কিনা, অথবা ত্রুটির জন্য উদ্যোক্তারা লজ্জা বোধ করবেন কিনা, যদি লজ্জা বোধ না করেন তবে আমরা বিষন্ন বোধ করব, কারণ তাঁদের উপর আমরা অনেক আশা রেখেছিলাম, এবং এখনও তাঁদের উপরেই আশা রাখি নতুন থিয়েটারের জন্য।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

হরলিক্‌স

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যে আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সদ্গুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

''হরলিক্‌স পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

আমূল—
আপনার দুধ ওয়ালা

আমূল—
আপনার চা ওয়ালা
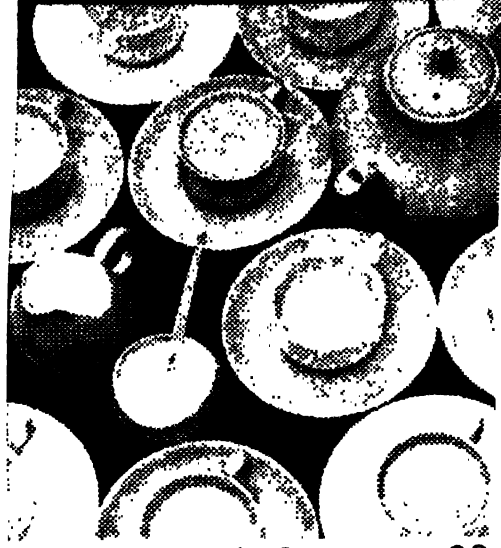
½ লিটার মাপের গেলাসে উঁচু উঁচু ২½ বড় চামচ আমূল মিল্ক পাউডার চালুন। একটুখানি অল্প-গরম জল মিশিয়ে লেইয়ের মত করুন। গরম জলে গেলাস ভরে নিয়ে নেড়ে নিন। আপনার বাচ্চার দুধের গেলাস তৈরী। (বিস্তারিত নির্দেশের জন্যে টিন দেখুন)। আমূল মিল্ক পাউডার চা আর কফির জন্যেও আদর্শ !

আমূল—
আপনার দই ওয়ালা

ওপরের পদ্ধতিতে দুধ তৈরী করুন। তারপর যেমন টাটকা দুধের দই বসান, তেমনি করে এই দুধ দিয়ে দই পাতুন
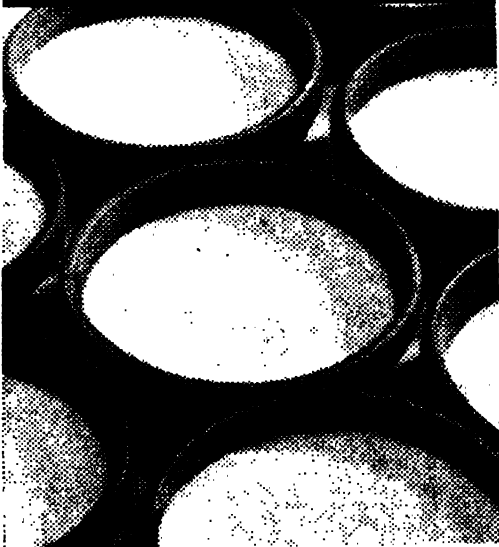
আমূল
মিল্ক পাউডার
ঘরে সবসময়ে দুধের ভাণ্ডার

RADEUS/AMP-1

"সুলভ সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী"

তৃতীয় খণ্ড
প্রকাশিত হলো।
গ্রাহকগণকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে অবিলম্বে তাঁদের প্রাপ্য খণ্ড সংগ্রহ করুন। নতুবা আমাদের পক্ষে বহুদিন ধরে বই রাখা সম্ভব নয়।
নিম্নলিখিত কাউণ্টার থেকে রচনাবলী সংগ্রহের সময় ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬॥ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।

কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

রাজস্থান-কাহিনী

লেখকের সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের রাজপুতানার মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ফলশ্রুতি এই মূল্যবান গ্রন্থটি। নিছক ঐতিহাসিক তথ্যে বইটিকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। রাজস্থানের তথ্য বাদশাহী আমলের বহু সরস তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরিবেশন করিয়া বইটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। সুদীর্ঘ প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বই। মূল্য—১৬৲

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস
(বোর্ড বাঁধাই)
নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ৩৫৲

●

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
বিখ্যাত ইতিহাসাশ্রয়ী সামাজিক উপন্যাস

অস্তি ভাগীরথী তীরে ২০৲

নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

●

নলিনীকান্ত সরকারের
সেই বিখ্যাত বই
শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মহান জীবনালেখ্য

দাদাঠাকুর

নতুন তথ্য সংযোজিত হয়ে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হলো। মূল্য—বারো টাকা

একালের অন্যতম সাহিত্যিক
আব্দুল জব্বারের
সেই অসামান্য বই

বাংলার চালচিত্র ২০৲

নতুন তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো।

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ

(বোর্ড বাঁধাই)
নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি

দ্বাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ২৮৲

ক্যালকাটা বুক ফেয়ার

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত Calcutta Book Fair-এ এক বিরাট বই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলায় আমাদের প্রকাশিত সমস্ত বই প্রত্যেকটি ক্রেতাকে শতকরা দশ টাকা (১০%) কমিশনে দেওয়া হবে।

প্রকাশিত হয়েছে।
প্রমথনাথ বিশীর

কাব্য গ্রন্থাবলী

চতুর্থ খণ্ড ১০৲

পূর্ববর্তী তিনটি খণ্ডের
মূল্য ৩৩৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

চিঠিপত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ধারণা

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে অনন্ত ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ধারণা' শীর্ষক পত্রটি পড়লাম—এই পত্রিকার ৪।২।১৯৭৮ তারিখের সংখ্যায়। 'নীলচাষীদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা' প্রসঙ্গে স্বয়ং রামমোহনের উক্তি, এই সূত্রে পত্রলেখককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই :

"I am positively of opinion that upon the whole the indigo planters have done more essential good to the natives of Bengal than any other class of persons. This is a fact which I will not hesitate to affirm whenever I am questioned on the subject either in India or in Europe".

(রামমোহন রচনাবলী : হরফ প্রকাশনী : ভূমিকা—পৃঃ পঁচিশ)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজের তাঁবেদারি প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই পত্রলেখক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দেখা যাক ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে রামমোহনের মনোভাব কি ছিল :

"Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants ..."

(ঐ : পৃষ্ঠা ৪৪৯)।

পত্রলেখক যে রাজনৈতিক তথা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রে উনিশ শতকের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন—তথাকথিত সেই প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মুখর প্রবক্তারা বিংশশতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিন্তু ইংরেজ শক্তির নির্লজ্জ তাঁবেদারি করেছিলেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে জয়ন্তবাবুদের কলমের কালি আজো শুকিয়ে যায় কেন?

উনিশ শতকের কিছু খ্যাতনামা বাঙালীদের সম্পর্কে অশালীন ও তাচ্ছিল্যকর শব্দপ্রয়োগ করার (যেন, শোভন ভাষা প্রয়োগ করলে সমালোচনার মান নিম্নগামী হয়) নির্বিচার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ইদানীং; সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতকের কিছু ঐতিহাসিক ও সর্বজ্ঞ প্রগতিবাদী রাজনীতিবিদদের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে নীরব থাকার নাম কি অসাম্প্রদায়িকতা? না কি ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিচার?

বাণীব্রত সেন
কলকাতা-২৫

যোগেশচন্দ্র ঘোষ

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' নামক প্রবন্ধে আমার শ্বশুরমহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষের ছবি সহ তাঁর উল্লেখ করার জন্য লেখক শ্রীরায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাবা (যোগেশচন্দ্র ঘোষ) মারা যাওয়ার পর আমরা বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করি এবং যৌথ পরিবারের যত্নের অভাবে তাঁর বহু লেখা নষ্ট হয়। ভাণ্ডারকর সাহেব ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের কাছেও তিনি কিছু পাণ্ডুলিপি রেখেছিলেন বলে তাঁর মুখে শুনেছিলাম; কিন্তু কোনোভাবেই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা আজও সম্ভব হয়নি।

আমার পুত্র শ্রীমান অভিজিৎ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করে সামান্য কিছু প্রকাশিত লেখা উদ্ধার করতে পারলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনার অধিকাংশই আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বাবার লেখা পাণ্ডুলিপি বা পত্র-পত্রিকার কপি থাকে এবং তিনি বা তাঁরা রচনাগুলির অনুলিপি সংগ্রহ করতে দেন, তবে আমরা এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য সপরিবারে কৃতজ্ঞ থাকবো। যোগাযোগ : কনকলতা ঘোষ, ২১/১, গড়িয়াহাট রোড (পশ্চিম) কলিকাতা—৬৮।

কনকলতা ঘোষ
কলকাতা-৬৮

পরিমল নয়, হেমেন্দ্রকুমার

দেশ পত্রিকায় (১১-২-৭৮) শান্তিদালঙ্কর দাশগুপ্ত এক রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ক কবিতা পাঠ ও ও তজ্জনিত কারণে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রতিক্রিয়ার কথা তুলেছেন। পত্রটি পড়লে মনে হয়, শিশিরকুমার তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া পরিমল গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। কিছুদিন আগে সুজিতকুমার সেনগুপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর কাছেই শিশিরকুমার তাঁর ঐ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। মূলত তথ্য বা, তাহলো এই—আমাদের বন্ধু কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে এতটা বিচলিত করেছিল যে, তিনি একটি সুদীর্ঘ শোক কবিতা রচনা না করে পারেননি। রামমোহন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন তাঁর অতুলনীয় উদাত্তকণ্ঠে সেই কবিতায় সদ্যস্বর্গত কবির প্রতি নিজের প্রাণের আকুতি নিবেদন করলেন, তখন সভাস্থ সকলেরই চোখ অশ্রুজলে ভিজে উঠেছিল। সভাভঙ্গের পর শিশিরকুমার বাইরে এসে দাঁড়ালেন এবং তারপর পথ দিয়ে ধাবমান একখানা মোটরগাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভাবাভিভূতস্বরে বললেন, দেখ হেমেন্দ্র আমি এখনি ঐ মোটরের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে পারি। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কি শিশির, কোন দুঃখে?

শিশিরকুমার বললেন, দুঃখে নয় ভাই, আনন্দের আতিশয্যে।

আমি অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললুম, আনন্দের আতিশয্যে আত্মহত্যা?

গদগদকণ্ঠে উত্তর হল, হ্যাঁ, ঠিক

[illegible] আমার মৃত্যু হলেও এইরকম একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করবেন, তাহলে সেই আনন্দে মোটরের তলায় পড়ে আমার আত্মহত্যা করতেও আপত্তি নেই।'

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শিশিরকুমারের আবির্ভাব ও কবিমানস' নামক নিবন্ধ থেকে তথ্যটি উদ্ধার করে দিলাম। নিবন্ধটি যুগান্তর পত্রিকায় (১৯শে আষাঢ় ১৩৬৬) প্রকাশিত হয়েছিল।

সমর রায় কলকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ ঃ শিবমন্দির

গত ৭ই মাঘ, ১৩৮৪ 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' শীর্ষক রচনায় 'চারি ভ্রাতার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির' বলে যে মন্দিরটির আলোকচিত্র চিহ্নিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমার একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার উত্তর-দিক)-সংলগ্ন ঐ 'পঞ্চরত্ন' রীতির মন্দিরটি বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ মন্দিরে নিজের নামে শিব প্রতিষ্ঠা করে শিবলিঙ্গের নাম দেন 'যাদবেশ'। ঐ পঞ্চরত্ন মন্দিরটির উত্তর দিকের দেওয়ালের কিছু ওপরে মার্বেল পাথরে খোদিত লিপিটি শ্রীরায়ের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি। সারি অনুসারে লিপিটি যেমন আছে ঠিক তেমনিই

[illegible]
বেদ বসবঙ্ক ভূমানে—
শাকে সংস্থাপিতো—
শিবঃ ॥ সমন্দিরো যাদবেশ
নাম্না যাদবশর্ম্মণা।"

লিপির প্রথম লাইনে প্রহেলিকার মাধ্যমে শকাব্দ উল্লেখিত হয়েছে, যদিও এটি স্পষ্ট নয়। বেদ=৪, বসু=৮, অংক=৯ 'ভূমানে' শব্দটির অর্থ ঠিক বোধগম্য হল না। 'শাকে' এই শব্দটির দ্বারা স্পষ্ট শকাব্দের কথা বলা হয়েছে। ঐ লাইনটির (অর্থাৎ শকাব্দের অর্থ) অর্থ বাদে লিপির অবশিষ্ট অংশের অর্থ এইরূপ—'যাদবশর্মা যাদবেশ নামে শিবকে মন্দিরসহ সংস্থাপিত করলেন।' এখানে 'যাদব শর্মা' নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'যাদবেশ' তাঁর নামাঙ্কিত শিব, যে শিবলিঙ্গটি বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। 'অঙ্ক' শব্দটিকে যদি ৭ ধরা যায় এবং 'ভূমানে' শব্দটির অর্থ যদি ১ করা যায় (যদিও কষ্টকল্পনা হয়), তাহলে 'অঙ্কের বাম দিকে গতি' এই নিয়ম অনুসারে ১৭৮৪ শকাব্দ বা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাকাল নিঃসংশয়ে বলা যায় না। যাদবচন্দ্র সে সময় জীবিত ছিলেন এবং তাঁর বয়স তখন প্রায় ৭০-এর মতো। উক্ত লিপির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ মন্দিরটি 'চারি ভ্রাতা'র প্রতিষ্ঠিত

[illegible]

[illegible] রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকে রাধাবল্লভজীউর বৃহৎ 'পাল.ন' মন্দিরটিও বলবন্ত ১৭৭২ শকাব্দ বা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাবল্লভের দালানের পাশে একটি চণ্ডীমণ্ডপ বা দুর্গাদালান এবং রাস্তার ওপর একটি 'আটচালা' রীতির শিব-মন্দিরও বর্তমান। 'দুর্গাদালান' ও 'আটচালা' মন্দিরটি কার তৈরি তা অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় উক্ত 'আটচালা' শিবমন্দিরটি রাধাবল্লভের মন্দির নির্মিত হবার কিছু আগে বা পরে তৈরি হয়েছিল।

প্রণব রায়
চুঁচুড়া, হুগলি

মুকুন্দ দাস

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্রের জাতীয় জাগরণের প্রগতা মুকুন্দ দাস রচনাটি পড়ে সুদীর্ঘ দিনের এক স্মৃতিতে মনটা ভরে উঠেছে।

আমি তখন বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। সনটা ইংরেজী ১৯২১। আমার পাশের গ্রাম ফুলবাড়িতে (টাঙ্গাইল মহকুমার মির্জাপুর থানা, বর্তমানে বাংলাদেশ) মুকুন্দ দাস এলেন। তাঁকে দেখবার জন্যে দূর-দূরান্তর থেকে বহু লোকের সমাবেশ হলো। সেদিনের সে কী উন্মাদনা! কী পালটা হলো মনে নেই।

মুকুন্দ দাস যখন গান ধরলেন—

"ভেঙো না, ঘর ভেঙো না
করি মিনতি
বাংলাদেশের কাঙাল
সন্ততি"

—তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠ—তাঁর সেই বীর্য্যবান অঙ্গসৌষ্ঠব যেন কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখলো। দীর্ঘদিন রোমন্থন করে আনন্দ পাই।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সারা মহকুমাটা জুড়ে। মুকুন্দ দাস চারণ কবি। তাঁহার সংগীত তখন ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে। তাঁহার 'মাতৃপূজায়' 'ব্রহ্মচারিণীর গানে'—এক অনাস্বাদিত দেশ মাতৃকার বন্দনা চলছে।

সময়টা ছিল আশ্বিনের শেষ' হঠাৎ শোনা গেল সাহাবাবুদের বৈঠকখানায় দারোগা পুলিস এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ধড়পাকড় আরম্ভ হলো, গানের আসর ভেঙে গেল। সে রাতে মুকুন্দ দাসকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

এই ঘটনার ৫-৬ বৎসর পর ঢাকাতে চারণ কবির রচিত কয়েকটি পালা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময়ে মুকুন্দ দাসের পরিবর্তে তাঁহার ভগিনের গানগুলি গাইতেন।

'জাগো গো জাগো গো জননী' 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' প্রভৃতি গানগুলি দেশটাকে জাতীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে বহু সাহায্য করেছে।

বাংলার মুকুন্দ দাস—জাতীয় সম্পদ। তাঁহার সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া দরকার।

সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী
বাড়বিল, উড়িষ্যা।

॥ ২ ॥

মুকুন্দ দাসের গানের বাণী নিয়ে দু-একটি কথা লিখে জানাচ্ছি। মুকুন্দ দাসের গান আমরা ছেলেবেলায় (সাত-আট বছর বয়সে) মুখস্থ করে ফেলে ছিলাম। আজকাল এ গানের পরিবর্তন লক্ষ করে দুঃখিত হয়েছি। 'স্বদেশ স্বদেশ' গানটির কয়েকটি পংক্তি তুলে দিচ্ছি। গেণ্ডারিয়াতে দীননাথ সেনের বাড়িতে এ গান আমরা মুকুন্দ দাসের কাছ থেকেই শিখেছিলাম। বোধ হয় ১৯১৮-১৯।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়।
এ যমুনা গঙ্গা নদী
তোদেরি হায় হত যদি
পরের জন্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন বয়॥
গোলকোণ্ডার সোনার খনি
বর্মা ভরা চুনী মণি
সাগর ছেঁচে মুক্তো বেছে
পরের কেন হয়॥"

আরো আট পংক্তি ছিল, এখন আর মনে করতে পারছিনে।

কিছুকাল পূর্বে রেডিয়োতে মুকুন্দ দাসের গান শুনে স্তম্ভিত হয়েছি। ভুল বাণী ও সুর এবং স্টাইল শুনে মনে হল যেন আধুনিক গান শুনছি। গানটি হল—

"এখনো খোলেনি আঁখি যাঁর—
আমি কি দিয়ে বোঝাব তাঁরে
কোন কর্ম সাধিবারে—
জনম লভিনু কোলে
ভারতমাতার।"

গানটি গাইবার সময় মুকুন্দ দাসের সারা দেহ কেঁপে উঠতে; গানের লয় ছিল দ্রুত। যখন ইনি গাইতেন—

"BA MA পাস করে
নকড়ি যদি নাহি মেলে
ভাবনা কেন? কিসের ভয়?
মিশে যানা চাষার দলে—
ক্ষেতে পরে খামার কর
শক্ত করে লাঙ্গল ধর—
দেখতে পাবি দুদিন বাদে
ঘুচে গেছে হাহাকার।"

তখন সারা প্রাঙ্গণ কেঁপে উঠতো—এ গান ষাট-বাষট্টি বছর আগে শোনা কিন্তু মনের অন্তরে ছবির মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানের বইতেও কিছু ভুল ও কিছু Interpolation আছে। একটি নির্ভুল গানের সংকলন করতে পারলে ভালো হত।

সমর চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা

থিয়েটার '৭৭

সম্প্রতি দেবাশিস দাশগুপ্তের 'থিয়েটার ১৯৭৭' (দেশ ২৮ জানুয়ারি) পড়লাম, ভাসা-ভাসা দায়সারাগোছের রচনাটিতে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাৎক্ষণিক সাংবাদিকতার ক্ষিপ্রতা আছে, অনুসন্ধানের গভীরতা নেই।

'একালের হাল আমলের বাংলা নাটক নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক।' শ্রীদাশগুপ্তের এই মন্তব্যে শুধু তাঁর কলকাতা-কেন্দ্রিকতাই প্রকাশ পায়। 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক থাকেন কলকাতার বাইরে

সুতরাং তাঁরা সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারেন যে সেই পত্রিকার নিয়মিত সমালোচকেরা কলকাতার বাইরেও একটু দৃষ্টিপাত করবেন। যে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে 'দেশ' পত্রিকার মনোযোগ অনেকখানি, অল্প-স্বল্প প্রতিবেদনও ঈপ্সিত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, একদল তরুণ সংগ্রামী ও অনন্যমনা নাট্যকর্মী কলকাতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটি সৎ সুস্থ ও বলিষ্ঠ নাট্য আন্দোলনের ধারাকে মফস্বলে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মফস্বল বলতে কলকাতার কাছাকাছি ব্যান্ডেল চন্দননগর রিষড়া নৈহাটি কোন্নগর আন্দুল সরশুনো সোনারপুর শুধু নয়, দূরের শহর গঞ্জ যেমন—আসানসোল বাঁকুড়া জিরাগঞ্জ জলপাইগুড়ি বালুরঘাট দুর্গাপুর বসিরহাট খড়্গপুর চিত্তরঞ্জন, এমনি সব জায়গাও ধরতে হবে। ১৯৭৭ সালে এইসব মফস্বল অঞ্চলেও এমন অনেক প্রযোজনা হয়েছে যা কলকাতার মঞ্চে হলে হৈ-হৈ পড়ে যেত। শ্রীদাশগুপ্তের সালতামামিতে সেই সব প্রযোজনার সামান্য উল্লেখ কি থাকতে পারত না? নাম করলে পক্ষপাতিত্বের বিতর্কে জড়িয়ে পড়ব, নইলে আমি এমন কয়েকটি প্রযোজনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারতাম যা যে কোন বিচারে 'থিয়েটার ১৯৭৭'-এ উল্লেখিত হয়েছে এমন কয়েকটি প্রযোজনার তুলনায় অনেক উচ্চমানের।

এই শীতের মরসুমে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল

যোগিতা চলে তার যে কোন একটিতে যিনি উপস্থিত থেকেছেন তিনিই স্বীকার করবেন মফস্বলী পরিচালকদের যথেষ্ট যোগ্যতা ও কুশলতা আছে। এঁদের থিয়েটারে খালেদ চৌধুরি বা সুরেশ দত্তের মঞ্চস্থাপত্য নেই, তাপস সেনের আলো এদের চিন্তার অতীত, তবু পুরস্কারপ্রাপ্ত দলগুলির মঞ্চ ও আলো অবিশ্বাস্য রকমের কম খরচের উপকরণে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু আলোকসম্পাতে ও আবহ সৃষ্টিতে কোথাও কোন অ্যামেচারিস শিথিলতা চোখে পড়ে না। এই সব প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত থেকে কলকাতাশ্রয়ী অনেক নাট্যবোদ্ধা মফস্বলের নাট্যকর্মকাণ্ডের বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখে পরিচালকদের প্রয়োগনৈপুণ্য ও রসবোধের তারিফ করেছেন। এরা নিয়মিত শো করতে পায় না, বিজ্ঞাপন দেবার অর্থসামর্থ্য নেই; ফলে বৃহত্তর দর্শকমহলে তেমন পরিচিতি ও খ্যাতিও জোটেনি। কলকাতার কোন সাধারণ মানের একটি নতুন প্রযোজনা নিয়ে আপনাদের পত্রিকায় যত লেখালেখি হয়, মফস্বলের কোন দুর্ধর্ষ প্রযোজনার ভাগ্যে তার ছিটেফোঁটাও জোটে না।

মফস্বল শহরে অনেক নাট্যকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, যাদের অনেকেই কয়েকটি নাট্যবিষয়ক পত্রপত্রিকার দৌলতে অল্পবিস্তর প্রচারলাভ করেছেন। এঁদের নাটক পাণ্ডুলিপি আকারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অভিনীত হয়, পরে এইসব

পত্রিকায় ছাপা হয়। বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতার উদ্ভব বাংলার বাইরেও বহুদূর বিস্তৃত—কানপুর লখ্নৌ বোম্বাই দিল্লী পর্যন্ত। এইসব পত্রিকা থেকেই প্রবাসী বাঙালীরা নাটক বাছাই করেন, সুতরাং অনেক মফস্বলী নাট্যকারের নাম জানেন। এঁদের নিয়ে সংবাদপত্রে, এমন কী লিটল ম্যাগাজিনেও বিশেষ আলোচনা দেখি না। এই সব সতত নাট্যনিরত অথচ অনালোচিত নাট্যকারেরাই কলকাতার অপরিচিত পরিচালকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক ধরনের সংগ্রামী নাটকের উৎসাহী দর্শক তৈরি করেছেন। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকদের একটা বড় অংশ এই দর্শকসমাজের।

মফস্বলের নাট্যকর্মীদের জন্যে করুণা প্রার্থনা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। এত বড় একটা আন্দোলন যে আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে তাতেই দুঃখ বোধ করছি। রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা চালু করেছেন তাতেও মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটার উপেক্ষিত। শ্রীদাশগুপ্ত এদের প্রতি মনোযোগ দিলে, 'দেশ' পত্রিকায় এদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরলে, রবীন্দ্র সদন এদের কথাও ভাবতে বাধ্য হতেন। কলকাতার অভিজাত মঞ্চে মফস্বলের অখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার স্থান করে নিতে পারত বহু আলোচিত দলগুলির পাশে।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
হুগলি

কনস্টবলের ছবি

দেশ পত্রিকায় (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) জন কনস্টেবলের ছবি সম্পর্কে সন্দীপ সরকারের লেখা 'অসীম কালের যে হিল্লোলে' নামে আলোচনাটি পড়লাম। আলোচনাটি ছোট, তবে তার মধ্যে অসংগতির মোট পরিমাণটা খুব ছোট নয়। সেগুলোই একে একে উল্লেখ করছি।

সন্দীপবাবু লিখেছেন, 'কনস্টেবল কিন্তু বড় শিল্পী। পুসা থেকে দেলাক্রোয়া এবং পরবর্তীকালের ইম্প্রেসোনিস্টদের তিনি নাহলে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না।' Poussin শব্দটার সঠিক উচ্চারণ বাংলা বানানে লেখা কঠিন। তবে 'পুসা'র চাইতে বিশ্বস্ততর বানান বোধ হয় হতে পারত। কিন্তু এহ বাহ্য। সন্দীপবাবুর উল্লিখিত এই 'পুসা'র জীবনকাল হল ১৫৯৪—১৬৬৫। আর কনস্টেবল জন্মেছিলেন ১৭৭৬ সালে। সুতরাং কনস্টেবল কিভাবে পুসাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং এই উদ্বুদ্ধ করা ব্যাপারটা আধিভৌতিক না আধিদৈবিক সেইটে যদি সন্দীপবাবু একটুখানি খোলসা করে বলতেন তবে বড়ই বাধিত হতাম। আর দেলাক্রোয়া কনস্টেবলের থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও কনস্টেবল দেলাক্রোয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এমন কথা সন্দীপবাবু ছাড়া আর কাউকে বলতে শুনিনি। কনস্টেবল ও দেলাক্রোয়ার ছবির অ্যালবাম পাশাপাশি রেখে একটুখানি মিলিয়ে দেখলেই সন্দীপবাবুও মনে হয় কথাটা আর কখনও বলবেন না।

আরেক জায়গায় সন্দীপবাবু লিখেছেন, 'ইম্প্রেসোনিস্টরা ক্যামেরার প্রতিযোগী হয়েছিলেন যা কনস্টেবল-টার্নার হননি।' ক্যামেরার কারবার আলো নিয়ে, এবং ইম্প্রেসনিজম আন্দোলনটার শুরুও যে হয়েছিল ছবিতে ঠিকমতো আলো ফোটাবার সমস্যা নিয়ে সেটা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ইম্প্রেসনিস্টরা ক্যামেরার প্রতিযোগী ছিলেন এমন কথা বোধ হয় যিনি পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার গোড়ার কথাও জানেন তিনিও বলবেন না। বরং কনস্টেবলের ছবির সঙ্গেই ফটোগ্রাফের অনেক বেশী সাদৃশ্য। প্রকৃতিকে যথাযথভাবে এঁকেও তিনি যে ফটোগ্রাফকে বহু দূরে ফেলে যেতে পেরেছিলেন, এখানেই কনস্টেবলের অসাধারণত্ব।

সন্দীপবাবু কনস্টেবল ও ভ্যান গঘকে সম-মানসিকতার শিল্পী বলেছেন। কেন যে বলেছেন তার সমর্থনে তিনি একটাই 'যুক্তি' (?) দেখিয়েছেন, 'প্রকৃতির মধ্যে দুজনেই ভাঙাগড়ার নানা খেলা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সৃষ্টি লয়ের আবর্তন দেখতে পেয়েছেন।' এই বাক্যটির সঠিক অর্থ কিছুতেই বুঝলাম না। আবছাভাবে যেটুকু বুঝেছি সেটা ভ্যান গঘের সম্পর্কে খাটলেও কনস্টেবলের সম্পর্কে কোনোক্রমেই প্রযোজ্য নয়। বরঞ্চ, কনস্টেবলের সমকালীন শিল্পী টার্নারের সম্পর্কে সন্দীপবাবুর এই উক্তিটা চলতে পারে। আর কনস্টেবল ও ভ্যান গঘ দুজনেই প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন এবং পাদ্রী হতে গিয়েও হননি এইজন্যেই যদি সন্দীপবাবু তাঁদের এক ধরনের শিল্পী বলে মনে করেন তবে আমার কিছু বলার নেই। তাহলেও সন্দীপবাবুর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ভ্যান গঘের চাইতে সেজানের সঙ্গে কনস্টেবলের অনেক বেশী মিল ছিল। কনস্টেবল ও সেজান দুজনেই বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। দুজনেই প্রকৃতির শান্ত স্থির রূপ নিয়ে ঘন রঙের চাপ ব্যবহার করে জোরালো গাঁথুনির ছবি আঁকতেন এবং ব্যক্তিগত কল্পনার উচ্ছ্বাসে ছবির মধ্যে কোনও ধোঁয়াটে ভাব (যেটা টার্নার, রেনোয়ের বা আমাদের দেশের অবনীন্দ্রনাথ, গোপাল ঘোষ প্রমুখ শিল্পীদের ল্যান্ডস্কেপে দেখা যায়) সৃষ্টি হতে দিতেন না। মৃত্তিকার সরসতা এবং উদ্ভিদজগতের সজীবতা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে দুজনেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত—ভ্যান গঘের ছবির শূন্যতা ও যন্ত্রণাময়তা তাঁদের ছবিতে অনুপস্থিত। দুজনের রঙের পছন্দেও মিল ছিল। দুজনেই সবুজ রঙ খুব বেশী ব্যবহার করতেন।

আরেক জায়গায় একটুখানি কবিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে সন্দীপবাবু আরেক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন। তিনি লিখেছেন, 'গাছপালা যখন নতুন পাতায় ফুলে সাজে, বরফের সাদা ওভারকোট খুলে যখন ধরিত্রী নগ্নিকা রূপ তুলে ধরে তখন কনস্টেবল তন্ময় হয়ে যান।' একই বাক্যের মধ্যে এক জায়গায় নতুন পাতা ফুলের সাজ, আর ঠিক তারপরেই ধরিত্রীর নগ্নিকা রূপ—ভাবের ঐক্য বটে।

অনির্বাণ রায়
কলকাতা-১৯

৩৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা
১০ ফাল্গুন ১৩৭৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অসিত ভট্টাচার্য'র প্রবন্ধ
ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের সমস্যা
প্রণব রায়ের প্রবন্ধ
কথাকলি
রাজলক্ষ্মী দেবীর গল্প
অনধিকৃত দুর্গ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

জাতির জীবনে নৈতিক সংকট

প্রাচীন ক্রীট সভ্যতার অবনতি ও অবলুপ্তির প্রধান কারণ কি কোন নিদারুণ প্রকা প্রাকৃতিক বিপর্যয়? অথবা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোর প্রত্যাঘাত? ইত্যাকার সব রকম প্রশ্ন বিচার করে ঐতিহাসিকেরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটা ভুল বলে প্রতিপন্ন হ মতো কোন নতুন তথ্য আজিও আবিষ্কৃত হয়নি। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাচীন ক্রীটের ও মিনোয়ান জাতির নৈতিক সততার বিপর্যয়ই তার অবলুপ্তির প্রধান কারণ। বৈষয়িক কৃতি উন্নতি, সাংস্কৃতিক জীবনে বিচিত্রতা ও রম্যতার চমৎকার প্রকাশ, অস্ত্রবল ও রণদক্ষতার শৌর্য অভ্যুদয়; সব থাকতেও জাতির জীবনের পক্ষে তার বিশিষ্ট রূপ নিয়ে সহজ ও স্থায়িত্ব চিরন্তন হয়ে যায় না। জাতীয় চরিত্রে নৈতিক সম্বলের দীনতা ও ক্ষীণতা হ প্রবলতম বৈরী, যার আঘাত প্রতিহত করবার মতো যোগ্যতা অন্য কোন সামাজিক অথবা বৈষয়ি শক্তির নেই। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক গবেষণার এই আবিষ্কার মহাত্মা গান্ধীর প্রচারি সমাজনীতির প্রধান বাণীর বাস্তব সত্যতার একটি বড় প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পা নৈতিক সততা মানবীয় কর্মজীবনের প্রধান নিয়ামক না হলে সুখ-সমৃদ্ধির কোন প্রযত্নের শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় না।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এই তথ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপল করবার বিশেষ প্রয়োজন ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে বলে মনে করা চ জাতীয় জীবনের শুধু রাজনীতিক ঘটনার নানাবিধ অদ্ভুত রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করে নয়, সংস্কৃতি শিক্ষা প্রশাসন বিচার অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সর্বত্র মাৎস্য ন্যা প্রকার নিয়ে যে স্বার্থময় ব্যস্ততার সমারোহ জাগ্রত হয়েছে, তারও উত্তেজনা ও ধূলিলিপ্ত লক্ষ্য করে সন্দেহ করতে হয় যে, জাতির জীবনে বুঝিবা সেই প্রাচীন ক্রীটের মিনোয়ান জীব অনুরূপ প্রবল নৈতিক সঙ্কটে অভিভূত একটা দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। রোম যখন আগু পুড়েছে নেরো তখন বীণা বাজিয়েছে, ইতিহাসের এই ঘটনাকে বাস্তব অবস্থার সত্যতা উপল করবার একটি নিরেট অক্ষমতার প্রতীক রূপ বলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই। প্রশ্ন করতে হ এতটা নিরেট ও নিদারুণ না হলেও আমাদের বর্তমান ভারতজীবনে অবস্থাগত সত্য উপল করবার বিচারশক্তি কি খুবই স্থূল ও প্রগল্‌ভ হয়ে যায়নি?

ইংরাজী ভাষাতে প্রবাদিত একটা বিজ্ঞতার বাক্য আছে : যুদ্ধ শুরু হলে প্রথম ঘায়েল হয়, সে হলো সত্য, অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা। তখন যে-কোন নিদারুণ মিথ্যা নেতা প্রবক্তাদেরই ভাষণে ও ঘোষণায় প্রতিনিয়ত প্রচারিত হতে থাকে। বিপক্ষের মর্যাদার বিনা ইচ্ছায় যে-কোন মিথ্যার লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয়, এবং আত্মপক্ষের গৌরব পরিস্ফীত করবার জ যে-কোন চমৎকার মিথ্যা প্রচারিত করা হয়। এইবার প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে এসে প্রশ্ন করতে হ রাজনীতিক ক্ষমতা অধিগত করবার ইচ্ছায় যে অতিমুখর প্রচার জাগ্রত করা হয়, সেটাও যুদ্ধাবস্থার অনুরূপ একটা উত্তেজক পরিবেশের মুখরতা নয়? এই প্রচারযুদ্ধের স্বপক্ষ ও পক্ষ পরস্পরের সম্পর্কে যে-কোন হীনতার অভিযোগ কল্পনা করতে ও প্রচার করতে কু বোধ করেন না। সমাজ ও সরকারের উচ্চতর ক্ষমতার ও মর্যাদাভাজন পদে যাঁরা থাকে তাঁদেরও বহুজনের আচরণে, গোপনে অথবা প্রত্যক্ষে, অবৈধ ও অসঙ্গত প্রলোভের উৎসব জা সত্যিই বাড়িয়ে বলা হবে না, যদি বলা হয় যে, দেশের সরকারী প্রশাসনের কোন-কোন ক্ষে বস্তুত প্রকাশ্যেই উৎকোচের উৎসব চলছে। মনীষী বার্টরান্ড রাসেল মন্তব্য করেছিলেন যে, এই যুগ হলো দালালীর যুগ। ভারতীয় অবস্থার শোচনীয় মালিন্য লক্ষ্য করলে বলতে হ রাসেলের মন্তব্য বর্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের বিশেষণ। স্বার্থবাদের প্রাণে এই বিশ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে যে, মিথ্যার জোরে জয়ী হতে পারা যায়, যদিও একটি বিরাট প্রত্যক্ষ ঘটন আশী বছর বয়সের কংগ্রেসের অধঃপতনে প্রমাণিত হতে দেখা গিয়েছে যে মিথ্যার জোরে পু হলেও শক্তিরক্ষা করা যায় না। সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, গান্ধী-নীতির প্রতি নিষ্ঠাশীল আনুগত্যে ঘোষণাকেও ফাঁকি দেবার ও তুচ্ছ করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। নৈতিক সততায় উ বিশ্বাস অটুট রাখতে না পারা গান্ধী-নীতির প্রতি সম্মানের ক্রিয়া নয়।

প্রসঙ্গত আর-একটি মৌল সত্যের কথা স্মরণ করতে হয়। গান্ধী-আদর্শের আ নীতিক প্রতিষ্ঠা গান্ধী-প্রচারিত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বটে। কিন্তু যদি গান্ধী-প্রচারিত লক্ষ্য পন্থার নৈতিক সামঞ্জস্য না থাকে, যদি এই বিশ্বাস না থাকে যে, মিথ্যার পথে সত্য লাভ ব সম্ভব নয় এবং মিথ্যার্জিত প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হবেই হবে তবে লক্ষ-লক্ষ চরকার গুঞ্জন স করে ও গান্ধী প্রচারিত গ্রামোদ্যোগের অনেক কীর্তি নির্মাণ করেও প্রকৃত গান্ধী-আদর্শের স প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। স্মরণ করতে হয় যে, গান্ধী-আদর্শ নিতান্ত বস্তু-নির্ভর নয়, নিতা নীতি-নির্ভর।
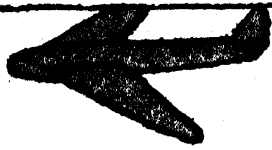
বাঁচাও! বাঁচাও!

বইয়ের মেলা ও বাংলা বই

নির্মাল্য আচার্য

১

কলকাতা শহরে সারা বছর নানা সাংস্কৃতিক সম্মেলন, প্রদর্শনী ও মেলার অন্ত ছিল না। কিন্তু ময়দান ঘিরে শুধু বইয়ের মেলা ব্যাপারটা নতুন। ১৯৭৬-এ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের উদ্যোগে কলকাতা বইমেলার সূচনা হয়েছিল এবং এ বছর তৃতীয়বার শুরু হল আরো প্রশস্ত জায়গা নিয়ে, আরো বড় আকারে বইমেলা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মননশীলতা নিয়ে বাঙালীর অনেক গর্ব। এ ধরনের বইয়ের মেলা নিঃসন্দেহে সেই গর্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে।

অবশ্য শুধু বইয়ের প্রদর্শনী কয়েক বছর আগে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে হয়েছিল। শুধু একটা বাৎসরিক প্রদর্শনী নয়, এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সারা ভারত থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীরা এখানে তাঁদের বই নিয়ে আসেন, প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক সেই মেলায় ঘুরে বই দেখার সুযোগ পান এবং বই বিক্রির পরিমাণও সামান্য নয়। সুসজ্জিত বইয়ের স্টলগুলি দশদিনব্যাপী কলকাতায় ও বাইরের অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের পুস্তক প্রেমিকের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

গত দুটি বই মেলায় যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই মেলা যে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় ও সফল হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৭৬-এ মেলায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী পুস্তক ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ৬৭, আর পরোক্ষভাবে ছিল ৪০০। ১৯৭৭-এ সংখ্যা দুটি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৩৭ ও ৭০০। দর্শক সংখ্যাও ১ লক্ষ ১২ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার হয়। ব্যবসার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। প্রদর্শিত বইয়ের টাইটেলের সংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে ৬৫ হাজারে ওঠে। ১৯৭৮-এর হিসেব এখনো পাওয়া যায়নি, তবে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবার গোটা ব্যাপারটা আগের দু' বছরকে অনেকখানি পেছনে ফেলে যাবে।

এ রকম সফল বইমেলার উদ্যোক্তা হিসেবে বুক সেলার্স ও পাবলিশার্স গিল্ড সকলেরই ধন্যবাদার্হ। সেই সঙ্গে তারিফ করতে হয় অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাকে। আর সব থেকে আশ্চর্য হতে হয় কলকাতা ও মফঃস্বলের অগণিত পুস্তক-নেশাগ্রস্ত দর্শক সাধারণকে দেখে। তাঁরা প্রমাণ দিচ্ছেন তাঁদের জানার আগ্রহের, তাঁদের সচেতনার।

কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। কলকাতা বইমেলার এই সাফল্যের কারণ কী? নিশ্চয়ই এর একটা পটভূমি আছে, বাস্তব পরিবেশের ভিত্তি আছে। সেই আলোচনা সমাজতাত্ত্বিকরা ভাল করতে পারবেন। ইতিহাস থেকেও কিছু সাহায্য হতে পারে। কার্যকারণ বিচার দরকার এই ধরনের শুভবুদ্ধি ও সৎ প্রচেষ্টাকে আরো সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সামাজিক অগ্রগতির কাজে লাগানোর জন্যে। নইলে ব্যাপারটা নিছক অ্যাকাডেমিক হয়ে দাঁড়ায়। শুধু বইমেলা নয়, আমাদের চোখ খোলা দরকার আরো অনেক কিছুর দিকে। সমাজ-বিবর্তনের ধাপে ধাপে সমাজদেহে কতকগুলি লক্ষণ ফুটে ওঠে, সেগুলিকে ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করা, তার সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক দূরদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগ—এই নিয়ে সীমায়িত ক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায়। তাই বইমেলার সাফল্য ব্যাপারটাকে নিছক একটা শীতকালীন পিকনিক হিসেবে দেখে তুচ্ছ করা যায় না।

বইমেলায় কারা আসেন, তাঁদের সামাজিক স্তরবিন্যাস, কারা বই কেনেন, কী ধরনের বই কেনেন, বাংলা বই কত বিক্রি হয়, অন্য ভাষার বই কত বিক্রি হয় ইত্যাদি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালানো দরকার। সেই সঙ্গে সারা বছর বইয়ের প্রকাশনা, কেনাবেচা ইত্যাদি নিয়েও যুগপৎ সমীক্ষা হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে ছাপা বই যেদিন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সেদিন থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, বইয়ের প্রকাশক বিক্রেতা এক ধরনের কূপমণ্ডূকতার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছেন। এক সময় কাপড়ের দোকানে বই বিক্রি হতো, সে কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে, একটা ছোট্ট চারকোণা অন্ধকার ঘরে ঠাসাঠাসি বই নিয়ে মুদিখানার মতো পরিবেশে একজন নিরুত্তাপ সদাবিরক্ত প্রকৃতির লোক হাতপাখা নিয়ে বাতাস খাচ্ছেন। বই দেখতে চাইলে তেড়ে মারতে আসেন প্রায়। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে অন্তত বলা যায়, আজও সেই অবস্থা অক্ষুণ্ণ আছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, লোকে বই দেখতে, বাছাই করতে ও কিনতে চায়—অথচ সে তুলনায় বইয়ের বিক্রি বাড়ে নি এবং প্রকাশক সম্প্রদায় সব সময়ই নিজেদের ব্যবসার মন্দা অবস্থার কথা একঘেয়ে সুরে শুনিয়ে থাকেন।

ইংরেজি-বাংলা দুই জাতের বই-ই প্রকাশ ও বিক্রি করে থাকেন, এমন দোকানে গেলেও দেখা যাবে, ইংরেজি বই প্রদর্শিত হচ্ছে যত্নসহকারে, আর বাংলা বই আড়ালে আবডালে লজ্জায় ঘোমটা টেনে রয়েছে।

বাংলা বইয়ের গোটা অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে হলে মহাভারত হয়ে যাবার ভয় আছে। কী বই বেরোচ্ছে, কোন বই বেরোচ্ছে না, কারা লিখছে, কেন লিখছে, কারা প্রকাশ করছে, কীভাবে প্রকাশ করছে, কীভাবে বিক্রি হচ্ছে, কারা কিনছে, কেন কিনছে ইত্যাদি নানা কথা এসে পড়বে। বইয়ের সঙ্গে যত লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত, তার কেন্দ্রে আছেন প্রকাশক। আমাদের দেশে আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশকই বইয়ের বিক্রেতা। সুতরাং এই ব্যবসার কেন্দ্রে তাঁর সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে বিরাজ করছেন যিনি, তিনি প্রকাশক। আর এই প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, অরুথা, আদর্শের উপর গোটা দায়িত্বের সিংহভাগ বর্তাচ্ছে। সব কিছুকেই যখন নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থনীতি, তখন তার চক্রাবর্তে লেখক, পাঠক সবাই কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যাক, আপাতত সে কথা।

কথা হচ্ছিল বাংলা বই নিয়ে। এখানে যুগ যুগ ধরে লেখক অবহেলার সঙ্গে লেখেন, প্রকাশক দায়সারাভাবে তা প্রকাশ করেন, বিক্রেতার বিক্রি করার উৎসাহ দেখা যায় না, পাঠক অন্যমনস্কভাবে তা কেনেন, অনুগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করেন এবং সমালোচনা করা বাহুল্য বিবেচনা করেন।

অথচ বই আমাদের সব অনুষ্ঠানের অঙ্গ। চালকলার মতো সব অনুষ্ঠানেই তা লাগে। সরস্বতী পুজো ব্যাপারটাই একটা বিশুদ্ধ বই পুজো, পরীক্ষা-ভীত ছেলেমেয়েরা যা প্রতি বছর পরমোৎসাহে করে থাকে।

ঊনিশ শতকে হিন্দু-মেলার বিবরণে দেখা যায়, ১৮৭০-এর চতুর্থ সম্মেলনে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে নানা স্বদেশী দ্রব্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে "বাংলা পুস্তক"। সেই ঐতিহ্য চলে আসছে অনেক দিন ধরে। ধর্মস্থানের সব মেলা বা জন-সমাবেশে তীর্থ মাহাত্ম্য, লতাপাতার গুণাগুণ বা টোটকা ওষুধের বিবরণ, নানা পাঁচালি ও ব্রতকথার পুস্তিকা পাওয়া যেত। রাজনীতির আসর যেখানে জমজমাট সেখানেও বই প্রদর্শিত হতো। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বইয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

তবে বইকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের হাতের কাছে মেলে ধরার ধারাবাহিক ও সুসংগঠিত চেষ্টা সম্ভবত মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারাই ঘটেছে। সেখানে 'প্রগতিশীল ভাবাদর্শ' প্রচারই তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল। এর ফলে সব সময় সব জাতীয় বই প্রদর্শিত হতো না।

১৯৪৮-এর কলকাতা ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বিরাট প্রদর্শনীতে বইয়ের দোকান ছিল শুনেছি। কিংবা বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে একটি সফল বইমেলার অনুষ্ঠান হয়েছিল বলে কানে এসেছে। আর চোখের সামনে দেখে আসছি অনেক বছর ধরে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পুস্তক-প্রদর্শনী। মোট কথা, বই প্রদর্শিত হয়ে আসছে নানা জনসমাবেশে, মেলায়, উপলক্ষে—অনেক কাল থেকেই। কিন্তু শুধু বই নিয়ে সুসংগঠিতভাবে ব্যাপক বইমেলার আয়োজন কলকাতায় দেখা যাচ্ছে ১৯৭৬ থেকে। এর আগে এমন হয়েছে যে, কয়েকজন ব্যবসায়ী একত্র কোনো হল-ঘর ভাড়া নিয়ে নিজেদের বই বিক্রি করেছে এবং ক্রেতাদের কিছু ছাড় দিয়েছে মোট দাম থেকে। তার পেছনে নিছক ব্যবসায়িক কারণ ছাড়া কিছু ছিল না।

ব্যবসা তো বটেই। কিন্তু আর সব ব্যবসার সঙ্গে একটা জায়গায় বইয়ের ব্যবসার তফাৎ মানতেই হয়। অর্থলগ্নী, উৎপাদন, বিক্রি, লাভক্ষতির হিসেবটা মূলত এক হলেও বইয়ের ব্যবসার একটা বড় সামাজিক ভূমিকা আছে, যা ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলে অন্য ব্যবসা থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। আদর্শহীন প্রকাশনা মানুষের যত ক্ষতি করতে পারে, খারাপ মানের একজোড়া জুতো বা দাঁতের মাড়ি-ক্ষয়কারী টুথপেস্ট সে ক্ষতি করতে পারে না।

স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর পার হয়েছে। কত শিক্ষিত বেড়েছে, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কত বই কেনে, কত নতুন লাইব্রেরি হয়েছে, লোকের ব্যক্তিগত ক্রয়-ক্ষমতা কতটা বেড়েছে, বই ও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ কতখানি বেড়েছে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ আজ তাঁদের দেখার দরকার আছে।

বিষয় বা গুণাগুণের কথা ছেড়ে দিলেও বই যে লোকে কিনতে চায় এবং ক্রমশ যে চাহিদা বাড়ছে, এটা বুঝতে বেশি দূরে যেতে হয় না। কয়েক বছর হল গ্রন্থাবলী প্রকাশের ও বিক্রির হিড়িক দেখলেই তা বোঝা যায়। অসংখ্য গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন প্রতিদিন দেখা যায়, অজস্র গ্রাহক সহজ কিস্তিতে সে বই কিনছেন! বই পড়ছেন কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, বইকে যে মূল্যবান সংগ্রহহিসেবে দেখা হচ্ছে এটাও কম কথা নয়। কেউ কেউ বলছেন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির একদা যে-সব গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতেন, সেগুলি এক-কালে সুলভে পাঠক সাধারণের হাতে পেঁৗছেছিল, এখন তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শূন্যস্থান পূরণ করছে এই সব হরেক গ্রন্থাবলী। অর্থাৎ ক্রেতা তৈরিই ছিল।

কথা হচ্ছে সেটাই। ক্রেতা তৈরি আছে, কিন্তু বই নেই। যেখানে বাংলা বইয়ের সংস্করণ এক-দুই হাজারের বেশি কেউ ছাপতে সাহস পান না, সেখানে এমন উদাহরণও আজ তৈরি হয়েছে যা ইতিমধ্যেই আট হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। গম্ভীর বা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লেখা বই এখন আগের থেকে অনেক বেশি বিক্রি হচ্ছে। অভিধান, কোষগ্রন্থ, নানা জ্ঞান-বিদ্যার বই, ছোটদের বইয়ের বিক্রি বেড়েছে। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পুনর্মুদ্রণ বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপন্যাস ও ধর্মগ্রন্থ আমাদের দেশে চিরকালই ভাল বিক্রি হতো, এখনো হয়। কিন্তু পাশা-পাশি কবিতার বইয়ের বিক্রি অনেকখানি বেড়ে গেছে, এমন কি নাটকেরও। বরং তাড়াতাড়ি বিক্রি হওয়ার উপযোগী 'বেস্ট সেলার' জাতীয় বইয়ের শেষ পর্যন্ত বিক্রি গড়পরতায় বাড়ে নি। এ থেকে প্রমাণ হয়, পাঠক আগের থেকে অনেক সচেতন হয়েছে। যে-সব বইয়ের কিছুটা স্থায়ী মূল্য আছে, সেই সব বইয়ের প্রতি আজকের পাঠকের নজর পড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের প্রকাশকরা এখনো অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো ধারণা নিয়ে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু-কিছু নতুন চিন্তায় ছাপ দেখা যাচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে-সব প্রশংসনীয় উদ্যম মাঠে মারা যাচ্ছে তাঁদের সংকীর্ণ ও প্রথাগত দোকানদারির মনোবৃত্তিতে।

কিন্তু প্রকাশনা, লেখক ও পাঠকের সমস্যা এক রকম, আর মূলত যোগসূত্র থাকলেও বই বিক্রির সমস্যাটা কিছু স্বতন্ত্র। বইমেলার সার্থকতা এই যে, অনেক লোকের চোখের সামনে অনেক রকম বই মেলে ধরা হয়েছে এখানে, যাতে সবাই পছন্দমতো ও প্রয়োজনমতো বই বাছাই করে কিনতে পারে। এর থেকে প্রকাশক-বিক্রেতারা একটা শিক্ষাই নিতে পারেন যে, বই ঠিকমতো ও আকর্ষণীয়ভাবে দেখাতে পারলে বিক্রি হয় এবং অনেক বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়। শুধু দু'খানা বিজ্ঞাপন দিয়ে চুপ করে বসে থাকাই বই বিক্রির একমাত্র উপায় নয়। অথবা প্রতিষ্ঠানগত স্তরের দিকে ছোঁড়ার অপেক্ষার হা-হুতাশ করাও কাজের কথা নয়। আজ দিনকাল অনেক বদলে গেছে সে-কথা তাঁদের যথেষ্ট সক্রিয় ও সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার।

২

বইমেলার সূত্রে বাংলা বই নিয়ে কথা যখন উঠলোই তখন এই সুযোগে কিছু জরুরী কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। আর সমস্যাটা যখন ব্যক্তিগত নয়, তখন কোনো সুযোগে সমবেতভাবে মতামত সংগ্রহের সুযোগ থাকলে সব থেকে ভাল। অনেক লোকের যৌথ চিন্তার সাহায্যে বাংলা বইয়ের সমস্যার চেহারা ও সমাধানের সূত্র নির্দেশ সহজসাধ্য হতে পারে। কারণ এটা একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা, যার সমাধানের উপর নির্ভর করছে আমাদের জাতীয় জীবনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির প্রশ্ন।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬, ২৭ ও ২৮ তিনদিন বাংলা প্রকাশনার নানাদিক নিয়ে এক সেমিনার বা আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কিছুকাল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার প্রকাশনা নিয়ে এ ধরনের আলোচনার আয়োজন তাঁরা করে যাচ্ছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁরা গত বছর কলকাতা গ্রন্থমেলার সময়ে তাঁদের পূর্ব নির্দিষ্ট সেমিনারটির ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্যমটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

বাংলা প্রকাশনায় ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে নানামুখী। প্রকাশক, লেখক, বই, মুদ্রাকারী, বিক্রেতা, পাঠক—সকলকে নিয়েই সমস্যা। এঁদের অবস্থাগুলি নানাদিক দিয়ে পর্যালোচনা ক'রে আগামী দশকে বাংলা প্রকাশনার চেহারা ও চরিত্র কী দাঁড়াতে পারে, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টাই ঐ সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল। এতে ১৫ জন প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন নানা বিষয় নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন আরো ২০ জন। উপস্থিত আরো কয়েকজন কিছু-কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। এই গোটা আলোচনা থেকে বাংলা বইয়ের একটা সামগ্রিক চেহারা বেরিয়ে আসে। সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকেই নানাভাবে বাংলা প্রকাশনা প্রসঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার অধিকারী। কথা অনেক সময় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে সেটা কতটা করেছে, তা এই এক বছরের হিসেবে চুলচেরা বিচার করে দেখানো কঠিন।

সে চেষ্টার চেয়ে বরং ঐ সেমিনারের মূল আলোচনাগুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা অনেক প্রাসঙ্গিক ও জরুরী। কারণ, সমস্যা ও অবস্থা একই আছে এবং আগামী কিছুকাল একই থাকবে। তাই বাংলা বই নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে হয়ত ঐ সেমিনারে আলোচিত বিষয়গুলি কিছুটা সত্যের সন্ধান দেবে। হাতের কাছে এমন একটা তৈরি উপাদান যখন আছে, তখন তার সাহায্য নেওয়া সর্বদিক থেকেই যুক্তিযুক্ত।

'বাংলা প্রকাশনের ধারা' সম্পর্কে একটি তথ্য-ভিত্তিক আলোচনা করেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বেরিয়ে আসে। গত একশো বছরে বাংলা প্রকাশনার সংখ্যা ও বিষয়গত অগ্রগতি বিশেষ কিছুই হয়নি, বা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

১৮৫৭-তে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল ৩২২টি (লঙ্ সাহেবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী)। ১৯৭১-৭৫: পাঁচ বছরের প্রকাশিত বইয়ের বার্ষিক গড় ৯৬০ (ডেলিভারি অফ বুকস অ্যাক্ট অনুযায়ী সরকারী দপ্তরে ও জাতীয় গ্রন্থাগারে যে-সব বই জমা পড়ে সেই হিসেবে)। এই ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের টেকস্ট বই ধরা হচ্ছে না। একটু উদারভাবে হিসেব করলেও এই সংখ্যা ১২০০ থেকে বেশি হবে কিনা সন্দেহ।

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার শতকরা তেত্রিশ। ১৯৭৩ সাল ধরে হিসেব করলে দেখা যাবে, ১২ হাজার ৮ শত ৮৩ জন সাক্ষর বাঙালী পাঠকের জন্য প্রস্তুত হয়েছে একটি করে বই। প্রয়োজনের তুলনায় এটা এতই কম যে হিন্দি, মারাঠী, তামিল ইত্যাদি ভাষার থেকে বাংলার অবস্থা ভাল হলেও সান্ত্বনার কিছু থাকে না। অন্য দেশের সঙ্গে ঐ ১৯৭৩ সালের হিসেব ধরেই তুলনা করলে এক্ষেত্রে আমাদের দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠবে। জাপান: ৩৫ হাজার ৮ শত ৫৭ বই (প্রতি ২ হাজার ৯ শত ১০ জনের জন্য একটি); ফ্রান্স: ২৭ হাজার ১ শত ৮৬ বই (১ হাজার ৯ শত ৩৬ জনের জন্য একটি); গ্রেট ব্রিটেন: ৩৫ হাজার ১ শত ৭৭ বই (১ হাজার ৫ শত ৭৭ জনের জন্য একটি); আমেরিকা: ৮৩ হাজার ৭ শত ২৪ বই (২ হাজার ৪ শত ২৭ জনের জন্য একটি); রাশিয়া: ৮০ হাজার ১ শত ১৬ বই (৩ হাজার ১৪ জনের জন্য একটি)।

আবার শুধু টাইটেলের সংখ্যা ধরলেই চলবে না, প্রতি বই কত কপি ছাপা হয়, তাও দেখতে হবে। অধিকাংশ বাংলা বই হাজার কপি ছাপা হয়। অথচ ১৮৫৭ সালে একটি বই গড়ে ছাপা হয়েছে ১৭১৭ কপি করে।

দ্বিতীয়ত বিষয়গত হিসেব। এক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রাধান্য। সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই খুবই সামান্য। ১৯৭৩ সালের হিসেব ধরলে দেখা যায় শতকরা [illegible] ভাগ সাহিত্য, ৪.২৯ ভাগ সমাজ-বিদ্যা, [illegible] কোনো দেশে এমনটা ভাবা যাবে না। এমন কি ফ্রান্সের মতো সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক দেশে সাহিত্য-বিষয়ক প্রকাশনা শতকরা ২৬.১৪ ভাগের বেশি নয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রেও সাহিত্যের প্রাধান্য। ১৯৭৩-এ মোট ৪৭টির মধ্যে সাহিত্য ২২টি। সে অনুবাদও বেশিটাই ইংরেজি থেকে (৪৭টির মধ্যে ২৯টি)।

১৯৭৩-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩৩, একশো বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ৮৬। সাহিত্যের বই ৬৮৪, একশো বছর আগে ছিল ৩৬৩। সাহিত্যের আধিক্য বটে, কিন্তু চিত্ত-বিনোদনের উপাদানই বেশি, প্রবন্ধের বই খুবই কম।

বাংলা বইয়ের অভাব আমরা মেটাচ্ছি ইংরেজি বই দিয়ে। জীবনের বহু বিচিত্র দাবি মেটানো বাংলা বইয়ের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইংরেজি বই নিজেরা ছাপিয়ে বা বাইরে থেকে আমদানি করে সে কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বইয়ের সমান সংখ্যক ইংরেজি বই ছাপানো হয়। আর বিদেশ থেকে ভারতে আমদানি করা বইয়ের দাম প্রায় পাঁচ থেকে নয় কোটি টাকার মধ্যে ওঠানামা করে।

সব রকম বিচারের শেষে সিদ্ধান্তে আসতে হয়, পূর্ণাঙ্গ জাতি গঠনে বাংলা বই তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হচ্ছে না—সংখ্যাগত বা বিষয়গত কোনো দিক দিয়েই না। অথচ জাপানী বই জাপানের সব দাবি মেটাতে সক্ষম। বিজ্ঞানের অতি জটিল বিষয় জাপানীতেই লেখা হয়। জাপানের সমান জায়গায় আসতে হলে শুধু সংখ্যাগতভাবে ঠিক বর্তমান অবস্থার পাঁচ গুণ উৎপাদন বাড়াতে হবে।

শিশুদের উপযোগী বইয়ের খুব অভাব (বছরে ৪০টির বেশি নয়) রয়েছে, ভাল পাঠ্যবই লেখা হচ্ছে না, সর্বস্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষার বই নেই। এ সবই মনে রাখতে হবে। বাংলা এখনো মূলত চিত্ত-বিনোদনের ভাষা, জীবনের ভাষা নয়। বাংলা ভাষাকে আমরা কখনো মর্যাদা দিইনি বলেই এটা ঘটেছে।

বাংলা বইয়ের ব্যবসায়িক দিকে আলোকপাত করেন শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু। তাঁর মতে, বাংলা বইয়ের সম্ভাব্য মূল ক্রেতার সংখ্যা মোটামুটি ১ কোটি ২২ লক্ষ। এর বাইরে নানা প্রতিষ্ঠান ও সরকার আছেন।

বইয়ের বাজারে আছে শতকরা ৮০ ভাগই পাঠ্য-উপপাঠ্য-সহায়ক বই, আর বাকি ২০ শতাংশ সাধারণ বই। সাধারণ বই বলতে কথা-সাহিত্য, ধর্ম ও শিশু-সাহিত্য। প্রবন্ধ-নিবন্ধের বা কবিতার বই সামান্য। আর সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাবলীর হিড়িক।

পশ্চিমবঙ্গে পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশকের সংখ্যা কত? পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক সংস্থার তথ্যানুযায়ী (১৯৭৩-৭৪) সদস্য সংখ্যা ১৪৮২; পুস্তক-বিক্রেতা ১০২৬, প্রকাশক ৪৫৬। অ-সদস্যের সংখ্যাও কম নয়। সব মিলিয়ে হিসেব দেখলে আনু-মানিক সংখ্যা দাঁড়াতে পারে—প্রকাশক ৬৫৬, বিক্রেতা ৪৯৮২। অবশ্য এখানে প্রকাশকরা প্রায় সকলেই বিক্রেতাও।

প্রকাশকরা বড়, মাঝারি ও ছোট তিন স্তরের। এমন মোট ৫০০ প্রকাশকের আনুমানিক হিসাব থেকে দেখা যায়, তাঁদের সমবেত বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ সাড়ে ষোল কোটি টাকার কাছাকাছি। প্রকাশনে বছরে গড়পরতা খরচ হয়, বড়দের আট-নয় লক্ষ টাকা, মাঝারিদের দুই-আড়াই লক্ষ টাকা এবং ছোটদের বার-তের হাজার টাকা। বার্ষিক আয় মোটামুটি পাঠ্যস্তরে ৩০% এবং সাধারণ-স্তরে ২০%। সরকারী, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত প্রকাশনা এই হিসেবে ধরা হয় নি।

প্রতি বছর সাধারণ বই তের-চোদ্দশো নতুন ও চার-পাঁচশো পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ ছাপা হচ্ছে। মোট ১৪০০ বই ধরলে মুদ্রিত মূল্যের হিসেবে বছরে এই জাতীয় বইতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের নানা স্তর মিলিয়ে হচ্ছে

[illegible] বইয়ের মোট ব্যবসায় পরিমাণ বছরে কমপক্ষে ৫৩ কোটি টাকার। অবশ্য এ সবই মোটামুটি হিসেব, কারণ সঠিক হিসেব বার করা দুঃসাধ্য।

চিত্তবাবু শ্রীশবাবুর বিবরণ থেকে বাংলা বই ও তার ব্যবসায়িক দিকের একটা চেহারা পাওয়া গেল। এবার আমাদের দরকার বইয়ের উৎপাদন-প্রক্রিয়াটা জানা। অর্থাৎ কাগজ, ছবির ব্লক, ছাপাখানা, বাঁধাই ইত্যাদির কথা। শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মিত্র এই তৈরির কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রধানত কপি-এডিটিং বিষয়ে কিছু কাজের কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

বই ছাপাখানায় দেবার আগে পান্ডুলিপি তৈরি করা বিষয়ে (কপি-এডিটিং ও লে-আউট) আমরা তেমন যত্নশীল নই। যেহেতু এখনো আমরা ছোটখাটো ছাপাখানায় হাতে কম্পোজ করা পদ্ধতির উপর নির্ভর করি, সুতরাং এই ধরনের ব্যাপারে আমরা খুব শিথিল। কিন্তু ছাপা আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হলে অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্য (লাইনো, মনো ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফোটো কম্পোজিশন) নিতে হলে এই শৈথিল্য মারাত্মক খরচসাপেক্ষ।

সৌন্দর্যকে অবহেলা করাই আমাদের মুদ্রণ-শিল্পের সাধারণ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অনেক বই আছে, যা দেখলেই পড়তে আগ্রহ হয়। টাইপের জল্প ও সমান ফাঁক যত্ন দিয়ে তৈরি। বেশি ফাঁক হলে অক্ষরবিন্যাস সুন্দর হয় না, বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যাও বেড়ে যায়। প্রকাশকদের দিক থেকে চাপ এলেই অসুন্দর ছাপার অভ্যাস ক্রমশ বদলাতে পারে। তবে ভাল ছাপার দাবি করার আগে লেখক ও প্রকাশকের পান্ডুলিপি তৈরি করার যত্ন নেওয়া দরকার। প্রুফ আসার পর যেন ভুল সংশোধন ছাড়া মূল রচনার আর কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্তন দরকার না হয়। এই কাজে লেখক, কপি-এডিটর ও নকশাকারককে (ডিজাইনার) বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। সকলের মধ্যে একটা আলোচনাও দরকার।

বাংলা বই প্রোডাকশনের অন্য দু-একটি সমস্যার কথাও দীপেনবাবু তুলেছেন। বাংলায় বই ছাপাবার উপযোগী গঠনের হরফ (টাইপ ফেস) বেশি নেই। হাতে কম্পোজের শতকরা নব্বইটি একই টাইপ ফেসে। অন্য কিছু টাইপ আছে, যা তেমন সুশ্রী নয়। আর আছে লাইনো ও মনো। মনো তেমন সুঠাম নয়। লাইনোয় ছাপা ঝরঝরে হয়, শব্দও বেশি ধরানো যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যয়সাধ্য মনে হলেও ছাপার তুলনায় এতে খরচ আসলে কম হয়। অন্যদিকে বেশি পরিমাণ ছাপার বা পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে অফসেট পদ্ধতিতে ছাপার কথা ভাবার সময় এসেছে।

বাংলা বইয়ের দুর্বলতম অংশ নিশ্চয়ই তার বাঁধাই। আর কোনো দেশে এত কম মজবুত অথচ শক্ত মলাটে বাঁধাইয়ের কথা ভাবা যায় না। খরচের জন্য যদি কাপড় ব্যবহার সম্ভব না হয় তাহলে শক্ত বোর্ডের বদলে এন্ড পেপারযোগে শক্ত কাগজ ও পাল্পু বোর্ড দিয়ে বাঁধলে বই কম খরচে মজবুত ও পড়ার সুবিধা হতে পারে। তাতে রঙীন জ্যাকেটও দেওয়া যেতে পারে। যেসব বই শক্ত বোর্ড বাঁধাই করতেই হবে সেসব ক্ষেত্রে হ্যান্ডলুম কাপড় ব্যবহার করলে একই খরচে বাঁধাই সুশ্রী ও মজবুত হবে।

এদেশে ছাপা ও বাঁধাইয়ের খরচ অন্য দেশের তুলনায় কম হলেও কাগজের ক্ষেত্রে অবস্থা একেবারে বিপরীত। এটাই প্রোডাকশনের সব থেকে বড় খরচ। বিভিন্ন প্রথায় ছাপার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাগজ দরকার হয়। সেটাও এদেশে এক সমস্যা।

বই হলেই তার পাঠকের কথা এসে পড়ে। বাংলা বইয়ের পাঠক কারা? এই পাঠকসমাজের স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। যদিও প্রকাশকের দৃষ্টিতেই তাঁকে আলোচনা করতে হয়েছে, কিন্তু এই কাজে তাঁর ভূমিকা প্রায় সমাজতাত্ত্বিকের।

পাঠকদের চরিত্র ও স্তরনির্ণয়সূচক কোনো বিশ্লেষণ বা সমীক্ষা প্রকাশকদের তরফ থেকে আজও হয়নি। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশকদের অনগ্রসরতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাব।

আছে। একই পাঠকের (সাধারণ বা জেনারেল বইয়ের) বিভিন্ন রুচি ও অভ্যাস। তা ছাড়া শিক্ষিত বাঙালী-মাত্রই দ্বিভাষী। বেশির ভাগ দরকারী বইয়ের জন্যই তারা ইংরেজী বইয়ের দ্বারস্থ হয়। ফলে বাঙালী পাঠকসমাজ বাংলা ভাষার পাঠক পর্যায়ভুক্ত হন না। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষার এতখানি বিচ্ছিন্নতা দেখা যায় না।

বাঙালী পাঠকসমাজ তিন ভাগে বিভক্ত—উচ্চমান, মধ্যমান ও নিম্নমান। শ্রেণী বিভাগ দেখেই এদের প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্যের মতে গত প্রজন্মের তুলনায় এ প্রজন্মে চিন্তাশীল পাঠকের সংখ্যা, বাংলা বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ বাড়েনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকে দু-দশক আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষার পাঠকদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যমানের। তাঁরাই ছিলেন সৃষ্টিশীল কথা ও কাব্যসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরাই অপেক্ষা করে থাকতেন প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকাগুলির জন্য, ঘরে ঘরে গড়ে উঠত লাইব্রেরি। নানা সামাজিক বিপর্যয়ে সে অবস্থা বদলে গেল, মূল্যবোধে ঘটল বিরাট

পরিবর্তন, সাহিত্যের মধ্যেও এল ভাঙনের চিহ্ন। জনপ্রিয়তার তাগিদে দ্রুততালে ঘটনাবহুল লেখার প্রতি ঝোঁক বাড়তে লাগল। যৌন জীবন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা থেকে এ সাহিত্য বক্তব্য ও শৈলীতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ব্যক্তিগত সংগ্রহের বদলে অফিস-কাছারিতে পাঠাগার গড়ে উঠল। সৎসাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠাশীল পত্রিকাগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হল।

এইসব কারণে বাংলা ভাষার পাঠকদের বিপুল এক অংশের চরিত্র বদল ঘটল। মধ্যমানে ভাঙন ধরায় এখন নিম্নমানের পাঠকসমাজ বাংলা ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখা দিয়েছে। আগে নিম্নমানের পাঠক 'বটতলার সাহিত্যে'র পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিন্তু আজ নিম্নমান ও মধ্যমান একাকার হয়ে গেছে। এখন কাম-ক্রোধ-বীভৎসতা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ীভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রকাশন শিল্প কোনোদিনই কেবল অর্থকরী চিন্তার দ্বারা চালিত হয়নি। বিদেশে যেমন এদেশেও তেমন তার পিছনে থেকেছেন জাতির চিন্তাশীল মানুষদের একাংশ। প্রকাশক বহুক্ষেত্রেই সামাজিক কর্তব্যবোধে পাঠকসমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিবেকবান প্রকাশকের আজকের ভাবনা তাই কেমন-

করে ব্যবসায়িক ভিত্তি বজায় রেখেও প্রকাশনায় বিষয়বৈচিত্র্য ও গুণগত উৎকর্ষ আনা যায়, নিম্নমানের পাঠককে কীভাবেই বা তুলে আনা যায় মধ্যমানে।

বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা বই তৈরির ও বিক্রির সমস্যা সম্পর্কে যতটা অবহিত, বিপননের বিষয়ে ততটা নন। তাঁদের ধারণা বিপনন ও বিক্রয় মূলত একই ব্যাপার। বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন শ্রীদিব্যেন্দু পালিত। তিনি বিপনন (মার্কেটিং) এবং বিক্রয় উন্নয়ন (সেল্‌স প্রোমোশন) নিয়ে কিছু কথা বলেছেন যা বাংলা গ্রন্থব্যবসায়ীর কাছে নতুন মনে হবে।

প্রথমেই তিনি ভেবে দেখতে বলেছেন যে, জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যসামগ্রীর মতো বইও একটি সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয় কিনা। সামগ্রীগুলি দু-রকম—প্রয়োজন এবং শখ, খেয়াল বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপকরণ। বইও তেমন আবশ্যিক ও আপেক্ষিক দু' ধরনের হতে পারে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী চাহিদারও রকমফের হতে পারে। গ্রন্থপাঠের আগ্রহ ও সেই আগ্রহ পূরণের সক্রিয় চেষ্টা নানা জটিল মানসিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আসলে গ্রন্থপাঠের সঙ্গে আগ্রহের চেয়ে বেশি সম্পর্ক প্রয়োজনের। প্রয়োজনই রূপ নেয় অভ্যাসে। এসব নিয়ে কোনো সমীক্ষা হয়নি বলে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এলোপাথাড়ি পরিস্থিতি দেখা যায়। ফলে এই শিল্পটি এখানে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে না।

অথচ বাজার ও চাহিদা সম্পর্কে অন্তর্বর্তী জ্ঞান না থাকলে মূলধন বিনিয়োগ, বই প্রকাশনার প্রকৃতি নির্ণয় ও লাভক্ষতির হিসেব সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। বইয়ের বাজার মন্দা বলে হা-হুতাশ করা ছাড়া প্রকাশকদের কিছু করার নেই। অথচ অন্যান্য সামগ্রীর প্রস্তুতকারকদের সমীক্ষাজাত জ্ঞান থাকায় তারা ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। বইয়ের ক্ষেত্রে হলেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এ ধরনের সমীক্ষা সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

বইয়ের ব্যাপারে বিপননের কাজ : বিভিন্ন ধরনের পাঠকের মানসিকতা ও চাহিদা সম্পর্কে প্রারম্ভিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই চাহিদাকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে 'আবশ্যিক' ও 'আপেক্ষিক' দু-ভাগে ভাগ করা। চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ: একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি বার করা যাতে যেসব পাঠকের কথা ভেবে বই বার করা হচ্ছে তারা সহজেই বইটি কেনার সুযোগ পায় ও বইটি সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করে সে-বিষয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এই তিনটি প্রক্রিয়াকেই সুচিন্তিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থেকে ও উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সাহায্য না নিয়ে মুমূর্ষু এই শিল্পকে আরো দুর্গতির মধ্যে ঠেলে নেওয়া হচ্ছে।

দিব্যেন্দুবাবু প্রকাশকদের আরো কিছু জরুরী পরামর্শ দিয়েছেন। পাইকারি ও খুচরো বিক্রির প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রেখেও পাঠক ও ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি বিক্রয়-সংযোগ স্থাপন। বিদেশে অনেক প্রকাশক এতে লাভবান হয়েছেন, আমাদের গ্রন্থাকারে বিক্রির ক্ষেত্রে এই উপায় সফল হয়েছে। তা ছাড়া বাজার প্রসারের জন্য কম দামে পেপার ব্যাকের কথা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বাংলা বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ বাঙালী প্রকাশকদের উদ্যোগেই সম্ভব কিনা, তাও তিনি ভাবতে বলেছেন।

বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারের অবস্থা, আয় ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনার শেষে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত কার্যক্রমের উপর তীব্র সমালোচনামূলক মন্তব্য রেখেছেন। গ্রন্থাগারিকদের পক্ষ থেকে তিনি বাংলা বইয়ের ছাপা, বাঁধাই সম্পাদনা প্রভৃতি নিয়ে প্রকাশকদের কাছে কিছু অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর আলোচনার শেষে তিনি

... একটি হচ্ছে প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের ... উদ্যোগে বাংলা বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা (... ইন প্রিন্ট') প্রণয়ন ও নির্দিষ্ট সময়ের ... নিয়মিত তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ধরনের তালিকা তৈরি হলে নিঃসন্দেহে তা বাংলা বইয়ের প্রচার ও প্রসারে একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী হাতিয়ার হয়ে থাকবে। এতে উপকৃত হবেন প্রতিটি প্রকাশক, বিক্রেতা, গ্রন্থাগার-পরিচালক ও পাঠক।

সৌরেনবাবুর অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের পাঠাভ্যাস সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো। তাঁর মতে বাঙালীর পাঠাভ্যাস ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। দু-দশক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক নমুনা সমীক্ষা করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল কলকাতায় ২০ থেকে ৫৪ বয়স গোষ্ঠীর শতকরা ৬৭ জন সংবাদপত্র পড়েন না, শতকরা ৮২ জন গ্রন্থবিমুখ এবং শতকরা ৯০ জন পত্রপত্রিকা পড়েন না। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে। ঐ অবস্থায় আরো অবনতি হয়েছে কি?

বাংলা প্রকাশন শিল্প যে নানা রোগে জরাজীর্ণ এবং খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে যে রোগীটি মারা যাবে বা রুগ্ন শরীরে বেঁচে থাকবে—এ কথাটি বেশ জোরালোভাবে বলেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি চাননি একা প্রকাশককে দায়ী করতে। তাঁর মতে বাংলা সিরিয়াস বই এত কম বেরোবার জন্য দায়ী পত্রপত্রিকার সম্পাদক, সমালোচক, লেখক। ভাল বই যে কিছু বেরোয় সেটাই প্রমাণ করে প্রকাশকরা সে ধরনের বই ...র করতে অনিচ্ছুক নন। পাঠকও যে শুধু হাল্কা বই পড়তে চায় তাও ঠিক নয়। তাঁরাও যে সিরিয়াস বই চান, তা প্রমাণিত হয়েছে অনেকবার।

পাঠক আছেন, কিন্তু তেমন বই নেই। বাংলা ভাষায় নৃতত্ত্ব, আদিবাসীর জীবন ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রের গবেষণা, সমাজতত্ত্ব, দেশের ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, শিল্প, সংগীত, শ্রমিক জীবন, ভ্রমণ, শিকার, সমুদ্রবিষয়ক, অরণ্য ও আরণ্যপ্রাণী, বাংলায় বহুল ব্যবহৃত অন্তত বিশ হাজার শব্দের সার্থক সকল ভারতীয় ভাষার অভিধান। ছেলেমেয়েদের নানা বিষয় শেখাতে সাহায্য করে এমন বই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ও লিপির বিবর্তনের সঙ্গে পরিচয় করানোর বই, মধ্যযুগীয় পুথিপাঠের ...পায়। মূল্যবান পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ—এসব ...তের কাছে কোথায়? বই নেই গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলে ...অল্প শিক্ষিতা মেয়েদের জন্যে, যা তাদের কাজে লাগবে। নানা বৃত্তি শেখাবে। শিশুপালন, মাতৃত্ব, ...ইত্যাদি বিষয়ক কাজের বই নেই। এমনি ...রো অসংখ্য বই নেই। অথচ আমরা ডুবে আছি ...ভূত আত্মতৃপ্তির মধ্যে।

লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক নিয়েও মহাশ্বেতা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অনেক তিক্ততা দূরে ...া যায় উভয়ের যৌথ উদ্যোগে। সব ক্ষেত্রেই চুক্তিপত্র থাকা উচিত এবং তার শর্ত একই রকম হবে। লেখকদের স্বার্থ রক্ষা পায় এমন চুক্তিপত্র হওয়া দরকার। প্রকাশক-সমিতি মধ্যস্থলে থেকে সব বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন। এই সমিতির উচিত একটি বিশেষজ্ঞ-বোর্ড গঠন করা, যা নতুন লেখকদের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করবেন। এই সমিতি মুদ্রণ-সংখ্যায় ছল-চাতুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেবেন।

সরকারের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মহাশ্বেতা। পাঠ্যবই নিয়ে প্রতি বছর কেলেংকারির ...মা নেই। এটা বন্ধ করার আইনগত ব্যবস্থা কোথায়? কাগজ প্রাপ্তি, ঋণ, বিশেষ ধরনের বই ...শে সহায়তা করা, নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশে ...য় উৎসাহ দেওয়া, লাইব্রেরি গ্রান্ট বাড়িয়ে তাতে ...সব বিশেষ বই কেনা হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা, গ্রামে-...রে আরো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সরকারেরই ...।

মহাশ্বেতার মতে বাংলা প্রকাশনার সমস্যা প্রকাশক-সমিতি, লেখকের। ভূমিকা আছে পত্র-পত্রিকার। দল-পোষণের বাইরে সুস্থ সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা ভাবা তাঁদের জরুরী দরকার।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্রীসত্যানন্দ প্রামাণিক। তাঁর নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেকালের পাঠ্যপুস্তকগুলি কেমনভাবে 'ক্লাসিকস' পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এখন দেখছেন এক একজন লেখক রাতারাতি তিন-চারখানা বই লিখছেন 'কাঁচি দিয়ে কাটা ও আঠা দিয়ে জোড়া' পদ্ধতিতে। পুস্তক এখন রচিত হচ্ছে না, গ্রথিত হচ্ছে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও অবাঞ্ছিত বইয়ে শিক্ষাজগৎ ছেয়ে গেছে। অনেক নামী লেখকদের নামে যে বই চলে তা তাঁরা নিজেরা লেখেন না। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনয়ন পাবার জন্যও নানা অসাধু উপায় গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত পাঠ্যপুস্তকগুলির কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। বই লেখার সময় ছাত্রছাত্রীদের মানসিক প্রবণতা ও গঠনের কথা ভাবা হয় না। বই ছাত্রদের দিকে চেয়ে লেখা হয়, অথচ ছাত্রীদের কথা ভাবা হয় না। গ্রামীণ জীবনের বাস্তব অবস্থার কথা না ভেবে নাগরিক পরিবেশ অনুযায়ী বই লেখা হয়। গ্রাম্য মেলা, গ্রাম্য খেলা ইত্যাদির কথা থাকে না। স্বীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না বলে এই বইগুলি থেকে ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা পায় না। গ্রামের শিক্ষকদের দিয়ে বই লেখানো হয় না। অহিন্দুদের কথা ভাবা হয় না। পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের পদ্ধতিটি বাতিল করা উচিত। উত্তম পুস্তকের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সুযোগ দরকার। অনেক বইয়ের মধ্যে থেকে বাছাইয়ের সুযোগ থাকা উচিত।

আর পুস্তক অনুমোদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ত্রুটি নির্দেশ করলেও প্রকাশকরা সে-বই বাতিল করেন না। অচল মুদ্রার মতো তা চলতেই থাকে। এর পরিণাম ভয়াবহ।

তাঁর মতে গ্রাম ও শহরের অধ্যাপক-শিক্ষক নিয়ে সম্পাদক-সমিতি গঠন করা উচিত, যাঁরা মুদ্রণের আগেই পাণ্ডুলিপি দেখে দেবেন। শিক্ষাপর্ষদ এই সমিতি গঠন করতে পারেন।

ভাষা, উচ্চারণ, বানান ইত্যাদি নিয়ে বাংলায় কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। নেই উপযুক্ত অভিধান, উচ্চারণ বিষয়ে বি বি সি-র মতো আদর্শ আমাদের আকাশবাণীতে পাওয়া যায় না। পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। অথচ ভাল প্রোডাকশন করা যায়, তার উদাহরণ বিরল নয়। রুচিবোধ বস্তুটা শৈশবে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জাগ্রত করা উচিত, নইলে সমাজের সর্বত্র সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা সফল হবে না।

আমাদের গ্রন্থজগতের অনগ্রসরতা ও বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে অনুবাদচর্চার মূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীঅরুণ মিত্র। অনুবাদ ব্যাপারটাই বহিরাগত। শুধু রচনাই অন্যের নয়, তার নির্বাচন, ভাষান্তর, প্রকাশন সবটার মধ্যেই দায়িত্বশীল চিন্তা ও কার্যক্রমের প্রয়োজন থাকে। তাই বাইরের সংগঠন এক্ষেত্রে দরকারী।

ভাল রচনা ও ভাল অনুবাদ—দুটোই বাছাইয়ের প্রশ্ন। মূল রচনা গুণান্বিত বলেই তো তার অনুবাদ। কাজেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অপরিহার্য।

বাংলা অনুবাদের রাজ্যে চলেছে নৈরাজ্য। যেন অর্থাগমই একমাত্র লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশের বিশ্রুত লেখকদের অনুবাদ গ্রন্থাবলীর তোড়জোড় দেখে শিউরে উঠতে হয়। শেক্সপীয়রের যৎসামান্য অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু তাঁর পুরো গ্রন্থাবলী অনুবাদের উপযোগী অনুবাদক মিলেছে? অনেকে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখেছেন, সেক্ষেত্রে অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজি থেকে, অর্থাৎ অনুবাদের অনুবাদ। যতদিন না উপায় হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি থেকেই না হয় অনুবাদ হল, কিন্তু তাতে কি যথেষ্ট নিষ্ঠা ও সততা থাকছে? ... অবাক হতে হয়। কিছু-কিছু উদাহরণ দিয়ে শ্রীমিত্র দেখিয়েছেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে যা চলছে সেই দায়িত্বহীন মনোভাবে আমাদের জ্ঞান ও শিল্পচেতনার সমৃদ্ধি ঘটছে না।

উৎকৃষ্ট সৃষ্টির উৎকৃষ্ট ভাষান্তর প্রকাশ করার আগ্রহটাই বড় কথা। অনেক সময় খুব অপরিচিত নাম হলে প্রকাশকরা অনুবাদ করাতে চান না, এটা অনুবাদ-আদর্শের বিরোধী। বাজারের কথা ভাবা দরকার, কিন্তু তার অর্থ স্রোতে গা ভাসানো নয়—বাজারে অন্য স্রোত সৃষ্টি করা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশক নিশ্চয়ই আছেন। বিক্রিও হয় এবং পাঠকও অন্ধ হয়ে যান নি।

কিছু জিনিস আছে যা জাতীয় স্বার্থে অনূদিত হওয়া দরকার, কিন্তু তা ব্যয়বহুল। সেক্ষেত্রে সরকারী সহায়তার কথা ভাবতেই হয়। মোট কথা, সবটাকেই সুসংগঠিত করা দরকার। উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদই হচ্ছে এ সংগঠনের শিকড়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশকের পারস্পরিক সংযোগের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নিজের উদ্যোগে অনুবাদ হলে ও তা প্রকাশযোগ্য হলে প্রকাশের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

যিনি যা অনুবাদ করবেন, সে-বিষয়ে তাঁর কিছুটা ধ্যান-ধারণা থাকা দরকার। অনুবাদক নিজে হবেন লেখক। কোনো ভাষা জানলেই অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদককে হতে হয় তাঁর মাতৃভাষায় লেখক। নইলে অনুবাদ অপাঠ্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

জনপ্রিয় সাহিত্য বলতে বাংলার কোন জাতীয় রচনার কথা বলা হয়, কারা সে-সব লেখেন, কেনই বা লেখেন—এ-সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে উপভোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বলা বাহুল্য, যে বই বেশি বিক্রি হয় এবং যা বেশি লোকে পড়েন, তাই জনপ্রিয় সাহিত্য।

আমাদের দেশে সব থেকে জনপ্রিয় বই রামায়ণ ও মহাভারত। ছাপাখানা পত্তন হওয়ার পর শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম প্রকাশিত দুটি বই হল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত। এছাড়া জনপ্রিয়তার স্তরে নানা ধরনের ধর্মপুস্তক, পৌরাণিক ও কাহিনীমূলক বইয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে গোড়া থেকে আজও।

উপন্যাস বাদে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পরিচয় নেওয়া যাক। ছোটগল্প চলে না, টানা কাহিনীর দিকে লোকের ঝোঁক বেশি। নাটক বেশি লেখা হয় না, বিদেশী নাটকের অনুবাদই মূল ভরসা, তাও কমই ছাপা হয়। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইত্যাদি বাদ দিলে মুষ্টিমেয় লোক কবিতার বই কেনেন। কবিতা-পত্রিকার প্রচার নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারপর রম্যরচনা। গত বিশ-ত্রিশ বছরে কয়েকটি বাদ দিলে খুব কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

অতএব ঘুরে ফিরে জনপ্রিয় সাহিত্য বলতে উপন্যাসই বোঝায়। কিন্তু উপন্যাসেরও নানা জাত আছে। বেশি চলে হালকা, তরল উপন্যাস। যা পড়তে কষ্ট হয় না, ভাবতে হয় না, যাতে প্রেম, সেক্স, অবাস্তব ঘটনা ও কাহিনীর একটা আপাত মনোরঞ্জক সংমিশ্রণ আছে, তাই পছন্দ করে অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা। সিরিয়াস উপন্যাসের কাটতির অবস্থা শোচনীয়। লাইব্রেরিতে পূর্বোক্ত জনপ্রিয় উপন্যাস অনেকগুলি করে কপি কেনা হয়, সদস্যরা সেগুলি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

বেশির ভাগ জনপ্রিয় উপন্যাসে বাস্তবতা নেই, তা পাঠকের ইচ্ছাপূরণ ও পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। আগামী দশকে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ এই জাতীয় বইয়েরই কদর থাকবে। কারণ, এর মূলে আছে এখনকার শিক্ষা-প্রণালী ও সামাজিক পরিবেশ।

জনপ্রিয় সাহিত্যের লেখকরা কেন লেখেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীগুপ্ত বলেছেন : 'আমার বিশ্বাস আজকের জনপ্রিয় লেখকরা যে ধরনের লেখা লেখেন, তার মূল কারণ ঐ ধরনের লেখা ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু লেখা লিখতে অপারগ।'

আছেন যাঁরা বর্ণিবিষয়ের স্রষ্টা যাঁরা সাঁইই শিল্পী এবং যাঁদের শ্রমিক সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও শরৎচন্দ্র, বিভূতি-ভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলি একই সঙ্গে সংস্কৃতিবান পাঠক ও সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করেছে। একদিক দিয়ে এই হল আসল জনপ্রিয় সাহিত্য।

শ্রীস্বপন মজুমদার আলোচনা করেছেন বাংলা চিন্তামূলক প্রকাশন ও তার সমস্যা নিয়ে। এই ক্ষেত্রে আমরা এমন এমন একটা অন্তঃসারশূন্যতার মধ্যে এসে পড়েছি, যেমন এর আগে কখনো আসি নি। এর কারণ খুঁজতে গেলে এক বৃত্তাকার অভিযোগ-চক্রের পৌনঃপুনিকে আটকে যাবার সম্ভাবনা।

বাংলা প্রকাশন-শিল্পের নিজস্ব চরিত্রের অভাব রয়েছে। সে চরিত্র গড়ে তুলতে দরকার ছিল আদর্শের মান স্থাপন ও প্রচারের উপযোগী এক মুখপত্রের। একটা পুরনো উদাহরণ আছে—সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'টুকরো কথা'। গ্রন্থের প্রচার ও মূল্যায়নের জন্য বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দরকার। এক্ষেত্রে উপযোগী পত্র-পত্রিকার অভাব রয়েছে। গ্রন্থ-সমালোচনা লেখা হয় না, লেখানো হয় এবং এই ক্ষেত্রে কোনো নীতির বালাই নেই। চিন্তামূলক রচনার ক্ষেত্রে লেখক যাচাই ও বিচার করার সুযোগ চান, ধরে নিতে হয় প্রথম প্রকাশিত লেখামাত্রেই খসড়া। তাঁর মত ও তথ্য পরীক্ষার জন্য সহ-সামাজিকের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতেই হয়। এক ধরনের স্থূল প্রচার-লালসার জন্য লেখকরা চরিত্রহীন সাময়িকীর দপ্তরে ধর্ণা দেন। অথচ ঐ সব সাময়িকী চিন্তামূলক রচনার প্রতি ঔদাসীন্য দেখায় এবং সেখানে ধরেই নেওয়া হয় সৃজনশীল লেখকের কর্ম চিন্তাশীল লেখকের তুলনায় উন্নত মার্গের। একটা হীনমন্যতার ফলে তাই লেখকরা তাঁদের চিন্তামূলক রচনায় সাহিত্য করার লোভ সামলাতে পারেন না, বিষয়কে রম্য করে পরিবেশন করতেই তাঁরা ব্যাকুল। আত্মবিক্রয়ের দৌড়ে যাঁদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, তাঁরাই প্রকাশকদের কাছে হয়ে ওঠেন লাভজনক শিকার। প্রকাশক সচরাচর লেখক আবিষ্কারের চেষ্টা করেন না।

প্রবন্ধের বই বলতে লেখকরা ধরে নেন সাহিত্য-সমালোচনামূলক বই। প্রবন্ধ যে সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয় নিয়েও হতে পারে, তা কেউ ভেবেও দেখেন না। চিন্তামূলক রচনা যদি কোনোক্রমে সরকারী পুরস্কার পেয়ে যায়, তাহলে সেই লেখকের পরের বইগুলি নির্বিচারে ছাপার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন প্রকাশকরা।

গ্রন্থস্বত্ব পেরিয়ে-যাওয়া বইগুলি পুনর্মুদ্রণের ঝোঁক এসেছে। কিন্তু তাতে তথ্যে সম্পূরণ, সম্পাদনা ইত্যাদির বালাই থাকে না। নতুন বইয়ের ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা, সমতা বিধানের জন্য পাঠক নিয়োগ করা প্রকাশকরা অকারণ অর্থব্যয় মনে করেন, লেখকরাও এটাকে তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ বলে ভাবতে অভ্যস্ত।

এরই মধ্যে আশার কথা এই যে, পাঠ্যপুস্তক বাদে সম্প্রতি চিন্তামূলক রচনার পরিমাণ কিছু বেড়ে । বছরের ১৩৫০/১৪০০ বইয়ের মধ্যে শতকরা ৩৬ থেকে বেড়ে ৪৮টি হয়েছে এই জাতীয় রচনা প্রকাশকরা ঠেকে শিখেছেন। তাঁরা দেখছেন, চিন্তামূলক রচনা ধীরগতিতে বিক্রি হয় বটে, কিন্তু প্রতিটি কপি বিক্রি হয়। এই নিরাপত্তার বোধই চিন্তামূলক রচনার প্রতি প্রকাশকদের আগ্রহী করে তুলেছে। এই জাতীয় বইয়ের দাম বেশি হলেও ক্রেতারা আপত্তি করছে না, এটাও একটা কারণ। আবার সরকারী উদ্যোগে এই জাতীয় বইয়ের বিক্রির সম্ভাবনা বেড়েছে।

বর্তমানে সৃজনশীল সাহিত্য যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার তুলনায় চিন্তামূলক রচনাই জনশিক্ষার উৎকৃষ্টতার বাহন। কিন্তু এই জাতীয় বই প্রকাশে প্রকাশকের মনোভাব প্রথম থেকেই নেতিমূলক। প্রচার, বণ্টন ইত্যাদির যে সব জানা কৌশল তাঁদের আয়ত্তে, এই জাতীয় বইয়ের জন্য তাঁরা তা প্রয়োগ করেন না।

পত্রিকার গতিপ্রকৃতি ও তাদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে, করেছেন শ্রীমালিনী ভট্টাচার্য। সাময়িকপত্রই হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে লেখকের সঙ্গে পাঠকের ভাবনার যোগাযোগ ঘটে থাকে বা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাঁর মতে আগামী দশকে বড় পত্রিকার মান আরো নামবে, যদিও তাদের কাটতি কমে যাবে না; ছোট পত্রিকার সংখ্যা কমবে না, বরং তাদের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে; মাঝারি ও ছোট পত্র-পত্রিকাগুলির কাছে ক্রমেই মধ্যপন্থা বলে কিছু থাকবে না—হয় সীমায়িত গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে থাকা, নয়তো বড় একটা সম্ভাব্য পাঠক-সমাজ স্বীকার করার চেষ্টা এই দুইয়ের মধ্যে একটা পথকে টিঁকে থাকার খাতিরেই মেনে নিতে হবে। ইতস্তত বিচ্ছিন্ন পাঠক

সমাজের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে ছোট পত্রিকাগুলি, যদি তাদের পারস্পরিক পরিচয় ও সমঝোতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা হয়।

বৃহৎ পুঁজি—তাকে যে কোনো ক্ষেত্রেই খাটানো হোক না কেন—নিজেকে ক্রমশ আরো না বাড়ালে আদৌ টিঁকেই থাকতে পারে না। তেমনি বড় পত্রিকারও নিয়ম নিজেকে চারদিক থেকে আরো বাড়ানো। মুনাফার একটি বড় অংশকে নিজের ডাল-পালা ছড়ানোর কাজে নিয়োগ করতে হয়, এভাবে ডালপালা না ছড়ালে মুনাফাও আবো বাড়ানো যায় না।

সাধারণভাবে পাঠকের রুচি নিম্নগামী নয়। যদি তা হয়ও তাহলে তার দায়িত্ব বড় পত্রিকার ওপর বর্তায়। অর্থাৎ যে-সামাজিক ব্যাধি পাঠকের মনকে নিম্নগামী করে, তার কৃষ্টিগত লক্ষণগুলি বড় পত্রিকার মধ্য দিয়েই প্রথম ফুটে ওঠে। আর নিজের অস্তিত্বরক্ষার দায়েই সর্বদা তাকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তাই সচেতনভাবেই সে অনড় অচল। একবার যা দিয়ে সাফল্য লাভ করে, রকমফেরে সেই বুলিই পাখি পড়ার মতো বলে চলে। বৃহৎ পুঁজির আনুকূল্যে তা বাজার ছেয়ে ফেলে বলে সহজলভ্য। পাঠক সমাজের প্রয়োজনটাই সাময়িকপত্রের মানদণ্ড না হয়ে সাময়িকপত্রই পাঠক সমাজের রুচির ব্যাপারে হর্তাকর্তা হয়ে দাঁড়ায়। বৃহৎ পত্রিকাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলাব জনাই পাঠক নয়, পাঠকের জনাই পত্র-পত্রিকা—এই বোঝাটাকে ঠেকিয়ে রাখাই বড় পত্রিকার স্বার্থের অনুকূল। তাই সমাজ জীবনে ভাবনা চিন্তার হাওয়া বদল হলে তাকে স্বীকার করে বড় পত্রিকা সব চাইতে শেষে।

মালিনী কিছু উদাহরণ দিয়ে নিজের বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরে তিনি ধরেছেন মাঝারি ও ছোট পত্রিকাগুলিকে। স্বল্প পুঁজি ও কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি মিলে নিষ্ঠার জোরে এঁরা

এঁরা অনেকটা মুক্ত। কিন্তু অনেক সময় নিজেদের বিচ্ছিন্নতাতেই তাঁরা আত্মতুষ্ট। ফলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক 'উচ্চাঙ্গ' আলোচনায় তাঁরা ব্যাপৃত। মধ্যে মধ্যে অন্য ধরনের জরুরী লেখা থাকলেও সামগ্রিক অনড় প্রাজ্ঞতার মধ্যে তা মিলেমিশে যায়। দু-একজন কর্মীর ওপর নির্ভরশীল বলেই প্রতিষ্ঠিত মাঝারি পত্রিকাগুলিকে বাধ্য হয়েই গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়। বিধ্বংসমূলক বিতর্ক ছাড়া অন্য ধরনের মৌলিক বিতর্কে জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আজকের ছোট পত্রিকার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। পাঠকও ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পাঠকের নানা ভিন্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণ পাঠক যা চান ও তাঁর যা চাওয়া উচিত তার মধ্যে অনেক তফাৎ এসে যায়। একমাত্র সুষ্ঠু ইতিহাস চেতনাই এই তফাৎকে চিনে তাকে দূর করার চেষ্টা করতে পারে। আগামীকালের গুরুত্বপূর্ণ লেখকরা এ-সব ছোট পত্রিকা থেকেই বেরিয়ে আসবেন শুধু দেখতে হবে ইতিহাস-চেতনার অভাবে ও বিকৃতির ফলে ছোট ছোট পত্রিকাও আত্মতৃপ্ত স্বগত কথনের মঞ্চে পরিণত হবে।

নিম্নমানের লেখা, ভুলে-ভরা ছোট পত্রিকা অনেক। বড় পত্রিকায় যা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জিত, সে ইতিহাস-চেতনা অনেক স্বল্পখ্যাত, ছোট, মফস্বল পত্রিকাতেই লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। এ-সব পত্রিকা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

'আগামী দশকের লেখক ও পাঠক' বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীবিনয় ঘোষ। তাঁর মতে, আগামী দশকে আমাদের দেশে বর্তমান সামাজিক অবস্থার মৌল পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই যথারীতি ধর্মগ্রন্থ, যাবতীয় উত্তেজনা প্রধান উপন্যাস কাহিনী, রম্যরচনাদি 'বেস্ট সেলার' থেকেই যাবে। কিন্তু তার পাশাপাশি 'কমিটেড' মননশীল সাহিত্য ক্রিটিকাল সাহিত্যের পাঠক বাড়বে। বিশেষত সমাজবিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জীবন-চরিতের ও জীবনধারার পর্যালোচনার। এ সাহিত্যই হবে 'স্টেডি সেলার'। কারণ, এই পাঠক শ্রেণী চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু হবে, নেশাখোর হবে না।

এই বক্তব্যের সমর্থনে বিনয়বাবু ইতিহাস সমাজ সমীক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অনেক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ আজ বিস্মৃতি

অতলে। হিসেব করলে তাদের মুদ্রণ ও বিক্রয় সংখ্যা খুব সাংঘাতিক কিছু নয়। কিন্তু ঐ দশকগুলিতে শুরু হয় ধীরে ধীরে সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি আজও তা বাড়ছে। বিক্রির হার দেখেও তা বো যায়। ২০ থেকে ৩০ বছরের তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখী সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অনুরূপ বিষয় বই পড়ার আগ্রহ খুবই প্রবল। এঁরা ছাত্র, অধ্যাপক শিক্ষক ও চাকুরিজীবী।

এই বলিষ্ঠ ধারাকে পরিপুষ্ট করার দা প্রকাশকদের। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যেমন

[illegible] চাইতে বাঙালীর [illegible]

[illegible] দোকানদারিতে—প্রকাশন ক্ষেত্রেও তাই। [illegible] মণলাপাতি বা মনোহারী দ্রব্যের দোকান-[illegible] মতো। সেখানে উদ্যম নেই, পরিকল্পনা ও [illegible] নেই। সত্যিকারের সুনামের অধিকারী একটা প্রতিষ্ঠান নেই যারা ভাল মানের বই বার করে বলে খ্যাতি আছে। দু-হাজারের বেশি বই ছাপার সাহস [illegible] প্রতিষ্ঠান পান না। বাংলার বাইরের বাঙালীদের জন্য চিন্তাও নেই তাঁদের। বিনয়বাবুর ধারণা ও বিশ্বাস, যে-কোনো ভাল বিষয়ের বই পাঁচ হাজার কপি স্বচ্ছন্দে ছাপা যেতে পারে। তার জন্যে কী করা প্রয়োজন তা প্রকাশকদেরই তিনি ভেবে দেখতে বলেছেন। কূপমণ্ডুকতা ও সংকীর্ণ দোকানদারির বৃত্তিটিকে ভেঙে এগিয়ে যাওয়াই আগামী দশকের প্রকাশকদের কাজ।

আগামী দশকের বাংলা প্রকাশনার ব্যবসায়িক দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য এক্ষেত্রে সংকটের চেহারা খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। প্রকাশক ও বিক্রেতা একই হওয়ার ফল বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে ভাল হয়নি—এ দুটির পৃথকীকরণ দরকার। নইলে উভয়েরই অযথা অনেক উদ্যম নষ্ট হয়।

পাঠকের স্তরবিন্যাস থেকে শুরু করে ক্রমশ বইয়ের বিক্রয়ক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক প্রকাশনার শতকরা হিসাব, প্রকাশকদের অবস্থা, ছাপা-বাঁধাই ইত্যাদি নিয়ে অনেক সমস্যা ও ত্রুটির কথা বলেছেন শ্রীভট্টাচার্য। বইয়ের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব রয়েছে, কমিশন দেওয়ার পদ্ধতিতেও প্রচারের অভাব রয়েছে। তালিকা ও প্রতিনিধি পাঠানো, ডাকযোগে প্রচার পুস্তিকা পাঠানো ইত্যাদি কিছু-কিছু ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। তা ছাড়া দরকার সত্যিকার ভাল সেলসম্যানশিপ।

পরিশেষে শ্রীভট্টাচার্য সূত্রাকারে আগামী দশকের এক কাঙ্ক্ষিত চেহারা তুলে ধরেছেন, যার অনেকটাই

[illegible]

পূর্ণ পরামর্শ হচ্ছে গ্রামের উপযোগী বই প্রকাশের পরিকল্পনা। মৎস্য চাষ বা কুটিরশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে সহজবোধ্য বই নেই। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও গ্রামের ছেলেমেয়ে ও শহরের ছেলেমেয়েদের তফাতের কথা ভাবতে বলেছেন তিনি।

গ্রাফিক আর্ট ও বই ডিজাইনের কথা বলেছেন শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। চিত্রভাষা ও চিত্রলিপি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনারের ডাক পড়ে। আগেকার কমার্শিয়াল আর্টের সীমা ছাড়িয়ে এই ডিজাইনারদের কাজ ব্যাপক হয়ে গেছে আজ। ভিসুয়াল কমিউনিকেশনের মূল দায়িত্ব তার। আর এর ক্ষেত্রটিও বেশ বিস্তৃত।

শ্রীগোস্বামী আমাদের দেশে কমার্শিয়াল আর্ট ও গ্রাফিক ডিজাইনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত বাংলা টাইপের সীমাবদ্ধতার কথা তুলেছেন। তাঁর মতে পরের দশকে বাংলা ছাপাখানায় হরফের ব্যাপারে গ্রাফিক ডিজাইনারের বেশ কিছু কৃত্য থাকবে।

এর পর বুক ইলাস্ট্রেশনের কথায় উচ্চমানের পাশাপাশি চরম নিম্নমানের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। ভিসুয়াল কমিউনিকেশনে ফাঁক থেকে যায় বা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় কেমনভাবে তাও দেখিয়েছেন। ইতিহাসবোধের অভাবে এক্ষেত্রে ভুল হচ্ছে। অর্থেস্টিক হওয়াই ইলাস্ট্রেশনের শেষ কথা নয়, ইলাস্ট্রেশন মানে কোনো লিখিত বিষয়ের চিত্রানুবাদ নয়। শব্দগত বিষয়কে আরো বেশি মাত্রায় প্রকাশ করা ও সম্প্রসারিত করাই হবে আগামী দশকে ডিজাইনারের কাজ। ব্যাপারটা ফ্যাকচুয়াল ইলাস্ট্রেশন না হয়ে হওয়া দরকার রচনার সম্প্রসারণ ও মহিমময় সংযোজন।

কোষগ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানবিষয়ক অজস্র পাঠ্যপুস্তকের দৈন্যদশা ও অবহেলা দেখে নৈরাশ্য আসে। অথচ আজ দরকার ফ্যাকচুয়াল গ্রাফিক

দায়িত্বহীন অযোগ্য ম্যাজরা।

পাঠ্যপুস্তক ডিজাইন করার জন্য উপযুক্ত গ্রাফিক ডিজাইনারের আবির্ভাব ঘটা দরকার। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণেও ছবির দরকার। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ আগামী দশকে প্রকাশনক্ষেত্রে গৃহীত হবে বলে শ্রীগোস্বামীর বিশ্বাস। উন্নত চিন্তা ও নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাল রেখে বাংলা প্রকাশনার পরিবেশ ও প্রকরণ সামনের দশকে অনেক এগিয়ে যাবে। গ্রাফিক ডিজাইনার হবেন সেই উন্নয়নের অংশীদার।

শ্রীগোস্বামী প্রস্তাব দিয়েছেন, বাংলা টাইপের পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালোগ প্রকাশ এবং ইতিহাস, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক চিত্র, পশুপাখির ছবি ইত্যাদি নিয়ে ভিসুয়াল সোর্সবুক প্রকাশের পরিকল্পনা অতিদ্রুত নেওয়া দরকার।

সমগ্র আলোচনা-চক্রটিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মতামত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও কর্মোদ্যোগ গৃহীত হওয়ার অবকাশ আছে। তবে আলোচিত বিষয়গুলির বাইরে কয়েকটি গুরুতর ফাঁক রয়ে গেছে। যদি কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাহলে সেই ফাঁক ভরাট করা হবে আরো পূর্ণাঙ্গ একটি জরুরী প্রকাশনার বিশেষ শর্ত। তবু যা হয়েছে তার জন্য সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানটি অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন।

সব শেষে জানানো কর্তব্য, প্রতিটি প্রবন্ধের সার সংকলনে অনেক জরুরী অংশ বাদ গিয়ে থাকতে পারে বা লেখকের অনভিপ্রেত বিকৃতি ঘটে যেতে পারে। সেজন্য আগে থেকে আমি মার্জনা চেয়ে রাখছি। অনেক সময় বিভিন্ন বক্তব্য পরস্পরবিরোধী বা পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে—সেটা অবশ্য সব আলোচনা-চক্রেরই সাধারণ ধর্ম।

অতুল্য ঘোষ

॥ ৩৯ ॥

জবনগর থেকে আমি, জগজ্জীবন রাম ও
ার পুত্রবধূ বেরোলুম সোমনাথের উদ্দেশে।
ই সোমনাথ, হিন্দুদের যে মন্দির সতেরবার
ণ্ঠিত হয়েছিল। অবাক কাণ্ড। চারিদিকে
দু রাজ্য, মুষ্টিমেয় বিদেশী সৈন্য এসে
বার আঘাত করেছে—কিন্তু আশেপাশের
নও হিন্দু রাজা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে
সেনি। খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান পুনরুদ্ধার ও
া করবার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টান জগৎ
ার মাইল দূরে থেকেও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে
সছে। আর সোমনাথ তো তৎকালীন
রতবর্ষের অঙ্গীভূত অঞ্চল। ধর্মরক্ষার জন্যও
ট এগিয়ে আসেনি, আর দেশরক্ষার কথা তো
ন্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষ
ন কোনও দেশ থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের
ধবাসীরা নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে
তেন না। আর সাধারণ হিন্দুরা ধর্ম সম্বন্ধে
দের কার্যকলাপ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই
মাবদ্ধ রেখেছে। সেইজন্যই অবাক লাগে
ন দেখি দ্বারকাতেই সারদামঠ। শঙ্করাচার্যও
। হিন্দু ছিলেন, তবে তিনি কেন ধর্ম
ারের জন্য ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি
নির্মাণ করলেন?

সোমনাথপত্তন একসময়ে বড় বন্দর ছিল।
বিদেশের জাহাজ এসে তো লাগতই, আবার
জরের এই বেলাভূমিতে গ্রীস, রোম, পারস্য
ভৃতি দেশের সার্থবাহীদের যাতায়াতে
মনাথ মহাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আবার
মনাথ থেকে চীনের সঙ্গেও বাণিজ্যের পথ
লা ছিল। আর মন্দির, যেসব বর্ণনা পাওয়া
য়, তাতে মনে হয়, শুধু যে স্থাপত্যশৈলীতে
ন্দরের বিশিষ্ট স্থান ছিল, তা নয়, ধনরত্নও
গাধ ছিল। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায়
, মন্দিরের গর্ভগৃহে এমন সব রত্নরাজি ছিল
, সেখানে আলো জ্বালার প্রয়োজন হত না।
সব রত্নের দ্যুতিতে গর্ভগৃহ আলোকিত হয়ে
কত। আর অলিন্দ ও নাটমন্দিরে প্রজ্বলিত
হস্র বর্তিকার মৃদু কম্পনের সঙ্গে যখন
নন্যসাধারণ রূপযৌবনশালিনী দেবদাসীরা
ত্য করতেন, তখন মনে হত যেন স্বর্গের
দ্রদেবের নৃত্যসভা। মন্দিরের বিশাল চত্বরের
ার্দিকে বহু শত বিপণী। বহু বিদেশাগত
র্লভ আপণদ্রব্যে সুসজ্জিত সেই চত্বর
থিবীর অন্যান্য দেশের লোকের আগম-
র্গমে মুখরিত হয়ে থাকত। আর পত্তনে
ড়া পেত দেশ-বিদেশের সুসজ্জিত অর্ণব-
াত। সর্দার বল্লভভাইয়ের উদ্যোগে পূর্বতন
মনাথ মন্দিরের ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসাবশেষের
শেই নতুন বিশাল মন্দির তৈরী হয়েছে—
রাতন ভারতবর্ষের এক মহাসমৃদ্ধ স্মৃতির
তি নূতন ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এখনও লোকে একটি গাছ দেখিয়ে বলে যে,
সেই গাছে শ্রীকৃষ্ণ শরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং
তাতেই তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। আরও কত
জায়গা দেখায়, আরও কত গল্পই যে আছে!
একটু দূরেই বেটদ্বারকা—সমুদ্রপথে যেতে
হয়। গুজরাটের সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গা-
গুলিতে অনেক স্মাগলিং-এর সুবিধাও আছে।
আরবদেশ থেকে বড় বড় 'Dhow' করে বহু
দ্রব্য এখানে আসে, আইন অনুসারে যা
ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে গেলে বহু টাকা
দক্ষিণা দিতে হয়। সেজন্য গোপনে এই ব্যবসা
বেশ ভালই চলে। গুজরাটের যেখানেই গিয়েছি,
সাদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি ছিল না।
আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে মনে হত যে,
নিজেদের আত্মীয়কুটুম্বের বাড়িতেই এসেছি।
আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল আহারের ব্যবস্থায়।
পুরি, কোথাও কোথাও বা রোটি, তার সঙ্গে
শ্রীখণ্ড, ধোকড়া আর লাড্ডু বা জিলাবী।
অবশ্য আচার থাকত নানারকমের। একটি
জায়গায় আমরা আগে থাকতেই বললুম যে,
আজ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কিছুটা সবজি থাকা
চাই। সবজিও এল প্রচুর—অর্থাৎ বড় বড়
পেঁয়াজ। গুজরাটের নিরামিষাশীর সংখ্যাই
বেশী। গুজরাটের পরই আমার মনে হয়,
বাংলা দেশে। দক্ষিণে কিছু ব্রাহ্মণ আছেন
নিরামিষাশী। তারপর গ্রামের পর গ্রামে
গেলেও কোনও নিরামিষ রান্নাঘর পাওয়া যায়
না। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পেঁছলুম গির
ফরেস্ট-এর ধারে। অরণ্য বললে আমাদের
যেমন বড় বড় গাছ, মাইলের পর মাইল গেলেও
সূর্য দেখা যায় না—এরকম একটা ধারণা
আছে, 'গির ফরেস্ট' সেরকম কিছু নয়।
উচ্চতায় আমাদের বাবলা গাছের মত, কয়েক
মাইল জুড়ে একরকম গাছ আছে। তারই মধ্যে
পশুরাজ সিংহ সদর্পে তাঁর রাজ্য শাসন
করেন। মহা আগ্রহে সেখানকার অফিসাররা
আমাদের সিংহ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।
বনের এক ধারে আমরা দাঁড়ালুম, সেখান
থেকে দেখা গেল গজ ষাটেক দূরে একটা
মোষ বাঁধা হয়েছে। সেখান থেকে আরও গজ
পঞ্চাশেক দূরে একটি সিংহ বেশ গম্ভীরভাবে
বসে আছে। ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি সিংহ
এসে সেখানে উপস্থিত হল। আমি কৌতূহল
সংবরণ করে আস্তে আস্তে গাড়িতে এসে
বসলুম। ড্রাইভার সংগে সংগে আমাকে জিজ্ঞেস
করলেন, 'আপনি বোধ হয় জৈন।' আমি
সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ায় সে খুব খুশী হল।
জগজীবন রাম এবং আমার পুত্রবধূ বেশ
ধীরস্থিরভাবেই একটি সিংহের লম্ফন, তারপর
মোষের রক্তপান, তারপর আরও কতগুলি
সিংহের আবির্ভাব—সব দেখে গাড়িতে এসে
আমাকে বিশদ বর্ণনা দিলেন। শুনলুম,
এরকমভাবেই নাকি সিংহ দেখানো হয় এবং
তাই-ই প্রথা। সব জিনিসটাই আমার অসুন্দর
ও বীভৎস বলে মনে হয়েছিল। নলিনীকান্ত
গুপ্ত মহাশয় বলতেন যে, সময় সময়
অশ্লীলতাও হয়তো সহনীয় হয়, কিন্তু
তার এ মনোভাবের পুরোপুরি সমর্থক।

গুজরাটে গেলেই গান্ধীজীর কথা আপনা-
আপনি এসে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়,
আমরা যে তাঁকে শুধু দেখেছি, তা নয়
তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে
আমাদের জীবনও সার্থক হয়ে উঠেছে। যে
মাটিতে তিনি হেঁটেছিলেন, যে বাতাসে তিনি
নিশ্বাস নিতেন, সেই মাটির স্পর্শ আমরা
পেয়েছি, সেই বাতাস প্রতিনিয়ত আমাদের
সেবায় নিযুক্ত আছে। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।
গুজরাটের এই খর্বাকৃতি শীর্ণকায় মানুষটি
কোনও লোকোত্তর কাজ করেননি। যা করে-
ছেন, সবই লোকায়ত্ত। 'Child is the
father of man'—বহু দিনের এই প্রবচনকে
নস্যাৎ করে দিয়ে পৃথিবীর মাঝে দৃষ্টান্ত
স্থাপন করেছেন যে, কেবলমাত্র নিজের সাধনা
দ্বারা, কোনও অলৌকিক শক্তির সাহায্য না
নিয়ে মানুষ যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তা
প্রমাণ করতে পারে। বাল্যকালে তিনি ছিলেন
অতি সাধারণ। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে নাচ
শিখতে গেলেন এবং বিদেশী বেশভূষার পারি-
পাট্য সম্বন্ধে হলেন অত্যুৎসাহী। ব্যারিস্টারি
পাশ করে দেশে ফিরলেন। তাঁর প্রথম কেসের
অভিজ্ঞতার কথা নিজেই লিখেছেন। (অতি
সহজ কেস, একবার উঠে দাঁড়িয়ে দুটি কয়েক
কথা বলা।)

'It was an easy case. I charged Rs. 30 for my fees. The case was not likely to last longer than a day.

'This was my debut in the Small Causes Court, I appeared for the defendant and had thus to cross examine the plaintiff's witnesses. I stood up, but my heart sank into my boots. My head was reeling and I felt as though the whole court was doing likewise. I could think of no question to ask. The judge must have laughed, and the vakils no doubt enjoyed the spectacle. But I was past seeing anything. I sat down and told the agent that I could not conduct the case.'

My Experiments with Truth—page 120

ব্যারিস্টারি হল না। এ ছাড়াও আরও
অনেক পারিবারিক অশান্তি ঘটে গেছে। এমন
সময় দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার একটা আহ্বান
এলো। কিছু আইন সংক্রান্ত কাজও বটে, আর
কোনও কোনও ব্যবসাও সংশ্লিষ্ট ছিল। দক্ষিণ
আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের হাতে বারবার লাঞ্ছিত
ও অপমানিত হতে হয়। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি
এসবও ওঁর শরীরের উপর বর্ষিত হয়।
গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি করতে। দক্ষিণ
আফ্রিকার ভারতীয়দের অসম্মান ও অমর্যাদা
দেখে সেখানে মর্যাদা রক্ষার লড়াই শুরু করে
দিলেন। সে এক অভিনব সংগ্রাম। বহু ঘাত
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়ে সেখানকার
মানুষকে খানিকটা মেরুদণ্ড সোজা করে
দাঁড়ানোর পথে এগিয়ে দিলেন। আর তখন
থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল আত্মানুসন্ধান
কিছুটা নামও হল। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা
খবরাখবর ভারতবর্ষে এসে পেঁছেছিল
মহামতি গোখেল গান্ধীজীকে পুরো সমর্থ

করেছিলেন। তিলকের আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা জানাবার জন্য ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে গান্ধীজী সভা করেন। কোনও জায়গায় বেশী সমর্থন পান, কোনও জায়গায় কম। তখনও কিন্তু ইংরাজের ন্যায়নীতির উপর গভীর আস্থা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'Natal Indian Congress' স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি আশ্রমও করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'Boer War' যখন আরম্ভ হয় তখন ইংরাজের পক্ষে একটি 'Ambulance Corps' সংগঠন করেন। প্রথম 'বিশ্ব মহাযুদ্ধ' যখন হয়, তখনও ইংরাজের পক্ষ নিয়ে সেখানে সেবাকার্য করেছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পর ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই সূত্রে ভারতীয় নেতাদের সংগে ঘনিষ্ঠ হন।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের কোথায় বসবাস করবেন, তা স্থির করতে পারেননি। গুরুকুল দেখতে যান। আশ্রমের সকলে গুরুকুলে কিছুদিন থাকবার পর শান্তিনিকেতনে এসে থাকেন। শান্তিনিকেতনে থাকা সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজের কথায় বলেছেন,

'So they were first put in the Gurukul, Kangri, where the late Swami Shraddhanandji treated them as his own children. After this they were put in the Shantiniketan Ashram, where the poet and his people showered similar love upon them. The experiences they gathered at both these places too stood them and me in good stead.

রবীন্দ্রনাথের সংগে গান্ধীজীর সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে দুজনের মধ্যে মসিযুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক কোনও-দিন ম্লান হয়নি।

১৯১৫-এর ২৫ মে আমেদাবাদের কাছে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হয়। শুরুতে ছিল পুরুষ-মহিলা মিলে পঁচিশজন। কয়েক মাসের মধ্যেই গান্ধীজীকে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। এক 'অস্পৃশ্য' পরিবারের পিতা, মাতা ও কন্যাকে গান্ধীজী আশ্রমের পরিবারভুক্ত করে নেন। ফলে আশেপাশে চতুর্দিকে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। অস্পৃশ্যেরা এসে একসংগে খাওয়াদাওয়া করবে, থাকবে—এটা সেখানকার অধিবাসীরা সহ্য করতে পারলেন না। আশ্রমে সমস্ত প্রকার সাহায্যদান বন্ধ হল। অবস্থা এমন হল যে, আশ্রমের ব্যয়নির্বাহ করা যায় না। একদিন সকালে গান্ধীজী যখন শুনলেন যে, সেদিন আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না, উনি সংগে সংগে অস্পৃশ্য পল্লীতে আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর অবশ্য অযাচিতভাবে এক অপরিচিত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্থসাহায্যের ফলে তখনকার মত সমস্যার সমাধান হয়। এর পরে অবশ্য এখান থেকে আশ্রম উঠে গিয়ে সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হয়। সেখানকার ঘটনাও সুবিদিত। একটি গরু রোগযন্ত্রণায় ভুগছিল। সেই গরুটির বাঁচবার কোনও আশা ছিল না। ঔষধ প্রয়োগ করে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করা হল এবং ... চতুর্দিকে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জৈন সমাজের মধ্যে বাস করে এ যে কত বড় অপরাধ তা সুবিদিত। পুনরায় সমস্ত সাহায্য বন্ধ হয়।

গান্ধীজীকে বারবার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু যতই সংকট হোক, উনি হয়তো সাময়িকভাবে কাজ স্থগিত রেখেছেন, কিন্তু কোনওদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। সমস্ত জীবনব্যাপী যুদ্ধ করেছেন। যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে, সেইরূপ ঠিক সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে। বর্তমানে গান্ধীজীকে মহামানব বলে ঘোষণা করা হচ্ছে—পূজাপাঠও আরম্ভ হয়ে গেছে। ওঁর জীবনে কিন্তু কেউ কোনও অলৌকিক শক্তি দেখেনি। একজন সাধারণ মানুষ সাধনার দ্বারা কত দূর পৌঁছতে পারে, গান্ধীজী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওঁর বিষয় যত আলোচনা হতে আরম্ভ করবে, দেখা যাবে সাধারণ মানুষের যেসব দোষত্রুটি আছে, সেসব দোষত্রুটি নিয়েই সাধনা করে গেছেন। কোনও সংঘাতই ওঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে পারেনি। ওঁর পরিচয়ে কোনও দেবত্ব নেই। উনি মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষ যে সাধনার ফলে মহত্তোমহীয়ান হতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গান্ধীজীর দেহাবসানের পর জহরলাল বলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ আমরা—মাটি দিয়ে তৈরী ছিলুম। গান্ধীজী আমাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন। কি কারণে বা কাদের দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এক নিরস্ত্র অসহায় জাতিকে গান্ধীজী শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন। যে মানুষের ইংরাজের ন্যায় ও নীতির উপর শ্রদ্ধা ছিল অসীম, তাদের নিয়ে তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪২ অবধি নানা আন্দোলন করে ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বলেন (Quit India)। এই সময়ের মধ্যে যে কেবলমাত্র ভারতবাসীর মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল তা নয়, প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নিজের সঙ্গেও কম লড়াই করতে হয়নি। বর্তমানে 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর কথা উঠেছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেছে। এখনও ... সঠিক ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেনি। 'সর্বাত্মক বিপ্লব' না বলেও গান্ধীজী নিজের জীবনে সর্বপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। যখন শুরু করেছেন আন্দোলন, তখন আপোসহীন সংগ্রামের কথা মুখে একবারও উচ্চারণ করেননি, বরং মাঝে মাঝে আপোসও করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর শক্তিও কমেনি, ভারতবর্ষেরও অমর্যাদা হয়নি। দেখা গেছে যে, আপোসের পর ভারতবর্ষ অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে এবং গান্ধীজীর আদর্শের উপর বিশ্বাস এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এত বড় একটা জীবন, অথচ কোথাও অসাধারণত্ব নেই। এই মহাজীবন সাধারণ মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ে শক্তিশালী করে তোলে এবং এই পথেই মানুষের মর্যাদার প্রতি মানুষ আরও আস্থাশীল হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত **Essays and Letters : Bankim Chandra Chatterji** নামক গ্রন্থে জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরেজী চিঠির কিছুটা অংশ মুদ্রিত করেছেন। এঁরা এই পত্রাংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে ঐ চিঠির অংশটুকু উদ্ধৃত করলেও বঙ্কিমচন্দ্র কেন বা কি প্রসঙ্গে চিঠিটি লিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। অথচ শচীশবাবু তাঁর বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চিঠিটি লেখার হেতু এবং শচীশবাবুও কেনই বা তাঁর বইয়ে ঐ পত্রাংশটি উদ্ধৃত করেছেন, যে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছেন। এখানে শচীশবাবুর মন্তব্যসহ সেই পত্রাংশটি উদ্ধৃত করছি। শচীশবাবু লিখেছেন—

মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিতাও লিখিতে হইত। সেটা ইচ্ছাপূর্বক নয়—দায়ে পড়িয়া। একবার কলেজ রি-ইউনিয়ন মিলন সভায় পাঠোপযোগী একটি কবিতা লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরুদ্ধ হইয়া ছিলেন। অনুরোধ করিয়াছিলেন জগদীশবাবু।... বঙ্কিমচন্দ্র তখন মালদহে। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, জানাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তাহার পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াদিলাম। উদ্ধৃত করিবার আরও একটু কারণ আছে—বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে লিখিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পত্রখানি শেষ করিয়াছিলেন। উপদেশটুকু মূল্যবান। পত্রখানি ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল। আমি অনুবাদ না করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

Malda
The 30th December

My dear Jagadish,

You write that you would be glad, if I sent something for the Re-union. As I would do anything to make you glad, I immediately got down to write a poem for you. I received your note on the evening of the 28th. the past having been accidentally delayed for a few hours. I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning....

If I send it by to-morrow post you won't get it in time. So I think I must give up the idea of contributing to your pleasure.

But it strikes me that it may be some compensation to you for this and contretemps of khani * had an opportunity of reading his unfinished novel before the assembled friends at the Re-union. And I therefore post back his manuscript to-day. Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetoric and ornament. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should rewrite his book with reference to these remarks....

Yours affly
Bankim Chandra Chatterji

এই চিঠির খানি হলেন জগদীশবাবুর পুত্র খগেন্দ্রনাথ রায়। তিনিও কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে কলেজ রি-ইউনিয়নের সভায় যোগ দিতেন।

শচীশবাবুর বই থেকে জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে পত্রাংশটি এখানে উদ্ধৃত করলাম, এই পত্রাংশেরও আবার তৃতীয় প্যারার But it strikes থেকে post back his manuscript to-day পর্যন্ত দুটি বাক্য ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে বাদ দিয়েছেন।

মনে হয় ব্রজেনবাবুরা ভেবে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে লিখলেন, I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning, পরে আবার লিখলেন—I therefore post back his manuscript today.

অতএব রাত্রে ঘুম আসায় পরের দিন সকালের জন্য কবিতা লেখাই যখন রেখে দিলেন, তখন ঐদিন খানির উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার পাঠালেন কখন? কিন্তু তিনি তো ২৮শে সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর চিঠি পেয়েছিলেন এবং ৩০শে রাত্রে কবিতা লিখতে বসেছিলেন। ঐ ৩০শে তারিখে সেদিন রাত্রে তিনি চিঠিটিও লিখেছিলেন, সেইদিনই সারাদিনের কোন এক সময়ে খানির পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন।

শচীশবাবুর বইয়ে উদ্ধৃত চিঠিটিতে প্রথম প্যারার পর '...' চিহ্ন দিয়ে মূল চিঠির যে অনুদ্ধৃত অংশের কথা আছে, মনে হয় ঐ অংশে চিঠি পেয়েই কেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লিখতে আরম্ভ করতে পারেন নি, কাজের চাপে বা অন্য কারণে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কথা ছিল।

যাক্, যে কোন কারণেই হোক্, ব্রজেনবাবুরা কিন্তু তাঁদের বইয়ে ঐ দুটি বাক্য বাদ দেওয়ায় তাঁদের উদ্ধৃতিটা কিছুটা খাপছাড়া হয়ে গেছে এবং রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশটাও হঠাৎ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ব্রজেনবাবুদের বড় বইয়ে দু লাইন স্থান সংকোচ করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

লেখার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরনের উপদেশ দেওয়ার আর একটা কাহিনী এখানে বলছি। বঙ্কিম রচনাবলীতে নূতন লেখকদের প্রতি তাঁর যে উপদেশ আছে, এটা কিন্তু তা নয়। সে লেখা সকলেই পড়েছেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা মৌখিক উপদেশ দেওয়ার ঘটনা বলছি। বলছি, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা কাহিনী থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র কেদারবাবুকেই উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল, তা এই—

কনিষ্ঠা বা তৃতীয়া কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন। এর পর থেকে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার উপর স্বভাবতই তাঁর স্নেহ আরও অধিক বেড়ে যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যা কখন কখন তাঁর স্বামীর কর্মস্থলে থাকলেও অধিকাংশ সময়ই পিত্রালয়ে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের বিখ্যাত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের খুড়তুতো ভাই সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথও চরিত্রবান, ভদ্র ও বেশ গুণী ছিলেন। আর নীলাব্জকুমারীরও শ্বশুর বাড়িতে খুব আদর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতার নিকটে বলে প্রায়ই দ্বিতীয়া কন্যা ও জামাতাকে দেখতে যেতেন।

এই রূপ একবার গিয়ে ফেরার সময় ট্রেন ফেল করে বালী স্টেশনে যখন পায়চারি

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারী দেবী

করছিলেন, তখন পূর্বোক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কেদারবাবুর বাড়ি বালী স্টেশনের নিকটেই এঁড়িয়াদহ গ্রামে। তিনি সেদিন ঘটনাক্রমে সেই সময় বালী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কেদারবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে আগে দেখেছিলেন। তাই চিনতে পারলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের কিছুটা পরিচয় দিয়ে সাহিত্যরচনা সম্পর্কে তাঁর উপদেশ চাইলেন। কেদারবাবু তখন নবীন যুবক এবং সেই সবে সাহিত্য সেবা শুরু করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন উপদেশ হিসাবে কেদারবাবুকে বলেছিলেন—ও ইচ্ছা যদি থাকে খুব পড়, পুঁজি বাড়াও। এরপর বিতরণ সহজ হবে। Spectator পড়েছ কি? এডিসন, স্টিল, সুইফট এঁদের লেখা দেখো। সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো বোঝো তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে লিখো না। এক কাজ করো, নিজের গ্রামের আর আশপাশের পরিচয়—গল্প হোক্, কাহিনী হোক যতটা পার সংগ্রহ করে লেখাবার চেষ্টা করো। আগে সেইটা কর দেখি। দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না। নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না। স্টাইল? স্টাইল শেখাতে হয় না। যা নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোমার স্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেও না। তাতে দুকূল যাবে আমাদের সহেব হবার মত। ভাল শোনাবে বলে বেশী বিশেষণ ব্যবহার ক'রো না। ঠিক বাছাই চাই। একটিই যথেষ্ট।

জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে, কলেজ রি-ইউনিয়নে পড়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি কবিতার কয়েক স্তবক লিখে ছিলেন। পরে তিনি সেই কবিতাটি সম্পূর্ণ করেছিলেন কিনা জানা না গেলেও, তাঁর লেখা সেই কয়েক স্তবকও আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। চিরকালের জনাই সে লেখা নষ্ট হয়ে গেছে।

আর একটা কথা, ঐ বার কলেজ রি-ইউনিয়ন সভার জন্য কবিতা লিখে পাঠাতে না পারলেও, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়েই যখন কলকাতার আসেপাশে বা অদূরে থাকতেন, তখন কিন্তু তিনি নিজেই ঐ রি-ইউনিয়নে যোগ দিতেন। এইরূপ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলেজ রি-ইউনিয়নে এলে, সেইবারেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৫, আর বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৩৮।

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রথম দর্শনের কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন—

'তাঁহাকে যখন প্রথম দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটা বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়া

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় জামাতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন, কোন এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব। সেই ভরসায় আমাকেও মিলন সভায় কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন।

সেই সম্মিলন সভায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—তাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটা দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। লেখা পড়িয়া একদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে, সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল।

বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন। কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি ছিল না। এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব, তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রথম দর্শনের কথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেও তাঁর জীবন স্মৃতির এই কথাগুলিই প্রায় বলেছেন। তিনি লিখেছেন—'সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকত কুঞ্জে কলেজ রি-ইউনিয়ন নামক মিলন সভা বসিয়াছিল।...আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল।... সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহু-দিনের অভিলাষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু।'

এখানে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতির লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে—বালক রবীন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র না হলেও তবুও তাঁকে যে কলেজ রি-ইউনিয়নে কবিতা পাঠের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তার কারণ তখনই তিনি জ্ঞানী-গুণী সমাজে কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতির লেখায় যে চন্দ্রনাথ বসুর উল্লেখ করেছেন সেই সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসুও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম এই কলেজ রি-ইউনিয়ন সভাতেই দেখেছিলেন। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথবাবুও নিজে লিখেছেন—'কলেজ রি-ইউনিয়ন নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্ররা একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন।

আমি দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক ছিলাম।...অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যেমনভাবে অভ্যর্থনা করিতে ছিলাম, বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? শুনিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়াইয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন।

একটা কথা, বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে কলেজ রি-ইউনিয়নে বাগানবাটীতে আসতেন বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের ঐ বর্ণনা, কারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি ছিল না। তিনি এখানে এসে নিজের গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব সর্বদাই বজায় রাখতেন। সভায় যাঁদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন, তাঁরা ছিলেন জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি তাঁর কয়েক জন মাত্র বিশিষ্ট বন্ধু।

মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি খণ্ডিত ইংরাজী চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিটি শুধু খণ্ডিতই নয়, মাঝে মাঝে ছিন্নও। এটি আগে একজন তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করলেও, চিঠির প্রসঙ্গ কথা হিসাবে প্রায় কিছুই বলেন নি। তাই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করে কয়েকটা কথা বলছি। পত্রাংশটি এই—

Jajpur, Aug. 2, 1882

My dear brother,

I sent you a chit. Upto Balasore (144 miles south) I was comfortable. Between Balasore and Jajpur, I had to suffer a great deal....palm land....clothes thoroughly soaked. I could get nothing, except Biscuits. The minu has super-annuated and is discharging pus. The pain....severe but it has been miraculously relieved. Jajpur is a wretched place—no food of any kind except fowls, rice, flour....no.

Thieves are watching us.

.. ..

He always says that father had attained to a high sphere of spiritual wish.

Yours

Bankim Chandra Chatterji

এই চিঠির ইতিহাসটা হচ্ছে এই—বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। এ সম্পর্কে তখন ২রা আগস্ট তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল তা হল—

Appointed temporarily to have charge of Jajpur Sub-Division during the absence of leave of Babu Dwarka Nath Roy or until further orders.

বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে গিয়ে কয়েক দিন পরে সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠিটি লিখে ছিলেন। চিঠিটি ছিন্ন এবং খণ্ডিত হলেও পড়ে দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে যাওয়ার সময় পথে বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। জাজপুরে তখন ভাল খাদ্যের অভাব এবং চোরেরও উপদ্রব ছিল। আর কোন এক ব্যক্তি সর্বদাই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর পিতার অর্থাৎ যাদবচন্দ্রের উচ্চ ধর্মভাবের কথা বলতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় সপরিবারে বাসায় থেকে যখন আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়েই তাঁকে ঐ দুর্গম ও কষ্টবহুল জাজপুরে বদলি করা হয়েছিল। এই বদলি হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধু-দের কাছে বলতেন—এটা একটা সেলাম লঙ্ঘনের ফল। সেই সেলাম লঙ্ঘনের ব্যাপারটা এই—

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার জেম্স মনরো-ও তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন। মনরো বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনতেন। তিনি দেখলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে দেখেও সামনে এসে সেলাম করলেন না। ইচ্ছা করেই বাগানের অন্যদিকে বেড়াতে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মনরোর নির্দেশেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে বদলি হন। জাজপুরে পাঠাবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়েছিল, সেখানে ২।১ মাস থাকবেন, কিন্তু তাঁকে সেখানে থাকতে হয়েছিল ৭ মাস।

বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার একটি চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর এই জাজপুরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও চক্রান্ত ছিল। তিনি তখন কালীপ্রসন্নবাবুকে লিখেছিলেন—

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার

আত্মহত্যার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম, ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। ......সেই মন্ত্রণার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ। আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য।......

আমি যে কি জন্য বৈতরণী লেকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি, তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল, 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী' সে ব্যক্তি নিশ্চয় জানিত উড়িষ্যায় বৈতরণী পারেই যমদ্বার বটে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিমজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'ইচ্ছা ছিল, তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) চারিটি চিরশত্রুর পরিচয় দিব। বঙ্কিমচন্দ্র এই চারিজনের নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং বিশেষভাবে আদেশ করিয়া

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত বয়সে

গিয়াছেন যে, যদবধি তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, তদবধি তাঁহাদের নাম কোন মতে যেন প্রকাশ না হয়। এই চারিজনের একজনও এক্ষণে এ পৃথিবীতে নাই। তথাপি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইলাম। ইঙ্গিতে একটু বলিব।

রাধামাধববাবুর প্রসঙ্গ উল্লেখকালে জনৈক রায়বাহাদুরের নাম করিয়াছি। এই রায়বাহাদুর ছোট লাটের দপ্তরে একজন বড় চাকুরে ছিলেন। তাঁহার মুঠার মধ্যে সেক্রেটারি টমসন সাহেব ঘুরিতেন ফিরিতেন। এই টমসন সাহেব পরে ছোটলাট হইয়াছিলেন। উক্ত রায়বাহাদুর টমসন সাহেবের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে নানারূপে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বর্তমান ছিল।'

এই সঙ্গে শচীশবাবু নাম উল্লেখ না করেই বঙ্কিমচন্দ্রের আর যে তিন জন শত্রুর কথা বলেছেন, তাঁরা হলেন—একজন নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও দু'জন গবর্নমেন্টের বিশ্বস্ত কর্মচারী।

শচীশবাবু এখানে যে রাধামাধববাবু ও রায়বাহাদুরের কথা বলেছেন, এঁদের সম্পর্কে তাঁর বইয়ে অন্যত্র বলেছেন—

কলকাতায় ভবানীপুর নিবাসী এটর্ণি রাধামাধব বসু বঙ্কিমচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই রাধামাধববাবুর সঙ্গে ঐ রায়বাহাদুরের বিবাদ বাধলে বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে, ঐ রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর চির শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নবাবুকে যে লিখেছিলেন, 'ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে'—মনে হয় ঐ চক্রের প্রধান পান্ডা ছিলেন, এই রায়বাহাদুরই।

এখানে একটা কথা—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জাজপুরে আসা নিয়ে মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে এবং বন্ধু কালীপ্রসন্ন ঘোষের কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ জানালেও, এখানে এসে শেষ পর্যন্ত তাঁর কিছু উপকারও হয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি তাঁর সীতারাম উপন্যাসটি লিখবার সময় তাতে এক জায়গায় এখানকার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পেরেছিলেন। যেমন,—

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছ সলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নদী জলরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে, গিরি শিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত ধান্য বা হরিৎ ক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্বতারোহণ করি... পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে।'

উদয়গিরি, ললিতগিরি, স্বচ্ছসলিলা নদী, অগণিত তালবৃক্ষ, ধানের ক্ষেত সবই এখানকারই বর্ণনা। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামে যে উড়িয়া ভাষাও এক জায়গায় ব্যবহার করেছেন, সেও তাঁর এই জাজপুর বাসেরই ফল।

দ্বিতীয়তঃ এই জাজপুরে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন হীন একরূপ নির্জন পুরীতে থাকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রচুর ধর্মগ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং এরই ফলে তখন তিনি রেভারেন্ড হেস্টির সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে বা মসীযুদ্ধ লড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ খণ্ডিত ইংরাজী চিঠিটিতে কোন এক ব্যক্তির কাছে পিতার উচ্চ ধর্মভাবের কথা শোনার যে প্রসঙ্গ আছে, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এই জাজপুরেই এক তিব্বতী সাধুর কৃপায় প্রাণ হারিয়েও প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি তখন ঐ সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৮ বছর বয়স থেকে মৃত্যুর সময় ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত পরম ধার্মিকভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন। যাদবচন্দ্রের ঐ প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশ্চর্য কাহিনীটি নিয়ে একাধিক ব্যক্তি, যেমন—যাদবচন্দ্রেরই কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্র, যাদবচন্দ্রের পৌত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্কালংকার প্রভৃতি অনেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন। যাদবচন্দ্রের জীবনের সেই আশ্চর্য কাহিনীটি এই—

যাদবচন্দ্রের বয়স তখন ১৫।১৬। সেই সময় একদিন তিনি অশুচি বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে ঢুকলে তাঁর পিতা শিবনারায়ণ তাঁকে খুব তিরস্কার করেন। এতে যাদবচন্দ্র পিতার উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে এই জাজপুরে অগ্রজ কাশীনাথের কাছে চলে আসেন, কাশীনাথ তখন এখানে নিমকীর দারোগার কাজ করতেন।

কাশীনাথ সেকালের রাজদরবারের ভাষা পারসিতে সুপন্ডিত ছিলেন। যাদবচন্দ্র দাদার কাছে থেকে ভালভাবে পারসি শিখলেন এবং এইখানেই কিছু কিছু ইংরাজিও পড়লেন। যাদবচন্দ্র জাজপুরে দু-তিন বছর রইলেন।

এই সময় যাদবচন্দ্রের একবার কঠিন অসুখ করে। অসুখ আদৌ সারল না। শেষে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে,—মৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন লক্ষ্য করে, মৃতদেহ বৈতরণী তীরে শ্মশানে নিয়ে আসেন। চিতায় মৃতদেহ তুলবেন, এমন সময় তাঁর শ্মশান-বন্ধুরা দেখতে পেলেন, বৈতরণীতে একটি নৌকা দ্রুতগতিতে তাঁদের দিকে আসছে। নৌকো তাঁদের কাছে এল, নৌকা থেকে এক জটাজুটধারী সাধু নেমে মৃতদেহের কাছে গিয়ে বললেন—এ মরে নি। —এই বলে কি এক আশ্চর্য বলে যাদবচন্দ্রকে উঠিয়ে বসালেন।

যাদবচন্দ্র প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, দেখে সকলেই মহা আনন্দে তাঁকে বাসায় নিয়ে এলেন। সকলের অনুরোধে সাধুও সঙ্গে এলেন। কিছুক্ষণ পরে সাধু যখন চলে যাবেন, এমন সময় যাদবচন্দ্র সাধুকে বললেন—আমাকে যখন প্রাণই দিলেন, তখন দয়া করে আমায় দীক্ষাও দিন।

এরপর সাধু যাদবচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান—তোমার চারটি পুত্র হবে। তাঁরা সকলেই উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হবেন। তাঁদের মধ্যে একজন তোমার বংশকে অমর করবেন।

বলা বাহুল্য যে, সাধুর কথিত ঐ বংশ অমরকারীই হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে গেলে, কোন ব্যক্তির পক্ষে যাদবচন্দ্রের ধর্মজীবনের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রকে শোনানো যে মোটেই অসম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে এখন দু-একটা কথা বলছি—

আগেই বলেছি—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রও একজন ডেপুটি কালেকটার ছিলেন। তিনি ডেপুটি কালেকটার হিসাবে এক সময় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি

দামোদর মুখোপাধ্যায়—(শান্তিপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভাস রায়ের সৌজন্যে)

মহকুমার মাজনামুঠা পরগনায় জমি বিলি বন্দোবস্তের সময় সাধারণের প্রভূত উপকার করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদারও একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এক সময় মাস ছয়ের জন্য কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শ্রীশবাবু কাঁথি থেকে বীরভূম জেলায় বদলি হবার সময় একদিন কলকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। সেদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন—মাজনামুঠা পরগনায় সাধারণত সকল লোকই আপনাদের মঙ্গল কামনা করেন।
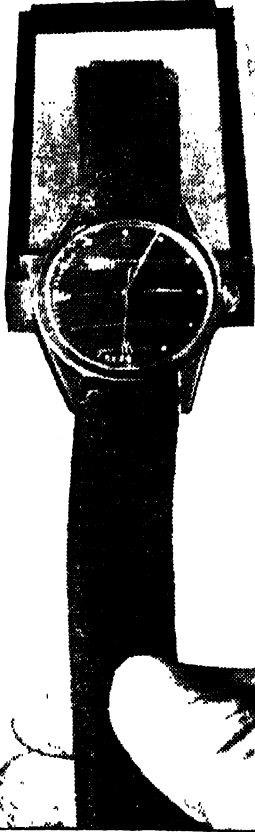
মাজনামুঠা পরগনায় যাদবচন্দ্রের উপকারের কথা স্মরণ করে যেমন সেখানকার বৃদ্ধেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, এবং প্রৌঢ় ও তরুণেরা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শুনে, শ্রীশবাবুর কাছে যাদবচন্দ্রের বংশের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করেছিলেন, ঠিক তেমনিই বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে গেলে, সেখানকার কোন ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর পিতার জাজপুরে ঘটিত ধর্মভাবের কাহিনীও শুনিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে দামোদর মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি উপন্যাস, নাটক ও ধর্মগ্রন্থ সব মিলিয়ে ২৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দামোদরবাবুর তিন খণ্ডে 'শুক্লবসনা সুন্দরী' উপন্যাসটি ইংরাজ লেখক উইল্কি কলিন্সের 'ওম্যান ইন হোয়াইট' গ্রন্থের অনুবাদ। এটি তাঁর একটি নামকরা বই।

দামোদরবাবুর 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহার ভাগ নিয়ে লেখা। আর তাঁর 'নবাব নন্দিনী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'-র অনুসরণে রচিত।

তিনি 'প্রবাহ মাসিক', 'অনুসন্ধান' পাক্ষিক এবং ইংরাজী 'নিউজ অব দি ডে' নামক দৈনিক পত্রেরও কিছুদিন করে সম্পাদক ছিলেন।

দামোদরবাবু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক হতেন। তাঁর একমাত্র কন্যার (একমাত্র সন্তানও বটে) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দামোদরবাবুর প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটি বলি—দামোদরবাবু তখন বহরমপুর কলেজে এফ-এ পড়েন। সেই সময়েই তিনি তাঁর 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসটি লেখেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এক ব্যক্তি দামোদরবাবুর কোন সহপাঠীর মুখ থেকে একথা শুনে উপন্যাসটি পড়তে চান এবং পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি দামোদরবাবুকে বলেন—পাণ্ডুলিপিটা এখন আমার কাছে থাক। আমি এটা নিয়ে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাব।

এরপর তিনি একদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেন—ওটা রেখে যান। আমি পড়ে দেখব। আগামী সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবেন।

পরের সপ্তাহে ঐ ভদ্রলোক গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেন—লেখাটা ভালই হয়েছে। তারপর যখন শুনলেন—লেখক একজন দরিদ্রের সন্তান, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—সে যদি এ বই ছাপাতে চায় তো বলবেন, আমিই সমস্ত টাকা দিয়ে দোব।

পরে এক সময় দামোদরবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে টাকা এনে 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। সেই থেকে ক্রমে নানা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দামোদরবাবুর সাক্ষাৎ হয়। এবং শেষে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়।

দামোদরবাবু অত্যন্ত স্বদেশভক্ত মানুষ ছিলেন। যেমন, বিদেশী চিনির সংস্রব আছে জেনে তিনি গুড় ছাড়া কোন মিষ্টান্ন খেতেন না।

তিনি বেশ সুরসিকও ছিলেন। বৈবাহিক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন, তবে তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। এইরূপ একবারকার একটা ঘটনা এই—

দামোদরবাবু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বসবার ঘরে ঢালা ফরাসের উপর বসে উপস্থিত সকলের সঙ্গে গল্প করছেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তো আছেনই, আরও কয়েকজন সাহিত্যিকও আছেন।

ঘরের বাইরে দরজার কাছে সকলের জুতো খোলা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শুঁড়তোলা তালতলার চটি জোড়াটাও সেখানে রয়েছে।

গল্প চলছে, এমন সময় দামোদরবাবু, ঘরের বাইরে দরজার কাছে যেখানে সকলের জুতো খোলা আছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন—পাশের কোথা থেকে বেশ খানিকটা জল গড়িয়ে আসছে এবং সেই জল গড়িয়ে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের শুঁড় তোলা চটিতে ঠেকছে। এই দেখে দামোদরবাবু সেই দিকে তাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করেই রসিকতা করে বলে উঠলেন—বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল রে! বঙ্কিমচট্টো ভেসে গেল!

বঙ্কিমচন্দ্র বাইরের দিকে তাকিয়েই বৈবাহিকের রসিকতাটা বুঝলেন। বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই বৈবাহিকের কথার উত্তরে বললেন—দামোদর মুখো হয়ে বুঝি?

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন, এমন কি দামোদরবাবুও।

দামোদরবাবুর 'শান্তি' উপন্যাসটির প্রথমার্ধ ১২৯৩—৯৫ সালের 'প্রচার' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। পরে এটি সম্পূর্ণ আকারে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। দামোদরবাবু তাঁর এই 'শান্তি' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর, স্বদেশ বৎসলগণের গৌরবকণ্ঠজ, কবিকুল-পুঙ্গব শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপবিত্র ও সমাদৃত নামে তদীয় একান্ত গুণপক্ষপাতী গ্রন্থকার কর্তৃক আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

বই বেরুলে দামোদরবাবু এই বই একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। বই পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন দামোদরবাবুকে লিখেছিলেন—

'......শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি তাহাতে দামোদর আমায় বঞ্চিত করিবেন না।'

এখানে বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমে 'দামোদর মুখো' কথায় দামোদর হল দামোদর নদ, আর শেষের চিঠির দামোদর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ক্রমশ

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ১৯ ॥
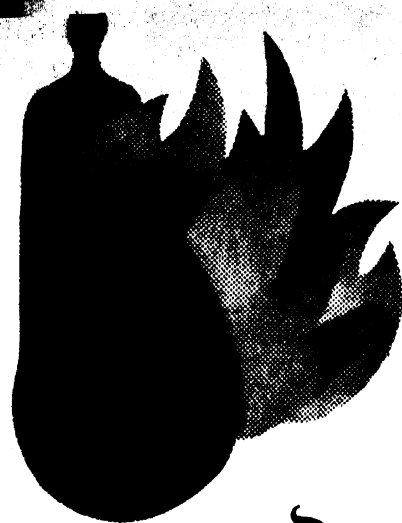
শুভ সংবাদটা দেবার জন্য চাঁদ বিবি " ফটিকির বাপ ও ফটিকির বাপ" বলে দাপাতে দাপাতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সাজ্জাদ নেই। সাজ্জাদরা তখন গয়ার বাড়ির গুয়াল বুড়ির আমবাগানে গিয়ে জড় হয়েছে। সাত-আটখানা গ্রামের মাতব্বররা এসে-জুটেছে। এবং জমায়েতে উত্তেজনা। কেউ বলছে, জান কবুল তবু কাল শালাগের খ্যালা হতি দেবো না। ঐ মাঠেই আমাগের জমায়েত করবো। কেউ এসে খবর দিচ্ছে বিশ্বেস-কুন্ডু-মাড়োবাবুরা লেঠেল এনে রেখেছে। আর ওদের পিছনে আছে মেন্দা। ওদের খেলা ভাঙতে গেলেই দাঙ্গা-কাজিয়া অব-ধারিত।

নিকিরিপাড়ার নাজিম, এ পাড়ার পীরু সরদার আর দারেপুরের দরাব মন্ডল এক মত যে কাজিয়া যদি বাধে বাধুক। লোক লেঠেল ওদেরও কম নেই। কিন্তু খালেক মুন্সী ঠান্ডা মাথার লোক। বদন-পুরির খয়রুল্লা মন্ডল বাছেরদিঘির লাবু শেখ, গরাণগড়ার নুর আলি, জটাগাছার সলিমুল্লা, আঠারোখাদার গর্জান গাজী ওরা কেউই কাজিয়া-দাঙ্গার দিকে যেতে চাইল না। তবে হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওরা একমত হল যে কাল জমায়েত শুধু নয় একটা পেল্লায় জমায়েত ডেকে ওদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ফুটবল ম্যাচ খেলাবার শয়তানী দিয়ে, আর মুরুব্বি লোকেদের গারদে পোরার ভয় দেখিয়ে চাষী-খাতকের দাবীকে গলা টিপে মারা যাবে না।

কালই জমায়েত করতে হবে ওদের শয়তানীর মুখের মত জবাব দেবার জন্য, সে বিষয়ে বৈঠকের সবাই এক মত। বশির যখন ওদের হাজত বাসের বর্ণনা দিচ্ছিল, কীভাবে তাদের রাখা হয়েছিল হাজতে, সেই নাপাকী পরিবেশে তারা নমাজ পর্যন্ত পড়তে পারেনি, তখনই উত্তেজনা চরমে গিয়ে দাঁড়াল। বশির চেষ্টা করেও গোলমাল থামাতে পারছিল না।

সাজ্জাদ উঠে দাঁড়াতেই একে একে দুয়ে দুয়ে সব চুপ করে গেল।

সাজ্জাদ বলল "আ'জ তুমরা ক্যান্ আইছ এখেনে? ফাটকের থে বের হয়ে আ'সে আমাগের চারখানা হাত গজায়েছে কিনা, তাই দেখতি? না, তার চাইতিউ বড় কোনও কাজ আছে কি না, তাই জানতি? কা'ল আমাগের কাজডা কী? লাঠি মারে কাদের কডা মাথা ফাটানো যায় তাই? না তার চাইতিউ বড় কোনও কাজ আমাগের আছে?"

সাজ্জাদের কথায় চাপা রাগ যেন বেরিয়ে আসছিল।

সাজ্জাদ বলল, "মুছলমানেরে লোকে যে গাঁড় মুখ্যু কয়, তা এই জন্যি। কোনডা কাম আর কোনডাই বা আকাম, ইডা বুঝার ক্ষামতা নেই। খালি লাফায়ে যায়ে লাঠি ধত্তি চায়।"

সাজ্জাদ চুপ করল। একটু থেমে বলল, "আমরা জমায়েত কা'ল করব। অ্যামন জমায়েত যা এদিকির লোক দ্যাখেনি। যে যার গিরাম ঝাঁটোয়ে যদি এই জমায়েতে আনতি পারো, তাতেই ওগের শয়তানির মুখির মতোন জবাব দিয়া হবে। আর বোঝাবো, হ্যাঁ তুমরাও মার দুধ খাইছিলে বটে। কী, কাল গিরাম খালি করে লোক আনতি পারবা সব?"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "পারবো।"

"অ্যাকেবারে মাথা ঠান্ডা রা'খে জমায়েত করতি তুমরা পারবা?"

"পারব।"

"চাষী খাতক নিজিগের বাঁচাবার জন্যি অ্যাক হতি পারবা?"

"পারব।"

সাজ্জাদ বলল, "তয় আমরা, চাষী খাতকেরা জমিদার আর মহাজনগের হাতের থে বাঁচার অ্যাকটা রাস্তা পাবো।"

"কিন্তু", সাজ্জাদ থামতেই দরাব বলে উঠল, "জমাতডা হবে কনে? ইশ্কুলির মাঠে তো ম্যাচ্ খ্যালবে।"

সাজ্জাদ বসে কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। কেউ বলল, গোহাটায় হোক। কেউ বলল, ওতে গোলমালের আশঙ্কা বেড়ে যাবে। কেননা গোহাটের কাছেই ইশকুলের মাঠ। ভিড় হাট ছাড়ায়ে খেলার মাঠে গিয়ে পড়বেই। তখন একজন বলল, তাহলে গাঙ-দিয়াড়ে যেখেনে পাট ওজন হয়, সেই দিকি হোক। বাদবাকী সকলেরই তাতে আপত্তি। জায়গাটা এ্যামন বড় নয়।

খালেক বলল, "এদিক ওদিক যাওয়ার কী দরকার? আমাগের ঈদগার মাঠেই জামা'তডা হোক না। লোক যদি অ্যামন বেশি আসে, ওর চারদিকিই তো মাঠ, জায়গার অভাব হবে না।"

"ঠিক ঠিক। খালেক মুন্সীর মাথা বড় সাফ।" সকলেই তারিফ করতে লাগল।

বশির উঠে বলল, "তা'লি, এই কথাই ঠিক থাকল তো? আপনারা সব ঈদগার মাঠে হাজির হবেন। উরা খ্যালা শুরু করবে চারডের সুমায়। আমরা তিনডের থে হাজির হতি শুরু করব। তা'লি এই কথাই ঠিক থাকল তো?"

সকলেই বলল, "হ্যাঁ ঠিক আছে।"

বশির বসতে না বসতেই খালেক উঠল। একটুক্ষণ চুপ করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"মুছলমান চাষী ও খাতক ভাইয়েরা, আমাদেরগে দেনার দায় আর খাজনার অত্যাচার থে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতি আগোয়ে যাওয়ার জন্যিই সাজ্জাদ মিয়া বশির মিয়ার ও আরউ সব ঈমানদার মুছলমানের ফাটক খাটার মতোন মুছিবতও পুহাতি হলো। ভাই মুছলমান চাষী ও খাতক আমরা যদি পিরতিজ্ঞে করি যে এর পিরতিকের আমরা করবই তা'লি ইন্‌শাল্লাহ্ কামিয়াব আমরা হবোই ক্যানো না আল্লাহ্ মালিক কোর-আনে কয়েছেন, "অইন্‌নাল্লা-হা লামায়াল্ মোহ্‌ছেনীন্। এর মানে হচ্ছে আল্লাহ নিশ্চয় নেক্‌কারগণের সঙ্গে আছেন। আর আল্লাহ্ এও কয়েছেন যে যাহারা আমার পথে জেহাদ করে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে আমার আপন পথ সকল অবশ্যই দেখাইব। ভাই আল্লাহ্‌র পথই ইছ্‌লাম। আর ইছ্‌লাম মানে শান্তি। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দেওয়া শান্তির পথে জেহাদ শুরু করি তাহলিই জানবা যে আমরা নেক্ কামই কত্তিছি। আর নেক্ কাম কত্তিছি বলেই আল্লাহ্‌ও নিশ্চয়ই আমাগের সঙ্গে আছেন। চলো ভাই মুছলমান চাষী ও খাতক আমরা আল্লাহ্‌র নামে নারা দিয়ে মহাজন ও জমি-দারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি।"

খালেকের কথা শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আল্লাহু আকবার।"

তারপর অতি উৎসাহ সহকারে যে যার গ্রামে চলে গেল। হঠাৎ বশিরের খেয়াল হল, তাই তো, গয়া তো আ'সে নি এই জমায়েতে। বিস্মিত হল সে। গয়া তো এমন তো কখনো করে না।

বশির সাজ্জাদকে বলল, "চাচা, গয়ারে দেখিছ?"

"গয়া?" সাজ্জাদ বলল, "না"।

"আজ যে আ'লো না অ্যাকবারউ?" বশির বলল, "ব্যাপারডা কী?"

"চল্‌দিন ওর বাড়িডা হ'য়ে যাই।" সাজ্জাদ বলল। "ফটিক আইছে।"

"তাই নাকি? তা'লি তো দ্যাখাডা কত্তি হয়।"

"চল, গয়ারেউ নিয়ে যাই।"

গয়ার বাড়ি গিয়ে দেখল বাড়িতে তালা মারা।

"এ যে দেহি তালা মারা!" বশির অবাক হল "কনে গ্যালো?"

সাজ্জাদও অবাক। "কিছু তো কয়নি আমারে।"

গয়ার নিকটতম প্রতিবেশী ইরফান মোল্লা বলল, "গয়া তো তার খুড়ীরি নিয়ে আজ সকালে শ্বশুর-বাড়ি চ'লে গ্যালো।"

সাজ্জাদ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকল। "শ্বশুরবাড়ি চ'লে গ্যালো! কা'ল আমাগের জমায়েত, আর গয়া শ্বশুরবাড়ি চ'লে গ্যালো! আমারে তো ক'লো না।"

বশিরের কানে একটু আগেই সোৎসাহে উচ্চারিত "আল্লাহ্ আকবর" ধ্বনি বেজে উঠল। ধ্বনি নয়তো যেন গর্জন। আর সেই সঙ্গে গয়ার কথাও মনে পড়ল, দ্যাখ বশির, আমাগের আন্দোলন খাতক আর চাষীর আন্দোলন, কৃষক ও প্রজার আন্দোলন। এর মধ্যে হিন্দুউ থাকবে মোছলমানও থাকবে। কিন্তু তুরা ইডারে কেরমেই মোছলমানের আন্দোলন ক'রে তুলতিছিস। এর ফল ভালো হবে না।

"আল্লাহু আকবর।"

সাজ্জাদ আর বশির দেখল, তাদের গ্রামের ছোট একটা দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে কালকের জমায়েতে সবাইকে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে বেড়াচ্ছে।

গয়ার কথা ভেবে হঠাৎ বশিরের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গয়ার জনশূন্য নিস্তব্ধ বাড়িটা দেখে বশিরের কেমন গা ছম ছম করে উঠল। রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ভঁক ভঁক করে মাগরোর মটোর বেরিয়ে গেল। ধুলো থিতুলে ওপারের বাড়িগুলো আবার প্রকট হয়ে উঠল। ওপারে সব হিন্দুর বাড়ি। বশিরের ছোটবেলায় এ পাড়াটা গোটাই হিন্দু পাড়া ছিল। মটোরের রাস্তা বেরোবার সময় হিন্দুগের পাড়ার কিছুটা রাস্তার মধ্যেই পড়ে যায়। তারপর থেকে হিন্দুরা এপারের ভিটে জমি ছেড়ে ওপারে উঠে যেতে থাকে। এক গয়াই গোঁয়ারের মত এদিকেই থেকে গিয়েছিল। আজ তার বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে বশিরের।

"চল চাচা। হয়ত জরুরী কোনো কাজে শ্বশুর-বাড়ি দোড়তি হয়েছে গয়ারে।" বশির নিজেকেই প্রবোধ দিতে লাগল। "কাজ সা'রেই আবার ফিরে আসবেনে। না আ'সে যাবে কনে? গয়া কি আমাগের ছাড়ে থাকতি পারবে?"

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরেই দেখল আবু তালেব ফটিকের সঙ্গে গল্প করছে।

বশির আর সাজ্জাদকে দেখে আবু তালেব চৌধুরী সালাম জানালেন। তারপর বশিরকে বললেন, "আরে ভাই, আপনি ছেলেন কনে, তামাম গিরাম আপনারে খুঁজে বেড়াতিছি। খবর আছে।"

ফটিক চৌকিটা ওর বাপ, আবু তালেব আর বশিরকে বসতে ছেড়ে দিয়ে নিজে টিনের সুটকেসটার উপর বসে পড়ল। সাজ্জাদ পাট বের করে নেবার পর থেকে আর ছাওয়ালের ঘরে ঢোকেনি। ঘরখানা ছিমছাম। দেখে মনে হল, সে বুঝি অন্য কারো বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। ছাওয়ালের ফুলকাটা বিছানার উপর বসতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

চাঁদবিবি সাজ্জাদকে বউ যে পোয়াতি হয়েছে, সে খবরটা দেবার জন্য হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু সাজ্জাদকে কিছুতেই কাছে পাচ্ছে না। আজকাল কী যে হইছে মন্দর, সব সুমায় সঙ্গে লোক, সব সুমায় সঙ্গে লোক। একটুও অ্যাকা পাওয়ার উপায় নেই।

মানুষ যে দুটো অ্যাকটা জরুরি কথা কবে তার জো নেই। চাঁদবিবির দম বন্ধ হবার জো হল।

আবু তালেব চৌধুরী বললেন, "খবর আছে। ভালো খবর। কাল সারাদিন যশোরে থাকে, বিস্তর কাজ ক'রে আইছি। কাল সকালেই ছৈয়দ ছাহেবের সংগে দেখা করে আপনাগের সব বিত্তান্ত তাঁরে কই। তিনি সব শুনে ডি এমরে অ্যাকখানা চিঠি লিখে দ্যান। সেই চিঠি নিয়ে ডি এম-এর সংগে দেখা করি। তিনি সংগে সংগে বিনাশর্তে আপনাগের উপরের থে কেস তুলে নিতি এস ডি ও-রে হুকুম দ্যান আর আপনাগেরে কার নালিশির উপর গ্রেপ্তার করা হয় আর আপনাগেরে জামিনি খালাস না দিয়ার কারণ কী তা তদন্ত করার ভার একজন ডি এস পি-র উপর তৎক্ষণাৎ দিয়ে দ্যান। জনাব আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী ছাহেব কাল সন্ধ্যের সমায় ঝিনেদায় আ'সে পৌঁছয়ে গেছেন। তিনি কাল দুপুরির মটোরে ছৈয়দ ছাহেবের সংগে এখেনে পৌঁছবেন।"

বশির উত্তেজিতভাবে বলল, "খবর তো সবই ভালো। এদিকি আমরাউ তৈরি। এই ইউনিয়নের সব কটা গিরামের লোক আসবে।"

"লোক বাইরির থেও আসবে।" আবু তালেব বললেন। "আপনাগের যে হাজতে পুরে বেইজ্জত করিছে আর তা যে শুধু শুধু না, কৃষক প্রজা আন্দোলনরি কাবু করার জন্যি, ইডা খুব রটে গেছে। তার ফলে শাপে বর হয়ে গেছে। অনেক লোক জমা হবে। তা জমায়েতের জায়গাডা হবে কনে ?"

"আমাগের ঈদগায়।" বশির বলল। "তার চাব পাশেই খেত। অ্যাখন ফসলও কিছু নেই। কাজেই লোক ধরবে বেশ।"

"খুব ভালো, খুব ভালো।" আবু তালেব খুব উৎসাহ দেখালেন। "ইডা ভালোই করিছেন। অ্যাখন অ্যাকটা কথা। ছৈয়দ ছাহেব আর বোকাইনগরী ছাহেবের মতোন দুইজন জনদরদী নেতারে অ্যাক সংগে পাওয়া খুবই খুশ-নছিবির ব্যাপার। এই গিরামে খাতির যত্ন করার লোক অনেক আছে ঠিকই, কিন্তু এইসব লীডারগেরে নিয়ে তুললি গিরামের এবং লীডারগের ইজ্জত রক্ষা হয় অ্যামন বাড়ি এই গিরামে কার আছে ?"

ফটিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ সে বলে বসল, "কেন, গরিব এবং খাতকদের বাড়ি উঠলে কিম্বা তাদের কাছ থেকে খাতির যত্ন পেলে কি এইসব লীডার তাঁদের ইজ্জৎ হানি হবে বলে মনে করবেন ?"

সাজ্জাদ ছাওয়ালের কথা শুনে খুশিই হল। বড় জবর সওয়াল করিছে ছাওয়াল। অ্যাঁ। আসতিছ চাষী খাতকের উদ্ধার করতি, তা খাতির দেখাতি তুমারে কি নিয়ে তুলতি হবে মেন্দাগের শাবানা মঞ্জিলি ?

আবু তালেব ফটিকের এই সাফ সওয়ালে মুহূর্তের জন্য বেকুব বনে গেল। তারপর নিজেই হেসে ফেলল।

বলল, "কথাডা আপনি ঠিকই তুলিছেন। দোষ লীডারগের নয়। দোষডা পুরো আমারই। আমার কথাডা ঐভাবে কওয়াডাই ভুল হইছে। মাফ করবেন ভাই। আসলে আমি কতি চাইছিলাম, ওগের বয়েস হইছে। উরা একটু আরাম করে বিশ্রাম নিতি পারেন, অ্যামন কোন্ বাড়ি এই গিরামে আছে।"

ফটিকের মুখেও হাসি দেখা দিল। বলল, "আপনার এই কথাডা খুবই ন্যায্য।"

"জায়গা আছে। জায়গা আছে।" সাজ্জাদ ধীরে ধীরে বলল। "এই গিরামে নেতা আসুক, মুরুব্বি আসুক, পীর আসুক, মৌলভী আসুক এস ডি ও আসুক, সবারই খাতির পাওয়ার জায়গা তো ঐ মেন্দাগের শাবানা মঞ্জিল। ওগের মেহমান্দারির সুখ্যাত্ সগলেরই মুখি। কিন্তু ওগের মেহমানদারি যতই ভালো হোক, আমাগের কৃষক-প্রজা নেতা শয়তান জমিদারগের বাড়ির থে বেরোয়ে জমায়েতে যায়ে কবেন জমিদারগের উচ্ছেদ চাই, ইডা তো ভালো দ্যাখায় না। না কি কন্ ?

"সে তো বটেই সে তো বটেই।" বশির এবং আবু তালেব একসংগেই বলে উঠলেন।

"তাই আমি কই কি, শাবানা মঞ্জিলির মতোন অত আরাম না পালিউ, এনাগেরে আমার বিয়াই হাজী ছাহেবের বাড়ি তুলতি পারি।" সাজ্জাদ ফটিককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কও বাপ ?"

ফটিকের এসব আলোচনায় জড়াবার ইচ্ছে ছিল না। বাপের কথাতেও সে লজ্জা পেল। তার বাজান এমনভাবে তার সম্মতি চাইছে যেন সেই ও বাড়ির মালিক।

তবু সে বাপের কথায় সায় দিল।

বলল, "হ্যাঁ, ও বাড়িতে ব্যবস্থা হতে পারে। তাহলে আজই খবর পাঠাতে হয়।"

আবু তালেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বশির বলল, "খবর আমি পাঠায়ে দিবানে।"

আবু তালেব বললেন, আরউ অ্যাকটা কাম করে আইছি। এই জমায়েত যাতে কেউ বন্ধ করতি না পারে, তার জন্যি আমি এস ডি ও-র পারমিশন নিয়ে রাখিছি।"

তারপর আবু তালেব বললেন, "এই জমায়েতডা সব দিক দিয়েই ভালো হবে বোঝলেন। অ্যাখন তো ইলেকশানের তোড়জোর হতি চলিছে, এরই মুখি আমাগের জমায়েতডা প্রজাশক্তির অ্যাকটা নমুনা হয়ে থাকবে। বোকাইনগরী আর ছৈয়দ ছাহেবের দিয়ে এ জমায়েতে বলাতি পারাডাউ আমাগের পক্ষে অ্যাকটা বড় কাজ হয়ে থাকলো। প্রজা পারটির ক্যানডিডেটের পক্ষে একটু আগোয়ে থাকা গ্যালো আর কি। ক্যান না, আমাগের বিরুদ্ধ ক্যানডিডেট যথেষ্ট মালদার লোক।"

বশির জিজ্ঞেস করল, "আমাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইছেন কিডা ?"

আবু তালেব কললেন, "ডিসট্রিক্ট বোরডের ভাইস চিয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্দকার ফজলুর রহমান।"

ফটিক বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা। এই সীটে বুঝি উনি দাঁড়াচ্ছেন ?"

আবু তালেব কললেন, "জে হ্যাঁ। নবাব নাইট খান বাহাদুর খান ছাহেব এইসব খয়ের খাঁগেরে হটাতি না পারলি কৃষক-প্রজা-খাতক এগের উন্নতির কোনও আশা নেই।"

বশির কলল, "যাই হাজী বাড়িতি খবর পাঠায়ে দিই গে। যদি কন তো ঝিনেদার মটোরে হাজী ছাহেবরেউ খবর পাঠাই উনি যান কাল চ'লে আসেন।"

সাজ্জাদ কলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সিডা হলি তো সব চাইতি ভালো হয়। আর তুমি বাপ," সাজ্জাদ ফটিককে বলল, "কালকে থাকে যাও। পরশু সকালের দিকি না হয় চ'লে যায়ো। আসল কথা কি জানো এত বড় বড় নেতা আসতিছেন, আমরা মুখ্যু সুখ্যু, চাষাভুষো লোক। ওগের সংগে তো কথা কতি পারবো না। আর উরাউ আমাগের সংগে কী বা কথা কবেন।"

বশির কলল, "ঠিক কথা। এই গিরামের ক্যান, আশেপাশের গিরামের মুছলমানগের মধ্যিও ফটিক ভাইর মতন ল্যাখা পড়া জাননেওয়ালা আর কেউ নেই।"

"উকিলউ না।" সাজ্জাদের কথার মধ্যে এই প্রথম ছেলের জন্য তার যে গর্বের ভাব প্রকাশ পেল, সেটা ফটিক লক্ষ্য করল। এবং তার ভালো লাগল।

আবু তালেব জিজ্ঞাসা করল, "ভাই আপনার সংগে ছৈয়দ ছাহেবের আলাপ নেই ?"

ফটিক বলল, "জে, না।"

"তা ভালোই হ'লো," আবু তালেব কলল, আপনার সংগে ও'র আলাপ হয়ে যাবেনে। যশোরে ছৈয়দ ছাহেব একচ্ছত্র লীডার। ওর সংগে আলাপ করে রাখা ভালো।"

ফটিক সসংকোচে বশিরকে বলল, "তাহলে তোমাকে আরও একটা কাজ করে দিতে হবে বশির ভাই। আমি আমার মুহুরিবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠিখানা হাজী ছাহেবের হাতে দিয়ে তাঁকে বলতে হবে উনি যেন সেখানা আমার বাড়িওয়ালা মৌলভী জয়নুদ্দী ছাহেবের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। হাজী ছাহেবকে এও বলে দিতি হবে যে আমি পরশু ফিরব।"

হরি মুহুরিকে ফটিক লিখে দিল ওর ফিরতে তিনদিন দেরী হবে। উনি যেন সব সামাল দিয়ে রাখেন। আবু তালেবের একটা কথা ফটিকের খুব মনে ধরেছে। সৈয়দ ছাহেবের সংগে আলাপ করে রাখা ভালো।

বশিরের সংগে সাজ্জাদও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। ওকে এখন হাটখোলায় গিয়ে বসতে হবে। মাতব্বর যারা আসবে তাদের আবার জমায়েতে লোক আনার কথা মনে করে দিতে হবে। সবাই যেন যে যত পারে তত লোক নিয়ে আসে জমায়েতে। সুদ আর খাজনা কমাবার দাবি তুলবে তারা। একথা সবাইকে বলে দিতে হবে। হিন্দুরা কেউ আসবে না। এমন কি যে হিন্দু চাষী ও খাতক তাদের মতোনই গরিব, জমিদার মহাজন বাকি খাজনা আর সুদ আদায়ের জন্য যাদের গলায় গামছা আর বুকে বাঁশ ডলা দিতে কসুর করে না, সেই তারাও সামিল হবে না এই জমায়েতে। কেন না তাদের চোখে, গয়া বারবার করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, এটা শুধু মুছলমানের আন্দোলন। কোর-আনের আয়েত আউড়ে তাদের জমায়েত শুরু হয়। শেষ হয় মোনাজাত করে। গয়া প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সভা যদি এই ভাবে শুরু আর শেষ হয়, তাহলে হিন্দু খেয়েস্তান মন খুলে সে জমায়েতে যোগ দেবে কি করে ? সাজ্জাদ হ'লো মোল্লার ঘরের রাম ছাগল। প্যাটে এলেম নেই এক দানা। তার বাপ কেরামত মোল্লার যেমন এলেম ছিল, তেমনি ছিল মান। তার যখন দু বছর বয়েস তখন বাপ গেল মারা। মোল্লার ছাওয়াল প্রথমে হ'লো মুখ্যু রাখাল, তারপর সারা জীবন ধরে চাষাই থেকে গেল। তবে সে ঈমানদার মুসলমান। নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। ইছলাম ধর্মের আহকাম শরা আটটা, যথা ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম, মকরুহ ও মোফসেদ, এসব মেনে সে চলে। তাই গয়ার কথায় সে বিশেষ গুরুত্ব দিত না। সে নিজে এর মধ্যে কিছু দোষের দেখতে পেতো না। এবং গয়ার মত ছাওয়াল এতে কেন আপত্তি করে তা সে বুঝতে পারত না। কারণ গয়া ছিল তার কাছে সাচ্চা হিন্দু এবং তার ছাওয়ালের চাইতেও বেশী।

গয়া বলত, চাচা প্রজা-খাতক আন্দোলনের বাইরির চিহারাডাউ যদি শুধু মুছলমানের মতোন হয়ে দাঁড়ায় তবে অনেকেই ভুল বুঝে বা বিরত হবার ভয়ে সরে দাঁড়াবে। তাহলি কিন্তু কোনোদিনই এর গুড়া শক্ত হবে না। ফলে আজ আমরা যা দাবি করতিছি কোনোদিনউ তা আদায় করতি পারবো না। আমাগের পিঠে ভাগ করতি চিরকাল উরাই, ঐ জমিদার মহাজনরাই আসবে আগোয়ে যাগের আমরা সরাতি চাতিছি। ভাগের নিক্তি সব সুমায় ঐ জমি-দার মহাজনদের হাতেই ধরা থাকবে। তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন। পিঠের ভাগ আমরা চাষী খাতকরা আর কখনোই পাব না। গয়ার কথায় ওরা কেউই কান দেয়নি। ওকে অনেকে সন্দেহ করেছে। অপমান করেছে কেউ কেউ। কিন্তু গয়া ওদের সংগেই থেকেছে এতদিন। আজ গয়া নেই। সারাদিন খচ্ খচ্ করেছে সাজ্জাদের মনটা। কাল জমায়েতে থাকবে না গয়া। এখন সাজ্জাদের মনে হচ্ছে, সত্যিই এত বড় জমায়েতডা শুধু মুছলমান চাষী-খাতকের জমায়েতই হবে। পুরো প্রজা-খাতক জমায়েত তো হবে না ঠিকই।

তালি আমাগেরই কি কোনও ভুল হতিছে ? এই প্রথম সাজ্জাদের মনে এই প্রশ্ন গভীরভাবে রেখা-পাত করল।

বশির বলল, "ও চাচা, যাবা না ? বাস আসার সুমায় যে হয়ে আ'লো ?"

"অ্যাঁ, তাই নাকি!" সাজ্জাদ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। "চল চল, শিগগির চল।"

সাজ্জাদ বেরোতে যাবে চাঁদ বিবি রান্নাঘর থেকে চাপা স্বরে ডাকতে শুরু করল, "ও ফটিকির বাপ, ও ফটিকির বাপ, এদিকি শুনে যান। কথা আছে। কথা আছে।"

"রাখ তোর কথা!" সাজ্জাদ বিরক্ত হল। "বাড়ি আ'সে শুনবানে। অ্যাখন তাড়া আছে।"

সাজ্জাদ আর বশির বেরিয়ে গেল। ফটিক আবু তালেবের কাছ থেকে প্রজা আন্দোলনের ব্যাপারে

এটা-সেটা জেনে নিতে লাগল। এবং ভূমি সমস্যা বিষয়ে আবু তালেবের পরিষ্কার ধারণা দেখে ফটিক সত্যিই রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

আবু তালেব বলল, "বাংলাদেশের রাজনীতির মূলে কথাডাই হ'লো ভূমি সমস্যা। জমিদারগের গিরাসের থে জমি নিয়ে যদি চাষীগের হাতে দিয়ে না দিয়া যায় তাহলি জমিরউ উন্নতি হবে না, আর চাষীগেরউ দুর্গতি ঘোচবে না। আপনারে অ্যাকটা হিসেব দিই তালি বোঝবেন আ'জ বাংলাদেশের আসল সমস্যার চিহারাডা কী? বাংলাদেশে খাজনাভোগী পরিবার, যাগের কেউ জমিদার, পত্তনিদার, লাটদার, গাঁতিদার, নানা নামে এ'রা নানা জায়গায় ছড়ায়ে আছেন। ইনাগের সংখ্যা হচ্ছে ছয় লাখ। তা ইনাগের বেশীর ভাগই হচ্ছেন পুঁটিমাছ। রাঘব-বোয়াল হচ্ছেন মাত্তর দশ-এগার জন। বর্ধমানের মহারাজাই বাংলাদেশের সব চাইতি বড় জমিদার। ত'ার জমিদারীর সালিয়ানা আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রকিশোর, নাটোর, ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য নসিপুর, দীঘাপাতিয়া, পুঠিয়া, করটিয়া, এই কটা পরিবার মিলে মোট রাজস্বের কম বেশী তিন ভাগের একভাগ রাজস্ব সরকাররে দ্যান। বাংলাদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রতি বছর চাষীগের কাছ থে যে খাজনা আদায় করেন তার পরিমাণ সাড়ে ষোল কোটি টাকা। তার মধ্যি সাড়ে তিন কোটি টাকা ত'ারা সরকাররে খাজনা ও সেস্ দ্যান, আর জমিদারির ঠ'াঠ বজায় রাখার জন্যি আমলা-ফয়লা ইত্যাদি বাবদ খরচ করেন পিরায় তিন কোটি টাকা। তাহলি দ্যাখেন কোনও মূলধন না খাটায়েই এনারা মুনাফা করেন বছরে দশ কোটি টাকা।"

"দশ কোটি টাকা!" ফটিক থ হয়ে বসে রইল।

"জে হ্যাঁ, দশ কোটি টাকা।" আবু তালেব বলল। "আর এ হিসেবে তো সুজা পথে টাকা আদায়ের। চাষীর কাছ থে নানা ছুতোয় বাড়তি আদায়ের হিসেব এর মধ্যি ধরা নেই। ইবার দ্যাখেন আরউ পরিষ্কার অ্যাকটা ছবি। ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের সালিয়ানা আয় হ'চ্ছে দশ লক্ষ টাকা। এই পরিবারের পোষ্য সংখ্যা কত, তা জানেন? মাত্র দশ-বার জন। অর্থাৎ বছরে ত'াদের প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় হতিছে প'চাওর হাজার টাকা। সেই সুমায় বাংলাদেশের চাষীর মাথাপিছু উদ্বৃত্তের পরিমাণ হতিছে মাত্তর ছয় টাকা।"

"বলেন কী!" ফটিকের চোখের সামনে আবু তালেব যেন এক টানে দেশের জানালাটা খুলে দিল।

"বাংলাদেশের চাষীর উদ্বৃত্ত থাকে মাথাপিছু বছরে ছয় টাকা!"

আবু তালেব বলল, "আসলে উদ্বৃত্ত কিছুই নেই। আছে ঋণ। ক্যাকস ঋণের বোঝা। ঐ যে উদ্বৃত্তের যে হিসেবডা দিলাম, সে হিসেব কষিছেলেন বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি। উডা ১৯২৯-৩০ সালের ঐ কমিটির রিপোরটেরই হিসেব। সাধারণত যাগের পনেরো বিঘে জমি আছে পরিবারের লোকসংখ্যা প'াচজন তাগেরই আয়ব্যয়ের হিসেব কষে অনেক কসরত ক'রে ঐ উদ্বৃত্ত বের কত্তি হয়েছে।"

আবু তালেব হাসল।

বলল, "আমিউ চাষীর ছাওয়াল, আপনিউ চাষীর ছাওয়াল, আমরা দুজনেই জানি বাংলাদেশে কজন চাষীর পনেরো বিঘে ক'রে জমি আছে। আর কডা চাষীর, বিশেষ করে মুছলমান চাষীর পরিবারের লোকসংখ্যা প'াচজন। জমি কম, মুখ বেশী, অ্যামন চাষীই বেশী। শতকরা ছেষট্টি জনেরই বেশী চাষীর জমি অ্যাক বিঘের থে বারো বিঘের মধ্যি। উদ্বৃত্ত থাকবে কন্ থে? বরং উলটো। আছে দেনা।"

আবু তালেব বলল, "বাংলাদেশে এখন কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে দুই শত দশ কোটি টাকা—এর উপর আছে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদির বোঝা।"

"বাংলার চাষী যে আজও বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য!"

আবু তালেব বলল, "অবিশ্যি আপনি যদি ইডারে ব'াচা কন।"

চাদ বিবি ঘরে একটা লণ্ঠন জেবলে আনতেই ফটিকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ফটিক নিমগ্ন হয়ে ভাবছিল। আবু তালেব অনেকক্ষণ হ'ল চলে গিয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্য, তার তথ্য তোলপাড় করে তুলেছে তাকে। চাষীর দেনার দায় পরিবারের প্রত্যেকের মাথায় এখন একশ টাকা। আর এই দেনার বেশীর ভাগটাই এসে চেপেছে মুছলমানদের ঘাড়ে। কেন না বাংলায় মুসলিম চাষীর সংখ্যাই বেশী। কোথায় তারা এত টাকা পাবে যে এ দেনা শোধ দেবে? পাট! তাই এদের এত পাট বোনার ঝোঁক। পেটের খোরাক থাক বা না থাক বাংলার চাষীকে পাট বুনতেই হবে। দাদনে ঋণে আষ্টেপৃষ্ঠে যে কঠিন ব'াধনে জড়িয়ে পড়েছে তার ফ'াস খোলার একটা মন্ত্রই ওরা জানে, পাট বোনা। দেখছে এ মন্ত্রে আর কাজ হচ্ছে না, বরং নতুন ফ'াসে জড়িয়ে পড়ছে, তবু পাট বুনছে।

চ'াদ বিবি দেখল ছাওয়াল কী য্যান ভাবতিছে। সাড়া শব্দ দিল না। তার সব কাজ হয়ে গেছে। এই সুমায়ের থে ফটিকির বাপ রাত্তির বাড়ি আসে খা'য়ে নিয়ার সুমায় পর্যন্ত কুনু কাম থাকে না চ'াদ বিবির। বড় অ্যাকা লাগে, বড় ফ'াকা লাগে তখন। আজ ছাওয়াল বাড়ি আইছে তাই হারিকেন জ্বালায়ে ছাওয়ালের সঙ্গে কথা কতি আ'লো। না হলি সে তো লণ্ঠন জ্বালায়ই না। কুপি জ্বালায়ে হা'ড়নের উপর বসে থাকে। ছাওয়ালের কথা মনে হয়, কত কথা মনে পড়ে।

বউডার কথা মনে হয়। কেমন ছম ছম করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতো বিটি। সারাদিনই হয় ইডা কত্তিছে নয় উডা কত্তিছে। তার কত কাজ করে দিত বউ। ক'াকই চালায়ে মাথার জট ছাড়ায়ে দিত। চুলি ত্যাল মাথায়ে দিত। আম্মাজান আম্মাজান ক'য়ে কত ডাকত। সেই বিটি অ্যাখন মা হবে। আল্লাহ্! ফটিক, তার সেই ছোট ফটিক বাপ হবে। আল্লাহ্। হঠাৎ চাঁদ বিবির দুশ্চিন্তা হল। বিটির উপর কুনু বদ্ দোওয়া যাতে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করা হইছে তো?

খুব আস্তে করে চ'াদ বিবি ডাকল, "ফটিক! বাপ!"

দশ কোটি টাকা! চাষীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যখন ঋণগ্রস্ত এবং সেই ঋণের পরিমাণ খাতকদের পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু যখন একশ টাকা, তখন কিছুমাত্র মূলধন বিনিয়োগ না করেই বাংলার জমিদারদের নীট আয় বছরে দশ কোটি টাকা! ফটিকের বিস্ময় ক্রমশই বাড়ছিল।

আর এই যে বিপুল অর্থ জমিদারগের হাতে আসে তা কী ভাবে খরচ করেন ত'ারা? আবু তালেব প্রশ্ন করেছিলেন।

জমির উৎপাদন বাড়াবার জন্যি ব্যয় করেন? প্রশ্নও আবু তালেবের।

না। জবাবও আবু তালেবের।

চাষীরা যাতে খরার সুমায় জল পায়, হাজার সুমায় মাঠের জল যাতে বেরোয়ে যায় তার জন্যি এস্টেটের থে সেচ দেওয়া বা খাল কাটার জন্যি খরচ করা হয়?

না।

তবে কি এই টাকা জমিদার হুজুররা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে লাগান?

না।

তবে?

এই প্রশ্নটা বুলেটের মত বিদ্ধ করেছিল ফটিককে। তবে! এ টাকা যায় কোথায়!

অনেক দিন আগে, ফটিক যখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছিল, বয়কট, চরকা, এসব নিয়ে মেতে উঠতে উদ্যত হয়েছিল, তখন দেওয়ান বাড়ির মেজোবাবু তাকে যে কথাটা বলেছিলেন, আজ তা মনে পড়ল 'দ'র। ফটিক হুজুগে মেতে কোনও কিছু করো না। এমন কি দেশের কাজও নয়। তাতে দেশের কোনও মঙ্গল হয় না। কেন না হুজুগটা তাড়াতাড়ি চলে যায় কিন্তু দেশটা চিরকাল থাকে। বর্জনে দেশের লোকের মঙ্গল করা যায় না। লোকের মঙ্গল হয় নির্মাণে। তাই আমি মনে করি তোমার বয়কট থেকে চরকা বরং ভালো। ওতে অন্তত নিজের কাপড়টা নিজে করে নেওয়া যায়। কিন্তু সব চাইতে ভাল ফটিক, মূলধন সঞ্চয় করা। দেশের লোককে শিল্পে উৎসাহী করে তোলা। নিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করা। ইনডাসট্রিই একালের ধর্ম। যে দেশ বা যে জাতি এই ধর্ম গ্রহণ করবে তার বিকাশ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ফটিক বলেছিল, আমরা যে পরাধীন। আমাগের হাত-পা যে ব'াধা মাজে কত্তা। তখনও ফটিকের মুখে কলকাতাই বুলি ফোটেনি।

মেজোকত্তা বলেছিলেন, এসব হচ্ছে কুঁড়েমির ছেঁদো কৈফিয়ৎ। অলসদের ছলের অভাব হয় না। ইতিহাস বলে যারা উদ্যোগী তারা সবই পায়, এমন কি স্বাধীনতাও। আমেরিকা তার সাক্ষী। সে কবে স্বাধীনতা পাবে বলে হাত-পা কোলে করে বসে ।'কনি। শিল্প ও কৃষি সে শ্রম ও উদ্ভাবনী বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে আগে গড়ে তুলেছে। তাই তার বয়কটটা হল সত্যিকারের সংগ্রাম। আর আমরা সহজে কিস্তিমাৎ করতে চাইলাম। তাই দাঁড়াবার ভিতটা শক্ত করে গড়ে তোলার পরিশ্রমটা সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। শুধু বয়কট শুরু করলাম। তাই আমাদের বয়কট কোনও সংগ্রামের হাতিয়ার হল না। ওদের বয়কটে সত্য ছিল। তার পিছনে নির্মাণের ভিত্তিভূমি ছিল। আর আমাদের বয়কটটা হল ভান।

কথাটা সেদিন ফটিকের খুব একটা ভাল লাগেনি। অনেক তর্ক হয়েছিল।

মেজোকত্তা বলেছিলেন, বাংলাদেশের নেতারা যদি সত্যিই লোকের হিত চান, তবে জেলে যাবার জন্য অত আগ্রহ না দেখিয়ে জমিদার, মহাজন, সাধারণ লোক সকলের শক্তি ও সঞ্চয় একত্র করে ইনডাসট্রি পত্তন করার জন্য নেতৃত্ব দিন। শিক্ষিত মনের সঙ্গে কৃষিকাজকে যুক্ত করতে এগিয়ে আসুন। দেখবে দেশ মুক্তির দিকে এগুবে। পার্শী ভাটিয়া এরা আমাদের চাইতে অনেক বিচক্ষণ। ওরা চুপ করে বসে নেই ফটিক, ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর আমাদের পলিটিক্যাল নেতারা মুখে স্বদেশী স্বদেশী করছেন কিন্তু স্বদেশী ইনডাসট্রি গড়ার দিকে সিরিয়াসলি কেউ এগিয়ে এসেছেন? কেউ মূলধন ঢেলেছেন? কর্মই যে ধর্ম এই মন্ত্রে দেশের ছেলেদের কেউ উদ্বোধিত করতে এগিয়ে এসেছেন? বাইরে এরা বাঘ কিন্তু ভিতরে একেবারে পঙ্গু ভিখিরি।

আশ্চর্য! আজ আবু তালেবও এই কথা শুনিয়ে গেলেন। মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের কথাই ধরেন। তিনি তো বাংলদেশের কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা। এদিকি তো স্বদেশী স্বদেশী বলে ফাটায়ে দেচ্ছেন, কিন্তু ত'ার মত লোকউ যখন আয়ের সিকি ভাগউ মূলধন হিসেবে নিয়োগ করেননি, তখন আর কার দুয়োরে যাবো?

"ফটিক বাপ", অনেকক্ষণ পরে চ'াদ বিবি ছাওয়ালকে আবার ডাকল। ছাওয়ালের সঙ্গে তার খুব কথা কতি ইচ্ছে করতিছিল। জিন ভূতির বা শয়তানের বদনজরের থে বিটি যাতে রক্ষে পায় তার জন্য চ'াদ বিবির ইচ্ছা ছিল বিটির শরীলডা বন্ধ করার কালামের আমল ক্যামন করে কত্তি হয়, সিডা ফটিকরি শিখোয়ে দ্যায়। কিন্তু তার ছাওয়াল ফটিক আবার কত দূরে চলে গেছে। তার সামনে বসে যে অ্যাক মনে ভাবতিছে এই লোকটারে সে ভাল চেনে না। এ তো শহরের উকিল! তাই চাঁদ বিবি একটুও আওয়াজ না করে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল। আর আকুলি বিকুলি মনে সে ডেকে ডেকে তার হারানো ছেলেকে খুঁজতে লাগল। ফটিক! বাপ্! ফটিক! (ক্রমশ)

কলকাতা আছে কলিকাতাতেই

নেপাল রাইস

আমার বাবার একটা ধানগাছ ছিল, সেই গাছের এক-একটা ধান থেকে যা এক-একটা চাল হত সেই একটা চাল বইবার জন্যে পর পর দুটো গরুরগাড়ি লাগতো। একটা চালে গোটা গ্রামের লোকের পেট ভরে যেতো। সেই ধানগাছের কাঠে তৈরি হোতো ফার্নিচার। মিথ্যেবাদীর গল্পে এইরকম শোনা গেছে। এবার সত্যবাদীর গল্প। আমাদের পাড়ায় একটা রেশনের দোকান আছে যেমন সব পাড়ায় আছে। সেই দোকানে কার্ড দেখালেই নেপাল চাল পাওয়া যায় যেমন পাওয়া যায় অন্য সব রেশনের দোকানে। এই নেপাল চাল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে হলধারী হলকর্ষণ করে পেট রোগা কলকাতাবাসীদের জন্যে তৈরি করেছেন। এক একটি, গীতোক্ত আত্মপুরুষের গুণসম্পন্ন—ইহাকে জলে সিদ্ধ করা দুরূহ। আধুনিক প্রেসার কুকার সিটি মারিয়া মারিয়া অস্থির, এক সিলিন্ডার গ্যাস ফক্কা ফাঁক—যতবারই টিপিয়া দেখি চাল হইতে ভাতের
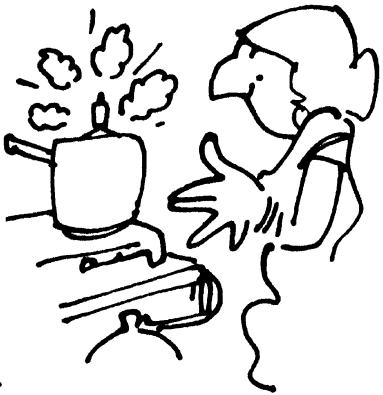
সম্ভাবনা অধিকাংশ বাঙালীর প্রতিভার মত প্রস্ফুটিত মাত্র, পূর্ণ বিকশিত নয়। এ চালের ভাত চাল মেরে খাবার নয়। হয় গিলে খাও না হয় শিলে বেটে খাও। এই চাল গৃহীর সন্ন্যাস। এই চাল নারীর অভিমানের মত। খাবার পাতে সব সময় বেঁকে বসে আছেন। কারুর সঙ্গেই হাতমেলাতে রাজি নন। ডাল ঢালুন, ঝোল ঢালুন, ভাত মাখে কার পিতার সাধ্য। এর কাছে সব কিছু তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, হাম সাচ্চা হ্যায়। এই বস্তু কাউকে সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে পেটে যাবার মাল নয়। ডাল ভেসে যায়, ঝোল ভেসে যায়, মধ্যপাতে ঘরজামাইয়ের মত গ্যাঁট। পৃথিবীর সমস্ত সুস্বাদু ব্যঞ্জনের স্বাদ এই জিনিস চ্যালেঞ্জ করে মেরে দিতে পারে। এর ওপর খাসবাবুর্চির রান্না মুরগীর কোর্মা ঢাললে কেন্ট পিসির কাঁচকলার ঝোলের মত মনে হবে। যে গৃহস্থ, ভোগ ভোগ করে, সংসার কটাহে আত্মবিস্মৃত হয়ে দুর্ভোগ ভুগছেন এই নেপাল চালের ভোগে, কয়েকদিন তাঁর সেবা করলেই, আপসে তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে—হরি ওঁম তৎ সৎ। সপ্তাহান্তে তিনি গৃহিণীকে মাতৃ সম্বোধন করবেন। দোতলার জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে, সামনের বাড়ির পরস্ত্রীকে লোলুপ দৃষ্টি দেবেন না। আমার আমার, বলে, অস্থির হবেন না। খুড়োর ছেলের বিষয় ধরে টানা-টানি করবেন না কর্মস্থলে, কারুর পেছনে লাগবেন না। তাঁর পরিপাক শক্তি পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথে চলবে। ৭৮ সালের বসন্তের আহার ৭৯ সালের বসন্তে হজম হবে। অনেকটা জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মত। বৎসরান্তিক পাচন সেবন।

ইদানীং সমরবাবু নেপাল চালের রাজনীতির শিকার হয়েছেন। রোজ সকালে, তাঁর খড়্গবাজ স্ত্রী, ভাতের বদলে, এই জেতো বাঙালীটিকে চারখানা হাতে গড়া রুটি, চারপোনার ত্রেপসীভ ঝাল দিয়ে পরিবেশন করছেন। সমরবাবুর ধারণা, বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছরে, স্ত্রীর প্রতি যত দুর্ব্যবহার করেছেন, ভদ্রমহিলা নেপাল চালকে শিখণ্ডী খাড়া করে এখন তার শোধ নিচ্ছেন। স্ত্রীর পক্ষের বক্তব্য, সকাল নটার মধ্যে সমরবাবুকে নেপাল চালের ভাত পরিবেশন, দ্রৌপদীরও অসাধ্য। খোলা বাজারে, বেঙ্গল ফাইন অঢেল সমরবাবু আদর্শ পাকড়ে বসে আছে ব্ল্যাকে চাল কিংবা না ভালবেসে যা দেবেন, তাই মেনে নিতে হবে। পরিপাক যন্ত্রকে সেইভাবে তৈরী করতে হবে। শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। খাও, রুটি খাও। ভালই তো, চল্লিশের পর ভাত আলু চিনি যত কম খাওয়া যায়। বেঁচে থাক সেই দেশহিতৈষীরা, যাঁরা চাল, চিনি, আলু মশলা তেলের মত স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক জিনিসের দাম, একটু নাক তোলা মত করে রেখেছেন। এমনিই তো কর্তার প্যান্ট, তলপেটের ওপর উঠতে চায় না। একটু থপথপে মত হয়ে গেছেন। বসলেই নাক ডাকে।

তবে কি জানেন? খুব খুশি হয়েন বাবু। বউয়ের ভাই। মাসের মধ্যে পনের দিন গেড়ে বসত। থাকে আসানসোলে। বলে, ব্যবসা করি। ব্যবসা না ছাই। ভগিনীপতি মারা শ্যালক। কলকাতায় কেনাকাটার ছুতো করে বোনের বাড়ি এসে ওঠে। এই চেহারা। আসানসোলের জল-বায়ু। খাওয়া। এই ভাত। বেড়াল ডিঙোতে পারে না। এখন। ইদানীং! বোকে বলেছি নো চালাকি। চালাও নেপাল। দুদিনের বেশী আর থাকতে চায় না। রাতে লুচির বদলে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি আহার। শ্যালক খেদানো চাল মশাই। পুলিশরা পর্যন্ত বেঁকে বসেছে।

কিন্তু, নিমাইবাবুকে যে তাঁর পোষা কুকুর সেদিন খ্যাক করে কামড়ে দিয়েছে। কদিন ধরেই কি রকম, কি রকম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। নেপাল চালের সঙ্গে মাংসের ছাট। কুকুরেও মশাই ঢেঁকুর তোলে, এই প্রথম শুনলুম। সেদিন রাতেও, যথারীতি, নিমাইবাবু পেয়ারের কুকুরকে এস্রাজ বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। বলা নেই কওয়া নেই, একবারে ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছে। এখন রোজ দুপুরে, ভাত দেখলেই, থালার পাশে গোল হয়ে ঘোরে, আর গোঁ গোঁ করে। কিরকম ডিসটেম্পারড মত হয়ে গেছে।

সে তো হোলো, কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। খাস বিলাইতিই হোক আর দোআঁশ হোক, কুকুর তো আর বাঙালী নয় হে! প্রথম ভাগ পড়েছে কি? পড়েনি। পড়লে, প্রথম পাঠেই শিক্ষা পেতো, গোপাল অতি সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়। আমার কি হয়েছে দেখো! সামনের দাঁত মিসিং। তোলালেন বুঝি? ধুস তোলাবো কেন? মকর সংক্রান্তির দিন, গো, ওয়েস্ট, গন। কোথায়, সাগরে! আরে না হে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায়। বুলেট প্রুফ কাচ শুনেছো, দাঁত প্রুফ পিঠে পাগলাবার সুযোগ হয়েছে। ভাবছি! কি ভাবছেন! এত রকম প্রতিযোগিতা হয়,

দাঁত দিয়ে পিঠে ছেঁদা করার একটা কম্পিটিশান করলে কেমন হয়। যে দন্তবীর দাঁত দিয়ে ওই পিঠে ছেদন করে, তার বক্ষস্থলে; খোয়া ক্ষীর নারকেল আর খেজুরে গুড়ের মাথাপুর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে, তাকে আমি দাঁতেন্দ্র উপাধি দেবো।

বড্ড বকেন মশাই। ঘটনাটা কি বলবেন তো! ঘটনা, চল্লিশ টাকা প্লাস একটি দাঁত চোট। পিঠে হবে। দু কিলো নেপাল চাল, গম কল থেকে গুঁড়ো হয়ে এল। দু টাকা দরের গোটা পাঁচেক নারকেল এল, খোয়া এল, একনাগরি গুড় এল সাড়ে তিন টাকা কেজির দুধ এল। এইবার! প্রথমে বছর সাতেক বয়েসের নাতি। মুখে পিঠে। মা বলছে, চিবো চিবো। যতবার সেই ইলিপটিক্যাল বস্তুটিকে মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ততবারই পচ করে বেরিয়ে আসছে। ছেলের তো ভেউ ভেউ কান্না, পারছি না মা, পারছি না। গোটা কতক চড়চাপড় হোলো। শয়তান ছেলে, ক্ষীর চুষে খেয়ে বাকিটা আর খেতে চাইছিস না, ওরে আমার গাধা, দাঁত দিয়ে ভেঙে দেখ, ভেতরে কি মাল আছে! হোলো না। দেখি তো রে, বলে রেগে মেগে ছেলের মা মুখে পুরলেন। পিঠে সামনের দিকে স্লিপ না করে টাগরার দিকে চলে গেলো। প্রাণ যায় রে পিছু! বড় ছেলে এসে ঠ্যাং ধরে, মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে,

কোমরে চ্যালা কাঠ পেটা করে গলা থেকে সেই টর্পেডো বের করে, বেয়াইয়ের মেয়েটাকে প্রাণে বাঁচালে। রোক চেপে গেল আমার। দেখি তো রে ব্যাপারটা কি। নিজের ওপর একটা কনফিডেনস ছিল—সামনে দুটো গজদন্ত, এখনো হাড় চিবিয়ে খাই, ছাত্রজীবনে পেনসিল আর ইরেজার দুটোই বহুত চিবিয়েছি। কর্মজীবনে বহু সতীর্থের কেরিয়ার চিবিয়ে খেয়েছি। মিনুর মা, কি এমন পিঠে করেছে! সত্যি বলছি ভাই, দ্যাটস এ ক্রিয়েশান! দুর্গের চেয়ে দুর্ভেদ্য। আমি চিঠি লিখবো। কোথায়? ডিফেনস ডিপার্টমেন্টে, আর টায়ার কোম্পানিতে। নেপাল চাল গুঁড়ো করে টর্পেডো তৈরি কর, হেলমেট, বর্ম তৈরি কর আর উড়ো জাহাজের টায়ার তৈরি কর। কোথায় লাগে নাইলন ফিলামেন্ট। ঘর্ষণে খইবে না, দংশনে ফুটো হবে না। কোথায় জন্মায় ভাই, এই মহা বিস্ময়!

ব্যাটা বাঙালী! কে ভাই তুমি। তোমার নিয়তি। এ চাল জন্মায় তোর ভাগোরে। নেপাল রাইসের ভাতে, ঘিয়ের সেন্ট দেওয়া ভাগাড়ের চর্বি ঢেলে, ধাপার ফুলকপি মেরে, মাঝে একটা এনজাইম পাঞ্চ করে দু হাত তুলে বল্ বেটাচ্ছেলে—বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দ্যাশ। ভুলে যা তোর কবিগুরুর সেই ছেলে বেলার ছড়া,

দুধেতে কদলী দলি, তাহাতে আমসত্ত্ব ফেলি, ভুলে যা, শিব গেলেন শ্বশুর বাড়ি বসতে দিলেন পিঁড়ে, তারপর শালিধানের চিঁড়ে। হে হে নেপাল ধানের চিঁড়ে। খা কত খাবি খা, ভোজনবিলাসী গুজনদার বাঙালী!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়   ছবি : অহিভূষণ মালিক

কলিকাতা
পুস্তক
মেলা

চিতার কাঠ

সুনীল দাশ

আর সাতটা পোড়াতে পারলে সাবুর মড়া পোড়ানোর সংখ্যা দাঁড়াতো একশোয়। একশো আর হল না। তিরানব্বইটা হওয়ার পর দুম্ করে সাবু নিজেই মরে গেল। এ রকমটা যে হতে পারে—সাবুর দলের কেউ ভাবতে পারেনি।

ভাবতে পারেনি বাপ্পাও। বাপ্পা খবর পেয়েছে অনেক রাতে। রাতের শোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার মুখে। খবরটা শুনেই তার একবার শ্মশানে আসার কথা মনে হল। পর মুহূর্তে মনে হয়েছে এতো রাতে শ্মশানে ওই দলের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। কেনই বা যাবে সব তো চুকিয়ে দিয়েছে অনেক দিন আগে। তবু কথাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা গেল না। বিশেষ করে সাবুরই দলের ছেলে শিবু এসে খবর দিয়ে গেল না।

শীত পড়েছে ঘন করে। রাস্তা ফাঁকা। দু' পাশের পেভমেন্ট বারান্দার নিচে ভিখারিরা শুয়ে আছে সার সার। শ্মশানের কাছে, ব্রীজের মুখটাতে দুটো দোকান খোলা। বাপ্পা শ্মশানে ঢোকার রাস্তায় না বেঁকে, সোজা ব্রীজের ওপর উঠে গেল। আদি গঙ্গার ওপর ব্রীজ। চিত্তরঞ্জনের মন্দিরটা পেরিয়ে গেলেই এই ব্রীজের ওপর থেকে কাঠের চিতার শ্মশানটা দেখা যায় স্পষ্ট। শিবু বলে গেছে সাবুকে ওরা এই শ্মশানেই পোড়াবে। সাবু নিজেও বরাবর পছন্দ করেছে কাঠের চিতা। কাঠের চিতায় পোড়ানোর মেজাজটাই আলাদা। বাপ্পা সিমেন্টের রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

ডানদিকে চিত্তরঞ্জনের মন্দির, বাঁদিকে আদি গঙ্গার পাড়ে লালবাবার আখড়া। মাঝখানে খানিকটা জমি রেলিং দিয়ে ঘেরা। ওই জমিটা ছেড়ে পুরোনো শ্মশানের পাঁচিল। একটা মাত্র চিতা জ্বলছে এখন। শ্মশানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ওই জ্বলন্ত চিতা সাবুর নয়। মড়া পোড়ানোর সময় সাবু নিজে পছন্দ করতো উত্তরের বেদীর ওপর চিতাটা। কার্ত্তিক মাসে শ্মশানকালীর পুজো হয় ওই বেদীতে। এখান থেকে কুয়াশার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না শ্মশানের মানুষজন, তবে বাপ্পা আন্দাজ করতে পারে, সাবুর মড়া নিয়ে শিবুরা এই উত্তরের চিতাটার ধারেই জড়ো হয়েছে।

এখান থেকে দৃশ্যটা অস্পষ্ট। ধোয়া-রঙ ছবির মত দেখাচ্ছে শ্মশানটাকে। লাইট পোস্টে আলো জ্বলছে গোটা চারেক। পোস্টের মাথায় ফুলের তোড়া বাঁধা রিং ঝুলিয়ে দিয়েছে কারা। এখান থেকে দেখাচ্ছে গাড়ির টায়ারের মত। বাপ্পা দু' মিনিট দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখল দৃশ্যটা। তারপর আস্তে আস্তে পা চালিয়ে ব্রীজ থেকে নেমে এলো। এগিয়ে গেল পুরোনো শ্মশানের দিকে।

এগিয়ে এসে শ্মশানের গেটটার সামনে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দেখল, জিন্স-এর নীল জ্যাকেট পরে বকাই চিতা সাজাচ্ছে। এতকাল এই দলটা যত মড়া পুড়িয়েছে, তার চিতা সাজিয়েছে সাবু, বকাই সাহায্য করেছে প্রতিবার। চিতা সাজানোর ব্যাপারে সাবু ছিল সত্যিকারের ওস্তাদ। চিতা সাজানোর ওর কেমন ধরনের একটা নেশা ছিল। আজকাল বেশির ভাগ মড়াই যায় পাশের ইলেকট্রিক

চ্যাঁচাচ্ছে। সাধুর সেটা পছন্দ ছিল না। এই [illegible] চিতায় শ্মশানটাকে ও মনে করত ওর নিজস্ব [illegible]। সাধুর স্বয়ই চড়ে গিয়েছিল চিতায় [illegible]।

বাপ্পা আরো এগিয়ে এসে বেদীটার কাছে দাঁড়াতে, বকাই মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'এসেছিস্। বাচ্চু শিবুকে দিয়ে আমিই খবর পাঠিয়েছিলুম।'

প্রথমে বকাই, তারপর একে একে অন্য সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল বাপ্পা। এই বকাই, স্বপন, শম্ভু, ভবানী, চিকু আর ভেবলুস— অল্প খানেক আগে সবাই ছিল বাপ্পার বন্ধু। এখন একজনও না। বরং মনে মনে প্রত্যেককে শত্রু মনে করে বাপ্পা।

ভেবলুস লক্ষ করছিল বাপ্পার গাঢ় হলুদ রঙের পুলওভারটা। চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'তোকে দেখেছিলুম প্রিয়ার নাইট শোতে ঢুকতে— নইলে বেরনোর আগে আমিই বলে আসতুম।'

'কে সাজিয়েছে রে?' সাধুর খাটের দিকে তাকিয়ে বাপ্পা জানতে চাইল।

ভেবলুস দেখছিল গাঢ় হলুদ পুল-ওভারের সঙ্গে বাপ্পার ঘন সবুজ রঙের ট্রাউজারটা মানিয়েছে খাসা। সে জবাব দিল, 'স্বপন সাজিয়েছে। সাধুর বিয়ের যোগাড়যন্তর স্বপনই করছিল কিনা।'

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্বপন আর শম্ভু। চিকু আর ভবানী কথা বলছে ঘাট-পুরুতের সঙ্গে। চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় দলের সবাই বেশ খানিকটা কান্নাকাটি করেছে। তার মধ্যে স্বপনটাই নিশ্চয় সব চেয়ে বেশি। স্বপন সাজিয়েছেও চমৎকার। ধুতি, পাঞ্জাবি। মুখে চন্দনের ফোঁটা। ফুল আর ধুপে ভরিয়ে দিয়েছে খাট। সাধু নিজেও সাজানো পছন্দ করত খুব। বার কয়েক তো সে নিজেই পকেটের টাকা খরচ করে মড়া সাজানোর জন্যে ফুল আনতে দিয়েছিল। সেই সাধুকে সাজানো হবে না ভাবা যায় না।

পায়ের টকটকে লাল চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিতে নিতে শম্ভু এগিয়ে এসে বলল, 'একে বলে মরণ মাইরি। মৃত্যু। দুম্ করে কখন এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারবে না।' এই দ্যাখো একটা মানুষ দাপাচ্ছে—এই দ্যাখো পাত্তা নেই। বেঁচে থাকা বড় আজব কাণ্ডরে ভাই।'

বাপ্পা বুঝতে পারল, সে শ্মশানে আসাতে এরা সবাই, এখন সংখ্যায় ছয়, বেশ খুশি হয়েছে। মাঝখানে একটা বছর বাপ্পা যে ওদেরকে পাত্তা দেয়নি—বার বার ডাকলেও আসেনি, এমন কি বাপ্পা যে দিনকতক সাংটার আড্ডাতেও যাতায়াত করেছিল— সে সব ক্ষোভ ধুয়ে ফেলেছে ওরা এখন।

একটু পরে ভবানীও এসে দাঁড়াল বাপ্পার পাশে, বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাসা পার্টি আনার। অনেক রাত হয়ে গ্যাছে বলে সকলের মত হল না।'

ভবানী শম্ভুকে সেধেছিল বার কয়েক। খাটে চড়ে, বাজনা শুনতে শুনতে সাধু শ্মশানযাত্রা করুক— এই ছিল তার ইচ্ছে। মিউজিক যে মানুষটার এতো পছন্দ ছিল তার জন্যে শ্মশানযাত্রার সেটাই তো সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতো। শম্ভুর এক পিসে হল চ্যাম্পিয়ান তাসা মাস্টার। ফ্যারেস্ট হিন্দিগান সে এমন জমপেশ করে বাজায়, খুশিতে কল্যে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় একেবারে। তাকে আনতে পারলে, সারা রাস্তা সে বাজিয়ে আনতো সাধুর পেয়ারের গানগুলো। ভবানীর বিশ্বাস, সাধুর আত্মা খুব খুশি হতো তাতে। কিন্তু শম্ভু তেমন গা করল না। গা করার কথাও নয়। শম্ভুর তো আর মিউজিকের জন্যে টান নেই।

সাধুর ছিল। ট্রিপল কঙ্গো, বঙ্গো, নাল, ঢোল থেকে শুরু করে তবলায় বোম্বাই ঠেকা দেওয়ায় দারুণ হাত ছিল সাধুর। বাপ্পাও সাধুর দলে এসেছিল ওই টানে। এখানে ওখানে সেখানে, ফাংসানে খেপ মারতো সাধুর মিউজিক পার্টির সঙ্গে। নইলে, যখন তখন মড়া পোড়াবার নেশা নিয়ে তো সে আর সাধুর দলে আসেনি। তবে দলের মধ্যে ছিল বলে অনেকবার সেও এই শ্মশান পার্টির সঙ্গী হয়েছিল এই যা।

ভেবলুস বলল, 'বাপ্পা, এসে গেছিস যখন, সাধুর মুখে আগুনটা তুই দিয়ে যা। তুই ছিলি সাধুর মোস্ট ফেভারিট শিসসো। সাধু তোকে ভাল বাসতো খুব।'

ভেবলুসের কথায় বাপ্পা দপ করে চটে উঠল। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে নিল নিজেকে। সাধুর মরা মুখটা দেখল।

'তাছাড়া তুই শালা বাউনের ছেলে। আর সাধুর এখানে তিন কুলে কেউ নেই যখন—' বকাই মন্তব্য করল, চিতা সাজাতে সাজাতে।

বাপ্পা সেই মুহূর্তে একটা অদৃশ্য ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পেল। ওই শব্দ আর শুনবে না সাধু। সাধুর বুকের তলাতেও ওই রকম একটা শব্দ ছিল। আজকে থেমে গেল সেই শব্দটা। শম্ভুর কথাটা খুব খাঁটি। কখন যে দুম করে বন্ধ হয়ে যাবে শব্দটা কেউ বলতে পারে না। সাধু যদি টের পেত, বছর খানেকের মধ্যে তার আয়ু ফুরিয়ে যাবে, তাহলে কি আর বাপ্পার সঙ্গে বেইমানি করত সে? এখন ভেবলুসের মুখে 'ফেভারিট শিস্সো' শুনে বাপ্পা দপ করে চটে উঠেছিল যদিও, কিন্তু কথাটা তো ফালতু বলেনি ভেবলুস। বাপ্পার হাতের চাঁটি দেখে কতবার না সাধু বলেছে, 'তুই শালা চাম্পিয়ান ড্রামার হবি। আমাদের মতো কেওড়া পার্টিদের ফাংসানে খেপ মারার জন্যে তুই জন্মাসনি, তুই বাজাবি জ্যাম ঝ্যাম ফাংসানে, স্টুডিওতে রেকর্ডিং করবি, বোম্বে থেকে ডেকে নিয়ে যাবে তোকে এক-দিন।' না, স্রেফ বাপ্পার কাছে আমড়াগাছি করবার জন্যে সাধু এসব বলতো না। তবু ওই রকম একটা মারাত্মক বদমাইশি সাধুই করলো শেষ পর্যন্ত। পরে

অস্বীকার করলেও, বাপ্পা জানে—কাজটা সাবুরই।

পুরো শীতের মধ্যেও আকাশটা হারিয়ে যায়নি। পাতলা কুয়াশা জড়িয়ে গোল চাঁদ ভাসছে আকাশে। সি আর দাশের মন্দিরের লম্বা চূড়ো বেয়ে নেমে আসা চাঁদের আলোটা কেমন যেন অপরিষ্কার। নিচে ইলেকট্রিকের আলোগুলোও এই কুয়াশায় ঠিক খুলতে পারেনি। বাপ্পা আর একবার পোস্টের মাথায় শুকনো ফুলের একটা শূন্যের দিকে তাকাল। সাবুকে এবার চিতায় তোলা হবে। সাবুর বরের সাজ খুলে নতুন সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। চাল-কলা-তিলের পিণ্ড করে রাখা হল কণ্ঠির কাছে। বকাই আর স্বপন করল এসব। ক্রিয়াকাণ্ড মেটানোর পর শোয়ানো হল চিতার ওপর। তার ওপর আবার সাজানো হল চিতার কাঠ।

আধপোড়া চিতার কাঠের মতই গায়ের রঙ সাবুর। চোয়াল বেশি রকমের চওড়া। চোখ চেয়ে মরেছিল বলে দু চোখে দুটো তুলসিপাতা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিতায় তোলার আগে তুলসিপাতা দুটো সরিয়ে নিতে দেখা গেল চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সাবুর দিকে তাকাতে, বাপ্পার ভেতরের রাগটা, বরং ঘেন্নাটা আর দপ করে উঠল না তেমন। উল্টে, ভুসভুস ধোঁয়ার মত একটা দুঃখ দুঃখ উঠে আসতে চাইল।

তবু মুখে আগুন দিতে প্রথমে রাজি হল না বাপ্পা। পরে বলল, 'সবাই একসঙ্গে দে আগুন। এখানে কেউ তো আর কাছা নিচ্ছে না, অশৌচ নিচ্ছে না।'

পাটকাঠিতে আগুন ধরানো হল। বাপ্পাকে ধরতে হল পাটকাঠির গোড়াটা। অন্যরাও ধরল। চিতা ঘুরে ঘুরে মুখাগ্নি হল সাবুর। আগুন বড় করে জ্বলে ওঠার সময় বাপ্পা আবার শুনতে পেল টিকটিক শব্দটা। সাবুর বুকের তলায় ওই ধরনের শব্দটা চিরকালের জন্যে থেমে গেছে।

বাপ্পা তাকিয়ে দেখল, বড় বড় আগুনের শিখা লাফাতে শুরু করেছে। সাবুর শরীর ধরে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। আগুন ধুয়ে দেয় সব পাপ। গুঁড়িয়ে ছাই করে দেয়। আগুন বড় শুদ্ধ। বড় পরিষ্কার।

সাবুর মনটা যে ভেতরে ভেতরে এতো নোংরা ছিল বাপ্পা ভাবতে পারেনি। খুব সরল, গোঁয়ার আর পরিষ্কার মনের মানুষ ভেবেই বাপ্পা মিশে ছিল। বাপ্পার বয়স সতেরো। দলের অন্য সকলের বয়স কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সাবুর বয়স কম করেও তিরিশ পেরিয়েছিল। তবু সাবু কক্ষনো দাদা দাদা ভাব দেখাতো না।

চিতা ধরে ওঠার পর বাপ্পা একা একা মাঠের দিকটায় এগিয়ে গেল। কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না তার। কিভাবে মরল ? কে মারল ? এসব তো বাপ্পার জানাই। তেমন ক্ষমতা থাকলে বাপ্পা নিজেই তো সাবাড় করে দিত বজ্জাতটাকে। সাবুকে ক্ষমা করা যায় না। বাস্টার্ডটা তার সব নিয়েছে।

এই শ্মশানের পশ্চিম দিকটার পাঁচিলের মাঝা-মাঝি একটা গেট। আদি গঙ্গার পাড় ও-দিকটায়। গেটের সামনেই ঘাট। ঘাটের ডান দিকে লাল বাবার আশ্রম, কয়েকটা স্মৃতি মন্দির। বাঁদিকেও আশ্রম আছে একখানা, বেশ কিছু স্মৃতি ফলক আছে। বাপ্পা গেটের কাছে এগিয়ে এসে একবার পেছন ফিরে দেখে নিল জ্বলন্ত চিতাটা। দেখল আগুনের আভায় জ্যান্ত মানুষগুলোর মুখ একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে। আগুনের শিষ উঠছে নামছে। সেই ওঠা-নামার তালে তালে জ্যান্ত মানুষদের মুখ থেকে আগুনের লাল আভা সরে যাচ্ছে, আবার এসে পড়ছে। আকাশটা যেন খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বলে মনে হয়। উত্তর-পূব কোণে সি আর দাশের মন্দিরের চূড়োয় সিমেন্টের আটচালাটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাপ্পা চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার আগে লাইট পোস্টের গায়ে শুকনো ফুলের রিং লক্ষ করল। সেগুলোর দিকে তাকাতে দেখে স্বপন এগিয়ে এসে বলল, 'সাবু ঝুলিয়েছিল ওগুলো, এই তো সপ্তা দুই আগে।'

বাপ্পা বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলুম। সাবু ছাড়া এসব ফালতু কাজে মাতে কে। সারা জীবন তো এই করলো।'

বাপ্পার মন্তব্যে স্বপন কোন উত্তর করল না। শুকনো ফুলের শূন্য থেকে চোখ সরিয়ে নিল চুপচাপ।

জল সামান্য বলে আদি গঙ্গার পাড়ে কাদা বেরিয়ে আছে। ঘাটের এই সিঁড়িগুলোতে বসে রাতের পর রাত কত গল্প করেছে বাপ্পা তার হিসেব নেই। শীতের রাতে বেশিক্ষণ কাটে জ্বলন্ত চিতার কাছাকাছি। গরমের রাতে ঘাটের কাছে এইসব সিঁড়ি। সাবুর মিউজিক পার্টিতে ঢোকার পর থেকে, কয়েক বছর ধরে, এই মড়া পোড়ানোর ব্যাপারটাও তার মধ্যে ক্রমশ কি রকম যেন নেশার মত টান ধরিয়ে দিচ্ছিল। অথচ তার আগে এই মড়া পোড়ানোর গন্ধটা সে সহ্য করতে পারত না। পরে, মা কিংবা দিদি যতই চেল্লামিল্লি করুক না কেন, বাপ্পা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে চলে আসত শ্মশানে।

কেন আসত ? কিসের টানে ?

মদ ? গাঁজা ? জুয়ো ?

না, সাবুর মতো মরা পোড়ানোর গন্ধে তার টান ধরেনি কোন দিনও। তবে আর পাঁচটা মানুষের মতো এখনো এ গন্ধ নাকে এলে সে নাকে সাত তাড়াতাড়ি রুমাল চাপা দেয় না তা ঠিক।

তবে কি ?

শ্মশানে এলে প্রথম প্রথম খুব দুঃখ লাগত তার। কষ্ট হত। সাবুকে বলত, 'ধ্যাৎ, যাবো না শ্মশানে, মন খারাপ হয়ে যায়।' শুনে সাবু ঠা ঠা করে হাসত, বলত', 'তুই শালা মেয়েছেলের মত কথা বলিস। ব্যাটাছেলে না ? চোখের জলে কেলিয়ে যাবি কিরে ?'

এমন কি স্বপনটা পর্যন্ত হাসত মুচিয়ে মুচিয়ে, যে স্বপন কিনা মেয়েছেলেদের বেছন্দ, ভুরু-প্লাক করে; কথা বলতে বলতে ঠোঁট কামড়ায়, কথায় কথায় অভিমানে কেঁদে ফেলে যখন তখন। অবশ্য পরে আর শ্মশানের দুঃখ বাপ্পাকে কব্জা করতে পারেনি। বরং কেমন একটা মজা পেতে শুরু করেছিল। তবে নিয়মিত আসেনি। সাবু যা বকাই-এর মত মড়া পুড়িয়ে সেঞ্চুরী করার সাধ কখনো উঁকি দেয়নি তার মনে। জীবনে মোট কতবার শ্মশানে এসেছে মড়া নিয়ে তার হিসেবটা পর্যন্ত রাখেনি।

ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির এক পাশে পড়ে আছে একটা আধপোড়া কাঠ। কাঠটার দিকে তাকাতেই বাপ্পার একটা বিশ্রী রাতের কথা মনে পড়ল। সাবু ক্ষেপে গেছিল সেই রাতে। এখন, এগিয়ে এসে বাপ্পা কাঠটার ওপর একটা পা দিয়ে দাঁড়াল। জলের ওপারে অন্ধকার বেশ ভারি। মাঝারি আকারের গোল চাঁদটার চারিপাশে হলুদ রঙ ছড়ানো।

স্বপন সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নে।' বাপ্পা হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল স্বপন, তারপর দেশলাইটা এগিয়ে দিল বাপ্পার দিকে। বাপ্পাও সিগারেট ধরাল।

'সাবুটা মাঝে মাঝেই তোর কথা বলত। তুই একেবারে আসাই ছেড়ে দিলি। ও খুব দুঃখ করত।'

স্বপনের কথা শুনে বাপ্পা এবার আর ভেতরের আগুন নেভাতে পারল না, ফুঁসে উঠল : 'নে তো. তুই শালা আর পিলসারিন মারিস না। দুঃখ করত। নেহাৎ মরে গেছে, তাই বলছি না কিছু। আমার কিন্তু গায়ের জ্বালা একটুও কমেনি। দেখলি ত ? ফল কি রকম হাতে নাতে ফলে গেল ? এক বছরও ভোগ করতে পারল না। এই হয়, বুঝলি—এই হয়। কোথায় পালাবি ? সগ্গে যাও আর নরকে যাও—এইখানেই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।'

লম্বা চুলে স্বপনের দু কান ঢাকা। সে চুপচাপ কথাগুলো শুনে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর একটু সময় নিয়ে বলল, 'সাবুর আর কোন উপায় ছিল না রে, নইলে তোর ঘড়িটা ও ফেরত দিয়ে দিত।'

এবার বাপ্পা দাউ দাউ করে উঠল, 'তার মানে সাবুই নিয়েছিল ? তোর কাছে স্বীকার করেছে ? আর সবাই জানে ?' বাপ্পার মাথার মধ্যে ঘড়িটার টিকটিক আওয়াজ বাজতে থাকল।

স্বপন অল্প ঘাড় তুলে, চোখের কোণ দিয়ে তাকাল তার দিকে। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, না আর কেউ জানে না। আগে আমি আঁচ করেছিলুম, তবে সিওর ছিলুম না। এই দিন কয়েক আগে একটা মড়া পুড়িয়ে, মাঝ রাতে ফিরে সাবুর ঘরে গিয়ে শুয়েছিলুম, শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সাবু বলে ফেলল।'

'হঠাৎ ? এতদিন পরে ?' চোয়াল শক্ত করে বাপ্পা প্রশ্ন করল। 'কেন তা বলতে পারব না। তবে যে লোকটাকে পোড়াতে এনেছিলুম না—সে লোকটার চেহারা অনেকটা তোর বাবার মত। ভবানীদের আত্মীয় হয় কি রকমের। তোর মতনই একটা ছেলে আছে। তবে ভাল ছেলে ভাই, লেখা-পড়ায় খুব ভাল আবার দেখতেও যা সুইট না—'

বাপ্পার ইচ্ছে করছিল স্বপনের পাছায় এক লাথি মেরে ওকে গঙ্গার জলে ফেলে দেয়। ভাবল, লেখা-পড়ায় টিকে থাকতে পারলে কি আর তোদের কেওড়া মিউজিক পার্টিতে ভিড়তুম শালা।

বলল, 'ঘড়িটা কোথায় ? কোথায় বেচেছে ও ?'

স্বপন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'যাহ, মরা মানুষকে নিয়ে এভাবে বলিস না, বলতে নেই।'

'তুমি নেকু আর হেঁচাক দিও না তো। সব শুয়োরের বাচ্চা সমান।' বাপ্পার গলায় রাগ গন গন করে।

কথাটা স্বপন হজম করল কিনা বোঝা গেল না। বলল, 'কোথায় বেচেচে তা কি আর আমাকে বলেচে ?'

'বললেও কি আর তোমরা শালা আমার কাছে খোলসা করবে ? তোদের আমি চিনি না ?'

খালের ওপারের রাস্তাটা বেশ অন্ধকার. অনেক দূরে লাইট পোস্টে আলো জ্বলছে কয়েকটা। খালের সামান্য জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট আকারের গোল চাঁদটাকে। চাঁদটা ভেসে যাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। অশ্বত্থ গাছের ডালপালার নিচে এই ঘাটের অন্ধকারে স্বপনের মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। বাপ্পার শেষ কথাটায় স্বপন বোধহয় বিরক্ত হল। ঝাঁঝ এসে গেল স্বরে, বলল, 'তুই মাইরি, তখন থেকে আন-সান বকে যাচ্ছিস। দেকচিস ত; কারো মন-মেজাজ ভাল নেই। আরে বাবা; এত দিনকার একটা ফ্রেণ্ড চলে গেল না জন্মের মত, পেয়ারটা তো তোর সঙ্গেও কম ছিল না এককালে।'

স্বপনের কথা থেকে বাপ্পা 'মনমেজাজ' শব্দটা ছিঁড়ে নিল। সপাং করে শব্দটা মেরে বলল, 'মনমেজাজ ? তোদের শালা মন বলে কিছু আছে ? থাকত যদি, তাহলে ওই রকম একটা লোকের বাড়ি থেকে—'

'একজনের দোষটা দশ জনের ঘাড়ে চাপাচ্ছিস কেন ? তাছাড়া ঘরের মধ্যে তুই নিজেও ত ছিলি বাবা।'

'মানে ? আমি ? আমার বাড়ি—আমার—'

আর একটা মড়া ঢুকল শ্মশানে। খুব জোরে বাজাচ্ছে খোল-কত্তাল হরি ধ্বনি দিচ্ছে গলা উঁচিয়ে।

দেখার জন্যে স্বপন ঘুরে দাঁড়াল। ওর রঙটা খুব ফরসা, ফ্যাটফেটে ফরসা একেবারে। লম্বাটে ফোলানো চুলগুলো একটু কটা। গোঁফ-দাড়ি উঠেছে দেরিতে, বেশিদিন নয়। সপ্তাহে একবারের বেশি কমাতে হয় না।

স্বপন বলল, 'এখন না হয় আমি জেনে গেচি—এর আগে পর্যন্ত অনেকের মত আমিও ধরে নিয়ে ছিলুম—তা ওটা তুই নিজেই সরিয়ে—সকলা মারছিলি। এ রকম ত আগেও হয়েচে—বল ?'

বাপ্পা আর ঘাটের কাছটায় দাঁড়াতে চাইল না। এভাবে কথা হতে শুরু করলে সে রাগের মাথায় হাত চালিয়ে দেবে ঠিক। তারপর পালটা খেতে হবে সকলের কাছ থেকে। স্বপন ছাড়া এখানে বাকি সব কটার গায়ে কষ খুব। তা না হলে কি সাবুকে ছেড়ে দিতে হয়। সে এখন সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল জলের দিকে। তারপর স্বপনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার চিতার দিকে ফিরে আসতে লাগল।

'আহা, রাগ করচিস কেন? কেউ ত ধরতে পারেনি—ব্যাপারটা'— বলতে বলতে স্বপন বাপ্পার পেছনে পেছনে এগিয়ে এল।'

সাবুর চিতা জ্বলছে দারুণ।

ছোটবড় আগুনের চুড়ো লাফিয়ে উঠছে। পড়ে যাচ্ছে। আবার লাফাচ্ছে। সবচেয়ে উঁচু হয়ে দাপাচ্ছে মাঝখানের চুড়োটা। এরপর চার পাশে ক্রমে নিচু হতে হতে নেমে যাচ্ছে আগুনের জিভ। সব মিলিয়ে যেন মস্ত একটা ফুল। আগুনের ফুল। কাঁপছে। শুধু আগুনের চুড়োগুলো নয়, তাব ওপরকার বাতাসও কাঁপছে তিরতির করে।

চিতার আগুনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে বাপ্পার। কে জানে আগুনের ওই নাচই তাকে ভেতরে ভেতরে টান দিয়েছে নাকি এতকাল। ওই দাপট ওই অস্থিরতার সব কিছু টেনে নেওয়া, নিয়ে ছাই করে দেওয়া, দেখার মধ্যে বোধহয় লুকোন একটা মজা আছে।

শুধু একটা দিন এই মজা আদৌ ধরেনি তাকে। সেদিন সে বাবাকে পোড়াতে এনেছিল।

বাবা হসপিটালে ছিলেন। সেরে উঠছিলেন। হঠাৎ মারা গেলেন। রাত তখন বারোটা। শম্ভু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে খবর দিয়ে দিয়েছিল দলের সবাইকে। অল্প সময়ের মধ্যেই একে একে সবাই হাজির হয়েছিল অভিজিতের বাড়িতে।

শোকের বাড়ি। মা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন বার বার। মাকে নিয়েই ব্যস্ত সকলে।

দাদা আর তার জনা কয়েক বন্ধু চলে গেছিল হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ আনতে। সাবু, ভবানী, স্বপন আর বকাই বসেছিল ছোট ঘরটার মধ্যে।

ছোট্ট ঘরটার মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ওরা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। সাবু বলছিল ওভাবে ঘরের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে সোজা হাসপাতালে চলে যেত যদি ভাল করত। বাপ্পার মনে আছে, স্বপন একবার সময় দেখেছিল। বারোটা তেতাল্লিশ। বাপ্পার বিদেশী হাত ঘড়িটা দেওয়ালের একটা ছোট্ট পেরেকে ঝোলান' ছিল।

হাসপাতাল থেকে বাবার দেহটা বাড়িতে আসতেই খানিকক্ষণের থমকানো ভাবটা কেটে গিয়ে উঠল কান্নার রোল। সবাই ছুটে গেল খাট সাজাতে। ওই সময়টাতেই, কোন এক ফাঁকে সাবু তুলে নিয়েছিল হাতঘড়িটা। পরদিন গলায় কাছা, হাতে কম্বলের আসন নিয়ে বাপ্পা যখন ঠেক-এ গিয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে বলল ঘড়ি চুরির কথাটা—তখন বোধ হয় সকলে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। স্বপনই তো বলেছিল—তুই এটা কি করে ভাবচিস ভাই। —তোর এই রকম একটা সময়ে—আমাদের মধ্যে থেকে কারো পক্ষে কি ও-রকমটা করা সম্ভব? উলটে ঠেক-এর কারো কারো কথায় এমন ইংগিত তো ছিলই যে বাপ্পা এই রকম শোকের মধ্যেও নকশা মারছে। ঘড়িটা নিজেই দিয়েছে বিক্রী করে। সেই থেকে সাবুর মিউজিক পার্টির ঠেক-এ আর ভুলেও বাপ্পা পা মাড়ায়নি।

বকাই খোঁচাচ্ছে। খুঁচিয়ে দিচ্ছে চিতার কাঠগুলো। খুঁচিয়ে দিলে আগুনের চুড়ো ছাপিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো আগুনের ফুলকি উঠতে থাকে ওপর-দিকে। দেখতে বেশ লাগে। অসংখ্য আগুনের গুঁড়ো ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। সাবুর হাত, পা মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। পুড়ে গেছে। গনগনে চিতার কাঠ পুড়ছে লাল হয়ে। আগুনের মত অমন সুন্দর রঙ আর কিসে হয়?

খানিকক্ষণ পরে, বাঁশটা রেখে, নীল জিনস-এর জ্যাকেটের পকেট থেকে তোয়ালের রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে বকাই এসে দাঁড়াল বাপ্পার পাশে; বলল, 'কোথায় আর সাতটা হলে সেঞ্চুরী করবে—না, নিজেই জ্বলে গেল।'

বাপ্পা চাঁচা গলায় বলল, 'ভগবান? পাপীদের ওসব হয় না।' বাপ্পা, বকাই কিছু বলার আগেই ভবানী হেঁকে উঠল, 'শ্মশানে এসেচিস—একটু ভেবে-চিন্তে কথা বল!'

বকাই বলল, 'ভদ্দরলোকের ছেলে না? চামারের মত কথা কেন রে? চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আচিস না?'

হঠাৎ বাপ্পা কেমন যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'সত্যি কথা বলবো। কাউকে পরোয়া করি নাকি?'

'সত্যি মানে তো তোর সেই ফরেন মালটা—সেই হাতঘড়ি। তুই আমাদের সকলের নামে দোষ চাপিয়েচিস।'

'এখন আর সকলে নয়। শুধু সাবু।'

'কেন? চিতায় গেচে বলে!'

'স্বপনকে জিজ্ঞেস কর। স্বপনকে বলেছি সাবু—আমার ঘড়িটা সাবুই নিয়েছিস। আমি ওসব মরা বাঁচার তোয়াক্কা করি না। নিয়েছে যখন বলবো। জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়েই বলবো—শয়তানটা আমার সব নিয়েছে।'

খোলকত্তাল বেজে উঠল জোরে। হরিধ্বনি। আর একটা চিতায় মুখে আগুন চলছে।

'সব নিয়েচে মানে? সাবু তোর আর কি কি নিয়েচে? বল?'

বলতে বলতে বকাই আরো এক পা এগিয়ে এল। বাপ্পা দেখল বাকি সকলেও এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কথাটা আচমকা বেরিয়ে গেছে বাপ্পার মুখ থেকে। কথাটা সে বলতে চায়নি। অথচ মিউজিক পার্টির সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার পর এ কথাটা বোধহয় সে অসংখ্যবার ভেবেছে।

'বল, আর কি কি নিয়েছে সাবু—বল?' ভবানী আর ভেবলুস একসংগে প্রশ্ন করে।

বাপ্পা চিৎকার করে ওঠে, 'আমি কি সব লিস্ট করে রেখেছি? রিস্টওয়াচটা খুব দামি। খুব পয়া ছিল।'

বাপ্পা যেন আরো কি বলতে গিয়ে থেমে যায়।

সবাই থমকে আছে। তাকে ঘিরে আছে। এই রকম দৃশ্যের পরেই কি ঘটে বাপ্পার জানা আছে।

'বল, আর কি কি গেছে তোর?'

চিতার আগুনের লাল আভায় ওদের মুখগুলো অন্যরকম দেখাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

বাপ্পা চিৎকার করে বলে উঠতে পারে—'সাবু একা নয়; তোরা সকলে মিলে চুরি করেছিস আমার ঘড়ি। তোরা আমার সব নিয়েছিস শুয়োরের বাচ্চারা!' কিন্তু পারে না। বাপ্পা জানে একথা বল[illegible]র কি হবে। বকাই কিংবা আর একজন কেউ গিয়ে টেনে আনবে একটা জ্বলন্ত চিতার কাঠ।

যার সংগে খোদ লড়াই—সেই তো এখন চিতার কাঠের সংগে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সাতটা বাকি ছিল। একই সংগে তার মনে হয়, বকাই ওরা ছজন আর সে। সংখ্যায় সাত।

জ্বলন্ত চিতার দিকে আর একবার তাকায় বাপ্পা। চিতার আগুনের স্বল্প দূরে দাঁড়িয়ে একটা ষাঁড় চিবোচ্ছে ফুলের রিঙ। টাটকা ফুল। সাদা। বাপ্পা আর একবার লাইট পোস্টে ঝোলানো শুকনো ফুলের শূন্যটা দ্যাখে। তারপর দৃশ্য ঘুরিয়ে নেয়। মাথা নামিয়ে বলে, 'কিছু না, আমার সব কি রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

ওরা বাপ্পার মনের অবস্থা বুঝতে পারে না। তবু ওদের মুখের কঠোরতা ভেংগে যায়।

বাপ্পা আর দাঁড়ায় না।

চিতার কাঠের আওতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। আর তার ফিরে আসার সমস্ত পথ জুড়ে তার মনের মধ্যে, একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রের টিক টিক শব্দ বারবার লাফিয়ে ওঠে, পড়ে যায়, আবার লাফিয়ে উঠতে থাকে।

ছবি : সুধীর মৈত্র

আজকের হল্যাণ্ড

সুনীলরঞ্জন দত্ত

বছর তের-চোদ্দ আগে হল্যাণ্ডকে যেমন দেখেছি তার তুলনায় এখন অনেক বেশী বদলেছে। তখন হল্যাণ্ডে বেকার সমস্যা একেবারেই ছিল না, সাধারণ মানুষ ছিল রাজনীতিতে প্রচণ্ড বিমুখ, জীবন ছিল সহজ আর সরল কিন্তু এখন এই ছোট্ট দেশটির আকাশে এসে ভিড় করছে নানা জটিল সমস্যার কালো মেঘ, মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার জালে। ১৯৭৬-এর একটি দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, সমস্ত দেশ জুড়ে সেদিন ছিল একটা থমথমে ভাব। এমন একটি মানুষও সেদিন ছিল না যে জানতে চায়নি তাদের শ্রদ্ধেয়া রানীর সদাহাস্য, সদালাপী স্বামী প্রিন্স বারনার্ড "লকিড" কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত কিনা। খুব ভালো মানুষ এই প্রিন্স বারনার্ড, মুখে হাসি আর বুকে একটি গোলাপ ফুল এই চেহারা নিয়ে দীর্ঘ-দিন ধরে সম্মান কুড়িয়ে এসেছেন সমস্ত হল্যাণ্ডবাসীর কাছ থেকে। বহু সম্মানজনক পদের সাথে তিনি ছিলেন যুক্ত। সবাই সেদিন উন্মুখ হয়ে বসে ছিল টেলিভিশনের সামনে কেমন করে এই অপমানজনক ঘটনার সংগে বারনার্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন তা বিশদভাবে জানার জন্য। ঝড় যতটুকুই উঠুক তার ঝাপটা এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল "সুজডেক"এর রাজ-প্রাসাদে। পৃথিবীতে এখনও যে সব দেশে রাজা রাণীর মত বিলাসী পদ রয়েছে সে সব দেশের রাজ পরিবারের তুলনায় হল্যাণ্ডের রাজ পরিবার অনেক বেশী ভাগ্যবান। এখনও এ দেশের রাণী "শো কেসে" সাজিয়ে রাখার মত অক্ষম পুতুলরাণীতে পরিণত হননি। শুধু সাধারণ পোশাক পরে বিলাসহীন জীবন যাপন করেও এ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে ঠিক আগের যুগের রাজা রাণীর মতই সম্মান পেয়ে আসছেন। ফলে, রাণীর পরিবারের প্রতিটি মানুষ পৃথিবীর যে কোন দেশের রাজ পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী সুখী। সেদিন সেই সুখীরাণী জুলিয়ানাও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর স্বামীকে যে সমস্ত সম্মানজনক পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে এটাই তাঁকে আঘাত করেছিল ভীষণ-ভাবে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই সুযোগে বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল তাদের দাবি ছিল পূর্ণ গণতন্ত্র চাই, কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে রানীকে আর টানা হবে না, কিন্তু এসব দলের ক্ষমতা খুবই সামান্য। অবশ্য রানী জুলিয়ানা বলেছিলেন তিনি সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াবেন। হল্যাণ্ডবাসীরা বহুদিন ধরে রাজার মুখ দেখেনি, রানী উইল-হেলমিনার পর এলেন রানী জুলিয়ানা এর পর রানী হয়ে আসবেন রাজকন্যা বেয়াট্রিক্স, কিন্তু বেয়াট্রিক্সও ঘোষণা করলেন প্রয়োজন হলে তিনিও সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করবেন। দেশের সাধারণ মানুষের কিন্তু এ-সবে একেবারে সায় ছিল না। বারনার্ডকে যে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে তাতেই তারা মর্মাহত। দুঃখে ভেঙে পড়া রানীকে সমবেদনা জানাবার জন্য বহু হল্যাণ্ডবাসী সুজডেকের প্রাসাদে ফুল পাঠিয়ে ছিল। এ ঘটনার কয়েক মাস পরেই আবার একটা সমস্যার মধ্যে হল্যাণ্ডবাসীরা জড়িয়ে পড়লো। পিটার মেণ্টেন নামে এক ধনী চিত্র সংগ্রাহককে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভায় একটা হুলস্থুল কাণ্ড হয়ে গেল। আসলে এই ধনী চিত্ররসিক একজন ইহুদি ঘাতক। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় ন্যাৎসি সেনাদের সহায়তায় পোল্যাণ্ডের একটি গ্রামে ইহুদীদের নিঃশেষ করেছেন। তাঁর
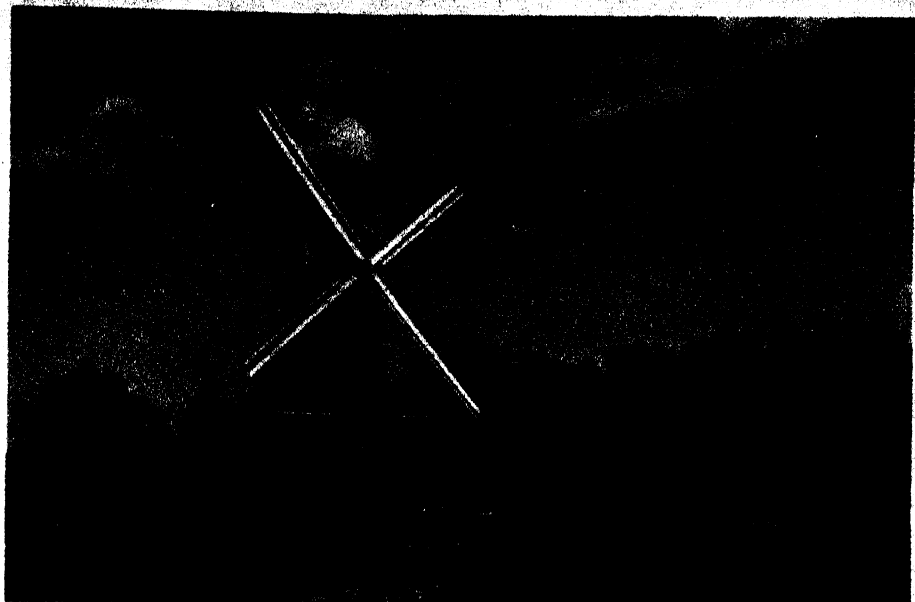
এসব কুকীর্তি আবিষ্কারের কৃতিত্ব হল্যাণ্ডের একজন সাংবাদিকের। কয়েক বছর আগে ইজরায়েলের একটি খবরের কাগজে পিটার মেণ্টেনের ইহুদী নিধনের কথা প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময় হল্যাণ্ডের সাংবাদিক অ্যাভাক ইজরায়েলে ছিলেন। খবরটি তাঁর নজরে পড়ে। দেশে ফিরে বহু চেষ্টায় তিনি পিটার মেণ্টেন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে খবরের কাগজে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পিটার মেণ্টেনকে বার কয়েক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল কিন্তু তখন প্রমাণিত হয়েছে মেণ্টেন নির্দোষ। এবার বেগতিক দেখে তিনি সুইজার-ল্যাণ্ডে পালালেন, কিন্তু বেশীদিন পালিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় দুশোখানা দুর্মূল্য চিত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সে সব চিত্র হল্যাণ্ড সরকার হস্তগত করেছে। অবশ্য প্রিন্স বারনার্ড এবং ইহুদী ঘাতক পিটার মেণ্টেনকে নিয়ে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন প্রায় স্তিমিত। এ সব ব্যাপার নিয়ে হল্যাণ্ডবাসীরা আর তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। কয়েক মাস আগে দেশে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল এবং নির্বাচনের আগেই মন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার ফলে মন্ত্রিসভা ভেঙে গিয়েছিল এবং নির্বাচনের পর ঐ মন্ত্রীরা এসে নতুন মন্ত্রিসভা গড়েও যে তাদের মতের তেমন মিল হচ্ছে না সেটাও এখন এদের কাছে তেমন একটা খবর নয়, এখন বরং হল্যাণ্ডে বসবাস-কারী দক্ষিণ মলুক্কাবাসীদের নিয়ে এরা ভীষণভাবে বিব্রত। বছর খানেক ধরে দক্ষিণ মলুক্কাবাসীদের আন্দো-লনটা বেশ জোরদারভাবে চলছে। ট্রেন হাইজ্যাক, ছোটদের স্কুল ঘেরাও এমন কি হল্যাণ্ডের রানী জুলিয়ানাকে পর্যন্ত চুরি করার একটা ফন্দি এটেছিল দক্ষিণ মলুক্কার টেররিস্টরা, এখন এদের আন্দোলনটা বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের অসন্তোষের কারণটা খুঁজতে গেলে পুরনো ইতিহাসের উপর চোখ বুলোতে হবে। কয়েক শ' বছর আগে ইংরেজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজদের মত ওলন্দাজরা বাণিজ্যের উদ্দেশে ভারত মহাসাগরের দিকে জাহাজ ভাসিয়ে ছিল, বণিকের ন্যায়দণ্ড এদের ক্ষেত্রেও এক সময় রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, ওলন্দাজরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলির উপর। সম্ভবত ওলন্দাজরাও জাহাজে যেসিন-গানের সাথে কিছু মিশনারিও নিয়ে-ছিল এবং তাদেরই দয়ায় দক্ষিণ মলুক্কার আম্বন, বুরু, ওরেতার ভেনিম্বার, কাই, অরু প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও হলো। এই সব দ্বীপের অধিবাসীরা প্রায় বংশানুক্রমে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করে ওলন্দাজ

প্যারেড-এ পাচ্ছেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোনও ডিটারজেন্টে কাপড় ধোয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে তার "পি এইচ লেভেল"-এর উপর :

কিছু ডিটারজেন্ট এতো নরম হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।

অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো কড়া হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটা খুব নরমও নয় আবার খুব কড়াও নয়। এই ডিটারজেন্ট সঠিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

SUPER DETERGENT WASHING POWDER

NEW Parade

THE IDEALLY BALANCED FORMULATION
■ WASHES WHITEST AND BRIGHTEST
■ PROTECTS CLOTHES

Godrej

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় দারুণ সাদা, দারুণ উজ্জ্বল করে।

আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর যে বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা কখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ঘন ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।

ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, ক্ষার জল বা পরিষ্কার জল সব জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ঘন ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যার ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

বিনামূল্যে !

৫০ গ্রাম সিম্বল—
২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে
৭০ গ্রাম সিম্বল—
৭০০ গ্রাম ও ১০০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে

শুভ্রতা ও ঝলক, চোখের পড়েনা পলক
—নতুন প্যারেড-এর চমক

[illegible] ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে ওলন্দাজ শাসকরা স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের কাজে মলুক্কা সৈনাদের ব্যবহার করতো। এর ফলে ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা ওদের উপর ক্ষিপ্ত ছিল, বিদ্রূপ করে মলুক্কানদের বলতো "ব্ল্যাক ডাচ" অর্থাৎ কালো ওলন্দাজ। ইন্দোনেশীয়ার মহান নেতা সুকর্ণ ক্রোধের সাথে বলেছিলেন "আমরা স্বাধীন হলে ওদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।" ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো, ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন হলো, সব কিছু ছেড়ে তারা দেশে ফিরে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু অনুগত মলুক্কান পরিবারকে। এক সময় এরা তাদের সেবা করেছে তাই বিপদের দিনে ওলন্দাজরা ওদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল। এইসব মলুক্কানরা হল্যাণ্ডে এসে সব রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে খুশীই হয়েছিস, কিন্তু মলুক্কানরা সমাধানটা চেয়েছিল অন্যভাবে। এদের ইচ্ছা ছিল দঃ মলুক্কার দ্বীপগুলি নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ হবে এবং ইন্দোনেশীয়ার সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে সেখানে তারা নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করবে। ইংরেজদের পক্ষে ভারতবর্ষ খণ্ডিত করা যত সহজ হয়েছিল সম্ভবত ওলন্দাজদের পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে টুকরো টুকরো করা তত সহজ ছিল না, কিন্তু মলুক্কাবাসীদের মাথা থেকে স্বাধীন মলুক্কার পরিকল্পনা মুছে গেল না। ওদের ধারণা হল্যাণ্ড সরকারকে চাপ দিয়ে ঐ কাজটি সমাধান করা যাবে, সেই উদ্দেশ্যেই বছর খানেক ধরে আন্দোলনের নাম করে নানা রকম সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। এ ধরনের আন্দোলনের জন্য হল্যাণ্ডবাসীরা প্রবীণ মলুক্কাবাসীদের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছে। যারা আন্দোলন করছে তারা বয়সে তরুণ, হল্যাণ্ডেই তাদের জন্ম। স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তারা মানুষ, মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের দৈন্য দুর্দশার সাথে তারা পরিচিত নয়, প্রবীণদের কাছে ঐসব দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সম্পদের কথা শুনে শুনে এদের ধারণা হয়েছে ঐ দ্বীপগুলি এক একটি স্বপ্নের দেশ, সেখানে আছে অফুরন্ত সুখ-শান্তি, হল্যাণ্ডকে তারা নিজেদের দেশ হিসেবে মনে করতে পারছে না, এখানে তারা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারেরও সুযোগ পাচ্ছে না, নিজেদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয়ই আর থাকছে না, হল্যাণ্ডবাসীদের সাথে মিসে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার যে কিভাবে এবং কবে সমাধান হবে তা কারো জানা নেই, হল্যাণ্ডবাসীরা ভেবেই পায়না এ দেশের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে কিসের লোভে এরা ফিরে যেতে চাইছে, কিন্তু মাটিরও যে একটা আলাদা টান আছে সেটা হল্যাণ্ডবাসীরা কি করে ভুলে গেল? এই মাটির টানেই তো হল্যাণ্ডবাসীরা বহু শতাব্দী ধরে সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে সুদক্ষ সৈনিকের মত। জুলিয়াস সিজার এই দেশটিতে পদার্পণ করে দেখেছিলেন প্রায় চারশো বছরের পুরনো বিক্ষিপ্ত ক্ষেত-খামারে কর্মরত গুল এবং সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে প্রায় প্রথম খৃষ্টাব্দ থেকে, তখন এ দেশের অধিবাসীরা দেয়াল তুলে সমুদ্রের হাত থেকে এ দেশটিকে রক্ষা করতো, ডাইক, এবং ড্যাম শুরু করেছে প্রায় ১ হাজার বছর আগে থেকে। ওলন্দাজরা ভীষণ পরিশ্রমী জাতি, প্রচণ্ড সংগ্রাম করে যেমন এরা সমুদ্রের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছে তেমনি সমুদ্রের বুকে নূতন ভূমি তৈরী করে দেশের আয়তন করেছে বৃদ্ধি, তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সুন্দর দেশটিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসি সেনারা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হল্যাণ্ড ছিল নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রচণ্ড আঘাতে ওলন্দাজদের সামরিক শক্তি বুদবুদের মত ফেটে গিয়েছিল, নাৎসি সৈন্যের ইহুদী নিধন যজ্ঞের সময় আমস্টারডাম শহরে কিশোরী "অ্যানা ফ্র্যাংক" লিখেছিল তার পৃথিবীবিখ্যাত "দিনলিপি"। ১৪ই মে হল্যাণ্ডের ইতিহাসে "ব্ল্যাক থারসডে" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। জার্মান সৈন্য দ্বারা ঐদিন ধ্বংস হলো আঠাশ হাজার ঘর-বাড়ী, হাসপাতাল, ইস্কুল, গীর্জা, দোকান। রটরডাম শহরের বুকে একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি পৃথিবীর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ব্ল্যাক থারসডে ধ্বংসলীলার কথা, এটি একটি নারীর মূর্তি যার হৃদয় এবং দেহের অনেকাংশ বিদীর্ণ, আকাশের দিকে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কিন্তু ফুলে ফলে সাজানো এই সুন্দর দেশটির পথে পথে ঘুরে বেড়ালে আর ওলন্দাজদের হাসি-খুশী সুন্দর মুখের দিকে তাকালে কখনো মনে হয় না বিভিন্ন সময় কতো ঝড় বয়ে গিয়েছে এ দেশটির উপর দিয়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এ দেশটির একটি মস্ত বড় সম্পদ, সেই লোভে বহু দেশের বহু ভ্রমণকারী ছুটে আসে হল্যাণ্ডে, যারা বেশ কিছুদিনের জন্য হল্যাণ্ডে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসে তাদের দখলে থাকে স্কেভেনিং, জিল্যাণ্ড, হুকভ্যান হল্যাণ্ডের সমুদ্র সৈকত। গ্রীষ্মকালে ওসব জায়গায় সমুদ্র সৈকতে পা ফেলার জায়গা থাকে না। আমস্টারডাম, রটরডাম, উটরেকট, ডেনহাগ এবং আরনহামের মতন বড় বড় শহরেও ভীড় হয় খুব। আমস্টারডামে এসে অনেকে "রাইক" মিউজিয়ামটা একবার ঘুরে যায়। এই মিউজিয়ামে রয়েছে রেমব্র্যাণ্ডের আঁকা ছবি।

রেমব্র্যাণ্ডের আবির্ভাব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। ঐ সময়টা ছিল হল্যাণ্ডের সবচেয়ে গৌরবময়, ইতিহাসে "স্বর্ণযুগ" হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, এই ছোট্ট দেশটি তখন একদিকে যেমন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড এবং নিউগিনিয়ার সম্পদে হয়েছিল ধনবান তেমনি ঐ সময় তারা পেয়েছিল রেমব্রাণ্ড এবং পিনোজার মতন গুণী শিল্পী। "শান্তি ভবন" আর মাদুরোডামের "লিলিপুট টাউন" দেখার জন্য অনেকে আসে ডেনহাগে। উইণ্ড "শিকণ্ডার ডাইক"-এ। এ গ্রামে রয়েছে দুশো আড়াইশো বছরের পুরনো [illegible] প্রাচীন ওলন্দাজদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরা, অধিবাসীদের দেখার জন্য অনেকে আসে মার্কেন এবং ভোলেণ্ডামে। তবে কয়েকটি শহর এবং গ্রামের নাম উল্লেখ করেই হল্যাণ্ডের দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা শেষ করা যায় না। সমস্ত দেশ জুড়েই রয়েছে প্রচুর দেখার জিনিস। এ ছাড়া বছরের নানা সময় জুড়ে রয়েছে নানা অনুষ্ঠান। ওলন্দাজরা ফুল খুব ভালোবাসে তাই ফুলের জন্য একটি উৎসব পালন করে। বিভিন্ন রং-এর ফুল দিয়ে সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি তৈরী করে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ীতে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সকলকে আনন্দ দেয়, এখানে এমন একটি পরিবারও নেই যার বসার ঘরটি ফুলে এবং ফুল গাছের টব দিয়ে সাজানো নেই। বিদেশে ফুল রপ্তানী করে হল্যাণ্ড সরকার বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করে। ৫ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যাটি থাকে ছোটদের উৎসবের জন্য। ঐদিন ছোট-বড় সকলেই নানা উপহার এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করে তাদের প্রিয় সান্তাক্লসের কাছ থেকে। বস্তুতপক্ষে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে ছোট ছেলে-মেয়েরা স্কুলে এবং বাড়ীতে এই উৎসব নিয়ে মেতে থাকে। স্কুলে-স্কুলে তখন সান্তাক্লস আসে ছোটদের আনন্দ দিতে। হল্যাণ্ডবাসীরা হল্যাণ্ডের রানীর জন্মদিন খুব ধুমধামের সাথে পালন করে। হল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে কার্নিভাল এবং ক্যারামুচ উৎসব হয়। ভারতীয়দের কাছে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে আমস্টারডামের "হরে কৃষ্ণ মন্দির", গেরুয়া রং-এর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাথা নেড়া বিদেশী ভক্তরা খোল-করতাল বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ গান গায়, মেয়েরা শাড়ী পরে কপালে তিলক কেটে মন্দিরে কাজ করে, এরা ভাত, ডাল, চাপাটি, পরটা দিয়ে নিরামিষ খাবার খায় আর একাদশী, পূর্ণিমা পালন করে, এদের মধ্যে অনেকে মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুর ঘুরে এসেছে। অনেকেই বাংলা-হিন্দী সামান্য কিছু জানে, কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক বলে বিদেশী ভাষায় গীতা উপনিষদ পাঠ করে। মন্দিরে ভক্তদের সংখ্যা কম নয়। যারা একবার এ-দেশ ঘুরে যায় তারা ওলন্দাজদের আতিথেয়তার খুব প্রশংসা করে। ওলন্দাজদের আর একটা মস্ত বড় গুণ হলো এরা খুব সহানুভূতিশীল, মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় এরা যে কতটা ব্যাকুল তার প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। পৃথিবীর যে কোন দেশের বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত নিঃসহায় মানুষের আর্তনাদে হল্যাণ্ড সাড়া দেয় অন্য সব দেশের আগে। সকলের আগে হল্যাণ্ডের দান পৌঁছে যায় সেই সব দেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে কিন্তু কোন দেশই এই ছোট্ট দেশটির কথা তেমন বড় করে প্রচার করে না যতটা করে অন্যান্য বড় বড় দেশ যেমন রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন কিম্বা ফ্রান্সের কথা। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও "হল্যাণ্ড সকলের বন্ধু" এ রকম একটা সুনাম আছে। সেই সুনামের উপরও কিন্তু কয়েক বছর আগে একটা কালো দাগ পড়েছিল। আরব ইস্রায়েল যুদ্ধে হল্যাণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও পৃথিবীর সব দেশ বিশেষ করে আরব দুনিয়া জেনেছিল হল্যাণ্ড আরবদের বন্ধু নয়। তাই আরব দেশগুলি তেলটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল এই ছোট্ট দেশটির বিরুদ্ধে। হল্যাণ্ডই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম দেশ যারা তেল সঙ্কট থেকে রেহাই পাবার জন্য রবিবার রাস্তায় গাড়ী বের করা বন্ধ রেখেছিল। তেল অভাবে দেশের চরম সংকটের কথা স্মরণ করিয়ে হল্যাণ্ড সরকার দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিল। উপায়ন্তর না দেখে এক মাস ধরে তেলের রেশন চালু রেখেছিল; কিন্তু এ ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমরা খুব অবাক হলাম। কোন রাজনৈতিক দলই নিজেদের দলের স্বার্থে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এই চরম সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করার কথা ভাবতেই পারলো না। ধর্মঘট করে মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে দেবার পরিবর্তে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য সরকারের সব নির্দেশই জনসাধারণ মেনে নিয়েছিল। এর ফলে হল্যাণ্ডবাসীর দুটি মনোভাব খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। এক হলো এরা খুব সহজে বুঝেছিল তেল তেল করে হাজার চেঁচালেও তেল পাওয়া যাবে না, রাতারাতি তেল সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা হল্যাণ্ড সরকারের নেই, আর একটি হলো সম্ভবত হল্যাণ্ডের প্রতিটি মানুষই ইস্রায়েলের শুভাকাঙ্ক্ষী, আরবদের তেল বয়কটের হুমকিতেও এরা এই নীতি থেকে এক চুলও নড়বে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের আগ্রহ যথেষ্ট, অন্তত বছরখানেক আগেও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর এরা খুব নজর রাখতো। ইন্দিরা গান্ধীকে ডিকটেটর হিসেবে খুব সমালোচনা করলেও এদেশে এমন একটিও মানুষ নেই যে ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে না। হল্যাণ্ড দেশটি খুবই ছোট। আয়তন মাত্র ২৪ হাজার বর্গমাইল, সেই তুলনায় লোকসংখ্যা খুবই বেশী, প্রায় সাড়ে তের মিলিয়ন, এর উপর রয়েছে নানা-দেশ থেকে আগত নাগরিক যারা এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে, এরাও সংখ্যায় কম নয়। ঔপনিবেশিকতার সূত্রে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে এদের সম্পর্ক ছিল ফলে সে সব দ্বীপের বহু অধিবাসী এখন হল্যাণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। যেমন ইংল্যাণ্ডে এসে মাথা গুঁজেছে বহু ভারতীয়, পাকিস্তানী আর সিংহলী, ১৯৭৫-এর নভেম্বরে সুরিনামা (ডাচ গিয়েনা) স্বাধীন হবার পর সে দেশের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ হল্যাণ্ডে চলে আসে। তাদের মধ্যে অনেকের বাবা-ঠাকুর্দারা এক সময় ভারতের অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তাদের বলা হয় "সুরিনামার হিন্দুস্থানী"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কল-কারখানায় কাজ করার জন্য তুরস্কের বেশ কিছু অধিবাসীকে নিয়ে আসা হয় এদেশে, উগাণ্ডা থেকে বহিষ্কৃত ভারতীয়েরাও জায়গা পেয়েছে হল্যাণ্ডে। এছাড়া আরো নানা দেশের লোকজন রয়েছে এখানে। এদের সকলকে নিয়েই আজকের হল্যাণ্ড।

লোকায়ত শিল্প : পুতুল

ত্রিপুরা বসু

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে, মানুষ যেদিন প্রথম সভ্যতার স্বাদ আস্বাদন করল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নতুন সম্পর্ক সেদিন স্থাপিত হল স্বাভাবিকভাবেই। সেদিন সে অসহায়ভাবে কেবল প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলো না, বরং তার বিভিন্ন উপাদানকে নিজস্ব কুশলতা প্রয়োগ করে তৈরি করতে শুরু করল নানা বস্তু—যা একান্তভাবেই শিল্পগত নৈপুণ্যে বিশিষ্টতার দাবীদার। প্রকৃতির অনন্ত উপাদান মাটি। তাকে নানা রূপে রূপান্তরিত করে পরে উত্তাপ প্রয়োগে তার জলীয় অংশটি নিষ্কাশিত করে সর্বপ্রথম উদ্ভাবন হল মৃৎশিল্পের। লোকায়ত শিল্পের বিচারে মৃৎশিল্পই আদিমতম। পরবর্তীকালে আরো নানা উপাদান এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যবহৃত হত চাক (Potter's wheel) এবং এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে 'পোন' বা চুল্লী (kiln) ব্যবহার ছিল। মৃৎশিল্পের প্রাচীনত্ব প্রমাণে এই দৃষ্টান্তগুলি যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট। পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড বলেছেন,
"In antiquity, too, it may be assumed that the use of the wheel indicates the industrialisation of ceramic production, the emergence of new specialised craft."
এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, মৃৎশিল্পের উদ্ভবকালের অনেক পরেই অপরাপর শৈল্পিক উপাদানগুলি পাওয়ার আন্তরিক তাগিদ কিংবা অসন্তুষ্ট শিশুর কপট ক্রোধ নিবারণকল্পে তার হাতে একটি সুদৃশ্য পুতুল তুলে ধরার জন্যে স্নেহময়ী জননীর আগ্রহ—এই ধরনের কোন কোন কারণ পুতুলশিল্পের উদ্ভবের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। পৃথিবীর কোন দেশের ঠিক কোন কালের মানুষ যে এই শিল্পটির উদ্ভাবনের জন্য কৃতিত্বের দাবীদার

কাকুরানের ঘোড়া
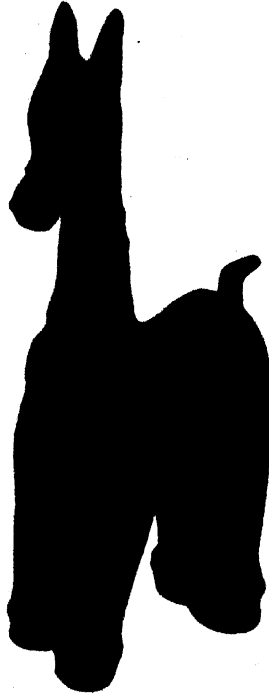
হবেন, তা নিয়ে নিবিড় গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। হয়তো এমন কোন অতি প্রাচীন পুতুল আজও কোন অঞ্চলের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত রয়েছে যা এ সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্তকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তবে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন পুতুলগুলি যে সাড়ে তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৈরি করা হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে সিন্ধু সভ্যতার বিস্তারক্ষেত্র হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো ও চানহুদাড়োর প্রত্ন-অভিযানে প্রাপ্ত উপাদানগুলি থেকে। রোম, গ্রীস, মিশর, সুমের বা অপরাপর সমকালীন প্রাচীন সভ্যতার আমলেও পুতুলশিল্পের নানা রূপান্তর ও চর্চা অব্যাহত ছিল বলে শোনা গেছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও সাইপ্রাসের সরকারী সংগ্রহশালার গ্যালারিতে এই সব প্রাচীন পুতুলের হদিশ মেলে। বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব ওয়েলশ মিউজিয়ামে রক্ষিত শূকর, মাথা নাড়ানো ষাঁড়, কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত অলংকারচর্চিত নৃত্যপটিয়সী নারী ইত্যাদি পুতুলগুলির কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। এই সব প্রাচীন পুতুলগুলির গঠনভঙ্গিমা ও নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিলে একথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে মানুষের অনুকরণ প্রবণতা, যাদুবিশ্বাস, ভীতি, ইঙ্গিত প্রবণতা, অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি অসাধারণ ও অনিবার্য আনুগত্যবোধ এবং বিশ্বাসের গভীরেই বুঝি প্রোথিত আছে পুতুলশিল্পের উদ্ভব রহস্যটি। লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি যে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ তাই এই শিল্পটিকে যুগে যুগে বৈচিত্র্য দান করে বিবর্তনের পথে টেনে নিয়ে গেছে। সমজাতীয় লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসে প্রভাবিত প্রাচীন মানবসমাজ সারা বিশ্বেই সেই বিশেষ ধর্মীয়চেতনাকে সংস্কার ও বিশ্বাসের সমর্থ ছত্রছায়ায় অতি যত্নে সংরক্ষণ করে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বীরভূমে 'পান্ডু রাজার ঢিবি'র ধ্বংসাবশেষ খনন করে যে সব প্রত্ন উপাদান লাভ করা গেছে তাদের কারো কারো সঙ্গে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে সুদূর ভূমধ্যসাগরের ক্রীট্ দ্বীপে রাজা মাইনোসের স্মৃতিবিজড়িত নোসসের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত কিছু কিছু পুরাবস্তুর সঙ্গে—সেই একই কারণে। মহিষাসুর, সর্পদেবী সেভাবেই মিশরসভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙালীর শিশুরক্ষক দেবী বিড়ালবাহনা ষষ্ঠীকেও দেখা গেল মিশরের বিড়ালবাহনা 'বাসট' রূপে। এদেশের শীতলা মিশরের প্রত্ন আবিষ্কারে দেখা দেন 'শেট্রা' রূপে, জোর বা প্যাটর যাঁর সহচর। আজো সারা বিশ্বের নানা দেশে কৃষি, শস্য, ক্ষেত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রায় একই ধরনেরই লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত। অন্তত এই সব দৃষ্টান্ত থেকে লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পৃথিবীর তাবৎ লোকায়ত সমাজগুলির মধ্যে একটি বহু প্রাচীন এবং সুস্পষ্ট যোগসূত্র সন্ধান করা বোধ হয় দুষ্কর নয়।

পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত ও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে এই বাংলাদেশের লোকায়ত পুতুলশিল্পের চর্চা সেই কোন অজ্ঞাত কাল থেকে সাম্প্রতিক দিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন যুগীয় মানুষের অনুকরণ-স্পৃহা বা এই জাতীয় কোন প্রবৃত্তি। গ্রীসে ধর্মান্ধতা, মিশরে দেবতার তুষ্টিবিধান ও ভারতবর্ষ তথা বাংলায় লোকদেবতার থানে 'ছলন' উৎসর্গ করার বাসনা পুতুলশিল্পে বৈচিত্র্য দান করেছে। অরণ্যনির্ভর শ্বাপদসংকুল জীবনে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, অরণ্য-দেবতা বা 'টোটেম' শক্তিকে বশীভূত করতে বাংলাদেশে অনেক পূর্ব থেকেই দেবতার প্রতীকরূপে পশুমূর্তি নির্মাণের প্রচলন আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'বারা-মুন্ড' প্রতীক। আজো মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে উন্মুক্ত বৃক্ষতলে লোকদেবতার থানে নিবেদিত হয় অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের পুতুল যাদের শারীরিক গঠনে একটি আদিম প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মুকুলগ্রামের হাতি-ঘোড়া শিল্পের
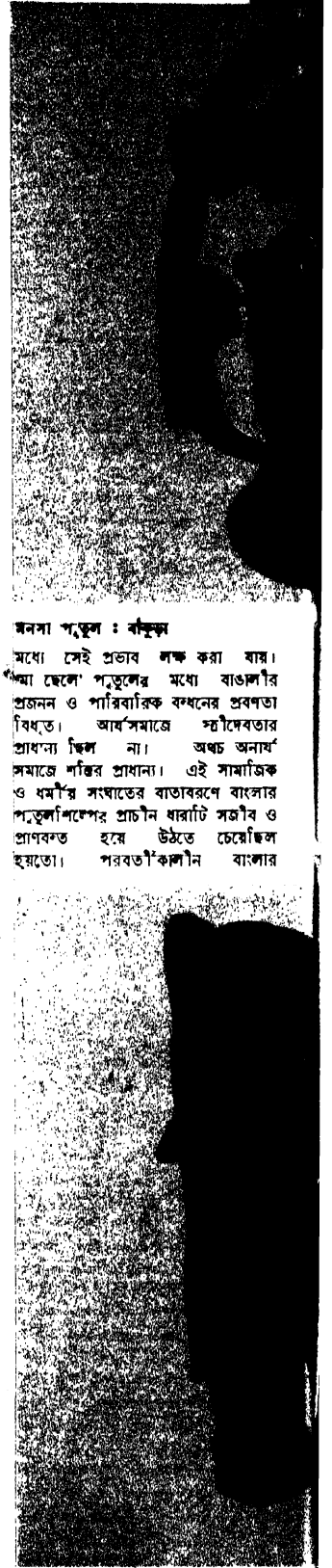
মনসা পুতুল : বাঁকুড়া

মধ্যে সেই প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'মা ছেলে' পুতুলের মধ্যে বাঙালীর প্রজনন ও পারিবারিক বন্ধনের প্রবণতা বিধৃত। আর্যসমাজে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য ছিল না। অথচ অনার্য সমাজে শক্তির প্রাধান্য। এই সামাজিক ও ধর্মীয় সংঘাতের বাতাবরণে বাংলার পুতুলশিল্পের প্রাচীন ধারাটি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে চেয়েছিল হয়তো। পরবর্তীকালীন বাংলার

মাটির হাতী : মেদিনীপুর

ডোকরা শিল্প : বর্ধমান

লোকায়ত শিল্পের অঙ্গীভূত হয়েছিল।
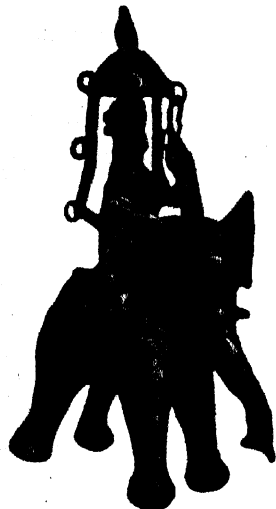
লোকায়ত শিল্পের বিচার করতে গেলে দেখা যায়, 'পুতুল'-এর মত জনপ্রিয় এবং বহুলচর্চিত শিল্পটির প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। সারা বিশ্বেই এর জনপ্রিয়তা সমান বৃদ্ধি পেয়েছে। দেবতাকে খুব কাছে

সামন্ত সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। আজ সেই সমাজ অনুপস্থিত। সেই সামন্ত প্রভুগণও কোথায় বিস্মৃত। কিন্তু লোকায়ত ধর্মনির্ভর গ্রামীণ বাংলায় অন্ততপক্ষে ধর্মীয় কারণেই পুতুলের ব্যবহার আজও আছে যথেষ্টই। বৈশাখে কুমারী মেয়েদের 'পুণ্যি পুকুর', 'যম পুকুর', বয়স্কাদের 'ইতু' বা 'সুবচনী

মঙ্গলচণ্ডী, কুল-কুলতি, টুসু ও ভাদু পরবে, অগ্রহায়ণ পৌষের লক্ষ্মী-পূজো' প্রভৃতিতে নানা ধরনের পুতুলের প্রয়োজন। পীরের মাজার, ধর্মঠাকুর-ষষ্ঠী-শনির থানে নিষ্ঠাসহকারে নিবেদন করা হয় নানা জাতের পুতুল। প্রাচীন গ্রীসেও 'আর্টেমিসের' কাছে কুমারী পুতুল ও ডায়নার কাছে নারী-মুখ জাতীয় পুতুল উৎসর্গ করা হত। সাম্প্রতিককালে জাপানের 'হাইনা-মাৎসুরি' উৎসবে কিশোর-কিশোরীরা নানা জাতীয় পুতুল সংগ্রহ করে যেভাবে সাজায় তা যেন আমাদের ঝুলন উৎসবেরই সামিল হওয়ার যোগ্য।

এ পর্যন্ত সম্মানপ্রাপ্ত মেদিনী-পুর জেলার শিলদা, পান্নাগড়, তমলুক ওড়গাঁদা, বাঁকুড়া জেলার লালবাজার কাঁকড়াম্বার, পোখরনা, ধন-আসাড়িয়া, বর্ধমান জেলার গোপালপুর, আড়া সাতঘেনী, মঙ্গল-কোট বীরভূমের পান্ডুরাজার ঢিবি,

পাঁচমুড়োর ঘোড়া : বাঁকুড়া

হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপুর, ২৪ পরগনার বোড়াল ও হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে যে সমস্ত পোড়ামাটির মডেল, 'টেরা-কোটা' বা পুতুল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন বাংলার পুতুলশিল্পের সুনিপুণ ধারাটি সম্পর্কে এক স্পষ্ট পরিচিতি লাভ করা যাবে। এ সমস্ত মডেল বা পুতুলের মধ্যে এক সুগভীর শিল্প-কুশলতা প্রযুক্ত হয়ে কিভাবে যে এদের সার্থকভাবে সুষমামন্ডিত করে তুলেছিল তা চোখে না দেখলে বোঝা দুষ্কর।

দুষ্কর। [আগ্রহীজন এজন্যে হাওড়ার বাগনানের নিকটবর্তী 'নবাসন আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা', মেদিনীপুর

ষষ্ঠীপুতুল : পাঁচমুড়ো
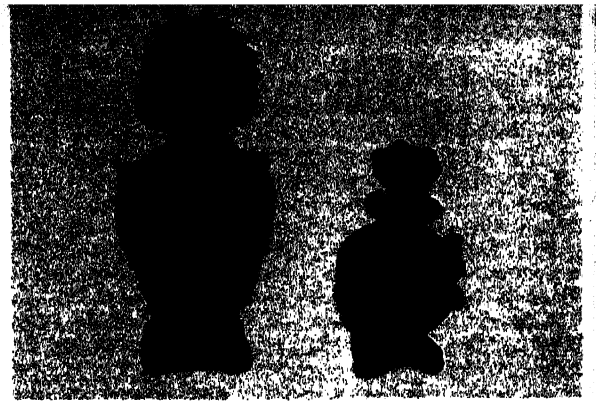
জেলার তমলুকের 'তাম্রলিপ্ত গ্রামীণ মিউজিয়াম', বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন' পুরুলিয়ার 'হরিপদ স্মারক সংগ্রহ-শালা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চিত্রবীথি', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগ্রহশালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়াম'-এর সংগৃহীত মডেল ও পুতুলগুলি এক নজরে দেখে নিতে পারেন]। দক্ষিণ ভারতের 'তেলেঙ্গা পুতুল' মথুরার 'গোপী-কিষেণ' রাজস্থানের 'গঙ্গাবতী', 'কোনহাম' ইত্যাদি পুতুলের তুলনায় বাংলার পুতুল অনেক বেশী মর্যাদা লাভের যোগ্য।

আজও বাংলাদেশে যে সমস্ত পুতুল তৈরি হয় তাদের উপাদান মূলত মাটি, কাঠ, শোলা, গো-মহিষের শিং বা কোন ধাতু। সাম্প্রতিককালে কাগজ, হাড়, পাথর, গালা, কাপড় ও তুলোর ব্যবহারও হচ্ছে। তবে মাটিই বাংলার পুতুল শিল্পের আদি ও অকৃত্রিম উপাদান। প্রথমেই এসে পড়ে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের তৈরী 'পোটো' পুতুলের কথা। নরম কাদার তাল রুটির মতো বেলে তা নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে তা থেকে তৈরী হয় দুখোল বিশিষ্ট ফাঁপা পুতুল। পরে তা রোদে শুকিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপে 'পোনে'র আগুনে পুড়িয়ে তাকে নানান 'দেশীয় উপাদানে' তৈরী বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা হয়। মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল, কেশব-বাড়, বাসুদেবপুর, আকুবপুর, মহিষাদল, ঠেকুয়াচক, ২৪ পরগনার জয়নগর, মজিলপুর, বারাসাত, মুর্শিদাবাদের কান্দি, কোটালিয়া, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম, বীরভূম জেলার রাজনগর, হাওড়ার প্রশস্ত, রসপুর, কলকাতার কালিঘাট ইত্যাদি স্থানের পটুয়াশিল্পীগণ এই সব পুতুল তৈরী করে থাকেন। স্থানীয় মেলা বা বাজারে এদের বিক্রি হতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, মুখ, বিভিন্ন পশু ও পাখী, মা-ছেলে, বউ, বুড়ো-বুড়ি ইত্যাদির মডেল এঁরা তৈরী করে থাকেন। 'পোটো' পুতুলকে শিল্পীরা 'শিলেট পুতুল' (Slate), 'হিংলী-পুতুল', 'মুখো পুতুল', ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে থাকেন।

অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ড'এর প্রতীকচিহ্ন হিসাবে অনেকেরই নজরে পড়ে, উন্নত কর্ণ, উদাত্ত গ্রীবা ও তন্ময় ভঙ্গিমা-বিশিষ্ট এক বিচিত্র ধরনের ঘোড়া। বলা বাহুলা, বাঁকুড়া জেলার পঞ্চ-

কাঠের পুতুল : কেশপুর
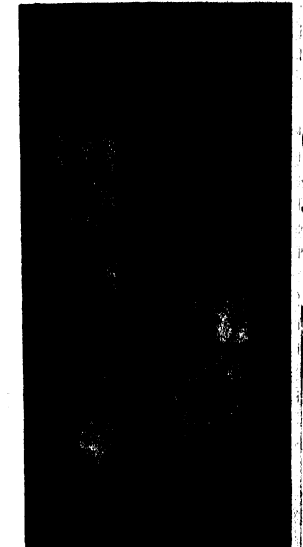
মৃত্তিকাশিল্পেরই' বিশিষ্ট অবদান এটি। এই ঘোড়া আজ এদেশের নাগরিক জীবনে তো বটেই বিদেশেও রীতিমত নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। বাঁকুড়া শহর থেকে তেইশ মাইল এবং বিষ্ণুপুর থেকে তের মাইল দূরে অবস্থিত, তালডাংরা থানার কুম্ভকারপল্লী পাঁচমুড়ো, এটিই হলো সেই পোড়ামাটির জগদ্বিখ্যাত হাতি ঘোড়া, বাঘ ও রণোন্মত্ত ষাঁড় নির্মাণের কেন্দ্রস্থল। পাঁচমুড়োর পুতুল শিল্পের যে নিজস্ব ঘরাণা আছে তা অনেকাংশে পার্শ্ববর্তী স্থানের কুম্ভকারশিল্পকে প্রভাবিত করে থাকলেও বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি গ্রামীণ মৃৎশিল্প তার নিজস্ব স্বকীয়তা বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এ জেলার উল্লেখযোগ্য পুতুলশিল্পের কেন্দ্রগুলি হলো তালডাংরা থানার বিবরদা কামারডিহা, ওন্দা থানার মাকড়ইজোড়

পুর, জয়কৃষ্ণপুর ও উলিয়াড়া, সোনামুখী শহর, পাত্রসায়েরের থানার হাবীরপুর, রাজগ্রাম (বাঁকুড়া থানা)। বলা বাহুল্য বাহির্বিশেষে এ'রা সকলেই পাঁচমুড়োর শিল্পীরূপে খ্যাত। পাঁচমুড়োর বিখ্যাত পুতুলশিল্পের জন্য কোন ছাঁচের ব্যবহার নেই। চক্রাকারে ও সবেগে আবর্তিত চাক'-এর কেন্দ্রস্থলে রক্ষিত নরম মাটির ওপর শিল্পীর দুটি কুশল হাত এক আশ্চর্য নিয়মে খেলা করে এই মনোভিরাম শিল্পটির জন্মদান করে। এই শিল্পগুলি আগাগোড়াই ফাঁপা। কিন্তু অপরাপর অধিকাংশ স্থানের শিল্পগুলি নীরেট ; এবং এদের কান ও লেজ আলাদা করা যায় না।

বাঁকুড়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনিদর্শন হলো বহুসাপের ফণা বিশিষ্ট মনসার ঘট, যা "মনসার ঝারি" নামে খ্যাত। আগে বেশ বড় আকারের ঘট তৈরী হোত যার ব্যাস অন্ততপক্ষে দু ফুট, উচ্চতায় ৩-৪ ফুট। এ বস্তুটির শিল্পসুষমাও অতুলনীয়। বাঁকুড়ার বিভিন্ন দেবতার থানে বেশ পুরোনো আমলে তৈরী বহুদারতন মনসার ঘট অনেকাংশে ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের বিনয় ঘোষ বলেছেন, "বস্তুত বাঁকুড়ার এই প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানগুলিই আমার কাছে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আদি ও অকৃত্রিম মিউজিয়াম বলে মনে হয়েছে। হাতি ঘোড়া দেবস্থানে মানত ও উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়, তাই বংশানুক্রমে উৎসর্গীত হাতি-ঘোড়ার স্তূপ প্রত্যেক দেবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ ষাট বছরের পুরোনো হাতি ঘোড়া এইসব দেবস্থানে দুর্লভ নয়, শতাধিক বছরের প্রাচীন নিদর্শনও দেবস্থানের আশেপাশের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় [বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব : পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : পৃঃ ১০৭]।" বস্তুত বাঁকুড়ার বিশ্ববিখ্যাত মৃৎশিল্প নিয়ে নিবিড় গবেষণার আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁরা সেভাবেই সহজে এই শিল্পটির ক্রমবিকাশের সূত্র উদ্ধারে সক্ষম হবেন। বাঁকুড়ার রূপনারায়ণ নদী গন্ধেশ্বরী খাল ও কেঞ্জেগি বাঁধের মাটি ওখানকার ঐ পুতুল বা মডেল শিল্পটির উপযুক্ত কাঁচামাল। বিশেষ ধরনের অগ্নিকুণ্ডে পরিমাণ মত তাপে শুকনো পুতুলগুলি পোড়ানো হয় ফাঁপা পুতুলগুলির নানা অংশে ছিদ্র থাকে—ভেতরকার বাষ্প বা ধূম নির্গমনের জন্যে। পোড়ানোর গুণে কোনটি লাল বা কোনটি কৃষ্ণকায় হয়ে ওঠে। এজন্যে কোন রং বা পালিশ করা হয় না।

উল্লিখিত শিল্পগুলি ছাড়াও বাঁকুড়ার শিল্পীগণ রেলপুতুল, চাকা-লাগানো গাড়ী, ঘোড়সওয়ার, ক্ষুদ্রায়তনের ঘোড়া হাতি, সন্তান কোলে জননী-মূর্তি বা ষষ্ঠী পুতুল, কলসী কাঁখে বধূ ইত্যাদি তৈরী করে থাকেন। আর, বাঁকুড়া ছাড়াও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, কাশিপুর, পুরুলিয়ার কালিদহ, কাঞ্চেড়া, লালগড়, গদীবেড়ো ইত্যাদি স্থানের কুম্ভকারদের তৈরী পুতুল বা ঘোড়া-হাতির খ্যাতিও কম নেই।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চৈতন্যচক অঞ্চলে গো-মহিষের শিং থেকে নির্মিত হয় এক ধরনের মনোরম পুতুল বা মডেল। প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন এই শিল্পটি ঐ এলাকার আট বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট প্রায় ১৮-১৯টি গ্রামের কয়েকশত সূত্রধর, মাহিষ্য ও বর্গক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের শিল্পীগণের সুনিপুণ কৃতিত্বে আজ দেশজোড়া খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার পারলেখামুণ্ডি থেকে দুজন শিল্পী এসে ঐ শিং শিল্পটি উক্ত অঞ্চলে প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং দক্ষশিল্পীর কুশল হাতের প্রভাবে অজস্র অমসৃণ গো-মহিষের শিং থেকে তৈরী হয় অতিমসৃণ ও সুদৃশ্য বিভিন্ন মডেল, জীবজন্তু, কলম দানী, খেলনা ইত্যাদি। আধুনিক যুগে

কৃষ্ণনগরের পুতুল—জেলে

গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এই শিল্পটি শৌখীন বাঙালীদের মধ্যে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

গ্রাম বাংলার বিল-ঝিল বা অন্য কোন জলাশয়ে একরকম বিনা আবাদেই 'শোলা' গাছ জন্মায়, যার পাতাগুলি তেঁতুল পাতার মতো ক্ষুদ্রায়তনের। এর কাণ্ডটি শুকিয়ে গেলে অত্যন্ত হালকা এবং ভেতরে ভেতরে শ্বেত-শুভ্র হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে এই কাণ্ডটি থেকে পাৎলা আস্তরণ সংগ্রহ করে বাংলার মালাকার শিল্পীরা তৈরী করেন নানা শৌখীন পুতুল ও খেলনা। দেবদেবীর ডাকের গহনাও এ'রাই তৈরী করেন। শোলার তৈরী লণ্ঠন, রেলগাড়ী, কুমীর, নৌকা বা জাহাজ, মানুষ, কলার কাঁদি, ঘোড়-সওয়ার ইত্যাদি দেখতেও সুন্দর এবং হালকা। নদীয়া জেলার 'বাতের বিলে' জাত উৎকৃষ্ট শোলার চাহিদা কলকাতার বাজারেও প্রচুর। শোলা শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা বাংলার প্রায় সর্বত্রই আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হাওড়া জেলার বালি, খুরুট, বসন্তপুর, ডোমজুড়, পাঁচলা, হুগলী জেলার ভানকুনি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, ২৪ পরগনার আড়িয়াদহ, আগরপাড়া, কলকাতার নতুনবাজার, কুমারটুলী, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, তমলুক, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, মাসিয়াড়া, পাত্রসায়ের বর্ধমান জেলার পাটুলী, সোমহানী, ভাতার, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, জোড়াঙ্গা, বোলনবাড়ী, বীরভূম জেলার পাইকার, মহুলা ইত্যাদি স্থানে।

নদীয়ার নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে পূর্ববাংলার নাটোর থেকে প্রতিমা গড়ার কাজে এসেছিলেন কুম্ভকারশিল্পীরা। পরবর্তীকালে তাঁরা কৃষ্ণনগর ও তার সন্নিহিত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এ'দের পদবী দুজেত 'পাল'। কৃষ্ণনগরের এই শিল্পীদের তৈরী মডেল বা পুতুলের খ্যাতি আজ প্রায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত। কৃষ্ণনগর শহরের উপকণ্ঠে জলঙ্গী নদীর তীরে 'ঘূর্ণি' এলাকায় এই জগদ্বিখ্যাত শিল্পী-পল্লীটি অবস্থিত। যতদূর জানা গেছে, হটু পাল ও রামচন্দ্র পাল—এই দুজন শিল্পীই এই শিল্প ঘরাণাটির জনক। যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা এই শিল্পটি একদা ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের প্রশংসালাভে ধন্য হয়। লণ্ডন, বোস্টন, প্যারিস প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে একাধিকবার। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই শিল্পের এক প্রদর্শনীতে শিল্পী রাখালদাস পালের তৈরী একটি চা-বাগিচার মডেলের দাম উঠেছিল যার শত টাকা। দেব-দেবীর মূর্তি, জেলে, চর্মকার, কর্মকার কুম্ভকার, বাদক, নর্তক-নর্তকী, বর-বধূ, আদিবাসী দম্পতি ইত্যাদির মডেল এখানে তৈরী হয়। জলঙ্গী নদীর পলিমিশ্রিত মাটিই এই বিখ্যাত শিল্পটির কাঁচা মাল।

বাংলার সূত্রধর সম্প্রদায় কাষ্ঠ খোদাইয়ের কাজে নানা সময়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে এসেছেন। হলুদ, গামার, আমড়া, ছাতিম, কদম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কোমল জাতীয় কাষ্ঠ থেকে সুকৌশলে এ'রা তৈরী করে থাকেন রাম-রাবণ, নারায়ণ, অবতার, নিতাইগৌর, নৌকা, বউ মিনিয়েচার ঢেঁকি, মন্দির বা মসজিদের মডেল ইত্যাদি। নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, দাঁইহাট, বর্ধমান জেলার নতুনগ্রাম, কলকাতার কালিঘাট—এই সমস্ত স্থানে কাষ্ঠের পুতুল বা মডেল নির্মাণের এক একটি ঘরাণা বর্তমান। মেদিনীপুরের দাসপুর এবং কেশপুরের সূত্রধরশিল্পীদের তৈরী 'কেঠো-পুতুলের' ওপর মিশরীয় 'মমি' যে কিভাবে তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করল তা অজ্ঞাত।

ইলামবাজারে ইদানীংকালে গালা থেকে নানা বিচিত্র ধরনের কাঁচা পুতুল তৈরী হচ্ছে। এর জনপ্রিয়তাও নেহাৎ কম নেই। বাঁকুড়া - মেদিনীপুর - বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে 'ডোকরা' নামক এক শিল্পী সম্প্রদায় বসবাস করেন। মাটি ও গালার তৈরী ছাঁচের মধ্যে গলিত পিতল ঢালাই করে এ'রা নানা দেবদেবীর মূর্তি বা মডেল তৈরী করে থাকেন। শিল্প বিজ্ঞানের ভাষায় এই পিতল-ঢালাই পদ্ধতিটি 'লস্ট ওয়াক্স কাস্টিং' নামে জ্ঞাত। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর থেকে এই শিল্পীরা বহুকাল পূর্বে এসে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন বলে জানা গেছে।

পুতুলের কথা বলতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই খেলনার কথা এসে ইংরেজী টয়-এর আগমন। কিন্তু পুতুল ও খেলনার মধ্যে সীমারেখা টানা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আড়াই হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে যে সমস্ত পুতুল তৈরী হয়েছিল তাদের মধ্যে এখন যেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা সবই খেলনার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। দেবতার 'থানে' নিষ্ঠা সহকারে নিবেদিত পুতুলগুলি সেই সেই দেবতার খেলার সামগ্রী হতে পারে। আবার পোড়া মাটির ঘোড়া-হাতি তো দেবতা ও শিশু উভয়েরই খেলার সামগ্রী। রথযাত্রার শিশুদের উৎসবের অঙ্গ 'মিনিয়েচার' রথে তো বয়স্কদের আরাধ্য জগন্নাথ বলরাম পুতুলের রূপে ধারণ করে আরোহণ করেন। গ্রামগঞ্জের মেলায় খেলনা বা পুতুলরূপে আমদানী হয় ঢোলক, বাঁশী, বেহালা, গাড়ী, মোটর, রেল ইত্যাদি সেও তো বয়স্কদের ব্যবহৃত বস্তুরই মডেল। তবে কি একথা বলব যে মডেল বা খেলনার ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুমন তার আগামী বাস্তবের মুখোমুখি হবার জন্যে শিক্ষানবিশী করে থাকে?

সে যাই হোক, পুতুল বা খেলনার মধ্যেকার সম্পর্কে যত বাদ বিতণ্ডাই থাক না কেন, পুতুলের ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিতান্ত আধুনিক আমলেও নানা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে পুতুলের ব্যবহার থেকে এ ধারণা করা দোষ নয়। আজকে অবশ্য বাংলার লোকায়ত পুতুলশিল্প সম্ভবত যুগগত কারণেই বিলাসী শৌখীন বাঙালীর ড্রয়িংরুমের সেল্‌ফে সম্মান লাভ করেছে। এ সমস্ত পুতুল নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রদর্শনীর খবরও মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। দশহরা, রথযাত্রা, আমবারুণী, পৌষ সংক্রান্তি, জন্মাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী, টুসু, ভাদু ইত্যাদির মেলাতেও এই পুতুলগুলি আমদানী হয়। বিক্রিও হয় মোটামুটিভাবে। কিন্তু তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায় প্রচ্ছন্নভাবে। শিল্পী এই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত থেকে কি পরিমাণে লাভবান হন? যে পরিমাণ শ্রম ও যত্ন এই শিল্পের পেছনে অকৃপণভাবে ব্যয় হয় তার বিনিময়ে শিল্পীদের প্রাপ্তিযোগ কিন্তু যৎসামান্যই। ফলত সাম্প্রতিক বাংলার লোকায়ত পুতুল শিল্পের জগতে হতাশার অন্ত নেই। কৃষ্ণনগর বা পাঁচমুড়োর পুতুল শিল্পের মত জনপ্রিয়তা তো আর কোন পুতুলের ললাটে সম্ভব হয় নি। ফলত অনেক শিল্পীই তাঁদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া এই শিল্পচর্চা থেকে নিজেকে নিরত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন এবং নিজ-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতেও বাধ্য হচ্ছেন। আজকের পুতুল শিল্পীদের অধিকাংশেরই পুতুল বা খেলনা তৈরী বা বিক্রি করে মন হয়তো ভরে কিন্তু আদৌ তার উদরপূর্তির সংস্থান হয় না। এখানেই বাংলার লোকায়ত শিল্প ও শিল্পীর ব্যর্থতা। অথচ এই শোচনীয়তার জন্যে কোন একজনকে দায়ী করা যায় না। দায় সমগ্র সমাজের, যে সমাজ মানুষকে যুগে যুগে আলোর পথে টেনে নিয়ে যায়।

চাইনা বুদ্ধের শান্তি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মেঘের গর্জনে বর্ষে অবিরাম
আছি কি জেগে? নাকি সুপ্ত?
দাপায় ঝোড়ো হাওয়া, আকাশ-পৃথিবীর
ক্ষীণ সীমানা অবলুপ্ত।

এখন এ-হৃদয় মধ্যরাত্রির
জানালাহীন পোড়ো ঘর,
ইতস্তত ছেঁড়া কাগজ-স্তূপে শুধু
ইঁদুর ঘোরে অতঃপর।

কিংবা আমি এক নৌকো, প্লাবনের
ঢেউয়ের দাঁতে দাঁতে ছিন্ন,
তীরের আশ্বাস নেইক সম্মুখে
অন্ধকার স্রোতাকীর্ণ।

রক্তে নেই বুঝি সমুদ্রের ডাক,
নেইক বর্ষণে ক্লান্তি,—
সাক্ষী থেকো তবু, আমি তো হে জীবন
চাইনি বুদ্ধের শান্তি।

চেয়েছি শুধু যেন দীর্ঘ ঈগলের
তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে বিদ্ধ
আকাশে করে পাই দীপ্ত বোধি, যার
প্রসাদে হবো বাক্-সিদ্ধ।

পাতাল পেঁৗছেও তাহলে উলূপীর
মোহিনী-পাশ ছিঁড়ে দৃপ্ত,
না এনে বিষে-নীল ধনঞ্জয়ে ফিরে
হবোনা আমি পরিতৃপ্ত।

সময় এইরকম

নীরদ রায়

বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমাপ্রার্থী ব্যথা—
বিজয়ী গাছের গোড়ায় স্তূপাকৃত জমে থাকা
শুকনো পাতার আহত বিস্ময়—
দুঃখী মানুষের সময় এইরকম,
এবড়োখেবড়ো লাল সুরকির পথে প্রতিনিয়ত
হারিয়ে যায়—তার কত উজ্জ্বল দিন—
ছেঁড়াকাটা আমোদ আহ্লাদ
স্বপ্নময় সূর্যের কাছাকাছি যাওয়ার জন্যে কত
দীর্ঘ প্রতিশ্রুতি—
দুঃখী মানুষের সময় এইরকম,
শুধু বর্ণপরিচয়ের কাছে—হাতের মুঠো আলগা করে
অর্থহীন গোছগাছ—
দুঃখী মানুষের সময় এইরকম।

বাজনা

কবিরুল ইসলাম

তুমি কি সেই বয়ঃসন্ধির নূপুর, যার শরীর ছিলো
বাজনা, ছিলো মঞ্জু মঞ্জরি
নূপুর পায়ে বাজতে পারে সবাই
তুমি বাজতে নিজের জোরে, নূপুর

আজ সেই নূপুরই দুপুর...
কত কী যে ভাঙতে গড়তে
গড়তে ভাঙতে
ভাঙতে ভাঙতে গড়া : শোনো,
সেই নূপুরই বাজে—

বাজে, বাজে ভরতি দুপুর দুরে
নূপুর, তুমি নিজের জোরে নারী॥

শান্তির অর্কিড

প্রদ্যোত মৈত্র

সব স্থির হয়ে যায় এমনি করে। জোৎস্নার মতন
গ্রীলের নকশার নিচে পড়ে থাকে বালিশে চাদরে
সংলাপ জড়ানো এক নায়কের চারপাশে এবড়ো খেবড়ো
স্মৃতি, নুড়ি, জলরেখা, নারীর চোখের মত অন্ধকার সব
স্থির হয়ে থেমে থাকে, দম আটকে বন্ধ হওয়া ঘড়ি।
মনের গহন জুড়ে স্খলিত শব্দের পরমায়ু
দুটি নীল মুখ যেন সাজঘরে নেপথ্য নাটকে
লটকে থাকে ঝাউবনে শব্দ করে
সমুদ্র-বেহালা
ভেতরে সমস্ত স্থির এমনি করে স্থিরতর হয়।

ঝুল বারান্দার টবে বিশল্যকরণী সেই লতা
মৃত্তিকা বিহীন শুধু ঝুলে থাকে, রৌদ্র এসে ছুঁয়ে যায় হাওয়া
ছুঁয়ে যায় তার মুখ, ছুঁয়ে যায় তার বিহ্বলতা
মুঠোর ভেতরে কিংবা মুঠো খুললে দেখা যায় দুর্লভ শিকড়।

অরণ্যদেব

চলবে ১২

শংকর

॥ ১০ ॥

গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করতে আহ্বান জানানোর ব্যাপারটা মিসেস পপি বিশোয়াসের মুদ্রাদোষের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ইতিপূর্বে টেলিফোনেও তিনি এই ধরনের কথা বলেছেন।

সুতরাং, ও'র কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু এবার মিসেস বিশোয়াস বেশ সীরিয়াস। মাথা নেড়ে ঘোষণা করলেন, "কিছুতেই ছাড়ছি না এবার। এমন গোপন ব্যাপার যে দিব্যি না-করা পর্যন্ত মুখ খুলছি না।"

মিসেস বিশোয়াস এবার নিজের হাতখানা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিলেন। "এই কড়ে আঙুলটা ছুঁয়ে বলুন, একটি কথাও আপনার মুখ থেকে বেরুবে না।"

এই মহিলার হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই। অগত্যা ও'র কথা মতো মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হলো।

খুব খুশী হলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "এ-ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না মিস্টার শংকর। আর একজনের কাছে আমাকে এইভাবে শপথ করতে হয়েছে। কী ভীষণ বুদ্ধি তার। সে কী করলো জানেন?"

মিসেস বিশ্বাস এবার দ্রুতগতিতে তাঁর ব্যাগ থেকে একখানা ফটো বার করে ফেললেন। "আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের এই ছবি ছুঁয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে যে ব্যাপারটা ভীষণ কনফিডেনসিয়াল থাকবে।"

কবেকার কোন পুরুষ যাঁর সঙ্গে কত বছর ধরে কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি যে আজও মিসেস বিশোয়াসের জীবনে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন তা আমার জানা ছিল না। মিসেস বললেন, "ও'র ছবি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে আমার খুব ভয় হচ্ছে। কারুর ছবি অথবা গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে সেই প্রতিজ্ঞা না রাখলে কী হয় জানেন তো?"

কী আর হতে পারে? আমি বিপদটা আন্দাজ করতে পারছি না।

উদ্বিগ্ন মিসেস বিশোয়াস কাতরভাবে বললেন, "যাকে ছুঁয়েছেন তার খুব ক্ষতি হতে পারে—এমন কি মৃত্যু ঘটতে পারে। আমার ছোটমাসী তো এইভাবেই মারা গিয়েছিলেন। আমি বাবা কোনো রিস্ক নিতে রাজী নই—মুখ খুলবার আগে তাই আপনাকে দিয়েও দিব্যি করিয়ে নিলাম। কোনো ত্রুটি হলে আমারও মৃত্যু হবে তা হলে।"

মিসেস বিশোয়াস এবার বোকার মতো হেসে উঠলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও'কে ভীষণ অসহায় মনে হলো। কিন্তু তারপরেই তিনি পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। ব্যাগ থেকে শেষ সিগারেট খণ্ড মুখে লাগিয়ে প্যাকেটখানা অবহেলাভরে হাতের মুঠোর মধ্যে মুচড়ে দুমড়ে বিধ্বস্ত করলেন; কাছাকাছি কোনো ওয়েস্টপেপার বাস্কেট খুঁজে না পেয়ে ওটিকে মেঝেতে ফেললেন এবং তখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের হাই-হিল জুতোর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত চাপ ওই কাগজের বল-এর ওপর প্রয়োগ করলেন।

মিসেস পপি বিশোয়াস যে তাঁর ইস্পাতের নার্ভ ফিরে পেয়েছেন তা ও'র সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার স্টাইল দেখেই বোঝা গেল। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "তাহলে বিজনেসের কথাগুলো হয়ে যাক, মিস্টার শংকর।"

কাজের কথা শুনতে আমি অবশ্যই প্রস্তুত। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনার তো অনেক লাইনে অভিজ্ঞতা। সেই জন্যেই আপনার সাহায্য চাওয়া।"

এখনও প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে দ্বিধা দেখাচ্ছেন মিসেস বিশোয়াস। এবার তিনি কিছু ইঙ্গিত দিলেন, "আপনি তো এক সময়ে হাইকোর্টে কাজ করতেন, ও-পাড়ার নাড়ি নক্ষত্র তো আপনার জানা।"

"অতোটা না-হলেও কিছুটা আমার জানা-শোনা" আমি ব্যাখ্যা করি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "একজন বড় ব্যারিস্টারকে খুব আর্জেন্টলি প্রয়োজন। নাম বলুন তো।"

ব্যারিস্টাররা বার অফ ইংলন্ডের প্রজা—তাঁরা সাধারণত অ্যাটর্নি অথবা অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ছাড়া সাধারণ মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না।

মিসেস বিশোয়াস ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না। "রাখুন রাখুন ওসব কথা। ভাল লোক হলে অবশ্যই তাঁর কাছে সোজাসুজি যাওয়া যাবে। আপনি শুধু নামটা বলুন বাকিটা এই পপি বিশোয়াস ম্যানেজ করবে।"

আমি আবার সমস্যায় পড়লাম। "মিসেস বিশোয়াস, ব্যারিস্টার অনেক রকমের হয়।"

"সে তো জানি, ভাল ব্যারিস্টার, খারাপ ব্যারিস্টার, খুব খারাপ ব্যারিস্টার," ফোড়ন দিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

"আমি সে-কথা বলছি না। মামলার বিষয় অনুযায়ী ব্যারিস্টার পাল্টাতে পারে। ব্যাপারটা ডাক্তারের মতো। প্রথমেই জানতে হবে—মেডিসিন না সার্জারি। হাইকোর্ট পাড়ায়—দেওয়ানি না ফৌজদারি। মেডিসিন এবং সার্জারির যেমন ডজন ডজন স্পেশাল বিভাগ আছে, তেমনি আইন পাড়াতেও আজকাল বহু রকমের স্পেশালিস্ট। যিনি আয়কর আইনে বিশেষজ্ঞ তিনি বিবাহ সংক্রান্ত মামলায় হয়তো মাথা ঘামাবেন না। যিনি শ্রমিক আইনে স্পেশালিস্ট তিনি হয়তো ট্রেড মার্ক অথবা পেটেন্ট কেসে ভাল করবেন না।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "উঃ, আমি ট্রেডমার্ক নিয়ে কী করবো—আমাদের এ লাইনে ট্রেডমার্ক বা পেটেন্ট কিছুই নেওয়া যায় না, সবাই নিজের কপালগুণে করে খায়।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "শুনুন, মিস্টার শংকর। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস—একটা কম বয়সী মেয়ের ভাগ্য এর ওপর নির্ভর করছে। ব্যাপারটা সিভিল না ক্রিমিনাল দাঁড়াবে তাও জানি না। আপনি একজন ভাল মানুষ ব্যারিস্টারের নাম করুন—যিনি মেয়েটার সমস্যা বুঝবেন, তার কথা মন দিয়ে শুনে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন।"

"সিভিল এবং ক্রিমিন্যালের মধ্যে অনেক পার্থক্য, মিসেস বিশোয়াস," আমি পপিকে মনে করিয়ে দিলাম।

"তাই বুঝি?" আকাশ থেকে পড়লেন। "আমি তো দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎই দেখি না। এই তো আমার সঙ্গে আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের সম্পর্ক: ডাইভোর্সটা সিভিল ব্যাপার হলো। কিন্তু স্বামী বেঁচে থাকতে হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর খুইয়ে আমি যে লাইনে চলে এলাম, সেটা নাকি ক্রিমিন্যাল ব্যাপার হয়ে গেল অথচ ব্যাপারটা বিশ্বাসই হয় না—ক্রিমিন্যাল কথাটা শুনলেই গা-টা রি-রি করে ওঠে। ভদ্রঘরের মেয়ে আমরা, ভদ্রভাবে খেটেখুটে দুটো পয়সা রোজগার করছি, দেশের জন্যে অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জও 'আর্ন' করেছি—এটাকে ক্রিমিন্যাল বললে মেজাজ খারাপ হয় কিনা বলুন?"

"যিনি ব্যারিস্টারের সহায়তা চান তিনি কে?"

"না, আমি নই", খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "যাঁর জন্যে দরকার তার

পরিচয় আপনি জানতে পারবেন একসময়, মিস্টার শংকর। আপনারা না-জানা পর্যন্ত সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ হবে না। তখন বুঝতে পারবেন, বাপ-মা আমার নাম কেন পাপি বিশোয়াস রেখেছিল।"

হাঙ্গামা না বাড়িয়ে আমি দু'একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের নাম করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "এ'রা খুব ভাল লোক। সরকারী এবং বেসরকারী দুই মহলেই এ'দের যথেষ্ট সুনাম।"

পাপি বিশোয়াস বলেছিলেন, "আপনার একশো বছর পরমায়ু হোক, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। খবরটা যার দরকার তার সঙ্গে এবার যোগাযোগ করতে হবে।" নিজের খেয়ালেই হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, "অতিদর্পে হত লঙ্কা। আমাকে যে বিপদে ফেলেছিল তার কিছুতেই ভাল হবে না, মিস্টার শংকর। পাপি বিশোয়াসকে সে এখনও চেনে নি।"

এর পরের দিনই মদনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঝকঝকে ইমপোর্টেড জামাকাপড় পরে শ্রীমান মদনা আমার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলতে এসেছিল।

আমার জন্যে মদনার চিন্তার অন্ত নেই। মদনা বললো, "স্যার, এক আধখানা খালি ফ্ল্যাট মিসেস চাওলাকে দিয়ে দিলেই পারতেন।"

এ বিষয়ে কোনো রকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার নেই। মদনা তবু মুখ বন্ধ করল না। বললো, "আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলুম, স্যার। এ পাড়ায় গেরস্ত ভাড়াটে আর আসবে না, স্যার। থ্যাকারে ম্যানসন মানেই এখন আমাদের সিলভার ড্রাগন। ওই যে তিনতলায় মিস্টার ঠাকুরের ফ্ল্যাট ছিল। ফিফটিন থাউজেন্ড রুপিজ ক্যাশ দিয়ে ফ্ল্যাটখানা মিসেস চাওলা নিয়ে নিলেন। মিস্টার ঠাকুর এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।"

খবরটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। মিস্টার ঠাকুরের মতো ভদ্রলোকও যে বেআইনী পথে ভাড়াটিয়া স্বত্ব অন্য কাউকে দিয়ে যাবেন তা আমি আশা করি নি। মদনা একগাল হেসে বললো, "অন্য একজন ওই ফ্ল্যাটের জন্যে দশ হাজার টাকা দাম দিয়েছিল। বড় মেমসায়েব সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ পনেরো হাজার দিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। নগদের নাম নারায়ণ—ক্যাশের সামনে ভদ্রলোক ছোটলোক সব সমান!"

মদনা বললো, "স্যার, আপনাকে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি—আপনি চাওলা মেমসায়েবের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলুন। আপনার ব্যাপারে মেমসায়েবের খুব দুঃখু হয়েছে।"

চাওলা মেমসায়েবের রিপোর্টে আমার হাফ-পূর্ববঙ্গীয় রক্ত গরম হয়ে উঠলো। মদনাকে এখনই একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু তার আগেই মদনা মুখ খুললো।

মাথা চুলকে মদনা বললো, "কাল রাত্রেই বড় মেমসায়েব জামাইবাবুকে বলছিলেন—ওই বাঙালী ম্যানেজারবাবু ভেবেছে কী? এ বাড়ির প্রত্যেকখানা ঘর আমি নিজের কনট্রোলে আনবো। দেখি ওই ছোকরার কত ক্ষমতা!"

মদনার মুখ এবার অজানা আশংকায় গম্ভীর হয়ে উঠলো। ফিসফিস করে সে বললো, "এরা লোক ভাল নয় স্যার। এরা পারে না এমন কাজ নেই। আমি স্যার, লুকিয়ে চলে এসেছি খবরটা আপনাকে দিতে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন রাজত্ব চালাচ্ছে কে?"

মদনা বললো, "বড় মেমসায়েবই সব। তারপরেই জামাইবাবু। খোদ চাওলা সায়েবের কোনো প্রতিপত্তি নেই। তিনি মেমসায়েবের হুকুম মতো মুখ বুজে কাজকর্ম চালিয়ে যান। মেমসায়েব রেগে গেলে বলেন, তুমি একটা অপদার্থ—গুড ফর নাথিং—আমি হাল না ধরলে এখনও বস্তিতে থাকতে।"

"সায়েব কী বলেন?" আমি জানতে চাই।

মদনা ফিক করে হাসলো। "সায়েব কিছুই বলেন না। মাথা নিচু করে সব কথা হজম করে যান।" মদনা এবার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের ভাষ্য শুরু করলো। "উপায় নেই স্যার। মেয়েমানুষের রোজগার ভোগ করলে তার গালাগালিও খেতে হবে। আমাদের কিষ্টোর নতুন-মা রোজগার করে এবং যখন-তখন কিষ্টোর বাপকে ঠেঙায়।"

মদনা এবার আরও কিছু ভিতরের খবর দিল। বললো, "বড় মেমসায়েব না থাকলে এই সিলভার ড্রাগনের বিজনেস কিন্তু একমাসও চলবে না। বড় বড় সব অফিসার তো মিসেস চাওলার খোঁজ করেন, চাওলা সায়েব কিংবা ম্যানেজারবাবুর খোঁজ করেন না। আর উর্বশী দিদিমণির কথাই তো আলাদা। কোনো কাজেই মন নেই। বড় মেমসায়েব তো সেদিন রেগেমেগে বললেন, "তোকে যে-কাজই দিই সে-কাজ হয় না। একটা অর্ডিনারি ছোঁড়ার কাছ থেকে একখানা ফ্ল্যাট পর্যন্ত তুই বার করতে পারলি না।"

ছোট মেমসায়েব কী বললেন জানবার জন্যে আমি মদনার মুখের দিকে তাকালাম। মদনা জানালো, "দিদিমণি কোনো কথাই বললেন না। গম্ভীর হয়ে রইলেন।"

মদনা এবার জানালো, "সব চেয়ে ভাল আছেন জামাইবাবু। এতো বড়ো সিলভার ড্রাগনের ম্যানেজার হয়ে আছেন, ব্যাগভর্তি টাকা রোজগার করছেন। কেউ কিছু বলে না ও'কে।"

মদনা বললো, "জামাইবাবুর শরীরে স্যার দয়ামায়া নেই। ক'দিন আগে এখানে কর্মচারীদের মাইনে বাড়াবার দাবি উঠেছিল। বড় মেমসায়েব এসটাফের সঙ্গে কথাই বললেন না। জামাইবাবু সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, কাউকে দরকার নেই। যার খুশি সে সিলভার ড্রাগন ছেড়ে চলে যেতে পারে।"

"তারপর যা ব্যাপার হলো না, স্যার। এতো কাছে থেকেও আপনারা জানতে পারেন নি।" মদনা ভিতরের খবর আমার কাছে ফাঁস করলো। "জামাইবাবু ট্রাংক-টেলিফোনে ছ'জন গুন্ডা আনিয়ে নিলেন।"

"কোথা থেকে? আমি জিজ্ঞেস করি।"

মদনা মোটেই অবাক হলো না। "কেন স্যার?" কলকাতার বড় বড় পার্টির গুন্ডা যেখান থেকে আসে—বেনারস থেকে। বেনারসের মিছরীলালজী নামকরা সাপ্লায়ার। আপনার থ্যাকারে ম্যানসনে দরকার হলে বলবেন, আমি টেলিফোন নম্বর দিয়ে দেবো। বারো ঘন্টার মধ্যে গুন্ডাপার্টি আপনার কাছে এসে যাবে। জামাইবাবু তো বলেছিলেন, বেনারসের মতো জায়গা হয় না—এতো সস্তায় এতো ভাল গুন্ডা এখন কোথাও পাওয়া যায় না।"

মদনা এবার মিটমিট করে হেসে ফেললো। "বেনারসের গুন্ডাদের দেখেই তো স্যার কর্মচারীদের এসট্রাইক মাথায় উঠলো। তারা সুড়সুড় করে ল্যাজ গুটিয়ে ডিউটি দিতে লাগলো—বললে, 'ভিক্ষে চাই না, কুকুর সামলাও।' কিন্তু বেনারসের গুন্ডাদের একটা বিশ্রী নিয়ম—সাত দিনের কমে কোনো বুকিং নেয় না। আধ ঘন্টার কাজ হলেও ওদের এক সপ্তাহ মিনিমাম রাখতে হবে। ফলে সাতদিন ওরা গেটের পাহারায় রয়ে গেল। ওই সময় এসটাফকে ওরা খুব হেনেস্তা করেছে স্যার—কিন্তু কোনো ব্যাটার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুলো না।"

মদনা এবার বেনারসের গুন্ডাদের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। "স্যার, চেহারা বটে—যেন পাথর কেটে কেটে এদের বানানো হয়েছে। ভোরবেলায় উঠে প্রত্যেকে আড়াইশ' ডন বৈঠক দেয়। তার পরেই এক পোয়া ভিজে ছোলা খাবে।"

মদনা বললো, "কিন্তু স্যার প্রথম দিন ডিউটিতে এসেই এরা যে কাণ্ড করলো! খোদ চাওলা সায়েবকেই

ওরা দোতলায় ঢুকতে দেয়নি, বলেছে, হুকুম নেই ঢোকবার। চাওলা সায়েব আধঘন্টা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর জামাইবাবু এসে ও'কে ভিতরে নিয়ে গেলেন। চাওলা সায়েবের মুখ টমাটোর মতো লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বড় মেমসায়েব গুন্ডাদের একটুও বকলেন না।"

এতোগুলো গুন্ডা এই থ্যাকারে ম্যানসনে এতোদিন থেকে গেল অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না!

"এরা কোথায় ছিল, মদনা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন? ছাদে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে? রামসিংহাসনজীর কাছ থেকে জামাইবাবু খাটিয়া ভাড়া নিলেন। খাটিয়ার ভাড়া খুব বাড়িয়ে দিয়েছেন রামসিংহাসনজী—প্রতিদিন দেড় টাকা। চারদিনে খাটিয়ার দাম উঠে যায়; কিন্তু কেউ কিছু বলে না। খাটিয়া মানে তো শুধু খাটিয়া ভাড়া নয়; থাকবার পারমিশন। খাটিয়া তো হাওয়ায় ভাসবে না—এই থ্যাকারে ম্যানসনের কোথাও তাকে তো রাখতে হবে।"

এই সব গুন্ডাদের সেবাযত্নের ভার মদনার ওপরেই পড়েছিল। মদনা সেই সুযোগে ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে। মদনা বললো, "কারুর মনেই এখন সুখ নেই, স্যর। গুন্ডামির বাজারেও এখন ভীষণ কমপিটিশন—রেট খুব পড়ে যাচ্ছে। এখন কুড়ি টাকায় ঠ্যাং ভাঙবার লোক পাবেন—অথচ দু বছর আগেও একশ' টাকার কমে কেউ কথা বলতো না। এখন স্যর যা বাজার, একশ' টাকায় খুন করানো যায়। নেহাত এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের কলকারখানাগুলো রয়েছে তাই, না হলে যে গুন্ডাদের কী অবস্থা হতো!"

"গুন্ডামির মার্কেট যদি এতো খারাপ থাকে, তা হলে কীসের বাজার ভাল?" আমার জানবার লোভ হয়।

"বুকের ছাতি, হাতের গুলি দেখিয়ে আজকাল ততটা লাভ হয় না, স্যর। এখন যে বুদ্ধিমানের যুগ। এখন যত পয়সা এই এসমাগলিং-এ, আর চারশোবিশ লোক ঠকানোয়। ওই সব লাইনে এখন খুব চাপ—কাজের লোকদের খুব টানাটানি।"

মদনার কথাগুলো আমাকে এক অজানা জগতে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই যা বিশ্বাস হতে চায় না মদনা তা কত সহজে বলে যাচ্ছে।

মদনা বললো, "শেষ পর্যন্ত নিশ্বেস ছেড়ে বেঁচেছি। গুন্ডারা বেনারস থেকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পেয়ে কোন্নগরে এক কারখানায় চলে গেল। কিন্তু চাওলা সায়েবের খুব ক্ষতি করে গেছে—চাকরবাকর কারও জানতে বাকি নেই যে, চাওলা সায়েবকে গুন্ডারা তোয়াক্কা করেনি। ও'র প্রেস্টিজের কিছু রইলো না।"

মদনা এর পরে আবার ফ্ল্যাটের কথা তুলতে গিয়েছিল, আমি উৎসাহ দেখাইনি। মদনা তখনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, শকুন্তলা চাওলার সঙ্গে সহযোগিতা করলে ভালই হতো; কারণ, বড় মেমসায়েবের এই রাজত্ব বেড়েই চলবে, কেউ তা আটকে রাখতে পারবে না।

মদনাকে শূন্য হাতে বিদায় করলেও শকুন্তলা চাওলার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদি কেউ এই থ্যাকারে ম্যানসনে ক্রমশই জাঁকিয়ে বসেন তিনি অবশ্যই সুন্দরী মিসেস চাওলা। তাঁর বিরাগভাজন হওয়া আমার পক্ষে যে যুক্তিযুক্ত না তা বুঝতে পেরে আমার দুশ্চিন্তার বোঝা আরও বাড়তে লাগলো। ও'র হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে আমার কর্মজীবনের শান্তি নষ্ট হতে বসলো।

কিন্তু তারপরেই অঘটন ঘটলো। সন্ধ্যার একটু পরেই সেদিন সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসনে প্রবল উত্তেজনা। রাতের অন্ধকারে একদল পুলিস ও অসংখ্য সাদা পোশাকের সরকারী কর্মচারীর আকস্মিক উপস্থিতিতে থ্যাকারে ম্যানসনের শান্ত জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এই ধরনের বিরাট 'রেড' আমি কখনও দেখিনি। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্র—মিলিটারি প্রত্যুৎপন্নমতিতে কয়েকখানা গাড়ি এসে থ্যাকারে ম্যানসনের বিভিন্ন গেটের সামনে থমকে দাঁড়ালো। সাদা পোশাকে অনেক লোক যে তার আগে থ্যাকারে ম্যানসনের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি।

তারপর হঠাৎ শ্যামের বাঁশি বেজে উঠলো। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা—এবং সিলভার স্লাগানের দিক থেকে যেন কিছু আর্তকণ্ঠের চিৎকারও ভেসে উঠলো।

উত্তেজিত সহদেব আমার কাছে ছুটে এসে বললো, "স্যর ভীষণ কান্ড চলছে। রিভলবার হাতে কত লোক যে এসেছে তার ঠিক নেই। থ্যাকারে ম্যানসনের চারদিক ওরা ঘিরে রেখেছে।" সহদেব এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি, তাই বেচারা একটু বেশী ভয় পেয়েছে। ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে সে ছাদে চলে গেল। তার চোখে জল। বৃদ্ধ বয়সে সরকারী গুলিতে খুন হবার সম্ভাবনা আছে জানলে সে নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতাতে আসতো না।

সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে একটু পরে নিজের ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও এক প্লেন-ড্রেস-এর পাল্লায় পড়লাম। বিনীতভাবে সে জানালো, এখন বেরনো চলবে না। এখনই অফিসার আসছেন বিশেষ কাজে। বুঝলাম, অনেকগুলো ফ্ল্যাটের ওপরই নজর রাখা হয়েছে এবং সর্বত্রই জালপাতা হয়েছে।

নিজের ঘরে নজরবন্দী থাকবার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ নয়। কয়েকবার পায়চারি করে আমার ধৈর্যচ্যুতি হলো।

সাদা পোশাকের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কারা? কী জন্যেই বা এখানে এসেছেন?"

লোকটি যে আমাকে কিছুই জানাতে পারবে না তা সোজাসুজি বলে দিল। তার সবিনয় নিবেদন, "আমাদের অফিসার এখনই আসছেন—তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন।"

আরও কিছুক্ষণ বন্দী সিংহের মতো পায়চারি করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠলো। ঘর থেকে বেরোবার শেষ চেষ্টায় সাদা পোশাকের প্রহরীর কাছে নিজের পরিচয় দিলাম; নিচে আপিসঘরে যে আমার অনেক কাজ আছে তাও জানালাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

লোকটি ঠান্ডা মেজাজে আমাকে জানিয়ে দিল, আমি এ বাড়ির ম্যানেজার হই আর মালিক হই, তাতে কিছু এসে যায় না। সায়েব এখানে না আসা পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারবে না।

হুড়মুড় করে আরও দুজন লোক এবার এসে পড়ে তাঁদের লিস্টি থেকে আমার ঘরের নম্বরটা মিলিয়ে নিলেন। তারপর আমার নামটাও জেনে নিলেন। "আপনি তো এখন থ্যাকারে ম্যানসনের চার্জে আছেন?"

দায়িত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

লোক দুটি এবার ঘোষণা করলেন আমার ঘর সার্চ হবে। "হা ঈশ্বর! আমি কী করলাম?"

"আলী বক্স তুমি এই দরজার সামনে দাঁড়াও। কাউকে ভিতরে ঢুকতে বা বেরোতে দেবে না", আগের লোকটির ওপর নতুন হুকুম হলো।

অফিসারদের অন্য একজন কাগজের লিস্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সব ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আছে?"

বললাম, "না, কয়েকটা ফ্ল্যাট খালি রয়েছে।"

সেগুলোর নম্বর নির্ভুলভাবে পরের পর বলে অফিসারটি আমাকে তাজ্জব করে দিলেন।

"কিছু মনে করবেন না, ওই ফ্ল্যাটগুলোও আমাদের সার্চ করতে হবে। চাবি নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। ওই কাজগুলো আগে সেরে আসি।"

আমার দেহ এবার ঠান্ডা হয়ে আসছে। খালি ফ্ল্যাটের চাবিগুলো ড্রয়ার থেকে বার করে নিয়ে আমি বললুম, "চলুন—আমি প্রস্তুত।" [ক্রমশ]

সঙ্গীতপ্রাণ অমিয়নাথ সান্যাল

সুধীর চক্রবর্তী

সুরলোকে সংগীতের আসরে তাল ভঙ্গ অপরাধে গন্ধর্বকে নির্বাসিত করা হত। সংগীতের তত্ত্বজ্ঞ ও সুরৈকপ্রাণ অমিয়নাথ সান্যাল গত ২৪শে জানুয়ারী মধ্য রাতে বিদায় নিলেন নরলোক থেকে, গভীর অভিমানে নিতান্ত নিঃশব্দে। তাঁর অনুশীলিত কণ্ঠে সুরের ভ্রমর নিত্য গুঞ্জরিত ছিল, পরিশীলিত রসরুচি চিরসুন্দরের অভিবন্দনায় উচ্ছ্বসিত ছিল, কিন্তু কোন্ গোপন কারণে গত এক দশক তিনি সুরের জগৎ থেকে স্বনির্বাসী ছিলেন। হয়ত ভারতীয় সংগীত জগতের উন্মত্ত সুর তাণ্ডব, মার্গ সংগীতের ব্যবসায়িক স্বৈর ব্যবহার তাঁর ভাল লাগেনি। সমকালীন ও তাৎক্ষণিকের তালে নিজের ধ্রুপদী লয় গাঁথতে চাননি। তাঁর মৃত্যু তাই বিদায়ের রিক্ততার সঙ্গে আমাদের পরিতাপের বিষণ্ণ পুরবীকে মিশিয়ে দিচ্ছে। জন্মে উনিশতকীয় এই সংগীত নায়ক (জন্ম ১৮৯৫, মে) অনুশীলনের একমুখী নিষ্ঠায়, সাংগীতিক সংসর্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ও সংগীত শাস্ত্র পাঠের নিঃসঙ্গ পথে আশ্চর্য সমন্বয়ী বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক দু-দিকেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও মেধাবী অভিনিবেশ। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ইতিহাস রচনায় কার্ট স্যাকস্ যেমন বিভিন্ন ললিতকলার অন্যোন্য সম্পর্ক বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন অমিয়নাথের 'প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা' গ্রন্থিকায় সেই বিরল মনের বর্ণিকাভঙ্গ দেখা যায়। আবার রাগরাগিণীর বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির যে নবপ্রয়োগ তিনি করেছেন তা অভিনবত্বে ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে পাশ্চাত্ত্য সংগীত বিশ্লেষক টোভে-কেও ছাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু তিনি সৃষ্টি করে গেছেন স্মৃতির অতলের রহস্যময় নান্দনিকতা ও বিশিষ্ট একটি সাংগীতিক দর্শন যা পরবর্তী প্রজন্মকেও নাড়া দেবে।

বস্তুত, ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনযুগে সপ্ত তার খুব গভীর সুরে বাঁধা ছিল। ভারতীয় দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের মত সংগীত শাস্ত্রও আস্বাদন ও বিশ্লেষণ এই ত্রিমুখী প্রয়াসে সিদ্ধান্ত ও রস পরিণতির পথ খুঁজেছে। ভরত রচিত নাট্য শাস্ত্র, মতঙ্গরচিত বৃহদ্দেশী; নারদরচিত সংগীত মকরন্দ এই তিনখানি কোষগ্রন্থ ছাড়াও শার্ঙ্গদেব, সোমনাথ, দামোদর ও লোচন পণ্ডিতদের উত্তরপ্রয়াস সংগীতের সুধারস-স্রোতে তত্ত্ব দর্শনের নোঙর ফেলে সব কিছু বুঝতে ও মাপতে চেয়েছে। একদিকে সুর গন্ধর্ব ও গান্ধর্বিকাদের সুরের অনুশীলন আরেকদিকে গীত-তত্ত্ববিদদের জিজ্ঞাসা ভারতীয় সংগীতকে অগ্রসৃতির পথে নিয়ে গেছে। উনিশ শতকে সেই ঐতিহ্য ধরে বাংলা সংগীতেও নবীনযাত্রা শুরু হয়। একদিকে নিধুবাবু, দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, মধু কান, বিষ্ণু, যদুভট্ট ও বিষ্ণুপুর ঘরানার অনুশীলন, আরেকদিকে সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির তত্ত্ব-সন্ধান একই সমুদ্র সন্ধানের দ্বিমুখী পথ। অমিয়নাথ সান্যালের মধ্যে ছিল এই দুইয়ের মধ্যে যুক্তবেণী রচনার দুর্লভ প্রতিভা। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন রসিক ও তাত্ত্বিক। সুরজ্ঞ ও গুণজ্ঞ। নিছক গান শোনার আনন্দিত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর অপরিমাণ, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন গানের বিশ্লেষণজাত আনন্দকে। ফলে তাঁর সঙ্গে আলাপচারি ও তাঁর রচনাপাঠে আমরা পেয়েছি একজন, সুরসিক সমঝদারকে। যিনি আসক্ত, বিদগ্ধ এবং পরিণামে বিবিক্ত। তাঁর সংগীতের জ্ঞান ও সুরের কান জীবিতকালেই তাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল। প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি বিনায়ক সান্যাল রচিত 'অবসুতের অপলাপ' থেকে একটি অংশ :

'আখড়ার গোষ্ঠীপতি ছিলেন স্বয়ং প্রাণাচার্য কৈলাসনাথ সান্যাল। গ্রহ-উপগ্রহ সব তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। প্রাণাচার্যই ছিলেন এই সৌর-মণ্ডলের প্রাণ-কেন্দ্র। দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সব শাস্ত্রেই ছিল এঁ'র অবাধ অধিকার, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো তিনি ছিলেন অসপত্ন ও একচ্ছত্র। তাঁকে এ যুগের ভরত বা শার্ঙ্গদেব আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন একাধারে বোদ্ধা, ব্যাখ্যাতা এবং শিল্পী। আড্ডার লঘুচপল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্বনান্ত চলতো। প্রাণাচার্যই ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, আর সকলে শ্রোতা ও দ্রষ্টা। সেতার এস্রাজ বাজিয়ে শোনাতেন, খালি গলায় খোলা হাওয়ায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ করতেন। মার্গ, আরভটী, দেশী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের সঙ্গীতের শ্রেণী-করণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলতেন। এক কথায় নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সম্পর্কে কত কথাই শোনা যেতো এই সিদ্ধকাম সঙ্গীত-সাধকের মুখে।'

উদ্ধৃত অংশের কৈলাসনাথ আসলে অমিয়নাথ এবং এই আসরের স্থান কৃষ্ণনগরে সান্যাল মহাশয়ের বাইরের

ঘর। গ্রহ উপগ্রহরাও নগণ্য ছিলেন না। অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল ছাড়াও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রমোহন আচার্য, দিলীপকুমার বিশ্বাস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকেই বছরের পর বছর নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে এই বৈঠকী আসরে জমায়েত হতেন। 'স্মৃতির অতলে' বইখানি অমিয়নাথ এঁ'দের প্রবর্তনাতেই লিখেছিলেন। Ragas and Raginis রচনায় ও নাট্যশাস্ত্র অনুবাদে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর সক্রিয় সহযোগ ছিল। কিন্তু এমন মজলিসী ও উচ্ছ্বসিত মানুষটি ছিলেন খুবই moody। সুরের উচ্চাবচের মত অমিয়নাথের মেজাজ কখন কোন্ সপ্তকে অবস্থান করবে তা নির্ণয় করা শক্ত ছিল। স্মৃতিকথনে শতমুখ কিন্তু আত্মকথনে কুণ্ঠ এই মগ্ন মানুষটির জীবনকথা ভারতীয় সংগীতের মত কয়েকটি তুকে বিভক্ত কিন্তু তাঁর জীবনের অস্থায়ীটি বাঁধা ছিল এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

কৃষ্ণনগরের চৌধুরীপাড়ায় ছিল অমিয়নাথ সান্যাল-দের পৈত্রিক ভদ্রাসন। পিতামহ হারাধন সান্যাল। পিতা প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক দীননাথ সান্যাল, যাঁর মধুসূদন সংক্রান্ত সটিক আলোচনা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে অনুপুঙ্খ ও বিশদ। দীননাথ সান্যালের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অনন্তপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ দ্বীপেন্দ্র-নাথ। অমিয়নাথ মধ্যম। দীননাথ সান্যাল সিভিল সার্জনের বৃত্তি নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরতেন। যশোহরে ১৮৯৫ সালের মে মাসে অমিয়নাথের জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন গয়া থেকে। ১৯১২ সালে কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই এসসি পাস করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে ১৯১৫-১৬ সালে মেসোপটেমিয়া চলে যান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে Bengali Double Companyতে। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে ফিরে মেডিকাল কলেজে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হন। সার্জারিতে প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা পান ঔপপত্তিক বিষয়ে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেননি ও পরীক্ষা দেননি বলে ডিগ্রি পান না। অবশ্য ১৯২৫-২৬ সালে কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজ থেকে হোমিও-প্যাথিতে ডিগ্রি পান এবং জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত হোমিও-প্যাথ ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসা করেছেন। সংগীত ছিল তাঁর প্রথম প্রেম, চিকিৎসাবিদ্যাও ছিল প্রিয়তম প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে সরস মন্তব্য করেছেন : 'এখন ভেবে দেখি—পরের চিকিৎসা করব কি, নিজেকে বেসুর থেকে রক্ষা করতে গিয়েই জান্ পরেশান হয়েছে।' অমিয়নাথ সারা জীবন কোন চাকরি করেননি। কেবল কলকাতার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কয়েক বছর অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩৭ সালের পর স্থায়ীভাবে কৃষ্ণনগরে বসবাস করেছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও সংগীততত্ত্বের অনুশীলন এই ছিল তাঁর নিভৃত ধ্যানের বিষয়। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার পথ তিনি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছেন মোট তিনখানি। প্রথমটি 'প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা' (১৩৫২), বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ পর্যায়ে বেরিয়েছিল। দ্বিতীয় বই স্মৃতির অতলে' (১৩৫৯) বাংলায় সংগীতস্মৃতিমূলক অসামান্য রচনা। সম্প্রতি 'জিজ্ঞাসা' থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় লেখা : 'Ragas and Raginis' (১৩৬৬) সংগীত বিষয়ে অমিয়নাথের নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শনসমৃদ্ধ। প্রথম ও তৃতীয় বই দুটি বর্তমানে অমুদ্রিত তথা অপ্রাপ্য। অমিয়নাথের চতুর্থ পাণ্ডুলিপি প্রায় বিশ বছরের শ্রমে ও প্রযত্নে প্রণীত 'ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সংগীত ও নাট্যাধ্যায়ের সটিক বঙ্গানুবাদ, এখনও গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত। পঞ্চম পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে লেখা Music of Alapa সম্ভবত শীঘ্রই মুদ্রিত হবে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ ও তানসেনের প্রসঙ্গ। এ ছাড়া ধারাবাহিক রচনা 'গুরুজীর বৈঠকে'। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর আরও কিছু সংগীত বিষয়ক দুর্মূল্য রচনা রয়েছে। তার একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া গেল প্রবন্ধের শেষে। অমিয়নাথ লিখেছেন : 'একটা দুঃখ থেকে গেল জীবনে। গান জিনিসটা লিখে শুনান যায় না। তা যদি যেত—তাহলে জীবনসন্ধ্যার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যেতাম।' স্মৃতির অতলে' পড়লে বোঝা যায় গান জিনিসটা লিখে শোনাবার ক্ষমতা এদেশে একমাত্র তাঁরই ছিল; আরও ছিল 'কলাবিৎ শিল্পীর হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য' সন্ধানের ক্ষমতা। কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে সংগীত সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানদর্শন ও বহুধা ব্যুৎপত্তি অবহেলা পেয়েছে। অনেক পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন করে মনোনিবেশ করে-ছিলেন 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র অনুবাদে ও ধ্যানে। এককালে যিনি দৃপ্ত সাহসে কালে খাঁ সাহেবকে শুনিয়েছিলেন আশাবরীর ধাঁচে 'তুয়া চরণকমলপর মনভ্রমর ভালভান যঁউ চন্দ চকোর' তিনি মৃত্যুর আগে জীবনদেবতাকে শোনালেন :

'মনেরি বাসনা শ্যামা শোন্ মা শবাসনা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা 'কালী' 'কালী'॥

সংগীতের এই অলৌকিক গন্ধর্ব লৌকিক মানুষের মত মাতৃপদে চিরশরণ নিলেন।

অমিয়নাথ সান্যালের সংগীত সংস্কার ছিল রক্তগত। পিতা দীননাথ সান্যাল ছিলেন গীতরসিক ও গায়ক। মা গাইতেন কীর্তন ও শ্যামা সংগীত। বাল্যে ও প্রথম কৈশোরে ভাল ভাল সংগীতের আসরে পিতাই নিয়ে যেতেন পুত্রকে, বুঝিয়ে দিতেন আদপকায়দা, সুরের ছেড়ছাড়্। অমিয়নাথ পিতৃস্মৃতি প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'তরুণ বয়সে আমার একটি সৌভাগ্য দেখা দিয়েছিল, যা তখনকার দিনে অন্তত বিরল। সঙ্গীত-প্রিয় প্রৌঢ় পিতৃদেব...তরুণ পুত্র সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হতেন খেয়াল-ঠুমরী সেতার-সরোদের মাইফেলে। বাবা ছিলেন...পরিপূর্ণ গীতরসিক। সব রকমের গান ভাল লাগলেও তাঁর প্রাণ পড়েছিল। বাংলা খেয়াল, টপ্ খেয়াল ও টপ্পার মধ্যে। রাগ-আলাপের মাধুর্যে আকৃষ্ট হলেও তিনি বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না।...আমাদের বাসায় প্রায় প্রতি পূর্ণিমাতেই গান বাজনার আসর হত। বাড়ির আসরের মধ্যমণি ছিলেন ভেলুবাবু অর্থাৎ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। তাঁর আসল পরিচয়

এসরাজের উপর অনন্যসাধারণ দখল এবং উঁচুদরের শিক্ষিতপটুত্ব।...বিশেষ করে জেলুবাবুর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে রাগ-সংস্কারটি মার্জিত হয়ে উঠেছিল।'

পিতা দীননাথ সান্যাল ও পিতৃব্য চিত্তরঞ্জন বাগচির কাছে অমিয়নাথ বহু রকমের বাংলা গান শোনেন বিশেষত পাঁচালি ও টপ্পা অঙ্গের গান। তবে তাঁর সাংগীতিক অভিজ্ঞতার পাকা বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল ১৯১২ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত শ্যামলাল ক্ষেত্রীর ১০১ হ্যারিসন রোডের আস্তানায়। এখানেই তিনি সাক্ষাৎভাবে গান বাজনা শোনেন ফৈয়াজ খাঁ, মৌজুদ্দিন, গহরজান, মালকাজান, বাদল খাঁ, গণপৎরাও ভাইয়া, রাধিকামোহন গোস্বামী, ফিদা হুসেন খাঁ ইত্যাদির। এর ফলে ভারতের চিরায়ত ও অনতিপ্রচল অনেক ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী-গজল-হোরী-চৈতী, শাওন, ঘাটো, ধুন যেমন শুনেছিলেন তেমনই তখনকার কলকাতার যাত্রা থিয়েটারের গানও প্রচুর শুনেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গান যেমন শুনেছিলেন তেমনই শিখেছিলেন হরিদাস স্বামী, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, কুম্ভনদাস, যুগরাজদাস, কৃষ্ণানন্দজী, চতুর্ভুজদাস রচিত গান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্রব হয়েছিল, আবার ফিকিরচাঁদের গানের লৌকিক বুনন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।

অমিয়নাথ সান্যালের সংগীতসাধনার যুগলগুরু বাদল খাঁ সাহেব ও শ্যামলাল ক্ষেত্রী। দেখা যাচ্ছে, শ্যামলালকে তিনি সর্বত্র গুরুজী আখ্যা দিয়েছেন অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, তিনি বাদল খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। তাতে অবশ্য বিরোধ নেই, কারণ বাদল খাঁ ও শ্যামলালজী হৃদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন এবং 'গুরুজীর বৈঠকে বাদল খাঁ সাহেব' রচনায় অমিয়নাথ নিজেই বাদল খাঁর কাছে গান শেখার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুরের রাজ্যে অশ্রান্ত পদাতিক। সেই জন্য অমিয়নাথের সুরের কাজটি যেমন পাকা ছিল তেমনই অভিজ্ঞতা ছিল শত শত গীত-মুখরিত। বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয় সে সব গানের তালিকা। 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে যে সব গানের উল্লেখ করেছেন সেই সব গান বাদেও উল্লেখযোগ্য বৈজু বাওরার 'প্রথম মণি ও'কার, দেবনমণি মহাদেব, জ্ঞানন-মণি গোরখ, নবীনমণি গঙ্গা', হরিদাস স্বামীর 'চন্দন খোর অঙ্গ চড়ায়ে আবীর লিয়ে এ'ডো এ'ডো ডোলত পনঘট ছোঁ আপন মন ভায়ো' তানসেনের 'রুম ঝুমতর আয়েরি নন্নন তিহার' অজ্ঞাত রচয়িতার 'পূজিব পীরিতি, প্রেম-প্রতিমা করি নির্মাণ' বা কলকাতার থিয়েটারের গান 'পাখি ঐ তো ডাকিলি গাছে' শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে বর্তমান লেখকের তাঁর মুখে বিশ্রম্ভালাপের অবকাশে। অসামান্য ছিল তাঁর আলাপচারির ভঙ্গী ও স্বাচ্ছন্দ্য। নানা বিষয়ের জ্ঞান ও সরস বাক্যবিন্যাস তাঁর অন্তরঙ্গজনের চিরসম্পদ হয়ে থাকবে। তিনি যথার্থই লিখেছেন: 'আমার স্মৃতি একচক্ষু হরিণ নয়। এর দুটি চোখ; একটিতে লোক-ধর্মী ইতিহাসের সামান্য আলো, অন্যটিতে লোকোত্তর অনুভবের স্নেহভাজন।'

বাংলা ভাষায় সংগীত বিষয়ক রচনার মৌলিকত্বে ও স্টাইলে অমিয়নাথ কোনদিনই স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন না। বস্তুত সংগীত তাঁর কাছে নিছক মনোরঞ্জনের উপায়মাত্র ছিল না, বরং সংগীতের সূত্রে তিনি খুঁজতে চেয়েছেন শিল্পের মৌল রহস্য, শিল্পীর হৃদয়বত্তার অরুণ রঙীন অভিজ্ঞতা; আবার সেই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছেন সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধের চরম সীমাকে। আমার এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁর রচনার থেকে কয়েকটি উৎকলন এখানে উপস্থিত করছি:

১। গাইয়ে-লোকের চোখের মধ্যে সুরের একটা অগ্নি-কোণ আছে।

২। অনুভবের ইন্দ্রধনু উদিত হয় জ্ঞানসূর্যের বিপরীত দিকে।

৩। বার বার কানে বেজে উঠেছে তানসেনের ধ্রুবখানী "নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতরস, বিতনা যাকো মিলে উত্নাহি পীজিয়ে"

সুন্দরতার মূলে অন্য কিছু আছে কিনা, অথবা সাক্ষাৎ চমৎকারিত্বের পরেও কোনও কিছু প্রত্যাশা থাকে কিনা, তানসেনের কথায় বুঝা যায় না।

৪। শ্যামলালজী বলতেন গানের মেজাজই হল আসল কথা। গায়কের মেজাজ নয়। তম্বুলালজী আরও গভীর রহস্যের আভাস দিয়ে বলতেন, গানেরও অরমান্ অর্থাৎ নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা আছে, যা গাইয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বতন্ত্র।...অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, গানের মেজাজ বা আকাঙ্ক্ষা যখন গায়ককে সুত-মীড়-মুর্কির আবর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন গানের অন্তরেই গানের রহস্য আছে, গায়কের অন্তরে নয়।

বোঝা যায় এই তত্ত্ববাদী গীতসাধক প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-প্রস্থানের আচার্যদের মত মনন, মেধা ও প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর কর্তব্য ও কৃতি সম্পর্কে কৃতপরিকর হয়ে প্রথম যৌবন থেকে জীবনের স্থির ধ্রুবপদ বেঁধে নিয়েছিলেন। আত্মস্মৃতির সূত্রে প্রবন্ধান্তরে লিখেছেন: 'এখন লিখতে বসে ভাবি আশ্চর্য আগ্রহ ও ক্ষমার বন্ধনে শ্যামলালজী আর বাদল খাঁ সাহেব আমাকে বেঁধে ফেলেছিলেন। কেউ কি কখনও ভাবতে পারে যে, কলিকাতায় অবস্থানকারী আমার মতো একটি তাজা চোখ-কান খোলা তরুণ যুবক গড়ের মাঠের খেলার কথা জানেনি, চলচ্চিত্রের আকর্ষণকে তুচ্ছ মনে করেছে, সমবয়স্কদের সঙ্গ ছেড়ে চুরাশি আর চুয়ান্ন বৎসরের বৃদ্ধ প্রৌঢ়ের সঙ্গ বেশী লোভনীয় মনে করেছে।' পরবর্তীকালে এই সুন্দরের সাধক কলাবিদ্‌দের সঙ্গ থেকে যখন ভ্রষ্ট হয়েছিলেন (১৯২৮ সালে শ্যামলালজীর দেহরক্ষার পরে) তখন সংগীত শাস্ত্রপাঠ ও টীকাকারিকা রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কৃষ্ণনগরে অধ্যাপকগণের সান্ধ্য সাহচর্যে। কেউ কি বিশ্বাস করবেন যে, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র অমিয়নাথ প্রবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ১৯৪০ সালের পরে (তখন তাঁর ৪৫ বছর বয়স) সংস্কৃত অধ্যয়ন শুরু করেন? পরে এই দেবভাষার তাঁর অধিকার এতদূর বিস্তৃত হয় যে, অনর্গল গদ্য ও শ্লোক রচনা করতে পারতেন। হয়তো অলৌকিক ক্রিমর মৌজুদ্দিনের মত অমিয়নাথের অন্তরে ছিল প্রতিভা ও মেধার অনন্যসম্ভব সমৃদ্ধি।

সংগীত সমালোচক হিসাবে অমিয়নাথ সান্যালের অতিরিক্ত দান হল তাঁর বর্ণনার নিখুঁত শব্দচিত্র ও ভাষার লাবণ্য। মৌজুদ্দিনের গলায় উদারার নিখাদ থেকে মুদারার কোমল ধৈবত পর্যন্ত একটি মীড় শুনে তাঁর মনে হয়েছিল 'অভিমানের অন্তে যেন হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য উছলে পড়েছে একটিমাত্র অশ্রু-রেখার মধ্যে'।

ফৈয়াজ খাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'এ'র মাথায় ছিল লাল মখমলের জরিদার টুপি, সুন্দর আন্দাজে ডানদিকে হেলানো। এ'র চৌখস মুখমণ্ডলে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি; তার প্রথম বাঁধটি ছিল ওষ্ঠাধরের সংযত রেখার মধ্যে; দ্বিতীয়টি ছিল সুঠাম মসৃণ চিবুকের নীচে একটি গাম্ভীর্যের রেখার মধ্যে।...পরিধানে ফিকে সবুজ রং-এর পাতলা সার্জের লংকোট; বুকের একটি বোতাম থেকে প্রতিপদের চাঁদের মত ঘড়ির চেন চলে গিয়েছে বুক পকেটের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে। সেই পকেটের উপর দেখা দিয়েছিল হলদে রং-এর রুমালের কুসুমোচ্ছ্বাস।' অংশটুকু পড়লে বোঝা যায়, নিছক বর্ণনাকে অতিক্রম করে লেখক ধরতে চাইছেন একজন পুরো শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে। সেই সূত্রেই উঠে আসে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সাংগীতিক প্রতিবেশ যা ছিল বিলাসী, শৌখীন ও রম্য। তাই বলে যেন মনে না হয় যে অমিয়নাথ শুধু সুন্দরের স্বপ্নাবেশে ধ্যান-মগন। অসুন্দরের পরম বেদনাও তাঁকে বেজেছে। কালে খাঁর আস্তানায় গিয়ে লেখক দেখলেন, 'জারুল কাঠের উলঙ্গ তক্তাপোষ; কোণে একটি জড়ানো মাদুর, ঠেস দেওয়া; তার পাশে মেঝেতে একটি বদনা; একটা লম্বালম্বি দড়িতে ময়লা গেঞ্জি, লুঙ্গি, ল্যাঙ্গোট আর একটি ধূসর বর্ণের গামছা টাঙানো রয়েছে।' কালে খাঁ তাকে গভীর সন্তাপে বলেন, 'একটি সাফা মুরেঠা আর এক জোড়া সাফা কুরতা-পায়জামা ব্যবহার করিনে। কারণ, একদিনের ব্যবহারের ময়লা-কুচ্‌লা হয়ে যাবে। রইস্ লোকদের বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি করতে হলে হরবখত সাফ কাপড়া লত্তার দরকার।' এইভাবেই তাঁর রচনায় বিবাদী সুরের চমক এসে যায়। কিন্তু তাঁর লেখনী সবচেয়ে ফুটেছে সুরের রসোপভোগের অনন্য অনুভূতির ভাষ্য রচনায়। কালে খাঁর গানের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত অথচ আবিষ্ট লেখনী: 'শব্দগুলি কখন সূক্ষ্ম গমকের নিস্বনে কেঁপে কেঁপে ওঠে, কখনও বা জমজমার মাদকতায় হেলতে দুলতে সপ্তকের এদিক-ওদিক যেখানে সেখানে নৃত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরেফিরে চলে যায়। শীতের অন্তে বসন্তের আমেজে পত্রপল্লবের মত যেন কথার টুকরা-গুলি ঝকঝক করে উঠে। বসন্ত আর যৌবন সমাগম একসঙ্গে! এদের আভাস ইঙ্গিতে রাগলতিকার বৃন্তে দেখা দেয় গিটকারির গুচ্ছ, আধ ফুটন্ত ফুলের স্তবকের মত। ললিতাপঞ্চম রাগিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তো দেখি বসন্তের চমক! সুরশ্রুতির শিহরণ তো যেন গানের শরীরে যৌবনেরই জাগরণ! এমন আশ্চর্য কখনও দেখিনি, শুনিনি, কল্পনাও করিনি। এ কি বাস্তবিকই ললিতা-পঞ্চমে উন্মত্ত যৌবন-বিভ্রম? না কি গুণীর হৃদয়ে প্রতিভার উন্মাদনার চরম একটা মূর্তি?'

পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়, একি সংগীত সমালোচনা না গদ্যকাব্য? এমন আশ্চর্য আমরা কখনও পড়িনি। যেন চন্দ্রাপীড়-পত্রলেখা-কাদম্বরীর ভণিতি ফিরে এসে সৌন্দর্য-গন্ধ-আবিষ্ট পূর্ণিমার পরিপূর্ণ রাত্রি দূর থেকে বিরহিণী মহশ্বেতাকে ইঙ্গিত করছে।

অমিয়নাথ নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য যে, মাত্র সঙ্গীত বিষয়ে অনু-সন্ধিৎসু হয়ে ইং ১৯৩৭ সালে চৌখাতা সংস্করণের (নাট্য শাস্ত্র) পাঠ আরম্ভ করেছিলাম।...কলিকাতায় ইং ১৯৩৮ সাল থেকে পূজাপাদ শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য-তীর্থ মহোদয় আমাকে "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থ পড়িয়ে ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিলেন।' এরই সম্পূরক কাজ আরম্ভ করলেন তিনি নিজে সংস্কৃত শিখে ১৯৪০ সালে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রীতিময় সতর্ক সান্নিধ্যে। সেই কাজ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সংগীত ও নাট্য অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ সটীক অনুবাদ প্রয়াস। এই কাজে তাঁকে আমরা ত্রিশ বছর সংসক্ত দেখেছি। এই বিপুল কর্মের কিছু অংশ কলকাতার 'সমকালীন' পত্রিকার ১৩টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, বেশ কিছু অংশ এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে এবং বহুলাংশ তিনি বছরখানেক আগে অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়েছেন। গ্রাফপেপারে আঁকা বাস্তুবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে বানানো অজস্র নাট্যনির্দেশ ও রঙ্গপীঠের সংকেত চিত্র অমিয়নাথের জ্যামিতিক বিদ্যার অভ্রান্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে তাঁর পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির ধূসর ম্লানতার মধ্যে।

'প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা' অমিয়নাথের ৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা ভারত সংগীত কথার সুলিখিত ও প্রামাণিক নিদর্শন। চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রকাশের সাবলীলতা বইখানির প্রাথমিক গুণ। বইটি পরবর্তী পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সৌভাগ্য পেলে আমরা ভারতীয় সংগীত ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতাম। কিন্তু অমিয়নাথ ততদিনে নিবিষ্ট হয়েছেন ভারতীয় রাগরাগিণীর অন্তর্লীন রহস্য সন্ধানে ও নতুন পথ প্রদর্শনে। তাঁর Ragas and Raginis বইখানি বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতায় ও মৌল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্যেও আদৃত হয়েছে। সংগীত-তাত্ত্বিক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ পূর্ণিমা সিংহ ও নরেন্দ্রকুমার মিত্র এই গ্রন্থখানির নতুনত্ব বিষয়ে দ্বিধাহীন ও উচ্ছ্বসিত। বইখানিতে অমিয়নাথ সান্যাল চেষ্টা করেছেন পরিসংখ্যানের রীতিতে ভারতীয় রাগরাগিণীর তত্ত্ব সন্ধান করতে। প্রসঙ্গত তিনি ভরত, মতঙ্গ, নারদ প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের অনেক মত ভ্রান্ত বলে খণ্ডন করেছেন। তাঁর গুরু শ্যামলাল ক্ষেত্রীর চিন্তা সূত্র থেকে প্রাপ্ত মেরু, খণ্ড মেরু ও মাতৃকা পদ্ধতি দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। এই কাজের জন্য তাঁকে বানাতে হয়েছে সারণী ও গীতসংগ্রহের বিপুল বিচিত্র সংকলন। সংগৃহীত গানগুলিকে করেছেন শ্রেণীকরণ। নিছক নান্দনিক প্রবর্তনা দুরূহের দারুণ আকর্ষণে কেমন করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে খুঁজে নেয় এই গ্রন্থ তার অদ্বিতীয় নিদর্শন হয়ে থাকবে।

তবু, শেষবিচারে তাঁকে তাত্ত্বিক না বলে রসিক

বলতে মন চায় যখন মনে পড়ে তাঁর কথাকোবিদ রূপ। নানা বিষয়ে তাঁর অনায়াস ও চকিত পরিক্রমা তাঁর মাথা গলার সুরের মত অনর্গলিত ছিল। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও সরসতার নমুনা হিসাবে একটা গল্প পেশ করি। একবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাউলদের কথা কিছু বলবেন?' প্রথমে স্বভাবসিদ্ধ 'না না' করে (আমরা কিন্তু জানতাম ওটা আসলে আলাপের কোনু ভানা না না) হঠাৎ নিমীলিত চোখে বললেন, 'ওহো. মনে পড়েছে, শুনুন। একবার দেবগ্রাম ইস্টিশনে অপেক্ষা করছি ট্রেনের জন্যে; সময় আর কাটে না। হঠাৎ চোখে পড়লো একদল বাউল বৈরেগী বসে আছে। হাজির হোলাম সেখানে। নাক গলিয়ে বাউল গুরুকে খামোখা শুধোলাম, 'তোমাদের তত্ত্বটা কি বলো দিকি?' সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'সে তুমি বুঝবে না।' আমি ভাবি লোকটা বলে কি। কত বড় বড় জ্ঞানীগুণী পার করলাম আর এতো গেঁয়ো বৈরেগী। চুলবুল করছি দেখে বৈরেগী বললে, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করছি উত্তর দিতে পারলে তবে বুঝবো এলেমদার।' তথাস্তু। রাজি হলাম। বৈরাগী বললে, 'বলো দেখি হনুমানের কেন মুখ পুড়লো। খবরদার ঐ ল্যাজের আগুন মুখে ঘষেছিল বলবে না। ঠিক কারণটা বলো?'

'সত্যি বলতে কি এমন বিপদে জীবনে পড়িনি। শাস্ত্র তো নয়, গানও নয়। তবু ঘাবড়ালাম না। মা বাগ্‌বাদিনীর শরণ নিলাম। ওমনি বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, হনুমানকে রামচন্দ্র বলেছিলেন লংকায় অশোক বনে গিয়ে সীতাকে তাঁর আংটি দেখাতে আর অভয় দিতে। হনুমান তা করলো উপরন্তু একটা বাড়তি কাজ করলো। বললো, মা তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করতে পারি। সীতা বললেন কি করে? হনুমান বললে, তুমি চড়ো আমার কাঁধে, আমি এক লাফে সমুদ্র পার হব। এইটাই হল অপরাধ। অর্থাৎ কিনা হনুমান অজ্ঞাতে জানকীর অঙ্গস্পর্শের ইচ্ছা করেছিল। এই অপরাধেই হনুমানের মুখ গেল পুড়ে।' শুনে বুড়ো বৈরেগী বললে, 'বলিহারি।'

আমরাও বলি, বলিহারি। বাংলা সাহিত্যে এই আরেক দান অমিয়নাথ সান্যালের। সংগীতের স্মৃতি জাগানিয়া বিবরণ পড়তে গিয়ে দুর্লভ এক রসিকের সন্ধান পেয়ে যাই আমরা। কালে খাঁ সম্পর্কে বলেছেন :

'কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে বুঝেছিলাম, তাঁর অন্তঃকরণ হীরকের মতই স্বচ্ছ। সেই হীরের বনাই, যাকে বলে কাটিং একটু এলোমেলো অসমান।'

একেবারে জাত সাহিত্যিকের কলম। আরেক জায়গায় বড়বাজারের গলির (যেখানে কালে খাঁ থাকতেন) বর্ণনায় বলেছেন : 'সে গলির এমন গড়ন-পেটন যে মনে হল—সূর্য কখনও তাকে বে-আবরু করতে পারবে না।'

এই রসসন্নিপাতের সঙ্গে যুগলবন্দীর মত তিনি বাজিয়েছেন ভাবগর্ভ গাঢ় অনুভূতির দ্যোতনা। যেমন শেষ বয়সের গহরজান বাঈয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

'সেই সন্ধ্যালগ্নের গহর বলতে মনে পড়ছে, এলোমেলো হাওয়ার একটি ঘূর্ণী যা নিজেও থাকে না, পরকেও দিশাহারা করে দিয়ে যায়।' আরেক জায়গায় মরমী এই গীতরসিক লিখে গেছেন :

'ভগবান মানুষের বুকের অস্থি-পঞ্জরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটিকে রেখেছেন সুরক্ষিত করে; তার মর্মে সন্ধান করার মত তীরও সৃষ্টি করেছেন অজস্র ও বিচিত্র; দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্য রেখেছেন কেবল একটি শ্বাসনালী এবং সুখদুঃখের উৎসটি রেখেছেন চোখের কোণে অতি সঙ্গোপনে।'

এ সব টুকরো কাজের পাশে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব মৌলিক মন্তব্য করেছেন যা তাঁর দীর্ঘ উপলব্ধ সংগীত-দর্শনের অংশ। যেমন, মণিলাল সেনের 'বাংলা সংগীতের ইতিহাস' বইটি বিশ্বভারতী পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'বাংলা ভাষার গ্রন্থ ও রাগরাগিণী নামের প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষ্য হয়েছে। বাংলাদেশে খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের গীত-রচনার শিরোদেশে প্রায়ই 'সিন্ধু ভৈরবী' 'বেহাগ-খাম্বাজ' 'মুলতানী-ধানশী' প্রভৃতি যুগল নামের আবির্ভাব দেখা যায়। বাংলার বাইরে অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। বাঙ্গালী গীতি-কার, গীত-শিল্পী ও সমজদারের কানে যে গীতরূপটি বেহাগ ও খাম্বাজের মিশ্র, অথবা পিলু ও বরবার মিশ্র বলে লাগে বাংলার বাইরে সেই রূপ-গুলি এখনও 'খাম্বাজ' বা 'পিলু' নামে চালু আছে দেখা যায়। বাংলার এরূপ অনুভব-সূক্ষ্মতার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালী বিশেষ করে শিক্ষিত শৌখীন শ্রেণীর বাঙালী, যেরূপ আগ্রহ করে ধ্রুবপদ ও রাগবন্ধ গীতের চর্চা করেছে সেরূপ ভারতে আর কোথাও হয়নি।'

বাংলা সংগীত সম্পর্কে তাঁর এই উচ্চ ধারণা যেমন তাঁর অভিজনতার পরিচয় দেয় তেমনই স্বাদেশিকতার দীপ্ত অভিমানটুকু ফুটিয়ে তোলে। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এই ছিল তার রচনার যুগল শক্তি। অভিজ্ঞতা ছিল সর্ব-ভারতীয় সংগীতের পরি-প্রেক্ষণীতে ভরা, উপলব্ধি ছিল অজস্র গান শোনা ও শেখার আনন্দজাত। তাই স্থির বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে লিখেছিলেন : 'কিম্বদন্তী বাদ দিয়ে মাত্র প্রত্যক্ষ শ্রবণের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মাপকাঠিতে বিচার করে আনন্দকিশোর ও যদুভট্টের রচিত গীত রূপগুলিকে কোনও অংশে বৈজু বাওরা প্রভৃতি সাধকদের রচিত গীতরূপ থেকে নিকৃষ্ট মনে করতে পারিনি। এবং এখনও পারিনে, কারণ কিছুদিন হল আমাকে মোটামুটি দেড় হাজার ধ্রুবপদ গীতরূপ—গীতিমাত্র নয়—পরীক্ষা করতে হয়েছিল। আনন্দ-কিশোর ও যদুভট্টের বিশেষ প্রচার হয়নি; সম্ভবত এ কারণে যে তাঁরা পূর্বের চর্বিত-চর্বণ না করে নিজ রচিত পদ গান করতেন।'

বর্তমান কালের অনেক সংগীত সমালোচক, গীত রচয়িতা ও সংগীত শিল্পীদের উপরের রচনাংশ দুটি দাগ দিয়ে পড়া দরকার তবে যদি তাঁদের বাংলা গান সম্পর্কে হীনমন্যতা ঘোচে। প্রসঙ্গত মনে হয়, অমিয়-নাথ সান্যাল সাধারণভাবে ভারতীয় মার্গসংগীতের অনুরাগী হলেও বাংলা গানের জন্য কান পেতে রাখতেন। বাংলা ও বাঙালীর সংগীত-কৃতি সম্পর্কে এমন সাভিমান অভিলাষ আর কারুর রচনায় দেখিনি। কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থে মুদ্রিত তাঁর লেখা 'শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী' স্বাদেশিক বোধ, মরমী অনুসন্ধান ও বিচিত্র উদাহরণের দুর্লভ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই নিবন্ধটি পড়লে অমিয়-নাথের বাংলা গান শোনা ও শেখার বহু বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। দেখা যায়, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ থেকে কীর্তন, পাঁচালি, টপ্পা, থিয়েটারের গান এমকি বাউল গান শিখতে তিনি দ্বিধা করেননি।

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে তাঁর মনে একটা আলাদা স্পর্শকাতরতা ছিল। 'রবীন্দ্রনাথের গানের অতীন্দ্রিয় স্ফূর্তির' কথা তাঁর লেখায় পাই। ব্যক্তিগতভাবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অমিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। তাঁর শেখা রবীন্দ্র-সঙ্গীত এসরাজ বাজিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। সংগীত চিন্তা' গ্রন্থিকার এক জায়গায় লিখেছেন : অবশ্য সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গানের লিরিক-লাবণ্য তাঁকে টানেনি, যতটা টেনেছিল সেই গানের অন্তর্লীন গীত-বাদ্য-নৃত্যের সমন্বয়ী ঐশ্বর্য। 'প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা' গ্রন্থিকার এক জায়গায় লিখেছেন : 'বাক্য ও অঙ্গাভরণের সুকুমারতা, গীতনৃত্য বিষয়ে উল্লাস ও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য এই সমাবেশ কৈশিকী বৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ঋতুরঙ্গ নামে পূর্ণাঙ্গ-সংগীতের মধ্যে এবং অধিকাংশ রচনার মধ্যেই কৈশিকীবৃত্তির পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গি পাই।'

অন্যত্র, প্রবন্ধান্তরে লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের যে কোনও গানকে পৃথক ভাবে দৃষ্টি করে তাকে রবীন্দ্র-সংগীত বলিনে। তাঁর পরিকল্পিত 'বর্ষামঙ্গল', 'ঋতুরাজ' (সম্ভবত ঋতুরঙ্গ বলতে চাইছেন) প্রভৃতি ব্যাপারকেই আমি রবীন্দ্রসংগীত বলে জানি, কারণ এর মধ্যে গীত-বাদ্য ও নৃত্যের অপূর্ব সমন্বয় পাওয়া যায়।'

প্রসঙ্গক্রমে সামান্য ব্যক্তিগত স্মৃতি এসে পড়ছে। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'সবাই বলেন লেখেন রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সমন্বয় সঙ্গতি খুব যথার্থ হয়েছে। আচ্ছা, এই কথা সুরের সঙ্গতিটা কি, একটু বুঝিয়ে দেবেন?'

স্বভাবসিদ্ধ নিমীলিত চোখে বললেন, শুনুন খুব ভাল সেটের কাপ ডিসে কখনও চা খেয়েছেন? দেখবেন তার কাপে যতটা চা বা জল ধরে ডিসেও ততটাই ধরে। উপচে পড়ে না। এই হল গানের 'কন্টেনার' আর 'কনটেন্ট' অর্থাৎ কথা ও সুর। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যাবে না। এইবার কাপের হ্যাণ্ডেলের কথা। জানেন তো, ওটা আলাদা করে তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়। অথচ এমন করে জোড়ে যে মনে হয় অভেদ। এও এক ধরনের কথা ও সুরের সংগতি। আলাদা ভাবে তৈরি অথচ অভেদ। আচ্ছা, আবার দেখুন সৌষম্যের দিকটা। অর্থাৎ কাপে যদি ফুল আঁকা থাকে তবে ডিসে হাতী আঁকা চলবে না, আঁকতে হবে প্রজাপতি। বুঝেছেন?'

বুঝেছিলাম তখনকার মত। কিন্তু সার্বিকভাবে এই প্রয়াত সংগীতবিদ্ আমার কাছে গীত-রহস্যের মত জটিল অথচ হৃদয় সংসক্ত হয়ে রইলেন। সারাজীবন তিনি সুরের পুষ্পপুঞ্জের পাশে মরমী ভ্রমরের মত গুণগুণ করে গেলেন। তাঁর সংগীত চিন্তা তাঁর নিজস্ব প্রবর্তনায় হয়ে রইল এক সঙ্গীতি বা প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত অমিয়নাথ সান্যালের সংগীত বিষয়ক রচনার নির্বাচিত ও কালানুক্রমিক তালিকা।

বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী/
Krishnagar College, Centenary, Commemoration Volume 1948

গান ও গায়কি/বিশ্বভারতী/কার্তিক—পৌষ ১৩৫৬

গীত ও স্বরলিপির প্রয়োজনবোধ/বিশ্বভারতী/মাঘ—চৈত্র ১৩৫৬

বাংলা সংগীতের ইতিহাস (গ্রন্থ সমালোচনা)/বিশ্বভারতী/কার্তিক—পৌষ ১৩৫৭

ভীষ্মদেবের প্রত্যাবর্তন/সমকালীন/৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা/পৌষ ১৩৬৬

সুরের সন্ধানে/সমকালীন/৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা/ফাল্গুন ১৩৬৬

নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা/সমকালীন/৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা/বৈশাখ ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়/সমকালীন/৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রের রচনা/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা/আষাঢ় ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা/শ্রাবণ ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রের ছায়াভূমি/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা/ভাদ্র ১৩৬৭

গুরুজীর বৈঠকে বাদল খাঁ সাহেব/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা/আশ্বিন ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতা-পূজন/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা/কার্তিক ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ-বিধান/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

পূর্বরঙ্গ ও বহির্গীত/সমকালীন/৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা/পৌষ ১৩৬৭

পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগ্‌দর্শনী/৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা/মাঘ ১৩৬৭

পূর্বরঙ্গের শেষ প্রয়োগ/সমকালীন/৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা/ফাল্গুন ১৩৬৭

নাট্যপ্রয়োগের কাল নির্ণয়/সমকালীন/৮ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা/চৈত্র ১৩৬৭

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্ত ও নৃত্য/সমকালীন/৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

নৃত্তের বস্তুতত্ত্ব/সমকালীন/৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা/আষাঢ় ১৩৬৮

সুরের সন্ধানে/সমকালীন/৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা/শ্রাবণ ১৩৬৮

আধুনিক ফরাসী চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী

সন্দীপ সরকার

॥ ১ ॥

যাঁরা ফরাসী দেশে গেছেন তাদের কেউ কেও হয়তো বলবেন, সম্প্রতি নতুন দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্টে আধুনিক ফরাসী চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয়ে গেল, তা যথার্থ প্রতিনিধিমূলক নয়। (নভেম্বর ২৯, ১৯৭৭—জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৮)। কারণ এতে শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় শিল্পীদের গৌণ কাজই ছিল এবং তা ছাড়া, অনেক মহৎ শিল্পী বাদ পড়েছেন।

দিল্লি থেকে ফেরার পর ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে শান্তি বর্মণের দেখা হলো। ছুটি কাটাতে তিনি কয়েক মাসের জন্যে দেশে ফিরেছেন। তিনি ফরাসী দেশের বাসিন্দা এবং ছবিই তাঁর জীবিকা। তিনি এই প্রসঙ্গে যে কথা বললেন সেটা প্রণিধানযোগ্য। ফরাসী দেশের চিত্রশালায় সে-দেশের এবং অন্য নানা দেশের হাজার হাজার কাজ আছে। কোনো পর্যটকের পক্ষেই, তিন মাস কি পাঁচ বছর থেকেও তার তল খুঁজে পাওয়া শক্ত। যেমন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বহু লক্ষ বই থাকলেও কলকাতার কত বাসিন্দা বা আগন্তুক তা পড়েছেন? কারণ, কোনো শিল্পকর্মের রহস্যময় অন্দর মহলে দস্যুর মতো প্রবেশ করা যায় না। বরং অন্য দেশে প্রেরিত প্রদর্শনী অনেক সময় সুষ্ঠু গ্রন্থনাগুণে তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত ভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং নান্দনিক পরিবেশে। ফরাসী রাষ্ট্রদূত

স্নানরতা তিন মহিলা ... সেজাঁ

দ্বৈরথ — দেলাক্রোয়া

তো এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এর চেয়েও ভাল প্রদর্শনী এ-দেশে আসছে আগামী বছরে।

যাঁরা ফরাসী দেশে যাননি অথচ শিল্পকলা সম্বন্ধে মোটামুটি ওয়াকিবহাল কিংবা ছবি ভালবাসেন তাঁরা আমার মতো উপকৃতই হয়েছেন বলেই মনে হয়। বড় শিল্পীর ভাল কাজ দেখাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। গৌণ কাজ? সবই কি? তাঁদের ছোট কাজে যে নিষ্ঠা এবং সততা দেখলাম তা এখানকার অনেক প্রধান শিল্পীর মুখ্য কাজে পাইনি। তা ছাড়া, সব কাজই ছোট ছিল না তো! ক্লোদ মোনের 'লাভাকুর সূর্যাস্ত' প্রভৃতি কিছু বড় ক্যানভাস ছিল তো প্রদর্শনীতে! আমার মতো সাধারণ দর্শক কী থেকে বঞ্চিত হলো তার হিসাব কষার কোনো কারণ দেখি না এই মুহূর্তে। কারণ, এই প্রদর্শনী দেখে আমি অন্তত অভিভূত হয়েছি। ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্য দর্শন করে যেমন মনে হয় পরম লাভ হলো, এই প্রদর্শনী দেখাও অনেকটা তেমনি একটি অভিজ্ঞতা। আর এর জন্যে ফরাসী সরকার এবং বিশেষভাবে ন্যাশনাল গ্যালারীর ডিরেকটার শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ শিহারেকে ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই।

আধুনিক চিত্রকলার জন্মলগ্ন নিয়ে মতভেদ আছে। যাঁরা ছবির সমঝদার 'আধুনিক' বিশেষণটি তাঁদের ভয়ানক অপছন্দ। আদিম গুহাবাসী মানুষের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল ভাল ছবিই তাঁদের মতে সমান মূল্যবান নান্দনিক অভিজ্ঞতা। সুতরাং, আধুনিক। কিছু কিছু ললিতকলা বিশেষজ্ঞের মতে, ইম্প্রেসনিস্টদের আমল থেকে অদ্যাবধি শিল্পকলার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তাই আধুনিক। কিছু কিছু রসিক অবশ্য 'সমকালীন' এবং 'আধুনিক' সমার্থক মনে করেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই আধুনিকতার জনক হিসাবে ধরা হয়েছে লুই জাক দাভিদকে (১৭৪৮-১৮২৫)। এটা আমার মতে যথার্থ।

দাভিদ ছিলেন নেপোলিয়নের দরবারের প্রধান শিল্পী। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ানের উত্থান-পতনের মধ্যেই ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গেল। শিল্প বিপ্লব এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পথও বহুল পরিমাণে সরল হলো। ফলে রেনেসাঁস এবং সপ্তদশক শতকের চিন্তা-ধরার কাছ থেকে ইউরোপ ক্রমে সরে এলো। দেকার্ত এবং নিউটনের নিয়মের রাজ্য তখন ক্রমশ পরিচিত উপকূলের মতো দূরে সরে গেল। অষ্টাদশ শতকের বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দেখা গেল পুশাঁ, রুবেনস, ভেলাসকুজ বা রেমব্রাঁর মতো শিল্পী আর সম্ভব নয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দাভিদ বিগত এবং আগতকালের মধ্যে সেতুর মতো। ইমপ্রেসনিজমের সময়টাকে যদি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠার সঙ্গে তুলনা করি, তবে বলতেই হয় তার প্রস্তুতি চলছিল বহুদিন থেকে। মানসিকতার দিক দিয়ে দাভিদ রক্ষণশীল হয়েও কিন্তু পূর্ববর্তী চিত্র-ঐতিহ্য অস্বীকার করতে পেরেছিলেন।

রোম সাম্রাজ্য এবং ১৬শ শতকীয় ইটালীর বিষয়ে অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের উৎসাহ কমে গেল অনেকটা। গ্রীক সংস্কৃতি এবং শিল্প বিষয়ে নতুনতর গবেষণা শুরু হলো। তা ছাড়া, প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ভারতবর্ষ এবং দূরপ্রাচ্যের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির ফলে বোঝা গেল রেনেসাঁসের আমলে তৈরি ভূমধ্য-সাগরীয় ধ্রুপদী ধারা শিল্পকলার শেষ কথা নয়।

দাভিদের 'সেনেকার মৃত্যুর' নব্য ধ্রুপদী ধারার মধ্যে অবশ্য নিশ্বোস নিতে কষ্টই হয়। বরং আমার জাঁ অগস্ত দমিনিক আংগ্রের (১৭৮০-১৮৬৭) কাজ মুগ্ধ করেছে বেশী। ৪র্থ হেনরীর রানী পটের মাঝখানে বসে আছেন গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত সাটিনের জামা পরে। সামনে বিছানো আছে কার্পেট। রানীর ডানপাশে ৪র্থ হেনরী ঘোড়া সেজেছেন এবং পিঠে চেপেছে তাঁর মেয়ে। বাঁ পাশে স্পেনের রাজদূত ফরাসী নৃপতির কান্ড দেখে হতবাক। পেছনের দেওয়ালে রাফেলের ম্যাডোনা। আর বাঁ পাশের শেষ প্রান্তে আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছেন রাজার দাসী। ছবির নির্মিতির দৃঢ়তা এবং রচনার সূক্ষ্ম ভারসাম্য দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। অংকনের ব্যাপারে রাফায়েলের প্রথাসিদ্ধ ধারা ত্যাগ করে আংগ্রে অবয়বের প্রান্তিক রেখার ওপর (outline) জোর দিয়েছেন। বর্ণের দ্যুতি অবশ্যই আছে, কিন্তু সামগ্রিক রূপবন্ধের (form) শুদ্ধতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন বলে তাঁর ছবিতে বর্ণের প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়নি সেই অর্থে। অথচ ছবিতে কী নিগূঢ় ব্যঞ্জনা।

শুদ্ধ সাত্ত্বিক আংগ্রের কিছু দূরেই আছেন রাজসিক ইউজিন দেলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩)। দুজন ঘোড়সওয়ারের দ্বৈরথ। মূলত রোমান্টিক তিনি। ব্যক্তি মানুষের আবেগ ছবিতে তিনি এনেছেন অলজ্জভাবে। ছবি দেখতে দেখতে বোদলেয়ারের একটি কথা মনে পড়ে গেল:

সরস—সুস্বাদু

MILKMAID
SWEETENED
Best Full Cream Milk
PREPARED IN INDIA
NET WEIGHT
Regd Trade Mark
FULL CREAM CONDENSED MILK

স্বাদে সত্যিই কী উপাদেয়

মিল্কমেড দিয়ে
চা ও কফি করলে কী
অপূর্ব যে স্বাদ হয়!
ফল বা পুডিং-এও
যদি একটু ঢেলে দেন—
কিছু না হোক—রুটিতেও
যদি সামান্য মাখিয়ে
নেনে, দেখবেন খেতে
কত সুস্বাদু হয়েছে!

মিল্কমেড

কনডেনসড্ মিল্ক

Nestle.

MM-CAS-1/78 BEN

'Delacroix was passionately in love with passion, but coldly determined to express passion as clearly as possible.' আংগ্রের বিপরীত মেরুর মানুষ দেলাক্রোয়া এবং বর্ণই তাঁর হাতে প্রধান হাতিয়ার। ঘোড়ার মখমলের মতো গা, লাগামের চামড়া, অশ্বারোহীদের অস্ত্রের ধাতু, জামা-কাপড়ের সূক্ষ্ম বুনোটের তফাত স্পষ্ট এসেছে পটে। পশমকে রেশম বা রেশমকে সুতী মনে করবার সুযোগ দেননি। এমনকি ঘোড়ার পায়ে যেন টাটকা রক্ত লেপে দিয়েছেন। এই ছবিতে যে উত্তেজনা আছে তার মায়া (illusion) হাজার হাজার মানুষ নিয়ে সিসিল বি ডি মিলের পক্ষে চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। মানুষ আর পশুর গতি, অভিব্যক্তি এবং ভঙ্গির মধ্যে চরম নাটকীয় মুহূর্ত ধরেছেন। অথচ তাঁর কৌশলের বিষয় প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগই দেন নি। দেলাক্রোয়া আলজারিয়া টিউনেসিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন ১৮৩২-এ। এ ছবিতে সুদূর জগতের আবহ তৈরি করেছেন তিনি। আপন ক্ষমতাবলে আমাদের বশীভূত করেন নিতান্ত হেলাভরে।

এঁদের সমসাময়িক জাঁ বাপ্তিস্ত কোরোর (১৯৭৬-১৮৭৫) কাব্যিক একটি নিসর্গ-চিত্র ছিল। পেছনে বাড়িঘর। সামনে বর্ণ। আকাশে মেঘ। বনের মধ্যে একজন অন্যমনস্ক বুড়ো। ছোট ছোট আঁচর দিয়ে ভালোবেসে আলতো করে পট ভরেছেন। প্রকৃতি নির্মিতির বিষয়ে অগাধ জ্ঞান তাঁর এই ছোট ছবিতে গেছেন। প্রত্যেকের ছবির রঙগুলো এমন তাজা যে মনে হয় শিল্পী গতকাল কাজ শেষ করেছেন। বর্ণ অবশ্য ঘন এবং চাপিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও কখনোই কাদা-কাদা হয়ে যায় না। বস্তুত, ছবি দেখতে দেখতে মনে হলো, আমাদের দেশের হুসেন প্রমুখ বহু তথা-কথিত বড় শিল্পীই আসলে লিলিপুট।

॥ ২ ॥

এর পাশেই রাখা আছে ইম্প্রেসনিস্ট এবং ঈষৎ পরবর্তী চিত্রকরদের কাজ। চোখের সামনেই বিরাট একটা বিপ্লব ঘটে যায়। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হঠাৎ যেন নোঙর তুলে শিল্পীরা স্থির করলেন তারা নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরুবেন। এঁরা চাক্ষুষী ব্যাপারের বাইরে অন্য কিছু পটে আনবেন না বলে ঠিক করলেন। বিভিন্ন বস্তু এবং প্রাণী জগৎ স্পর্শ করে আলো কেমন ঠিকরে এসে অক্ষিগোলকে আঘাত করে, বর্ণময় অনুরণন তোলে, এঁরা তারই অনুসন্ধানী হলেন। যা কিছু চিত্রগত নয় তা অপ্রাসঙ্গিক মনে করলেন। এঁরা অমিশ্রিত বর্ণ ছোপ-ছোপ করে পটে লাগালেন। প্যালেটে বা ক্যানভাসে বর্ণের মিশ্রণ ঘটালেন না। ফলে উজ্জ্বল উষ্ণ বর্ণের সমারোহে এক-এক সময় মাতাল হয়ে যেতে হয়। হালকা ছায় (tone) এবং কালো রঙ ব্যবহার না করার ফলে তাঁদের ছবি একেবারেই অন্য রকম। সূর্যের আলো এঁদের কাছে ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল এটা বেশ বোঝা যায়।

লাঠিহাতে উপবিষ্ট বৃদ্ধ — গয়া

লাভাকুর সূর্যাস্ত — মোনে

পরিষ্কার। আকাশের নীচের খোলা আলো বাতাস তাঁর ছবিতে খেলা করেছে। বরং গুস্তাভ কুর্বের দুটি কাজ আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

য়োহান বারটোলড জোংকিনডের (১৮১৯-১৮৯১) 'চাঁদনী রাত' কাজটি খুবই সুন্দর। কালো, ধূসর, বাদামী ঘন ছায় আর সামান্য হলুদ মেশানো সাদা দিয়ে ছবিটা এঁকেছেন। ছোট্ট ছবি। অনুচিত্র। জলরঙের মতো করে তেলরঙ চাপিয়েছেন। ছবিটা সামান্যক্ষণ দেখলেই কেমন ঘোর লাগে। হঠাৎ মনে হয় আলোছায়া ঘেরা গ্রামে হেঁটে চলেছি। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্যে চাঁদ লুকোচুরি খেলা করছে।

মোট বাহাট্টটা কাজ ছিল। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের সামাজিক অবস্থা, মানুষ, পরিবেশ এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে ছবিগুলি দৃশ্য অভিজ্ঞতা। বালজাক থেকে জোলা পর্যন্ত ফরাসী উপন্যাসের মেজাজটা ভিন্নভাবে ধরা পড়ে। মনে হয়, এইসব ছবির অভিজাত থেকে শহুরে মধ্যবিত্তদের আমি চিনি। এঁদের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে। অপ্রধান বহু শিল্পীর কাজ অবশ্যই প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু তার ফলে বড় বড় শিল্পীদের সমসাময়িকদের সঙ্গে দেখতে পেয়ে আমাদের লাভ হয়েছে। সমগ্র যুগ ছবির ব্যাপারে কী করতে চাইছিল তা খুবই পরিষ্কার। নানারকম যুগের হুজুগে মেতেও প্রত্যেকে আত্মানুসন্ধান সমানে চালিয়ে পিসারোর (১৮৩০-১৯০৩) এবং সিসলের (১৮৩৯-১৮৯৯) দুজনের দুটি পট পাশাপাশি ছিল। দুটি নিসর্গচিত্র। ছোট ছোট ছোপ-ছোপ দিয়ে কাজ করেছেন। দুজনেই নীল, লাল, হলুদ, কমলা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রঙগুলির মূল্য উভয়ক্ষেত্রে ভিন্ন হওয়াতে স্পষ্ট বোঝা যায় পিসারোর ছবি দুরন্ত দুপুরে আঁকা এবং সিসলের ছবিটা পড়ন্ত বেলায়। উভয়ে একই আন্দোলনের শরিক হয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। সিসলের 'মোরের গির্জা' ছবির যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো নীল আকাশের দিকে দাম্ভিক চূড়াটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ গথিক স্থাপত্য বৈচিত্র্য শুধু নয়, কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে আলোর খেলা এই ছবিতে আনতে চেয়েছেন তিনি। ছবিটা মোনের 'রুয়ে ক্যাথিড্রাল' পর্যায়ের ছবিগুলোর কথা মনে আনে। এখানে পটের বাকলে বর্ণ এবং ছায় নিয়ে সিসলে গির্জার চূড়ার আলো-ঝলসানো অংশটা এবং নীচের ছায়া-ছায়া অংশটার তফাতটা ধরেছেন। কিন্তু কালো আদৌ ব্যবহার করেননি।

নিসর্গচিত্রের মধ্যে মোনের 'লাভাকুর সূর্যাস্ত' অসাধারণ। রঙের ছোট বড় ছোপ, মোটা রেখার দাগ, ঝাঁড়, নানা মাপের চ্যাপটা এবং সাধারণ তুলি দিয়ে লাগিয়েছেন। টাটকা রঙ মিলিয়ে দিয়েছেন কোথাওবা। নদীর বাঁ পাশে ঝোপ, ডান পাশে দ্বীপের মতো জায়গায় দু তিনটে নেড়া গাছ। জলের ওপর দুটো নৌকা। দূরে অস্পষ্ট ওপারের বাড়িঘর। পশ্চাৎপটের মধ্যে প্রধান অংশ দখল করে রয়েছে লাল একটা সূর্য। আকাশে কমলা হলুদ সিঁদুর রঙের সমারোহ। জলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ হলুদ মোটা ছোট ছোট রেখা নেমে এসেছে। আর হঠাৎ একটা অনুপ্রাণিত মুহূর্তে ডান পাশে দিগন্তরেখার কাছে মোনে দারুণ দুঃসাহসভরে সবুজ পাতলা করে লেপে মিলিয়ে দিয়েছেন। দূরে সরে আসুন একটু। দেখুন শুধু এর জন্যে দিগন্তটা পিছিয়ে গিয়ে সমস্ত আকাশটা কেমন গোল হয়ে গেছে। ক্রমশ ফ্রেম ছাড়িয়ে ছবিটা ঘর গ্রাস করে বড় হবে। আর হঠাৎ আপনার মনে হবে আপনি লাভাকুর নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন। ছবিটার সামনে দাঁড়ালে মোনের হাত বেরিয়ে এসে আপনার হাত চেপে ধরবে। তাঁর কবজীর এমন জোর যে হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা বহুক্ষণ আপনার সাধ্য হবে না। মস্তিষ্কের কোষে কোষে যখন নেশা ধরবে ধীরে ধীরে তখন তিনি আপনাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবেন। আমি এই ছবির সামনে থেকে সরে আসার সময় করজোড়ে তাঁকে নমস্কার করেছি।

নিসর্গচিত্রের মধ্যে সাইনাকের (Signac) 'দ্য ব্রিজ অব আর্টস' সুন্দর ছবি। ছোট ছোট ছোপ দিয়ে সেতু গাছপালা নদী আকাশ এঁকেছেন। মোজাইকের মতো করে হালকা অমিশ্র রঙ নিয়ে জুড়েছেন। আলোর বিচ্ছুরণ প্রতিফলন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো এঁর গুরু সোরেরে (Seurat)-কে টেনে এনেছিল ইম্প্রেসনিস্টদের আওতার বাইরে। সাইনাক তত্ত্বর কঠিন খোলসটুকু ভেঙে তার মধ্যেকার কাব্যিক স্বাদটাকে নিয়েছেন। ঘন রঙ কিন্তু হালকা অথচ নিশ্চিত তুলির কাজ। আলোর সমতাকে বজায় রেখে দৃশ্যকে কেমন দ্বিমাত্রিকভাবে পেতে ফেলেছেন পটের ওপর সেটা দেখার মতো। অথচ কাজটা মূলত মণ্ডনধর্মী।

আর ছোট্ট সুন্দর কাজ ছিল পল সেজাঁর (১৮৩৯-১৯০৬)। দেখলেই বোঝা যায় স্নানরতা তিন মহিলার ওপর তিনি পুনর্নির্মাণের সেই নিয়ম খাটিয়েছেন যা সব সময় নিসর্গ বা স্থিরবস্তুর (still life) ওপর প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি শুধু নির্মিতির প্রয়োজনে বিকৃতিকরণের আশ্রয় নেন। অথচ মানুষ বা প্রকৃতিকে বিকৃত বা পঙ্গু করে উপস্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইম্প্রেসনিস্টদের মতো বিশেষ মুহূর্ত বা তাৎক্ষণিককে ধরার পক্ষপাতি নন তিনি প্রকৃতির সমান্তরাল ঐকতান ক্যানভাসে রচনা করেছে

সব সময়ই। ভূতাত্ত্বিক বহরগুলোর সমান্তরাল কোন কাজ। তাঁর গাছপালা মানুষজন সব কিছুরই ওপর ভাস্কর্যের আয়তন এবং বস্তুপুঞ্জের ঘনত্বের ওজন বর্তেছে। অথচ ত্রিমাত্রিকভাবে তিনি পট ব্যবহার করেছেন। ইম্প্রেসনিস্টরা যদি বিপ্লব ঘটিয়ে থাকেন তবে বিপ্লবোত্তর গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছেন সেজ্যাঁ। সেই জন্যে বিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের ওপর তাঁর প্রভাব এত বেশী। নাটক নেই তাঁর ছবিতে। আবেগের উৎক্ষেপ ঘটে না তাঁর পটে। প্রকৃতির সামনে তাঁর ভূলার্দিপ সমীচেন ভঙ্গী। ফন গোখের বিপরীত মেরুর মানুষ তিনি। গাছপালার মধ্যে তিন সখী নাইতে নেমেছে নদীর জলে। একটু তেরছাভাবে ডান দিক থেকে ছোট ছোট সবুজ, হলুদ ঘন রঙ বাঁ দিকে নামিয়ে এনেছেন। গাছপালার পাতায় রোদের ঝিলিমিলি, হাওয়ার ঝিকিমিকি এঁকেছেন। আবার সেই একই ঘন রঙের আঁচড় অনুভূমি বরাবর সমান্তরাল করে সারিবদ্ধভাবে কেটেছেন। ফলে জলের স্রোতে গাছপালার ছায়া মনে হয়েছে।

এসবের পর যে নিসর্গচিত্রের কথা বলব তা পিয়ের বোনারের (১৮৬৭—১৯৪৭) আঁকা 'বাগান।' বস্তুজগৎকে স্বাধীন স্বরাট চিত্রল ছবিগত রূপান্তরে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বর্ণ এবং ছায় তাঁর প্রধান হাতিয়ার। মোটা ক'রে শুদ্ধ এবং মাধ্যমিক রঙগুলি সম্পূরক হিসাবে পাশাপাশি রেখে দৃশ্যসঙ্গীত রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য। বসন্তে উদ্যান কেমন ফুলে ফুলে ভরে যায়। থরে থরে সাজায় নিজেকে তা দেখিয়েছেন। ছবিটা বিমূর্ততার খুবই কাছাকাছি। বর্ণের প্রতিটি আঁচড় কেমন ঘন এবং বুনোটের কতো মজা। ভাল চিত্রকর যখন সাদৃশ্যের সীমান্ত অতিক্রম করেন তখন আমাদের আপত্তি করতে দেন না।

(৩)

এছাড়া ছিল অনেক ভাল প্রতিকৃতি। তাও দুভাবে ভাগ করা যায়। এক ধরনের প্রতিকৃতি ঘষেমেজে শেষ করা হয়েছে। অন্য ধরনের প্রতিকৃতিতে শিল্পীর নিজস্ব ব্যাপারটা বেশি। যেরকমই হোক প্রতিকৃতি আসল মানুষটির সঙ্গে মেলা চাই। এখানে জীবন্ত রক্তমাংসের প্রতিকৃতি ছিল। কিছু কিছু প্রতিকৃতির চাকচিক্য এবং বাস্তববোধ থাকা সত্ত্বেও প্রথাসিদ্ধ বাস্তব (academic) প্রতিকৃতি এতে স্থান পায়নি। দেগা ভেলার্নের প্রতিকৃতিতে তেলরঙের মোটা অথচ সাবলীল আঁচড় চাপিয়ে কাজ করেছেন। তিনি এখানে ভেলার্নের ব্যক্তিত্বর নানামুখী দিকগুলির সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণার কথা বলতে চেয়েছেন। লিওন বোনা-র 'শ্রীমতী এয়াররলের প্রতিকৃতি' ভিন্ন ধরনের। শ্রীমতীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলেছেন। সম্রাজ্ঞীর মতো ভঙ্গী এই রূপসী মহিলার। লালের প্রাধান্যে বিধৃত। নরম ত্বক। হাতে কুঁচকনো প্লাভস। খুঁটিনাটির দিকে বিশেষ লক্ষ্য বোনার। উচ্চ মধ্য শ্রেণীর এই মহিলার কিছু স্তাবকতা হয়েছে।

রেনোয়ার দুটি প্রতিকৃতি ছিল। একটি 'ভদ্রমহিলার', অন্যটি একটি 'মেয়েমানুষের'। মানুষ-মানুষীর শরীর সম্বন্ধে—বলতে গেলে জীবনের ওপর প্রবল আসক্তি তাঁর ছবিতে স্পষ্ট। রেনোয়া দুটি ছবিতে তেল এতো কম ব্যবহার করেছেন যে প্যাস্টেল ব'লে ভ্রম হয়। এইসব রক্তমাংসের নারীদের, তাদের মুদ্রাদোষ, খামখেয়াল সত্ত্বেও আমরা ভালবেসে ফেলি। অথচ রুচি এবং সূক্ষ্ম অনুভবের কথা স্পষ্ট। কিন্তু রূপরসগন্ধ-স্পর্শময় মানুষ তিনি। 'ভদ্রমহিলার' ছবিটাই আমার খুব ভাল লেগেছে। লাল পশ্চাৎপটের ওপর প্রথমে সামুদ্রিক সবুজ-নীল রেশমী জামা চোখে পড়ে। তারপর এক চামচ সমুদ্রের জলের মতো তার টলটলে চোখগুলি। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুলের গুচ্ছ নির্মিতির প্রয়োজনেই এসেছে। রেনোয়ার 'মেয়েমানুষ' অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। থলথলে নরম। দেগার মতো রেনোয়া নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে পারতেন না। যা দেখতেন তা নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। তাঁর হাতে পড়ে আমরাও কেমন প্রেমিক হয়ে পড়ি। পাশেই তুলুস লুত্রেকের আঁকা প্রতিকৃতি। অভিজাত ভদ্রলোকটি অহংকারী আর নিষ্ঠুর। পশ্চাৎপটে সবুজ এবং ভদ্রলোকের গালে সবুজ। লুত্রেক স্বাধীনতা যেমন নিয়েছেন, তেমনি একেত্রে প্রথাগত কাজের মতো পরিচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন ছবিকে। একটা কথা খুবই পরিষ্কার, তিনি মানুষ বা পৃথিবীর কাছে কিছুই আসা করেন না।

পল গগ্যাঁর লাঠি হাতে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে না ভালবেসে থাকা যায় না। তিনি যে কত বড় রঞ্জক (colourist) তা এই ছোট প্রতিকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। বৃদ্ধের রূপবন্ধের সরলীকরণ দুঃসাহসভরে করেছেন। বিশেষত হাত দুটি। বাঁ হাতের মোটা আঙুলগুলো। অঙ্কন কত সহজ। এদিকে ছায়ার খেলা সম্পূর্ণভাবে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। জাপানী ছাপাই ছবির প্রভাব তাঁর এ কাজের মধ্যেও রয়েছে। মুখটার তলগুলোর নানা বিরোধী রঙ দিয়েছেন। চুলে দাড়িতে সবুজ বেগুনী আর কত রঙীন রেখা দিয়েছেন। একটু দূরে এলেই কিন্তু বোঝা যায় লোকটি বৃদ্ধ। তার দাড়ি চুল সব পাকা। অথচ গগ্যাঁ কিন্তু নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। এই বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করে পটে হাজির করেছেন। তার বিষয় কোনো মন্তব্য করেননি। দুঃখী বৃদ্ধকে আমাদের কিন্তু খুবই প্রাজ্ঞ মনে হয়েছে।

আরও কত ছবি ছিল। সব যে আমার ভাল লেগেছে তাও নয়। যেটা পরিষ্কার সেটা হলো প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য—এবং একাগ্রতা, নিষ্ঠা। প্রত্যেকে কত ভিন্ন ভাবে জীবনকে দেখেছেন। আর তাই কেবল তাঁদের প্রধান কাজেই নয়, গৌণ কাজেও আমাদের মন ভরে দিতে পারেন। অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আলাদাভাবে কোনো কবির বই পড়া, আর সংকলনে অন্য কবির ভীড়ের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করা আমার মনে হয় দুটোই দরকার। তাতে সেই কবিকে বোঝা সহজ হয়। ছবির ক্ষেত্রেও একক এবং যৌথ প্রদর্শনী দুটোরই প্রয়োজন। পুরনো দুই বন্ধুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে এই প্রদর্শনী দেখেছি। সুকান্ত বসু—ন্যাশনাল গ্যালারীর ছবি সংরক্ষণের প্রধান এবং প্রকাশ কর্মকার। এই দুই শিল্পী বন্ধুর সান্নিধ্যে ছবি দেখাও এক মনোরম অভিজ্ঞতা।
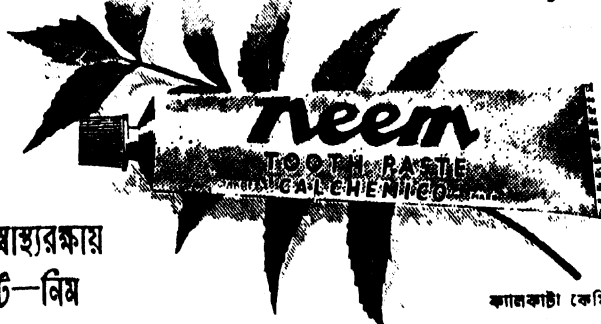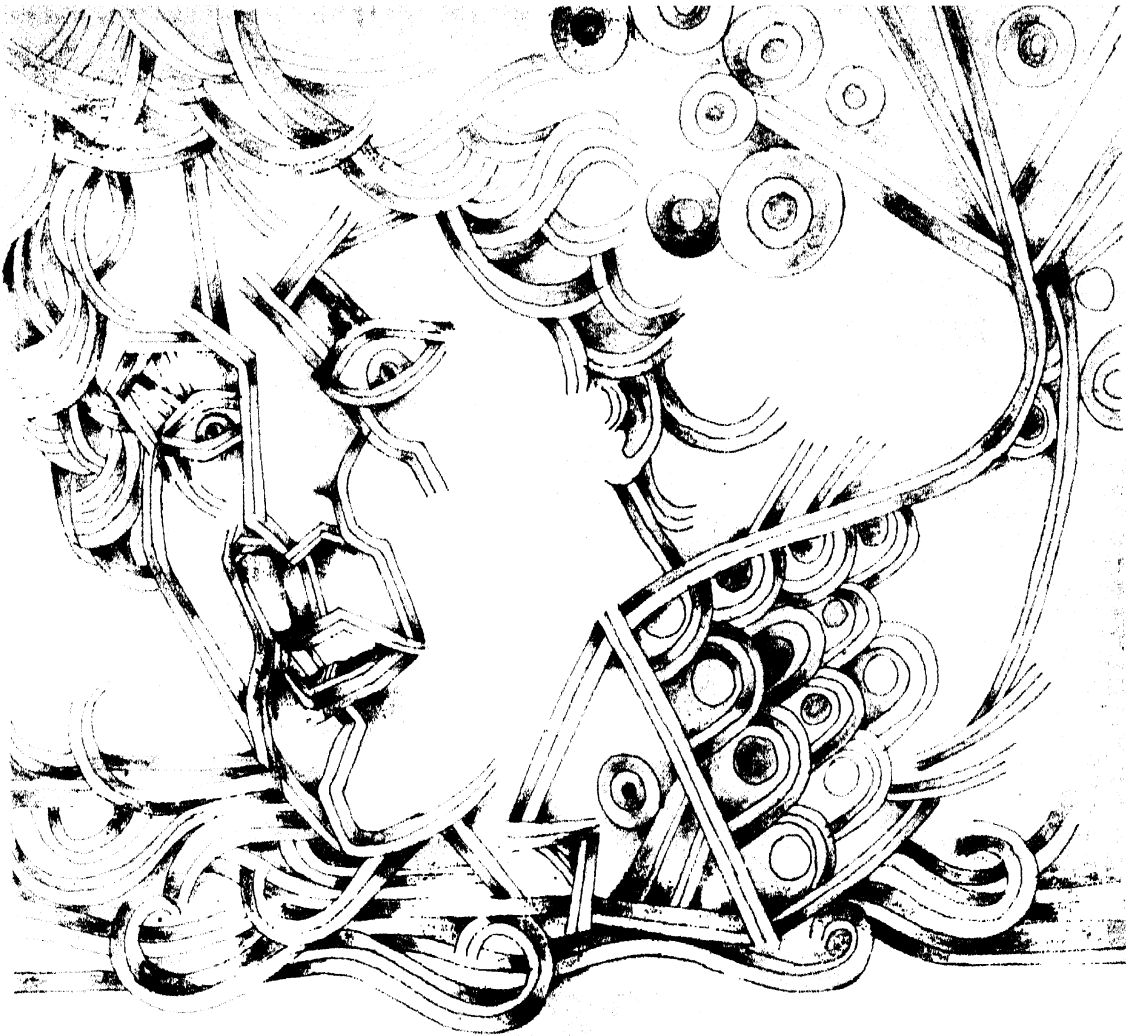
পাঁক ফণিভূষণ আচার্য

নিতাই হালকাভাবে একটু নড়েচড়ে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করতেই গোসাঁইদীঘির পাঁক গলা অবধি ঠেলে উঠে এলো। ওর বুকের ভেতরে একটা ভয় লকলক করে ওঠে। ঠিক একটা ভয়-পাওয়া গাছের মতো সে ঠায় থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেপে মেপে ছোট-ছোট শ্বাস নেয় সে। জোরে শ্বাস নিতেও তার ভয় যদি শরীরের ভার বেড়ে যায়, যদি গোসাঁই-দীঘির পাঁক আরো ওপরে ওঠে আসে, যদি শরীলের বাকিটা গিলে নেয় গোসাঁইদীঘির বহুদিনের হাঁ-করা খিদে। গলায় থুতু শুকিয়ে কাশমিলা গাছের আঠা হয়ে আছে। ঘিট মারতেও জোর লাগে। তাতেও ভয়। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? সে যখন গোসাঁইদীঘির পাড়ে এসেছিল তখনও ঠিক দুপুর হয়নি; আর, এখন অর্জুন-ঘোড়ানিমগাছের মাথায় বিকেল যাই-যাই করছে। সেই থেকে সে ঠায় দাঁড়িয়ে। একটু পা বদল করবে, তার উপায়ও নেই। শালা কপাল........

নইলে সেই থেকে এখানে একটা জনমনিষ্যিরও দেখা পায় না সে? ভুল করেও কি কুনো মনিষ্যি এখানে এসে পড়তে পারে না? বন্ধু-কুটুম না হয় না-ই থাকলো, এ পিরথিবিতে বন্ধু-কুটুম বলতে তার কে-ইবা আছে, শত্তুরও তো কেউ আসতে পারতো? পিরথিবিটা কি আজ তার একেবারে শত্তুরশূন্য হয়ে গেল নাকি? মানুষ যে মানুষের এত প্রিয় হতে পারে, নিতাই আজ এই প্রথম জানতে পারলো। সে এখন কিছুই চায় না, টাকাকড়ি বিষয়-আশয় ঘরবাড়ি—কিছুই সে আর চায় না। ভালো হোক, মন্দ হোক, সে এখন শুধু যে কোন একটা মানুষের মুখ দেখতে চায়। যেন কতদিন সে মানুষের মুখ দেখেনি।

পাড়ের ওপরের অর্জুন মহানিম আর ফলসা গাছগুলো আকাশে মাথা ঠেকিয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে যেন তাকে একমনে দেখছে। কপালে অজস্র ভাঁজ নিয়ে আরো চরম কিছু দেখার জন্যে ওরা অপেক্ষা করে আছে যেন। দুটো মেছো বক পাঁকে পা ডুবিয়ে থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দুপুর থেকে দু-তিনটির বেশি মাছ ধরতে পারেনি ওরা। যতক্ষণ আলো ততক্ষণ বক দুটো থাকবে, ততক্ষণ ভরসা। তারপর সন্ধে হবে, আর ওরাও এই পাঁক ছেড়ে উড়ে চলে যাবে। তার পরের কথা ভাবতে নিতাইর গায়ে কাঁটা দেয়। ততক্ষণেও কি এই আত্যান্তরে কেউ এসে পড়বেন না? বন্ধু কিংবা শত্তুর? অর্জুন মহানিমের আড়ালে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হেসে উঠবে কিংবা ডেকে উঠবে, 'কে নিতাই নাকি? ওখানে একগলা পাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে একা কি করছিস রে তুই?' নিতাই কি বলবে তাকে?

একটা দারুণ ফন্দি এসে যায় তার মাথায়। সে তাকে বলবে, পাঁকের মধ্যে একটা মস্ত বড় মাছ সে পায়ের তলায় চেপে ধরে আছে। একটু সাহায্য করলেই তুলে এনে দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নেবে। তারপর শালাকে পাঁকের মধ্যে পুঁতে রেখে সে সড়াৎ করে ওপরে উঠে ছুটে পালাবে। মরুক শালা কেঁদে ককিয়ে। সে পেছন ফিরে তাকাবেও না। মন্দ নয় ফন্দিটা, কিন্তু কোন শালা কি আজ এমুখো হবে? তার কি তেমন সুকৃতি আছে?

গোসাঁইদীঘির সঙ্গে নিতাইর আবাল্য পরিচয়। দীঘির উত্তর-পুব কোণে ছিল করমচার ঝাড়। ছোট-বেলায় কতবার সে এর পাড়ে করমচা চুরি করতে এসেছে। এক বুক রোদ্দুর নিয়ে দীঘিটা সারাদিন চুপচাপ আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতো। দীঘিটাকে ওর খুব ক্লান্ত মনে হতো। জলে গিরি-মাটি রঙের একটা সর পড়তো। ওর সরটা সারাদিন কেমন পাক খেয়ে আপসে যেন ঘুরতো। তা থেকে নিতাই বুঝতে পারতো, দীঘির জল ঘুরছে ওদিকে। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকলে ভয়-ভয় করতো। ঠিক তখনই গোসাঁইদীঘি সম্পর্কে মার কাছ থেকে শোনা নানা সম্ভব অসম্ভব কথা মনে পড়ে যেত তার। পাড়ের ওপর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার তার আর সাহস থাকতো না, সে আর কাঁকন গোসাঁইবাগানের লতাপাতার ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে ছুটতে থাকতো। তখন মনে হতো, কার যেন অদৃশ্য হাত ওদের ধরবার জন্যে লকলকিয়ে এগিয়ে আসছে। সামনের গাছগাছালির ডালপালা

ঝোপঝাড়গুলোকে সেই অদৃশ্য হাতের লম্ববেণী আঙুল বলে ভুল হতো তার। কোঁচড়ের করমচা-গুলো মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যেত, থেমে নিচু হয়ে ওগুলো কুড়োবার সাহস হতো না। পাতার ফুটো দিয়ে আকাশের ছিটেফোঁটাগুলোকে মনে হতো গোসাঁইবাগানের কোন অদৃশ্য দেবতার চোখ। ভয়ে প্রাণটা ধুকপুক করে উঠতো বুকের ভেতর।

অথচ গোসাঁইবাগান রোজই কেমন ইশারায় ওদের সেই ছায়ার ভেতরে চুপি চুপি ডেকে আনতো। গোসাঁইবাগানের গাছগাছালির আড়ালে ওদের সেই কিশোর বয়স হয়তো এখনো লুকিয়ে আছে। সে প্রতি নিমেষে পদে পদে শুধু অবাক হয়ে যাবার সময়। ওখানেই সে একদিন কাঁকনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, ভালোবাসা কাকে বলে। ও যেন গোসাঁইবাগানের লাল টকটকে একটা ডালিম গাছের ফুল—ঝোপঝাপের আড়ালে একলা-পাকলা ফুটে উঠেছে। ওখানেই একদিন সে কাঁকনকে বুকে চেপে ধরে বলে ফেলেছিল, 'জেবনে তুই শুধু আমারই হবি। এই গোসাঁইবাগানের করমচা গাছের মতো শুধু আমারই—'

তারপর কাঁকনের কি হলো, নিতাই আজও বুঝতে পারে না। পরের দিন থেকে সে আর এলো না। তিন মাসের মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে গেল পাশের গাঁ ঘাটুয়ার ঝগড়ুর সঙ্গে। কাঁকন ওদের গাঁয়ে আসে, যায়। নিতাইর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু কাঁকন আর সে কাঁকন নেই। সে এখন অন্যের। নিতাইরও বছর পাঁচেক হলো বিয়ে হয়ে গেছে দিনু বাউরির মেয়ে আতরের সঙ্গে। আতরের এখন ভরন্ত বয়স। সে কাঁকনের চেয়ে এখন অনেক বেশী সুন্দরী। কিন্তু নিতাই আজও কাঁকনকে ভুলতে পারেনি। ওর কথা মনে পড়লে যেন গোসাঁই-বাগানের মাথায় মেঘ ঘনিয়ে ঘোর হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা কেমন করকর করে ওঠে, ফলসা গাছের গায়ে হাত বুলোলে যেমন হয়।

মাথার ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। বোধ হয় চিল-টিল হবে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখার ভরসা হয় না। বড়ো একটা ছায়া পিছলে সরে যায় পাঁকের ওপর দিয়ে। এর চেয়ে একটা পাখি হওয়া ছিল ঢের ভালো। তাহলে সে আকাশে খুশিমতো উড়ে বেড়াতে পারতো, যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যেতে পারতো। আহ, পাখি হওয়ার কত সুখ! তাহলে মনটা যখন তার মেঘলা দিনের মতো বৃষ্টির ভাপে টনটন করে ওঠে, তখন একবার কাঁকনদের গাঁয়ের ওপর বেশ একটা চক্কর মেরে ঘুরে আসা যেত। কারও কিছু বলারও থাকতো না। তাহলে কি সে আজ এতক্ষণ গোসাঁইদীঘির পাঁকে একটা গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো? সত্যি, সে আজ গোসাঁই-বাগানের অর্জুন-মহানিম আর ফলসাগাছের মতো মাটিতে শেকড় পুঁতে দিয়ে একটা গাছ হয়ে গেছে। ইচ্ছে মতো চলাফেরার ক্ষমতা আজ আর তার নেই। গাছের মতো সে আজ সবাইকে দেখবে, সব কিছু শুনবে; কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারবে না। কোথাও যাবার ইচ্ছে হলেও সে আজ আর যেতে পারবে না। চারদিকের গাছগাছালির মতো সেও আজ নিথর, বোবা হয়ে গেছে।

ক'দিন আগেও গোসাঁইবাগান বা গোসাঁইদীঘি এমন নিথর ছিল না। পাম্পের জল তোলার ভট ভট আওয়াজে কানে তালা লাগার মতো অবস্থা হয়েছিল। জল তুলে দীঘিটাকে আরো বড়ো, আরো গভীর করে কাটা হবে। এখানে নাকি মাছের চাষ করবে গবর-মেণ্ট। জল ছেঁচে সব মাছ তুলে নিয়ে গেছে কণ্ট্রাক্টরের লোকজনেরা। নিতাই সারাদিন এখানে ঘুর ঘুর করেছে, চেয়েচিন্তেও দেখেছে, একটা চুনোপুঁটিও ওর দিকে ওরা ছুঁড়ে দেয়নি। কাপড় তুলে জলে নামতে গেছে, চ্যাঁচামেচি করে ওকে তুলে দিয়েছে। শালা শকুনের জাত। আজ সকালে ফলসা গাছের কাঁধ বরাবর রোদ উঠলে সে মাছের লোভেই এসেছিল গোসাঁইদীঘির পাড়ে। উত্তর-পশ্চিম কোণে দীঘির পাঁকের ওপর ঠিক তখনই এত্তো বড়ো একটা বান মাছ পাঁকের ওপর পিঠের শিরা তুলে ভেসে উঠে-ছিল। নিতাই আর লোভ সামলাতে পারেনি। কেউ কোথাও নেই দেখে সে তড়বড়িয়ে নেমে এসেছিল। কিন্তু সে বেশীদূর এগোতে পারেনি। তার আগেই সরসর করে তার হাঁটু, হাঁটুর পর কোমর, কোমরের পর বুক অবধি পাঁকের মধ্যে ডুবে গেল। বান মাছটা পাঁকের ভেতর কোথায় সেঁধিয়ে গেছে, আর দেখা যায়নি। বান মাছের আশা ছেড়ে নিতাই পাড়ে ফিরে আসার অনেক চেষ্টা করেছে। ঠিক তখনই সে বুঝতে পারে, পাঁকের নিচে কে যেন তাকে একটু একটু করে টানছে। ব্যাঙকে সাপ যেমন একটু একটু করে গিলে খায়, তাকেও কেউ যেন তেমনি করে খুব আস্তে আস্তে অন্ধকার একটা পেটের ভেতর গিলে নিচ্ছে। মনে পড়ে, গোসাঁইদীঘির জল ওপরে গিরিমাটি রঙের সর নিয়ে সারাদিন পাক খেয়ে বড়ো ভয়ানকভাবে ঘুরতো। দু-হাতে পাঁক ঠেলে সে আর পাড়ে ফিরে আসতে পারেনি, আরো তলিয়ে গেছে পাঁকের নিচে। পাঁক ঠেলে ঠেলে হাত দুটো তার অসাড় হয়ে গেছে। বুকসই পাঁক উঠে এসেছে গলা বরাবর। তারপর গলা ছিঁড়ে সে চেঁচিয়েছে। আতরের নাম ধরে সে চেঁচিয়েছিল প্রথমে, কাঁকনের নাম ধরেও ডেকেছিল বার দুই। গনাইর নাম ধরেও সে ডেকেছিল। গনাই গোরু বেচতে গেছে মঙ্গল-বার হাটে। ফিরবে সেই সন্ধের মুখে। তাও কোন পথে ফিরবে, তার ঠিক নেই। খলসেমারির মাঠের ভেতর দিয়ে যদি ফেরে তো তার ডাক সে শুনতেই পাবে না। তবু সে বার কয়েক গলা ছেড়ে ডেকেছিল, 'গ-না-ই......'

অন্তত আতরও যদি একবার জানতে পারতো, গোসাঁইদীঘি ওকে বানমাছের টোপ দেখিয়ে পাঁকে ফেলে একটা প্রকাণ্ড অজগরের হাঁ-এর ভেতর ধীরে ধীরে গিলছে, তাহলেও সে ওকে বাঁচাবার জন্যে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করতে পারতো হয়তো। একটা দড়ি বা যা-হোক একটা কিছু ওর দিকে ছুঁড়ে দিলেই সে বেঁচে যেতে পারবে। মাত্র কয়েক পা উঠে যেতে পারলেই সে জন্মের মতো বেঁচে যাবে। মাত্র কয়েক পা। আতর কি তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না? মনে মনেও কি সে একবারও টের পাচ্ছে না, ও এখানে পাঁকের মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে, গোসাঁইদীঘির পাঁক তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে জন্মের মতো পাতালে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? হাত-পা হিম মেরে আসছে তার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মরে যাবে, আতর তার কিছুই টের পাবে না। হয়তো সে এখন মনের আনন্দে চুল বাঁধছে, নয়তো গনাইর জন্যে চোখে কাজল পরছে পুরু করে। গনাইর মন ভোলাবার জন্যে আতর যে দিন-রাত কত চেষ্টা করে, সেকথা কি নিতাই জানে না? রাঙচিতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দু-জনকে হাসাহাসি করতে সে কতবার দেখেছে। নিতাই মানুষের বাচ্চা। সব জেনে-শুনেও সে কিছু বলতে পারে না। তার মুখ বন্ধ। টানাটানির দিনে গনাই তাকে দু-দশ টাকা ধার-কর্জ দেয়, কোনদিনই সে তা শোধ দিতে পারে না। গনাইকে তাই কিছু মুখ ফুটে বলাও যায় না। কিন্তু তাই বলে গনাইর কি এসব করা ঠিক? বাড়িতে বউ আছে, দেখতে শুনতেও কিছু মন্দ নয়, তবু আতরের পাশে শালার দিন-রাত ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ানো চাই। তার বউ কি হরির লুটের বাতাসা? শালা ভেবেছে কি? কিন্তু গনাইর আর দোষ কী? আতর যদি ওকে আসকারা না দিত, তাহলে কি গনাইর তার বউর কাছে ঘেঁষার এতখানি বুকের পাটা হতো? বেড়ার ধারে গনাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুক খালি করে ওর কানে সাপের মন্তর ঝাড়ে আতর—বহুবার চোখে পড়েছে তার। সারা-দিন বাবুদের খামারে মোষের মতো খেটেখুটে ঘরে ফিরে নিতাই যখন দেখে, অন্ধকারে বেড়ার ধারে গনাই দাঁড়িয়ে আছে, আর ওকে আসতে দেখে আতর এই মাত্তর হাতের কাঁচের চুড়ির আওয়াজ নিয়ে দাওয়ার দিকে ঝাপটা দিয়ে ছুটে সরে গেল, তখন নিতাইর বুকের ভেতর একটা আগুনের মালসা যেন ধিকিধিকিয়ে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ধার-কর্জের মতো বালাই আর নেই। আসল ব্যাপারটা চাপা দিতে গনাই গলা কেশে শুধোয়, 'নেতাই নাকি রে? আজ বাবুদের খামারে কি কাজ হলো?' নিতাইর বুকের

[illegible] অথবা এক কলসী জল হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে। ঘরের মনিষ্যিই যদি বেইমানি করে, নিতাইর তাহলে আর করার কি থাকে?

সেদিক থেকে কাঁকন বরং ঢের ভালো। ও নিজেকে কখনো ভিন মাঁনষ্যির কাছে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়নি। কাঁকনের অতি বড় শত্তুরেও ওকথা বলতে পারবে না। সে নিজেই তো কতবার কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও ঘাটুয়ায় গেছে, ঝগড়ুর ঘরের সামনে দিয়ে কতবার আসা-যাওয়া করেছে বিনা কারণে গলা ঝেড়ে কেশেছে, কাঁকন কি ওকে ইশারায় এক-আধবার ডাকতে পারতো না? তার ওপর ঝগড়ুও নেই—সাত দিনের জবরে মুখে রক্ত উঠে মারা গেছে। তাও তো তিন বছরের কম হবে না। আসলে, কাঁকন একটু অন্য ধাতের মেয়ে। নিতাই কাঁকনকে আজও ভুলতে পারেনি। কাঁকনের সঙ্গে নিতাইর কেমন একটা দুঃখের সম্পর্ক আছে। নিতাই যখন কোন দুঃখের মধ্যে পড়ে কিংবা প্রাণে কষ্ট পায়, ঠিক তখনই তার কাঁকনের কথা মনে পড়ে। হয় মার কথা, নয় কাঁকনের কথা। মা তাকে বড়ো কষ্টে পিতিপালন করেছিল। কিন্তু তার রোজ-গারের পয়সা খাবার জন্যে মা পিরথিবিতে বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। এখন নিতাইর আর নিজের বলতে কেউ নেই। আতর তার নিজের হয়েও ঠিক নিজের নয়। সে যেন গনাইর কাছ থেকে ধার করে আনা একটা রুপোর টাকার মতো। হাতে ধরতে না ধরতেই ফসকে পালায়। শালা পরের পয়সায় পোদ্দারি!

ভাবতে ভাবতে নিতাইর চোখে কেমন একটু তন্দ্রা এসে পড়েছিল। ফলসা গাছের পাতায় হঠাৎ হাওয়া হিসহিস আওয়াজ করে উঠতেই সে চটকা ভেঙে তাকালো। আকাশে আলো কমছে। গোসাঁইবাগানের মাথায় ছায়া ক্রমশ ঘোর হয়ে আসছে। দীঘির ধারের পাঁকে পা পুঁতে দিয়ে যে বক দুটো সারাদিন বসেছিল, তারা কখন নিঃশব্দে উড়ে চলে গেছে। এখন নিতাইর নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। চারদিকের ঘোর হয়ে ওঠা ছায়া এবার তাকে গিলে নেবার জন্যে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে। একটু পরেই রাত হয়ে যাবে। সে সারা রাত কি করে এই কণ্ঠা পর্যন্ত পাঁকের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকবে? রাতের কথা মনে হতেই তার বুকের নিচে প্রাণটা ধুকপুক করে ওঠে।

বছর দু-তিন আগে একবার সে গোসাঁই-বাগানের ডুমুর গাছের নিচে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে একটা নরম তুলতুলে খরগোশ ধরেছিল। কাঁটার খোঁচা লেগে হাত-পা ছড়ে গিয়ে কয়েকটা জায়গায় রক্ত ঝরেছিল তার। আতরের বারণ না শুনে সে ওটার গলা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছিল। আতরকে বলেছিল ঝাল লংকা দিয়ে বেশ কষে রাঁধবি। বেশ জুৎ করে খাওয়া যাবে খন। কিন্তু ওটার পেটে ছুরি চালাতে গিয়ে নিতাই চমকে ওঠে। কয়েকটা বাচ্চা তার মায়ের পেটের মধ্যে তখনও খুব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। কেমন একটা পাপবোধ তার ঊনকোটি শিরায় শিরায় সেদিন এক লহমায় ছড়িয়ে পড়েছিল। না, কাজটা সে ভালো করেনি। তখনও খরগোশটার বুকের ভেতর প্রাণটা ধুকপুক করছিল। ঝাল লংকা দিয়ে আতর বেশ কষে রান্না করেছিল খরগোশটাকে। আতর খুব তৃপ্তি করে খেলেও নিতাই কেন যেন তার একটুও মুখে দিতে পারেনি। মরা খরগোশটার পেটের ভেতরে ঘুমন্ত বাচ্চাগুলো আর তার বুকের ধুকপুকানি তার ফিরে ফিরে মনে পড়ছিল। তারও বুকের ভেতরে আজ ঠিক তেমনি প্রাণটা ধুকপুক করছে। আজ এই মুহূর্তে তার সেই মরা খরগোশটার কথা মনে পড়ছে। আতর হয়তো ওটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু নিতাই ভুলতে পারেনি। হয়তো গোসাইবাগানও ভোলেনি। আর গোসাঁইদীঘি?.... ..

থপ থপ করে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মনে হয়। ওটা কি ওর বুকের ধুকপুকানির [illegible]? নাকি অন্য কিছু? আওয়াজটা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে। কি হতে পারে ওটা? গোসাঁইবাগানের ঠাকুর দেবতা-টেবতা নয়তো? নাকি অন্য কেউ? আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হচ্ছে বটে। মনিষ্যির পায়ের আওয়াজ বলেই তো বোধ হচ্ছে। মনিষ্যি? ঠিক তাই। আহ, মনিষ্যি! নিতাই কত-কাল যেন মনিষ্যি দেখেনি; মনিষ্যির মুখ কি রকম সে আজ এই ক-ঘণ্টায় যেন ভুলে গেছে।

পাড়ের ওপর গাছগাছালির ছায়ার নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আস্ত একটা মানুষ। নিতাই ভুল দেখছে না তো? গোসাঁইবাগানের ঠাকুর যাচ্ছে না তো তার লম্বা-লম্বা পা ফেলে? ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল তার। গলা চিরে ডাকতে গিয়ে একটা জন্তুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে, 'ওটা কে বটে?'

পাড়ের আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে ঠিক জন্তুর মতো আওয়াজ ভেসে এলো, 'কে বটে?' নিতাই নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওটা তার গলার প্রতিধ্বনি নয় তো? ছায়াটা গাছগাছালির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিতাই ভরসা পায়। বলে, 'আমি নেতাই—'

ছায়াটা গলা ঝেড়ে কাশে।

'নেতাই? তুই ওখানে ক্যানে?'

পরিষ্কার গনাইর গলা। আহ্, পিরথিবিতে ভগমান আছে বটে। নইলে এ সময়ে এ পথে গনাই আসবে কেন? সে তো খলসেমারির মাঠ দিয়ে সোজা ওর বাড়ি চলে যেতে পারতো?

'আমি এখানে পাঁকে আটকে গেছি রে গনাই। উঠতে পারছি নি—'

'মাছ উঠেছিল, ধরতে নেমেছিলি বোধয়?'

'হুঁ—'

'তুই একটুনি দাঁড়া। আমি কিছু একটা লিয়ে আসচি—'

গনাইর ভারী ভারী পায়ের আওয়াজ ফিকে হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় দূরে কোথায় মিলিয়ে যায়। নিতাই আবার একা হয়ে যায়। গনাইর ফিরে আসা পর্যন্ত যদি সে আর পাঁকের মধ্যে তলিয়ে না যায়, তাহলে সে ঠিক বেঁচে যাবে, আতরকে কাঁকনকে সে আবার দেখতে পাবে। খলসেমারির মাঠে কাল সকালে রোদ্দুর উঠবে, গোরু চরবে, সে আবার সব দেখতে পাবে। আর কিছুক্ষণ। গনাই একটু বাদেই একগাছি মোটা রশি কিংবা যা-হোক-একটা কিছু নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু দড়িটা সে ধরবে কি করে? হাত দুটোয় যে তার আর কোন সাড় নেই। দড়িটা ধরতে না পারলে সে পাঁক কেটে ওপরে উঠবে কি করে? সে হাতদুটো তার নেড়েচেড়ে একটু দেখবে নাকি? কিন্তু ভয় করে, যদি সুট্ করে নাকটা পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যায়।

পাড়ের ওপর গাছগাছালির পাতার ফাঁক গলে হাওয়া হুটোপুটি খাচ্ছে। খুব কাছেই কোথাও শেয়াল ডেকে উঠলো গোসাইবাগানের অন্ধকারের ভেতর। সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে গোটা-দুই রাতচরা পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সে চোখ তুলে আকাশে তাকায়। আকাশে এক ঝাঁক তারা। সে নিজের মনে তারা গুনতে শুরু করলো— এক, দুই, তিন.......

একটা তারা খসে পড়লো। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠলো এক লহমার জন্যে। তারপর যে-কে-সেই অন্ধকার। তারা-খসা দেখতে পাওয়া ভালো নয়। মা বলতো অমঙ্গল হয় ওতে। অমঙ্গল আর এখন কী হবে? এখন তো শুধু একটা অমঙ্গলই বাকি। নাহ, শালা গনাই আর আসবে না। ও হয়তো এখন তার বউকে নিয়ে মজা লুটছে। ও দেখে গেছে, নিতাই পাঁকে ডুবে মরেছে। সে মরলে গনাই তো দুহাতে সোনার কলস পেয়ে যাবে। শালা তখন আতরকে নিয়ে রামরাজত্ব ভোগ করবে। ও কি ওকে বাঁচাতে আসবে? কক্ষনই না। আসবে না।

শালার গায়ে যদি মনিষ্যির রক্ত থাকতো তাহলে
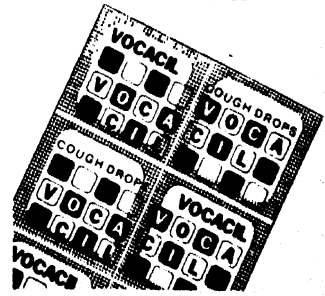
ঠিক আসতো। শালা যে একটা রামশিংখোড়, ওকথা জানতে আর কারো বাকি নেই।

'আমি যদি আজ এখানে মরি, গনাই, শালা তোকে আমি ছাড়বনি।'

মনে মনে নিতাই বলে। ওর গালে কখন থেকে একটা মশা বসে রক্ত খাচ্ছে। হাত তুলতে ভরসা হয় না। যদি তলিয়ে যায় আচ্ছা, পাতালে কি আছে? ওখানে কি ওই খরগোশটাকে মারার জন্যে ওর বিচার হবে? শাদা তুলোর মতো যার গা, যার পেটের মধ্যে কচি তুলতুলে কয়েকটা বাচ্চা কী পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল....। কিন্তু সে তো খরগোশটার মাংস খায়নি। তাহলেও কি পাপ?

অন্ধকার চিরে একটা ব্যাঙ্ ককিয়ে ডেকে উঠলো পাঁকের ওপর—বেশ কাছেই কোথাও মনে হচ্ছে। সাপে ধরেছে বোধয় ব্যাটাকে। ব্যাঙ্‌টা থেমে থেমে আর্তস্বরে ককিয়ে উঠছে এক-একবার। আস্তে আস্তে সাপটা গিলছে বোধয় ওটাকে—গোসাঁইদীঘি যেমন আজ ওকে গিলছে।...ব্যাঙের আর্ত ডাকের মধ্যে ব্যবধান যত বাড়ছে, তার ডাকটাও ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। বোধহয় জলঢোঁড়াই ধরে থাকবে ওটাকে, বিষাক্ত কিছু নয় হয়তো। তবু ভয় করছে নিতাইর। শেষে একটা আর্ত গোঙানি রেখে ব্যাঙ্‌টা একেবারে চুপ মেরে যায়। মরণ-কান্না এমনিই হয় তাহলে।

নাহ্, শালা গনাই তাহলে এলো না। আতরকে নিয়ে এখন শালা ফূর্তি করছে।

'আমি যদি নেতাই হই, তালে মরে গেলেও তোকে ছাড়বোনি শালা—ঠাকুরের দিব্যি।

নিতাই বিড়বিড় করে কথাগুলো নিজেকেই শোনায়। আবার ধুপধুপ করে মানুষের পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। গনাই তাহলে বেইমানি করেনি। শালা হাজার হোক, মানুষের বাচ্চা তো! শরীলে দয়ামায়া আছে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো কে একজন এসে পাড়ের ওপর দাঁড়ালো। নিতাই ভালো করে চেয়ে দেখে। ঠিক যেন শাদা চুনকাম করা বিশালাক্ষীর মন্দির। মেয়েমনিষ্যি মনে হয়। গনাই তাহলে আসেনি। শালা আর তাহলে আসবে না। সে যা ভেবেছে, তাই। মেয়েমানুষই। কিন্তু কাকে যেন মেয়েমানুষটা খুঁজছে, মনে হচ্ছে? গোঁসাইবাগানের দেবী-টেবী নয় তো? তা যদি হয়, তাহলে ও নিশ্চয়ই নিতাইকেই খুঁজছে। নিতাই গোঁসাইবাগানের সেই পোয়াতী খরগোশটাকে মেরেছিল, ও কথা নিশ্চয়ই গোঁসাইবাগানের দেবী ভোলেনি।

'কে বটে?'

ভয়ে ভাববে না ভেবেও নিতাই মুখ ফসকে ডেকে ফেলে। সংগে সংগে ছায়ামূর্তিটা নড়ে ওঠে। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছে, ঠিক তাই। গোঁসাইবাগানের দেবী চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে ছায়ামূর্তিটা ডেকে ওঠে, 'শংকরী, আয়—'

হেই ভগবান! এ কী শুনলো সে! গোঁসাই-বাগানের দেবী তো নয়। এ যে কাঁকনের গলা!

'কাঁকন, তুই?'

'তুই কে?'

'আমি নেতাই—দীঘির পাঁকে সারা দিন পুঁতে আছি রে। উঠতে পারছিনি—'

নিতাইর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। কাঁকনও কোন কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু আঁধকারে অনেকগুলো ঝিঁঝি-পোকা এক সংগে গলা মিলিয়ে ডেকে চলে।

'তুই আমার শংকরীকে দেখেছিস?'

'শংকরী কে বটে?'

'আমার নতুন-বিয়োনো গাই। আজ মাঠে চরতে এসে ঘরে ফেরেনি—'

'অ—'

কাঁকন তার গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে পাড় থেকে নেমে আসে। সারা দিনের পর এতক্ষণে নিতাইর চোখের কোণ দুটো হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে। এখন তার মার মুখ বড় বেশি মনে পড়ছে। আহ্, মাকে সে কতদিন দেখেনি।

কাঁকন অন্ধকারে পাড়ের খুব কাছে [illegible] এসে পড়ে, সে তাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুই আর আসিসনি, কাঁকন। তালে তুইও আমার মতন পাঁকে ডুবে যাবি—'

কাঁকন দাঁড়িয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'তুই উঠতে পারসিছনি ক্যানে?'

'উঠতে পারলে সারাদিন এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি? তুই আমার দিকে যা-হোক-একটা কিছু ছুঁড়ে দে, লতা-ফতা যা-হোক-একটা কিছু। আমি উঠে যেতে পারবো তালে—'

কাঁকন আবার পাড়ের ওপর উঠে যায়। কিছুক্ষণ পরে তাকে আর দেখা যায় না। কাঁকনও তাহলে গনাইর মতো চলে গেল। মনিষ্যির ওপরে আর নিতাইর বিশ্বাস নেই। আতর আর গনাইর ওপর তার বিশ্বাস আগেই চলে গেছে। কাঁকনের শরীলেও তো মানুষের রক্ত, তাকেও কি বিশ্বাস করা যায়? যেদিন সে কাঁকনকে জন্মের মতো হারিয়েছিল, সেদিনের কাঁকন আর আজকের এই কাঁকন একই শরীল, একই মনিষ্যি। বাঁচাবার হলে কাঁকন তাকে সেদিনই বাঁচাতো। কাঁকনের কাছে নিতাইই চেয়ে শংকরী অনেক বেশি দামী। সে তাই হয়তো তাকে পাঁকের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে রেখে খুব সহজে তার শংকরীকেই খুঁজতে চলে গেল।

'অন্ধকারে লতা-ফতায় হাত দিতে ভয় লাগে। তার চে' আমি আঁচলটা এগিয়ে দিচ্ছি। তুই ধরে উঠে আয়।'

কাঁকন ফিরে এসেছে। না, কাঁকন আতর বা গনাইর মতো নয়। সে ভিনজাতের—সে কাঁকন। মনিষ্যির রক্ত আছে তার শরীলে—দয়ামায়া তার না থেকে পারে?

কাঁকন আঁচলটা এগিয়ে দেয়। নিতাই তার নাগাল পায় না।

'শংকরীর দড়িটাও যদি হাতে করে নিয়ে আসতুম—'

নিতাই বুঝতে পারে, কাঁকন দড়ি আনার নাম করে কেটে পড়ার ফন্দি করছে। কাজেই, তার মৃত্যু আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজ রাত্তিরেই সে মরে যাবে। কাল সকালে গনাই সবার আগে এসে গাঁয়ের লোক জড়ো করবে। তারপর তো তার রামরাজত্বির শুরু। আতরও স্বস্তি পেয়ে বেঁচে যাবে।

'নে, ধর—'

নিতাইর সামনেই থপ্ করে কী একটা এসে পড়লো। কাঁকন বিধবা—অন্ধকারে ওর শাদা কাপড়-খানা চিনে নিতে কষ্ট হয় না নিতাইর। সে পাঁকের ভেতর থেকে প্রাণপণে তার একটা হাত টেনে বের করে আনে। হাতে জোর নেই একেবারে। অতি কষ্টে সামনে হাত বাড়িয়ে সে কোন রকমে কাপড়ের খুঁটটা ধরে ফেলে। তারপর আর একটা হাতও বেরিয়ে আসে পাঁকের ভেতর থেকে। দুহাতে কাপড়ের ধারটা সে পেঁচিয়ে কষে ধরে।

গোঁসাইদীঘির ঠান্ডা গ্রাস থেকে নিতাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। পাঁকের ওপর দিয়ে তার হিম-হয়ে আসা শরীরটা পিছলে পাড়ের দিকে সরে আসছে। খানিকটা এসে সে কাপড়ের কোণটা ছেড়ে দেয়। পা টলছে তার। টলতে টলতে ওপরে উঠে এসে বুঝতে পারে, কাঁকন তার কাদামাখা কাপড়খানা অন্ধকারে হুড়বড় করে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে।

'সত্যি কাঁকন, আর-জনমে তুই আমার কেউ ছিলি—'

কাঁকন এ কথার জবাবে আজ আর কোন কথা বললো না। রাগ করে চিরজন্মের মতো চলেও গেল না। সে অন্ধকারে নিতাইর চোখের সামনে ঠিক বনের দেবীর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। নিতাই বললো, 'চল—'

'কুথায়?'

'আজ রাত্তিরেই তোর শংকরীকে খুঁজে আনি গে চল্।'

ছবি : সুনীল শীল

বিজ্ঞান

ভৌত গবেষণাগার
আমেদাবাদ থেকে ফিরে : ১

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যেখানে এবং সেই সঙ্গে কাজের প্রতিশ্রুতি, সেখানে সাফল্যকে অনেক সময় মনে হয় গৌণ ব্যাপার। যেন, সোনা যখন তখন মূল্য তো তার একটা থাকবেই। হয়ত এই কারণেই যখন কেউ বোঝে তার হাতে সত্যিই এক তাল সোনা, তখন সেই সোনার মূল্য যাচাই নিয়ে সে আর তত বেশি মাথা ঘামায় না। মূল্যটা—ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইমপ্লায়েড'। আমেদাবাদে ভৌত গবেষণাগারে ডাইরেক্টর ডঃ দেবেন্দ্র লালের সঙ্গে কথা বলার সময় ঠিক এই কথাগুলোই ভিড় করে বসল আমার মাথার ভেতর। প্রচণ্ড চটপটে, বিনয়ী এবং কল্পনাপ্রবণ ডঃ লালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই মনে হল, এ মানুষটি শুধু পণ্ডিতই নন একজন হৃদয়বান দক্ষ প্রশাসকও। এবং সেই সঙ্গে একথাও হয়ত যোগ করা সঙ্গত হবে, ডঃ বিক্রম সারাভাই এবং অধ্যাপক কে আর রামনাথন যে ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দেশের বিশিষ্ট এই গবেষণাগারটির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, ডঃ লালের নেতৃত্বে এখন তা পল্লবিত। পৃথিবীর মানচিত্রে তার আসন এখন অন্যতম।

ডঃ লালের প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে এখনকার কাজকর্মের কিছু পরিচয় দিই।

ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। তবে এ নাম

ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির রূপকার ডঃ বিক্রম এ সারাভাই

বললে স্থানীয় লোকেরা কেউ চিনবে না। তাদের কাছে সংক্ষিপ্ত নামটিই বেশি পরিচিত। পি আর এল।

আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণা—এই গবেষণাগারের একটি বড় রকমের ঐতিহ্য। এবং এর মূল অনুপ্রেরণা ডঃ রামনাথন।

প্রসঙ্গটি তুলতেই এখনকার তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ এইচ এল এস সিনহা বললেন, এই তো গত বছরেই আমরা বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের বেশ কিছুটা এলাকায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। বলতে পারেন, এটা আমাদের একটি প্রোজেক্ট। বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের সমুদ্র তলের তাপমাত্রা কোথায় কী রকম সেটা জানাই হল এই প্রোজেক্টের লক্ষ্য।

প্রোজেক্টটির পরিকল্পক ছিলেন পি আর এল'এর প্রবীণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি আর পি সারাথি এবং সহ-পরিচালক এবং বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এস পি পানডিয়া। ঠিক হয় বিমান থেকে দুই সমুদ্রের উপরি-তলের তাপমাত্রা মাপা হবে ইনফ্রা রেড রেডিও মিটারের সাহায্যে। রেডিও মিটার আমেদাবাদের স্পেস অ্যাপলিকেশন সেন্টার-এর কুশলীরাই তৈরি করেছিলেন।

হায়দ্রাবাদের রিমোট সেনসিং এজেনসি দিলেন একটি ডি সি-৩ বিমান। বলতে পারেন, বিমানটি ভাড়া করা হল। অভিযানের প্রথম পর্ব শুরু হয় বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর থেকে। এই অভিযানে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের দায়িত্ব ছিল ডঃ সিনহার ওপর। আর কারিগরি সংক্রান্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্পেস অ্যাপলিকেশন সেন্টারের আর এম পানডিয়া।

বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য কর্মী নিয়ে দশ জনের দল। অভিযান শুরু হয় ১৯৭৭এর মে মাসে।

প্রশ্ন : ডঃ সিনহা, দেখছি পি আর এল-এর প্রোজেক্ট হলেও আরও অনেক সংস্থার ওপর এর জন্যে আপনাদের নির্ভর করতে হয়েছে। এতে আপনাদের অসুবিধে হয় নি?

'কিছু কিছু অসুবিধে হয় নি, সে কথা বলব না'। বললেন ডঃ সিনহা। 'যেমন ধরুন, বোম্বেতেই আমাদের অভিযান সাত দিন পিছিয়ে গেল। দরকার অসামরিক বিমান দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেলের ছাড়পত্র। এটা না পাওয়া পর্যন্ত বিমান যাত্রাই করতে পারি না। মুশকিল এই বিমান সংস্থার কর্মীরা তখন আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁদের কাজকর্মে তখন চলছে 'গো স্লো' নীতি। তাই এই দেরি। এই দেরি আমাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে খুবই ক্ষতিকর। কারণ এই প্রোজেক্টের মূল লক্ষ্যই ছিল মৌসুমী বাতাসের প্রভাবে দেশের এ অঞ্চলে যখন বৃষ্টি হয় সে সময় সমুদ্র তলের কোথায় কি রকম তাপমাত্রা থাকে সেটা জানা। সাত দিন দেরি করা মানে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য আমরা আর সংগ্রহ করতে পারলাম না। এ ছাড়া আরও একটি অসুবিধে, বৈদ্যুতিক বিভ্রাট। কি বলব আপনাকে, বিমান বন্দরেও যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, সেই বিদ্যুতেরও তড়িৎ বিভব যে এমন নামা ওঠা করে, আমাদের জানা ছিল না। ২২০ ভোল্টের বদলে বিভব মাত্রা নেমে দাঁড়ায় কখনও ১৮০ ভোল্ট বা তারও কম। শুধু সান্তাক্রুজই নয়, পরে দমদম অথবা ভুবনেশ্বর এবং ভিসাখাপট্টম বন্দরেও আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এর ফলে ইনফ্রা রেড রেডিও মিটার থেকে শুরু করে আরও অনেক যন্ত্র নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে বেশ কিছুটা অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে আমাদের।

খুঁটিনাটি বাধা ছিল বিস্তর। কিন্তু তাদের সমাধান করে প্রোজেক্টের কাজ করে গেছেন পি আর এল'র বিজ্ঞানীরা। প্রথমে বোম্বে থেকে যাত্রা করে উপকূল থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার আরব সাগরের ভেতর গিয়ে তথ্য সংগ্রহ। মৌসুমী বাতাস। আকাশে মেঘের স্তর। কখনও মেঘের ওপর থেকে। কখনও বা নিচে উড়ে উড়ে বিস্তৃত অঞ্চলের তাপমাত্রা সংগ্রহ। তারপর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল ৬ জুলাই। শেষ ২ আগস্ট। দমদম বিমান বন্দর থেকে উড়ে তাঁরা দেশের পূর্ব উপকূল বরাবর ভিশাখাপট্টম পর্যন্ত অনুরূপ পর্যবেক্ষণ চালান। এই সময় তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বিভিন্ন বিমান বন্দর এবং আবহাওয়া দপ্তরের আবহাওয়া বিষয়ক সংকেতের ওপর। নির্ভর করতে হয়েছে আরও নানান সংস্থার ওপর।

যেমন বিভিন্ন তথ্য তাঁদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল ডিজিটেল টেপ রেকর্ডারে। মাঝে মাঝেই ওই সব তথ্যের পাঠোদ্ধারের দরকার হচ্ছিল। এর জন্য প্রয়োজন কমপিউটার বা যন্ত্রগণক। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফানডামেনটাল রিসার্চ এবং ভিসাখাপট্টমের ভারত হেভী প্লেট অ্যান্ড ভেসেলস লিমিটেডের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের যন্ত্র গণকগুলি ব্যবহার করতে দিয়ে।

প্রঃ এ ধরনের তথ্যের তাৎপর্য কি?

শাহিবাগের এই সেই 'বাড়িটি'। ১৯৪৭ সালে ডঃ সারাভাই এখানেই তাঁর ভৌত গবেষণাগারটি বসিয়েছিলেন

উত্তর : আপনাকে আগেই বলেছি। আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌসুমী চলার সময় কোথায় কেমন তাপীয় অবস্থা থাকে তা জানা। অর্থাৎ এক কথায় ওই সব জায়গার 'থার্মাল ম্যাপ' বা তাপীয় মানচিত্র তৈরি করা। এ ধরনের মানচিত্র আমাদের অনেক ভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন, কখন মৌসুমী আসবে, তার দরুন কখন কোথায় বর্ষা নামবে, বৃষ্টির পরিমাণ কতটা দাঁড়াতে পারে, ঝড় অথবা সাইক্লোন হবে কি না, এমন অনেক কিছু। এ ছাড়া সমুদ্রের নিচেকার ভূস্তরের নিচে কোথায় তেল আছে কি না তারও আভাস দিতে পারে এই তাপীয় মানচিত্র। যেমন ধরুন, যদি দেখা যায় কোথাও সমুদ্র তলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম, বুঝতে হবে সেখানকার গভীর স্তরে তেল থাকা সম্ভব।

মৌল গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য কতটা প্রয়োজন? এ কাজ তো দেশের আবহাওয়া দপ্তরও করেছে। তাই যদি হয়, আপনারা কি তার পুনরাবৃত্তি করছেন না?

এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছি ওই গবেষণাগারের আরও দু জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ডঃ আর এন কেশবমূর্তি এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

তাঁদের বক্তব্য, এ ধরনের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যও মৌলিক গবেষণাই। সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা, সূর্য দিনের দিকে যে পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীর বুকে ছুঁড়ে দেয়, প্রতিফলনের মাধ্যমে তার কতটা অংশ পৃথিবী ত্যাগ করে—এ সবের দৈনন্দিন হিসেবের উপর নির্ভর করে যন্ত্রগণকের সাহায্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত কিছু কিছু মডেল তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য।

ডঃ কেশবমূর্তি বললেন, ১৯৭২ সালে গুজরাটে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি হয়ে গেল। কেন? দেখা গেছে ওই বছর সারা এশিয়া মহাদেশের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ছিল কম। তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা ছিল বেশি। ওই বছর মৌসুমী বায়ু তার নিজস্ব স্থান থেকে পাঁচ ডিগ্রি পূর্ব দিকে সরে যায়। এর ফলেই গুজরাট এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সেবার অতটা অনাবৃষ্টি। আমাদের বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করা গেলে এ ধরনের ঘটনার পূর্বাভাস অনেক আগে থেকেই দেয়া সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, শুধু বিমানের সাহায্যেই নয়, পি আর এল এই উদ্দেশ্যে দেশের পঁয়ত্রিশটি জায়গায় মানমন্দির বসিয়ে নিয়মিত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

*

দৃষ্টান্ত আরও আছে। পরে দিচ্ছি। তার আগে

ড়ার যে কথা [illegible] এবং প্রতিশ্রুতি— আর এল-এর জন্ম এবং বিবর্তনের যা পরিবাহক র পরিচয় দিই।

তিনি ডঃ বিক্রম এ সারাভাই।

বাবা অম্বালাল সারাভাই এবং মা সরলাদেবী জেরাই একটি স্কুল তৈরি করেছিলেন। যার নাম রেখেছিলেন তাঁরা 'রিট্রিট'। মন্টেসরি স্কুল। সুযোগ্য শিক্ষকদের অধীনে শিশু বিক্রমের বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ হল এখানেই গড়ে উঠেছিল।

সম্মানের সঙ্গে আই এস সি পাশ করার পর চ শিক্ষার জন্যে বিক্রমকে পাঠান হল কেমব্রিজের ন্ট জনস কলেজে। তখন বয়েস আঠারো বছর। ১৯৪০ সালে এখানে তিনি পেলেন পদার্থ বিজ্ঞান বং গণিত সহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের 'ট্রাইপস'। ইচ্ছে ল সেখানেই পড়াশুনা করবেন। হল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজল। বিক্রম কেমব্রিজ ছেড়ে রে এলেন দেশে। বাঙ্গালোরে ইনডিয়ান ইনসটি-উট অভ্ সায়ান্স অধ্যাপক সি ভি রমনের অধীনে হাজাগতিক রশ্মির ওপর শুরু করলেন গবেষণা। র বছর দুই পরই আমেদাবাদে ভৌত গবেষণাগার নানোর ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে থাকেন। ই সময় পুনায় ডঃ রামনাথনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা । ডঃ রামনাথনকে তিনি নিজের পরিকল্পনার থা বলেন।

১৯৪৫ সালে তাঁর বাবা-মা'র উদ্যোগে তৈরি ল কর্মক্ষেত্র এডুকেশনাল ফাউনডেশন। উদ্দেশ্য জ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য া। ওই বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তিনি মব্রিজে ফিরে যান এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ লে সেখানে ডকটরেট ডিগ্রির জন্যে তাঁর গবেষণা-টি পেশ করেন। গবেষণার বিষয় : 'কসমিক রে নভেসটিগেশন ইন ট্রপিক্যাল ল্যাটিচ্যুড।' কেম-জের বিশেষজ্ঞরা তাঁর গবেষণায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রেন। ১৯৪৭ সালে তাঁকে ডকটরেট ডিগ্রি দেয়া ।

কেমব্রিজ থেকে ফিরে আসার অব্যবহিত পর রিট্রিট'-এই তিনি স্থাপন করলেন একটি গবেষণা-র। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সহকারী নিয়ে এখানেই রু করলেন মহাজাগতিক রশ্মির উপর গবেষণা।

ঠিক হল আমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি বসান হবে। ডঃ রামনাথন জানালেন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর কে অবসর নেয়ার পর তিনি ওই গবেষণাগার পরি-চালনার দায়িত্ব নেবেন। সেই সঙ্গে এগিয়ে এল

কাশে একস রশ্মি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্যে এই টি তৈরি করেছেন পি আর এল এর বিজ্ঞানীরা। বা থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটের ডগায় এটি ন হয়েছিল

১৫ ফেব্রুয়ারি পি আর এল এর নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতা করছেন এস এস ভাট-নগর। তাঁর পেছনে বসে রয়েছেন সি ভি রামন। বাঁদিক থেকে : জি ভি মভলংকর এবং হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা

আমেদাবাদ এডুকেশন সোসাইটি এবং কর্মক্ষেত্র এডু-কেশনাল ফাউনডেশন। এলেন কস্তুরভাই লালভাই. জি ডি মাভলংকর প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি পর্ষৎ-এর (সি এস আই আর) প্রধান তখন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান পরিকল্পক এস এস ভাটনগর। ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণার পরিকল্পনা। বিক্রম তাঁদের নিজের পরিকল্পনার কথা জানালেন। জানালেন, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে মহাজাগতিক রশ্মি, ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা চালানর ক্ষেত্রে আমেদাবাদের অবস্থান খুবই আদর্শস্থানীয়। এখান থেকে ভূ-চৌম্বক নিরক্ষ রেখার দূরত্ব খুবই কম। এর ফলে এই সব অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপারে এমন সব ঘটনা ঘটে যাদের জানা গেলে মহা-জাগতিক পদার্থবিজ্ঞান যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণার কথাও বিক্রম ভাবলেন এই সঙ্গে। তার কারণ অবশ্য ডঃ রামনাথন। বিক্রম জানতেন গবেষণার কাজে সফল হতে গেলে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশী। এক; কোন গবেষণা চালানর জন্যে কোন কোন বিষয় নির্বাচিত করলে গবেষণাগারের সুযোগসুবিধায় তাদের ফলপ্রসূ করা সম্ভব। অর্থাৎ এমন কিছু নিয়ে কাজ করতে চান না, যা শোনায় ভাল, অথচ সুযোগসুবিধে এবং সাজসরঞ্জামের অভাবে যাকে কোনদিনই বাস্তবায়িত করা যাবে না। দুই; উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এবং বিজ্ঞানী নির্বাচন।

এ সব ব্যাপারে ডঃ সারাভাই ছিলেন প্রচণ্ড সতর্ক।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ পি আর এল এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন ভারতীয় নোবেল বিজ্ঞানী ডঃ চন্দ্রশেখর বেংকট রামন। আর তার পরই ডঃ সারাভাইএর নেতৃত্বে শুরু হল ভৌতপদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী গৌরচন্দ্রিকা।

মহাজাগতিক রশ্মি, আবহাওয়া বিজ্ঞান এ-সবের ওপর গবেষণা, গবেষণার সাজসরঞ্জাম তৈরি এমন বহু কাজে লেগে পড়লেন এখানকার বিজ্ঞানীরা। ১৯৬২ সালে শুরু হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা। তারও দায়িত্ব নিলেন ডঃ সারাভাই। মহাকাশ গবেষণার জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান হলেন তিনি। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এবং পি আর এল এর সহযোগিতায় থুম্বায় বসান হল রকেট উৎক্ষেপ কেন্দ্র। আমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেণ্টারের প্রতিষ্ঠায় মূলেও নেতৃত্ব দিয়েছে পি আর এল। বহু আধুনিকতম যন্ত্র এখানে তৈরি করে মহাকাশ গবেষণায় লাগান হয়েছে। থুম্বা থেকে গোড়ায় যে সব রকেট উৎক্ষেপ করা হয় সেই সব রকেটের ডগায় বসান হত আবহাওয়া এবং জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকারী যন্ত্রপাতি। ওই সব যন্ত্র তৈরির দায়িত্বও গ্রহণ করেন এখানকার বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা। উল্লেখ্য ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভটের সাহায্যে মহাকাশ সংক্রান্ত যে তিনটি পরীক্ষা চালান হয়েছিল তার মধ্যে দুটি পরীক্ষার যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন 'পি আর এল'-এরই বিজ্ঞানীরা। এই দুটি পরীক্ষা হল : এক, মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে যে একস রশ্মি ভেসে আসে তার পরিমাণ ; দুই, পৃথিবীর আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ।

ডঃ সারাভাইএর অকাল মৃত্যুর পর পি আর এল এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন ডঃ এম জি কে মেনন। অতঃপর এ দায়িত্ব এসে বর্তায় ডঃ দেবেন্দ্র লালের ওপর।

একটা ব্যাপার লক্ষ করার মত। পর পর যিনিই এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার নিয়েছেন, বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁদের অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য, নেতৃত্বেও তাঁরা বলিষ্ঠ।

ফলে এখানকার গবেষণা কখনও সীমারিত গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকেনি। নিয়মিত সম্প্রসারিত হয়ে গুণগত উৎকর্ষ লাভ করেছে।

বর্তমানে যে সব ক্ষেত্রে 'পি আর এল'-এর গবেষণা চলছে তাদের মধ্যে প্রধান : ১। সৌর এবং গ্রহবিষয়ক পদার্থবিদ্যা। রকেট এবং বেলুনের সাহায্য তাঁরা সূর্য এবং আবহাওয়া বিষয়ক পর্য-বেক্ষণ চালাচ্ছেন এবং তার উপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক গবেষণা ; ২। প্লাজমা এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানে তত্ত্বীয় অনুসন্ধান ; ৩। পরীক্ষামূলক প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন মডেল তৈরি করে জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ; ৪। অবলোহিত-জ্যোতির্বিদ্যা বা ইনফ্রা রেড অ্যাসট্রোনমি; ৫। পার-মাণবিক এবং মহাজাগতিক বিজ্ঞান এবং ৬। আরকিওলজি এবং হাইড্রোলজি।

আগামী সংখ্যায় এই সব গবেষণার কথা আলোচনা করব।

সমরজিৎ কর

খেলা

ংগ্রামে উপভোগ্য
ক টেস্ট সিরিজ

উনিশশো একাত্তর সালে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে
কটের দুই শক্তিশালী দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও
ণ্ডকে টেস্ট যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতের ক্রিকেট
যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিল এবার অস্ট্রেলিয়ায়
় পরাজয় সত্ত্বেও কিন্তু গৌরব কিছু কম নয়।
। যেতে পারে টেস্ট সিরিজে ২—৩ খেলায় পরাজিত
ও ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সংগ্রামের গৌরব-
মা মাথায় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে এসে-
।

পরাজিত পক্ষকে সাধুবাদ জানাতে বা তাদের নিয়ে
-হুল্লোড় করতে মানুষের মন সায় দেয় কখন? যখন
ও পরাজয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে অতি সূক্ষ্ম।
বা পরাজিত পক্ষ জয়ের খুব কাছাকাছি এসে
ত হয়। অথবা তাদের সংগ্রামে থাকে শৌর্যের
রচয়—তাদের খেলা দেখে মানুষের মন তৃপ্তিতে
় ওঠে। এই সব শর্ত পালিত হয়েছিল বলেই
৬০-৬১ সিরিজে ফ্রাঙ্ক ওয়েরেলের পরাজিত ওয়েস্ট
ডজ দলের খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ায় পেয়েছিল
ার সম্মান,আজ পর্যন্ত কোনো দল যে সম্মান
নি। ওই সিরিজের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা ব্রিসবেন

ষণ সিং বেদী

ঠর টাই টেস্ট—টেস্ট ইতিহাসে একমেবাদ্বিতীয়ম।
় টেস্টের এক তারকা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এখনকার
ধনায়ক ববি সিম্পসন। তখন ২৩ বছরের উঠতি
লোয়াড়। সূচনাকারী ব্যাটসম্যান। প্রথম ইনিংসে
রছিলেন ৯২ রান। তারপর প্রচুর টেস্ট খেলেছেন
ম্পসন। সাতটি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক
রছেন। ৯ বছর অবসর-যাপনের পর অধিনায়ক
াবে এটি তাঁর অষ্টম সিরিজ। ক্রিকেটের সেই কথিত
চন ক্লাড়ানট এবার ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট খেলার পর
় কণ্ঠে বলেছেন টাই টেস্টের পর এমন টেস্ট আর
লনি, এমন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে মাঠে
াইনি।

স্থান কাল পরিবেশের কোনো প্রভাব খেলার উপর
ড় কিনা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। আমি কিন্তু
বেন মাঠের কিছু মাহাত্ম্যের হদিস পাচ্ছি ভারত-
স্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে। ১৯৬০-৬১ সিরিজে ব্রিসবেন
ঠ খেলা হয়েছিল ডিসেম্বরের ৯, ১০, ১২, ১৩ ও
তারিখে। এবার খেলা হয়েছে একটু আগে
সম্বরের ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ তারিখে। সেবার হয়ে-
শৈত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কৃষ্ণকায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান-
় খেলা। এবার হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে .....
ডিয়ানদের। এবারও ..... এবার

বলা বাহুল্য, সেবার টেস্ট টাই হয়েছিল। এবার হতে
পারত।

শুধু ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট কেন, পার্থের দ্বিতীয়
টেস্টও কি টাই হতে পারত না? ক্রিকেটের ভাগ্যদেবী
চাননি, আর একটি টেস্ট টাই হোক, তাই কোনোটিই
হয়নি।

ব্রিসবেন এবং পার্থে দুটি খেলাতেই ভারত হেরেছে
জয় সম্ভাবনার মধ্যে এবং ক্রিকেটের যাবতীয়
নাটকীয়তার শিহরণ জাগিয়ে। ব্রিসবেনে ববি সিম্পসন
যেমন বলেছেন, "টাই টেস্টের পর এমন ক্রিকেট
খেলিনি", তেমন পার্থে হারার পর ভারত অধিনায়ক
বিষেণ সিং বেদী বলেছেন—"আমার দশ বছর পরমায়ু
কমে গেছে। এ ধরনের শ্বাসরোধকারী খেলা হৃৎপিণ্ডের
পক্ষে মোটেই ভাল নয়।"

দুটি টেস্টে হারার পর ভারত পর পর মেলবোর্ন
ও সিডনি টেস্ট জিতে সিরিজ ২—২-এ সমান করল,
যেমন করেছিল দেশের মাঠে ১৯৭৪-৭৫ সিরিজে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেবারও ছয় দিনের
শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শেষ রক্ষা করতে
পারেনি। এবারও পারল না অ্যাডিলেড টেস্টে অস্ট্রে-
লিয়াকে হারিয়ে 'রাবার' ছিনিয়ে নিতে। তবে
অ্যাডিলেডে ছয় দিনের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় পাহাড়
প্রমাণ রানের পেছনে তাড়া করেও ভারত জয়ের কাছা-
কাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে
তুলেছিল অনমনীয় দৃঢ়তায়। পরাজয় তীরে এসে তরী
ডোবার মত।

মোটের উপর এ সিরিজে ভারত ক্রিকেটের যাবতীয়
শর্ত পালন করেছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে
প্রশংসা কুড়িয়েছে। ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তায়
দুলিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে জয়ের
শূন্য ঘরটা পূর্ণ করেছে এবং পাঁচটি টেস্টেই সংগ্রাম
করেছে চোয়াল শক্ত করে। এর সঙ্গে আছে একটি
বিশ্ব রেকর্ডও। কোনো দল কোনোবার বিদেশ সফরে
গিয়ে কি পর পর প্রথম ৮টি খেলায় জিততে পেরেছে?
সফরে ভারতের এই জয়ের নজীর বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা
পেতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, ভারত যে দুটি টেস্টে জিতেছে
সে দুটিতে জিতেছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসে, তিনটিতে
হেরেছে জেতার মুখে এসে। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া হারতে
হারতে জিতে গেছে। ভারত জিততে জিততে হেরেছে।

বাহাদুরী অস্ট্রেলিয়ারও কম নয়। অস্ট্রেলিয়া
টেস্টে খেলিয়েছে মোট ১৯ জন খেলোয়াড়কে। তার
মধ্যে ১৪ জনেরই টেস্ট অভিষেক হল এই সিরিজে।
উপায়ও ছিল না। কারণ ধরাকে নিক্ষত্রিয় করার পরশু-
রামের প্রতিজ্ঞার মত সরকারী টেস্ট ব্যবস্থাকে পঙ্গু
করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন অস্ট্রে-
লিয়ার টেলিভিসন মালিক ধনকুবের কেরি প্যাকার।
বিপুল অর্থের টোপ ফেলে বিশ্ব ক্রিকেটের রুই
কাতলাদের তিনি তুলে নিয়েছেন। তার মধ্যে অস্ট্রে-
লিয়ারই কুড়ি জন। সুতরাং নতুনদের নিয়ে অস্ট্রে-
লিয়াকে দল গড়তে হয়েছে। কিন্তু একদিক দিয়ে
আপাতত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেটা শাপে বর হয়েছে।
পিটার টুহি, টনি ম্যান, ওয়েন ক্লার্ক, রিক ডারলিং,
ডেভ রিক্সন, স্যাম গ্যানন প্রমুখ খেলোয়াড়রা কি টেস্টে
চান্স পেতেন, যদি অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা প্যাকারের
ওয়ার্লড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হত। চিত্তাকর্ষক
ব্যাটসম্যান টুহি, ওপেনার ডারলিং, স্পিনার ও ব্যাটস-
ম্যান ম্যান, উইকেট কিপার রিক্সন, পেসার ক্লার্ক এই
সিরিজেরই আবিষ্কার। প্রত্যেকেই কষ্ঠিপাথরে যাচাই
হয়ে গেল বিশ্বখ্যাত ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে এই
ধরনের সিরিজ খেলে। দীর্ঘ ৯ বছর পরে আবার টেস্ট
ক্রিকেটে ফিরে এসে এবং অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট তরণীর
হাল ধরে ববি সিম্পসন শুধু নিজ যোগ্যতারই পরিচয়
দেননি, একটি নতুন দলকে নব প্রেরণায় উজ্জীবিত করে
তুলেছেন।

ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলার আগে পুরো শক্তির
অস্ট্রেলিয়া দল .....দের হয়ে ইংলণ্ড থেকে ফিরে
আসে। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে তিনটি টেস্টে হেরে, যায়
১ উইকেটে, ৫ উইকেটে এবং ইনিংস ও ৮৫ রানে।
দুটি টেস্ট অমীমাংসিত থাকে। অস্ট্রেলিয়া দলে শুধু
..... জিলি খেলতে পারেননি পিঠে

চোট থাকায়। তখন বলা হয় লিলির অভাবেই অস্ট্রে-
লিয়ার এই বিপর্যয়। ভারত কিন্তু খেলেছে লিলির
চেয়ে আরো ফাস্ট 'রকেট' বোলার জেফ টমসনের
বিরুদ্ধে। এবং ফাস্ট বোলার ওয়েন ক্লার্কের বিরুদ্ধেও,
যে টমসনের চেয়েও বেশী উইকেট পেয়েছে সিরিজে।
টমসন পেয়েছেন ২২টি উইকেট, ক্লার্ক পেয়েছেন
২৮টি। ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা সর্ব-
জনবিদিত ছিল। কিন্তু এবার সে দুর্বলতা অনেকখানি
কেটে গেছে। ভারতের স্পিনারদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার
নবাগতদের মোকাবিলার কথা আগেই বলেছি। প্যাকার
প্রেমী, যারা সরকারী টেস্ট ছেড়ে গেছেন, তারা কতটা
সফল হতেন বলা শক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় দলই বলা
হোক, আর তৃতীয় দলই বলা হোক অস্ট্রেলিয়ার নতুন
দল শক্তিহীন ছিল না। বরং ভারতই কিছুটা শক্তিহীন
হয়ে পড়ে সুরিন্দর অমরনাথের মত একজন সাহসী
ব্যাটসম্যান একটি টেস্টও না খেলতে পারায়।

সুরিন্দর অমরনাথ, যার হাতে আছে সাহস-সুন্দর
স্ট্রোক, সে খেলতে পারলে ফল কী হত সে প্রশ্নে
যাচ্ছি না। কিংবা শেষ টেস্টে আম্পায়ারের বিরুদ্ধে
পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলছি না, যদিও বিষেণ সিং
বেদী যে পাঁচটি আউট ও নট আউটের ক্ষেত্রে অস্ট্রে-
লিয়ার অনুকূলে সিদ্ধান্ত দেবার অভিযোগ তুলেছেন
সে পাঁচটির অর্ধেক অভিযোগ সত্য হলেও ফল অন্য
রকম হতে পারত। শুধু বলছি সিরিজটা সত্যিই
উপভোগ্য হয়েছে, ক্রিকেট তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে,
আর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সরকারী টেস্ট।
এই সিরিজের সময়েই অস্ট্রেলিয়ার প্যাকারের ওয়ার্লড
সিরিজ টেস্টে বিশ্ব তারকারা খেলা সত্ত্বেও ভারত-
অস্ট্রেলিয়া টেস্টে দর্শক সমাগম হয়েছে অনেক বেশী।

ববি সিম্পসন
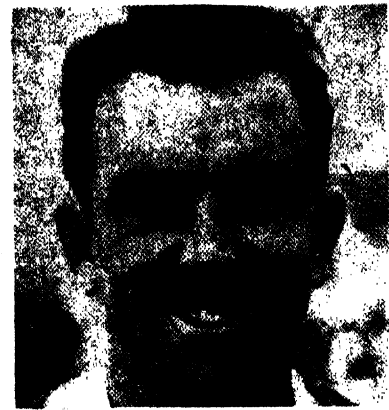
সংক্ষিপ্ত স্কোর সমেত এখন পাঁচটি টেস্টের
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক। প্রসঙ্গত বলে নিই
অস্ট্রেলিয়ায় এটি ছিল ভারতের তৃতীয় সফর এবং দুই
দেশের সপ্তম সিরিজ। দুই দেশের মধ্যে মোট ৩০টি
টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতল ১৯টিতে, ভারত
৫টিতে। ৬টি টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।
সব দেশের সঙ্গে ভারত খেলছে মোট ১৫৭টি টেস্ট।
জয়ের সংখ্যা ২৮, পরাজয় ৬৫ এবং ড্র ৬৪টি।

অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন ভারতের ১৬ জন
—বিষেণ সিং বেদী (অধিনায়ক), সুনীল গাভাসকর
(সহ-অধিনায়ক), গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, ব্রিজেশ প্যাটেল,
দিলীপ বেঙ্গসরকর, চেতন চৌহান, মহীন্দার অমরনাথ,
সুরিন্দার অমরনাথ, মদনলাল, অশোক মানকড়, সৈয়দ
কিরমানি (উইকেট কিপার), শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন,
কারসন ঘাউড়ি, এরাপল্লী প্রসন্ন, ভগবৎ চন্দ্রশেখর ও
ভরত রেড্ডি (উইকেট কিপার)। আগেই লিখেছি
অংশুমান গাইকোয়াড়কে পরে পাঠানো হয় সুরিন্দর
অমরনাথের হাতে চোট লাগায়। ম্যানেজার হয়ে গিয়ে-
ছিলেন পলি উমরিগর।

প্রথম টেস্ট—ব্রিসবেন : ২—৭ ডিসেম্বর
(টসে জয়ী সিম্পসন। অস্ট্রেলিয়া জয়ী ১৬ রানে)

ভারত সফরের প্রথম ৮টি খেলায় জয়ী হয়ে টেস্ট
খেলতে নামে। ছয়জন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া

[illegible] প্রথম দিন ১৬৬ রানে ইনিংস শেষ [illegible] মনে যে স্মৃতির ছবিটি ফুটে ওঠে [illegible] নিমেষে ম্লান হয়ে যায় ভারতের সবচেয়ে [illegible] ব্যাটসম্যান গাভাসকর মাত্র ৩ রান করে [illegible]। দিনের শেষে ভারত করে ১ উইকেটে [illegible] রান। দ্বিতীয় দিন ভারতীয়দের মধ্যে হতাশা [illegible], যখন মাত্র ১৫৩ রানে ইনিংস শেষ হয়ে [illegible]। [illegible] ছিল ২ উইকেটে ৯০। শেষ ৮টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬৩ রানের মধ্যে। টেস্টের আগে [illegible] দলের বিরুদ্ধে সহজ জয় এবং দুর্দান্ত ফাস্টবোলার জেফ টমসনের বলে খুব ভাল রান করার সুবাদে অধিনায়ক বেদী বলেছিলেন, টমসনকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু দেখা গেল অধিনায়ক সিম্পসন ভারতের ব্যাটসম্যানদের উপর টমসনকে দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে বেশী উইকেট নিয়েছেন। অপর ফাস্ট বোলার ওয়েন ক্লার্ককে দিয়েও। স্লিপে চারজন ও গালিতে দুজন ফিল্ডার রেখে ব্যাটসম্যানদের চাপের মধ্যে রেখে সফল হন সিম্পসন। বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ ছাড়া কেউই আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করতে পারেন না। ৪৮ রান করার পর বেঙ্গসরকারের আউট দুর্ভাগ্য জনিত। টমসনের বাম্পার দেহের জোর ঝাঁকুনিতে খেলতে গেলে মাথা থেকে ক্যাপটি খসে পড়ে এবং স্টাম্পের উপর থেকে খসে পড়ে বেলটি—ক্রিকেট আইনে

পিটার টুহি

হিট-উইকেট আউট। এ ধরনের আউট কদাচিৎ ঘটে থাকে। ব্রিজেশ প্যাটেল এবং অশোক মানকড় যদি কিছু রান পেতেন তাহলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ১৩ রানে এগিয়ে থাকতে তো পারতই না উলটে ভারতই এগিয়ে যেত এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো জয়ও হাত ছাড়া হত না। মাত্র ১৭ রানের জন্য অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথম টেস্ট জয়ের সুযোগ চলে গেল। আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়াকে কম রানে শেষ করে দিয়ে ভারত একটু আত্মতুষ্ট হয়ে খেলাটিকে নিয়েছিল। যার ফলে অফ স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করে উইকেট হারায়। প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল কেন ওভাবে আউট হবেন? কেনই বা অশোক মানকড় একইভাবে শূন্য রানে ফিরে আসবেন? টেস্টের বাইরে তাঁর প্রচুর রান। এবং সে জন্যই টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু টেস্টে অশোক কোনদিনই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারলেন না।

দুই দল প্রথম ইনিংসে অল্প রানে পড়ে গেলেও খেলাটি এগিয়ে যায় কিন্তু ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার পথ বেয়ে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই আঘাত হানেন মদনলাল। মাত্র ৭ রানের মধ্যে পড়ে যায় ৩টি উইকেট। ওপেনার হিবার্টকে ২ রানে এবং অপর ওপেনার কোজিয়ারকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন মদনলাল। মহীন্দার অমরনাথও শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান ক্রেগ সার্জেন্টকে। দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ৬২ রান করতে পারে অধিনায়ক সিম্পসন এবং ডেভ ওগিলভির দৃঢ়তায়।

৯ বছর পরে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে এসে সিম্পসন প্রথম ইনিংসে বেদীর বল আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেননি। যার ৫ রান করেছিলেন। [illegible] ইনিংসে ব্যাট করতে থাকেন দৃঢ়তায়, [illegible] হয়ে, স্ট্রোকে লাবণ্য মিশিয়ে। চতুর্থ উইকেটে ওগিলভির সঙ্গে যোগ করেন ৯৩ রান, পঞ্চম উইকেটে টুহির সঙ্গে ৮৪। নিজে করেন ৮৯। তাঁর ইনিংসের মধ্যে গৌরবোজ্জ্বল জীবনের ছবিটিই বার বার ফুটে ওঠে। স্ট্রোকের সৌন্দর্যে অবশ্য সিম্পসনকেও ছাড়িয়ে যান তাঁর নিউ সাউথ ওয়েলস দলেরই তরুণ খেলোয়াড় পিটার টুহি। প্রথম ইনিংসে ১৪২ মিনিটে ১১টি চার ও ১টি ছয় সমেত তার ৮২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭ অস্ট্রেলিয়ার জয়ে বড় দান। তবু অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৭ রান করতে পারত না, যদি দশ নম্বর খেলোয়াড় জেফ টমসনের ব্যাট চাবুক না হয়ে উঠত। টমসন দশ নম্বরে নেমেও ৪১ রানে নট আউট থাকেন। শেষ দুই উইকেটে অস্ট্রেলিয়া যোগ করে ৮১ রান। আমরা পরে দেখতে পাব শেষ দুই উইকেটে ভারত ২৩ রান যোগ করতে পারেনি বলেই হেরে যায়। জয়ের মুখে এসে শেষ ২ উইকেটে করে মাত্র ৬ রান। অথচ অস্ট্রেলিয়ার ১১ নম্বর খেলোয়াড় হার্স্টও ২৬ রান করে রান আউট হন।

একটা প্রশ্ন জাগে, দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলীয়রা বেদীর ঘূর্ণি বলকে কি বশে আনতে পেরেছিল? প্রথম ইনিংসে যে বেদীর শিকার ছিল—ওগিলভি, সার্জেন্ট, সিম্পসন, টুহি ও রিক্সন—নির্ভরযোগ্য পাঁচ জন, সেই বেদী দ্বিতীয় ইনিংসে একটিও উইকেট পেলেন না কেন? এমন কি বোলাররাও তাঁর বলে হাত খুলে পিটিয়ে গেলেন।

যাই হোক বেঙ্গসরকার ১ রান করে ফিরে গেলেও তৃতীয় দিনের শেষে ভারত করে ওই এক উইকেটে ৫১ রান। সুতরাং জয়ের জন্য প্রয়োজন থাকে ২৯০ রানের, হাতে ৯টি উইকেট। সামনে জয়ের চ্যালেঞ্জ।

একদিন বিরতির পর দেহ মনে চাঙ্গা হয়ে গাভাসকর ও মহীন্দার অমরনাথ রান এগিয়ে নিতে থাকেন। মাঝে মাঝেই ঝলসে ওঠে গাভাসকরের ব্যাট। মহীন্দারের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৮১, বিশ্বনাথের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৫৯, মানকড়ের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৪৫, কিরমানির সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ৪৭ রান যোগ করে এবং নিজে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথম সেঞ্চুরি (গাভাসকারের একাদশ সেঞ্চুরি) করে গাভাসকর যখন বিদায় নেন তখন ভারতের জয়ের জন্য দরকার ৯৮ রান হাতে ৪ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া শঙ্কিত। তারা যদি ২ উইকেটে ৮১ রান করতে পেরে থাকে, ভারত কি ৪ উইকেটে ৯৮ যোগ করতে পারবে না? বিশেষ করে বাকি আছে দুজন ব্যাটসম্যান—কিরমানি ও মদনলাল। রান এগোচ্ছে, উইকেটও পড়ছে। খেলায় নাটকীয় উত্তেজনা। কিরমানি ৫৫ রান দিয়ে গেলেন, মদন কিন্তু দুইয়ের বেশী নয়। প্রসন্ন বিদায় নিলেন দুটি চোস্ত চার মেরে। ৯ উইকেট পড়ল ৩১৮ রানে। বাকি এক উইকেট। ম্যাচ জিততে সেটি তখনই দরকার অস্ট্রেলিয়ার। ভারতের জিততে দরকার ২৩ রান। ভরসা শুধু বেদী, যে বেদীর ৫০ রান করার নজীর আছে টেস্টে। হাতে মারও আছে পাকা ব্যাটসম্যানের মত। মার বের হতেও আরম্ভ করল হাত থেকে। শেষ মুখে শ্বাসরোধকারী অবস্থা। আশা নিরাশার সুতোয় ঝুলছে দুটি দল। অস্ট্রেলিয়া ভাবছে ভারত জিতে যাবে। কারো ভাবনা টেস্টটা টাই হবে না তো! বেদী ভাবছেন এখনো বাকি ১৭ রান। তখনই ভুলটা হল বোধহয় বেদীরই। টমসনের মত হাণ্টারের মুখে ফেলে দিলেন চন্দ্রশেখরকে, ব্যাট যার কাছে জমিদারবাবুর ছড়ি—প্রতিরোধের হাতিয়ার নয়। ব্যাট ছুঁয়ে রিক্সনের বিশ্বস্ত হাতের মধ্যে বল আশ্রয় নিতেই অস্ট্রেলিয়া শিবিরে জয়ের দামামা বেজে উঠল। ১৭ রান আর করা গেল না। অস্ট্রেলিয়া ১৬ রানে প্রথম টেস্ট জিতে ১—০ এগিয়ে রইল। চতুর্থ দিন নির্ধারিত সময়ের ৮ মিনিট আগে খেলার উপর যবনিকা পড়ল।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে ১৬৬ রান (পিটার টুহি ৮২, গ্যারি কোজিয়ার ১৯, টনি ম্যান ১৯; বেদী ৫৫ রানে ৫ উইঃ, চন্দ্রশেখর ৩৪ রানে ২ উইঃ, মহীন্দার অমরনাথ ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ভারত—প্রথম ইনিংস ১৫৩ রান (দিলীপ [illegible] প্রসন্ন ২৩; ওয়েন ক্লার্ক [illegible] রানে ৪ উইঃ, জেফ টমসন ৫৪ রানে ৩ উইঃ, টনি ম্যান ১২ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৭ রান (ববি সিম্পসন ৮৯, পিটার টুহি ৫৭, ওগিলভি ৪৬, জেফ টমসন নট আউট ৪১, টনি ম্যান ২৯; মদনলাল ৭[illegible] রানে ৫ উইঃ, মহীন্দার অমরনাথ ২৪ রানে ২ উইঃ, চন্দ্রশেখর ৮২ রানে ২ উইঃ)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৪ রান (সুনীল গাভাসকর ১১৩, মহীন্দার অমরনাথ ৪৭, বিশ্বনাথ ৩৫, সৈয়দ কিরমানি ৫৫, বেদী নট আউট ২৬; টমসন ৭৬ রানে ৪ উইঃ, ক্লার্ক ১০১ রানে ৪ উইঃ, হার্স্ট ৫০ রানে ২ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট—পার্থ : ১৬—২১ ডিসেম্বর

(টসে জয়ী বেদী। অস্ট্রেলিয়ার জয় ২ উইকেটে)

ব্রিসবেনে টেস্ট অভিষেক হয় অস্ট্রেলিয়ার ছয় জনের—হিবার্ট, ওগিলভি, টুহি, ম্যান, রিক্সন, ক্লার্ক-এর। দ্বিতীয় টেস্টে ওপেনার হিবার্টের বদলে দলে আসেন সিডনির স্কুল শিক্ষক ডাইসন, পেস বোলার হার্স্টের বদলে স্যাম গ্যানন এবং কোজিয়ারের বদলে কিম হিউজ। প্রথম টেস্টে কোজিয়ার করেন ১৯ ও

মহীন্দার অমরনাথ

৬০। সহ অধিনায়ক ক্রেগ সার্জেন্ট দুই ইনিংসে শূন্য করলেও তাকে দলে রাখা হয়। ডাইসন ও গ্যাননের এটি প্রথম টেস্ট।

ভারত দলে পরিবর্তন করা হয় দুজনকে। অশোক মানকড়ের বদলে চেতন চৌহান এবং প্রসন্নর বদলে বেঙ্কটরাঘবন দলে আসেন। চার বছর পর চৌহানকে টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথম টেস্টে ২৪ ওভার বল করে একটিও উইকেট না পাওয়ায় প্র[illegible] বোধ হয় বাদ পড়েন। ব্রিজেশ কিন্তু ১৩ ও ৩ [illegible] করেও দলে থেকে যান।

পার্থ পিচ পৃথিবীর ফাস্ট। ফাস্ট বোলারদের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। আবার ব্যাটসম্যানরা খেলতে পারলে বেশী রান ওঠে ফাস্ট পিচেই। উঠেছেও। প্রথম দিনই ভারতের ৭ উইকেটে ৩২৯ রান প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ব্যাটিংয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাও আবার গাভাসকরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে আউট হয়েছিলেন ৩ রান করে। এবার করেন ১ রান বেশী। কিন্তু চৌহান, মহীন্দার, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকর ও কিরমানি অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে অতি দ্রুত রান সংগ্রহ করেন। আগের ১৫৩টি টেস্টের মধ্যে কোনো টেস্টে কি ভারত একদিনে ৩২৯ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে? দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মহীন্দার ও চৌহানের ১৪৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নতুন রেকর্ড। ১২৪ রানে এতদিন এ রেকর্ডটি ধরা ছিল বিনু মানকড় ও হেমু অধিকারীর। মহীন্দার করেন তার সর্বোচ্চ (৯০) টেস্ট রান। চৌহানও তার সর্বোচ্চ ৩৪-কে অনেক পেছনে ফেলে ৮৮তে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দিন ৭০ মিনিটে আর ৭৩ রান যোগ করে ভারত প্রথম ইনিংস শেষ করে ৪০২ রানে। অস্ট্রে-

নয়ার বিরুদ্ধে ভারতের এটা সবচেয়ে বড় রানের ইনিংস। আগের বড় ইনিংস ছিল ৪৭-৪৮এ অ্যাডিলেডে করা ৩৮১।

ব্যাটে মুগুয়ার পর বলেও চাঁদমারী শুরু হল। অস্ট্রেলিয়ার ৬৫ রানের মধ্যে বেদী ফেরত পাঠালেন ওগিলভি ও টুহিকে, মদনলাল ক্লেগ সার্জেন্টকে। কিন্তু আবার সেই অধিনায়ক সিম্পসন স্বমূর্তি ধরে চতুর্থ উইকেটে ডাইসনের সঙ্গে যোগ করলেন ৮৪ রান, পঞ্চম উইকেটে রিক্সনের সঙ্গে ১১১। নিজের নামের পাশে ১৭৬। এক স্মরণীয় ইনিংস। যৌবন উত্তীর্ণ খেলোয়াড়ের ব্যাটিংয়ে কৈশোরের কীর্তি। যার ফলে অস্ট্রেলিয়ার ৩৯৪ রানের ইনিংস। মাত্র ৬ রান পিছনে।

দ্বিতীয় দফার সূচনায় ভারতের খেলা এই সিরিজের শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং প্রদর্শনী। গাভাসকারের রাজসিক ১২৭, মহীন্দার অমরনাথের চোখ ঝলসানো ১০০ এবং দ্বিতীয় উইকেটে দুজনের ১৯৩ রান। যে কোন জুড়ির রানে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আবার রেকর্ড হল। ভেঙে গেল ৪৭-৪৮এ অ্যাডিলেডে, ষষ্ঠ উইকেটে করা বিজয় হাজারের ও দাতু ফাদকারের ১৮৮ রানের রেকর্ড। কিন্তু আলোর পর অন্ধকারের মতই ভারতের শেষ ৮জন খেলোয়াড় যোগ করলেন মাত্র ৯০ রান। এক সময় ছিল ১ উইকেটে ২৪০। ৯ উইকেটে যখন ৩৩০, বেদী ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিলেন। অর্থাৎ সিম্পসনকে চ্যালেঞ্জ জানালেন— জেতো দেখি চতুর্থ ইনিংসে ৩৩৯ রান করে।

চ্যালেঞ্জ অবশ্যই গ্রহণ করেছিলেন সিম্পসন। কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষে ২৫ রান তুলতেই অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিল ওপেনার ডাইসনকে।

শেষ দিনের খেলা। জয়ের জন্য বাকি ৯ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার ৩১৪ রান করার দরকার। ভারতের জয়ের জন্য দরকার ৩১২ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াকে আউট করার। সময় ৬ ঘণ্টা। শেষের ঘণ্টায় ১৫টি ম্যান্ডেটরি ওভার, সুতরাং আবার উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি।

উত্তেজনা শুরুও হয় দিনের দশম বলটিতে মদনলাল অস্ট্রেলিয়ার সহ অধিনায়ক সার্জেন্টকে ফিরিয়ে দিলেন। ২ উইকেটে ৩৩ রান। ধরেই নেওয়া হয় অতপর ভারতীয় স্পিনারদের বলে অস্ট্রেলিয়া কুঁকড়ে যাবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে খেলতে থাকেন টনি ম্যান, যিনি 'রাতের প্রহরী' হিসাবে আগের দিন ব্যাট করতে নেমেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ওগিলভিও। প্রথমে আক্রমণকারী ছিলেন ভারতের বোলাররাই। আস্তে আস্তে তারা আক্রান্ত হন ব্যাটের দাপটে। তৃতীয় উইকেটে ১৩৯ রান যোগ করে এবং নিজে ১০৫ রান করে তৃতীয় ঘণ্টায় যখন ম্যান আউট হন তখন পার্থে পালের হাওয়া কিছুটা অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ম্যানের এটি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি তো বটেই, জীবনের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। সাত বছর আগে আর একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন এম সি সি-র বিরুদ্ধে। তবে তিন ঘণ্টায় ম্যানের ১০৫ রানের পাশে ওই তিন ঘণ্টায় ওগিলভির ৪৭ রানের মূল্য বোধ হয় সমান সমান। ভারতীয় বোলারদের মনোবলে চিড় ধরাবার জন্যই ওগিলভির ওই দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল। ওগিলভির বিদায়ের পর ৪ উইকেটে ১৯৫। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার আরও ১৪৪ রান। পঞ্চম উইকেটে সিম্পসন-টুহি জুড়ি খেলছেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে, যদিও চন্দ্র-বেদী-বেঙ্কটের বলের লক্ষ্য ও নিশানা ছিল নির্ভুল।

ঘড়ির সঙ্গে রানের গতি শুরু হল শেষ ঘণ্টায় ম্যান্ডেটরি ওভার শুরু হতে। রান তখন ৪—২৮১। জয়ের বাকি ৫৮ রান। হঠাৎ উলটো হাওয়া ভারতের পালে। মদনলালের এক ওভারে হিউজ এল বি ডবলিউ আউট এবং মদনলালের হাতেই রান আউট অধিনায়ক সিম্পসন। রান ৬—২৯৬। জয়ের বাকি ৩৩। সময় সরে যাচ্ছে। ক্রিকেট নাটক দারুণ জমে উঠেছে। টুহির ব্যাট এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। আবার চাঞ্চল্য। বেদীর এক ওভারেই টুহি ও রিকসনের বিদায়। রান ৮—৩৩০। জয়ের বাকি ৯ রান। ভারতকে জিততে হলে চাই ৭ রানের মধ্যে দুটি উইকেট। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। মাঠের প্রতি

দর্শক প্রতি বেতার শ্রোতা হৃৎপিণ্ড বাজছে প্রতিটি বল ও প্রতিটি রানের সঙ্গে। একটি লেগ বাইয়ের এক রানে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৮। দু দলের রান এখন সমান সমান। ভারতের জয়ের আশা শেষ তবে এখনো টাই হতে পারে। তা আর হল না। বেদীর বলে একটি চার মেরে টমসন অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে দিলেন ২ উইকেটে ম্যান্ডেটরি ওভারের ২২টি বল বাকি থাকতে। বেদী দুই ইনিংসে পেলেন ১০টি উইকেট। আগে কখনো পাননি। এই টেস্টেই মহীন্দার প্রথম সেঞ্চুরি করেন এবং বব সিম্পসনের পূর্ণ হয় শত ক্যাচ।

ভারত—প্রথম ইনিংস ৪০২ রান (চেতন চৌহান ৮৮, মহীন্দার অমরনাথ ৯০, বেঙ্গসরকর ৪৯, মদনলাল ৪৩, বিশ্বনাথ ৩৮, কিরমানি ৩৮, বেঙ্কটরাঘবন ৩৭, টমসন ১০১ রানে ৪ উইঃ, স্যাম গ্যানন ৮৪ রান ৩ উইঃ, ক্লার্ক ৯৫ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৩৯৪ রান (সিম্পসন ১৭৬, ডাইসন ৫৩, রিকসন ৫০, হিউজ ২৮, ওগিলভি ২৭, বেদী ৮৯ রানে ৫ উইঃ, বেঙ্কটরাঘবন ৫৫ রানে ২ উইঃ)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ৩৩০ রান (গাভাসকর ১২৭, মহীন্দার অমরনাথ ১০০, চৌহান ৩২, ব্রিজেশ প্যাটেল ২৭, গ্যানন ৭৭ রানে ৪ উইঃ, টমসন ৬৫ রান ২ উইঃ, ক্লার্ক ৮৩ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৮ উইঃ ৩৪২ রান (টনি ম্যান ১০৫, টুহি ৮৩, সিম্পসন ৩৯, ওগিলভি ৪৭, রিকসন ২৩, বেদী ১০৫ রানে ৫ উইঃ, মদনলাল ৪৪ রানে ২ উইঃ

তৃতীয় টেস্ট—মেলবোর্ন : ৩০ ডিসেঃ—৪ জানুঃ (টসে জয়ী বেদী। খেলায় ভারতের জয় ২২২ রানে)

"ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসারটেনটি" বলে যে কথাটি আছে এই সিরিজে বার

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

বার সেটা ফুটে উঠেছে। প্রথম দুটি টেস্টে জয়ের মুখে এসেও ভারত পর পর হেরে গেল। তৃতীয় টেস্ট জিতল অতি সহজে। তাও শূন্য রানে প্রথম দুটি উইকেট হারাবার পর। তার পরেরটি জিতবে আরও সহজে। ইনিংসে। শেষটিতে আবার চরম উত্তেজনা।

মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট ছিল সিরিজের তুলাদণ্ড। ভারত হারলে ভারসাম্য বজায় থাকত না। সিরিজের আকর্ষণও কমে যেত রাবারের প্রশ্নে। তাই এটি ছিল টেস্ট লড়াই হাতে রাখার গুরুত্বপূর্ণ খেলা।

ভারত দলে আবার পরিবর্তন হল। দুটি টেস্টের চার ইনিংসে মাত্র ৪৬ রান করায় ব্রিজেশ প্যাটেল বাদ গেলেন। মদনলালকে বসানো হল চার ইনিংসে ৫২ রান করায়। বেঙ্কটকেও বলা হল বিশ্রাম নাও। অশোক মানকড় আবার চান্স পেলেন। প্রসন্নকে আবার আনা হল। কারনসন ঘাউড়ি খেললেন প্রথম। সূচনাতেই বিপর্যয়। নির্ভরযোগ্য দুই ওপেনার

সুনীল গাভাসকর

গাভাসকর ও চৌহান শূন্য রানে আউট। মুখ্যত মহীন্দার অমরনাথ (৭২)ও গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের (৫৯) সাহসী ব্যাটিংয়ের ফলে প্রথম দিনের শেষে ভারতের ৬ উইকেটে ২৩৪ রান। দ্বিতীয় দিন ২৫৬ রানে ইনিংস শেষ। অশোক মানকড় (৪৪) প্রথম আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করলেন। অস্ট্রেলিয়া ওইদিনই শেষ হয়ে গেল ২১৩ রানে। তারপর দিনের শেষে ভারত করল ১ উইকেটে ৫০। ১৫টি উইকেট পড়ল দ্বিতীয় দিনে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয়ের মূলে চন্দ্রশেখরের অসাধারণ বোলিং। আগের দুটি টেস্টে যে চন্দ্রশেখর মাত্র ৫টি উইকেট পেয়েছেন, প্রতি উইকেটের জন্য ৬০ রান খরচ করে, সেই চন্দ্রশেখর প্রথম ইনিংসে পেলেন ৬টি উইকেট প্রতি উইকেটের জন্য মাত্র ৮ রান দিয়ে (৮.৬৬ গড়ে)। এও সেই ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তার আরও প্রমাণ পাব গাভাসকরের ব্যাটিংয়ে। তিনটি টেস্টের প্রথম ইনিংসে যার রান ৩, ৪ ও ০— দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর রান ১১৩, ১২৭, ১১৮। কী বৈসাদৃশ্য।

হ্যাঁ, এই টেস্টে গাভাসকরের সেঞ্চুরি ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে যায় এবং পর পর চারটি টেস্টে সেঞ্চুরি করার এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হন তিনি। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবার আগে সেঞ্চুরি করেছিলেন দেশের মাঠে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। সেটি ছিল তাঁর দশম টেস্ট সেঞ্চুরি।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪৩ রানে শেষ হওয়ায় জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল। সময়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয়নি, মুখ্যত ওই চন্দ্রের জন্য। মাঠ ভিজে ছিল। ভিজে পিচে চন্দ্রশেখর ভেল্কি দেখিয়েছেন, ১৮ বছর আগে কানপুর মাঠে যেভাবে রিচি বেনোর অস্ট্রেলীয় দলকে ভেল্কি দেখিয়ে ছিলেন জেসু প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৬৪ রানে। শেষ দিন মাত্র ৩৯ মিনিট খেলার পর তৃতীয় টেস্টের উপর যবনিকা পড়ে। ভারত জেতে ২২২ রানে। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথম টেস্ট জয়। সিরিজে ভারত১—২এ পিছিয়ে। কানপুরের জেসু প্যাটেল পেয়েছিলেন ১২৪ রানে ১৪টি উইকেট। চন্দ্রশেখর এ টেস্টে পেলেন ১০৪ রানে ১২ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে গড় আরও ভাল ৫.৩৩। তবে গৌরবের সঙ্গেই একটু লজ্জা মেশানো ছিল। তিন টেস্টেই তিন জোড়া গোল্লা যদিও দুবার নট আউট। তাঁর জীবনে আছে ৪ জোড়া গোল্লা।

ভারত—প্রথম ইনিংস ২৫৬ রান (মহীন্দার অমরনাথ ৮২, বিশ্বনাথ ৫৯, অশোক মানকড় ৪৪, বেঙ্গসরকর ৩৭, ক্লার্ক ৭০ রানে ৪ উইঃ, টমসন ৭৮ রানে ৩ উইঃ গ্যানন ৪৭ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২১৩ রান (কোজিয়ার ৬৭, সারজেন্ট ৮৫; চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ৬ উইঃ, ঘাউড়ি ৩৭ রানে ২ উইঃ, বেদী ৭১ রানে ২ উইঃ)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪৩ রান (গাভাসকর ১১৮, বিশ্বনাথ ৫৪, মহীন্দার অমরনাথ ৪১, অশোক মানকড় ৩৮, কিরমানি ২১; ক্লার্ক ১৬ রানে ৪ উইঃ, কোজিয়ার ৫৮ রানে ২ উইঃ, গ্যানন ৮৮ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রান (কোজিয়ার ৩৪, ক্লার্ক ৩০, চন্দ্রশেখর ৫২ রানে ৬ উইঃ, বেদী ৫৮ রানে ৪ উইঃ)

চতুর্থ টেস্ট—সিডনি : ৭—১২ জানুয়ারি

(টসে জয়ী সিম্পসন। ভারত খেলায় জয়ী ইনিংস ও ২ রানে)

ভারতের যে দলটি মেলবোর্নে জেতে সেই দলটিই নামে সিডনিতে এবং মেলবোর্নের মতই ভিজে মাঠ পেয়ে যায়। ফলে স্পিনারদের ঘূর্ণি বলের ধাক্কা সামলাতে পারে না অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৩১ রানে। সিরিজে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস এবং পর পর তিনটি ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার অগোছালো ব্যাটিং। ওই ভিজে পিচেই ভারতের ব্যাটসম্যানরা ৮ উইকেটে ৩৯৬ রান করে দান ছেড়ে দেয়। একটা বড় প্রশ্ন ছিল গাভাসকর পর পর পাঁচটি টেস্টে সেঞ্চুরি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভার্টন উইকসের সম কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারবেন কিনা। পারেননি এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট করার সুযোগ পাননি অস্ট্রেলিয়া ইনিংসে হেরে যাওয়ায়। ব্যাটে, বলে এবং ফিল্ডিংয়ে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েই ভারত ২—২এ সিরিজ সমান করে। তার সঙ্গে একটি নতুন গৌরব— বিদেশে সর্বপ্রথম ইনিংসে জয়।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে ১৩১ রান (সিম্পসন ৩৮, ডাইসন ২৪; চন্দ্রশেখর ৩০ রানে ৪ উইঃ, বেদী ৪৯ রানে ৩ উইঃ)

ভারত—প্রথম ইনিংসে ৮ উইঃ ডিক্লেঃ ৩৯৬ রান (বিশ্বনাথ ৭৮, ঘাউড়ি ৬৪, গাভাসকর ৪৯, বেঙ্গসরকর ৪৮, কিরমানি ৪২, প্রসন্ন নট আউট ২৫; টমসন ৮২ রানে ৩ উইঃ, ক্লার্ক ৮২ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৩ রান (টুহি ৮৫, কোজিয়ার ৬৮, সিম্পসন ৩৩; প্রসন্ন ৫১ রানে ৪ উইঃ, ঘাউড়ি ৪২ রানে ২ উইঃ, বেদী ৬২ রানে ২ উইঃ, চন্দ্রশেখর ৮৫ রানে ২ উইঃ)

পঞ্চম টেস্ট—অ্যাডিলেড : ২৮ জানুয়ারি—৩ ফেব্রুয়ারি

(টসে জয়ী সিম্পসন। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪৭ রানে এবং রাবার লাভ ৩—২ জয়ে)

পঞ্চম টেস্টের আগে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। দুটি টেস্টে হেরে পর পর তিনটি টেস্ট জিতে রাবার লাভের একটিই নজীর আছে ক্রিকেট ইতিহাসে। নজীরটি সৃষ্টি করে রেখেছে ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দল ১৯৩৬-৩৭ সিরিজে গাবি অ্যালেনের ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে। ১৯৭৪-৭৫এ ভারত দ্বিতীয় নজীর গড়তে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দেশের মাঠের সিরিজে। বিদেশে কি পারবে?

অ্যাডিলেডের ব্যাটসম্যান সহায়ক উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সুযোগে অস্ট্রেলিয়া যখন পর্বতপ্রমাণ ৫০৫ রানের ইনিংস গড়ল এবং তার পর ভারতকে ফলো-অন করাবার সুযোগ পেয়েও ফলো অন না করিয়ে নিজেরাই ব্যাট করে জয়ের জন্য ভারতকে ৪৯৩ রান করার ধাক্কায় ফেলল তখন বড় হয়ে উঠল আর একটি প্রশ্ন। চতুর্থ ইনিংসে চারশো রানের বেশী করে টেস্ট জয়ের নজীর আছে দুটি। একটি ব্র্যাডম্যানেরই দলের ১৯৪৮এ লীডসে। করেছিল ৩ উইকেটে ৪০৪ রান। আর একটি এই বেদীর ভারত দলের ৭৬-এর পোর্ট অব স্পেন টেস্টে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জিতেছিল ৪ উইকেটে ৪০৬ রান করে। এবার কি ভারত নিজের দ্বিতীয় এবং টেস্ট ইতিহাসের তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে? পারেনি—আমরা সবাই জানি। এও জানি চারশোর বেশী রান অর্থে প্রায় পাঁচশো (৪৯৩) রান দরকার ছিল চতুর্থ ইনিংসে। তার মধ্যে করেছে ৪৪৫। এবং করেছে কী অবস্থার মধ্যে? [illegible] আম্পায়ারের অ-ক্রিকেটীয় আচরণের [illegible] সংগ্রাম করে। ক্রিকেট খেলা বলেই পক্ষপাত[illegible] সিদ্ধান্ত বলব না। মুখবন্ধেই বলেছি বেদীর [illegible] যোগের কথা। হয়তো টস জিতে প্রথম ব্যাট [illegible] সুযোগের অভাবেই ভারতকে হার স্বীকার [illegible] হল। একটি বিশ্ব রেকর্ড করার সুযোগও হল [illegible] ছাড়া। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে এর [illegible] দায়ী। ৪৯৩ রান করে জিততে পারলে সেটা [illegible] চতুর্থ ইনিংসে বেশী রান করে জয়ের বিশ্ব রেক[illegible] চতুর্থ ইনিংসে ৪৪৫ রানও কিন্তু এখন [illegible] স্থানে, ১৯৩৮-৩৯এ ডারবানে ইংলণ্ডের [illegible] ৬৫৪ (৫ উইঃ) রানের পরে।

লেখার কলেবর বেড়ে যাচ্ছে বলেই ছবি[illegible] পঞ্চম টেস্টে ভারতের সংগ্রামী রূপটি ফুটিয়ে [illegible] সম্ভব হল না। ব্রিসবেন এবং পার্থ টেস্টের [illegible] অ্যাডিলেডের পঞ্চম টেস্ট ভারতীয়দের সং[illegible] স্মরণীয় হয়ে রইল ক্রিকেট ইতিহাসে।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে ৫০৫ রান (ইয়[illegible] ১২১, সিম্পসন ১০০, টুহি ৬০, রিক ডার্লিং [illegible] উড ৩৯, রিক্সন ৩২; চন্দ্রশেখর ১৩৬ রানে ৫ [illegible] ঘাউড়ি ৯৩ রানে ৩ উইঃ)

ভারত—প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রান (বিশ্বনাথ [illegible] বেঙ্গসরকার ৪৪, কিরমানি ৪৮, অংশুমান [illegible] ক্লার্ক ৬২ রানে ৪ উইঃ, ক্যালেন ৮৩ রানে ৩ [illegible] টমসন ১২ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৬ রান (ডা[illegible] ৫৬, সিম্পসন ৫১, কোজিয়ার ৩৪, ইয়ার্ডলি [illegible] বেদী ৫৩ রানে ৪ উইঃ, ঘাউড়ি ৮৩ রানে ৪ উই[illegible]

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪৫ (মহী[illegible] অমরনাথ ৮৬, বিশ্বনাথ ৭৩, বেঙ্গসরকার [illegible] কিরমানি ৫১, ঘাউড়ি ২৩, ইয়ার্ডলি ১৩৪ রানে [illegible] উইঃ, ক্যালেন ১০৩ রানে ৩ উইঃ, ক্লার্ক ৭৯ [illegible] ২ উইঃ)

মুকুল

লবদলের নেপথ্যে

শোক দাশগুপ্ত

এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে, আটাত্তরের ফুটবল
মের বাজনা তখন জোরেশোরেই বেজে গেছে।
কাৎলারা পছন্দসই জালে ধরা দিয়েছে, উঠতিরাও
গিলে ফেলেছে। যারা দলবদল করে তাদের ক্ষেত্রে
ক দিকটাই বড়। অবশ্য, উঠতিরা বড় দলের
র সুযোগ পেতেও আগ্রহী থাকে।

কলকাতার ফুটবলে টাকা-পয়সার লেনদেনের
ারটি নতুন নয়। অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়েরা
ও বিনা পয়সায় খেলতে আসেনি। কিন্তু ব্যাপক-
টাকা-পয়সার লেনদেন শুরু হয় ষাটের দশকে।
গরীব দেশে একটি বড় দল গত বছর শুধু
লারদের জন্য খরচ করেছে পাঁচ লাখ টাকা।
ন বাঁচিয়ে টাকা দেওয়া-নেওয়ার একটা সাধারণ
া মোটামুটি সব ক্লাবই পেয়ে গেছেন। রাস্তাটি
ই মজবুত যে চাকরি করেন না এমন ফুটবলারও
অপেশাদারী ফুটবলের দেশে নিশ্চিন্তে বাড়ি
তে পারেন।

দল বদলের নেপথ্যে টাকার খেলাটাই বড়। কিন্তু
আরো কিছু থেকে যায়। নামী খেলোয়াড়কে
লাচনায় আনতে কিছু কাঠখড় পোড়ে। দর
কষি করতে হয় খুব সতর্কভাবে যাতে আলো-
ভেস্তে না যায়। এই আলোচনায় ইদানীং
লায়াড়দের চেয়েও বেশী উৎসাহ দেখান বাড়ির
জনেরা। এতে দুটো সুবিধা হয়। প্রথমত
ফ্লাণ্ট ফুটবলারকে কর্মকর্তার সঙ্গে দর কষাকষি
ত হয় না। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞ অভিভাবকেরা
-পয়সার ব্যাপারে বেশ মেধাবী আলোচনা চালাতে
রন। কোনো কোনো ফুটবলার অবশ্য নিজের ব্যাপার
জই বুঝে নেয়।

আগের বছরের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-
াদের বাধ্য করে বিশেষ জায়গার খেলোয়াড় খুঁজতে।
হরণ আছে হাতের কাছেই। ছিয়াত্তরে ইস্টবেঙ্গল
টামুটি ভাল ফুটবল খেলেও লীগ পেল না। কর্ম-
ারা কোচ অমল দত্তের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে
মত হলেন যে দলে মাত্র একজন নিয়মিত উইঙ্গার
ায় ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ হয়েছে একপেশে।
জিৎ সেনগুপ্তের দিকে দ্বিগুণ নজর রাখায়
বেঙ্গলের আক্রমণ ভোঁতা হয়ে গেছে। সুতরাং
জন পজিটিভ উইঙ্গার চাই। চোখের সামনে ছিল
জন—লতিফুদ্দিন এবং উলাগানাথন। লতিফুদ্দিনকে
লে রাখলেন মঈন। কিন্তু অরুময়নৈগমের নজর
য়ে বেরিয়ে এলেন উলাগানাথন।

এর উলটো ঘটনাও কিন্তু দেখা যায়। কোনো
শষ জায়গার কথা ভেবে নয়, সরাসরি কোনো
শষ খেলোয়াড়কেও চাওয়া হয়। হাবিব-আকবর
া সত্ত্বেও সাতাত্তরে মোহনবাগান শ্যাম থাপার
পাগল হল কেন? মোহনবাগানের কর্মকর্তারা
তেন, শ্যাম থাপাকে সরিয়ে নিলে ইস্টবেঙ্গলের
মণের ধার অনেক কমে যাবে। বড় ম্যাচে বড়
করার যে অভ্যাসটি শ্যাম আয়ত্ত করেছে, তাও
চয় শৈলেন মান্নার মাথায় ছিল।

শুধু রুই-কাৎলা নয়, উঠতি তারকাদের কথাও
তে হয়। দলবদল যারা করান তাঁরা তাই ছোট
র খেলাও দেখেন নিয়মিত। গত বছর ইস্ট-
গলের জোড়া "রিক্রুটিং অফিসার"কে তাই
খছি খিদিরপুর আর জর্জ টেলিগ্রাফের অনেক
রণ খেলাতেও। তরুণ মুখিয়া, সুবিমল ঘোষ এবং
া কেউ কেউ ছিল ওদের নজরে। এইভাবেই
বেঙ্গল সাতাত্তরে তুলে এনেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ
ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে, মোহনবাগান মানস
চার্যকে।

সুতরাং চোখ চাই ফুটবলার চিনে নেবার। কলকাতার
বলে যে কর্মকর্তা জীবিত অবস্থাতেই আজ প্রায়
বদন্তীতে পরিণত, সেই জ্যোতিষ গুহকে একবার
জ্ঞাস করেছিলাম : "এই খেলোয়াড় চেনার জন্য
বিশেষ কোনো ক্ষমতা প্রয়োজন?" জে সি গুহ
বলেছিলেন : "একজন ফুটবলারই পারে, আরেকজন
ফুটবলারকে চিনে নিতে।" জ্যোতিষ গুহের এই
কথায় সায় দিয়েছেন সুকুমার সমাজপতি। কিন্তু
একটা কথা বলে রাখা ভাল, অনেক বিখ্যাত
ফুটবলারকে দেখেছি ফুটবল খেলা বোঝে যা
ফুটবলার চেনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আনাড়ি। আবার
নামী খেলোয়াড় নন, অথচ খেলোয়াড়ের জাত বুঝে
নিতে পারেন—এমন কর্মকর্তাও দেখেছি।

ফুটবলার চেনার এবং সেই ফুটবলারকে দলে
টানার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল জ্যোতিষ গুহের।
ত্রিবান্দ্রমে প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে
খেলছিল একটি সতেরো বছরের ছেলে। লেফট
উইঙ্গারের জায়গা থেকে ভিতরে তীব্রবেগে ঢুকে পড়ার
ভঙ্গীটি জ্যোতিষ গুহকে মুগ্ধ করল। সুতরাং পরের
বছর ছেলেটি কলকাতায় চলে এল লাল-হলুদ জার্সি
গায়ে চড়িয়ে। সেই উইঙ্গার সালের কথা আর নতুন
করে বলার কি আছে?

ছেষট্টিতে এই রকমই এক প্রদর্শনী খেলায়
জে সি গুহের নজর কাড়ে দেরাদুনের একটি কুড়ি-ফুটে
ফরোয়ার্ড। কলকাতা মাঠে প্রথম আবির্ভাবেই
রাজস্থানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে আঠারো।
বছরের শ্যাম থাপা। আজ শ্যাম কলকাতার সবচেয়ে
দামী ফরোয়ার্ড। কিন্তু বারো বছর আগে এই
হীরের টুকরোকে যিনি চিনে নিয়েছিলেন, তাঁর
ক্ষমতাকে অস্বীকার কে করবে?

আটচল্লিশে লণ্ডন অলিম্পিকের আগে শিলং
ক্যাম্পে ভেংকটেশের খেলা নাকি বলাইদাস চ্যাটার্জির

শৈলেন মান্না

জ্যোতিষ গুহ

পছন্দ হয়নি। জ্যোতিষ গুহ ভেংকটেশকে আনলেন।

ভেংকটেশ তখন রাইট ইনসাইড ফরোয়ার্ড ছিল। কিন্তু
ওর মাথা নিচু করে খেলার ধরণ দেখে জ্যোতিষ গুহ
বললেন : "তুই রাইট আউটে খেল, ভাল হবে।"
ভেংকটেশের প্রথমে একটু দ্বিধা ছিল। পরের কাহিনী
সকলেরই জানা।

স্বল্পখ্যাত রাম বাহাদুর, বীর বাহাদুর, হাবিব
এবং আরো অনেক ফুটবলারকে এইভাবেই তুলে
এনেছেন জে সি গুহ।

খেলোয়াড় চিনলেই হবে না, সেই খেলোয়াড়কে
দলে টানার কায়দা-কানুনও জানা থাকা চাই।
সাত্তরে ফুটবল মরসুমের আগে মহমেডান স্পোর্টিং
ক্লাবের কর্মকর্তা বদল হয়। তরুণ কর্মকর্তারা
আসরে নামলেন মহা উৎসাহে। দলবদলের বাজারে
জ্বলজ্বল করছিল ইস্টবেঙ্গল থেকে অপসারিত
চারজন স্টার ফুটবলার ছাড়াও হাবিব, আকবর, শ্যাম
থাপা এবং উলাগানাথন। ওরা প্রায় সবার দিকে দৃষ্টি
দিলেন। একাধিক দুপুরে ওদের সঙ্গে দেখলাম
সুধীর আর গৌতমকে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওরা
পেলেন শুধু দুজন প্রায় অস্তগামী তারকা—তরুণ
বসু এবং অশোক ব্যানার্জিকে।

লীগ শুরু হবার মুখে এক পড়ন্ত বিকেলে
মহমেডান স্পোর্টিং টেন্টের লনে দাঁড়িয়ে পরিশ্রমী
কর্মকর্তা হায়দার আলি নস্করকে জিজ্ঞেস করলাম :
"সুধীর-গৌতমকে এত চেষ্টা করেও পেলেন না
কেন?" পাশে দাঁড়ানো আরেক কর্মকর্তার দিকে
ভাস্করের দিকে করুণ হেসে জবাব দিলেন :
"কেন পেলাম না তা আমরা সত্যিই জানি না। সুধীর
আর গৌতম দুজনেই খুব ভাল ছেলে। ওদের সঙ্গে
আমাদের অনেকবার কথা হয়েছে। লেনদেনের দিক
দিয়ে কোনো অসুবিধা ছিল না। তবু যে কেন ওরা
এল না তা বুঝতে পারছি না।"

আশা করা যায়, অভিজ্ঞতা ওদের এই ব্যাপার-
গুলি বুঝতে সাহায্য করবে। এমনকি, সত্যজিৎ
মিত্রকেও ওরা নিতে পারলেন না। চিন্ময় চ্যাটার্জি
এবং শ্যামল ব্যানার্জি দলে থাকা সত্ত্বেও সত্যজিৎ
মিত্রকে দলে রাখতে পারল ইস্টবেঙ্গল। কারণ
ইস্টবেঙ্গলে দলবদলের খেলায় দুই দক্ষ খেলোয়াড়
ছিলেন—জীবন চক্রবর্তী এবং পল্টু দাস। এরা দুজন
এবং একদা ফুটবল সম্পাদক অজয় শ্রীমানী—এই
তিনজনই দলবদলের আসরে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে
ইস্টবেঙ্গলকে অপ্রতিরোধ্য করে রেখেছিলেন।

ওরা তিনজন এবং শেষের দিকে দুজন—যে
ফুটবলারদের দিকে নজর দিয়েছেন, বেশীর ভাগ
ক্ষেত্রেই মাছ টোপ গিলেছে। ভোর ছটায় কোনো
ফুটবলারের পিছনে ধাওয়া করার কথা থাকলে
চারটের সময় সঙ্গী কর্মকর্তাকে ডেকে তুলেছেন
অজয় শ্রীমানী। আর ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত 'জীপ'।
ওরা হাজির থেকেছেন সন্তোষ ট্রফি, রোভার্স
ডুরাণ্ড—সব আসরে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেলেঘাটার
দিদির বাড়ির সদর দরজা খুলে মিহির বসু
দেখেছে ওদের দুজনকে। পঁচাত্তরের এক সকালে গৌতম
সরকারকে মোহনবাগানে আনার জন্য ওর বাড়িতে
গেলেন চুনী গোস্বামী। সকাল তখন সাতটা।
উল্টোদিকের একটি ঘরে বসে ছিলেন এক ভদ্রলোক।
চুনী গোস্বামী শুনলেন সেই কাক-ভোর থেকে
গৌতমের বাড়িতে এসে বসে আছেন জীবন চক্রবর্তী।
চুনী গোস্বামী সচরাচর দলবদলে মাথা গলান না।
কিন্তু সেদিন স্বীকার করেছিলেন মনে মনে : এমন
পরিশ্রমী কর্মকর্তা যে কোনো দলের 'অ্যাসেট'।

উলাগা যেভাবে ইস্টবেঙ্গলের জালে ধরা পড়েছে
তাওতো কম চমকপ্রদ নয়। পঁচাত্তরের শীল্ড ফাইনালে
ব্যর্থ হবার পর অনেকেই, এমনকি ভাস্করের বন্ধুরাও
মনে করেছিল ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু ছিয়াত্তরের
দলবদল শুরু হবার আগে ইস্টবেঙ্গলের ঐ দুই
কর্মকর্তা ভাস্করের বাড়িতে গিয়ে বললেন : এই
চার গোল খাওয়া (পঞ্চম গোল খেয়েছিল প্রশান্ত)
গোলকীপারকেই আমরা চাই।

দল-বদলের আসরে মেরুন-সবুজের স্বার্থ যিনি
আগলান সেই শৈলেন মান্নার কিন্তু খুব বেশী
পরিশ্রম করতে হয় না। ভারতের সর্বকালের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ ডিপ ডিফেন্ডার হিসেবে তো বটেই, কর্মকর্তার
ভূমিকাতেও শৈলেন মান্না প্রতিষ্ঠিত।

শৈলেন মান্না ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেন
সরাসরি। খেলোয়াড়দের ভালবাসেন। ওদের দুঃসময়েও
পাশে দাঁড়ান। গত বছর লীগ ম্যাচে অপ্রত্যাশিত
পরাজয়ের পর ফুটবলাররা যখন বিক্ষুব্ধ মোহনবাগান
জনতার আক্রোশে ম্রিয়মান, তখন শৈলেন মান্নাই ওদের
পাশে দাঁড়িয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন।

খেলোয়াড়দের যেহেতু ভালবাসেন, কোনো ফুট-
বলার মান্নাদাকে কথা দিলে কথার খেলাপ করে না।
উলাগা গতবছর ইস্টবেঙ্গলে যাবার পর শৈলেন মান্না
দুঃখ করে বলেছিলেন : এই প্রথম আমাকে পাকা
কথা দিয়ে একজন ফুটবলার এমন কাণ্ড করল।

শ্যামও দল-বদলের আগে আমায় বলেছিল
মোহনবাগানে যাচ্ছি মান্নাদার কথায়।

এ লেখা যখন আপনারা পড়বেন, তখন রুদ্ধশ্বাস
জল্পনাকল্পনা প্রায় শেষ। এখনও দলবদল শুরু হতে
পনেরো দিন বাকী। এখন কি দেখছি? ইস্টবেঙ্গলের
কর্মকর্তারা শেষ চেষ্টা করছে সুধীর, গৌতমকে
ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। প্লেনের টিকিট কাটছেন
হায়দ্রাবাদে হাবিবের মুখোমুখি বসার জন্য। ঘনঘন
বাজছে শৈলেন মান্নার টেলিফোন। শুনছি। গুজব
ছড়াচ্ছি। কঠিন প্রশ্নের দোলায় দুলছি : শ্যাম
ইস্টবেঙ্গলে ফিরবে কি ফিরবে না?

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

পথের শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা—৯। দাম : বারো টাকা।

'পথের শেষ কোথায়' আবু সয়ীদ আইয়ুবের কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন। রচনাগুলির সময়ের ব্যাপ্তি ১৯৩৪ থেকে ১৯৭৬, কিঞ্চিদধিক চার দশক।

আজ থেকে দশ বছর আগে আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮) প্রকাশিত হয়। সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে আইয়ুব একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। শুধু রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কাছেই নয়, আধুনিক কবিতা বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের কাছেও আইয়ুবের এক-একটি গ্রন্থপ্রকাশ এক-একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ঘটনা।

আইয়ুবের দ্বিতীয় বইটি ইংরেজিতে রচিত, নাম—'Poetry and Truth', বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের তত্ত্ব। তৃতীয় বই বহু-খ্যাত ও বহু-আলোচিত 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩)। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যে বিশেষ ধরনের আলোচনার আইয়ুব সূচনা করেছিলেন, 'পান্থজনের সখা'-তে তারই সম্প্রসারণ এবং তারই সম্পূরণ।

এ সম্পূরণ কিন্তু সমাপ্তিসূচক নয়। শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থ যা করে থাকে, যত প্রশ্নের উত্তর দেয়, নতুন প্রশ্ন জাগায় তার থেকে অনেক বেশি, 'পান্থজনের সখা'-ও তাই করেছে। প্রশ্ন শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, প্রশ্ন মানুষকে নিয়ে, জগৎ ও জীবনকে নিয়ে। এমন প্রশ্ন যার শেষ উত্তর কেউ জানে না—আইয়ুবও না, রবীন্দ্রনাথও না। রবীন্দ্র-চর্চায় আইয়ুবের ভূমিকা বিনম্র জিজ্ঞাসুর ভূমিকা। জীবনচর্চাতেও। পথের মতো, পথ-বিষয়ক জিজ্ঞাসারই বা শেষ কোথায়?

সুতরাং আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চাকে ঘিরে আলোচনা চলতেই থাকে। পাঠকদের মধ্যেও, আইয়ুবের নিজের মনেও। 'পান্থজনের সখা'র তিন বছর পরে 'গালিবের গজল থেকে' (১৯৭৬)। আরো এক বছর পরে, জুলাই ১৯৭৭-এ প্রকাশিত হল 'পথের শেষ কোথায়'। এ পর্যন্ত আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ। এ সম্বন্ধে 'পথের শেষ কোথায়' বইয়ের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন (পৃঃ ২৩), "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার যা বলবার তা বলেছি দুখানা মাঝারি আকারের গ্রন্থে ('আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, এবং 'পান্থজনের সখা'তে)। Poetry and Truth এবং 'গালিবের গজল থেকে'—এ দুটি গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন। বর্তমান গ্রন্থেও তা-ই।"

কথাটা ঠিক। শুধু 'যা বলবার তা বলেছি'—এই বিনীত বাক্যাংশটুকু ঠিক নয়। নয় যে, পরের বাক্য দুটিই তার প্রমাণ। যিনি বুঝতে জানেন এবং বলতে জানেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে দুখানা মাঝারি মাপের বইয়ে ফুরিয়ে যাবার নয়। বিশেষত তাঁর কাছে, রবীন্দ্রনাথের কথাকে যিনি নিজের কথায় পরিণত করে নিতে পারেন।

'পথের শেষ কোথায়' বইটিকে এক হিসেবে হয়তো আইয়ুবের প্রারব্ধ রবীন্দ্রচর্চার অনুবৃত্তি বলা যায়। কিন্তু সে রকম বললে বইটির আংশিক পরিচয়ই মিলবে, গোটা বইটির পরিচয় হবে না। আইয়ুবের আগের দুটি বাংলা বইও প্রবন্ধ-সংকলন, কিন্তু তাদের মূল বিষয় একটাই—রবীন্দ্রনাথ। 'পথের শেষ কোথায়' নানা বিষয়ের প্রবন্ধ। এর বিষয়-পরিধি বিস্তৃত। এই বিস্তার আইয়ুবের বহুমুখিতারই পরিচয় দেয়॥ তবে একটা জিনিস লক্ষ করবার : বিষয় নানান ধরনের হলেও, আসলে কিন্তু তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। আইয়ুবের ধর্মজিজ্ঞাসা, সাহিত্যজিজ্ঞাসা এবং জীবনজিজ্ঞাসা—অথবা বলি, আইয়ুবের ঐকান্তিক মূল্যজিজ্ঞাসা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভিতরে-ভিতরে গভীর ঐক্যসূত্র রচনা করে রেখেছে।

'পথের শেষ কোথায়' বইটির বিষয়-সূচি লক্ষ করবার মতো :—

ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসংগত (মুখবন্ধ); বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানু-

ভূতি: সুন্দর ও বাস্তব; কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য; ভূমিকা : আধুনিক বাঙলা কবিতা; আধুনিক কাব্যের সমস্যা : বিশ্বাস; সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ; সাধু ও সজ্জন; সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু; 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'বিসর্জন' পথের শেষ কোথায়; নয়নে কেন আঁখি; এবং Tendencies in Modern Benga'' Poetry; এবং Sudhindra Nath Datta (1901-60)

কোনটি স্বতন্ত্র বিষয়, কোনোটি ধর্ম নিয়ে, কোনোটি হিতসাধক কর্ম নিয়ে, কোনোটি নন্দনতত্ত্ব নিয়ে, কোনোটি-বা আধুনিক কবিতা নিয়ে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধের একেবারে গোড়ায় আছে মূল্যের বা ভ্যালুর প্রশ্ন।

বইটির প্রধান একটা অংশ রবীন্দ্রনাথ। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'বিসর্জন', পথের শেষ কোথায় এবং নয়নে কেন আঁখি—প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রচর্চা। এখানেও গোড়ার কথা মূল্যজিজ্ঞাসা। নান্দনিক মূল্য নয়, সরাসরি জীবনমূল্য। এই মূল্যজিজ্ঞাসাই আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার বিশিষ্টতার অন্যতম প্রধান ভূমি। এইখানেই আইয়ুব তাঁর কালের অন্যান্য রবীন্দ্র-আলোচকদের থেকে স্বতন্ত্র।

সাহিত্যসমালোচনা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, রচনাবিশেষের উৎকর্ষবিচার এবং/অথবা সেই উৎকর্ষবিচারকে সামনে রেখে—কাছে বা দূরে রেখে—রচনাটির সাহিত্যগত পরিচয় ও ব্যাখ্যা, এই কাজে আইয়ুব বিশেষ উৎসাহী নন। 'নয়নে কেন আঁখি' প্রবন্ধে আইয়ুব নিজেই বলেছেন (পৃঃ ১৭১) "চলিত অর্থে আমি কাব্যসমালোচক নই, রবীন্দ্র-প্রেমিক বলেই নিজের পরিচয় দিতে চাই।" আইয়ুবের আলোচনায় কবিতা ও গানের পরিচয় বা ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে বিশেষভাবেই আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য কাব্যরূপ বা কাব্যগুণ নয়, তার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির জগৎ।

আবার বলি, আইয়ুবের লক্ষ্য সরাসরি সাহিত্য, বা সাহিত্যতত্ত্ব, বা সাহিত্যগত স্ট্র্যাটেজির তত্ত্ব, এসব কিছুই নয়। আইয়ুবের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্প নয়, তাঁর কল্পনাশক্তি কবিত্বশক্তি নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনার জগৎ। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা, ঈশ্বরভাবনা, জীবনভাবনা। রবীন্দ্রচর্চায় আইয়ুবের ভূমিকা মীমাংসকের ভূমিকা নয়, এমন কি তার্কিক-জিজ্ঞাসুর ভূমিকাও নয়, সমধর্মী ও সমপ্রাণ, বিস্মিত ও মুগ্ধ, অন্তরঙ্গ হৃদয়সংবাদ-জিজ্ঞাসুর ভূমিকা, আইয়ুব যাকে বলেছেন প্রেমিকের ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বলতে নিশ্চয়ই এখানে আমরা যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব-মীমাংসাকে বুঝব না। ভাবনা এখানে বেদনায় সঞ্জীবিত, উপলব্ধিতে সমর্পিত। 'পান্থজনের সখা' এবং 'পথের শেষ কোথায়', গ্রন্থনামে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি দুটি তারই ইঙ্গিত দেয়। ইঙ্গিত দেয় যে, ভাবনা বটে, কিন্তু এ ভাবনার শেষ পরিচয় বেদনাতে। গদ্য-প্রবন্ধ নয়, গানই এর প্রকাশের স্বাভাবিক বাহন। এবং সেই প্রকাশের পরিচয়েরও।

কিন্তু আইয়ুব তো গান লেখেননি, তাহলে এই বেদনার বাণীকে তিনি কীভাবে রূপ দেবেন? উপলব্ধির সত্যকে কি তর্কের ভাষায়, ন্যায়ের শৃঙ্খলায় আদৌ প্রকাশ করা যায়? বোধ হয় যায় না। আইয়ুব নিজেই সে কথা বলেছেন। বলেছেন ('নয়নে কেন আঁখি', পৃ ১৭২) যে, রবীন্দ্রকাব্যের গূঢ় ব্যঞ্জনা রসিক-হৃদয়কে যে পারিজাত-সুরভিত লোকে নিয়ে যায়, তার পরিচয় নীরস গদ্যের বিশ্লেষণী ভাষায় বলা অসম্ভব।

আইয়ুবের গদ্য অবশ্য মোটেই নীরস নয়, বরং আশ্চর্য রকমের সরস। কিন্তু সরসতাই এখানে যথেষ্ট নয়, আরো কিছু চাই, এবং এ পথটাই ভিন্ন। নিছক সরসতার পথে নয়, আইয়ুব তাঁর অভিপ্রেত পথেই এবং যথাযোগ্য পারানির কড়ি হাতে নিয়েই যাত্রা করেছেন। আইয়ুবের বিশ্লেষণ চমকপ্রদ, যুক্তিবিন্যাস সুপরিচ্ছন্ন, তর্ক অকাট্য, কিন্তু তা আইয়ুবের আলোচনায় মাত্র প্রাথমিক স্তর। যা আসল কথা তা হল অন্তর্দৃষ্টি, তা হল গভীরতা, তা হল ব্যঞ্জনা—না-বলা কথার বেদনা। অথবা বলতে পারি, তা হল সুরের সংকেত। রবীন্দ্রনাথের যেমন শেষ পারানির কড়ি তাঁর গান, রবীন্দ্রচর্চায় আইয়ুবেরও

তেমনি শেষ পারানির কড়ি তাঁর গান।

কার গান ? বলা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক যে, এখানে রবীন্দ্রনাথের গান আইয়ুবের নিজেরই গান হয়ে উঠেছে। এমন বোধ-করি আমাদের সকলেরই মাঝে মাঝে হয়ে থাকে, নিজের অগোচরে, দুর্লভ মুহূর্তে।

'পথের শেষ কোথায়' বইটির মুখ-বন্ধ 'ভাষা শেখায় তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত' খানিকটা আত্মকথা জাতীয় রচনা। তার একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো। নিজের রবীন্দ্র-আলোচনার বিষয়ে তিনি বলছেন (পৃ ১৪), " কয়েকজন সুধী পাঠক-পাঠিকাকে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও নাটক একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করতে আমি সহায়তা করেছি। হয়তো আমার চোখ দিয়েও। কিন্তু আমার চোখ তো আমি অনেকটাই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অবশ্য শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নয়; আরো অনেক দার্শনিক ও কবির কাছ থেকে।"—এই কথার মধ্যেই আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার একটি প্রধান বিশেষত্বের হদিশ পাওয়া যাবে। তা হল এই যে, নিজের দৃষ্টি আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আইয়ুবের কাছে অনেকটাই এক হয়ে গিয়েছে। গিয়েছে বলেই আইয়ুবের প্রবন্ধ মাঝে মাঝে এমন গানের সুরে বেজে ওঠে।

বলা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক যে, এই-খানেই আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চার বিশিষ্ট স্বাদুতা। সাবজেক্টিভ ? হতে পারে। আইয়ুব যেমন রবীন্দ্রভাবে-ভাবিত, আইয়ুবের রবীন্দ্রনাথও কি তেমনি আইয়ুবভাবে-ভাবিত ? তা-ও হতে পারে। কিন্তু এখানে অন্য পথ কোথায় ?

নিখাদ অবজেক্টিভ দৃষ্টি এখানে সম্ভবও না, সত্যও নয়। তত্ত্বজ্ঞ কোনো দার্শনিকের যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তরত্নাবলীর পরিচয় দিতে হলে এমপ্যাথির এই পথ তেমন অত্যাবশ্যক ছিল না। কিন্তু কবির মনোজীবনের যে গভীরে আইয়ুব আমাদের নিয়ে যেতে চান, যে গহনে সত্য আর মায়া একাকার, যেখানে অস্তি আর নাস্তিতে বিরোধ নেই, যেখানে কালকের বিশ্বাস আর আজকের সন্দেহ পাশা-পাশি আলো-আঁধারি রচনা করে, সেই বেদনালোকে প্রবেশের অন্য পথ নেই। তুলনা করছি না, তবু স্মরণ করতে পারি, কবি কালিদাসের বেদনালোকের গহনে রবীন্দ্রনাথও তো অনেকটা এই পথ ধরেই আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কথাটা এইখানেই এসে পড়ে। আমরা চিরকাল রবীন্দ্রনাথকে ভগবৎ-বিশ্বাসী কবি বলেই জানি—এমন ভগবানে বিশ্বাসী যিনি আনন্দময়, কল্যাণময় এবং প্রেমময়। রবীন্দ্রনাথকে সচরাচর আমরা আনন্দবাদী কবি বলে জানি, যাঁর কাছে সমস্তই মধুময়, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্। রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিরকাল সত্য সুন্দর কল্যাণ এই সব মহৎ মূল্যে আস্থাশীল দ্রষ্টা-কবি বলেই জানি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা সেই রকম ঋষি-কবি বলে জানি, যিনি যা জানবার জেনেছেন, যা পাবার পেয়েছেন, যাঁর কোনো প্রশ্ন নেই, সংকট নেই, যন্ত্রণা নেই। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার এইটেই সুপ্রচলিত দৃষ্টিকোণ। আইয়ুবের দৃষ্টিকোণ ঠিক কী অর্থে ভিন্ন

আইয়ুব কি এসব কথা মানেন না ? আইয়ুব কি অন্ধকারের, অমঙ্গলবোধের, বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত মূল্যবোধের দৃষ্টি-কোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে দেখাতে চান ? রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যেই কি আইয়ুব এর প্রমাণ পেয়েছেন ? রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে পৃথিবী কি উদাসীন, অনাত্মীয়, অচেতন জড়পিণ্ড ? প্রকৃতি কি অন্ধ, অজ্ঞান জড়শক্তি ? ঈশ্বর কি অমানবিক, অথবা অক্ষম, অথবা অনুপ-স্থিত ? যাকে প্রেম বলি, সে কি মরীচিকা ? যাকে মূল্য বলি সে কি মিথ্যা ? মানুষের সমস্ত আর্ত প্রশ্ন কি নাস্তির কঠিন নীরবতায় প্রতিহত ? এই কি ট্র্যাজিক দৃষ্টিকোণ ?

এই রকম অমঙ্গলবোধের, অন্ধ-কারের দৃষ্টিকোণ যে সম্পূর্ণ নতুন তা নয়। কিন্তু ঠিক এই দৃষ্টিকোণই কি আইয়ুবের ? নিছক অন্ধকারের, নিছক শূন্যতার ? এমন বললে ভুল হবে। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আইয়ুবের দৃষ্টি আদৌ অমঙ্গলবোধের দৃষ্টি নয়, আদৌ নৈরাশ্যের দৃষ্টি নয় ?

এ প্রশ্নে হ্যাঁ এবং না, এই দুই বিকল্প উত্তরের দুটিই অতিসারল্যের দোষে দুষ্ট। এ প্রশ্নের সরল উত্তর সম্ভব নয়, কেননা প্রশ্নটাই বালকোচিত। ঠিকভাবে প্রশ্ন করলে তার উত্তর আইয়ুবের গ্রন্থেই মিলবে। বস্তুত এইটেই আইয়ুবের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আইয়ুবের উত্তর আড়াল করতে চাই না, এখানে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের দৃষ্টি মোহমুক্ত দৃষ্টি। এই মুক্তি কঠিন বেদনার মূল্যে অর্জিত। এই কথাটাই নিজের মতো করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সত্য যে কঠিন'। আরো বলছেন, 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন'। এই তপস্যাই মূল্যহীনকে সোনা করে তোলে। এই তপস্যাতেই মানুষের মানবমহিমা।

না, উত্তরকাব্যে রবীন্দ্রনাথ একেবারে শূন্যতায় এসে ঠেকেন নি। তাঁর মূল্য-বোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি, গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর নয়। তাতে 'পথের শেষ কোথায়' বইটির পরিচয় একপেশে হয়ে পড়বে। তার কারণ বইয়ের সবটাই তো রবীন্দ্রনাথ নয়। অন্য বিষয়ের প্রবন্ধগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কয়েকটি তো পত্রিকায় প্রকাশ কালেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল; গ্রন্থে প্রকাশিত না হলে হয়তো তারা আজকের পাঠকদের অধি-কাংশের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যেত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত 'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি' (১৯৩৪) সেই রকম একটি বিখ্যাত ও বুদ্ধিঝলকিত রচনা। বিশ্ব রহস্যের উদ্ঘাটনে বুদ্ধিই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং সে বুদ্ধি যে বিজ্ঞান বুদ্ধি, উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীদের এই প্রত্যয় যখন বিংশ শতকে এসে কিঞ্চিৎ টলে গেল, তখন নানা গোত্রের অপরোক্ষানুভূতির সমর্থকেরা এই ঘটনাকে তাদের পৌষ মাস গণ্য করে বিভিন্ন ধরনের অপরোক্ষ অনুভূতির তরফ থেকে নানা রকমের বিকল্প দাবি উপস্থিত করেছিলেন, যেমন দাবি চির-কাল অতীন্দ্রিয়বাদীরা রহস্যীয়ারা বুদ্ধি-

বি ... এই প্রবন্ধটি—... অপরোক্ষ অনুভূতি ... এইসব ... কণ্ঠ দাবির প্রতি সুদক্ষ সমালোচনা।

'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধটি প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের। ... নন্দনতত্ত্বের একটি পুরুষপূ... প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত—অতুলনীয়... সংক্ষিপ্ত আলোচনা। নন্দনতত্ত্ব বিষ... আইয়ুবের কাছ থেকে একটি পূর্ণা... গ্রন্থের প্রত্যাশা পাঠকমাত্রেরই ছিল... তা পূরণ হয় নি। হয় নি যে ত... অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথ আইয়ুবে... আরো জরুরী, আরো হৃদয়গ্রা... আকর্ষণ। সম্ভবত পাঠকদেরও।

'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবে... কাব্য' (১৯৩৮) আর এক... সুপরিচিত সাহিত্যতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ... নন্দনতত্ত্ব ঘটিতও বলা যায়। প্রবন্ধটি... বিষয় উপরের স্তরে, কবিতা... দুর্বোধ্যতা এবং কবিতার অর্থ-সমস্যা... আর ভিতরের স্তরে, আর্ট ও বিপ্ল... আর্ট ও সমাজ। মূল্য নিয়ে আইয়ুবে... প্রশ্নের, চরম মূল্যের প্রশ্ন নিয়ে তাঁ... উৎকণ্ঠার সূত্রপাত বোধ করি এর কাছাকাছি সময় থেকেই। মূল্যে... চূড়ান্ত অগ্রাধিকার এই সময়ই ঘোষি... হল। সেই সূত্রেই আইয়ুব দা... করলেন সমাজবিপ্লবের লক্ষ্য অ... কিছু নয়, শেষ লক্ষ্য চিৎপ্রকর্ষ এ... চারুশিল্পের সম্প্রসারণ। আর্ট কোনো... কিছুর উপায় নয়, আর্ট অন্যতম একা... চরম উপেয়।

আধুনিক কাব্য সম্পর্কিত চিন্তা... প্রায় এই সময় থেকেই রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। 'ভূমিকা ; আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৪০) 'আধুনিক কাব্যের সমস্যা : বিশ্বাস' (১৯৪৩) এবং Tendencies in Modern Bengali Poetry (১৯৪৩)। তিনটি প্রবন্ধই আধুনিকতার সূত্র দিয়ে গাঁথা একালের কাব্যপ্রসঙ্গ। 'সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ' (১৯৪৩... প্রবন্ধটিও আধুনিকতা নিয়েই, তবে তার অবলম্বন কাব্য নয়, মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের উপন্যাস।

'Sudhindranath Datta (1901-60)' প্রবন্ধটিকেও (১৯৬০) অংশ... আধুনিক কাব্য বিষয়ক ... বর্ণ... কার যায়, কিন্তু এর মুখ্য ... কাব... নয়, কবি,—সুধীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব... প্রবন্ধটি অসামান্য। কিন্তু সে প্রসঙ্গে... আগে অপর প্রবন্ধ দুটির বিষয় একটু বলে নেওয়া দরকার।

প্রবন্ধ দুটির একটি হল 'সাধু ও সজ্জন' (১৯৪৯) আর অপরটি হল 'সেকুলারিজম ও জওয়াহরলাল নেহরু' (১৯৬৫)। দুটি প্রবন্ধে আইয়ুবের ধর্মজিজ্ঞাসা। আরো তলিয়ে দেখলে আইয়ুবের মূল্যজিজ্ঞাসা।

প্রথমটির উপজীব্য সাধু এবং সজ্জনের বৈপরীত্য। সাধু অর্থ এখানে ভগবৎ-বিশ্বাসী, যিনি বিশ্বাস করেন ভগবানের জগৎ ত্রুটিহীন জগৎ ; ... জগতে চিরসিদ্ধ ; পাপ অমঙ্গল অশান্তি এসব কেবল খণ্ড-দর্শনজনিত রজ্জুতে সর্পভ্রম। সাধু অর্থ ধার্মিক ভক্ত, ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ—ভগবান ছাড়া যাঁর আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। অপর পক্ষে, সজ্জন তিনি যিনি অমঙ্গলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যিনি মনে করেন জগৎ ত্রুটিপূর্ণ এব...

…তোকের ব্যক্তির জন্যই দুটি সংশোধনের, যিনি সজ্জন নেই কর্মই যত, যিনি মগ্ন করেন আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ নয়, তবে সাধু। "…সজ্জন ব্যক্তির কাছে প্রয়াস হচ্ছে তার মনোগত আদর্শ, বাইরের বাস্তব অমঙ্গল ও অন্যায়ের সংগে যুদ্ধে যেটাকে ক্রমশ সত্য করে তুলতে হবে" (পৃঃ ৭১)। সজ্জনের দৃষ্টান্ত বুদ্ধ, অথবা মার্কস। আইয়ুবের মতে সাধুর পন্থা আর সজ্জনের পন্থা পরস্পরের পরিপূরক নয়; ভগবৎ-বিশ্বাস সজ্জনতা-বিকাশের অন্তরায়, তা সম্যক্ চরিত্র-বিকাশের অনুকূল নয়। "হিতসাধন-ব্রতী মানুষের জীবন একটি বিরামহীন অন্তহীন সংগ্রাম" (পৃ ৭৯)। ভগবৎ-ভক্ত আদৌ সংগ্রামী নন, বরং সংগ্রামের অন্তরায়।

ষোলো বছরের ব্যবধানের পর সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু' প্রবন্ধ (১৯৬৫)। কিন্তু দুই প্রবন্ধের মধ্যে যোগ দুর্লক্ষ্য নয়। মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত দু'একটি ইংরেজি রচনায় এই যোগের সূত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এটি তুলনায় আরো পরিণত প্রবন্ধ। আজকের দিনে দিকে দিকে ধর্মান্ধতার যে নতুন জোয়ার লক্ষ করা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধের গুরুত্ব অসাধারণ।

ব্যক্তির আত্মগত ও অন্তরঙ্গ ধর্ম আর গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে আইয়ুব যে আত্যন্তিক পার্থক্য দেখিয়েছেন, সেই পার্থক্যের কারণেই ধার্মিক বিষয়ে তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত খানিকটা নাকচ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তাঁর কাছে জওয়াহরলালের মতো সজ্জনের পক্ষে ধার্মিক হওয়া আর একান্ত অসম্ভব রইল না।

সে যাই-ই হোক, প্রথমে প্রথম প্রশ্ন। সেকুলারিজম্ কী বস্তু? কোন্ রকমের রাষ্ট্রকে বলব সেকুলার? আইয়ুব প্রথমে দুই প্রান্তবর্তী দুটি মত তুলে ধরেছেন। মানবেন্দ্রনাথ সেই রাষ্ট্রকেই সেকুলার বলবেন, যে রাষ্ট্র কেবল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ বা প্রচার করার সাংবিধানিক অধিকারই দেবে না, 'বরঞ্চ ধর্মমাত্রের পরিব্যাপ্ত ঊর্ণাতন্তু থেকে নিজেকে এবং সকলকে মুক্ত করার মৌল অধিকার' (পৃঃ ৮৮) দেবে। দেবে এমনভাবে যে, পূর্বোক্ত বেছে নেবার সাংবিধানিক অধিকার ক্রমেই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অপর পক্ষে গান্ধিজীর কাছে সেই রাষ্ট্রই সেকুলার যে রাষ্ট্র সকল ধর্মসম্প্রদায় ও সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান। শ্রদ্ধার তারতম্য না ঘটলেই বুঝতে হবে সেকুলার।

নেহরু মধ্যপন্থী। তার আপত্তি সংঘবদ্ধ ধর্মে। তিনি মনে করেন, "প্রায় সর্বত্র ধর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্র বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পশ্চাদ্গতি, সামাজিক শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ" (পৃ ৮১)। কিন্তু নেহরুর মতে— এবং আইয়ুবের মতেও—ধর্মের আর একটা দিকও আছে। তা গুণগত-ভাবে ভিন্ন। তার স্মূল কথাটি হল মানুষের আত্মিক বিকাশ, এমন একদিকে তার অভিব্যক্তি যাকে পরম প্রেম আন করা চলে" (পৃ ৯৩)। নেহরু বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ-ভাবে আস্থাশীল। সেই সঙ্গেই তাঁর মন আকুল হয়ে ওঠে জগতের অতল গভীরতার ছোঁয়ার জন্য, জগতের পূর্ণ রহস্যটি উপলব্ধি করবার জন্য, জগতের অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে নিজের মনের সুরটি মেলাবার জন্য। আবার নেহরু এ-ও মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও তন্নিষ্ঠ বিচারপদ্ধতিই জগৎ-রহস্যকে বুঝবার শ্রেষ্ঠ উপায়। আইয়ুব ঠিকই বলেছেন, "…যদিচ নেহরু ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, তবু আমি না-মনে করে' পারি না যে, তাঁর চিত্তের একটি গোপন ভক্তি-ভাবে না-হোক্ তারই সহোদর কোনো ভাবে ভরা ছিলো। উনিশ শতকী কলা-পাহাড়ী সেকুলারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারতেন বলে'ও আমার মনে হয় না" (পৃ ৯১)।

এ বিষয়ে আইয়ুবের নিজের বক্তব্য কী? তিনিই কি উনিশ শতকী কালাপাহাড়ী সেকুলারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন? জানি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রশ্নে আইয়ুবের নিজের মনে কোনো স্ববিরোধ নেই। বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে জগৎ-রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান যে সম্ভব, তা তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন না। কিন্তু, সহজেই বোঝা যায়, নেহরুর মতো আইয়ুবের চিত্তেও একটি গোপন কক্ষ আছে, এবং সেখানে ভক্তি-সহোদর একটি গভীরতার ভাব বিরাজমান আছে। সেই ভাবই আইয়ুবের সমস্ত মূল্যবোধের উৎস।

সেকুলারিজমের প্রশ্নে আইয়ুব মানবেন্দ্রনাথ বা মার্কস্‌বাদীদেরও সমর্থক নন, আবার গান্ধিজীরও সমর্থক নন। বরং তিনি নেহরুরই সমর্থক। আইয়ুব জানেন, আমাদের সেকুলার গণতন্ত্রের ভিৎ এখনো খুব কাঁচা, আমাদের মন এখনো মধ্যযুগ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। তার জন্য তিনি ধর্মকে দায়ী করেন নি, সমাজ-ব্যবস্থার কথাও তোলেন নি, দায়ি করেছেন সংঘবদ্ধ ধর্মকে, সাম্প্রদায়িক ধর্মকে। হোয়াইট হেডের একটি বিখ্যাত উক্তিকে আইয়ুব ধর্মের স্বরূপলক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন:

"Religion is what the individual does with his own solitariness".

তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "ধর্মের অবক্ষয় চাই না তবে ধর্ম-সম্প্রদায়ের অবসান অবশ্যই কামনা করি" (পৃ ৯৯)।

সংঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে আইয়ুব একটি অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেছেন: "…আজ ধর্মসম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করার প্রস্তাবে সবচেয়ে প্রবল বাধা ধার্মিকদের কাছ থেকে আসবে না, আসবে রাজনৈতিকদের কাছ থেকে সেইসব ক্ষমতালোলুপ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রাজনীতির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত" (পৃ ১০২)।

দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে রাজনীতির হাতিয়ার সে সম্পর্কে আইয়ুব সম্পূর্ণ সচেতন। হয়তো তিনি এ-ও মানবেন যে, শুধু আজ নয়, চিরকালই সাম্প্রদায়িক ধর্মের একটা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থ-নৈতিক ভূমিকা ছিল। প্রশ্ন এই যে, উচ্চতর ধর্মের কি আদৌ কোন সামাজিক ভূমিকা নেই? এই অভিজ্ঞত ধর্মচেতনা কি আদৌ সাংস্কৃতিক ব্যাপার নয়, তার উপর কি সামাজিক শক্তির কোনো প্রভাব নেই? ধর্ম এবং ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো অনিবার্য যোগ আছে কি না তা ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিদ্যাগত এবং মনো-বিদ্যাগত অনুসন্ধানের বিষয়। আইয়ুব সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করেন নি। হোয়াইট-হেড যে solitariness-এর কথা বলেছেন, ব্যক্তির সেই মহার্ঘ নির্জনতা কতখানি ঘাতসহ শক্তি, কতখানি স্বয়ম্ভূ কতখানি সমাজ-ছুট্, কত-খানি বিষয়ান্তরস্পর্শশূন্য, সে বিচার আইয়ুব করেন নি। এইখানে পাঠকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

আগেই বলেছি, সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে ইংরেজি প্রবন্ধটি অসামান্য রচনা। তা 'পথের শেষ কোথায়' বইয়ের একটি মহামূল্যবান সম্পদ। ব্যাখ্যানের দ্বারা এই সংবেদনশীল রচনার মূল্যের লাঘব ঘটাতে চাই না। কিন্তু আইয়ুবের রচনাবলীর মধ্যে এই প্রবন্ধটির যে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, এখানে সেই দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সুধীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে আইয়ুব কেবল যুক্তি ও তথ্যের সহায্যই নেন নি, তিনি এম্প্যাথির পথেও অগ্রসর হয়েছেন, যাকে বলা যায় কল্পনাশ্রয়ী পুনর্গঠন, অনেকখানি তারও সাহায্য নিয়েছেন। পরবর্তী পর্বে আইয়ুব যে রবীন্দ্রচর্চায় ব্রতী হয়েছেন, তার পথের সন্ধান আইয়ুব এই প্রবন্ধ রচনার কালেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

এক বইয়ে এতগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমাহার নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার ব্যাপার। বইটির দ্বিভাষিকতা যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারত, প্রবন্ধের গুরুত্বে তার নিরসন ঘটে গিয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্য কথা। চার দশকের এই প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে দিয়ে এই বইয়ে যে-একটি ব্যক্তি-চরিত্র ফুটে উঠেছে—চিন্তা-শীল, সংবেদনশীল, মূল্যসচেতন ব্যক্তি-চরিত্র, বিনম্র অথচ সাহসীর, ধার্মিক অথচ সজ্জনের ব্যক্তি-চরিত্র, সেই ব্যক্তি-চরিত্রের কারণেই বইটি পাঠকের কাছে সম্মাননীয় হয়ে থাকবে।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন

এ বছরের সুরদাস সংগীত সম্মেলনের (রবীন্দ্র সদন, ফেব্রুয়ারী ২; ৩, ৪) প্রধান আকর্ষণ ছিলেন

খেয়াল গায়ক ভীমসেন যোশী ও সানাইবাদক বিসমিল্লা খাঁ। স্বর্গীয় ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁর পুত্র সবীর খাঁর মেধাবী তবলা সংগতকার রূপে আবির্ভাব এবং মনজুর হুসেনের উচ্চাঙ্গ কাওয়ালি পরিবেশন ছিল দুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মনজুর হুসেন সম্মেলনের শেষ শিল্পী ছিলেন এবং সময়ের অভাবে খালি দুটি কাওয়ালিই গেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ অথচ মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং দক্ষ অলঙ্করণ এই দুটি গানেই গায়ক ও গীতরীতির মহত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

ভীমসেন যোশীর প্রধান নিবেদন ছিল শুদ্ধ-কল্যাণ রাগে মধ্য-বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতালে নিবদ্ধ দুই খেয়াল। (ফেব্রুয়ারী ৩) যেহেতু প্রথম খেয়ালটির লয়ে তালের ছন্দ ফোটানোর ক্ষমতা ছিল তিনি ধীর স্বরবিস্তারের পথে না গিয়ে শিল্পী চক্রবৎ, সূক্ষ্ম ছন্দ ও তান অলংকৃত বিস্তার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। ফলও ভাল হয়েছিল, তবে অত তাড়াতাড়ি মধ্যলয়ে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি। অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী অন্তরা বিস্তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছিল। খানদানি প ধ প র্স ন-ধ সংগতির ব্যবহারও প্রশংসনীয়। তানকারি কাঠামোর দিক থেকে যত উৎকৃষ্ট হয়েছিল, কণ্ঠপ্রণালী ও ঝোঁক-ঝটকার ব্যবহারও ততো মনোজ্ঞ হয়েছিল। দ্রুত খেয়ালটিতে আরো উৎকৃষ্ট তানকারি ছিল এবং যন্ত্রীরা যে লয়ে ঝালা আরম্ভ করেন সে লয়ে নিপুণ দুনি তান গেয়ে ভীমসেন যোশী সবাইকে চমকিয়ে দিলেন। দু-একটি বিদ্যুৎগতি সপট তানও অতি আনন্দদায়ক হয়েছিল। কাফী ও ভৈরবী ঠুমরী দুটিও অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং দ্রুত স্বরের নকশা-গুলিতে বিদগ্ধতা ও আবেগ দুই-ই ছিল। শেষে তাঁকে সেই জনপ্রিয় ভজন 'মো ভজো' গাইতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবলা সংগতকার বিনোদ পাঠক ঠিকভাবে লগ্গি না বাজাতে পারায় ঠুমরী ও ভজনগুলির লগ্গি-পর্ব একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সোহনলাল শর্মার হার-মোনিয়ম সংগত ভাল লেগেছে।

বিসমিল্লা খাঁ (ফেব্রুয়ারী ২) বাজিয়েছিলেন পরজ-বসন্ত রাগে তিনটি গৎ ও পাহাড়ি এবং শিবরঞ্জনী ধুন। বিলম্বিত একতাল গৎটির সরল বিস্তারের কাজে সেই পুরোনো যাদুর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল এবং তান ও জমজমার কাজ সচ্ছল ও সুরেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় গৎটি ছিল মধ্যলয় আড়াচৌতালে এবং এটিতে বিসমিল্লা খাঁর পুত্র নাজির হুসেনের নিপুণ তবলাবাদন ছাড়া বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য পাইনি। দ্রুত তিনতাল গৎটিতে কিছু ছন্দের কাজ ভাল লেগেছে। পাহাড়ী ধুনটিতে স্বরের ব্যবহারে যথেষ্ট কল্পনার ছাপ ছিল এবং শিবরঞ্জনি ধুনটিতে স্বর ও আওয়াজের তারতম্য নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। শ্রোতাদের অনুরোধে শিল্পী ভৈরবী বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

বিসমিল্লা খাঁর আগের শিল্পী কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কেদার রাগে আলাপে ও [illegible] প র ন প ব্যবহার করে রাগটিকে নট-কেদার বা কেদার-নটের রূপে মিশিয়ে ফেলেন। আবার তিনি প-ক্ম ন ধ প পদও ব্যবহার করেন, যা ইমনের। এই রাগে মধ্যমের ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বোঝা গেল যখন প ন র্র র্স ন ধ প ধ ম বিন্যাসের মত একটি ভুল বিন্যাস (দ্রুত খেয়ালের

বিসমিল্লা খাঁ

অন্তরায়) মধ্যমে শেষ হওয়ায় যতটা খারাপ শোনান উচিত ছিল ততটা শোনাল না অথচ প র্র র্স ন ধ প বিন্যাসটি পঞ্চমে শেষ হওয়ায় কামোদের মত শোনাল। তানের কাজ সুরেলা হলেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়নি। তুলনায় বাহার রাগে খেয়ালটি ও শেষের দাদরাটি ভাল হয়েছিল।

রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করার অক্ষমতা দেখা গেল মণিলাল নাগের হেম-বেহাগ ও খম্বাজ রাগে সেতার বাদনেও (ফেব্রুয়ারী ৪)। আলাউদ্দিন খাঁ সৃষ্ট হেম-বেহাগ খণ্টি বেহাগ থেকে স্বতন্ত্র দুই মূল কারণে—অবরোহণে বেহাগসুলভ ম গ (র) স পদের জায়গায় গ ম র স ব্যবহার হয় এবং ন র্স ধ ম প এইভাবে উত্তরঙ্গে ধৈবৎ ও মধ্যমের মধ্যে একটি হেমন্ত বা হেমসুলভ সম্পর্ক রচনা করা হয়। মণিলাল নাগ প্রথম পদটির জায়গায় ম গ (র) স পদই ব্যবহার করে গেছেন আলাপে। আলাপের একদম শেষে এই রাগের ঐ পকড়টি মাত্র একবার ব্যবহার হয়, উত্তরাঙ্গের পকড়টি একেবারেই ব্যবহার হয়নি। আবার যখন শিল্পী প ধ প-ম বাজিয়ে খানিকটা হেমন্তের মেজাজ এনেছেন তিনি তখনই বেহাগের গ ম গ জুড়ে দিয়ে খাঁটি বেহাগের প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। যদি তিনি কাজগুলি এভাবে শেষ না করে ন র্স ধ ম প বা ম প ধ ম প গ দিয়ে শেষ করতেন তাহলে অন্তত উত্তরাঙ্গে রাগটির শুদ্ধতা বজায় থাকত। প্রচণ্ড পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আলাপটিতে।

মোটামুটি চলনসই হয়েছিল কারণ তে গ ম র স প্রয়োগ ব্যবহার হয়েছিল যদিও ঠিক উচিত মত নয়) এবং শিল্পী শেষাংশে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রদার কিছু তান-তোড়া ও উলটো ঝালার খেলা বাজিয়ে ছিলেন।

খাম্বাজ রাগে বিলম্বিত গৎটিতে আবার রাগভ্রষ্টতা দেখা গেল এবং শিল্পী ইমন-বিলাবলের ন্‌ র গ ম গ, পলের ম প র্ন র্স, আলহাইয়া-বিলাবলের ম গ র গ প ও বেহাগের ম প ন র্স নির্দ্বিধায় ব্যবহার করলেন। একটি তানে তিনি দু-বার নিষিদ্ধ স র গ সঙ্গতিও ব্যবহার করলেন অথচ খাম্বাজের বহু প্রথাগত স্বরবিন্যাস শোনা গেল না। এই সব বাদ দিলে (যদিও বাদ দেওয়া সম্ভব নয়) বলা যায় কিছু ছন্দের কাজ ও তান ভালই হয়েছিল তবে গৎকারিকে ছাপিয়ে দিয়েছিল সবীর খাঁর তবলায় উচ্চাঙ্গের রেলা, রেলা-বিস্তার, তেহাই, সাথসঙ্গত, জবাব ও দ্রুত চৌতাল ঠেকা। সবীর খাঁর বাজনা শুনে বোঝা গেল যে তিনি তাঁর পিতার মতই উৎকৃষ্ট সঙ্গতকার হতে চলেছেন। তাঁর বাজনাই সেদিনের প্রথম শিল্পী সরোদিয়া সত্য বিশ্বাসের

সাবির খাঁ

মোটামুটি চলনসই জিলা কাফি গৎ দুটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এই শিল্পীর ইমন রাগে আলাপটি ভাল হয়নি।

দিল্লীর সেতারী দেবু চৌধুরী (ফেব্রুয়ারী ৩) পুরিয়া-কল্যাণ রাগে আলাপ ও দুটি গৎ বাজিয়ে ছিলেন। রাগটিকে পূর্ব-কল্যাণ বলে ঘোষণা করানো হয়েছিল। এইভাবে প্রচলিত রাগের নাম পালটিয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা অতি বিভ্রান্তিকর হতে পারে—পূর্বা ওই বৈবং যুক্ত ও পঞ্চম-হীন রাগ এবং এতে কল্যাণ-অঙ্গ যোগ করলে যে রাগ সৃষ্ট হতো তা পুরিয়া কল্যাণ হতো না। আলাপে রাগরূপায়ণ পূর্ণাঙ্গ হয়নি এবং পঞ্চমহীন গ ম ধ গ ম গ র স বিন্যাসের ব্যবহার রাগটিকে পুরিয়ার এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল। গৎকারি ও তানকারি বিশেষ ভাল হয়নি।

সম্মেলন শুরু হয়েছিল বলরাম পাঠক ও অশোক পাঠকের ইমন রাগে সুরবাহার-সেতার যুগলবন্দী দিয়ে। বলরাম পাঠক তাঁর সুরবাহারটিকে অনেক নামিয়ে বেঁধেছিলেন মন্দ্র সপ্তকে সেতারের সঙ্গে সুর মেলাবার জন্য এবং সম্ভবত তার টান টান রাখার জন্য অস্বাভাবিক রকম মোটা নায়কি তার লাগিয়ে ছিলেন। অবশ্য আমি যন্ত্রটি পরীক্ষা করিনি কাজেই আমার এই মন্তব্য অনুমানমাত্র, কিন্তু যাই করে থাকুন ফল ভাল হয়নি। কারণ তাঁর সুরবাহারে না ছিল রেশ না ছিল লালিত্য।

আলাপে স্বর-বিস্তার সুপরিকল্পিত হয়নি এবং রাগরূপায়ণও পূর্ণাঙ্গ হয়নি তবে যেটুকু রাগ বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল তা অশোক পাঠকই করেছিলেন। ধামার গৎটি মোটামুটি চলনসই হয়েছিল এবং দ্রুত গতে অশোক পাঠক কয়েকটি তান বাজাতে গিয়ে সুরচ্যুত হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত মন্দ বাজাননি।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

ময়না

সেই আবেগ, সেই কৃত্রিম অশ্রুপাত, সেই একই ধরনের সাজানো গপ্পো যা বাংলা ছবির জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাপি কুক্ষিগত করে রেখেছে চলচ্চিত্রশিল্পকে। ইউনাইটেড মিশনের "ময়নাও" সেই ট্র্যাডিশনের সশ্রদ্ধ অনুসারী। তবে পরিচালক অসীম ব্যানার্জীর অসীম কৃতিত্ব এটাই যে তিনি এই সাজানো গল্পের ছবিতেও দর্শককে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, বুকের মধ্যে থেকে দীর্ঘশ্বাসও টেনে বার করে এনেছেন দু-একবার। আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছবিটা জমিয়ে রাখতে পেরেছেন, দর্শককে বিশেষ অন্যমনস্ক হতে দেননি। এই কৃতিত্বের কারণেই হয়তো তাঁর পক্ষে লক্ষ্মীর কৃপালাভ সম্ভব হবে।

পরিচালকের চিত্রনাট্য একটু উদার এবং বুদ্ধিদীপ্ত হলে এই সাজানো কাহিনীর কৃত্রিমতা কিছুটা বর্জন করা যেতো। খানিকটা বাস্তবের কাছাকাছি আসা যেতো। নায়ক রঞ্জিৎ মল্লিকের নিষ্ঠুরতা হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য করা যেতো। সহ-নায়িকা আরতি ভট্টাচার্যকে শুরু থেকেই এমন ত্যাগোন্মুখ এবং মহানুভব না দেখিয়ে দোষে-গুণে মিশিয়ে দেখানো যেতে পারতো। আর নায়িকা সুমিত্রা মুখার্জীর চরিত্রকে কিছুটা অন্তর্মুখী করে তুললে তার বেদনাটা আরও বেশি করে প্রকাশ করা যেতো। সুমিত্রার মত শিল্পী যখন হাতে ছিল তখন এটা করার বিশেষ অসুবিধা ছিল বলে তো মনে হয় না। আসলে পরিচালক বেশি নির্ভর করেছেন সংলাপের ওপর। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু সংলাপ হাততালি এনে দিলেও দুঃখ এবং বেদনার ব্যাপারগুলি কি সংলাপের মধ্যে দিয়ে তেমন গভীরভাবে প্রকাশ করা যায়! ছবিতে উৎপল দত্তর চরিত্রটি সব দিক থেকেই এক বিস্ময়কর সংযোজন। শিল্পীকে দারুণ ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর অভিনয়ও হয়েছে দুর্দান্ত। শুধু একটি অনুযোগ। যে চরিত্রের মুখে আদ্যন্ত 'দখণে' বুলি, গানের ক্ষেত্রে তিনি হঠাৎ 'কলকাত্তাইয়া' হয়ে যান কেমন করে। তাঁর কথ্য ভাষাতে গানটি বাঁচত হলে মজা অনেক বেশি জমতো।

আমাদের দর্শকদের গরিষ্ঠাংশই ভিজনশিয়ালী। গ্রাম্য নায়িকাকে শহুরে নায়ক যতই অপছন্দ করুক এবং বিবাহ

সুমিত্রা মুখার্জী

বিচ্ছেদের ব্যাপারটা যতই পাকা করুক, শেষ পর্যন্ত যে তারা আবার মিলিত হতে পেরেছে তাতে ভিন্ন ভিন্ন কারণে দর্শক প্রদর্শক পরিবেশক প্রযোজক সকলেই খুশি। উপরন্তু সহ-নায়িকাও নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করতে পেরে পরিচালক-চিত্রনাট্যকারের কাছে কৃতজ্ঞ। সবকিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শিল্পের কতটা কাছাকাছি পৌঁছল কি পৌঁছল না তা নিয়ে আক্ষেপ করে আর লাভ কি। আরও অনেক ছবির মত "ময়না" যে শেষ পর্যন্ত খাঁচায় বন্দী না থেকে মুক্তি পেয়েছে, বাংলা চলচ্চিত্রের এই দুর্দিনে সেটাই তো একটা বড় সান্ত্বনা।

চিত্রনাট্যের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে থেকেও যতটা সম্ভব বেরিয়ে এসে ভালো অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, সুমিত্রা মুখার্জী, নায়িকার দাদার চরিত্রে দিলীপ রায়, বাবার চরিত্রে অসিতবরণ এবং কিছুটা আরতি ভট্টাচার্য। রঞ্জিৎ মল্লিকেরও সেই চেষ্টা করাই উচিত ছিল। সুব্রত সেনকে যে অসহ্য মনে হচ্ছিল তার জন্য শিল্পীর চেয়ে তাঁর মেক-আপটাই বেশি দায়ী। অজয় গাঙ্গুলী এবং বীরেন চ্যাটার্জী প্রমাণ করেছেন একটু ভালো সংলাপ পেলে তাঁরা অবলীলায় দর্শকের অন্তরে পৌঁছে যেতে পারেন। মলিনা দেবীকে ছবিতে যে আর দেখা যাবে না তাঁর পর্দায় উপস্থিতির মুহূর্ত-গুলিতে সেই দুঃখটাই বড় বেশি করে বাজে।

এই ছবির গান সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন আছে। চমৎকার সুর করেছেন নবাগত সংগীতকার শচীন গাঙ্গুলী (এবং অনুপম মুখার্জী)। সবকটি গানের সুর এবং গাওয়া চমৎকার। গান দিয়েই একাধিকবার নাটক সৃষ্টি হয়েছে ছবিতে। নতুন এই সুরকারকে বাংলা ছবির দর্শকরা নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাবেন।

রবি বসু

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

জয়া আপ্পাস্বামী
(১৯১৮—)

রামকিংকর তাঁর 'সুজাতা'-র বিখ্যাত মূর্তিটি করেছিলেন দীর্ঘাংগী জয়া আপ্পাস্বামীকে দেখে। জয়া আপ্পাস্বামী একাধারে শিল্পী এবং কলা সমালোচক। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে ১৯৪৫-এ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কমিউনিস্ট চীনের জন্মলগ্নে তিনি পিকিং-এর কলেজ অব আর্টসের ছাত্রী ছিলেন (১৯৪৭-৫০)। ১৯৫৩ সালে তিনি ওহিওর ওবারলিন কলেজ থেকে শিল্পকলায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দিল্লি শিল্পীচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী শিল্পী এবং সভাপতি ছিলেন (১৯৬৪-৬৮)। এই সময় তাঁর অধিনায়কত্বে সংগীত এবং নাটকের প্রযোজনার ব্যবস্থা করে শিল্পীচক্র এবং বিহারের দুর্ভিক্ষের জন্যে ছবি নীলাম করে প্রচুর টাকা তোলেন।

ছাত্রী হিসাবে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে পিকিং-এ ছিলেন। তাছাড়া পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর ঘুরেছেন ১৯৭৩-এ। সরকারী সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে হাঙ্গারী, পূর্ব জার্মানী, ফ্রান্স পরিভ্রমণ করেন। ১৯৭৬-এ প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাদের প্রদর্শনী নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মঙ্গোলিয়ায় গিয়েছিলেন।

তিনি শিল্পকলা নিয়ে ওবারলিন কলেজে সহকারী গবেষক ছিলেন (১৯৬১-৬৩)। সিমলার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ এডভান্সড স্টাডির ফেলো ছিলেন (১৯৭০-৭১)। ১৯৭৭-এ শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। তারও আগে দিল্লির আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেছেন (১৯৫৩-৬৪)। তাঁর কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব অবশ্য ১৯৬৪-৭৬। এই সময় ললিত কলার পত্রিকা 'কনটেমপোরারী'র সম্পাদিকা ছিলেন এবং তাঁরই সম্পাদনায় শিল্পীদের জীবনী সম্বলিত সচিত্র পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হয়।

বহু গ্রন্থের লেখিকা তিনি। এগুলির মধ্যে 'অবনীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড দ্য আর্ট অব হিজ টাইমস' (নতুন দিল্লি ১৯৬৮) 'অ্যান ইনট্রোডাকসান টু মর্ডান ইণ্ডিয়ান স্কালচার' (দিল্লি ১৯৭০), রামকিংকর (১৯৬১), শৈলজ মুখোপাধ্যায় (১৯৬৫), ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯৬৮) কলা সমালোচক হিসাবে তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে।

কলকাতা এবং অন্যত্র বহুবার একক প্রদর্শনী করেছেন এবং যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৭৪-এ শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে আইফেকস পুরস্কার পান।

ছবিতে তিনি কখনোই প্রকৃতি বা জীবন থেকে দূরে সরে যাননি। সংযমী হলেও অন্তঃসলিলা আবেগ তাঁর কাজের মধ্যে স্বপ্রকাশ। নিবিড় ধ্যানের ছবি তাই আগ্রাসী আঁকিয়েদের ভীড়ে যাদের চোখে পড়ে না। প্রথম জীবনে

তাঁর ছবিতে নিঃসঙ্গ নারীদের একা দেখা যেতো। পরবর্তীকালে এরা ক্রমশ যক্ষীতে রূপান্তরিত হলো। তারপর তারা হলো বনবালা, অরণ্য দেবী, নদীর সাকার রূপ। যেন পৃথিবীর সব কিছু মাতৃরূপী শক্তির দৈবী লীলাস্থল। তাঁর হাতে সেই অর্থে ভারতীয় নিসর্গচিত্র নতুন মোড় নিল। নন্দলাল এবং চীনা নিসর্গচিত্রের প্রভাবে তিনি কিন্তু ভিন্নখাতে নিজের প্রতিভাকে বইয়ে দিলেন নিসর্গের মধ্যে যেন চলেছে সৃষ্টি-স্থিতির অবিশ্রাম খেলা। প্রকৃতি তাঁকে প্রেরণা দেয়। তাঁর ছবিতে শূন্যের অবয়ব চাপ চাপ রঙের ভাগবাটোয়ারায় বিধৃত। তাঁর ছবিতে নীল সবুজ এবং পরিপূরক হলুদ, কমলা এবং বাদামী রঙের প্রাধান্য এবং আছে নিপুণ বুনোটের সব মজাদার খেলা। ঐতিহ্য নির্ভর হয়েও তিনি বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন দুঃসাহস ভরে।

বৈকাল হ্রদ (তৈলচিত্র ৩০"×৪৮") পেছনে নীল পাহাড়। হালকা স্বচ্ছ আকাশ হ্রদের জলে মুখ দেখে গভীর ভালবাসায়। সামনে তীরভূমির আভাস। সবুজে, হলুদে, নীলে এই নির্জন হ্রদের পরিবেশের আবেশ দর্শককে আচ্ছন্ন করে।

জয়া আপ্পাস্বামী সমালোচক-সম্পাদিকা হিসাবে নিজের দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নতুন শিল্প-সমালোচক তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর অবদান প্রচুর। সমালোচকদের মতামত সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল—নিজের মত তাঁদের ওপর আরোপ করেননি। প্রাচীন, নবীন, রক্ষণশীল, বিপ্লবী সকল শ্রেণীর সমালোচককে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তেমনি তাঁরই জন্যে বহু তরুণ শিল্পী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। হয়তো এইসব জন্যে তাঁর সৃজনী কাজ কিছুটা কম হয়েছে, কিন্তু তিনি ফিরে তাকাননি। তাঁর আক্ষেপও নেই।

হরলিক্স

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যে আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্সকে। সে জানে, হরলিক্স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

ক্যালামাইন

কোমল ও ঝলমলে দীপ্ত

আকর্ষণীয় তিন রকম শেড

সুরভিত সুগন্ধ

মেয়েদের
মনের কথা
প্রকাশ পায় অনেক
সুন্দর পন্থায়
বিমল তাদের
মধ্যে একটি
VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

চিঠিপত্র

সন্ন্যাস

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' বইটির যে-আলোচনা 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য আলোচককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখক বা আলোচকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং এ-বিষয়ে আমি শ্রদ্ধাশীল। বইটি যে আলোচকের প্রশংসা পেয়েছে এতে বইটির অন্যতম সম্পাদক হিসেবে পত্রলেখক আনন্দিত। তবে আলোচকের কয়েকটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তাঁর মন্তব্যকে খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে সামান্য আলোচনা করাই লক্ষ্য।

আলোচক লিখেছেন, "ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে সন্ন্যাস কথাটির মানে হল ইহলোক থেকে মুখ ফিরিয়ে পরলোকের দিকে তাকানো। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভবত এই সংজ্ঞার এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।" সম্ভবত পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়েই আলোচক এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু 'ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে' সন্ন্যাসের অর্থ কি? গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কাম্যানাং কর্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"—অর্থাৎ, কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলে থাকেন। কাম্য কর্মের অর্থ সকাম কর্ম। সন্ন্যাস প্রসঙ্গে গীতার ৫ : ১, ২, ৩, ৬; ৬ : ১, ২, ৪; ৯ : ২৮; ১৮ : ১, ৭, ৪৯ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্লোকে আলোচনা রয়েছে। এর মূল কথা, ভোগের বাসনা ত্যাগই সন্ন্যাস। কর্ম ত্যাগ করতে শ্রীকৃষ্ণ কখনও বলেননি, বরং যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ নিষ্কাম কর্ম করার কথাই তিনি বলে গেছেন। তবে হ্যাঁ, নিষ্কাম কর্মের ব্যাপারে স্বামীজী এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন যে আলো তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। আরেকটি কথা, সন্ন্যাসের যেটি মূল মন্ত্র (প্রৈষমন্ত্র) তাতে পরলোককেও ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। পরলোককে ত্যাগ করলাম—এমন প্রতিজ্ঞা সকল সন্ন্যাসীকেই নিতে হয়। আর ইহলোককে যে ত্যাগ করার ব্রত নিতে হয় সেখানে ইহলোক বলতে বোঝাচ্ছে 'আসক্তি' বা 'বাসনা', প্রধানত কাম, কাঞ্চন ও মানযশের বাসনা। সন্ন্যাস নেবার সময় আরেকটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় যার ভাবার্থ—সকল প্রাণীকে আমি অভয় দান করছি। অতএব, ক্ষুধা-ব্যাধি ইত্যাদি ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা সন্ন্যাসীর কাছে 'পরধর্ম' নয়। স্বামীজীর মতো শিবাজী-গুরু রামদাস, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যারণ্য মুনি বা কেরালার নারায়ণ স্বামী ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ব্যাখ্যাত সন্ন্যাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আলোচকের আরেকটি মন্তব্য—"অবাক হয়ে যেতে হয় যখন দেখি, সন্ন্যাস জীবনের যাবতীয় ব্রহ্মানন্দে বুঁদ হয়ে থাকাই যে মানুষটির জীবনের পরমতম লক্ষ্য ছিল, তিনিই বলেছেন, 'আগে পেট ভরে খাও তারপর ধর্মকর্ম হবে'।" স্বামীজীর এই উক্তিটি (?) মূলত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি বলেছিলেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। বস্তুত প্রিয়তম শিষ্য নরেন যখন বার বার সমাধির জন্য ব্যাকুল হয়ে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিল তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন : ছিঃ, তুই তো ভারী হীনবুদ্ধি; কোথায় ভেবেছিলাম তুই বিশাল বটগাছের মতো হবি, হাজার হাজার লোক তোর আশ্রয়ে শান্তি পাবে, আর তুই নিজেই কিনা মুক্তি চাইছিস? স্বামীজীর জীবনী পড়লেই স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে কিভাবে লোককল্যাণে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। আসলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাদ দিয়ে স্বামীজীর মূল্যায়ন করা কঠিন।

আলোচক আরও লিখেছেন—"এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকদের 'বায়াস' হল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।" আসল কথা গ্রন্থের লেখকেরা স্বামীজীর মানসিকতা ও কর্মের উৎসে যেতে চেয়েছেন। স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনা, কৃষিচিন্তা শিক্ষা - অর্থনীতি -রাষ্ট্রনীতি-সঙ্গীত-সাহিত্য-শিল্প -মানবতাবাদ-বিপ্লবচিন্তা ইত্যাদির পরিচয় দেবার সাথে সাথে সেইসব চিন্তার গোমুখী'টিকেও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাঁকে শুধু সন্ন্যাসী, বা দেশপ্রেমিক, বা সাহিত্যিক বা মানবতাবাদী বলাটা ভুল ঠিকই, এবং নাস্তিক রাজনীতিবিদও তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন এ-কথাও ঠিক, তবে স্বামীজীর চিন্তার মূল সূত্রটিকে আবিষ্কার করতে গিয়েই লেখকেরা ধর্মকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। স্বামীজীর নানান চিন্তার আশ্চর্য প্রতিফলন দেখতে পাই পরবর্তী যুগে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'নবমানবতাবাদ' দর্শন ও রাষ্ট্রনীতিতে, যদিও একজন অধ্যাত্মবাদী, দ্বিতীয়জন জড়বাদী। স্বামীজীর চিন্তার এই উৎস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে মূল্যায়নে ভুল থেকে যেতে পারে যা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে লক্ষণীয়।

বর্তমান পত্রলেখকের প্রবন্ধটিকে সাধুবাদ জানানোয় আলোচককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন, অর্থাৎ স্বামীজী মার্কসের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা, এটি একটি আলাদা প্রসঙ্গ। একটি জায়গায় পাই যে, তিনি বলছেন, তাঁর কাছে কমিউনিস্ট নেতারাও আসতেন এবং তাঁর কাছে শিক্ষণীয় তত্ত্ব পেতেন। পাশ্চাত্য নতুন দর্শনের মধ্যে তিনি সোস্যালিজম্, নিহিলিজম্ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মার্কসিজম বা কমিউনিজমের নয়। অবশ্য, তাঁর মতো সমাজসচেতন ও অধ্যয়নশীল ব্যক্তি মার্কসিজম্ সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন না, এটি ভাবতেও কেমন লাগে! যাই হোক, এটি পৃথক গবেষণার বিষয়। আলোচকের অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো অন্যত্র।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন, চেরাপুঞ্জী, মেঘালয়

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি

৯১ই ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি সম্পর্কে শিশিরকুমারের উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্‌পট বর্ণনার জন্য শান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। শিশিরকুমার

কবি সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রভক্তিতে তাঁর চেয়ে কম যেতেন না। দুজনেই বিশ্বকবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে কবিতা লিখুন এই বাসনা শিশিরকুমার সযত্নে লালন করেছিলেন—তার প্রমাণ পাই বেশ কয়েক বছর পরে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" ভবনে যেদিন সত্যেন দত্তের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে শিশিরকুমার ঐ কবিতাটি স্বয়ং আবৃত্তি করার পূর্ব-মুহূর্তে হুবহু ঐ কথাগুলিই বলেছিলেন, যথা—"যদি জানতাম আমার মৃত্যুর পরেও......."!

শুধু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি নয়; কবির অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে শিশিরকুমারের এত উচ্চ ধারণা ছিল যে "বিসর্জন" নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয় দেখে শিশিরকুমার বলেছিলেন—"আমি স্টেজ ভেঙে ফেলেও এ রকম অলৌকিক অভিনয় করতে পারব না!"

অসুস্থতা ও বার্ধক্যে পীড়িত শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি—"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা কোনো দিনই বুড়ো হব না—আমাদের ভয় কিসের?"

প্রভাত বসু কলিকাতা—১৪

গঙ্গার জল

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রাণেশ চক্রবর্তী লিখিত "গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন" লেখাটি সম্বন্ধে কিছু না বলে পারছি না। লেখাটির প্রথম লাইনেই এমন একটি ভুল যা অত্যন্ত বিসদৃশ—প্রত্যেক নদীর জন্মই কি গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ থেকে? উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান নদী (গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, ঝিলাম) ছাড়া অন্যান্য নদীগুলোর জন্ম যে হিমবাহ থেকে নয়, মনে হয় সকলেই তা স্বীকার করবেন। লেখক একজন বিখ্যাত পর্বতারোহী শুনেছি, তিনি অবস্থিতি সম্বন্ধে একটু যত্নবান হয়ে মানচিত্র ঘেঁটে যদি দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন গঙ্গোত্রীর বারো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নয়, দক্ষিণ-পূর্বে গোমুখের উৎপত্তি। তারপর এই লাইনটি—"যে বিপুল পরিমাণ জল দিনের পর দিন বছরের পর বছর অক্লেশে গঙ্গাকে জল যুগিয়ে চলেছে সেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ হিমালয়ের অন্যতম হিমবাহ;"—এর সঠিক অর্থটা বোধগম্য হল না, মনে হয় লেখক "যে বিপুল পরিমাণ তুষার......." বলতে চেয়েছেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে গঙ্গার জল শুকিয়ে যাওয়ার যে থিওরী তিনি বলতে চেয়েছেন তা সহজে মেনে নেওয়া যায় না কারণ তিনি কি শৈলিক পর্যায়ে (upper reaches) ভাগীরথীর জলের প্রবাহ পরিমাপ করে দেখেছেন? আমরা এও তো জানি যে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের ফলেও বিপুল জলরাশি নদীতে এসে পড়ে। তাছাড়া লেখক "গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন"—কোথায়, পার্বত্য এলাকায়, না সমভূমি পর্যায়ে সেটা পরিষ্কার করে লেখেননি।

এই প্রবন্ধে একটা কথা [illegible] আছে [illegible] তার প্রভাব উপ-নদীর জলের ধারাও পুষ্ট হয়েছে এবং প্রায় সমস্ত উপনদীগুলোতেই বাঁধ দিয়ে জলের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সেই সব উপনদীগুলো নিশ্চয়ই আগের মত সেই পরিমাণ জল গঙ্গায় আনতে পারছে না। আর উঁচু পার্বত্য এলাকায় হিমবাহের পিছিয়ে যাওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, এটা সাধারণত হয়েই থাকে, অনেক সময় এগিয়েও আসে, [illegible] এলাকায় এর প্রমাণও পাওয়া যায়। আর প্রাকৃতিক যে কোন ব্যাপারেই পঞ্চাশ বা একশ' বছরে কি হল বা না হল তার থেকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসাটা আমার মনে হয় ঠিক নয়।

বিশ্বরূপ গোস্বামী কলকাতা

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র

আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রসূন মুখোপাধ্যায় বলেছেন— 'বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র' নামে লেখক এ পর্যন্ত যা প্রকাশ করেছেন, তার সব কটিই কি সত্যই অপ্রকাশিত?

প্রথমত—আমার প্রবন্ধের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী' বা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' নয়। নাম—বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র। 'বঙ্কিম-চন্দ্র' এবং 'কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' এই দুটি পৃথক কথাকে 'ও' দিয়ে যোগ করা হয়েছে। তাই 'কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' বলায় এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, এমন কি সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূরও অপ্রকাশিত পত্র রয়েছে। আর প্রবন্ধের নামের মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র'ও থাকায় প্রধানত অপ্রকাশিত পত্রের সূত্রেই বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত স্বীকৃতি সহ প্রকাশিত পত্রের কথাও বলেছি।

দ্বিতীয়ত—প্রবন্ধে কোথাও বলিনি যে, যে পত্রগুলি প্রকাশ করছি, সেগুলি সবই অপ্রকাশিত। এক তো বলেছি, কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র, তাছাড়া যে চিঠিগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে বার বার বলেছি প্রকাশিত। প্রসূনবাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের যে চিঠির কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধেও তো বলেছি, ঐ চিঠি রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। আর প্রসূনবাবু আমার যে ৫ম কিস্তির লেখার কথা বলেছেন, তাতে আমি তো পরিষ্কারই লিখেছি—বঙ্কিম-চন্দ্রের পারিবারিক চিঠিগুলির মধ্যে কয়েকটা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই অপ্রকাশিত। এখনও বেশ কিছু চিঠি অপ্রকাশিত থেকে গেল।' কেন অপ্রকাশিত রাখলাম তাও বলেছি। তবুও প্রসূনবাবু অহেতুক ও অসংগতভাবেই ঐ প্রশ্ন তুলেছেন।

তৃতীয়ত—প্রসূনবাবু বলেছেন, আমার প্রবন্ধের নামের 'অপ্রকাশিত' বদলে 'অনালোচিত' করা উচিত ছিল। কিন্তু কেন? প্রসূনবাবু নিজেই

বলেছেন—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বই ছাড়া অন্য কোথাও এই পত্রগুলি তেমন করে গ্রথিত হয়ে উঠল না। এতে তিনি তো নিজেই স্বীকার করছেন, পত্রগুলি আগেই গ্রথিত বা আলোচিত হয়েছে। (যদিও হেমেন্দ্রবাবুর বইয়ে কয়েকটা চিঠি আছে এবং তারও মধ্যে কিছু চিঠি ভুল, বিকৃত ও খণ্ডিত-ভাবেই আলোচিত হয়েছে।) অতএব অনালোচিত নাম হবে কিরূপে? 'কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি' নাম ঠিকই দিয়েছি। আর আমার প্রবন্ধে যে বেশ কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি আছে, তাতে তো আর কারও সন্দেহ নেই!

প্রসূনবাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থ সংখ্যার প্রসঙ্গে কোন কারণ না দেখিয়েই সাহিত্য সাধক চরিতমালার ভুলের কথা বলেছেন। অথচ সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনীতে এর লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বইয়ের নাম ও প্রকাশের তারিখ দিয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য, রাজকৃষ্ণ রায়ের বই-এর সঠিক সংখ্যা আমার প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। তাই সাহিত্যসাধক চরিতমালায় ঐ বই-এর সংখ্যা ভুল কি ঠিক সেটা আমার বর্তমানে আলোচ্যই নয়।

রাজকৃষ্ণবাবুকে লেখা চিঠিটির প্রসঙ্গেও আমার ঐ একই কথা। আমার প্রবন্ধে প্রসঙ্গগত ঐ চিঠিটির প্রয়োজনীয় অংশটুকুই নিয়েছি। কিছুটা বাদও দিয়েছি। সমস্ত চিঠিটি আমার প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। প্রসূনবাবু পুরো চিঠিটার খোঁজ করে-ছেন। তিনি দেখতে পাবেন, চিঠিটি সাহিত্যসাধক চরিতমালায় ছাড়া অন্য হচ্ছে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কবিকণ্ঠহার' গ্রন্থেও ছাপা হয়েছে।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা-৭০০১২

বিজ্ঞান

"অগ্রজ বিজ্ঞানী কে আর রামনাথন" সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলে পারলাম না।

মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে কর মহাশয়ের (এবং আরও অনেকের) একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি রয়েছে। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার শৈশব পার হয়েছে বহুকাল। এখন দেশে বিজ্ঞানের উচ্চমান রক্ষার কথা স্মরণ করে ঐ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা একান্ত প্রয়োজন।

মৌলিক গবেষণা তাকেই বলবো যার দ্বারা কোন সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা-ধারা, ব্রহ্মাণ্ড-পদার্থ-শক্তি-জীব গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির যুগান্তকারী নির্দেশ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গবেষণা-পত্র মাত্রই কোনও না কোন নূতন তথ্যের আধার ঠিকই। কিন্তু সে তথ্য মৌলিক না-ও হতে পারে। বেশীর ভাগ গবেষণা পত্রের তথ্য ও রূপ কোনও মৌলিক গবেষণার অনুকার বা অনুরণন। উদাহরণস্বরূপ বর্ণালী বীক্ষণের কথাই ধরা যাক। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সংখ্যা লক্ষের কোঠায়। কিন্তু তার মধ্যে মৌলিকের সংখ্যা মাত্র শতকের কোঠায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরাও সারাজীবন সাধনা

[illegible]
গবেষণাগুলো [illegible] করেছেন। তাঁদের মধ্যে [illegible] কমল পত্রলেখাই [illegible]। পাঁচ বছরে পঞ্চাশটিও (তাও আবার তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে)। [illegible] কথা (আলোচ্য নিবন্ধের ২য় পৃষ্ঠার ১ম কলমের ২য় প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)।

বিজ্ঞান-বিজ্ঞানী সম্বন্ধে কিছু বলতে, বিশেষ করে লিখতে, তথ্য সম্বন্ধে লেখকের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। লেখক তাঁর মতামত, ধারণা ইত্যাদি নিজের খুশি অনুযায়ী লিখতে পারেন; ওটা তাঁর নিজস্ব। কিন্তু তথ্য মতামত বহির্ভূত। ওটাকে নির্ভুল সরবরাহ করতে হবে।

ভারতীয় আবহ-বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতীয়করণের পর (১৯৪৪ খৃঃ) প্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর জেনারেল যিনি হন তাঁর নাম ডঃ সুধাংশুকুমার ব্যানার্জি। ডঃ ব্যানার্জি ঐ পদ থেকে অবসর নেন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ রামনাথন অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং, তাঁর ডি-জি পদ থেকে অবসর নেবার সুযোগ জুটলো কই? কর মহাশয় শুধু এই ভুল তথ্যই পরিবেশন করেননি। তার চেয়েও বড় অন্যায় করেছেন যে ভাবে এ খবরটি পরিবেশন করেছেন। ও'র লেখা পড়ে পাঠকের এ ধারণা হওয়া অন্যায় নয় যে ঐ খবর তিনি সংগ্রহ করেছেন ডঃ রামনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে।

বলা বাহুল্য, আমার উদ্দেশ্য কর মহাশয়ের লেখা পড়ে ডঃ রামনাথন সম্বন্ধে যেন লোকের ভুল ধারণা না হয়। [illegible] ছিলেন যে বিজ্ঞান-সাধনায় ও [illegible] চিন্তনের ধারক তার জন্য তিনি সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের, বিশেষত আবহ-বিজ্ঞানীদের, পরম শ্রদ্ধাভাজন।

মনতোষ গঙ্গোপাধ্যায়
পুনে-১৬

ফুটবলের ছবিতে ভুল

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ৬৬ পৃষ্ঠার "এক নজরে জাতীয় ফুটবলের ফল" শীর্ষকে প্রকাশিত ছবিটির তথ্য পরিবেশনে কিছু ভুল আছে। ছবিটিতে গোলে প্রবিষ্ট খেলোয়াড় বাংলার শ্যাম থাপা নয় কারণ ফাইনালে বাংলা হাফ হাতা জার্সি পরে খেলে নি তা পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিগুলি থেকে বোঝা যায়। ছবিটি পাঞ্জাব বনাম কেরলের দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালের প্রথম গোলের দৃশ্য। গোলে প্রবিষ্ট খেলোয়াড়টি কেরলের নাজিমুদ্দিন।

প্রদীপ দত্ত
কলিকাতা-৩২।

সংশোধন

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় আর্কো পোলোর কলিকাতা দর্শন' শীর্ষক পত্রের লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথের স্থলে রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হবে।

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

পঙ্কজকুমার মল্লিকের রচনা
আধুনিক বাংলা গান
জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ
বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব
সমরেশ মজুমদারের গল্প
জিয়োন মাছ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি-২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সমাজহিতের দায়িত্ব ও প্রশাসন

সংবিধানের বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের নিয়ামক নীতির নির্দেশ আছে, যদিও এক্ষেত্রে বেশির ভাগ নির্দেশ বস্তুত পরোক্ষ বলে অভিহিত হতে পারে। শিক্ষা সম্বন্ধে সাংবিধানিক নির্দেশের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সংস্কৃতি সম্বন্ধে 'কম্পোজিট কালচার' এক সমন্বিত সংস্কৃতির নির্দেশক অঙ্গীকার আছে। সমাজহিতের কর্তব্য ও নীতির নির্দেশ আছে। সরকারী কর্তব্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হয়ে আকাদেমি বলে অভিহিত একাধিক সংস্থা প্রচলিত আছে, যদিও এগুলি প্রত্যক্ষ প্রকারে সরকারী প্রশাসনের পরিচালনাধীন নয়। এগুলি আত্মশাসিত সংস্থা বলে অভিহিত। প্রত্যক্ষ প্রকারে সরকারী প্রশাসনের অধীন না হলেও এ সত্য স্বীকার করতে হয় যে, সরকারের প্রভাব এই সব সংস্থার মধ্যে নিতান্ত একটা শূন্যতা নয়।

প্রত্যেক রাজ্য সরকারের আচরণে যেমন শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কর্তব্যের অঙ্গীকার ক্রিয়ান্বিত হতে দেখা যায়, তেমনই সংস্কৃতি সাহিত্য সমাজহিত ও শিল্পকলা সম্বন্ধে পরোক্ষ কর্তব্যেরও প্রকাশ দেখা যায়। এই কর্তব্যের পুরোভাগে একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়ে নিয়োজিত করে রাখবার দৃশ্য প্রায় সব রাজ্যেই দেখা যায়। যদি সাহিত্য ও শিক্ষার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধু সমাজহিত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তবে দৃশ্যটা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে উপভোগ্য বলে বোধ হবে না। বরং তাঁর মনে নানা রকমের ভয়াবহ সন্দেহের বিভীষিকা ঘনিয়ে উঠবে। বিশেষ করে, বড় বড় পূজার সোৎসব অনুষ্ঠান, যেগুলি জনজীবনের পক্ষে আনন্দের সমারোহময় উদ্‌যাপন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সেগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর নিদারুণ এক অনাচারের অনুষ্ঠান বলে বোধ হবে। ঘটনাক্ষেত্রের সব স্থানের সব দৃশ্য একই প্রকারের অবশ্য নয়। সুস্থ সদাচারিত অনুষ্ঠান অনেক সঙ্ঘ ও সংস্থার উৎসাহে ও প্রয়াসে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ দুর্গাপূজা কালীপূজা ও সরস্বতীপূজার সমারোহ বস্তুত সাংস্কৃতিক অনাচারিতার একটি গ্লানিবহুল অনুষ্ঠান। এই শোচনীয় ঘটনাকে প্রাচীন রোমের সভ্য-সংস্কৃতির উপর বর্বরীয় আক্রমণের অনুরূপ একটি ঐতিহাসিক বিষাদের নিদর্শন বলে মনে করা চলে। এবং সেই সঙ্গে দুঃখও বোধ করতে হয় যে, পূজার শাস্ত্রীয় বিধানের অনুগত নিয়মসমূহের জন্য নিষ্ঠার সামান্য সম্বলও নেই, এমনতর অযোগ্য ও শিক্ষাবর্জিত একশ্রেণীর বালক ও যুবকের নেতৃত্ব কয়েকটি হিন্দু উৎসবের অদৃষ্টের উপর আরোপিত হয়েছে। চাঁদা আদায়ের জুলুম, যাতায়াতের জনপথের উপর অবৈধ আধিপত্যে মণ্ডপ নির্মাণ করা, এবং মাইক নামক যন্ত্রের শান্তিসংহারক নিনাদ ; বীভৎস অশালীন সঙ্গীতের দিনরাত্রির ক্লান্তিহীন চিৎকার ; সব মিলিয়ে শত-শত 'সর্বজনীন' পূজার অনুষ্ঠান যেমন সামাজিক সৌষ্ঠব ও শান্তির, তেমনই সাংস্কৃতিক শ্রী ও রম্যতার যে হত্যা সম্ভব করে, সেটা সামাজিক কল্যাণের সমূহ ভবিষ্যতেরই সৌষ্ঠব ও অভিরুচির সর্বনাশক অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন করতে হয়, যে-সরকার সমাজ ও সংস্কৃতির কল্যাণকৃৎ হবার অঙ্গীকার নিয়ে কর্তব্যেরও মন্ত্রণালয় বিহিত করেছেন, সে সরকার মাইকধর্ষিত পূজা-উৎসবের দুর্ভাগ্যের করুণ বিলাপ কি শুনতে পান? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একটি দশ বছর বয়সের মূঢ়মতি ও কাণ্ডবোধবিহীন বালক একটি মাইকের সাহায্যে অবিরাম নিনাদের আঘাত দিয়ে পাড়ার হাজার-হাজার মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের সমূহ বিপন্নতা ঘটিয়ে দিতে পারে। ঘরে বসে দুই ব্যক্তি কথা বলতে পারবেন না, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রোগ্রামের সব হর্ষ চাপা পড়ে মিথ্যে হয়ে যাবে, রোগীর কাতর আহ্বান ঘরের ভিতরে স্বজনের কানে প্রবেশ করবে না, ঘরের দরজার কাছে আগত ব্যক্তির কোন হাঁক-ডাকের শব্দ ঘরের ভিতরে পৌঁছবে না ; ঘুম অসম্ভব হবে, জপতপ আহত হবে, লেখাপড়ার আত্মা মূক হয়ে ছটফট করবে, এবং মুমূর্ষু রোগীর প্রাণের সাড়া সেই অভিশপ্ত হল্লার কয়েকটি প্রবল আঘাতেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এহেন নিদারুণ সামাজিক ক্ষতি সাধিত করবার অবাধ সুযোগ এনে দিয়েছে মাইক নামক একটি বস্তু, অন্য ক্ষেত্রে এর যে উপযোগিতা থাকুক না কেন। স্মরণ করিতে হয়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই অভিযোগের কথা যে, পাড়ার মাইকযন্ত্রের হল্লা সহ্য করতে না পেরে তাঁর মৃত্যু হবে ('আর বাঁচবো না')। কী নিষ্ঠুর রকমে সত্য হয়েছিল তাঁর আশংকা। দিন দুই পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, কোন নৈতিক যুক্তিতে মাইক ব্যবহার করবার এরকম অত্যাচারের সমর্থন করা সম্ভব নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে এমন সব জঘন্য 'ধর্মীয়' অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে যেগুলি গোপনতার বাইরে বের হয়ে এলেই দেশের আইন তাকে শাস্তি দিয়ে সায়েস্তা করবে। মাইক নামক যন্ত্রের প্রগল্‌ভ ব্যবহারের শব্দ কারও ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকুক, তাতে অন্যের পক্ষে কোন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু অথচ ধর্মানুষ্ঠানের উপলক্ষ্য নিয়ে মাইকের জঘন্য ব্যবহার কিন্তু ঘরের বাইরে হাজার জনের শান্তি স্বস্তি ও সাংস্কৃতিক অভিরুচির উপর অত্যাচার করে। এরকম শব্দবাণ নিক্ষেপ করবার অবাধ অধিকার কারও থাকতে পারে না। দেশের সরকার সমাজ ও সংস্কৃতিকে এই দুর্ভাগ্যের আঘাত থেকে মুক্ত করবার কোন আইন কি বিহিত করতে পারেন না?

তৃতীয় বিশ্ব বই-মেলা

সুনীত ঘোষ

নয়াদিল্লির পুরোনো কেল্লার মুখোমুখি 'প্রগতি ময়দান'। রাজধানীর স্থায়ী মেলা প্রাঙ্গণ। মাত্র কিছুদিন আগে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কৃষি মেলা', তারপরে 'শিল্প মেলা'। তারপরেই হয়ে গেল বিশ্ব বই-মেলা। এই রাজধানীতেই প্রথম বিশ্ব বই মেলা হয়েছিল ১৯৭২ সালে, দ্বিতীয় মেলা ১৯৭৬ সালে। এখন তৃতীয় মেলা। এবারে আয়োজন একটু ব্যাপক। গত ৭/১ ফেব্রুয়ারি প্রায় চৌদ্দ হাজার বর্গ-মিটার জুড়ে দশ দিনের এই মেলার উদ্বোধন করেন উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বি ডি জাত্তি। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স এবং ফেডারেশন অব পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলায় প্রায় দু' লক্ষ বই এসেছে।

বিভিন্ন দেশের রঙ-বেরঙের পতাকা ও রোশনাইয়ে মেলা প্রাঙ্গণ ঝলমলে। ১নং গেটের দু-উচ্চ স্তম্ভগুলির ফাঁক দিয়ে তাকালেই সর্বপ্রথম চোখে পড়বে 'জাতি কক্ষ' (হল অব নেশন্স)। এরই সমস্ত দোতলা জুড়ে 'হিন্দী মণ্ডপ'। প্রায় শতাধিক হিন্দী পুস্তক প্রকাশক একজোট হয়ে এই মণ্ডপটির আয়োজন করেছেন। সুসংগঠিত এই মণ্ডপটির সর্বাঙ্গে সাফল্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ের চিহ্ন। গত বিশ-পঁচিশ বছরে হিন্দীভাষা যে কী জোর কদমে এগিয়েছে—এবং এগোচ্ছে তার এক নির্ভরযোগ্য ঝাঁকি পাওয়া গেল এই হিন্দী মণ্ডপে। তরক্কি কেবল বই-এর শোভন বহিরঙ্গ অথবা আধুনিক প্রকাশন পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগেই নয় তরক্কি সর্ব-বিষয়ে। মনে হয় এমন কোন বিষয় নেই যা হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গল্প-কবিতা-উপন্যাস সমালোচনা ইত্যাদি বাদ দিলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও কারিগরি বিষয়ে হিন্দীতে যে এত বই লেখা হয়েছে তা অন্তত আমার জানা ছিল না। 'রাজস্থানী কক্ষে' বিরাটকায় 'রাজস্থানী হিন্দী শব্দকোষ' রাষ্ট্রভাষায় রাজস্থানী ডায়লেক্ট নিয়ে গবেষণার নজির। দু'পা এগোলেই চোখে পড়বে বিরাট আকার পুরু রেক্সিনে বাঁধাই সুদৃশ্য চতুর্বেদের হিন্দী অনুবাদ। আধুনিক ইনডাসট্রিয়াল সাইকোলজি নিয়ে লেখা 'ঔদ্যোগিক মনোবিজ্ঞান', সূচীশিল্প নিয়ে লেখা 'আধুনিক সিলাই কলা', আধুনিক হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত 'ফাইনান্সিয়াল আকাউন্টিং', অর্থনীতি সংক্রান্ত 'নিয়োজন তথা আর্থিক বিকাশ' থেকে সাংবাদিকতার উপরে লেখা 'হিন্দী পত্রকারিতা বিবিধ আয়াম' এবং লোকগীতের উপরে 'রাজস্থানী লোকগাথা' হিন্দী লেখকদের বিষয়-পরিধি প্রমাণ করে। হিন্দী লেখকেরা যে কত খোলা মনে অন্য ভাষা থেকে রত্ন সংগ্রহ করে নিজেদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করছেন তা হিন্দীতে অনুদিত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গৌরকিশোর ঘোষ, শংকর প্রমুখ লেখকের বইগুলো দেখলেই বোঝা যায়। তবে আজমীরের কৃষ্ণ ব্রাদার্স প্রকাশিত কাকা সাহেব কালেলকার রচিত 'যুগমূর্তি রবীন্দ্রনাথ'-এর বানানের দিকে বোধ হয় না তাকানই ভাল।

শিশু সাহিত্যের বইও প্রচুর। 'আট সে অস্সী সাল তক বচ্চোঁকে লিয়ে' লেখা অজস্র স্বল্পমূল্যের সুদৃশ্য পকেট বই-এর স্টলে ছেলেমেয়েদের ভীড় লেগেই আছে। তবে এতে স্টলমালিকরা একটু বিতিব্যস্ত কারণ ভীড়ের মধ্যে কিছু চতুর ছেলে বই-এর পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে বইখানাই পকেটে রেখে দিচ্ছে। প্রতিদিনই এরকম কিছু-কিছু পড়ুয়া ছেলেকে মণ্ডপ থেকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

'Every Book deserves a beautiful person like you' (আপনার মত একজন সুন্দর মানুষ প্রতিটি বই-এর প্রাপ্য)। জাতিকক্ষের নীচের তলায় প্রবেশ পথে এই স্লোগান দর্শক-দের স্বাগত জানায়। ভেতরে ঢুকতেই ডাইনে-বাঁয়ে চোখ-ধাঁধানো ইংরেজী বই-এর ছড়াছড়ি। এবং স্ল্যাকস ও বেল-বটম পরা তরুণ-তরুণীদের ছোটাছুটি। দেখলাম, অনেকেই সাগ্রহে একখানা বই নিয়ে টানাটানি করছেন। বইখানার নাম 'Sexual Politics' (যৌন রাজনীতি)। অনেকে আবার উলটে-পালটে দেখছেন বিখ্যাত বেহালাবাদক
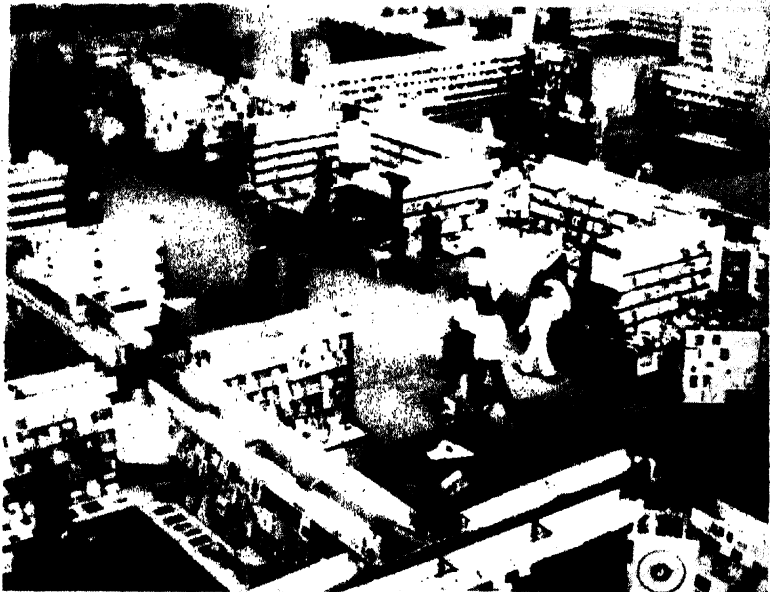
য়িহুদি মেনুহিনের 'An unfinished Journey' এবং বেদ মেহতার 'Mahatma Gandhi and his Apostles'। অন্যান্য বই-এর মধ্যে সহজে নজরে আসে পশ্চিম জার্মানীর স্প্রিংগার-ভারলাগ কোম্পানীর "Pathology of the Femele Genital Tract". কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত ডেনিস কিংসকেইড-এর লেখা 'British Social life in India' জে-এম গোল্ডথর্প-এর 'Sociology of Third World' এবং ডব্লু জি আর্চারের লেখা "Kalighat Paintings"।

কিন্তু আর কয়েক পা ভেতরে গেলেই মনটা ভারী হয়ে আসে। সেখানে বিভিন্ন অহিন্দীভাষী রাজ্যের প্রকাশকেরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। হিন্দী মণ্ডপের চোখ-ধাঁধানো জেল্লা এখানে নেই। ভীড়ও কম। সবই কেমন যেন ম্যাটম্যাটে। পশ্চিম বাংলার প্রায় চল্লিশজন প্রকাশক একটা আলাদা জায়গা নিয়ে তাদের দোকান খুলে বসেছেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার অনেক নামজাদা প্রকাশকই অনুপস্থিত। তাছাড়া যে-সব বই দেখান হচ্ছে তা থেকে পশ্চিম বাংলার প্রকাশন শিল্পের দীন চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। একই কথা প্রযোজ্য ওড়িশা, কেরালা, আসাম, গুজরাত প্রভৃতি রাজ্যের প্রকাশন ব্যবসা সম্পর্কে।

কয়েক গজ দূরে শিল্পকক্ষে (Hall of

Industries) আর এক অলমলে দুনিয়া। সেখানে ৩৫টি দেশের ২০০ প্রকাশক তাদের পণ্য নিয়ে বসেছেন। দেশগুলির মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশ এবং নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্থান, মরিশাস, কেনিয়া, ভিয়েতনাম, নাইরোবি, ইরাক, মেক্সিকো, কিউবা, ঘানা, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশ। বলাবাহুল্য, অধিকাংশ বই ইংরেজীতে লেখা। তবে বিভিন্ন দেশের নিজ নিজ ভাষাতে লেখা বইও বিস্তর।

হিন্দী মণ্ডপের পরেই এখানে ভীড় বেশী। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "Transfer of Power" সিরিজের ছ'খানা ভল্যুম দেখা গেল প্রদর্শনীতে। উন্নত দেশগুলি থেকে প্রকাশিত বই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু কয়েকটি উন্নয়নশীল ছোট ছোট দেশও প্রকাশন শিল্পে যে অভাবনীয় উন্নতি করেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সম্পর্কে জাপানী গবেষকদের অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ মুণ্ডাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখা 'Cultural Formats of the Mundas' এবং 'Hill People Surrounding Ganges Plains'

তেমনি, প্রাচ্য সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার গবেষকদের কৌতূহলের সাক্ষ্য বহন করছে আফগানিস্থান সম্পর্কে লেখা "South west Afghanistan"। বে-সরকারী প্রকাশন সংস্থা ছাড়াও মেলায় যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্র-সংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই এল ও)।

ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী বই-এর মধ্যে জরুরী অবস্থা নিয়ে লেখা বইগুলিও আছে।

'ইন্দ্রধনুষ' মণ্ডপের সবটাই জুড়ে আছে "জাতীয় প্রদর্শনী"। এটা মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের নিজস্ব ব্যাপার। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে ইংরেজী ও অন্যান্য সংবিধান স্বীকৃত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রায় ছ' হাজার বাছাই করা বই এখানে প্রদর্শিত। প্রায় ৬০০ বই আনা হয়েছে পশ্চিম বাংলা থেকে। হিন্দী বই-এর সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেশী। আলাদা করে সাজান হয়েছে শিশুসাহিত্য এবং পেপার-ব্যাক। বারটি সরকারী উদ্যোগও অংশ গ্রহণ করেছেন এই প্রদর্শনীতে।

কিন্তু ভীড় সবচেয়ে বেশী "বই বাজারে"। মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে কয়েকশ' পুস্তক বিক্রেতা হাজার হাজার ইংরেজী ও হিন্দী বই নিয়ে বসেছেন। একটু ধৈর্য ধরে দরাদরি করলে ১০০ টাকার বই ৫০ টাকায় কেনা যায়। বলাবাহুল্য, ভীড় এখানে বেশী এবং বহু বিদেশী খরিদ্দার এই দরাদরির সুযোগ নিয়েছেন।

মেলা কেবল রাশি রাশি বই দেখাবার জন্যই নয়। আনুষঙ্গিক হিসাবে আছে বই ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষামূলক পুস্তক প্রকাশন সমস্যা নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত তার বিস্তারিত আলোচনা। এতে আমেরিকা, বৃটেন, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট প্রকাশকেরা যোগ দিয়েছেন। ভারতের যে কজন প্রকাশক এতে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৬ জনই দিল্লীর, ২ জন বোম্বাই-এর এবং মাদ্রাজ ও কলকাতার একজন করে।

মেলা চলাকালে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স বই প্রকাশনায় সম্পাদকদের ভূমিকা সম্পর্কে আট দিনের এক অনুশীলনীর ব্যবস্থা করেন। বই বণ্টন নিয়েও এক সেমিনার হয়েছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি। 'আন্তর্জাতিক বই-এর বাজারে ভারতের প্রভাব' এ-নিয়ে শীতল প্রিয়লানি স্মারক বক্তৃতা দেন লণ্ডন বাটারওয়ার্থ কোম্পানীর চেয়ারম্যান লর্ড গ্রাহাম। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অথর্স গিল্ড আয়োজিত 'ভারতীয় গ্রন্থকারদের চতুর্থ জাতীয় কনভেনশনে লেখকদের পেশাগত ও আর্থিক সমস্যা, সরকারী প্রকাশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকদের অভিযোগ, ভারতীয় ভাষার লেখকদের সমস্যা নিয়ে বিস্তর বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে। এই কনভেনশন অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজী-নবিশ লেখকের ঘরোয়া ব্যাপার ছিল। এমন কি ভারতীয় ভাষার লেখকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনাচক্রে পূর্ব ভারতের কোনও বিশিষ্ট লেখকের স্থান ছিল না।

প্রকাশন ব্যবসায়ে বিশ্বে ভারতের স্থান অষ্টম। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৮ কোটি, কিন্তু বছরে বই ছাপা হয় গড়ে ১৫ হাজার। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারই ইংরেজী, যদিও ইংরেজী জানা শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ। হিন্দী বই-এর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং বাংলা প্রায় এক হাজার। বাকী সাত হাজার অন্যান্য ভাষায়। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় জনসংখ্যা এবং বই-এর আনুপাতিক হার খুবই নগণ্য—প্রতি দশ লক্ষের জন্য মাত্র ২৭ খানা বই। কিন্তু এ-থেকেও বই-এর প্রচার সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু বই নিশ্চয়ই স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করে। অনেক বই-এর বরাতে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার সুযোগও আসে না—গুদামেই উই-এর ভক্ষ্য হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজে পাঠ্য বই-এর কথা আলাদা। সেখানে স্বেচ্ছাক্রয়ের কোন কথা নেই, পরীক্ষা পাশের জন্য ছাত্ররা কিনতে বাধ্য।

অপরাধী কে? অনেক লেখক ও প্রকাশকের মতে সাধারণ লোকের বই পড়ার অভ্যাস নেই। এ-কথায় হয়ত কিছু সত্য আছে। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, দামলা আজকের খা-পোষা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বই পড়ার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সংগতির অভাবে বই কিনে পড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেকে বই পড়াই ছেড়ে দিয়েছেন।

বই মেলায় লেখক ও প্রকাশকের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু স্বল্পবিত্ত পাঠকের এই অভাব অনটনের বেদনা কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, বই পড়ার মানসিকতা সৃষ্টি যদি বিশ্ব বই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে রাজধানীতেই বারে বারে এই মেলা হলে কী সেই উদ্দেশ্য সফল হবে? ১৯৭২ সাল থেকে এ-পর্যন্ত তিনটি বিশ্ব বই মেলাই এই রাজধানীর বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশকের আর্থিক লাভ ও প্রচার ছাড়া সাধারণ্যে বই পড়ার আগ্রহ কতটা বেড়েছে? এবং এই মেলা দিল্লি শহরের বাইরে কতটা উৎসাহ সৃষ্টি করতে পেরেছে? বলাবাহুল্য, মেলার উদ্যোক্তা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। এমন কি, গত দুটি মেলাতেই যা কত টাকার বই বিক্রী হয়েছে তারও কোন হিসাব ট্রাস্টের কাছে নেই। দিল্লিতে এই মেলা বসাবার একমাত্র কারণ স্থানীয় প্রগতি ময়দানে মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা। খরচ বাঁচাবার জন্যই দিল্লিতে করতে হবে এ-যুক্তি ধোপে টেকে না এই কারণে যে মেলা-বাবদ ট্রাস্টের লোকসানের বহরই বেড়েছে। গত মেলায় ট্রাস্টের লোকসান গিয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। এবারে লোকসান হবে প্রায় তের লক্ষ টাকা। মেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। লোকসান যখন দিতেই হবে তবে বছর বছর দিল্লিতে কেন? এর উত্তরে ট্রাস্টের নতুন চেয়ারম্যান, পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল এ এল ডায়াস জানান, ভবিষ্যতে অন্য কোন শহরে হবে না এমন কোন কথা নেই। এ-সম্পর্কে ট্রাস্টের মন খোলা।

শিশুদের শক্ত খাবার খাওয়ানোর শুরুতে প্রত্যেক মায়ের কী কী জানা দরকার

শিশুদের কখন থেকে শক্ত খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

তিনমাস বয়স থেকে আপনার শিশুর সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য দরকার কঠিন নয় তরলও নয় এরকম শক্ত খাবার। তবে, শক্ত খাবার ধরাবার আগে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন। যে সব শিশু তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তাদের অন্যদের চেয়ে আগেই শক্ত খাবার দরকার হয়। মনে রাখবেন, শিশুদের শক্ত খাবার ধরাবার সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা মনে করেন তিন মাসের পর থেকে দুধ ছাড়াও শক্ত খাবার শিশুদের প্রয়োজন।

শিশুর উপযুক্ত শক্ত খাবার কীভাবে ঠিক করতে হয়।

এমন খাবার আপনাকে বেছে নিতে হবে যাতে শিশু তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারে—অর্থাৎ এমন সুষম খাদ্য যাতে প্রোটিন, ভিটামিন, শর্করা, স্নেহ ও লৌহ জাতীয় পদার্থ পুরোপুরি আছে।

সর্বাঙ্গীন পুষ্টি যোগাতে প্রথম শক্ত খাবারের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন।

মস্তিষ্ক ও দেহ গঠনের দিক থেকে যে কোন শিশু জন্মাবার পর তার প্রথম বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশুর দরকার দেহগঠনের সহায়ক পুষ্টিকর খাদ্য।

আমার ডাক্তারের মতে সেরেল্যাকই সব দিক থেকে পুষ্টিকর।

কারণ সেরেল্যাকে আছে খাঁটি ঘন দুধ, শস্যদ্রব্য ও চিনি এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লৌহজাতীয় পদার্থ। তাছাড়া এতে সঠিক পরিমাণে প্রোটিন, স্নেহ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ রয়েছে। এই জন্য পৃথিবীর সর্বত্র মায়েরা সেরেল্যাক দিয়ে তাঁদের শিশুদের শক্ত খাবার ধরান।

সেরেল্যাক খেতেও চমৎকার।

সেরেল্যাকের স্বাদ সত্যিই চমৎকার। সেদ্ধ করা আপেল, পেঁপে বা কলা জাতীয় ফল, এছাড়া সব রকম ফল সেরেল্যাকের সাথে মিশিয়ে
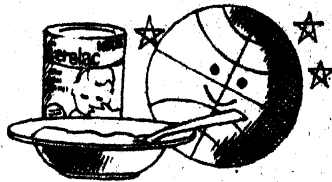
শিশুকে খেতে দিতে পারেন। দেখবেন আপনার শিশু এক চামচ শেষ হতে না হতেই আর এক চামচ খেতে চাইছে।

সেরেল্যাক সবদিক থেকে সুবিধাজনক তো বটেই, স্বাস্থ্য সম্মতও।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পুরোপুরি খাদ্য তৈরি করতে আপনাকে শুধু জলের সঙ্গে সেরেল্যাক মেশাতে হবে। আগে থেকে দেওয়া খাঁটি ঘন দুধ, শস্যদ্রব্য ও চিনি—সব মিলে যে সুষম খাদ্য তৈরি হয় তা একাধারে যেমন পুষ্টিকর তেমনই স্বাস্থ্যসম্মত।

সেরেল্যাক কোন সময়ে খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল।

সকালে স্নান করানোর পর শিশুকে সেরেল্যাক দিন। দেখুন কীরকম খুশি হয়ে খাচ্ছে। চতুর্থ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে একেবারেই বোতলের দুধ সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে সেরেল্যাক দিতে শুরু করুন।

মনে রাখবেন একমাত্র

সেরেল্যাক

আপনার শিশুকে সুস্থ সবল ও দীপ্তিমান করে তুলবে।

সেরেল্যাকের স্নেহ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ আপনার শিশুকে সুস্থ করে গড়ে তোলে। এর প্রোটিন তাকে সবল করে এবং এর ভিটামিন ও লৌহ উপাদানে সে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য তিন মাসের পর থেকে আপনার শিশুকে নিয়মিতভাবে দিন সেরেল্যাক।

NESTLE
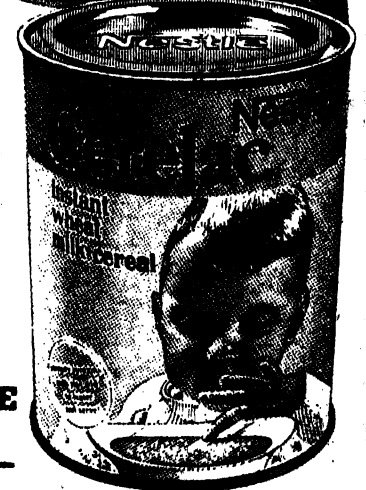
সব রকমে পুষ্টিকর সুষম শিশুখাদ্য—তৈরি করা সহজ, খেতেও চমৎকার।

CLC-CAS-2/77 BEN

কণ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৪০ ॥

আলিপুর জেলে সশ্রম দণ্ডাজ্ঞা শেষ হতেই জেল গেটে আবার D I R-এ গ্রেপ্তার হলুম। এবারে ডিভিসন-১ কয়েদী। এর আগে কোনবারই ডিভিসন-১ হইনি। ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট ডিভিসন ঠিক করে দেন। কিন্তু এটা করা হয় অদ্ভুতভাবে। প্রথম ভারতীয় সহকারী Assaye Master ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ডিভিসন-৩। আবার অনেকে ডিভিসন-১ হয়েছিলেন, যাদের অনেকের সরকারীমতে ডিভিসন-১ হবার যোগ্যতা ছিল না। ডিভিসন-৩দের পরতে হত জেলের পোশাক— জাঙ্গিয়া, কুর্তা, আর তার সঙ্গে গামছা ; সবই জেলের তাঁতে বোনা। তার সঙ্গে দু'খানা কম্বলও মিলত। একখানা মাথায় দাও, আর একখানা পেতে শোও। অবশ্য কোন কোন পুরনো জেলে মাথার দিকটা উঁচু করে বাঁধান থাকত। গ্রীষ্মকালে অবশ্য কম্বলে শুতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু সকলেই তো জেনেশুনে জেলে যেতেন। সেইজন্য কষ্টটা সহনীয় হতে সময় লাগত না। অনেকে আবার জাঙ্গিয়া পরতে চাইতেন না—তা নিয়েও অনেক অশান্তি। যাঁরা জাঙ্গিয়া পরতে চাইতেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কম্বল পরতেন, আবার কেউ কেউ বিবস্ত্র হয়েই থাকতেন। প্রথম প্রথম জেলখানার বাবুরা আমাদের নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাঁদের কোন সংজ্ঞা ঠিক হয়নি। সমাজবিরোধী কাজ করে যারা আসত—তারা তো সাধারণ কয়েদী, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন করে যাঁরা জেলে আসতেন, তাঁদের কি বলা হবে ? সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যাপারে খুব গণ্ডগোল ছিল। আমরা স্বেচ্ছায় কাজ করতুম, কিন্তু অনেকে করতেন না, ফলে একটা ধস্তাধস্তি লেগেই থাকত। জেল কোডে একটা করে মশারি দেবার কথা থাকত, কিন্তু সাধারণত দেওয়া হত না। পরে অনেক চেষ্টা করে বাইরে থেকে মশারি আনার ব্যবস্থা করা হয়। আর জেলের সঙ্গে বাগান ছিল, সেখানকার সাধারণ কয়েদী ও ডিভিসন কয়েদীদের খাওয়ার, দুর্দশার অন্ত ছিল না। লাঠির মত মোটা আর পাথরের মত শক্ত কাটোয়ার ডাঁটা যতদিন পাওয়া যেত, ব্যস্—আর অন্য তরকারীর দরকার নেই। তার সঙ্গে লাল রঙের মোটা চাল, আর পোকা ধরা ডাল। যত ইচ্ছে খাও—তোফা। অবশ্য চেষ্টা চরিত্র করলে রুটি পাওয়া যেত। হপ্তায় দুদিন আধছটাক করে মাংস বা গুড় বা আলুর দম পাওয়া যেত। সরকারী উৎসবের দিনে খাওয়াটা একটু ভাল করবার চেষ্টা ছিল।

ডিভিসন-১দের কারাবাসের আটক থাকার কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো রাজকীয় ব্যবস্থা। পরিধানের জন্য ধুতি অথবা পাজামা এবং শার্ট। ডিভিশন-৩এর তিনমাসে একবার ইন্টারভিউ এবং ডিভিসন-১ কয়েদীদের পনের দিন অন্তর একবার। চিঠি লেখা এবং পাওয়ার ব্যবস্থাও অনুরূপ। ডিভিসন-১ কয়েদী ইচ্ছে করলে বাড়ী থেকে খাট, গদি, বিছানা—সব আনতে পারে, বাড়ী থেকে রোজ খাবারও আসতে পারে। প্রত্যেকের জন্য খাট গদি বালিশ এবং চাদর। শীতকালে ডিভিসন-৩এর কম্বলের কুর্তা, ডিভিসন-১এর ফ্লানেলের শার্ট। ডিভিসন-৩ এর খাদ্য তালিকা আগেই দিয়েছি। ডিভিসন-১ এর খাদ্যতালিকা—সকালে টোস্ট মাখন ডিম দুধ। দুপুরে ভাত ডাল তরকারী মাছ এবং দই। রাত্রেও অনুরূপ। মাছ অথবা মাংস। অবশ্য D I R-এর যা ব্যবস্থা ছিল, তার কাছে ডিভিসন-১ কয়েদীর ব্যবস্থা অনেক কম। দুমাসে তিন শিশি জবাকুসুম তেল, অনুরূপ গায়ে মাখা সাবান, ছটা ধুতি বা পাজামা, দু বছর অন্তর একটু ভাল কাপড়ের গরম কোট এবং একটি পশমী চাদর। দু বছর অন্তর এক জোড়া ঘোড়তোলা জুতো, আর বছরে একজোড়া করে স্যান্ডেল। খাওয়া প্রায় ডিভিসন-১এর মতনই। তার চেয়ে একটু ভাল। আর গায়ের লেপ, খাটের মশারি এসব তো ছিলই। ছাড়া পাওয়ার সময় এগুলো সঙ্গে আনা যেত। অর্থাৎ বিনা বিচারে যাঁরা আটক আছেন, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একটু বেশী করে দিয়ে যদি তাদের মন একটুও ভোলান যায়—তারই একটু অপচেষ্টা।

আমি আলিপুর জেলে 'মেসডেমে' ওয়ার্ডের একটি সেলে ছিলুম। চারটি সেল নিয়ে একটি ওয়ার্ড। ওরই একটিতে জওহরলাল ছিলেন। 'মেসডেম' কথাটি হল 'misdemeanour' কথাটির অপভ্রংশ। এর বাংলা কি হবে জানি না। Oxford Dictionaryতে বলে Indictable offence less heinous than felony'। আমি তো বিনা বিচারে আটক ছিলুম, অতএব আমার সঙ্গে 'felony' কথা আসে কি করে বুঝি না। আর জহরলাল যে কি felony করেছিলেন তা আমার জানা নেই। 'felony'র অর্থ ইংরাজী অভিধান মতে legally graver than misdemeanour। মনে হল যে এই চারটি সেল নিয়ে এই ওয়ার্ডটি তৈরী হয়েছিল স্বভাব-দুর্বৃত্তদের জন্য। ওয়ার্ডটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সেলগুলির সামনে ছোট্ট একটি উঠোন, আর পেছন দিকে প্রশস্ত মাঠ। পেছনে মাঠ থাকলে কি হবে, দেখবার তো উপায় নেই, জানলা বলে কিছু নেই। মাথার উপরে ৩ ফুট × ৯ ফুট গবাক্ষ। আমার ঘরের পিছন দিকে একটা চাঁপা গাছ ছিল। শুনলুম, কোন এক সাহেবের দ্বারা রোপিত। আর কাজ করবার জন্য ছিল দুজন ফালতু। একজনের বাড়ী মেদিনীপুর—তার নাম গোবর্ধন। আর একজন বরিশালের—তার নাম নিতাই। জেলখানার এই ফালতু ব্যাপারটি সভ্যতার মানদণ্ডে বর্তমানে একেবারে সঙ্গতিহীন। চুরি করেছে বা ডাকাতি করেছে বা দাঙ্গা করেছে—সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। তা বলে এরা জামা কাচবে, এঁটো বাসন মাজবে, ঘর ঝাঁট দেবে, এমন কথা জেল কোডের কোথাও নেই। সশ্রম কারাদণ্ডর মধ্যে গৃহভৃত্যের কাজ কি করে এসে গেল এটা বোঝাই শক্ত। আর তারাও কয়েদী, আমরাও কয়েদী ; তবু তারা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন তারা আমাদের ক্রীতদাস। গোবর্ধনের নাম হয়ে গিয়েছিল গোবরা—সে খুব গপ্পে লোক। প্রায়ই আমাদের জেলখানার সাহেব ভূতের গল্প শোনাত। আর নিতাই একটু গর্ব করে বলত যে, বাবামশাই, গোবরার সঙ্গে বেশী কথা বলবেন না, ও চোর। নিতাই এসেছিল দাঙ্গা করে। জেলখানায় চোর বা ছিঁচকে চোরদের কেউ আমল দিত না। ইজ্জৎ ছিল, যারা ডাকাতি বা দাঙ্গা করে আসত।

D I R-এ আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী মশাই ও তাঁর ভাই বীরেন গাঙ্গুলী, নৃপেনদা (বোস), বসন্ত মজুমদার, মহাশয়ের পুত্র ননী মজুমদার, আনসার জারোয়ানী, জয়নগরের বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, দক্ষিণ কলকাতার বিমল ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখার্জী, ধীরেন দত্ত ও আরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি। জেলখানায় শুনেছি এবং দেখেছি খুব দলাদলি এবং গণ্ডগোল হত। আমাদের জেলে সেরকম কিছু ছিল না। আমার ঘরে পড়ার একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সুধীর দাশগুপ্ত, শান্তি দাশগুপ্ত (পরে মিনিস্টার হয়েছিলেন) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিত দত্ত (জেলখানায় নাম ছিল রাধিকা), আরও কয়েকজনের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। নিয়মিত আড্ডা হত ও পড়া হোত। অভয়াশ্রমের অমূল্যপ্রসাদ চন্দ্র (রমাপ্রসাদ চন্দ্র মশায়ের পুত্র) নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। পরে দিল্লীতে আত্মহত্যা করেন। বাংলার ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র—এসবও যেমন নিয়মিত পড়া হত, তেমনি কিছু কিছু Bertrand Russell, D. H. Lawrence, Whitehead, Shakespeare Whitman, T. S. Eliot—এঁদেরও আনাগোনা ছিল। আর গানের আসর তো খুব বড় করেই বসত। ধীরেন দত্ত একটা সিটিং-এই ২০।২৫ খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারত। এসবের সঙ্গে ছিল পাশা, তাস, দাবা ও আরও অন্যান্য খেলা। আমার ঘর ছাড়া অন্যান্য ওয়ার্ডেও গান এবং খেলা হত। কিন্তু পড়াশুনার আড্ডাটা আমার ঘরেই ছিল। চারজন এম-এ দেয়। ন'জন দেয় বি-এ পরীক্ষা। ইণ্টারমিডিয়েটের ছিল এগারজন, আর ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য ছিল উনিশজন। বেশ একটা সুস্থ পরিবেশ। পারস্পরিক অসুখ-বিসুখেও সাহায্য পাওয়া যেত। আমি তো শয্যাগত ছিলুম বললেই হয়। নৃপেনদা (বসু) আর চপলা (তালুকদার)—এই দুজনের জন্যই বোধহয় সে যাত্রা রক্ষা পেলুম। নৃপেনদা ডাক্তার হলে কি হবে, কিন্তু স্নেহে একেবারে মায়ের মতন।

ঠিক হল থিয়েটার হবে। সকলে তো আমাকে ধরলে, অভিনয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলুম। কিন্তু রিহারসেলের সময় কথাগুলো এত আস্তে আস্তে বলতুম যে

...আমায় বাতিল করে দিলেন। আমি ... প্রম্পটার। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ...। কিন্তু অলক্ষ্যে যদি বিধাতাপুরুষ ... কেউ থাকেন, তিনি একটু মুচকি ...লেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য মশায়ের একখানি বই অভিনয় হবে। থিয়েটারের দিন সকালে ...র মেন পার্ট—চরিত্রটি হচ্ছে অধ্যাপক অতুল ঘোষের, সে আলিপুর জেল থেকে বদলি হয়ে গেল। অতএব আবার অভিজ্ঞরা স্থির করলেন যে আমাকেই নামতে হবে। জীবনে সেই প্রথম ও শেষ অভিনয়। যাঁরা আমার পরম শত্রু (?) তাঁরা সোৎসাহে বললেন যে অভিনয় খুব ভাল হয়েছে, আবার করতে হবে অর্থাৎ আমাকে নিয়ে মজা করতে চান।

জ্যোতিষচর্চাও জেলে খুব হত। অমূল্যচন্দ্র এবং আরও দু-একজন তাঁরা ঠিকুজী কুণ্ঠি তৈরী করতেন এবং সেখানেই ভিড় বেশী হত। আমাদের ঘরে একজন হস্তরেখাবিশারদ ছিলেন। তাঁর দু-একটা গণনা অভ্রান্তভাবে মিলেছিল। আর যায় কোথায়? খুব ভীড়। আমাদের সঙ্গে নিবারণ পোদ্দার বলে একজন ছিলেন। অবশ্য শেষের কবিতা অনুযায়ী তাঁকে নিবারণ চক্রবর্তী বলে ডাকা হত। হস্তরেখাবিশারদ তাঁর হাত দেখে গণনায় যা বলেছিলেন সবই মিলে গেল। গোলমাল বাধল তাঁর মায়ের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে। তারপর দু হপ্তা যায়, পাঁচ হপ্তা যায়, দুমাস যায়; মায়ের মৃত্যুসংবাদ আর আসে না। জেলে হৈ-হৈ, সকলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করল, কিন্তু নিবারণবাবু বিশ্বাসে অটল। চারমাস বাদে নিবারণবাবু একটি চিঠি পেলেন যে তাঁর এক মাসীর মৃত্যু হয়েছে। ব্যস, নিবারণবাবুর উল্লাস দেখে কে। এই মাসীর কাছে তিনি এক বছর বয়স থেকে এগার বছর অবধি ছিলেন এবং তাঁকেই মা বলে ডাকতেন। আবার হৈ-হৈ। শান্তি দাশগুপ্তকে হস্তরেখাবিশারদ বলেছিলেন যে শান্তিবাবুর যখন একটা বয়সে পোঁছবেন, সেইসময় তাঁর নিশ্চিত বিবাহ হবে। শান্তিবাবু এবং আরও অনেকেই অবিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে গণনা অভ্রান্ত। শান্তিবাবু একটি বিয়ের বরযাত্রী হয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে বিয়ের দিন বিকালে বর কলেরায় আক্রান্ত হয়। অতএব সেই কন্যাকে শান্তিবাবু বিয়ে করেন। একেবারেই অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু হস্তরেখাবিশারদ গণনা করে যে বয়স বলে-ছিলেন, ঠিক সেই বয়সেই বিবাহ হল।

মাঝে মাঝে জেলখানায় ফিস্টও হত। আমাদের মত লোক যারা জীবনের অনেকটা অংশ কংগ্রেস অফিসে কাটিয়েছে, তাদের কাছে প্রাত্যহিক খাবারটাই ছিল রাজসিক। আর ফিস্টের খাবার দিন মনে হত যেন কোন নবাবের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছি। এসব সত্ত্বেও মনের মধ্যে সবসময় একটা বাইরে বেরোবার আকাঙ্ক্ষা থাকত। আমরা জেলের মধ্যে, অথচ বাইরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ তখনও স্তিমিত হয়নি। নানা ঘটন দুর্ঘটনার সংবাদ যখন এসে পোঁছত, তখন মানসিক অবস্থাও সেইভাবে ওঠা-নমা করত আর একটা বড় বিসদৃশ ঘটনা মনকে যথেষ্ট পীড়া দিত। একই অপরাধে বন্দী, এক জেলে আছি, অথচ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী ও প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের খাওয়া-দাওয়ার এ পার্থক্য যে মনের দিক থেকে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আবার তাদের সঙ্গে যখ সাধারণ কয়েদী অর্থাৎ ফালতুদের ব্যবস্থা কথা মনে পড়ত, তখন হত মনের ভেত একটা তীব্র জ্বালার অনুভূতি। মধ্যযুগে জেলখানার বর্বরতার কথা আমরা পড়েছি শুনেছি। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদে সঙ্গে এই বিংশ শতাব্দীতেও মধ্যযুগে ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না এখনও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী পুরো মানুষে মর্যাদা পায় না। স্বাধীন দেশের মানুষের যে একটা মর্যাদা, সে যেখানেই থাকুক, সেটা তা প্রাপ্য। অপরাধ যদি করে থাকে, তার দণ্ড ভোগ নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে জীবনধারার মধ্যে এত পার্থক্য থাকবে কেন? এই যে দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য উৎসব জেলখানার মধ্যে করতে দেওয়া হয় এগুলো আর কিছুই নয়, কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক অব্যবস্থা ঢাকা দেবার একটা প্রচেষ্ট মাত্র।

ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের সমস্যা

অসিত ভট্টাচার্য

যে কোনো বড়ো রাজনৈতিক পরিবর্তন সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে নতুন করে চিন্তাভাবনা জাগায়। যেভাবে সবকিছু এতোদিন চলে এসেছে সেভাবে যে আর চলতে পারে না, এ-কথা সকলে-ই অল্পাধিক উপলব্ধি করেন। আমাদের দেশে-ও সাম্প্রতিক নির্বাচনী পরিবর্তনের পর আমাদের এই উপলব্ধির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ভারতে সাম্প্রতিক যে-সব পরিবর্তন এসেছে তার কারণ একটি নয়। এর নানা দিক আছে। রাজনৈতিক কারণ হিসেবে জরুরী অবস্থার মতো সুনির্দিষ্ট বিধানের কথা অনেকে-ই বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ-নৈতিক দিকটি উপেক্ষণীয় নয়—যদিও সাধারণ আলোচনায় তা উপেক্ষিত-ই হয়ে থাকে। অথচ গত কয়েক বছরের ক্রমবর্ধমান বেকারী ও তার উপর ক্রমাগত কলকারখানা বন্ধ হয়ে অধিক থেকে অধিকতর মানুষের জীবিকার অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার ওপর ক্রমিক মূল্যহীনতার আঘাত ইত্যাদি এসেছে বলে-ই দেশের মানুষ আজ এতো বড়ো পরিবর্তনের জন্যে এতোটা আগ্রহী হয়েছেন, মনে হয়।

কিন্তু বেকারী, মন্দা ও কারখানা বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি এ-সবই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। উপসর্গ যেমন রোগ নয়, তার বহির্লক্ষণ তেমনি দেশের এইসব দৃশ্যমান সমস্যাগুলিও দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার বহির্লক্ষণমাত্র। বাস্তবেও আমরা এ-সত্যের পরিচয় পেয়েছি। উপসর্গের চিকিৎসায় রোগ সারে না। তেমনি দেশে বেকারী আছে অতএব, দাও দু/পাঁচ হাজার চাকরি—যদিও সে চাকরির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক নেই—এ-ব্যবস্থায় সুফল ফলে না। ফলে-ও নি। বস্তুত এর ফল কি দাঁড়ায়?

সেই চাকরির বেতন বাবদ একদিকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ে, অন্যদিকে সরকারের ব্যয় বাড়ায়, সরকারের পক্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সরকার যে সব ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ করেন—স্কুল, হাস-পাতাল বা পথঘাট কি সেতু নির্মাণ যাই হোক—সেইসব ক্ষেত্রে নতুন কিছু নির্মিত হয় না, অর্থাৎ নতুন চাকরির সৃষ্টি হয় না, এবং সম্ভবত পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছাঁটাই হয়। ফল হয় এই যে, হঠাৎ একটা ক্ষেত্রে নতুন কিছু চাকরির সৃষ্টি করায় অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে নতুন চাকরি দেওয়া সম্ভব হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী চাকরি বা তার আয় হ্রাস পায়। শুধু তাই নয়—অনুৎপাদক শ্রমের জন্যে চাকরি দেবার ফলে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সাধারণ মানুষ ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেন। যিনি দশ গজ কাপড় কিনতেন, তিনি হয়তো আট গজ কেনেন। অনেক মানুষ এইভাবে মোট ক্রয় কমিয়ে দিলে, শিল্পপতিদের মোট বিক্রয় হ্রাস পায়, এবং তাঁরাও লোকসান এড়াবার জন্যে কারখানা পূর্ণত বা আংশিক বন্ধ করে দেন—কারখানায় লোক ছাঁটাই হয়। সংক্ষেপে, শুধু সরকারী নয়, বেসরকারী স্তরেও লোকনিয়োগ কমে গিয়ে বেকারী বাড়ে। কাজে-ই কিছু চাকরি দিলেই বেকারীর সমস্যার সমাধান হয় না, বরং এরকম অবিবেচিতভাবে বিশৃঙ্খল কাজ করলে, বেকারী বাড়ে। রামের বা শ্যামের অনুগত লোক হয়তো চাকরি পায়, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ কাজ পায় না। বরং তাদের কাজ পাবার সম্ভাবনা কমে।

কেবলমাত্র চাপ দিয়ে শাসনগত শক্তি প্রয়োগ করে দর কমাবার চেষ্টা করলে-ও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না। এ-দেশে সাম্প্রতিককালে আমরা তা দেখেছি। পাকিস্তানে আয়ুব খাঁ-র শাসনামলেও মানুষের একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শুধু খোলাবাজারে নয়, সুষ্ঠু রেশনিং-এর জন্যেও নিয়মিত ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহের আবশ্যকতা থাকেই। তার জন্যে উৎপাদনের হার অনবচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। কাজে-ই উৎপাদন ব্যবস্থাকে গতিশীল না করে কেবল মূল্যহ্রাসের চেষ্টা করলে সে-চেষ্টা সফল হয় না।

মূলগত সমস্যা : আর্থিক কাঠামোর স্থাণুত্ব

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভারতের মূলগত অর্থ-নৈতিক সমস্যা বলতে কি বোঝাতে চাই? কি সেই সংকট, যার থেকে এ-দেশের আর্থিক কাঠামোয় ও জীবনে, বেকারী মন্দা ও পণ্য-মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা-স্থায়ী আকার নিয়ে বসেছে? মূল সমস্যা এই যে, গোটা বিংশ শতাব্দী ধরে ভারতের আর্থিক কাঠামো অনড় রয়ে গেছে। সামাজিক কর্মবিন্যাসে কোনো সদর্থক পরিবর্তন-ই ঘটেনি। অথচ অর্থনৈতিক উন্নতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, কৃষি, পশুপালন মাছের চাষ ও বাগিচার কাজ ইত্যাদি প্রাথমিক স্তরের কাজে নিযুক্ত মানুষের হার, মোট কর্মনিযুক্ত মানুষদের মধ্যে হ্রাস পায়। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বা দ্বিতীয় স্তরের কাজে নিযুক্ত মানুষদের হার সমগ্রের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। সেই বিচারে ভারতের অবস্থা এই যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এখানে (ক) প্রথম ও (খ) দ্বিতীয় স্তরে কর্মনিযুক্ত মানুষের হার ছিল : শতকরা ৭১·৮ ও ১২·৬। বিবিধ ব্যবসায়, বৃত্তি ও পরিবহণের কাজে বা (গ) তৃতীয় স্তরের কাজে নিযুক্ত মানুষের হার সেই সময়ে ছিল ১৫·৬। এর ষাট বৎসর পরে ১৯৬১-তে দেখি যে, কর্মবিন্যাসের এই ছক পরিবর্তিত হয়নি—যদি কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে তা অবনতির দিকে। বস্তুত ১৯৬১-তে কর্মবিন্যাসের ছকে (ক) ৭২·২; (খ) ১১·৭; (গ) ১৬·০) শিল্পে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায় কারণ এই সময়ে হস্তশিল্প যে-হারে কমেছে, বৃহৎ শিল্পে কর্মনিযুক্তি সে-হারে বাড়েনি। তৃতীয় স্তরের কাজের সামান্য বৃদ্ধিতে যদি কেউ আশান্বিত বোধ করেন, তবে তাঁর স্মরণ রাখা দরকার যে এই সব ব্যবসায় ও বৃত্তিজীবীদের মধ্যে আছেন পথঘাটের ফেরিওয়ালা, চানাচুর ও চা-ওয়ালা, ট্রেন-বাসের হকার ও ক্যানভাসার, পথের ধারে ধুলোর ওপর ফলুরিওয়ালা ও পানওয়ালা। এ-ছাড়া আছেন নানা ধরনের বাজিকর, হরেক রকমের পাণ্ডা-পুরুত ও গণৎকার। এবং সাপুড়ে ও বাঁদরনাচ কি ভালুকনাচ দেখানো লোক। এইসব বৃত্তি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য—যুগ যুগ ধরে আমাদের অনগ্রসরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এঁদের জীবনে ছুটি নেই, আয়ের নিশ্চয়তা নেই, কায়িক ক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যতীত পুঁজি নেই, রোগ হলে সামাজিক নিরাপত্তা নেই, বরং আয়ের পথ রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত। এই সব মানুষকে 'অসংগঠিত বৃত্তির' (ডিসঅরগানাইজড সেকটর) লোক বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন বৃত্তি-ব্যবসায়ে মোট যে তিন কোটি লোক কর্মনিযুক্ত তাঁদের মধ্যে সওয়া কোটি মানুষ এই 'অসংগঠিত বৃত্তি'তে আছেন। অর্থনীতির বিচারে এরা কর্মহীনদের সমপর্যায়ভুক্ত। সামাজিক উৎপাদনে এঁদের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর।

তাছাড়া কলিন ক্লার্কের পুরনো যে মত অনুযায়ী মনে করা হতো যে আর্থিক কাঠামোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় স্তরের কর্মী-হার, মোট কর্মিসংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধি পায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা গেছে তা ঠিক নয়। জাপান, পশ্চিম জার্মানী বা সোভিয়েত রুশিয়া প্রভৃতি যেখানেই আর্থিক জীবনে অগ্রগতি হয়েছে, সেখানেই শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যা ও অনুপাত মোট কর্মীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা পর্যালোচনা করেই এ সি মেজলস (এক্সপোর্টস অ্যান্ড ইকনমিক গ্রোথ ১৯৬৩) আর্থিক বিকাশে শিল্পশ্রমিকদের আনুপাতিক সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সামাজিক কর্মবিন্যাস ছাড়াও দেশের জনসংখ্যায় কর্মনিযুক্ত মানুষের অংশ কতো তা থেকে দেশের সমৃদ্ধির একটা আন্দাজ মেলে। জনসংখ্যায় কর্মনিযুক্ত মানুষের অংশ যদি বাড়ে তা হলে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আশা করা যায়। এক্ষেত্রেও ভারতে গোটা বিংশ শতকে অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতি হয়েছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতে জনসংখ্যায় প্রতি একশো জনে সাতচল্লিশ জন ছিলেন কর্মনিযুক্ত এবং তিপ্পান্ন জন কর্মহীন। ১৯২১ পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৩১ থেকে দেশে কর্মীর হার কমতে থাকে এবং ১৯৫১-তে কর্মিহার জনসংখ্যায় শতকরা ৩৯ জনে দাঁড়ায়। ১৯৬১তে অবস্থার সামান্য যে উন্নতি (শতকরা ৪৩) সেন্সাসের হিসেবে ধরা হয় তার যে বাস্তব ভিত্তি নেই তা সেন্সাস কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করেন (সেন্সাস ১৯৬১, পেপার নম্বর ওয়ান দ্রষ্টব্য)। বস্তুত এই সময়ে কর্মনিযুক্ত মানুষ, দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগের বেশী ছিলেন না—ষাট ভাগই ছিলেন বেকার।

গত দশকের অবনতি

১৯৬১ থেকে ৭১-এর মধ্যে আমাদের আর্থিক কাঠামোর সর্বাংশে অবনতি ঘটে। প্রথমত মোট জন-সংখ্যায় কর্মনিযুক্ত মানুষের হার, শতকরা ৪৩ থেকে শতকরা মাত্র ৩৩·৫ হয়ে দাঁড়ায়। মোট কর্মিসংখ্যা দশ বছরে ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ থেকে ১৮ কোটি ৩৬ লক্ষে নেমে আসে—অর্থাৎ ৫০ লক্ষ হ্রাস পায়। কর্ম-নিযুক্ত মানুষদের মধ্যে নারী কর্মীদের সংখ্যা বিশেষ ভাবে কমে আসার ফলেই ১৯৬১ থেকে ৭১-এ কর্মি-সংখ্যার অবনতি ঘটে। এই সময়ে নারীকর্মীর সংখ্যা ২ কোটি ৪৬ লক্ষ হ্রাস পেয়েছিল। ফলে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ১ কোটি ৯৭ লক্ষ বৃদ্ধি পেলেও মোট কর্মি-সংখ্যা, মোটমাট পঞ্চাশ লক্ষ কমে যায়।

সহজেই বোঝা যায় যে, দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কর্মিসংখ্যা যদি সমহারে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে দেশে বেকারী বাড়ে। নারী কর্মীর সংখ্যা হ্রাসের সমস্যাটি আংশিক কর্মী সম্পর্কে সেন্সাস কর্তৃপক্ষের ধারণার ওপর নির্ভরশীল বলে আপাতত তা হিসেবের বাইরে রাখলেও দেখি যে কেবলমাত্র পুরুষদের কর্মনিযুক্তির হারও (শতকরা ১৫·৫ ভাগ) জনসংখ্যার অনুপাতে (২৪·৭ ভাগ) বাড়েনি। বস্তুত এই দশকে দেশের জনসমাজে ব্যাপক বেকারীর বৃদ্ধি বাস্তবিক-ই এক নিদারুণ সামাজিক পরিস্থিতির পরিচয় বহন করে।

কর্মনিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ও হার কমে যাওয়া ছাড়াও এই দশকে সমাজে জীবিকার (এমপ্লয়মেন্ট প্যাটার্নে) বিন্যাসে যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে-ও জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের গভীর সংকটের প্রতি-ফলন চোখে পড়ে। দেখা যায় যে, কৃষক সংখ্যা যেখানে মোট কর্মনিযুক্ত মানুষদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, সেখানে কৃষিতে, ভূমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যা প্রায় সেই অনুপাতে (শতকরা ৯ ভাগ) বেড়ে গেছে। এর অর্থ এই যে, কৃষকদের যে অংশ আর কৃষক থাকতে পারেননি—তাঁদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছেন। এই চিত্র দুঃস্থতার।

১৯৬১ থেকে ৭১-এ সামাজিক কর্মবিন্যাসের ছক থেকে যে চিত্র পাই, তা-ও সমভাবে হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৭১-এ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কাজে যথাক্রমে শতকরা ৭২·৫, ১০·৭ ও ১৬·৭ ভাগ কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। দেখা যাবে যে, ১৯৬১-র তুলনায় ১৯৭১-এ মোট কর্মীদের মধ্যে শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যাই বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬৬-র শিল্প-মন্দার সময় থেকে-ই শিল্পে কর্মনিযুক্তির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে—পশ্চিমবঙ্গে তা বিশেষত-ই হ্রাস পায়। শিল্পে কাজ না পেয়ে অনেকেই খুচরো ব্যবসায়ী তথা বেকারদের দলে ভিড় করেন।

এদিকে দেশের সামাজিক অর্থনীতিতে যখন স্থিতাবস্থাও রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, হয়নি, অবনতি-ই দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তখন দেশে জনসংখ্যার চাপ কিন্তু ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। বিশেষত ১৯২১-এর পর থেকে এই প্রবণতা স্পষ্ট। এর ফলে এলাকাপিছু, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে, জন-সংখ্যার চাপও বেড়ে চলেছে। বিংশ শতকের সূচনায় ১৯০১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ২৩·৬ থেকে ২৫·১ কোটি হয়। অথচ ১৯২১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাঁচ দশকে জনসংখ্যা ২৫·১ কোটি
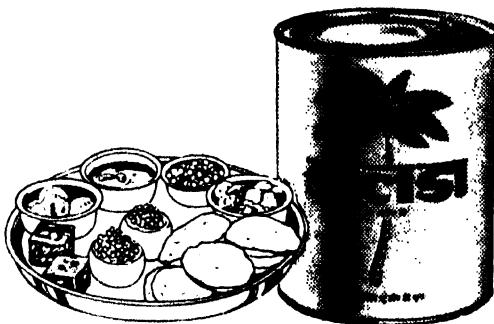
থেকে দ্বিগুণের বেশী হয়ে ৫৪·৭ কোটি হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ১৯৫১-এর পূর্বে পর্যন্ত শতকরা ১১ থেকে ১৪-র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৫১ থেকে ৭১-এর মধ্যে তা শতকরা ২১ থেকে ২৫-এর মধ্যে চলাচল করছে। এই বৃদ্ধিহার ঊর্ধ্বগতিশীল ও সেই কারণেই বিশেষভাবে ভয়াবহ। ভূমিতে জনসংখ্যার চাপও আজ অত্যন্ত; ১৯২১ থেকে ৭১-এর মধ্যে এ-দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ৮১ থেকে ১৮২ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক অচলতার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আহার ও আশ্রয়ের সমস্যাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

স্থায়ী সমস্যার পরিচয়

দেখা যায় যে, আমাদের স্থায়ী অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

(১) আমাদের জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধিশীল, অথচ কর্মনিযুক্ত মানুষের হার সে অনুপাতে বাড়ছে না; বরং ইদানীংকালে তা নিম্নাভিমুখী। ফলে দেশের জনসংখ্যায় বেকার মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত দুই-ই বেড়ে চলেছে। গত দশ বছরে বেকার সংখ্যা এইভাবে খুব বেশী বেড়েছে।

(২) যাঁদের কর্মনিযুক্ত বলে মনে করা হয় তাঁদেরও কর্ম-বিন্যাসের ছক (অকুপেশনাল প্যাটার্ন), বিংশ শতকের সূচনা থেকেই অনড় ও স্থাণু থেকে গেছে। কিছুতেই এর পরিবর্তন ঘটছে না। দেশে আংশিক শিল্পায়ন এই অবস্থায় কিছুমাত্র তারতম্য আনেনি। **এই অনড় আর্থিক কাঠামোকেই ভারতের জাতীয় অর্থনীতির মূলগত সমস্যা বলা যায়।** কি করে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে অবরুদ্ধ বিকাশের ধারাকে তার অবরোধ ভেঙে বাধামুক্ত বিকাশের পথে উত্তীর্ণ করা যায় সেইটাই আজ আমাদের প্রধান সমস্যা।

(৩) আর্থিক কাঠামোর স্থাণুত্বের সঙ্গে যুক্ত আর এক প্রধান সমস্যা হলো দেশের জনসংখ্যায় কৃষকদের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস ও ক্ষেত মজুরদের অনুপাত বৃদ্ধি। এটিও স্থাণুত্বের পরিণামফল। অর্থনৈতিক অচলতার ফলে দেশে কর্ম নিযুক্তির নতুন পথ বিশেষ উন্মুক্ত হয়নি। তাই দেউলিয়া কৃষক আজ ক্ষেত মজুরের দলবৃদ্ধি করে—কারখানায় সে কাজ পায় না।

(৪) উপরিউক্ত সমস্যাগুলির আর এক প্রতিফলন এই যে দেশে নগরায়ণ (আরবাইনিজেশন) হচ্ছে অতি-মন্থর গতিতে এবং গ্রামগুলিরও যথাযথ বিকাশ হচ্ছে না।

(ক) নগর-জীবনের তুলনায় গ্রাম-জীবন অধিক রুচিকর এটা আমাদের অনেকের মত ও বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু নগরায়ণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য তার ফলে দূর হয়ে যায় না। এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নাগরিক মানুষের আয় বেশী এবং আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেশী। নগরায়ণ আয় বাড়ায় বলে, শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমেত মানুষের জীবনমানের উন্নতির সূচনা করে। আজকের সমৃদ্ধ দীর্ঘজীবী এবং অপেক্ষাকৃত নীরোগ ও উচ্চ শিক্ষিত অধিবাসী-অধ্যুষিত উন্নত দেশগুলির অধিকাংশ মানুষ তাই নাগরিক। অথচ ভারতে গত দুই দশকে পরিকল্পনার পর ১৯৫১ থেকে ১৯৭১-এ মোট জনসংখ্যায় নাগরিক মানুষের হার বেড়ে হয়েছে শতকরা ১৭ থেকে ২০ ভাগ মাত্র। অথচ বৃহদাকারে শিল্পায়ন ঘটলে নগরায়ণ কি দ্রুত বৃদ্ধি পায় তার উদাহরণ হিসেবে যুদ্ধপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। প্রথম দুটি পরিকল্পনার প্রভাবে ১৯২৬-এর তুলনায় ১৯২৯-এ সেখানে নাগরিক জনসংখ্যার হার সমগ্রের তুলনায় শতকরা ১৮ থেকে ৩৩-এ উন্নীত হয়। যুদ্ধপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের আদর্শ এটা আমার বক্তব্য নয়। বক্তব্য এই যে, ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে নগরায়ণ ঘটে এবং সেক্ষেত্রে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান সমেত জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি সম্ভব হয়।

গ্রাম ও শহর : জাপান ও ভারত

গ্রাম ও শহরের মধ্যে আমাদের বিকাশে কোন দিকে ঝোঁক দিতে হবে এ বিষয়ে নানা মত আছে। সেটা স্বাভাবিক। বিশেষত শিল্পায়নের শম্বুকগতি যখন ষাটের দশকে পশ্চাদগতিতে রূপান্তরিত হলো, তখন দেশের অধিকাংশ মানুষের কর্ম-নিযুক্তির ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকার বিষয়েও হতাশা সঞ্চারিত হয়। এই সময়ে অনেক অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন করেন যে, ভারতের মতো দেশে কৃষিকে আরো উন্নত করে কৃষিতেই আরো মানুষকে স্থায়ীভাবে কর্ম-নিযুক্ত রাখা সম্ভব কি না। এই রকম একটি আলোচনায় রিচার্ড জে ওয়ার্ড ('ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল চেঞ্জ', পত্রিকা জানুয়ারি ১৯৬৯) উল্লেখ করেন যে, ভারতের কৃষিতে জাপানের মতো বা তুলনীয় লোক নিযুক্ত রাখতে হলে, ভারতের কৃষিকে জাপানের মতো উন্নত হতে হবে। কিন্তু উন্নত আধুনিক কৃষির প্রধান উপকরণ হলো : রাসায়নিক সার। সারের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে পারলে এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলে তবেই কৃষির উন্নয়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে তুলনীয় হারে ভারতীয় কৃষিতে সারের ব্যবহার করার সমস্যা কি কি, তা বিচার করা দরকার। ওয়ার্ডের তথ্য অনুযায়ী জাপানে সারের দর, ভারতীয় দরের শতকরা ৩৭ ভাগ কম। (ভারত প্রতি কেজি ৩৪·৫ এবং জাপান ২১·০ সেন্ট।) অথচ জাপানে সারের ব্যবহার এতো বেশী যে, ভারতে জাপানের অনুরূপ সারের ব্যবহার করতে হলে তাতে খরচ পড়বে মার্কিন মুদ্রায় ১৩৮৮·৩ কোটি ডলার বা ১০৪১২ কোটি টাকা। এই অঙ্ক বর্তমান ভারতীয় রাজস্ব বাজেটকে ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ত জাপানে সারের এই বিপুল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে কারণ সে-দেশে ধানের তুলনায় সারের দর কম—১ কেজি ধান যদি ১ টাকা হয় তাহলে ১ কেজি সার ৯০ পয়সা মাত্র। তুলনায় ভারতে বা সিংহলে ধানের দরের তুলনায় সারের দাম দুই থেকে তিন গুণ বেশী। অধিকাংশ কৃষকের আয় এ-সব দেশে এতো সীমায়িত এবং শিল্পপণ্য এতো মূল্যবান যে, যথেষ্ট সারের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

বস্তুত শিল্পোৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে রাসায়নিক সার, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্পপণ্যের দর হ্রাস করে এবং ক্রেতা মানুষের আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, কৃষি পণ্যের দর বৃদ্ধি করতে পারলে, তবেই কৃষির উন্নতি সম্ভব। কারণ সে ক্ষেত্রেই শুধু কৃষি ও পণ্যের বিনিময়-হার উভয়ের পক্ষে লাভজনক হতে পারে। জাপানে তাই হয়েছে। জাপানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্মরণে না রেখে, কেবল আত্মসান্ত্বনার প্রয়োজনে জাপানের কৃষিকে উদাহরণ দাঁড় করালে তা নিছক মনোবিলাস হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত কৃষিতে উন্নয়নের জন্যে শিল্পভিত্তিক পণ্যের প্রয়োজন জাপানের তুলনায় এ-দেশে অনেক বেশী হতে পারে। কারণ এ-দেশের আবহাওয়া জাপানের চেয়ে শুষ্ক। ফলে, জাপানের চেয়ে আমাদের সেচের জলের প্রয়োজন বেশী। সেক্ষেত্রে সেচের উপকরণ হিসেবে নলকূপ তথা লৌহ ও ইস্পাত এবং সেচখাত বাঁধিয়ে রাখার জন্য সিমেন্টের প্রয়োজনও আমাদের বেশী। সুতরাং আমাদের কৃষির উন্নতির জন্য শিল্পের উন্নতি বিশেষতই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রেই শুধু সহনীয় দরে ভারতীয় কৃষিতে শিল্পপণ্যের সরবরাহ অব্যাহত থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত জাপানে কৃষির যে উন্নতি জাপানের কৃষিতে অধিক সংখ্যক মানুষকে ধরে রাখতে পেরেছে তার মূলে আর একটি কারণ আছে। তা হলো, জাপানের কৃষিতে নিজ নিজ ছোট জোতের ওপর পূর্ণ মালিকানা-স্বত্ববিশিষ্ট ছোট ছোট কৃষক পরিবারের প্রাধান্য। ১৯৭১-এর একটি হিসেব দেখা যায় ভারতে প্রতি একশো হেক্টর চাষের জমিতে ১২২ জন কর্মনিযুক্ত অথচ জাপানে ঐ একশো হেক্টর চাষের জমিতে কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২১০ জন। অজস্র ছোট কিন্তু উন্নত কৃষিজোত থাকায় এই ধরনের লোক-নিয়োগ সম্ভব করেছে।

কিন্তু জাপানে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় ২য় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর ম্যাকআর্থারের শাসনামলে। আমাদের দেশে সেরকম পরিবর্তন আজও আসেনি। এ বিষয়ে কাজ এগোয়নি শুধু নয়—চিন্তার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানার আগে জাপানের বিষয় আর একটি সত্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাপানেও সাম্প্রতিককালে কৃষি থেকে শিল্পে এবং গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্রোত ক্রমেই স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে। সমৃদ্ধ ছোট জোতগুলি এখন কৃষি ও জাতীয় অর্থনীতির আরো বিকাশের পথে অন্তরায় বলে বিবেচিত। কারণ, এর ফলে বিবর্ধমান শিল্প-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাচ্ছে না, এবং কৃষিতে এলাকা অনুযায়ী শ্রমিকের খাতে ব্যয় বেশী হয়ে পড়েছে। (দ্রষ্টব্য : কে বিদা 'জাপানীজ ইকনমি' ১৯৭০)।

ভারতীয় গ্রাম ও গ্রামবাসী

কৃষি ও শিল্পের উন্নতি যে পরস্পর নির্ভরশীল তা দেখলাম। কিন্তু কৃষির উন্নতির প্রসঙ্গে স্বভাবতই গ্রাম-জীবনের কথা আসে। ভারতীয় সমাজ গ্রাম-কেন্দ্রিক, শুধু একথা বললে প্রায় কিছুই স্পষ্ট হয় না। কি রকম গ্রামে অধিকাংশ ভারতবাসী বাস করেন? অবস্থা এই যে, ভারতের অধিকাংশ গ্রামবাসী শতকরা ৫৫র কিছু বেশী মানুষ—এমন সব গ্রামে বাস করেন যেখানে লোকসংখ্যা পাঁচশোরও কম। এক হাজার অধিবাসীর গ্রামকে যদি বড়ো গ্রাম বলি, তাহলে ভারতের শতকরা ৮০ জনই এর চেয়ে ছোট গ্রামে বাস করেন।* বস্তুত আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের অধিকাংশ মানুষের আবাস পাঁচশোর কম অধিবাসীবিশিষ্ট গ্রামে।

এতো ছোট ছোট গ্রামের সমস্যা যে কি কি ও কতো সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই সব গ্রাম, সাধারণত বড়ো সড়ক পথ থেকে দূরে থাকে—ফলে, চলাচল ও বাণিজ্যের মূল ধারার সঙ্গে এদের যোগাযোগ হয় ক্ষীণ। যদি মনে রাখা যায় যে, ভারতে গড়ে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪২ জন ১৪ বছর বা তার কম বয়স্ক এবং স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সমভাবে বিভক্ত তাহলে (বয়স্ক পুরুষদেরই আর্থিক স্বাধীনতা আছে ধরে নিলে) পাঁচশো জনের গ্রামে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা ১২৫-এর বেশী হয় না। হাজার মানুষের গ্রামে সংখ্যাটি কম-বেশী আড়াই শো হবে। যেহেতু এই সব কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুর অধ্যুষিত গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এমনিতেই কম সেই কারণে এই সব স্বল্প-আয়ের অল্প-সংখ্যক ক্রেতার গ্রামে, কোনো বড়ো বিপণি, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, শাসনকেন্দ্র বা আধুনিক ও উন্নত জীবনের উপযোগী কোনো সুবিধাই থাকে না। কারখানা রেখেও লাভ হয় না—কারণ বারো মাস যথেষ্ট শিল্প-শ্রমিক এখানে মিলবে না—দক্ষ শ্রমিক বাইরে থেকে আনার সমস্যা তো আছেই! ফলে, সার, বীজের দোকান এখানে থাকে না, এবং পাম্প সারাই, মেরামতি, ডিজেল তেল সরবরাহ ইত্যাদি কোনো কিছুরই ব্যবস্থা হয় না। উপযুক্ত সড়কের অভাবে, উৎপন্ন শস্য শহরের বাজারে যে-দরে বিক্রীত হয়, গ্রামের মানুষ সে-দর পায় না। ফলে আর্থিক আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও আইনের আশ্রয় থেকে শুরু করে আধুনিক জীবনের উপযোগী যাবতীয় পণ্য-সরবরাহের সুবিধা থেকে এই সব গ্রামের মানুষ অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত হন।

নিঃসন্দেহে ভারতীয় আর্থিক জীবনের পুনর্বিন্যাস করতে হলে জনবসতির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এক হাজারের বেশী লোকের বসতি না থাকলে কোনো এলাকায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, পাকা সড়ক যোগাযোগ, আধুনিক কৃষি উপযোগীর উপযুক্ত পণ্য সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। অথচ ভারতীয় পরিকল্পনায় সমস্যার এই দিকটি উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এই বসতির পুনর্বিন্যাস করতে হলে আরো প্রয়োজন কৃষিভূমির একীকরণ (ল্যান্ড কনসলিডেশন)। এটিও তথাকথিত ভূমি সংস্কারের উপর নির্ভরশীল।

---

* রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ৯৯৯ বা তার চেয়ে কম অধিবাসীর গ্রামে গ্রামীণ জনসংখ্যার যে অংশ বাস করেন, তার শতকরা হিসাব নিম্নরূপ—অন্ধ্র : ৫৫; আসাম : ৮১; বিহার : ৮০; গুজরাট : ৬৬; হরিয়ানা : ৫৬; কর্ণাটক : ৭৪; মধ্যপ্রদেশ : ৯০; মহারাষ্ট্র : ৭০; ওড়িশা : ৯১; পাঞ্জাব : ৭২; রাজস্থান : ৮১; উঃ প্রদেশ : ৮০ এবং পঃ বঙ্গ : ৭১।

প্রসঙ্গ, ভূমিসংস্কার : ছোট জোতের বহুলতা

ভারতীয় আর্থিক জীবনে গতিশীলতা আনতে হলে দেশে যে একটা ভূমি সংস্কার আনতে হবে, এ-কথা আজ প্রায় সকলেই বলেন। অথচ, ভূমি সংস্কার বলতে যে, এ'রা স্পষ্টত কি বোঝেন তা প্রায় কেউই বলেন না—বলতে পারেন না। এই বিষয়ে সরকারী চিন্তা ও তার ফলে সরকারী কাজ, কিভাবে বাস্তবের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করে, তার পরিচয় নেওয়া দরকার। তার আগে, এ-দেশের কৃষি-ভূমিতে সম্পত্তির অধিকার কিভাবে বিন্যস্ত সেটি দেখতে হবে।

এ-দেশে সমস্ত কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৪২ জন এক একরেরও কম জমি চাষ করেন—অথচ তাদের চষা জমির পরিমাণ মোট কৃষি-জমির শতকরা মাত্র ১·২ ভাগ। অনুরূপভাবে ১ থেকে ৫ একর জোতের মালিক কৃষক পরিবার গুলির সংখ্যা শতকরা ২৯, কিন্তু তাদের কর্ষণাধীন জমি মোট কৃষি জমির শতকরা সাড়ে চৌদ্দ ভাগ। পাঁচ থেকে দশ, এবং দশ থেকে পঞ্চাশ একর জমির মালিক কৃষক পরিবারগুলি সংখ্যায় প্রায় তুল্যমূল্য—কিন্তু তাদের কর্ষণাধীন জমির পরিমাণে পার্থক্য বিস্তর—যথাক্রমে শতকরা ১৮·৫ ও ৪৮·৪ ভাগ। পঞ্চাশ একরের বেশী জমির মালিকরা সংখ্যায় শতকরা মাত্র একজন, কিন্তু এ'দের হাতে কর্ষণাধীন জমির শতকরা ১৭ ভাগ ন্যস্ত।*

সাধারণ হিসেবে পাঁচ একর জমির একটি জোতকে অর্থকরী জোত (ইকনমিক হোল্ডিং) ধরা হয়। সেই বিচারে এ-দেশের শতকরা ৭১টি জোত অর্থকরী নয় —বস্তুত প্রায় অর্ধেক জোত (৪২ ভাগ) এক একরেরও কম। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই সব জোতের মালিকরা কেবল নিজের জমি চাষ করে বেঁচে থাকতে পারেন না। ভাগচাষ ছাড়াও, এই সব পরিবারের শিশু, বালক, ও বৃদ্ধ থেকে যুবকদেরও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে রেল, বাস ও স্টীমার স্টেশনে মালবাহী কুলী হিসেবে কাজ করে প্রাণধারণের চেষ্টা চালাতে হয়। অনিবার্য অকাল মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রায়শই অসফল এই সংগ্রাম। দেশের শতকরা সত্তরের বেশী সংখ্যক জোতগুলি যতোদিন দেশের শতকরা ১৫-১৬ ভাগ কৃষিজমি চাষ করবে—যা অর্থকরী নয়, এমন সব এলাকা চাষ করে যতোদিন দেশের অধিকাংশ কৃষকের শ্রমশক্তি বন্দী থাকবে—ততোদিন দেশের আর্থিক জীবনে জোয়ার আসবে কি করে?

মধ্যচাষীর ভূমিকা

অথচ দেশের অধিকাংশ কৃষককে বাদ দিয়েও অন্তত কিছু দূর পর্যন্ত কৃষির উন্নতি সম্ভব। কারণ দেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবার ছোট জোতের মালিক হলেও, দেশের অধিকাংশ কৃষি জমি ছোট জোতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কৃষি জমির শতকরা বিশ ভাগ এলাকা যাঁরা চাষ করেন, তাঁরা পাঁচ থেকে দশ একর জমির মালিক। এ'দের অল্প কিছু পুঁজির সম্বল আছে। তাঁরা যে এলাকা নিয়ে চাষ করেন উপযুক্ত সাহায্য ও নির্দেশ পেলে সেগুলি অর্থকরী চাষের বাহন হতে পারে। আই এ ডি পি-র ১৯৬৮তে প্রকাশিত 'মডার্নাইজিং ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার, ১ম শীর্ষক' শীর্ষক প্রতিবেদনে স্পষ্টতই উল্লেখিত হয় যে, এ-দেশে নতুন কৃষির উদ্যোগ এসেছে এইসব মাঝারি কৃষকদের কাছ থেকে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের কিছু এলাকা বাদ দিলে যাদের হাতে ১৫ একর বা তার বেশী জমি আছে, তাঁরা নিজের হাতে জমি চাষ না করে, 'বাড়তি জমি' ভাগ-চাষের জন্যে বন্দোবস্ত দেন। তাঁদের পক্ষে এই ব্যবস্থাই লাভজনক। কারণ ভাগ-চাষে কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে, খরচ না করে, পরিচালনার দায়িত্ব ও শ্রম স্বীকার না করে, মোট ফসলের অন্তত অর্ধেক ঘরে আসে। এই কারণেই এই ধরনের বড়ো চাষীর কাছ থেকে অন্তত নতুন উচ্চ ফলনশীল শস্যের চাষে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়নি। মধ্য চাষীরাই এতে বিশেষত এগিয়ে আসেন এবং ছোট চাষীরাও উৎসাহিত হন। কিন্তু শেষোক্তদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা সীমায়িত হবার ফলে, ইচ্ছা সত্ত্বেও এ'রা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ কেবল বড়ো চাষীদের লাভবান করছে, এই অতি-সরলীকৃত অর্ধসত্য থেকে তাই আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

বড়ো চাষীর ভূমিকা

পনেরো একরের বেশী জোতের মালিক বড়োচাষী কখনই নিজে চাষ করেন না, এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে এ ধরনের বড়ো চাষী সাধারণত নিজেই চাষ করেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সহ প্রাক্তন জমিদারী অধ্যুষিত পূর্বে ভারতে এ ধরনের ঘটনা বিরল। এমনকি উত্তরপ্রদেশেও ড্যানিয়েল থর্নার দেখেন যে, বেশী জমির মালিক কিছুটা জমি নিজে চাষ করে বাকি জমি ভাগে দেন। পশ্চিমবঙ্গে বেশী জমির মালিকদের রীতি হলো সাধারণত সব জমিটাই ভাগে বরাদ্দ করা। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের 'অল ইন্ডিয়া ডেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সারভে ১৯৭১-৭২' থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যা জানা যায় তা এই : এখানে মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৫৮ জন ভূমিহীন অথবা আধ একর থেকে এক একর জমির মালিক। যাঁরা আধ একর জমির মালিক, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬ জনের বেশী লোক চাষ করেন সওয়া একর থেকে আড়াই একর এবং শতকরা ২ জন আড়াই থেকে পাঁচ একর। নিজেদের জমি আধ একর হওয়া সত্ত্বেও এ জমি তাঁরা পান কোথা থেকে? রিজার্ভ ব্যাংকের প্রদত্ত তথ্য থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর মেলে। এতে দেখি যে, ২৫ একরের জমির মালিকরা নিজেরা কোনো চাষাবাদ করেন না। এ'দের জমিই অন্যেরা ভাগে চাষ করেন।

সীলিং-এর অকার্যকারিতা

এক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বলতে আমরা কি বুঝবো? রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিকদের মধ্যে পাঁচ একরের বেশী জমির মালিক হলেন শতকরা ৮ জন। যেখানে ছোট চাষীর বাহুল্য এতো বেশী এবং খেতমজুরদের হার এত বেশী ভারতে মোট কর্মনিযুক্ত মানুষের শতকরা ২৬ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ জন। সেখানে কৃষিতে কতো জমি আছে যে, ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিকদের মধ্যে তা বণ্টন করলে মানুষ স্থায়ীভাবে উপকৃত হবে? এ ছাড়া গ্রামের কর্মহীনদের কথাও ভাবতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মনিযুক্ত জনসংখ্যা ১২৩·৭ লক্ষ, কর্মহীন মানুষ ৩১৯·৪ লক্ষ, তার মধ্যে গ্রামবাসী ২৪২·৮ লক্ষ এবং কৃষক ও খেতমজুর ৭২·৩ লক্ষ (১৯৭১ সেন্সাস)। মোট চাষের এলাকা ৫৫·৭ লক্ষ হেক্টর (ফার্টিলাইজার স্ট্যাটিটিক্স ১৯৬৮-৬৯)। এর মধ্যে কাকে কতো পরিমাণ জমি বণ্টন করা হবে? ভারতের আবাদী এলাকা (এন এস এ) ১৪ কোটি হেক্টর, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ১২·৬ কোটি এবং তার উপর কর্মহীন মানুষ ৩৬·৩ কোটি (ইন্ডিয়া ১৯৭৬ এবং সেন্সাস ১৯৭১)। এখানেও সেই একই প্রশ্ন।

বস্তুত কৃষিতে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে, জমি বণ্টনের কথা যাঁরা বলেছিলেন, তাঁরা লাভজনক কৃষি-ব্যবস্থার কথা (ভায়েবল এগ্রিকালচার) ভাবেননি বা কৃষিতে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কথাও ভাবেননি। এমন কি কৃষির আয় তথা কৃষির সমৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক বিকাশ ও রূপান্তরের কি যোগ, তাও তাঁরা চিন্তার মধ্যে আনেননি। অধ্যাপক এম এল দাঁতওয়ালার সদম্ভ স্বীকৃতি অনুযায়ী, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে, তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে, প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের আয় সমভাবে মাসিক একশো টাকা করে দেওয়া। এতে পাঁচ জনের একটি চাষী পরিবারের আয় দাঁড়ায় দৈনিক ৩ টাকা ৩০ পয়সা বা মাথা পিছু ৬০ পয়সা। এতে শুধু কৃষিতে পুঁজি সঞ্চয় অসম্ভব হয় তাই নয়, কৃষকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা রুচির কোনোই উন্নতি সম্ভব হয় না। তাছাড়া শিল্প-পণ্যের ক্রেতা হিসেবে গ্রামাঞ্চল অবহেলিত থাকে। ফলে শিল্প ও কৃষি কিছুরই বিকাশ সম্ভব হয় না। অথচ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধ্যাপকের নির্দেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক দাঁতওয়ালা বিস্তর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন (ইকনমিক উইকলি, বম্বে সন ১৯৫৬)।

সীলিং আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অর্থ এই নয় যে, দেশের কৃষিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। সেটা আদৌ কোন বক্তব্য নয়। বস্তুত আজকে এ-দেশের কৃষি অর্থনীতিতে সত্যকার পরিবর্তন আনতে হলে ভাগ চাষ বন্ধ হওয়া দরকার। সে-কাজ কঠিন বলেই কেউ তাতে অগ্রসর হন না। এখনও হননি। সীলিং বেঁধে কৃষি অর্থনীতির সমস্যার সমাধান যে হবে না, তা তথ্যপঞ্জী থেকে স্পষ্ট। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যতই যৎসামান্য হোক, জমি বণ্টন করে হয়তো সাময়িক জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়, কিন্তু জনসাধারণের দুর্গতি তাতে দূর হবে না, এবং দুস্থতা ও দুর্গতি যদি থেকেই যায়, তাহলে রাজনৈতিক মুনাফাও অচিরে অদৃশ্য হবে।

কিন্তু সীলিং বেঁধে জমি বণ্টনকে কেউ কেউ 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বলে চালাতে চান। এ'রা কৃষি ও সমাজতন্ত্র উভয় বিষয়েই সমূহ অজ্ঞতার পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর 'ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া' গ্রন্থের (১৮৯৯, ইং অনু: মস্কো ১৯৫৬) ভূমিকায় যা বলেন তা বিশেষত প্রণিধানযোগ্য :

Agronomists in W. Europe who demand the consolidation of the village community are not socialists at all but people representing the interests of big land-owners who want to tie down the workers by granting them patches of land, that in all European countries those who represent land-owners interests want to tie down the agricultural workers by alloting them land." (পৃ: ৫)

অথচ এইভাবে 'প্যাচেস অফ ল্যান্ড' ছড়িয়ে এ-দেশে সমাজতন্ত্র আনার কথা বলা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার বলতে কি বোঝায় ভারত সরকারের তরফ থেকেও তা কোনোদিন স্পষ্ট করা হয়নি। আমাদের বিদ্বানমণ্ডলীও এ বিষয়ে নীতিগত লক্ষ্য (স্ট্র্যাটেজিক এইম) কি, তার স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেননি। এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ভূমিতে কৃষকের অধিকার স্বত্ব (পেজেন্ট প্রোপ্রাইটর-শিপ) প্রবর্তন করা সরকারের লক্ষ্য ছিল। এই ধারণার ভিত্তিতে ড্যানিয়েল থর্নার তাঁর 'ল্যান্ড অ্যান্ড লেবর ইন ইনডিয়া' (১৯৬২) গ্রন্থে উত্তর প্রদেশের জমিদারী নিরোধ আইনের বিস্তর অপ্রশংসা করেন, কারণ এতে নাকি প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করে, ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হয়।

কিন্তু সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রস্তাবটা প্রকৃত পক্ষে ছিল কি? এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো ভারত সরকারেরই 'রিপোর্ট অফ দি প্যানেলস অন দি কমিটি অফ ল্যান্ড রিফর্ম' (১৯৫৯)। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিষ্ঠিত এই কমিটি অদূর ভবিষ্যতে দেশের ভূমি ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ দেননি। বরং তাঁরা কৃষিতে, প্রচলিত স্বত্বগুলি সুদৃঢ় করার সুপারিশ করেন। একথা বলার পর তাঁরা একই সঙ্গে এই আশ্চর্য আশা প্রকাশ করেন যে, কোনো এক ভবিষ্যতে ভারতীয় কৃষিতে পঞ্চায়েতী গ্রাম-সমাজ বা 'ভিলেজ কম্যুনিটি' সমস্ত চাষাবাদ সমেত গোটা গ্রাম-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এটা খুবই আশ্চর্য আশা এই কারণে যে, 'গ্রাম-সমাজ' যে কি ছিল, তা আজ ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে—পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় এ ধরনের গ্রামীণ ব্যবস্থা যে মারাঠা ভারত দক্ষিণ ভারতের সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ছিল তা ব্যাডেনপাওয়েল তাঁর 'ভিলেজ কম্যুনিটি' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে কিভাবে আমাদের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের গর্ভ থেকে 'ভিলেজ কম্যুনিটি' জন্মলাভ করবে, তা আমাদের বলা হয়নি। অথচ আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সেই ব্যবস্থাই আমাদের গ্রাম-জীবনের সবটাই নিয়ন্ত্রণ করবে। মনে হয়, সরকার কৃষি জমিতে স্বত্ব-স্বামীত্বের প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব জ্ঞান করে একটা কাল্পনিক সমাধানের চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। এটা সমাধান তো নয়ই, সমাজতন্ত্রও নয়।

কৃষি-সমবায়

কৃষিতে অর্থনৈতিক সংকটের আর যে একটি

---

* এইচ বি শিভামাগগী : ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

সম্ভাব্য সমাধানের ওপর বিশেষত তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) সময় বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তা হলো কৃষি-সমবায়। আশা প্রকাশ করা হয় যে, দেশে, কৃষি-সমবায়গুলি উৎপাদন ও আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনবে। কার্যত সে রকম কিছুই হয়নি। কেন হয়নি, তার বিশ্লেষণ করা হয় ১৯৬৫র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গ্যাডগিল কমিটির প্রতিবেদনে। মূল কারণ একটিই : ভারতীয় কৃষিতে জমির ওপর মালিকানায় নানা রকম ভেদ-বিভেদ থাকার ফলে, এবং তার ওপর অতি ছোট চাষী ও ভাগচাষীরা সংখ্যায় খুব বেশী বলে, তাদের সঙ্গে জমির বড় মালিকদের সমবায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনি। একে অন্যের ভাগচাষী বা মজুর হয়ে দাঁড়ায়।

তা ছাড়া সমবায় যদি কার্যকরী হয়, তাহলেই যে, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে তা মনে হয় না। বহু ছোট ছোট ক্ষেত-খামারে বহু লোক আজ যত রকম কাজে নিযুক্ত, সমবায়িক খামারে তার অনেক কাজই নিষ্প্রয়োজন হবে। যেমন, ছোট ছোট ক্ষেত ঘিরে আল বাঁধা ও তা টিঁকিয়ে রাখার জন্যে আজকের মতো মানুষের শ্রমশক্তির অপচয় ঘটবে না। একই কাজ করতে আজ যতো শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয় তার আর প্রয়োজন হবে না। যেমন ছোট ছোট নানা আকারের ক্ষেতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঠনালা কাটতে যত শ্রমশক্তি ব্যয় করতে হয়, সুসংবদ্ধ সমবায়িক ক্ষেতে তার দরকার হবে না। সংক্ষেপে সমবায় কার্যকরী হলে কৃষিতে লোক-নিয়োগের প্রয়োজন কমবে। সেক্ষেত্রে কৃষি-সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের ব্যাপক পরিকল্পনাও প্রয়োজন। তা না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, আর্থিক উন্নতি বিশেষত কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে লোক-নিয়োগ বাড়ে না—তা কমে যায়। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। ভারতীয় কৃষিতে জনবাহুল্য আমাদের কৃষির অনগ্রসরতার পরিচায়ক, এটা মনে রাখা উচিত। কৃষিব্যবস্থা অগ্রসর হলে এ দেশের কৃষিতে বহু মানুষের প্রয়োজন কমবে। বস্তুত শিল্পায়ন ব্যতীত শেষ পর্যন্ত কৃষিরও উন্নতি সম্ভব নয়।

॥ ২ ॥

আমাদের মূলগত সমস্যাগুলির রেখাবয়ব পাওয়া গেল। প্রসঙ্গত এ যাবৎ সমস্যা-সমাধানে কি করা হয়েছে তার একটি বিচার ও আলোচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথমেই যা চোখে পড়ে, তা এই যে, এ দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে সরকার অগ্রসর হননি। সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থেকে, জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ সমস্যাগুলির মোকাবিলায় সরকারের চেষ্টা আবদ্ধ থেকেছে। সাধারণ সমস্যা বলতে বিশেষত উল্লেখ্য (ক) দেশের বহির্বাণিজ্যে ক্ষতি বোধ করে, ভারতীয় টাকার মুদ্রামূল্য সুরক্ষিত করা, (খ) দেশে খাদ্য সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং (গ) দেশের প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরতা দূর করাও, স্বাধীনতার পূর্ব যুগ থেকে দেশের সাধারণ সমস্যার মধ্যে গণ্য।

আমাদের পরিকল্পনার ধারার দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে বরাবর দুটি মূল লক্ষ অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। (১) দেশে মাথা-পিছু খাদ্য সরবরাহ বা 'অ্যাভেলাবিলিটি' পর্যাপ্ত রাখা। (২) শিল্পোৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ।

মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য সরবরাহে অ্যাভেলাবিলিটি ও ভোগ এক নয়। মাথা-পিছু যথেষ্ট খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি দেশে আয়ের বিশেষ অসাম্য থাকে, তাহলে অল্প-আয়ের মানুষদের পক্ষে মাথা-পিছু খাদ্যের ভোগ, প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে। অন্যান্য পণ্যের ভোগ সম্পর্কেও এই সত্য আরো বেশী প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত মানুষের ভোগ নির্ভর করে তার আয়ের মানের ওপর। নানা স্তরে ব্যক্তির ভোগ নির্ভর করে সমাজে আয়ের বণ্টনের ওপর এবং সামগ্রিক সামাজিক ভোগ (টোটাল সোস্যাল কনজাম্পশনে) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক আয় বা, তার ওপর। আমাদের পরিকল্পনায় সমাজে আয়ের বণ্টনের নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, কাজেই এখানে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের ভোগবৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়নি। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৯) এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং এ সম্বন্ধে কিছু উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পঞ্চম পরিকল্পনাই কার্যকর হয়নি। আমাদের পরিকল্পনায় তাই বারবার সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়েছে, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর যাতে বিভিন্ন পণ্যের অ্যাভেলাবিটি বা প্রাপ্তি-সম্ভাবনা বাড়ে।

মাথা-পিছু খাদ্যশস্য

স্বাধীনতার পর, বিশেষত পরিকল্পনার যুগে মাথা-পিছু খাদ্যের অ্যাভেলাবিলিটি প্রায়শই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয়নি। হিসেব করা হয় যে, প্রত্যেক মানুষের দৈনিক ১৬ আউন্স বা সাড়ে চারশো গ্রামের সামান্য বেশী খাদ্যশস্য ভোগ করা দরকার। আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এই প্রয়োজন ইদানীংকালে প্রায় কখনই মেটেনি। নির্ভর করতে হয়েছে আমদানির ওপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু (১৯৫৬) থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত প্রায় কোনো বছরেই খাদ্য আমদানি ৩২ লক্ষ মেট্রিক টনের কম হয়নি। (ব্যতিক্রম শুধু ১৯৫৫, ৫৬ এবং ৭১ ও ৭২)। ১৯৬০-এর দশকে খাদ্যশস্যের আমদানি হুহু করে বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৫, ৬৬ ও ৬৭তে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রায় ৭৫ লক্ষ, এক কোটি সাড়ে তিন লক্ষ ও ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন! এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, দেশে উৎপাদনের তুলনায় আমদানি খুব বেশী না হলেও ভারতের রেশনিং ব্যবস্থা প্রধানত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই খাদ্য আমদানি এইভাবে দারুণ বাড়তে থাকায়, ভারতের রেশনিং ব্যবস্থা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়, শিল্পাঞ্চলে অশান্তি প্রবল হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯৬০ থেকে ৬৪তে আমাদের রেশন সরবরাহের শতকরা ৭৫ থেকে ৯০ ভাগ আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের মুখে এসে ভারত সরকার কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন উদ্যোগ নেন এবং দেশের রেশনিং ব্যবস্থাকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর গড়ে তোলার সত্যকার চেষ্টা শুরু করেন।

যদিও ১৯৫৯-এ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারত এক অভূতপূর্ব খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হবে, এবং তখন কোনো সূত্রেই প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানি করা সম্ভব হবে না, সুতরাং সরকারের উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হওয়া। তবু আমাদের দেশের সরকার বা পণ্ডিতবর্গ সে বিষয়ে মনোযোগ দেননি। কেবল ১৯৬৬র ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতের পক্ষে মার্কিন গম আমদানির সুবিধাজনক শর্ত প্রত্যাহার করে নেবার পর এবং ভারতের টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য হ্রাস করার (ডিভ্যালুয়েশন-এর) ফলে আমদানির ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুন, রেশনিং সরবরাহে আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাসের চেষ্টা শুরু হয়। এখনও ভারতের রেশন সরবরাহের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

প্রভূত খাদ্য আমদানি সত্ত্বেও, এ দেশে লোক-পিছু খাদ্যশস্য পাওয়ার সম্ভাবনা বা অ্যাভেলাবিটি ১৯৫১ থেকে ৭৫—এই পঁচিশ বছরের মধ্যে মাত্র নয় বছর যথেষ্ট হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে, ১৯৬৭তে উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষের উদ্যম নেবার পর, সাত বছরের মধ্যে চার বছরই খাদ্যের অ্যাভেলাবিটি যথেষ্ট হয়। তবু বর্তমান অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়নি। খরা ও বন্যার প্রকোপে অঞ্চলবিশেষে ঘাটতি ঘটেই। খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা প্রয়োজনের তুলনায় প্রায়শই কম হয় বলে, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা থেকেই যায়। মূল্যবৃদ্ধির দরুন দরিদ্র ও বাঁধা আয়ের সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হন।

ভারতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় চেষ্টা হয়েছে, শিল্পোৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জন। এই চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে। ভারত আজ যে নানা ধরনের পণ্য ও বৃত্তি উৎপাদন ও সৃষ্টি করতে পারে তৃতীয়

বিশ্বের অন্য কোনো দেশ তা পারে না। পরিকল্পনার পূর্ব যুগে যখন ভারতে ইস্পাতের সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় ৮ লক্ষ টন, আজ সেখানে ৬৮ থেকে ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া, ভারত আজ এমন কারিগরী জ্ঞান অর্জন করেছে যে, এ দেশ আজ কেবলমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে পারে।

কিন্তু ঠিক এইখানেই ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বলতা বিশেষত চোখে পড়ে। যে দেশ আজ নিজেই ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে পারে, সেই দেশই এখন আকরিক লোহ অশোধিত অবস্থায় জাপানে চালান দেয় এবং ইরানে তা ঈষৎ উন্নত পর্যায়ে (পেলেট্স্) চালান দিতে চুক্তিবদ্ধ। বস্তুত বাৎসরিক ৬৮ থেকে ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। আকরিক সম্পদে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও জাপান বছরে ৯৩০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করে—খনিজ সম্পদে ও অন্য সব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন করে যথাক্রমে ১২০০ ও ১১৬০ লক্ষ টন (১৯৭০)। ভারতের যে আকরিক লোহসম্পদ আছে তাতে আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটের তুল্য হতে পারে।

শিল্প ও কৃষি : কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

তাহলে কেন আমাদের শিল্প-উৎপাদন পিছিয়ে পড়ে থাকে? এইখানেই কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধে প্রশ্নটি গুরুত্ব অর্জন করে। অধিকাংশ ভারতবাসী যে কৃষি-নির্ভর ও অতি দরিদ্র তা আমরা দেখেছি। পঞ্চম খসড়া পরিকল্পনায় ভারতের দরিদ্রতম শতকরা ৩০ জন মানুষের মাথাপিছু ভোগ (১৯৭২-৭৩-এর দরে) মাথাপিছু চল্লিশ টাকা ষাট পয়সা করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু এটাও কার্যকরী হয়নি। ভারতের এই বিপুল দরিদ্র সাধারণ বাস্তবে, শিল্প-পণ্যের বাজারের বাইরে বাস করেন। আজকে কৃষির পুনর্গঠন করে, একই সঙ্গে কৃষকের আয়বৃদ্ধি করে কৃষি থেকে শিল্পে লোক-নিয়োগের অনুপাত বাড়িয়ে চললে তবেই দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করা সম্ভব। ভারতের অবরুদ্ধ আর্থিক বিকাশের পথ মুক্ত করার এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

এইখানেই অবশ্য কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি আসে। সর্বাগ্রে অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে, 'কৃষি-উদ্যোগ বিকেন্দ্রিত' এই ধারণাটি ভুল। ব্যক্তির নিজের কাছে যা-ই মনে হোক সমাজ-বাস্তব সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দেশেই উচ্চফলনশীল ধান গম প্রভৃতি চাষের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার ফলেই ঘটে। উচ্চফলনশীল শস্যের বিশেষ বীজ সরবরাহ সংস্থা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

ওপরে যে সামগ্রিক উদ্যোগ ও ব্যাপক পুনর্গঠনের বিষয় উল্লেখ করেছি, তা দেশব্যাপী পরিকল্পনা ব্যতীত সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কার্যপরিচালনার প্রধান সিদ্ধান্ত-গুলি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য একটি দৃঢ় কেন্দ্রের প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত সিদ্ধান্তই কেবল একটি কেন্দ্রে নিতে হবে। আঞ্চলিক প্রয়োজন-গুলি নিরূপণের জন্য এবং আঞ্চলিক কার্যনির্বাহের জন্যেও, আঞ্চলিক কেন্দ্র থাকা দরকার। কিন্তু ফেডারাল সরকারের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিক (বা রাজ্য) সরকার-গুলিকে কেন্দ্রীয় শাসনের কাঠামোর ভিতরেই কাজ করতে হয়, পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সে-ই কথা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যেই বিকেন্দ্রিত সিদ্ধান্তের এলাকা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। ভারতবর্ষ অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড এলাকার যোগফল নয়। দেশের অঞ্চলগুলি ভারতের সামগ্রিক সত্তার অন্তর্নিহিত অংশ। এ কথা মনে রাখলেই কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রিত এলাকার পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ হবে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

আমাদের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, ভারতের আর্থিক বিকাশকে বাধামুক্ত করতে হলে আজ একটি দেশব্যাপী উদ্যোগ-আয়োজন অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে কৃষির পুনর্গঠন ও শিল্পায়ন উভয়েরই উদ্যোগ নিতে হবে। আজ এই সমস্যা বিশেষ জরুরী। জাতীয় অর্থনীতির মন্থরগতি ও স্থায়ী মন্দা, আজ লগ্নী, উৎপাদন ও লোক নিয়োগ, সর্বক্ষেত্রে অচলতাকে স্থায়ী করেছে। অথচ দেশে একদিকে যেমন ব্যাপক বেকারী ও দারিদ্র্যের সমস্যা আছে, অন্যদিকে সমাজে একটি বিত্তশালী অংশও বর্তমান। ফলে সীমাবদ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার সংযোগে পণ্যমূল্যও উত্তরোত্তর বাড়তে পারছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ যে উৎপাদনের সংকট সে কথা আজ নয়—১৯৭২-এর ২০ অক্টোবর—তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন ও বলেন যে, "আজকের এই মূল্যবৃদ্ধি-জনিত সংকটের মূলে রয়েছে ইস্পাত ও রাসায়নিক সারের উৎপাদন হ্রাস......বিদ্যুৎশক্তির অভাব (শর্টেজ) অবস্থাকে আরো সংকটাপন্ন করেছে। (স্টেটসম্যান ২১।১০।৭২)

১৯৭২ থেকে সমস্ত পণ্যমূল্য হুহু করে বাড়তে থাকে এবং ১৯৭৩ ও ৭৪-এ অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী পাইকারী মূল্যসূচী ১৯৭২-এ শতকরা ২১.৫ ভাগ বাড়ে এবং ১৯৭৩-এ এই মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ২৮ ভাগ। এর পরও ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এই সময়ে ১৯৬০-এর তুলনায় এক টাকার প্রকৃত মূল্য তেত্রিশ পয়সায় নেমে আসে। সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এর পর থেকে মূল্য বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হয়। জরুরী অবস্থার প্রথমার্ধে—জুলাই ১৯৭৫ থেকে ৭৬-এর মার্চ পর্যন্ত—মূল্য হ্রাসের প্রবণতা বজায় থাকে। কিন্তু এপ্রিল ৭৬ থেকে যে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়, আজও তার অবসান ঘটেনি। জরুরী অবস্থার প্রথম পর্যায়ে মূল্যমান শতকরা ১০.৭ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তার দ্বিতীয়ার্ধে (এপ্রিল ৭৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ৭৭ পর্যন্ত) মূল্যসূচী আবার শতকরা ১১.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এবারে খাদ্যশস্যের দর ততো বাড়েনি (শতকরা ১১ ভাগ) যতটা বেড়েছে কাপড়ের (১৬ ভাগ) এবং বিশেষত ভোজ্য তেলের (শতকরা ৮৩ ভাগ)।

লগ্নীর সংকট

মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার কারণ হিসেবে একদিকে রয়েছে উৎপাদনের 'সংকট এবং অন্যদিকে মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধি। কিন্তু উৎপাদনের সংকটের গভীরে রয়েছে ভারতীয় শিল্পে লগ্নীর অভাব। ১৯৭২ ফেব্রুয়ারির ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া বুলেটিনে উল্লেখ করা হয় যে, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অধীন বিভিন্ন ধাতু ও রাসায়নিক সার শিল্পে লগ্নীর পরিমাণ পরিকল্পনার বরাদ্দের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগের মতো হয়েছিল। পরবর্তী বছর-গুলিতে—১৯৭৪, ৭৫ ও ৭৬-এ পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পেতে অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৪-এর তুলনায় ৭৫-এ লগ্নী পুঁজির পরিমাণ ২০৬৫ কোটি থেকে ১১৯৪ কোটি টাকায় নেমে আসে। আবার ১৯৭৫-এর তুলনায় ৭৬-এ ক্যাপিটাল ইস্যু ১২২ কোটি থেকে ১০৫ কোটি টাকায় নামে।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে এরকম ক্রমিক অবনতির কোনো কারণ পাওয়া যায় না। কমার্স পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী আয়ের অনুপাতে সঞ্চয়ের হার ১৯৭৪ থেকে ৭৫-এ, ১০.১ ভাগ থেকে বেড়ে ১৪.৭ ভাগ হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে দশ বছরে বড়ো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং লভ্যাংশ হ্রাস পায় নি। একটি হিসেব অনুযায়ী ভারতের ২০টি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ১৯৬৩ থেকে ৭৫-এর মধ্যে ১৩২৫.৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫১২০.৩ কোটি টাকার হয়—অর্থাৎ প্রায় চতুর্গুণ বেড়ে যায়। মন্দার সময়েও লাভের হারে তারতম্য ঘটে নি। ১৯৭০ থেকে ৭২-এ, এই তিন বছরের প্রতি বছরেই মোট লগ্নী পুঁজির তুলনায় মুনাফার হার শতকরা ১০.৩ ভাগ হয়েছিল এবং অর্ডিনারি পেড আপ ক্যাপিটালের অনুপাতে অর্ডিনারি ডিভিডেণ্ড-এর হারও মোটামাট শতকরা ১০ ভাগ হয়।

এই সময়ে ১৯৭২-এর আগের বছর পর্যন্ত পণ্য মূল্য বিশেষত খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল ছিল। অথচ ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ যথেষ্ট ভালো থাকা সত্ত্বেও লগ্নী কেন বাড়েনি, সেটা বাস্তবিকই একটি প্রশ্ন। বরং এই সময় থেকেই লগ্নী হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থার কারণ হিসেবে পূর্বোক্ত ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বুলেটিনের ফেব্রুয়ারি ৭২ সংখ্যায় শিল্পপতিদের তরফে আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করা হয়:

". . . there has been the psychological factor brought into the picture through Industrial Licensing Policy based on the recommendations of the I. L. P. Committee (Dutt Committee) and the Administrative Reforms Commission.

Apart from substantially enlarging the role of the public sector in future industrial growth, restrictions on diversification and expansion of 20 larger industrial houses and majority of foreign companies was imposed. Simultaneously, over 128 items have been reserved for exclusive production in the small scale sector. The functioning of the Monopolics Commission, the right of convertibility of loans by financial institutions into equity have created a psychological irritant to investors."

এই বক্তব্যের সারমর্ম একটিই! সরকারের শিল্প-নীতিতে শিল্পপতিরা বিরক্ত এবং লগ্নী করতে অনিচ্ছুক।

লগ্নী হ্রাস ও কারখানা বন্ধ

লগ্নীর এই ক্রমিক অবনতি শিল্পক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে তাতে নতুন লগ্নী দূরে থাক, পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিই অলাভজনক হয়ে ওঠে। ১৯৭২-এই জানা যায় যে, সরকারের ন্যাশনাল টেক্সটাইল করপোরেশন (এন টি সি) ও তার রাজ্য শাখা-সংস্থাগুলি দেশে ৭৬টি 'রুগ্ণ' সুতী বস্ত্র কারখানা পরিচালনা করছে। আজ পর্যন্ত এই অবস্থার কোনো সদর্থক পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭৬-এ তথাকথিত 'জনতা বস্ত্রের' দাম শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়াবার অনুমতি পেয়েও কাপড়-কলের মালিকপক্ষ নিজেদের অবিক্রীত বস্ত্রের ভারে ভারাক্রান্ত ও ক্ষতি-গ্রস্ত বলে বর্ণনা দেন। অন্যদিকে ১৯৭৬-এর ২২ অগস্ট বোম্বাইতে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর ভাষণ থেকে জানা যায় যে, ভারতের সুতী বস্ত্র কারখানাগুলির প্রায় অর্ধেক অলাভজনক, শতকরা ৪০টি কারখানার যন্ত্রপাতি চল্লিশ বছর বা তার বেশী পুরনো এবং কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের উদ্যোগ বা সামর্থ্য মালিকপক্ষের নেই।

সংকট অবশ্য সুতীবস্ত্র শিল্পেই আবদ্ধ থাকেনি। ১৯৭৬-এর ১৩ই অগস্ট ভারতের তৎকালীন বাণিজ্য-মন্ত্রী জানান যে, ১৯৭৫-৭৬-এ ১৩টি পাটকল বন্ধ হয়ে যায়। জরুরী অবস্থায় অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি—বরং ছাঁটাই-এর সংবাদ মানুষের অগোচরে থাকে। এর পর ঐ অগস্টে-ই (স্টেটসম্যান ২৬।৮।৭৬) জানা যায় যে, চা-বাগিচা শিল্পও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং সরকার তিনটি চা-বাগান স্ব-নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বস্তুত ৭৬-এর ১১-ই অগস্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬-এ শিল্পসমৃদ্ধ মহারাষ্ট্রে-ই ১৮৬টি শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয় ১০৪টি শিল্প-কারখানা এবং রাজধানী দিল্লীর সংলগ্ন ও নানাভাবে তার প্রসাদপুষ্ট হরিয়ানাতেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিল্পোদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। (আনন্দবাজার ১২।৮।৭৬)

এই সব তথ্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, অর্থ-নৈতিক মন্দা কোনো একটি রাজ্যে বা কেবলমাত্র দু-একটি শিল্পে আবদ্ধ থাকে নি। ১৯৭৬-এ তা ভারতব্যাপী হয়ে পড়ে এবং বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগকে রুগ্ণ করে ফেলে। এর আগে

১৯৭৫-এর মার্চে কোলকাতায় রুগ্ণ শিল্প সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্রে, এর উদ্যোক্তা দিল্লীর ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান শ্রী বি কে ম্যাডান, দেশের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার কারণ হিসেবে দেশের আর্থিক বিকাশের শ্লথ মন্থর গতিকেই নির্দেশ করেন। ১৯৭৬-এ শিল্পবিশেষে উৎপাদনের উন্নতি হলেও (যেমন : ইস্পাতশিল্প শতকরা ১৯.৮ ভাগ; খনিশিল্প ১৫.১; সিমেণ্ট ১৫.২; বিদ্যুৎ-শক্তি ১৫.০; মোটর গাড়ি ১৪.৫) এবং সাধারণভাবে শিল্পোৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও, তা নতুন লগ্নীর বা লোক-নিয়োগের ফলে সম্ভব হয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পে চালু উৎপাদন-ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করেই এটা সম্ভব হয়। এই উন্নতি শিল্পের ব্যাপকতর ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেনি। ফলে শিল্পক্ষেত্রে নতুন কোনো জোয়ার আসেনি।

সরকারের ব্যর্থতা : নতুন শিল্পনীতির অভাব

বছরের পর বছর, একের পর এক, শিল্পোদ্যোগ যখন বন্ধ হয়ে চলেছে তখন সরকারের উচিত ছিল এমন একটি শিল্পনীতি গ্রহণ করা যাতে শিল্পে লগ্নী ও লোক-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়—শিল্পের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তৎকালীন সরকার সে পথে গেলেন না। নতুন কোনো শিল্পনীতি গ্রহণ না করে, তাঁরা কেবল-ই বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ক্ষতি-পীড়িত কলকারখানাগুলি অধিগ্রহণ করতে থাকেন। এতে গোটা পাবলিক সেক্টর-ই ক্ষতিগ্রস্ত ও রুগ্ণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং আর্থিক জীবনে সরকারের পক্ষে নতুন উদ্যোগ নেবার স্বাধীনতা-ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, এ-ভাবে চললে কালে,

"... the government will be saddled only with the sick units in the public sector. This will be known as the sick sector while the healthy units will be looked after by the private sector."

বস্তুত তৎকালীন সরকার সমাজতন্ত্রের এক বিচিত্র ব্যাখ্যার দ্বারা নিজেদের নীতিহীনতাকে সমর্থন করছিলেন। একদিকে বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রের কারণে দেশের বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত শিল্পোদ্যোগগুলিকে সম্প্রসারিত হতে দেওয়া হবে না, যদি-ও এই সিদ্ধান্তের যা স্বাভাবিক পরিণতি, সরকার কর্তৃক নিজ উদ্যোগে শিল্প-সম্প্রসারণ, সে নীতি-ও তাঁরা গ্রহণ করেন নি। সম্প্রসারণ না করায় "ফলে বৃহৎ পুঁজির কোনোই ক্ষতি হয়নি—এই সময়ে তাঁদের সম্পদ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, কারণ স্বেচ্ছামত দর বাড়াবার ক্ষমতা তাঁদের আয়ত্তে ছিল। বরং সরকারের নীতির ফলে দেখা যায় যে, শিল্পে লাভ হলে সেটা মালিকপক্ষের পকেটপূর্তি করবে, আর শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 'রুগ্ণ' হলে, তার দায় বহন করবে করদাতা জনসাধারণ। মিশ্র অর্থনীতির অন্তর্নিহিত এই অবিমিশ্র বঞ্চনা নীতিকে এই অনগ্রসর সমাজে সমাজতন্ত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়।

বস্তুত ১৯৭১-এর জুনে ১০ কোটি টাকা সরকারী মূলধন নিয়ে রুগ্ণ শিল্প পুনর্গঠন সংস্থা গঠন করা ছাড়া সরকার দেশের শিল্পক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলেছে তার প্রতিকারের জন্যে নতুন কোনো শিল্পনীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। (দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখকের 'নতুন শিল্পনীতির অভাবে স্থায়ী-মন্দা', কম্পাস শারদীয় ১৯৭৬)। ১৯৭২-এর শেষাংশে সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে নতুন শিল্পনীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনায় সূত্রপাত হলেও তা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বরং ৭২-এর ৫-ই অক্টোবর সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শিল্পনীতিতে কোনো পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ সংকটের সেই সূচনা পূর্বেই নতুন শিল্পনীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল সবচেয়ে বেশী। পরবর্তী কয়েক বছরে অবস্থা ক্রমাবনতি এই নীতিহীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার অন্যতম পরিণাম বলা যায়।

ভুল নীতি—মুদ্রা সংকোচন

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন কোনো নীতি না নিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্যে সরকার মুদ্রা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করেন। এতে কোনোই ফলোদয় হয়নি। মোট মুদ্রা সরবরাহ এবং তার মধ্যে সরকারকে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ ১৯৭০ থেকে প্রতি বছর ক্রমাগতই বেড়ে চলে। পাঁচ বছরে মোট মুদ্রা সরবরাহ বাড়ে শতকরা ৫৩ ভাগ এবং ব্যাঙ্ক ঋণ শতকরা ৮০ ভাগ। ১৯৭৪ থেকে ৭৬-এর মধ্যে মুদ্রা সরবরাহের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পর পর শতকরা ৬.৫; ৯.৭; এবং ১৭ থেকে ১৮ ভাগ বেড়ে যায়। এর ফলে মূল্যস্তর হয় ঊর্ধ্বগামী, অথচ আকস্মিক ব্যাঙ্ক-ঋণের কড়াকড়িতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়—শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

আজকের বেকার সমস্যা : সমাধানের সূত্র

অবহিত সকলেই সম্ভবত স্বীকার করবেন যে, আজ দেশে বেকার-সমস্যা এতো তীব্র যে এর সমাধান করতে পারলে তবেই সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হতে পারে। দু' বছর আগের সংবাদ অনুযায়ী (আনন্দবাজার ২১।৮।৭৬) ভারতে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি! স্পষ্টত ৯৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। সামগ্রিক ভাবে বেকারের সংখ্যা কতো তা কেউ জানেন না। তবু এর একটি যুক্তিসহ অনুমান সম্ভব। 'ইণ্ডিয়া ১৯৬৭'-র তথ্য অনুযায়ী ১৯৬৬-র শেষে ভারতে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষ ২২ হাজার। তখন-ই মোট বেকারের সংখ্যা অনুমিত হয় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি। আজ যদি নথিভুক্ত বনাম মোট বেকারের অনুপাত ১৯৬৭-র সমান আছে ধরে নিই, তাহলে, মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.৩ কোটি থেকে ৩.৭ কোটি। স্পষ্টত সাড়ে তিন থেকে চার কোটির মধ্যে। এটি অবশ্য-ই একটি অনুমান কিন্তু ভিত্তিহীন অনুমান নয়।

আজ এই সমস্যার তীব্রতা সর্বত্র স্বীকৃত কিন্তু সমস্যা সমাধানের স্পষ্ট সূত্র কেউ নির্দেশ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে কেবল চাকরি দেবার শুভেচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হলে যে কোনোই ফলোদয় হবে না, সেটা আমাদের স্পষ্টত বোঝা উচিত। ১৯৭২-এর ৩১ ডিসেম্বর কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় পূর্ববর্তী-সরকারের সঙ্কল্প প্রকাশিত হয় : ফাইভ ল্যাখ জবস এভরি ইয়ার : সেণ্টার মে' অ্যালোকেট স্পেশাল ফাণ্ডস'। কিন্তু এ-সবের ফল কি হয়েছে? শুধু চাকরি নয়, মানুষকে উৎপাদনশীল কাজ দিতে হবে এবং তদুপযুক্ত পরিকল্পনা করতে হবে। না হলে, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরো বৃদ্ধি করা হবে। গত পাঁচ বছরে তাই হয়েছে।

আজকের পরিস্থিতিতে এর জন্যে প্রয়োজন সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা, আলোচনায় জনমতের অংশগ্রহণ এবং এই ধরনের আলোচনার ভিত্তিতে সদর্থক নতুন পরিকল্পনার প্রবর্তন। আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের পরিকল্পনার নজীর আছে। দ্য গল এই ধরনের সম্মতি-ভিত্তিক পরিকল্পনার সাহায্যেই ফরাসীদেশকে ১৯৪৫ থেকে '৫৮র গ্লানিকর অবস্থা থেকে ত্রাণ করেন। আমাদের-ও এই ধরনের পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে, কারণ খসড়া ৫ম পরিকল্পনাতে-ই উল্লেখিত হয় যে, ভারতের মোট উৎপাদনের (জি এন পি) শতকরা ৮৫ ভাগ বেসরকারী উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কারণে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের সম্মতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকরী করলে, আমরা সুফল পেতে-ও পারি। কিন্তু যা কখনোই করা উচিত নয়, তা হলো, 'পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে,' এই ধ্বনি তুলে, উনিশ শতকের অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা। সাইমন কুজনেট্‌স্ তাঁর 'ইকনমিক গ্রোথ অ্যাণ্ড স্ট্রাকচার' (ভারতীয় সংস্করণ : ১৯৬১) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, শিল্পায়নে যে দেশ যতো পশ্চাদ্বর্তী তার শিল্প ও আর্থিক বিকাশে সরকারের ভূমিকা ততো গুরুত্বপূর্ণ হয়। সেই ভূমিকা অস্বীকার করলে এই জনবহুল, বহুভাষী ও অজস্র ভেদ-পীড়িত দেশের পরিণাম পাকিস্তান বা প্রাক্তন অস্ট্রো-হাঙ্গারীয় সাম্রাজ্যের মতো হতে পারে। এই সত্য স্মরণে রেখে, আমরা যতো শীঘ্র একটি সম্মতি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তা কার্যকরী করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হব, ততোই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১০ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সব চিঠি কোনদিন প্রকাশিত হয়নি, অথচ আজ আর পাওয়াও যাচ্ছে না, চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেছে, এমন কিছু চিঠির হদিস পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গ কথা সহ সেগুলির সম্বন্ধে কিছু বলছি—

বাংলা গদ্য রচনায় তখনও কোন স্থির ও সুষ্ঠু পদ্ধতি নির্ধারিত হয়নি। তখন একদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-বহুল বাংলায় গ্রন্থ রচনা করছেন, অপরদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ কথ্য ও গ্রাম্যভাষায় যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখে কথ্যভাষা প্রচলনের চেষ্টা করছেন।

এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখা গ্রন্থগুলির ভাষাকেই সংস্কৃত-বহুল হলেও কেহ কেহ তখন গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করেন।

এমনি সময়ে ইংরাজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে এসে এই দুই পন্থার অর্থাৎ পণ্ডিতীভাষা ও আলালীভাষার মধ্য পথ ধরে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকেও সংস্কৃতবহুল বলে বিবেচনা করলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে একদিন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে বলেছিলেন—'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' (পুরাতন-প্রসঙ্গ)

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা নিয়ে এইভাবে শুধু মুখে অপরের সঙ্গে আলোচনাই করতেন না, বাংলা গদ্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি একবার বিদ্যাসাগরমশায়কে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে এই চিঠির কথা উল্লেখ করে গেছেন। বিহারীবাবু এই চিঠিটির কথা বিদ্যাসাগরমশায়ের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্নের কাছে শুনেছিলেন। এ সম্পর্কে বিহারীবাবু লিখেছেন—

'নারায়ণবাবু বলেন, বাংলাভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে পত্র পাওয়া যায় নাই।'

বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবিতকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবার বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখা নিয়ে তাঁর বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় কটাক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনের ঐ লেখা গ্রন্থভুক্ত করবার সময় অবশ্য কটাক্ষগুলি বাদ দিয়েছিলেন।

লেখা বা সমাজসংস্কারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটু আধটু মতানৈক্য থাকলেও, তিনি বিদ্যাসাগর মশায়কে একজন প্রকৃত মহাত্মা ব্যক্তি ভেবে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করতেন।

বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তখন তিনি সম্ভবত বিদ্যাসাগর মশায়ের পুত্রের কাছেই একটি শোকসূচক পত্রও লিখেছিলেন, এ সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখে গেছেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর বঙ্কিমবাবু একখানি সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রও পাওয়া যায় নাই!'

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কতগুলি চিঠি লিখেছিলেন সে সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। শুধু রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ৩ বার ৩টি চিঠি লিখেছিলেন। একটি চিঠির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ১২৯৯ সালে চৈত্রের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। অপর দুটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ নিজেই হারিয়ে ফেলেন এবং এজন্য পরে দুঃখও প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লুপ্ত চিঠি দুটির কাহিনী এখন বলছি—

রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮-৮৯ সালে। বইটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন বইটি পড়ে স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে একটি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসাসূচক পত্রটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন—

'সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে, তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম। সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোন বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা, তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে নিন্দে করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করাল। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল, সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।'

এই চিঠিটির কথায় রানী চন্দ তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ বললেন—তখন সবে বৌ-ঠাকুরানীর হাট লিখেছি। এখন মনে হয় কত কাঁচা লেখা ছিল তখনকার কালে। কিন্তু বৌ-ঠাকুরানীর হাট পড়ে বঙ্কিম তখন আমাকে একটা চিঠি লিখলেন, আমার লেখার প্রশংসা করে ও আমার ভবিষ্যতের সাফল্য অনুমান করে। সেই চিঠিখানা আমাদের কোনো আত্মীয়ের এক বন্ধুর হাতে যায়। তারপরে সেই চিঠির অন্তর্ধান। আমি আর দ্বিতীয়বার তা দেখলুম না।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)

এবার রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে লুপ্ত চিঠিটির কথা বলছি, সেই চিঠিটি হারিয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একে দুর্ভাগ্য বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ঐ চিঠিটি লেখার যে কারণ ঘটেছিল, তার একটু বিস্তৃত প্রসঙ্গ কথা বলা প্রয়োজন। ব্যাপারটা ছিল এই—

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রচারের এই প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে দুটি হিন্দুর তুলনা করেছিলেন—একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্মপরায়ণ। আর একজন আচারপরায়ণ কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমোক্ত হিন্দুটির সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—ঐ লোকটি কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয় সেখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা বলেন।

প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, এর চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এক সভায় 'একটি পুরাতন কথা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ

করেন। সেটি ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের [illegible]
রবীন্দ্রনাথ তাতে লেখেন—'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসংকোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে, নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। .....কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি ঐ অগ্রহায়ণ মাসে প্রচারে প্রকাশ করেন। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। .... কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশি প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষত তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে এই যে কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।.......

প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তায় মাসে একটি।....

কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জুন আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা। অর্জুন বলিলেন—না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া অর্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে সত্য রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে সত্যচ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন, মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই ধর্ম হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। .....এক্ষণে রবিবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ প্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরাপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল ?'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখার পর রবীন্দ্রনাথ পৌষের ভারতীতে আবার এক দীর্ঘ কৈফিয়ত লিখলেন। এবার অবশ্য তিনি তাঁর লেখায় খুব বিনয় প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন উত্তর দিলেন না। তবে এই সময় তিনি তাঁর উপযুক্ত আর একটি কাজ করেছিলেন। তিনি ২৩ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একটি ক্ষমাসুন্দর পত্র লিখে নিজেদের মধ্যেকার ক্ষণিকের বাদানুবাদের ধূলিমলিনতা মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক পত্রটি রবীন্দ্রনাথই কিভাবে কখন হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্পবয়সের চাপল্য হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই বাদানুবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর পত্রটির প্রসঙ্গে পরে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন—

'ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ......এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি ছাড়া কারও কারও লেখা থেকেও অনুমান হয় বঙ্কিমচন্দ্র কখন কখন রবীন্দ্রনাথকে আরও চিঠি লিখেছিলেন। যেমন, নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—

'আমি বেহার হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটা দ্বিতল গৃহে ছিলেন 'রংগমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। আনন্দমঠ তখ বাহির হইয়াছে।.....

বঙ্কিমবাবু সেদিন সান্ধ্য-আহারের জন্য আমায় আমন্ত্রণ করিলেন এব আরও কয়েকটি বন্ধুকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিবেন বলিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—রবি ঠাকুরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি ?

আমি বলিলাম—যৎ সামান্য এবং বহুদিনের।

তিনি বলিলেন—তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত। He is a talente young man.

সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হেমবাবু ও আরও কয়েকট নিমন্ত্রিত উপস্থিত। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—রবি কোনও কারণে আসিতে পারে নাই।

'বড় আনন্দে নানাবিধ সাহিত্যালাপে সন্ধ্যাটি কাটাইলাম।'

নবীনচন্দ্রের এই লেখা পড়ে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন রবীন্দ্রনাথকে চিঠির দ্বারাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র থাকতেন বৌবাজারে আ

রবীন্দ্রনাথ থাকতেন জোড়াসাঁকোয়—অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল তফাতে। তখন টেলিফোনও ছিল না। তাই মনে হয়, তিনি তাঁর কোন কর্মচারী অথবা নিকটজন মারফত চিঠি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চিঠি ঠিক রবীন্দ্রনাথকে লেখা না হলেও অপরকে লেখা সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রসংগও থেকেছে। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উভয়ে মিলে এক সময় বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদাবলী সংগ্রহ করে 'পদরত্নাবলী' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশবাবুর মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছিল। সে সম্বন্ধে চিঠি লিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুকে লেখা এক চিঠিতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশবাবু ১৩০৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রিকায় লিখেছেন—

"১৮৮৫ পত্রায় পূর্বে 'প্রচারপত্রে কৃষ্ণচরিত্রের যে অংশ অর্থাৎ কৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি সম্রাট নও, মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না' প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহার রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল। পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত যুদ্ধ প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারী অসংগত বলিয়া বোধ হয়।' ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইয়াছিল এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিংসাবৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক, অথচ হিংসার মত সমাজ-বিরোধী (এন্টি-সোসাল) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সে সময়ে রবীন্দ্রবাবু ও আমার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' মুদ্রিত হইয়াছিল। এবং আমি উহার একখণ্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম।'

শ্রীশবাবুর চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

....পদরত্নাবলী পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব ? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের ? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। (যথা—William the Silent)। ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্য চরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ....ইতি— তাং ২৫শে আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেই সময় তিনি একখণ্ড 'কৃষ্ণচরিত্র' রবীন্দ্রনাথের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন, তাঁর ঠিকানা জানতেন না বলে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনজনের জন্য তিনখানি 'কৃষ্ণচরিত্র' দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় ঐ সংগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তা এই—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

তিনখানি 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিঃ ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না। এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—তাং ১০ই আগস্ট

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে সমানই শ্রদ্ধা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়ির সাহিত্যিক সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ তো আসতেনই, রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।...'

পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে আলাপে রবীন্দ্রনাথের সংকোচ কেটে যায়। এবং

তিনি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার জন্য লেখা চাইতেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। হিতবাদী ও সাধনার জন্য লেখা চাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এই

সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১২৯৮, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) থেকে কয়েক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। হিতবাদী প্রকাশিত হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এ সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজী হয়েছেন।'

সাধনা কাগজের জন্যও লেখা চাইতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। সাধনা ১২৯৯—১৩০২ সাল পর্যন্ত চার বছর চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ৪র্থ বৎসরে সাধনার সম্পাদক ছিলেন, প্রথম তিন বৎসর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক হিসাবে থাকলেও আসলে তিনিই সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে যেতেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখা দিতে পারেন নি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য ঐ সময়েই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—অন্তত চারটি প্রবন্ধ না লিখলে হয় না। তা পেরে উঠছি না। তোমাকে একটা দিলে তো চলবে না। স্বর্ণকুমারী রয়েছেন। আমার নাতিদের জন্য খেলনা দিয়ে গেছেন, আমি তো সব বুঝি, তাঁর 'ভারতী' আছে। রবি আসেন। তাঁর 'সাধনা' আছে। তারপর এক আছেন, আমার বেহাই দামোদরবাবু। তিনি 'নব্যভারতের' জন্য ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিদি স্বর্ণকুমারী যেমন আসতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতেন। যেমন—

১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় ৭ম বার্ষিক উৎসবে সভার আহ্বায়ক দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন গিয়েছিলেন। সেদিন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের রচনা কৌশল এবং ঐ নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সেদিন ছিল ১১ই মাঘ। দ্বিজেন্দ্র-নাথের নির্দেশে সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাঘোৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়া ১২৮৯ সালে বাংলার সাহিত্যসেবীদের নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে যে সারস্বত সমাজ স্থাপিত হয়, তাতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সহ-সভাপতি হয়েছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সম্পাদক হয়েছিলেন—কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সহ-সভাপতি করা হলেও তিনি সময়ের অভাববশত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারেন নি। তবুও একথা ঠিক যে সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিশ্চয়ই হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এতটা ঘনিষ্ঠতা থাকায় সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত কোন না কোন সূত্রে এঁদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে আরও চিঠি লিখেছিলেন। তবে সে চিঠির আজ আর হদিস্ মিলছে না।

কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ মজুমদারকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটি আগে উদ্ধৃত করেছি, সেটি ছাড়া তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দু-একটি চিঠির কথা শ্রীশবাবুর নিজের লেখা থেকেই জানা যায়। যেমন, শ্রীশবাবু তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'রাখালের (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা) হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়। বঙ্কিমবাবু নিজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় পদ্ধতি মতেই চিকিৎসা করিতে পারিতেন। স্বয়ং সচরাচর ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া লইতেন। সে যাহা হউক, অন্যান্য চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন রাত্রে আমায় চিঠি লিখিলেন, যেন প্রাতে আমার আত্মীয় সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন খুড়া মহাশয়কে লইয়া যাই। তিনি হোমিওপ্যাথির মত ছোট শিশিতে ঔষধ রাখিতেন। দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—এ যে ঠিক হোমিওপ্যাথির মত।

আমি বলিলাম—উনি দুই তিনটা ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়া চিকিৎসা করেন। তাহাতে বেশ উপকার হয়। এটা বেশ উন্নত পদ্ধতি।

,,বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হোমিওপ্যাথিতে প্রত্যেক ঔষধ পৃথক ব্যবহার করা উচিত। তাহাতে উপকার হইতেছে। সে পরীক্ষার পর ইহাকে উন্নতি বলিতে পারি না।

যাহা হউক, প্রশংসিত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার উপরে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল।'

এখানে প্রসঙ্গত বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ডাক্তারি বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্রেও সাতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলিপুরে চাকরি করিতে করিতে তিনি মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শরীরতত্ত্ব বা এনাটমি পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মত তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বল্পকাল মধ্যে শরীরতত্ত্ব শিখিয়া লওয়া বড় কঠিন সাধ্য নয়। তিনি অস্থি বা শরীরতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে বসিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অনন্যসাহায্যে অধ্যয়ন

করিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়াছি, তাঁহার যখন কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাসনা জন্মিত, তখন তিনি সে বিষয়টা আয়ত্ত করিবার জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। যতদিন সেটা আয়ত্ত না হয়, ততদিন তাঁহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়া রাশীকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।' —বঙ্কিম-জীবনী

এবার শ্রীশ মজুমদারকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটা চিঠির কথা বলি—শ্রীশবাবু লিখেছেন—

"১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ...সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সে মামূর্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, আর কখনও সেরূপ দেখিয়াছি মনে হয় না। ....কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'এখন আর ইংরাজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরাজী ভাষাটা ভারি ইন্‌সিন্‌সিয়ার বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন—'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।'

প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম—'ইদানীন্তকালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্ব-প্রধান সংস্কারক তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।'

এখন 'মাসিক সমালোচকে' প্রকাশিত শ্রীশবাবুর লেখাটা সম্বন্ধে একটু বলছি। শ্রীশবাবুর এই লেখাটি 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক' নামে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচকে'র ৭ম-৮ম যুগ্ম সংখ্যায় (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৬) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় লেখককে আহ্বান করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রীশবাবুকে বলেছিলেন 'এর আগে আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল' এ থেকেই মনে হয়, আগে চিঠি লিখতে না পারলেও এখন এই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে চিঠি লিখেই আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং চিঠিটি বাঙলাতেই লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর সঞ্জীবচন্দ্র ৫ বছর 'বঙ্গদর্শন' চালিয়ে বন্ধ করে দেন। তখন এই শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতি নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এ-ব্যাপারে শ্রীশবাবুর প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীশবাবু লিখেছেন—'আমার 'বঙ্গদর্শন'-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিম-বাবু একদিন বলিলেন, শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমার লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, তা হবে না। ...আর আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজদাদাও খান। ....সেবারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।

শ্রীশবাবুর পরিচালনায় বঙ্গদর্শনের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৮৩)। প্রকাশক ছিলেন বৌবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট। এই বঙ্গদর্শনের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি-সম্বাদ' প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি তখন বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করে দেবার জন্য মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভাবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু নইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি—তাং ২০ ফেব্রুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র তখনও পর্যন্ত বঙ্গদর্শনের উপর কর্তৃত্ব করতেন এবং তাঁরই নির্দেশে শ্রীশ মজুমদার পরিচালিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।

এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে 'নিবেদনে' শ্রীশবাবু না, এজন্য শ্রীশবাবুর মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভ দূরীকরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর (সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু আগেই হয়েছিল) শ্রীশবাবু আবার বঙ্গদর্শন বার করার উদ্যোগ করেন। এবার তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ-চন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব গ্রহণ করে ১৩০৮ সালের বৈশাখে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন। সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ।

এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে 'নিবেদনে' শ্রীশবাবু লিখেছিলেন—

'বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য-সংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সহৃদয়তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।...'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন যে কয়েক বৎসর প্রকাশিত হয়েছে, ততদিন বরাবরই সেই প্রাচীন বঙ্গদর্শনের সুনাম ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। [ক্রমশ]

প্রণব রায়

কেরলের কোট্টারাম্ রাজ্যের রাজার প্রতিষ্ঠিত এক দেবমন্দিরের মুক্তাঙ্গনে বহুকাল আগে কথাকলি পালার মহড়া চলেছিল এইভাবে—ঠিক সন্ধ্যায় মন্দির দেবতার আরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাকলি পালানাচ শুরু হওয়ার অন্তত ঘন্টা তিনেক আগে নৃত্যশিল্পী মেক্আপের জন্যে সাজঘরে প্রবেশ করলেন। একটি তৈলদীপ (নিলাবিলক্কু) সাজঘরে জ্বলে উঠল। দেওয়ালে ঝুলন্ত আয়নায় তিনি মেক্আপ নেবার জন্যে মন দিলেন। টিম্‌টিমে প্রদীপের অল্প আলোয় আপনমনে অঙ্গরাগ করে চললেন একটার পর একটা লাল, হলুদ, কালো, সবুজ, সাদা রঙ দিয়ে। কিন্তু এই অঙ্গরাগেরও একটা নিয়ম আছে। প্রথমে হলুদ রঙ দিয়ে কপালে আঁকতে হবে 'নামম্' অর্থাৎ কতকটা অর্ধ সুদর্শনচক্রের মতো। এটা হোল অবতার কৃষ্ণের প্রতীক। এর পর কালো রঙের নেত্ররঞ্জনী দিয়ে গাঢ়ভাবে নেত্রঅপাঙ্গদ্বয় রঞ্জিত করে শিল্পী তাঁর মুখমণ্ডলে সবুজ রঙের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন। শুধু ঠোঁট দুটোয় দেওয়া হোল লাল রঙ। পরে আর এক কঠিন অঙ্গরাগ—নাম 'চোট্টি' অর্থাৎ গালের দুপাশে দাড়ি করার মতো সাদা রঙের প্রলেপ। চালবাটা ও কাগজ মিশিয়ে আস্তে আস্তে এই অঙ্গরাগ করতে হয়। মুখমণ্ডলের এই অঙ্গরাগ শেষ হওয়ার পর মস্তক নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মুকুটে ভূষিত করে শিল্পী চাকচিক্যময় বস্ত্র ও অন্যান্য আভরণে নিজেকে সজ্জিত করলেন। এটা 'বেশম্'। এরপর সাজঘর থেকে বেরিয়ে মন্দির অঙ্গনে তাঁর অভিনয় দেখানোর পালা। সে স্থান ইতিমধ্যেই 'নিলাবিলক্কুর' (তৈলদীপ) সমারোহে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করেছে। মৃদঙ্গম্ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারধ্বনি এবং দাক্ষিণী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের ভাবগম্ভীর সুরারোপে মন্দিরপ্রাঙ্গণ যেন এক স্বর্গীয় সুষমায় পরিপ্লুত। শিল্পী তাঁর অভিনয়ে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে অদ্ভুত সব পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে। দর্শকবৃন্দের সামনে তিনি যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্র অথবা দশানন, কখনও বা মহাভারতের কোন চরিত্র অথবা অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারিণী অপরূপা উর্বশী। নৃত্যের আশ্চর্য ছন্দ ও ভঙ্গিমা 'মুদ্রা'র বিচিত্র কৌশল ও শিল্পীর মুখমণ্ডলে ব্যঞ্জনাময় ভাবব্যক্তি—এই সব মিলিয়ে সে সময়ের কথাকলি নৃত্য রাজপরিবার ও বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। সম্প্রতিক কালেও [illegible] নৃত্যগুলির মধ্যে কথাকলির [illegible] আশ্চর্য মাধুর্য লক্ষ করা গেছে।

কথাকলি ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য যেমন ভরতনাট্যম্, মোহিনীঅট্টম এ সমস্তই ভারতের সুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্যকে অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছিল। নৃত্য সম্বন্ধে এই সব দাক্ষিণী নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের অনুষঙ্গরূপে পরিপাটী সাহিত্যকৃতি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকলার অবদান অনস্বীকার্য। সংস্কৃতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধিনিষেধ দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যসমূহে মোটামুটি অনুসৃত হলেও কালক্রমে দেশ ও কালের প্রভাবে তার কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী থেকে। এক্ষেত্রে 'ক্ল্যাসিক্যাল' সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে এর মিল খুব বেশি। দাক্ষিণী শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির অভিনেয় বিষয় যেমন রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্য বা ইতিহাসমূলক পৌরাণিক আখ্যান থেকে গৃহীত তেমনি এর প্রয়োগবিজ্ঞানের (অভিনয়ের) নিয়মাবলীও রচিত হয়েছে ভরত প্রভৃতি সুপ্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারদের আদর্শ অনুসরণ করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ চতুর্দশ শতকে রচিত তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলংকারগ্রন্থের নাট্যপরিচ্ছেদে যে চার প্রকার অভিনয়ের কথা বলেছেন সেগুলি হোল, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অর্থাৎ অভিনেতা যে চরিত্রে 'রূপারোপ' করেন তা তাঁর অঙ্গভঙ্গী, সংলাপ, সাজসজ্জা (আহার্য) ও ভাবব্যক্তির মধ্যে ফুটে ওঠে। ভারতের প্রায় সব শাস্ত্রীয় নৃত্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশী লক্ষ করা যায় শুধুমাত্র অভিনেতার বাচিক বা সংলাপ ছাড়া। এর পরিপূরকরূপে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের মাধ্যমে অভিনেয় বিষয় পরিস্ফুট করা হয়। অঙ্গসঞ্চালন ও

'রুক্মিণী স্বয়ংবরম্' পালার এক দৃশ্য

বিবিধমুদ্রার সুষ্ঠু প্রয়োগে বিষয়বস্তু দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উদ্ভবের আগে সুপ্রাচীনকালেও সংলাপবর্জিত এই মূকাভিনয়ের (প্যান্টোমাইন) অনুষ্ঠান হোত বলে জানা গেছে। কালক্রমে অভিনয়ের এই সুপ্রাচীন রীতিটি লুপ্ত হয়ে গিয়ে দৃশ্যকাব্যে সংলাপ মুখ্যস্থান লাভ করতে থাকে। আঙ্গিক, আহার্য (সাজসজ্জা) ও সাত্ত্বিক অভিনয় নাট্যে যথারীতি চালিত হয়।

কিন্তু নৃত্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যেখানে নৃত্যই মুখ্যস্থান অধিকার করে সেখানে নাটকীয় সংলাপের কোন প্রয়োজন হয় না। কথাকলি ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। প্রায় তিন শ বছরেরও বেশি আগে কেরলের কয়েকজন [illegible] পূর্বোক্ত সুপ্রাচীন মূকাভিনয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কথাকলির সৃষ্টি করেছিলেন। কেরলের মাটিতে সেই বিলুপ্তপ্রায় সুপ্রাচীন অভিনয়ের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের কিছু কিছু সেই সময় নিশ্চয়ই ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাট্যকার ভাসের তেরোটি রূপকের (দৃশ্যকাব্য) মালায়ালম লিপির প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এই কেরলের ত্রিবান্দ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল—অনেক কাল সেগুলি লোকচক্ষুর অগোচরে থাকার পর। কথাকলি সৃষ্টির আগে 'কৃষ্ণনাট্টম' নামে এক ধরনের নৃত্যনাট্যের উদ্ভব হয় ভাগবতের কাহিনী আশ্রয় করে। এর রচয়িতা ছিলেন কেরলের কোঝিকোদ রাজ্যের জমিদার মানবেদন থম্পুরান্। ৮২১ মালায়ালম অব্দ বা ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে এই নৃত্যনাট্য রচনা করেন। এর ঠিক পরেই এই ধরনের নৃত্যনাট্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কোট্টারাকারের রাজা বলবীর কেরলন্ 'রামনাট্টম্' নামে এক নৃত্যনাট্যের প্রচলন করেন। পরবর্তী কালের কথাকলির আদি রূপ এই রামনাট্য। রামনাট্যের নৃত্যমাধুর্যে চমৎকৃত হয়ে বেত্তীথুনাদের রাজা তাঁর রাজ্যে এর প্রবর্তন করেন। এখানেই সর্ব প্রথম এই নৃত্যনাট্য অনুশীলন ও অভিনয়ের জন্যে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় 'কলিযোগম্'। মধ্য কেরলে 'কলিযোগম্' বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পাশাপাশি আরও অনেক রাজ্যে তার প্রসার হয়। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানে কোট্টারাকারের রাজার সৃষ্ট রামনাট্টমের মঞ্চাভিনয়ের অনুশীলনই ছিল উদ্দেশ্য যদিও তার মধ্যে কিছু নতুন নতুন বিষয় অনুপ্রবেশ করেছিল।

এখনকার কথাকলি বলতে যা বোঝায় তার স্রষ্টারূপে যিনি অমর হয়ে আছেন তিনি হলেন কোট্টারামের এক যুবরাজ—কেরল বর্মা। সাহিত্য ও শিল্পে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী কেরলবর্মা প্রথমে পূর্বপ্রচলিত রামনাট্টমের শিল্পগত প্রয়োগকৌশলের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হলেন। তাঁর আগে রামনাট্টম্‌এ উচ্চমানের কলাকৌশলের সাহায্যে তাকে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার সম্ভাবনার কথা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। বোধ হয় কিছুটা অসুবিধাও

মুখমণ্ডলে অঙ্গরাগ

ছিল। গতানুগতিক রামায়ণের কাহিনীকেই রামনট্টম্‌এ অভিনেয় বিষয়রূপে কঠোরভাবে গ্রহণ করা হোত বলে বিষয়বস্তুর কোন অভিনবত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত, অভিনয়ের শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির চলন ছিল না। কেরল বর্মা এইগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে প্রথমে অভিনেয় বিষয়ে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে মহাভারত ও পুরাণের অনেক আকর্ষণীয় কাহিনী অবলম্বন করে কয়েকটি নৃত্যনাট্য রচনা করলেন, যেগুলি 'কোট্টারাম্ নৃত্যনাট্য' রূপে কথাকলির ইতিহাসে ক্ল্যাসিক রচনারূপে স্বীকৃত হয়েছে। শুধুমাত্র নৃত্যনাট্য রচনায় নয়, এইগুলির সার্থক অভিনয়ে চরিত্রোপযোগী যথাযথ ভাবব্যক্তির জন্যে নতুন নতুন 'মুদ্রা'র প্রচলন, নৃত্যের তাল ও লয়ের অদ্ভুত সুষম বিন্যাস যা দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের ফলে সম্ভবপর এবং এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্যব্যতীত যা এক প্রকার অনায়ত্ত হয়ে ওঠে—এই সবই কেরল বর্মার অসাধারণ প্রতিভার ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। কথাকলি এই সময় থেকেই একই সঙ্গে মালায়ালম্ ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পরূপে বিদগ্ধজনের নিকট স্বীকৃত হতে থাকে যেটা অন্য কোন ক্ল্যাসিক নৃত্যের পক্ষে এতখানি লাভ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে যে কথাকলি সাহিত্যমালার উদ্ভব হয়েছে তার জন্যে কেরল বর্মার সৃজনধর্মী সাহিত্যই অনেকাংশে দায়ী।

কেরল বর্মা মালায়ালম্ ভাষায় উৎকৃষ্টমানের এই কথাকলি সাহিত্য সৃষ্টি করে সে সময়ের খ্যাতনামা রামনাটম শিল্পী ও গুরু ভেল্লাত্তু পানিক্করের সাহায্যে কোট্টারামে এই কথাকলি নৃত্যের প্রশিক্ষণ ও প্রচারের জন্যে 'কথাকলিযোগম্' নামে এক শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই প্রথম 'কথাকলি' নামের উদ্ভব হয়। নামটিও খুবই তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে অর্থাৎ 'কথা' বা আখ্যান অথবা কাহিনীকে আশ্রয় করে 'কলি' বা নৃত্যের তাললয়ে সঙ্গীতের সুরমাধুর্য ফুটিয়ে তুলে এক শিল্পশ্রী সৃষ্টি করা হোত। প্রাক্-প্রচলিত রামনাট্টম্‌এ এর প্রায় কিছুই ছিল না বললেই চলে। কথাকলিতে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই তিন প্রকার অভিনয় যুক্ত হয় এবং যন্ত্র ও কণ্ঠ-

কথাকলি নর্তক

সাজঘরে (কথাকলি নর্তক) অলংকরণ ও বেশবিন্যাসে

সংগীতের মাধ্যমে আখ্যান অংশকে বিবৃত করা হয়। কথাকলির আবির্ভাবে কৃষ্ণনাট্টম্ ও রামনাট্টম্-এর জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে কেরলের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ-পরিবার ও জমিদার শ্রেণীর পোষকতা ও তত্ত্বাবধানে কথাকলি নৃত্যের দ্রুত প্রসার হয়। পরে এই নৃত্যে অভিনয় পদ্ধতির সূক্ষ্মতর কারুকার্য সন্নিবিষ্ট হয় কেরলের কাপলিংগাদ্ মানার এক তরুণ নাম্বুদিরির হাতে। কাপলিংগাদ্ মানার নেদুম্পুরয়াক্কল গ্রামে তিনি নতুন একটি 'কলিযোগম্' প্রতিষ্ঠা করে কেরল বর্মার কথাকলিকে আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করেন। এর পর সারা কেরল রাজ্যে বহু কথাকলি ক্লাব বা কলিযোগম্-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজপরিবারের দ্বারা কথাকলির সৃষ্টি হলেও এর সাম্প্রতিক জন-প্রিয়তার পশ্চাতে রয়েছে নগরবাসী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইংরেজ আমলে কেরলের সামন্তরাজ্যের ওপর বৃটিশ শাসকবর্গ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। তার ফলে রাজপৃষ্ঠ-পোষকতায় সংবর্ধিত কেরলের সাহিত্য ও শিল্পের সমৃদ্ধি বেশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। এমন কি য়ুরোপীয় ধর্মপ্রচারকেরাও সে সময় কথাকলির প্রচার ও প্রসারের বিপক্ষে ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতে থাকেন। এর ফলে কথাকলির অগ্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। এই সুন্দর নৃত্যকলা এইভাবে অনাদর অবহেলায় প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এমনি সময়ে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে মানাক্কুলাম্-এর খ্যাতনামা রাজা কক্কটু করনবপ্পাদ, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুন্দরাজা ও মহাকবি ভাল্লাথোল সেই বিস্মৃতপ্রায় কথাকলি নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে সঙ্কল্প করলেন। মহাকবি ভাল্লাথোলের নেতৃত্বে এই নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। তার নাম দেওয়া হোল 'মানাক্কুলাম্ কলিযোগম'। কেরল রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ কলাকেন্দ্র 'কেরল কলামন্ডলম্'-এর প্রতিষ্ঠা হয় এর প্রায় দশ বছর পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। মুকুন্দরাজা ও ভাল্লাথোলের গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে কথাকলির শুধু পুনরুজ্জীবন ঘটেনি, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী কেরলবাসীর কাছে তা অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই উচ্চাঙ্গ নৃত্যটি কেরলের সীমা ছাড়িয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে। আজ কথাকলি নৃত্য ভারতের বাইরে য়ুরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার নানা দেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয়তা, সমাদর ও পুরস্কার লাভে ধন্য, একথা অনস্বীকার্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই কথাকলির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এর উচ্চমানের মুদ্রা ও অভিনয়ভঙ্গী তাঁর নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে বিশেষ সহায়ক বলে স্বীকার করেন। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের অভিনয়াংশে কথাকলির বিশেষ বিশেষ মুদ্রা ও কোন কোন অভিনয়শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট, বিশেষ করে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে কথাকলি মুদ্রার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কথাকলি আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত ও একটি উচ্চাঙ্গ ভারতীয় নৃত্যরূপে বিদগ্ধজনের কাছে প্রচুর সম্মান লাভ করেছে। ভারতের অপরাপর শাস্ত্রীয় নৃত্য যেমন ভরত-নাট্টম্, ওড়িষী, কুচিপুদী, কথক, মণিপুরীও কথাকলির মতো এত সম্মান ও সমাদর লাভ করতে পারেনি। এর মধ্যে শৃঙ্গার প্রভৃতি নটি রসই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। কথাকলির বিভিন্ন পালার এই রসগুলি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। অপরাপর নৃত্যে অঙ্গী বা প্রধান রস হিসেবে শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য এবং তার সহায়ক বীর, করুণ প্রভৃতি রসের গৌণ রূপে প্রকাশ ঘটে। কথাকলির জন্যে যেমন একদিকে সমৃদ্ধশালী মালয়ালম সাহিত্য রচিত হয়েছে তেমনি উন্নতমানের সংগীতকলাও বিকাশ লাভ করেছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কেরল বর্মা যে চারটি সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন সেগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করেছিল। তাঁর সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী উন্নায়ি ওয়ারিয়রও এক শক্তিশালী নাট্যকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে কালকেয় বধ, নলচরিথম, রুগ্মিণি স্বয়ম্বরম, কিরাথম্, লবণাসুরবধম, কীচকবধ্ম, কল্যাণসৌগন্ধিকম, রাবণবিজয়ম্ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এইগুলির বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রের তান্ডবনৃত্য প্রাধান্য লাভ করলেও নারী চরিত্রের (অবশ্য কথাকলিতে পুরুষেরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন, আধুনিককালে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে) 'লাস্য' নৃত্যও বিরল নয়। লাস্যনৃত্যের মধ্যে শৃঙ্গাররসের বাহুল্য থাকে। কথা-কলিতে প্রধান বা 'আদি অবসান' ভূমিকায় নারীকে খুব কমই দেখা যায়। সমগ্র কথাকলি সাহিত্যের মাত্র দুজন কবি—কোট্টারামের রাজা ও উন্নায়ি ওয়ারিয়র কোন কোন নারী চরিত্রকে 'আদি অবসান' ভূমিকায় উন্নীত করেছেন। উর্বশী এরূপ একটি নারী চরিত্র। যেমন কথাকলির 'অর্জুনোর্বশীয়ম্' নামক একটি পালায় উর্বশী আদি থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বর্গীয় রূপলাবণ্য ও কামশৃঙ্গারের অভিনয় দ্বারা ধ্যানমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয় অর্জুনের চিত্তবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কার্যে বিফলমনোরথ হয়ে উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দেন।

কথাকলিতে উর্বশীর নৃত্য-ভঙ্গিমায় ছন্দ সংগীতের তাললয়ের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। আঙ্গিক,

নৃত্যনাট্য 'উত্তরাস্বয়ম্বরম্'-এর একটি

কথাকলি নর্তকীর অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা

আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার অভিনয় উর্বশীর মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে। এই উর্বশীচরিত্র অভিনয়ে যে সব নট খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'দাক্ষিণী ঘরানা'র কুঞ্জুকৃষ্ণ পানিকরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অপর একজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম কুঞ্চম্বম্ কুঞ্জু পিল্লাই। কিন্তু কুঞ্জুকৃষ্ণ পানিকর ছিলেন উর্বশীর ভূমিকায় অনন্য। তাঁর অভিনয়ের গুণে উর্বশীর অপরূপ দেহলাবণ্যের মাধুর্য এত বেশি ফুটে উঠত যে দর্শকদের মনে হোত যেন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের অমর কাব্যের উর্বশী স্বর্গলোক থেকে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। তারও বহু আগে কোট্টায়ামের যুবরাজ কেরল বর্মাও নাকি উর্বশী চরিত্র অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। এ সম্পর্কে এক চমৎকার গল্প কেরলের নানা স্থানে চলিত আছে :

একবার দক্ষিণ কেরলের কোন রাজা কেরল বর্মার সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'কালকেয় বধ' পালা বেশ কয়েক রাত্রি ধরে তাঁর রাজধানীতে অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু উর্বশীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করতেন তাঁর অভিনয় রাজার ভালো না লাগায় অভিনয় শেষ হওয়ার আগেই তিনি আসর ছেড়ে যেতেন। তখন একদিন পরিচালক রাজাকে জানালেন, নতুন এক অভিনেতা ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। রাজা সেইদিন সারা রাত ধরে উর্বশীর অদ্ভুত অভিনয় দেখলেন এবং নতুন অভিনেতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোট্টায়ামের যুবরাজ কেরল বর্মা কিনা। উর্বশীর ভূমিকায় কেরল বর্মার অভিনয় তাঁর খুবই পরিচিত ছিল। কেরল বর্মা তাঁর বেশভূষা খুলে ফেলে রাজার কাছে তাঁর পরিচয় দিলে রাজা তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করলেন।

একালে কথাকলিনৃত্য সেই ঐতিহ্যপরম্পরার অনুসরণ করলেও নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যে কিছুটা পরিবর্তিত রূপ লাভ না করেছে একথা বলা যায় না। এই পরিবর্তন বিশেষ করে চোখে পড়ে মঞ্চসজ্জায় ও কিছুটা অভিনেয়-বিষয়ে। ক্লাসিক সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় কলাকৌশলের প্রতি আস্থা রেখেও কথাকলিতে আজ অনুপ্রবেশ করেছে আধুনিক চিন্তা ও গবেষণার ফলশ্রুতি। পশ্চিমবাংলায় 'কলকাতা কলামণ্ডলম্'-এর উদ্যোগে আজ থেকে দু'বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কলকাতা কথাকলি ক্লাব'। এই ক্লাবের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কথাকলি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতা কলামণ্ডলম্-এর অধ্যক্ষ গোবিন্দন্ কুট্টিও একজন বিখ্যাত কথাকলি শিল্পী যিনি কথাকলিকে পৃথিবীর নানা স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কলামণ্ডলম্-এর শঙ্কর-নারায়ণও একজন প্রসিদ্ধ কথাকলি শিল্পী। এঁরা দুজনে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে কথাকলির বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। একদা বিস্মৃতপ্রায় কথাকলির নৃত্যসৌন্দর্য আজ বিশ্বের দরবারে বিদগ্ধ ও রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিগত কয়েক বছরে কলকাতা কলামণ্ডলম্-এর উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত আধুনিক রঙ্গমঞ্চে কথাকলির কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতা কলামণ্ডলম্এ ১৯৬৮ সালে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কথাকলি, ভরতনাট্যম্, মোহিনীঅট্টম্ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত, সুদৃশ্য প্রেক্ষালয় আজ কথাকলির প্রদর্শনস্থল। সেকালের মতো দীপমালায় শোভিত মুক্ত অঙ্গনে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান আজ আর দেখা যায় না। নৃত্যপ্রদর্শনীও সারারাত্রি-ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় না।

আধুনিক দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে কথাকলিনৃত্যে কিছু কিছু নতুন বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য লোকগাথা থেকে কিছু কিছু কাহিনীও গৃহীত হয়েছে, যেমন সোহরাব ও রুস্তম্, ডেভিড্-গলিয়াথের কাহিনী প্রভৃতি। রাজস্থানী লোকগাথার কোন কোন চিত্তাকর্ষক কাহিনীও আধুনিক কথাকলির অন্যতম বিষয়বস্তুরূপে পরিগৃহীত। সবচেয়ে লক্ষ করার হোল, অভিনেতার সাজসজ্জার আড়ম্বরকে কিছুটা সরল করার চেষ্টা, পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখাবয়বের নিপুণ সঞ্চালনের দ্বারা বিশেষ ভাবের প্রকাশেই অভিনয়ের সাফল্য প্রদর্শনের উদ্যোগ এবং সবশেষে নারীচরিত্র-রূপায়ণে অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ। এ-বিষয়ে সাম্প্রতিককালে রীতা গাঙ্গুলী এক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'রূপানুরূপে' অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর উভয় চরিত্র অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের দেশে কথাকলির সমাদর এক পরিশীলিত গোষ্ঠী বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিকট সীমাবদ্ধ। একালের দর্শক-বৃন্দের কাছে এই নৃত্যকলার অভিনয়-কৌশল ও প্রাচীন মুদ্রাগুলির তাৎপর্য আজও দুর্বোধ্য অথবা পৌরাণিক কাহিনী আজ আর তেমন দর্শকদের আকৃষ্ট করে না। 'বেশম্' বা সাজ-সজ্জাও আধুনিক চরিত্র রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করে। প্রাচীন মুদ্রাগুলির সাহায্যেও কোন আধুনিক বিষয়ের অভিনয় সহজসাধ্য হয় না। এই সব সমস্যার কথা চিন্তা করে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলার কোন কোন গবেষক ও শিল্পী কথাকলির মধ্যে একালের উপযোগী কিছু কিছু নতুন 'মুদ্রা' উদ্ভাবনের জন্যেও চেষ্টা করছেন। এ-বিষয়ে সাফল্য অর্জিত হলে নব-যুগের সৃষ্টি হবে। তবে লক্ষ করা প্রয়োজন, এই প্রাচীন নৃত্যকলাটির চিরায়ত শিল্পসৌন্দর্য যেন আদৌ ক্ষুণ্ণ না হয়।

উপলব্ধি

গণেশ বসু

মুখের ওপরে নামে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির মতো গাঢ় ছায়া
নির্বিকার ঔদাসীন্য ঘিরে রাখে ছেঁড়া তাঁবু, ছত্রিশ বছর
নিংড়ে নিংড়ে বের করে কান্না এক, সহানুভূতির ছিটে ফোঁটা
গাঢ় অন্ধকারে ডোবে, স্বরগুলো ফিকে হয়, ম্লান
হয়ে যায় ভালোবাসা, অত বড়ো চেতনার মুখ অন্তরীপ।

ফুলে ফুলে কেঁপে ওঠে অপমান, নিঃশব্দে গোপন
জ্বালা ঝরে, বাজী-হারা ঘোড়া আমি, নিরুদ্ধ বেদনা
ধাওয়া করে বন্ধুদের স্মৃতি নিয়ে, দুঃসাহস ভরে
দাঁড়াবার জোর নেই, আমার গৌরব নেই কোন,
অভ্যাসের ছাঁচে দীর্ণ, শিকড়েরা আলগা হয়, জ্বলজ্বলে আত্মানুবর্তিতা।

বিস্মৃতি বিলীন প্রান্তে ভেসে যায় আমাদের বোবা দুঃখগুলি।

একই আকাশের নীচে

জিয়া হায়দার

একই আকাশের নীচে আমরা আছি, এই কথা ভেবে
অজস্র সান্ত্বনা পাই ; নুইয়র্ক কিংবা ঢাকা, যা-ই
হোক, সকলেই একই সূর্য দ্যাখে, একই চন্দ্র তারা;

এখানে যখন রাত্রি, ওখানে দিবস ;
তাতে কিবা আসে যায় ; বসন্তে এখানে যেই ফুল
ফোটে, পিছু ফেলে আসা বাংলার প্রাঙ্গণে
হয়তো তার নাম নেই এখানে, শরৎ-ও বুঝি পলাতক তাই ;
নবান্ন রয়েছে এখানেও, সে নয় হেমন্ত; তা'তে
কিবা আসে যায় ; পৌষে চন্দ্রপুলি কিংবা ক্ষীরের পাঁচালী
বাংলার কিষাণের ঘরে,
অন্তত এখানে আছে বরফের গাথা ;
দাদীমার বিপুল সাধনা দিয়ে তৈরী নকশী কাঁথা না-ই বা
থাকলো, তবু আমরা একই আকাশের নীচে
আছি, এই তো অনেক সান্ত্বনা!

হাডসনের পানি জমে বরফ হয়েছে,
যন্ত্রযান চলতে গিয়ে থেমে আছে, কখন, কখন
নগরকর্তারা সব বরফ সরাবে।

সেন্ট্রাল পার্কের বৃক্ষ নেড়ে হয়ে নতুন যৌবন
আর জীবনের স্বপ্নে থরো থরো কাঁপে;
কুয়াশায় ঝাপসা হয় দিগন্তের রেখা—ব্রডওয়ে টাইমস স্কোয়ার,
এবং রমনার পার্ক, জিন্না অ্যাভিনুর মোড়, লক্ষ্মীর বাজার।

ধোঁয়াটে কুয়াশাময় সবকিছু, নুইয়র্ক ঢাকার নগরী—
পাশের ফ্ল্যাটের ওই বুড়ো মহিলাটি আজ আর
আপিসে যাবে না, বড়ো শীত, ঠান্ডা; বুড়ো
জননী আমার, সেও বুঝি
বেলা হলে হেঁসেলে যাবেন!

কুয়াশার বরফের জাংলা ভেঙে ভেঙে
রোদ্দুরটা আকাশের একটু-খোলা সামান্য চত্বরে
উঠলেই মিলিয়ে গেল এক হয়ে বুড়িগঙ্গা এবং হাডসন,
সেন্ট্রাল রমনা আর নুইয়র্ক ঢাকার নগরী।

অপরাহ্নে, চার্লিকে স্মরণে রেখে

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

সনাতন হাসিও সামলাও।

চামড়ার রুটির সঙ্গে ফিতের ব্যঞ্জনে
সোনার হরিণ খুঁজতে আর্দ্র বিদূষক
সহজে সঙ্গীর মধ্যে খুঁজে পায় সম্পন্ন মোরগ;
অথবা বিশুষ্ক স্ত্রীর প্রয়োজনে ক্লান্ত নারীঘাতী।
তথাপি অন্যত্র সেও অম্লান নারীর
আর্ত ত্রাতা : ঘরের বিপন্ন হাওয়া থেকে
নিয়ে যায় পৃথিবীর সবুজ বাতাসে।

হেলানো টুপির মতো তার বাঁকা হাসির চাবুকে
শিউরে ওঠে দেশে দিকে মদির মজলিশ;
কাঁটা-চামচের সঙ্গে বেকন জোটেনি,
মাখনের মৃদু স্পর্শে কাঁপেনি শৈশব;
মরুদেশে সঙ্গীহীন খেজুরের মতো
বালুঝড়, মরীচিকা তাকে দেয়নি পান্থ-পেয়াবাস;
—সংসারের ঢেউ-এ ঢেউ-এ যুঝেছিল বিবিক্ত বিবেক।

সমুদ্রের কোন পারে তার উনা, নাকি টিউলিপ?

এখানে মলিন রোদে সহজিয়া স্তব॥

ঠিক সেখানেই থাকবে

হেনা হালদার

ঠিক সেখানেই থাকো যেখানে রয়েছো চিরদিন
নিষ্ঠায় নিয়তি স্থিত সংকল্পে অটল। কাছে নয়, দূরে নয়
দৃষ্টির সীমার মধ্যে, নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।
যদিও নিষ্ক্রিয় তবু একেবারে নিস্পৃহ নয়
নির্বাপিত হয়ে নাতিশীতোষ্ণ এখনো।

আলোকিত অন্ধকারে, বন্ধদ্বারে অনর্গল হাওয়া
স্রোতহীন নদী বক্ষে নিঃশব্দ জোয়ার......
শস্য কাটা মাঠে মাঠে আঁটি বাঁধা খড়ের সান্ত্বনা
বিসর্জিত প্রতিমার ভেসে ওঠা শোলার মুকুট।

কিছু নেই তবু কিছু আছে। চিঠিহীন শূন্য খাম
ওপরে ঠিকানা লেখা প্রিয় পরিচিত।
তুচ্ছ কিন্তু মহামূল্য!
প্রমত্ত প্রেমের পর অবসন্ন ঘর জুড়ে স্মৃতির গালিচা
ম্যাজিক কার্পেট নয়। কোথাও যাবে না সঙ্গে নিয়ে
ঠিক সেখানেই থাকবে, যেখানে রয়েছে চিরদিন।

বাচ্চাটাকে দেখিস!
একটু বাদেই ফিরব।

শিকারীগুলোকে শিক্ষা দিয়ে হরিণ-শিশুটিকে আমার গভীর অরণ্যের গুহায় নিয়ে যাব...

স্বর্ণোদ্যানে শিকারী...
এ-রকম জীব আগে কখনো দেখিনি...
কামড়াবে না তো?
হিক্কক্
হিস্‌স্...

অন্যান্য প্রাণীও একে-একে ফিরে আসছে...

ভয় পেও না! এগুলো পোষা!
ঘর্‌র্‌র্‌
গর্‌র্‌র্‌

আমি এসে গেছি!

ভেলায় ওঠো! বিদায় হও!
সে আর বলতে!
চলো হে!

আমরা এখন একেবারে নিরস্ত্র।
তাতে কী! আমরা চারজন, ও একা! ও-পারে গিয়ে ওকে শিক্ষা দেব!
হুম্!
চলবে
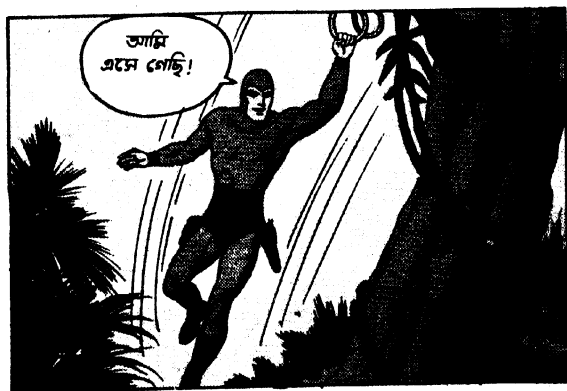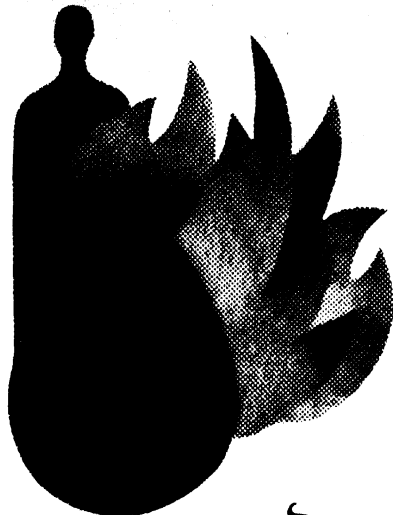
প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

দিগন্তে কালবৈশাখী

॥ ১ ॥

একটা ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গের মামলা সেকেন্ড্ ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে সফীকুল শেষ পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেল। সোজা সহজ মামলা। পরিষ্কার ৪০৫ ধারার কেস। সেকেনড ম্যাজিসট্রেট হামিদ সাহেব প্রথম দিকে তার মক্কেলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই অগ্রাহ্য করেননি। আসামী পক্ষের উকিল বাড়োরি বিপদ দেখে হঠাৎ ৪০৪ ধারা উদ্ধৃত করে একটা ফ্যাকড়া বাধিয়ে বসল। বলল, এ মামলায় যেহেতু মুভেব্‌ল্ প্রপারটি জড়িত নেই, সেই হেতু এই মামলাটাকে ৪০৫ ধারায় বিচার করা চলে না। ছোকরা ম্যাজিসট্রেট ঘাবড়েই গেলেন। বাড়োরি হিন্দু সভার নেতা এবং তার প্রতিপক্ষের উকিল একজন মুসলমান। ছোকরা ম্যাজিসট্রেটও মুসলমান। বাড়োরি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করল। স্যর এই আদালতের উচ্চ আদর্শ এবং গরিমাময় ঐতিহ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার। এই আদালত আশা করে আপনিও সেই আদর্শের, সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্যতা প্রদর্শন করবেন। মামলাটাকে, ইওর অনার স্ট্রিকটলি আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে রেখেই আপনি বিচার করবেন সে বিশ্বাস আমাদের অন্তত পুরোমাত্রায় আছে। আশা করি, আমার বিজ্ঞ সহযোগী, ফরিয়াদী পক্ষের উকিল, যাকে আমরা একজন ঈমানদার মুসলমান বলে জানি, উনিও আমার আশার অংশভাগী হবেন।

বাড়োরি খুবই ঘোড়েল। তাকে ঈমানদার মুসলমান বলে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে হামিদ সাহেবকে আরও ঘাবড়ে দিল। হামিদ সাহেব শেষে সফীকুলের কথাই শুনতে চান না। শেষে সে যখন সেকেনড ম্যাজিসট্রেটকে মামলা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের মক্কেলের অনুকূলে রায় বের করে নিয়ে বার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল তখন তার আর নড়ে বসারও যেন শক্তি নেই।

বেয়ারাটাকে গেলাসটা বের করে দিয়ে শুধু বলল, "পানি।"

বার লাইব্রেরী তখন সরগরম। বরদা আর খালেকুজ্জমানে তখন ফাটাফাটি চলেছে। দিগম্বর মৈত্র, অপেক্ষাকৃত সিনিয়ার উকিল, মাঝে মাঝে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বারে বারে পান খাচ্ছেন এবং নিজের অজ্ঞাতেই আবার তর্কে জড়িয়েও পড়ছেন। আর মাঝে মধ্যে বিপন্ন হয়ে দিগম্বর সফীকুলকে সাক্ষী মানছেন, বেশ তো বেশ তো সফীক মিয়াকেই জিজ্ঞেস করা যাক না। উনিই বলুন না।

বেয়ারা জল এনে দিল। সফীকুল ঢক ঢক করে গেলাসের জলটা খেয়ে নিল।

খালেকুজ্জমান বললেন, "বরদাবাবু তখনের থে ক্যাবল বলেই চলিছেন মোছম্মানগের অন্যায় আবদার তিনি জান থাকতি মানে নেবেন না। ভালো কথা। কিন্তু মোছম্মানুগের আবদারটা যে কী আর সিডা ক্যান্ যে অন্যায়, এই কথাডাই জানতি পারা গ্যালো না।"

বরদাকান্ত বললেন, "আপনাগের সব দাবিই আবদার আর সব আবদারই অন্যায়, এর আর বিতং করে বলার কী আছে? তাহলি যে ঠগ্ বাছতি গাঁ উজাড় করে দিতি হয়!"

"এইটে হল গে টিপিক্যাল হিন্দু মেনটালিটি।" খালেক বললেন, "জানেন কিছুই আপনাগের বলার নেই, তবু গার জোরে গলাবাজি করেই জিতে যাতি চান। অ্যাঁ!"

বরদা বললেন, "হারা জিতার কোনও প্রশ্নই নেই। মোছলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলোরে আপনি কী ক'বেন? উডা আবদার ছাড়া আর কী?"

খালেক বললেন, "মোছলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলো কী এমন ছিল যা আপনার কাছে আবদার আবদার ঠেকিছে? সিডা কবেন তো?"

বরদা বললেন, "অযৌক্তিক প্রস্তাবকেই আমি আবদার বলি।"

খালেক বললেন, "তালি কন্ না, কোন্ প্রস্তাবডা আপনার কাছে অযৌক্তিক ঠেকতিছে?"

"মোসলেম কনফারেনসের", বরদা বললেন, "সব প্রস্তাবই অযৌক্তিক।"

"তালি ইবার কন", নাছোড় খালেক বরদাকে চেপে ধরল, "মোছলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলো কী?"

বরদাকান্ত কোণঠাসা হয়ে বললেন, "তা বেশ তো, আপনার মুখ থেকেই শোনা যাক না! দিগিনদা শোনেন দেখি, খালেক মিয়ার জবানীতে মোসলেম কনফারেনসের প্রস্তাব কতটা যুক্তিপূর্ণ শুনায়।"

খালেক বললেন, "তাহলি শোনেন। তবে সিডা শুনার আগে অ্যাকটা ছোট্ট কথা শুনে রাখেন। কাজে দিতি পারে। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না, কথাডা বলিছেন বিবেকানন্দ স্বামী মহারাজ।"

বরদাকান্ত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু খালেক তাঁকে কোনও সুযোগই দিলেন না। বলে চললেন, "মোছলেম কনফারেনস যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করিছেন তার মধ্যি তিনটে বিষয়ই ছিল প্রধান। যথা : এক, স্বতন্ত্র নির্বাচন বহাল রাখতি হবে ; দুই, পানজাব আর বাংলায় মুছলমানরে শতকরা ৫১ডা আসন দিতি হবে আর তিন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুছলমানদেরে অ্যাক তৃতীয়াংশ আসন দিতি হবে। ন্যান্, অ্যাখন কন দিনি বরদাবাবু, এর মধ্যি কোন্‌ডা মুছলিম পয়েনট অফ ভিউ-এর থে আপনার কাছে অযৌক্তিক।"

বরদা আবেগোকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নাউ দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। দ্যাখেন মিয়া সাহেব, এই কথাডা আপনার মুখ দিয়ে শোনবো বলেই আপনারে দিয়ে কবুল করায়ে নিলাম। নাহলি আমি মোসলেম কনফারেনসের এই র‍্যাংক কমিউন্যাল প্রস্তাবউ জানি, আর বিবেকানন্দের বাণীডারেউ জানি। কোনও হিন্দুই এ প্রস্তাবে সায় দিতি পারে না। কেন না হিন্দুর চোখি ভারতভূমির প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। সে তাই ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যি হাসতি হাসতি এই ভূমিতে তার প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বিভেদের সবরকম চক্রান্ত আমরা বানচাল ক'রে দেবো। আপনাগের এই বিভেদপন্থী মনোভাবকে আমরা দারুণ হেইট করি।"

বাড়োরি এতক্ষণ বসে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। হঠাৎ খালেককে লক্ষ্য করে বললেন, "হোয়াই ডোনটউ গো টু ইওর ওন সয়েল? আপদ যায় তাহলি!"

খালেক বলল, "এইটেই আমার ওন সয়েল বাড়োরিবাবু। আমি মুছলমান। ইছলাম আমার ধর্ম। মুছলমান ভৌগলিক প্রতিমারে পুজো করে না। বিশ্বকবি ডঃ ইকবাল বলিছেন, বর্ণ ও রক্তের প্রতিমা ধ্বংস করিয়া (স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বের) ধর্ম ইছলামে আত্মবিলোপ কর—যেন তুরাণী, ইরানী, আফগানী ইত্যাদি ভৌগলিক জাতীয়তাসূচক বিশেষাত্মক কিছু অবশিষ্ট না থাকে। তাই এক মুছলমানই একথা জোর দিয়ে কতি পারে, হিন্দুস্তান আমার, বোখারা আমার, ইরাণ, তুরাণ আমার। আর আমি সব গুলিসানেরই বুলবুল। হিন্দুর মত ঘরের বাইরি পা দিলি আমাগের জাত যায় না। আমাগের ভাবনা চেতনা তাই অ্যাত্ত ইউনিভারসাল।"

দিগম্বরবাবু এই সুযোগটা আর নষ্ট করতে চাইলেন না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ক্যান্ আমাদের মুনি ঋষিদের ভাবনা-ধারণাই যথেষ্ট ইউনিভারসাল্ ছিল।"

খালেক বলল, "সে তো আপনাগের ব্যাদে ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। তখন হিন্দুউ অনেক বড় ছিল। কিন্তু আজকের হিন্দু কি সেই হিন্দু? বিশ্ব থেকে হিন্দুর দৃষ্টি কবেই স'রে গেছে। তার পরের থে হিন্দুর দৃষ্টি, সৃষ্টি আর কর্ম তো ক্যাবল হুঁকো আর হাঁড়ি আর জা'ত বাঁচাতিই খরচ হইছে। অ্যাখন সম্বল ক্যাবল চালাকি।"

তর্ক শুনতে শুনতে তন্দ্রা এবং ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সফীকুল।

"ইওর অনার, ইওর অনার," বাড়োরি চিৎকার করে উঠলেন, 'ইনডিয়ান পিনাল কোডের ৪০৪ ধারায় প্রপারটির ডেফিনিশন্‌টার প্রতি আপনারে অ্যাকবার চোখ বুলোতি অনুরোধ করতিছি স্যর। এই দ্যাখেন স্যর এখেনে স্পষ্ট বলা হইছে মুভেবল প্রপারটি অর্থাৎ কিনা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্র ছাড়া ক্রিমিন্যাল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর অপরাধ অনুষ্ঠিত হতি পারে না। আমার মাননীয় ও বিজ্ঞ সহযোগী উত্থাপিত ৪০৫ ধারার অভিযোগ ঐ একই কারণে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতি পারে না। স্যর, এই মামলার ফরিয়াদী, আমার বিজ্ঞ সহযোগীর মক্কেল শ্রীমতী হরপ্রিয়া দাসী এই মামলার আসামী আমার মক্কেল শেখ বরকতুল্লাহ্ ওরফে বকু শেখের হাতে টাকা পয়সা, গহনাগাটি, বাসন কোসন আসবাবপত্র অর্থাৎ এককথায় অস্থাবর সম্পত্তি বলতি যা বুঝি তার কোনোকিছুই তীর্থযাত্রার কালে বিশ্বাস ক'রে আমার মক্কেলের কাছে রা'খে যাননি। ফরিয়াদী নিজিই বলিছেন, ইওর অনার, যে তিনি তাঁর ধানের ক্ষেত, যেহেতু বকু মিয়াই বরাবর তা চাষ করে থাকে, এবং তাঁর ক্ষেতের ধান বকু মিয়ার জিম্মায় রা'খে গিছিলেন। শ্রীমতী হরপ্রিয়া দাসী তীর্থ সা'রে ফি'রে আসে দ্যাখেন তাঁর ক্ষেতে ধান নেই। তিনি অ্যাখন সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে ৪০৫ ধারার মামলা রুজু করিছেন। স্যর, ক্যান্ ধান গাছ বি কল্‌ড্ অ্যাজ অস্থাবর সম্পত্তি? ধান গাছরে কি স্যর মুভেবল বলা যায়? আমি স্যর এই পয়েনটেই এই মামলা খারিজ করে দিতি অনুরোধ জানাতিছি। যত্তো বাজে ব্যাপারে খামাখা আদালতের সময় নষ্ট।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাড়োরির টোপটা ভালমতই গিলে ফেলেছিলেন। সফীকুল যতবার মুখ খুলতে যায়, ম্যাজিস্ট্রেট ততই বলেন, "ডোন্‌ট ওয়েস্‌ট্ মাই টাইম প্লীজ। দি ক্রাক্স অফ দি পয়েনট হিয়ার ইজ অ্যাজ দি ডিফেনস হ্যাজ পয়েনটেড আউট, হোয়েদার এনি মুভেবল্ প্রপারটি ইজ ইনভলবড্ অর নট্। তার উপরেই ৪০৫ ধারা অর্থাৎ ক্রিমিন্যাল ব্রিচ অফ ট্রাসট-এর মামলা দাঁড়িয়ে আছে। নাউ, ইফ আই হ্যাভ্ টু বিলিভ দ্যাট স্ট্যান্‌ডিং প্যাডি ক্রপ ইজ এ মুভেবল প্রপারটি দেন আই হ্যাভ টু পুট মাই বিলিফ অন এ মুভিং মাউনটেন অলসো। ইজনট্ ইট?"

এবং আদালত হাসিতে ফেটে পড়ল। সফীকুলের কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে কিছুমাত্রও স্থৈর্য হারাল না। সে শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। ম্যাজিসট্রেটের দিকে চেয়ে স্মিত হাসল। যেন তাঁর বিদগ্ধ রসিকতাটি পরম উপভোগ করেছে।

তারপর বলল, "না ইওর অনার, আমি আপনাকে মুভিং মাউনটেনের উপর আপনার বিশ্বাস ন্যস্ত করতে
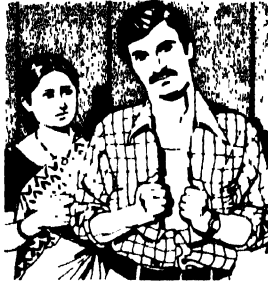
কখনোই পরামর্শ দেয় না। এমন কি দেয়ার আর মোর থিংগস ইন হেভেন অ্যান্ড আরথ্ হোরেশিও, হ্যামলেটের এই বহ্ ব্যবহ্ত উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করে কোনও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতেও আপনাকে প্ররোচিত করব না। আমি শুধু ইওর অনার আপনাকে এইটেই দেখাব যে ধানের গাছ সম্পর্কে আমার বিজ্ঞ সহযোগী ডিফেনসের জ্ঞানের বহর কতটা লম্বা।"

আদালতে চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বাড়োরি একটু ইতস্তত করলেন। মনে হল বোধহয় তিনি এই কথায় বাধা দিতে চান। কিন্তু না, তিনি বসেই রইলেন। সফীকুল তাঁর দিকে চাইল।

"ইওর অনার, তার জন্য আমি আমার বিজ্ঞ সহযোগী মাননীয় ডিফেনসকে বিশেষ দোষ দিই নে। কারণ ও'রা শহরের লোক, কত ধানে কত চাল হয়, ও'দের পক্ষে জানা হয়ত সম্ভব নয়। এমন প্রসিদ্ধিও আছে স্যর যে ও'র জাতভায়েরা ধান গাছে তক্তা হয়, এই কথাও নাকি বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু স্যর, আমি হেলো চাষীর ছেলে, আমার বাবা এখনও নিজে লাঙল চালান। অতএব ইওর অনার ধান সম্পর্কে আমি, আমার বিজ্ঞ সহযোগীর বিজ্ঞতার প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করেও, অধিকতর যে অভিজ্ঞ, সবিনয়ে অন্তত এই নিবেদনটুকু করতে হয়ত পারি। এই মামলায় আমার বক্তব্য সহযোগী ডিফেন্স যদি একটু সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করতেন তাহলে কষ্ট করে ইনডিয়ান পিনাল কোডের অতগুলো পাতা উলটে তাঁকে আর ৪০৪ ধারার প্রপারটির কোয়ালিফিকেশনের দিকে নজর দিতে হত না। তার চাইতে বরং মনশ্চক্ষে একবার ধানক্ষেতের দিকে চাইলেই ধান গাছ কখন স্থাবর এবং কখন অস্থাবর, এর উত্তর নিজেই পেয়ে যেতেন। স্যর, ধান স্ট্যানডিং ক্রপ্ ততক্ষণই যতক্ষণ তাকে কাটা না হয়। এবং ততক্ষণ সে স্থাবর। ইমমুভেবল। পাকা ধান কেটে আঁটি বেঁধে মাঠে ফেলে রাখলে তাকে আর স্ট্যানডিং ক্রপ বলা যায় না। পাকা ধানের আঁটি সারটেনলি মুভেবল। বাড়িতে বা খামারের গাদায় রাখা আঁটি বাঁধা খড়কে বিজ্ঞ সহযোগী কী বলবেন? স্থাবর বা অস্থাবর? খামারে তাগাড় করে রাখা পাকা ধানের আঁটিকে বিজ্ঞ ডিফেনস কী বলবেন? স্থাবর সম্পত্তি না অস্থাবর সম্পত্তি? পাকা ধানের আঁটি, টাকা-পয়সা, বাসন-কোসন, গহনা-গাঁটি, আসবাবপত্রের মতই অস্থাবর নয় কেন, বিজ্ঞ ডিফেনস কি তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন? উনি তা যে পারেন নি ইওর অনার, ও'র বক্তব্য ঘাঁটলেই আপনি বুঝতে পারবেন। ধানের আঁটি অস্থাবর সম্পত্তি এবং এই মামলায় তা জড়িত। সেই কারণেই আমরা মনে করি এই মামলা ৪০৫ ধারার আওতায় সুন্দরভাবে পড়ে। কেননা ফরিয়াদী তাঁর এই অস্থাবর সম্পত্তির যে দায়িত্ব বিশ্বাস করে আসামীর হাতে ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আসামী ইচ্ছাপূর্বক এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয় ইওর অনার, আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারাও পরিষ্কার ভঙ্গ করেছে। তাই তাকে চুরির দায়েও আমরা অভিযুক্ত করছি।"

সফীকুলের এই সওয়াল ম্যাজিসট্রেট অবশেষে মেনে না নিয়ে পারেন নি।

দিগম্বর বললেন, "আহা, বন্দে মাতরম্ তো জাতীয় সঙ্গীত। এতে তুমার আপত্তি থাকা তো ঠিক নয়।"

"দ্যাখেন," খালেকুজ্জমান বললেন, "আপনারা যতই চ্যাচোমেচি করেন আর যাই করেন, মোছলেম মেজরিটির পর আপনারা কিছুতেই বন্দে মাতরমরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে চাপায়ে দিতি পারবেন না। মুছলমান মাত্রই এই পৌত্তলিকতাকে রেজিসট্ করবে।"

বাড়োরি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। "কী অ্যাতবড় কথা! যে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে আজ আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত হচ্ছে। যে বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে শত শত যুবক ফাঁসীর মঞ্চে শহীদ হয়েছে। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবণিতা কারাবরণ করছে, সেই বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে অ্যাত বড় অশ্রদ্ধার কথা কইতি আপনাদের একটুও বাধলো না।"

বাড়োরির চিৎকারে সফীকুলের তন্দ্রা ছুটে গেল। তার মনে হল বেশ খিদে পেয়েছে। সে এক আনা পয়সা বের করে বেয়ারার হাতে দিয়ে বলল, "মুড়ি আর তেলেভাজা এনে দাও তো। খাই।" তারপর সে হাই তুলল। বেয়ারা পয়সা নিয়ে চলে গেল।

দিগম্বর বললেন, "বঙ্কিমের এই অত্যাশ্চর্য রচনাতেও তুমরা পৌত্তলিকতা দেখতিছ। আশ্চর্য চোখ বটে!"

"দোষ কি আমাগের চোখের দিগম্বর বাবু," খালেকুজ্জমান বললেন, "দোষ বঙ্কিমীর কলমের। আচ্ছা কন্ তো, আপনারা তো খুব জাতীয়তাবাদী, ইংরেজ তাড়াবার জীন্য তো আপনাগের কারু চোখি ঘুম নেই। তা যে ইংরেজ আজ আপনাগের অ্যাত চক্ষুশূল, সেই ইংরেজরে বন্দে মাতরমের ঋষি অ্যাকেবারে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজায়ে ঘরে ডা'কে আনলেন ক্যান, না'ড়ে মার না'ড়ে মার করে সিংহনাদ, যত দোষের দুষি আমরা নাড়েরাই, আচ্ছা তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু হিন্দুগের মধ্যি অ্যামন কারুরি পালেন না ক্যান্ বঙ্কিম, যার উপর তিনি হিন্দু রাজ্য গ'ড়ে তুলার ভার দিতি পারতেন? জীবানন্দ না, মহেন্দ্র না, শেষকালে বিদেশী ফিরিঙ্গির হাতে দেশটারে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ডেপুটিগিরি কত্তি লাগলেন। অ্যাঁ! দেশের সম্রাট হলো ইংরেজ বণিক, আর বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট হলেন ইংরেজ সরকারের ডেপুটি বাবু! বাঃ! বেশ ভালো বন্দোবস্ত!"

দিগম্বর খুব প্যাঁচে পড়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। তারপর তারস্বরে বলতে লাগলেন, "দ্যাখো বঙ্কিমীর মাহাত্ম্য বুঝা অত সুজা না। বুঝলে! আছো তো মক্কার দিকি মুখ ফিরোয়ে, তা দেশীয়ভাব বুঝবা কি করে? খালি এ'ড়ে তক্কো!"

"জে না," খালেকুজ্জমান বললেন, "আমরা অ্যাখন আর মক্কার দিকি মুখ ফিরোয়ে নেই। বঙ্কিমবাবুর নির্দেশ মতনই শ্বেতদ্বীপির দিকিই মুখ ফিরোইছি। অবিশ্যি একটু লেট হয়ে গেছে।"

সফীকুল এই তর্কে কান দিচ্ছিল না। কয়েকটা ব্যাপারে সে উদ্বেগের মধ্যে আছে। এক, সইফুল। সইফুলকে নিয়ে তাঁর চিন্তার কারণ এই যে তার মনোভাব ফটিকের কাছে ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এবং প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করছে সইফুল। এবং সেও। তাই সে সইফুলকে এড়িয়ে চলছে। দুই, হাইকোরটে এতদিন পরে তার মক্কেলের কেসটা উঠেছে। ফলাফলের জন্য সে উদগ্রীব হয়ে আছে। তিন, ছবি। এই রবিবারে তাকে আসতেই দিতে চাইছিল না। কান্নাকাটি করছিল ছেলেমানুষের মত। বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে ছবির। দিন দিনই অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠছে। এই ক মাস ধরে সে নিয়মিত প্রতি শনিবার ঝিনেদায় যায় আর রবিবার শেষ বাসে যশোরে ফেরে। তারপর কয়েকটা রবিবার কিছুতেই তাকে আসতে দিল না ছবি। কিন্তু এই সোমবারে তার মামলা ছিল একেবারে প্রথম দিকে। ছবি কিছুতেই শুনবে না। কেবল বলে, আজ যদি যান ফিরে আসে আমার মরামুখ দেখতি হবে। একেবারে পাগল!

বরদাকান্ত দত্ত বললেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন?"

খালেকুজ্জমান বললেন, "আপনারে? না কিছুই না।"

"আহ্‌হা আমারে ক্যান?" বরদা বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্ররে।"

"আপনি যদি না শুনে থাকেন তবে দিগম্বরবাবুর কাছে শুনে ন্যান।"

টেবিলে থাপ্পড় মেরে বরদা বললেন, "আপনার কোনও রাইট নেই আমাগের এভাবে ইনসালট করার।"

খালেকুজ্জমান চটে গেলেন। বললেন, "আপনারে আমি কখন ইনসালট্ করলাম? ভালোরে ভালো!"

"আলবাত করেছেন!" বরদা খাপ্পা হয়ে বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের ইনসালট্ মানেই সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমান।"

"আ! বরদা!" দিগম্বরবাবু একখিলি পান মুখে পুরে বললেন, "চুপ করো মা।"

"দ্যাখলেন তো দিগম্বরবাবু," খালেকুজ্জমান বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "আমার বক্তব্যই প্রমাণিত হয়ে গেল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে যদি কোনও বস্তু থাকে তা'লি বঙ্কিমবাবু হলেন তারই ঋষি। তাঁর মন্ত্র হতিছে বন্দে মাতরম্। ঐ মন্ত্রে ভারতীর হিন্দুগের মনে প্রেরণা জাগাতি পারে। আমি মুছলমান. আমি অন্য কালচারে মানুষ, আমার ধর্ম আলাদা, ঐ হি'দুর মন্তর আমি নিতি যাবো ক্যান্?"

"তাহলে যান না মিয়া ছাহেবরা," বরদা বললেন, "সোজা টিকিট কা'টে মক্কায় চলে যান।"

"কোনও প্রয়োজন নেই, খালেকুজ্জমান বলল, "এ দেশটাতেই আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে। ইটাও আমার দেশ। কী কন্ ছফীকুল ভাই?"

কিন্তু সফীকুল জবাব দিল না। সে তখন ঝিনেদায়। তার অবুঝ বিবিকে সামাল দিচ্ছে। ছবি ছবি আমার কোনও উপায় নেই। কাল আদালত খুললেই আমার মামলা। দুহাত দিয়ে ছবির চোখের পানি সে তখন মুছিয়ে দিচ্ছে।

নড়ে, নড়ে। ছবি কাতরভাবে বলল, হঠাৎ হঠাৎ প্যাটে উডা মুড়া মারে ওঠে। আমার ঘুম ভাঙে যায়। আমার ভয় করে। আমার বিজায় ভয় করে তখন।

কেন, তোমার কাছে রাত্তিরে কেউ শোয় না?

বউ বিটি শোয়। ছবি গলা খুব নিচু করে বলল। কিন্তু আপনারে না পালি ভয় যায় না। আমার রাত্তিরি ঘুম ভাঙে যায়। আপনারে খুব পাতি ইচ্ছে করে। আপনি থাকলি ভয় করে না। আজ থা'কে যান। থা'কে যান।

ফটিক অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। বাস স্ট্যানড থেকে প্যাঁক প্যাঁক হরন্ দিচ্ছে। আর সময় নেই।

ছবি শোনো! খুব নরম করে ফটিক বলল। আগে আমার কথা শুনে নাও। তারপরও যদি থাকতে বলো, থাকব। কাল আমি যদি ঠিক সময়ে কোরটে হাজির হতে না পারি এক মহিলার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, জানো। এখন তুমি বল আমি কী করব?

ছবি ধীরে ধীরে ওর মুখের দিকে চাইল। ম্লান হেসে বলল, জানিনে যান। তারপর আস্তে এগিয়ে এসে ওর বুকে মুখ চেপে বলল, যান। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

ভেবেছিল ছবিকে একটু আদর করবে ফটিক। সেই মুহূর্তে বাস ভ্র-র-র-র্ করে স্টারট দিল। ফটিক এক লাফে ঘর থেকে উঠোন। ছবি চাদর চাদর বলে চাদরখানা চৌকি থেকে তুলে নিয়ে ফটিকের গায়ে ছুঁড়ে দিল। ফটিক চাদরখানা এক হাতে জড়াতে জড়াতে বাস স্ট্যানডের দিকে পড়ি মরি দিল দৌড়।

"শাট্ আপ!"

"ইউ শাট্ আপ!"

"আঃ বরদা, খালেক তুমরা শুরু করলে কী, কও দিনি?"

ফটিক চমকে উঠে দেখে তুমুল উত্তেজনা। তার সামনে টেবিলের উপর মুড়ি তেলেভাজা পড়ে আছে। সে ঠোঙাটা তুলে নিয়ে মুড়ি খেতে লাগল।

"মুসলিমস্ আর লাইক দ্যাট।"

"লাইক হোয়াট?"

"লাইক খান বাহাদুর। সব সময় তারা হিন্দুগের পিঠি বিশ্বাসঘাতকের মত ছুরি মা'রেছে।"

"ক্যামন করে?"

"য্যামন ক'রে বোদে সরকাররে বিট্রে ক'রে রাতারাতি বোরডের চেয়ারম্যান হইছেন খান বাহাদুর।"

"আঃ! বরদা! থামো নারে ভাই। কানের পোকা নড়ে গ্যালো যে!"

"বোদে সরকারের পিঠি ছুরি মা'রে খান বাহাদুর যে চিয়ারম্যান হইছেন, আপনি খোন্দকার সাহেবের মুখির উপর একথা কতি পারবেন?"

বরদা একেবারে চুপ। খান বাহাদুর বরদার সিনিয়ার।

খালেক বললেন, "হিন্দুজ আর লাইক দ্যাট।"

"ল্যাইক হোয়াট্?"
"ল্যাইক ইউ।"
"কী, কী বললেন।"
"ঠিক বলছি। হিন্দুরা আপনারই মতোন। ফ্রম জয়চাঁদ টু উমিচাঁদ অল আর অ্যালাইক। হিন্দুগের ইতিহাস স্বদেশের পিঠে ছুরি মারার ইতিহাস। সং সাহস নেই। মনে অ্যাক মুখে অ্যাক। হিপোক্রাটস্!"

বরদা আস্তিন গুটোচ্ছেন দেখে দিগম্বর শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই ছেলে ছোকরাদের নিয়ে আর পারা যায় না। মুখ থাকতি হাতাহাতি ক্যান্ বাপু। এতটা নিচে নেমে আসা তিনি পছন্দ করেন না। উই মাস্ট হ্যাভ ডিগনিটি। আসলে দিগম্বরবাবুকে মুসলমান পাড়ার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।

"ইউ মাস্ট উইথড্র।"
"উমিচাঁদ না জয়চাঁদ, কাকে উইথড্র করব?"
"দ্যাট আপ, আই সে। আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু!"
"আঃ বরদা! কী ছেলেমানুষী করছ?"

দিগম্বরবাবু দেখছেন ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে, মুসলমান ছোঁড়াগুলো তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এখন কি মাথা গরম করার সময়? বরদার কী, হিন্দু পাড়ায় মধ্যি বাড়ি, সিকিওরড্ লাইফ।

"থামেন তো দিগম্বরবাবু। আপনি মানুষ না কী? আপনার সামনে বসে এই ইনসোলেন্ট লোকটা এনটায়ার হিন্দু জাতটাকে বিশ্বাসঘাতকের জাত বলে লেবেল-মারে দেছে, আর আপনি সেই সময় নিশ্চিন্ত মনে বসে শুধু দাঁত খুঁটোতিছেন? আপনার লজ্জা করে না!"

বরদার মন্তব্যে দিগম্বর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু তার কিছু করার নেই।

বাপু হে দোষটা কি আমার? আমার পিতামহ রায় * দিগীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র বাহাদুর, গভরনমেন্ট প্লিডার, দোষ যদি দিতি হয়, তাঁরে দ্যাও। তিনি রাজসাহী থেকে উঠে আসে একটা প্যালেশিয়াল বিল্ডিং হাঁকড়ালেন। জুড়ি হাঁকায়ে কোর্টে আসতেন। তখন তাঁর নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাতো! ছোট লোকদের যে এত বাড় বাড়ন্ত হবে, তারা লেখাপড়া শেখবে, সদাশয় ইংরেজ বাহাদুরে যে তাঁর মত রাজভক্ত প্রজার বংশধরগের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যত ছোটলোকগেরে মাথায় তোলবেন, ইডা তিনি স্বপ্নেউ ভাবতি পারেন নি। তালি কি আর তিনি ঐ সস্তায় জমি পায়ে ঐ জায়গায় ঐ পেল্লায় দীননাথ ধাম গড়ে তোলতেন। স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত দিনেশচন্দ্রের আমলে দান ধ্যান বিলাস ব্যসনে অনেকটা, আর পাঁচ ভাই-এর ভিতরে পারটিশন শুটে বাকি রবরবা অন্তর্হিত হয়। দিগম্বরবাবু জন্মে ইস্তক দেখছেন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। ও'রই বাপ জেঠারাই একটু সুবিধে দাম পেয়ে মুসলমানগের কাছে ওগের জমি জমা বেচে দিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। এখন সেই পাতকের ফল ভোগ করতিছেন দিগম্বর এবং তাঁর শরিকেরা। আগে ছোটলোকেরা ওখেনে মসজিদ বানায়নি। বছর কয়েক হ'ল ওয়া যখন মসজিদ বানাতি শুরু করল, দিগম্বরবাবু আর তাঁর শরিকেরা ইংরেজের আদালতে স্থায়ী ইনজাংশন প্রার্থনা করলেন। জেলা জজ তখন গোলক ভট্টাচার্জি। জেলা ম্যাজিসট্রেট মিঃ টমশন। গোলক ভটচার্জি ইনজাংশন্ ভেকেট করে দিয়ে বদলি হয়ে চলে গেলেন। পরের বছর তিনি রায় সাহেব হলেন। তারপর থেকেই ছোটলোকেরা এমন আস্কারা পেয়ে গেল যে মহরমের বাজনার আওয়াজ বাড়িয়ে দিল। আর সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যে নেই আল্লাহু আকবর শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেলেঙ্কারীর এখেনেই কি শেষ? যেদিন মায়ের সখের ময়নাটা রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে এই সুমধুর নাম উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ আল্লা হু আকবর বলে আজান দিয়ে উঠল, সেইদিন তাঁর মা অন্নজল ত্যাগ করে বললেন, বাবা এই অধর্মের পুরীতি আর না, আমারে বিন্দাবন পাঠায়ে দে। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা খসলে 'বিন্দাবন পাঠায়ে দে', আর অমনি বিন্দাবন পাঠিয়ে দিলাম, সে যুগ কি আর আছে? তাই ময়নাটারে জলে গোবর গুলে খাইয়ে, ছাতুর দলায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে খাইয়ে এবং সকাল সন্ধ্যা গোঁসাই বাবাজীকে দিয়ে, পড়ো ময়না রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে পড়িয়েও যখন তার মুখ থেকে যবনের আজান থামানো গেল না, তখন দিগম্বর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্য জাত খোয়ানো ময়নাটাকে মসজিদে দান করবেন মনস্থ করলেন। দিগম্বর একদিন মসজিদের ইমামকে এই আশ্চর্য ময়নার কথা বললেন। ইমাম ছাহেব কৌতূহলী হলেন এবং বাবুদের বাড়িতে গিয়ে স্বকর্ণে যখন সেই রাধাকৃষ্ণ বলা ময়নার মুখে পরিষ্কার আল্ লা-হু আকবর বুলি শুনলেন তখন আল্লাহ্র কুদরতের কথা ভেবে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আলহাম্‌দোলিল্লাহ্ বলে ইমাম ছাহেব আহলাদে ডগমগ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। দিগম্বরবাবুকে বললেন, কত্তাবাবু তালি শোনেন, আল্লাহ্ একবার তুর পর্বতে হজরত মুসা নবীরি নিজির মুখি কইছিলেন, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই নামের জিকের হামেশা করিও। এই নামের মর্যাদা অপরিসীম, এর জিকের অমূল্য। জগতের সমস্ত বস্তুর মূল্যও এর সমতুল্য নয় বোঝলেন! তা আমি আল্লাহ্র বান্দা এই পাখিডারে বাড়ি নিয়ে যাবো আর ঐ খোদার জিকেরের নামডা শিখোয়ে দেবো। ইমাম খুশি মনে খাঁচা সমেত পাখিটাকে নিয়ে চলে গেলেন। দিগম্বরের বাড়ির লোকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পাপ বিদেয় হ'ল। কোন্ আক্কেলে তুই নাড়েগের ঐ ডাক পড়তি গেলি! এখন যা, দ্যাখ গে, প্যাঁজ রসুনির গন্ধ শুকতি ক্যামন লাগে! দিগম্বরের মা এই ধরনের কথা বলতে বলতে এখন পা ছড়িয়ে পাখির শোকে কাঁদতে থাকেন।

ছেলেমেয়ে নিয়ে মুসলমান পাড়ায় ঘর করেন দিগম্বর। তাই জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করার নীতি তাঁর নয়। তিনি চান, মুসলমানরা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পরিত্যাগ করুক। তারা জাতীয়তাবাদী হোক। ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মানুক। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি টেনে আনা কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক শ্রী পদ্ম নিয়ে এত হুহুংকার কেন? এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের "নেড়ে মার নেড়ে মার" এই নিছক সাহিত্যগত একটা সংলাপ নিয়ে খালেকুজ্জমানের মত মুসলমানেরা এত উগ্র হয়ে ওঠে কেন, এটাও দিগম্বর ভালো বুঝতে পারে না। আফটার অল্ ওটা তো উপন্যাস। আসলে পাতি নেড়েদের রসবোধ বড় কম। সব ব্যাপারেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে টেনে আনা চাই। এইটেই তিনি শান্তভাবে খালেকুজ্জমানকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। ছোকরা একটু রাগী কিন্তু ছেলে খারাপ না। তাছাড়া সে দিগম্বরের পাড়ারই ছেলে। ওকে হাতে রাখারই তিনি চেষ্টা করেন। হচ্ছিল তাদের দুজনের মধ্যে কথা। বরদার তার মধ্যে নাক গলাবার দরকার কী? নাঃ, এমন অক্ওয়ার্ড অবস্থার মধ্যে এরা তাকে ফেলে! দিগম্বর চুপ করে রইলেন।

"হ্যাঁ, আপনারে উইথড্র করতি হবে।"

খালেকুজ্জমান বলল, "বরদাবাবু আপনার কেস্ খুব উইক্। আমি উইথড্র করলিউ জয়চাঁদ থেকে উমিচাঁদের স্বদেশদ্রোহিতার ঘটনা ইতিহাস উইথড্র করবে না। ঘরসন্ধানী বিভীষণরে রামায়ণ উইথড্র করবে না। বিভীষণের স্বদেশদ্রোহিতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতাকে যে জাতি ধর্মের দোহাই দিয়ে জাস্টিফাই করতি পারে, তাগের কাছ থেকে কী আশা করতি পারা যায় কন?"

"আপনি আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন! মীরজাফরের বংশধরের মুখি এ কথা মানায় না। আপনারে আপনারে—"

"আঃ বরদা! এটা বার লাইব্রেরি। কুরুক্ষেত্র নয়। ডেকোরাম নষ্ট করো না।"

"আপনার ডেকোরামের নিকুচি করিছে। আপনাগের জন্যিই তো—"

পিওন এসে বলল, "টেলিগ্রাফ।"

মুহূর্তে সব চুপ।

"কার টেলিগ্রাম?"
"সফীকুল মোল্লা।"

সফীকুলের সাড়া নেই। সে তখন চিন্তায় যে ডুবে গিয়েছে। ছবি বড্ড অবুঝ হয়ে উঠছে। ছবি কে বিদায় বেলায় ওকথা বলল?

"আরে ও মোল্লা সাহেব", দিগম্বর ডাকলেন "মোল্লা সাহেব!"

সফীকুলের চেতনা ফিরে এল।

সে বলল, "আমাকে কিছু বলছেন?"

"আপনার টেলিগ্রাম!"

"টেলিগ্রাম" সফীকুলের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল ছবি! ছবি বলেছিল ফিরে আসে আমারে দেখা পাবেন না! সফীকুলের বুক ধক্ ধক্ করতে লাগল সই করতে হাত কাঁপল।

"কী মশাই, ডারবির টিকিট কিনিছেন না কী?"

সে জবাব দিল না। বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনা নি সে খামটা ছিঁড়ে ফেলল।

ঝপ্ করে সফীকুলের মুখে আনন্দের আ ছড়িয়ে পড়ল। সে টেলিগ্রাম খানা দিগম্বরবাবুর হা দিল। কনগ্র্যাচুলেশনস্। অ্যাপেল্যান্টস অ্যাকুইটে অফ্ অল্ দি চারজেস্। লেটার ফলোস। এল।

টেলিগ্রামখানা জোরে জোরে পড়ে দিগম্ব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোন্ কেস্? কোন্ কেস?"

"এইটেই আমার প্রথম কেস্।" সফীকুল বলল মহামান্য সম্রাট বাহাদুর ভার্সাস্ মোহাম্মদ বছিরুদ্দ ওরফে শানা মিয়া অ্যান্ড্ আদারস্। ৩৭৬ ধার কেস্।"

"আরে বুঝিছি। সেই যে সেই দলবদ্ধ বলাৎকারে কেস্। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল ছেলেন খান বাহাদ স্বয়ং।" দিগম্বর বললেন, "ইডা তো সেই কেস্?"

"জে।" সফীকুল জবাব দিল। "সেই কেস্।"

"দেখি টেলিগ্রামটা।" বরদা চাইতেই দিগম্বর সে তার হাতে দিয়ে দিলেন।

"কী হে, বরদা, শেষ পর্যন্ত তুমার সিনিয়া মত অ্যামন ডাকসাইটে অ্যাকজন ফজদৌর উকিল, ত কিনা পচা শামুকি পা কাটলো? অ্যাহ্!"

খালেকুজ্জমান উঠে এসে সফীকুলের হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, "কনগ্র্যাচুলেশনস্ ভাই ছাহেব।"

বরদা টেলিগ্রামখানা নিয়ে তার সিনিয়ারের কা ছুটে গেলেন। দিগম্বর একটা পান মুখে ফে সফীকুলকে অভিনন্দন জানালেন। খবরটা ততক্ষ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। জুনিয়ার উকিলদের কেউ কে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে সফ কুলের মনে। আর কেবলই ছবির কথা মনে হচ্ছে। ছ এখানে থাকলে সে এক্ষুনি ছুটে যেতো বাড়িতে সবার আগে সে তাকেই দিত খবরটা। আর মনে পড় মিস্ পালিতের কথা। সে কৃতজ্ঞ, লতিকার কাছে ঋণের অন্ত নেই। এমন আনন্দ কোনদিন পায় সফীকুল। তার আত্মবিশ্বাস তার অহমিকাবোধ এ তার জিগীষা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক হয়ে গি তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিচ্ছে। সে যেন যে পড়বে। সে যদি এই আনন্দ কারও সঙ্গে ভাগ ক নিতে না পারে তাহলে সে যেন চৌচির হয়ে যাবে। মন ছবির কাছে ছুটে যাচ্ছিল বার বার। কাল মা আছে। নাহলে আজ সন্ধ্যের মোটরে সে চলে যে খোন্দকারের চাপরাশি টেলিগ্রামটা ফেরত দিয়ে গে তার মানে খান ছাহেবও দেখেছেন। ভালোই। হ সফীকুল উঠে পড়ল। ওর এখনই লতিকাকে একটা করে দেওয়া উচিত। ওর কৃতজ্ঞতাটা তাকে জান উচিত। যখন বার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে সফী পোস্টাফিসের দিকে যাচ্ছিল তখন তার মনে হ যেন সে উড়ছে। হঠাৎ দিগম্বরের মন্তব্যটা তার ব সপাং করে আঘাত করল। কি হে বরদা, শেষ পর্য তুমার সিনিয়ারের মত অ্যামন ডাকসাইটে ফজ উকিল, তার কিনা পচা শামুকি পা কাটে অ্যাহ্। সফীকুলের মুখটা বিস্বাদ হয়ে উঠল। তাহলে পচা শামুক! এদের কাছে তার মূল্য এইটুকু!

(ক্র

অনধিকৃত দুর্গ

রাজলক্ষ্মী দেবী

"প্রতিজ্ঞা করো, আর এসব কথা আমাকে বলবে না।"

"তাহলে তুমিও প্রতিজ্ঞা করো।"

"কী?"

"প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে ভুলে যাবে। কক্ষণো মনে আনবে না।"

> মনে আনবে না আমার দুই উজ্জ্বল চোখ—
> দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসী নাকের পাটা—
> অভিমানী ওষ্ঠাধর—
> মনে আনবে না আমার স্তুতিবাক্যগুলি—
> মনে আনবে না আমার কটুবাক্যগুলি—

মিলিটারী হাসপাতাল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এর পরিধি। দুটো ব্লকে'র মাঝে মাঝে কয়েক সারি গাছ, —গাছের মাথায় ঝিকমিকে রোদ,—আর তলায় মন-কেমন-করা ছায়া।

দুপুরে—রোগীরা বেশিরভাগ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন,—ডাক্তার-নার্স'রাও সেই ফাঁকে ইজিচেয়ারে অর্ধ-হেলান দিয়ে একটু ঘুমের আমেজ উপভোগ করে নিচ্ছে—তখন, অনেকদিনই সিস্টার লীলা সেন নিঃশব্দে গাছের তলার ছায়া দেখে। অনেক দূরে বাংলাদেশের জন্যে, বাংলা মায়ের জন্যে, একটা চলে-যাওয়া বাঙালী ছেলের জন্যে তার মন কেমন করে।

"প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে ভুলে যাবে। কক্ষণো মনে আনবে না।"

কিন্তু আত্মবিশ্বাসী উজ্জ্বল কিশোর মুখটা মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। তারপরে আরেকটা উদ্ধত আহত অভিমানী মুখ। কিশোর মুখটাকেই আবার ফেরাতে চায় লীলা। ওটা তবু সহনীয়।

প্রবল জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিলো ছেলেটা। প্রথম বার্ষিক সৈনিক ক্যাডেট। বাঙালী। বাংলা ভাষায় মাকে ডাকাডাকি করছিলো,—"মা গো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও।"

লীলা কেন,—সব নার্স ডাক্তাররাই জানে, জানত—এ শুধু জ্বরের প্রলাপ নয়। শরীরে মনে খুব ভেঙে পড়েছে ছেলেটা আর তার কারণ, এই রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা আকাদমীতে নরম নরম তরুণদের পিটেয়ে রগড়ে দুমড়ে মুচড়ে দুঁদে সৈনিক বানাবার যে তিন-বর্ষব্যাপী কার্যক্রম, তার প্রথম ধাক্কাটাই সব থেকে ভয়ংকর, যার ইরেজি নাম ragging—বাংলায় বুঝি হবে ধোলাই দেওয়া। নতুন ছাত্র ভর্তি হলো কি, কথা নেই—পুরোনো ছাত্রীরা শিকারী কুকুরের পালের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপরে। নাড়ুগোপাল বানানো, নাকখত দেওয়ানো,—ফ্রন্ট রোল কি ব্যাকরোল, এগুলি তো মামুলি ধোলাই। নতুন নতুন অত্যাচারের কল্পনা পুষ্ট হচ্ছে আজকাল,—এমন কি, একটা ছেলে হঠাৎ মারাও গিয়েছে। তারপর থেকে ragging নাকি, কড়া আপত্তির দরুণ, সরকারীভাবে বন্ধ এবং নিয়মের বহির্ভূত।

কিন্তু বেসরকারীভাবে? অফিসারদের লোচনের অন্তরালে? কোনও সন্দেহ নেই, এই ছেলেটার কোমরে দড়ি দিয়ে থান ইঁট বেঁধে দিয়ে তাকে চলতে বাধ্য করা হয়েছিল। উরুতে এবং নরম পুরুষাঙ্গে প্রবল ঘর্ষণের দাগ আছে। জায়গাগুলি প্রচুর ফুলেছে। তার তাড়সে জ্বর। কিন্তু প্রলাপ তো জ্বরের নয়,—প্রলাপ ওর চকিত ভীত স্পর্শকাতর অবচেতন মন থেকে উঠে আসছে। যাকে বলে "shock" অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতের দুর্দান্ত চপেটাঘাত,—ছেলেটা তাই খেয়েছে। যেমন আগের কালে বাংলাদেশের গাছে বসে ভূতেরা চড় মারত,—সে-চড় খেলে আর রক্ষা নেই, বাড়িতে এসে সেই যে হু-হু করে জ্বর আসবে, তা শীতল হবে একদম দাঁতকপাটি লাগার পর।

"ছেলেটা বাঁচবে তো, ডাক্তার?"—ভীরু গলায় প্রশ্ন করেছিলো লীলা সেন।

"কেন বাঁচবে না? এই তো জ্বর নামিয়ে দেবার ওষুধ দেওয়া হলো। এখন আইসব্যাগ লাগাও। আর কিছু আপাতত করবার নেই।"

তবুও লীলা বসে থেকেছিলো ছেলেটার বিছানার পাশে। জামার বুকে নাম লেখা,—ক্যাডেট সলিল বিশ্বাস। আলুথালু চুল,—নরম অসহায় মুখের ছেলেটা তখনো বকেই চলেছে। "কনভয় দেখেছো কী রকম চলে? আমি দেখেছি,—ছবিতে। কী সরু

The New York Times

TRY GARLIC IT MAY HELP

LONDON—Adding garlic to the menu may help prevent diseased arteries researchers reported yesterday.

Long respected as a popular remedy for a variety of ailments, the pungent root has now been shown by medical tests to have "a very significant protective action" in limiting the effects of fat on the rate at which blood clots.

Reporting this in a letter to the medical magazine, the Lancet, doctors Arun Bordia and H.C. Bansal, of R.N.T. Medical College, Udaipur India, said the blood of 10 patients coagulated more slowly when they ate garlic with fatty food than it did when they ate similar food without garlic.

In effect, this means garlic could help prevent fatty deposits building up on the artery walls and clogging them. (Reuters).

THE TIMES OF INDIA

BOMBAY, DEC., 3-1976

Eat Garlic and Cut Cholesterol

NEW DELHI, December 2: A medical study has revealed that garlic is effective in reducing blood cholesterol. An experiment by Dr. R. C. Jain, pathologist at the University of Benghazi in Libya has now shown that garlic reduces the cholesterol level.

He did the experiment on rabbits which he fed with a diet containing large amounts of Cholesterol for 16 weeks. Their aorta (main blood vessel) and liver were deposited with cholesterol but after giving them garlic, he noticed that the fat dissappeared and the blood cholesterol came down. Dr. Jain has reported the results of his experiment in "The Journal of Indian Medical Research . How exactly garlic brings down cholesterol level is, however, not clear, Dr. Jain said-Samachar

SUNDAY STANDARD

Vijayawada, Sunday October 31, 1976

Raw Garlic is anti-bacterial

NAINI TAL Oct. 29 (Samachar) Raw garlic possesses anti-bacterial property against a number of micro-organisms including those which are resistant to commonly used anti-biotics. This is revealed in researches conducted at the Pantnagar University. According to the research findings, anti-bacterial property of garlic is lost on boiling.

Eve's Weekly

July-17-1976

AYURVEDA IN YOUR HOME

Suresh Chandra Chaturvedi

GARLIC

Regular use of garlic helps the digestive system and removes gas and constipation It increases the blood, cures chronic cold and cough, Gastric troubles are cured by taking garlic every day.

বিশেষ ফরমুলায় তৈরী

লসোনা

দুর্গন্ধমুক্ত

প্রকৃত আকার

অনায়াসে গেলা যায়

Lasona
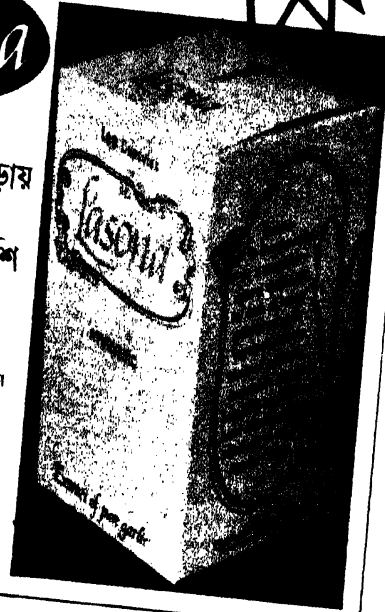
কাঁচা রসুনের অপ্রীতিকর গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
আপনাকে একাধিক দিক থেকে উপকৃত করে, যেমন—

* কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় * হজমশক্তি বাড়ায়
* বায়ু নাশ করে * ওজনবৃদ্ধি রোধ করে
* রক্ত পরিষ্কার করে * দীর্ঘস্থায়ী দুর্দমনীয় কাশি দূর করতে সাহায্য করে

লসোনা নির্ভেজাল রসুনের নির্যাস
সুবিধাজনক গন্ধহীন স্বচ্ছ নরম ক্যাপসুলের আধারে রসুনের সহজাত গুণ নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত।

আপনার শহরের অগ্রণী কেমিষ্ট ও বড় বড় দোকানে এখন অবাধে পাওয়া যাচ্ছে।

টমাস ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ২০ হামাম ষ্ট্রীট, বোম্বাই ৪০০০২৩

রসুন-চিকিৎসা পদ্ধতিতে পথিকৃত

LA-B-33

রাস্তা ধরে উঠে যায়। একপাশে অতল খাদ। মিলিটারী কনভয় সোজা উঠে যায়। মিলিটারী লাইফ সোজা নয়। সহজ নয়। এক পাশে খাদ। এক পাশে ভয়। আমি হার মানবো না। আমি মিলটারীতে যাবোই।"

পরেরদিন সকালে চোখ খুলেছিলো সলিল। ভীরু মুখটাকে যেন নতুন বানিয়ে দিলো তার দুই দীপ্ত চোখ। "গুড মর্নিং সিস্টার।"

"সিস্টার, তুমি বাঙ্গালী ?"

"ও রে সর্বনাশ,—বাড়িতে খবর দিলে আর উপায় নেই। তুমি বাঙ্গালী তো, বুঝতেই পারবে বাংলাদেশের মায়েরা কী রকম একটুতেই অস্থির হয়ে যান। মা তো আমাকে এ-লাইনে আসতেই দিতে চাননি। আমি খুব জেদ করেছিলাম। কী বিশ্রী অবস্থা, বলো তো,—আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্সে কেন বাঙালীরা বেশি সংখ্যায় আসবে না ? এমনিতেই লোকে বলে ভীতু বাঙালী, ভেতো বাঙালী।"

"আমার তো লোভ ছিলো পাইলট হবো,—জেট চালাবো। আকাশের ওপর বিমানে বিমানে লড়াই চালাবো। কিন্তু মা-র দারুণ আপত্তির চোটে এয়ার ফোর্সে নাম দেওয়া গেলোই না। মায়ের এক ছেলে কি-না আমি। তাই থেকে গেলাম আর্মি ক্যাডেট।"

"যাই বলো,—" লীলার মুখ থেকে এই কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিলো,—"বড় নিষ্ঠুরতা করেছে ওরা তোমার ওপর। কড়া সৈন্যনীতি এক জিনিস, কিন্তু তাই বলে এইসব অন্যায় জুলুম, কদর্য মারপিট ?"

"সিস্টার, আমিও প্রথমে তাই ভাবছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এটাও একরকমের প্রস্তুতি। কঠিন, শক্তপোক্ত হবার যে-সাধনা আমরা বেছে নিয়েছি, "র‍্যাগিং" তো তারই প্রথম পরীক্ষা, মজবুতি-র তৈয়ারী। আমরা যে 'ক্যাডেট'—ভারতের ভাবী সৈনিক। পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াবো, ভাঙবো কিন্তু মচকাবো না,—হাত না থাকলে পা দিয়ে লড়বো,—হার মানবো না কিছুতে।"

সলিল যেন এ-দেশের প্রাণবন্ত যৌবনের মূর্ত প্রতীক। তিন দিন ও নাকি হাসপাতালে ডাক্তারের নজরবন্দী থাকছে। আসলে এই বাহানাটা ডাক্তার বার করেছেন ওকে "র‍্যাগিং"এর চূড়ান্ত মোক্ষম সময়টা থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু সলিল অস্থির। মৃদু মৃদু আবেদন জানাচ্ছে লীলাকে।

"তুমি একটু ডাক্তারকে বলতে পারো না সিস্টার ? কী জন্যে আমাকে এখানে আটকিয়ে রাখা ? "কোর্স"-এর সঙ্গীরা দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে পড়াশোনায়, খেলায়, ড্রিলে। জানো তো, যতদিন না "ড্রিল স্কোয়াড" পাশ করছি, আমরা ক্যাডেট-কোয়ার্টার্স ছেড়ে এদিক ওদিক যাবারও অনুমতি পাবো না ?"

"সময় হলেই ডাক্তার ছেড়ে দেবেন তোমাকে।" স্তোক দেয় লীলা। "কেন, এখানে কি তোমার খুব খারাপ লাগছে।"

"কী যে বলো, খারাপ লাগবে কেন? এতো আদরযত্ন পাচ্ছি। বিশেষত, তুমি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে দারুণ ভালো লাগছে।"

"বাড়িতে মা ছাড়া আর কে আছেন ?"

"বাবা, মা, বুড়ীদিদা আর বাচ্চা কুকুর।"

"কোন্ স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছো ?"

"স্কুল নয় সিস্টার,—কলেজ। আমি তো সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছিলাম। কিন্তু মামুলি পড়াশোনা আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছিলো না। রাস্তায় বড় বড় পোস্টার, লাল অক্ষরে লেখা আহ্বান, দেশের ভাবী সৈনিকদের জন্যে। আমি মন ঠিক করে ফেললাম, মিলিটারীতে যাবো। পরীক্ষা দিলাম। প্রথম 'চান্সে'ই পেয়ে গেলাম।"

"আবার 'খেল' কেন, সলিল ? আমার বুঝি আর কোনো কাজ নেই।"

"তোমাকে নাম ধরে ডাকবো, সিস্টার ?"

"আমার নাম তুমি জানো নাকি ?"

"এই তো একটু আগে ডাক্তার তোমাকে ডাকলেন। উনি তোমাকে 'সিস্টার' বলেন না কেন ? খুব ভালো চেনেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ, উনি তো আমার বড়ো দাদার মতো। তুমিও তো ছোটো ভায়ের মতো। আমাকে 'লীলাদি' ডাকতে পারো।"

"উঁহু,—" দুষ্টু হাসে সলিল,—"দিদি কাকে বলে আমি জানিই না। আমি তোমাকে দিদি-টিদি ডাকতে পারবো না।"

"লীলা, একটু কাছে বসো না আমার। একটুক্ষণ গল্প করো আমার সঙ্গে।"

স্বাভাবিক। তিনদিন কেটে গিয়েছে, কিন্তু ওর শারীরিক অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয় দেখে ওর হাসপাতাল-বাসের মেয়াদ ডাক্তার আরও দুদিন বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেশ থেকে এতো দূরে,—মায়ের স্নেহের কাঙাল ছেলেটা কাউকে যে আঁকড়ে ধরবে, তা তো বিচিত্র নয়। আর এতো রকমের গল্প বানাতেও পারে। অন্য নার্সেরা ওর নাম দিয়েছে 'বক্তিয়ার'—বকবক স্বভাবের দরুন।

কিন্তু সলিলের মুঠোয় লীলার হাত,—কখন, কেমন করে ঘটে গেলো এই ব্যাপারটা ? "ছেলেমানুষি করছো কেন, সলিল ?" আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসলো লীলা।

"হাত ধরলে কী হয় ?"

"কিছু হয় না। পাঞ্জা লড়তে চাও, এক্ষুণি ধরতে পারো। হেরে যাবে। তোমার চেয়ে তাগড়া ছেলেদের আমি পাঞ্জা লড়ে হারিয়েছি। কিন্তু মনে রেখো, হাসপাতাল শুশ্রূষা দেয়, স্নেহ দেয়—তার বেশী কিছু দেয় না।" ,

"তুমি কক্ষণো কাউকে তোমার হাত ধরতে দাওনি ? মানে, ভালোবেসে হাত ধরতে দাওনি ? সত্যি বলো।"

"ও-সব কথায় তোমার কী দরকার। আমার চোখে তুমি একটা বাচ্চা ছেলে,—আর বর্তমানে অসুস্থ, অশক্ত, অসহায় আমার 'পেশেণ্ট'।"

"আমি কিন্তু আগে কক্ষণো কারও হাত ধরিনি। লীলা, তুমিই আমার প্রথম ভালোবাসা।"

"পাগলামি কোরো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়ো, জানো ?"

"থাক, বুড়োমি করো না। তুমি আমার ভালো-বাসা থামাতে পারবে না। আমরা সৈনিক। সৈনিক কক্ষণো হার মানে না,—লড়ে যায়।"

প্রতিদিন টেম্পারেচরটা দেখে চার্ট-এ লেখা হয়। লীলা তাকিয়ে আছে 'চার্টে'র দিকে আর সলিল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লীলার মুখের দিকে। হঠাৎ বলে উঠলো,—"প্রকৃত সৈনিক কিছুতেই হারে না, জানো লীলা ? যে-দুর্গ অধিকার করতে পারে না, —সেই দুর্গের তলায় সে রেখে যায় একটি স্টিক্ ডিনামাইট। প্রথমে কোথাও কিছু তফাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু তারপর, সহসা, এক মুহূর্তে সব বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অহংকারী দুর্গ ধূলিসাৎ হয়ে যায়।"

সপ্তম দিনে স্বচ্ছন্দে সলিলের আরোগ্য-কার্ড বানালো লীলা। এখন ফিরে যাও নিজের ব্যারাকে, যাদুধন। যে-কর্তব্যে এসেছো, সেই সৈনিক-শিক্ষাতে মন দাও গিয়ে। তা-ই তো তোমার মধ্যে প্রোজ্জ্বল প্রেরণা। তাতেই তো তুমি সুন্দর আর সার্থক।

তবুও যখন সলিল আকুল প্রশ্ন করলো, —"আজ ঠিক ছাড়া পাব তো ?" তখন এক মুহূর্তের জন্যে রাগ হ'লো লীলার। অকৃতজ্ঞ —এতো মায়া-মমতা পেয়েছে তবুও ভাব দেখো না, যেন ওকে কেউ দারুণ কষ্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো হাসপাতালে।

"লীলা, —আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

"কী বলো ?"

"রাগ করবে না তো ?"

"না।"

"তোমার হাতটা একটুক্ষণ, একবার ছুঁতে পারি ?"

"কী পাগল ছেলে তুমি!" সস্নেহে সলিলের কপালে হাত রাখলো লীলা, —কিন্তু মুহূর্তে সে হাত ওর কপালে নেই, ঠোঁটে। সলিল একটা তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়েছে তাতে। কিন্তু তক্ষুণি ছেড়ে দিলো। বললো, —"যাচ্ছি। আর কিছু বলার নেই।"

লীলা পোড়-খাওয়া মেয়ে। সলিল তাকে

Nestle
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে
NESCAFE
instant coffee
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্‌স্ট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি

চঞ্চল একটু থাকার বেশি কিছু দিতে পারেনি। কিন্তু সলিলের চিঠি আর ছবি পেয়ে সে একটু কাতর বোধ করলো। এতটা গড়াবে ভাবেনি। ছবিটা 'ক্যাডেটে'র পোশাক পরে তোলানো। বড় সুন্দর উঠেছে। চোখে সেই অপরাজেয় হাসির ঝিলিক। পেছনে আবার লিখে দিয়েছে—To Leela with burning love from Salil

"ক্যাডেট ব্যারাক"এর নিয়ম-কানুন লীলা জানে। এই সব কথা চাউর হলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে সলিলকে। চেপে যাওয়াই একমাত্র পথ। এ সবই তো ছেলেমানুষ থেকে বড়োমানুষিতে উত্তীর্ণ হবার প্রক্রিয়া।

পথে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো। সলিল-দের থামবার অনুমতি নেই, —সে এগিয়ে যাচ্ছিলো। লীলা তার কাছে এসে তীব্র গলায় ফিসফিসিয়ে বললো,—"অন্যায় করেছো। ছবিতে ও-সব লিখেছো কেন ?"

"ছবিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে দিও।"

তা কি লীলা পেরেছিলো ? পারেনি। মনকে বুঝিয়েছিলো, স্মৃতির বাক্সে অনেক খেলনাই তোলা থাকে। রথের মেলায় অযাচিত পাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া কতো টুকিটাকি ভাঙাচোরা সঞ্চয়ে ভরা শিশুদের বাক্স যেমন থাকে। কবে কে অতর্কিতে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে; কে হোলির দিনে রং মাখাবার ছলে তার গালে সুস্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ রেখেছিলো। আর বেশি লীলা পায়নি। তার পরে দিতে হয়েছে অনেক। পুরুষের থাবলা থেকে দেহ বাঁচানো যায়নি। কখনো কখনো দেহে টান পড়লে মন উতলা হয়ে ওঠে। সেই সব মুহূর্তগুলি অসহ্য কষ্টের। কেন না, জানা থাকে যে এই সব সম্পর্ক নিতান্ত জৈবিক। এক ডাক্তার পরিণীত,—স্ত্রী সম্প্রতি এক বছরের ছুটিতে বাপের বাড়ি গেছেন, সন্তান হতেও বটে, কিছুদিন বিশ্রামের জন্যেও বটে। ফিরে এলেই অন্য ব্যবস্থা হবে। অথবা অন্য ডাক্তারটি, যিনি নারী দেখলেই সুরত প্রচেষ্টায় মনোযোগী হন,—যাঁর দ্রুত হাতের পরীক্ষা রোগিণীদেরও রেহাই দেয় না। তাঁর আদরে-আহ্লাদে শুধু কষ্ট নয়,—ঘৃণা, আত্মগ্লানি। কিন্তু তারা সবাই উপরওয়ালা। অতএব, তাঁদের দাবী অগ্রগণ্য অপরিহার্য।

কতটুকুই বা পেয়েছে লীলা তার স্মৃতির বাক্সে। টুকরো টুকরো কথার মধ্যে এক একটা জ্বলজ্বলে বাক্য—"লীলা, তুমি আমার প্রথম ভালো-বাসা" "To Leela with burning love from Salil" ছবিটি থাকল। মাঝে মাঝে স্বপ্নহেন মনে পড়ায় অবুঝ এক কিশোরকে।

দ্বিতীয় আক্রমণ তো দৈবায়ত্ত সংঘটন। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা দুইই ভেঙেছে ক্যাডেট সলিল বিশ্বাসের। এটা ওর শেষ "টার্ম,"—এবারের পরীক্ষার ওপরই নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ, আর এই সময়েই কিনা এ হেন এক দুর্ঘটনা।

"স্লিং" বানিয়ে ওকে বিছানায় পরিপাটি ভাবে শোয়ালো লীলা। এবার জ্বরের ঘোর নয়,—ডাক্তার বুঝি 'মরফিয়া' ইঞ্জেকশন দিয়েছেন, তারই ঘোরে প্রলাপ বকছে। কথা বলা ওর একটা রোগ বিশেষ।

"What bloody hell—আমি মোটেই ইচ্ছে করে পড়ে যাইনি। আমি তো ঘোড়াকে jump করাচ্ছিলাম। না, গোঁয়ার্তুমি নয়। না, না, না,—আমি মোটেই ইচ্ছে করে প্রাণ নিয়ে খেলতে যাইনি। What do you mean, Sir,—আমার কি ঘোড়াটার জন্যেও মায়া হবে না ?"

"জানি, জানি। হয় আমি মরতাম, নয় ঘোড়াটা যেতো। আমাকে চট করে মন ঠিক করে ফেলতে হলো। ঘোড়াটার লাগেনি তো ? ঘোড়াটা বেঁচে গেছে, Thank God !"

সকালে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সলিল হাসলো,—"আবার ও হাসপাতালে। লীলা, মরা হলো না।"

কী ক্লান্ত, কী ভঙ্গুর ওর সেই হাসি! চোখ ছলছল করে উঠলো,—কিন্তু লীলা শক্ত গলায় বললো, —"দু বছরে আশিখানা চিঠিতে পাগলামি করেও শান্তি হলো না ? শেষে এই কান্ড করতে গেলে !"

"ইচ্ছে করে করিনি কিন্তু। অথবা, যদি অচেতন কোনো ইচ্ছে আমার ওপর সওয়ার হয়ে থাকে, যার ওপর আমার হাত ছিলো না। আমি তো আমার সৈনিক জীবন নষ্ট করতে চাই নি।" অস্থির হলো সলিল। "জানো তো, এ বছরের শ্রেষ্ঠ 'ক্যাডেট' হিসেবে পাস করার কথা ছিলো আমার। আমি শুধু ভালোবাসার ব্যাপারে পাগল নই, নিজের উচ্চাশা নিয়েও যে পাগল। কিন্তু, বড়ো বিতৃষ্ণার জীবন এই যুদ্ধবাজী।"

"তোমার মুখে এই কথা— !"

"ছেলেমানুষ হিসেবে এসেছিলাম তো,—যুদ্ধের গৌরবের দিকটাই জানতাম, বুঝতাম। এখন বুঝতে পারছি, বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ মারা একটা অশ্লীল ব্যাপার। আর ক্যাডেট ব্যারাকের জীবন ? থুঃ। মিথ্যে কথা, অন্যায়, মেয়েদের শরীর নিয়ে কুৎসিত গল্পগুজব। সৈনিককে সব দিক থেকে শক্ত হতে হবে,—অনুভব বর্জন করাও বোধ হয় শক্ত হবার অঙ্গাবিশেষ। সে হিসেবে আমি একটু বে-মানান। তবে হাত-পা-ভাঙা দ' না হলে এবার তোমাকে দেখে নিতাম।"

"দেখে নিতে ?"

উজ্জ্বল অথচ ভাবহীন চোখ দুটো দিয়ে লীলার দিকে তাকালো সলিল,—"হ্যাঁ, দেখে নিতাম তোমার শরীরটা সত্যি সত্যি অতটাই শীতল কি না।"

"সলিল! কী ভীষণ বদলে গেছো তুমি!"

"বালক ছিলাম, যুবক হয়েছি। একে বদলে যাওয়া বলে না,—বলে বড়ো হওয়া, মানুষ হওয়া।" হা হা করে হাসে সলিল। ওর আগেকার সুন্দর স্মিতহাস্য মনে করে সত্যিই চোখে জল এসে যায় লীলার। "কার জন্যে কাঁদছো ? নিজের দুঃখে না আমার দুঃখে ? ও আমার জন্যে দুঃখ কোরো না, প্লীজ। তোমাকে দুঃখ করা মানায় না।" সলিলের কথাগুলি যেন ফোঁটা ফোঁটা বিষের মতো ঝরছে, যেন ঘায়ের ওপর ছিটে ছিটে নুন হয়ে পড়ছে। "তোমরা, নার্সরা, দুঃখ সুখ ভালোবাসা আহ্লাদ, এ সব জানবে না কোনোদিন। তাই বলে বোঝাতে এসো না, তুমি পবিত্র তুলসীপাতাটি। সব বুঝতে পারি আজকাল। তুমি কী পেয়েছিলে তার মূল্য বুঝলে না, লীলা।" শেষের দিকটাতে সলিল যেন শান্ত একটা অভিশাপ উচ্চারণ করলো।

লীলা আর শোনে নি। লীলা সেখান থেকে চলে গিয়েছিলো। লীলা বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে অতীতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলো।

"প্রতিজ্ঞা করো আর এ-সব কথা আমাকে বলবে না।"

"তাহলে তুমিও প্রতিজ্ঞা করো।"

"কী ?"

"প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে ভুলে যাবে। কক্ষণো মনে আনবে না।"

ভুলে যাব, ভুলে যাব। আশিখানা লম্বা চিঠি কুচি কুচি হলো। ছবিটা ? না, ছবিটা ছেঁড়া হবে না, ছবিটা থাক। সলিল বিশ্বাস যেদিন মস্ত জেনারেল হবে, সেদিন হয় তো লীলা সেন বুড়ী থুত্থুরী। তখন স্মৃতির বাক্স হাতড়ে সেই সলিলকে খোঁজা হবে, যে-সলিল আর নেই।

সে সলিল আর নেই। আর কখনো ফিরবে না। এখন সলিল বিশ্বাস লীলাকে দেখলে চুপ করে থাকে। অন্য নার্সদের সঙ্গে পুরোদস্তুর বকবকানি চালু আছে। আস্তে আস্তে একটা পুরো মাস কেটে গেছে। হাত-পায়ের প্লাস্টার খোলার সময় এসেছে।

"লীলা তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছো।"

"না তো।"

"জানো তো, এবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই পরীক্ষা পাস, তারপর এই জায়গা থেকে বিদায়।"

"জানি।"

"আর চিঠি লিখবো না।"

"ভালো কথা। মাথা ঠিক রেখে উন্নতি করো। দশের একজন হও।"

দশের একজন, না শুয়ে শুয়ে যারা প্রাণ দিতে কাড়াকাড়ি করবে তাদের একজন।

ডিসেম্বর ১৯৭১য়েই বাংলাদেশের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর সেই লড়াই শুরু হলো। এখন আশংকায় কেন প্রাণ কাঁপে? কেন বারবার মনে হয়, যুদ্ধ যতদিন না বাধে ততদিন রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার জন্যে ব্যবস্থায় যেমন গৌরব—যুদ্ধকালে তেমনই তার ভয়াল দাবী?

লীলা রোজ কাগজ দেখে, মালা গাঁথার মতো ফুটে ওঠে সারি সারি নাম। মৃত, আহত, নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ।

হাসপাতালে যারা আসে, তাদের মুখও খুঁটিয়ে দেখে নিতে হয়। এই যুদ্ধের বেশির ভাগ ঘায়েল সৈনিক হাত-পা খুইয়েছে। বিদেশী বিত্তের তথা মার্কিন অস্ত্রের সহায়তা অনেক বেশি পরিমাণে পেয়েছিলো পাকিস্তান। ওরা তাই যুদ্ধক্ষেত্র ভরে পুঁতেছিলো এমন এমন চোরা 'মাইন',—যার সন্ধান পাওয়া যায়নি ভারতীয় সেনার সাধারণ শ্রেণীর 'মাইন ডিটেক্টরে'। মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে এই ভাবেই। জয়-পরাজয়ের অব্যর্থ হিসেব। লম্বা ধনুক হেরে যাবে চওড়া ধনুকের কাছে,—বন্দুকের নাক কেটে দেবে স্টেনগান আর অটোমেটিক রাইফেল। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৭১য়ে ইতিহাস পালটে যাচ্ছে। শস্ত্র দুর্বল, তবুও ভারত জিতছে।

"সিসটার"—একটা ব্যাকুল আর্তনাদ শুনে লীলা সেই দিকে ছুটে যায়। "প্লীজ, প্লীজ, আমাকে মেরে ফেলো। আমার যে দুটো পা-ই গেছে। আমি কীসের জন্যে বেঁচে থাকবো?" হাউ হাউ করে কাঁদছে মুক্তিবাহিনীর এক কিশোর বাঙালী। এই বয়সেই তো সলিল বিশ্বাস এসেছিলো যুদ্ধের তালিম নিতে। এসেছিলো উজ্জ্বল সব আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর তারপর—

লীলা ছেলেটির কপালে হাত রাখলো। "তুমি না সৈনিক? মৃত্যুর সামনে যে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তা কি ভুলে গেলে?"

"একটা পা না থাকলে আমি মেনে নিতাম। কিন্তু দুটো পা-ই যে গেছে। সিসটার, এই পা'টার হাঁটু পর্যন্ত ছিলো, জানো? কিন্তু ছোটো হাসপাতালে ঘা হয়ে গেলো, অপারেশন করে পুরোটাই বাদ দিতে হলো। আমি কী করবো, কী করবো সিসটার।" কপাল চাপড়াতে থাকে ছেলেটা। "আমি যে বরবাদ হয়ে গেছি।"

"শোনো, একটু শান্ত হও। যুদ্ধের আগে কী করতে?"

"এম এ পড়ছিলাম।"

"তাহলে অতো অস্থির হচ্ছো কেন? পা নেই, কিন্তু মস্তিষ্ক তো তোমার অকেজো হয় নি। আজও তুমি অনেক কিছুই করতে পারো দেশের জন্যে। তোমাকে চিন্তাশীল নেতার ভূমিকা নিতে হবে। পড়বে শিখবে জানবে জানাবে তুমি। হতাশ হয়ে পড়ছো কেন?"

এ হতভাগা ছেলেটাও প্রবল আবেগে লীলার হাত চেপে ধরে। "ধন্যবাদ, সিসটার, অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমায় আলো দেখিয়েছো। আমি দুর্বল হবো কেন,—কাঁদবো কেন,—কাঁদবো কেন আমি? আমি যে সৈনিক।"

"আমি যে সৈনিক। সৈনিক কখনো হার মানে না। তোমার ভালোবাসা পাবোই আমি।"

"প্রতিজ্ঞা করো, আর এ সব কথা আমাকে বলবে না।"

"তাহলে তুমিও প্রতিজ্ঞা করো।"

"কী?"

"প্রতিজ্ঞা করো আমাকে ভুলে যাবে। কক্ষণো মনে আনবে না।"

ভোলা যায় না। এক ভালোবাসার অত্যাচারেই তো এই শত সহস্র, খন্ড-বিখন্ড ভালোবাসা। একটি মুখ বড় মনে পড়ে যায় এই সব মুখে চোখ রাখলে। এরা সবাই যে একই পথের পথিক। প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ হাসপাতালের শয্যায়। মাত নারীর হাহাকার করে লীলার বুকের মধ্যে।

এতোগুলো তরুণ সৈনিককে সেবায় সুস্থ করে তু আবার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হয়। মনে হয়, কী প্রলয়ংকরী প্রক্রিয়া,—যার প্রসাদে শত্রু অরণ্য হ যায় রক্তজবার মতো বেদনাপ্লুত।

সলিল কি ফিরবে না আর? ছবিটার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে লীলা। "তুমি ঠি বলেছিলে। দিনে দিনে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আমা সব সাবধানী, অহংকারী দুর্গ।" ছবিটা হেসে যায় যুদ্ধ এমন ভয়ংকর, ওর ভয় করে না?

বীরচক্র, তার ওপরে মহাবীর চক্র, সর্বোপরি পরমবীর চক্র। বেঁচে থেকে কেউ বড়ো একটা পা না। পরমবীরচক্র (পস্থিউমাস) পেয়েছে সেক টেনান্ট সলিল বিশ্বাস। কতো বড়ো একটা ছ ছেপেছে। দুর্গ আর অবশিষ্ট নেই, শিরদাঁড় বাঁকিয়ে শুয়ে পড়েছে এখন। শেষ পর্যন্ত সলিল রাই বিজয়ী, ওরা মরতে জানে। তাই না ও বাঁচতে জেনেছিল। গভীর রাত্রে ছবির সঙ্গে লীলা শেষ আলাপ হয়।

"ভেবেছিলাম তুমি ফিরে আসবে।"

"লীলা, যা যায় তা কি ফেরে? কৈশো ফেরে নি। যৌবনকেই বা কী করে ফেরাবো যৌবন তো জীবনের উন্মেষ।"

"সলিল, তোমাকে কিছুই দিতে পারি নি আমাকে ক্ষমা করো।"

"সৈনিক কখনো ক্ষমা করে না। যে শত্রু হা মানে না, তাকে সে গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যে দুর্গ অধিকৃত হয় না, তার তলায় সে রেখে যা একটি স্টিক ডিনমাইট।"

চুরমার হয়ে গিয়েছে দুর্গ। লীলার দুই চো জলে ভরে যাচ্ছে। সলিলের সেই ছবিটাই বুকে চেপে ধরে এই গভীর রাত্রে লীলা প্রার্থনা করছে সকালের সূর্য যেন আর তাকে না দেখতে হয়।

শংকর

॥ ৯১ ॥

দুই দিকে দুই পর্বতপ্রমাণ দেহরক্ষী নিয়ে আমি এবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রক্ষীদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কে, কেন আপনাদের এখানে আগমন, তা কী জানতে পারি ?"

তার উত্তরে একজন বললেন, "তা হলে প্রথমে চৌত্রিশ নম্বর ঘরটাই সারা যাক। আপনার আপত্তি নেই তো ?"

গোটা ব্যাপারটাতেই আমার প্রবল আপত্তি ; কিন্তু সে-কথা এই মুহূর্তে কে শুনছে ? চাপা বিরক্তি প্রকাশ করে জানালাম, "আপনাদের যেখান থেকে খুশী আরম্ভ করুন, যেখানে খুশী শেষ করুন।"

চৌত্রিশ নম্বরের কাছাকাছি এসে এক ঝলকের জন্যে একখানা হলদে রং-এর কাগজ আমার সামনে ঘুরিয়ে নিলেন জনৈক দেহরক্ষী। কিছু পড়বার আগেই কাগজখানা আবার তাঁর পকেটে ঢুকে গিয়েছে। আন্দাজে বুঝলাম, সার্চ ওয়ারেণ্ট সংগে নিয়েই ওঁরা আজকের এই অ্যাডভেনচারে এসেছেন।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী এঁরা কোথা থেকে এসেছেন তা গৃহকর্তাকে জানাতে বাধ্য। কিন্তু আইনের প্রহরীরা ঘটনাস্থলে এসে আইন মান্য করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন। আইনের এই দুই দীর্ঘদেহী অভিভাবক এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না এবং তাঁদের নিজস্ব পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

চৌত্রিশ নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে একজন প্রশ্ন করলেন, এই ফ্ল্যাট কতদিন আমাদের খাস অধিকারে আছে ? আমার যথার্থ উত্তর পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে কখনও প্রাইভেটলি কাউকে এই ঘর ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি তো ?"

এই প্রশ্নের মধ্যে যে প্যাঁচ ছিল তা আমার আত্মসম্মানে ঘা দিল। আমি সংগে-সংগে জানিয়ে দিলাম, ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলা বা লুকিয়ে ব্যবসা করার অভ্যাস এ-বাড়ির ম্যানেজারের নেই।

আমার আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হচ্ছে এই সামান্য ব্যাপারটুকুও আইনরক্ষীরা নজর করলেন না। তাঁদের মুখে রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠলো। ভাবটা এইরকম : 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই তল্লাসীর কাজে নিযুক্ত রয়েছি এবং এই রকম "সত্যভাষণ" শুনে শুনে আমাদের কান পচে গিয়েছে।'

ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমারও চিন্তা আরম্ভ হলো। সীমা বিদায় নেবার পরে সেই কবে জেঠমালানির ওপর প্রতিশোধ নেবার নেশায় মিস্টার আর সি ঘোষ এই ফ্ল্যাটের অধিকার বিলাসিনী দেবীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আইন মতো আমি চাবি লাগিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, কিন্তু তারপর এই ফ্ল্যাটে আমি এসেছি বলেই মনে পড়ে না।

সীমার স্মৃতিবিজড়িত এই ফ্ল্যাটে ঘুরে যাবার কথা আমার যে মাঝে-মাঝে মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু, কেন জানি না, শেষ মুহূর্তে আমি পিছিয়ে গেছি। যে-সীমাকে আমি স্মরণে রাখতে চাই সে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে ; জেঠমালানির ওই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটে যার স্মৃতি বন্দী হয়ে রয়েছে তার নাম সুলেখা। কলগার্ল সুলেখা সেনের সঙ্গে আমি কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না, এবং সেই কারণেই এই ফ্ল্যাটে ফিরে আসবার উৎসাহ বোধ করিনি।

আজ আইনের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অকস্মাৎ আমার বিচারবুদ্ধি জেগে উঠলো এবং কে যেন ঠান্ডা জলে ভেজানো গামছা শীতের সন্ধ্যায় আচমকা আমার দেহের ওপর চেপে ধরলো। আমার সমস্ত শরীর অনাগত বিপদের আশংকায় সিরসির করে উঠলো। আমার হঠাৎ মনে হলো, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, পা দুটো ক্রমশ যেন অবশ হয়ে আসছে :

আইনের দুই অভিভাবক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—ওঁদের অভিজ্ঞ দুজোড়া চোখ আমার মনের গভীরেও উঁকি মারছে নাকি ? তাহলে তো বজ্রপাত আসন্ন।

আমার চিন্তাযন্ত্র এবার দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করেছে। আমার প্রশ্ন : কোন্ সাহসে আমি আইনের অভিভাবকদের সংগে অমন জোরের সংগে কথা বলছি ? দীর্ঘদিন ধরে সুলেখা সেনের বিত্তাক্ত জেঠমালানির প্রমোদভবনের সংগে আমার চাক্ষুষ যোগাযোগ নেই। এই ফ্ল্যাটের চাবি আমার জিম্মায় আছে সত্য, কিন্তু রামসিংহাসন চৌরাশিয়া নামক দ্বাররক্ষী এখনও তো থ্যাকারে ম্যানসনে সদর্পে আধিপত্য রক্ষা করে চলেছেন। আমার অজ্ঞাতে কোথায় কোন্ ফ্ল্যাটে তিনি কী বিলি-ব্যবস্থা করেছেন তার ঠিক নেই।

জেঠমালানি পরিত্যক্ত এই ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট একটা চাবি সংগ্রহ করা রামসিংহাসনজীর পক্ষে কোনো কাজই নয়। এবং তিনি যদি গোপনে এই ফ্ল্যাটে ব্যবসায়িক যাতায়াত রেখে থাকেন তা হলে আজ আমার বিপদ আসন্ন। গোপন কোনো খবরা-খবর না-পেয়ে আইনের অভিভাবকরা সাধারণত এই ধরনের অভিযানে নির্গত হন না। তাঁরা কী সত্যিই কোনো খবর পেয়েছেন ?

আইনের অভিভাবক জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় আপনার চাবি।"

আমার হাত অবশ হয়ে আসছে। এই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাট থেকে কোনো কিছু আবিষ্কৃত হলে, কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি নিরপরাধ। আমার অজ্ঞাতে আমারই দারোয়ান এখানে রাজত্ব চালাচ্ছেন এই বক্তব্য দুগ্ধপোষ্য বালকেরও হাসির উদ্রেক করবে।

আমার হাত থেকে চাবি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একজন রাজপুরুষ ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে লাগলেন।

হঠাৎ আর একজনের খেয়াল হলো : "সাক্ষী ?"

প্রথম জন বললেন, "সাক্ষী ধরে নিয়ে এসো তুমি—ততক্ষণ আমি জল থেকে মাছ তুলি। বেঁটে দত্তমশাইকে তুমি ঝটপট হাজির করাও।"

দ্বিতীয়জন বললেন, "বেঁটে দত্তমশাই এখন আসল জায়গায় খুব ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়।"

প্রথমজন বুদ্ধি দিলেন, "স্পেশালি ম্যানেজ করে নিয়ে এসো ওই বেঁটে দত্তকে। নাপিতের অভাবে তো বিয়ে বন্ধ করা যায় না!"

দ্বিতীয়জন এবার ছুটলেন বেঁটে দত্ত নামক নিরপেক্ষ সাক্ষীর সন্ধানে। তিনি যে এই 'বরযাত্রী' দলের সংগে খানাতল্লাসির সাক্ষী হিসেবে থ্যাকারে ম্যানসনে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না।

প্রথমজন এবার হুড়মুড় করে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং বিরাট টর্চ জ্বালিয়ে প্রথম ঘরখানা দেখে নিলেন। এই ঘরেই একদিন জেঠমালানিদের ফার্নিচার বোঝাই ছিল—এইখানেই একদিন সীমার সংগে বিচিত্র এক অস্বস্তির মধ্যে আমার পরিচয় হয়েছিল। আজ সীমার কোনো চিহ্নও এখানে পড়ে নেই।

আইনের অভিভাবক শূন্য ড্রয়িংরুম দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলো ঠুকে ঠুকে অদৃশ্য গহ্বরের সন্ধান করলেন। এবারও তিনি নিরাশ হলেন। মনে মনে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি—রামসিংহাসনের মলিন হস্তকে আমি বোধ হয় অকারণেই সন্দেহ করেছি।

আইনের অভিভাবক এবার আলো জেলে ভিতরের কুঠুরিগুলোও তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। প্যানট্রি এবং টয়লেটের ওপরে বক্সরুমও বাদ গেল না।

ইতিমধ্যে টাক-মাথা গোপালভাঁড়ের মতো চেহারা এক ভদ্রলোককে নিয়ে দ্বিতীয় অভিভাবক ফিরে এসেছেন। এই গোপালভাঁড়ই যে বেঁটে দত্ত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বেঁটে দত্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখি, কী গুপ্তধন এখান থেকে উদ্ধার করলেন ? তাড়াতাড়ি লিস্টি ছাড়ুন—ওখানে সই করে আমি আবার নিচে ফিরে যাবো। ভাল নাটক চলছে ওখানে।"

আমার দিকে তাকিয়ে বেঁটে দত্ত বললেন, "যা-যা রেখেছেন ঝটপট বলে দিয়ে কাজ হালকা করে ফেলুন, স্যার। পড়েছেন যখন যবনের হাতে তখন খানা খেতে হবে সাথে। কোনো চান্স নেই পিছনে পালাবার।"

প্রথমজনের দিকে তাকিয়ে বেঁটে দত্ত বললেন "খুরে-খুরে নমস্কার আপনার বড়বাবুকে—আমাকে ধরে নিয়ে আসবার সময় বললেন কিনা দশ পনেরো মিনিটের কাজ। এখন দেখছি হোল নাইটে লিস্টি পাকা হয় কিনা সন্দেহ। এ-আনলে কে আপনাদের সংগে এখানে আসতো ?"

চৌত্রিশ নম্বরে কিছুই পাওয়া যায়নি শুনে বেঁটে দত্ত খুশী হলেন। বললেন, "উঃ বাঁচলাম আমি। কাজ একটু হালকা হলো!"

কিন্তু আইনের অভিভাবক মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আফসোস করলেন, "আমার কপালই খারাপ। আমি সার্চ করতে এলে, সমুদ্রও ড্রাই হয়ে যায়!"

ওঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বেঁটে দত্ত আমাকে অনুরোধ করলেন, "কেন নন কো-অপারেশন করছেন স্যার ? ছিটেফোঁটা ছাড়ুন—না হলে ওঁদের উন্নতি হবে না। কথায় বলে, দিও কিঞ্চিৎ না কোরো বঞ্চিত!"

বেঁটে দত্ত তাহলে কি সন্দেহ করছেন যে আমার জানাশোনা জায়গায় বে-আইনী জিনিসপত্র লুকনো রয়েছে ?

"হাত চালিয়ে, স্যার," এবার আবেদন জানালেন বেঁটে দত্ত। "বুঝতেই পারছেন, হাতে সময়ের অভাব। আপনারা সবাই সহযোগিতা না করলে, আজকের রাত্রি শিবরাত্রি হয়ে যাবে—কেউ চোখের পাতা বুজবার সময় পাবে না।"

বেঁটে দত্তর ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে খুব। কিন্তু কোনোরকম তোয়াক্কা না-করে তিনি বললেন, "আপনার এবং এদের ভালর জন্যেই বলছি। আমার আর কী ? আমি তো সরকারের সাক্ষী—আমার না আছে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, না আছে ইনক্রিমেণ্ট, না আছে প্রমোশন। স্রেফ রাহাখরচের বদলে আমাকে সাক্ষী দিয়ে বেড়াতে হয় ; অথচ সায়েবদের চটাবার উপায় নেই। এসব ব্যাপারে সহযোগিতা না-করলে, সামান্য যে-একটু-আধটু কাজ কারবার আছে তা মাথায় উঠবে।"

আমার ওপর ভরসা না-রেখে ওঁরা দুজন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—কিন্তু জালে মাছ উঠলো না।

বেঁটে দত্ত ছটফট করতে লাগলেন। টপাটপ ইঁদুর ধরুন, স্যার। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আজ! সন্ধ্যেবেলায় সবে একটু বেরিয়েছি, আর বড়বাবুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। বললে, দত্তমশাই, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে আসার নাম করে, এ কোথায় এসে পড়লাম—বাড়িতে পর্যন্ত একটা খবর দেওয়া নেই।"

চৌত্রিশ নম্বরের তল্লাসী শেষ করে আইনের অভিভাবক দুজন আমার দিকে আবার যুগল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমার সম্বন্ধে তাঁদের ভরসা যে একটুও বাড়েনি তা বেশ বুঝতে পারছি।

ওঁরা এবার এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডরোথি ওয়াটের ফ্ল্যাটও সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানেও নিষ্ফল আধ ঘন্টা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। বেঁটে দত্ত তখনও উদ্ধার-করা মালের লম্বা লিস্টিতে সাক্ষীর সই লাগাবার জন্যে ছটফট করছেন।

এখনও মুক্তি নেই। এবার সেই ভুতুড়ে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট যেখান থেকে একদিন ফিলিপ মেমসায়েবের ট্রাঙ্কবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। উনিশ নম্বরের কথা তুলতেই আমি ফ্ল্যাটের চাবি

ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলে যান!
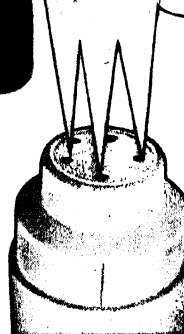
এগিয়ে দিলাম। বিরক্তভাবে বললাম, "আপনারা নিজেরাই সরেজমিনে খোঁজখবর করুন।"

ওঁদের তিনজনকে বেয়ারার সঙ্গে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে উত্তেজিত আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অফিস ঘরে এসে বসলাম। কার দয়ায় আজকের এই নাটক এখানে শুরু হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারলে ভাল হতো। ভাবছি, এখন আমার কী কর্তব্য? এখনই একবার চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীকে খবরটা দেওয়া প্রয়োজন। এ-বাড়ির কর্ত্রী হিসাবে দুঃসংবাদ তাঁর কানেই প্রথম পৌঁছনো উচিত। কিন্তু কী বলবো তাঁকে? সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিরক্ত করে বোধ হয় লাভ হবে না—কারণ এ-বাড়ির দৈনন্দিন সমস্যাবলী সম্বন্ধে বিলাসিনী দেবীর কোনোরকম ঔৎসুক্য নেই।

এই মুহূর্তে যাঁর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর নাম অবশ্যই গণপতিবাবু। সুখে-দুঃখে বিপদে-আনন্দে একমাত্র গণপতিবাবুর উপদেশ এবং উপস্থিতির ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। এখন কোনো বিপদে পড়লে একমাত্র তিনিই আমার হয়ে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে রাজী হবেন।

গণপতিবাবুর নম্বর ডায়াল করবার জন্যে হাতটা বাড়াতে যাচ্ছি ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। কে এই অসময়ে আমাদের স্মরণ করতে চাইছেন?

"হ্যালো, হ্যালো, আমি পপি বলছি," মিসেস পপি বিশোয়াস যে এই দুঃসময়ে আমাকে জ্বালাতন করবেন তা ভাবতে পারি নি।

"হ্যালো, মিস্টার শংকর, কেমন আছেন?" মিসেস পপি বিশোয়াস কি আমার সঙ্গে এখন রসিকতা করছেন?

"আর কিছু বলবার আছে আপনার?" বিরক্ত কণ্ঠে আমি টেলিফোনালাপের ইতি টানতে চাইলাম।

পপি বিশোয়াস কিন্তু মোটেই বিরক্ত বোধ করলেন না। বরং খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। এমন অবস্থায় যে কেউ এইভাবে হাসতে পারে তা আমার অকল্পনীয়।

হয়তো আমি সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন নামিয়ে দিতাম। কিন্তু মিসেস বিশোয়াস এবার প্রয়োজনীয় কথা আরম্ভ করলেন। "আপনার ওপর খুব রেগেছি আমি, মিস্টার শংকর। আপনি কোন সাহসে উনিশ নম্বরের চাবি ওদের হাতে দিয়ে নিজে আপিস ঘরে সরে এলেন?"

মিসেস বিশোয়াস একথা জানলেন কী করে? ওঁর চোখে কী টেলিভিশন ক্যামেরা লাগানো আছে?

"আপনি আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। এখনই ওই উনিশ নম্বরে চলে যান। এখানে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। সুযোগ পেলেই হয়তো কিছু বে-আইনী জিনিস ওখানে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলবে।"

আমি মিসেস বিশোয়াসের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। কিন্তু তিনি কি এই নাটকের ধারাবিবরণী শুনে চলেছেন। আইনের অতিথিদের আকস্মিক আগমনের সংবাদ তিনি এরই মধ্যে পেলেন কি করে?

মিসেস বিশোয়াস আবার মুখ খুললেন। "মিস্টার শংকর, আপনার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে শুনলাম! শুনুন, মিস্টার শংকর, কোনো ভয় নেই আপনার। একদম চিন্তা করবেন না। আপনার ভালর জন্যেই এসব হয়েছে মনে রাখবেন।

এসব কী বলছেন, মিসেস বিশোয়াস? বাড়িতে সার্চ হলে তার থেকে আমার মতো লোকের কী ভাল হতে পারে?

মিসেস বিশোয়াস আমাকে আশ্বাস দিলেন, "আমার ঘরেও সার্চ হবে নিশ্চয়। কিন্তু এক ফোঁটা চিন্তা করবেন না। কিন্তু প্লিজ আপনি ওদের একলা ছেড়ে দেবেন না, উদোর পিণ্ডি যদি কেউ বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু বিপদের শেষ থাকবে না।"

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। মিসেস বিশোয়াস অনেক কিছুই জানেন মনে হচ্ছে। দেখে-শুনে এবারে আমাকে তিনি বিপদে ফেললেন নাকি? কিন্তু এখন ভাববার অবসর নেই। টেলিফোন নামিয়েই ছুটলাম উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের তালাচাবি নিয়ে তখন ধস্তাধস্তি চলছে। আইনের অভিভাবক একবার বেঁটে দত্তর সাহায্য চাইলেন। কিন্তু দত্তমশাই সোজাসুজি বললেন, "ও-কাজে আমাকে নামাবেন না মশাই, নিরপেক্ষ সাক্ষী কখনও তালা ভাঙায় সাহায্য করে না। উকিলের জেরার সামনে আমার শোচনীয় অবস্থা হবে।"

ওঁদের দেরি হওয়ায় আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। মিসেস বিশোয়াস আমার মধ্যে যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন তার হাত থেকে বাঁচা গেল।

এবারেও আইনের অভিভাবকদের নিরাশ হতে হলো। আধঘণ্টা দেওয়ালে মাথা ঠুকেও ওঁরা কিছু বার করতে পারলেন না। ওখান থেকে এগারো নম্বর ফ্ল্যাট। সেখানেও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এ-ব্যাপারে ওঁরা দু'জন মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না—কিন্তু এখনই হায়ার অফিসারকে রিপোর্ট করতে হবে।

একজন সিনিয়র অফিসার এই সময় এগারো নম্বর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আইনের দুই অভিভাবক এবার জুতোর গোড়ালি ঠুকে স্যালুট জানালো এবং সার্চের খবরাখবর দিল। বেঁটে দত্ত একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন, "কিছু পাওয়া গেল না স্যার—শুধু শুধু আমাকে খাটালো।"

তরুণ অফিসার ভদ্রলোক এই খবরে আশ্বস্ত হলেন এবং এবার আমার দিকে মুখ ঘুরোলেন।

মুখ দেখেই আমার চেনা-চেনা মনে হলো। অফিসার ভদ্রলোকও বলে উঠলেন, "শংকর না? তুমি এখানে?"

শ্যামলকে ততক্ষণে আমি চিনে ফেলেছি। আমাদের হাওড়া কাশুন্দের ছেলে সে—এক সঙ্গে অনেকদিন 'সুর ঝংকার' রেডিওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী শুনেছি।

শ্যামলকে দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে—বিপদের সময় ঈশ্বর আমাকে মাঝে-মাঝে একটু আলো দেখিয়ে দেন।

শ্যামল বসুরায় আর একবার অফিসার দু'জনের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে সব খবরাখবর নিয়ে নিলেন। ওরা দু'জন জানতে চাইলেন, এবার তাঁরা কী করবেন? শ্যামল বসুরায় এক টুকরো কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আপনারা ওই মিসেস বিশোয়াসের ফ্ল্যাটখানা সার্চ করুন।"

শ্যামল বসুরায় অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আপিসে চলে এলেন। শ্যামল যে পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্রীয় কাস্টমসের বড় অফিসার হয়েছে এ-খবর জানা ছিল না।

শ্যামল আমার বিড়ম্বিত জীবনের কিছু কথাও জেনে নিলো। কেমন করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে হাইকোর্ট এবং হোটেলের অজ্ঞাতবাসপর্ব শেষ করে আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনে আশ্রয় লাভ করেছি তাও সে শুনলো।

শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে চা দেওয়া চলে কি না। "তোমার ঘরে যখন কিছুই পাওয়া যায়নি, তখন চা খেতে আপত্তি কী?"

এরপর শ্যামল কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে বসেছিল এবং তারই মধ্যে আমি বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর খবর যোগাড় করে ফেলেছিলাম।

শ্যামলের কাছেই শুনলাম, আজকের আচমকা আক্রমণে কাস্টমস্ এবং পুলিস দু'জনেই অংশ গ্রহণ করছে। তবে স্থানীয় থানার পুলিস নয়—খোদ লালবাজারের সঙ্গেই এই অভিযানের গোপন পরিকল্পনা হয়েছিল।

শ্যামল বসুরায় জানালো, "অবাক কাণ্ড। কলকাতা শহরের বুকের ওপর এতো বড়ো বে-আইনী কাজের কেন্দ্র চলছিল, অথচ পুলিস ও আমরা কেউ খবর রাখতাম না।"

শ্যামল বসুরায় নতুন কলকাতায় বদলী হয়েছে

এবং অফিসের বড় কর্তা ওকেই এই স্পেশাল অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

শ্যামল বললো, "ওই সিলভার ড্রাগনের এক-একখানা ঘর থেকে চোরাই আইল্যান্ড বেরিয়ে আসছে। সোনা, বিদেশী কারেন্সি নোট ডিউটি ফাঁকি দেওয়া জাহাজী হুইস্কি, ইমপোর্টেড সিগারেট, ঘড়ি—কী না পাওয়া যাচ্ছে। পুরো লিস্ট বানাতে আজ সমস্ত রাত কেটে যাবে।"

শ্যামল জানালো, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার, একটু আগেই এক ব্যাগ জাল ডলার নোটও পাওয়া গেল। কেউ বোধহয় ওই মিসেস চাওলাকেও ঠকিয়ে গিয়েছে; কিন্তু জেনে-শুনেও মিসেস চাওলা প্রাণধরে ওগুলো ফেলতে পারেন নি।"

আরও শুনলাম, এগারোজন কমবয়সী মেয়েকে সন্দেহজনক অবস্থায় বিভিন্ন খুপরিতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা এখন পুলিস দেখে কান্নাকাটি শুরু করেছে এবং মিসেস শকুন্তলা চাওলার নামে যা-তা বলছে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার মিস্টার সরকার ওদের নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। প্রতিটি মেয়ের স্টেটমেন্ট নিতে হচ্ছে। ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্টেও বড় কেস হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। হোটেল অথবা বার-এ এইসব মেয়েদের ঢুকতে দেওয়ার আইন নেই।

অ্যারেস্ট? শ্যামলের কাছেই শুনলাম, অ্যারেস্টের তালিকায় শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী এবং সুযোগ্য জামাই রয়েছেন। অতি ধুরন্ধর মহিলা এই শকুন্তলা চাওলা—বলতে চাইছিলেন যে সিলভার ড্রাগনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ লাইসেন্স রয়েছে মিস্টার চাওলার নামে। সৌভাগ্যক্রমে পাশের একখানা ফ্ল্যাটের বাইরে শকুন্তলা চাওলার নেমপ্লেট ছিল এবং ওখান থেকে প্রচুর ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টেড হুইস্কির স্টক পাওয়া গেল।

স্বামীকে এগিয়ে দিয়ে জামাইকেও বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন মিসেস চাওলা। কিন্তু জামাই-বাজীবন বারের ম্যানেজার হিসেবে মাইনে নিয়ে থাকেন। এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েরা ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে যেসব স্টেটমেন্ট দিচ্ছে তাতে কানে তুলো দিতে হয়।"

উর্বশী? তার খবর জানবার জন্যেও আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছি।

"সে কি? উর্বশীর লেটেস্ট খবর রাখো না তোমরা? শ্যামল অবাক হয়ে গেল।" চব্বিশ ঘণ্টা আগেই সে তো মা এবং স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এ-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। কেন, আজকের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখোনি তুমি? পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে: 'ইউ, তুমি এইভাবে নিজের সর্বনাশ কোরো না। ফিরে এসো। তোমাকে এখনও ক্ষমা করা হবে।" এই 'ইউ' যে উর্বশী সে-সম্বন্ধে বসুরায়ের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

আরও শুনলাম, উর্বশীর সঙ্গে কাস্টমসের কোনো যোগাযোগ হয় নি। অন্য এক অচেনা সূত্র থেকে খবর পেয়েই তাঁরা এই রেডের ব্যবস্থা করেন।

ইমমরাল ট্রাফিকের এ-সি মিস্টার সরকারের সঙ্গে উর্বশীর যোগাযোগ হয়েছে মনে হলো। ভিতরের লোক না বেঁকে বসলে ওঁদের পক্ষে এতো খবরাখবর পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

থ্যাকারে ম্যানসন মহাভারতের আর এক পর্ব এবার বোধ হয় শেষ হতে চললো। ঘরে ঘরে তালা পড়লো—তালার ওপর গালা চাপালেন পুলিস ও কাস্টমসের লোকেরা। শকুন্তলা চাওলা, জামাই ও স্বামীসহ বিভিন্ন অভিযোগে থানার হাজতে চলে গেলেন। পিছনে আর এক বিরাট গাড়িতে সিলভার ড্রাগনের বিনোদিনীরাও বন্দিনী অবস্থায় থানায় চালান হলেন।

এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। শকুন্তলা চাওলার সিলভার ড্রাগন যে কোনোদিন সরকার ও পুলিসের শনির দৃষ্টিতে পড়তে পারে, তা কারও কল্পনায় ছিল না।

আমার সম্বন্ধেও নানা গুজব রটেছে। কারণ অনেকেই খোঁজখবর করতে এসে আমাকে অফিস ঘরের মধ্যে বহাল তবিয়ত দেখে অবাক হয়ে গেল। তাদের খবর ছিল যে খালি ফ্ল্যাট সার্চ হবার পরে আমাকেও পুলিসের কালো খাঁচায় ঢোকানো হয়েছে।

এর পরেই আমি মিসেস বিশোয়াসের ফোন পেয়েছিলাম। সকাল নটার সময় মিসেস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে তিনি মদে চুর হয়ে আছেন। এই ভোরবেলায় মিসেস বিশোয়াস যে এমন বেসামাল হতে পারেন তা ভাবিনি।

মিসেস বিশোয়াস জড়ানো গলায় আমাকে ওঁর সামনে বসতে বললেন। "কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর, আপনাকে না-ডেকে পারলাম না। আমার এই অবস্থা মাফ করবেন, আজ আমি কোনো আইন-কানুন মানছি না।"

মিসেস বিশোয়াস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড প্রায় বলতেন—'অতি দর্পে হত লংকা'! দেখলেন তো মিসেস শকুন্তলা চাওলার চ্যাপটার। ভেবেছিল পুলিস এবং গভরমেন্ট অফিসার ওর রুমালের খুঁটে বাঁধা আছে। ভেবেছিল, থানায় প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে উড়ো টেলিফোন করে, টুসকি মেরে আমাকে এখান থেকে বিদায় করবে এবং এই কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটখানা অকুপাই করবে। কিন্তু কী হলো?"

"তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে!" মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস।

একটু হেসে ফেললেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "অনেক পাপের প্রতিশোধ নেওয়া হলো আজ, মিস্টার শংকর। উর্বশী চাওলা মায়ের অনেক কিছুই জানতো, কিন্তু একটা খবর তেমন রাখতো না। এই মায়ের সঙ্গে জামাইয়ের নোংরা ব্যাপারটা। সেই খবরটা বাধ্য হয়ে কানে তোলাতে হলো। তারপর আমাকে আর তেমন কিছু করতে হয়নি। ওই যে ব্যারিস্টারের নাম করে দিলেন আপনি, উনি খুব হেল্প করেছেন উর্বশীকে। উনি না থাকলে, ওকে এতোক্ষণ আর জীবন্ত পাওয়া যেতো না।"

আরও একটু ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। "উর্বশী এখন আগুনে পুড়ে-পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। ও আর এই সব নোংরা সম্পত্তির সুখ ভোগ করতে চায় না—সে সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে চায়।"

আবার হাসলেন মিসেস বিশোয়াস। "আমি খবর পেলুম, পুলিস ওই সিলভার ড্রাগনের ভিতরের খবর উর্বশীর কাছে শুনেছে এবং ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু পুলিসের ওপর শকুন্তলার যা ইনফ্লুয়েন্স—পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে সেই কাজ করতে হলো, যা মিসেস চাওলা আমার ব্যাপারে করেছিলেন। কাস্টমসের খোদ কর্তাকে টেলিফোন করে দিলাম।"

মদের ঝোঁকে মিসেস বিশোয়াসের হাসি বেড়েই চলেছে। "মধ্যিখান থেকে আপনার ওপর একটু অত্যাচার হলো। কিন্তু উপায় ছিল না—ওই মিসেস চাওলা যদি আপনাকে সন্দেহ করতো তা হলে আরও বিপদে পড়ে যেতেন। আমি সেফটির কথা ভেবে ওঁদের জানালাম, আপনার খাস ফ্ল্যাটগুলোতে এবং ওয়ান মিসেস পপি বিশোয়াসের ফ্ল্যাটেও মিসেস চাওলার বে-আইনী মাল লুকনো থাকে।"

মিসেস বিশোয়াসের ওপর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারলাম না। সজল চোখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "অ্যাই অ্যাম ভেরি স্যরি, মিস্টার শংকর, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওই মিসেস চাওলা ঠিক আপনাকে সন্দেহ করে বসতো এবং আপনার প্রাণ সংশয় হতো।"

মিসেস বিশোয়াস কাঁদতে-কাঁদতে হাসতে-হাসতে বললেন, "আজ আমার বুকটা খুব হালকা হালকা মনে হচ্ছে, মিস্টার শংকর। অনেকদিনের জমা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছি আমি। আপনি কিছু মনে করবেন না—আজ আমি ভিকটরি সেলিব্রেশন করবো," এই বলে মিসেস পপি বিশোয়াস টেবিলে রাখা হুইস্কির বোতলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। [ক্রমশ]

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার ব্যবহার করার পরও
কিছু অবশিষ্ট গুঁড়ো থেকে যাওয়া সম্ভব

ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক !

এর মধ্যে আছে দেড়গুণ ফেনা সৃষ্টির ক্ষমতা।

ভিমে আছে পরিষ্কার করার যে কোনো পাউডারের চেয়ে বেশী ডিটারজেন্ট। তাই এর বাড়তি পরিষ্কার করার ক্ষমতা—তেলা ভাব আর সমস্ত দাগ নিমেষে সাফ করে দেয়, কোনো গুঁড়ো অবশিষ্ট রাখে না। তা ছাড়া ভিম অতি-মিহি ও মোলায়েম হওয়ার ফলে পরিষ্কারও ভালো হয় অথচ আঁচড় পড়ে না। ভিম ব্যবহারে সব কিছু ঝলমলে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।
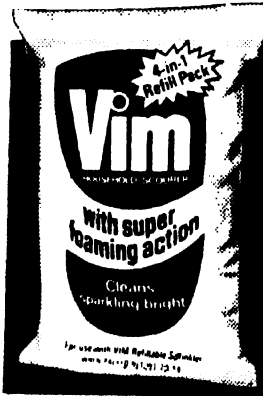
আপনার
২০% দাম
বাঁচবে
এই প্যাক
কিনলে

হিন্দুস্থান লিভারের এই উৎকৃষ্ট উৎপাদন কেবল ৬০০ গ্রাঃ ও ২.৫ কেজি প্যাকে পাওয়া যায়, কখনও খোলা বিক্রী হয় না।

লিনটাস· V 57-203 BG

বিজ্ঞান

ভৌত গবেষণাগার
আমেদাবাদ থেকে ফিরে : ২

প্লাজমা। প্লাজমা বলতে এখানে রক্তের সেই তরল উপাদান, যাকে বলা হয় প্লাজমা, তার কথা বলছি না এ প্লাজমা, পদার্থবিজ্ঞানীরা যাকে প্লাজমা বলে থাকেন সেই প্লাজমা।'

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, পদার্থ কোন কোন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে? এ প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর স্বরূপ অনেকেই হয়ত বলবেন : কেন? তিন অবস্থায়। কঠিন, তরল এবং গ্যাস।

তিনটি নয়। পদার্থ আরও একটি অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। যেমন, ধরুন কোন একটি পদার্থ নিলেন। পদার্থটিকে প্রচণ্ডভাবে গরম করা হল। তার তাপমাত্রা উঠল কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই অবস্থায় পদার্থটি গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করবে ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটবে আরও একটি ঘটনা। পদার্থের পরমাণুর মধ্যে থাকে ইলেকট্রন। প্রচণ্ড তাপ শক্তির প্রভাবে ওই পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। এবং এর ফলে অবস্থাটা দাঁড়াবে এই রকম : গ্যাসীয় অণু অথবা পরমাণুর নিজস্ব গণ্ডী থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ায় ওই সব অণু বা পরমাণু পজিটিভ আয়নে পরিণত হয়ে গেল। তখন ওই গ্যাসের উপাদান বলতে বোঝাবে পজিটিভ আয়ন এবং ইলেকট্রনের মিশ্রণ। কেউ কারোর সঙ্গে মিশছে না। অথচ পাশাপাশিই আছে। পদার্থের এই অবস্থাকেই বলা হয় প্লাজমা। যেন দই-এর মত ব্যাপারটা। দই-এর মধ্যে থাকে মাখন। দইকে খুব করে নাড়ালেন। ফলে দই-এর মধ্যেকার মাখন বেরিয়ে এল। তৈরি করল ঘোল

পারমাণবিক বিজ্ঞানের 'পানডিয়া থিওরেমের' স্রষ্টা অধ্যাপক এস পি পানডিয়া পি আর এল-এর সহ-পরিচালক

আর মাখন। তারা পরস্পর না মিশে পাশপাশিই থেকে গেল। অবশ্য উপমাটা স্থূলে।

সৌর-ঝড়ের সময় প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে আসে প্লাজমার মেঘ। যার ব্যাস দশ হাজার থেকে কখনও এক লক্ষ কিলোমিটারের মত দাঁড়ায়। গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার। এই মেঘ পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। প্লাজমার মেঘ আন্তর্নক্ষত্র জগতেও ছড়িয়ে থাকে। তাদের পারস্পরিক সংঘাতে সৃষ্ট হয় বেতার তরঙ্গের বিকিরণ। এ সব ঘটনা বেশ কিছুকাল ধরে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুলেছে। সম্প্রতি প্লাজমার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করারও চেষ্টা চলছে কোন কোন দেশে।

মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে এই অ্যানটেনাটি তৈরি করেছেন পি আর এল-এর কুশলীরা

নেয়া হবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ—প্লাজমা অবস্থায়। এই প্লাজমাকে আবদ্ধ করা হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রচণ্ড গতিতে ছোটাছুটি শুরু করবে ওই আইসোটোপ। তারা পরস্পর পরস্পরকে করবে আঘাত। আঘাতের ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোজন বা ফিউশন। আর এই ফিউশন সৃষ্টি করবে প্রচণ্ড উত্তাপ। বস্তুত এই ফিউশন পদ্ধতির ব্যাপারে সফল হওয়ার জন্যে অনেকেই চেষ্টা করছেন এখন।

চেষ্টা করছেন আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির (পি আর এল) বিজ্ঞানীরাও।

'ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারে প্লাজমা নিয়ে কাজ হচ্ছে। সেখানে এর প্রযুক্তিগত দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের মূল লক্ষ্য এর ফিজিকসটি স্টাডি করা। প্লাজমা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অন্বেষণ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এখানকার যাবতীয় পরীক্ষার আমরা পরিকল্প নিয়েছি। যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হয়েছে বা হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরই নির্ভর করে।' বললেন পি আর এল-এর তরুণ প্লাজমা পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ পি আই জন।

বিভিন্ন ধরনের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে প্লাজমার আচরণ জানার কাজ চলছে এখানে। চৌম্বক দর্পণ তৈরি করে প্রচণ্ড গতি প্লাজমার প্রতিফলন, প্লাজমার ওপর অভিঘাত বা 'শক ওয়েভ'-এর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি জানার ব্যাপারে মৌলিক গবেষণা চলছে এখানে, দেখলাম নানা যন্ত্রপাতি। বেশির ভাগই তৈরি করেছেন পি আর এল-এরই কারিগর। যা যে কোন বিদেশী গবেষণাগারের কাছেই গৌরবের মত। এখানে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি সওদার কোন প্রবণতা নেই। পরীক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞানীরাই যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করেন। সে যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এখানকার ওয়ার্কশপে। দেশীয় কাঁচামালে, দেশীয় সংস্থার সহযোগিতায়।

ডঃ জন বললেন, '১৯৮১ সাল হবে প্লাজমা বিজ্ঞানীদের কাছে একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। আশা করা যাচ্ছে, ওই বছর পৃথিবীর প্রথম পরীক্ষামূলক ফিউশন রিঅ্যাক্টরটি চালু হয়ে যাবে। আর তা যদি হয়, প্লাজমার ব্যাপারে তখন আমরা এমন সব অভূতপূর্ব তথ্যাবলী পেতে থাকব যা এ ধরনের গবেষণা প্রচুর সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে।'

পেছনে নয়, পৃথিবীর অগ্রজতম গবেষণাগারের সঙ্গে তাল রেখে প্লাজমা বিষয়ক কোন কোন গবেষণায় পি আর এল-এর গবেষকরা এখন সমপর্যায়ে এগিয়ে চলেছে।

'ফ্রাস্ট্রেশন? নো ফ্রাস্ট্রেশন। তা হবে কেন? উই হ্যাভ ডেফিনিট প্রোগ্রাম। উই নো হোয়্যার উই স্ট্যান্ড, উই নো হোয়্যার উই গো। কাজের যাবতীয় সুযোগ এখানে আমরা পাচ্ছি।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন, ভারতে কাজের সুযোগ নেই, ভাল কাজও সমাদর পায় না। তার উত্তরেই এই জবাব দিলেন ডঃ জন।

*

সৌর এবং গ্রহ পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই গবেষণাগার উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে এখানকার বিজ্ঞানীরা সূর্য, আন্তর্গ্রহ পরিমণ্ডল, পৃথিবীর চৌম্বক বলয়, আয়নমণ্ডল এবং ভূ-চৌম্বকের ওপর পর্যবেক্ষণ চালান। ভূ-পৃষ্ঠে সংস্থাপিত যন্ত্রপাতি ছাড়াও এ কাজে তাঁরা রকেটবাহিত যন্ত্রপাতিও কাজে লাগান। বিগত কয়েক বছর ধরে মাউন্ট আবু থেকে তাঁরা ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রভার ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আসছেন। এই উদ্যোগ আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন পারমাণবিক এবং আণবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সাহায্য করেছে। সম্প্রতি পি আর এল একটি নতুন প্রকল্পে হাত দিয়েছে। এই প্রকল্পে সৌর ঝড় এবং আন্তর্গ্রহ পরিমণ্ডলের বিভিন্ন

অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলুন—বাঞ্ছিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার দিয়ে

কামাবেন? নানা, সে তো পুরুষদেরই সাজে! একে তো মেয়েদের কোমল চামড়া ব্লেড দিয়ে কেটে-ছড়ে যাওয়ার ভয় বেশী, তার ওপর কামানোর পর গজিয়ে ওঠে শক্ত খোঁচা লোম!

তাহলে? অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলার জন্যে ব্যবহার করুন, বাঞ্ছিত ক্রীম—কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার। অ্যান ফ্রেঞ্চ চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, তাই আপনার চামড়া থাকে রেশমী কোমল—কয়েক সপ্তাহ ধরে!

অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার লেবুর সুগন্ধে আর ফুলের সুগন্ধে পাওয়া যায়। আপনার পছন্দমত বেছে নিন।

অ্যান ফ্রেঞ্চ* হেয়ার রিমুভার, অবাঞ্ছিত লোম দূর করতে বাঞ্ছিত ক্রীম

* Licensed User of TM ; Geoffrey Manners & Co. Ltd.

176-HR-244 Ben

সমন্বয় নিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালাবে। শেষোক্ত পর্যবেক্ষণ আন্তর্গ্রহ ভ্রমণের ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে। যেমন 'সোলার ফ্লেয়ার' বা সূর্যের স্থানিক বিস্ফোরণের সময় যে 'শক ওয়েভ' সৃষ্টি হয় তার চরিত্র এবং মহাকাশে চলমান মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর ওই 'শক ওয়েভ' কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়—এ সব জানার ব্যাপারে এই গবেষণা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

পি আর এল এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অধ্যাপক দেবেন্দ্র লালের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে মহাজাগতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে আধুনিকতম গবেষণার কাজ। মহাজাগতিক পরিমণ্ডল এবং সূর্য থেকে বিকীর্ণ মহাজাগতিক রশ্মি কি কি ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে এখানে। কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে 'তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ-অনুসন্ধানী' বা 'রেডিও অ্যাকটিভ ট্রেসার' এর সাহায্যে সমুদ্রের গতি প্রকৃতির অনুসন্ধানের, ভূ-তাত্ত্বিক এবং মহাজাগতিক তথ্য সংগ্রহের মাস স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে অনুসন্ধান

পি আর এল-এর ডাইরেক্টার অধ্যাপক দেবেন্দ্রলাল বললেন, এ দেশে 'অ্যাডমিনিসট্রেটিভ মেকানিজম ইজ টোটোলি ফেইলড'। তার জন্যেই দেশের মানুষ বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন

চলছে মহাজাগতিক উৎস জাত নানা রকম গ্যাসের অস্তিত্ব।

মার্কিন দেশের ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যান্ড স্পেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) চাঁদের পাথর পরীক্ষার ব্যাপারে প্রধান অনুসন্ধানকারী বা প্রিনসিপাল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে মনোনীত করেছেন অধ্যাপক লালকে। অ্যাপলো ১১ থেকে অ্যাপলো ১৭ পর্যন্ত সমস্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে যে সব পাথরের নমুনা এনেছিলেন অধ্যাপক লাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম পরীক্ষক। সোভিয়েত চান্দ্রযান লুনা-১৬ এবং ১৭র নিয়ে আসা চাঁদের পাথর পরীক্ষার দায়িত্বও তাঁকে দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক লালের তত্ত্বাবধানে এ সব কাজ পি আর এল-এর বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শুধু পরীক্ষামূলক নয়, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানেও এই গবেষণাগার এখন শিরোনাম। এখানকার সহ পরিচালক ডঃ এস পি পানডিয়ার নেতৃত্বে এখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর একটি পারমাণবিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী। উল্লেখ্য, ডঃ পানডিয়া নিজেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী। বিভিন্ন পদার্থের নিউক্লিয়াসের নানা রকম চরিত্র এবং বিক্রিয়া জানার ব্যাপারে তিনি একটি তত্ত্বও তৈরি করেছেন। যার নাম 'পানডিয়া তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের সাহায্যে খুব সহজভাবে এবং অল্প আয়াসে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের শক্তি স্তর এবং কর্মালীর বিবরণ পাওয়া যায়।

পি আর এল-এর আর একটি সংযোজন—পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ক গবেষণা। তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪র সাহায্যে বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নমুনার বয়স নির্ণয়ের ব্যাপারে একটা নিজস্ব ঘরানাই তৈরি হয়েছে এই গবেষণাগারে। এই বিভাগের পরিচালক ডঃ ধরমপাল অগ্রওয়াল। তাঁর পরিচালনায় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগে যে গবেষক দলটি কাজ করছেন এ দেশে সেই দলটিই সব চেয়ে বড়। পুরাতাত্ত্বিক নমুনার বয়েস জানার জন্যে আরও একটি পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁরা। নাম 'থার্মোলুমিনিসেন্স ডেটিং' পদ্ধতি। ভারতে একমাত্র এখানেই এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান হচ্ছে। হরপ্পা সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন, সবরমতি নদীর জলপ্রবাহ, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ ভারতের কোন কোন খনির ধাতু ব্যবহার করত এবং কোন কোন সময়ে—এখানকার পুরাতত্ত্ব বিভাগ সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

বলা বাহুল্য, ভারতীয় গবেষণায় পি আর এল-এর স্থান এখন অনবদ্য। এখানকার পরিবেশ থেকে শুরু করে কাজকর্মের মধ্যে অভূতপূর্ব গতিশীলতা লক্ষ করেছি। সেই সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা। এবং সে চেষ্টার প্রধান পুরোহিত অধ্যাপক দেবেন্দ্র লাল।

*

'গবেষকদের স্বাধীনতা দিতে হবে। গবেষক নিজে থেকে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ভাবুন, বলুন কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। আমি ডাইরেক্টার। আমার কাজ তাঁকে সাহায্য করা। এ ধরনের পরিবেশ থাকলে, গবেষণার কাজে কেউ পিছুপা হবেন না। ফ্রাসট্রেশনও থাকবে না।' এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখকের কাছে মন্তব্য করলেন অধ্যাপক লাল।

প্রথম পরিচয়েই মনে হল ৪৯ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞানী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীই শুধু নন একজন মানবদরদী প্রশাসক। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'হিউম্যান ফার্স্ট, দেন সায়ান্স।' টাটা ইনসটিটিউট অভ্ ফানডামেন্টাল রিসার্চ থেকে মহাজাগতিক রশ্মির উপর অনবদ্য গবেষণার দরুন তিনি ডকটরেট উপাধি পান। তাঁর গাইড ছিলেন অধ্যাপক বারনারড পিটারস। পরবর্তীকালে সমুদ্র বিজ্ঞান এবং সমুদ্র রসায়নের ওপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। 'সায়ানস' পত্রিকার তিনি লেখক, মার্কিন দেশের ন্যাশনাল আকাদেমির সদস্য, সদস্য ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমিরও। প্রতি দু বছর অন্তর ছয় মাস তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার 'স্ক্রিপস ইনসটিটিউশন অব ওসেনোগ্রাফি'তে অধ্যাপনা করেন। এটা তাঁর স্থায়ী পদ।

'পৃথিবীর যে কোন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে যান, দেখবেন, ভারতীয় এবং জাপানী বিজ্ঞানীদের সংখ্যাই সেখানে বেশি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যোগ্যতা কি এ থেকে বোঝা যায় না?' বললেন অধ্যাপক লাল।

'বিজ্ঞান এক ধরনের সংস্কৃতি। এটা গড়ে তুলতে সময় লাগে। দরকার নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব দিয়েছেন মেঘনাদ সাহা, হোমী ভাবা, সারাভাই প্রমুখের মত বিজ্ঞানী।' গবেষণাগার পরিচালনার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একথা বলেন।

তাঁর মতে, দেশে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ব্যাপারে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সাফল্যের পেছনে যে বাধা, তার জন্যে দায়ী বিজ্ঞানীরা নন। আসলে আমাদের দেশে 'অ্যাডমিনিসট্রেটিভ মেকানিজম ইজ টোটালি ফেইলড।' যাঁরা বলেন মৌল গবেষণায় খরচ হচ্ছে বেশী, ভুল বলেন। প্রায়োগিক গবেষণার খরচের তুলনায় তা খুবই কম। কিন্তু প্রায়োগিক গবেষণাকে সরাসরি এবং সময়ের অপচয় না করে জনকল্যাণে কাজে লাগানর জন্যে দরকার বলিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এদেশে সেখানেই মারাত্মক ত্রুটি। মৌল গবেষণার উন্নতি দরকার। না হলে প্রায়োগিক বিজ্ঞানকে থেমে পড়তে হবে। আর তা যদি হয়, সেটা কি জনস্বার্থের পরিপন্থী হবে না?

সার্থক নেতৃত্বের কথা বলেছিলাম। অধ্যাপক লালের মধ্যে এই সার্থক নেতৃত্বটি আছে বলেই সারাভাই-এর স্বপ্নকে তিনি হয়ত সার্থক করতে পারেন। এর জন্যেই পি আর এল এখন গবেষণার ক্ষেত্রে শিরোনাম।

সমরজিৎ কর

খেলা

এই জয়, এই হার, এই রাবার

প্রণবেশ সেন

কুল খেলা নয়, রং খেলা নয়, এমন কি ঐ যে আকাশ-কাটানো, মাঠ-কাঁপানো ফুটবল, তাও নয়—ক্রিকেট, ক্রিকেটই। তার কোন তুলনা নেই—প্রতিরূপ নেই, এমনকি কোন বিকল্পও চোখে পড়ছে না। খেলার জগতে, যদি বলা যায়, তবে বলবো সে 'আপনাতে আপনি বিকশি' এক উর্বশী। তা নইলে আমাদের এই দেশ থেকে সহস্র যোজন পথ পেরিয়ে কোন এক ভিনদেশে তার চারুচরণের মঞ্জির বেজে উঠলো, আর বেতার তরঙ্গে সেই মঞ্জিরের রিনিঝিনি শুনে এখানকার এক অতি ঘরকুনো, একবার নয় দুবার নয় বারবার ভাবলো, 'আহা যদি যাওয়া যেত অস্ট্রেলিয়ায়!' ভাবাটাই সার। ডানা তো নেই, তাছাড়া বিত্তহীনের ওড়বার আকাশও সীমায়িত। অতএব কান পেতে রই, যখন যেখানে থাকি, সারাক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত। এই-ই তো ক্রিকেট।

ক্রিকেট এ-দেশে খুব একটা নতুন নয়, যতদূর মনে পড়ছে সালটা বোধহয় ১৭২৫। পশ্চিম উপকূলে কচ্ছের কাছে এক বন্দরে দুদল বৃটিশ নাবিক অবসর কাটাবার জন্যে সমুদ্রের লোনা হাওয়া চাখতে চাখতে ক্রিকেট খেলা শুরু করলেন। (কেউ কি জানেন

এঁদের নাম? এঁদের জন্যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরীর কথা কি ভাবতে পারেন না ক্রিকেট রসিক-সুজনেরা?) আর সেই খেলার শেষ আজও দেখা যাচ্ছে না, বরং দেখছি ক্রিকেট নির্দিষ্ট দেশের সীমা পেরিয়ে সমর-সাথী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এটাও ক্রিকেটের একটা মজার দিক। একটা খেলার রস আস্বাদন করতে গেলে এ-দেশ সে-দেশের আরো অনেক ক্রিকেটের স্মৃতি ভিড় করে আসে। আর এ-জন্যেই হয়তো ক্রিকেটের যে-কোন খেলাই চরিত্রে আন্তর্জাতিক।

সৎ সাহিত্যও তো তাই। আসলে জীবন নিয়েই তো সাহিত্যের কারবার। আর এই জীবন নামক ব্যাপারটা খণ্ডিত নয়। এটা একটা প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই মিলেই ক্রিকেট, জীবনের ছবি। শুধু এই মিলেই? উঁহু, মিল আছে জীবন নামক দামাল ছেলেটার সংগে তার চরিত্রেও। কখন যে কোথায় কি করে বসবে এই দুষ্টু ছেলেটা, কারুর বোঝবার বা বলবার যো নেই। হ্যাঁ নাটকীয়তাই ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য—জীবনের যেমন, তেমনি।

এই ধরুন না, অস্ট্রেলিয়ায় সদ্য শেষ হওয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট সিরিজটির কথা। প্রথম থেকেই তো জমাটি নাটক। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৬৬ রানে পাততাড়ি গুটোল। একমাত্র পিটার টুহি ৮২ রান করে—খেলাটা যে অস্ট্রেলিয়া দলের, তা মনে করিয়ে দিলেন। একটু উল্লসিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, বাগে পাওয়া গেল, ক্যাংগারুকে এবার খাঁচায় পোরা যাবে। ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করল। ৩ উইকেটে রান উঠল ৯০। খুব একটা ভাল নয়, তবে একেবারে খারাপও নয়। কিন্তু তারপর? ভারতের বাকীরা যে কোনদিন ক্রিকেট খেলেছে এমন কথা ভাববার সুযোগই পেলাম না আমরা। মাত্র ৬৩ রানে আটটা উইকেট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ভেংসরকার খেলছিলেন মন্দ নয়, কিন্তু ৪৮ রানের মাথায় তাঁর টুপিটা বেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁকে আউট করল। কেন যেন মনে পড়ে গেল, ডেসডিমোনা রুমাল হারিয়ে এবং কালিদাসের শকুন্তলা ভরতের দেওয়া অংগুরী হারিয়ে অমনি করেই জীবনের খেলা থেকে একটা ইনিংসে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা ইনিংসই তো শেষ নয়। অতএব দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হল। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে তুললো ২৪৬ রান। আমরা আবার ভাবলাম, খেলাটা বোধ হয় হাতের মুঠোয় এল। কিন্তু যাদের কাছে কিছু আশা করতে নেই, সেই শেষ দুই উইকেট—ইংরেজিতে যাদের বলে টেল এণ্ডার, তাঁরা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঐ নামেরই কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুললো ৮১ রান। ওঁদের মোট রান হল ৩২৭। ববি সিম্পসন, অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক, যিনি নয় বছর আগে বাণপ্রস্থে গিয়েছিলেন, তিনি আবার ক্রিকেট-সংসারে প্রবেশ করে ৮৯ রান করলেন।

এরপর ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামল। সুনীল গাভাসকর ১১৩ রান করলেন। ৬ উইকেটে ভারতের রান ২৪৩। আমরা বুকে হাত দিয়েছি, ভাবছি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার মওকা মিলল। ৭ উইকেটে ভারতের ২৫১, ৮ উইকেটে ২৭৫। তখনও আশা আছে। ৯ উইকেটে ৩১৮। আশাটা একটু হোঁচট খেল। আরো ৬ রান করে বেদী আউট হয়ে গেলেন ২৬ রানে। চন্দ্রশেখর করলেন পূর্ণচন্দ্রের মতোই একটি শূন্য। ভারত হারল মাত্র ১৬ রানে।

হারা-জেতার মাঝখানের হাইফেনটা কতোটা লম্বা—ভাবতে ভাবতে ব্রিসবেনের পরে এল পার্থের দ্বিতীয় টেস্ট। হ্যাঁ, এ খেলাতেও ভারত হারল ২ উইকেটে। অথচ এ খেলাতেও ভারতের এই হার, জিততে জিততে হারা। ভারত প্রথম ইনিংসে করলো ৪০২ রান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে কোনো ইনিংসে ভারত এই প্রথম চারশো রান অতিক্রম করল। আমরা খুশী, স্কোরটা জেতবার মতো বলে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াও পিছিয়ে নেই। প্রথম ইনিংসে তাদের স্কোর ৩৯৪ রান। ভারত এগিয়ে রইল ৮ রানে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হল প্রায় Love all থেকে। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে বেশ ভালই সূচনা করল। গাভাসকর-অমরনাথ জুটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আগেকার ভারতীয় রেকর্ড ভেঙে রান করলেন ১ উইকেটে ২৪০ (গাভাসকর ১২৭)। একটা বড় ইনিংসের কথা ভাবছি, কিন্তু আর মাত্র ৯০ রানেই খেল খেতম। ৯ উইকেটে ৩৩০ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। ভাবলাম ভারতের কোমর কি কোনদিনই শক্ত হবে না? যাকগে, অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করল—এল শেষ দিন। ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার তখন ৩০৯ রান। খেলা শেষের ঘণ্টা বাজো-বাজো। রাত কাটাবার জন্যে আগের দিন যাকে মাঠে নামানো হয়েছিল, সেই টনি ম্যান ১০৫ রান তুলে প্রমাণ

করে দিয়েছেন, তিনি শুধু রাতের প্রহরীই নন, দিনের সংগ্রামী নায়কও। কিন্তু তাঁকেও চা-পানের বিরতির ঠিক আগে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জয় তখন নির্ভর করছে পিটার টুহি এবং সেই বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখানো ববি সিম্পসনের ওপর। সিম্পসনও একসময় তাড়াহুড়ো রান তুলতে গিয়ে আউট হলেন। কিন্তু যতক্ষণ টুহি ততক্ষণ ভারতকে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' বলতেই হয়েছে। ৩০৯ রান থেকে এক হাতে পালস টিপে আরেক হাতে আঙুল গুনতে শুরু করেছি—হার কতোটা এগোল, নাকি জয়ই কতোটা পিছিয়ে গেল। ৩২৯ রান। টুহি ও রিক্সন তখনও শক্ত হাতে ব্যাটের দেয়াল তৈরী করে উইকেট পাহারা দিচ্ছেন। জয়ের আশাকে যখন জবাব দেব ভাবছি, ঠিক তখনই, 'সেই মুহূর্তে' ৩৩০ রানের মাথায় বেদীর বলের ছিদ্র ছোবলে টুহি-রিক্সন দুজনেই ধরাশায়ী। জয়োল্লাসের চিৎকারটা গলার কাছে এসে গ্রীন সিগন্যাল না পেয়ে আটকে রইল। আর তো মাত্র দুটো উইকেট—টমসন আর ক্লার্ক, ওঁদের করতে হবে ৮ রান। গুণতে শুরু করলাম ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬—ক্রিকেটের স্কোর? নাকি হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ? হলফ করে বলতে পারব না। তখনও ভাবছি, ৩৩০-এ যদি দুটো উইকেট পড়ে গিয়ে থাকে, তবে ৩৩৮ এই বা তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না কেন? সময়ও খেলছে তখন। থাকবে, না যাবে? ম্যানেডেটরী ওভার কি অনিঃশেষিত তূণ? এমন একটা জটিল প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার আগেই দেখি টমসন বেদীর বলে বাউণ্ডারি দর্শিয়ে

ভারতের জয়কে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। না। জীবন যেমন পদ্মপাতায় জল, তেমনি ক্রিকেটও। এই জয়, এই হার।

চৌঠা জানুয়ারীর শীতে কাঁপানো ভোর—একটা আশ্চর্য সুন্দর সংবাদ নিয়ে এল। সেই সংবাদ—যার জন্যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৮—এই ৩০ বছর আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। দু-দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। জয়ের মুখ এর আগেও আমরা তিনবার দেখেছি, তবু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে থাকলো মেলবোর্নের ঐ ২৮তম ম্যাচটি। এই টেস্ট সাফল্যের সঙ্গে কেমন যেন মিল আছে ১৯৫৯ সালে কানপুরের গ্রীনপার্কে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো প্রথম টেস্টটির সঙ্গে। সে খেলায় নটেশাকটি মুড়িয়েছিল পঞ্চম দিনের দেড় ঘণ্টার মধ্যে। আর এ খেলাটা শেষ হল পঞ্চম দিন শুরু হবার ৩৯ মিনিটের মাথায়। কানপুরে জয় ৮৯ রানে, আর এবার ২২২ রানে। কানপুরে জয়ের পিছনে ছিল জেসু প্যাটেলের দুর্ধর্ষ বোলিং। প্রথম ইনিংসে তাঁর শিকার ৬৯ রানে ৯টি উইকেট। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৫ রানে ৫টি উইকেট। মেলবোর্নের জয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্ব অস্বীকার না করেও বলছি, সাফল্যের চাবিকাঠিটি ছিল চন্দ্রশেখরের হাতে। দুই ইনিংসে তিনি পেয়েছেন মোট ১২টি উইকেট। সত্যিই খেলা-জিতিয়ে খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর। এর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে একই ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ৫টিরও বেশী উইকেট পেয়েছেন মাত্র তিনজন। ৪৭-৪৮ সালে মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে লালা অমরনাথ পেয়েছিলেন ৭৮ রানে ৭টি উইকেট। ৬৭-৬৮ সালে এডিলেডে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে আবিদ আলি পেয়েছিলেন ৫৫ রানে ৭টি উইকেট। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে প্রসন্ন পেয়েছিলেন ১৪৬ রানে ৬টি উইকেট, আর ব্রিসবেনের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি পেয়েছিলেন ১০৪ রানে ৬টি উইকেট। সেদিক থেকে চন্দ্রশেখর, হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ২টি ইনিংসেই ৬টি করে উইকেট পেলেন।

চন্দ্রশেখরের পর যে নামটি আমাদের টানছে সেটি হল সুনীল গাভাসকর। ব্রিসবেন, পার্থ এবং এই মেলবোর্ন—তিনটি টেস্টেই, তিনি শতরান করেছেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে, একমাত্র বিশ্বক্রিকেটের সেই রান তোলার যন্ত্র ডন ব্রাডম্যান ১৯৪৭-৪৮ সালে ৫টি টেস্টের তিনটিতেই শতরান অতিক্রম করেছিলেন। একটি ছিল ডাবল সেঞ্চুরি। গাভাসকর গত মরশুমে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ খেলাতেও সেঞ্চুরি করেছিলেন। সেদিক থেকে গাভাসকর পর পর চারটি টেস্টে শতরান করলেন। ভারত এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ৩টি টেস্ট ম্যাচ জিতেছে—১৯৫৯, ১৯৬৪ ও ১৯৬৯ সালে তার কোনটিতেই কোন ভারতীয় খেলোয়াড় শতরানের দিগন্ত স্পর্শ করতে পারেন নি। এই প্রথম গাভাসকর, জেতা-খেলাতেও সেঞ্চুরি করলেন (১১৮)। আর একটি সেঞ্চুরি হলেই গাভাসকর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এভার্টন উইক্‌স্‌ এর পরপর ৫টি টেস্টে সেঞ্চুরি করবার কৃতিত্বের ভাগীদার হতে পারতেন। কিন্তু ক্রিকেট বড়ো কঞ্জুষ, জীবনের মতই। দিতে গিয়েও হাত তুলে নেয়।

এল চতুর্থ টেস্ট—সিডনিতে। চতুর্থ দিনে খেলাটার যা অবস্থা ছিল তাতে ভারতের না-জেতাটা একটা অসম্ভব রকমের অবাস্তব ব্যাপার হত। তবু ক্রিকেটে তো সবই সম্ভব। নিশ্চিত লোফা বল আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, ৯৯ রানে এসে উইকেটটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে, দু'পক্ষই সমান সমান রান করে খেলাটাকে না-জেতা, না-হারার চেহারা দিয়ে দেয়। আবার যাঁরা খেলছেন তাঁরা কেউ নন, খেলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যান প্রকৃতি। তাঁরই দাক্ষিণ্য খেলাকে হারায়, জেতায় কিম্বা ড্র করায়। সুতরাং শেষ কথা কে বলবে, খেলা শেষের আগে, অন্তত এই ক্রিকেটে?

সকাল থেকেই ভাবছিলুম বৈশাখী ঝড়ে আমগুলোর মতো টুপটুপ করে ঝরবে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটগুলো। তা টুপটুপ করে না হোক, অনেক সময়েই পড়েছে। ব্যতিক্রম আবার সেই পিটার টুহি। আঠার মত আটকে রইলেন উইকেটে। বেদী, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন তাঁদের তূণ থেকে বাছা বাছা বাণগুলো একের পর এক ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু সেই ছোটখাটো তরুণ টুহির ব্যাটের বর্মে আঘাত খেয়ে সে বাণগুলো ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল। প্রথম ইনিংসে ১৩১ রান করবার পর এবং ভারতের চেয়ে ২৬৫ রানে পিছিয়ে থাকার পর্ব হার তো অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যে লেখা হয়েই গিয়েছিল, তবু এই টুহি সেই 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদির গড়' তেমনি করেই লড়তে লাগলেন। সঙ্গী পেলেন—না, সহখেলোয়াড়দের কেউ নন, মেঘলা আবহাওয়া। একটু বৃষ্টি, একটু আলোর অভাব আর টুহির ঐ ঘাঁটি-আগলানো খেলাটাকে টেনে নিয়ে গেল পঞ্চম দিনে। পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই লং লেগে বিশ গজ দৌড়ে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে একটা অসম্ভব কাণ্ড করে টুহির ক্যাচ ধরে ফেললেন মদনলাল। স্বীকার করতেই হবে টুহির বীরোচিত ইনিংসের সমাপ্তি মদনলালের ঐ বিস্ময়কর ক্যাচে, এ খেলার শৌর্যকে উজ্জ্বলতর করেছে। টুহির উইকেটটি পড়ে যেতেই খেলা শুরুর ২৯ মিনিটের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস মুড়িয়েছে। ভারত জিতেছে ১ ইনিংস ২ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এতবড়ো জয় ভারত আর কখনো লাভ করেনি। আর এই জয় ভারতকে আরো এক কঠিন আশার মুখে দাঁড় করিয়ে দিলে।

শেষ টেস্ট হবে অ্যাডিলেডে, ৬ দিনের সময়-সীমায়। যদি ঐ খেলায় ভারত জিততে পারে, তবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ৩০তম এই টেস্ট ম্যাচটি উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে ক্রিকেটের ইতিহাসে। ১৯৩৬-৩৭ সালে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ড সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দুটো খেলায় পিছিয়ে থেকে পর পর তিনটি খেলাতেই জিতে অ্যাশেজ পায়। বিশ্বের আর

খেলতে হল। দুটি খেলার সিরিজে থেকে সিরিজ জিততে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া যদি ঐ শেষ টেস্ট জিততে পারত তবে সে এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হবে। অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের ২—২ খেলা থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করার মত সিরিজ এর আগে মাত্র দুটি ঘটেছে। ১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ২টি ম্যাচ জিতল, দক্ষিণ আফ্রিকা জিতল পরের দুটি ম্যাচে ; আর শেষের সেই ম্যাচটি জিতে বাজীমাৎ করল ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। সেবার ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতল ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লিতে, কলকাতা ও মাদ্রাজে জিতল ভারত, আর বোম্বাইতে শেষ ম্যাচটি জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এমনি এক দুর্লভ সম্ভাবনা নিয়ে এল পঞ্চম টেস্ট। এই টেস্টে টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া ৫০৫ রানে তাদের প্রথম ইনিংস সমাপ্ত করল, ববি সিম্পসনের একশো রান এবং ইয়ালোপের ১২১ রানের সুবাদে। প্রথম ইনিংসে ভারত করল মাত্র ২৬৯ রান। ফলো অন করাতে পারতেন ববি সিম্পসন, কিন্তু সে পথে না গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলেন। ২৫৬ রানে ঐ ইনিংসের সমাপ্তি। ভারতের চেয়ে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে রইল ৪৯২ রানে। জিততে হলে ভারতীয় দলকে ৪৯৩ রান করতে হবে। সময় অঢেল, কিন্তু রানও প্রায় অফুরান। তবুও ভারতের ইনিংস এগিয়ে চলল। ষষ্ঠ দিনের মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির কিছুক্ষণ পর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘটলো ৪৪৫ রানে। হায়রে। অস্ট্রেলিয়ার টেল এণ্ডাররা—নীরেন চক্রবর্তীর কবিতার মান রাখলেন, কিন্তু আমাদের টেল এণ্ডাররা পারলেন না। সেই না-পারাতে এবং আগের উইকেটগুলো আরো গোটা পাঁচ-ছয় রান তুলতে না পারায় দরুন মাত্র ৪৭ রানের ব্যবধানে ভারত একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

আমরা অবশ্যই অভিনন্দন জানাব অস্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেট অধিনায়ক ববি সিম্পসনকে। তাঁর ৪২তম জন্মদিনে তিনি এমন একটা সিরিজ জিতলেন, যা জিতলে ক্রিকেটের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও গর্ববোধ করতে পারতেন। যে বয়সটাকে কোনো আউটডোর গেম বরদাস্ত করে না, যে বয়সের অনেক আগেই বহু খেলোয়াড় তাঁদের আত্মচরিত্রের শেষ পাতাটি লিখে ফেলেছেন, সেই বয়সে, ৯ বছর পর খেলতে নেমে প্রতিটি টেস্টেই অসামান্য লড়াই-এর স্বাক্ষর রেখে জয়ী হওয়ার মত ঘটনা খুব কম ক্রিকেটারের ভাগ্যেই ঘটেছে। পাঁচটা টেস্টের প্রথম দুটো জিতলেন—একটা ১৬ রানে, একটা ২ উইকেটে, যাকে বলে হারতে হারতে জেতা—ঠিক তাই। পরের দুটোতে হারলেন সংশয়াতীতভাবে। একটাতে ২৮২ রানে, আর একটাতে এক ইনিংস ২ রানে। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা নেই, চূড়ান্ত রকমের মানসিক চাপ নিয়ে সিম্পসন পঞ্চম টেস্টে নেমেছিলেন। আর সে নামাও অবিস্মরণীয়। জয় পরাজয় যেখানে সরু সুতোর ওপর ঝুলছে, একটু হেললেই এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে, সেখানে ৫ জন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। ৯ বছর পর টেস্ট খেলতে নেমে দুটো সেঞ্চুরি সমেত ৫৩৯ রান করা, এবং শেষ টেস্টে ৫ জন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে নামার ঝুঁকি নিঃসন্দেহেই বীরোচিত। আর বিজয়লক্ষ্মী বীরের গলাতেই জয়-মাল্য দেন।

তাই বলে ছোট করবার উপায় নেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের। যে-কৃতিত্ব সিম্পসনের অস্ট্রেলিয়া দলের, তাই-ই কিন্তু অভিনন্দিত করছে ভারতীয় দলকে। লড়াইটা যদি সমানে সমানে না হত, তবে অস্ট্রেলিয়ার এই জয় ক্রিকেট ইতিহাসের জয়ের তালিকায় শুধু একটা নতুন সংযোজনই হত, তার বেশি কিছু নয়। কথাটা বুঝতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের গোড়া থেকে জয়-পরাজয়ের হিসেবটা একটু জেনে নেওয়া যাক। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৫টি টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতল ৪টি, ১টি হল অমীমাংসিত। '৫৬ সালে ৩টি টেস্টের ২টিতে জিতল অস্ট্রেলিয়া, ড্র হল ১টিতে। '৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া জিতল ২টিতে, ভারত ১টিতে, আর অমীমাংসিত রইল ২টি টেস্ট ম্যাচ। '৬৪ সালে ৩টি টেস্টের মধ্যে ১টি অমীমাংসিতভাবে শেষ, একটিতে জিতল ভারত আর একটিতে অস্ট্রেলিয়া। '৬৭-৬৮ সালে ৪টি টেস্টেই জিতল অস্ট্রেলিয়া। '৬৯ সালে ৩টি জিতল অস্ট্রেলিয়া, ১টি ভারত, ১টি রইল অমীমাংসিত। তারপর এই '৭৭-৭৮ সালের সিরিজ। জয়-পরাজয়ের নিশ্চিত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হল প্রলম্বিত পঞ্চম টেস্টের শেষ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত।

ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই সিরিজে খুব একটা খারাপ খেলেন নি। গাভাসকর এই টেস্ট সিরিজে ৪৫০ রান সংগ্রহ করে টেস্ট ক্রিকেটে ৩ হাজারের ওপর রান করে নিয়েছেন। বিশ্বনাথও ৩ হাজার রানের গণ্ডীটা ছাড়িয়েছেন ৪৭৩ রান সংগ্রহ করবার সুবাদে। এছাড়া অমরনাথের ৪৪৫ রান, ভেঙ্গসরকারের ৩২০ এবং কিরমানির ৩০৫ রান ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে নতুন কৃতিত্ব সংযোজন করবার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। বোলিংএ বেদী-চন্দ্রশেখর জুটি আবার প্রমাণ করেছেন যে, স্পিনে এখনও তাঁদের জুড়ি নেই। বেদী এই সিরিজে পেয়েছেন ৭৩০ রানে ৩১টি উইকেট, আর চন্দ্রশেখর পেয়েছেন ৭০৪ রানে ২৮টি উইকেট।

জমাটি এই সিরিজ হয়তো বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। কেরী প্যাকার নামক যে দানব ক্রিকেট মাঠে অর্থশক্তির অশালীন ঔদ্ধত্যের তরবারি ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন, এই সিরিজ প্রমাণ করেছে, সে তরবারিতে লোভের বিষ মাখানো থাকলেও ক্রিকেটকে হত্যা করবার মত যথেষ্ট ধার তার নেই।

জীবন তো ফুরোয় না, জীবন-রূপক ক্রিকেটও তাই ফুরোবে না। জীবনে যেমন হার-জিৎ-সম্মান, ক্রিকেটেও তেমন এই জয়, এই হার, এই 'আবার'।

পাকিস্তান-ইংলণ্ড বন্ধ্যা টেস্ট সিরিজ

ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংলণ্ডের কাছে পাকিস্তান যেন বন্ধ্যা ভূমি। নিজেদের দেশে ইংলণ্ড ১৯টি টেস্ট খেলার মধ্যে পাকিস্তানকে হারিয়েছে ৮টি খেলায়। কিন্তু পাকিস্তানে খেলতে এসে ১২টি টেস্টের মধ্যে ১১টি ড্র করল, এবারের তিনটি ড্র টেস্ট নিয়ে। পাকিস্তানে ইংলণ্ডের জয় মাত্র একটি টেস্টে। তাও দীর্ঘ ১৬ বছর আগে, টেড ডেক্সটারের ইংলণ্ড দল যেবার পাক-ভারত সফরে এসেছিল। ১৯৬১-৬২ মরসুমের সেটাই ছিল পাকিস্তানে ইংলণ্ডের প্রথম সরকারী সফর।

অপরদিকে ক্রিকেটে পাকিস্তানের প্রচুর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট ৩০টি টেস্টের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জয়ও মাত্র একটি টেস্টে। অবশ্যই গৌরবের কথা, সে জয় এসেছিল ১৯৫৪ সালে প্রথম সফরে এবং ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে। ক্রিকেটে পাকিস্তানের কৌলীন্যের স্বীকৃতি সেখান থেকে। তারপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তান অনেক কীর্তির অধিকারী হলেও ইংলণ্ডকে কিন্তু হারাতে পারেনি কোন টেস্টে, যদিও অনেক খেলায় ইংলণ্ডকে কাবু করতে কসুর করেনি। এবারও তিনটি টেস্টেই আপেক্ষিক আধিপত্য ছিল পাকিস্তানের। কোন টেস্টেই পাকিস্তানের রান অতিক্রম করতে পারেনি ইংলণ্ড। স্কোর থেকে দেখা যাবে হয় পরে ব্যাট করে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের রানে পিছিয়ে থেকেছে, না হয় আগে ব্যাট করে পরে পিছিয়ে পড়েছে। অথচ সাম্প্রতিক কালের ক্রিকেটে কিন্তু রমরমা ইংলণ্ডেরই বেশী। গত মরসুমে ভারতে এসে তিনটি টেস্টে জিতে রাবার নিয়ে গেছে। পাঁচ টেস্ট সিরিজের ফল ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে ৩—১। স্বদেশে অস্ট্রেলিয়াকেও হারিয়েছে ৩—০ রয়ে। কিন্তু পাকিস্তানে ইংলণ্ডের এই ব্যর্থতা কেন?

ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের পাঁচজন খেলোয়াড় কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় পুরো শক্তি নিয়ে খেলতে পারেনি। তাছাড়া পাকিস্তানে ক্রিকেটের পরিবেশ প্রতিকূল। পিচ অসহায়ক। খেলার সময় গণ্ডগোল এবং ঝুটঝামেলা লেগেই থাকে।

খেলার সময় গণ্ডগোল ক্রিকেটারদের মনঃসংযোগে যদি ব্যাঘাত ঘটে থাকে দু'পক্ষেরই ঘটেছে। যে পিচে ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে হয়েছে সেই পিচেই ব্যাট করেছে পাকিস্তান। তাছাড়া ইংলণ্ডের টনি গ্রেগ, ডেনিস অ্যামিস, অ্যালান নট, ডেরেক আণ্ডারউড এবং জন স্নো যেমন কেরি প্যাকারের ক্রিকেট সার্কাসে যোগ দিয়েছেন, তেমন পাকিস্তানেরও তো পাঁচজন প্যাকার সিরিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ইংলণ্ডের ডেনিস অ্যামিস এবং জন স্নো আগে থেকেই টেস্ট টিমের ছাঁটাই খেলোয়াড়। কিন্তু প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাকিস্তানের পাঁচজন—মুস্তাক মহম্মদ, মজিদ খাঁ, জাহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল, ইমরান খাঁ—এই পাঁচজনই পাকিস্তান দলে ছিলেন অপরিহার্য। সুতরাং প্যাকার শুধু ইংলণ্ডের শক্তি খর্ব করেননি, পাকিস্তানের জাতীয় দলকে বেশী দুর্বল করেছেন। টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দুটি ডাবল সেঞ্চুরির (কম্পটনের ২৭৮ এবং ডেক্সটারের ২০৫) জবাব দিয়েছেন একা জাহির আব্বাস, '৭১-এ বার্মিংহাম টেস্টে ২৭৪ এবং '৭৪-এ ওভাল টেস্টে ২৪০ করে।

ইংলণ্ডের ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়েও দিয়েছিল পৃথিবীর এক নম্বর ওপেনার জিওফ বয়কটের অন্তর্ভুক্তিতে। বহুদিন বয়কট টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে সরে ছিলেন। গত মরসুমে ভারতেও আসেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অবশ্য শেষ তিনটি টেস্ট খেলেন পূর্ণ গৌরবে, ওপেনার হিসাবে ডেনিস অ্যামিসের শোচনীয় ব্যর্থতার পর। এবং বলা বাহুল্য, সেই বয়কটই পাকিস্তানে ইংলণ্ডের সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান। ৮২.২৫ গড়ে তিনটি টেস্টের পাঁচ ইনিংসে করেছেন ৩২৯ রান।

পাকিস্তানে সফর করতে এসেছিল ইংলণ্ডের ১৬ জন খেলোয়াড়। যেমন—মাইক ব্রিয়ারলি অধিনায়ক (মিডলসেক্স), জিওফ বয়কট—সহ-অধিনায়ক (ইয়র্কশায়ার), ইয়ান বথাম (সমারসেট), জিওফ কোপ (ইয়র্কশায়ার), পল ডাউনটন (কেন্ট), ফিল এডমণ্ডস (মিডলসেক্স), মাইক গাটিং (মিডলসেক্স), মাইক হেনড্রিক (ডার্বিশায়ার), জন লিভার (এসেক্স), জিওফ মিলার (ডার্বিশায়ার), ক্রিস ওল্ড (ইয়র্কশায়ার), ডেরেক র‍্যানডল (নটিংহ্যামশায়ার), ব্রায়ান রোজ (সমারসেট), গ্রাহাম রুপ (সারে), বব টেলর (ডার্বিশায়ার) ও বব উইলিস (ওয়ারউইকশায়ার)। ম্যানেজার ছিলেন কেন ব্যারিংটন।

এই ১৬ জনের মধ্যে হেনড্রিক, বথাম ও ডাউনটনকে টেস্টে খেলানো হয়নি। অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি খেলতে পারেননি তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট, সিন্ধু একাদশের সঙ্গে একদিনের খেলায় সিকান্দার বখত-এর বলে তাঁর হাতের হাড় ভেঙে যাওয়ায়। প্লাস্টার বাঁধা হাত নিয়ে ব্রিয়ারলিকে ইংলণ্ড ফিরে যেতে হয়। শেষ টেস্টে অধিনায়ক হন জিওফ বয়কট, নানা কারণে এতকাল যাঁর ইংলণ্ডের অধিনায়ক হবার আশা পূর্ণ হয়নি।

পাকিস্তানের পক্ষে যাঁরা টেস্ট খেলেছেন তাঁরা হচ্ছেন—ওয়াসিম বারি—অধিনায়ক, জাভেদ মিঁয়াদাদ, হারুণ রসিদ, মুদাসসর নজর, ওয়াসিম রাজা, সফিক, সাদিক মহম্মদ, আব্দুল কাদির, ইকবাল কাশিম, মহসিন খাঁ, সরফরাজ নওয়াজ, সিকান্দার বখত ও লিয়াকৎ খাঁ। এদের মধ্যে স্যাফিক, কাদির, মহসিন ও লিয়াকৎ প্রথম টেস্ট খেললেন।

সংক্ষেপে তিনটি টেস্টের পর্যালোচনা করা যাক।

প্রথম টেস্ট—লাহোর : ১৪—১৯ ডিসেম্বর
(টসে জয়ী ওয়াসিম বারি : ফল ড্র)

লাহোরের মন্থর পিচ এবং দুই দলের মন্থর ব্যাটিং প্রথম টেস্টের উল্লেখ করার ঘটনা। আর উল্লেখ করার ব্যাপার দর্শক হামলায় পর পর দুদিন খেলায় বিঘ্ন সৃষ্টি, কাঁদানে গ্যাস এবং পাকিস্তানের গদিচ্যুত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহধর্মিণী বেগম নসরৎ ভুট্টো ও তার কন্যা বেনজিরের গ্রেপ্তারবরণ, দর্শকদের উত্তেজিত করার কারণে।

টসে জিতে প্রথমদিন পাকিস্তানের ২ উইকেটে মাত্র ১৬৪ রান সংগ্রহ মন্থর ব্যাটিংয়ের দায়ে যতখানি দুষ্ট তার চেয়েও বেশী বিরক্তিকর ছিল দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় মুদাসসর নজরের মাত্র ৫২ রান সংগ্রহ। তবে মনে রাখতে হবে এটি ছিল মুদাসসরের জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট। পরের দিন সেঞ্চুরি করে তিনি অবশ্য পাকিস্তান ক্রিকেটে নিজের স্থানও পাকা করে নিয়েছেন।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৪০২ রান করার পর অবশ্যই ইংলণ্ডের উপর যথেষ্ট চাপ ছিল। তবু পৌনে ছ'ঘণ্টায় জিওফ বয়কটের ৬৩ রানও কি যথেষ্ট মন্থর ব্যাটিং নয়? ১৪৮ রানের মধ্যে ইংলণ্ড পাঁচটি উইকেট হারিয়ে রীতিমত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেন জিওফ মিলার ৬ ঘণ্টা উইকেটে থেকে এবং ৯৮ রান করে। বেচারা মিলার, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান ছিল নট আউট ৮৬। টেস্টে ৯৮ রানে নট আউট থেকে গেলেন। সেঞ্চুরি করতে পারলেন না সহ-খেলোয়াড়ের অভাবে।

প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে যা কিছু জলুস দেখিয়েছেন পাকিস্তানের হারুণ রসিদ, উপভোগ্য ইনিংসে ১২২ রান করে। তার ষষ্ঠ টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি। হারুণ ও মুদাসসরের তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৮০ রান যোগ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নতুন রেকর্ড।

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪০২ রান। (হারুণ রসিদ ১২২, মুদাসসর নজর ১১৪, জাভেদ মিঁয়াদাদ ৭১; জিওফ মিলার ৩—১০২, জিওফ কোপ ১—১০২, পিটার লিভার ২—৪৭)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৮৮ রান (জিওফ বয়কট ৬৩, জিওফ মিলার নট আউট ৯৮, বব টেলর ৩২; সরফরাজ নওয়াজ ৪—৬৮, ইকবাল কাশিম ৩—৫৭)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ) ১০৬ (হারুণ রসিদ নট আউট ৪৫)।

দ্বিতীয় টেস্ট—হায়দরাবাদ : ২—৭ জানুয়ারী
(টসে জয়ী ওয়াসিম বারি। ফল ড্র।)

জয়ের জন্য ইংলণ্ডকে পুরো একদিন ও ১০ মিনিটে ৩৪৪ রান করার সুযোগ দিয়ে পাকিস্তান যখন দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন ইংলণ্ডের সামনে ছিল পরাজয় ভীতি। কারণ পাকিস্তানের একটি নতুন ছেলে তার জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করে প্রথম ইনিংসে পায় ৪৪ রানে ৬টি উইকেট। ছেলেটির নাম আব্দুল কাদির। এক বয়কট ছাড়া কেউ তার লেগ স্পিনের মোকাবিলা করতে পারেননি। শেষে বয়কট এবং ব্রিয়ারলি ইংলণ্ডের হার বাঁচান অসামান্য দৃঢ়তায়। বয়কট শেষ পর্যন্ত ১০০ রানে নট আউট থাকেন। এটি তাঁর পঞ্চদশ টেস্ট সেঞ্চুরি।

অস্ট্রেলিয়ায় একটি ছেলের খেলা দেখে ডেনিস লিলি মন্তব্য করেছিলেন—"যদি বছরখানেকের মধ্যে এই ছেলেটি পৃথিবীর নামী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে না পারে তবে বুঝতে হবে ভাল ব্যাটসম্যান চেনার মত আমার জ্ঞান নেই।" হ্যাঁ, সেই ছেলেটির নামই হারুণ রসিদ। প্রথম টেস্টে ১২২ ও নট আউট ৪৫ রান করে দ্বিতীয় টেস্টে করে আরও উপভোগ্য সেঞ্চুরি। মাত্র দুই ঘণ্টা ৫০ মিনিটে ৬টি ছয় ও ১০টি চার সহ ১০৮ রান, তাও পায়ের পেশীতে টান নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে খেলে।

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ২৭৫ রান (হারুণ রসিদ ১০৮, জাভেদ মিঁয়াদাদ নট আউট ৮৮, মুদাসসর নজর ২৭, ফিল এডমণ্ডস ৩—৭৫, জিওফ কোপ ২—৪১)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ১৯১ রান (জিওফ বয়কট ৭৯; আব্দুল কাদির ৬—৪৪)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ ডিক্লেঃ) ২৫৯ রান) মুদাসসর নজর ৬৬, হারুণ রসিদ ৩৫, জাভেদ মিঁয়াদাদ নট আউট ৬১; বব উইলিস ২—২৬, জিওফ কোপ ২—৪২)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (১ উইঃ) ১৮৬ (জিওফ বয়কট নট আউট ১০০, মাইক ব্রিয়ারলি ৭৪)।

তৃতীয় টেস্ট—করাচি ১৮—২৩ জানুয়ারী
(টসে জয়ী জিওফ বয়কট। ফল ড্র।)

প্যাকারের কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে মুস্তাক মহম্মদ, জাহির আব্বাস ও ইমরান খাঁ করাচিতে এসেছিলেন তৃতীয় টেস্ট খেলার জন্য। পাকিস্তান বোর্ড কিন্তু তাদের খেলায়নি। প্রথম টেস্টের মত তৃতীয় টেস্টের গতি ছিল শম্বুকের মতই। ইংলণ্ডের অধিনায়ক হয়েই বয়কট এক কাণ্ড করে বসেন পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ না দিয়ে। খেলাটি যে ড্র হবে তা জেনেও বয়কটের এই সিদ্ধান্তে শেষ দিনের খেলা প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়। উইকেটকিপার অধিনায়ক ওয়াসিম বারি নিজে হাতের গ্লাভস খুলে বল করতে শুরু করেন। এ টেস্টে ৬৬ রানে ফিল এডমণ্ডসের ৭টি উইকেট তার জীবনের সেরা বোলিং। পাকিস্তানে ইংলণ্ড দলের চারটি সফরের মধ্যে তিনটি সিরিজই বন্ধ্যা থেকে যায়।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৬৬ রান (গ্রাহাম রুপ ৫৬, বব টেলর ৩৬, জিওফ বয়কট ৩১, জন লিভার ৩৩; ইকবাল কাশিম ৩—৫৬, আব্দুল কাদির ৪—৮১)।

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ২৮১ রান (মুদাসসর নজর ৭৬, মহসিন ৪৪, ওয়াসিম রাজা ৪৭, হারুণ রসিদ ২৭; ফিল এডমণ্ডস ৭—৬৬)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইঃ) ২২২ রান (জিওফ বয়কট ৫৬, ডেরেক র‍্যাণ্ডল ৫৫, গ্রাহাম রুপ নট আউট ৩৩)।

মুকুল

পপ্‌পু ফীডারের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ—
আপনার চোখের সামনে

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

বই

Views on Cinema — Mrinal Sen, Ishan, Calcutta, Rs. 25.

আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রেরণার মূল উৎস ইঙ্গ-মার্কিন দুনিয়া। অথচ ভারতীয় অভিজ্ঞতার বাস্তব ঐ চলচ্চিত্র থেকে এতই দূরে যে চলচ্চিত্রের সংজ্ঞাই এদেশে বিকৃত, খণ্ডিত। পঞ্চাশের দশক থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিবর্তনের যে হওয়া বইছে, সেই হাওয়ার ইঙ্গ-মার্কিন বৃত্তের বাইরে অন্য অনেক দেশের চলচ্চিত্রের গন্ধ আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রেরণার পরিমণ্ডল প্রসারিত হতে হতে এতদিনে তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়া অর্থাৎ আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও কাছে টেনে এনেছে। শোষণ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানব-চেতনা এই দেশগুলিতে চলচ্চিত্রকে তার বাহন রূপে গ্রহণ করেছে; গল্প বলার সাবেকি ঐতিহ্য, চিত্রতারকা ভজনার মোহান্ধকার, মায়াবী রূপবৈভব, সব পরিহার করে চলচ্চিত্র ক্রমশই তথ্য-নির্ভর সচিত্র রাজনৈতিক বাণী হয়ে উঠেছে। সাহিত্যেও যেমন, শিল্পেও

তেমনই শিল্পের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড পালটায় নতুন শিল্পসত্তাকে গ্রহণ করবার জন্যই। এই অন্য চলচ্চিত্রের একটা ভারতীয় রূপ মৃণাল সেনের গত সাত আট বছরের চিত্রকর্মে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। যে আদর্শগত অন্বেষা তাঁর এই সময়ের চলচ্চিত্র রচনার ভিত্তি, সে সম্পর্কে চিন্তাশীল দর্শকের কৌতূহল খানিকটা মিটবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধাবলীর সাম্প্রতিক সংকলনে।

বাংলা চলচ্চিত্র বহুদিন নিজেকে বন্দী করে রেখেছে নিজেরই তৈরি মোহজালে, দর্শক কী চায় তারই মনগড়া এক স্বপ্নলোকে। প্রথম আবির্ভাবে চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক চমকই দর্শক টেনেছিল। 'বক্স অফিসে বিপুল সাফল্যে যুদ্ধপূর্ব চলচ্চিত্রকারেরা এমনই নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার স্বাদ পান যে তাঁরা এই শিল্পরূপের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার বিকাশের দিকে উদাসীন থেকে যান। অর্থনৈতিক সাফল্য থেকে আসে আত্মসন্তোষ, আত্মসন্তোষ থেকে দায়িত্বহীনতা. এই দায়িত্বহীনতারই জেরে সেদিনের চলচ্চিত্রকারেরা অন্য শিল্প-গুলির বিশেষত তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের বিপ্লবে অগ্রগতির ছোঁয়াচ বাঁচাতে পেরেছিলেন।' মৃণালবাবুর এই অনুযোগ নিয়ে ভাবতে বসলেই আরো বিস্ময়কর লাগে এই ভেবে যে তিরিশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা বাস্তবের সাম্রাজ্যবিস্তার করেছিলেন তাঁরা অনেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্রিয় হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ছবিতে নেই তাঁদেরই গল্প-উপন্যাসের বাস্তবতার কোন স্পর্শমাত্র। বাংলা চলচ্চিত্রের মোহমুক্তি ও 'পথের পাঁচালী'তে ঐতিহাসিক উত্তরণের যে ইতিহাস মৃণালবাবু রচনা করেছেন, তার প্রথম অধ্যায় যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতির আলোড়ন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেশভাগের অস্ত্রোপচারে নির্মূল উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত 'ছিন্নমূল' ছবি, তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অন্য জাতের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উত্থানপতনের ধারা বড় বিচিত্র। 'পথের পাঁচালী' যখন অবলীলায় দর্শকমন জয় করে নিয়ে চিত্র ব্যবসায়ীদের যাবতীয় হিসেব গোলমাল করে দিয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল বুঝিবা ভারতীয় চল-চ্চিত্রের যুগান্তর ঘটে গেল। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ক্রমবিস্তারে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচনার প্রাজ্ঞতর আত্মপ্রকাশে যেন তারই লক্ষণ দেখা গেল। অথচ 'অপরাজিত' দর্শক পেল না। এক বিশেষ মানব সম্পর্কের সমগ্রতায় এই তন্ময় উদ্ঘাটন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক দুর্লভ কীর্তি। বোঝাই গেল, ভালো ছবির আকর্ষণ দর্শকদের ছোট একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আরো অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়েছেন মৃণাল সেন। তিনি নিজেই বলেন, 'অনেক বছর ছবি নিয়ে আছি। নিজেকে শিক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছি অনেক অভিজ্ঞতায়। একেবারেই বেপরোয়া হয়ে সম্প্রতি চলচ্চিত্রকে প্রচার পুস্তিকায় রূপান্তরিত করছি, তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মেশাচ্ছি, প্রচারাত্মক উপসংহার টানছি, গল্পের ক্রমান্বয়তা থেকে সরে যাচ্ছি, জীবনের তথাকথিত সূক্ষ্মতার দিকে তাকাচ্ছি না। এই সব কিছুই আমার চিন্তার অঙ্গ হয়ে গেছে। এই আমার পরীক্ষার ক্ষেত্র। এরই মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

এই চেষ্টার পথে সারি সারি পাঁচিল। শিল্পের শুদ্ধতার উনবিংশ শতকীয় যে আদর্শ একদা দাঁড় করানো হয়েছিল বৈপ্লবিক চিন্তার প্রবাহকে বাধা দেবার জন্য, তারই ওজর টেনে কোন ব্রিটিশ সমালোচক যখন এক আফ্রিকান ছবিতে সূক্ষ্মতার অভাবে বিচলিত হন, তখন মৃণালবাবু বলে ফেলেন, 'জানো না, তোমরাই পূর্ব-সুরীরা বহুদিন হল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের সব সূক্ষ্মতা?' বাধা আসে প্রযোজক, পরিবেশক, ব্যবসায়ী-দের কাছ থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রতি-রোধের ধার কিছুটা দুর্বল হয়েছে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের ভূমিকায়। 'ভুবন সোম' ছবির খরচ যুগিয়েছিল কর্পোরেশন। কর্পোরে-শনের কাছে অনেক প্রত্যাশা মৃণাল-বাবুর। কর্পোরেশন সত্যিই অনেকগুলি ভালো ছবি তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু মধ্যম ব্যবসায়ীদের অনীহায় সে ছবি দেখবার সুযোগ পাননি জনসাধারণ। যতদিন না নিজের সিনেমাগৃহ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে এই কর্পোরেশন, ততদিন কাগজে-কলমে তার যতটা কৃতিত্ব মনে হবে, আসলে দেখা যাবে তার চেয়ে অনেক কম। ছবির আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ে কর্পোরেশন খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে নতুন ছবির খরচ যোগাবার সচ্ছলতায় পৌঁছেছেন; কিন্তু ছবি তৈরি হয়ে বিদেশী পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকার দুর্দশাই এখনও অনেক ভালো ছবির ভবিতব্য।

অন্য ধরনের ছবি, রাজনৈতিক ছবি করার ক্ষেত্রে আরো মৌলিক সমস্যার প্রশ্ন তুলেছেন মৃণাল সেন। তিনি বলেন, লাতিন আমেরিকানরা দুঃসাহসিক। গভীর রাজনৈতিক তাগিদে তাঁরা গোপনে ছবি তুলছেন, গোপনে দেখাচ্ছেন, গোপনেই সেই ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মতই ঔপনিবে-শিক শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম-রত আফ্রিকার অনেক দেশেও। আমরা জানি, এই সব ছবিতেই বাস্তবের প্রতি-ফলন ঘটে নির্মম পুঙ্খানুপুঙ্খতায়; এই সব দ্বান্দ্বিক ও গভীর ছবিতেই দর্শকদের শিক্ষিত করে তোলা হয়,

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনু-যায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০০১

২। প্রকাশকাল সাপ্তাহিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর বাপ্পাদিত্য রায় ভারতীয় নাগরিক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০০১

৪। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০০১

৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :

(ক) মালিক আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীক-কুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

আমি বাপ্পাদিত্য রায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্য-গুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

বাপ্পাদিত্য রায়

১ মার্চ ১৯৭৮ প্রকাশক

তাঁদের [illegible] হয়ে তোলা হয়, তাঁদের উত্তেজিত করে তোলা হয়, তাঁদের আবেগকে প্রজ্বলন্ত করে তোলা হয়, এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা সক্রিয় যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। এই কাজ রাজনৈতিক কাজ। কিন্তু কারা এই ছবির দর্শক? কারা বিপ্লবের ঝুঁকি নিয়ে এই ছবি গোপনে দেখেন? কারাই বা সুরক্ষিত গোপন আশ্রয়ে বসে এই ছবি নিয়ে আলোচনা করেন? তাঁরা কি কখনই হতে পারেন এমন দর্শক যাঁরা রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন কিংবা রাজনৈতিক বিশ্বাসে অর্পিত নিরপেক্ষ? এই সব ছবি কি কখনও পৌঁছয় ঐ সব দেশের জনসাধারণের কাছে?' আমাদের দেশে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' চলচ্চিত্র কখনই একটা বড় ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। অতটা গোপনে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র চর্চার প্রয়োজনই পড়েনি। কিন্তু তবুও কি আমাদের রাজনৈতিক ছবি কখনও পেরেছে উদাসীন কিংবা প্রতিপক্ষীয় দর্শককে নাড়া দিতে? রাজনৈতিক কাজের আরেক সার্থকতা হতে পারে বিশ্বাসীদের ঐক্যরচনায়। তাও কি পেরেছে আমাদের রাজনৈতিক ছবি? বরং রাজনৈতিক ছবি নিয়ে তর্কবিতর্কে পরস্পরের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেছেন সহযোগী রাজনৈতিক বিশ্বাসীরা। যে রাজনীতির বাণী মৃণালবাবু তাঁর ছবিতে উচ্চারণ করেছেন, সেই রাজনীতির অনুগামীরাই তাঁর ছবির কঠোরতম সমালোচনা করেছেন; তাঁদের বিচারের সঙ্গে মৃণালবাবুর রাজনৈতিক বিচার সম্পূর্ণ মিলে যায়নি বলে।

চিত্র পরিচালক যেই কোন বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, তখনই তিনি দর্শকসমাজের একটি বিশেষ অংশকে বেছে নেন। সেই অংশটিও যখন তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না, তখন সেই পরিচালকের জমির পরিধি ভয়াবহ সংকুচিত হয়ে যায়। সেই সংকীর্ণ জমিতে দাঁড়িয়ে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ছবি তৈরি করে যাওয়ার যে প্রাণপণ চেষ্টা মৃণালবাবু করে যাচ্ছেন, তার কোন ক্রমান্বয়িক বিশ্লেষণ অবশ্য এই সংকলনে নেই, যেমন নেই তাঁর ছবির ক্রমান্বয়িক আনুষঙ্গিক তথ্যবিবরণ যা এই ধরনের সংকলনে অপরিহার্য। বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত রচনা সাজিয়ে এই ধরনের সংকলন সম্পাদনায় যে যত্ন প্রত্যাশিত তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। ইংরেজি ভাষার প্রয়োগে ব্যবহারে ভ্রান্তি, বানান ভুল, মুদ্রণ প্রমাদের বহুলতায়, রচনাগুলির তারিখের অনুল্লেখে যে অযত্ন প্রতিফলিত, লেখা বাছাইয়ের কাজেও সেই অযত্ন পরিলক্ষিত। নয়তো কেন এই সংকলনে স্থান পাবে কয়েকটি ছবির দীর্ঘ তথাকথিত সারমর্ম, দু তিনটি অনুজ্জ্বল সাময়িক সাক্ষাৎকারের বিবরণ, আর স্থান পাবে না মৃণালবাবুর বাংলা রচনার দুটি সংকলন থেকে কিছু জরুরী নিবন্ধ বা সাক্ষাৎকারের অনুবাদ, সম্পূর্ণতার দাবিতে? ১৯৬৫ সালে 'আকাশকুসুম' ছবিটিকে কেন্দ্র করে স্টেট্সম্যান পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও আশীষ বর্মনের মধ্যে পত্রযুদ্ধটি পুনর্মুদ্রণ করে অবশ্য প্রকাশকেরা ভালোই করেছেন।

বইটির রূপসজ্জা চিত্র পরিচালকের লেখা বইয়ের উপযোগী, বিশেষত ছবির স্থিরচিত্রের সংযোজনে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

রাশিয়ার চিঠি

হয়তো এই প্রদর্শনী প্রতিনিধিমূলক নয় (আকাদমী অব ফাইন আর্টস —৫—১০ ডিসেম্বর)। কেমন যেন আড়ষ্ট, ভারী, কল্পনাহীন। রুশ বিপ্লবের ষাট বছর পূর্ণ হলো। তবুও শিল্পীদের প্রতি বিশ্বাস করার সাহস দেখাতে পারল না রাষ্ট্রনায়কেরা। তৈলচিত্র এবং ছাপাই ছবির প্রদর্শনী এটি। তরুণ শিল্পীরা সে দেশে এখনও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্যে লাঞ্ছনা এবং নির্যাতন সহ্য করছেন। তাঁদের কাজের যে সব প্রতিচিত্র দেখেছি তার সঙ্গে প্রদর্শিত কাজের আদর্শের তফাত ভীষণ।

অথচ ঠিক এমন হবার কথা ছিল না। ১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লবের পর রুশী কবি শিল্পীদের মধ্যে বিরাট আশাবাদ জেগে উঠেছিল। ছবির জগতে কিংবদন্তীর নায়ক কাশিমীর মেলভিচ (১৮৭৮—১৯৩৫) থেকে ক্যানদিনস্কী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হলো। ছবি সম্বন্ধে সেই সময় মস্কো সেন্ট পিটারসবুর্গে যে সাড়া জেগেছিল বুদ্ধিজীবী মহলে, তার অনুরূপ কিছু পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে—এমন কি পারীতে—কল্পনার অগম্য ছিল। বিপ্লবের পর মেলভিচ, কানদিনস্কী পেলেন বড বড় পদ। তেমনি নির্মিতিবাদ (construc-tinism) নিয়ে এলেন ভ্লাদিমীর টাটলিন (১৮৮৫—১৯৫৩), আন্তয়ন পেভস্নার, গাবো। বিপ্লবোত্তর আশাবাদকে সম্পূর্ণ নতুন রূপবন্ধে উপস্থাপিত করলেন। তাঁদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবাদ সব কিছু মানব সমাজের কল্যাণে লাগবে। কিন্তু ক্রমে রাষ্ট্র শিল্পীদের প্রচারমূলক শিল্পকলা সৃষ্টি করার নির্দেশ দিল। নির্বাসিত রুশী ভাস্করেরা প্রবাসে কিন্তু অনুপ্রাণিত সৃজনশীলতার দিকে অগ্রসর হতে পারেননি। রক্ষা করতে পারেননি তাঁদের যৌবনের প্রতিশ্রুতি। মার্কিন সমাজের বিকার ক্রমশ তাঁদের বিপর্যস্ত এবং গ্রাস করে ফেলল। থিয়েটার, ব্যালে, সঙ্গীত এবং এমনকি অর্বাচীন সিনেমার ক্ষেত্রে রুশীদের অবদানের মত আধুনিক শিল্পকলায় তারা উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর রাখতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে যা হলো—খেলো, মাঠো জিনিস—তৈলচিত্র কক্ষে তার প্রচুর নিদর্শন ছিল। যে প্রথাগত বাস্তব কাজ শিল্পীরা পরিত্যাগ করলেন ইউরোপে, তাই রুশ দেশে রাষ্ট্রিক ছত্রছায়ায় পুষ্ট এবং বৃদ্ধি পেল। ফলে কল্পনা ভোঁতা এবং পঙ্গু হলো। বিদ্রোহী তরুণদের কাজ প্রদর্শন করার মতো উদারতা ব্রেজনেভ প্রশাসনের কাছে আশা করাই ভুল। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণ বিপ্লবোত্তর অগ্রণী শিল্পীদের বন্ধু চলচ্চিত্রগুরু আইজেনস্টাইনের সাদা কালো অঙ্কন (drawing) প্রদর্শিত

হলো অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে নভেম্বরের মাঝামাঝি। অগ্রণী শিল্পীরা আইজেনস্টিনকে কতদূর প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর অঙ্কনে তার অজস্র প্রমাণ ছিল ছড়িয়ে। শিল্প-পাখির ডানা কাঁচি দিয়ে কেটে তাকে পোষ মানানো হলো, ফলে সে আর উড়তে পারল না।

(২)

ক্যানভাসে আঁকা ছবি ছিল ৩১টা—এর মধ্যে একটি টেম্পারা—১০৪×১০৬ সি এম থেকে ১৬০×১৮৫ সি এম। বড় বড় ছবি, দক্ষ হাতে আঁকা কিন্তু ধাক্কা মারে না। দ্রাক্ষারস (wine) যেন সিরকায় (vinegar) পরিণত হয়েছে। দুটি স্টিল লাইফ ছিল যা সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রদর্শনীতে চালিয়ে দেওয়া যেতো।

ভাল কাজগুলো কিন্তু খুবই উন্নতমানের। এর মধ্যে লেনিন প্রাইজ বিজয়ী মর্যাসিয়াংকো ইজসাইয়ের 'তূর্যবাদক' একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে তূরী বাজাচ্ছে। পাশে কালো ঘোড়া। দ্রুতগতি অশ্ব। লাল ফ্ল্যাগ। ধূসর ছায়া। দারুণ নাটকীয় ছবি। কশোউমভ নাধীরের 'নীরবতা' অন্য জাতের ছবি। ওপরে পাহাড়। মাঝখানে নদী—সাদা জল। মোটা করে রঙ লাগানো। প্রস্তরখণ্ডে ধৃত ভূতাত্ত্বিক সময়। আর এখানে ওখানে দু-একটি সৈনিক। জারিন ইন্দ্রিসের 'ক্রেমলিনের দূত'-কে সাইকেল থেকে নামতে দেখা যায়। একটি হাতে চিঠিটা ধরা। মোটা করে সাদা রঙ চাপিয়ে পট তুলে আনা হয়েছে। পেছনের দেওয়ালটা সাদা—আর একটু ধূসর করে ঔজ্জ্বল্য কমালেই ছবিটা খুলতো ভাল। তাছাড়া রাজকোলিফ এলবেকের "১৯২০" মোটের ওপর দৃষ্টি কেড়ে নেয়। বিরাট প্রান্তর পটের সামনে। মাঝখানে গোলাবাড়ি করেকটি। পিল পিল করে মানুষ বেরিয়ে আসছে। লাল ফেস্টুন হাতে। বিরাট বিস্তারের ভাবটা দারুণ ফুটেছে। ছবির পশ্চাৎপটের বনপ্রান্তর কিন্তু নীচের অংশের সঙ্গে মেলেনি। তাই মাঝখান থেকে অনুভূমি বরাবর ছবিটা ফেটে দু টুকরো। অন্যান্য কোনো উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল কি? কই মনে পড়ছে না।

(৩)

রুশী ছাপাই ছবি (Graphics) আমার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে। ছাব্বিশটা ছবির মধ্যে পাথর ছাপ, লিনোকাট, রঙীন এচিঙ, অ্যাকোয়া টিণ্ট, সাদা কালো এচিঙ—ছিল নানারকম কাজ। শিল্পী যা চেয়েছেন তা এনেছেন। যত্নের ছাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে। ফাঁকিবাজি অঘটন, ধাপ্পাবাজি যা কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনের অনেক তরুণদের মধ্যে প্রচলিত এবং যা তাদের নিছক কারিগরের স্তরে নামিয়ে আনে, তা নেই। সোভিয়েত মুলুকে ছাপাই ছবি তুচ্ছ শিল্প মাধ্যম (minor art form), তাই সরকারী নেকনজর এদিকে কম পড়ে। সুতরাং শিল্পীরা এক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীন। হয়তো তাদের সচিত্র বইয়ের কাছ থেকে ছাপাই ছবি বেশি দূরে নয়, তবুও প্রান্তরের খোলা হাওয়া এখানে বেশি। বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কলকারখানা, শহর, উরাল, স্তেপস, প্রান্তর, নদী, মানুষজন, তুষার, পশুপাখি—সব মিলিয়ে রাশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড যেন তার সব বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

ছাপাই ছবি একটা খুবই সীমাবদ্ধ মাধ্যম। তবুও তার মধ্যে নানারকম কসরৎ, খেলা, দক্ষতা শিল্পীরা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য দেখিয়ে বহুক্ষেত্রেই আমাদের চক্ষু সার্থক করেছেন।

কিছু কাজে আবার যতে সূক্ষ্ম রসবোধ, গভীর জীবনদৃষ্টি এবং আঙ্গিক নৈপুণ্যের রাজযোটক মিল হয়েছে।

ভারাউকভ নিকোলাইয়ের পাথর ছাপ ছবি 'মহিলার পাখি শিকার' অসাধারণ কাজ। ওপরে বিস্তৃত কালো। নীচে তুষার ধবল মুক্ত প্রান্তর—ইতস্তত ছড়ানো ঝোপঝাড়। কালো আর সাদার মধ্যে কিছু ধূসর ছায় (tone)। মিশিক্ষ

কালোর মধ্যে এক ঝাঁক উড়ন্ত বুনো হাঁস। একজন মহিলা বাস্কেলাস্কা ক্যাপ ওভারকোট এবং গ্যালোসেস পরে বন্দুক ছুঁড়েছেন। নলের মুখে ধোঁয়া। দুটি শিকারী কুকুর। একটির মুখে একটি হাঁস। অন্যটি হাঁসের দিকে ভৌ করে উঠেছে বলে তার মুখে ধোঁয়া—শীতে যেমন সবাইয়ের মুখ থেকে বেরোয়। ভারাউকভের এই কাজটি এমন সংবেদনশীল যে এর সামনে থেকে সহজে চলে আসা যায় না।

পোর্সলেডোভিচ অ্যালেকসজেন্দ্রা 'গিন্নী' পাথরছাপ ছবি। ক্যাটে বাদাম রঙের মধ্যে টুলে বসে অতিথির জন্যে অপেক্ষা করছেন মোটাসোটা মাতৃমূর্তির মতো দেখতে এক মহিলা। তিনটে প্লেটে সাজানো খাবার। 'গ্রাম্য শিল্পবস্তু চি (১৯৭৫) যোগেন চৌধুরীর আগেকার কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। টেবিলে তিনটে ডিম এবং দুটি জাগ রয়েছে—একটি জাগের ওপর একটি প্রজাপতি—ওপরে তিনটে ডালিম দড়িতে ঝুলছে। মানুষের ঘর গেরস্থালি সম্বন্ধে অসাধারণ একটা মায়া তৈরী হয়।

তাছাড়া বহুরকম কাজ ছিল ভাল কাজ। স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

মালবিকার কথক নৃত্য

কলকাতার একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মালবিকা মিত্রের নৃত্য দীক্ষা জয়পুর ঘরানার কথকে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারাটিকে যিনি অসামান্য অনুরাগে সঞ্জীবিত করে ছিলেন সেই জয়লাল মহারাজের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত রামগোপাল মিশ্রের

[illegible] বাংলার [illegible] একক নৃত্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে শিল্পী [illegible] প্রথম পর্বের কথক থেকে শুরু করে দরবারী আমলের কথকের পরিবর্তিত ও বহু বিচিত্র রূপকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে সমর্থ হন। উত্তর ভারতের মন্দিরে দেবদেবীর স্তোত্র ও লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা বা কথকতা প্রসঙ্গে সেবাদাসীরা কথক নৃত্য প্রদর্শন করতেন। মন্দির যুগের সূচনায় কথকে অভিনয় ও নৃত্যের সমাবেশ ছিল। কথক নৃত্যের পরবর্তী পর্বে আসে নৃত্ত অর্থাৎ ভাবাভিনয়হীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম সঞ্চালন যার মাধ্যমে ছন্দ ও লয় প্রকাশ পেত। মন্দির

পর্বের কথকে মালবিকা এই দিকটিই বিশেষভাবে তুলে ধরেন শিবস্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালীয় দমন, ভরতের পাদুকা আনয়ন প্রভৃতি অংশে। অভিনয়ে তিনি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। পায়ের কাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনেও তিনি পরিণতির পরিচয় দিয়েছেন। এমনও হয়েছে যে 'বোলের' সময় তাঁর পায়ের একটি নমনীয় পেশী মাত্র সঞ্চালিত হয়েছে, অনেকগুলি ঘুঙুরের মধ্যে হয়ত মৃদুমন্দভাবে বেজে উঠেছে একটি ঘুঙুর। এভাবেই ফুটে উঠেছে তাঁর নাচের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপবৈভব।

দরবারী কথকের বিশিষ্ট দুটি ঘরানা, পৃথক দুই নৃত্যশৈলী। একটি জয়পুর ঘরানা, অন্যটি লক্ষ্ণৌ ঘরানা। মালবিকা প্রথমোক্ত ঘরানার শিল্পী। কথকের জয়পুর ঘরানার সাধারণ গুণাবলী সব পরিচয়ই তাঁর নৃত্যে পাওয়া যায়। সঠিক 'ভাউ', 'টুকরা' বা ছোট ছোট 'বোল পড়া' ও দেখানো এবং সর্বোপরি দীর্ঘস্থায়ী 'তোড়ার' রূপায়ণে তাঁর নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। নৃত্যশিল্পী নৃত্যের রূপকল্পের বাইরে একটি ভাবকল্প সৃষ্টি করতে চান। মালবিকার নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রকাশভঙ্গিমাজাত রূপকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আস্তে আস্তে তাঁর নৃত্যে আনবে সেই ব্যঞ্জনা যা কোন মুদ্রণ-বিদ্যায় অধিগত নয়।

মালবিকার নৃত্যে মোটামুটিভাবে কথকের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন পণ্ডিত রামগোপাল মিশ্র (তবলা), রমেশ মিশ্র (কণ্ঠসঙ্গীত), ও রামনাথ মিশ্রের (সারেঙ্গী)। পরিবেশিত গান ও বাজনায় বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে মালবিকার সম্যক ধারণা [illegible] তাল, মান, লয়, ভাব ইত্যাদির অভাব ঘটেনি। এদিক থেকে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' অংশে তিনি সাফল্যের চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিলেন।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

সৃষ্টিছাড়া

বাংলা-সিনেমার খুব অসুখ। আজ অনেক দিন হলো। এ এক ব্যাপক এবং ক্রমিক কারিকুরি—ঝাপসা হয়ে আসছে লেনস-এর দৃষ্টি, গল্পের স্নায়ু পেশীগুলি ক্রমশ শিথিল হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে, অভিনয়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে যাত্রা ও থিয়েটার-এর সংক্রাম, শিরদাঁড়া-ভাঙা প্লট আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, এবং ক্যামেরার সঙ্গে বিষয়বস্তু ও ছবির মেজাজের, সংলাপের সঙ্গে অভিনয়ের, সাজপোশাক ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে চরিত্রের যোগসূত্রগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছে। এমন নয় যে আমরা জানি না যে, এই অসুখের মূল ভাইরাসটি আছে কোথায়। অধিকাংশ বাংলা চলচ্চিত্রের স্ক্রিপটটি দেখলেই বুঝবেন কি অপলকা স্বাস্থ্য, কি অবিরল গোঁজা-মিল নিয়ে গজিয়ে ওঠে এক-একটি বাংলা ছবি। তবু প্রতিটি নতুন বাংলা ছবির পোস্টার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনে ক্ষীণ আশা জাগে যে হয়তো অসুখটা একটু ভালোর দিকে মোড় নেবে, অন্তত সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে, কিংবা একটি বা দুটি দৃশ্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাবো, প্রতিভার ঝিলিক—বাংলা চলচ্চিত্র আধুনিক সিনেমার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে সংলগ্ন হবে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি নতুন বাংলা ছবি এই ব্যাপ্ত অসুখ থেকে গজিয়ে ওঠা বিষাক্ত স্ফোটকের মতো। এরা এনটারটেনমেনট কিংবা বিশুদ্ধ নান্দনিকতা—কোনো একটি উদ্দেশ্যে সমর্পিত নয়। এরা না করে বাণিজ্য, না হয়ে ওঠে শিল্প। এমনি একটি ছবি শ্রীগুরু বাগচী পরিচালিত 'সৃষ্টিছাড়া'। বলাই বাহুল্য নামটি এ-ছবিটিরই বিরুদ্ধে আয়রনি বা নিহিত বিদ্রূপের কাজ করছে মাত্র।

এই যে ব্যাপ্ত অসুখের কথা এতক্ষণ বললাম, আশ্চর্যের বিষয় এর প্রতিটি উপসর্গ-ই সৃষ্টিছাড়ার মধ্যে দেখা যায়। ক্রমাগত আলগা-হয়ে-যাওয়া কাহিনীর পেশী, শিরদাঁড়া-ভাঙা প্লট, বিক্ষিপ্ত ক্যামেরা, উদ্দেশ্যহীন গেঁজলে-ওঠা সংলাপ, এবং শুধুমাত্র স্ক্রিপ্ট-এর এক-একটি যোজনবিস্তৃত গহ্বর পূরণের জন্য গান—এবং সে-গান রবীন্দ্রনাথের, যাঁর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ডুবন্ত তরীখানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যান! অর্থাৎ এখানেও আসল অসুখটি স্ক্রিপ্ট-এর মধ্যে নিহিত আছে।

১। এ-ছবির প্রধান ও মারাত্মক ত্রুটিটি হলো, যে-দুটি অবৈধ প্রণয় এ-কাহিনীর পেছনে কাজ করছে সেই দুটি অতীত ঘটনায় কিছুই চিত্রায়িত হয় না—আমরা শুধু দিলীপ রায়ের মন্থর সংলাপ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারি। এতে হয়তো সাহিত্যের দাবি

মেটে, কিন্তু চলচ্চিত্রের নয়। ধরুন ছবিটি যদি সম্পূর্ণ নির্বাক হতো, তাহলে পরিচালক কি করতেন? মনে রাখতে হবে, কিন্তু চলচ্চিত্রে সংলাপ শুধু অনিবার্যভাবে আসবে, এবং সেখানে একটি অস্ফুট শব্দ পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে থাকতে পারে না। সংলাপ হবে শুধুমাত্র ছবির পরিপূরক ছবিকে সাহায্য করবে, পৌঁছে দেবে মন, কিন্তু ছবি যা-চেষ্টাও করলো না সংলাপ সেদিকে হাত বাড়াবে না—কক্ষনো না।

২। এই যে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য অতীত কাহিনীকে একবারের জন্যেও সামনে আনা হলো না—এর পক্ষে সম্ভাব্য যুক্তিটি হবে এই যে পরিচালক মূল কাহিনীটি শুধুমাত্র প্রাধান্য দিতেই চাননি, একেবারে নিটোলভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, এই প্রচেষ্টায় তিনি কতদূর সার্থক? মূল বাণিজ্যিক দিকটা তো হলো পার্থ-মহুয়ার প্রেম, কিন্তু তা দিয়ে এ-ছবির বারো রীল

ভরবে কি করে? তাছাড়া, পরিচালক একই সঙ্গে একটি সমাজতাত্ত্বিক ও প্রেমের ছবি গড়তে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সমাজতন্ত্রের নামে বাণিজ্যিক চালটি হলো কিছু সেক্সি নৃত্যদৃশ্য এবং অবৈধ প্রণয়ের একান্ত পানসে একটু ইঙ্গিত নিয়ে আসা। কিন্তু এতে হয় না। অবৈধ প্রণয়চর্চা করতে হলে অন্তত পোলানস্কির ধরনের তীব্রতা চাই—শহরে সৃষ্টিছাড়ার সঙ্গে একই আকাশের তলায় চায়নাটাউন চলছে বলে কথাটা বললাম। ফলে সমাজতন্ত্রের নামে আমরা যা দেখলাম তা হলো, জ্যাট সিকসটি নাইনপায়ী বিকাশ রায়, মাঝরাতে ফ্রস্টেড্-লিপস্টিক-লাঞ্ছিতা নিলীমা দাস, এবং হট-লাজ নামক একটি নাচঘরের দুটি কিংবা তিনটি চেষ্টিত দৃশ্য, এবং শেষ পর্যন্ত অন্তিম দৃশ্যে দাদুর সামনে নাতনীকে নিয়ে নায়কের "সমাজ বলে কিছু নেই" বলে প্রস্থান এবং সমর্থনে রবীন্দ্র সংগীত। এ ছাড়া যা রইলো তা হলো, চরিত্রগুলির নিছক আমদানি, আলগা সংলাপ, অহেতুক রুক্ষতা কিংবা হতাশা বোধ—কিন্তু কোনো কিছুই পরস্পরের

সঙ্গে সমন্বয়ে [illegible] প্রায় কিছুই [illegible] হয়ে [illegible] কৈশোরক ভালোবাসার [illegible] উঠতে পারেনি—[illegible] নিশ্চিত ছিলেন যা যে [illegible] বাড়বে।

৩। অর্থাৎ [illegible] ফাঁকির বিরাট-বিরাট গহ্বর [illegible] আছে। সেখানে অসংলগ্নভাবে কয়েকটি দৃশ্যকে ভাবা হয়েছে মাত্র। বাংলা ছিলো কোনো রকমে কম টাকায় একটা ছবি —ছবি মানে কয়েকটি দৃশ্য তুলে নিলে —বাকিটুকু রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগিয়ে ম্যানেজ করে নেবেন। সুতরাং পার্থর জন্যে মহুয়ার মন কেমন করলে—কেননা পার্থ গেছেন হাজতে—মহুয়া অপরের কণ্ঠ ধার করে শুধু ঠোঁট নাড়িয়ে যান—আমার মন কেমন করে গানটির সঙ্গে। এবং সমস্ত দৃশ্যটি [illegible] একবার মহুয়ার ক্লোজ-আপ (কোনো লো-অ্যাঙ্গেল শট এড়িয়ে [illegible] ছাটা উচিত ছিলো), একবার গাছ থেকে গাছে ক্যামেরার প্যানিং চলতে থাকে [illegible] মনে আছে অগ্নিপরীক্ষা নামে এক প্রাচীন ছবির অন্তিম সিকোয়েন্স[illegible] নায়িকার (সুচিত্রা সেন) মাথাবে[illegible] বোঝানোর জন্যে এই রকম প্যানিং [illegible] হয়েছিলো। অর্থাৎ বাংলা ছবি[illegible] প্যানিং প্রায় স্ট্রেপ্টোমাইসিন-[illegible] মতো—প্যানিং-এর প্যান-এর মধ্যে প্র[illegible] সব কিছুই এসে যায়।

৪। এই ধরনের একেবারে পুরো[illegible] ভাবার সঙ্গে হাস্যকরভাবে মেশা[illegible] হয়েছে আধুনিক চলচ্চিত্রের দু-এক[illegible] বিশেষ ধরন—যেমন জাম্পকাট বা জু[illegible] এর শিক্ষিত ব্যবহার। কেন এই ক[illegible] মিশ্রণ—যেখানে মূলশৈলীগত [illegible] অভাব? শহরের আলোটা নিভিয়ে দ্য[illegible] বললেন বিকাশ রায়—পরের দৃ[illegible] আমরা জাম্পকাট করে চলে আস[illegible] অন্ধকার রাস্তায় গাড়ির হেডলাইট[illegible] প্রায় সমস্ত ছবিতে এই একটি দৃ[illegible] মনে রাখার মতো—কিন্তু লেটিমো[illegible] ক্লান্তিকর পরিণতি। খানিকক্ষণ প[illegible] আমরা বুঝতে পারি গাড়িটা চল[illegible] না, শুধু দুলছে মাত্র।

[illegible]

daCunha/Nutra/1 U. Ben

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক
ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা
যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

চিঠিপত্র

দুর্গাপ্রতিমা

• বিগত ২৮ জানুয়ারী ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রণব রায় আমার পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এত অবান্তর ও অলীক কথা রহিয়াছে, যাহা গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

(ক) তিনি তাঁহার মূল প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরী ও কংসনারায়ণী রীতির দুর্গাপ্রতিমা যেসব স্থানে পূজিত হয় তাহার তালিকাপ্রসঙ্গে হাওড়া জেলার পাঁড়ুয়াগড়, ঘাটাল-বরদার বিশালাক্ষী-দুর্গা ও কলিকাতা রসপুরের রায়বংশের দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৩৪, ২ অনুচ্ছেদ)। ঘাটালের বিশালাক্ষী দুর্গার মূর্তিবর্ণনা ভিন্নভাবে উল্লেখ না করা হইলে ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁহার মূল প্রবন্ধে আশ্বিনের দুর্গোৎসবে পূজিত মহিষমর্দিনীর কথাই বলিয়াছেন? যদি তাহাই না হইবে, তবে পরবর্তী অনুচ্ছেদের শুরুতেই তিনি কেন লিখিলেন, "বনেদীঘরের দুর্গাপুজোয় দশভুজা (কোথাও কোথাও অষ্টাদশভুজা) মহিষমর্দিনী ছাড়াও শিবদুর্গা ও দ্বিভুজা অভয়া দুর্গামূর্তির প্রচলন হয়েছিল সেকালে।" (পৃষ্ঠা ৩৪, ৩য় অনুচ্ছেদ)। ইহাতে এরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, লেখক উল্লিখিত স্থানের দশভুজা বা অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার পর পরবর্তী অনুচ্ছেদে শিব-দুর্গা ও দ্বিভুজা অভয়া দুর্গামূর্তির বর্ণনাসূচক পৃথক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং লেখকের প্রতিবাদের যথার্থ্যতা কোথায়?

(খ) আমার প্রেরিত আলোকচিত্র সহ প্রতিবাদ দেখিয়া লেখক নিজ ত্রুটি ঢাকিবার জন্য বহু অবান্তর উক্তিপূর্বক পুনরায় লিখিয়াছেন, "বরদার পূর্বোক্ত বিশালাক্ষীও দুর্গারূপে পূজিতা হন, আশ্বিন মাসে সমারোহ সহকারে তাঁর দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে পূজা হয়। তাঁরও কার্তিক গণেশাদি আছে এবং কার্তিক গণেশ মূর্তি লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপরে সংস্থিত। আমি ঐ বিশালাক্ষী দুর্গা সরজমিনে বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছি...।" এক্ষেত্রে আমি পুনরায় বলিতেছি, লেখকের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। লেখক মনে হয় কোনদিনও বরদার ঐ বিশালাক্ষীর মূর্তি দেখেন নাই। বরদা হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে আমার স্বগ্রামে আমি দীর্ঘকাল বসবাস করিতেছি এবং ভালভাবেই জানি যে, বরদার বিশালাক্ষীর কোন কার্তিক গণেশ ইত্যাদি নাই এবং তাঁহার পূজা মহাসমারোহে হয় পৌষ মাসে; আশ্বিনে নয়। যদিও তিনি শাক্তদেবী তবুও বিশালাক্ষীর নিজস্ব স্থানে পূজা হয়। কোনদিনই দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে পূজা হয় না। লেখক এইসব তথ্য অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়াই আমি আলোকচিত্র দ্বারা বিশালাক্ষী মূর্তির বর্ণনা দিয়াছি। এক্ষেত্রে লেখক তাঁহার কল্পিত দেবীর মূর্তি আলোকচিত্রসহ প্রকাশ করুন, যাহাতে 'দেশ' পত্রিকার পাঠকবর্গ কোনটি সত্য তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(গ) লেখক সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার রচিত পুস্তকে বিশালাক্ষীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া পরামর্শ দিয়াছেন। আমি স্থানীয় অধিবাসী, সুতরাং তাঁহাদের রচিত পুস্তক অপেক্ষা বিগত ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বরদা গ্রামের শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "রাজা শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী মাতার ইতিহাস" পুস্তকটি প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করি এবং লেখককেও পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আশা করি তাহা হইলে তিনি বরদার বিশালাক্ষী সম্পর্কে নিজের ভ্রম সংশোধন করিতে সক্ষম হইবেন।

(ঘ) রসপুর গ্রামের রায়বংশের দুর্গাপূজার তথ্যাদি সরাসরি সংগ্রহের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "সরাসরি সংগ্রহ বলতে তাঁর পুস্তক থেকে একেবারে ভাষাসহ গ্রহণ করা বা তার ভাব গ্রহণ করা বোঝায়।" তাহা হইলে লেখকের উপদেশমতই দুইটি লেখা একসঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়া দেখা যাক। তিনি 'ভাষা' কিংবা 'ভাব' গ্রহণ করিয়াছেন, না ইহা ছাড়া সরজমিন তথ্য দ্বারা সংগৃহীত নতুন কিছু বলিয়াছেন? পাঁচুগোপালবাবুর লেখায় রহিয়াছে, "এতদ্ভিন্ন দুর্গাপ্রতিমার নিকট তিনটি নব পত্রিকা এবং একুশটি ঘট স্থাপন করিবার বিধি আছে।.. এই বংশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন আজিও পূজার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। দেববংশের উন্নতির স্বর্ণযুগে তাঁহাদের বাণিজ্যতরীসমূহ দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। প্রাচীনকালের সেই বাণিজ্যের স্মারক চিহ্ন আজিও 'বুহিত তোলা', নামে প্রথা পূজার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া রহিয়াছে। নবমী পূজা দিবসে বাঁশের একটি কৃত্রিম নৌকা প্রস্তুত করা হয় এবং মধ্য রাত্রে সীমন্তিনীগণ বাদ্য এবং শঙ্খধ্বনি সহকারে এই কৃত্রিম নৌকা পূজামণ্ডপ হইতে গৃহে লইয়া যান। ইহা 'বুহিত তোলা' নামে অভিহিত (পৃঃ ২৮)।" প্রণববাবু লিখিয়াছেন "এই পূজায় তিনটি নবপত্রিকা ও একুশটি ঘট স্থাপনা করা ছাড়াও নবমীর দিন 'বুহিত তোলা' নামে একটি অনুষ্ঠান চালিত হয়। বাঁশের একটি নকল নৌকা তৈরি করে মাঝরাতে বাড়ির মেয়েরা বাজনা ও শাঁখ বাজিয়ে সেই নৌকাটিকে পুজোমণ্ডপ থেকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতেন। সম্ভবত এটি বংশের কোন প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন, হয়ত বা কোন বিস্মৃত অতীতে এই বংশের পূর্বপুরুষরা দেশবিদেশে ব্যবসা করে নৌকোর ধনরত্ন এনে উপস্থিত করতেন। সেটাই কি ইঙ্গিত করছে?"

দেখা যাইতেছে পাঁচুগোপালবাবুর রচনার এই অনুচ্ছেদটির বিচ্ছিন্ন লাইন, তিনি আগুপিছু করিয়া চলিত ভাষায় অপটু হস্তক্ষেপে চালাইয়া দিয়াছেন: অথচ সেখানে তাঁহার কথিত বারংবার সরজমিন পরিদর্শনপ্রসূত নতুন কোনও তথ্যের চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং এই সমস্ত ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া এবং অপরের লেখা সুকৌশলে আত্মসাৎ

স্বাস্থ্যরক্ষায় টাকা খাটান–হকিন্স-এ রান্না করুন

হকিন্স আপনার পরিবারের সকলকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর খাবার যোগায় কারণ হকিন্স-এ রান্না করা খাবারে অনেক বেশী পুষ্টিগুণ বজায় থাকে। সেন্ট্রাল ফুড এণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট-এর বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার এক নিরীক্ষায় জানা যায় যে প্রেসারে রান্না ক'রলে কয়েকটি পুষ্টিকর পদার্থ, বিশেষতঃ ভিটামিন আর প্রোটিন খাবারে ভালোমত বজায় থাকে।

এছাড়াও হকিন্স আপনাকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেয় কারণ, এতে রান্না হয় ১২২° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে, যে উত্তাপ বীজাণুশূন্য করে, ফলে, খাবারেও কোন বীজাণু থাকে না। আপনি হয়তো জানেন না—সাধারণতঃ যে উত্তাপে রান্না হয়, অর্থাৎ ১০০° সেন্টিগ্রেড (যে উত্তাপে জল ফুটতে শুরু করে), সে উত্তাপে বীজাণুমুক্ত করা যায় না। তা'র জন্যে চাই হকিন্স প্রেসার কুকারের ১২২° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ।

রন্ধনপ্রণালীর একটি সহজ, সচিত্র বই ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। এতে ১২৭টি রন্ধনপ্রণালী দেওয়া আছে যেগুলি পূর্বেই আস্বাদিত। আপনার সুস্বাদু রান্নার গুণে আপনি পরিবারের সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠবেন কারণ, এভাবে রান্না করা খাবার খেলে তাঁদের সকলের স্বাস্থ্য আরো ভালো হ'য়ে উঠবে।

সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রান্না করুন

হকিন্স প্রেসার কুকারে রান্না ক'রতে অর্দ্ধেকেরও কম সময় লাগে। হকিন্স-এ, বেশীর ভাগ অন্য প্রেসার কুকারের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না হয় কারণ এর

লিন্টাস-PCA. 77-2415 BG-A

ডিজাইন এমন যে ভেতরে বাষ্প চলাচলের পরিসর অনেক বেশী।

বছরে ২০০ টাকা বাঁচান

বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে হকিন্স-এ রান্না ক'রলে আপনি ৫৩% কেরোসিন বা অন্য যেকোনো জ্বালানী—যেমন, গ্যাস, কয়লা বা বিদ্যুত বাঁচাতে পারেন। তার মানে, শুধুমাত্র জ্বালানীতেই আপনি প্রতি বছরে ২০০ টাকার চেয়েও বেশী বাঁচাতে পারেন। অর্থাৎ প্রথম বছরেই আপনার হকিন্স তার দাম উশুল ক'রে দেয়।

খাবার-দাবারের ওপরেও আপনি পয়সা বাঁচাতে পারেন :

মোটা চাল-ডাল বা একটু ছিবড়ে মাংস, সস্তা হ'লেও, ভাল ক'রে গ'লতে চায়না ব'লে আপনিও সেসব রান্না ক'রতে চান না। হকিন্স ব্যবহার ক'রলে আপনি এসবও নরম ও সুস্বাদু ক'রে রান্না ক'রতে পারেন।

মেরামতির খরচ বাঁচায়

হকিন্স-এর ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে কম। হকিন্স-এর গ্যাসকেট আর সেফটি ভাল্‌ভ সাধারণ প্রেসার কুকারের চেয়ে টেঁকে বেশী।

হকিন্স প্রেসার কুকার পাঁচ বছরের জন্য গ্যারান্টী দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে, যে-সব অংশ গ্যারান্টীর আওতায় পড়ে, তা বদলে দেওয়া হয়। সব সময়েই আপনি বিনাপয়সায় হকিন্স-এর সার্ভিস পাবেন। ভারতের সব বড় শহরেই হকিন্স-এর অনুমোদিত সার্ভিস কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রের, ফ্যাক্টরীতে তালিম পাওয়া মেকানিকদের কাছ থেকেই আপনি চটপট, যোগ্যতাপূর্ণ সার্ভিস পাবেন।

হকিন্স—সবচেয়ে নিরাপদ প্রেসার কুকার

হকিন্স-এর বিশেষ ডিজাইনের জন্যে এই প্রেসার কুকার সম্পূর্ণ নিরাপদ—দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। এর ঢাকনা পাশের দিকে না খুলে নীচের দিকে, অর্থাৎ কুকারের ভেতর দিকে খোলে। বাষ্পের চাপ নিরাপদ মাত্রায় নেমে না গেলে চেষ্টা ক'রলেও ঢাকা খোলা যায় না। সেফটি ভাল্‌ভ হ্যাণ্ডেল বারের নীচে থাকায় তা দিয়ে বাষ্প নীচের দিকে বেরিয়ে যায়। ফলে, দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

বলুন তো, এখন হকিন্স না নিয়ে কি থাকতে পারবেন?

আপনার সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে বিশ্বাসী ডীলারের কাছ থেকে হকিন্স কিনুন। অথবা, এখানে লিখুন : প্রেসার কুকারস্ এণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সেস্ লিঃ, পি ও. বক্স ১৫৪২, বোম্বাই-৪০০ ০০১

® হকিন্স ও হকিন্স-ইউনিভার্সাল হল রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক।

© রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবহারকারীদের ১৯৭৭-এর কপিরাইট—প্রেসার কুকারস্ এণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সেস লিঃ।

আপনার দেহমন, টাকাকড়ি'র মঙ্গলচিন্তায়-হকিন্স

সিনটাস PCA. 77.2415 BG-B

করিয়া তিনি নিজেই নিজেকে যে হেয় ও লঘু করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাঁশরীমোহন ভৌমিক
কুশপাতা, ঘাটাল।

গঙ্গার জল

গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে দুচার কথা বলতে চাই।

লেখক বলছেন প্রত্যেক নদীর জন্ম গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ থেকে।—এ কথা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়। হিমবাহ ছাড়াও নদীর জন্ম হয়। ভারতের মহানদী, দামোদর, কাবেরী কৃষ্ণা গোদাবরী, নর্মদা সহ বহু নদীই তার উদাহরণ।

দুই : লেখকের মতে হিমবাহের জন্ম হয় চিরতুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ থেকে ও গিরিশ্রেণী থেকে।—এ কথা কি ভূবিজ্ঞান সম্মত?

হিমবাহের জন্ম হয় তুষারক্ষেত্র থেকে। সেই তুষারক্ষেত্র চিরতুষারবৃত পর্বত শৃঙ্গ সন্নিহিত অঞ্চলে যেমন সৃষ্টি হয় আবার অন্যত্রও সৃষ্টি হয় (কন্টিনেন্টাল হিমবাহ)।

তিন : লেখক বলছেন ১৯৩৯ সালে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ মিঃ জে বি অডেন গঙ্গার উৎসমুখ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন গত ত্রিশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ তখনই দু ফার্লং পিছিয়ে গিয়েছিল।—প্রকৃত পক্ষে অডেন ১৯৩৯ নয় ১৯৩৫ সনেই গঙ্গোত্রী হিমবাহের নিম্নাংশের সমীক্ষা করেছিলেন এবং হিমবাহটি যে বর্তমান গঙ্গোত্রীর গঙ্গামন্দিরের এক মাইল নীচে পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শেষ তুষারযুগে ঐ হিমবাহ প্রায় জংগলা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ মতও প্রকাশ করেছিলেন। (উৎস: Gangogtri An organ of Gangotri Glacier Exploration Committee, Vol. I, Chapter III)

সুতরাং লেখক গঙ্গোত্রী হিমবাহের দু ফার্লং পিছিয়ে যাওয়ার কথা অডেনের মত বলে যা লিখেছেন তা বোধ হয় সঠিক তথ্যপ্রসূত নয়। বরং অডেনের বসানো চিহ্নগুলো খুঁজে বার করে তারই ভিত্তিতে Gangctri Glacier Exploration Committee তাঁদের ১৯৬৮ সনের সতোপন্থ অভিযানের সময় হিমবাহটির যে সমীক্ষা করেন তাতে তাঁরা লক্ষ্য করেন যে হিমবাহটি গত প্রায় ত্রিশ বছরে দু ফার্লং পিছিয়ে গেছে। (উৎস : ঐ, Geological Observation made during the Satopanth Exploration, 1968, by Dr. Dhrubajyoti Mukhapadhyaya)

চার : লেখক গঙ্গার জল শুকিয়ে গেলে ভারতবর্ষের যে ভয়ানক চেহারা হবে সেই প্রসঙ্গে ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন তা মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়।

ডঃ মুখোপাধ্যায় জংগলা থেকে ঝালা পর্যন্ত ভাগীরথীর প্রশস্ত উপত্যকাটির সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে যদিও অডেনের মতে ধ্বসের ফলে ভাগীরথীর গতিপথ আটকে গিয়ে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয় [illegible] সেই হ্রদটিই আজকের ঐ বিস্তৃত উপত্যকা। তবুও ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করেন 'I suggest that this may represent the floor of a large glacial lake found in front of the receeding glacier.'

এবং ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'Of course, more work should be done on the geomorphology of the suschi region to arrive at a definite conclusion.'

পরিশেষে জানাই ভূতাত্ত্বিক ও এভারেস্ট শীর্ষারোহী শ্রী সি পি ভোরার গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষার সময়ই বর্তমান পত্রলেখকের ঐ হিমবাহটি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্কোচনের কারণ সম্পর্কে শ্রী ভোরার অভিমত : The discharge from the reservoir of the Gangetic glacier is much higher than fresh precipitation each winter.

সুতরাং ভবিষ্যতে গঙ্গার জলের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত সময় এসে গেছে।

তপন পাল
চুঁচুড়া

॥ ২ ॥

শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তীর 'গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে 'কেন' প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করেছিলাম। প্রথমই হোঁচট খেলাম প্রত্যেক নদীর জন্ম যে শুধু মাত্র হিমবাহ থেকে হয় এই মন্তব্য দেখে। আমাদের দেশে নর্মদা, কাবেরী গোদাবরীর মত ইত্যাদি নদীর উৎপত্তি কি হিমবাহ থেকে?

তারপরেই তিনি লিখেছেন গোমুখ গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ পশ্চিমে। আসলে গোমুখ গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত।

এখন গঙ্গার জল কি শুধু মাত্র হিমালয়ের অসংখ্য হিমবাহই জুগিয়ে চলেছে? গংগার বিশাল অববাহিকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তার কি কোন ভূমিকা নেই? শ্রীচক্রবর্তী অনেক গবেষকের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু জলের প্রবাহ যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে কোন তথ্য (data) দিতে পারেন নি। হিমবাহ শুকিয়ে যাচ্ছে এই তত্ত্ব আমাদের জানা। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে না বাড়ছে এবং গঙ্গার উপনদীগুলিতে বাঁধ দেওয়ায় কী ঘটেছে তার সামগ্রিক বিচারের পরেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারব।

ত্রিদিবকুমার বসু
কলিকাতা-১৯

ছো নাচের শিল্পী

প্রণব রায় লিখিত "মুখোশ ও ছো নাচ" প্রবন্ধের উপর সুধীর করণ, পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো, এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের চিঠি পড়বার সুযোগ হয়েছে। শ্রীভট্টাচার্যের গবেষণা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। অন্যদিকে শ্রীমাহাতোর অভিযোগ

[illegible] নিয়ন্ত্রণ বাদ্যযন্ত্র ও আঞ্চলিক [illegible] ক্রম বিবর্তনের ধারা ইত্যাদি নিয়ে তর্কবিতর্ক চলবে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে।

আমার প্রশ্ন ছো নাচ বা মুখোশ নিয়ে নয়, ছো-নৃত্যে শিল্পীদের নিয়ে। পুরুলিয়ার মানে আজ দাঁড়িয়েছে ছো আর কুষ্ঠ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয় যে ছো নৃত্য শিল্পীদের জাতিগত সামাজিক অবস্থান, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অথবা বাদ্যকারদের ভূমিকা নিয়ে কেউ আলোচনা করেননি।

ছো-এর ব্যাখ্যা নিয়ে নাচিয়েরা কি পাবে? তাদের দরকার ভালো খাবার, উত্তম বাসস্থান, সাবলীল দেহভঙ্গিমার জন্য চাই সুন্দর স্বাস্থ্য। কোনটাই কি তাদের আছে? কালেবরকুমার, রমেশ-কুমার, শশধর মাহাতো, পতিচরণ মাহাতো, গম্ভীর সিং প্রমুখ নৃত্য-শিল্পী আজ পুরুলিয়া জেলার গৌরব। দেশে-বিদেশে এঁরা বহুবার বহু জায়গায় নেচেছেন, কিন্তু তাঁরা কি তাঁদের প্রাপ্য পাওনা পেয়েছেন? পুরুলিয়ার তে.ড়াং, চড়িদা, সিন্দরী প্রভৃতি গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে কোন কোন সময় ভয় দেখিয়ে তাদের বিদেশে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ইরানের শাহের নিমন্ত্রণে যে দলটি ঘুরে এলো তাতে গম্ভীর সিং ছিলেন না কেন? গম্ভীর সিং-এর বিভিন্ন নৃত্য-মুদ্রার ভংগী নিয়ে 'মার্গ' পত্রিকাতে সুনীল কোঠারীর প্রবন্ধ আছে। এই বিশেষ দলটির তিনিই 'অধ্যমণি'। তিনিই নাচের গুরু। আশুবাবুর সুনাম তাঁরই জন্য। 'রঙ্গ নায়ক' হিসাবে একবার তিনি লণ্ডন নিয়ে গিয়েছিলেন, পূর্ব বাংলার লোকগীতির জনৈক গায়ককে ইরান নিয়ে গেলেন মফস্বল কলেজের অধ্যাপককে, আর যাদের নিয়ে যেতে পারলেন না তাদের তিনি পি আর এস. এবং পি এইচ ডি খেতাবে ভূষিত করলেন। উমেশ মাছোয়ার, দিবাকর কালিন্দীরা যেমন ছিল তেমনিই রইলেন।

ভাস্কর ঘোষ
কলকাতা-৬৫

মুকুন্দ দাস

রাজেশ্বর মিত্র লিখিত মুকুন্দ-দাসের উপর প্রবন্ধটি পড়ে একটি বিষয়ে লেখবার ইচ্ছা রোধ করতে পারলাম না। ওঁরা উভয়েই জানিয়েছেন 'স্বদেশ, স্বদেশ করিস তোরা' গানটি মুকুন্দ দাসের লেখা। আমার মনে হয় গানটি গোবিন্দ দাসের রচনা। গানটির কথা ছিল—

'স্বদেশ, স্বদেশ কর্চ্চ কারে?
এদেশ তোমার নয়—
এই যমুনা, গঙ্গানদী,
তোমার ইহা হতো যদি
পরের পণ্যে গোরা-সৈন্যে
জাহাজ কেন বয়?'
ইত্যাদি

প্রসংগত বলে রাখা যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন, যার [illegible] আন্দোলনের বান্যা বেগে উত্তাল তখন মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা দল মারফত 'মাতৃপূজা' (রচনা ১৯০৬) যাত্রা রচনা করলেন ও মঞ্চস্থ করতে শুরু করেন। ১৯০৭/৮ নাগাদ সরকারী দমন নীতি চরম সীমায় পেঁছোলে ১০৮ ধারায় তাঁকে সমেত সমস্ত দলটাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে ওরা অভিযুক্ত করে। 'মাতৃপূজা' যাত্রাগানে একটি গানের চরণ ছিল—'বাবু বুঝবে কি আর মলে/ ...ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করলে সারা,/ চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা বাবু খুলে।' সেই সময় এই একই 'শ্বেত ইঁদুর' সংক্রান্ত গান লিখে ভবরঞ্জন মজুমদারও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। মুকুন্দ দাসকে এই কেসে তিনশ' টাকা জরিমানা সহ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে অভিযুক্ত করা হয়। বাংলার জেলে রাখা নিরাপদ নয় বলে দিল্লীতে পাঠানো হয়। তাঁর গ্রেপ্তারী ঘটনাটি ঘটে বরিশালের পূর্বাঞ্চল উত্তর সাহাবাজপুরে।

অবশ্য ঐ একই সময়ে 'স্বরাজ' চাওয়ার আন্দোলন সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন: 'স্বরাজ, স্বরাজ করিস তোরা/ স্বরাজ কি গাছের ফল? অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা/পর পদলেহী ভীরুর দল।'

দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যাবে অন্য কিছু রচনায়। যেমন "অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে আগুন নিয়েই খেলবে তারা/ .... "

তাঁর অগ্রণী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার ছাপ আতমাত্রায় স্পষ্ট হয় যখন দেখি 'ভোট সর্বস্ব' নেতাদের ভণ্ডামি, কপটতা, অসততা 'ও ছল-চাতুরীপূর্ণ জনবিরোধী ভূমিকার সম্পর্কে সচেতন করতে, তাঁর কণ্ঠ সরব ছিল—যেমন—'ছল-চাতুরী, কপটতা, মেকী মাল আর চলবে ক'দিন?/হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে দেশের কি আর আছে সে দিন।/ খেতাবধারী হোমরা-চোমরা, নেতা বলেই মানতে হবে/ মনুষ্যত্ব থাক কি না থাক, তাঁর হুকুমেই চলবে সবে।'

মিহিরকান্তি ন্যায়বান
কাশীনগর, ২৪ পরগনা।

চিত্র প্রদর্শনী

গত ২১ শে জানুয়ারী দেশ পত্রিকায় চিত্রকলা আলোচনা কলমে শ্রীশন্দ্ধশীল বসু মহাশয়ের লেখা পড়লাম। লেখা পড়ে ভাল লাগল এবং চিত্রশিল্পীদের ও সমালোচকদের যে যে সমস্যায় পড়তে হয়, সে বিষয়ে সুন্দর-ভাবে বুঝিয়েছেন। এর জন্যে একজন ছবি আঁকিয়ে হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার আসল বক্তব্য হল, এই প্রদর্শনীতে আমার দুটো ছবি ছিল, এতে শন্দ্ধশীলবাবু যে মন্তব্য করেছেন আমার ছবির সম্বন্ধে সেটা হল: "বিকাশ ভট্টাচার্যর প্রভাব স্পষ্ট হলেও, বিকাশের শৈলীকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন অনিমেষ।" যদি আমি জিজ্ঞাসা করি কে এই বিকাশ ভট্টাচার্য? আমি তো তাকে চিনি না বা তাঁর ছবি দেখি[illegible] মন্তব্য আমার ছবির উপর লেখা উচিত হলো? আমি দেশ ছাড়া গত ১২ বছরেরও বেশী। বিকাশ ভট্টাচার্য এবং তাঁর ছবির সঙ্গে আমার আদৌ সম্পর্ক নেই, তা হলে আমার উপর তাঁর প্রভাব কিভাবে পড়তে পারে? কিন্তু বহুল প্রচারিত দেশ পত্রিকায় শন্দ্ধশীলবাবুর লেখা পড়ে আমার সম্বন্ধে সেই ধারণাই বেশীর ভাগ পাঠক মনে করবেন। আসল যাঁর প্রভাব আমার মধ্যে এখনও হয়ত অজান্তে আসে, সেই স্বর্গীয় শিল্পীর নাম উল্লেখ করলে খুশী হতাম।'

সর্বশেষে তাঁকে আমার ছবির উপর অন্য যে মন্তব্য করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনিমেষ নন্দী
কলকাতা-৩১

কণ্টকল্পিত

অতুল্যবাবুর 'কণ্টকল্পিত' অত্যন্ত মনযোগের সাথে পড়ছি। ১১ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় উনি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জন্মধন্য হুগলি জেলার সুনাম প্রসঙ্গে যাঁদের নাম দিয়েছেন তাতে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, টপ্পার জনক রামনিধি গুপ্ত ও স্বনামধন্য এস ওয়াজেদ আলীর নাম হয়ত তাঁর মনে পড়েনি।

সবিনয়ে জানাই কবি রঙ্গলালের জন্ম হুগলি জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত বাকুলিয়া গ্রামে, রামনিধি গুপ্তের জন্মধন্য গ্রাম হলো পান্ডুয়া থানা অধীন চাঁপ্তা এবং তাজপুর হলো [illegible] জন্মস্থান। [illegible] চট্টোপাধ্যায় (জন্মগ্রহণ করেছিলেন সবাই গ্রামে) এর নামও নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদের অনেকেরই জন্মস্মৃতি ভাবে হুগলির সুখ্যাতি চির অম্লান।

শংকর মল্লিক [illegible],

কবি হেমচন্দ্র বাগচী

দেশ পত্রিকায় ১৪ই মাঘ (ইং ২৮ জানুয়ারী) তারিখের সংখ্যায় শ্রীসুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'কবি হেমচন্দ্র বাগচী' প্রবন্ধটি পড়িয়া সবিশেষ অবগত হইলাম।

লেখক লিখিয়াছেন, যে তিনি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি এ পাস করেন। কিন্তু কবি হেমচন্দ্র বাগচী সিটি কলেজে বি এ সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি এ পড়িতেন। আমি তখন সিটি কলেজে বি এসসি পড়িতাম। আমরা একসঙ্গে রামমোহন রায় হস্টেলে একই ঘরে থাকিতাম। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তখনই তাঁহার কবিতা মাঝে মাঝে প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায় বাহির হইত। হোস্টেলে থাকিতে তিনি অনেক সময় অনেকের সম্বন্ধে মজার মজার কবিতা লিখিয়া আমাদের দেখাইতেন। মনে হয় তিনি অবশ্য বেশী দিন হস্টেলে ছিলেন না। তাঁহার ছোট ভাইকে দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সেইজন্য তাঁহাকে অন্যত্র বাসা লইতে হয়।

সুরেশচন্দ্র জানা পাটনা-১

দেশ ৫৪ বর্ষ ১৯ [illegible]
২৭ ফাল্গুন [illegible]

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
একটি বিকল্প ব্যবস্থা
প্রণব রায়ের রচনা
বিষ্ণুপুর মন্দিরের পোড়ামাটিসজ্জা
প্রভাত দেব সরকারের গল্প
স্কাই-স্ক্যাপার

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সমাজ সংস্কারের আইন

সম্পাদকীয়

কথিত আছে যে, রানী অহল্যাবাই তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে প্রচলিত প্রথা ও সহজ প্রত্যয় অনুযায়ী সহমরণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরের অনুরোধে তিনি সেই ইচ্ছা পরিহার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিচার অতীতের সেই সংস্কারপ্রবণ যুগে নিতান্ত বিরল ছিল। আঠার শতকে রামমোহন ও আরও কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল হিন্দুর অভিমতে সতীদাহ প্রথার অবসান ঈপ্সিত হয়েছিল বটে, কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, সতীদাহের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রবল কোন জনমত আন্দোলিত হয়নি। এই ঘটনার মধ্যে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিরাট একটা জনমতের সমর্থন না পেলেও সমাজ সংস্কারের আইনগত উদ্যম সম্ভব হতে ও সার্থক হতে পারে।

সাম্প্রতিক সংবাদ এই যে, ভারত সরকার বিয়ের বয়সের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। মেয়েদের পক্ষে বিয়ের আইনসম্মত বয়সের মাত্রা পনের থেকে আঠারো, আর ছেলেদের বিয়ের বয়সের মাত্রা আঠারো থেকে বাড়িয়ে একুশ করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন, এই আইন দেশের সকল সমাজের উপর প্রযুক্ত হবে। প্রশ্ন : বিয়ের বয়সের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার এই প্রয়াস কি জনসংখ্যায় বৃদ্ধিহার কিছুটা খর্ব করবার ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে? বিস্ময়ের বিষয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন, না, সেরকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের বয়সের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। জনসাধারণ তাই প্রশ্ন করতে পারে, তবে কিসের জন্য, কী উদ্দেশ্য? দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনেক বক্তব্যের যুক্তি খুবই ঘোলাটে বলে বোধহয় থাকে। এক্ষেত্রেও জনসাধারণ বলতে পারে, এইতো কিছুদিন আগেও একাধিক মন্ত্রীর বক্তব্যে বিঘোষিত হতে শোনা গিয়েছে যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস করবার জন্য বিয়ের বয়সের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে।

রামায়ণে ও মহাভারতের বিবৃত কাহিনী থেকে এমন ধারণা করবার যুক্তি পাওয়া যায় যে, বাল্যবিবাহের প্রথা সেই পৌরাণিক জীবনে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু উনিশ-বিশ শতকেরও ভারতীয় জীবনের দৃশ্যে দেখা যায়, বাল্যবিবাহই যেন প্রচলিত প্রথা। এবং প্রসঙ্গত দ্বিতীয় সত্যটিও স্মরণ করতে হয় যে, এই বাল্যবিবাহের প্রথা নিরোধ করবার জন্য প্রচলিত সর্দা আইন (হরবিলাস সর্দার উদ্ভাবিত আইন) সুদীর্ঘকালের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রথার প্রকোপ খর্ব করতেই পারেনি, অথবা অত্যন্ত সামান্যরূপে খর্ব করতে পেরেছে। এই অভিজ্ঞতার শিক্ষা সম্মুখে থাকতে এমন বিশ্বাসে পরিতুষ্ট হবার কোন প্রেরণা পাওয়া যায় না যে, সাম্প্রতিক আইন আদর করে হোক বা রক্তচক্ষু দেখিয়ে হোক আইনের নির্দিষ্ট বয়স অনুযায়ী বিয়ের প্রথাকে জাতির জীবনে সমূহ-সার্থক প্রথায় পরিণত করে দেবে। শিক্ষিত জনসমাজে বিয়ের বয়সের মাত্রা এমনিতেই অবস্থার সহজ প্রভাবে আঠারো-একুশের বেশি হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য জনসমাজ, যাদের অভ্যস্ত ঐতিহ্যে বিয়ের জন্য কোন বয়সের অপেক্ষায় থাকবার কোন নিয়ম অথবা সংস্কার নেই, তাদের ইচ্ছে ও আচরণের উপর এই আইন কোন প্রভাব সঞ্চারিত করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজেই নতুন আইনটা জাতির সামাজিক জীবনে বড় রকমের কোন সংশোধন সম্ভব করতে সাহায্য করবে বলে আশ্বস্ত হবার মতো কোন সঙ্কেত পাওয়া যায় না।

আর-একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের মাত্রা কমিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেকের চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এটা হলো ভোটদাতার ন্যূনতম বয়স। ইচ্ছার কথাটা এই যে, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বিহিত একুশ বৎসর বয়সের পরিবর্তে ষোল বৎসর বয়স বিহিত করা হোক। অর্থাৎ ভোটদানের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ক বলতে ষোল বছর বয়সের ব্যক্তিকে বোঝাবে। লক্ষ্য করতে হয়, ষোল বছর বয়সের পক্ষে নানা যুক্তির সমর্থন ও অভিমত আন্দোলিত হতে শুরু করেছে। এবং এই প্রস্তাবের বিপক্ষেও নানা যুক্তির কথা মুখর হয়ে উঠছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারা যায় যে, গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান সমর্থিত গৃহীত ও ঘোষিত হবার পর গণপরিষদেরই সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার' সম্বন্ধে বেশ বিষণ্ণ রকমের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, নিছক একুশ বছর বয়স হওয়াই ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কতার প্রমাণ নয়। নির্বাচন যাঁদের ভোটে নিষ্পন্ন হবে, তাঁদের যোগ্যতার মান নির্ধারিত করবার জন্য আরও অন্য প্রকারের যোগ্যতার সম্বল থাকা চাই। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সংশয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে, অন্য একটি মন্তব্য করতে পারা যায়—ন্যূনতম ষোল বছর বয়স যদি প্রাপ্তবয়স্কতার পরিচয় বলে স্বীকৃত হয়, তবে সরকারী কর্মপদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও কি প্রার্থীর পক্ষে ষোল বছর বয়সের ব্যক্তি হওয়াই তার প্রাপ্তবয়স্কতার পরিচয় বলে স্বীকৃত হবে? গৌতম বুদ্ধ যখন কপিলাবস্তুতে এসে ধর্ম প্রচার করতে তৎপর হলেন, তখন পিতা শুদ্ধোদন (কপিলাবস্তুর রাজা) এই শর্তে গৌতম বুদ্ধকে ধর্মপ্রচার করবার অধিকার দিতে সম্মত হয়েছিলেন যে, গৌতম বুদ্ধ একুশ বছর বয়সের থেকে কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষু করতে পারবে না। গৌতম বুদ্ধ এই শর্তে সম্মত হয়েছিলেন, এবং একুশ বছর বয়সের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষু করেননি, পরিব্রজ্যা গ্রহণ করবার ধর্মগত দীক্ষা দেননি। রাজা শুদ্ধোদনের দাবির মধ্যে এই নীতিই নিহিত হয়েছে যে, একুশ বছর বয়সের চেয়ে কম বয়সের ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে সুপরিণত বলে মনে করা চলে না।

আধুনিক বাংলা গান

পঙ্কজকুমার মল্লিক

প্রবল বন্যা যখন তার সুবিপুল জলরাশি নিয়ে নদীর দুই কূল প্লাবিত করে তার প্রবল বেগকে প্রাণপণ চিৎকারে অস্বীকার করলেই বা তার জলকে কর্দমাক্ত ও পানীয়ের অযোগ্য বলে তারস্বরে ঘোষণা করলেই সেই বেগ প্রতিহত হয় না। এই দুর্দম জলপ্রবাহে বহু সুপ্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা ভাসিয়ে নিলেও, বন্যার প্রথম বেগ যখন মন্দীভূত হয়ে আসে, তটরেখা যখন নদীর বুকে আবার জেগে ওঠে, তখন জল হয় নির্মল ও সুস্বাদু, চারিদিকের অবারিত বিশাল প্রান্তরে পড়ে পলিমাটির আস্তরণ, ধরণীর উষর বুকে জেগে ওঠে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। এইরূপ ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়েই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে—"The old order changeth yielding place to new. God fulfils himself in many ways least one good custom corrupt the world."

এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাসই আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতির ইতিহাস। এই ভাঙা-গড়া শুধু বহিঃ প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের ভাবের জগতে, চিন্তার জগতে, শিল্পের জগতে, সাহিত্যের জগতে এই ভাঙা-গড়া প্রাচীনকে স্থানচ্যুত করে বসায় নবীনকে, স্থাণু ও জড়কে চির বিদায় জানিয়ে এগিয়ে আসে নূতনের অভ্যর্থনায়।

সাম গানের উত্তরসাধক ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ সংগীতজগতের শীর্ষদেশে স্বীয় অভ্রভেদী মহিমায় সমাসীন। মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্র ছন্দে অপূর্ব রাজ সমারোহে এবং পরিপূর্ণ রাজোচিত মর্যাদায় তার গুরুগম্ভীর আগমন ধ্বনি মনকে নিয়ে যায় এক অনাস্বাদিত আনন্দলোকে। বহু মহাজন অধ্যুষিত সুপ্রশস্ত রাজপথেই তার গতি। সংকীর্ণ পথ এ সমারোহের বিস্তৃতির পক্ষে শুধু অপর্যাপ্ত নয় আব্যান্তরও বটে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা, রাজপথ স্বর্গ থেকে তৈয়ারী করে পাঠাননি, মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে বহু গহন অরণ্যানি, দুর্গম পর্বত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বহু পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় ক্লেশ স্বীকার করে, বহু যুগের চেষ্টায় এক একটি রাজপথ গড়ে উঠেছে এবং অগণিত পথচারীর পায়ে পায়ে সেই পথ বিস্তৃততর হয়েছে। কিছুদিন পরে মানুষের সহজাত নব নব উদ্ভাবনী শক্তি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে আর একটি নূতন পথের সৃষ্টিতে। এইরূপে গড়ে উঠেছে নব নব পথ। এই একইভাবে মোগল যুগে সংগীতের বাঁধাধরা রীতির বাঁধ ভেঙে চলার ছাড়পত্র নিয়ে খেয়ালের আবির্ভাব ঘটলো। বলা বাহুল্য সেই সময়ে তাহা আধুনিক সংগীতের পর্যায়ভুক্তই ছিল। এখন আধুনিক বাংলা সংগীতের নামে অনেক জায়গায় যে নাসিকা কুঞ্চন হয়, সে সময় খেয়ালের ভাগ্যে তা যদি ঘটেও থাকে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। এইরূপে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সংগীতের রূপ ও ঢঙের পরিবর্তন সংগীত জগতের বিবর্তনেরই ইতিহাস।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আধুনিক গান। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক তর্ক-বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আধুনিক গান বলতে আমরা মোটামুটি যা বুঝি—তার সুস্পষ্ট পরিচয় এখনও স্থির হয়নি। আধুনিক গানের একটা পর্যায় বা পরিচায়ক-অভিধা পর্যন্ত জোটে নি, যেন অনিকেত অজ্ঞাত কুলশীল ভবঘুরে দশা। অবশ্য তাই বলে সংগীত সমাজে উহা যে অনাদৃত হয়েই রয়েছে এমন কথা বলি না। যে শ্রেণীর গান জনগণের চিত্ত-দোলা দুলিয়ে দেবার শক্তি রাখে, ভাবরসেও দীন নয়—তার একটা নিজস্ব রূপ, আর প্রসাদ গুণ অবশ্যই আছে। এ ক্ষেত্রে অনড় মনোভাব নিয়ে আধুনিক -গীত প্রকৃতির যথার্থ্য বিচার করা উচিত নয়।

প্রথমেই আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে—আধুনিক শব্দটি নিয়ে। সকলেই জানেন আধুনিক অর্থে সাম্প্রতিক, সহজ কথায়—বর্তমান কালের, হালের বা মডার্ন, কিন্তু ব্যাপক অর্থে ধরলে সময়ের গণ্ডী অতিক্রম করে এর রাজ্য অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়ে—তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

আমরা যদি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের দিকে ফিরে চাই, তাহলে দেখতে পাব—সহজিয়া তন্ত্রের বৌদ্ধ উপাদান চর্যাগীতিতে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের অনেক কথা। এই চর্যাগীতির পদগুলি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। যেমন অধ্যাত্ম ভাবের দু' একটি পদের গীতাংশ :—

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।
দু'আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

অর্থাৎ ভবনদী গম্ভীর, গভীর বেগে ছুটে চলে, দুই তীরে কাদা, মাঝখানে ঠাঁই নাই।

কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ় উজুবাট সংসারা।
বাল ভিন একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥

অর্থাৎ, ওরে মূঢ়, কূলে কূলে ফিরিসনে, সংসারের মাঝখানেই রয়েছে সহজ পথ।— নদীমাতৃক বাংলারই সঙ্গে এই চিত্রের সম্পর্ক রয়েছে। যতদূর মনে হয়, এই চর্যাগীতির প্রভাব এসে পড়েছে উত্তরকালের বাঙালী রচয়িতার ভাবে-ভাষায়, যেমন রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী যুগবাহী নিছক অধ্যাত্মতত্ত্বের গান কিংবা আধ্যাত্মিক প্রেমের গানের সঙ্গে চর্যাগীতির কিছু সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। .... এ কথাও তৎকালীন শিল্প-সাহিত্য থেকে জানা যায়। কোনো বিশেষ ঘটনায়, সামাজিক বা ধর্মগত উৎসব অনুষ্ঠান, গৃহস্থের নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীত ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। প্রতি কাজে ভাব-বিলাসেই বাঙালী গীত-মুখর হয়ে উঠেছে। তার গান সে রচনা করেছে, তার সুরও সে রচনা করেছে। এইরূপে বাংলার গীত-প্রবাহিণী বিভিন্ন ধারায় আলিঙ্গিতা হয়ে কল-গৌরব ভাবে নেমে এসেছে পূর্বযুগের সানুদেশ থেকে দিকে দিকে রস সঞ্চার করে বর্তমান কালের সমতল ভূমিতে। এখানে গীতধারার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে আমার বক্তব্য খানিকটা পরিষ্কার হবে। চতুর্দশ শতকের শেষ দিক থেকেই ধরা যাক, সে সময় ধর্মকে ভিত্তি করেই গার্হস্থ্য আর সামাজিক জীবনের কর্তব্য ঠিক করা হত। বাঙালী বারো মাস তেরো পার্বণে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিত, এখনকার মতো দিনযাপনের দুঃখ গ্লানি তখনকার বাঙালীকে মারতে পারেনি। মোট-কথা জনসাধারণ ছিল বড় অনুষ্ঠানপ্রিয়। এর প্রমাণের অভাব নেই। তারা বৃক্ষ, জলাশয় প্রতিষ্ঠায় গান গাইত—অন্নদানে, জলদানে, ভূমিদানে অনুষ্ঠান-সুর তুলতো, সাংসারিক বিঘ্ন-বিপত্তি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মঙ্গলচন্ডীর গান করত, সচ্ছল অবস্থার কামনায় সত্যনারায়ণের স্তুতিগান করত, সর্পভীতি দূর করতে বিষহরি বা মনসার গান করত, জ্বরস্ফোটকের হাত থেকে রক্ষা পেতে শীতলার গান ধরত, আর শিশু-কল্যাণকামী জননীর ষষ্ঠীর মঙ্গল গান গাইত, মাতৃকা পূজনে গজলক্ষ্মী বাসলীর গান জাগিয়ে তুলত। এই সমস্ত ছোট বড় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে বাঙালী যে গান আর সুর তৈরী করলে তা স্ব স্ব সময়ের আধুনিক গানের রূপ নিয়ে গানের ভান্ডারে জমা হয়ে রইল। তারপর আমরা পাই ধর্ম ঠাকুরের গাজন আর শিবের গাজন। গম্ভীরা উৎসবে এই দুই গাজনের সমন্বয় ঘটল। পরে এল সূর্য ও শনির পাঁচালী গান। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার যে, কীর্তন-সুর প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত লোকের মন অধিকার করে নিল। বাংলার মাঠে-ঘাটে 'মহীপালের গীত' গাওয়া হত। এই গীতের গায়নরাই কীর্তনের প্রবর্তক বলে জানা যায়। এই কীর্তনের সুরে গাওয়া শুরু হল—খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মধুর পদাবলী কীর্তন বাঙালীচিত্তকে সুবিপুল ভাবরসে মথিত করে তুলল। বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাঙালীর অন্তরে বাহিরে, সর্বত্রই ঝংকৃত হয়ে উঠল—

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-দেশম।
ন কুরু নিতম্বিনী গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম॥
নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম।
বহু মনুতে ননু তে তনু সংগত-পবন-চলিতমপি রেণুম॥

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাবরসের আর এক বিপুল প্লাবন দেখা দিল বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের মধুর পদকীর্তনের ভিতর দিয়ে। দুরূহ তানকেলি বর্জিত সেই সুমধুর সংগীত-রসধারা বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল করে তুলল। শত শত কন্ঠে ঝংকৃত হয়ে উঠলো সেই সাবলীল গীতমাধুরী ছন্দ। চন্ডীদাসের কন্ঠে বেজে উঠলো—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।........

আর, অপূর্ব মাধুর্য ও শব্দঝংকার নিয়ে বিদ্যাপতির কন্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গনাইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
সব তু-হু করবি বিচার
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহে মুঞি ছার॥

এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এই সংগীত রসধারায় নূতন জোয়ার আনলো। সমগ্র দেশ এক অপূর্ব আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। পদাবলী কীর্তনের সুমধুর ঝংকার বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো। প্রবল ও প্রমত্ত এক ভাব-বন্যায় সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব এক সংগীত প্রবাহে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।" ক্রমশ এই কীর্তন নানা রূপে সমৃদ্ধ হল গরাণহাটি, রেনেটি, মনোহারসাহী ও মন্দারিণীতে। মহাপ্রভু, কীর্তনের প্রচলিত রূপ পরিবর্তন করে যে অপূর্ব রূপ সৃষ্টি করলেন—তা' স্বভাব-সুন্দর অনুপম সংকীর্তন। এই সংকীর্তনের

পদ্ম ও অন্যের স্রোতে সারা বাংলা ভেসে গেল। বৈষ্ণব পদাবলী হল এই অভিনব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বাণী-রূপ। এই গীত-রূপ যুগে যুগে সর্বচিত্তজয়ী হয়ে চির-অম্লান রয়েছে। এই রস-কীর্তনের প্রতিষ্ঠার প্রায় সংগে সংগেই পূর্ব প্রচলিত শিবসংগীত ও শক্তিসংগীত বা কালী কীর্তন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আবার শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকেই বাংলার যাত্রার প্রবর্তন ও ক্রমপ্রসার লাভ করতে থাকে। যাত্রা মূলত গীতাভিনয়, গানই এর মধ্যে প্রধান, সেজন্য যাত্রার গান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলো। এমনি করে বাংলা গানের ও নানাবিধ সুর ও ঢঙের সঞ্চয় বাড়তে লাগলো। যাত্রার প্রভাব যখন কমে এলো,—জেগে উঠলো পাঁচালী-গান। এই পাঁচালী-গান পরিপূর্ণতা পেল দাশরথি রায়ের হাতে। পাঁচালীর পর এলো তরজা ও কবিগানের প্রাবল্য। এর অবদানও কম নয়। পাঁচালী ও কবিগান বাংলার কথকতার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। একটা কথা বলা হয়নি—কীর্তন গানে একটি গানের ভিন্ন ভিন্ন পদ ভিন্ন ভিন্ন তালে গাওয়ার প্রচলন হল। এইরূপ তাল সংগতকে 'তালফেরতা' আখ্যা দেওয়া হল। 'তালফেরতা' অর্থাৎ তালের পরাবর্তি—কিন্তু এইরূপ গানকে 'তালভিন্না' নাম দিলে বোধ হয় ভুল হবে না। যাই হোক তারপরে এলো হালকা ছন্দে থিয়েটারি গান।

বাংলা গানের আধুনিক রূপ আর তার সংস্থান বিচার করবার জন্য একটা রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করলাম। বাংলাদেশের কবি রামপ্রসাদের গানের নিজ সারবৈশিষ্ট্যে নামকরণ হয়েছে 'রামপ্রসাদী গান' আর রামনিধি গুপ্তের গান 'টপ্পা' জাতীয় বলে 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে প্রখ্যাত। পদাবলী ইত্যাদি সমস্ত গীত-শ্রেণী বাংলা গানের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি, নইলে বাংলা গান আজকে বাণী, সুর ও ভাবরসের প্রশস্ত রবীন্দ্র-রাজপথে এসে পৌঁছতে পারত কিনা সন্দেহ। বাংলার বাউল গান আর একটি অমূল্য সম্পদ। কীর্তনের প্রায় কাছাকাছি বাউল-গান বাংলাকে নাচিয়েছে, মাতিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এ দেশের কীর্তন বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না। কীর্তনে বা বাউল গানে ভাবের মন্দিরে যা অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল মিলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্য রচনা করা হয়েছে—

কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দিশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

ও তার রসদ কোথা না জেনে তায় গগন ভেবে মরে
ও সে মানষের উদ্দেশ জানিস যদি কৃপা করে
বলে দে রে।

উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা"—যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র হলেন রাগমিশ্রিত আধুনিক গানের প্রবর্তক। কাব্যরচনায় যেমন মহাপণ্ডিত ছিলেন সংগীত শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 'অন্নদামংগলে' এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। অন্নদামংগলের কাব্যাংশ পাঁচালীর রীতিতে গাওয়া হত। তাঁর কাব্যসমূহে যে সমস্ত গান আছে তার সুর রচনাও তিনি করেছেন যেমন শ্রী, সোহিনী, বিভাস, তোড়ী, মল্লার, মূলতান, মালকোষ ইত্যাদি। এই গানগুলি শুদ্ধ রাগে গাওয়া হত বটে কিন্তু তাতে তান সমারোহ ছিল না। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, হিন্দুস্থানী উচ্চাংগ সংগীতের অনুশীলন ব্যতীত বাংলার সংগীতের মোক্ষ লাভ যদি না ঘটে তা হলে সে অনুশীলন বাঙালী অনেক কাল থেকে করে আসছে। তবুও এটা ঠিক বাংলা গান স্বধর্মচ্যুত হয়নি? এ তো গেল সুরের কথা; এখন ভারতচন্দ্রের একটি গীতরচনার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ভব সংসার ভিতরে
ভব ভবানী বিহরে।
ভুতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে
চেতনা চেতনে মিলি দুইজনে
দোঁহ দেহরূপে চরে॥

এই রচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতচন্দ্র আধুনিক গানের মূর্তি তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আদর্শে গান রচনা করেছেন মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, আরও ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক গীতরচয়িতা এই পথাবলম্বী। এর পরে ক্রমে ক্রমে শক্তিশালীর দানে বাংলা গান উৎকর্ষ লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি, অতুলপ্রসাদের গীত ও সুর সংযোজনায় প্রসাদগুণ বর্তমান আছে। তাঁরা বিবিধ সুর আহরণ করে অতি নিপুণভাবে তাহা বাংলার আপনার করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের গানের মধ্যে বাণীরূপ ও ভাবরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে রাগরূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। কবি নজরুল ইসলামেরও গান ও সুর এই ভাবধারার অন্যতম নিদর্শন।

যাঁর অলোকসামান্য প্রতিভায় বাংলা গান অমিত ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে—সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অতীতের সম্পদের উপর ভিত্তি করে যে সংগীতসৌধ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—তা নূতনত্বে ও রাগিণী এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। প্রাচীন সুর, প্রচলিত রাগ-রাগিণী এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সংগে রবীন্দ্র সংগীতের নিবিড় যোগ রক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'সংগীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সংগে সুরের মিশ্রণই ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু সুর নয়, সুরের সংগে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা, বিচ্ছেদে নয়।' কলাবৎগণের অভ্যাস গানকে গতিহীন, অচেতন, জড়ত্বের পরে স্থাপন করা—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশিত হয়েছে গীত-রাগের প্রকৃত সত্তা লুপ্ত না হয়ে জড়ত্বের বিলয় ও গতিশীল। কলাবৎগণ বাণীকে করেন সুরের দাসী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর যথার্থ অর্থব্যঞ্জক। সুরের রস আর কাব্যের রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দুটি রসের মিলন রবীন্দ্রগীতিতে রাজযোটক হয়ে উঠেছে। এইটাই আধুনিক গানের পূর্ণ আদর্শ—প্রাণময় রূপ। এতে যে নূতন সৃষ্টির সন্ধান মেলে তা প্রাণরস বৈভবে পূর্ণ। যা ছিল স্তব্ধ-ধারা তা হয়েছে মুক্তধারা। তিনি নব-ভাব ভগীরথের মায় গীতধারার মুক্ত গতি দিয়েছেন। তাই নব নব কলরাগিণী তুলে এই যে গীত-ধারা প্রবাহিত ইহা লক্ষ করবার বিষয়। এই ধারার প্রসাদস্বরূপ আধুনিক নামধেয় গান, রূপে-রসে প্রকাশ পাবার শক্তি পেয়েছে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে, ধ্রুপদ গানের চারটি তুকের মতো সুর গঠনের বিভাগরীতি—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ রবীন্দ্র সংগীতেই যথার্থভাবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রবর্তনের পর থেকে সমস্ত বাংলা আধুনিক গানেও এই রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

আধুনিক গান আজ ঐশ্বর্যহীন নয়। এই শ্রেণীর গান ভাববৈশিষ্ট্যে উন্নত। এই গীত-ধারায় প্রায় সর্ব রসেরই প্রকর্ষ সাধিত হয়েছে। নব রসের প্রায় সমস্ত রসই এর মধ্যে বিদ্যমান। যদিও যথার্থ হাস্য রসাত্মক গান এক বাংলা ভিন্ন ভারতের অন্য কোনো স্থানেই সম্যক বৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে মাত্র আধুনিক গীত রচনা-পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার সংগীত একটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে, তাই নতুন ছন্দে, ভাবে, সুরে সৃষ্ট হল কীর্তন, বাউল, লোকসংগীত প্রভৃতি। এই প্রকৃতির গীতধারা বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সার্থক রূপে ফুটিয়ে তুলেছে। ভাবসম্বন্ধে আধুনিক গানও সকলের সংগে অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করতে পেরেছে। ইহা আধুনিক গানের গৌরব। বাঙালীর এই সংগীত সম্পদের বার্তা, বাঙালীর নিজস্ব ধারা প্রবর্তনের কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তিই সপ্রমাণ করে। একদা তিনি বলেছিলেন—

"বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেন না অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে সাং [illegible] শক্তি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই ...একটা খুব বিস্ময়ের জিনিস এখানে দেখা যায়—হিন্দুস্থানী গান বাংলায় আমল পায়নি। এটা আমাদের দৈন্য হতে পারে। অনেক ওস্তাদ আসেন বটে, গোয়ালিয়র হতে, পশ্চিম দেশ, দক্ষিণ দেশ হতে, যাঁরা আমাদের গান বাদ্য শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সেসব গ্রহণ করিনি। কেন না আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকবর শা'র সভায় তানসেন যে গান গাইতেন সাম্রাজ্য মদ-গর্বিত সম্রাটের তা উপভোগের জিনিস হতে পারে কিন্তু আমাদের আপনার হতে পারে না। তার মধ্যে যে কারু নৈপুণ্য ও আশ্চর্য শক্তিমত্তা আছে তাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি নে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্য নিজের দৈন্য নিয়ে বাংলা দেশ চুপ করে থাকেনি। বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্তন। বাংলার সঙ্গীত সমস্ত প্রথা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী কত তালই বেরুল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। খোল একটা বেরুল যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই। কিন্তু কেউ বললে না এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব। নেচে-কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা। অন্য প্রদেশে তো এমন হয়নি। সেখানে হাজার বৎসর আগেকার পাথরে গাঁথা কীর্তি সমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি সঙ্গীত সম্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। বাংলা দেশের সাহস আছে—সে মানে নি চিরাগত প্রথাকে। সে বলেছে 'আমার গান আমি গাইবো' ...কোন কোন হিন্দি গান আমি শুনেছি—যাতে আশ্চর্য গম্ভীরতা ও কারুকলা আছে কিন্তু আমার বিশ্বাস—আমাদের বৈষ্ণব-কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙে-চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য করে যাতে তাঁদের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্বেল হয়ে উঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরী করেছেন। আমি তুলনা করে কিছু বলবো না, কেন না আমি সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা জানি নে কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে—বাংলাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা সম্পদ আছে তা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো কিন্তু তুলনা দ্বারা মূল্যবানের যথার্থ মূল্য যাচাই করে নেব। সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতি কিন্তু এ কথা আমি বলব না যে—'যা হয়ে গেছে তা আর হবে না।' হয়ত সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্তিতা করতেও পারি কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব করে—জীবনের স্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, নইলে তা টিঁকবে না। আগেও হিন্দুস্থানী সংগীতের চর্চা হয়েছে বটে কিন্তু তেমন করে হয়নি। আমাদের দেশের সৌখিন ধনী লোকেরা হিন্দুস্থানী গায়কদের আহ্বান করে আনতেন—কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গান প্রবেশ করেনি। যেমন বাউল আর কীর্তন এ-দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। এইটেই বাংলার গৌরব।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও সাহস করে এই মন্তব্য করতে পারি যে—বাংলা আধুনিক গান স্থায়ী নামকরণে নব নব ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বজনের মনোরঞ্জন করে অন্তর-গীতা হয়ে উঠবে।

উপসংহারে আমার বলবার কথা এই যে, আজকের যা আধুনিক কালকে তা পুরাতন। বিগত যুগের গান, সেই সময়ে যা আধুনিক নামে প্রচারিত হত, আজকে তা প্রাচীন বলে গণ্য হচ্ছে, সেই রকম এই 'আধুনিক গান' বলে যে সমস্ত গানকে অভিহিত করা হচ্ছে—তা অবশ্যই পঞ্চাশ বছর বা একশ' বছ পরে প্রাচীনের কোঠায় গিয়ে পড়বে। তাহলে, আধুনি গান' এই সাময়িক পরিচয় সংজ্ঞার সার্থকতা কোথায় আজকে আধুনিক গানের একটা পর্যায় ঠিক করে-তার স্থায়ী পরিচয় জ্ঞাপক নাম দেওয়া পণ্ডি গুণীজনের কর্তব্য। প্রথমেই বিচার করতে হবে গীত-রীতি—রীতি অর্থে রচনা পদ্ধতি বা স্টাইল কেননা স্টাইল বা রীতিই চেনবার সহায়ক 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ'। আর এই গানের বৃত্তি অর্থাৎ বিলাস - বিন্যাস - ক্রম ব Dramatic mode of graceful presentatio —এটাও মনে রাখতে হবে। এই রকম গীত-প্রকৃ মিলিয়ে এর যথার্থ একটা অভিধা দেওয়া অসঙ্গ নয়। যেমন বর্ণ-বিভাগে উত্তম-সংকর, মধ্যম-সংকর, অধম-সংকর, সেই রকম আধুনিক গানবে যদি রাগ-সংকর বা সুর-সংকর বলা হয় তাহলে মিশ্ররাগের ঠুমরীও ঐ পর্যায়ে পড়ে। তাহলে রীতিই হচ্ছে চেনবার মুখ্য পথ—কেন না 'রীতির রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতং'—চিত্র যেমন রেখায় প্রতিষ্ঠিত, কাব্য তেমনি রীতিতে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক গান পুষ্ট করতে হলে কেবল ভারত নয় বিশ্বের গীত-ভাণ্ডারের উৎকৃষ্ট বস্তু যাচাই করে নিয়ে স্বীকরণ দ্বারা আমাদের স্বকীয়ত বজায় রেখে রূপ-রস ব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করতে হবে।

আমার শেষ কথা, বাংলা আধুনিক গানের ধারা যাতে পঙ্কিল হয়ে না ওঠে, সেদিকে অশে মনোযোগ দিতেই হবে। বাণী-রূপ ও সুর-রূপ এই দুটিই বলিষ্ঠ ও মনোজ্ঞ না হলে—রূপ-ভ্রষ্ট গানের কদর মোটেই থাকতে পারে না। এদিকে সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন তা বলা বাহুল্য নইলে এই গীত-ধারা অল্পকালের মধ্যেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে বালতুল-শয্যা-শায়িনী হয়ে পড়বার আশংকা আছে।

নিবন্ধটি ১৯৫৬ সালে রচিত এবং নিতাই ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিজ্ঞান

ভৌত গবেষণাগার

আমেদাবাদ থেকে ফিরে ঃ ৩

প্রথমে বিভূতি। তারপর সেই বিভূতি থেকেই জন্ম নিল মানুষ। সময় সকাল ন'টা। কাল ২৩৪০০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

এখন এ কথা অদ্ভুত এবং হাস্যকর মনে হলেও, তখন এটাই ছিল বিশ্বাস। বিশ্বাস। কারণ, যাঁর মুখ থেকে এই উক্তিটি বেরিয়ে এসেছিল তাঁকে অবিশ্বাস করার মত তখন কিছু ছিল না। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ লাইটফুট। ১৬৪২ সালে যিনি ঘোষণা করেন ঃ 'ম্যান ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য ট্রিনিটি অন অকটোবার, ২৩৪০০৪ বি সি অ্যাট নাইন ও' ক্লক ইন দ্য মর্নিং।'

মানুষের উৎপত্তিকাল সম্পর্কে এ ধরনের কথা এখন অনেকের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হবে সন্দেহ নেই। শুধু সত্য যা, তা হল, অতীতকে জানার জন্যে আজকের মানুষ যতটা আগ্রহী, অতীতের মানুষও ঠিক তেমনই আগ্রহী ছিল। ডঃ লাইটফুট কী ভাবে মানুষের জন্মকাল হিসেব করেছিলেন আমাদের জানা নেই। গত কুড়ি পঁচিশ বছরে পটাশিয়াম আর্গন, কার্বন-১৪ প্রভৃতির তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপের উপর নির্ভর করে পুরাতত্ত্ববিদরা যে সব হিসেব বের করে-ছেন ডঃ লাইটফুটের হিসেব তার সঙ্গে মেলে না। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পুরাতত্ত্ববিদরা বল-ছেন মানুষ পাথর কেটে অস্ত্রশস্ত্র অথবা সাজসরঞ্জাম তৈরির কাজ শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় তিরিশ লক্ষ বছর আগে। তামার ব্যবহার সে তুলনায় মাত্র ছয় থেকে চার হাজার বছরের কাহিনী। লোহাকে কাজে লাগানর কৌশল আরও কিছুটা জটিল ব্যাপার। সেটা রপ্ত করতে মানুষকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে মানব সভ্যতায় লোহার চল শুরু হয় ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

পাথর, তামা এবং লোহার ব্যবহারিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রারও পবিরর্তন ঘটল। শুরু হল চাষ আবাদ। তৈরি হল গ্রাম। তারপর নগর। তৈরি হল নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস এবং সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সভ্যতা।

'প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় ঘটনাবলীর সময় জানার জন্যে আধুনিকতম উদ্যোগ নিয়ে গবেষণা চলছে আমেদাবাদের 'পি আর এল'-এ'। বললেন, 'পি আর এল'-এর পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান ডঃ ধরমপাল আগরওয়াল।

ডঃ আগরওয়াল বললেন, 'এখানে দুটি পদ্ধতি নিয়ে আমরা কাজ করছি। এক, কার্বন-১৪ ডেটিং পদ্ধতি। বাংলায় যাকে বলা চলে কার্বন-১৪ কাল-গণনা পদ্ধতি। দুই, থার্মোলুমিনিসেনস বা তাপ-দীপ্তি পদ্ধতি।'

শেষোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রীর বয়েস মাপার ব্যবস্থা ভারতে একমাত্র 'পি আর এল'-ই আছে। এই পদ্ধতিতে প্রাচীন সামগ্রীকে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে তা থেকে বেরিয়ে আসে বিশেষ এক ধরনের দীপ্তি। এই দীপ্তির পরিমাণ হিসেব করে ওই সামগ্রীর বয়েস কত তা অনুমান করা যায়। অজৈব বস্তু, যেমন প্রাচীন কালের মানুষ মাটি, পাথর প্রভৃতির সাহায্যে যে সব জিনিসপত্র তৈরি করেছিল কোন সময়ে তাদের তৈরি করা হয় এই ভাবে তা হিসেব করা যায়।

'তবে তাপদীপ্তি পদ্ধতিতে বয়েস মাপার ব্যাপারে কিছু অসুবিধেও আছে।' বললেন জনৈক গবেষক। তিনি বললেন, 'ধরুন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন একজন মানুষ একটি মাটির বাসন তৈরি করল। ধরুন, এই বাসনটির সাহায্যে শেষবারের মত সে রান্না করে-ছিল ছয় হাজার বছর আগে। তারপর দীর্ঘকাল সেটি কোন জায়গায় পড়েছিল। অবশেষে মনে করুন দুই হাজার বছর পর সেই বাসনেই রান্না করল পরবর্তী-কালের কেউ একজন। রান্না করা মানে বাসনটিকে আবার গরম করা হল। এর পর ওই বাসনটি যদি আর গরম করা না হয় এবং সেটাকে নিয়ে এসে তাপদীপ্তি কালগণনা পদ্ধতিতে তার বয়েস অনুমান করার চেষ্টা করি তা হলে দেখা যাবে ওই বাসনটির বয়েস এসে দাঁড়িয়েছে চার হাজার বছর। অর্থাৎ ওই গরম করার দরুন তার বয়েসের দুই হাজার বছর হারিয়ে গেল।'

তুলনায় কার্বন-১৪ কালগণনা পদ্ধতি অনেকটা নির্ভরযোগ্য। তবে এর জন্যে দরকার জৈবিক বস্তু কণা। আর জৈবিক বস্তু মানেই তার মধ্যে থাকবে কার্বন।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই রকম।

বাতাসে আছে নাইট্রোজেন। আর, মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে আসছে নিউট্রন। এক একটি নাইট্রো-জেন পরমাণু সেই নিউট্রনের এক একটি গ্রাস করে রূপান্তরিত হয় কার্বন-১৪ নামের এক ধরনের আইসো-টোপ বা সমস্থানিক পদার্থ। যা তেজস্ক্রিয়। এ থেকে বেরিয়ে আসে বিটা কণা বা ইলেকট্রন। তেজস্ক্রিয় এই কার্বন-১৪ এবং প্রাকৃতিক কার্বন—যাকে বলা হয় কার্বন-১২—এরা উভয়েই অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে কার্বন ডাই-অকসাইড। যার অর্থ বাতাসে থাকে দু রকমের কার্বন ডাই-অকসাইড। কার্বন-১৪ সমন্বিত কার্বন ডাই-অকসাইড এবং কার্বন-১২ সমন্বিত কার্বন ডাই-অকসাইড। এদের প্রথমটি তেজস্ক্রিয় দ্বিতীয়টি তেজস্ক্রিয় নয়। বাতাসে এই ধরনের উপাদানের অনুপাত সব সময় প্রায় একই রকম থাকে। অবশ্য ইদানীং এর কিছুটা ব্যতিক্রমও হয়েছে। যেমন, কলকারখানায় কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানি পোড়ানর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের মাত্রার হেরফের হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে ঘটান হচ্ছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের সময় প্রচুর নিউট্রন বের হয়। যা নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪তে। এ সব কারণে বাতাসে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই-অকসাইড এবং সাধারণ কার্বন ডাই-অকসাইডের অনুপাত ব্যাহত হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত সেটা খুবই কম। মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি, প্রাচীনকালে বায়ুমণ্ডলে দু রকম কার্বন ডাই-অকসাইডের অনুপাত যা ছিল, এখনও সেই অনুপাত প্রায় সেই রকমই রয়েছে।

• অতএব অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই, পৃথিবীর গাছ-পালা কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ করে সালোক সংশ্লেষণের সাহায্যে তৈরি করছে কার্বোহাইড্রেট। এই কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে থাকছে দু রকম কার্বন—কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২। তাদের অনুপাতও থাকে একই রকম। আবার পশুপাখি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করায় তাদের শরীরেও থাকে ওই দুই রকম কার্বন। তাদের শরীরেও তাদের অনুপাত থাকে আগেরই মতন।

যতদিন উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবিত অবস্থায় থাকে ততদিন এই কার্বনের লেনদেন চলে অব্যাহত গতিতে। তেজস্ক্রিয় 'ক্ষরণ' বা 'ডিকে'র ফলে কার্বন-১৪ এর

ভূপালের কাছে ভীমবেটকা থেকে সংগৃহীত প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন এই চিত্রলিপি। পাথরের গায়ে আঁকা ছবিগুলি যেন আজও জীবন্ত। ঘটনা কাল ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

অনুপাত কমলেও খাবারের মাধ্যমে নতুন কারবন-১৪
অনুপাত কমলেও খাবারের মাধ্যমে নতুন কাববন-১৪
গ্রহণ করে সেই ঘাটতি তারা পূরণ করে নেয়।

তবে যে মুহূর্তে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী মারা যায়, তার পর থেকে এই ঘাটতি পূরণ আর সম্ভব হয় না। তাদের দেহের সঞ্চিত কার্বন-১৪-এ ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে তেজস্ক্রিয় ক্ষরণ বা রেডিও অ্যাকটিভ 'ডিকে'। পরীক্ষা করে জানা গেছে কার্বন-১৪র 'হাফ লাইফ' ৫৭৩০ বছর। এর পর অবশিষ্ট যেটুকু কার্বন-১৪ থাকবে তারও অর্ধেক পরিমাণ পুনরায় ক্ষরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে ওই একই সময় নেবে। রূপান্তরের ফলে কার্বন-১৪ তৈরি হয় নাইট্রো-জেনে। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে যে পরিমাণ কার্বন-১৪ নেয়া হল, স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের মাধ্যমে তার অর্ধেকের ক্ষরণ ঘটতে সময় লাগে ৫৭৩০ বছর। ফলে কোন প্রাণী অথবা উদ্ভিদের (কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি) দেহে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২-এর অনুপাত যতটা থাকার কথা, মৃত্যুর পর যত দিন যাবে, দেখা যাবে তাদের দেহে ওই দুই বস্তুর অনুপাত পালটে যাচ্ছে। কতটা পালটাল সেটা দেখে বলা যায় ঠিক কতদিন আগে ওই গাছ বা প্রাণী (তাদের অংশাবশেষও হতে পারে) জীবিত অবস্থায় বিরাজ

কালিবঙ্গায় পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই কবর। নিখুঁত আয়তাকার এই কবর দেখে বেশ অবাক হতে হয়। এর মধ্যে পাওয়া গেছে সে যুগের নানা রকম মৃৎপাত্র, পাথরের (বিড) গহনা। দেখে মনে হয় মৃত্যুর পর কাউকে সমাধি দেবার সময় তার ব্যবহার্য জিনিসগুলিও তার সঙ্গে সমাধিস্থ করত প্রাচীনকালের মানুষ। ঘটনা কাল ২০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ব।

...হয় বয়সের জোড়।

... নানা রকম পদ্ধতি কাজে লাগান হয়। ... সংগ্রহ করা হয় জৈবিক নমুনা। যেমন কাঠের ..., কাঠ কয়লা, প্রাণী দেহের অবশেষ প্রভৃতি। ... সেই নমুনা থেকে সাবধানে পৃথক করতে হবে কার্বন ঘটিত উপাদান। পৃথক করার পর সেই কার্বনকে অক্সিজেন যা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয় কার্বন ডাই-অকসাইড, অ্যাসেটিলিন, মিথেন, কখনও বেনজিনও। পরে বিকিরণ মাপার যন্ত্রের (গিগার কাউনটার) সাহায্যে ওই সব গ্যাসের বিকিরণ মাত্রা মেপে দেখা হয় তাদের মধ্যে কতটা কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২ ছিল। অতঃপর এই দুই বস্তুর অনুপাত বের করে বলে দেয়া হয়, যে নমুনাটি পরীক্ষা করা হল তার আনুমানিক বয়েস কতটা হতে পারে।

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, তা না হয় হল। প্রাচীন যুগের কাঠকয়লা কিংবা জৈবিক কোন্ অবশেষ সংগ্রহ করে ওইভাবে কোন যুগের তারা, তা জানা গেল। কিন্তু যে সব অবশেষ জৈবিক নয়, ধরুন, পুরনো দিনের তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি। তারা হয়তো মাটি, পাথর অথবা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি। তেজস্ক্রিয় কার্বন-কালনির্ণয় পদ্ধতিতে তাদের বয়েস জানা যাবে কিভাবে?

এক্ষেত্রে পদ্ধতিটা হয় পরোক্ষ। যেমন, ওই সব অস্ত্র অথবা তৈজসপত্রের উপাদান কার্বন নাও হতে পারে। কিন্তু এমন তো হতে পারে, প্রাচীনকালের মানুষ ওই সব অস্ত্র দিয়ে গাছ কাটত। অতএব সে যুগের কিছু গাছের চিহ্ন তার গায়ে লেগে থাকতে পারে। কিংবা ওই সব বাসনে শস্যকণা রেখে দেওয়া ছিল। সেই শস্যকণার যৎসামান্য আজও থেকে গেছে। বিকৃত অবস্থায় অবশ্য। রাঁধার বাসনে কিছু পোড়া কাঠের চিহ্নও থেকে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই চিহ্ন অবশ্য খুবই সামান্য। তবু ওই সামান্যতম গাছের চিহ্ন অথবা শস্যকণার মধ্যে যেটুকু কার্বন থাকে তাকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এখন বলে দিতে পারেন ওই সব বস্তু কোন কালের।

পি আর এল-এর পুরাতত্ত্ব বিভাগের কার্বন-১৪ কালগণনা পদ্ধতির যন্ত্রপাতি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। জটিল সাজসরঞ্জাম। একের পর এক একটি আধার। প্রাচীনকালের জৈব নমুনা রাখা হচ্ছে একটি পাত্রে। শোধন, বিশোধনের মধ্যে দিয়ে সেই নমুনা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পাত্রের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে তৈরি হচ্ছে মিথেন গ্যাস। সেই গ্যাসকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর এক প্রান্তে। নিয়ে যাওয়া বললে ভুল হবে। নলের মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে পাত্র থেকে পাত্রান্তরে এগিয়ে যাচ্ছে বরং বলি।

'হ্যাঁ, এখানেই।' বললেন জনৈক বিজ্ঞানী। 'দেখুন, সীসের পুরু ইঁট দিয়ে জায়গাটি দুর্গের মত ঘেরা। ওই মিথেনের মধ্যে আছে কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২। কার্বন-১৪ প্রতি মিনিটে ক'টি বটা কণা ছেড়ে দিচ্ছে, সেটা হিসেব করে আমরা বলে দিতে পারব, মিথেনের মধ্যে মোট যতটা কার্বন ছিল, তার মধ্যে কতটা ছিল কার্বন-১৪। সেটা জানা গেলেই, যে জৈব নমুনা থেকে কার্বন সংগ্রহ করে মিথেন তৈরি করা হয়েছে, সেটা কোন কালের আমরা জানতে পারব।'

প্রশ্ন : মিথেন গ্যাসকে অমন সীসের দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

উত্তর : সংগত প্রশ্ন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। আমরা জানতে চাই, যে তেজস্ক্রিয়তার আমরা হিসেব করতে চলেছি, তার উৎস শুধু এই মিথেনই যেন হয়, অন্য কিছু নয়। এখানে অন্য কিছু বলতে আমি পরিবেশকে বোঝাচ্ছি। যেমন, এই যে বাড়িতে আমরা রয়েছি—কংক্রিটের দেয়াল, বিকিরণ সেখান থেকেও আসতে পারে। আসতে পারে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবেও। যাদের আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। সীসের দুর্গ তৈরি করে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। এটা না করলে, মিথেনের কার্বন-১৪ থেকে যতটা বিকিরণ বের হচ্ছে তার সঙ্গে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন মিশে হিসেবটা গুলিয়ে দিত।

বলা বাহুল্য, এখানকার সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে ভারতে। তৈরি হয়েছে পি আর এল-এরই কর্মশালায়। সারা দেশে তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে কালগণনার মত এমন গবেষণাগার আর দ্বিতীয়টি নেই।

কথা বলছিলাম ডঃ ধরমপাল আগরওয়ালার সঙ্গে। শান্ত এবং সমাহিত চরিত্রের মানুষ। কথা বলেন ধীরে ধীরে। যেন সুদূর কোন অতীতকে উদ্ঘাটন করছেন তিনি নিরত।

পুরাতত্ত্ব তাঁর ভালবাসা। হয়ত এই কারণেই বয়েস যখন বছর পনের তখন তিনি কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে অন্ধকার গুহার মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন অতীতের সন্ধান। দিল্লির স্কুল অভ আরকিওলজি থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পান ১৯৬২তে। তারপর চলে যান বোম্বের টাটা ইনস-টিটিউট অভ ফানডামেন্টাল রিসার্চে। এখানেই তাঁর শুরু কার্বন-১৪ নিয়ে কাজ। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে পি আর এল-এর বর্তমান ডাইরেকটার ডঃ দেবেন্দ্রলালের। ডঃ লালের সুমধুর

'পি আর এল'-এর পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা বিভাগের প্রধান ডঃ ধর্মপাল অগ্রওয়াল

ব্যবহার এবং অসাধারণ কল্পনাপ্রবণ মন তাঁকে আকর্ষণ করে।

'১৯৭২ সালে হল আন্তর্জাতিক পুরাতাত্ত্বিক সম্মেলন।' বললেন ডঃ অগ্রওয়াল। 'এই প্রথম পুরাতাত্ত্বিক আলোচনাচক্রে মিলিত হলেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন আঙিনার বিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞানী, রাসায়নিক, জীববিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ, পুরাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক। উদ্দেশ্য প্রাচীনকে জানা।'

'তারপর ডঃ লাল পি আর এল-এর দায়িত্ব নিয়ে চলে এলেন। ১৯৭৩ সালে বোম্বে থেকে আমরাও এখানে চলে এলাম। বলতে পারেন, এই গবেষণাগারে তারপর থেকেই শুরু হল পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য কাজ করছেন আমার সহকারী শীলা কুসুমগার, আর ভি কৃষ্ণমূর্তি, আর কে পন্থ এবং এ সিংভি।'

'ইন সায়ান্টিফিক কেরিয়ারস, ইটস নট অলওয়েজ দ্য অ্যাকাডেমিক ইনটারেসট দ্যাট ডিটারমিন দা কোর্স। সারকামসটান্সেস অ্যান্ড ইনডিভিজুয়াল অলসো প্লে গ্রেট রোল।' বললেন ডঃ আগরওয়াল।

বলতে বাধা নেই, পি আর এল-এ এ দুটিরই সাক্ষ্য দেখেছি। আর তা সম্ভব হয়েছে যে 'ইনডিভিজুয়াল'-এর অস্তিত্বে, তিনি ডঃ দেবেন্দ্র লাল।

ডঃ আগরওয়াল বললেন, 'আমাদের গবেষণার লক্ষ্য তিনটি। পুরাতাত্ত্বিক কাল নির্ণয়, পুরাতাত্ত্বিক আবহাওয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং পুরাতাত্ত্বিক যুগে মানুষ কী ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা।

... এপর গবেষণা চালিয়েছি। এই গবেষণা ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আমাদের সাহায্য করেছে। যেমন ধরুন, আমরা জানতে পেরেছি, এ দেশে মধ্যপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়েছিল ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। এই সময় মানুষ ধনুক এবং বর্শা ব্যবহার করত। ধনুকের তীরের ডগায় থাকত পাথরের সূক্ষ্ম ফলক। আমাদের দেশে নতুন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক দক্ষিণাঞ্চলের সংস্কৃতি। এর সময়কাল ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই, কাশ্মীর অঞ্চলীয় সংস্কৃতি। যা ২৪০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা।

'এর পর লৌহ যুগ। সিন্ধু সভ্যতার প্রসার ঘটে এই সময়ে। পাকিস্তান, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং গুজরাটের প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। পোড়া ইঁটের বাড়ি, সুপরিকল্পিত নগর এবং উন্নত ধরনের ধাতুবিদ্যার নিদর্শনে ভরা ওই অঞ্চলের অবশেষ এটাই প্রমাণ করে সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে ওই একই সময়ে—২০০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে—আর এক ধরনের সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন ধরুন, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের বনস সংস্কৃতি, মধ্যপ্রদেশের মালবা সংস্কৃতি মহারাষ্ট্রের জরাব সংস্কৃতি, প্রভৃতি। ওই অঞ্চলের মানুষও তখন ধাতুর ব্যবহার রপ্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের মধ্যে নগর সংস্কৃতি দানা বাঁধে নি। তাদের সংস্কৃতির মধ্যে গ্রামীণ চরিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে।

'সংস্কৃতি অথবা জীবন প্রণালীর এই বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশগত বৈষম্য। সিন্ধু সভ্যতা অধ্যুষিত অঞ্চলের মাটি ছিল উর্বর। তামার হাল্কা যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই মাটি চষে চাষ আবাদের কাজটা ছিল সহজ। কিন্তু দোয়াবের কথা ধরুন। মৌসুমী বৃষ্টির প্রভাবে সে অঞ্চলে তখন ছিল বড় বড় অরণ্য। তামার হাল্কা সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে তা পরিষ্কার করে চাষের জমি তৈরি করা শক্ত হওয়ায় ওই সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামীণ পর্যায়েই থেকে গিয়েছিল। কারণ, সেখান থেকে বিহারের লোহার খনির দূরত্ব অনেক বেশী। অতএব লোহা বয়ে নিয়ে গিয়ে তা দিয়ে ভারী যন্ত্রপাতি তৈরি করে যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে তেমন অবস্থা ওই অঞ্চলের মানুষের তখনও হয়ে ওঠেনি। তাই নগর সভ্যতার জন্যে দোয়াবকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

'পি আর এল'-এর পুরাতাত্ত্বিক গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন বিগত ৪৫০০০ হাজার বছরের রাজস্থানের বিস্তৃত অঞ্চল কখন বর্ষা অধ্যুষিত হয়েছে, কখনোবা এক নাগাড়ে খরায় জর্জরিত হয়েছে। তার আগে অবস্থাটা কেমন ছিল সেটা অবশ্য তাঁরা বলতে পারেন না। কারণ, কার্বন কালনির্ণয় পদ্ধতিতে ৪৫০০০ হাজার বছরের চেয়ে পুরনো সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁরা এটাও আবিষ্কার করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথর এবং তামা সংক্রান্ত প্রযুক্তির অঞ্চল বিশেষে বিনিময় ঘটেছে। তাঁরা জানতে পেরেছেন, তখনকার মানুষের মধ্যে বিমূর্ত কল্পনাপ্রবণতাও বিরাজ করত। বিভিন্ন সময়ে তৈরি পাথর তামা অথবা লোহার ব্যবহারিক সামগ্রীর কলাকৌশল দেখলেই এটা বোঝা যায়। তাম্রযুগের মানুষ ভারতের কোন কোন তামার খনি ব্যবহার করত 'পি আর এল'-এর বিজ্ঞানীরা এখন তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। আর তার জন্যে তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নানা রকম পদ্ধতি। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ, মাস স্পেকট্রোমিটার, গিগার কাউনটার ইত্যাদি। এক সঙ্গে কাজ করছেন রাসায়নিক, পদার্থ বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, পুরাতাত্ত্বিক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে—সবার সঙ্গে সহযোগিতা রেখে তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন।

সমরজিৎ কর

কণ্টকাবৃত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৪১ ॥

দিল্লী থেকে সকালে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছন হল। আমি পন্থজীর সঙ্গে ছিলুম। লক্ষ্ণৌ-এ যুবসমাবেশে পন্থজীর বক্তৃতা। সেখান থেকে আমরা রাজভবনে গেলুম। মধ্যাহ্নভোজন সেরে যাওয়া হবে আসাম। রাজভবন থেকে এয়ারপোর্টে যাবার পথে শ্রীমান নারায়ণ গাড়িতে উঠলেন। তখন ডেবরভাই কংগ্রেসের সভাপতি, আর শ্রীমান নারায়ণ অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। গাড়িতে কথায় কথায় শ্রীমান নারায়ণ বললেন, "এখনও এক বছর হয়নি, কি করে চালিহা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? ডেবরভাই আপনাকে জানাতে বললেন যে এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।" আমি নির্বাক শ্রোতা। অনেকক্ষণ শুনে পন্থজী ঘাড় নেড়ে বললেন, "শ্রীমান নারায়ণ, আইন করা হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য। আর এ তো আমাদের সংগঠনের আইন, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে লঙ্ঘন করলে আইনের মর্যাদা আরও বাড়বে।" শ্রীমান নারায়ণ আরও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পন্থজী চুপ। আমরা এয়ারপোর্টে হাজির হলুম।

ফকরুদ্দিন, বিমলা চালিহা, মিসেস খঙ্গমান, কামাখ্যা (ত্রিপাঠী) আর দেবু (বড়ুয়া)—এঁরা পাঁচজন লোকসভার সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী এঁরা আসাম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। বিষ্টুবাবু (মেধী) ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কামরাজের সঙ্গে কথা কয়ে স্থির হয় যে বিষ্টুবাবু মাদ্রাজের রাজ্যপাল হবেন। পন্থজী এবং জওহরলাল দুজনেই এ-ব্যাপারের সবটা জানতেন। আইনসভার নির্বাচনে মিসেস খঙ্গমান হেরে গেলেন, বিমলা চালিহারও পরাজয় হল। ফকরুদ্দিন, কামাখ্যা ও দেবকান্ত নির্বাচিত হন। দেবকান্তর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা শুরু হয়। পার্টি থেকে চালিহাকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু কিছুদিন আগেই ওয়ার্কিং কমিটিতে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, নির্বাচনে যারা হেরে যাবে, এক বছরের মধ্যে তারা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না। অবশ্য এটা ছিল সুপারিশ, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি-র সামনে উপস্থাপিত হয়নি। ডেবরভাই এই সুপারিশকেই আইনসঙ্গত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। পন্থজী অবশ্য তাঁর মিষ্ট অথচ দৃঢ় অভিমত দিয়ে ডেবর ভাই-এর যুক্তি খণ্ডন করেন। ফকরুদ্দিন হলেন অর্থমন্ত্রী। ওঁর অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ভাষা আন্দোলন নিয়ে সংঘর্ষ হয়। অনেক জায়গায় অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। পাশাপাশি তিনখানা দোকান, অসমীয়া হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের দোকান পোড়েনি, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর দোকান পুড়েছে। সেই সময় সুচেতা (কৃপালিনী) আসামে অনেক কাজ করেছিলেন। সুচেতার একটা সুবিধে ছিল। এঁর কাছে অসমীয়া বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবী—এসবে কোন প্রভেদ ছিল না এবং একথা সকলে বিশ্বাস করত। আমার বেশ মনে আছে, আমরা একজায়গায় গিয়েছিলাম খোলা গরুর গাড়ি চেপে। রাস্তা ডুবে গিয়েছিল, ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখা গেল যে অসমীয়া হিন্দু এবং বাঙালী হিন্দুরা দু'টো সামিয়ানার নীচে বসে হরিনাম করছে—আলাদা আলাদা। তখন অনেক রাত, তবু সুচেতার উৎসাহের অন্ত নেই। খানিক বাদেই দেখা গেল, সুচেতার সঙ্গে বাঙালী অসমীয়া সব হিন্দুরা একসঙ্গে সংকীর্তন করছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখলে মনে হবে না, এরাই কয়েকদিন আগে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল। সুচেতা চলে এলেন, আমি থেকে গেলুম। আসামে আমাকে যেতে হয়েছিল, আমাকে কংগ্রেস সভাপতি পাঠিয়েছিলেন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি—দুজনেরই আমন্ত্রণ ছিল। সেইসময় ফকরুদ্দিনের কাজ করবার যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছি, তা ভোলবার নয়। অনেক বাঙালী হিন্দু গৃহহীন হয়েছিলেন। তাঁরা সাময়িকভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে স্থান পেলেও তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছিল। সেই ব্যবস্থাপনায় ফকরুদ্দিনের পারদর্শিতা অনন্যসাধারণ। কোথাও গৃহনির্মাণের করোগেটের টিন আসতে দেরী হচ্ছে। ফকরুদ্দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলছেন যে অমুকদিন অমুক সময় টিন এসে পৌঁছান চাই এবং এলে আমায় খবর দেবেন। নতুন করে টিউবওয়েল বসাতে হবে, দেরী হয়ে যাচ্ছে—সেখানেও ফকরুদ্দিন। ওষুধ গিয়ে পৌঁছয়নি বড় বড় ডাক্তাররা ছোটাছুটি করছেন। তা নইলে ফকরুদ্দীনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। একজন মন্ত্রী চেষ্টা করলে গোটা সরকারকে চালিয়ে নেওয়া যায় এবং যথোচিতভাবে আর্তত্রাণ করা যায়। সেদিন ফকরুদ্দীনের কর্মদক্ষতা দেখে যেমন বিস্মিত হয়েছিলুম, তেমনি ওঁর ওপর শ্রদ্ধাও বেড়েছিল। কোন কোন সংবাদপত্র মাঝে মাঝে ওঁর ওপর সাম্প্রদায়িকতার দোষ চাপাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। অনেকভাবে অনেকদিন আমি মিশেছি মতদ্বৈধ হয়েছে, অনেক তর্ক হয়েছে, কিন্তু হৃদ্যতা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাপ আসামের লোক, উত্তরভারতে চাকরির জন্য যান এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। ফকরুদ্দীন ব্যারিস্টারী পাস করে আসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে জেল খেটেছেন, অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছেন, রাজ্যে এবং কেন্দ্রে তো মন্ত্রী ছিলেনই, পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হন। কংগ্রেস যখন ভাগ হয়, উনি একদিকে আর আমি একদিকে। তবু দেখা হলে হৃদ্যতার অভাব হয়নি। বিধান শিশু উদ্যান উদ্বোধনের সময় সসঙ্কোচে রাষ্ট্রপতিকে লিখলুম, "রাষ্ট্রপতি মহোদয়, যদি আপনার সময় ও সুবিধেমত এসে বিধান শিশু উদ্যানের উদ্বোধন করেন, তাহলে আমরা বাধিত হব।" উত্তর এল ফকরুদ্দিনের কাছ থেকে। "দাদা, আপনাদের যেদিন সময় আর সুবিধে হবে, সেদিনই আমি যাব।" উদ্বোধন করতে এলেন। তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা। কিছু অবুঝ পুলিস কর্মচারীদের অযথা হস্তক্ষেপের ফলে একবার মনে হয়েছিল রাষ্ট্রপতিকে এনে কাজ নেই। অবশ্য তৎকালীন পুলিস কমিশনার বিচক্ষণতা ও কার্যদক্ষতা সহকারে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। গোড়ায় ঠিক ছিল, শিশু উদ্যান উদ্বোধন করে অরুণাচল যাবেন। যেমনি আমার মুখে শুনলেন যে শিশু উদ্যানের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যেবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, অমনি সব বাতিল হয়ে গেল। শিশু উদ্যানে ডাঃ রায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করার কথা। পুলিস কর্তৃপক্ষ মঞ্চ থেকে মর্মর মূর্তি অব্দি গাড়ী করে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি গট্‌গট্‌ করে হেঁটে চলে গেলেন, কারুর কথা শুনলেন না। জনসভা শেষ হবার পর রাজভবনে ফিরে গেলেন এবং আবার সন্ধ্যেবেলা এলেন। হেঁটে ঘুরে ঘুরে সবটা দেখলেন। আমি যখন বললুম যে পুলিসের পক্ষ থেকে মঞ্চের একপাশে শৌচাগার করার কথা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির নাকি হাঁটতে কষ্ট হয়, উনি হেসে বললেন যে রাষ্ট্রপতি ভবনেই তো তাঁকে রোজ দু'মাইল করে হাঁটতে হয়। শিশু উদ্যান দেখে মহা খুশী। আমাকে বললেন যে আপনি তো বেশ আছেন, এত বড় বাগান। আমি বললুম, "ভাইসাহেব, তোমার তো মোগল গার্ডেন আছে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, "ওখানে তো আমি আবদ্ধ। চারদিক পাঁচিল ঘেরা।" প্রায় দশবছর আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তখন থেকেই শরীর খারাপ। Emergency সই করার পর মনও ভেঙ্গে পড়েছিল। সেই সদাহাস্যময় মানুষটির আর চিহ্ন দেখতে পাওয়া যেত না। একদিন বাড়ীতে আমায় বললেন, "দাদা, বাতাঞ্জন কি কাবাব খাবেন?" আমি তো থ। মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খালি হাসছেন। শেষে কৌতূহল না চাপতে পেরে জিজ্ঞেস করলুম যে ওটা কিসের মাংসের কাবাব? হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসি আর থামে না। বললেন, "আপনারা যাকে বেগুন পোড়া বলেন, এটা তাই। গালিব খুব খেতে ভালবাসতেন।" বাঁকুড়ায় যখন পূর্বাঞ্চলের সব প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলন হল কামরাজ ছিলেন সভাপতি। বাঁকুড়া ছোট শহর। অত সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশ, কেউ কেউ একটু অসুবিধা অনুভব করছিলেন। ফকরুদ্দিনের স্বাভাবিক, অমায়িক ব্যবহারে বেশ একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সামান্য কথায় বলা যায় না। পাহাড়, জঙ্গল, জলপ্রপাত, ব্রহ্মপুত্র আর নানারকমের উপজাতি—এইসব মিশে একটা বিচিত্র অঞ্চল। ভারতবর্ষের মধ্যে সবশেষে আসামে ইংরাজের আধিপত্য জারি হয়। এখন আসামের অনেক অংশ বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিমলা চালিহার সময় অনেক সমস্যাই ছিল। চালিহা স্বভাবে ছিলেন শান্ত ও ভদ্র। কিন্তু শাসন-

[illegible] অসুস্থ হওয়ায় জীবনের শেষের দিকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। গঠনমূলক কর্মীরূপে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহুদিন 'নিখিল ভারত কাটুনী সংঘে'র সদস্য ছিলেন। রচনাত্মক কাজে গভীর আগ্রহ ছিল। আর আদর্শের দিক দিয়ে ছিলেন গান্ধীবাদী। মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হত, কিন্তু গ্রাহ্য করতেন না। আমি একবার জোর করে জয়পুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নাগাল্যান্ড সম্বন্ধে জয়প্রকাশের শান্তিমিশনের খুব বড় সমর্থক ছিলেন। যখনই দিল্লীতে শান্তিমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে, বিমলা চালিহা প্রবলভাবে নানা যুক্তি দিয়ে শান্তিমিশনের সার্থকতা বুঝিয়েছেন।

কামাখ্যা (ত্রিপাঠী) ছিল একজন দক্ষ শ্রমিক সংগঠক এবং তার INTUC'র সংগে যোগাযোগ বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কামাখ্যাদের আদি বাস উত্তরপ্রদেশ, কিন্তু সেজন্য আসামে ওর কাজকর্মে কোন অসুবিধা হয়নি। দেবকান্ত (বড়ুয়া) তো সুপরিচিত। আমার সংগে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এক পরিবারভুক্ত বললেই চলে। সুকবি, সুসাহিত্যিক ; কেবলমাত্র অসমীয়া ভাষা নয়, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। ১৯৫২-তে লোকসভায় কংগ্রেস দলের ডেপুটি চিফ্ হুইপ্ ছিল, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে জহরলাল ওকে অনেক কাজের দায়িত্ব দিতেন।

চীন বমডীলা আসার পর কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি অনেকদিন আসামে ছিলুম। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ ত' ছিলই আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও বহুবার যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেইসময় যে সব বিচিত্র ঘটনা আসামে দেখেছিলুম, তা ভোলবার নয়। অবশ্য তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। গোহাটি থেকে ডিব্রুগড়ের দিকে যাচ্ছি, দেখলুম, মাইল পোস্টগুলোয় মাইল লেখা অংশটা মোছা, আর বড় রাস্তার ধারে ধারে ছোট রাস্তার মুখে যে সব গ্রামের নাম লেখা বোর্ড, সেগুলোর নাম লেখা অংশটুকু মোছা। গোড়ায় ঠিক খেয়াল করিনি, পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে এগুলো সব মুছে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬২ সালেও কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের ধারণা ছিল চীনা সৈন্যরা গ্রামের নাম পড়ে ও মাইল পোস্টের মাইল দেখে ধীরে ধীরে এগুবে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বাবার সংগে কলকাতা আসতে যেমন রাস্তার ধারে মাইলপোস্টের ইংরাজী সংখ্যা পড়ে ইংরাজী ১, ২,........শিখেছিলেন, ভারত সরকারের ধারণা হয়েছিল, চীনা সৈন্যরা বোধ করি সেইভাবে এগিয়ে যাবে। প্রকারান্তরে অবস্থা তাই ছিল। আসাম থেকে কলকাতা অব্দি প্রতিরোধ করবার মত কোন বাহিনী ছিল না। তেজপুরের ঘটনা আরও বিচিত্র। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারী ব্যাঙ্কে নথিপত্র ও কারেন্সী নোট পোড়ান হয়। এই দহনকার্য সর্বসমক্ষেই

[illegible] থেকে এইসব কার্য করা হয়, অথচ স্থানীয় লোকদের বলা হচ্ছিল, তারা যেন স্থানত্যাগ না করে। চীনা সৈন্য কাছাকাছি আসার জন্য আসামের অধিবাসীদের মনে একটা মিশ্র ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে যাকে demoralisation বলে সেটা ঘটল কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব কার্যকলাপে। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল গ্রামত্যাগ। নওগাঁতে এক সময় ৫০,০০০ লোক এসে হাজির হয়েছিল। চা-বাগানের ম্যানেজাররাও অদ্ভুত মনোবল (?) দেখিয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী সব পদস্থ কর্মচারীই সব ফেলে রেখে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে যানবাহনের অভাবের জন্য অনেকে পালিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। সেই সময় দেবকান্তর সংগে অনেক জায়গা ঘুরেছিলুম। রাজ্য সরকার নিরুপায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ভয় উৎপাদনের সবরকম অপচেষ্টা হয়েছিল। আসামের অনেক অঞ্চলের লোককেই প্রতি বছর ধনপ্রাণ নিয়ে বিপর্যস্ত হতে হয় ব্রহ্মপুত্রের বন্যার তাণ্ডবলীলায়। কিন্তু স্বয়ং সরকারের পক্ষ থেকে যদি ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা সামাল দেওয়া খুব শক্ত। রাজ্য সরকার এবং মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেক কমিটি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে জনস্রোত সামাল দেওয়া প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। যে যেমন অবস্থায় ছিল চলে এসেছে। ইস্কুল-কলেজ সব ভর্তি। তেজপুর হাসপাতালের কথা আগেই বলেছি—জওয়ানদের কান্না, শীতবস্ত্রের অভাবে ১৪,০০০ ফিট ওপরে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। তার উপর কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে 'ফ্রস্ট'-এ। জওয়ানদের অভিযোগ, তারা দেশরক্ষার জন্য লড়াই করতে পারল না—অসহায় অবস্থা। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও আসামের জনসাধারণ ও নেতাদের মনোবল অটুট ছিল। আমরা অনেকেই একসংগে ঘুরেছি। নিজেরা অনেক বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি, দেশরক্ষার কথা বলেছি। কিন্তু এক আক্রমণে আমরা অর্থাৎ যারা দেশের কর্ণধাররূপে বিবেচিত হতুম, তারা কত বড় অপদার্থ তা প্রমাণিত হয়। এর ওপর আসামবাসীদের আর একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের উপদেশ দেবার জন্য দলে দলে নেতা, উপনেতা, পার্লামেন্টের সদস্য, আরও অনেক দায়িত্বশীল নাগারিক আসতে আরম্ভ করেন। যে সব আসামের অধিবাসী সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছে, সরকার তাদের দিকে নজর দেবে, না এইসব গণ্যমান্য অতিথিদের সাড়ম্বর অভ্যর্থনার আয়োজন করবে—এই বিভ্রাটের সম্মুখীন হতে হয়। রাজ্যপাল একদিন করুণ সুরে আমায় বলেন, "যাঁরা আসছেন তাঁরা আমাদের অতিথি, সব সময়ই বরেণ্য। তাঁদের সাহায্য এবং সহানুভূতি আমরা চাই। কিন্তু সাময়িকভাবে যদি তাঁদের আসা-যাওয়াটা বন্ধ করা যায়। তাহলে ভাল হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে কয়েকবার বিভিন্ন ব্যক্তির অনুরোধে তাঁদের অর্থ সাহায্য করবার জন্য ওখানকার কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীকে চিঠি দিলে মহারানী ঐ ব্যক্তিদের টাকা দিয়েছিলেন। এইরূপ একবারকার কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন কোন পত্রিকা সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য তাহা আমি জানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা কৃতকার্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মহারানী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী তন্দণ্ডে চারিশত টাকা প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় চারিশত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারিশত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। * (* বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সংকলিত।)

'সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল; তিনি সেই পত্রিকা স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙলায় লিখিত হইত। বাঙলা ভাষায় বাঙালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু 'রজনী'র হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক চরিত্র অংকিত করিলেন।'

শচীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা থেকে সংগ্রহ করে এই যে লিখেছেন, 'উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল' এবং শেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। —এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কলকাতায় ঐ সম্পাদকের সংগে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কয়েকটা চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল এবং সম্পাদকের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের নানা সূত্রে পরিচয়ও ছিল।

শচীশবাবু তাঁর লেখায় সম্পাদকের নাম অথবা সম্পাদকের কাগজের নাম, কিছুই উল্লেখ করেন নি। তাই এতকাল পরে সে সব খুঁজে বার করা, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে ঠিক ঐ সময়কারই একটা বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বিলাত আপীলের চান্দা' এবং 'কবি মাইকেলের নিরাশ্রয় পুত্রদ্বয়ের সাহায্যার্থে চান্দা' শিরোনামায় চাঁদা আদায়ের কয়েক বারের বিবরণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকবার তীব্রভাবে আক্রান্ত হতে দেখছি। কাগজটির নাম 'মধ্যস্থ'। কাগজে সম্পাদকের নাম নেই। শুধু আছে—এই পত্র কলিকাতা সিমুলিয়া কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ২০১ নং ভবনে মধ্যস্থ যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাগজে সম্পাদকের নাম না থাকলেও জানা গেছে, এই 'মধ্যস্থ'র সম্পাদক ছিলেন, সেকালের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোমোহন বসু। মনোমোহনবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও ছেলেবেলায় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে বছর বহরমপুর থেকে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' বার করেন, সেই বছরই অর্থাৎ ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে মনোমোহনবাবুও তাঁর সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চার বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। মনোমোহনবাবুও তাঁর মধ্যস্থ ঐ চার বছরের মতই সম্পাদনা করেছিলেন। মধ্যস্থ প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে হয় মাসিক। ১২৮০ সালের পুরো মধ্যস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থ ২য় ভাগ খণ্ডটি আমার কাছে আছে। মধ্যস্থ আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। তাই অনেকেই হয়ত এ পত্রিকা দেখেননি। কেউ কেউ হয়ত এর নামও শোনেন নি। আমার এক বন্ধু জ্যোতিপ্রসন্ন সেনের বাড়ির পুরাতন গ্রন্থাগার থেকে এটি পাই। এতে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসংগ আছে, তা তিনি জানতেনই না।

আগেই বলেছি, কলকাতার কোন্ কাগজের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, তা আজ খুঁজে বার করা অত্যন্ত কষ্টকর, কে জানি না, তবুও চাঁদা আদায়, বার বার আক্রমণ এবং সর্বোপরি সময়ের সংগে ঠিক মিলে যাওয়ায়, এই মধ্যস্থ থেকেই, কিছুটা প্রসংগ কথা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকটা আক্রমণ একেবারে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হুবহু এইজন্য যে, পাঠক-পাঠিকারা দেখবেন আক্রমণ কী তীব্র ছিল। তাই এর মধ্যে আর নিজের কোন কথা দিলাম না এবং উদ্ধৃতিও ছোট করলাম না।

প্রথম বছরের বঙ্গদর্শন কলকাতার ভবানীপুরের একটা ছাপাখানা থেকে ছেপে প্রকাশিত হলেও, দ্বিতীয় বছর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেসে ছেপে সেখান হতেই প্রকাশিত হত। পত্রিকা ও প্রেস দেখাশুনা করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কর্মচারী রেখেছিলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রও দেখাশুনো করতেন।

দ্বিতীয় বছরের অর্থাৎ ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'গর্দভ' নামে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এই প্রবন্ধটিকে তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। লোকরহস্যের প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখে গেছেন—

'বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্য মাত্র গালি গালি ভিন্ন রহস্য নাই। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। .... সামাজিক যে সকল দোষ তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। .... এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।'

'গর্দভ' প্রবন্ধ ছাড়া অন্যান্য কারণেও মধ্যস্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত শ্রীঅঃ (অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র সরকার) লিখিত 'তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধের জন্য লেখকের সংগে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকাও আক্রান্ত হয়েছিল। ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যস্থে একজন লিখেছিলেন—

রাগিণী—একা বাহাদুর
তাল—গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল

....

যে লেখা লাগে নজরে
সে কলম কজনে ধরে
কাকের ছানা, বকের ছানা
হ্যাঁদুর দেবতা খ্যাড় মাটি।
ভূষিমাল ময়লা ধরা
ভেতরেতে গর্দা ভরা।

....

এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে
এডিটার বহু নরে
(কিন্তু) কলম যে কিরূপে ধরে,
তা অনেকে জানে না।
একখানা বিকোয় না দেশে.
মশলা বাঁধে অবশেষে।
তবু কত সর্বনেশে কলম ধরতে ছাড়ে না।

এইভাবে ঐ দীর্ঘ কবিতায় গালি দিয়ে কবিতার শেষে কবি লেখেন—

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'এবার অতি অল্প হইল।' অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন—পরে আরও বেশ আক্রমণ হবে। অবশ্য এই 'তুলনায় সমালোচন' নিয়ে মধ্যস্থ-র কয়েক সংখ্যায় আরও আক্রমণ চলেছিল।

এবার 'গর্দ্দভ' প্রবন্ধটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কীভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলছি। আক্রমণের হেতুটা জানবার জন্য 'গর্দ্দভ' প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'...হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা আছে। কেননা, আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন! আমার পূজা গ্রহণ করুন।......

হে গর্দ্দভ, কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র! যেখানে সেখানে তোমারই বড় বড় পদ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া উকিল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তি সুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া তুমি দয়াময় হইয়া অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও। তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখন দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সংগোপনপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভ-লোকপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে 'প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল' বলিয়া মহা গর্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠী মধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈল-নিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া তুলট হস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।....

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব-পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন?

তুমি নানারূপে নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।....

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত; বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর; বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি, ঘাস খাইয়া সুখী কর।'

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই গর্দ্দভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, তখন ১৮ই শ্রাবণ তারিখের মধ্যস্থ পত্রিকায় চিঠিপত্রের আকারে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল—

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় একখানি ভদ্রগোচ সংবাদপত্রের সম্পাদক। সুতরাং নানা রকমের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র দেখিতে পান। কাঁঠালপাড়ার বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ মাসের সংখ্যা আপনার হস্তগত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তৎসন্নিবিষ্ট 'গর্দ্দভ' নামক প্রবন্ধটিও পাঠ করিয়া থাকিবেন। আপনার সরল হৃদয় পাঠক মনে করিতে পারেন, বঙ্গদর্শনের লেখক একজন সভ্য লোক, তিনি কি কখনো ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত ছলে কথা কহেন? এটি কেবল গর্দ্দভেরই স্তব হইবেক, পাঠকের এই বিবেচনা অযৌক্তিক নহে।

আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করণের পূর্ব্বে আত্মপরিচয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। আমি বঙ্গদর্শনের সেই আরাধ্য দেবতা। আপনার নিকট পরিচিত হইলাম। এক্ষণে একটি উপকার করুন। আমার প্রিয়দর্শন বঙ্গদর্শনের সহিত আমার মাসান্তে দেখা হয়। আপনি প্রতি শুক্রবার লেখকের বাটীতে গিয়া দেখা করেন। আপনার নিকট আমার এই অনুরোধ, আগামী শুক্রবার যখন দর্শন সম্পাদকের বাটীতে যাইবেন, আমার এই আশীর্বাদী পত্রখানি আমার সেই প্রিয় ভক্তকে দিয়া আসিবেন, তাহাতে বড় বাধিত হইব।

প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক ভক্তবরেষু।

বাছা! বরংবৃণু! বরংবৃণু! কেননা এতদিনের পর জানিলাম বঙ্গদেশে আমার মহিমা বুঝে এমন ব্যক্তি আছে। তোমার বুদ্ধি বলে তোমার অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মধ্যে আর যে তাচ্ছিল্যভাজন হইব না, এতদিনের পর সে আশা জন্মিল। তাঁহারা অনায়াসে বুঝিবেন, যখন কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট আমার অবতার মাত্র হইয়া পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখন আমি স্বয়ং বা কেন উপেক্ষিত হইব? অদ্য তোমার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অগ্রসর হইলাম।

হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! আমি অনেকবার অনেক ভার বহন করিয়াছি। কিন্তু এখন যে কতকগুলা আনাড়ী লোকে আমার পৃষ্ঠে, ইংরাজী গ্রন্থাপহারিত ভাব-পূর্ণ বাঙলা পুস্তকের বোঝা অর্পণ করে, তাহার ভার আর সহ্য করিতে পারি না। যা হউক, বাপু! তুমি একজন সুলেখক, তুমি একটু চেষ্টা করিয়া আমার

[illegible] রাজ্যের রাজত্ব কর। আশীর্বাদ করি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বক্তৃবিদের ন্যায় গর্দভ-প্রধান হও।

আমার ভক্তের মধ্যে আধুনিক বাঙলা গ্রন্থাকারের মাথা বড় সুখাদ্য, যেহেতু উহাতে বিলাতী-পনিরের গন্ধ পাওয়া যায়। হে সুক্ষ্মদর্শন! অদ্য জানিতে পারিলাম, দ্বাপরে যে পুচ্ছ আমার মস্তক শোভিত করিয়া ভক্তজনের মনোরঞ্জন করিত, এই কলিতে তাহা দোলায়মান সুগোল রূপ ধারণ করিয়া তোমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি আমার ভক্তের মধ্যে প্রধান।

হে ভক্তপ্রবর! আমার এই গর্দভ অবতারের আদ্যান্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। একদিন আমি বিষ্ণুলোকে বসিয়া অবসরক্রমে একখানা মাসিক পুস্তক পড়িতেছিলাম। এমন সময় বীণাপাণির দুহিতা বঙ্গভাষা সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—হে চতুর্ভুজ! আপনি দস্যু-দলন বলিয়া ত্রিভুবন খ্যাত, অতএব আমাকে নিরাপদ করিয়া আপনার নামের আধুনিক সার্থকতা সম্পাদন করুন। আমি বাঙলা গ্রন্থকারস্বরূপ দস্যুদিগের অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না। অবগত আছেন, আমি বহুদিন হইতে উপযুক্ত ভক্তদিগের বিরহে দিন দিন 'দীনা, ক্ষীণা, মলিনা' হইতেছি। বিদ্যাসাগর নামে একটি প্রিয় ভক্ত আছে, তাহার উপর আবার যত বিলাতী সভ্যতা-প্রাপ্ত ষণ্ডতে প'ড়ে দস্যুর আচরণ করিতেছে। আবার আমাকে (এই দেখুন বলিয়া অঙ্গে বন্ধন চিহ্ন দেখাইয়া বলিল) বিলাতী রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া, মাসে মাসে, বৎসর বৎসর যখন তখন—কখনো বা বিজাতীয়দিগের উচ্ছিষ্ট কাব্যরস, কখনো দেশী ঝাল মিশ্রিত আচার [তাও আবার অধিক পরিমাণে] খাওয়াইয়া মারিতে উদ্যত। জানেন আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত, মধুপানে শরীর কোমল, তাতে আবার শোকে এখন শীর্ণ হইয়াছে, তবে কি করিয়া মদ্যপায়ী প্রিয় দ্রব্য আমার স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। এখন আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর উপায়ন্তর নাই।'

বাপু! শুনিলে—বঙ্গভাষার এই দুরবস্থা কাতরোক্ত বচনে দস্যুদলন মানসে, গর্দভরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। অচিরাৎ গর্জন দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব। তুমি আমার বরপুত্র রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ, সুতরাং সর্বাগ্রেই আমার পূজা সর্বত্রে উত্তমরূপে প্রচার করিতেছ ও করিতে থাক। তোমার প্রথম পূজাতেই প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি—কিছুকাল ধনেমানে মর্ত্যসুখ ভোগ কর, পরে কাল পূর্ণ হইলে, বিষ্ণুর পরম ভক্ত যেমন অন্তে চতুর্ভুজ দেহপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারে আমার চরণ প্রসাদে তুমিও আমার এই চতুষ্পদ মূর্তি ধারণের যোগ্য হইবে—সাধনা কর—এইরূপে আর দিনকতক সাধনা কর, সিদ্ধ হইবে!!!

কলিকাতা ইউনিভারসিটি — আশীর্বাদক
৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার — শ্রীগর্দভ

১৮ই শ্রাবণের মধ্যস্থ পত্রিকায় শ্রীগর্দভের চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার দু' সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৩২শে শ্রাবণের মধ্যস্থয় একেবারে প্রথমেই 'বঙ্গদর্শন—গর্দভ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে প্রকৃত বা ছদ্ম কোন নামই কারও নেই। তাই এটি স্বয়ং সম্পাদকের লেখা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধের মাথায় সম্পাদক শুধু ভনিতা হিসাবে লেখেন—আমরা অনেকের অনুরোধে এই প্রস্তাবটি এস্থলে প্রকটন করিতে বাধ্য হইলাম।

এখন ঐ 'বঙ্গদর্শন—গর্দভ' প্রবন্ধটি সবই এখানে উদ্ধৃত করছি—

এক গর্দভের কথায় সুসভ্য বঙ্গীয় নরমণ্ডলে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এ সং বড় মন্দ দেওয়া হয় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি আমোদ-কাংলা বাংলা দেশে লোকের মনোরঞ্জনার্থ কত কত মহাশয় কত রং, কত ঢং ও কত সং-বিশিষ্ট কত পত্র, কত পুস্তক, কত নাটক, কত ছড়া, কত গীত কত কি প্রচার ও গান করিলেন, তাহা গণিয়া উঠা ভার; কিন্তু সে সকলের টেক্কা স্বরূপ প্রিয়দর্শন বঙ্গদর্শন আজকাল সকলের মনোহরণ করিতেছেন। বিশেষত বৃহল্লাঙ্গুল এবং গর্দভাদি—লেখক মহাশয়দিগের প্রতিভার আভা এত তেজস্বী যে, বঙ্গীয় যুবক-গণের পক্ষে তত্তাবৎ সম্মোহন-বাণ বিশেষ হইয়া উঠিতেছে। দুঃখের মধ্যে তাঁহাদের সুকোমল দর্শনেন্দ্রিয় তত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া এককালে অন্ধবৎ হইয়া পড়িতেছে।

তাহা হউক, তথাপি আমোদের এক শেষ হইল! এতদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য আসরে একদল উত্তম গায়ক যে নামিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় নাই। ইঁহারা যখন প্রথমে তানপুরাদি যন্ত্রের সুর বাঁধিলেন, তখন বোধ হইল 'কালোয়াতি গান' হইবে।। গৌরচন্দ্রিকাতে বোধ হইল কীর্তন, হালকা গানে বোধ হইল ঢপ্, সমালোচনের ছড়া শ্রবণে বোধ হইল পাঁচালি, দুই একটা তুক্কা শুনিয়া বোধ হইল কালীয় দমন যাত্রা, এখন গর্দভাদির সং দেখিয়া বোধ হইতেছে 'কেরপারামের আম বাত্তারাই' বা হয়! এত দূর হইয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহারই বা নিশ্চয় কি? এক একদল যাত্রাওয়ালা আছে, তাহারা খোল, করতাল, তবলা, ঢোল, নূপুর, ঘুঙুর, চামর, মন্দিরা, পুতুল তার প্রভৃতি সকলই সঙ্গে রাখে। যখন যেমন জুটে যায়, তখন তাহাই করে কৃষ্ণযাত্রা তকলার যাত্রা ঢপের গান গাছ রামায়ণ এবং পুতুলবাজি পর্যন্ত কিছুই ছাড়ে না। ইহারাও সেইরূপ সর্বতোষক ও সর্বপোষক হওয়াই শেষে ছায়াবাজী পর্যন্ত না দেখাইয়া কি ছাড়িবেন?

কেহ কেহ বলেন ইঁহারা তাহা করুন মানা করি না, কিন্তু গরীব বেচারা সেকেলে মরা মানুষগুলোকে ধরিয়া আনিয়া এত ষাস্তাধাস্তা কেন করেন? হিন্দুজাতির দেবাবতার ও দেবতুল্য পরম পূজ্য পুরুষগণকে তাঁহাদের আপনাদের আরাধ্য গর্দভদেবের সাজে সাজাইয়া কি সুখ পান, তাহাতো বুঝিতে পারি না।

কেহবা বলেন, যদি মৃত জীবিত সকল নরদেহী জীবই গাধা হইল, তবে
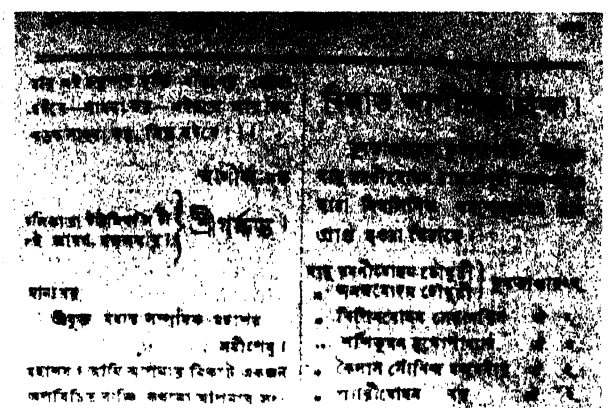
শ্রীগর্দভের পত্রের শেষাংশ

তাঁহারা জনকতক মানুষ হইয়া এতবড় বিশাল ভূমণ্ডলে কিরূপে ও কিসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন? যাঁহাদিগকে লোকে চিরকাল বীরশ্রেষ্ঠ ও ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ও নরপাল বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছে তাঁহারা হইলেন গাধা! যাঁহা-দিগকে বড় লেখক বলিয়া লোকে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহারাও হইলেন গাধা! যদি এত গাধা হইল, তবে এই গাধার জগতে যে বিধাতা দুই চারি জন মনুষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে গাধার সহিত সহবাস ও আলাপজনিত ঘোর ক্লেশে নিক্ষেপ করিলেন, সেই বিধাতাও কি গাধার ন্যায় আক্কেলবান নহেন?

উপরের এই তর্কটি শুনিয়া একজন রসিক পুরুষ (অথবা রসিক গাধা) সেদিন এই গল্পটি করিলেন—

বাউনাড়া গাঁয় বড়াইরাম নামে এক যুবা পুরুষ বড় সুখে বাস করিত। তাহার অসুখের দুইটি প্রধান কারণ ছিল। তাহার প্রথম এই যে, সে ভাবিত, আমি রূপে, গুণে, বিদ্যা, সাধ্যে সবার চেয়ে এত বড়, (পুকুরের পাড়ের চেয়ে হিমালয় যত বড়, তত বড়!) এবং সকলেরি ভুল-ভ্রান্তি দেখিতে পাই, আমার তা মোটে নাই—সকলেই কম বুঝে, আমি সব বুঝি; তবু আশ্চর্য এই আমি যা বলি লোকে তা শুনে না; আমি যা করি লোকে তা করে না; আমি কোথায়ও গেলে লোকে উঠে দাঁড়ায় না, আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না (তা তো করবেই না!) তারাও আমাকে গ্রাহ্য করে না।

... কি সময়যোগ্যা মানবী তাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কাহারো সহিত বন্ধুত্ব করিতে পাইল না। অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রণয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইল না।

কিছুকাল এইরূপে যায়, বড় অসুখ। ক্রমে লোকালয় আর ভাল লাগে না. সমস্ত নরনারী যেন কীটপতঙ্গ—সকলেই যেন দুচক্ষের বালি। অবশেষে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অসামান্য তেজভরে একদিকে বাহির হইয়া পড়িল। প্রান্তর মধ্যে এক বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া মহা আস্ফালনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আত্মমাহাত্ম্য ও আর সকলের হেয়ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই গাছে এক মায়াচারী ব্রহ্মদৈত্য বাসা করিয়াছিল। সে দেখিল এ ব্যক্তির নিকটে দ্বিতীয় মনুষ্য নাই, অথচ 'আমি এমন তেমন, আমাকে বেটারা মানে না, এত বড় স্পর্দ্ধা' ইত্যাদি গর্বিত বাক্যে বায়ুর সহিত প্রবল পরাক্রমে বিতণ্ডা করিতেছে। ব্রহ্মদৈত্য তাহার ভাব দেখিয়াই বুঝিল, এ ব্যক্তি অহঙ্কারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

মায়াচারী তৎক্ষণাৎ এক ক্ষেমঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উড়িয়া আসিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়া বড়াইরাম ভাবিল স্বয়ং ভগবতী আমার দুঃখ দূর করিতে আইলেন। অমনি প্রণিপাতপূর্বক আত্মমনোবেদনা সমস্তই সুগোচর করিয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'মা। আমাকে মানুষ দেখাইয়া দাও।'

ক্ষেমঙ্করী স্বীয় দেহ হইতে একটি পক্ষ উৎপাদন করিয়া বলিল, 'যাও বৎস। এই পালকটি কর্ণে দিয়া হট্টে যাও, যাহাকে মানুষ দেখিবে, তাহার সহিত প্রণয় সূত্রে বন্ধ হও, তাহাকে ছাড়িও না।' যেমন বলা অমনি পক্ষীর অন্তর্ধান হওয়া।

বড়াইরাম পালক লইয়া মহাহর্ষে ও মহাদর্পে পুনর্বার লোকালয় চলিল। এক হট্টে গিয়া উপস্থিত হইল। কানে পালক দিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করে, মানুষ দেখিতে পায় না। যাহারা হাট-বাজার করিতেছে সকলেই শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, শকুনী, গৃধিনী, শালিক, গাধা ইত্যাদি।। তাহারা যে যাহা বলিতেছে, সব যেন শিয়াল কুকুরাদির ডাক। দেখিতে অতি ভীষণ। মনুষ্য হইয়া এককালে সহস্র সহস্র ইতর প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করা কত বড় বিভীষিকা-ময় ব্যাপার তাহা বঙ্গদর্শনের লেখক মহাশয়েরা বিলক্ষণ ভুগিতেছেন।

বড়াইরাম সেই বিস্তৃত হট্টে এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে একমাত্র নরদেহ দেখিতে ও সেই দেহের মুখ হইতে একমাত্র মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে দেহ একটি স্ত্রীলোকের। তাহার বর্ণ ঠিক জাম্ববর্ণ, তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে বিশাল, তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ তাহার কেশ যেন তারের চেঁচ, তাহার চর্ম অতি কঠোর, তাহার গায়ে মলাপুঞ্জ স্থানে স্থানে যেন দ্বীপপুঞ্জ; তাহার চাহনি প্রাণহারিণী (মনোহারিণী নহে।) তাহার স্বর ঋষভ-নিন্দিত কি বায়স-কূজিত নিনাদ অপেক্ষাও সুমধুর। সে কয়গাছি খেংরা বিক্রয় করিতেছিল, তাহা হইল; পরে সে এক পয়সার শুটকী মৎস্য আধ পয়সার প্যাঁজ, আধ পয়সার মুলো, আর এক পয়সার মিসি ফিসি হ্যানত্যান কিনিয়া সায়ংকালে বাটী চলিল। বড়াইরাম ক্ষেমঙ্করীর উপদেশানুসারে তাহারই পশ্চাৎ লইল।

মাঠের মধ্যে যখন স্ত্রীলোকটি দেখিল, একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে, সে ভয় পাইল [যদি অমন দেহে ভয় বাসা পায়।] যাহা হউক নিদান তাহার সন্দেহ হইল। সে ছল করিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। —তখন তাহার আরও সন্দেহ বাড়িল, সে আবার চলিল। বড়াইও চলিতে লাগিল। সে দৌড়িল বড়াইরামও দৌড়িল। সে বসিয়া পড়িল, বড়াইরামও বসিল। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে গা? উত্তর হইল—আমি তোমারই। সে কহিল 'মর বেটা, তোর ঘরে মাসী কেউ কি নেই?' উত্তর 'তুমিই আমার সব'। মেয়েমানুষ ছুটিল। বড়াইও তাই করিল। সে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, 'ওগো দাদাগো! ওগো শিগ্গির করে এসো গো। এক মিনসে আমায় মারে গো।'

তাহার দাদা এক লাঠি হাতে ছুটিয়া আইল। আসিয়া বলি[illegible] 'থাকি কিরা?' থাকি দেখাইল—'ঐ যে।'

থাকী বাটী প্রবেশ করিল. বড়াইরামও সঙ্গে সঙ্গে যায়, এমন সময় ঘাড়ে এক ঘা লাঠি পড়িল। 'বাবারে' বলিয়া চীৎকার। কিন্তু মনের এ ক্ষিদে, তৎক্ষণাৎ উঠিয়াই থাকীর পশ্চাতে ধাবিত হইল। সেবারে থাকীর দাদা আসিয়া বড়াইকে ধরিল। বড়াই বলিল—ছেড়ে দাও তুমি শিয়াল, আমি মানুষ, আর ঐ আমার মেয়েমানুষ। তুমি আমায় ধর কেন?

থাকীর দাদা বুঝিল, এ পাগল। তাহাকে লইয়া ঘরের হাতিনায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমাকে ভদ্রলোক দেখিতেছি, তুমি এমন কেন হইলে?

বড়াইরামের কানে পালক থাকাতে ঐ কথাগুলি যেন ঘেউ ঘেউ শব্দের মত শুনিতে পাইল। সুতরাং কোন উত্তর করিল না। সেটি ডোমের বাড়ি। পাড়া-সুদ্ধ ডোম জড়ো হইয়া যে যাহা বলে, বড়াইরাম সকলই ইতরপ্রাণীর বুলি শুনেন এবং তাহাদিগকে ইতর প্রাণী দেখেন। কিন্তু যেই মাত্র থাকী আবার আইল, অমনি মহাপ্রফুল্ল হইয়া তাহার নিকট যাইতে চায়। থাকী যেই মাত্র কথা কহিল, অমনি বুঝিতে পারিয়া যথোচিত উত্তর দিতে লাগিল। থাকী বুঝাইল—তুমি ভদ্রলোক, আমরা ইতর লোক, আমাদের বাটীতে রাত্রে থাকিলে তোমার জাতি যাইবে, অতএব বাটী যাও, ইত্যাদি

সেকথা কে শুনে? তদুত্তরে কেবলই প্রেমের কথা। তচ্ছ্রবনে থাকী ডোমনীর দাদা সহ্য করিতে না পারিয়া আবার মারিতে লাগিল এবং টানিয়া-হিঁচড়িয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। এই দেরাথ্যে বড়াইরামের কানের পালক পড়িয়া গেল। ভ্রম দূর হইল, সকলকেই আবার মানুষ দেখিল। বিশেষ লজ্জা পাইল, প্রহারের যাতনায় অভিভূত হইল। তখন বিস্তর বিনয় করিয়া কহিল,

প্রতি শুক্রবার প্রকাশমান।

নবীনতাবাঁকপনায় বঙ্গদেশবাসীগণেরপরীক্ষ চিত্তরঞ্জন-[illegible]
নিত্তীক্য চিত্তপ্রফুল্লকর সত্যসাহায্য [illegible] হইবার হেতুতে [illegible]

২য় ভাগ। { শুক্রবার, ৩রা শ্রাবণ, ১২৮০ সাল। } ১১সংখ্যা।

আমরা অনেকের অনুরোধে এই ক-থাটি প্রথমে প্রকটিত করিতে বাধিত হইলাম।

বঙ্গদর্শন—গর্দ্দভ।

এক গর্দ্দভের কথায় সুসভ্য বঙ্গীয় নরমণ্ডলে মহা হুলস্থুল প-ড়িয়া গিয়াছে। এ সংবাদ মন্দ দে-ওয়া হয় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসরা-বধি-আমোদ-কাংলা বাংলা দেশের লোকের মনোরঞ্জনার্থ কত কত মহাশয় কত রং, কত ঢং ও কত সং-বিশিষ্ট কত পত্র, কত পুস্তক, কত নাটক, কত ছড়া, কত গীত, কত কি প্রচার ও গান করিলেন, তাহা গ-নিয়া উঠা ভার, কিন্তু সে সকলের টেক্কা স্বরূপ প্রিয়দর্শন বঙ্গদর্শন আজকাল সকলের মনোহরণ ক-রিতেছেন। বিশেষতঃ যুবজন এবং গর্দ্দভাদি-লেখক মহাশয়দি-গের প্রতিভার আভা এত তেজস্বী যে, বঙ্গীয় যুবকগণের পক্ষে তাহা এক সম্মোহন বাণ বিশেষ হইয়া উঠিতেছে। দুঃখের মধ্যে তাঁহা-দের সুকোমল মর্ম্মেন্দ্রিয় তত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একবারে অজ্ঞানবৎ হইয়া পড়িতেছে!

তাহা হউক, তথাপি আমোদের এক শেষ হইল। এক দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য-সাগরে একদল উত্তম [illegible] স্বক যে জন্মিয়াছেন, তাহাতে [illegible] সংশয় নাই। ইঁহারা [illegible] জামপুরাদি যন্ত্রের সুর [illegible]

'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' কাহিনীর প্রথমাংশ

আমার আর চলিবার শক্তি নাই। একে সমস্ত দিবস অনাহার, তাহাতে এই প্রহার, তোমরা কৃপা করিয়া আমায় থাকিতে দাও।

তাহাদের দয়া হইল। তাহার এখনকার কথা শুনিয়া বোধ হইল, এ পাগল নয়, সুতরাং থাকিতে দিল। ডোমগণ ও থাকীর দাদা কর্মান্তরে বাহির গেল। বড়াইরাম আবার পালক লইয়া কর্ণে পরিল। আবার সেই ভাব দাঁড়াইল। আবার থাকী ভুমনীর সহিত মিত্রতা করিতে ব্যগ্র হইল। এবারে থাকীর মন ভিজিল। ভদ্রলোক, এতটা অনুনয়, বিনয়, স্তব, আরাধনা, প্রেমোক্তি করিতেছে, ইতর স্ত্রীলোক কতক্ষণ কঠিন থাকিতে পারে? বিশেষতঃ বড়াইরাম দেখিতে কুপুরুষ নয়, অতএব থাকী ভুমনীর মন ভিজিল। কিন্তু তাহার প্রকৃতি, ব্যবহার ও বাক্য এত মধুর যে, যখন মনটা ভিজিয়া গেল, তখন সেই আর্দ্র মনের প্রতিরূপ বা প্রতিধ্বনিস্বরূপ এই কয়টি মধুমাখা কথা মুখ হইতে নির্গত হইল। যথা—

তবে এস, এখানে আর মর কেন? চল তবে ঐ চুলোয় তোমায় গুঁজড়ে রেখে আসি গে! —ইত্যাদি রূপ প্রেমের ভাষার অজস্র স্রোত বহিতে লাগিল, তাহা আমরা সকল বলিতে চাহি না। ঐ প্রেমালাপ হইতে হইতে বড়াইরামকে থাকী আপনার পর্ণ-মন্দিরে লইয়া গেল। তাহার এক পার্শ্বে দুটি শূকর ও একটি বাচ্ছা, অপর পার্শ্বে এক অজরামের সপরিবারে অবস্থান। মধ্যস্থলে একটা নেলের মাদুর পাতা। মরি মরি! সেই মাদুর কিবা তৈলাক্ত, কিবা পালিত পশুবাবলীর খুরভ্রষ্ট সুকর্দমাক্ত, কিবা অজ্ঞাতপূর্ব সদাম্লাত!

যাহা হউক থাকীর আদেশ মাত্র বড়াইরাম তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। থাকী শুকগুলো ভাজা পোড়া প্রভৃতি আনিয়া দিল, পথশ্রান্ত ও প্রহারাহত নায়ক তাহাই ভোজন করিলেন। থাকী জল আনিয়া দিল, তিনি ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে খাইয়া ফেলিলেন, থাকী বাহিরে যায় দেখিয়া বড়াইরাম বলিলেন—'কোথায় যাও', থাকী বলিল—'মুয়ে আগুন, যেখানে যাই না, তোর কি?' বড়াইরাম বলিলেন—'আমি তোমা ছাড়া থাকিতে পারিব না, যেখানে যাইবে সেখানেই সঙ্গে যাইব।' থাকী বড় বিপদে পড়িল। তাহার দাদার আসিবার পূর্বেই দুই জনে এত ঘনিষ্ঠতা ও এত ঝগড়াঝাটি হইল যে, সেই রাত্রেই বড়াইরামকে থাকীর শতমুখীর আস্বাদন পাইতে হইয়াছিল।

পরদিন, থাকী আপন দাদার কাছে বড়াইরামের সহিত তাহার বে দিতে বলিল। তার দাদা এই কথায় [illegible] তাহাকে যা কতক বলাইয়া দিল। তাহার কারণ সে অব্যক্ত রাখিল না। অর্থাৎ 'তবে আমার উপায় কি হইবে? আমার আজও বে হয়নি, তুই কি বলিয়া বে করিবি এবং কে আমার রেঁধে বেড়ে দিবে, —কে আমার সেবা করিবে?'

কিন্তু থাকী কিছুতেই আইবুড়ো থাকিতে সম্মত হইল না। বলিল—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর ফিরিবে না। বরং তোমার যা যা করতেম, তাও করবো।

পাড়ার পাঁচজনে থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল। বড়াইরামের সহিত থাকীর বিবাহ হইল। কিন্তু কোন উচ্চজাতি ডোম হইলে তাহার যে যে প্রকরণ নিরূপিত আছে, তাহার অন্যথা হইল না। তন্মধ্যে প্রধান এই—এক মাচা বাঁধা হইল, তাহার উপর থাকী বসিল, মাচার নীচে বড়াইরাম বসিলেন (কানে সেই পালক আছে) উপরে থাকী পা ধুইতে লাগিল—সেই পাদোদক বড়াইরামের মস্তকে পড়িল এবং তাঁহাকে সেই জল লেহন করিয়া পান করিতে হইল।

এইরূপে কিছুদিন কাটায়। প্রত্যহ পাঁচ-ছয় বার করিয়া থাকীর পদাঘাত ও তিন-চার বার করিয়া থাকীর খ্যাংরা খাইতে হয়। তৎবাদে ঝুড়ি, চুপড়ি বুনিতে ও শূকরাদি চরাইতে বাধিত হইতে হইল। কিন্তু থাকী সঙ্গে না থাকিলে মারিয়া ফেলিলেও বড়াইরাম এসব কিছুই করেন না।

একদিন সেই ক্ষেমঙ্করী দেখা দিল। বড়াইরাম প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী আর একটি পালক দিয়া বলিল, —এইটি তোমার প্রেয়সীর কর্ণে দিও'। বড়াইরাম পরমানন্দে তাহাই করিলেন। ওমা! থাকী কানে পালকটি দিবা মাত্র বড়াইরামকে আর মানুষ দেখে না, একটা গাধার মত আকার দেখিতে পাইল। অমনি দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বড়াইরাম একবার যান, একবার আসেন। যতবার আসেন, ততবারই খ্যাংরা। ভাগ্যক্রমে থাকীর কানের পালকটি বেশীক্ষণ থাকিতে না থাকিতে এক প্রবল বাতাসে তাহা উড়িয়া দূরে গেল। থাকী পুনর্বার বড়াইরামকে মানুষ দেখিল। কিন্তু অপূর্ব পালক তাহার কর্ণভরণ হইয়াছিল, এক্ষণে পালকের জন্য আবদার ধরিল। দেখে, বড়াইরামের কর্ণে একটি সেইরূপ পালক রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ

৭ ভা, ১২৮১। [illegible] ৫০৭

বঙ্গদর্শন—গর্দ্দভ।

পরিশিষ্ট।

মহান্ত মহাশয়! গত সংখ্যার ইতি প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ হয় নাই। থাকী ভুমনীর [illegible] নীচ [illegible] যেই অনুরক্তা [illegible] হইয়াছিল! একারণ এই পরিশিষ্ট প্রকাশের প্রয়োজন হইতেছে। [illegible] থাকী ভুমনী ও বড়াইরামের গ-ল্পটি কেন শেষ হইয়াছে, যদিও সাধা-রণ পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে, ত-থাপি আমরা কিছু বিশেষ ও বিস্তার ক-রিয়া দেওয়া উচিত। তদ্ব্যতীত আমার [illegible] বক্তব্য আছে তাহা সেই সঙ্গে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করি-তেছি।

যাঁহারা মনোযোগের সহিত বঙ্গদ-র্শনের প্রধান দুই তিন লেখকের লেখা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বুঝিতে বাকী নাই, যে, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা দুই তিন জন এবং সাহিত্যের আরো এক আধ জন ব্যতীত ভারতব-র্ষে উক্ত অঙ্গের লেখক ও গ্রন্থকর্ত্তা প্রায় আর নাই, প্রায় আর ছিলনা এবং প্রা-য় আর হইবে কি না সন্দেহ। এই যে "প্রায়" শব্দ ব্যবহার করিলাম, ইহা ভয়ে ভয়ে করিতে হইল, কিন্তু হয়তো 'প্রায়' উড়াইয়া দেওয়া তাহাদিগের অভিপ্রায় হইলেও হইতে পারে। তাঁহাদের বুদ্ধিতে বোধ দিবার জন্য এ সব কল্পনা করিয়া বলিতেছিলা। আপনি ও আপনার পা-ঠকগণকে যথার্থরূপে জানাইতেছি, যে, বঙ্গদর্শনের [illegible] লেখক গণকে পূর্ব্বে আমি নিরহঙ্কৃত ও কুসংস্কারবর্জিত ব-লিয়া ভাবিতাম, এক্ষণে তাঁহারা বিশ্ব-পূজ্য ও দেশমান্য (মৃত জীবিত) বহু ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক রূপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে অপ্রমা-ণীকৃত অলৌকিক দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিদায় করাতে আমার পূর্ব্ব বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে —তাঁহাদিগকে নিরহঙ্কারী, ন্যায় ও সদ্বিচারক ভাবিবার পরিবর্ত্তে অবিকল বড়াইরাম বলিয়া স্থির প্রত্যয় জন্মিয়াছে!

আর পরিত্যাগের পূর্ব্বে বড়াইরাম যেরূপ অনন্ত ভাবের ভাবুক ছিলেন, ইঁহাদের লেখনী ও বিশেষে সেই প্রকার ভাব, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। ক্ষেমঙ্করীর পালক কানে দিয়া বড়াইরাম কোনো মানুষকে মানুষ দেখে নাই, ইঁহারাও দুই চারিখা-না বহি লিখিয়া সামান্য গ্রন্থকারকেই গ্রন্থকার ও স্বদেশ পূজ্য কোনো মানুষকেই মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত আছেন। ব্রহ্মদৈত্যের বাস-বৃক্ষের মূলে বসিয়া বড়াইরাম যেমন [illegible] প্রলাপ-পত্র দেখাইয়াছিল, ইঁহারাও তেমনি স্বীয় অন্যান্য লেখের প্রমাণার্থ এবং

"যেমন দেবতা তিনি, সেরূপ [illegible] তিনি,
সেই প্রভু [illegible]"

এই বাক্যের সমর্থনার্থ [illegible] যে কি ছাই ভস্ম প্রলাপ-বক্তৃতা দেখাই-তেছেন, তাহার মর্ম্ম [illegible] কিছুই স্থির হইয়া উঠেনা।

বঙ্গদর্শন-গর্দভ। পরিশিষ্টের আরম্ভাংশ

তাহা কাড়িয়া লইয়া আপন কণ্ঠে পরিল। অমনি আমার ... বড়াইরাম পালকের কুহক হইতে মুক্ত হওয়াতে থাকীকে বৎ-কুৎসিতা রমণী বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার নীচ জাতিত্ব ও অন্যান্য নীচত্ব সকলই স্মরণ পথে উদিত হইল। এবার থাকী তাড়াইতে না তাড়াইতে বড়াইরাম আপনিই পলাইল। এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যের মাঠে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল 'মা ভগবতি। আমায় এমন পালক দাও, যাহাতে যথার্থ মানুষ চিনিতে পারি।'

ব্রহ্মদৈত্য এবারে ক্ষেমংকরী না হইয়া অদৃষ্ট থাকিয়া নরাকৃতে ডাকিয়া উপদেশ দিল, 'যাও বৎস। স্বদেশ যাও, সকলই মানুষ; দোষ-গুণ সকলেরই আছে; আমি বড় একথা কদাচ মনে করিও না। তোমার যেমন দশটা গুণ আছে, তেমন পাঁচটা দোষও আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপ দোষ-গুণ দুই আছে। কেও এক বিষয়ে, কেহ অন্য বিষয়ে গুণী। অতএব কাহাকেও অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিও না। নম্রভাবে সকলের সংগেই সদ্ভাবে গিয়া থাক। দেখিবে পরম সুখ পাইবে। তোমার মনের রোগ দেখিয়া আমি তোমাকে পালক দিয়াছিলাম। সে পালক আর কিছুই না, অহংকার। অহংকারের বশে লোকে আপনাকেই মানুষ দেখে, আর সকলকে গাধা, শিয়াল, কুকুরবৎ দেখিতে পায়। এমন কাজ আর কখনও করিও না। কাহাকেও নীচ জ্ঞান করিও না।'

এইখানেই 'বংগদর্শন-গর্দভ' প্রবন্ধ বা কাহিনী শেষ হয়েছে। এর পর পাদটীকা বা মন্তব্য হিসাবে লেখা হয়েছে—

মধ্যস্থ মহাশয়! আমার কথাটি ফুরাইল। এখন ভাবিয়া দেখুন, গর্দভ লেখক কানে পালক দিয়েছেন কিনা? এবং তাঁহারা কেহ কেহ বড়াইরাম ও থাকীর মতন আর সকলকে গাধা দেখিয়া আপনা আপনি পরস্পরকে বড় হন ও বড় করেন কি-না? যদি তাহা হয়, তবে তাঁহাদের ভাগ্যে বড়াইরামের ন্যায় পরিণাম ফল তোলা আছে কি-না? যাহাতে এ রোগের প্রতিকার হয়, এই বেলা আপনারা তাহার চেষ্টা করুন। অলমিতি বিস্তরেন।'

২২শে শ্রাবণ তারিখের মধ্যস্থয় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর, এর পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই ভাদ্র তারিখের মধ্যস্থয় এই বড়াইরামের কাহিনীরই জের টেনে 'বংগদর্শন-গর্দভ পরিশিষ্ট' নামে আরও একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সে লেখার একটি লাইনও আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না। ৩২শে শ্রাবণের কাগজ থেকে বড়াইরামের ঐ জঘন্য কাহিনীটি উদ্ধৃত করবার সময়েই বার বার ভেবেছি, এটাকে সংক্ষেপ করে নিজের ভাষায় কিছুটা ভদ্রস্থ করেই না হয় বলি। কিন্তু সেই সংগে এও ভেবেছি তাহলে মধ্যস্থর আক্রমণের তীব্রতা বা ঝাঁঝটা তো আর লোকে জানতে পারবেন না। আর এ কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা নিজেরা পড়েও নিতে পারবেন না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক লেখকদের দ্বারা কিরূপ নির্মমভাবে যে আক্রান্ত হতেন, সেটা দেখাবার জন্যই এ লেখাটা হুবহু উদ্ধৃত করেছি।

এখন ঐ বড়াইরামের কাহিনীটি সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত—লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করেই বড়াইরামকে বলেছেন, তাতে কারও সন্দেহই নেই। তাই এখানে বড়াইরামের সংগে থাকীর কাহিনী আনায় সেটা একদিকে যেমন, অপ্রাসংগিক, অযৌক্তিক ও অসংগত হয়েছে, তেমনি অন্যায়ও হয়েছে।

দ্বিতীয়ত—অহংকারী বলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কারও কারও ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অহংকারী মোটেই ছিলেন না। আমি আগেই বলেছি—বঙ্কিমচন্দ্র দিনে চাকরিতে হাড়ভাংগা খাটুনির পর প্রতিদিন রাত্রে আটটা থেকে দুটো আড়াইটা পর্যন্ত নিয়মিত পড়তেন ও লিখতেন। তাই কারও সংগে বসে অহেতুক গল্প করে সময় নষ্ট করার মত সময় তাঁর ছিল না। তবুও তিনি যেটুকু সময় পেতেন, তারই মধ্যে পরিচিত ও অপরিচিতদের সংগে কথাবার্তায় এমন কি হাসি ঠাট্টায়ও কাটাতেন। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রনাথ বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের যেটুকু করে সম্পর্কের কথা আগে বলেছি তাতেই পাঠক-পাঠিকারা দেখেছেন, তিনি কিরূপ পরোপকারী, দরদী, ...বৎসল, রসিক ও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র যে অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, একথা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু লেখকের বঙ্কিম-স্মৃতি বিষয়ক লেখা থেকেও জানা যায়। শেষে আর একটা কথা, বঙ্কিমচন্দ্র যদি অহংকারীই হতেন, তাহলে রমেশ দত্তর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে তিনি নিজের গলার মালা নিয়ে তখনকার অখ্যাত তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় কখনোই পরিয়ে দিতে পারতেন না। তাই আমার বক্তব্য, তিনি রাসভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অহংকারী মোটেই ছিলেন না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে 'কর্মযোগী' বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ সাহিত্যিক দ্বারা অহেতুক আক্রান্ত হতেন বলে, প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাই এ সম্পর্কে লিখে গেছেন—

'.........তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।'

'কন্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনা-প্রবণ লোকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।' (ক্রমশ)

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২ ॥

লতিকাকে টেলিগ্রামটা করে দিয়ে সফীকুলের মনে হল আর কিছু করবার নেই। খুব একা একা ঠেকতে লাগল তার। সে যে কত একা তা যেন হঠাৎ টের পেল। পোস্ট অফিসে যে ক'টা মুখ দেখল সে, সব অচেনা। পথেও কোনও চেনা মুখ নজরে পড়ল না। সে কত একা! ছবি এখানে থাকলে এমনটা হত না। সে সবার আগে তার কাছেই ছুটে যেত। বলত, ছবি আমি সেই মামলায় জিতেছি। এই জজ আমার সওয়ালে কান না দিলে হবে কী, হাইকোরটের জজ আমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন। আমার মক্কেলদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন। কিন্তু ছবি নেই এখানে। সফীকুল প্রচন্ডভাবে একজন কাউকে চাইছিল। সে তার আপনার কোনও একজনের সঙ্গে তার আনন্দটা ভাগ করে নিতে চাইছিল। এমন একজনকে সে পেতে চাইছিল, যে তাকে হিংসা করবে না, তাচ্ছিল্য করবে না, যে তাকে বুঝবে। লতিকাই ছিল এসব ব্যাপারে দি বেস্ট্। লতিকা, না ছবি? ছবি অবশ্যই খুব খুশী হত। খু উ ব খুশী। কিন্তু লতিকার সঙ্গে ল পয়েনট আলোচনা করা যেত। আলোচনা করা যেত এমন সব বিষয়ে যা তৃপ্ত করত তার মনের ক্ষুধাকে। যা ছবির সঙ্গে করা যায় না। লতিকার সঙ্গ তাকে আরেক ধরনের আনন্দ দিত, যা ছবির কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। লতিকার কালচার, তার বৈদগ্ধ্য, তার আন্তরিকতা, সে অন্য ধরনের জিনিস। সফীকুলের মত লোকের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে তা পাওয়া সম্ভব নয়। লতিকা অন্য গ্রহের মানুষ। ছবি? ছবি তার আটপৌরে অস্তিত্বের ভিত্তি। ছবি তার বিবি। ছবি তার এ দুনিয়ার বন্ধন। লতিকা বেহেশ্তের হুরী। স্বপ্ন।

মনের নিক্তির দুটো পাল্লায় দুজনকে তুলল সফীকুল। এদিকে ছবি, ওদিকে লতিকা। তারপর দুজনকে ওজন করতে করতে পথ হাঁটতে লাগল। এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার মনে পড়ল মন্মথবাবুর কথা। অমনি তার প্রাণে উৎসাহ আবার জেগে উঠল, হ্যাঁ, মন্মথবাবু। এ খবর শুনলে তিনি খুব খুশী হবেন। কিন্তু হরি মুহুরী নেই। তীর্থ করতে গিয়েছে। এ অবস্থায় একা সে ও বাড়িতে যাবে কী? যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মন্মথবাবুর মেয়ের দু চোখের শীতলতা তার প্রতি যে বিরূপতাব ব্যক্ত করেছিল, তারপর আর তাঁর বাড়িতে যেতে সে ভরসা পায়নি। না, তার একার যাওয়া সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে বরং একটা চিঠি লিখে সুখবরটা জানিয়ে দেবে মন্মথবাবুকে। আর হাইকোরটের রায়ের নকলটা এলে সে সেটা মন্মথবাবুকে দেখিয়ে আসবে। আর ততদিনে মুহুরীও এসে পড়বে তীর্থ থেকে। হ্যাঁ, সেই ভাল হবে। সে বরং মৌলভী জয়নুদ্দীকে গিয়ে টেলিগ্রামটা দেখাক। তিনি খুব খুশী হয়ে উঠবেন। সইফুল! হ্যাঁ, সইফুলকে সে বলবে। সইফুল একথা শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবে। সে দ্রুত বাড়ির পথে পা বাড়াল।

বাড়ির পথেই আবু তালেব চৌধুরীর সঙ্গে তার দেখা। সালাম জানিয়ে তিনি সফীকুলকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর বললেন, "চলেন, চলেন, বাসায় চলেন, জরুরি কথা আছে।"

চলতে চলতে আবু তালেব বললেন, "ওঃ, আজ আপনারে খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে গিছি। বার লাইব্রেরির থে আপনিউ বেরোইছেন আর আমিউ গিয়ে হাজির হইছি। এট্টুর জন্যি দ্যাখাডা হয়নি। তারপর আলাম আপনার বাসায়। নেই। আবার কাছারিতি গ্যালাম যদি অন্য কুথাও থাকেন। নেই। আবার বাসায় আলাম। সেই বন্ধ। যাক, শেষ পর্যন্ত আপনারে যে ধরতি পারিছি, সিডাই আল্লাহর মেহেরবাণী।"

ঘর খুলে সফীকুল বলল, "ভাই বসেন। আমি একটা বাতি নিয়ে আসি। চা খাবেন না কি?"

আবু তালেব বললেন, "আরে ওসব পরে হবে। আগে জরুরি ব্যাপারটা সারে নিই। খবর আছে।"

সফীকুল বলল, "কী ব্যাপার! কোনও খারাপ খবর নয় তো?"

"খুব খারাপ।" আবু তালেব বললেন! "আপনাগের গিরামের পুন্নু স্যাকরার বাড়ি জ্বলায়ে দেছে। হ্যান্ড নোট, বন্ধকী তমসুক সব পুড়ে ছাই। পুন্নু স্যাকরারে দা দিয়ে কুপোয়ে দারুণ জখম করে ফেলিছে। ওর বিটার বউরি দুর্বৃত্তরা নিয়ে চলে গেছে। পুন্নুর বাড়িউ লুঠ হইছে। খাদু শেখ থানায় গিয়ে কবুল করিছে, পুন্নুরি জখম করা আর বাড়িতি আগুন দিয়ার সঙ্গে সে জড়িত। তবে অ্যাকটা ডাকাতির দলের সঙ্গে মিশে সে কাজডা করিছে। তাদের নাম সে কতি নারাজ। এই কথা কইছে, আল্লাহর হুকুমি ইনছাফ পাবার জন্যিই সে এই কাম করিছে।"

সফীকুল জিজ্ঞেস করল, "খাদু শেখ মানে তো সেই খাদু শেখ যে আব্বুগের সঙ্গে হাজত খেটেছিল?"

"জে।"

সফীকুল এবার বেজায় উদ্বিগ্ন হল।

"কাকে কাকে অ্যারেসট করেছে দারোগা?"

আবু তালেব বললেন, "এখনও আর কাউরি গ্রেফতার করেনি। তবে জোর গুজব যে বশির আর আপনার আব্বুরি ঝুলোবার তাল কত্তিছে। জমিরুদ্দীরউ ধরতি পারে।"

"পুন্নু স্যাকরার অবস্থা কী? কিছু জানেন?"

"অ্যাখনও জ্ঞান ফেরেনি।" আবু তালেব বললেন। "যদি বাঁচে তো ভানির দিন।"

"কবে ঘটনা ঘটেছে?"

"পরশু। আমার ভয় উরা এই ছুতোয় কৃষক প্রজা কর্মীদের আবার অ্যারেসট করে না বসে।"

সফীকুল একথার জবাব দিল না। চুপ করে ভাবতে লাগল।

আবু তালেব বললেন, "ইলেকশনের কাজ ক্রমেই আগোয়ে আসতিছে। আপনার আব্বা আর বশির আমাগের ওদিকির খুঁটি। অ্যাখন থানায় থানায় আমরা প্রজা সম্মেলন করাতি শুরু করিছি। চাষী আর খাতকগের দুরবস্থার কারণ যে জমিদারি প্রথা আর মহাজনী শোষণ সিডা আমরা অ্যাখন বুঝোতি পারতিছি। চাষী খাতকগের সাহস বাড়তিছে। চাষী খাতকের প্রত্যেকটা ভোটের দাম কত, তাও তারা ক্রমে ক্রমে বুঝতি শুরু করতিছে। সেই সুমায় এই কান্ড ঘটে গেল। অ্যাখন করা কী? সৈয়দ ছাহেবের কাছে গিছিলাম।"

"তিনি কী বললেন?" সফীকুল জিজ্ঞেস করল।

"তিনি কলেন", আবু তালেব বললেন, "আপনারে কাজে লাগাতি। ওগের গেরেফতার কল্লিই যান্ আপনি বেল্ পিটিশন্ মুভ্ করে ওগের ছাড়ায়ে আনতি পারেন।"

সফীকুল বলল, "ঠিক আছে। আমার যা করবার তা করব।"

আবু তালেব বললেন, "তাইলি তো হয়েই গ্যালো। তালি প্রেয়োজন হলি কোরটেই আপনার সঙ্গে দ্যাখা করব। অ্যাখন তবে উঠতি হয়।"

"খুব তাড়া আছে?"

"ক্যান্, কন্ দিনি? অ্যাখন যাব প্রেসে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাগের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলতিছে। পুন্নু স্যাকরার বাড়ি ডাকাতিডা আমরাই করাইছি, এই কথাই রটায়ে ব্যাড়ানো হতিছে। অ্যাকদিকি বিশ্বেস কুন্ডুগের দল আবার অন্য দিকি খোন্কার মেন্দার দল আমাগের বিরুদ্ধি আড়ে-হাতে লাগে গেছে। মেন্দা হইছেন খোন্কারের খুঁটি। তাই আমরা অ্যাকটা ইশ্তেহার ছাপাতি দেবো। বোঝলেন তো? কাজ মাত্তর এই।"

সফীকুল বলল, "ব্যাপারটা আমার ভালো করে জানা দরকার। খাদু হঠাৎ পুন্নু স্যাকরার বাড়িতে কেন চড়াও হল?"

"তয় শোনেন।"

আবু তালেব সমস্ত কাহিনীটা বলে গেলেন। পুন্নুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিল খাদু। পুন্নু খাদুকে সাদা কাগজে টিপ ছাপ করিয়ে টাকা ধার দেয়। যত টাকা নিয়েছিল খাদু, পুন্নু তার টিপ্ মারা কাগজে ডবল টাকা বসিয়ে দেয়। তারপর পুন্নু খাদুকে বলে অ্যাকটা জমি যদি সে পুন্নুকে লিখে দেয় তালি পুন্নুর দেনা শোধ হয়ে যাবে। সেই মত জমি লিখেও দেয় খাদু। কিন্তু তারপরও পুন্নু খাদুর তমসুক ফেরত দেয় না। এই নিয়েই বিবাদ।

"খাদু তার জবানবন্দিতি এই কথাই কয়েছে। এও কয়েছে যে সে বাইরির যে লোক ভাড়া করে আনিছিল। তবে কারউ নাম কয়নি। এদিকি গিরামে তোলপাড়। পুন্নুর বিটার বউরি নাকি লুঠ করে নিয়ে গেছে। আর সবাই মিলে দোষডা চাপাচ্ছে প্রজা আন্দোলনের উপর। এই আন্দোলনই নাকি ছোটলোকগেরে ক্ষ্যাপায়ে তোলছে এবং যার ফলে আইন শৃংখলা ভাঙে পড়ার জো হইছে।"

"তারপর, আমাদের খান বাহাদুরের কাজ কতটা এগোচ্ছে?"

আবু তালেব বললেন, "যতটা খুঁটি আলগা লোকটারে ভাবিছিলাম, তা না। বেশ বুদ্ধি রাখে। জেলা বোরডডা হাতে রাখিছে তো, অ্যাখন আবার প্রেসিডেনট, উডা মস্ত সুবিধে। তার উপর টাকাউ আছে। তারপর ইউনাইটেড মোছলেম পারটির নাম ছাড়ে উনি অ্যাখন মোছলেম লীগ পারলামেনটারি পারটির ক্যানডিডেট হইছেন। এতেও ও'র খানিকটে সুবিধে হবে। একদিকি খান বাহাদুর মৌলভীগের কাজে লাগাতিছেন, আবার অন্যদিকি দাউদ মিয়ার মত লোকেদেরউ কাজে লাগাতিছেন।"

"দাউদ!" সফীকুল বিস্মিত হল। "কোন্ দাউদ?"

"আপনাগের দাউদ। হাজী ছাহেবের ভাতিজা।"

"সে আবার কী কাজে লাগল?"

আবু তালেব বললেন, "আসল কাজডা তো সেই কত্তিছে।"

সত্যিই অবাক হল সফীকুল। দাউদ তার কাছে একটা প্রহেলিকা। একবার তার মনে হয়, লোকটা সরল। আবার কখনও তার মনে হয় খুবই মতলববাজ। সফীকুল লক্ষ্য করছে, ইদানীং মৌলভী জয়নুদ্দীর পরিবারের সঙ্গে দাউদের খুব খাতির বেড়েছে। জয়নুদ্দী প্রায়ই 'ছবি বিটির ভাই', 'আমার বিটির ভাই' বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। এই সরল লোকটাকে সে কিছু বলতেও পারে না। আবার 'ছবি বিটির ভাই' দাউদের এই পরিচয়ে সে অস্বস্তিও বোধ করে। দাউদ সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা কিছু ছিল না। ফুটকির মৃত্যুর পর ছবি শোকে অধীর হয়ে তাকে যা বলেছিল দাউদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তা থেকে দাউদের বিষয়ে ভাল ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই সে দাউদকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু জয়নুদ্দী দাউদ সম্পর্কে খুবই উচ্ছ্বসিত। তাঁর বিচারে দাউদ একজন সত্যিকারের

পাঁচটি বছর নীট লাভ
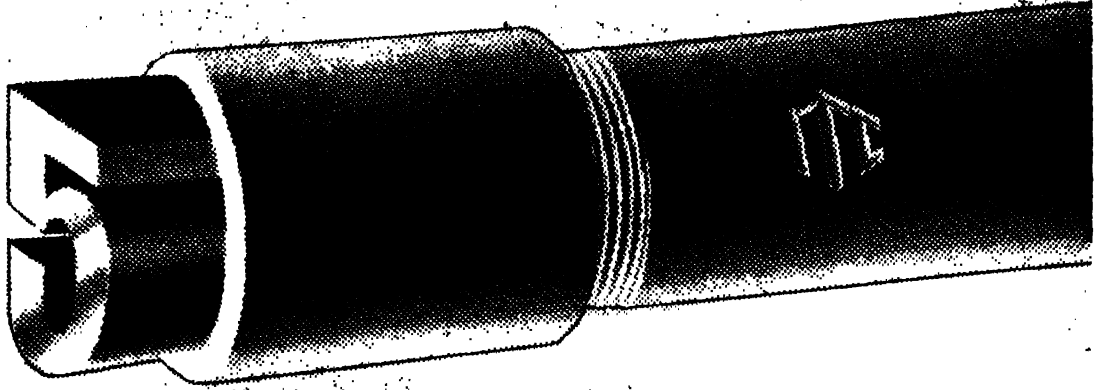
তৈরির গুণে অন্যান্য টিউবের তুলনায় আই টি সি টিউব ৫টি বছর বেশি টেঁকে

আইটিসি টিউবের (টাটা পাইপ) বৈশিষ্ট্য তার মজবুত গড়নে। কাঁচা মাল থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত আইটিসি টিউব এই উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি। তার ফলে এই টিউব পাঁচ বছর বেশি নির্ঝঞ্ঝাটে চলে।

উঁচু জাতের স্টীল থেকে উঁচু জাতের পাইপ

একমাত্র আইটিসি টিউবই উঁচু জাতের রিমিং স্টীল থেকে তৈরি হয়। এই স্টীল অনেক বেশি খাঁটি ও পরিষ্কার। সেইজন্য টিউবের গা মজবুত এবং জোড়গুলি খুব শক্ত হয়। তাই টিউবের গায়ে ঠিক-মতো প্যাঁচ কাটা যায়। ফলে জোড়ের মুখ ভেঙে যাবার বা লিক হবার ভয় থাকে না।

ক্ষয়রোধে রক্ষাকবচ

আইটিসি টিউব যাতে মরচে পড়ে ক্ষয়ে না যায়, সেইজন্য তাতে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী বরাবর ঠিকমতো দস্তার কোটিং দেওয়া থাকে।

জোড়ের শির থাকে না, তাই জলের প্রবাহ অবাধ

ফ্লেটসমুন নামে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি বলে আই টি সি টিউবের ভিতরে কোন শির থাকে না। ফলে জোড়ের মুখে ময়লা জমার কোন আশঙ্কা থাকে না এবং তোড়ে জল চলাচল করতে পারে।

নির্ভরযোগ্য উঁচুমান

আইটিসি টিউব তৈরি করার সময়, উঁচুমান বজায় রাখার জন্য, প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষ নজর রাখা হয়। তাইতো আইটিসি টিউবের উঁচুমান এতো নির্ভরযোগ্য।

আইটিসি টিউব—মজবুত স্টীল
কড়া জান, ৫টি বছর বাড়তি কাম।
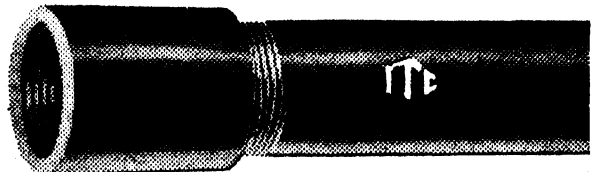
আই এস ঃ ১২৩৯ (পার্ট ১) ১৯৭৩ অনুযায়ী তৈরি

ITC ইণ্ডিয়ান টিউব

দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড
টাটা-স্টুয়ার্ট্‌স্ অ্যাণ্ড লয়েড্‌স্-এর একটি উদ্যোগ

ITC/CAS-7/77 BEN

মুছলমান। উওরের বেদখলে এ যদি জিলা দিল মজ্জওয়ান যত আসে, জয়নন্দীর হতে, তত ভাল। মোছলেম জাহানের তরক্কি তাতে ধর্যিস্থত হবে।"

সফীকুল কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাউদ কী কাজ করছে?"

আব্দু তালেব বললেন, "ও তো জেলা বোরডের ঠিকেদার।"

"তা জানি।"

"তাই দাউদ মিয়া হলেন খোন্‌কারের পেয়ারের বান্দা।"

আব্দু তালেবের বলার ধরনে সফীকুল খুব মজা পেল। মৌলভী জয়নন্দী তো খোন্দকার সাহেবকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সেই খোন্‌কারের বান্দা সম্পর্কে তার স্নেহ উথলে পড়ে। এবং দাউদ মৌলভী ছাহেবের কাছে আদৌ গোপন করেনি যে সে খোন্‌কারের লোক। নাঃ, ক্ষমতা আছে তার।

"দাউদ মিয়া কত্তিছে কী, জানেন তো?"

সফীকুল উৎসুক হয়ে উঠল।

"অ্যাখন জিলা বোরডের রাস্তা মেরামত কত্তিছে। কিন্তু বড় সুন্দর অ্যাকটা কায়দা ধরিছে। যে-সব ইউনিয়নির মধ্যি দিয়ে রাস্তাডা যাতিছে, সেইসব ইউনিয়নির মুছলমান মাতব্বরগের ডাকে কচ্ছে যে বোরডের চিয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্‌কার বজলুর রহমান তারে হুকুম দেছেন, পেরথমে গিরামের লোকদের কাজ দিবা আর তাগেরে ন্যায্য মজুরি দিবা আর তাগের পাওনা পাই পয়সা অব্দি মিটেয়ে দিবা আর আমি মুছলমান, আল্লাহর বান্দা, তাই দ্যাখবা ধ্যানো আমার মুছলমান ভাইরাই সব কাজ পায়। আপনাগের ইউনিয়নির মধ্যি রাস্তা মেরামত হবে আপনারা অ্যাখন লোক দ্যান্‌। দাউদ মিয়ার ক্যাপাসিটি আছে বোঝলেন। এর মধ্যিই শৈলকুপো-ঝিনেদার দিকি বেশ কয়েকটা ইউনিয়নির মাতব্বরগেরে হাত ক'রে ফেলিছে।"

সফীকুল হঠাৎ যেন দাউদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ছবির কাছে যে দাউদের কথা শুনেছিল, এ যেন সে দাউদ নয়, সেদিন তার বাসায় এসে যে দাউদ আত্মগ্লানি উদ্‌ঘাটন করে গেল, এ যেন সেই দাউদও নয়। এ দাউদ ধূর্ত, বেশ পরিণত এবং দক্ষ। কিন্তু মৌলভী জয়নন্দীর সঙ্গে তার এত মেলামেশার অর্থ কী? জয়নন্দী বলেছেন, দাউদ একদিন ওদের সবাইকে সারকাস দেখিয়েছে। সইফুল! ঝপ করে অন্ধকারটা সরে গেল তার চোখের উপর থেকে। হ্যাঁ, সইফুল। কোনও ভুল নেই। একটা সাপ যেন সফীকুলের হৃদ্‌পিণ্ডে ছোবল দিল।

সফীকুলের স্বভাবত শান্ত মন প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করে উঠল। তার কানে আর কিছু ঢুকছিল না। সইফুল। সইফুলের জন্য সে চিন্তিত হয়ে উঠল। আব্দু তালেব তারপর অনেক কিছু বলে গেলেন। মুসলিম লীগ পারলামেনটারি পারটির কেওয়র দুর্বলতা। নবাব, নাইটের নেতৃত্বের অসুবিধা। এবং কৃষক প্রজা দলের কোথায় শক্তি। আব্দু তালেবদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী এবং মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ। কত কী, বললেন আব্দু তালেব। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত ওদিকের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মৌলভী আব্দু তালেবকে তাদের ক্যানডিডেট করেছেন, তাও বললেন। একটা কথাও সফীকুলের কানে গেল না।

"আমাগের দুটো মস্ত সুবিধে আছে, জানেন।" আব্দু তালেব বললেন। "এক, আমাগের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার। আর দুই, আমাগের নেতা শের-এ বাংগাল মৌলভী আবুল কাসেম ফজলুল হক।"

সইফুল, সইফুল! সাবধান।

"আর জানেন তো, হক ছাহেবের হক কথা।" নিজের রসিকতায় আব্দু তালেব নিজেই হেসে ফেলেন। তুমি দাউদকে জানো না সইফুল। ও লোক মোটেই সুবিধের নয়।

আব্দু তালেব বলে চলেছেন, "বাংলার রাজনীতির সমস্যাডা যে প্রিকিতপক্ষে ডাল ভাত আর কাপড়ের সমস্যা এই কথাডা আমাগের নেতা হক ছাহেবই পেরথমে কলেন। এই সজ্জা কথাডা তিনি ছাড়া হিন্দু মুছলমান আর কোনও নেতার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, তা জানেন?"

দাউদের পাল্লায় পড়ো না সইফুল। খবরদার খবরদার!

"আমরা তো কোনও লম্বা চওড়া কথা কচ্ছি নে।" আব্দু তালেবকে কথায় পেয়েছে। "থানায় থানায় যে-সব প্রজা সম্মেলন আমরা কত্তিছি, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমরা যে লোকেরে ভোট দিয়ে সরকার গড়াত পাঠাবো, তারে কৃষক প্রজার আপন লোক হতি হবে। না হলি চাষীর ডাল ভাত আর কাপড়ের সমস্যার সমাধান আর কেউ করবেন না। বোঝলেন তো?"

সইফুল সইফুল। দাউদ বড় সাংঘাতিক লোক। ও ছবির ভাই বটে, কিন্তু ছবিদের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

"বোঝলেন তো?"

সে মহা কেলেংকারীর ব্যাপার। তুমি সইফুল, ছবি এলে বরং তার কাছ থেকে জেনে নিও। "আচ্ছা ভাই", আব্দু তালেব বললেন, "অ্যাখন উঠি। প্রেসে যাতি হবে।"

সফীকুলের যেন ঘুম ভাঙল। আব্দু তালেব এখনও আছে। সে লজ্জিত হল।

আব্দু তালেবকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে সে নিজের চেয়ারে বসল। প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউনসিলের নির্বাচন এগিয়ে আসছে। খোন্‌কার তাদের ওদিক থেকেই দাঁড়াচ্ছেন। তার বাজান খোন্‌কারের বিরুদ্ধ দলে চলে গিয়েছেন। খোন্‌কারকে সে ভাল চেনে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেশাগতভাবে তাকেও খোন্‌কারের বিরুদ্ধাচারণ করতে হয়েছে। প্রথম মামলাতেই খোন্‌কার আর সফীকুলে লড়াই হয়েছে। এবং সে জিতেছে। মহামান্য হাইকোর্ট তার মক্কেলের আপীল মঞ্জুর করেছেন। দিগম্বরের ভাষায় পচা শামুকে পা কেটেছেন খোন্‌কার। ব্যক্তিগতভাবে খোন্‌কার সম্পর্কে ভাল মন্দ কোনও ধারণাই তার নেই। নিশ্চয়ই খোন্‌কারেরও তাই। কে এক সফীকুল মোল্লা কোন্‌ এক মামলায় তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তা হয়তো শহরের সব চাইতে কর্মব্যস্ত উকিলের আজ মনেও নেই। কিন্তু সফীকুলের সব মনে আছে। তাঁর অবজ্ঞাপূর্ণ চাহনী, তাঁর অহমিকা, কিছুই ভোলেনি সফীকুল। কেন? সে অভিজাত নয় বলে? সে নতুন উকিল বলে? খোন্‌কার তাদের ওদিকেরই ক্যানডিডেট হলেন। এবং তাঁর জয়লাভের পথ প্রশস্ত করার জনাই তার বাজানকে ডাকাতির কেস্‌-এ জড়িয়ে হাজত খাটাবার তোড়জোড় চলেছে। সাজ্জাদ মোড়লকে চেনেনও না খান বাহাদুর। সে যে সফীকুলের বাপ, তাও তিনি জানেন না। তথাপি সফীকুল আর তার বাপ সাজ্জাদ খোন্‌কারের জয়যাত্রার পথে বিরক্তিকর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কী? নিছক ঘটনাচক্র? কোথায় ছিল দাউদ, কোথায় ছিল সফীকুল আর কোথায় ছিল সইফুল? ঘটনাচক্রে সফীকুল সইফুলদের ভাড়াটে। ঘটনাচক্রে দাউদ খোন্‌কারের ভাড়াটিয়া ঠিকেদার। সফীকুল যে ছবির খছম, তাও ঘটনাচক্রেরই ফল। তা হলে কী দাঁড়াল? দাউদ সইফুলের দিকে এগুচ্ছে। সফীকুল দাউদের অতীত জানে। সইফুল, সাবধান। কিন্তু সেদিন যখন দাউদ এসেছিল তার কাছে, তখন তাকে কি এক সরল এবং অনুতপ্ত লোক বলে সফীকুলের মনে হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছিল। সফীকুল স্বীকার করছে, সেদিন তার মনে দাউদের প্রতি সহানুভূতিরও সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আব্দু তালেব দাউদের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে দিলেন, সেটা তো এক ধূর্ত মতলববাজের। অতি চতুরতার সঙ্গে যে শ্রেণীর লোক অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগোয়, বোঝা গেল দাউদ সেই শ্রেণীরই এক লোক। ওর মুখোস খুলে দেওয়া উচিত। সইফুল, খবরদার তুমি ও

লোকটার সঙ্গে মিশো না। সইফুলের এ সর্বনাশ সে হতে দেবে না। সফীকুল বেশ উত্তেজিত বোধ করতে লাগল। যে করেই হোক দাউদের গ্রাস থেকে সইফুলকে বাঁচাতেই হবে।

সফীকুল চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। আব্বা, সইফুল, দাউদ, খোন্‌কার। খোন্‌কার, দাউদ, সইফুল, আব্বা। খোন্‌কার আব্বা দাউদ সইফুল। খোনকার আব্বা খোন্‌কার আব্বা। দাউদ সইফুল দাউদ সইফুল। তার প্রতিটি হৃদস্পন্দন যেন কথাগুলোকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল। খোন্‌কার আব্বা, দাউদ সইফুল। অস্থির হয়ে সফীকুল ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু দাউদ জয়নুদ্দী মৌলভীর বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করছে, এতে ফটিক এত বিচলিত বোধ করছে কেন?

বিচলিত হয়ে উঠেছি কেন? লোকটা দাউদ বলে। ওর পিছনের ইতিহাস জানি বলে।

কিন্তু মৌলভী সাহেব নিজে যখন ও'র সঙ্গে মাখামাখি করছেন, তখন তোমার কী বলবার আছে?

বলবার আছে মানে! মৌলভী সাহেব কি জানেন, দাউদ কী চরিত্রের লোক? তাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য নয় কী? বিশেষত দাউদ যখন ও বাড়িতে ঢুকেছে ছবির ভাই বলে পরিচয় দিয়ে। কিছু একটা ঘটে গেলে বদনাম তো ছবিরই হবে।

হ্যাঁ তা হবে।

তবে? আমার কি উচিত নয় এই সরলপ্রাণ অতিথি বৎসল মৌলভী সাহেবকে সতর্ক করা?

কিন্তু মৌলভী সাহেব যদি উলটো বোঝেন? দেখনি কি দাউদ নানা ছুতোয় এই পরিবারটিকে কত ভাবে সাহায্য করছে? মৌলভী সাহেব সরল মনে সেগুলো গ্রহণ করছেন। বাবুকে নিজের কাজে টেনে নিয়েছে। এতে এই অমিতব্যয়ী দরিদ্র পরিবারটির কত সুবিধে হয়েছে। দাউদ কথা দিয়েছে মৌলভী সাহেবকে বাবুকে সে ঠিকেদারীর কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। তারপর বাবুর বয়েস বাড়লে তাকে আলাদাভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আর বাবু তো এখন থেকেই রোজগার শুরু করেছে। মৌলভী সাহেবের আর্থিক সাশ্রয় খানিকটা হয়েছে।

কিন্তু দাউদ কি এ কাজ বিনা মতলবে করছে?

যে মতলবেই করে থাকুক, মৌলভী সাহেব যে দাউদের উপর খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, সেটা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না?

ওটা তো দাউদের শয়তানী।

এটা যে শয়তানী, তুমি মৌলভী সাহেবকে বোঝাবে কী করে?

বোঝাবো কী করে?

সফীকুল এতক্ষণে যেন একটা ধাক্কা খেল।

দাউদের মতলব যে সত্যিই খারাপ, এটা বোঝাবো কী করে?

সফীকুল অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরতে লাগল। সত্যিই তো, ব্যাপারটা ওর নিজের কাছেই আজগুবি বলে মনে হল এখন। আমি কষ্টে আছি। একটা লোক এসে আমার ছেলেকে একটা কাজে লাগিয়ে দিল। নানাভাবে সে আমার উপকার করতে লাগল। তখন কেউ যদি এসে বলে, মিয়া ও লোকটা সুবিধের নয়। ওর মতলব খারাপ। তা সে কথা কি আমিই বিশ্বাস করতাম।

মৌলভী জয়নুদ্দীর চোখে দাউদ সাচ্চা মুসলমানই শুধু নয়, সে মদিনার আনসার প্রতিম। একদিন মৌলভী সাহেব এসে বললেন, উকিল ছাহেব, আপনারে আর কী কব, আমার ছবি বিটির ভাই, দাউদ মিয়ার মত লোক আর হয় না। ওর দেলটা যে কত দরাজ তা আর কতি পারব না। আমার বাবুডারে কাজে লাগাইছে, জানেন তো। তা দ্যাখেন ওর আক্কেল। বাবুর ঘুরাঘুরির করতি কষ্ট হবে বলে তারে নতুন অ্যাকটা র‍্যালে সাইকেল কিনে দেছে। আমি কলাম, ইডা কি ক'রলে বাপ, অ্যাক কাঁড়ি টাকা ফালতু খরচ ক'রলে! তা দাউদ ক'লো কি জানেন, বাবু আমার ছোট ভাই, ওর কাজের সুবিধে হবে ব'লে সাইকেল কিনে দিছি। এ খরচ ফালতু হবে ক্যান্? দ্যাখেন উকিল ছাহেব আমার অ্যাতখানি বয়স হল, মুছলমানের এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ইডা এই দাউদ ছাড়া আর কারু মধ্যি প্রকাশ পাতি দাখলাম না। আল্লার প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-ছালাম অ্যাকদিন মাক্কবাসী মোহাজের আর মদিনাবাসী আনছারগের ডাকে কলেন, শোন মদিনাবাসী আনছারগণ, শোন মক্কাবাসী মোহাজেরগণ ইছলামের আদর্শ প্রেত্যেক মুছলমান প্রেত্যেক মুছলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে তুমরা জুড়ায় জুড়ায় ভাই ব'লে যাও। প্রেত্যেকেই অন্যের মধ্যির থে অ্যাকজন ভাই বাছে ন্যাও। হজরতের কথা শুনা মাত্তর সবাই নিজির পছন্দ মত ভাই বাছে নিল আর প্রেত্যেকেই নিজির ধন দৌলত তার ধম্ম ভাইরি সমানভাবে ভাগ ক'রে দিল। এই হ'ল মুছলমানের আদর্শ। মদিনাবাসী সাদ ইবনে রাবী ছেলেন আনছার। তিনি আবদুর রহমান নামে একজন মোহাজেররে ভাই ব'লে গ্রহণ করিছিলেন। তাঁর ছিল দুই বিবি। তিনি তাঁর অ্যাক বিবির আপোষে তালাক দিয়ে তাঁর ভাই আবদুর রহমানের সঙ্গে নিকে পড়ায়ে দিছিলেন। এই হ'ল মুছলমান। এই রকম ভ্রাতৃভাব যতদিন ছিল ততদিন মুছলমান উঠিছে। আমার ছবি বিটি য্যামন, তার ভাই দাউদও ত্যামন। সাচ্চা মুছলমান। তার মধ্যি এই ভাবটা পুরো মাত্রায় আছে। আবেগে মৌলভী জয়নুদ্দীর চোখ ছলছল করে উঠল।

সফীকুল পাইচারি করতে করতে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, মৌলভী জয়নুদ্দীর কাছে দাউদের নামে কিছু বলা কতটা অর্থহীন। সে ছটফট করতে লাগল।

তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

বিচলিত হব না! দাউদের মতলব টের পাবার পরও বিচলিত হব না! জানো, রাস্‌কেল্‌টার মতলব?

হ্যাঁ। সইফুল।

এই মেয়েটার সর্বনাশ করবার ফিকিরে দাউদ এখন এইভাবে জাল বিস্তার করেছে। সে বিষয়ে মৌলভী সাহেবকে কি সাবধান করে দেওয়া উচিত নয়।

মৌলভী সাহেবকে কী বলবে?

মৌলভী সাহেবকে?

থমকে গেল সফীকুল। তাই তো, কী বলবে মৌলভী সাহেবকে?

বলবে কি, মৌলভী ছাহেব আপনি দাউদকে যা ভাবছেন সে তা নয়। আপনি ভাবছেন, দাউদ ফেরেশ্‌তা, আসলে সে কিন্তু শয়তান।

ক্যান্ আপনি এ কথা কতিছেন ক্যান্?

মৌলভী সাহেবের এই প্রশ্নের জবাবে, সে কী বলবে?

বলবে যে দাউদের অতীত খুব খারাপ? এ তো চুক্‌লি খাওয়ার মত শোনাচ্ছে। কী প্রমাণ তার হাতে আছে? তার বিবি? তার শ্বশুর? এদের সে জড়াবে? সফীকুলের মন সাড়া দিল না। তবে? শুধু তার মুখের কথা? কিন্তু মৌলভী সাহেব তার কথা বিশ্বাস করতে যদি দ্বিধাগ্রস্ত হন?

ছি ছি। না, সে নিজেকে এখানে নামিয়ে আনতে পারবে না।

তাহলে সইফুলের সর্বনাশ হবে আর সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবে?

না, সে সইফুলের সর্বনাশ হতে দেবে না। সে বরং তাকেই কথাটা বলবে। হ্যাঁ, সেই ভালো। সইফুল তার কথা অবিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই না। কিন্তু কোথায় সইফুল। আজ তিন মাসের উপর তার সঙ্গে দেখাই হয়নি। সফীকুলই তো এড়িয়ে গিয়েছে তাকে। হঠাৎ সেই উষ্ণ সন্ধ্যাটা মূর্ত হয়ে উঠল। এক লহমার জন্য সইফুল এসে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। তারপরই স্মৃতিটা মিলিয়ে গেল।

সে তবে এই! সে তবে এই। তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে সফীকুল ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। সইফুলকে কে অধিকার করবে? সে না দাউদ? এখন এইখানে সে এনে ফেলেছে নিজেকে! তাই তার দাউদের উপর এত রাগ? তাই দাউদকে সে সরাতে চায়? না না। দাউদ খারাপ, দাউদ খারাপ। আমি সইফুলের ভাল চাই, ভাল চাই। সইফুল সইফুল! একটা অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা জাগ্রত হয়ে সফীকুলকে কাতর করে তুলতে লাগল। [ক্রমশ]

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

সমাগত বসন্ত

তা হলে নিউইয়র্ক শহরে এখন সত্যিই বসন্ত সমাগত? যার আশায় এরা জন্মের জন্য চাতকের মতো চেয়ে থাকে?

অ্যালেন বললেন, 'কী! খুব শীত?'

ও'র শীত লাগছিলো না। ভারি কোটটা খুলে হাতে নিলেন। কিন্তু আমার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুতে অভ্যস্ত দেহে বেশ হাড় কাঁপানোই মনে হচ্ছিলো। আস্তে আস্তে কমে গেল। সেটা যথেষ্ট জোরে হাঁটার জন্য। কমলেও আমি বা বুদ্ধদেব কেউ ওভারকোটের অন্তরাল থেকে বেরুলাম না।

'চলুন, প্রথমে বইয়ের দোকানগুলো দেখি।' এটা বুদ্ধদেবের প্রস্তাব।

আমরা বলতে গেলে প্রায় ওয়াশিংটন স্কোয়ারেরই বাসিন্দা। যার তিনদিক জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল বিশাল অট্টালিকা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। দক্ষিণ দিকে চলে গেছে গ্রীনিচ গ্রাম। সেখানেই পায়ে পায়ে সব বইয়ের দোকান, সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশনার আস্তানা। সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক এবং বিদ্রোহীদের নেহাৎই একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এই অঞ্চলকে হেনরি জেমসই বিখ্যাত করে গেছেন। গারিবাল্ডির একটি মূর্তি আছে সেখানে, সাংঘাতিক শীতের মধ্যেও দেখেছি বাচ্চারা বরফের বল নিয়ে খেলা করছে তার তলায়, ছাত্রছাত্রীরা হাসছে হাঁটছে দৌড়চ্ছে। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে বয়স্ক মাস্টাররা চলে যাচ্ছেন গম্ভীর মুখে, একটু রোদ পেলে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন মায়েরা। কিন্তু সেগুলো সব বেলা বারোটার দৃশ্য, রাত্রিবেলা একেবারে সুনসান। কেউ কোথাও নেই। একটি জনমানিষ্যির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওখানে নতুন গিয়ে যখন দু' চারদিন আমাদের খাবার খুঁজতে বেরুতে হতো, (এক কাপ চা বা কফির জন্য হলেও তখন না বেরিয়ে উপায় ছিলো না) আমি রোজ আমার দাঁতে দাঁত লাগা শীতকম্পিত কণ্ঠে গুন গুন করতাম, 'কুজনহীন কানন ভূমি, দুয়ার দেয়া সকল ঘরে, একেলা কোন্ পথিক তুমি, পথিকহীন পথের পরে।'

সেই রাত্রির চেহারা নাকি এই হয়েছে? এই রকম লোকে লোকারণ্য। আর আলো কী উজ্জ্বল! পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে চারদিক, দুই পাশের উঁচু উঁচু বাড়ির মাঝখানের এক ফালি লম্বা আকাশে তারার ভিড়। কী অবাক কান্ড। এ কি ভোজবাজি?

সে রাত্রে অবশ্য বেশী ঘুরিনি আমরা, এক-একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে একেকবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন বুদ্ধদেব। কতো নাম, কতো বই, কতো সুগন্ধ। সেই স্পর্শে গন্ধে নামে মানুষটি আত্মহারা, আবেগে সেই জগতেই ঘুরপাক খেলেন দু ঘন্টা। তারপরে বাড়ি ফিরে এলাম। অ্যালেনের ইচ্ছে ছিলো না, বলছিলেন, 'আরে, এখুনি ফিরবে কী?' কিন্তু রাত একটু বাড়তেই শীতের কামড় যথেষ্ট ধারালো হয়ে উঠছিলো। আমি একেবারে শক্তপোক্ত ভাবে নারাজ হয়ে উলটোপথ ধরলাম।

সেটা ছিলো মার্চ মাসের শেষ, এপ্রিল পড়তে পড়তেই অনুভব করলাম, সূর্যের তাপ বেড়েছে, সারাদিন ঝক ঝক করছে রোদ, আকাশ গভীর নীল। যদিও তারই মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে একটু, সে ক্ষণিক। মেঘহীন বৃষ্টি। বিদায় নিতে নিতে যাই যাই করে যতোটুকু লেগে থাকা যায় শুধু সেটুকু শীতই অবশিষ্ট। নতুন ঋতুর নতুন উদ্যমের সঙ্গে শীতের জরা আর পাল্লা দিতে পারছে না। আর এই নতুনকে আমন্ত্রণ জানাতে লোকেরা বাড়ি রং করছে, গৃহিণীরা মোটা পর্দার বদলে, হালকা পর্দা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন দরজা জানালায়, মাথা ঘামাচ্ছেন তার ডিজাইন নিয়ে, পুরোনো আসবাবের বদলে কেনা হচ্ছে নতুনতর নমুনা। মেঝের ঘন রং কার্পেট তুলে নরম রং পাতা হয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, বাথরুমের শাওয়ার কার্টেন্‌টি পর্যন্ত না বদলিয়ে শান্তি নেই।

আরো বদলাচ্ছেন। আলোর ঢাকনা বদলাচ্ছেন, বালবের পাওয়ার বদলাচ্ছেন, মখমল কুশানের বদলে স্তূপ করছেন সিল্ক সাটিন। লিভিংরুমের জানালায় ঝুলিয়ে দিচ্ছেন বাগান।

এদিকে অ্যাভিনিউর ধারে ধারে সাজানো গাছগুলোও কখন যেন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে নিজে নিজে, আর সেখানে কে যে কোথা থেকে বোতামটি টিপে দিচ্ছে, ঠিক জলসিঞ্চন হয়ে যাচ্ছে দু' বেলা। রোদে যাবার আগে, আর রোদ থেকে ফেরার পরে দু' বেলাই জল খেয়ে তারা সবুজ, যেন ছোটো বাচ্চা হাত পা ধুয়ে ফিটফাট। আর ফিটফাট এই সেদিনের নোংরা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ফুটপাত। বরফের জল সারা শহরটিকেই ধুয়ে মুছে তকতকে করে দিয়ে মিলেছে গিয়ে হাডসন নদীর হৃদয়ে।

একদিন বেরিয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর কলেজ পর্যন্ত গেলাম। ফিরবো একা। একা চলবার মহড়া সেই প্রথম। ওঁর ক্লাস ছিলো, কিন্তু উদ্বেগে ঢুকতে পারছেন না, কেবলি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন আর বলছেন, 'হারিয়ে যাবে না তো? একবার কোনো রকমে পূব পশ্চিম গোলমাল হলে কিন্তু মরে যাবে ঘুরতে ঘুরতে। না এলেই পারতে।'

আমারও যে একটু একটু ভয় করছিলো না তা নয়। কোন্ বাসে উঠতে কোন্ বাসে উঠবো, আর ওঠা মাত্রই তো দুম করে বন্ধ হয়ে যাবে দরজাটা, চেষ্টা করলেও আর নামতে পারবো না। তখন কী হবে?

পৃথিবীর এই বিশাল নগরটির চেহারা ঠিক অন্যান্য নগরের মতো নয়। এর পরিকল্পনা কোন্ প্রযুক্তিবিদের দ্বারা সাধিত হয়েছিলো জানি না। অন্তত আমি জগতের যতোগুলো শহর দেখেছি তাদের সকলের চেয়েই এর চেহারা অন্য রকম। উত্তরে দক্ষিণে সব অ্যাভিনিউ, পূবে পশ্চিমে স্ট্রীট। ভিতরে ভিতরে অবশ্য জট পাকানো রাস্তা আছে, কিন্তু মানহাটানের ভূগোলটা এই রকম। অ্যাভিনিউগুলো দোকান বাজার হোটেল আপিস বাণিজ্যিক সংস্থা ইত্যাদিতে ঠাসা। আর স্ট্রীট-গুলো সব আবাসিক। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে, যেমন চোদ্দো স্ট্রীট, তেইশ স্ট্রীট, চৌত্রিশ বিয়াল্লিশ ইত্যাদি। এই স্ট্রীটগুলোও তাদের বিপণি দেখিয়ে আমার মতো পথিকের মন-হরণে সর্বদাই সক্ষম।

ওয়াশিংটন স্কোয়ারে গিয়ে তিনটে অ্যাভিনিউ আর অনেকগুলো স্ট্রীট এক সঙ্গে মিলেছে। তার দক্ষিণেই রাস্তা ঢুকে গেছে গ্রামে, সেখানকার পথ ঘাট সব অন্য রকম। অনেক অলিগলি, অনেক নাম না জানা পাড়া। কামিংস এখানেই ছিলেন। তাঁর রাস্তার নাম ছিলো, প্যাচিন প্লেস। একবার এই বাড়ি বার করতে বুদ্ধদেবকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিলো। মানহাটানের অংক কষা রাস্তার যে কোন বাড়িতেই নম্বর জানলে নিয়ে যায় ট্যাকসিওলা। এখানে আর পারে না। ঘুরে ঘুরে যখন গিয়ে পৌঁছোলেন, 'সময়ের জ্ঞান নেই' এই অপবাদে নিশ্চয়ই তাঁকে কলঙ্কিত করা যায়। নিমন্ত্রণ ছিলো চায়ের, চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কামিংস, ভাবছেন কী হলো আমার বিদেশী বন্ধুর। যখন বহাল তবিয়তে গিয়ে পৌঁছোলেন, তখন কী কৈফিয়ত দিয়েছিলেন তা অবশ্য আমার জানা নেই কেননা আমি সঙ্গে ছিলাম না।

আমাকে অনেকভাবে বুঝিয়ে বাসের কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপর বুদ্ধদেব নেমে গেলেন। আমি কিন্তু বাসের জন্যে অপেক্ষা করলাম না। সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। অ্যাভিনিউটা যখন ঠিক আছে, স্ট্রীটটাও নিশ্চয়ই পাবো। আর যেহেতু উত্তরে অগ্রসর হচ্ছি, এবং আমার স্ট্রীট পশ্চিমে, তখন অবশ্যই পশ্চিমটা বাঁয়ে থাকবে। অর্থাৎ অ্যাভিনিউ না বদলালে আর ভয় নেই। রওনা তো হচ্ছি এক থেকে, ব্লক গুণে গুণে গেলেই হবে।

কিন্তু ব্লক গুণে গুণে যাবো কোথায়? আসলে সেই চৌদ্দ স্ট্রীট। বিছানা

আপনার চুল
সুন্দর সতেজ রাখতে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
সুপ্রাচীন সূত্রের বহু-পরীক্ষিত ল্যাকটোনের সাথে প্রাকৃতিক চন্দন তেল মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এই কেশ তেল—অপরিসীম যত্নে ও সতর্কতায়। একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার চুল যাতে সুন্দর ও সতেজ হয়ে বাড়তে পারে।
অনবদ্য এই কেশ তেলের
প্রস্তুতকারক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
(ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে)
BENGAL CHEMICAL
UNSCREW
CANTHARIDINE
A SUPERFINE HAIR TOILETRY
ভারতে
এই তেলের
বিক্রয়
সর্বাধিক
ACIL/BC2/78 BEN

খাজিপ কিনতে গিয়ে তিন সপ্তাহ আগে যে বিকেলে যে স্ট্রীটের প্রেমে আমি হাবুডুবু খেয়ে এসেছিলাম। এখন সেখানে গিয়ে মনের সুখে সব দেখবো। এক থেকে চৌদ্দ সহজ দূরে নয়, বাসে উঠেও নামতে পারতাম। আসলে ঐ বন্ধ বাসে উঠতে আমার ভয়ই করছিলো, যদি নামতে না পারি। চৌদ্দ স্ট্রীটের কথা ভেবেই এই ভয় নয়, নিজের স্ট্রীট বিষয়েও খুব ভরসা হচ্ছিলো না। তা ছাড়া হাঁটতে আমার খুব ভালোও লাগছিলো। তখনকার শীত বলা যায় আমাদের মাঘ মাসের মতো। একটু হেঁটেই গা গরম হয়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে নয়ন মন বিমোহিত।

বসন্তের এমন স্পষ্ট আবির্ভাব আর কখনো দেখিনি। শুধু অ্যাভিনিউর সাজানো কাননই নয়, স্ট্রীটগুলোর দু' পাশে সারিবদ্ধ গাছের যে কংকালগুলো এতোদিন একটা উদ্বাহু রিক্ততার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, অবাক হয়ে দেখি সেই সব গাছের ডালে ডালে কচিপাতার কলরোল। লালচে লালচে ফোঁটা ফোঁটা পাতাগুলো কী আনন্দেই না শিহরিত হয়ে তির তির করে নাচছে বাতাসে।

মহিলারা খাটো কোটে, হালকা টুপিতে ছিমছাম। বালক-বালিকারাও নেমে এসেছে রাস্তায়। চ্যাঁচাচ্ছে, দৌড়চ্ছে, স্কেট করছে, তাদের আর আনন্দের সীমা নেই। জাঁদরেল সাহেবরা মোটা ওভারকোট ছেড়ে রেইনকোট ধরেছে, যুবকরা দুর্দান্ত হাওয়াকে উপেক্ষা করে জ্যাকেটের জীপার খুলে দিয়েছে—

হাঁটতে হাঁটতে দেখতে দেখতে কখন ভুলে গেছি চৌদ্দ স্ট্রীটের বিপণি, প্রকৃতির আকর্ষণে এতোগুলো ব্লক পার হয়েও মনে হচ্ছে না কোনো পরিশ্রম হলো।

বিকেলে আরো সুন্দর। ফুটপাত ভর্তি সব রঙিন রঙিন হালকা চেয়ারে টেবিলে বাগানের ঘেরাও দিয়ে বসে গেছে রেস্তোরাঁ। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষের দল আসছে, বসছে, হাসছে, খাচ্ছে, গল্প করছে, উঠে যাচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, একটা আমোদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। আর ফুল কি ফুল। ফুলের দোকানগুলোও যে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। আর তা সাজিয়ে রাখারই বা কী বাহার। ধাপে ধাপে থরে থরে নাম লিখে লিখে রং মিলিয়ে মিলিয়ে একেবারে নন্দনকানন। দেখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পথিক, কিছু না কিছু কিনেই নিচ্ছে সবাই। জায়গাটা একেবারে আলোয় আলো।

শুধু ফুলের রংয়েই আলো হয়ে নেই; গ্রীনিচ গ্রামের ছবি আঁকিয়েরাও রংয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তারাও তাদের ছবি নিয়ে নেমে এসেছে পথে, ফুটপাতের ধার ঘেঁষে বসে গেছে প্রদর্শনী, ইজেল পেতে সেখানেই আঁকছে তারা, বিক্রী করছে, দশ মিনিটে তৈরি করে দিচ্ছে পোর্ট্রেইট। যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই নিজের নিজের প্রতিবিম্বের আকর্ষণে বসে যাচ্ছে আঁকাতে। কতো রকমের যে পোজ্ দিচ্ছে তার ঠিক নেই। কেউ সহাস্য, কেউ চিন্তিত, কেউ উদাসীন, কেউ বিমর্ষ। আবার কেউ চোখ টান টান করে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন, আবার কবিতা লেখার ভানও করছে কেউ।

আকাশের তলায়, রাস্তার উপরেই যে এরকম একটা অবাধ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করা যায় এ আমাদের কাছে একেবারেই নতুন। পঁচিশ তিরিশটা ব্লক ভর্তি প্রমোদের মেলা। সকলেই সুখী, সকলেই খুশি। প্রণয়ীযুগলদের তো কথাই নেই। এরই মধ্যে আবার ঝাপটা হাওয়ায় একটা মেয়ের নকল চুলের পালা প্রায় উড়ে যাচ্ছিলো, দু হাতে চেপে ধরে সে হেসে উঠলো জলতরঙ্গের মতো, তার প্রেমিকও জড়িয়ে ধরে সাহায্য করলো তাকে। এরই মধ্যে আবার বীট কবিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দাড়ি নিয়ে। তারাই তখন নতুন করে দাড়ির প্রবর্তক। এবং সরু প্যান্টের। পায়ে ইচ্ছাকৃত ছেঁড়া ময়লা ক্যানভাসের জুতো, গায়ে ঘন রং, হাত কাটা বুক খোলা সার্ট, উদ্‌ভ্রান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। মেয়ে বীটরাও আছে সঙ্গে। তাদের গালে রং নেই, ঠোঁটে রং নেই, পিঠ ছাওয়া না-আঁচড়ানো সোনালী চুল বাতাসে উড্ডীন। পায়ে কালো মোজা।

আস্তে আস্তে সূর্য যখন হেলে যাচ্ছে পশ্চিমে, আগুনের বলটা খানিকক্ষণ থমকে থেকে অন্ধকারের সীমানায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে, আর সেই কৃত্রিম আলোর ফোয়ারায় রাত বাড়তে বাড়তে সবাই যেন আরো চঞ্চল আরো উদ্দাম। সেই উদ্দামতার স্রোতকে অনেকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সারা রাত্রির দরজায়।

পেইভমেন্ট ছেড়ে একটু নিচে নেমে নক্ষত্রের মতো মিটিমিটি আলো জ্বলা ছোটো নাইট ক্লাবগুলো মদ্য এবং খাদ্যের সঙ্গে জ্যাজ বাজিয়ে শোনাচ্ছে, বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও আবার কবিতা পাঠও চলছে সেই সঙ্গে।

আর মানহাটানের দিকে এগিয়ে গেলে তো একেবারে ধাঁধিয়ে যাবে চোখ। বিজ্ঞাপনের কী ঘটা! এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিজ্ঞাপন যে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। স্বচ্ছ কাচের শো-কেসগুলোতে রক্ত মাংসে গড়া যুবতী যুবতী মেয়ের মতো দেখতে প্রমাণ সাইজের এক একটি পুতুলকে স্প্রীংয়ের পোশাক পরিয়ে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যে, কল্পনা করা যায় না তাদের প্রাণ নেই। এই স্প্রীংয়ের পোশাক প্রদর্শনে সব বস্ত্রব্যবসায়ীরাই সমান উন্মত্ত। কার থেকে যে কে বেশী আকর্ষণ করবে ক্রেতাকে তার প্রতিযোগিতায় এক একজন দোকানদার তাদের মডেলগুলোতে আবার নানা রকম অশ্লীল ভঙ্গিতেও দেখাচ্ছে।

ফীফ্‌থ্ অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটলে মনে হয়, বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত, এমনি তার জাঁক।

নিউইয়র্ক টাইমস্‌-এর পাতাটি ওজনে এতোটাই ভারি হয়েছে যে, এখন আর

রোববারের পত্রিকাটি একজনের পক্ষে বয়ে আনা সহজ নয়। অবশ্য রোববারের 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্' পত্রিকা বহন করা সব সময়েই কষ্টসাধ্য।

একদিন এক ভদ্রমহিলা গল্প করলেন, (জানি না সত্য কিনা) একটি সদ্য আগত ভারতীয় ছেলে নাকি বড় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো। সে তখন নতুন এসেছে, প্রায় কিছুই চেনে না, কিছুই জানে না, এই কাগজটিরও নাম শোনা ছাড়া চোখে দেখেনি। সকাল বেলা কিনতে বেরুলো। রাস্তায় নেমেই দেখে এক হকার লেছে কাগজ নিয়ে। তৎক্ষণাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখের পাইপটা বাঁকা করে ধরে (এখানে এসেই নিজেকে বিজ্ঞ দেখাবার জন্য এটা কিনেছে) পকেট থেকে ব্যাগ বার করতে করতে বললো, 'দাও তো একখানা।'

মোটা সাহেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, মাথার বিরল কেশে হাত বুলোলো, বললো, 'কী দেব?'

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বললো, 'কী আবার, একখানা কাগজ।'

'কাগজ? আমি তো একখানাই কিনেছি।'

'একখানা।'

'দেখছোই তো একখানা।'

'ও। না, আমি বলছিলাম যে—'

'কাগজ কোথায় পাবে জিজ্ঞেস করছো কি?'

'ঠিক তাই।' মুখের পাইপ ততোক্ষণে আলগা, 'কাইন্ডলিকে' খাইন্ডলি বলার চেষ্টাও ঢিলে।

সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে আঙুল তুলে অদূরেই ফুটপাতের সঙ্গে লাগানো একটি কাগজ বোঝাই চাকাওলা গাড়ি দেখিয়ে বললো, 'ঐ তো। যাও একটা কাগজ নিয়ে এসো।'

'কাউকে তো দেখছি না।'

'কে থাকবে! পাশেই বাক্স আছে, দাম ফেলে দাও ভিতরে।'

পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে সাহেব চলে গেল হনহন করে। ছেলেটি লজ্জিত, দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললো, সাহেবগুলোর চেহারা এতো একরকম যে বোঝাই যায় না কোন্‌টা ছোটোলোক আর কোন্‌টা ভদ্রলোক। যত্তো সব—'

সেই কাগজে আপনি কী চান? সব আলাদা আলাদা বিভাগ সাজানো। খুঁজে পাবার সুবিধের জন্য লম্বা সূচিপত্র আছে। খেলাধুলো থেকে শুরু করে জগতের যাবতীয় খবরে ঠাসা। বোধ হয় কেজি আটেক কাগজ তাতেই লেগে যায়। আর তার জন্য যদি আট কেজি লাগে বিজ্ঞাপনে লাগে দশ কেজি। জামা জুতো আসবাবপত্র, বাসন, ঘরসাজানো, তৈরি বাগান, তৈরি বাড়ি, বাড়ি তৈরি, বাড়ি ভাড়া গাড়ি, দোকান, খাবার, রেস্তোরাঁ, এগুলো তো মামুলি। তার উপর রোগা থাকার উপায়, মোটা কমাবার বড়ি, যোগাভ্যাসের পদ্ধতি, ব্যায়ামের বই, মাথার নকল চুল, গালের নকল মাধুর্য, বয়স্ক নিষ্প্রভ চোখের জন্য নকল যুবতী-চোখ, চোখের পল্লব, দাঁতের পাটি, বুকের প্যাড, কোমরের টাইট, প্রেম করবার উপায়, স্বামী-পাকড়াবার কৌশল, মেয়ে ভুলোবার শিক্ষা, কী যে থাকে না তা কেউ ভেবে বলতে পারে বলে আমার ধারণা হয় না।

এসবে চোখ বুলোলে তাজ্জব হয়ে ভাবতে হয় এতো প্রয়োজনও তাহলে আছে জীবনে?

আপনি নিঃসঙ্গ আছেন? এই যে এই সংস্থায় সঙ্গী আছে। এখুনি চিঠি লিখুন কেমন সঙ্গী আপনার পছন্দ। বিয়ে? তাও পাবেন। বিয়ে নয়? শুধু প্রেম? হ্যাঁ, তাও আছে বইকি। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বীচে গিয়ে ফুর্তি করে আসতে চান? বেশ তো। কী ধরনের গড়ন পছন্দ? কী কী গুণসম্পন্ন পুরুষ বা মেয়ে পছন্দ? রোগা? মোটা? মাঝারি? বয়স্ক? যুবতী? তরুণী? বালিকা?

শুধু তাই নয়, তার উপরে কম্পিউটার মেশিনেরও বিজ্ঞাপন আছে বইকি। এখন তো এ দেশে বিবাহবিচ্ছেদের জ্বালায় অস্থির হয়ে লোকেরা সব বিয়ের পাত্রপাত্রীদের জন্য কম্পিউটার মেশিনেরই শরণাপন্ন হচ্ছে। প্রেমটেম যা করবার করে নাও, কিন্তু বিয়ের বেলায় এখানে এসো, ঠিক বউ বা বর করে দেবে মেশিন। কেন না, এ তো দেখাই যাচ্ছে বিয়ে করা এক জিনিস, প্রেম অন্য। প্রেমের দায়েই অবশ্য বিয়ে, কিন্তু টেঁকে না কেন? কেন দেখতে দেখতে আগুন নিবে ছাই হয়ে যায়? ঠিক মতো নির্বাচন হলে নিশ্চয়ই ধিকিধিকি অন্তত জ্বলবে, অন্তত বাচ্চাগুলোর জন্যে থাকা যাবে একত্র। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে খুন করতে ইচ্ছে করবে না পরস্পরকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর হবে না, ছেলেমেয়েরা জুজু হয়ে থাকবে না ভয়ে।

তাই মেসিনের কাছেই হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের নাম ঠিকানা গুণাবলী জমা আছে। মেশিনই পরীক্ষানিরীক্ষা করে জানিয়ে দেবে কোন ধরনের পুরুষের সঙ্গে কোন ধরনের স্ত্রীলোক যুক্ত হলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম।

বলা যায়, এ-ও এক ধরনের ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলানো। ভারতীয়দের ব্যাপারটা নির্ভর করে ঠাকুর পুরুত আর জ্যোতিষীর উপর, ওদেরটা মেশিন। তবে মেশিন একটা বিজ্ঞানসম্মত বস্তু, সেটা অবশ্যই কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে না।

বাইরের ধস্তাধস্তির কাজ
মজবুত কাপড়ের সাজ
দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনে চলাফেরার ভীড়ে ধস্তাধস্তি, ঠেলাঠেলি, দৌড়-ঝাঁপ এই সবকিছুই সহ্য করার জন্যে আপনার চাই শক্ত-মজবুত কাপড়।
আপনার কর্মব্যস্ত জীবনে এই টানাপোড়েনের সঙ্গে যাতে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তার জন্যে শক্ত-মজবুত বুননে তৈরী বিনীর এই সূতীর কাপড়। যে কাপড় পরেও আরাম—টেঁকেও বহুদিন।
বিনী র সূতীর কাপড়!
শীতল আরামকর-বিনীর মজবুত কাপড়

ছোট ছোট কবিতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১

রহিম ছাগের পাল নিয়ে যায় মাঠে
ঘণ্টা বাজে ওদের গলায়
ওরা ঘাস খায় সারাদিন,
আত্মাহীন মাংস নিয়ে এলোমেলো চরে,
বিকেলে ঘাসের পরে ঝরে হিম, ওরা হিম চাটে
এদিকে ওদিকে ঘুরে হয়তো হারিয়ে যেতে চায়
কারো কারো হারিয়ে যেতেই ভালো লাগে।
এদিকে ছাগলশিশু কচিস্বরে ডাকে,
রহিম হাঁক পাড়ে, আও, আও,
ওদের তো তাড়া নেই, ওরা জানে
রহিম তো কাছাকাছি রয়েছে কোথাও,
নিয়ে যাবে ; অথচ জানে না
রহিম চেনে না তাঁকে, শ্রীচৈতন্য ; মাৎসর্য মানে না॥

২

অনেক কিছুই চাইনি কিন্তু অনেক কিছুই পেলাম।
যেতে বললো, যাই নি
কিন্তু শেষ অবধি তো এলাম
এই   শ্মশানে, কারখানায়,
মানুষ মেরে এরাই নাকি লৌহ ভালো বানায়।
লৌহ বলতে মনে পড়লো বিষ্ণু আর পূরবী
মধ্যিখানে বসেন।

আচ্ছা, আপনি কলকাতাতে বসে কী কী করেন ?
শুধু সময় নষ্ট,
আপনি খোঁজেন চেষ্টা করা কষ্ট ?
মুখখানি তো বাংলা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি
পোশাক-আশাক করেন।

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

সাঁকো পার হওয়া যায় না......
উড়ে আসে ঝড়। আলোর ফুল
ঘুরে ঘুরে   জল-বুকে নকশা এঁকে যেতে ;
কোমল মোমের ছাইয়ে কৃপাদৃষ্টি—
তবু বোম্বাই সংসারে পাগল রক্তের কণা ছোটে......

সাঁকো পার হওয়া হয় না।
বাইরের ওই যে আকাশ নদীর মুখোমুখি দাঁড়ায়—
খসাছে চরের মাটি, সেখানেও কৃপাদৃষ্টি ;
বোম্বাই সংসারে পাগল রক্তের সমান ভাগাভাগি!

সাঁকো পার হওয়া যায় না......!
নদীর ধারায় হিম কাঁপন,
শরীর-স্রোতে, হ্যাঁ শরীর-স্রোতে—
হাত নেড়ে এখনই চলে যেতে দাও তাকে।
সে সুখে নেই ; বোম্বাই সংসারে রক্তের কণা ছোটে!

ওই

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

লেখো, যে ভাবে খুশি, একটা কবিতা। যে কোন ভাবেই হোক,
অন্তত আট বা ছ'লাইন কিছু একটা লেখো।
যে কোন জিনিসই ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কবিতার ভেতর। শুধু
শুধু প্রকাশ কোরো ন
রক্ত ঝরে পড়ার গোপন কথা।
লেখো।
কেনো বসে আছো চুপচাপ ভূতের মতন। বেজে ওঠে বেল,
দরজা খোলো—সার্ট পরে প্যান্ট পরে
আরো সব ভূতেরা এসেছে। কফি দাও, কথা বলো।
ভুলে যাও না লিখতে পারার কথা,
ভুলে যাও
সাদা পাতা ও পেনের কথা, ভুলে যাও
দুপায়ে এখনো দাঁড়িয়ে থাকার কথা।
উড়ে যাও
জানালা দিয়ে দূরে। ওই,
আলো জ্বলে উঠেছে আবার। ঝলমল করছে ভূতুড়ে পাড়া।

সুন্দরবনের বাঘ

কল্যাণ চক্রবর্তী

ব্যাঘ্রকুলের আবাসস্থল এ সুন্দরবন নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিকদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আছে : (১) 'সুন্দরী' নামক বৃক্ষ থেকে, (২) মনোরম বা সুন্দর বন ও সুন্দর প্রাণীকুল থেকে, (৩) সমুদ্রের নিকটবর্তী বনরাজি বা সমুদ্রবন থেকে। কিন্তু মতবাদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, এটা নিশ্চিত যে, সুন্দরবন পৃথিবীর ব্যাঘ্র-মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ বন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল—যেখানে বন ও বন্যপ্রাণী একটি বিশেষ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে ও প্রকৃতি একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু ভারসাম্য রচনা করেছে। এখানে বন ও বন্যপ্রাণী একটি বিশেষ প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈব পরিবেশের মধ্যে তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে। জলকাদা ও অসংখ্য শূলোয় ভরা এ জঙ্গলের প্রাণী কতকগুলো বিশেষ ধরনের অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে থাকে—যাকে এক কথায় অভিনব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে:

সুন্দরবনের অভূতপূর্ব পরিবেশে মানুষখেকো বাঘ, মানুষখেকো কুমীর,

গোসাপ, বিচিত্র রঙ-বেরঙের পাখি, মাছ, কচ্ছপ, সাপ, মৌমাছি, কাঁকড়া, শামুক ও অসংখ্য বিচিত্র প্রাণীর এক অত্যাশ্চর্য সমারোহ ঘটেছে। এমন কি, যেসব মানুষ সুন্দরবনের বিচিত্র পরিবেশে গড়ে উঠেছে তাদের আচার-আচরণেও এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত। পুরাণের বিচিত্র উপাখ্যানে, রূপকথায় ও সর্বোপরি সুন্দরবনের বিচিত্র পরিবেশ মানুষের মনের কোনায় হয়ে উঠেছে মহিমামণ্ডিত ও চমকপ্রদ। হয়তো এ কারণেই এ বনজীববিজ্ঞানের গবেষণার পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মানুষের প্রাণীহত্যার পাশবিক প্রবৃত্তি ও বনাঞ্চলের ক্রমশ সংকোচনের ফলেই বুঝি এক সময়ের গর্ব যে জাভাদেশীয় গণ্ডার ও বুনো মোষ, আজ তা সুন্দরবনে অতীতের বস্তু হয়ে উঠেছে। কাজেই অন্যান্য অসংখ্য জীবজন্তুর ভাগ্য আজ প্রকৃত গবেষণার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

Estuary বা খাঁড়ি হচ্ছে নদীর অলবণাক্ত জল ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এ রকম অপর্যাপ্ত মিষ্ট ও নোনা জলের মিশ্রণে এক অপূর্ব রাসায়নিক পরিবেশ গঠিত হয়। জলে লবণাক্ততার দৈনিক পরিবর্তন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যে গাছপালা ও প্রাণীকুলের শারীরতত্ত্বগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়। কাজেই খাঁড়ির জলের তাপমাত্রা নদীর জলের ও সমুদ্রের জলের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। জলে লবণাক্ততার শতকরা তারতম্যের জন্য প্রাণীকুলকে একটি বিশেষ ধরনের অনুকরণে আবদ্ধ হতে হয় যার নাম 'অসমো রেগুলেটারী অ্যাডাপটেশন'। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামায় প্রাণীকুলকে উভচরের ভূমিকা পালন করতে হয়।

সুন্দরবনের বাঘের চাতুর্য আজ মানুষের কাছে উপাখ্যানও। এ প্রাণীর সবিশেষ ভয়াবহতা মানুষের কাছে কল্পনার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হয়তো সুন্দরবনের বাঘের বৈশিষ্ট্যের কিয়দংশ তুলে ধরতে পারে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কোনও অঞ্চলে ২৪ পরগনা জেলার আমতলী গ্রামের কয়েকজন মৌলী মধু সংগ্রহের উদ্দেশে যায় ১৯৭৭ সালের ১৮ই মে। ঐ প্রকল্প অঞ্চলের একটি ছোট খালে তারা রাত কাটানোর পরিকল্পনা নেয় ও নৌকো নোঙর করে। রাত যখন প্রায় তিনটে তখন হঠাৎ তাদের নৌকোর চার আরোহীর মনে হয় যে, নৌকোটা নড়ে উঠেছে। হঠাৎ এক আরোহীর নৌকোর পিছনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। সে দেখতে পায় এক বিরাট বাঘ তাদের নৌকোর উপর সামনের দু পা তুলে ঝুলে আছে। পিছনের পায়ে মাটি না পাওয়ায় ও নৌকোর ডালির মধ্যে যে সরু ফাঁক আছে তার মধ্যে বাঘের পা ঢুকে যাওয়ায় বাঘটির নৌকোয় উঠতে অসুবিধা হয়। ইতিমধ্যে মানুষের সাড়া পাওয়ায় বাঘটি একটি বিশেষ শব্দ করে সাঁতার কেটে জঙ্গলের তীরে উঠে পড়ে। নৌকোয় বাঘের পা টানাটানির সময় তার কিছু লোমও আটকে যায়। সাধারণত সুন্দরবনের বাঘ যখন জঙ্গল থেকে সাঁতার কেটে নৌকোয় কোনও শিকার ধরে তখন নৌকোর কোনও আরোহী সে ঘটনা ঘটবার পূর্বে সামান্যতম ইঙ্গিতও পায় না, কেবলমাত্র যখন বাঘটি যুক্ত কোনও মানুষকে মুখে নিয়ে জলে ঝাঁপ দেয় তখন তার সঙ্গী-সাথীরা নৌকো নড়ে ওঠার আওয়াজ পায়। এত সূক্ষ্ম, চতুর ও দক্ষ শিল্পীর মত সমস্ত কাজটা সংঘটিত করে যে, প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসই হয় না যে, ঐরকম ঘটনা কোনও প্রাণীর পক্ষে ঘটানো সম্ভব।

এ অঞ্চলের প্রাণীকুলের প্রজনন কর্মাবলী চন্দ্রের অবস্থানের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সামুদ্রিক প্রাণিকুলের আহার্যের সময় পরিমাণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামার উপর নির্ভরশীল। যেমন একটি কাঁকড়ার (ফিডলার ক্রাবের—উকা উপজাতীয়) একটি অন্তর্নিহিত জীববিজ্ঞানরূপ ঘড়ি আছে—যার সাহায্যে তার আহার্যের সময়ের, এমন কি শরীরের উপরকার রঙে পরিবর্তনও সাধিত হয়। আরও দেখা গেছে যে ঐ জীববিজ্ঞানরূপ ঘড়ি (biological clock) জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনের সঙ্গে লবণাক্ততা, জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামা, চন্দ্রের অবস্থান ও সূর্যালোকের একটি ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive correlation) আছে। অপর দিকে প্রাণী প্ল্যাঙ্কটনের সঙ্গে সূর্যালোকের আতিশয্যের একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক (negative correlation) পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। কোন খাঁড়ির প্রাণী ও উদ্ভিদের উপরে কেবলমাত্র দিনের আলোয় গবেষণা প্রাণিকুলের অর্ধ ও বিচিত্রতর অধ্যায়ের উপরে আলোকপাতে অসমর্থ হয়। সুন্দরবনের বাঘের মানুষ খাওয়ার ঘটনাও উপরিউক্ত তথ্যাদির আলোকে বিবেচনাসাপেক্ষ, এবং উন্নততর জীববিজ্ঞান গবেষণাই নতুনতর দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে। প্রত্যক্ষ গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুন্দরবনের খাঁড়ির যে-কোনও নদী-নালায় প্ল্যাঙ্কটনের রাতের সংগ্রহ দিনের সংগ্রহ অপেক্ষা সাধারণত বেশী হয়ে থাকে অর্থাৎ রাত্রিবেলা একই নদীতে যে প্ল্যাঙ্কটন (plankton) পাওয়া যায় তা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে দিনের বেলার সংগ্রহের চেয়ে অনেকাংশে বেশী।

সমুদ্রের নিকটে জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামার তারতম্য ২½ থেকে ৩½ মিটারের মধ্যে সাধারণত হয়, এবং যেখানে সামুদ্রিক স্রোতের প্রভাব কম সেখানে ওঠানামার তারতম্য ৫½ থেকে ৬½ মিটারের মধ্যে হতে পারে।

ভূতাত্ত্বিক বিচারে সুন্দরবনের জন্ম কিন্তু বেশী দিনের নয়। দুই বা তিন হাজার বছর আগে বর্তমান সুন্দরবনের বেশীর ভাগ অঞ্চলই সমুদ্রগর্ভে ছিল। পলিমাটি দিয়ে গঠিত এ অঞ্চলে আবার সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপে ১৫৮৫ সালে দুই লক্ষ মানুষ (আনুমানিক), ১৬৮৮ সালে ষাট হাজার মানুষ (আনুমানিক) ও ১৭০৭ সালে তিরিশ হাজার মানুষ (আনুমানিক) নিহত হয়। ১৭০৭ সালে নাকি জলের উচ্চতা প্রায় পনের মিটার পর্যন্ত উঠেছিল বলে জানা যায়। গঙ্গার ইতিহাসের সঙ্গে সুন্দরবনের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারতবর্ষের অন্য আটটি অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কাজ চলছে ক্রমিক ব্যাঘ্রকুলকে তার অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা ও প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও জটিল ভারসাম্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। সুন্দরবনের

বাঘের সংরক্ষণবিধিগুলোর উপরে গবেষণাও ঐ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ অংশ। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষখেকো, সুন্দরবনের বাঘ মরা মাংস গ্রহণ করে না ও ঐ প্রাণী থাকি কোনও জ্যান্ত প্রাণীর টোপ (live bait) কখনই গ্রহণ করে না ইত্যাদি বহু ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা যে ভ্রান্ত সেটা বর্তমান লেখকের অন্যান্য পরিসংখ্যানভিত্তিক আলোচনায় রয়েছে। শেষোক্ত ধারণা অর্থাৎ জ্যান্ত প্রাণী টোপ দিয়ে সুন্দরবনের বাঘকে আকর্ষণ করার এক পরীক্ষা বর্তমান লেখক গ্রহণ করেছিলেন সুন্দরবনের প্রকল্প অঞ্চলে ১৯৭৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। সুন্দরবনের প্রকল্প অঞ্চলে প্রায় একটি গৃহপালিত শূকরকে লোহার খাঁচার ভিতরে রেখে দেওয়া হল। প্রথম দু দিন বাঘের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন একটি পুরুষ বাঘের পায়ের ছাপ লোহার খাঁচার চারিপাশে দেখা গেল। চতুর্থ দিন দেখা গেল ঐ বাঘটি লোহার খাঁচার চারিদিকে গর্ত করে ঢোকার চেষ্টা করে চলেছে, অবশ্য সমর্থ হয়নি। দু-একবার লোহার তার পরীক্ষা করেও দেখেছে ওটি কেমন শক্ত। এ খবর শোনার পর পঞ্চম দিনে লেখক আরও একটি গৃহপালিত শূকর নিয়ে ঐ অঞ্চলে হাজির হন ও সদ্য নিয়ে আসা শূকরটিকে লোহার খাঁচায় রেখে ও খাঁচার শূকরটিকে বাইরে বের করে বেঁধে দেওয়া হল পর্যবেক্ষণ শিবিরের কাছে। লেখক পর্যবেক্ষণ শিবির থেকে বাঘের গমনাগমন প্রভৃতি নজর করতে ব্যাপৃত হলেন। প্রথম দু-তিন ঘণ্টা বাঘের অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ প্রায় তিনশ' পঞ্চাশ মিটার দূরে দেখা গেল যে একটি বাঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে পর্যবেক্ষণ-লাইনের ধারে এমন ভাবে শুয়ে আছে যে তার কেবলমাত্র লেজটাই নজরে পড়ে, তার শরীরের বাকী অংশ জঙ্গলের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সন্ধ্যার ঠিক আগে বাঘটিকে আর ঐ জায়গায় দেখা গেল না। প্রথম রাত এভাবে কাটল, ও রাতে মাত্র একবার বাঘের গর্জন শোনা গেল। পরের দিন সকাল হতেই আবার ঐ বাঘটিকে একই ভাবে একই জায়গায় দেখা গেল। কিন্তু দশ-পনের মিনিটের মধ্যে বাঘটি চোখের আড়াল হল ও সকাল দশটা নাগাদ আবার পর্যবেক্ষণ লাইনের ধারে দেখা গেল। এবার লেজ ছাড়াও শরীরের পেছন দিকের খানিকটা অংশও দেখা গেল। আবার মিনিট পনের এভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর বাঘটি হঠাৎ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কোথাও আর তার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হঠাৎ বিকেল সাড়ে চারটার সময় দেখা গেল বাঘটি পর্যবেক্ষণ শিবিরের কাছে জলাধারের ডানদিকে বসে আছে। চোখকে বিশ্বাস হল না। হঠাৎ কোন সুযোগে জাদুকরের মত এখানে এসে গেল তা বোধগম্য হল না। জ্যান্ত টোপ দেওয়া শূকরটির তখন আধমরা অবস্থা। শূকরটি নিজের চোখকে বারে বারে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাঘটির কোন চিত্তচাঞ্চল্য

নজরে পড়ল না। জ্যান্ত টোপ তখন সুন্দরবনের বাঘের কাছ থেকে মাত্র চল্লিশ মিটার দূরত্বে। কিন্তু প্রায় ত্রিশ মিনিটকাল অতিক্রান্ত হল অথচ বাঘের নজরে, শ্রবণে ও ঘ্রাণে জ্যান্ত টোপ ধরা পড়ল না। হঠাৎ জঙ্গলে কোন নাম-না-জানা পাখির কারসাজি বোধ হয় বাঘকে হঠাৎ জ্যান্ত টোপের ওপরে দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। বাঘের ঘ্রাণশক্তির তীব্রতা সম্বন্ধে সন্দীহান হওয়ার কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও সঙ্গে সঙ্গে এসেই জ্যান্ত টোপ ধরতে প্রবৃত্ত হল না। বাঘটি হঠাৎ নিকটবর্তী জঙ্গলের ধার দিয়ে চলতে শুরু করল জ্যান্ত টোপের দিকে, যেতে যেতে হঠাৎ টোপ থেকে প্রায় আট মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে রইল ও নিজের শরীরকে যতদূর সম্ভব নীচু ও ছোট করে শেষের আট মিটার বিদ্যুৎগতিতে টোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে। শূকরটি চীৎকার করার খুব বেশী সময়ও পেল না। শিকারপদ্ধতি ভালভাবে দেখার উদ্দেশে জ্যান্ত টোপটিকে নাইলন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল পর্যবেক্ষণ শিবিরের খুঁটির সঙ্গে। বাঘ তাই তিন-চার মিনিট ধরে টোপটিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও সফল হোল না। তখন ওখানেই টোপের মাংস খাওয়া শুরু করল ও বেশ খানিকটা মাংস নিয়ে প্রায় চার শ' মিটার দূরে চলে গেল। প্রায় পনের মিনিট বাদে আবার বাঘটি দড়ির সঙ্গে বাঁধা ও পড়ে থাকা মাংস নিতে এল। স্পট-লাইটের আলোতে বাঘটি মাংসের কাছে এসে প্রায় দশ মিনিট ধরে টোপের অবশিষ্ট হাড়-মাংস খেল। তারপর পাত্রে রাখা মিষ্টি জলের পাত্র থেকে জল খেল ও প্রায় রাত সাড়ে আটটার সময় নিকটবর্তী জঙ্গলে চলে গেল। সমস্ত ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হল। সুন্দরবনের বাঘের এরকম বিচিত্র দৃশ্য নিজের চোখে দেখে বাঘের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য সম্যক উপলব্ধি করা গেল।

সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে বহু গল্পকথা ফেরে লোকের মুখে মুখে—তার অনেকাংশই অবশ্য অলীক কল্পনা। জীববিজ্ঞানীদের কর্তব্য হল সেই অলীক কল্পনার জগৎ থেকে বিজ্ঞানের আলোকে ঘটনাগুলির বিচার করা ও বাঘের প্রকৃতি ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। মানুষখেকো বাঘ সম্পর্কে মানুষের ধারণার সার্থক উপলব্ধি ও বিজ্ঞানের নিরীখে তার সত্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। বাঘ সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিজ্ঞানসম্মত হলে মানুষের প্রেম ও প্রীতি এ প্রাণীটির ওপরে বেড়ে ওঠারই সম্ভাবনা—ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কর্মীদের পক্ষেও প্রকল্প রূপায়ণের কাজ সহজতর হবে কারণ প্রীতির শৃঙ্খলে বাঁধা না গেলে কেবলমাত্র আইনের শৃঙ্খলে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ দুরূহ হয়ে উঠতে পারে। জন্তুদের ওপরে মানুষের সহজাত প্রীতিই কেবলমাত্র প্রকল্পের সম্যক সাফল্য আনতে পারবে, এর জন্য কোন বিকল্প সহজ পথ নেই কারণ, মহাত্মা গান্ধীর কথায়,

"It is an arrogant assumption to say that human being are lords and masters of the lower creation On the contrary being endowed with greater things in life, they are, trustee of the lower animal kingdom."

আগন্তুকেরা ফিরে যাচ্ছে
যাক্ বাবা...
প্রাণে মরিনি!

অরণ্যদেবের সুর্গোদ্যান কে এরা ধ্বংস করতে বসেছিল.....

ও একা! আমরা চারজন! পেরে উঠবে না!
আমাকে বাদ দাও...

এবারে...
মার!

অরণ্যদেবের ঘুষি চলছে...
উঃ!
আঃ!

তোমরা একে অসভ্য, তায় অকৃতজ্ঞ!

এই বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও তোমরা আমার পোষা প্রাণীগুলিকে মারতে চেয়েছিলে!
NO HUNTING
7/24

এবার তোমাদের শাস্তি দেব!
কী? কী শাস্তি?
?
!
চলবে

বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব

জগন্নাথ চক্রবর্তী

চল্লিশ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের কিছু কিছু সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট তো নয়ই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুনীতিকুমারের মতো ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও সমিতি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সফল হতে পারেননি। তবু বাংলা বানানের সংস্কার যে সম্ভব, এবং সংস্কারের ফল যে ভাল হতে পারে, এই প্রত্যয় সমিতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই প্রথম সংস্কারের কাজ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় একটি সংস্কারেরও প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় বানান সংস্কারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত হতে আরম্ভ করেছে ; এটি সুলক্ষণ। মনে রাখতে হবে যে, বানান সংস্কারের কাজে যতো বিলম্ব হবে, কাজটি ততোই দুরূহ হয়ে উঠবে। অভ্যাস ও অভিধানের মধ্যে বানানের শিকড় যতোই প্রলম্বিত হবে তার উৎপাটন ততোই কঠিন হবে। ইংরেজি ভাষায় এই কারণেই বানান সংস্কার এখন প্রায় অসম্ভব। এমন কি মার্কিন ইংরেজিও এ বিষয়ে এক কদমের বেশি অগ্রসর হতে পারে নি। বাংলার অবস্থা কিন্তু তা নয়। তবে এই শতাব্দীর মধ্যে যদি দশ কদম এগোনো না যায়, পরে হয়তো এক কদমও এগোনো সম্ভব হবে না।

বাংলা বানান সংস্কার আরো জরুরী এই কারণে যে, সংবাদপত্র ও পুস্তক মুদ্রণে আংশিকভাবে লাইনো টাইপ মনো টাইপ প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ায় একই বাংলা শব্দের মুদ্রিত চেহারায় নানা বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। বাংলা টাইপরাইটারের টাইপগুলি আবার লাইনোর সঙ্গে সর্বত্র একরূপ নয়। এর উপর রয়েছে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিজ্ঞাপন সাইনবোর্ড প্রভৃতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন লিখন ও বানান রীতি। নতুন টাইপ পুরোনো টাইপ, এ-কেলে বানান সেকেলে বানান, যুক্তাক্ষর বিষয়ে এক এক জায়গায় এক এক পদ্ধতি এ সবই এক ধরনের অস্থিরতার পরিচায়ক। শিক্ষার্থী শিশুর পক্ষে—চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রভাব যেখানে প্রবল—বাংলা অক্ষর ও পদের এই বহুরূপী চেহারা অত্যন্ত ক্ষতিকর। লাইনো টাইপ প্রবর্তনের ফলে বাংলা বানানে যে নিঃশব্দ বিপ্লব শুরু হয়েছে তাকে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে হলে এখনই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

ভাষা মানুষের মুখের জিনিস। লিখিত রূপটি অনেকটা মৌখিক ভাষারই রৈখিক রূপ বা চিত্ররূপ মাত্র। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, ভাষা ও বর্ণমালা দুটি আলাদা জিনিস। একই হিন্দি রচনা দেবনাগরি ও ফারসি উভয় বর্ণমালাতেই লেখা যায়। মোগল আমলে গীতা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা ফারসিতে লেখা হয়েছে। বর্ণমালা ব্যবহারের তারতম্যে একটি ভাষা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় না। রোমান বর্ণমালার সাহায্যে ভারতের তাবৎ ভাষা লেখা যায়, এবং ইংরেজ আমলে সেনা বিভাগে রোমান লিপিতে হিন্দুস্থানীই ব্যবহৃত হত। ইয়োরোপে স্লাভ গোষ্ঠীর ভাষায় সর্বত্রই যে রুশ ভাষার মতো সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় তা নয়, হাঙ্গারিয়ান, চেক প্রভৃতি ভাষায় রোমান বর্ণমালাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে এই সব ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। পৃথিবীতে অনেক মৌখিক ভাষা আছে যার কোনো লিখিত বর্ণমালা ছিল না বা নেই। আমাদের দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এরূপ অনেক ভাষার ব্যাকরণ ইংরেজরাই প্রথম রচনা করেন এবং ইংরেজি অর্থাৎ রোমান বর্ণমালাই এইসব ভাষাভাষীর মধ্যে প্রচলন করেন। ফলে, খাসি ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার যদিও কোনোই মিল নেই তবু খাসি ভাষার বর্ণমালা এবং ইংরেজি ভাষার বর্ণমালা অভিন্ন, অর্থাৎ রোমান।

একথাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এই কারণে যে বানানের বদল ঘটলে, এমন কি বর্ণমালার বদল ঘটলেও, ভাষার ক্ষেত্রে 'গেল গেল' রব তুলবার যৌক্তিকতা নেই। কোনো বিশেষ বর্ণমালা বা চিত্রমালার (যেমন চীনা ভাষার) সাহায্যে রচিত একটি নির্দিষ্ট বানানের মধ্যে, অর্থাৎ দৃশ্যমান চেহারায় যেটি প্রকাশ করা হয় তার দিকে তাকিয়ে, যদি আমার অভীপ্সিত শব্দটি ঠিকমতো চিনে নিতে এবং উচ্চারণ করতে পারি, এবং আমার মতো অন্যেরাও তা পারেন, তা হলেই হল। এই চেনা সম্ভব হয় গৃহীত অভ্যাসের ফলে। 'ক' ছবিটি দেখলেই আমরা 'ক' ধ্বনি উচ্চারণ করি, কিন্তু রীতি ও অভ্যাস ছাড়া এ দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। একজন ইংরেজের কাছে 'ক' ছবিটির কোনোই তাৎপর্য নেই, কিন্তু 'K' ছবিটি দেখলে সে 'ক' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। স্টেশনের গায়ে 'কানপুর' বা KANPUR যাই লেখা থাকুক না কেন, জায়গাটি একই থাকছে, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বর্ণমালার সাহায্যে একে 'কানপুর'ই বলছেন। বর্ণমালায় রচিত বানানের মূল কাজ কোনো শব্দকে, অর্থাৎ তার উচ্চারিত রূপটিকে, সনাক্ত করা এবং সেটি ব্যবহার করতে সাহায্য করা।

ধরা যাক, 'পুষ্করিণী' এই শব্দটি। লিখিত বা মুদ্রিত আকারে এই রৈখিক ছবিটি দেখা মাত্র আমরা মনে মনে 'পুশ্‌কোরিনি' এই বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করি বা করতে অভ্যস্ত। বাংলা 'পুশ্‌কোরিনি'তে মূর্ধন্য-ষ, মূর্ধন্য-ণ ও দীর্ঘ-ঈ উচ্চারণ নেই, কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণে আছে। সংস্কৃতে অতএব 'পুষ্করিণী' বানান সঠিক, কিন্তু বাংলার তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে। বাংলায় আমরা সংস্কৃত বানান লিখছি অর্থাৎ সংস্কৃতে উচ্চারিত 'পুষ্করিণী' শব্দের ছবিটি ব্যবহার করছি, কিন্তু এই ছবিটিকে সনাক্ত করছি সম্পূর্ণ অন্য একটি উচ্চারিত শব্দে যেটি সংস্কৃত নয়, পুরোপুরি বাংলা 'পুশকোরিনি।' সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, শুধু এই খবরটুকু জানাবার জন্য পদটির পুরোপুরি সংস্কৃত স্বরলিপি ব্যবহার নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সংস্কৃত থেকে গৃহীত হলেও বাংলার মধ্যে এসে এটি আর সংস্কৃত শব্দ নেই, রূপান্তরিত হয়েছে খাঁটি বাংলা শব্দে যার মধ্যে ষ, ণ, ঈ অনুপস্থিত। আমরা এমনই অভ্যাসের দাস যে এই অভ্যস্ত বানানের পরিবর্তনের কথা উঠলেই বরং অবাক হই, এটি যে এখনও চলছে এতে আশ্চর্যান্বিত হই না। সূর্য স্থির আছে এবং পৃথিবীই ঘুরছে একথা শুনেও একদা লোকে এমনি অবাক হয়েছিল। উপরন্তু, পণ্ডিতেরা বলে দিয়েছেন এটি 'তৎসম' শব্দ, এবং আমরা তাই শিরোধার্য করেছি। অভ্যাসের বশেই পণ্ডিতদের দেওয়া সংস্কৃত বানান আমরা পরিত্যাগ করতে পারিনি এবং পণ্ডিতদের মতকেই অভ্রান্ত জ্ঞান করেছি। সংস্কৃত 'পুষ্করিণী' এবং বাংলা 'পুষ্করিণী' আসলে দুটি পৃথক শব্দ। একটি থেকে আরেকটি এসেছে, এইমাত্র। একে 'তৎসম' না বলে 'তদ্ভব'ই বলা উচিত। দুটির উচ্চারণ আলাদা, দুটি শব্দ শুনতে দু রকম, অতএব এ দুটিকে 'তৎসম' কী করে বলি? অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনো সংস্কার সমিতি বাংলা বর্ণমালার খাঁটি বাংলা বানান রচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে 'পুষ্করিণী'র নতুন বানান করেন 'পুশ্‌কোরিনি' তবে সেটিই হবে শুদ্ধ ; খাঁটি বাংলার সেটিই হবে সঠিক চিত্ররূপ বা বানান।

বাংলা বানানে যে বিড়ম্বনা চালু আছে তাতে শিক্ষার্থী থেকে সাধারণ সাক্ষর মানুষ সকলেই বিড়ম্বিত। এর অবসান ঘটানো প্রয়োজন। এই বিড়ম্বনার মূল রয়েছে 'তৎসম' ও 'তদ্ভব' এই দুটি পৃথক সংজ্ঞানিরূপণের মধ্যে। ইংরেজির BENCH ও বাংলার 'বেঞ্চ' বা 'বেঞ্চি' কি সমান? বাংলা শব্দটি কি ইংরেজির তৎসম? সংস্কৃতের নিরিখে নিশ্চয়ই তৎসম। কিন্তু ইংরেজির B বাংলায় উচ্চারণ করি কি? আমরা কি 'ব্বেন্‌চ্‌' বলি, যেমন বলি 'ওয়েস্‌বাস্‌'? বলি না, এবং বলি না বলেই বাংলায় লিখবার সময়ও 'ব্বেঞ্চ' লিখি না। তবে সংস্কৃতের বেলাতে এ রকম করি কেন? ইংরেজি CASH শব্দটি ল্যাটিন CAPSA শব্দ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ল্যাটিন CAPSA ইতালিয়ান ভাষায় হয়েছে CASSA, ফরাসীতে CASSE এবং ইংরেজিতে CASH; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শব্দের উচ্চারণ ও বানান সেই সেই ভাষার রূপান্তরিত উচ্চারণ ও বানানবিধি অনুযায়ীই হয়েছে, ল্যাটিনের তৎসম বলে কোনো ক্ষেত্রেই মূলের P-কে ধরে রাখা হয়নি। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়ে ইংরেজি বানানে এই স্বাভাবিক ঝোঁক বহুক্ষেত্রেই বজায় থাকেনি। অথচ জার্মান ভাষায় বানান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চারণানুগ। তবু আমরা কেন ইংরেজির ব্যর্থতাকেই অনুকরণ কোরবো? সংস্কৃতের কাছে বাংলার ঋণ অপরিসীম। কিন্তু সেজন্য বাংলার স্বাভাবিক বিকাশ কেন ব্যাহত থাকবে? সংস্কৃত 'ফল' এবং বাংলা 'ফল' দুটি দেখতে হুবহু এক রকম হলেও এদের ভাষাগত স্বাদ আলাদা। বাংলা ফলটিও তৎসম নয়, কারণ সংস্কৃত শব্দটি অকারান্ত, বাংলায় এটি হলন্ত 'ফল্‌'। অতএব বলা উচিত, বাংলা 'ফল' তদ্ভব, তৎসম নয়। আরবী হম্‌লহ্‌ বাংলায় হয়েছে 'হামলা'। এটি হয়েছে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী। আরবী নিঃস্বর ব্যঞ্জন-সর্বস্ব শব্দটি বাংলায় বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে আকারান্ত হয়ে বসেছে। আরবী তৎসম বানান কি বাংলায় চালানো সমীচীন হত?

'তৎসম' এই কানা অন্ধের মতো গ্রহণ করায়, বানানের বিশুদ্ধি রক্ষার এক কল্পিত অলিখিত দায়িত্ব আমাদের কাঁধে যেন এসে ভর করেছে। কিন্তু তৎসম তদ্ভব যে-নামই দেওয়া হোক, বাংলা বাংলাই। বাংলা সংস্কৃতেরও তৎসম নয়, পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশেরও তৎসম নয়, আবার আরবী ফারসি ইংরেজিরও তৎসম নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা এদের তদ্ভব নিশ্চয়ই : সে তো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই ঋণের বোঝা সাইনবোর্ড লাগিয়ে চিরদিন বানানেও বহন করে চলতে হবে। বাংলা একটি স্বাধীন সমৃদ্ধ ভাষা। এর উচ্চারণের রীতি যেমন নিজস্ব, বানানেরও তেমনি নিজস্ব রীতিনিয়ম বাঞ্ছনীয়। অন্য কোনো ভাষার রীতি-নিয়মের সঙ্গে এর আপোস করবার প্রয়োজন নেই। অন্যের কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি এবং নেবো, কিন্তু সব কিছুই নিতে হবে নিজের মতো করে। বানানের ক্ষেত্রে এই স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা না দেখানোই ১৯৩৭ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচারিত বানান সংস্কারের প্রধান দুর্বলতা। বানানের ক্ষেত্রে তথাকথিত তৎসম শব্দের তৎসমত্ব বজায় রাখার বিভ্রান্তিকর চেষ্টায় এতে বাংলার নিজস্ব প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ঝোঁকের দিকটা অবহেলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর উভয়েই বুঝেছিলেন যে সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিন্তু সংস্কার করতে বসে অন্যদের প্রতিকূলতায় তাঁরা আসল জায়গাটিই বাদ রেখে দিয়েছেন। তাঁদের আরব্ধ পদক্ষেপ পথের ইঙ্গিতটুকুই শুধু দিতে পেরেছে। আমাদের প্রয়োজন অনেক বেশি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের। যখন বলা হয়, সংস্কার সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত 'আচার্য' বানান ভুল, 'কার্তিক' বানান ভুল, তখন এই ভুলশুদ্ধির বিচার করা হয় সংস্কৃত বানান অনুযায়ী। তৎসমত্বের হিসাব বাদ দিয়ে এ দুটিকে বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ হিসাবে ভাবলে প্রকৃত সমস্যা ও তার সমাধান বোঝা সহজ হয়। বাংলায় শব্দ দুটি 'আচার্‌জ' এবং 'কার্‌তিক' এই-ভাবেই উচ্চারিত হয়, এবং তাই শুদ্ধ বাংলা শব্দ। বাংলার বাংলাত্বকে অগ্রাধিকার দিলে রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের মতো নিরীহ সংস্কারে বিচলিত হবার কারণ ঘটতো না। অথচ সেদিন এই সামান্য বিষয় নিয়েই প্রচণ্ড বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল।

সংস্কার সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারটিকে একেবারে বর্জন বা উপেক্ষা করতে পারেননি, তৎসম শব্দ নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন। তার প্রমাণ, দ্বিত্ব বর্জনই হয়েছে প্রথম সূত্র। এটি আকস্মিক নয় যে, শুধু এই সূত্রটির জন্যই সেদিন বানান সংস্কার

...বিশেষ প্রবল আন্দোলন হয়েছিল এবং প্রায় ... ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রের সম্পাদকগণ, এমন কি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ... রবীন্দ্রানুরাগী মনীষীও, তীব্র বিরোধিতা দেখিয়েছিলেন। সনাতনপন্থীরাও এখন স্বীকার করেন যে, সে সময়ে মনীষীরা এই বানান সংস্কারে যতোই বাধা দিয়ে থাকুন না কেন, আজ এই দ্বিত্ববর্জিত বানান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দু-চারজন পণ্ডিত এখনও দ্বিত্ব মেনে চললেও কালক্রমে এই বিরোধিতাও আর থাকবে না। দ্বিত্ববর্জিত বানানের বিপক্ষে তাঁদের কিছু কিছু বলবার কথা নিশ্চয়ই আছে, তবে তাঁরা এখন মানেন যে এই পদ্ধতি মুদ্রণ-কার্যে খুবই সহায়তা করেছে এবং তারই ফলে রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব আজ প্রায় নির্মূল। এই স্বীকৃতি বিশ্লেষণ করলে যে-সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে—বিপক্ষে সর্বদাই সামান্য কিছু বলার থাকে, এবং এই সামান্য কিছুর দোহাই দিয়েই প্রবল প্রতিকূলতা করা হয়ে থাকে, কিন্তু মুদ্রণ কার্যের উপযোগিতার দিকটি বর্তমানকালে উপেক্ষা করা যায় না এবং এই শেষ যুক্তিটিই শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় এবং হওয়া উচিত। মুদ্রণ কার্যে সহায়তার কথা রাজশেখরবাবুরা তোলেন নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের একজন মুখপাত্র সংস্কার সমিতির সভায় উপস্থিত থেকে সোৎসাহে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় একটা সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বলেছিলেন : "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে, হয়েছে আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায় আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।" প্রাকৃত বাংলা ভাষাই প্রকৃত বাংলা ভাষা। এই ভাষাটি আজ পর্যন্ত অভিধানে, ব্যাকরণে, বানানে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়নি। এটি করা দরকার। বাংলা ভাষা এখন সাবালক, নিজেকে নিজের নামে পরিচয় না দেবার আর কোনো যুক্তি নেই। মুদ্রণের সুবিধার কথাটিও বর্তমানযুগে বিশেষভাবে বিবেচ্য। শতকরা একশো ভাগ উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস কোনো ভাষাতেই দেখা যায় না—শুধু এই যুক্তি আওড়ালে কোনো কালেই কোনো বানান সংস্কার সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রথম বানান সংস্কারই বা কি করে সম্ভব হয়েছিল? বানান শতকরা একশো ভাগ উচ্চারণানুগ হয় না বলে কোনো ক্ষেত্রেই হবার দরকার নেই, এমন কি প্রায় উচ্চারণানুগও হবার দরকার নেই, এটি কুযুক্তি। এ-কালের বানান সম্পর্কে প্রায়ই 'অরাজকতা'র কথা তোলা হয়ে থাকে। কিন্তু মূলের গলদ সম্বন্ধে আমরা নীরব; তৎসমজনিত অরাজকতাকে আমরা অরাজকতা বলি না! অথচ বাংলা বানানের আসল অরাজকতা এখানে। বিদেশী ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের বানান নিয়ে সংস্কার সমিতি অনেক মাথা ঘামিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন কিছু বিধান দিয়েছেন যা বাংলার উপর জোর করে চাপানো এবং অযৌক্তিক। সংস্কৃত তৎসমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ইংরেজি তৎসমের বেলায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলায় নেই, কিন্তু যেহেতু সংস্কৃতে আছে অতএব তৎসম শব্দে বাংলায়ও তা রাখতে হবে। ঠিক এইভাবেই ইংরেজি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের দীর্ঘস্বরের বেলায়ও বানানে তা রাখার জন্য সংস্কার সমিতি ব্যস্ত হলেন এবং সেই মতো বিধান দিলেন। ইংরেজিতে যাই থাক, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ঝোঁক অনুযায়ী EAST, SEAL বাংলায় 'ইস্ট', 'সিল' ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সংস্কার সমিতি এদের দীর্ঘ-ঈ কারান্ত 'ঈস্ট' 'সীল' করে ছাড়লেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, এই নিয়মটি কেউই মেনে চলছে না। তখন আক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে : "নিয়মটি তো খুবই ভাল, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবীণ ... নবীন কোনো সাহিত্যিকই এই নিয়ম মেনে চলছে না।" কিন্তু নিয়মটি কি সত্যিই ভাল? আমরা বলি না ভাল নয়, এবং সেই জন্যই কারো পক্ষে এ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যেক ভাষার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, রীতি থাকে, তাকে স্বীকার না করলে কোনো অস্বাভাবিক আরোপ স্থায়ী হয় না, চলে না, চালানোর চেষ্টা সকলের কাছেই পীড়াদায়ক ঠেকে। প্রথম শিক্ষার্থীর এনা... যদি বিকৃত বানান আরম্ভ করতেই নিরুৎসাহিত হয়ে য... তবে মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার অবশিষ্ট কাজ ... করে সম্পন্ন হবে? ইদানীং শিক্ষার্থীর উপর পাঠে... গুরু বোঝার সমস্যা নিয়ে অনেকেই ভাবছে... মাতৃভাষার বানান যদি সরলীকৃত হয়, স্বাভাবিক হ... তবে তা হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ।

সংস্কৃত 'কার্য' বিশেষ একটি প্রাকৃতে কেন 'ক... লেখা হত? বলা বাহুল্য, প্রাকৃতে শব্দটি প্রকৃ... 'কজ্জ' উচ্চারিত হত এবং সেই জন্যই বানান এর... হয়েছিল। বর্তমান বাংলায়ও অতএব সংস্কৃত ... প্রাকৃতের দোহাই না দিয়ে বাংলার যা স্বাভা... উচ্চারণ তার সমান বা প্রায় সমান বানানই ... উচিত। এক্ষেত্রে মূলের দোহাই পাড়া যুক্তি ন... যখন সনাতনপন্থী আক্ষেপ করে বলেন, ... উচ্চারণের জন্য আমরা 'কর্ণ, বর্ণ, ফল, তৃণ, প্রণ... পরিণাম' প্রভৃতি শব্দ বাংলা ভাষা থেকে উ... করতে পারব না, তাদের ভুল উচ্চারণেই পড়তে হ... তখন আমরা বলি, না তা নয়, এই শব্দগুলি বাংল... শুদ্ধ (দন্ত্য-ন) উচ্চারণেই রয়েছে, এদের বাংলা ... থেকে উচ্ছেদের কোনো প্রশ্নই নেই, শুধু ... বানানে এগুলি প্রচলিত আছে এই যা। বানা... এই ভুলগুলি এখন বাংলা বানানের স্বাভা... নিয়মেই শুধরে নিতে হবে। এর জন্য আমা... সকলেরই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

'সুপ্রচলিত শব্দের' দোহাই বাংলা বা...

সংস্কার সমিতিও দিয়েছিলেন। এই দোহাই দিলে কোনো সংস্কারই কোনোদিন করা যায় না। রক্ষণশীলদের প্রভাবেই সমিতি শ-ষ-স-এর বেলা এক কদম এগোতে না এগোতে আবার এক কদম পিছিয়ে গেলেন। তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত অনুযায়ী হবে, এই সিদ্ধান্তে খুশি না থেকে এক্ষেত্রে তাঁরা তদ্ভব শব্দগুলিকেও আক্রমণ করে বসলেন এবং তাদের বেলাতেও ণ-ত্ব ষ-ত্ব দাবী করলেন। মজা হচ্ছে, তারপরও নিরুপায়ের মতো আবার জানালেন যে, নানা ক্ষেত্রে 'প্রচলিত বানান'ই বজায় থাকবে। যখন সমিতির সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে সনাতনপন্থী বলেন, "যা হোক মূর্ধন্য-ষ-এর প্রতি যে অবিচার হয়নি এজন্য আমরা সমিতিকে অশেষ সাধুবাদ জানাচ্ছি; 'শ ষ স' সম্বন্ধে সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন," তখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে মূর্ধন্য-ষ-এর প্রতি সমিতি অতিরিক্ত সুবিচারই করেছেন, কিন্তু অবিচার করেছেন বেচারা বাংলা ভাষা ও শব্দের প্রতি। পরিবর্তন বিরোধীও অবশ্য স্বীকার করেন যে, "মূর্ধন্য-ণ তবু উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু মূর্ধন্য-ষ ধ্বনি বাঙালী রসনায় দুঃসাধ্য।" কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্ধন্য-ষ নাকি আমাদের চাই-ই! বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণকে গৌণ জ্ঞান করার ফলেই এই সব বিপত্তি! উচ্চারণকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করবার তাগিদেই সাম্প্রতিক কালে 'স্ট' হরফটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সংস্কৃতের 'ষ্ট'-কেই কাজে না লাগিয়ে ST-ধ্বনির জন্য কেন এই অতিরিক্ত 'স্ট' যুক্তাক্ষরটি সৃষ্টি করতে হল? আমরা বলি, এই কাজটি খুবই সমীচীন হয়েছে। বাংলা উচ্চারণে স্ট (ST)-ধ্বনি (স্টেশন, স্টোভ) গৃহীত হবার পরও বানানের ক্ষেত্রে তাকে স্বীকার না করা এবং বাংলা বানানকে সংস্কৃত বানানের চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টাই হত অযৌক্তিক। বানানের জন্যই ভাষা, না ভাষার জন্য বানান, এটি, সর্বাগ্রে স্থির করা দরকার। উচ্চারিত বাংলা শব্দের লিখিত রূপ হিসাবেই বানানের অস্তিত্ব বানানের উচ্চারিত রূপ হিসাবে বাংলা শব্দের অস্তিত্ব নয়। লিখিত বা মুদ্রিত সাহিত্যও উচ্চারিতব্য, পঠিতব্য, এমন কি মনে মনে হলেও তা উচ্চারিতই ধরতে হবে। বানানের অরাজকতা অবশ্যই দূর করতে হবে। কিন্তু অরাজকতা দূর করা মানে নিয়মের নামে অনিয়মের রাজত্ব কায়েম করা নয়। নিয়ম রচনা করবার সময় দেখতে হবে তা সম্পূর্ণরূপে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক কিনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি সহমত প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনই সংস্কার সাধন করা কর্তব্য। বাকি ক্ষেত্রগুলিতে মীমাংসা ধীরে ধীরে হতে পারবে। বিকল্প রাখতে হলে সীমায়িত ক্ষেত্রেই তা রাখা উচিত। হ্রস্ব-দীর্ঘ ণত্ব-ষত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ আর কোনো মতেই ফেলে রাখা উচিত নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির পুস্তিকায় (৩য় সংস্করণ, ১৯৩৬, মে) স্বীকার করা হয় যে, "বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে ভ্রান্ত যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে।" আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারে বানান শুধু সরল নয়, যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হবে। অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য তো নয়ই, বরং সংযুক্ত অক্ষর ও চিহ্নে যে বাহুল্য প্রচলিত রয়েছে তার বিলোপ ঘটানোই এই সংস্কারের বৈশিষ্ট্য হবে। লেখক ও পাঠক, পরিবর্তনের মুখে, খুব অল্প সময়ের জন্য সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হবেন ঠিকই, কিন্তু নতুন দশমিক মুদ্রার মতো তা অচিরেই দূর হবে। নতুন শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে শতকরা একশো ভাগ, আর মুদ্রাকরের লাভ হবে ষোল আনার উপর আঠারো আনা। সংযুক্ত বর্ণের জটিল বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই মিলবে, ণত্ব ষত্ব নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে না; ছাপাখানার কেস এবং টাইপ রাইটারের কীবোর্ড অনেক ছোট এবং ত্বরিত কাজের উপযোগী হবে, কম্পোজিটর ও প্রুফরীডারের কাজ সহজতর হবে; লাইনো টাইপের প্রয়োগ ব্যাপকতর হতে পারবে এবং সব টাইপ-কেসই এক রকম অর্থাৎ লাইনোর মতো হবে।

বানান সংস্কার সমিতি একটা সুন্দর ঘোষণা করেছিলেন: "বানানের নিয়ম যাহাতে বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল হয়, সেই চেষ্টা করা হইয়াছে।" যদি সত্যিই সর্বাত্মকভাবে সেই চেষ্টা তাঁরা করতেন তাহলে বানানের পর্বতপ্রমাণ জটিলতা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যেত। দেখা যাচ্ছে সঠিক ঘোষণার পরও ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে সমিতি সাহসী হননি। "বাংলা ভাষার প্রকৃতি"ই যদি তাঁরা অনুধাবন করতেন তাহলে ণ-ত্ব ষ-ত্বের বেলায় অন্তত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের উপর নির্ভরশীল হতেন না। তাঁরা বলেছেন, "কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে, এই আশায় এই প্রকার শব্দে বিকল্পের বিধান দেওয়া হইয়াছে।" কিন্তু সংস্কার সমিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলতর বানানের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে সাহসী হননি। রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন এবং অসংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ বর্জন, এই দুটিই প্রকৃত সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। আর এই দুটি ক্ষেত্রেই সমিতি প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে দীর্ঘ যুক্তি দিতে বাধ্য হন। সমিতি বলেন, "বাংলায় কোন কোন শব্দে দ্বিত্ব হয় কোন কোন শব্দে হয় না, যথা কর্ম্ম, কর্ণ; সর্ব্ব, সর্গ। তাছাড়া হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব হয় না। এই অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করিলে বাংলায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দের বানান অপেক্ষাকৃত সরল হইবে।" যা বাংলায় অনাবশ্যক, বাংলা থেকে তা বাদ দেওয়া একটি প্রকৃত সংস্কার। কিন্তু সমিতি এখানে অহেতুক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সমর্থন দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এ যেন যুক্তির বদলে শাস্ত্রের সমর্থন দেখিয়ে বিধবা বিবাহের ন্যায্যতা প্রমাণ করার মতো ব্যাপার। এছাড়া হিন্দী মারাঠীর দোহাইও তাঁরা দিয়েছেন। তারও প্রয়োজন ছিল না। হিন্দী মারাঠী বা সংস্কৃতের মুখ চেয়ে নয়, বাংলার নিজস্ব প্রয়োজন ও স্বধর্মের কথা মনে রেখে, বাংলার ক্ষেত্রে আবশ্যক অনাবশ্যক বিবেচনা করেই বাংলা বানানের সংস্কার করতে হবে। অসংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ বর্জনের কথাও খুব সমীচীন। কিন্তু বাংলার সব শব্দই তো অসংস্কৃত। আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃতের মতো দেখালেও সেগুলি সংস্কৃত নয়, বাংলাই। অতএব সব ক্ষেত্রেই কেন মূর্ধন্য-ণ বর্জন করা হবে না? সব ক্ষেত্রে মূর্ধন্য-ণ বর্জনই যে "বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল" সমিতি একথা কবুল করতে পারেননি। সমিতির ব্যর্থতাই এখানে। অথচ সমিতির পুস্তিকায় স্বীকার করা হয়েছিল—'অভ্যস্ত নীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই সংস্কার সাধ্য হইবে না।" অতি উত্তম কথা। আমরাও তাই বলি, এবং আরও বলি যে, শুধুমাত্র সাধু সংকল্প এবং সদিচ্ছার পরিবর্তে আসুন এখনই "বাংলা ভাষার প্রকৃতি" অনুযায়ী বাংলা বানানের সংস্কার সাধন করি, অনাবশ্যককে বিনা দ্বিধায় বিদায় দিই এবং যাবতীয় বাংলা বানানকে যথা সম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী সরল করি, এবং যেখানে জটিলতা রয়েছে বা সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে সরলতার পথনির্দেশ করি।

বাংলা বানান সংস্কার আরম্ভ করতে হবে বর্ণমালা থেকে। আধুনিক বাংলার অন্যতম প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বাংলা ভাষার প্রথম সংস্কারক বলতে পারি। কারণ, সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি তিনিই প্রথম দেন, এবং তাঁর রচিত 'বর্ণ পরিচয়' পুস্তকে তিনি বর্ণমালার সংস্কার করেন, বাংলা বর্ণমালা থেকে সংস্কৃতের দীর্ঘ-ৠ ও দীর্ঘ-ৡ বর্ণ দুটি বাদ দিয়ে দেন। সংস্কার সমিতির আলোচনায় বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাবও উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাহস দেখাতে পারেননি। ঋ, ঌ-কেও তাঁরা বর্জন করতে পারেননি, এমন কি ঌ-কেও না। আমরা মনে করি, বাংলা বর্ণমালা বাংলার নিজস্ব

স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিকেই প্রকাশ করবে এবং তা থেকে যাবতীয় বাহুল্য বর্জিত হবে।

আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল সূত্রগুলি এইভাবে বিবৃত করা যায়ঃ

(১) বাংলা বর্ণমালা থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দেওয়া হবে। দরকার হলে বর্ণমালায় প্রয়োজনীয় বর্ণ যুক্ত হতে পারবে। বর্ণের মোট সংখ্যা যথাসম্ভব কমানো হবে।

(২) যুক্তাক্ষর বর্জন করা হবে। যুক্তস্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত আকারে অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে, মিশ্র অক্ষর থাকবে না।

(৩) যুক্তাক্ষর বর্জনের জন্য হস চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে হস্ চিহ্নের ব্যবহার খুব সীমায়িত রাখা হবে।

(৪) বানান হবে বাংলা উচ্চারণের যথাসম্ভব কাছাকাছি। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণভাবে গ্রাহ্য এই নীতি বিসর্জন দেওয়া চলবে না। কিছু কিছু পার্থক্য অভ্যাসের দ্বারা নির্ণীত হবে।

(৫) প্রয়োজনীয় স্বর ও ব্যঞ্জন চিহ্ন লাইনো টাইপের ছাঁদে বর্ণের ডান দিকে পৃথকভাবে দেওয়া হবে, যাতে কোনক্রমেই যুক্তাক্ষর সৃষ্টি হবার সমস্যা না দেখা দিতে পারে।

এই পাঁচটি মূলনীতির ফলশ্রুতি এবার আলোচনা করা যাক। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালায় মোট বারোটি স্বরবর্ণ প্রচলিত আছেঃ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ ও, ঔ। বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণে সবই হ্রস্ব, অতএব শুধু হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ থাকবে, বাদ যাবে দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ-ঊ। বাংলায় ঋ ও ঌ-র কোনো আলাদা উচ্চারণ নেই, এরা যথাক্রমে রি ও লি। অতএব ঋ ও ঌ বাদ যাবে এবং তাদের কাজ রি ও লি দিয়েই করা হবে, যেমন রিতু, লিচ্। ঐ এবং ঔ এরা যুক্তস্বর যথাক্রমে ওই এবং ওউ। অযুক্ত আকারেই এদের লেখা হবে, ফলে ঐ এবং ঔ বর্ণমালা থেকে বাদ পড়বে। 'আও', 'ওয়া' 'ইয়া', 'ইয়ে' প্রভৃতি যুগ্ম স্বরসূচক আলাদা স্বরবর্ণ যেমন নেই, তেমনি 'ওই' এবং 'ওউ' সূচক আলাদা স্বরবর্ণ বা স্বরচিহ্নেরও দরকার নেই। বাংলার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বরধ্বনি অ্যা, এটি বর্ণমালায় যুক্ত হবে। বর্তমানে অ্যা-স্বরকে অনেক ক্ষেত্রে 'এ' দিয়ে প্রকাশ করা হয়, এটিকে অ্যা দিয়েই প্রকাশ করা হবে। এটি অ-য় য-ফলা আকার নয়। এটি অ-আ-র মতোই একটি পৃথক পূর্ণস্বর অ্যা এবং এর স্বরচিহ্ন হবে —্যা অর্থাৎ অ্যা-কার, দৃষ্টান্ত যথা—অ্যাখন, অ্যাতদিন, ম্যালা, ব্যালা গ্যাল। ফলে বাংলা স্বরবর্ণের মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে সাত—অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও। কিন্তু স্বরচিহ্নের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়, যেহেতু বাংলায় অ-স্বরের কোনো আলাদা চিহ্ন নেই, যদি অ-চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় তবে সংখ্যা সাত-ই হবে। স্বর-চিহ্নগুলি লাইনো টাইপের উপযোগী, অর্থাৎ মূল বর্ণ থেকে পৃথকভাবে, প্রদর্শিত হবে। যথা— া (আ), ্যা (অ্যা), ি (ই), ু (উ), ে (এ), ো (ও)। সর্বত্র শুধু হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ ব্যবহৃত হবে। স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতিবাচক শব্দেও কেবল হ্রস্ব স্বরই ব্যবহৃত হবে, এবং বিদেশী শব্দেও তাই। উদাহরণ —কুমির, উনিশ বাঘিনি, বাঙালি, উর্ ধ, দুর, ইস্ টদামি পুরুব, দিরঘ। ঋ-কে রি অথবা র-ফলা (যদি র-ফলা থাকে) ও হ্রস্ব-ই-কার দিয়েই প্রকাশ করা যায়, এবং তাই করা হবে, যথা—রিতু, রিজু, আবৃরিত বা আব্রিত, ক্লিশ। ঐ এবং ঔকে যথাক্রমে ওই এবং ওউ লেখা হবে, যথা—ওইরাবত, ওইহিক। বাংলা স্বরধ্বনির আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ এ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, সেটিকে আমরা বলতে পারি হ্রস্ব-ও বা লঘু-ও। এটি অনেক ক্ষেত্রে অ এবং ও-র মাঝামাঝি। বাংলা উচ্চারণে এর প্রয়োগ অসংখ্য। বাংলাতে অধিকাংশ অ-ই একটু গোল অর্থাৎ ও-ভাবাপন্ন বা ও-ছোঁয়া, যেমন হিন্দীতে অধিকাংশ অ-ই হ্রস্ব-আ বা আ-ছোঁয়া; 'অব্ তক্' শোনায় 'আব তাক'। বাংলায় তেমনি 'মন্দ' শোনায় অনেকটা 'মোন্দো'। এই স্বরটিকে সর্বদা ও-কারান্ত না লিখে বর্তমানের মতে অ-কারান্তই রাখা যেতে পারে। তা না হলে ও কারের বড্ড বাড়াবাড়ি ঘটবে এবং জটিলতা বাড়বে অভ্যাসের দ্বারাই সুস্পষ্ট ও-র সঙ্গে এই অস্পষ্ট ও-র সমতা বা পার্থক্য সূচিত হবে। অতএব 'গতি'কে 'গোতি' বা 'তুলনা'কে 'তুলোনা' লেখা দরকার নেই। বাংলায় অ এবং হ্রস্ব-ও-র এই পারস্পরিকতা সম্বন্ধে অবহিত থাকলে 'ওই' এব 'ওউ'কেও অনেক ক্ষেত্রে অই এবং অউ দিয়েই প্রকাশ করা যাবে, বই এবং বউ-কে 'বোই' এবং বোউ ন লিখলেও চলবে, এবং পৈশাচিক, বৈজ্ঞানিক মৌমাছি-কে পইশাচিক, বইমানিক, মউমাছি লিখতে পারবো। পদের অন্তে উচ্চারণ অকারান্ত বা হসন্ত যাই হোক, শুধু অকারাত বর্ণই ব্যবহৃত হবে হস্ চিহ্ন দেওয়া হবে না; অভ্যাসের দ্বারা এ-দুয়ের পার্থক্য সূচিত হবে, যেমন নতুন, আনত, মন লিখিত। হস্ চিহ্ন একটি ব্যঞ্জনসূচক চি এটিকে লাইনো টাইপে এবং অন্য সর্বত্র বর্ণের নি সামান্য একটু ডান দিকে স্থাপন করা হবে, যাতে এটি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সম্পূর্ণ আলাদ থাকতে পারে এবং অসংখ্য বাড়তি টাইপ সৃষ্টি ন করতে পারে।

বর্তমানে বাংলা বর্ণমালায় মোট চল্লিশ ব্যঞ্জনবর্ণ দেখা যায়ঃ ক, খ, গ, ঘ ঙ; চ, ছ জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, ব, শ, ষ, স হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ; ং, ঃ, ঁ। এর মধ্যে কতগুলি অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি বাদ যাবে। বাংলায় দু ব-এর প্রয়োজন নেই, কারণ শুধু বর্গীয় ব-ই উচ্চারিত হয়; বহিরাগত শব্দে অন্তস্থ-ব উচ্চার ওয়-দিয়ে প্রকাশ করা যাবে, যেমন ওআকিল, ওঅর অতএব অন্তস্থ-ব বাদ যাবে। বাংলায় অন্তস্থ-য-এর উচ্চারণের জন্য একটি পৃথক বর্ণ য় (ইয়=y) রয়েছে

অন্য যেসব জায়গায় য ব্যবহৃত হয় সেখানে সর্বত্রই উচ্চারণ বর্গীয়-জ, অতএব এই সব জায়গায় বর্গীয়-জই লেখা হবে, এবং 'য' বাদ যাবে, যেমন জখন, জাতনা, জম। যেখানে উচ্চারণে পূর্ণ স্বর আ, ও প্রভৃতি রয়েছে সেখানে য়া, য়ো প্রভৃতি লেখা হবে না, যেমন খেআ, দোআত। শুধু 'ইয়্'-উচ্চারণ বুঝাতেই য়-র ব্যবহার হবে, যেমন ছায়ায়, আয়ুধ। বাংলায় মূর্ধন্য-ণ উচ্চারিত হয় না, সর্বক্ষেত্রে দন্ত্য-ন উচ্চারিত হয়ে থাকে। অতএব সব বানানে শুধু দন্ত্য-ন ই থাকবে, মূর্ধন্য-ণ সম্পূর্ণ বাদ যাবে, যেমন কারন, পন, হরন। শ-ষ-স এই তিনটির মধ্যে বাংলায় প্রধানত তালব্য-শই উচ্চারিত হয়। বানানও তদনুযায়ী হবে, যথা হাশি, ভাশা। দন্ত্য-স উচ্চারিত হয় শুধু ত, থ, ন এবং র ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে এবং কিছু বিদেশী শব্দের উচ্চারণে, যথা অস্ত, অস্থির, স্নান, স্টেশন। মূর্ধন্য-ষ বাংলায় উচ্চারিত হয় না, অতএব ষ বাদ যাবে। লেখা হবে আশাঢ়, বর্শন, ভাশা। ঞ-বর্ণটি বাদ যাবে। যুক্ত বর্ণে এটি ন-দিয়ে প্রকাশিত হবে, অন্যত্র য়ঁ লেখা যাবে, যথা অন্চল, অন্জলি, মিয়াঁ, যাচ্না। ত এবং খণ্ড-ৎ দুটি পৃথক বর্ণের প্রয়োজন নেই, শুধু ত বা হসন্ত-ত্ হলেই কাজ চলে যায়। অতএব খণ্ড-ৎ বাদ যাবে, যথা মহত, উত্পল, আল্বত্। ঙ এবং ং দুটির কাজই ঙ-দিয়ে করা যায়, অতএব অনুস্বার (ং) বাদ যাবে, যথা বাঙলা, বাঙালি, রঙ, শঙকা। বিসর্গ (ঃ) টিও অপ্রয়োজনীয়। কারণ বিসর্গের কাজ উচ্চারণ অনুযায়ী হয় দ্বিত্ব ব্যঞ্জন দিয়ে, অথবা হসন্ত হ্ দিয়ে, সম্পন্ন হতে পারে। তাছাড়া পদের শেষে বিসর্গও অপ্রয়োজনীয়। অতএব বিসর্গ (ঃ) বাদ যাবে, লেখা হবে দুখ্খ্, বাহ্, আপাতত। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মোট সংখ্যা তাহলে দাঁড়াবে বত্রিশঃ ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ; ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য়, র, ল; শ, স, হ, ঁ। এই সংখ্যা আরো কমানো যায় যদি ড়, ঢ়, কে পৃথক বর্ণ না করে ড., ঢ., এইভাবে ডানদিকে বিন্দু যুক্ত ড, ঢ-আকারে লেখা হয়। যেহেতু অন্তস্থ-য বলে কোনো আলাদা বর্ণ থাকছে না, অন্তস্থ-য় কেও বিন্দুশূন্য শুধু য-দিয়েই লেখা যেতে পারে। ইংরেজি জেড (Z) উচ্চারণের উপযোগী কোনো বর্ণ বাংলায় নেই, এটির কাজ বিন্দুযুক্ত জ (জ.) দিয়ে চলতে পারে।

বাংলায় প্রচলিত যুক্তাক্ষরের সংখ্যা শ-দুয়েকের কম নয়। আমাদের প্রস্তাবিত বানানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সব ভেঙে দেওয়া হবে, এরা বিযুক্ত-ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করবে মাত্র। বিযুক্ত-করণের জন্য প্রথম প্রথম হস্ চিহ্নের ব্যবহার স্বভাবতই একটু বেশি হবে, অভ্যস্ত হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই হস্ চিহ্নের দরকার হবে না। পদের আদিতে যুক্তধ্বনি বোঝাবার জন্য হস্ চিহ্ন সম্ভবত একটু বেশিমাত্রায়ই ব্যবহার করতে হবে, যেমন গ্লানি, স্নেহ। রেফ (র্) সম্পূর্ণ বাদ যাবে, তার বদলে র বা হসন্ত র্ ব্যবহৃত হবে, যথা তর্ক, তরক, গর্হিত, গরহিত, পার্ক, পারক। যেহেতু বাংলায় র-ফলা (্র)র ছড়াছড়ি, জটিলতা কমাবার জন্য আপাতত র-ফলাটিকে লাইনো টাইপের মতো আলাদাভাবে বিযুক্ত ব্যঞ্জন-চিহ্ন হিসাবে রাখা যেতে পারে। স্বরচিহ্ন যেমন উ-কার (ু), ব্যঞ্জনচিহ্ন তেমনি র-কার (্র) বা র-ফলা। পদের আদিতে বিশেষ করে এই র-কারের প্রয়োজন বেশি হবে। অন্যত্র একে র বা হসন্ত-র (র্)-এর বিকল্প হিসাবে রাখা যাবে, যেমন—প্রতিদিন, ব্রত, ক্রমশ, মন্ত্র, বিদ্রোহ, অথবা পর্তিদিন, ব্রত, ক্রমশ, মন্ত্র, বিদ্রোহ। র-ফলাকে পরে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যেতে পারবে, সেই জন্য প্রকাশ ও প্রকাশ এই বিকল্পের ব্যবস্থা থাকছে, কিন্তু জবরদস্তি করা হচ্ছে না। র-ফলা থাকলেও, তা লাইনো টাইপের মতো বিযুক্ত আলাদা একটি ব্যঞ্জনচিহ্নমাত্র হয়ে থাকছে, অসংখ্য যুক্তাক্ষর সৃষ্টি করছে না। পুরোনো ক্র, গ্র, ঘ্র, প্র, ব্র ভ্র ইতিমধ্যেই ক্র, গ্র, ঘ্র, প্র, ব্র, ভ্র হয়েছে, এবং তাই হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে, বানানে সংযুক্ত বর্ণ ছাড়াই সংযুক্ত উচ্চারণ বাংলা ভাষার একটি সাধারণ রেওয়াজ। দ্রুত উচ্চারণে এটি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তখন 'সন্তান' এবং 'সন তারিখ', 'শর্করা' এবং দর করা একই রকম হয়ে যায়। বানান-রীতির বিভেদে কোনো প্রাথাক্য সৃষ্টি হয় না। কাজেই বানানে সংযুক্ত বর্ণ সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে না। লাইনোটাইপের চাপে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ভাঙার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পাঠকের চোখও ক্রমশ এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। 'বক্তা' অনেকদিনই 'বক্তা', এবং 'কল্পনা' 'কল্পনা' হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে সব যুক্তাক্ষরকে অনুরূপভাবে ভাঙা হয়নি, সেটি এখন হবে। যুক্তাক্ষর ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কতকগুলি যুক্তবর্ণ বাংলায় শুধু দ্বিত্বধ্বনিই সূচিত করে, সেগুলি সেইভাবেই বিযুক্ত আকারে প্রকাশ করা হবে, বানানে সংস্কৃত উচ্চারণের দাসত্ব থাকবে না। য-ফলা (্য), ব-ফলা (্ব) ম-ফলা (ম)র ক্ষেত্রে এই দ্বিত্ব খুবই পরিস্ফুট, যথা—বাক্ক, পক্ক, রুক্কিনি, আরোগ্গ, রম্ম। যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখবার পর উচ্চারণ-অনুযায়ী যুক্তাক্ষরগুলি নিম্নলিখিত আকার ধারণ করবে। হস্ চিহ্ন বিকল্পে প্রযোজ্য ধরতে হবেঃ—

ক+ক — ধিক্কার
ক+ত — রক্ত
ক+ব — পরিপক্ক
ক+ম — রুক্কিনি
ক+য — বাক্ক
ক+র — ক্রেতা, ক্রেতা
ক+ঋ — কৃপা, ক্রিপা
ক+ল — ক্লেশ
ক+ষ — রক্খা
ক+ষ+ণ — তিখ্ন
ক+ষ+ম — লখ্খি
খ+য — মুখ্খ
খ+র — খ্রিশ্ট, খ্রিশ্ট
খ+ঋ — খ্রিশট, খ্রিশ্ট
গ+দ — বাগ্দা
গ+ধ — মুগ্ধ
গ+য — ভাগ্গ
গ+র — গ্রহ, গ্রহ
গ+ঋ — গৃহ, গ্রিহ
গ+ল — গ্লানি
ঘ+র — আঘ্রাত, আঘ্রাত
ঘ+ঋ — ঘৃত, ঘ্রিত
ঙ+ক — শঙ্কা
ঙ+ক+ষ — আকাঙ্খা,
ঙ+খ — শঙ্খ
ঙ+গ — বাঙালি, অঙ্গার
ঙ+ঘ — জঙ্ঘা
ঙ+ঘ+য — দুর্লঙ্ঘ
চ+চ — উচ্চ
চ+ছ — আচ্ছাদন
চ+ঞ — যাচ্না, যাচ্য়াঁ
চ+য — চবন, বাচ্চ
জ+জ — লজ্জা
জ+জ+ব — উজ্জল
জ+ঝ — কুজ্ঝটিকা
জ+ঞ — বিগ্গঁ
জ+ঋ — জৃম্ভন, জ্রিম্ভন
জ+ব — জ্লন্ত
ঞ+চ — অন্চল
ঞ+ছ — লান্ছনা
ঞ+জ — অন্জলি
ট+য — অকাট্ট
ট+ট — অট্টালিকা
ট+র — ট্রেন, ট্রেন
ঠ+য — পাঠ্ঠ
ড+ড — উড্ডয়ন
ড+য — জাড্ড
ড+র — ড্রাম, ড্রাম
ড়+গ — খড়্গ

ণ+ট — কন্‌টক
ণ+ঠ — কন্‌ঠ
ণ+ড — পন্‌ডিত
ণ+ণ — বিশন্‌ন
ণ+য — পন্‌ন
ত+ক — ফুত্‌কার
ত+খ — উত্‌খাত
ত+ত — উত্‌তাল
ত+ত+ব — মহত্‌ত
ত+থ — উত্‌থান
ত+ন — রত্‌ন
ত+প — উত্‌পাত
ত+ব — তরা, গুরুত্‌ত
ত+ম — আত্‌তা, আত্‌তা
ত+ম+য — দউরাত্‌ত
ত+য — অত্‌তাধিক
ত+র — তিপুরা, ত্‌রিপুরা
ত+র+য — ত্‌ম্‌বক, ত্‌রম্‌বক
ত+ঋ — তিপ্‌ত, ত্‌রিপ্‌ত
থ+য — আতিথ্‌থ
থ+র — থি, থ্‌রি
দ+গ — মুদ্‌গর
দ+ঘ — উদ্‌ঘাটন
দ+দ — উদ্‌দাম
দ+ধ — উদ্‌ধার
র+দ+ধ+ব — উর্‌ধ
দ+ব — উদ্‌বাহু, দিধা
দ+ভ — উদ্‌ভিদ
দ+ম — পদ্‌দ, পদ্‌দ
দ+য — উদ্‌দান
দ+র — দুত, দ্‌রুত
দ+ঋ — দিক্‌পাত, দ্‌রিক্‌পাত
ধ+ব — বিধ্‌ধস্‌ত
ধ+য — আরাধ্‌ধ
ধ+র — ধুব, ধ্‌রুব
ধ+ঋ — ধিত, ধ্‌রিত
ন+ত — দন্‌ত
ন+ত+ব — শান্‌তনা
ন+ত+উ — জন্‌তু
ন+ত+র — মন্‌ত, মন্‌ত্‌র
ন+থ — পন্‌থা
ন+দ — আনন্‌দ
ন+দ+র — মন্‌দ, মন্‌দ্‌র
ন+ধ — অন্‌ধ
ন+ধ+য — বিন্‌ধ
ন+ধ+র — অন্‌ধ, অন্‌ধ্‌র
ন+ন — কান্‌না
ন+ব — অন্‌নয়
ন+ম — তন্‌ময়
ন+য — বন্‌ন
ন+ঋ — নিপ, ন্‌রিপ
প+ত — তপ্‌ত
প+ন — শপ্‌ন
প+প — খপ্‌পর
প+য — আপ্‌পায়ন
প+র — পলয়, প্‌রলয়
প+ঋ — পিথক, প্‌রিথক
প+ল — প্‌লাবন
প+স — লিপ্‌শা
ফ+র — ফক, ফ্‌রক
ফ+ল — ফ্‌ল্যাট
ব+জ — কুব্‌জ
ব+দ — শব্‌দ
ব+ধ — লুব্‌ধ
ব+য — অব্‌বয়
ব+র — বজ, ব্‌রজজ
ব+ঋ — বিথা, ব্‌রিথা
ব+ল — ব্‌লাউজ
ব+ব — জব্‌বর
ভ+য — লভ্‌ভ
ভ+র — ভমর, ভ্‌রমর
ভ+ঋ — ভিগু, ভ্‌রিগু

ম+প — কম্‌প
ম+প+র — কম্‌প, কম্‌প্‌র
ম+ফ — লম্‌ফ
ম+ব — বিলম্‌ব
ম+ভ — আরম্‌ভ
ম+ম — সম্‌মান
ম+য — রম্‌ম
ম+র — আম, আম্‌র
ম+ঋ — মিত, ম্‌রিত
ম+ল — ম্‌লান
র+ক — তর্‌ক
র+চ — অর্‌চনা
র+ট — শার্‌ট
র+ত — বার্‌তা
র+প — দর্‌প
র+য — কার্‌য
র+শ — দর্‌শন
র+হ — গর্‌হিত
ল+ক — উল্‌কা
ল+গ — বল্‌গা
ল+ট — উল্‌টা
ল+প — গল্‌প
ল+ব — পল্‌লল
ল+ম — শাল্‌মলি
ল+য — কল্‌ল
ল+ল — আল্‌লা
ল+হ — কল্‌হন
শ+চ — পশ্‌চিম
শ+ছ — শিরশ্‌ছেদ
শ+ব — অশ্‌শ
শ+ম — শশান
শ+য — বশ্‌শতা
শ+র — সম, স্‌রম
শ+ঋ—সিগাল, স্‌রিগাল
শ+ল — শ্‌লাঘা
ষ+ক — শুশ্‌ক
ষ+ট — কশ্‌ট
ষ+ঠ — কনিশ্‌ঠ
ষ+ণ — বিশ্‌নু
ষ+প — পুশ্‌প
ষ+ফ — নিশ্‌ফল
ষ+ম — ভিশ্‌শ
ষ+য — বিশেশ্‌শ
স+ক — তশ্‌কর
স+খ — স্‌খলন
স+ট — স্‌টেশন
স+ত — অস্‌ত
স+ত+উ — বস্‌তু
স+ত+র — অস্‌ত, অস্‌ত্‌র
স+ত+ঋ — বিস্‌তিত, বিস্‌ত্‌রিত
স+থ — অস্‌থির
স+ন — স্‌নান
স+প — নিশ্‌পন্‌দ
স+ফ — স্‌ফটিক
স+ব — নিজশ্‌শ
স+ম — ভশ্‌শ
স+য — আলশ্‌শে
স+র — সাব, স্‌রাব
স+ঋ — সিজন, স্‌রিজন
স+ল — স্‌লাভনিক
হ+ণ — অপরান্‌হ
হ+ন — জান্‌হবি
হ+ব — জিওভা, জিব্‌ভা
হ+ম — বম্‌হা, ব্‌রম্‌হা
হ+য — লেজ্‌ঝ
হ+র — র্‌হদ
হ+ঋ — র্‌হিদয়
হ+ল — আল্‌হাদ
অনুস্বার — বাঙলা
বিসর্গ — আহ্‌, আপাতত
চন্দ্রবিন্দু — চাঁদ
হসন্ত — বন্‌দর, বন

শংকর

॥ ১২ ॥

পরপর নামা-বেনামা সাতখানা ফ্ল্যাটে তালা ঝুললো এবং সরকারী সীলমোহর পড়লো। থ্যাকারে ম্যানসনের এতোগুলো ফ্ল্যাটে যে মিসেস শকুন্তলা চাওলা তাঁর নিষিদ্ধ সাম্রাজ্য বিস্তার করে-ছিলেন তা আমারও জানা ছিল না।

বেচারা মদনা বিভ্রান্ত। সে বললো, "ধম্মের কল বাতাসে সত্যিই নড়ে। আমি স্যার আর এই গোলমেলে লাইনে থাকবো না, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি এবার গেরস্ত লাইনে ফিরে যেতে চাই।"

এরপর মদনার অনুরোধ : "আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিন, স্যার। এনি চাকরি—কোন্ শালা আর এই সব হাঙ্গামায় থাকে।"

মদনা অবশ্য আমার ওপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। কয়েক দিনের মধ্যেই সে অনেক খোঁজখবর নিয়েছে। মদনা বলেছিল, ভাবনানি ম্যানসনের প্রাইভেট গেস্ট-হাউস থেকে তার ডাক এসেছিল। "কিন্তু স্যার, আমি নাক-কান মলেছি—নোংরা লাইনে আর থাকবো না।"

মদনা এবার দার্শনিকের মতো কঠিন এক প্রশ্ন তুলেছিল। "আমাকে কী ভগবান পানিশ দিচ্ছেন স্যার?"

"ঈশ্বর তো সবারই মঙ্গল করেন শুনেছি, মদনা। তিনি কেন শুধু শুধু তোমাকে 'পানিশ' দেবেন?"

মদনা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "না স্যার, আমার যে অনেক দোষ। সুইপারের ছেলে হয়ে, বাপ-পিতা-মহের কাজ ছেড়ে দিতে চাইলাম আমি। তাই হয়তো অসন্তুষ্ট হয়ে আমায় বললেন, দেখাচ্ছি মজা তোর। ময়লা ঝাঁটাকে যখন তোর অতোই ঘেন্না, তখন তার থেকেও ময়লা ঘেঁটে খেতে হবে তোকে।"

কী উত্তর দেবো আমি?

মদনা কিন্তু ভেঙে পড়েনি। সে বললো, "আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না স্যার। স্বয়ং পুলিস আমার কিছু করতে পারলো না, ভগবান তো কোন ছার! আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার। আপনি শুধু আমার দুটো উপকার করুন।"

মদনার জন্যে আমি অনেক কিছুই করতে পারি। মদনার প্রথম অনুরোধ : তাকে এ-বাড়ির সিঁড়ির কোণে একটু থাকতে দেবার অনুমতি। মিসেস চাওলার ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সেও আশ্রয়-হীন হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্যই আমার কোনো আপত্তি নেই। "মদনা, তুমি যদি আমার বাথরুমে রোজ স্নান সারতে চাও তাতেও অসুবিধে নেই।"

জিভ কেটে মদনা বললো "মরে গেলেও না, স্যার। আপনি বামুন মানুষ। দয়া করে আপনি থাকতে দিচ্ছেন বলে, আমি আবার কলঘরে স্নানের সুখ চাইবো? এতোবড়ো গঙ্গানদী পাবলিকের জন্যে বয়ে যাচ্ছে কেন? আপনি একদম ভাববেন না।"

মদনার দ্বিতীয় অনুরোধটি আশ্চর্য! মদনা বললো, "আমাকে একখানা ক্যারাকটার সার্টিফিকেট দিন, স্যার।" কলকাতা শহরে এই এক অসুবিধে! ক্যারাকটার থাকুক চাই না থাকুক একটা সার্টিফিকেট চাই-ই, তাছাড়া চাকরি-বাকরির অ্যাপ্লিকেশন করা চলবে না।

মদনার ক্যারাকটার! এবং সার্টিফিকেট চাইবার লোক খুঁজে পেলো না, মদনা? "আমার মতো লোকের সার্টিফিকেটে কী হবে মদনা?"

মদনা মোটেই দমলো না। "আসল লোককেই ধরেছি আমি। আপনি তো খোদ ইংরেজ ব্যারিস্টারের কাছে কাজ করে এসেছেন।"

বাধ্য হয়ে মদনার জীবনের সাফল্য কামনা করে ইংরিজীতে প্রশংসাপত্র লিখতে হলো আমাকে—জীবনে এই প্রথম সার্টিফিকেট রচনা। আমার মতো লোকের কাছেও সার্টিফিকেট প্রার্থনা করবার অভাগা মানুষ তা হলে কলকাতা শহরে আছে!

মদনার অনুরোধে সার্টিফিকেট পত্রের ওপরে লিখতে হলো : প্রাইভেট সেক্রেটারি টু লেট নোয়েল বারওয়েল, বার-অ্যাট-ল। আমি অবশ্যই সায়েবের সেক্রেটারি ছিলাম না, আমি ছিলাম কলকাতা হাই-কোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু। কিন্তু মদনা 'বাবু' কথাটা পছন্দ করলো না। বাবুর সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—তার থেকে 'সেক্রেটারি' অনেক সম্ভাবনাময়।

মদনা দুদিন পরেই ফিরে এসে সুসংবাদ দিয়েছিল। বারওয়েল সায়েবের নামাঙ্কিত সার্টি-ফিকেট নিষ্ফল হয়নি। সদর স্ট্রীটের ডিকসন সায়েবের কাছে চাকরি পেয়েছে মদনা। "বড় মজার চাকরি, স্যার।" অদ্ভুত নেশা এই ডিকসন সায়েবের। নিজের চাকরি-বাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, ডিকসন সায়েব এখন দুপুরে নিজের হাতে রান্না করেন। সেই রান্না আবার ডিকসন সায়েব তারপর বেশ কয়েক বাড়িতে বিলিয়ে আসেন।

মদনা বললো, "আমার খুব ভাল ডিউটি, স্যার। রান্নাবান্নায় ডিকসন সায়েবকে সাহায্য করি, তারপর ডেকচি মাথায় করে, সায়েবের লিস্টি ধরে খাবার বিলি করে আসি। সায়েব নিজে আজকাল সব জায়গায় যেতে পারেন না। কত বুড়োবুড়ী যে আমার জন্যে মুখ শুকিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, আপনাকে কী বলবো? আমাদের কিরণ বউদিকে সায়েবের লিস্টিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আপনার যদি কোনো উপোসী পার্টি থাকে বলবেন, গরম খাবারের ব্যবস্থা করে দেবো।"

"মদনা, চিরকাল তো মিসেস শকুন্তলা চাওলার মোকদ্দমা চলবে না। একদিন নিশ্চয় আবার ওই সিলভার ড্রাগন খুলবে। তখন তুমি কী করবে?"

মদনা সোজা জানিয়ে দিল, তাকে মালিক করে দিলেও সে আর এই সিলভার ড্রাগনে ফিরছে না। মদনা শুনেছে, উর্বশী দিদিমণিকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস পাহারায় কোন্ এক হোটেলে রাখা হয়েছিল। মিসেস চাওলার লোকরা নাকি সুযোগ পেলেই ওকে খুন করে ফেলবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে নাকি হুমকি দেখানো হয়েছে। এখন আচমকা উর্বশী দিদিমণির খবরই পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় কোন্ অজানা ঠিকানায় তিনি চলে গিয়েছেন। কেউ কেউ বলছে, মনের দুঃখে উর্বশী দিদিমণি দেশের বাইরে পাড়ি দিয়েছেন এবং কখনও আর দেশে ফিরবেন না।

মদনার খবরটা মিথ্যা নয়। ইংরিজী কাগজে তথাকথিত 'ইউ'-এর নামে সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন আমারও নজরে পড়েছে। এবং এর পেছনে যে শকুন্তলা চাওলার অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ রয়েছে তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু সরকারী শাসনযন্ত্র এবারে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে। অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী এবং জামাই দীর্ঘ জেলখাটার শাস্তি লাভ করেছেন। সব রকম সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও যে অনেক সময় বিপদের মেঘ অপরাধীর ওপর বজ্রপাত করে তার উদাহরণ হিসেবে মিসেস শকুন্তলা চাওলার কাহিনী আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

শকুন্তলা চাওলার এই আকস্মিক পতনে আমি আনন্দিত হবো না দুঃখিত হবো? যে পর্বতপ্রমাণ উচ্চাভিলাষ নিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন তা অবশ্যই সমর্থন-যোগ্য নয়। ছলে-বলে-কৌশলে তিনি যে এই বাড়িটা পুরোপুরি গ্রাস করবার মতো ক্ষমতার অধি-

কারিণী ছিলেন তাও সন্দেহাতীত। সুতরাং শকুন্তলার পতন আমাদের পক্ষে সুসংবাদ। কিন্তু অন্য দিক থেকে অপ্রত্যাশিত অসুবিধার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। মাসের প্রথমে ভাড়া আদায়ের অংক অকস্মাৎ অনেক কমে গেল। শকুন্তলা ছিলেন আমাদের ভাড়াটিয়া ভাষায় 'গুড পে-মাস্টার'। একসঙ্গে সাতখানা ফ্ল্যাটের ভাড়া আচমকা বন্ধ হলে বিডন স্ট্রীটের চন্দ্রোদয় ভবনে কী ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবে কে জানে?

চন্দ্রোদয় ভবনের শ্রীমতী বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেলে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলতো। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তো আমাদের মতো সামান্য কর্মচারীর নাগালের বাইরে রয়েছেন। থ্যাকারে ম্যানসনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যতই নাটকীয় হোক, সে বিষয়ে বিলাসিনী দেবীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

সিলভার ফ্লাগন আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে আমার কোনো হাত নেই। কোনো ভাড়াটে যদি হঠাৎ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করেন তার জন্য ম্যানেজারকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু কবে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে সে বিষয়ে চিন্তা করবার মতো দায়িত্ববোধ অবশ্যই আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মেরে আমি কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছি। আইনের জটিল প্যাঁচে এইসব ফ্ল্যাট বছরের পর বছর তালাবন্ধ থাকতে পারে। পরিস্থিতি যে মোটেই আশাপ্রদ নয় তার আর একটি কারণ সিলভার ফ্লাগনের নায়ক-নায়িকাদের একপ্রস্থ জেলে পাঠিয়েই সরকার সন্তুষ্ট হননি। গুজব যে আরও কয়েকটি বড় বড় অভিযোগ ওঁদের বিরুদ্ধে আদালতে পেশ করা হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে যখন কিছুটা হতাশা বোধ করছি ঠিক সেই সময় ভরত সিংজী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ভরত সিং সামান্য কিছুদিনের মধ্যে আরও মোটা হয়েছেন। উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় ভরত সিং ক্রমশ চৌকো হয়ে যাচ্ছেন। গোল মুখখানার পরিধি যেন আর একটু বেড়েছে। ভরত সিং-এর মেজাজ বেশ খুশী খুশী। সম্প্রতি তাঁর ওপর দিয়ে সুরজলাল ন্যাগরচাঁদের বিশেষ কোনো ধকল যাচ্ছে বলে মনে হয় না।

ভরত সিং-এর জামাকাপড়ের স্টাইলের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। শুনেছি, একদা এই ভরত সিং হলদে রঙের খাদি পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে ভাবনানি ম্যানসনে চাকরি করতেন—এমন কি একটি আধময়লা গামছাও তাঁর কাঁধে শোভা পেতো। কিন্তু সে সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ভরত সিং-এর পরিধানে এখন হাল ফ্যাশানের স্যুট, যার প্রস্তুতকারক পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত প্রতিষ্ঠান মিরজা আলী। ওই দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে একদিন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভরত সিং সেদিন কমপ্লেন করেছিলেন, ইন্ডিয়ান টেলররা আজকাল ভাল কাজ করতে পারে না। তাঁর দুখানা মূল্যবান ইংলিশ ড্রেস মেটিরিয়াল্স তারা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, ভরত সিং এবার থেকে হয়তো খোদ স্যাভিল রো থেকেই স্যুট বানিয়ে আনবেন।

যে অদ্ভুত জামাকাপড় পরে ভরত সিং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তার সবই ফরেন হতে পারে। একমাত্র দিশী জিনিস ওঁর স্ফীত মধ্যপ্রদেশটুকু।

ভরত সিং আমার সঙ্গে খুবই আন্তরিক ব্যবহার করলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, কয়েক সপ্তাহ ফরেনে থাকায় তিনি খোঁজখবর রাখতে পারেননি। ফিরে এসেই মিসেস বিশোয়াসের এক লেডি ফ্রেন্ডের কাছে খবরাখবর পেয়ে তিনি প্রথম সুযোগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

"সমবেদনা জানাতে?" আমি জিজ্ঞেস করি মিস্টার ভরত সিংকে।

জিভ কেটে ভরত সিং বললেন, "ঠিক তার উলটো। হিংসে করতে! নিজের চোখে তোমার সৌভাগ্যটা দেখতে এলাম।"

"এ সব কী রসিকতা করছেন, মিস্টার সিং?" আমি সত্যিই ওঁর হেঁয়ালি ধরতে পারছি না।

ভরত সিং বললেন, "সাত সাতখানা ফ্ল্যাটে একসঙ্গে তালা পড়লো—এটা কি কম ভাগ্যের কথা?"

"কী বলছেন মিস্টার সিং? আমার ভাড়া আদায়ের কী অবস্থা হলো একবার ভেবে দেখুন। সামনেই কর্পোরেশনের ট্যাক্স জমা দেবার দিন।"

ভরত সিং নিজের মত পরিবর্তন করলেন না। বললেন, "রেসের জ্যাকপট জিতলেও বাড়ির মালিকরা এতো খুশী হবেন না!"

আমি ভরত সিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ভরত সিং হালকা মেজাজে বললেন, "আজ আপনি চা খাইয়ে দিন, মিস্টার শংকর। তালা পড়েছে মানেই তো একদিন তালা খোলা হবে, তখন আপনাকে কে দেখে?"

ভরত সিং লোকটি আমাদের লাইনের এনসাইক্লোপিডিয়া। বাড়িভাড়া সংক্রান্ত লিখিত আইন ও অলিখিত কানুন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সীমাহীন। এই রকম বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

ভরত সিংজীর জন্যে চা এল। চায়ে দু'চামচ চিনি দেওয়া থাকে। কিন্তু একবার চুমুক দিয়েই টি-বয়কে তিনি আরও দু'চামচ চিনি 'তুরন্ত' আনবার নির্দেশ দিলেন।

বাড়তি চিনি মেশাতে মেশাতে ভরত সিং বললেন, "ভাগ্যবান স্বামীর বউ মরে, আর ভাগ্যবান বাড়িওয়ালার ভাড়াটেকে পুলিসে জেল দেয়। আপনি আবার স্পেশাল ভাগ্যবান—একখানা নয় দু'খানা নয়—হোলসেল রেটে সাতখানা পাখী এক ঢিলে মারা পড়লো!"

মিটমিট করে হাসছেন ভরত সিংজী। এবং আমি ওঁর হেঁয়ালির রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। মিসেস চাওলার জেলে যাওয়া এবং দরজায় দরজায় তালা পড়া মানেই ভাড়া পড়ে থাকা। পর পর কয়েক মাস ভাড়ার ডিফলটার হওয়া মানেই ভাড়াটের বিপদ ডেকে আনা। কয়েক মাস পরে যখন ওঁরা তালা খুলতে আসবেন তখনই হয়তো অনাদায়ী ভাড়ার জন্যে উচ্ছেদের মামলা করে দেওয়া যায়। সাধারণ সময়ে মিসেস শকুন্তলা চাওলার মতো টেনান্টকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানোর কথা স্বপ্নেও ভাবা যেতো না।

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে ভরত সিং রসিকতা করলেন, "ব্যাপারটা এবার যেন বুঝেছো মনে হচ্ছে।"

আমি মুর্খের মতো গর্ব প্রকাশ করলাম। ভরত সিংকে মনে করিয়ে দিলাম, একদা আমি ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু ছিলাম, সুতরাং আইনের সমস্যা সমাধান আমার কাছে সহজ ব্যাপার!

ভরত সিং কিন্তু পরমুহূর্তেই মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী বুঝেছো?"

আমি এবার অনাদায়ী ভাড়ার সুযোগে উচ্ছেদ মামলার পরিকল্পনাটা ওঁকে ব্যাখ্যা করলাম।

চৌষট্টি টাকার স্পেশালিস্ট ডাক্তার যেভাবে জুনিয়র ডাক্তারের সামনে হাসেন সেই ভাবে মিস্টার ভরত সিং আমাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

চায়ের কাপে চোঁ-চোঁ আওয়াজ করে ভরত সিং বললেন, "অতো অর্ডিনারি পয়েন্ট হলে ভরত সিং মাথা ঘামাতো না। অনাদায়ী ভাড়ার জন্যে উচ্ছেদের মামলা তো যে কোনো বটতলার উকিল করতে পারে, তাঁর জন্যে এই সব ব্রেন দরকার হয় না" এই বলে ভরত সিং নিজের এবং আমার মাথার দিকে আঙুল দেখালেন।

"তা হলে?" ব্যাপারটা যে খুব সহজ নয় তা এবার বোঝা যাচ্ছে।

ভরত সিং বললেন, "নিয়ে আসুন আপনার খবরের কাগজের রিপোর্ট।"

যে খবরের কাগজে কিছুদিন আগে শকুন্তলা চাওলার সপরিবারে জেল শাস্তি ভোগের খবরটা বেরিয়েছিল তা পুরনো খবরের কাগজের স্তূপ থেকে খুঁজে বার করলাম।

"নো নো, দিস ইজ ব্যাড," আমাকে ইংরিজীতে

ছনি লাগালেন ভরত সিং। "এই সব মূল্যবান লল তুমি এখনও কেটে নিয়ে ফাইলবন্দী করো নি ? রের কাগজের একটা লাইন অবহেলা করি না আমি। ণো প্রপার্টিজ সম্বন্ধে কিছু বেরোলেই আমি ঙ্গ সঙ্গে কেটে নিয়ে ফাইলে রেখে দিই। এই র কাটিং সোনার চেয়ে দামী, মিস্টার শংকর।"

ভরত সিং এরপর আবার বললেন, "হাউ লাকি উ আর! সত্যি আপনাকে হিংসে করতে ইচ্ছে ছে। নিজের অজান্তে আপনি সোনার খনির ন্ধান পেয়েছেন।"

তালার উপর তালা ঝুলছে—এর সঙ্গে সোনার নির সম্পর্ক কী ? আমি মিস্টার ভরত সিং-এর থাবার্তায় আর তেমন ভরসা রাখতে পারছি না।

শূন্য চায়ের কাপটা টেবিলের এক কোণে সরিয়ে লেন ভরত সিং। পকেট থেকে সুগন্ধ রুমাল বার রে নাকের ডগা মুছে নিলেন। তারপর তিনি টকীয়ভাবে আমাকে জেরা শুরু করলেন।

"মিসেস শকুন্তলা চাওলার এসট্যাব্লিশমেণ্ট রেড রেছিল কারা ?"

"কাস্টমস ও পুলিস। পরের দিন আবগারী ভাগের ইনসপেকটরও যোগ দিয়েছিলেন।"

"কাস্টমস কী কী কেস করেছিল ওদের রুদ্ধে ?" ভরত সিং-এর প্রশ্ন।

"কাগজের রিপোর্ট পড়ে বুঝলাম ডজনখানেক স—বেআইনী সোনা রাখার অভিযোগ, বেআইনী সার এবং পাউন্ড রাখার কেস, বিনা লাইসেন্সে হাজী সিগারেট ও মদের বোতল রাখার অভিযোগ, রও কত কী!"

"ফাস্ট ক্লাস। এই সব প্রত্যেকটি অভিযোগে দের সাজা হয়েছে ?" প্রশ্ন করলেন মিস্টার ভরত ং।

"জেল এবং জরিমানা দুই", আমি উত্তরে লাই।

ভরত সিং বললেন, "নাউ একসাইজ কেস। ওরা কী করলেন ?"

"বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা", আমি উত্তর দিলাম। "ওঁরা ক্রেট-ক্রেট বিলিতী মদের ওপর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যে কী একটা কেস করেছেন। ওই সব মদের স্টক তাঁরা বাজেয়াপ্ত করার নোটিশও দিয়েছেন। আর তৃতীয় কেসটা আরও কড়া। কদিন আগেই সিলভার স্লাগনের বার-লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। মিসেস চাওলার বার-লাইসেন্স চেক করতে আসবার সাহস এর আগে কারুর ছিল না। এখন আরও একটা সিরিয়াস কেসের আসামী হলেন ওঁরা—বিনা অনুমতিতে মদের ব্যবসা চালানো।"

ভরত সিং আবার ব্যারিস্টারি স্টাইলে প্রশ্ন করলেন, "একসাইজ কেসগুলোতে কী হলো ?"

"সে রিপোর্টও সংবাদপত্রের আইন ও আদালত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েক মাস জেল খাটবার এবং জরিমানা দেবার হুকুম দিয়েছেন আদালত।"

ভরত সিংজী বললেন, "গুড। কিন্তু আমাদের পয়েন্ট এখনও শেষ হয়নি। লাস্ট বাট নট দি লিস্ট—পুলিস। তাঁরা কী করলেন ?"

"থানার পুলিস নয়—লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার সদলবলে এসেছিলেন।"

"তাঁরা কী করলেন ?" আবার প্রশ্ন তুললেন ভরত সিংজী।

"ডজনখানেক মেয়েকে সিলভার স্লাগনের ছোট ছোট খুপরি থেকে তুলে নিয়ে গেলেন ওঁরা। আমরা ভেবেছিলাম ওদেরও হাজতবাস হবে। কিন্তু থানায় ওদের আলাদা-আলাদা স্টেটমেণ্ট নিয়ে তখনকার মতো ছেড়ে দিয়েছিলেন অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার।"

ভরত সিংজী : "এদের সম্বন্ধে কাগজে কি বেরিয়েছে ?"

ধরা হয়। এবং তারা আদালতে একের পর এক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে যে মিসেস শকুন্তলা চাওলা এবং তাঁর সুযোগ্য জামাই প্রকাশ্যে এই ঘৃণ্য ব্যবসা চালাতেন। অর্থের অভাবে মেয়েরা এ-লাইনে এসেছে এবং তাদের রোজগারের প্রধান অংশ এনট্রেন্স ফি হিসেবে মালিকদের হাতে নিয়মিত তুলে দিয়েছে।"

"এই কেসে কী হয়েছে ?"

"আদালত ওই সব মেয়েদের কোনো শাস্তি দেন নি। কিন্তু অর্থের লোভে পতিতালয় পরিচালনার অভিযোগে শকুন্তলা চাওলা ও তাঁর জামাইকে আবার জেলে পাঠিয়েছেন।"

ভরত সিং বললেন, "অর্থাৎ প্রমাণ হয়েছে যে মিসেস চাওলা ঘৃণ্য কাজে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঘরবাড়ি ব্যবহার করেছেন। ....নাউ, এবার আপনি বলুন থ্যাকারে ম্যানসনের এই গৃহস্থ বাড়ি আপনি মিসেস চাওলাকে পতিতালয় হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন ?"

"অবশ্য নয়।" মিস্টার সিং-এর প্রশ্নে আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

মিস্টার সিং বললেন, "এইটাই সুবর্ণ সুযোগ। আইনে বলছে, বেআইনী কাজে ভাড়াটে বাড়ি ব্যবহারের অধিকার ভাড়াটের নেই। টুক করে এই সুযোগে মামলা ঠুকে দিন—এই সব ফ্ল্যাট এখনই আপনার হাতে ফিরে আসবে। ইমমরাল ট্রাফিক আইনের মামলার রায়ের কপি ঝটপট জোগাড় করে নিন, তারপর উচ্ছেদের মামলা ঠুকুন। স্ট্রাইক দি আয়রন হোয়েন ইট ইজ রেড—বুঝলেন মিস্টার শংকর," এই বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন ভাবনানি ম্যানসনের প্রাক্তন ম্যানেজার এবং সুরজলাল নাগরচাঁদের দক্ষিণ হস্ত শ্রীভরত সিং। (ক্রমশ)

জিয়োন মাছ

সমরেশ মজুমদার

চা চুরির জন্য চাকরীটা চলে গেল বংশীর। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়, সবাই চুরি করে কেউ সাধু নয়। মেয়েগুলোর সুবিধে একটু বেশী, আংরার তলায় পুঁটলি বেঁধে বেশ নিয়ে যায়, চৌকিদার শালা তখন চোখ বুজে থাকে। পোয়াতি মেয়েদের তো পোয়াবারো, ডুগপেটের সঙ্গে সাইজ মিলিয়ে ওপর পেটে চা বেঁধে নেয়। বিরাট গুদামে পাহাড় করা চায়ের পাতা, কাঠি বাছাই চলছে দিন-রাত। গাদা গাদা কামিন আর বুড়ো কুলিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। চারধার টাটকা চায়ের গন্ধে ম ম করছে। বাছাই চায়ের প্যাকিং চলছে একধারে। ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে পেরেকের। মাঝে মাঝে গুদামবাবু টহল দিয়ে যাচ্ছে মশমশ করে পাতা ডিঙিয়ে। কামিনদের কাঁধের বাচ্চাগুলো পা ছড়িয়ে সেই চায়ের ওপর গু-মুত ছড়াচ্ছে—তার বেলা কিছু নয়, শুধু বংশী যখন আর না পেরে কয় মুঠো পাতা চা কোঁচরে ভরে ছুটির ভোঁ বাজলে যেই বেরুতে গেল সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদার শালা ওর পেট ধরল খামচে! এ্যাদ্দিন পাতা তুলতো বংশী। পিঠে ঝুড়ি নিয়ে ট্রাকে চেপে চলে যেত খুঁটিমারী ডিম-ডিমার ধারে। সারা দিন পাতা তুলে সন্ধ্যায় ফিরে আসতো গুদামে। পাতিবাবু ওজন করে পাতা নিতো দেখে শুনে। ব্যাস ছুটি। সেই কাঁচা পাতা কি করে চেহারা পালটে ম-ম গন্ধ ছড়ানো চা হয়ে যায় কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। তাগড়া জোয়ান-দের গুদামের কাজে নেওয়া হয় না। কিন্তু সেদিন আংরাভাসার গায়ে চা পাতা তুলতে গিয়ে সেই শালা গোলাপটা এমন চোট দিল পায়ে যে তিনমাস হাসপাতালে ওষুধ গিলতে হল ওকে। বেরিয়ে আসার পর হাঁটতে গেলে খোঁড়াতে হয় দগদগে ঘা শুকিয়ে গেলেও পা-টা হয়ে আছে কাঠির মতন লিকলিকে। শরীরে তাগদ বলতে কিছু নেই। কোনরকমে গুদামে কাজ মিলল ওর। আরামের চাকরী। হপ্তা গেলে পেট ভর্তি ভাতের টাকা মেলে, সুরজপ্রসাদের ভাটিখানায় এক বোতল করে হাঁড়িয়াও কুলিয়ে যায়। তিন নম্বর কুলি লাইনের শেষ ঘরটায় সারা রাত নেশা করে শুয়ে থাকে বংশী। বৌটা ছেলের বয়সী একটা মিস্ত্রীর সঙ্গে ভেগে গেছে বিনাগুড়ি। বেশী দূর নয়, ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটাই হয় না। বৌটা এ্যাদ্দিন ছিল বাঁজা, গতর টসকায়নি। উড়ো খবর আসে, এবার নাকি বিয়োবে। যারা খবর দেয় তারা বংশীর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভাবখানা এমন, তোমার কেরামতি ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু সে সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না বংশী। মেয়েছেলের জাত পোষ মানে না কখনো। পুরুষ-মানুষ যদি পেট আর দিলে সুখ রাখতে পারে—চাই কি আর! পেট ভরলেই তো দিল ভরে। কিন্তু শালা সোনিরাম মুদি লোভ দেখাল, 'ওরে বংশী শুনলাম গুদামে কাজ করছিস, নিয়ে আয় চা মুঠি কতক দশ টাকা কিলো দেব।' ব্যাস লোভ শালা হেলে সাপের মত লিকলিকিয়ে উঠল সারা গায়ে। মাত্র তিন মুঠো চায়ের জন্য চাকরী খতম করে দিল গুদামবাবু। এক বোতল হাঁড়িয়ার দাম হতো চা-টায়। কপালে যা বাধা তার বেশী চাইতে গেলেই ফেঁসে যেতে হয়—কেউ যদি এ খবরটা আগে বলে দিত!

ধরা পড়ার পরই হয়ে গেল কেলোটা। চৌকি-দার তো ওর কোঁচরে হাত রেখে চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে, ছাড়াবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল বংশী। গেটের সামনেই নালি—সোজা চলে গেছে আংড়াভাসায়। নালির ওপর সিমেন্টের বাঁকানো সাঁকোর ওপর চলছিল ধস্তাধস্তি। দৃশ্যটা দেখে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসছে। মদোনিয়া কুলিকামিনের দল ভিড় করে মজা দেখছে। দাঁত বের করে মেয়ে-গুলো ঢলে পড়ছে। গুদামবাবু আর অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজারকে এদিকে আসতে দেখে পেটের গিঁট খুলে দিল বংশী। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুর ঝুর করে পাতাগুলো পড়ল নালিতে, পড়ে ভেসে চলল। যদি ডুবে যেত তলায় তাহলে গুদামবাবু দেখতে পেত না, প্রমাণ থাকতো না কিছু। সঙ্গে সঙ্গে নাম কাটা গেল খাতা থেকে। ছিঁচকেমির ব্যাপার বলে দশ মাইল দূরের থানায় খবরটা দিল না কেউ। ভিড় হালকা হয়ে গেলে বংশী দেখল বাবুরা ছুটি পেয়ে দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কুলিকামিনরা চাবাগানের হাঁটা পথে ফিরে যাচ্ছে লাইনে। আর সামনের শিরিষগাছের একটা নিচু ডালে বসে বুক ফুলিয়ে একটা ঘুঘু ওর দিকে তাকিয়ে শেষ বার ডেকে নিচ্ছে।

সারাদিন ঘরে শুয়ে বসে কাটাল বংশী। সেই ভোরে ভোঁ বাজতেই লাইন খালি করে মেয়ে-পুরুষ
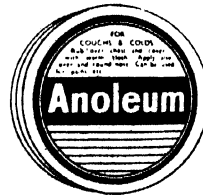
যেতেনে লেগেছে কাজে। হাসপাতালে থাকতে এতো কষ্ট হয়নি আজ মটকা মেরে পড়ে থাকতে যেমনটা হয়েছিল। এই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আজ নয় কাল ওরা ছেড়ে দিতে বলবেই। বাগানে যারা কাজ করবে তাদের জন্য ঘর দেওয়া হয়। একবেলা রাঁধে লাইনের সবাই। রাত্তিরবেলায় গরম গরম ভাত খেয়ে বাকিটা জলিয়ে পরদিন কাজে নিয়ে যায়। কিন্তু কাল রান্না হয়নি কিছু। মেজাজ ছিল না। দু'এক-জন এসেছিল উপায় বাতলাতে, ম্যানেজার কিংবা বড়বাবুর কাছে ধরাধরি করতে। একটা ইউনিয়ন আছে ওদের, কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়া চুরির কেস নিয়ে কিছু করবে না ইউনিয়ন।

ঠা ঠা দুপুরে ঘরের বাইরে এল বংশী। বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলে পায়ের ব্যথাটা বাড়ে। হাঁটাচলার মধ্যে থাকলে ঠিক হয়ে যায়। খালি গায়ে একটু জবরো জবরো ভাব লাগছে। টানাটানিতে ধুতিটা কাল ফেঁসে ফিঁসে গিয়েছিল। পাতি তোলার সময় যে ঢলঢলে খাঁকি হাফপ্যাণ্টটা পরতো সেটাই গলিয়ে নিয়েছে এখন। প্যাণ্টে সুখ হয় না ওর। সুখ যে ছাই কিসে হয়, শুধু খাওয়া ছাড়া। গলা ভর্তি ভাতগুলো যখন পেটের মধ্যে বিজুর কাটে তখনই সুখ হয় জব্বর। খাওয়ার কথা মনে পড়তেই কষ্ট হল বংশীর। পেটের চামড়াটা শালা পিঠে লেগে যাবার ধান্দায় আছে! চাউল আছে ঘরে সেরখানেক, খেয়ে নিলেই তো শেষ হয়ে গেল। তিন দিন বাদে হপ্তা। বংশী শেষ পর্যন্ত উনুন ধরাবে বলে ঠিক করল। চারধার চুপচাপ, শুধু মাঝে গলা ছেড়ে মোরগগুলো চেঁচাচ্ছে। ওখানে সব ঘরেই মুরগীর দঙ্গল। বংশীর বউ এককালে মুরগী পুষতো। বউ পালাতে বংশী সেগুলোকে রোজ রাত্রে একটা একটা করে কেটে খেয়েছে। আঃ, সেই দিনগুলোয় খাওয়াটা ছিল কী সুখের! মেয়েছেলের শরীরের চেয়ে মুরগীর মাংস স্বাদে জিভ জুড়িয়ে দেয়।

আনমনে হাঁটছিল বংশী। একদম ন্যাংটাপোঁদা বাচ্চা আর থুত্থুরে বুড়োবুড়ি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। লাইনের শেষ প্রান্তে এসে খুঁটিমারী জঙ্গলের দিকে তাকাল ও। ঘন জঙ্গলটা ক্রমশ নিচ থেকে আরো নিচে নেমে গিয়েছে। একটু এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল বংশী। তেমাথা বুড়ো সিরিন গুলতি হাতে বসে। নড়বড়ে মুঠোয় গুলতির বাঁট নিয়ে পানসে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। বংশী ওর সামনে উবু হয়ে দাঁড়াতে বুড়ো চোখ তুলল, তারপর চিনতে পেরে বলল, 'নোকরি গেলাক রে তুর ?' 'হু।' বংশী ওর হাত ধরে আস্তে আস্তে তুলল, 'কা করতিস রে ?'

বসে বসে বুড়ো মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিল বোধ হয়, বংশীকে পেয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বুড়োর যখন ষাট বছর বয়স তখন চামুর্চির এক বিধবাকে বিয়ে করে। প্রায় তিরিশ বছরের ছোট বউটাকে বিয়ে করার কারণ বুড়োর ছেলেরা সব বাপকে ছেড়ে আলাদা, বউ এসে বাগানে কাজ করে স্বামীকে খাওয়াবে। তা বলতে নেই বউটা বুড়োকি দেখাশুনা করছে ঠিক মতন। মাঝে মাঝে একবেলার জন্য চামুর্চিতে গিয়ে সৎ মেয়েকে দেখে আসে এই পর্যন্ত। লোকে বলে অনেকের সঙ্গে নাকি ফষ্টি-নষ্টি করে বউটা, চাদনী রাতে কেউ কেউ চাবাগানের মধ্যে দেখেছে পুরুষের সঙ্গে। তা কোন্ মেয়েটা এই লাইনের সতী হয়ে আছে বল ? শুধু ফেঁসে না গেলেই হল আর বুড়োকে তো কোন অযত্ন করছে না—কারোর কিছু বলার নেই। তা সেই বউ আজ দুদিন যেতে পারেনি কাজে। ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে। আজ জ্বর নেই বটে কিন্তু শরীর কাহিল। সকাল থেকে মাংস মাংস করছে। গুলতি দিয়ে বুড়োকে বলেছে একটা ঘুঘু মেরে আনতে। শুকনো ধান খেতে ঘুঘুরা ভিড় করে ভর দুপুরে। জোয়ান বয়স হলে বুড়ো দশটা ঘুঘু মেরে দিত কিন্তু এখন ঢোঙাগুলো হাত ফসকে এদিক ওদিক চলে যায় যে!

ঘরের দরজায় এসে বুড়োর যেন সম্বিত এল। বংশী যত ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে চায় ও ঘাড় নাড়ে। ঘড়ের ছাউনি অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, ভেতরে ঢুকতে একটু হেঁট হতে হয়। ভেতরের খাটিয়ায় মচমচ শব্দ হয় তারপর বুড়ো সিরিনের বউ-এর আংরার তলা দেখা যায়। বংশী বোঝে খালি হাতে বুড়ো ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। বুড়োর বউ-এর সঙ্গে ওর কথাবার্তা তেমন নেই। বউ পালাবার আগে মাঝে মধ্যে ওর ঘরে অবশ্য গেছে। বংশীর সন্দেহ এরই পাল্লায় পড়ে বউটার মন বিগড়েছে। না হলে এ সদেশীয়া মেয়ে হয়ে হিন্দী কথা বলে! চামুর্চিতে একটা হিন্দী সিনেমা হয় শুনেছে বংশী, তা বলে এত ঢং কিসের! আজকাল ওদের বাগানে মাসে দুমাসে একটা করে পিকচার দেখানো হয় বড় সাহেবের কুঠির সামনে—সিরিনের বউ-এর ঠাটঠমক সেই রকম।

'ভাগ গেলাক সব চিঁড়িয়া—না রে' সিরিনের বউ পাশে এসে দাঁড়াল। চুলগুলো রুক্ষ, চেহারাটা থমথমে। হঠাৎ বংশীর মনে হল সিরিনবুড়ো সাঁত্যিই বুড়ো। স্বামী না হয়ে বড়া-বাপ হতে পারত সহজেই। হঠাৎ যেন বংশীকে দেখে বউটা চোখ কপালে তুলল, 'নোকরী খরতম, মরদ হজম' বলে হাসল।

প্রথম কথাটার মানে বুঝলেও পরেরটা কেমন রহস্য হয়ে থাকল বংশীর।

'তুম জোয়ান আদমী, তুমারা ডর কিয়া, বোলো ?' বউ ঠোঁট টিপে বলল।

'যা বড়া ঘর যা।' বংশী সিরিনের কাঁধে টোকা দিতে বুড়ো সিঁধিয়ে গেল ঘরে। রুক্ষ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বউ বলল, 'কা কাম করতিসে রে ?'

'কুছ্ না।' বংশী গুলতিটা নিয়ে হাত বোলাল।

'দো চিঁড়িয়া মার দে, তুম ভি খায়গা হামরা ঘর মে।' বউ বলল।

'ঠিক হ্যায়।' বলে বংশী পা চালাল। এই মেয়েটার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। কেমন ঢিপঢিপ করে বুক।

বেছে বেছে অনেকগুলো ঢোঙা পকেটে পুরে লাইন ছাড়িয়ে নিচে নামল বংশী। যেখানটায় চাল শুকুতে দেওয়া হয় সেখানে কয়েকটা কাক ছাড়া কিছু নেই। ফাক্টরীর সামনে গেলে নিশ্চয়ই কয়েকটা পাওয়া যেত কিন্তু ওদিকে যেতে মন চাইছে না। লাইন ছাড়িয়ে যেতেই জঙ্গলের শুরু। বাঁ-দিকের হাঁটা পথ ধরে খানিকটা গেলেই আংরাভানা নদী। এই ভর দুপুরে খাঁ খাঁ করছে চারধার। নদী ধরে কয়েক পা হাঁটতেই ঘুঘু পাওয়া যাবে। এখন বড়-জোর হাঁটু অবধি জল। জঙ্গলের পথ ধরতেই বংশী দেখল একটা মদেশিয়ার সঙ্গে বাবুমত লোক এদিকে আসছে। মদেশিয়াটা হাত নেড়ে ওকে থামতে বলছে। অবাক হল বংশী। বাবুটাকে ও জীবনে দ্যাখেনি। মদেশিয়াটাকে চেনাচেনা মনে হলেও ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে। গুলতি হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে আসতে দেখল বংশী। বাবুটা মদেশিয়াকে ফিসফিসিয়ে কি বলতে সে সম্মতি জানাল ঘাড় নেড়ে। বাবুটা বলল, 'তোমারা নাম বংশী ?'

ঘাড় নাড়ল সে।

'কাল নোকরী চলা গিয়া তুমারা ?'

'হাঁ।'

'লেও সিগারেট পিও।' একটা দেশলাই আর আর হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট ওর দিকে এগিয়ে দিল বাবুটা। বিড়ি খুব কম খায় বংশী, খইনি চলে। সিগারেট খাওয়ার পয়সা কোথায় ? কিছু না বুঝে হাত বাড়িয়ে ওগুলো ধরল বংশী। ব্যাপারটা কি ?

'ঘাবড়াও মৎ, হামারা বাত শোন', বাবুটা হাসল, 'তুম রুপিয়া মাঙতা হ্যায় ?'

এ আবার কি রকম প্রশ্ন! টাকা কে না চায় ? মুখে বলল, 'জী বাবু, পেটকে লিয়ে রুপিয়া জরুরত হ্যায়।'

'ঠিক বাত। খানেকে লিয়ে, আচ্ছা কাপড়াকে লিয়ে, ভেইলি হাঁড়িয়াকে লিয়ে সব কইকো রুপিয়া চাহিয়ে। মগর বংশী, তুমারা নোকরী তো খতম কর দিয়া সাহেব, আভি কেয়া করেগা ?' বাবুটা বলল।

'পতা নেহি বাবু।' বংশী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

'ঠিক হ্যায়, হাম শুনা তোমারা বাত। উ সাহেব লোকক্কা দিল দেখো, মুঠিভর পাতি নেহি ছোড়নে সেকতা। থুঃ।' ঘেন্নায় থুতু ছড়ালো বাবুটা, 'এইসা বাগানমে তুম কাম মৎ করো। তুম হামারা কামমে লাগো।'

'আপকা কাম ?' একটা বাবু ওকে যেচে চাকরী দিচ্ছে ভাবা যায় না।

'আরে ভাই হামারা চার পেটি পাতা চা চাহিয়ে। ও দারোয়ান শালা পয়চান্তা নেহি। তুম চলো, কোনঠু পাতা চা ও বাক্সা ইয়ে হামারা আদমীকো বাতা দেও। সিরেফ চার পেটি, ব্যাস।'

'কাঁহা ? ফ্যাক্টরী পর ?' অবাক হয়ে গেল বংশী।

'দুসরা কাঁহা মিলেগা ভাই।' দশ টাকার একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিল বাবু, 'কোই ডর নেহি। আজ রাত দো বাজে ইহাঁ চলা আনা, হামারা ইয়ে আদমী তুমকো সাথ লে যায়গা। কাম খতম হোনেসে আউর চালিস রুপিয়া মিলেগা। আরে দারোয়ান ভি রুপিয়া লিয়া—কুছ নেহি বোলেগা।'

'আরি বাপু, হাম মর যায়েগা।' ঠক ঠক করতে লাগল বংশী।

'আরে, কুছ ডর নেহি। উনলোক তুমকো ভাগায়া দিয়া আউর তুম লেড়কিকা মাফিক বাত করতা। আরে বদলা লেও। যাদা কুছ করনে নেহি পড়েগা তুমকো। ব্যাস জবান পাক্কা ? শুন, ইয়ে বাত দুসরা কিসিকো মত বাতানা। বেইমানকো হাম জিন্দা নেহি রাখতা।' কেমন রক্ত ঠাণ্ডা করা গলায় কথাটা বলে চলে গেল বাবুটা সঙ্গীকে নিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ধাতটা ফিরে এল তখন বংশীর খেয়াল হল ওর হাতে সিগারেট আর দেশলাই এবং টাকাটা রয়ে গেছে। আজ রাতে ওরা চুরি করবে পেটি পেটি চা। নিয়ে যাবে কিসে ? নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই চাবাগানে এতকাল কাজ করে শেষ পর্যন্ত ও এই কাজ করবে ? মনের মধ্যে দুটো লোক অনেকক্ষণ পাঞ্জা কষে শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল বংশী। দারোয়ান যখন ওদের দলে কেউ টের পাচ্ছে না যে বংশী এর মধ্যে আছে। ওরা যখন ফাঁকতালে কিছু টাকা ওকে পাইয়ে দিতে চায় ও নেবে না কেন ? শধু তো পেটিগুলো চিনিয়ে দেওয়া—গুঁড়ো চা থেকে পাতা চা আলাদা করে দেওয়া—এটা এমনকি অপরাধ! আর নোকরী যখন খতম করে দিয়েছে ওর এটা করলে তেমন পাপ হবে না। অনেকটা হালকা হয়ে পকেটে সিগারেট আর টাকা রেখে দিয়ে ও সামনের দিকে হেঁটে গেল। কুল কুল করে অল্প জলের স্রোত বইছে। নদীর ওপাশে ঝুঁকে আসা একটা শালগাছের ডালে বুক চিতিয়ে বসে আছে একজোড়া ঘুঘু। চকিতে ঢোঙা পরিয়ে গুলতিটা টিপ করল বংশী। ডান হাতে রবারটা কানের কাছে টেনে এনে ফট করে ছেড়ে দিতেই ঝটপট শব্দ হল গাছটায়। বংশী চেয়ে দেখল মাদী ঘুঘুটা একপাক খেয়ে আংরাভানার জলে গিয়ে পড়ল ধপাস করে। সাধ্যের বাইরে দ্রুত হেঁটে জলের মধ্যে নেমে পড়ল বংশী। যা স্রোত দেড় ঠ্যাঙে হাঁটা মুশকিল। কোন রকমে পাখীটাকে ধরে ফেলল ও। জলে ডানা ভিজে গেলেও বুকের কাছটা কি গরম, ধোঁয়া ওঠা ভাতের মত।

ঘুঘুটাকে একটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলে শুকনো জায়গায় বসল বংশী। চার ধারে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। পাকা কাঁঠালের গন্ধ আসছে যেন। এই বনের ধারে কয়েকটা গাছ আছে কাঁঠাল, আমের। মানুষের ফেলা আঁটিতে গজিয়ে গেছে। পেট জুড়ে খিদেটা চনমনিয়ে গেছে। শালা বনে ফল আছে পাখী আছে—ঠিকই চলে যাবে। আর আজ রাত্রে ধরা পড়লে নির্ঘাৎ সদরে পাঠাবে! দারোয়ানটার মুখ মনে পড়ল বংশীর। ও এর মধ্যে আছে ? অথচ ওর তিন মুঠো চা ধরার সময় কি বীরত্ব দেখাচ্ছিল। মানুষকে চেনাই যায় না। রামজীকে গানা করে দারোয়ান। রামজী কে ? কে জানে! না, এই চুরি ঠিক চুরি

[illegible]

আর এসে গেলেই পঁচিশ সের চাউল কিনে রাখবে ও। একমাস নিশ্চিন্ত। না, তাতেই সব টাকা শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিশ সের চাউল আর দশ বোতল হাঁড়িয়া। ব্যাস আর কি চাই। মনের সুখে চোখ বন্ধ করে সরু পায়ে হাত বোলাতে লাগল বংশী।

খুঁটিমারী রেঞ্জের এই জংগলটা চলে গেছে মাথুয়া ডিঙ্গায়ে ভুটানের পাহাড়ের তলায়। এদিকে জংগলের ঘনত্ব কম। পায়ে হাঁটাপথে ফালি ফালি করে জংগল ছিঁড়ছে। হাতি ছাড়া ভয়ের কিছু জানোয়ার এদিকে আসে না। আর হাতি এলে খবর ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের মুখে মুখে। নিশ্চিন্তে বসে বংশী পাখীর ডাক শুনছিল। আংরাভানার জলের শব্দের সংগে পাখীর ডাকগুলো কেমন মিলে মিশে যায়। আজ রাতে যদি ও কাজটা করে তবে কাল একবার বিনাগুড়ি গেলে কেমন হয়। পেট হওয়া বউটাকে দেখে আসবে। বউটার সংগে ওর ঝগড়া ঝাঁটি হয়নি কোনদিন, অথচ না বলে কয়ে ফট করে কেমন চলে গেল। শুধু বউটাকে বাচ্চা দিতে পারল না বলে ভেগে গেল? কিন্তু ওর শরীর তো ঠিকঠাক কাজ করে। শরীরের মেশিনটায় ভগবান যদি জং ধরায় তাহলে ও কি করবে? গুলতিটা হাতে তুলে নিল বংশী। কি আশ্চর্য, আবার ঐ শাল-গাছটার ডালে ঘুঘু এসে বসেছে। অন্য ঘুঘুরা কি একে খবরটা দেয়নি! গুলতিতে টিপ করে ঢোঙা ছাড়ল বংশী। তড়াক করে ঘুঘুটা ওড়ার চেষ্টা করেই বোঁটা খসা আমের মত নিচের জলে পড়ল। আর সংগে সংগে পায়ের আওয়াজ পেল ও। বুঝতে না বুঝতে একটা শরীর তীরের মত ওর পাশ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন রকমে জল হাঁতড়ে ঘুঘুটাকে ধরে ওর দিকে ফিরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হাসল। ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে বংশী। সিরিন বুড়োর বউ। ও এল কখন? 'কা দেখিস রে?' দু-হাতে ঘুঘুটাকে ধরে ওপরে উঠে এল সে। নিচের আংরাটা ভিজে গেছে একদম, ওপরের ব্লাউজে জলের ছাপ। জলে ভিজে বুক যেন আরো ফুলে উঠেছে।

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল বংশী। বউটা কাছে এসে আর একটা ঘুঘু দেখতে পেয়ে ঠোঁট ওল্টাল, 'মোটে দুটা? হামারা চারটো চাহিয়ে।'

বংশী বলল, 'তুমরা বোখার হুয়া, প্যানিমে মৎ নামো।'

'কিঁউ?' চোখ তুলল বউটা, 'বোখার ঠাণ্ডা হো যাবেক। তুম একদম বুদ্ধু, এতনা তুমারা ঘরমে হাম গিয়া তুম হামকো নেহি দেখা। মেরা নাম জানতা?'

ঘাড় নাড়ল বংশী। সিরিন বুড়োর বউ বলে কি।

'সে-রা'। টেনে টেনে উচ্চারণ করল বৌটা, 'সেরা মেরা নাম। প্যার করনা কাম।' বলেই কপট ঘাড় নাড়ল, 'সবকো সাথ নেহি'।

'তু ঘর যা।' বংশী বলল।

'কিঁউ।' ভ্রু তুলল সেরা, 'তুমারা পসন্দ নেহি হোতা?'

উঠে দাঁড়াল বংশী। মেয়েটার মতলব খারাপ।

সেরা হাসল, 'ও বুড়া মরবেক। এতনা ডর উসকো, থুঃ, তুম মরদ নেহি!'

'এ্যাই।' বংশী ধমকে উঠল।

চোখে চোখ রেখে এগিয়ে এল সেরা। হাতের ঘুঘুটাকে ছুঁড়ে দিল অন্যটার পাশে। তারপর বুকের জামার সেপ্টিপিন টুক করে খুলে বংশীর হাত টেনে নিল সেখানে, 'দেখো হামকো, ক্যায়সা মরদ তুম?' ঘুঘুর বুক কিংবা গরম ভাতের চেয়ে উষ্ণ দুটো তামাটে পাহাড় ছুঁয়ে দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে গেল বংশীর। মেয়েছেলের শরীর এত নরম হয়! ওর বউটার শরীরের এসব তো এমন করে ছিল না! কোমরে হাত রাখলে তো হাত এমন ডুবে যেত না! চুমু খাবার সময় জিভ দিয়ে টোকা মারলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সুখটা তো জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত শরীর নিংড়ে দিয়ে নিস্পন্দ হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বংশী।

অনেক পরে সেরা নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে হাসল, 'তুহার বহুটা ঝুট কথা বলে। তুম বহুৎ তেজী মরদ হ্যায়। লাও, একঠো সিগারেট পিলাও।'

চমকে উঠে বসল বংশী। হঠাৎ নেমে আসা শ্রান্তিটা চট করে চলে গেল। ওর কাছে সিগারেট আছে জানল কি করে সেরা! কিছু না বলে প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে চোখের দিকে তাকাল বংশী। নিপুণ হাতে দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা ওর দিকে বাড়িয়ে নিজেরটা টানতে লাগল সেরা। ওর জিভের রসে ভেজা সিগারেটে টান দিতে দিতে বংশী শুনল, 'তুম হামকো শাদি করেগা?'

চমকে তাকাল বংশী, 'হাম?'

'হাঁ। আজ রাতমে চল চামুর্চি, নেহি, হাসিমারা। উঁহা তুমারা কাম মিল যায়গা।'

'সিরিন—!' বংশী বলল।

'ও বুড্ডা মর যায়গা আজকাল। হাম ইঁহা নেহি রহেগা।'

'কিঁউ।'

হাসল সেরা, 'মেরা পেটমে বাচ্চা আ গিয়া। দোসরা আদমীকে বাচ্চা। লাইনকা আদমীলোক হামকো মার ডালেগা।'

হাঁ হয়ে গেল বংশী। সেরার পেটে বাচ্চা আছে! তবু ওর সংগে এমন মজা করল। নিশ্চয়ই কারো সংগে ফেঁসে গিয়েছে। আর এখন ওকে শাদি করতে বলছে বাঁচবার জন্যে? বংশী বলল, 'হাম নেহি যায়েগা।'

'কিঁউ, তুমকো সুখ নেহি দিয়া হাম?' আদুরে গলায় বলল সেরা।

'দুসরা আদমীকা বাচ্চা—' বলতে গিয়ে থেমে গেল বংশী। খিল খিল করে হাসল সেরা, 'তো কেয়া। আরে বুদ্ধু, জেনানালোক বাতানেসে তব তো মরদলোক সমঝতা বাচ্চা উসকো হ্যায়। সমঝ লেও ইয়ে তুমারা বাচ্চা, ব্যাস। তুমারা বহুকো উপর বদলা লে লেও।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বংশী বউটার কথা ভাবল। সেরা যা বলছে তা করলে বউটা জব্দ হয়ে যাবে। কিন্তু সিরিন বুড়ো—

'আজ রাতকো কাম খতম করকে পুলকা পাস চলা আও। হাম সামান লেকে উঁহা খাড়া রহেগা।' উঠে দাঁড়াল সেরা।

'রাতকো কাম?' অবশ হয়ে গেল বংশী। রাতের কাজের কথা এ জানলো কি করে? উঠে দাঁড়াল ও।

'পঞ্চাশ রুপিয়ামে রফা হুয়া না? হাম সব শুনা। আরে ডরতা কিঁউ, হাম কিসিকো নেহি বাতায়গা। তুম মেরা বাচ্চাকো বাপ হ্যায়।' বলে বংশীর চিবুক এক হাতে নেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল লাইনের দিকে। খানিকটা গিয়ে আবার ও ঘুরে দাঁড়াল, 'ইয়াদ রাখনা, পুলকা পাস হাম খাড়া রহেগা দো বাজে মে।' তারপর রানীর মত হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল আড়ালে। হঠাৎ বংশী টের পেল ওর ভাল পা-টা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে আর সরু পায়ে ব্যাথাটা চাগাড় দিয়ে উঠছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর। একটা হিম ভয় বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে। সেরা নিশ্চয়ই ওর পেছন পেছন এসেছিল। তারপর আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবুটার কথা সব শুনেছে। শালা। মেয়েছেলেটা সাক্ষী থেকে গেল ব্যাপারটার। ফাঁস করে দিলে আর রক্ষে থাকবে না। পা দুটো যদি ভাল থাকতো তবে থোড়াই কেয়ার করতো বংশী। এখন ওর কথা না শুনলে! বংশীর কান্না পেয়ে গেল। কার সংগে মজা লুটে ফেঁসে গিয়ে ওর ওপর ভর করতে চাইছে সেরা। এমনিতে মেয়েছেলেটা এমন জিনিস কোনদিন টের পাইনি ও। তা বলে অন্য একটা বাচ্চার বাবা সেজে ওকে চলতে হবে? এও তো শালা এক ধরনের চুরি। চামুর্চি কিংবা হাসিমারা যেখানেই থাক এই চুরিটাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। বসে পড়ল বংশী। ঘুঘু দুটো নিয়ে যায়নি সেরা! কাঠ হয়ে পড়ে আছে, সে দুটো। হঠাৎ ওর মনে হল সেরাকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে তো একদিন ভেগে পড়তে পারে। সব যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন কে আর সেরাকে বিশ্বাস করবে? নিজের বউ-এর ওপর বদলা নেওয়া হল, চাকরী খতমের বদলা হল আবার সেরাকেও টাইট দেওয়া হল। একটু খুশী খুশী মন হওয়ার সংগে পায়ের ব্যাথাটা কমে গেল বংশীর। সামনের দিকে তাকাতে ও আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্যাপার কি। ঘুঘুগুলোর কি আজ মরতে ইচ্ছে করছে নাকি। নাহলে শাল গাছের সেই নিচু ডালটায় আবার একটা এসে বসেছে কেন? আর বসে অমন বুকেই চিতায় কেন? গুলতিতে ঢোঙা পুরে টিপ করল বংশী।

চার চারটে ঘুঘু কাঠের আগুনে ঝলসাচ্ছিল। গর্ত খুঁড়ে তিন ইঁটের উনুনের ওপর ছাল ছাড়ানো পাখিগুলোকে চেনা যাচ্ছিল না। লকলকে আগুনের তাতে সাবধানী হাতে ঝলসে নিচ্ছে সেরা। একটা পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। আগুনের রঙ লেগেছে মেয়ে-ছেলেটার গালে। বুড়া সিরিন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর দুটো পা ভাঁজ করে হাঁটু ওপরে তোলা। মাথার কাছে বসে বংশী দেখছিল সেরাকে। বুড়োর ঠ্যাং দুটোর মাঝখান দিয়ে সেরাকে দেখছে ও। ঠ্যাং দুটোকে হঠাৎ গুলতির বাঁটের মত মনে হল ওর। ও নিজে যেন ঢোঙা, এক্ষুণি সাঁই করে ছুটে যাবে সামনে ঐ আগুনে গাল লাল হওয়া ঘুঘুটার দিকে। খুক খুক করে হাসল বংশী। একটু একটু নেশা হয়েছে। সেরা ঘুঘু চারটে পেয়ে লুকোন বোতল বের করেছিল। নিজে খায়নি এক ফোঁটা। বুড়ো তো আধ বোতল খেয়ে চিৎ হয়ে গেছে। শালি ভাগবার জন্য বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সন্ধ্যে থেকে। চোখে রঙ লাগছে বংশীর। মাথা নেড়ে নিজেকে ঠিক করল ও। মাথা সাফ রাখতে হবে। রাতের কাজটা গোলমাল না হয়। আজ সন্ধ্যেবেলায় সব মুশকিল হয়ে গেল। জংগল থেকে আসবার সময় লাইনের লোকজন যারা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল তাদের সংগে দেখা। সবাই ওকে দেখে হই হই করে উঠল। অবাক বংশী শুনল ইউনিয়ন থেকে গিয়ে-ছিল বড়সাহেবের কাছে। এক কথায় বড়সাহেব নাকি বংশীকে চাকরী ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। তবে গুদামে নয়, হাসপাতালের কাজে। কাল সকালে যেন বংশী ডাকদারবাবুর সংগে দেখা করে। কি করবে বুঝতে পারছিল না বংশী। দেড় ঠ্যাঙে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল। চাকরী আছে তার, এই বাগান এই কুলি লাইন ওই পাতির গন্ধ যা সে ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসছে সেখানেই সে রাজার মত থাকতে পারবে—আঃ। তারপর একটু একলা হয়ে চারটে ঘুঘু ঝুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবটুকু আনন্দ ধারায় মনটা হাওয়ার মত বেরিয়ে গেল ভুস করে। আজ রাত্রে পোঁটি পোঁটি চা চুরি করে ওকে সেরার সংগে পালিয়ে যেতে হবে। ইস, যদি কয়েক ঘণ্টা আগে খবরটা সে জানতো। বাবুটা বলে গেছে বেইমানি করলে লাস ফেলে দেবে। কি করবে ও।

নেশার চোখে সব কিছু সুন্দর লাগে। গুলতির বাঁটের মধ্যে দিয়ে ও সেরাকে দেখল। কি নির্লিপ্তের মত নুন মরিচ ছড়াচ্ছে মাংসের ওপর। এখন গন্ধটা বেরুচ্ছে দারুণ। এই সেরা আর জংগলের মধ্যে শুয়ে থাকা সেরার মধ্যে কোন মিল নেই—এই রকম যখন ভাবতে শুরু করেছিল ও ঠিক তখনই একটা কলাইকরা থালার ওপর মাংসগুলো রেখে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সেরা। ওর চাকরী ফিরে পাবার কথা শুনেছে সেরা। বংশী সিরিল বুড়োকে খবরটা দেবার সময় ওকে শুনিয়ে-ছিল। বুড়ো খুশী হয়েছিল। কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সেরা।

রান্না হয়ে গেলে দু-হাতে বুড়োকে ঝাঁকাল সেরা, 'ওঠ, ওঠ, এ বুড়া, ওঠ।' অনেক ঝাঁকুনির পর সিরিন চোখ খুলে ঢুলতে লাগল। উঠে বসল। মাংসের থালাটা সামনে ধরতে দু-একবার মুখ থুবড়ে তার মধ্যে পড়ে যেতে সেরা এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে বুড়োর মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। বুড়ো কয়েকবার সেটাকে চিবোতে চেষ্টা করল।

ঝাড়তে জোর পাচ্ছে না, সু সু করে রস টানছে, কপালের রগগুলো তির তির করে কাঁপছে, চোয়াল নড়ছে না ইচ্ছেমত। শেষ পর্যন্ত প্রায় আস্ত মাংসটা মাটিতে থু থু করে ফেলে দিয়ে নেশার ঘোরে কাঁদতে লাগল বুড়ো। তারপরই বংশী একটা আজব ব্যাপার দেখল। সেরা আর একটা মাংস ছিঁড়ে নিজের মুখে পুরে সেটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে কাদা করে আবার মুখ থেকে বের করে সেই কাদাটা বুড়োর মুখে গুঁজে দিল। চিবোতে হল না বুড়োকে, জিভ দিয়ে সেটাকে নেড়ে চেড়ে কপাৎ করে গিলে ফেলল বুড়ো। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল একটা হাত বালিশ করে। মাংস খাওয়া হয়ে গেল বুড়োর।

মাংসের থালিটা সামনে রেখে সেরা বংশীর কাছে এসে বসল। দূরে সেই বটগাছটার তলায় কারা মাদল বাজাচ্ছে—ডিম ডিমা ডিম, ডিম—তালটা এ ঘরে সোজা যেন চলে আসছে। 'খালে মাংস'। সেরা বলল।

বোতল শেষ হয়ে গিয়েছিল বংশীর। মাংস খাওয়ার সময় ওরা কোন কথা বলল না। শব্দ করে পাখির নরম হাড় চুসছিল সেরা। খাওয়ার সময় মেয়েদের চেহারায় কোন গরমি থাকে না। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে পা ছড়িয়ে বসল বংশী। কটা বাজে? একটার সময় গিয়ে দাঁড়াতে হবে লোকটার জন্যে। ও দেখল থালা সরিয়ে সেরা আর একটা বোতল বার করছে। বাঃ, মেয়েটার কাছে তো বেশ লুকোন মাল থাকে। সেরা বলল, 'লে, মৌজ কর।'

ঘাড় নাড়ল বংশী, 'না। নেশা হো যাবেক।'

'হোনে দে।' সেরা সামনে এসে বসল আবার। বলে কি মেয়েটা? গুদামে অত বড় কাজ আছে, তারপর হেঁটে আজ রাত্রে চলে যেতে হবে হাসিমারার দিকে, নেশা করলে চলবে কি করে? ওর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেই সেরা হাসল, 'তুম আদমীটু সাচ্চা হ্যায়। শুন, আজ রাতমে নেহি যানে পড়েগা তুমকো।'

'কিঁউ?' থ হয়ে গেল বংশী।

'পহেলে দেখি তুম ক্যায়সা মরদ হো। দো মাস বাদ হামলোগ যা শেকতা—বাকী ইসকা অন্দর তুমারা বাচ্চা হামারা ইঁহা আয়ে তো।' বলে নিজের পেট দেখিয়ে হাসল সেরা।

হাসপাতালে থাকতেও শরীর এত অবশ হয়নি বংশীর। হাঁ হয়ে ব্যাপারটা শুনল ও। সেরা তখন স্রেফ মজাকি করেছে। ওর পেটে বাচ্চাটাচ্চা আসেনি। আজ অবধি কখনোই আসেনি। আগের স্বামী আর এইটে—দুটোই ক্ষমতা হারাবার পর বিয়ে করেছে। বংশীর ওপর ওর নজর ছিল। বংশীকে যাচাই করবার জন্য ও মিথ্যে বানিয়ে বলেছে। বলে দেখেছে বংশী সাচ্চা আদমী। এখন বংশীকে দুই মাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর মধ্যে বাচ্চা আসে তবে দুই নম্বর থালি চাঁদের দিন ওরা পালিয়ে যাবে।

ফট্‌ করে যেন আর একটা গিঁট খুলে গেল বংশীর। কিন্তু মুক্তির আনন্দের চেয়ে অন্য একটা সুখের স্রোত ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে ফেলল সহসা। আঃ। একটা হাতে সেরার হাত ধরে বসে থাকল বংশী। সিরিন বুড়োর নাক ডাকছে সমানে।

হঠাৎ সেরা বলল, 'তুম আজ গুদামমে মৎ যাও।'

এখন সত্যি আর যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। এতগুলো সুখের খবর একসঙ্গে পেয়ে আর ভাল লাগছে না বিপদের মধ্যে পা বাড়াতে। বংশী বলল 'উ শালা মার ডালেগা।'

কি ভাবল সেরা। তারপর বলল, 'লে দম ভর পি লে হাঁড়িয়া। উসকা বাদ যা। মাতোয়ালা আদমীসে উনলোক কাম নেহি করায়গা।'

দম ভর খেয়ে যখন বংশী বাইরে বেরুল তখন ওর পায়ের ব্যথাটা কখন হাওয়া হয়ে গেছে। খোলা জায়গায় আসতেই ওর হঠাৎ মনে হল ঘর-বাড়ি আকাশ কেমন উলটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে সে-গুলোকে ঠিক করল ও। ডিম ডিমা ডিম মাদল বাজছে। চোখে কেমন ঝাপসা লাগছে সব। চোখ তুলে ও সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। খুঁটি-নারীর অঙ্গটা যেন ক্যালেণ্ডারে দেখা শিব ঠাকুরের মত বসে আছে মাথায় একটা চাঁদ ঝুলিয়ে। আহা, কি রূপ। দু-হাত জোড় করে প্রণাম করার চেষ্টা করল বংশী। চোরা জোৎস্নায় চারধারে হলদে সাদা ছড়াচ্ছে। টলতে টলতে বংশী মোড়ের দিকে এগোল। তামাম কুলি লাইন নিস্তব্ধ এখন। শুধু মাদলটা বাজছে—থেউসির তো বৃহৎ দেরী।

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বংশী আর দাঁড়াতে পারল না। সবে হিম পড়া ঘাসে বসে পড়ে আশে-পাশে তাকাল। জঙ্গল থেকে দলে দলে জোনাকি এসে ছড়িয়ে পড়ছে মাঠে। ফিনিক ফিনিক টিপ পরাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে। কটা বাজে এখন? এখন সব ঠিকঠাক, চাকরী হল সেরার মত মেয়েছেলে ওর বাচ্চা পেটে নেবার জন্য অপেক্ষা করছে, আর ওকে এখন চুরি করতে যেতে হবে। কান্নাটা হঠাৎই এসে গেল ওর।

অনেকক্ষণ পর সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পেয়ে তাকাল বংশী। অন্ধকারে টর্চ জেলে কেউ সাইকেলে চেপে আসছে। ঠিক ওর সামনে এসে ওর মুখে আলো ফেলল লোকটা। তারপরই আচমকা পেটে একটা লাথি খেল বংশী, 'ই শালা কুত্তাকা বাচ্চা, ফিন নোকরি মিলা তুমারা? আঁ?' সেই মর্দেশিরটা। হু হু করে কেঁদে ফেলল বংশী, 'মু না জানলেক কুছ, সাচ্, কিরায়া।'

লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, 'লে দশ রুপায়া ঘুমাকে দে।' পকেট থেকে টাকাটা বের করে বংশী ওর দিকে তাকাল, 'কাম?

ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে লোকটা আবার সাইকেলে চাপল, 'শালা দারোয়ান ফাঁসায় দেলেক। বেইমান। জানসে খতম হোগা ও।' বলে পাই পাই করে চলে গেল সাইকেলটা।

পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু মনে লক্ষ লক্ষ চাঁদ ফুটে উঠল বংশীর। আঃ, বেঁচে গেছে ও, বেঁচে গেছে। প্রচণ্ড একটা ভয়ের সাপ এতক্ষণ যেন জড়িয়ে রেখেছিল ওকে, হঠাৎ স্নান করে ওঠার মত হালকা হয়ে গেছে যেন। আনন্দে ডিগবাজি খেতে গিয়ে টলে পড়ল বংশী। শালা মাতোয়ালা হো গিয়া।

লাফাতে লাফাতে হাঁটছিল বংশী। চাঁদ আর জোনাকিগুলো যেন মিছিল করে ওর সঙ্গে আসছে। আর দু মাস—ব্যাস। তারপর রাজা হো যায়গা। থালি চাঁদকো রাত আ যাও পেয়ারে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন ও পুলের ওপর এসে পড়েছে বুঝতে পারেনি। এখানেই দু-মাস পর সেরা আসবে।

হঠাৎ আর একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। যদি নিজের বউটার মত সেরার পেটেও ওর বাচ্চা না আসে। যদি ওর শরীরের ভিতর বাচ্চা আনার যন্ত্রটা খারাপ থাকে? নিজের বউটার তো বাচ্চা [illegible] এখন। প্রচণ্ড একটা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল বংশী। তাহলে তো সেরা আসবে না। বরং ওর দিবে তাকিয়ে ফ্যালনা হাসি হাসবে। সারা জীবন এখানে চোরের মত থাকতে হবে। পুলের বাঁশটা দু-হাতে ধরে ওপর দিকে তাকাল ও। হঠাৎ পায়ের যন্ত্রণাট ফিরে এল বংশীর। নেশাটা কেটে যাচ্ছে। ওপর দিকে তাকিয়ে চাঁদটাকে দেখতে দেখতে হাঁ করল ও আয় চাঁদ—মেরা অন্দরমে আ যা। —গলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নাকে গিলতে চেষ্টা করছিল বংশী একটু একটু করে সমস্ত চাঁদকে সারা শরীরে পুরে নিয়ে ওর মনে হল ও নিজেই থালি চাঁদ হয়ে গিয়েছে। শরীরটা হয়ে উঠেছে ফুলের মত। কি আরাম—আঃ। কিন্তু থালি চাঁদ হয়ে গেলেই বে বিপদ। আস্তে আস্তে আবার ক্ষয়ে যেতে হয়-পনের দিন পর একদম শেষ। তখন শুধু অন্ধকার তখন শুধু কোন রকমে জিইয়ে রাখা নিজেকে।

দ্রুত পা চালাল বংশী। নিজের কাছে চাঁদটাকে রাখা বড় বিপদ, বরং সেরার কাছে জমা করে দিলে ভাল। রোজ রোজ যদি জমা করে দেয় তাহলে হারাবার ভয় থাকে না। দু মাসটাও যে একদি করে বেড়ে বেড়ে যায়। চাঁদটাকে উগরে দেব জন্য ঢোঙার মত ছুটতে লাগল বংশী।

সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজকুমার

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সদ্য প্রয়াত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়ের জীবনী কাগজে বেরিয়েছে, সকলেই পড়েছেন। তবু এবং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন তাঁর সঙ্গীতজীবনের পটভূমিকা নির্দেশ করতে। তাঁর জন্ম ১৯০৫ সালে কলকাতায়। তাঁদের বাড়ি ছিল চালতাবাগান অঞ্চলে। তাঁর পিতা মণিমোহন মল্লিক ছিলেন একজন বার্ধক্য মধ্যবিত্ত। বাল্যকালে তিনি সিটি ইনস্টিটিউশন মাইনর স্কুলে পড়েছেন। সেখানে তিনি প্রথম গান করেন জনৈক শিক্ষকের রচিত রাজভক্তিসূচক একটি সঙ্গীত। গানটি সামান্যই, কিন্তু সেই থেকে তাঁর গান গাওয়া সম্পর্কে ভয় ভেঙে যেতে থাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি জনৈক "লক্ষ্মী মিত্তির"-এর নাম উল্লেখ করেছিলেন। রাগসঙ্গীতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন বিশ্বনাথ রাও-এর শিষ্য দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কলেজের পাঠ বঙ্গবাসীতে, ১৯২১-২২ সালে। দিনেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং তাঁর প্রথম শেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল "হেরি অহরহ তোমারি বিরহ"—এই গানটি। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে একটি আশ্চর্য সংযোগের ফলে তিনি কলকাতায় বেতার প্রতিষ্ঠানে গাইবার সুযোগ পান। এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন—"একদা তুমি প্রিয়ে", যেটি এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সিনেমা জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে স্বনামধন্য হরেন ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায়। প্রথমে দু একটি নির্বাক ছবি যখন দেখানো হত তখন পর্দার সামনে যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিনি। তার পরের কাহিনী আজ সকলেরই জানা, সেটা তাঁর নিউ থিয়েটার্স-এর সঙ্গে সুদীর্ঘ সংযোগ। "মুক্তি" নামক চিত্রে তিনিই ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক এবং এই সময় থেকে বহু বিখ্যাত গানে সুর দিয়ে তিনি খ্যাতির শিখরে অধিষ্ঠিত হন। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি দুটি সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, একটি অল ইণ্ডিয়া রেডিও যেখানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষার আসর পরিচালনা করতেন, অপরটি ছিল পশ্চিম বাংলা সরকারের লোকরঞ্জন শাখা, যেটি বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঙ্কজকুমার প্রসঙ্গে প্রথম মনে পড়ে তাঁর উদাত্ত মধুর ও গম্ভীর কন্ঠের কথা। এমন সুকন্ঠের অধিকারী খুব কম শিল্পীই হতে পেরেছেন। কিন্তু, এইটিই তাঁকে এতবড় খ্যাতিতে উত্তীর্ণ করতে পারত না, যদি না তার সঙ্গে থাকত তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যচেতনা, পরিশীলিত রুচি এবং সুগভীর ডিগনিটি ও ইণ্টিগ্রিটি। সারা জীবন তিনি কমার্সিয়াল আর্ট বা আর্টিস্ট নিয়ে কাটিয়েছেন; কিন্তু সেখানে তিনি খেলো হয়ে যাননি, বরঞ্চ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন পরিচ্ছন্ন বৈদগ্ধ্য এবং পরিপাটি সংযত রুচিবোধ। কমার্সিয়াল আর্টও তাঁর কাছে আর্টই ছিল—তাই সেখানেও তিনি স্রষ্টার সম্মান অর্জন করেছেন, জনরুচির লঘু আকর্ষণের শিকার হবার পক্ষে তাঁর গুরুত্ব এত অধিক ছিল যে সেই আকর্ষণটাই প্রত্যাহত হয়ে ফিরে গেছে তাঁর কাছ থেকে। আমার মনে পড়ে, তরুণ বয়সে যখন তাঁর কন্ঠে শুনি হালকা খেমটা চালের গান "যে গগনে জনম আমার আকাশে চাঁদ ছিল, আকাশে চাঁদ জল রে" তখনও মনটা একটা আশ্চর্য পুলকে স্পন্দিত হয়েছিল, যে রকমটা হয় এই বসন্তের জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় হঠাৎ লেবুফুলের মধুর গন্ধ ভেসে এলে। আর্টিস্ট এইখানেই সার্থক, কেননা অতি সাধারণ লোকচিত্তের জন্য যা তিনি উপস্থাপন করলেন, তা এনে দিল এক লোকোত্তর অনুভূতি এবং এইটিই হচ্ছে চারুশিল্পে প্রতিভার নিজস্ব অনুদান। একদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, বোধ করি ১৯৩৩ সাল;—পঙ্কজবাবু রেডিওতে অর্গান বাজিয়ে (অর্গানের সঙ্গে পঙ্কজবাবুর গলা অনুপম মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠত) গাইছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে",—সেদিনও অনুভব করেছিলুম তাঁর কন্ঠে মেলোডির অপূর্ব আকৃতি যা শ্রোতার চিত্তকে অভিভূত করে ফেলেছিল। এই ধরনের মেলোডিতে পঙ্কজকুমার ছিলেন অননুকরণীয়।

পঙ্কজবাবুর সমসাময়িক সুরকার যাঁরা ছিলেন (নজরুল ব্যতীত) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশুকুমার দত্ত এবং শচীন দেববর্মন। পঙ্কজকুমারের রীতি ছিল এঁদের সবাইকার থেকে ভিন্ন। প্রথমত যে লিরিকটিকে তিনি সুরে রূপায়িত করতেন তাকে তিনি নিজের মনোভাবের সঙ্গে একান্তভাবে সমন্বিত করে নিতেন। এই সমন্বয়টি হচ্ছে বিশেষভাবে মেলোডি নির্ভর, যা তাঁর স্বকীয় সঙ্গীতচিন্তা থেকে উদ্ভূত। যেমন, "ও কেন গেল চলে"—এই গানটি;—এতে যে সৌন্দর্য আমাদের আকৃষ্ট করে, তা মেলোডির অতি কোমল মর্মস্পর্শী সঞ্চরণ, এইটিই তাঁর কন্ঠের সংযত বেদনাপ্লুত উচ্ছ্বাসে একটি করুণ রসকে প্রগাঢ়ভাবে প্রসারিত করে দিত। তাঁর অধিকাংশ কম্পোজিশনে তানের প্রয়োগ স্বল্প, কৃত্রিম প্রয়োজনও নেই,—শুধু কতিপয় মীড় এবং সুরের লীলায়িত বিকাশেই তিনি অপূর্ব রসসৃষ্টি করতেন। ছন্দও তাঁর রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে; কিন্তু ছন্দ আশ্রয় করেছে মূল উপাদান সুর বা মেলোডিকে, যেখানে তিনি অতিমাত্রায় ওরিজিনাল।

তাঁর সঙ্গীতচিন্তার পরিচয় পাওয়া যেত বিশেষভাবে তাঁর পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষার আসরে। এই আসরে তিনি বার বার উপদেশ দিতেন কাব্যের মর্মে প্রবেশ করবার জন্য। অনেক সময় গান না গেয়ে তিনি বার বার গানটি পাঠ করে শোনাতেন, এতে অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত; কিন্তু পরে তাঁরা বুঝতে পারতেন এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি ছিল, শেখাবার সময় তিনি বুঝিয়ে দিতেন কোন কোন অংশে তিনি জোর দিয়েছেন পাঠ করবার সময়। শিক্ষক হিসাবে পঙ্কজকুমারের স্থান অধিকার করা শক্ত। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার আসর শুধু গান শেখার ক্লাসই ছিল না, প্রাসঙ্গিকভাবে বহু বিষয়ে তিনি নিপুণভাবে উপদেশ দিতেন। এমনকি ব্যাকরণের কিছু কিছু তত্ত্বও তাঁকে অনুশীলন করতে দেখা যেত। এই আসরে তিনি যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেন, এমন নয়, অনেকের গানই শেখাতেন, এমনকি তাঁর সুরে দেওয়া জনপ্রিয় গান, অথবা হিন্দী গানও বাদ যেত না। দিনের পর দিন ভক্তিপূত চিত্তে তাঁকে কীর্তনাঙ্গ গান শেখাতেও শুনেছি। ইদানীং তিনি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার আসরটিতে বাংলার কাব্যসঙ্গীতকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার মনে হয়, রেকর্ড বা সিনেমা-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এই আসরের মাধ্যমে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কারণ সঙ্গীতের তত্ত্ব, উচ্চারণরীতি, পরিশীলিত গায়ন পদ্ধতি, স্বরলিপির অনুশীলন ও আনুষঙ্গিক বহু তথ্য তিনি এই আসর মারফৎ প্রচার করতেন। সঙ্গীত শিক্ষকের ভূমিকাতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী;—নানা দিক দিয়ে বিচার করে একথাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করতে হয়। বেতার প্রতিষ্ঠান পরে তাঁকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এমার্জেন্সির দরুনই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই বা সবটাই কি তাই? যেভাবে সঙ্গীতজগতের এই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছি তাকে ইংরেজিতে বলতে হলে বলতুম "আনফর্চুনেট"। তিনি নিরতিশয় বেদনাহত হয়ে ফিরে এসেছিলেন যে সামান্য ভদ্রতার সঙ্গেও তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগই আমাদের কানে এসেছে। তাঁর অবসর সম্বন্ধে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করি না, কারণ অবসর সকলকেই দিতে হয়—কিন্তু যাঁরা অবসর দিয়ে থাকেন, তাঁদের সহৃদয়তা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে রাখে। এই সহৃদয়তা বা সংবেদনশীলতার অভাব এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনেককেই তিক্ত করে রেখেছে এবং তখন থেকে যখন ইনটারনাল এমার্জেন্সি লোকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পঙ্কজকুমারের সঙ্গীতচিন্তা প্রসঙ্গে কথা উঠলে বেতারে "মহিষমর্দিনী" অনুষ্ঠানের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য। এই একটি অনুষ্ঠানে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা আজ পর্যন্ত আর কারুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা ছিল। উষাকাল থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টিতে কোন্ কোন্ সুর কিভাবে রূপায়িত হলে সেগুলি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, সে সম্বন্ধে বহু চিন্তা তাঁকে করতে হয়েছে। গানগুলিকে তিনি একান্তভাবে তাঁর কন্ঠের উপযোগী করে তুলেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ, উদাত্ত, সুরেলা কন্ঠে

গানগুলি যখন ঊষার স্বচ্ছ অন্ধকারে প্রসারিত হত, তখনকার অনুভূতি ভোলার নয়। চন্ডীর শ্লোক-গুলি তিনি ভিন্ন ভিন্ন তালে গাইতেন এবং তা থেকে একটি অপূর্ব ওজঃশক্তি প্রতিটি শ্রোতার চিত্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। আমাদের একটি বৃদ্ধ ভৃত্য লেখাপড়া কিছুই জানত না, কিন্তু মহালয়ার প্রত্যূষে এই অনুষ্ঠানটি সে সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ নিয়ে শুনত প্রতি বৎসর। অবাক হয়ে ভাবি কী সে আবেদন, যা একজন নিরক্ষর ব্যক্তির সৌন্দর্যচেতনাকে এমনি করে জাগ্রত করতে সমর্থ হত। অবশ্য এই সব সংস্কৃত গান ঠিক সংস্কৃতরীতির নিদর্শনসূচক নয়, কারণ এতে লঘুগুরু উচ্চারণ প্রণালী যথাযথভাবে রক্ষিত হত না, তথাপি সম্পূর্ণ লৌকিক দেশীয় পদ্ধতিতে তিনি যে কম্পোজিশন করেছিলেন তাতে পূজা, উপাসনা এবং উদ্দীপনার ভাবগুলি সর্বাংশে উপস্থিত থাকত। অতএব এটিও একটি রমণীয় আর্টরূপে পরিগণিত হয়েছে এবং তাঁর দেশবাসী এই অনুষ্ঠানটিকে একটি জাতীয় মর্যাদা প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। অবশ্যই এর সংগে বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের স্বকীয় প্রচেষ্টাও সমানভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

সংস্কৃত শ্লোক তাঁকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করত। পরিণত বয়সে এদিকে তিনি অধিকতর আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইদানীং সংগীত শিক্ষার আসরে প্রথম তিনি যে সংস্কৃত শ্লোকটি গাইতেন, সেটি "সংগীতরত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রের প্রথম শ্লোক। "মহাপ্রস্থানের পথে" চিত্রটিতেও তিনি কয়েকটি মহিমান্বিত সংস্কৃত গান শুনিয়ে গেছেন। একাজে বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় এবং অপরজন বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখো-পাধ্যায়। পঙ্কজবাবু তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে যে সুরারোপগুলি রেখে গেলেন, সেগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে সেটি দেখা আমাদের কর্তব্য। জানি না তাঁর পরিচিতদের মধ্যে এগুলি কেউ সংগ্রহ করে রেখেছেন কি না।

পঙ্কজকুমারের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯০৫ সালে যখন তাঁর জন্ম হয় তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান সমগ্র বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত। তখনও কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ কবি অপেক্ষা গায়ক বলে কম সমাদৃত নন। তাঁর পূর্বেকার মায়ার খেলা থেকে বহু কাব্য-সংগীতই গায়ক-গায়িকাদের কন্ঠে কন্ঠে প্রচারিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কদাচ কোনও একটি বিশেষ বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিলেন না, বাংলা গানের একটি সুবিপুল অংশই ছিল "রবিবাবুর গান"। তবে, দুঃখের বিষয় নিরতিশয় বিকৃতিসাধন থেকে তাকে রক্ষা করা যায়নি অনেক সময়। তারপর, একে একে শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, গীতাঞ্জলি, ফাল্গুনী, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত, চিরকুমার সভা, নটীর পূজা, ঋতুরঙ্গ, তপতী, নবীন প্রভৃতি অভিনয় বা অনুষ্ঠানাদির গান গুলি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গীতাঞ্জলির গানগুলি তো বহু বৎসর যাবৎ সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন গায়ক-গায়িকা প্রায় কেউ ছিলেন না যিনি এক-আধটা গীতাঞ্জলির গান না গাইতেন। বিখ্যাত অভিনেত্রী-গায়িকা নীহারবালা স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে চিরকুমার সভার গানগুলি শিক্ষা করেছিলেন। এই নাটকের গানগুলিও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল সারা বাংলায়। নটীর পূজার গান-গুলিই কি কম জনপ্রিয় ছিল? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় তাঁর নতুন অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করতেন, তখনই তার বেশ কিছু গান বহুলভাবে প্রচারিত হয়ে যেত। দিনেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর কাছ থেকে অনেকেই গান শিখে নিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন তার প্রধান কারণও ওই সংগীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা। যে সব অনুষ্ঠান তিনি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রচনা করছিলে[ন] সেগুলির নানা দিক থেকে বিশেষত্ব এত অধিক ছি[ল] যে একান্ত আপন গোষ্ঠী ভিন্ন তিনি সেগুলি[র] রূপায়ণ সম্পর্কে নির্ভর করতে পারতেন না। তা[ই] শান্তিনিকেতনে নিভৃতে সেগুলি রচনা করে নিজে[র] তত্ত্বাবধানে সেগুলি যাতে সম্যকভাবে অধিগত হ[য়] সেদিকে সচেষ্ট হতেন। তথাপি কলকাতায় তা[র] ধারাবাহিকতা কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয়নি। সম্প্রতি প্রয়াত অনাদিকুমার দস্তিদার কলকাতায় এ[ই] শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকেই রবীন্দ্র-সংগীত ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁ[র] সহায়তা না পেলে সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের প্রচা[র] আদৌ সহজসাধ্য হত না। সাহানা দেবী তার পূর্বেই রবীন্দ্রসংগীতে সুপরিচিতা হয়েছেন কলকাতায়। তার পরে এলেন শ্রীযুক্তা কণক দাশ। বিশ দশকে[র] মাঝামাঝি থেকেই বোধ হয় তিনি গ্রামোফোনে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মত এ[ত] অধিকসংখ্যক রবীন্দ্রনাথের গান আজ পর্যন্ত আর কেউ রেকর্ড করেছেন বলে জানিনে। রবীন্দ্রসংগী[ত] এইভাবেই সারা বাংলায় স্থিতিলাভ করে এসেছে যদিচ রবীন্দ্রনাথ দশম দশক থেকেই কলকাতা থেকে তাঁর সংগীতের মাধ্যম শান্তিনিকেতনে স্থাপ[ন] করেছিলেন।

পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় এই ঐতিহ্যের সংগে সারাজীবন ধরে নিজের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও অনুরাগীদের মধ্যে এবং এই রবীন্দ্রসংগীতের অনু-শীলনের প্রেরণা থেকেই সামগ্রিকভাবে বাংলার প্রতিটি সুরকার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হবার একটা প্রবল উৎসাহ আজ জাগ্রত হয়েছে বাংলার সমাজজীবনে। পঙ্কজকুমার একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন, লোকে তাঁকে ঘিরে একটি আইডিয়াকে পোষণ করত। আজ সেই ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটল। আজ ভাববার অবসর পাচ্ছি তিনি কতখানি আমাদের দিয়ে গেছেন।

পঙ্কজ-কণ্ঠ

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী যিনি নিজেই বাংলা সঙ্গীত-রাজ্যে একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ ছিলেন সেই পঙ্কজকুমার মল্লিকের বাংলা গানে ভূমিকা তথা অবদান সম্পর্কে যদি কেউ সাগ্রহে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তবে বহু বিচিত্র বাংলা গানে শিল্পীর কণ্ঠস্বরের নিদর্শন-স্বরূপ গ্রামোফোন রেকর্ডগুলির সাহায্য তাঁকে নিতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অনেকগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডই আজ আর পাওয়া যায় না। রেকর্ড বাজারে অচল হলেই তাকে বাতিল করার প্রথা গ্রামোফোন কোম্পানীগণ প্রবর্তন করেছেন। অপ্রয়োজনীয় বিধায় অধিকাংশ বাতিল রেকর্ডের মূল ছাঁচ (matrix) নষ্ট করে ফেলার ফলে অতীত দিনের বহু গৌরবোজ্জ্বল সঙ্গীত নিদর্শন, পঙ্কজকুমার মল্লিকের বহু গ্রামোফোন রেকর্ডের মতন, চিরতরে কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

পঙ্কজকুমার মল্লিকের আনুপূর্বিক বাংলা গানের এবং তিনটি সংস্কৃত স্তোত্রের (যা সন্ধান পাওয়া গিয়েছে) তার একটি কালানুক্রমিক বিবরণ তুলে ধরা হল। এই তালিকাতে যথাক্রমে রেকর্ড নং, প্রকাশ কাল, রচয়িতার নাম এবং অন্যান্য তথ্য যথাসম্ভব উল্লেখ করা হয়েছে। গানগুলির সুরকার সম্বন্ধে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের × চিহ্নিত 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' (সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক) এবং 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' (সুরকার শান্তিদেব ঘোষ) ব্যতিরেকে অন্যান্য গানের সুর রবীন্দ্রনাথের। অতুলপ্রসাদের গানের সুর তাঁর নিজেরই দেওয়া। 'মায়া' (সুরকার রাইচাঁদ বড়াল, সহযোগী পঙ্কজকুমার মল্লিক), 'অধিকার' (সুরকার তিমিরবরণ), 'আলোছায়া' (সুরকার কৃষ্ণচন্দ্র দে) এবং 'কথা কয় কাছে দেখা যায় না' ও 'আমি কোথায় পাব তারে' (প্রচলিত বাউল সুর) ব্যতীত অন্যান্য গানগুলির সুর দিয়েছেন শিল্পী স্বয়ং।

পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রথম কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ড সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করছি।

শিল্পীর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত ভিয়েলোফোন কোম্পানী থেকে, সম্ভবত ১৯৩০ কিংবা ১৯৩১ সালে। বল্লভদাস ভাটিয়া নামে এক গুজরাতী ব্যবসায়ী ভিয়েলোফোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান শতাব্দীর সম্ভবত দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে। এই কোম্পানীর হেড অফিস ছিল মাহিম, বোম্বাই। কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে এ'দের অন্যতম শাখা অফিস ছিল। এ'রা বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত এবং প্রকাশ করতেন। 'ভারতবর্ষের একমাত্র স্বদেশী কোম্পানী' ভিয়েলোফোন কোম্পানীর এপ্রিল, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত এস ৩নং বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকায় পঙ্কজবাবুর টি ৬০০৮নং রেকর্ডে 'আমারে ভালোবেসে' (পরবর্তীকালে কলম্বিয়া রেকর্ডে এই গানটি পুনঃপ্রকাশিত হয়) ও 'নেমেছে আজ নবীন বাদল' গান দু'টির বিবরণ মুদ্রিত আছে। শিল্পীর পরিচয় সম্বন্ধে তাঁরা লিখেছেন 'পঙ্কজবাবু বেতারের আসরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক। দুইখানি আধুনিক গান আপনাদের মনস্তৃপ্তির জন্য গাহিয়াছেন'। শিল্পীর নামের পাশে বন্ধনী মধ্যে 'এমেচার' শব্দটির উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই রেকর্ডটির দাম ছিল এক টাকা আট আনা।

পঙ্কজবাবুর পরবর্তী রেকর্ড এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস অ্যাণ্ড ভ্যারাইটিজ সিণ্ডিকেট থেকে। হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় স্তবক রেকর্ডগুচ্ছের মধ্যে এটিও ছিল অন্যতম রেকর্ড। এটির দাম নির্ধারিত হয়েছিল দু' টাকা বার আনা। 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' এবং 'তোমার আসন শূন্য আজি' গান দুটির রেকর্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অধিককাল সময়ে রেকর্ডটি চালু রয়েছে এবং কয়েক বছর আগে গান দুটি মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দুস্থান কোম্পানী এই রেকর্ডটি প্রকাশের সময় তাঁদের প্রচারপত্রে লিখেছিলেন—"শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবু বেতারের আসরের আজকালকার একজন সুপরিচিত উচ্চাঙ্গের গায়ক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নটরাজের গান সঙ্গীতপ্রিয় মাত্রেরই সুপরিচিত। পঙ্কজবাবুর সাধাগলায় নটরাজ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অপর গানখানি 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর' অতি সুন্দর হইয়াছে। শুনিলে নিশ্চয় তৃপ্ত হইবেন।"

পঙ্কজবাবুর তৃতীয় রেকর্ড এবং কলম্বিয়া কোম্পানী থেকে প্রকাশিত প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় জুন, ১৯৩৩ সালে। এই রেকর্ডটি প্রচারের সময় কলম্বিয়া কোম্পানী তাঁদের প্রচার-পত্রে লিখেছিলেন—"পঙ্কজবাবু কলিকাতায় সর্বজনপ্রিয় সুবিখ্যাত সুরশিল্পী। বেতার যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত আজ দিগ্-দিগন্ত কলমুখর করিয়াছে। এই কৃতিত্বের মূলে আছে উদাত্ত-গম্ভীর স্বর সুস্পষ্ট বাণী, অনাড়ম্বর গতি। পঙ্কজবাবুর সুর-যোজনা ও গাহিবার ধারা একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এই রেকর্ডখানির দুইটি গানেই তাঁর সেই স্বকীয়ত্ব তিনি পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। 'এসো মুক্তির নামে, আনো শান্তির বাণী' বলিবার একমাত্র অধিকারী যেন এই সুর, এক কণ্ঠ এই অনুপ্রাণনা।" এই রেকর্ডটির দামও ছিল দু' টাকা বার আনা।

পঙ্কজবাবুর ষষ্ঠ রেকর্ড ও কলম্বিয়া কোম্পানী থেকে প্রকাশিত চতুর্থ রেকর্ড (জি ই ২১৯১) অভূতপূর্ব জনসমাদর পায়। 'ও কেন গেল চ'লে' এবং 'আমারে ভালবেসে' (ইতিপূর্বে ভিয়েলোফোন কোম্পানী থেকে প্রকাশিত) গান দুটি সঙ্গীতপ্রেমিক লোকেদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। যন্ত্র-পূর্ণ বাংলা গানের গ্রামোফোন রেকর্ডের মধ্যে বিক্রয়াধিক্যে যে ক'টি রেকর্ড শীর্ষস্থান লাভ করেছিল এটি ছিল তাদের অন্যতম। প্রায় ঊনত্রিশ বছর রেকর্ডটি সচল থাকার পর ১লা জুলাই ১৯৬৩ তারিখে রেকর্ডটি বাতিল হয়ে যায়। সুখের বিষয় ১৯৭৬ সালে রেকর্ডটি মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে রূপান্তরিত হয়ে পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। এই রেকর্ডটি প্রথম প্রকাশের সময় কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁদের প্রচার-পত্রে যা লিখেছিলেন তা আজ অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হতে পারে, তবুও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে তৎকালীন সঙ্গীত-ভাবনার কিছু পরিচয় হয়ত এতে পাওয়া যাবে। তাঁরা লিখেছিলেন—"উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যখন শুধু ব্যাকরণ বিভীষিকা সৃষ্টি করে, যখন পল্লী-সঙ্গীত ও ছন্দচটুল সুলভ-সঙ্গীত বিরক্তির কারণ ঘটায়, তখন সঙ্গীতপ্রিয় গ্রাহকগণের নিকট মধ্যপন্থী মডার্ন সঙ্গীতই আনন্দদানে সক্ষম। আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় আধুনিক সঙ্গীতের দিকপাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের প্রণালীরও কত পরিবর্তন হয় তাহা নিম্নলিখিত গানগুলি বার বার না শুনিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না।" স্থানাভাববশত পরবর্তী কালে প্রকাশিত রেকর্ডগুলি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রচার-পত্রের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হল না।

রেকর্ড-সংকেত

১০″ ৭৮ আর পি এম : জিই এবং ডিই—কলম্বিয়া, এইচ—হিন্দুস্থান, এন এবং পি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস, এম এ—ওডিয়ান এবং টি ভিয়েলোফোন ১২″ ৭৮ পি এম : এইচ এইচ—হিন্দুস্থান

৭″ মাইক্রোগ্রুভ ই পি রেকর্ড : ঘিওই ওডিয়ন, এল এইচ—হিন্দুস্থান এবং সেভেন ই আর ই এবং সেভেন ই পি ই—হিজ মাস্টার্স ভয়েস

১০″ এবং ১২″ এল পি রেকর্ড : ই এ এল পি এবং ই সি পি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস, এল এইচ এক্স—হিন্দুস্থান। তারকা (*) চিহ্নিত রেকর্ডগুলি ৭৮ আর পি এম রেকর্ড থেকে মাইক্রোগ্রুভ রূপান্তরিত এবং পুনঃপ্রকাশিত।

টি ৬০০৮	আমারে ভালবেসে	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
(১৯৩০ ?)	নেমেছে আজ নবীন বাদল	বাণীকুমার
এইচ ১	প্রলয় নাচন নাচলে যখন	রবীন্দ্রনাথ
(সেপ্টেম্বর '৩২)	তোমার আসন শূন্য আজি	ঐ

জি ই ২০১৮ (জুলাই '৩৩)	এস মুক্তির নামে ওগো সাথী ভালোবাসি	বাণীকুমার ঐ
জি ই ২০৫৬ (নভেম্বর '৩৩)	নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী কেন গান গাই	বাণীকুমার ঐ
জি ই ২১২৪ (জুন '৩৪)	মায়ের মন্দিরে-যে নবীন-যুগের ওগো আমার অন্ধকারের আলো	বাণীকুমার ঐ
জি ই ২১১১ (ডিসেম্বর '৩৪)	ও কেন গেল চলে আমারে ভালবেসে	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ
জি ই ২০৬৭ (অক্টোবর '৩৬)	এ মোর বরণ মালাটিরে আজি মোর সকল পুঁজি	বাণীকুমার ঐ
এইচ ১১৪২৬ (ডিসেম্বর '৩৬)	অশ্রুকণার মেলা নয়নে তোমার চোখের চাওয়া	বাণীকুমার ঐ
এইচ ১১৪৫৮ (ফেব্রুয়ারী '৩৭)	আজি আঁধার হইল আলা [নিউ থিয়েটার্সের 'মায়া' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য
জি ই ২৪০৫ (এপ্রিল '৩৭)	জীবনে জেগেছিল মধুমাস এই চাঁদিনী যামিনী	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ
এইচ ১১৫১৭ (জুন '৩৭)	চলে যায় মরীচিকা মায়া অজানার [নিউ থিয়েটার্সের 'রূপলেখা' কথাচিত্র]	বাণীকুমার
এইচ ৫২৩ (জুলাই '৩৭)	গগনে গগনে আপনার মনে যৌবন সরসীনীরে মিলন শতদল	রবীন্দ্রনাথ ঐ
জি ই ২৪৩৫ (অক্টোবর '৩৭)	ওগো নন্দিতা, প্রীতি গানে —অভিসার গীতি (অন্যান্য শিল্পীদের সহকণ্ঠে)	বাণীকুমার
জি ই ২৪৪০ (ডিসেম্বর '৩৭)	কোন্ লগনে জনম আমার তুমি ভুল করোনা পথিক (রাধারাণী দেবীর সহকণ্ঠে) [নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য সজনীকান্ত দাস
এইচ ১১৫৫৪ † (জানুয়ারী '৩৮)	দিনের শেষে ঘুমের দেশে আমি কান পেতে রই [নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' কথাচিত্র]	রবীন্দ্রনাথ ঐ
জি ই ২৫০২ (জুলাই '৩৮)	ওরে সাবধানী পথিক, বারেক দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় [নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান' কথাচিত্র]	রবীন্দ্রনাথ ঐ
জি ই ২৪৮০ (অক্টোবর '৩৮)	তোমার গানের ডালা —গোধূলি	অজয় ভট্টাচার্য
জি ই ২৫০৩ (জানুয়ারী '৩৯)	মরণের মুখে রেখে এমনি দিনে তারে বলা যায় [নিউ থিয়েটার্সের 'অধিকার' কথাচিত্র]	রবীন্দ্রনাথ ঐ
এইচ এইচ ৪ (জানুয়ারী '৩৯)	দুঃখে যাদের জীবন গড়া (প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের সহকণ্ঠে) কোথা সে খেলাঘর (পাহাড়ী সান্যাল ও প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের সহকণ্ঠে) [নিউ থিয়েটার্সের 'অধিকার' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
এইচ ১১৭১৭ (জুন '৩৯)	শেষ হলো তোর অভিমান [নিউ থিয়েটার্সের 'দেশের মাটি' কথাচিত্র] প্রভু এইতো আশা ছিল আমার মনে	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
এইচ ৭৪৭ (অক্টোবর '৩৯)	দিনগুলি মোর স্মৃতির কুসুম প্রভু আঁধার পারাবারে	বাণীকুমার ঐ
এইচ ৮০১ (মার্চ '৪০)	ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায় আমার তরে মনে পড়ে সেই মধুমালতীর বীথিকা দিয়া —শেষ বাসর	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
এস এ ২৫১ এবং ভি ই ৫১০৭ (জুলাই '৪০)	আমার ভুবন তো আজ এই তো মিলন শুরু [অ্যাসোসিয়েটেড প্রডাকসনের 'আলোছায়া' কথাচিত্র]	রবীন্দ্রনাথ অজয় ভট্টাচার্য
এস এ ২৫২ এবং ভি ই ৫১০৯ (জুলাই '৪০)	বাঁশী তুই বাজা রাখাল পাতার ঘরে একটি যে ফুল (রাধারাণী দেবীর সহকণ্ঠে) [অ্যাসোসিয়েটেড প্রডাকসনের 'আলোছায়া' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
এস এ ২৫৩ এবং ভি ই ৫১০১ (অগাস্ট ? '৪০)	কিবা বঙ্কিম ঠাম মধুর মাধুরী সনে (রাধারাণী দেবীর সহকণ্ঠে) [অ্যাসোসিয়েটেড প্রডাকসনের 'আলোছায়া' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
এস এ ২৫৪ ভি ই ৫১০৪ (নভেম্বর '৪০)	কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে [নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' কথাচিত্র]	রবীন্দ্রনাথ অজয় ভট্টাচার্য
এস এ ২৫৫ এবং ভি ই ৫১০৫ (নভেম্বর '৪০)	ওরে চঞ্চল যবে কণ্টক পথে হবে [নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
এস এ ২৫৬ এবং ভি ই ৫১০৬ (মার্চ '৪১)	এস যৌবন—এস যৌবন-মত্তা বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী [নিউ থিয়েটার্সের 'নর্তকী' কথাচিত্র]	অজয় ভট্টাচার্য চণ্ডীদাস
এস এ ২৫৭ এবং ভি ই ৫১১৩ (সেপ্টেম্বর '৪১)	হে বিশ্বনাথ শিবশংকর [নিউ থিয়েটার্সের 'নর্তকী' কথাচিত্র]	শংকরাচার্য
ভি ই ২৫০৯ (জুলাই '৪২ ?)	আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয় নাও মালা, নাও গলে	অজয় ভট্টাচার্য ঐ
ভি ই ২৫১৮ (জানুয়ারী '৪৪)	আবার যে রে রঙ ফিরেছে আজি বসন্ত জাগিল (ইলা ঘোষের সহকণ্ঠে)	অজয় ভট্টাচার্য বাণীকুমার
ভি ই ২৫২১ (জুন '৪৪)	মরণ যে তোর এল পাশে যে দিন তোমার গাইল বীণা	বাণীকুমার ঐ
ভি ই ২৫২৪ (নভেম্বর '৪৪)	তুমি কেবলি ছবি সঘন গহন রাত্রি (পরিচালনা : আবদুল আহাদ)	রবীন্দ্রনাথ ঐ
ভি ই ২৫২৮ (জুন '৪৫)	জনম-মরণ জীবনের দুটি দ্বার কার চারু চরণের মঞ্জীর	শৈলেন রায় ঐ
ভি ই ২৫৪৬ (সেপ্টেম্বর '৪৬)	নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় খর বায়ু বয় বেগে (পরিচালনা : সুবিনয় রায়)	রবীন্দ্রনাথ ঐ
ভি ই ২৫৫০ (জানুয়ারী '৪৭)	তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু (পরিচালনা : সুবিনয় রায়)	রবীন্দ্রনাথ ঐ
ভি ই ২৫৫২ (মে '৪৭)	বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে বাণী মোর নাহি	রবীন্দ্রনাথ ঐ
পি ১১৯০০ (মার্চ '৪৯)	আমার অন্ধপ্রদীপ আমারে তুমি অশেষ করেছ	রবীন্দ্রনাথ ঐ
পি ১১৯০২ (মে '৪৯)	দিন যদি হল অবসান ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী	রবীন্দ্রনাথ ঐ
পি ১১৯০৫ (অক্টোবর '৪৯)	আমি শ্রাবণ আকাশে ওই আমার প্রিয়ার ছায়া	রবীন্দ্রনাথ ঐ
পি ১১৯০৬ (ফেব্রুয়ারী '৫০)	জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর ওগো তুমি পঞ্চদশী	রবীন্দ্রনাথ ঐ
এন ৩১২৬৭ (সেপ্টেম্বর '৫০)	আমার রাত পোহাল	রবীন্দ্রনাথ
পি ১১৯১১ (অক্টোবর '৫০)	গানখানি মোরা রেখে যাবো যৌবনেরি বীণার তারে (উৎপলা সেনের সহকণ্ঠে)	শৈলেন রায় ঐ
পি ১১৯১২ † (জানুয়ারী '৫০)	হে মোর দুর্ভাগা দেশ আমার প্রাণে গভীর গোপন	 ঐ
পি ১১৯১৩ (মে '৫১)	এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে	রবীন্দ্রনাথ ঐ
পি ১১৯১৮ (অগাস্ট '৫২)	অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে (শিবস্তোত্রম) [নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' কথাচিত্র]	কালিদাস শংকরাচার্য
পি ১১৯২০ (সেপ্টেম্বর '৫২)	চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর	রবীন্দ্রনাথ ঐ

প ৬১১৯২২ মার্চ '৫৩)	কথা কয় কাছে, দেখা যায় না আমি কোথায় পাব তারে (পরিচালনা : শান্তিদেব ঘোষ)	লালন ফকির গগন হরকরা
'প ১১৯২৪ অগাস্ট '৫৩)	ঊর্ধ্বে অজেয় কে তুমি যাত্রী —তেনজিং অভিনন্দন	শৈলেন রায় ঐ
প ১১৯২৬ সেপ্টেম্বর '৫৩)	সবার মাঝে জাগে যে মহাপ্রাণ শান্তি দাও, শান্তি দাও (উৎপলা সেনের সহকণ্ঠে)	শৈলেন রায় ঐ
প ১১৯২৭ সেপ্টেম্বর '৫৩)	ভয় হতে তব অভয় মাঝে ভুবনেশ্বর হে	রবীন্দ্রনাথ ঐ
প ১১৯২৯ জুন '৫৫)	যদি তোর হৃদ-যমুনা (কাবেরী বসু ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত) [অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাইকমল' কথাচিত্র]	অতুলপ্রসাদ
।ন ৭৬০১৩ জুন '৫৫)	পোড়া বিধি আমার (কাবেরী বসু ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত) [অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাইকমল' কথাচিত্র)	
।ন ৭৬০১৪ জুন '৫৫)	বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাবেরী বসু ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত) [অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাইকমল' কথাচিত্র)	
প ১১৯৪৭ এপ্রিল '৬১)	হে মোর দেবতা ভরিয়া যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি	রবীন্দ্রনাথ ঐ
।প ১১৯৫৬ (অক্টোবর '৬১)	বাহির পথে বিবাগি হিয়া বাহিরে ভুল হানবে যখন	রবীন্দ্রনাথ ঐ
।প ১১৯৫৭ নভেম্বর '৬১)	বন্ধুরে—আমার ঘুড়ি উড়িয়ে তোরা যে জাতবিচারি [একতা প্রডাক্‌সনসের 'আহ্বান' কথাচিত্র]	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় শৈলেন রায়
'প ১১৯৬৪ এপ্রিল '৬২)	আজি ঝড়ের রাতে আমায় ছজনায় মিলে	রবীন্দ্রনাথ ঐ
ঃ সি এল পি ২২৮০* জানুয়ারী '৬৩)	হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে ('সঙস অব প্যাট্রিয়টিজম' অ্যালবামের অন্তর্ভুক্ত)	
সভেন ই আর ই ২ * মার্চ '৬৩)	আমারে তুমি অশেষ করেছ তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর দিন যদি হল অবসান ভয় হতে তব অভয় মাঝে	
এল এইচ ১৪* (এপ্রিল '৬৩)	প্রলয় নাচন নাচলে যখন গগনে গগনে আপনার মনে যৌবন সরসীনীরে মিলন শতদল † দিনের শেষে ঘুমের দেশে	
ই সি এল পি ২৩০০* (মার্চ '৬৪)	ভুবনেশ্বর হে তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর আমারে তুমি অশেষ করেছ বাণী মোর নাহি কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে ওরে সাবধানী পথিক, বারেক তুমি কি কেবলি ছবি সঘন গহন রাত্রি আমার প্রিয়ার ছায়া বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে ওগো তুমি পঞ্চদশী এমন দিনে তারে বলা যায়	
এল এইচ ২১* (মে ১৯৬৫)	আমি কান পেতে রই [অন্যান্য শিল্পীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে প্রকাশিত]	
সেভেন ই আর ই ৩ (জুলাই '৬৬)	আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল অন্তরে জাগিছ, অন্তরযামী তোমার বীণায় গান ছিল আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়	
ই এ এল পি	বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে	

১০১৭* (জুলাই '৬৭)	সঘন গহন রাত্রি ['বর্ষামঙ্গল' গীতিমালিকার অন্তর্ভুক্ত]	
এল এইচ ৬৬* (মে '৬৯)	তোমার আসন শূন্য আজি [অন্যান্য শিল্পীর রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে প্রকাশিত]	
ই এ এল পি ১০৪৯* (এপ্রিল '৭০)	দিন-গুলি মোর সোনার খাঁচায় আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় তোমার বীণায় গান ছিল জয় করে তবু ভয় কেন তোর আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি চরণ ধরিতে দিও গো আমার প্রাণে গভীর গোপন আজি ঝড়ের রাতে অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী দিন যদি হল অবসান ('গোল্ডেন গ্রেটস')	
বি ও ই ১০৬৬ (মার্চ '৭২)	নানা প্রান্তায় শ্রীরস্তি (উৎপলা সেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেফালী ঘোষের সহকণ্ঠে) [জাহ্নবী চিত্রমের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' কথাচিত্র]	ঋগ্বেদ : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
এল এইচ এক্স ৮* (মে '৭২)	† দিনের শেষে ঘুমের দেশে আমি কান পেতে রই যৌবন সরসী নীরে মিলন শতদল গগনে গগনে আপনার মনে প্রলয় নাচন নাচলে যখন তোমার আসন শূন্য আজি [অন্য শিল্পীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে প্রকাশিত]	
সেভেন ই পি ই ৩১১৬* (এপ্রিল '৭৬)	ও কেন গেল চলে আমারে ভালবেসে যে দিন তোমার গাইল বীণা মরণ যে তোর এল পাশে	

নীহার ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৬৲

জর্মন নাটক সংকলন

চারটি বিশ্ববিখ্যাত জর্মন নাটক একসঙ্গে বেরুল।

মৃণাল সেন / মোহিত চট্টোপাধ্যায় ৮·০০

ওকা উঁরি কথা

ই. এ. এস. প্রসন্নর

ক্রিকেট খেলার সাড়াজাগানো বই

ওয়ান মোর ওভার ৮৲

ভিনু মানকড়

ক্রিকেট খেলা শেখো ৬৲

[illegible] প্রথম খণ্ড দাম ৮·০০

কুলদীপ নায়ার

জরুরী অবস্থার নেপথ্য কাহিনী

দি জাজমেণ্ট ১২·০০

চিত্ত সেনের টুরিস্ট গাইড

পূর্ব ভারত টুরিস্ট গাইড ৮৲

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নেপাল, ভূটান ও সিকিম বেড়াবার টুরিস্ট গাইড।

পশ্চিম ভারত টুরিস্ট গাইড ৮৲

উত্তর ভারত টুরিস্ট গাইড ৮৲

স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল

শার্লক হোমস অমনিবাস

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিখণ্ডের দাম ১৬৲।

সর্বসাধারণকে ১৫% কমিশন দেওয়া হচ্ছে।

বাইরের ক্রেতারা v.p. মাধ্যমে সুযোগ পাবেন।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্ক আতঙ্ক নয় ৬৲

অঙ্ক নিয়ে গল্প! মজার মজার অঙ্কের খেলা।

অঙ্ক শেখার আগ্রহ বাড়াবে, মনও মাতাবে।

মজার খেলা অঙ্ক ৬৲

অদ্রীশ বর্ধনের নতুন উপন্যাস

লোহার কোর্ট ১০

নেশার ঝোঁকে চাণক্য ৫·০০

তখন নিশীথ রাত্রি ১২·০০

বনমানুষের হাড় ৭৲

নারায়ণ সান্যালের নতুন রহস্য উপন্যাস

ঘড়ির কাঁটা ৮৲

আজি হতে শতবর্ষ ১৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর নতুন উপন্যাস ৯৲

রাতের আকাশ

ঝরা বকুলের গন্ধ ১২৲ দ্বিচারিনী ৭৲

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

ভৌতিক অমনিবাস ১০৲

সায়েন্স ফিকশান অমনিবাস ৮৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সনাতন পাঠকের চিন্তা ১০৲

বিক্রমাদিত্য

ব্রিজ ৭৲

নারায়ণ সান্যাল

তিলোত্তমা ১৬৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ১২·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ১০·০০

মনোজ বসুর

শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৮·০০

পার্ল এস বাক

নবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকার স্মরণীয় উপন্যাস।

কমাণ্ড দা মর্নিং দাম ১০·০০

মনোজ বসুর ক্লাসিক উপন্যাস

বন কেটে বসত ১৫·০০

নিশিকুটুম্ব ২৫৲ **চীন দেখে এলাম** ১২৲

জুল ভের্ণ রচনাবলী

৬ষ্ঠ খণ্ড বেরিয়েছে। প্রতি খণ্ডের দাম ১৬৲।

সর্বসাধারণকে ১৫% কমিশন দেওয়া হচ্ছে। বাইরের ক্রেতারা v.p. মাধ্যমে এই সুযোগ পাবেন।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

১ম খণ্ড ১২·০০

২য় খণ্ড ১২·০০

সর্বসাধারণকে ২০% ছাড়।

প্রশান্তভূষণের

আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণের পুত্র দাম ১২৲

ভারত কাঁপানো মামলা

The Case that shook India—গ্রন্থের বাংলা

কুমুদ দাসগুপ্ত / পরিতোষ পাল

অন্ধকারের দিনগুলি দাম ঃ ৬·০০

পুলিসী রাজত্বে নারী লাঞ্ছনা ও গণহত্যার নেপথ্য কাহিনী।

ছবি মুখোপাধ্যায়ের রান্নার বই

চাইনিজ রান্না ও জলখাবার ৬৲

বিলিতি ও ফ্রেঞ্চ রান্না ৫৲

ভারতীয় রান্নার গাইড ৬৲

স্বামী দিব্যানন্দের

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব ১০৲

সাধু সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য

প্রথম ৯·০০ দ্বিতীয় ৯·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

দেবকুমার ভট্টাচার্য

গ্রুপ থিয়েটারের সঠিক কাজকর্মের বেসরকারি শ্রাদ্ধের আয়োজন যখন আমরা নিজেরাই করে ফেলেছি তখন নজরুল সাহেবের উল্লাসকর ধ্বনি 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কথাটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল আওয়াজ হবে। শুরুতেই এই আঁকাড়া ভাষা প্রয়োগ বোধ হয় ঠিক লাগসই হোল না আর তাই একটু খোলসা করার দরকার।

মানেটা হোল এইরকম যে ভুলভ্রান্তি, অর্ধবিশ্বাস, অর্ধশিক্ষা এবং চিন্তাশক্তির অপরিপক্কতা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অসচেতনতার জন্যই বোধ হয় গ্রুপ থিয়েটারের আমরা জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আন্দোলনের কর্মকাণ্ড বেশ খানিকটা গোলমেলে করতে পেরেছি। অবশ্য শুরুর আগে যে শুরু সেটা দিয়ে বলে রাখি যে এ সবই হোল অনুভূতির কথা। চার পাশ দেখে শুনে খুট ঝামেলা বুঝে যা মনে হচ্ছে তাই বলা। এই সব অনুভূতির জন্ম সেই কাল থেকে যখন নীতি নিয়ে একটা লড়াই চলত। অর্থাৎ 'গণ' শব্দ উচ্চারণেই 'সৎ' ব্যক্তিদের নাক কুঁচকে যেত অথবা 'সৎ' এর নামোল্লেখে গণবাদীরা মুখ ঘোরাতেন। ব্যাপারটা বেশ বোঝা যেত। বেশ স্পষ্ট ছিল এই দুই নীতির ব্যবহার। কিন্তু এখন সব প্রায় চুলোর দ্বারে গেছে। এসেছে নীতি বিসর্জনের কাল। আর এই নীতি বিসর্জনের যুগে অথবা প্রাপ্তির বাজারের কারবার দেখে কি রকম যেন একটা ভ্রম হচ্ছে [ভ্রম!] যে নাট্যআন্দোলন শব্দটার ব্যবহার কিরকম যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে এবং যে ফ্যাশানটা আজ যথেষ্ট প্রাচীন। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে সন্ধ্যাকালীন সময় কাটানোর অথবা একটু "অ্যাটিস্" বনে যাওয়ার প্রবণতার দরুন বোধ হয় একটা ধারণা চালু হয়ে গেছে যে থিয়েটার কর্মটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। এর জন্য শিক্ষা বা রেওয়াজ কোনটাই তেমন লাগে না। তাই একটা দলে কিছুকাল থেকেই বেরিয়ে আসা এবং এই "সহজ কাজ"টা সেরে ফেলা। এই এক রাত্তিরের রাজা উজির হয়ে যাওয়ার কাজে হরিপদ কেরানীর কোনও শিক্ষার প্রয়োজনই তেমন বোধ হয় না। অথচ মজা হোল সামাজিক যে কারণে নাট্য আন্দোলনের শুরু তা কিন্তু নীতিভিত্তিক। কিন্তু আজকের আমাদের বেশির ভাগ থিয়েটার দলের কাজকম্মো দেখে উদ্দেশ্যহীনতা ছাড়া কিছুই তেমন নজরে পড়ে না। এলোমেলো। যদি গত দশ বছর ['৬৭-'৭৭]এর কাজকম্মোর একটা খতিয়ান নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে '৬৭-র সময় থেকে হঠাৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মঞ্চ তোলপাড় হোতে লাগল। প্রায় বেশির ভাগ নাটকই বিপ্লবের সূচনা, কোথাও কোথাও আবার পুরো বিপ্লবটাই ঘটে যেত অক্লেশে। নাটকের শেষে লাল আলো জ্বেলে এবং তার সঙ্গে 'ইনটার ন্যাশনাল' বা 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানখানা হয় রেকর্ডে অথবা অ-সন্নিহিত কণ্ঠে গাওয়া হোত। এমন নাটকও দেখা গেছে যেখানে মিলিটারী অস্ত্রাগার পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু মজা হোল আজকে দেশের বাস্তব অবস্থা বা শ্রমিক কৃষক অথবা শাদা কলার পরা মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র হিসেব নিকেশ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যেখানে সামান্যতম আন্দোলনের বারোটা বেজে যাচ্ছে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথায় একদল যখন 'সাইরি প্রাণ টকের আলু' বলে অক্লেশে অন্য ছাতার তলায় যায় সেখানে মিলিটারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারটা শুধু স্বপ্ন নয়, ভুতুড়ে। দোহাই ধর্ম, ভাববেন না যে আমি নাটকে রাজনৈতিক ব্যাপার ব্যবহারের বিপক্ষে! রাজনীতি জীবনের সুখ দুঃখ, ভালবাসা লড়াই প্রভৃতির মতোই একটা অঙ্গ। তাকে বাদ দেয়া মানে অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো। আসলে থিয়েটার শিল্পটা দাঁড়িয়ে মৌল জিনিসের মাধ্যমে, তাকে তাই শৈল্পিক হতে গেলে বাস্তববস্তোর হতে হবে। আর তা হতে গেলে যিনি সেই শিল্পের ব্যবহার ঘটাবেন

অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। আর এই সমাজ সচেতনতা বা বাস্তববোধ নাট্যকার বা পরিচালকের না থাকলে আজগুবি সব কারবার ঘটবে। থিয়েটারী বিপ্লব ঘটিয়ে কিমিতিবাদী সুলভ অদ্ভুত নাট্যকর্ম ঘটিয়ে ভূতের বেগার খাটা হবে। কথা প্রসঙ্গে এসে পড়ল 'কিমিতিবাদী' শব্দটা। কিমিতি অর্থাৎ কিম্ ইতি। মানে কি এটা? যাঁরা ঐ কারবার করতেন তাঁরা নিজেরাই বলতেন 'কি এটা?' আরে মশাই, যদি কি এটা নিজেরাই জানতে বা বুঝতে না পারেন তাহলে কি প্রয়োজন সে কাজ করার? আমরা যা বুঝি বা যা বুঝতে পারি অথবা যা বুঝতে চেষ্টা করি সেটাই তো বলবার বা বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু যা বুঝি না, যা দেখে নিজেরাই বলি 'কি এটা' তা নিয়ে কলকাতার এই স্বল্প মঞ্চ ব্যবস্থা দখল করা কেন? তাই এসব গোলমেলে রঙ্গ দেখে যদি চীৎকার করে বলা যায় 'দে গরুর গা ধুইয়ে' তাহলে বোধ হয় কারবারগুলোকে এক বাক্যে প্রকাশ করা যায়!

তা না হয় হোল। কিন্তু কথা হোল যে হঠাৎ এই তূরীয়ভাবে রাজনীতির নামে হঠকারী কাজকারবার মঞ্চে ঢুকল কি করে? অনুভব হয় বিশাল পুরুষ শ্রীউৎপল দত্তর কর্মের অক্ষম অনুকরণেই ব্যাপারটা ঘটেছে। তাঁর কাজের যা মাপ, ক্ষমতা ইতিহাস

রূপান্তরী প্রযোজিত ভূতের বেগার

বিশ্লেষণে তাঁর যা পারদর্শিতা সেটার ধার কাছে দিয়ে না গিয়ে হঠাৎ সচেতন-হয়ে-যাওয়া কিছু অ-সচেতন কর্মী তূরীয়ভাবে কাজ করলেন। হয়তো ভাবলেন যে এই পথেই 'প্রগতিবাদীদের' লিস্টে নাম ঢোকান যাবে অথবা কলকাতা তথা বাংলার বাম ঘেঁষা মানুষ সহজেই ভীড় করবে টিকিট ঘরে। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হোল প্রাপ্তি। নীতি নয়। বা নীতি ভিত্তিক প্রাপ্তিও নয়। জোর কদমে হঠাৎ বাজার গরম করার ব্যাপার। রাজনীতি মঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করল ব্যবসার অন্যতম পণ্য হিসেবে রাজনৈতিক শিক্ষা না নিয়ে। কেবল একটা ভাবনা ভাবিত হোল যাতে মালটা বাজারে কাটে। কি করছি বা কেন করছি তার হিসেব নিকেশ শুরু হোল একটি মাত্র কারণে। সেটা হোল বিক্রী। ফলে না হোল রাজনৈতিক কাজ না হোল অন্য কিছু। আবার তারই মাঝে আমাদের আর কিছু কর্মী যাদের রাজনীতি বা সমাজনীতি ব্যাপারটা তেমন সয় না তারা ধরলেন কিছু অদ্ভুত, কিম্ভূত কিমিতি নাটক। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা জীবনের নেতিবাচক কিছু শব্দ উচ্চারিত হোল উঁচু পর্দায়, নীচু পর্দায়। বললেন, "এটা ভালো নাটক"। আসলে ভালো বা মন্দ বলে থিয়েটারে কিছু নেই। আছে ঠিক বা ভুল নাটক। সমাজের একজন অত্যন্ত ভালোমানুষ তার নির্বিরোধী ভালো-

বলে সমাজের কোনও মঙ্গল বহন করতে পারেন না। তাই তিনি ভালো হতে পারেন কিন্তু তাঁর কর্ম 'ঠিক' নয়। আর ঐ একই নিয়মে ভালো নাটক বলেও কিছু থাকতে পারে না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই সব 'ভালো নাটক' দর্শককে কমিউনিকেট করতেও পারল না। তাঁরা বললেন—এটাই সমস্যা। সমস্যা কমিউনিকেশনের। কিন্তু কমিউনিকেশনের সেই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আরও এক জটিল জাল ফেলে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য বা নেতিবাচক করে কতটা কমিউনিকেট করা গেল! আসলে মনে হয় উল্টোপাল্টা কিছু বলে নজর কাড়ার ব্যাপার। ভীড় রাস্তায় হঠাৎ রংবেরং পোশাক পরা উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি করা মানুষ যেমন ভীড়ের নজর কাড়ে তেমনিই। আর এসব কারণেই একই দল একাধারে অ্যাবসার্ড প্রযোজনাও করতে পারেন আবার তারপরেই 'জনগণের' নামে এমন একটা নাটক করেন যা দেখে স্বয়ং 'জনগণের' নিজেদের অচেনা ঠেকে। অথচ রাজনৈতিক কর্মীরা যখন তাঁদের রাজনৈতিক প্রচারের কাজে নাট্যের আয়োজন করেন তা কিন্তু হয় অতি সহজবোধ এবং পরিষ্কার। এবং সেখানে এই হঠাৎ করে লাল আলো এসে পড়ে নাটকের শেষে 'এ লড়াই জিততে হবে' বলে গান শোনা যায় না। তার নিজস্ব একটা প্রস্তুতি থাকে। এবং প্রচারমূলক হলেও তার নিজস্ব একটা ব্যাকরণ আছে। যেটা আর যাইহোক 'দুদুও খাব তামাকও খাব' নয়। আর নয় বলেই তাকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট, নীতিও স্পষ্ট কোনও গোলমেলে ব্যাপার নয়। দর্শকদেরও একরকমভাবে একটা ভালোলাগার ব্যাপার থেকে যায়।...এইসব যখন চলছে তখন দেশে ব্রেশট সাহেব বেশ পপুলার হয়ে গেছেন। ছন্দে বললে—তিনি পুজ্য বঙ্গদেশে 'জলসার' অভাবে। অর্থাৎ খুব জোর আক্রান্ত। বদহজমের চোঁয়া ঢেঁকুর হিসেবে তিনি উপস্থাপিত। নাচ গান হাসি তামাসা মিলিয়ে [গুলিয়ে] দু আড়াই ঘণ্টার জমজমাট আসর। সেট্-এর দরকার নেই; কেউ বয়ে আনলেই চলবে। নাচের দরকার নেই কারণ যেতো কোমর নাড়িয়ে যাও। আর গান? সেটা তো আমরা পারিই। সঙ্গে থাকবে কিছু চুটকি রসিকতা, বহুল ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি বাস্। বাস, ব্রেশট নেমে পড়লেন মাঠে। থুড়ি, মঞ্চে। কত সহজ ব্যাপারটা [দেখে শুনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পেটে টিউমার হয়েছে বলে ভ্রম হয়]! এসব করলেই ব্রেশট দর্শন প্রচারিত হয়ে গেল। মাঝে মধ্যে একবার সূত্রধার ঢুকে পড়বে—তাহলেই অ্যালিনিয়েশন। এ যেন ট্রেনে বিক্রী ওষুধের মতো। যার এক পুরিয়া সেবনে মাথা

[illegible] যা হোক, ব্রেক্‌ট প্রক্রিয়া বাজারে ছাড়া [illegible]। কারণ ঐ এক ব্যাপার। জমাবার রাস্তা। [illegible] কোন কোন দলের। নাকে কানে গলায় বুটো [illegible] ছড়াছড়ি করে ব্রেক্‌ট যেন দেহ পসারিণী [illegible] আলাদীনের প্রদীপ নিয়ে মা ভৈঃ বলে [illegible]। আর একটা-আধটা দলের যেই একটু [illegible]বাটা যাত্রা শুরু, ব্যস্ অমনি আমরা বাকি সবাই ঝেড়ে পড়লাম গলায় কিম্‌পুরুষদের ব্যবহার্য [illegible] নিয়ে। আর সেইসব নাট্যকাররা যারা 'সিরাজ-দ্দৌল্লা' অনুসরণ করে আজও লিখে চলেছেন [অর্থাৎ সিরাজদৌল্লাতে সিরাজ একজন দেশপ্রেমী যিনি দেশকে স্বাধীন করতে চান, তাঁদের নাটকে একজন শ্রমিক বা কৃষক যিনি শোষণমুক্তি চান। সিরাজদৌল্লাতে একজন দালাল ছিলেন এ'দের নাটকেও একজন দালাল থাকবেন। সেখানে ছিল শত্রু ইংরেজ। এখানে পুলিশ বা জোতদার বা মালিক] তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ার খোঁজ পেয়ে পটাপট করে লিখে ফেললেন। কারণ 'ম্যাসে' নিচ্ছে ইদানীং। এই 'ম্যাস্' বা 'জনগণ' এর নামে সবই চালিয়ে দেয়া যায়। 'মজার মজা' নাটকের সংলাপ 'আগের কালে ছিল ভগবান আর এ কালে হোল জনগণ'। অথচ গণের যে কি হাল তা গণই জানে। আপাতত সুরকিওয়ালার দ্রুত পাল্টি খাওয়া রীতিতে পড়ে তার গনোরিয়া হবার দাখিল। ঐখানেই এখন জনগণমন ঠেকেছে। যাহোক, যে কথা লিখেছিলাম—। চালু হোল দু চারটে গান (?), একটু কোরাস নাচ (?) এবং শিবদুর্গাদের নিয়ে রসিকতা। এটাও বেশ চালু। এই দুর্গাকালীর ব্যাপারটা। যেহেতু এটা চালু তাই স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত প্রায় সব দেবদেবীই আপাতত বেশ জমিয়ে বসেছেন। জানি না ষষ্ঠীপুজোর যিনি ষষ্ঠী তিনি ঠাকুর কি না এবং তিনি এই নাস্‌বন্দী জমানায় হাজির ইতিমধ্যেই হয়েছেন কিনা! মোটমাট বর্তমানের রেওয়াজ এই। সূত্রধার আসবেই এবং এসে কিছু কথা বললেই মঞ্চের পাশ থেকে ধাঁইধাপ্পা করে ঢোল বেজে উঠবে এবং ব্রেক্‌ট মঞ্চে নামবেন!!! '৭৭ এর শেষতক আমরা অনেকেই এইভাবে চালাচ্ছি। যাদের জমছে না কোনওভাবে তারা 'ফ্রাসট্রেটেড' হয়ে গিয়ে সন্ধ্যায় ভজনে যাচ্ছি। আর যাদের জমছে তারা যাত্রা পাড়ায় অথবা টালিগঞ্জে চুল ফাঁপিয়ে ঘুরছি। ফলে নাট্যের যে গোলযোগের ব্যাপার এই '৬৭ থেকে '৭৭ পর্যন্ত বেশ চালু তার জন্য মূলত দায়ী আমরা। আমরা থিয়েটার কর্মীরা। আমরা হয়ত বাজার জমাতে গিয়ে, বাঁচবার রসদের জোগাড়ে অর্থের সন্ধানে এদিক সেদিক ছুটেছি। কারণ অর্থের বেশ পর্যাপ্ত দরকার। সেটা অনর্থের মূল হলেও, সামর্থ্যেরও মূল রসদ। তাই তাকে দরকার বইকি! এ দরকার চিরকালই ছিল, আছে এবং থাকবেও। পূর্বে নীতিভিত্তিক পথে সে প্রাপ্তি এসেওছে। কিন্তু প্রাপ্তির রাস্তার রাস্তা কোনটা সেটা ভাবতে গিয়েই কি আজকের এই গোলকধাঁধায় পাক খাওয়া? হয়ত তাই। হবেও বা। সিরিয়াস থিয়েটারের শুরুতে ভাবনা শুরু হোল কেবল নীতির টানে। নাট্যশিল্পের মতো বড়ো মাপের ব্যাপারটা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্প সাহিত্যের সব শাখা তাকে মেলাবার এবং জানবার জানাবার তাগিদে ও সামাজিক কর্তব্য ও দায়বোধে প্রাচীন ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শৈশব শুরু হোল। নবান্নর আয়োজনেই সাঙ্গ হোল সেই শৈশব কাল। সেই শৈশবেই এলো তার প্রাপ্তি। নীতির প্রতিষ্ঠায় চারদিকে তুলকালাম ঘটে গেল। মানসিক, নৈতিক সব লাভই তার জুটল। বিশাল বিশাল তাবড় তাবড় ব্যক্তিরা এক সাথে কাজ করে সেই কর্মকাণ্ড ঘটালেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। বোধ হয় আমাদের ঐতিহাসিক চরিত্রই তার কারণ। ঐক্যবদ্ধ না হতে পারা বা না হতে চাওয়াই মনে হয় আমাদের চরিত্র। যদিও তার কারণ অনুভূত হোত, যদিও তার কারণ নিজেদেরই বাঁচবার তাগিদে। তবুও। ফলে নবান্ন বিভক্ত। হোল। শত সহস্র ভাগে। এমত অবস্থাতেও সে তার নির্দিষ্ট পথে চলতে পারত যদি তার মূলে থাকত কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু সেখানেও ভাঁড়ে মা ভবানী। ফলে টান পড়ল সব দিকে। নাটক, নাট্যকর্মী, স্থান এবং অর্থ তো বটেই। সবারই আদর্শ ঘোষিত হোল, নীতি নির্ধারিত হোল এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অর্থের যোগাড় শুরু হোল। কিন্তু মতাদর্শ অনুযায়ী পথ চলা দুর্গম হোল না কারণ অর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বোধ হয় চিন্তা এল এই পথে যে আদর্শকে ধরে রাখবার জন্য যদি পাত্রটাকে ঠিকমত করে পোক্ত করে রাখা না যায় তাহলে বিপদ। তাই আপাতত আদর্শের আধারটাকে সচল রাখা দরকার। আদর্শকে নয়। চারদিকে সবাই ছুটল পাত্রটাকে বাঁচাবার জন্য। ফলে নীতি ও আদর্শের ছোট্ট গণ্ডীটার মধ্যে যেনো জল ঢুকল। গণ্ডী বড় হোল। বলতে শুরু করলাম যে বাঁচবার জন্য এই অ্যাডজাস্টমেণ্ট দরকার। নিশ্চয়ই, তা তো দরকার বটেই। আর তাই তো দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছোটা। আর ছুটতে ছুটতে "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ

খাঁচা—সুন্দরম

তাই" মতে হাতের সামনে যা পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ রাজনীতির মতো কিছু, কিংবা অদ্ভুত কিম্ভূত অথবা ব্রেক্‌টীয় প্রক্রিয়া ধরে ফেলা এই "অমূল্য রতনের" খোঁজে। কারণ ক্ষিধে বেড়ে গেছে। অ্যাড্‌যাস্টমেণ্টের ক্ষিধে। মাসে ৮০০ বা ১০০০ লোককে [একটা হলে যদি ধরে নেয়া যায় ৮০০ বা ১০০০ সিট আছে] মজাবার পর সপ্তাহে ঐ সংখ্যক লোককে মজাতে হবে কারণ আরও বেশি লোকের কাছে পোঁছতে হবে। তারপর এল সপ্তাহে ৩২০০—৪০০০ (চারটে-শো) এর মতো লোককে টানতে। ফলে আরও বিজ্ঞাপন, আরও আয়োজন এবং আরও মন ভোলানো কারবার। কারণ আদর্শের আধারটা শক্ত করতে হবে। তাই "বাবুদের থিয়েটারের পণ্য নারীনাভির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে একটু আধটু ম্যাসে যা নেয় তা তো করতেই হবে—বুঝলেন না? হ্যা—হ্যা—হ্যা।" হ্যা হ্যা হ্যা তা আর বুঝি নি। কিন্তু বাপু হে সবাই জানি যে লক্ষ্মীর, সঙ্গে সরস্বতীর কোনও বিরোধ নেই। ইতিহাস কি এমন কোনও ভাল নাটক বা ভাল প্রযোজনার কথা বলতে পারে যা ম্যাসে নেয় নি বা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করে নি? এমন একটা নজীর পাওয়া যাবে সেই নবান্নর কাল থেকে? না, যাবে না। তাহলে আমরা কেন ছুটলাম ঐ লক্ষ্যহীন ভাবে সস্তা আমোদের দিকে? কেন এই দু নম্বরী কারবার? মানুষের বাঁচার কথা বললে কেন থিয়েটারী লাগে? কেন মনে হয় না তা আমার কথা আমাদের কথা বলে? নিজস্ব মাটির গন্ধ কেন পাওয়া যায় না? কেন নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে চেনায় না? আসলে বোধ হয় আমাদের আদর্শের ভিতটা পোক্ত ছিল না, পোক্ত নেই। আর তা নেই বলেই যাদের তা আছে তারাও এই গোলমালের ভীড়ে হারিয়ে যাচ্ছেন। সস্তা আমোদ টানে বড় বেশি। কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধি জ্ঞান সততা দিয়ে যা তৈরী হয় তা মজবুত। আর তাই আপাত দৃষ্টিতে হারিয়ে গেলেও ভবিষ্যতে সেটাই থাকবে। থাকতে বাধ্য। কারণ এখন ব্যাঙের ডাকবার সময়, [illegible] তাই [illegible]। এখনকার সততার অর্থ কোন মাল বাজারে চলবে এটা ঠিকমত খুঁজে বার করা। তাই এ বছরে 'কমরেড লেনিন' প্রযোজিত হবে, পরের বছরই 'জয় বাব তারকনাথ।'' হোক তাই, ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই জানবে তার ব্যবসার চাবিকাঠি কোনটা। সেই চাবিকাঠি নারী নাভি, রাজনীতি (?) বা ব্রেক্‌টীয় প্রক্রিয়া যাই হোব না কেন! এখন তো 'নেই কাজ তো থিয়েটার কর' এ যুগ। আর তাই উল্টোপাল্টা ব্যাপার আমরা কর চলেছি। যে স্বার্থপর বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের সর্ব ব্যাপারের বিপক্ষে, সেই বাস্তব অবস্থাটা বদলানো কাজে হাত না দিয়ে একেবারে লাফিয়ে শেষধাপে গি যে স্বপ্ন দেখছি সেও যে ঐ 'ভূতের সঙ্গে প্রেম করা মতো ব্যাপার'। অথচ বাস্তব প্রয়োজন এলে সামান্য তম আন্দোলনে অংশীদার হতে গেলে আমরা অনেকে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলি।

আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলা সত্তা। কোনও সঠিক উদ্দেশ্য সামনে রেখেও আম যৌথ হতে পারি না। অথচ মুখে বলি সব সময় এ যৌথ হবার কথা। কিন্তু সেই আমরাই 'জগন্নাথ'-এ বিক্রি বেশি বলে হিংসে করি, 'দান সাগর' দু-চার কল শো বেশি পেলেই বলি ওদের নাটক চলে ' 'ব্যারিকেড' বিক্রি হলেই বলি উৎপল দত্তর নামে কা 'বদনাম' সুনাম কুড়োলেই বলি বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথ নাটক করার মানে হয় না, 'ফুটবল' প্রতিদিন আমন্ত্র অভিনয় করে বেড়ালে রেগে যাই, সমালোচক নিজে নাটককে খারাপ এবং অন্য কাউকে ভাল বললেই তা মূর্খ বলি। আসলে আমরা পরস্পরের ক্ষতি চা কোনও নাট্যদলের ভাঙনের সংবাদে আমরা গিন্নী মতো চব্য চোষ্য করে পরচর্চার মজলিসীতে ব আনন্দ পাই। এই আমাদের চরিত্র, আর তাই বিচ্ছি পথে পা ফেলে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা চলার চেষ্টা কি কিন্তু ইতিহাস বলে যে দু তিনটে থিয়েটারের দ নিয়মিত মঞ্চ নিয়ে অভিনয় করতে গিয়ে নানান কার ফিরে এসেছেন আবার পুরোনো পথে। অর্থাৎ এব ক্ষমতার বেশি দূরে যাওয়া যায়নি। তাই নাট্যর মে ঘোরাতে গেলে, এলোমেলো অবস্থার অবসান ঘটা গেলে, বায়স্কোপের লোক নিয়ে তৈরী ব্যবসায়ী দ গুলোর অবস্থা নস্যাৎ করতে গেলে, নিশ্চয়ই চ যৌথ প্রযোজনা, কোনও এক শৃংখলাবদ্ধ নেতৃত্ব নীতির বশবর্তী হয়ে। তা না হলে নাট্য আন্দোলনে বা গ্রুপ থিয়েটারের সঠিক কাজ কম্মোর গণেশ উ যাবেই। কারণ নিজেদের এই সব কর্মকাণ্ডর পিছ আছে আর এক শক্তির চাপ। যে শক্তি বেশ সক্রিয় ছি বা এখনও আছে।

বিজন ভট্টাচার্য বা উৎপল দত্ত রচিত এ নির্দেশিত নাট্য প্রযোজনা যদি আজও আমরা ক কয়েকটি নাটকের দলের মিলিত চেষ্টায় করি তাহ আর এক 'নবান্ন' যুগ আসতে বাধ্য। প্রতিনিধিত্বমূ সেই সংগঠন-এর একটাই নীতি এবং একটাই পথ এ তা হলো সুস্থ ও সঠিক নাট্য প্রযোজনা। সংগঠনের নেতৃত্ব দেবে অন্য এক কমিটি যাতে সংগঠ কোন মত্ত হস্তীর তাণ্ডবনৃত্যের স্থান না হয়। এইভাবে সব কটি দলের সব পরিচালকই একটি ক নাটকের পরিচালনার ভার পাবেন। তাদের নিজস্ব স যদি আপাতত টিকিয়ে রাখার নেহাৎ প্রয়োজন তাহলে তাও করতে পারেন, কিন্তু সেটা করতে হ কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাজের নীতিতে। আর নী রক্ষিত হলে আত্মকলহও কম হবে বলে অনুমান হ

এ সবই হলো অনুভূতির কথা। যা বলা গে এতক্ষণ সবই সেই অনুভূতি মালা। থিয়েটারের গ সামান্য আঁচড় লাগলে যে এখনও শরীরে দগদ ঘায়ের যন্ত্রণা পাই। আর তাই কিছু দুঃখ, কিছু এবং কিছু যন্ত্রণার জন্য নিজেদের সমালোচনা। উ করে নিজেদের সর্বাঙ্গে চাবুক মেরে একটু স হবার চেষ্টা। অন্য কাউকে দোষারোপ করার অ নিজেদের কাজকর্ম সম্বন্ধে একটু সজাগ হও এটুকু হতে না পারলে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' সম্মি দর্শকের সংলাপ হবে। এবং আলাদা আলাদা ভ টিকে থাকা যাবে, যৌথ ভাবে বেঁচে থাকা হবে

কলকাতার হকি মরা নদীর শীর্ণ ধারা

পুষ্পেন সরকার

"একদিন এই নদীতে বেশ স্রোত ছিল। জোয়ার ভাটা বইত। পাল তুলে নৌকা আসত। আজ এই শীর্ণ নদীর তিরতিরে জল দেখে তোমরা অবহেলা করছ। বলছ, 'মরা নদীর সোঁতা'। কিন্তু আমরা তোমাদের মত বয়সে এই নদীতে কত সাঁতার কেটেছি। অনাবিল আনন্দের মাঝে কেটেছে সময়। উত্তেজনা উন্মাদনায় ভরপুর থাকত সেই দিনগুলি।" মধ্য বয়স উত্তীর্ণ এক ভদ্রলোক তাঁর কিশোর ছেলেটির সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে বলছিলেন উপরোক্ত কথাগুলি।

কলকাতার হকির অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে যদি কেউ আজ উপরোক্ত উপমা দেয় তাহলে সেটা কি খুব অমিল হবে? কলকাতার হকি, সত্যিই আজ মরা নদীর শীর্ণ ধারার মত। মাঠে দর্শক নেই। দু একটি দল ছাড়া অন্যগুলি চলছে কায়ক্লেশে। হকি নিয়ে কলকাতার মানুষ মাথা ঘামায় না। হকিকে ভালবাসে না বাংলার মানুষ।

অথচ এই কলকাতাই একদিন ভারতীয় হকির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় অলিম্পিক দল বাংলার খেলোয়াড় ছাড়া গড়া যেত না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় দলে ছিলেন অ্যালেন ও সৌকত আলি। ১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অ্যালেন, ট্যাপসেল, আর কার। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে অ্যালেন, ট্যাপসেল, গ্যালিবার্ডি ও এমেট। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে ক্লডিয়াস, গ্রহনন্দ সিং, প্লাকেন ও জ্যানসেন সকলেই বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে অলিম্পিক দলে স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে নির্বাচিত পাঁচজন হাফব্যাকের মধ্যে চারজন ছিলেন বাংলার—ক্লডিয়াস, কেশব দত্ত, ডালুজ ও যশোবন্ত রাজপুত। এ ছাড়া ফরোয়ার্ডে সি এস দুবে ও সি এস গুরুং। এরপর থেকেই বাংলার প্রতিনিধিত্ব কমতে শুরু করে। উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবে কলকাতার হকি মানের অবনতি শুরু হয়।

কলকাতার হকি মরসুমের আয়ু মাত্র তিন মাস। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ এপ্রিল। বেটন কাপের শেষ পর্যায়ের খেলার জন্য কখনো কখনো বিশেষ অনুমতিতে আরও এক সপ্তাহ হকির অবস্থান। এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় যায় তিনটি বিভাগের লীগ খেলায়। বাকি সময়ে বেটন কাপ, লক্ষ্মী বিলাস কাপ, ল্যাগডেন শীল্ড, কাইজান কাপ ও পঙ্কজ গুপ্ত কাপ চলে।

প্রথম বিভাগের হকিতে আছে ২০টি দল। দ্বিতীয় বিভাগে ১৬টি। ৩৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হয় তৃতীয় বিভাগের লীগ। চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে নক-আউট খেলার পর তৃতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ঠিক হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা উঠে আসে উপরের বিভাগে। লীগ তালিকার শেষ দুটি দল নেমে যায় নীচের বিভাগে। তিনটি বিভাগে মোট খেলা হয় ৪৫৭টি। প্রথম বিভাগে ১৯০। দ্বিতীয় বিভাগে ১২০। তৃতীয় বিভাগের নক-আউট নিয়ে ১৪৭।

গত বছর প্রথম ডিভিসন হকি লীগে ছিল মোহনবাগান (চ্যাম্পিয়ন), কাস্টমস (রানার্স), ই আর এ এ, সি ই এস সি, মহমেডান, বি এন আর,

এণ্টাল, পোর্ট ট্রাস্ট, খালসা ব্লুজ, ইস্টবেঙ্গল, রেঞ্জার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড, পাঞ্জাব স্পোর্টস, গ্রীয়ার, ইস্ট ক্যালকাটা, এরিয়ান, ই আর এস সি, হাওড়া ইউনিয়ন, টাউন ক্লাব এবং উয়াড়ি। টাউন ক্লাব ও উয়াড়ি দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস ও রাজস্থান দ্বিতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়ে এ বছর প্রথম ডিভিসনে খেলছে।

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ বর্তমানে ফুটবলের মত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ তিন বছর পর পর বি এন আর হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পোর্ট এবং কাস্টমসের শক্তি তার আগেই ম্লান হয়ে এসেছিল। ১৯৬৮ সাল থেকে অন্য দলগুলি দুই প্রধানের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল গড়ে অর্থের জোরে। বিভিন্ন রাজ্যের কুশলী খেলোয়াড়দের তারা তিন মাসের জন্য কলকাতায় এনে ক্লাবের জার্সি গায়ে পরায়। লীগ এবং বেটনের খেলার পর আবার এই সব মরসুমী পাখি যে যার রাজ্যে বা চাকুরী স্থলে ফিরে যায়।

গত বছর মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৯টি খেলার প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়ে। গোল করেছিল ৫৯টি খেয়েছিল মাত্র ২টি। রানার্স কাস্টমস ৫ পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী ই আর এ এ ৮ পয়েন্ট পিছনে ছিল। ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল গড়তে পারেনি। অনেক পিছনে স্থান পেয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে লীগের লড়াই একতরফা ছিল। ইস্টবেঙ্গল যে বছর দল গড়ে, অর্থাৎ বাইরের খেলোয়াড় আমদানী করে সে বছর প্রতিযোগিতা হয় দুই প্রধানের মধ্যেই।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকার দিকে আরও একটু নজর করলে দেখা যাবে ২০টি দলের মধ্যে ১১টি দলের পয়েন্ট ১৩ থেকে ১৭-র মধ্যে। জয়ের সংখ্যা গড়ে তিন। অন্য পয়েন্টগুলি আসে ড্র ম্যাচ থেকে। যার অর্থ গড়াপেটার খেলা হয় বেশী। সংবাদপত্রের কাজে মাঠে গিয়ে দেখেছি, খেলা শুরু হবার আগেই ফল কি হবে সেটা ঠিক হয়ে আছে।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিভিসনের কথায়। গত বছর দ্বিতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওয়েস্ট বেংগল পুলিস এবং রানার্স রাজস্থান। ডাব্লিউ বি পুলিস পেয়েছিল ২৫ পয়েন্ট। রাজস্থানের সংগ্রহ ২৪। পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র এক। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে নেমে গেছে পুলিস এ সি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাব।

তৃতীয় বিভাগে চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঝাড়খণ্ড স্পোর্টিং, ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, জুলিয়ান ডে স্কুল এবং মেরিন ইনজিনিয়ারিং কলেজ। চার গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে নক-আউট খেলায় ঝাড়খণ্ড ১—০ গোলে মিত্র সংঘকে হারিয়ে প্রথম হয়েছিল। দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়া টাউন ক্লাব এ

... সংঘ এবং এফ সি আই এ বছর দ্বিতীয় বিভাগে [illegible] দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে [illegible] জন্য সাচ্চা লড়াই হয় বেশী। এখানে দলগত [illegible] পার্থক্যও সামান্য। রাজ্যের বাইরে থেকে খেলোয়াড় এনে সম্মান লাভের আর্থিক সঙ্গতি এদের নেই। এমন কি অর্থ এবং উৎসাহের অভাবে প্রতি বছরেই এই দুটি বিভাগে এক বা একাধিক দল লীগ খেলায় অংশ নিতে পারে না।

ঘেরা মাঠ তিনটিতে চলে প্রথম ডিভিসনের এবং বেটনের খেলাগুলি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের এবং অন্য টুর্নামেন্টগুলির খেলা হয় গ্রীয়ার, ভবানীপুর, বাটা, পার্শী, অরোরা, ওয়াই এম সি এ এবং মাঝে মাঝে পুলিস ও কাস্টমস মাঠে। এই মাঠগুলিতে গোলের পিছনে নেট এবং মার্কিং-এর অভাবে খেলা না হওয়ার ঘটনা গা সওয়া হয়ে গেছে।

এবারে আসা যাক নক আউট প্রতিযোগিতাগুলির কথায়। বেটন কাপের আগে অন্যগুলির কথা আগে সেরে নিতে চাই। লক্ষ্মীবিলাস কাপ-সিনিয়র টুর্নামেন্ট। ৬৯ বছরের পুরোনো। কোন রকমে নাম কো ওয়াস্তে চালানো হচ্ছে। গত বছর ফাইনাল নিষ্পত্তি হয়নি। 'ল্যাগডেন শীল্ড।' সিনিয়র (৬জন) ও জুনিয়ারদের মিলিত প্রতিযোগিতা। বছর সাতেক বয়স। পুষ্টির অভাবে অসুস্থ শিশু। গত বছর ১২টি দল খেলেছিল। 'কাইভান কাপ' জুনিয়রদের জন্য। ৭১ বছরের পুরানো। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের জন্মের আগে থেকেই চলে আসছে। ভারতের প্রাচীন প্রতিযোগিতাগুলির অন্যতম হিসাবে ধরা হয়। ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

'পঙ্কজ গুপ্ত কাপ।' আন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতা। স্কুলের ছাত্রদের হকি খেলায় উৎসাহ দেবার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৭০—৭১ সালে চালু হয়েছে। খেলোয়াড়দের বয়স ১৭ বছর ৩ মাসের মধ্যে হওয়া চাই। লীগ ও নক আউট প্রথায় খেলা হয়। সাধারণত ... পায়। গত বছর ১০টি স্কুল খেলেছিল। ফাইনালে কিশোর ভারতী টাই ব্রেকারে রানী রাসমণিকে ৩—২ গোলে হারিয়ে পেয়েছিল পঙ্কজ গুপ্ত কাপ। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রতিযোগিতায় যোগদানের সংখ্যা কমে আসছে। 'এম এল মিত্র কাপ'—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খেলতে আগ্রহী না হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে।

'বেটন কাপ—' কলকাতা বা ভারতের নয়, বিশ্বের প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা। ৮৩ বছর বয়স। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শক্তিশালী দলগুলি একদিন উন্মুখ হয়ে থাকত এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য। দুর্লভ সম্মান ছিল বেটন জয়ের। খেলা দেখতে হাজারে হাজারে হকি উৎসাহী প্রত্যহ এসে ময়দানকে সচকিত করে তুলতেন। আজ বেটন কাপের জলুস ভারতের অন্য অনেক প্রতিযোগিতা থেকে ম্লান। নেহরু হকি বা আগা খাঁ কাপে খেলতে নামী ও শক্তিশালী দলগুলির আগ্রহ এবং উৎসাহ অনেক বেশী।

অবশ্য এখনও বাইরের কিছু নামী দল যোগ দিচ্ছে বেটনে। গত বছর যোগদানকারী ২৫টি দলের মধ্যে ১০টি ছিল বাইরের। এ এস সি (জলন্ধর), ওয়েস্টার্ন রেল (বোমবাই), সি আর টি এফ (দিল্লি), কোর অফ সিগনালস, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস এবং স্থানীয় মোহনবাগান, ই আর এ এ ও কাস্টমসের মধ্যে বেটনের শেষ অঙ্কের প্রতিযোগিতা একেবারে প্রাণহীন ছিল না। ডাবল লেগ ফাইনালে মোহনবাগান ২—১ ও ১—১ গোলে ওয়েস্টার্ন রেলকে হারিয়ে মোট ১৪ বার বেটন জয়ের সম্মান পেয়েছিল।

কলকাতার হকি পরিচালনার দায়িত্ব বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের। আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। আয় থেকে ব্যয় বেশী। প্রতি বছরই পাঁচ ছয় হাজার টাকা বাড়তি খরচ হয়। দেনা ক্রমে বাড়ছে। এ ছাড়া ভারতের হকি ফেডারেশন মন্ট্রিল ওলিম্পিকে বাংলার খেলোয়াড় ছেত্রী ও কোচ গুরুবক্সের খরচ বাবদ মোটা ... দেনার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৪৬,৬৭৮ টাকা ৪৩ পয়সা। অর্থের অভাবে অ্যাসোসিয়েশন বেটন কাপে নাম দামী দল এনে আকর্ষণ বাড়াতে পারেন না। কো[illegible] পরিকল্পনায় সার্থক রূপ দেওয়া সম্ভব হয় [illegible] অর্থের অভাবে।

যে কোন খেলার উন্নতি অনেকখানি নির্ভর ক[illegible] জন-সমর্থনের উপর। স্কুল এবং কলেজ স্তরে উপযু[illegible] শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা চাই। পশ্চিম বাংলায় এর কোনটি[illegible] নেই। নিয়মিত হকি খেলে এমন স্কুলের সংখ্যা বহ[illegible] খোঁজ করেও পাওয়া শক্ত। কলেজগুলিতে খেলা হয় না। এম এল মিত্র কাপ বন্ধ হয়ে গেছে খেলোয়াড় না পাওয়ায়।

অপুষ্টিতে ভুগছে হকি ক্লাবগুলি। মোহনবাগা[illegible] ও ইস্টবেঙ্গল ধনী ক্লাব। ফুটবলের বিরাট বাজেটের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে হকি চালাতে পারে। মহমেডান স্পোর্টিং-এর আগ্রহ কমে গেছে। বি এন আর, কাস্টমস, ই আর এ এ, পোর্ট ট্রাস্ট, ই আর এস সি প্রভৃতি অফিস দলগুলি খেলোয়াড়দের চাকুরী দিয়ে দলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা এখন আর বিশেষ করছে না। অন্য ক্লাবগুলি ফুটবল চালাতেই হিমসিম খাচ্ছে।

এরপর আসছে সরকারী সাহায্যের কথা। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলী দুঃখ করে বলছিলেন, 'নেহরু হকির জন্য খরচ হয় লক্ষাধিক টাকা। যার মধ্যে সরকারী অনুদানের বড় অঙ্ক থাকে। সে তুলনায় আমরা এখানে পাই মুষ্টি-ভিক্ষা। বেটনের জলুস বাড়াবো কোথা থেকে? টাকা ছাড়া ভাল দল আসতে চায় না।'

সব দেখে শুনে বলা যায় বাংলায় হকির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। পলি মাটি পরিষ্কার করার আগ্রহ নেই কারও। ফলে আগামী দিনে নদীর তিরতিরে জলধারাও যদি শুকিয়ে যায় তাহলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

পাক ভারত হকি এবং নতুন উপলব্ধি

কোনো পাকিস্তানী যদি প্রশ্ন তোলে—স্বাধীনতাপূর্ব হকি-গৌরবে ভারতের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার্য নয়, সে গৌরবে পাকিস্তানেরও ভাগ আছে তবে এক কথায় প্রশ্নের অবাস্তবতা উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা স্বাধীনতা লাভের আগে আমস্টার্ডামে, লস অ্যাঞ্জেলস ও বার্লিন অলিম্পিকে হকির স্বর্ণপদক ভারত লাভ করলেও সে ভারত তো অখণ্ড ভারতই—পরে ভারত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশটুকু বাদ দিয়ে নয়। সেই বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশের খেলোয়াড়রাও খেলেছে যুদ্ধপূর্ব অলিম্পিকে। সুতরাং সেই অংশের খেলোয়াড়রাও বিজয় গৌরবের অংশীদার, যেমন অংশীদার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়রাও। ভারত স্বাধীন হবার পর বেশ কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হকি খেলোয়াড় ভারতকে আর স্বদেশ মনে করতে পারেন নি। হয় অস্ট্রেলিয়ায়, না হয় নিউজিল্যাণ্ডে, কিংবা ইউরোপে পাড়ি দিয়েছেন।

যেহেতু স্বাধীনতা লাভের শর্তের মধ্যেই ছিল দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তান নামে পৃথক দেশের অস্তিত্ব সেহেতু ভারতীয় হকির অতীত গৌরব থেকে পাকিস্তান বঞ্চিত। অলিম্পিক রেকর্ডে বিজয়ী হিসাবে ভারত নামটিই লেখা আছে। সেখানে পাকিস্তানের উল্লেখ নেই। থাকাও উচিত নয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে দেশ খণ্ডিত হয়েছে। একটি অংশ পরিণত হয়েছে পৃথক রাষ্ট্রে। দেশ বিভাগের পর বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান আক্ষেপ করে বলেছিলেন : পাকিস্তান পেল কী? যা নিয়ে মুসলমানদের গর্ব সেই দিল্লি আগ্রা ফতেপুর সিক্রি লক্ষ্ণৌয়ের স্থাপত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি সবই তো ভারতে পড়ে রইল। এমন কি হকি খেলায় বিশ্বজয়ের স্বর্ণমুকুটও।

মন্তব্যটি বোধ হয় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশের কোন প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড়ের মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাই হকি খেলায় বিশ্বখ্যাতি অর্জনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। বিশেষ করে এ আই এস দ্বারা, ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক যাকে পরে পাঠানো হয়েছিল ভারত দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। আখতার হোসেন লতিফুর রহমান, সবুর প্রভৃতি যারা অতীতে অলিম্পিক খেলেছেন ভারতের পক্ষে তাঁরাও পাকিস্তানে গিয়ে দারার হাত শক্ত করেন এবং প্রধানত লাহোরের ব্রাদার্স ক্লাবের মাধ্যমে পাকিস্তান হকির শক্তিশালী দেশ হিসাবে অলিম্পিক অভিযান শুরু করে। যুদ্ধোত্তর দুটি অলিম্পিকেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে এবং ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে পাকিস্তান সেমিফাইনালে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত দখল করে চতুর্থ স্থান। ওই দুটি অলিম্পিকে কোনবার ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা হয়নি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—অচিরেই পাকিস্তান ভারতের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। কেননা খেলার প্রথাপ্রকরণ, কব্জির পেলবতা, গতিবেগ, আক্রমণ রচনার কৌশল—সবই ভারতের খেলার অনুরূপ। ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে খুব দেরী হয়নি। ১৯৫৬র মেলবোর্ন অলিম্পিকেই পাকিস্তানের সঙ্গে হকি ফাইনালে ভারতের প্রথম সংঘর্ষ এবং কারোরই অজানা নেই সে ফাইনালে ভারতের জয় রীতিমত কষ্টার্জিত। পাকিস্তান সমানে সংগ্রাম করে হেরে যায়। শর্ট কর্ণার থেকে ভারতের জয়সূচক গোলটি করেন এখনকার কোচ আর এস জেন্টল। শেষ সময়ে পাকিস্তান পেনাল্টি স্ট্রোক পেয়েও গোলটি শোধ করতে পারে না। হকি দুনিয়ায় ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যে প্রথম চ্যালেঞ্জ আসে পাকিস্তানের কাছ থেকে। প্রথম পরাভবও পাকিস্তানের কাছে, দু বছর পরে টোকিও এশিয়ান গেমসে। তখনো কিন্তু পাকিস্তান হারাতে পারেনি ভারতকে। তাই পরাজয় না বলে বলেছি পরাভব। টোকিও এশিয়ান গেমসে ভারত ও পাকিস্তানের খেলাটি শেষ হয়েছিল গোলশূন্য অবস্থায়। দুই দেশের পয়েন্টও ছিল সমান। কিন্তু সব খেলার হিসাবে গোল পার্থক্যে পাকিস্তান পেয়েছিল চ্যাম্পিয়নের সম্মান। ভারত হয়েছিল রানার্স। পাকিস্তান করেছিল ১৯টি গোল। তাদের বিরুদ্ধে কেউ গোল করতে পারেনি। ভারতের গোল ছিল ১৬—১।

পরাভবের পর পরাজয় আসতেও বেশী সময় লাগেনি। ভারতীয় হকির গৌরব গরিমা ম্লান করে পাকিস্তান প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয় রোমে। এই লেখার সঙ্গে আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের খেলার জয় পরাজয়ের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। তা থেকে দেখা যাবে দুই একবারের ব্যতিক্রম ছাড়া ওই সময় থেকে ভারতের উপর পাকিস্তানই প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে, যার সূচনা ১৯৫৮-র টোকিও এশিয়ান গেমস থেকে। ১৯৭৩ সালে আমস্টার্ডামে বিশ্ব কাপের সেমি ফাইনালে ভারতের ১—০ গোলে জয় পাকিস্তানের দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে। মিউনিখ অলিম্পিকের বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে অশোভন আচরণের জন্য পাকিস্তানের প্রথম সারির সব খেলোয়াড় সাসপেণ্ড হওয়ায় আমস্টার্ডাম বিশ্ব কাপে পাকিস্তানকে দ্বিতীয় দল পাঠাতে হয়েছিল।

সে যাই হক, পাকিস্তানের কাছ থেকে এবং ইউরোপের ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ আসছে একথা উপলব্ধি করেও ভারতীয় হকির কর্মকর্তারা যেমন ঘর সামলাতে পারেননি, তেমন পাকিস্তানও বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারেনি, হকি ক্ষেত্রে শুধু ভারতই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অন্যান্য দেশও গোকুলে বাড়ছে। তাই হকি খেলার এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রথম খর্ব হয় ১৯৭২এ মিউনিখ অলিম্পিকে। বিগত মণ্ট্রিয়েল অলিম্পিকে তো আরও খর্ব হয়েছে। পাকিস্তান পেয়েছে তৃতীয় স্থান, ভারত সপ্তম।

সাম্প্রতিক কালের অলিম্পিক, বিশ্ব কাপ এবং আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতকেই বার বার হেনস্থা হতে হয়নি, পাকিস্তানও পরাজিত হয়েছে বিস্তর খেলায়। আমার নিশ্চিত ধারণা, এই উপমহাদেশের হকি প্রাধান্য এত সহজে খর্ব হত না, যদি দুই দেশের মধ্যে হকি সফরের ব্যবস্থা থাকত। প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক সফরের মধ্য দিয়েই অন্যান্য দেশের দল নিজেদের গড়ে তোলে। কিন্তু বহুকাল থেকে আমরা পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি। শুধু হকি কেন, দুই দেশের মধ্যে শেষ ক্রিকেট সফরও তো হয়েছে সতের বছর আগে।

আশার কথা, এখন দুই দেশের কর্তৃপক্ষই বোধ হয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন উপমহাদেশে খেলার উন্নতির জন্য মৈত্রীর হাত প্রসারিত করা উচিত। এই উপলব্ধির ফলেই বুয়েনস এয়ারসে চতুর্থ বিশ্বকাপ হকি আরম্ভের আগে দুই দেশের মধ্যে চারটি হকি টেস্ট হয়ে গেল। দুটি ভারতে, দুটি পাকিস্তানে। আমরা সবাই জানি ফল কী হয়েছে। প্রথম তিনটি টেস্টে ভারত পরাজিত হবার পর চতুর্থ টেস্টে জিতেছে ২—১ গোলে। প্রথম তিনটি টেস্টে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে, বিশেষ করে তৃতীয় টেস্টে ৬—০ গোলে জিতে শেষ টেস্টে পাকিস্তানের পরাজয়—আমার ধারণা—আত্মতুষ্টি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লঘুভাবে নেবার ফল। এই টেস্ট খেলাগুলি থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে ভারতের চেয়ে হকিতে পাকিস্তান অনেক শক্তিশালী। খেলার টেকনিক ট্যাকটিকস, গতিবেগ এবং ক্রীড়া দক্ষতা—কোনদিক দিয়েই ভারতের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। এই টেস্টের ফলেই ভারত উপলব্ধি করেছে তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলটি চতুর্থ বিশ্বকাপে ভারতীয় হকির নষ্ট সুনাম পুনরুদ্ধার তো করতে পারবেই না, বরং আরো নৈরাশ্যের সৃষ্টি করবে।

দীর্ঘ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ভারত ছিল বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা। সেই ভারতীয় হকির শোচনীয় পরিণতির মূলে খেলোয়াড়রা কতখানি দায়ী, কতখানি দায়ী প্রশাসনিক কোন্দল ও গোষ্ঠীস্বার্থ সে কথা তুলে আর লাভ নেই। আজ একটু লাভ হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার সুবাদে। এই টেস্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কর্মকর্তাদের গরম মাথা নরম করার প্রয়োজন আছে। যে কারণেই হোক যেসব অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া হয়েছিল তাদের ছাড়া দল গড়ার অর্থ আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে আর একবার হেনস্থা হবার ঝুঁকি নেওয়া। ক্ষতি অনেকখানিই হয়ে গেছে। তবু কর্তৃপক্ষ বাদ দেওয়া খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে আবার কয়েকজনকে ডেকে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। অলিম্পিক অঙ্গন বা বিশ্ব কাপের আসর যে পরীক্ষা নিরীক্ষার স্থান নয় সেটা উপলব্ধি করা হল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার পর। ধন্য আমাদের হকি প্রশাসকরা। মণ্ট্রিয়েল অলিম্পিকে পুরো শক্তির ভারত দলের আটটি খেলার মধ্যে চারটিতে পরাজয়ের পর তারা কি আশা করেছিলেন অনভিজ্ঞ এবং প্রায় আনকোরা এই দলটি বিশ্ব কাপ জয় করে ফিরে আসবে?

সত্যি কথা, মণ্ট্রিয়লে শোচনীয় ফলের আংশিক কারণ অনভ্যস্ত অ্যাস্ট্রোটার্ফে খেলা। পাকিস্তানের তৃতীয় স্থানে নেমে যাবার সেটাও কারণ হতে পারে। আশা করা যায় এই টেস্টের মাধ্যমে পাকিস্তানও যথেষ্ট লাভবান হবে। হয়তো বিশ্বকাপও এই উপদেশে ফিরে আসবে।

ভারত ও পাকিস্তানের খেলা সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা গেল না। চুম্বকে এ পর্যন্ত খেলার ফল ছাপা হল।

পাক-ভারত হকি

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ
পাকিস্তান	১৯	১১	২	৬	৩০	১২
ভারত	১৯	৬	২	১১	১২	৩০

খেলার ফল : মেলবোর্ন অলিম্পিক ফাইনাল (৫৬) ভারত ১—০ ; টোকিও এশিয়ান গেম (৫৮) ০—০ ; রোম অলিম্পিক ফাইনাল (৬০) পাকিস্তান ১—০ ; জাকার্তা এশিয়ান গেমস ফাইনাল (৬২) পাকিস্তান ২—০ ; টোকিও অলিম্পিক ফাইনাল (৬৪) ভারত ১—০ ; হামবুর্গ আন্তর্জাতিক হকি (৬৬) ০—০ ; ব্যাংকক এশিয়ান গেমস ফাইনাল (৬৬- ভারত ১—০ ; লণ্ডন প্রাক অলিম্পিক হকি (৬৭) পাকিস্তান ১—০ ; ব্যাংকক এশিয়ান গেমস ফাইনাল (৭০) পাকিস্তান ১—০ ; বার্সিলোনা বিশ্ব কাপ সেমি ফাইনাল (৭১) পাকিস্তান২—১ ; মিউনিখ অলিম্পিক সেমিফাইনাল (৭২) পাকিস্তান ২—০ ; আমস্টার্ডাম বিশ্ব কাপ সেমি ফাইনাল (৭৩) ভারত ১—০ ; তেহরাণ এশিয়ান গেমস ফাইনাল (৭৪) পাকিস্তান ১—১ ও ২—০ ; কুয়ালালামপুর বিশ্ব কাপ ফাইনাল (৭৫) ভারত ২—১ ; কায়েদে আজম শতবার্ষিকী হকি (৭৬) পাকিস্তান ৫—০ ; হকি টেস্ট (৭৮) বোম্বাইয়ে পাকিস্তান ২—১ ; বাঙ্গালোরে পাকিস্তান ৩—২ ; করাচিতে পাকিস্তান ৬—০ ; লাহোরে ভারত ২—১।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

The Story of a Tribal by B. M. Pugh. Orient Longman. Rs 16.00.

আসাম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অন্যান্য রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল বি কে নেহরুর মুখবন্ধ সহ রানসিল এম পিউয়ের আলোচ্য আত্মচরিতে একজন সংবেদনশীল সামাজিকের উন্মেষ ও অন্বেষণ আভাসিত। জন্ম-সূত্রে তিনি পেয়েছেন পারিবারিক খৃস্টীয় আচার ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি উপজাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। আর আপন আয়াস ও প্রযত্নে তিনি অর্জন করেছেন আধুনিক মানুষের অঙ্গীকার। অতএব নিছক নূতনত্বের গৌরবেই নয়, অংশত আসাম তথা ভারত উপ-মহাদেশের অনেক অজ্ঞাত-প্রায় আখ্যান শ্রীযুক্ত পিউয়ের এই স্মৃতিচারণে স্পষ্টতর।

আসামের ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিবর্তনে বলা বাহুল্য, খাসি-অবদান অনিবার্য। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন অস্ট্রিক মোন-খমের ঐতিহ্যের শরিক হিসাবেই একদা আসামে আগমন ঘটেছিল খাসি উপজাতির। আর অতীতের অনুষঙ্গ আজও স্বভাবতই খাসি ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে প্রত্যক্ষতর। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার মোন-খমের গোষ্ঠীর পলাউঙ এবং খাসি ভাষার চমকপ্রদ সাদৃশ্য কার্যত উনিশ শতকের মধ্যভাগেই জে আর লোগ্যানের গবেষণা কর্মে সুস্পষ্ট হয়। পরবর্তীকালে পি ডব্লিউ শ্মিটের Die Mon-Khmer Voelker : ein Bindeglied zwischen Voelkern Zentralasiens und Austronesiens' (১৯০৬) নামীয় গ্রন্থে এই চর্চিত (১৯০৬) নামীয় গ্রন্থে এই চর্চিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সমধিক বিস্তৃতি পায়। শ্মিট সাহেবের পরিশ্রমী নিষ্ঠায় নিছক মোন-খমের ভাষা-গোষ্ঠীরই নয়, নিকোবরী এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের উপভাষাবলীর সঙ্গে খাসি ভাষার বিস্তৃত সাদৃশ্যও নির্ধারিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের সূত্রেই বলা বাহুল্য, অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের অবগতি সম্প্রসারিত হয়েছে। ভাষা-তত্ত্বের নিরিখে অধুনা জ্ঞাতব্য যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম আসামে প্রবেশ করেছিল। আর আজও আসাম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একাধিক প্রসিদ্ধ নামের (কামাখ্যা, ডিব্রুগড় ডিগবয়, প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি) ব্যুৎপত্তিতে বস্তুত তাই খাসি (অস্ট্রিক) প্রভাব প্রত্যক্ষতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় প্রত্যেক উপজাতির অনমনীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় সামাজিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত পিউয়ের প্রতিক্রিয়া কিঞ্চিৎ ভিন্নতর।

শ্রীযুক্ত পিউ স্পষ্টতই লিখেছেন যে উপজাতি হিসাবে তাঁর অনন্য ও অত্যুগ্র অভিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি কার্যত কখনও সচেতন ছিলেন না। আরও অনেক উদারহৃদয় মানুষের মতো তিনিও জানতেন, বৃহত্তর অর্থে তিনি ভারতীয়। আর বাঙালী ও পাঞ্জাবীর মতো তাঁরও পরিচিতি খাসি হিসাবে নিঃসন্দেহে। উপজাতি ও জাতির সুষ্ঠু ও সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ এবং উভয়ের মধ্যে চুলচেরা পৃথকীকরণ যথার্থই অসাধ্যসাধন। সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজার্চনা ও উৎসবাদি প্রকারভেদে সর্বত্রই বর্তমান। উপজাতিসমাজে শৃঙ্খলার তাগিদে প্রবীণ ও গুণিজন পরিচালিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকরী। আর আদিম ও অনগ্রসর নামাঙ্কনে উপজাতিদের সদাসর্বদা চিহ্নিত করা অর্থহীনক। অতি বড় প্রগতিবিলাসীর পক্ষেও মেঘালয়ের খাসি কিংবা নাগাল্যাণ্ডের আও অথবা অরুণাচলের আদিদের অর্বাচীন আখ্যা দেওয়া বাতুলতামাত্র। সর্বোপরি শিক্ষিতের সংখ্যাধিক্য যদি প্রগতির মাপকাঠি হয় তবে খোদ কেবলব সঙ্গে প্রতি-যোগিতাতেও অসামব মিজো উপজাতির স্থান হিন্দুর ঊর্ধ্বে। অবশ্য অদৃষ্টের পরিহাসই বলা চলে, উপজাতিরা স্বেচ্ছায় নিজেদের 'অনগ্রসর' হিসাবে দাবি জানায় — বহুবিধ সাংবিধানিক সুযোগ ও সুবিধা লাভে সুলভ প্রত্যাশায়। আর 'অনগ্রসর' কালিকে চিহ্নিত হওয়ার এমত আজব আত্মক্ষয়ী অভিলাষ উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের মধ্যে সতত সংক্রামিত। সুযোগ-সুবিধার অনিবার্য প্ররোচনায় সমগ্র সমাজই সম্ভবত একদা প্রগতির পরিবর্তে অধোগতিকেই পরমজ্ঞানে মানবে। অবশ্য আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার কথা হল, শ্রীযুক্ত পিউয়ের মতো সম্মানিত ও সর্বজন-মান্য সামাজিকের নেতৃত্বেই উপজাতি-সমাজের এই অবক্ষয় ও হীনতাভাব থেকে মুক্তি সম্ভবপর।

শ্রীযুক্ত পিউ কার্যত কৃষি বিজ্ঞানী। এলাহাবাদ অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল অধ্যাপনাকর্মে নিরত ছিলেন। তদুপরি একদা রাজনীতি ব্যতীত বহুবিধ কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন পরম প্রযত্নে। প্রথাসিদ্ধভাবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরেও কচিৎ তিনি সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হয়েছেন। আলোচ্য আত্মচরিত্রের উনবিংশতি অধ্যায় বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মে শ্রীযুক্ত পিউয়ের অংশ গ্রহণের সাক্ষ্য। সর্বোপরি তাঁর কর্মবহুল জীবনচর্চার পশ্চাৎপটও পর্যায়ক্রমে অতীব আকর্ষক। খাসি পাহাড়ের প্রান্তবর্তী গ্রামের এক কিশোরের মনোরাজ্যে আকস্মিকভাবেই বলা যায়, এক নূতন জগতের ছায়া পড়ে।

নিজের নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ডির গ্রামজীবন থেকে লেখক একদা বহির্বিশ্বের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন কেবলমাত্র নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও কর্মজীবনে সার্থক করে তোলার প্রয়াসেই নয়, সেই সঙ্গে আপন দেশ ও জাতিকে বিশ্বের পটভূমিতে স্থাপনের আগ্রহ ছিল তাঁর আন্তরিক। আমেরিকার কৃষিবিদ্যা শিক্ষণ তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কাজে লাগাতে পারেন স্বদেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায়। আর এইভাবেই শিক্ষকরূপে, কৃষি বিভাগের সরকারী অফিসার হিসাবে এবং সর্বোপরি নিজে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনার মাধ্যমে তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন তাঁর নিজের জাতি ও সমাজের প্রগতির প্রতীক। তাই এ-কাহিনী সর্বাংশে একজন মানুষের ব্যক্তিগত সাংসারিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে একজন যথার্থ সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী। এখানে সর্বাংশে এ-কারণেই মর্যাদা পায় সমগ্র খাসি সমাজের জীবনচর্যার সমুদয় বিষয়াবলী। আর একই সঙ্গে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে পরিবেশ ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর একক সংগ্রাম ও সংবেদনশীলতা।

তথ্যগত ভুলভ্রান্তি অবশ্য কিছু চোখে পড়ে। পি আর এস—'প্রেম চন্দ্র রায় স্কলারশিপ'-এর সংক্ষেপণ নয়, লেখা উচিত, 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেণ্টশিপ'। এবং এই পরীক্ষা দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গম ব্যক্তিমাত্রেরই একচেটিয়া ছিল না। অথবা বাঙালীদের বংশনাম বা পদবীমাত্র উল্লেখই সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, একই পদবীধারী বহু ব্যক্তির একই প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে অবস্থান কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু এমত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এবম্প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভবত স্বাভাবিক। অবশ্য তার ফলে এই মূল্যবান গ্রন্থের কিছুমাত্র ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা করি না।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

অবুঝ সবুজ

ইদানীং আমার তরুণতর এবং তরুণতম শিল্পীদের কাজ দেখতে ভাল লাগছে। সবাইয়ের কাজ নয়। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাজ, বিশেষত যাঁদের কাজ বিক্রী হতে, হতে বাজারে হয়ে গেছে, তাঁদের নকল করেন, তাঁদের কথা বলছি না।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে অশোক বিশ্বাস আমাকে বলেছিলেন, নীরদ মজুমদার বা পরিতোষ সেনের চেয়ে পরবর্তী কোনো কোনো শিল্পীর প্রভাব তরুণদের ওপর বেশি—এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেটা অশোক বিশ্বাস আর তাঁর সমকালীন শিল্পীরা বোঝেন না সেটা হলো নীরদ মজুমদার বা পরিতোষ সেনকে অনুকরণ করার জন্যে কবজীর জোর চাই। শিশু-ভোলানো ছবি বা রোমহর্ষক রাক্ষস-খোক্কস মিষ্টি মিষ্টি করে তেলরঙে আঁকার জন্যে অতো ক্ষমতা লাগে না। রাজনীতির মতো ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যাঁরা স্তাবক পরিবৃত হন, তাঁদের মৌলিকত্ব আছে কী-না সে বিষয় সন্দেহ হয়। যে সব ধর্মগুরু ম্যাজিক দেখিয়ে অন্ধ শিষ্যদের পাকড়াও করেন, তাঁদের খুব বড় সাধক বলে যারা ধরে তারা মূর্খ।

তরুণতর শিল্পীর মধ্যে যাদের [illegible] নিজের মতো করে ছবি আঁকছেন। এটা একটা আশাপ্রদ নতুন লক্ষণ। তবে, একজন শিল্পীর পরিণতিতে পৌঁছতে পাঁচ থেকে দশ বছর লাগে। ম্যাক্সমুলার ভবনে একটা যৌথ প্রদর্শনী দেখে একথা মনে হলো (১৬-৩০শে নভেম্বর)। এঁদের তিনজন স্বাধীনতা পরবর্তী আমলে জন্মগ্রহণ করেছেন।
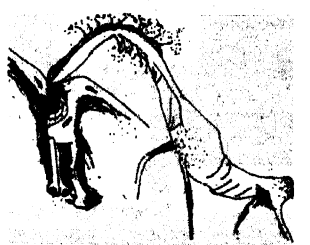
সুনীল দে (জন্ম ১৯৪৮) তৈলচিত্রে রঙের চরিত্রটা মোটামুটি

আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের রচনা এবং রূপারোপে এখনও কিছু শিক্ষানবিশী দুর্বলতা আছে। বিশেষত কসরৎ দেখানোর দুর্মদ ইচ্ছা। কিন্তু এসব ক্রমে কেটে যাবে। গভীর কোনো উপলব্ধি আসবে মনে হয়। মেয়েদের ঝুলন্ত বুক, মানুষের উত্তোলিত হাত, যা জ্যামিতিক আকারের ভেতর শায়িত মূর্তির মধ্যে তখন নিবিড় কোনো ব্যঞ্জনা আসবে। তখন পাহাড় আর ওদেলিয় রেদোঁর এক চক্ষু দৈত্যরা অকারণে পটে হানা দেবে না। রঙ চাপানো, পটের বাকলে বুনোটের কারুকৃতি ভাল লেগেছে। বিশেষত মৌলিক এবং প্রধান যৌগিক বর্ণ ব্যবহারের বিশেষত্ব চোখকে বেশ খানিকটা টেনে রাখে।

প্রশান্ত নিয়োগীর (জন্ম ১৯৫২) কাজ ছাত্রসুলভ হলেও ভীষণ তাজা। টগবগ করছে রক্ত। আর চারপাশের পৃথিবীটা নিজের মতো দেখার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আছে। প্রশান্তর তুলি চালনার মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। ঘন রঙের আস্তরণ দিয়ে পট ঢেকে তার মধ্যে ঝড়, ঘূর্ণিবায়ু বইয়ে দেন। আর পুরনো নতুন মোটরগাড়ির মধ্যে হঠাৎ একটা মিরাক আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু [illegible] মনে হয় তার উপস্থিতি। তিনি বেশ একটু নতুন দৃষ্টি দিয়ে রেখা সাবলীলভাবে গড়িয়ে দেন, কখনো সম্মোনতি (contour) রেখা ব্যবহার করেন এই অস্থিরতা বজায় রেখে তাঁকে আর একটু আত্মস্থ হতে হবে। তাঁর কাজে এখনও আধুনিক ফরাসী শিল্পকলার গন্ধ একটু বেশি।

রেবন্ত গোস্বামীর (জন্ম ১৯৫৩) রেখাচিত্রে অদ্ভুত সব চিত্রকলা। অনেক ক্ষেত্রে শিশুচিত্রের রূপারোপ ব্যবহার করেছেন আদিমতা আনার জন্যে। রেখা খুবই ধারালো। সাবলীল। এখানে মাটির নীচে আলুর মানুষের মতো বিচিত্র মুখ এবং চরিত্র থাকে। মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে কুকুর। মুরগী চরে বেড়ায়। অনেক সময় রূপকথার সচিত্রকরণের কাছে চলে আসেন নিজের অজ্ঞাতে। গোসাঁইজীর ছাপ-ছবি এবং রেখাচিত্রের সঙ্গে দুটি প্রদর্শনীতে আলাপ হলো। তৈলচিত্র এবং জলরং [illegible]

রূপে আসল আসল

অলোক ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪২) এঁদের মধ্যে পরিণত কাজ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ কাজগুলি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি কয়েক সপ্তাহ আগে।

তুলি-কালির কাজ

সমীর ঘোষের কাজে কারিকুরী থাকে কিছু। সব সময়ই। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকে কম। দেশলাইয়ের মতো দপ করে জ্বলে উঠে ফস করে নিবে গিয়ে অন্ধকারের ওজন বাড়িয়ে দেয়। আমি ক্রমাগত একটা কথা বলে চলেছি—ছবিকে প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না তিনি। তার কারণ তাঁর প্রতীক, চিত্রকল্প এবং এমন কি চিন্তাধারাও ধার করা।

গত যুদ্ধের সময় হিটলারের কড়া শাসনে অস্ট্রিয়ার মানুষদের একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। অত্যাচারের আশংকায় বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করতে হয়েছিল। ফলে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অস্ট্রিয়ায় তৈরী হয় 'স্কুল অব ফ্যানটাস্টিক রিয়ালিজম'। 'কলা-বাস্তব কৌশল' সদবাস্তবের পুনরুত্থিত রূপ। ভিয়েনা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের জন্মস্থান। সুতরাং দুঃস্বপ্নকে বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করা অস্ট্রীয়দের পক্ষে সহজ।

ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছেন সমীর ঘোষ। নেভিল স্যুট বা 'এ ক্যানটিকাল ফর লাইবোভীৎস'-এর মতো তৃতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস পড়ে কল্পনায় তিনি ভীত হতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা না-থাকলে ছবি কেমন হতে পারে সমীর ঘোষের ছবি তার প্রমাণ। ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে তেজস্ক্রিয় মেঘ এবং ফোলানো-ফাঁপানো জলোচ্ছ্বাস তাঁর প্রধান চিত্রকল্প। ধরে ধরে চুলের মতো সরু সরু রেখা মিলিয়ে ঢেউ। আছে সাদা এবং কালোর মধ্যবর্তী ধূসর ছায়া। গাছের মতো দেখতে তেজস্ক্রিয় ছত্রকের ওপরে কখনো ষাঁড়ের মাথা, কখনো পাগলা ঘোড়ার ভয়ংকর মুখ। জড়াজড়ি করে আছে নর-নারী। কল্পনার তীব্রতা থাকলে এই বিষয় কেমন হতে পারে দেশের প্রচ্ছদে কিছু দিন আগে হেন্সোরের মুদ্রিত ছবির কথা চিন্তা করলে বোঝা যায়। সাদা-কালোর সুষ্ঠু ভাগ-বাটোয়ারা, শূন্যতার অবসর এবং রেখার জাল তৈরী করা, সূক্ষ্ম মোটা রেখার খেলা, এসব দিয়ে প্রযুক্ত শিল্পেও নানা কাজ হয় এবং বিজ্ঞাপনে চলে। ভুল অংকন এবং ছবি ধরে ধরে মিলিয়ে মিলিয়ে হিসাব করে আঁকা যায় না।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

পার্কসার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন

এ বছরে পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলনের (কলামন্দির, ফেব্রুয়ারী ৯, ১০, ১১) প্রথম সন্ধ্যায় শোনা আসাদ আলী খাঁর বীণা বাদন। এঁর বাগেশ্রী রাগে আলাপ শুরু হয় ধীর, গম্ভীর ও তিন স্বরে নির্মিত খড়জের মীড়েব কাজ দিয়ে। পরিকল্পনা ছিল পরিপক্ক এবং তীব্র কোমল গান্ধার ও নিষাদ বড় চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নায়কি তারে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে স্বরবিন্যাসে একটি সূক্ষ্ম দোলন সংযোজিত হল এবং এই দোলনের উপযুক্ত স্থানে ঝোঁক বা মেজরাবের বোল ব্যবহার করে শিল্পী অতি সাধারণ স্বরবিন্যাসের মধ্যেও অদ্ভুত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। লপেটের কাজও হয়েছিল অতি মনোরম। অবশ্য তিনি অন্তরার ষড়জ লাগানোর আগে ধ্রুপদী কায়দায় যথেষ্ট ভিত তৈরী করেন নি।

জোড়ে লহক, গমক, প্রক্ষেপ, মীড়খণ্ড ও তানের প্রয়োগ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। উলটো-ঝালা, ঠোঁট-ঝালা ও লড়-লপেটের কাজও ভাল লেগেছে। চৌতাল গৎকারিও মন্দ হয়নি কিন্তু শিল্পী সাথ-সঙ্গত পর্যায়ে অন্তত পাঁচবার সমে পৌঁছতে অক্ষম হয়েছিলেন। পাখা-ওয়াজ সঙ্গত করেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সুর পঞ্চম গোষ্ঠীর কণ্ঠে হনুমন্ত মতের ছয় রাগের রূপায়ণ দিয়ে। এর পরে ছিল চিত্রেশ দাসের কথক নৃত্য এবং ইনি ঠাট, চক্রধর (বিশেষ করে বাঁ পায়ের চক্রধর যাতে তিনি গোড়ালির ওপর ঘুরতে ঘুরতে পায়ের ডগা দিয়ে প্রথমে পাঁচ ও পরে নয় 'ধা' বাণী সংযোজন করেন) রেলা-বিস্তার তৎকার ও সওয়াল-জবাবে পারদর্শিতা দেখান। তাঁর চার অ্যামেরিকান ছাত্রীর নাচও ভালই হয়েছিল। এঁর পরের শিল্পী পুষ্পেন সেনের পুরিয়া-কল্যাণ খেয়াল দুটিতে বিস্তার ও তানের কাজ সুরেলা ও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। তবে অন্তরা বিস্তারের সময় চারবার ধ ন র্ঋ ন ধ এবং দুবার ধ ঋ ন ধ পদ ব্যবহার হওয়ায় মারোয়ার ছায়া এসে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় সন্ধ্যার দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন মুনওয়ার আলী খাঁ এবং এঁর প্রধান নিবেদন ছিল মারোয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল ও

আসাদ আলী খাঁ

তারাণা। বিস্তারের কাজ সুপরি-কল্পিত ও মেজাজী হয়েছিল এবং ঢিমে, দুই সপ্তকব্যাপী সরগমের কাজে বক্র স্বরবিন্যাসেব বাহার ছিল। উপযুক্ত জায়গায় গমক ও অবরোহী সপটের ব্যবহার বিস্তারের উপভোগ্যতা বাড়িয়ে ছিল। তবে ঋ ধ ন র্স পদের মাধ্যমে অন্তরার ষড়জে যাওয়া ঠিক হয়নি কারণ এতে সোহিনীর ছায়া এসে যায়। খানিকক্ষণ ধ ন র্ঋ ন ধ বিস্তার করার পর ধ র্স অথবা ধ র্ঋ র্স পদের মাধ্যমে ষড়জ লাগালে মারোয়ার আসল রূপ ফুটে ওঠে।

বিলম্বিত খেয়ালটির শেষাংশে সুপরিকল্পিত ও জোরদার বড়-পাল্লার গমক তানকারি ছিল এবং তানে জো-অঙ্গে ছন্দ সংযোজনও উৎকৃষ্ট হয়েছিল। বিস্তার, দ্রুত সরগম ও অবরোহী তানের মিশ্রণও ভাল লেগেছে। দ্রুত খেয়ালটিতে শোনা গেল মজাদার ছন্দযুক্ত দুনি সরগম, উচ্চাঙ্গের দুনি ও দ্বিগুণ-দৌড় তান, লম্বা তান ও সরগম নির্মিত তেহাই এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলতান বা দ্রুত সপটের মাধ্যমে মুখড়ায় এসে পড়ছিল। তারাণাটিও

মুনাওয়ার আলী খাঁ

ভাল হয়েছিল এবং তবলাবাদক শংকর ঘোষ ও হারমোনিয়ম বাদক মোহনলাল শর্মা অনুষ্ঠানের প্রথম থেকেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গত করেছিলেন। পরের কেদারা রাগে তারাণাটিতে নিপুণ রাগ-বিস্তার ও তানকারির চিত্তাকর্ষক মিলন ঘটেছিল। স্বর্গীয় বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবের একটি প্রখ্যাত ঠুংরী 'ইয়াদ পিয়া কি আয়ে' ও 'হরি ওঁ' গেয়ে শিল্পী অনুষ্ঠান শেষ করেন। এদিনের অনুষ্ঠান মিত্রা বালসুব্রামনিয়মের ভরতনাট্যম দিয়ে শুরু হয়।

এইদিনের শেষ শিল্পী ছিলেন শিশিরকণা ধর চৌধুরী এবং এঁর বেহালায় হেম-বেহাগের খাঁটি রূপ ফুটে ওঠে আলাপ অংশে। তাঁর পরিকল্পনা সব অংশে নিখুঁত হয়েছিল এবং তিনি সবসময় আরোহণ-অবরোহণ মিশিয়ে স্বর-বিস্তার করেছিলেন যা এ রাগটি সঠিকভাবে বাজানোর একমাত্র পন্থা। গ ম র স সব কাজের শেষেই ব্যবহার হয়েছিল এবং প ধ ন প ধ প-ম অংশে শিল্পী কিছু উৎকৃষ্ট নকশা বুনেছিলেন। জোড়ে বেহাগ সুলভ গ ম গ (র) স পদ একটু বেশী প্রাধান্য পাওয়ায় রাগরূপ একটু এলো মেলো হয়ে পড়ে তবে গমক-তান ও বোলতঙ্গের কাজ ভাল হয়েছিল। শংকরা রাগে গৎ দুটি পুনরাবৃত্তিপূর্ণ ছন্দ ও তানের কাজের ভারে সুখশ্রাব্য হতে পারে নি।

রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়েকের মালকোষ রাগে বিলম্বিত খেয়াল শুনে বোঝা গেল যে চিন্তাশীলতা ও স্বর বিস্তারে নিপুণতার অভাবে মালকোষের মত রাগও সংকীর্ণ এবং নিষ্প্রভ শোনাতে পারে। মধ্যলয় অংশে প্রাথমিক গমক ও ছন্দের কাজ খাপছাড়া ও উদ্দেশ্য-হীন মনে হয়েছে তাঁর চিরাচরিতের গলাসাধা পালটা গোছের নকশার মাধ্যমে অতি-তার ষড়জ লাগানোর প্রচেষ্টা (যা এক সময় খুব হাততালি কুড়োত) চিরাচরিতের নিয়মে বেশীর ভাগ সময়ই সুরচ্যুত হয়েছিল। অতিতার ষড়জটিও প্রত্যেকবারই প্রথমে কয়েক শ্রুতি নিচে লেগে শেষকালে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সুরের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। এই স্বর থেকে যে গমক-গুলি নেমেছিল সেগুলিও অতি কর্কশ ও প্রায়ই বেসুরো হয়েছিল। দ্রুত খেয়ালটির ছন্দপ্রধান সরগমের কাজগুলি যে-কোনো সাধারণ সংগীত শিক্ষার্থীও গাইতে লজ্জা পেতেন। দুনি গমকতানগুলিও কর্কশ ও কাঠামোর দিক থেকে অতি মামুলি লেগেছে। তারাণার তানগুলি এর চেয়ে সামান্য ভাল হয়েছিল।

এঁর পরের শিল্পী ছিলেন সরোদীয়া ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ এবং এঁর দরবারী-কানাড়া রাগে আলাপ ও জোড় কাঠামোর দিক থেকে খাপছাড়া ও প্রায়ই রাগভ্রষ্ট হয়েছিল। ইনি দরবারীর তথা কানাড়া অঙ্গের অন্যতম প্রধান জ্ঞ ম র স বিন্যাসের জায়গায় অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞ র স ব্যবহার করেছেন এবং গান্ধার শ্রুতি ঠিকভাবে না লাগায় এই স্বরটিকে প্রায়ই দেশী-তোড়ী বা কাফির গান্ধারের মত

শুনিয়েছে। আবার তিনি ভৈরবীর কায়দায় জ্ঞ ম প দ ম প জ্ঞ ব্যবহার করেছেন এবং সিন্ধু-ভৈরবীর কায়দায় জ্ঞ র ণ্‌ দ্‌ কাজে লাগিয়েছেন। তিনি জায়গায় জায়গায় ণ্‌ প্‌ র বিন্যাস এতক্ষণ ক্রমাগত ভাবে ধৈবৎ বা গান্ধার না লাগিয়ে বাজিয়ে গেছেন যে রাগটিকে সে সময় মধ্‌মদ্‌-সারং, একপ্রকার মেঘ, সুহা বা নায়কি-কানাড়ার মতন শুনিয়েছে। জোড়ে পল্লাশ-কাফি জ্ঞ র ণ্‌ প্‌ ও সুহার প ণ স র জ্ঞ শোনা গেল। দ্রুত-জোড়টি তুলনায় খানিকটা ভাল লেগেছে কিন্তু শিল্পী এই রাগের অতিকোমল ও তীব্রকোমল শ্রুতিগুলি না ব্যবহার করায় এ অংশটিও প্রশংসনীয় নয়। দ্রুত তোড়ার কাজ নিম্ন মানের হয়েছিল এবং ঝাল্লার কাজ সুরচ্যুত হতে হতে তার ও অতিতার সপ্তকে একেবারে বেসুরো হয়ে পড়েছিল।

জিলা-কাফি রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ দুটি তুলনায় খানিকটা ভাল হলেও এগুলিতে শিল্পী জৌনপুরীর কায়দায় কোমল ধৈবৎ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছিলেন প র্স ণ-দ প বিন্যাসে। সওয়াল জবাব পর্ব শেষের দিকে প্রায় প্রহসনের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। একটি পিলু ধুন বাজিয়ে শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

এরপর শোনা গেল ওস্তাদ সরাফত হুসেন খাঁর বৈরাগী রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। শিল্পী অবশ্য রাগটিকে বৈরাগী-ভৈরব বলে ঘোষণা করিয়ে ছিলেন। বৈরাগী-ভৈরব ভৈরব ঠাটের নিষাদ বর্জিত ষাড়ব-ঔড়ব জাতির রাগ এবং এর প্রচলন আজকাল একেবারেই নেই। শিল্পী যে রাগটি গেয়েছিলেন তার নাম বৈরাগী, ব্যবহারিত স্বর স ঋ ম প ণ—অর্থাৎ ঠাট ভৈরবী ও জাতি ঔড়ব-ঔড়ব—এবং রচয়িতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এ রকম ঘোষণা অতিশয় ক্ষতিকর।

যা হোক যেহেতু শিল্পী তাঁর প্রত্যেকটি স্বরবিন্যাস মধ্য সপ্তক ষড়জে টেনে নিয়ে গিয়ে রাগের অংশ স্বরগুলিকে প্রাধান্য দিতে নারাজ হন, দীর্ঘ বিস্তারপর্ব প্রচণ্ড রকম একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং রাগের পূর্ণ-বিকাশও হয় না। উল্লেখনীয় যে এই রাগের প্রায় প্রত্যেকটি স্বরকেই মোকাম করে বিস্তার করা যায় রাগটির কাঠামোর গুণে। তানকারি ও সাথ-সংগতের কাজ অবশ্য উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং সাথ-সংগতের অংশে মহাপুরুষ মিশ্র ভাল তবলা বাজিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী তরুণ সেতারী বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় বাজিয়েছিলেন মিয়াঁকী-তোড়ী রাগে আলাপ, জোড় ও দ্রুত তিনতাল গৎ। আলাপের প্রথম দশ মিনিট ধরে খালি মন্দ্র-উত্তরাংগ (অর্থাৎ ক্ষ্ম্‌ দ্‌ ন্‌ স) বিস্তার হয় এবং অবরোহী জ্ঞ-ঋ মীড়ের মাধ্যমেই মাঝে মাঝে গান্ধার প্রয়োগ হয়। পূর্বাংগের ঋ জ্ঞ ও ঋ জ্ঞ ম বিস্তারও দীর্ঘস্থায়ী ও নিপুণ হয়। পঞ্চম লাগার পর থেকেই শিল্পী কিন্তু রাগভ্রষ্ট হতে আরম্ভ করেন মধ্য-উত্তরাংগে (অর্থাৎ মধ্যসপ্তকের ক্ষ্ম দ ন অংগে)। ন দ প বিন্যাসে এত দুর্বল ও নিষাদ এত প্রবল হয়ে পড়ে যে মুলতানির ছায়া এসে যায়। ক্ষ্ম দ ন দ প বিন্যাসেও একই গলদ ধরা পড়ে এবং পূরিয়া-ধানেশ্রীর মতন শোনায়। ক্ষ্ম দ ন প বিন্যাসে খালি নিষাদ প্রবল হয় না নি-প সংগতিও এসে পড়ে। যেহেতু এই দুই স্বর মিয়াঁকী-তোড়ীর অংশ-স্বর নয় (অংশ-স্বর স জ্ঞ দ, গ্রহ ধৈবৎ ও অপন্যাস গান্ধার) এই সংগতি একেবারে ভ্রান্ত এবং শুনতে একেবারে বেমানান।

এই অংশে সঞ্চারী বর্ণ ঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়ায় শিল্পীর অন্তরা-গামী বিন্যাস ক্ষ্ম দ ন র্স যখন ব্যবহার হয় তখন শ্রোতার মন থেকে গান্ধারের অস্তিত্ব মুছে গেছে)। আগের ভ্রান্ত স্বর বিন্যাসগুলিও এর জন্য দায়ী) এবং শিল্পী এই বিন্যাসের ধৈবতে যথেষ্ট জোর না দেওয়ায় মনে হল যেন পরজ বা পরজ-বসন্ত বেজে উঠলো। শিল্পী যখন সংগে সংগে একই ভাবে ক্ষ্ম দ ন র্স র্ঋ র্স বাজালেন তখন এই ভ্রান্তি আরো গাঢ় হল।

উত্তরাংগের এই ভ্রান্তিগুলি জোড়েও ছিল উপরন্তু জ্ঞ ক্ষ্ম প ক্ষ্ম প ক্ষ্ম জ্ঞ বিন্যাসে আরোহী পঞ্চম এসে পড়ে এবং বলাই বাহুল্য মুলতানির ভাবও। জোড়ের শেষাংশে এবং দ্রুত গৎটিতে সুপরিকল্পিত, সুপরিবেশিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তানকারি ছিল কিন্তু যেভাবে এগুলির আগে রাগরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছিল, তানকারিতেও আনন্দ পাওয়া গেল না। এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করে দিল যে কেবল নিপুণ অলংকরণ ও তান-তোড়ার মাধ্যমেই একটা অনুষ্ঠান দাঁড়াতে পারে না—রাগ-রূপায়ণও নিপুণ হওয়া চাই।

রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানটি দিল্লীর ব্রজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং এঁর পেশকার টুকরা, চক্রদর, গৎ-নিকাশ ও লয়কারি দক্ষ হলেও এতে সাবলীলতার অভাব ছিল। ভাল তবলা সংগত করেছিলেন দিল্লীর লতিক আহমেদ।

নীলাক্ষ গুপ্ত

পূরবী-বিভাস

এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র গানের অনুষ্ঠান নয়, এই অনুষ্ঠান আত্মপরিচিতির, হয়তো বা আত্মবিশ্লেষণের। মাঘ মাসের একটি সকালে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার আয়োজিত এই সংগীতানুষ্ঠান ঠিক সেই সময়ে অনুষ্ঠিত যখন শীত ও বসন্ত একাকার হয়ে থাকে। স্টার রংগমঞ্চে সেদিন সকালে বিগত দিনের শিল্পীরা আগামীকালের প্রতিভাদের আশীর্বাদ জানালেন।

'বিগত' শব্দটি হয়তো সঠিক নির্বাচন নয়। কারণ প্রবীণ শিল্পীরা যে রকম অনায়স দক্ষতায় গান করলেন, সেই অবলীলায় নবীন শিল্পীরাও উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত। অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হল অমিয়া ঠাকুরের গান দিয়ে। মূল গানের পর তিনি গাইলেন 'কী ধ্বনি বাজিল'। সংগে এসরাজে সহযোগিতা করলেন সুভাষ চৌধুরী. প্রথম গানেই শ্রোতাদের শ্রবণে বিদ্যুৎ শিহরণ। প্রত্যেকটি শ্রোতা গায়কীর মহিমার কাছে বয়সকে 'হার মানতে দেখে বিস্মিত হলেন। সকলের অনুরোধে অমিয়া ঠাকুর এর পর গাইলেন সেই বিখ্যাত গান 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। অতুলপ্রসাদের গান শোনালেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুপ্রভা সরকার যে নজরুলগীতি গাইলেন, সেই গানে একই সংগে কাব্য ও সুরের যুগ্মবেণী। একালের অনেক জনপ্রিয় শিল্পীদের গানে সুরের কায়দার কাছে কাব্য পরাভূত হয়, কোন কোন জায়গায় কথার উপরে অতিরিক্ত আবেগের জন্য সুরবৈচিত্র্য নির্বাসিত হয়। সুপ্রভা সরকার যে রকম দাপটে 'সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে' অথবা 'কাবেরী নদী জলে' গান করেন, তখন সমস্ত শ্রোতা মাঝে মাঝেই সহর্ষ অভিনন্দন জানান। অনেকদিন বাদে যথার্থ বৈঠকী গানের আমেজ পাওয়া গেল। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন অখিলবন্ধু ঘোষ। অখিলবন্ধু ঘোষ আধুনিক গান করেন, কিন্তু সেই আধুনিক গানের জাত আলাদা, এবং তাঁর রাগপ্রধান গান শুনলে বোঝা যায়, সংগীতশিল্পী হিসাবে তিনি কতটা পরিশ্রমী এবং নিবেদিত। স্বকীয়তাই তাঁর মূলধন। অথচ দীর্ঘ শিল্পীজীবনে যোগ্য সমাদর লাভ হয়নি। সেদিনকার গানের অনুষ্ঠানে যখন কেদাররাগের 'আজি চাঁদনী রাতে গো' গানের সঞ্চারীতে বসন্ত এসে মিলে যায় অবলীলায় অথবা সেই বিখ্যাত 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' গান শুনে শ্রোতারা উপলব্ধি করেছেন যোগ্য শিল্পীকেই সম্বর্ধনা জানান হয়েছে। যাঁর সাহায্যার্থে এই অনুষ্ঠান সেই নীলমণি পাল একটি গান শোনান।

যদিও অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'বন্দনা ও অভিষেক', কিন্তু বন্দিত ও অভিষিক্ত করার জন্য এত কথা বলা হয়েছে যে মনে হয় অনুষ্ঠানের নাম 'বন্দনা, অভিষেক ও কথকথা' বললে মানানসই হত। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে বেশ কিছুটা দেরী করলেন, তারপর মাত্রাতিরিক্ত বক্তৃতা অযৌক্তিক বিশেষণের বোঝায় অনেক বেলা গড়িয়ে গেল। বিশেষণের প্রলোভন বড় গোলমালে ফেলে, মাত্রাজ্ঞানের অভাবে উদ্যোক্তাদের খেয়াল ছিল না, অমিয়া ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীতের যে আসন, আধুনিক গানে অখিলবন্ধু ঘোষের সেই আসন নয়। এই কথামালার পর গানের সময় কমে গেল, ফলে যাঁদের পরিচিতির সব.চেয়ে জরুরী ছিল সেই সব নবীন শিল্পী নির্বাচিত তিনটি গানের জায়গায় দুইটি (কেউ বা একটি) গান গাইলেন এবং প্রায় ট্রেন ধরার মত তাড়াহুড়ো করে।

ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার সত্যিকারের কয়েকজন সম্ভাবনাময় আগামী দিনের শিল্পীর সংগে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেক শিল্পী কোথা থেকে কিভাবে গান শিখছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়াও একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী নূপুর চক্রবর্তী গান গাইলেন দাপটে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর মত। আর একজন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী আশিস ভট্টাচার্যের গানে শুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতের নিষ্ঠা সহজে উপলব্ধ

অমিয়া ঠাকুর

সুপ্রভা সরকার, অনীতা মজুমদার

হয়। অতুলপ্রসাদের গানে মঞ্জুশ্রী গুহের সুন্দর কণ্ঠ তাকে মর্যাদা এনে দিতে পারে। আরও একটু অনায়াস হলে মঞ্জুশ্রী নিশ্চিন্তভাবেই চিহ্নিত শিল্পী হবেন। আঙ্গুরবালার ছাত্র শ্যামল মুখার্জী সেদিন নজরুলগীতির অনুষ্ঠানে অবাক করেছেন। একজন সার্থক শিল্পীর যে যে গুণ দরকার, শ্যামল মুখার্জীর সেই সব গুণই আছে। যে কোন সুরের অনুষ্ঠানেই শিল্পীর গান সমাদৃত হতে পারে,

শক্তি ঠাকুর

নবীন প্রতিভার হ্যান্ডিকাপ নিয়ে নয়, যথার্থ শিল্পীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আধুনিক গানের শিল্পী শান্তনু ভট্টাচার্যের গায়কীর পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন আর একটু স্বকীয়তার। এই আসরে দু'জন শিল্পী ঠিক নবীন প্রতিভা নয়। শক্তি ঠাকুর ও অনীতা মজুমদার ইতি-মধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে বেশ কিছুটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তবে সেদিনকার অনুষ্ঠানে, দু'জনের গান শুনে এটা বেশ বোঝা গেল, আগামী দিনের শিল্পী তালিকায় এঁরাই হয়তো শিরোনাম হবেন। অনীতা মজুম-দারের নজরুলগীতি, শিল্পীর রেওয়াজী কণ্ঠ এবং সঙ্গীত পরি-বেশনের স্বভাবনৈপুণ্য প্রমাণ করেছে। শক্তি ঠাকুর গেয়েছেন আধুনিক গান। একখানি গান জীবনানন্দ দাসের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার গীতিরূপ। অপরটি কেদাররাগাশ্রয়ী একটি গান। দু'ধরনের গানেই তিনি অনন্য। প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি কথা মনে পড়ল; প্রবীণ শিল্পীরা গেয়েছেন মন থেকে কিন্তু নবীন শিল্পীরা গানগুলি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শই গেয়েছেন খাতা বা কাগজ দেখে। এর থেকে প্রমাণিত হয় কিছু কিছু গান আসে প্রাণের তাগিদে, আর কিছু গান হয় কাজের তাগিদে। নবীন শিল্পীরা কর্মব্যস্ত থাকুন, এটা আমাদেরও কাম্য, কিন্তু শিল্প যান্ত্রিক হলেই আমাদের আপত্তি। সব শেষে আসরে উপস্থিত হলেন, বিতর্কিত তরুণ পানের দল 'মহীনের ঘোড়াগুলি' বিতর্কের অবসান হোক। সেদিনের অনুষ্ঠানে নির্ভুল-ভাবে প্রমাণিত ঘোড়াগুলির প্রতিভা আছে কিন্তু 'গৃহিনীপণা' নেই। বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ ঘোড়াগুলির তেজ আছে, ওঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন "দূর হটো এ ক্লিটিকওয়ালে, ইয়ে গান তো হামারা হ্যায়।"

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

নাট্যোৎকলার অনুষ্ঠান

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এক উৎসবের মাধ্যমে ভুবনেশ্বরের নাট্যোৎকলা সংস্থা ওড়িশা প্রদেশের যে লোক ও ধ্রুপদী শিল্পের পরিবেশন করে তা কলিকাতার শিল্প রসিকদের কাছে এই বছরের অন্যতম উপভোগ্য অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মাহারিদের শ্রেষ্ঠ নৃত্য, যা শুধু পুরীর জগন্নাথের সামনে উপস্থাপন হত পুরাকালে, সেই ওড়িশী নৃত্য থেকে শুরু করে গঞ্জাম জেলার লোকনৃত্য পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করার কঠিন কাজ নাট্যোৎকলা প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন করে। শুধু নাচ নয়, সঙ্গে ছিল প্রখ্যাত কণ্ঠ-শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়কের উচ্চাঙ্গ সংগীত। সাম্বলপুর ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের লোকসংগীত পরিবেশন করেন জনগণের শিল্পী ফকীরমোহন পট্ট-নায়ক ও রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জ। কলিকাতার সংগীতরসিকদের কাছে এই দুই লোকসংগীতকারের এই বুঝি প্রথম অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনের প্রথম অনুষ্ঠান 'শংখ-বাদন' এই উৎসবের যথাযথ সূত্রপাত করে। উৎসবের মূল সুর—ব্যক্তিগত প্রতিভার সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়—এই আশ্চর্য লোকশিল্পের উপস্থাপনাতেই ফুটে উঠেছিল। পরবর্তী অনুষ্ঠান ওড়িশী ভঙ্গিতে পরিবেশিত গীত-গোবিন্দম নৃত্যনাট্য স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের উপস্থিতির জন্য। তাঁর জয়দেব আর

সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর কৃষ্ণের নৃত্যের সাথে রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর হৃদয়হারী গানের মিলনে নৃত্যনাট্যটি অনবদ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে নাট্যোৎকলা কলি-কাতার মেয়ে ওড়িশী নর্তকী অলকা-নন্দা রায়কে মঞ্চে উপস্থিত করে। অলকানন্দার এই প্রথম মঞ্চে অবতরণ, সেই হিসাবে তার নাচ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। দোষের মধ্যে বলা যায় ওড়িশার প্রধান বৈশিষ্ট্য—বর্তুলাকার অঙ্গচালনা—তার নৃত্যে আরও বেশি করে ফুটে ওঠা উচিত ছিল।

পরবর্তী অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জ ও ফকীরমোহন পট্টনায়ক ওড়িশার সমৃদ্ধ লোকসংগীতের সঙ্গে শ্রোতাদের পরি-চয় করিয়ে দেন। কিন্তু সে দিনের চিত্তজয়ী লোকশিল্পী ছিলেন শ্রীহরি নায়ক যাঁর ছো 'নটরাজ' দর্শকদের বহুকাল মনে থাকবে।

শেষ দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর একক ওড়িশী নৃত্যানুষ্ঠান। কলিকাতার নৃত্যামোদীরা তাঁকে ওড়িশী নৃত্যের সেরা শিল্পী হিসাবে জানে। এবারের অনুষ্ঠান দেখে মনে হল তিনি তাঁর উচ্চমানকেও ছাড়িয়ে গেছেন—বিশেষ করে তাঁর পল্লবি ও অভিনয় অংশে। এবং রঘুনাথের গানের এমনই গুণ যে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও আবেগ এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে এই নৃত্যকে ঘিরে।

ভগবান সাউর দলের লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান এই উৎসবের উপযুক্ত উপ-সংহার হয়েছিল। গঞ্জামের বিখ্যাত রণপা বা ছাড়েয়া লোকনৃত্যের অংশ গ্রহণকারী বালকদের মধ্যে পরিলক্ষিত ঐকবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালন ও অনায়াস ভঙ্গি কলিকাতার মঞ্চে বাড়ন্ত যৌথ নৃত্যানুষ্ঠানের অল্প শিক্ষিত শিল্পী-দের অবশ্য অনুধাবনযোগ্য।

বিক্রমন নায়ার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

শুভদা

শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপের আবেদন যে এখনও যথেষ্ট তার প্রমাণ রূপচক্রের সাম্প্রতিক প্রযোজনা শুভদা। তবে কোন উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপের ক্ষেত্রে সতর্ক নজরের প্রয়োজন। উপন্যাস বা গল্প যেভাবে বা যে ছন্দে চলে নাটকের ক্ষেত্রে সে চলার কিছু পার্থক্য আছে। মাধ্যম পরিবর্তন এর অন্যতম কারণ। উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন নাটকে তা নয়। নাটক নিশ্চয় মূল কাহিনীকে বিকৃত করবে না, কিন্তু উপন্যাসের গতিও নাটকের ক্ষেত্রে কাম্য নয়: রূপচক্রের শুভদার নাট্যরূপের দুর্বলতা বড় বেশি করে প্রকট। হারু রায়ের নাট্যরূপে অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। নাট্যরূপের দুর্বলতা সমস্ত নাটকটাকেই সমগতিতে ধরে রেখেছে। নেশার বশীভূত একটা মানুষ কিভাবে গোটা সংসারে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এটাই নাটকের বিষয়বস্তু। শুভদার ত্যাগ তিতিক্ষার কাহিনীই নাটকের মূল ঘটনা। অভিনয়কে মূলধন করে নাট্যরূপের দুর্বলতা যতখানি ঢাকা সম্ভব অভিনেতা অভিনেত্রীরা সে চেষ্টায় সফল হয়েছেন।

মঞ্চে একটি গ্রাম্য গৃহ বা বজরার ছবি ব্যবহার করে শুভদার ঘর বা সুরেন্দ্রনাথের বজরার দৃশ্যের ব্যবহার নিঃসন্দেহে অন্য ব্যঞ্জনা এনেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই জোনাল অভিনয় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়নি। জ্ঞানেশ মুখার্জীর নির্দেশনায় সময়ের অভাব অনুভূত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। হয়তো আরও কিছু সময় নির্দেশনার জন্যে বরাদ্দ করলে কতকগুলি ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া যেত। কোন কোন অঙ্কের পরবর্তী দৃশ্য-শুরু হওয়ার পরেও আগের দৃশ্যের শেষ হয়নি। পরিচালনার আর অন্যান্য ত্রুটির দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যরূপের দুর্বলতার জন্য। মূল কাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বস্ততার ও অনুসরণের প্রচেষ্টার ত্রুটিতার পরিচালককে বহন করতে হয়েছে। এই কারণেই শুভদার পরিচালনায় যে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি ছিল তা বিনষ্ট হয়েছে।

তবে সব দুর্বলতা ও ত্রুটির অধিকাংশ দায়ভার মোচন করেছেন শিল্পীরা। শুভদার ভূমিকায় গীতা দে, অভিনয়কে যে কোন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায় তার প্রমাণ দিয়েছেন। কোন কোন দৃশ্যে যেখানে অতি নাটকীয়তার সম্ভাবনা ছিল প্রবল সেখানে গীতা দের সংযম লক্ষ করার মত। মাধবের মৃত্যুর দৃশ্যে মায়ের যন্ত্রণাকে তিনি ভোকাল না করে শুধু মাত্র অভিব্যক্তির সাহায্যে প্রকাশ করে যন্ত্রণাকে আরও তীব্র করতে সক্ষম হয়েছেন। নেশাখোর হারানের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। নেশা

এবং সংসারের প্রতি ভালবাসা এ দুয়ের দ্বন্দ্বকে নিপুণ শিল্পীর মত তিনি প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানেশ মুখার্জীর অভিনয়ে কখনও সামান্য অতি নাটকীয়তার প্রশ্রয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে অতি নাটকীয়তা সম্ভবত কাহিনীর জন্যেই। ললনার চরিত্রে কল্যাণী মণ্ডল আদ্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেছেন। বিধবা ললনার যৌবনের জ্বালা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ উভয়কেই সার্থক-ভাবে উপস্থিত করেছেন কল্যাণী। ললনার অভিনয়ের পাশাপাশি সুরেন্দ্র-নাথের ভূমিকায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিষ্প্রভ বলে বোধ হয়েছে। ফিল্মের নায়কের মত মুভ করার ব্যাপারে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য যতখানি যত্নবান ততখানি অভিনয়ের ব্যাপারে বোধ হয় নি। যে দৃশ্যেই সুরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি ঘটেছে সেই দৃশ্যেই দলগত অভিনয়ও কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় প্রভাত বোস, সঞ্জয় ভোস, সঞ্জয় দত্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাঃ জমিদার স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। কণিষ্ক সেন কৃত আলোর প্রয়োগে কিছু কিছু দেখার মত কাজ আছে তবে নাটকে আলোর আর একটু দ্রুত ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য
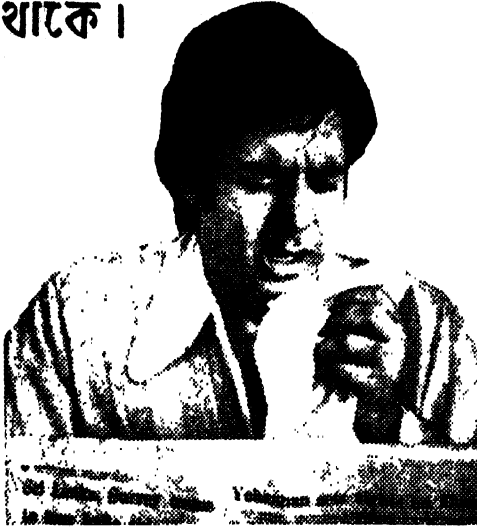
প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

হরকৃষণ লাল (১৯২১—)

হরকৃষণ লালের নাম এবং কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। গত বছর বোম্বাই প্রবাসী লেখিকা "সুজাতা" এসে হরকৃষণ কেমন মানুষ তার অনেক গল্প করেন। দিল্লিতে ফরাসী প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। ছাব্বিশে ডিসেম্বর ভোর সাড়ে ছটায় বন্ধুর বাড়ির কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিলেন একজন অপরিচিত মানুষ। আমি নাম বললুম। বন্ধু নাম শুনে ছুটে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের হিন্দী অভিনেতা মতিলালের মতো দেখতে সৌম্যকান্তি মানুষটি। নমস্কার বিনিময় হতেই বললেন, অধীনের নাম হরকৃষণ লাল—চিত্রকর। দিল্লিতে আমার প্রদর্শনী চলছে। বোম্বইতে থাকি। কিছুদিন মনে হচ্ছে দুজনই এ বাড়ির মেহমান। সুতরাং আলাপটা শুরু হোক। সেই শুরু। গত বছরের শেষ এবং এ বছরের প্রথম কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটলো। আশ্চর্য আবেগপ্রবণ স্বভাব। শিশুর মতো। উর্দু বলেন দারুণ। সময়োপযোগী 'সায়ার' আবৃত্তি করেন। অনবদ্য ভঙ্গীতে গল্পের ভাণ্ডার খুলে দেন। পুরোপুরি বৈঠকী মেজাজের মানুষ। রামকিংকরের সঙ্গে চারিত্রিক মিলটা খুব। এমন মানুষকে না ভালবেসে পারা যায় না।

চিরকুমার হরকৃষণ থাকেন বোম্বাইয়ের সমুদ্রের উপকূলে। তাঁর ঘরটা স্টুডিও বটে। আবাসও বটে। ঢেউয়ের আওয়াজ না কি অনবরত এসে আছড়ে পড়ে দোরগোড়ায়। বোম্বাইয়ের লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ সবাইয়ের প্রিয় এই মানুষটি একা থাকলেও এঁকে দেখাশুনো করার লোকের অভাব হয় না।

পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক গ্রামে তাঁর জন্ম। ছাত্র ভাল ছিলেন। ১৯৪০এ ইংরাজী ভাষায় অনার্স নিয়ে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। তখন লাহোরের শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুকুটহীন রাজা ভবেশ সান্যাল। শিল্পকলা সম্বন্ধে পাঞ্জাবে নতুন চেতনার উদ্ভব হয়েছে তাঁর জন্যে। অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়ির অমতে হরকৃষণ চলে যান বোম্বাই। পিতা-মাতা চেয়েছিলেন ছেলেকে আই সি এস পড়াবেন। বোম্বাইতে নানা ছোটখাটো কাজ করে জে জে স্কুলে শিল্পকলার পাঠ নেন তিনি। ধনীর ছেলে হয়েও শিল্পের জন্যে সকল রকম গ্লানি মেনে নিলেন। পাশ করেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৯-১৯৫৩ পর্যন্ত দিল্লি পলিটেকনিকের শিল্পশিক্ষায়তনে শিল্পশিক্ষক ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র থেকে মীরা মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত আজ তাঁর কৃতি ছাত্র সংখ্যা অনেক। এঁদের প্রত্যেকের ছাত্রজীবনের কত গল্প হরকৃষণ করেন স্নেহের সুরে। ১৯৫৩তে ভারতের যে পাঁচজন শিল্পী প্রতিনিধি সোভিয়েত দেশ এবং পোল্যাণ্ডে যান তিনি তাঁদের একজন। ১৯৫৩-৫৪ ইউরোপের যাদুঘরগুলি তিনি তীর্থ করে আসেন। ১৯৫৬-৫৮ ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তি লাভ করেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রণালয়ের শিল্পকেন্দ্রের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন বহুদিন ধরে। ১৯৬২-তে সে পদ ইস্তফা দিয়ে তিনি পুরোপুরি শিল্পকলাকে জীবিকা করেন। এর জন্যে যথেষ্ট দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে তাঁর মনস্তাপ নেই।

ভারতবর্ষীয় শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর চিত্র নানা সময় বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছে। ইংলণ্ড ('৪৭, '৭৪)। আফগানিস্থান ('৪৯-'৫০)। মার্কিন দেশ কানাডা (৫১, '৭২)। মিশর, সাউদি আরব তুর্কিস্থান ('৫১)। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ('৫১)। সোভিয়েত দেশ, পোলাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি ('৫৩)। যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লাভিয়া, রুমানিয়া বুলগারিয়া ('৫৮)। ভেনিস বিয়েনালে ('৫৩)। সাও পাওলো বিয়েনাল ('৬২)। টোকিও বিয়েনাল ('৬৬)। প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে আকাদমী অব ফাইন আর্টস সুবর্ণ পদক ('৬০, কলকাতা) এবং আর্ট সোসাইটি (বোম্বাই '৬১) উল্লেখ্য। একক প্রদর্শনী হয়েছে একাধিক দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, শ্রীনগর, চণ্ডীগড়, পুরী, সান জোস কালিফোর্নিয়ায়। কাজ আছে দেশী-বিদেশী নানা সংগ্রহশালায়।

হরকৃষণ লালের খুব পুরনো কাজগুলো গ্রামের সমাজ, মানুষ, মেলা, গরু মহিষ বেচা-কেনার দৃশ্য, গ্রাম্য রমণী, নিসর্গ এবং মানুষ একসঙ্গে করে তিনি দৃঢ়বদ্ধ রচনা, নির্মিতি এবং রঙের কাজে বিধৃত করেছেন। ছবিগুলোর মধ্যে ছন্দিতরেখার কাজ গৌণ স্থান গ্রহণ করেনি। মাটি-ঘেঁষা ছবিগুলোর মধ্যে কবিতার প্রাধান্য। তবু মোটামুটি বলা যায়, হরকৃষণের কাজ প্রথমে ছিল বাস্তবানুগ। চিরদিনই তিনি কিন্তু নিসর্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। নানা ঋতুতে বর্ণের বিস্ফারণের রূপান্তর চিত্রভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে আধা বিমূর্ত বিমূর্ত কাজ করেছেন এক সময়। সুরপাগল হরকৃষণ নানা রঙের মিলন এবং বিরোধের মধ্য দিয়ে ঐকতান তৈরি করেছেন। ইদানীং নিসর্গের পরিবেশে আদিরূপ (archetypes) নিয়ে কাজ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে ভাবছেন। তাঁর ছবিতে খেয়ালের বিস্তার নেই হয়তো। কিন্তু আছে ঠুংরীর মধুরতা। নাটক নেই আছে ধ্যান। মরমী বিন্যাস।

'পূর্ণিমা' (৩২"×৪০" তৈলচিত্রে) মানুষের আকার, গাছপালা সব কিছুর ওপরে সবুজ রঙের একটা চাঁদ বিরাজ করছে আপন মহিমায়। লাল, সবুজ, বেগুনী প্রভৃতি বর্ণ শুদ্ধভাবে দৃশ্য সুরের নানা কাজ করে চলেছে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে। রঙ কিন্তু তিনি ঘন করে চাপিয়ে কাজ করেছেন—পরকলার টটকা রঙ। ছায়ের ব্যবহার মৃদু মোলায়েম কিন্তু ভীষণ সংবেদনশীল। নির্মিতি, মণ্ডন; রচনা এ সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সুমিত শিল্পদৃষ্টি।

হরকৃষণ লাল নিজের একটা অদ্ভুত জগতে বাস করেন। কারো সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই, এমনকি শত্রুর সঙ্গেও নয়। জীবনে সাফল্যই তাঁর ধ্যান। ছবিতেও।

উচ্ছ্বাস ভরে আনা আকাশ
MORARJEE
M
MILLS

চিঠিপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ ঃ শিবমন্দির

২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের দেশে প্রকাশিত প্রণব রায়ের চিঠির উত্তর—

বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাইই তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশে এবং আশেপাশে খুব নামডাক ও প্রভাব প্রতিপত্তি। বৃদ্ধ পিতামাতা উভয়েই তখনও জীবিত। আর চার ভাইএর নিজেদের মধ্যেও বেশ সদ্ভাব। এই সময় চার ভাই বসে একদিন ঠিক করলেন—বাড়িতে বাবার নামে একটা বড় শিবমন্দির এবং মায়ের নামেও কাঠের নয়, পিতলের বড় এক রথ প্রতিষ্ঠা করাবেন, রথে ৮ দিন জাঁক-জমকের মেলাও বসাবেন। এই স্থির করে চার ভাই মিলে মহাধুমধামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিন রথ এবং ঐদিনই শিবমন্দিরও যথাক্রমে মা ও বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করালেন।

মায়ের নামে রথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে, রথের দিন বঙ্কিমচন্দ্রের মা দুর্গা-সুন্দরী দেবী রথের রশি প্রথম স্পর্শ করে দিতেন। তারপর জনসাধারণ রথ টানত। মা'র স্পর্শের জন্য রথের দীর্ঘ রশি বাড়ির ভিতরে যেত। সেই রীতি আজও চলে আসছে। বর্তমানে বঙ্কিম-চন্দ্রের বংশধর সুনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বাণী দেবী রথের রশি প্রথম স্পর্শ করে দেন। রথ কার নামে প্রতিষ্ঠিত মেলার লোকে তা জানেই না। তারা শুধু জানে—বঙ্কিমবাবু ও তাঁর ভাই-দের প্রতিষ্ঠিত রথ বা বঙ্কিমবাবুদের রথ।

ঠিক এমনিই পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের মাথায় চূড়ার কাছে একটা ছোট্ট পাথরে প্রতিষ্ঠার তারিখ সহ 'শিবঃ সমন্দিরো যাদবেশ নাম যাদব শর্মনা' লেখা থাকলেও লোকে একে বঙ্কিমবাবুদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির বলেই জানে।

পত্রলেখক মন্দির গাত্রের লেখা উদ্ধৃত করে বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভাইরা এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নি, করেছেন তাঁদের পিতা যাদববাবু। মন্দির গাত্রের লেখা আমি ভালই জানি। কিন্তু তবুও একথা তো সত্য যে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ যাদবচন্দ্রের যোগ্য পুত্ররাই সব করেছিলেন। আর বৃদ্ধ এবং ঋণগ্রস্ত যাদবচন্দ্রও এত অবুঝ ছিলেন না যে, খ্যাতনামা পুত্র ও পৌত্রদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঢাক, ঢোল পিটে নিজেরই নাম দিয়ে যাদবেশ মন্দির বা শিবমন্দির করবেন। আমি আগে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র-দের চার ভাইএর এক অভিনব দলিলের কথা বলেছি, এও প্রায় তেমনিই পিতার নামে যাদবেশ শিবমন্দির করা তাঁদেরই কাজ।

আমার প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠক-খানার ছবিটা ছাপতে গিয়ে ঐ ছবিতে এই শিবমন্দিরটিও থাকায় ছবির নীচে অতি সংক্ষেপে পরিচিতি হিসাবে লিখে-ছিলাম—'বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ও তাঁদের চারি ভ্রাতার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির'। পিতার নামে যাদবেশ মন্দির হলেও, ঐ মন্দির যে এঁদেরই তৈরি তাতে তো আর কারও কোন সন্দেহ নেই। আমার প্রবন্ধে শিবমন্দিরের কোথাও উল্লেখ নেই। থাকলে মন্দিরের ইতিহাসও দিতাম। তাই ছবির ছোট্ট ক্যাপশানে আসল কথাটাই দিয়েছি

পত্রলেখক বলেছেন—যাদবচন্দ্রের অট্টালিকার উত্তর-পূর্ব দিকে রাধা-বল্লভের বৃহৎ দালান মন্দিরটিও যাদব-চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। আরও বলেছেন—রাধাবল্লভের মন্দিরের পাশে দুর্গা দালান এবং রাস্তার উপর আটখানা শিবমন্দির কার তৈরি তা আজ বলা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন বংশধর তাঁদের বাড়িতে বাস করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতিরাও অনেকে নিজ নিজ বাড়িতে আছেন। যাঁকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবেন—দুর্গা-দালানটি তৈরি করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত আইনজীবী কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর আটখানা শিবমন্দিরটি করেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায়। এই রামহরিই কাঁটালপাড়ায় মাতামহ রঘুদেব ঘোষালের সম্পত্তি পেয়ে নিজের হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে আসেন। সেই থেকেই তাঁর বংশ-ধরেরা কাঁটালপাড়ার অধিবাসী।

পত্র লেখক যাদবচন্দ্রের বাড়ির আয়তন ও সীমানা আদৌ জানেন না। তাই দক্ষিণ দিকে মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অংশটা দেখেই বিচার করে বলছেন যাদবচন্দ্রের অট্টালিকার উত্তর-পূর্ব কোণে রাধাবল্লভের মন্দির। বঙ্কিমচন্দ্রের অংশের উত্তরে তাঁদের আরও বাড়ি আছে। যাদবচন্দ্রের সেই অট্টালিকা থেকে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ-পূর্বে রাধা-বল্লভের মন্দির। তাই উত্তর-পূর্ব কোণে হবে না, হবে পূর্বে।

রাধাবল্লভের মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন রঘুদেব ঘোষাল। এই মন্দির যাদবচন্দ্রের বাড়ির অংশের সংলগ্নে পড়ায়, যাদবচন্দ্র জ্ঞাতিদের সঙ্গে আপোসে এই মন্দিরটিকে নিজের বাড়ির ঠাকুর দালান হিসাবে গ্রহণ করেন। এবং এর পরিবর্তে পাশেই রাধাবল্লভের বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন। পুরাতন মন্দিরটি বছর পনের আগেও ভগ্নাবস্থায় ছিল। এখন কেবল একদিকের একটা দেয়ালের অংশ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা—৭০০০১২

'চাঁদ কহে চামেলী গো'

'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত হিমাংশুকুমার দত্তের জীবনী সম্পর্কে একটি প্রতিবাদপত্র ১৪ই মাঘ, ১৩৮৪ তারিখে বেরিয়েছে। পত্রলেখক শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'অনেক আশা ছিল যে সুরসাগরের ব্যক্তিগত জীবনের বিয়োগান্ত ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট তথ্যের সন্ধান মিলবে।' কিন্তু তাঁর সে কৌতূহল চরিতার্থ না হওয়ায় অনুযোগ করেছেন বাগাড়ম্বরে—'সেই নায়িকা কি চিরকালই উপেক্ষিতা হয়ে থাকবেন, উত্তরপুরুষরা কি তাঁর কোন পরিচয়ই পাবে না?...আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তো অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, সুতরাং আজকে তার ওপর থেকে যবনিকা তুলে

...জ্ঞেছ কি?'...ইত্যাদি। সুস্পষ্ট ... অভিযোগকারী যদি সুর-... প্রেমের পাত্রীর নাম ধাম জানা ... থাকেন, তা প্রকাশ্য নয় এই ধরনের ...। ঘটনাটি শুধু অনতিবিগত ... নয়। ভদ্রমহিলা বর্তমান এবং ... থেকে অবসরও নেননি। ... লেখকের কাণ্ডজ্ঞান ও দায়িত্ব-... রাখতে হয়, ছিদ্রান্বেষীদের সেসব ... না থাকলেও।

... প্রতিবাদীর আরেক নালিশ 'সুর-... অন্তিম ব্যাধি সম্পর্কেও ...বাবুর গোপনতা অবলম্বনের ... হাস্যকর মনে হয়।' আমার লেখার ...—'হিমাংশুর অন্দ্রে মারাত্মক ...গের বীজাণু বাসা বেঁধেছে।' ব্যাধির ... আর গোল্ড ইনজেকশনের ...ও লিখেছি। অসুখটি intestinal tuberculosis হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা অবিসংবাদিত তথ্য না হতে পারে, বিতর্কও সৃষ্টি হতে পারে। কারণ হিমাংশুকুমারের পরিবারেই আমি রোগের অন্য নাম শুনেছি। সেজন্যে ব্যাধির নাম উল্লেখ করিনি, অপ্রয়োজন বিবেচনায়। কিন্তু সেজন্যে 'গোপনতা অবলম্বনের প্রয়াস হাস্যকর' মন্তব্য উন্মার্গগামী হয় না কি? অকারণ 'হাস্য' প্রবণতা এক ধরনের মস্তিষ্ক রোগের পরিচয় দেয়।'

প্রতিবাদকারীর তৃতীয় অভিযোগ 'শচীন দেববর্মণের গাওয়া 'আলোছায়া দোলা' ও 'মন্দিরে এলে কে তুমি' গান দুটির সুররচনা" হিমাংশুকুমারের নয়। কারণ 'ওই দুটি সুরই শচীন দেব বর্মণ' তাঁর সুরারোপিত হিন্দী ছায়াছবি 'ডক্টর বিদ্যা' ও 'কোন কহ..'-তে ব্যবহার করেছেন।" অদ্ভুত যুক্তি (?)। পত্রলেখক নিশ্চিত জেনে রাখবেন, শচীন দেব বর্মণ দুখানি বোম্বাই ফিল্মে ওই দুটি সুর ব্যবহার করলেও তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া 'আলোছায়া দোলা' এবং 'মন্দিরে এলে কে তুমি' গান দুখানির সুরসংযোজক হিমাংশুকুমার, শচীন দেববর্মণের রেকর্ড করা 'মঞ্জু রাতে আজি', 'যদি দখিনা পবন' প্রভৃতি রাগভঙ্গিম গানের মতন। 'আলোছায়া দোলা' ও 'মন্দিরে এলে কে তুমি'-তে হিমাংশুকুমার সুরারোপ করেছিলেন বোম্বাই ছবি দুটির প্রায় দুই যুগ আগে।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
...লিকাতা-২৩

দুর্গোৎসব

'দুর্গোৎসব ও লেখকের উত্তর' (...৮-১-৭৮) শ্রীপ্রণব রায় প্রতিবাদ-...রী শ্রীবাঁশরী মোহন ভৌমিককে ...সব যুক্তিতে হেয় প্রতিপন্ন করার ...টা করেছেন তা তাঁর অজ্ঞতারই পরিচায়ক। লেখক তাঁর মূল প্রবন্ধে ... বর্তমান পত্রে কোথাও ঘাটালের ...দা গ্রামে অনুষ্ঠিত কোন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের কথা উল্লেখ করেননি—...বরই তিনি এ গ্রামের বিশালাক্ষী—...দীর কথা বলেছেন; এমনকি ঐ ...বীর মন্দিরের কথাও তাঁর পত্রে ...খ করেছেন। ঘাটাল থানার বরদা ...ম শোভা সিংহ প্রতিষ্ঠিত ঐ বিশা-...ক্ষী মূর্তি আমি নিজেও বহুবার ...খেছি। তাতে শ্রীবাঁশরী মোহন ভৌমিকের বর্ণনা মত কেবলমাত্র দেবী বিশালাক্ষীই অধিষ্ঠিতা আছেন—সঙ্গে কোন কার্তিক-গণেশ বা লক্ষী-সরস্বতী নেই। এ বিষয়ে বাঁশরীবাবুর প্রেরিত বিশালাক্ষীর যে আলোকচিত্রটি তাঁর প্রতিবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তাই প্রামাণিক।

অন্যদিকে এই দেবীর ধ্যানমন্ত্রসহ বর্ণনা বিনয় ঘোষ রচিত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে (১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৭) যা প্রকাশিত হয়েছে, তা বাঁশরীবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। বিনয়বাবু লিখেছেন, "দেবী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর স্থাপিত। তন্ত্রোক্ত মতেই দেবীর মূর্তি কল্পিত হলেও, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পূজাপদ্ধতিও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে হয়।...চতুর্ভুজা মূর্তি এবং ত্রিনেত্র। নগদন্ত ও নিম্ন-ওষ্ঠ উর্ধ্বদন্ত দ্বারা দংশিত। ধ্যানেরও বৈশিষ্ট্য আছে! পূজারী যে ধ্যানে পূজা করেন সেই ধ্যানটি এই:
রক্তাং পীনপয়োধরাং ত্রিনয়নাং
খড়্গেন্দুজুটো লোকাং
শ্বেতপ্রেত কৃতাসনাং নরশিরঃ কঙ্কাল
মালাধরাং
ব্যেহস্তক পরিপূর্ণ খর্পর ভূজাং
সচ্ছ রিকাং দক্ষিণে
ভক্তানাং বরদায়িনীং ভগবতী বন্দ্যে
বিশালাক্ষিকাং।"

তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা করেছি। তাতেও তিনি বাঁশরীবাবুর বক্তব্যই অভ্রান্ত বলে মত দেন এবং বরদার এই বিশালাক্ষীর কোন লক্ষ্মী-সরস্বতী বা কার্তিক-গণেশ নেই বলেই উল্লেখ করেন। অতএব শ্রীরায়ের তথ্য অনুযায়ী "বিশালাক্ষীও দুর্গারূপে পূজিতা হন" বা "দুর্গা-পূজা পদ্ধতিতে পূজা হয়" কীভাবে?

লেখক তাঁর পত্রে আলোচ্য এই বিশালাক্ষী দুর্গার "আশ্বিন মাস সমারোহসহকারে" পূজা-অনুষ্ঠানের যেসব কথা লিখেছেন, তাও বিভ্রান্তি-কর। কারণ দেবীর দৈনিক পূজা ছাড়াও পৌষমাসে আড়ম্বর সহকারে পূজা হয়, আশ্বিনে নয়। এ বিষয়ে জনগণনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত ও শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (৩য় খণ্ড) পুস্তকের ৪৩২ পৃষ্ঠায়, বরদা গ্রামে সারা বৎসরে যে সব পূজা পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হয় তার বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে: (ক) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং (খ) পৌষ সংক্রান্তিতে মকরস্নান ও বিশালাক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ তথ্য যদি সম্পূর্ণ ভুল হত, তাহলে শ্রীরায় নিশ্চয়ই প্রতিবাদ জানাতেন, যেমন তিনি তাঁর লেখা 'ঘাটালের কথা' পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠায় জনগণনা দপ্তরের প্রকাশিত ঐ পুস্তকটির মেলা-পার্বণ সম্পর্কে ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি যখন জনগণনা দপ্তরের প্রকাশিত পুস্তকে বরদার বিশালাক্ষী সম্পর্কিত বর্ণনার বিন্দুমাত্রও বিরোধিতা করেননি, তখন 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (৩য় খণ্ড) পুস্তকের বিবরণটিই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং শ্রীরায়ের দম্ভোক্তি—"আমি ঐ বিশালাক্ষী দুর্গা সরেজমিনে বেশ কয়েকবার পরি-দর্শন করেছি"—সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য এক উক্তি মাত্র।

পত্রলেখক শ্রীরায় তাঁর পত্রে শ্রীভৌমিককে শিক্ষা দেবার জন্য পশ্চিম-বাংলার নানাস্থানের দুর্গাপ্রতিমা ঘুরে ঘুরে দেখার পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন, "যেসব পরিবারে অভয়া দুর্গার পূজা প্রচলিত আছে সেখানে তিনি মহিষ-মর্দিনী নন, অথচ তিনি সপরিবারে আছেন অর্থাৎ কার্তিক গণেশাদিও আছেন।" এ বিষয়ে শ্রীরায় যদি কেবল-মাত্র ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুরের গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের দুর্গোৎসবগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাহলে দ্বিভুজা অভয়া দুর্গামূর্তির সঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির নৈকট্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারতেন। কারণ, তিনি কি জানেন যে, ঐসব অঞ্চলে গন্ধবণিকদের পূজায় নির্মিত দ্বিভুজা অভয়া দুর্গামূর্তির মাথার উপরে চালচিত্রের ঠিক মধ্যস্থলে সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজার মূর্তি এঁকে দেওয়া হয় এবং পূজার মন্ত্রেও 'দ্বিভুজা' বা বলে 'দশবাহু সমন্বিতাং'—বলে চিরাচরিত মন্ত্রেই পূজা সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও লেখক তাঁর গভীর অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে পত্রলেখক তাঁর ঐ পত্রে, 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মত নিজের ও পঞ্চানন রায়ের লেখা "ঘাটালের কথা নামক সচিত্র বিস্তৃত গ্রন্থে এই বিশালাক্ষীর বিবরণ ও মন্দিরের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে" বলে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেছেন। কিন্তু এ দাবীও যে বিন্দুমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা ঐ বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে। উক্ত বইটির 'নির্ঘণ্ট' অধ্যায়ে বিশালাক্ষীর প্রসঙ্গ নির্দেশে যে চার পৃষ্ঠার উল্লেখ আছে, তার মধ্যে ৩০ পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র ব্যক্ত হয়েছে, "...বরদার প্রসিদ্ধ দেবী বিশালাক্ষী শোভা সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন," ৫৩ পৃষ্ঠায়, "বিশালাক্ষী বা অনুরূপ দেবীর নাম হইতে বরদা...", ২২৩ পৃষ্ঠায়, "শোভা সিংহের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবী এই অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। বিশালাক্ষীর মাটির মন্দিরটি বর্তমানে দ্বিতীয় পরিখার বাহিরে পাকা রাস্তার পাশে অবস্থিত।" এবং সর্বশেষ ১০৫ পৃষ্ঠায়, "খাজাপুরে (১০৫) বিশালাক্ষী, শীতলা ও শিবের দালান (১১১)" ঐ বইয়ের নির্ঘণ্টে উল্লেখিত না হলেও ১৬৩ পৃষ্ঠায় 'সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান : পূজা পার্বণ ও মেলা' শীর্ষক অধ্যায়ের ১৭৫ পৃষ্ঠাতে বরদার বিশালাক্ষী সম্পর্কে আরও যে কথা বলা হয়েছে, "নাড়াজোলরাজের ও বরদার বিশালাক্ষীর পূজাস্থান হইতেও পূর্বে তোপধ্বনি হইত।" সুতরাং শ্রীরায়ের উক্তি মত তাঁর লেখা বইয়েতে বিশালাক্ষীর বিবরণ কোথায় বা আলোকচিত্রে কেবলমাত্র বিশালাক্ষীর আটচালা ছাড়া মন্দির কোথায় এবং লেখকের বড় গলায় উচ্চারিত দাবীর ভিত্তি কোথায়? এবং বাঁশরীবাবু তথ্য-নিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে "চিঠিতে উক্ত বিশালাক্ষীর আলোকচিত্র ও তা বর্ণনা তিনি প্রকাশ না করলে পারতেন"—লেখকের এই উক্তি শোভন নয়, যা বিজ্ঞজনোচিতও নয়। শোভনতা বোধ না থাকে না থাকুক, কিন্তু কাচে ঘরে বাস করে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অপরে ঘরে ঢিল ছোঁড়েন না।

তারাপদ সাঁতরা
নবাসন, বাগনান

পক্ষিনিবাসে সারাদিন

১৮ ফেব্রুয়ারীর 'দেশে' 'পক্ষি নিবাসে সারাদিন' লেখাটি সুন্দর রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে কম লোক ভারতের এই বৃহত্তম পক্ষিনিবাসে যায় ভরতপুর বিষয়ে আর একটু তথ্য দি ভ্রমণকারীদের আর একটু সহায়তা হ এই আশায় সামান্য কিছু খবর দিই পত্রলেখকের এই জঙ্গলে কয়েকদি থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

আগ্রা থেকে ভরতপুর বাসস্ট্... ৩৪ মাইল। সেখান থেকে শান্তিকুটি ৩ মাইল। স্থানটির নাম কেওলাদে ঘানা বা সংক্ষেপে Ghaua bir... sanctuary। শান্তিকুটিরের পেছ... বিখ্যাত পক্ষিনিবাস, বিস্তারিত বিলে... সুন্দর বর্ণনা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন কিন্তু একটা জিনিস শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ে চোখে পড়লে লেখাটি সমৃদ্ধতর হ... পারতো। একটু খোঁজ খবর করলে জানতে ও দেখতে পেতেন। শান্তি-কুটিরের সামনে যে বিস্তৃত অর... সেটিও ভরতপুর অভয় অরণ্য। যেখানে দেখা যায় প্যান্থার জাতীয় বা... মশাইকে, হায়না, নীলগাই আর বুনো মহিষ। হরিণ তো আছেই। জীপে ক... ঘুরে দেখার ব্যবস্থা ঐ শান্তি কুটি... থেকেই করা হয়। সব থেকে আশ্চর্য ঐ জঙ্গলে আছে তা হল 'পাইথ... জোন'। ময়াল সাপের এলাকা কয়ে... বিঘে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে... বলে ঐ এলাকার নামই দেওয়া হয়ে... 'পাইথন জোন'।

রাজা সুরযমল ভরতপুরে কেল্লা তৈরী করেছিলেন আঠারো শতাব্দীতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ... প্রমা... ঘটেছে—আঠারো শো ... হ... পারে না কথাটা অন্ধ মনেই তো বহ... সাল ইত্যাদি।

শতদল ভট্টাচার্য
কলকাতা-৯

বার্লিনে দুর্গাপূজো

শংকর মজুমদারের "বার্লিনে দুর্গা-পূজো'র (দেশ, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭) বিবরণ পড়ে মনে হলো, ভদ্রলোকের ওখানে পুজো দেখতে ততখানি আগ্রহ ছিলো না যতখানি উৎসাহ উনি দেখিয়েছেন বার্লিনের প্রবাসী বাঙালী-দের দোষত্রুটি খুঁজতে, তাদের নিন্দে করার ব্যাপারে। আমার মত প্রবাসী বাঙালীদের দুর্ভাগ্য যে এইরকম এক ব্যক্তিকে বিদেশে আমরা আন্তরিকতা দেখাই (শংকরবাবুর কথাতেই "বাড়িতে ডেকে নিয়ে গলা অবধি" খাওয়াই), আর তার ফল এই যে, উনি দেশে ফিরে আমাদেরই কেচ্ছা গান। শংকরবাবু কি হীনমন্যতায় ভুগেছেন বার্লিনের

লীদের সৌভাগ্য দেখে? নাহলে ওঁর
ার এতো তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল কেন?
আমি বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে
ই। কাজেই জোর গলায় বলতে
, শতকরা নব্বই ভাগ বাঙালীর
ভার্সিটির খাতায় নাম লেখানো
একথা ডাহা মিথ্যে। ছাত্র হিসেবে
"সস্তা ঠিকে কাজ সরকারের তরফ
" পান এ তথ্যটি যে শংকরবাবুকে
াগালো জানতে ইচ্ছে করে। কোনো
? শংকরবাবু বার্লিনে গেছলেন
ত। আমি আছি ওখানে গত পাঁচ
রে। বার্লিনের প্রবাঙালীরা প্রায়
হাতের অফুরন্ত সময়কে হরেক
লাদলি মতানৈক্য ইত্যাদি দিয়ে
াখেন" পড়ে আমি স্তম্ভিত
অফুরন্ত সময় শংকরবাবুর
হয়তো বেড়াতে গিয়ে বার্লিনে,
কিন্তু খেটে খেতে হয় ওখানে,
দাম বুঝি। শংকরবাবুর কি
পড়েন নি বিদেশের সেই শত বাস্ত-
মধ্যেও বাঙালীরা মিলেমিশে
জোকে কিভাবে সফল করে
ন শত অসুবিধের মধ্যেও?
নের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতেও
ীদের পারস্পরিক অকুণ্ঠ সহ-
তা প্রশংসার্হ।
ার্মাণ মার্ক ও ভারতীয় টাকার
র মূল্যটাও শংকরবাবুর জানা
ভালোমতো। এক মার্কের পরিবর্তে
টাকা ("পুজোর খরচ তিন হাজার
মানে প্রায় পনেরো হাজার
"—শংকরবাবু) বোধ হয় ভারতে
লাবাজারে পাওয়া যায়, আসল
িময়ের হারটা হলো বর্তমানে ১
র্কের পরিবর্তে প্রায় তিন টাকা আশি
সা।

শাক মুখোপাধ্যায়
চম বার্লিন—১২

জা রামমোহন রায়ের
ই ভত্য

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ
াটি পড়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ
এলো। তাই এই চিঠি।

অনেকেই জানেন না যে চাকরিসূত্রে
া রামমোহন বিহারের চাত্রা ও
ালপুর শহরে বেশ কিছু দিন কাটিয়ে-
লেন। চাত্রা বর্তমানে হাজারিবাগ
লার এক নগণ্য সাব-ডিভিশন; অথচ
যুগে দক্ষিণ বিহারের কমিশনারী
ন চাত্রা। (যা পরে রাঁচীতে
নান্তরিত হয়)। এই চাত্রা কমিশ-
রীতে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন
জিস্ট্রার। চাকরির উপলক্ষে দক্ষিণ-
হারে আমায় কিছু অফিস দেখাশোনা
তে হয় এবং চাত্রাও আমার যেতে
। সম্প্রতি সেখানে গিয়েছিলাম।
া রামমোহন যে অফিসে বসে কাজ
তেন, সেই অফিসে এখনও ট্রেজারী
সাব-রেজিস্ট্রারের দপ্তর আছে। তার
ফস বিল্ডিং-এর সামনে আজও আছে
ই দুশো বছরের পুরোনো অশ্বত্থ
। পাথরের তৈরি সেই পুরোনো
ল্ডিং আজও মহকুমা সাব-রেজিস্ট্রারের
ফস।

সম্প্রতি আমার এক বন্ধু—যিনি
ছুকাল পূর্বে হাজারিবাগে ডেপুটি
কমিশনার ছিলেন—আমায় বলেন যে
হাজারিবাগে রেজিস্ট্রার অফিসের
রেকর্ড রুমে দুশো বছর আগেকার
দলিল-পত্র পাওয়া যেতে পারে এবং
রাজা রামমোহনের হাতে সই-করা
ফার্সী কাগজ-পত্র খুঁজলে পাওয়া যেতে
পারে। কোন গবেষক, অনুসন্ধিৎসু
ঐতিহাসিক বা কোন সংস্থা এই কাজে
এগিয়ে এলে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর
থেকে রাজা রামমোহন লিখিত কাগজ-
পত্র নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুবল গাঙ্গুলী
পাটনা-১৩

লেখকদের মুষ্টিযুদ্ধ

৪ মার্চ-এর পত্রিকায় শ্রীসুনীত ঘোষ দিল্লীর বিশ্ব বইমেলা প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানিয়েছেন কিন্তু একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ না থাকায় তা পত্রাকারে লিখে পাঠালাম।

বিদগ্ধ ভাষণ, আলোচনা ইত্যাদি ছাড়াও বই মেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুই দল হিন্দী লেখকের মুষ্টিযুদ্ধ। নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচীতে এরকম কোন কিছুর উল্লেখ ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেল।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হিন্দী লেখক সম্মেলনের সকালের বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল "মত প্রকাশের স্বাধীনতা বনাম সরকার ও প্রশাসক"। জনৈক র‍্যাডিকাল লেখক কিছু বলতে চাইলে দলে ভারী গোষ্ঠী সে আবেদন নাকচ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম। মঞ্চের উপরে দুই দলে এক রাউণ্ড মুষ্টিযুদ্ধ হয়ে গেল। র‍্যাডিকালদের নেতা কর্ণসিং চৌহান তাঁর ভাষণে এই ঘটনার উল্লেখ করতে চাইলে সভাপতি ডঃ বীরেন্দ্র নারায়ণ সিং আপত্তি করেন। ব্যস, আবার তুলকালাম। প্রগতিশীলদের ঘাঁটি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র মঞ্চের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়া-শীলদের বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক রাউণ্ড মুষ্টিযুদ্ধ। শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে এই অঘোষিত ঘটনা ছিল উপরি পাওনা।

অবশেষে বিকেলের বৈঠকে সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র কার্তিকের সম্মেলনের "অসামান্য সাফল্য" দাবী করতেই র‍্যাডিকালদের নেতা কর্ণসিং প্রতিবাদ করে বলেন "সম্মেলনের নামে এটা নাটক আসলে একটা জনসংঘী ব্যাপার"। না এর পরে আর তৃতীয় রাউণ্ড হয়নি।

নিরঞ্জন বসু
দিল্লী

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারির দেশে শ্রীশ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ঘরবাড়ি ও নগর পরিকল্পনা' প্রবন্ধটি পড়ে খুবই ভাল লাগল। প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'সাম্প্রতিককালে জার্মো' জেরিকো ও চাতালহুয়ুকে যে সমস্ত খননকার্য চালানো হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, সেসব জায়গায় সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব নবম সহস্রক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময় বিস্তৃতি লাভ করেছিল।" তিনি এখানে যে সময়ের কথা বলেছেন সে সময় নবপ্রস্তর যুগের (Old Stone age or Neolithic age) অন্তর্গত, এই যুগে মানুষ তার জীবনধারণের মান অনেক উন্নত করে। কিন্তু তাই বলে তখনকার মানুষের জীবনধারণকে সভ্যতা রূপে গণ্য করা যায় না। মানবজীবনের কৃষ্টির উৎকর্ষতাকে সভ্যতা বলা যেতে পারে। সুতরাং নবপ্রস্তর যুগে মানব-জীবনধারণের উন্নতি হলেও তাকে পুরোপুরি সভ্যতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তখনকার উন্নততর জীবনধারণ সভ্যতার দিকে অগ্রসরের প্রয়াস মাত্র। এই কারণেই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই অংশে সভ্যতা কথাটির ব্যবহার আমার মনঃপূত হয়নি। মানবসভ্যতার উন্মেষ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রকের পরে। এবং ঐতিহাসিকরা সেই দিক থেকে মিশরীয় সভ্যতাকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতারূপে গণ্য করেন। (উল্লেখ্য সভ্যতার প্রত্যয় বিশ্লেষণ হল—সভ্য+ষ্য)।

লেখক এই প্রবন্ধে 'মহেঞ্জোদাড়ো' —এই বানানটি ব্যবহার করেছেন। এটা অবশ্যই ভুল। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, বহু বইতে এই বানানটির কোনোরূপ সংশোধন হয়নি। ইংরেজী বইতে Mohenjodaro এবং বাংলা বইতে মোহেঞ্জদাড়ো। মহেঞ্জোদাড়ো বা মহেঞ্জেদাড়ো বলে উল্লেখ থাকে। কিন্তু সিন্ধি (Sindhi) ভাষানুযায়ী এই শব্দটির প্রকৃত বানান হল 'মোঅন্‌জো-দড়ো' এবং তার অর্থ মৃতের স্তূপ (Mound of death)।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে মো-অনজোদড়োতে মন্দিরের অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মোঅন্‌জোদড়োতে কোন মন্দির পাওয়া যায় নি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে" বলেছেন —'মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব না পাওয়াতে ম্যাকে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এ অঞ্চলের সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার (Mesopotamia) অঞ্চলের সভ্যতার সাদৃশ্য দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো উভয় সভ্যতা একজাতীয় লোকের দ্বারা সৃষ্ট তাঁদের পক্ষে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ আছে, যেহেতু মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বড় বড় মন্দির ছিল'। সুতরাং এর থেকেই সুস্পষ্ট যে মোঅন্‌জো-দড়ো ও হরপ্পায় কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

সৌপর্ণ লাহিড়ী
ত্রিবেণী, হুগলী।

সৌরশক্তি

বিশ্বকল্যাণে সৌর শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয় (২১শে মাঘ ১৩৮৪) পড়লাম। সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আপনার লেখায় যে সমস্ত পদার্থ শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় ও অস্তিত্বের অফুরন্ত মেয়াদ বহন করে না, তাদের তালিকায় কয়লা ও পরমাণু-শক্তির সঙ্গে কাঠ ও বিদ্যুৎকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কাঠ আমরা যদেচ্ছা উৎপাদন করতে পারি। নতুন বৃক্ষ রোপণ করে ব্যবহৃত পুরাতন বৃক্ষের স্থান পূরণ করা যায়। সুতরাং বৃক্ষ বা কাঠের অস্তিত্ব আবর্তনশীল ও কাঠের অস্তিত্ব অফুরন্ত। দ্বিতীয় বিদ্যুৎ। এই শক্তিও যথেচ্ছা উৎপাদন করা সম্ভব জলশক্তি ও বায়ুশক্তির সাহায্যে। জল ও বায়ু অফুরন্ত এবং তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাও অফুরন্ত। সর্বশেষে যে সূর্যকে শক্তির উৎস হিসাবে গ্রহণ করা তাত্ত্বিক ভাবে ঠিক নয়। কারণ সূর্য ক্রমেই শীতল হয়ে আসছে ও এক সময়ে তার মৃত্যু হবে। নক্ষত্রবিজ্ঞানী জেমস জীনের মতে সূর্য মরণোন্মুখ (ডাইনিং সান)। অবশ্য এই উৎস বহুকাল অবাধ চলবে। সৌর শক্তি বিশ্বকল্যাণে প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তারাপদ ভৌমিক
রাঁচি

সাহিত্যের পুরস্কার

আমার সাহিত্যের পুরস্কার নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে গত ১৪ই মাঘ তারিখের দেশ পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য পুরস্কারের সঙ্গে কোন গ্রন্থের নাম জুড়ে দিলে পুরস্কা-রের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়—এই কথাটি বলার সূত্রেই আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির citationটির অনুবাদ (বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবন রক্ষিত অনুবাদ) উদ্ধৃত করে বলেছি যে তাতে গীতাঞ্জলির উল্লেখ করা হয় নি—নোবেল কমিটি কবি এবং তাঁর কাব্য-কেই পুরস্কৃত করেছেন, বিশেষ কোন কাব্যগ্রন্থকে নয়। পত্রলেখক (শ্রীমোহিত চক্রবর্তী) citation এর যে অনু-বাদটি উদ্ধৃত করেছেন তাতেও গীতা-ঞ্জলির উল্লেখ নেই। কাজেই ঐ উদ্ধৃতির দ্বারাও আমার বক্তব্যই সমর্থিত হচ্ছে। পত্রলেখক আমার আসল বক্তব্যটিকে ডিঙিয়ে গিয়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে রবীন্দ্র কাব্যালোচনার অবতারণা করেছেন। আমার প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্য বা অন্য কোন কাব্যেরই আলোচনার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমি শুধু আমাদের সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি—কাব্যা-লোচনার প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। কোন্‌টা প্রাসঙ্গিক, কোন্‌টা অপ্রাসঙ্গিক সে বোধটি না থাকলে ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যায়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সংশোধন

গত ১৪ জানুয়ারির দেশ পত্রিকায় পরেশ নন্দীর সন্তোষ ট্রফির উপর লেখায় বাবার নামটা দুবারই ভুল প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানার লোক হিসেবে আমি জানি ওটা নিছক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। পি মিশ্রের জায়গায় বেরিয়েছে পি মিত্র ও কালু মিশ্রের জায়গায় বেরিয়েছে কালু মিত্র। নাম দুটি হবে পৃথ্বীশ্বর মিশ্র বা পি মিশ্র এবং কালু মিশ্র।

প্রভাত মিশ্র

প্রকাশিত হল

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের মর্মকথা

সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ

দাম ৮·০০
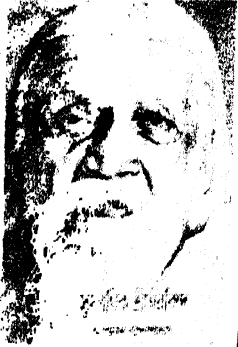
যাঁরা ভাবেন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য, তাঁদের ভ্রান্তি নিরসন করতেই এই বই—'সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ'। অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইয়ে অত্যন্ত সহজ ও ঝরঝরে ভাষায় অনুসন্ধান করেছেন সেই দর্শনের তাৎপর্য, লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ও আরও পাঁচজনের উপলব্ধির কথা। সার্থক ভ্রমণকাহিনীর মতো সরস বর্ণনাময় এই গ্রন্থ। এতে আছে আশ্রমের ইতিহাস, আছে প্রতি বছরে চারবার যে শ্রীঅরবিন্দ সর্বজনের সম্মুখে 'দর্শন' দিতেন তার সাবলীল বর্ণনাসহ আরও অনেক বিবরণ। প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞদের সাহায্যে লেখা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের মূল আদর্শের মর্ম অত্যন্ত অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় বিশেষত সকলের জন্যে লেখা এই বইয়ে।
মূল্যবান এই বইটি পণ্ডিচেরীর শ্রীমায়ের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হল।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

বিমল মিত্রের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

দাম ১০.০০

এই কাহিনীর নায়ক লোকনাথের একদিন মনে হল, আণবিক বোমা ফেলে মানুষ যে-পাপ করেছে তার জন্য পৃথিবীর কারোর না কারোর অশৌচ পালন করা অপরিহার্য। এই অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে এমনভাবে তাড়া করে ফিরতে লাগল যে, একদিন সে এক মহা-অশৌচ ব্রত পালন করা শুরু করে দিল। সেই অশৌচ-ব্রত শুধু লোকনাথের একার জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির হয়ে তার এই ব্রত উদ্‌যাপন।
বিমল মিত্রের পাঠক জানেন, কাহিনীকে কী অসামান্য কৌতূহলকর করে পরিবেশন করেন তিনি। 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' উপন্যাসে তাঁর গল্প-পরিবেশনের সেই জাদুকরী দক্ষতা এক উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে গিয়েছে, কেননা বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এই কাহিনী সর্বাংশে নতুন ধরনের।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

পতি পরম গুরু ৩৫.০০ রাগ ভৈরব ৫.০০ রাজাবদল ৭.০০ নিশিপালন ৬.০০ প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭.০০ হাতে রইলো তিন ৬.০০ চলো কলকাতা ৫.০০ বেগম মেরী বিশ্বাস ৩০.০০ নিবেদন ইতি ৫.০০ রং বদলায় ৫.০০ রাজা হওয়ার ঝকমারি (কিশোর উপন্যাস) ৭.০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সমরেশ বসুর

হিমালয়ের পাদদেশ তরাইয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে মূলত চিরকালীন মানুষকে নিয়ে লেখা হৃদয়দ্রাবী উপন্যাস

মহাকালের রথের ঘোড়া

দাম ১০·০০

শুধু স্বপ্ন নয়, এক নতুন জীবনের শপথ নিয়েছিল রুহিতন কুরমি,–উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের নকশাল-বাড়ির দক্ষিণ-পূবে টুকরিয়া-ঝাড়ের নীচে চুনিলাল মোজার উঠ্‌বন্দী প্রজা ভূমি-হীন কৃষক রুহিতন,–সেই একমাত্র স্বপ্নিল বিশ্বাসের পথে, যে বিশ্বাসে সম্মোহনের অলৌকিকতায় অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়, বোবায় কথা কয়, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়, ভূমিহীনে ভূমি পায়, জন-মজুরে রাজ্য চালায়। আরও অনেকের সঙ্গে রুহিতন নিজেকে উৎসর্গ করেছিল সেই বিশ্বাসে, জীবনের সব কিছু পণ রেখে। অতএব মারা ও মরা সমার্থক। শুরু হয়েছিল মুক্ত অঞ্চল গড়ার, শ্রেণী-শত্রুকে খতম করার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই। কিন্তু কে করে সৈনাপত্য, যুদ্ধ করে কারা? অন্ধকার দানা বাঁধে কোথায়; অমোঘ সাফল্যের মূলে যে পোকারা প্রতিমার মূর্তি কুরে কুরে খায়, কি তাদের নাম? রুহিতনের এই জিজ্ঞাসার জবাবে তার মায়ের সেই গান মনে পড়ে যায় : 'উত্তরে উনাইল ম্যাঘ/পচ্ছিমে বরষিল গ!/ভিজি গেল গাবানি কাপড়।'...বুক জ্বলে, চোখ গলে, জীবন কেন এমন বৈপরীত্যে ভরা?
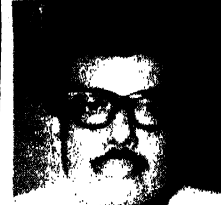
রূপদর্শীর

ব্যঙ্গগল্প-সংকলন

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র

দাম ৬.০০

গুল এবং গল্প—দুই মিলে গুল্প। বঙ্গসাহিত্যে গৌর-কিশোর ঘোষ ওরফে রূপদর্শীর এক মোক্ষম অবদান গুল্প। এ-হেন সরস এবং উপাদেয় বস্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল যে আগে কখনও চাখবার সুযোগ পান নি—এ-কথা হলফ করে বলা যায়। তেমনই আরেকটি চমক-জাগানো চরিত্রও একই সঙ্গে হাজির করেছেন রূপদর্শী—যার মুখে এই গুল্প অমৃত-সমান। সেই চরিত্রের নাম ব্রজদা। এ-যাবৎ রচিত ব্রজদার সমুদয় গুল্প-সম্ভার এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ৮.০০ আমাকে বলতে দাও ৭.০০ গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে ৪.০০ আমরা যেখানে ৫.০০ সাগিনা মাহাতো ৫.০০ লোকটা ৩.০০ নন্দকান্ত নন্দাষুশ্টি ৮.০০ দুষ্টুর দুপুর (কিশোর-সাহিত্য) ৩.০০

দ্বাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

মুকুল দত্তের

জনপ্রিয় বই

ফুটবলের আইনকানুন

দাম ১০.০০

এই লেখকের আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ

টেবিল টেনিসের আইনকানুন

দাম ৪.০০

প্রকাশিত হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

যুগ্ম কিশোর-উপন্যাস

হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

দাম ৫.০০

শিমুলতলার লাট্টু পাহাড়ের ওপর থেকে দুর্গের মতো যে-অদ্ভুত বাড়িটা দেখা যায়, কী আছে সেই হলদে বাড়িটার মধ্যে? কারা থাকে সেই বাড়িতে? রাত্তিরে যাদের নাম করতে নেই, সেই পরমাত্মারা? কেন শোনা যায় চুড়ির রিনঠিন শব্দ? কেন বাড়িটাকে পাহারা দেয় একজন আশ্চর্য মানুষ? ওটা কি পুতুলহাটের রাজার বাড়ি—যে-বাড়িতে লুকনো রয়েছে অজস্র গুপ্তধন? বিমান আর তার কলেজের বন্ধু স্বপন—দুজনে মিলে একদিন সোজা চলে গেল হলদে বাড়ির রহস্য খুঁজে বার করতে। গিয়ে যা দেখল ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বিমানকে মনে পড়ছে? সেই বিমান—যার চোখের সামনে ঘটে গিয়েছিল বিরাট এক ব্যাঙ্ক-ডাকাতি। সেই বিমান—যার কোলে মাথা রেখে মরে গিয়েছিল ব্যাঙ্কের দারোয়ান বুধ সিং। সেই বিমান—যে নাকি পুরো ডাকাতের দলকে তাড়া করে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল, আর যাকে সাহায্য করেছিল বুধ সিংয়ের অশরীরী আত্মা। দুটি অসামান্য জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী 'হলদে বাড়ির রহস্য' ও 'দিনে ডাকাতি' এক সঙ্গে ছাপা হয়ে বেরুল। শুধু ছোটদের কেন, সব-বয়সী পাঠকদের পক্ষেই এ-এক দ্বিগুণ উত্তেজনাকর খবর।

দেশ ৪৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা
৪ চৈত্র ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
বাংলা মুদ্রণ : দ্বিশতবার্ষিকী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতা
দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়
সুব্রত সেনগুপ্তর গল্প
অবিশ্বাস

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্রাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

প্রবাল দ্বীপে বসতি

রূপকথার ঘটনা নয়, কিন্তু রূপকথারই ঘটনার মতো বৈচিত্র্যে আকীর্ণ একটি বাস্তব সম্ভাবনার ঘটনা। সেই সম্ভাবনার যে সুযোগ সেদিন দেখা দিয়েছিল, তারই কথা স্মরণ করে আজ অনুভব করতে হয়, মানুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণের বৃহৎ কোন সুযোগের অমর্যাদা বস্তুত জীবনেরই অমর্যাদা। সুযোগ বার-বার ফিরে আসে না। এই অমোঘ নিয়মের সূত্র ধরে প্রসঙ্গত একটি কাব্যিক প্রকারের মন্তব্য করা চলে, বাঙালী জীবনের পক্ষে প্রবাল দ্বীপে বসতি করবার একটি বড় সুযোগ একেবারে হারিয়ে না যাক, অনেক দূরে সরে গিয়েছে ; যদিও আবার চেষ্টা করে সেই সুযোগ আহ্বান করতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আগত শরণার্থীদের আন্দামানে পুনর্বাসিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে তিনি অনুরোধ করবেন। তাঁর এই ইচ্ছার পূর্ণ সাফল্য কামনা করে প্রসঙ্গত অতীতের ঘটনার দৃশ্যটাকে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। অতীতের সেই ঘটনা এই যে, আন্দামান দ্বীপে বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের অবাধ ও প্রশস্ত সুযোগ যদি রাজনীতিক বামপন্থিতার বিচিত্র আতিশয্যে সেদিন বাধাগ্রস্ত না হতো তবে আজ আর বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে এমনতর অনুরোধ করবার প্রয়োজন অনুভূত হতো না। সেদিনের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির মধ্যে এই সিদ্ধান্তের আভাস ছিল যে, আন্দামান দ্বীপ বিশেষ করে বাঙালী উদ্বাস্তুর উপনিবেশ হবে, যদিও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষে আন্দামানে বসতি লাভ করবার সুযোগ একেবারে রুদ্ধ করা হবে না। আজ দেশের প্রত্যেকের পক্ষে নির্বিরোধ মনের বিচার দিয়ে এবং ঘটনার রূপ লক্ষ্য করে এই সত্য উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধে নেই যে, আন্দামান দ্বীপে বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের উদ্যমে বাধা দেবার আন্দোলন প্ররোচিত করে একাধিক বামপন্থী রাজনৈতিক দল বস্তুত বাঙালীর জীবনের নতুন ঐতিহাসিক সম্ভাবনার নিদারুণ ক্ষতি সাধিত করেছিলেন। বাস্তব তথ্যের পরিসংখ্যান এবং কল্পনা, উভয়ই এক্ষেত্রে সমন্বিত হয়ে অভিযোগ করতে পারে, অদূরদর্শী রাজনীতিক চিন্তা-বৃত্তির কোলাহল, ভারত মহাসাগরের তরঙ্গময় কলরোলের মধ্যে প্রবালখচিত দ্বীপ ওই আন্দামানের বনরাজিনীলা আয়তনের উর্বর মাটিতে বাঙালীর উপনিবেশ রচনার প্রশস্ত সম্ভাবনাকে নিতান্ত একটি ক্ষীণতায় পরিণত করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও সেদিন সেই বাধার আন্দোলনকে যেন একটা ভাল অজুহাত হিসাবে নীতি পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছিলেন। বাঙালী শরণার্থীকে আন্দামানে বসতি করিয়ে দেবার প্রথা বর্জন করে কেন্দ্রীয় সরকার অন্য রাজ্যের লোক নিয়ে গিয়ে আন্দামানে তাদের জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ অবারিত করে দিলেন।

কলকাতাতে সম্প্রতি দন্ডকারণ্য থেকে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুর আগমন ও সমাবেশ লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার চিন্তিত হয়েছেন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দেবার মতো কোন উপায় নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে পশ্চিমবঙ্গে, তাদেরও পুনর্বাসিত করা সম্ভব নয় ; একথাও রাজ্য সরকারের প্রবক্তারা স্পষ্টভাষায় বলেছেন। সমালোচকের পক্ষে স্মরণ করা কঠিন নয়, এবং স্মরণ করে রাজনীতিক মনোবৃত্তির ও মতবৃত্তির ঋতু পরিবর্তনের একটি চমৎকার বিস্ময় সহ্য করতে হয়। আজকের এঁরাই কিন্তু সেদিন ঠিক বিপরীত মর্মের প্রচার মুখরিত করে, এই দাবি করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেরই ভিতরে আগন্তুক জনতার অর্থাৎ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্পন্ন করতে হবে।

অতীতের কথা তুলে আজ আর সমালোচনা প্ররোচিত করবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। এ বিষয়ে জনমতের পক্ষে একবাক্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে সমর্থন করবার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্দামান দ্বীপে বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন প্রশস্ত করবার নীতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবার কর্তব্য রাজ্য সরকারকে অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। বাঙালী উদ্বাস্তুকে আন্দামানে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বসতি বিস্তারিত করবার সুযোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য পুনর্গঠিত হওয়া উচিত।

কবির কল্পনাতে ঐতিহাসিক ঘটনার যে ঘোষণা সঙ্গীতিত হয়েছে, তার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়—সন্তান যাঁর তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ। বঙ্গভূমির সন্তান ওই তিনদেশে ঠিক উপনিবেশ গঠিত করেছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন না, যদিও বাঙালী পন্ডিত ও প্রচারকের কৃতিত্বে ওই তিন দেশে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের সংস্থা স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। উপনিবেশ স্থাপিত ও গঠিত করবার সবচেয়ে বড় সুযোগ দেশখন্ডনের ঘটনার পরে এসেছিল। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিতে সেই সুযোগ খুবই বড় হয়ে সঙ্কেতিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিনের বামপন্থিতার রাজনীতিক ক্রিয়া যেন কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টা ও ইচ্ছাকে নিতান্ত বাধাদেবারই আনন্দে আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের প্রয়াসে বাধা প্রদান করেছিল। আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তুরা, এখন যাঁরা পুনর্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের জীবনে সমস্যার অনেক প্রশ্ন থাকলেও, শোনা যায়, তাঁরা অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলে পুনর্বাসিত বাঙালী উদ্বাস্তুর তুলনায় অনেক ভাল আছেন।

একটি বিকল্প ব্যবস্থা

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে বেকারের যে সংখ্যা ও বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার দেখানো হয়েছে তাতে একটা বিষয় বেশ স্বচ্ছ—যে দলই সরকার গঠন করুক বা ক্ষমতায় আসুক রাতারাতি কোন সমস্যার সমাধান হয়ে উঠবে না। সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় এমন অবস্থা কোনদিন কোন রাষ্ট্রেই সম্ভবত হবে না যেখানে মানুষের মনে অর্থমনস্কতার বিকার থাকবে না এবং ক্ষমতার শীর্ষে শুধু নির্মোহ ব্যক্তিরাই অবস্থান করবে। যদি কোনদিন সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে, যদি কেন্দ্রীভূত শক্তিই দেশের অর্থ পরিচালনার পূর্ণভার গ্রহণ করে, তখন সেই ভার যে শ্রেণীর উপর বর্তাবে, তাদের ব্যবস্থাপনায় যে দেশের দশের শুধু মংগল-চিন্তাই একনিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ মানুষের লোভ, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, আজও যেমন আছে, সেদিনও থাকবে। অর্থ ও ক্ষমতা বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষেরও চারিত্রিক ভারসাম্য টলিয়ে দিতে পারে।

তথাপি, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখেই বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে সমাজের মানসিক তথা চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা ব্যতীত আর কোন আশু উপায় আছে বলে মনে হয় না। আমাদের যে 'সেটআপ' তাতে প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, মনোভাব বদল হওয়া দারুণ কঠিন ব্যাপার। আমাদের সমাজে শুধু ধনের বৈষম্যজনিত অনগ্রসরতা নয়, শিক্ষা-বৈষম্যজনিত অনগ্রসরতা ভয়াবহ। একদিকে বিত্তবান ধনিক, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা আত্মস্বার্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, চতুর এবং কুশলী, আর একদিকে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণ যাদের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা খুব কম যারা স্বভাবতই পরের বুদ্ধিতে উত্তেজিত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণই অপরিণামদর্শী দলনেতাদের হাতের ক্রীড়নক, রাজনীতির শিকার, সমাজে বিড়ম্বিতভাগ্য মার-খাওয়া জনগণ। আর আছে শিক্ষিত বেকার, শিক্ষিত নিম্নবিত্ত যারা অভাবে ব্যর্থতার গ্লানিতে নিয়তমোহ্যমান, কখনো বা অগ্নিগর্ভ আস্ফালনে দিশাহারা।

সমাজের যে অর্ধেকের বেশি অংশে মজ্জাগত জড়তা, দরিদ্র অবস্থাজাত উদ্যমহীনতা, অজ্ঞতাজাত বিপাকে-পড়া পরিস্থিতি—এই ভাব এই অবস্থা শিক্ষার সঞ্জীবনী ব্যতীত কদাচ দূর হওয়া সম্ভব নয়। 'গরীবি হঠাও', 'কথা কম কাজ বেশি' বা এই ধরনের আরও কিছু জুৎসই বুলি সাময়িক কিছু উত্তেজনা সঞ্চার করলেও করতে পারে। 'মদ্যপান নিবারণী সভা' বা ঐ জাতীয় প্রচেষ্টার কিছু উপকারিতা হয়ত আছে। কিন্তু এসবের দ্বারা জনসাধারণের স্বভাবের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না। যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের কথাই ধরা যাক। যদি এক শ্রেণীর মানুষ সমাজে সবচেয়ে যে নিকৃষ্ট কাজ সেই কাজই তাদের বরাদ্দ হয় তাহলে কি কখনো অপর শ্রেণীর অবজ্ঞা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে? আজকাল ত শহরে গ্রামে সর্বত্রই সেপটিক ট্যাঙ্ক হয়েছে, কলকাতা শহরে বরাবরই আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপের ব্যবস্থা আছে তবে মেথর শ্রেণীকে নিকৃষ্টতম কাজটির জন্য জিইয়ে রাখার প্রয়োজন কি? গৃহস্থ মাত্রেই তো নিজের বাড়ির পায়খানা পরিষ্কার করতে পারে। বাড়ির জঞ্জাল নির্দিষ্ট স্থানে জমিয়ে রাখতে পারে। রাস্তায় নির্দিষ্ট আধারে ফেলতে বাধা কোথায়? মেথর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেই সমাজে তাদের চিহ্নিত নিম্নস্থান থাকবে না, অন্যথায় সে চিহ্নিত নিম্নস্থান থেকেই যাবে। আজ আর ছোঁয়াছুঁয়িতে আমাদের জাত যায় না। গ্রামে এখনো যায় বটে, অধিকাংশ শহরেই যায় না। অপর ধর্মাবলম্বীর ঘরে পানাহারেও জাত যায় না। এ-যুগে আমরা বুঝতে শিখেছি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকার জন্মায় না। ব্রাহ্মণের সন্তান শুধু অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন যাজন করে না, কার্যগতিকে ট্যানারীতে কাজ করে, পুলিশে চাকরী করে, দরকার হলে শ্রেণীশত্রু খতম করতে পিছপা হয় না। কালাপানি পার না হতে পারলেই উচ্চ সমাজে যেন মান থাকে না। বিভিন্ন বর্ণে বিবাহের ঘটনা সমাজে আর ঘোট পাকায় না, এমন কি বিদেশী কন্যা বিবাহে উচ্চ সমাজে যেন মান বাড়ে। সুতরাং বর্ণভেদের প্রকটতা আধুনিক হিন্দু সমাজে স্তিমিত। সমাজনৈতিক রাজনৈতিক বহুবিধ কারণের মধ্যে শিক্ষাই এই মানসিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ এ বিষয়ে সকলেই একমত। তেমনি এই বোধের উদয় হবার সময় এসেছে যে ধনীর গৃহে জন্মালেই ধনের অধিকার অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহের উপার্জিত তথা সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি ভোগের অধিকার জন্মায় না। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনার অধিকার, কোন বিশেষ কর্মদক্ষতা যেমন অর্জন করতে হয় তেমনি সাবালকের পক্ষে ধনভোগের অধিকারও অর্জনসাপেক্ষ। কয় জন পিতা-মাতা আপন সন্তানকে সে শিক্ষা দিই বা দিতে পারি অর্থাৎ মানসিক সায় পাই শিক্ষা দেবার! অথচ এই শিক্ষাই মানুষের অর্থমনস্কতার উগ্রতা ও ধনপুঞ্জীভূত করার উদগ্র কামনা দূরীকরণে সহায়তা করে বলে আমার বিশ্বাস।

অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের আভাস সমাজের গর্ভ থেকেই আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপদেষ্টারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ অভিমত যদি না দিতে পারে, যখন যে দল ক্ষমতায় আসীন তখন যদি তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির না থাকে, দলের কর্মীরা যদি সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হয় এবং রাষ্ট্রশাসন যন্ত্রকে যথাযথ পরিচালনা বা বশে রাখতে না পারা যায় তাহলে একটি বিরাট দেশে যে ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটা সম্ভব ঠিক সেটাই আমাদের দেশে ঘটছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠিন চাপে বাস্তবের মার খেয়ে অন্তত এটুকু চৈতন্য সাধারণ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেরই হয়েছে যে ভোটাভুটির প্রহসন, মিথ্যা গালভরা প্রতিশ্রুতি, ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলন ইত্যাদির চেয়ে খেয়ে পরে বাঁচার তাগিদটাই জরুরি। সেজন্য প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই একটা কাজ চাই—তা হাতে-কলমে কাজ হোক, গায়ে-গতরে খাটার কাজ হোক বা বুদ্ধিমানের কাজ হোক, একটা কিছু চাই যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবন ধারণ করা যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের অধিকাংশের কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে একটা বিরাট দেশ, এক রাজ্যের সমস্যার সংগে আর এক রাজ্যের সমস্যা জড়িত, এক রাজ্যের সমৃদ্ধির সূত্রে অপর রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, দেশের খনিজ সম্পদ উৎপাদন অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের উপর অর্থনীতির বনিয়াদ, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার ন্যায়সংগত অধিকার সকলেরই কিন্তু কৃষিযোগ্য ভূমির উৎপাদন লোকসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়, খাদ্যশস্য-বাসযোগ্য ভূমি লোকসংখ্যার অনুপাতে দিন-দিনই কমতির পথে। এই সাধারণ সংবাদগুলি সারা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মনে গেঁথে দিতে হলে জাতীয় সরকারকে যে ধরনের শিক্ষাদানে বদ্ধপরিকর হতে হয়—বর্তমান বয়স্ক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বা মদ্যপান নিবারণী সভা ইত্যাদিতে তার ঘাটতি আছে মনে হয়। পূর্বে হোক পশ্চিমে হোক জনজীবনের বিড়ম্বিত ভাগ্য মার খাওয়া শোচনীয় অবস্থা যে অনেকটাই মানুষের হাতে গড়া ব্যবস্থার জন্য, ব্যক্তির অজ্ঞতার জন্য সেকথা বুঝবার, বোঝবার এবং প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হবার দিন এসেছে। পূর্ব-পশ্চিমের সব সভ্য দেশেই স্থিতধী দূঢ়প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই শিক্ষাদানে আজ ব্রতী। নিঃসন্দেহে তারা সংখ্যালঘু। অধিকন্তু ব্যক্তিজীবনে কর্মক্ষমতার পরিধি খুব বেশি হলেও গড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি নয়, প্রকৃতির নিয়মে ব্যক্তি মানুষকে বিদায় নিতে হয়, ব্যক্তি আদর্শ-ইচ্ছা বা কর্মের প্রভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে অপরাপর প্রভাবে। শুধু তাই নয়, একজন যা বলে বা প্রকাশ করে আমরা আপন আপন বুদ্ধি-বিচার শক্তি অনুযায়ী সেই ভাবের বক্তব্যের সারাংসার অনুধাবন করি আবার ব্যাখ্যা করি ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাশক্তি অনুযায়ী, প্রয়োগ করি আপন আদর্শের আদলে। কোন সৎ আশাবাদী চিন্তা-আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পথে অগ্রগতিতে পরস্পর-বিরোধী চিন্তার প্রতিফলন থাকতে পারে, বহুবিধ বিপত্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। সমাজ আপন গতিতে এগিয়ে চলে।

মুশকিল এই যে যখন আমরা একটা বহুকাল প্রচলিত ব্যবস্থায় পারিপার্শ্বিকে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই, যখন পিতৃপুরুষানুক্রমে বংশপরম্পরায় সুখ-দুঃখ ভোগ করি বা কোন অধিকার দখল করে থাকি তখন পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক ত্রুটি গলদ বিপর্যয় বৈষম্য এমন কি অন্যায় আমাদের চোখে পড়ে না গা-সহা হয়ে যায়, কোন প্রশ্নও জাগে না। যারা ক্রমাগত নানা অসুবিধা ভোগ করে, অভাবে-অনটনে দিন কাটায়, শারীরিক ক্লেশ ও ব্যর্থতাবোধের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, হয়ত মরীয়া হয়ে কখনো কখনো সব ভেঙেচুরে ফেলবার একটা সাময়িক উত্তেজনা তাদের মধ্যে আসে। আর সেই অবস্থাতেই সমাজে এখানে ওখানে নানা ধরনের বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ ঘটে। ইতস্তত বিক্ষোভের ঘটনাগুলি একসূত্র বন্ধনে গেঁথে সংগঠিত পরিচালনায় যদি আসে এবং একটি মুখ্য উদ্দেশ্যে যদি পরিচালিত হয় তবে সমাজে বিপ্লব ঘটে। সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক হতে পারে। কোন সমাজে কিভাবে সেই অমোঘ শক্তি ক্রিয়া করছে সেটা সমসাময়িককালে বোঝা শক্ত হলেও সমাজ বিশেষের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বর্তমান যুগে বহুবিধ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও—যুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই বা নারী স্বাধীনতা তথা প্রগতির লড়াই আমাদের নয়। অধিকাংশ এশীয়, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাবাসীর লড়াই মানুষের মত বেঁচে থাকার—অন্ন বস্ত্র, বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, রোগের চিকিৎসা, রোগ উপশমের উপায় ও উপযুক্ত শিক্ষা—অজ্ঞতা দূরীকরণ।

উন্নত দেশগুলির সংগে দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলির গুণগত প্রধান পার্থক্য উন্নত সমাজের মেয়ে পুরুষ উভয়েই দারুণ পরিশ্রমী দায়িত্বশীলও বটে। সে সব সমাজে কায়িক শ্রম শুধু সমাজের নীচুতলার একচেটিয়া নয়। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শিক্ষিতেরাও বাস্তব অর্থে কায়িক শ্রম করে। আমাদের দেশে যেটা অকল্পনীয়। আত্মসমর্থনে যুক্তি এই যে, দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য ও শ্রমমূল্য কম হলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকে কায়িক শ্রম থেকে অব্যাহতি নেবেই! কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যদি প্রতি সক্ষম মেয়ে-পুরুষ আট-দশ ঘণ্টা খাটে তাহলে সেই সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফসল ওঠে কত! আমাদের প্রতিবেশী জাপান একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। তৃতীয়ত সীমায়িত লোকসংখ্যা। চতুর্থত কৃষিজাত শস্য উৎপাদনে, সর্বপ্রকার উৎপাদনে তথা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ। সর্বোপরি প্রশংসনীয় উদ্যমী প্রচেষ্টা—ভালভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা সমাজের উচ্চনীচ নির্বিশেষে।

সবদেশে গ্রামই শস্যের ভাণ্ডার, খাদ্যদ্রব্যের আকর। এই কারণে অধিকাংশ উন্নত দেশগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রামজীবনের সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর। দরিদ্র দেশগুলিতে বিপরীত। পরাধীনতা দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ সত্য কিন্তু অজ্ঞতাও আর একটি কারণ বটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, ভাগ্যও মানতে হয়, এসব সত্ত্বেও বলতে হয় পুরুষকারের উদ্বোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটা শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে প্রযোজ্য নয় ব্যবহারিক জীবনেও প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাদ, কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে স্বল্পকাল বাসের সুযোগে ও গ্রামাঞ্চলে প্রাণের সুযোগে সীমায়িত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় বুঝেছি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যাতায়াত

কৃষ্যাদি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সামগ্রিক রাজনৈতিক চেতনা না জাগলেও দলগত উত্তেজনা সর্বত্রই আছে। বহুস্থানে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র, জন-সংযোগ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদি হয়েছে। সাক্ষরতাই শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি বলে গণ্য হয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণ ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি চোখে পড়ার মত। কোথাও কোথাও চাষের জন্য ট্রাকটর ভাড়ার ব্যবস্থা জমে উঠেছে, সারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই তিন দশকে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি বলেই মনে হয়। চিকিৎসা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বিদ্যালয়ের অভাবটাই অধিক। দূর দূর গ্রাম থেকে একটি গঞ্জের হাটের দিনে সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি ঔষধের আশায় রোদ বৃষ্টি মাথায় করে কিভাবে যে শিশু, বৃদ্ধ, নারী রোগী দলে দলে আসে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কৃষিক্ষেত্রে সেই সনাতন পদ্ধতি। এই সব চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের মনে একবার প্রশ্ন জাগবেই সত্যই কি দেশটা স্বাধীন ? এই স্বাধীনতা এদের কাছে কতটা অর্থবহ ? বড় বড় শহরের মসনদে বসে থাকা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সত্যই কি জনসাধারণের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। পূর্ব-উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গ্রামবাসীর অধিকাংশের সমস্যাই প্রধানত একটি—প্রকট দারিদ্র্য। অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা ও শিক্ষার দারিদ্র্য। অবশ্য দারিদ্র্যের পরিধি শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয় শহরের শ্রমজীবী বিভিন্ন জীবিকা আশ্রয়ী অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত—অশিক্ষিত শ্রেণী, স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ী, দোকানী, শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত—দেশের এই বৃহৎ জনসংখ্যা। এছাড়াও আছে কর্মহীন দুঃস্থ, আছে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার। এসব কথা সকলেরই জানা, নতুন করে বলবার কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল নানা ধরনের বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান আছে। দেশী বিদেশী বহু প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বহু শহরে বহু গ্রামে আছে। অন্ধ্র, তামিলনাদ, কেরল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের কিছু গ্রামে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী দুঃস্থদের কাছে বিদেশের সাহায্য পৌঁছায়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তর ভারতে, ওড়িশায় এ ধরনের সাহায্য আছে। বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের দরিদ্রসেবা, গ্রাম-সেবা আছে। সে সব মহানুভব প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলতে হয় এই আংশিক প্রচেষ্টা কোন বিরাট দেশের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিদেশী সাহায্যের গুপ্ত পথে রাজনীতির করালছায়া মুখব্যাদান করে। এমন কি ধর্মের ছদ্মবেশেও বিপদ আসে—যা রাষ্ট্র সংহতির মূলে পর্যন্ত আঘাত হানিতে পারে—একথা আজ আর অবিদিত নেই।

আবহমানকাল ধরে ধনী সম্পন্ন গৃহস্থ দরিদ্রকে দান করে, শ্রেষ্ঠীরা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। এখনো অভাবী গৃহস্থও মমতা-সমবেদনা প্রকাশ করে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়, সাধুসজ্জনকে সেবা দেয়, সাধ্যমত অতিথি পরিচর্যা করে। সম্পন্ন গৃহস্থ পুত্রের অন্নপ্রাশনে, পুত্র বা কন্যার বিবাহে গ্রামবাসীকে ভোজন করায়। পিতামাতার পারলৌকিক কর্মে জ্ঞাতিভোজন শুধু নয় কাঙালী বিদায় করে। মানবিক মর্যাদা, মানবিক বেদনা এখনো খোয়া যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান হয়েছে কোথায় ? আর আজকের প্রাগ্রসর সভ্যযুগে সমাজে কাঙালী থাকবে কেন ? আজও শুধু ব্যক্তি, সম্পন্ন গৃহস্থ, ভূস্বামী এদেরই পূর্ণ দায়িত্ব নয়, যৌথভাবে সকলে এবং প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সরকার যদি স্থির সংকল্প গ্রহণ না করে তাহলে ব্যাপক পরিবর্তন অসম্ভব। সমগ্র ভারত সমাজে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বিত্তবান বণিক শ্রেণী, ধনী শিল্পপতি ইত্যাদির পাশাপাশি একটি সুস্থ-স্বস্থ সচেতন কর্মীশ্রেণী গড়ে তুলবার পূর্ণদায়িত্ব প্রত্যেক রাজ্য সরকারের তথা কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের।

একথা স্মরণ রাখা ভাল যে বর্তমান পৃথিবীর সমাজ সাক্ষ্য দেয় যে অর্থ-নৈতিক সমতা কোথাও নেই। তবে সমান সুযোগের পথ খোলা আছে। অনুন্নত দেশগুলিতে, দরিদ্র দেশগুলিতে তাও নেই। এমন কি সরকারের নিরপেক্ষ সমর্থনও অনেক দেশে নেই। সুতরাং আর্থিক অসমতা মেনেই নিতে হবে। মানুষে মানুষে যেমন চেহারা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, শক্তি-সামর্থ্যের পার্থক্য তেমনি ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রগত গুণগত পার্থক্যের জন্য শিক্ষা, বৃত্তি প্রভৃতির তফাত অবশ্যম্ভাবী সমাজে। আর ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি, রুচি শিক্ষা ও বৃত্তি তার জীবন-যাপনের রীতিতে ছাপ রাখবে। সুতরাং সব সমাজে শ্রেণীভেদ থাকবে। অবস্থার অসাম্য থাকবে। মানসিকতার ভেদাভেদও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই ভেদ, সেই অসমতা জাতিগত বংশগত গোষ্ঠীগতভাবে কায়েমী হয়ে না বসলেই মঙ্গল। আজকের সমাজে ধনী-সচ্ছল আর দুস্থ-নিরন্নের যে আসমান-জমিন ফারাক, যে পীড়াদায়ক বৈষম্য তা যদি কমিয়ে আনতে না পারা যায় তবে একপক্ষের দুঃখ-দুর্দশা তো থেকেই যাবে উপরন্তু সমাজে উত্তরোত্তর বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষ বেড়েই চলবে। উন্নত ধনী সমাজগুলিতে জীবন-যাপনের ব্যবহারিক দিকটায় খানিকটা সমতা আছে। আমি বলতে চাইছি খাওয়া পরা মাথার উপর একটি আচ্ছাদন নীচুতলার লোকদেরও সে সমাজে আছে। আমাদের দেশে যার একান্ত শোচনীয় অভাব। মানসিকতার পার্থক্য। জীবন-যাপনের রীতির স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি স্বীকার করেও বিত্তবান ধনী, সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশে একটি সুস্থ কর্মী-শ্রেণী না থাকলে সমাজে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। সমাজসৌধের ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দরকার এই কথাটাও উচ্চকোটির মানুষদের বুঝবার সময় এসেছে। বিদ্বেষ ও শত্রু খতমের পথ যে একান্ত পথ নয় সে সাক্ষ্য বর্তমান ইতিহাসে আছে। শুভবুদ্ধি ও উদ্যোগের সহযোগিতায় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাওয়াই হবে মহৎ কাজ।

যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার, ব্যবস্থাপনার ভার, শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার যান্ত্রিক দিকটা বজায় রাখতে তারা নিয়ত ব্যস্ত—এই ইংরেজ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থায় এমন কতগুলি বদ অভ্যাস দৃঢ়মূল হয়ে আছে যেগুলি দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ যান্ত্রিক পটুত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলেও উদ্যোগী কর্ম তৎপরতা সমন্বয়ী দৃষ্টি রাজনৈতিক পরিণতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট নয়। অথচ এই স্বভাব দৈন্যবশতই আমরা বহুদিকে পশ্চাৎপদ। এছাড়া আজ আমাদের সমাজে বয়স্ক রাজনীতিতে বিদ্বেষ ও সর্বক্ষেত্রে প্রাদেশিক মনোভাবের উৎকটতা। এবম্বিধ ভাব জাগার পশ্চাতে হয়ত পরাধীনতার অভিশাপ সক্রিয় তথাপি মনে হয় অন্যতম কারণ শৈশবে ও কৈশোরে সমাজ সাধারণের সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে কোন প্রকার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলবার শিক্ষার অভাব। কিন্তু যৌবনে যখন বৈষম্যমূলক অবস্থা ও নানা ধরনের বিধিব্যবস্থা পীড়াদায়ক বোধ হয়, ব্যক্তি-জীবনে বহুস্থানে ঠেকতে হয় ঘা খেতে হয়, যখন আর্থিক সংকট বেকার অবস্থা বহুজনকে দিশাহারা করে তোলে তখনি তাদের রোষ ক্ষোভ কখনো বা শ্রেণীবিদ্বেষে কখনো বা প্রাদেশিকতায় প্রকাশ পায়। নানাভাবে বঞ্চিত মানুষদেরই রাজনীতির শিকারে পরিণত হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তাদের মনে স্বভাবতই সচ্ছল শ্রেণীর মানুষদের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা রোষ জাগতে পারে। সচ্ছল ধনী অবস্থায় বংশপরম্পরাক্রমে যাদের জীবন কাটে তাদের অনেকের মনে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, দুস্থ শ্রেণীর প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সচেতন বুদ্ধিজীবী বা ধার্মিক উদার মহানুভব প্রকৃতির মানুষদের মনে দয়ার ভাব বা অনুকম্পার ভাব প্রবল হতে দেখা যায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুস্থ বা উচ্চ সর্বশ্রেণীর সামাজিকের মধ্যে সমানাধিকার বোধ বা সমভাব জাগা সম্ভব নয় যদি সর্বস্তরের শিশু ও কিশোরের মনে ব্যবহারিক অর্থে সমানাধিকার ও সমভাবের ধারণা না দেওয়া হয়, জীবনে সমানাধিকার ভোগের সমব্যবস্থা না থাকে। ঋষিকল্প জ্ঞানী ত্যাগী স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা সমভাব পোষণ করেন কিন্তু সাধারণ সামাজিকের মনে সে ভাবের বীজ শৈশবে উপ্ত না হলে, সেই বোধের উদয় হতে বহু সময় নেয় অথবা সেই বোধের উদয়ই না হতে পারে। যৌবনে উত্তরণের মুখে সমাজ-জীবন ও পারিপার্শ্বিকের জটিলতায় শৈশবের সরলতা স্বাভাবিকভাবেই জটিল হতে থাকে গৃহ ও সমাজ পরিবেশে সামাজিক তথা আর্থিক শ্রেণীবোধের তথা ভেদের ধারণা দৃঢ় হতে থাকে। গৃহ ও সমাজ প্রতিবেশের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ব্যক্তিজীবনে গভীর। সমাজের বহিরঙ্গ তথা অন্তরঙ্গের পরিবর্তন পরিবর্ধনে অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত দেশ প্রচলিত শিক্ষা।

॥ ২ ॥

মুখবন্ধে উল্লিখিত লক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক-ভাবে বহিরঙ্গ পরিবর্তনের ইঙ্গিত থাকলেও শিক্ষা নীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধেই মূলত আলোকপাতের চেষ্টা থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রসঙ্গত উচ্চশিক্ষার সমান্তরাল একটি কার্যকরী বিদ্যাশিক্ষার কথা উল্লেখিত হবে। সে বিষয় অবতারণার পূর্বে পুনর্বার উত্থাপন করি—গ্রামীণ অর্থনীতির বিধ্বস্ত অবস্থা আমাদের পিছিয়ে থাকার একটি কারণ। শুধু শস্য উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা, কৃষি পদ্ধতির উন্নতি যথেষ্ট নয় আনুষাঙ্গিকভাবে সংরক্ষণ, হস্তান্তর ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। সর্বোপরি জন্মবৃদ্ধির হার সংকোচনের আত্যন্তিক প্রয়োজন। পূর্বে যখন বসন্তের টিকা বা কলেরার ইনজেকশন ব্যাপকভাবে দেবার ব্যবস্থা ছিল না সাধারণ মানুষেরা ভয় পেত, সমাজে নানা গুঞ্জন উঠত। কিন্তু এই টিকা ও ইনজেকশনের উপকারিতা এখন আমরা বুঝি। তেমনি জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা ও কার্যকারিতায় সাধারণ মানুষকে অভ্যস্ত করে তুলতে হলে সরকারী নীতির কঠোরতা প্রয়োজন হতে পারে। গ্রামবাসী শহরবাসী অজ্ঞ জনসাধারণের আবেগ ও ভাবপ্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে যে সব দলনেতা তাদের রাজনীতির হাতিয়ার করে, সেই নেতাদের নির্বুদ্ধিতা যে সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা বুঝবার ক্ষমতা সেইদিন হবে যেদিন যথার্থ সমাজশিক্ষা পাবার তাদের সুযোগ আসবে।

ধর্মশিক্ষায় অধ্যাত্মবোধের শিক্ষায় প্রথম সোপান প্রবৃত্তি দমনে একথা প্রাচীনকাল থেকেই শেখানোর চেষ্টা হয়েছে। মানসিকতার উদ্বোধন নীতি ধর্মের অগ্রাধিকার শেখাবার শত সহস্র প্রচেষ্টা আজও মানুষের জৈব প্রকৃতিকে সংশোধন করতে পারেনি, জৈব প্রবৃত্তিকেও সংযত করতে পারেনি, দমন করতে পারেনি। মানসিক ভিত্তি প্রস্তুতির পুনঃপ্রচেষ্টা ব্যবহারিক অর্থে শিক্ষার মাধ্যমে এবং পরিপূরক হিসাবে তাই বিজ্ঞানের সহায়তা বাস্তব জীবনে আবশ্যক। হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভ অবদমনে শিক্ষা এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ যেমন সমাজ রক্ষায় অবশ্যম্ভাবী তেমনি শুধু সহানুভূতি নয় কঠোরভাবেই কামপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ জন্মনিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জৈব প্রবৃত্তির অবদমনে কর্তব্য-বুদ্ধিকে সজাগ করে তোলা দরকার। কথাটা নিষ্ঠুরের মত শোনালেও ভেবে দেখা দরকার যাদের আয় নেই, উপার্জন নেই, যারা পথে বাস করে, ভিক্ষাবৃত্তি যাদের অবলম্বন পরের গৃহে দাসদাসীবৃত্তি যাদের অবলম্বন, যারা রুগ্ন এমনি আরও অনেকে যদি বিকারগ্রস্ত না হয়, যদি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেতনা থাকে তাহলে স্বেচ্ছায় তারা সাবধান হয়। যদি শিশুরা সুস্থভাবে উপযুক্ত-ভাবে প্রতিপালিত না হয় তবে রুগ্ন-অশিক্ষিত-ক্ষীণকায় সেই সব শিশুদের দ্বারা সমাজের কি উপকার সাধিত হতে পারে ? তাদের ব্যক্তি জীবনেরই বা ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল ? অবাঞ্ছিত সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থহীনতা সমাজের নীচু তলার মানুষেরা বুঝতে শিখলে তবেই হয়ত ভয়াবহ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কিনারা হতে পারে। পিতা-মাতার এই কর্তব্য বুদ্ধি জাগা চাই—যে সন্তানকে প্রতি-পালনের ক্ষমতা নেই, সে সন্তানকে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় ভূমিষ্ঠ করবারও অধিকার নেই তাদের। আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থের যা অবস্থা তাতে একটি বা দুটি সন্তানের অধিক সন্তান হলে মানুষ করে তোলা কষ্টকর। শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে সতর্ক করার দরকার হয় না। যেখানে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা

সেখানেই সাবধান বাণী পৌঁছানো দরকার। সরকারী নীতিতে কোন ধর্ম বা জাতির প্রতি সহজ ভাব ধারণের স্থান কম। সমাজ যখন সমস্যাভারে বিপন্ন তখন দলীয় রাজনীতির কাছে নতিস্বীকারের অবকাশও সরকারের থাকে না। সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশিত।

॥ ৩ ॥

এই পর্যায়ে বিচার্য হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় কয়েকটি মূল নীতি যা সমগ্র ভারত সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে ইংরেজ প্রবর্তিত এ-যাবৎকাল প্রচলিত ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন প্রয়োজন যা লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি রদ করবে। এই নীতি মূখ্যত সমাজ জাগরণের কুশলী মন্ত্রণায় পর্যবসিত হলেই সার্থক হবে। উগ্র ব্যক্তিবাদের পরিবর্তে সমগ্র সমাজ চেতনাই হবে সে শিক্ষার ফলশ্রুতি। এই শিক্ষা যেন ব্যক্তিকে বুঝবার সুযোগ দেয় সমাজে ব্যক্তির যথার্থ স্থান কোথায়। সর্বরাজ্যে সর্বস্তরের প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় একযোগে মূলনীতিগুলি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ দ্বন্দ্ব বিরোধের আশংকা থেকেই যাবে। একটি গোষ্ঠীর স্বার্থতা, অপর গোষ্ঠীর সুযোগ প্রাপ্তি, রক্ষণশীলতা বা উষ্মা-অবজ্ঞা-দাম্ভিকতায় এক ধরনের অসুস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনাও থেকে যাবে। একথা বলাই বাহুল্য যে এমন আদর্শ অবস্থা কোন সমাজেই কোনদিন আসবে না যেখানে প্রতিব্যক্তিই সুখী বা সন্তুষ্ট। তথাপি আশা করা হচ্ছে যদি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উপরিউক্ত পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাধান্য পায় বা অবশ্য শিক্ষণীয় নীতি বলে গৃহীত হয় তবে ধীরে ধীরে সমাজের চারিত্রিক রূপ বদলাবে—

ক। জাতি, ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতির উগ্র অভিমান দূর করা,

খ। দারিদ্রের দীনতা ও বিত্তশালীর অভিমান দূর করা

গ। স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষা দান,

ঘ। দেশের আইন-আদালত, রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতির কাঠামো কেমন সে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঙ। নির্বাচনের উদ্দেশ্য কি, ভোটদান পদ্ধতি কেমন, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব কি, নাগরিকের কর্তব্য কি, দাবী কি—সে সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান,

চ। বৃহৎ ভারতবোধের উদ্বোধন,

ছ। সামাজিক সচলতা সহজীকরণ, প্রাদেশিকতা দূরীকরণ,

জ। গ্রাম সমাজের অর্থনৈতিক সুস্থ অবস্থা কিসের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঝ। ব্যক্তির সুস্থ জীবন যাপনের জন্য কমপক্ষে কতটুকু স্থান ও সুসম খাদ্যের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অবহিত করা;

ঞ। খাদ্যের উৎস কি, লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ কি, ঘাটতি কতটা, কিভাবে তা পূরণ হয় ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান;

ট। শস্যব্যতীত অন্যান্য খাদ্যাদির পরিমাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঠ। কেন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে পড়ে, কিভাবে সাধারণের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজলভ্য হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ড। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে—বন্যা খরা অতিবৃষ্টি চাষ আবাদের কি প্রকার ক্ষতি করে, তার ফল কিভাবে সমাজে অনুভূত হয়, যাতায়াত ব্যবস্থায় কি পরিমাণ অসুবিধা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে—সে সম্বন্ধে জ্ঞান দান,

ঢ। অসুস্থ হলে আমরা কি করি, কার কাছে যাই, চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে আমরা কিভাবে অব্যাহতি পাই—সমাজ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কাদের উপর ন্যস্ত সে বিষয়ে জ্ঞান দান;

ণ। কত রকমারি শিল্প আছে আমাদের দেশে, ক্ষুদ্র শিল্প, ভারী শিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদি, কেমন করে লেনদেন হয়, আমদানী রপ্তানী কিভাবে হয়, এক দেশের সংগে আর এক দেশের রাজনৈতিক যোগাযোগ কিভাবে ঘটে এবং চালু থাকে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ কিভাবে রক্ষা পায়,

ত। খনিজ দ্রব্য কত প্রকার আছে আমাদের দেশে, কোথায় আছে, কি ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত উন্নত বা অবনত; পণ্যসম্ভার কিভাবে এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়, কে বা কারা সে সব কাজে যুক্ত থাকে; ইত্যাদি বহুবিধ সংবাদ, জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিক শিশু ও কিশোরের সম্মুখে উন্মোচিত হলে তবেই বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে পারিপার্শ্বিক সচেতনতার বিকাশ ঘটে বা সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘস্থায়ী নাবালকত্ব, একদেশদর্শী মনোভাব, বহু প্রকার আবেগ অভিমান সমাজ মন থেকে দূর হতে সহায়তা করে।

স্বীকার করা ভাল যে, সাক্ষরতা শিক্ষার একটি প্রধান অংগ বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়। স্বচেষ্টায় গ্রন্থাদি পাঠ করে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাতে অন্তত দশ বছরের বিদ্যালয়ের পাঠ, পরবর্তী চার-ছয় বছরের শিক্ষা প্রয়োজন। বয়সের অভিজ্ঞতায়, শিক্ষার প্রভাবে ও পরিবেশ পরিস্থিতির গুণে সাধারণ মানুষের মানসিক পরিণতি ঘটে। কিন্তু যদি শৈশব-কৈশোর অবস্থায় সমাজ ও জীবনের নানা সংবাদ পরিবেশন করা যায় কতগুলি মূল্যবোধ গেঁথে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে মানসিক ক্রমপরিণতি যৌবনেই বিকশিত হতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাক্ষরতা শিক্ষার আনুষঙ্গিকরূপে সমাজ ও জীবনের নানা সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আত্যন্তিক প্রয়োজন।

বলাই বাহুল্য প্রচলিত শিক্ষাধারায় পরিবর্তন আনতে গেলে বহুবিধ সমস্যা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষত সচ্ছল ঘরের, ধনী ঘরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা আসবে কারণ উচ্চকোটির অভিভাবকদের স্ব স্ব সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা থাকে। অভিভাবকদের বিশেষ মতামত আছে, ভাল-মন্দ বিচারেও তারা তীক্ষ্ন। বহু শিক্ষকের ভ্রুকুটি সহ্য করতে হতে পারে কারণ পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণ ও পরীক্ষা পাসই এ শিক্ষার অন্তিম বা একান্ত উদ্দেশ্য হবে না বলে। বহু শিক্ষাবিদও একমত না হতে পারেন। অবোধ শিশুর নিষ্পাপ সরলতা ভেঙে দিয়ে এই শতাব্দীর খর মধ্যাহ্নে জাগিয়ে তুলতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। হয়ত তাঁদের মনে হবে অলীক কল্পনার ইন্দ্রজালে ঘেরা মায়া রাজ্য সৃষ্টিই উৎকৃষ্টতম নীতি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে সচেতন করে তোলা তাহলে উপরিউক্ত সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব বোধের শিক্ষা দানের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। বিশেষত যখন সমাজের বঞ্চিত জনজীবনের সামাজিক উন্নয়ন আমাদের কাম্য। দ্বিতীয়ত আজ যখন সুস্পষ্ট যে, শতাব্দীকালের অনুসৃত শিক্ষার ফলে ভয়াবহ বেকার সমস্যা ও বিচ্ছিন্ন সংহতি পরিদৃশ্যমান—সেই পরিস্থিতিতে প্রচলিত নীতি বা ধারার পরিবর্তন হবে না-ই বা কেন?

সমাজ মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গ্রাম-শহর-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, ইংরিজী দেশীয় ভাষা মাধ্যম সরকারী-বেসরকারী ধর্মীয় ইত্যাদি বিদ্যালয়ের শ্রেণীগত পার্থক্য নির্বিশেষে সমগ্র ভারত সমাজে শিশু শিক্ষায়, মাধ্যমিক শিক্ষায় ও বয়স্ক শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতির মূলদর্পণ যদি হয় জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে সমতার শিক্ষা দান তবে আশা করি সমাজের সর্বস্তরে কতগুলি ভাব-ধারণা-মূল্যবোধ জাগা সম্ভব। একদা প্রাচীন ভারত সমাজে ধর্মশিক্ষা-সমাজ-শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যুগ বিবর্তনের সংগে সংগে সমাজ জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। আজকের বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষায় বিশেষ ধর্মশিক্ষা অংগীভূত নয়, কিন্তু মানবধর্ম বিচ্যুত শিক্ষাও হতে পারে না। সমাজ শিক্ষা মানবধর্ম শিক্ষা না থাকলে কেবলমাত্র বিষয় শিক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা মানবচরিত্রের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে পারে না। পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মিবৃন্দের শিক্ষাব্রতীর ভূমিকা ছিল সমাজ শিক্ষায়। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ভ্রষ্ট চরিত্রই সমাজে স্পষ্ট। ধর্মগুরুর ভূমিকা এ-যুগের সমাজে সংকীর্ণ। শিক্ষাব্রতীই এখন একমাত্র ভরসা।

॥ ৪ ॥

পশ্চিমবংগকে আদর্শরূপে ধরা যাক। পশ্চিমবংগ সরকার গোষ্ঠী ও মতবাদ নিরপেক্ষভাবে এই নীতি পোষণ করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এই রাজ্যে ৩০ হাজার গ্রামে কোথাও কোথাও প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। অনুমান করা যাক প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে অন্তত ষাট থেকে নব্বই হাজার শিক্ষিত ছেলেমেয়ের কাজ জুটবে। আমি গ্রামের কথাই উত্থাপন করছি এই জন্য যে, শহরে সম্ভবত বেসরকারী ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলি সরকারী অর্থসাহায্য ব্যতীতই কাজ চালাতে সক্ষম, সে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক বিষয়ে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র; এমন কি বিত্তবান সচ্ছল অভিভাবকদের সহায়তায় সে সব বিদ্যালয় থেকে সরকারী নীতির বিরোধিতাও হতে পারে। শহরের বড় বড় সরকারী বিদ্যালয়গুলির সেটআপে অভ্যস্ত শিক্ষকদের পক্ষেও বিরোধিতা করা সম্ভব, অসন্তোষ প্রকাশ করা স্বাভাবিক। সুতরাং প্রথম ধাপে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও শহরাঞ্চলে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার অধিকতর সুযোগ আছে বলে সেখানেই শুরু হওয়া যুক্তিযুক্ত। ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সহায়তায় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

উপরিউক্ত ত্রিশ হাজার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হওয়া উচিত ষাট থেকে নব্বই হাজার উচ্চশিক্ষিত বা বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত উৎসাহী, কর্মী, আশাবাদী তরুণ সম্প্রদায়। যারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির দিকে বিশেষ নজর দেবে। শুধু জ্ঞান আহরণে, সঞ্চয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাস্তবে প্রয়োগের নিপুণতা যেমন নবীন শিক্ষকদের আয়ত্তে থাকবে তেমনি তাদের কাজ হবে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীকে উদ্দীপিত করে তোলা। অনুমান করা যাক প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত তিন জন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত হবে, প্রধান বা প্রধানা এম-এ বা বি-এ পাস অবশ্যই হবে, দ্বিতীয় জন যদি স্কুল ফাইনাল হয় তবে শিক্ষণ শিক্ষা অবশ্য থাকা চাই এবং তৃতীয় জন সংগীত, সূচীশিল্প অন্যান্য হাতের কাজ বা রন্ধন বিদ্যায় পারদর্শী হবে।

মঠ-মাদ্রাসা-গুরুকুল পন্ডিচেরী, মিশনারী স্কুল কনভেন্ট ইত্যাদির সংগে এই বিদ্যালয়গুলির চরিত্রগত পার্থক্য এই যে, কোন একদেশদর্শিতার আবর্তে না রেখে সমাজের বঞ্চিত সন্তানদের সামনে বৃহত্তর সমাজভাবের অনুকূল একটি বাস্তববাদী কার্যকরী শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা, যার দ্বারা ব্যক্তি-সমাজ-জীবন-রাষ্ট্র-অন্তরাজ্য-আন্তর্জাতিক পরস্পর সম্বন্ধ ও বর্তমান যুগ ও জীবনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মায়। আইন-আদালত-শিক্ষা-ধর্ম-সরকারী শাসনযন্ত্রের গোষ্ঠী নিরপেক্ষ স্থিতি এগুলির পারস্পরিক যোগ এবং এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকের তথা নাগরিকের অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মায়।

তরুণ উৎসাহী, আশাবাদী শিক্ষকদের যেন শিক্ষার এই নীতি তথা উদ্দেশ্য ও সে উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হবার পথটি সম্বন্ধে উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা

সারা বিশ্বে পরীক্ষিত বেগন® স্প্রে

'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' শক্তিশালী বলে আপনার ঘরদোর সব রকম কীট থেকে সুরক্ষিত রাখে দীর্ঘকাল ধরে

এই দেখুন সুখের, আরামের কীটমুক্ত বেগনগৃহ

সবরকম কীটের কবল থেকে দীর্ঘস্থায়ী ছুটকারা লাভ করুন— মাত্র একবার স্প্রে করেই।
বেগন স্প্রে এক সাধারণ স্প্রে নয়। একবার স্প্রে করলেই সবরকম কীটের সমস্যার ব্যাপারে শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী 'অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া' সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তার মানে বেগন-স্প্রে যেমন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল তেমনি খরচও কম।

আরশোলা খতম করতে:
ময়লা ফেলার পাত্রে, ড্রেনে এবং লুকিয়ে থাকবার অন্য আর সব জায়গায় বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

মাছি ও মশার জন্যে
যেখানে ওরা বসে সেখানে স্প্রে করুন: জানলায় কাঠে ও ফ্রেমে, পর্দায়, ফিটিঙে, তেমনি দেওয়াল, সিলিং আর আসবাব পত্রেও…

ছারপোকা খতম করতে
যেখানে ওরা বাসা বেঁধেছে সেই সব আসবাবপত্রে গদিতে এবং গৃহসজ্জার জিনিষপত্রে বেগন-স্প্রে ব্যবহার করুন।

আরশোলা, মাছি, মশা, ছারপোকা · ঘরের সবরকম কীটের ক্ষেত্রে কেবল বেগন-স্প্রে সত্যিসত্যি কাজ করে:

১) **ফ্লাশ করার ক্রিয়ায়**
লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে কীট বার ক'রে দেয় এবং এদের মেরে ফেলে।

২) **পজিটিভ 'স্পর্শজনিত' ক্রিয়ায়**
স্প্রে-করা সমস্ত জায়গায় স্পর্শজনিত শক্তিশালী ক্রিয়ার ফলে— এখানে যে সমস্ত কীট চলে ফিরে বেড়ায় বা বসতে চায় তাদের নিশ্চিত ভাবে মেরে ফেলে।

৩) **অবশিষ্টাংশের ক্রিয়ার ফলে**
দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্য্যকরী। স্প্রে মুছে বা ধুয়ে না গেলে স্প্রে করা জায়গাটি অনেক দিন ধরে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে।

একমাত্র স্প্রে যার অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া'র কীট থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাওয়া যায়।

স্প্রে

বায়ারের আন্তর্জাতিক গবেষণায় এক প্রমাণিত কীটনাশক

OBM-7822-BEN

থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শিক্ষণ শিক্ষার N C E R T প্রবর্তিত কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। কর্ণাটক হায়দ্রাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তথা শিক্ষণ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগের পূর্বে জেলা পরিষদের পক্ষে সেই জেলার সমস্ত প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সভা ডেকে শিক্ষানীতি কার্যকরী করার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। পরে সর্বদা লক্ষ রাখতে হবে যাতে সুষ্ঠুভাবে সেই নীতি যথাযথ পালিত হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, জনসংযোগ, খাদি গ্রামোদ্যোগ বুনিয়াদী শিক্ষা বিশ্ব-ভারতীয় লোকশিল্প সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই বিদ্যালয়গুলির সরাসরি যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। নবীন শিক্ষকদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জেলা শহরের বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যেন নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষিত হয়। মাঝে মাঝে স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের একত্রিত করে জেনে নেওয়া দরকার হবে তারা কি বিষয়ে জানতে চায়, তাদের ছেলে-মেয়েদের কি বিষয়ে শিক্ষা দিতে চায়, কি বিষয়ে শিক্ষা দিলে গ্রামের সমাজে কাজে লাগবে বলে তারা মনে করে ইত্যাদি। এইভাবে শিক্ষকদের জানতে হবে বিশেষ বিশেষ গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ কোন কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে কৃষি, মৎস চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, গালার কাজ, কুমোরের কাজ, ছুতোরের কাজ, মাটির পুতুলের কাজ, পট তৈরীর কাজ, মিষ্টান্ন প্রস্তুতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার স্থান বিশেষে বিশেষ চাহিদা আছে। বহু ধরনের হাতের কাজ, কারিগরী, শ্রেণী বিশেষের মধ্যগুপ্ত না থেকে যেখানে চাহিদা আছে সেখানে শেখানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে নানা বিষয়ে পারদর্শী বহু লোক স্থানীয় বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সহায়তায় এইসব পারদর্শী ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া সহজ। জেলা শহরে বহু গান-বাজনা জানা ছেলে-মেয়ে আছে, বয়স্ক সংগীত শিক্ষক আছে যারা স্থানীয় প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে পারলে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি প্রযুক্তির দিকটায় নজর দেওয়া অত্যাবশ্যক। বড় শহরে মফস্বল শহরে শিশু কিশোরের সামনে জীবনের নানা দিকের, নানা অবস্থার উপকরণ থাকে তারা অনেক কিছুর সঙ্গে বাস্তবভাবে পরিচয়ের সুযোগ পায়, গ্রামে তা আদৌ নেই। অল্পসংখ্যক লোক বিশেষ জীবনের ছাঁদ, পরিমিত পরিবেশ এরই মধ্যে বেড়ে ওঠে গ্রামের শিশু কিশোররা। শিক্ষকদের সেই জন্য নানা দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য। বই-এর পাঠ তো বটেই, তদতিরিক্ত গান-বাজনা সেলাই রান্না বিবিধ শিল্প শিক্ষা, মাঠে-ঘাটে হাতে-কলমে কাজ, খেলা-ধুলা ব্যায়ামের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যুক্ত থাকা অবশ্যকর্তব্য। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ছবি দেখানো, (ভারতের বিভিন্ন স্থানের, দেশ-বিদেশের, বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রকল্পের কাজের ইত্যাদি) নাটকের আয়োজন করা, বিভিন্ন ব্যক্তিকে আহ্বান করে কথা বলার ব্যবস্থা করা দরকার হবে। অর্থাৎ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মুখ্যকেন্দ্র হয়ে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সহযোগী অংগস্বরূপ হলে গ্রামজীবনে অচিরে পরিবর্তন আসা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে এই সব উদ্যোগী ব্যবস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা সরকারী নির্দেশনার থেকেও জরুরী। গ্রামের মেয়েদের জীবনে সংগীত, সূচীশিল্প হাতের কাজের সুযোগ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। ঘর-সংসারের নানা দায়িত্ব বহন ও সন্তান পালন অবশ্যকর্তব্য সন্দেহ নেই কিন্তু তদতিরিক্ত মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন সামাজিকেরা বুঝতেন বলেই সেই মানসিক অবলম্বনের খোঁজে ধর্ম অনুষ্ঠানে ব্রতনিয়ম পালনে নারী সমাজকে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। এ-যুগের জটিলতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্ন কোটিতেও পুরুষ-নারী উভয় পক্ষের বিষয় সচেতনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা, রুচি শিক্ষা কলা শিক্ষার দ্বারা সাধারণ ঘরের মেয়েদেরও মানসিক প্রসারের পরিণতির প্রয়োজন আছে, অন্যথায় বহু সামাজিক সমস্যা নিরসন অসম্ভব হবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী বুদ্ধি বাস্তব দৃষ্টিও জাগা সম্ভব শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই। একদিকে সচ্ছল জীবন-যাপনের ইচ্ছা অপরদিকে ধর্ম সংগীত শিল্প নানাবিধ কর্ম সমাজ-সেবা রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রতি আগ্রহে জৈব প্রবৃত্তি দমনের উপযুক্ত রুচি বুদ্ধি জাগা সম্ভব, সন্তান ধারণের জৈব ইচ্ছা অবদমনে সহায়ক হতে পারে। ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে ব্যবহারিক উপায় অবলম্বনের বাস্তব বুদ্ধি ও মানসিক প্রস্তুতি হওয়া সম্ভব শিক্ষার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে। এইভাবে বিবাহের বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রজননের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকাকালীন সন্তান সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচারেও আপত্তি উঠবে না মেয়েদের পক্ষে। মনে হয় পুরুষরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবে নিজের ক্ষমতা সীমায়িত করায় বাধা হবে না, অস্ত্রোপচারের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই সুফল লক্ষ করা যাবে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সত্বর কার্যকরী করা সম্ভব হলে। যে দলই যে রাজ্যে সরকার গঠন করুক, এই দায়িত্বে সদাসচেতন ও সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী যে দলমতের সমর্থক হোক, ব্যক্তি অভিমতের প্রাধান্যে শিক্ষা-মন্ত্রকের নীতি সতত চঞ্চল হলে সাধারণ সত্য অবহেলিত হবে, অথচ সাধারণ কতগুলি সত্য মেনে নিতে না পারলে ভারতবর্ষের জনজীবনের অবস্থার উন্নতি ও মানসিকতার পরিবর্তন সুদূর পরাহত। একথা স্মরণ রাখা ভাল যে সর্বপ্রকার উদ্যোগী তৎপরতা সৎ চেষ্টা বানচাল করে দেবার জন্য সমাজের মধ্য থেকেই অবাঞ্ছিত শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, পরে অকৃতজ্ঞ সমালোচনা, অবজ্ঞা অস্বীকৃতি সেই সমাজের মধ্যে থেকেই আসতে পারে যাদের জন্য এই ভাবনা এবং প্রাণপাত ব্যক্তি প্রচেষ্টা ও সমবেত শুভ ইচ্ছা। অতএই সরকারের পক্ষে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শিক্ষকের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান প্রাণ রক্ষার্থে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য তেমনি শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদ সম্প্রদায়ের পক্ষে সব কিছু উপেক্ষা করে সমাজহিতৈষণাই অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করা সমীচীন। একথা সর্বজনবিদিত যে শিক্ষাহীন উত্তেজনা মানুষকে বিবেকহীন কাজে ঠেলে দিতে পারে যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তি-জীবনের অসাফল্য আর্থিক কৃচ্ছ্রতা, ক্ষুধা-অনাহারের জ্বালা, তবে ফল হয় মারাত্মক। সামাজিক অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষের অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বিধ্বস্ত অবস্থা ও আনুষঙ্গিক শিক্ষাহীনতার কুফল।

এতদ্ব্যতীত জীবন মানের বৈষম্য পর্যুদস্ত অবস্থা ব্যর্থভাব শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের যে কি হাল সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে সরকার শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষায় আনুকূল্য করতে পারে। যে-কোন পর্যায়েই হোক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন মান তার বয়স-অভিজ্ঞতা শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত; প্রাথমিক মাধ্যমিক বা কলেজী বিদ্যালয়ের পার্থক্যে বেতন হারের পার্থক্য রাখা যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয় না। এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন হারের পার্থক্য থাকবার কোন সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষক পদের প্রার্থী যদি এম-এ পাস হয় তা সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা হোক তাতে বেতন হারের পার্থক্য রাখার কারণ কি? যদি স্ব স্ব যোগ্যতায় বা সময়ের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাস শিক্ষক ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবেই তার বেতন হারের উচ্চমান প্রাপ্তির যথার্থতা। অন্যথায় এম-এ পাস প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে সদ্য এম-এ পাস কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন হারের অসাম্য রেখে এবং সেই সূত্রে পূর্বাহ্ণে যোগ্যতা বিচার সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই অর্থহীন অসাম্যের প্রকট পরিচয় আমাদের সমাজে বহুক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। ফল যে কতটা মারাত্মক সমাজবিজ্ঞানী মাত্রেই অবহিত আছেন। একথা আমরা সাধারণ সামাজিকেরাই বা কে না জানি যে একদিকে উচ্চ শিক্ষিত মাধ্যমিক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকের মনে ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানি বোধ আর একদিকে নামে শিক্ষিত গুণগত উৎকর্ষের অভাব আছে এমন লোকের আধিক্য ও তাদের হাতে শিক্ষার ভার—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-কলেজী শিক্ষা এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিম্ন মানের দিকেই গতি-শীল। যদি উচ্চ শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ না পেয়ে গ্রামের প্রাথমিক কি মফস্বলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করতে বাধ্য হয় স্বাভাবিক কারণেই তারা ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হতে পারে—বিশেষত বেতন হারের বৈষম্যের দরুন তাদের ব্যর্থতা বোধ জাগে। বেতন হারের সমতা রক্ষা করে, যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার করে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মানসিক সুস্থতা অনেকটাই বজায় রাখা যায়। অবশ্য পরিবেশের পার্থক্য থাকবেই।

॥ ৫ ॥

গ্রামীণ বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি কার্যকরী করে তুলতে রাজ্য সরকারের বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা শিক্ষাখাতে অধিক ব্যয় করতে হবে। রাজ্যের বিত্তশালী সম্প্রদায় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী বিভিন্ন ব্যাংক, সম্পত্তিশালী উচ্চকোটির নাগরিকেরা অনায়াসেই এই শিক্ষা প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে পারে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা সমাপ্তির পর গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা আদৌ শহরমুখী হয়ে না ওঠে। তারা গ্রাম সমাজেরই সম্পদ—এইদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দরকার হবে। অর্থাৎ সেই উদ্দীপনা সৃষ্টিই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্বাচন পাঠদানের পদ্ধতি এবং পাঠ্য পুস্তক রচনায় সর্বদা সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রয়োজন হবে। তবে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যে, তীক্ষ্ণধী, যথার্থ মেধাবী শিক্ষার্থী পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশের সর্বপ্রকার সুযোগ পায়। অন্যথায় সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি, মনীষার অপচয় হবার সম্ভাবনা।

এই সূত্রে একটি বিবেকী অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা ও দিকদর্শনা পাঠক সমাজের উদ্দেশে তথা রাজ্য ও জাতীয় সরকারের উদ্দেশে রাখার চেষ্টা করা যাক। ধর্মে-শাস্ত্রে সর্বদাই লোভ অবদমনের বাণী উচ্চারিত, প্রবাদে আছে বারংবার, অসারতা প্রমাণের চেষ্টা যে, ধন-জন-যৌবনের গর্ব বৃথা। নিমেষেই কাল সর্বস্ব হরণ করে নিতে পারে, নেয়। কিন্তু ধর্মাবিকার, জনগর্ব যৌবনমত্ততা থেকে মুক্তি কোথায়? যুক্ত কয়জন? সমাজে আছে রূপের বেসাতি, শক্তির দম্ভ, ধনের লোভ, ধনের গর্ব, অহমিকা ঔদ্ধত্য, ভোগের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। কোন ক্ষেত্রে সংযম আছে? আধুনিক ভারত সমাজে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বের প্রভাবও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আছে সমগ্রব্যাপ্ত নয়। এ যুগে পূর্ব-পশ্চিমের কিছুসংখ্যক মনীষী সমাজ মনোভাবের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনস্বী শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী অর্থনীতি বিদগণ অনুকূল মনোভাবের সমর্থক। যতদূর বোঝা যাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন-কানুন অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো সব কিছুর সমন্বয়ী প্রভাবে একটা দেশে, সমাজ চরিত্রে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ধারার পরিবর্তন ও অর্থনীতির বিন্যাসের সুষ্ঠুতা-উপযুক্ততায় সমাজে উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে পরিবর্তন ঘটা মূলত সম্ভবপর হয়। সুতরাং সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামোটার স্বরূপ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের একটা সাধারণ পরিচয় থাকা দরকার। দুঃখের বিষয় জনসাধারণের কথা দূরে থাক, রাজনৈতিক কর্মী যারা নাকি স্থানীয় সমাজের মাতব্বর তাদের মধ্যেও সে জ্ঞানের অভাব লক্ষ

করা যায়। সাধারণের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সংগে যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে দলনেতাদের তেমনি থাকা দরকার সমাজ ও অর্থনীতির বিন্যাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা। শুধু ইডিওলজি বা ইজম্ যথেষ্ট নয়। অসন্তুষ্ট বা অজ্ঞ বা ক্ষুব্ধ মানুষকে রুষ্ট করে তুললেই ক্ষিপ্ত আন্দোলন, কিন্তু মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ কোন স্থায়ী ও সুস্থ-সুষ্ঠ প্রি... ... করে তুলতে পারে না। অর্থনীতিক বৈষম্য দূর করা বা অর্থনীতি কব্জা করা যায় না। শ্রমিকের শক্তিই মালিকের সমৃদ্ধির কারণ, মুনাফার মেরুদণ্ড। অতএব ঘেরাও বা ধর্মঘট করে কার্যসিদ্ধি বেতনবৃদ্ধি এ যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রচেষ্টা তেমনি কৃষকদের ধর্মঘট জোতদার খুন, ব্যবসায়ী খুন, শিল্পপতি খুন, বাজারে মারধোর, চোরাগোপ্তা, ট্রেনে ছিনতাই প্রতিকারহীন ভ্রষ্ট রাজনীতি। অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর। কৃষককে জমি চাষ না করার উসকানি, সর্বস্তরের কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে কর্মবিরতির প্রবর্তনা, পরোক্ষে যে সামাজিক বিপন্নতাই ডেকে আনে ইতিহাসে সেই ফলশ্রুতির নজিরই প্রধান। তাই সব দেশের সমাজেই সমাজ তথা অর্থনীতির বিন্যাস ব্যবস্থাটা অনুধাবন করার চেষ্টা শুধু মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় নয় সর্বস্তরের মানুষের বুদ্ধিগম্য করে তোলার চেষ্টায় আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সাধারণভাবে সমাজের উচ্চকোটি বলতে আমরা বুঝি বিত্তবান সম্প্রদায়—কলকারখানা বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সংস্থায় যুক্ত ধনী কারবারী, শিল্পপতি, শিল্পসংস্থা-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ সরকারী বেসরকারী বিভাগীয় কর্মচারী, ধনী লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন বৃত্তিজীবী ইত্যাদি। এবং সচ্ছল শিক্ষিত সম্প্রদায়। সংস্কৃতিবান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চকোটির পর্যায়ভুক্ত কিনা আর্থিক মানের বিচারে—সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা বিষোদ্গার না করে কে বা কারা এবং কি বিষয় দেশের সমাজের অর্থনীতির নিয়ামক—সে সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনা প্রসারিত হলেই সমাজে অধিকতর মংগল। দেশের সম্পদ—ব্যবসাবাণিজ্য উৎপাদন-লেনদেন এগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ জ্ঞান, মোটামুটি ধারণা সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হওয়া আশু প্রয়োজন। অস্তিমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কোন কিনারা করা সম্ভব কিনা সেই প্রত্যাশায় সাদামাটাভাবে সাধারণ সামাজিকের মনোভাব নিয়ে একটি বিবেকী বনিয়াদের প্রস্তাব দেওয়া যায়। সামাজিক হিতের জন্যই নানা ধরনের আইন-কানুন সমাজে প্রচলিত, সমাজের শান্তি শৃংখলা বিধানের উদ্দেশ্যেই নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রচার। তেমনি যদি সম্ভব হয় ব্যক্তি সম্পত্তি উচ্ছেদের বা স্বার্থমনস্কতা ভোগাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দূরীকরণের প্রশ্ন না তুলেই বহুদিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা। অবশ্য সকল সমাজেই আয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর নানা রকম লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ দেয় কর ইত্যাদি নির্ধারিত আছে।

আবার কর ফাঁকি দেবার উদার সুযোগ রেহাই পাবার গুপ্তপথও বহুপ্রকার। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনবার সৎ চেষ্টা কি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায় না?

যদি সমাজে প্রতি ব্যক্তির শ্রেণীর আয়ব্যয়ের মাপকাঠিতে ধনসঞ্চয় ও সম্পত্তি দখলে থাকা বা সম্প্রসারের একটি উচ্চতম মাত্রা নির্ধারিত থাকে, তদুপরি যদি প্রতি নাগরিকের পক্ষে আয়-ব্যয়-সঞ্চয়-সম্পত্তির অধিকার বা বিস্তৃতি ইত্যাদির বিবৃতি দেওয়া বাধ্যতামূলক জাতীয় নীতি হয়, তাহলে প্রতিবৎসর সংবাদ সরকারের নখদর্পণে থাকতে পারে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির কর্মগ্রহণের সময়, অবসর গ্রহণের সময় বা দায়িত্বের অব্যাহতি প্রাপ্তির সময় উক্ত বিষয়ের ঘোষণা বিবৃতিদান আবশ্যিক নীতি হিসাবে গ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তির সংজ্ঞায় রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য, শিল্পসংস্থা ব্যবসা কেন্দ্রের পরিচালক উপদেষ্টা, আদালতের বিচারপতি, স্বাধীনবৃত্তিধারী আইনজীবী, চিকিৎসক, পূর্তকর্মী সকলেরই অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। দল, গোষ্ঠী, শ্রেণী, ধর্ম, গ্রাম-শহর-শিল্প-নগরে সর্বপ্রকার ব্যবধান-বিভেদ নির্বিশেষে প্রতি কর্মক্ষম আয় উপার্জনশীল নাগরিকের পক্ষে প্রযোজ্য হবে এই বিবৃতি দান, তবেই মনে হয় ছলে বলে কৌশলে ফাঁকি দেবার প্রবণতা, অল্প সময়ের ব্যবধানে উৎকোচ গ্রহণ, তহবিল তছরূপ করে অর্থসংগ্রহের ঐকান্তিক প্রবণতায় ভাটা পড়তে পারে। সঞ্চয়ের ঊর্ধ্বসীমা ও বিস্তৃতি, সম্প্রসারণের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত থাকায় ধনপুঞ্জীভূত করার গৃধ্নুতা দমিত হতে পারে। অধিকন্তু দেশের মাটিতে থাকাকালীন, দেশীয় কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকাকালীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশে অর্থস্থানান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মাত্রেরই পক্ষে আয়ের কিঞ্চিৎ অংশ দেশে সঞ্চিত রাখা বাধ্যতামূলক ভারতীয় নীতি হতে পারে। এইভাবে উচ্চকোটির গগনচুম্বী স্ফীতি নিরোধের চেষ্টা অপরপক্ষে নিম্ন আয়ের মানুষের উপর আর্থিক চাপ হ্রাসের চেষ্টা সফল হতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

॥ ৬ ॥

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসংগ অবতারণার পূর্বে রাজ্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পরিসংখ্যান বিভাগ সংবাদ পরিবেশন বিভাগ ইত্যাদির দ্বারা জনসাধারণের নিকট কিভাবে নানা বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে, উপকৃত হতে পারে ভেবে দেখা যাক। অর্থাৎ জনশিক্ষায় এইসব বিভাগের ভূমিকা কেমন হতে পারে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। সত্য কথা বলতে কি খুব অল্পসংখ্যক অভিভাবকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে ৫।১০ বছর পরে ছেলে বা মেয়ে যদি শিক্ষা সমাপ্ত করে তাহলে কি ধরনের ভবিষ্যৎ সামনে। যদি বি-এ, এম-এ পাস করে তাহলে কি ধরনের কাজ কোথায় জোগাড় করতে সক্ষম হবে তা অনেকেই আমরা অনুমানে সমর্থ হই না। অথবা যদি এম-এ না পড়ে বা পড়বার যোগ্যতা না থাকে, কি ছেলেমেয়েকে এম-এ পড়াবার মত সামর্থ্য না থাকে তাহলে কি পড়া যুক্তিযুক্ত হবে, কি পেশার জন্য তৈরী হবে। কিম্বা যদি ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার কি উকিল ব্যারিস্টার হবার জন্যই উচ্চাশা পোষণ করে তাহলে শিক্ষা সমাপ্তির পর সেই সব পেশার ক্ষেত্রে কি রকম চাহিদা থাকবে। আমরা সাধারণত সে রকম কোন বিশেষ চিন্তাভাবনা না করেই ছেলেমেয়েকে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাই। সাধারণ ঘরের অভিভাবকদের বিশেষ কোন প্ল্যান থাকে না, ছেলে মেয়েকে বিশেষ দিকে পরিচালনা করবার ক্ষমতারও অভাব দেখা যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ সমাজ পরিস্থিতির কোন স্পষ্ট ছবি বা ইংগিত আমাদের সামনে ধরে দেবার ব্যবস্থা নেই। গতানুগতিকভাবে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলেজে ভর্তি হয়, কলেজের পাঠ শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে: তার মধ্যে অনেক মেয়ের বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। যাদের হয় না, হয় তারা চাকুরীর সন্ধান করে অথবা উচ্চশিক্ষার চেষ্টায় নিরত থাকে। ছেলেদের চাকরী বাকরী না জুটলে সাধারণত বিবাহ হয় না অন্তত শহরাঞ্চলে এই রকমই অবস্থাটা। তবে অবস্থাপন্ন ঘরে বা শিক্ষাদীক্ষাহীন নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবয়সে ছেলেদের বিবাহ হতে দেখা যায়। সম্ভবত যারা একটা কিছু নিয়ে বিদ্যা আয়ত্ত করে সেই বিদ্যার বিনিময়ে আয় উপার্জন বা চাকুরীর চেষ্টা মুখ্য (সচ্ছল শিক্ষিত অসচ্ছল উভয় সংসারেই) তাদের উপার্জনের উপায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহাদি না হতেই দেখা যায়। তারাই উচ্চশিক্ষার্থে বা উপার্জনের উপায় না থাকাতে যোগ্যতা থাক্ বা না থাক বিশ্ববিদ্যালয়ে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারে বদ্ধপরিকর হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা যে কর্মে নিযুক্ত ছেলে সেই কাজের দিকে ঝোঁকে। অথবা পরিবারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পিতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যে কর্মে কৃতী বা সফল অনেকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়। উচ্চশিক্ষিত বা সমাজের উচ্চকোটির কথা আমি বলছি না তারা সবসময়েই সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। যারা ততটা সচেতন নয় বা যাদের সীমায়িত ক্ষমতা, ব্যয়সাধ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫।৭ বছর ছেলেমেয়েদের শিক্ষানিমিত্ত প্রেরণের সামর্থ্য নেই বা যারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কি হতে পারে সে অনুমানে সিদ্ধ নয়, পারদর্শী নয়, তারা যাতে উপকৃত হয় এমন একটা সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে পারে উপরিউক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পরিস্থিতি কর্মখালির সংখ্যা এবং আগামী বছর কি অবস্থা দাঁড়াবে তার একটা আনুমানিক সম্ভাব্য ছবি উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইস্তাহারে থাকা দরকার। যার উপর নির্ভর করে সাধারণ অভিভাবকেরা আপন আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী স্ব স্ব সন্তানদের রুচি প্রবণতা অনুযায়ী তাদের কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত করতে পারে।

রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পরিসংখ্যান বিভাগ, সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র

ইত্যাদি এক যোগে উদ্যোগ সহকারে নিম্নলিখিত রূপ সংবাদ যাতে জনসাধারণের গোচরীভূত হতে পারে তার সহজ উপায় করতে পারে।

১। রাজ্যে কত প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কেন্দ্র, বিভাগ ইত্যাদি আছে, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস কাছারি, সরকারী-বেসরকারী নানাবিধ কর্মপ্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, ডাকখানা, খবরের কাগজের অফিস, ছাপাখানা, ইত্যাদি যাবতীয় কর্মপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দোকান, ঔষধ ব্যবসায়, বিভিন্ন যানবাহন শকভাগ, ভ্রমণ বিভাগ, বেতার-টেলিভিশন কেন্দ্র, খেলাধুলা কেন্দ্র, হোটেল রেস্তরাঁ ইত্যাদি সর্বপ্রকার কেন্দ্রে বা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মের সংবাদ দান;

২। উপরিউক্ত সরকারী-বেসরকারী রকমারি কেন্দ্রে-বিভাগে-দপ্তরে সর্বক্ষেত্রে প্রতি বছর কত লোক নিয়োগের সম্ভাবনা সে সংবাদ দান ;

৩। আগামী বছর বা পরবর্তী ৫ বছরে সে সবক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্প্রসারণের ইঙ্গিত। আনুমানিক কত সংখ্যক কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা তার ইঙ্গিত দান ;

৪। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য কোন খাতে ব্যয় সঙ্কোচ বা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে কিনা সে বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ:

৫। কোন প্রতিষ্ঠানে, বিভাগে, কেন্দ্রে, সংস্থায় কি ধরনের কাজ হয়, সেই সব কেন্দ্রে ক্ষেত্র বিশেষে কর্মীর কি ধরনের শিক্ষাগত বা গুণগত শারীরিক শক্তিগত যোগ্যতা থাকা দরকার সে সব সংবাদ দান;

৬। সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে বেতন হারের পার্থক্য নির্দেশ, বয়স-সীমার উল্লেখ ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহ ;

৭। ধরাবাঁধা চাকুরী ব্যতীত স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ কতটা, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুযোগ আছে, রাজ্যের কোন কোন স্থানে সে সুযোগ ঘটা সম্ভব, কোন কোন স্থানে কি কি বৃত্তিজীবীর চাহিদা আছে এবম্বিধ সংবাদ সরবরাহ;

৮। দোকানপাট, হাটবাজার ইত্যাদির সংখ্যা কত, কোথায় কি আছে, কোথায় কখন হাট বসে, মেলা হয় ইত্যাদি। সে সব স্থানে লোকসমাগম কেমন, কি ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলে সে সংবাদ;

৯। শিল্পাঞ্চলের যাবতীয় সংবাদ;

১০। বড় শহরের কর্পোরেশন, ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মব্যাপারে কর্মীর সংখ্যা—সম্ভাব্য কর্মখালির সংখ্যা, কি ধরনের কাজ সেখানে হয় কি ধরনের যোগাযোগ সেখানে ঘটে ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহ;

১১। সর্বক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকেত দান।

এমনি বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রতি বছর যদি পরিবেশন করার রেওয়াজ থাকে তাহলে জনসাধারণের পক্ষে সমাজ ও জীবনের চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছায়। শুধু কলকাতা শহরের সংবাদই যথেষ্ট নয়। প্রতি জেলা শহরের ছোট বড় সব শহরের সংবাদ বিস্তারিত এবং যথাযথ ভাবে পরিবেশিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সেই সংবাদ গ্রামে গ্রামে পৌঁছানো দরকার। গ্রামের চাষী গৃহস্থ সাধারণ মানুষেরও জানা চাই গ্রামের জোতদার, গঞ্জের আড়তদার মহাজন ছাড়াও আর কার কাছে তারা খন্দকুটো নিয়ে যেতে পারে, উপযুক্ত দাম পেতে পারে প্রয়োজনে টাকা ধার করতে পারে। যে জনমজুর খাটে, যে মুনিশ সেও যেন শুনতে পায়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়দের কাছ থেকে জেনে নিতে পারে, ক্ষেতে যখন কাজ থাকে না ঠিক সেই সময়টায় কোন্ অঞ্চলে মাটি কাটার কাজ হচ্ছে, কোন্ ব্যাপারী কোন হাটে গো-মহিষ নিয়ে যাবে, কোথায় কলকারখানার কাজে শ্রমিকের দরকার হবে—হয়ত সে সব জায়গায় তার কাজ জুটে যেতে পারে। এমনি বহুবিধ এবং বিস্তারিত সংবাদ সরবরাহের দ্বারাই উপরিউক্ত বিভাগগুলির কর্মতৎপরতার সার্থকতা।

নানা জাতীয় সংবাদ শুধু সরকারী নথিপত্রে আবদ্ধ থাকলে জনসমাজের বুদ্ধি খোলে না। দলিল দস্তাবেজী ধাঁচ থেকে সর্বসাধারণের সুলুক সন্ধানে কাজে এলেই সংবাদ সরবরাহের প্রগতি। বেতার, দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারের দায়িত্ব নিতে পারে—শুধুমাত্র কর্মখালির বিজ্ঞাপন, শেয়ারমার্কেট বা সোনা রূপার দরের হ্রাস বৃদ্ধির সংবাদ যথেষ্ট নয়, সাধারণের কাছে আরও সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। ডাকঘরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারী দপ্তরখানায়, কোর্ট-কাছারিতে, ব্যাঙ্কে, হাসপাতালে নানা জাতীয় সংবাদ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য চার্ট করে টাঙিয়ে রাখা যায়।

এই ধরনের কাজের জন্য একদল শিক্ষিত লোকের দরকার হবে—বড় শহরের বিভিন্ন এলাকায়, জেলা শহরের প্রতি মৌজায়, রাজ্যের নানা অঞ্চলে, গঞ্জে, হাটে, গ্রামে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা গ্রন্থনা করা গবেষণা করাই হবে তাদের কাজ। মার্কেট রিসার্চার, দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার ইত্যাদি ব্যক্তিগণ এই ধরনের কাজে লিপ্ত, আমাদের দেশে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা সংবাদ পরিবেশন বিভাগে এই ধরনের কর্মী আছে বলে শুনিনি, এই ধরনের সংবাদ সংগ্রহ ও সমীক্ষায় ঐসব বিভাগ প্রবৃত্ত আছে বলেও মনে হয় না। এছাড়াও জনসাধারণকে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা যদি ঐসব বিভাগে যুক্ত থাকে তাহলে উপকার হয়, তাদের অভিজ্ঞ মতামত সর্বসাধারণের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক। অন্তত এই সব মতামত ও সংবাদের উপর নির্ভর করে অভিভাবকদের সাধারণ বুদ্ধি পরিণতি লাভ করতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষা কমিশন বসে কিন্তু শিক্ষা গবেষণার স্থায়ী চেষ্টা বা সংস্থা আছে বলে শুনিনি। শিক্ষাবিদগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের সমীক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা-কার্যকারিতা উপকারিতা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে পারেন। শিক্ষা গবেষণা—সমীক্ষা বিভাগ ও উপরিউক্ত বিভাগগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হতে পারে—সমাজে বিভিন্ন শিক্ষার প্রভাব, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতির প্রভাব অনুধাবন করা, সমাজের মনোভাব জানা, শিক্ষার্থীর মনোভাব—উন্নতি অবনতি পর্যবেক্ষণ, শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করা, শিক্ষাপদ্ধতির প্রণালীর ত্রুটি সফলতা পর্যালোচনা বিভিন্ন পাঠক্রমের সফলতা ব্যর্থতা কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব নিরীক্ষণ, বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষা-শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রে সফলতা, কৃতিত্ব ব্যর্থতা অনুধাবন, বিভিন্ন কর্মে রত ব্যক্তির কর্মদক্ষতা, কর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মনোভাব ইত্যাদি জানা। এইসব পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, সমীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে স্বতই শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষা পরিষদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুগ কঠোর বা শিথিল নীতি গ্রহণ করতে পারে ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাপদ্ধতি ও রীতির পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। মধ্যশিক্ষা পরিষদ বৃত্তিশিক্ষা পরিষদ (অস্তিত্ব আছে কিনা জানা নেই), বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পাঠক্রমের পরিবর্তন, সংযোজন বিয়োগে এই ধরনের সমীক্ষা বিশেষ সহায়ক। এই গ্রহণ, বর্জন পরিবর্তন, সংযোগ বিয়োগ, শিথিল ও কঠোর নীতি অবলম্বনের পথেই শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ প্রয়োজনের গতি অনুসারে থাপ খাইয়ে চললে সমাজ উপকৃত হয়। অন্যথায় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত রীতিপদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হতে থাকলে তার বহতা ও বৃদ্ধি সম্ভব হলেও ক্ষেত্র বিশেষে অপ্রয়োজনীয় স্ফীতি নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ভার যাদের উপর তারা সক্রিয় ও তৎপর না হলে তাদের গয়ংগচ্ছ ভাব দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করতে পারে, অবনতির পথে এগিয়ে দিতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের যথোপযুক্ত সংবাদ পরিবেশন-সরবরাহ, শিক্ষা গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনিং কেন্দ্রে, বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী অনুপ্রবেশের সংখ্যা প্রতি বছর নির্দেশ করতে পারে। এইভাবে একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি সাধন সম্ভব অপরদিকে কোন বিশেষ বৃত্তিতে, বিষয়ে অনাবশ্যক ভিড় কমিয়ে বৎসরান্তে উপরোত্তর বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি আয়ত্তে রাখার একটি বাস্তবানুগ চেষ্টা করা যায়।

॥ ৭ ॥

ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা সীমায়িত, ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ তথাপি আশা হয় এই আলোচনায় উত্থাপিত ধারণা—লক্ষণ প্রশ্ন সমাধান, দিকনির্দেশগুলি পাঠক সমাজের চিন্তায় কিছু খোরাক জোগাবে। হয়ত কতিপয় শিক্ষাবিদ উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার ব্যক্তিচিন্তার একদেশদর্শী দোষ পরিহার করে কিছু সমর্থনযোগ্য উপযোগী প্রস্তাব কাজে লাগাবেন—সেখানেই এই জাতীয় আলোচনার সার্থকতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাবশ্যক ভীড় অনেকটা হ্রাস পায় যদি একটি বিকল্প ব্যবস্থা সাধারণের জ্ঞাত থাকে, আয়ত্তে থাকে এবং সম্মুখে ভবিষ্যতের কিছু আশ্বাস থাকে। অযথা সময় অর্থ এবং যুবশক্তির অপচয় নিবারণের একটি উপায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং কেবলমাত্র যথার্থ তীক্ষ্ণধী মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষেই উচ্চশিক্ষা সুগম করা। মনে রাখতে হবে এই আলোচনায় (এবং পূর্ববর্তী আলোচনায়) প্রস্তাবিত সামগ্রিক শিক্ষানীতি পূর্ণভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আওতায় আনবে এবং তা সর্বরাজ্যে প্রযুক্ত হবে। অন্যথায় সরকারী প্রকল্প ব্যর্থতার সাধারণ দৃষ্টান্তের ন্যায় সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত শিক্ষাপ্রকল্পও একটি ব্যর্থ প্রকল্পে পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার বিন্যাসে নিম্নরূপ সংযোগ সম্ভব কিনা চিন্তা করা যেতে পারে :

সর্বভারতীয় শিক্ষানীতির আওতায় পড়বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বা এগার বার শ্রেণী আজকাল যা হয়েছে) স্তরে সেই সব শিক্ষার্থীদেরই প্রবেশাধিকার দান যুক্তিযুক্ত হবে যারা উচ্চশিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষার্থে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশের যোগ্য, পিতামাতাও সন্তানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অবশ্যই এই শিক্ষার্থীগণ প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগের উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিকল্প ব্যবহারিক শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা।

এই বিকল্প শিক্ষাস্তরে নানা বিষয়ক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিতভাবে কলা, বিজ্ঞান, সূক্ষ্মকলা, কারিগরী, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবহারিক বিদ্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বন সংরক্ষণ, যানবাহন ভ্রমণ পাবলিক সার্ভিস, শাসন পরিচালনা, আইন, হস্তশিল্প, ছাপা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় অঙ্গাত্মক শিক্ষাক্রমের সংযুক্তি বাঞ্ছনীয়। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপর্যায়ে এবং এই উচ্চ বিকল্প স্তরে ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত বিভাগে বিমূর্ত ধারণার পরিবর্তে বাস্তবমুখী কার্যকারিতা ও প্রযুক্তির দিকেই প্রধান লক্ষ থাকবে কিন্তু শেষোক্ত বিভাগে বিমূর্ত ধারণার আভাস দেওয়াই সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

বিকল্প ব্যবহারিক শিক্ষার নিম্নরূপ একটি অপটু ছক দেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উৎকর্ষের দিকে লক্ষ রেখে একটি সুপরিকল্পিত মডেল প্রস্তুত করবেন। দশম শ্রেণীর পরবর্তী এই বিকল্প শিক্ষাক্রমের কাল দুই-তিন-চার বছরের অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর বয়স যদি ষোল-সতের হয় তবে পরবর্তী শিক্ষা সমাপ্ত করতে করতে তার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। দেশে যত প্রকার সরকারী-বেসরকারী ট্রেনিং কলেজ, প্রযুক্তি-বিদ্যার কেন্দ্র ইত্যাদি আছে সেগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

উচ্চতর মাধ্যমিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয়ের সূচনা (বিজ্ঞান বিষয়ক—কলা বিষয়ক)
গ্রন্থাগার
জার্নালিজম
শিক্ষকতা
ইঞ্জিনীয়ারিং
মেডিকেল

উপরিউক্ত বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ যদি জেলা শহরে থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা ও চাহিদার অনুপাতে বিভিন্ন কেন্দ্র যদি জেলা শহরে স্থাপিত হয়, তাহলে স্থানীয় শিক্ষার্থী জেলা শহরেই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রাদেশিকতা বোধের মুক্তি ঘটানো ও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু করার সুযোগ মাধ্যমিক পর্যায়ে যথেষ্ট আছে। রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বদলীর ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অনুকূল ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-মূলক ছবি প্রদর্শন ও বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা ইত্যাদির অবকাশ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সর্বরাজ্যে প্রত্যেক বড় শহরে শুধু নয় অত্যাবশ্যকভাবে প্রত্যেক জেলা শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা ও ইংরিজী ভাষার পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা সর্বভারতীয় শিক্ষানীতির অংগীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সামাজিক সচলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। একটি জেলা শহরে পনেরটি বিদ্যালয়ে যদি পনেরটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তাহলে অন্তত পনের জন ভিন্ন রাজ্যের শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্পর্শে শিক্ষার্থী শুধু নয় শহরবাসী আসতে পারবে। এইভাবেই অপর রাজ্যের শিক্ষাসংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পারে। একে অপরের পরিচয় লাভে প্রাদেশিক মনোভাবও দূরীভূত হতে সহায়তা করে।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের উপস্থিতি এবং মতামত বিশেষ মূল্যবান। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিরিবিলি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। অন্তত N C E R T-র উদ্যোগে কোদাইকানাল, উটাকামণ্ড প্রভৃতি মনোরম পার্বত্য নগরীতে অনেকে সে উদ্দেশ্যে সময় যাপন করার সুযোগ পান এটুকু জানা আছে। এই সুব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হলে ভাল হয়। সর্বস্তরের উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট সে সুযোগ পৌঁছালে শহর কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে। নানাজাতীয় পাঠ্যপুস্তকে কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ফলে বৃহৎ ভারত সমাজ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা অনুল্লিখিত, উপেক্ষিত থাকে। স্থানগত, বিশেষ রাজ্যগত বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও সেই সব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত সেই শিক্ষকরাই দিতে পারেন, যারা সেই সব সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেই সমাধানের ইঙ্গিত নিহিত।

আনুমানিক ৮৫ লক্ষ ভারতীয় গ্রামে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি অনুসরণের প্রাথমিক সোপান রূপে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। স্মরণ রাখা কর্তব্য শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, শিক্ষা প্রসারের দ্বারা সমাজ মানসের পরিবর্তন সম্ভব হলে তবেই অর্থনৈতিক বিন্যাস ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন-প্রচলন, কৃষি উৎপাদনে অধিক মনোযোগ সংযোগ ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তথা জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা যা আয়ত্তে আনার চেষ্টা সম্ভবত কার্যকরী হতে পারে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের আদৌ উদ্দেশ্য নয় প্রচলিত কাঠামো ভেঙে চুরে বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে উৎ করে তোলা। বরং ক্রমভাবে শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতির খোলনলচে বদলানে উদ্দেশ্যে গোড়া থেকে শুরু করাই এ প্রস্তাবের লক্ষ্য।

আজকের পাঁচ-সাত বছরের শিশুর মনে যে ধারণার বীজ উপ্ত হবে তা বিকাশ ঘটবে ধীরে ধীরে দশ-পনের-কুড়ি বছরে আর তখনই পূর্ণবিকাশে ফসল সমাজ ভোগ করবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রয়োগ শুরু হবে প্রাথমি শিক্ষা পর্যায়ে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আয়ত্তে আসবে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক ও মধ্যবর্তী বিকল্প স্তরটি। এইভাবে ধীরে ধীরে ওই পাঁচ বা সাত বছর বয়স্ক শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করবে তখন পরি-কল্পিত মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক বা বিকল্প ব্যবস্থাটি গ্রহণে সমর্থ হবে।

প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি সফল হতে পারে দলমত ও গোষ্ঠীমত নিরপেক্ষ মনোভাবে ভাবিত শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীর চেষ্টায়, শিশুশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে এই শিক্ষাদানে উদ্দীপিত করে তুলবার সার্থক প্রচেষ্টায়। শিক্ষানীতি শিক্ষাপ্রণালী তথা পদ্ধতি শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবই শিক্ষাধারায় অংগীভূত, ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই সব কিছুর পারস্পরিক প্রভাবে ও প্রবাহে সমাজ চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ।

বর্তমান আলোচনায় অভিপ্রেত—ন্যূনতম শিক্ষার আলো জনসমাজে বর্ষিত হোক, যে শিক্ষার গূঢ় অভিপ্রায় সামগ্রিক সমাজবোধের উদ্বোধন। স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারী বেসরকারী কার্যালয়ে-কর্মস্থলে গোষ্ঠীমত দলমত প্রচারের প্লাবনে যে ক্ষতি সমাজে হয়েছে যত শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয় ততই মঙ্গল। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, রাজ্য ও জাতীয় মন্ত্রকের কর্মচারী এদের পক্ষে দলমত-গোষ্ঠীমতের ভারবাহী হওয়ার অবকাশ নেই এবং তা সমাজহিতকর আদৌ নয়। দেশের শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী শাসন বিভাগীয় কর্মীদের নিরপেক্ষ শিক্ষাদান কর্মচিন্তা ও কর্মনিষ্ঠাই স্বাধীন সমাজকে ভিন্ন চরিত্র দেয়। অন্যথায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আত্মহত্যার সামিল। এই উক্তি বা বুদ্ধি সংকটে মাভৈ বাণী মাত্র নয়—সমাজের আত্মজিজ্ঞাসা জাত উপলব্ধি। নির্ণীত উচ্চকোটির আত্মজিজ্ঞাসা ও নিম্নকোটির আত্মজাগরণ শিক্ষানীতির ফলশ্রুতি। পরন্তু ব্যবহারিক অর্থে অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক বিভিন্নমুখী প্রকল্প সফলতার ভিত্তিভূমি সেই ফলশ্রুতিতে। জনসাধারণের প্রত্যাশিত মানসিক পরিণতি যুগপৎ উচ্চশিক্ষার্থে উদ্‌ভ্রান্তি আবেগাতিশয্যজাত প্রাদেশিক বৈর ও গোষ্ঠীবদ্ধ কূপমণ্ডূকতা দূরীকরণে সহায়ক। পরোক্ষে বেকার সমস্যা অন্তর্হিতকরণ, একটি বিবেকী অর্থনীতির সূচনা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক তিরিশ হাজার গ্রামে ষাট থেকে নব্বই হাজার শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব, অনুরূপভাবে সমগ্র ভারতে আনুমানিক আশি-পঁচাশি লক্ষ গ্রামে অন্তত কমপক্ষে একশো সত্তর লক্ষ শিক্ষিত বেকারের সুরাহা হওয়া সম্ভব।

শেষ কথাটি শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশে—শিক্ষাব্রতী নিরপেক্ষ সমাজকর্মী সমাজ হিতৈষণা জ্ঞানদানই শিক্ষক তথা শিক্ষাব্রতীর উদ্দিষ্ট কর্ম। শিক্ষার সংজ্ঞাটি বড় ব্যাপক। একটি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্তিকরণ, বিশেষ কারিগরী দক্ষতা লাভ, আত্ম-বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ চতুরতা, ধুরন্ধরতা বৃদ্ধিতেই শিক্ষার সার্থকতা নয়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষা—একথা শিক্ষাব্রতী মাত্রেই জানেন। যে কালে, যে দেশে জন্মেছি, বেঁচে আছি—সেই যুগ ও জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা, যে সমাজে বাস করছি সে সমাজ সম্বন্ধে সচেতনবোধ অর্থাৎ এই সবকিছুর সাধারণ ধারণা ও চেতনা শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। ব্যক্তির সামাজিক নির্ণীত বা চিহ্নিত স্থান, ব্যক্তির স্ব যোগ্যতা প্রণিধানযোগ্য, ব্যক্তির দায়িত্বশীল কর্তব্যবুদ্ধির উপর সমাজ আশ্রিত, সমাজে ব্যক্তির কৃত্য ও দেয় কি, প্রাপ্যই বা কি তাও অনুধাবনীয়। সর্বোপরি এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য তথা পরিণত মনস্কতা লাভেই শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষা সমাজ প্রচলিত একটি পদ্ধতি-প্রণালী রীতি ব্যবস্থা, যে পথে বা মাধ্যমে এক যুগের চিন্তা-ভাব-ধারণা-সদ্‌ইচ্ছা-আশা আকাঙ্ক্ষা কর্মকুশলতা নৈপুণ্য জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষাব্রতী সেই পথের অন্যতম নিয়ামক, পথ প্রদর্শক তার গুরু দায়িত্ব, সমাজের অনেক আশা।

ভরত রাজার জন্য

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

গম্ভীর সুগন্ধ আজ পড়েছে ছড়িয়ে।
ফাল্গুন লেগেছে গাছে, চিৎ হয়ে
শুয়ে আছে নদী, ভরত রাজার প্রিয় মৃগটি ঘুরছে
লাল নীল সাদা সব ফুটেছে অদ্ভুত!
সন্ন্যাসী রাজার স্নেহে কলরব করে ওঠে খড়ের দেওয়াল
মানুষের বাসী সিংহাসন, শরীরের খোসা ছাড়ানো রজনী
ইতিহাস থেকে ফেরা যুদ্ধের জঞ্জাল
সব ছেড়ে এসে তবু ভালবাসা হয়ে ওঠে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তুত
সম্পূর্ণ মানব হয়ে একাগ্র কুড়িয়ে নেয়
সদ্যমৃত মৃগজননীর শিশু, রুগ্ন গাছটির পিতা হয়ে দেয়
নিয়মিত জলের আদর। তখনি গন্ধের স্বাধীনতা
আকাশের অভ্যস্ত বাতাসে ভাষা পায়
ভাঙে সন্ন্যাসের অর্জিত স্থিরতা,
ভারতবর্ষও কি নড়ে ওঠে
ভরতরাজার মতো জন্মে জন্মে নতুন মাংসের প্রতিভায়?
যে জানে সে জড় হয়ে ধ্যানী বসে থাকে,
যে দ্রুত সব পেতে চায়, তাকে
নদী করে ঘৃণা
ফুল একবারো তার আত্মায় নামে না ;
হায়
অক্ষর নিরর্থ ক্রোধে সাজানো সংসারে ঢুকে যায়,
যজ্ঞের আগুন তাকে কোনদিন স্পর্শ করে না।

লাফ

আলোক সরকার

কেবল লাফ দিয়েছিল অকারণ অপরিকল্পিত লাফ
আর যেখানে এসে থামল
সেখানে গাদা-করা খড়, শুকনো নিষ্ফল থেঁতলানো পাখির ডিম।

নিষ্ফলগুলো এক দুই ক'রে গুনলো খড়খড়ে ডিমের খোসা
আঙুলে টিপে ভাঙলো মড়মড় ক'রে।
নিষ্ফলগুলো মনোযোগ দিয়ে গুনলো, খুব উদগ্রীব হয়ে

শুনলো খোসা-ভাঙার শব্দ। হাওয়া দিয়েছে তখন
নড়েচড়ে উঠছে খড়ের গাদা
শুকনো খড়ের আঁশ উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক—

আর তার চোখ বড় বড় একাগ্রতায় দেখলো
এই নিষ্ফল এই থেঁতলানো পাখির ডিম
ওই শুকনো খড়ের আঁশ টলতে টলতে সোজা হচ্ছে আবার।

আর কিছুই নয় কেবল তার সময় কেবল একটা সময়
অবচ্ছিন্ন অসংযোগ, অনির্মিত
একটা প্রয়াস হয়ে উঠছে অনির্মাণ—বিদ্যুন্ময়
একটা প্রয়াস। আর তার হাত তার বড় বড় চোখ
শুকনো খোসা দেখছে, ভাঙছে মড় মড় করে—
অকারণ অপরিকল্পিত লাফ আর এই অসম্পৃক্ত মনোযোগ।

আমার গল্প

শ্যামলকান্তি দাশ

না গো, শাদা পাতায় রক্ত ঢালতে আর আমার ভাল্লাগে না
ভাল্লাগে না সারাদিন দুঃখ আর কালোকুচ্ছিৎ নিয়ে অক্ষরবৃত্ত লিখতে
সারাজীবন বই আর বই, ঘোষবাবুর জন্যে বই, বোসবাবুর জন্যে বই,
মিত্তিরবাবুর জন্যে বই, সামন্তবাবুর জন্যে বই,
আর কতজনের জন্যে গাধার খাটুনি খাটতে হবে আমাকে?
ঘাস বিচালি লিখতে লিখতে জান কয়লা হয়ে গেল আমার।

সত্যি সত্যি ঘুম আসছে না আমার, এবার একটু গা-ঝাড়া দিলে কেমন হয়
চুলোয় যাক পাঁচ ফর্মা দশ ফর্মা চেক রয়্যালটির কুটকচালি
জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এখন একটু দেখতে পেলে মন্দ হয় না
সপ্তমীর চাঁদ কীরকম চুটিয়ে শোভা ঢালছে মরা খটখটে দেবদারুর মাথায়
আর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত থেকে মলয়বায়ু এসে
কীরকম ঝপাঝপ ছুরি বসিয়ে দেয় আমার বুকে
মন এই সময় একটু উতলা, ডানা মেলতে চাইছে, ক্ষতি কী
না গো, ডানা মেলা মেলাটেলা নয়, অইসব গোদা বাংলা ছাড়ো
আমি মানে ঢেঁড়শমার্কা এই লোকটা এখন জেটপ্লেনের মতো
সাঁই সাঁই শব্দে উড়ে বেড়াতে চায় বাউড়িয়া
বাউড়িয়া না বাগনান? বাগনান না ভোগপুর? ভোগপুর না বালিচক?
কী জানি কোথায় তিনি সারাদিন টুহু টুহু শব্দে
ডেকে উঠছেন পূর্ণদুপুরের পাখি, তেনার চোখে কি জয়বাংলা হয়েছে?
নাকি নতুন কোনো ভাষার টনটন করে উঠছে তেনার দুগ্ধধবল তলপেট?
আমি যে তাঁকে ভাঙতে ভাঙতে উড়িয়ে আনব তাড়িয়ে আনব
স্বর্ণলংকা থেকে অযোধ্যা, সে তাঁর অভিপ্রায় নয়
তাঁর নীল হলুদ মাংসের মধ্যে গোলপরগুা চর্বির মধ্যে
নাক ডুবিয়ে বসে থাকবো সেরকম দুঃখও তাঁর ধাতে সয় না
তাহ'লে? তাহ'লে কি আর কোনো কথা নেই?
আবার আমাকে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে আমার চোখ
আর দেবতার অন্ধতা ও মানবীর কালো সায়া বিষয়ে
ঘন ঘন লিখতে হবে পঙক্তির পর পঙক্তি, চতুর্দশপদী
মূর্খের মতো সাপ ও জ্যোৎস্নার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে অক্ষরের মাণিক্য
আর সারা জীবন বই লেখা ছাড়া অন্য কোনো নিয়তি থাকবে না আমার!

না গো, আর বই লিখবো না আমি
আমার প্রতিটি বইয়েই যে এখন তাঁর জীবন জ্বলজ্বল করছে!

রাম ও তাঁর এল আই সি পলিসি দুই একত্রে বেড়ে উঠলো

অভিনন্দন! বিয়ের পর রাম ২০ হাজার টাকার এক ৩০ বছরের প্রগ্রেসিভ প্রোটেকশন পলিসি করালেন।

নতুন অতিথির আগমন। ৫ বছর বাদে রামের স্ত্রীর একটি সুন্দর ছেলে হ'ল। এইসঙ্গে তাঁর পলিসির মূল্য বেড়ে ৩০ হাজার টাকা হয়ে গেল, যাতে তিনি তাঁর এই নতুন দায়িত্ব পুরোপুরি সামাল দিতে পারেন।

প্রয়োজনে আরো বৃদ্ধি। ৫ বছর বাদে তাঁর স্ত্রীর একটি ফুটফুটে মেয়ে জন্মালো। ওদিকে তাঁর পলিসির মূল্য আরো বেড়ে ৪০ হাজার টাকা হয়ে গেল।

আর কোনো চিন্তা নেই। বাকি ২০ বছরে যেকোনো পরিস্থিতিই আসুক না, রামের পরিবারের সম্পত্তি হ'ল ৪০ হাজার টাকা আর প্রতি বছরের বোনাস।

প্রগ্রেসিভ প্রোটেকশন—একমাত্র পলিসি যার মূল্য বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়

দু'বার পাঁচ-পাঁচ বছর কাটবার পর ৫০% বৃদ্ধি। অতিরিক্ত প্রিমিয়াম সাধারণ হারে, কোনো ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া। আপনার পলিসির মূল্য তাহলে ১০ বছরে হয়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ, আর সেইসঙ্গে আপনারও মিলছে আরো নিরাপত্তা। এই পলিসি ২০, ২৫, ৩০ বা ৩৫ বছরের জন্যে যেকোনো সময় অবধি নেওয়া যায়।

এখনই বীমা করান এবং ১৯৭৭/৭৮ সালের অধিক বোনাস লাভ করুন।

নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয়। রাম অবসর নিচ্ছেন আর ওদিকে তাঁর পলিসির পূর্ণকাল প্রাপ্ত হয়ে উনি পাচ্ছেন ৪০ হাজার টাকা ও বোনাসের ২১ হাজার* টাকা ধরে মোট ৬১ হাজার টাকা।

* বর্তমান দেয় হারে

জীবন বীমার কোনো বিকল্প নেই

daCunha/LIC/49 Ben

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১২ ॥

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে ঢাকার বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠির কিছুটা ছেপেছেন। পুরো চিঠিটি আজও কোথাও ছাপা হয়নি। হেমেন্দ্রবাবু কোথায় চিঠিটা দেখেছিলেন জানি না, তবে তিনি তাঁর বইয়ে চিঠির যেটুকু ছেপেছেন, সেটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি—

'আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার বদলি সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছে, তাহা মোটেই বিশ্বাস করিবেন না, স্টেটসম্যান যাহা লিখিয়াছে তাহাই সত্য। সম্পাদক মনে করিয়াছে যে, 'রজনী'তে আমি হীরালালরূপে সম্পাদককে আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপ অনুমান খুবই আশ্চর্যজনক। আমার পক্ষে ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনও সম্ভব নহে।'

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বদলির ব্যাপারটা হল, তাঁকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে অর্থ দপ্তরের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে সরিয়ে পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে উড়িষ্যার জাজপুরে বদলি করা। হেমেন্দ্রবাবু যে পত্রাংশটুকু ছেপেছেন তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তিনি একজনকে আড়াল করবার জন্য এতে নিজের কলম চালিয়েছেন। কারণ, উপরে উদ্ধৃত চিঠির প্রথম বাক্য 'আপনার পত্র পাইয়াছি' দেখে মনে হয়, এই অংশটা মূল চিঠির প্রথম দিকের অংশ। তাই চিঠির প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ 'সম্পাদক যাহা লিখিয়াছে' বা সম্পাদক মনে করিয়াছে একথা কখনই লিখতে পারেন না। বন্ধুর কাছে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি নিশ্চয়ই সম্পাদকের নাম, অন্তত তাঁর কাগজের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বিশেষ করে চিঠিতে যখন স্টেটসম্যান পত্রিকার নাম করে ছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ে এই চিঠির প্রসঙ্গে আরও যা যা বলেছেন সে সব ক্ষেত্রেও পত্রিকার বা পত্রিকার সম্পাদকের নাম করেননি। শুধু বলেছেন—জনৈক পত্রিকা সম্পাদক। এই সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন উক্ত সম্পাদকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছিল। অতঃপর 'রজনী' উপন্যাস বাহির হইলে উপন্যাসের হীরালাল চরিত্র তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া উক্ত সম্পাদক ক্ষোভ করেন।'

হেমেন্দ্রবাবু তাঁর লেখায় পত্রিকার বা পত্রিকা-সম্পাদকের নাম না করলেও জানা গেছে, পত্রিকাটি হল—অমৃতবাজার পত্রিকা এবং এর সম্পাদক হলেন—শিশিরকুমার ঘোষ। তবে হেমেন্দ্রবাবু যে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকার সময় এই সম্পাদকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল, তা ঠিক নয়। হেমেন্দ্রবাবু ভুল করে অপরের কথা এই সম্পাদকের উপর চাপিয়েছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকাকালে যে মধ্যস্থ পত্রিকা তাঁকে বার বার আক্রমণ করেছিল, সেই মধ্যস্থ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে। সেইটাই বলছি—

কোন কাগজের সম্পাদক বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে চাঁদা আদায়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন, তা জানি না। আর চাঁদার টাকার ঠিক মত সদ্ব্যবহার হয়নি বলে, শচীশবাবু যা বলেছেন, তাও অস্বীকার করছি। তবুও একটা কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্য প্রবন্ধ 'গর্দভ' নিয়ে মধ্যস্থে যে

মনোমোহন বসু (মধ্যস্থ সম্পাদক)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা রহস্যের সীমা ছাড়িয়ে নোংরামিতে গিয়ে পৌঁছেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অপরকে নিয়ে রহস্য করলে, অপরেও যে যথারীতি তাঁর রহস্যের উত্তর দিতে পারেন, একথা বঙ্কিমচন্দ্র ভালভাবেই জানতেন। আর তাঁর রহস্যের উত্তর উপযুক্ত হলে তিনি হার স্বীকার করেও তা উপভোগ করতেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মৌখিক রহস্যের কাহিনী বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রদের কাঁঠালপাড়ার বাড়ির অদূরেই মাদ্রাল গ্রাম। এই গ্রামে কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় নামে তখন এক ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি উপস্থিত কবি ছিলেন, অর্থাৎ ফরমাইস মত সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন।

কৃষ্ণমোহন এলে সকলে মিলে তাঁকে নিয়ে মজা করতেন এবং এক একটা বিষয় বলে, সেই সেই বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করতেও বলতেন। কৃষ্ণমোহনকে নিয়ে এই সব মজা ও রঙ্গ-রহস্যে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন যোগ না দিলেও, উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করতেন।

একদিন কৃষ্ণমোহন বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন—আপনি আজ আমায় কিছু বলুন। আমি তার উপর একটা কবিতা বানাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—আচ্ছা। —বলেই মজা করবার জন্য বললেন—আমি একটি কবিতার লাইন বলছি, আপনি তার সঙ্গে মিলিয়ে আপনার কবিতা রচনা করুন। আমার কবিতার লাইন হচ্ছে।

গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অদ্ভুত কবিতার লাইন শুনে উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হলেন। সকলেই বললেন—একি উদ্ভট কবিতা। যা পৃথিবীতে কখন ঘটেনি, তা নিয়ে কি রকম কবিতা হবে! শিয়াল কি কখনো আকাশে উঠেছে, যে আকাশে শিয়াল হুয়া হুয়া করে ডাকবে।

সকলেই যখন এইরূপ বলছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছেন। আর কবি কৃষ্ণমোহন কোন দিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট করে আপন মনে কি চিন্তা করতে লাগলেন।

একটু পরেই কৃষ্ণমোহন বললেন—তবে শুনুন। বলেই তিনি তাঁর কবিতা বলে যেতে লাগলেন। তাঁর কবিতার মর্মার্থ এই—লক্ষ্মণ শক্তিশেলে অজ্ঞান হয়ে পড়লে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনতে গেল। সেখানে বিশল্যকরণীর গাছ চিনতে না পেরে হনুমান শেষে গন্ধমাদন পর্বতকেই উপড়ে মাথায় করে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে আসতে লাগল। গন্ধমাদন পর্বতে বাঘ-ভল্লুক প্রভৃতি নানা রকমের জীবজন্তু ছিল, এমন কি অনেক শিয়ালও ছিল। হনুমান আসার পথে দেখল, সূর্যদেব উদিত হতে যাচ্ছেন। তখন সে সূর্যকে আর উদিত হতে না দিয়ে নিজের বগলের মধ্যে পুরে নিয়ে আসতে লাগল। এদিকে ভোর হয়ে এলে, হনুমানের মাথার উপরের গন্ধমাদন পর্বতের শিয়ালরা তাদের স্বভাববশত দল বেঁধে হুয়া হুয়া করে ডাকতে লাগল। এক দম্পতি সেদিন রাত্রে দারুণ গরমে ঘর ছেড়ে উপরের ছাদে গিয়ে শুয়েছিল। ভোর রাত্রে আকাশে শিয়ালের হুয়া হুয়া ডাক শুনে পত্নী স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে বললে—

কভু শুনি নাই নাথ ভুবন মাঝারে
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।

কৃষ্ণমোহনের কবিতা শুনে সকলেই খুশী হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও হাসতে হাসতে বললেন—ঘাট হয়েছে। সত্যিই আপনি অপরাজেয়।

কবি কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে যদিও এটা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা হাল্কা ধরনের রহস্য বা পরিহাস ছিল, তবুও দেখা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর কথার জবাব সানন্দেই উপভোগ করেছিলেন, এমন কি পরাজয়ও স্বীকার করেছিলেন।

এই কবি কৃষ্ণমোহনের জবাবের মত মধ্যস্থ পত্রিকায় শ্রীগর্দভ লিখিত পত্রটি

VOLTAS

রেফ্রিজারেটারের অটোম্যাটিক ডিফ্রস্টিং সম্বন্ধে কঠিন সত্য—

যা বলবার সাহস রাখে একমাত্র ভোল্টাস!

যদি বোতাম টিপতে আর ট্রে খালি করতে হয়— তাহলে আর অটোম্যাটিক কিসের?

তথাকথিত অটোম্যাটিক ডিফ্রস্টিং রেফ্রিজারেটার ডিফ্রস্ট করার জন্যে— ফ্রিজ খুলতে, বোতাম টিপতে, ফ্রিজ বন্ধ করতে, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ট্রে খালি করতেও হয়।
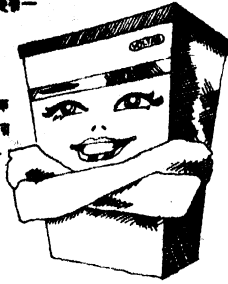
অটো-ডি যুক্ত ভোল্টাস ওপাল ১৬০-এর বোতাম টিপতে বা ট্রে খালি করতে হয় না।

এ ডিফ্রস্ট হয়— একেবারে নিজে নিজে!

ফ্রিজ কত তাড়াতাড়ি ডিফ্রস্ট করা দরকার?

রোজ করাই সবচেয়ে ভালো। বরফ গলবার সময়টাতে ফ্রিজ বিশ্রাম পায়। পরদিন সকালে তাজা হয়ে আবার কাজ শুরু করে।
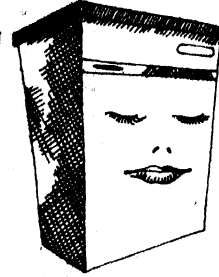
একমাত্র ভোল্টাস ওপাল ১৬০ রোজ ডিফ্রস্ট হয়— একেবারে নিজে নিজে!

অসাধারণ অটো-ডি যুক্ত ভোল্টাস ওপাল ১৬০ রোজ রাত্রে নিশ্চিতভাবে ডিফ্রস্টিং চালু করে— একেবারে নিজে নিজে!

কি করে বিজলী খরচ বাঁচানো যায়...

ডিফ্রস্ট হবার সময় ফ্রিজে বিজলী খরচ হয় না। যত বেশীবার ডিফ্রস্ট হবে, তত বেশী বিজলী খরচ বাঁচবে! তথাকথিত অটোম্যাটিক ডিফ্রস্টিং ফ্রিজের বেলায় রোজ বোতাম টিপতে মনে থাকলে তবেই বিজলী খরচ বাঁচাতে পারবেন।
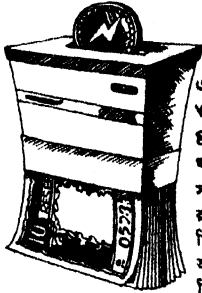
একমাত্র ভোল্টাস ওপাল ১৬০ প্রতি বছর ৪৫ দিনের বিজলী খরচ বাঁচায়!

সারা বছর ধরে এ রোজ রাত্রে ৩ ঘণ্টা করে ডিফ্রস্ট হয়। অর্থাৎ, বছরে আপনার ৪৫ দিনের বিজলী খরচ বাঁচে!

কি করে রেফ্রিজারেটার বাছতে হয়...

সেরা রেফ্রিজারেটারে দক্ষ কমপ্রেসার সমেত নিখুঁতভাবে ব্যালেন্স করা রেফ্রিজারেশন সিস্টেম থাকে, আর ডিফ্রস্টিং-এর জন্যে বোতাম টেপার বা ট্রে খালি করার ঝামেলা থাকে না।
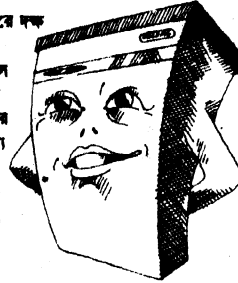
অটো-ডি যুক্ত ভোল্টাস ওপাল ১৬০-এর পেছনে আছে রেফ্রিজারেটার ও এয়ারকণ্ডিশনার তৈরীর ৫০ বছরের অভিজ্ঞ দক্ষতা।

ফলে আপনি পান— নিখুঁতভাবে ব্যালেন্স করা রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, সুদক্ষ কমপ্রেসার, আর অসাধারণ অটো-ডি ব্যবস্থা—যা ডিফ্রস্ট করে একেবারে নিজে নিজে!

একমাত্র অটো-ডি যুক্ত ভোল্টাস ওপাল ১৬০ ডিফ্রস্ট হয়— একেবারে নিজে নিজে! আপনাকে দরজা পর্য্যন্ত খুলতে হয়না।

অনুমোদিত ভোল্টাস বিক্রেতার কাছ থেকে কিনুন কিম্বা এখানে যোগাযোগ করুন:

ভোল্টাস লিমিটেড অ্যাপ্লায়েন্সেস ডিভিশন

বম্বে • কোলকাতা • নিউ দিল্লী • মাদ্রাজ • ব্যাঙ্গালোর • লক্ষ্ণৌ
জামশেদপুর • আমেদাবাদ • সেকেন্দ্রাবাদ • পাটনা • কোচিন
কানপুর • জয়পুর • চণ্ডীগড়

CASV-259-244 BEN

পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ মজাই উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদর্শন-গর্দভ কাহিনীটি পড়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন।

মধ্যস্থের 'বঙ্গদর্শন গর্দভ' প্রকাশিত হওয়ার বছরখানেক পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রজনী উপন্যাস লেখেন। এর সম্পাদকরূপী হীরালাল চরিত্রটি কোন সম্পাদককে লক্ষ্য করে আঁকা তা জানি না, তবে হীরালাল চরিত্রটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন একটি ক্ষোভের প্রতিশোধ তা অনুমান করা যেতে পারে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন কম ছিল। আর তিনি যে তখন বেশ রাগী প্রকৃতিরও ছিলেন, তা তাঁর জীবনী পড়েও জানা যায়।

রজনীর হীরালাল চরিত্র অনেকেই পড়েছেন। তবুও এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বইয়েরই উদ্ধৃতি দিয়ে হীরালালের কিছুটা পরিচয় দিচ্ছি—

'হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শেখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র। তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথা কেরানীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল।........তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল।....কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশে টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। ......অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল।'

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, হীরালাল অর্থলোলুপ ছিল এবং রজনী হীরালালকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায়, হীরালাল তাকে নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে চারদিকে জলের মধ্যে গঙ্গায় এক চরে একা ফেলে পালায়। আর যাবার সময় রজনীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র হীরালালের পত্রিকার নাম দিয়েছেন—স্তম্ভচুম্বিভস্মশ্যাং।

এখানে একটা জিনিস শুধু লক্ষ্য করার এই যে, মধ্যস্থ সম্পাদক তাঁর কাগজের প্রথম পাতাতেই মাথায় একটা দুর্বোধ্য সমাসবদ্ধ বড় শব্দ ব্যবহার করতেন, আর তিনি নাট্যকারও ছিলেন। অনেকগুলি নাটকও লিখেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠির কথা নিয়ে এবারের প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি, এখন আবার সেই চিঠিতেই ফিরে আসছি। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবিরোধ যদি ঘটেও থাকে, সেটা তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না। তাই ঐ সম্পাদক সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে যা লিখেছিলেন, তা সত্য। তিনি অন্য কাউকে লক্ষ্য করে হীরালাল চরিত্র চিত্রিত করেছিলেন। তবে ঐ চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, তাঁর আজপুরে বদলি হওয়া নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা তখন যা লিখেছিল, তাতে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—

We understand that Baboo Bankim Chandra Chatterji, the officiating Assistant Secretary to the Bengal Government, received a short and sweet note from Mr Secretary Macaulay, on the 22nd January, Mr Macaulay is reported to have written, 'very much pleased with the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour.' The charge against Bankim Baboo is that, during his time, office secrets oozed out from the office This is the alleged charge, and which of course every body must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bankim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These secretaries have now come forward with the charge that Bankim Baboo permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr Blyth.

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে অর্থ দপ্তরের অ্যাসিস্টান্টে সেক্রেটারী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক ভদ্রলোক। বাঙালীদের জন্য এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করার পর ঐ পদে বাঙালী নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল।

অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপসারিত করার কারণ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ কথা লিখলেও, তখন কিন্তু ইংরাজ পরিচালিত স্টেটসম্যান পত্রিকা অন্য কথা লিখেছিল। স্টেটসম্যানের সেই লেখাটা এই—

'With respect to the statements made by our contemporary, we are informed that no 'charge' of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra Chatterji, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or his abilities. It is a singular thing that if 'office secrets' were devulged during the period for which the Baboo acted as assistant secretary, the head of the office is unaware of the fact, and the words which purport to be an extract from Mr Macaulay's letter were never written by him. Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant....'

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'যাঁহারা স্টেটসম্যান না পড়িয়া শুধু বাঙালীর কাগজ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মেকলে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়াছিলেন। মেকলে সাহেব অপবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুতার সুখ্যাতি করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। ......মেকলে সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদ উঠিয়া

বিনামূল্যে
'কী'
ডিটারজেন্ট,
বিজ
পরিষ্কার করবার
পাউডারের সঙ্গে
New Super Action
KEY
BIZ
CLEANING POWDER
WITH SUPER DETERGENT

প্রত্যেক বিজ প্যাকের সঙ্গে— যার ওজন	আপনি পাবেন বিনামূল্যে 'কী' প্যাক যার ওজন
৫০০ গ্রা.	৫০ গ্রা.
৬০০ গ্রা.	৫০ গ্রা.
১.২ কেজি.	৫০ গ্রা.
৩.০ কেজি.	১০০ গ্রা.

শিগগির! স্টক থাকতে নিন
গোদরেজ-এর তৈরী
বিজ পরিষ্কার, বিরাট সাশ্রয়!

দেওয়া আক্কার সেক্রেটারীর পদ সৃষ্ট হইল। সিভিলিয়ান স্মাইথ সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।'
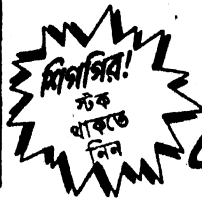
বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারিত করার আসল কারণটা ছিল, ঠিক ঐ সময়টা বঙ্গদর্শনে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়া। তিনি আনন্দমঠে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন।

ইংরাজ সিভিলিয়ানরা বাঙলা জানতেন। তাঁরা বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এরই ফলে তাঁর ঐ অপসারণ।

এবার অপরের জন্য সাহায্য চেয়ে বা অপরকে সাহায্য করবার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী অথবা তাঁর কর্মচারীকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর দুটি চিঠির কথা বলছি। এ চিঠিও আজ আর নেই। শুধু চিঠিদুটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, এখানে প্রথমে যে চিঠিটির কথা বলছি, তার উল্লেখ আছে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থে। আর শেষের চিঠিটির কথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশন ইন্ মেকিং' গ্রন্থে লিখে গেছেন। চিঠি দুটির প্রসঙ্গ এই—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় বহরমপুরের সংলগ্ন কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী একবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাল দান করবেন স্থির করেছিলেন। মহারাণীর যে কর্মচারীর উপর এই শাল বিতরণের ভার পড়ে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল।

এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সন্ধান পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের বাড়িতে যান। সেখানে জগদীশবাবুকে না পেয়ে তাঁর পুত্র খগেন্দ্রনাথকে বলে কয়ে তাঁকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নেন। খগেন্দ্রবাবু লিখেছিলেন—যাঁর উপরে বিতরণের ভার আছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে একটা চিঠি দেন তো এই গরীব ব্রাহ্মণ একটি শাল পান।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণের হাতে খগেনবাবুর চিঠি পেয়ে তাঁকে বললেন—ঠাকুর আমি কাউকে সুপারিশ চিঠি দিতে ভালবাসি না। তবে খগেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। তার কথা অগ্রাহ্য করতে পারব না। এই বলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণের হাতে শাল বিতরণকারীর নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ ঐ চিঠির বলে একটি শাল নিয়ে আসেন। শাল নিয়ে ফিরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরের বাসায় দু-একদিন ছিলেনও। ব্রাহ্মণ দেশে ফিরিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বললেন—ঠাকুর, আমার বাড়ি থেকে আপনি শুধু হাতে ফিরলে, আমার উপর আপনি প্রসন্ন হবেন না, বলে মনে হচ্ছে। তাই এই যৎ সামান্য কিছু দিলাম নিন। এই বলে তিনি ব্রাহ্মণের হাতে দশটি টাকা দিলেন।

ব্রাহ্মণ শাল এবং টাকা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারত সভা নামক ভারতীয়দিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই সভার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির শেষ কয় পংক্তি যা পাওয়া গেছে, আগে তার উল্লেখ করেছি। এবার এই ভারত সভা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি চিঠির কথা উল্লেখ করছি। চিঠিটি পাওয়া না গেলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশান ইন মেকিং' নামক আত্মজীবনীতে এই চিঠির কথা লিখে গেছেন। সেই চিঠির প্রসঙ্গটা এই—

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সভা স্থির করেন যে শুধু ভারতবর্ষেই এখানকার ইংরাজদের কাছে আমাদের দাবী-দাওয়ার কথা জানালে চলবে না। ইংলণ্ডে গিয়েও শাসক ইংরাজ জাতির কাছে ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কথা প্রচার করতে হবে। এজন্য ভারত সভা লালমোহন ঘোষকে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তখন এই প্রতিনিধির বিলাতে যাতায়াত এবং সেখানে থাকার খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে।

ঐ সময় ভারত সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যান। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টার কিছুদিন আগেই বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বহরমপুরে থাকার সময় সেখানকার কাশিমবাজার রাজবাড়ির লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তাই সুরেনবাবু গেলে, সুরেনবাবুর হাতে কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে একটি চিঠি লিখে দেন।

সুরেনবাবু এবং তাঁর সঙ্গী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি নিয়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে যান। মহারাণী বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি পেয়ে ভারত সভাকে তখন কয়েক হাজার টাকা দান করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সুরেনবাবু লিখে গেছেন—

The only substantial sum that we obtained was from the Maharani Swarnamoyee. I fortified myself with a letter from Baboo Bankim Chandra Chatterji, the great Bengalee novelist, who evinced the utmost sympatthy wih the whole movement. Armed with this letter and accompanied by my indefatigable friend, Babu Dwarakanath Ganguli, we called upon Rai Rajib Lochan Rai Bahadur, manager of the Maharani Swarnamoyee's estate, at his house at Berhampore. The old man received us with kindness, but he promised us only one-half of what we wanted. We thanked him, of course, though we made it clear that we expected more. We took leave of him, and as we were about to step into the street from his house, he summoned us back and said 'I have reconsidered the matter and promise the whole amount. you want', We thanked him very heartily and left his house, blessing him and the Maharani Swarnamoyee.' (ক্রমশ)

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ৩ ॥

কেন এত আসে লোকটা? তার জন্য। সইফুল বোঝে। কেন দাউদ এলে তার সরে পড়তে ইচ্ছে হয়, কেন তাকে ভাল লাগে না, সইফুল সেটা বুঝতে পারে না। অথচ লোকটা, দাউদ যার নাম, ছবি বুর যে ভাই, তার সঙ্গ পাবার জন্য কত কী না করে! দূর থেকে সইফুল দেখে, খুঁটিয়ে লক্ষ করে। লোকটা তাদের বাড়ির দরজায় এসেই সাইকেলের ঘণ্টি বাজায়। তার চোখ দুটো সারা বাড়িটার উপর যেন বাতির মত ঘোরে। কী এক আশায় তার চোখ মুখ জ্বলতে থাকে। ফর্সা মুখটা টকটকে হয়ে ওঠে। সব দেখে সইফুল। এও দেখে তার ভাইবোনেরা ঘণ্টি শুনে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তাকে ঘিরে কলরব করে। দাউদ তাদের কাছে মস্ত আকর্ষণ। অবাধে তারা তার কোলে পিঠে কাঁধে চাপে। দাউদ তাদের কোনোদিন বিসকুট, কোনোদিন বা লবেনচুষ খাওয়ায়। সন্দেহ নেই দাউদ সইফুলদের পরিবারে একঘেয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্য এনেছে।

তাদের সারকাস দেখিয়েছে একবার ম্যাজিক দেখাতে নিয়ে গিয়েছে দুবার। বাবুকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে দাউদ। একটা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে। আবুবু তো দাউদ বলতে অজ্ঞান, বাব, এবং তার অন্য ভাইবোনেরাও দাউদ ভাই ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না। এমন কি তার আম্মা, যে অত লাজুক, আশ্চর্য ক্ষমতা দাউদের, সে আম্মাকেও খালা খালা বলে বশ করে নিয়েছে। কেন? সইফুল জানে, কেন। এমন কি তার সন্দেহ, আম্মাও সে কথা জানে। বুঝতে বাকি নেই তার। দাউদ সইফুলকে পেতে চায়। আম্মার ভাবগতিক দেখে মনে হয়, তার বিশেষ আপত্তিও নেই।

আপত্তি সইফুলের। আগে সে একদম বের হত না দাউদের সামনে। কথা কইত না। এখন বের হয়। কথাবার্তাও বলে। কিন্তু তার ভাল লাগে না। লোকটার সান্নিধ্যই তাকে কুঁকড়ে দেয়।

অথচ দাউদের চেহারা ভাল। একটা দিল-খোলা ভাব আছে। কিন্তু যেটা সইফুলকে সরিয়ে দেয় তা হল লোকটার চাহনী। কচিৎ চোখে চোখ পড়লে সইফুল তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা দেখতে পায়। যা সইফুলকে ভয় পাইয়ে দেয়। তখন তার মনে হতে থাকে লোকটাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলেই সে এক হ্যাঁচকায় তাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যাবে। আর তখনই সইফুলের দাউদের কাছ থেকে সরে পড়তে ইচ্ছে হয়। ফলে হয় কি যে সময় দাউদ তার সঙ্গ বেশী করে চায়, ঠিক সেই সময়েই সইফুলের অস্বস্তি বেড়ে যায়। সে কোনও না কোনও অছিলায় দাউদের সামনে থেকে সরে পড়ে।

কিন্তু কেন তার এত অস্বস্তি হয় দাউদকে দেখলে? কেন সে ভয় পায়? অথচ দিন দিন দাউদের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। দাউদ ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছে। আর ততই সইফুলের মনে আশঙ্কার এক কালো মেঘ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে আছে সে। ঘুম আর আসতে চায় না।

সইফুল আমি তুমারে সুখি রাখব। অন্ধকারে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। দাউদের মনে হল ঠিক তার মশারির উপর। খোনকার আমারে যে কাজডা দেছেন তাতে আমি কিছু পয়সা করতি পারব। লাখের টাকার থে ওভারশিয়ার, সাব-ওভারশিয়ারগের দস্তুরি বাবদ যদি পাঁচ পারছেন্টও ছাড়ে দিই, তালিউ যা লাভ আমার থাকিবে তাতে যশোরে আমি অ্যাকখান কুঠা-বাড়ি বানায়ে ফেলতি পারি। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যি খোনকার আমারে স্পেশাল রেট করায়ে দেছেন। যতটা কাজ হইছে তা তিনি নিজেই ইনসপেকশন করিছেন। আমি কাজের সাইটি পাঁচখানা দশখানা গিরামের মোড়ল মাতব্বরগের আনে জুগাড় করে রাখিছি। খোনকার যে ছাইটিই গেছেন সেখেনেই যায়ে দেখিছেন যে মোড়ল মাতব্বরা তাঁর জন্যি অপেক্ষা কত্তিছে। তিনিই সকলের আগে আচ্ছালা-মু আলাইকুম বলে আগোয়ে গেছেন। তিনিই আগে ওগের হাতে হাত রাখে মোছাফাহ্ করিছেন। এতবড় একজন আশরাফ তাগের সঙ্গে অ্যামনভাবে মিশিছেন বলে মোড়ল মাতব্বররা গলে জল হয়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওগের হয়ে খোনাকারের কাছে আরজি পেশ করে কইছি, হুজুর আমরা গিরামের লোক অ্যাক পাশে পড়ে থাকি। কেউ আমাগের মানুষ বলে গিরাহ্যি করে না। কেউ আসে ভুলুক দিয়েও দ্যাখে না যে আমরা বাঁচে আছি না নেই? হুজুরির মত লোক এই পেরথম আলেন। তা আপনিই আমাগের ধরতি গেলি মা বাপ। আপনার কাছে অ্যাকটা আরজি পেশ কত্তিছি। আপনি যে আলেন এই কথাডা মনে রাখার জন্যি আমরা অ্যাকটা মিলাদ কত্তি চাই। তার খরচাটা কিন্তু হুজুররি দিতি হবে। না বলালি শোনবো না। খোনকার তক্ষুণি রাজি হয়ে নগদ টাকা মোড়লগেরে হাতে তুলে দেন। আমার এই কাজে খোনকার খুব খুশী। এই সব মিলাদে যে-সব মৌলভী আসতিছেন সুইফুল সবাই কতিছেন, কওমের খেদমতের জন্যি আল্লাহই খোনকাররে মনোনীত করিছেন। এমন শরীফ মুছলমানরে ভোট দিয়ে আরও উঁচু জায়গায় পাঠালি মুছলমানগের লাভ আরও হবে।

তুমারে আমি কোনও কষ্ট দেব না সইফুল। আমি তুমার জন্যি কুঠা বানাবো। আল্লাহর বরকতে পয়সার কোনও অভাব হবে না। ইটির ভাঁটা যে-সব করিছি, তাতে খুব ভাল ইট হইছে। রাস্তার কাজে অত ভাল ইট দিলি লোকসান। ডিসট্রিকট বোরডের রাস্তার জান বড় জোর তিন মাস। না হলি প্যাচ রিপেয়ারের কাজ বেরোবে কন থে? আর আমরাই বা কাজ পাব কনে? ভাল ইট তাই সব বেচে দিচ্ছি। পয়সা আসতিছে বেশ। তুমার কোনও অভাব রাখব না সইফুল।

তার কী অধিকার আছে সইফুলের ভাল মন্দ নিয়ে কথা কইবার? এটা একেবারেই অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নয় কি? এবং অনধিকার চর্চা? সফীকুল নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে তার নিজের কাছেই প্রশ্নগুলোকে ছুঁড়ে মারল। দাউদ যদি সইফুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্যই মৌলভী জয়নুদ্দীর বাড়িতে যাতায়াত করে থাকে তাতে সফীকুলের কী? বার বার সে নিজেকে এই প্রশ্ন করছে কিন্তু তাতে সে শান্ত হচ্ছে না। তার অশান্তি বেড়েই চলেছে। এবং সেই সঙ্গে মনে একটা তীব্র জ্বালা।

দাউদ লোক ভাল নয়। আপনারা ওকে এখন যেমন দেখছেন মৌলভী সাহেব, ও কিন্তু আদৌ তেমন নয়।

ক্যান্, দাউদ বেয়াদবি করল কী? যদি জয়নুদ্দী ওকে সরাসরি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন?

দাউদ দুশ্চরিত্র। এই কথাটা বলতে পারবে সফীকুল? না, পারবে না। তার পক্ষে বিনা প্রমাণে কারোর বিরুদ্ধে এ কথা বলা সম্ভব নয়।

আপনারেও তো আমি ভাল লোক বলে জানতাম। কিন্তু আপনি যে চুকলিখোর তা তো জানতাম না। যদি জয়নুদ্দী এই কথা বলে বসেন, তাহলে আমার ডিফেন্স কী আছে? বলব, আমি একথা শুনেছি? কিন্তু সেটা কি হিয়ারসে-র পর্যায়ে পড়বে না। সফীফুল উকিল। সে জানে হিয়ারসে ইজ নো এভিডেনস্। শোনা কথার সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না। জয়নুদ্দীও যদি গ্রাহ্য না করেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

উকিল ছাহেব, আপনি কলেন, দাউদ দুশ্চরিত্তির। আমি কচ্ছি দাউদ খাঁটি মুছলমান। খোনকার ওরে নিজির ছেলে মত দ্যাখেন। আর তিনি আপনার মত পতিত উকিল না? বুঝিছেন?

কী বলবার থাকবে সফীকুলের?

দাউদ কী কত্তিছে জানেন? তা'লি শুনে রাখেন। যেখেনে যেখেনে ও রাস্তা মেরামতের কাজ কত্তিছে, সেখেনে সেখেনেই সে গিরামের বেকার মুছলমানগেরে ডাকে ডাকে কাজ দেচ্ছে। অবিশ্যি যতটা তার সাধ্যি। আজ পর্যন্ত আর কেউ ওর মতন কওমের খেদমত করিছে এই দিগরে? কন্? আপনার মুখির থে দাউদ সম্পর্কে অ্যামন কথা শোনবো, বিশেষ করে সে যখন আমার ছাব বিটির ভাই, ইডা আশা করিনি। ছিঃ। মুছলমান এই যে অন্য মুছলমানের ভাল দেখতি পারে না, এই করেই মুছলমানরা মত্তিছে। এর জবাবে সফীকুলের কি কিছু বলার আছে? কিছু না।

তবে কি আমি চুপ করে থাকব? সব জেনেও, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে সত্যটা চেপে থাকব এবং তার সুযোগ নিয়ে দাউদ সইফুলকে হাতের মুঠোয় করে ফেলবে! সফীকুলের কলজের গরম শিক কে যেন ঢুকিয়ে দিল। সে না না বলে আর্তনাদ করে উঠল।

সইফুল দাউদ সম্পর্কে ওর মায়ের পরিবর্তন যত লক্ষ্য করছে, ততই শংকিত হয়ে উঠছে। সে লক্ষ্য করছে দাউদ এসে যেন তার মায়ের মনের সঞ্চিত স্নেহ ভাণ্ডারের চাবিটা হাতিয়ে নিয়েছে। মনুর জন্য এই চাপা স্বভাবের নারীর অন্তরে গোপনে যে সঞ্চয় জমে ছিল, কী আশ্চর্য কৌশলে দাউদ তার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। মনু একটা চাকরী পেল না বলে দেশে থাকতে পারেনি। তাকে সেই কোন্ বারমা মুলুকে চলে যেতে হল এই দুঃখু আম্মার কলজেটাকে টুকরো করে দিয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে আম্মা কখনোই হা-হুতোশ করেনি। এমন কি মনু যেদিন চলে যায়, সেদিন আব্বাজান বরং হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন এবং খোনকার সাহেবকে খুব গালমন্দ করছিলেন মনুকে চাকরী না দেবার জন্য কিন্তু আম্মাজান একেবারে চুপ। ধীর স্থিরভাবে কেবল মনুর ভালোর জন্য আল্লাহর কাছে দোওয়া মেগেছিল। তারপর আর সে সম্পর্কে কখনও কোনও কথা বলেনি। তারপর মনু যখন শাদীর কথা লিখল, এক বর্মী মেয়েকে শাদী করছে মনু, তাই নিয়ে আব্বাজান ভাল মন্দ কত কথা বললেন। আম্মা একেবারে চুপ। সইফুলের শাদীর ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত একটা কথাও আম্মা আব্বুকে বলেনি। আল্লাহ্ যা করেন তাই হবে। ইদানীং তার শরীরটা ভেঙে পড়ছে। ঘুষঘুষে জ্বর হয়। আম্মা কোনও ডাক্তার দেখাবে না। ডাক্তার বেগানা পুরুষ। আর আম্মা খাঁটি মুছলমানের বেটি, মুছলমানের বউ। কী করে ডাক্তারকে হাত ধরতে দেবে জবান দেখাবে, বুক পিঠ পরীক্ষা করতে দেবে! না, তা হয় না। আম্মা ডাক্তারকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না। খালি জল পড়া তেল পড়া আর তাবিজ কবজের উপর দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে। টাকা লাগবার ভয়ে আব্বুও জোর করে না। বেচারি কোথায় পাবে টাকা।

এমন সময় এল দাউদ। আম্মাকে খালা বলল।

নতুন!
আমূল-এর তৈরী
মিল্ক-কোকো পানীয়
নিউট্রামূল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!
আমূল নিবেদন করছেন শক্তিবর্ধক নিউট্রামূল
দারুণ স্বাস্থ্যকর পানীয়, যা আগে কখনও পাননি।
ঘন আমূল দুধ। বিশুদ্ধ মল্ট। প্রোটিন।
ভিটামিন। খনিজ পদার্থ। প্রতি কাপ নিউট্রামূলে
গড়ে তোলে স্বাস্থ্য, বেড়ে যায় জীবনীশক্তি।
আর এর স্বাদ! আহা অপূর্ব। অনেক বেশী
কোকো। অনেক বেশী দুধ। ঘন ক্রীমেভরা দুধ
ও কোকোর সবগুণই এতে পাবেন।
নিউট্রামূল উৎপাদন হয় আমূল-এর নতুন
ডেয়ারী ও ফুড প্রসেসিং কেন্দ্রে—যা জগতের
একটি আধুনিকতম উৎপাদন কেন্দ্র।
প্রতি টিনে পাবেন ৫০০ গ্রাম নিউট্রামূল। তার
মানে, অন্যান্যদের চেয়ে ৫০ গ্রাম
(অর্থাৎ ৫ কাপ) বেশী।
নিউট্রামূল—আজই খান।
Nutramul
AMUL'S NOURISHING DRINK
প্রতি টিনে ৫০ গ্রাম বেশী
বাজারে ছেড়েছেন :
গুজরাট
কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিমিটেড,
আনন্দ, গুজরাট
daCunha/Nutra/1 U. Ben

জোর করে তার লজ্জা ভাঙল। আম্মা যেন দাউদের মধ্যেই মনুকে পেল। আর তাজ্জব কাণ্ড করল দাউদ। জোর করে আম্মাকে সিভিল সার্জনের কাছে নিয়ে গেল দাউদ। ওষুধ পত্তর গাদা গাদা কিনে দিল। শুধু তাই নয়, তার খালা-আম্মা ওষুধ খাচ্ছে কিনা নিজে এসে তার তদারক করে যায়। লেডী ডাক্তার বাড়িতে নিয়ে আসে।

আম্মারও খুব দাউদের উপর টান। তাই আম্মা এখন সইফুলের উপর নজর দিতে শুরু করেছে। নিজের উপর কখনোই নজর দেয় না সইফুল। শুধু একটা সন্ধ্যায় একটু সাজসজ্জায় মন দিয়েছিল। ফটিক ভাইয়ের ধ্যান ভাঙবার জন্য। তা সেই সন্ধ্যাটা বিষ না অমৃত, আজও বুঝে উঠতে পারল না সইফুল। ইদানীং আম্মা ওকে কাছে নিয়ে বসায়। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দেয়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু সইফুল জানে আম্মা যেদিন একটু বেশী যত্ন নেয়, সেইদিন দাউদ আসে। আর এইখানেই সইফুলের অস্বস্তি।

তুমারে আমি মাথায় করে রাখব সইফুল। তুমার জন্যি বাড়ি তোলবো। অনেক গয়না পরাবো। টাকা? টাকার জন্যি ভাবে না। আমি অনেক টাকা রোজগার করব। আমার অনেক টাকা হবে সইফুল। তুমি ওর জন্যি ভাবে না। আমি এখন কী করে টাকা রোজগার কর্ত্তি হয়, সিডা শিখে গিছি। টাকা করার জন্যি ল্যাখাপড়া শিখার কোনও দরকারই লাগে না। কী লাগে জানো? মুরুব্বির জোর অর্থাৎ তদবীর আর তকদীর আর হিম্মত। তা এই তিনই আম্মার আছে সইফুল। ইবারের ডিস্ট্রিক্ট বোরডের কামডা তুলে ফেলত্তি পারলিই আমার হাতে কিছু টাকা জমে যাবে। তুমি যদি চাও তাই দিয়ে তুমার জন্যি আমি এই শহরেই অ্যাকটা মনজিল গড়ায়ে দিতি পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ঐ টাকায় ইবার পি ডবলিউ ডির অ্যাকটা বড় কাজ ধরি। খোন্‌কার কয়েছেন, ইবারের ইলেকশনে মুছলমানরাই জেতবে। তাই মুছলমানরাই মন্ত্রী হবে। তাহলি সইফুল আমাগেরই সুবিধে। বড় বড় কাজ পাতি তখন অনেক সুবিধে পাবো আমরা।

তা অ্যাখন তুমার কী ইচ্ছে তাই কও? দাউদ সেই গভীর রাতের অন্ধকারে সইফুলকে সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল। তুমার যা ইচ্ছে তাই হবে সইফুল। তুমি যা বলবা তাই করব। অ্যাতদিন নিজির ইচ্ছেয় চলিছি, আর না। ইবার নিজিরি আর কারউ হাতে ছাড়ে দিতি চাই। সে আমারে চালাক। সে আমারে ভালোবাসুক। তুমি আমারে নিবা সইফুল? তুমি আমার ভার নিবা?

আমি লোক ভাল না? আমারে তুমার বিশ্বাস হয় না? তয় এত সরে থাকো ক্যান্? ক্যান্ অত সরে সরে থাকো? তুমার আব্বা আমারে ভালোবাসেন। আমার জীবনে আমি অনেক কিছু পাইছি কিন্তু খালা আম্মার মতন কারোরই পাইনি। খালা আম্মা আমারে য্যামন ভলোবাসেন অ্যামন ভালবাসাউ কারু কাছ থে পাইনি। আমি তুমাগের বাড়ির মধ্যি খালা আম্মারেই সব চাইতি ভালোবাসি।

না না সইফুল না। তুমারে। বেশী ভালোবাসি বোধ হয় তুমারে। কিন্তু তুমি তো সইফুল পাথর। তুমি তো কোনও সাড়া দ্যাও না। আমারে এড়ায়ে যাও। তুমাগের বাড়ি গেলি সবাই আমার কাছে ভিড় করে আসে। কিন্তু তুমি অত তেজ দ্যাখাও ক্যান্? আমি তুমার কী করিছি সইফুল যে তুমি আমারে মানুষির মধ্যি গিরাহ্যি কর না? আমি যদি তুমার আব্বুরি কই, খালা আম্মারে কই, তালি অ্যাকদিনি তুমারে শাদী করে ফেলতে পারি। না না সইফুল। পারিনে। তুমি যদি নারাজ হও তয় আমার অ্যামন সাধ্যি নেই তুমারে শাদী করতি পারি? কিন্তু তুমি আমার উপর অ্যাত নারাজ হতিছ ক্যান্?

আমার এ বিষয়ে কোনোই দায়িত্ব থাকত না, সফীকুল ভাবল, যদি দাউদ একেবারে অপরিচিত কেউ হত। যদি দাউদের সঙ্গে তার চেনা শোনা না থাকত। যদি দাউদ তার আত্মীয় না হত, ছবির ভাই বলে পরিচয় দেবার কোনও সুযোগ ওর না থাকত। কিন্তু দাউদ মৌলভী সাহেবের বাড়িতে প্রবেশই করছে ছবির ভাই বলে। কাজেই ও যদি কোনও কেলেঙ্কারী করে ফেলে তবে তার দায়িত্ব ছবি এবং সফীকুলের উপরও এসে পড়বে। ছবি তাকে পরে দুষতে পারে, তুমি তো ছিলে। তবে জেনে শুনে এই কেলেঙ্কারী ঘটতে দিলে কেন? কী জবাব তখন দেবে সফীকুল? আবার কারোর সম্পর্কে হুট করে নালিশ করাটাও তার রুচিতে বাধে। তাকে এই রকম অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য দাউদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল সফীকুল। তার ক্ষমতা থাকলে সে এই মুহূর্তে দাউদকে এই শহর থেকে বের করে দিত। কিন্তু তাও সম্ভব নয় সফীকুলের পক্ষে। এই শহরের যিনি সব চাইতে পরাক্রমশালী ব্যক্তি সেই খান খোন্দকার বজলুর রহমান বাহাদুরের সব চাইতে কাছের লোক হচ্ছে দাউদ। তাঁর একেবারে ডান হাত। সেই ঘটনাটাও সফীকুলকে দাউদের প্রতি বিমুখ করে তুলল। দাউদের মুরুব্বি খোন্দকার সাহেব! জোড়া মিলেছে ভাল। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

হঠাৎ সফীকুলের মনে হল সে কত অসহায়। সে কত আশ্রয়হীন। এই শহরে সে আছে দাউদের চাইতে অনেক বেশী সময়। কিন্তু এই শহরে আজও সে আগন্তুক। সে মিশতে পারল না কারও সঙ্গে। কোনও প্রতিপত্তিশালীকে মুরুব্বি হিসেবে পাকড়াও করতে পারল না। আজও সে তার পেশায় এমন কোনও ছাপ রাখতে পারল না যাতে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

অথচ দাউদকে দেখ। কী বা তার সম্বল? কিন্তু তাতে কী? সে এল অনেক পরে। মুরুব্বি হিসেবে জোগাড় করল খোন্দকারকে। তাঁর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সে দু পয়সা করে নিল। মৌলভী জয়নুদ্দীর মুখে শুনেছে দাউদ এই শহরে বাড়ি তৈরি করার স্বপ্নও দেখছে। এবং এটা সত্যি যে, হাজী সাহেবের যে-টাকা নিয়ে দাউদ পালিয়েছিল, সেটা সে শোধ করে দিতে চেয়েছে। বাইতির টাকাও দিয়ে দেবে বলছে। আর সে? সফীকুল মোল্লা বি এ বি এল? এখনও পর্যন্ত এই শহরে তার টিকে থাকবার জামিনও কেউ নেই। কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। শ্বশুরের টাকায় সে ওকালতি করছে।

দাউদ সম্পর্কে ভালো মন্দ কিছু বলাই তার সাজে না। কারণ দাউদ সফলতা অর্জন করেছে। আর এই সাফল্যের কারণ, সফীকুল চুলচেরা বিচার করে দেখল দাউদের মূলধন। আর সেই মূলধন হল মুসলিম সমাজের প্রতি দাউদের শর্তহীন আনুগত্য এবং সেই আনুগত্য থেকে লাভ উঠিয়ে নেবার অপরিসীম ক্ষমতা। আর সফীকুল যেন একটা দোলক। কেবলই দুই দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরছে।

দাউদের বিরুদ্ধে তার কী বলার আছে? প্রশ্ন উঠল সইফুলের মনে। দাউদের চেহারা ভালো। ওর ব্যবহার ভালো। অন্তত সইফুলের অভিযোগ করার কিছু নেই। দাউদ যেরকম তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, সইফুল তা দেখে মনে মনে প্রমাদ গণেছিল। ভেবেছিল আব্বা, আম্মা, বাবু আর অন্য ভাইবোনেদের যেমন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে দাউদ, এবার তেমন তার দিকেই হাত বাড়াবে। এতখানি বয়েস হয়েছে সইফুলের কিন্তু পুরুষ সম্পর্কে এতদিন ওর মনে কোনও কৌতূহল জাগেনি। ফটিক ভাই এসেই ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথম ঝড় তুলল। ভালো কি মন্দ, কী করেছে তা সে জানে না তবে তার মনে মাঝে মাঝে ফটিকভাইএর বুকে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। যে প্রবল তৃষ্ণায় অহরহ বুক ফেটে কাঠ হয়ে থাকে, ফটিকভাইএর বুকে মুখ গুঁজে তার উপশম পেতে ইচ্ছে হয় তার। ফটিক ভাই! ফটিক ভাই! তুমি কী পাষাণ!

না, তার কথা আর ভাববে না সইফুল। ভাববে না! সে কি ইচ্ছে করে ভাবে? রাতে ঘুমুতে পারে না সইফুল। একটা তপ্ত শ্বাস, একটা স্পর্শ তার গায়ে ঠেকা মাত্র সে চমকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় তার। জ্বালা জ্বালা জ্বালা। আর দেহটা পুড়ে পুড়ে খাক হতে থাকে। সে পাগলের মত দৌড়ে চলে যেতে চায়, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ফটিকের বুকে। সে জানে শুধু ওখানেই সে তার জ্বালা জুড়োতে পারে। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখে সইফুল। গভীর রাতে সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ দিনই ফটিকের ঘর অন্ধকার। জানালা বন্ধ থাকে। কখনও জানালা খোলা অন্ধকার। কখনও ঘরে আলো জানালা খোলা। সেদিন আর ঘরে ফিরতে পা ওঠে না তার। কচিৎ সে দেখে জানালা খোলা ঘরে আলো আর একটা লোক, লোকটার ছায়া বলাই ভালো, ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্থির হয়ে। এইসব দিনে ভয় পেয়ে যায় সইফুল। থরথর শরীর নিয়ে দ্রুত ঘরে এসে ঢোকে। শক্ত করে খিল এঁটে দেয়। আর বিছানায় শুয়ে অসহ্য উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। এ রোগ, সে জানে, সারবার কোনও লক্ষণ নেই। বরং বাড়ছে দিনে দিনে।

দাউদ তার এ রোগের ওষুধ নয়, সে জেনে গিয়েছে। তবু আজকাল আম্মা যখন তার চুল বাঁধতে বসে, কাঁকই দিয়ে যত্ন করে জট ছাড়িয়ে দেয় তার দুর্বল হাতে, সেই হাতের স্পর্শ তখন, সইফুল বুঝতে পারে, কী কথা বলতে চাইছে। আম্মাজান যে আজ আবার খানিকটা খাড়া হয়েছে, সে তো দাউদের জন্যই। সেই জোর করে আম্মাকে ডাক্তার দেখিয়েছে। ওষুধ কিনে দিয়েছে। জোর করে ওষুধ খাওয়াতে শুরু করছে। এই সূত্রেই দাউদের সঙ্গে তার কথা-বার্তা চালু হয়েছে। এমন লোকের সঙ্গে কথা না বলে থাকা কি যায়? আম্মা যে খুশী, তা তার আঙুল-গুলোই বলে দেয়। দাউদ তাকে চায়। কিন্তু সইফুল কী করবে? সে তো আর তার নয়। ফটিকের। ফটিকভাই ফটিকভাই তুমি কী পাষাণ! সইফুল হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সইফুলরি না পালি আমার কী ক্ষেতি? মেয়েলুকির কি অভাব আছে দেশে? ভাত ছড়ালি কাগের অভাব এদেশে মুছলমানগের বিয়ের বাজারে হয় না! দাউদ অত্যন্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বলল। এতদিন হয়ে গেল, কিন্তু কই সইফুল তো তার দিকি একটুও ঢললো না। দাউদ আর সইফুলের মধ্যে যে দূরত্বটা ছিল, সেই সে ব্যবধান সে তো কমাতে পারল না। এখেনেই বড় চোট খায় দাউদ। পুরনো দাউদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। বিশেষত সেইসব রাতে যখন তার বিছানার একদিকটা ফাঁকা পড়ে থাকে এবং শরীরে জাগে ক্ষুধা। তখন সে অস্থির হয়ে ওঠে। সইফুলকে মিনতি করে তার বিছানার সঙ্গী হবার। কিন্তু কোথায় সইফুল? এগিয়ে আসে কালাজিরে। দাউদ অস্থির হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় শূন্য বিছানায় শুয়ে কাটানোর চাইতে কঠিন আযাব আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে আর নেই। সইফুল সইফুল! ফুটকিকেও সে কাতরভাবে ডাকে। কখনও সখনও ফুটকি আসে তার বিছানায়। সেই স্মৃতিকে উন্মাদের মত জড়িয়ে ধরে দাউদ প্রায় গোঙাতে থাকে, তুই আমারে অ্যাকটা সুযোগ দিলিনে ক্যান্ ফুটকি। তুই আর কদিন ছবুর করলি নে ক্যান্। তোর কোনো অভাবই আমি রাখতাম না।

তারপর ধীরে ধীরে এই যন্ত্রণা যখন কমে আসে এবং দাউদ ক্লান্ত এবং হতাশ, তখন সে বিড়-বিড় করে একটানা সাপের মন্ত্রের মত আউড়ে যায় সইফুল সইফুল সইফুল।

এবং তারপর তার রাগ চড়তে থাকে। সইফুলরি না পালি আমার কী ক্ষেতি? ক্যান্? দেশে কি মেয়ের অভাব আছে? আমি দাউদ মিয়া অ্যাখন আর কারু মুখাপেক্ষী নই। নিজির রোজগারে করে খাই। দু একজন লোকরে পুষার ক্ষমতাও আল্লাহ আমারে করে দেছেন। খান বাহাদুর খোন্‌কার এই শহরের অ্যাকজন মাতব্বর। আজ তিনি আমার আপনার লোক। নিতান্ত ফ্যালনা নই আমি! তয়? তয় সইফুল আমারে পাত্তা দেয় না ক্যান্? অ্যাত সাহসই বা সে পায় কন্ থে? আজ যদি আমি মৌলভী ছাহেবরে আমার ইচ্ছের কথা জানাই তিনি খুশী হয়েই এ শাদীর ব্যাপারে আগোয়ে আসবেন। খালা আম্মাও খুশী হবেন, আমি জানি।

কিন্তু সইফুল? সে কি খুশী হবে? এই কথাডা আমি কইতি পারিনে। আমি ওরে বুঝতিই পারিনে। আল্লাহ্! সইফুল ছাড়া আর কাউরির শাদী করতি আমি পারব না।

দাউদের সংগে নিজের তুলনা করল সফীকুল। কেবল সে কত পিছনে পড়ে আছে। দাউদ এই শহরে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় সইফুলদের সে উপকারও করেছে। বাবু মিয়াকে নিজের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে দাউদ। ফলে মৌলভী সাহেবের সত্যিই কিছু সাহায্য হচ্ছে। সফীকুলের এমন ক্ষমতা কি আছে? নেই। তার শিকড় কোথাও নেই। গভীর রাতে নাতি হবে শুনে চাঁদ বিবিকে যে কথা বলেছিল সাজ্জাদ, সে কথা হঠাৎ মনে পড়ল সফীকুলের। সে রাতেও তার এইরকম ঘুম আসছিল না। সফীকুল শুনল সাজ্জাদ বলছে প্যান-প্যানানি থামা দিন ঘুমোতি দে। নাতিন নাতিন তো কত্তিছিস, ও নাতিন কি এই ভিটেয় থাকবে। এ ভিটে হল চাষার আর যে আসতিছে তার বাপ হল উকিল। ভদ্দর লোকগেরই অ্যাকজন। যারা শহরে থাকে। শ্যাওলার মত ভাসে বেড়ায়। আমরা বাপদাদার ভিটের খুটোয় বাঁধা। আমাগের যে উরা কেরমেই দূরি সরে যাবে। নাতি নিয়ে আদর করার আশা ছাড়। কথাটা খুবই কড়া। কিন্তু সত্য। সন্দেহই নেই যে সফীকুল ভাসছে, এবং এটাও তো ঠিক যে তার বাজান আর আম্মা মরে গেলে হয় ঐ ভিটে বিক্রি হয়ে যাবে আর না হয় সাজ্জাদ যা বলে, শিয়ালকাঁটার গাছ জন্মাবে।

সে ভাসছে কিন্তু দাউদ নয়, দাউদের এখানে সহায় সম্বল জুটে গিয়েছে। সে মুসলিম লিগের একজন পৃষ্ঠপোষক, দাউদের পায়ের তলে শক্ত মাটি। আর সে? সে নিজেই এত দুর্বল সে অন্যকে রক্ষা করবে কী করে? সইফুলকে দাউদের খপ্পর থেকে সে বাঁচাবে কী করে? ছেলেমানুষের মত মৌলভী সাহেবের কাছে নালিশ জানিয়ে?

সে বলবে, মৌলভী সাহেব, দাউদকে আপনি বেশী পাত্তা দেবেন না।

মৌলভী সাহেব জিজ্ঞেস করবেন, ক্যান্ কন তো?

সে বলবে, দাউদ সুবিধের লোক নয়।

মৌলভী সাহেব বলবেন দাউদ সাচ্চা মুছলমান।

সে বলবে, দাউদ আপনাদের সর্বনাশ করতে পারে।

দাউদ আমাগের যে উপকার কত্তিছে তা আর বলে শেষ করা যায় না।

সইফুলকে দাউদের কাছ থেকে সাবধানে রাখবেন।

সইফুলরি আমি ঠিক করিছি দাউদের সংগে শাদী দেবো।

না না না! দোহাই আপনার ও কাজও করবেন না!

আপনার এত মাথা ব্যথা ক্যান্, কন্ তো!

তারপর? তারপর কী বলবে সফীকুল? তার কেন যে মাথা ব্যথা সইফুল সম্পর্কে তা কি বলা যায়? না নিজেও ভাল করে জানে? সে শুধু এইটুকু জানে যে সইফুলের কোনও ক্ষতি হবার আশংকা তাকে অস্থির করে তোলে।

দাউদ মিয়ারে আমার ভয় করে। ক্যান্ জানিনে। দাউদ মিয়ারে আমার ভয় করে। বালিশে মুখ গুজে কান্না চাপছে সইফুল। আমি জানি আম্মা তুমার মনে কী আছে? আমি জানি বাজান আপনার মনে কী আছে? বাবু জামিলা এগের মনে কী আছে তাও আমি জানি। দাউদ মিয়া। কিন্তু আমারে দাউদ মিয়ার কাছে ঠেলে দিয়ে না। ওরে আমার ভয় করে। সেই পেরথম দিন আমি যখন ওরে দেখি ক্যামন করে যান্ আমার দিকি তাকাইছিল, আমি ওর চোখে একটা ঝিলিক দেখিছিলাম। সেই দিনির সেই ওরে আমি ভয় করি। যেদিন সকালে পেরথম আসে আমাগের বাড়ির দরজায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজালো সেই তখনই আমার বুক কাঁপে উঠিছিলো। তখনই বুঝিছিলাম লোকটা আমার পাছ ছাড়বে না। একে একে বাজান বাবু, জামিলা কুটি, কুসি ছোট ভাই সবাই দাউদ মিয়ার ভক্ত হয়ে উঠল। এমন কি আম্মাও। কী ক্যামতা দাউদ মিয়ার, আম্মারে নিয়ে আজকাল ম্যাজিক দ্যাখায়ে আনিছে। সইফুল ওরে আরও ভয় পায়? সে জানে দাউদ মিয়া বশ করার কায়দা জানে। আগে সে দাউদের সামনে বেরোই হত না। কথা কইত না। আজকাল কথা কইতি হয় নাইলি ভালো দ্যাখায় না। কথা কই। ভালো দ্যাখায় না। কথা কই। ভালো লাগে না। দাউদ মিয়া চায় আমি ওর কাছে থাকি। কথা কই। তালি সে খুব খুশী হয়। আর দাউদ মিয়া খুশী হলি বাড়ির সকলেই খুশী হয়। কিন্তু আমি খুশী হতি পারিনে। লোকটার সামনে আমি আড়ষ্ট হয়ে পড়ি।

ফটিক ভাইর কাছে গেলি তো অ্যামন হয় না? তখন আর চলে আসতি ইচ্ছে করে না। ফটিক ভাইর কথা শুনতি ভালো লাগে। ওর সংগে কথা কতি ভালো লাগে। অ্যামন কি ওর কাছে চুপ করে দাঁড়ায়ে থাকতিও ভালো লাগে। ক্যান জানি নে? কিন্তু ফটিক ভাই আমার উপর নারাজ। আমারে অ্যাড়ায়ে অ্যাড়য়ে চলে। আমি সব বুঝি। ক্যান্ আল্লাহ্ ক্যান্ আমার অ্যামন হল যে আমারে চায় না তারই দিক আমার দেলডা পড়ায় আর যে আমারে চায় তার দিক থেই মুখ ফিরোয়ে ন্যায়। আমি অ্যাখন করি কী?

আমি কি ছবি দুর চাইতি খারাপ দেখতি? কাজ কামে কম? তয়? ফটিকভাই আমারে অ্যাড়ায়ে যায় ক্যান্ আর সে যত অ্যাড়ায়ে যায় ততই আমার দেল তারই পিছনে ছোটে ক্যান্? আল্লাহ্। তুমি আমারে মেহেরবাণী কর। আমি যা চাই আমারে তা পাওয়ায়ে দ্যাও। দুহাই তুমার। এ যন্তন্না আর সহ্য কত্তি পারতিছি নে। দাউদ মিয়া খারাপ লোক তা আমার মনে হয় না কিন্তু আমার ওরে ভয় করে। আমি ওরে চাইনে। আমি আমি ফটিকভাইরি চাই।

অসহ্য যন্ত্রণাবোধের মধ্যে সইফুল গভীর রাত্রিতে আল্লার দরবারে তার আরজি পেশ করল এবং বোধ করল তার যন্ত্রণা খানিকটা কমল। সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। (ক্রমশ)

স্কাই স্ক্র্যাপার

প্রভাত দেব সরকার

ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ীটার সামনে এসে অসিত চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালো। ঘাড়ে ব্যথা ধরে চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসে, বাড়ীটার শেষ দেখা যায় না—উঃ কত উঁচু বাড়ীটা! ক'তলা?

দশ পনের তলা বাড়ী ইতিমধ্যে অসিত অনেক দেখেছে, দু একটিতে কার্যব্যাপদেশে উঠেছেও, কিন্তু এত উঁচু বাড়ী এই প্রথম দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল হয় গুণে দেখবার বাড়ীটা ক'তলা।

সামনে থেকে পাশে সরে এসে অসিত গুণতে আরম্ভ করে—এক দুই তিন চার.......ষোল সতের.... উনিশ, কুড়ি ....তারপর হিসেব গুলিয়ে যায়, আবার প্রথম থেকে শুরু করে—এক দুই ইত্যাদি! না, বারবারই চোখে কেমন ধাঁধা লেগে ঘটকে গোনা মাঝপথে গুলিয়ে যায়।

বাড়ীটা বাইশ-তেইশ তলা তো বটেই! দাদা আর জায়গা পেল না, বেছে বেছে এই বাড়ীতে এসে

উঠেছে। কেন কলকাতায় এর চেয়ে নীচু বাড়ী ছিল না নাকি আমেরিকায় থাকে বলে দাদা বাড়ী যত উঁচু পছন্দ করে? দাদা তো সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম আমেরিকা থেকে দাদা চিঠি লিখতো, জানিস এখানকার বাড়ী সব মনুমেণ্টের ডবল তিন ডবল উঁচু! মানে ক'তলা? দাদাকে অসিত প্রশ্ন করে পাল্টা চিঠি লিখেছিল।

ধর একশো পঞ্চাশ তলা কি তারো উঁচু! দাদা লিখেছিল। কিন্তু ধারণাটা স্পষ্ট হয়নি। তারা আজন্ম থেকেছে একতলা বাড়ীতে, তাও ঘরে সিলিং ফ্যান টাঙিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলা-ফেরা করতে হয়। কি নিচু। সিলিং-এ হাত ঠেকে যায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে জামা খুলতে গেলে!

উঁচুতলায় থাকা দাদার অভ্যেস হয়ে গেছে আমেরিকায় থেকে থেকে। দাদা বোধ হয় তাদের মত নীচু তলায় আর থাকতে পারবে না!

বাবার কথা অসিত জানে না, কিন্তু মা, দাদার চিঠি পাওয়ার মুহূর্ত থেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন; কেন দুটো দিন আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে পারতো না অজু? দেশে যখন এসেছিস মা-বাবার কাছে আসতে দেরি হয়েছিল কি।

কিছু না! অসিত মাকে বলেছিল, আপিসের কাজে এসেছে, মা তোমাদের আদর খাবে বসে বসে? হোমরা-চোমরা কত সাহেব-সুবো আসবে তার ঠিক কি! তাদের কোথায় বসতে দাঁড়াতে দেবে এখানে শুনি? এই তো দেড়খানা ঘর।

বাইশতলা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্রতাটা বড় স্পষ্ট হয়ে যেন হাতির সামনে একটা কালো পিঁপড়ে দাঁড়িয়ে উঠে!

দাদা ঠিকই করেছে অভয় সরকার লেনের তেরর বি বাড়ীতে না উঠে। দাদার দিকে হয়ে অসিতের মনে হয়, দাদা খুব ছেলেবেলা থেকেই এমন এক একটা কাজ করেছে যার সঙ্গে সংসারের কারো মেলেনি। আর এইসব করেছে বলেই দাদা আজ অনেক ওপরে উঠে গেছে, অত দূরে গিয়েও পদ-মান-সম্মান পেয়েছে। কি হত দাদা যদি পাস করে এখানে বসে থাকতো 'বঙ্গ আমার জননী আমার বলে' পদসেবা করতো? বাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বি এস সি পাশ করে দাদা যখন এক বন্ধুর সঙ্গে আমেরিকা যাবার সব ঠিক-ঠাক করেছিল! বাবা তখন বলেছিলেন, বড়সাহেব আমাকে 'কথা দিয়েছেন, মিস্টার বোস, তোমার ছেলেকে আমাদের অফিসেই নেব, ডোণ্ট-ওরি।

দাদা যদি সেই আশায় বসে থাকতো এই দশ বছরে কি হতো? এখন সেই বড়সাহেবই বা কোথায় আর সেই আপিসই বা কোথায়? বাবাকে তাই রিটায়ার করবার আগেই বিদায় নিতে হয়েছে। ভাগ্যিস দাদা তখন জোর করে কারো কথা না শুনে আমেরিকায় পালিয়েছিল। দুঃখ যতই করুক দু-চার বছরের মধ্যে দাদা বাবার রোজগারের টাকাটা পূরণ করে দিয়েছিল। সংসার তাদের অচল হয়নি।

দাদা তো তোদের ভুলে যায়নি, পরও হয়নি। বাবা-মা'র দুঃখটা শুধু শুধু মিছিমিছি। ছেলে কাছে থাকলেই আর আপন হয় না, তার সাক্ষী তাদের জ্ঞানপুড়ো দাদা মনোজ, মাসীমা এ-বেলা ও-বেলা এসে মনোজদার নিন্দে করে যান মা-বাবাকে দেখেন না, টাকা-পয়সা ওড়ায় আরো কত কি। বোনের সঙ্গে মাও হয়তো যোগ দেন দাদার গুণগান করতে।

পারলে সেও দূরে চলে যাবে, সংসারের প্যানপ্যানানি তার ভাল লাগে না। রাম লক্ষ্মণ না হলে ওদের চলবে না।

চিঠিটা বোধ হয় দাদার পেঁছনর সংগে সংগে তাদের বাড়ীতে এসেছিল, কি দাদা পেঁছে চিঠি লিখেছিল। কোম্পানীর ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে এসে দাদা উঠেছে, খরচ-পত্তর সব কোম্পানীর—অনেক কাজ এবারে কারো সংগে দেখা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। শর্ট স্টে। দাদা ... দশতলা, একশ তিন নম্বর কামরা—সকাল আটটার মধ্যে দেখা করতে।

বেশ বোঝা যায় দেশে এলেও দাদার মরবার সময় নেই। কাজ নিয়ে কোম্পানীর খরচে এসেছে। কাজ। কাজ। কাজ।

বিশতলা এত বড় বাড়ী, কিন্তু নীচে কোন আপিস ঘর নেই যে বলে দেবে কিভাবে কোথায় যেতে হবে কার ঘরে। সামনে রেলগাড়ির ওয়াগনের মত দুটো লিফ্‌ট আছে হাঁ করে। যার যত নম্বর খুশী বোতাম টেপো, উঠে যাও। বাড়ীটার ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব কারো সংগে যেন কারো সম্পর্ক নেই—মনে হয় একটা দূর-গামী রেলগাড়ীকে লাইন থেকে তুলে এনে আকাশে খাড়া করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোপ-ট্রিকের মত বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, স্বর্গের সিঁড়ি যেন।

হোক নিজের দাদা, তবু একশ তিন নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অসিত কেমন যেন ইতস্তত করলে। আটটা বাজতে এখনো মিনিট পনের বাকি আছে, তার আগে নক করা বোধ হয় উচিত হবে না, দশ বছরে মন-মেজাজ-অভ্যাস অনেক বদলে গেছে দাদা যদি কিছু মনে করে, বিরক্ত হয়? সাহেব মানুষ।

ততক্ষণে ঘরের লাগোয়া মসৃণ জায়গাটায় পায়চারি করলে কেমন হয়—এই তো ডান দিকে হাত দশেক দূরে আকাশের উঁকিটা দেখা যাচ্ছে, যেন কোন কিশোরীর নীল ঘাঘরার প্রান্ত দেশ।

অসিত লক্ষ করে এগিয়ে গেল, কিন্তু মসৃণ মার্বেলে পায়ের শব্দটা কেমন বিশ্রী আওয়াজ, মনে হল আশ-পাশের বন্ধ ঘরে আঘাত লাগল এখনি হয়তো সব দরজা খুলে সমস্বরে প্রশ্ন উঠবে, কাকে চাই? শব্দ করলে কেন?

অপ্রস্তুতের এক শেষ। অসিত পা টিপে টিপে ফিরে এসে একশ তিন নম্বরের সামনে কাঠ হয়ে দাঁড়াল, মনে হল রিস্টওয়াচের টিক্ টিক্ শব্দটা হাত বেয়ে কানে এসে বাজছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

দরজা খুলে দাদাই অভ্যর্থনা করলে এসে গেছিস। আয় ভেতরে আয়।

লাল কার্পেট পাতা, সোফা-কোচ দিয়ে সাজান ঘরটা বেশ প্রশস্ত। বাবার আপিসের বড়সাহেবের ঘরটা বোধ হয় এমন সাজান-গোছান সুন্দর ছিল না। দাদার তুলনায়—

অমল জিগেস করলে, কখন বেরিয়েছিস্—চা খেয়েছিস্?

অসিত মাথা নাড়লে, মানে খেয়েছে। কখন বেরিয়েছে কি বলবে, ঘড়ি তো দেখেনি ফার্স্ট বাসে এসেছে, কলোনি কি এখানে।

বেয়ারাকে ডাকতে হল না, আপনি এসে সামনে দাঁড়াল। অমল নির্দেশ দিলে টেবিল সাজাও দু-জনের খাবার।

খাবার মানে ব্রেকফাস্ট। মাখন, টোস্ট ডিম, ফল, চা-কফি, দুধ। কি খাবে না খাবে অসিত ঠিক করতে পারে না। সেই কোন ভোরে উঠে মা এক কাপ চা করে দিয়েছিলেন—আর কি দেবে, তাদের ব্রেকফাস্ট মানে তো এক কাপ চা, বিস্কুট কি রুটি কচিৎ কখনো।

অসিত বিরস মুখে বললে, আমি এত খাব না।

অমল টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বললে খা, খা। কিছু তো খাসনি?

কথাটা অসিতের কেমন যেন কানে লাগল, কিছু তো খাসনি? তার মানে তুমি কি করে জানলে কিছু খাইনি। তোমার এখানে আসবো বলে পেট খালি রেখে এসেছি নাকি?

অসিত যেন প্রতিবাদ করবার জন্যে বললে হ্যাঁ খেয়ে এসেছি। মা লুচি ভেজে দিয়েছিল আলুর ছেঁচ্‌কি—

অমল মুখে এক রকম শব্দ করে বললে কত কাল যে ওসব জিনিস খাওয়া হয়নি। আমার জন্যে আনলি না কেন?

যেন বড় ধরা পড়ে গেছে, অসিত মিন মিন করে বললে, তুমি যদি না খাও? তোমার ওসব এখন—

অমল বাধা দিয়ে বললে, দূর-র, মার হাতের আলুর ছেঁচ্‌কি লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, গ্রান্ড।

অসিতের যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, দাদার মুখের দিকে চেয়ে কেমন বিস্ময় বোধ করে—সেই দাদা তাদের যেমন ছিল তেমনি আছে মা-বাবার ভয়ের কোন কারণ নেই।

টেবিলে বসে ব্রেকফাস্টের উপকরণ দেখে অসিতের মনে যে বিরূপ ভাবটা জেগেছিল, (তাদের তুলনায় দাদা কেমন সুখে আছে।) সেটা বোধ হয় গেছে মায়ের হাতের আলুর ছেঁচকির স্বাদ দাদা এখনো ভোলেনি যে।

তবু খেতে কেমন ইচ্ছে করছে না, হয়তো অভ্যেস নেই বলে কি এই ভেবে দাদা ইচ্ছে মত এত খায় আর তারা দুটি ডাল-ভাত, খালি পেটে এক কাপ চা ছাড়া কিছু খায় না। অথচ এই লোকটা তাদের একান্ত আপনার—কোন খবরই রাখে না তারা কি খায় না খায়। মাসে মাসে কটা টাকা দিলেই কি সব হয়ে গেল?

অমল তাড়া দিলে, কি রে খা। বসে আছিস কেন, চুপ করে কি ভাবছিস?
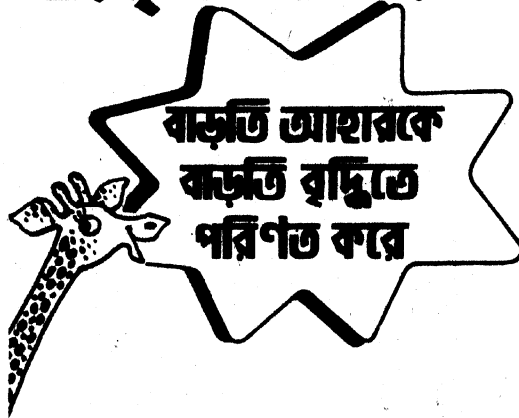
কিছু না, অসিত টোস্টের মাখনে ঠোঁটটা

টেবিলের দিকে বললে, এত খেলে আর ভাত খেতে পারবো না।

অমল হেসে বললে ভাত কম করে খাস।

ঠিক এই মুহূর্তে যে কথাটা বলবার ইচ্ছে হয়েছিল অসিত বলতে পারলে না, কেমন আটকে গেল। বললে, এত সকালে খাওয়া অভ্যেস নেই।

অমল তেমনি তাড়া দিয়ে বললে নে-নে খেয়েনে, অত কথা বলতে হবে না। পাঁড়িভটো খা, গ্রেট ইস্টার্ন থেকে এনেছে।

অসিতের মনে পড়ল, দাদা ছোটবেলায়ও খেতে খুব ভালবাসতো, একটু-আধটুতে মন উঠতো না—মাকে অনেক সময় দাদার বরাদ্দ বাড়াবার জন্যে তাদের ভাগে কম করতে হত। কিন্তু তা বলে দাদা স্বার্থপর ছিল না, সবাইকে ভাগ করে দিতো। এই তো সেবার দাদা যখন পাশ করলো, বড়দি দাদাকে মিষ্টি খাবার জন্যে দশটা টাকা দিয়েছিল, দাদা সে-টাকা নিয়ে তাকে সঙ্গে করে একটা দোকানে ঢুকে ঠিক এমনি করে তাকে তাড়া দিয়ে খাইয়েছিল, নে খেয়ে নে ফেলছিস কেন, ক্ষীরের সিঙ্গাড়া ভাল তো! মা তোকে না আনলেই হত।

সত্যি সেদিন অসিত আর খেতে পারছিল না। দাদার যেমন কাণ্ড পয়সা পেলে তো সব পেটে পুরে দেবে। কেবল খাওয়া।

দাদা বোধ হয় এখনো তেমনি আছে, যা মাইনে পায় সব খেয়ে শেষ করে দেয়। বাবা-মা ভুল ধারণা করেছেন দাদা চাকরি করে অনেক টাকা জমিয়েছে খুব সুখে আছে, তাঁদের দিকে যেমন নজর দেওয়া দরকার তেমন নজর দিচ্ছে না স্বার্থপর—

শেষ কথাটা মনে হতে অসিত মনে মনে যেন প্রতিবাদ করলে, না না, কখখোন না। আমেরিকার মত জায়গায় যত টাকাই মাইনে পাক ভদ্রভাবে চলতে গেলে কুলোয় না, আর যদি কুলোয়ও তাতে ব্যাঙ্কে টাকা জমে না। এ কি কলকাতার মেসবাড়ি এখনো তিন-চার টাকা মিল চার্জে চলে যাবে!

অসিত দেখলে দাদা সবই খুঁটিয়ে খেল, একটু কিছু ফেলল না। দাদা চিরকালই পাত পরিষ্কার করে খায়, মা বলতো অমলের মত কেউ চেটেপুটে খেতে পারে না। কি সুন্দর করে খায় দেখ্ দিকি! তোদের যেন হাঁস-মুরগির খাওয়া, ছড়িয়ে-মাড়িয়ে একশা!

অমল লক্ষ করে বললে, আপেলটা খা! দুধ, দুধ খাবি না? তাহলে বাঁচবি কি করে?

আবার সেই রূঢ় সত্য কথাটা বুঝি মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—বাঁচার উপায় কি আছে। খাব কি করে? বাবার রোজগার নেই; সে এখনো বেকার, দুই বোনের বিয়ে বাকি—তোমার কটা টাকা সম্বল—

না এসব কথা দাদাকে সে বলতে আসেনি তবু কেন যে এসব চিন্তা মনে আসছে, আশ্চর্য! দাদার কোন অপরাধ নেই, আমেরিকায় গিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে বলে তার কোন ক্ষোভ নেই। বাপ-মায়ের প্রাণ আলাদা, তাঁরা কারণে অকারণে একটুতে দুঃখ পেতে পারেন অভিমান বা রাগ করতে পারেন। কোন যুক্তি নেই।

অমল ভাইকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, আজকাল তুই বড় গম্ভীর হয়ে গেছিস্।

দাদার কথা শুনে অসিত হাসলে, এর চেয়ে প্রাণ খোলা সে কবে ছিল? দাদা কি জানবে তার ওপর সংসারের চাপটা কি। সুখের দেশে হেসে-খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে, কলকাতার অবস্থা কি বুঝবে।

না, দাদাকে বলে কোন লাভ নেই—আপেল কলা, বেদানা, মুসুম্বি তারা চোখে দেখলেও জিভে ঠেকায় না কোনদিন, নেহাৎ যদি অসুখ-বিসুখ করে দু-এক টুকরো কখনো মুখে ওঠে—কি দুর্মূল্য এসব জিনিস! এ তো আর আমেরিকা নয় ফল না খেলে লোকে গরীব বলবে।

অমল বললে এখানে আপেল তেমন ভাল নয়, কোয়ালিটি জিনিস পাওয়া যায় না। মার্কেটে দেখলুম ঘুরে ঘুরে—

দাদার কথা কেমন যেন বড়লোকের ড্রইংরুমে বসে বাজার দর আলোচনা করার মত। সেই যে কোন রানী বলেছিল, রুটি নেই তো ওরা কেক খায় না কেন? ভাত জোটে না, বল?

প্রথম কামড়ে আপেলটা বেশ মিষ্টি মনে হয়েছিল, কিন্তু গলাধঃকরণ করবার আগে মুখটা কেমন তেতো তেতো লাগল। হয়তো তার জিভের দোষ, কি অধিক মিষ্টতা তিক্ত স্বাদের উদ্রেক করে।

অসিত বললে, কাশ্মিরী নয় বোধ হয়।

অমল বললে ঐ বলে তো দিলে, দশ টাকা কিলো।

বিজ্ঞের মত অসিত বললে, তোমাকে ঠকিয়েছে আজকাল যেখানে-সেখানে আপেলের চাষ হচ্ছে, চাল আর আপেল এক দাম।

অমল উত্তেজিত হয়ে বললে, দেশটা চোর হয়ে গেছে খাবার জিনিসেও চুরি! মটন! আমেরিকায় এসব নেই, খাবার জিনিস নিয়ে ওরা জোচ্চুরি করে না। প্রচুর আছে আর তা ন্যায্য দামে পাওয়া যায়! পিওর অ্যান্ড ফ্রেশ!

আমেরিকার অনেক প্রশংসা দাদার চিঠিতে অসিত শুনেছে। এ আর নতুন কি, ওরা সৎ, চরিত্রবান, পরিশ্রমী, ধনী। তবু অসিতের মনে হল প্রতিবাদ করে বলে, সব দেশেই চোর-জোচ্চোর, ঠগ্ আছে। আমেরিকা যে গম দেয় সে কি সব সময় ভাল! সে শুনেছে যা ওরা খায় না, তাই আমাদের খাওয়ায়! যাক গে ওসব কথা বলে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই! যে কাজের জন্যে—

তখনো খাবার টেবিলে বসে মনে মনে অনেক কল্পনা করে অসিত বললে, তুমি কলকাতায় ক-দিন থাকবে?

অমল বললে, দশ দিনের প্রোগ্রাম, হয়তো দু-একদিন আরো থাকতে পারি! কেন?

না, তাই জিজ্ঞেস করছি? মা বলছিল যদি—

অমল কথা কেড়ে নিয়ে বললে, মাকে বলিস এর মধ্যে সময় পেলে একদিন যাব।

বাবাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কতদিন দেখেননি।

যাব যাব। নিশ্চয়ই যাব। মাকে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আলুর ছেঁচকি আর সরষেবাটা দিয়ে মাছের ঝাল—

কবে যাবে বল? সাগ্রহে অসিত জিজ্ঞেস করলে, ডেফিনিটলি কিছু বলতে পারছি না, তুই বরং এর মধ্যে একদিন এসে খবর নিয়ে যাস।

তাই হবে। খানিক পরে অসিত বেরিয়ে এসে করিডরে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন সব কেমন গুলিয়ে গেল, দাদাকে যে-কথা বলবে বলে এসেছিল—বলা হল না। মনে মনে দাদার উপর অভিমান হল, দাদা তো সব জানে, নিজে থেকে কেন জিজ্ঞেস করলে না? আজ তিন বছর সে পাস করে বসে আছে, বাবা বুড়ো হয়েছেন, বোনেরা বড় হয়েছে, অভয় সরকার লেনের একতলা বাড়ির ক-জন বাসিন্দার অবস্থার কোন ইতর-বিশেষ হচ্ছে না, ঘরের দেওয়ালের চুন-বালি খসতে আরম্ভ করেছে ছাদও ফুটো হয়ে গিয়ে জল পড়ছে। দাদা কি কিছু বুঝতে পারে না, ভাবতে পারে না? বাড়ীর বড় ছেলে কৃতী হয়েছে বিদেশে অত বড় চাকরি করছে চোখ ফিরিয়ে কি দেখতে পারে না? তা হলে আর তার মুখ-চাওয়া কেন? ইদানীং তো বাবার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে, বড় খোকা বোধ হয় মার্কিনী মহিলা বিয়ে করেছে না-হলে এত টাকা কি করে? দেশে তো মোটে পঞ্চাশো টাকা ব্যাঙ্ক বরাদ্দ করেছে।

ঘরে বসে খেতে খেতে দাদাকে বিশেষভাবে অসিত লক্ষ করেছে, সন্দেহের কিছু পায় কি-না! দাদার কথা-বার্তায় আত্মীয়তার সুর অনুধাবন করেছে। কখনো মনে হয়েছে দাদা ঠিকই আছে যেমন ছিল দশ বছর আগে। কখনো মনে হয়েছে দাদা অনেক বদলে গেছে। অনেক দূরে চলে গেছে পর হয়েছে! খুব চাল বেড়েছে। কি, বিয়ে? না না, সে রকম কিছু করলে নিশ্চয়ই বলতো।

কিন্তু এত কথার মধ্যে দাদা কই তার চাকরির কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না—বললে না বাবা কেমন আছেন? মা কেমন আছেন? এতদিন পরে

... যেন কেমন ওপর ওপর মনে হল। মনে হল ... হয়ত সে বিদেশাগত স্বজন কারো খবর নিয়ে এসেছে।......

কণিকাদের মোজেক মার্বেল মাড়িয়ে ডানদিকের খোলা বারান্দার ওপর অসিত সরে এল। দশতলা থেকে নীচের দিকে চাইতে বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বেশ শক্ত করে বারান্দার রেলিং ধরে নীচের দিকে অসিত চাইলে—আশ্চর্য যেন দৃশ্যটা লাগছে তলার মানুষগুলোকে কত ছোট আর অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে, খেলনার টিনের গাড়ির মত মোটরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে কত ধীরগতি সব স্লো ক্যামেরায় ধরা যেন।

*

সঙ্গে মা কটা নারকেল নাড়ু করে দিয়েছিলেন, দাদা খেতে ভালবাসতো। মা বলেছেন, দাদা যেদিন বাড়ীতে আসবে সেদিন ছাঁচ তুলে অনেক রকম নারকেলের খাবার করে খাওয়াবেন, চন্দ্রপুলি, মনোহরা, রসকরা। মার হাতের নারকেলের খাবার বিখ্যাত।

আর কি কি সব দাদাকে খাওয়াবে সেদিন অসিত মনে মনে ফর্দ করতে করতে বিশতলা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল। দাদা কচু শাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা খেতে খুব ভালবাসে, আর কি কি সব ভালবাসে খেতে অসিত মনে করতে চেষ্টা করলে—মোচার ঘণ্ট নারকেল কুরো দিয়ে, লাউচিংড়ী, ইলিশ মাছের ভেপ্‌‌‌না—?

ইস্-ইস্ ইলিশ মাছের যা দাম! হোক, দাদার জন্যে এতদিন, দশ বছর পরে একদিন! খরচের কথা অত ভাবলে চলে না। অসিত মনে মনে বেশ উত্তেজনা বোধ করে দাদাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়ানর ভাবনায়! যেন দায়িত্ব তার! দাদা যাতে খুশী হয়, দাদা যাতে তাদের—

দূর-র এসব কি ভাবছে সে। আগে দাদা বাড়ী আসুক, দাদার সময় হবে কি না, তার ঠিক কি—আজ দাদা বলবে, তারপর না হয় মাকে জিজ্ঞেস করে আয়োজন করা যাবে। এর মধ্যে একদিন কথা উঠেছিল, বাবা তো আমল দেন্‌নি, বলেছেন ওসব ওর মুখে এখন রুচবে না, বাঙালী খাদ্য ওর পছন্দ হবে না। তার চেয়ে অমলকে জিজ্ঞেস করে নিস্ কি খেতে এখন সে ভালবাসে। কথায় বলে আপ রুচি খানা।

অসিত বাবার কথা উড়িয়ে দিয়েছে, দেশ বদল হয়েছে বলে কি রুচিও বদলে গেছে? একবার দাদা এসে দাঁড়াক না অভয় সরকার লেনে, তখন দেখা যাবে কত বড় সাহেব হয়েছে, ঝিঙে-এ পোস্ত, কচু-শাক ভাল লাগে কিনা। মা আসবার সময় বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, দাদাকে বলবি অন্নপ্রাশনের সময় যে-যে ব্যঞ্জন রান্না হত সব রান্না হবে—সে যা খেতে ভালবাসতো—

মা দাদাকে লোভ দেখাচ্ছে! খাওয়ার লোভ দাদা যেন কচি ছেলেটি আছে।

বাঁ দিকের প্যান্টের পকেটে নারকেল নাড়ুর ঠোঙাটা যেন ফুটছে! অসিত অবাক হয়ে যায় ভেবে সে এতক্ষণ জিনিসটাকে এইভাবে বয়ে এনেছে কি করে! এখন বিশতলা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটস্থ ঠোঙাটা কুঁচকে আওড়ানোর মত মনে হচ্ছে। ঠোঙাটা পকেট থেকে বার করে হাতের মুঠোয় ধরলে।

কিন্তু একি! লিফ্‌টের গায়ে ওটা আবার কি লট্‌কান আছে? আউট অফ্ অর্ডার! তার মানে উত্তোলক যন্ত্র বিকল? এখন উপায়! লিফ্‌ট ছুটোই খারাপ! এখন দশতলা সিঁড়ি ভাঙো! উঃ

দাদার ঘরের সামনে এসে যখন অসিত দাঁড়াল দম প্রায় ফুরিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে, এখুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায়! দাদার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

হাঁফ ফেলে একটু সুস্থির হয়ে অসিতের মনে হল, দাদা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না বলেই এত উঁচুতে এসে উঠেছে—যেন পোষ-মানা খাঁচার পাখিটা উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসেছে। তাড়া দিয়ে পাখিটাকে ধরবার জন্যে যেন অসিত হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। কোন তবাতার বার রাখল না।

অমল ভাইকে অভ্যর্থনা করে বললে, আয় অসি কি খবর?

মুখ তুলে অসিত লজ্জায় একশেষ হয়ে গেল। তার সামনে দাদার পাশে একটি যুবতী মহিলা সকৌতুকে তাকে লক্ষ করছে—তার কাঁধ পর্যন্ত রুক্ষ চুল, পেট-বার করা পেটিকোট-আভাসিত পীনোন্নত স্তন, উন্মুক্ত মসৃণ বক্ষদেশ, স্খলিত অঞ্চল, কেমন যেন একটা অযৌক্তিক, অশ্লীল সম্বন্ধের ইঙ্গিত করছে। ইচ্ছে করছিল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেটা বোধ হয় আরো অশ্লীল, অশোভন হবে। অসিত মুখ নীচু ক'রে সামনের সোফায় গা ডুবিয়ে দিলে।

অমল জিজ্ঞেস করলে, তারপর বল।

না, কি আর বলবে! এখন সে সব বুঝতে পেরেছে, কেন দাদা আর তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে চায় না, কেন দুদিনের জন্যে দেশে এলেও মা-বাবার কাছে থাকতে চায় না।

অসিত আত্মসংবরণ করে বললে, কাল তোমার নেমন্তন্ন, মা বলে দিয়েছেন। এস।

বলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অমল বললে, দাঁড়া, এঁ'রা সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, মিস্—

অসিত গ্রাহ্য করলে না, পিছন ফিরেই বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—আমি জানি, আমাকে আর বলতে হবে না!

সোজা খোলা বারান্দার ওপর এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অসিত নীচের দিকে চেয়ে দেখল, আর যেন অবাক-বিস্ময় বোধ হচ্ছে না দৃশ্যটা দেখে।

তারপর কি ভেবে পকেট থেকে নারকেল নাড়ুর ঠোঙাটা বার করে এক একটা করে নীচে নিক্ষেপ করতে লাগল। মুখের নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ করলে, কতক্ষণে থুতুটা মাটিতে গিয়ে পড়ে।

কষ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ৪২ ॥

১৯৫২-এর সাধারণ নির্বাচনে, প্রফুল্লদা, কালীবাবু (মুখোপাধ্যায়), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হৃদয় চক্রবর্তী প্রমুখ অনেক মন্ত্রী ও নেতা পরাজিত হলেন। ডঃ রায় প্রফুল্লদাকে মন্ত্রিসভায় নেবার জন্য আগ্রহী। প্রফুল্লদা কিছুতেই মত দিলেন না। সেই সময় জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি। জওহরলালের একটা সারকুলার ছিল, যাঁরা সাধারণ নির্বাচনে এসে এসেমবলীর প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরাজিত হবেন, তাঁদের যদি আবার প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা আনা হয় তবেই তাঁদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া যাবে। আমার খুব অস্বস্তিকর অবস্থা। ডঃ রায়, প্রফুল্লদা এবং কালীবাবুকে চান কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির সারকুলার এবং প্রফুল্লদার নিজেরও ঘোরতর আপত্তি। সমস্যার সমাধান হয় না। ডঃ কাট্‌জু এখানকার রাজ্যপাল, পরে কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টার হয়েছিলেন। তিনি একটা সূত্র বার করলেন। লোকাল বডিজ কন্‌সটিটিউএন্সি দ্বারা যাঁরা উর্ধ্বতন আইন পরিষদে নির্বাচিত হবেন তাঁদেরও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত বলা চলবে। ব্যাখ্যা হিসাবে এতে কোন অসংগতি নেই। কিন্তু প্রফুল্লদার খুঁতখুঁতানি যায়নি। জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতিরূপে যখন এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে চিঠি দিলেন তখন প্রফুল্লদার আপত্তি দূর হল। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন মিউনিসিপাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আমরা প্রফুল্লদা, কালীবাবু, তারকদা, হৃদয় চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে এলুম।

*

তারকদা ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষ। বাল্যকালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তখনকার বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার জেল হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক যখন গঠিত হয় তাতে যোগদান করেন। পরে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। '১৯৫২ নির্বাচনে নদীয়া জেলার সবকটি আসনে আমরা জয়লাভ করি কেবল ও'র আসনে পরাজয় হয়। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। ও'র পরাজয়ের কাহিনী বিশ্বাস করতে কারোর প্রবৃত্তি হয়নি। নদীয়ার সমস্যা ছিল অনেক। দেশ বিভাগের ফলে নদীয়া জেলার খানিকটা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সব জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে নদীয়া জেলা তাদের মধ্যে প্রধানতম। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দেশবিভাগ সমস্যায় বিপর্যস্ত। সবটাই কিন্তু পূর্বাঞ্চল। পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার জন্য যে সমস্যা হয় দুই দেশের সরকার আপোস আলোচনায় তা সমাধানের একটা উপায় বার করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বা তৎকালীন নেতারা মুখে যতই আপত্তি করুন পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিময় হয়েছিল। অর্থাৎ এদিককার পাঞ্জাব থেকে প্রায়—প্রায় কেন, সব মুসলমানই ওদিককার পাঞ্জাবে চলে যান এবং ওদিককার পাঞ্জাবের সব হিন্দু এদিককার পাঞ্জাবে চলে আসেন। অবশ্য তাও রক্ত পিচ্ছিল পথেই হয়েছিল। প্রথম দিকে হিন্দুদের যে ট্রেনগুলি নিয়ে আসে তার কামরাগুলি মৃতদেহে ভর্তি আর মুসলমানদের যে ট্রেনগুলি নিয়ে যায় তার কামরাগুলিরও অবস্থা অনুরূপ। এসব সত্ত্বেও একটা সামঞ্জস্য হয়। কেবলমাত্র পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্যে দুই দেশের সরকার "রেঞ্জ-বদল" অর্থাৎ পারস্পরিক জমি বিনিময় মেনে নেন এবং ইভাক্যুয়ী প্রপার্টি অ্যাক্টও হয়। যে সব হিন্দু আসেন তাঁরা মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি, চাষের জমি এবং পেশা সবই পান। কষ্ট সেখানেও হয়েছিল খুব তবু তারই মধ্যে খানিকটা আশার আলো ছিলো। এখান থেকে তিন লক্ষ মুসলমান চলে যায় ফিরে আসেন সাত লক্ষ। এটা আমার অভিযোগ নয়, সত্য ঘটনার বিবৃতি। আমরা মন থেকে ধর্মানুযায়ী লোক বিনিময় প্রথা স্বীকার করে নিতে পারিনি। ফলে আপোসে জমি অদলবদলও হয়নি বা ইভাক্যুয়ী প্রপার্টী অ্যাক্ট হয়নি। আজ দেশ বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব নিতে কংগ্রেসেরও অস্বীকার করা উচিত নয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যখন কংগ্রেস দেশ বিভাগের কথা ভাবেওনি সেই ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ওঁদের কাগজে দেশ বিভাগের সমর্থনে লিখতে আরম্ভ করেন। তাতে যে মানচিত্র বেরিয়েছিল তাতে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা, দিনাজপুর জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলাকে ভারতবর্ষ থেকে বাইরেই দেখানো হয়েছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু মহাসভা—তাঁরাও এ ব্যাপারে কংগ্রেসের পুরো সমর্থক ছিলেন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীভূপতি মজুমদার এই দুজন কংগ্রেসী নেতা ছাড়া আর কোন নেতা দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি।

নদীয়া জেলায় যে চাপ পড়ে তার জন্যে তারকদার অসামান্য কর্মদক্ষতা দেখেছি। সে সময় তারকদার সঙ্গে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘোরবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আর সমস্যা কি একরকমের? যেখানে দেড়হাজার বসতির ব্যবস্থা, করতে হবে, দেখা গেল দুদিনের মধ্যে পাঁচহাজার বসতি হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেড়হাজারের জন্যে যে নলকূপ, ত্রিপল ও আহার্যের আয়োজন হয়েছে তাই নিয়ে পাঁচহাজারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ এক জায়গায় নয় এ প্রায় নদীয়া জেলার সর্বত্র। সরকারী কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন এত সামান্য যে কোন ছকেই একে কেউ ফেলতে পারছেন না। সেই সময় দেখেছি তারকদার কর্মদক্ষতা। তিনি যে সবাইয়ের কষ্টের অবসান করতে পেরেছিলেন তা নয়। তবু যাহোক করে একটা ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। কাঠামোটা ভেঙে পড়েনি। তারকদার চেষ্টার ফলেই স্থানীয় লোকেরা গভীর মমত্ববোধ নিয়ে সহযোগিতা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে সব ব্যবস্থা হয়েছিল তা সমস্যা পুরোপুরি সমাধানের জন্য নয়, তা একান্ত সাময়িক। আর যেগুলিতে পুরোপুরি সমাধানের ভার নেওয়া হয়েছিল তার পরিণতি হয়েছিল যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রথম দিকে বিভিন্ন শিবির থেকে কয়েক হাজার ছিন্নমূল বাঙ্গালী সেখানে গিয়েছিল। মনে অনেকেরই ছিল প্রত্যাশা। একবার আমরা দেখতে গেলুম। অনেকেই ছিলেন। প্লেন থেকে বাস্তারে নামা হল। গাড়িতে ছিলেন ডঃ রায়, প্রফুল্লদা, মিঃ জন্‌সন (তখন ওখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত) আর তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কাট্‌জু। আমিও সে গাড়িতে ছিলুম। পথে যেতে যেতে দেখা গেল যে সব বাঙ্গালী ওখানে বন কেটে চাষ করবেন বলে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই রাস্তা মেরামতের জন্য খোয়া ভাঙ্গায় লিপ্ত। জেরা করে আরও জানা গেল যে পঁয়ত্রিশটি ইঁদারার মধ্যে ত্রিশটিতে জল নেই। টিউবওয়েলগুলিও প্রায় সেই রকমই। অর্থাৎ খাবার জল দূরের কথা চান করা কাপড় কাচার জলেরও অভাব। অথচ যাঁরা সেখানে গেছেন তাঁরা এই আশ্বাস পেয়েই গেছেন যে তাঁদের গতরে খেটে জমিতে ফসল ফলাতে হবে এবং সেচের জলও পাওয়া যাবে। অনেক জায়গায় গিয়েছিলুম। সর্বত্রই শিবির। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় যেমন শিবিরে ছিলেন সেখানেও সেই একই অবস্থা। প্রাথমিক আরম্ভে এইরকম। পরে অবশ্য শ্রী সুকুমার সেন (ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকশন কমিশনার) যাবার পর কিছুটা সুরাহা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কোন আয়োজনই যথেষ্ট ছিল না। রায়পুরের কাছের ক্যাম্পটিতে থাকবার কথা তের হাজার, সেখানে ছিল সাঁইত্রিশ হাজার। পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে অকর্মণ্যতা আমরা দেখিয়েছি তা স্বাধীন ভারতবর্ষে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

ক্যাম্পগুলির নাম ছিল "ট্রানজিট্ ক্যাম্প" অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা এসে প্রথমে এখানে উঠবেন। এখানে সাময়িকভাবে বাস করবার পর তাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যাবেন। পরিকল্পনা ছিল এই অথচ স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য যে আয়োজন করার প্রয়োজন তা কিছুই করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়ই হিসাব দিতেন যে ছ'বছরে ট্রানজিট ক্যাম্পগুলির জন্য ৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ৮৪ কোটি টাকা শুনতে অনেক কিন্তু যার পেছনে কোন পরিকল্পনা নেই এবং সবই অস্থায়ী সেখানে ৮৪ কোটি কেন হাজার ৮৪ কোটি টাকাও কিছু নয়। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে তাদের কোথাও পাঠানো হল না অথচ এই ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি বরাবর অস্থায়ী থেকে গেল। আট, দশ, বার, ষোল বছর ধরে এই ট্রানজিট ক্যাম্পের অধিবাসীদের কেবল মাত্র

সরকারী ডোলের উপর নির্ভর করে থাকতে হল। ফলে কৃষক অথবা শিল্পী অথবা ছোট-খাটো দোকানদার কেউই নিজের বৃত্তি অবলম্বন করতে সক্ষম হল না, প্রকারান্তরে তাদের ভিক্ষুকে পরিণত করা হল। সরকার এবং কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক যুক্তি দেখানো হল ঠিকই। যুক্তিগুলো যে অসার ছিল তাও নয়। একটা বড় যুক্তি ছিল যে পশ্চিম জার্মানীতে ৪৪ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছিল। তাদের দু'বছরের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম জার্মানী এ সমস্যার সমাধান করতে পেরে-ছিলেন কারণ তাঁরা কত লোকের ব্যবস্থা করতে হবে জানতেন এবং নির্দিষ্ট দিনের পর আর উদ্বাস্তু আসেনি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ১৯৪৭ সালে এ দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভা কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট দেন যে এখানে বিশেষ উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। তারপর কোন বছর আসে পঞ্চাশ হাজার, কোন বছর আসে তিন লাখ, কোন বছর আসে এক লাখ। যেমন সংখ্যার কোন স্থিরতা ছিল না, কোন নির্দিষ্ট সময়ও ছিল না। সেইজন্য সরকারের পক্ষে কোন পরি-কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বই লেখা যায় সমস্যার সমাধান করা যায় না। সমস্যা এমন জটিল হয়ে উঠেছিল যে লোকের চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো যে একেবারে ভেঙে পড়েনি তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য অধ্যায়। এর সঙ্গে ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের এই সমস্যার প্রতি গভীর ঔদাসীন্য ও এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড অজ্ঞতা। ভিন্ন রাজ্যের অনেকেই প্রশ্ন করতেন যখন পাঞ্জাবে পুনর্বাসন সম্ভব হল পশ্চিম-বঙ্গে হল না কেন। দু'টো সমস্যা যে সম্পূর্ণ আলাদা অনেক দেশনেতার এ জ্ঞানও ছিল না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও এ বিষয়ে জানবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল তাও মনে হয় না।

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির উপর অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোল-কাতার কথা আলাদা সেখানে চাপ সবচেয়ে বেশী। একটা লক্ষণীয় বিষয় যেখানেই উদ্বাস্তুরা বসবাসের জন্য ও চাষের জন্য সামান্য জমি পেয়েছেন সেখানকারই চেহারা বদলে গেছে। এবং তার ষোল আনা কৃতিত্ব যেসব উদ্বাস্তু সেখানে গেছেন তাঁদের। যেমন শিলিগুড়ি। লোকসংখ্যা ছিল আট হাজার এখন হয়েছে আশি হাজার। উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বলাও চলে। জলপাইগুড়ির মাল নামক গ্রামে প্রথম যখন গিয়েছিলুম একটা ছোট্ট ভাঙ্গা বাড়িতে একটা ইস্কুল ছিল এবং কয়েক ঘর লোকের বাস। এখন এক সমৃদ্ধ জনপদ। বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে ছিন্নমূল যেসব নরনারী এসেছেন তাঁরা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা-বৃদ্ধি করেছেন তাই নয় নিজেদের চেষ্টায় অনেক অঞ্চলকে সমৃদ্ধও করেছেন। অন্যান্য রাজ্যে কোন ব্যবস্থা না করে উদ্বাস্তু পাঠানোর ফলে সেই সব জায়গায় পুনর্বাসন এক বিভীষিকায় পরিণত হয়। ফলে বহু জায়গাতেই পুনর্বাসন না হয়ে সে জায়গাগুলি অশান্তির পীঠস্থান হয়ে ওঠে। স্বাধীন হবার পর চোদ্দ পনেরো বছর ধরে কেবলমাত্র সাময়িক সাহায্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পুনর্বাসনের পরিকল্পনা থাকলেও তা ছিল অবহেলিত। এখনও পশ্চিমবঙ্গে বহু অঞ্চল আছে যেখানে উদ্বাস্তুদের বসবাস হয়েছে বটে কিন্তু তার পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না বলে ভিত্তিটা অর্থনৈতিক হয়নি। ঋণ দেওয়ার নিয়মও ছিল অদ্ভুত। যে অভাবগ্রস্ত মানুষ তাকে যদি গরু কেনবার জন্য ঋণ দেওয়া হয় আর সেই ঋণ যদি দেওয়া হয় আংশিকভাবে তবে তার পক্ষে গরু কেনা কখনও সম্ভব হয় না। যে গরুর আড়াইশ' টাকা দাম তার জন্য যদি প্রথমে একশ টাকা দেওয়া এবং বিভিন্ন দফায় দেওয়ার শর্ত থাকে তাহলে টাকাটা দেওয়া হয় বটে এবং অভাবগ্রস্ত লোকে টাকা পায় বটে কিন্তু গরু কোনদিন কেনা হয়ে ওঠে না। ঠিক গৃহ নির্মাণের ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিও তাই। চুন কেনার পয়সা থাকে তো সিমেন্ট কেনার পয়সা থাকে না। ঘরের মেঝে হয়তো করা যায় কিন্তু ছাদ করা যায় না। এই সামগ্রিক অব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা যে এখনও বেঁচে আছি এবং রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারি এ পৃথিবীর সর্বকালের পরমাশ্চর্য ঘটনা।
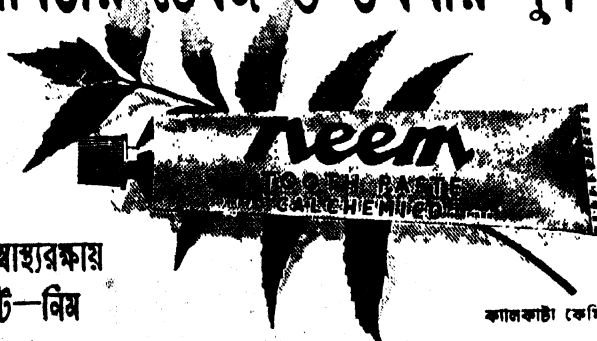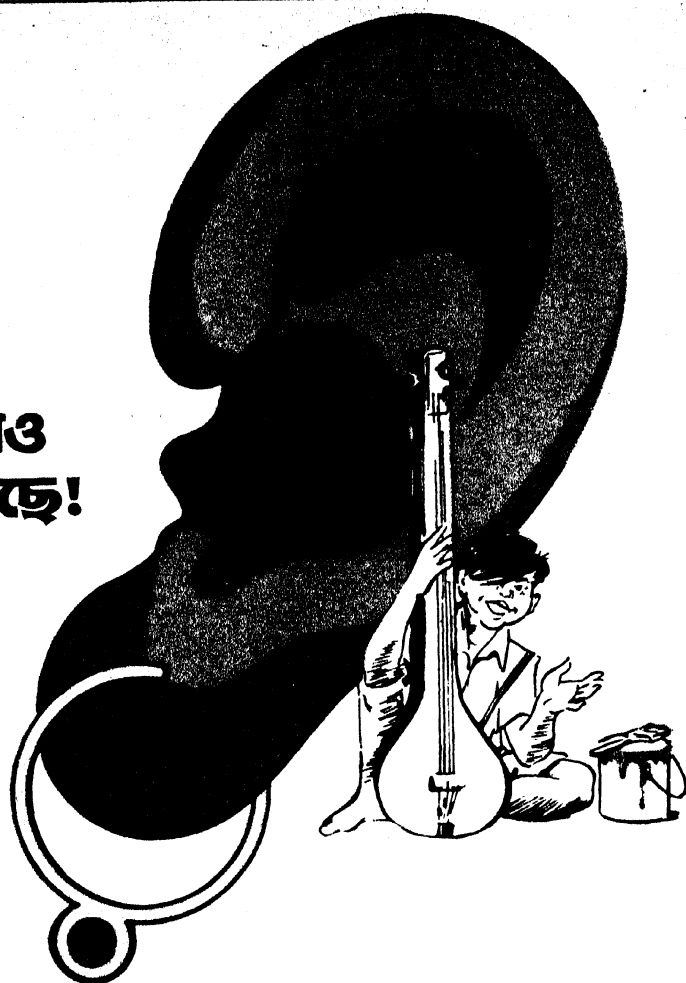
বিষ্ণুপুর মন্দিরের পোড়ামাটি সজ্জা

প্রণব রায়
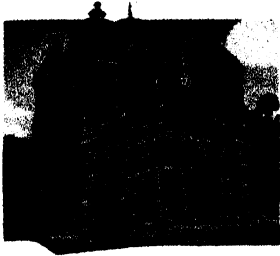
মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে বাংলার মন্দির পোড়ামাটির শিল্পের (এখানে 'টেরাকোটা'কে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে) যে বিপুল সমৃদ্ধি বাঙালীর শিল্পচিন্তাকে এক উচ্চ মার্গে উন্নীত করেছিল মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে তার চরম বিকাশ লক্ষ করা যায়। প্রধানত শ্রীচৈতন্যের নববৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বিষ্ণুপুর ও পার্শ্ববর্তী স্থানে এই শিল্পটির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য, মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এক নতুন রূপ লাভ করেছিল সারা বাংলা দেশে। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার নানা স্থানে পোড়ামাটির অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং মন্দিরকে স্থায়ীভাবে সজ্জিত করার জন্যে অলংকরণ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ কথা বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগে পোড়ামাটি শিল্পের অভ্যুদয় বাংলা দেশে এক উল্লেখযোগ্য 'ঘটনা' হলেও এর পশ্চাতে রয়েছে সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় শিল্পচিন্তার' এক উত্তরাধিকার। পোড়ামাটি শিল্পীরা এই উত্তরাধিকারই ইতিহাসের ঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন করে লাভ করেছিলেন এই সময়ে। অবশ্য, সেই সময়ে হিন্দু আমলের প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রাচীন মন্দির ও তার কারুকলা তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছিল, তা বলা শক্ত। কেননা, পাল ও সেন আমলের মন্দিরগুলিতে (যার কিছু কিছু তখন অবশিষ্ট ছিল এবং এখনও অল্প কয়েকটি বর্তমান) অলংকরণের যে শৈলী ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তার সঙ্গে এ যুগে মন্দির অলংকরণের মিল প্রায় ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র অলংকরণে নয়, মন্দিরের আকারেও অর্থাৎ স্থাপত্যশৈলীতেও চৈতন্যোত্তর যুগে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়েছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব শৈলী খর্বাকৃতি 'চালা'মন্দির উচ্চশীর্ষ প্রাচীন 'রেখ'রীতির স্থান বহুল পরিমাণে অধিকার করতে থাকে আরও কিছু আগে থেকে এবং পরে 'রত্ন'শৈলীরও উদ্ভব হয়।

বাংলা দেশে এই সময়ে মন্দির পোড়ামাটি শিল্পের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল প্রসঙ্গত তার
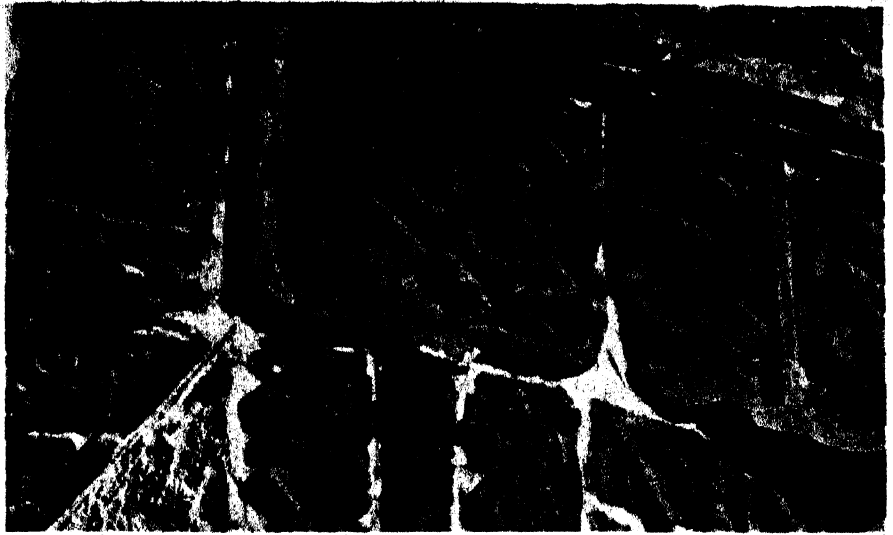
শ্যামরায়ের মন্দিরে পোড়ামাটি অলংকরণ —সংকীর্তনদৃশ্য

'রাসমণ্ডলচক্র', শ্যামরায়ের মন্দির

শ্যামরায় মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে নর্তকীবৃন্দ
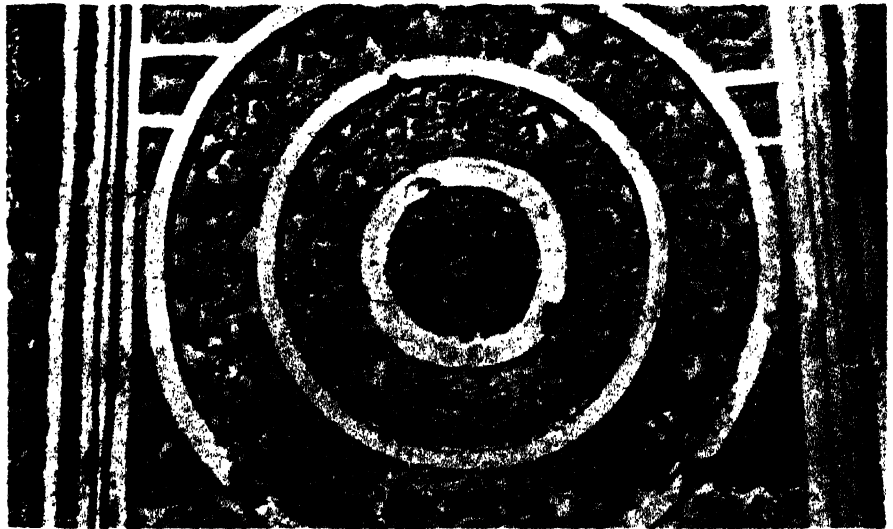
কিছু আলোচনা এখানে অপরিহার্য। মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী কালে সর্ব-ভারতীয় মন্দিরস্থাপত্য ও তার অলংকরণের সঙ্গে তৎকালীন বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ কোন বৈসাদৃশ্য ছিল না। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরের মতো একই ধরনের অনেক হিন্দু মন্দিরও তৈরী হয়েছিল। জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরের অলংকরণে মূর্তিবিন্যাস অপেক্ষা ফুল, লতাপাতা ও নানা প্রকার নকশার আধিক্য ছিল। অবশ্য, ব্যতিক্রমও ছিল না, তা নয়। সে যুগে নির্মিত বাহুলাড়া ও সোনাত-পলের (বাঁকুড়া জেলা), রেখদেউলে (আঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) মূর্তি-বিন্যাসের চেয়ে নকশার আধিক্য দেখা যায়। এগুলি আদিতে জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। এমনি আরও অনেক মন্দিরে যেখানে হিন্দু দেবদেবীর পুজো হত বলে মনে করা যায় সেখানে দশাবতার, নারায়ণ, অনন্ত বাসুদেব প্রভৃতি দেবমূর্তি অলংকরণের জন্যে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হত বলে জানা যায়। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত বা কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত দৃশ্যপট সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। বৌদ্ধ জাতকের অনেক কাহিনী ও সামাজিক কিছু কিছু কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যচিত্র মন্দির অলংকরণের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী কয়েক শতকে (তেরো শতক থেকে পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) বাংলার মন্দিরভাস্কর্য অন্যান্য শিল্পকলার মতো স্তিমিত হয়ে পড়ায় আনুমানিক পনেরো শতকের শেষ ভাগে সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশে মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পুনরুজ্জীবন হয়। ষোল-সতেরো শতকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে যেমন 'চালা'-রীতিটির উদ্ভব অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নকশার বদলে মূর্তি-বিন্যাস একালে বহুল প্রচলিত হয় এবং মূর্তিগুলি রাধাকৃষ্ণলীলা ও রামায়ণাদি পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে তৈরী হতে থাকে। সমসাময়িক সামাজিক ঘটনার দৃশ্যাবলীও অলংকরণের বিষয়-রূপে গৃহীত হয়। ছোট বড়ো নানান আকারের টালি বা মাটির ফলকে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি বা কোন কোন দৃশ্য অথবা নকশা সুন্দর করে অঙ্কিত করা হত। মন্দিরের সামনের দিক বা পাশে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে মন্দির অলংকৃত করার কাজ এই সময়ে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। হিন্দু আমলের অভ্যস্ত 'রেখ'দেউলের বদলে 'চালা' ও 'রত্ন'রীতির অসংখ্য মন্দিরগাত্রে এই মূর্তিবিন্যাস ও বিচিত্র নকশা-কাজ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সতেরো শতকের শুরু থেকে বা তারও কিছু আগে বিষ্ণুপুর ও পাশা-পাশি স্থানে পোড়ামাটি ও পাথরের অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হলেও তাদের বেশির ভাগই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পোড়ামাটির অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বিষ্ণুপুরের সে সময়কার মন্দিরগুলি আজ সংখ্যায় অল্প হলেও এগুলিকে সে যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় বলে গণ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরে এই মন্দিরগুলি সবই সতেরো শতকে তৈরী হয়েছিল। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত শ্যাম-রায়ের 'পঞ্চরত্ন' (৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ও কেষ্ট-রায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) সে যুগের মন্দির পোড়ামাটি শিল্পের দুটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এগুলির আরও আগে আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাসমঞ্চটি বীর হাম্বীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। (যদিও প্রমাণযোগ্য কোন লিপি এখন আর নেই।) মল্লভূম বিষ্ণুপুরের ইতিহাস ও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বীর হাম্বীরই প্রথম মল্লরাজ যিনি বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। জানা যায়, রাসমঞ্চটি ছাড়া বিষ্ণুপুর দুর্গ

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ, আঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ (বিষ্ণুপুর)

এলাকার কিশোরকিশোরীর ও মৃন্ময়ী মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (অবশ্য বর্তমান মৃন্ময়ী মন্দিরটি তার অনেক পরে তৈরী হয়েছে। ডেভিড ম্যাককাচ্চনের 'টেম্পলস্ অব বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট' পুস্তিকায় মাণিকলাল সিংহ প্রদত্ত বিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে।) রাসমঞ্চটি শুধুমাত্র বিষ্ণুপুরের একটি প্রাচীন দেবালয় বলে নয়, এটির অদ্ভুত স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ও পূব দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি খুবই তাৎপর্যবহ। মূর্তিগুলির মধ্যে সংকীর্তনদৃশ্য সুন্দররূপে পরিস্ফুট। মনে হয়, মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটি মূর্তি সংস্থাপনের বহুল প্রচলিত রীতিটি তখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি, যদিও বাংলার অনেক স্থানে সেই সময়েই মূর্তি অলংকরণ-রীতিটি প্রচলিত হয়েছিল। ষোল শতকের শেষের দিকে তৈরী যশোহর রর রায়নগর (১৫৮৮ খ্রীঃ) ও মুর্শিদাবাদের গোকর্ণের (১৫৯০ খ্রীঃ) মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তিসমাবেশ লক্ষ করে বাংলা মন্দিরে মূর্তি অলংকরণের রীতিটি যে সে সময়ে সুপ্রচলিত হয়ে উঠেছিল সে কথা মন্দিরগবেষক ডেভিড ম্যাককাচ্চন স্বীকার করেছেন। (দ্রষ্টব্য: 'বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ'/ ডেভিড ম্যাককাচ্চন, 'পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭২, ৭ জুলাই সংখ্যা) এগুলিরও অন্তত এক শ বছর আগে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঘাটালের (মেদিনীপুর জেলা) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' মন্দিরে পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি ও নকশা-কাজের যে সুন্দর নিদর্শন মেলে তা থেকে মনে হয় মন্দির পোড়ামাটি শিল্পের পুনরুজ্জীবন অনেক আগেই হয়েছিল। [বর্তমান লেখক অবশ্য সিংহবাহিনী মন্দিরের এই প্রতিষ্ঠাকাল বিষয়ে সন্দিগ্ধ। লেখক কর্তৃক সরেজমিন অনুসন্ধানে বর্তমান লিপি পরবর্তী কালের বলে জানা গেছে।]

এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ফলেই মল্লভূম বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্থানে স্থানে পোড়ামাটি ও পাথরের সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পোড়া-মাটির মন্দিরগুলিতে উৎকৃষ্ট মানের মূর্তি-অলংকরণ ও খোদাই-কাজ পোড়া-মাটি শিল্পকে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। বীর হাম্বীরের পরে রঘুনাথ সিংহ শ্যামরায় ও কেষ্ট-রায়ের মন্দিরে মূর্তি ও নকশায় যে আশ্চর্য যাদুজাল সৃষ্টি করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে তা শিল্পরসিকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। রঘুনাথ সিংহের পৌত্র দুর্জন সিংহের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনের 'একরত্ন' মন্দির এর বেশ কয়েক বছর পরে নির্মিত হলেও পোড়া-মাটির অত্যাশ্চর্য কীর্তিরূপে তাও চিরভাস্বর। সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা এই আশ্চর্য শিল্প-কীর্তিগুলি যে রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। শ্যামরায়ের মন্দিরের এক স্থানে সম্ভবত এই শিল্পীদের কয়েক-জনের নাম আছে। মনে হয় সুদূরে ভুবনেশ্বর ও কোণার্ক মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্যগুলি মল্লরাজাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পাথরের বদলে পোড়া-মাটি বা ইঁটের ওপর এমনি এক শিল্প-সৌন্দর্য তারা বোধ হয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরে উৎকৃষ্ট কারু-কার্য বলতে তো ইঁটের মন্দিরগুলোতেই আছে। পাথরের মন্দিরে এমন সুন্দর কারুকার্য কোথায়? যদিও লালবাঁধ এলাকার রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত কালাচাঁদের 'একরত্নে' (১৬৫৬ খ্রীঃ) ভাস্কর্যের সন্ধান মেলে অথবা চৈতন্য সিংহের প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামের 'একরত্নে' চমৎকার মূর্তি ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি এখানকার ইঁটের মন্দিরের তুলনায় খুবই নগণ্য। পূর্বোক্ত তিনটি ইঁটের মন্দিরের পোড়া-মাটির কাজে দেবদেবীর লীলাবিষয়ক চিত্র অথবা তদানীন্তন মল্লভূম রাজ্যের পারিপার্শ্বিক সামাজিক দৃশ্যপটের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যা কিছুই প্রতিফলিত হোক্ না কেন, এ সকলের ওপরে শিল্পসৌন্দর্যটিই বড়ো হয়ে ওঠে, দর্শকমনে যার আবেদন চিরায়ত। মূর্তিগুলির আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিমা ও সূক্ষ্ম রেখাবিন্যাসে এক সুষম ছন্দ বিধৃত রয়েছে—সঙ্গীত বা নৃত্যের বিধিবদ্ধ তাললয়ের সঙ্গে যেন তার কোথায় মিল আছে। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে শিল্প-ঐশ্বর্য, কোণার্কের কালাতীত ভাস্কর্যে যার পরিচয় মেলে।

জোড়বাংলার পোড়ামাটিসজ্জা দেবদেবী-লীলাদৃশ্য
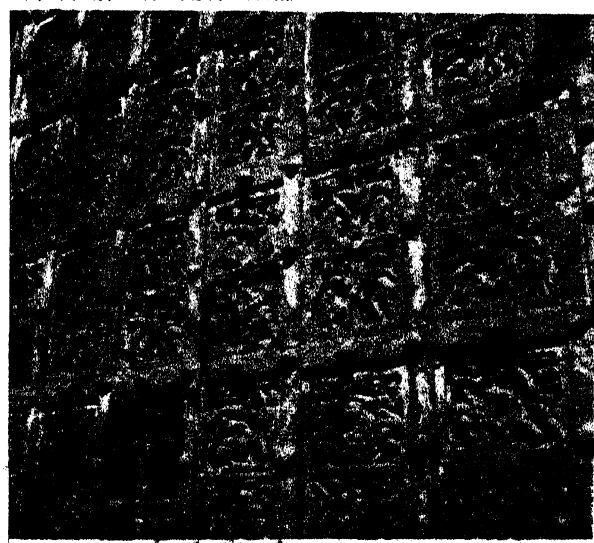
বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও কোণার্কের ভাস্কর্যে কাল ও স্থানের ব্যবধান সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা আদর্শগত মিল আছে। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর মাটির মধ্যে সেই সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় শিল্পীর কৃতিত্ব যে কত বেশী তা অনুমান করা কঠিন নয়।

বিষ্ণুপুরের উপরি উক্ত তিনটি মন্দিরের মূর্তিবিন্যাসে কয়েকটি পদ্ধতি মেনে চলা হয়েছিল। প্রথমত, দেওয়ালের একেবারে নীচের অংশে প্রথম সারিতে পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর চিত্র-সমাবেশ। শ্যামরায় ও কেষ্টরায়ের মন্দিরে বাঘ, হাতী, হরিণ ও গোরুর পালের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এই অংশে। মদনমোহনের একরত্নের (প্রতিষ্ঠা-কাল ১০০০ মল্লাব্দ বা ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই অংশে হংসপঙক্তির বিপুল সমাবেশ ও তার ঠিক ওপরে সমান্তরালভাবে সজ্জিত গোরুর পাল ও যষ্টিহস্তে রাখাল বালকদের দৃশ্য। এই সারির ঠিক ওপরে পশুশিকার ও বন্যপ্রাণীকে পোষ মানানোর দৃশ্য। শিকারদৃশ্যের প্রথমে হিংস্র বনাজন্তু-পূর্ণ অরণ্যভূমি, শিবিকারোহণে রাজার শিকারযাত্রা, হস্তিপৃষ্ঠে হরিণ ও ব্যাঘ্র শিকার, ভয়ার্ত জন্তুর চিৎকার প্রভৃতি একের পর এক দৃশ্যের যেন অভিনয় চলেছে। গভীর অরণ্যের পট-ভূমিতে এই দৃশ্যগুলি প্রাচীন বন-বিষ্ণুপুর রাজ্যের এক জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করে। দ্বিতীয়ত, এই সারিগুলির ওপরে সমসাময়িক সমাজচিত্র অঙ্কিত। যেমন, ঝাম্পানে জমিদার বা রাজার অন্যত্র গমন, উষ্ট্রারোহী পরিব্রাজক বা বণিকের দূরদেশ যাত্রা, ফিরিঙ্গী জল-দস্যুদের নৌযুদ্ধ, তীরন্দাজের তীর-নিক্ষেপ, সুন্দরী যুবতীর রূপসজ্জা ও বিলোল কটাক্ষ, মন্দিরে দেবপূজা ইত্যাদি অসংখ্য সামাজিক দৃশ্য। জোড়-বাংলার এই অংশের এক স্থানে রাজ-দরবারকক্ষ ও রাজার গোপন মন্ত্রণা, রাজপ্রাসাদ, অপরাধীর দণ্ড—ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ, অন্তঃপুরে রানী ও পরি-চারিকা, সিংহাসনে উপবিষ্টা পাটরানীর চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। অপর পক্ষে, বিলাসীজনের কামিনীসম্ভোগ-দৃশ্যও আছে। আরও আছে প্রান্তরে সৈনিকদের কুচকাওয়াজ।

তৃতীয়ত, সামাজিক দৃশ্যপটের ওপরের দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক দেবদেবীর লীলাদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। মন্দিরের সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিন বা চার প্রস্থে ও চারপাশে দেবদেবীর বহু মূর্তি ও দৃশ্যাবলী অসংখ্য পোড়া-মাটি ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয়, খিলানের ওপরে কেন্দ্রীয় প্রস্থে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য অথবা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধদৃশ্য অবশ্য খুব কমই দেখা যায়। মদনমোহন মন্দিরে এই যুদ্ধদৃশ্য ও ভীষ্মের শর-শয্যা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এখানে ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধও আকর্ষণীয়। শ্যামরায় ও মদনমোহন
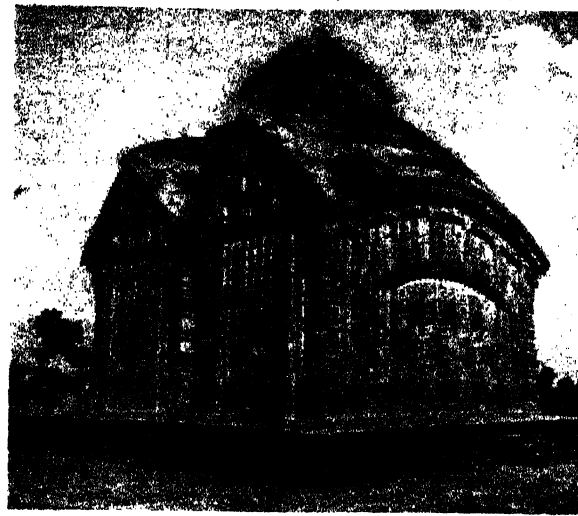
জোড়বাংলা, ১৬৫৫ খ্রীঃ (বিষ্ণুপুর)

মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দৃশ্যের বহু ফলক আছে। জোড়বাংলার হরিনাম সংকীর্তনের দৃশ্যগুলি ভক্তমনকে আকর্ষণ না করে পারে না।
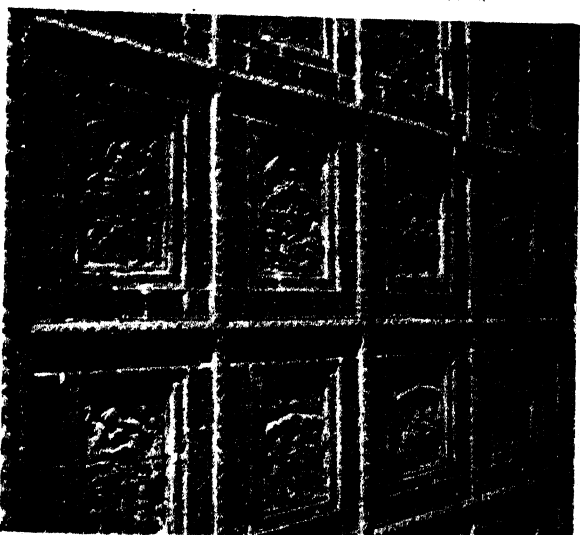
পোড়ামাটি অলংকরণে মূর্তি-বিন্যাসের এই পদ্ধতিগুলি কয়েকশো সব মন্দিরে অনুসৃত হয়েছে। কালক্রমে বাংলার অসংখ্য মন্দিরে এই পদ্ধতি এক প্রকার 'প্রথাগত' হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার অসংখ্য মন্দিরে যেখানে যখানে পোড়ামাটি-সজ্জা আছে সেখানেই এই রীতি অনুসৃত হতে দেখা গেছে।

বিষ্ণুপুরের মন্দির পোড়ামাটি শিল্পে রাধাকৃষ্ণলীলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে 'রাসমণ্ডলচক্র' ও 'নবনারীকুঞ্জর' চিত্র-গুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রাস-মণ্ডলচক্র অর্থাৎ একই রূপে কৃষ্ণ অনেকগুলি মূর্তি ধারণ করে মণ্ডলাকারে গোপীদিগের সঙ্গে নৃত্যরত। শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডলচক্রগুলি এতই সুপরিকল্পিত যে, অন্যান্য স্থানে এগুলির জুড়ি মেলা ভার। মনে হয় এগুলি পরবর্তী কালের বহু শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কৃষ্ণলীলার মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হলেও বহু মন্দিরে এটি অনুপস্থিত থেকে গেছে। আবার কোথাও কোথাও কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে না রেখে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মন্দিরের সামনের দিকে রাখা হয়েছে। শ্যামরায় ও জোড়-বাংলার ভেতর ও বাইরের দেওয়াল অসংখ্য পোড়ামাটি ফলকে ছাওয়া। 'শ্যামরায়ে' দ্বিতলের ভেতর ও বাইরেও অলংকরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শ্যাম-রায়ে' রাম-রাবণের লঙ্কাযুদ্ধ-দৃশ্যটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতি-স্পর্ধী রাম-রাবণের যুদ্ধোন্মত্ত রূপটিকে শিল্পী অদ্ভুত কৌশলে ফুটিয়ে তুলে-ছেন। মনে হয়, এই চিত্রটিও বহু শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামায়ণের এই দৃশ্যটি অলংকরণ-ভাস্কর্যে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্যামরায়ের মতো অন্য কোথাও এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল বলে মনে হয় না।

প্রসঙ্গত শ্যামরায় ও জোড়বাংলার দু-একটি দৃশ্য এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। পৌরাণিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে 'শ্যামরায়ের' এক স্থানে নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপু-বধের চিত্রটি খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাবে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, ভক্তবৃন্দ মণ্ডলাকারে নৃসিংহদেবের স্তুতি কর-ছেন। অপর একটি দৃশ্য হলো, ভীষণাকৃতি অপ্রাকৃত জন্তুর মূর্তি। একটি অদ্ভুত আকৃতির পাখি (যদিও ঠিক পাখি নয়) তার নটি নখে করে নটি হাতীকে নিয়ে শূন্যে পলায়মান, অপর দিকে পদ্মসরোবরের মাঝদরিয়ায় মালাধারী এক মৎস্যনর। জোড়বাংলার এক স্থানে কতকটা মোরগের মতো অদ্ভুত আকৃতি এক পাখি দশটি নখে দশটি হাতীকে নিয়ে পলায়নরত, বাঘ, ঘোড়া ও হাতির সংমিশ্রণে অদ্ভুত আকৃতির এক পশুর চারটি হাতীকে একসঙ্গে আক্রমণ, পশুটির শুঁড় থাকলেও মুখগহ্বরে ক্ষুরধার দন্ত দৃশ্যমান, অষ্টপাদবিশিষ্ট হিংস্র অশ্বনর ও পাশে দুটি হাতীর ওপরে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ও দু পাশে দুটি ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গনরত—এই সব অপ্রাকৃত জীবজন্তুর মূর্তি খুবই বিস্ময় সৃষ্টি করে। এসব অলৌকিক প্রাণীর আকৃতি অঙ্কনের প্রেরণা শিল্পীরা কি করে পেলেন? মদনমোহন মন্দিরটি পোড়া-মাটি অলংকরণের এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচুর্যের দিক থেকে নয়, এক-একটি প্রশস্ত ফলকে নিখুঁতভাবে খোদাই করা মূর্তি ও ফলকের চারপাশে সূক্ষ্ম ফুল-কাটা নকশা এমন সুষমভাবে সজ্জিত রয়েছে যার দ্বারা এক সামগ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের ফুল-কাটা নকশা করা ফলক ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্ত বাসুদেবের 'একরত্ন' মন্দিরে ও অন্যান্য আরও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। কিন্তু মদনমোহনের কারুকার্যই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না।

বিষ্ণুপুরের মন্দির পোড়ামাটি শিল্প রাজপৃষ্ঠপোষকতায় এক ক্লাসিক শিল্পমর্যাদা লাভ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দূরবর্তী নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির পরবর্তী কালে নির্মিত হয়েছিল, বিষ্ণুপুরের এই মন্দিরগুলি নিঃসন্দেহে বেশ কিছুর আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল। 'বিষ্ণু-পুরী পোড়ামাটি মূর্তি'র নকশা বা 'বিষ্ণুপুরী নকশা' তৈরিতে সেকালের কোন কোন সূত্রধরশিল্পী বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বলেই মনে হয়। আঠারো শতকে নির্মিত বেশ কিছু মন্দিরে 'বিষ্ণুপুরী নকশা'য় তৈরী অনেক মূর্তিফলক চোখে পড়ে। একটি অখ্যাত মন্দিরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দাসপুর থানার (মেদিনীপুর জেলা) পুরুষোত্তমপুর গ্রামে রায়দের ব্রজকিশোর জীউর একরত্ন (১৭৭২ খ্রীঃ)। এখানের মূর্তিফলকগুলির চার-পাশ সুন্দর নকশা-কাটা ও খোদাই-কাজ 'মদনমোহনে'র নকশা-কাটা ফলকগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। স্থাপত্যের দিক থেকেও এর সঙ্গে 'মদনমোহনে'র মিল আছে। পরবর্তী কালে নির্মিত মেদিনীপুর, হুগলি ও বর্ধমান জেলার অনেক মন্দিরের অলংকরণে 'বিষ্ণুপুরী নকশা'র চলন হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করলে হয়তো বাংলার এই লুপ্তপ্রায় শিল্পটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

মদনমোহন মন্দিরে অপূর্ব অলংকরণ,

অরণ্যদেব

এর পর : অরণ্যদেবের ভিক্ষু

পণ্ডিচেরীর দিনগুলো

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

প্রথম কবে শ্রীমাকে দেখলে ? —জানতে চায় কত লোকে।

কবে দেখিনি ? —জবাব দিতে গিয়ে ভদ্রতায় বাধে। অথচ, জ্ঞান হওয়া অবধি বাড়িতে অধিষ্ঠিত দেখেছি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের ছবি। প্রতিদিন, ভোর চারটে নাগাদ আধো ঘুমের মধ্যে লক্ষ করেছি—পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নানা মন্ত্রপাঠের শেষে আহ্নিকের অঙ্গ হিসাবে পিসেমশাই পড়তেন শ্রীমায়ের বাণী আর শ্রীঅরবিন্দের লাইফ ডিভাইন।

পিসেমশাইয়ের বন্ধু মিহিজামের বিজয় রায়চৌধুরীর মুখে মা ছাড়া কথা ছিল না। বাড়িতে আসতেন সরোজিনী ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী সত্যানন্দ (ভবভূষণ মিত্র) : সবার মুখে শুনতাম শ্রীমায়ের স্নেহ ও করুণার ব্যাখ্যান।

ঊরু ভেঙে হাসপাতালে ছিলেন বারীন ঘোষ। দেখা করতে যেতেই বললেন : দাদু, তোরা যা মায়ের কাছে, বুঝতে চেষ্টা কর কিভাবে জগজ্জননী ধরা দিলেন মানুষী ওই শরীরে ; সেজদা বলেছেন—মাকে না চিনলে ভগবান মেলে না।........

এসব তো গেল বাইরের খবর। অন্তর থেকে মাকে দেখলাম কবে ?

মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পাবারও বহু বছর আগে মাকে কিন্তু দেখেছি আমি। যুদ্ধের সময়ে, ছোট একটা দুর্ঘটনায় বাঁ হাতটা আমার ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল। বয়স তখন আমার সাত। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে হাত সেট করে দিলেন সাহেব এক ডাক্তার। বাড়ি তাঁর স্কটল্যাণ্ডে।

ও হরি! যন্ত্রণা কিছুতেই কমতে চায় না। আর প্লাস্টারের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগল আলুবখরার মতো কেমন যেন টোপা টোপা লালচে টুসটুসে ফোসকা। কষ্ট বেড়ে চলল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। পাশে আমার মা শুশ্রূষায় রত। কি একটা কাজে মা একটু ঘরের বাইরে গেলেন হঠাৎ। অসহ্য যন্ত্রণায় তীব্রতম মুহূর্তে কেমন করে জানি না আমার চোখ পড়ল ঘরে টাঙানো শ্রীমায়ের ছবির ওপরে।

এক ঝলক সাদা আলো যেন ঠিকরে সিঁড়ির মতো নেমে এল আমার দিকে। আর সেই সিঁড়ি বেয়ে শ্রীমা নেমে এলেন, হাতে তাঁর এক গোছা রজনীগন্ধা। প্রসন্ন তাঁর মুখশ্রীতে উজ্জ্বল হাসি আর দু-চোখে অতল নীল আলো। শান্তিপ্রদ সেই আলো আর সেই গন্ধের সঙ্গে বাস্তবিক না কল্পনা জানি না—একটা স্পর্শ আমায় এক নিমেষে ভুলিয়ে দিল হাজার বিছের কামড়ানি। ডুবে গেলাম প্রশান্তির মধ্যে।

পরদিন আমার মা বললেন যে, ঘরে ঢুকে ওভাবে আমায় ঘুমিয়ে পড়তে দেখে একটু অবাক লেগেছিল তাঁর। ক-বছর পরে নিশিকান্তের কবিতায় মায়ের যে বর্ণনা পড়ি, তাতে চমক লেগেছিল মনে : আমারই অভিজ্ঞতার কথা মূর্ত করেছেন তিনি—"শুভ্র বহ্নিধারিণীর শিখায় মল্লিকা।"

*

সে যুগে কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরী যাওয়া খুব সুখপ্রদ ছিল না। রেলের ক্লান্তি ছাপিয়ে বড় করে বাজত ফরাসী ভারতের শুল্ক বিভাগের কড়াকড়ি। তা সত্ত্বেও যেন অবলীলাক্রমে কেটে গেল কটা দিন আর রাত। সহযাত্রী ছিলেন ও-পথে অভ্যস্ত বাবার একাধিক বন্ধু। তাঁদের অনেকেই হাতে একটু টাকা জমলেই চলে যেতেন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে। কলকাতায় কেউ যখন কৈফিয়ত চাইত, "অত ঘন ঘন কেনই বা পণ্ডিচেরী যাওয়া, বাপু ? হয়টা কি ?" —"হবে আবার কি ? দেনা হয়।" রহস্যে প্রবীণ সিদ্ধেশ্বর বাঁড়ুজ্যে জবাব দিতেন।

অনেকে আবার দু-বছর, দশ বছর, বিশ বছরও অপেক্ষা করে থাকতেন— কবে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি আসবে।........

পথশ্রান্ত, ভর সন্ধেবেলা পৌঁছলাম আমরা পণ্ডিচেরী। উঠলাম পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী সুধীর সরকারের ডেরায়। আলিপুর বোমার মামলার অতি নিরীহ সেই আসামী ইনি—জামালপুরের বাসন্তী প্রতিমা ভাঙার খবর নিয়ে প্রথম যে ভগ্নদূত ফিরেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

ভগভগে তামায় ঢালাই করা বলিষ্ঠ সাত্ত্বিক চেহারা—হাসামাত্র দু-চোখের আগুন খপ করে ছড়িয়ে পড়ে নিখুঁত রোমান প্রতিমূর্তির মতো সুধীর দাদুর সারা মুখে। "আয় রে আয়, দাদু, আমার অষ্টাবক্র মুনি রে।" আহ্বান জানালেন উনি, যেন জন্মান্তরের কোনও ইয়ারদারের সম্ভাষণ।

স্নানান্তে বাইরের ঘরে আসতেই ওঁর মেজছেলে গামা সযত্নে চুল আঁচড়ে দিল, সেজ ছেলে মনা অ্যালুমিনিয়ামের বোতল খুলে মাখিয়ে দিল মহীশূরী চন্দন তেল। মা-মরা দাদা-ভাইদের দেখভালের কর্ত্রী, ওঁর কন্যা বনলতা ডাক দিলেন খেতে। সামান্য সবজি, গরম দুধ আর আশ্রমের পাঁউরুটি—সবই মুখে ঠেকল অমৃত যেন। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম মানুষগুলোকে। না হাসতেই ওদের চোখের মণি উপচে আসে চাপা হাসির দ্যুতি, মুখমণ্ডলেও তার ছটা। মনে দোলা লাগল : হাসিনন্ত, হাসিনন্ত, হাসিনন্ত, হাসিনন্ত।

পরদিন সাত সকালে চটপট স্নান সেরে তৈরি হয়ে সুধীর দাদুর সঙ্গে বার হলাম বাবা-মা ও আমরা তিন ভাই। আশ্রমিকদের দিন শুরু হয় শ্রীমায়ের দর্শন দিয়ে। সুধীরদাদুর বাড়ির পরের রাস্তা লোকে ভরে গিয়েছে। টুঁ-

শ্রীমা—সাত বছর বয়সে

শব্দটি কেউ করছে না। উন্মুখ প্রতীক্ষায় সবাই দাঁড়িয়ে। ভোরের আকাশ ...ময় ছোঁয়া তখনো কাটেনি। সূর্য উঠব উঠব করে রাঙিয়ে দিয়েছে পুবের আকাশ। মনে পড়ল পিসেমশাইয়ের মন্ত্রধ্বনি : মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
পুবের আকাশ। মনে পড়ল পিসেমশাইয়ের মন্ত্রধ্বনি : মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মধুর এই লগ্নে শ্রীমা আবির্ভূত হলেন তাঁর দোতলার প্রকোষ্ঠে।

চপল এক ঝলক হাওয়া খেলতে লাগল তাঁর মাথার হালকা ওড়না নিয়ে ; একহাতে সে-ওড়না চেপে, স্তব্ধ নয়ন মেলে ধরলেন শ্রীমা আকাশের দিকে, তারপর সমুদ্রের দিকে, তারপরে মনে হল একজন একজন ক'রে সমবেত সেই পাঁচ-ছশো নারী-পুরুষ-শিশুর চোখে চোখ রেখে প্রত্যেককে করুণায় প্লাবিত ক'রে অন্তর্মুখী হয়ে গেলেন তিনি। কখন যেন মিলিয়ে গেলেন তিনি। হাওয়ায় রেখে গেলেন চাপা এক সৌরভ। মনে পড়ে গেল....আমার সেই দুঃখের রাতের শ্রীমাকে : গন্ধটা রজনীগন্ধার।

সুধীরদাদুকে জিগ্যেস করলাম : মা কি রজনীগন্ধা ভালবাসেন ?

বলিস কি ?—ফুরৎ এল জবাব : রজনীগন্ধার নাম মা রেখেছেন "নূতন সৃষ্টি"।

*

প্রাতরাশের পরে হাজির হলাম আশ্রমের প্রধান গৃহে। এখানেই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ থাকেন, পুরনো দিনের কয়েকজন সাধক-সাধিকা সমেত। এই ভবনের উত্তর প্রকোষ্ঠ থেকে সকালে শ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলাম। এবারে তাঁর স্পর্শ পাবার পালা।

ধ্যানকক্ষে বসে ভাবছি নানা কথা, এমন সময়ে নিঃশব্দে সম্ভ্রমভরে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। দেখলাম—সিঁড়ি বেয়ে (ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম আমার স্বপ্নে) শ্রীমা এলেন নেমে। একে একে সারি বেঁধে সবাই মায়ের সামনে দাঁড়াচ্ছে, প্রণাম করছে, অফুরন্ত মৌন হাসিতে ভাস্বর শ্রীমা কারো হাতে ফুল দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, কারো দু'হাত ধরে একটুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকছেন।

একেবারে তাঁর সামনা-সামনি পড়ে গেলাম অসতভাবে কিছু জানবার জেনবার আগেই। মায়ের চোখের দিকে অপলক-অনড় কেমন যেন কি একটা ঘটে গেল। চাকুরিয়া লেকে সাঁতার কাটতে যেতাম। মাঝামাঝি ছিল একটা দ্বীপের মতো, যার কাছে পৌঁছে ডুবুরির মতো আমরা নেমে যেতাম পাতালপুরীর সন্ধানে। তেমনি অথৈ মনে হল মায়ের চোখ, যতই ডুবি, আলোয় ততই সব আলো হয়ে ওঠে। সংবিৎ যখন ফিরল, দেখি তাঁর গোলাপ পাপড়ির মতো নরম দুটি হাত আমার গালে ন্যস্ত।

লোকে বলে শিশুর মতো নিষ্পাপ; কিন্তু দশটা বছরের কলকাতার জীবন বিবেকে এনে দিয়েছিল কত-না মনস্তাপ কত যেন মালিন্য। মায়ের ছোঁয়ায় মনে হল—আমি সত্যি নির্মল, আমি সত্যি সুন্দর। কাগজমোড়া মিষ্টি গন্ধের প্রকজোড়া শাকের মতো কি যেন মা আমার হাতে দিলেন। সেটা বুক পকেটে রাখলাম। বেরিয়ে এসে সুধীরদাদার কাছে জানলাম ওটা "নবজন্ম"।

"ও নলিনী, এই নাও, দেখ আমাদের অষ্টাবক্র মুনি—" ব'লে উনি পথ মুখে দাঁড় করালেন উন্নত-গুম্ফবান এককাঁধ কালো চুলে সমৃদ্ধ, ধপধপে সাদা ধুতি-চাদর পরা মাঝারি চেহারার একজনকে। ক্ষুরে চাঁছা চিবুকের থুৎনি থেকে

মেয়েদের ক্লাশ নিচ্ছেন শ্রীমা

ক্ষুরধার একটা দীপ্তি এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ওঁর প্রায়-মেয়েলি মমতায় মাখা ভ্রমরকালো চোখে।

"তেজেনের মেজ ছেলে বুঝি? পুথুলীন?" বলে আশ্রমের প্রধান সচিব নলিনীকান্ত গুপ্ত এক অহর্মায় আপ্যায়ন করে নিলেন আপনমনের অন্তঃপুরে। ইনিও ছিলেন আলিপুর বোমার মামলার আসামী।

"মার কাছে হয়ে এলে?" নলিনীদা প্রশ্ন করামাত্র মুখিয়ে উঠলেন সুধীরদাদু: "আর বোলো না। ডাইনী বুড়ি ড্যাবডেবে চোখে বাছাকে গিলে খেল গো, ও নলিনী, গিলে খেল।"

"আচ্ছা, হুঃ, হুঃ" বলতে বলতে আধা-কৌতুকে আধা-গাম্ভীর্যে দোদুল্যমান নলিনীদা রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজ পথ ধরলেন।

কিছুকাল বাদে কানে গেল যে মা-শ্রীঅরবিন্দের অনুরক্ত কোনও শিষ্য নালিশ পাঠিয়েছেন—সুধীর সরকারের মাথায় নিশ্চয় অপশক্তি ভর করেছে, কারণ ডাইনী-ফাইনী ছাড়া মা সম্বন্ধে তার মুখে কথা নেই। শুনে মা-শ্রীঅরবিন্দ খুব হেসে মন্তব্য করেছেন, "কোনও অপশক্তির সাধ্য নেই সুধীরের কেশস্পর্শ করে, এমনই নিবিড়ভাবে ভগবানের শক্তি তাকে ঘিরে আছে।"

মনে হয় এমনি একটা অভিযোগ গিয়েছিল শ্রীমায়ের কাছে: আশ্রমের ঝাড়ুদার-মেথরদের তত্ত্বাবধান করেন যে সাধক (গঙ্গাধর তাঁর নাম) তিনি সম্প্রতি মায়ের কাছে যান না আশীর্বাদ নিতে—নিশ্চয় অপশক্তি তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। জবাবে শ্রীমা বলেন "সে কি? ওতো অহর্নিশ অন্তর থেকে আমার চেতনার সঙ্গে একাত্ম!"

পোশাকী ভক্তির আতিশয্য সম্বন্ধে সে যুগে পরিহাস-ছলে শ্রীঅরবিন্দ একবার সম্ভবত বলেছিলেন যে মানুষ যেই শোনে সাধনার পথে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা দরকার, তখনই তারা আর-কিছু পারুক না-পারুক আগে-ভাগে সাধারণ বুদ্ধি (কমনসেনস্)-টুকু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

বেলা তখন দশটা। সুধীরদাদু ডিস্পেন্সারিতে নিয়ে গেলেন একটু সুপ খেতে। সেখানে তখন বসতেন তিন-তিনজন ডাক্তার: নগেন ভটচায, যতীন নাগ আর নৃপেন সেন। প্রথম দুজনে আশ্রমেই দেহরক্ষা করেছেন। কনিষ্ঠতম নৃপেনদা আজ সত্তরের বেশি বয়সে অটুট তারুণ্য ও উৎসাহ নিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে আছেন। দেখা হলে ভুলে যাই, প্রায় তিনযুগ অতিক্রান্ত হল তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পরে।

সুধীরদাদু ব'লে রেখেছিলেন যে সুপটা শ্রীমায়ের বিশেষ নির্দেশে আশ্রমের শাক-সবজি দিয়ে তৈরি করা হয়; ওটা নিয়মিত খেলে শরীর ভাল থাকে। ডিস্পেন্সারির উঠোন পেরিয়ে বাঁ হাতে ছোট একটা ঘরে [illegible] সবাই বাটিতে ক'রে সুপ খাচ্ছেন দেখলাম। আমরাও ভিড়ে গেলাম তাঁদের দলে, ঘরের এককোণে।

অদূরে একটা ভাঁড়ার মতো। ছোকরা-পানা এক সাহেবকে গিয়ে বড় লোকে কত কিছু বলছে, গোবেচারা ভদ্রলোক মন দিয়ে তা শুনছেন, উঠে গিয়ে তারপরে এটা-সেটা এনে এনে দিচ্ছেন। বৃদ্ধা একজনও কিছু ফরমাস করলেন, সাহেব তা সংগ্রহ করতে করতে বৃদ্ধা নির্ভেজাল বাংলায় ডাক দিলেন, "ওহো, পিয়ার্সন —বলতে ভুলে গেছি, একটু আদাও দিও বাপু।" স্মিত হেসে একটু বাঁকা উচ্চারণে সাহেব ফিরে এসে জিনিস দিতে দিতে জানাল, "আমি ভুলিনি।"

ইনি আমাদের বন্ধু রিচার্ডের বাবা, ন্যাথানিয়েল পিয়ার্সন। পরে বহু মেহনত ক'রে আমাদের ইংরেজি ব্যাকরণের ক্লাস নিয়েছেন। তখনো বোধ হয় অ্যালেন-আনউইন্ থেকে শ্রীঅরবিন্দের উপরে রচিত ওঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।

সুপ খেতে খেতে আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা জটাধারী মধ্য-বয়সী লোক বারবার তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো মেশাচ্ছেন, খুকখুক করে কাসছেন, সোচ্চারে গলা খাঁকারি দিয়ে চমকে চমকে উঠছেন। উঠে চ'লে যাবার আগে সুধীরদাদুর পাশে ব'সে বাবাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন: "কাল এলেন বুঝি? এ তিনটি আপনার খোকা? বউমা ভাল?"

"হ্যাঁ, ভীষ্মদা।" বাবা জবাব দিলেন। "আসবেন কিন্তু!"

এসেছিলেন ভীষ্মদা—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তারিয়ে তারিয়ে কলকাতা থেকে আনা মিষ্টি খেলেন। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে চমকে উঠছিলেন। আবার স্বস্থ হয়ে হাসি গল্প করছিলেন।

ক'দিনের মধ্যেই মালুম পড়ল আমাদের বয়সী ছেলেদের মহলে কি দারুণ প্রতিপত্তি ভীষ্মদার। গুলিখেলা ও ক্রিকেটের খবরে ওঁর প্রিয় সাকরেদ ছিল কিটটুস্—আমাদের বন্ধু কিট্টু রেজ্ডি।

আশ্রমের ডাইনিং রুমে ভীষ্মদা তখন কাজ করতেন। কেমন যেন ওঁর ধারণা হয়েছিল যে শ্রীঅরবিন্দ চান না উনি আশ্রমে গান-বাজনা চর্চা করেন; তাই খুসখুস ক'রে কাসতে কাসতে অনবরত উনি দমন করে রাখতেন গানের স্পৃহা।

কিন্তু দু'একদিন ওঁকে বড়ই লজ্জিত হতে দেখেছি। ট্রে-ভরতি থালা-বাসন নিয়ে যেতে যেতে চেতন-মনের শাসন ভুলে হাত চালিয়ে সাপট তান মেরেছেন, গেয়ে উঠেছেন জয়জয়ন্তীতে "ফুলের দিন" থেকে কোনও কলি—ঝনঝন্ ক'রে বাসন গড়িয়ে পড়তেই উনি নতজানু হয়ে, কত যেন অপরাধ করেছেন, এইভাবে সেগুলি কুড়োতে বসেছেন। অন্যান্য সাধক-সাধিকারা এসে হাত লাগিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে: "ও কিছু না, ভীষ্মদা দিন্‌না আমাদের।"

তারপর ক'দিন দেখেছি ভীষ্মদার তূষ্ণীম্ভাব।

৯ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা, এককোঁচড় ফুল কুড়িয়ে আনলেন ভীষ্মদা। বাড়ি এসে বললেন, "বৌমা, আজ বালেশ্বর যুদ্ধের স্মৃতিবার্ষিকী। যতীনদার একটা ছবি আছে?"

ছবিতে ফুল দিয়ে সারা সকাল ভীষ্মদা সুন্দরভাবে সাজালেন। আপন মনে গানও গাইলেন বেশ কিছু। ইতিমধ্যে গান-বাজনায় আমার টান দেখে উনি মাঝে মাঝে বহুবার বাড়ি এসে টুকটুক ক'রে নানা কথার ফাঁকে চেষ্টা করেছেন আমার অনুরাগ বাড়াতে।

খবর পেলাম—শ্রীমা অনুমতি দিয়েছেন, আমরা তাঁর টেনিস খেলা দেখতে যেতে পারি। এবং বড় মাঠেও তিনি যখন যাবেন, আমরা উপস্থিত থাকতে পারি। বেলা তখন প্রায় চারটে।....

হাজির হলাম টেনিস কোর্টে। ঝকঝকে পরিষ্কার পরিপাটি [illegible] বাঁধানো মাঠ—সমুদ্রের ধারেই। পড়ন্ত রোদে কেমন একটা বিশিষ্ট রূপ যেন ধরা পড়ল আমার চোখে।....কালো চকচকে একটা হাম্বার গাড়ি এসে থামল। সাদা রেশমের সালোয়ার কামিজ পরণে, শ্রীমা নামলেন।

দু'চোখ ভ'রে দেখলাম মায়ের ওই নূতন মূর্তি; তাঁর প্রতি পদক্ষেপে মনে হল ফুটে উঠছে এক-একটি সোনার পদ্ম, তার কোরকে কোরকে উপচে পড়ছে অফুরন্ত আনন্দের স্রোত। বারবার চোখ কচলেও মনটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না এমন সময় সহাস্য বদনে শ্রীমা চলে গেলেন আমার পাশ দিয়ে। হাওয়ায় জেগে রইল পিপারমিন্টের মতো স্নিগ্ধতা।

যারা ব্যায়াম ও খেলাধুলো করত, সাধারণত তাদেরই অধিকার ছিল তখন খেলার মাঠে যাবার। বিশেষ অনুমতি নিয়ে অবশ্য কেউ কেউ উপস্থিত থাকতেন।

টেনিস খেলা সেরে শ্রীমা আসতেন প্লে-গ্রাউন্ডে, অর্থাৎ আশ্রমের তদানীন্তন বিদ্যালয়ের চত্বরে (নূতন বিদ্যালয়-ভবনটি হস্তগত হয় ১৯৫২ সালে মাত্র)।

প্লে-গ্রাউন্ডে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সাদা হাফপ্যান্ট-হাফশার্ট পরা আপাদমস্তক হাসি-হাসি গন্ধে ভুরভুর, বেশ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তেজে টইটুম্বুর ছোকরা মানুষটি—এতক্ষণ টেনিস খেলছিলেন যিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে। অল্পবয়সী কটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে কিছু আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, আমায় দেখেই ডাক দিলেন "এসো, ভাই!"....

চড়াক ক'রে চিংড়ি মাছের মতো উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে জিগ্যেস করল "প্রণবদা একটা বেঞ্চ দিই?"

"দেরে ভাই, মনোজ, লক্ষ্মীটি—"

খেলা শেষ হবার আগেই অনেক খাল্‌পুষ্ট একটা সবুজ রং করা চওড়া বেঞ্চি এনে দিয়ে হুকুম জারি করল : "বসো, এখানে।"

একটু বাদেই হুইসিল দিলেন দাদা—প্রণবকুমার ভট্টাচার্য।

দলে দলে সারি দিয়ে দাঁড়াল ছেলে-মেয়ের দল, সংখ্যায় বড় জোর দুশ-আড়াইশ হবে। শ্রীমা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের হাতে একথলি-ভরতি গরমা-গরম খোসা-ছাড়ানো নোনতা বাদামভাজা দিতে লাগলেন। আমার কিন্তু আত্ম-সম্মানে বাধল : "আমি তো খেলাধুলো করিনি—তবে কেন বাদাম নিতে যাই।"

বেঞ্চি ছেড়ে মাঠের উত্তর সীমায় যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীমাকে দর্শন করছি। হঠাৎ হুঁশ হল—মা এগিয়ে আসছেন গট গট ক'রে, ব্যূহ ভেদ ক'রে সরাসরি আমার দিকে। সঙ্গের যুবকটি বাদামের ট্রে হাতে নিয়ে অনবরত ইশারায় ডাকছেন আমায় এগিয়ে যেতে।

তাড়াতাড়ি মায়ের সামনে গিয়ে হাত পাতলাম।

একগাল হেসে মা আমার অঞ্জলি ভ'রে দিলেন তাঁর প্রসাদে এবং নির্দেশ দিলেন—রোজই যেন এসময়ে আসি। এইভাবে মনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিলেন শ্রীমা।

ক'দিন বাদেই ঘটল আর একটা ব্যাপার।

বাদামের পরিবর্তে সেদিন শ্রীমা বিতরণ করছেন পাকা কলা। দূর থেকে কলাগুলির ছাতা-পড়া কালচে কালচে চেহারা দেখে মোটেই চাড় পাচ্ছিলাম না ওমুখো হতে। আমার ঠিক সামনা-সামনি এসে শ্রীমা অবাক ক'রে দিলেন : স্বয়ং তিনি অত্যন্ত বদ্‌খদে-রকম কালো একটি কলা তুলে নিলেন ট্রে থেকে।

শ্রীমা টেনিস খেলছেন

সেটির খোসা ছাড়ালেন সন্তর্পণে। হাসলেন আমার চোখে চোখ রেখে। তারপরে —অবলীলাক্রমে কলাটি তিনি খেয়ে ফেললেন ধীরে ধীরে। সর্বজন-সমক্ষে আর কোনদিন তাঁকে আমি খেতে দেখিনি।

অনুতাপে মাথা আমার নুয়ে পড়ল। মা নিজে হাতে ক'রে যা এনে দিচ্ছেন, তার গুণাগুণ বিচার করেও সংশয় জাগতে পারে আমার মনে?

ভারাক্রান্ত চিত্তে জলভরা চোখে দাঁড়ালাম মায়ের সামনে অপরাধীর মতো। সব ভোলানো দৃষ্টি মেলে প্রসাদ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। সংবিৎ যখন ফিরল, কলাটা খেয়ে তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল রসনা : যেমন মিষ্টি তেমনি অভিনব তার খোশবু। শুনলাম, বিশিষ্ট এই কলাগুলি শ্রীঅরবিন্দের অতি প্রিয়; একটু বেশি পেকে কালচে না হ'লে এর সোয়াদ খোলে না।

মায়ের লীলা-কীর্তনের উদ্দেশ্যে কলম ধরিনি। কিন্তু তাঁর ওই অন্তর্যামী চেতনার হাজার দৃষ্টান্ত থেকে আর একটিমাত্র কাহিনী উদ্ধার করতে লোভ হচ্ছে।

কলকাতা থেকে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের আরো চার-পাঁচটি সতীর্থ সমভিব্যাহারে বাবা তখন পণ্ডিচেরী যাতায়াত করেন। মদন বসু, রাজেন গাঙ্গুলি, অরুণ ও রবি মিত্র, লতা বসু কাভাই। যাবার আগের দিন এঁরা প্রত্যেকে দু'টিন উৎকৃষ্ট পীক-ফ্রীন্‌স বিস্কুট কিনে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যেতেন : কার কাছে যেন খোঁজ পেয়েছিলেন যে ওই বিস্কুটটা শ্রীমায়ের পছন্দ। একটা টিন শ্রীমায়ের কাছে থাকত; অন্য টিন থেকে একটি কণা বিস্কুট ভেঙে শ্রীমা স্বাদ-গ্রহণ করতেন তারপরে ভক্তের হাতে দিতেন প্রসাদ হিসাবে।

একবারে একজন ভক্তের দুর্ভাগ্যক্রমে বাজারে মাত্র একটিনই পীক-ফ্রীন্‌স মিলল; অন্য একটিন প্রায় সমান মেকারের বিস্কুটও নিলেন তিনি অগত্যা। কিন্তু মনের অগোচরে থেকে গেল একটি ইচ্ছা : "আহা মা যদি পীক-ফ্রীন্‌সটাই আমায় দিতেন।"

আশীর্বাদ নিয়ে উঠে যখন দাঁড়ালেন তিনি—হাসতে হাসতে শ্রীমা তাঁর হাতে তুলে দিলেন পীক-ফ্রীন্‌স-এর কৌটোটা।

ভদ্রলোকের চোখ ফেটে ঝরে পড়ল অনর্গল অশ্রুধারা।

সে-যুগে আশ্রমের সর্বত্র টাঙানো থাকত শ্রীঅরবিন্দের বাণী : "সর্বদা এমনভাবে আচরণ কর—যেন শ্রীমা তোমাকে দেখছেন। কারণ, সত্যিই তিনি সর্বদা সমুপস্থিত।"

কোন্ অর্থে শ্রীমা সর্বদা সমুপস্থিত থাকতে পারেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সদা-কৌতুকময় শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন : তোমার জিজ্ঞাসা, শ্রীমা জড়-জগতে বসে দেখতে পান কিনা আজ সকালে লয়েড জর্জ প্রাতরাশে কি খেলেন অথবা রুজভেল্ট্ তাঁর পরিচারকদের প্রসঙ্গে কি বললেন তাঁর গিন্নীকে? মায়ের কি মাথাব্যথা এত সবে? তিনি শুধু খেয়াল রাখেন জাগতিক শক্তিগুলি কিভাবে কাজ চালাচ্ছে কারণ সেগুলির প্রয়োগ করেন তিনি আপন কর্মে। অন্যথায় তিনি জানতে পারেন বই-কি যা যা তাঁর জানা প্রয়োজন—কখনো অন্তর থেকে, কখনো-বা তাঁর মস্তিষ্কগত মন দিয়েও।...

ছেলেবেলায় বড় বিচিত্র লাগত—শ্রীমা আর শ্রীঅরবিন্দের ফটোর দিকে তাকিয়ে : ঘরের ডান দিক থেকে বাঁয়ে সামনে থেকে পিছনে, কোনাকুনিভাবে, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে দেখেছি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সমানেই তাঁরা নজর করছেন। স্বপ্নে, জাগরণে ধ্রুবতারার মতো ওই দৃষ্টি আমাদের সঙ্গে থেকেছে রক্ষা করেছে কতো না প্রতিকূলতা থেকে।

*

দৃষ্টি-প্রসঙ্গে বলি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা।

১৫ই আগস্ট দুপুরবেলা, নতুন জামা-প্যান্ট পরে লাইন অনুসরণ করে উঠলাম গিয়ে আশ্রম ভবনের দোতলায়—নিষিদ্ধ সেই দরজা দিয়ে সিঁড়ির ডান-হাতী পুবের ঘরটায়। সামনের দর্শনার্থীদের ফাঁক দিয়ে এক লহমায় দেখে নিলাম—ডানদিকে বসে আছেন শ্রীঅরবিন্দ, আর বাঁদিকে শ্রীমা, একেবারে আমাদের মুখোমুখি।

মাত্র দু-হাত তফাতে যখন এসে দাঁড়ালাম, মনে হল কর্পূরের মতো জমাট আগুনের মতো গনগনে অথচ হিমালয়ের মতো শীতল দুর্লভ্য একটা সান্নিধ্যে এসে পড়লাম। মোটা মোটা তুলসী মালা সাজানো শ্রীঅরবিন্দের চরণতলে, যার সৌরভে বুক ভরে উঠল।

কিন্তু কেমন যেন অভিভূত বোধ করলাম, সোজা শ্রীঅরবিন্দের দিকে না তাকিয়ে বিহ্বল দুরুদুরু বুকে ফিরে দেখলাম শ্রীমায়ের হাসিতে বরাভয় : তাঁর নজর অনুসরণ করে চোখ রাখলাম শ্রীঅরবিন্দের চোখে—যেন শ্রীমা এইভাবে নীরবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একই বরাভয় দেখলাম শ্রীঅরবিন্দের আননে। ব্যবধান কেটে গেল। মন বলল : ওই চরণতলে যুগ যুগ যেন মাথা রেখে ধন্য হতে পারি।

পরম স্নেহের মধ্যেও নির্লিপ্ত দেখলাম শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে। তার ব্যাখ্যা আজও সম্যক হতে পারেনি আমার ভাষায়।........

*

এত যে বিরাট পরিবর্তন, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ, দেহ-মন-প্রাণে নূতনের এই স্পন্দন—সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, পুরনো অভ্যস্ত দুনিয়াটা ছেড়ে কোন এক রূপকথার রাজ্যে বাস করছি। কোথায় যেন শরীর একটু অনভ্যস্তও বোধ করছিল। নৃপেনদা পরামর্শ দিলেন, একটা দিন নিরিবিলি শুয়ে কাটাতে।

অতএব টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে বাবা গেলেন আশ্রমের ডাইনিং-রুম থেকে ভাত আনতে। সেখানে অন্নদাতা ছিলেন চারু বিশ্বাস। বাবাকে জিগ্যেস করলেন, "খোকার অসুখ-টসুখ হয়নি তো?" নানা কথার পর ভাত দেবার আগে নিয়মানুবর্তী চারুদা চুপি চুপি জানতে চাইলেন "দাদা, কার্ডখানা আছে তো সঙ্গে?"

বামুন যতই চেনা হোক, আশ্রমের অতিথি আপ্যায়ন বিভাগের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সূচাগ্র অন্নও সেদিন কাউকে দিতেন না চারুদা। শৃঙ্খলা-প্রিয় এইসব সাধক-সাধিকার অকপট সেবায় সেদিনের আশ্রমের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংখ্যায় ক-জনই বা ছিলেন সেদিন তাঁরা? পাঁচশ বড় জোর?

*

বন্দরের কাল শেষ হয়ে আসছে। কলকাতা ফেরার লগ্ন সমাগম।

ভাবতেও খারাপ লাগছিল। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি মন থেকে এমন একটা কিছু প্রত্যয় পেয়েছিল, যার জোরে কলকাতা ছাড়ার আগেই সে বন্ধু-বান্ধবকে বলে এসেছিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় : "আমার দাদারা ফিরলেও আমি আর আসছি না।" শুনে বাড়িতে নালিশও করেছিলাম আমরা এবং মিথ্যা ভাষণের সুবাদে বকুনিও কম খায়নি টোপো।

এখন বার বার মনে জাগছে আহা, ফিরে যদি যেতে না হত!

এমন নয় যে কলকাতায় আমরা আনন্দে থাকিনি বা কলকাতাকে ভালবাসতাম না। যে বন্ধুদের সঙ্গে মানুষ হয়েছি আশৈশব, আত্মীয়-পরিজন যাঁদের

স্নেহ-মমতায় বড় হয়েছি, অত উঠ করে কোন [illegible] পরিবেশে যেতে গেলাম ? পরিণত বয়সে এটা [illegible] বই-কি।

যুদ্ধের মাত্র ক-বছর আগে আমরা যারা [illegible] রসাতলগা সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সুধা পান করেছি আমরা [illegible] কিন্তু সেই সঙ্গে নীলকণ্ঠ হইনি কি তাঁর মানসিক উদ্বেগের হলাহলে ?

বালিগঞ্জ প্লেসের ছোট বাড়িটির উঠোনে লক্ষ্মীপাই ও তার আদরখেকো বাছুরটি, ঢাউস খাঁচা-ভরা ময়ূর-তিনটে, বিশ্বস্ত কুকুর [illegible]—এদের যেমনটি রেখে বোমার ভয়ে আমরা মিহিজামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তেমনটি ফিরে না-পাবার দুঃখ ছ-বছরের শিশুর বুকে কিভাবে বাজতে পারে, কল্পনা করি আজ।

ফিরে এসেই কলকাতায় দেখেছি দুর্ভিক্ষ, মহামারী। তার পিঠপিঠ যখন বাধল ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গা, পুবের মাঠ পেরিয়ে ডিহি শ্রীরামপুর লেনের ওপার অবধি বিধ্বংসী মুসলিম লীগের গুণ্ডারা অগ্নিকাণ্ড করেছে সারা রাত, পর পর ক-দিন ক-রাত আকাশ লাল হয়ে উঠেছে—বিভীষিকায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও আশুতোষ লাহিড়ির সঙ্গে জিপে ঘুরে ঘুরে বাবা অস্ত্র জোগাড় করেছেন। পাড়ার ছোকনদা (আদিনাথ সেনের ছেলে) প্রভৃতি দুঃসাহসী যুবকদের সহযোগিতায় ও বণ্ডেল রোডের গয়লাদের কল্যাণে কাজু প্রতিরোধ-বাহিনীর কাজে মেতেছে নাওয়া-খাওয়া ভুলে। এসব কথা আজও মনে পড়ে সুস্পষ্ট।

মনে পড়ে—শ্যামাপ্রসাদ জানতে চাইলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে। "এখন কি কর্তব্য ?" শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত মন্তব্য নিয়ে ফিরে এলেন মধু দাদু (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) : "আজ যদি যতীন মুখুজ্যে থাকতেন, তিনি জানতে চাইতেন না—কি কর্তব্য; তিনি কাজ হাসিল করে এসে খবর দিতেন—দেখুন, অরবিন্দ, কি করতে পেরেছি।"

মনে পড়ে—দাঙ্গার সেই ভয়াল দিনগুলোয়, চোখের সামনে দেখেছি, ভরদুপুরে হুকুমচাঁদ কারখানায় যাবার পথের ওই মাঠে, ডোবার কচুরিপানা ভেদ করে একটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল বার বার ; প্রতিরোধ বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের আমরা সে-খবর দিই ; তারা জল থেকে একটা অর্ধনগ্ন লোককে টেনে তুলে মুসলীম লীগের চর সনাক্ত করে এবং ধোলাই দিতে দিতে উত্তেজনার মাথায় সাঙ্গ করে দেয় তার ভবলীলা!

ছোট ছোট এমনি কত খুঁটিনাটির মধ্যে অনুভব করতাম আমরা যে অতি কাঁচা বয়সে যে শান্তির স্বাদে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা, সেই সময়, সেই দিন-গুলো আর ফিরে পাব না কলকাতায়! কাঁচা মনের আয়নায় অবর্ণনীয় একটা দুঃখের বাষ্প জমা হচ্ছিল : সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ কথাটা পাকামোর মতো শোনালেও কল্পনাপ্রসূত নয়। ইংরেজি-বাংলা, সবই আমরা শিখেছিলাম বড়দির কাছে : ইনি ছিলেন বাবার পিসীমা, স্বনামধন্য বিনোদবালা দেবী। বিপ্লবী দলের ছোট-বড় সবারই তিনি ছিলেন দিদি। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে নামী অল্পনামী কত লোক আসতেন বাড়িতে : তাঁর প্রায় সমবয়সী ছোট মামা ললিত চাটুজ্যে (শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী-জীবনের বন্ধু) আসতেন মেয়ে-জামাই (তারা-দিদি ও রমাপ্রসাদ মুখার্জী) সমেত ; আসতেন হরিপদ চাটুজ্যে, হুমায়ুন কবির, সরোজিনী ঘোষ, সুরেশ মজুমদার (পরাণ), অতুল ঘোষ, যাদুগোপাল মুখুজ্যে, হেমন্ত সরকার, নিখিল রায় মৌলিক (ভবানন্দ গিরি), সত্যেন মজুমদার, মাখন সেন প্রভৃতি আরও কত গুণমুগ্ধ আত্মীয় ও বন্ধু।

বড়দির কাছে পড়তে বসে একদিন জানতে চাইলাম, "জাজিভিটি মানে কি ?" কপাল চাপড়ে জবাব দিলেন, "আমায় দেখেও বুঝিসনে ? ওটার মানে দীর্ঘায়ু।" দিন-বদলের অমোঘ ছন্দের সঙ্গে বড়দির দরাজ দিল যেন আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। অসুখে পড়লেন। শার্দুলজয়ী বীর ভাইটির যোগ্য দিদি ছিলেন যিনি—দেখতে দেখতে কেমন যেন অসহায় শয্যাশ্রয়ী হয়ে পড়লেন ; আত্মীয়-স্বজন পরিবৃতা বড়দি তারপরে ইহলোক যেদিন ত্যাগ করলেন, বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটার অনেকখানি আলো যেন নিবে গেল।

এতসব কারণই হয়তো জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের বিমুখ করে তুলেছিল কলকাতা ফিরে যেতে। শলা-পরামর্শ করে তিন ভাই শরণ নিলাম শ্রীমায়ের : "আমরা এখানে থেকে যেতে চাই, মা।"

"তোমাদের বাবা-মা জানেন কথাটা ?"

মনে মনে প্রমাদ গণলাম "এই রে!" এবং স্বীকার করলাম যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তাঁদের তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছায়।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে শ্রীমা আশ্বাস দিলেন, "বেশ, আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবেখন।"

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আমার মায়ের হাতদুটো ধরে শ্রীমা সন্তর্পণে প্রস্তাব করলেন : "ছেলে তিনটে তো থাকতে চায়। ওদের দেখা-শোনার জন্য কি তোমারও থাকা সম্ভব হবে এখানে ?"

বাবা-মায়ের একান্ত স্বপ্ন ছিল, অপোগণ্ড তিনটি মানুষ হলে শেষ জীবনে এসে তাঁরা পণ্ডিচেরীতে বসবাস করবেন। সেই স্বপ্ন যে এমন শীঘ্র ও অপ্রত্যাশিতভাবে বাস্তব হবে, ভাবতেও পারেননি তাঁরা। সেই যে সেদিন শ্রীমায়ের চরণে আমাদের সঁপে দিলেন তাঁরা আর কোনদিন আপন সন্তান বলে কোনও দাবী তাঁরা করেননি আমাদের কাছে ; ভাল যদি কিছু দেখেছেন, সুখী হয়েছেন ; দুঃখ পেয়েছেন বিপরীত ক্ষেত্রে। আমাদের কাউকে কখনো ভর্ৎসনার প্রয়োজন হলে শ্রীমাকে বলতে শুনেছি : "তুমি না শ্রীঅরবিন্দের সন্তান ? তোমার কি শোভা পায় এমন কাজ ?"

বাবা-মায়ের সঙ্গে শুরু হল নতুন একটা সম্পর্ক। [ক্রমশ]

[আলোকচিত্র : শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে]

শংকর

॥ ১৩ ॥

মিস্টার ভরত সিং-এর অমূল্য উপদেশ আমার সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। একই সঙ্গে এতগুলো ফ্ল্যাট মহামুক্ত করার সুযোগ নাকি খুব কম ভাগ্যবানের জীবনেই এসে থাকে।

ভরত সিং আরও বলেছিলেন, "মিস্টার শংকর, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তাই এই স্পেশাল ফর্মুলা দিলাম। বহু সাধনা করে এইসব ওষুধ আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। টম-ডিক-হ্যারিকে এই জ্ঞান আমি কিছুতেই দিতাম না।"

কী জানি? ভরত সিংজী যে কেন আমার ওপর এত সদয় হলেন, তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু তিনি যে সত্যিই আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে এসব বুদ্ধি দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

ভরত সিংজী বলেছিলেন, "মিস্টার শংকর, আমি তো সামান্য গেটকীপার থেকে এই বরুণা প্রপার্টিজের রেসিডেন্ট ডিরেকটর হয়েছি। আপনিও একদিন আমার মত উন্নতি করতে পারেন যদি চোখ কান খোলা রাখেন, যদি দেওয়ালের ওপর ভবিষ্যতের লেখাগুলো পড়তে পারেন।"

ভরত সিংজী এবার সস্নেহে পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, "মিস্টার শংকর, জমিজমা বাড়িঘরদোরের এই রিয়েল এসটেট বিজনেস শেয়ার মার্কেট এবং ঘোড়ার রেসিং-এর থেকেও 'একসাইটিং'—ইফ ওনলি এই ব্যবসার রহস্যটা একবার বুঝতে পারো।"

ভরত সিংজী চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। কী ভেবে তিনি আবার বসে পড়লেন। বললেন, "সাধারণ লোকের ধারণা, কেবল জুট, গানি এবং শেয়ারের ফাটকাতেই কলকাতার স্পেকুলেটররা অঢেল পয়সা করেছে। তুমি জেনে রাখো, এর থেকে কম পয়সা করেনি কলকাতার জমিজমার ফাটকাবাজরা।"

"জমিজমা-বাড়িঘরদোরে আর একটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। জমি ইজ গডেস লছমি। পাটের দাম আচমকা ধসে গিয়ে স্পেকুলেটরকে ডোবাতে পারে—কিন্তু ক্যালকাটার গডেস কালী এমনই পাওয়ারফুল যে এ শহরের আশেপাশে জমির দাম সেই জোব চার্ণকের সময় থেকে শুধু বেড়েই চলেছে।"

আমি মন দিয়ে ভরত সিংজীর কথা নীরবে শুনে যাচ্ছি। ভরত সিংজী বললেন, "ভাবনানি ম্যানসনের পাশে সেকালের সায়েববাড়িগুলো যখন একের পর এক সুরজলাল নাগরচাঁদকে কিনিয়ে দিয়েছিলাম, তখন অনেকেই আমাকে বদ্ধপাগল ভেবেছিল। কেউ কেউ বলেছিল, বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে আমি সুরজলাল নাগরচাঁদকে পথে বসাচ্ছি। সুরজ-লালজী তখন শেয়ার এবং জুটের ফাটকা থেকে টু পাইস কামিয়ে অন্য কোনো ভদ্রলাইনে সরে আসবার সুযোগ খুঁজছেন। জহুরী লোক ও'রা—আমার মতলব নিয়ে নিলেন। বললেন, একের পর এক বাড়ি কিনে যাও।"

নিজের কৃতিত্বে গর্বিত ভরত সিংজী বললেন, "তোমাকে যখন সব খবরই দিচ্ছি তখন আরও একটা সিক্রেট শুনে রাখো। জমিজমা সম্পত্তি কেনবার সময় কখনও দু'চার পয়সার জন্যে টানাটানি করতে নেই। আমাদের বরুণা প্রপার্টিজের পলিসি হলো বাজার দর থেকে একটু বেশী প্রাইসে প্রপার্টি কেনা। যার দাম একশ টাকা তাকে একশ এক টাকা দাও।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন ভরত সিংজী। "ভাবছেন, আমরা টাকা নষ্ট করছি এইভাবে? মোটেই না। জাস্ট দ্য অপোজিট। আমাদের এমন সুনাম হয়েছে যে, লোকে প্রথমে এসে আমাদের কাছেই সম্পত্তি অফার করে। দরাদরি করে লেখু তেতো করলে কী হয় তার সুন্দর একটা উদাহরণ শুনবে?"

ভরত সিংজী বললেন, ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানির নাম শুনেছো? বহুদিনের পুরোনো সায়েব কোম্পানি। সায়েবদের নবাবীতে বিজনেসের যে অবস্থাই হোক, কোম্পানির বিলডিং এবং ল্যান্ডেড প্রপার্টি অনেক ছিল। সায়েবরা ওই কোম্পানিকে প্রথমে গোয়েঙ্কাদের কাছে অফার করেছিলেন। কুড়ি লক্ষ টাকা হলেই অমন কোম্পানি হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে। কিন্তু গোয়েঙ্কাজীর সেই পুরনো স্বভাব—দরদস্তুর না করলে ওর ভাত হজম হয় না। বুড়ো হরিদাস গোয়েঙ্কা বললেন—নাইনটিন লাখ। অপ্রস্তুত সায়েবরা বললেন, কালকে ফাইনাল বলবো।"

"ভিতর থেকে সিক্রেট খবর পেয়ে আমাদের নাগর-চাঁদজী সেই রাত্রেই ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানির মিডলটন সায়েবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, সায়েব আমি দরাদরির ওই মেছোবাজার মেন্টালিটি নিয়ে তোমার কাছে আসিনি। আমি তোমাকে সাড়ে কুড়ি লাখ টাকার অফার দিলাম। মিডলটন সায়েব খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা দিয়ে দিলেন। পরের দিন খবর পেয়ে হরিদাস গোয়েঙ্কা টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে সায়েবের কাছে চলে এলেন। মিডলটন সায়েবকে বললেন, 'তোমাকে আমি টোয়েন্টিওয়ান লাখ অফার করছি।' কিন্তু মিডলটন সায়েব বাচ্চা। সোজা গোয়েঙ্কাকে বলে দিলেন, তুমি বড্ড দেরিতে এসে পড়েছো মিস্টার গোয়েঙ্কা। সুরজলাল নাগরচাঁদের সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গিয়েছে।"

একগাল হেসে ভরত সিংজী বললেন, "তখন হরি গোয়েঙ্কার যা অবস্থা! দেখলে আপনার চোখে জল এসে যাবে! হরি গোয়েঙ্কা সায়েবের হাত ধরে বলেছেন, আমি গডের নামে শপথ করছি, আর কখনও দরদস্তুর করবো না, আমাকে ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানি কিনতে দাও। এই কোম্পানি না পেলে আমার বুক ফেটে যাবে। কিন্তু সায়েব বাচ্চা অত সহজে ভোলবার পাত্র নয়। সোজা বলে দিল, তুমি বরং সুরজলাল নাগরচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করো—ও'রা হয়তো তোমাকে ফেট্‌লওয়েল কুলেন আবার বিক্রি করতে পারেন।"

ভরত সিংজী জানালেন, লজ্জার মাথা খেয়ে বুড়ো হরিদাস গোয়েঙ্কা তখন ভরত সিংজীর মাধ্যমে নাগর-চাঁদজীর কাছে আবেদন করেছিলেন ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানি না কিনতে পারলে তাঁর নাকি ফ্যামিলিতে প্রেস্টিজ থাকবে না। আদরের ছোট নাতিকে জন্মদি... একটা বিলিতী কোম্পানি উপহার দেবেন ব... তিনি নাকি নাতবউকে চিঠি লিখে বসে আছেন।

নাগরচাঁদজী তো প্রথমে বুড়ো গোয়েঙ্কাকে এড়াবার জন্যে সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুরে বেরিয়ে গেলেন, ফিরলেন পনেরো দিন পরে। আদরের নাতির বার্থডে এগিয়ে আসছে দেখে অধৈর্য হরিদাস গোয়েঙ্কা ইতিমধ্যে কুড়ি লাখ টাকার কোম্পানির জন্যে তিরিশ লাখ টাকা অফার করলেন। কিন্তু সুরজলাল নাগরচাঁদ কোম্পানির মালিকরা নরম হলেন না। এই ভরত সিংই শেষ পর্যন্ত হরি গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এলেন, তাঁরা খুব দুঃখিত, কিন্তু এখন কিছুই করবার নেই। কারণ নাগরচাঁদজীর ফ্যামিলি অ্যাসট্রোলজার কোষ্ঠি বিচার করে এখন কেবল কিনতেই পরামর্শ দিয়েছেন, বেচলে কোষ্ঠির ফল খুব খারাপ হবে। হরি গোয়েঙ্কাজী বরং এর থেকেও ভাল কোনো বিলিতী কোম্পানি কিনে নাতির জন্মদিনে উপহার দিন!

ভরত সিংজী এবার হরিদাস গোয়েঙ্কার কল্পিত দুঃখে হাসতে লাগলেন। বললেন, "দু নম্বর উদাহরণ দিই আপনাকে। একটা এগজাম্পলে আপনার পুরোপুরি বিশ্বাস নাও হতে পারে।"

"অমন গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেল। মাত্র ফিফটি থাউজেন্ড রুপিজের দরাদরিতে সুবলপুরের রায়দের হাত থেকে ফসকে গেল। সুবলপুরের ফেমাস রায় ফ্যামিলি—টাকার কুমীর। কিন্তু বুড়ো মিস্টার রায়ের পুরনো হ্যাবিট, পুরো দামে এক কথায় তিনি কোনো সম্পত্তি কিনবেন না। মিস্টার রায়ের ছোট ছেলে অবশ্য প্রাইভেটলি গ্রেট ইন্ডিয়ানের মালিক মিস্টার স্টিভেনকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, 'আপনি বরং গোড়াতেই একটু দাম বাড়িয়ে বলুন, যাতে বাবা কিছুটা দরাদরির স্যাটিসফ্যাকশন পান।' কিন্তু স্টিভেন সায়েবও

...বলে উঠলেন, বিজনেসের প্রাইমারি এই ফিলজফির ওপরেই সমস্ত ব্রিটিশ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আট লাখ টাকার হোটেলের জন্যে সাড়ে আট লাখ চেয়ে, তারপর আমার আট লাখে রফা করা আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।' রায়দের এমনই ব্যাড লাক যে ঠিক ওই সময় সিমলার এক পার্টি এসে এক কথায় আট লাখে রাজী হয়ে গেলেন। ওই পার্টির হাতে পুরো ক্যাশ ছিল না—কিন্তু স্টিভেন সায়েব তাতেও আপত্তি করলেন না। আড়াই মাসের মধ্যে কিস্তিতে টাকা দিতে রাজী হলেন এক কথায়।"

ভরত সিং হেসে বললেন, "সুরজলাল নাগরচাঁদের পলিসিতে যে বোকামি নেই তা এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?"

আমাকে অবশ্যই ও'র সঙ্গে একমত হতে হলো। সব সময় সস্তায় কিনতে চেষ্টা করা যে নিরাপদ নয় তা অবশ্যই বুঝতে পারছি, মিস্টার রায়ের মতো এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা পোস্টাপিসে খাম পোস্টকার্ড কিনতে গিয়েও দরাদরির জন্য উসখুস করেন।

ভরত সিংজী বললেন, "মাথায় একটু বাড়তি বুদ্ধি থাকলেই বিজনেস করা যায়—তার জন্যে ক্যাপিটাল দরকার হয় না। আপনিও ইচ্ছে করলে এই রিয়েল এসটেটের বিজনেসে ঢুকে পড়তে পারেন।"

আমার কাছে একপ টাকাও নেই, আমি আবার কীভাবে বিজনেসে নামবো?

ভরত সিংজী প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "যাঁরা এই কলকাতায় এখন কোটি কোটি টাকার বিজনেস করছেন তাঁরা ক' পয়সা সঙ্গে নিয়ে এই শহরে এসেছিলেন? সুরজলালজীর বাবা তো এক টাকা দশ আনা পকেটে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নেমেছিলেন। এই যে আমি। নিজের অ্যাকাউন্টে একখানা ছোট ম্যানসনের মালিক হয়েছি, আমার ক্যাশ কী ছিল।"

ভরত সিংজী যে এতখানি গুছিয়েছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। ভরত সিং আমাকে ভরসা দেবার জন্যে ব্যাখ্যা করলেন, "দেখুন, বড় বড় শহরে ক্যাপিটালের অভাব নেই—লাখ লাখ টাকা খাটাবার জন্যে হাজার হাজার কুঁড়ে এবং বোকা লোক রেডি হয়ে বসে আছে। যা অভাব তা হলো বিজনেস আইডিয়ার। ঠিক মতো বুদ্ধি বার করতে পারলে, বিজনেসের পয়সা হাওয়া থেকে এসে যায়। বিবেকানন্দ স্বামীই তো বলে গিয়েছেন, পয়সার অভাবে কখনও কোনো বড় কাজ আটকে থাকে না। ছোটবেলায় এক মিটিঙে আমি কথাটা শুনেছিলাম। তারপর এ লাইনে হোল লাইফ কাটিয়ে বুঝেছি, বিবেকানন্দ স্বামী টপ বিজনেসম্যান ছিলেন।"

ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অন্ধকারের ওপরে ভরত সিংজী এবার তাঁর দূরদৃষ্টির আলোকসম্পাত করলেন। বললেন, "কলকাতার ভবিষ্যৎটা রঙীন ছবির মত আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অতীতে ছিল—জমি কেনো। জমি কাউকে ঠকায় না। এর পর এলো জমির ওপর বাড়ি করার পর্ব। তারপর এলো ভাড়া বাড়ানোর যুগ। যেন-তেন-প্রকারেণ বাড়িভাড়া বাড়িয়ে চলো। রেন্ট কনট্রোলের দয়ায় পুরনো বাড়ির ভাড়া বাড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন আবার নতুন যুগ আসছে কলকাতার সায়েব পাড়ায়। ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরে মহেশ্বর—এবার ভাঙার পালা।"

ভরত সিংজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমার কাছে তেমন স্পষ্ট হচ্ছে না। ভরত সিং বোধ হয় তা বুঝতে পারলেন। মৃদু বকুনি লাগিয়ে বললেন, "এতদিন বড় ব্যারিসটারের চেম্বারে কাজ করে আপনার কী লাভ হলো, মিস্টার শংকর? খুব সহজ জিনিসটাও মাথার মধ্যে ঢোকাতে পারছেন না।"

দাঁত বার করে হাসতে লাগলেন মিস্টার ভরত সিং। বললেন, "শুনুন, মিস্টার শংকর—এখন যে ভাঙবে সে জিতবে। যে রাখতে চাইবে সে হেরে যাবে। আপনি তো জানেন, লর্ড শিভা হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল, তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু কেউ পেরে ওঠেন না। এবং শিভাই হচ্ছেন ইনচার্জ অব ডিমলিশন।"

কর্পোরেশনের ডিমলিশন স্কোয়াডের ম্যানেজার হিসেবে নটরাজ শিবকে কল্পনা করতে বেশ কৌতুক বোধ করছি।

কিন্তু ভরত সিংজী মোটেই রসিকতা করছেন না। তিনি গম্ভীরভাবেই তাঁর গোপন সংগ্রহের কয়েকটি মূল্যবান রত্ন আমাকে উপহার দিতে শুরু করলেন।

ভরত সিংজী বললেন, "আরব দেশে মরুভূমির তলায় তেলের খনি আছে। আর আমাদের এই সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় ছোট ছোট জমির ওপর টাকার খনি রয়েছে। বুদ্ধিমানেরা ম্যানেজ করে, এ-পাড়ার একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি থেকে ভাড়াটে বিদায় করো। তারপর উদ্ধার সিং অ্যান্ড কোম্পানিকে খবর দিয়ে ওইসব বাড়ি তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলো। সেইসঙ্গে আর্কিটেক্টকে খবর দাও। দোতলা তিনতলা বাড়ির যুগ শেষ হয়েছে—সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় ওসব বাড়ির দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই। এখন দশতলা, পনেরোতলা, বিশতলা বাড়ির যুগ।"

ভরতসিংজী এবার আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। "কী ভাবছেন, মিস্টার শংকর? যেভাবে কাল-কাটা এগিয়ে চলেছে সেভাবে হিসেব করলে তিন বছরের মধ্যে পাঁচতলা বাড়িও সিক লিস্টে পড়ে যাবে—ডিমলিশন কনট্রাক্টর উদ্ধার সিং-এর তাই তো ধারণা। সে তো অনেক বাড়ি সম্বন্ধে অ্যাডভান্স এস্টিমেট করে রাখছে।"

উদ্ধার সিং লোকটির নাম আমি আগে শুনি নি। কিন্তু ভরত সিং-এর বর্ণনায় মনে হলো, এই লোকটিকে 'পুরনো-বাড়ির কসাই' বলা চলতে পারে।

ভরত সিংজী বললেন, "জমির ওপর পুরনো বাড়ি একবার খালি করতে পারলে আর কোনো চিন্তা নেই। বাড়ি ভাঙার জন্যে উদ্ধার সিংকে এক পয়সাও দিতে হয় না। বরং উদ্ধার সিংই বাড়ির পুরনো ইট, কাঠ, পাথর এবং রাবিশের জন্যে নগদ টাকা গুনে দিয়ে যাবে।"

ভরত সিংজী স্বীকার করলেন, "সব চেয়ে শক্ত

ব্যাপার এই ভাড়াটের 'উকুন' সাফ করা।"

ও ব্যাপারেও ভরত সিংজীর নিজস্ব গবেষণা আছে। ভরত সিংজী বললেন, "ভাড়াটে বিদেয় করবার জন্যে ভগবান যখন দুখানা হাত দিয়েছেন তখন দুটোরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। এক হাত ভাড়াটের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে এবং আর অন্য হাত তার ঘাড়ে ধাক্কা দেবার জন্যে সর্বদা রেডি রাখতে হবে।"

ভরত সিংজী এবার ব্যাখ্যা করলেন, "শুধু ঘাড়-ধাক্কা দেবার যুগ কলকাতা থেকে চলে গিয়েছে, মিস্টার শংকর। মামলার নাম করে উকিল মুহুরীরা শুধু আপনার কাছ থেকে মাসের পর মাস পয়সা নিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি ফল কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তাই আমরা অনেক পয়সাটা উকিলের পিছনে না ঢেলে ভাড়াটের পিছনেই ইনভেস্ট করি। নগদ নারায়ণের দৌলতে অনেক ভাড়াটে সুড় সুড় করে পুরনো বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।"

"এখানেও সুরজলাল নাগরচাঁদের পলিসি খুব ক্লিয়ার—দু পাঁচ হাজার টাকার জন্যে আমরা জল ঘোলা করি না। আজকেই তো ভাবনানি মদনসনের এক ভাড়াটের মালপত্তর আমাদের লরিতে পার্কসার্কাসে পৌঁছে দিয়ে এলাম।"

"এসব সার্ভিস দিতেই হয়," আমাকে উপদেশ দিলেন মিস্টার ভরত সিং। "উঠে যেতে রাজী হলে আমরা গঙ্গাজলে ভাড়াটের পা পর্যন্ত ধুইয়ে দিতে রেডি আছি।"

সুরজলাল নাগরচাঁদের রেসিডেন্ট ডিরেকটর ভরত সিং-এর কর্মজীবনে অভাবনীয় সাফল্যের কারণগুলো এতোদিন পরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভরত সিংজী আজ যেন জ্ঞানের কল্পতরু হয়েছেন। কোনো কিছু গুপ্তবিদ্যা তিনি আমাকে দান করতে দ্বিধা বোধ করছেন না।

ভরত সিংজী বললেন, "মামলা-মোকদ্দমা অথবা ক্যাশ ইনসেনটিভ—এই দুই ওষুধে শতকরা নিরানব্বুই-জন টেনান্টকে বিদায় করা যায়। কিন্তু এক পার্সেন্ট কেস আছে যা মিঠে কড়া কোনো ওষুধেই নরম হতে চায় না। তাদের নিয়েই বড় বড় পার্টিরা বিপদে পড়ে যান। চোখানি প্রপার্টিজের মিস্টার চোখানির তো হার্ট অ্যাটাক হল এক বেয়াড়া ভাড়াটের দাপটে। সেজন্য লাখ রুপেয়া আটকে গেল মিস্টার চোখানির—এদিকে ওই ভাড়াটে লোয়ার কোর্ট থেকে হাইকোর্ট, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছেন। যেদিন সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরুলো এবং ট্রাংক টেলিফোনে খবর এলো যে মিস্টার চোখানির জিত হয় নি, সেইদিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে মিস্টার চোখানি বুকে পেন ফিল করতে লাগলেন।"

"অথচ আমার নাড়ী দেখুন—সব সময় শান্তভাবে রয়েছি, কোনোরকম এক্সাইটমেন্ট নেই," এই বলে ভরত সিং নিজের হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। সহজে যারা আমার মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে জমিজমা বাড়ি ঘরের লাইন যে তাদের জন্যে নয় তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

হাত গুটিয়ে নিয়ে ভরত সিং বললেন, "একটা টেনান্টের জন্যে মিস্টার চোখানির করোনারি অ্যাটাক হলো, অথচ সুরজলাল নাগরচাঁদের ফাইলে ওইরকম এগারোখানা কেস ছিল এক সময়।"

ভরত সিং বললেন, "নাগরচাঁদজীকে জিনিয়াস বলতে পারেন। ওই এগারোটা পার্টির ওপর আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু নাগরচাঁদজী শান্তভাবে আমাকে উপদেশ দিলেন, 'শাস্ত্র বলছে যা সারানো যায় না তা সহ্য করে নিতে হয়। চোখানীরাজী নতুন প্লটে ক'খানা ফ্ল্যাট তুলতেন?' আমি বললাম, 'আশি-খানা। নাগরচাঁদজী উত্তর দিলেন, 'একজনের জন্যে আশিখানা ফ্ল্যাট আটকে গেল। তার থেকে ওই ভাড়াটেকে একখানা নতুন ফ্ল্যাট দিয়ে হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেললেন না কেন? চোখানিরাজী না হয় ভাবতেন যে উনআশিখানা ফ্ল্যাটের স্কীমই নিয়েছেন তিনি।"

ভরত সিং বললেন, "[illegible] চাঁদজীর ওই স্কীমে আমি এগারোটা কেসই [illegible] করে ফেললাম তিন দিনের মধ্যে।"

ভরত সিংজী বললেন, "সে-তুলনায় আপনার কথা ভাবলে আমার হিংসে হচ্ছে, মিস্টার শংকর। আপনার ল্যান্ডলেডি হার্ড লাক সি ইজ এবং হার্ড লাক ইউ আর। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সাত-আটখানা ফ্ল্যাট এবার আপনি খালি করে ফেলতে পারবেন।"

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম ভরত সিং-এর প্রতি। তিনি বললেন, "এ তো সামান্য ব্যাপার। তোমাকেও আমার দরকার হবে মিস্টার শংকর। তখন তুমি নিশ্চয় আমাকে হেল্প করবে।"

"কী দরকার বলুন?" আমি ভরত সিংজীকে মুখ খুলতে অনুরোধ করলাম।

কিন্তু ভরত সিংজী আজ আর বেশী-দূর এগোলেন না। বললেন, "আজ তুমি নিজের কাজে এগিয়ে যাও। ল্যান্ডলেডির কাছে গিয়ে নিজের সম্বন্ধে ক্রেডিট নাও। আমার ব্যাপারে আমি আসবো—খুব শীঘ্র তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

ভরত সিংজী এবার আরও এক স্টেপ এগিয়ে গেলেন। বললেন, "বিনা ক্যাপিটালে বিজনেসের কথা হচ্ছিল না? এই তো আপনার সামনে সুবর্ণ সুযোগ। আটখানা ফ্ল্যাট থেকে মিসেস চাওলাকে বিদায় করে, চারখানা ফ্ল্যাট বেনামে নিজেই ভাড়া নিয়ে নিন আপনি। ওই কখানা ফ্ল্যাটের সেলামির টাকায় একটা ছোটখাট বিজনেস শুরু করে দিন। দেখবেন ক বছরের মধ্যে আপনি নিজেই টাকার ওপর শুয়ে আছেন।"

ভরত সিংজী এবার উঠে পড়লেন। যাবার আগে আমাকে সর্ববিষয়ে সব রকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবং জানালেন তিনি শীঘ্রই আমার কাছে অন্য ব্যাপারে আসবেন।

এই 'অন্য' ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি একলা বসে-বসে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। (ক্রমশ)

সোয়াদ

মিলন মুখোপাধ্যায়

উল্টোদিকে গেলে সুবিধে হয়। ডান ধারের জানালাটা পাওয়া যায়। আরো দু'চারজন দাবীদার থাকে বটে, তবে, তেমন হিমশিম খেতে হয় না। রোজকার কামরায় 'শেয়ালদা' মুখো ডানদিকের জানালা ছটি। তিনটের বাতাস লাগে কল্যাণী যেতে বাকি তিনটে শেয়ালদা। এই তিনটের যে কোনোটা হলেই চলে যায়। সকালে এদিকে রোদ নেই। বাতাস। বৈশাখের বাতাস। একটু গরম। তবু, বাতাস তো বটে। ঘেমো গায়ে লাগলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

জগবন্ধু আজ ডান ধারের জানালা পেলেন না। বঙ্গবাসীতে পড়ে বখাটে দু'টো, পাঁচু আর খরগোশ, সেইসঙ্গে খগেনবাবু—তিনজনে মিলে তিনটে বাতাস এবং ছায়া দখল করে ফেললো। লাফিয়ে উঠে, পাল্লা দিয়েও পারলেন না জগবন্ধু। ব্যাজার মুখে দৌড়ে গিয়ে বাঁ ধারের জানালা ধরলেন। পেছনে আরো আট-দশ জন তো আছেই। পাঁচুর বন্ধুর দিকে কটমট চেয়ে এক পলক ভাবলেন, খরগোশ নাম কি মানুষের হয়? হলেই বা, কেন হয়! খরগোশের মতো দ্রুতগতি বলে? না, সাদা ফুটফুটে এবং বেঁটে গোলগাল বলে! উঁহু, তাহলে তো সাদা শুয়োরও হতে পারতো। শুয়োরের বাচ্চা!

যাকগে, অনেক দিন, প্রায় গোটা চত্তির মাস পার করে দিয়ে আজকে আবার রোদের মুখে বসতে হলো। সিগারেট বিড়ি খাওয়া বারণ আজকাল। কোনো শালাই শোনে না। জগবন্ধুই বা শালা হবেন না কেন? সরকারের শালা! বরাবরই। ভরপেট ভাত, পুঁই চচ্চড়ি, মুসুরির ডাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে প্রথম বসবার পরই একটা বিড়ি না ধরালে কিসসু হজম হয় না। রোদ, পাঁচু অথবা খরগোশের কথা ভুলে আয়েস করে একটা বিড়ি ধরালেন জগবন্ধু। নিয়ম মতো এই বিড়িটি শেষ হতে হতে কল্যাণী এসে যাবে। তারপর, ফিরতি পথের বাতাসে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট ঝিমঝিম ভাতঘুমটুকু।

কল্যাণীতে সব ভরে গেল। বসবার জায়গা নেই। জগবন্ধু আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন।

—"কত্তা, ঠিক হয়ে বসুন—"

পা নামিয়ে, বাঁ পায়ের ওপরে ডান পা তুলে ঝিমোবার জন্যে তৈরী হলেন। জনা কয়েক দাঁড়িয়ে আছে। দুম্ করে নৈহাটি। ওমা, ঘুম ভাঙলো কেন? আসলে, বাতাস লাগলেও, রোদের তাত ঝামেলা করছে। ঘাড়ে, কানের পেছনে চিড়চিড় ঘাম। পাতলা ঝিমুনি। কামরা এখন একেবারে বোঝাই। মানুষ ঝুলছে দরজায়।

—"দাদা, একটু ধরুন না।—"

কালো, রোগা, চোয়াড়ে মুখটির আধখানা জানালার ওপাশে। বাঁ হাতে একটা প্যাকেট গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে ভেতরে। প্রায় জগবন্ধুর মুখের সামনে। ডান হাতে নিশ্চয়ই দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলেছে। হাতে নিয়ে, কোলের ওপর রাখতে রাখতে জগবন্ধু বুঝলেন, প্যাকেট নয়, কৌটো। খবরের কাগজে মোড়া টিফিনের কৌটোই হবে। শাঁখ বাজিয়ে গাড়ি নড়তেই ছোঁড়ার বাঁ-হাতটি জানালার শিক আঁকড়ে ধরলো। চোখ বুজে পেছনে হেলান দিতে দিতে জগবন্ধু, দেখতে পেলেন, ছেলেটি ঝুলতে ঝুলতে শেয়ালদা চললো। মাঝে মধ্যে এই উটকো ঝামেলা ঘাড়ে, মানে, কোলে আসে বাঁ ধারে বসলে। টিফিনের কৌটো, বই, ছাতামাতা, যে কোনো প্যাকেট। শেয়ালদায় গাড়ি ঢোকবার আগেই মালিক ভেতরে সেঁধিয়ে যায় এবং মৃদু হেসে গচ্ছিত মাল ফেরত নিয়ে নেয়। যারা গোটা পথটাই ঝুলে আসে বাতাস পেতে, তারা প্ল্যাটফর্মে পা রেখে বাইরে থেকেই হাত বাড়িয়ে দেয়,

—"দিন, দাদু—"

কেউ চাইছে না। উল্টোডাঙ্গা পুলের ওপর দিয়ে গাড়ির দুলকি চালে ঘটাং ঘট্ ঘট্ শব্দ। নিয়মমাফিক ঘুম ভেঙ্গে গেছে জগবন্ধুর। কোলে, কাগজে-মোড়া টিফিনের কৌটোয় হাত ছুঁইয়ে চোখ মেলে তাকালেন। ঘাড়ে পেছনে জমা ঘাম টের পেলেন। পিঠে, বগলে, কোমরে এবং শরীরের নানান খাঁজে খাঁজে প্যাচপ্যাচ করছে। রুমাল বের করলেন পকেট হাতড়ে। চশমা খুলে কাচ মুছলেন প্রথমে। কপালে, ঘাড়ে রুমাল ঘষতে ঘষতে সোজা হয়ে বসলেন জগবন্ধু। কামরায় চোখ বুলিয়ে দেখলেন। কেউ চাইছে না। ফিরেও দেখছে না কেউ। সীট ছেড়ে দু'একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। চাপ বাড়ছে গেটের দিকে। নামার তাড়া। দৌড়ে গিয়ে বাস ধরো, ট্রাম ধরো অথবা 'ওয়াকিং রেস' শুরু করে দাও। শরীর টানটান তৈরি হচ্ছে সবাই। ভিড়ে পাঁচু, খরগোশ বা খগেনবাবুকে দেখা গেল না। দরজার দিকে এগিয়ে রয়েছে বোধ হয়।

জানালার শিকে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঝুলন্তদের দেখবার চেষ্টা করলেন জগবন্ধু। জীবনে একবার দেখা আবছা রোগা, চোয়াড়ে মুখটা ঝুলছে না। চাইছে না কেউ। হয়তো, ধাক্কায় ধাক্কায় ভিড়ের ওপাশে পৌঁছে গেছে।

দপ্ করে রাগ উঠল মাথায়। শালা, কুড়ি বছরের ওপর হয়ে গেল নিজের টিফিন, টিফিনের কৌটো বইতে হয় না, কোথাকার কোন্ হরিদাস ত্যাঁদোড় ছোঁড়ার টিফিন কোলে করে বসে থাকো! কখন গাড়ি থামবে, উনি দয়া করে কাছাকাছি আসবেন, ওঁর হাতে টিফিনের কৌটো তুলে দিতে হবে।

মনে হতেই, অনেক অনেক পুরোনো দিনের আলু ভাজা, রুটি, মাছের বড়া অথবা শাকসবজিদের গরম গন্ধ মাথার চারপাশে ঝাপসা হয়ে ঘুরতে লাগলো। সে সব মায়ের আমলের সুখশান্তি। একাম চলছে। বিয়াল্লিশের সুধু, সুধা, সুধাময়ী এখন আবার নতুন করে ওসব পারবে, ভাবা যায় না। জীবনে দুটো চাকরি বদল করেছেন জগবন্ধু। তিন নম্বরে বঁড়শি গাঁথা পুঁটি কিংবা বোয়ালের মতো ঘুরে-ফিরে রিটায়ার হতে চললেন। প্রথম চাকরি, সেই 'ঘোষ অ্যাণ্ড কোং'-এর প্রথম দিন থেকেই হাতে টিফিনের কৌটো ছাড়া বেরোতে পারতেন না জগবন্ধু। মা সাত সকালে উঠে উনুন ধরাতেন, রান্না শুরু হয়ে যেতো। অসুখ-বিসুখ, ঝড়ঝাপটা সব কিছু সামলে দুপুরের জন্যেও জলখাবার তৈরি করে দিতেন মা। সকালে ভরপেট খেয়ে, টিফিনের কৌটো বগলে বেরিয়ে পড়তেন জগবন্ধু। প্রথম প্রথম লজ্জা করতো, অস্বস্তি হতো—দুপুরে খিদের সময় কিন্তু খারাপ লাগতো না। মা যতদিন ছিলেন, অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

—"মা, কি দিয়েছো আজ?"

কাবলী জুতোর বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে জগবন্ধু

জিগেস করতেন। রোজকার মতো মিটিমিটি হাসতেন মা,—

—"দুপুরে খুলে দেখিস!"—

ঘোষ অ্যান্ড কোং-এ লুকিয়ে খুলে দেখতেন গোড়ার, লুকিয়ে চুরিয়ে খেয়ে ফেলতেন। দিন কয়েক যেতেই টের পেলেন আপিসের বারো আনা কেরানীই বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে আসে। চুপচাপ নিজের টেবিলে বসে খেয়ে নেয় দু'চারজন। ছোটো ছোটো দলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, গপ্পোসপ্পো করেও খায় অনেকে। বিন্টু নিয়োগী, শচীন ভট্টাচার্যের দল থেকে ডাক এলো একদিন—"কি মশাই, কি আনলেন আজ?"

ভৌমিকবাবু কিছু একটা চিবুতে চিবুতে বললেন,—"চলে আসুন, ভাগাভাগি করে খাই!"

সবে কোটো খুলেছিলেন জগবন্ধু। নতুন চাকরি। কোটোয় শুধু ঢেঁড়স ভাজা, রুটি, কোণের দিকে এক খণ্ড পাটালী গুড়। না-না-না করেও শেষে লজ্জায় লজ্জায় উঠে গিয়েছিলেন। ভাগাভাগি করে বিন্টুর মাছ ভাজার টুকরো, শচীনের পলতা পাতার বড়া; ভৌমিকবাবুর আলুসেদ্ধ—সকলের সঙ্গে জগবন্ধুরও মুখ বদলাবদলি হয়েছিলো। ও'র পাটালিগুড় সেদিন হিট্। কাড়াকাড়ি করে খেয়েছিলো সবাই।

অ্যাতো দিন, অ্যাতো বছর পরে সেই সব কথা ভেসে আসতেই মনটা ভার ভার এবং পরের মুহূর্তেই হাল্‌কা ঠেকলো। সেই মা, মায়ের রান্না করে দেওয়া অজ্ঞাত টিফিন, আপিসে দলের মধ্যে আবিষ্কার, মুখ বদলাবদলি করে একসঙ্গে খাওয়া—এর বউ, ওর পিসীমা, তার মায়ের হাতের এক একদিনের এক এক পদ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎই, এমনি এমনিই, কোলের ওপরে রাখা কাগজে মোড়া কোটোয় হাত বোলালেন জগবন্ধু এবং আবছাই মনে হলো, কী আছে এতে?

—"কি স্যার, বাসায় ফেরত যাবার তাল করছেন নাকি!"

সবাই নেমে গেছে। খালি কামরা। খগেনবাবু ছাতা বগলদাবা করতে করতে বললেন।

সামান্য চমকে, কোটোটা বাঁ হাতে নিলেন জগবন্ধু। ডান হাতের রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কিছু বলবেন ভাবলেন, তার আগেই খগেনবাবু জুড়ে দিলেন,

—"তাও তো যেতে পারবেন না এ গাড়িতে। এটা বোধ হয় বারাসাত হয়ে ফিরবে। —উঠে পড়ুন—"

বলতে বলতে গেটের দিকে এগোলেন।

জগবন্ধুও উঠে দাঁড়িয়েছেন। উল্টো মুখে যাবার জনাকয়েক লোক ছাড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ছে। এ গাড়ি এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে ফিরবে। কিন্তু, মানুষটা গেল কই? নিজের টিফিনের কোটো ভুলে চলে গেল আগেভাগে? আজকালকার ছোঁড়াগুলোর মাথার ঠিক নেই। হয়তো কোনো সোন্দরী মাগী দেখেছে, বেবাক্ ভুলে হাঁটা দিল পেছন পেছন।

গাড়ির ল্যাজে-মুড়োয় শাঁখ বাজলো। গেটের কাছে এসে নামতে নামতে খগেনবাবু পেছনে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে, অর্থাৎ জগবন্ধুকেই বলা, এমনিভাবে বললেন,

—"তাড়াতাড়ি নামুন মশাই! এই সব ইলেকট্রিক ট্রেনের বিশ্বাস নেই। হুশ্ করে ছেড়ে দিলো, তো, ভুশ্ করে পড়ে গেলেন। এই বুড়ো বয়েসে প্ল্যাটফর্মে স্রেফ নির্জলা একটি আছাড় খেলেও—তিন মাস তো বটেই—একেবারে বিছানা নিতে হবে—"

দুজনে নামতে না নামতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো।

খগেনবাবু বললেন,—"দেখলেন তো ছোঁড়াটা কেমন গেল! চেন টেনেও তো হলো কচু—"

—"কে গেল? কোথায়?"

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে দেখতে দেখতেই বললেন জগবন্ধু। ভাবছেন অন্য কথা। কোটোর মালিক হারামজাদা গেল কোথায়?

—"কোথায় মানে?"

দু পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন খগেনবাবু। ঘুরে তাকালেন,

—"বলি, আপনি কি ভাবের জগতে ছিলেন, না, টানা ঘুমিয়েছেন?"

কোটো সমেত বাঁ হাত অটোমেটিক মেশিনের মতো পেছনে চলে গেছে জগবন্ধুর। ডান হাতটিকেও পাঠিয়ে দিলেন। যেন, পেছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। জেনে-চিনে করলেন না। হয়ে গেল।

মুখে একটু লজ্জার ভাব ফুটিয়ে বললেন,—"এই পাতলা তাতঘুমটুকু—"

তারপরেই মুখের ভাব গলার স্বর পাল্টে জিগ্যেস করলেন,—"কেন? কি হলো?"

খগেনবাবু বললেন,—"কি আবার? বা হয়—খড়দার পরে চলন্ত কোনো ছোঁড়ার মাথা লাগলো ইলেকট্রিক পোস্টে—তেমন হইচইও হলো না। —এই গাড়ির স্পীড—কোনো চান্সই নেই, মাথা বলে কথা! আমি তো আর দেখিনি! সবাই বলাবলি করছিলো—জোয়ান ছেলে! কপাল—কপালেই লেগেছে—"

জগবন্ধু স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। কোটোর মালিক কি?

খগেনবাবু বললেন,—"এই ভিড়ে যে যার নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। গেটের লোকগুলো ছাড়া ভেতরের কেউ তো টেরই পায়নি প্রথমে। টের পেয়েও গা নাড়া দেবে কে? গাড়ি থামলেই তো আপিসে বড় সাহেবের দাঁত-খিঁচুনি খেতে হবে! ওরই মধ্যে বোধ হয় দু'একজন চেন টানার চেষ্টা করেছিলো। হয়, জোরে টানেনি, কিংবা, শালা, লেকলাই খারাপ—" বলতে বলতে খগেন-বাবুর যেন হুঁশ হলো, একাই কথা বলছেন। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন। ব্যস্ত গলায় বললেন,—"কই চলুন! যাবেন না? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে—"

জগবন্ধু বললেন, সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে,

—"আপনি এগোন। আমি একটু বসে যাই। মাজায় খিঁচ ধরেছে। বয়েস তো হলো—"

বারাসাত লোকাল হয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

—"আপনি মাজা সামলান, আমি দৌড়োই। দেরি হয়ে গেছে—" বলতে বলতে ছাতা উঁচিয়ে প্রায় দৌড়ই লাগালেন খগেনবাবু।

এই মুহূর্তে জগবন্ধু কি করবেন ঠাহর পাচ্ছেন না। হাতের কোটোটা সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। পুরোনো বাংলা দৈনিকে মোড়া। বিজ্ঞাপনের পাতা। পাত্র চাই, কর্মখালি, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ—। মোটা সুতোয় জড়ানো। গায়ে হালকা টোকা দিতে ঠুকঠুক শব্দ। অ্যালুমিনিয়াম কিংবা স্টিলের কোটো। এটার মালিকের কথাই কি বললেন খগেনবাবু? পড়ে গেছে খড়দায়? শুধু পড়েই যায়নি, অভাবে বললেন, মরেই গেছে নির্ঘাত। গাড়ির ওই দুর্দান্ত স্পীড, পোস্টে-মাথায় লেগে কি হতে পারে ভাবতেই নিজের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। চৌচির ফাটা একটা কপাল এবং মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গল্‌গল্ করে। দমকে দমকে। রক্তে, ঘিলুতে, মাংসে—জগবন্ধুর গা গুলিয়ে উঠলো। ভাবলেন, টিফিনের কোটোটা ছুঁড়ে ফেলে দেন প্ল্যাটফর্মে। দিয়ে, এক নম্বরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, পেচ্ছাব করে ফ্রেশ হয়ে নেন। মড়া ছুঁলে যেমন স্নান করতে হয়, অনেকটা তেমনি। আবার মনে হলো, যদি আদৌ অন্য কোনো ছেলে পড়ে মরে গিয়ে থাকে। কোটোটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কেউ বলে উঠলো,—"দাদু, কি করলেন, আমার টিফিনটা—"

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে এক পলক দেখে নিলেন জগবন্ধু। পেছনে, চারপাশে, দূরে কেউই ও'র দিকে তাকিয়ে নেই। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। ছাড়া ছিটিয়ে কয়েকটা বাস্তুহারা টাইপের ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরের বেঞ্চিতে বুড়ি, ভিখিরির মতো চেহারা, শুয়ে আছে। কালো কোট পরা টিকিট-চেকারদের দেখে পেঙ্গুইনের ছবি মনে পড়ল জগবন্ধুর। গেটের বাইরে খুচরো জটলার দিকে ভাসা চোখে চেয়ে থাকলেন। কয়েক মুহূর্তের এই ফাঁকা ফাঁকা ভাব পরের ট্রেনটা না আসা পর্যন্ত। ওই তো এক নম্বরে ঢুকছে একটা লোকাল। লাদাই ভিড়। ভালোমতন থামতে না থামতেই মানুষের জঙ্গলে বোঝাই হয়ে যাবে স্টেশন। তাও দু-এক মিনিট। অন্যো কাঁটায় ব্যাপটার সাফ হয়ে যাবে আবার।

কিন্তু, জগবন্ধুর আর দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় নেই। দেরি হচ্ছে। হচ্ছে নয়, হয়ে গেছে। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার ভাবলেন, কোনো পেঙ্গুইনের হাতে বেওয়ারিশ কোটোটা জমা দিয়ে চলে

বাস। নিশ্চিন্দি। নিজের কোনো দায়িত্ব আর রইলো না। কিন্তু কোম্বটাই বা এটা নিয়ে করবে কি? হারানো-প্রাপ্তি' ডিপার্টমেন্টে জমা দেবে। ভেতরের খাবারটা, কী আছে কে জানে,—পচে যাবে। কেউ নিতে আসবে না। খড়দায় ঘরে পড়ে থাকা মানুষটা তো আর শেয়ালদায় পৌঁছাবে না কোনোদিন। ভাবতে ভাবতে গেট পেরিয়ে বাস। বাসে ঝুলতে ঝুলতে জানালায় বসা লোকটিকে কৌটোটা ধরতে বললেন জগবন্ধু,

—"ভাই, ধরবেন একটু—"

গোটা পথ সাবধানে ঝুলে এসেছেন। শ'য়ে শ'য়ে ল্যাম্পপোস্ট-লাইটপোস্টগুলো থেকে মাথা বাঁচিয়ে। লালবাজারের মোড়ে নেমে হাঁটা ধরবেন, যেন, ভুলেই গেছেন,

"দাদু, আপনার টিফিন—"

ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন জানালার ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে কৌটোটা এগিয়ে ধরে আছেন। জগবন্ধু একবার ভাবলেন, বলি,

"আমায় বলছেন? আমার তো নয়—"

না বলে, প্যাকেটটি নিলেন। গলা কাঁপিয়ে 'ধন্যবাদ'ও দিয়ে দিলেন একটা।

আপিসবাড়ির লিফ্‌টের লাইনে দাঁড়িয়ে রুমাল বের করলেন পকেট থেকে। ঘামছেন। ভীষণ ঘামছেন জগবন্ধু ভটচায। কপাল মুছে রুমালটায় চোখ পড়তেই এক মুহূর্ত মনে হলো লাল। চোখের ভুল, ঘামে ভিজে কেমন হলদে দেখাচ্ছে। চশমা খুলে কাচ মুছে আবার পরে নিলেন।

লিফ্‌ট নেমে এলো।

—"জগাদা, তুমি চান্স পেয়ে যাবে—"

পেছন ফিরে দেখেন বেন্দা। বৃন্দাবন মল্লিক। আপিসে প্রায় দেড় যুগের বন্ধু। কলিগ। ওরও রিটায়ারের সময় হয়ে এলো বলে। জগবন্ধুর আগে চারজন। পেছনে দুজনের পরে বেন্দা এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁফাচ্ছে এখনো। দৌড়ে এসেছে নিশ্চয়ই। লিফ্‌টে একবারে ছ'জনের বেশি নেয় না। দম নিয়ে বেন্দা যা বলবে, জগবন্ধু জানেন,

—"ধরে রেখো একটু—"

অর্থাৎ, ওর সই হবার আগেই যাতে হাজরি খাতাটা সাহেবের ঘরে ঢুকে না যায়।

এই চারতলা বিশাল দালানে অসংখ্য আপিস। লিফ্‌ট দুটো। মোটামুটি সকলেরই মুখ চেনা। মাথা নেড়ে মৃদু হাসি, বড় জোর "উফ্‌, কি গরম পড়েছে দেখেছেন" এই সব। এক অই বেন্দা। বেন্দার সঙ্গে টিফিনে রাস্তায় নেমে আসেন জগবন্ধু। নিত্য তিরিশ দিন। মানে, যে ক'দিন হাজরে দিতে হয় আপিসে। নেমে এসে, ভেজিটেবল চপ, কচুরি; ছাতাম-থায় খান ফুটে দাঁড়িয়ে। এবং, ইদানীং অম্বল হয় রোজই। কলা, ডিম সেদ্ধ রোজ পোষায় না। দেড়-দু' টাকা বেরিয়ে যায়—পেটটাও শালা খালি পড়ে থাকে। অম্বলও হয় না। তাই, বেশির ভাগ দিনই পুরি কচুরি, ছোলার ডাল—এই সব চলে। বেন্দার শরীরগতিক এখনো ভালো। অম্বলের ধাত নেই। পেটের অসুখে ছুটি নিয়েছে কবে, বলা মুশকিল। অথচ, প্রায় একই বয়সী দুজনে। টিফিনের কৌটোটা পেটের আড়ালে ধরে জগবন্ধু বললেন,

—"আমি পেলে, ধরে রাখবো।"

জগবন্ধুর ডান পাশের টেবিলে বসে কমলা। সুধার চেয়ে বয়েসে ছোটো। চেহারায় ছিরিছাঁদ এখনো ধরে আছে বেশ। ফরসা গোলপানা মুখটুকু। দোহারা গড়ন। কাজেকম্মে কম বয়সী ছুঁড়িগুলোর থেকে চটপটে। ওথলানো পুরু ঠোঁট এবং চোখ, ভুরু ইত্যাদি মিলিয়ে ভালোই লাগে। দোষের মধ্যে দুটি। এক : দোক্তা পান খেয়ে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কালচে দাগ। দুই : এইখান থেকে কমলার চেয়ারে-বসা ভঙ্গিটি দেখতে গেলেই একটু হোঁচট খেতে হয়। কোমরের শাড়ি এবং বুকের নিচে আঁটো ব্লাউজের মাঝামাঝিখানে ধবধবে পেটটা ঝুলে ঝুলে থাকে। হাঁটলে, দাঁড়ালে বোঝাই যায় না। বসে থাকলেই অই চার মাসের পোয়াতি পেটটুকু। গত ছ' বছর ধরে কমলার এই কোম্পানীতে ঢোকার পর থেকেই দেখে আসছেন জগবন্ধু। আজকেই প্রথম হঠাৎ মনে হলো, ওইটুকু আমার নিজের সম্পত্তি। সারা আপিসের কোনো শালা দেখতে পায় না। স্রেফ আমি। জগবন্ধু ভটচাজ।

সাবধানে, খুব গোপনীয় সম্পত্তি অথবা চোরাই মাল লুকিয়ে রাখবার ধরনে বেওয়ারিশ টিফিনের কৌটোটি দেরাজে ঢুকিয়ে বললেন,

—"কেমন আছেন, কমলা দেবী? কাল আসা হলো না যে?"

বলতে বলতে ওর পেট পিছলে চোখ নিয়ে গেলেন গোল ফরসা মুখে।

—"পরশু আলু-কাবলি আর ফুচকা খেলুম না,

ব্যস্‌, পেটটা নরম হয়ে গেল। কাল সারাদিন দাস্ত—"

ভদ্রমহিলার মুখে নিজের পেট খারাপ বা পায়খানার কথা শুনতে কানে কেমন লাগে। অসভ্য-অসভ্য মনে হয়। কমলা কি অসভ্য!

—"কড়া ওষুধ গিলে, আজ ঠিক আছি!"

মহিলা বেশির ভাগ দিনই দুপুরে খায় না কিছু। বলে,—"ডায়েটিং করছি, ভটচাজদা! সকালে তো ভরপেট খেয়েই আসি—"

কোনো কোনোদিন নিজের টেবিলে বসেই কুটকুট করে বিস্কুট খায়। সঙ্গে চা থাকে কিংবা থাকে না। ওর পেটের দিকে একটুও না তাকিয়ে, টেবিলের জাবদা লেজার খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন জগবন্ধু,

—"তা হঠাৎ অমন রাস্তায় খাবার শখ হলো কেন?"

—"ওই তরফদার কোম্পানীর বাণীদির পাল্লায় পড়ে—"

কমলা বললে, সুর পাল্টে,

——"আপনারা যে কি করে অই রাস্তায় ছাঁইভিজাবি খেয়ে হজম করেন—বাবা—!"

—"হজম করতে আর পারি কই, রোজই তো প্রায় অম্বল হয়!"

—"বউদিকে বললেই পারেন, একটু রুটি-তরকারি করে দেবেন—ঘরের খাবার—"

সুধার সারা গায়ে বাত। ব্যথা লেগেই আছে। পাঁচটা ছেলেমেয়ের হ্যাপা সামলে, জগবন্ধুকে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যে রেঁধে খাওয়ায়, এই ঢের। রাত পোয়াতেই একটানা ঘ্যানর-ঘ্যানরের মধ্যেও চোখ-কান বুজে থালা চেটেপুটে খেয়ে নেন জগবন্ধু। খেয়েই দৌড়। মায়ের আমল তো আর নেই! টিফিন বানিয়ে দেবার কথা বললে সুধার কি ধরনের মুখ ছুটবে, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল। দাঁত দেখিয়ে বিকশিত একখানা হাসি দিলেন কমলাকে।

—"আজকে ঘর থেকে টিফিন এনেছি—"

বলতে গিয়েও অম্বলের চোঁয়া ঢেঁকুরের মতো গিলে ফেললেন কথাগুলো। লেজারে মুখ ফিরিয়ে ভাবলেন, কিন্তু, কী আছে কৌটোয়? কী আছে?

*

বেন্দা এসে দাঁড়ালো টেবিলের সামনে। মুখ না তুলেও টের পেলেন জগবন্ধু। এই ভয়ই করছিলেন এতক্ষণ। ঘাড় গুঁজে থাকলেন সামনের খাতাপত্তরে।

—"চলো দাদা, আর কতো?"

জগবন্ধু শুনতে পেলেন না। সুধার সামনে ঠিক এমনি ঘাড় গুঁজে খেতে থাকেন। শুনতে পান না কিছু।

—"বলি, আজ যে জগাদা, কি বল গিয়ে, সেই 'দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য' হয়ে কাজ করে যাচ্ছে—"

কমলার দিকে ফিরে চোখের ইশারা করলো বোধ হয়, তারপর, টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বললে,

—"খিদে-টিদেও কি পাবে না!—"

'পাবে না' কি রে হারামজাদা! জ্বলে যাচ্ছে! সেই বারোটা সাড়ে-বারোটা থেকে পেটে খাণ্ডবদহন চলছে। কী আছে কৌটোয়?

—"কে ? অ ! বেন্দা।—"

মুখ তুলে দেখে নিলেন একবার। কি বলবেন, মনে মনে বাক্য রচনা কম্‌প্লিট্‌।

—"চলো। অমিয়র দোকানে আজকে হিংয়ের কচুরি আর আলুর দম, খোঁজ নিলুম—"

বাক্যটি গুছিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন জগবন্ধু। বললেন, —"না রে বেন্দা, আজ খিদে নেই। অম্বলটা একেবারে গলা-বুকে-পেটে ওঠানামা করছে।"

"খিদের জায়গায় 'অম্বল' শব্দটা মোক্ষম বসিয়ে বুকে হাত বুলোলেন। একটা ঢেঁকুর তোলার চেষ্টা করলেন প্রাণপণ। উঠলো না। মুখ বিকৃত করে আবার বললেন,—"তুই খেয়ে আয় !"

—"সে কি! একেবারে কিচ্ছুটি মুখে দেবে না—"

বেন্দা-শ্বশুরবাড়িতে যেন জগবন্ধু-জামাই একেবারে জামাই ষষ্ঠীর দিন এসেছেন! শালা! গলার কাছে হাত বুলিয়ে জগবন্ধু মাথা নাড়লেন,

—"না ভাই। আজ আর হিম্মৎ নেই।"

বেন্দা তবু ছাড়ে না,

—"হজমি গুলিটুলি নিয়ে আসব নাকি ?"

বন্ধ কোটোর গন্ধ পেল নাকি কে জানে! ওপরের দেরাজটা চেপে ধরে চেয়ারে হেলান দিলেন জগবন্ধু,

—"আনিস্‌ দশ নম্বার !"

"দাও।—"

সামনে হাত পেতে ধরলে বেন্দা। দশ নয়া নিয়ে তবে বিদেয় হলো।

হিন্দুস্থান প্লাস্টিকস্‌, ছোটো করে বলা হয় 'এইচ পি'। আপিসটি ছিমছাম। সায়েব, কেরানী, টাইপিস্ট সব মিলিয়ে জগবন্ধুর সময় ছিল বোধ হয় জনা কুড়ি। তখন ছিল একখানা ঘরে আপিস। এখন তিনটে। মাঝের এই ঘরটিই বড়। তিন সারিতে কেরানী, অ্যাকাউন্টেন্ট, টাইপিস্টরা বসে। জগবন্ধু সিনিয়ার লোক। কোণের বাঁ দিকে জানালা ঘেঁষে টেবিল। উল্টো দিকের সারিতে ছেলে ছোকরাদের দুটি দল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাগাভাগি এবং হাস্যহাসি করে ঘরে বানানো টিফিন খাচ্ছে। এ পাশে উইই কোণের দিকে মিলেন্‌ গাঙ্গুলী, টাইপিস্ট শোভনা এবং ছায়া বার বার কোটো থেকে চিবোচ্ছে, কথা বলছে কলকলিয়ে। কমলার টেবিলে বিস্কুটের প্যাকেট। মুখোমুখি বসে তরফদার কোংয়ের বাণী সরকার। বাকি সবাই বেরিয়ে গেছে বাইরে, নিচে। দোকানে, ফুটপাথে।

ছেলেছোকরাদের খাওয়া শেষ হলো। যে যার নিজের কোটো গুছিয়ে বাথরুমে হাত ধুতে গেল। এর পরেই নিচে রাস্তায় নেমে যাবে পান-সিগারেট খেতে। ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন বেওয়ারিশ কোটোর মালিকের চেহারা দেখতে পেলেন জগবন্ধু। ওদেরই বয়সী। কালচে, রোগা হতভাগা মুখ ছিল না ? 'খুড়োর, অব্বুক গো'। খিদের টান ধরেছে পেটে। মিনিটে মিনিটে পিত্তি পড়ছে, টের পেলেন জগবন্ধু। দু দুটো বিড়ি টানতে হলো খালি পেটে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ঝক্‌ঝকে সাদা টালির মেঝে। সিনিয়ারদের এই বাথরুমে তিনটে পেচ্ছাব, দুটো পায়খানা। একটা দিশী, অন্যটা কমোড।

বেসিনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জগবন্ধু দেখলেন, কপালে ঘাম দিয়েছে। ফাঁকা বাথরুমে খুব ভালো করে লিকুইড্‌ সাবানে হাতমুখ ধুলেন। রুমাল দিয়ে মুছলেন এবং পায়খানায় ঢুকে পড়লেন। তক্‌তক্‌ করছে কমোড। কালো ঢাকনাটা তোলা। হালকা ফিনাইলের গন্ধ। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ফ্লাশ টেনে দিলেন। ছোটবেলায় ইস্কুল পালাবার সময় যেমন বইখাতা জামার তলায় কোমরে গুঁজে রাখতেন, অথবা, কলেজে বন্ধুদের কাছ থেকে 'প্রভাত প্রস্তাব', 'এই ছিল তোর মনের মতো পর্নো-বই চেয়ে নিয়ে পেটের কাছে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে লুকিয়ে বাথরুমে চলে যেতেন, ঠিক সেই রকম, আজ অনেক, অনেককাল পরে, ভুঁড়ির গায়ে ধুতিতে আটকানো টিফিনের কোটোটা টেনে বের করলেন। হাত কি একটু একটু কাঁপছে ? বড়ো খিদে! কী আছে ভেতরে ? কতো-ও-ও দি-ই-ই-ন ঘরের রান্না টিফিন খাই না! ভাবতে ভাবতে, সুতোর বেড়া খবরের কাগজ খুলে দলা পাকিয়ে কমোডে ফেলে দিলেন। ফ্লাশ টানতেই কাগজের গোল্লাটা জলের হুল্লোড়ে একটু নাচানাচি করে তলিয়ে গেল। পরিষ্কার।

কালো ঢাকনা নামিয়ে, জুত করে বসে পড়লেন জগবন্ধু। অ্যালুমিনিয়ামের কোটোটা দেখলে প্রাণ জুড়োয়। চ্যাপ্টা, চৌকো, অনেকটা মাঝারি ডিক্‌শনারীর সাইজ। চারপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। নাম-টামও নেই। বেনামী কোটোর ঢাকনা খুলতে ভুরভুর গন্ধ। ইলিশ মাছের পেটি। কড়া করে ভাজা। পাশে পেঁপের তরকারি। একটু মুখে দিতেই, আহা! কে রেঁধেছে রে ছোঁড়া ? কে রাঁধলো ? মা, মাসি, বউদি, না তোর বউ ? চারটে ভাঁজ করা হাতরুটি। নরম একেবারে। নিশ্চয়ই মাখন কিংবা ঘি মাখানো। গন্ধ শুঁকে দেখলেন জগবন্ধু। খাঁটি গাওয়া ঘি! ঠাসা টিফিন। কোণে চেপেচুপে দলা পাকানো খানিকটা ছানা। চিনি দেওয়া।

কাঁটা বেছে বেছে, তারিয়ে তারিয়ে ভাজা ইলিশের সোয়াদ নিলেন জগবন্ধু। চেটেপুটে ছানাটুকু খেয়ে ঢেঁকুর তুললেন। উঠে দাঁড়ালেন ধীরে সুস্থে। কমোডের ঢাকনা তুলে মাছের কাঁটা ফেলে দিলেন। ফ্লাশ টানতেই দিব্যি সব সাফ! কিন্তু কোটোটা তো আর ও রাস্তায় যাবে না। সুতরাং, গুছিয়ে খুব যত্নে মুছে বন্ধ করলেন। কমোডের পেছনে, নিচে এক ফালি জায়গায় রেখে দিলেন ওটা। যেন, মেথরদের কাউকে দান করা গেল। তিনটে মেথর কোম্পানীর। যে আগে পাবে, তার। বেসিনে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এইবার একটা বিড়ি ধরাবেন।

বাথরুমের ছিটকিনিতে হাত রাখলেন জগবন্ধু। ভরা পেটে আর একটা ঢেকুর উঠে আসছিল, হঠাৎ মনে হলো, কালো, রোগা চেহারার ছেলেটা দরোজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কপাল, মাথা ফাটা। রক্ত, ঘিলু মাখামাখি হয়ে গড়িয়ে পড়ছে,

—"দাদু, কি করলেন, আমার টিফিনটা ?"

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

রোববারের এ হেন কাগজে ঠিক প্যানের সাইজে প্যানের মতোই গ্লাসি পেপারে নানা রংয়ের নানা রকম ছবিসম্বলিত দুটি সাপ্লিমেন্টারি আসতো। সে বই দুটি চমৎকার। ফ্ল্যাটে ছোটখাট বোলা থেকে জাপানী প্রথায় ধান চাষ মৎস চাষ রান্নার রেসিপি, এখানে-ওখানে-সেখানে কোণে ঘুপচিতে ব্যাঙের ছাতা তৈরির নিয়ম সব থাকতো। এবং সেগুলো শুধু কথার কথা নয়, লেখার জন্য লেখা নয়। দেখে দেখে পড়ে পড়ে অন্ধের মতো এগিয়ে গেলেই হলো, ছোটখাট রান্না যেমন সব কিছুই ঠিক ছবির মতো হয়ে যেতো। আমি কৌতূহলবশত বসে বসে অনেক কিছুই করতাম। ঐ ছবি দুটির জন্য আমার অদম্য আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিলো। কিন্তু শুধু ঐ বই দুটিই, কাগজের স্তূপে আর কিছুতেই নজর দিতাম না। বিদেশী খবরে আমার উৎসাহ কম ছিলো। কয়েকখানা সাপ্লিমেনটারি আমি দেশেও নিয়ে এসেছিলাম, মনে হয়েছিলো একটুখানি জমি পেলে জাপানী প্রথায় ধান চাষটা একবার দেখবো। সেটি হয়নি। উৎসাহের অভাবে নয়, স্থানাভাবেই সম্ভব হলো না। কিন্তু আট বাই পাঁচ একটি চৌবাচ্চা করতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। তাতে জল ভরে, তলায় কাদা মাটি বালি ঘাস দিয়ে চমৎকার তেলাপিয়া মাছের চাষ হয়েছিলো।

মাত্র পাঁচটি মাছ এনে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তা থেকে কতো অসংখ্য পাঁচ যে হলো তা আর গুণে উঠতে পারিনি। একদিন সত্যেন বসু (বৈজ্ঞানিক) এসে বললেন, 'ও কি করেছিস রে, মাছ তুলিসনি কেন? না তুললে বড়ো হবে কী করে?'

আসলে নিয়ম হলো সংখ্যা বাড়লেই তুলে ফেলতে হয়, নইলে স্থানাভাবে খেলতে পারে না, বাড়তে পারে না। কিন্তু আমি কী করে তুলি? তুলে ওদের কী করবো, কোথায় রাখবো? খেতে তো পারি না?

শুনে সত্যেনদা বললেন, 'কেন খেতে পারবি না, তবে করেছিস কেন?'

কী মুশকিল। পোষা মাছ কেউ খায়?

শেষে না তুলে তুলে ওরা সাংঘাতিক বেড়ে গেল, ভরে গেল চৌবাচ্চা। কী সুন্দর যে লাগতো দেখতে! দুপুরে কোথায় ডুবে থাকতো, কিন্তু সকালে রোদ ওঠার আগে আর বিকেলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সব উঠে আসতো উপরে। আমি নেশার মতো বসে বসে দেখতাম, কেউ এলেই তার ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রতি লক্ষ না রেখে দেখাতে নিয়ে যেতাম। তারপর এক সকালে তারা সবাই একসঙ্গে মরে গেল। বাড়িতে মশার ওষুধ ছিটিয়ে গিয়েছিলো কর্পোরেশনের লোক, ভিতরে ঢুকে চারপাশের নর্দমায়ও ছিটিয়েছিলো, সেই পিচকিরির ওষুধ ছিটকে গিয়ে পড়েছিলো আকাশের তলাকার ঐ চৌবাচ্চার জলে, সঙ্গে সঙ্গে মরে ভেসে উঠলো সব।

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর ঐ সাপ্লিমেন্টারি দুটি ছাড়া শুধু আমি যে আর কোনো পৃষ্ঠাই উল্টোতাম না তা নয়। বুদ্ধদেবও ঘাড়ে করে এনে প্রথম পৃষ্ঠার হেডিং গুলো দেখেই অভ্যাস রক্ষা করে স্নান করতে যেতেন। একদিন সকালে হঠাৎ সূচিপত্রটি নজরে পড়লো। খবরের কাগজে যে আবার সূচি থাকে এ আমি কল্পনাও করিনি। পরম কৌতূহলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চোখকে পরিভ্রমণ করাতে করাতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলাম। তারপরেই পৃষ্ঠার নম্বর দেখে পাতা উল্টোলাম। তারপরেই চোখের সামনে জ্যোতির্ময়রূপে প্রায় একশো বাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে বিহ্বল। যে রাস্তায় চাও, যেমন চাও, যা চাও, সব আছে। ফোন নম্বরও আছে সব বাড়ির। অতএব খবর নিতে অসুবিধে কী? অসুবিধে শুধু এই যে বুদ্ধদেবকে কখন কীভাবে রাজী করাই।

সাধারণত স্নান করে এসে সকালের চায়ে চুমুক দিলেই তাঁর মেজাজ খুলে যায়। কাজে যাবার বা বসবার আগে ঐ তাঁর বিনোদন। সেই সময়েই ঝপ্ করে ডুব দিলাম জলে, 'এসো, বাড়ি বদলাই।'

বুদ্ধদেব সহজভাবেই বললেন, 'পাবো কোথায়?'

'পেলেও কি বদলাবে?'

'বোধ হয়।' একটু হাসলেন, 'এই তিমির গর্তে বসবাস সত্যি অসহ্য।'

আমি যোগ করলাম, 'আর কী সুন্দর বসন্ত বাইরে। চলো না আজ দুপুরে বেরিয়ে কয়েকটা বাড়ি দেখে আসি।'

অভ্যাস মতো হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলো না—সত্যি—',

আমার তূণে তো বাণ আছে সুতরাং ঘাবড়ালাম না। ধীরে অস্তে বললাম, 'টেলিফোন করে দেখতে পারো।'

'কাকে?'

'বাড়িওলাদের।'

'বাড়িওলারা সবাই এসে তোমাকে বুঝি টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তুমিই করো না।'

'করতাম। কিন্তু মুশকিল এই টেলিফোনে ওদের কথা আমি বুঝবো না, ওরাও আমার কথা বুঝবে না।'

'ঠিক আছে দাও নম্বর, আমি করি।'

'করো।' গোটা পাঁচেক নম্বর পেতে দিলাম চোখের তলায়, 'সব আমাদের এই অঞ্চলেরই কাছাকাছি। উত্তরে দক্ষিণে যেখানে চাও করো।'

ভুরু কুঁচকে গেল। বলাই বাহুল্য, মনটাও নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললেন, 'এ সব আবার কোথা থেকে সংগ্রহ করেছো?'

'রোজ তো খবরের কাগজ পড়ো, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দ্যাখো না?'

'ও, এখানে এসেও বুঝি ওটাই তোমার পড়বার একমাত্র বিষয়?'

'আর কি। তোমাকে তো এই তিমির গর্ত থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'আমার জন্যই?'

বুঝতে পারছিলাম রাগ হয়ে যাচ্ছে এই বদলাবদলির সংবাদে। আমি গরমের চেয়ে ঠাণ্ডা লড়াইতে বেশী বিশ্বাসী। সুতরাং, বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম না, রান্নাঘরে গেলাম। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলুম, বাড়ির খোঁজ আমি করবোই এবং তা আজই।

নরমে গরমে খোশামোদে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেবকে দিয়ে কয়েকটা ফোন করানো গেল। খেয়েদেয়ে উঠে বেরিয়ে বাড়িও দেখা হলো। প্রথমটায় তাঁকে প্ররোচিত করতে বা উত্তেজিত করতে যতোই বেগ পাই না কেন, নানা স্থানে বাড়ি দেখার পরে তাঁর উৎসাহে বেশ জোয়ার লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটু ভিতরে ঢুকে বাড়িগুলো তো বেশ সস্তা। কিন্তু ঝকঝকে তকতকে নয়, আধুনিক নয়, বাথরুমগুলো জীর্ণ, দোকানপসার দূরে। সবই তো নিজেদের করতে হবে সুতরাং সব সুবিধের দিকেই নজর রাখতে হবে। বুদ্ধদেব নিজে থেকেই বললেন, 'চলো, তার চেয়ে হোটেল অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ করি।'

হোটেল অ্যাপার্টমেন্টের মাত্র একটাই খবর জানা ছিলো। গেলাম সেখানে। তার কাউন্টার, তার আসবাব, তার সজ্জা, চকচকে লিফট, চকচকে দেওয়াল, চকচকে মানুষ, সব কিছুর চাকচিক্যই মুগ্ধ করলো আমাদের। ব্যবহারের তো তুলনাই নেই। অত বড়ো বাড়িটায় মাত্র একটি ফ্ল্যাটই খালি ছিলো, দুর্ভাগ্যবশত সেটি আমাদের পছন্দ হলো না। পছন্দ হলো না মানে অন্য কিছু নয়, ভীষণ ছোটো। খেলাঘরের মতো। কিন্তু কী সুন্দর করে যে সাজানো, ঝলসে যায় চোখ। ঐটুকু পরিসরে আধুনিকতার উৎকৃষ্ট নমুনা।

আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ঐ শহরে নিতান্ত নগণ্য নয়। কতো কারণে কতো ঋণী হয়েছি তাঁদের কাছে, কতো কৃতজ্ঞ হয়েছি, দুজনের বেশী একজনকেও যদি একদিন একটা পার্টিতে ডাকি লিভিংরুমটি তাতেই উপচে পড়বে। আর রান্নাঘর খাবার ঘর বলে তো কিছুই নেই। ঐ একটি লিভিংরুম আর একটি বেডরুম। রান্নাঘর দেওয়ালের খাঁজে। কিন্তু কী আলো কী রোদ! ঘরের ভিতরে এই আলো এই রোদ আমাদের মনে মোহ বিস্তার করছিলো। 'নিয়েই নিই, নিয়েই নিই' করতে করতে শেষ পর্যন্ত না নিয়েই নেমে এলাম রাস্তায়। বাড়িটা ছিলো এইটথ্ অ্যাভিনিউর তেইশ স্ট্রীট, পশ্চিমে। পথে আসতে আসতেও বুদ্ধদেব অত ভাড়া এবং অত ছোটো সত্ত্বেও নেবার দিকেই ঝুঁকছিলেন। অ্যাভিনিউর কাছাকাছি এসে, আর একটি হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট চোখে পড়লো। নাম চেলসী হোটেল। সামনের দরজাটি বিশাল, সেটি সপাটে খোলা, ভিতরের প্রশস্ত কার্পেট মোড়া লবিটি রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে, ভারি ভারি মেহগনি পালিশের আসবাবপত্র ওরা যাকে বলে অ্যান্টিক, ঠিক তাই। গম্ভীর সম্ভীর সম্ভ্রান্ত চেহারা। উপর দিকে তাকালে গ্রীল নয়, কালো মোটা পুরোনো দিনের নকশি কাটা রেলিং ঘেরা বারান্দা—আধুনিক একেবারেই নয় কিন্তু কুলীন। আমি বললাম, 'এসো না এই হোটেলটায় ঢুকে জিজ্ঞেস করি এখানে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যায় কিনা।'

ইতস্তত করে রাজী হলেন। লবি পেরিয়ে কাউন্টারের কাছে যেতেই পুস্তক পাঠে নিমগ্ন সুপুরুষ ম্যানেজারটি উঠে দাঁড়ালো, 'কোন সাহায্য করতে পারি?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'এখানে কি কোনো অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হয়?'

'আছে। চারতলায়।' পাশে বসা টেলিফোনের মেয়েটি একপলকে আমাকে দেখছিলো, হেসে বললো, 'খুব সুন্দর ড্রেস। কোন দেশ?'

'ভারতবর্ষ।'

'নেহরু?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। খুব ভালো।'

তখন খুব ভারতপ্রীতি চলছিলো, নেহরু সর্বদাই সম্মানিত পুরুষ, ভারতীয়দের কদর বেড়েছিলো। উপরন্তু এতো ভারতীয়দের ভিড়ও তখন হয়নি। সস্ত্রীক ভদ্রলোকের সংখ্যা নগণ্য। শাড়ি পরা মেয়ে ছবিতেই দেখেছে বেশীর ভাগ সাধারণ লোক। তার মধ্যে আমার মতো একটা সিঁদুরপরা, খোঁপা বাঁধা পুরো বাঙালী মেয়ে; দ্রষ্টব্য বই কি।

ম্যানেজার ভদ্রলোক কাউন্টারের কাঠ তুলে বেরিয়ে এলেন। আলাপ জমাবার চেষ্টায় বললেন, 'এ দেশে বেড়াতে?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'না, কাজ নিয়েই এসেছি।'

'কী কাজ?'

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছি।'

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?' চোখে মুখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠলো, 'আর মিস্টার? মিস্টারও কি কোনো কাজ নিয়ে এসেছেন?'

'না, আমি সঙ্গীমাত্র।' হাসলাম।

ভদ্রলোকের নাম জানলাম, মিঃ আপেল্, আদি নিবাস জার্মানিতে ছিলো, মাত্র দুই পুরুষ এখানে। বেশ শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি। ফ্ল্যাট দেখাতে নিজেই নিয়ে গেলেন। অবশ্য দরকার ছিলো না কিছু, কেননা সে কাজের জন্য অন্য একটি ছেলে ছিলো।

ফ্ল্যাট দেখে আমাদের খুব পছন্দ হলো। মস্ত মস্ত দুটি ঘর, তিনটি ক্লসেট, বেশ বড়ো রান্নাঘর, বাথরুমটিও বড়ো। আসবাবপত্র নিচের মতোই পুরোনো

...দেখলাম মিঃ আপেলের বেশ গর্ব। বললেন, 'জানেন এই ... কতো? নব্বই। এই শহরে এমন পুরোনো হোটেল ক'টা? আমরা ... দেখেছি। এই হোটেলে অনেক শিল্পীসাহিত্যিক থেকে গেছেন! ... মাস্টার্স বহুকাল ছিলেন। শুনে কি রোমাঞ্চিত হবেন না টমাস উল্‌ফ-এর প্রথম উপন্যাস এই হোটেলে বসেই লেখা? আর ডিলান টমাস? তিনি তো যখনই নিউইয়র্কে আসতেন, এখানেই উঠতেন। এখনো কয়েকজন লেখক আছেন এখানে।'

এই সংবাদে আমরা সত্যিই রোমাঞ্চিত হলাম। হোটেল হিসেবে নয়, কিন্তু আমাদের হিসেবে ভাড়াটা বেশী ছিলো, তবু দ্বিধা না করে নিয়ে নিলাম ফ্ল্যাটটা।

মিঃ আপেল বললেন, 'তোমরা আসবার আগে আমি পর্দাটর্দা সব বদলে দেব। কী রং তোমাদের পছন্দ বলো? এখন পথে পথে টিউলিপ ফুটছে, ছাপা চাও তো সেই ফুলের ছাপা পর্দাও আছে। বালিশের ওয়াড় কি রঙিন চাও? না সাদা? রান্নাঘরের দেওয়ালটা একটু পুরোনো হয়ে গেছে, বলো তো নতুন পেপার লাগিয়ে দিতে পারি। সিস্টার কী বলছো? তোমার পছন্দই তো পছন্দ।'

আমার কী পছন্দ সেটা গৌণ, আমাদের ভদ্রলোকের বেশ পছন্দ হয়েছে সেটা বোঝা গেল। নইলে কাউন্টার ফেলে উঠে আসতেন না চারতলায়।

ভারি ভারি দুই প্রস্থ শীতের পর্দা সরিয়ে রাস্তায় তাকালাম। সামনে রেলিং-ঘেরা লম্বা বারান্দাটা আমাদের দেশের মতো। চারটি বড়ো বড়ো ফরাসী জানালা, সত্যি অন্ধকারে এই আড়াইটি সপ্তাহ কেটেছে মনে হলো এখানে এলে সে দুঃখ ভুলতে একবেলাও লাগবে না। আর এই ভদ্রলোকটি তো চমৎকার।

নিচে এসে নামধাম লিখিয়ে আগাম দিয়ে যাবার কথা ভাবলাম, যাতে কোনো রকমেই হাতছাড়া না হয়। কিন্তু সঙ্গে অর্থ ছিলো না, তাই বললাম, 'আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি চেক নিয়ে, এই সময়টুকু অপেক্ষা করো।'

মিঃ আপেল ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে না না তাতে কী? আগাম লাগবে না, আমি এই বুক করে রাখছি।'

যেখানে অত মহান মহান সব সাহিত্যিকেরা বাস করে গেছেন সেই বাসস্থানের আমরাও বাসিন্দা হচ্ছি, সেই সুখ আমাদের অনেকক্ষণ ঘিরে থাকলো। বুদ্ধদেব বললেন, 'মনে হচ্ছে এখুনি চলে আসি। সুন্দর ফ্ল্যাটটা। শেষ পর্যন্ত পাবো তো?' তারপর সেই লেখকদের বিষয়ে, তাদের লেখা বিষয়ে এবং ফ্ল্যাট বিষয়েই আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসে মনে পড়লো আজ রাত্রেই আমাদের দুখানা থিয়েটারের টিকিট কেনা আছে।

নিউইয়র্কে এসে এই আমার দ্বিতীয় নাটক দেখা। এটি একটি বিখ্যাত গীতিনাট্য, আগনার। পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত, এই নাটকটির বিষয়বস্তু হলো এই যে, রাজার জন্যে রাজার বাগদত্তা বধূকে তার পিতার রাজ্য থেকে বিবাহের কারণে নিয়ে আসা হচ্ছে, তিনি আসছেন সমুদ্র বেয়ে একটি পালতোলা নৌকোয়। তখনকার দিনে এই একমাত্র বাহন দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার। সসম্মানে সালঙ্কারা কন্যাকে বরের বাড়িতে নিয়ে এসে বিবাহ করাই রাজাদের নিয়ম। সঙ্গে কতো লোকজন সেপাই শান্ত্রী।

যবনিকা উঠলে দেখতে পেলাম, সত্যিই সমুদ্রের উপর ভাসমান একটি বিশাল পালতোলা নৌকো। ঢেউয়ে দুলছে। আমার চোখ বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। পালটা একটু ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে। নৌকোর ভিতর তিনটি বিলাসবহুল কক্ষ, মাথার উপরে প্রশস্ত ছাদ।

একটি কামরায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্রসাধনরত রাজকন্যার বিষণ্ণ মুখ আয়নায় প্রতিফলিত। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী, ডাইনে বাঁয়েও দুজন সুন্দরী দাসী দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে মাঝিমাল্লা লোকজন, সবাই জমকালো পোশাকে সজ্জিত, কোমরবন্ধে তরবারি। রাজকীয় মর্যাদা অনুযায়ীই তো নিয়ে যেতে হবে কন্যাকে, তাই এসেছে এরা। যার যেথা স্থান সেই সেই পজিশন অনুযায়ী স্ট্যাচুর মতো সব দাঁড়িয়ে। নৌকোর রেলিংঘেরা সেই মস্ত ছাদে অন্যমনস্ক এক যুবক পায়চারি করছে মাথা নিচু করে, দূরে তীর দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে প্রায় পৌঁছে গেল। এইবার যুবকটি ধীরে ধীরে নামছে সিঁড়ি বেয়ে, নিচে রাজকন্যা শুনতে পাচ্ছে সেই পদধ্বনি, সে চমকে উঠলো, মুখ ঢাকলো দু হাতে, ছেলেটি নামতে নামতে গান গেয়ে উঠলো। সে গান দুঃখের, বেদনার, কান্নার।

যুবকটি রাজার ভাইপো, ভাবী কাকিমাকে নিতে এসেছিলো, দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিতে দিতে কখন দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছে বুঝতেও পারেনি। তীর যতোই এগিয়ে আসছে ততোই তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সবই গানের মধ্য দিয়ে। বিলিতি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীত কানে ততো মধুবর্ষণ করছিলো না। করতো, যদি চপল গান হতো। কিন্তু এ গান ক্ল্যাসিকেল। উঁচুদরের যে কোনো কিছু বোঝবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা আমার ছিলো না, কিন্তু স্টেজের উপরেই ঐ রকম সমুদ্রে ভাসমান তিন কক্ষসম্বলিত নৌকোটি দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না। একবারো মনে হচ্ছিলো না ব্যাপারটা একান্তভাবেই বানানো, সাজানো, আলোর কারসাজিতে চোখের ধাঁধা। এদের মার্গসংগীতে অজ্ঞতা সত্ত্বেও স্টেজ এবং অভিনয়ের উৎকর্ষ আমাদের মুগ্ধ করে রাখলো।

দুটি অংকেই নাটকটি সমাপ্ত। প্রথম অংক শেষ হয়ে যাবার পরে বিরতি। বিরতির পরের দৃশ্য রাজবাড়ি। এতক্ষণ জলের পরে এই দৃশ্য আবার বিমোহিত করলো। স্টেজের মধ্যেই কতো তার ঘর, কতো গবাক্ষ, কতো ব্যালকনি, কতো থাম -যেখানে পাত্রপাত্রীকে দেখতে পেলাম, সেটি রাজকন্যার জন্য নির্দিষ্ট বহুমূল্য উপাদানে সুসজ্জিত একটি ঘর। রাজকন্যা উচ্চ আসনে সমাসীন, পায়ের কাছে রাজা হাঁটু ভেঙে বসে প্রণয় নিবেদন করছেন, জানতে চাইছেন, তাঁর ফুলের পাপড়ির চেয়েও নরম মধুর সুন্দরী প্রিয়তমার মুখে তিনি কী করলে হাসি ফোটাতে পারেন। প্রিয়তমার এই বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, রাজকার্যে ব্যাঘাত হচ্ছে। এই বিষাদ তার কিসের জন্য?

এই নিবেদনও গানের মাধ্যমে। প্রিয়তমা জবাবে একটি প্রার্থনা জানালেন, বললেন, একবার, মাত্র একবার তিনি রাজার সেই ভাইপো, যে তাঁর চালনদার হয়ে এসেছিলো, তার সঙ্গে দেখা করতে চান। শুনে রাজার মুখে ছায়া পড়লো, তিনি, সটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদেই প্রবেশ করলো প্রেমিক, আর দেখা হতেই দুজনে গানের মধ্য দিয়ে এমন কান্নাকাটি শুরু করলো যে সরু মোটা আর্তনাদে কানের পর্দা ফেটে যায় আর কি!

এতো বিখ্যাত নাটক, এতো বিখ্যাত সব গান, শুধু শিক্ষার অভাবে তেমন উপভোগ করতে না পারার দরুন মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনেক। বাইরে তখন যথেষ্ট ঠান্ডা পড়ে গেছে। ব্যাগে সদর দরজার চাবি ছিলো, খুঁজে পাই না। সর্বনাশ। তবে কি সারা রাত পথেই পড়ে থাকবো নাকি?

এ বাড়িতে এটাও একটা মারাত্মক বিপদ। নিয়ম আছে, সদর দরজাটা ভিতর থেকে হেনরিই খুলে দেবে অধিবাসীরা বাড়ি ফিরে এলে। অবশ্য চাবিও আছে সকলের কাছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে ভুলবশত কেউ চাবি ফেলে গেল, কিংবা হারিয়ে ফেললো, তখন? সেজন্য মাইনে দিয়ে রাখা আছে দরজা খোলার লোক। কিন্তু কোনো দিন হেনরি সেখানে থাকতো না। একজন ভাড়াটে গল্প করেছিলেন, একদিন কোনো শীতের রাতে একটি লোক নাকি সত্যিই চাবি হারিয়ে সারা রাত ঢুকতে পারেনি। বরফে জমে বোধ হয় মরেই গিয়েছিলো। তারপরে কিছু দিন একটু হুঁশিয়ার থাকতো তারপর আবার যে কে সেই।

চাবি না পেয়ে আমার সেই গল্প মনে পড়ে গেল। ভয়ে আরো খুঁজে পাই না। বুদ্ধদেব তাঁর স্বভাবজাত অসহিষ্ণুতায় অস্থির হয়ে উঠলেন তারপরে কী ভাগ্যে তাঁর নিজের ওভার কোটের পকেট থেকেই বেরুলো চাবিটা। মনে পড়লো, বেরিয়ে এসেও রাত বাড়লে শীত করবে ভেবে মাথার বেড়ে টুপিটা আনতে ঢুকেছিলেন। ফিরে এসে আর চাবিটা আমাকে দেননি।

ও বাড়িতে গেলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকেও বাঁচবো। তবু আরো তো চারটে দিন থাকতে হবে? কিন্তু তা থাকলাম না। সপ্তাহান্তে সমস্ত জিনিসপত্র মিঃ আপেলের জিম্মায় রেখে আমরা ওয়াশিংটনে অশোক মিত্রর বাড়ি চলে গেলাম। ওরা বোধ হয় তখন দেশে ফিরে আসছিলো, অশোক বারে বারেই তার আগে একবার যাবার কথা বলে গিয়েছিলো। এই সুযোগে যেতে পেরে দুটো দিন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে ফিরে এসে সোজা চেলসী হোটেল।

হয় বিয়ে না হয় ইয়ে

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম মৃত্যু বিয়ে এই তিন নিয়ে, এই ইহজগতের আর যত কিছু ইয়ে। এই তিনের ভবিতব্যতার অভিকর্ষ থেকে কেউ কখনও ইচ্ছার রকেট ইনজিন চালু করে স্বেচ্ছায় নিজেকে ছিটকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। যেখানে মনে হবে এ সব যেন বিধির বিধান। আপনার জন্মাবার বহু আগে ভাগেই সব ঠিকঠাক হয়ে আছে কবে কার সঙ্গে আপনার কী সব ঘটে যাবে, কাকে দেখে কবে আপনি কবার হোঁচট খাবেন কিম্বা আমতা আমতা করে পরে ঢোক গিলবেন

এবং তারও পরে দৃষ্টির প্রসন্নতার ভার নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তৃপ্তির অতল তলে হাবুডুবু খাবেন। সময়ের অপেক্ষায় থাকুন, দেখবেন এসব কিছুর পরিচয় শুধু হাতনাতে নয় বরং বুকে পিঠেও পাচ্ছেন। বাবা মার কৃপায় আপনি বাঁড়ুজ্যে কিম্বা ঘোষ বোস মিত্তির যে কোন একটা কিছু হোন, স্থির জানবেন সংসারের মায়ামঞ্চে নিতান্ত মেকী খোলসে আপনি অভিনয় করতে এসেছেন। ভিতরে আর এক-জন আপনাকে জো হুজুর করে সব কিছু করিয়ে নিয়ে চলেছে। ইচ্ছা তাঁর, নিমিত্ত আপনি শুধু।

এমন উক্তি আবার সবার মনঃপূত হবে না। তাঁরা বলবেন—বিজ্ঞান এখন সব কিছুতে নাক গলাচ্ছে, জন্ম মৃত্যুকে শাসন করছে, আয়ুষ্কালের লেজটিকে টেনে বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে এখন পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে জমিদারি করছে। বিজ্ঞান চৈতন্যজ্ঞানের পরম ছটায় দিকবিদিক উদ্ভাসিত করে তুলছে। কেমন করে সহজে মেনে নেওয়া যায়, আমরা নিমিত্ত মাত্র! সবই তাঁর ইচ্ছে! তিনিটা কে?

ও সব তত্ত্বকথা থাক। অন্তত বিয়ে টিয়ে (এবং সেই সঙ্গে ইয়ে টিয়ে তো বটেই) অত সোজাসুজি কোন নিয়মের ফরমুলায় ফেলে বিধিবদ্ধ রেশন মাফিক সোজা রাস্তায় চালান করা যাবে না। মনুর আমল থেকে শুরু করে হালে মোরারজীর কাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মানুষের গ্রহণ মনের ইচ্ছা নামক মৃগীটি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সমাজের যাবতীয় শাসন, বাধা এবং নিয়মের গন্ডি অক্লেশে বাসনার হাইজাম্প দিয়ে মধুর সন্ধানে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। রসের ব্যাপারে ঘোড়ামুখো সবাই কারবারী, যার ফলে কখনও সখনও গড়বড়ি, শেষ পর্যন্ত পরিণতি যার গড়াগড়িতে। সুযোগ সুবিধা পেলে নিতান্ত নিভাজ গোমুখো গোবেচারা ভাল মানুষটিও ক্ষেত্র বিশেষে বাঘমুখো হয়ে যায়। সামাজিক দেয়াল এবং জোয়াল পেরিয়ে তখন ছুটে চলে ইয়ের সন্ধানে।

সরকারী চাকরে মাত্রেই জানেন কাজে বহাল হবার সময় মুচলেকা লিখে দিতে হয় যে একটি থাকতে আর অন্যটিকে কখনও নয়। পন্ডিত নেহরুর আমল থেকে এই নিয়ম চালু হয়ে আসছে। কোন এক উচ্চপদের কে একজন নাকি নিজের একটি থাকতে অপরের আর একটিতে হাত বাড়িয়েছিলেন! পন্ডিতজী রাগে অভিমানে নিয়ম তখুনিই ফেঁদে-দিয়েছিলেন। কিন্তু ফাঁদ পাতা ভুবনে। কত হুদো হুদো চাকরে ভাজা মাছ ঠিকই উলটিয়ে খেয়ে চলেছেন। ঘরে বাইরে মানে বিয়েতে ইয়েতে না মিশিয়ে ম্যানেজ করে এমন ভাবে চলেছেন যাতে কোন ফাঁপরে পড়ছেন না।

পনু মিত্তির তার চোদ্দ পুরুষে বর্ণ বাগবা-জারিয়ান—চোস্ত রকফেলার, কথায় বক্তেশ্বর। তার বন্ধুবান্ধবদের শাসিয়ে এবং শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—তোরা বামুনরা চিরকালের সালসা। সমাজের আইন টাইন করার ভার নিজেদের উপর নেওয়ায় ঝোলা আনা ঝোল নিজেদের দিকেই টেনেছিস। অন্য কারো কথা কখনও ভাবিসনি। তোদের মাথা কেমন পরিষ্কার আর অন্য কোন কথা মনে হল না—আমদানি হল তাই কুলীন প্রথার, যার জুড়ি আর এ ইহজগতে নেই। অর্থাৎ বামুনরাই বিয়ের আর ইয়ের দুই-এর লাগাম একই সঙ্গে হাত তুলে নিল, ক্রীড়াকান্ডের রেসকোরসের মাঠে নেমে পড়ল।

পনু মিত্রের বন্ধুবান্ধবরা ভুরু কুঁচকে তাকালে সে আরও বলতে থাকে—ব্যাপার বোঝ, বাহাত্তুরে হয়ে বয়সের ভারে নুব্জ, পক্ককেশে মাথা পরিপূর্ণ; না হয় কায়ক্লেশে তিনি চন্ডীপাঠটি পর্যন্ত চালাতে পারেন, কিন্তু? কিন্তু ডজন খানেক সোমত্ত কুমারীর পাণিগ্রহণ করে তাদের যাবতীয় খিদে-তেষ্টা মেটানোর ঝক্কি সামলানো কি এই বয়সের কাজ? সেই থেকেই কুলীনের বিয়ের পর কার্যত প্রকসি দেওয়ার ইয়ে চালু হয়ে আছে। অর্থাৎ বিয়ের আড়ালে আবডালে নেপোয় মারছে দই।

ওর বন্ধুবান্ধবরা সগর্জনে ওকে থামিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে—বেছে বেছে শুধু বামুনদের কেন কাড়া? ইয়ের ব্যাপারে সব বাপুরাই সরেস! অমন লুকিয়ে খাওয়ার নজির সব স্তরে সব সময়েই ছিল এবং এখনও আছে।

এখন ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কাজে-কম্মে এখন ঘোরাঘুরি বেড়েছে কত। সুযোগ সুবিধা ইচ্ছা এবং পয়সা থাকলে উপর থেকে স্বয়ং উর্বশীকেও লিফটে করে নামিয়ে আনা যায় ফ্ল্যাটে। ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য ওরফে ভবা এখন একজন সার্থক

বিজনেস এক্জিকিউটিভ। তার হালে কেনা বালি-গঞ্জের দেড় লাখের ফ্ল্যাট, তাতে নিজের নীড়ের পাখী—ঢাকাই বুলবুল। সেই সঙ্গে বম্বেতে একটি মারাঠি দোয়েল। মাদ্রাজে একটি তামিল টুনটুনি, দিল্লিতে একটি পাঞ্জাবী ঘুঘু। কোরে কামারে কখনও দেখা নেই। ভদ্রলোক চালিয়ে যাচ্ছেন অদ্ভুত ভাল ভাবে। একসাথে সমানে চলছে নীরব নীড় এবং নষ্ট নীড়—এরার প্লেনে চড়ে রাজপাখীর মত তিনি কখনও এ-নীড়ে ও-নীড়ে হানা দিচ্ছেন।

আগে বয়স হতে না হতে এক রকম জবরদস্তি করে পাত্রস্থ বা পাত্রীস্থ (এবং সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ) করে দেওয়া হোত। ধারণা ছিল একবার যেনতেন প্রকারেণ বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। বিয়ে হল জীবনের চাওয়া-পাওয়ার প্রেশার-কুকারের সেফটি ভালভ। সব অঘটন থেকে রক্ষাকবচ। কিন্তু কাঁচা বয়সের বিয়ে পাকা বয়সে কখনও কখনও ধোপে টেকে না। বিয়ের বর্ম ইয়ের তীরে কখন সখন পর্যুদস্ত হয়ে যায়—এমন নজিরের অভাব নেই।

কিন্তু কথাটা তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে পুরা-কালেও সমাজে বিয়ের সঙ্গে পাশাপাশি ইয়েও বিরাজ করে এসেছে। বহু দেবতা, মুনিঋষিরা ইয়ের খপ্পরে

পড়ে নাজেহাল হয়েছেন, তার নিদর্শন ভূরি ভূরি। তপোবন সুন্দরীরা ইয়ের স্পেসালিস্ট ছিলেন—তাঁদের খ্যাতি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকত। একবার শুধু মনে করুন উর্বশী, রম্ভা মেনকাদের। দেবযানী বাবার ছাত্রের সঙ্গে। দ্রৌপদী একই সঙ্গে পঞ্চ পান্ডবদের নিয়ে রসসাগরে সন্তরণ করেছিলেন। কুমারী মাতা কুন্তী, সূর্যের কৃপাধন্যা। গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা গৌতম-বেশী ইন্দ্রের সঙ্গে বুঝতে পেরেও পিছ-পা হননি। বালির পত্নী তারা এবং রাবণের পত্নী মন্দোদরী—এই সমস্ত নজির দুবার বলার প্রয়োজন নেই। তবু স্মরণীয় হয়ে আছে—'পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং'।

আগেকার অহল্যার কথা থাক। হালের কালের এক অহল্যার কথা বলি। এখানে গৌতম হলেন আমেরিকান-প্রবাসী একজন বাঙালী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার। নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে থাকেন এবং সেখানের হাসপাতালের একজন নামজাদা ডাক্তার। সুখের সংসার উথলে উঠছে। সবকিছুই নরমে গরমে ঠিকই চলছিল। হঠাৎ একদিন ডাক্তার বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন তাঁর গাড়ির নম্বরে নিউ ইয়র্ক শহরের পুলিস ফাইন করে একগাদা টিকিট পাঠিয়েছে। উনি হকচকিয়ে গেলেন। অচ্ছো করে এক প্রতিবাদ পাঠালেন, এই লিখে যে ওমুক ওমুক দিনে আমি গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্ক কস্মিনকালে যাইনি। সাবধান, এমন ভুল ভবিষ্যতে আর নয়। ফের আবার পরের মাসে নিউ ইয়র্কের পুলিসের কাছ থেকে টিকিটের সমন এলো ওমুক ওমুক দিনে সেই একই রাস্তায় একই জায়গায় আপনার গাড়ি রাখার জন্য ফাইন দিতে হবে। ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং নিউ ইয়র্কের কোর্টে গিয়ে পুলিসের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন যে তাঁকে অহেতুক পুলিস মানসিক ও আর্থিক হাঙ্গামায় ফেলছে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল। মামলায় পুলিসও তাদের সাক্ষী দিল। আস্তে আস্তে বেরুল ভদ্রলোক ঠিকই গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্ক আসেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অহল্যা স্বামী হাসপাতালে চলে গেলে গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্কে একই রাস্তায় একই জায়গায় গাড়ি ১১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত পার্ক করে ওমুক

[illegible] আর একজন বন্ধুর সঙ্গ [illegible] বন্ধু হবার পর এখানে অহল্যাকে [illegible] হল না। তাঁদের বিয়ে ইয়ে করার ফলে ভেঙ্গে গেল। দুজনে দুমুখে চলে গেলেন।

ইয়ের শুরু কবে? বিয়ের সঙ্গে ইয়ের তফাতটাই বা কী? বিয়েটাই প্রেয়, ইয়েটা ত্যাজ্য? বিয়ের পরিসমাপ্তি ঘরবাঁধা। ইয়ের শুরু থেকেই ভয়-ভাঙ্গা। বিয়েটা আসল—ইয়েটা সুদ। কাঁচা বয়সে ইয়ের খপ্পরে পড়লে হয়তো ভবিষ্যতে মাথা ঠাণ্ডা হলেও হতে পারে কিন্তু বুড়ো বয়সে ঠাণ্ডা মাথা গরম হলে আর রক্ষে নেই। ইয়ের স্রোত তখন প্রবল—সমাজসংসার ডিবরুগড়ের মত ভেসে যাবে।

বিগতদিনের বাবু কালচারের যে নিস্করুণ ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাতে ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে প্রকাশ্যে বিয়ের সঙ্গে ইয়ের ব্যাপার জুড়িতে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। সে আমলে বোধহয় লোকের বুকের পাটা ৩৬ নয় ৬৩ ইঞ্চি ছিল। সন্ধ্যে হতে না হতে ঠাকুরদাদা, বাবা, নাতির মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। গোঁফ চুমড়ে আতর মেখে চুনোট করা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি পরে তিন জেনারেশন একই ফিটনে গিয়ে উঠে বসলেন নিজের নিজের ইয়েদের বাড়িতে রাত্রি কাটাবেন বলে। ঘরের বউরা কর্তাদের সাজিয়ে গুজিয়ে খাইয়ে পাঠাতে কিন্তু কসুর করতেন না।

আগেকার দিনে প্রেম করে বিয়ে করাটা একটা বিরাট কাজ বলে হয়তো গণ্য হোত। কিন্তু এখন এমন কিছু করাতে আর কৃতিত্বের কিছু নেই—নিতান্ত মাছের ঝোল-ভাতের ব্যাপার হয়ে গেছে। অহরহ ছেলে-মেয়েরা আপন আপন পছন্দমত বিয়ে করছে। বরপক্ষ জানল না, কন্যাপক্ষ জানল না, এদিকে না জানিয়ে কলকমে বরকনের ফুলশয্যেও হয়ে গেল। আর্থিক জুগিয়ায় স্ত্রী পুরুষের অহরহ বিচরণের ফলে মাখন আর আগুন কাছাকাছি অনবরত আসছে—ফলে যা হবার তাইই হচ্ছে। এর একটা সুবিধা হয়েছে এমন গান্ধর্ব মতে বিয়েতে অনেক সময় গুরুজনদের আর্থিক গুরু যাতনা থেকে ছেলেমেয়েরা রেহাই দিয়ে থাকে। স্বইচ্ছায় দেখেশুনে বুঝে বিয়ে করলে যে বিয়ের বনিয়াদ সিমেন্ট বা ইস্পাতের মত চিরকাল মজবুত হয়ে থাকবে এ কথা ভেবে নিলে কিন্তু গোল বাধবে। প্রেম করে বিয়েও ধোপে টিকছে না—এমন বহু নজির আছে। জোট ভেঙ্গে যাওয়া এইরকম দুজোড়া স্বামীস্ত্রী মিস্টার ও মিসেস চাকলাদার ও মিস্টার ও মিসেস কাঞ্জিলাল। তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর ওয়ার্ড মেকিং ওয়ার্ড টেকিং খেলার পর বউ পালটাপালটি হয়ে গেল। মিস্টার চাকলাদারের এখন নতুন বউ হলেন কিনা মিসেস কাঞ্জি-লাল এবং মিস্টার কাঞ্জিলালের মিসেস চাকলাদার। এমন বউ বদলের অদলবদলের খেলাও ঘটছে—তাতে ঘটক লাগছে না। প্রেম করে বিয়ে করলেই সকল ক্ষেত্রেই পরিণতি এইরকম বউ উলটো-পালটানর অবস্থা হবেই তা কিন্তু ভাববার কারণ নেই।

একবার আমাদের মামাদার কথাটা শুনুন। তিনি কেমন নিজের বউকেই (বিয়ে করেও) আজীবনকাল ইয়ে করে গেলেন। হয়ের হাতছানে এ এক বিরল নজির। উনি মফঃস্বল শহর থেকে এলেন কলকাতায় চাকরী করতে গোঁফের রেখা মুখে ফুটতে না ফুটতে। কিছু-দিন বাদে বাবা মা পছন্দ করে নিজেদের জানাশুনা ঘরের এক মেয়েকে ছেলের বউ করে আনলেন। মামাদা বিয়ে করে আবার কর্মস্থলে ফিরে এলেন। পরবাসে এই করলাঘাটার আপিস আর বউবাজারের মেস এই করে তাঁর ৬৫ বছর পর্যন্ত কেটে গেল। নামে মাত্র ছুটিছাটায় কখনও বাড়ি যেতেন। কিন্তু একটি কাজ তিনি প্রসন্ন-চিত্তে আজীবন ধরে করে গেলেন। প্রতি সপ্তাহে প্রথমে দুখানি পরে একখানি করে চিঠি স্ত্রীকে নিয়মিত লিখে গেলেন। আজীবনকাল খামছে খামছে নিজের হৃদয়কে খামের মধ্যে বউএর কাছে পাঠানর একটি বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। চিঠির তাড়া মেজের উপর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখলে একটি চারপেয়িতে পরিণত হবে—সেটা হবে সান্ত্বনার শয্যা। বউয়ের বয়স হল কিন্তু স্বাদ পুরোনো হল না। সেদিন এক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে দেখে শুধিয়েছিলুম—কী ব্যাপার মশাই, আজকাল আপনার লেখায় বিয়ে-টিয়ের গপ্পো থাকে না, শুধুই গামলা গামলা ইয়ের গপ্পো থাকে কেন?

উনি বললেন—সাহিত্যিকরা কী রাজর্ষিশ্রী—লোকের চরিত্রে হোয়াইট ওয়াশ করবে? চারদিকে যা দেখছি তাই লিখছি। আপনাদের নিয়েই লিখি। আপনারা ইয়ে কম করুন আমরাও তাহলে কম করে লিখব।

উত্তরে বললুম—বলেন কি মশাই? সবার পেটে পেটে ইয়ের খিদে?

উনি বললেন—হ্যাঁ একরকম ওইরকমই ব্যাপার।

আসলে জানবেন আগে শরৎ চাটুজ্যের উপন্যাস যেখানে গিয়ে থামতো, আমাদের উপন্যাস সেখান থেকে শুরু হয়, শেষ তার তাই ইয়েতে।

ওঁর সদাসর্বদা পকেটভর্তি গপ্পো থাকে। এইরকম কথাবার্তায় উনি রীতিমত মুডে এসে গেলেন এবং না প্রত্যাশা করতেও আপনা থেকেই গপ্পো বললেন—ইয়ে নিয়ে এত শঙ্কিত হচ্ছেন, এই শুনুন এই কিছু আগে এই গপ্পোর মশলা পেয়েছি। এবার পূজা সংখ্যায় যাবে তার আগেই আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তার ভাবার্থটা এইরকম :

একজন পরিণত বয়সের ভদ্রলোক রিটায়ার করে যখন সুখে নাতিনাতনি ছেলেমেয়ে নিয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটাবেন হঠাৎ প্রবল বেগে তিনি কেমন মায়ের ভক্ত হয়ে উঠলেন। কথা নেই, বার্তা নেই সকল সময় লোক দেখলেই তারস্বরে কেবল বলতে লাগলেন—'মা তোমারই কৃপা'। হঠাৎ তাঁকে কেমন মাতৃ-ইয়েতে পেল। প্রায়ই তিনি বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হয়ে যেতে লাগলেন। আর নাতিপুতিতে ইন্টারেস্ট নেই। কখনও কখনও আবার রাত্রেও বাড়ি থাকতেন না। কেউ কিছু শুধলে বলতেন—মায়ের ওখানে গিয়েছিলুম রে। বাড়ির লোকরা ভাবত তিনি কালীঘাট কিম্বা দক্ষিণেশ্বরে রাতবেরাতে মাকে দেখতে যাচ্ছেন। এইরকম একদিন উনি সারারাত

বাড়ি ফেরেননি। বাড়ির সবাই মনে করল উনি কালী-তীর্থে গেছেন। পরের দিন সকালবেলা পুলিস বাড়ির কড়া নেড়ে জানাল ভদ্রলোকের মৃত্যু সংবাদ। জীপে চড়িয়ে বড় ছেলেকে নিয়ে গেল এ-রাস্তা ঘুরে ও-রাস্তা ঘুরে সেই কলকাতার অখ্যাত পল্লীতে। পরে জানা গেল ইদানীং উনি ওখানেই যেতেন। এই মায়ে পাওয়ার গপ্পের শেষ। পূজা-সংখ্যায় আরও বড় করে দেখবেন।

সেদিন এক বিলিতি কাগজের প্রথম পাতায় খবর দেখলুম মার্কিন দেশের এক নামজাদা বিমানসংস্থার একজন বিমান-নন্দিনীর প্রতিবেদন। এই কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী কর্মরত সেবিকারা বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করলে চাকরীতে বহাল থাকা আর সম্ভব নয়। এই মহিলা নিশ্চয় প্রেমঘোরে মরিয়া হয়ে এই অযৌক্তিক নিয়মকে একটি জ্যান্ত পরিহাস বলতে চাইছেন। উনি বলছেন—ব্যাপার বেশ মজার—সত্যি বিয়ে করলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু বিয়ে না করে ইয়ে করলে কিছু যায় আসে না। তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের ভেবে দেখতে বলেছেন যে তাঁরা সবাই বিয়ে করা কিন্তু তলে তলে এইসব সেবিকাদের কাছ থেকে যে ইয়ের সেবা তাঁরা আদায় করছেন তার [illegible] গোপন কথা প্রকাশ্যে বিয়ের হাটে ফাঁস করে দিলে তখন? অতএব এ নিয়ম রাখা কেন?

একজন মহা-ইয়েবাজ রাজনৈতিক কেউকেটা দেহ রাখলেন। সাঙ্গপাঙ্গরা পৌরসভাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ এবং কাঠখড় পুড়িয়ে রাজি করালে শ্মশানঘাটে তাঁর একটি স্মৃতি ফলক উৎকীর্ণ করবার। এই স্মৃতি-ফলকে তাঁর গুণগান দুছত্র লেখা হবে তাও ঠিক হল। বহু বচসার পর তাঁর নানান গুণাবলীর মধ্যে তিনি যে আজীবনকাল 'চিরকুমার' ছিলেন, সই কথাটিও লিপিবদ্ধ করা স্থির হল। বাহারী কায়দায় ফলক লিখিয়ে আনা হল এবং যথাসময়ে আর একজন সেই-রকম গণ্যমান্য রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে এসে সেই ফলক উন্মোচন করা হল। কাগজে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাঁর বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে সেই 'চিরকুমার' কথাটিও ছাপা হল। সেটি পড়ে সবাই একটু মুখ নামিয়ে মুচকি হাসল। ভাবখানা এই ক্ষেত্রে এই চির-কুমার বিশেষণটির অর্থ একটি জলজ্যান্ত আর্য প্রয়োগ কারণ তাঁর জীবন কৌমার্যের কলকল্লোলে কত না ভেসেছিল। সে কথা কে না জানত? তবু তিনি বাহাত চিরকুমার।

ইয়ের নটে গাছটি সহজে মুড়বে না। বিয়ে থাকলেই ইয়ে থাকবে এবং ইয়ে থাকলেও বিয়ে থাকবে। বিয়ে এবং ইয়ে যদি দুই-ই না থাকে তাহলে এ-পক্ষ এবং ও-পক্ষ থেকেও না থাকার মামলা হবে।

যে মরুভূমি মানুষের সৃষ্টি

রাজস্থানের মরুঅধ্যুষিত শহর বিকানির। এই শহরের অল্প দূরে ছোট্ট সেই গ্রাম। নাম উদয়রামসর। আশপাশের মানুষের কাছে গ্রামটি বিশেষভাবে পরিচিত। একটি কারণে। এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে। রোগজীর্ণ মানুষ এখানে আশ্রয় নিত। আর নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখত।

কিন্তু বাদ সাধল থর। থর মরুভূমি। আজ থেকে দুই দশক আগে একদিন সবাই আবিষ্কার করল থর যেন আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তার রাশি রাশি বালি স্তূপ হয়ে জমতে শুরু করেছে উদয়রামসরের সর্বত্র। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বালিয়াড়ি। যেন বালির পাহাড় এক একটা। তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেখানকার স্বাস্থ্যনিবাসটির দিকে। গ্রাস করলও একদিন। হ্যাঁ, সেই স্বাস্থ্যনিবাসটিকে। বাড়িটার এক তলার সমস্ত ঘর বালির নিচে চাপা পড়ল। আর তার আশপাশের জমি দখল করে নিল বালিয়াড়ির শৃঙ্গ। পুরো স্বাস্থ্যনিবাসটিই যেন চাপা পড়ল বালিয়াড়ির গভীরে। ফলে ওই অঞ্চলের অধিবাসী যারা, তার স্থানটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল।

মরু-বিজ্ঞানীরা তখন বলেছিলেন, এই তো সবে শুরু। এ ঘটনা অনেক দিন ধরেই ঘটছে। উদয়রামসরের স্বাস্থ্যবাসটি শুধু ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। থর। এর আগ্রাসী ভূমিকা বড় ব্যাপক। উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানের সীমা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৩৭০ মাইল বিস্তৃত এই মরুভূমি। চওড়ায় কোথাও বা ২২০ মাইলের মত। একের পর এক বালিয়াড়ি, লবণের এলাকা এবং বালির পুরু আস্তরণে ঢাকা সমতল। ভারতের চারটি প্রদেশ তাদের আগ্রাসে কবলিত। রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব। কিছুদিন আগেও অনেকে বিশ্বাস করতেন,

মরু সৃষ্টির পেছনে ছাগলের ভূমিকা অন্যতম। এদের মুখ থেকে কোন কিছুই রক্ষা করা যায় না। সুদানের মরু অঞ্চলে ছাগলরা কিভাবে গাছে চড়ে পাতা খাচ্ছে দেখুন। ছবিটি তুলেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পি আলমসে

থর ক্রমে পূবে দিল্লির দিকে প্রসারিত হচ্ছে। প্রতি বছর এক কিলোমিটারের মত। তবে ইদানীং কেউ কেউ বলছেন, এটা নিছক জনপ্রিয় বিশ্বাস। থর আদৌ প্রসারিত হচ্ছে না।

হয়ত তাই। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথাও অস্বীকার করা যায় না। থরের অন্তর্ভূমির চেহারা আগের তুলনায় অনেক পালটেছে। যেমন, বছর চল্লিশ আগেও বারমার-এর কাছকাছি একটি পাহাড় ছিল। পুরানো দিনের যাঁরা মানুষ, তাঁদের অনেকের মুখেই শোনা যায়, দূরে থেকে সেই পাহাড়টিকে তাঁরা দেখতে পেতেন। পাহাড়টির উৎরাই-এ তাঁরা নামা ওঠাও করেছেন। সেখানে তখন কোন বালির স্তর চোখে পড়েনি। কিন্তু এখন পাহাড়টির প্রায় সবটাই বালির গভীরে নিমজ্জিত। এ ছাড়া থরের বহু অঞ্চলে এখন আগের চেয়ে বালিয়াড়ির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এক সময়ের ছোট ছোট বালিয়াড়ি এখন আয়তনে সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক। থরের গ্রামাঞ্চলের মানুষও স্বীকার করেন এ কথা। তাঁদের বক্তব্য, এ অঞ্চলে

অভিশপ্ত থর। একদার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার চারণ ভূমি। এখন মানুষের কাছে বিভীষিকা।

বৃষ্টির পরিমাণ দিন দিন কমছে। তুলনায় খরার প্রকোপ বাড়ছে।

*

কেন এমন হল?

বিশেষজ্ঞদের উত্তর : কারণ হয়ত অনেক। তাদের মধ্যে অন্যতম জনসংখ্যার চাপ। পৃথিবীতে আরও মরুভূমি আছে। থরের স্থান তাদের মধ্যে একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। থরই পৃথিবীর একমাত্র জনবহুল মরুভূমি। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এখানকার জনসংখ্যা গড়ে ৬১। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় এখানকার যা জনসংখ্যা ছিল এখন তা বেড়ে গিয়ে প্রায় তিন গুণে দাঁড়িয়েছে।

ফলে চাপও পড়ছে বেশী। ছোট বড় নির্বিশেষে গাছ কাটা চলছে। জ্বালানির চাহিদা মেটাতে। এর ওপর আছে ছাগলের অত্যাচার। মরু অঞ্চলে এমনিতেই চাষ-আবাদের সুযোগ কম। খাবার এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সেখানকার মানুষকে নির্ভর করতে হয় গৃহপালিত প্রাণীর ওপর। থর মরু অঞ্চলের মানুষ খুবই দরিদ্র। উট, গরু এমন সব প্রাণী পোষার মত তাদের অবস্থা নয়। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় ছাগলের ওপর। কারণ ছাগল পুষতে ঝক্কি কম। খরচও কম। যে কোন গাছপালাই তাদের আহার্য বলে তাদের খাবারের জন্যে চিন্তার প্রয়োজন হয় না। চলতি প্রবাদ : ছাগলে মুখ দিলে কোন গাছপালা আর অবশিষ্ট থাকে না। আর আছে ভেড়া। মরুভূমির মানুষ ভেড়াও প্রতিপালন করে। এবং ভেড়ার সঙ্গে কিছু ছাগলও। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা, ভেড়া বড় নিরীহ প্রাণীও। বোকাও। ভেড়ার পালে কোন হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব ঘটলে চিৎকার করে যে একটু জানান দেবে, তাও নয়। এর জন্যেই ভেড়ার পালের মধ্যে কিছু ছাগল রেখে দিতে হয়। বিপদের গন্ধ পেলেই তারা তারস্বরে চিৎকার করে। এই চিৎকারে হিংস্র প্রাণীরা ঘাবড়ে যায়। কখনও পালায়। অথবা চিৎকার শুনে রক্ষকরা ছুটে আসে। শত্রুর হাত থেকে ছাগল এবং ভেড়ার দলকে রক্ষা করে।

অতএব অবস্থাটা দাঁড়ায় এই রকম। শুকনো মরুভূমিতে যেটুকুও বা সবুজের সম্ভাবনা থাকে গরু, ছাগল এবং ভেড়া তাদের সাবাড় করে দেয়। ফলে সেখানকার মাটি হয় আলগা। এতটুকু হাওয়া পেলেই সেই মাটি ধূলিকণা হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে ব্যাপক এলাকা জুড়ে। যা মরুভূমির মরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।

এ ছাড়া মরুভূমির আর একটি শত্রু এক ধরনের ইঁদুর। এক নাগাড়ে মাটি খুঁড়ে মাইলের পর মাইল জমি এরা আলগা করে। আলগা মাটি সৃষ্টি করে ধূলি-ঝড়। অর্থাৎ আর এক প্রস্থ মরুত্ব বাড়ানর পালা। উল্লেখ্য, থর মরুভূমিতে বছরে শুধু ইঁদুরেই মাটি খোঁড়ে হেক্টর প্রতি ১৭০০০ কিলোগ্রামের মত। ফলে ওই মরুভূমির আকাশ ছেয়ে প্রায় বারো মাসই ছড়িয়ে থাকে ধুলোর মেঘ। মৌসুমী বাতাসের কাঁধে চেপে সাগর থেকে আনা জলীয় বাষ্প যদিও বা সেখানে পৌঁছয়, ওই ধূলি-মেঘ তাদের শুষে নেয়। ফলে বর্ষার সম্ভাবনা যায় কমে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষকদের মতে, রাজস্থানের বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। সারা পৃথিবীতে এটাই নাকি ধূলিধূসরিতম অঞ্চল। গত ১৮ বছরে এখানকার মরুভূমিতে বালির পরিমাণ আট শতাংশ বেড়ে গেছে।

*

থর একটি উদাহরণ মাত্র। সামগ্রিকভাবে ধরলে বলতে হয়, পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশই হয় শুধু মরুভূমি, নয় তো প্রায় মরু অঞ্চল। আর ওই সব অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি। জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে বছরে গড়ে দুই শতাংশ। ফলে চাষের জমির ওপরও চাপ বাড়ছে। ফলে অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুন সুফলা শস্যক্ষেত্রও মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই ঠিক এইভাবেই সারা পৃথিবীতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইলের মত শস্য ক্ষেত্র এখন মরুভূমিতে পরিণত। কয়েক হাজার বছর আগেও সাহারায় ছিল অফুরন্ত প্রাণের উৎস। ছিল সবুজের সমাবেশ। বেশি দিন নয়। এই তো, মাত্র দশ হাজার বছর আগেও পৃথিবীর বুকে চলছিল শেষ বরফ যুগের রাজত্ব (great quoternary ice age)। তার অনেক পরেও সাহারার অনেক অঞ্চল সাহারায় পরিণত হয়নি। পরিবর্তে সেখানকার পরিবেশ ছিল আর্দ্র। ছিল বনজ সম্পদ। সেখানে তখন হাতি, জলহস্তী, জিরাফ, হরিণ থেকে শুরু করে নানা রকম পশুপাখী বিচরণ করত। সাহারার কোন কোন পার্বত্য গুহায় প্রাচীন যুগের আঁকা ছবি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাণবন্ত সেই সাহারা এমন মরুভূমিতে পরিণত হল কেন?

কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শুধু সাহারা নয় পৃথিবীর তাবৎ মরুভূমির নেপথ্য নায়ক প্রাকৃতিক জলহাওয়া। যুগে যুগে জল হাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কখনও প্রচণ্ড খরা এবং অনাবৃষ্টি, কখনও বা বন্যার প্লাবন। জমির মাটি সংরক্ষণের ব্যাপারে দুই-ই ক্ষতিকর। খরা এবং অনাবৃষ্টিতে চাষের জমির ক্ষতি হয়। গাছপালা জন্মাতে পারে না। ফলে জমির মাটি অনাবৃত হয়ে পড়ে। জমে ওঠে ধুলোর প্রলেপ। এই ধুলো বাতাসে ভেসে দূরান্তে

পাড়ি দেয়। আঞ্চলিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। মাটি সরে গিয়ে ভূস্তরের পাথর অনাবৃত হয়। সেই পাথর সৃষ্টি করে বালি কণা। কিংবা, যখন অতিবৃষ্টি হয়, জমির ওপরকার মূল্যমাটি তার বন্যায় পরিবাহিত হয়ে স্থানান্তরে চলে যায়। এ ধরনের অবক্ষয়ও মরুভূমি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

'হ্যাঁ, মরুভূমি প্রকৃতিরই সৃষ্টি। বলেছেন আর এক দল বিশেষজ্ঞ। তবে 'মরুকরণ' বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ডেজার্টিফিকেশন', তার জন্যে দায়ী মুখ্যত মানুষ।'

গত সতের বছরে সুদানে দক্ষিণ বরাবর সাহারা মরুভূমি সম্প্রসারিত হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ মাইল। দক্ষিণ আমেরিকায় আতাকামা মরু অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা চলছে বিগত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর। ৫০ থেকে ১০০ মাইল প্রসারিত তার থাবা এখন প্রতি বছর এক থেকে দুই মাইল ক্রমেই সবুজের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

'মরুভূমির এই সম্প্রসারণের জন্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সম্পর্ক নিকট।'

মরুভূমির মানুষদের নির্ভর করতে হয় চারণ ক্ষেত্রের ওপর। গরু, উট, ছাগল, ভেড়া—এদের অব-

সাহারার পাহাড়-গুহায় আঁকা প্রাচীন চিত্র। মাঝখানে জিরাফ। ওপরে শিকারীর ভয়ে ছুটন্ত হরিণ। সাহারা যে এক সময় প্রাণবন্ত ছিল এই ছবিটিই তার প্রমাণ

লম্বন করেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। এই সব গৃহপালিত পশু নিয়ে তারা এক জায়গায় আস্তানা নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার সমস্ত গাছপালা, [illegible] যখন [illegible], তখন তাদের [illegible] অন্যত্র। [illegible] মরু [illegible]।
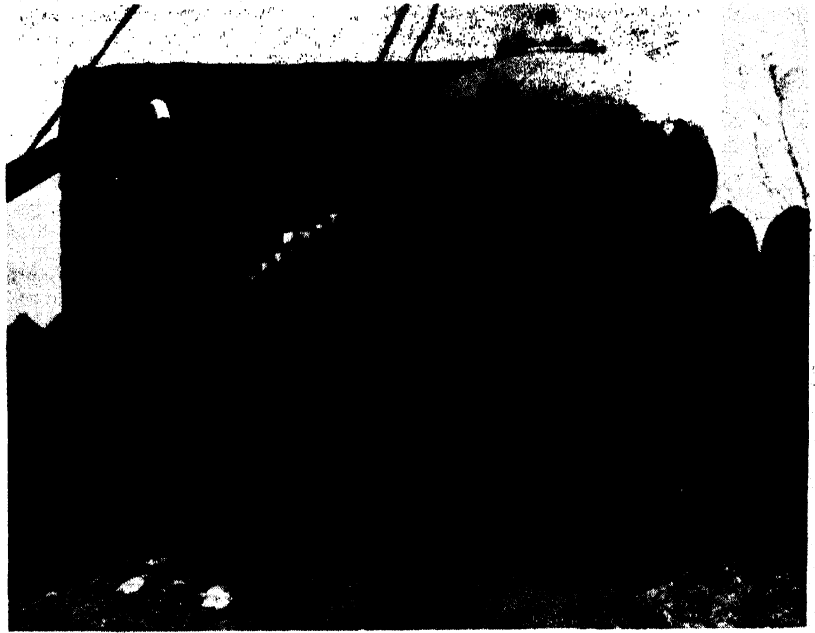
খরের বালির গভীরে নিমজ্জিত উমররামসরের সেই স্বাস্থ্যনিবাস

এ ধরনের ঘটনার একটা বড় রকমের দৃষ্টান্ত সুদানের কোরদোফান প্রদেশ। এক সময়ে এখানকার জনসংখ্যা ছিল কম। প্রায় মরু অঞ্চল হলেও সেখানে তখন গাছপালা জন্মাত। ওই অঞ্চলের বাবলা গাছ ছিল বিখ্যাত। বাবলার আঠা রপ্তানির ব্যাপারে পৃথিবীতে সুদানের স্থান ছিল প্রথম। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নাগাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেখানকার বাবলাগাছের অস্তিত্বই প্রায় অবলুপ্ত। মাত্র দশ বছর আগেও খারতুম শহরের মানুষ কাঠ আনতে যেত মাত্র মাইল দশেক দূরে। এখন তাদের যেতে হয় ৫০ থেকে ৬০ মাইল। চারণ ক্ষেত্রের অবস্থাও সঙ্গীন। প্রায় মরু অঞ্চল এখন পুরো মরুভূমিতে রূপান্তরিত।

*

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি খবরে বলা হয়েছে, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৬ এই নয় বছরে শুধু কোরদোফান অঞ্চলেই গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। সেখানে এখন ভেড়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লক্ষ, ১০ লক্ষ ছাগল, ৭ লক্ষ গরু এবং উটের সংখ্যা ৪ লক্ষ। ওই অঞ্চলের যাযাবররা বছরে জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ায় ৫৪ কোটি ৮০ লক্ষ টন কাঠ এবং শুকনো গাছপালা। জমি ন্যাড়া করে গাছপালা সংগ্রহের দরুণ ওই অঞ্চলের মাটি রুক্ষ হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে অনুর্বর। জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমেছে ২৫ শতাংশের মত।

পেরু এবং চিলির কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলের চেহারা এখন দাঁড়িয়েছে চাঁদের পিঠের মত। ব্রাজিলের অ্যামাজন অধ্যুষিত 'বর্ষা অরণ্য' বা 'রেইন ফরেস্ট' সূর্যের উত্তাপে এখন যেন পোড়া মাটির দেশ। একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে হিমালয়ের পাদদেশের কোন কোন অঞ্চলেও। জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বনের পর বন নির্মূল করায় সেখানকার জলসিক্ত জমির মাটি এখন আগের তুলনায় অনেক আলগা হয়ে পড়েছে। এই আলগা মাটি সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের জলে পরিবাহিত হয়ে গিয়ে জমছে সমভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায়। এর দরুণ, বিভিন্ন নদী মজে যাচ্ছে। কোথাও পড়ছে চড়া। সৃষ্টি করছে প্রায় মরু অঞ্চল বা 'সেমি অ্যারিড জোন'। কোথাও বা ডেকে আনছে অনাকাঙ্ক্ষিত প্লাবন।

'আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানও কৃত্রিম মরু সৃষ্টির অন্যতম কারণ।' বলেছেন কোন কোন বিশেষজ্ঞ।

'এক সময়ে জমি চষা হত গরু, ঘোড়া অথবা উটে টানা হালকা লাঙলে। এখন ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাক্টর। ট্রাক্টরের মাটি খোঁড়ার ক্ষমতা অনেক বেশী। ট্রাক্টরে বেশ কিছুটা গভীর মাটির স্তর অনাবৃত হয়। এতে করে জমিতে ধুলোর পরিমাণ বাড়ে। এই ধুলো বাতাসে ছড়ায়, দূরাঞ্চলে পরিবাহিত হওয়ায় জমির অবক্ষয় ঘটায়। আর এইভাবে চলতে চলতে পৃথিবীর বহু অঞ্চলের জমির অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন প্রায়-মরুভূমির মত।

গত কয়েক বছর ধরে কৃত্রিম মরুভূমি সৃষ্টি রোধ করার জন্যে নানা রকম গবেষণা চলছে। প্রায় মরু অঞ্চলকে আবার সজীব করে তোলার জন্যে বেশ কিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, ভারতের থর মরুভূমির কোন কোন অঞ্চলকে কৃষি-উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছেন যোধপুরের 'সেনট্রাল অ্যারিড জোন রিসার্চ ইনসটিটিউট'-এর বিজ্ঞানীরা। ইঁদুরের হাত থেকে মাটি বাঁচানোর জন্যে তাঁরা পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভূমি সংরক্ষণের জন্যে তাঁরা বসাচ্ছেন নানা রকম গাছপালা। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ফলের চাষও সম্ভব হয়েছে। সেখানে জল সংরক্ষণের জন্যে নানা রকম পদ্ধতিও কাজে লাগান হচ্ছে। এর ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যেই থরের বেশ কিছু অঞ্চলকে বাসের যোগ্য করে তোলা গেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে কৃষি উৎপাদনও। সাহারায়, সুদান, অ্যালজেরিয়া, চিলির মরুভূমি, গোবি এবং আরবের বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলকে সবুজ করে তোলার চেষ্টা চলছে বেশ কিছুকাল। এর জন্যে নানা রকম আইনও তৈরি করা হয়েছে। যেমন বেপরোয়া গাছ কাটা চলবে না। যত্রতত্র মাটি কাটা চলবে না, ইত্যাদি। বৃক্ষ রোপণ করে মাটির অবক্ষয় বন্ধ করার জন্যে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন কোন অঞ্চলে এ ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাড়াও পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জনসাধারণ কিছুটা তৎপর হলে কৃত্রিম মরু-সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সমরজিৎ কর

দৃষ্টিকোণ

মেঠো বেহালা

মানভূমের এক সাঁওতাল পল্লীর পরিবেশে আমার শৈশবের বহুদিন কেটেছিল। তখন আমার বয়স বছর সাত আট। রোজ সকাল ৯টা বাজার পরে স্লেট আর চকখড়ির কবল থেকে ছাড়া পাবার জন্য আমার মন ছটফট করতে থাকত। কান দুটো উৎকর্ণ হয়ে উঠত কি যেন শোনার অপেক্ষায়। একটু পরে দূরে থেকে একটা ক্ষীণ মেঠো বেহালার আওয়াজ ভেসে আসত। বহুদিনের পুরোনো চাকর প্রসন্ন মাঝি উঠোনে দাঁড়িয়ে কালিন্দী গরুকে চান করাতে করাতে থেমে গিয়ে হেসে বলত 'উই যে বটে, এবার লিখাপড়া ছাইড়ে মাঠকে ঘাটকে ঘুইরে বুলাবি, খানা কেনে—' আমিও এক ছুটে জানালার ধারে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়তাম।

আমাদের বাড়ির সামনে থেকে লাল কাঁকর বিছানো মোরামের রাস্তা সোজা পেয়ারা বাগান আর আতা বাগানের মাঝখান ধরে কম্পাউন্ডের বড় গেটের দিকে চলে গেছে। দেয়ালের বাইরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধানো পিচের রাস্তা, রাস্তার ওপারে মাঠ। সেই মাঠ পেরিয়ে আসত সে, হাতে তার থাকত একটা মেঠো বেহালা বা ফোক ভায়োলিন, কাঁধে একটা একশো তালি মারা ঝোলা, মুখে শুভ্র হাসি। লোকে তাকে ডাকত সুবল সখা।

ক্রমে দূরের ছোট চেহারাটা বড় হত। ধীর পদক্ষেপে সে এসে বসত আমাদের বারান্দার সামনে কাঁঠাল গাছটার ছায়ায়। ততক্ষণে আমাদের বারান্দায় পাড়াপড়শীদের ভিড় হয়ে গেছে। সকলেই ঘিরে ধরত তাকে। সবাইকার সাথে মিষ্টি হেসে কুশল বিনিময় করে সুবল সখা তার বেহালাটি হাতে তুলে নিত। তারপর অনেকক্ষণ সময় এক অপরূপ সুরের যাদুতে ভরে উঠতো পরিবেশটি। কখনও বা দাঁড়িয়ে কখনো বসে, কখনো বা ঘুরে ঘুরে নেচে গান গাইত সুবল সখা। বেহালাও বাজাতো সেই সাথে। পায়ে ঘুঙুরের তাল, তার ছন্দটি একেবারে নিজস্ব,—মহুয়া ফুলের গন্ধের মত। শিশু থেকে বুড়ো অবধি সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনত সেই গান। গানগুলি বেশীর ভাগই ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক ঘটনার ভিত্তিতে গড়া, কিছু কিছু দেহতত্ত্বের গানও থাকত। কয়েকটি গানের কথা কানে লেগে আছে এখনও। একটি গান ছিল 'শতেক রাবণ সবাই কি তোর বাপ, বইল্যে ন দাও মেঘনাদ' অথবা 'ঝিঙা ফুল লিলেক জাতি কুল গো, সাঁঝে ফুটে ঝিঙাফুল সকালে মলিন গো।' গম্ভীরা ঢঙের গান, 'আইলো গৌরীর বর হে শিঙাফুঁকা এইবার সিদ্ধি গাঁজা ঘইষতে ঘইষতে যাবেক গৌরীর দম হে,' সবশেষে আমার মাকে কাছে ডেকে গরাদের পিছনে দণ্ডায়মান আমাকে দেখিয়ে সে গাইত, 'আয় যশোদা দেইখে যা তোর কালো ছেলের কারখানা, ও যে চুরি কইরে খাইছে ননী কারো মানাই শুনে না'। বাস্তবিক মার ভাঁড়ারে রাখা মিল্কমেড মার্কা ঘন দুধের টিনগুলি আমার জ্বালায় রাখা যেত না।

গান শেষ হলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো সুবল সখা। আদর করত চুলে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। বলত, 'ডাগুরটো হইয়ো কি হবি বটে আঁ?' আমি বলতুম 'তোমার মতো হবো' সেই শুনে হাঃ হাঃ করে হাসতো সুবল সখা। বলতো 'কেনে গো? বাবুদের ছেইল্যা হাকিম হবি, দারোগা হবি বটে,' হাঁ।'

আমি প্রশ্ন করতাম 'তুমি কোথা থেকে আস ?' বাড়ির পুব দিকে' ধুধু করছে মাঠ, দূরে সাহেব বাঁধের জল বাড়ন্ত রোদে ঝিলমিল করছে, সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলত 'উই হোথা', 'কোথায় যাবে? শুধাতাম আমি। পশ্চিম দিকে আকাশের পানে নির্দেশ করে সে বলত 'উই হোথা'। তাকিয়ে দেখতাম সেই দিকে। যতদূর চোখ যায় ধানক্ষেত, দূরে দিগন্তসীমায় ধূসর চাণ্ডিল পাহাড়ের সারি, রোজ বিকেলে যার মাথা টপকে সূর্যি নামে পাটে।

এরপর যে যা দিত তাই ঝুলিতে ভরে নিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিত সুবল সখা।

এর কিছুদিন পরেই আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। সাহেব বাঁধের জল। আতাবাগান, পেয়ারাবাগান, চাণ্ডিল পাহাড়; সুবল সখা সব রইল পিছনে পড়ে। আর সব 'বাবুদের ছেইল্যাদের' মতই সুবল সখার ভাষায় 'দারোগা হবার আর হাকিম হবার' অভিশপ্ত অধ্যায় শুরু হল আমার জীবনে। গাছ থেকে কচি ফল বোঁটা শুদ্ধ ছিঁড়ে নিলে যেমন হয় তেমনই হল আমার অবস্থা। স্কুলের পড়ায় মন বসে না, অর্ধেকটা মন যে রয়ে গেছে কুলগাছের তলায়। কোন কোন ঘর্মাক্ত বিকেলের পড়ন্ত রোদে একগাছা বই, খাতা আর পুঁথিগত বিদ্যার বোঝা বয়ে ভারবাহী পশুর মত ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ মনে পড়ত সুবল সখার কথা। সূর্যোদয়ের পথ থেকে সূর্যাস্তের পথে চলেছে সে ভবঘুরে জীবন, কাঁধে একটা একশো তালিমারা ঝোলা, হাতে মেঠো বেহালা।

আমার অবস্থাটা মা বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন। বাবাকে বললেন, 'দেখছ না, ছেলেটা এত গান ভালবাসে, দাও না একটা ব্যবস্থা করে, গান শিখুক।' মার পীড়াপীড়িতে বাবা রাজী হলেন। বাড়ির কাছেই একটা গানের ইস্কুলে আমার গান শেখার ব্যবস্থা হল।

প্রথম দিন তো আমি মহা উৎসাহে স্কুলে গেছি। গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। একি ! এরা কারা ! একজন মধ্যবয়সী টাকমাথা ভদ্রলোক একটা হার্মোনিয়মের পিছনে বসে এক এক লাইন গাইছেন আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে জনা দশেক ছেলেমেয়ে সেই লাইনটি পুনরাবৃত্তি করছে তারস্বরে। মাস্টারমশাই গানের মধ্যে মধ্যে 'আবার বল' 'প্রথম থেকে' 'সম থেকে ধর' ইত্যাদি যাবতীয় শব্দ উচ্চারণ করছেন। ততক্ষণে আমি বিস্তর ঘাবড়ে গেছি। যাই হোক, তাঁকে নমস্কার করে বসলুম। আমার প্রথম দিনের শিক্ষা হল শুদ্ধ স্বর গলা দিয়ে বার করা। মাস্টারমশাই হার্মোনিয়ামের রীডে আঙুল চেপে ঋষভ কণ্ঠে গাইলেন 'সা...' আমিও পাখী পড়লাম 'সা...'

'উহু, হল না, সা...'আমি আবার 'সা...' এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমার মনে হল গানের মত ভয়ংকর জিনিস পৃথিবীতে কিছু হতে পারে না। সেদিনই আমার প্রথম ও শেষ গান শেখা।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। দেয়ালের গায়ে কুড়িটা নতুন ক্যালেণ্ডার পাল্টে পাল্টে গেছে। শহরের গতিমান জনতার ভীড়ে সেই সাত বছরের ভাবুক ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গেছে ঠিকানা নেই। স্কুল জীবন শেষ হল। শিবপুর বি ই কলেজে পাঁচটা বছর কেটে গেল হু-হু করে। দারোগা কিংবা হাকিম হওয়া আর হয়নি, অগত্যা বাবা বিশ্বকর্মা এবং ময়দানবের ইস্কুলে নাম লিখিয়েছি, যদিও বুঝি প্রযুক্তিবিদ হবার থেকে এদেশে দারোগা হলেই হয়তো ছিল ভালো, সুবল সখাই ঠিক। তার কথা মনে পড়লে এখনও কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। চারদিক থেকে কানে কি যেন সুর ভেসে আসে। এই সুর অবশ্য অনেক বেশী বাস্তব। পাইলশ্যাফটের মাথা থেকে যখন ভারী মেক্যানিকাল হ্যামার নেমে আসে শব্দ তুলে, যখন রোলড স্টীল জয়েস্টে রিভেট করে গাসেট প্লেট লাগানো হয় আওয়াজ ওঠে ঠং ঠং ঠকাস, কংক্রীটের রোটারি মিক্সার ঘর ঘর শব্দ করে ঘুরতে থাকে তখন সব সুর মিলেমিশে যেন এক আজব অর্কেস্ট্রা শুনতে পাই। সেই সাথে কর্মরত কুলিমজুরেরা সমস্বরে গলা মেলায় 'হেঁইয়ো রে হেঁইয়ো, খুব সামালো হেঁইয়ো'। দূরে দাঁড়িয়ে কাজ তদারক করতে করতে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনি সেই সুর। পি ডবলিউ ডির রাস্তা বানায় মাস্টার রোলের মেয়ে কামিনরা। সকালে তারা যখন দল বেঁধে কাজে আসে মিলিত স্বরে গান গাইতে গাইতে তখন এক ধরনের সুর। দিনের কাজ সেরে যখন ফিরে যায় তখন অন্য ধরনের সুর গায় তারা।

'দিনের কাজ ফুরোলো
ঘরে চল সই,
দিনের কাজ ফুরোলো
মরদ তের কই
শালবনের ছায়ে
হরিণ শিশু চলে
শাল বনের ছায়ে
চিতার চোখ জ্বলে।
দিনের কাজ ফুরোলো
ঘরে চল সই'

—এ এক অন্য জীবনের গান। শহুরে হার্মোনিয়াম মার্কা ন্যাকা ন্যাকা মেকী গান এর কাছে দাঁড়াতেই পারবে না।

*

মাসটা ছিল নভেম্বর। হিল কার্ট রোড ধরে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং এর পথে চলেছি এক দরকারী কাজে। সকাল বেলা। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘোর কুয়াশা। এই সাতসকালে ফগলাইট জেলে জীপ চালাতে হচ্ছে।

ঘুম-এ এসে গাড়ি থামালাম। ঘুম-এর মনেস্ট্রী বা বৌদ্ধবিহার আমার খুব প্রিয় জায়গা। ভাবলাম এখানে একটু জিরিয়ে যাই। জীপের বনেটের উপর পা ছড়িয়ে বসে ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢেলে খাচ্ছি, পিঠে একফোঁটা রোদের আমেজ পেতে শুরু করেছি, কুয়াশাও ধীরে ধীরে কাটছে। এমন সময় দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে একটি চেহারা উদয় হল। মনেস্ট্রীতে ঢোকার মুখে আমার দিকে চোখ পড়তে একটু হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি এক বিদেশী হাইকার, আমারই বয়সী, কি দুচার বছরের বড়ই হবে। একমাথা বাদামী চুল, নীল জিনের প্যাণ্ট, পায়ে ভারী বুটজুতো; গায়ে পুরনো একটা ফারের জার্কিন, পিঠে ছোট হোল্ডল সাইজের একটি হ্যাভারস্যাক এবং তার উপরে ঝোলানো একটি গীটার। হঠাৎ মনটা আনচান করে উঠলো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম 'সুপ্রভাত,'— 'সুপ্রভাত' আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে জানালো সেও 'দেশ কোথায় তোমার ?'—জিজ্ঞাসা করলাম আমি— 'কোথা থেকে আসছো ?' কুয়াশা ছিঁড়ে ফেলে সূর্য তখন সবে উঁকি দিয়েছে পুব পাহাড়ের চূড়োয় হঠাৎ সেইদিকে নির্দেশ করে সে হাসিমুখে বলল 'ওই দেশ থেকে।' আর বলতে হল না। ওকে তুলে নিয়ে বসালাম আমার জীপের বনেটের উপর। মৌজ করে পা ছড়িয়ে বসলাম দুজনেই। গরম কফি ঢেলে খেতে দিলাম। অসংকোচে থেলে ও হ্যাভারস্যাক থেকে কমলালেবু বার করে একটা গুঁজে দিল আমার হাতে শুরু হল গল্প। ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে ও জানালে ওর বাড়ি ইটালীতে, নাম জো। আর্কিওলজির ছাত্র ভারতবর্ষে এসে হিন্দু মুঘল ও দ্রাবিড় স্থাপত্য স্টাডি করেছে। এদিকের গুম্ফা অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখে নিয়ে তারপর যাবার ইচ্ছে প্যাগোডার দেশ বর্মায়।

খানিকক্ষণ গল্প করার পর গীটারটা তুলে নিল সে। আপন মনে গাইল সে নিজেরই লেখা, নিজেরই সুর করা গান, সহজ সরল সুরে, সাদামাটা গলায় গেয়ে গেল সে। গানটির মোটামুটি অর্থ হল—

'এই সবুজ ঘাস আর দ্রাক্ষাবন
তার ওপারে নীল সমুদ্র
সমুদ্র পেরিয়ে আকাশ
সমুদ্রে আমি যাবই
কেন না আকাশকে যে ভালবাসি'

—ওর গান শুনতে শুনতে অনেকদিন পরে সুবল সখার কথা মনে পড়ল আমার। সে কি আজো বেঁচে আছে ? যদি বেঁচে থাকে তো কোথায় আছে ? ছেলেবেলার ছবিগুলি খেলতে লাগল আমার চোখের সামনে। মানভূমের সুবল সখা আর ইটালীর জো, দুজনের মধ্যে বিরাট ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষার সুরে এত তফাৎ থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হল এই আকাশ, এই পৃথিবী এবং এই পথে দুজনেই যেন একই গন্তব্যমুখী অভিযাত্রী।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে স্টীয়ারিংও বসলাম। আমারও তো জীবন এইরকম হতে পারতো।

হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিল জো। দার্জিলিং পর্যন্ত ওকে একটা লিফট দিতে চাইলাম। ও নিল না। ইটালীতে বিরাট প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে সে। এক সময় দেশে ওর নিজেরই তিনটে গাড়ি ছিল। তবু হাঁটতেই চায় কারণ ও যে দেশে যেতে চায় সেখানে কোন গাড়ি যেতে পারে না কোন দিন।

রঞ্জন প্রসাদ

খেলা

কলকাতায় শ্বাসরুদ্ধকারী জাতীয় ভলিবল

চিরঞ্জীব

পঁচিশতম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে কলকাতায়। ছাব্বিশতম জাতীয় ভলিবলও হল কলকাতায়। ভলিবলের ইতিহাসে পর পর এই প্রতিযোগিতা একই রাজ্যে হওয়ার নজির নেই, একই শহর তা দূরের কথা। পর পর দুটি প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পাওয়া শুধু নয়, তাকে সফল করাই বড় কথা। ১৯৭৫-এ বিশ্ব টেবল টেনিসে যে ট্রাডিশনের শুরু, আজও তা অব্যাহত। আর তা শুধু নেতাজী স্টেডিয়ামের ভিতরে নয়, কলকাতায় আউটডোর খেলাতেও। এছাড়া, একই মাসের মধ্যে একই শহরে দুটি বড় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হল অত্যন্ত সাফল্যের সংগে। অথচ মোহবাগান মাঠে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালে মাঝে মাঝে যখন ঘোষিত হচ্ছিল জাতীয় ভলিবলের কথা, গ্যালারিতে আমার পাশে বসা পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার ট্রেজারার রঞ্জু ঘোষ বললেন তখনই: ফুটবলের পর কেউ কি ভলিবল দেখতে যাবে? ফেব্রুয়ারির ২১ থেকে ২৭ ভবিবল, আর ২ তারিখে রাজ্য সংস্থার এক কর্মকর্তার মুখ থেকে কথাগুলোয় আশংকা ফুটে উঠেছিল।

ওর কয়েক মাস আগের কথা। অন্ধ্রের প্রাকৃতিক দুর্যোগ শেষে যখন জানা যায়, ওখানে ন্যাশনাল গেমস হচ্ছে না তখনই কথা ওঠে বিভিন্ন খেলা আগের মত আলাদা আলাদা করে তাদের জাতীয় প্রতিযোগিতা করুক। সব শুনে তো জাতীয় ভলিবল সংস্থার মাথায় হাত। এত দ্রুত হবে কেমন করে, কে করতে পারবে আয়োজন? পঁচিশতম প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে, ছাব্বিশতম প্রতিযোগিতা অন্তত এক বছরের মধ্যে হওয়া দরকার। সভার পর সভা বসল জাতীয় ফেডারেশনের। সকলেই বললেন, দায়িত্ব নিতে পারে শুধু পশ্চিমবঙ্গ। ওদের বেশি খাটতে হবে না। সাজানো নেতাজী স্টেডিয়াম, থাওয়া থাকার ব্যবস্থা করলেই হল। গতবারও ডিসেম্বরে প্রতিযোগিতা হওয়ায় অসুবিধা হয়নি। শ' সাতেক পুরুষ ও মেয়ে খেলোয়াড়ের থাকা থাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল বড়দিনের ছুটিতে সেণ্ট টমাস স্কুলে।

তখন ডিসেমবর কেটে গেছে। জাতীয় ফেডারেশন তারিখ ঘোষণা করলেন প্রতিযোগিতা হবে ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু তখন তো স্কুল-কলেজ ছুটি থাকে না। কোথায় থাকবে তা হলে খেলোয়াড়রা। পশ্চিমবঙ্গ সংস্থা ভেবেছিলেন, জাতীয় ফুটবলের মত ভলিবল খেলোয়াড়দেরও তুলে দেবেন কিড স্ট্রিটে এম এল এ হোস্টেলে। বিধানসভার অধিবেশন থাকায় তা আর সম্ভব হয়নি। এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সল্ট লেকের সরকারী বাড়িগুলো পাওয়ায়। সমস্যা আরও—সাতদিন ধরে প্রতিযোগিতার ব্যয়ও কম নয়। নেতাজী স্টেডিয়ামের জন্য শুধু বিদ্যুৎ খরচ দিয়ে বায় লাঘব হলেও অন্যান্য খরচও কি কম? পুরো টিকিট বিক্রি হলে ভাবনা থাকে না, না হলেই যত চিন্তা। গতবার শেষের দিক যেমন ভিড় ছিল স্টেডিয়ামে তা হলে চলতে পারে। কিন্তু সন্তোষ ট্রফি শেষ হতে না হতেই একই মাসে লোকের পয়সা আসবে কোথা থেকে। দর্শকরা এ ব্যাপারে অবশ্য উদ্যোক্তাদের খুব একটা নিরাশ করেননি। কলকাতা আবার দেখিয়ে দিল: কোনো খেলাই ছোট নয়। আমরা শুধু ক্রিকেট টেস্ট ও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখি না'। দুই বেলা খেলা এবং একদিন বাদে, বাকি ছয়দিন কাজের দিন থাকায় দর্শকদের অসুবিধা হলেও তাদের হাজিরা নগণ্য ছিল না। ভাল খেলার দিনক্ষণ জেনে ওরা গ্যালারিগুলো ভরে তুলেছিলেন, উপস্থিত থেকেছেন অধিকরাত্রি পর্যন্ত।

এ তো আরম্ভের পরের কথা। ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার (ভি এফ আই) পুরনো ঝগড়া মিটে এক হওয়ার পরেও নানা গণ্ডগোল যে এখনও রয়েছে, তা স্পষ্ট হল। জাতীয় পর্যায়ে অবশ্য এখনও এটা প্রকট নয়। কিন্তু রাজ্য পর্যায়ে বিশেষ করে কেরালা ও উত্তর প্রদেশ এখনও বিবাদমুক্ত হয়নি। কেরালা থেকে পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে দুটি করে চারটি দল এল, উত্তর প্রদেশ থেকেও তাই। সকলের কাছেই এমন এমন প্লেয়ার্স লিস্ট যে অর্ধেক করে খেলোয়াড় উভয়ের দলে 'কমন'। সল্ট লেকে পৃথক পৃথক ঘর দিতে হল ওদের। কিন্তু খেলবে কারা? খেলার ফিকশ্চারে তো একটি কেরালা বা একটি উত্তর প্রদেশ। উদ্যোক্তারা পড়লেন সমস্যায়। আপসের ব্যবস্থাও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন ফল হয়নি। উভয়েই কলকাতায় এসে বলতে থাকেন 'আমরাই আসল দল'। কেরালার দুই দলে শুধু দুই মন্ত্রীর গোষ্ঠী নয়, একদল রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা অনুমোদিত, আর একদল রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ লালিত। সেবাস্তিয়ান আর ওমেন দুই ব্যক্তির ঝগড়ার ফল পোহাতে হল কেরালাকে। শেষ পর্যন্ত কেরালার আই জি-র টেলেক্সেও কাজ হয়নি। তাই গতবারের রানার্স ওদের মেয়েরা তৃতীয় স্থান পেয়ে ফেরে। জিমি জোস ও গোপীনাথ তো খেললনই না। শুধু এলেন আর গেলেন। গতবারের শক্তিমান কেরালা তাই ফাইনালের অনেক আগেই বিদায় নেয়। ওদের রাজ্যের দুই কর্তার ঝগড়ায় ক্ষতি শুধু কেরালা দলের নয়, ছাব্বিশতম জাতীয় প্রতিযোগিতা একটি দলের ভাল খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হল। যে মেয়েদল গতবার ফাইনালে বাংলাকে বেগ দিয়েছিল এবার তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি। প্রতিযোগিতার প্রথম কদিন ওরা কোর্টেই নামেনি। দর্শক হিসেবে গ্যালারিতে স্থান নিয়েছিল খেলোয়াড়রা। অবশ্য ওদের ব্যাপার এলাকায় আসেনি মাস দুয়েক আগে সে না হওয়ায়।

বাংলার পুরুষ ও মেয়ে দুটি দল নিয়েও কম গণ্ডগোল হয়নি। পুরুষদল নিয়ে দলবাজি হয়েছে। 'এই দল বাংলাকে ডুবিয়ে দেবে' এমন কথাও বলা হল। মেয়ে দলও তথৈবচ। অভিযোগ করা হল—এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন দল নির্বাচন কখনও হয়নি। বলা হল—নির্বাচকরা কয়েকজনের চাপে পড়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোনো কোনো পত্রিকায় এসব কথা ফলাও করে ছাপা হল। উদ্বোধন দিনে বাংলার পুরুষদলের খেলা চলাকালে দর্শকরা যখন করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করছিলেন, তখনও প্রেস বক্সের পিছনে বসে বলেছেন: এমন একটা বাজে দলের বাজে খেলাকে সমর্থন জানানোর কোনো মানে হয়?

দল নির্বাচনে যতই 'গলদ' থাকুক, খেলা তো নমার পরেও এমনভাবে সমালোচনা কখনও শোনা গেছে বলে জানি না। তাছাড়া এই সব সমালোচনার হেতুই বা কি? দলের নাম ঘোষণা বা খেলা চলাকালে নিশ্চয়ই আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে ১৭ জনকে দলে রাখারও কোনো মানে হয় না। 'গণ্ডগোল' যাতে বেড়ে না যায় সেই কারণেই কি বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেদের নেওয়া হয়েছিল মন রাখতে? এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভাল হয়নি। কেননা ব্যাপারটা পরে জানাজানি হয়ে যায় এবং তিনজন খেলোয়াড় তৃতীয় দিনে ট্রাক স্যুট ফেরত দিয়ে

পুরুষদের ফাইনালে পাঞ্জাব বনাম রাজস্থান
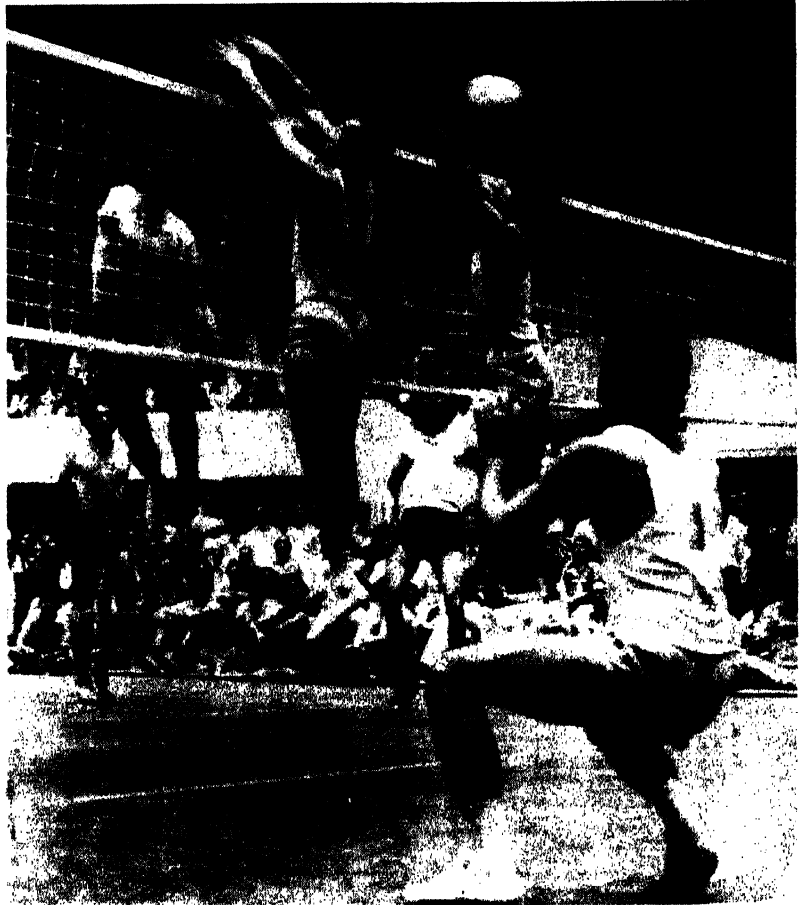
দর্শক গ্যালারিতে স্থান নেয়। সব অভিযোগ জড়ো করে একদিন রাজ্য সম্পাদক দিলীপবাবুকে জানালাম। প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় দিলীপবাবু একগাল হেসে বললেন, পুরুষ দলে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সুযোগ দিয়েছি গতবারের অভিজ্ঞতা থেকেই। গতবারও নবীন ও প্রবীণে দল গড়া হয়েছিল। কিন্তু প্রবীণরা ব্যর্থ হতে থাকায় নবীনদের নামিয়ে কিছুটা ভাল ফল হয়। এবার শুরুতেই প্রবীণদের ছাটাই করা হয়েছে। আশা করি এবার ফল ভাল হবে। ওরা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছবে। মেয়েরাও ভাল খেলবে।

জিজ্ঞাসা করলাম : চ্যাম্পিয়ন হবে কি?

সম্পাদকের জবাব : অসম্ভব নয়। মেয়েদেরও নতুনদের না নিয়ে উপায় ছিল না। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের প্রথম পাঁচজনই রেলে চাকরি পেয়েছে। আমরা তাই পরবর্তী সেরাদের নিয়েছি। দুটি দলই যদি এবার ফল খারাপ করে, তাতেও অখুশি হবো না। অন্তত পরবর্তী বছরগুলোর জন্য তৈরি হোক, সাহস বাড়ুক, অভিজ্ঞতা হোক।

সম্পাদক মশাইয়ের যুক্তির বিরোধিতা করতে পারিনি। উনি অনুরোধ জানালেন, দীর্ঘকাল পর ঝগড়া মিটেছে ফেডারেশনের। অনেকদিন পর 'মিলিত' জাতীয় প্রতিযোগিতা হচ্ছে—এতে আপনাদের সহযোগিতা চাই। গণ্ডগোলের কথা বাদ দিয়ে খেলার দিকে নজর দিন না।—বলেই সপ্তাহব্যাপী বিনি প্রেসের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেই হয়েন চ্যাটার্জিকে ডেকে বললেন : এ'কে একটা ফিকশ্চার দিন।

মেয়ে পুরুষ উভয় বিভাগেই একই নিয়ম। কোয়ার্টার ফাইনালের আগে পর্যন্ত খেলা হবে লীগ পদ্ধতিতে, তারপর নক আউট প্রথায়। পুরুষদের ২৫টি দল নিয়ে ৪টি গ্রুপ। এদের মধ্যে নবাগত পি অ্যান্ড টি। লীগ পর্যায়ে খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা উঠবে যেমন, তেমনি মেয়েদের বিভাগেও ১৮টি দলের ৪টি গ্রুপে লীগের পর কোয়ার্টার ফাইনাল।

প্রতিযোগিতা শুরুর অনেক আগেই পুরুষ বিভাগে ফেভারিট ধরা হয়েছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসকে। ওরা তো প্রতিযোগিতার প্রায় দু সপ্তাহ আগে কলকাতায় এসে অনুশীলন শুরু করে। ইন্দার সেন সিং, মহিন্দার সিং, হেম সিং, নায়ার, চতুর্বেদী, যশদেব সিং, ঈশ্বর সিং, পি আর পাতিল, নেকি রাম প্রমুখকে নিয়ে। ২১ তারিখে জাতীয় ভলিবলের উদ্বোধনের আগে রাজ্য কোর্টে ওদের অনুশীলন দেখে কিন্তু তেমন আশাপ্রদ মনে হয়নি। তবু সার্ভিসেস। ওদের ফিটনেস অতুলনীয়। কয়েকদিন আগে রেলওয়েজের পুরুষ দল এল, সেই একই দল দুবনাস সিং, এম কে মানুয়েল, অশোক রেড্ডি, জামির খান, অক্ষয় রেড্ডি, মহম্মদ আলি, অপূর্ব পালোধি, রিয়াজ আমেদ ও মনোহরণকে নিয়ে মেয়েদলের দুজন হেমলতা ও মারিয়া রোজারিও শুধু সাউথ সেন্ট্রাল রেলের। বাকিরা পূর্ব রেলের পূরবী চৌধুরী, দীপ্তি মল্লিক, মুক্তি বসু, অমিতা মজুমদার, মায়া দে সরকার, লক্ষ্মী সিকদার, তপতী মণ্ডল ও সন্ধ্যা মুখার্জি। দীপ্তি ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলার অধিনায়িকা।

গতবার ভি এফ আই দুটি থাকায় পাঞ্জাব আসেনি। এবার এল বলবন্ত সিং, নৃপজিত সিং বেদী, ইন্দার সিং, জাগীর সিং, চঞ্চল সিং, কমলজিত সিং, নারায়ণ শর্মা, সুরীন্দর পাল সিং, মহীন্দর সিং প্রমুখকে নিয়ে। নৃপজিত এই নিয়ে ২২ বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলল। বলবন্ত ১৯৬৭তে সেরা অ্যাথলিট ছিল, বিশেষজ্ঞরা বললেন, এখনও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেরালা, তামিলনাড়ু সম্পর্কেও অনেকে জানান, ওরা ভাল খেলা দেখাবে। কিন্তু একজন জানালেন, এবার বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে রাজস্থানের দিকে। ওদের সবাই অলরাউন্ডার। এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় দেখবেন ওরা অঘটন ঘটাবে। রাজস্থান পৌঁছতেই ওদের তরুণ কোচকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দলের কার পারফরমেন্স কেমন? কোচ বললেন : আমার সবাই ভাল। নামগুলো দিয়ে দিলেন তখনই। শ্যামসুন্দর রাও রাম্র কে পুরোহিত প্রভাকর রাজু, সুমের সিং, এন কে গোপাল, অশোক কুমার, অনিল কুমার, সুরেশ মিশ্র, নেমি চাঁদ, অমর সিং, মহম্মদ আশান ও গোপাল রাম। ওদের গড় বয়স ২৫। রাজস্থান রাজ্য দল হিসেবে, এলেও ওরা অধিকাংশই কোটার। ওখানকার শ্রীরাম রেয়ন কয়েক বছর হল ভলিবল টিম করেছে, এদের দিয়েছে ভাল চাকরি। রাজস্থানের ভলিবল দল বলতে শ্রীরাম রেয়নকেই বোঝায়।

বাংলা দল নিয়ে রাজ্য নির্বাচকমণ্ডলী এমন দোটানায় পড়েছিলেন যে প্রতিযোগিতার সপ্তাহখানেক আগেও জানা যায়নি কারা দলে আছে। তারও আগের কথা বলি—এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্যই দলকে একত্রে অনুশীলনের ব্যবস্থা তেমন আগে ভাগে করা যায়নি। করা গেলে পুরুষ দল হয়তো কোয়ার্টার ফাইনালেরও উপরে যেতে পারত, মেয়েদেরও চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাপ্তি সম্পর্কে কারুর দ্বিমত থাকত না।

অনেক টালবাহানার পর বাংলার দুই দলের নাম ঘোষণা করা হয়।

পুরুষ : সমর দত্ত, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, টি পি গোপালন, পুলক দাস, সমীর রায়, সুশান্ত চ্যাটার্জি, চন্দ্রশেখর সর্বজ্ঞ, দেবব্রত চক্রবর্তী, অশোক দত্ত, তাপস দে, স্বপন মিত্র, সুব্রত চ্যাটার্জি, প্রভাত সাধু খাঁ, শেখর ব্যানার্জি, আমিনুর রহমান ও দীনেশ ভট্টাচার্য। কোচ—অমরেশ মজুমদার।

মেয়ে : মিতা ঘোষ, সুমিতা দেব, বুলা ঘোষ, তাপসী চৌধুরী, বিজলী চ্যাটার্জি, প্রেয়সী ব্যানার্জি, যোগমায়া কোলে, কৃষ্ণা তরফদার, মঞ্জু ঘোষ, তাপসী সাঁতরা, আভা মুখার্জি, দীপালী পাত্র ও শ্যামলী ধর। কোচ—শিবশংকর চ্যাটার্জি।

পুরুষ বিভাগে গ্রুপ লীগের ফিকশ্চারে সবচেয়ে সুবিধা পেল সার্ভিসেস। 'এ' গ্রুপে তাদের সঙ্গে রইল হরিয়ানা, পি অ্যান্ড টি, গুজরাট, আসাম ও চণ্ডিগড়। 'বি' গ্রুপে তিনটি সম শক্তিমান দল রেলওয়েজ, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে রইল মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও পণ্ডিচেরি। 'সি' গ্রুপে কেরালা, রাজস্থান ও বিহারের সঙ্গে দিল্লি, ত্রিপুরা ও হিমাচল প্রদেশ। এতদিন জানতাম উদ্যোক্তারা সহজে ফাইনালে ওঠার জন্য পছন্দমত ফিকশ্চার বানান কিন্তু পাঞ্জাবের মত শক্তিশালীরা রইল পশ্চিমবঙ্গের 'ডি' গ্রুপে। খেলতে হল উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপুর ও ওড়িশার সঙ্গে।

২১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল গতানুগতিকভাবে। বলাই বাহুল্য বিশ্ব টেবিল টেনিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বর্ণাঢ্য ও চমৎকার মার্চ-পাস্টের ধারে কাছে কেউ আসতে পারছে না। নাইজিরীয়দের জাতীয় পোশাকে আগমন, চীনাদের যন্ত্রের মত নিখুঁত পা ও হাত আগে পিছু যাওয়া কলকাতা আর কবে দেখতে পাবে কে জানে? অথচ সেই নেতাজী স্টেডিয়াম রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণে তেমন দৃষ্টি না দেওয়ায় মাত্র তিন বছরেই যদিও স্টেডিয়ামটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে, অনেক আসনই বসার অনুপযোগী, লাউড স্পিকারে ঘড় ঘড় আওয়াজ। অনেক সময় ত কোনো কথাই বোঝা যায় না। ভলিবলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বোঝা গেল না বাংলার অধিনায়ক ও অধিনায়িকার শপথের কথাগুলি। বোঝা গেল না কী বললেন উদ্বোধক স্নেহাংশু আচার্য বা সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ।

খেলা স্টেডিয়ামে। কিন্তু তার আগে ছেলেমেয়েরা ওয়ার্ম-আপ করবে কোথায়, কাছেই অবশ্য ক্ষুদিরাম হল রয়েছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্ষুদিরাম হলেরও ফাঁসি হবার উপক্রম। ক্রীড়া পরিষদ সভাপতি স্নেহাংশুবাবুর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পূর্ত দফতর ক্ষুদিরাম হল মেরামত করেনি। তাই নেতাজী
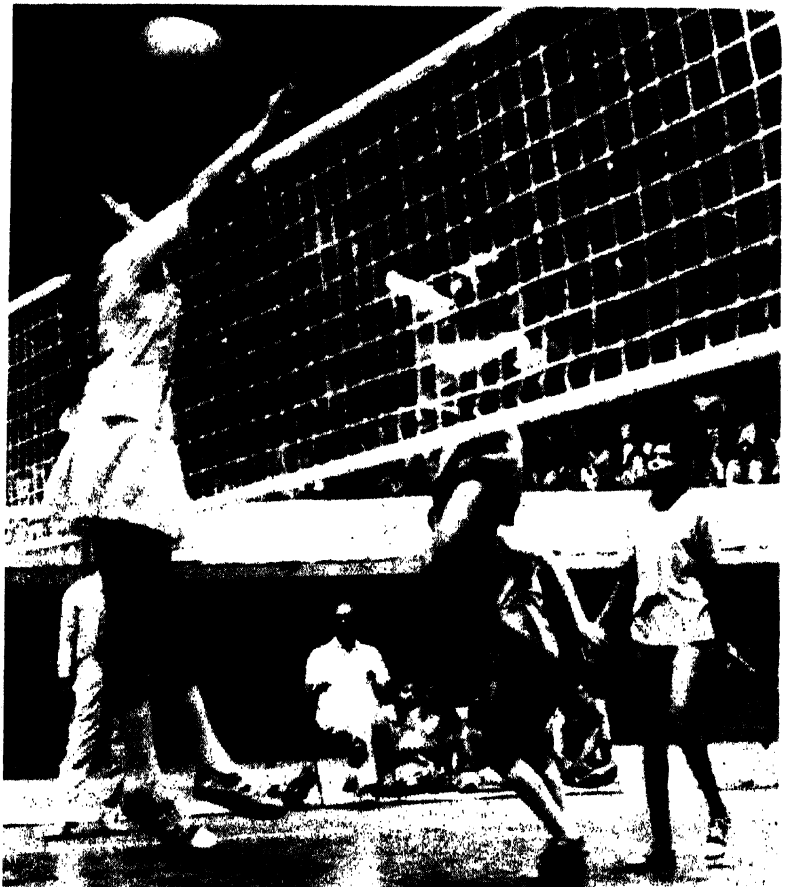
মহিলাদের কেরালা বনাম তামিলনাড়ুর খেলা

স্টেডিয়ামের বাইরে দর্শকদের আনাগোনার মাঝেই বল ছোড়াছুড়ি করেছে, ওই প্যাসেজেই দৌড় ঝাঁপ করে গা ঘামিয়ে নিয়েছে বাধ্য হয়ে। খেলার মাঠে বা কোর্টে যেমন অবাধ গতি, 'স্বাধীন' পরিবেশ চাই, তেমনি দরকার অনুশীলনেরও। আমাদের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এটি বোধ হয় এখনও অজানা। সরকারী নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত আজও থাকে বিশ বাঁও জলে, ভলিবলের সময় তা আবার প্রমাণিত হল।

এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে—এ কথা আগেই ঘোষিত হয়। প্রথমত এবার ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন, দ্বিতীয়ত এশিয়ান গেমসের জন্য দল গঠন ও রাশিয়া সফরেও যাওয়ার কথা আমাদের পুরুষ দলের। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের কৃতিত্ব দেখাতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কেরালার তিন খ্যাতিমান বাদে সব দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ভাল খেলায়। কষ্ট হয় কেরালা ও উত্তর প্রদেশের জন্য। গতবার শুধু নয়, গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় ভলিবলে এরা সুপ্রতিষ্ঠিত, দুটিই ভাল দল নিয়ে আসছে। যে উত্তর প্রদেশ পুরুষরা গতবার বাংলাকে চুরমার করে দিয়েছিল, এবার তারাই হেরেছে বাংলার কাছে ৮-১৫, ১৩- ১৫, ১৬-১৪ ও ৩-১৫ পয়েন্টে লীগের খেলায়। বাংলা গ্রুপের সকলকেই হারিয়েছিল, রুখতে পারেনি শুধু পাঞ্জাবকে। লীগে বাংলা হারায় মণিপুরকে ১৫-৪, ১৫-২ ও ১৫-১৩য়। ওড়িশাকে ১৫-২, ১৫-৪ ও ১৫-৭এ। কর্নাটককে ১৫-২, ১৫-৭, ১৩-১৫ ও ১৫-৬এ। জম্মু ও কাশ্মীরকে ১৫-৯, ১৫-২ ও ১৫-১এ। আর পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে কিছুটা (এক সময়ে ৯-৫ এগিয়ে ছিল) লড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলার পুরুষদের সব কিছুই যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রথম গেমে হারে ৯-১৫, দ্বিতীয় গেমে ৮-১৫ এবং তৃতীয় গেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায় ১৫-১এ। পাঞ্জাব খুব আহামরি খেলেনি। শুধু বল্লুকে ব্লকে আটকালেই বাংলার পয়েন্ট হত, কিন্তু এমন এলোপাথাড়ি ম্যাচ বাংলা বোধ হয় গোটা টুর্নামেন্টে খেলেনি। রানার্স হয়ে বাংলা পাঁচ বছর পরে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল। রাজ্য নির্বাচক কমিটি ভীষণ খুশি হলন। কেননা দল গঠন নিয়ে এমন হেনস্তা হননি কখনও ও'রা। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা মুখোমুখি হয় 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসের। সার্ভিসেস ১৫-১০, ১৫-৮ ও ১৫-৩ পয়েন্টে হারায় বাংলাকে। এই ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে বাংলা মোটামুটি লড়েছিল। তরুণদের নিয়ে গঠিত বাংলা যে এমন ফল দেখাবে ভাবা যায়নি। আসলে ওদের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা বোধ হয় আত্মসম্মানে লেগেছিল। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যারা শুধু অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন তাদের যুক্তি যথার্থ ছিল না। 'লিফটার নেই' 'লিফটার নেই' বলে যে ধ্বনি উঠেছিল তাও অসার প্রমাণিত হল।

তখন ওদের বোঝানো যায়নি এখনকার ভলিবলে শুধু লিফটার, শুধু ব্লকার বা শুধু স্ম্যাশার বলে কিছু নেই। ফুটবলে যেমন এখন গোলকিপার ছাড়া বাকি সকলেই যেমন অ্যাটাকার, তেমনি ভলিবলেও প্রত্যেকেই সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরে প্রত্যেককে নেটের কাছে আসতে হয়, যেতে হয় পিছনেও। সুতরাং ব্লক, স্ম্যাশ, সার্ভিস, লিফট তো প্রত্যেককেই করতে হয়। আর এটা যাদের আছে, তারাই 'কমপ্লিট' দল।

এমন 'কমপ্লিট' দল কারুর নেই। এবারের চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাবেরও না। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস বা রানার্স রেলওয়েজেরও ছিল না। কমপ্লিট দল নিয়ে এসেছিল শুধু রাজস্থান। 'সি' গ্রুপের লীগে তারা বিহারকেও ১৫-৭, ১৫-৩, ১৫-৯ হারায়। দিল্লিকে এবং কেরালাকে ১৫-৮, ১৫-৬, ও ১৫-৪এ। অবাক করেছে গুজরাট। 'এ' গ্রুপে তারা হয়েছে রানার্স, চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস। এই গুজরাট লীগে দারুণ লড়ে সার্ভিসেসের কাছে হারে ১৩-১৫, ১১-১৫ ও ১৩-১৫। 'সি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন তরুণদের নিয়ে গড়া তামিলনাড়ু বেশ সহজেই হারায় অন্ধ্রপ্রদেশকে ১৫-৬, ১৫-৩ ও ১৫-৯। তবে গ্রুপে রানার্স রেলওয়েজের কাছে তারা প্রথম গেমটি খুইয়েছিল ১১-১৫। এর পর উপর্যুপরি তারা দারুণ খেলে জেতে ১৫-৮ ও ১৫-৮। আর শেষ গেমে ডিউসের পর খেলা শেষ হয় ১৬-১৪য়।
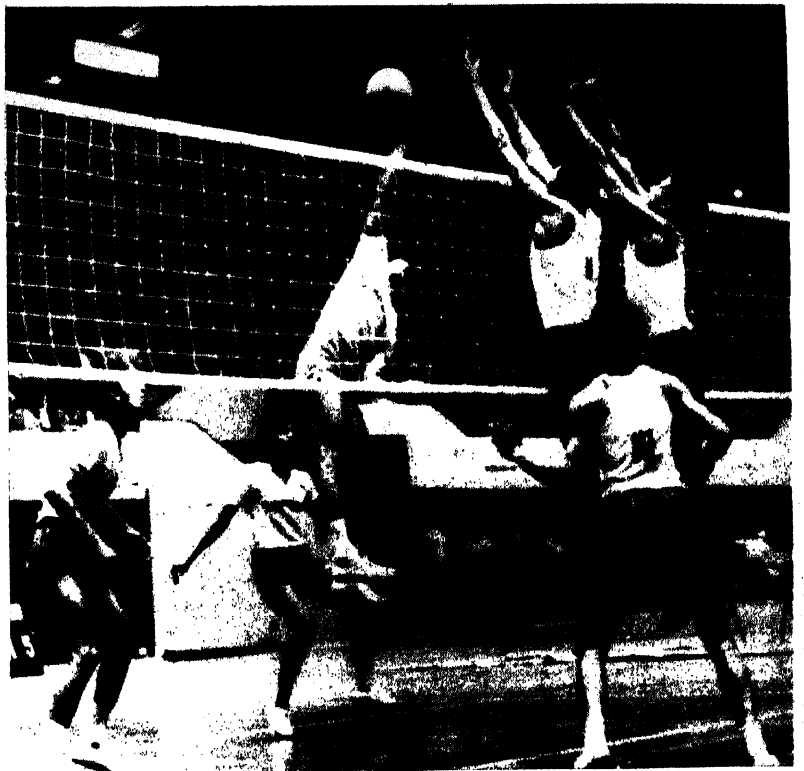
পুরুষদের বিভাগে বাংলা বনাম উত্তরপ্রদেশের খেলা

রেলওয়েজে নতুন রক্ত নেই। গত ক'বছর যারা ছিল, তারাই রয়েছে। তারই ফল হল অন্যের বিরুদ্ধে। রেলকে জিততে দু ঘণ্টার উপর সংগ্রাম করতে হয়। রেল জেতে ১৫-৬, ১৫-১২, ১৫-১৭, ১১-১৫ ও ১৫-১১।

শোচনীয় ফল হয়েছে পুরুষ বিভাগে পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্য মণিপুর, আসাম ও ত্রিপুরার। তারা একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি। ওড়িশা জিতেছিল শুধু মণিপুর এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে।

পুরুষ বিভাগে গ্রুপ 'ডি'র পাঞ্জাবকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু লীগের খেলায় ওড়িশার মত পিছিয়ে থাকা রাজ্যের কাছে শুরুর গেমটিতে ওরা হেরেছিল কেন (৯-১৫) তা বিস্ময়ের। ওড়িশার বিরুদ্ধে পরের তিনটি গেমে পাঞ্জাব অনায়াসে ১৫-৯, ১৫-৩ ও ১৫-৪ জিতেছিল। তারা মণিপুরকে হারায় ১৫-১৩, ১৫-৯ ও ১৫-৯এ; জম্মু ও কাশ্মীরকে ১৫-০, ১৫-১ ও ১৫-১; কর্ণাটককে ১৫-১, ১৫-৮ ও ১৫-২এ এবং উত্তরপ্রদেশকে ১৫-২, ১৫-৯ ও ১৫-৫ পয়েন্টে। কোয়ার্টার ফাইনালে গুজরাটকে হারায় ১৫-৫, ১৫-৯ ও ১৫-১৩য় এবং সেমি-ফাইনালে প্রচণ্ড বেগ দিল তামিলনাড়ু। প্রথম গেমে ৪-১৫ হেরে পরের দুটি জিতে নেয় ১৫-৫ ও ১৫-৫। তবে চতুর্থ গেমটি তামিলনাড়ু কেড়ে নিল ১৩-১৫য়। শেষ গেমে পাঞ্জাব সহজে ১৫-৪ জিতল।

অপর ফাইনালিস্ট রাজস্থানও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে বেগ পায়নি। তারা লীগে ত্রিপুরাকে ১৫—০ ১৫—২ ও ১৫—২-এ ; হিমাচল প্রদেশকে ১৫—৬, ১৫—৬ ও ১৫—৪-এ ; বিহারকে ১৫—৭, ১৫—৩ ও ১৫—৯-এ এবং দিল্লিকে ১৫—৬, ১৫—৩ ও ১৫—৪-এ হারাল। চারটি খেলায় জেতার সুবাদে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেও লীগের শেষ খেলায় ফল রীতিমত হতাশার। শক্তিহীন কেরালার কাছে স্ট্রেট সেটে হারল রাজস্থান। কেরালা 'দারুণ' খেলে জিতল ১৫—৮, ১৫—৬ ও ১৫—৪ পয়েন্টে। যারা কেরালার ওই খেলা দেখেননি, খবরের কাগজে ফল দেখে ধারণা করলেন জিমি, জোস ও গোপীনাথ কি তবে খেলতে রাজি হয়েছে? আসলে 'দুর্বল' কেরালার বিরুদ্ধে রাজস্থান গা ছাড়া খেলেছিল—ওটি নিয়ম রক্ষার ম্যাচ বলে, ঠিক যেমনটি টেনিসের ফিরতি সিঙ্গলস নামকেওয়াস্তে হয়ে দাঁড়ায় প্রথম ম্যাচগুলি জিতে থাকলে।

কোয়ার্টার ফাইনালে রাজস্থান দুরন্ত গতিতে হারাল গতবারের রানার্স রেলওয়েজকে ১৫—১৩, ১৫—১০ ও ১৫—৮-এ। এবং পাঞ্জাব হারাল গুজরাটকে ১৫—৫, ১৫—৯, ও ১৫—১৩ পয়েন্টে। বাকি দুটি কোয়ার্টার ফাইনালে তামিলনাড়ু বিহারকে ১৫—১০, ১৬—১৪ ও ১৫—১০এ এবং সার্ভিসেস ১৫—১০, ১৫—৩ ও ১৫—৩ পয়েন্টে পশ্চিমবঙ্গকে।

সেমি ফাইনাল দুটিতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও পাঞ্জাব : তামিলনাড়ুর খেলার মত শ্বাসরুদ্ধকারী ম্যাচ বোধ হয় গোটা প্রতিযোগিতায় হয়নি। প্রথম গেমে পাঞ্জাব হারল ৪-১৫। কিন্তু পরের দুটি ১৫-৫, ১৫-৫ জিতে যখন ফাইনালে ওঠার পথ প্রশস্ত করতে যাচ্ছে, তখনই তামিলনাড়ু, রুখে দাঁড়াল এবং ১৫-১৩ জিতল। শেষের গেমে অবশ্য পাঞ্জাবের কাছে দাঁড়িয়ে হারে ওরা ১৫-৪এ।

আর একটিতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসকে যখন প্রথম দুই গেমে হারায় রাজস্থান, তখন ধরেই নিয়েছিলাম সার্ভিসেসের ব্যূহ ভেদ হল সরাসরি। কিন্তু তা হল না; তৃতীয় গেমটি ওরা ১৫-১১এ ছিনিয়ে নেয়।

মেয়েদের বিভাগে গ্রুপ লীগের কোনো খেলাই তেমন চোখে পড়ার মত হয়নি। যদিও পাঁচ গেম পর্যন্তও গড়িয়েছিল ম্যাচ। 'সি' গ্রুপের লীগে হিমাচল প্রদেশ-মহারাষ্ট্র খেলাটি চলে এক ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। হিমাচল জেতে ১৫-৬, ১৫-৯, ১০-১৫, ৯-১৫ ও

১৫-১৩য়। খেলা শেষে বিজয়ীরা হাততালি পেয়েছিল হাজার হাজার দর্শকের; কিন্তু খেলা দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায়নি। কম খেলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় কেরালা। ওদের 'বি' গ্রুপে আর ছিল পাঞ্জাব, আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মীর। শেষের দলটি না আসায় খেলা সীমায়িত ছিল ওই তিন দলের মধ্যে। বাকি গ্রুপের দলগুলিকে চারটি করে খেলতে হয়েছিল।

ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে বাংলা বা রেল একটিও গেম হারেনি কারুর কাছে। লীগে বাংলা হারায়, দিল্লিকে ১৫-৩, ১৫-৮ ও ১৫-২এ; পি অ্যান্ড টিকে ১৫-৪, ১৫-৩ ও ১৫-১এ; চণ্ডিগড়কে ১৫-০, ১৫-৬ ও ১৫-৫এ এবং গুজরাটকে ১৫-৩, ১৫-০ ও ১৫-২এ। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ১৫-৫, ১৫-১ ও ১৫-৫এ হারায় অন্ধ্র প্রদেশকে এবং সেমি-ফাইনালে ১৫-৩, ১৫-৮ ও ১৫-০য় হারায় তামিলনাড়ুকে।

রেল লীগে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে জেতে ১৫-১, ১৫-০, ১৫-০য়; মধ্যপ্রদেশকে হারায় ১৫-০, ১৫-২ ও ১৫-১এ; অন্ধ্র প্রদেশকে ১৫-৬, ১৫-২ ও ১৫-১৩য় এবং হরিয়ানাকে ১৫-৬ ১৫-৩ ও ১৫-২এ। কোয়ার্টার ফাইনালে রেল ১৫-৪, ১৫-৪ ও ১৫-২এ হারায় দিল্লিকে এবং সেমি-ফাইনালে কেরালাকে ১৫-৫, ১৫-৩ ও ১৫-৫ পয়েন্টে।

বাংলা সহ পূর্বাঞ্চল থেকে মেয়ে দল ছিল তিনটি। বাকি দুটি বিহার ও আসাম। বিহার বা আসাম লীগের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। আসাম একটিও ম্যাচ জেতেনি। বিহার জিতেছিল দুটি ম্যাচে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

পুরুষ বিভাগে তবুও বিহার ও বাংলা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের মেয়েরা নিতান্তই পিছিয়ে। ফুটবলের পরেই জন-প্রিয়তায় যে খেলার স্থান দ্বিতীয়, (রেজিস্টার্ড খেলোয়াড়ের সংখ্যাও দ্বিতীয়) সেই ভলিবলে অনেক রাজ্য পুরুষ বিভাগেও প্রতিনিধিত্ব করে না এই আটাত্তরেও, এর চাইতে লজ্জার আর কি আছে! আসলে ক্রিকেট, ফুটবলের বাইরে বোধ হয় এখনও সমাজে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের চোখ যায়নি। প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরজিত সেনগুপ্ত, প্রসূন ব্যানার্জি ও সাবির আলিকে ভলিবলের কদিন নেতাজী স্টেডিয়ামে দেখে এক ফুটবল-পাগলকে খবরটি দিতেই তিনি বললেন : দেশটার কি হচ্ছে! ভলিবল দেখার কি আছে। ওরাও যাচ্ছে! এটা তো লেডিজ গেম।

হয়তো তাই। বাংলার বা পূর্বাঞ্চলের পুরুষেরা যা পারেনি, মেয়েরা তাতে সফল হল। মেয়ে বিভাগে দুই ফাইনালিস্ট বাংলা ও রেলে মাত্র দুজন অবাঙালী ছিল। (ওই দুজন রেলের হলেও ফাইনালে খেলেছিল শুধু একজন)।

এবার পুরুষদের ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-১২, ৫-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-৭এ ফাইনালে প্রথম উন্নীত রাজস্থানকে হারায়। আর মেয়েদের বিভাগে নবাগত রেলওয়েজের কাছে হারল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা ৮-১৫, ৪-১৫, ১৫-১০ ১৫-৯ ও ১৫-৫ পয়েন্টে।

ছাব্বিশতম জাতীয় ভলিবলের কথা ওই ফলের মধ্যে সীমায়িত ছিল না। এক একটি ম্যাচ মাঝে মাঝে এমন উদ্দীপনাময় ও শ্বাসরুদ্ধকারী ছিল যার সঙ্গে ভারত-পাকিস্তান হকি, ইডেনে লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা টনি লুইসের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতে টেস্ট জয়ের মত হৃৎপিণ্ড তোলপাড়কারী খেলার সঙ্গে অথবা ফেবরুয়ারিতেই সমাপ্ত মোহন-বাগান মাঠে বাংলা পাঞ্জাব ফুটবল সেমি-ফাইনাল বা ফাইনাল দুটির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সপ্তাহব্যাপী জাতীয় ভলিবলে কলকাতার দর্শকরা প্রায় প্রতিদিনই রক্তের চাপে ভুগেছেন, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছেন। শাঁখ, বিউগল, কাঁসর ঘণ্টা, পটকা ইত্যাদির সমাবেশ ফুটবল বা ক্রিকেটের টেস্টে দেখি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হ্যালোজেন আলোয় বর্ণ ছড়ানো ইনডোর স্টেডিয়ামেও এসব ঘটনা এবার সাধারণ ব্যাপারে পর্যবসিত হল।

আবার সকাল নটা থেকে সাড়ে বারোটা বা একটা এবং বেলা তিনটে থেকে রাত সাড়ে নটা বা দশটা অবধি এক টানা খেলা দেখার ধৈর্য বোধ হয় ভারতের আর কোনো রাজ্যের ক্রীড়ামোদীদের নেই। কলকাতা জানিয়ে দিল 'আমরা শুধু সুরবেক বা অরলোয়াস্কিকে দেখার জন্য নয়, জুনিয়র কিংবা পার্ক ইয়ং সুনের খেলা দেখতে নয়, আমরা যেমন ওদের জন্য ভিড় করি, যেমন লাইন লাগাই ওরাণ্টেস বা বিজয় অমৃতরাজের খেলা দেখার জন্য, তেমনি যাই ভলিবলের পূরবী, তপতী, দীপ্তি, মিতা, প্রেয়সী, তাপসী, সুস্মিতাকে দেখতে। দেখি নৃপজিত, বলবন্ত, অশোক রেড্ডি, সুমের সিং, প্রভাকর, সুরেশ মিশ্রকে দেখার জন্য।'

সমঝদার এই দর্শকরা অবশ্য শুরুতেই তাদের প্রিয় দল বাংলার পুরুষ ও মেয়েদেরই অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে থাকেন অনেকটা 'স্বার্থপরের' মতই। শুরু থেকেই বাংলার দুটি দলের মধ্যেই সংহতি, উদ্দীপনা ও সংগ্রামী মনোভাব অবাক করে দেয়। তবে ভলিবল যে কতখানি নাড়া দিতে পারে তা উদ্বোধন দিনের মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের খেলায় জানিয়ে দেয়। পাঁচটি গেম শুধু নয়, প্রতিটি পয়েন্টের জন্য দুটি দল র‍্যালির পর র‍্যালি করেছে, একটি পয়েন্টের জন্য চার বা পাঁচবার র‍্যালিও হয়েছে। জয়ের পর পরাজয়, তারপর জয়, আবার পরাজয়, সবশেষে জয় এইভাবে গেম হয়েছে। গোটা প্রতিযোগিতায় এমন নাটকীয় ভলিবল দেখা যায়নি। মহারাষ্ট্র জিতেছিল যেভাবে ১৫-১২, ১৩-১৫, ১৫-১০ ও ৮-১৫। শেষ গেমটিতে মহারাষ্ট্রের আবদুল বশীথ একলাই দলকে টেনে নিয়ে ১৫-১২ পয়েন্টে জিতিয়ে দেয়।

অন্যরা যত ভালই খেলুক, নিজের প্রিয় দলের সাফল্যের চাইতে বড় কিছু হতে পারে না। তাই যে

মহিলাদের ফাইনালে বাংলা বনাম রেলওয়েজ

উত্তর প্রদেশের কাছে বাংলা গতবার এই নেতাজী স্টেডিয়ামে হেরেছিল, এবার সেই কোর্টে বাংলা প্রতিশোধ নিল। শক্তিমান দলের বিরুদ্ধে নেমেও এমন কঠিন সংগ্রাম বোধ হয় বাংলার ভলিবল ছেলেরা কদাচিৎ করেছে। উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে কি লিফট, কি স্ম্যাশ, কি সার্ভিস—বাংলা এদিন ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠেছিল। উত্তর প্রদেশের মাটি কাঁপানো স্ম্যাশ ও চমৎকার প্লেসিংকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এরা। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে উত্তর প্রদেশ গতবারের কয়েক-জনকে বাদ রেখে কলকাতায় এসেছিল।

তবে স্ম্যাশ বলতে এখনও বলবন্ত বা বল্লুর। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই তার আভাস পাওয়া গেছল। অবশ্য যাঁরা ও'কে জানেন, তাঁরা বল্লুকে বাধাও দিতে পেরেছিলেন। একটু দেরিতে ব্লক করলে বল্লু ঘায়েল হয়ে যায় তা প্রমাণিত হয়েছে। ওর যা উচ্চতা (সাত ফুটের কাছাকাছি) তাতে আগে ভাগে ব্লক করলেই ব্লক ব্যর্থ হবে। বিপক্ষরা ব্লক করছে দেখেই বলের নিশানা পরিবর্তন করেছেন বল্লু ও পয়েণ্ট পেয়েছেন। শুধু তার হাতের জোরেই পানজাবের কাছে বাংলার হার হয়েছিল লীগের শেষ খেলায়। বাংলার পুরুষরা কত দুর্বল উপলব্ধি করি ওই ম্যাচে। পরাজয়টা যেন শুরুর একটু পরেই ওরা মেনে নিয়েছিল। বাংলা আসল শক্তি পরীক্ষায় হারেনি শুধু, পলায়ন করেছিল। পরাজয়ে গৌরব আছে, যদি সে পরাজয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ঘটে, কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বিতাহীন পরাজয় তো কাপুরুষতারই নামান্তর। এদিক থেকে আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত কম বয়সী মেয়েরা আলোকবর্তিকাস্বরূপ। হারি ক্ষতি নেই, কিন্তু তবে বিপক্ষকে বেগ দিতে পিছপা হবো কেন? মায়াবী যুবকরা কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারেনি, কিন্তু সেমি-ফাইনালিস্ট তামিলনাড়ুকে যে-ভাবে বেগ দিয়েছিল, তামিলনাড়ুর সেই ঘা বহুদিন দগদগে থাকবে। দু ঘণ্টার বেশি স্থায়ী ওই খেলায় মহারাষ্ট্র ৪-১৫ হেরে দ্বিতীয় গেমে ১৫-৭ জিতে নেয়। জেতেন তৃতীয় গেমও। রাত তখন নটা। আমরা মারাঠীদের জয় কামনা করছিলাম তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরতে। কিন্তু তা হল না; চতুর্থ গেম চলে গেল এম জি আর-এর রাজ্য দলের অনুকূলে ১৫-৪এ। এবার মহারাষ্ট্র আবার শক্তি ফিরে পেল। জিতল ১৫-২এ।

দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে গতবার দর্শকদের ফেভারিট ছিল কেরালা, এবার হয় তামিলনাড়ু। পিছিয়ে পড়ে এগিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত মানসিকতা ওদের রয়েছে। রেলওয়েজের কাছে প্রথম গেমে

পুরুষদের তামিলনাড়ু বনাম সার্ভিসেস দলের খেলা

১১-১৫ হেরে এগিয়ে যায় ১৫-৮, ১৫-৪ ও ১৬-১৪য়।

এবারের প্রতিযোগিতায় অন্য সব খেলায় অনু-পস্থিত থাকলেও যারা পুরুষদের সেমি ফাইনাল দুটি দেখেছিলেন, তাঁরা হয়ত ভলিবলকে আর লেডিজ গেম বলবেন না। এই খেলায় যে অসম্ভব ধৈর্য, প্রখর তাৎক্ষণিক বুদ্ধি এবং দারুণ শারীরিক সক্ষমতা চাই —সকলেই একথা উপলব্ধি করেছেন। এবার যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন চারটি দল সেমিফাইনাল খেলেছে। এদের র‍্যালি ব্লক, স্ম্যাশ, প্লেস দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষত শর্ট লিফটে চকিতে কিছু স্ম্যাশ ক্ষণে ক্ষণে দর্শকদের তৃপ্তি এনে দেয়। হাজার হাজার দর্শকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'বাঃ', 'ইউনিক'। আবার কিছু বল প্লেসিং শুধু দর্শকদের হকচকিয়ে দেয়নি, বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বুদ্ধিবিভ্রমও ঘটে যাচ্ছিল। সমানে সমানে লড়াই হলে যা হয়, তা-ই দেখেছি পুরুষদের সেমিফাইনালে। ভলিবলও ক্রমশ 'পাওয়ার গেম' হয়ে পড়ছে, তা সকলের কানে বিঁধে আছে। একজনের স্ম্যাশ বিপক্ষের ব্লকে ঘা খেয়ে 'বদাম' 'বদাম' শব্দে ফিরে গেছে। কখনও বা হয়েছে মেঘের গর্জন। আবার স্ম্যাশ কাঠের ফ্লোরে লেগে দারুণ শব্দে স্পিন করে প্রবল গতিতে চলে গেছে দর্শক গ্যালারিতে। বল কখনও বা জড়িয়ে গেছে চতুর্দিকের রক্ষণ-জালে। রাজস্থান, তামিলনাড়ুর প্রায় প্রত্যেকের সোয়ার্ভিং সার্ভিস ছাব্বিশতম জাতীয় ভলিবলকে স্মরণ করিয়ে রাখবে। মেয়েদের মধ্যে এ কৃতিত্ব রেলওয়েজের দীপ্তি মল্লিক ও বা-হাতি মায়া দে সরকারের। এখনকার মেয়েরা শুধু লিফট করে না, বা অন্য কোর্টে বল ক্লিয়ার করে ক্ষান্ত নয়। এদেশের মেয়েরা ব্লক করতে জানে, স্ম্যাশ করে— এবারের ফাইনাল একথা বলে দিল।

অভিজ্ঞতা, স্থৈর্য, বুদ্ধি কত বড় সম্পদ খেলার মাঠে, সে প্রমাণ পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব ও মেয়েদের বিভাগে রেলওয়েজের জয়। হেরেছে কম বয়সী ও স্বল্প অভিজ্ঞতার বাঙালী মেয়েরা এবং রাজস্থানী যুবকরা। খেলার মাঠে একক ভাবে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সুব্রতা দেবনাথ ও রূপা ব্যানার্জি (মুখার্জি) বহুদিন সংগ্রাম করলেও দলগতভাবে সমস্ত শক্তি ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতের সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কখনও এমনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে দেখিনি একমাত্র মেয়েদের কবাডিতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে ছাড়া। গোটা প্রতিযোগিতায় বাংলা অনায়াসে জিতলেও, ওই সব খেলা চোখে লাগার মত ছিল না। কিন্তু ফাইনালে শ্রেয়সী ও বুলার লিফটিং এবং বিজলী, তাপসী, মিতা ও সুমিতার ব্লকিং ও প্লেসিং ভোলা যাবে না। গতবার বাংলার মেয়েরা ফাইনালে জিতেছিল কেরালার বিরুদ্ধে প্রায় একতরফা খেলে। এবার রেলকে প্রতিটি পয়েণ্টের জন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে। আশা করেছিলাম পাঞ্জাব : রাজস্থান পুরুষদের ফাইনালটি দর্শনীয় হবে কিন্তু তার আগে মেয়েরা যা দেখালেন তা পুরুষ সেমি-ফাইনাল দুটির সম্পূর্ণতা। এবারের ভলিবল দর্শকদের মুগ্ধ করেছে, তৃপ্তি দিয়েছে। প্রিয় দল সংগ্রাম করে হেরেছে যখন, অলক্ষ্যেই অনেকে চোখের জল ফেলেছেন। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যে বা ব্যর্থতায় যা হয় নেতাজী স্টেডিয়ামে বাংলার মেয়েদের পরাজয়ে দর্শকরা সেই ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছেন। আর কোনো খেলায় রাজ্য দলের সঙ্গে দর্শকদের এমন আত্মীয়তা দেখিনি যা দেখাল বাংলার এই কিশোরীরা। ভলিবলের পক্ষে এ বোধ হয় অনেক বড় প্রাপ্তি।

ফটো : তপন দাস

বাংলার ক্রিকেট এবং এবার রঞ্জির খেলা

বিগত ৪৩ বছরের রঞ্জি ট্রফির খেলায় যে বাংলা একবারের বেশি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি সেই বাংলা এবার ভাল কিছু করবে এমন দুরাশা অবশ্য ছিল না। তবু কোয়ার্টার ফাইনালে হায়দরাবাদের কাছে সহজ হারের যুক্তি কি? হায়দরাবাদ তো এমন কিছু শক্তিশালী দল নয়। তাদের বহু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আবিদ আলিও খেলেননি। তিনি লীগ ক্রিকেট খেলতে ইংলন্ডে চলে গেছেন।

বাংলার একবার রঞ্জি ট্রফি জয় ৩৮ বছর আগে। অর্থাৎ সাহেবদের আমলে। দলের অর্ধেক খেলোয়াড়ই ছিলেন শ্বেত সম্প্রদায়ের। ১৯৩৮-৩৯ মরসুমে ওই জয়ের পর বাংলার খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দল অবশ্য আরও ছ'বার রঞ্জি ফাইনাল খেলেছে কিন্তু ক্রিকেট খেলার রাজ্য হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। হায়দরাবাদের রেকর্ড আরও খারাপ। কোনবার রঞ্জি ট্রফি পায়নি। ফাইনাল খেলেছে মাত্র দুবার, ১৯৪২-৪৩এ এবং একুশ বছর পরে ১৯৬৪-৬৫তে। সেই হায়দরাবাদের কাছে এবার বাংলা হয়তো ইনিংসেই হারত, যদি বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ না হত। দুই ইনিংসের রান ১৯৭ ও ৮ উইকেটে ১০৮। হায়দরাবাদের এক ইনিংসে ৩১৭। হায়দরাবাদ খেলার সামগ্রিক ফলে জেতেনি, প্রথম ইনিংসের ফলে জিতে গেছে—একথা ভেবে বাংলার খেলোয়াড়রা যেমন আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারে, তেমন হায়দরাবাদের খেলোয়াড়রা আপসোস করতে পারে বাংলাকে ইনিংসে হারাতে পারেনি বলে। যদি চারদিনের খেলার একদিন বৃষ্টিতে ধুয়ে না যেত এবং শেষদিন কিছু আগে খেলা শেষ না হত তবে কোন পক্ষের আত্মতুষ্টি এবং আপসোসের বোধ হয় কারণ ঘটত না।

এ বছর কেন, গত বছরও কি নকআউটে বাংলা ভাল খেলেছিল? মোটেও না। গত বছর বাংলাকে খেলতে হয়েছিল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর এক শক্তিহীন দল হরিয়ানার সংগে। হেরেছিল ১৮২ রানে। দুই ইনিংসে বাংলা করেছিল ১৩৫ ও মাত্র ৫৯ রান।

পূর্বাঞ্চলীয় লীগে কিন্তু প্রতি বছরই চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বাংলা। এর অর্থ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ক্রিকেটেই দীনতা। বাংলার তুলনায় বাকি তিনটি রাজ্য বিহার, আসাম ও ওড়িশা অনেক দুর্বল। বনের মধ্যে শেয়াল রাজার মত পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির ক্রিকেটেই বাংলার রাজত্ব। পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় প্রতিবারে শীর্ষস্থান। এবারও সম্বলপুরে ওড়িশাকে হারায় ইনিংস ও ৮৬ রানে। ইডেনে দুই দিনেরও কম সময়ে আসামকে ইনিংস ও ১১৪ রানে। জামসেদপুরে বিহারকে কিন্তু সরাসরি হারাতে পারেনি। জেতে প্রথম ইনিংসের ফলে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ একটু শক্তিশালী হতেই বাংলা ক্রিকেটের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিহারের বিরুদ্ধে রানের সংখ্যাটা অবশ্য প্রশংসা করার মত। ৪২৯ রানের বেশ বড়সড় ইনিংস, যদিও ওর মধ্যে পলাশ নন্দী (১৫১) এবং বরুণ বর্মনেরই (১০১) (নট আউট) ২৫২। বাকি আটজনের ১৭৭। কিন্তু যেটা মিনি বিস্ময়ের ব্যাপার তা হচ্ছে ওই বড় ইনিংসের বিরুদ্ধেও বিহারের ৪০৭ রান করার কৃতিত্ব। একটি বড় ইনিংসের বিরুদ্ধে একটি দুর্বল দল যদি বড় ইনিংস গড়ে তবে নিশ্চয়ই বোলাররা প্রশংসার দাবী করতে পারে না। হয়তো পিচ ব্যাটসম্যানের সহায়ক ছিল। তবু কি ব্যাটে কি বলে সাম্প্রতিক কালের ক্রিকেটে বাংলার গৌরব বিশেষ নেই। বিশেষ নেই বললে একটু আছেই বোঝায়। সর্বভারতীয় নিরিখে বলা উচিত গৌরব কিছুই নেই। যেটুকু আছে তা ক্রিকেট খেলা নিয়ে বাংলার মানুষের পাগলামি। অবশ্য ক্রিকেট না বলে টেস্ট ক্রিকেট বলা উচিত। টেস্টের ধারাবিবরণী শোনার জন্য রেডিওর সামনে কান পেতে বসে থাকি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ধারাবিবরণী শুনি। বসি আজকাল টেলিভিসনের সামনেও। একখানা টিকিটের জন্য হন্যে হয়ে উঠি। কালোবাজার থেকে বহুমূল্যে টিকিট কিনি।

বাংলার ক্রিকেট, কলকাতার ক্রিকেটকে দিনে দিনে নেমে যেতে দেখেও কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চেয়ে ফুটবলের দল বদল নিয়ে আলোচনায় সাধারণের আগ্রহ অনেক বেশি। বাংলার ক্রিকেট দল যখন হায়দরাবাদে হারছে তখন সর্বত্র ক্রীড়ামোদিদের আলোচনা সুব্রত ভট্টাচার্য মোহনবাগানে থাকছে, না মোহনবাগান থেকে ইস্টবেংগলে যাচ্ছে? ক্রিকেট নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। ইস্টবেংগলের শ্যামল ব্যানার্জি যেদিন মোহনবাগানে খেলার জন্য সই করল সেদিন আই এফ এ অফিসের সামনের এক জনতা ধাবিত হল ইস্টবেংগল মাঠে। সেখানে তখন ক্রিকেট প্র্যাকটিস হচ্ছিল। "সব ভন্ডুল করে দাও—ক্রিকেট ক্রিকেট চলবে না।" বলে জনতা সত্যি সত্যিই সব তছনছ করে দিতে উদ্যত হল। ভাগ্যিস ইস্টবেংগল মাঠে তখন দু-চারজন প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির ছেলে উপস্থিত ছিল। তারা বলল, ক্রিকেটে আমরা মোহনবাগানকে হারিয়েছি না? "হারিয়েছ? তবে চলুক ক্রিকেট।" ক্রিকেট সম্পর্কে এই হচ্ছে আমাদের মানসিকতা, ক্রিকেটের প্রতি আমাদের ভালবাসা।

বাংলা ক্রিকেটের যারা ভাগ্য-বিধাতা তারাও যদি বলেন—"চার-পাঁচজন বাঙালীকে আমরা টেস্ট খেলিয়েছি না? টেস্ট খেলার আয়োজন করছি না?" তবে সমালোচনার উৎসাহ উবে যাবে। তবু প্রশ্ন থেকে যাবে ক্রিকেট সম্পর্কে তাদের দরদ কি খাদহীন?

কেন আমাদের ক্রিকেট এগোচ্ছে না? প্রতিকূল প্রকৃতি অবশ্যই আংশিক কারণ। ক্রিকেট মরসুম এখনো (এই লেখার সময় পর্যন্ত) শেষ হল না। ফাল্গুন-চৈত্রের কড়া রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠ, ক্রিকেটারদের মুখ থেকে রক্ত ওঠার উপক্রম (দৃষ্টান্ত ১৯৭৬ মরসুমে গোপাল বসু)—তবু জনহীন মাঠে চলছে ক্রিকেট। কলকাতার লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদী কান পেতে আছে ফুটবলের পদধ্বনি শোনার জন্য। স্বীকার করছি, মাঠের সংখ্যা কম এবং খেলার সংখ্যা অনেক বেশি বলে কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। কিন্তু পরিকল্পনামত যেভাবে ক্রিকেট চলা উচিত, যেভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত, যেভাবে উচিত দল গড়া সেভাবে কি সব কিছু হচ্ছে?

এবারের দল গড়ার কথাই বলা যাক। এবার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, শ্রেষ্ঠ বোলার এবং শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়া হয়নি।

প্রদীপ পান্ডে গত পাঁচ বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করেছে। ১৯৭৩এ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একবার মাত্র তাকে খেলানো হয়। নবাগত হিসাবে খারাপও খেলেনি। তারপর থেকে বাদ। গত বছর পর পর বার ইনিংসে প্রদীপ করে অর্ধশত রান। এবার মরসুমের শুরুতে জামাডোবায় আমন্ত্রণ ক্রিকেটে প্রথম খেলায় করে অনবদ্য ১৩৮। মাদ্রাজে আন্তঃ-আঞ্চলিক ক্রিকেটে করে ১১৮। অফিস লীগে একাধিক সেঞ্চুরি আছে। কলকাতা জে সি মুখার্জি কাপ এবং সি এ বি লীগে ওর রান: ৬৭, ১, ৪৫, ৫৩ নট আউট, ১৩, ২৪, ১৫ ও ১০১ নট আউট এবং ১৪। গড় ৫৯·৬৩।

সি এ বি লীগে এবার সেরা বোলার সুব্রত গুহ। অন্তত স্কোর বইয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী। সুব্রত গুহও কিন্তু রঞ্জি দলে স্থান পায়নি।

সেরা অলরাউন্ডার ফারাসাতুল্লা। এমন কি জে সি মুখার্জি কাপে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলাতেও ইস্টবেংগলের এই সফল ক্রিকেটার ৫৩ রান করেছিল, ২১ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিল।

শুনলাম, গোপাল বসুকেও বাদ দেবার কথা উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য দল গড়ার আগের রাতে গোপালের দুশ্চিন্তা কম ছিল না। হয়তো ওর গায়ে সর্বভারতীয় গন্ধ থাকায় বাদ পড়েনি।

কিন্তু প্রদীপ পান্ডে, সুব্রত গুহ ও ফারাসাতুল্লাকে বাদ দেওয়া হল কেন। প্রদীপ দুঃখ করে অনেকের কাছে বলেছে, যদি দলে স্থান না পাই ধরে নেব আমার ভাগ্য পাষাণ চাপা। জন্ম ক্লাব ক্রিকেটের জন্য।

আদালতে সি এ বি-র নির্বাচন খারিজ হবার থেকে বাংলা ক্রিকেটের প্রশাসন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিসিভার প্রমথনাথ পালিতের হাতে। আইনজীবী মানুষ। খেলার ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা কম বলে আদালতের ক্ষমতা বলে এক নির্বাচক কমিটি গঠন করেন। তাদের মধ্যে সকলেরই যে ক্রিকেট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আছে তা নয়। তবে দাত্তু ফাদকার এবং পংকজ রায়ের মত বহু অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা তো নির্বাচক সমিতিতে ছিলেন। শোনা যায়, নির্বাচকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন: প্রদীপ 'ব্যাড এলিমেন্ট' সুব্রত 'টিম স্পিরিট নষ্ট করে' এবং গোপাল বসু 'গ্রুপ' করে। মন্তব্যগুলি হাস্যকর।

ক্রিকেট মহলের সবাই কিন্তু বলেন প্রদীপ অত্যন্ত ভাল ছেলে। দোষের মধ্যে বড় বেশি রঙচঙের পোশাক পরে। সুব্রত গুহ সম্পর্কে অভিযোগ শুনে অনেকেই হাসবে। খেলার দিন সকালে দলের স্বার্থে বেংকটরাঘবণকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর একটি টেস্ট ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তাকে ওই অভিযোগে বাদ দেওয়া শুধু অন্যায় নয় হাস্যকর। গোপাল 'গ্রুপ' করে এটাও নতুন খবর। গোপাল সম্পর্কে মাঠের মানুষ কিন্তু বলে, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের গোপালের মতই গোপাল সুবোধ বালক। ওর নাকি ফর্ম নেই। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪০ রান তো ওই করেছে। ফর্মের কথাই যদি ওঠে অম্বর রায় দলে আসে কীভাবে? অম্বর নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিককালে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। কিন্তু এ বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য কোন রান নেই। রঞ্জি ক্রিকেটেও ইডেনে আসামের বিরুদ্ধে ৪, হায়দরাবাদে জামসেদপুরে ২০, হায়দরাবাদে ২৭।

শুনেছি দল গড়ার ব্যাপারে নানা অভিযোগ তুলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-রিসিভারের কাছে দীর্ঘ এক চিঠি পাঠিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সুজিৎ বসু। চিঠির কপিও নাকি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে।

প্রশাসনের এই চিত্র। ক্লাব মহলেও কি প্রতিশ্রুতিবানদের বিকশিত করার খুব প্রয়াস আছে? ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিলীপ দত্ত নামে একটি ছেলে ১৯৭৬-৭৭এ সি এ বি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জুনিয়র ক্রিকেটার। সাহাপুর স্পোর্টিং থেকে এবার এসেছে গ্রীয়ারে। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান। ওকে কিন্তু ব্যাট করতে পাঠানো হচ্ছে সাত-আট নম্বরে—যখন রব ওঠে মারো মারো। দুই একটি ম্যাচে তিন নম্বরে পাঠানো না হয়েছে এমন নয়। যোগ্যতা প্রমাণও করেছে হাফ-সেঞ্চুরি করে। তবু ওকে শেষ দিকে পাঠানো হচ্ছে। এই হচ্ছে কলকাতার ক্রিকেটের হাল।

সীমায়িত ওভারের একদিনের ক্রিকেট উইলস ট্রফির খেলা শুরু হল এবার থেকে। পুরস্কার অর্থের ক্রিকেট। খেলল রঞ্জি ক্রিকেটের পাঁচ অঞ্চলের পাঁচটি বিজয়ী দল (বাংলা একটি)। উইলস একাদশ ও বোর্ড সভাপতি একাদশ। বাংলা দল থেকে দিলীপ দোশিকে বাদ দেওয়া হল কেন? সীমায়িত ওভারের ক্রিকেটে দিলীপ কিন্তু অপরিহার্য। গত বছর দেওধর ট্রফির খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে আট ওভার বলে মাত্র ষোল রান দিয়ে গাভাসকরের উইকেট পেয়েছিল। বিলেতে বেনসন হেজেস কাপের খেলায় বার ওভারে মাত্র এক রান দেওয়ায় জন আর্লট অসম্ভব প্রশংসা করে লিখেছিলেন—কাউন্টি ক্রিকেটে বোধ হয় বেস্ট লেফট আর্ম স্পিনার।

মুকুল

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

SRI RAMAKRISHNA (A Biography in Pictures) (1976, Price—Rs. 56).
SWAMI VIVEKANANDA (A Biography in Pictures) (1977. Second edition. Price —Rs. 62). অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবাটী, পিথোরাগড়, হিমালয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী নিয়ে অনেক লেখা বেরিয়েছে। কিন্তু ছবির ফ্রেমে তাঁদের পূর্ণ্য-জীবনকথা ধরে রাখার প্রচেষ্টা সহজ নয়। অদ্বৈত আশ্রম ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য লীলা অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে একটি দুরূহ কাজ সম্পাদন করেছেন। কোন ভারতীয় প্রকাশকের পক্ষে এত সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করা গর্বের বস্তু। আমাদের সৌভাগ্য, যে-সময়ে রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন সে-সময়ে তাঁর ফটো গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তা না হলে আমরা কি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুরকে দেখতে পেতাম? কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে কীর্তনের সময় ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে

থাকা, স্টুডিয়োর তোলা তাঁর করুণাঘন চাহনির ফটো, ঠাকুরের নিজের হস্তাক্ষর, তাঁর মহাপ্রয়াণের দৃশ্য—এ সব ছবি আজ আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রামকৃষ্ণ-জীবনের সব ঘটনা, তাঁর পূত জীবনের লীলা-সহচরী শ্রীশ্রীমায়ের কথা, তাঁর ত্যাগী সন্তানদের কথা, বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে আলোচ্য গ্রন্থে এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে তা বারবার দেখতে ইচ্ছা করে; বারবার এগুলি দেখে আমরা নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ করতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর কৃষ্টি ও সাধনার একটি প্রামাণ্য চিত্রও এই গ্রন্থে লভ্য। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী-গ্রন্থের প্রচ্ছদপট থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোভাগের ছবি খুবই সুচিন্তিতভাবে দেওয়া হয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ধানক্ষেতে সাদা বক দেখে ছয় বছরের বালক গদাধরের যে প্রথম সমাধি হয়েছিল,—প্রচ্ছদপটে তার রূপ দেখে আমরা বিস্মিত হই। ফুলের গন্ধে মৌমাছির ভিড় দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে-ই অধ্যায়ে যেখানে ঠাকুরকে ঘিরে সমবেত হয়েছেন তাঁর ভক্ত ও ত্যাগী সন্তানগণ। গঙ্গায় শেষবেলায় খেয়া তরী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে ঠাকুরের দিব্য জীবনের শেষ অধ্যায়।

স্বামীজির দিব্য জীবন-কথার ছবি নিয়ে যে গ্রন্থটি বেরিয়েছে তার দ্বিতীয়

সংস্করণে দুইটি দুষ্প্রাপ্য ছবি সংযোজিত। একটি ছবি হল কাশ্মীর হাউসবোটে মিস ম্যাকলিয়ড, মিসেস ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ,—অপর ছবিটিতে দেখতে পাই Ridgely Manor-এ স্বামী বিবেকানন্দের ছবি,—এখান থেকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, "The secret of life is not enjoyment but education through experience."

স্বামীজির জীবনের প্রতিটি ঘটনা তাঁর বাণী তাঁর সাধনা, তাঁর সহযোগীদের কথা,—সব কিছুই প্রামাণ্য ছবির মাধ্যমে বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে এই চিত্রগ্রন্থে উপস্থাপিত। এই গ্রন্থেরও প্রচ্ছদপট এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম খুবই আকর্ষণীয়, অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তুর দিকে লক্ষ রেখে ছবির মাধ্যমে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে শিরোভাগে। এই জীবনী-গ্রন্থে আমরা শুধু স্বামীজির কথাই জানতে পারি, তা-নয়, —স্বামীজির গুরুভাই, তাঁর শিষ্য-শিষ্যা এবং সর্বোপরি সমসাময়িক বাঙালী জীবনের যে স্বল্প-পরিসর পরিচিতি আমরা এই গ্রন্থটিতে পাই, তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

বিদেশী আর্ট পেপারে চমৎকার ছাপার যে নিদর্শন আমরা এই গ্রন্থ দুইটিতে দেখতে পাই এবং যে আঙ্গিক সৌকর্য ও পারিপাট্য এই গ্রন্থ দুখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

সুব্রত গুপ্ত

উজ্জ্বল ছুরির নীচে। আনন্দ বাগচী ॥ পাঁচ টাকা।
হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা। সুনীল বসু ॥ পাঁচ টাকা।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯

তাঁর ঘরে ঢোকবার চাবিটি আনন্দ বাগচী নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন: 'ছুটন্ত জানলায় বসে উল্টো চলচ্চিত্র শুধু দেখি।'

উল্টো চলচ্চিত্র মানে সদ্য ফেলে আসা দিনগুলি। সেগুলিই তাঁর কবিতার মৌল উপাদান। অর্থাৎ, তাঁর মন নিকট-বর্তমানে তেমন আকৃষ্ট হয় না যেমন সদ্য অতিক্রান্ত বর্তমানে, যা প্রত্যক্ষ করা যায় অথচ নাগালের বাইরেই থাকে।

স্মৃতি তো আর কিছুই নয়, ছবি। শুধু ছবি, ছবি আর ছবি। সময়ের উজ্জ্বল ছুরির নীচে জীবনের যে-চমকপ্রদ খেলা চলেছে আনন্দ বাগচীর কবিতা তারই করুণ রঙিন চলচ্চিত্র। আর তিনি নিজেই এই চলচ্চিত্রের দর্শক-রূপী নায়ক।

চলচ্চিত্র বলেই 'ট্রাফিক' শব্দটি তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহৃত। কিন্তু তা শুধু সময়ের বিরামহীন গতিবেগের নির্দেশক। বুঝতে কষ্ট হয় না যে কবি আসলে জনস্রোতের তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, যিনি জানেন 'প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য কিছু নেই, সব দৃশ্য উত্তেজনাহীন' এবং 'অন্য তরুণের হাতে এখন সমস্ত কলকাতা'। ছুটির ঘণ্টা শুনতে শুনতে, খেলা ভাঙার খেলা দেখতে দেখতে অনিবার্য ভাবেই তাঁর পাঠক স্মৃতিমেদুর হ'য়ে ওঠেন, রসসিক্ত হন।

আনন্দ বাগচীর কবিতা ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু তাঁর বাক্যবিন্যাসে খাঁসা গদ্য চাল। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তাঁর শব্দ ব্যবহারের চমক, উপমা প্রয়োগের যথার্থতা, ভিন্ন কবির অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তির সরস আত্মীকরণ—দক্ষ কারিগর হিসেবে তাঁর খ্যাতিকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলেছে।

হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা। নিজের কবিতার বইয়ের এমন একটি গমগমে নামকরণ অনেক কবিই করতে পারবেন না। ইচ্ছে থাকলেও সাহস পাবেন কি? সুনীল বসু পেরেছেন। কারণ, যা মনে আসে সোজাসাপটা বলে দিতে পারেন তিনি। ভাবনাচিন্তাগুলো প্রাথমিক স্তরে যে অবস্থায় থাকে যথাযথ সেই অবস্থাতেই তিনি উপস্থিত করতে পারেন। ফলে, তাঁর কবিতায় এমন একটি জঙ্গী বেপরোয়া ভাব, এমন একটি স্পষ্টতা এসেছে যা তাঁকে করেছে বিশিষ্ট। সহজ সত্য কথা সহজ ক'রে বলা ভাবী শক্ত।

সুনীল বসুর কবিতা বিশ্লেষণাত্মক। চারধারের মুখোশ-পরা মানুষ, অস্বাভাবিক মানবসম্বন্ধ, নিষ্পিষ্ট ব্যক্তিগত স্বাধইচ্ছে, বাধ্যতামূলক সৌজন্যসাধন, শূন্যগর্ভ শব্দবিলাস ইত্যাদি অসঙ্গতিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে। কখনো তাঁকে মনে হয় শুদ্ধচিত্ত দেবশিশু, কখনো বা রাগী ছোকরা। কিন্তু সব সময়েই এই কবি একজন আস্ত সুস্থ মানুষ হিসেবেই খাড়া থাকেন। তাঁর রচনারীতির একটু নিদর্শন তুলে ধরছি:

আমি এক মূর্তিমান ক্ষুধা, পাঁচ ফুটের খাঁচায় পোরা/এক দুর্দান্ত ক্ষুধার দৈত্য।/সমস্ত ইন্দ্রিয়বন্ত আর কলকব্জায় দুবেলা চিবিয়ে/চুষে চেটে খাচ্ছি এই অনিন্দ্য/স্বর্গভোগ্য খাদ্য তাজ্জব আস্ত গোটা পৃথিবীটা।

অর্ধেন্দুকুমার সরকার

সোসাইটি অব কণ্টেম্পরারী আর্টিস্ট

সোসাইটি অব কণ্টেম্পরারী আর্টিস্টদের প্রদর্শনী সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে (বিড়লা আকাদমী—নভেম্বর ২৯—ডিসেম্বর ১১)। এ'দের কাজ আমি অনেক দিন ধরে দেখছি। এ'দের মধ্যে অনেকেই কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে এ'দের কারো কারো কাজের প্রভাব পড়েছে। সুতরাং এই গোষ্ঠির শিল্পীদের একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্বর কথাটা খুলে বলি। সাম্প্রতিক শিল্পকলার যে ধারা ভারত-বর্ষের কান্তকলার অবব হিকায় প্রবাহিত হয়েছে সেটার সম্যক মূল্যায়ন করে এই সব সৃজনশীল শিল্পীদের নতুন-তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে যেতে হবে। নতুনতর সৃষ্টির আয়োজন করতে হবে। এটা আমি বিশেষ করে এ'দের কাছ থেকে আশা করি।

বর্তমান প্রদর্শনী আমাকে কিন্তু কিছু পরিমাণে নিরাশ করেছে। তার কারণটা খুলে বলি। এক ধরনের আঙ্গিকসর্বস্ব ছবির প্রতি কিছুকাল মোহবন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। এই সব ছবিতে শিল্পীর মেজাজ এবং অনুভূতির হদিস মেলা ভার। যথা—সুহাস রায়ের তিনখানা কাকের ছবি। সমস্ত পট সাদা—একটি ছবিতে কাকটি ডান পাশে! একটিতে বাঁ পাশে, শেষের টিতে মধ্যিখানে। শূন্যতের অবসর সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, যেটা জাপানী শিল্পীরা বহুদিন আগে সুন্দরভাবে দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ'র ছবি নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে মাত্র। দর্শকদের মধ্যেও একটা শূন্যতার ধোঁয়াশার আবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর মন পেলাম কই? টেনসিল এবং স্প্রে পদ্ধতিতে একটা ছিমছাম ছবি প্রযুক্ত-শিল্পতে মানায় ভাল। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত ভারতীয় অনুচিত্র ভেঙে টেমপারা দিয়ে এক ধরনের ফ্যানটাসি তৈরীতে নিপুণতা দেখিয়েছেন আগের প্রদর্শনীগুলিতে। এবার ভিনটেজ কার পর্যায়ে তিনখানা ছবি দেখিয়েছেন। এ গাড়ি প্রজাপতি বাহিত হয়ে কখনো আকাশে ওড়ে কখনো চালকবিহীন অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে। এবং কখনো পুরনো কলকাতার কোনো বাবু, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ছবিগুলোর নিঃসন্দেহে একটা মজা আছে, তবে আমার যেন মনে হলো রোমান্টিক উপন্যাসের মুন-শীয়ানা অর্জন করেছেন অবশ্যই। এবারে ভাঙা গামলা দিয়ে তিনি রচনা করেছেন তিনটি ছবি। অদ্ভুত কিছু শহুরে মানুরঞ্জন ঈষৎ জলরঙের খেলায় পশ্চাদপট এবং সম্মুখপটের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে এই পর্যায়ের একটি ছবিতে ভাঙা গামলার সঙ্গে মনুরঞ্জনের বিকৃতি সমস্ত ছবিটার রচনায় সঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর কাছে আমি আরও উন্নতমানের রচনাকর্ম আশা করেছিলাম।

এবারে প্রদর্শনীতে সুনীল দাসের কাজ আমার ভাল লেগেছে। বিরাট পরিধির মধ্যে উপযুক্ত শূন্যতার অব-সর সৃষ্টি করে রঙের যোজনা করেছেন অনায়াস ভঙ্গীতে। দুটি ছবি খুবই বড়। একটি ছবি ছোট। বড় ছবি এবং ছোট ছবি দুটি ক্ষেত্রেই তিনি দক্ষ শিল্পীর ছাপ রাখতে পেরেছেন। এটা আমি মনে করি খুবই কৃতিত্বর কথা। বিশেষত সুনীল—৩, ৭৭-এ ছবিখানি

দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে পাশ্চাত্য কোনো ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্ছনার কথা। রচনা এবং রঙের ঐকতান সম্পন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি।

গণেশ পাইনের তিনখানা ছবিতে তাঁর চিরাচরিত রচনার ভঙ্গী দেখতে পেলাম। এ'র ছবির একটা গুণ আছে যেটা দর্শকদের ভাবায় এবং রস ডুবিয়ে দেয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রচনার কুশলতা প্রতিটি ছবি-তেই আছে তবে তাঁর কাছে আরো বড় পরিধিতে তাঁর রচনাসৌকর্য দেখতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ করে তাঁর কথোপ-কথন ছবিটা আমার ভাল লেগেছে। এ ছবিতে একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে এবং

ডানপাশে একটা পাখি উদ্গ্রীব ভাবে এগিয়ে আসছে। পাখিটার ঠোঁটের কাছটা একটু আবছা হয়ে গেছে। এই জায়গাটাতে একটা ভাবনা আসে, পাখি কি কোনো কথা বলবে কানে কানে?

সুদক্ষ বিকাশ ভট্টাচার্যকে আরেকটু বিকশিত দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে দেখলাম তাঁর পুরোনো কাজের রকমফের। গণেশ হালুই-এর তিনটে কাজ আছে, তার মধ্যে বড় বড় দুটি কাজের চেয়ে ছোট ছবিটা অনেক সংবেদনশীল। মানু পারেখ গুর্জরদেশের লোকশিল্পের রূপবন্ধ ভেঙে আধুনিক করেছেন। তাঁর তেলরঙের কাজের মধ্যে একটা মজা আছে। রেবা হোড়, শৈলেন মিত্র এবং অনিলবরণ সাহার কাজ তেমন উল্লেখ করার মতো নয়।

ছাপ ছবিতে এবার দীপক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাজ আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আর সবাই সেই গতানুগতিকতার মোহে আবিষ্ট। সোমনাথ হোড়ের মতো সুদক্ষ শিল্পীর কাছে আমি অন্য আবেদন আশা করি। তাঁর ক্ষত সিরিজের কাজ আছে। সাদা জমির ওপর সাদা ক্ষত-চিহ্ন থেকে সাদা রক্ত ঝরে পড়ছে। এই ধরনের কাজ তাঁর কাছে অনেক দেখেছি। এখন একটু ক্লান্তিকর মনে হয়। অন্যান্য ছাপাই শিল্পীদের মধ্যে

সনৎ করকে একটু নিষ্প্রভ দেখলাম। শান্তিনিকেতনে ওঁর আরও ভাল কাজ আমি দেখেছি।

ভাস্কর্য বিভাগে ক্যাটালগে নাম থাকা সত্ত্বেও অজিত চক্রবর্তী প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত। মানিক তালুকদারের কাজে পূর্বে কিছু প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। এবং তাঁর পোড়ামাটির কাজগুলো একেবারেই জমেনি। তার মধ্যে দুটি কাজ আমার কেমন যেন ফুলদানির মতো লেগেছে। আর্ট কলেজে কারশিল্প বিভাগে বাঁশের ওপর কাজ করা হয়। আগুনে শলাকা পুড়িয়ে কারু কাজ করা হয়। সেই কাজের কথা মনে হলো। ভাস্কর্যের বস্তুপুঞ্জ, আয়তন, ওজন কিছুই নেই।

কাত্যায়ন সাকলাত দলের দ্বিতীয় মহিলা শিল্পী। এবার তিনি কাপড় কেটে কোলাজ করেছেন। এটা দেখতে স্টেনড গ্লাসের মতো। নানারকম রঙীন কাপড়। সিলক, ফ্লানেল, সুতি। সুতরাং দেখতে ভাল। একটা ডিজাইন আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রচনা দুর্বল হওয়াতে কাজ মোটেই জমেনি।

রথীন মৈত্র

ছাপাই ছবি : নতুন পদ্ধতি

হোসেঙ ডি পি পান্ডরীর বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র তাই কলকাতা সম্বন্ধে দুর্বল। থাকেন বোম্বাই-এ। প্রথম প্রদর্শনী করতে কিন্তু এই মহানগরে ফিরছেন। পার্সী তিনি তবু জন্ম-কর্ম তো এখানে। ন' বছর ধ'রে সময় পেলেই গভীর নিষ্ঠায় ছাপাই ছবি (Graphics) নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইংরাজী 'গ্রাফিকস' শব্দটি খুবই ব্যাপক

বিরাট কাজ (১২৭ সি এম × ৭৪ সি এম)। ভারতবর্ষে এত বড় ছাপাই ছবি মুদ্রণ যন্ত্রে ফেলে রোলার দিয়ে কেউ ছেপেছেন ব'লে জানা নেই। অথচ তাঁর ছাপা খুবই উন্নতমানের। ছবির বুনোটের মজাদার কারিকরী তাঁর কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেয় (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ২২-২৮ জানুয়ারী)। মিস্ত্রীর মতো দৈহিক পরিশ্রম এবং কিছু নান্দনিক জ্ঞান তাঁর কাজে আছে। অদ্ভুত মিতকথনে ছবি জমিয়েছেন। অঙ্কনে ফাঁকি চাপা দেবার জন্যে অনেকে ছাপাই ছবি করেন এবং সেখানে অঘটন ঘটলে সেটা নিজের কাজ ব'লে চালানো যায়। হোসেঙ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। অঙ্কন মন্দ নয়; কিন্তু অনেক সময় তিনি অংকনের ওপর জোর দেবেন, না রঙের বুনোটের ওপর—তা স্থির করতে পারেননি ব'লে ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কখনো কখনো গুহাচিত্রের রঙচটা বুনোটের ভাবটা এসেছে। বিশেষত যেসব জায়গায় তিনি অজন্তার নারীদের মুখ রেখায় রেখায় ওপরে ওপরে আরোপ ক'রে নতুন ভাবে রচনা নিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন। হয়তো দুটো হাতি পাশে রেখেছেন। কিংবা খনির ভেতরে দুজন শ্রমিক। এসব কাজে জোর আছে। আছে ভারতীয় বর্ণস্পর্শ। আবার কিছু কাজে ভিজে ভিজে মেঘের বা চন্দ্রপৃষ্ঠের রূপের বিমূর্ততা নিয়ে খেলেছেন। পাথুরে উবড়ো-খাবড়া বুনোট। কিন্তু কিছু কাজ বুনোটের জন্যেই বুনোটে মেতেছেন। নিরাকার। কাঠামো নেই, রচনা নেই। তবু তাঁর আন্তরিকতা এবং সংবেদের জন্য ভাল লাগে। এইসব ক্ষেত্রে দক্ষতাই প্রধান হয়ে ওঠে এবং নান্দনিক বিস্ফোরণ ঘটে না কোনো তবু তাঁর

এবং যেসব মাধ্যমে ছাপ মুদ্রিত ক'রে তোলা হয় তাকেই বোঝায়। এই ছাপ তোলার জন্যে নানারকম ব্লক, প্লেট, স্ক্রিন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় যথা এনগ্রেভিং, এচিং লিথোগ্রাফি, সেরিগ্রাফি, ড্রাই পয়েন্ট, অফসেট। এমনই এক ধরনের নতুন পদ্ধতি বার করেছেন হোসঙ। পেটেন্ট পর্যন্ত নিয়েছেন। এগুলি স্টেনসিল কেটে তিনি রিলিফ প্লেট তৈরী করেন নানারকম রজন এবং প্লাস্টিকের শিট দিয়ে। প্লাস্টিকের ছাঁচটা ধাতু বা দস্তার ছাঁচের চেয়ে টেকসই হয়। সুতরাং মুদ্রণ কাজে ব্যবহার হলে এর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ খরচ খুবই কম।

হোসঙ অশরীরী (non figurative) এবং অবয়বী দু'রকম ছবিই রেখেছিলেন। ছোট বড় মিলিয়ে মোট চোদ্দটা ছবি। তার মধ্যে একটি পরীক্ষার মধ্য অনুসন্ধিৎসা আছে এবং সেইজন্যে তাঁর কাজ মন্দ লাগে না। এমন উন্নতমানের এবং এত বড় দিশী ছাপাই ছবি কম দেখেছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো হোসেঙ একটি নতুন নিখুঁত এবং সস্তা পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন।

সন্দীপ সরকার

বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার

সাঙ্গীতিকের বসন্ত উৎসবের প্রথম বৈঠকে (ফেব্রুয়ারি ২৬) শোনা গেল বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার বাদন। তাঁর প্রথম নিবেদন ছিল রাগ দুর্গা। হাত গরম করে নেওয়ার ছলে শিল্পী প্রথমেই কিছু ভাল তান-তোড়া

শোনালেন। এর পরে শোনা গেল এই রাগেই একটি দ্রুত তিনতাল গৎ এবং এতে ছোট, মাঝারি ও লম্বা তানগুলি উৎকৃষ্ট হয়েছিল। স্বপন চৌধুরী ভাল তবলা সংগত করেছিলেন এবং সেতারের তেহাই, তোড়া ও মোহরার নিপুণ জবাব দিয়েছিলেন। ঝালার আগে ছন্দোময় বোলকারিও ভাল হয়েছিল, তবে জুড়ি-চিকারি নায়কির চেয়ে জোরে বাজায় ঝালা যথেষ্ট ভাল হয়নি।

শিল্পীর দ্বিতীয় নিবেদন ছিল লুপ্তপ্রায় পট্-বেহাগ রাগে আওচার, জোড় ও তিনতালে নিবদ্ধ বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ। শিল্পী সেনী মতের অর্থাৎ বিলাবল ঠাটের পট্-বেহাগ বাজিয়েছিলেন যার সুষ্ঠু রূপায়ণ শিল্পীর রাগের চলনের এবং চলনের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম খোঁচখাঁচের ওপর দখলের উপরই নির্ভর করে। কোমল গান্ধার যুক্ত পট্-বেহাগ পরিবেশন করা অনেক সহজ—যদিও দুই গান্ধারের ব্যবহারে এটির কাঠামো একটু এলো-মেলো হয়ে পড়ে। শিল্পীর রাগ রূপায়ণ উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং মুহূর্তের জন্যেও বেহাগ বা বেহাগড়ার ছায়া এসে যায়নি। তবে এটিই আওচারের একমাত্র গুণ ছিল না—শিল্পী অল্প সময়ের মধ্যে এই রাগের প্রত্যেকটি অঙ্গের যে চুলচেরা বিস্তার করেছিলেন এবং অর্থপূর্ণ মীড়, আশ ও মুড়কির ব্যবহারে বিস্তারের মধ্যে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার তুলনা বিশেষ পাওয়া যায় না। জোড়টিও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং বিলম্বিত গৎটিতে দক্ষ বক্র লয়কারি এবং সুগঠিত তানকারি ছিল। দ্রুত গৎটিতে বিস্তারের কাজ, তার-পরন ও তানকারির এক আনন্দদায়ক সমাবেশ ঘটেছিল। ঝালার কাজও ছিল সুরেলা, পরিষ্কার ও ছন্দোময়। স্বপন চৌধুরীর জবাব, রেলা ও টুকরায় যে সমঝদারি ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গেল তার তুলনাও বিরল।

এর পরে শোনা গেল হাম্বির রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ। বিলম্বিত গৎটিতে ছিল সুখশ্রাব্য জোড় অঙ্গের কাজ এবং আরো উৎকৃষ্ট তান-তোড়া। দ্রুত গৎটি ছিল অমৃত সেন (১৮১৩-১৮৯৩) রচিত এবং এতে জুড়ি-না-ছোঁয়া তানের কাজ অতি নিপুণ হয়েছিল। অতি-দ্রুত গৎ ও ঝালার কাজও ভাল লেগেছে। শিল্পী একটি রাজস্থানী ধুন ও অমৃত সেন রচিত এক খাম্বাজ দ্রুত গৎ বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের একক আসর

যখন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, তখন থেকেই গান শুনছি তাঁর। বেতারে এবং যত দূর মনে পড়ে, রেকর্ডেও। তারপর মুখোপাধ্যায় হলেন। গানের জগৎ থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বলে মনে পড়ে না। প্রথম থেকেই তীক্ষ্ম, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ কণ্ঠ তাঁর। রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত। কম দিন তো হল না। সেই পঞ্চাশের শুরু থেকে বেতারে শিল্পী পূরবী চট্টোপাধ্যায় একটানা গান শুনিয়ে আসছেন। ১৯৫৪ থেকে রেকর্ড বেরুচ্ছে নিয়মিত। বিদেশ ঘুরে এসেছেন, বাংলাদেশেও গিয়েছেন কয়েকবার। যশ এবং বয়স তাঁর কণ্ঠের সাবলীলতা একটুও কেড়ে নেয়নি। একই জায়গায় ধরে রেখেছেন কণ্ঠের তারুণ্যকে। কোনো অবসাদ আসেনি, কোনো স্খলন বা চ্যুতি ঘটেনি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যময় কণ্ঠের কোথাও। আগেও যেমন, এখনও তেমনই, একই-রকম ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের সহজ সুরের মেজাজী কিছু গান পূরবী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শুনতে।

সে কথারই প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন—গত ২৬ ফেব্রুয়ারি—রবীন্দ্র-সদনে। মুখ্যমন্ত্রীর আর্তত্রাণ তহবিলে অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক দুর্যোগের জন্য সাহায্যকল্পে পূরবী মুখোপাধ্যায়ের একক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন 'ঘরোয়া' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপস্থিত থাকতে পারেননি। ৫০০১ টাকার সাহায্য

দেওয়ার কথা অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঘোষণা করা হল।

এর পর আসরে এলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়। দু ভাগে ভাগ করে-ছিলেন শিল্পী তাঁর গানের অনুষ্ঠান। প্রথমার্ধে পূজা ও প্রেমের বারটি গান। বিরতির পর বসন্তের ন'টি গান। দু-তিনখানি গানের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপ ঘোষের কণ্ঠে শোনা গেল রবীন্দ্র-কবিতা। মূল অনুষ্ঠানের মেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে বাছাই কিছু কবিতা শোনালেন প্রদীপ ঘোষ।

পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করলেন 'প্রথম আদি তব শক্তি' দিয়ে। পরের গান ছিল 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে'। কিন্তু সংগতের অতিরিক্ত ঝংকারে তাঁর আরম্ভের এই গান দুটিতে কণ্ঠ হারিয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় গানে (শুধু তোমার বাণী) সংগত ছিল ন্যূনতম। কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল পূরবী মুখো-পাধ্যায় যখন চতুর্থ গানটি ধরলেন। 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'—এই গানটি শুনিয়েই পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করলেন, এই জাতীয় সহজ স্ফূর্তির গানে এখনও তিনি কি অসামান্য। সেই দাপট অক্ষুণ্ণ ছিল 'এ মণিহার' 'ধরা দিয়েছি গো', 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই' ও দ্বিতীয়ার্ধের

'মোর বীণা ওঠে', 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত, 'অনেক দিনের মনের মানুষ', 'আমার মল্লিকাবনে' এবং 'ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা'তে। ছিল কৈশোর যৌবনের উতলা আবেদন 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো'তেও। কিন্তু 'নববধূর মতো শঙ্কিত দীপশিখা'র আকুল অনুনয়—'ধীরে ধীরে ধীরে বও'—পুরবীর তীক্ষ্ণ গায়কীতে যে কিঞ্চিৎ মেজাজছুট লাগে এ কথাও সেই সঙ্গে মনে হল। মনে হল, কণ্ঠের তারুণ্যকে যেমন সহজে ধরে রেখেছেন পূরবী মুখোপাধ্যায়, পরিণতিকেও তেমনই হয়তো সরিয়ে রেখেছেন অজ্ঞান্তে। না হলে এত স্বাভাবিক গুণপনা যাঁর কণ্ঠে, 'ও চাঁদ চোখের জলে' গানটিতে 'জোয়ার' এত বেমানান রকমের দীর্ঘ শোনাবে কেন, কেন 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ'-এর 'আকাশ' এত বহুশ্রুত হয়েও অচেনা মনে হবে তাঁর গাইবার ধরনে? গায়কীর তফাতে কি সুরেরও এত হেরফের মনে হয় কানে? অথচ সেই বুনুনিতেই তৈরী হয়েছিল এই দুটি গানে।

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের একক আসর

'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার, হয়নি সে গান গাওয়া'—এই কথাটাকেই অন্যভাবে বলে অনুষ্ঠান শুরু করলেন অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় সেদিন—গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসর হলে হয়তো ওই গানটি দিয়েই শুরু করতেন কোনো শিল্পী। সে-দিনের বিষাদ-বিস্তৃত পরিবেশে নতুন অনুষঙ্গ পেত সে গানের বাণী। কিন্তু নজরুলগীতির সচেতন শিল্পী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুব্রত সরকার

শোকতর্পণের জন্য বেছে নিলেন নজরুলেরই একটি অনন্য রচনা—'সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়ে, তুমি ফিরিলে না ঘরে'। সেদিনের অনুষ্ঠান সূচীতে নির্ধারিত ছিল না এই গান। তবু যে শিল্পী তাঁর প্রথম অঞ্জলি নিবেদন করলেন এই গানটি দিয়ে তার কারণ, সেদিনই মধ্যাহ্নের সূচনা হয়েছে সঙ্গীতজগতে এক ইন্দ্রপতনের শোকচ্ছায়া সঞ্চারিত করে। নরলোক থেকে সুরলোকে পাড়ি দিয়েছেন সুরসাগর পঙ্কজকুমার মল্লিক। "দিনের শেষে ঘুমের দেশে"—যখন সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী, এ জীবনের সব লেনদেন যায় ফুরিয়ে, তখন "দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না", তাঁকে আর কোন্ গানে এমন করে স্মরণ করা যেত।

সেদিনের একক আসরের আয়োজন করা হয়েছিল দাতব্য অনুষ্ঠান হিসেবে। 'মেনকা ভিলেজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' নামের একটি কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে নজরুল-গীতির এই অনুষ্ঠান। সংস্থার উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রয়াত পঙ্কজকুমার মল্লিকের স্মরণে এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হল। ধন্যবাদ দেওয়া হল একক আসরের শিল্পী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়কে এই অনুষ্ঠানে র তাঁর সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করা হল। হাস্যকর লাগল এই ভেবে যে, এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুই গ্রামকে 'ভিলেজ' এবং কল্যাণমূলক কাজকে 'ওয়েলফেয়ার' বলেই অভিহিত করেন না, ইংরেজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাও পোষণ করেন, এঁরা। স্যুট পরা ঘোষকের বিশুদ্ধ বাংলা ঘোষণার পরে শাড়ি পরিহিতা বঙ্গললনা ইংরেজীতেই ধন্যবাদ জানালেন এবং প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন ইংরেজী ভাষাতেই। নজরুল যে ইংরেজীতে গান লেখেননি, এতে এঁরা মর্মাহত কি না, তা অবশ্য বোঝা যায়নি। এটুকুই শুধু সান্ত্বনা।

যাই হোক, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় তাঁর একক আসর শুরু করলেন 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' গানটি দিয়ে। মুদ্রিত অনুষ্ঠানসূচীর প্রথম গান এটি নয়, সেই সূচীতে ছিল—'প্রথম প্রদীপ জ্বালো'। কিন্তু সেদিনের আসরের পরিবেশ যেভাবে বদলে গিয়েছিল, তাতে প্রথম প্রদীপটি যে অন্য গানেই জ্বালাতে হয়েছিল তাকে সে কথা আগেই বলেছি। বস্তুত নির্ধারিত সূচীর কুড়িটি গানের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সেই সূচী থেকে দশটি ও অন্য দশটি গান বেছে নিয়ে অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় তাঁর একক গানের ডালি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ধরা পড়ল কারণ শুধু বাইরের দুর্যোগ নয়, শিল্পীর কণ্ঠেও দুর্বিপাক কিছু ঘটে গিয়েছে গলা একেবারে ধরা ছিল প্রথম দিকে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন শিল্পী। দেখা গেল কণ্ঠ সম্পর্কে যেখানেই সামান্য সংশয় দেখা দিচ্ছে, সেখানেই মাইক থেকে গলা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, রেশ কেটে যাচ্ছে বারবার। কণ্ঠের যে দাপট অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের গানের প্রাণ, সেই দাপটই অনুপস্থিত। শিল্পীও এক-সময় স্বীকার করলেন সে কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানে এক ধরনের আমেজ এনে দিতে পেরে-ছিলেন অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। বিরতির পর তাঁর গলা অনেকটা খুলে গিয়েছিল। একেবারে শেষ গানে, 'বল রে জবা বল' গানটিতে কণ্ঠ আবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মধ্যবর্তী অনেক গানের ফাঁক তিনি যে অসামান্য মেজাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষত, 'কে নিবি ফুল', 'নাইয়া ধীরে চালাও তরণী', 'আমার যারা দেয় মা ব্যথা', 'বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়', 'তেপান্তরের মাঠে' এবং 'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ' দারুণ জমাটি পরিবেশন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

দুই পুরুষ

কয়েকটি প্রি-টাইটেল এসট্যাবলিশিং শটস দিয়ে ছবির আরম্ভ। এ-সব দৃশ্যাবলীর বিষয়বস্তু : জেলের দরজা; নুটুবিহারীর জেল-মুক্তি; ক্রুদ্ধ শিশির বটব্যাল (এই একটি মাত্র দৃশ্যের জন্য তিনি এসেছেন) : সিঁড়িতে শিশিরবাবুর ওঠানামা, ঘরের মধ্যে পায়চারি এবং এই তীব্র উক্তি যে, তাঁর মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে (অভিনয়ে লিলি চক্রবর্তী) নুটুর বিবাহ সম্ভব নয়, যেহেতু নুটু স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান হেতু জেলের আসামী; এর পর নুটুর কিছু বক্তৃতাধর্মী সংলাপ, এবং একই দৃশ্যে ক্রমাগত পালটে পালটে যাওয়া নুটুর কপালের ওপরের চুল; এবং কঙ্কনা গ্রামে চাষীদের ঘরে আগুন ধরিয়ে জমিদাররূপী তরুণকুমারের বন্দুক বাগিয়ে ধরা, এবং সেই বন্দুকের বিরুদ্ধে নুটুবিহারীর বিজয়ী বাহুবল। নুটুবিহারীর চরিত্রে অবশ্যই উত্তমকুমার। এবং শেষোক্ত অতিনাটকীয় দৃশ্যটির ওপরই সোচ্চার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের সঙ্গে টাইটেল শুরু হয়।

অধিকাংশ বাংলা ছবির টাইটেল সিকোয়েনস ছবির দুর্বলতম অংশের একটি। অথচ এ-দেশের চলচ্চিত্র সমালোচনায় কোনো ছবির টাইটেল শটস নিয়ে কথা ওঠে না—প্রায় কখনই না! 'দুই পুরুষ' প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ ছবির টাইটেল সিকোয়েনস টালিগঞ্জের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। প্রথমত, বেশ কয়েকবার একেবারে তলার নামগুলির প্রায় অধিকাংশই ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত পর্দার বাঁ ধার থেকে একের পর এক নামের তড়িৎগতি আনাগোনা ক্লান্তিকর ও চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। তৃতীয়ত, অক্ষরের গঠন, বিন্যাস এবং ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের ব্যবহার সোচ্চারভাবে পুরোনোগন্ধী। এই টাইটেল সিকোয়েনস-এ বিশুদ্ধ ভিসুয়ালস-এর অভাব বড় শোচনীয়। এর একটিমাত্র উদ্দেশ্য হলো নেহাত মোটা চালে আমাদের কাছে কয়েকটি তথ্যের পরিবেশনা মাত্র, যেমন শ্রেষ্ঠাংশে উত্তমকুমার, কাহিনী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, চিত্রনাট্যে বিকাশ রায়, পরিচালনায় সুশীল মুখার্জি, ক্যামেরায় বিজয় দে ও শান্তি দত্ত, শব্দগ্রহণে অনিল নন্দন, সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী, সঙ্গীত পরিচালনায় অধীর বাগচী ইত্যাদি।

একেবারে প্রথম দিকের কয়েকটি দৃশ্যের বর্ণনা দিলেই বুঝবেন 'দুই পুরুষ'-এ ঠিক কোন পর্যায়ের চিত্রনাট্য, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনার সমন্বয় ঘটেছে। যেখানে টাইটেল শুরু সেখানে একেবারে প্রয়োজনহীনভাবে একটি গান, এবং সে গানের কথায়, এমনি সব শব্দসমন্বয় : "সুখের বৃন্দাবন, দুকূল ভাঙা উজান এখন নয়নযমুনায়" ইত্যাদি। অর্থাৎ এখনো সেই সাবেকী ফরমুলা কাজ করছে—সিনেমা-কি-খেল-এর পূর্বে লাগাও এক জোরদার গানা, না হলে ভিড়ভাট্টা হবে কি করে? না হলে আর কি উদ্দেশ্যে, কাদের খুশী করার জন্য টাইটেল সিকোয়েনস-এর আরম্ভ গান দিয়ে? তারপর গান থেকে কাট করে দুর্গা প্রতিমার মুখ ও ঢাকের বাদ্যি। এই নিয়ে বাংলা ছবিতে প্রারম্ভিক সিকোয়েনস-এ দুর্গা বা কালী ঠাকুরের মুখ কতবার দেখলাম? তারপর কাট করে স্বপনকুমারের মুখ (যাত্রা) এবং

উত্তমকুমার নন্দিনী

সেখান থেকে লং শটে আবার দুর্গা প্রতিমা, তারপর প্রতিমার দিকে ধীরে ধীরে ক্যামেরা এগোতে থাকে এবং মাঝপথে কাট করে একটা যাত্রার মহড়া-দৃশ্যে চলে যায় যেখানে জমিদারের ছোট ছেলে (অভিনয়ে সমরকুমার) মহাভারত নামের গ্রামের এক চাষীকে (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) লাথি মারে। লাথি খেয়ে মহাভারত বারংবার "আমার মুখে লাথি মেরেছে" বলে বিলাপ করতে থাকে, এবং আমরা হঠাৎ কাট করে প্রথমে একটি দেয়াল-লিখন (ইট ইজ ইজিয়ার ফর এ ক্যামেল টু পাস থ্রু দ্য আই অফ এ নিডল দ্যান ফর এ রিচ ম্যান টু এনটার ইনটু দ্য কিংডাম অফ গড) এবং মুহূর্ত পরে একটি বইয়ের ওপর চলে যাই, যার মলাটে লেখা "পল্লীসংস্কার"। এই পুস্তকে নিমগ্ন মানুষটির হাত আর বই যা মুখ আড়াল করে ছিলো এবার সরে যায়—আমরা উত্তমকুমারকে দেখতে পাই। অর্থাৎ দুর্গাপুজো, চাষী-জমিদার, ধনীর অত্যাচার, পল্লী-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলি দর্শকের সামনে রাখা হলো। খুব ভালো কথা। কিন্তু সেটা যেভাবে হলো তাতে প্রথম থেকেই এ ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা যে কোন পর্যায়ের হতে চলেছে সেটা দর্শক বুঝতে পারে। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই বিমলারূপী সুপ্রিয়া দেবী গালে হাত দিয়ে রান্নাঘরে বসে থাকার দৃশ্য-

কল্পনাটি ছবিটির বিষয়ে দর্শকের প্রাথমিক ধারণাকে আরো মজবুত করে। আমি যে উদ্দেশ্যে এইভাবে বিশ্লেষণ করে ছবির প্রারম্ভিক দৃশ্যাবলীকে এখানে রাখলাম তা হলো শুধু এই খবরটুকু পেঁাছে দেওয়া যে, আধুনিক সিনেমা-ভাবনায় এ স্টাইল আর গৃহীত হয় না—এ জিনিস একেবারে অচল। গল্পের নায়ক সমাজকর্মী—এই তথ্যের এসট্যাবলিশিং শট হিসেবে তাকে 'পল্লীসংস্কার' নামের একটি আনকোরা প্রচ্ছদের বই পড়তে দেখানো কি বড্ড ফাঁকিবাজির এবং কাঁচা কাজ নয়?

কিন্তু এ ধরনের কাঁচা কাজ তো সারা ছবিতে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে আছে, প্রায় যে-কোনো জায়গা থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। ঠিক 'বিশ্রামের' পূর্ব-মুহূর্তে কয়েকটি দৃশ্যের কথা ভাবুন—চিত্রনাট্যের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠবে। নুটু মোক্তার থেকে আগামী দিনে উকিল হবে—এই তথ্যটুকু, নুটুর ক্রমশ পরিবর্তিত চেহারা, চুলের কায়দা এবং সাজপোশাকের কয়েকটি শট পাশাপাশি জুড়ে এবং ওভারল্যাপিং করিয়ে পরিবেশন করা হলো। চিত্রনাট্যের দুর্বলতার জন্যে পরিচালককে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, কিন্তু এডিটিং এমনি দুর্বল, কিংবা মসৃণ এডিটিং-এর উপযোগী শট হয়তো না থাকার দরুন সমস্ত ব্যাপারটা একটা সুঠাম চেহারা পাবার আগেই মনে হয় যেন "বিশ্রাম" কথাটাকে জোর করে পর্দার ওপর লটকে দেওয়া হলো। তারপর টেকনিক্যাল কাজেও তো এ ছবি একেবারে নাবালক। বাঈজীর কাছে জমিদারপুত্রের গান শোনার দৃশ্যটি ভাবুন। আঁকা আকাশে আঁকা মেঘের পাশে একেবারে কম্পাস-নিটোল আঁকা চাঁদ—আর কতদিন বাঙালী দর্শক এই 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' মার্কা বস্তু সহ্য করবে? এবং সেই সঙ্গে এমনি গান : "চাঁদের এত বাহার/এই ভরা পূর্ণিমা রাতে/এই রাত আরো যে মধুর তুমি রয়েছো সাথে"?

সংগীতপ্রিয় বাঙালী দর্শক শুনে হয়তো খুশী হবেন যে, এ ছবিতে এরকম একটি-দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচখানা গান আছে! কল্যাণীর ছোটো ভাই সুশোভন (দিলীপ রায়) লখনৌর বাঈজীদের কাছে গান শিখেছে, এবং তার চেয়েও বেশী শিখেছে মদ খাওয়া। সুতরাং পরিচালক ছবিতে গান সংযোজনার সুযোগটি কাজে লাগিয়েছেন। লখনৌ-বাঈজীদের দ্বারা দীক্ষিত শিল্পীর প্রথম গান, "আমি সুখী কত সুখী কেউ জানে না" ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি, তার কোনো গানের মধ্যেই লখনৌ-এর গন্ধ পেলাম না। এবং তিনি এত বড় শিল্পী যে, জমিদার-বাড়িতে বিকেল সাড়ে চারটের সময় গান গাইতে বসে (গ্রান্ডফাদার ক্লকে সময় সাড়ে চারটে দেখানো হয়েছে।) উপযোগী রাগ হিসেবে প্রথমে বেছে নেন "বেহাগ" (রাত্রি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের রাগ), পরে "বসন্ত" (রাত্রি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরের রাগ) এবং তারও পরে "ইমন" (আরও এক রাত্রির রাগ)! আর যদি বলেন যে, সময়টা বিকেল নয়, ভোর সাড়ে চারটে, তা হলে তো সবই একেবারে গণ্ডগোল।

এ ছবিতে অভিনয় সম্পর্কে একটাই বক্তব্য—শিল্পীদের নিষ্ফল কিন্তু সৎ প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। শুধু একটা কথা—নটুবিহারী একটি দৃশ্যে আবৃত্তি করে বলেন, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান/অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।" কথাটা তাহাদের। সেইটাই ছন্দের দাবি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'পদের' সঙ্গে 'তাহাদের'—এই গুরু-চণ্ডালী মিশ্রণ ঘটিয়েও সে দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুলহন ওহি যো পিয়া মন ভায়ে

বধূ হবার যোগ্যতা তারই আছে যে প্রিয়তমের মন জয় করতে পারে। এই যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারটি নিয়েই ছবির যা কিছু মজা। বিরাট ধনী মদন পুরীর একমাত্র নাতি প্রেমকৃষণের দুলহন কে হবে—সহজ সরল মনের ফুলওয়ালী রামেশ্বরী অথবা উগ্র আধুনিকা শশীকলার উগ্রতর আধুনিকা কন্যা শ্যামলী—তাই নিয়েই যত নাটকীয়তা। মধুসূদন কালেলকার রচিত এই কাহিনীর উৎস অবশ্যই সাগরপারে—যেখান থেকে বাংলা ছবি 'যোগাযোগ'-এর ঘটনা আহরিত হয়েছিল। ছবির নির্মাতারা বিদেশী সাহিত্যকে স্বীকৃতি না জানিয়ে ঘোর স্বদেশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মৃত্যুপথযাত্রী মদন পুরী যখন তার নাতবউকে শেষ মুহূর্তে দেখতে চাইল এবং মরবার আগে আশীর্বাদ করে যেতে চাইল, প্রেমকৃষণের প্রিয়তমা শ্যামলী তখন কাশ্মীরে। প্রক্সি দেওয়া হল ফুলওয়ালী রামেশ্বরীকে দেখিয়ে। আর অমন সরলপ্রাণা নাতবউকে দেখে মদন পুরীর অসুখ ভাল হয়ে গেল। ছবির মজাটা জমল তখন থেকেই যা ইনটারভ্যাল পর্যন্ত অটুট ছিল, এবং ছবিটি হয়ে উঠেছিল পরম উপভোগ্য। কিন্তু পরিচালক লেখ ট্যানডন যখন ছবির হালকা মেজাজটিকে সিরিয়াস করে তুলতে চাইলেন তখনই ঘটল বিপত্তি। ছবিটা হয়ে গেল গতানুগতিক আর পাঁচটা ছবির মত। তবু রক্ষে, পরিচালক কোন ছুতোয় মারপিটের আমদানি করেননি, তাহলে আরও কেলেঙ্কারি হত। শ্যামলীর মা শশীকলার সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রামেশ্বরীই প্রেমকৃষণের দুলহন হতে পেরেছে। দর্শকের প্রত্যাশাও পূর্ণ।

রাজশ্রী প্রোডাকসনসের এই ছবির অভিনয়ের দিকটি খুব জোরদার। মদন পুরী, ইফতেকার, শশীকলা ইত্যাদি পুরনো শিল্পীদের পাশে প্রেমকৃষণ এবং আনকোরা নতুন শিল্পী রামেশ্বরী ও শ্যামলীও চমৎকার অভিনয় করেছেন। জগদীপের অভিনয়ে ভাঁড়ামী একটু বেশি থাকলেও ওই চরিত্রের মানবিক ব্যাপারটি দর্শকের হাততালি পেয়েছে। আর চমৎকার গান রচনা ও সুর করেছেন রবীন্দ্র জৈন। বোম্বাই ছবির সংগীতের নানা হট্টগোলের মধ্যে এই দৃষ্টিহীন মানুষটির ভারতীয় রাগসংগীতের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য হয়তো আমাদের ফিল্মী সংগীতকারদের নতুন করে দৃষ্টিদান করবে।

রবি বসু

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্তের সৃষ্টি হবে।
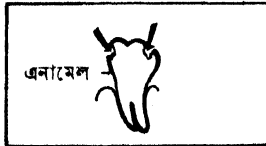
সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।
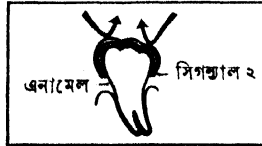
সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

চিঠিপত্র

মুখোশ ও ছো-নাচ

দেশ পত্রিকার "চিঠিপত্র" আমাদের হাতে ভুল সংশোধনের একটা ভাল সুযোগ এনে দিয়েছে। শ্রীপ্রণব রায় লিখিত "মুখোশ ও ছো-নাচ" রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর "চিঠিপত্রে" কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা আমরা পেলাম। কোন কোন খ্যাত লেখক পর্যন্ত আঞ্চলিক সংস্কৃতি নিয়ে দ্রুত লিখে

কার্তিক

গেছেন, এবং প্রচুর ভুল তথ্য প্রচার করেছেন। সাধারণ পাঠকদের এই শ্রেণীর রচনা বিচার করে নেওয়ার উপায় ছিল না। বরং এই সব রচনা তরুণ লেখকদের উপকরণ সংগ্রহের উপজীব্য হয়েছে।

ডাবর, পুরুলিয়া থেকে শ্রীপশুপতি
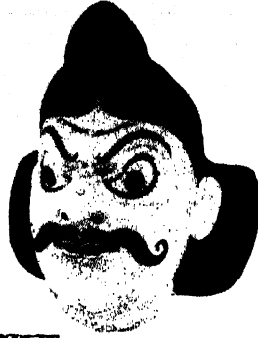
পরশুরাম

মাহাত (২৮ ফেব্রুয়ারী, দেশ) যে চিঠিখানি লিখেছেন তার বক্তব্য সমর্থন করে মাত্র দু-এক কথা এখানে লিখছি! শ্রীমাহাত শ্রীপ্রণব রায়ের ছবিগুলিতে যে ভুল ধরেছেন তা সঠিক, অর্থাৎ "কার্তিকেয় ও লক্ষ্মী" নিঃসংশয়ে হবে "কিরাত ও কিরাতিনি।" অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কার্তিকের গোঁফ কখনও বড় হয় না। উক্তিটি বিশদ করার জন্য কার্তিক মুখোশের একটি ছবি দেওয়া হল,—একেই বলে "বাবু" মুখোশ। শ্রীমাহাত কার্তিকের পেটে বাঁধা যে ময়ূর-মুখোশের উল্লেখ করেছেন, তারও একটি চিত্র দেওয়া হল। ময়ূরটি অবশ্য সব দলে বা সব ক্ষেত্রে কার্তিকের সঙ্গে নাও থাকতে পারে।

শ্রীপ্রণব রায় "পরশুরামের যুদ্ধ আস্ফালন" নামে যে ছবিটি দিয়েছেন,

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা!
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহের মূল্যবান পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার... ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে!
ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
Cadbury's
Bournvita
More Cocoa
৭৫ পয়সা বাঁচান
৪৫০ গ্রামের কম খরচের রিফিল প্যাক কিনলে।
জরুরী কথা: বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।
OBM 8376 BEN

কার্তিকের ময়ূর

ওটি কোন অসুরের আসরে প্রবেশের ছবি। শ্রীমাহাতর চিঠিতে পরশুরামের যথাযথ বর্ণনা আছে। পরশুরাম-মুখোশের একটি ছবি এখানে দেওয়া হল।

নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ দত্ত মহাশয় লিখিত 'ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। প্রভূতকীর্তি পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে কৌতূহলী ব্যক্তি বিরল নন, অতএব প্রবন্ধটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধ এই লেখাটির জন্য লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি জিজ্ঞাসা রাখছি আশা করি তিনি পত্রিকা মারফৎ কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে বাধিত করবেন। (১) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণবের' একটি পুঁথি ছিল বলে এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে (পৃঃ ১৪), সেই পুঁথিটি এখন কোথায়? জাতীয় গ্রন্থাগারে আশুতোষ সংগ্রহে 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণবে'র দুটি পুঁথি আছে, উল্লিখিত পুঁথি কি তার অতিরিক্ত?

(২) ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন কোন লেখায় কি প্রসঙ্গে বর্তমান নিবন্ধপ্রাপ্ত (পৃঃ-১৪) 'নতুন খবর' দিয়েছেন?

(৩) এই প্রবন্ধে (পৃঃ-১৬ ৩য় কলমে) উল্লেখিত 'জগন্নাথের চরিতকার' কে?

জগন্নাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহের জন্য লেখক যেসব প্রামাণিক গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহার করেছেন তার প্রাপ্তিস্থান সহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেলে খুব ভালো হতো।

প্রসঙ্গত আলোচ্য নিবন্ধে ব্যবহৃত সংস্কৃত উদ্ধৃতি ও তার অনুবাদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এগুলির অর্থবোধ যে সুগম হলো না তার আংশিক কারণ অবশ্যই ছাপার ভুল। প্রবন্ধের ১১শ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে 'বিবাদভঙ্গার্ণব' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে 'পিতামহচরণাশ্চ

চৌরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি' —এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে 'পণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের প্রসাদে চুরি করা দ্রব্যে চোরের স্বত্ব স্বীকার করা হয়।' সবিনয়ে জানাই এই অনুবাদ ঠিক হয়নি। 'পিতামহচরণাঃ' বলতে জগন্নাথ এখানে নিজের পিতামহ বাচস্পতি ভট্টাচার্যকে বুঝিয়েছেন, অতএব এই পঙক্তির অনুবাদ হবে, 'গ্রন্থের পিতামহও চুরি করা দ্রব্যে চোরের স্বত্ব স্বীকার করেন।' পিতামহের সিদ্ধান্তের প্রামাণ্যে বিষয় ব্যবস্থা করতে জগন্নাথকে একাধিকবার দেখা গিয়েছে, উদাহরণ-স্বরূপ স্বত্বের প্রসঙ্গেই 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। 'অথ ধনগতং স্বত্বং পুরুষগতং বা স্বামিত্বং ভবতি, তত্র কারণং কিম্? অত্র পিতামহচরণাঃ অর্জনমেব স্বত্বহেতুশ্চর্জনং শাস্ত্রোক্তা-র্জনরীতিব্যাপার এব।' ইত্যাদি। (ফোলিও ২খ পংক্তি—৭। ইংরিজী অনুবাদ—কোলব্রুক ডাইজেস্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৬)।

সুব্রতা সেন
সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা—১২

চা শিল্পে বাঙালী

২১ জানুয়ারী সংখ্যার 'দেশ'এ প্রকাশিত মানস দাশগুপ্তের 'চা-শিল্পে বাঙালীর উত্থান ও পতন' প্রবন্ধটিতে চা-শিল্পের আদিপর্বে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনন্য উদ্যম ও অবদানের চিত্রটি বহুলাংশে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের একটি তথ্যগত ভ্রান্তি নিরসন প্রয়াসেই এই চিঠি। সর্বপ্রথম বাঙালী জয়েন্ট স্টক কোম্পানী 'জলপাইগুড়ি টি কোম্পানী লিমিটেড' এর প্রমোটারদের পরিচিতিসূত্রে শ্রীরামচন্দ্র সেন মহাশয়কে সরকারী কর্মচারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র সেন আইন-বিদদেরই একজন ছিলেন। পেশায় উকিল শ্রীসেন নবগঠিত কোম্পানীর সেক্রেটারী পদেও কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি ৺রামচন্দ্র সেনের পৌত্র। পারিবারিক সূত্রে জ্ঞাত এই তথ্য নিবেদন করছি।

প্রসঙ্গ ক্রমে জানাই শ্রীরামচন্দ্র সেন অপরিণত বয়সে অকালে পর-লোকগমন করায় তাঁর মাতৃপিতৃহীন অসহায় নাবালক সন্তানগণ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে আমার পিতা ৺শরৎচন্দ্র সেন সরকারী চাকুরী নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীদাশগুপ্ত ও তাঁর তথ্য সংগ্রাহক অধ্যাপক শিবশংকর মুখোপাধ্যায়কে সম্ভবত এই ঘটনাটি বিভ্রান্ত করে থাকবে।

শংকর নারায়ণ সেন
কলকাতা-২৯

দেশ ৪৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা
১১ চৈত্র ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

অমল চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
ইউরো-কমিউনিজম কি ও তার প্রকৃত স্বরূপ
প্রণবেশ সেনের রচনা
এই পাগল করা খেলা
শেখর বসুর গল্প
মাঝখান থেকে
প্রতিভা বসুর ভ্রমণ-রচনা
স্মৃতি সততই সুখের

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্ন

কথিত আছে যে, লীগ অব নেশন-এর এক আলোচনার আসরে ইংরাজ ও ফরাসী প্রতিনিধির মধ্যে কথা-কাটাকাটির প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ইংরাজ প্রতিনিধি ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশটিকে ব্রিটেনের পক্ষে ফিরে পাওয়ার দাবি করে বসেছিলেন। তাঁর মতে ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশ ব্রিটেনের ঐতিহাসিক স্বত্বের একটি অংশ। কারণ, অতীতের ব্রিটেনের নরম্যান শাসনকালে ফ্রান্সের ব্রিটেনের প্রদেশ নরম্যান নৃপতিদেরই শাসনের অধীন ছিল। এবং ব্রিটানি নামটিই প্রমাণিত করে যে, ফ্রান্সের ওই প্রদেশ খাস ব্রিটেনের একটি অন্তরঙ্গ অংশ। অনুমান করা চলে যে, ইংরাজ প্রতিনিধির মুখে এহেন দাবির ঘোষণা শুনে সেদিনের সেই লীগ অব নেশন-এর সেই প্রতিনিধিদের বৈঠকী সমাবেশের সকলেই কৌতুক অনুভব করেছিলেন। কেউই ওই দাবিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে নিতান্ত একটা বিবাদীয় উগ্রতার লঘু পরিহাস বলে মনে করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই, অতীতের ঘটনার মাটিকে এভাবে খুঁড়ে ও প্রোথিত তথ্যের কফিন তুলে নিয়ে বর্তমানের জীবন্ত ঘটনার সত্য-মিথ্যার প্রমাণ সন্ধান করবার কোন অর্থ হয় না।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নিউ-ইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে ভারতের সঙ্গে সিকিমের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিলেন, সেটা ঠিক হয়নি। অন্তর্ভুক্তি খুব বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু এখন আমি ঘটনাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। বেশির ভাগ মানুষই এই ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। ভূতপূর্ব শাসনকর্তা চোগিয়ালকে বেশির ভাগই মানুষ চাইতেন না।"

শ্রীমোরারজী দেশাই-এর এই অভিমত কি ভারতের আরও অনেক ব্যক্তির এবং অনেক রাজনীতিক দলের পরিপোষিত একটি ধারণার প্রতিধ্বনি ? তা নয়। তিনিই বলেছেন যে, এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন রাজনীতিক দলের ও জননেতার মুখে এরকম অভিমত উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। ভারতীয় সংসদেও এরকম অভিমতের সামান্য সাড়াও শুনতে পাওয়া যায়নি। ব্যক্তিবিশেষের চিন্তার অন্তঃস্তলে এরকম ধারণা নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু সেটা ভারতীয় জনমতের স্বরূপ থেকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন একটি ধারণা। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ভারতীয় জনমতের হৃদ্‌পিণ্ড চমকে উঠতে পারে। কারণ, তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে দেশভূমিরই একটি অংশের তথা রাজ্যের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়ের নৈতিক সত্যতা ও উদ্বেগ সম্পর্কে সংশয়ের আরোপ আছে। এ বড় দুঃখের বিষয়, এবং উদ্বেগেরও বিষয়। তারই অভিমতের বয়ানে ভাষিত হয়েছে যে, সিকিমবাসী মানুষ সবাই ভারতের সঙ্গে সিকিমের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নেবার পর অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে আপত্তি করবার কী যুক্তি থাকতে পারে ? চীন নেপাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদিন ভারতের নামে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে এবং চোগিয়ালের অধিকারের পক্ষে যে আপত্তির কোলাহল সৃষ্টি করেছিল, সে কোলাহল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়নি।

অতীতের যে ঘটনা অতীতেরই ঘটনা হিসাবে কালের প্রবাহের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে, তার ইতিবৃত্তের মধ্যে নিহিত সামান্য কোন স্মৃতিচিহ্নকে জীবন্ত তথ্য হিসাবে জাগ্রত করা যে উচিত নয়, এ সত্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাইয়ের মতো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বয়ং তাঁর যুক্তিদক্ষ চিন্তা ও বিচারের মধ্যে এই উপলব্ধির সাক্ষাৎ পাবেন যে, জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি সম্পর্কে অতীতের ঘটনার সমাধির মধ্যে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগের ছেঁড়া-কাগজ পাওয়া যেতে পারে। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। যেটা আইনত 'অবৈধ' কাজ ছিল না। কিন্তু বস্তুত ও নৈতিক সত্য অনুযায়ী অবৈধ ছিল। জননেতা শ্যামল গান্ধীর নেতৃত্বে জুনাগড়ের জনসাধারণ প্রতিবাদের আন্দোলন উদ্বেলিত করে এই সুসংহত অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, জুনাগড় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। সিকিমেও অনুরূপ ঘটনার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ঘটনাতেও দেখা যায় যেমন শাসনকর্তা মহারাজা, তেমনই প্রায় সর্বসমর্থিত নেতা আবদুল্লা জনমতের প্রতিনিধি হিসাবেই কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে মতদান করেছিলেন। পর্তুগীজের শাসিত গোয়ার সঙ্গে ভারতের অন্তর্ভুক্তির ঘটনাও জনমতের সমর্থনে নিষ্পন্ন হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রশাসনের আশ্রয়ে সমন্বিত হবার এইসব ঘটনার প্রত্যেকটিই জনসাধারণের ইচ্ছায় সুসাধিত হয়েছিল। ধারণা করতে অসুবিধা নেই, এইসব ঘটনার প্রত্যেকটিরই সম্পর্কে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মনে কোন প্রশ্ন নেই। ভারতের রাষ্ট্রিক দেহ খণ্ডিত হোক, এরকমের কোন দাবি অথবা ঘটনা তিনি সমর্থন করতে পারেন, এটাও নিতান্ত একটা মিথ্যা সন্দেহের কোলাহল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য স্বচ্ছ করে দিয়েছেন।

যে বিশেষ জিজ্ঞাস্য একটি বিষয়ে দেশের জনমতে আন্দোলিত হতে পারে, সেটা এই যে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কি রাষ্ট্রীয় সংহতির মতো বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে কোন সমালোচনা মূলক অভিমত প্রকাশ করবার কোন সার্থকতা থাকতে পারে ?

ব্যঙ্গচিত্র

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

অন্ধকার সাপ্লাই করপোরেশান

॥ দুই ॥

মিস্টার তুলপুলে, ওই পাখার জায়গায় আমি আর একটু যোগ করতে চাই। লিখুন—প্রাচীনকালে, হাতপাখার যুগে, স্নেহ-ভালবাসা, সম্মান, বশ্যতা, সখ্যতা প্রকাশের মাধ্যম ছিল, একটি হাতপাখা। গুরু এসেছেন, শয্যা আসনে বসিয়ে পাখায় বাতাস করছেন। জমিদার এসেছেন জমিদারিতে নায়েব পাখায় বাতাস করছেন। জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ী চৌকিতে বসিয়ে হাওয়া করছেন। পাখার বাতাসে কতরকম ভাব মিশিয়ে দেওয়া যেত সে যুগে। বাতাস বলতো, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, হুজুর প্রাণে মেরো না, ঠাকুর দয়া কর, নাথ! হৃদয়ে এসে লেপ্টে যাও। সেই কৃষ্ণের বাঁশি, যমুনা পুলিনে, সিক্ত বসনা রাধা, অঙ্গরমণীর নিটোল হাতে চুড়ির রিনিঝিনির সংগে ছাঁচ তালপাতার পাখা। এক হাতে পাখা, এক হাতে শ্বেতপাথরের গেলাসে মিছরির সরবত। অহো, অহো। লিখুন, বড় বড় করে লিখুন, ফচকে বিদ্যুতের পাখা আমাদের সনাতন জীবন ছন্দের সমস্ত গৌরব হরণ করে নিয়ে ছিল, আমাদের মেয়েদের হাতের তালপাখা কেড়ে নিয়ে তাদের নারীসুলভ মধুর বৃত্তি উপড়ে দিয়েছিল। ঘরে ঘরে, টঙ্গে টঙ্গে, রঙ চটা, বীভৎস দর্শন কাঠ কিম্বা অ্যালুমিনিয়ামের ত্রিবক্র, ফ্যারফ্যারে পাখা, ফরফর করে রসকসবর্জিত, স্নেহহীন, বস্তুতান্ত্রিক হাওয়া ছিটিয়ে, দাঁত বের করে ধনতন্ত্রের মহিমা প্রচার করছে। হাটাও পাখা। লাগাও হাতে ঘোরানো পাখা। এ পাখার হাওয়াতে ভাই মধু আছে, মধুর রসের ত্যারছা পরশ, অথবা শান্ত, দাস্য সখ্য মধুর ভাবের বৈষ্ণব পদাবলী আছে।

এবার সাবহেডিং দিন, ॥ পাখাতে চামচে ফিট ॥ পাখাতে চামচে ফিটটা কি ব্যাপার! যা বলছি লিখে যান, লিখে যান মিঃ তুলপুলে, প্রশ্ন করে ভাব চটকে দেবেন না। এই দেশে ছোটো বড় সকলেরই কিছু না কিছু চামচে আছে। দাদা, দাদা করে পাশে পাশে ঘোরে। মালটি হাতিয়ে নিয়ে, আখেরটি গুছিয়ে নিয়ে দাদাকে ল্যাঙ মেরে ড্রেনে ফেলে দিয়ে সরে পড়ে। চামচে মারা দাদার সংখ্যা খুবই কম, দাদা মারা চামচের সংখ্যাই বেশি। আমাদের এই অবিদ্যুৎচালিত কেঠোপাখা চামচেদের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। নেতাদের পাখা ঘোরাতে প্রথম প্রথম অনেক চামচে জুটবে। নিজের চাকরি, বউয়ের মাস্টারি ভায়ের বেকার ভাতা, রেশানের দোকান, সিমেন্টের পারমিট, বাপের বৃদ্ধবয়সের ভাতা, এটা ওটা সেটা, কিন্তু! কিন্তু যে আল শেষের সেদিন পর্যন্ত হাসিমুখে পাখা ঘুরিয়ে যাবে বুঝে নিতে হবে সেই নিষ্ঠাবান, স্টেনলেস চামচ। নেতাগিরির সুপ-গালে ভুল চামচে ডোবাতে দিয়ে অনেক নেতাই এক-তুতে কেতরে গেছে। এবার একটু ব্রতকথার ঢঙে দুটো লাইন লিখুন—দারুময় কীলক পাখার কত গুণ ভাই, মানুষের চরিত্র কষে যাচাই, নারীর নারীত্ব বাড়ায়, প্রেম উড়োখই, তোমরা বাছা, থেকে থেকে, হাঁক ছেড়ো না, শ্যালক বিদ্যুৎ কই। কিরকম হল মিঃ তুলবুলি! মাস্টারপীস, কোথায় লাগে—দান্তে, লোরকা, সার, মুসুলিনি, এ যেন সিমলেপাড়ার হরিগিরির গালফুরুলি। ফুরুলি নয় স্যার ফুলুরি। ওই হল হে, তাই হল, যা বাতাসা, তাহাই বাসাতা, যাহা ধকস তাহাই বাসক।

এইবার আমাদের পারের পয়েন্ট। লিখুন, সবচে বড় অভিযোগ, বিদ্যুতের সংগে সংগে জলও চলে যায়। হেলী, সহেলী, শহরবাসী, শোনেননি দাদা, জলেই যে বিদ্যুৎ থাকে। চক্ষুমুদ্রিত করে কল্পনা করুন, পদতলে গড়ে তোলা, বুকে নাচে মহাশ্যামা। জলের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক রে ভাই! উপমাটা উপলব্ধি করুন। বিদ্যুৎও নেই, জলও নেই। জল যদি নাই থাকে যাবজ্জীবও যাবে। কবি ব্রাউনিংকে স্মরণ করুন—আমি দুঃখে আছি কিন্তু আমার চে দুঃখে আছে আরও কত জন। রাজস্থানের কথা ভাবুন। সাহারা মরুভূমির কথা চিন্তা করুন। ফ্রানসে জলের বদলে ওয়াইন। তবে? তবে ভাই, জলের জন্যে কেন এত হাহুতাশ। লৌহমিশ্রিত কলকাতার পেঁকো জলে স্নান করলে, রেশম চিককন চুলে জটা হয়, পাক ধরে। ওই জল খেলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয়। জার্মানীতে জলের বদলে বীয়ার। জলকষ্টে মনোকষ্ট, প্রাণ আঁকুপাঁকু আর তখনই জাগবে পুরুষকার, আরো রোজগারের জন্যে হন্যে হবেন। উপার্জন বাড়িয়ে বোতল বোতল বীয়ার খাবেন। নধর-কান্তি, রমণীমোহন চেহারা হবে। বাথরুমে জল নিয়ে খাবলাখাবলি না করার ফলে বাত, সর্দি, কাশি, ব্রংকাই-টিস সহজে হবে না। আর! তবু যদি মনে হয় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে শিশুর আদর্শ অনুসরণ করুন। ভগবান দু হাতে দুটো বুড়ো আঙুল দিয়েছেন, সে কি কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্যে! আজ্ঞে না। অন্ধকারে বসে বসে চুকচুক করে শিশুর মত বুড়ো আঙুল চুষুন। মনটি শিশু শিশু হয়ে উঠবে। মুখে সব সময় ভুবনভোলানো অমায়িক হাসি। জীবাণুযুক্ত জল সরবরাহ বন্ধ করে আমরা দেশের স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে জোরদার করে তুলছি। স্নানের বদলে শরীরের চামড়ায় সাদা জুতোর ক্রিম মাখুন। জুতোও চামড়া দেহেও চামড়া। অসুবিধেটা তাহলে কোথায়!

এইবার সেই সুচিন্তিত আরাম্বক অনুচ্ছেদটি "সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি" আপনার। এইবার দিনের সাহিত্য করুন, আর রাতের সাহিত্য নয়। সারা সন্ধ্যে স্পিরিটে, স্পিরিটেড হয়ে মাঝরাতে চোরা আলোয়, তান্ত্রিক চোখে, কলমের ডগা দিয়ে যে বস্তু বেরোয়, তাতে খুন থাকে, ধর্ষণ থাকে, মদ থাকে, মেয়েছেলে থাকে, মনোবিকার থাকে। ওসব আর চলছেনি! চলছেনি লিখবো স্যার! ইয়েস, ওসব আর চলছেনি, অপসংস্কৃতি। তামসী রাত্রি, মানুষের স্নায়ুর বাঁধন আলগা করে দেয়, দুর্বল করে দেয়। মনের দরজা খুলে, মেফিস্টোফিলিস সামনের চেয়ারে বসে কেবলি অসৎ পরামর্শ দিতে থাকে—গীতা পড়ে কি হবে, পর্নোগ্রাফি পড়, লেখাতে সেকস ঢোকা নইলে বাজার পাবি না। ইয়ারকি! অন্ধকারের দাসত্ব কেন করবেন। কেন ফাউস্টের মত আত্মবিক্রয় করবেন। বরং সন্ধ্যে হলেই শিশুর মত দুধু ভাতু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। তারপর সেই ঊষালগ্নে, পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে উপনিষদের ঋষির মত গেয়ে উঠুন, হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাসাপি হিতং মুখং। আবার ফিরে আসুক বেদের কাল, ত্রিসন্ধ্যা কাল, পান্তাভাতের কাল, পানবুড়ির কাল, ভন্ ভন্ মশা ও ম্যালেরিয়ার কাল। জাগো ভারত। জাগো বাঙালী। অনেক দিললাগী হয়েছে আর না, ভরত যাহা ছিল তাহাই হইবে।

এইবার তাঁহাদের উদ্দেশ্যে, "যাঁহারা উৎপাদন কমিয়া গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছেন" চিললাও মাৎ। যতই উৎপাদন বাড়ুক সব দই মেরে দিলে বড়লোক নেপোরা। দেশের মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষ বেদের কাল থেকেই নটেশাক, তেলাকুচা ও কদলিকান্ড খেয়ে এই সভ্যতাকে পুষ্পিত, পত্রোদ্গত করে এসেছে। মশাই! ওইসব লোহালক্কড়, গজাল মজাল, দৈত্যের মত যন্ত্র-পাতি, গাড়িঘোড়া, মানুষ মারা কল। বনস্পতি বোতলের জল না তৈরি করলেও চলে। কেন! চালাবাড়িতে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে, মাটির থালে, পাথরের বাটিতে ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে বেঁচে থাকেনি! ব্রিজ যখন ছিল না বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে লগবগ, লগবগ করে মানুষ খরস্রোতা নদী পেরিয়ে যেতো না! সাঁকোর ওপর যুবতী রমণী আর ইয়া ইয়া কংক্রিট ঢালা বল্টু মারা ব্রিজের ওপর রমণী, কোনটা ভাল! যন্ত্রের শক্তিকে আমরা এতকাল অশ্ব-শক্তি, হর্সপাওয়ার দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি। জীবজগতে শুধু অশ্বই আছে কেন, মানুষ কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী নয়। মনুষ্য শক্তিতেই সব হবে। সবার উপর মানুষ সত্য। অন্ধকারে মনুষ্য উৎপাদন আশা করি ব্যাহত হবে না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

PEARS
TRANSPARENT
SOAP
পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান
আপনার ত্বককে রাখুন পিয়ার্সের কোমল যত্নে!
এর প্রত্যেকটি স্বচ্ছ ট্যাবলেট তৈরী হয় সাবান-তৈরীর
এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দিয়ে! পিয়ার্স যেমন কোমল,
তেমনি খাঁটি— আর খাঁটি বলেই এত স্বচ্ছ!
পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার
ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে।

পণ্ডিচেরীর দিনগুলো

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

কলকাতায় বড়দা পড়ছিল ম্যাট্রিক শ্রেণীতে, আমি থার্ড ক্লাসে আর টোগো ফিফ্‌থ্‌-এ। শ্রীমায়ের নির্দেশ-পত্র নিয়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিশির-কুমার মিত্রের কাছে গেলাম। শিশিরদা অভিমত দিলেন : শ্রীমা চান, প্রথম বছরে আমরা ভালভাবে ফরাসীটা শিখে নিয়ে নিজের নিজের বিদ্যা অনুযায়ী পরের বছর যেন উঁচু ক্লাসে চ'লে যাই।

অগত্যা তিনজনেই শিং ভেঙে বাছুরের দলে, ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়ে গেলাম—ফরাসীকা ওয়াস্তে। আট ন'মাস আগেই বছর শুরু হয়ে যাবার দরুন সহপাঠীরা সবাই আমাদের চেয়ে বেশ এগিয়ে ছিল।

দু'তিনটে ছেলেকে পাকড়াও করে শিশিরদা হুকুম দিলেন, "কিহে, ইতিহাস পড়তে যাচ্ছ তো? দাদুর ক্লাসে?" জবাবে তারা জানাল, হ্যাঁ। শিশিরদা আমাদের তিন ভাইকে তাদের হেফাজতে দিয়ে দিলেন। আমাদেরই সমবয়সী তারা। শিশিরদার খদ্দের পেয়ে মহাগর্বে তারা আমাদের নিয়ে গিয়ে ঠাঁই ক'রে দিল তাদেরই বেঞ্চে।

এখনকার খেলার মাঠে ঢুকেই যে বারান্দাটা ডান হাতে, তার লাগোয়া প্রকাণ্ড জিমন্যাশিয়ামটা তখন বিভক্ত ছিল তিনটি ক্লাস ঘরে। একেবারে পশ্চিমে ছিল সব-চেয়ে প্রশস্ত ঘরটি—তার পাশে, পূর্ববৎ, ওয়াল্‌বারটি এখনো বিদ্যমান। সেটায় আমাদের ক্লাস বসল।

পৌনে আটটায়। ফার্স্ট পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ামাত্র সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ এসে ঢুকলেন, অতি দ্রুত, জুতো মশমশ ক'রে শৌখীন মলাক্কা বেতের ছড়ি। দাড়ি-গোঁফ সাফ-সুরত কামানো। চোখে নীল-চশমা। মুখে একটা চাপা দুষ্টু হাসি। গায়ের ফতুয়াটা বুকস্কন্ধের উপরে টায়ে টায়ে আঁটা। পরনে ধোপদুরস্ত পায়জামা।

হাতের লাঠি টেবিলে রেখে উনি আসন গ্রহণ ক'রে আমাদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ও'কে প্রাণ খুলে স্বাগত জানাল।

কেউ বলল, "Bonjour, দাদু!" কেউ জুড়ে দিল—"দাদুদা!" একটা গুজরাতি ছেলে আরো সম্ভ্রমভরে আপ্যায়ন করল, "দাদুকাকা, কেম্‌ছো?" ক্লাসের মনিটার ঝুমুর ভট্‌চায (মনীশ ঘটকের ভাগ্নী) আর তার পিসতুতো দিদি চম্‌ আমাদের বেশ বুঝিয়ে বলল, "এরা কিচ্ছু জানে না, বুঝলি? এরা ভাবে দাদুই ও'র নাম। ও'র আসল নাম চারুচন্দ্র দত্ত!"

গ্রীন-রাইপ জ্যাক্‌-ফ্রুট আমি আগেই ও'র "পুরনো কথা" পড়েছিলাম। এরপরে হাতে পাই "দুনিয়াদারী"। ও'কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, উনি নীল চশমা খুলে, ঘর্মাক্ত কলেবর, রুমালে চোখ মুছতে মুছতে কথা পাড়লেন : "কিরে, তুই রথীন, তুই পৃথ্বীন আর তুই টোগো ওরফে ধৃতীন্দ্র?"

তাজ্জব! আমাদের চিনলেন কি করে? রগড় করে উনি বললেন, "তেজেনকে বলিস, তার চারুকাকার কাছে তোরা ইতিহাস পড়বি, কেমন?"

ক্লাস শুরু হল। রোম আর কার্থেজের যুদ্ধের কাহিনী। হাতের লাঠিটার বাঁকানো দিক আমার ঘাড়ে আলতো ক'রে লাগিয়ে টান মেরে দাদু বললেন, "এইভাবে ওরা শত্রুপক্ষের জাহাজগুলি অধিকার ক'রে গর্জন ছাড়ত : দেলেন্দা কার্থাগো!"

দাদু ক্লাস নিচ্ছিলেন সম্ভবত ফরাসীতেই। আজও ভেবে পাইনে কি করে প্রথম দিন থেকেই তাঁর কাহিনীর রস উপভোগে সক্ষম হলাম! মাখনের তালে যেমন সহজে চাকু খেলানো যায়, তেমনি হেসে-খেলে উনি আলাপ করতেন হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষায়। ক'বছর বাদে একটা নতুন ছেলে ভর্তি হল; হোমটাস্কের কথায় সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে ভাঙা হিন্দীতে নিবেদন করল যে ইংরেজি বা ফরাসী তো সে জানে না, কি করে লিখবে?

দাদু হাতছানি দিয়ে ওকে কাছে ডাকলেন : "তোর মাতৃভাষা কিরে?"

"কন্নাড়," জবাব দিল সে সন্ত্রস্তভাবে।

"তা, বিশ্বেশ্বর, তুই কানাড়ীতেই লিখে আনিস।" এবং সেই রচনার সংশোধন করে উনি নম্বরও দিয়ে দিলেন!

বছরের পর বছর উনি ইতিহাস পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বাড়তি আনন্দ দিয়েছেন : বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি উনি আমাদের কাছে গল্পের মতো ব'লে গিয়েছেন : প্রতিটি চরিত্র এমন টসটসে রক্তে মাংসে সজীব হয়ে উঠত, ভাবতাম আমরা—এদের সবার সঙ্গেই উনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, ওরা যেন একই জগতের বাসিন্দা। লাস্ট ডেইজ অব্‌ পম্পেই, স্কারলেট পিম্‌পারনেল, এ টেইল অব টু সীটিজ, সবকিছুরই উনি যেন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী!

আরও ক' বছর পরের কথা। বয়সের কল্যাণে তখন আমাদের কারো কারো মন বেশ উড়ু উড়ু! ক্লাস থেকে একটি অন্যমনস্ক ছেলের নজর অনুসরণ করে উনি দেখেন—ওধারে, মাঠের প্রান্তে রোদ পোহাচ্ছে একটি সুদর্শনা ছাত্রী।

দাড়াম করে টেবিলে চাপড় মেরে ছেলেটির নাম ধরে হাঁক মারলেন দাদু : "My Boy, restrain Yourself!"

তার অপ্রতিভ ভাবটা না কাটতেই উনি হো হো ক'রে হেসে টিপ্‌পুনি দিলেন : "প্রেমের definition কি, শুনবি? Love is something that comes only once in a life time; if it comes too often to somebody, he is not ভদ্দরলোকের ছেলে!"

কত সময়ে দাদুর বাড়িতেও গিয়েছি। একবার গিয়েছি—সঙ্গে আছেন "শ্রীঅরবিন্দ : জীবন ও যোগ" গ্রন্থের লেখক প্রমোদকুমার সেন, আর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রসেনজিৎ। সেদিন দাদু আলোচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। "অমন চোখ আর জীবনে দেখলাম না," বলেই দাদু জুড়ে দিলেন, "অবশ্য কত্তার কথা আর কি বলব তোমায়, প্রমোদ? বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক-সায়েব শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি সম্বন্ধে বলতেন : জোন্‌ অব্‌ আর্ক যদি শুনে থাকেন দিব্যবাণী, অরবিন্দ দেখেন দিব্য-ছবি!"

ফিরে আসি প্রথম পাঠশালার কথায়।

ফার্স্ট পিরিয়ডের শেষে একজোটে সবাই শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম বিদ্যালয়ে। সেকেন্ড পিরিয়ডে পড়লাম খাস ফরাসী এক মেমসাহেবের খপ্‌পরে। নাম তাঁর মাদাম লিলিয়ান। পরে জানলাম, আমাদের দুষ্টু দলের শিরো-মণি শ্রীমান্‌ আল্যাঁ-র গর্ভধারিণী তিনি। সেদিনকার কথা ভাবলেই মনে পড়ে আল্যাঁ-র ক্রুদ্ধ তর্জনী-সংকেত ও শাসানি : "আলাকি পুবা?" (অর্থাৎ "চালাকি পেয়েছ?")

মাদাম লিলিয়ানের মাথায় ছিল চমৎকার একরাশ কটা কটা চুল, পরিপাটি ক'রে বাঁধা। সুশ্রী চেহারা। ফরাসী ছাড়া একবর্ণ বোঝেন না, বলেন না!

ভারি বিপন্ন বোধ করতে লাগলাম। বিন্দু-বিসর্গ কিছুই ছাই ঠাহর করতে পারছি না, হাসি বলছেন, নাকি মোষ বলছেন! কখনো বা গান করাচ্ছেন, তাতে আন্দাজী ধুয়ো দিচ্ছি : "কিনে যাক্‌, যাক্‌, জামে নাভি গো!" কখনো একে ডাকছেন ব্ল্যাকবোর্ডে, ওকে দিচ্ছেন ছবি আঁকতে। কখনো খুব মজার কথা ব'লে নিজেই ফুর্তিতে শিসিয়ে উঠছেন। আর এলোপাথাড়ি কথার ঝড় তুলে ঝাঁ ঝাঁ লাগিয়ে দিচ্ছেন আমাদের কানে।

ইতিউতি তাকিয়ে দেখি কাঁচুমাচু মুখে অদূরেই বসে তারকদাদা! সমান বিভ্রান্ত তার ভাবখানা। আমাদের দুরবস্থা দেখে প্রবোধ দেবার মতলবে তারক উসখুস করতে করতে অবশেষে ধাঁ করে বিনা ভূমিকায় পকেট থেকে একটি দেড় সেরী আধ-কাঁচা রম্ভা বের করে সম্পূর্ণ যশুরে সামদরে পার্শ্ববর্তী শেন্‌-কে প্রস্তাব জানাল : "ও শেন্‌, কলা খাবে?"

শেন্‌ একটু ভাল মানুষ। কবি নর্ম্যান ডাউসেটের কন্যে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই আমন্ত্রণে বিহ্বলা, মুখ চোখ লাল, উঠে দাঁড়িয়েই বেচারা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল : "ম্যাডাম্‌, ম্যাডাম্‌, ট্যারোক—ব্যানান্‌, ব্যা-ব্যা-ব্যানান!" মাদাম কিছু হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই শেনের শোচনীয় চেহারা দেখে হাপুস নয়নে কান্না জুড়ে দিলেন ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে।

পাশের ক্লাস থেকে ছুটে এলেন মাদামের স্বামী, ছ' ফুট লম্বা, তাগড়া আধা-ছোকরা সাহেব। ভয় হল, মার-ধোর করবে নাকি? কলকাতায় ধেড়ে-মদন বহু মস্তান্‌কে টোগো ওই ছোটবেলাতেই যথেষ্ট ঠেঙিয়ে কিছু সুনাম অর্জন করেছিল। আস্তিন গুটিয়ে সে উঠতে গিয়ে দেখে, নাঃ, আমাদেরই পক্ষ নয়ে সাহেব কি যেন হুস্‌হুসিয়ে ব্যাখ্যা করছে, তারপরে বউকে ধাতস্থ দেখে সবার মুখ রক্ষার্থে ক্লাস চালু ক'রে দিলেন নতুন একটা গান দিয়ে। দেখলাম, ও-গানটি অন্তত তারকের অজানা নয় : "ফ্যালো যাকে, ফ্যালো যাকে, ধর্মে ভূত, ধর্মে ভূত" বলে সে-ও খুব দিল্‌ দিয়ে হাত ঝুলিয়ে আর কনুই দুলিয়ে আসরে নেমে গেল!

তারকের মনে যখন ভাবের উদয় হত, তারস্বরে সে আবৃত্তি করত তার কাব্য-মঞ্জুষার সবেধন নীলমণিটি : "পথিক আসিয়া এমন কামড় দিল কুকুরের পায়ে!"

এই তারকের আর-একটি নাটকীয় কীর্তি না বললে সম্পূর্ণ হবে না ওর চরিত্র-চিত্রণ। প্রভাকর পণ্ডিতের বাংলা ক্লাসে কেউ নাকি সেদিন 'পণ্ডিচেরী' বানান করতে পারছে না, এটা অবশ্য শোনা কথা। শেষের পঙক্তি থেকে হাত তুলল তারক। অত্যন্ত অনুপ্রেরিতভাবে প্রভাকরদা—ওর বানান শোনবার আগেই—সবাইকে হটিয়ে তারককে প্রথম বেঞ্চিতে বসিয়ে ঘোষণা করলেন : "নাও, এবারে আমাদের তারকবাবুর কাছে শোন তোমরা সঠিক বানানটা!"

এতখানি খাতিরে ঘাবড়ে গেল তারক। বার পাঁচ-ছয় ভণিতা ক'রে নিল—"বলি কিন্তু, প্রভাকরদা? বলি তা হলে?" প্রভাকরদারও রোখ চেপে গেল—"বল না, বল তুমি তারকবাবু!" অতঃপর, বিভীষণ সংকল্পে সারা মুখ গম্ভীর করে তারক রায় জারি করল :

"প—নয় ডিগ্রি—চারি, পণ্ডিচারী—এতো সহজ বানান!"

*

থার্ড পিরিয়ডে বসত আমাদের স্টাডি ক্লাস।

বাড়ি থেকে যেসব ছাত্র হোমটাস্ক করে আসতে পারত না, অথবা পাঠ্যপুস্তকের নূতন একটি অধ্যায় আগেভাগে পড়ে প্রস্তুত থাকতে চায়, মূলত তাদের কথা ভেবে এই ফাঁকা পিরিয়ডগুলিতে একজন ক'রে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হাজির দিতেন। পালা ক'রে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের কাছে পরামর্শ নিতে পারত।

সে আমলে আমাদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ছিল প্রায় অবিকল ফরাসী বিদ্যালয়ের অনুরূপ। ফলে, অনেকেই অনেক ক্লাসে মন বসাতে পারত না। যেমন অঙ্কের ক্লাসে অধিকাংশ অঙ্কই ফরাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল, তাতে মনোনিবেশ করা দুরূহ ছিল বইকি। প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকের অভাবে কত সময়ে স্বয়ং শ্রীমা পাঠ্য-বিষয় রচনা করে দিয়েছেন। গণিতকে যে সুপাঠ্য ও সুপাচ্য করে তোলা যায়, তার নিদর্শনস্বরূপ তিনি যেসব নমুনা ছ'কে দিয়েছিলেন, সেগুলি সযত্নে গচ্ছিত ছিল মনোজ দাশগুপ্তের কাছে। এগুলির ভিত্তিতে নতুন পাঠ্য পুস্তক প্রণীত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীমায়ের অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতির আর-একটা দিক ছিল। কোনও ছাত্র যদি কোনও বিষয়ে অসাধারণ হয়, তাকে তার মেধা অনুযায়ী উঁচু ক্লাসে তুলে দেওয়া হত; আবার সে যদি কোনও বিষয়ে কাঁচা থাকত, তাকে তা মেরামত করে নিতে হ

নিচু ক্লাসে। গণিতে কেউ যদি থাকত পঞ্চম শ্রেণীতে ভূগোল ইতিহাসে থাকত অষ্টমে, ইংরেজিতে চতুর্থের।...তবে ন্যূনতম জ্ঞান না হওয়া অবধি কেউ যেন হাল না ছাড়ে—সেদিকে শ্রীমা দৃষ্টি রাখতেন।

এই স্টাডি ক্লাসে ঘটত বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিষয়ের সমাবেশ। এবং দুষ্টু ছেলেমেয়েরা বেছে বেছে এমন বিষয় নিয়ে যেত এমন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে, যে বিষয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা এদের অজানা ছিল না।

তিনকড়ি মিত্র ইংরেজি ব্যাকরণে এতই নিপুণ ছিলেন যে নর্ম্যান ব পিয়ার্সনকেও তাঁর শরণ নিতে দেখেছি। অথচ স্টাডি ক্লাসের ভার তিনি যেদিন নিতেন, তাঁর ভালমানুষির সুযোগ নিত অনেকেই। জিতেন্দর ছিল তাদের মোড়ল। তিনকড়িদার স্টাডি ক্লাসের সময়ে বইখাতা নিয়ে সে উঠে বসত গিয়ে ওয়াল্‌বার্‌'এর টঙে। সেখান থেকে তিনকড়িদাকে প্রশ্ন করত এটা-সেটা। তিনকড়িদা ওয়াল্‌বার্‌'এর পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভাল কথায় বুঝিয়ে বলতেন, "জিতেন্দর্‌, শ্রীমা পছন্দ করেন না ক্লাসের সময়ে কেউ বাইরে থাকে—"

কতদিন গিয়েছে, পাছে জিতেন্দর পড়ে হাড়গোড় ভাঙে, এই ভয়ে পরম ভক্তের মতো তিনকড়িদা পাহারা দিয়েছেন ওকে সারা পিরিয়ড়!

*

আবার ফরাসী ক্লাস ফোর্থ পিরিয়ডে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, লাল টুকটুকে ফুলো ফুলো গাল, অত্যন্ত শৌখীন এক প্রৌঢ়া মেমসাহেব ঘরে ঢুকলেন। মাদামের শ্বশুর-বাড়ির কপুরুষ ফরাসী ভারতে এসে কেউ গভর্নর, কেউ আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। মাদামের পরলোকগত স্বামী ছিলেন পণ্ডিচেরীর পৌরপিতা। মাদামের দশাসই চেহারার সঙ্গে বেশ খাপ খাওয়াত গালভরা নামটি : ইভন্‌ রোব্যার-গেব্‌লে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ ওকে ডাকতেন 'সুব্রতা' বলে; পণ্ডিচেরীর সরকারী গ্রন্থাগারের উনি ছিলেন সর্বেসর্বা এবং ফরাসী ভারতের ইতিহাস নিয়ে বহু বইটইও লিখেছেন।

কালো গাউনে ভূষিত ওই বপু দেখে স্মরণ হল, বালিগঞ্জ প্লেসে পরশুরামের 'চিকিৎসা-বিভ্রাট'এর একটি অভিনয়-রজনীর কথা : বিপুলার ভূমিকা নিয়েছিলেন দিলীপ বসু; কিন্তু এই মাদামের "জি-এ-টি-এ-আর" দিলীপ বসু সংস্করণের দুগুণ হবে হেসে-খেলে।

একটা খাতা খুলে হুড়মুড় করে মাদাম রোল ডাকতে বসলেন : আর্‌ভ্যা-প্রাসাৎ, পাবুশাহো, রোত্যা, পুৎভ্যা, বেঃ! .. একটু মন-সমীক্ষা ঘটতেই মালুম হল যে ওগুলি আমাদের হতভাগ্য পিতৃদত্ত নাম : অরবিন্দ প্রসাদ, প্রভুচরণ, রথীন, পৃথীন, ভাই ইত্যাদি।...

শুরু হল পাঠ। একে একে সবাই উঠে দাঁড়াল কি সব চাম-চিকড়ি বলতে লাগল, মাঝে মাঝে মাদাম থামিয়ে উচ্চারণ শুধরে দিলেন, তারপরে কৃতার্থের মতো মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে খাতায় নম্বর লিখে তাকে বসতে বললেন। মূষিকের প্রসূতি পর্বতের মতো, মাদামের ক্ষীণকণ্ঠের আড়ালে মূর্ত ক্ষুদ্র কায়াটির সামনে এন্তার ইকরি-মিকরি শুনতে শুনতে বেশ রোখ চেপে গেল; আমার পালা আসা-মাত্র হুট ক'রে উঠতে যাচ্ছি, হাতে টান মেরে কালু বাধা দিল, "অ্যাই, তুই আজ প্রথম এলি, তুই আবার কি বলবি?"

ততক্ষণে কিন্তু হাত ছাড়িয়ে মুখ খুলে দিয়েছি; অর্গল-বিমুক্ত বাক্‌ব্রহ্ম দমাদ্দম নিঃসৃত হল বিশুদ্ধ ফরাসীতে, জগন্নাথ তর্করত্নের রীতিতে। আসল কথা হল, সেদিনের পাঠে ভারি মিষ্টি কথা কয়েকটা ছিল, "মন্ত্র, মোয়া" ইত্যাদি। বাঙালী অন্তর আমার বেশ পুলক পাচ্ছিল।

এই ভেনি-ভিডি চরিতার্থ হল, রাশভারি মাদামের আহ্লাদে আটখানা হাত-তালি শুনে; সেইসঙ্গে গুচ্ছের আরো কি যেন বললেন তিনি। তারপরেই খবরটা সাকার হ'য়ে উঠল, যখন সবার হাতে তিনি মুঠো মুঠো লজেন্স ও বাছা বাছা ডাকটিকিট দিলেন।

একমাত্র এই মাদামের ক্লাসেই আমরা পেতাম দশের মধ্যে সাড়ে-দশ, [illegible], এমন-কি (রেকর্ড আমার দাদার) চৌদ্দ!......

*

স্কুল সাড়ে এগারোটায় ভাঙতেই আমরা ডাইনিং-রুমে মধ্যাহ্নভোজন সেরে চলে আসতাম আশ্রমের প্রধান ভবনে। উঠোনের বনস্পতিটির মাথার মুকুট তখনো ভেঙে দেয়নি অবাধ্য সাইক্লোন এসে। ভর দুপুরের কড়া রোদে ওর ছায়াশীতল আশ্রয়ে একবার যে বসেছে জীবনে ভোলেনি তার মহিমা। বিশেষত, গরমকালে যখন থোকা থোকা হলদে ফুলের ভারে ঢেকে যায় ওর পাতা আর মৌমাখা সৌরভে ভরে ওঠে বুক থেকে মগজ।

নীরদদার ঘরের পাশ দিয়ে যে-সিঁড়ি, দুপুরে—ওই সময়ে শ্রীমা নেমে আসতেন ওই সিঁড়ি বেয়ে, মুখ্যত আশ্রমের ক্ষেতের ফল-ফুলুরি-সব্‌জি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। গোবিন্দরাজুর একটা হরিণ ছিল, তার জন্মদিনে ওই সময়ে শ্রীমা আদর ক'রে খেতে দিতেন বাছা বাছা শাক আর ফল। এমন কি, আমাদের রিচার্ডের পোষা গাধাটাও একবার ওখানে পেল মায়ের আশিস।

প্রথম দিন থেকেই মায়ের কাছ ঘেঁষে আমি এমনভাবে দাঁড়ালাম যে তাঁর বাঁ বাহুটা এসে লাগল আমার গালে : শীতল স্নিগ্ধ ওই স্পর্শে জুড়িয়ে গেল সমস্ত অন্তর। দিনের পর দিন এই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকতাম।

এই দর্শনের সময় দৈনন্দিন কৌতুকের সৃষ্টি করতেন দু'জন সাধক।

তামিল কবি শুদ্ধানন্দ ভারতী (আশ্রমের নাম রাধানন্দ) রোজ একটি ফরাসী গান বা কবিতা লিখে দু'পা দুরেই ওৎ পেতে বসে থাকতেন তাঁর ঘরে; মা নামলে ফুলবাগানের তত্ত্বাবধায়ক যতীন দাস হাঁক পাড়তেন, "রাধানন্দ, come, mother is waiting!" অমনি অসম্বৃত আলখাল্লাধারী কবি এসে হন্তদন্ত হয়ে লুটিয়ে পড়তেন শ্রীমায়ের চরণে; মা কবিতাটি সংশোধন ক'রে দিলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন।

ও'র হাতে মা দিতেন সাজিভরা ফুল। নিয়েই গায়েব হয়ে যেতেন রাধানন্দ। তাঁর জন্মদিনে ঘটা ক'রে মাকে শুনিয়ে দিতেন স্বরচিত গান, হার্মোনিয়ম বাজিয়ে।

অপর কৌতুক বিতরণ করতেন প্রৌঢ়া মৃদুদি। আমরা দুষ্টুমি ক'রে জানতে চাইতাম তাঁর পুরো নামটা। উনি বলতেন—অমৃদুভাষিণী; মানে কি, জিগ্যেস করলেই বাংলা মায়ের পল্লী অঞ্চলের লৌকিক মাধুর্য বিকীর্ণ ক'রে "হারামজাদারা!" বলে পাড়া-মাতানো এমন হুঙ্কার তিনি দিতেন যে বাধ্য হয়ে বলতে হত, "বাপুরে এই যদি মৃদুভাষিণী হন—"

মৃদুদি ছিলেন বেশ গোলগাল ছোটখাট বহরের মানুষ। ও'রও ঘর খুব কাছেই। মা নেমেছেন খবর পাওয়া-মাত্র ছুটতে ছুটতে ফুল নিতে আসতেন। দেবু ও ছোটকা প্রভৃতি পথ আগলে দাঁড়াত আর উনি অনবরত "দোহাই, মুখপোড়ার দল, যেতে দে! মা চলে যাবেন রে," ইত্যাদি শাসন ও অনুনয়-বিনয় মিশিয়ে এমন তুল-কালাম বাধাতেন যে মা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাতেন ও'র দিকে।

ছোটকা বলত, "অত হাঁপাচ্ছেন কেন? মা ভাববেন আপনার হাঁপানি হয়েছে!" ডুকরে উঠতেন মৃদুদি: "হ্যাঁরে, ও মনা, হাঁপানিকে ইংরেজিতে কি বলে রে?" কেউ রহস্য করে চাপা গলায় ফোড়ন দিল, "অশ্বত্থামা" তেড়েমেড়ে মৃদুদি তখন "Mother, Mother, he telling আই, অশ্বত্থামা!" ব্যাপারটা মা উপভোগ করতেন। কখনো-বা কপট রাগে বকুনি দিতেন, "মৃদু, গোলমাল কোর না, শ্রীঅরবিন্দ বিশ্রাম করছেন!"

শ্রীঅরবিন্দকে উনি বলতেন বাবা; তাঁর নামে একেবারে জল!

মাঝে মাঝে মৃদুদি মিষ্টি বানিয়ে বাবাকে পাঠাতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ তৃপ্তি ভরে তা খেতেন। শুনেছি পান্তুয়ার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের খানিক পক্ষপাতও ছিল। এই মৃদুদিকে সাধনার কথা বুঝিয়ে বাংলায় কিছু পত্রও দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ।

দুপুরের এই দর্শনের একটি দিনের কথা বলি। ফ্রান্স থেকে নতুন একটা ফুলগাছ এসেছে—নার্সিসাস। প্রথম যেদিন দুর্লভ ওই ফুল ফুটল, যতীনদার আনন্দ ধরে না। সাজিয়ে গুছিয়ে টবটা বেশ ভাল রকম এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে উনি অপেক্ষা করছেন—মা নামবেন বলে।

ইতিমধ্যে দামাল কিছু ছেলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এসে পড়ল ফুল গাছটার কাছে। হোঁচট খেয়ে টোগো পড়ল টবের ওপরে। ফুল সমেত মুচ করে ডাঁটাটা ভেঙে গেল। আর হাঁউমাউ করে যতীনদার আর্তনাদ: "সর্বনাশ হল, মাকে ফুলটা দেখানো গেল না!"

এমন সময়ে অকুস্থলে শ্রীমায়ের আবির্ভাব।

আত্মসংবরণ করে ফুলটা টোগোর হাতে গুঁজে দিয়ে বামালসমেত অপরাধীকে নিয়ে যতীনদা হাজির হলেন মায়ের সামনে। বলির পাঁঠার মতো টোগোর চেহারা দেখে শ্রীমা হেসে অস্থির। ওর হাত থেকে তারপরে ফুলটা নিয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন, "চোট লাগেনি তো?" ভবিষ্যতে আরো সাবধান হবার পরামর্শ দিয়ে মা আসামীকে রেহাই দিলেন।

টোগো যতীনদাকে বলল, "ভালই হল; এমনিতে তো ফুলটা আমার হাতে দিতেন না শ্রীমাকে দেবার জন্য!"

দস্যিপনার কাহিনীর শেষ নেই।

খেলার মাঠে, যেখানে শ্রীমায়ের বিশ্রামের ঘর—সেখানটায় তখন ছিল ক'টা গুদাম-ঘর, মালিক ছিল বাইরের এক ব্যবসায়ী। দেয়ালের এধারে দরজা-জানলা কিছুই ছিল না। কিন্তু তার ওপরেই (বর্তমানে যেখানে আশ্রমের সিনেমার প্রজেক্‌শান-হল্‌) ছিল একটা ক্লাস-ঘর; পাশাপাশি আরও ক'টা ক্লাস—সোজা এখনকার আসনের ক্লাস পর্যন্ত। তার পাশে একটা ছাদ ছিল বিপজ্জনক—ওখানে ওঠা নিষেধ ছিল। পরে মেরামত ক'রে ওখানে বসে ব্যান্ড পার্টি।

আমাদের ডানপিটে দলের নেতা ছিল তখন দুর্ধর্ষ গুর্জর রাষ্ট্রীয় ছাত্র ভাগ্যচন্দ্র; তারা নিষিদ্ধ ওই ছাদে যেত "ধাপ্‌পা" (লুকো-চুরির আঞ্চলিক একটি রূপ) খেলতে। টোগো প্রাণচঞ্চল্যে তাদেরই পর্যায়ে ছিল। একদিন লোভ সংবরণ না করতে পেরে সেও যোগ দিল বিপজ্জনক ওই খেলায়। দিবি তো দে, সেদিনই জম্‌জমাট আসরে এসে হাজির হলেন দাদা (প্রণবদা) এবং সবকটি নাম বলে দিলেন শ্রীমাকে।

পরদিন প্রসাদ বিতরণের সময়ে অভিযুক্তদের একজনও শ্রীমার মুখের দিকে সাহস করে তাকাতে পারল না। মনের ভয়ে তাদেরও ধারণা হল, শ্রীমা খুব অপ্রসন্ন হয়েছেন। মনমরা টোগো একটু পরে খেদের সঙ্গে আমায় বলল, "আচ্ছা, আগে তো কোনদিন আমি ও-ছাদে যাইনি; ধরা পড়লাম একেবারে প্রথম দিনেই?"

দাদার শুনে কি মনোভাব হল, শ্রীমাকে বললেন কথায় কথায় টোগোর উক্তিটি। শ্রীমা জবাব দিলেন: "যারা খাঁটি, তারা সামান্য একটু ভুল পথে চললেও সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তাদের এইভাবে সতর্ক করে দেন।"

কথাটা অবশ্য টোগোর কানে আর তুলে দিইনি।

*

প্রণবদাকে লোকে বাইরে থেকে জানত মিলিটারি মেজাজের মানুষ। অর্থাৎ নেহাতই কাঠখোট্টা যেমন বিরাট পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক পবিত্রদা (P. B. Saint-Hilaire)কে কেউ কেউ পরিচয় দিত "মায়ের ড্রাইভার" নামে, তেমনি দাদাকে অনেকে "মায়ের বডিগার্ড" ছাড়া কিছু ভাবতে পারত না। কিন্তু আমরা কাছ থেকে তাঁকে চিনতাম যারা, মানুষের এই পল্লবগ্রাহী চরিত্র দেখে আমাদের খারাপ লাগত।

দাদার মধ্যে ছিল একাধিক ব্যক্তিত্বের জটিল সংমিশ্রণ। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর অধ্যয়ন ছিল গভীর। সঙ্গীতে তাঁর শুধু অনুরাগই নয়; দীর্ঘকাল ক্ল্যারিওনেট চর্চা করেছেন তিনি অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে (যিনি আমায় চার-পাঁচ বছর পরম ধৈর্য নিয়ে [illegible] শিখিয়েছেন); খেলার মাঠে লম্বা দৌড়ের অর্ডার দিয়ে মাইক্রোফোনে দাদা শিস দিতেন—স্বতঃস্ফূর্ত সেই সুরবিহারে পূর্ব-কল্পিত ছাঁদ কিছু থাকত না, কিন্তু অনুভব করা যেত যে বহু দূর থেকে একটা সুন্দর জগৎ যেন নেমে আসতে চাইছে। অমিয় গাঙ্গুলি ছাড়া অমন দরদী শিস দেওয়া আমি আর শুনিনি। দাদা আমার জীবনের প্রথম বাঁশি যেটা উপহার দেন, মাদ্রিদ, মিউনিক, মস্কো সর্বত্র সেটা আমার সঙ্গে আজও ঘোরে। তাঁরই উৎসাহে অর্কেস্ট্রার জন্য কিছুকাল আমি সুর রচনা করেছি পশ্চিমী হার্মনীর সঙ্গে—যা শ্রীমায়ের প্রশংসাও পেয়েছে।

একটি কৌতুকপ্রিয় সদানন্দ পুরুষের পাশাপাশি সেদিন দাদার মধ্যে আমরা সভয়ে লক্ষ্য করতাম বিষণ্ণ চিন্তাকুল দ্বন্দ্ব-শ্রান্ত একটি মন। "সভয়ে" বলছি অকারণে নয়। দাদার বিষণ্ণ মুহূর্তে অপ্রিয় কিছু যদি দেখতে পেতেন, নির্মম হয়ে উঠতেন তিনি, এমনকি প্রহার দিতেও অরুচি থাকত না তখন।

একদল বডি-বিল্‌ডার ও ভারোত্তলন-বিশারদ তখন আমাদের মধ্যে গ'ড়ে উঠছিল দাদার প্ররোচনায়; এমনকি তাদের সন্তোষার্থে প্রায়ই পেশী-সঙ্কোচন ইত্যাদির প্রদর্শনী হত আশ্রমে—মনতোষ রায়, মনোহর আইচ প্রভৃতিও এসে যোগ দিয়েছেন তাতে। উক্ত দলে আমাদের সহপাঠী শৈলেশ, অনিলবরণ রায়ের ভাইপো তাপস, জাস্টিস বশিষ্ঠনারায়ণের পুত্র পর্ণকুমার প্রমুখ অনেকেই ছিল। প্রত্যেকে তারা তখন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, কিন্তু চঞ্চল প্রাণকে ঠাণ্ডা রাখবার সোনার কাঠি খুঁজে পায়নি তখনো। একদিন চপল এক মনোভাব নিয়ে শৈলেশ দাদার মুখের ওপরে চোপা করল; দাদারও তখন "কৃষ্ণপক্ষ" চলছে। বাংলার জুনিয়ার বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ও জগৎ শীলের ছাত্র প্রণবকুমারের দু-তিনটে চড়েই কিশোর শৈলেশ কুপোকাৎ হল।

আমি তখন শারীর-শিক্ষা গ্রন্থাগারে দাদার সঙ্গে দিনে ক'ঘণ্টা কাজ করতাম। পরদিন সকালে, ইস্কুলের ফাঁকে, কাজে গিয়ে দেখি—দাদার চোখমুখ ফোলা, কত-না কেঁদেছেন যেন। সাহস হল না কিছু প্রশ্ন করতে। নিভৃত এক অবকাশে নিজেই বলতে শুরু করলেন: "আমার হয়েছে জ্বালা। তোদের বেয়াদপি দেখলে শাস্তি দিয়ে ফেলি, আর নিজেও ভুগি তার ফল। সারারাত কাল ঘুম এল না চোখে শৈলেশের কষ্ট হচ্ছে ভেবে।"

এর অল্পকাল পরে, বিজয়া-দশমীর বাণীতে শ্রীমা ঘোষণা করলেন যে নিরাশা ও বিষাদের অসুর অবশেষে পরাজিত হয়েছে। এর পরে ধীরে ধীরে দাদা ওই কৃষ্ণপক্ষের কুক্ষি থেকে বেরিয়ে আসেন শুক্ল শুভ্র এক রূপান্তরের প্রক্রিয়াতে। আজও তাঁর সাধনা শেষ হয়নি।

প্রথম দিন শিশিরদার সঙ্গে বাংলা ক্লাসে ঢুকছি—এমন সময়ে অস্বাভাবিক গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হয়ে দেখে নিলাম এক লহমায় পাশের ক্লাসের দুরবস্থা। বছর-চল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক ডাগর ডাগর শিবনয়ন মেলে ব'সে আছেন। মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল নেমে এসেছে ঝরনার মতো কাঁধ ছাড়িয়ে বুকে, পিঠে; পুরু দুটি ঠোঁট ফাঁক করা—যেন সর্দি হয়েছে। পাঞ্জাবী ঠেলে আত্মজাহির করছে শরীরের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভুঁড়িটা। তাঁকে ঘিরে একপাল বাঙালী-গুজরাতি-হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়ে ছুটোছুটি করছে টেনে টেনে ছড়া কেটে:

"কবি রেগে আগুন/তেলে তেলে বেগুন!"

শিশিরদা দরজার কাছে ডাক দিলেন: "বলুন, নিশিকান্ত, কিছু করব নাকি?" ইহলোকে ফিরে এলেন ভদ্রলোক। ত্রস্তপদে উঠে এসে জবাব দিলেন শীর প্রশান্ত কণ্ঠে: "নাঃ, শিশিরবাবু। প্রথম দশ মিনিট হট্টগোলের পরেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে এসে ব'সে। তখন রামায়ণ বলা শুরু করি—আর কেউ টুঁ শব্দ করে না!"

নিশিকান্তের কথা একাধিক কারণে বড় ক'রে অন্যত্র বলবার আগ্রহ রইল। বিদ্যালয়-প্রসঙ্গে বলি শুধু—ক' বছর পরে তিনি যখন আমাদের "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়াতে এলেন, বড় দুঃখ হয়েছিল, অত রসিক, অমন জ্ঞানী মানুষটা মাস্টারি করতে বসলেই কেমন বিস্বাদ হয়ে যান। বহু বছর বহুদিন ও'র মজলিসে এবং একান্তে ব'সে যত কিছু শিখেছি, যত বিস্মিত হয়েছি ও'র সাহিত্য-রসগ্রাহী মনের প্রসার ও উত্তুঙ্গতা দেখে, ততই ক্ষুব্ধ হয়েছি অধ্যাপনার মাধ্যমে এত সব মণিরত্ন তিনি দিয়ে যেতে পারছেন না দেখে।

শিশিরদা আমাদের দু' ভাইকে নিয়ে বাংলার সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পোঁছে দিলেন। ইলাদির ক্লাসে। সহপাঠী পেলাম মনোজ ও আরতি দাশগুপ্ত, মনা ও বনলতা সরকার, অমিতা সেন, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, রণজিৎ সরকার—সকলেই আমার চেয়ে অল্প-বিস্তর বয়স্ক মনে হল। ইলাদির স্বামী নলিনীকান্ত সেন পরে আমাদের ভূগোল ও অঙ্কের ক্লাস নিয়েছেন।

ক' মিনিট ক্লাসে বসেই হৃদয়ঙ্গম করলাম, এ বড় কঠিন ঠাঁই। যেমন ইলাদির শাসন, তেমনি নিখুঁত কাজের দিকে তাঁর নজর। ক্লাসে সবাই তটস্থ। বাংলা বলতে গিয়ে দৈবক্রমে বিজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র—বকুনি। আচরণে তিলমাত্র শালীনতার অভাব ঘটা মাত্র—বকুনি। রাস্তায় আমাদের কে যেন জোরে কথা বলেছে, তার জের টেনে—বকুনি। ডাইনিং রুমে একজন 'কিউ' ভেঙে আগ বাড়িয়ে খাবার নিয়েছে ব'লে—বকুনি।

অথচ মানুষটি ছিলেন দেখতে অসাধারণ কিছু নয়। গাম্ভীর্যের আড়ালে রস-বোদ্ধা এক অভিজাত বুদ্ধি অনবরত আমাদের যাচাই ক'রে নিত। গভীর কর্তব্য-বোধে মমতায় ঘাটতি ছিল না। গোল গোল কাঁচের আড়ালে কিন্তু ওই তাকানো দেখলে বহুদিন অবধি বুকের তলা হিম হিম লাগত।

মর্মে মর্মে ইলাদি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রবাসী বাঙালীর সন্তানকে ছত্রিশ জাতের আওতায় ব'সে বাংলা শেখাতে হলে উগ্র একটু শুচিবাই থাকা দরকার। সেদিন তাঁর শক-থেরাপি খুব মুখরোচক না লাগলেও পদে পদে পরবর্তী জীবনে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি ও'র কাছে। যেমন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি তিনকড়ি মিত্র, রানী মৈত্র, রবীন্দ্র খান্না, শিশির মিত্র, নীরদবরণ, পিয়ার্সন, কার্পেলেস প্রভৃতির অবদান। অল্প বয়সের ঔদ্ধত্যে কত অন্যায় করেছি এঁদের কাছে, কত

অত্যাচার সহ্য করেছেন এ'রা অম্লান বদনে, শ্রীমায়ের সন্তান ব'লে স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন। সবার নাম করতে না পারলেও কত শিক্ষক, কত অধ্যাপকের কাছে ঋণী থেকেছি সারা জীবনের জন্য।

১৯৫০ সালে শ্রীমা বললেন, "ইলার কাছে তালিম নিয়ে তুমি নিশিকান্তের একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করবে আমাদের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে।" এবং এই আবৃত্তির সূত্র ধ'রে লক্ষ করেছি শ্রীমা কতখানি নির্ভরতার সঙ্গে কারো কাছে কাউকে শিক্ষানবিসী করতে পাঠিয়েছেন। মহড়া দেবার সময়ে মা উপদেশ দিয়েছেন, "ভাল ক'রে শোন, ইলার স্বরটা এখানে কিভাবে চড়ছে!" অথবা ঃ "না, এখানে কিন্তু ইলার গলা আরো সুরেলা হয়!"

দেখতে দেখতে এসে পড়ল আশ্রমে আমার প্রথম জন্মদিন। সে-যুগে ব্যক্তি-জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন ছিল এই জন্মদিনটি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, কেন জন্মদিনকে অতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় আশ্রমে ঃ সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাগতিক শক্তিগুলির ক্রিয়াতে আছে যে-ছন্দ, সেই ছন্দের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় জন্মদিনে, যখন পুরো সত্তায় (দেহে, মনে, প্রাণে) জাগে একটা উন্মীলন, নতুনভাবে ছন্দিত হবার আকাঙ্ক্ষা! এই জন্যই জন্মদিনে শ্রীমা বিশেষ আশীর্বাদ দেন।

ও সবের কিছুই বুঝতাম না তখন। কিন্তু জানতাম ওদিন আমরা রাজার রাজা।

ভোর তখন পাঁচটা হবে কিনা সন্দেহ। রাতের তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম সেরে সদ্যস্নাতা শ্রীমা দাঁড়ালেন এসে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের পাশেই ছোট প্যাসেজটিতে। মাথার ভিজে চুল বাঁধেননি তখনো। দিনটা কালীপুজো ছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু পরনে ছিল তাঁর ঘোর কালো মখমলের একটা পোশাক। আশ্রমে অনেক পুজো-পার্বণের সঙ্গে বড়দিনও উদযাপিত হত। শ্রীমা এসব মানতেন উৎসবগুলির প্রতীক-রূপ স্মরণার্থে।

মাকে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সেই যে দিনটার শুরু হল, বিকেল পর্যন্ত তারপরে ন' দশবার তাঁর কাছে গেলাম, বই, চকোলেট, ফুলের তোড়া কত-না উপহার পেলাম।

কলকাতা থেকে তার আগের দিন অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী এসে পৌঁছেছেন, বাবার কাছ থেকে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন নানা মিষ্টি। আর আমাদের তদানীন্তন দ্বিতীয় ডেরা সুধীরদাদুর বাসায় আমার মা-ও কম আয়োজন করেননি। বিকেল এলেন নলিনীদা (গুপ্ত), অমৃতদা, নিশিকান্ত (টাটকা একটা জন্মদিনের কবিতা নিয়ে—এটি প্রতি বছরেই আমার পাওনা ছিল), নৃপেনদা প্রভৃতি। তারপর শুরু হল বালখিল্যদের পর্ব। সে এক মহাভোজ। সন্ধ্যে কখন উৎরে গেল খেয়াল ছিল না।

তড়িঘড়ি স্নান সেরে আশ্রমে গেলাম, দিনান্তে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীমা অনুযোগ করলেন ঃ "বাঃ, তোমায় যে সকালবেলা মনে করিয়ে দিলাম খেলার মাঠে এসো ; এলে না তো?"

"বাড়িতে অনেকে এসেছিলেন, মা। হুঁশ ছিল না, কিভাবে সময় গেল", ভাঙা ইংরেজিতে সাফাই গাইলাম।

"হুঁ, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দেখছি", একমুঠো জুঁইফুল দিয়ে শ্রীমা বললেন, "আজ কিন্তু রাতের ধ্যানে এসো না। বাড়ি ফিরে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নাম নিয়ে ভাল ক'রে ঘুম দাও, কেমন?"—সাধারণত রাতের ধ্যান দেরিতে বসত ব'লে শ্রীমা চাইতেন না, ছোটরা অতক্ষণ জেগে বসে থাকুক। জন্মদিন ছাড়া আর একটি দিন এর ব্যতিক্রম ছিল।

৩১শে ডিসেম্বর ঠিক রাত বারোটায় নূতন বৎসরের অভ্যর্থনায় বেজে উঠত শ্রীমায়ের অর্গ্যান। সুরলোকের সেই শঙ্খধ্বনি শুনব ব'লে সন্ধ্যে বেলাতেই খেয়ে-দেয়ে মাদুর বগলে আমরা বসতাম গিয়ে আশ্রমের প্রধান ভবনের চাতালে। অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় এই সঙ্গীতেরই বা বুঝতাম কতটুকু? কিন্তু আমাদের শৈশব-চেতনায় অপূর্ব আলোড়ন জাগাত এর মূর্ছনা। গভীরের পানে আমাদের পথ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে চলত এই বাজনা। কল্পনায় মনে হত—কখনো নির্জন মাঠের বুক চিরে আঁধার রাতে শুনছি উদাস বাঁশির আহ্বান, কখনো আবার প্রবল ডমরুর উদ্দীপনা, কখনো উদাত্ত ভৈরব ঐকতানে মুহ্যমান হয়ে দেখতে পেতাম তারাজ্বলা নতুন একটা আকাশ—যেখানে উঠছে অনেক আলোর ঢেউ, ছুটছে নানা গন্ধের ফোয়ারা প্রস্রবণ!

মায়ের বাজনা থেমে গেলে চোখ মেলে দেখতাম, রোজকার পরিচিত লতানে গাছটার সাদা ঝুমকো ফুলের ভিড়ে সম্পূর্ণ অচেনা তাৎপর্য নিয়ে ঝলমল করছে সবুজ পাতার হাসি।

ঠিক সেই লগ্নে কানে আসত শ্রীমায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত নববর্ষের বাণী। দল বেঁধে অলৌকিক সেই পরিবেশে শ্রীমাকে গিয়ে জানাতাম সম্ভাষণ। পেতাম তাঁর আশীর্বাদ।

বড় রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় লাগত এই নৈশ সম্মেলন।

যতদিন শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিয়েছেন, ভোরবেলা, ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীমা নেমে এসেছেন দর্শনের দিন (চারটে নাগাদ) সবাইকে আশীর্বাদ দিতে। তারপর যেতাম আমরা সমুদ্রের ধারে—সূর্যোদয় দেখতে।

অক্ষয় আনন্দের আলোকে সেই দিনগুলি আঁকা আছে মনের গহনতম কন্দরে।

পরে আমরা এই অভিজ্ঞতার স্বাদ ফিরে পেতে চেয়েছি, যখন পরীক্ষিতের ছাদে পালন করেছি কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। গেয়েছি মনে মনে লক্ষ্মীর প্রশস্তি ঃ "কমল-কানন বাসিস ভাল!" [ক্রমশ]

[আলোকচিত্র ঃ শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে]

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
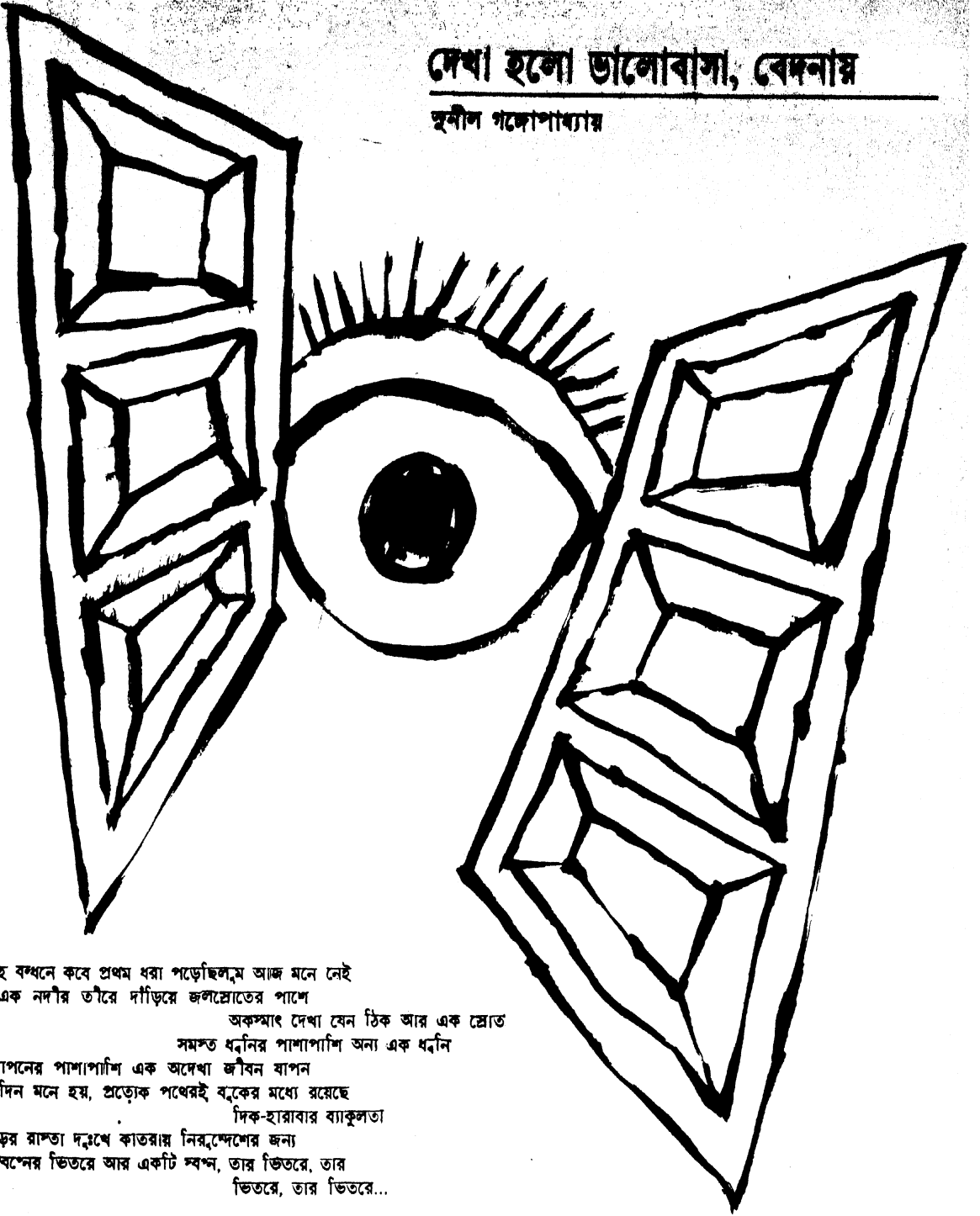
মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই
না এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের পাশে
অকস্মাৎ দেখা যেন ঠিক আর এক স্রোত
সমস্ত ধ্বনির পাশাপাশি অন্য এক ধ্বনি
ন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন
একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা
বাড়ির রাস্তা দুঃখে কাতরায় নিরুদ্দেশের জন্য
ক স্বপ্নের ভিতরে আর একটি স্বপ্ন, তার ভিতরে, তার
ভিতরে, তার ভিতরে...

কার গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে
র হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
দয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট স্টিমারের মত ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোষাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে

ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উঁচু আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
                    পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
                    তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,
                    আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
                    আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে, আমি তাঁকে
                    শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি।

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
                    শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙীন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
                    সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেন্ডারের ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
                    কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু' মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব...
ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
                    ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশী রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
                    প্রাণ খোলা বুক কাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
                    হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
                    আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন
দশকর্ম ভান্ডারের পাশের গাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
                    লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
                    স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
                    বিসদৃশ ঠ্যাঙ
গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তীর ছেলেদের
                    সঙ্গে ছিপি খেলছিলাম।

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো ফিরে যাবো আবার
                    আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর, সুদূর শহর
                    গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে

জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে
চাইনি

এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া
শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থল পদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
'নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
অথবা জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা

এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দীঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলার
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে এক একদিন সব নৈঃশব্দ্য খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে

জেগে উঠতো নিশির ডাক :
শান্তা না মূল? শান্তা না মূল?

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরেই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূরে আকাশ গঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালী পরিচয়
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথর কুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, শুর্কি ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলেছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল, সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
সে ভেঙেছে, ভাঙার নেশায় ভেঙে গেছে
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশী
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ!

আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
বেরিয়ে এসেছি হাওয়ায়
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়
আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহদের দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর!
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠনের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো,
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুল চোর,
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ

হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুংকার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পথের বাঁকে, তারা
হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি
স্মৃতির মধ্যে ঢুকেছিল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে
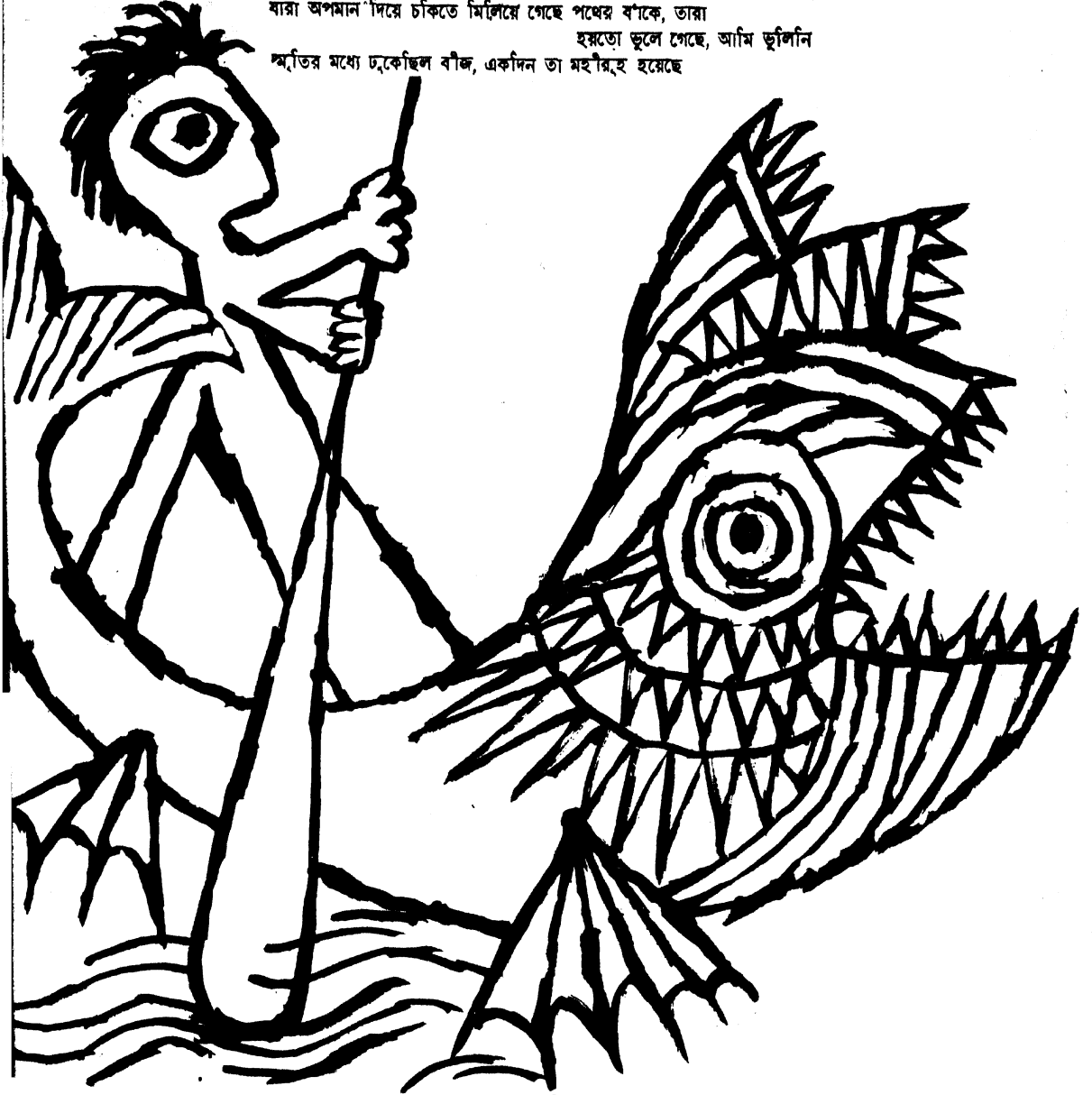
তার হিরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পাখি যার হীরে কুচি চোখ
বহুদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি
আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের জন্য প্রতীক্ষা ?
আমি বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়
বারুদখানা
আমি বৃষ্টির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বৃষ্টিকে মনে হয়
তেজস্ক্রিয়
আমি জানলায় গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে
প্রশ্ন করি, জানো, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের প্রতীক্ষা ?
এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য

যার কামারশালায় বিচ্ছুরিত শব্দের ফুলকি সব সময়
ঘিরে রাখে আমার
একলা সময়
আসলে আমার একাকিত্ব নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই
এক একদিন এই শহর স্তব্ধ হয়ে যায়
এক একদিন এই চোখে দেখা জগত থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়
সমস্ত জনপ্রাণী
সেই মাতৃ গর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অস্তিত্বের মধ্যেও
জেগে থাকে আদিম শব্দ
সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহা জাগরণ
সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি
তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়
এক অন্য অন্ধকার
স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না
গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে যেতে হঠাৎ আঁকড়ে ধরি
ভাসমান তৃণ
এই নিমজ্জন ও ভেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই
শরীরকে খোঁজাখুঁজি
যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন
স্তন ও কোমরের খাঁজে অন্য এক
রূপের চোখ ফাটানো বিভা,
তার ভিতরে অন্য এক, তার
ভিতরে, তার ভিতরে,
যেমন স্বপ্নের মধ্যে
স্বপ্ন...
এমনকি যেখানে সুন্দর অতি প্রথাসিদ্ধ, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়
সেখানেও সমস্ত আলোর পাশে উড়তে থাকে আরও একটি আলোর পর্দা
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার
হিরণ্য ডালপালা নিয়ে
সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হীরে কুচি চোখ
অচেনাতম কণ্ঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে? প্রতীক্ষায় আছি!
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদব্রহ্ম, তখনই
ছ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়
কার প্রতীক্ষা? কিসের জন্য প্রতীক্ষা? উত্তর পাই না
যদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে সেই আর অন্য নীলিমা
মৃত্যুর ওপারে জীবন!

ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে
যমজের মত ছুটে যায়
অথবা হ্রদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম
জলের কিনারে
দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়, দেখা হলো, দেখা হলো
রোদ্দুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ, এত মায়া, এত বেশী মায়া
পায়ে পায়ে চোর কাটার মত ভুল, ফেলে যাওয়া নীল রুমালের মত
অভিমান
সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হলো
দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফোঁটা ছন্নছাড়া কান্না বিন্দু
পড়ে রইলো ঘাসে
এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, যে-কোনো নদীর বাঁকে
চোখের ইসারা
দেখা হলো, পাথরের বুকে ঘুম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে
দেখা হলো
জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিভৃত শিল্পের বড়
মর্মভেদী টান
দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা হলো... ...
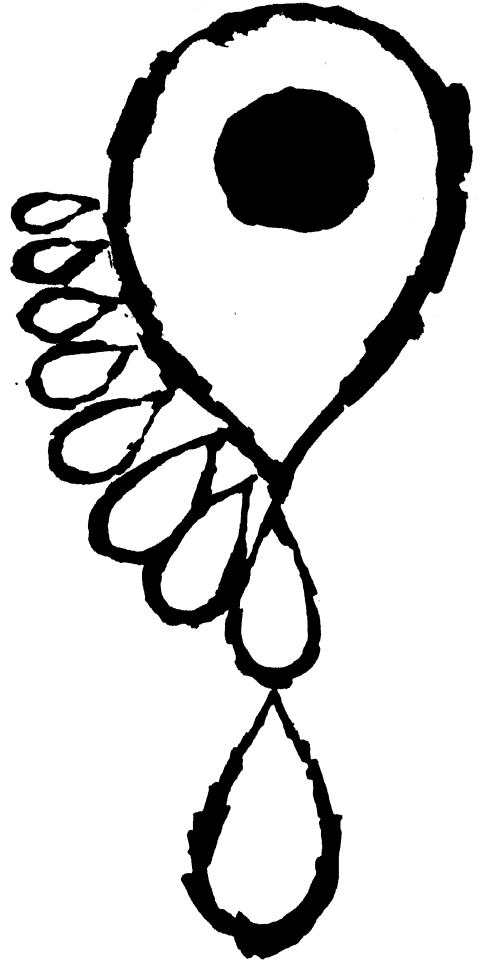
বাংলা মুদ্রণ ঃ দ্বিশতবার্ষিকী

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত চার্লস উইলকিনসকে একপ্রস্থ বাংলা টাইপ নির্মাণের জন্য গবর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে শুধু নির্দেশমাত্র নয়—বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। উইলকিনস সে-কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাঁর অত্যাশ্চর্য সাফল্য প্রত্যাশার সকল সীমা অতিক্রম করে। য়ুরোপীয় শিল্পীদের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন উইলকিনস এদেশে একাই ধাতুবিদ্যাবিশারদ, খোদাইকর, ঢালাইকর এবং মুদ্রাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই মহান আবিষ্কার-কর্মে তাঁকে শারীরিক শ্রমও কম করতে হয় নি। এরূপ একটি কঠিন শিল্পকর্মে একক আত্মনিয়োগকারীকে যে-সকল দুরতিক্রম্য বিঘ্ন-বাধার সম্মুখীন হতে হয়, উইলকিনস তা এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ও তৎপরতায় জয় করেছেন যা য়ুরোপীয় শিল্পীবর্গের নিকটও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। পৃথিবীর অন্যত্র যা নিরন্তর প্রয়াসে বহুযুগের সমবেত সাধনায় ক্রমশ আয়ত্তিগত হয়, উইলকিনস সেই দুর্লভ সার্থকতা একাই এবং প্রথম প্রচেষ্টাতেই অধিগত করেছেন।"

—নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ, ১৭৭৮ খৃঃ

*

বাংলা মুদ্রণ তথা বঙ্গীয় মুদ্রিত সাহিত্যের দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হল বর্তমান বর্ষে। এই শুভমুহূর্তে প্রথিতযশা মহাপ্রাণ দুই প্রাচ্যবিদ্ মনীষীর নাম গভীরভাবে স্মরণীয়। একজন বঙ্গীয় মুদ্রণশিল্পের জনক স্যার চার্লস উইলকিনস, দ্বিতীয়জন বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যের কালক্রমের ইতিহাসে শিরোনাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ। বঙ্গের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল, 'ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য'[1]

ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহ প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছিল একখানি সুবৃহৎ বাংলা ব্যাকরণ—বাংলা হরফে ছাপা প্রথম গ্রন্থ—এই বঙ্গভূমি থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত; রচয়িতা বঙ্গহিতৈষী হালেদ (১৭৫১—১৮৩০), মুদ্রাকর মহামতি চার্লস উইলকিনস (১৭৫০—১৮৩৬)।

সুবিখ্যাত ইংলণ্ডীয় কাম্মী শেরিডনের নাম কার না জানা। পুরো নাম রিচার্ড ব্রিন্সলি শেরিডন। ইনি ছিলেন তরুণ বয়সে হালেদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হালেদের বয়স তখন কুড়ি-একুশ। দুই বন্ধুর সে-সময়ে এক ভাবনা এক কল্পনা এক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যস্থলে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁর নাম এলিজাবেথ অ্যান লিনলে (১৭৫৪—১৭৯২)। সুন্দরী এবং সুগায়িকা। উভয়েই তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। প্রেমের উদ্দাম তরঙ্গে দুই বন্ধুই তখন উচ্ছ্বলিত, এই সময় (১৭৭১) হালেদ ও শেরিডন—দুই মিত্রে মিলেমিশে প্রাচীন গ্রীক কবির লেখা প্রেমের একখানি পত্রকাব্যও (The Love Epistles of Aristaenetus) অনুবাদ করে ফেলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে অবশেষে একজনকে বরণ করে নিলেন কুমারী লিনলে—তিনি বাচস্পতি শেরিডন; ব্যর্থ প্রেমে বিষণ্ণ হালেদ অতীতের দিনগুলি বিস্মৃত হবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রাইটারের চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে এলেন ভারতবর্ষের মাটিতে। সেটা ১৭৭২ সালের কথা।

ভারতবর্ষে আসার পূর্বেই প্রাচ্য ভাষা, বিশেষত আরবী ফারসী ভাষায় হালেদ আগ্রহী হয়েছিলেন। এ-বিষয়ের প্রতি তাঁকে কৌতূহলী করেছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রাচ্যভাষাবিদ্ স্যার উইলিয়ম জোন্স। ১৭৬৮ সালে হালেদ অক্সফোর্ডে ক্রাইস্ট চার্চে ভর্তি হলে সেখানে জোন্সের সাহচর্য লাভ করেন। সে-সময় থেকেই জোন্সের উৎসাহে প্রাচ্যভাষা অনুশীলনে মনোযোগী হন হালেদ। ভারতবর্ষে এসে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষাটাও তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করে ফেলেন। যে-বছর হালেদ দেশ ছেড়ে ভারতে আসেন সে-বছরই বঙ্গের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব (১৭৩২—১৮১৮)। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় এই ওয়ারেন হেস্টিংসের গভীর অনুকূলতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন হালেদ। দোষেগুণে হেস্টিংস ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় পুরুষ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই হেস্টিংস সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। যদিও তিনি সাধারণভাবে অত্যাচারী বলে পরিচিত ছিলেন—কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ উদারচেতা এক মহান-পুরুষ।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এই রকম ধারণা পোষণ করতেন; এবং বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ চন্দ্রশেখর উপন্যাসে হেস্টিংসের চরিত্র অঙ্কন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখে গেছেন।[2]

হালেদ প্রাচ্য ভাষা চর্চায় নিযুক্ত, সুতরাং তাঁর প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হল। হেস্টিংস চেয়েছিলেন ভারতবর্ষীয় আইন-কানুনের সাহায্যেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে। তাঁর প্রেরণায় ও উৎসাহে ১৭৭৪ থেকে '৭৬ সালের মধ্যে হালেদ হিন্দু-আইনের অনুবাদ করেন। হেস্টিংসের আগ্রহে সেই অনূদিত গ্রন্থ A Code of Gentoo Laws নামে প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে লণ্ডন থেকে। গ্রন্থের ভূমিকায় কোর্ট অব ডিরেক্টরদের প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের যে পত্র মুদ্রিত হয়েছে তাতে আছে—

'I have now the satisfaction to transmit to you a complete and correct copy of a translation of the Gentoo Code, executed with great Ability, Diligence and Fidelity by Mr. Halhed from a Persian Version of the original Shanscrit, which was undertaken under the immediate inspection of the Pundits or compilers of this work.'

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL

বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাংগুএজ'-এর (১৭৭৮) আখ্যাপত্র

*

অতঃপর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, ১১৮৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশ থেকে হালেদের যে বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়—সেটিই ইতিহাসে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক, বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যের যাত্রাপথে প্রথম মাইলস্টোন। ঐতিহাসিক সেই বইটির শিরোনাম A Grammar Of The Bengal Language। গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী
A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED
ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥
PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

---

১. দ্রষ্টব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'।

২. 'চন্দ্রশেখর', ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

'ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্মঠ লোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য-রক্ষার ভার তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্যরক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সক্ষম, তাহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য হইতে পারে না—কেন না তাহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন হেস্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।'

বংগীয় মুদ্রণশিল্পের জনক স্যার চার্লস উইলকিনস

আখ্যাপত্রে লেখকের নামের নীচে মুদ্রিত দুই চরণের সংস্কৃত শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—ইন্দ্রাদয়ঃ অপি যস্য শব্দবারিধেঃ অন্তং ন যযুঃ, কৃৎস্নস্য তস্য প্রক্রিয়াং বক্তুং নরঃ কথং ক্ষমঃ। অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি [দেবতারা]ও যে শব্দ-সাগরের অন্ত পেলেন না, সমগ্র সেই শব্দবারিধির প্রক্রিয়া মানুষের পক্ষে বলা কেমন করে সম্ভব ?

আটপেজি আকারের এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮। প্রথমে আখ্যাপত্র, আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা সাদা ; পরে ১—২৫ পৃষ্ঠা ভূমিকা, ২৬—৩০ পৃষ্ঠা সূচীপত্র-সংশোধন-সংযোজন-বিজ্ঞপ্তি ; অতঃপর ১—২১৬ পৃষ্ঠা ব্যাকরণ। সর্বমিলিয়ে (২+৩০+২১৬) ২৪৮ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থের প্রকাশ কাল : M DCC LXXVIII, অর্থাৎ ১৭৭৮ সাল, বঙ্গাব্দের হিসাবে ১১৮৫ সন।

হালেদ প্রণীত এই শব্দশাস্ত্র 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং'—ফিরিঙ্গিগণের উপকারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ বণিক ও শাসনকার্যে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য হালেদ এই বৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করেন। ব্যাকরণের সূচীপত্রটি এইরকম :

এ গ্রন্থ শুধু বোধপ্রকাশক শব্দশাস্ত্র মাত্র নয়। ব্যাকরণের আলোচনা ছাড়াও এতে আছে সংখ্যা গণনা, মুদ্রা ও ওজনের বিস্তারিত পরিচয় ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়। তাছাড়া আবার ছন্দ নিয়েও রীতিমত আলোচনা করা হয়েছে বইয়ের শেষে।

বইয়ের প্রতিটি জোড় পৃষ্ঠার শিরোদেশে লেখা A GRAMMAR OF THE এবং বিজোড় পৃষ্ঠার শিরোদেশে লেখা BENGAL LANGUAGE। বইয়ের নাম সহ প্রতি পৃষ্ঠার মুদ্রিত বস্তুর মাপ লম্বায় ৬½ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ৪½ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠার ছত্র সংখ্যা ২১। তবে মহাভারতের দ্রোণপর্ব থেকে যেখানে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে-পৃষ্ঠায় বাংলা কবিতা ছাড়া অপর কোনও ইংরেজি শব্দ নেই, সেখানে দুই চরণের এক-একটি শ্লোকের

বঙ্গের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হুগলী থেকে ছাপা হয়েছিল হালেদের বাংলা ব্যাকরণ

একটি মুদ্রাক্ষর ছাপাখানার যন্ত্রে বহুবার ব্যবহারের ফলে ভোঁতা হয়ে যায়। নূতন অবস্থায় অক্ষরটির বা টাইপটির যেরূপ তীক্ষ্ণতা থাকে, পুরাতন হয়ে গেলে আর তেমন থাকে না। অক্ষরের এদিক ওদিক অল্পবিস্তর ভেঙে যায়। ছাপাখানার একেই বলে ভাঙা টাইপ। 'শান্তি' ছাপতে চাই, কিন্তু ি-কারের মাথা ভেঙে যাওয়ায় ছাপা হয়ে দাঁড়ালো 'শান্ত'। এইভাবে জ্যৈষ্ঠ হয় আবার জ্যেষ্ঠ হয় জ্যেষ্ঠ, আর যাত্রী ী-কারের মাথা ভেঙে যাত্রা শুরু করেন। হালেদের সমস্ত বইটি নতুন টাইপে ছাপা, তাই বইয়ের কোথাও ভাঙা টাইপ চোখে পড়ে না। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে আট পৃষ্ঠা অন্তর ফর্মার নির্দেশ আছে a, b, c ও সংকেতের দ্বারা। আখ্যাপত্র, ভূমিকা ইত্যাদি অংশ চার ফর্মায় সম্পূর্ণ। তারপর ব্যাকরণ অংশের ফর্মা নির্দেশিত হয়েছে ক্যাপিটাল A, B, C ব্যবহার করে। Z চিহ্নিত ফর্মার পর Aa, Bb সংকেত দ্বারা ফর্মা চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার একেবারে নীচে ডানদিক ঘেঁষে পরের পৃষ্ঠার প্রথম শব্দটি মুদ্রিত হয়েছে। পৃষ্ঠার নীচের এই স্বতন্ত্র শব্দ পৃষ্ঠার ছত্র সংখ্যা গণনায় বা মুদ্রিত বস্তুর পরিমাপের মধ্যে ধরা হয় নি। বইয়ের কোথাও অকারণে পাতা ফাঁকা রাখা হয় নি। নূতন অধ্যায়ের জন্য নূতন পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয় নি : যে পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে সে-পৃষ্ঠায় সামান্য জায়গা থাকলে পরের অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছে সেখানেই। কোথাও দু লাইন কোথাও বা তারও কম ফাঁক দেওয়া হয়েছে দুই অধ্যায়ের মাঝে।

হালেদের ব্যাকরণে ইংরেজি বাংলা ও ফারসী—এই তিন লিপির ব্যবহার আছে। সমগ্র গ্রন্থে মাত্র দু-তিন স্থলে ফারসী লিপি (গরদিদন, নমুদন বদুন, সতান) পাই। মূল ব্যাকরণটি মুখ্যত ইংরেজি ভাষায় রচিত হলেও বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত অজস্র বাংলা শব্দ এবং পুরাতন বাংলা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত বিপুল সংখ্যক বাংলা শ্লোক বা কবিতা। পুথির জগৎ থেকে ছাপার হরফে বাংলা কবিতার সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ। মুখ্যত মহাভারত রামায়ণ ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে উদ্ধৃতিগুলি সংগৃহীত। এর মধ্যে মহাভারত থেকে গৃহীত কবিতার অংশই সর্বাধিক। তাছাড়া প্রাচীন গীতের অংশবিশেষও মুদ্রিত হয়েছে দু-এক পাতায়। সমগ্র গ্রন্থে যে-পরিমাণ বাংলা উদ্ধৃতি মুদ্রিত হয়েছে তা একত্রে সংগ্রহ করলে বইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ হয়ে যাবে। বইয়ের ৩৭ থেকে ৪২ পৃষ্ঠায় একটানা বাংলা কবিতা ছাপা। ৩৭ এবং ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রতিটি শ্লোকের সংগে তার রোমান-রূপও মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু ৩৯ থেকে ৪২ পৃষ্ঠায় শুধুই বাংলা কবিতা। ৩৭ থেকে ৪২—এই ছয় পৃষ্ঠায় 'মহাভারত দ্রোণপর্ব মধ্যে এক অধ্যায়' থেকে ৭২টি চরণ পর পর মুদ্রিত হয়েছে। সেই পৃষ্ঠাগুলির দিকে তাকালে গ্রন্থটিকে আর ব্যাকরণের বই বলে মনেই হয় না ; মনে হয় যেন বাঙালীর সম্পাদিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত একখানি কাশীদাসী মহাভারত।৩ যে কটি বাংলা পুথি থেকে হালেদ তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে মহাভারত স্থান পেয়েছে সর্বপ্রথম। দ্রোণপর্ব থেকে যে অংশ হালেদ তাঁর ব্যাকরণে উদ্ধার করেছেন প্রথম বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ এখানে সেই অংশটুকু উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা গেল :

মুনিঃ বলে সুন পরিক্ষিতের তনয়।

এক কালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে।
নিমন্ত্রিয়া প্রাপ্ত বন্ধু আনে সভাকারে॥
সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন।
মান্ব শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রন॥
আইল অনেক রাজা না হয় গননে।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে॥

[পৃষ্ঠা ৩৭]

নানা বিধি আসনে বসিলা রাজা গনে।
একে একে সভাকারে পুছিস কথনে॥
বসুদেব খুড়া সেনী সাত্যকির বাপ।
সোমদত্ত দেখি তবে বড় হইল তাপ॥
ডাকিয়া বলিল সেনী সুন সোমদত্ত।
সভা মাঝে বৈস তুমি এ কোন মহত্ত॥
আমা সভা নামানিস কোন অহঙ্কারে।
পৃথিবির মধ্যে কেবা নাজানে তোমারে॥

[পৃষ্ঠা ৩৮]

মর্য্যাদা থাকিতে কেনো না জাহো উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে উঠি বৈস গিয়া॥
এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে জেন ঘৃত ঢালি দিল॥
সোমদত্ত বলে সেনী নাকরিস গর্ব্ব।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব॥
কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্তর।
এত কটু ভাসা মোরে কহিস বর্ব্বর॥
তোমা হৈতে নিচ কেবা আছয়ে মানুষে।
মোর অগোচর নহে জানিয়ে বিশেষে॥
এতেক সুনিয়া সেনী অতি ক্রোধ মন।
কোপে ডাক দিয়া বলে সুন সর্ব্ব জন॥
এত অহঙ্কার হইল আরে কুলাঙ্গার।
পরনিন্দা ছিদ্র নাহি চাহো আপনার॥
ইহার উচিত ফল দিব আমি তোরে।
এত বলি কোপে সেনী উঠিল সত্তরে॥

[পৃষ্ঠা ৩৯]

সেনী দেখি সোমদত্ত উঠিল তখন।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জন॥
তবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা ভঙ্গে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমানে।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি করে খানে খানে॥
তবে সভে উঠি দুহা নিবারন কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল॥
সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়ান॥
দ্বাদশ বৎসর সেই কৈল অনাহারে।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে॥
তপস্যায় বস হইল দেব দিগম্বর।
বৃষভে চড়িয়া আইল বনের ভিতর॥
শিব বলে বর মাগ সুনহ রাজন।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন॥

[পৃষ্ঠা ৪০]

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভূতি ভূসন অঙ্গ জটা তাঁর কেশ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া ঠাকুরে।
বিবিধ প্রকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥
সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥
সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
জতেক ভূপতিগন বসিয়া দেখিল॥
অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥
যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি॥
তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে॥
ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি॥

[পৃষ্ঠা ৪১]

হর বলে বর দিলু সুনহ রাজন।
তোর পুত্র জিনিবেক সেনীর নন্দন॥
প্রানেতে মারিতে তারে নাহবে সকতি।
এত বলি অন্ত ধ্যান হইল পসুপতি॥

শিবের স্থানে সোমদত্ত পাইয়া এই বর।
আনন্দিত হইয়া গেল আপনার ঘর॥
শিব বরে ভূরিশ্রবা সাত্যকি জিনিল।
তার উপক্ষন এই তোমারে কহিল॥৪

[পৃষ্ঠা ৪২]

কলকাতা থেকে হালেদের এই মহান ঐতিহাসিক গ্রন্থখানির কয়েকটি কপি বিলেতেও পাঠানো হয়েছিল প্রকাশের পরেই। জানি না এ-বই সেখানে শ্রীমতী লিনজের চোখে পড়েছিল কি-না কোনদিন॥

*

হালেদের গ্রন্থে এই যে বাংলা কবিতা ছত্রের পর ছত্র মুদ্রিত হল, তা ছাপাবার সমস্ত গৌরব এবং কৃতিত্ব মুদ্রককুলগুরু স্যার চার্লস উইলকিনসের। ১৭৭৮-এর অনেক আগেই বাংলা অক্ষর বা বর্ণমালার মুদ্রিত রূপ আমরা দেখেছি, কিন্তু সেগুলির সবই হাতে কাটা ব্লকের সাহায্যে ছাপা। বইয়ের একটি বা দুটি পৃষ্ঠায় বাংলা অক্ষরের নমুনা হিসেবে ব্লকের সহায়তায় মুদ্রিত। ছাপাখানায় যেভাবে টাইপ কম্পোজ করে প্রুফ দেখে মেক্-আপ করে বই ছাপা হয়, এসব বইয়ের বাংলা লিপিগুলি সেভাবে ছাপা নয়। উইলকিনসই প্রথম ধাতুনির্মিত টাইপ কম্পোজ করে, প্রচলিত হাতে সাজানো মুদ্রাযন্ত্রের রীতিতে বঙ্গভাষা মুদ্রণের গৌরব লাভ করেন। ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত বাংলা হরফের যেসব নমুনা ১৭৭৮-এর পূর্বে পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে প্রথম বইটির নাম 'চায়না ইলাস্ট্রেটা'। আমস্টারডাম থেকে ছাপা এ বইয়ের প্রকাশ কাল ১৬৬৭ সাল। গ্রন্থের একটি পাতায় বাংলা লিপির নমুনা ছাপা হয়েছে ব্লক বা প্লেটের সহায়তায়। এর পরের নমুনা পাওয়া যায় প্যারিস থেকে ১৬৯২ সালে লাতিন ভাষায় ছাপা একটি পুস্তকে। তার পর বাংলা লিপির নিদর্শন মেলে ১৭২৫ সালে জার্মানী থেকে লাতিন ভাষায় ছাপা আর একখানি বইতে। ১৭৪৩-এ হল্যান্ড থেকে মুদ্রিত আর একখানি লাতিন বইতে বাংলা লিপি পাই। ১৭৪৮-এ জার্মানীতে ছাপা একটি বইতে ১৭২৫ সালে মুদ্রিত ব্লকটি পুনরায় ব্যবহার করা হয়। অতঃপর ১৭৭৩ সালে বাংলা হরফের নমুনা ছাপা হল লন্ডন থেকে। এর তিন বৎসর পর ১৭৭৬-এ লন্ডন থেকে যে বইটি ছাপা হল তার লেখক আমাদের সেই হালেদ সাহেব, যে বইয়ের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের নাম A Code of Gentoo Laws। একটি পৃষ্ঠায় ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয়েছে বাংলা বর্ণমালার নমুনা। ১৭৭৭-এ লন্ডন থেকে মুদ্রিত আরও একখানি বইতে বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বইটি ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী'র একটি খণ্ড।

মনে রাখতে হবে ১৬৬৭ থেকে ১৭৭৭-এর মধ্যে যতগুলি বইতে বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার সবগুলিই ব্লক বা প্লেটের সাহায্যে ছবির মত করে ছাপা; ধাতুর অক্ষর তৈরি করে কম্পোজ করে এসব পৃষ্ঠা ছাপা হয় নি।

বিপুল সাধনায় হালেদ তো বৃহৎ একখানি বাংলা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলেন—যার মধ্যে বাংলা ভাষার নিদর্শনস্বরূপ বাংলা কবিতার ছড়াছড়ি। কিন্তু এ বই ছাপা হবে কেমন করে? আড়াই শত পৃষ্ঠার একখানা বই তো আর ব্লক করে ছাপা যেতে পারে না। এদিকে পাতায় পাতায় আছে বাংলা ভাষার অজস্র উদাহরণ। এই বাংলা ছাপাবে কে? বাংলা ছাপাখানাই তো তখনো অনাবিষ্কৃত। ধাতুনির্মিত বাংলা মুদ্রাক্ষর কেমন ভাবে তৈরি হবে? কে তার ছাঁচ প্রস্তুত করবে? ইংরেজি ও বাংলা ছাপার মধ্যে অনেক তফাৎ। বাংলায় আ-কার ই-কার ঈ-কার উ-কার ঊ-কার ঋ-কার যুক্তাক্ষর ইত্যাদির হাজারো ঝামেলা, আছে বর্ণে জটিলতা। এক উ-কার স্বরচিহ্নের আকৃতি ও প্রয়োগ কত রকমের! ক্+ু=কু, র্+ু=রু, শ+ু=শু, হ+ু=হু ইত্যাদি। একটা ইংরেজি ছাপাখানায় যত সংখ্যক টাইপের দরকার হয়, বাংলায় তার বহুগুণ বেশি মুদ্রাক্ষরের প্রয়োজন। প্রথম আমলে বাংলা মুদ্রণের জন্য প্রায় এক সহস্র হরফের প্রয়োজন হত; এখন হাতে কম্পোজে তা অর্ধেকে এসে নেমেছে। লাইনোতে সেটা তিনশোরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে।

হালেদের বাংলা ব্যাকরণ ছাপার কাজে এগিয়ে এলেন তাঁরই স্বদেশবাসী আর এক প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ চার্লস উইলকিনস। কুড়ি বছর বয়সে তিনিও সেই রাইটারের চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—হালেদের বছর খানেক আগেই। এদেশে এসে প্রথমে তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা শেখেন, পরে সংস্কৃত ভাষার একেবারে গভীরে প্রবেশ করেন। উইলকিনস এক সময় নিতান্তই শখ করে ছেনি কেটে দু-একটি বাংলা হরফ তৈরী করেছিলেন নিজের খেয়ালে। কিন্তু এই সামান্য সংবাদটিও হেস্টিংসের অগোচর ছিল না। হালেদ যখন তাঁর ব্যাকরণটি

---

৩. হালেদ ইংরেজ হয়েও রীতিমতন বাঙালী ছিলেন। এমন স্বচ্ছন্দে অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন যে কোনো বঙ্গীয় আসরে বাঙালীর পোশাকে তাঁকে নাকি আদৌ বিদেশী বলে মনেই হত না।
W. H. Carey লিখিত 'The Good Old Days of Honorable John Company' গ্রন্থে আছে, 'Halhed was so remarkable for his proficiency in colloquial Bengalee, that he was known when disguised in a native dress to pass as a Bengalee in assemblies of Hindoos.'

৪. হালেদের ব্যাকরণে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত যাবতীয় শ্লোক একত্রে সংগ্রহ করে পুনর্মুদ্রিত করেছেন পশুপতি শাশমল 'হালহেডের ব্যাকরণে প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রথম মুদ্রিত পাঠ' শীর্ষক প্রবন্ধে; চতুষ্কোণ ১৩৭৮ আশ্বিন।

ছাপার বিষয়ে বড়লাটের সাহায্য চাইলেন তখন হেস্টিংসের প্রথমেই মনে পড়ল উইলকিনসের কথা। হেস্টিংসের কথায় উইলকিনসও অত্যন্ত আগ্রহী হলেন ছাপার কাজে এগিয়ে এলেন বন্ধু হালেদের পাশে। হালেদ এবং উইলকিনস দুজনেই তখন হুগলীর কুঠিতে কর্মচারী। সুতরাং বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বে

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলকাতা ও তৎসান্নিহিত হুগলী

উইলকিনসের কাজের প্রতিটি পর্যায় নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেলেন হালেদ। বাংলা মুদ্রণশিল্পে উইলকিনসের সগৌরব কৃতিত্বের কথা বিবৃত করলেন হালেদ তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায়।

হালেদ লিখেছেন, 'এই পুস্তকে বাংলা অক্ষরগুলিকে এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা অবশ্যই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হবে। যদিও এই বইতে আমার চেষ্টা অসম্পূর্ণ কিংবা অনুল্লেখ্য বলে প্রতিভাত হতে পারে কিন্তু এর পাতায় পাতায় যে অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ কারিগরী দক্ষতার পরিচয় রয়েছে—তার অন্তর্নিহিত মূল্য গ্রন্থটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। যাঁরা বাংলা অক্ষরের জটিলতা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন তাঁরাই এ-বিষয়ে একমত হবেন যে বাংলা অক্ষরকে ইস্পাতের ছাঁচে ঢালা কত দুরূহ কাজ। প্রতিটি অক্ষরের অসম দৈর্ঘ্য এবং আয়তন, তাছাড়া নানা প্রকারের যুক্ত-বর্ণে অক্ষরগুলির বিভিন্ন অবস্থান। নিখুঁত ও সুসমঞ্জস ঢালাইয়ের কাজে অক্ষরসমূহের অপরিবর্তনীয় সমানুপাতিক আকৃতির প্রয়োজন। কিন্তু বাংলা বর্ণমালার যথাযথ রূপকার হিসেবে কোনো দক্ষ লিপিকরকে পাওয়া খুবই দুর্লভ। উইলিয়ম বোল্টস্ (যিনি বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত বলে খ্যাত) লণ্ডনে সর্বাপেক্ষা কুশলী শিল্পীর সহায়তায় এক প্রস্থ টাইপ নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্বাধিক জটিল অংশটিতে বা প্রাথমিক বর্ণমালার ক্ষেত্রেই তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত বর্ণমালার নমুনা দেখে এমন কোনো ধারণা করার কারণ নেই যে এ ধরনের নূতন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্ধ্বে তা কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত চার্লস উইলকিনসকে একপ্রস্থ বাংলা টাইপ নির্মাণের জন্য গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে শুধু নির্দেশমাত্র নয়—বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। উইলকিনস সে-কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাঁর অত্যাশ্চর্য সাফল্য প্রত্যাশার সকল সীমা অতিক্রম করে। য়ুরোপীয় শিল্পীদের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন উইলকিনস এদেশে একাই ধাতুবিদ্যা বিশারদ, খোদাইকর, ঢালাইকর এবং মুদ্রাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই মহান আবিষ্কার-কর্মে তাঁকে শারীরিক শ্রমও কম করতে হয়নি। এরূপ একটি কঠিন শিল্পকর্মে একক আত্মনিয়োগকারীকে যে-সকল দুরতিক্রম্য বিঘ্নবাধার সম্মুখীন হতে হয়, উইলকিনস তা এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ও তৎপরতায় জয় করেছেন যা য়ুরোপীয় শিল্পিবর্গের নিকটও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। পৃথিবীর অন্যত্র যা নিরন্তর প্রয়াসে বহু যুগের সমবেত সাধনায় ক্রমশ আয়ত্তিগত হয়, উইলকিনস সেই দুর্লভ সার্থকতা একাই এবং প্রথম প্রচেষ্টাতেই অধিগত করেছেন।' (লেখক কর্তৃক অনূদিত)

হালেদের কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এ কাজে উইলকিনসের কী পরিমাণ অধ্যবসায় নিষ্ঠা পরিশ্রম প্রীতি ও আন্তরিকতা যুক্ত ছিল। উইলকিনসের পূর্বে উইলিয়ম বোল্টস লণ্ডনে প্রসিদ্ধ অক্ষর নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনের সহযোগিতায় বাংলা মুদ্রাক্ষর নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-কাজে তিনি সাফল্য লাভ করেন নি।

চার্লস উইলকিনস বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক হলেও নিজে কিন্তু বাংলা বইপত্র কিছু লেখেন নি কোনদিন। হালেদের বই ছাপতে গিয়ে ব্যাকরণচর্চায় তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মায় এবং পরবর্তীকালে তিনি ইংরেজি ভাষায় একখানি মূল্যবান সুবৃহৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।[৫] সেই বই ১৮০৮-এ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় উইলকিনস বলেন,

'About the year 1778, my curiosity was excited by the example of my friend, Mr. Halhed, to commence the study of the Sanskrit.'

হালেদের ব্যাকরণ গ্রন্থখানির মুদ্রণ উপলক্ষে মহামতি উইলকিনস বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উইলকিনসই প্রথম ধাতুনির্মিত সঞ্চলনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরের (moveable Bengali metal types) জন্মদাতা। হালেদের ব্যাকরণে যে বাংলা টাইপ উইলকিনস ব্যবহার করেন তার উচ্চতা বা টাইপ-হাইট সাধারণভাবে ⅞ ইঞ্চি। এক ফেসের টাইপই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে—নামপত্র থেকে ভেতরের সকল অংশে; পাইকা স্মল-পাইকা গ্রেট অ্যান্টিক বর্জাইস বোল্ড, কিংবা দশ-পয়েন্ট বারো-পয়েন্ট চোদ্দ-পয়েন্ট ইত্যাদি হাজারো রকমের টাইপ ব্যবহারের যুগ তো আর সেটা ছিল না। দৃঢ়চেতা উইলকিনস শক্ত ইস্পাতের উপর ছেনি কেটে বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম সরণীটি তৈরী করে দিয়েছিলেন, তার পর সেই পথে লাইনো মনো অফসেট প্রভৃতি মুদ্রণরীতির কত নূতন নূতন বিজয় অভিযান চলেছে—পরীক্ষা নিরীক্ষার আজও অন্ত নেই।

শতবর্ষেরও কিছু পূর্বে বাংলা মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে একটি মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। বাংলা মুদ্রণশিল্প বিষয়ে মাতৃভাষায় সম্ভবত এটি প্রথম পুস্তক। বইটির কোনো উল্লেখ ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে বা ইতিহাসে পাই নি। ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার ৯৬ পৃষ্ঠায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে গ্রন্থটির একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে খোঁজ করে দুষ্প্রাপ্য ওই বইখানির সন্ধান পাই। নাম 'বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন', ১৮৭২ সালে প্রকাশিত। রচয়িতার নাম যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই গ্রন্থেও উইলকিনসের কথা আছে। লেখকের মন্তব্য, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আমাদের দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। ....ইতিপূর্বে বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকাদি কিছুই ছিল না এবং বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না। অতঃপর মাস্টার উইলকিনস (যিনি সার চার্লস নামে খ্যাত) সাহেব বহু যত্ন সহকারে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদেশের অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মাকে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আদি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।' বইয়ের শেষাংশে লেখকের উক্তি, 'উপসংহার কালে আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, আপনারা যদ্যপি মাতৃভূমির উন্নতি অভিলাষ করেন; আপনাদের মধ্যে যদ্যপি কাহারও স্বদেশানুরাগপ্রিয়তা

প্রাচীনতম বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির দুটি পৃষ্ঠা। দীর্ঘ সাত-আট শত বৎসরের হস্তলিখিত সাহিত্যের যুগ অতিক্রমের পর বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যের সূত্রপাত

থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে যাহাতে বাঙ্গালা 'কেস' ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হউন। ইহাতে যে কেবল মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় উন্নতি সাধন হইবে এমন নহে, বাস্তবিক ইহার উপর আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে।'

১৭৭৮-এ হুগলীতে হালেদের বই ছাপা হল। প্রেসের মালিক একজন পুস্তকবিক্রেতা, নাম এনড্রুস। জন ক্লার্ক মার্শম্যান :

The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন—

'the first book in which Bengalee types were used was Halhed's Bengalee Grammar, printed at Hooghly at the press established by Mr. Andrews, a bookseller, in 1778.'

অনুসন্ধান করেও এনড্রুস বা তাঁর প্রেস সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত বিশেষ কোনো বিবরণ এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ব্যাকরণ গ্রন্থখানি ছাপতে হেস্টিংস বেশ কয়েক সহস্র টাকা আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। বইয়ের

৫। স্যার চার্লস উইলকিনসের গ্রন্থাবলী :
1. The Bhagvat-Gita, 1785.
2. Hitopadesa, 1787.
3. Story of Sakuntala from Mahabharata, 1793.
4. Richardson's Persian, Arabic and English Dictionary, new edition, 1806.
5. A Grammar of the Sanskrita Language, 1808.
6. Radicals of the Sanskrita Language, 1815.

না প্রয়োজনীয় কাগজ এসেছিল বিলেত থেকে জাহাজে করে। দুশো বছর আগের ছাপা বই, কিন্তু কাগজ ও কালি ঔজ্জ্বল্য আজও নষ্ট হয় নি কিছুমাত্র।

হালেদের এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কখনো ছাপা হয় নি, যদিও প্রথম মুদ্রণ প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই বইয়ের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য এ বইয়ের একাধিক কপি আজও আমরা দেখবার সুযোগ পাই কয়েকটি গ্রন্থাগারে দুর্লভ সংগ্রহরাজির মধ্যে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, শ্রীরামপুর কলেজ ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাই-

১৭২৫ সালে জার্মানী থেকে ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা
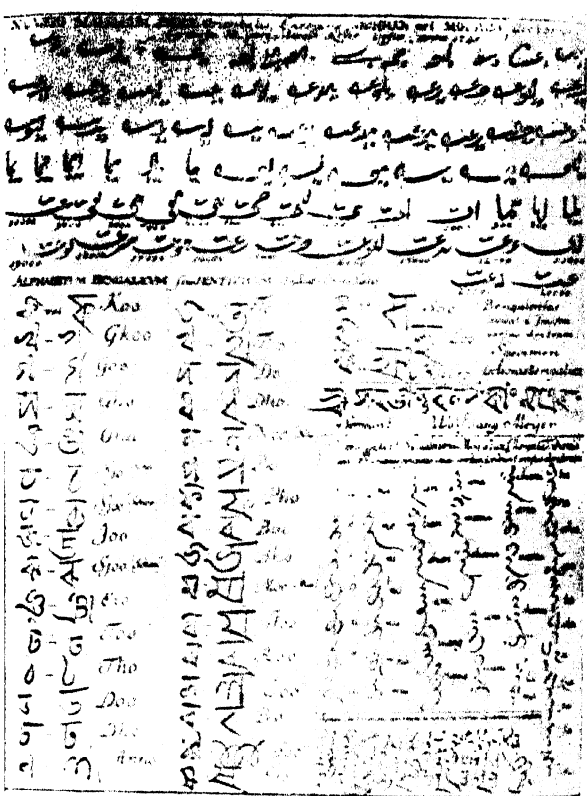
ব্রেরিতে এই মহামূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি সযত্নে রক্ষিত আছে। তাছাড়া লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়মে এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও এই বই সংগৃহীত আছে।

*

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যখন বঙ্গভূমিতে প্রাচ্য-ভাষা অনুশীলন ও গবেষণায় একান্ত নিমগ্ন; অক্লান্ত যত্নে ও অপ্রতিহত উদ্যমে বাংলা মুদ্রাক্ষর আবিষ্কার-কর্মে যখন সদা সচেষ্ট; তখন বাংলাদেশে সাধারণ বাঙালীর জীবনধারাটি কোন্ খাদে কেমন ভাবে বইছিল জানতে কৌতূহল হয়। ১৭৫৭ সালের পলাসীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর মৃত্যু হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের—কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল কবিওয়ালার দল। কবিগান, তরজা, যাত্রা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই গানের উচ্চকিত কোলাহলে এবং ঢাক ও কাঁসির শব্দে কলকাতার আকাশ তখন বিদীর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে।' সাধারণ বাঙালী তখন শোভাবাজারে, পাথুরিয়াঘাটায়, জোড়াসাঁকোয়, জানবাজারে বাগবাজারে, হোগলকুঁড়িয়ায় কবির দল খুলে, সাজ বাজিয়ে, গাজনে সঙ্ বের করে, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবী ও কালীঘাটে কালিকা দেবীর পুজোয় মাতামাতি করে চৌরঙ্গী অঞ্চলের চৌরঙ্গীনাথের মন্দিরে অর্চনা করে, ইংরেজ রেশমকুঠির মুৎসুদ্দিগিরি করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলির লড়াই দেখে, সেতার এসরাজ বীণ বাজিয়ে, কবিগান হাফ-আখড়াই পাঁচালী শুনে এবং রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আসরে গীতবাদ্য ও আমোদ করে কাল কাটাচ্ছিল।৬ যে বঙ্গসাহিত্যকে এই নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করে গ্রানিটস্তরের উপরে স্থাপন করেছিলেন যিনি, সেই রামমোহন রায়, বাঙালী-জীবনের অমাবস্যার অন্ধকারেই একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন—হালেদের বই যখন বেরল তখন তাঁর বয়স হবে বছর চারেক।

*

হালেদ তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, উইলকিনস নিজের হাতে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। অবিস্মরণীয় উইলকিনসের মহান গৌরব ও কৃতিত্বের কথা পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেও প্রশ্ন থেকে যায়—বাংলা মুদ্রাক্ষর উদ্ভাবন কর্মে তিনি কি বিশেষভাবে কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা পান নি? হালেদের ভূমিকায় হরফ নির্মাণের কাজে উইলকিনস কারও সাহায্য পেয়েছিলেন বলে কোনও উল্লেখমাত্র নেই। উইলকিনসের কোনো লেখাতেও এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো সহায়কের নামোল্লেখ আমরা পাই নি।

বাংলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির কাজে উইলকিনসের সাহায্যকারীর প্রশ্নটা তবে উঠছে কেন?

A Grammar of the Bengal Language প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর ১৭৮৩-র অক্টোবর মাসে জর্জ পেরি নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ মুদ্রাকর নিকল্সকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন,

'Mr. Wilkins is the gentleman in whose hands typography has made a rapid progress; some years ago, when in the interior parts of the country, and in the midst of thickets, with no assistance but of a people hardly civilized, he made every tool necessary to forming the punches and matrices, and casting a complete fount of Bengal characters so currently united as not to leave their juntions visible but on very minute examination; as you may see in Mr. Halhed's Bengal Grammar.' চিঠিটি ছাপা হয়েছিল **A Biographical Dictionary of Living Authors, 1876,** নামক গ্রন্থে। হালেদ লণ্ডনে ফেরেন ১৭৮৫ সালে, উইলকিনস ফিরে যান পরের বছর ১৭৮৬ সালে। অর্থাৎ জর্জ পেরি যখন কলকাতায় বসে এই চিঠি লেখেন তখন হালেদ বা উইলকিনস কেউই ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নি। সুতরাং জর্জ পেরির এই চিঠি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বা সমসাময়িকের সাক্ষ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। উইলকিনস যে হরফ নির্মাণের কাজে কোনো এক দেশীয় কর্মকারের সহায়তা পেয়েছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় কিছু পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশনারীদের নানা লেখায়। কিন্তু কে সেই সহায়ক কারু-শিল্পী কি তাঁর নাম? কি তাঁর পরিচয়? তিনি কি ইংরেজ, নাকি তিনি আমাদেরই লোক—খাঁটি বঙ্গসন্তান?

১৮০১ সালে কলকাতা থেকে **The East India Chronologist** নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে ১৭৭৮ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে জে. বি. গিলখ্রীস্টের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা হয়েছে,

'Mr. Wilkins, the celebrated Sanscrit scholar, aided by an ingenious artist by the name of Shepherd, completed under the patronage of Governor Hastings, two elegant founts of Persian and Bengalese types, and the first specimen of Oriental Typograhpy of this description appeared this year, viz., Halhed's Bengal Grammar, Printed at Hooghly, and Balfour's Formes of Herkeru.'

এই উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, হালেদের বাংলা ব্যাকরণ ছাপার সময় উইলকিনস হরফ নির্মাণের কাজে এমন এক কারিগরের সহায়তা লাভ করেছিলেন
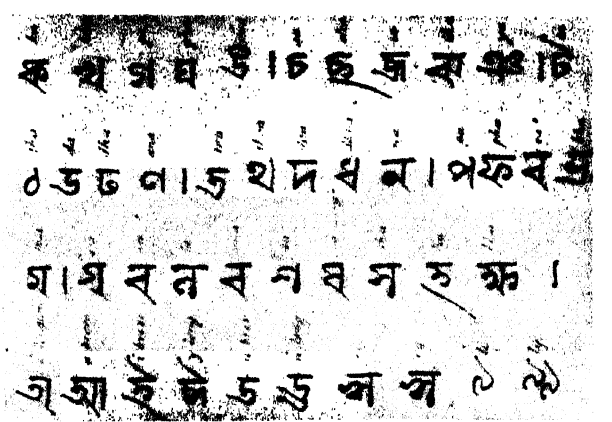
১৭৪৩ সালে হল্যান্ড থেকে ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

যিনি মূলত একজন শিল্পী এবং যিনি উদ্ভাবনী শক্তিতেও ছিলেন বিশেষ অধিকারী। উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে শিল্পীর নাম শেফার্ড। কিন্তু অন্যান্য সকল সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে উইলকিনস যে সহকারীর সহায়তা লাভ করেছিলেন তাঁর নাম পঞ্চানন।

৬। দ্রষ্টব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য।'

প্রত্যেক বিজ প্যাকের সঙ্গে— যার ওজন	আপনি পাবেন বিনামূল্যে 'কী' প্যাক যার ওজন
৫০০ গ্রা.	৫০ গ্রা.
৬০০ গ্রা.	৫০ গ্রা.
১.২ কেজি.	৫০ গ্রা.
৩.০ কেজি.	১০০ গ্রা.

CANTIGA
O MENINO JESUS
Recem nacido.
BALOQ JESUZER

HE Baba Jesus,
Baloq Nirmol
Bibi Mariar udorer

Amar doear Jesus.
He baba Jesus,
He xonar baba
Tomaque ami toi
Cori tomar xeba,
Amar doear Jesus.
He xondor Jesus,
He xondorarxi,

লিসবনে ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় বাংলা প্রার্থনা-গীত

লণ্ডনে হালেদ সাহেবের তিরোধান ঘটে ১৮০০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ওই বৎসর ১৮ সেপ্টেম্বর সমাচার দর্পণ পত্রিকায় হালেদের মৃত্যুসংবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সেখানেই উইলকিনসের সহকারী হিসেবে পঞ্চাননের নামটি স্পষ্টত পাই। সমাচার দর্পণ লিখেছেন, 'হালহেড সাহেব।—অপর পূর্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য একজন সাহেবের মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংগ্লংড দেশাগত সম্বাদপত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতি বৃদ্ধ হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংলণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গালা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষার যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উইলকিনস সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতি বৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদপত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিনগুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উইলকিনস সাহেব পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তদ্দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।'

এর পর উইলকিনস ও পঞ্চাননের নাম একত্রে পাই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের The Life and Times of Carey, Marshman and Ward (১৮৫৯) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। মার্শম্যান লিখেছেন,

'He [Charles Wilkins] likewise gave instruction in the art which he had acquired, to an expert native blacksmith of the name of Panchanan, through whose labours it became domesticated in Bengal.'

মিশনারীদের লেখায় পঞ্চাননের নাম যত্রতত্র পাওয়া গেলেও সর্বত্রই যে উইলকিনস প্রসঙ্গেই তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে কর্মকার পঞ্চাননের যোগাযোগ হয়েছিল উইলকিনসের পর। ফলে কেরীর জীবনেতিহাসের পাতায় পঞ্চাননের নাম বহুবার এসেছে দক্ষ একজন বাংলা মুদ্রকের ভূমিকায়। উইলকিনসের সহচর হিসেবে পঞ্চাননের নাম আবার পাই জর্জ স্মিথের The Life of William Carey (১৮৮৫) গ্রন্থে। জর্জ স্মিথ লিখেছেন :

'He [Charles Wilkins] taught the art to a native blacksmith, Panchanan, who went to Serampore in search of work just when Carey was in despair for a fount of the secred Devanagari type for his Sanskrit Grammar, and for the founts of the other languages besides Bengali which had never been printed.'

The East Indian Chronologist গ্রন্থে উইলকিনসের সাহায্যকারী হিসেবে 'শেফার্ড' নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র সহায়কের নাম পঞ্চানন বলা হয়েছে। 'শেফার্ড' কখনই দেশীয় ব্যক্তি হতে পারেন না ; এদিকে অপর সকল সূত্রে বলা হয়েছে সহায়কটি ছিলেন এদেশের একজন মানুষ। কোনো native blacksmith কখনই শেফার্ড নামধারী হতে পারেন না। সহায়কের নাম যাই হোক উইলকিনস যে বাংলা হরফ নির্মাণে কোনো কারুশিল্পীর বিশেষ সাহায্য লাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন একবাক্যে।

পঞ্চাননের নাম সবাই উল্লেখ করলেন, অথচ শেফার্ড নামটির উল্লেখ আছে কেবলমাত্র গীলখ্রীস্টের একটি মন্তব্যে। 'An ingenious artist' যদি ইংরেজ হন তবে গীলখ্রীস্ট ব্যতীত আর সকলেই তাঁকে 'an expert native blacksmith of the name of Panchanan' বলেছেন কেন ? মনে রাখা দরকার উইলকিনসের সহায়ক এই পঞ্চাননকে আমরা কেরীর কর্মসাধনাতেও বারে বারে পেয়েছি। মার্শম্যান কেরীর যে প্রামাণিক জীবনী লিখেছেন সেখানে মুদ্রণবিশারদ—উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন সেই শেফার্ডের নাম কোথাও নেই। অন্যত্রও শেফার্ডের নাম কোথাও নেই, সর্বত্রই রয়েছে পঞ্চাননের নাম।

বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগের ইতিবৃত্তে উইলকিনসের সহায়ক এক বাঙালী কৃতী শিল্পী হিসেবে পঞ্চাননের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আজ দ্বিশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে তাঁর নামটিও আমরা পরম গৌরব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

পঞ্চানন প্রসঙ্গে এখন আমাদের প্রশ্ন—উক্ত কারুশিল্পীর পুরো নামটি কি ? সমকালীন সাক্ষ্য সবসময়ই এই কারুশিল্পী বা কর্মকারকে পঞ্চানন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলায় তাঁকে পঞ্চানন কর্মকার বলে সর্বদা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি আমাদের সব সময় মনে থাকে না কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। ধাতু-শিল্পের প্রতিভাবান আর্টিস্ট পঞ্চানন তাঁর কর্মসূত্রে 'পঞ্চানন কর্মকার' নামে একালে সুবিদিত, কিন্তু বৃহৎ কর্মকাণ্ডের আড়ালে মানুষটির আসল পদবীটাই আমরা বিস্মৃত হয়ে বসে আছি। বাংলা মুদ্রণরীতির উদ্ভাবনের ইতিহাসে তিনিও তো এক নমস্য ব্যক্তি, তাঁর পুরো নাম পঞ্চানন মল্লিক। তাঁর আদি নিবাস হুগলী জেলার জিরাট বলাগড় গ্রামে। বলাগড় থেকে বংশবাটি বা বাঁশবেড়ে এবং

১৭৭৬ সালে লন্ডন থেকে ব্রুকের সাহায্যে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

টাটা স্টীল আবার ভারতে এই প্রথম কয়েকটি বিশেষ জাতের ইস্পাত তৈরি করলেন...
এটা সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতীয় কারিগরী বিদ্যা প্রসূত ইলেক্‌ট্রো-ফ্লাক্‌স্‌ রিফাইনিং পদ্ধতির প্রয়োগে

সাধারণ ইস্পাতকে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান তৈরি, মহাকাশ গবেষণার যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে দরকারী উচ্চমান ও সূক্ষ্ম কাজে লাগানো যায় না। এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিবহন শিল্পের অনেক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উচ্চ মানের ইস্পাতের দরকার। ইলেক্‌ট্রো-ফ্লাক্‌স্‌ রিফাইনিং পদ্ধতিতে তৈরি ইস্পাত এই সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরযোগ্য হয় কারণ :

- অপ্রয়োজনীয় অধাতব পদার্থ বার করে নেওয়া হয় বলে এই ইস্পাতের অসাধারণ পরিশুদ্ধতা সম্ভব হয়।
- তৈরির সময় ইস্পাত-- জমানোর প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এর গ্রেনগুলি খুব মিহি হয়।

এই ধরনের পরিশোধিত
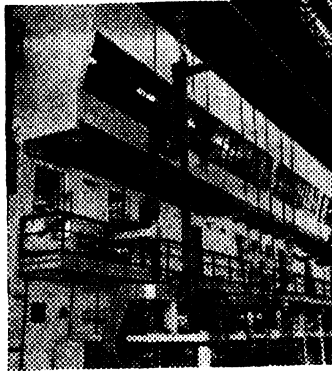
ইস্পাতের ব্যবহার অপরিহার্য যেখানে যন্ত্রপাতিকে
বেশী তাপ
বেশী চাপ ও
ডাইনামিক লোডিং-এর
ধকল সহ্য করতে হয়।

টাটা স্টীলের রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ডিভিসন বিদেশী কারিগরী বিদ্যার সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় এই পদ্ধতি এদেশে উদ্ভব করেছে।

আজ জামসেদপুরে ভারতে প্রথম সম্পূর্ণ দেশী ইলেক্‌ট্রো-ফ্লাক্‌স্‌ রিফাইনিং প্ল্যান্টে বছরে ৭০০০ টনের উপর বিশেষ জাতের ইস্পাত তৈরি হচ্ছে। এই উন্নত কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে অতি উচ্চ মানের নানা ধরনের বিশেষ জাতের ইস্পাত দেশের প্রয়োজনের জন্যে তৈরি করে টাটা স্টীল নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছে।

TIS-2774

লদের ব্যাকরণে মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নিদর্শন

র সেখান থেকে শ্রীরামপুরে চলে আসেন পঞ্চানন মল্লিক। অপুত্রক পঞ্চাননের
 কন্যা: জামাতা মনোহর পরবর্তীকালে বিখ্যাত মুদ্রাকর হিসাবে ইতিহাসে
পরিচিত।

*

হালেদের বই তো ছাপা হয়েছিল আজ থেকে দুশো বছর পূর্বে। সেই
য় বঙ্গাক্ষরে ছাপতে খরচ পড়ত কি রকম? ১৭৭৯ সালে বাংলা মুদ্রাক্ষরে
পতে কত খরচ পড়বে—সে-বিষয়ে কিছু সংবাদ পাই ১৭৭৯ সালের ৮
নুয়ারি তারিখে লেখা জর্জ হগসনের একখানি পত্রে। এই চিঠি যে-সময়ে লেখা
র মাত্র কয়েক মাস আগে হালেদের বই ছাপা হয়েছে। হগসনের লিখিত
বেদনপত্র থেকে জানা যায় চার্লস উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে গভর্নর জেনারেল ও
উন্সিল কলকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছিলেন। স্বভাবতই
লেদের গ্রন্থখানির মুদ্রণ-সাফল্যেই এই আগ্রহ।

হগসনের পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল:

To J. P. Auriol, Esq., Secretary to the General Department.
Sir, The Hon'ble the Governor-General and Council having
ought proper to establish a printing office under the Super-
tendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit
u the enclosed copy of the Rates of Printing and to desire that
u will prepare and furnish Mr. Wilkins with copies of all
ch papers in your office as will admit of being printed, whether
 the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks
r Names, Dates and other occurrences as are liable to alter,
d specifying the Number of each Form usually issued in the
urse of a year.

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
(Sd.) Geo. Hodgson,
Secretary.

Revenue Department,
Fort William,
e 8th January, 1779.

চিঠির সঙ্গে ইংরেজি, এবং বাংলা ও ফারসী ছাপার যে প্রস্তাবিত রেট দেওয়া
হে তা এই:

For English Impressions—
For every Quire of Folio Post, Paper included.
If Printed on one side .. .. Sa. Rs. 3
If Printed on both sides .. .. „ 5

For Persian and Bengali—
For every Quire of Folio Post
Printed on one side .. .. Rs. 5
Printed on both sides .. .. „ 7

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ছাপাখানাটি স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।
১৭৮০-তে জেমস আগস্টাস হিকি তাঁর বেঙ্গল গেজেট মুদ্রণের জন্য কলকাতার
সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ১৭৮৪ সালে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'ডি
ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন।

*

হালেদের ব্যাকরণে বাংলা কাব্য প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়ে আমাদের সামনে উপ-
স্থাপিত হয়। বঙ্গাক্ষরে বাংলা গদ্যের মুদ্রিত রূপ কোথায় আমরা প্রথম পাই?
সেও ওই হালেদেরই ব্যাকরণে—'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুএজ'
গ্রন্থে। সেদিক থেকে বাংলা গদ্য এবং পদ্য—এই উভয়েরই মুদ্রিত
রূপের ধারক এই ব্যাকরণ গ্রন্থখানি আমাদের কাছে এক অবিস্মরণীয়
কীর্তি এবং সেদিক থেকে মহান উইলকিনস সাহেবের নিকট আধুনিক বঙ্গসাহিত্য
চিরকালের জন্য ঋণী। হালেদ তাঁর ব্যাকরণের অন্তর্গত বাংলা পাঠগুলি বাংলা
মুদ্রাক্ষরে ছাপার সুযোগ না পেলে সেগুলি তিনি অবশ্যই রোমান হরফে ছাপিয়ে
বই প্রকাশ করতেন। রোমান হরফে বাংলা লেখা ১৭৭৮ সালের পূর্বে অনেক
ছাপা হয়েছে। ১৭৪৩ সালে সুদূর পর্তুগালের লিসবন নগরে ছাপা হয়েছে
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' এবং 'পর্তুগিজ-বাংলা
ব্যাকরণ ও শব্দকোষ'। কোনো বই-ই বাংলা অক্ষরে ছাপা নয়।৭ তাই বাংলা
মুদ্রাঙ্কনের ইতিহাসে এই বইগুলি প্রাসঙ্গিক নয়। ১৭৭৮-এ সব্যসাচী উইলকিনস
বাংলা মুদ্রাক্ষরে পদ্য এবং গদ্য একই সঙ্গে ছাপিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

গদ্যের উদাহরণ হিসেবে হালেদ সমকালীন একটি মাত্র চিঠি গ্রন্থের শেষাংশে
উদ্ধার করেছেন। প্রথমে সমকালীন বাংলা হস্তাক্ষরের নিদর্শনরূপে জনৈক
জগতাধর রায়ের হাতে লেখা একখানি পত্রের প্রতিলিপি-চিত্র ব্লকে মুদ্রিত। পরে সেই
চিঠির হুবহু পাঠ ছত্রানুসারে মুদ্রাঙ্কিত। এই টাইপের আকৃতি মূল বইয়ের বাংলা
টাইপ থেকে ছোট, সুগঠিত এবং সুবিন্যস্ত। তের ছত্রের এই ক্ষুদ্র পত্রখানি মুদ্রণের
জন্য ছোট আকারের প্রয়োজনীয় কিছু টাইপ কি নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল?
আমার তা মনে হয় না। এই পৃষ্ঠার ছোট হরফগুলির আকৃতি ও গঠন পরীক্ষা
করে আমার মনে হয়েছে এ-অংশ ছাপার হরফ সম্ভবত মুদ্রিত নয়। মুদ্রাক্ষরের

BENGAL LANGUAGE. 109

"I see all the Heavens as it were in a cloud of fire,
"The fine Dhoenkatee displays its brightness in the open day."

[illegible]

"Falling in the line of battle I ascend to Paradise,
"But thou, O Dhonengjoy, for this crime wilt go to hell."

The form for the participle present is the same with that of the first person of the present tense; as দেখি seeing or I see, আসি coming or I come; as

[illegible]

"The son of Dron beholding the fight of the Koorees, coming
"into the presence of Orjoon, dishonoured himself."

The first gerund or supine is formed from this participle, by adding to it the termination of the oblique case তে as কান্দিতে in or by weeping, মরিতে in dying, হইতে in becoming &c. Example.

কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল মূর্চ্ছিত

"By repeated weeping the Rannee became senseless."

This gerund commonly supplies the place and the use of our in-

হালেদের ব্যাকরণের আর একটি পৃষ্ঠা

BENGAL LANGUAGE

মর্য্যদা থাকিতে কেনো শাজাহো এতিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে এতি বৈস গিয়া॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জ্বলিন।
স্বগ্নির উপরে জেন ঘৃত ঢালি দিন॥

সোমদত্ত বলে সেনী নাকরিস গবর্ব।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব॥

কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্ত্বর।
এত কটু ভাসা মোরে কহিস বর্ব্বর॥

তোমা হইতে নিচ কেবা আছয়ে মানুষে।
মোর অগোচর নহে জানিয়ে বিশেষে॥

এতেক সুনিয়া সেনী অতি ক্রোধ মন।
কোপে ডাক দিয়া বলে সুন সর্ব্ব জন॥

এত অহঙ্কার হইল আরে দুরাচার।
[illegible] ছিদ্র নাহি চাহো আপনার॥

[illegible] উচিত ফল দিব আমি তোরে।
[illegible] কোপে সেনী উঠিল সত্ত্বরে॥

১৭৭৮ সালে কলকাতায় উইলকিনসের সৃষ্ট প্রথম ধাতুনির্মিত হরফে মুদ্রিত হাল্হেডের ব্যাকরণের একটি পৃষ্ঠা

আকারে ছোট করে কোনো দক্ষ লিপিকরের দ্বারা অংকিত এবং পরে তা ব্লক মুদ্রিত। সেই লিপিকর স্বয়ং পঞ্চানন মল্লিকও হতে পারেন।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় থেকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র—বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ইতি তো কম দিনের নয়—সুদীর্ঘ সাত-আট শত বৎসরের। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য স বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যের মাত্র দুশো বছরের ইতিহাসে প্রথম শতবর্ষেই বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁর প্রথম গ্রন্থখানি (কবিকাহিনী, ১৮৭ হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনের পর বর্ষে বর্ষে অতিবাহিত হল অ একটি শতাব্দী। জানি না দিগন্ত উদ্ভাসিত করে বাংলার সাহিত্যাকাশে অ আবার কোনো নূতন সূর্যের আবির্ভাব ঘটবে কি না।

---

৭ দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথ সংবাদ' গ্রন্থে বাংলা ভাষা রোমান হরফে মুদ্রণের নিদর্শন :

Bramane—Tomi care bhoso ?

Romo—Poromexorcre Purno Bromere.

B—Tobe tomora boro utom bhosona bhoso, amora tah bhusi.

R—Zodi tomora xei Purno Bromere bhoso tobe queno cubit cudhoram nana odhorma bhosona deqhi ?

B—Tomi emot guiamonto hoia amardiguer Poromexor ainda corohe ? ehate tomard'guer xastre cparniman nahi.

R—Amarghore xastre liqhiasenè ze zon dhormo ninda co xe boro naroqui; ebons ze zon odhormere dhormo bole xe mo naroqui.

বাংলা মুদ্রণ ও মুদ্রিত গ্রন্থের আদিপর্ব বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য নিম্নলি গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য :

১। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১২৭
২। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব—রজনীকান্ত গুপ্ত, ১২৮৫।
৩। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৩৫৩।
৪। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ১৩৭১
৫। বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক—সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭৮।
৬। যখন ছাপাখানা এলো,—শ্রীপান্থ, ১৩৮৪।

Bengali Literature in the Nineteenth Century—Sus Kumar De, 1919.

The Printing Press in India—Anant Kakba Priolk 1958.

Early Indian Imprints—Katharine Smith Diehl, 19

The Bengali Press—Samarjit Chakraborti, 1976.

কানে পরুন রত্ন। কাঁকন পরা হাতের করুন যত্ন।
কিন্তু ঝলমলে সুন্দর চুলের জন্যে ব্যবহার করুন সানসিল্ক!
সান
সিল্ক*

চতুর্থ ট্রিয়েনাল : নতুন দিল্লি

সন্দীপ সরকার

॥ ১ ॥

বিয়েনাল, ট্রিয়েনাল এইসব শব্দগুলি ইদানীং শিল্পীমহলে খুবই প্রচলিত। টোকিও, ভেনিস, সাও পাওলো এসব জায়গায় কান্তকলার দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীর বেশ নামডাক। নতুন দিল্লির ত্রৈবার্ষিকী ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। গত এক যুগ ধরে চলছে নিয়মিত। না-হবার কারণ নেই।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮। তখন ঘড়ির কাঁটায় ৫-১৫ বেজেছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি চতুর্থ ট্রিয়েনাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন। মোট চল্লিশটি দেশের কয়েক হাজার ছবি, ভাস্কর্য, ছাপাই ছবি, এবং কিছু ছবির ধোঁকাবাজি প্রদর্শনীতে ছিল। এবার সেভিজসানের মতো বড় ভাস্কর আসেনি সেকথা ঠিক। বা হাওয়ার্ড হজকিনের মতো চিত্রকর। ভাল কাজ কিন্তু কম আসেনি।

রাষ্ট্রপতি বললেন, সমকালীন শিল্পকলার প্রদর্শনী সবগুলো প্রাদেশিক রাজধানীতে হওয়া উচিত এবং আশা করা যায় প্রাদেশিক সরকার মাত্রই এ-ব্যাপারে সাহায্য করবেন। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জন্যে লাঞ্ছিত মানুষের অবস্থার উন্নতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অনিয়ন্ত্রিত অবাধ শৌখিন দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে যাওয়াতে মানবসমাজে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক তা ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে। অথচ অধ্যাত্ম জীবন খুবই মূল্যবান। দৈহিক সুখ-সুবিধার মতই মানুষ তার অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। এরই প্রতিফলন অবশ্যই দেখা যাবে ভারতবর্ষের মাটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে।

ললিতকলা আকাদমীর সভাপতি রামনিবাস মিরধা রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, নয়াদিল্লির ত্রৈবার্ষিকীর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। এশিয়ায় এত বড় প্রদর্শনী এর আগে কখনো হয়নি। গতবারে ছাব্বিশটা দেশের পরিবর্তে এবারে চল্লিশটি দেশ যোগদান করেছে। এবারে যেসব দেশ প্রথমবার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের অন্যতম হলো চীন, আলজেরিয়া ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এবং ভিয়েৎনাম।

ত্রৈবার্ষিকীর সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। শিল্পী ছাড়া নর্তক, গায়ক, বাদক লেখক, কবি এতে যোগদান করে চিন্তার আদান-প্রদান করলেন।

ছটি স্বর্ণপদক পেলেন ছজন শিল্পী এবং তার সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা। এর জন্যে সরকারও তো বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার অনুমতি সরকার দিয়েছে। এছাড়া ত্রৈবার্ষিকী থেকে ভাল কাজ কেনার জন্যে বিদেশী টাকার এক লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

॥ ২ ॥

ত্রৈবার্ষিকী দেখে কয়েকটা কথা স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। প্রথমত পৃথিবীর সর্বত্র বিমূর্ত শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ কমে গেছে। আমার মতে এটা খুবই সুলক্ষণ। দ্বিতীয়ত নিখুঁত বাস্তব রীতির দিকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন ঘটছে। হাতে তুলিতে ক্যামেরার সঙ্গে পাল্লা দেবার ঝোঁক স্পষ্ট এবং সেখানেও অবিশ্বাস্যরকম সাফল্য দেখিয়েছেন শিল্পীরা। এসবই অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের অতি সচ্ছল দেশগুলির বিষয় মোটামুটি সত্য। অন্তত অবয়বী কাজের প্রতি তাদের আসক্তি খুবই প্রবল। এক এক সময় বাস্তবতার এমন হাই ভোলটেজ বিদ্যুৎ চলাচলি যে শক খেতে হয়। তৃতীয়ত কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যেও নন্দনতত্ত্বের হাওয়া বদল হয়েছে। এর জন্যে সেসব দেশের শিল্পকলায় দারুণ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ত্রৈবার্ষিকীতে দেখা গেল রাশিয়াও সমাজবাদী বাস্তবতার পথ ছেড়ে অবয়বী ছবি ভিন্নভাবে আঁকার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে চীন তার ঐতিহ্যের প্রতি ভীষণ সজাগ। যুগোস্লাভিয়ায় নানান ধরনের অত্যন্ত উন্নতমানের কাজ হচ্ছে। এই ত্রৈবার্ষিকীতে অন্য সব দেশ তাদের

কাছে হেরে গেছে। হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়ার ছবিতে ভাস্কর্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ আছে। মোটামুটি সবই স্বাস্থ্যকর এবং পরিণত বোধ-বুদ্ধির লক্ষণ। বিকার যা তাও বয়স্ক মানুষের।

চতুর্থত লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ছবি নন্দনতত্ত্বের কানুন-কানুন না করে যেমন করার চেষ্টা হচ্ছে তেমনি বিমূর্ততার দিকে ঝোঁকও দেখা যাচ্ছে সেখানে। তৃতীয় বিশ্বে কিন্তু অন্তরের সংকট চরম জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গিয়েছে। প্রতীচ্যকরণের ভোগবিলাসের হাতছানি, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জটিল আবর্ত এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সুবিধাবাদী অপরিণামদর্শিতা—সবই চিন্তার নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে মানুষকে। পরম্পরার প্রতি অনাস্থা দেখা গেছে। অথচ ছিন্নমূল অবস্থার জন্যে নিরুপায় হয়ে ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রতীচ্যপ্রীতি অনেকটা গণিকার আকর্ষণের মতো—যিনি স্বৈরিণীর গৃহে গেছেন তিনি তো মজেছেন, আবার যিনি ওদিকে না তাকিয়ে সতী স্ত্রীর সঙ্গে সুখে ঘর করেন, তিনিও বিদগ্ধ বেশ্যার কথাই ভাবেন জাগরণে এবং স্বপ্নের মধ্যে। ফলে একটা অসতর্ক বেচাল অবস্থা। অপরিণত বয়োসন্ধির ব্যাপার। কিন্তু অরাজকতার কালো মেঘের মধ্যে অন্ধকারের কলকাকলি নয় দেখেছি তাও নয়।

॥ ৩ ॥

সব দেশগুলির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার কিছু নেই। শুধু উল্লেখযোগ্য দেশগুলির সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার 'দিব্যদর্শন শিল্পকলার' (Visionary Art) নিদর্শন পাঠিয়েছে। জলরঙ, তেলরঙ পাথরখোদাই—সব কাজেই যা দেখা গেল। ঔপনিবেশিক বিস্তারের দিনগুলো থেকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল মার্কিন মুলুকে। মরমী এবং গোঁড়া ক্যাথলিক প্রোটেস্টেণ্ট ঐতিহ্যের আওতায় সেখানে নানা অদ্ভুত এবং উদ্ভট সম্প্রদায় (sect)-এর জন্ম। সম্প্রতি প্রাচ্যের তন্ত্রের ধ্যান থেকে জেন এবং প্রাচীন মিশরী ধর্মের দিকে ঝোঁকে আকৃষ্ট। প্রতীচ্যের পক্ষে এইসব আকর্ষণ নতুন নয়। এলিঅট, মাদাম ব্লাভাটস্কী এবং ফিনিসীয় টেরট তাস সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন 'পোড়োজমি' কাব্যে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নৈরাশ্য এবং প্রত্যয়হীনতার প্রেক্ষিতে ভোগবাদী ক্রমশ ভাগ্যবাদী হয়েছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি এবং তজ্জনিত সার্বিক সংকট, বিশেষত পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা-জনিত ভীতি তরুণদের প্রাচ্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। থিয়োসফি থেকে উদ্ভূত এইসব কাজ আপনার ভাল লাগতে পারে, না-ও পারে। কিন্তু শিল্পীমাত্রই পরিশ্রমী এবং যত্ন নিয়ে কাজ করেছেন। ক্যানভাসে রঙ ঢেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছেতাই-এর বিপরীত দিকে এসেছেন তাঁরা। এঁদের জয় হোক।

মানসিকতার বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য প্রান্তে জাপান। মার্কিনীদের মতোই আধুনিকমনস্ক কিন্তু সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে সচেতন। প্রযুক্তির ভোগের উপকরণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য নেই, কিন্তু মেফেস্টোফিলিসের কাছে তার আত্মা বেচে দিতে সে নারাজ। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ নয় একাত্মতাই তার ধ্যান। অথচ প্রকৃতিকে দলামোচড়া করার ফলে উদ্ভূত সমস্যায় তার জাপানী শিল্পীরা আক্রান্ত। একটা নিদারুণ অসহায়তার মধ্যে সৃজনীশক্তির অহঙ্কার নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই সাহসিকতা তাঁদের কাজে ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করেছে। অথচ গত ত্রৈবার্ষিকীতে তাঁদের কাজ যেন আরও ঘন ছিল। তসিমিৎসু ইমেইর সোনালী স্ক্রিনের ওপর লাল এবং অন্যটিতে নীল আগুনের শিখার মতো রেখার নৃত্য সুদৃশ্য বিমূর্ততার জন্যে তীব্রভাবে টানে। মরিয়ুকী কুরাবায়াশির কাগজের ওপর এক্রালিক রঙের জালের মধ্যে সূচীশিল্পের মতো সূক্ষ্ম নকশী দেখে বোঝা যায় তিনি পরিশ্রমী। বরং প্রাইজ পাওয়া সত্ত্বেও কসোইটোর সিরামিক এবং প্লাসটিক ভাস্কর্যের রূপবন্ধের চমৎকারিত্বে চোখ ধাঁধালেও মন ভরাতে পারেনি। আমার আঙ্গিক এবং কৌশলের দিক দিয়ে ভাল লেগেছে ইউকিও সাওতোমের কাজ। তাঁর স্টুডিওর জানলা থেকে দেখা 'অনু-

ভূমিক আলো' (১০×২২৭ সি এম) হলো দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত নিরুদ্বেগ সমুদ্র। দুটি অনুভূমিক সমান্তরাল রেখায়। সারল্যের মধ্যে ছবি বিধৃত। সামনে বালিয়াড়ী ঈষৎ ঢেউ খেলানো, মাঝখানে টোল খাওয়া রুপোলি জল সূর্যের আলোয় চিকচিক করে, তার ওপরে নীল ধূসর আকাশ। একটি খাড়া রেখা নেই। তুলির ওপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। 'মহানাগরিক জঙ্গল' ছবিতে নীচে কালো অরণ্য। অসংখ্য খবরের কাগজ উড়ছে শহরের সংবাদ বুকে ধরে আর উড়ন্ত পাখির চোখে দৃশ্যমান শহর ব্লু প্রিণ্টের' মতো পড়ে আছে। আবেগ নেই। আছে নিরাসক্ত সৌন্দর্যবোধ। উভয় জার্মানীর কাজ খুব কাছাকাছি। স্পষ্টই বোঝা যায় একই শিল্পকলার ঐতিহ্যের ওপর দুটি দেশই নির্ভরশীল। কিন্তু মানসিকতার পার্থক্য কিছু আছে। পূর্ব জার্মানী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। পশ্চিম জার্মানী নব্য বাস্তব ধারায় বিশ্বাসী। পূর্ব জার্মানীর ছবিতে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব কিছু কম নয়। ভাস্কর্যে রাজনৈতিক বক্তব্য মূর্ত। ওয়ালটার আর্নল্ডের কাঠের কাজ একটি মেয়ের মুখ, দীর্ঘায়িত গলা এবং রূপারোপের মধ্যে আদিম সারল্য রয়েছে। অন্যদিকে ওয়েলাণ্ড ফরস্টার গাছের মতো করে বহু দেহ মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে নাম দিয়েছেন 'শহীদ'। সুজান কাণ্ড-হর্নের ছবিতে ভালবাসা এবং জীবন সম্বন্ধে নিবিড় আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি শিল্পীর কাজে ক্ষমতার তারতম্য সত্ত্বেও জীবনের ওপর আসক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর কাজে রাজনৈতিক বক্তব্য তীক্ষ্ন এবং সেই সঙ্গে নৈরাশ্যের অপ্রত্যয়ের ভাবটা প্রকট। যন্ত্র উন্নত জীবনধারণের মান, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বন্ধ্যাত্ব মানুষকে আখের মতো পিষে রস নিংড়ে নিচ্ছে। এসব ছবি মূলত যন্ত্রণার—আর্তনাদের। চোখে দেখা বাস্তবের নীচে যে বাস্তবতা তারই প্রতিফলন। বীভৎস্য রসের ছবি এবং ভাস্কর্য। কিন্তু যথেষ্ট আবেদন আছে। কখনো অমানুষিকভাবে জ্যামিতিক। কখনো ক্লেদাক্ত পরিস্থিতির প্রতিফলন। কিন্তু এমন নিখুঁত যে তেলরঙে তুলিতে মাঝে মাঝে হার মানে ক্যামেরা। যেমন ধরা যাক জান পিটার ট্রিপের প্রতিকৃতিগুলি। তুলির নিয়ন্ত্রণ অসাধারণ।

সে তুলনায় অস্ট্রেলিয়া বা বৃটেনের কাজে আধ্যাত্মিক দৈন্যই প্রকাশ পেয়েছে। বৃটেন ভাস্কর্যের নামে কৃষ্ণনগরের পুতুলের মতো দেখতে দুটি প্রমাণ সাইজের মানুষ দেখিয়েছে। বৃটেনের ভাস্কর এবং অস্ট্রেলিয়ার ভাস্কর উভয়ের নাম জন ডেভিস। অস্ট্রেলিয়ান ডেভিস শুকনো ডাল-পালা, কাঠি—যা না-কি পাখির বাসায় চলে—তা ভাস্কর্য বলে চালিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের কাজ প্রদর্শিত হলে ভাল হতো।

নাইজিরিয়া এবং টানজানিয়ার উপজাতি ভাস্কর্যের আদিমতা, সরলীকরণ, দীর্ঘায়ণ—রূপারোপের জোর নতুন করে প্রমাণ করে ভাস্কর্যে খুব কম দেশই তাদের কাছে আসতে পারে। যদিও তৈলচিত্রে উভয় দেশের আড়ষ্ট এবং অনেকটা দিশাহারা।

বাংলা দেশের ছবি আশ্চর্যভাবে বিমূর্ত, এবং এর কারণটা অনুমান করা যেতে পারে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান বুদ্ধিজীবীদের ঔপ-মহাদেশিক ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর না করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয় নানাভাবে। ফলে একরকম প্রাণের দায়ে তাঁরা ছবি বিমূর্ত করেন। কিন্তু তবু যেন নদীমাতৃক দেশের নিসর্গের অনুষঙ্গ এসে পড়ে। আমার ভাল লেগেছে মহম্মদ কিব্রীয়ার 'অশেষ' চিত্রমালা পর্যায়ের কাজ। মূর্তজা বশীরের কাজও খুব রসঘন আকার এবং রূপবন্ধের নান্দনিক খেলা। নিতুন কুণ্ডুর 'ছেলের কাছে চিঠি' এবং মেয়ের অন্য ধরনের। একটি কাঠের খোপ-কাটা ফ্রেম জ্যামিতিকভাবে ভাগ করে প্রথমে আকার নিয়ে মজাদার খেলা দেখিয়েছেন। ভেতরটা উঁচু নীচু করে তার মধ্যে এঁকেছেন। কখনো নিসর্গের আভাস, কখনো গ্রামের জীবনের। অন্য ধরনের আরেকটি কাজ হলো আমিনুল ইসলামের। ক্যানভাসের মধ্যে একটা আধখোলা দরজা এবং তার চারপাশে আয়না কেটে নকশী করা। কাজটা কোলাজ এবং হয়তো মণ্ডন-ধর্মী। কিন্তু এত বড় (১২০×১২০ সি এম) একটা ভঙ্গুর কাজ কিভাবে এল সেটাই অবাক লাগে।

সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বুলগেরিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ার নানারকম কাজ হচ্ছে ভালোয় মন্দে মিশিয়ে। সরকারী খবরদারী না থাকায় দৃশ্য জগতের সৌন্দর্য তারা আবিষ্কার করছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু ছোট ছোট ভাস্কর্য সূক্ষ্ম মোচড়গুলো দারুণ লেগেছে যদিও ছবি ভীষণ নীরস। বুলগেরিয়ার ছবিতে উত্তাপ যেন বেশি।

কিন্তু সব সেরা কাজ বোধ হয় এবার যুগোশ্লাভিয়ার। বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রযুগের মানুষ তাঁরা, কিন্তু মন তাঁদের অযান্ত্রিক। তাজা। এই অস্থির ধৈর্যহীন যুগে তাঁরা ধৈর্যের অসম্ভব পরীক্ষা দিয়েছেন। কলাকৌশলে দক্ষতার চূড়ান্ত অথচ রসাবেশেও চরম। এমন পর্যায়ের সৃজনীশক্তি যেখানে মানুষের ওপর বিশ্বাস জন্মায় আবার। মনে হয় যদি এই স্তরে সে উঠতে পারে তাহলে হয়তো তার আশা আছে—পৃথিবী হয়তো উড়ে যাবে না।

প্রথমেই ধরা যাক নিভাস কাউ-ভূরিক-কুর্চভিকের কাজ। মিশ্র মাধ্যমের ছবি নিজেকে ছেড়ে দিয়ে করেছেন। ওস্তাদের গুন গুন করে গান। মার্ক শাগালের কাজের মতো শ্লাভনিক লোক শিল্পের রূপরসগন্ধস্পর্শের কল্পমায়ার কানন। নিভাসের কাছ থেকে শ্লাভেন সরবিনভিকের কাছে এলে মনে বুঝি নতুন দেশে এলাম। বাস্তবের মানুষ এবং তার ভেতরের কল্পনা রাজ্য একসঙ্গে এসেছে এঁর তৈলচিত্রে। রঙ, তেল প্রায় না মিশিয়ে ব্যবহার করার জন্যে, প্যাস্টেলের গাঢ় গূঢ় সমাচার আনে। ছোট বড় ছোপ, কিছু রেখা, বিন্দু এবং উষ্ণ হৃদয়ের আবেগ। 'পেঁয়াজবিক্রেতা বুড়ো মানুষটির' ভাঙা স্বপ্ন, দুঃখ, কল্পনার জগতটার দৃশ্যটা কেমন তা বুঝিয়েছেন। পেঁয়াজের সঙ্গে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ভায়োলেট। লোকটি শরৎ-

চন্দ্র থেকে লেখত যে কায়োরই
হতে পারত। তেমনি যে মাংসল সজীনরকমে অশোক
মিশানার শুয়ে স্বপ্ন সমুদ্রের দো বার্থ চেষ্টা!
দোলে সেও খুব জীবন্ত। বি হয়নি। শ্রীমতী
সমস্যা নিয়ে যে বাস্ত গোয়েন্দা তো মন্ত্রী হতে
দার্শনিক বাস্তব জগতের সঙ্গে স দের প্রতি তার
হারিয়ে ফেলেছে, তাঁকেও ভাল দের প্রতি তার
এগুলি মানুষের মুখের নয়, খোঁজ চলছে।
ভেতরের প্রতিকৃতি। সে অতি সুস্পষ্ট।
ভাজিল্লাভ স্টানিকের সদবাস্তব কংগ্রেস দলের
মামুলি মনে হয়েছে। বিরোধী দল ছিল
মেটিকের তৈলচিত্রগুলি বড় লোকসভা পরি-
খুঁটিনাটির প্রতি তাঁর অন্যচিত্র
মতো বয়। তাঁর সব ছবিতে রঙমা ছিল। লোক-
একটি নারী আছে, কখনো সে শনরকম টালমাটাল
কখনো ছায়া ছায়া অস্পষ্ট আন রাজাকে (কে
মাত্র। পুরুষমাত্রই কিন্তু প্লাস্ট সঞ্জীব রেড্ডীকে
মূর্তি—ভারী, পুরানো, শ্বেত ই ভাল হবে
এবং রক্তশীল। ফোটোগ্রাফিকে মিটিং-এ এ কথা
মানায় এঁর খুঁটিনাটি। স্টিল হইহই করে
নারী এবং অ্যান্টিক মূর্তির
পুরুষ আছে প্রতিটি কাজে। আবিশেষ পছন্দ
ছবিতে একটি প্লাস্টারের ন তাঁর হাতের
সামনে পেছনে আয়না থাকায় রেড্ডী স্পীকার
ছবির ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যা নও হেলদোল
ব্যাপারটা জমেছে। ছবিটা যে আছি ; না
দিয়ে দেখবেন মূর্তিগুলো তার উ আগে অবধি
ধার ঘেঁষে যাবে। সামনে দেখলে বি ভাব। একবার
মনে হবে সেগুলো আছে মাঝখ নিষ্ঠায় নিজের
চাক্ষুষী বিভ্রম সৃষ্টিতে র মধ্যে কেউ
জুড়ি নেই।
জর্জ সিউহার ছবি স্পীকার-পদের
প্লাস্টিকের ওপর উল্টোদিক বিরোধী দলও
নঞর্থক পদ্ধতিতে আঁকা। রের পর এরকম
জেল্লা এবং মাদার অব পার্লে
দেখতে পটের উপরিভাগ। র অর্জন করতে
কখনো রঙ ফেটে চটে অন্য
ঢেকে শিল্পীর নিয়ন্ত্রণ মতো নানার
চাক্ষুষী ভ্রমের সৃষ্টি করে
মোজাইক এবং কাচচিত্র (stained শূন্য হল,
glass)-এর রূপারোপের থেকে সঞ্জীব
মানুষের অবয়বে আরও ভেঙে কা কানও তরফ
লাগানো হয়েছে। মানুষের লাঞ্ছন য়নি। আর,
কথা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ নির্বাচনে
অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপখ্যানের ম
বিধৃত। মায়ের কোলে ভগ্নকরভা গে বহুবার
ভাঙাচোরা দেহ। দুঃখে বিকৃত মা কখনও বাইরে
মুখ চীৎকার করে উঠছে যন্ত্রণা দ্বিতীয়বার
মাইকেলএঞ্জেলোর পিয়েতা'র স তীব্র আপত্তি
কতো তফাত। বরং নিখিল বিশ্বা য়েই ডঃ রাধা-
অনেক কাছাকাছি। কিন্তু নৈরা ষ্ট্রপতি করতে
মধ্যে পুনরুত্থান হয়। মানবপুত্র বলে রলালকে বলা
আমি আলফা (গ্রীক ভাষায় প্র
অক্ষর) ওমেগা (গ্রীকে শেষ অক্ষর) মার রাষ্ট্রপতি
অর্থাৎ মানুষ আদি, মানুষই অ থাকা সত্ত্বেও
শুরু এবং শেষ। সিউহার মানসি ডঃ জাকির
গড়ন দণ্ডাবস্থার মতো।
ন কামরাজ
মায়সেদ বারবারের রঙীন নির্বাচিত
খোদাই তৈলচিত্রকে সূক্ষ্ম কাজে করি। শেষ
মানায়। ছায়ের ব্যবহার রঙের পরতে চনা হয়,
ওপর পরত ছাপিয়ে ভেতর থেকে নেন।
জেল্লা টেনে আনা। নাকের ওপর আলো
ঠিকরে বার করা। মুখের ওপর প্রধান-
আলোর তারতম্য। কি অমানুষি র প্রবীণ ও
পরিশ্রম, রুচি এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাব অধিকাংশের
বেগ। চাদরের মতো নীল জল লেন। কাম-
গালিচার ঢেউ ক্রমশ ফুলতে ফুল সভাপতি
তীরে মাথা কোটে। 'টেমপো লেকেন্ড সুনাম ও
রোমান্টিক-১ এবং ২' তিনটে ছবিতে জাকির
আজানু পর্যন্ত বিস্তৃত নারী—প্রাচী
ইউরোপীয় শিল্পগুরুদের মতো সূক্ষ্ম

হোসেনের বেলায় আমাদের মত মেনে নিয়ে-ছিলেন, কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয়নি। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। মনোনয়নপত্র পেশ করার আগে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী পার্টি কমিটির মিটিং-এর জন্য সঞ্জীব রেড্ডী ইউরোপ গিয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে যখন শুনলেন কংগ্রেসের কোনও কোনও মহল তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়াটা ঠিক পছন্দ করছে না, সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করে ফেললেন। কামরাজের বাড়িতে কামরাজকে ও আমাকে বললেন, 'এই গোলমালের মধ্যে আমার না দাঁড়ানোই উচিত।' কামরাজ জানালেন, 'তুমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে এস।' কামরাজ আমাকে আগেই প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি যেতে বললেন। আমার উপস্থিতিতে শ্রীমতী ইন্দিরার কাছে কুশলপ্রশ্নাদির পর সঞ্জীব রেড্ডী জানালেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি-পদে দাঁড়াতে অনিচ্ছুক। শ্রীমতী ইন্দিরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে আমরা চাই। আমি মনোনয়নপত্রে আপনার নাম দিয়ে প্রস্তাব করব এবং আমি নিজে আপনার মনোনয়নপত্র পেশ করব।' এবং শ্রীমতী ইন্দিরা নিজে সঞ্জীব রেড্ডীর নাম রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য প্রস্তাব করেন। এর আগের এবং পরের ঘটনা সত্য, এবং মিথ্যার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ বঞ্চনার আর কোনও নজির নেই পৃথিবীতে। পার্টির দলপতি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নাম প্রস্তাব করে পরে পিছন থেকে ছোরা মেরে হারিয়ে দিলেন—এ ঘটনা সত্য হলেও বিশ্বাস করা কঠিন। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডী মাত্র ষোল-সতেরটি পার্লামেন্টারী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যে মনোনয়নপত্রে সই করে সে ভোট দেয়, কখনও বিরুদ্ধে যায় না। আর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যতরকমের গর্হিত কাজ করা সম্ভব ভারতের প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা সবই করেন। কংগ্রেসের আশি বছরের ইতিহাসে কংগ্রেস দলেরই প্রধানমন্ত্রী নিজে এক মসীময় কালিমা-লিপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এর নজির নেই যে, দলপতি নিজে অগ্রণী হয়ে দলের মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। এ পরাজয়ে সঞ্জীব রেড্ডীর কোনও ক্ষতি হয়নি, গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান চিরকালের জন্য সভ্য সমাজে হেয় হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয় জয়লাভ করেছিলেন ; কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, সেই সঞ্জীব রেড্ডীই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং তা হলেন সর্বসম্মতিক্রমে। এই সম্মতিতে লোকসভার কংগ্রেসী দলের পূর্ণ সমর্থন ছিল, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টের যে কংগ্রেস দলের কিছু সদস্যের কাছে সঞ্জীব রেড্ডী ছিলেন অযোগ্য, হঠাৎ সেই দলই তাঁকে যোগ্যতম প্রার্থী বলে স্থির করলেন।

অরণ্যদেব স্বর্ণোদ্যান থেকে ফিরে যাচ্ছেন...

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১৩ ॥

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর যে অপ্রকাশিত ডায়রির কথা আগে বলেছি, সেই ডায়রি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। এ সম্পর্কে নবকৃষ্ণবাবু যা লিখে গেছেন, তা এই—

'প্রকৃতি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতির মোকদ্দমা বেধেছিল। কারও কথাতেই কালীপ্রসন্নবাবু মামলা মিটিয়ে নিতে চাইলেন না। অবশেষে ঐ মামলা মিটিয়ে দেবার জন্য বঙ্কিমবাবুকে ধরা হয়েছিল। মামলাটি মিটিয়ে ফেলবার জন্য বঙ্কিমবাবু কালীপ্রসন্নবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর চিঠি পেয়ে কালীপ্রসন্নবাবু বঙ্কিমবাবুকে টেলিগ্রাম করেন—

'Will pay your letter every attention. Letter follows."

বঙ্কিমবাবুর মধ্যস্থতায় মামলাটি অচিরেই মিটে গিয়েছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯০, ঐ টেলিগ্রামখানি অবিনাশবাবুকে দেখাবার জন্য বঙ্কিমবাবু আমাকে দেন।

নবকৃষ্ণবাবুর এই ডায়রিতে অবিনাশবাবু উল্লেখ থাকলেও অবিনাশবাবুর পুরা নাম নেই। এবং প্রকৃতি পত্রিকার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির কেন মামলা বেধেছিল, আর কিভাবেই বা মামলাটি মিটে গিয়েছিল, তারও কোন কথা নেই। তখনকার দিনে এই মামলাটি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে একটি বহু আলোচিত চাঞ্চল্যকর মামলা ছিল। এই ভেবেই হয়ত নবকৃষ্ণবাবু মামলার পুরা বিবরণ এমন কি অবিনাশবাবুর পুরা নামও উল্লেখ করে যাননি।

প্রকৃতি সম্পাদকের এই মামলায় পড়ার কথা এবং মামলা মিটিয়ে নেবার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি লেখার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থেও লিখে গেছেন। তবে হেমচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস' নামক গ্রন্থে এই মামলার ও মামলা মিটে যাওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস দিয়েছেন। এই মামলা সম্পর্কে শচীশবাবুর লেখাটি প্রথমে উদ্ধৃত করছি। পরে হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর দীর্ঘ লেখাটির সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি। শচীশবাবু লিখেছেন—

'সাহিত্যিক মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ দিতে ও বিপদে সাহায্য করিতে কখন তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। একবার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম প্রকৃতি। অনুকূলবাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গোবিন্দচন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই তো কালীপ্রসন্নবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকিল, মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবত রাজার। দরিদ্র সাহিত্যসেবী অনুকূলবাবু মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। সেন মহাশয় মোকদ্দমা মিটাইবার জন্য সধ্যামত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

'অবশেষে অনুকূলবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না।.....যে যুবক ক্ষীণ যষ্ঠী সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপনাবলী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে সে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূলবাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্নবাবুকে পত্র লিখিলেন—অনুকূল সাহিত্য সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদগ্রস্ত তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে ও অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল জানিবে।'

এই মামলার ব্যাপারে নবকৃষ্ণবাবুর ডায়রিতে অবিনাশবাবুর নাম আছে। শচীশবাবুর লেখায়—কিন্তু অবিনাশ নেই, আছে অনুকূল। সম্ভবত অবিনাশবাবু অনুকূলবাবুর ভাই অথবা অন্য কোন নিকটজন ছিলেন। অনুকূলবাবু মামলার ওয়ারেন্টের বলে বা মামলা তদ্বিরের জন্য ঢাকায় গেলে তখন নবকৃষ্ণবাবু ঐ অবিনাশবাবুকেই টেলিগ্রামটা দেখিয়ে এসেছিলেন।

শচীশবাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষের ন্যায় কবি গোবিন্দ দাসেরও পরিচয় ছিল। শচীশবাবু লিখেছেন—'আমি ১২৯২ সালের কথা বলিতেছি। সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র সানকিভাঙ্গার বাটীতে থাকেন। প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত সাহিত্যিকেরা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করিতেন—চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার....। সময় সময় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিতেন।'

কলকাতার যে পল্লীতে প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ঐ পল্লীটিরই নাম সানকিভাঙ্গা। এখানে তিনি ভবানী দত্ত লেনে থাকতেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রকৃতি সম্পাদকের নামে মামলা করেছিলেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। অতএব শচীশবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ মামলার অন্তত আট বছর আগে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় ছিল। তাই প্রকৃতি সম্পাদকের

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সম্পাদকের বিপদের জন্য তো বটেই, তাছাড়া গোবিন্দচন্দ্রই ঐ মামলার মূল জেনেও মামলা মিটিয়ে নেবার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষকে অনুরোধ করে থাকতে পারেন।

যাই হোক, হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস' গ্রন্থ থেকে এবার ঐ মামলার কিছুটা বিবরণ দিচ্ছি—

ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী ১২৮৩ সালে প্রভাত-চিন্তা নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে নিজ রাজ্যের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী বা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। এর কিছুদিন পরেই ভাওয়াল জয়দেবপুরের অধিবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস রাজা কালীনারায়ণের পুত্র কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হন। ঐ সময় রাজকুমারের বয়স ছিল বছর উনিশ।

রাজা কালীনারায়ণ পুত্র এবং মন্ত্রীর উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরোন। তরুণ রাজকুমার আবার মন্ত্রী কালীপ্রসন্নর উপর ভার দিয়ে নিজে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতে থাকেন।

গোবিন্দচন্দ্র নিজ কর্তব্য হিসাবে রাজকুমারকে প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করতেন। রাজকুমার যেমন গোবিন্দচন্দ্রের কথায় কান দিতেন না, মন্ত্রী কালীপ্রসন্নও তেমনি গোবিন্দচন্দ্রের ঐ আচরণের জন্য তাঁর উপর বিরক্ত হতেন।

ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা এই—রাজা কালীনারায়ণের তিন বিবাহ ছিল। তাঁর দ্বিতীয়া রাণীর ভাগিনীপুত্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) তৃতীয়া রাণীরও ভাগিনীপুত্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং রাজা খানসামা একরাত্রে মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে জনৈক বেচু শিকদারের বাড়িতে কু-অভিপ্রায়ে যায়। গিয়ে বাইরের দরজায় আঘাত করতে থাকে এবং দরজা খুলে দিতে বলে। বেচু বাড়িতে ছিল না। তার স্ত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকে।

চিৎকার শুনে বেচুর ভৃত্য বাইরে এলে শ্যামচরণরা তাকে খুব প্রহার করে চলে যায়।

বেচু বাড়ি এসে সমস্ত শুনে রাজদরবারে নালিশ জানাল। মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন বিচার করে কেবল বাজার পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন এবং দুই শ্যামাচরণকে বেকসুর খালাস দিলেন।

এই বিচারে ভাওয়ালের প্রজামণ্ডলী বিস্মিত হলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্রও বেদনা বোধ করলেন। তিনি এ সম্পর্কে পুনর্বিচারের জন্য রাজকুমারকে অনুরোধ জানালেন।

রাজকুমার পুনর্বিচারে অস্বীকৃত হলে, গোবিন্দচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন পুনর্বিচার করাবেনই। এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি ভাওয়ালের জনসাধারণের দ্বারে গিয়ে সকলকে বোঝালেন এবং একদিন পুনর্বিচারের দাবীতে বিশাল জনতা নিয়ে রাজদরবারে এসে হাজির হলেন। জনতা জানাল, পুনরায় বিচার না হলে তারা নিজেরাই ঐ অন্যায়ের বিচার করবে।

রাজকুমার বিশাল জনতা এবং তাদের কথা শুনে ভীত ও বিচলিত হলেন। শেষে পুনর্বিচারে রাজী হলেন। এবার বিচারক রাজকুমার নিজে এবং মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন। বিচারে রায় হল—শ্যামাচরণব্যঙ্গ রাজার জমিদারীতে যে যে পদে নিযুক্ত ছিল, তা থেকে বরখাস্ত হল এবং ব্যাঙ্গার ৫০০ টাকা জরিমানা হল।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (অধ্যাপক কুমুদকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে)

ব্যাঙ্গা সম্বন্ধে আরও একটা ব্যবস্থা হল—যতদিন না লোকে তার সম্বন্ধে ভাল মত পোষণ করে, ততদিন সে রাজ্যের একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জুতো পায়ে ও ছাতা মাথায় দিতে পারবে না।

এই বিচারেও গোবিন্দচন্দ্রের হৃদয়ের বেদনা দূর হল না। তখন তিনি রাজদরবারে সকলের সামনেই রাজগৃহের তাঁর চাকরিতে ইস্তাফা দিলেন। অবশ্য পুনর্বিচার করানোর পরে তাঁর পক্ষে আর চাকরি করাও মুশকিল ছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কলকাতায় 'নবযুগ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভাওয়ালের উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও মন্ত্রী কালীপ্রসন্নর বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন রাজাকে বোঝালেন এ রচনা গোবিন্দচন্দ্রেরই। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁর জন্মভূমি জয়দেবপুর থেকে নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র এই আদেশ শুনে রাজাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ঐ রচনা তাঁর নয়. তিনি নবযুগে কখনও লেখেননি। এজন্য তিনি সাক্ষী হিসাবে নবযুগ সম্পাদককেও আনতে চেষ্টা করবেন।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কোন কথাতেই আর কান দিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র চির-দিনের জন্য নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হলেন। নির্বাসিত হয়ে গোবিন্দ-চন্দ্র কলকাতায় এসে ঠিক করলেন—না লিখেও যখন লিখেছি এই অপবাদ নিলাম, তখন এবার সত্য সত্যই লিখব।

এই ঠিক করে ভাওয়াল রাজদরবারের বহু অনাচার অত্যাচার ও কলংক কাহিনী নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র 'মগের মুলুক' নামে এক বিদ্রুপ রসাত্মক কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। কাব্যটি যথা সময়ে ১২৯৯ সালে কলকাতার 'প্রকৃতি নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হল।

'প্রকৃতি'তে মগের মুলুক প্রকাশিত হলে ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন প্রকৃতির সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারীর নামে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে নালিশ করেন। প্রকৃতির পরিচালকগণ ওয়ারেন্টের বলে গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা যেতে বাধ্য হলেন।

প্রকৃতির পরিচালকবর্গের এই বিপদে গোবিন্দচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তিনি কলকাতায় তাঁর বন্ধু নব্যভারত পত্রিকার সম্পাদক দেবী-প্রসন্ন রায় চৌধুরীকে ধরে ঢাকার এক উকিলের সাহায্যে মামলা লড়ার ব্যবস্থা করালেন। এই ব্যবস্থা করে তিনি একদিন প্রকৃতির পরিচালকবর্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি গেলে সেদিন তাঁর সঙ্গে ভীত, দরিদ্র ও দুর্বলপ্রকৃতির এ'রা বিরূপ ব্যবহার করেছিলেন এবং মামলাটিরও কিভাবে সমাপ্তি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে এবার হেমবাবুর 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' বই থেকেই উদ্ধৃত করছি—

...তাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে আর বাক্যালাপ না করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তখন কবি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নির্ভীকতা এবং আত্মসম্মানবোধ এই ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, তথা হইতে কবি ফিরিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তিনিই অনুষ্ঠাতা হইয়া এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন। ঢাকার জনৈক বিশ্বস্ত সাহিত্য-সেবকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এই মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন তিনি নাকি সেই পত্র দেখিয়াছেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভা আহূত হয় এবং 'প্রকৃতি' সম্পাদক উক্ত সভায় ঘোষ মহাশয়কে একখানি ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে সম্পাদক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বলেন।

যথাসময়ে তাহা বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রার্থনা করেন। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল।...

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত 'ক্ষমাপত্র' প্রত্যেক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক কাগজে (তখন দৈনিক বাঙ্গলা কাগজ ছিল না) প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যথা সময়ে তাহা বঙ্গদেশের প্রায় সকল কাগজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সময়কার দেশের লোকে জানিতে পারিয়াছিল যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন। এতদুপলক্ষে দাস-কবি একখানি পত্র আমাদিগকে একবার লিখিয়াছিলেন—

প্রকৃতি-সম্পাদক আমায় লিখিত 'মগের মুলুক'এর পাণ্ডুলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়াছিলেন এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকদ্দমা করিতে সাহস পায় নাই।'

এই মামলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে—বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ক্ষমাপত্র লিখিয়ে নিয়ে মামলা মিটিয়ে নিতে বলেন নি। তিনি অমনিই মামলা মিটিয়ে নিতে বলেছিলেন। প্রকৃতি সম্পাদক নিজে গিয়ে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন তিনি কখনই সাহায্যপ্রার্থীকে এইভাবে হেয় করে মামলা মিটিয়ে নিতে বলতে পারেন না।

ঢাকার একজন সাহিত্যসেবক বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি দেখেছিলেন বলে হেমবাবু তাঁর গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন। চিঠিতে যদি ক্ষমাপত্র লিখিয়ে নেওয়ার কথা থাকত, তাহলে হেমবাবু সে কথা ঐ সাহিত্যসেবকের মুখে নিশ্চয়ই শুনতেন এবং লিখেও যেতেন।

প্রকৃতি সম্পাদককে দরিদ্র ও দুর্বল প্রকৃতির দেখেই বুদ্ধিমান ও চতুর রাজ-মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমাপত্রের কথা কিছুই জানতেন না। পরে হয়ত কাগজে দেখেছিলেন বা শুনেও ছিলেন।

প্রকৃতি সম্পাদকের এই মামলার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কোর্টে একটি মামলার বিচারের কাহিনী মনে পড়ছে। এখানে যেমন বলছি, বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি সম্পাদককে ক্ষমা স্বীকর করবার কথা বলেননি, তিনি তাঁর নিজের কোর্টের মামলার প্রসঙ্গে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলে চিঠি দিয়ে-ছিলেন।

বাড়ির লোকজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের নানা ধরনের চিঠি নিয়ে আলোচনা করেছি ও করছি; কিন্তু তাঁর কর্মস্থলে উপরওয়ালাদের বা ইংরাজ সিভিলিয়ানদের লেখা তাঁর কোন চিঠি নিয়ে এ পর্যন্ত কোন কথা বলিনি। অফিসে নিছক চাকরির কথা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র কখন কখন প্রয়োজনবোধে অন্য প্রসঙ্গেও চিঠিপত্র লিখতেন। এখানে হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যান্ড সাহেবকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠির প্রসঙ্গ ও ঐ সঙ্গে তাঁর কোর্টের সেই মামলার কাহিনীটিও বলছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে হুগলী থেকে হাওড়ায় বদলি হয়ে আসেন। এবার তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বর্ধমান ডিভিশন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিসট্যান্টের পদটিও পান। এখানে ঠিক বলতে গেলে, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেবই ছিলেন তাঁর উপরওয়ালা। বঙ্কিমচন্দ্র এবার হাওড়ায় ছ সাত মাস ছিলেন। এই হাওড়ায় থাকাকালে একটি মামলায় তাঁর দেওয়া রায়ের উপর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিরূপ মন্তব্য করলে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা কড়া চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠি সাধারণের কাছে কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। তবে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুল্লতাত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর লেখা ঐ চিঠির ভাষা বা বক্তব্য এবং মামলাটিরও বিবরণ শুনে এ সম্পর্কে তাঁর বঙ্কিম জীবনী গ্রন্থে যা লিখে গেছেন, তা সংক্ষেপে এই—

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান, তখন সেখানে সি ই বাকল্যান্ড ছিলেন অ্যাকটিং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ঐ সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে একটা নোটিস জারি করা হয়েছিল যে কেউ কম্বাসটিবল্ বা দাহ্য পদার্থ দিয়ে ঘর ছাইতে পারবে না। ছাইলে তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। মূল নোটিসটি ছিল ইংরাজিতে। ইংরাজী থেকে বাঙ্গলায় অনুবাদ করে নোটিস জারি করা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন ইংরাজ সম্পাদক।

রাজকৃষ্ণ রায়

সাহেব অনুবাদে কম্বাসটিবলের বাঙলা করেছিলেন, জ্বলীয় নয় 'জলীয়'।

মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এক বৃদ্ধার একটি গোলপাতার ঘর ছিল। ঘরটি রীতিমত দাহ্য পদার্থ গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া বলে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধার উপর নোটিশ জারি করেন।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানতো না। তাই নোটিসটি পেয়ে সে তার এক প্রতিবেশীকে দেখায়। প্রতিবেশীটিও ছিল অল্পশিক্ষিত। সে নোটিস পড়ে বৃদ্ধাকে বললে—নোটিশে জল দিয়ে ঘর ছাইতে নিষেধ করেছে।

বৃদ্ধার ঘর গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া, তাতে জলের নামগন্ধও নেই। তাই নোটিস পেয়েও বৃদ্ধা নিশ্চিন্ত হল।

এদিকে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ দেখলেন, বৃদ্ধা নোটিসের আদেশ লঙ্ঘন করে চলেছেন। কম্বাসটিবল পদার্থ গোলপাতা দিয়েই ঘর ছেয়ে রেখেছে। তাই তাঁরা বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এই মামলার বিচারের ভার পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধার মুখে সমস্ত শুনে, বুঝলেন—বৃদ্ধার অল্পশিক্ষিত প্রতিবেশীটি নোটিসের উদ্দেশ্য ধরতে পারেনি। 'জলীয়' শব্দের যা অর্থ হয়, সেই অর্থই সে বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাকে যে গোলপাতার ছাউনি বদলাতে হবে, তা সে আদৌ জানতেই পারেনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধাকে নির্দোষ ভেবে, তাকে মুক্তি দিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা মুক্তি পেল দেখে বাকল্যান্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে ঐ মোকদ্দমার নথীপত্র চেয়ে আনালেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রায় পড়ে তার উপর মন্তব্য লিখেছিলেন বাঙলা ভাষার উপর অহেতুক দরদ দেখাতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই মামলাটি নষ্ট করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রায়ের উপর বাকল্যান্ড সাহেবের ঐরূপ মন্তব্য পড়েই রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি তখনই বাকল্যান্ড সাহেবকে এক পত্রে লিখলেন—
'You are not my judicial superior officer, and you have no right to criticise my judgement.'

তিনি আরও লিখেছেন—আমার রায়ের উপর মন্তব্য লিখে আপনি যে অন্যায় করেছেন, তার জন্য আপনাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এক মাসের মধ্যে যদি ক্ষমা না চান, তাহলে আমি কমিশনার সহেবকে সমস্ত জানাব। তখন তিনি চাইলে, আপনি অবশ্যই এই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। বাকল্যান্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইলেন না। ঠিক এই সময় কমিশনার সাহেব একদিন হাওড়ায় এলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সমস্ত কথাই জানালেন।

বাকল্যান্ড সাহেব একথা জানতে পেরে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কেন না, তিনি নিজেও জানতেন যে, কারও রায়ের উপর মন্তব্য লেখা বে-আইনী। তবুও তিনি তখন ক্রোধভরে লিখেছিলেন এই ভেবে যে একজন দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিসস্ট্রেট উচ্চপদস্থ সাহেবের বিরুদ্ধে লিখতে কখনই সাহসী হবেন না। এই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই যে একটা কান্ড করবেন, তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। এখন তাঁর এই বে-আইনী কাজের কথাটি কমিশনার সাহেবের কানে উঠেছে শুনে তিনি এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একটা মিটমাটের জন্য সচেষ্ট হলেন। তাই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে তোষামোদের সুরে বললেন—আমার বার্ষিক রিপোর্টে আমি আপনার সম্বন্ধে কি লিখেছি আপনি তা দেখেছেন কি? আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার কথা লিখেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে বললেন—প্রশংসা পাবার মত যদি কাজ করে থাকি, তাহলে লিখেছেন, তাতে আর হয়েছে কি?

বাকল্যান্ড ভেবেছিলেন—প্রশংসার কথা শুনলে বঙ্কিমচন্দ্র নরম হবেন। কিন্তু তা হলেন না দেখে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিষ্কার বললেন—বঙ্কিমবাবু, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে লেখা আপনার চিঠিটি প্রত্যাহার করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—যে বে-আইনী কাজ করেছেন, তার জন্য ক্ষমা চাইলে, আমি তখন চিঠি প্রত্যাহার করে নেব।

বাকল্যান্ড বললেন—দেখুন, ম্যাজিসস্ট্রেটের একটা প্রেস্টিজ আছে তো? আমি আপনার রায়ের উপর যেখানে মন্তব্য লিখেছিলাম, তার নীচে লিখছি—উপরিউক্ত মন্তব্য লেখার জন্য আমি দুঃখিত, আমি এক্ষণে ঐ মন্তব্য প্রত্যাহার করলাম।

সাহেব এইভাবে লিখলে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটি প্রত্যাহার করলেন।

এরপর থেকে বাকল্যান্ড বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং আজীবন তাঁর হিতৈষী বন্ধু ছিললন। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'বেঙ্গল আন্ডার লেফট্যান্ট গবর্নরস'য়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের যে ডায়ারির কথা নিয়ে আরম্ভ করেছি, সেই ডায়ারির কথায় আবার ফিরে আসছি। ঐ ডায়ারির এক জায়গায় নবকৃষ্ণবাবু লিখেছেন—'রাজকৃষ্ণ রায়কে বঙ্গদর্শনে লিখবার জন্য বঙ্কিমবাবু একবার চিঠি লিখেছিলন। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনে লিখলে কলম পিছু দেড় টাকা করে দক্ষিণা পাওয়া যেত। রাজকৃষ্ণবাবুকে দক্ষিণার কথাও জানানো হয়েছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই এ কথা শুনেছিলাম। বঙ্গদর্শনে একবার কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর লেখা বাতিল করে নগেন্দ্রনাথ বসুর একটি রচনা দেওয়া হয়েছিল।'

নবকৃষ্ণবাবু রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় তাঁর সহকারী ছিলেন এবং রাজকৃষ্ণবাবুর 'বীণা' প্রেসের তদারককারী কর্মীও ছিলেন। অতএব রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে বঙ্গদর্শনে তাঁর লেখা ও দক্ষিণার কথা শোনা নবকৃষ্ণবাবুর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এখানে নবকৃষ্ণবাবুর ডায়ারির ঐ লেখা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লুপ্ত চিঠিটির কথা ছাড়াও আরও দুটি বিষয় সম্বন্ধে জানা গেল। (১) বঙ্গদর্শন প্রতি পৃষ্ঠা দু কলমে ছাপা হত। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র এক পৃষ্ঠা লেখার জন্য লেখককে তিন টাকা সম্মান দক্ষিণা দিতেন। একশ বছরেরও আগে তখনকার তিন টাকার মূল্যমান আজকের ত্রিশ টাকারও অনেক বেশী ছিল। তাই মাঝারি আকারের বঙ্গদর্শনের এক পৃষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের ভালই দক্ষিণা দিতেন বলা যেতে পারে। (২) বঙ্কিমচন্দ্র কোন লেখকের কাছ থেকে নিজে লেখা চেয়ে নিলেও, পছন্দ না হলে, স লেখা বাতিল করতে এতটুকুও ইতস্তত করতেন না। কারণ, বঙ্গদর্শনের উচ্চ মান বজায় রাখাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। (ক্রমশ)

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ৪ ॥

সত্য বলতে কি ফটিক কেমন যেন এক ধরনের বিষণ্ণতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, সে তার শরিক হতে পারছে না। মনের গভীরে কে যেন তাকে খুঁটোয় বেঁধে রেখে দিয়েছে। যেন একটু এগুতে গেলেই টান পড়ছে দড়িতে। ফলে তার ভূমিকাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক তার্কিকের। সে যেন শুধু পেশাদার সমালোচক হয়ে উঠেছে। অ্যাসোসিয়েশনে মুছলমান উকিলদের দিয়ে খান বাহাদুর বজলুর রহমান চেয়েছিলেন একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে। সেটা হবে একটা আবেদনের মত। তাতে বলা হবে খোন্দকার লীগ ক্যানডিডেট অতএব তিনিই মুসলিম সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। সফীকুল প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, লীগ বাংলাদেশে মুছলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং লীগের কোনও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও নেই এবং লীগের নেতৃত্ব কলকাতার কয়েকজন অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশের জমিদার ও ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ নবাব নাইট স্যার আর খান বাহাদুর খান সাহেবদেরই মুঠোর মধ্যে। তাই লীগ বাংলার গরীব মুসলমান কৃষক প্রজার বা মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাংলার চাষী খাতক, শ্রমিক ও গরিব চাকুরিজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীরা লীগকে এবং তার ক্যানডিডেটকে তাদের প্রতিনিধি বলে মানতে পারে না।

খালেকুজ্জমান ব্যক্তিগতভাবে সফীকুলের মতই খোন্দকারের প্রতি বিরূপ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সে খোন্দকারকে যেহেতু তিনি লীগের ক্যানডিডেট সেই কারণেই তাঁকে সমর্থন করা মুছলমানের কর্তব্য বলে মেনে নিল। তাঁর মতে মুসলিম জাহানের সংহতি ও উন্নতি একমাত্র লীগের দ্বারাই হতে পারে। কারণ লীগ হল নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। আজ যদি মুছলমান সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করতে হয় তবে সে লড়াই করতে হবে ভারত জুড়ে। এবং তার জন্য একটা মজবুত পলিটিক্যাল হাতিয়ার মুছলমানদের চাই। লীগই সেই হাতিয়ার। যেমন কংগ্রেস হিন্দুদের। সফীকুল প্রচণ্ড বিরোধিতা করায় খোন্দকারের লোকেরা প্রস্তাবটা বার অ্যাসোসিয়েশনে তুলল না। কেননা তরুণ মুসলমান উকিলদের বেশ কিছু সমর্থন সফীকুল পেয়ে গেল। ফলে খালেক সফীকুলের উপর রেগেই গেল। এতে সফীকুল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। খালেক আর সে প্রায় একবয়সী এবং সে পড়াশুনা করে। তাই যদিও খালেকের মতামত সব সময় তার কাছে গ্রহণীয় হত না তবু তাকে সফীকুল পছন্দই করত।

খালেককুজ্জমান বলেছিল, এই কামড়া আপনি ভাল করলেন না। আমাগের মুছলমানগের মধ্যি কডা লেখাপড়া জানা লোক আছে যে আপনার ইকনমিক প্লান বোঝবে ওর মানে বুঝার লোক কডা আছে কন? সফীকুল বলেছিল, ইকনমিক প্রোগ্রাম এই ইংরাজী কথাটার মানে না কৃষক খাতক প্রজাদের যেহেতু কেউই ইংরাজী পড়েনি, তাই তাদের কেউই এই কথাটার মানে বুঝতে পারবে না। বরং ইসপাহানী আদমজী, ফারুকী, গজনভী, খাজা নাজিমুদ্দিন, এমন কি আমাদের খোন্দকার সাহেবরাই একথার মানেটা যে বুঝবেন সেকথা আমি জানি।

খালেকুজ্জমান বলেছিল, জানেন যদি তাহলি ঐ ফালতু সওয়ালডা তোললেন ক্যান?

তুললাম এই জন্য সফীকুল জবাব দিয়েছিল, আমাদের চাষী খাতকেরা ইংরাজীর মানে জানে না বটে, কিন্তু তারা যে ডাল ভাতের সমস্যায় পীড়িত, এই ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবে বোঝে। সওয়ালটা এই জন্য তুলতে হল। খোনকারের এই সমস্যার সমাধানে কোনও বক্তব্য নেই। অথচ যে মুসলমান সমাজের ভোট খোনকাররা কুড়োতে যাচ্ছেন সেই সমাজে শতকরা নব্বুই জনেরই ভাত কাপড় জোটে না। কাজেই ভোট দেবার আগে জেনে নেওয়া ভাল খোনকারদের এই ব্যাপারে কী দাওয়াই বাতলাবার আছে।

খালেকুজ্জমান বলেছিল, আমরা যে শত্রুবেষ্টিত সে কথা ভুলে যাচ্ছেন ক্যান্? আজ কাগের জন্যি বাংলার মুছলমানগের এই দুর্দশা? হিঁদুগের জন্যি। হিঁদুগের আধিপত্য খতম না কত্তি পারলি মুছলমান ওঠবে কী করে? এই হিঁদু আধিপত্য খতম করার জন্যি চাই মুছলিম ইউনিটি। ইডা মানেন তো?

না। স্পষ্ট করে বলেছিল সফীকুল। না মানিনে। মুছলমান জমিদার আর মুছলমান প্রজার ইউনিটিতে প্রজার কোনোই লাভ নেই। আর তাছাড়া হিন্দুগের জন্যই মুসলমানদের এই দুর্দশা এই কথাও সর্বাংশে সত্য নয়।

সফীকুল মুছলিম ইউনিটির কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারছে না। এই কথাটির কোনও আবেদনই তার মনকে স্পর্শ করতে পারছে না।

খালেক শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে বলেছিল, আপনার এই মনোভাব হিঁদু স্বার্থেরই সহায়ক হবে। কথাটায় দুঃখ পেয়েছিল। কারণ খালেকের মত শিক্ষিত লোককেও সে বোঝাতে পারেনি যে, যে মুসলিম ইনটারেসটের কথা খালেক ভাবছে, তা শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত এবং সুবিধাভোগী মুসলমানের স্বার্থরক্ষার কথা। তাদের স্বার্থ শুধু চাকরি এবং পলিটিক্যাল ক্ষমতার হিস্যা বেঁটে নেওয়া। আর সফীকুল ভাবছে সামগ্রিকভাবে দেশটার কথা যেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শতকরা আশি নব্বুই জনেরই হাঁড়ি চড়ে না, যাদের পরণে টানা জোটে না এবং যারা ভুগছে নানাবিধ রোগে। এদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হবে না! শুধু মুসলিম ইউনিটির ধুয়ো তুললেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হবে। সফীকুল একথা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ নিতান্তই যুক্তিহীন কথা এটা।

এর চাইতে কৃষক প্রজা দলের কথাবার্তা তার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয়। কিন্তু সেখানেও সংশয় উঁকি মারে। এ দলের নেতৃত্বেও উপস্বত্বভোগীদের ভিড় কম নয়। যদিও প্রজার স্বার্থরক্ষাই এই দল নিজের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু নেতাদের মধ্যে প্রজা কোথায়? অধিকাংশই হয় জোতদার, নয় উকিল মোক্তার। অর্থাৎ তার মতই উপস্বত্বভোগী। এদের হাতে কৃষক খাতকদের স্বার্থ সত্যই নিরাপদ তো? এই প্রশ্ন উঁকি মারে তার মনে।

আবু তালেব বলেছিল, আপনারে নিয়ে মুশকিল কি জানেন, আপনি গাছে না উঠতেই এক কাঁদির খোয়াব দেখেন। ধাপে ধাপে না আগোলে আমাগের উপায় কী? আমরা জানি আমাগের উঁচু মহলে এমন কিছু লোক আছেন যাগের স্বার্থ আর চাষী খাতকগের স্বার্থ এক নয়। সুযোগ আলি তাগের বন্দবস্ত করা যাবে।

কিন্তু আবু তালেব যত উৎসাহভরে এই কথা উচ্চারণ করে সফীকুল ততটা আগ্রহ নিয়ে এই কথাটি গ্রহণ করতে পারে না। কোথাও সে ভিড়তে পারে না। এককালে কংগ্রেসকে সে মনে করত হীরে। কিন্তু সেটা যে হীরে নয় কাঁচ এ উপলব্ধি যেদিন তার হল, সেদিনের মানসিক যন্ত্রণা সে ভুলতে পারে না। একটা ঘটনা তো মর্মান্তিক। এক সময় মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী তুলেছিল। সেই সময় হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করার একটা চেষ্টা নেহরু কমিটি করছিলেন। এই মীমাংসার সময় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করবেন, আপোষ নিষ্পত্তির আলোচনায় শুরুতেই একথা মুসলমানদের স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিতরকার সত্য হচ্ছে এই যে তাতে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের প্রেম ও আস্থার অভাব যে আছে সে কথাটা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

সফীকুলের তরুণ মন এই যুক্তির সারবত্তা সেদিন স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেনি। এবং মিঃ জিন্না, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা এই শর্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সংবাদ কাগজে পড়ে সফীকুল সেদিন কী খুশিই না হয়েছিল। মিশ্র নির্বাচন বা যুক্ত নির্বাচন স্বীকার করে নেবার পর এই মুসলিম নেতারা বলেছিলেন, যদি প্রাপ্তবয়স্কমাত্রকেই ভোটাধিকার দানের কথা হয়, তাহলে আমাদের আর কোনও কথা নেই কিন্তু কোনও কারণে তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুধু বাংলা আর পানজাবের মুসলমানদের জন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু নেতারা এতে ঘোর আপত্তি তুললেন। তাঁদের বক্তব্য, আসন সংরক্ষণের দাবির ভিতর, এমন কি তা নির্দিষ্টকালের জন্য হলেও, স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষধর বীজাণুগুলি সমানভাবে লুকিয়ে আছে। সুতরাং জাতীয়তার উচ্চ ও মহান আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা মুসলমানদের এই প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। সফীকুল এই কথাও মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেস সাময়িক সুবিধার জন্য তো আর আদর্শ ছাড়তে পারে না। কিন্তু সেই কংগ্রেসই আবার যেদিন তপশীলী হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিকে চিরকালের জন্য মেনে নিয়ে "জাতীয়তার উচ্চ ভাব ও মহান আদর্শ"কে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না, সেদিন সফীকুল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মনে হল এই দুনিয়ায় তার বুঝি আর দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই। কংগ্রেস, তার কংগ্রেস এই করল!

তপশীলী হিন্দুদের হাতে রাখার জন্য যে নির্বাচন পদ্ধতি কংগ্রেস চিরকালের জন্য মেনে নিতে দ্বিধা করল না, তাহলে মুসলমানদের ক্ষেত্রে মহম্মদ আলির সুপারিশ কংগ্রেস গ্রহণ করল না কেন? এ প্রস্তাব তো বরং অনেক ভালো ছিল। বাংলা ও পানজাবের মুসলমানদের ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আলি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে অনুরূপ প্রস্তাবই তো গ্রহণ করতে বলেছিলেন কংগ্রেসকে, এবং তাও "নির্দিষ্টকালের জন্য" অর্থাৎ যদিন পর্যন্ত না প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার চালু হচ্ছে, সেই পর্যন্ত। তখন কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করল কেন? সফীকুল আজও তার কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না। মোহাম্মদ আলির প্রস্তাব ছিল যুক্ত নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক যাতে হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থীরা নিজ সম্প্রদায়ের ও অন্য সম্প্রদায়ের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট রেকরড করাতে বাধ্য হবেন। তপশীলী হিন্দুরা হিন্দু ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক আসনের জন্য চারজন করে প্রার্থী প্রথমে নিজেরাই মনোনীত করবেন, তারপর যুক্ত নির্বাচনের দ্বারা তার মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করা হবে।

সফীকুল আজও বুঝতে পারে না, মরহুম মোহাম্মদ আলির ফরমুলার সঙ্গে এই নীতির মূলগত প্রভেদ কোথায় ? আর তা যদি নাই থাকবে তাহলে কেনই বা কংগ্রেস মোহাম্মদ আলি ফরমুলা প্রত্যাখ্যান করল এ কি সুবিধাবাদী নীতি নয় ? এবং অদূরদর্শিতা নয় ? মুসলমানদের দাবীগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস কি আরও বিচক্ষণতা আর বিবেচনাবোধ দেখাতে পারত না ? নিশ্চয়ই পারত। তাহলে তো এত বিদ্বেষ সৃষ্টি হত না। কিন্তু পারল না কেন ? সে কি কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের হৃদয় এবং বুদ্ধি । সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বলে ? এর ফলে কংগ্রেস কী পেল ? কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের চির অবিশ্বাস। সফীকুল বুঝতে পারল কংগ্রেসের জাতীয়তার আবরণটা ভুয়ো। সেই কারণেই কংগ্রেসের কাছেও হিন্দু স্বার্থটাই দেশের স্বার্থ। সফীকুল দেখেছে অনেক নমস্য লোক আছেন কংগ্রেসে। পূতঃ চরিত্র, শুদ্ধ বুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু কংগ্রেসে তাঁরা কোণঠাসা। তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কংগ্রেস ছেড়েছিল সফীকুল। তারপর থেকে সে আর রাজনীতি করে না।

সফীকুল টের পাচ্ছে, কোথাও তার জায়গা নেই। কোনও কিছুই সে আঁকড়ে ধরতে পারে না। কেন সে এমন ? কেন মুসলিম সংহতির নারায় সে গলা মেলাতে পারে না ? কেন সে বিশ্বাস করতে পারে না কৃষক প্রজা পারটির মধ্যবিত্ত নেতারা তাদের নির্বাচনী ওয়াদা সত্যই পূর্ণ করবেন ? কংগ্রেস হিন্দু মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবে তার এই বিশ্বাসটাও ভেঙে যাচ্ছে কেন ? শুধু হিন্দু ইনটারেস্ট নয়, সফীকুল দেখে শঙ্কিত হচ্ছে, বাংলার কংগ্রেস হিন্দু জমিদার মহাজনের স্বার্থ রক্ষার দিকেই দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ছে। এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে কংগ্রেস ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। সফীকুল অসহায় বোধ করছে। সফীকুল যেন এক অতলস্পর্শী বিষণ্ণ-, তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কোনও কিছুতে উৎসাহ পাচ্ছে না। আজ মামলা ছিল না। তাই ভেবেছিল কোরটে যাবে না। সকাল থেকে বসে বসে আইনের পুরনো নজির ঘাটছিল। তাতেও মন বসছিল না তার। যত রাজ্যের এলোমেলো চিন্তায় মনটা এদিক ওদিক ঘুরছিল। আজ চারমাস হল ছবি নেই। ঠিক মত যেতে পারছে না ছবির কাছে। কথা দিয়েও রাখতে পারেনি। ছবির অভিমানের বোঝা ক্রমেই ভারী হচ্ছে।

আজকাল ফিনেদার গেলে ছবি অবুঝের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কান্নাকাটি করে। ফটিক কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে তার কাছেই থাকুক, এমন আবদারে অতিষ্ঠ করে তুলছে মাঝে মাঝে। তখন তার বিরক্তিও লাগে। সে প্রকাশ করে না বটে তবে ছবি টের পায়। এবং ভয় পায়। ছবির চেহারারও পরিবর্তন হচ্ছে। মুখখানা কেমন ভরন্ত কেমন ক্লান্ত, কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। আবার পেটটা কেমন মোটা কেমন বেঢপ হয়ে পড়ছে দিন দিন। এখন ফটিক আর ছবির রাত্রি আর তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে না। ছবি হয় ঘ্যান ঘ্যান করে নয় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফটিক তার মাথার চিন্তাগুলো নামাতে পারে না কোথাও। থামাতেও পারে না। তার কোরটের চিন্তা, বার লাইব্রেরির আলোচনার জের পলিটিকস, তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা ব্যর্থতা তার মাথায় এসে গুতো মারতে থাকে। ফটিক জেরবার হয়ে যায়। এবং ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক। কোথায় চলেছ ফটিক ? এই সময় এই প্রশ্নটা বার বার উঁকি দিতে থাকে এবং সে তার উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ছবির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সে ফটিকের গায়ের উপর একখানা হাত চাপিয়ে দেয়।

কোথায় যাচ্ছ তুমি ফটিক ? প্রশ্নটা ঘাই মেরে ওঠে। সে তার একখানা হাত ছবির হাতের উপর আলগোছে রেখে দেয়।

আপনি কি ঘুমোয়ে পড়িছেন ? ছবি খুব আস্তে জিজ্ঞেস করে।

ফটিকের কানে সে প্রশ্ন ঢোকে না। তার মনে তখন বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, কোথায় চলেছ ফটিক ?

আমি।

আপনি কি ঘুমোয়ে পড়িছেন ? ছবি আবার জিজ্ঞেস করে।

আমি ?

হ্যাঁ তুমি ?

আমি জানিনে। মানে বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গে কথা কতি আজকাল আপনার আর ভালো লাগে না না ? ছবি ফটিকের শরীর থেকে ওর হাতখানা আস্তে টেনে নেয়।

কেন বুঝতে পার না ফটিক ?

হিসেবগুলো মেলে না।

কোন্ হিসেব মিলছে না ?

কোন হিসেব ? কোন হিসেবই তো দেখি মেলে না।

যেমন ?

এই ধর, কোনও জায়গায় আমার শিকড় গজালো না কেন ? ছিলাম চাষীর ছেলে, লেখাপড়া শিখলাম। আর অমনি আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম পরিবারের থেকে। আমার বাজান ধরেই নিয়েছেন তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর ভিটে শিয়ালকাঁটার জঙ্গলে ছেয়ে যাবে।

আমার সঙ্গে একটা কথাও কবেন না ? ছবি কাঁদতে শুরু করে। আমি কী কসুর করিছি, কন্ ? আমারে কি আপনার ভালো লাগে না ?

সেদিনই রাতে আম্মা বাজানকে জানিয়েছিল যে তার নাতি হবে। আমার ঘুম আসছিল না। তাই আমি দুজনের কথাই স্পষ্ট শুনেছিলাম। বাজান আম্মার কথা শুনে চুপ করে রইলেন। আম্মা বলল, আপনি খুশী হননি ? বাজান বলল খুশী। তুই আমার দেলের উপরে হাত রাখে বোঝ সেখানে কী

হাতিছে ? আম্মা জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি কিছু কতিছেন না ক্যান ? তাতে বাজান বলল, বেল পাকলে কাকের কী ? আমি সাজ্জাদ। আমি হলাম চাষা। আমার নাতি কি আমার লাঙলে আসে হাত ঠ্যাকাবে ? কক্ষণো না। তালিম আর লাফালাফি কিসির জন্যি। নাতি হচ্ছে ভালো কথা। আল্লাহ ওগের সবার উপর তাঁর বরকত নাজিল করুন। এর বেশী কিছু আর চাইবি নে ফটিকির মা, তাহলিই কষ্ট পাবি।

আমারে কী আপনার ভালো লাগে না ? এবার বেশ জোরেই ফুঁপিয়ে ওঠে ছবি।

এবং ফটিকের তন্ময়তা ভাঙে।

ছবি ছবি, তুমি কাঁদছ কেন ? ফটিক একটু শঙ্কিতভাবেই বলে।

এতে ছবি পাশ ফিরে শোয় এবং কথার কোনও জবাব দেয় না এবং আপন মনে কাঁদতে থাকে। গত কয়েক মাস ধরে অভিনীত দাম্পত্য নাটকের পুনরাভিনয় শুরু হয় এবং একাধারে অভিনেতা এবং দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য ফটিক নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

ফটিক ছবির শরীরে আলতোভাবে হাত রাখে। কিন্তু আজ তার এই ছকবাঁধা একটা ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির বেশী কিছু ঠেকে না। তথাপি ফটিক তার মনে ছবির প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে থাকে।

ফটিক বলে, কী হল ছবি, ওদিকে ঘুরে শুলে যে! আমার উপর নারাজ হয়েছে ?

ছবি পাশ ফেরে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, এখন তো আর আমারে ভালো লাগে না আপনার।

গত কয়েক মাস বহুবার শোনা সংলাপ, ফটিক হাই তোলে কারণ সেও জানে এর পিঠে তাকে কী বলতে হবে। সে বলে, কে বলল ?

ছবি বলে, আমি বুঝি, সব বুঝি।

ফটিক হাই তোলে। তার চিন্তার সুতোটা এবার ছিঁড়ে যায়। এটা তাঁর বিশেষ ভালো লাগে না। কিন্তু পাছে ছবি দুঃখ পায় তাই সে এ ভাব প্রকাশ করে না। সে এখন অভিনেতা।

তুমি ছাই বোঝ।

তালি আমি এত কথা কলাম এতক্ষণ তা সাড়া দেলেন না ক্যান ? ছবি অতি কষ্টে ফটিকের দিকে ফেরে। ছবি যে পরিশ্রান্ত তা বোঝা যায়।

বিশ্বাস কর, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম একটা কথাও শুনতে পাইনি।

আপনার মুখে খালি ঐ অ্যাক কথা। ছবি বলে। অভিমানে।

কিন্তু কথাটা সত্যি। ফটিক উত্তর দেয়। নিরুত্তাপ।

জানেন, আজকাল নমাজ পড়তিউ প্যাটে চাপ লাগে। শরীল কী রকম ঝ্যান ঠ্যাকে, ভয় লাগে।

ফটিক নিরুত্তর।

আমি ঠিক মরে যাব। আমার খুব ভয় লাগে, জানেন ?

ফটিক নিরুত্তর।

আপনি চুপ করে আছেন ক্যান।

এর জবাব কী দেবে ফটিক। বার বার এই একই প্রশ্ন তোলে ছবি। ফটিক হাই তোলে। বারবার সেই একই জবাব দেয় ফটিক। ফটিক হাই তোলে। ছবিকে প্রবোধ দিয়েছে। সাহস দিয়েছে কত। কিন্তু এই একঘেয়ে প্রশ্ন তোলার বিরাম নেই ছবির। নতুন কোনও উত্তরও জানা নেই ফটিকের। ফটিক আজকাল আর জবাব দেয় না। বিরক্তি চেপে নিরুত্তর থাকাই পছন্দ করে। এবং এর ফলে ফটিক আর ছবির মধ্যে এক তিক্ত ব্যবধান গড়ে ওঠে।

কেন এরকম হচ্ছে ? যে আন্দোলনই শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা হিন্দু মুসলমান সংঘাতেরই পটভূমি তৈরি করে তুলছে। কেন এমন হবে ?

কেন এমন হবে না ফটিক! মেজোকর্তার কথা তার মনে পড়ে যায়। না হওয়াটাই তো আশ্চর্য। আমাদের মনে একটা ভণ্ডামি আছে যেটা সর্বদাই আমরা ঢেকে ঢুকে রাখতে চাই। এই সংঘাত আমাদের ভণ্ডামির মুখোসটা খুলে দেয় যায়।

আপনি কাকে ভণ্ডামি বলছেন ?

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সম্পর্কে আমাদের আহা উহুকে।

এটা ভণ্ডামি কেন মেজোবাবু ?

মানুষকে তুমি যদি মানুষের মূল্যে বিচার না কর তাহলে তার কাছে পৌঁছুবে কী ভাবে ? কবীর কী ছিলেন, বলতে পারো ? তিনি হিন্দু না মুসলমান ? বলতে পারবে ? পারবে না। কেননা এ প্রশ্নটাই তোমার মনে আসবে না। কারণ তিনি ছিলেন মানুষ। কবীরকে নিয়ে তুমি যাই কর, তা হিন্দু মুসলিমের মিলন ঘটাবার পটভূমিই তৈরি করবে, উলটোটা করাতে পারবে না। কেন ? তিনি মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছেন মানুষ হতে পেরেছিলেন বলে। লালন, চণ্ডীদাস এরাও পেরেছেন। এবার তাহলে বুঝে দেখ আমরা পারছি নে কেন ? পারছিনে তার কারণ আমাদের প্রেম নেই আছে রাজনীতি।

ফটিক চুপ করে গিয়েছিল। কবীর লালন চণ্ডীদাস সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট ছিল না।

তারপর বলেছিল, কবীর ওরা সাধক ছিলেন। তাঁকে তো অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি।

কবীর জোলা ছিলেন। কাপড় বুনে পেট চালাতেন। দুঃখ ধান্ধা কাকে বলে তোমার আমার থেকে কম বুঝতেন না। মেজোকর্তা বলেছিলেন। নিচু জাত ছিলেন বলে মনুষ্যের অবমাননা মানুষকে মানুষের হৃদয় থেকে কত দূরে নির্বাসন দিতে পারে, এই দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতাটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রেমের অভাবেই মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। প্রেমই মানুষকে কাছে টানে। প্রেমই জাত পাত এই সবের ভেদ চিহ্ন উড়িয়ে দেয়। তখন তার সামনে যে সমস্যাই আনো, তা অর্থনীতিরই হোক আর রাজনীতিরই হোক, তার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। আমাদের মনে এই আসল বস্তুটি কি আছে ফটিক ? আমরা কে কাকে ভালোবাসি ?

আমরা কে কাকে ভালোবাসি ? ফটিক জ জারনালের পাতা উল্টোতে উল্টোতে একেবারে অন্য ভাবনায় চলে এল। আমি কি কাউকে ভালোবাসি ? আমার বাবা আমার মা আমার বিবি শ্বশুর শাশুড়ি, আমার ইশকুল কলেজের বন্ধু, কাকে ?

আমি কি ছবিকে ভালোবাসি ? অর্থাৎ এতটাই ভালোবাসি যে ছবির জন্য এখানকার প্র্যাকটিস ছেড়ে আমি ওর কাছে চলে যেতে পারি ? এবং সুখী হতে পারি ? ফটিক আশা করছিল ওর মনের কাছ থেকে হয়ত উৎসাহব্যঞ্জক কোনও উত্তর পাবে। কিন্তু তার মন সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলতে দ্বিধা করল। এবং পরমুহূর্তেই বিষণ্ণতা তার মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছবি কি এরই মধ্যে তার কাছে পুরনো হয়ে এল ? এই তো তারা ঘর বাঁধল! দু বছরও পেরোয়নি এখনও। ছবি তো তাকে কিছু দিতে বাকি রাখেনি। না, তা রাখেনি। তার টাটকা শরীরটা দিয়ে তার শরীরের তাপ জুড়িয়েছে। এ আকর্ষণ ছবির কিন্তু এখনও ফুরিয়ে যায় নি। আর কী দিয়েছে ছবি ? একখানা সুন্দর তাজা মন। উপস্থিত বুদ্ধি। তীব্র আবেগ। সেইটেই কি ছবির ভালোবাসা ? যা কি-না অনেক সময় ফটিকের মনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্লান্তি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। তবে ফটিক ছবির কাছে কী পায় নি ? একটা স্পন্দনহীন অভাব বোধ ক্রমশ ছবির কাছ থেকে ফটিককে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। এবং সেই কারণেই কি ছবির সঙ্গ, ছবির সান্নিধ্য ফটিকের একঘেয়ে লাগছে ? তাকে বিরক্ত বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত করে তুলছে ? ফটিকের মন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল হ্যাঁ। কী চায় ফটিক ছবির কাছ থেকে ?

তাও ভাল করে বুঝতে পারে না ফটিক। কিন্তু ফটিক বুঝতে পারে তার পোড়-খাওয়া পরিণত মন আরও একটা পরিণত মনের সঙ্গ চায়। কিন্তু তার এই দাবি কে পূরণ করতে পারে ? সইফুল ? ছবি যা দিতে পারছে না, তা দিতে পারবে সইফুল ? ফটিক চমকে উঠল। সইফুলের কথা উঠছে কেন ? তুমি তাকে ভালোবাসো তাই। আমি সইফুলকে ভালোবাসি ? মিথ্যে কথা। তাই যদি হবে তবে সইফুলের জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ কেন ? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি কি সাধে! ঐ রাসকেল দাউদটার জন্য। আমি জানি মৌলভী সাহেবের সরলতার সুযোগ নিয়ে দাউদ সইফুলের সর্বনাশ করার মতলব আঁটছে। তাই আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। দাউদ তো ওদের উপকারই করছে। কিন্তু কেন, তা জানো ? জানি। সইফুলকে পাবার জন্য। হ্যাঁ তাই। তাতে তোমার বিচলিত হবার কী আছে ? ওরা তো দাউদের ইতিহাস জানে না। তুমিই বা দাউদের কতটুকু জানো ? ফটিক নিরুত্তর। আর দাউদ যে সেই সাবেকী দাউদই আছে, তার যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, তা তুমি জানো ? জানি। সেদিনের সেই খামখেয়ালী লুজ ক্যারেকটারের বোকা অলস প্রকৃতির লোকটা আজ অনেক চটপটে, কর্মঠ এবং চতুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে এখনও লুজ ক্যারেকটার আছে সে বিষয়ে তুমি কি সিওর ? কয়লার কালো ধুলে কি যায় ? এটা কি উকিলের মত কথা হল ? ফটিক চুপ। দাউদের মতলব যে খারাপ এ সম্পর্কে কোনও এভিডেন্স পেয়েছ ? দাউদের টারগেট সইফুল, এর জন্য আবার এভিডেন্স দরকার কী ? কিছু না কিছু না। এভিডেন্স চাই দাউদের মতলব যে খারাপ সেইটা যাচাই করার জন্য। দাউদ সইফুলকে শাদী করতে চায় এটা নিশ্চয়ই বদ মতলব হতে পারে না ? ফটিক চুপ। তাহলে ? ফটিক চুপ। সইফুলকে টারগেট করা ছাড়া দাউদের বদ মতলবের আর কোনও উদাহরণ তোমার জানা আছে ? ফটিক চুপ। দাউদের প্রতি তোমার এই ঈর্ষার মূলে কি সইফুল নেই ? ফটিক চুপ। আসলে তুমিও সইফুলকে চাও।

না। ফটিক প্রতিবাদ করল। আরেকবার না বলতে গেল পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে মনে মনে কাতরাতে লাগল, ছবি, ছবি!

সেদিনের আততায়ী সন্ধ্যাটা মুহূর্তে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ফটিক অতিকষ্টে সেই বিকারের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল। জোয়ার কেটে যাওয়ার পর ক্লান্ত সফীকুল চোখের উপর থেকে হাত সরাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন কাঠ হয়ে গেল। সইফুল। স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, সত্যিই সইফুল। কিন্তু এ কী চেহারা সইফুলের! ওর এ অবস্থা করল কে ?

তীব্র অনুশোচনায় ফটিকের গলার স্বর বদলে গেল।

বলল, "আমাকে মাফ কর সইফুল। আমি সেদিন তোমার প্রতি খুবই অন্যায় করে ফেলেছি।"

সইফুলের চোখ টলটল করে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

বলল "কসুর আপনার না, আমার। আল্লাহ তার সাজা আমারে দেছেন। তাই ও কথা আর কওয়ার দরকার নেই।" একটু থামল সইফুল। "ঝিনেদার থে চিঠি আইছে, ছবিবুর সাধ দিয়া হবে। আমাগেরে আপনার সঙ্গে যাতি লিখিছে।"

ফটিকের মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেল।

বলল, "খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। নিয়ে যাব তোমাদের।"

"আম্মাজান যাতি পারবে না। আববুও না। শুধু" একটু থামল সইফুল, "শুধু জামিল যাবে। ওরে নিয়ে যাবেন।"

"আর তুমি যাবে না সইফুল ?" ফটিক আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল।

"জে না, আমি এখন শাদীর মেয়ে এখন আর—"

শাদীর মেয়ে। অসহিষ্ণু ফটিক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একলাফে এগিয়ে গিয়ে সইফুলের দুটো কাঁধ চেপে ধরল। "দাউদ!"

"জে। আমার মত আমি এই খবরডা আম্মাজানরে জানায়ে দিয়ে আসতিছি।"

ফটিকের দিকে চাইল সইফুল। তার দুই গাল জলের ধারায় তখন ভাসছে। (ক্রমশ)

অবিশ্বাস

সুব্রত সেনগুপ্ত

নবীন এখন যার কাছে যাচ্ছে সে মেয়েটির নাম নীলা। আসল নাম অবশ্য সতী। সতীর মতো এখানকার প্রায় সব মেয়েরই একটা করে নকল নাম আছে। নাম জিজ্ঞেস করলে তারা নকল নামটাই বলে। কেউ বলে, নামে কি দরকার? নবীন জিজ্ঞেস করাতে সতীও প্রথম দিন তার কাছে নীলা নামটা বলেছিল। তারপর সে এই মেয়েদের কাছে কতোবার এসেছে নবীনের এখন তা মনে নেই। কখনও রাতে, কখনও বিকেলের দিকে এসেছে। সিনেমা দেখতে, তাদের যাত্রা-দলের পালা দেখাতেও সতীকে নিয়ে এখানে ওখানে কয়েকবার গেছে। এই কয়েক মাস আগে রবীন্দ্রকাননে যাত্রা উৎসবেও সতী এসেছিল। তবে এরকম সকাল দশটা-এগারটার সময় আগে কখনও আসেনি। নবীনকে এই সময় দেখে সতী নিশ্চয় খুব অবাক হবে। হঠাৎ নবীনের মনে হলো, সতীর নাম সতী কে রেখেছিল আজ জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঘরের দরজা ভেজান দেখে নবীন একটু দাঁড়াল। সোজা পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবে, না বাইরে থেকেই সতীকে ডাকবে?—কে জানে এখনও ঘরে খদ্দের টদ্দের আছে কি না? নবীন ভাবল, আজ সতীর সামনে একটু অভিনয় করতে হবে। ও যদি জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার এত সকালে কি মনে করে? —নবীন বলবে যে, কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। শুধু সতীর কথা মনে হয়েছে। তাই এত সকালে সে এখানে ছুটে এসেছে। —সতী অবশ্য কথাটা বিশ্বাসই করবে না। আবার সতীও যখন মাঝে মাঝে ভালবাসা-টাসার কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে নবীনও সে সব চুপচাপ শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না। অদ্ভুত ব্যাপার। যাত্রার পালাতেও অভিনয়, এখানেও অভিনয়। নবযুগ যাত্রা পার্টির আগামী পালা "পতিহারা সতী"-তে অনেকগুলো প্রেমের দৃশ্য আছে, এখানে একটা মহড়া হয়ে গেলে মন্দ হয় না। একটু ইতস্তত করে নবীন দরজার কড়াটা নাড়ল। একটু পরে দরজার পাল্লা ফাঁক করে সতী এসে দাঁড়াল। একটা শাড়ি কোনরকমে গায়ে জড়ানো। কিছু বুকের ওপর কিছু পিঠের দিকে, এলোমেলো চুল, চোখ দুটো লাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সতী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার—মানে আবার কি? ঠিক কথা নবীন আগে কখনও এই সময় আসেনি কিন্তু এখানে যে আসে, যার কাছে আসে দুজনেই জানে এখানের আসার কি কারণ। সতী আবার বলল এ সময় তো তুমি আস না।

নবীন বললো, কখনও আসিনি, সে জন্যই তো এলাম। এখন ঘরে ঢুকতে দেবে, না এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে?

সতী হাসার চেষ্টা করে গলা তুলে বলল, অ্যাই তোমাকে আসুন আজ্ঞে বলে ঘরে আনতে হবে নাকি—ভেতরে আসতে পারছ না, বাইরে দাঁড়িয়ে ঢং করছো?

ঘরে ঢুকে নবীন দেখল, নিচে আধপোড়া সিগারেট, দেশলাই-এর খালি বাক্স পড়ে আছে। বিছানার চাদরটা কোচকানো, আবার একদিকে উঠে গিয়ে তোশক বেরিয়ে পড়েছে। দুটো বালিশ বিছানার দু দিকে। সতী পা তুলে সেই বিছানার ওপর বসল, নবীন একটা চেয়ারে।

নবীন বলল, একটু চা-ফা আনাও—আমিই না হয় টাকা দিচ্ছি?

সতী তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকা আঁচল টেনে টেনে পিঠের দিকে নামিয়ে দিল। ফলে নবীনের চোখের সামনে সতীর নাভিসুদ্ধ পেট বেরিয়ে পড়ল। সতী বলল, ঢং করে আবার ওখানে বসা হয়েছে কেন, এখানে এসে বসতে পারছ না?

নবীন বিছানায় উঠে সতীর কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলল, তুমি ভালবেসে কাছে না থাকলে কি করে কাছে আসি?

—ইস খুব হয়েছে।

—আমি কিন্তু বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে আসিনি। তোমার এখানেই খাব, কি, খাওয়াবে তো?

—খাবে, কি আছে?

—কি জানি, আজ আসার পর থেকেই যেরকম আদর আপ্যায়ন করছ—কে রান্না করবে? তুমি?

—না।

—তুমি একদিন রান্না করে খাওয়াবে বলেছিলে কিন্তু।

সতী কোন উত্তর দিল না। নবীন মাথাটা উঁচু করে সতীর মুখ দেখার চেষ্টা করল। সতী অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। নবীন বলল, তোমার বোধ হয় অনেক নতুন নতুন লাভার জুটেছে। আমাকে আর আগের মতো ভালবাস না।

সতী নবীনের মাথার চুল টানতে টানতে বলল, যাত্রার পালা লিখে লিখে তোমার কথাবার্তাও চিৎপুর-মার্কা হয়ে গেছে। —এই মরেছে নবীন এর কাছে ধরা পড়ে গেল নাকি? —এখানে আসার আগে নবীন যে ভেবে এসেছে সতীর সঙ্গে আজ খুব প্রেমের ভান করবে। তাতে তাঁর নতুন পালা "পতিহারা সতী" লিখতে কিছুটা সুবিধে হতে পারে। আর কিছু না হোক কোন কথার উত্তরে সতী কি বলে শুনে কিছু সংলাপ তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নবীনের উদ্দেশ্য সতী বুঝতে পারলে তো মুশকিল। আবার আগের কথায় ফেরার জন্য নবীন জিজ্ঞেস করল, আজ তোমার এখানে কি রান্না হবে? মাছ আছে তো? কি মাছ?

—শোল মাছ।

—শোল মাছ! কি করবে এত টাকা জমিয়ে?

—টাকা দিয়ে কি করবো বুড়ো হওয়ার আগে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে হবে না? এখানে আমার মেয়াদ আর ক' বছর—তখন আমায় কে দেখবে বল?

—কেন এত লোক আসে তোমার কাছে তাদের কাউকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পার না?

—পালিয়ে কোথায় যাব? কতো মেয়েকে তো দেখলাম, এখান থেকে যে যায় তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। শেষে পরের এঁটো বাসন মেজে দু মুঠো ভাত জোগাড় করতে হয়।

—এখন থেকেই বুড়ো বয়েসের কথা ভাবতে শুরু করেছ, কি এমন বয়েস হয়েছে তোমার?

—কচি খুকি!

—না গো, খুকি হতে যাবে কেন? পুরো যুবতী। একখানা ঝলমলে শাড়ি পরিয়ে তোমায় আসরে দাঁড় করিয়ে দিলে না পাবলিকের প্রেম একেবারে উথলে উঠবে।

—আবার ঢং আরম্ভ হলো!

—দূর শালা তখন থেকে ঢং ঢং করছো কেন? আচ্ছা তোমার চোখ দুটো এতো লাল দেখাচ্ছে কেন গো?

—কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। তোমার কথা ভেবে ভেবে।

জানা কথা সতী বানিয়ে বলছে। কিন্তু নবীন চমকে উঠল। কারণ সেও ভেবেছিল সতীকে এসে এই কথা বলবে। নবীন আপন মনে বলে উঠল, অ ভাল-বাসা তকে লিয়ে যাব চাইবাসা।

নবীন জানে, এ মাগীর পেশাই ভালবাসার কথা বলা। এর সঙ্গে তার পারা মুশকিল। উঠে বসে বলল, চা আনবে বললে কি হল?

সতী গলা তুলে বৃন্দাবন বৃন্দাবন বলে ডাকতে লাগল। একটু উঁচু পর্দায় তুলতেই সতীর গলার স্বর বেশ বিশ্রী লাগছে। এমনিতেও ওকে সত্যি খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নবীন ভাবল আজ এখানে আসা বিশেষ কাজের হলো না। সারা রাত কোন খদ্দেরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মেয়েটা শ্রান্ত, মেজাজটাও সে জন্য ভাল নেই। নিজে থেকে আগে কয়েকবার নবীনকে ভাত খাওয়াতে চেয়েছে। আজ নবীন খাবার কথা তুলতে দায়সারা ভাবে বলল, খাবে কি আছে? নবীনটবীন কেউ এখন না এলেই ও খুশী হতো। হয়তো আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে চায়। খিদে পেয়েছে কি ঘুম পেয়েছে এরকম মেয়ের সঙ্গে কি ভালবাসা জমে? নবীন বলতে চাইল আজ চলি। আর একদিন আসা যাবে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সতীর চাকর ঘরের মধ্যে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। ভাবখানা যেন, ওর মালকিন মার সঙ্গে প্রেমট্রেম কি করছে তা দেখা তার বারণ। সতীরও যেন চাকরকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনার কোন দরকার নেই সে জন্য বুকের ওপর অগোছালো আঁচল গোছানোর কোন চেষ্টাই করল না। বৃন্দাবন চায়ের পয়সা নিয়ে মাথা নীচু করেই চলে গেল। নবীন জিজ্ঞেস করল, ওর সামনে তোমাদের একটুও লজ্জা-টজ্জা করে না?

সতী বলল চাকরকে কিসের লজ্জা!

—তা বটে কিসের লজ্জা। শালার কপাল ভাল, বিনে পয়সায় সুন্দর সুন্দর মেয়েদের ইয়েটিয়ে দেখতে পায়।

—দ্যাখ এবার কিন্তু আমি মুখ খারাপ করবো।

—অমন সুন্দর মুখখানা খারাপ করতে যাবে কেন? আমি কি খারাপ কিছু বলেছি? আমি একজন নাট্যকার মানে পালা লেখক—খবরের কাগজে আমার পালার বিজ্ঞাপনে এবার কি লিখেছে জান, অশ্রুসজল যুগ-যন্ত্রণার সামাজিক সমস্যার পালা, তা এ বড় বড় কথা বলা হলো, তুমি একটা কথারও মানে বোঝনি তা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমিও অবশ্য ঠিক বুঝিনি, তবে সমাজের এই সব অবহেলিত লোকদের কথা লেখক হিসেবে আমার তো ভাবা উচিত? কেউ ভাবেনি এমন কি শরৎ চাটুজ্জেও না। এই বৃন্দাবন দের বুকে কি কখনও একটু ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছে হয় না।

—কি যা তা বকছ? যাই হোক না কেন চাকরের কাছে আমাদের একটা মান সম্মান আছে না?

সে দেখতে সিনেমার হিরোর মতো হলেই বা তাকে নিয়ে বিছানায় শুতে হবে!

—যাট যাট আমরা তবে কোথায় যাবো? যাক গে ওদের ভাল করে কাজ নেই। বল দেখি তুমি এখন কি করবে?

—বৃন্দাবন এলে ঘরদোর পরিষ্কার করে জল টল তুলে আনবে।

—আরে আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি করবে?

—আমি স্নানটান করবো তারপর পুজো করবো?

—স্নান এখানে এই ঘরে করবে?

—হুঁ।

—বাহ বেশ। তারপর কার পুজো করবে?

—কার আবার? ঠাকুরের।

—ঠাকুর ফাকুর কি দরকার? তুমি তো আমার পুজো করলেই পার?

—এবার আমি সত্যি খিস্তি করবো। ঠাকুর দেবতা নিয়ে বেশী ঢ্যামনামি করো না।

—মুখ খিস্তি তো আমি আসার পর থেকেই করছো। ইস মেয়েছেলের হাতে অপমান আর সহ্য হয় না। তোমার স্নানটান হোক তারপর আমি কেটে পড়বো।

—তোমার সামনে স্নান করবো নাকি?

—কেন, করলে কি হয়?

—আহা—

এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। কে এল আবার? সতী গলা বাড়িয়ে বলল, কে ভেতরে এস।

নবীন বলল, হয়ে গেল, তোমার অন্য কোন লাভার এল দেখ।

সতীর কোন লাভার নয়, ঘরে ঢুকল মাথার চুল সাদা কিন্তু কাল গোফ গামছা কাঁধে মালী। হাতে শালপাতার ঠোঙায় ফুল। ঘরের এক কোণে ফুল রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতেই শুধু একটা হাত দেখা গেল। হাতখানা ভাজকরা একটা বাংলা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিল। তার পরই গুটি-গুটি ঘরের মধ্যে ঢুকল একটা বিড়াল। খবরের কাগজটা তুলতে গিয়ে নবীন খাটের নীচে দেখতে পেল একটা থালার ওপর ধনে পাতা, দুটো ডিম, লাল টমেটো আর আলু। কাগজটা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নবীন অনেকটা উঁকি মারার মতো লম্বা আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল। দেয়ালের আলমারিতে কয়েকটা কাপ ডিস আর ভেট সিক্সটি নাইনের একটা খালি বোতল। নবীন এখানে যতদিন আসছে ঐ জায়গায় এই খালি বোতলটা দেখছে। কোনদিন জিজ্ঞেস করে নি, আজও করল না, ওটা কোত্থেকে এল ওখানে রাখারই বা কি দরকার? দেয়ালের আর একদিকে জিভ বের করা মা-কালীর বিরাট ছবি। নবীন বলল, চায়ের বদলে বিয়ার টিয়ার বললেই হতো।

চা খাওয়া হয়ে গেলে সতী বলল, চল।

—কোথায়?

—খবরের কাগজটা নাও। চল আমরা একটু ছাদে যাই। বৃন্দাবন ঘরটা পরিষ্কার করুক।

ছাদে কাদের শাড়িটাড়ি শুকোচ্ছে। কার্নিশের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে এরকম আরও সব বাড়ি দেখা গেল। একেবারে সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একজন মোটা সোটা বয়স্কা স্ত্রীলোক আর তাকে ঘিরে কয়েকটি অল্পবয়েসী মেয়ে গল্পগুজব করছে। মাঝে মাঝে তাদের হাসির শব্দ, গানের দু এক কলি শোনা যাচ্ছে। সতী নবীনের হাত ধরে টেনে বলল, এদিকে সরে এস খানকির ইয়েগুলো আমাদের নিয়ে কি বলাবলি করছে। পরনে একটা ভেজা গামছা, বুকের ওপর আর একটা ঐ রকম গামছা দিয়ে ভিজে শাড়ি হাতে স্বাস্থ্যবতী ফরসা একটি মেয়ে ছাদে উঠে এল। যদিও নবীনের চোখ মেয়েটির শরীরের ওপর, সে কোনরকম অস্বস্তি বোধ করছে মন হল না। নবীন ভাবল, পালায় কোন স্ত্রী চরিত্র এরকম পোশাকে নামালে সবাই অশ্লীল অশ্লীল বলবে।—সতী বলল, একটু বসো। আমি দেখে আসি বৃন্দাবনের কদ্দুর হলো।

কিন্তু সেই যে গেল আর আসার নাম নেই। একা একা বসে নবীন একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ দেখতে আর কতক্ষণ ভাল লাগে। আজ তাদের কোম্পানীর চলতি পালার বিরাট বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সমগ্র যাত্রা জগতের কর্ণধারদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। ডাতার, দেউলটি, ইটাগাড়িয়া, ভাঙালপুর, পাতিহাল সর্বত্র পূর্ণ প্যান্ডেলে সুপার হিট পালা। আমাদের উত্তর ভারত এবং উড়িষ্যা সফর শুরু হচ্ছে। ইচ্ছুক নায়েকরা যোগাযোগ করুন। আমাদের আগামী আকর্ষণ নবীন মঠের, পতিহারা সতী।—নবীন হঠাৎ চমকে উঠল, পালার নামের মধ্যে সতী মেয়েটার নাম ঢুকে গেছে, সে তো আগে খেয়াল করেনি। কিন্তু সত্যিই ও ওর কথা ভেবে পালার নাম দেয়নি। এত নাম থাকতে এই মেয়েটার নামই বা সতী হতে গেল কেন?

সতী এসে সামনে দাঁড়াতে নবীন কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হলো। ভেজা কপাল, কানের কাছে ভেজা চুল। স্নানের পর সতীকে শুধু সুন্দর না, কি রকম স্নিগ্ধ আর শান্ত দেখাচ্ছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপও ধুয়ে মুছে গেছে। সতী বলল, আমার পুজোটুজো সব হয়ে গেছে।

নবীন তার হাত দুটো সতীর কাঁধের ওপর রেখে তাকে নিজের দিকে একটু টেনে নিয়ে বলল, তাহলে এস এখন একটু প্রেম করি?

সতী বলল, নীচে আমার ঘরে চল।

সিঁড়ি দিয়ে সতীর পেছনে পেছনে নামতে নামতে নবীনের কেন যেন মনে হলো, প্রেমের উঞ্ছবৃত্তি আর ভাল লাগে না। সতীর মতো তার যদি সত্যি-কারের কোন প্রেমিকা থাকতো। সতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি সত্যি খাবে তো? বৃন্দাবনকে তাহলে বলি?

—সত্যি খাব মানে। ভালবাসায় এক নম্বর, দু নম্বর হয়, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাপারে সবই আসল, নকল ব্যাপার চলে না পেয়ারী।

এরকম একটা ডায়লগ দিতে পেরে নবীনের এক-বার যাত্রার কায়দায় হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কি মনে হতে গলা নামিয়ে সতীকে বলল, চল না, বাইরে কোথাও খেয়ে নেব?

সতী যে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাবে তা নবীন ভাবতে পারে নি। সতী বলল খেয়েটেয়ে কি করবে,

সিনেমায় নিয়ে যাবে? একটা পুরনো ভাল ছবি এসেছে মহালক্ষ্মী বেহুলা।

নবীন মোড়ের পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সতী তাকে এখানেই দাঁড়াতে বলেছে। কিন্তু ও আসতে এত দেরী করছে কেন? এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই অস্বস্তিকর। নবীনের একটা পান খাওয়া হয়ে গেছে, দোকানীকে আরও একটা জর্দা পান বানাতে বলেছে। এখানকার রকগুলোতে সব সময়ই কিছু উগ্র চেহারার ছোকরাদের বসে থাকতে দেখা যায়। এদের মা বা বোন হয়তো এ পাড়ার কোন ঘর ভাড়া করে ব্যবসা চালায়। আর কয়েকজন দালাল দাঁড়িয়ে বা হাঁটু মুড়ে বসে এদিকে ওদিকে নজর রাখছে। একজনের নাম বাচ্চু আর একজনকে নবীন চিনতো কিন্তু তাকে আজকাল আর দেখতে পায় না, তার নাম পাগলা হামিদ। এ পাড়ারই দু তিনটে মেয়ে পানের দোকানে পান কিনতে এসেছে। নবীনের দিকে তাকিয়ে একজন শিস দিয়ে উঠল।

সতী এসেই বলল, রিকশা ডাক। আমি হাঁটতে পারবো না।

রিকশা উঠে নবীন জিজ্ঞেস করল, হাতিবাগানের দিকে যাব?

যেন হঠাৎ মনে পড়তে সতী বলল, এক জায়গায় যাবে?

—কোথায়?

—একটা গৃহস্থ বাড়িতে?

সিনেমা যাবে বললে, খাওয়া দাওয়া করতেও হবে তো?

—চল না, বেশীক্ষণ না। এই রিকশ এদিকে, হরিসার বাজারের দিকে চল।

রিকশা চলতে লাগল। সতী হাসি মুখে বলল, যার বাড়ি যাচ্ছি না এ আমার এক বন্ধু। ও জানে না, আমি লাইনের, তুমি গিয়ে উলটোপালটা কিছু বলবে না কিন্তু—আমরা এক গাঁয়ের মেয়ে।

—ওরা যদি বলে, তোমার সঙ্গে এই সুন্দর লোকটা কে, কি বলবে?

—আমি ওদের বলেছি, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। —লাভ করে—ওরা অনেক দিন দেখতে চেয়েছে, আমি বলবো তুমি সেই লোক—কি ঠিক তো? তোমার নাম কি বলবে?

—কেন নবীন মঠ?

—নবীন—না, আমি যে বলেছি নাম বরুণ?

—ঠিক আছে ডাকনাম বরুণ আর ভাল নাম নবীন।

—যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় থাক বলবে নিউ আলিপুর।

—দূর—ওসব জায়গা আমি একদম চিনি না। কিছু জিজ্ঞেস করলে ধরা পড়ে যাব। তার চেয়ে বলব হাওড়া।

—কিন্তু আমি যে বলেছি—

—আচ্ছা বলব নিউ আলিপুর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাই নি।

সতী কি ভেবে চুপ করে গেল। নবীন ভাবল, তার 'পতিহারা সতীর ব্যাণ্ড' বেজে গেল। এ এসেছিল সতীর সঙ্গে প্রেমিকের অভিনয় করতে, উলটে এই মেয়েটিই এমন ভাবভঙ্গি করছে যে নবীন বুঝতে পারে না, কে কার সঙ্গে অভিনয় করছে। এখন আবার শুরু হল অভিনয়ের মধ্যে অভিনয়।

একটা মিষ্টির দোকানের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে সতী রিকশাওয়ালার হাতে মিষ্টি কেনার টাকা দিল। কেনা হয়ে গেলে মিষ্টির বাক্সটা সতী নবীনের হাতে দিল।—বাঃ অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই।

একটা বস্তিবাড়ির বারান্দায় উঠে গিয়ে সতী মাঝ বয়সী এক ভদ্রমহিলার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নবীন ভাবল, তারও ঐ রকম করা উচিত। সে মাথা নীচু করে মহিলার পা ছুঁল। তরকারি কোটা বন্ধ করে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এস এস বাবা। ঘরে গিয়ে বসো।

সতী জিজ্ঞেস করল, কুমু কোথায়?

—এই তো এখানেই গেছে। এখনই আসবে। ওকে নিয়ে তক্তপোশে গিয়ে বস।

ভেতরে একটাই হাতল ভাঙ্গা কাঠের চেয়ার। নবীন সেই চেয়ারে আর সতী তক্তপোশের ওপর পা তুলে বসল। ঘরে একটা মাত্র ছোট জানলা। বারান্দার রান্নাঘরের মাঝবয়সী মহিলার আধখানা দেখা যাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বললেন, যা দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়।

উনি তো একবারও নবীনের পরিচয় জানতে চাইলেন না। হয়তো দেখেই উনি যা ভাবার ভেবে নিয়েছেন। নবীনের মজাই লাগছিল। এভাবে না এলে এখানে তার কোনদিনই হয়তো আসা হতো না। এদের সঙ্গে পরিচয়ও হতো না। কিন্তু সতী মেয়েটা আহ্লাদে কি রকম করছে দেখ! একবার কোমর দোলাচ্ছে, একবার কাঁধ থেকে আঁচল সরিয়ে আবার আঁচলে কাঁধ ঢেকে দিচ্ছে।

নবীন বলল, এমন করছ যেন তোমার নিজের ঘর বাড়ি।

সতী বলল, নিজেরই তো। আমার মা-র বাড়ি—তারপর গলা বাড়িয়ে বারান্দার মহিলার উদ্দেশ্যে বলল, তাই না মা? তিনি বললেন, নিশ্চয় মা।

কে এসেছে মা?—বলতে বলতে একটি মেয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে একবার সতী একবার নবীনের মুখ দেখে নিল। সতী গলা বাড়িয়ে বলল, কি হল? এদিকে আয়।

মেয়েটি মুখে হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখখানা ভারি মিষ্টি। তবে পায়ের কাছে শাড়ির পাড় ছেঁড়া আর ব্লাউজের কাঁধে সাদা সুতোর সেলাই দেখা যাচ্ছে। সতী বলল, কুমু দেখ তোদের বাড়িতে নিয়ে আসব বলেছিলাম। আজ ধরে এনেছি।

একটু চুপ করে থেকে কুমু বলল, কতদিন শুনছি আসবেন আসবেন, এতদিন আসেন নি কেন?

সতী কিছু বলার আগেই নবীন উত্তর দিল আমি তো আসতেই চাই ও না নিয়ে এলে কি করে আসব?

সতী চোখ বড় বড় করল, ওমা দেখেছ।

বারান্দা থেকে কুমুর মা ডাকলেন, কুমু, এদিকে আয় একবার?

সতী সেদিকে মুখ বাড়াল, কেন, কুমুকে ডাকছ কেন, আমি কিন্তু কিছু খাব না।

নবীন তাড়াতাড়ি বলল, আমি কিন্তু যা খাওয়াবেন তাই খাব।

সতী নবীনের কাঁধে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বলল, কী অসভ্য, তুমি কি এখানে খেতে এসেছ না কি?

নবীনের হঠাৎ খেয়াল হল মিষ্টির বাক্সটা এখনও তার হাতেই আছে। তাড়াতাড়ি সেটা কুমুর হাতে তুলে দিল। সতী বলতে লাগল, দেখ না আমি কিন্তু একবারও বলিনি তবু নিজে থেকে মিষ্টিগুলো কিনল। কেন আনলে—মা এসব একদম পছন্দ করে না।—নবীন মনে মনে বলল, থাম্ মাগী বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাক্সটা মা-র কাছে রেখে এসে কুমু বলল, আমরা গরীব। কি আর খাওয়াতে পারবো, আজ কিন্তু এখানেই ভাত খেয়ে যেতে হবে।

নবীন হিসেব করে নিল, খেয়ে যেতে হলে এখানে আরও অনেকক্ষণ থাকতে হবে। ততক্ষণ এরকম চালিয়ে যেতে হবে। সে তার পোষাবে না। সতীকে বলল, কি সিনেমার কথা বলছিলে?

সতী বলল, ও হ্যাঁ, কুমু তুইও চল না আমাদের সঙ্গে?

—আমি তোমাদের সঙ্গে কি যাব?

—কেন গেলে কি হয়, চল না?

নবীন বলল, সিনেমায় গেলে আমার কিন্তু খুব প্রেম পায়।

কুমু হাসি চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করল কি—কি পায়?

—প্রেম পায়।

—প্রেম পায়!

কেন, লোকের ঘুম পায়, কান্না পায়, খিদে পায় —তার আর প্রেম পেতে পারে না?

কুমু হাসতে হাসতে মুখে আঁচল চাপা দিল। সতী গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে শাসন করার ভঙ্গিতে নবীনকে বলল, তোমাকে না বলেছি সব সময় বাজে বাজে কথা বলবে না?

নবীন বলল, ওরকম ধমক লাগিও না বাবা। আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যাব।

যাক ব্যাপারটা ভালই চলছে। পালাকার নবীন মঠের এরকম অভিনয়ের প্রতিভা দেখলে তার দলের লোকরা অবাক হয়ে যাবে। কুমু ঘর থেকে চলে যেতে নবীনের হঠাৎ মনে হল, তার পালায় আদর্শ নায়িকা হিসেবে সতী নয়, কুমুর মতো একটা মেয়েরই দরকার ছিল। এর আদলেই দাঁড় করানো দরকার 'পতিহারা সতীর' সতীকে। কিন্তু এই সতীর সামনে কুমুর সঙ্গে খুব বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ সে পাবে না। কুমুর সঙ্গে আলাদা দেখা করার উপায়ও নেই। বিশেষ করে সতীর সঙ্গে তার যে সম্পর্কের কথা তাকে জানানো হয়েছে তারপর। নবীন যদি আড়ালে ডেকে কুমুকে বলে, এসব মিথ্যে—সতী সম্বন্ধে তুমি যা জান তা সত্যি নয়, ও আসলে একটা, আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, কোন মেয়ের সঙ্গেই নেই আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, যদি দাও ভালবাসাও নিতে পারি?

কলাই করা ছোট ছোট দুটো থালে মিষ্টি হাতে কুমু আর তার পেছনে জলের গ্লাস হাতে কুমুর মা ঘরে ঢুকলেন। তক্তপোশের এক কোণে বিছানা একটু সরিয়ে জিনিসগুলো রাখা হলো।

কুমু আর তার মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে নবীনের হঠাৎ কষ্ট হতে লাগল। এরা কতো সহজে সতী আর তার সম্পর্কের ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছে মার আর মেয়ে সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করার চেষ্টা করছে। তার বদলে নবীনরা তাদের সঙ্গে ছলনা করছে। কিন্তু এদের তো কোন দোষ নেই। নবীনই বা নিজেকে এসবের সঙ্গে জড়াতে গেল কেন? কোনভাবে এরা সব কিছু জেনে ফেললে তার সম্বন্ধে এদের কি ধারণা হবে? নবীনের সঙ্গে কুমুদের আর কোনদিন দেখা না হলেও হয় ওর সম্পর্কে ওরা একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবে, নয়তো জানবে নবীন একটা ঠক সে যে কোন পরিকল্পনা না করে, প্রায় না জেনে পুরো না বুঝে এখানে এসে পড়েছে, কেউ তা বিশ্বাস করবে না।

কুমুর মা সতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ প্রথম দিন ওকে নিয়ে এলি, ডাল ভাত ঘরে যা হয়েছে খেয়ে যাবি।

নবীন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। যাঃ বড্ড অন্যায় হচ্ছে এ সব। এদের ঘরের ডাল-ভাত শুধু বিনয় করে বলা বানানো কথা নয়। ঘরদোর, ঘরের লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদের যা অবস্থা তাতে মনে হয় ঘরে ডাল-ভাতই শুধু আছে। কিন্তু খেতে বলতে হয়, খেতে বললে। না না আজ বড্ড পেট ভরে আছে। বলে যাকে খেতে বলা হল সে কিছুতেই খেতে রাজী হবে না; কুমুর মা-র কথাগুলো মোটেই সে ধরনের নয়। খেতে বললে এরা খেতে রাজী হবে ভদ্রমহিলা এ বিশ্বাস থেকেই কথাগুলো বলছেন। কিন্তু নবীন চুপ করে থাকতেও পারল না। সতীর তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। ও রাজী হয়ে যেতেও পারে। নবীন বলল, দেখুন আপনারা এভাবে বার বার বললে, না বলতে আমাদের খারাপ লাগবে। আর একদিন আসব সেদিন এখানে ঠিক খাব।

নবীন আর একটা বানানো কথা বলল। সে কি সত্যি আর একদিন এখানে আসবে? কিন্তু না বললে যে খারাপ লাগবে এ কথাটা তো বানানো নয়। নবীনের হঠাৎই মনে হল সে এখানে যা যা করছে, যা যা বলছে তার সবই বানানো তা নয়। যেমন কুমু মেয়েটিকে তার ভাল লাগছে তা সত্যি, সতীর সঙ্গে তার বানানো ব্যাপারটা বাদ দিলে এই বাড়িতে এসে তার এক রকম ভালই লাগছে তা মিথ্যে নয়। সে যদি বলে, এখানে এসে খুব ভাল লাগছে—তা কি ভুল হবে? নবীন বলল, সত্যি আপনাদের এখানে এসে খুব ভাল কাটল আজ।

কুমুর মা হেসে ঘর থেকে চলে গেলেন। কুমু বলল নিন খান।

সতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কুমুকে তোমার কেমন লাগছে?

—খুব ভাল।

—আমার চেয়েও?

—অনেক বেশী।

সতী চোখ বড় বড় করে বলল, দেখলি, দেখলি কুমু কি বলল। দাঁড়াও ভাল লাগাচ্ছি তোমার—বলতে বলতে কুমু বিছানা থেকে একটা বালিশ তুলে নিল। রাগের ভাণ করে যেন এখনই নবীনকে মারবে এ ভাবে দু হাতে বালিশটা তুলল। —না পুরোটা ভাণ নয়। বালিশটা সত্যি নবীনের পিঠের ওপর এসে পড়ল। বালিশটা তুলতে তুলতে সত্যিকারের বিরক্তি নিয়ে নবীন বলল, কি হচ্ছে এ সব?—কিন্তু মুখ তুলে সতীর দিকে তাকাতে সে একটু অবাক হয়ে গেল। চোখের ঐ দৃষ্টি, মুখের ঐ ভাব সব বানানো? সতী যখন নবীনকে বানিয়ে ভালবাসার কথা বলে, নবীন তা বুঝতে পারে। ওরকম নকল প্রেমের কথা নবীনও সতীকে বলে। কিন্তু নবীন একজন বাঁধা খদ্দের, আর হয়তো পছন্দসই খদ্দের, কারণ নবীনকে নিয়ে বিশেষ ঝামেলা উৎপাত নেই; সেজন্য একটু বেশী সময় কখনও একটু বাড়তি সোহাগ সে পায় কিন্তু নবীন জানে আসলে সতীর সঙ্গে তার কতটুকু সম্বন্ধ, সতীও বোধ হয় জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নবীনের ভয় হল, অভিনয় করতে করতে সতীর হয়তো নেশা ধরে গেছে—নইলে এত স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি কি করে হয়?

না এরকম মেয়েকে চরিত্র করে পালা লেখা নবীনের কম্মো নয়। নাটক-নভেলে সুবিধে করতে না পেরে সে দু একটা পালাফালা লেখে। যাত্রা ব্যাপারটাও তার ধাতে খুব একটা সয় তা নয়। এমনিতেও প্রেমট্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি, মানুষের হৃদয়ের রহস্যটহস্য নিয়ে গোলক ধাঁধা এ সব তার আসে না। যাকে বলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবনে সে একটা প্রেম পর্যন্ত করতে পারল না। তবে নবীনের বদলে কোন দরদী কথাসাহিত্যিকের হাতে পড়লে সতী নির্ঘাৎ একটা হিট নারী চরিত্র হতে পারতো। আপাতত সতীর ঘোরটা একটু কাটানো দরকার। নবীন কুমুকে বলল, তখন যে সিনেমার কথা বলছিলাম, তুমি কিছু বললে না তো?

কুমু হেসে বলল, কি বলবো?

—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো?

কুমু গলা নামিয়ে বলল, বাবা এখুনিই খেতে আসবেন তো আমাকে না দেখলে রাগ করতে পারেন।

সতীর দিকে তাকিয়ে নবীন বলল, দেখেছ কি ভাল মেয়ে!

সতী রাগ দেখিয়ে বলল ঠিক আছে। আমার তো ...বেই খারাপ।

কুমু এগিয়ে এসে বলল, আরে আপনারা তো কিছুই খাচ্ছেন না। মিষ্টিগুলো তখন থেকে পড়ে আছে—

নবীন বলল, এত আমি খেতে পারবো না। তুমি ...টো তুলে নাও।

—না না সে কী! ও কটা আপনি খেতে পারবেন।

নবীন খপ করে কুমুর একটা হাত ধরে বলল, কটা তোমাকে তুলতেই হবে।

লজ্জা পেয়ে কুমু যেন একটু কুঁকড়ে গেল। ওর ...কে তাকিয়েই নবীনের মনে হল, পুরুষের স্পর্শ ...তে অভ্যস্ত নয় এই শরীর। কৌতূহল আছে, ...জাও আছে। নবীন ওর কোমরের নরম খাঁজে ...লতোভাবে একটু আঙুল রাখলে ও বাধা দিতে ...রবে না। কিন্তু নবীন ও সব কিছুই করল না। ...টা মিষ্টি তুলে ওর ভেজা হাতে তুলে দিল। সতী ...লক্ষ করল তারপর তক্তপোশ থেকে নেমে কোন ...া না বলে বারান্দায় কুমুর মা-র কাছে চলে গেল। ...ু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, একটা কথা বলব?

নবীন কুমুর মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল। ...ু আবার বলল, অবশ্য আমার এ সব বলা ঠিক হবে ...া বুঝতে পারছি না।

—কি বল না?

—আপনি সত্যি সতীকে বিয়ে করবেন?

—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

একটু চুপ করে থেকে কুমু আবার বলল, আমার কি রকম মনে হচ্ছে তাই বলছি, আপনি সতীর সঙ্গে কতোদিন মেলামেশা করছেন জানি না, আপনি ওর সম্বন্ধে সব জানেন?

কুমুর চোখ থেকে নবীন চোখ সরাতে পারছে না। হঠাৎ কি বলবে, কি উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারছে না। এই মেয়েটা এই কুমু যেন মুহূর্তে অনেক অভিজ্ঞ, বয়স্ক হয়ে উঠেছে। ও সব জানে, ওর কাছে সব ধরা পড়ে গেছে। নবীন আর সতীর সব ছেলেমানুষী বোকামির ও নীরব সাক্ষী।

কুমুই আবার কথা বলল, আমি ভাবলাম, আপনাকে সব জানানো দরকার। এখানে সতীর সম্বন্ধে সব কিছু শুধু আমিই জানি। কিন্তু আমি যে জানি সতী তা জানে না। আমার মা-বাবা সতীকে খুব ভালবাসে, সতীও এখানে এসে খুশি হয়। কিছু বললে ওর খুব কষ্ট হবে সেজন্য আমি কিছু বলতেও পারি না। কিন্তু একদিন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে, শুধু আমার বাড়ির লোকজন নয় চার পাশে অন্য ভাড়াটেরা আছে, সবাই জানতে পারলে, জানলে যে সতী শরীর ভাঙিয়ে টাকা রোজগার করে, খারাপ পাড়ায় ঘর ভাড়া করে থাকে তখন কি অবস্থা হবে ভাবলে ভয়ে আমার বুক কাঁপে। আমি কি করবো বলুন তো?

নবীন নিজেকে ডেকে বলতে লাগল, ওহে নবীন, নবীন চন্দ্র মঠ শান্ত হও শান্ত হও। সাবধানে কথা বল। এ মেয়েটি সতীর কথা জানে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এখনও কিছু জানে না। সতী কি, কি রকম তুমি যে এর চাইতে বেশী জান তা এ জানে না। একে জানানোর দরকার নেই। যে যার যতটুকু জানা নিয়েই থাকুক। সব সত্য প্রকাশ করে দেওয়ার বীরত্ব তোমাকে দেখাতে হবে না। তাতে কারও কোন লাভ নেই।

কুমু জিজ্ঞেস করল, এখন আপনি কি করবেন? কুমুর গলা যেন বসে গেছে। কুমু আবার কুমুতে ফিরে এসেছে। আবার সেই লাজুক নিরীহ মেয়েটি।—এখন কি করবে, কি করা উচিত নবীন জানে না। সতীকে ডাকবে, ডেকে বলবে এখনই চল এখান থেকে? পরে এক সময় সতীকে বুঝিয়ে বলবে, এখানে সে যাতে আর না আসে? নবীন কুমুকে বলল, সতীকে ডাক।

কুমু বলল, ওকে কি বলবেন আপনি?— এখন কিছু বলবেন না।

নবীন বলল, এখানে ওসব কিছু বলব না। তবে এখন আমাদের উঠতে হবে—ওকে যাবার কথা বলব। তোমার বাবার তো আসার সময় হল?

কুমুর মা বারান্দা থেকে বলে উঠলেন, এ পাগলী মেয়ে কি আরম্ভ করেছে দেখ?

বারান্দার ওদের কথা নবীনরা এতক্ষণ ভুলেই ছিল। ওদের কথাবার্তাও কানে আসে নি। কুমুর মা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন আর তার কাঁধে গাল চেপে আহ্লাদী সতী। নবীন কি উঠে যাবে, সতীকে সরিয়ে আনবে?

—এই পাগলী বলছে তরকারি কুটবে, চা তৈরী করবে। আমি বললাম, আরে সবুর কর বিয়ে থা হোক দিন তো পড়েই আছে। তখন মনের সুখে এ সব করিস।

সতী আড় চোখে নবীনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তখনও আমাকে এসব করতে দেবে না বলেছে। বাড়িতে চাকর রান্নার লোক সব আছে।

—তা তো দেবেই না। ভাল কপাল করে এসেছিস। তোর আর আমাদের দশা হবে কেন?

কুমুর মা আর সতীই কথা বলছে। কুমু স্তব্ধ হয়ে আছে। নবীনের মুখেও কথা নেই। সতীর এখন নবীনকেও খুব দরকার নেই। কুমুর মা-র কথাবার্তা ওদের ঘরের পরিবেশে ও যেন বন্দ হয়ে আছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তার একটা শব্দও বানানো নয়—সবই ও ভেতর থেকে বলছে।

কিছুক্ষণ পরে সতী সত্যিই চা তৈরী করে নিয়ে এল। নবীনের সামনে কাপ রাখতে রাখতে বলল, মা বলেছে এখন যেতে দেবে না। খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রামটিশ্রাম করে একেবারে বিকেলে—

নিজের চায়ের কাপ নিয়ে সতী আবার তক্তপোশের ওপর উঠে বসল। নবীনের যা বলার এখনই বলা উচিত। দরকার হলে সতীকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে। নবীন চায়ের কাপ হাতেই উঠে দাঁড়াল। কুমুর মা তখনই দরজায় এসে দাঁড়ালেন। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, হ্যাঁ বাবা, মুরগির ডিম খাও তো, পাশের বাড়ির ছেলেটাকে আনতে দিয়েছি কিন্তু।

নবীন মুখ তুলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা কুমুর দিকে তাকাল। সে তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নবীন কুমুর মা-র দিকে তাকাল। তিনিও তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তবে দুজনের চোখে দু রকম ভাষা। সতী হঠাৎ কথা বলল, হ্যাঁ মা, ও সব খায়। বলতে লজ্জা পাচ্ছে। কি গো মা জিজ্ঞেস করছেন, কিছু বলছ না? নবীনের চোখ এবার সতীর চোখ দেখল। দেখতে লাগল।

নবীন আবার বসে পড়ল সেই হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ারে। এখন সতীর ওপর জোর খাটানো তার সাধ্যের বাইরে। সতীকে কুমুর কথা, কুমুর কাছে যা তার মা-র কাছে সতী আর নবীনের সব কথা বললে এ ঘরের বাতাস শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠবে। নবীন বুঝতে পারল, এই পরিবেশ থেকে সতীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন ক্ষমতা তার নেই। ঠিক কথা সতী আজ রাতেই আবার তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাবে। কোথায় থাকবে কুমু তার মা, এই ঘর-দোর, কোথায় থাকবে নবীন। তবু সতী অভিনয়ে কি রকম মেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে যেন মিথ্যাটাকেই সত্যি বলে ভেবে নিচ্ছে। সতীর এখন আর নবীনকেও দরকার নেই। সতী অবশ্য জানে না নবীন ছাড়া আর একজন এখানে আছে যার চোখে এ সবই বানানো, হাস্যকর। নবীন কি সতীকে এখন এখানেই বলবে, বলবে যে কুমু সব জানে, খেলা টেলা বন্ধ কর?—শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় সতীর মুখের চামড়ার তলা থেকে রক্ত সরে যাবে। নবীন একবার সতী একবার কুমুর দিকে তাকাল। কুমু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, তার মা দরজার কাছ থেকে সরে গেছেন। তিনজনে এবার বোঝাপড়া হোক। কুমু হঠাৎ বলে উঠল, বাবা আসতে কেন দেরী করছেন দেখি।

বলেই সে ঘর থেকে চলে গেল। যে কোন সময় কুমুর বাবা এসে পড়বেন। তার মানে আর একটি চরিত্র আরও অভিনয়। এখনও সময় আছে, এখনও সব নাটক ভেঙে দেওয়া যায়। অন্তত এই অবস্থায় যে যতটুকু জানে সেভাবেই তাকে ছেড়ে দিয়ে সতীকে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। কুমু জানে না, সতীর সব কথা নবীন জানে। সতী জানে না কুমু তার আসল পরিচয় জানে। কুমুর মা কোন কিছুই জানেন না। বিচিত্র পরিস্থিতি—কিন্তু যে যা জানে না তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি নেই—আছে?

তক্তপোশের ওপর বসে আছে সতী, শান্ত, নির্লিপ্ত। নবীন ভাবল সতীকে ডাকবে। হঠাৎই তার মনে হল, এখানে যা কিছু হচ্ছে, তা তো সত্যি হতেও পারতো। সত্যি হওয়া এমন কি অসম্ভব। এখনও কি হতে পারে না—নবীন এত দূর ভাবতে পারে না। কিন্তু না হোক সত্যি না হোক চিরকালের জন্য, সে কেন সতীর মতো যা কিছু মেনে নিতে পারছে না? ভুল করেও সে কিছুক্ষণের জন্য সব বিশ্বাস করে বসলে কার কি এসে যায়?

ঘরের মধ্যে এখন সতী আর নবীন। দুজনেই নিঃশব্দে বসে আছে। এখন যা হবার তা হোক, নবীন বাধা দেবে না। হঠাৎ সে ডাকল, সতী?

উ?

কিন্তু নবীন উত্তর দেওয়ার আগেই অবাক হয়ে দেখল সতীর চোখের কোণে জল চিক চিক করছে। দুজনের চোখ দুজনের চোখ দেখছে। হঠাৎ সতীর গলার শব্দ নবীনের কানে এল, কতো ঢং জানো মাইরী, তোমার চোখে জল কেন গো?

ছবি •• সমীর সরকার

শংকর

॥ ১৪ ॥

চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বেশ, কয়েকবার চেষ্টা করেছি। জরুরী কথাবার্তা বলবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীর্থ কাকের মতো অপেক্ষা করতে দেখে চন্দ্রোদয় ভবনের দারোয়ানজী আমাকে মৃদু বকুনি লাগিয়েছেন। "বাবুজী, কেন আপনি এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকেন?" সাংসারিক কোনো কাজে মাতাজীর এখন নাকি মন নেই। ঘুমনোর সময়টুকু বাদে সব সময় তিনি ঠাকুরঘরে বসে আছেন। একবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসে তিনি সামান্য কিছু খেয়ে নেন—তাও রান্না ভাত নয়, ঠাকুরের প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণের পর দ্বিতীয়বার স্নান শেষ করে, তিনি আবার ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়েন এবং চামর নাড়িয়ে ঠাকুরকে ঘুম পাড়ান।

ভিতরের কর্মচারীদের কাছ থেকে আরও খবর পাওয়া গেল। জরুরী তারবার্তা পেয়ে কোন্ সুদূর তীর্থস্থান থেকে বিলাসিনী দেবীর মন্ত্রদাতা গুরুদেবও চন্দ্রোদয় ভবনে পদধূলি দিয়েছিলেন। সব অশান্তির শীঘ্রই সমাধান হবে এমন ভরসা অবশ্যই তিনি বিলাসিনী দেবীকে দিয়েছেন, কিন্তু পরিবর্তে বারো হাজার গুপ্ত বীজমন্ত্র প্রতিদিন পুনরাবৃত্তির গুরুনির্দেশ মিলেছে। এই মন্ত্রপাঠ কতদিন ধরে চলবে তা একমাত্র বিলাসিনী দেবী ছাড়া কেউ জানে না।

অগত্যা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি।* কিন্তু তার আগে বিলাসিনী দেবীকে থ্যাকারে ম্যানসনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ পত্র ওখানকার কাগজ-কলমেই লিখে ফেলেছি। বিশেষ করে শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে আইন-আক্রমণের সুযোগটা যে অবিলম্বে নেওয়া প্রয়োজন তাও জানিয়েছি তাঁকে। এ বিষয়ে আমি মিস্টার ভরত সিং-এর নাম উল্লেখ করতেও দ্বিধা করলাম না। তাঁর গোপন পরামর্শ যে বিলাসিনী দেবীর স্বার্থের পক্ষে মহামূল্যবান হতে পারে তাও লিখে দিলাম।

সাক্ষাতের সুযোগ না মিললেও বিলাসিনী দেবী সম্পূর্ণ নীরব রইলেন না। পুজো ও প্রার্থনার মধ্যেও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে ওঠেন নি তা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা গেল। চন্দ্রোদয় ভবনের একজন দূত দিন দুই পরে থ্যাকারে ম্যানসনে এসে জানিয়ে গেলেন, শকুন্তলা চাওলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন আমি নিজেই গ্রহণ করি। দূত আরও জানালেন যে এ-ব্যাপারে আমি যেন ভরত সিংজীর উপদেশ গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত না হই।

তার পরের দিনই গণপতিবাবু কাগজ-পত্তর বগলে করে হাজির হলেন। বললেন, "ছোটখাট বৈষয়িক ব্যাপারে বিলাসিনী দেবীকে বিব্রত কোরো না, শংকর।"

"ছোটখাট বিষয়! শকুন্তলা চাওলার মামলার বিষয়টা আমাদের মতো ম্যানেজারের জীবনে বৃহৎ এক ঘটনা।"

গণপতিবাবু মৃদু হাসলেন। "তোমাদের কাছে বৃহৎ ঘটনা। কিন্তু সংসারের সোনার শিকল কেটে মুক্তির জন্য যিনি ছটফট করছেন তাঁর কাছে কোন ঘরে কোন্ ভাড়াটে রইলো তাতে কী এসে যায়?"

গণপতিবাবু বললেন, "তোমার কোনো চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। এই নাও তোমার পাওয়ার।"

"পাওয়ার?"

"হাওড়া কোর্ট এবং হাইকোর্টের সব ব্যাপার এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি? পাওয়ার গো। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি—আম মোক্তারনামা। তোমার নামেই আমমোক্তারনামা লিখে দিয়েছেন বিলাসিনী দেবী, যাতে ওই জাঁদরেল মহিলার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার সময় ওঁকে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে না হয়।"

পাওয়ারখানা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "আমি খুব খুশী হয়েছি, শংকর। হরি উকিলের ছেলের মতোই বুদ্ধি দেখিয়েছো তুমি। এবার ওই সিলভার ড্রাগনের চাওলাগুষ্টিকে ঝাড়ে বংশে নিপাত করবার যে মতলব তুমি দিয়েছো তা অ্যাটর্নিপাড়ার বড় বড় উকিলের মাথাতেও আসতো না।"

ছাত্রের কৃতিত্বে গর্বিত গণপতিবাবু বললেন, "বড় বড় ব্যারিস্টার কেন, এই গণপতি সামন্তও এবার তোমার কাছে হার মেনেছে। এতোদিন উল্টো সিধে, নরম গরম, মেডিসিন সার্জারি কত উপায়ে কত ভাড়াটাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছি। ওই তো আমার কাজ, ভাড়াটে এবং ঠিকে-প্রজা উচ্ছেদ করে বাবুদের হয়ে খাস দখল নেওয়ার জন্যেই তো আমার জন্ম! তবু এই মরকথুজের কথা আমার মাথায় কখনও আসেনি। শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করলেই দেখবে পাশুপত অস্ত্রের মতো কাজ হবে।"

গণপতিবাবু বিড়ি ধরালেন। তারপর বললেন, "চন্দ্রোদয় ভবনের বড়বাবুর কাছে ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে নিজেই একবার বইপত্তরগুলো নেড়ে দেখলাম। ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে যা ইচ্ছে করা যায় এই ধারণা একেবারে ভুল। পরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে, তাকে না জানিয়ে সেখানে মেয়েমানুষের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অপরাধের ক্ষমা নেই।"

গণপতিবাবু এবার আমার পিঠ থাবড়ালেন। "এখনকার জজরা আই-টি অ্যাক্ট সম্বন্ধে খুবই স্ট্রিক্ট। ইস্কুল কলেজ মন্দির গীর্জার দেড়শ গজের মধ্যে কোনো ভাঁটিখানা শুঁড়িখানা গজিয়ে উঠুক তাই তাঁরা চান না, ব্রথেল তো দূরের কথা। এ-ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হবে না কারণ হাতে নাতে ধরে দেবার হাঙ্গামা নেই। বে-আইনী শুঁড়িখানা এবং পতিতালয় চালাবার জন্যে ইতিমধ্যেই চাওলা মেমসায়েবের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।"

গণপতিবাবু বললেন, "অ্যাদ্দিন এ-লাইনে কাজ করছি কিন্তু এ রকম কেস করবার সুযোগ পাইনি। আমার বাবুদের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে একজন হাফ গেরস্ত আছে—কিন্তু হাতে-নাতে ধরে কে কেস প্রমাণ করবে?"

গণপতিবাবু আরও জানালেন, "নিজের হাতে কেসটা চালাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে দেওঘরে গিয়ে ক্যাম্প ফেলতে হবে। মস্ত বড় এক সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল বেধেছে—বাবুদের স্বার্থ রক্ষে করবার জন্য কতদিন যে ওখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই।"

গণপতিবাবু আমাকে ভরসা দিলেন, "তোমার জন্যে আমার এক ফোঁটা চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা আমার থেকেও ভালভাবে করে ফেলবে। সেই কথাই আমি চন্দ্রোদয় ভবনে বলে এসেছি।"

বিদায় নেবার আগে গণপতিবাবু আরও জানালেন, "চোখের আড়ালে হচ্ছি বলে মনের আড়াল হবে না। সুযোগ পেলেই আমি খোঁজ খবর করবো।"

এর জন্যে আমি গণপতিবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম। হাঁ হাঁ করে উঠলেন গণপতিবাবু। "কোনো ধন্যবাদ আমার পাওনা নেই। এই যে এখানে আমি আসি, কথায় কথায় যে বিলাসিনী দেবীর কাছে ছুটে যাই—এসব অকারণে নয়। তোমাকে যে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আজেবাজে লোকের পরিবর্তে বসাতে পেরেছি এও আমার বিশেষ সুবিধে। কেন এসব করেছি একদিন জানতে পারবে, কোনো কিছুই তোমার অজানা থাকবে না। তখন তোমারও হয়তো ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন না-আসা পর্যন্ত একটু সাবধানে, চার-

একবার ইচ্ছে হলো গণপতিবাবুকে বলি এখানে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। হাইকোর্ট এবং হেস্টেলের স্বর্গমর্তের পরে ফ্ল্যাট বাড়ির এই নরকবাস আমার পক্ষে ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সায়েব পাড়ার প্রাচীন গলির পুরনো বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে সংসারের এতো বিষ এমনভাবে জমা হয়ে আছে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে গণপতিবাবু এবার আমাকে অন্য কোনো সুযোগ দিন।

গণপতিবাবু কিন্তু কথা বলার সুযোগই দিলেন না। আমার ভাগ্যদেবতা যে প্রসন্ন সূর্যের মতো এবার সমস্ত অন্ধকার বিতাড়িত করবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গণপতিবাবু এরপর জরুরী কাজের মোকাবিলার জন্যে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিলেন। আমার সব প্রশ্নের উত্তর ওঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেল না।

কিন্তু এখন আমি তেমন চিন্তিত হচ্ছি না। গণপতিবাবু না-থাকলেও ভরত সিংজী আছেন। আইনের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আইন বিষয়ে সত্যিই কোনো অসুবিধা হলো না। ভরত সিং যেন অন্তর্যামী তিনি যেন আগাম জেনে বসে আছেন যে বিলাসিনী দেবী ভাড়াটিয়া বিতাড়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপরেই অর্পণ করবেন।

ভরত সিং বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, মিস্টার শংকর। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে সুরজলাল নাগরচাঁদের উকিল-ব্যারিস্টারের অভাব নেই। সেনেট হলের থামের মতো বড় বড় ব্যারিস্টার এই ভরত সিং-এর টেলিফোন পেলে দশ মিনিটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেন। কার সঙ্গে কনসালটেশন চান বলুন? কাউকে যদি এখানে আনিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় তাও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

ভরত সিংজীর মনোবল দেখে আমি তাজ্জব। নাম করা ব্যারিস্টারদের সম্পর্কে অর ডিগনাম, না'

স্যানডারসন মরগ্যানের কর্তারাও এতো জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।

"পারবেন কী করে?" এবার উল্টো চাপ দিলেন ভরত সিং। পুরো ফি অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকে পাঠালে ওঁদের মন পাওয়া যায় না।" সুরযলাল নাগরচাঁদের সামান্য রহস্য এবার ব্যাখ্যা করলেন ভরত সিং। "আমাদের পলিসি অন্য। যে যেভাবে পেমেন্ট চায় তাকে সেইভাবে খুশী করো। একই অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করছি আমরা কিন্তু চেক বই না-দেখিয়ে ক্যাশ গুণে এবং রসিদের কথা না তুলে ডবল ডিভিডেন্ড আদায় করছি আমরা। কয়েকজন বাঘা-বাঘা ব্যারিস্টার এই ভরত সিং-কে অবলাইজ করবার জন্যে বড় বড় সায়েব কোম্পানির ব্রীফ ফেলে রেখে আমাদের কাজে মন দিচ্ছে!"

একদম চিন্তা না-করবার নির্দেশ দিলেন ভরত সিং। বললেন, "এমন সব লোক দিয়ে দিচ্ছি যারা অর্ধেক ফিতে ডবল কাজ করে দেবেন। এই ভরত সিং-এর ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

কথাগুলো যে একদম মিথ্যে নয় তা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। ভরত সিং-এর নির্দেশিত পথে গণপতিবাবুর অনুপস্থিতি আমি বুঝতেই পারলাম না। বিভিন্ন আদালতে একাধিক মামলা শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী, জামাই ও সিলভার ড্রাগনের নামে রুজু হয়ে গেল।

ভরত সিং আমাকে আরও উপদেশ দিলেন, "টাটকা খবরগুলো ল্যান্ডলেডির কাছে গরম গরম পোঁছে দিন।"

ল্যান্ডলেডির নাগাল পাওয়া যে খুব শক্ত তা ভরত সিং-এর কাছে আর চেপে রাখা গেল না। কিন্তু ভরত সিং আমার কথার ওপর গুরুত্ব দিলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, "মেনসুইচকে সবাই নাগালের বাইরে রাখতে চেষ্টা করে। আমাদের কাজ হলো মেনসুইচের কাছাকাছি থাকা, না-হলে কোনো কাজই করতে পারবেন না।"

এবার ভরত সিং বললেন, "কী বলছেন, মিস্টার শংকর? আমি নিজেই তো ইমপর্ট্যান্ট একটা ব্যাপারে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, কোনো অসুবিধে হলো না!"

"পেলেন ও'কে?" আমি একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই জেরা করলাম।

"খুব সহজ ব্যাপার। প্রথমবার ট্রাই করে ফেল হলাম। তখন নিজে বিডন স্ট্রীটে হাজির হয়ে একটু রিসার্চ করতে হলো। দশ টাকা খরচ করেই জানতে পারলাম, প্রতিদিন সাতটা পঁয়তাল্লিশের সময় মিনিট পনেরোর জন্যে মাতাজী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যেও তিনি চুপ করে ব্যালকনিতে বসে থাকেন। মাতাজীর দু নম্বর টেলিফোনটা যে ব্যালকনিতেই আছে সে খবরও পেয়ে গেলাম। তারপর কোনো অসুবিধে হলো না। ভগবান আমাদের মাথাকে সবচেয়ে টপ হাইটে রেখেছেন কেন? মাথা খাটাবার জন্যে, মিস্টার শংকর।"

এবার আমাকে আরও উপদেশ দিলেন ভরত সিং। বললেন, "সব সময় টেলিফোন করতে সাহস না হলে চিঠি লিখে দিন। মালিককে নিয়মিত গরম গরম রিপোর্ট দিয়ে যাবেন, যাতে ভুল বুঝবার অবকাশ না হয় কখনও।"

অভিনব পন্থায় এবং ভরত সিং-এর কূট পরিকল্পনায় অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে আমাদের মামলাগুলো আদালতে উঠেছিল। "ওরা জেলে থাকতে থাকতে কেল্লা ফতে করুন", এই উপদেশ দিয়েছিলেন ভরত সিং।

বন্দী কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করছিলেন শকুন্তলা চাওলা। এই মামলায় যাতে তাঁদের মুক্তি পর্যন্ত পিছিয়ে যায় সে-ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন উকিলরা। কিন্তু ভরত সিং-এর নির্দেশিত পথে তাঁদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

আইনের রহস্যময় রথ যে কখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার কখন যে অদৃশ্য ইঙ্গিতে মেল ট্রেনের মতো ছুটতে থাকে, তা নির্ধারণ করা আমার পক্ষেও শক্ত হয়ে উঠলো। ভরত সিং-এর সান্নিধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম যে আইন পাড়ার শিক্ষা আমার অসম্পূর্ণ ছিল, ব্যারিস্টারের বাবু হিসেবে অনেক কিছুই আমার অজানা ছিল।

শকুন্তলা চাওলার সঙ্গে এইভাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক অলিখিত বিপদ আছে। শত্রু যদিও এই মুহূর্তে পরাজিত ও বিপর্যস্ত, তবুও এর শেষ কোথায় কে জানে? শকুন্তলা চওলারা বন্দীশালার অভ্যন্তর থেকেও নিরন্তর বাধা দিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু ভরত সিং-এর প্রদর্শিত পথে আইনের রণাঙ্গণে আমরাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি এবং আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল জানতে তাঁর বেশী সময় লাগবে না।

শকুন্তলার সঙ্গে সংগ্রামের শেষ অঙ্কের পূর্বেই থ্যাকারে ম্যানসনে এক অপ্রত্যাশিত অতিথির আবির্ভাব ঘটেছিল।

তখন সকাল দশটা। আইনপাড়ার এক দিকপালকে পাকড়াও করবার জন্যে শকুন্তলা চাওলার নথিপত্র আমি অফিস ঘরে বসে এক মনে গুছিয়ে ফেলছি। ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে বললো, "স্যর আপনি একবার আসুন। দুর্জন ভদ্রলোক আপনাকে জরুরীভাবে খোঁজাখুঁজি করছেন।"

আপিস থেকে বেরিয়ে ফয়ারের কাছেই এই অপরিচিতদের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরা আমাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন—আমাদের গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে।"

আরও শুনলাম, তাঁরা গাড়ি ভিতরে এনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গেটের দারোয়ান বাধা দিয়েছে। এই বদলী স্বাররক্ষীটি রামসিংহাসনের সাময়িক অনুপস্থিতিতে দিবারাত্র প্রহরীর কাজ করছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে অনেক অপকর্ম বন্ধ করছে। টেলিগ্রাম পেয়ে কয়েক ঘন্টার নোটিশে বিদায় নেওয়ায় রামসিংহাসনজী বোধ হয় প্রয়োজনীয় গোপন ট্রেনিং দিতে পারেন নি!

অপরিচিত দুই সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে গেটের বাইরে এসে অপেক্ষমান ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ট্যাক্সির পিছন দিকে এক কঙ্কালসার দেহ কুণ্ডলি পাকিয়ে কোনোরকমে শুয়ে আছে। এই দেহ যতই শীর্ণ হোক তাকে না চেনবার কোনো কথাই ওঠে না।

বরদাপ্রসন্ন হালদার না?

সেই কবে তীর্থযাত্রার তীব্র আকর্ষণে আমার ওপর আচমকা সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বরদাপ্রসন্ন এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি পোস্টকার্ডে বিভিন্ন তীর্থস্থানের খবরাখবর দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা। সংসারবিরাগী বরদাপ্রসন্ন শেষ পর্যন্ত তীর্থের দেবতার কাছেই আত্মনিবেদন করেছেন এমন গুজবও চন্দ্রোদয় ভবন থেকে শুনেছি। কিন্তু তাঁকে এইভাবে আবার দেখবো তা কল্পনা করিনি।

বরদাপ্রসন্নের দেহ অস্থিসার। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—বেশ কয়েকদিন ওদিকে কারও নজর পড়ে নি।

সাক্ষাৎকারী যুবক দুটি বললেন, তাঁরা বারাণসী থেকে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গী হয়েছেন, ওঁরা ওখানকার কলেজের ছাত্র।

ওঁরা অনুরোধ করলেন, "দারোয়ান ঢুকতে দিলো না! কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুরোধ যদি কিছুক্ষণের জন্য ওঁকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে বিশ্রাম নেবার অনুমতি দেন।"

দারোয়ান, তুমি কাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ঢুকতে দাওনি! আমি কেন, স্বয়ং বিলাসিনী দেবীরও ক্ষমতা নেই বরদাপ্রসন্ন হালদারকে এই বাড়িতে প্রবেশের বাধা দেওয়ার। সেই ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের আদি ব্যবস্থা অনুযায়ী বরদাপ্রসন্ন যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তিন তলার হাফ-ফ্ল্যাটে তাঁর অবাধ অধিকার। এখানকার চাকরির সঙ্গে এই ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই।

ট্যাক্সির দরজা খুলে আমি বরদাপ্রসন্নের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। "কালী কালী ব্রহ্মময়ী তারা আমার"—দুর্বল কণ্ঠে সেই পুরনো আবৃত্তি না শুনলে আমি এই বৃদ্ধকে চিনতেও পারতাম না।

চোখ মেলে তাকালেন বরদাপ্রসন্ন। আমাকে চিনতে পারলেন তিনি। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বহু কষ্টে তিনি বললেন, "আবার আসতে হলো। আমাকে একবার সব ঘুরিয়ে দেখাও।"

বরদাপ্রসন্নের ঘর খালি ছিল। দ্রুতগতিতে তালা খুলিয়ে, সেই ঘর পরিষ্কার করিয়ে আমরা একটা স্ট্রেচারের সাহায্যে ওঁকে সেই পুরনো ঘরে তুলে ফেললাম। পথের শ্রান্তিতে বরদাপ্রসন্ন তখন আবার সংজ্ঞাহীন।

দুজন সঙ্গীর একজন বললেন, বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটে কয়েকমাস আগে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর আলাপ। সংসারে বীতশ্রদ্ধ বরদাপ্রসন্ন কর্মজীবন থেকে মুক্তি নিয়ে নানা তীর্থ পরিক্রমা করে অবশেষে পবিত্র তীর্থ বারাণসীতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "আর না। এইখানেই মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। আমার আর কোনো অচরিতার্থ বাসনা নেই।"

অপর সঙ্গী বললেন, "বারাণসীতে দেহরক্ষার জন্যে কত মানুষ প্রার্থনা করে। আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বরদাপ্রসন্ন অকস্মাৎ পালটে গেলেন। কাতরভাবে সবাইকে অনুরোধ করলেন, একবার আমাকে থ্যাকারে ম্যানসনে নিয়ে চলো।"

"কোথায় থ্যাকারে ম্যানসন? সেখানে আপনার আপনজন কে আছে?" ছেলেরা বরদাপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করেছে।

কলকাতার থ্যাকারে ম্যানসনে বরদাপ্রসন্নর কেউ নেই। হয়তো তাঁকে ওখানে ঢুকতে দেওয়াও হবে না। তবু বরদাপ্রসন্ন একবার দু' চোখ দিয়ে সেই বাড়িখানা দেখতে চান। অগত্যা দুজন ছাত্র তাদের কাজকর্ম ছেড়ে এই বৃদ্ধকে কলকাতা দেখিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছে।

ভাবনানি ম্যানসনের ডাক্তার ভড়কে খবর দেওয়া হলো। বরদাপ্রসন্নকে পরীক্ষা করে তিনি বিশেষ আশা দিতে পারলেন না। বললেন, "ওঁর কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকলে তা অপূর্ণ রাখবেন না।"

বরদাপ্রসন্ন ইঙ্গিতে আমাকে ওঁর মুখের কাছে কান আনতে অনুরোধ করলেন। তারপর বহু কষ্টে বললেন, "কাশীতে গিয়েও মুক্তি পেলাম না। এই পুরনো বাড়িটা ঘুমের মধ্যেও আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল। কালী কালী ব্রহ্মময়ী আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, হালদার বংশের ছেলে—কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাবি তুই?"

একটু পরেই বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "তেলকালি, কলকালি, কাটাকালী, রক্তেকালী এরা সব কোথায়? তাদের ডেকে পাঠাও।"

তেলকালি এবং কলকালি খবর পেয়েই ছুটে এলেন। কিন্তু দারোয়ান কালী তো বরদাপ্রসন্নর আমলেই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। তেলকালিবাবু সে-কথা কয়েকবার বলার পরে বরদাপ্রসন্নর খেয়াল হলো।

এরপর বরদাপ্রসন্ন অদ্ভুত এক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনের সব ঘরগুলো দেখবো। তেলকালি, কলকালি—পারবি আমাকে দেখাতে?"

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তেলকালিবাবু কোথা থেকে ছোট্ট একটা খাটিয়া জোগাড় করে আনলেন। তারপর সেই খাটে শুইয়ে জীবন্ত বরদাপ্রসন্নকে ওঁরা একে একে সমস্ত ফ্ল্যাটে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে এসে তেলকালিবাবু বললেন, "মনে পড়ছে? ফিলিপ সায়েবের ফ্ল্যাট। এখনও খালি পড়ে রয়েছে। বউকে খুন করে বাক্সর মধ্যে পুরে রেখে ফিলিপ সায়েব পালিয়েছেন, আর ফেরেননি।"

"সে কী গো?" অবাক হয়ে গেলেন বরদাপ্রসন্ন। "তোমরা একবার খাট নামাও।" খাট নামাবার পরে হাঁপাতে লাগলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "হতেই পারে না। এই তো সেদিন কাশীতে আমার সঙ্গে ফিলিপ সায়েবের দেখা হলো। পরিবারের শোকে লোকটা বিবাগী হয়ে পথে পথে ঘুরছে। একবারও তো মনে হলো না বউকে খুন করে পালিয়েছে!"

তেলকালিবাবু বললেন, "সংসারে এমনই হয়, স্যার। যেখানে বেশী ভালবাসা সেখানেই বেশী ঘেন্না। ঘেন্নার পরে হয়তো আবার ভালবাসা।"

থ্যাকারে ম্যানসনে আজ এক স্মরণীয় দিন। বরদাপ্রসন্নর খাট একের পর এক ফ্ল্যাট থেকে অন্য ফ্ল্যাটের সামনে চলে আসছে। একের পর এক রুদ্ধদ্বার খুলে গৃহবাসীরা স্বাগত জানাচ্ছেন বরদাপ্রসন্নকে।

বরদাপ্রসন্নর চোখে জল। মাঝে মাঝে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তেলকালিকে বলছেন, "তেলকালি, বড় ময়লা। আবার সব চুণকাম করো, চুণকাম করো—এতো ময়লা মার্টিন সায়েব সহ্য করতে পারবেন না!"

থ্যাকারে ম্যানসনে যেখানে যত ঘর আছে তার পরিক্রমা শেষ করে বরদাপ্রসন্নের খাটকে ওঁর নিজস্ব ঘরে আনা হলো। তেলকালিবাবু ইতিমধ্যেই সে-ঘর দ্বিতীয়বার পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন।

বরদাপ্রসন্ন এবার বললেন, "তেলকালি, আমার ছবির পোঁটলাটা বার করো।"

তেলকালিবাবু দ্রুত বরদাপ্রসন্নর ট্রাংক থেকে ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের ছবিখানা ঘরের কোণে টাঙিয়ে দিলেন। স্ত্রীর ছবিখানা বরদাপ্রসন্ন নিজের বুকের ওপর রাখলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে, আমাকে হয়তো ফিরতে হতো না। কিন্তু এখানে বাক্সর মধ্যে ফেলে রাখার শাস্তি পেলাম। কাশীতে গঙ্গার ধারে শুয়ে শুয়েও আমার মুক্তি হলো না। রোজ আমাকে স্বপ্নে দেখা দিতো, বলতো, ফিরে এসো, ফিরে এসো—আমার মুক্তি পেলুম না। সেই ফিরতে হলো।"

বরাদপ্রসন্ন হালদার সেই রাত্রেই থ্যাকারে ম্যানসনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর শেষ কথা : "তেলকালি—বড় ময়লা, বড় ময়লা। চুণকাম করো, চুণকাম করো—এতো ময়লা মার্টিন সায়েব সহ্য করতে পারবেন না।"

(ক্রমশ)

আপনার গরমের ছুটি হ'তে আর তো সামান্য দেরী

ভারতের সব জায়গা আপনার জন্যে হাজারো আনন্দের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। বিমানযোগে যেতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

উত্তর

কাশ্মীর ঃ আনন্দের ভূ-স্বর্গ। হাউস্‌বোট, ছোট ছোট সিকারা, জলে স্কী-খেলা আর আছে হিমালয়ের সৌন্দর্য। নিকটবর্তী বিমানবন্দর, শ্রীনগর।

ডালহাউসী ঃ হিমালয়ের পাদদেশে এই শহরটি শান্ত, শীতল, অবসর যাপনের উপযুক্ত। নিকটবর্তী বিমানবন্দর, জম্মু।

মুসৌরী ঃ উত্তর প্রদেশের পর্বতমালার নীরব প্রবেশদ্বার। হাঁটা পথে দীর্ঘ ভ্রমণ অথবা আকাশপথে রোপ্‌ওয়েতে। নিকটতম বিমানবন্দর, দিল্লী।

দক্ষিণ

উটকামণ্ড ঃ ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ বৃক্ষশোভিত নীলগিরির মনোরম শৈলাবাস। নিকটতম বিমানবন্দর, কয়েমবাটোর।

ব্যাঙ্গালোর ঃ ৯০০ মিটার উঁচুতে সুন্দর উদ্যান নগরী। কর্ণাটক ভাল ক'রে দেখার একটি আদর্শ কেন্দ্রস্থল। মোটরযোগে জোগ জলপ্রপাত ও উটকামণ্ডে যেতে পারেন। বিমানপথে ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ।

হর্‌সুলী হিল্‌স ঃ চন্দন ও ইউক্যালিপ্‌টাসের শান্ত জঙ্গলের মাঝে নয়নাভিরাম শৈলাবাস। নিকটতম বিমানবন্দর, ব্যাঙ্গালোর বা তিরুপতি।

পূর্ব

দার্জিলিং ঃ হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগের জন্য এই শহরটি হ'ল শ্রেষ্ঠ। কালিম্পং ও সিকিমে যাবার প্রবেশদ্বার। নিকটতম বিমানবন্দর বাগ্‌ডোগ্‌রা।

শিলং ঃ পাইন বিথীর মাঝখানে হাঁটাপথ অপূর্ব গল্‌ফ্‌ কোর্স আর আছে নয়নাভিরাম পাহাড়ের দৃশ্য। নিকটবর্তী বিমানবন্দর, গোহাটী।

ইম্ফল ঃ চির সবুজ উপত্যকায় জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় ও হ্রদ নিয়ে এই শহরটি। পোলো খেল্‌তে পারেন এবং উপভোগ করবেন বিচিত্র পোষাকে লোকনৃত্য। মোটামুটি সারাভারতের সঙ্গে বিমানপথে যোগাযোগ রয়েছে।

পশ্চিম

সাপুটারা ঃ মনোরম আবহাওয়া ও চমৎকার দৃশ্যের পটভূমিকায় ১০০০ মিটার উঁচুতে এই অপরূপ শৈলাবাস। নিকটতম বিমানবন্দর, আমেদাবাদ।

মহাবালেশ্বর ঃ এখানে ১৫০০ মিটার উঁচুতে মারাঠা দুর্গ, পাথরের মন্দির এবং আরামদায়ক আবহাওয়া রয়েছে। নিকটতম বিমানবন্দর, বোম্বাই।

মাউণ্ট আবু ঃ নাক্কিহ্রদ, গোমুখ ও সূর্যাস্ত উপভোগের এক লোভনীয় শৈলাবাস। নিকটতম বিমানবন্দর, আমেদাবাদ।

বিমানে স্বল্প পাড়িতে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

দেশব্যাপী চলাচল ও দ্রুতগতি আধুনিক বিমানবহর বিশিষ্ট ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্‌ আপনাকে সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে।

সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে আপনার ট্র্যাভেল এজেন্ট, যাত্রায় আপনাকে করবে সাহায্য।

যেখানে যাবেন আমাদের বিমানে চলুন

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্‌

বিজ্ঞান

থিবীর প্রাচীনতম জীব-কোষ

পৃথিবীর বয়েস কত?

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ৪৬০ কোটি বছর।

তাই যদি হয়, তাহলে পৃথিবী নামক এই গ্রহে বন-সৃষ্টি হয়েছিল কোন কালে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার বেলায় বিজ্ঞানীরা কিন্তু ধাগ্রস্ত। তাঁদের বক্তব্য, পৃথিবীর বয়েস সম্পর্কে নরা মোটামুটি নিশ্চিত। কত হবে? ৪৬০ কোটি র। দু চার কোটি বছর এদিক ওদিকও হতে পারে। ন্তু পৃথিবীর বুকে ঠিক কবে জীবনের বিকাশ ছিল, সে ব্যাপারে 'নিশ্চিত অনুমান' বলতে যা ঝায় সেটা করাও শক্ত।

'পৃথিবী নয়, আদিতে জীবন সৃষ্টির মূল রখানা ছিল মহাকাশে।' বলছেন কোন কোন বিজ্ঞানী। তখন অবস্থাটা ছিল এই রকম। উত্তপ্ত পৃথিবী। নও তার গা দিয়ে আগুন ঝরছে। সূর্য থেকে এগিয়ে সছ তীব্র অতিবেগুনী রশ্মি বা 'আলট্রা ভায়লেট।' বায়ুমন্ডলে 'ওজন' স্তর গড়ে ওঠেনি। ফলে থিবীর বুক পর্যন্ত সেই রশ্মির গতিও অপ্রতিহত। ন্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্রের সে আচ্ছাদনটি পৃথিবীর র্বাকাশে এখন ঢালের মত আগ বাড়িয়ে দূরাকাশ কে আগত মহাজাগতিক রশ্মি বা কণাদের পৃথিবীর কে এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে তখন সেই চৌম্বক ত্রটিও তৈরি হয়নি। আচ্ছাদনটির নাম 'ভ্যান-অ্যালেন লট।' সূর্য এবং নক্ষত্র থেকে মহাজাগতিক পরি-ডলে বিকীর্ণ হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক ন্ম—প্রোটন এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিউ-য়াস। 'ভ্যান অ্যালেন বেল্‌ট' এই সব কণাদের বেশির গকে প্রতিফলিত করে মহাকাশে ছড়িয়ে দেওয়ায় থিবীর তাবৎ জীবজগৎ অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে া পাচ্ছে।

হ্যাঁ, তখন—আজ থেকে প্রায় চার শ' কোটি বছর গে, হয়ত বা তারও আগে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মাণু ওই সব তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং কণার প্রভাবে ায়ক্রমে তৈরি করেছিল বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ। রি করেছিল জল, কার্বন মনোকসাইড, নাইট্রোজেনের কসাইড, অ্যামোনিয়া, সাইনোজেন প্রভৃতি এবং শেষে অ্যামাইনো অ্যাসিড। বিভিন্ন ধরনের মাইনো অ্যাসিড তারপর তৈরি করল আরও জটিল ায়নিক যৌগ। তৈরি হল প্রোটিন ও আরও কিছু ছু রাসায়নিক যৌগ। আর এসব যখন তৈরি হচ্ছিল থিবীর আকাশ জুড়ে তার বায়ুমন্ডলের মধ্যে ছিল প্রচন্ড বিদ্যুৎ ক্ষরণ। বা ইলেকট্রিক্যাল সচার্য। ঝড়ের সময় যেমন বিদ্যুতের চকমকি জ্বলে থিবীর বায়ুমণ্ডল তখন প্রায় সর্বক্ষণ ওই ধরনের মকিতে পরিব্যাপ্ত থাকত। এই বিদ্যুতের বিভব া লক্ষ লক্ষ ভোল্ট। এই পরিবেশে ইতিমধ্যে তৈরি ভন্ন যোগ নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি জীবন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান ডি এন এ অথবা এন এ অণুর পূর্বসূরী অণুদের। সেই সব অণু কাশেই বিচরণ করতে থাকে।

এখন যাকে 'জিন' বলা হচ্ছে তার মূল উপাদান টিন, নিউক্লেয়িক অ্যাসিড এবং পলিস্যাকারাইড্‌স্‌। ৫০ সালে অধ্যাপক স্ট্যানলি মিলার মন্তব্য করেন, কথা ঠিক পৃথিবীতেই জীবনের বহুমুখী বিকাশ ছে। কিন্তু যে সব মূল উপাদান দিয়ে জৈবিক ষ তৈরি করার কথা তারা বায়ুমণ্ডলেই সৃষ্ট ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই উপাদানগুলি যথাক্রমে . কার্বন মনোকসাইড, কার্বন ডাই-অকসাইড, থেন, হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া। অধ্যাপক ার গবেষণাগারে পৃথিবীর আদিযুগের আবহমণ্ডল ষ্ট করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে এক ধরনের রাসায়নিক া তৈরি করতে সমর্থ হন। যার নাম ডাই-সায়ানা-

সুইজারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত একখন্ড জীবাশ্ম পরীক্ষা করে দেখছেন ডঃ এলসো বারঘুরন (বাঁ দিকে)। ডান দিকের দুই প্রস্থ ছবি ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে তোলা হয়েছে। উপরে a, b, c, d, e এবং f-এর সাহায্যে একটি মিথোজেন কোষে কীভাবে বিভাজন হচ্ছে দেখান হল। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'সেল ডিভিসন'। এই কোষ ৩৫০ কোটি বছর পুরনো। জীবাশ্ম থেকে পাওয়া। g, h, i এবং j আধুনিক মিথোজেনের কোষ বিভাজনের ছবি
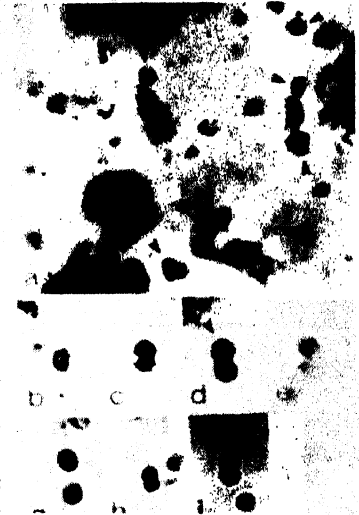
মাইড। তিনি লক্ষ্য করেন এই যৌগ অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ থেকে সহজেই জল সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের যৌগ তৈরি করতে পারে। ডাই-সায়ানামাইডের জলীয় দ্রবণ এবং সরল পর্যায়ের অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে পেপটাইড অণু। যারা প্রোটিন অণুর খন্ডাংশ উপাদান। বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে এই পেপটাইড অণুদের আবার সংযুক্ত করে তৈরি করা যায় পলিপেপ-টাইড। যারা জিনের অন্যতম উপাদান। ডঃ মেলভিন ক্যালভিন (লরেনস রেডিয়েশন ল্যাবোরেটারি, ক্যালি-ফোর্নিয়া) এবং শ্রীলংকাজাত ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ডঃ সিরিল পোন্নামপেরুমাও এইভাবে একাধিক জৈবিক অণু তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য ডঃ পোন্নামপেরুমার পরীক্ষাটি আরও নাটকীয়। গত ষাটের দশকে তাঁর এই পরীক্ষা বিজ্ঞানী মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

তাঁর পরীক্ষাটি ছিল এই রকম। একটি বিরাট ফ্লাস্ক। ডঃ পোন্নামপেরুমা তার মধ্যে নিলেন হাইড্রো-জেন, মিথেন, কার্বন মনোকসাইড, কার্বন ডাই-অকসাইড, জল এবং অ্যামোনিয়া। যন্ত্রগণকের সাহায্যে

৩৫০ কোটি বছরের পুরনো মিথোজেন কোষের ছবি। ছবি তিনটি তোলা হয়েছে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে। বাঁ দিকে দুটি জীবাণুর একটি শৃঙ্খল। প্রত্যেকটি লম্বায় এক মিলিমিটারের ১/১০০০ ভাগ। ডান দিকে একটি জীবাণু কীভাবে চারটি কোষে ভাগ হয়েছে, লক্ষ করুন। অবশ্য ভাগও হয়েছিল ৩৫০ কোটি বছর আগে। এটা এখন তাদের শিলীভূত রূপ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই জীবাণু পৃথিবীতে জৈবিক বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে

নে নিলেন, আজ থেকে চার শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের স্বরূপটি কেমন ছিল। গণক জানাল, তখন, ঊর্ধ্বাকাশে কোন 'ওজন' সের স্তর ছিল না। বাতাস বলতে হাইড্রোজেন, থেন, কার্বন মনোকসাইড, কার্বন ডাইঅকসাইড, মোনিয়া এবং জলীয় বাষ্প। সেই বায়ুমণ্ডলে চলছে অতিবেগুনী রশ্মির অবাধ বর্ষণ। সেই সঙ্গে ড বৈদ্যুতিক ক্ষরণ। বায়ুমণ্ডলে কোন কোন গ্যাস অনুপাতে ছিল তাও জেনে নিলেন তিনি। জেনে লেন অতিবেগুনী রশ্মির মাত্রা, বৈদ্যুতিক বিভব-া, আবহাওয়ার তাপমাত্রায় ইত্যাদি। তারপর, ফ্লাস্কের া অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে কিছুক্ষণ বসে লেন।

এবং তাভাবিত ব্যাপার। ডঃ পোন্নামপেরুমা খলেন, ফ্লাস্কটির মধ্যে নানা রকম জৈবিক অণু তৈরি াছে। যাদের মধ্যে ডি এন এ বা ডিঅকসিরাইবো-উক্লেয়িক অ্যাসিডও ছিল।

বিজ্ঞানীদের এখন ধারণা, পৃথিবীর বুকে নয়, াকাশেই জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে জীবনের ায়নিক উপাদানগুলি তৈরি হয়। এবং তৈরি য়ার পর হয়ত দীর্ঘকাল মহাকাশেই ভাসমান স্থায় তাদের থাকতে হয়েছিল। তারপর ভূ-পৃষ্ঠের মাত্রা যখন কমে এল, তৈরি হল প্রাণ ধারণের মত রবেশ ওই সব আর এক প্রস্থ রাসায়নিক বিবর্তনের থ এসে পড়ে। তৈরি করে এমন ধরনের রাসায়নিক গ, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভাজিত হওয়ার ক্ষমতা থ। ডি এন এ, আর এন এ বলতে এখন যা বোঝান ছ, তারা হয়ত সে ধরনের কিছু ছিল না। তাদের প্রকৃতি ছিল আরও সরল। কিন্তু জীবনের যে ন লক্ষণ—প্রজননক্ষমতা, অর্থাৎ একটি প্রাণ থেকে রূপ আর একটি প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি—দের মধ্যে তা প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন এখানেই। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ পরস্পর ায়নিক বিক্রিয়া করে প্রথমে তৈরি করল সরল যৌগ। সব সরল যৌগ আবার পরস্পর বিক্রিয়া করে র করল এমন ধরনের জটিল যৌগ যাদের স্থূলভাবে বলা চলে জীবনের ইঁট, বালি, সিমেন্ট। ওই সব গের মিলনের ফলেই সেই রাসায়নিক অণুর সৃষ্টি— বংশ বৃদ্ধির মত ক্ষমতা অর্জন করেছিল। প্রশ্ন এই শেষোক্ত গুণসম্পন্ন অণু কি মহাকাশেই সৃষ্ট ছিল।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন, না, অতটা ব হয়নি। প্রজননের জন্যে মুখ্যত দুটি জিনিস ার। পুষ্টিকর পদার্থ এবং দ্রাবক। সৃষ্টিকর পদার্থ ত ওঁরা মনে করেন সেই সব পদার্থ একটি অণু অনুরূপ একটি অণু সৃষ্ট হতে গেলে যাদের ার। আর দ্রাবক বলতে ধরে নেয়া হচ্ছে, এমন একটি ম যা পুষ্টি সামগ্রীদের (নিউট্রিয়েনট্স্) ুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওই ধরনের অণু তৈরির ারে সাহায্য করতে পারে। ওঁদের বক্তব্য, প্রথম টা ঠিক আছে। পুষ্টির জন্যে যে সব সামগ্রী ার—মহাকাশে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থিতি অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সমস্যা ওই দ্রাবকটিকে । দ্রাবক বলতে এখানে জলের কথা বলা হচ্ছে। জল বাষ্প অবস্থায় থাকবে না, থাকবে তরল থায়—যেমনটি পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই। এই র মধ্যে থাকবে 'নিউট্রিয়েন্ট', থাকবে অণুঘটকের কা নিতে পারে এমন ধরনের কিছু কিছু ায়নিক যৌগ। আর থাকবে সেই আদি প্রাণ—অর্থাৎ ল সেই রাসানিক যৌগ—যার প্রজনন ক্ষমতা আছে। একটি অবস্থা দাঁড়ালে তবেই সম্ভব ঐ সব র বংশ বৃদ্ধি। মহাকাশে ঠিক এই ধরনের স্থিতি সৃষ্টির কোন সুযোগ ছিল না।

তাদের ধারণা, উত্তপ্ত অবস্থা থেকে পৃথিবীর ভূ-স্তর এক সময় যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, ক্রমে হল জল। সাগর, মহাসাগর, নদী প্রভৃতি। মহাকাশে এতদিন ধরে যেসব জৈবিক অণু তৈরি হয়েছিল এবং বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করত—তারা এবার পেল জলের স্পর্শ। জলীয় দ্রবণের মধ্যে ছিল 'নিউট্রিয়েন্ট।' শুরু হল দ্বিতীয় প্রস্থের রাসায়নিক বিবর্তন। এই বিবর্তনই শেষ পর্যন্ত তৈরি করল পৃথিবীর 'আদি প্রাণ।' যার প্রকৃতি হয়ত ডি এন এ-র মতও ছিল না। রাসায়নিক গঠন যার ছিল আরও সরল। তবে জৈবিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে তারা নিজেদের মত অণু তৈরি করতে পারত।

এবং ক্রমে সময় বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে চলল বিবর্তনের ধারা। তৈরি হল আরও জটিল জৈব-যৌগ। জটিল 'প্রাণ'। তৈরি হল ডি এন এ-র মত অণু। তৈরি হল ভাইরাসের মত 'আণবিক প্রাণ।' তারপর এক-কোষী-জীব। ব্যাকটেরিয়া। অবশেষে ধাপে ধাপে সৃষ্ট হয়ে চলল জটিল—আরও জটিল জীব। উদ্ভিদ। এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণীজগৎ।

যদি ধরে নেওয়া হয় পৃথিবীর বয়েস ৪৬০ কোটি বছর, তাহলে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল কবে? ৫০ অথবা ১০০ কোটি বছর আগে? বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর বুকে জীবন সৃষ্টির প্রাথমিক কাল আজ থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে। বলা বাহুল্য, 'কাল' সম্পর্কে অনুমান করলেও সৃষ্টির প্রথম 'প্রাণটি'র স্বরূপটি কেমন ছিল তার অস্তিত্বের কোন সাক্ষ্য সংগ্রহ এখনও সম্ভব হয়নি। প্রাচীন ভূ-তাত্ত্বিক যুগের জীবাশ্মের মধ্যে কিছু কিছু জীবাণু বা অনুরূপ প্রাণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন এ সব জীবাণুর আবির্ভাব অনেক পরের ঘটনা। তবে এদের বিশ্লেষণ করার পর কারোর কারোর ধারণা হয়েছে, পৃথিবীতে প্রথম জীবন সৃষ্টি ঘটে তিন শ' কোটি বছরেরও আগে। সম্ভবত তিন শ পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

এই সময়টা আরও পিছিয়ে দিতে চেয়েছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এলসো বারঘুরন সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত এক ধরনের সূক্ষ্ম-জীবাণু পরীক্ষা করে তার মধ্যে এক ধরনের প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। জীবাণু। এক-কোষী জীবাণু। অনুমান ওই জীবাণুর আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে। ডঃ বারঘুরন প্রমাণ করেছেন, এরা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। যাদের বলা হয় 'মিথোজেন্স' বা 'আর্কিব্যাকটেরিয়া।' এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এখনও পাওয়া যায়। তবে ডঃ বারঘুরনের অনুমান, এই ব্যাকটেরিয়ার আদি বংশধররা আজ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে বাস করত। তাঁর ধারণা, বিবর্তনের দিক দিয়ে চিন্তা করলে বলা চলে, 'এরা হল তৃতীয় পর্যায়ের প্রাণী।' চরিত্রে যারা উচ্চতর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পর্যায়ে পড়ে না, আবার 'নিম্নশ্রেণী'র ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গেও এদের তুলনা করা যায় না। এদের অবস্থান ব্যাকটেরিয়ার ওপরে। ডাঃ বারঘুরন মনে করেন, নতুন আবিষ্কৃত জীবাশ্ম জৈবিক বিবর্তনের রাসায়নিক দিকটি সম্পর্কে হয়ত আমাদের আরও স্পষ্ট ধারণা দিতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে কোন কোন সময়ে এবং কীভাবে জীবজগৎ তার আদি অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেটা জানা যাবে।

উল্লেখ্য, 'মিথোজেন' অকসিজেন পরিহার করে, কার্বন ডাই-অকসাইড হজম করার ক্ষমতা রাখে এবং পরিবর্তে তৈরি করে মিথেন গ্যাস। অকসিজেনহীন পরিবেশে তাদের বাস। এরা বাস করে উষ্ণপ্রস্রবণে, গভীর সমুদ্রের কন্দরে, মানুষ এবং প্রাণীর অন্ত্রান্তে। বিজ্ঞানীরা এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সিউয়েজের পচা আবর্জনা থেকে ইদানীং মিথেন তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছেন। অনেকে মনে করেন এইভাবে মিথেন উৎপাদন করে জ্বালানি সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যাবে।

সমরজিৎ কর

প্যারেড-এ পাচ্ছেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোনও ডিটারজেন্টে কাপড় ধোয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করে তার "পি এইচ লেভেল"-এর উপর ঃ

কিছু ডিটারজেন্ট এতো নরম হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।

অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো খসখসে হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটা খুব নরমও নয় আবার খুব খসখসেও নয়। এই ডিটারজেন্ট সঠিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় দারুণ সাদা, দারুণ উজ্জ্বল করে।

আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর যে বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা কখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ঘন ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।

ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, ক্ষার জল বা পরিষ্কার জল সব জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ঘন ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যার ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

শুভ্রতা ও ঝলক, চোখের পড়েনা পলক
—নতুন প্যারেড-এর চমক

কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষিপ্ত-দর্শন উৎসব

দীপক মজুমদার

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬ এই ছদিন কলকাতায় এমন একটি উদ্দীপনা-নিবিড় আন্তর্জাতিক সংগীত উৎসব অনুষ্ঠিত হোলো যার নজির এই দুর্গতিক্লিষ্ট শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জ্যাজ ইণ্ডিয়া নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কলকাতা শাখা, কলকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শহরের এই প্রথম আন্তর্জাতিক জ্যাজ উৎসবের ছ'টি সন্ধ্যাই উপভোগ পাশাপাশি এই সুর-খরস্রোতটিকে বয়ে যেতে দেখবেন সর্বদাই বিস্ময়াপন্নভাবে মানুষের স্বপক্ষে। ক্লান্তি ও সমষ্টি উভয়ের ভূমিকাই এর মধ্যে সমানভাবে তীব্র। শুধু তাই নয়, ক্রমান্বিত এই পারস্পরিক সম্বন্ধির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এমন এক প্রচণ্ড গতিবেগ যার শুরু হয়তো বিষণ্ণ বিচ্ছিন্নতাবিদ্ধ আর্ত মানুষের অনমনীয় বিশ্বাস-মগ্নতায় কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তেই যা ফেটে পড়তে পারে আবিষ্ট আন্দোলিত এক ইন্দ্রিয় তন্ময়তায়, পরম তৃপ্তি ও আত্মবিলীনতার এক বস্তু-রতি-সুখসারে।

বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন মন জ্যাজকে বিভিন্ন স্বভাবে জেনেছে ও দেখেছে। তার নিজস্ব জীবনরসে জারিয়ে এইসব বিচিত্র ধারণার সত্যামিথ্যাকে জ্যাজ পরিণত করেছে এক বালু-নিবন্ধ জগচ্চিন্তায়। তাই ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে এর তুলনা যেমন অর্থহীন, তেমনই অর্থহীন এর মধ্যে 'গণসংগীত' নামে ভৌতিক চীৎকার-শিল্পটিকে খোঁজা। জ্যাজ প্রসঙ্গে নানা ঝড় বয়ে গেছে। সেসব অজস্র জ্যাজ নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কিছু নেই।

কলামন্দিরে কৃষ্ণ বাউল ক্লার্ক টেরী ও স্নো উইলিয়মস এর অনুষ্ঠান

করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাঁদের পক্ষে বোঝা মুশকিল কী গভীর ও সুখকর একটি বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন বা রেহাই পেয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপগুলির মধ্যে অন্যতম হোলো ব্লুজ, জ্যাজ ও রক-এর ধারাবাহিকতা ও তার অন্তর্নিহিত ক্ষিপ্ত-দর্শন বা soul যাকে ঘিরে জেগে রয়েছে হৃদয়-শরীরে আবদ্ধ মানুষের ক্লান্তিহীন আত্মযুদ্ধ। ধ্বংসলোলুপ আত্মরতিপর বর্তমান সভ্যতা যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে এক করাল ভবিষ্যতের তিমিরে ঠিক তারই বিপরীত স্রোতে, শ্রম, নিষ্ঠা ও জাগতিক প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত ধরিত্রী-দর্শনে আলোকিত, এই সুধারস বহন করছে মানুষের অনশ্বর সৌন্দর্য। আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতির প্রত্যেকটি শিল্প-আন্দোলন এই মহাসংগীতধারায় কাছে ঋণী: চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক, যা-ই ধরা যাক না কেন। সেই অর্থে এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীটি অভূতপূর্ব এক আধুনিক জীবনশিল্প। একটি গতিশীল দার্শনিক উপলব্ধির এমন বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষ ও মানবিক অভিজ্ঞতা বর্তমান পৃথিবীর আর কোনো শিল্পে আমরা পেয়েছি কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ থাকতে পারে কারো কারো. অন্তত এই নিবন্ধ রচয়িতার আছে। যে-কোনো জ্যাজ-অনুসন্ধিৎসু পাঠক তার ইতিহাস ও সমালোচনার শুধু কয়েকটি ব্যাপারে পাঠককে সতর্ক করে দিতে চাই। জ্যাজ একটি ক্রমান্বিত বিবর্তন। এই শতাব্দীর শুরুর বাঁকে কৃষ্ণ-আমেরিকান দাসদাসীদের শ্রমক্লান্ত নিগৃহীত মুহূর্তমালার অবসাদ ও অস্পষ্ট মুক্তির স্বপ্ন এর পিতা। আদি জন্মভূমি আফ্রিকার স্বতোৎসারিত ছন্দরাগ ও স্মৃতি-বিস্মৃতি আহ্লাদিত আকুল ইন্দ্রিয়বোধ এর মা। আর ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে ক্রমশ ভীড় করেছে কলকারখানা, গির্জে, শহরের খানাখন্দ অলিগলি, অসুখ-বিসুখ, চোরাগোপ্তা, আগুনজল অর্থাৎ কড়া হুইস্কি, দিনের পর দিন অমানুষিক লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ, যা-কিছু ছুঁলে বা আঘাত করলে সুর বা ছন্দ জেগে ওঠে তাকেই ব্যবহার করা: ফলে কাঠ, লোহা, টিন, তার টেনে ছেড়ে দেওয়া, বোতল চামচ, বড় ঠাসা তুলোর বলে ধুপ ধুপ ঘুসি যা-ইচ্ছে যা-প্রাণ-চায় তারই ব্যবহার; পিয়ানো, বেহালা, শিঙা কয়েকরকমের, সানাই দু-একরকমের, বাঁশী ও তার কিছু হেরফের, খাদের জগতে গভীর পুলকে বিচরণ করা এক ধরনের দানব তারযন্ত্র, দু-তিন ধাঁচের গীটার আর নানা জাতের ঢাক, দামামা ও ডুবকী ইত্যাদি ছাড়াও পৃথিবীর যে-কোনো বাজনা জ্যাজ-এ ব্যবহৃত হতে পারে যদি প্রয়োজন ঘটে।

এই বিবর্তনের সুযোগ নিয়ে একদল সমালোচক বেশ জাঁকিয়ে বলতে শুরু করেছেন যে বর্ণবিদ্বেষের

পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে জ্যাজকে একটি সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশে রেখেই দেখতে হবে। শ্বেতশুভ্র পাশ্চাত্য সভ্যতায় কেউ কেউ যে বর্ণ-কোলাকুলির পুঁথিগত উন্মাদনাকে বাস্তব সত্য হিসেবে চালাবার ব্যগ্রতায় এভাবে রাতকে দিন বানাতে চাইবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রসঙ্গটা সোজাসুজি অত্যাচার ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্তর্জাগতিক প্রতিবাদ। আর, অন্তত আমেরিকায় কৃষ্ণ-আমেরিকানরাই ভুক্তভোগী হিসেবে এই প্রতিবাদের অন্যতম ভাষা গড়ে তুলেছেন জ্যাজ অনুষঙ্গগুলির মধ্যে। আগাগোড়াই কিছু কিছু শুভ্র আমেরিকান শিল্পী সেই প্রতিবাদের কৃষ্ণ কাঠামো দিয়ে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জ্যাজ-এর ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষের ব্যাপারটা 'ভুলে যাওয়া' বলা যতো সহজ কাজ ততো সহজ নয়। পনেরো-কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত ইওরোপের রাজা-রানীদের দরবারে 'উচ্চ প্রশংসা'-প্রাপ্ত রীতিমতো

বিখ্যাত জ্যাজশিল্পীরা নিয়মিত প্রত্যাখ্যাত হতেন হোটেলের ঘর চেয়ে। এখনও আমেরিকার দারুণ-দক্ষিণে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বর্ণবিদ্বেষের স্থূল-সূক্ষ্ম-নির্বিশেষে যে-কোনো ধরনের প্রকাশকে ঘৃণা করার অভিজ্ঞতা থেকেই একজন শ্বেতাঙ্গ জ্যাজ-শিল্পীর সহজ পাঠ শুরু হয়। যুদ্ধ-বিরোধী জ্যাজ রক, আলোক-মাতাল অ্যাসিড রক, পোলান্ডের জীবনোৎসব জ্যাজ ও ঋদ্ধি-রক সেই সহজ পাঠেরই অনিবার্য আঙ্গিক ও অনুভূতিগত ফলশ্রুতি। এরই সমান্তরাল ঘূর্ণীপথে, এই তো সেদিন, ১৯৫৬ সালে রোজা পার্কস, মন্টগোমারী, আলাবামায়, বাসের পেছন দিকে গিয়ে বসতে অস্বীকার করার একটি আপাত-তুচ্ছ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ঘটিয়ে আমেরিকার সাম্প্রতিক বর্ণবিদ্বেষ-এর ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাই উল্টিয়ে দিলেন। তার ঠিক ন'বছর পর নিউ ইয়র্ক-এর হার্লেমপাড়ায় বীভৎস দাঙ্গা। তারপর একে একে : ম্যালকম এক্স হত্যা, স্টোক কারমাইকেল, এল্ডরিজ ক্লিভার, হিউজ নিউটন, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস এবং কবি লি রয় জোনসের পৌরোহিত্যে কৃষ্ণশক্তির জাগরণ, মার্টিন লুথার কিঙ্ হত্যা, কৃষ্ণ-মরাল আন্দোলন, ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে কৃষ্ণ-সংস্কৃতির উত্তরোত্তর সক্রিয় ভূমিকা, শুধুমাত্র ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা বা এলভিস প্রিসলে নয়, ব্লুজ-জ্যাজ-রক-এর সঙ্গে মিশে গেল প্রবল এক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ-ঝাঁকুনী : বীটলস, রোলিং স্টোনস, ডোরস, বব ডিলান, জেনিস জপলিন, আর্লো গাথরি জিমি হেনড্রিকস, গ্রেস স্লিক ইত্যাদি অসংখ্য শ্বেতবর্ণের চারণের দল। জ্যাজ কিন্তু আর থাকলো না রাজকীয় দরবারে উপঢৌকন কূটনৈতিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উপহার শিল্পোন্নত নগর সভ্যতায় বিবেক-মোচনের চর্চাকেন্দ্র, ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন কিম্বা চতুর্দিকে ভাঙা বোতলের টুকরো আর লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালে যন্ত্রপাতি ছড়ানো ঘেটো-কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম-আর্তির বোবা অভিজ্ঞান। শুধুমাত্র আমেরিকার অধিকার-রক্ষা আন্দোলনই নয়, উন্মোচিত আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান সংঘারামও ব্লুজ-জ্যাজ-রক-এর সুর-সমুদ্রের এক গহিন কৃষ্ণ-চারিত্রিক গভীরতা। এই গভীরতাই ফুটিয়ে তোলে জ্যাজএর বিশ্বমুখীনতা, মহাসাঙ্গীতিকতা ও স্বপ্ন-প্রতিরোধী বস্তু-সত্যতা।

আসলে শাদা-কালোর এই বিরোধ-আগ্রাসী বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত থাকে বৈষম্য-ঘাতক মৈত্রী-বোধের এক লোক-নিবন্ধ খনিজ-দর্শন। ভূগর্ভ-দর্শনও বলা যেতে পারে তাকে। বিচ্ছিন্নতার পর্বতমালাগুলি তার ভয়ে কতোদূর ভীত তা খুব শক্ত নয় লক্ষ্য করা। জ্যাজ-এর সাম্প্রতিক জগৎ-প্লাবিত স্বীকৃতিই তার অন্যতম প্রমাণ। আর কে না জানে যে 'বিচ্ছিন্নতাই আধুনিক বিশ্বমানসের পরিচয়' এহেন দ্রুত বার্তা রটে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি জাঁকালো সংবাদ-স্রোতের মাধ্যমে! শুধুমাত্র ধনতন্ত্রী সভ্যতাই নয় সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাও নিপুণ রক্ষণ-শীলতার মাধ্যমে ত্রাতা করে রেখেছিল জ্যাজ-এর এই বিপর্যয়কর স্বাধিকার প্রমত্ততাকে। এই দুই মানব-গোষ্ঠীর পালক-সমাজ যথাক্রমে মনে করে এসেছেন জ্যাজ অশিক্ষিত এঁদো-গলির মজাদার ক্ষ্যাপা-চার্টান অথবা দুলালী ঘরের অনুমোদন-পঙ্ক চ্যাংড়ামি। এই মুহূর্তে গদার-কাপ্রা কামু-সার্ত্র-দস্তয়ভস্কি, পেলে লুসুন-অ্যালেক্স হেইলি এবং 'তৃতীয় বিশ্ব' নামক জয়নগরের মোয়া আচ্ছাদিত কলকাতা-কালচারে জ্যাজ-কে অপসংস্কৃতির বাহক ঠাওরাবার মতো ব্যক্তির অভাব নেই, কি প্রগতি কি প্রতিক্রিয়া কো শিবিরমে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটা নাগাদ ইউ-নাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে একটি ছোট্ট মিলন-সভার আয়োজন করেছিলেন। জন চার-পাঁচ সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ক্লার্ক টেরী ও তাঁর জলি জায়ান্টস এবং অতিথিশিল্পী জো উইলিয়ামস-এর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। তার আগের সন্ধ্যায় জ্যাজ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবের প্রধান আসর ডালহাউসি ইনস্টিটিউটে পোলান্ডের নামিস্লাভস্কি কোয়ার্টেট এবং নিয়েমেন কোয়ার্টেট তাঁদের উৎসব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় সকলকেই কুপোকাৎ করে ফেলেন। পরের দিন সেই ঘোর নিয়েই আমেরিকান জ্যাজ শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হতে যাই। স্মৃতিতে ভিড় করতে থাকে শিকাগোর বিপজ্জনক এলাকায় 'পেপার লাউঞ্জ' নামক অন্ধকূপ বার-এর ঠাসা উষ্ণ রাত্রি-উন্মথিত মানবিক পরিবেশে রে চার্লস, মাডি ওয়াটারস, বিগ জো উইলিয়াস (যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তিনি নন) ও জ্যাক এলিয়ট-এর ভয়-উত্তেজনা-আনন্দ-ক্রোধ-একাকীত্ব ও অধরা সংঘবোধে উৎক্ষিপ্ত প্রচণ্ড জ্যাজ তুলকালাম ; ওল্ড টাউনের বিভিন্ন বার-এ সারা রাতের বিনোদন অনুষ্ঠান সেরে এঁদের অনেকেই কোনো কোনো দিন চলে আসতেন অতি সাধারণ 'পুওর রিচার্ডস' বার-এ ক্লান্ত অবসন্ন হৃদয়-শরীরের সেই সব সাঙ্গীতিক খাঁড়ি-পথ-যাত্রা : ১৯৬৮-র এক হিমালয়-পিষ্ট বিকেলে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার ছোট্ট একটি বিশ্ববিদ্যালয়-শহরের বাইরে কারখানা-গুদোম ছড়ানো এক শিল্পাঞ্চলে. সকালে মার্টিন লুথার কিঙ-এর নিহত হবার খবর এসেছে, উৎপাদন-সেবী সমাজের সমস্ত 'কাজকর্ম', সুপার মার্কেট, অফিস, বার, টেলিভিশন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই এই খবর ধুলোর মতো এসে পৌঁছেছে কিন্তু কাউকেই প্রত্যক্ষভাবে বিচলিত হতে দেখিনি. ফলে এই আবেগপ্রবণ বঙ্গসন্তান একা একা ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছি এই এলাকায়। অকস্মাৎ দেখা গেল হাজার খানেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কৃষ্ণ-আমেরিকানদের একটি শোক-শোভাযাত্রা হাউমাউ করে মড়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে, মানুষের শোকগাথা হিসেবে জ্যাজের একটি উৎসকে সেদিন আশীর্বাদতুল্য জেনেছিলাম। এইসব অনুষঙ্গ অকারণে ভীড় করছিলো মনের মধ্যে। জো উইলিয়মস

বললেন 'জ্যাজ চোখবুজে শুনতে হবে'। বুঝতে পারছি অন্তর্দৃষ্টির কথা বলছেন কিন্তু ওঁকে বলা হোলো না যে ওই অন্তর্দৃষ্টি জন্ম নেয় জাগ্রত পার্থিব অবলোকান থেকেই। মমীভূত রেকর্ড জ্যাজ-এর যে আস্বাদন দেয় তাকে বিমূর্ততার পথযাত্রী এক ভাববিধুর সাঙ্গীতিক আরাধনা ছাড়া আর কী বলা যায়? এটা নিশ্চিত জানি জো উইলিয়মস জ্যাজকে আরো সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সম্মান কি জ্যাজ-এর প্রয়োজন? জ্যাজ একটি উপস্থাপিত বক্তব্য, তার মধ্যে দৃশ্য পরিমণ্ডলের আভাস একটি বিশেষ অভিঘাত। নৃত্য, খণ্ড-নাট্য রসিকতা ইত্যাদি নানা শারীরিক ছন্দ জ্যাজ-এর প্রাণ। সে-সব মিলিয়ে আমরা যা পাই তা হোলো অভিজ্ঞতার এক ঘটমান চেহারা। তবেই তার ঝাঁকুনি সক্ষমভাবে আমাদের বিপর্যস্ত করে। যেমন আগের দিন করেছিল পোলিশ জ্যাজ। সবুজ চিকনের পাঞ্জাবি পরা নিয়মের সেদিন বাজপাখির মতো আকাশে ঘুরে ঘুরে গেয়েছেন। বিশেষ করে 'তীর্থযাত্রী' অংশে আজেরবাইজানী সুরের ব্যবহার, পাহাড়ে পাহাড়ে দিশেহারা সেই এশিয়া মাইনরী তীব্র গোঙানি ভোলার নয়। ড্রামার, জেরিজ দ্রিয়েমস্কি বলেন : আমাদের পায়ের তলায় মাটি আর মাথার ওপরে আকাশ। আর কী চাই! জবিগনিউ নামিস্লাভস্কি তাঁর আগের শিল্পীর মতো ছিন্নবাধা বালক নন, বরং একটু স্থিতধী ও সুর-সংগঠনের সাধক। নিয়েমন-এর বিচরণ অশান্ত, নামিস্লাভস্কি উদ্বিগ্নচিত্তে সাপুড়ের একাগ্রতায় গড়ে তোলেন কয়েকটি পাতা ঝরার দিন, তাঁর আলতো স্যাক্সোফোন এমন এক নির্লিপ্ত আনে যাকে ঝড়ের পূর্বাভাস বলা যায়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নির্লিপ্ত বস্তু অবগাহন যেমন জ্যাজ-এর, তেমনি ব্রেশট-গ্রটাউস্কি প্রস্তাবিত বিশ্লেষণী সম্পৃক্ততারও উত্তরসূরী। পোলাণ্ডের জ্যাজসাধকেরা জানেন যে অবমাননার অভিজ্ঞতা আমেরিকান জ্যাজ সাধকদের মতো অর্জন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকেছেন বিশ্ব-জাগতিক অবমাননা ও ভূমিমাত্রিক লোক-রস-সম্ভারের বিশ্লেষণী রূপান্তরের দিকে। স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতাকে তাঁরা যথেচ্ছ ব্যবহার করেন না—বারবারই ফিরে আসেন অতৃপ্ত শিক্ষার্থীর মতো বারোপর্বের লৌকিক সুরছন্দটির খুঁটির কাছে। দর্শক-শ্রোতার 'আরো আরো' অনুরোধের উত্তরে নামিস্লাভস্কি বাজান সোনি রলিনসের গান : 'কেমন সুন্দরী, না?' এমন সংযুক্ত ভালোবাসা ও দান-বুভুক্ষু গানে তাঁর নির্লিপ্ত তো একটু টলবেই। কিন্তু কী অসহায়ভাবে সুন্দর সেই সংযম-হারানোর আকুলতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি পোলাণ্ডের উদ্দাম পরীক্ষামূলক জ্যাজ শিল্পীদের দল ল্যাবরেটোরিয়ম উৎসব শেষ করলেন তাঁদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতি মেশানো অফুরন্ত সম্ভাবনাস্পৃষ্ট চৈতনা আরতি দিয়ে। এঁদের পুরোহিত ছিলেন গায়ক ও আলতো স্যাক্সোফোন বাদক মারেক স্ট্রিজোউস্কি এবং এঁদের অধিকাংশ সংগীতাংশের রচয়িতা জানুস গরজিওয়াচ। মারেকের গলা মানুষের শৈশব-স্বর্গকে দিকে দিকে উদ্ভাসিত করে, তার আগ্রহ, কৌতূহল ও রূপাকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর অন্তর্নিহিত মানবশক্তিরই অন্য এক পরিচয়। উদ্যোক্তারা তাঁদের পুস্তিকায় ঠিকই লিখেছেন : মারেক ভবিষ্যতের জ্যাজ কন্ঠজগতে একটি নতুন দেশ গড়ে তুলতে চলেছেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল নরওয়ের ক্যারেন ক্রগ ও তাঁর ট্রায়োর কয়েকটি ব্লুজ গানে। পোলিশ জ্যাজ-এর দিগন্ত অভিসারী চিররাখাল মানুষ ক্যারেনের গাওয়া বিলি হলিডের দুটি গানের মধ্যে নিটোল সাংসারিক অপার্থিবতা পায়। 'বাবা-র হতে পারে, মা-র হতে পারে, কিন্তু শিশু ঠিকই পেয়ে যায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ' এবং 'কার বাপের কী, আমি যদি রোববার সকালে গির্জেয় যাই আর সোমবার রাত্তিরে মাল খেয়ে রাস্তায় গড়াই, তাতে কার বাপের কী' এই বিখ্যাত ব্লুজ গান দুটি ক্যারেন গেয়েছেন তাঁর আধুনিক জীবনবোধ থেকে। শুধুমাত্র সশ্রদ্ধ ও সক্ষম ঐতিহ্য-প্রণাম নয়, কোনো ভবিতব্য-কাতরতা তো নয়ই, বিলি হলি ডে-র অনড় শুদ্ধতাকে ক্যারেন পরিণত করেছেন এক ধাবমান ফল্গু-বিদ্রোহে, অথচ তা ঘরোয়া, আটপৌরে ও সহিত-কামনায় টইটম্বুর। ক্যারেনের স্নিগ্ধতা আমেরিকার জোনি মিচেলকে মনে পড়িয়ে দেয়। তৃতীয় দিনের আসর বসেছিল কলামন্দিরে। এটিই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে সকলে ধরে নিয়েছিলেন সম্ভবত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ আমেরিকান জ্যাজশিল্পীদের অনুষ্ঠান বলে। ক্লার্ক টেরী ও তাঁর জলি জায়াণ্টস এবং জো উইলিয়মস অবশ্যই আমেরিকান জ্যাজ-এর প্রফুল্ল সংবেদনটিকেই বেশি প্রকাশ করেছিলেন তার ভুয়োদর্শনের দিকটির চেয়ে। আমরা আনন্দ পেয়েছি কিন্তু অতৃপ্ত থেকেছি। ক্লার্ক টেরী অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে তিরিশের যুগের আচ্ছন্ন অনুভব দিয়ে শুরু করেন, ডিউক এলিংটনের 'স্যাটিন পুতুল' যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মাইলস ডেভিসের 'সব কিছুই ব্লুজ' অংশটিতে ক্লার্ক ও তাঁর বাস বা পূর্বে উল্লিখিত খাদের তারযন্ত্র বাদক ভিক্টর স্প্রোলস সুরের যে নাভি-কেন্দ্র সৃষ্টি করছিলেন সেই সন্ধ্যায় তার আর কোনো অনুসরণ হোলো না। ক্লার্ক তাঁর 'আবোল-তাবোল ব্লুজ' গেয়েও সেই কেন্দ্রটিকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। অথচ ক্লার্ক তাঁর শিঙা বাজিয়েছেন প্রাণ ঢেলে আলতো স্যাক্সো ক্রিস উড, পিয়ানোতে হিলটন রুইস ড্রামে এড সফ এবং নারদীয় তন্ত্রী ঝংকারে ভিক্টর আমেরিকান জ্যাজ-এর মৌলিক পথচারী মানদণ্ডটিকে ঠিকই উপস্থিত করেন। কেবল বিশেষ ধূলি-তীক্ষ্ন সংলাপটি যেন ওই 'সব কিছুই ব্লুজ' গানটিতে ঝলসে উঠে হারিয়ে গেল। দ্বিতীয় অংশে দীর্ঘকায় জো উইলিয়মস-এর অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ঘাঘু জ্যাজ অনুরাগীদের প্রিয় একটি অভিব্যক্তি মনে পড়লো : ষণ্ডটা বেরোবে কখন, When is the bull going to come out'—সমস্ত মানুষ অপেক্ষা করে আছে কখন এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ, বিস্মৃত জনপদ ছড়ানো, কন্ঠ সত্যিকারের একটি দার্শনিক লাফ মারবে। ঘটনাটি সেভাবে ঘটলো ন। জো উইলিয়মস কি লাস ভেগাস-এর বিনোদন-জগতে সুখে আছেন? মনে হোলো তা-ও সত্যি নয়। এই প্রবীণ শিক্ষকের কাছে কতো কিছু পাওয়ার ছিলো এবং আছেও। চতুর্থ দিনের বৃটিশ দল নিউক্লিয়াস সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে জ্যাজ কখনো নির্বীর্য শীতলতা ও তার গাণিতিক রোবট-রূপবন্ধে বিশ্বাস করে না। ইয়ান কার তাঁর 'শেষের সে দিন ভয়ংকর' মোটো-টিকে পরিত্যাগ করুন। তাঁর পিয়ানোবাদক জেয়ফ কাসল ছুটে বেরিয়ে আসেন এই শ্বাসরোধী ঠাণ্ডাঘর থেকে। জ্যাজ কাউকে দূরে সরিয়ে রাখে না, তার জগতে অবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। পঞ্চম দিনে ছিলেন সুইডেনের রিনারামা কোয়ার্টেট। তাঁরা পাগলের মতো ভারতীয় মার্গ সংগীতের সংগে বন্ধুতা করছেন, নিজেদের জীবনদৃষ্টি ক্ষুণ্ণ না করে। ফলে কোনো অস্বস্তিকর অনুষঙ্গের অস্তিত্ব এই বন্ধুত্বে নেই। এর থেকে কী ঘটতে পারে তা এখনো বোঝা মুশকিল। এই সীমান্তে এঁদের মতো দক্ষতা বিদেশে আমেরিকার স্যাণ্ড বুল ছাড়া আর তেমন দেখিনি।

পরিশেষে লুই বাঙ্কস ও তাঁর জ্যাজ ইণ্ডিয়া আসেবলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই তাঁদের সক্রিয় জ্যাজ চর্চার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনার জন্য। কলকাতা জাগতিক অর্থে একটি অন্যতম জ্যাজ শহর। এই শহরের মানসিকতায় জ্যাজ খুব সহজেই রোপিত হতে পারে যদি আমরা জ্যাজ-কে কোনো ঔপনিবেশিক বিনোদনী মনোভাবে না দেখতে শিখি। লুই তাঁর শিঙাবাদক বসকো অনসোরাটে ও ফ্র্যাংক দুবিয়েরের প্রতি আরো বেশি আস্থা রাখুন, এ-ও কামনা করি। কলকাতা লুই-এর এই পাথকৃৎ-প্রচেষ্টার কাছে ঋণী থাকল। পুনশ্চঃ উইলিস কনোভর অনুষ্ঠান উদ্গাতা হিসেবে পাশ্চাত্যে সফল হতে পারেন প্রাচ্যে অচল। যে জীবনবোধ থেকে প্রাচ্য-মানস জ্যাজ-এর দিকে এগিয়ে আসছে তার সংগে শ্রীকনোভর পরিচিত নন।

বক্সিংয়ে ইন্দ্রপতন

বক্সিং ইতিহাসে ১৯৭৮-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্সার মহম্মদ আলির খেতাব হারানোর কারণে। ওইদিন লাস ভেগাসে হিল্টন হোটেলের স্পোর্টস প্যাভিলিয়নে লিওন স্পিংকস নামে ২৪ বছর বয়সী এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা আলিকে হারিয়ে হেভিওয়েট বক্সিংয়ের বিশ্ব খেতাব ছিনিয়ে নেয়। বজ্রাহতের মত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় আলির সমর্থক ও অনুরাগীরা। কারণ তাদের ধারণা ছিল এই গ্রহের কোনো মুষ্টিযোদ্ধার হাতে মহামুষ্টিক মহম্মদ আলির পরাজয় ঘটতে পারে না।

কে এই লিওন স্পিংকস ? অ্যামেচার জীবনে আলির মতই লাইট হেভি ওয়েটের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। আলি জিতেছিল রোম অলিম্পিকে, স্পিংকস গতবার মণ্ট্রিয়লে। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ জগতে অ্যামেচারদের পরিচিতি অত্যন্ত সীমায়িত। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন মিউনিখ ও মণ্ট্রিয়ল অলিম্পিকের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন কিউবার টিওফলো স্টিভেনসন। এবং যে কারণে স্টিভেনসনের বিশ্বখ্যাতি সে কারণও আলাদা। যাই হোক, স্পিংকসের পেশাদার বক্সিংয়ে কোন পরিচয় ছিল না। অ্যামেচার থেকে প্রোফেশনাল বক্সিংয়ে এসেও এর আগে লড়েছে মাত্র ৭টি ফাইট। ৭টির মধ্যে আবার মাত্র দুটিতে ১০ রাউন্ড করে। সেই স্পিংকস লড়ল ১৫ রাউণ্ড। অমিতবিক্রমে এবং শেষ রাউণ্ডে আলিকে নক আউট করার উপক্রম করে শেষ পর্যন্ত জিতল পয়েণ্টে।

দুজনই মার্কিন মুলুকের কৃষ্ণকায় মুষ্টিযোদ্ধা। আলি লুইসভিলের অধিবাসী, স্পিংকস সেণ্ট লুইয়ের। বয়সটা অনেক কম বলে স্পিংকস তারুণ্যের তেজে দীপ্যমান। দেহের ওজন অনেক বেশি বলে আলির বাড়তি সুবিধা পাবার কথা। আগেই লিখেছি, লিওন স্পিংকস ২৪ বছরের তরুণ, আলির বয়স ৩৬। স্পিংকসের দেহের ওজন ১৯৭½ পাউণ্ড, আলির ২২৪½ পাউণ্ড।

বছর দেড়েক আগে আলি রজবআলি নামে এক বক্সিং প্রেমিক মহম্মদ আলিকে উদ্দেশ করে এক খোলা চিঠি লিখেছিলেন। এই রজবআলিকে বক্সার মহম্মদ আলির হিতৈষী বলা যেতে পারে। আবার সমালোচকও বলা যেতে পারে। চিঠির ভাষা ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ভাব বক্সিং প্রেমে ব্যঞ্জনাময় এবং বিষয়বস্তু সতর্কবাণী। অর্থাৎ মহম্মদ আলিকে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—এখনই যদি অবসর গ্রহণ না কর তবে বক্সিংসাম্রাজ্য থেকে তোমার সিংহাসন-চ্যুতি অবধারিত।

চিঠির মর্ম এই রকম : "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুষ্ট্যাঘাতে যেসব বক্সারের নাক ভেঙেছে তারা দীর্ঘকাল ধরে খেতাব আঁকড়ে রাখতে পেরেছে। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এর ভূরিভূরি নজির রয়েছে। যেমন রকি মার্সিয়ানো ভেঙেছিল আর্চিমুরের নাক। মার্সিয়ানোর নাক ভেঙেছিল জো লুইয়ের ঘুষিতে। ম্যাক্স স্মেলিংয়ের ঘুষিতে জোলুইয়ের জ্যাক শার্কের মুষ্ট্যাঘাতে স্মেলিংয়ের জ্যাক ডেম্পসির বজ্রমুষ্টিতে শার্কের এবং জেস উইলার্ডের ঘুষির চোটে ডেম্পসির নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছিল। সবাই বক্সিং জগতের বিস্ময় জাগানো নাম। প্রায় ১৫ বছর আগে আর্চি মুর তোমার নাক ভাঙার পর থেকে তোমার উত্থান।

কিন্তু কতদিন খেতাব ধরে রাখা সম্ভব ? তুমি কি দীর্ঘদিন ধরে রাখনি ? যদিও সারা পৃথিবী তোমার লড়াই দেখার জন্য পাগল, তোমার কথা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং রিংয়ের উপর তোমার আবির্ভাব সম্ভাবনা বিশ্বসংবাদ, তবু তোমার অবসর নেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বলতো খেতাবী লড়াই তোমার চেয়ে আর কে বেশি লড়েছে ? ব্রাউন বম্বার (জো লুই) অবশ্য ব্যতিক্রম। তার ফলও ফলেছিল। হাতেনাতে ফল পাবার তোমারও দিনও আগত।

তুমি বলতে—আই ফ্লোট লাইক এ বাটারফ্লাই অ্যাণ্ড স্টিং লাইক এ বী। এখন অনেকে বলে—ইউ স্টিং লাইক এ বাটারফ্লাই অ্যাণ্ড ফ্লোট লাইক এ বী। বড়ই দুঃখের কথা। তোমার বয়স এখন চৌত্রিশ। হাতের সেই চমক আর নেই। ঘুষির জোর কমে গেছে। একটু মন্থরও হয়ে পড়েছ। তুমি এখন হাঁসপা হয়ে চল এবং তোমার অনেক ঘুষিই হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট, হাওয়ামুখী। এমন একসময় ছিল যখন তোমাকে নক আউট করার জন্য ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ধাবিত ট্রাকের প্রয়োজন হত। অচিরে মন্দগতির স্কুটারের ধাক্কায় হয়তো তুমি মুখ থুবড়ে পড়বে। চার বছর আগে কেন নর্টনের আপারকাটে তোমার চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল। দুমাস আগে জিমি ইয়ংয়ের হুক তোমার কানের একটি পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছে। গত মাসে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারনি। মানুষরূপী

চোয়ালে স্পিংকসের ডানহাতের ঘুষি খেয়ে আলি কাহিল

একটা পর্বত এসেছিল মহম্মদের কাছে। নাম অ্যাণ্টোনিও ইনোকি। তুমি স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বরের সঙ্গে বলেছিলে পর্বত ধ্বংস করে ফেলবে। মুষ্টি-কুস্তির ওই লড়াইয়ে তুমি কতটুকু কেরামতি দেখিয়েছ ? বিশ্বজয়ী বক্সার হয়েও কেন গিয়েছিলে বক্সিংয়ের প্রহসন করতে ? রাশি রাশি ডলারের জন্য নয় কি ?

তোমার মুষ্টির জোরেই তুমি মহাবলীর শিরোপা পেয়েছ। লিস্টন, কুপার, ফোরম্যান, বাগনার, নর্টন, ফ্রেজিয়ার প্রভৃতিকে হারিয়ে তুমি যেমন বারবার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছ, তেমন ডলারের ডালিতে পূর্ণ করেছ তোমার কোষাগার। ফেঁপে ফুলে উঠে এখন সে কোষাগার ফেটে যাবার উপক্রম। বলতো কত অর্থ উপার্জন করেছ বক্সিং থেকে ? নিশ্চয়ই কম করে ৫০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪০ কোটি টাকা)। তোমার আরো চাই। চাহিদার শেষ নেই। তাই বার বার অবসর নেবার কথা বলে আবার লড়াইয়ে ফিরে আসছ। মুষ্টিযুদ্ধের মর্যাদা নষ্ট করে মুষ্টি-কুস্তিতে নেমে পড়েছ।

কিন্তু আর কতকাল এভাবে চালাবে ? মুষ্টি-যুদ্ধের ইতিহাস বলছে, হেভিওয়েটের মাত্র ৪ জন বক্সার—জেমস জেফারিস, জেনি টুনে, জো লুই এবং রকি মার্সিয়ানো অপরাজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে অবসর নিয়েছিল। এদের মধ্যে টুনে এবং মার্সিয়ানোই অপরাজিত থেকে গেছে। অর্থের প্রলোভনে জো লুই ও জেফারিসকে আবার রিংয়ে ফিরে এসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এরাও তো ছিল বক্সিং জগতের বিস্ময়। আকাশছোঁয়া আত্মবিশ্বাস এবং অন্তহীন প্রলোভন হয়তো অচিরে তোমারও পতন ডেকে আনবে।"

দেড় বছর আগে আলি রজবআলি যে আশংকা করেছিলেন সেটাই ফলে গেল। বক্সিং জগতে ইন্দ্র-পতন ঘটে গেল। শেষ হয়ে গেল প্রবাদ-পুরুষের গরিমার দিন। আর কি ফিরে আসবে ?

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

আঁকন বাঁকন। সরল দে। ভারতী, প্রকাশ, ৮১/৩এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা—৭০০০৪৭। তিন টাকা।

সরলতাই সরল দে-র ছড়াগুলির অন্যতম গুণ। ছোটদের ছড়া মাত্রেরই তাই। উদ্ভট হোক, খাপছাড়া বা ছমছড়া হোক, তাকে আগে অকপট হতে হবে। ছোটদের স্বতস্ফূর্ত প্রাণের কথাকে, অনাবিল কৌতূহল ও আনন্দ-বিস্ময়কে একছড়া কাব্যধর্মী বাক্যের স্পন্দনে জীবন্ত করে তোলা ছড়ার কাজ। সেই কাজটি 'আঁকন বাঁকন'-এ অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। ছবিকে গানে বাজানো ছড়ার আর একটি কর্তব্য। ছোটরা ছড়ার ভেতর দিয়েই ছবি পড়তে শেখে। আবৃত্তিপ্রবণতা শিশুর আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপ। ছড়ার মধ্যে এই ব্যাপারটি প্রচ্ছন্ন শিল্পবোধের সাহায্যে একটি পরিণতির দিকে এগোয়। তার অভিজ্ঞতার জগৎকে ছড়াব্যাপ্ত ও নিবিড় করে দেয়। শিশুমনের বোধাদয় ও বর্ণপরিচয় না ঘটলে একজন বড় কবির পক্ষেও ছোটদের ছড়া লেখা প্রায় অসম্ভব। সরল দে-র সরলপ্রাণ ছড়াগুলির মধ্যে ছোটরা নিজেদের কথা কিছু কিছু খুঁজে পাবে। তাঁর 'টোন দিয়েছি টোন দিয়েছি', 'কু ঝিক ঝিক নদী,' 'আকাশ,' 'হাট,' 'গল্পামণি কাকাক,', 'অম্বা', 'কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং', 'কাকতাড়ুয়া,' প্রভৃতি দেখানো পুলিশ' এই কারণেই আমাদের ভাল লেগেছে। ছড়ার মধ্যে উদ্ভট এবং মিলের চমক দুইই বৈচিত্র্য আনে।

> দুই দিকে দুই হাত ছড়ানো
> ঠ্যাং বাড়ানো লম্বা।
> চোখ গোল গোল নাকটা বাঁড়
> কান দুটো কি বম্বা।

এখানে শেষ শব্দটা বেশ লাগসই হয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই।—

> আঁকবো না তোর খাঁচা
> আঁকবো না পুই মাচা
> ও পাখি তোর জন্য উধাও
> আকাশ এঁকে রাখি॥

এখানে এই 'উধাও' শব্দটা, আমাদের মনে হয়েছে, ছোটদের ছড়ার হাত ছাড়িয়ে চলে গেছে। ছোটদের জগতের এই সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকলে সরল দে ভবিষ্যতে ছোটদের আরও মনের মত হতে পারবে বলে মনে হয়। একই ছত্র বা ছত্রাংশের ব্যবহার একাধিক ছড়ার মধ্যে না করলেই ভাল হত। 'আঁকন বাঁকন'-এর উনিশটি ছড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি উপভোগ্য।

আনন্দ বাগচী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি নাটক

অন্য কথামালা

বাংলায় মৌলিক নাটকের অভাব। তাই বলে যেন তেন মৌলিক নাটক মাত্রেই কি শাশ্বত? গল্প বলতে

র‍্যানব্যাক্সি'র গার্লিক পার্লস্-এ

সর্বাত্মক স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃতই কার্য্যকর এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পন্থা হিসাবে বহুকাল থেকে কাঁচা রসুন স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছে।

"রসুনের তেলের ক্যাপসুল . . . রোগ নির্মূলকারক রসুনের কোয়ার সমস্ত উপাদান এর মধ্যে রয়েছে . . . রক্তকে সতেজ করে, রক্ত শোধন করে, হজমশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে . . . ফুসফুসের রোগ . . . সবরকম অন্ত্রীয় গোলযোগ, ক্ষুদামান্দ্য প্রভৃতির জন্য সুপারিশ করা হয় . . ." ডাঃ কে. এম. নাদকার্ণির ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা।

রন্ধনের সময় রসুনের কয়েকটি অনবদ্য গুণ নষ্ট হয়ে যায়। র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্ল্স্-এ রয়েছে কাঁচা রসুনের বিশুদ্ধ আরক এবং রসুনের প্রকৃতিদত্ত সবক'টি গুণ।

- কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ সুসংহত রাখে এবং উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া দমন করে।
- পেটের বায়ু নিরোধ করে এবং হজমশক্তি বাড়ায় ও লিভারের কার্য্যক্ষমতার উন্নতি করে।
- পুরোনো কাশি, সর্দ্দি ও ফ্লু-কে নিরাময় করে।
- রক্তের অশুদ্ধতা দূর করে, ব্রণ, কালসিটে ও কালোদাগ পরিষ্কার ক'রে, ত্বককে সুস্থ ও মসৃণ রাখে।

গার্লিক পার্লস্—গন্ধ বাদে রসুনের সব গুণ। খাবার আগে, ১টি কিম্বা ২টি মুক্তদানা (পার্লস্) খেলে, আপনি বহুদিক থেকে উপকার পাবেন প্রাকৃতিক উপায়ে।

র‍্যানব্যাক্সির গার্লিক পার্লস্— সর্বাত্মক স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক উপায়।

ও একটা মুক্তমীয়ালা—আর গল্প
ল যদি কোন বক্তব্যকে বিস্তারিত
য়ে গল্পের কাঠামোর, সেটা করতে
নিপুণ আর্টিস্ট-এর কাজ।
তার মুক্তোঙ্গল প্রদীপ বিশ্বাস
'অন্য কথামালা' প্রযোজনা
ছন। পূর্ববর্তী প্রযোজনা
লার যে প্রতিশ্রুতি দেখা
ছিল, 'অন্য কথামালায় সেই
য়ালা, আর্টিস্ট-এর নৈপুণ্য সবই
পশ্চিত—কেউ কথা রাখেনি।

নির্দেশক প্রদীপ বিশ্বাস হয়তো
ছিলেন অভিনয়রীতিকে বাস্তবিক
ত। কিন্তু এই ন্যাচারালিস্টিক
নয় কোন সময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়নি।
াহ রতন ভট্টাচার্য, শ্যামল চন্দ্র ও
প বিশ্বাস ছাড়া প্রায় সকলের
নয় বিবর্ণ, নীরক্ত, স্বাদহীন—
কালের ইলিশমাছের মত। নাটকের
সেক্রেটারির ভূমিকায় অশোক খণ
ধরনের বাস্তবিক অভিনয় বার্থ
কতটা খারাপ লাগতে পারে তার
রেণ হয়ে রইলেন। মহিলা চরিত্রে
দীপা রায় এই নিষ্প্রাণ অভিনয়-
র মধ্যে ব্যতিক্রম। অনেক যত্নে
ন চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়েছেন।
তু বাদ সেধেছে সংলাপ, তাই
বগে তাঁর বাচনভংগী সুন্দর হলেও
দও সেখানেও সংলাপ শুধুই ছেলে-
ুখী)। অন্যত্র রূঢ় বিরক্তি প্রকাশে
ক প্রথাগত হতেই হয়।

একটি সেটে সব কিছু দেখানোর
াকল্পনা অনেক সময় চরিত্রের
যাতায়াত কম্পোজিশনে গোলমাল
ঘটায়। শ্যামল চন্দ্রের মঞ্চ পরি-
কল্পনায় সব কিছু জড় করা হয়েছে।
প্রথম থেকে দুটি বেড়া দেখেই
বুঝেছিলাম, একটা আদালত-দৃশ্য
থাকবেই, সে আশা আমার শেষ দৃশ্যে
পূরণ হল। মাঝে মাঝে অনাবশ্যক-
ভাবে নেটের পেছনে অতীত ঘটনার
কিছু মূকাভিনয় দেখানো হয়েছে, যা
কোন মাত্রা যোগ করেনি, উপরন্তু
অনেক সময় হাসির খোরাক
যুগিয়েছে। নাটকের মাঝখানে একজন
পাড়ার মস্তান আসে। বর্তমান বাংলা
নাটকে মস্তানী সংলাপ বোধ হয়
রিলিফের সবচেয়ে জোরদার হাতিয়ার।
গল্প বলার ঢঙে নাটকটি সাজানোর
কোন অর্থই হয় না। কনিষ্ক সেনের
আলোর পরিকল্পনা মোটামুটি। এই
নাটকে উল্লেখযোগ্য আবহপ্রয়োগ।
কাশীনাথ রায়ের সুর ও নুটু চৌধুরীর
শব্দগ্রহণ বেশ ভাল। (প্রক্ষেপণ অনেক
জায়গায় এলোমেলো)। নেপথ্যে আত্ম-
কথনের অংশ খুব ভাল, কিন্তু গানটি
নয়। কথামালার কোন গল্পের সূত্রে এই
নাটকের নাম 'অন্য কথামালা' রাখা
হয়েছে কিনা জানি না। তবে খরগোশ
ও কচ্ছপের দৌড়ের গল্পটি স্বাভাবিক-
ভাবেই মনে পড়ে। দর্শকের মন
খরগোশের মত ছুটতে গিয়েও ঘুমিয়ে
পড়ে, নাটকটি কচ্ছপগতিতে চলতেই
থাকে এবং প্রায় দুই ঘন্টায় শেষ হয়।
কচ্ছপটি লক্ষ্যে পৌঁছনোর পর খর-
গোশের ঘুম ভাঙে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

Vim
Vim

4-in-1
Refill Pack
Vim
with super
foaming action

Dattaram-NP-23 M-Ben

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

মারওয়ান (১৯৩৪—)

জন্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর দামাস্কাসে। বর্তমানে বার্লিনের বাসিন্দা। জন্মসূত্রে সিরিয়ান, কিন্তু এখন পশ্চিম জার্মানীর নাগরিক। নয়াদিল্লির চতুর্থ শিল্পকলা ত্রৈবার্ষিকীতে তাঁর ছবি ভারতবর্ষে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

এই কাজটি (মুখ, ১৯৭৭' ক্যানভাসে ডিম টেম্পেরা ১৪৬×১১৪ সি এম, বর্তমানে আছে মিউনিসিপাল গ্যালারী, হাউস অবরহাউমানএ)। ছবিটি সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে ত্রিবার্ষিকীতে পশ্চিম জার্মানীর কাজ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। দুই জার্মানীর কাজের মধ্যে এবার মিল ধরা পড়েছে—মূলত একটি জার্মান জাতি এবং শিল্পকলার একই পরম্পরার শরিক সেটা বোঝা গেল।

জার্মান জাতির শিল্পকলা-ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। মধ্যযুগ হয়ে ডুয়েরার, হোলবিন হয়ে আধুনিক কালের অভিব্যক্তিবাদ (একসপ্রেসনিজম পর্যন্ত তার বৈচিত্র্য বৈপরীত্য প্রচুর। এসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। এই বিরাট ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যেরই শরিক ত্রৈবার্ষিকীতে অংশগ্রহণকারী জার্মান শিল্পীরা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বহিরাগত মারওয়ানও এই ধারায় অবগাহন করেছেন।

মোটামুটি দেখা যাচ্ছে শিল্পকলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী নৈরাজ্যের অবসানের লক্ষণ। খাস মার্কিন মুলুকে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ এবং তার পরবর্তী 'অপ' 'পপ' আর্ট হটে গেছে। চালাকি এবং ফাঁকিবাজির দিন যে বিগত ক্রমশ ভারতবর্ষীয় শিল্পীরা বুঝতে পারবেন।

দুজন নারীসহ পশ্চিম জার্মানীর মোট সাতজন 'বাস্তববাদী' শিল্পীর কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। তার মধ্যে ত্রৈবার্ষিকীতে পুরস্কৃত নারী ভাস্কর হেডে বিউল ছিলেন। বাদবাকী সবাই চিত্রকর। *ক্লাউস ভোগলেগেসাঙ সাধারণ আর রঙবেরঙের পেন্সিলে এঁকেছেন। জ্যান পিটার ট্রিপ এক্রালিক তৈল মাধ্যমে এবং জলরঙে অসাধারণ প্রতিকৃতি* দিয়েছিলেন। হ্যানস পিটার রয়টার তেলরঙে বড় বাড়ির করিডর, গির্জার অভ্যন্তরের জ্যামিতি নিয়ে খেলেছেন। ডিটমার উলরিখ তেল মাধ্যমে এক্রালিক ও তৈলচিত্রে মানুষের জীবন কেমন নৈর্ব্যক্তিক ও যান্ত্রিক হয়ে গেছে তা দেখিয়েছেন। ক্রিস্টিয়ানে মেটার চক এবং রঙীন পেন্সিল দিয়ে পাখির পরিত্যক্ত বাসা, পাথরের সিংহাসন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কল্পনার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। মারওয়ানই একমাত্র ডিম্ব টেম্পেরায় বড় বড় পটে মুখ এঁকেছেন।

জীবন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাবার ফলে মানবিক সম্পর্কগুলি যান্ত্রিক হয়ে গেছে। এসবের জন্য জটিল অবক্ষয় মানুষের বাইরে ভেতরে। ফোটো বাস্তববাদের নিখুঁতত্ব থেকে প্রতীকী কাজ, মিলিয়ে মিলিয়ে সূক্ষ্ম তুলি চালানো থেকে, তুলিকে অনিয়ন্ত্রিত জোরালো ব্যবহার, পেন্সিল, খাড়ি— মাধ্যম যাই হোক দারুণ দক্ষ এঁরা। এবারে দক্ষ কাজ প্রায় সব দেশ দিয়েছিল বিশেষত জাপান। মুন্সীয়ানা এবং রস সবচেয়ে বেশি ছিল অবশ্য

যুগোস্লাভিয়ার কাজে। এর পরেই বোধ হয় জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীর স্থান।

মারওয়ান পণ্ডিত মানুষ। ১৯৫৫-৫৭ তিনি দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৫৮ থেকে তিনি বার্লিনের নাগরিক। ১৯৫৮-৬২ বার্লিন হাই স্কুল অব ফাইন আর্টসে শিল্পকলার পাঠ নেন। হ্যান্স ট্রিয়ারের সর্বাধিক প্রতিভাবান ছাত্র বলে তাঁর খ্যাতি। ১৯৬৬-তে বার্লিনের কার্ল হফার মেমোরিয়াল আর্ট পুরস্কার লাভ ... ১৯৭৩-এ সিটি দ্য আর্টসের থেকে প্যারীতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। ১৯... বার্লিন হাই স্কুল অব ফাইন আর্টসে অতিথি অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

মারওয়ানের তিনটে বড় ... ছিল। তিনটেই মুখ। অভিব্যক্তি... তুলি চালিয়ে মুখের বিরাটত্বকে ... করেছেন। মানুষের মুখ শুধু ... মাংস পেশী ত্বকই নয়, কিন্তু ... জটিল আধারস্বরূপ। তার ... মানবত্ব, দেবত্ব, চিন্তাভাবনা মনস্ত... সমস্যার প্রতিফলনের মুকুর। ... ভেতর ব্যক্তিত্বের লুকোচুরি ... অস্বচ্ছ রঙের লাভাস্রোতে কখনো ... কখনো অদৃশ্য। কতো রহস্য মান... মনে এবং কী অদ্ভুতভাবে পেশী ... ত্বকের কুঞ্চনে, ভঙ্গিতে প্র... পায়। মানুষ মারওয়ানের কাছে দে... নয়, দানবও নয়, কিন্তু তার দুর্ব... তাঁর কাছে গোপন নেই। তার ... প্রতি সহানুভূতি তাঁর প্রবল। মান... মুখের প্রতি তাঁর নিবিড় আস... বস্তুত এক অর্থে এগুলো মারওয়া... স্বপ্রতিকৃতি।

মারওয়ানের কাজ তিনটির ... জার্মান বিভাগের কাজগুলির এ... মিল আছে, যদিও পার্থক্যও কম ন... কারণ অন্য শিল্পীদের কাজে যে... রিটাচিং-এর মতো করে তুলি চালা... হয়েছে। মারওয়ান সে তুলনায় অ... বেশি আবেগপ্রবণ। পটের ও... নিজেকে নিক্ষেপ করেছেন।

MILKMAID
REGISTERED TRADE MARK
SWEETENED
PREPARED IN INDIA
NET WEIGHT
ONLY MEDAL
Best Full Cream Milk
Regd Trade Mark
FULL CREAM CONDENSED MILK

স্বাদে সত্যিই কী উপাদেয়

মিল্কমেড দিয়ে
চা ও কফি করলে কী
অপূর্ব যে স্বাদ হয় !
ফল বা পুডিং-এও
যদি একটু ঢেলে দেন—
কিছু না হোক—রুটিতেও
যদি সামান্য মাখিয়ে
নেন, দেখবেন খেতে
কত সুস্বাদু হয়েছে !

মিল্কমেড

কনডেনস্‌ড মিল্ক

Nestlé.

MM-CAS-1/78 BEN

আপনার ছেলেমেয়েদের
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়,
তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে...
কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা !
বোর্নভিটাতে এখন পাবেন আরও বেশী কোকো, ফলে আরও বেশী স্বাদ আর পুষ্টিগুণ।
শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু' চামচ বোর্নভিটা দিয়ে এক সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত দেহের মূল্যবান পুষ্টিগুণ দরকার, বোর্নভিটা তা যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার... ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে !
ক্যাডবেরিস
বোর্নভিটা
Bournvita
g net
৭৫ পয়সা বাঁচান
জরুরী কথা : বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার একটি
সাধারণ টিনে ঢেলে রাখুন।
OBM 8376 BEN

"সুলভ সংস্করণ বিভূতি রচনাবলী"

তৃতীয় খণ্ড গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকগণকে এই খণ্ড আগামী ৩১শে মে ১৯৭৮-র মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাঁরা এই খণ্ড সংগ্রহ করতে পারবেন না, ৩১ শে মে-র পর তাঁদের ৩.৭৫ পয়সা দিয়ে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে বই সংগ্রহ করতে হবে। কাউণ্টার থেকে রচনাবলী সংগ্রহের সময় শনিবার ও ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬॥ পর্যন্ত।

প্রকাশিত হ'ল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস

॥ ষোল টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

গল্প-গ্রন্থাবলীর প্রথম পর্যায়

কথা কল্পনা কাহিনী

সুবৃহৎ কলেবর, শোভন সংস্করণ, দাম মাত্র ১৬৲

সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস

আনন্দধারা ৬৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

রক্তের বিষ ৮৲

বিমল মিত্রের

আসামী হাজির

"আসামী হাজির" উপন্যাসের পটভূমিকা পশ্চিম বঙ্গের একটি পল্লীগ্রাম। ঘটনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একজন সত্যকারের সক্রিয় সৎ মানুষের ঐকান্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার রক্তাক্ত কাহিনী এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকা নয়নতারা বর্তমান কালের নারী-সমাজের চরম সমস্যার মূর্তিমতী জিজ্ঞাসা, আর নায়ক সদানন্দ বর্তমান যুগের সামাজিক অপশাসনে রুদ্ধ আর্ত অসহায় মানব-বিবেক। বিমল মিত্র এই উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাকে একটি মূল ঘটনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন। এর প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি চরিত্র এমনই বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী যে, আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই এই জগতের সামিল হয়ে যাই। আমরা অকস্মাৎ আত্মানুসন্ধানী আত্মসচেতন হয়ে উঠি। এক কথায় আমরা নিজেরাও এই মহৎ আসামীর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে নি[illegible]ক লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পাই।

১ম খণ্ড—২০৲ ২য় খণ্ড—২৫৲

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সুদীর্ঘকালের স্মৃতিচারণ

ফিরে ফিরে চাই ২০৲

অহিভূষণ ভট্টাচার্যের

Student's

TRILINGUAL DICTIONARY

ত্রিভাষিক অভিধান

ইংরাজী • বাংলা

হিন্দী

॥ প্রকাশিত হল ॥ ত্রিশ টাকা

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রকাশিত হয়েছে

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী ২০৲

১ম খণ্ড-২০৲
২য় খণ্ড-২০৲
৩য় খণ্ড-২০৲
৪র্থ খণ্ড-২০৲
৫ম খণ্ড-২০৲

গ্রাহকরা শীঘ্রই সংগ্রহ করুন

প্রকাশিত হয়েছে

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের

একখানি মূল্যবান গ্রন্থ

মহৎ স্মৃতি

মূল্য পাঁচ টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৭৩ / ৩৪ ৮৭৯১ কলিকাতা-৯ / ৩৪ ৩৪৯২

চিঠিপত্র

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

'দেশ' পত্রিকায় নারায়ণ দত্ত মহাশয়ের 'ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি' লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি মনোজ্ঞ ও রসোত্তীর্ণ এই লেখাটির মধ্যে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এজন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই। বোধ হয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ('বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা'র লেখক) পরে অর্ধ-বিস্মৃত যুগের প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতদের মহনীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার কাজে আর কেউ ব্রতী হননি। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ গবেষকগণের ধারা লুপ্ত হতে চলেছে। 'টুলো পণ্ডিত'দের আমরা টোলের মধ্যে দেখেই তৃপ্ত। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেরই, সেকালের সমাজ ও সাহিত্যে দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার যোগ্য।

যাই হোক, বর্তমান লেখাটির কয়েকটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) লুট করা দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কি না— এ বিষয়ে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন যে বিধান দিয়েছিলেন সেই ব্যবস্থাপত্রটির শেষে আছে 'পিতামহ-চরণাশ্চ চৌরিতদ্রব্যে ('চৌরিত্য দ্রব্যে' নয়) চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি'। লেখক এই অংশটি উদ্ধৃত করে অনুবাদ করেছেন—'পিতৃপুরুষের প্রসাদে চুরি করা দ্রব্যে চোরের স্বত্ব স্বীকার করা হয়।' কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হবে— 'পিতামহও (অর্থাৎ তর্কপঞ্চাননের পিতামহ) চুরি করা দ্রব্যে চোরের স্বত্ব স্বীকার করেন।" তর্কপঞ্চাননের পি তা ম হ ছিলেন সেকালের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হরিহর তর্কালংকার। তিনি নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন এবং 'অন্বীক্ষানয়কৌমুদী' নামে একটি ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করেন। হরিহরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখর বাচস্পতি বাঙলার শ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। যাঁর 'দ্বৈতনির্ণয়' নামক স্মৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দত্ত মহাশয় করেছেন। জগন্নাথ পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রটিতে 'পিতামহচরণাশ্চ'-এর দ্বারা নিজের পিতামহ অথবা মনে হয় পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্মার্ত চন্দ্রশেখরের মতেরই উল্লেখ করে থাকবেন।

(খ) তর্কপঞ্চাননের ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন রঘুদেব (রঘুনাথ নয়) বাচস্পতি।

(গ) রঘুদেবের টোলে ছাত্র জগন্নাথের সঙ্গে যে আগন্তুক পণ্ডিতের ন্যায়ের বিচার হয়েছিল তাঁর নাম রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ('রামাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ' নয়)। তিনি 'জগদীশ তর্কালংকারের পৌত্র (পৃঃ ১২) নন, বৃদ্ধ প্রপৌত্র। জগদীশের বংশ-পরম্পরা এইরূপ—জগদীশ—রঘুনাথ—রাধানাথ তর্কবাচস্পতি—নারায়ণ বিদ্যাবাগীশ—রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ। (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, পৃঃ ১৬৯)।

(ঘ) তর্কপঞ্চাননের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবাদভঙ্গার্ণব' সেকালে হিন্দু আইনের অমূল্য নিধি। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে এই অপ্রকাশিত গ্রন্থটির যে প্রতিলিপি আছে তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৯৯ ('আট শ' নয়)। এই গ্রন্থটি রচনা করতে জগন্নাথের চার বছর (১৭৮৮-৯২) সময় লেগেছিল ('তিন চার' বছর নয়)। দীনেশবাবু লিখে-ছিলেন (১৯৫২) 'বাঙালী প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া কর্তব্য'। এদিকে আজও কেউ দৃষ্টি দেননি।

(ঙ) গাজীপুরের 'কর্ন-ওয়ালিশের সমাধিমন্দিরের মূর্তি-গুলির খোদিতার নাম 'ফ্ল্যাক্সম্যান' (Flaxman), 'ক্লাক্সম্যান' নয়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত আর একটি বিস্ময়কর প্রতিভা গত শতকের তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বিখ্যাত বাচস্পত্য অভিধানের রচয়িতা। তাঁর মধ্যেও বিদ্যার সঙ্গে জাগতিক বুদ্ধি ও প্রখর ব্যক্তিত্ববোধের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটেছিল। কিন্তু সবার ঊর্ধ্বে বিদ্যাসাগরই এই নবীন চেতনায় অনন্য প্রকাশ।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়

শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি

২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের পৈত্রিক ভদ্রাসন সংলগ্ন শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে শ্রীপ্রণব রায় লিখেছেন, "লিপির প্রথম লাইনে প্রহেলিকার মাধ্যমে শকাব্দ উল্লেখিত হয়েছে, যদিও এটি স্পষ্ট নয়।........ 'অংক' শব্দটিতে যদি ৭ ধরা যায় এবং 'ভূমানে' শব্দটির অর্থ যদি ১ করা যায় (যদিও কষ্ট-কল্পনা হয়), তাহলে 'অংকের বাম দিকে গতি' এই নিয়ম অনুসারে ১৭৮৪ শকাব্দ বা ১৮৬২ খৃীস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাকাল নিঃসংশয়ে বলা যায় না।" তাঁর এই বক্তব্যের উত্তরে একটি মাত্র কথা বলা যায় যে, লিপি পাঠের কিছু-মাত্র যোগ্যতা থাকলে এই বিশেষ লিপিটির পাঠোদ্ধার তিনি নিঃসংশয়েই করতে পারতেন, অনুমানের উপর নির্ভর করতে হত না। মন্দিরলিপি পাঠের অভিজ্ঞতা আছে এমন অনেকেই ওই লিপিটির সঠিক পাঠ কি তা জানেন। লিপির প্রথম পঙ্‌ক্তি মোটেই অস্পষ্ট নয় এবং লিপিটিতে পরিষ্কার লেখা আছে : 'বেদ বস্বশ্ব ভূমানে'— অর্থাৎ বেদ=৪, বসু=৮, অশ্ব=৭, ভূ=১ ; 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুযায়ী ১৭৮৪। এক্ষেত্রে শ্রীরায় 'অশ্ব'কে 'অংক' ধরায় প্রতিষ্ঠালিপির অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে 'অংক'কে ৭ ধরে গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া ঐ লিপিতে উৎকীর্ণ 'ভূমানে' শব্দটিও তাঁর কাছে "বোধগম্য" হয়নি। অতএব তিনি "কষ্টকল্পনা" করে ঐ শব্দটির অর্থ ১ ধরেছেন। আসলে

তিনি যদি 'ভূ' ... এবং 'মানে' শব্দটিকে "যন্ত্র" বা অন্বিত সূচক প্রত্যয় অর্থে ধরতেন, তাহলে অর্থ দাঁড়াত '১৭৮৪ যন্ত্রে' (শকাব্দ) —যা এই লিপির প্রকৃত অর্থ।

তদুপরি পত্রলেখক আলোচ্য লিপিটি স্বচক্ষে দেখেননি বলে সন্দেহ হয়, কেননা উল্লিখিত মার্বেল পাথরের ঐ লিপির ঠিক নিচেই পঞ্চ পলেস্তারার উপর স্পষ্ট লেখা আছে 'শক ১৭৮৪' সুতরাং মন্দিরলিপিটি স্বচক্ষে দেখে থাকলে এই সংযোজনটুকু কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু সেটি এত সোজাসুজি ভাষায় লেখা আছে যে, তাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবকাশ নেই।

তারাপদ সাঁতরা
নবাসন, বাগনান

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ ঃ শিবমন্দির

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ তারিখের 'দেশ'-এ "বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে ঃ শিবমন্দির"—এই শিরোনামায় শ্রীযুক্ত প্রণব রায় মহাশয়ের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচিত শিবমন্দিরটি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতা কর্তৃক কিংবা যাদবচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা এই বিতর্কে আমার কিছু বলার নেই; আমি শুধু ঐ চিঠিতে উল্লেখিত শ্লোকটি এবং তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায়ের ভাবনা সম্বন্ধেই কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। শ্রীযুক্ত রায়ের মতে মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :

বেদ বস্বঙ্ক ভূমানে—
শাকে সংস্থাপিতঃ—
শিবঃ ॥ সমন্দিরো যাদবেশ
নামা যাদবশর্ম্মণা

এই শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেন—" 'ভূমানে' শব্দটির অর্থ ঠিক বোধগম্য হল না।" কিন্তু, ভূমানে শব্দটির অর্থ আদৌ দুর্বোধ্য নয়। বেদশ্চ বসুশ্চ অঙ্কশ্চ ভূশ্চ মানং (=প্রমাণ, পরিমাণ) যস্য, তস্মিন্ শাকে—এই হল ব্যাসবাক্য এবং ভূ-র অর্থ এক, উল্লেখ্য যে সংখ্যাকোষ-এ 'এক' বোঝায় এমন শব্দাবলীর নাম এইরূপে বিধৃত আছে : 'একমাখ্যেন্দুভূম্যাশ্বিগজাস্যরদশুক্রদৃক্।' এখানে স্পষ্টত এক-বাচক শব্দ হিসেবে ভূমি শব্দটির উল্লেখ আছে। ভূমির পর্যায় শব্দ 'ভূ', অতএব ভূ-র অর্থ এক ধরলে আদৌ 'কষ্টকল্পনা' হয় না। কেন না, এইটিই একমাত্র সম্ভাব্য অর্থ।

তাহলে, প্রথমচরণের ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায় :—বেদ=৪, বসু=৮, অঙ্ক=৯, ভূ=১; সংখ্যানাং বামতো গতিঃ', অতএব ৪৮৯১ উলটো লিখলে ১৯৮৪ দাঁড়ায়, যে শকাব্দ বিশ্বাসযোগ্য নয়। (দ্রঃ পৃঃ ২) যদি 'বস্বঙ্ক' এই শব্দটির জায়গায় 'বস্বশ্ব' কিংবা 'বস্বব্ধি'—এইরূপ উৎকীর্ণ থেকে থাকে তাহলে অনায়াসে ১৭৮৪ শকাব্দে পৌঁছানো যায়। অশ্ব=৭ কিংবা অব্ধি=৭, অতএব 'বেদ বস্বশ্ব (কিংবা, বস্বব্ধি) ভূমানে—' এইরূপ পাঠই সঙ্গত মনে হয়। মন্দিরগাত্রে

হয়েছে।
অজিত মিশ্র
মেদিনীপুর

অমিয়নাথ সান্যাল

'দেশ' পত্রিকায় "আড্ডাগুরু অমিয়নাথ সান্যাল" শীর্ষক একটি নিবন্ধে শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য সদ্যপ্রয়াত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশাস্ত্রবেত্তার স্মৃতিচারণ করেছেন। আমার পিতৃদেব অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল তাঁর "অবসৃতের অপলাপ" গ্রন্থে অমিয়নাথের আড্ডার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আমি এই প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"আখড়ার গোষ্ঠীপতি ছিলেন স্বয়ং প্রাণাচার্য কৈলাসনাথ সান্যাল। গ্রহ-উপগ্রহ সব তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। কে কখন উদিত হয়ে কখন অস্তমিত হবেন, সে সময়টি পর্যন্ত মাপা ছিল। এঁরা হলেন নিত্য পরিকরের দল; অনিত্য যাঁরা, তাঁরা ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ উদিত হয়ে যদৃচ্ছ পুচ্ছ সঞ্চালন করে সরে পড়তেন। অনিচ্ছা বা পুচ্ছের অভাব এর কারণ নয়। নানা ধান্দার আড্ডারস নিষেবণের অখণ্ড অবকাশ এঁদের ছিল না। কিন্তু নিত্য অনিত্য সব পরিকরই ছিলেন স্বয়ংপ্রভ সূর্যের হিরণ্যদ্যুতিতে আলোকিত। প্রাণাচার্যই ছিলেন এই সৌরমণ্ডলের প্রাণকেন্দ্র। দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, চিকিৎসা- জ্যোতিষ সব শাস্ত্রেই ছিল এঁর অবাধ অধিকার, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো তিনি ছিলেন অসপত্ন ও একচ্ছত্র। তাঁকে এ যুগের ভরত বা শার্ঙ্গদেব আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন একাধারে বোদ্ধা, ব্যাখ্যাতা ও শিল্পী। আড্ডায় লঘু চপল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্বণাও চলতো। প্রাণাচার্যই ছিলেন প্রধান প্রবক্তা আর সকলে শ্রোতা ও দ্রষ্টা। সেতার, এস্রাজ বাজিয়ে শোনাতেন। খোলা গলায় খোলা হাওয়ায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ করতেন। মার্গ, আরভটী দেশী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের সঙ্গীতের শ্রেণীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলতেন। এক কথায় নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সম্পর্কে কত কথাই না শোনা যেত এই সিদ্ধকাম সঙ্গীত-সাধকের মুখে! একটা কথা বলে রাখি এখানে—প্রাচীন অর্বাচীনের কোন বিচার ছিল না এই আড্ডার আখড়ায়। পথ চিনে যে এসে জুটতো, তাকেই সাদরে সভ্য বলে মেনে নেওয়া হতো। সভ্যদের পেশারও মিল ছিল না কোনো, মেশার নেশায় ওরা আসতো।"

বলা বাহুল্য, এই "কৈলাসনাথ"ই অমিয়নাথ। আমার পিতৃদেব ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে লোকান্তরিত হয়েছেন।

তপোব্রত সান্যাল
মালদা

১৮ই ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের কষ্টকল্পিত রচনায় জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীঘোষের আজকের রচনা, আগামীকালের দলিল। তাই ভুল সংশোধনের জন্য এই পত্রাঘাত, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বরং ইতিহাসের মালমশলায় বোঝাই শ্রীঘোষের এই সুপাঠ্য রচনায় আমরা মুগ্ধ।

শ্রীঘোষ লিখেছেন, ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে জলপাইগুড়িতে মেডিকেল স্কুলের সংলগ্ন ভবনের শিলান্যাস করতে গিয়ে পারেন নি।

প্রকৃত ঘটনা ছিল (১) ১৯৪৯ সালে তখনকার সবেধন নীলমণি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের নতুন ভবনের শিলান্যাস করতে এসে ছাত্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিলেন ডাঃ রায়। ছাত্র বিক্ষোভের কারণ ছিল কয়েকদিন আগেই কলকাতার ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদ। (তখন কলকাতায় কথায় কথায় গুলি চলতো)। ডাঃ রায় বলতেন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। আনন্দচন্দ্র কলেজ তখন সাধারণ ইনটারমিডিয়েট কলেজ ছিল তবে বি-এ পড়ানো হতো কিন্তু বি-এসসি বা বি-কম এর বন্দোবস্ত ছিল না। মেডিকেল স্কুলের নাম ছিল 'জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল'। বর্তমানে ওখানে ফার্মেসী পড়ানো হয়। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় ডাঃ রায়-এরই প্রযত্নে মেডিকেল স্কুল উঠে যায়। (২) শ্রীঘোষ লিখেছেন, মেডিকেল স্কুলের সংলগ্ন ভবনের শিলান্যাস'। শিলান্যাসের অসমাপ্ত নাটক ঘটেছিল তদানীন্তন ইউরোপীয়ান ক্লাবের নাচঘরের আসরে। শিলান্যাসের স্থানটি ছিল বর্তমান ডিস্ট্রীক্ট লাইব্রেরী ও পুলিশ কোয়ার্টারের সংলগ্ন স্থান। হাঁটাপথে এখান থেকে জ্যাকসন স্কুল প্রায় তিন মাইল।

ডাঃ রায় বিক্ষোভের প্রতিবাদে রাগ করে চলে গিয়েছিলেন এবং প্রায় দশ বছর শিলান্যাস আটকে রেখেছিলেন। সাল ছিল ১৯৪৯। আজকের দিনে হয়ত এইভাবে রাগ দেখানো যেত না।

মুকুলেশ সান্যাল
জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞান কংগ্রেস

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) শ্রীযুক্ত সমরজিৎ কর-এর লেখা 'আমেদাবাদ বিজ্ঞান কংগ্রেস অনেককে হতাশ করেছে' পড়লেম। গত ২৫ বছরের কিছু বেশী বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে এই সংস্থার বেশ কয়েকটি বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে ইদানীংকালে যে দ্রুত লয়ে এই অনুষ্ঠানের মানের অবনতি ঘটেছে তা লক্ষ করে আসছি। এ বিষয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা যদি একটু সজাগ হতেন তা হলে হয়তো এর প্রতিকার হতো। অবনতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমরজিৎবাবু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেননি।

... বিভিন্ন বিভাগীয় সভাপতির পদগুলির যে মর্যাদা তা স্বভাবতই দেশের একমাত্র কৃতী বিজ্ঞানীদেরই প্রাপ্য। এঁরাই হলেন এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রাণপুরুষ। এঁদের উপর অধিবেশনের সার্থকতা অনেক অংশে নির্ভর করে। অথচ যে নির্বাচন পদ্ধতিতে এঁদের নির্বাচিত করা হয় তার সুযোগ নিয়ে বিজ্ঞানের ভেকধারী একদল স্বার্থান্বেষীদের গোষ্ঠীচক্র এই সব নির্বাচন সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেছেন ইদানীংকালে। আমার এই মন্তব্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই সোচ্চার হয়ে হয়তো প্রতিবাদ করবেন কিন্তু কোনও নজির দিয়েই তাঁরা একে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইদানীংকালে কোন কোন বিভাগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ভোটযুদ্ধে পরাজিত করে প্রায় অখ্যাত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি ও বিভাগীয় সদস্যপদে। মূলসভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। কোনও একটি বিভাগের নির্বাচনে এ বছর যে ব্যাভিচার ঘটে তার কোন প্রতিকারই বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালকমণ্ডলী করেননি, প্রমাণ সহ বেশ কিছুসংখ্যক সভ্যের আবেদন সত্ত্বেও। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, যেখানে এই সংস্থার সব কার্যকলাপ কেবলমাত্র গোষ্ঠীবিশেষের কুক্ষিগত, যাঁদের অনেকেই নিছক স্বার্থের খাতিরেই এই অধিবেশন জিইয়ে রেখেছেন, কোন উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই অনুষ্ঠানে আশা করা যায় না। বিজ্ঞানের নিষ্ঠা যাঁদের নেই, তাঁদের কাছে উচ্চমানের বিজ্ঞান আশা করা যায় কি ভাবে?

আমি সমরজিৎবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় অধিবেশনে গতানুগতিক গবেষণাপত্র পাঠের রীতি বর্জন করা উচিত এবং এগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমিতির ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুতপক্ষে এই দাবী অনেকের এবং অনেকদিনের। প্রসঙ্গত, ভারতীয় রসায়ন সংস্থা ১৯৬৩ সাল হতে রসায়নের বিভিন্ন বিভাগের জন্য এ ধরনের আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করে আসছে প্রতি বছর। তা সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন বিভাগেও গতানুগতিকভাবে গবেষণাপত্র পাঠ বজায় আছে এবং গবেষণাপত্রগুলির নির্বাচনে সুষ্ঠু পদ্ধতির অভাবে মানের ক্রমশই অবনতি ঘটছে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভ্যরা অধিবেশনে যোগদানের জন্য রেলপথে যাত্রার কনসেশান অনেকদিন ধরেই পেয়ে আসছেন, বরং আজকাল এই সুযোগ নানাভাবে কিছুটা সীমিতই হয়েছে। সুতরাং এই ব্যবস্থা অধিবেশনের মানের অবনতির কোন মুখ্য কারণ নয়। বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভাগুলির অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যরাও অধিবেশনের সুযোগে কিছু দেশ ভ্রমণ করেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু এ-সব অধিবেশনের মানের অবনতি ঘটে না। তার একমাত্র কারণ এ-সব

অনুষ্ঠানের সভা ও কর্মকর্তাদের ... বৈজ্ঞানিক মানসিকতা।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে কয়েক বছর ধরে "Focal Theme" নামে যা হচ্ছে তা প্রহসন মাত্র। সারা বছরে দু'টি বা তিনটি দিন বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় সর্বস্তরে সমাজ কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রসায়ন বিভাগ।

মার্তণ্ড মন্দির

১৪ই জানুয়ারী সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয়ের "মার্তণ্ড মন্দির" সম্পর্কে পত্রটি পড়ে কিছু বিস্মিত হলাম। "দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ" গ্রন্থে ডঃ এরিক ফন দানিকেন যদি লিখে থাকেন বাইবেলে য়িহুদীদের ভবিষ্যৎ-প্রবক্তা (prophet) ইজেকিয়েলকে কারা নাকি এক বিশাল বিমানে চড়িয়ে কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে ছিল, তা হলে বলি বাইবেলে এ-কথা কোথাও লেখা নেই। দানিকেন কোথায় এ খবর পেলেন? ইজেকিয়েলের নিজের লেখা একটি ইতিহাস বই আছে। এটি বাইবেলের Old Testament-এর অন্তর্গত। তাতে এ সম্পর্কে কোন কথাই নেই। তা ছাড়া য়িহুদীরা সে সময়ে বাবিলনের রাজা নেবুকাডনাজারের ক্রীতদাস হিসেবে বাবিলনেই জীবন অতিবাহিত করছিল। ইজেকিয়েল কোথাও বলেন নি বা ইতিহাসও বলে না যে নেবুকাড-নাজারের সময় কোন মহাকাশযান উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটা দানিকেনের গাঁজাখুরি গল্প। আর নাসা বিজ্ঞানী ব্লুমরিশ যে ওই গল্প পড়ে ইজেকিয়েলের পুঁথি নিয়ে গবেষণা করে "অনুমান" করলেন যে, কোন মহাকাশ-যান ইজেকিয়েলকে নিয়ে কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের মত কোন মন্দিরে গিয়েছিল, এটাও তেমনি গাঁজাখুরি গল্প। কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে এই গল্প ফাঁদা একটি হাস্যকর ব্যাপার। এত জায়গা থাকতে কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের এমন কি অলৌকিকত্ব ছিল যে সেখানে ইজেকিয়েলকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যদিও তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে কোন মহাকাশযান ইজেকিলেয়কে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় ব্লুমরিশের অনুমানের উপর নির্ভর করে দানিকেন ১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে ভারতে এসেছিলেন এবং মার্তণ্ড মন্দিরে সেই মহাকাশযানের ফেলে যাওয়া তেজস্ক্রিয়তার খোঁজ করে দেখলেন যে, মন্দিরের উত্তর দ্বারের বাইরে থেকে মন্দিরের বেদী পর্যন্ত যে ৫২ মিটার×১২ মিটার পথ আছে, তা তেজস্ক্রিয় এবং তেজস্ক্রিয়তা বেদীর নীচের অংশে তীব্রতর। কিন্তু মন্দিরের কাছে যে কোন মহাকাশযান নেমেছিল সে ত ব্লুমরিশ নিজেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন মহা-... দানিকেন যতখানি জানিয়েছেন, ততখানি তেজস্ক্রিয় থাকা আজ আড়াই হাজার বছর পরে কোনভাবেই সম্ভব নয়। ব্লুমরিশ জায়গাটি খুঁড়ে ওখানকার তেজস্ক্রিয়তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে উপদেশ দিয়েছেন। অজিতবাবু দুঃখ করে লিখেছেন যে, কে আমায় বলে দেবে কেন ওই জায়গা অমন তীব্র তেজস্ক্রিয়। তিনি লিখেছেন, এ বিষয় নিয়ে তিনি কিছুদিন আগে দু-একটা সংস্থার কাছে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কেউ কোন খোঁজ করেছে বলে খবর পান নি, অর্থাৎ কেউ তাঁর চিঠির জবাব দেবার ভদ্রতা-টুকুও করেন নি। তাঁরা হয়ত এটাকে wild goose chase বলে মনে করেছেন। কিন্তু সত্যি, জায়গাটি অমন তেজস্ক্রিয় কেন এ সম্বন্ধে একটা অনু-সন্ধান হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। জানি না অজিতবাবু কলকাতায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বা বোম্বাইতে ভাবা এটমিক রিসার্চ সেণ্টার বা নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের ডিপার্টমেণ্ট অব এটমিক এনার্জিকে এ বিষয়ে লিখে-ছিলেন কি না। লিখলে তাঁরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আগ্রহী ও উদ্যোগী হতেন। তবে ইজেকিয়েলের মহাকাশযান মার্তণ্ড মন্দিরে উড়ে আসার আজগুবি গল্পটা কেউই বিশ্বাস করবেন না।

অনিল সোম
জামসেদপুর-৯

কনস্টেবলের ছবি

"দেশ" পত্রিকায় (২৫শে ফেব্রুয়ারী) জন কনস্টেবলের সম্বন্ধে আমার লেখার 'অসংগতি' দেখিয়ে অনির্বাণ রায়ের চিঠি এবং আমার লেখাটি আবার পড়লাম। 'কোরো' (Corot) লিখতে গিয়ে 'পুসা' কিভাবে কলম ফসকে বেরিয়ে গেল সেটা ভেবে অবাক হচ্ছি। ভুলটি ধরিয়ে দেবার জন্যে রায় মশাইকে ধন্যবাদ। তিনি বলেছেন, "'পুসার' চাইতে বিশ্বস্ততর বানান বোধহয় হতে পারতো", কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে সেটা কি তা বলেন নি।

সাধারণভাবে উদ্ধৃতি এবং পাদ-টীকা আমার লেখাতে এড়িয়ে ...ল, তবে রায় মশাইয়ের মতো মানুষের জন্যেই এগুলো থাকা দরকার ব'লে মনে হচ্ছে। না-থাকার একটা অর্থনৈতিক কারণও আছে। এ-দেশের গরীব শিল্পকলা সমালোচক সাধ্যমতো কিছু অতি প্রয়োজনীয় বই কিনে রাখেন। কিন্তু যে-ধরনের যতো বই তাঁর হাতের নাগালে থাকা দরকার, তা অর্থাভাবে তিনি জোগাড় করতে পারেন না। রঙীন সচিত্র বই তো বিকোয় আগুনের দামে, সুতরাং গ্রন্থাগারে নিয়মিত গিয়ে তাঁকে পড়াশুনো করতে হয়। লেখার সময় আমি সম্পূর্ণভাবে স্মৃতির ওপর নির্ভর করি। রায় মশাইয়ের চিঠি পড়ে ছুটলাম বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে। দেখলাম কনস্টেবলের ওপর লেখার বেলায় স্মৃতি আমাকে একটি ক্ষেত্রে ছাড়া বিপাকে ফেলেনি।

তাই রায় মশাই আমার ছোট্ট লেখাটির যে-সব 'অসংগতির' কথা

বলেছেন, তা মেলে দেখার কারণ দেখছি না। তবে আমার এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, কনস্টেবল এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে পড়াশুনো তাঁর তেমন গভীর নয়। কনস্টেবল সম্বন্ধে গ্রন্থের অভাব নেই, সেগুলো তিনি যদি ঘাঁটাঘাঁটি না-ও করেন, তবু আমার অনুরোধ, তিনি যেন কার্ল'স পিককের প্রামাণ্য "জন কনস্টেবল, দ্য ম্যান এণ্ড হিজ ওয়ার্ক" (জন বার্কার লিঃ, লণ্ডন, ১৯৭১) একবারটি উলটে-পালটে একটু দেখেন। তা হলে তাঁর নিজের বহু ভুল ধারণা ভেঙে যাবে।

কনস্টেবলের সময় ক্যামেরা অবিষ্কৃত হয়নি। শিল্পী তাই অনেক খোলা মন নিয়ে মানুষ বা দৃশ্য আঁকতে পারতেন। ইম্প্রেসনইজমের পেছনে ক্যামেরা আবিষ্কারের বড় রকমের অবদানের কথা জানার জন্যে কান্তকলার ইতিহাস খুব গভীরভাবে না জানলেও চলে। শিল্পীরা দেখলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা যা আঁকছেন, ক্যামেরা তা মুহূর্তে তুলে নিচ্ছে। এই সময় পারীর বাজারে জাপানী প্রিণ্ট এসে পড়ে। শিল্পীরা দেখছেন, জাপানী ছবি দ্বিমাত্রিকভাবে আঁকা হলেও কেমন 'বাস্তব' হতে পারে। তাছাড়া খোলা আকাশের নীচে এসে তাঁরা সূর্যকে আবিষ্কার করলেন। ক্যামেরা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল বলেই ছবিতে তাঁরা ভিন্নতর উপায় অবলম্বন করেছিলেন। পূর্ববর্তী ওলন্দাজ, ইংরাজ বা ফরাসী শিল্পগুরুদের নিসর্গচিত্রের সঙ্গে ইম্প্রেসনিস্টদের আঁকা নিসর্গ-চিত্রের মৌলিক পার্থক্য আছে। তাঁদের ওপর কনস্টেবলের প্রভাব পড়েছিল। কনস্টেবল এবং ইম্প্রেসনিস্ট ভিন্ন যুগ এবং মানসিকতার শিল্পী। তবু উভয়ের মিল কম নয়। অমিলের অন্তত একটি কারণ ক্যামেরা।

রায়মশাই লিখেছেন, "কনস্টেবল দেলাক্রোয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এমন কথা সন্দীপবাবু ছাড়া কাউকে বলতে শুনিনি।" এটা অবশ্য বৈঠকখানা বা কফি হাউসে বলা-কওয়ার ব্যাপার নয়, কিন্তু বাড়িতে বা পাঠাগারে পড়া-শুনোর ব্যাপার। রায় মশাই শাসালেও কনস্টেবল এবং দেলাক্রোয়ার অ্যালবাম পাশে রেখে আবার বলব, প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে প্রভাবিত করেছিলেন। তার আগে ফরাসী দেশের সঙ্গে কনস্টেবলের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে হয়।

একবার ইংলণ্ডের এক প্রদর্শনী থেকে এরোস্মিথ নামে এক চিত্র বিক্রেতা ফরাসী দেশে তাঁর ছবি নিয়ে যান। এঁর সঙ্গে পরে আসেন স্রত (Schroth) নামে আরেক বিক্রেতা। এর কিছু দিনের মধ্যে এরোস্মিথ দেউলে হয়ে যান এবং স্রত ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন। কনস্টেবল নিজে ফ্রান্সে কখনো যাননি এবং নতুনভাবে সে-দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন নি। কিন্তু তার আগেই ফরাসী দেশে ডাকসাইটে শিল্পী হিসাবে খুব নাম-ডাক হয়। 'হে উয়েন' এবং 'এ ভিউ অন দ্য স্টাউর' লুভারে প্রদর্শিত হয় তার আগেই। সকলে এ ছবি দুটি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সে দুটিকে ভাল একটা জায়গায় সসম্মানে টাঙান হয়। চরম হলো যখন ফরাসী নৃপতি কনস্টেবলকে স্বর্ণপদক দিলেন (পিকক : ৩৫ পৃঃ)।

"But while English public remained generally indifferent to Constable's art, the stir he had created had repercussions there . . . . so well did the French learn that lesson that his example became for them a liberating influence. As a pioneer he was honoured by such men as Delacroix and Geri- and succeeding generation, either directly or indirectly were indebted to him for a new conception of Naturalism" (পৃঃ ৪৯)। গরিকোৎ (উচ্চারণ ঠিক তো রায় মশাই ?) ঘোড়া আঁকতেন আর কনস্টেবল ছিলেন মূলত নিসর্গ-চিত্রকর। প্রভাব কিন্তু এ-স্থলে গভীরতর স্তরে। কনস্টেবলের জন্যে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছিল এবং বর্ণকে আলাদা মর্যাদা তিনি প্রথম দিয়েছিলেন।

.."the Impressionists themselves, in admitting their debt to Corot and Delacroix, were in effect admitting their debt to Constable. whose art ..had first opened the eyes of Corot and Delacroix to the possibilities of Naturalism." (পৃঃ ৪৮-৪৯) দেলাক্রোয়ার ওপর কনস্টেবলের সূক্ষ্ম এবং গভীর প্রভাব রায় মশাই পাশাপাশি দুজনের এ্যালবাম খুলেও দেখতে পাননি, সেটা তাঁর চোখের দোষ!

ভ্যান গঘের সঙ্গে কনস্টেবলের মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মিল তিনি খুঁজে পাননি, কারণ অবশ্য প্রতীচ্যের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অগভীর জ্ঞান। ভারতের ধর্ম এবং সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে রবীন্দ্র-নাথ, নন্দলাল বা যামিনী রায়ের কাজ যেমন বোঝা যায় না, তেমনি প্রতীচ্যের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে না জানলে দান্তে, টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, এলিঅট, ভ্যান গঘ বা কনস্টেবলের কাজ বোঝা যায় না।

পরিশেষে আমার কাব্য করার মধ্যে আমি দোষের কিছু দেখি না। দিগবসনাও ফুলসাজে সাজতে পারে সে অভিজ্ঞতা রায় মশাইয়ের নেই মনে হচ্ছে।

সন্দীপ সরকার

দাঁইহাট

পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরা বসু মহাশয়ের "লোকায়ত শিল্প : পুতুল" রচনাটিতে তিনি লিখেছেন, 'নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, দাঁইহাট, বর্ধমান জেলার নতুনগ্রাম, কলকাতার কালীঘাট—এই সমস্ত স্থানে কাঠের পুতুল বা মডেল নির্মাণের এক একটি ঘরানা বর্তমান।' দাঁইহাট নদীয়া জেলার নয়, বর্ধমানে।

অজিতেন্দ্র সিংহ নতুন দিল্লী-৩

সংশোধন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারীর দেশ পত্রিকায় আমার শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কিত চিঠির শিরোনামে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বদলে কোগেশচন্দ্র ঘোষ নামটি ছাপা হওয়ায় এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

কনকলতা ঘোষ

শরদিন্দু রচনাবলীতে বিশেষ ছাড়

৩০ মার্চ স্বর্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮০ তম জন্মতিথি। এই উপলক্ষে ওইদিন থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত আট দিন 'শরদিন্দু অম্নিবাস' সমেত শরদিন্দুবাবুর যাবতীয় গ্রন্থে সাধারণ ক্রেতাদের শতকরা ২০ টাকা 'বিশেষ ছাড়' দেওয়া হবে। আমাদের নিজস্ব বিক্রয়-কেন্দ্র ছাড়াও যে-কোনও দোকান থেকে আমাদের প্রকাশিত শরদিন্দুবাবুর বই কিনলেই এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। ক্রেতাদের এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য পুস্তক-বিক্রেতাদেরও ওই সময়ে শরদিন্দুবাবুর গ্রন্থের উপর অতিরিক্ত শতকরা আড়াই টাকা 'বিশেষ কমিশন' দেওয়া হবে। মফস্বলের পুস্তকবিক্রেতারাও এই সুবিধা পাবেন। তবে, সেক্ষেত্রে, তাঁদের 'অর্ডার'-এর সঙ্গে মনিঅর্ডারে, পোস্টাল অর্ডারে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে শতকরা ২৫ টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। চেক গ্রাহ্য হবে না ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থসম্ভার :

বহু যুগের ওপার হতে ৩.০০ কহেন কবি কালিদাস ৩.০০ শঙ্খকঙ্কণ ৩.০০ তুঙ্গভদ্রার তীরে ৭.০০ শজারুর কাঁটা ৬.০০ বেণী সংহার ৫.০০ কল্পকুহেলি ১০.০০ উত্তম মধ্যম ৫.০০ দাদার কীর্তি ৮.০০ অম্নিবাস : ১ম ২৫.০০ ২য় ৩০.০০ ৩য় ৩০.০০ ৪র্থ ২০.০০ ৫ম ২৫.০০ ৬ষ্ঠ ২৫.০০ ৭ম ৩০.০০ ও ৮ম খণ্ড ২৫.০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

অনবদ্য উপন্যাস

ভ্রষ্টলগ্ন দাম ২.৫০

মাতৃভূমির মুক্তিকামনায় গুপ্তবিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছিল বাঙলার একদল আত্মভোলা যুবক। সুখ, ঐশ্বর্য, স্নেহ, প্রেম, মমতা কোনও কিছুরই আকর্ষণ তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারে নি। তাদের নিয়েই রচিত এই অনবদ্য উপন্যাস। আদর্শের সাধনার সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের এবং ব্যক্তি-মনের সমস্যার সংঘাত কী জটিলতার সৃষ্টি করে, সমাজ কীভাবে কখন ব্যক্তি-স্বার্থের সর্বগ্রাসী দানবিক রূপের আড়ালে তুচ্ছ হয়ে ওঠে, তারই বিচিত্র ও অপরূপ বিশ্লেষণ 'ভ্রষ্টলগ্ন'। মনস্বী লেখকের অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, প্রকাশ-শৈলীর আন্তরিকতায় এবং চরিত্র-চিত্রণের অসাধারণ কুশলতায় 'ভ্রষ্টলগ্ন' একটি অনবদ্য রচনা হয়ে উঠেছে ॥

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

প্রবন্ধ-সংগ্রহ ৫.০০ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪.০০ শ্রীগৌরাঙ্গ ৬.০০ জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২.৫০ লোকারণ্য (উপন্যাস) ৪.০০

ছোটদের বই

রেবন্ত গোস্বামীর

অরুমিতুদের কথা

৪.০০

মঞ্জিল সেনের

ডাকাবুকো

৫.০০

অন্নদাশংকর রায়ের

হৈ রে বাবুই হৈ

৫.০০

শিশিরকুমার মজুমদারের

তুফান দরিয়ার পরান মাঝি

৫.০০

সুবোধ ঘোষের

সেই অদ্ভুত অভ্রধনি

৫.০০

গিরিধারী কুণ্ডুর

টংসা চু

৫.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

চরকা বুড়ি

৪.০০

সমরেশ বসুর

মোক্তারদাদুর কেতুবধ

৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

রাজকুমারের পোশাকে

৪.০০

অমরনাথ রায়ের

দেশবিদেশের বিজ্ঞানী

১০.০০

লীলা মজুমদারের

বাতাসবাড়ি

৪.০০

মনোজ বসুর

ওস্তাদ নটবর

৬.০০

বিমল করের

আশ্চর্য স্বাদের উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন দাম ৮.০০

একটা আশ্চর্য অসুখ নিয়ে বেঁচে ছিল সুরপতি। বুকের গভীরে প্রচ্ছন্ন প্রবল এক বেদনা। থেকে থেকে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠে যেন শ্বাসরোধ করে দিতে চাইত। ঠিক কোনখানটিতে যে এর উৎস এবং কিসে এর উপশম, বুঝতে পারত না সুরপতি। বোঝেনি মীরাও। বুঝলে সুরপতির জীবনে মীরা থেকে আরম্ভ করে রমা, তরু, শ্যামা, বকুল এতগুলি মেয়ের আগমন ঘটলেও কেন মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না—এ প্রশ্ন তার মনে জাগত না। নীলেন্দু, প্রমথ এবং সুরপতির ভালোবাসা পাওয়ার পরেও কেন সত্য হয়ে উঠল না তার নিজেরও চাওয়াটুকু, তাও অগোচর থাকত না। আসলে আমরা কেউই বুঝি না, বুঝতে পারি না। যদিও ওই একই অসুখ নিয়ে আমরা অনেকেই বেঁচে আছি —বেঁচে থাকি। সুরপতির মতন, মীরার মতন। 'প্রচ্ছন্ন' এক আশ্চর্য বেদনার গল্প, কিংবা অন্বেষণের, অথবা ভালোবাসার।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

দ্বীপ ৬.০০ মোহ ৭.০০ দংশন ৬.০০ সান্নিধ্য ৫.০০ অসময় ১২.০০ একা একা ৫.০০ ভুবনেশ্বরী ৪.০০ মৃত ও জীবিত ৪.০০ কুয়াশায় ৬.০০ কুশীলব ৩.৫০ আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪.৫০ যদুবংশ ৮.০০ পূর্ণ অপূর্ণ ১৫.০০ পরিচয় ৪.০০ বালিকা বধূ ৭.০০ গ্রহণ ৪.০০ খড়কুটো ৬.০০ কাপালিকরা এখনও আছে (কিশোর-সাহিত্য) ৭.০০ ওআণ্ডার মামা (কিশোর-সাহিত্য) ৬.০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

কালকূট-এর

বিশিষ্ট ভ্রমণোপন্যাস

তুষারসিংহের পদতলে

দাম ৬.০০

কালকূট-এর যাত্রা এবার উত্তরে। স্বর্ণশিখর-প্রাঙ্গণ দার্জিলিং থেকে তুষারসিংহের দেশ সিকিমে। স্নো রেঞ্জের আড়াল থেকে যিনি তাঁর পান্না-সবুজ রঙের কেশর ফুলিয়ে চিরকাল সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখেন সিকিমের আত্মাকে—সেই তুষারসিংহ। যার পদতল থেকে উৎসারিত হয়েছে সর্বনাশী তিস্তা। তিস্তার সেই দুর্গম ভয়ংকর-সুন্দর আঁতুড়ঘর দর্শনের অভিযাত্রা 'তুষারসিংহের পদতলে'। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় লেখক অনেক কথাই লিখে উঠতে পারেননি। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে অনেকগুলি অংশ নতুন সংযোজিত হয়েছে ॥

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ৮.০০ অমৃত বিষের পাত্রে ৮.০০ কোথায় পাবো তারে ৩৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মীরা মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়

পরবর্তী আকর্ষণ

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প
শূন্য যান
অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
শুধু বিঘে দুই
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবন্ধ
ভাষার সূক্ষ্মতা ও সংস্কার

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

আন্তরিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে

নয়াদিল্লিতে এশীয় লেখক সম্মেলন বলে অভিহিত এক সম্মেলনে উপস্থিত কয়েকজন ভারতীয় এবং বিদেশীয় লেখকের ভাষণে যে বিশেষ অভিমত উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে, সে অভিমত সাহিত্যের অনেক সমালোচকের বিচারে সম্পূর্ণ সমর্থিত হবে বলে মনে হয় না। সেই অভিমতের প্রধান কথা এই যে, পদ্ধতির সৌকর্যই কথাশিল্পের প্রধান সৌকর্য। কেউ কেউ বলেছেন—পদ্ধতিই সব, কথাশিল্পের রূপ সৃষ্টি করতে পদ্ধতিই হলো প্রধান রূপকার। কোন ভাবের, আবেগের ও জ্ঞানের বাহক কিংবা দ্যোতক হবার গুণে নয়; পদ্ধতির গুণে কাহিনীর রম্যতা নির্মিত হয়ে থাকে।

ভারতীয় প্রাচীন আলংকারিকদের একাধিক জনের অভিমতে সাহিত্যকর্মের মধ্যে পদ্ধতিকেই রম্যতার প্রধান গুণ-ধর্মের আধার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলংকারিক কুন্তকের প্রচারিত 'বক্রোক্তি জীবিতম্' প্রত্যক্ষ অর্থে যা-ই বলুক না কেন, পরোক্ষ অর্থে বস্তুত পদ্ধতির গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রশস্তি করেছে বলে মনে করা চলে। ফরাসী কথাশিল্পী মোপাসাঁকে একটি চিঠি লিখে এই উপদেশ দিয়েছিলেন ফ্লবেয়ার—আইডিয়ার যথার্থ অনুগত করে কোন শব্দ প্রয়োগ করবার সময় এই সত্য স্মরণ রাখবে যে, একটি ভাবরূপ অভিব্যক্ত করবার জন্য মাত্র একটিই যথার্থ শব্দ আছে। আধুনিক ফ্রান্সের কবি পোল ভালেরি নাকি অনেকটা অনুরূপ তত্ত্বের সমর্থক। একটি জলস্রোতের গতিভঙ্গীর পরিচয় অর্থাৎ বিশেষণ অন্বেষণ করতে গিয়ে কবি ভালেরি নাকি চিন্তা করে কয়েকটা দিন পার করে দিয়েছিলেন। তারপর সেই জলস্রোতের গতিকে 'কুণ্ঠিত' বলে বিশেষিত করেছিলেন।

কিন্তু কথাশিল্পে এবং কবিতাশিল্পেও কারুশৈলী তথা পদ্ধতির গুরুত্ব যাঁরা অস্বীকার করেন না, তাঁরাও পদ্ধতিকে গুরুত্বের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করতে চান না। তাঁদের মতে পদ্ধতিই সব নয়। তাঁদের মতে, পদ্ধতির পক্ষে কথা কাহিনী ও কবিতার শিল্পরূপের চমক সৃষ্টি করা খুবই সহজে সম্ভব বটে, কিন্তু শিল্পরূপের 'মায়া' সৃষ্টি করা তত সহজে সম্ভব নয়। তাঁদের মতে এই মায়া হলো, রূপের প্রাণারাম। চিত্রকলার সার্থক নির্মাণের তত্ত্ব বর্ণিত করে বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখা যায় যে, বর্ণিকা তুলিকা ইত্যাদির গুণকর্মের সঙ্গে লাবণ্য-যোজনার উল্লেখও আছে। এই লাবণ্যযোজনা শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভা ও উদ্ভাবনের সেই সৃষ্টি, যে সৃষ্টি শিল্পরূপের উপর আরোপিত না হলে শিল্পরূপ মায়াময় রম্যতায় স্ফুটিত হয় না, যদিও শিল্প থাকে। ক্লাসিক বলে আখ্যাত ও সম্মানিত হয়ে আসছে বিশ্বের সব দেশের সব সাহিত্যের যে-সব সৃষ্টি, তার সংজ্ঞা সম্বন্ধে যদিও পণ্ডিত সমাজের ধারণাতে কিছু প্রভেদ দেখা যায়, এক্ষেত্রে মোটামুটি এবং সর্বসম্মত সত্য নিরূপিত হয়েই আছে, চিরায়ত রম্যতাই ক্লাসিক বলে আখ্যাত হবার যোগ্যতম গুণের পরিচয়। ভার্জিলের মহাকাব্য ঈনিডের মধ্যে সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন যে, রণক্ষেত্রের উদ্দেশে ধাবিত অশ্বারোহী বাহিনীর দ্রুততা ও মত্ততার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ভাষার এমনই এক সৌকর্য সৃষ্টি করেছেন, যার গুণে দ্রুত ধাবিত অশ্বের পদশব্দের মতো শব্দচ্ছবি সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু কোন সমালোচক কি একথা কখনও বলেছেন যে, ভাষা ও শব্দের কারু পদ্ধতির গুণে ভার্জিলের মহাকাব্য চিরায়ত রম্যতা লাভ করেছে? মহাকাব্য যে মহাভাবনার সৌন্দর্য বহন করে, সেটা ওইরকমের ভাষাগত কোন কর্মের সাধ্যগত বিষয় নয়।

আলোচ্য এশীয় লেখক সম্মেলনের বক্তা ও প্রবক্তরা যা-ই বলুক না কেন, সাহিত্যের সৃষ্টিতে পদ্ধতির সৌকর্য ও কারুরূপের গুণগত মর্যাদা ও গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও একটি সত্য স্মরণে রাখবার যুক্তি আছে। জীবনের বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের রূপ সৃষ্টি করতে নিতান্ত কারুকর্মের সৌন্দর্যই প্রধান সম্বল নয়। ভাব ও ভাবনার রম্য সমাহার, এবং লাবণ্য-যোজনা চাই। সাহিত্যের সৌকর্য ও রম্যতা কখনই প্রধানত পদ্ধতির অথবা কারুতাময় কোন বিন্যাসকর্মের চমৎকারিতার উপর নির্ভর করে না। বাণিজ্যবৃত্তির প্রভাবে পরিচালিত টেকনোলজির যুগে মানবীয় জীবনের একটি বড় ভয় এই যে, আন্তরিক সাহিত্যের সৃষ্টি বিরল হয়ে আসবে। কবির ভয় ছিল—যেন ভঙ্গী দিয়ে না ভুলায় চোখ। সেই ভয় তথা ভঙ্গীসর্বস্ব সাধনা আধুনিককালের সাহিত্যে রম্যতার মানহানি ঘটাতে চাইছে বলে সন্দেহ করা চলে। ইবসেন তাঁর ঘরের দরজার পর্দা একটু নড়ে উঠতেই ডাক দিয়েছিলেন—ভেতরে এস নোরা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এই নোরা ইবসেনের ডলস হাউসের নোরা, বাস্তব জগতের রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়। ডিকেন্স তাঁর একটি উপন্যাস লিখবার সময় কাহিনীর একস্থানে এসে একটি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। বুঝতে পারা যায়, কাহিনী এক্ষেত্রে লেখকের অন্তরের সার্থক সৃষ্টি হতে পেরেছে, যদিও কাহিনী ও লেখকচিত্তের মধ্যে এতটা অদ্বৈতবোধ লেখকতার দিক দিয়ে খুব মহৎ একটা গুণ নয়। লেখক ও শিল্পীর বিচার প্রধানত 'অবজেকটিভ' হবে। অক্সফোর্ড হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়ে ফরাসী মনস্বী জাঁ ককতো প্রসঙ্গত এই মন্তব্য করেছিলেন যে, বড়রকমের কারিগরী এবং হল্লার সৃষ্টি নয়, সার্থক সাহিত্য হলো লেখকের অন্তরের ছায়াময় প্রশান্তির সৃষ্টি।

জনতা পার্টিকে জোড়াতাড়া
দিয়ে রখার
একমাত্র আঠা!
কংগ্রেস (ই)

ইউরো-কমিউনিজম কি ও তার প্রকৃত স্বরূপ

অমল চট্টোপাধ্যায়

"দীর্ঘদিন ধরে মসকো ছিল কমিউনিসট আন্দোলনের উৎস এবং আমাদের কাছে রোমনগরী। আমরা মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা শুনে বিগলিত হয়ে যেতাম, যেন তা ছিল বড়দিনের উৎসব। সেটা হচ্ছে আমাদের শৈশব দিনের কথা। কিন্তু এখন আমরা সাবালক হয়েছি। কমিউনিজমও এখন পোপের শাসনাধীন চার্চের চরিত্র হারিয়েছে [অর্থাৎ চার্চে পোপ যেমন সর্বময় কর্তা, কমিউনিসট জগতে মসকোর সেই সর্বময় কর্তা হওয়ার দিন ফুরিয়েছে।]......সোভিয়েট সমাজতন্ত্র এখনও সেই আদিম যুগেই আছে।"—বার্লিন অধিবেশনে স্পেনের কমিউনিসট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল স্যান্টিয়াগো ক্যারিলোর ভাষণের অংশ বিশেষ।

• • •

ইউরোপের এবং বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কমিউনিসট পার্টিগুলির আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য থেকেই 'ইউরো-কমিউনিসট' শব্দটির উৎপত্তি। এই বৈসাদৃশ্য প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন ইটালী, ফ্রান্স, ব্রিটেন অথবা স্পেনের কমিউনিসট পার্টির মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উপরিউক্ত কমিউনিসট পার্টিগুলি নিজেদের দেশের জাতীয় ভিত্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দরুণ আদর্শগত ও কৌশলগত দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নীতি মেনে চলতে অস্বীকার করে। কেননা তারা মনে করে যে, 'সোভিয়েত-পথ' তাদের দেশের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়। এই পথ অনুসরণ করলে ক্ষমতা করায়ত্ত করা তাদের পক্ষে সুদূর পরাহত হয়ে পড়বে। ষাটের দশক থেকে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিসট পার্টিগুলি তাই ভিন্ন ভিন্ন পথে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার দাবি তুলতে থাকে। ইউরো-কমিউনিজমের উৎপত্তি এই দাবি থেকেই। পরবর্তীকালে এই দাবি এতই প্রবল হয় যে, এই পার্টিগুলি সোভিয়েত কমিউনিসট পার্টিকে বিশেষ কোন মর্যাদা দিতে এবং কমিউনিসট জগতে ক্রেমলীনের একাধিপত্যকে স্বীকার করতেও গররাজি হয়।

ইউরোপীয় কমিউনিজমের সুদৃঢ় ঐক্য যে ইতিমধ্যেই অতীতের বস্তু হয়ে গিয়েছে, তা ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে চেকোস্লোভাকিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ইউরোপীয় কমিউনিসট পার্টি সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এর কারণ হিসাবে অবশ্য সোভিয়েত-চীন সংঘর্ষ ও শোধনবাদের ব্যাপক বিস্তারকেই মূলত দায়ী করা হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতার ছোঁয়ের প্রভাব থেকে ইউরোপের কমিউনিসট পার্টির বিশেষ কেউই রেহাই পায়নি। পূর্ব ইউরোপের আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের নরওয়ে আইসল্যান্ড ও হল্যান্ডের পার্টিগুলি এই সম্মেলনকে বর্জন করেছিল।

বস্তুত, ফরাসী কমিউনিসট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বকালেই দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন ঘটে, এবং তা ফরাসী [PCF], ইটালী [PCI] ও স্পেনের [PCS] পার্টিত্রয়ের এক ঐক্য সাধনের মধ্যে রূপ নেয়। এক বহুদলীয় ও স্বাধীনতাকামী আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই ত্রিদলীয় ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয় এবং এইভাবেই ইউরো-কমিউনিসট আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। রোমে এক ঘরোয়া আলোচনার পর ফরাসী পার্টির নেতা জর্জ মারকাই ও ইটালী পার্টির নেতা এনরিকো বার্লিনগুয়ার ১৯৭৫ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি যে বক্তব্য ঘোষণা করেন, তাকে ইউরো-কমিউনিজমের 'ম্যানিফেস্টো' বলা যেতে পারে।

এই ঘোষণায় একাধিক রাজনীতিক দল, ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং বিরোধিতা করার অধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হাতবদল করার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দল গঠন ও আন্দোলন করার অধিকার, দেশের ভেতর ও বাইরে যথেচ্ছ যাতায়াত ও বাস করার অধিকার, ব্যক্তি-জীবনের অলঙ্ঘনীয় অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং শিল্পজাত, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা ও লেখার অবাধ অধিকার প্রভৃতির প্রতি এই পার্টিগুলির আনুগত্য ও স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য ফরাসী ও ইটালীর পার্টিদ্বয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নীতির কাছে কোন রকম নতি স্বীকার করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী

স্যান্টিয়াগো ক্যারিলো—স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল।

বিরোধী ছিল। আবার অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেরই সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। যথা ইটালীর হচ্ছে ১৭,৭০,০০০ এবং ফরাসীর ৪,৫০,০০০। ওদিকে সতেরটি দেশের কমিউনিসট পার্টির সর্বসাকুল্যে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২,৩৫,০০০। ফিনল্যান্ডের ৪৮,০০০, পশ্চিম জার্মানীর ৪০,০০০, স্পেনের ২৫,০০০, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়াম প্রত্যেকের ১৫,০০০, গ্রীসের ২০,০০০ এবং আইর্সল্যান্ডের মাত্র ২,৫০০।

বার্লিন অধিবেশন

১৯৭৬ সালে জুন মাসে পূর্ব বার্লিনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল ইউরোপীয় কমিউনিসট অধিবেশন হয়েছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কমিউনিসট আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক যুগান্তর। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের সুস্পষ্ট ঘোষণা যথা, "অন্য কোন দেশের কমিউনিসট পার্টির উপর সোভিয়েত কমিউনিসট পার্টির মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হবে না"—এরপরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবীণ নেতারা ক্রেমলীনের শাসককর্তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব কমিউনিসট নেতাদের অভাবনীয় ও অপ্রতিরোধ্য বিরোধিতা ও বিদ্রোহের তীব্রতায় হতমান ও হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, এর আগে কখনও সংখ্যায় এত বেশী কমিউনিসট নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিজেদের আদর্শগত পার্থক্য সারা বিশ্বের কাছে এমন স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেননি, অথবা আন্তর্জাতিক কমিউনিসট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বনির্বাচিত সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় জন্যে এমনভাবে প্রশ্নও করেননি।

বার্লিন অধিবেশনের সমাপ্তির পর নীতি-বিষয়ক ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিসট পার্টিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কী রকম হবে, তা খুবই স্পষ্ট ভাষাতেই উল্লেখ করা হয়। একে অনেকটা 'কমনওয়েলথ' ধরনের বলা যেতে পারে, অর্থাৎ 'কমিউনিসট কমনওয়েলথ'—যেখানে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই নিজের নীতি ও কর্মসূচী বাইরের কোন দেশের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারবে। এটা ব্রিটেনের সঙ্গে তার প্রাক্তন উপনিবেশগুলির যে রকম সম্পর্ক, অনেকটা সেই ধরনের। এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী। রাষ্ট্রগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, "প্রত্যেক দেশ তার নিজের আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা এবং নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনভাবে রচিত রাজনীতিক ধারা অনুসরণ করবে এবং এইভাবে প্রত্যেকের জাতীয় লক্ষ্য যথা শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্র অর্জন করার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই সংগ্রামে অবশ্যই শ্রমজীবী মানুষ, গণতান্ত্রিক শক্তি এবং সর্বদেশের সাধারণ মানুষের কথা সর্বাগ্রে স্থান পাবে।"

মুখ্য সুবিধা

এই ঘোষণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ বোধহয় এই যে, "মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মহান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সৌহৃদ্যপূর্ণ ও স্বেচ্ছাপ্রসূত সহযোগিতা এবং সমস্বার্থতার প্রতি আনুগত্য যা প্রত্যেক পার্টির সমানাধিকার, সার্বভৌম স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ না করা, প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার অবাধ অধিকার স্বীকার করে নেয়।" বস্তুত, এই অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই ইউরোপের বিভিন্ন কমিউনিসট পার্টি যেমন যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে কঠিন ও নিরন্তর সংগ্রাম করছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এই দাবি মেনে নেওয়া এক বড় রকমের অধিকার ত্যাগ করাই বোঝায় এবং "সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ" [যা সব দেশের কমিউনিসস পার্টিগুলিকে একই ধরনের আদর্শগত ও কৌশলগত পথ অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতার নামান্তর মাত্র] প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্রেমলীনের দীর্ঘদিনের যে প্রচেষ্টা ও দাবি, এই ত্যাগ স্বীকার তা শিকে তোলারই সামিল। বলা বাহুল্য, এই সর্বপ্রথম মসকো অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশে কমিউনিসট পার্টিগুলির স্বনির্বাচিত পথে চলার দাবির কাছে নতি স্বীকার করল।

প্রধান বিষয়বস্তু

এই শীর্ষ ঘোষণায় যুক্তফ্রন্টীয় লড়াই পদ্ধতিকেও সমর্থন করা হয়েছিল। বস্তুত, পশ্চিম ইউরোপের পার্টিগুলি দীর্ঘদিন ধরে এই ইচ্ছাই পোষণ করছিল। কারণ নির্বাচনে লড়াই ও রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করার জন্যে যুক্তফ্রন্ট-ব্যূহ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার ব্যাপারে তারা ছিল একমত, যদিও অবশ্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থার ভয়াবহতা এবং ধনতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে তাদের মধ্যে কিছু মতানৈক্যও ছিল। অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে রণকৌশল ও কলাকৌশলগত নীতির প্রশ্নে তারা ছিল এক ও অভিন্ন। আবার উদ্দেশ্য-সাধন অর্থাৎ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা সম্মিলিতভাবে প্রার্থী দেওয়ার ব্যপারে প্রয়োজনবোধে নিজেদের বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে নামিয়ে আনতেও তারা দ্বিমত ছিল না। কারণ, ফরাসী ও ইটালী এই দুই দেশের কমিউনিসট পার্টি যথেষ্ট প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হলেও অবাধ নির্বাচনে এককভাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করার মত ক্ষমতা অন্যান্য দেশের ছিল না। তাই ক্ষমতায় আসার উপায় হিসাবে অন্যান্য জনপ্রিয় বামপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধার ব্যাপারেই তারা ছিল বেশী আগ্রহী। এই অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল—তা তারা যদি

কমিউনিসটদের নীতির সংগে একমত নাও হয় অথবা নিজেরা কমিউনিসট-বিরোধী বলে যদি তাদের সমালোচকও হয়—তবুও সেই সব দলের সংগে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই ইউরো-কমিউনিসটরা সমভাবেই আগ্রহী ছিল।

বস্তুত, এই ঘোষণায় এমন কিছুই ছিল না যার বিরুদ্ধে কোনও স্বাধীনচেতা পার্টি, আপত্তি করতে পারে। আন্তর্জাতিক কমিউনিসট আন্দোলন যে সম্প্রতি গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত এই ঘোষণার ভাষায় তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দলের নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত পথ বেছে নেওয়ার অধিকারকে মসকো অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রথম স্বীকার করল। রুমানিয়া পার্টির নেতা Ceausescu আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের একটি কেন্দ্র থাকার ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা ক'রে খোলাখুলিভাবে বলেই ফেললেন, "এরকম একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থাকার কোন অর্থই হয় না।" স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল স্যান্টিয়াগো ক্যারিলো এবং 'ইউরো কমিউনিজম অ্যান্ড দ্য স্টেট' গ্রন্থের লেখক [প্রখ্যাত প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক হ্যারি ডোবিলিয়া.সর মতে এই বইটি মসকোয় এক ভূকম্পন ঘটিয়েছে] আরও স্পষ্টভাবে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে মসকো ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের উৎস। এখন আমরা সাবালক হয়েছি। আর কমিউনিজমও এখন পোপের-শাসনাধীন চার্চের চরিত্র হারিয়েছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জন করার জন্যে এখন প্রয়োজন প্রতিটি দেশে তাবৎ সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির একত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করা।" তিনি একথাও বলেন যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র এখনও আদিম যুগেই আছে।"

'টিটো' ডকট্রিনের স্বীকৃতি

ক্যারিলো বস্তুত পি-সি-আই নেতা এনরিকো বার্লিনগুয়ার, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, পি-সি-এফ নেতা জর্জ মারকাই এবং রুমানিয়া পার্টির নেতা নিকোল্যাক ক্যাজেসা‌ু-র দাবিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন, কারণ কমিউনিস্ট জগতে এঁরাই ছিলেন সোভিয়েত নীতির সবচেয়ে কড়া সমালোচক এবং ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির স্বনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় দাবিদার। আবার এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে পি-সি-আই-ই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সবচেয়ে দূরে সরে গিয়েছিল এবং ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সমালোচনায় তারাই সবচেয়ে বেশী মুখর হয়েছিল। বস্তুত, নির্বাচনী লড়াইয়ে এই সোভিয়েত-বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং এর ফলে পি-সি-আই ইটালীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পর্যবসিত হয়েছে। আবার ইটালীতে সমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে পি-সি-এফ এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আরও স্বাধীন পথ ধরেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর ভিন্নমতাবলম্বীদের [ডিসিডেন্ট] প্রতি সোভিয়েত শাসকবর্গের ব্যবহার ও আচরণকে তীব্র আক্রমণ করেছে। L' Humanite পত্রিকার ১ নভেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সোভিয়েত সরকারী নীতির সমালোচক লিয়োনিদ প্লিয়ুসকে মানসিক চিকিৎসালয়ে জোর করে অন্তরীণ রাখা এবং আঁদ্রে শাখারভকে নোবেল পুরস্কার আনতে যাওয়ার জন্যে ভিসা না দেওয়ার' বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছিল। রুশোর সেই বিখ্যাত উক্তি প্রতিধ্বনি করে তারা দাবি করল, স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং চলাফেরা ও নিজের লেখা প্রকাশ করার অধিকার তার মধ্যে অন্যতম।" ফ্রান্সের পলিটব্যুরোর অন্যতম সভ্য জীন কানাপা আবার কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েত শ্রম-শিবির ও দমননীতি সম্পর্কে ঐ পত্রিকার ১২ ডিসেম্বরের সংখ্যায় তীব্র নিন্দা করেন। এমন কি, পার্টির বিগত কংগ্রেসে "সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র" বাক্যাংশটিকেও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ম্যানিফেস্টো থেকে অপসারণ করেছে। আবার সমাজতন্ত্রকে ফরাসী রঙে ধোলাই করে দলের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় তারা সোভিয়েত নীতির তীব্রতর সমালোচনাকেই যথোপযুক্ত পথ বলে বেছে নিয়েছে।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি দলের স্বাধীনভাবে সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নেওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির ঘোষণায় প্রত্যেক নেতাই [যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন] খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট টিটো। কারণ এই ঘোষণা আসলে তাঁর 'জাতীয় কমিউনিজম' তত্ত্বেরই স্বীকৃতি—যে দাবির জন্যে যুগোস্লাভিয়াকে তিন দশক আগে কমিনফরম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবার এই ঘোষণা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির [CPSU] 'টিটো ডকট্রিন'-কে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতিও। এই ডকট্রিনে প্রত্যেক কমিউনিস্ট পার্টির নিজের আদর্শগত ও কৌশলগত পথ বেছে নেওয়ার অধিকার দাবি করা হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বার্লিন অধিবেশন হলো 'ইউরো-কমিউনিস্ট' নামে কমিউনিস্ট পার্টির আর একটি উপদলের জন্মের স্বীকৃতি। এই নবজাতকের মসকো অথবা পিকিং কোথাও কোনও আদর্শগত অনুগত্য নেই, দ্বিতীয়ত, এই পরিস্থিতির আর এক অপরিহার্য পরিণতি হলো আশীর্বাদ থেকে স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁক ও পরিবর্তন। বলা-বাহুল্য, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ ব্যতিরিকে আদর্শবাদ এক শূন্যগর্ভ বুলি ও অপ্রাসঙ্গিকই হয়ে যায়।

জীন কানাপা—ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য

ভগ্নোন্মুখ সাম্রাজ্য

সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বের প্রতি ইউরো-কমিউনিস্টদের এই ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞা ক্রেমলীনের শাসকদের মনে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, যেহেতু এই পরিস্থিতি যথেষ্ট বিপদ ঘটাতে পারে। যেমন জাতীয় কমিউনিজমের এই দাবি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাতে পারে। স্পষ্টতঃ ক্রেমলীনের প্রধান ভয় হচ্ছে দুটি—প্রথম, পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং দ্বিতীয় ও আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, পূর্ব ইউরোপের বশংবদ পার্টিগুলির মসকোর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই ভাবেদার দেশগুলির উপর নিজের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে মসকোকে ইতিমধ্যেই ৩১ ডিভিসন লাল ফৌজ পুষতে হচ্ছে। আরও বড় বিপদ হলো, ক্রেমলীন-অধ্যুষিত এক কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভা লাল চীন, যুগোস্লাভিয়া ও আলবানিয়া ইতি এই ভাঙনের কারণ হয়েছে। সোভিয়েত-বি তাত্ত্বিকরা বলেন যে, আদর্শগত নেতৃত্ব অথবা কি আন্তর্জাতিক প্রভাব হারানোর চেয়ে ক্রেমল নেতাদের আরও বড় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে কমিউনিজম-বিষয়ক প্রখ্যাত তাত্ত্বিক এবং মস প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনা ব

"The danger that would be present for the Soviet leadership ... is just a political or psychological one. also has military strategic implicatio of the gravest nature. Soviet Rus would fall between two chairs: be ween a Communist world that had jected it and a capitalist world th would not accept it."

এই অবস্থার অপরিহার্য পরিণতি হবে—সামরিক রাজনীতিক উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েতের বিচ্ছিন্নতা।

চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জ

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়ে নেতারা ইউরো-কমিউনিস্টদের চ্যালেঞ্জের বিরু এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে মসকোর প্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে অভিযান চালিয়েছেন। প্র ধাপ হলো, জাপানের স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করা। দ্বিত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সোভিয়েত পত্রি 'নিউ টাইমস্'-য়ে ৩৫০০ শব্দ সম্বলিত এক প্রব ক্যারিলোর উপর আক্রমণ। এর অনাতম কারণ হলে সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিনবাদকে স্থায়ী কর মানবিক অধিকার হরণ ও আর্থনীতিক অগ্রগতি রুদ্ধ করা এবং অন্যান্য তাবৎ ত্রুটির জন্যে সোভিয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে ক্যারিলোর অবিরাম বিষোদ্গার বিশেষজ্ঞদের মতে এই আক্রমণ কেবল ক্যারিলো উদ্দেশ্যেই নয়; তা সমস্ত ইউরো-কমিউনিস নেতাদের প্রতি এক সতর্ক বাণী। পরবর্তী ধা হলো, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিধা-বিভ ক'রে বর্তমান ক্রেমলীন-বিরোধী নেতৃত্বকে বিচ্ছি করা এবং এক সোভিয়েত-পন্থী নূতন দল গঠ করা। রাজনীতিক বিশেষজ্ঞেরা বলেন, "ইউরো কমিউনিস্টদের উপর মসকোর কষাঘাত করার প্রচে এই আন্দোলনের সাফল্যের ফলে কেবল জটিলতর হচ্ছে, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ইটালীতে। এদি আবার এই দুটি দেশে পরবর্তী নির্বাচনেই কমিউ নিস্ট পার্টি কোয়ালিশান সরকার গঠনে সফল হ পারে।

যে ঘটনাপ্রবাহ এই দুটি দেশকে সেই সম্ভাবনা দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা হলো—প্রথম, মসকো প্রকাশ্যে নিন্দা ও তার প্রভুত্বকে অবজ্ঞা করে এব সেই সংগে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রকা ও সমর্থন ঘোষণা করে ইটালী এবং অতি সম্প্র ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি জনপ্রিয়তা ও সম্মা অর্জন করেছে। এবং দ্বিতীয়, এই সব দেশে বিবি আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধা দক্ষিণপন্থী দলগুলির চরম ব্যর্থতা।

১৯৭৬ সালে সংসদীয় নির্বাচনে ইটালী কমিউনিস্ট পার্টি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি [CDP] পরাজিত করতে অসমর্থ হলেও মো প্রদত্ত ভোটে নিজের অংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। যথ ১৯৭২ সালে প্রাপ্ত ৯০,৮০,০০০ [২৭·২ শতাংশ ভোট থেকে বর্তমানে ১,২৬;২০;০০০ [৩৪·৪ শতাংশ] ভোট পেয়ে ৬৩০ জন প্রতিনিধি মণ্ডলে ২২৮টি আসন লাভ করেছে; অর্থাৎ ১৯৭২ সালের তুলনায় আরও ৪৯টি আসন বেশী। এ দ্বারা সে নিজেকে শুধুমাত্র দেশের দ্বিতীয় বৃহত্ত দলেই পরিণত করে নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে একটানা ক্ষমতাসীন সি-ডি-পি-র এক যোগ্য ও ক্ষমতাশীল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও পেরেছে। এই পরিস্থিতি হলো ইটালীর রাজনীতির ক্রমবর্ধমান পোলারাইজেশনের প্রধানতম ও অবিচ্ছেদ্য পরিণতি। তাই সি-ডি-পি সরকারের উপর পি-সি-আই ইতিমধ্যেই এক আধিপত্য

আধিপত্য অর্জন করেছে এবং বাস্তবে এই সরকারের এক অংশীদারই হয়েছে। কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সি-ডি-পি সরকার দেশের বিবিধ আর্থনীতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা সমাধান এবং পরিকল্পনা রচনায় কমিউনিস্টদের মৌন সম্মতি নিয়েই প্রশাসন পরিচালনা করছে।

এদিকে ফ্রান্সে ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনকালে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে এক কোয়ালিশান সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল এবং আগামী নির্বাচনে পি-সি-এফ বামপন্থী কোয়ালিশান সরকারে সোস্যালিস্ট পার্টির এক জুনিয়ার অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্টতর হয়েছে। আবার প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী এঁরা দুজনে দুই ভিন্ন দলের হওয়ার দরুন যদি কোন সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয় তখন এই সম্ভাবনা আরও প্রকট হবে কারণ ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র এই রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা এর আগে কখনও করেনি।

সোভিয়েতের ভয়

ফ্রান্স ও ইটালীতে কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা ক্রেমলীনের পক্ষে এক অনাবিল আনন্দের কারণ হওয়া উচিত—বিশেষ করে এর ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও আতলান্তিক জোটের উপর যে চাপ সৃষ্টি হবে, সে কথা ভেবে। প্রাক্তন মার্কিন স্বরাষ্ট্রসচিব হেনরী কিসিংগারের ভাষায় এই বিপদকে ব্যাখ্যা করা যায়, "মার্কিন-বাসীরা এই জোটের ব্যাপারে সন্দিহান ও হতবুদ্ধি হবে।... এই জোটের সম্পর্কের উপর তার ফলাফল হবে মারাত্মক। অধিকন্তু ন্যাটোর সামরিক শক্তি ও ঐক্য মারাত্মকরকমভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। ইউরোপীয় ঐক্যের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাও বিনষ্ট হবে।" কিন্তু এই নিশ্চিত ও আশাতীত সুবিধার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সোভিয়েত নেতারা আদৌ উৎসাহিত বোধ করেন না। এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন অপর এক ক্রেমলীন বিশেষজ্ঞ যথা—"ফ্রান্স ও ইটালীর কমিউনিস্টরা যদি শাসনক্ষমতা পরিচালনায় কোন ভূমিকা লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে তাদের সংগে ক্রেমলীনের সম্পর্ক তিক্ততর এবং পার্থক্য ব্যাপকতর হবে। নির্বাচক-মন্ডলীর কাছে নিজেদের উপর বিশ্বাসভাজনতা বজায় রাখার জন্যে এই সব দেশের কমিউনিস্টরা মসকো থেকে নিজেদেরকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরও খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করতে বাধ্য হবে। আবার সোভিয়েত নেতারা অন্য দেশের বিরোধী দলভুক্ত কমিউনিস্টদের কাছ থেকে নিজেদের সমালোচনা শোনার চেয়ে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টদের সমালোচনাকে আরও মারাত্মক এবং বিপদসংকুল বলে বিবেচনা করেন।" অপর আর এক কারণ হচ্ছে, ফ্রান্স ও ইটালীর অ-কমিউনিস্ট সরকারের সংগে মসকো এক বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সফল হয়েছে। কিন্তু প্যারিস ও রোমে কমিউনিস্টরা যদি সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হয়, তখন এই সম্পর্কের অবনতি অবধারিত। পরিশেষে, ইউরো-কমিউনিস্টদের প্রতি সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রখ্যাত ক্রেমলীন-বিশেষজ্ঞ ভিক্টর জর্জা বলেন, "সোভিয়েত নেতারা নিজেদের শাসন-পদ্ধতি, নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে পশ্চিমের কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে রাজনীতিক ভীতির চেয়ে ইউরো-কমিউনিস্টদেরই বেশী ভয় করেন।"

প্রাসংগিক প্রশ্ন

বহুদলীয় ও স্বাধীনতাকামী দৃষ্টিভঙ্গি, গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা অদল বদল, অস্তিত্ব বজায় রাখা ও বিরোধিতা করার অধিকার, চিন্তা ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা, অবাধ বিরোধিতা ও আন্দোলন করার অধিকার, জাতীয় কমিউনিজম, মসকোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি প্রভৃতি গালভরা রাজনীতিক চটকবাণী যে শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আবার অতীত ভুলভ্রান্তি থেকে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তারা যে অনেক বেশী আধুনিক, দক্ষ ও বাস্তববাদী হয়েছে সে সম্পর্কেও কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই দলগুলি আরও গণতান্ত্রিক হয়েছে। সুতরাং যেসব দল নিজেদের অভ্যন্তরীণ রীতিনীতি ও সাংগঠনিক ব্যাপারে আজও 'অথোরিটারিয়ান', তারা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কোনকালে স্বাধীনতার রক্ষক ও ধারক হতে পারবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই প্রাসংগিক প্রশ্ন হচ্ছে, (১) গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি ইউরো-কমিউনিস্টদের এই আনুগত্যকে কী শুধু মুখের কথাতেই বিশ্বাস করা হবে, অথবা এই আন্তরিকতাকে ইতিহাসের কষ্টিপাথর এবং অতীতে অনুরূপ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন? (২) আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, একবার সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হতে পারলে অথবা এককভাবে শাসনক্ষমতা হাতে পেলে এই সব পার্টির কর্মধারা তখন আর কতখানি গণতন্ত্র-সম্মত হবে এবং (৩) কী অর্থে ও কোন বিষয়ে ইউরো-কমিউনিস্টরা স্বাধীন। আবার

এনরিকো বারলিনগুয়ার—ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল।

পশ্চিমের পার্টিগুলির এই সব নীতি ও কর্ম-সূচীর আপাত উদাহরণই বা কি? কোন রকম দুর্বলতা অথবা পূর্ব-বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে, স্বাধীনতা ঘোষণার এই আন্তরিকতার সংগে নির্বাচনী-স্বার্থের এক অপূর্ব মিশ্রণ। উল্লেখ্য, পি-সি-এফ ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেসে যখন রাশিয়ার বহুবিঘোষিত রাজনীতিক বুলি "সর্বহারাদের একনায়কত্ব" পরিত্যাগ ক'রে তার স্থলে আরও লাগসই ও চটকদার শব্দা-লংকার "শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্ব" [hegemony of the working class] গ্রহণ করল [এটি আর একটি অলংকার এবং এই দুই শব্দালংকারের প্রভেদ নির্ণয়ও অনুরূপ দুরূহ], তখন অধিবেশনে উপস্থিত মোট ১৭০০ প্রতিনিধির একজনও ভিন্নমত প্রকাশ করেন নি যদিও আবার পূর্ববর্তী অনুরূপ সমস্ত কংগ্রেসেই এই ১৭০০ প্রতিনিধি একইভাবে "সর্বহারাদের একনায়কত্ব" শব্দালংকারকে সমর্থন করেছিলেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই ১৭০০ প্রতিনিধির একজনও বা আগের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন না কেন? এই পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছিল যদিও এই ঐক্যমত স্পষ্টত পার্টির মধ্যে সেই লৌহকঠিন প্রভুত্বেরই প্রমাণ। আর এখন সকলেই জানেন যে ইতিমধ্যে সোভিয়েত সংবিধান থেকেও এই অলংকারটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাস কী বলে

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ক্ষমতা দখলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নিজস্ব জাতীয় পথ গ্রহণের সংকল্প এবং গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য কোন নূতন ঘটনা নয়। ইউরোপীয় কমিউনিস্টদের নিম্নোক্ত উক্তি-গুলি তার প্রমাণ।

(ক) বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জর্জি ডিমিট্রভ ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বলেন, "আমাদের তথা মার্কসীস্টদের একান্তভাবে জানা প্রয়োজন, বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো—দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ ছকে বাঁধা অথবা সোভি-য়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নির্দিষ্ট পথে চলার কোন প্রয়োজন নেই। সে এগিয়ে যাবে তার স্বকীয় পথে এবং তার ইতিহাস, তার সমাজ, তার জাতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।"

(খ) ১৯৪৫ সালের জুন মাসে [পূর্ব] জার্মানী পার্টির ঘোষণা, "আমরা মনে করি যে [আমাদের দেশের উপর] সোভিয়েত পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া ভুল হবে কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে যে অবস্থা, সেখানে উন্নতি ঘটাতে হলে সোভিয়েত পদ্ধতি আদৌ প্রযোজ্য হবে না। আমরা আরও মনে করি, বর্তমানে অবহেলিত জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োজন...এবং তা হলো সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তবেই আপামর দেশবাসীর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার সুরক্ষিত হবে।"

(গ) হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এনরো জেরো ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে বলেন: "বর্তমানে দেশের বিশাল কার্যভার কমিউনিস্ট অথবা অন্য কোন পার্টির পক্ষে এককভাবে সমাপন করা সম্ভব নয়। কমিউনিস্টরা একথাও মনে করে যে, নূতন দেশ গঠনে জনতার সংগে কাজ করার এক-চেটিয়া অধিকার তাদের নেই এবং সে অধিকারের প্রয়োজনও নেই। অধিকন্তু, একদলীয় শাসনকে কমিউ-নিস্ট পার্টি সমর্থন করে না। অন্যান্য পার্টিও দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসুক।"

(ঘ) পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভর্লাউ গোমুলকা ১৯৪৬ সালের জুন মাসে বলেন, "আমাদের দেশে [সরকারী] কাজের জন্যে বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং সরকারী ক্ষমতা সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বহারা অথবা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্বের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশ নিজস্ব পথে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এবং সেদিকে সে এগিয়ে চলেছে।"

(ঙ) চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীতে বলেন, "কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত পদ্ধতিই যে একমাত্র পথ আমরা তা মনে করি না।.... অন্য কোন দলের সংগে কোয়ালিশান করা কোন সুযোগ সন্ধানের ব্যাপার নয়; তা হলো এক অস্থায়ী ও সীমিত কোয়ালিশান এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করতে হলে গণতান্ত্রিক সংসদীয় রীতি যাতে নিয়মতান্ত্রিক আইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তা আমাদেরকে সুনিশ্চিত করতে হবে।"

গণতান্ত্রিক পৃথিবী ভালভাবেই জানে যে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বর্তমানে গণ-তান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাদের আনুগত্যের যে কথা তারস্বরে ঘোষণা করছে তা, বিগত চল্লিশের দশকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতারা অনুরূপ বাগ্মিতা ও গুরুত্বের সংগে যেসব ঘোষণা করে-ছিলেন, তার থেকে আদৌ স্বতন্ত্র নয়, অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতা পুরোপুরি দখল করার আগে পর্যন্ত কমিউ-নিস্টরা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিজেদের আনুগত্য ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা এইভাবেই জাহির করে থাকেন।

আবার ১৯৩০-এর দশকে এবং পুনরায় '৪৫ সালে 'পপুলার ফ্রন্টে' যোগ দেওয়ার কালে পি-সি-এফ নেতারাও 'সর্বহারাদের একনায়কত্ব' শ্লোগানের প্রতি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের নেতা মরিস থোরেস 'লণ্ডন টাইমস'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎ কালে বলেছিলেন, "ফ্রান্স কখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে না। ফ্রান্সের অধিবাসীরা তাঁদের মহান [অতীত] ঐতিহ্যের ধারক হয়ে স্বকীয় পথ বেছে নেবেন।" ইতিহাস কিন্তু জানে যে, সেই মহান ও গৌরবময় ঐতিহ্যও পি-সি-এফ-কে অল্পদিন পরেই স্তালিনবাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত করতে পারে নি।

পুনরায়, অতি সম্প্রতি ক্যারিলোকে মতাদর্শগত পরিবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যথাযথ গুরুত্ব সহকারেই জবাব দেন যে শেষ বিশ্লেষণে তাঁদের দল হলো 'লেনিনপন্থী'। এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক পৃথিবী জানে, কোন লেনিনপন্থী দল আপনা থেকে গণতন্ত্রী হয়েছে এমন কোন নজীর আজও পর্যন্ত নেই। বলাবাহুল্য, এই ঘোষণা ও আনুগত্যের বহবারম্ভ 'democratic pluralism'-এর ইঙ্গিত নয় : তা স্পষ্টতই হচ্ছে সেই বজ্রকঠিন লেনিনীয় বিধান তথা 'democratic centralism' অর্থাৎ অবং ভিন্নমতের দমন ও লোপ। পূর্ব অথবা পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির অ দ্যও পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালীর নির্দেশক নীতি। এ কোন মুক্ত ও অবাধ আলাপ-আলোচনার নীতি নয় ; এ হলো এক লৌহকঠিন শৃঙ্খলার 'ডকট্রিন'। এ পথ হলো এক বন্ধ মতের পথ, এ এক 'রেজিমেণ্টেড পার্টি লাইন', এক কর্তৃত্ব ও আজ্ঞানুবর্তিতার পথ, সব রকম মতবিরোধ দমন ও মতবিরোধীদের বিলোপের পথ। তাই মৌল প্রশ্ন এই নয় যে, ইউরোপের কমিউনিস্টরা কী পরিমাণ স্বাধীন ; প্রশ্ন হলো, তাঁরা কী পরিমাণে 'কমিউনিস্ট'। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যখন বার্লিনগুয়ার এক সাক্ষাৎকালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "এক লৌহ-কঠিন বন্ধন পি-সি-আই-কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং যাঁরা মসকোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন তাঁরা চিরতরে নিরাশ হবেন।" বস্তুত, পূর্ব অথবা পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেই এই মন্তব্য সমভাবেই প্রযোজ্য।

অভিন্ন চরিত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে মত পার্থক্য আছে সে কথা ঠিক ; কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য, কোন আন্তর্জাতিক-বিষয়ক প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কদাচ কোন মতানৈক্য ঘটেনি। আর তো দেখা গিয়েছে, পি-সি-আই অ্যাঙ্গোলার কিউবানদের "স্বাধীনতা সংগ্রামী" বলে অভিবাদন জানিয়েছে, এণ্টাবিতে আটক 'হোস্টেজ'দের ইসরাইলী সৈন্য উদ্ধার করলে সেই ঘটনাকে 'উগাণ্ডার জাতীয় সার্বভৌমত্বের অসহনীয় লঙ্ঘন' বলে নিন্দা করেছে, আফ্রিকায় সোভিয়েত নীতিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমেরিকার কূটনীতিক প্রচেষ্টাকে সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া-ঔপনিবেশিক ও সামরিক কলাকৌশলগত স্বার্থ বজায় রাখার প্রয়াস বলে নিন্দা করেছে।

দীর্ঘকাল ধরেই কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশক নীতি হলো, শ্রমিক শ্রেণীর 'ভ্যানগার্ড' হিসাবে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের জন্যে চাপ সৃষ্টি করে সমাজের বৃহত্তর অংশের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতি এই অবজ্ঞা—তা সে "সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র" নামে উপস্থাপিত করা হোক, অথবা 'শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্ব' নামে আরও এক আকর্ষণীয় অলংকারযুক্ত শব্দ সংযোজন করে উপহার দেওয়া হোক—এই উভয়েরই সেই একই বস্তু যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রভেদকে তুলে ধরেছে। আবার কমিউনিজম এমন এক দর্শনের ধারক যা আপন গুণ ও স্বভাবেই পশ্চিমের নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসের গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে। অধিকন্তু, কমিউনিস্টরা দাবি করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একবার জয়লাভ করলে [এই জয়লাভ সরকারী ক্ষমতা অধিকারের দ্বারাই সূচিত হয়] তখন সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যশীল পার্টিগুলিই শুধু টিঁকে থাকবে, যে পার্টির সমাজতন্ত্রে আস্থা নেই সে অবশ্যই প্রতিবিপ্লবী এবং সেহেতু তার রাজনীতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার কোন অধিকার থাকে না। শুধু তাই নয়, আবার যেহেতু একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই জনগণের প্রকৃত স্বার্থ যথাযথ প্রকাশ করতে পারে, তখন শেষ বিশ্লেষণে অন্য সব পার্টিই প্রতিবিপ্লবী হতে বাধ্য। নীতিগতভাবে এই সব দল তখন বেআইনী হয়ে যায় যদিও পারিস্থিতি কখনও কখনও সাময়িকভাবে তাদেরকে সহ্য করে।

অপরিচিত রাজনীতিক প্রাণী

পৃথিবীর যে সব দেশে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসেছেন সেখানকার" বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে উপরিউক্ত যুক্তি ও তথ্য প্রকৃত ঘটনার দ্বারা সমর্থিত। এমন কি খোদ সোভিয়েত রাশিয়াতেও কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা পূর্ণ শাসনক্ষমতা দখল করার আগে পর্যন্তও বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন। অতএব দেখা যাচ্ছে কোন কমিউনিস্ট পার্টি যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলে, ক্ষমতাচ্যুত হলেও যখন সে গণতন্ত্রের রায় মেনে নিতে গররাজী হয় না, অন্যান্য

মার্শাল টিটো—যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট ও লিওনিদ ব্রেজনেভ—সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট সর্বপ্রধান।

বামপন্থী দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে স্বীকৃত হয়, সর্বহারাদের বাইরে অন্যান্যদের ভূমিকারও দাবি করে, আভ্যন্তরীক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার উপর জোর দেয় এবং সমানাধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলে—তখন তাকে গণতন্ত্র ও কমিউনিজম এই উভয় জগতেই এক অপরিচিত রাজনীতিক জীব বলেই মনে হবে। বলা বাহুল্য রাজনীতিক শব্দালঙ্কার 'শোধনবাদ'-এর প্রবণতার এমন এক প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে যে খোদ শোধনবাদেরই বিরোধিতা করারই আর সম্ভাবনা থাকছে না।

এ কেবলই কৌশলগত হাসি

পরিশেষে উল্লেখ্য, কমিউনিস্টরা যখন বুঝতে পারলেন যে ভায়োলেন্সের দ্বারা বিপ্লব করা আর সম্ভব নয়, তখন নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে একমাত্র বিকল্প হিসাবে পরিষদীয় পদ্ধতিকেই একসপ্লয়েট করার সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, কার্যসিদ্ধির পর এ পথকে তাঁরা যথারীতি পরিত্যাগই করবেন। এখানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একমাত্র তাৎপর্য হচ্ছে যাতে জনসাধারণ দ্বিধাহীন মনে তাঁদেরকে সমর্থন করে ও ভোট দেয়। কিন্তু তাঁরা যাকে 'ঐতিহাসিক প্রগতির' অপরিহার্য পথ বলে মনে করেন, সেই গতিপথকেই গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী যদি বিপরীতমুখী করে দেয় তাহলে সে অবস্থা স্বীকার করে নিতে কি তাঁরা প্রস্তুত ? যে সব গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিধি ও প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে তাঁদের পরাজয় ঘটাবার হাতিয়ার হতে পারে, একবার নিরঙ্কুশ রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকারী হলে সেগুলিকে কি তাঁরা বজায় রাখবেন ? কমিউনিস্ট নামধারী ও কমিউনিস্ট আদর্শের যোগ্য অধিকারী কোন পার্টি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অতীতে এমন কাজ কখনও করেনি এবং ভবিষ্যতে কখনও করতে পারে না। তাই তো দেখা গেছে, ইউরোপে যে সব গণতান্ত্রিক দল এককালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল, তাদেরকে বর্তমানে কোন মন্ত্রিসভা অথবা সংসদে দেখতে পাওয়া যায় না ; তাদের অস্তিত্ব এখন একমাত্র ইতিহাসের সূচীপত্রেই দেখা যাবে। কারণ সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রথা ও আদর্শের প্রতি কমিউনিস্টদের প্রীতি ও আস্থা হলো এক 'কৌশলগত হাসি' [Tactical Smile] তথা দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের কৌশলমাত্র এবং তাঁরা সব সময়ে গণতন্ত্রের নাম করেই গণতন্ত্রকে হত্যা করেন। সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে—ইউরোপ এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্টরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সেই বিখ্যাত থিসিসকেই অনুসরণ করছে যা হলো : "Communism repudiates Parliamentar-. ism as the form of the future; it renounces the same as a form of the class dictatorship of the proletariat; it repudiates the possibility of winning over the parliaments; its aim is to destroy Parliamentarism. The task of the proletariat consists in blowing up the whole machinery and destroying all the parliamentary institutions. Therefore, it is only possible to utilising the bourgeois State organizations with the object of destroying them."

লক্ষণীয়, আমাদের দেশেও মার্কসবাদী কমিউনিসট পার্টি ইউরো-কমিউনিসটদের দাবি ও প্রীতি প্রতিধ্বনি করে ইদানীং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছে যথা কলকাতার শহীদ মিনারের পদতলে 'অকটোবর বিপ্লবের' হীরক জয়ন্তী উৎযাপনকালে তাদের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অতি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই কথা বলেছেন। এ যেন অনেকটা 'পেতে থাকলেই বাসুন হয়' সেই প্রবাদের মতোই দ্বান্দ্বিক। তাই এদেশে কোন রাজ্যে মার্কসিস্টদের সঙ্গে কোন রকম নির্বাচনী আঁতাত অথবা কোয়ালিশান সরকার গঠন করার পূর্বে জনতা পার্টি যেন আন্তর্জাতিক কমিউনিসট আন্দোলন এবং ক্ষমতা দখলের কলাকৌশল থেকে শিক্ষা নেয়। কারণ বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাসের পাতার দিকে চোখ বন্ধ করে রাখলে জনতা পার্টি শুধু নিজের ভবিষ্যতকেই বন্ধক দেবে না, সেই সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকেও বন্ধক দেবে। সর্বশেষে মনে রাখা প্রয়োজন, যে সমাজ [অথবা দল] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে মনে খুশিমত চিন্তা করে বর্তমানের অসুবিধাজনক পছন্দকে এড়াতে চায়, সে এই সংযমের জন্যে কোন পুরস্কার পায় না ; সে শুধু নিজের অবলুপ্তিকেই ত্বরান্বিত করে।

কণ্টকাকীর্ণ

অতুল্য ঘোষ

॥ ৪৪ ॥

মুকুটমণিপুরে পৌঁছে কংসাবতী বাঁধের কাজ শেষ হতে প্রায় সাড়ে বারটা বেজে গেল। কংসাবতী, কুমারী এবং শিলাবতী—তিনটে নদী বেঁধে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীতে সেচের জল দেওয়া হবে। যত দূরে মনে হচ্ছে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর বেশী জল পাবে এবং হুগলী অতি সামান্য। বাঁকুড়ার খাতড়া থানায় মুকুটমণিপুরে এই বাঁধ। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে, এই দিকটা ছোটনাগপুরেরই একটা অংশ। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর শাল-পলাশের বন। মহাবিস্তৃত জঙ্গল অঞ্চল ছিল। ক্রমাগত গাছ কাটার ফলে জমির অবক্ষয় ঘটেছে। তবু এখনও যে শোভা তা অতুলনীয়। ফাল্গুনে পলাশ যখন তার রক্তরাঙা বিজয়কেতন ওড়ায় তখন অতি জড়বাদীও চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। এখনও কিছু কিছু হরিতকী, আমলকী ও বয়ড়া গাছ আছে। তা ছাড়া পিয়াল, অর্জুনেরও সমারোহ কম নয়। আগে এই অঞ্চলে বহু ভেষজ গাছ ছিল। এখন অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে কংসাবতী খুব চওড়া। আর বর্ষাকালে খুব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। বাঁকুড়া থেকে খাতড়া যাবার পথে শিলাবতীর ক্ষীণ রেখা দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে। বর্ষাকালে এর তাণ্ডবলীলায় ঘাটাল মহকুমায় বিপর্যয় হয়। কংসাবতীর উৎপত্তি-স্থান দেখলে বোঝাই যাবে না যে, কংসাবতী এরকম বিস্তৃত রূপ নিতে পারে। পুরুলিয়া থেকে রাঁচী যাবার পথে জয়পুর এবং ঝালদার মাঝে রাস্তার উপর একটা বার ফুট চওড়া কালভার্ট আছে। সেইখান দিয়েই কংসাবতী বয়ে আসছে। একটু দূরেই একটি ছোট্ট বিধ্বস্ত পাহাড়। মনে হয় যেন কেউ গদাঘাতে পাহাড়টাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। একটিও গাছ নেই। ক্রমাগত গাছ কেটে ফেলার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি।

মুকুটমণিপুরের কাজ সেরে আমরা খাতড়ার বাংলোয় ছিলুম। সেইখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন। সেখানে একরকম মিষ্টান্ন দিল—নাম চিত্তরঞ্জন। অপূর্ব খেতে। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে বলা হল যে, মিষ্টিটি খুব ভাল। যেন সবাইকে দেওয়া হয়। খাওয়ার পর আমরা বিশ্রাম করছি এমন সময় কর্তৃপক্ষের একজন চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'আজ্ঞে, সব ব্যবস্থাই তো ঠিক, কেবল মিষ্টান্নটি নেই।' আমি হাসি চাপতে পারলুম না। ফলে সব কথাই ফাঁস হয়ে গেল। পরামর্শটি দিয়েছিলেন ডাঃ রায়। ও'রই সন্দেশটি ভাল লেগেছিল। উনি হেসে হেসে বললেন, 'ওহে, তোমরা তো সেইরকম করলে'—বলেই গল্প শুরু করলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর অজস্র গল্প বলতে
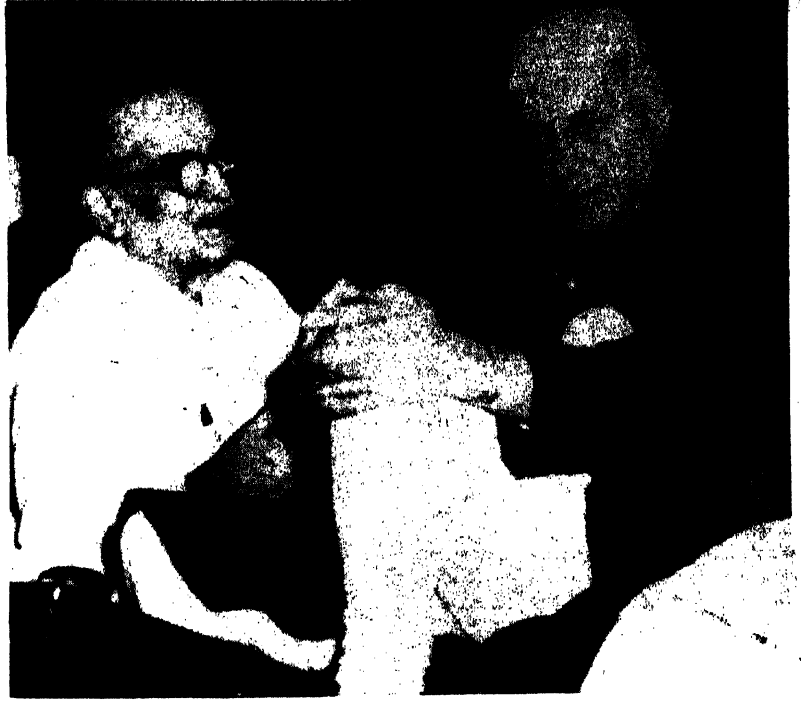
পারতেন এবং নিজে না হেসে। খাতড়ায় যে গল্পটি বললেন তার সারাংশটি হল—ছোট ভাই বড় ভাইকে চিঠি লিখেছে—দীর্ঘ চিঠি : 'দাদা, তোমার বাড়িতে অসুখ। তার উপর আয় সামান্য। ছেলেপুলেও অনেকগুলি। আমার কাছ থেকে অর্থসাহায্য গেলে তবু খানিকটা সুবিধা হয়। তোমার এ অবস্থা জানা সত্ত্বেও গত বছর কিছু পাঠাতে পারি নাই। এবছর তাহাও পারিলাম না।' এই ছিলেন ডাঃ রায়। এক দিকে যেমন কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত ; আবার যাতায়াতের পথে অবসর পেলে তাস খেলতেন। আর তাঁর ঝুলিতে অজস্র ছোট গল্প ভরা ছিল। তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা অনেকেই জানেন। প্রশাসক হিসেবেও খুব নাম হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে সময় সময় খুব আড্ডা দিতে পারতেন—এ খবর অনেকেরই অজানা।

আমরা মুকুটমণিপুর থেকে বাঁকুড়া শহরের কাছে গৌরীপুর কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র ও কুষ্ঠ রোগীদের হাসপাতাল গেলুম। যাবার পথে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চবার্ষিকী যোজনা নিয়ে আলোচনা করলেন। একটা গোলমাল ডাঃ রায়ের মধ্যে ছিল। তাঁর চিন্তাধারা ছিল বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক ও নগরমুখী। কুটিরশিল্প বা গ্রামের চাষবাস সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কিন্তু মন ছিল না। এটা জওহরলালের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। অবশ্য জওহরলালের ঔদাসীন্য বোঝা যায়, কিন্তু ডাঃ রায়ের অবহেলা আমার বুদ্ধির অগম্য। কারণ, জওহরলাল যাকে 'প্ল্যানার' বলে তা ছিলেন না। খানিকটা তিনি ভাবরাজ্যে বাস করতেন। সেজন্য বাস্তবের রূঢ় সংস্পর্শে বহু সংঘাতের সৃষ্টি হত। এবং ভারতবর্ষের স্বনির্ভরতার জন্য জওহরলাল বরাবরই শিল্পসৃষ্টির দিকে জোর দিয়েছেন। ডাঃ রায় ছিলেন সত্যিকারের একজন 'প্ল্যানার'। বাস্তবের রূঢ় সংঘাত তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। তবুও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর কোনও সময়ই কেন যে জোর দেননি তা ব্যাখ্যা করা শক্ত।

গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রমটি একটি শালবনের মধ্যে। আবহাওয়া ভাল। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম এবং চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত আছে। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার কুষ্ঠ রোগীর শতকরা হার স্বাধীনতার পর অনেক কমে গেছে। কিন্তু সমস্যা খুবই জটিল। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে কুষ্ঠ রোগীদের সমাজে স্থান নেই। এখন অধিকাংশ কুষ্ঠ রোগী রোগমুক্ত হচ্ছেন কিন্তু তাঁদেরও সমাজে স্থান হচ্ছে না। তারপর তাঁদের স্থান কোথায়? কুষ্ঠাশ্রমে থাকা চলবে না ; কারণ, তাঁরা রোগমুক্ত। সমাজে স্থান নেই ; কারণ, তাঁদের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। এবং সাধারণভাবে সমাজে এখনও কেউ বিশ্বাস করেন না যে, কুষ্ঠরোগী সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হতে পারে। একদা যিনি কুষ্ঠরোগী ছিলেন, চিকিৎসার গুণে স্পৃশ্য হয়েছেন—এ বোধও অধিকাংশ লোকের মধ্যে নেই। অধিকাংশ বললে ভুল বলা হয়, একেবারেই নেই বললেই চলে। সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবীরা যতটা আগ্রহশীল হলে সমাজ থেকে এই অহেতুক ও অমূলক কুসংস্কার দূর হতে পারে তার চেষ্টাও বিশেষ নেই। এর ফলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একদা কুষ্ঠরোগী বর্তমানে রোগমুক্ত—এ'দের তা হলে স্থান কোথায়? রোগমুক্তকে পরিবারের লোক বর্জন করতে পারে না, অতএব সেখানে রোগমুক্তদের স্থান হয়। অবশ্য-

পরিণতি—সমাজে একঘরে হয়ে থাকা। মুখে কেউ বলে না; কিন্তু পারতপক্ষে সকলেই ঐ পরিবারকে এড়িয়ে চলে। তা হলে উপায় কি? যাঁরা রোগমুক্ত তাঁরাও তো মানুষ! তাঁরাও তো স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন-যাপন করতে চান! কিন্তু তাঁদের কাছে সব পথ বন্ধ। এ যেন টিঁকে থাকার জন্য বেঁচে থাকা। আইন করে এই সামগ্রিক সামাজিক কুসংস্কার বন্ধ করা যাবে না। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি চিকিৎসকগণ এবং সমাজপতিগণ কুষ্ঠরোগীর রোগ নিরাময়ের পরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হন।' 'আফটার কেয়ার কলোনি'র দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না। কিছু লোককে এগিয়ে এসে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্ত মানুষ যে পরিবারে বাস করেন যদি সেই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন তবেই হয়তো একটা পথ খুলে যেতে পারে। আমি হয়তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে দেখেছি যে, তাঁদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। যেন মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার তাঁরা হারিয়েছেন। আমি অনেক দিন একটি কুষ্ঠাশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলুম। আমার বুদ্ধিতে কোন পথ বার করতে পারিনি।

গৌরীপুর থেকে আমরা গেলুম দুর্গাপুর। সেখানে অনেক রাত অবধি ডাঃ রায় দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট 'কোক ওভেন প্ল্যান্ট'টা ঘুরে আসার জন্য বেরুলেন। তখন রাত নটা বেজে গেছে। অফিসাররা সসংকোচে একান্ত নিভৃতে আমাকে বললেন যে, তাঁদের শারীরিক ক্ষমতায় আর কুলচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে ছিল সাংবাদিক শিবদাস ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও অনিল ভট্টাচার্য (যুগান্তর পত্রিকা)। এরা দুজনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে ডাঃ রায়কে বোঝাতে গেল যে, তাঁর ঐ বয়সে—সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এতটা পথ অতিক্রম করেছেন—পরিশ্রম বেশ হয়েছে। আজ রাত্তিরে তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এ দুজনের সাহস অসামান্য। সেজন্য যে কথা কেউ সাহস করে বলতে যায়নি, এরা বলে ফেলেছিল। ডাঃ রায় শুনেই বললেন, 'ও! তোমাদের বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে!' একজন অফিসারকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এদের খাবার ব্যবস্থা করে দাও'। ব্যস, তারপরেই বেরিয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য সঙ্গে ছিলুম। ওই দুজন সাংবাদিকের অবস্থা সংকটাপন্ন। অপর সব সাংবাদিকরা ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল। এবং বেচারীরাও একটু মুষড়ে গেল। আমরা সাড়ে দশটার পর ফিরে এসে দেখি অফিসাররা শিবদাস ও অনিলকে অনেক সাধ্যসাধনা করছেন খাবার জন্য। তারা না খেয়ে চুপ করে বসে আছে। সে একটা উপভোগ্য দৃশ্য। আর ডাঃ রায়ের হাসি। ভেবেছ, বুঝি আমাদের জন্য আলাদা আলাদা করা আছে।' আবার হাসি। আবার একটা খাওয়ার গল্প। ডাঃ রায় যখন দিল্লী যেতেন ওঁর সঙ্গে যেত জওহরলালের জন্য ভাল ভাল বড় বড় মিষ্টান্ন। উনি সে সময় দিল্লী গেলে জওহরলালের বাড়িতে (প্রধানমন্ত্রী ভবনে) থাকতেন। সেবারে প্লেনের হয়েছে অনেক দেরি। ডাঃ রায় গিয়ে যখন পেঁছিলেন তখন সকালের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গেছে। সে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হল না। ডাঃ রায় নিজের ঘরেই সকালের খাবার খেতে বসলেন এমন সময় জওহরলালের আবির্ভাব। সকলেই মনে করেছে যে, কুশল প্রশ্ন করবার জন্য জওহরলাল গেছেন। ডাঃ রায় ঠিক বুঝেছেন। উনি বিমলাকে (জওহরলালের বাড়ির অতিথিদের পরিচর্যার ভার শ্রীমতী বিমলার উপর ছিল) ডেকে বললেন—'এবারে নতুন ধরনের মিষ্টি এনেছি—নিয়ে এসো না আমার জন্যে! আর, জওহরলালকে প্লেটে করে দাও।' অবশ্য তারপরে দুজনেই মিষ্টান্ন আস্বাদ করেন। জওহরলাল খেলেন অসময়ে—আর ডাঃ রায় খেলেন চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও। ওঁর ডায়াবিটিস ছিল। ইনসুলিন ইনজেকশন নিতেন, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রীতি কম ছিল না। সবচেয়ে ভাল বাসতেন বাড়ির তৈরী পায়েস—আর সেটা যদি খেজুরের গুড়ের হত তা হলে তো কথাই নেই!

বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১৪ ॥

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি ছেপেছেন, আর একটি চিঠির কথা শুধু উল্লেখ করে গেছেন। যে চিঠিটি ছেপেছেন, তাতে শচীশবাবুর চাকরিতে সুখ্যাতির কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের খুশী হওয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের বাড়ির খবর দেওয়া—এই ধরনের কয়েকটা কথা আছে মাত্র।

শচীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটির কথা শুধু উল্লেখ করেছেন, সেটির সম্বন্ধে লিখেছেন—'একবার তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বায়ু পরিবর্তন উদ্দেশে কিছু দিনের জন্য চন্দননগরে বাস করেন। বাড়িটি অতি সুদৃশ্য, দ্বিতল, গঙ্গার উপর। তিনি কিছুদিন তথায় একাকী থাকিয়া আমায় পত্র লিখেন—তোমার খুড়ীকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।

আমি খুড়ীমাকে লইয়া একদিন প্রাতঃকালে চন্দননগরে আসিলাম। .... আমায় বলিলেন,—তোমার খুড়ীকে বাগান দেখাইয়া লইয়া এস। আমি স্নান করিয়া লই।'

এরপর এই প্রসঙ্গেই শচীশবাবু লিখেছেন, তিনি যখন তাঁর খুড়ীমা অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বাগান দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে আবার বাড়ির কাছে ফিরে এলেন, তখন বাড়ির দুতলায় ক্রুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ভীষণ চীৎকার শুনতে পেলেন। পরে তাঁরা জানতে পারলেন, ভৃত্য স্নান করাবার সময় ভুল করে যে কলসীতে অত্যধিক গরম জল ছিল, সেই কলসীর জল বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় ঢেলেছিল। মাথায় ঐরূপ অত্যধিক গরম জল পড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ভৃত্যের উপর রেগে চীৎকার করে উঠেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভৃত্যরা কলসীতে করে জল নিয়ে সেই জল ঢেলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে স্নান করাতো তার একটা কাহিনী এখানে বলছি—

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের তৈরি একতলা বৈঠকখানা বাড়িটির চারটি ঘরের মধ্যে এক পাশের যে ঘরটিতে তাঁর ভৃত্য মুরলী থাকত, সেই ঘরের মেঝে এবং ছাদের মাঝখানে আর একটি ছাদ ছিল। মূল ছাদে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে ঐ ঘরের মাঝের ছাদে যাওয়ারও একটা দরজা ছিল। এই মাঝের ছাদের উপরের ছাদে ঠিক মাঝখানটিতে একটি মাঝারি গোছের গোলাকার ঝাঁঝরি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নানের সময় তাঁর ভৃত্য কয়েক কলসী জল নিয়ে উপরের ছাদে ঝাঁঝরির পাশে বসে থাকত, আর বঙ্কিমচন্দ্র মাঝের ছাদে ঝাঁঝরির নীচে বসতেন। ভৃত্য ঝাঁঝরির মুখে ধীরে ধীরে কলসী থেকে জল ঢালত, সেই জল ফোয়ারার মত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গায়ে-মাথায় পড়ত। এইভাবে তিনি কৃত্রিম ফোয়ারার জলে স্নান করতেন। বলা বাহুল্য যে, মাঝের ছাদে পড়া জল পাইপ বেয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে পড়ত। এই ঘরটি আজও আছে বটে, কিন্তু সেই স্নানাগারটি আজ আর নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার এই স্নানাগারটি থেকে যেমন তাঁর স্নানে সৌখিনতা বা বিলাসিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর ঐ কাঁটালপাড়ার বাসভবনেরই কক্ষে কক্ষে যে টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল, তা থেকেও তাঁর আরামী স্বভাবের এবং বুদ্ধিমত্তার বেশ সন্ধান মেলে। তখন দেশে ইলেকট্রিকের প্রচলন হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাড়িতে সেজবাতি জ্বালাতেন এবং টানাপাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তখনকার টানাপাখাগুলো সাধারণত এই ধরনের ছিল—ঘরটি যতটা লম্বা কিছু কম প্রায় ঐ মাপেরই লম্বা এবং হাত দেড়েক চওড়া মাদুর চারদিকে রঙিন ফিতায় মুড়ে প্রথমে একটা মোটা বাঁশ বা ঐ ধরনের একটা গোলাকার কাঠের দাঁড়ের সঙ্গে সংলগ্ন করে ঝোলাতে হত। তারপর মাদুর সহ সেই বাঁশ বা কাঠের দাঁড়টিকে দড়ি দিয়ে ঘরের কড়িকাঠের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে হত। ঐ বাঁশ বা কাষ্ঠদণ্ডটির মাঝে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা থাকত। নীচে মেঝে থেকে সেই দড়ি ধরে টানলেই মাদুরটা দুলতে থাকত এবং ঘর বাতাসে ভরে যেত। কয়েক বৎসর আগেও মফঃস্বলের যে সব শহরে ইলেকট্রিক ছিল না, সেখানকার কোর্ট-কাছারিতে হাকিমদের ঘরে এই টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় নিজের এবং কন্যাদেরও শয়ন কক্ষগুলিতে এইরূপ মাদুরের টানা পাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব কক্ষের পাখা টানবার দড়িগুলোকে ঘরেব দরজার মাথায় ফুটো করে বাইরে এনে বারান্দার উপর দিয়ে বারমহলে নীচে চাকরদের ঘরে দেওয়া হত। সেখানে বারমহলে চাকররা তাদের ঘরে বসে ঐ সব দড়ি টানত এবং সেই টানে এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর কন্যাদের ঘরগুলিতে পাখা দুলে বাতাস হত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বেশভূষা এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যেও এমনি একটা সুরুচি ও সৌখিনতার ছাপ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর স্নেহভাজন সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু সৌখিন ছিলেন। তাঁহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটী—পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। ... বাড়িতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই।'

এবার একটা কথা—শচীশবাবু যে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চন্দননগর থেকে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন—তোমার খুড়ীকে নিয়ে এখানে চলে এস, শচীশবাবুর এই কথা থেকে আমার এও দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ সঙ্গে স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকেও একটা চিঠি দিয়েছিলেন, অন্তত এই বলে যে, শচীশকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চলে এস।

এরূপ বিশ্বাস বা অনুমান করার হেতু এই যে, প্রথমত—রাজলক্ষ্মী দেবী সেকালের তুলনায় ভালই লেখাপড়া জানতেন। দ্বিতীয়ত—ভাসুরপো জ্যোতিশকে লেখা রাজলক্ষ্মী দেবীর যখন একাধিক চিঠি পাচ্ছি, তখন এটা অনুমান করা ভুল হবে না যে, তিনি তাঁর স্বামীকেও নিশ্চয়ই চিঠিপত্র লিখতেন আর বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে চিঠি লিখতেন।

পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পারিবারিক চিঠি পেয়েছি, কিন্তু স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিও পাই নি। ঠিক

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

এমনি বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখা রাজলক্ষ্মী দেবীরও কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। পাওয়া না গেলেও বেশ অনুমান হয়, কাঁটালপাড়া অথবা কলকাতায় পরিবার রেখে বঙ্কিমচন্দ্র যখন একা বাইরে কর্মস্থলে থাকতেন, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন এবং রাজলক্ষ্মী দেবীও স্বামীকে চিঠি দিতেন।

স্ত্রীকে চিঠি লেখার অভ্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র দুবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল সেকালের প্রথা অনুযায়ী বাল্যেই এগার বছর বয়সে। প্রথমা স্ত্রী মোহিনী দেবীর বয়স ছিল তখন মাত্র পাঁচ। মোহিনী দেবীর পিতা নবকুমার চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রদের কাঁটালপাড়ার বাড়ির মাইল দুই দক্ষিণে নারায়ণপুর গ্রামে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন বাইশ এবং মোহিনী দেবীর বয়স ষোল সেই সময় কয়েক দিনের জ্বরে ভুগে মোহিনী দেবী হঠাৎ মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাড়িতে ছিলেন না, কর্মস্থল যশোহরে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোন কোন লেখকের লেখা থেকে জানা যায়, মোহিনী দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর থেকে স্ত্রীকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—তোমাকে এবার শীঘ্রই এখানে নিয়ে আসব।

মোহিনী দেবী লেখাপড়া জানতেন। তিনি স্বামীর ঐ চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। স্বামীর কাছে থাকতে পাবে এই আনন্দে তিনি তখন সেই

চিঠি অনেককেই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও মোহিনী দেবীর—তাদের
সে আশা আর পূর্ণ হয়নি।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হলেও পিতামাতার
আদেশে, বিশেষ করে অভিন্নহৃদয় বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আগ্রহে বঙ্কিম-
চন্দ্র কয়েক মাস পরে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এবার পাত্রী কাঁটালপাড়ার
অদূরেই হালিশহরের। নাম রাজলক্ষ্মী দেবী, বয়স বার। রাজলক্ষ্মী দেবীর
পিতা সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল অন্য জায়গায়। তিনি হালিশহরে
গৃহ-জামাতা হিসাবে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র
বঙ্কিমচন্দ্রকে সংগে নিয়ে হালিশহরে গিয়ে পাত্রী পছন্দ করে এসেছিলেন।

এখন আমার কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমা স্ত্রীকে যখন চিঠি লিখতেন
বলে জানা যায়, তখন তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও চিঠি লিখতেন। বিশেষ করে
রাজলক্ষ্মী দেবী মোহিনী দেবী অপেক্ষা আরও বেশী শিক্ষিতা ছিলেন এবং
বঙ্কিমচন্দ্র এই স্ত্রীর প্রতিও বড় অনুরক্ত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী পরস্পরকে লেখা কোন চিঠি যদি পাওয়া
যেত, তাহলে নিছক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুখ-দুঃখ ও প্রয়োজনীয় কথা
ছাড়াও কিছু রঙ্গ-রসিকতার কথাও সেই চিঠিতে হয়ত দেখা যেত। কেননা,
এঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে মাঝে নিজেদের নিয়েও যে কিরূপ রহস্য-প্রিয় ছিলেন
সে সম্বন্ধে উভয়েরই একটি করে ঘটনার উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র একবার কর্মস্থল থেকে সস্ত্রীক ট্রেনে বাড়ি আসছিলেন।
তাঁরা প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ছিলেন। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে কিছুক্ষণের
জন্য থামলে সেই স্টেশনের একটি যুবক কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের কামরার কিছু
দূরে দাঁড়িয়ে রাজলক্ষ্মী দেবীর দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটির এই ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে, যুবকটিকে গাড়ির
মধ্যে ডেকে কাছে বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি কর বাপু ?

—এই স্টেশনে কাজ করি।

—কত বেতন পাও ?

—ত্রিশ টাকা।

—বেশ, তা তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখবার জন্য অত আঁকু-পাঁকু করছিলে
কেন ? আমার নাম বঙ্কিম চাটুজে। ডেপুটীগিরি চাকরি করি, বেতন পাই
আটশ টাকা। অনেকগুলো বইও লিখেছি। তা থেকেও বেশ টাকাকড়ি পাই।
সেই সব এঁর হাতে সঁপে দিয়েও মন পাইনি।

যুবকটি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুনেছিল এবং তাঁর উপন্যাসও পড়েছিল।
বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। তখন সে নতমস্তকেই
কোন দিক আর না তাকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেল।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এখানে বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন, স্ত্রীর মন পাননি, ওটা
নিছক ঐ যুবকটিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই একটা বানানো কথা। বঙ্কিমচন্দ্র
যখন যুবকটিকে ঐ কথাগুলি বলছিলেন, রাজলক্ষ্মী দেবী তখন শুধু মৃদু মৃদু
হাসছিলেন।

এবার রাজলক্ষ্মী দেবীর একটা রঙ্গ-কাহিনী বলছি। কাহিনীটি বঙ্কিম-
চন্দ্রের স্নেহভাজন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি। অক্ষয়বাবু
লিখেছেন—

'বংগদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন
বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে
থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বর খানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরাণী সদর পৃষ্ঠার যে
বড় বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নীচে কখন একটি শূন্য
বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা সবে মাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন,
তিনি সেই বংগদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ
করিলেন—বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে বংগদর্শন, এযে রঙ্গদর্শন ?

বঙ্কিম হাসিতে হাসিতে উত্তর করেন—আমি তো বঙ্গদর্শনই লিখিয়াছিলাম,
তবে তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রংগদর্শন হইয়াছে, আমি কি করিব মা!'—
নবপর্যায় বংগদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৪

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মী দেবীকে নিশ্চয়ই চিঠি লিখতেন বলে যেমন
অনুমান করছি, তেমনি কোন চিঠি পাওয়া না গেলেও এও অনুমান করছি যে,
বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুদেরও
অবশ্যই চিঠি লিখতেন। কেন তা বলছি—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমার দেখা
লোক' বইয়ে লিখে গেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় তাঁদের বাড়ির কাছে
থাকতেন তখন হেমচন্দ্র প্রায়ই কলকাতা থেকে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন।
শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় মানিকতলায় থাকার সময়
অনেকের সংগে হেমচন্দ্রও প্রতি রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করতেন।
আরও কারও কারও লেখায় জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন বৌবাজার স্ট্রীটে থাকতেন
তখন প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকরা তাঁর কাছে আসতেন।
বৈঠকে সাহিত্য আলোচনা হত, আর রাজলক্ষ্মী দেবী অন্দরমহল থেকে 'ঠাকুর'
মারফৎ গরম লুচি তপসে মাছ ভাজা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন। বঙ্গদর্শনের শুধু
লেখক হিসাবেই নয়, বন্ধুত্বের সূত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে হেমচন্দ্রের নানাভাবে
যোগাযোগ ছিল। তাই এঁকেও নিশ্চয়ই চিঠি লিখতেন।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আজও আমাদের কাছে প্রায় সমানই প্রিয় ও
পরিচিত থাকলেও, সেকালের কবি ও প্রাবন্ধিক, যিনি বিশেষ করে ঐতিহাসিক
প্রবন্ধ রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, সেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজ অনেকের
কাছেই অপরিচিত হয়ে পড়েছেন।

[illegible] অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শুধু বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখকই ছিলেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়ও ছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বিখ্যাত বই 'নানা প্রবন্ধ'র প্রতিটি প্রবন্ধই বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসটি এঁকে উৎসর্গ করেন। এমন কি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণবাবুর 'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনাটিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বহুভাষাবিদ রাজকৃষ্ণবাবু কিছু কম বয়সেই মারা যান। তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চিঠি পাওয়া না গেলেও তাঁর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে তখন কলকাতায় যে শোকসভা হয়েছিল, সেই শোকসভার একটি ছেঁড়া চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সৌজন্য ও অমায়িকতা গুণে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মৃত্যু হওয়ায় দুঃখে সকলের একবার মিলিত হওয়া আবশ্যক ...আগামী ৯ই ফাল্গুন রবিবার বেলা চারটার সময় .... অক্রূর দত্তের গলি ১৪ নং ভবনে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সভা আহ্বান করা হইবে। অনুরোধ আপনারা সভায় উপস্থিত হইবেন। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত

চিঠির গোবিন্দলাল দত্ত ছিলেন, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক। বৌবাজারের অক্রূর দত্ত লেনে অবস্থিত এই সাবিত্রী লাইব্রেরী ছিল একটি বিখ্যাত লাইব্রেরী। এর প্রশস্ত হলে তখন নানা ধরনের সাহিত্য সভা প্রায়ই হত।

শচীশবাবুর বই থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। তার কাহিনীটা এই—

ভারতের তৎকালীন ইংরাজ সরকার ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'রায় বাহাদুর' এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে সি আই ই উপাধি দিয়েছিলেন। সি আই ই উপাধি প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—

দরবার হইল একুশে মার্চ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সুতরাং তিনি দরবারে যাইতে পারেন নাই।

আর 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—সেই সময় এই নিয়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'উপাধি-উৎপাত' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [illegible]

বুদ্ধি সৌজন্য ও অমায়িকতা গুণে সকলেরই প্রিয়

ছিলেন। [illegible] বাঙ্গালী মাত্রেই অত্যন্ত

ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মৃত্যু

[illegible] একবার মিলিত হওয়া আবশ্যক

[illegible]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শোকসভার চিঠি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নগেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন—'যদি একথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিমবাবু রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন তাহা হইলে আজ সেকথা লইয়া আমরা স্পর্ধা করিতে পারিতাম।'

এই প্রসঙ্গেই শচীশবাবু লিখেছেন— ইহার কিছুদিন বাদে সাহিত্য সম্পাদক একখানি বিস্বস্ত পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম সকলকে জানাইয়া তিনি বলিলেন যে, 'নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। এই পত্র বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছিলেন।

শচীশবাবু সাহিত্য-সম্পাদকের নাম না করলেও ইনি হলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুরেশবাবু তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' নামক বিখ্যাত বইটিতে চারটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ের বহু আলাপ-আলোচনার কথা বিস্তৃত ভাবে লিখে গেছেন।

শচীশবাবুর বই থেকে এইরূপ আরও একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। সেই চিঠিটির প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—

'একবার একটি বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া খামের উপর মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লিখিয়াছিলেন—এ বাড়িতে মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই। আপনি বোধ হয়, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইংরাজস্তোত্র' লেখাটার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকেও শচীশবাবুর ঐ লেখার সত্যতা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া, পাণ্টলুন সেই ধড়া—আর হুইপ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে শুভংকর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোসামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে মানদ! আমায় টাইটেল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রনাম করি।....

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট

পান্টলুন পরিব নাকে চশমা দিব, কাঁটা-চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে মিষ্টভাষিন্। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিস্টার লেখাইব। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

প্রায় এই ধরনেরই আর একটা কাহিনী এখানে বলছি—

বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী এস কে লাহিড়ী বা শরৎকুমার লাহিড়ী এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি হাফটোন ছবি প্রকাশ করবার ইচ্ছা করেন।

হাফটোন ছবির ব্লক তখন এদেশে কেউই করতে পারতেন না। বিলাত থেকে করিয়ে আনতে হত। এজন্য এতে যথেষ্ট খরচ পড়ত।

শরৎবাবু এই ব্যয় বহন করেই বিলাত থেকে ব্লক করিয়ে আনতে মনস্থ করেন। এজন্য তিনি তাঁর পিতাকে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠান। শরৎবাবুর পিতা রামতনু লাহিড়ী ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রামতনুবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে পুত্রের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন এবং এ বিষয়ে তাঁরও যে খুব আগ্রহ আছে তাও বললেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শুনেই কিন্তু নিজের ছবি ছাপাতে সম্মত হলেন না। তারপর রামতনুবাবুর পীড়াপীড়িতে শেষে বললেন—আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যদি ছাপানো ঠিক মনে করি, তাহলে আমি আপনার ছেলে শরৎকে খবর দোব।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা শুনে রামতনুবাবু চলে এলেন।

কয়েক দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎবাবুকে ডেকে পাঠালেন। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র শরৎবাবুকে চিনতেন না। তাই তিনি এলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

উত্তরে শরৎবাবু বললেন—আমার নাম এস কে লাহিড়ী।

—আপনার প্রয়োজন?

—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি কোন এস কে লাহিড়ীকে তো চিনি না। অতএব ডেকে পাঠাবার তো কোন সম্ভাবনা নেই।

শরৎবাবু এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে আত্মপরিচয় দিতে লাগলেন। বললেন—আমার পিতার নাম রামতনু লাহিড়ী, আমার নাম শরৎকুমার লাহিড়ী।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ হেসে বললেন—তাই বল। তুমি শরৎকুমার লাহিড়ী, তা না বলে যদি বল—এস কে লাহিড়ী তাহলে কি করে চিনব বল।

শরৎবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথায় একটু লজ্জিত হয়ে কোন উত্তর দিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষে তাঁকে ছবি প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইংরাজ স্তোত্র' রচনা থেকে উদ্ধৃত করে যে দেখিয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—কাঁটা চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব ইত্যাদি, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবনেরও পরবর্তীকালের একটা অনুশোচনা। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এক সময়ে সাহেবী ভাবাপন্ন হয়ে কাঁটা-চামচে ছাড়া খেতেন না। পরে তিনি কিভাবে কাঁটা-চামচ ছাড়লেন সে সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত মজিলপুরের কালীনাথ দত্তর কাছে একদিন গল্প করেছিলেন। কালীনাথবাবু সেই গল্পই এইভাবে লিখেছেন—'একদিন তিনি কাঁটা-চামচ হস্তে একটি কৈ-মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃপুন বিফলপ্রযত্ন হইতেছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—কি বিড়ম্বনা! উপায় থাকিতে কি কর্মভোগ।'—এই কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল।...............

এই সময় তিনি শুধু কাঁটা-চামচে খাওয়াই ছাড়েননি মাছ-মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি তখন যশোহর জেলার ঝিনাইদহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র একবার তাঁর বিশেষ পরিচিত শোভাবাজার রাজবাড়ির কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন মনস্থ করেন। এবং এও ঠিক করেন যে টেবিল চেয়ারে ও কাঁটা-চামচে ভোজের আয়োজন করবেন। এই স্থির করে তিনি কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর কাঁটা-চামচগুলো চেয়ে পাঠান। এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এই—

প্রিয়তমেষু,

........তোমার জ্যেষ্ঠতাতের এই মরণাপন্ন অবস্থা, আর তোমার পিতার শয্যাগত এই অবস্থায় তুমি যে ভোজের ঘটা বাধাইয়াছ, তাহা অতি বিস্ময়কর। তোমার বালকবুদ্ধি আজও যায় নাই। ....

আমার ছুরি-কাঁটা যাহা ছিল, তাহা ঝিনাইদহ হইতে আসিবার সময় সেরেস সাহেবকে দিয়া আসিয়াছি।

আমার বিবেচনায় যদি গোপেন্দ্রকৃষ্ণকে খাওয়াইতে হয় তবে আমাদের দেশী ব্যঞ্জনাদি উত্তম করিয়া খাওয়াইলে ভাল হইতে পারে। ....ইতি তাং বুধবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের দাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি উপদেশ এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশীয় প্রথার উপরও তাঁর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। (ক্রমশ)

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ৫ ॥

দাউদ একখানা বড় আয়না কিনেছে। সেই পানের দোকানের মত বড়। যখনই ফুরসৎ পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখান একবারটি দেখে নেয়। সইফুল তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, একথা শোনার পর থেকে দাউদ তার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে এ আল্লার মেহেরবাণী। আল্লাহ তার সকল গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। দাউদ আয়নায় একবার মুখখানা দেখে নিল। এবার সে একবার বাড়ি যাবে। বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বড় ভাইয়ের সঙ্গে তার একদিন দেখা হয়েও গিয়েছে। সে তার হাত দিয়ে আব্বার কাছে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেনি। প্রথম বাধা বাইতিদা। ওর সঙ্গে একটা ফয়সালা করে নেওয়া দরকার। আর দ্বিতীয় বাধা এবং সেইটেই প্রধান, তার চাচা। চাচার টাকার জন্য নয়। টাকা সে ফিরিয়ে দেবে। এখনই দিতে পারে। তা নয়। আর তাছাড়া দাউদ জানে টাকার পরোয়া চাচা করেন না। অনেক টাকা সে নষ্ট করেছে। তা নয়। আসল কারণ ফুটকি। ফুটকি আত্মহত্যা করেই দাউদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। ফুটকি ছিল চাচার পেয়ারের শালী। তাকে দাউদ ফিরিয়ে দেবে কী করে?

সইফুল তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, এ খবরটা শোনা মাত্র দাউদ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে খুব যে একটা অপ্রত্যাশিত ছিল, তা তো নয়। তবে সে আনন্দে ফেটে পড়তে পারল না কেন? সেইটাই তো স্বাভাবিক ছিল, নয় কী? সেইটাই তো সে চাইছিল, মনে প্রাণে নয় কী? তবে? তবে খুশিতে সে ফেটে পড়ল না কেন? সইফুল রাজী হয়েছে। তার আর সইফুলের মধ্যে আর তো বাধা থাকল না কিছু? না, আর কী বাধা? কেন, ফুটকি! হায় আল্লাহ্! দাউদ ভয় পেয়ে গেল। ফুটকি, দাউদ এখন বুঝতে পারল, আত্মহত্যা করে তার কী সর্বনাশই না করেছে! দাউদকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। সইফুলকে শাদী করার আগে ফুটকির হাত থেকে তাকে অব্যাহতি পেতে হবে। না হলে সইফুলের ক্ষতি হবে। আয়নায় দাউদ বেশ উৎকম্প বোধ করতে লাগল। সে ঠিক করল বাড়ি যাবে। সে তার কৃতকর্মের জন্য চাচার কাছে, চাচীর কাছে, ছুটকি-ভাবীর কাছে, বাইতিদার কাছে, সকলের কাছে মার্জনা চাইবে। তার পুরানো খাতার হিসেব মিটিয়ে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে দাউদ ফিরে আসবে সইফুলের কাছে। আল্লাহ্ হয়ত তাই চান। তার গুণাহের জের যেন সইফুলকে টানতে না হয়। দাউদ তা দেখবে। দেখবে দেখবে যেন কারও বদদোওয়া সইফুলের উপর না পড়ে। সইফুল সইফুল। সইফুলকে সে কোনও কষ্ট দেবে না। দাউদ তার মনের দিকে চেয়ে দেখল, সইফুল সম্পর্কে সেখানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি বিরাজ করছে। এমনটি আর কোনও মেয়ের বেলায় সে অনুভব করেনি। সইফুলের কথা মনে হলে সে শরীরের ডাকে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না, যদিও তাকে বিছানায় পেতে তার খুবই ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার চাইতেও বেশী ইচ্ছে হয় সইফুলকে নিয়ে এখানে ওখানে যেতে। তার সঙ্গে বসে বসে বা পাশাপাশি শুয়ে কথা বলতে। সইফুলের ফরমায়েস খাটতে। তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখতে।

আর? আরেকটা ইচ্ছেও তার হয়। বাপ হবার ইচ্ছে তার হয়। খুব হয়। দাউদ আয়নাটায় তার মুখখানা দেখে নিল। যেন যাচাই করল, বাপ হলে তাকে মানাবে কিনা? সইফুল হবে দাউদের বাচ্চার মা। কথাটা ভাবতে থাকলেই দাউদের শরীর সুখে শিরশির করতে থাকে।

খবরটা বাবুই দাউদকে দিয়েছিল। দাউদ তখন ঝিনেদা-মাগুরোর রাস্তা সারাতে ব্যস্ত। বাড়ি যায়নি। তার গ্রাম চার মাইল দূর এবং তার সাইকেল আছে। তা সত্ত্বেও সে গ্রামে ঢোকেনি। সে মধুপুরেই ক্যাম্প করেছে। এবং যথারীতি সে বিভিন্ন গ্রামের মোড়লদের ডেকে কাজের লোক দিতে বলেছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খোন্দকার বজলুর রহমান ছাহেবের মুছলমান দরদের কথা বলেছে এবং মাতব্বররা তার কথা মন দিয়ে শুনেছে এবং বেকার লোকেদের এনে রাস্তার কাজে, ইঁট তৈরি, পাঁজা তৈরি এবং তা পোড়াবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সব ঠিক ঠিক চলছে। দাউদ ভোটের আগে রাস্তা তৈরি করতে পারুক আর না পারুক, এটা ঠিক যে সে খোন্দকারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত ঝিনেদা-শৈলকুপার দিকটায় সকলেই এখন খোন্দকার বজলুর রহমানের নাম জানে।

কিন্তু তার নিজের গ্রামের দিকে এসে দাউদ দেখল এখানে আরেকটা বেশ জোরালো স্রোত বইছে। এবং সে স্রোত কৃষক প্রজা আন্দোলনের। দাউদ দেখে অবাক হল যে প্রত্যেকটা মাতব্বরই জানে যে সামনে একটা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে খোন্দকার বজলুর রহমান ছাহেব ক্যান্ডিডেট। আবার দাউদকে এ কথাও শুনতে হল, খোন্দকার তো জমিদার, তিনি চাষীর উপকার আর কী করবেন? দাউদ দেখল, এদিকে খোন্দকারের পক্ষে মাটি বেশ শক্ত। দাউদ চিন্তিত হল।

কৃষক-প্রজা ক্যান্ডিডেট মৌলবী আবু তালেবকে দাউদ চেনে। তার মক্তবে দাউদ পড়েছেও কিছুদিন। এ অঞ্চলে তাঁর সম্মান খুব। কিন্তু আরেকজন আবু তালেব কে? যার নাম প্রায়ই মাতব্বরদের মুখে সে শুনেছে। তাকে দাউদ চেনে না। মনে হয়, এই লোকটাই নাটের গুরু। আর আছে সাজ্জাদ মোড়ল। ফটিক ভাই-র বাপ। আর বশির। সেও সাজ্জাদের সাগরেদ। আর শুনছে তাদের পাড়ার লোকেদের কথা। বিশেষ করে খালেক মামুর কথা। এঁরা এ অঞ্চলের মানী লোক এবং ঈমানদার বলে এঁদের মান আছে। এ অঞ্চলের লোক এঁদের কথাই মেনে আসছে। এঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে কারো পক্ষে এই অঞ্চলে মাটি তৈরি করে দেওয়া শক্ত। তার উপর আবার কালোজিরে আর ফুটকি দুজনেই তাকে জখম করে দিয়েছে। দাউদ দেখল, সে এখানে বেজায় কোনঠাসা।

কালোজিরেকে নিয়ে ভেগে পড়ার জন্য তার তেমন ক্ষতি কিছু হত না। তাদের পরিবারেই যা কিছু গণ্ডগোল হত। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুটকি আত্মহত্যা করেই তার অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। দাউদ যে গর্হিত কাজ করেছে, সে রায় উচ্চ রবে ফুটকিই চাউর করে দিয়ে গিয়েছে। তার চরম বেইজ্জতি হয়েছে সেইখানেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা মেরামত দাউদ দেখল যত না শক্ত তার চাইতে ঢের বেশী শক্ত তার নিজের জখমী ইজ্জত মেরামত করা। কিন্তু দাউদকে যেমন রাস্তা মেরামত করতে হবে, তেমনি তার ইজ্জতটাকেও মেরামত করে নিতে হবে। নাহলে এ অঞ্চলে তার মুরুব্বী খোন্দকার ডুবে যাবে। এই সম্ভাবনা দাউদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। মৌলভী আবু তালেব গরিব। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা দেখে দাউদ ঘাবড়ে গেল।

দাউদ এই বিষয়ে দু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যও বটে, আর একটা বড় পেমেন্ট নেবার জন্যও বটে, যশোরে এসেছিল। এবং যথারীতি গতকাল সন্ধ্যায় সইফুলদের বাড়ি গিয়েছিল। সইফুলের আম্মা ভাল আছে, উঠে বসেছে এবং ওষুধে যে কাজ দিয়েছে, তা দেখে দাউদ খুশী হল। জামিলা তাকে আজকাল নানা ফরমায়েশ করে এবং বড় বুবু যে তার উপর কত অন্যায় করে, সে সব কথা বিস্তারিতভাবে শোনায় এবং দাউদ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং গম্ভীরভাবে তার সুচিন্তিত রায় প্রকাশ করে। এবং বলাই বাহুল্য সব রায়ই জামিলার অনুকূলে যায়। ফলে জামিলা দিন দিন দাউদের ন্যাওটো হয়ে পড়ছে। দুটো একটা কথা আজকাল সইফুলও বলে। এই ধরনের পারিবারিক জীবনের মোলায়েম অভিজ্ঞতা দাউদের জীবনে বিশেষ ঘটেনি। ছবি যখন ছোট, তখন বছর দুই তিন জ্বালিয়েছিল। আবদারও করত। তারপর কি করে যেন ওর কানে গেল, চাচা ঠিক করেছেন ছবির সঙ্গে ওর শাদী দেবেন। কেমন এক ধরনের লজ্জা আর সঙ্কোচ যে তার মনে গজিয়ে উঠল, দাউদ আর কিছুতেই ছবির সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেনি। আজও পারে না। ইয়াকুবই ছিল ছবির প্রকৃত সাথী। তারপর কী যে হল? চাচা মত বদলালেন। ওর আম্মা বলে, চাচীরই ফুসলানিতে। ছবির সঙ্গে দাউদের শাদী হল না। দাউদের মনে ওর চাচার প্রতি কেমন একটা তীব্র বিদ্বেষ বাসা বাঁধল। দাউদ যে এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল তাও নয়। আজকাল যেন সে কথাটা বুঝতে পারে। হয়ত সেই কারণেই সে চাচার আওতায় মানুষ হতে পারেনি। চাচা ওর ভালোর জন্য যা কিছু করেছেন তার একটাকেও সে ভালো মনে মেনে নিতে পারেনি। সে-সবই ভেস্তে দিয়েছে দাউদ।

ফুটকির মত মেয়েকেও সে কষ্ট দিয়েছে। সে কি এই কারণে যে ফুটকি চাচারই পেয়ারের শালী? আয়নাটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল দাউদ। যদি ফুটকি একবার উঁকি দেয়? ফুটকি না সইফুল? কার প্রত্যাশা করছে দাউদ? দাউদ বিভ্রান্ত বোধ করল। আজ যখন সইফুল তার নাগালের মধ্যে, তাকে শাদী করতে চেয়েছে, তাকে শাদী করতে চলেছে তখন দাউদের মনে বারবার ফুটকি উঁকি মারছে কেন? তখন সে এত বিভ্রান্ত বোধ করছে কেন?

দাউদ ভাই, দাউদ ভাই! কাল অনেক রাতে বাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছিল। বু আপনারে শাদী করবে। বাবু হাঁফাচ্ছে। তার চোখ মুখ খুশীতে জ্বলজ্বল করছে।

দাউদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল দাউদ।

জিজ্ঞাসা করল, তুমার বু তুমারে কইছে?

বাবু বলল, না।

সে তখনও হাঁফাচ্ছে।

দাউদ ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে

রইল।

বাবু উত্তেজিতভাবে বলল, আম্মাজান বাজানরে কইছে। আমি স্পষ্ট শুনিছি। আম্মা বাজানরে একটু আগেই কলো, সইফুল দাউদ বাপেরে শাদী কত্তি রাজী হইছে। আপনি ইবার আগোতি পারেন।

ফুমার বাজান কী কলেন? দাউদের স্বরেও চাপা উত্তেজনা।

বাবু বলল, বাজান আল হামদো লিল্লাহ্ বলে চেঁচায়ে ওঠলেন। তারপর আম্মারে কলেন, ছুরা নেছায় এই কথা কওয়া আছে যে আল্লাহ্ মালিক চান যে তুমাগের বোঝা হালকা করেন, কেননা মানুষির অত্যান্ত দুব্বলা করে ছিস্টি করা হইছে। বলেই আম্মা নাক ডাকায়ে ঘুমোয়ে পলেন। আর আমিউ আস্তে করে সাইকেলডারে বের করে নিয়ে আপনারে খবরডা দিতি আলাম।

দাউদ এবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

দাউদ চুপ করে আয়নার দিকে চেয়ে বসে রইল।

ফুমার বু ফুমারে কিছু করেছে?

বাবু অত্যান্ত দুঃখের সঙ্গে বলল, বু একথা কবে আমার সাথে? হুঃ! বু-রি আপনি চেনেন না। কী দেমাকী মেয়ে। আমাগের বলে মানুষ বলেই গিরাহ্যি করে না!

দাউদ আয়নার দিকে চেয়ে হাসল। বড় ম্লান সে হাসি। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। বাবুকে বিদায় দিয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম আসেনি। প্রথম দিকে উত্তেজনায় এবং আনন্দে। আল্লাহ্ আবার তাকে অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দ তার উবে যেতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনে ধীরে ধীরে কালবৈশাখীর মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠতে থাকল। একটা ভয় সন্দেহ ধারণ করে তার মেরুদাঁড়ার মজ্জা বেয়ে নামতে লাগল। ফুটকি। ফুটকি কি তার এত সুখ সহ্য করবে? ফুটকি কি প্রতিশোধ নেবে?

দাউদ আয়নার দিকে এমন আগ্রহ ভরে চেয়ে আছে যেন ফুটকি তাতে ভেসে উঠবে দাউদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। দ্যাখ ফুটকি, দাউদ কাতর প্রার্থনা জানাল, গুণাহ্ যদি হয়ে থাকে তা আমার। সইফুল নিদ্দুষী। তোরই মত নিদ্দষী। ওরে তুই কষ্ট দিসনে।

দাউদ ঠিক করল ফুটকির সঙ্গে সে মোকাবেলা করে নেবে। কী করে নাগাল পাবে ফুটকির? দাউদ ঠিক করল সে বাড়ি যাবে। এবং ফুটকির কবর দেখে আসবে। মধুপুরের হাটে হঠাৎ একদিন নেয়ামতের সঙ্গে দাউদের দেখা হয়ে যায়। নেয়ামতের তখন খুবই খারাপ অবস্থা। সে তখন আশে-পাশের কয়টা হাটে মেসিনটা বয়ে এনে শুধু তফন সেলাই করে কোনও মতে চালাচ্ছে। ভাইকে দেখে নেয়ামত প্রথমে কথাই বলতে চায়নি। কালোজিরেকে নিয়ে দাউদ পালাবার পর নেয়ামতের দোকান লুঠ হয়ে যায়। হাটে সে আর করে খেতে পারেনি। কিন্তু দাউদ এ সুযোগ ছাড়েনি। হাটের পর বড় ভাইকে দাউদ তার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারপর আন্ডা পরোটা আর চা-পানি খাইয়ে তার রাগ ভাঙায়। অনেক কথা দুই ভাইয়ের মধ্যে হয়। দাউদ তার কাজের কথা বলে। তার আগেকার কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে। বাইতির সঙ্গে দেখা করতে চায়। দাউদ বাড়ি ফিরতে চায়। তার চাচার টাকা শোধ করে দিতে চায়। ভাই যেন এ বিষয়ে তাকে একটু মদত দেয়।

ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেছিল নেয়ামত। তা সত্ত্বেও সে দোনামনা করছিল। তখন দাউদ বলল, নেয়ামত যদি ভালো করে দরজির দোকান চালাতে পারে, তাহলে তার জন্য যা টাকা লাগে দাউদ দিতে পারে। এই কথায় নেয়ামত বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এবং বলেছিল অবশ্যই সে দাউদের জন্য চেষ্টা করবে। নেয়ামতের হাত দিয়ে সে তার দুই আম্মা আর ফুটকির জন্য শাড়ি কিনে পাঠিয়েছিল। আব্বুকে কিছু টাকাও।

নেয়ামত আর সবই করেছে এ পর্যন্ত। তার আব্বাকে মধুপুরে এনে দাউদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছে। দাউদ তার কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছে। রহমান নির্কিরি ছাওয়ালকে শুধু মাফই করেনি, দাউদের পরিবর্তন, তার কাজ কামের নমুনা দেখে তাজ্জবও হয়ে গিয়েছে। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ছাওয়ালের দৌলতে সেও হয়ত একদিন হাজী হতে পারে। তারও বাড়িতে বড় ভাই-এর মত একটা দহলিজ দাউদ তৈরি করে দেবে। তারও বাড়ি হাজী বাড়ি হবে। অতএব বাড়ি যাওয়ার রাস্তা দাউদের খোলা হয়ে গিয়েছে। শুধু তার চাচা আর বাইতি, বাকি আছে এই দুইজন। এঁরা যদি তার গুণাহ্ মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহ্ও তাকে মেহেরবাণী করবেন এবং ফুটকির রাগও তিনিই মিটিয়ে দেবেন। চাচা আর বাইতিরা গ্রামে নেই, তাই ওদের সঙ্গে কথা বলতে রহমান বা নেয়ামত পারেনি। হাজী সাহেব ঝিনেদায় বাড়ি তুলছেন আর বাইতি বেরিয়েছে যাত্রা গাইতে।

দাউদ ভুলেই গিয়েছিল যে খোন্দকারের সঙ্গে আজ তার দেখা করার কথা আছে। হঠাৎ মনে পড়তেই সে আয়নার সামনে থেকে উঠে পড়ল। তার মনে আবার উৎসাহ ফিরে আসছে। সইফুল তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, এইটেই আসল কথা। তার কেন যে ধারণা হয়েছিল, সইফুল রাজী হবে না, কে জানে?

করা সত্ত্বেও দাউদের সঙ্গে আজও সইফুলের ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপ তেমন হয়নি। সইফুল সরে সরেই থেকেছে। এবং সত্যি বলতে কি, তাতে সইফুলের প্রতি দাউদের আকর্ষণ বেড়েই গিয়েছে।

দাউদ আয়নার দিকে একবার চাইল। তারপর ডাক দিল, "কাতলা!"

"জে।" কাতলা এগিয়ে এল। তার হাতময় ময়দা।

দাউদ সস্নেহে কাতলার দিকে চাইল।

"দ্যাখ কাতল, ভাবতিছি তোরে এ বাড়ির বাবুর্চির কাজের থে ছাড়ায়ে দেব।"

কাতল ঘাবড়ে গেল। "ক্যান্, আমার রান্না কি আর খাওয়া যাচ্ছে না?"

"আরে না বিটা না, তোরে আমি ছাইটি নিয়ে যাব। তুই সেখেনেই থাকবি।"

"তা'লি এ বাড়ি থাকবে কিডা?"

"সেইডেই তো কতি চাচ্ছি। এ বাড়ি দ্যাখাশুনা করার জন্যি একটা ভালো লোক দ্যাখেক দিন। বিটি ছাওয়াল হতি হবে। কাজে কম্মে ভালো। বাড়ির লোক-জনেরে ভালো করে দ্যাখাশুনো কত্তি পারে। ঝগড়া টগড়া করবে না। অ্যামন লোক চাই। বুঝলি।"

কাতলা বলল, "বুঝিছি। আপনি শাদী কত্তিছেন।"

দাউদ খুশী হল। "কী করে বুঝলি?"

"কাতলা বলল, বোঝলাম। কারে শাদী কত্তিছেন, তাউ বুঝিছি।"

"তাউ বুঝিছ?" দাউদের খুশী উপছে পড়তে লাগল। "কওদিন শুনি?"

কাতলা বলল, "ঐ মৌলবী ছাবের বিটির।"

দাউদ এবার হেসে ফেলল। "বিটা আবার হাত গুনতি শিখিছে।"

"হাত গুনতি লাগবে ক্যান?" কাতলা বলল, "চোখ চায়ে থাকলিই তো সব বুঝা যায়।"

দাউদ বলল, "তোর বিটা বড় বুদ্ধি। তাই তো তোরে আর বাবুর্চির কামে আটকায়ে রাখতি চাইনে। তোরে ইবার ঠিকেদারির কামে লাগায়ে দেব। তোর মাথা দেখতিছি আমার চাইতিউ ছাফ। এখন দ্যাখেক দিন খুঁজে পা'তে, একটা ভালো কাজের লোক যাতে পাওয়া যায়।"

"জে, দ্যাখবানে।"

"হ্যাঁ দেখিস বিটা, আবার ঝগড়াটে টগড়াটে না হয়। ঝাড়া হাত-পা হলিই ভালো। বাড়ির লোকের মতনই থাকবে। বুঝিছ? এখন গোছলের পানি দাও।"

দাউদ গোছল করতে করতে সইফুলের কথাই ভাবতে লাগল। এবং এই কথা ভেবে সে সত্যিই অবাক হল, কেন এতদিন সইফুল সম্পর্কে মনে এতটা দুশ্চিন্তা পোষণ করেছিল। আর সইফুল তাকে শাদী করতে রাজী, বাবুর মুখ থেকে এ কথাটা শুনে কাল রাতে তার মনে এত আশঙ্কাই বা দেখা দিল কেন? সইফুল কেন তাকে পছন্দ করবে না? খছম হিসেবে সে কি খারাপ? অতীত নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চায় না দাউদ। সে ভুল করেছিল, সে তওবা করেছে, আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেছেন। তা না হলে সইফুলকে তিনি মিলিয়ে দিতেন না। তা না হলে সইফুলকে তিনি রাজী করাতেন না। দাউদ ভাবছিল, এই উপলক্ষ্যে শোকর গুজারি করার জন্য সে তার বাড়িতে মৌলভী ডেকে একদিন কোর-আন তেলাওয়াত করাবে কিনা। তাহলে দু-চারজন এমন লোককে দাওয়াত করা যায়, যাদের কাছ থেকে সে উপকার পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও উপকার পাবার আশা রাখে। ডিস্ট্রিক্ট বোরডের চিফ্ ইন্জিনিয়ার বুড়া হিন্দু, এই ব্যাপারে তাকে নেমন্তন্ন করার মানে হয় না। তাকে বরং সাহেবী কায়দায় একটা ভেট্ পাঠিয়ে দেবে। দাউদ দেখেছে হিন্দু অফিসাররা সাহেবদের মতই বড়দিনের সময় ভেট পেলে খুব খুশী হয়।

মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে দাউদ মনে মনে হেসেই ফেলল। তুমি হাজার টাকা ঘুষ দিয়েও যে ফল না পাবা, বড়দিনে ষাট সত্তর টাকা খরচ করে একটা ভেটের ডালি সাজায়ে পাঠাও তাতে তার দুনো কাজ পাবা। কয়েক থুকো আঙুর, একটা দুটো আনারস, বড় বড় মর্তমান কলা, গুটা কতক বিলাতী ফল, কেক বিস্কুট, এক বোতল বিলিতি, একটা আট দশ সেরী পাকা রুই কিম্বা একটা খাসী। শালার দিশী সাহেব-গুলো ওতেই খুশী। শালারা ভাবে আমাগেরে সাহেব বলে মানতিছে। খুশী হয়। তখন যত ইচ্ছে ওগের মাথায় হাত বুলোও। মনে মনে দাউদ এ কথা আওড়ায় আর মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

সেই রকম একটা ভেটের ডালি পাঠাবে নাকি চিফ্ ইন্জিনিয়ার মুখারজি সাহেবকে? না কি স্রেফ এক বোতল বিলিতি আর একটা খাসী পাঠিয়ে দেবে? কিন্তু এখন তো বড়দিন না। তাহলে কোন্ উপলক্ষ্যে সে মাল পাঠাবে। উপলক্ষ্য ছাড়া কিছু পাঠানো তো ঘুষ? ওরে বুবাস! মন্দ তাহলি একেবারে ত্রিভুবন ছুটিয়ে দেবে না! নাঃ! দাউদ ওর তালিকা থেকে মুখারজি সাহেবের নাম কেটে দিল। পি ডবলিউ ডি-র নতুন এস ডি ও ছালেম ছাহেবকে নিয়ে দাউদের বেশী দুশ্চিন্তা নেই। এর আগেও তাঁকে দু-একবার দাওয়াত খাইয়েছে দাউদ। তা ছাড়া ডিসট্রিক্ট বোরডের রাস্তার কাজ দেখে খুশীও হয়েছেন এবং তিনি সে-কথা তাকে বলেওছেন। তাছাড়া কওমের খেদমত করার বাসনায় ছালেম ছাহেব যে উদ্বুদ্ধ তার প্রমাণও দাউদ শিগ্‌গিরই পেতে চলেছে। যশোর-খুলনা রোডে যে কাজটা বেরুবে, সেটা এবার দাউদের কপালে নাচছে। ছালেম ছাহেব মদ খান না। ইছলামের আহ্‌কাম আট শরা মেনে চলেন। সেদিকে কোনও নড়চড় হয় না। তিনি ঘুষ নেন না। ঠিকেদারদের কাছ থেকে শুধু পার-ছেন্‌টেজ্ খেয়ে থাকেন। পাঁচ পারছেন্‌ট্ বাঁধা বরাদ্দ। তার বেশি না। লোভ তাঁর শরীরে আল্লাহ্ মোটে দেননি। তার বাড়িতে কোর্-আন তেলাওয়াত হবে, ওয়াজ-নছিহত হবে, এই উপলক্ষ্যে দাওয়াত পেলে খুশীই হবেন ছালাম ছাহেব। ডিস্ট্রিকট বোরডের হেড ক্লারক নকীব মিয়াকেও আনা যাবে। আর হাঁ, ট্রেজারীর হেড্ কেরাণী ওবাইদুল মিয়াকেও বলতে হবে। গাজী গোলামের উপর সব ভারটাই চাপিয়ে দেবে দাউদ।

গোছল শেষ করে মাথা মুছতে মুছতে হঠাৎ বলে উঠল, "বাবু মিয়াগেরে সেদিন বাড়িসুদ্ধ দাওয়াত দিলি ক্যামন হয়?"

খুব উৎসাহ বোধ করল দাউদ। আসলে ওরা এলেই তো সে সব থেকে খুশী হয়। কী এতক্ষণ আজে বাজে কথা চিন্তা করছিল দাউদ। ঠিকেদারি করতে করতে এই কদিনের মধ্যেই, দাউদ দেখল, তার মাথাটা কেবল ফন্দী ফিকিরেই ভর্তি হয়ে উঠেছে। কিসে দু পয়সা ঘরে আসবে এছাড়া আর অন্য চিন্তা নেই। আশ্চর্য! তার এতক্ষণ ধরে সযত্নে তৈরি করা দাওয়াতের তালিকার দিকে তার যেন এখন নজর পড়ল। সব তার কারবারের লোক। কাকে হাতে রাখলে দু পয়সা ঘরে আসার ব্যবস্থা হবে কেবল তাদের নামেই তালিকা ভর্তি। -সেখানে সইফুলের নাম নেই, বাবু-জামিলের নাম নেই, তার খালা-আম্মার নাম নেই, মৌলভী জয়নুদ্দীনের নাম নেই! বলিহারি যাই!

কিন্তু দাওয়াত দিলেই কি ওরা আসবে? বিশেষত সইফুল? নিশ্চিন্ত হতে পারল না দাউদ। আর সইফুল না এলে তো সবই বৃথা। তাই তার মনে হল এখন এসব কিছুই করে কাজ নেই। পরে হবে। পরে হবে। বরং হ্যাঁ, সে এক কাজ করতে পারে। আবার তার মাথায় বেশ ভালো একটা বুদ্ধি এল। এবার সে নেয়ামতের সঙ্গে ব্যবস্থা করে বাড়ি যাবে। তার আব্বা আর আম্মাকে যশোরের বাসায় নিয়ে আসবে। দিন কতক রাখবে। সেই তখন সে একদিন দাওয়াত দেবে সইফুলদের।

লুঙ্গি আর কামিজ পরে মুখে পাউডার ঘষছিল দাউদ। এই বুদ্ধিটা তার বেশ মনে ধরল। এবং তার মনে হল, সইফুল এতে বোধহয় আপত্তি করবে না। দাউদ সইফুলের উপর তার কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছাকে খাটাচ্ছে, সইফুল এটা যেন মনে না করে। এটা সে চায় না। ফুটকি তাকে চরম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। দাউদ চায় সইফুল নিজের ইচ্ছায় তার ঘরে আসুক। তার ঘর, তার মন ভরে তুলুক। সইফুলকে সে কোনও কষ্টে রাখবে না। তাকে সে কুটোটিও ভাঙতে দেবে না।

সইফুল! মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে দাউদ আয়নাটাকেই যেন বলল, তুমার জন্যি আমি বাঁদী রাখে দেবো। তুমারে কোনও কষ্ট দেবো না। এই কথা যখনই সে সইফুলকে বলতে যায়, দাউদ বোধ করে, ফুটকি আস্তে করে এসে দাঁড়ায়। আর নিঃশব্দে হাসতে থাকে। আজও তাই হ'ল। দাউদ বোধ করল, ফুটকি হাসছে। দাউদ অকস্মাৎ খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ সে একটা অস্বস্তির ভিতর কাটাল। তারপর ঠিক করে ফেলল, সে একজন পাকা মৌলভীকে ডেকে আনবে ওয়াজ্-নছিহতের জন্য। তারপর আবার কী ভেবে ফুটকির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া মাগল। তারপর ফুটকিকে বুঝিয়ে বলল, তুই বেহেশ্‌তি হ ফুটকি। আমার ছাড়ে দে। সইফুলরি নিয়ে আমারে সুখী হতি দে।

দরজার কড়া খট্‌খট্ করে নড়ে উঠতেই দাউদের চমক ভাঙল। কাতলা দরজা খুলে দিল। গাজী গুলাম।

"কী, দাউদ মিয়া ফিরিছেন না কি?"

"জে। কাল রাত্তিরিই ফিরিছেন।"

দাউদ ঘরের ভিতর থেকেই সাড়া দিল, আচ্ছালামু আলায়কুম গুলাম ভাই। আসেন আসেন।"

"ওয়া আলাইকুমচ্ছালাম।" বলে গাজী গোলাম দাউদের শোবার ঘরেই ঢুকে পড়ল। "তারপর, কন দেখি খবর টবর কী?"

"কাতলা!" দাউদ হাঁক দিল। গাজী গোলামকে তার শোবার ঘরে হুট করে ঢুকতে দেখে দাউদ বিশেষ খুশী হল না। তার কেমন যেন মনে হল ঘরে সইফুল আছে। তার যেন পর্দা নষ্ট হল।

"জে।" কাতলা এসে দাঁড়াল।

দাউদ বলল, "যা যা একটা কুরসি নিয়ে আয়। বাড়িতি একটা লোক আলি খাতির করতি শেখোনি!"

গাজী গোলাম দাউদের সৌখীন বিছানায় থ্যাপ্ করে বসে পড়ে বলল, "খাতির দ্যাখানো অ্যাখন রাখেন। কুরসি ফুরসি কিছু আনতি হবে না। খবর কী ওদিককার অ্যাখন তাই কন? আপনাগের ওদিক নাকি খবর ভালো না।"

দাউদ বলল, "জে। সেই খবর দিতিই তো আলাম। কিন্তু আপনারা এ খবর পালেন কন্ থে?"

গাজী গোলাম বললেন, "বোরডের মেম্বার মেন্দা মিয়ার কাছ থে। তিনি আইছেলেন বোরডের মিটিংই। খোন্‌কার ছাহেবরে করে গেছেন, ওগের উদিক খোন্‌কার ছাহেবের নাকি দাঁত ফুটোতি হবে না। খোন্‌কার ছাহেব ঘ্যান অথৈ জলে পড়ে গেছেন। আমারে কলেন, দাউদ মিয়া যদি ফিরে থাকে, তালি তারে এখেনে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসো শিগগির। আসলে, যা বোঝলাম, মেন্দা মিয়ার কথায় ও'র বিশ্বাস হয়নি। বিটা খোন্‌কার ছাহেবরে ছাপোরট দিয়ার ওয়াদা দিয়ে তলে তলে নিজিই চিয়ারম্যান হবার চিন্তা করিছিল।"

গাজী গোলামের প্রতি বিরক্তি খানিকটা কমল দাউদের। ওকে বিছানার উপর বসে পড়তে দেখে দাউদের মেজাজটা খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। সইফুল ছাড়া এই বিছানায় আর কেউ উঠবে একথা ভাবতেও পারে

না দাউদ। কিন্তু সে বিরক্তি দাউদের কথায় উবে গেল। জিজ্ঞাসা করল দাউদ "খান বাহাদুরির মিজাজ অ্যাখন ক্যামন?"

দাউদকে এবার একটা বড় পেমেন্ট্ নিতে হবে। কাজের মেজারমেন্ট্ হয়ে গিয়েছে। বিলও জমা দেওয়া হয়েছে দু মাস হয়ে গেল। চিফ্ ইন্জিনিয়ারের সই পর্যন্ত হয়ে আছে। টাকার অংকটা বড় বলেই চেয়ারম্যানের স্যাংশন্ দরকার। দাউদ শুনেছে জেলার তহবিলে এখন অত টাকা নেই বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে একটু চিন্তায় পড়ল।

চিন্তা না করে উপায় কী? চব্বিশ হাজার টাকার বিল! এক আধ টাকা নয়। এ টাকা আটকে গেলে, রাস্তার কাজই শুধু আটকে যাবে না, তার সব খোয়াবও মিলিয়ে যাবে।

গাজী গোলাম, "খান বাহাদুরির মিজাজের কথা জিজ্ঞেস কত্তিছেন? অ্যাখন তিনি যারে সামনে পান তারেই গিলে খান অ্যামন অবস্থা! আমরা চুনোপুটি, পিরানডা আমাগেরই যায়!"

সর্বনাশ, তাহলে কি টাকার কথাটা পাড়া যাবে? দাউদ একটু বিপন্ন বোধ করল।

"আপনাগের ওদিক নাকি কৃষক প্রজার লোকেরা খোনকার ছাহেবরে হারাবার জন্যি আড়ে-হাতে লা'গে গেছে?" গাজী গোলাম দাউদের মুখের দিকে চাইল।

দাউদ বলল, "এদিকি এই তো ক্যাবল আলাম। দিন কতক যায়ে চায়ে না দেখলি বোঝবো ক্যামন করে যে প্রকিত জোর কার কতডা আছে? তা মেন্দা মিয়া তো ওদিকির অ্যাকজন তালেবর লোক। উনি তো শুনি আমাগের ওদিকি খান ছাহেবের শক্ত খুটি। উনি কন কী?"

"উনি পেরথমে আসেই তো অ্যাক চোট ডর ধরায়ে দেছেন উনারে।" গাজী গোলাম বলল। "তারপর যা কলেন তা এই, ঐদিকি আপনার নাকি খুবই বদনাম।"

দাউদির মুখ কালো হয়ে গেল। গাজী গোলাম লক্ষ্য করল।

"ঝিটা বুড়ো ক্যাবল দোহি এই কথাই খালি কয়। কয়, খান বাহাদুর আপনি আর লোক পালেন না! শেষে কিনা দাউদির উপর আপনারে নির্ভর করতি হ'ল? উডা তো মহা যাউস্তারা। নামকরা বদমাইশ!" গাজী গুলাম বলল, "আরও বলে কি, ওই আপনারে ডুবোয়ে ছাড়বে।"

দাউদ অথৈ জলে পড়ে গেল। সর্বনাশ! মেন্দা যা বলেছে, তা কি বিশ্বাস করেছেন খোন্কার?

গাজী গোলামকে সে বলল, "আমার চাচার সংগে মেন্দার ঝগড়া, তা সেই ঝালডা আমার উপর ঝাড়ে দিল। আমি তো মেন্দার কোনও ক্ষেতি করিনি। আর খান বাহাদুরির জন্য কী করিছি বা কী কত্তিছি তা আপনি তিনার ডা'ন হাত আপনি নিজিই সিডা শৈলকুপের ছাইতি যায়ে দেখে আইছেন। খোন্কারও দেখিছেন। আমি যে খান বাহাদুরির ছাইট্ ইন্স্পেক্শনে যাতি কতাম, তা এই জন্যি। উনি যে কয়বার গেছেন, আপনি নিজিউ তো দেখিছেন, ক্যামন ভিড় জমায়ে ছাড়িছি। মোড়ল মাতব্বরগের ডাকে আনিছি। উরা তো খান বাহাদুরির মত অ্যাত বড় একজন আশরাফের সংগে, অত বড় একজন লিডারের হাতে হাত ঠ্যাকায়ে মোছাফাহ্ করতি পা'রে জীবনডারে সাথক বলে ভাবিছেন। আমি ইডা কতি পারি, ওদিকি আর কারউ দাঁত ফুটোতি হবে না। আর এদিকি এই তো ক্যাবল আলাম। কাজে ত্যামন করে হাতই ঠ্যাকাতি পারিনি। এদিকির কথা এখনই কব কী করে? তার উপর আবার পেমেন্ট্ আটকায়ে গেছে। কাজ আগোবেই বা কী করে?"

গাজী গোলাম বলল "আরে মেন্দা মিয়া অন্য মতলবে ঘুরিছেন। আপনি যে ঠিকেডা পাইছেন, তান অ্যাখন তাতে খাবল মাত্তি চান। আপনার কাজের যে খানিকটে কাজ কাটে মেন্দা মিয়া তাঁর জামাইরি দিয়ার জন্যি খান বাহাদুরির কাছে সুপারিশ করিছেন। মেন্দা মিয়ার আসল মতলব হ'ল এই।"

"তা একথা শুনে খান বাহাদুর কী কলেন?"

আগ্রহভরে গাজী গোলামের মুখের দিকে চেয়ে রইল দাউদ।

গাজী গোলাম বলল, "মেন্দা মিয়ারে হ্যাঁ কননি খান বাহাদুর, আবার না-উ কননি। উনি চলে যাবার পরই খোন্কার মিয়া আমারে কলেন, এক্ষুনি আপনারে তার কাছে নিয়ে যাতি।"

হ্যাঁ-উ কননি না-উ কননি? তার মানে কি? দাউদের ভাবনা দ্রুত তালে এগিয়ে চলল। দেখল, সে এখন সম্পূর্ণ খোন্কারের অধীন। কাজেই খোন্কার যা হুকুম করবেন তাকে তাই তামিল করতে হবে। তার ঠিকের ভাগ যদি মেন্দার জামাইকে দিয়ে দিতে হুকুম করেন খোনকার, তবে দাউদ জানে তক্ষুনি তাকে তা দিয়ে দিতে হবে। তার সব ইচ্ছে ওলোট পালট হয়ে যাবে। ঠিকের পরিমাণ কমে গেলে রোজগারের পরিমাণ কমে যাবে। ভেবেছিল, শাদীর আগেই সইফুলের জন্য একটা পাকা মন্জিল্ তৈরি করে ফেলবে এবং সইফুলকে সেটা দেইন মোহর দেবে। তবে কি সব ভেস্তে যাবে? মেন্দার প্রস্তাবে সরাসরি না করে দেননি খোন্কার। কেন? এইটেই বড় চিন্তায় ফেলেছে দাউদকে।

"আরে মিয়া," গাজী গোলাম বলল, "চটপট চলেন। খান বাহাদুর আপনার জন্যি বসে আছেন?"

দাউদের আত্মবিশ্বাস আরও একটু বহরে খাটো হয়ে এল।

শুকনো গলায় বলল "দাঁড়ান, পুষাকডা এট্টু বদলায়ে নিই।" (ক্রমশ)

মাঝখান থেকে

শেখর বসু

"ও, ভাল কথা, কাল ওরা আসবে।"

"কারা ?"

"এর মধ্যেই ভুলে গেলে!"

কারা, কী ব্যাপার, চিন্ময় অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দোলা বলল, "তোমার মাথায় কী আছে বলো তো! আগাগোড়া ইতিহাস না বললে একটা কথা ধরতে পার না।"

উত্তরে চিন্ময় বোকা-বোকা মুখ করে তাকাল দোলার দিকে। ওর মুখ দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে, ও এখন সাত হাত জলের তলায়। শুধু জলের তলায় নয়, পা দুটো কাদার মধ্যে গেঁথে গেছে। হাজার চেষ্টা করলেও ও জলের ওপরে ভেসে উঠতে পারবে না। কারা, কী ব্যাপার—ধরিয়ে না দিলে ওর পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

দোলা কিন্তু ধরিয়ে না দিয়ে পুরোটাই বলে দিল, বাচ্চাদের যেভাবে বোঝায় ঠিক সেইভাবে। "আমার বন্ধু মিতু, যে দিল্লিতে থাকে, সে আজ কলকাতায় আসবে। আগামীকাল ও ওর বরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসবে। সন্ধেবেলায়। মা-থা-য় ঢু-কে-ছে এ-বা-র ?"

কথার ভঙ্গিতে চিন্ময় হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর কী যেন বলতে গিয়ে আবার হাসল। তারপর বলল, "তুমি বোধ হয় স্কুলের পরীক্ষায় কখনোই ব্যাখ্যা লিখতে না, লিখলেও নম্বর পেতে না নিশ্চয়ই। ব্যাখ্যার মাথায় ছোট ছোট হরফে লেখা থাকত—প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। মাস্টারমশাইরা কথাটা ইয়ার্কি করার জন্যে লিখে দিতেন না। দুম করে কিছু বলে ফেললে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, একটু আগের কথাও বলে নিতে হয়। কথা হচ্ছিল রিন্টুদের স্কুলের স্পোর্টস নিয়ে, তার মধ্যে তুমি হঠাৎ বলে বসলে—কাল ওরা আসবে। আমার জায়গায় ভগবান থাকলেও তোমার কথা ধরতে পারত না।"

উত্তর দেওয়ার জন্যে ঠোঁট নড়ছিল দোলার, চিন্ময় থামতেই ও বলল, "যাই বলো আর তাই বলো, তুমি একটু ঢিলে আছ, চট করে কোনো কথাই ধরতে পার না। সব সময় তোমার লেট অ্যাকশন।"

"সব সময় ?"

প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে, চোখ মুখের ইঙ্গিতে প্রসঙ্গটিকে অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল চিন্ময়, কিন্তু দোলা সে পথে গেল না। একটু থেমে কেমন যেন বিরত মুখ করে বলল, "পার্থকে একবার ফোন করে খোঁজ নিও তো, খুব অসুবিধে হচ্ছে।"

"কিসের খোঁজ ?"

"কাজের লোক, কাজের লোক। ভেঙে না বললে একটা কথাও তুমি ধরতে পার না। অদ্ভুত!"

বিষয়টা এমনই বিস্ফোরক যে, চিন্ময় আর রসিকতার লাইনে না গিয়ে নিচু গলায় বলল, "আজকেই ওর সঙ্গে দেখা হতে পারে, দেখা হলেই খোঁজ নেব।"

কথা হচ্ছিল চিন্ময়ের অফিসে বেরুবার মুখে। ও হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, "দাও দাও ওটা দাও, দেরি হয়ে গেছে।"

দোলা ড্রয়ার খুলে ইলেকট্রিকের বিলটা এনে দিল। চিন্ময় ওটা পকেটে পুরে তিন লাফে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই ওর কেমন যেন খটকা লাগল, এটা কী করে সম্ভব ?

ও দোলাকে শুধু বলেছিল—দাও, ওটা দাও, কিন্তু দোলা কী করে বুঝল, ও ইলেকট্রিক বিল চাইছে। অফিস যাওয়ার মুখে তো ও অনেক কিছু চায়, যেমন রুমাল, যেমন পেন, যেমন অফিসের কাগজপত্তর, যেমন খুচরো পয়সা—আরও কত কিছু। কিন্তু দোলা সে-সব কিছু না এনে, প্রশ্ন না করে, সঠিক জিনিসটা এনে দিল কীভাবে? কাল রাত্তিরে ও অবশ্য একবার বলেছিল, আজ বিলটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এরকম কত কথাই তো ও রোজ বলে, আর অধিকাংশ সময় যা বলে তা করতেও পারে না, করা হয়ে ওঠে না। দোলা কি তাহলে মাঝখানের কথা ধরতে পারে, আর পারে বলেই কি মাঝখান থেকে কথা বলে ?

অফিসে পৌঁছুবার পরেও প্রশ্নটা চিন্ময়ের মাথার মধ্যে ঘুরল কিছুক্ষণ, তারপর এক সময় ও ভুলে গেল।

অন্য দিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়িই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল চিন্ময়, বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস পেয়ে গেল। বাড়ি যখন ফিরল তখন শেষ বিকেল। এই সময় ও বহুকাল বাড়ি ফেরেনি, দিনের শেষ আলোয় তাই সব কিছু কেমন যেন নতুন নতুন লাগছিল। দোলাও অন্য রকম। লম্বা লাল বারান্দায় কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে নরম আলো, আলো জ্বালতে গিয়েও জ্বালল না চিন্ময়। দোলা বলল, "কী ব্যাপার! আজ এত তাড়াতাড়ি ?"

"বেরুবো। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও তো।"

"না, আমি মাঠে-ঘাটে হাওয়া খেতে যাব না।"

"মাঠে-ঘাটে কে বলল ?"

"আউট্রাম ঘাটও যা মাঠ-ঘাটও তাই।"

আবার চমকে উঠল চিন্ময়। সত্যিই তো, আউট্রাম ঘাটের কথাই ও ভাবছিল, কিন্তু দোলা কী করে জানল! ওরা তো কালেভদ্রে গঙ্গার ধারে যায় যদি প্রায়ই যেত তাহলে না হয় ধরে ফেলা সম্ভব ছিল। ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার ঘটনাটাও মনে পড়ে চিন্ময়ের।

দিনের আলো আরও কিছুটা মরে গেছে, ঝাপসা আলোয় বেশ রহস্যময়ী দেখাচ্ছিল দোলাকে। রহস্যময়ী দোলা বলল, "তার চে নিউ মার্কেটে চলো, কিছু কেনাকাটা আছে, ফেরার পথে... বাড়িতে আজ আর ঝামেলার মধ্যে যাব না।"

কেমন যেন মরিয়া হয়ে চিন্ময় উত্তর দিল, "সেই

সকল
কাজে
সকল
সাজে
তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়
শাড়ী, ধুতি, বেড কভার
ও গৃহ সজ্জার বস্ত্রাদি
ন্যায্য দাম,
সঠিক মাপ
পাকা রং,
নিখুঁত বোনা
কলিকাতা
ওজেলাসমূহে
তন্তুজ বিক্রয় কেন্দ্র
ছড়িয়ে আছে
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল
স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬৭. বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪
৩৫-৩৬৫৮/৬৩৪৮
ABC/T7/77

ভালা। আজ আমরা হোটেলেই খাব, অনেক দিন হোটেলে খাইনি।"

"চাইনিজ কিন্তু"

"ঠিক আছে।"

চা করতে চলে গেল দোলা। এদিকে অদ্ভুত এক খেলা ধরতে পারার আনন্দে মেতে উঠল চিন্ময়। খেলাই তো, খেলা না হলে শরীরে এভাবে জিতে যাওয়ার শিহরণ দেখা দিত না। মজার খেলা, একটুখানি শুনেই পুরো কথাটা ধরে ফেলার মজা কি কম! দোলা শুধু বলছিল—বাড়িতে আজ আর ঝামেলার মধ্যে যাব না, এইটুকু শুনেই ও ঠিক ধরে ফেলেছে, ঝামেলা মানে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা, দোলা আজ হোটেলে খেতে চায়।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দোলা যখন ঘরে ঢুকল তখন ঘরে-বাইরে সমান অন্ধকার। দরজার পাশেই সুইচ বোর্ড। খুট করে সুইচ টিপতেই ঝলমলে আলো লাফিয়ে পড়ল চিন্ময়ের দু চোখের ওপর। আলোয় যখন চোখ সয়ে এল ওর তখন দোলা বলল, 'ইস্'। বলে ও চায়ের কাপ চিন্ময়ের হাতে দিয়ে এদিকের চেয়ারে এসে বসল। তারপর বলল, "ইস্! তাকানো যায় না, একেবারে শরীর ভেঙে গেছে। এই শরীর নিয়ে উনি আমাদের খবর নিতে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় একটা রিকশা ডেকে দিলাম।"

"রিকশা কেন, জ্যাঠামশাইয়ের গাড়ির কী হল?"

"গাড়ি গ্যারাজে।"

দোলা আরও কী সব বলে যাচ্ছিল, কিন্তু চিন্ময় সেদিকে কান দিতে পারছিল না। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা, উত্তেজনায় হাত পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছিল। প্লেটের ওপর বসানো চায়ের কাপ কাঁপছিল ঠক ঠক করে। আবার জিতে গেছে, আবার। কার শরীর খারাপ দোলা একবারও বলেনি, অথচ চিন্ময় ঠিক ধরে ফেলেছে। জ্যাঠামশাই এ বাড়িতে এসেছিলেন বছর-খানেক আগে, যদি নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন তা-হলে না হয় দোলার মুখে ওইটুকু শুনেই বোঝা যেত। কিন্তু জ্যাঠামশাই আসেন না, ওরাও যায় না, মাঝে শুধু একবার অসুস্থতার খবর পেয়ে জ্যাঠামশাইকে দেখতে গিয়েছিল ওরা, ব্যস ওই পর্যন্তই। এত সামান্য সূত্রের ওপর নির্ভর করে, কিংবা বলা যেতে পারে আন্দাজেই দোলার কথার ফাঁক থেকে জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বার করার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চিন্ময়। তারপর আবার বসে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা একটু একটু করে অনেকখানি বেরিয়ে গেলে চিন্ময় স্বাভাবিক হল।

দোলা কিন্তু বরাবরই স্বাভাবিক। ওর কথার ভেতর থেকে দু-দুটো গোপন কথা চিন্ময় ধরে ফেলার পরেও দোলা একবারও বিস্মিত হয়নি। নাকি, ওর কাছে এটাই স্বাভাবিক!

নিউ মার্কেটে ঢোকার মুখে চিন্ময় হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "এক কাজ করবে, আজ কেনাকাটা বাদ দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল দোলা, "আমিও তাই ভাব-ছিলাম, কিন্তু সিনেমা এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে।"

শুনে চিন্ময় এতই চমকে গেল যে, আর একটু হলেই বোধ হয় ওর হৃৎপিণ্ডটা জামার বাইরে বেরিয়ে পড়ত। দোলা কী করে ধরতে পারল যে ও সিনেমার যাওয়ার কথা বলবে! কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না-না, বই মনে হয় ইন্টারভ্যালের পরে শুরু হবে।"

কিন্তু টিকিট কেটে হলে ঢুকতেই বুঝতে পারল, বই বেশ কিছুক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সিনেমার পর্দায় একটা পাকানো, বদমাইশ চেহারার বুড়ো এক চোখ ছোট করে একটি সুন্দরী মেয়েকে বলছে, "দ্যাকো দ্যাকো আবার কান্না হচ্চে। আমি যা বলেচি তোমার ভালোর জন্যেই বলেচি।" মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ছি, আমাকে ছেড়ে দিন।"

পরের দৃশ্যে একটি ঘোরানো রাস্তা ধরে ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটেছে। প্রতিটি বাঁকের মুখে গাড়ি উলটে-যায়-যায় অবস্থা। শব্দ উঠছে স্কী-ই-ই-ই-ই-চ, স্কী-ই-ই-ই-ইচ। অবশেষে একটা পুরনো রাজবাড়ি মার্কা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। দাঁড়াতেই গাড়ি থেকে লাফ মেরে নামল একজন সুদর্শন যুবক।

বোঝাই যায় এর আগে সিনেমার পর্দায় নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেছে। কী সেগুলো? একটা সময় ছিল, একটা সময় মানে অনেক আগে. চিন্ময় যখন সবে কলেজে ঢুকেছে—তখন এই রকম পরি-স্থিতিতে ঠিক ও পাশের লোকের কাছ থেকে আগের ঘটনাগুলো জেনে নিত. কিন্তু এখন, এই বয়সে আর জিজ্ঞেস করা যায় না। জিজ্ঞেস করার খুব একটা প্রয়োজনও ও অনুভব করছিল না। দোলাও না। সিনেমা আর একটু এগোতেই ওরা ধরে ফেলল, আগে কী-কী ঘটেছিল।

সিনেমা শেষ হওয়ার পরে ওরা সিনেমার আস্ত গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। খাবারের অর্ডার দিয়ে ওরা মারামারির দৃশ্যগুলো নিয়ে কথা বলল। তারপর খাবার খেতে খেতে গল্প করল অভিনয় নিয়ে। খাওয়া হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে ওরা যখন রাস্তায় নামল তখন ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু সিনেমার মারাত্মক প্রেম আর গান। বাড়িতে পৌঁছুবার একটু আগেই ওদের সব কথা শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফেরার পরে ওরা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের ছোটখাট শব্দ মাঝেমধ্যে ঘরে ঢুকে ওদের দুজনের ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় দোলা হঠাৎ বলল, "বেশ গরম, আজ আর খাটাব না।"

"কিন্তু...।"

"না, নেই।"

"এই তো।"

দু হাত দিয়ে শূন্যে চটাস চটাস করে শব্দ তুলল চিন্ময়। তাই দেখে একটু বিরক্ত হয়ে মশারি খাটাল দোলা।

পরদিন, তার পরদিন, তারপর আরও অনেক দিন ধরে ওরা শুধুমাত্র মাঝখান থেকে কথা বলে গেল। কথার মাথা নেই, কথার শেষও থাকে না সব সময়, অথচ যা বলার ওরা দিব্যি বলতে পারে, যা বোঝার বুঝতে পারে চমৎকার। আস্তে আস্তে সংক্ষিপ্ত এবং সাংকেতিক কথায় ওরা এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে, গাদা গাদা কথা শুনলে ওদের অস্বস্তি হত রীতিমত। তার ফলে ওরা অসামাজিক হয়ে উঠল ক্রমশ। কারও বাড়িতে বেড়াতে গেলে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না, ওদের বাড়িতে কেউ এলেও ভুল বুঝত ওদের।

ওদের বাড়িতে দুটো বড় বড় ঘর। দিনের বেলায় ঘর দুটোয় বোঝাই হয়ে থাকত কাকের ডাক, ফেরিওলার হাঁক আর অল্প দূরের খেলার মাঠের আওয়াজ। রাত্তিরে ঘরে ঢুকত রাত্তিরের নিজস্ব শব্দ। বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কথা বললে মাঝেমধ্যে নিজেদের গলার স্বরেই চমকে উঠত দোলা আর চিন্ময়। তবু ওরা বেশি কথা বলত না, বলার প্রয়োজনই হত না, দুটো-চারটে কথাতেই যা বলার সব বলে ফেলত ওরা।

শুধু কথাই নয় অনেক কাজকর্মও ওরা মাঝখান থেকে করত। খবরের কাগজ, বইপত্তর ওরা আর গোড়া থেকে পড়ত না। পড়ত মধ্যিখান থেকে, তাও সবটা নয়, এইভাবে পড়েও ওরা মোদ্দা কথাটা ধরে ফেলত ঠিকই। এইভাবেই দেশ-বিদেশের খবরাখবর জানত, বইয়ের নায়ক-নায়িকার গোপন দুঃখ টের পেত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ওরা এক নম্বরের পরে দু নম্বর, দু নম্বরের পরে তিন নম্বর আইটেম ধরে ধরে এগোত না, শুরু করত মাঝখান থেকে। এইভাবে ওদের রান্নার পদ কমতে কমতে একেবারে কমে গেল। একটা সময় ছিল যখন সিনেমা থিয়েটার দেখতে গেলে ওরা অনেক আগে হলে পৌঁছে যেত। বাড়তি সময়টুকু ওরা ঝাল-মুড়ি খেত, কর্নফ্লেক্স খেত, চা কিংবা আইসক্রিম খেত; তার পরেও হাতে সময় থাকলে সোজা বা ব্যাঁকা পথে কিছুটা হেঁটে গিয়ে ফিরে আসত আবার। এখন ঠিক তার উলটোটা। সিনেমা-থিয়েটার শুরু হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা হলে ঢোকে, কিন্তু মাঝখান থেকে দেখলেও ওদের গল্প বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

একটা সময় ছিল যখন মাঝেমধ্যে ওদের চোখমুখ

জ্বালা জ্বালা করত, ঠোঁট শুকিয়ে যেত, হাতের তালু গরম হত, শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যেত দপ করে। ওরা বুঝতে পারত। শুরুর আগে শুরু হত তাকানোর ভঙ্গিতে হাতের আঙুলের অস্থিরতায়। এখন আর এসব নেই। এখন মাঝপথে ওরা বোঝার চেষ্টা করে কখন যেন শুরু হয়েছিল!

অফিসে যেতে প্রায় প্রতিদিনই দেরি হয়ে যায় চিন্ময়ের, অথচ আগে হত না। আগে ঘরদোর ঝকঝকে করে রাখত দোলা, এখন আর করে না। এখন শুধু ঘরের মাঝখানটাই পরিষ্কার, কোনায় কোনায় ধুলো আর ঝুল। ওই ঘরের মধ্যিখানে বসে, কদাচিৎ টুকরো-টুকরো কথা বলে ওদের দিন কেটে যাচ্ছিল। দিন, দিনের পরে দিন; রাত, রাতের পরে রাত।

এক রাত্তিরে বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর দোলা হঠাৎ বলল, "এই রে! একবার ছাতে যেতে হবে।"

"কেন, ওগুলো তোলোনি?"

"উহুঁ।"

"যাও তবে।"

"একা...তুমি...।"

মাঝ রাত্তিরে এমন কতগুলো চাপা রহস্যময় শব্দ ওঠে যে, ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও পরিষ্কার বোঝা যায়, বেশ রাত হয়েছে। এখন ঠিক সেই রকম রাত, খোলা জানলা দিয়ে রহস্যময় মৃদু শব্দ চোরের মতো ঘরে ঢুকছিল।

তিনতলা থেকে চারতলার ছাদে উঠল দোলা আর চিন্ময়। ছাদের মুখেই চিলেঘর, ঘরের পাশেই একফালি উজ্জ্বল হলুদ আলো দেখে চমকে উঠেছিল দোলা, অবাক হয়েছিল চিন্ময়, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। খোলা ছাদে পা দিয়ে ওরা প্রথমেই তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আকাশ থেকে ছাদের ঠিক ওপরে ঝুলে পড়েছিল প্রকাণ্ড একটা হলুদ চাঁদ।

ছাদের ওপর দড়িতে ঝোলানো একগাদা জামা-কাপড়। জামাকাপড় তোলার জন্যে হাত বাড়াল দোলা, কিন্তু তুলল না। ওর একটা হাত এখন দড়িতে, অন্য হাত কোমরে। পিঠের ওপরে খোলা চুল আস্তে আস্তে উড়তে লাগল অল্প হাওয়ায়। চিন্ময় ছাদের রেলিংয়ে ভর দিয়ে একবার দোলাকে দেখে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বাইরে অন্য সব বাড়ির ছাদ, সব ছাদই অদ্ভুত নির্জন। নির্জন সব ছাদের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে দোলার দিকে তাকাতেই কেমন যেন গা সিরসির করে উঠল চিন্ময়ের। দোলাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আগের মতোই দোলার একটা হাত দড়িতে, অন্য হাত কোমরে, পিঠের ওপরে খোলা চুল উড়ছে অল্প হাওয়ায়, কিন্তু কোথায় যেন কী-একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে কাছে যেতেই দোলা ঝলমলে মুখ করে বলল, "আমার ভীষণ কাশ্মীরের কথা মনে পড়ছে। মনে আছে সেই গুলমার্গ, উরিব্বাস! চারদিকে কী বরফ, কী বরফ, বাংলোর চালে বরফ, দেয়ালে বরফ। ঘরটা কী দারুণ সাতটা কম্বল, ঘরে ফায়ার প্লেস। ফায়ার প্লেস থাকলে আর কম্বলের দরকার হয় না, মনে আছে একটা-একটা করে সাতটা কম্বলই আমরা ফেলে দিয়েছিলাম গা থেকে। রাত্তিরে ঠিক এত বড় চাঁদ উঠেছিল, বরফের মাঠে চাঁদের আলো, ওরকম দৃশ্য আমি আর কক্ষনো দেখিনি, মনে আছে কাচের জানলার পাশে বসে আমরা প্রকৃতি দেখেছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত, ইস্ এক্ষুনি যদি আবার ওখানে যেতে পারতাম!"

স্মৃতি অসম্ভব তাজা না হলে কেউ এরকম গলায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু দোলা তো বছর বারো আগের কথা বলছে। বারো বছর মানে এক যুগ, এক যুগ আগের কথায় কেউ কি এত খুশি হতে পারে! কেউ পারুক বা না পারুক দোলা পারছে। দোলার চোখেমুখে, শরীরের ঈষৎ দুলুনিতে সুখস্মৃতির চিহ্ন।

দোলা কিন্তু তখন এত মোটা ছিল না, আজ যা চেহারা তার ঠিক অর্ধেক ছিল ও। ছিপছিপে দোলা ঘোড়ায় চড়ার সময় কী ভয় না পেয়েছিল, কিন্তু একটুখানি যাওয়ার পরে ওর ভয় ভেঙে গিয়েছিল একদম। খাড়াই পথে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিল ঘণ্টা চারেক পেছনের ঘোড়ায় ছিল চিন্ময়। চিন্ময় হঠাৎ এই ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেল চোখের সামনে। কয়েক মুহূর্ত ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্ময় বলল, "মনে আছে সেই ঘোড়ায় চড়ার কথা?"

"থাকবে না আবার। তুমি তো প্রথমদিকে খুব বড় বড় কথা বলেছিলে, কিন্তু খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গিয়েছিল।"

"মোটেও না। আর যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে তো...।"

"থাকে তো কী?"

"ইচ্ছে করে শুকিয়েছিলাম।"

"ইচ্ছে করে!"

"হ্যাঁ। একটা ভীতু লোক দেখলে আর একটা ভীতু লোক অনেক সময় সাহসী হয়ে ওঠে। আমি ভয় পাওয়ার ভান করে তোমাকে সাহস দিয়েছিলাম।"

কার্নিশের ফাঁকে লুকোনো কয়েকটা পাখি ডানা ঝটপট করে আকাশে উড়ে গেল, চাঁদের আলো বেড়ে গেল দপ করে, আশেপাশের নির্জন ছাতগুলো যেন মুখ ফিরিয়ে তাকাল এদিকে। এত কাণ্ড ঘটে গেল অথচ দোলার হাসি থামল না, বরং বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশ। হাসতে হাসতে ওর শরীর ফুলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ে যাচ্ছিল। এই হাসি যখন থামল তখন কাছে না গিয়েও বোঝা যায় দোলার শরীর বেশ ঘেমে গেছে।

"আরে কী হল! এত হাসির কি আছে? অদ্ভুত তো......" বলতে বলতে হাসতে শুরু করল চিন্ময়, হাসতে হাসতে ওর হাসি বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। হাসির শব্দে শূন্যে উড়ে যাওয়া পাখিগুলো কার্নিশের ফাঁকে ফিরতে গিয়েও পারল না।

হাসি থামলে চিন্ময়ের মনে হল, এভাবে গলা ছেড়ে ও কদ্দিন হাসেনি। অনর্গল কথা বলতে বলতে দোলার মনে হল এত কথা ও কদ্দিন বলে নি। বারো বছর আগের কাশ্মীর ওদের চোখের সামনে উঠে এসেছিল। কত দৃশ্য, কত ঘটনা, কত কথা। কথা আর ফুরোচ্ছিল না, এত কথা যে, এক-এক সময় ওরা দুজনেই একইসঙ্গে কথা বলছিল।

এদিকে ছাতের ওপর ঝোলানো চাঁদ আস্তে আস্তে সরতে সরতে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। চাঁদের আলো কমে গেছে, ওদের ছায়া দীর্ঘ হতে হতে ঝুলে পড়েছে ওদিকের কার্নিশের ওপর। আশেপাশের বাড়ির ছাতের ওপর চাপ-চাপ অন্ধকার। দমকা হাওয়ায় শীতের আভাস। কিন্তু ওদের একটুও শীত লাগল না, বরং শেষের দিকে চোখেমুখে কেমন যেন জ্বালা ধরে গেল। থেকে থেকে শুকিয়ে যেতে লাগল দুজনের ঠোঁট। হাতের তালু গরম হল, শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে গেল হঠাৎ। ওরা বুঝতে পারল, বোঝার পরেই ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন বেশ একটু বেলায় ঘুম ভাঙল দুজনের। ঘুম ভাঙার পরেও ওরা শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অন্যান্য দিনও শুয়ে থাকে, কিন্তু অন্যান্য দিন এভাবে শুয়ে থাকার মধ্যে চমৎকার আলসেমি থাকে। আজ ছিল না, আজ এই মুহূর্তে রীতিমত ক্লান্ত বোধ করছিল দুজনেই। অল্প ঘুমের জন্য চোখ করকর করছিল ওদের।

- একটু পরে উঠে পড়ল দোলা, আর একটু পরে দু কাপ চা হাতে নিয়ে ফিরে এল ঘরে। নিঃশব্দে চা খেল দুজনে। তারপর একটু থেমে শুকনো হাসি মুখে ফুটিয়ে দোলা বলল, "ছেলেমানুষী"।

কেন ছেলেমানুষী বুঝতে চিন্ময়ের একটুও অসুবিধে হল না। কাল রাতের সমস্ত কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। এর মতো ছেলেমানুষী আর কীই-বা হতে পারে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চিন্ময়ও বলল, "ছেলেমানুষী"।

জানলা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছিল ঘরের মেঝের। ওদের দুজনের চোখের সামনে সেই টুকরোটা বাড়তে বাড়তে ঘরের মধ্যিখান পর্যন্ত চলে এল। ঘর এখন কাকের ডাক, পাশের বাড়ির আওয়াজ, ফেরিওলার হাঁক আর নানা বিচিত্র শব্দে বোঝাই হয়ে গেছে।

ওই শব্দ সরিয়ে দুজনের কেউই আর একটা কথাও বলল না।

ছবি : সমীর সরকার

পণ্ডিচেরীর দিনগুলো

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

"কলকাতায় সংস্কৃত পড়তে তো ?" প্রশ্ন শিশিরদার।

"ইস্কুলে যা পড়ায়, তাই। তাছাড়া আপন-মনে গীতা-টীতা পড়ি ; অনেক বইই আমি পড়ে ফেলেছি এভাবে, আর-কাউকে না জিগ্যেস ক'রে।"

"খুবই ভাল তো। তা শোন, শ্রীমা চান সবাই যত্ন করে সংস্কৃত শিখুক। আমাদের কত বড় গৌরবময় ঐতিহ্য। জান তো ?" শিশিরদা গল্পচ্ছলে বললেন আমায়—কি বিভ্রাটে ওঁকে পড়তে হয়েছিল, যখন শান্তিনিকেতনে আসেন অধ্যাপক লেসনী (নাকি ভিনতের্নিৎস ?) : রবীন্দ্রনাথ ওঁকে সম্বর্ধনা জানানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন শিশিরদার উপরে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখে যখন সংস্কৃতের খই ফুটতে শুরু করল, দ্বিধার মাথা খেয়ে শিশিরদাকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হল : আমি স্যার সংস্কৃত জানলেও কথোপকথনে অচল।

শিশিরদা ফিরে এলেন বাস্তবে : "তা যাক ও-কথা! তুমি আপাতত কুঞ্জবিহারীর ক্লাসে গিয়ে বোস। তারপরে শাস্ত্রীজী যেমন বুঝবেন, সেইমতোই ব্যবস্থা করা যাবে।"

কুঞ্জদা ছিলেন যতদূর জানি উড়িষ্যার লোক। রামকৃষ্ণদাস বাবাজীর পরে উনিই ছিলেন আশ্রমের প্রথম ওড়িয়া সাধক। ওঁকে আমি এর আগে দেখেছিলাম আশ্রমের জিম্‌ন্যাশিয়ামে। ভারি ভারি ডাম্বেল-বারবেল উঠছে-নামছে কুলকুল ক'রে ঘাম ঝরছে সবার গা বেয়ে—হঠাৎ নাদুস-নুদুস এক খোকন টলতে টলতে সেই ব্যূহে প্রবেশ করল। সন্ত্রস্ত কুঞ্জদা ছুটে গেলেন তাকে সামলাতে। আত্মহারা ভঙ্গীতে তিনি বললেন, "আহা রে, কী সুন্দর ছেলেটা। যেন ঢাঁড়সের মতো উপমাটির যাথার্থ না খুঁজে পেলেও অপরূপ এবং অভিনব বলে মনে গেঁথে রইল আমার।

পাকা খেলোয়াড় ও জিমন্যাস্ট হলেও কুঞ্জদা ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী : ক্লাসেও দেখলাম, আমাদের সঙ্গে "আপনি" ছাড়া ব্যবহার করেন না। ওঁর ক্লাসে তখন ছিল রাঘবাম্মা (পরে শ্রীমা ওকে নাম দেন নিরতা) আর সুধা—গুজরাতী কবি সুন্দরমের কন্যা ; আমি এলাম তৃতীয় জন।

শংগুলোয় একটু স্যামবাজারী উচ্চারণ দিয়ে কুঞ্জদা আমায় আপ্যায়িত করলেন : "আপনি এলেন, খুব ভাল কথা ; আজই সাস্ত্রীজী আসছেন ক্লাস পরিদর্শনে। ....

দক্ষিণ ভারতের নমস্য বেদ ও তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত টি বি, কপালী শাস্ত্রী এলেন। গায়ে চাদর মুড়িয়ে, বেশ দিদিমা ধরনের অমায়িক আচরণে তিনি ঢোকা মাত্র বড় আপন লাগল তাঁকে। আলাপ শেষ হ'লে ইংরেজিতে আমায় অনুরোধ করলেন : "সংস্কৃতে কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাবে ?" বুক ফুলিয়ে আমি শুরু করে দিলাম বিনা বাক্যব্যয়ে : "হে কৃষ্ণো কোরুনা-শিন্ধু দীনো-বোন্ধু জগোৎপতে! 'আর্জ ত্বম বন্দ্যো' হম্‌, মাতৃত্বাং প্রনমাম্যোহম!"

'বন্দ্যো' হম কেন দীর্ঘ হল, উনি জানতে চাইলে কটাস করে মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, "অবগ্রহ"।

সহর্ষে গা টেপাটেপি করছিল সহপাঠিনী দুজনে আমার উচ্চারণ শুনে। শাস্ত্রীজী টানটান হয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে উল্লসে উঠলেন : "সাধু, সাধু! তোমার সংস্কৃত-জ্ঞান প্রশংসনীয়!" তারপরে অত্যন্ত দোনা-মোনা ক'রে অভিমত দিলেন : "কিন্তু একটা কথা। গৌড়ীয় উচ্চারণ ত্যাগ ক'রে যদি উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের একটা ঘরানা বেছে নাও, বেশি লোকে বুঝবে তোমার বক্তব্য। শ্রীঅরবিন্দেরও এই ধারণা!"

পরে, দিলীপকুমার রায়ের গানের ক্লাসে আমরা শাস্ত্রীজীর কয়েকটা রচনাও দিলীপদার সুরে গেয়েছি। শাস্ত্রীজী তাতে তৃপ্ত হয়েছেন।

কিন্তু দক্ষিণের উচ্চারণেও আঞ্চলিকতার প্রভাব কম উগ্র নয়—লক্ষ ক'রে আমি কতকটা অজান্তেই গুজরাতী লেখক পূজালালজীর ক্লাসে ঝুঁকেছিলাম তাঁর সংস্কৃত বাচনভঙ্গীর দিকে। আরও পরে জগন্নাথ পণ্ডিতের কাছে বেদপাঠের সময়ে আমি আর্যসমাজী পদ্ধতিটিই সর্বভারতীয় হবার উপযুক্ত ব'লে বেছে নিই।

পরপর ক'বার যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁর প্রাচ্যবাণী সম্প্রদায় সমেত পণ্ডিচেরী এলেন শ্রীমাকে তাঁর স্বরচিত নাটক দেখাতে। সংস্কৃত যে মৃত ভাষা নয়—এই বিশ্বাসে তিনি পেলেন শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ সম্মতি। কিন্তু আমাদের বড় দুঃখ হয়েছিল, তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্যই তাচ্ছিল্যে পরিণত হয় ছিদ্রান্বেষীদের কাছে—কারণ তাঁর গৌড়ীয় (অথবা চাটুলা) উচ্চারণ রীতি।

শ্রীমায়ের সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগের মশাল জ্বালিয়ে শ্রীমান বিকুলিত আজ আশ্রমের শিশু-মহলেও সংস্কৃতকে কথ্য ভাষায় পরিণত করেছে যে উদ্দীপনা নিয়ে, তার কাছে খোদ রেডিও ভ্যাটিকানের লাতিন অতি স্তিমিত।

সংস্কৃত-পর্ব শেষ হয়নি।

১৯৫০ সালের পূর্বভাগে জার্মান এক জ্ঞানযোগী আশ্রমে এলেন। কার্লসরুয়োর লোক। বিচারক ছিলেন ম্যুনিখ্‌ না ফ্রাংকফুর্টে। নাৎসী অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে দেশত্যাগী, উনি নীড় বেঁধেছিলেন তাহিতি-তে। শ্রীমা তাঁর নাম রাখলেন মেধানন্দ এবং আশ্রমের গ্রন্থাগারটি বর্তমান নূতন ভবনে উঠিয়ে নিয়ে

শ্রীমা যখন জাপানে ছিলেন

গিয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন এঁর হাতে।

বেশ বন্ধুত্ব জমল মেধানন্দের সঙ্গে। উনি আমাদের ভূগোল পড়াতে লাগলেন। কথায় কথায় উনি রাজী হলেন আমায় জার্মান শেখাতে। শ্রীমায়ের অনুমতি পেতে অসুবিধা হবে না ধ'রে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম হলেন। দমে গেলাম প্রথম সওয়ালেই : "সংস্কৃত ক্লাশে কদ্দুর এগিয়েছ ?"

মেনে নিলাম যে সারা বছরই প্রচুর ঢিলে দিয়েছি সংস্কৃতে ; হয়তো-বা নামও কাটা গিয়েছে।

'সে কি ?' চোখ বড় বড় করে শ্রীমা তাকালেন : "নিজের দেশের এত সম্পদ ফেলে কিসের সন্ধানে যাচ্ছ জার্মান শিখতে ? কি পাবে ওতে ?"

চুপ ক'রে আছি দেখে শ্রীমা সরাসরি নির্দেশ দিলেন : "কাল থেকেই আবার সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দাও। পরে আমায় জানিও কতদূর উন্নতি হ'ল। যথাসময়ে জার্মানের কথা চিন্তা করব খন।"

অথচ শ্রীমা স্বয়ং জার্মানের চর্চা করেছেন, খবর পেয়েছি পরে।

অবশেষে যথার্থই উনি আমায় ডেকে অনুমতি দিলেন একদিন মেধানন্দের সঙ্গে কথা হয়েছে জার্মান শুরু করতে পারি।

এই জার্মানটা নতুন করে ঝালিয়ে ১৯৬৩ সালে দিল্লী যাই আমি জাতীয় মহাফেজখানায় জার্মান সরকারের বহু দলিল-দস্তাবেজের পাঠোদ্ধার এবং তর্জমার জন্য। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের আগ্রহাতিশয্যে ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের মধ্যস্থতায় সরকার নিযুক্ত গবেষকদের টপকে আমিই পেয়েছিলাম সদ্য-লব্ধ ওই সম্পদের সদ্ব্যবহার-দায়িত্ব। দেড়যুগ বাদে আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাব কি যাব না, এই দ্বন্দ্বে আমায় দোদুল্যমান দেখে শ্রীমাই প্রবোধ দিলেন : "তুমি যা খুঁজে পাবে, তার মূল্য অপরিসীম!"

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম আমার জার্মান-বিদ্যা আজ বহুকাল উবে গেলেও সেদিনের ওই দলিলগুলি যা অনুবাদ করেছিলাম, তার ভিত্তিতে, আরো একযুগের বেশি গবেষণা ক'রে সম্প্রতি মহীশূরে হিস্টরি রেকর্ডস কমিশনে আমি যে ভাষণ দিই, তার মূল্য প্রসঙ্গে যখন অধ্যাপক মন্মথ দাস যা ব্যাখ্যা-

সাহেব আমায় অভিনন্দন জানালেন, আপন অন্তরে তখন কোন্ দেবতার চরণে আমার কৃতজ্ঞতার হবিষ্য ঢেলেছিলাম, অনুমান করা কি কঠিন?

*

তরুণ আলোক-চিত্রকর বিদ্যাব্রতের লেখা হিন্দী স্তোত্রে সুর দিয়ে তখন চিন্ময়ানন্দজী বিরাট কোরাস-দল গড়েছেন। মহড়া চলছে। ভিড়ে গেলাম। লোকে বলেছিল—সংগতে থাকবেন নলিনীদা। কিন্তু গাইতে ব'সে খটকায় পড়লাম : এ নলিনীদার না আছে গোঁফ না আছে টাক, না চাঁচর চিকুরের আভিজাত্য।

লম্বা লম্বা সাদামাটা চুল বেশ তেলতেলে, পাক বিশেষ ধরেনি (যদিও ওঁরও নাকি ষাট-ঘেঁষা বয়স)—'নকল' নলিনীদা শুনলাম ডাকসাইটে হাসির গানের হীরো, নলিনীকান্ত সরকার। ঝাড়ালো, অতি বলদৃপ্ত গঠন। কিন্তু বড়ই দাম্ভিক মনে হল।

কেমন যে আত্মস্থ হয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মাঝারি লয়ে উনি তিনতালের বোল তুলছিলেন তবলায়—পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিলকুল একটা থোড়াই কেয়ার ভাব নিয়ে।

ভুল ভাঙল—ক'দিন পরে। আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারে এই নলিনীদা একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। চেয়ারের ওপরে বাবু হয়ে বসে। এবং (সচরাচর যা ঘটতে দেখেছি ত্রিশ বছর ধরে) তীর্থের কাকের মতো তাঁকে ঘিরে রসলোলুপ কয়েকটি শ্রোতা।

ওঁর আলোচনায় ছেদ পড়ল—গেট দিয়ে চিন্ময়ানন্দকে ঢুকতে দেখে।

"আরে, নলিনদা যে, বিশ্রাম করছেন?"

কিন্তু পুলকিত চিন্ময়ানন্দের প্রেম-সম্ভাষণ যেন কানেই যায়নি, উদাসীন নলিনীদা বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি নাচাতে নাচাতে ওই নখ-দর্পণে বুঝি বা বিশ্বরূপ দর্শনে নিমগ্ন রইলেন।

প্রাণ-ভোমরা হুল শানাচ্ছে স্বামীজীর কণ্ঠতালুতে। একটু গলা খাঁকারি

শ্রীমা দর্শনার্থীদের পূজার ফুল বিতরণ করছেন—১৯৫০

দিয়ে তিনি জানান দিলেন, "দাদা, কথা বলছেন না। অন্যায় করেছি কিছু?"

"নাঃ, চিন্ময়" দপ্ করে জ্বলে উঠলেন নলিনীদা, তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ, তোমরা যা ভাল মনে হয় করছ, কর। আমি ন্যায় অন্যায় বিচার করতে বসি কোন্ সুবাদে?" দারুণ খেদ নিয়ে মান ভাঙলেন দাদা।

"সে কী দাদা, তার মানে?"

"তুমি আমার মনে করলে কি হে চিন্ময়? আবার কৈফিয়ত চাইছ—তার মানে!" ধমকে প্রাঞ্জল হল তাঁর কণ্ঠ।

ন যযৌ ন তস্থৌ তখন চিন্ময়ানন্দের অবস্থা। দেখিয়া বীরের মনে কথঞ্চিৎ যেন দয়া উপজিল। গলার সুর বেশ খাস্তা অথচ মোলায়েম ক'রে একান্তে উপদেশ দেবার মতো নলিনীদা কথা পাড়লেন, "শোন হে, চিন্ময়, তোমার নামে নালিস আছে!"

বিবর্ণ স্বামীজীকে এক নিমেষে দেখে নিয়ে আড্ডার ওপরে দাদা মারলেন সম: "তুমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, নির্লিপ্ত সংলোক, এই ভেবে কত ভদ্র-পরিবারের মেয়েরা যায় তোমার কাছে গান শিখতে, সেই সুযোগে তুমি, তুমি কিনা—"

নলিনীদার উক্তি এখানে একটু ফাঁকি খাচ্ছে দেখে অভিযোগের ঝাঁজ স্পষ্ট হল স্বামীজীর গলায় : "তা দাদা আপনি এমন মিথ্যা দুর্নাম যদি করেন, আমি শ্রীমাকে বাধ্য হয়ে জানিয়ে দেব—"

"একে তুমি মিথ্যা দুর্নাম বল? মেয়েগুলোকে তুমি বল না, এই গা টেপ্, এই নে, পা টেপ্ এবার—"

ক্ষোভে, দুঃখে রুদ্ধবাক্ স্বামীজীকে নলিনীদা হানলেন তাঁর সর্বশেষ এবং মোক্ষম বাণ : "হ্যাঁগো, হার্মনিয়মের পর্দায় তুমি গা টিপ্‌তে পা টিপ্‌তে বল না, হুলপ্ করো দেখি সবার সামনে—"

সমবেত সকলের অট্টহাসে যোগ দিয়ে আশ্বস্ত চিন্ময়ানন্দ নতি স্বীকার করলেন, "দাদা পায়ের ধুলো দিন্!"

আগেই বলেছি—বড়দিন উৎসব প্রতিপালিত হত আশ্রমে। সমারোহে সবাইকে থলি-ভরতি কেক, মিষ্টি, নানা উপহার দিতেন শ্রীমা। আমাদের পাশের বাড়ির জেঠিমা ছিলেন বনেদী ঘরের গিন্নী, অতি দিলদরিয়া। নলিনীদার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ডগমগ করতে করতে বললেন, "ও দাদা, এই দেখুন, শ্রীমা আমায় একটা রঙিন ফল্ও দিয়েছেন—"

ফুট্‌কড়াই ছিটকে পড়ল বিজ্ঞ-ভাবাপন্ন নলিনীদার মুখ থেকে : "তা তিনি বুদ্ধির কাজই করেছেন!"

শ্রীমা-প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য কেউ আশা করেনি। সবার মুখের বিরূপ অভিব্যক্তি উপেক্ষা করেই থেকে কাসলেন নলিনীদা : "বলি, অবলাকে শ্রীমা ফল দেবেন নাতো কি দেবেন?"

বিনা নোটিসে হাসতে হাসতেই যেন হুট করে এই জেঠিমা একদিন ইহলীলা সম্বরণ করলেন। বহু বছরের পরিচিতা এই বন্ধু-পত্নী সম্বন্ধে সন্তপ্ত নলিনীদা শুধু বললেন, "আমাদের উনি এইভাবে এপ্রিল ফুল বানালেন?"

সেদিন ছিল বিলক্ষণ পয়লা এপ্রিল।

দুষ্ট সরস্বতী কিভাবে নলিনীদার চির-তরুণ রসনায় বিরাজ করতেন, তার আর একটা নজির দিই।

এইচ এম ভি থেকে লোক এসেছে সাহানা দেবীর কিছু গান রেকর্ড করে নিতে। সাহানাদি বলেছেন, "বুড়ো-বয়সে একা কত গাইব, খান-কয় কোরাসও নাও!" অগত্যা আমরা যারা ছেলেবেলা থেকে ওঁর কাছে গান-বাজনার চর্চা করেছি, সবার ডাক পড়ল।

বাইরের আওয়াজ এসে যাতে রেকর্ডিং না পণ্ড করে, তার জন্য দেয়ালে দেয়ালে কার্পেট ঝুলনো। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু হিসেবে যেটা ধরা হয়নি, সেটা—কার্পেট থেকে একটা বোটকা সোঁদা গন্ধ এসে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলল ঘরের পরিবেশ।

নলিনীদা তবলা নিয়ে সাহানাদির সঙ্গে ঘরে ঢুকছেন। নাক সিঁটকে সাহানাদি বললেন "বাপ্‌রে, কার্পেটের গন্ধে টেঁকা দায়—"

প্রতিবাদ করল নলিনীদার সদাই উদাত্ত রসনা : "বিশ্বাস কর, অন্তত আমার পেটের নয়।"

স্তম্ভিত সাহানাদি বকুনি দিলেন : "তোমার ভীমরতি হয়েছে, নলিনীদা? ছেলেমেয়েগুলোর মাথা না খেলে চল্‌বে না বুঝি?"

হাসির অন্তরালে যে নলিনীদা গভীর জলের মাছ, তাঁর সান্নিধ্য আমি কম পাইনি। বাঙালী প্রাতঃস্মরণীয় কত মনীষীর আটপৌরে স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণ পেয়েছি তাঁর বৈঠকে; বাংলা ভাষার শৈলী, বাংলা কবিতার ছন্দ, বাঙালীর কৃষ্টি-সভ্যতা—সর্ববিষয়ে আমাদের নলিনীদা একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ। যেমন তাঁর স্মরণশক্তি, বাচনে তেমনি ইন্দ্রজালী। সামান্য একটু প্রতিভা যেই তাঁর নজরে পড়েছে, কিভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাকে ফুটিয়ে তুলতে—তা নিজে আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

নব্বই বছর বয়সে নলিনীদাতে যেন একটা প্রৌঢ়ত্বের ছায়া আনাগোনা করতে দেখছি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বার্ধক্যটা দেরিতেই আসুক এই কামনা করি আমরা যারা তাঁর স্নেহে ধন্য।

*

নলিনীদারই দৌত্যে প্রথম পদার্পণ আমার দিলীপকুমার রায়ের গৃহে। ১৯৪৮ সালে শ্রীমায়ের নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি নৃত্যনাট্য হচ্ছে, সঙ্গীত-পরিচালনায় দিলীপদা। বিষয়-বস্তু : ভারতের ক্রম-বিবর্তন। একটি স্থানে "আবির্ভূতা ভারত-জননী" বন্দনা-গীতির জন্য বড় বড় সব গাইয়েদের আসরে ফুদে মরিচ ছিলাম বোধহয় আমরা তিনটি : রবিবালা পটেল, রিচার্ড আর অধম। রবিবালার গলা তো নয়, যেন একঝাঁক দোয়েল-শ্যামা-খঞ্জন : এই দেখছি নেমে আসে, আবার ফুড়ুৎ করে হুহু শূন্যে মিলিয়ে যায়। আর একটি গলা সেদিন দিলীপদার খুব প্রিয় ছিল : নলিনীদার কনিষ্ঠা কন্যা বকুলদির (হ্যাঁ, আশ্রমের সম্পর্কে বাপ-বেটি সবাই দাদা সবাই দিদি) : "বকুলের মতো গমক কেউ দিতে পারে না," পরম বাৎসল্যে দিলীপদা বলতেন।

অল্পকাল পরে—সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে চ'লে গিয়েছি। রবিবারের সকাল। হাতে সময় আছে। একটু ক্লান্ত হয়ে চিৎ-সাঁতারে কখনো কুম্ভক করছি, কখনো উপভোগ করছি "আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরায় হাত।" এমনি সময়ে হুস করে এক আওয়াজ এল পাশ থেকে। ডুব সাঁতার মেরে শুশুকের মতো উদয় হল দিলীপদার।

উল্লসিত, তিনি বললেন, "কিহে, তুমিও সাঁতার-প্রিয়?" প্রায়ই তারপর দেখা হত ওই ক্ষীরধারায়ে ঘনিষ্ঠ হল পরিচয়।

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে দেখে অবধি মনটায় কেমন যেন এক স্ফূর্তি সর্বদা ফেটে পড়তে চাইছিল। হাতে-খড়ি হবার আগেই নাকি মুখে মুখে আমি ছড়া বানাতাম। বাপ্, ঠাকুর্দা, বাপের পিসী এবং বাপের ঠাকুমা—আমার আগের ওই তিন-পুরুষের লেখা কবিতা আমি পড়েছি। এই বাইটা আমারও ভর করল। দিনে দু-তিনটে ক'রে কবিতে লিখছি তখন। কি খেয়াল হল একদিন, খান-কয় পদ্য নিয়ে দিলীপদার ডেরায় হাজির হলাম।

"চলে এস, খদ্দের।" ব'লে সেই যে ডাক দিলেন, তারপরে মাসের পর মাস, প্রায় রোজই আধঘণ্টা-একঘণ্টা গিয়ে তাঁকে উত্যক্ত করেছি নিত্য নূতন

রচনা নিয়ে।

"ছন্দে হাত দেবার প্রয়োজন নেই, কান তৈরি," উনি বলতেন। "দরকার এখন শব্দ-সম্ভারের।" এবং এই শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ এভাবে না ব'লে অন্যভাবে বলা কি ক'রে সম্ভব—উনি দেখাতে লাগলেন। একদিন আমি ঢুকতেই উনি উঠে দাঁড়ালেন: "খুব ভাল কাঁঠাল এসেছে, কলকাতার কাঁঠাল: তুমি ভালবাস কাঁঠাল খেতে?" ব'লে রানীদির দিকে তাকালেন। এক সাড়ম্বরে জল-খাবার।

আর একদিন দেখি তন্ময় হয়ে হার্মোনিয়মের সঙ্গে গুন গুন করছেন; পাশে চৌকির ওপরে আগের দিনে লেখা আমার একটা কবিতা। আমায় দেখে, প্রায় সমানে-সমানে, কথা পাড়লেন, "দেখ দেখি সুরটা তোমার পছন্দ হয় কিনা।" এ গানটি বিশেষ ক'রে তাঁর এমন নেক-নজরে প'ড়ে যায় যে কখনো একক, কখনো কোরাসে ওটি গেয়ে শুনিয়েছেন শ্রীমাকে।

বাড়িতে ওঁর অতিথি-অভ্যাগতের অভাব ছিল না। কৃষ্ণপ্রেম (রোনাল্ড্ নিক্সন), হেমেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গে উনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তারই ফাঁকে একসময়ে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে সেদিনের সদ্য-লেখা কবিতা ঝালিয়ে দিয়েছেন।

আশ্চর্য হতাম অত বড় জ্ঞানী লোক, তুচ্ছ একটা অপোগণ্ডকে কেন এত লাই দেন। সমাধান পেলাম—যেদিন পড়লাম ওঁর "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল": বাপের কাছে পেয়েছিলেন উনি কিশোর-বালককেও সমান মর্যাদা দেবার তালিম। তখনও বয়স আমার ষোল হতে বছর-তিন বাকি।

ইতিমধ্যে কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভক্তদের এক পত্রিকাতে ছাপা হল আমার একটা কবিতা। দেখে নরেন দাশগুপ্ত পরম আগ্রহভরে বললেন, "ওরে, তুই কয়েকটা কবিতা কপি ক'রে দিস, আমি শ্রীঅরবিন্দকে পড়তে দেব।" এবং নীরদ-বরণের হাতে সেগুলি দিয়েওছিলেন। ফলাফল আমার অজানা। নীরদদাকেও জিগ্যেস করিনি কোনদিন।

প্রায় ওই একই সময়ে, যতদূর খেয়াল হচ্ছে 'আনন্দমেলা'য় একটা কবিতা বার হল এবং পেলাম পাঁচ-টাকা দক্ষিণা। ছোট এক খামে মনিঅর্ডারের কুপন-সমেত টাকাটা শ্রীমায়ের হাতে যখন দিয়ে বললাম যে আমার কবিতার দরুন এটা এসেছে—এমন ব্যগ্র হয়ে উনি সেই প্রণামী গ্রহণ করলেন—মনে হল না জানি কোন সাত রাজার ধন। সেদিনের সেই বিদুরের খুদ দিয়ে পরিতুষ্ট ইষ্ট দেবতার হাসি যে-মহাসুখ দিয়েছিল তার স্বাদ জীবনে আর কমই পেলাম।

আমার দ্বিতীয় কবিতার বই 'আলোর চকোর' যখন ছাপা হল, দিলীপদা সুদূর পুণার আশ্রম থেকে "ভারতবর্ষে" লিখলেন দীর্ঘ এক প্রবন্ধ—স্বাগত জানালেন প্রকাশ্যে, বহুদিন আগে আবিষ্কৃত তাঁর কিশোর কবিকে। তবে দিলীপদা বরাবর আমায় সতর্ক ক'রে বলেছেন, "হয় গদ্যছন্দ ছাড়, নয় আমায় ছাড়!" কিন্তু দুটির কোনটিই আমি বর্জন করতে পারিনি।

প্যারিসে আসার পরে ১৯৬৬ সালের শেষ বা ১৯৬৭ সালের গোড়ায় তাঁর শেষ যে চিঠি আমি পাই, তাতে লিখেছিলেন, "তোমাকে আমার 'গল্পরাগ-মালা' উৎসর্গ করছি এই ভরসায় যে তুমি আর্ট-ফর-আর্টস-সেক-বর্গীয় বুলিতে বিশ্বাস করো না..." সে গ্রন্থ ('গল্পরাগমালা') প্রকাশিত হয়েছে কিনা খবর যেমন পাইনি, তেমনি জানা নেই অভিমানী দিলীপদা কোন্ অপরাধে এত বছর আমায় তাঁর মন-কোকনদ থেকে বিসর্জন দিয়ে আছেন!

আশ্রম পাঠশালার প্রথম বছরের শেষে নোটিস পড়ল—নতুন বছরে কে কোন্ ক্লাসে যাবে। মাত্র দেড়-দু' মাসের প্রচেষ্টায় কতটুকুই বা ফরাসী শিখেছি? কাজেই আহামরি ফলও কিছু মেলেনি। মনটা তাও খারাপ লাগছে, এমনি সময়ে দেখা পেলাম শিশিরদার।

"শিশিরদা, কি করলে চট-জলদি ফরাসীটা শিখতে পারি, বলুন না!"

খানিক চিন্তার পরে শিশিরদা বাতলালেন: "সত্যেনদা নিশ্চয় তোমার ভার নিতে পারেন; কিন্তু মাকে তো একবার জিগ্যেস করা দরকার।" সেদিন আশ্রমে সত্যেনদার কাছে অথবা মুত্তাইয়ানের কাছে ফরাসী শেখাটা শ্লাঘনীয় ছিল।

ফরাসী ভালভাবে শিখতে চাই শোনা-মাত্র সানন্দে শ্রীমা বললেন; "বেশ তো! নাঃ, সত্যেনের কাছে তোমার যাওয়ার দরকার নেই; দাঁড়াও, ভেবে দেখি! আচ্ছা, তুমি দেবুকে চেন? কিংবা গামা, কিংবা কনক, কিংবা—"

মায়ের মুখ হঠাৎ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। অদূরে উপবিষ্ট অমিয় গাঙ্গুলীকে ইসারা করা মাত্র অমিয়দা তড়াক করে হাজির হল। মা বললেন, "শোন, রোজ বিকেলে আমি যখন পায়চারি করি টেনিস খেলার শেষে, তখন তুমি একে একটু ফ্রেঞ্চ শেখাবে!..." অমিয়দার চক্ষু চড়কগাছ দেখে মা ভরসা দিলেন: "কিচ্ছু ভেব না। আমিই সব দেখিয়ে দেব।"

সেদিন থেকেই লেগে গেলাম অমিয়দার সঙ্গে। শ্রীমায়ের Belles Histoires (ছোটদের গল্প) দিয়ে প্রথম পাঠের শুরু। একাধিকবার পায়চারির ফাঁকে ফাঁকে মা এসে পাশে বসলেন, দিলেন কত-না পরামর্শ! অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই শ্রীমায়ের সঙ্গে শুরু করে দিলাম ফরাসীতে কথা; ভুল দেখামাত্র তিনি শুধরে দিতেন। ভাষার নির্ভুল প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি এতদূর সতর্ক যে প্যারিস থেকে তাঁকে যে চিঠিপত্র লিখেছি তার কোথাও কোন প্রয়োগের সূত্র ধরেও একবার তিনি আমায় সজাগ করে দিলেন: "এখনো এমন ভুল হয়?"

আমার দাদা রথীন ছিল অসাধারণ মেধাবী ছাত্র: দশম শ্রেণী থেকে সে ট্রিপ্‌ল প্রমোশন নিয়ে সপ্তমে উঠল; পরপর দু'বছর আমি ডবল প্রমোশন নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে ধরে ফেললাম তাকে।

সত্যেনদার পরিবর্তে অমিয়দার কাছে মা আমায় ফরাসী শিখতে পাঠিয়েছেন শুনে দয়াকর হেসে খুন: "ও আবার ফরাসীর কি জানে?" দয়াকর সত্যিই ভাল ফরাসী জানত। কিন্তু কেন অমিয়দাকে শ্রীমা বেছে নিয়েছিলেন, তার একটি জবাব আমি অন্তর থেকেই সেদিন পেলাম, যেদিন উচ্চশিক্ষার ("হায়ার কোর্স") সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়ানোর ভারও নিলাম। শ্রীমা সেদিন বললেন, "শেখাতে বসলেই আসল শিক্ষার সূচনা হয়!"

*

শ্রীমা যখন পায়চারি করতেন, তাঁর ক্ষিপ্র পদক্ষেপের সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমসিম খেয়ে যেতেন অষ্টসখীর দল: আটজন সাধিকা ওই সময়ে মায়ের কাছা-কাছি থাকতেন—তাঁদের মধ্যে বিশেষত একজন মায়ের প্রয়োজনে এটা-সেটা জোগান দিতে সদা তৎপর ছিলেন। বয়স এঁদের কারোই বোধহয় তখন ত্রিশের কোঠা পার হয়নি। শ্রীমা তখন সত্তর ছোঁব-ছোঁব করছেন।

সবার পিছনে শিবঠাকুরের বাহনের মতো বিশাল কলেবর ও ভুঁড়ি নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে খড়্গনাসা এক জটাধারী হাফপ্যান্ট পরে পরম দার্শনিকের মতো কটা পাক দেবার পরেই বসে পড়তেন। কে যেন খবর দিল—উনি হায়দ্রাবাদের নিজাম-বাড়ির ছেলে; শ্রীঅরবিন্দ ওঁর নাম রেখেছেন দারা (ঔরংজীবের সহোদর সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বানের কথা স্মরণ করে); ওঁর আসল নাম আগা সৈয়দ কিসব জাঁহাপনা তাঁহাপনা যেন!

একদিন দারা জানালেন যে তাঁর খুব ইচ্ছে আমায় কিছু মিষ্টি খাওয়ান। পরদিন যেন ওঁর বাসায় যাই। কথামতো খোঁজ নিয়ে হাজির হলাম। উনি থাকতেন রাস্তার ধারেই দোতলার একটা ঘরে; তার জানলা থেকে দড়ি নামিয়ে দিতেন—সেই দড়িতে তাঁর প্রয়োজনীয় সামগ্রী বেঁধে দেওয়া হত এবং কুয়ো থেকে জল
ার ধাঁচে উনি তা ঘরে তুলতেন।

আমায় দেখে উনি খুব খুশী। ভুঁড়ির ওপরে খাতা বাগিয়ে ইংরেজিতে একটা চিরকুটে ফর্মান জারি করলেন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুদীখানার নামে:

পণ্ডিচেরীতে বালকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন শ্রীমা

"স্ট্যাণ্ডার্ড স্টোর্স, পত্রবাহককে উত্তম এক পৌণ্ড (pound) মিষ্টান্ন দিবেক্!" বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে খুব ভাল লাগল সেই মিষ্টি। দারাসাহেবের আমন্ত্রণে আরো ক'বার ও-কীর্তি করবার পরে টের পেলাম যে আমায় মিষ্টি খাইয়ে তৃপ্তি পান এবং ততোধিক তৃপ্ত হন বিলগুলো শ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে—শ্রীমাকে মেটাতে হয় ওঁর পাওনাদারের তাগিদ! বড়ই লজ্জা হল। দারা-সাহেবের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

দারা ছিলেন স্বভাব-কবি। বিশেষত উদ্ভট মিলের জন্য তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। Mother almighty'র সঙ্গে উনি মিলিয়েছিলেন all my tea! অশোকবিজয় রাহার "টোটেনথামেন/ওঠেন-নামেন" এর চেয়ে কম মূল্যবান মিল দারা খুঁজে পাননি। ছাত্র-মহলে জনপ্রিয় একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা অলংকৃত করে দারার হস্তাক্ষরে লেখা দেখেছিলাম একবার:

I tell you for the last time
Not Sports and Pastime
Is allowed during class-time!

শ্রীঅরবিন্দ মাঝে মাঝে উপভোগ করতেন দারার এই মিল-কচ্‌কচি!

*

সে-সময়ে থাকতাম আমরা বাজারের কাছে, ভাড়া এক বাড়িতে। পড়শী ছিলেন সস্ত্রীক নরেন দাশগুপ্ত ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা: প্রীতিদি, তপতীদি আরতিদি, মনোজ; বড় ছেলে স্বরাজদা যাতায়াত করতেন মামা হিমাংশু নিয়োগীর সঙ্গে।

সন্ধেবেলা আমাদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে নরেনদাদের সঙ্গে মা যেতেন রাতের ধ্যানে। তাঁদের সঙ্গেই ফিরতেন। খুবই চাপা মানুষ ছিলেন নরেনদারা-গিন্নী দু'জনে; কিন্তু কোথায় যেন ছিল এক গভীর আত্মীয়তার ভাব। ওঁরা জানতেন নিস্পৃহভাবে স্নেহ করতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নরেনদার কাছে বছর-পাঁচেক আমরা দর্শন পড়েছি। শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবন' পড়াতে পড়াতে উনি উদ্‌ঘাটন করে দিতেন কোথায় ষড়্‌দর্শনের কোন্ সূত্র প্রচ্ছন্ন আছে; উন্মনা হয়ে যেতেন শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও সাধনার তত্ত্ব পর্যালোচনা করতে করতে। নিজের অন্তরে তিনি এমনভাবে

শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী সাব্যস্ত করেছিলেন যে উত্তুঙ্গ ওই অনুভূতির শিখর থেকে শিখরে আমাদের নিয়ে বিচরণ করতেন অভিজ্ঞ শেরপা-রাজার স্বাচ্ছন্দ্যে।

নরেনদা প্রয়াণের পরে পাকিস্তান থেকে বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (উনি ওখানে তখন এম পি হয়ে হিন্দুদের হয়ে লড়ছেন) আমাদের লিখলেন "নরেন ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের সহপাঠী। আর ইডেন হিন্দু হোস্টেলে যতীনদার স্নেহভাজনদের অন্যতম। দাদা ওকে দলের কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছিলেন।"

মনে পড়ল বটে একবার আশ্রমের খেলার মাঠে 'বাঘা যতীন' জীবনী-চিত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনি বলে উঠেছিলেন: "এইখানে যতীনদার সঙ্গে আমিও ছিলাম।" আর কখনো কেউ তাঁকে উত্তেজিত দেখেনি।

*

আমার বাবা-মা প্রথম যেবারে আশ্রমে আসেন, পুরনো সাধক রজনী পালিত গাড়ি নিয়ে তাঁদের রিসিভ করতে যান শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে।

আশ্রমে আমরা থেকে যাবার পরে বেশ কিছুকাল বাবা কলকাতা-পণ্ডিচেরী টানা-পোড়েন করলেন—শ্রীমায়ের সংসারে বাড়তি চারটি জীবের অন্ন সংস্থানের ভার লাঘবের সদিচ্ছায়। মন কিন্তু তাঁর পড়ে থাকত আমাদেরই আছে। দু-একদিন অন্তর কলকাতা থেকে বাবার চিঠি আসত, তাতে পরামর্শ দিতেন: শ্রীমার কাছে যে-সুযোগ পেয়েছ, তার মর্যাদা যেন আমরা রাখতে পারি, উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি মা-শ্রীঅরবিন্দের করুণায়।

১৯৪৯ সালে শ্রীমাই আটকে দিলেন বাবাকে: "তোমার কি কলকাতায় ফিরে যাওয়া নেহাৎই দরকার?" বাবাকে ইতস্তত করতে দেখে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি: "আমি চাই তুমি এবারে আশ্রমে থেকে যাও!"

"কিন্তু, মা, কলকাতায় কাজকর্ম তো বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে—"

"যা পার চিঠিপত্রেই সেরে ফেল।"

বাবা থেকে গেলেন। কিন্তু আশ্রমে তখন সবাই কিছু না কিছু কাজ করত, অথচ শ্রীমা কোনও কাজের ভার দিলেন না বাবাকে। "কর্মই হল ঈশ্বরের কাছে

খেলার মাঠে শিক্ষাদানরত শ্রীমা

[আলোকচিত্র : শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে]

শরীরের প্রার্থনা," শ্রীমা বলেছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের নটী-র বন্দনা মূর্ত হয় সংগীতে আর ভংগীতে। মরিয়া হয়ে বাবা কোনদিন যান ফল বিতরণের ঘরে হাত লাগাতে, কোনদিন-বা রাজসেনাদি'র বিভাগে—আশ্রমের ছাপাখানায়।

শ্রীমা অবশেষে একদিন কথা পাড়লেন: "শোন, তোমার জন্য বিশেষ একটা কাজ আছে, অপেক্ষা করছিলাম প্রস্তুতি খানিক এগিয়ে গেলেই খবর দেব বলে। প্লে-গ্রাউণ্ডের পিছনে যে-বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন প্রথম যুগে, তার উঠোনে খুব ছোটদের জন্য একটা খেলার মাঠ বানাতে দিচ্ছি। এটা থাকবে তোমার মায়।'

মাঠ প্রস্তুত হল। শ্রীমা সে-মাঠে রোজ সন্ধ্যেবেলা আসতে লাগলেন। ছোট-দের হাতে দিতেন তিনি মিষ্টি বা বাদাম বা কোনও ফল। সারা বিকেল, শ্রীমায়ের আগমন-প্রতীক্ষায়, খেলার স্থলে ছেলেমেয়েরা বালির উপরে বানাত কত-না দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাকার, সেতু—বাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী। শ্রীমা আগ্রহভরে এগুলো দেখতেন, বাবাকে পরামর্শ দিতেন নানা রকম।

সারা সকাল বাবা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতেন নানা ফুল। তা দিয়ে প্রতিদিন ভিন্ন ধরনের একটি মালা গাঁথতেন আমার মা। সেটি সন্ধ্যেবেলা শ্রীমা গলায় পরতেন এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রমের প্রধান-ভবনে ফিরে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের চরণে সেটি নিবেদন করতেন।

এই উঠোনেই সপ্তাহে তিনদিন করে শ্রীমা ছোটদের ক্লাস নিতে লাগলেন। একদিন শ্রুতিলিখনও দিতেন; আমরা দু-তিনজন মিলে প্রথমে একপ্রস্থ তা সংশোধন করে শ্রীমায়ের হাতে দিতাম—তিনি তা স্বয়ং দেখতেন তারপরে।

এবং এই উঠোনে স্বচক্ষে দেখেছি শিশুদের ভিড়ে, চাঁপাতলায় অভ্যস্তান্ হয়ে বসে মহাসাধিকা মা আনন্দময়ী প্রসাদ চেয়ে নিয়েছেন শ্রীমায়ের কাছে: "আমিও তোমার মেয়ে, মাগো!" তাঁদের নয়নে নয়নে দেখেছি ভাবের বিনিময়।

এই বাড়িতে, দোতলায় রাস্তার ধারের ঘরটিতে আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি মেঝের উপরে লম্বালম্বি একটা দাগ: বছরের পর বছর দিনে-রাতে আট ঘণ্টা করে অন্তত পায়চারি করতেন শ্রীঅরবিন্দ ছোট ওই ঘরে, একই ভাবে। সিমেণ্টের মেঝে বহন করছিল তার সাক্ষ্য!

আমার বাবা-মাকে কী চোখে শ্রীমা দেখতেন, তার একটি উদাহরণ ও অভিব্যক্তি (তাঁরই উক্তিতে) অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রবীন্দ্রনাথের ছোট একটি গল্পে পড়েছিলাম চৌদ্দ বছরের ছেলের মানসিক নিঃসঙ্গতার কাহিনী। কবি-দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন যে বয়সটি বড়ই মর্মান্তিক: কিশোর নিজেকে আর মানিয়ে নিতে পারে না বালকদের সঙ্গে, অথচ বয়স্কদের সভায় সে যদি মুখ খোলে, তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয় ধৃষ্টতার অপবাদে॥

আমি কথাটি বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচাই করছিলাম, কারণ সেদিন আমার বয়সও চৌদ্দ। মনের আনাচে কানাচে কত-না প্রবৃত্তি উঁকিঝুঁকি মারছে। তাদের উপস্থিতি কখনো বিচিত্র মনে হচ্ছে, কখনো-বা লাগছে পীড়াদায়ক! কাকেই বা বলি এসব খবর?

লজ্জার মাথা খেয়ে আমি শেষ-মেশ শ্রীমাকেই সব জানালাম। কারণ তিনি বলতেন—সবচেয়ে যে-কথা বলতে আমার কাছে সংকোচ পাবে, সেটা জানিয়ে দিলেই দেখবে তার উপদ্রবে আর ভুগতে হচ্ছে না। মনে পড়ল—মহাভারতের সেই গল্প: দুর্যোধনের মনে পাপবোধ থাকার দরুন সে শিশুর মতো নিরাবরণ অবস্থায় হাজির হতে পারে নি।

অপরিসীম ভালবাসায় আমার কাঁধে বা হাতটি রেখে এমনভাবে শ্রীমা তাকালেন যে খেয়াল হল— নিজের অজান্তেই একটা ভীতিবোধ মনের মধ্যে বহন করছিলাম, ভাবছিলাম "হয়তো-বা শ্রীমা খুব বকুনি দেবেন!"—সেটা খসে পড়ল চোখের পলকে। হালকা লাগল বুকটা।

শ্রীমা জানতে চাইলেন আমার বয়স কত হল। বললাম।

কানে এল—যেন কতদূর থেকে শ্রীমায়ের কণ্ঠ ভেসে আসছে: "চৌদ্দ বছর? এই তো সময় যখন মনে জেগে ওঠে কত আস্পৃহা, মহৎ কত-না আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, বড় হবার সাধ! যদি সেসব দিকে দৃষ্টি রাখ, তা হলে ছোট-খাট এসব তোমায় মোটেই উতলা করবে না। এসব বাইরের জিনিস, বাইরে থেকে ভাসতে ভাসতে আসে, ভাসতে ভাসতে বাইরে চলে যায়; এর সংগে তোমার স্বভাব-চরিত্রের সম্পর্ক নেই!"

তারপরে অত্যন্ত নিভৃতে আমায় বললেন: "তা ছাড়া তেজেন আর ঊষা তোমার বাবা-মা; তাদের মন তো এসবের কতই ঊর্ধ্বে। তোমার মনে এসব কিছু কোন প্রশ্রয় পেতেই পারে না। শ্রীঅরবিন্দ নিজে তোমাদের গ্রহণ করেছেন—তাঁর কথা স্মরণ কোর, শান্তি পাবে!"

আর একটা দিন শ্রীমা আমায় এই-রকম কথার পিঠে বয়স কত হল জানতে চেয়েছিলেন।

তখন সবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গুরুপাক পদগুলি পাতে পড়েছে; পরিপাক করতে পারবার আগেই বড়াই করে শ্রীমাকে গিয়ে বিধান দিলাম: "দেখ, মা—তুমি আর শ্রীঅরবিন্দ যা-সব বলছ, লিখছ, এগুলি বড়ই ধোঁয়াটে, হেঁয়ালি-হেঁয়ালি; যুক্তির পরীক্ষায় ওসব ধোপে টিঁকবে না। এই ধর দেকার্ত—কী স্বচ্ছ, সুন্দর!"

ঘাড় ধরে বার করে দেবার পরিবর্তে শ্রীমা শুনছিলেন আমার বক্তৃতা, যেন কতই চিত্তাকর্ষক এক বিষয়-বস্তু।

তারপরে সস্নেহে জিগেস করলেন: "তোমার বয়স কত হল?"

"আঠারো!"

"যখন আঠাশ বছরে পড়বে, আজকের কথাটা ভেবে দেখো। তখন হয়তো তোমার মতামতের পরিবর্তন ঘটবে। মনে করে আমায় জানিয়ে যেও—"

এবং একটু নীরব থেকে স্বগতোক্তির মতো যোগ দিলেন, "তবে আমার কথা যদি একদিন মেনে নিতে পার, তবে তুমি দেখবে যে শ্রীঅরবিন্দের মতো যুক্তিপূর্ণ, এমন আগাগোড়া consistent ভাবধারা তুমি কমই খুঁজে পাবে।"

আঠাশ বছরে পৌঁছনর অনেক আগেই যুক্তি-কচকচির মোহ অতিক্রম করে উপলব্ধি করেছি শ্রীমায়ের উক্তির সত্যটি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রথম যৌবনের অবিমৃশ্যকারিতার দরুন তাঁর কাছে মার্জনাও ভিক্ষা করেছি।

ফিরে আসি আমাদের কৈশোরের সান্ধ্য-প্রবৃত্তিতে।

আমাদের একটি সহপাঠীর মনে জাগত না-জানা কেমন এক ব্যর্থতার ভাব। গুনগুন করে শ্রীমা ছোট একটি সুর ভেঁজে ওকে একদিন বললেন, "এই সুরটা আপন মনে গাও যদি, দেখবে মন ভরে উঠছে আনন্দে!" সুরটা হচ্ছে বেটোফেনের বেহালা-কনচার্টোর 'অস্থায়ী' থেকে নেওয়া: শ্রীমা যেন প্রসঙ্গান্তরে বলেও ছিলেন যে এটা রচনার সময়ে বেটোফেনের মধ্যে নেমে এসেছিল ভগবানের প্রত্যক্ষ করুণা!

নিজে শ্রীমা আমাদের শুনিয়েছেন কত কাহিনী, গেয়েছেন কত গান, শিখিয়েছেন কত খেলা। একসময়ে সন্ধ্যেবেলায় বিশ-পঁচিশ মিনিট বিশ্রামের অবসরে শুনতেন তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রীয় সংগীতের বাছাবাছা রেকর্ড। তখন তাঁর সান্নিধ্যে নীরবে গিয়ে আমরা কেউ কেউ বসেছি, আর দেখেছি ওই সংগীতের অন্তঃপুরে শুধুমাত্র শ্রবণমাধুর্যের পর্যায় ছাড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতো আমাদের উপলব্ধি থেকে উপলব্ধির জগতে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ঐতিহ্যময় কাশী

সোমনাথ চক্রবর্তী

কাশী—এই নামটুকুই যথেষ্ট। এদেশে, বিদেশে—সর্বত্র একে চেনাবার জন্য আর পাঁচ কথা বলার দরকার পড়ে না। আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল ভারতবর্ষের বুকে কাশী যেন একটা রূপকথার রাজপুরীর তোষাখানা। হাজার বছরের ভারত তার জমা ভাঁড়ার নিয়ে এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে—মহাকালের হাতের ছোঁয়ায় সব কিছু অতীতের ধুলোকণায় পরিণত না হয়ে।

চিরকালের কাশী বা আজকের বেনারসের রূপটা আজকের দিনের যাত্রীদের ট্রেন থেকে নেমেই কিন্তু ঝট করে চোখে পড়ে না। আধুনিক শহরের সাজসজ্জা এই নতুন গড়া দিকটায় ভর্তি। সাইকেল-রিকশা, বাস, আর সমুদ্রপারের টুরিস্টের ছড়াছড়ি। রাস্তায় রাস্তায় আধুনিক পোশাকের পাশেই শেরোয়ানী, চাপকান, কুর্তা, পাগড়ির ছড়াছড়ি। চোখ-ঝলসানো নিয়নের আলোর মালা গাঁথা রাস্তায় গাড়ি আর রিকশার মিছিল, পাশেই আধো-অন্ধকারে বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া চাপদাড়ি কোচোয়ান সাদা ঘোড়া জোতা টাঙা নিয়ে দাঁড়ায়। টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে পেতলের বাতিদানে। পোটলা-পুঁটলি কাঁধে ষোলো আনা সংসারী মানুষজন, না-হয় কোনো কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসী পুণ্য অর্জনের লোভে তীর্থধর্ম করতে পা বাড়ায় এদিকে, বিধবারা শেষ বয়সের ঠাঁই নিতে আসে কাশীর মাটিতে। নিত্যদিন বুড়ো কোচোয়ান সেলাম ঠুকে যাত্রীদের কাছে এগিয়ে যায়—'হুজোর, ধরমশালা মে কোই যানা, আইয়ে।' সওয়ারী নিয়ে রাস্তায় নামে টাঙ্গা, হাড়-জিরজিরে ঘোড়ার পিঠে সপসাপিয়ে চাবুক পড়ে, পাশ দিয়ে ছোকরা রিকশাওয়ালা শিস দিয়ে ছুটে যায় অনেক আগে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র গোধুলিয়াকে ছাড়িয়ে পূব দিকে একটু এগোলেই আস্তে আস্তে বেনারসের আলাদা রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গলির পর গলি—আলো-আঁধারির খেলা তার কোণে কোণে। চোখ তুলে আকাশ দেখতে গেলে শুধু দেখা যায় ঋজু হয়ে থাকা যক্ষপুরীর মতো বিশাল সব বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, বলা যায় অট্টালিকা—ধরন গড়ন সব কিছুতে প্রাচীন স্থাপত্যের ছাপ। একে অপরের গায়ে-পড়া—ঘিঞ্জি। ছাদের আলসেতে কিংবা গাছগাছালির পাতার আড়ালে বাঁদর-হনুমানের জোড়া জোড়া সন্ধানী চোখ। বিশ্বনাথের গলির আশেপাশে 'কচৌরি' ভাজার গন্ধ নাকের কাছে ঘুরঘুর করে। আদ্যিকালের ঝুলকালি-ভরা মিঠাই-ওয়ালার দোকানে রাবড়ি, পেঁড়া, ক্ষীরের ছড়াছড়ি—আতর-জর্দার মিঠে গন্ধ। অন্যমনস্ক একটু এদিকে হলেই ষণ্ডের উদয়। ওইটুকু এক রত্তি গলি, জল আর ফুল-বেলপাতার স্তূপ, কাদায় প্যাচপ্যাচে পাথরের শান-বাঁধানো রাস্তা। সন্ধ্যে হতে না-হতেই হাজার ঘন্টার ঘনঘটা, কোথাও ডমরু-ভেরীর নিনাদ, কৌপীন পরা সাধু, গায়ে ছাই মাখা সন্ত—সংখ্যায় অগুনতি। বাঘছালের ওপরে আসীন রুদ্রাক্ষের মালা, পাশে ত্রিশূল, হাতে গাঁজার কলকে, ঢুলুঢুলু চোখে বাবা তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে এধার ওধারে এক টুকরো জায়গা যোগাড় করে বসে। দু পা এগোলেই দুধারে দু কুড়ি ঠাকুর-দেবতা পাচ্ছেন ভক্তের প্রণাম আর প্রণামী কুড়োচ্ছে পাণ্ডা-পুরোহিতরা। বাঁ পাশেই হয়তো লাল-হলদে ঘাগরা পরা রাজস্থানী বউ, পিছনে কপালে তিলক দক্ষিণ ভারতীয় দম্পতি, সামনেই একমাথা সিঁদুর বাঙালী গিন্নীর দল। সব জাত, সব জায়গার মানুষের মিছিল এখানে সারাটা বছর ধরে লেগেই আছে, বিশেষ করে তিথিপার্বণ, স্নানযোগ আর শিবরাত্রির দিন হলে তো কথাই নেই। সবার মুখে এক ডাক—জয় বাবা বিশ্বনাথ—বোম ভোলে। মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধের চিতায় কোন পুণ্যবানের দেহটা আগুনে পুড়ছে। সকাল-সন্ধ্যে গঙ্গাস্নানে এসে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল নিষ্প্রভ-হয়ে-যাওয়া চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সে আগুনের দিকে। পাশেই কোথাও ভিখারীদের পঙ্‌ক্তিভোজনের হইচই। গঙ্গার জল ছপছাপিয়ে চলে নৌকো-বজরার শ্যাওলা ধরা দাঁড়গুলো। ঘোলা গঙ্গার পাড়ে দৈত্যের মতন দাঁড়ানো বাড়িঘর, ঘাট। পরপারে বসতিহীন ব্যাসকাশী। কপালে তিলক কেটে ঘাটওয়ালারা ঘাটে বসে—মাথার ওপর বিরাটকায় সব ছাতা। তুলসীদাসী রামচরিতমানসের সুরেলা কথকতার লোভে পড়ে হিন্দুস্থানী রমণীদের ঘাটে স্নান সেরে ফেরা হয়নি কোথাও। আবার কোথাও সকাল-সন্ধ্যের নামাজের সুর অষ্টপ্রহর নামগানের মাইকের আওয়াজ ছাপিয়েও কানে আসে গঙ্গার বুকে এপাশে ওপাশে ধাক্কা খেতে খেতে।

কাশীর গঙ্গায় মকরস্নান

এই আজকের বেনারসের ছবি। সে-কালের একালের—সর্বকালের কাশীরই নতুন মাজাঘষা রূপ—নিবে যাওয়া প্রদীপের সলতে-পোড়া ধোঁয়ার আচ্ছন্ন করা গন্ধের মত যুগ-যুগান্তের ভারত-বর্ষের প্রতীক এই কাশী দিক-দিগন্তের মানুষকে হাতছানি দেয় ধর্ম মোক্ষ কাম অর্থ আর জ্ঞানের পসরা নিয়ে।

*

কাশী নগরের পত্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, পশ্চিম ভারতে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের হাজার খানেক বছর পরেই সিন্ধুসভ্যতার সমান্তরাল আরও দুটো সভ্যতা ভারতের দাক্ষিণাত্যে আর গাঙ্গেয় অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। গাঙ্গেয় উপত্যকার এই সভ্যতার একটা কেন্দ্র এই কাশী। আজকের বারাণসী শহরের কাছেই রাজঘাটে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে আবিষ্কার করেছেন এক ইঁটে-গড়া শহরের অস্তিত্ব, বয়স যার প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছরের পুরোনো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাপ্তির শেষ ভাগ থেকেই সমাজে শুরু হয়ে যায় কৃষি আর পশুপালনের প্রচলন, পরবর্তী ধাপে গড়ে ওঠে গ্রাম, দেখা যায় ছোট ছোট কুটিরশিল্প। জীবিকার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীবিভাগ শুরু হয়ে যায়, শিল্পকলা আর লিপির চর্চাও প্রাধান্য পায়। মানুষের জীবনে খানিকটা স্থিরতা আসে, শিল্পচিন্তার অবকাশ মেলে, জনসংখ্যাও বাড়ে। সভ্যতার আদিকালে শহর গড়ার বীজ এমনি করেই এক-এক জায়গায় মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করে বিশাল মহীরুহের মত। কাশীও এর ব্যতিক্রম নয়।

[illegible] হল,
কাশীর চেহারা ছিলো বৃত্তাকার—প্রায়
াচ ক্রোশ বা 'কোশ' আয়তনের ব্যাস
রে, যার থেকেই এই কাশী নামের
চনা। ন্যায়শাস্ত্রকার মনুর পরবর্তী
ত্তম বংশধরের নাম ছিল 'কাশ্য',
িনি কাশী রাজ্যের রাজা ছিলেন।
াঁর নামেই এই নগরীর নামকরণ
য়েছে এ ধারণাও কেউ কেউ করেন।
ৌদ্ধ জাতকের গল্পগাথাতেও কাশী
মে রাজত্বের উল্লেখ আছে, যার রাজ-
নী ছিল বারাণসী। সংস্কৃত সাহিত্যে
ই শহরের অবস্থিতি বলা হয়েছে
রুণা' এবং 'অসি' নামে দুটি নদীর
াঝখানে। প্রাচীন কাশীর সাংস্কৃতিক
দর্শন সাক্ষ্য দেয় যে, সে যুগের
গরের অধিবাসীরা ছিল বর্ণসংকর—
ার্য এবং অনার্য আদিবাসী গোষ্ঠীর
লনোদ্ভূত।

কাশীর নামের উল্লেখ আর বিবরণ
েখা যায় যজুর্বেদ, সাংখ্য স্মৃতি,

াশীর গঙ্গায় নিমজ্জিত মন্দির
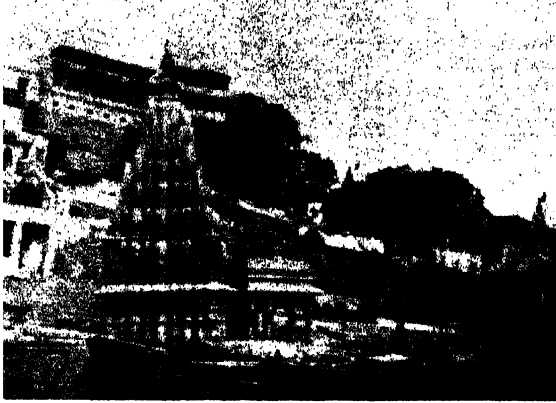
রাশর স্মৃতি, মহাভারত-রামায়ণ,
নৎকুমার পুরাণ, শিব পুরাণ, লিঙ্গ-
ুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মাৎস্য পুরাণ,
্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, আর
্কন্দপুরাণের চতুর্থ কাণ্ডের নামই
াশীকাণ্ড। পরবর্তী কালে তুলসী-
সী রামায়ণের সৃষ্টি এই কাশীতেই।
খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ সালে রচিত
াভারতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে,
াশীর রাজার সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগা-
াগ ছিল। মগধ কোসাম্বি কোশালা
াঞ্চাল আর হস্তিনাপুরে যে রাজত্ব
ড়ে উঠেছিল তা কাশীরই সমসাময়িক।
খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই দর্শন
িল্প, সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মসাধনা আর
ংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার চর্চা তুঙ্গে
ঠেছিল, তার ফলেই লৌকিক আর
াস্ত্রীয় ভাবভাবনার মিলন আর প্রকাশ
ার সুযোগ ঘটেছিল এখানে।
কাশী যে শুধু হিন্দু ধর্ম-
চেতারই বীজভূমি তাই-ই নয়,
কাধিক ধর্ম আর তার ধর্মগুরুদেরও
িভিন্ন সময়ে এ শহরে প্রতিষ্ঠা ও
দার্পণ ঘটেছিলো। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম
তাব্দীতে ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থংকর
ার্শ্বনাথের জন্ম হয় এখানেই, এর
রই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে
ৌতম বুদ্ধ আসেন এ শহরে। বৌদ্ধ-

অনেকেও কাশী দর্শন করেন। অষ্টম
শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য কাশীতেই বস-
বাস শুরু করেন এবং জানা যায় যে,
তাঁর ব্রহ্মসূত্র নামে দর্শনশাস্ত্র কাশীতে
বসবাসকালেই রচনা। পরে তিনি এখানে
একটা মঠও তৈরি করেন, যা উর্ধ্বমঠ
বা সুমেরু মঠ নামে খ্যাত। মধ্যযুগে
১২শ শতকে রামানুজ, ১৪-১৫শ
শতকে নববৈষ্ণব পন্থার প্রবক্তা
রামানন্দ, ১৫শ শতকে ধবন
রুইদাস, ১৪৪০ থেকে ১৫১৮র
মাঝামাঝি সময়ে কবীর আর গুরু
নানক, ১৪৮৫-১৫৩৩-এর কোনো এক
সময়ে চৈতন্যদেব, ১৮শ শতকে গুরু
তেগসিং বাহাদুর—এঁদের সবাইকেই
কাশীর টানে আসতে হয়েছিল
ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে।

দেশবিদেশের পর্যটকরাও এসে-
ছিলেন কাশীতে। ৫ম শতকে ফা-
হিয়েন আর সপ্তম শতকে হিউয়েন
সাঙ-এর রচনাবলীতেই তাঁদের এখানে
আসবার প্রমাণ মেলে। কাশীর টানে যে
কেবল পণ্ডিত-পর্যটকরাই এসেছিলেন
তা নয়। এসেছিল লুণ্ঠনকারীর দল
যুগে যুগে কাশীর জনপদ লুঠে ভেঙে
তছনছ করতে। এসেছে আহমেদ
নিয়ালতাজিন (১০১৩), ১৩শ
শতাব্দীতে আলাউদ্দীন আর তুর্কী
আফগান দস্যুরা, ১৪৯৪-এ সিকান্দার
লোদি, আর ১৭শ শতাব্দীতে

প্রাচীন কাশীর ধ্বংসাবশেষ

শাজাহানের আদেশেও একবার
কাশী লুঠ হয়। প্রতিবারই
এদের লক্ষ ছিল হিন্দু মন্দিরের ওপর।
হাজার হাজার মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এদের দৌরাত্ম্যে।
সংস্কৃতিকেন্দ্র কাশী কিন্তু কোন
দিনই চিরকাল একই রাজত্বের শাসনা-
ধীনে ছিল না। ঐতিহাসিক সূত্রে সর্ব-
প্রথম দেখা যায় যে, চতুর্থ শতকে গুপ্ত
সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এই কাশী।
নবম, দশম শতকে কাশী যথাক্রমে
প্রতিহার আর চেদী রাজত্বের অংগীভূত
হয়। অজাতশত্রুর রাজা হওয়ার সংগে
সংগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র
হয়ে দাঁড়ায় এ শহর। ঋষিপত্তন বা
সারনাথের বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের
পাশাপাশি ধর্মচক্রের প্রবর্তন এরই সম-
সাময়িক কালের। ফা হিয়েনের ভ্রমণ-
বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে সেকালের
কাশীতে তিরিশটি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ
ছিল আর তিন হাজারের মত বৌদ্ধ
শ্রমণ ও ভিক্ষু সেখানে বসবাস করতেন।
এর পর স্বল্প সময়ের অন্তরে কাশীতে
বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন কালে রাজত্ব করে
গেছেন। এসেছে আকবরের কাল থেকে
আওরংগজেব পর্যন্ত মুসলিম শাসন,
যার শেষ ভাগে দশনামী নাগা
সন্ন্যাসীরা কাশীর বুকে মুসলিম
শাসনের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে
লড়াইয়ে নেমেছিল। মধ্যযুগের শেষের
দিকে কাশী চলে যায় অযোধ্যায় নবাবের
শাসনে, পরে কাশীরাজ ক্ষমতায়
আসেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
কাশী অধিগ্রহণও শাসনের ক্ষেত্রে একটা
উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
কাশী বিভিন্ন রাজত্বের অধীনে
থাকলেও ধর্মীয় কারণে নানা ক্ষুদ্র
করদ রাজারা কাশীর নানা উন্নয়নে
সাহায্য করেছেন। সাহায্যদাতাদের মধ্যে
পঞ্চকোট মহীশূর দিগপতিয়া উদয়-
পুর বুঁদি ইন্দোর জয়পুর দারভাংগা
গোয়ালিয়র নাগপুর আর নেপালের
রাজপরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।
কাশীর নগরদেব বিশ্বনাথের
মন্দিরের প্রথম সূত্রপাত ঘটে প্রায়
৫ম শতাব্দীতে। জানা যায়, প্রায়
এক শো হাত উঁচু পিতলের মূর্তি ছিল
মহেশ্বরের। ১৫৮৫তে টোডারমল
বিশ্বনাথের মন্দিরের সংস্কারসাধন ও
নতুন করে তৈরি করান। রাজা মানসিংহ
প্রায় হাজারটি মন্দির ঐ সময়ে কাশীতে
তৈরি করে দিয়েছিলেন। আজকের
মন্দিরটির তৈরি শুরু হয়েছিল
১৭৭৭-এ রানী অহল্যাবাইয়ের আমলে।
পরে মহারাজা রণজিত সিংহের তত্ত্বা-
বধানে ১৮৩৯এ নতুন রূপদান করা হয়
মন্দিরের।
সংস্কৃতি-শিক্ষার ধারায় কাশীর
সঙ্গে তুলনা করা যায় সাগরের। দিক্-
দিগন্তের শিক্ষার্থী আর শাস্ত্রজ্ঞানীদের
মিলনে সাধনার এ এক মহান ক্ষেত্র
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাশীর ব্রাহ্মণ্য-
সমাজের বিরাট দান তৎকালীন হিন্দু
সামাজিক আইনকানুন প্রণয়নে।
বিজ্ঞানেশ্বরের পুঁথি কাশীতেই সৃষ্ট।
বৈদিক যুগের শিক্ষাদর্শে—এক-একজন
পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী শিষ্য-
দের গুরুগৃহে শিক্ষাভ্যাস কাশীতে
বিভিন্ন রাজানুকূল্যে বেড়ে উঠেছিলো।
প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো মানমন্দিরের।
সাহিত্য ব্যাকরণ জ্যোতিষশাস্ত্র ফলিত
তন্ত্র বেদ মীমাংসা দর্শন পুরাণ অর্থ-
শাস্ত্র আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের
বিস্তার এরই ফলাফল। বলা হয়—
সংস্কৃত চর্চার ব্রাহ্মণ গুরুকুল এসে-
ছিলেন এখানে মিথিলা আর বাংলা
থেকে।
বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা আর
কাশী নগরীর মন্দির-নগরীতে
রূপান্তর হবার পরেই তীর্থযাত্রীর দল
কাশীর পথে আসতে শুরু করলো। এই
উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে
সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষজনকে কাশী

সারনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আলোকচিত্র : সোমনাথ ঘোষ

[illegible] তার অলংকার [illegible] হয়ে [illegible] হলো সাধারণ মানুষের কাছে তীর্থ-কাশী। পর্যটন, আনন্দ আর ধর্মের বিরাট সমন্বয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর জীবিকার শুরু হল। পুরোহিত-পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের পুজো-অর্চনার সুযোগ করে দিতে লাগলো শুরু হল বংশানুক্রমিক যজমানি। কাশীর ধর্মীয় দিকটি এক বিরাট সংস্কৃতির জাল তৈরি করেছে। নানা ধরনের শাস্ত্র পুঁথি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচারের সংগে জড়িয়ে আছে নানা কুল-কর্মবৃত্তি—পণ্ডিত পূজারী কথকঠাকুর গোমস্তা এমন কি মাঝিমাল্লা থেকে মণিকর্ণিকা-হরিশচন্দ্র ঘাটের ডোম—অগ্রদানী বামুন—নাপিত পর্যন্ত। গোমস্তা-ভন্দররা এলো তীর্থযাত্রী আর পাণ্ডাদের ফাইফরমাশ খাটতে। কীর্তনীয়া কথকঠাকুর আর আনুষ্ঠানিয়াদের কাজ হলো ধর্মমূলক সংগীত-আবৃত্তি বিতরণ করা। জলপথে যাত্রীদের আসা-যাওয়া বেড়ে যাওয়ায় নৌকো-বজরার মাঝি-মাল্লাদের সংখ্যা বাড়লো।

তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়বার সংগে সংগে কাশীর কুটিরশিল্পও একটা বিরাট বাজার পেলো উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির জন্য। এক বিরাটসংখ্যক খোদাইকার যারা মন্দিরের পাথরের খোদাইয়ের কাজে ডাক পেত তারা অবসর-অবকাশে ছোটো ছোটো শিবলিংগ বা অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করতে লাগলো যাত্রীদের কাছে বিক্রির জন্য। কাশীর আতর জর্দা যা একদিন রাজদরবারে শোভা পেত তা

সাধারণ যাত্রীদের হাতে পৌঁছে গেল, কুমোররাও পোড়ামাটির চিত্রিত থালা কুঁজোর চাহিদার যোগান দিতে লাগলো।

হাতির দাঁতের শৌখিন জিনিসপত্র পিতলের বা কাঁসার কাজেও কাশীর একটা ঐতিহ্য ছিল। জানা যায় যে কাশীর খোদাইকারদের অধিকাংশই মূলত গোণ্ড আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মীরজাপুরের বাসিন্দা। কাশীতে পাথর খোদাইয়ের কাজে এদের আনানো হয়েছিলো রাজাদেশে। আজকের কাশীতে শিল্পশাস্ত্রে জ্ঞানী খোদাই-শিল্পীর সংখ্যা কমে গেছে। বাবু মিয়ান নামে একজন মুসলিম শিল্পীর মৃত্যুর সংগে সংগে প্রায় বছর কুড়ি আগে এই শিল্পের বাতি ক্রমশ নিবে এসেছে।

বেনারসের বেনারসীশিল্প সারা ভারতে কিংবদন্তীবিশেষ। সিল্কের শাড়ির ওপর চোখ-জুড়োনো জরির কাজ, বাহারে ডিজাইনের যে বৈশিষ্ট্য কাশীর তন্তুবায়েরা ফুটিয়ে তুলতেন তা এক বিশেষ ধরনের শাড়ির সৃষ্টি করেছে সারা ভারতে। আজও কাশীর পাড়ায় পাড়ায় হাতে চালানো তাঁতে হিন্দু-মুসলিম শিল্পীরা বেনারসীর বুকে নকশা ফুটিয়ে তোলেন। তবক বা রাংতা তৈরিও আজকের কাশীর

নবনির্মিত বিড়লা মন্দির

সারনাথের বুদ্ধমন্দির

সারনাথের স্তূপ

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে সূর্যোদয়

আছে।
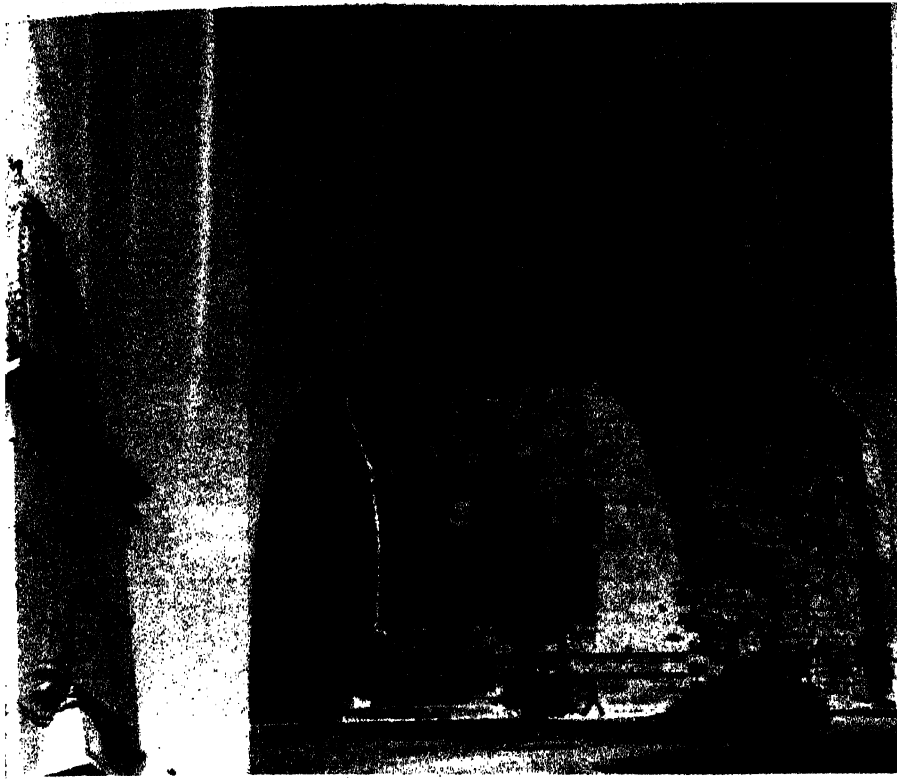
আজও কাশীর বেশ কিছু বাড়ীর দেওয়ালে বিয়ে-পার্বণে আঁকা দেওয়াল-চিত্রের মতো যেমন রাম-সীতা-হনুমানের গল্পগাথারও চিত্ররূপ থাকে, তেমনি থাকে জ্যামিতিক নকশা ফুলপাতার রঙিন দেওয়াল-জোড়া ফ্রেসকো। কোনো দক্ষ শিল্পীর হাতে রূপ পাওয়া ছবি সেগুলো নয়। সাধারণ মানুষজনেরই আঁকা। এসব ছবি থেকেও বোঝা যায় যে, শিল্পকলার চর্চায় একদিন কাশীর সাধারণ মানুষও পিছিয়ে থাকতো না। স্টাইলে এ ছবির বেশ কিছুটা সাদৃশ্য মেলে মীরজাপুরের জঙ্গলের আদিবাসী-দের আদিম চিত্রকলার সঙ্গে।

রূপসী শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চায় কাশী পথিকৃৎ। মার্গীয় কণ্ঠসংগীতের মধ্যে ঠুংরী দাদরা এবং টপ্পার একটি নিজস্ব ঘরানা কাশীর আছে, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির মত এখানে হিন্দু মন্দিরেও হয়তো এক সময় নৃত্যগীত-চর্চা হতো ধর্মীয় উপকরণ হিসাবে। রাজনর্তকী বা দেবদাসীদেরও হয়তো একটা বিশেষ স্থান ছিলো, যা কাশীর সাংস্কৃতিক জগতে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারার মধ্যে রয়ে গেছে। আজও নগরীর পল্লীর কোণে কোণে বিবর্ণ আভি-জাত্যের মধ্যে মুজরো বসে কখনও-সখনও।

বিসমিল্লা খানের মত সানাইবাদক, সিতারাবাঈ বা গোপীকৃষ্ণের মত নৃত্য-শিল্পীর কলাসাধনার স্থান তো এই কাশীই।

সাধু-সন্ন্যাসীদেরও একটা নিজস্ব সমাজ আছে, আছে গণ্ডী। সনাতন ধর্ম সমাজে বজায় রাখতে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই চেষ্টা অপরিসীম। খ্যাত-নামা অগ্রণী নৃতাত্ত্বিক ডঃ সুরজিৎ সিংহ ও শ্রীবৈদ্যনাথ সরস্বতীর ১৯৬৯ সলের সমীক্ষা অনুসারে, কাশীতে হিন্দু সাধুসন্তরা প্রধানত তিনটি ধারায় বিভক্ত। দশনামী সন্ন্যাসীরাই সংখ্যায় সর্বাধিক, যাদের মধ্যে আছে তিনটি গোষ্ঠী—ডাণ্ডি, নাগা ও পরম-হংস। এ ছাড়াও আছে গোরক্ষপন্থী আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়। অহিন্দু সন্ন্যাসী-দের মধ্যে আছে শিখ, মুসলিম আর বৌদ্ধরা। প্রায় তিন শো মঠ, আশ্রম, আখড়ায় হাজার কয়েক সাধু-সন্ন্যাসীর বাস শহরে।

কাশীর একটা নিজস্ব রূপ আছে তার পাথরে ঢাকা বিশাল সোপান-শ্রেণীর হিম-ছোঁয়ায়, আছে আপন স্বর্ণ গৈরিকের পাশেই বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল আভিজাত্য, গন্ধ আছে ফুল, বেলপাতা, অগুরু চন্দনের পূজার উপকরণের সংগে শ্মশানের ধোঁয়ার। আর শব্দ তার হাজার মন্দিরের সমবেত আরতির শংখারতির ব্যাপ্তিতে। এ সব কিছুর সমাহারই কাশী।

শাস্ত্রীয়, লৌকিক, আর নৈর্ব্যক্তিক —এই ত্রিধারার দুর্লভ সমন্বয়ের সঙ্গম-স্থল এই কাশীই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির, মৈত্রীবন্ধনের নাটমন্দির। যার মাঝে বিভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভাবু-ভাবী পূজারী ও পূজার্থীকে যুগ-যুগান্ত ধরে একই চন্দ্রাতপের নীচে দাঁড় করিয়েছে, একই মন্ত্র তাদের গলায় বেজেছে সেই একেরই উদ্দেশে।
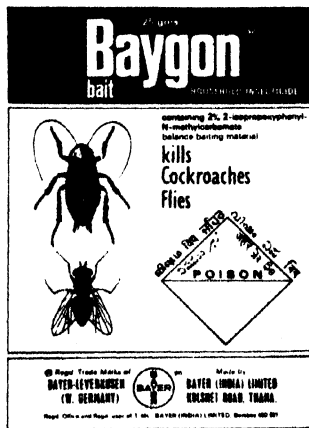
ছাগল সিরিজ ঃ ১

নরেশ গুহ

রেতে মশা, দিনে মাছি ঃ
প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যে আছি
ডিহি কলকাতায়।
প্রগতিরও মাত্রা নেই থেমে ঃ
খনে নেমে, খনে যায় চ'ড়ে
সন্ধ্যে হ'লে ঠিক করে প্রায়শঃ
যখন বিদ্যুৎ চ'লে যায়।
বিপ্লবী বানানে লেপা দেয়াল
হঠাৎ আর চোখে হয় না খেয়াল।
জটিল সংকট।
তবু বিপন্ন বিশ্বকে ভালোবেসে
সুকুমার রায়-কৃত বিখ্যাত ছাগল
পরিস্থিতি বুঝে,
শিং চুলকিয়ে, কেশে,
দাঁড়ায় গা ঘেঁসে।
গলা খাটো ক'রে বলে—
'দেবো নাকি বক্তৃতাটা,
যার বিষয় হচ্ছে ছাগলে কি না-খায়?
মিনি ল্যাজ নেড়ে অন্ধকারে
অনুমানে মুখের পানে তাকায়।

আমি তাকে স্নেহ করি, ভক্তিভরে শুনি
খাদ্যাখাদ্যে অভিজ্ঞতা তার।
হেন বিজ্ঞ জন্তু দেশে বড়ো দরকার।
একমাত্র সে-ই
টিকটিকি দেখেছে চেটে, ওতে
কিচ্ছু খাবার মতো নেই।

নৃত্যপ্রিয় চিত্তে তার তবু একটু ঘুসঘুসে অসুখ—
এখনো পারেনি দেখতে চেটে
আছে কিনা রস টিভি সেট-এ।
বিস্তর জাবর কেটে ভেবে ঠিক করেছে সেদিন,
নেই ওতে কিসসু ভিটামিন।
হয়তো বা খেতে টক, হয়তো বা কষা ঃ
দিনে চাটে মাছি, আর
রাতে খায় মশা ॥

ব্যক্তিগত

দিব্যেন্দু পালিত

মানুষের পর মানুষ আসে তাদের অব্যবহিত পরিকল্পনা নিয়ে
বলে, 'টেলিফোন করেছিলাম তিনবার—
রাস্তায় কী-রকম জ্যাম দেখেছেন তো!
এরই মধ্যে আবার ব্রেক ফেল করল!
ভাগ্যিস আগেই টের পেয়েছিলাম!'

আমি ভাবি, টের না পেলে কী হতো!
ভাবি, ওই ভাগ্যিস কথাটার কী যেন মানে!
ভাবতে ভাবতেই বেজে ওঠে টেলিফোন—হ্যালো—
তখন মনে পড়ে যে-কোনো লড়াইয়েই আছে দু'টি পক্ষ,
সেতুর মতো ভাগ্য জুড়ে রাখছে তাদের;
মনে পড়ে, দুঃখ ছাড়া আর কেউই একা হাঁটে না।

সব ঠিক-ঠিক চললে প্রথম বৃষ্টির সঙ্কেতের মধ্যে দিয়ে
জমে উঠবে বোয়িংয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত—
আভাস পাবো, কিন্তু দেখব না;
পরিকল্পনাই উড়িয়ে নিয়ে যাবে নিউইয়র্ক আর হামবুর্গে।

যার সৌন্দর্যে ডুবে থাকতে থাকতে আমার শরীর,
ঈষৎ আঁচল সরিয়ে নতুন ভঙ্গিমায় সে দেখায় মেদ;
বলে, 'একটু মোটা হয়েছি না!'
আমি তাকিয়ে থাকি, আর ভাবি, মেদের আড়ালে একদিন কী ছিল!
সম্প্রসারণে অভ্যস্ত চোখ আটকে যায় পাহাড়ে।

পাহাড়ের পর পাহাড়,
আর পাহাড়—
শুধু তারও মাথা ডিঙিয়ে থমকে থাকে লাল একটুকরো মেঘ—
সে আড়াল হয় না,
তার কোনো প্রতিপক্ষ নেই!

না, কোনো কথা নয়

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

যদিও তোমার সঙ্গে অনেকদিনের পরে দেখা
একা
অবেলায় যে যে কথা মনে আসে, সামান্য সুযোগ পেলে
তুমিও তা এখনি বলতে,
কিন্তু লোড-শেডিংএর বিপর্যয় হঠাৎ থামিয়ে দিলো সব।
অন্ধকারে
যৎসামান্য শব্দ হয়
আঙুলের, পরিধেয় নড়ে ওঠে, বুঝতে পারি,
একটি কথা বলে উঠলে
শব্দগুলি ঢেকে ফেলবে দৈবের অতীত ঃ
কিন্তু না, কোনো কথা নয়,
বিদ্যুৎ-সংকট, সে কি আজ এখনি হয়েছে।

অরণ্যদেব

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ... কলম্বাসের সান্টা মারিয়া জাহাজে ছিল ছোট্ট একটি কেবিন বয়.....

পরে সে নিজেই একটি জাহাজের ক্যাপ্টান হয়। আসলে, তিনিই হচ্ছেন প্রথম অরণ্যদেবের পিতা!
জলদস্যু!
!

ক্যাপ্টানের যুবক-পুত্রের সামনেই জলদস্যুরা ক্যাপ্টানকে হত্যা করে....

যুবক-পুত্রটি বেঁচে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় সমুদ্রতীরে এসে ওঠে। অরণ্যের বামন-উপজাতির লোকেরা তাকে বাঁচিয়ে তোলে.....

... প্রতিজ্ঞা করছি, পৃথিবী থেকে জলদস্যুতা, অন্যায়, অবিচারের আমি উচ্ছেদ করব। আমার বংশধরেরাও এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকবে...

পিতার হত্যাকারীর খুলি ছুঁয়ে সে শপথ নেয়।
আসলে তিনিই প্রথম অরণ্যদেব.....

তাঁর বংশধরেরাও একের পর এক পূর্বপুরুষের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ... কাজ করে যাচ্ছেন... সবাই ভাবে অরণ্যদেব মৃত্যুঞ্জয়.....
অরণ্যদেবের...
মৃত্যু নেই...

অরণ্যদেবের ডান-হাতে খুলি-চিহ্ন, তাঁর শাস্তির প্রতীক... আর

বাঁ-হাতে মঙ্গল-চিহ্ন, তাঁর বন্ধুতার প্রতীক.....

এখন যিনি অরণ্যদেব... লুটেরা, বদমাসরা তাঁর নাম শুনলে কেঁপে ওঠে!
8/14
এরপর : নতুন গল্পের শুরু
১

শংকর

॥ ৯৫ ॥

কোথাকার কোন বরদাপ্রসন্ন! ক'দিনেরই বা পরিচয় আমার সঙ্গে? তবু তাঁর আকস্মিক পুনরাবির্ভাব এবং মৃত্যু আমার মনের মধ্যে গভীর বেদনার আগুন জ্বালিয়ে গেল। বেশ তো ছিলেন তিনি এই থ্যাকারে ম্যানসনের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে বহু দূরে তীর্থ-পথের দেবতাদের সান্নিধ্যে। সেখানে দেহ রাখলে আমরা এমনভাবে তাঁর বিয়োগ ব্যথায় কাতর হতাম না। কিন্তু এক অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে কেবল মরবার জন্যেই যেন তিনি ফিরে এলেন স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এই থ্যাকারে ম্যানসনের সীমানায়।

বরদাপ্রসন্নর শেষ মুহূর্ত যে আসন্ন, মৃত্যুর দূত যে অদূরেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে তা অনভিজ্ঞ আমি কিন্তু মোটেই বুঝতে পারিনি। হাল্কা খাটিয়ায় ফ্ল্যাট পরিক্রমা শেষ করে বরদাপ্রসন্নকে আমরা শুইয়া দিয়েছিলাম তাঁর নিজস্ব ঘরে।

বরাদাপ্রসন্ন বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে আমরা তাঁর ঘরখানি এতোদিন ব্যবহার না করে রেখে দিয়েছি। বিছানায় শুয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বরদাপ্রসন্ন আমাকে বলেছিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আমার কোনো আশ্রয়ই এখানে নেই। তোমরা আমাকে লজ্জা দিলে শংকর। এ-জানলে কোনকালে আমি এখানে ফিরে আসতাম। একবার যারা এই থ্যাকারে ম্যানসনের জল খেয়েছে তাদের মোহমুক্তি নেই—বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে বসেও আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনকে ভুলতে পারলাম না।"

বরদাপ্রসন্নর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমাকে একলা কাছে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কেন আমি ফিরে এলাম বলো তো?"

এর উত্তর আমি জানবো কী করে? আমি মাথা নিচু করে নির্বাক হয়ে ও'র কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে বাবার বয়োবৃদ্ধ মুহুরিমশাই থাকতেন—আমি তাঁকে মাস্টারমশাই বলে ডাকতাম। আজ এই মুহূর্তে বরদাপ্রসন্নর জরাজীর্ণ মুখটি দেখে বার বার মাস্টারমশায়ের কথাই মনে হতে লাগলো। কোথায় জন্মেছিলাম, কোন্ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলাম, কী সব স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর সংসারের দেবতার বিচিত্র খেয়ালে আত্মীয়-পরিজনহীন হয়ে নিঃসঙ্গ আমি এখন কোন্ পরিস্থিতিতে এসে পড়লাম!

বরদাপ্রসন্ন আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "বড় ভুল করে ফেলেছিলাম। অভিমান করে, মনের মধ্যে অভিযোগ নিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে গিয়েছিলাম, তাই মায়ার বাঁধন কাটতে পারলাম না, আবার ফিরতে হলো।"

বরদাপ্রসন্ন এবার বললেন, "তোমাকেও ভুল বুঝেছিলাম, ভাই। আমার মনের মধ্যে ওই রামসিংহাসন চৌরাশিয়া সন্দেহর বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে আমাকে অপমান করে বিদায় করবার জন্যেই তোমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে চাকরি দেওয়া হয়েছে। গণপতিবাবু তোমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে এখানে স্পেশাল কোনো অপকর্ম করতে চান, এমন সন্দেহও মনের মধ্যে ছিল। এতোদিন পরে বুঝলাম, আমার হিসেবে ভুল হয়েছিল। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ভাই। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা করো, তোমাদের যা কিছু অভিযোগ আছে তা তুলে নাও না-হলে যে এখান থেকে খালাস হবার অর্ডার মিলবে না।"

এখান থেকে খালাস বলতে বরদাপ্রসন্ন যে ইহলোক থেকে মুক্তির কথা বলছেন তা আমি বুঝিনি।

বরদাপ্রসন্ন এই অপরিচিত পরিবেশে আমাকে ভালবাসা এবং ভরসাই দিয়েছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে যে অপ্রসন্নতার আগুন ছিল তার সন্ধান আমি পাইনি—সুতরাং ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর বিরুদ্ধে তো আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু বরদাপ্রসন্ন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, দুর্বল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ক্ষমা করলে তো ভাই?"

সজল চোখে আমি বরদাপ্রসন্নের শীতল হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিলাম। বরদাপ্রসন্ন আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সাবধানে থেকো ভাই। এ-বাড়ির জন্মলগ্নে দেবতাদের বিরক্তি রয়েছে—এখানে কেউ তো সুখ পাবে না। মার্টিন সায়েব পাননি, তাঁর বউ পাননি। কালোয়ার গুপ্তরা পাননি, কালীঘাটের হালদাররা পাননি, অর্ধচন্দ্র গুপ্তরা পাননি। এমন কি বেচারা তেলকালির ভাগ্যেও সুখশান্তি জোটেনি। তোমার জন্যেও আমার কেমন ভয় হয় ভাই। তুমি বরং দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মন্ত্র জপ করো প্রতিদিন।"

বরদাপ্রসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত সংবাদ শুনবার জন্যে অসীম আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমিও অনেকদিন পরে একজন উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে একের পর এক বিস্তারিত খবর দিতে লাগলাম।

সিলভার ড্রাগন ও শকুন্তলা চাওলার সাম্প্রতিক খবরও বরদাপ্রসন্ন মন দিয়ে শুনলেন। এমন একজন বেপরোয়া ভাড়াটে, যিনি একদিন হয়তো পুরো থ্যাকারে ম্যানসনকেই গ্রাস করে ফেলতে পারতেন, তিনি যে নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে কারাগারে বন্দিনী এবং আমরা তাঁর উচ্ছেদের ব্যবস্থা সুগম করে ফেলেছি শুনে বরদাপ্রসন্ন হালদার কিন্তু খুশী হলেন না।

তিনি আমাকে আবার কাছে ডাকলেন। আমার কানে কানে ক্ষীণকণ্ঠে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ওরা যা করছে তার শাস্তি ওরা নিজেরাই পাবে। তুমি কিন্তু ওই সিলভার ড্রাগনকে ভিটেছাড়া করিও না—বাস্তু সাপকে বিদায় করতে নেই, তাতে গেরস্তর ক্ষতি হয়।"

মৃত্যুর আগে বরদাপ্রসন্নের মুখে এই ধরনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মিসেস চাওলার দূত আমার অলক্ষ্যে এই অল্পসময়ের মধ্যে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে যোগাযোগ করলো নাকি? কিন্তু বরদাপ্রসন্ন যাই বলুন, এ-ব্যাপারে আমরা আদালতের মাধ্যমে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি, এখন আচমকা পিছু হটবার কোনো কারণ নেই।

বরদাপ্রসন্নের আকস্মিক মৃত্যু থ্যাকারে ম্যানসনে আমাদের ওপর শোকের কালোছায়া বিছিয়ে গেল। কে এই বরাদাপ্রসন্ন—তিনি আমাদের আত্মীয় নন, আপনজন নন। কর্মজীবনে প্রতিদিনের যে যোগসূত্র ছিল তাও তো বেশ কিছুদিন আগে ছিন্ন হয়েছিল। তবু কলকালি, তেলকালির চোখে জল। বেচারা সহদেব, সেও নানা কাজের ফাঁকে বরদাপ্রসন্নর জন্য চোখের জল ফেলেছে।'

আমার সঙ্গে যখন সহদেবের দেখা তখন কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ ফুলে উঠেছে। সহদেব বললো, "হালদারমশাই বড় মুখ করে আমার কাছে সিঙি মাছের ঝোল আর ভাত খেতে চাইলেন, অথচ আমি কিছু করতে পারলাম না।"

আমি ভাবলাম, হয়তো সহদেবের পয়সার অভাব ছিল। বললাম, "আমার কাছ থেকে সিঙি মাছের পয়সা চেয়ে নিলে না কেন, সহদেব?"

সহদেব এবার ভেঙে পড়লো। "হুজুর, এক জোড়া সিঙি মাছের আর কত দাম? যতই সময় খারাপ হোক, আপনার আশীর্বাদে হালদারমশাইকে একদিন মাছ কিনে দেবার মতো ক্ষমতা আমার আছে। একবার তো ভাবলাম চলে যাই বউবাজার মার্কেটে—বেস্ট, জ্যান্ত মাছ ওখানেই পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস পেলাম না, হুজুর।"

কান্নায় সহদেবের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো। "পণ্ডিতমশাই তো সব জেনেশুনে আমার কাছে খেতে চাননি যাবার সময় আমি কেন পাপের বোঝা বাড়াই, হুজুরে? মৃত্যুর পরে ওপরে উঠেই তো উনি জানতে পারবেন আমি সুইপারের ছেলে!" সহদেবের কান্না আর থামতে চায় না।"

কাঁদতে-কাঁদতে সহদেব বললো, "আবার আগে পণ্ডিতমশাই খুব দুঃখু পেয়ে গেলেন। আমাকে বারবার বললেন, কী হলো তোর, সহদেব? আমাকে একটু মাছের ঝোল-ভাত খাওয়ালি না? আমি বকুনি হজম করে গেলাম, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, পণ্ডিতমশায় যাবার সময় আমার হাতে খাবেন না—আমি পরিচয় ভাঁড়িয়ে এখানে কুক-বেয়ারার কাজ করছি, আমি জাতে সুইপার।"

কলকালি নিজেও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। মনের দুঃখে ক'দিন সে ছাদের ঘরে চুপচাপ বসে রইলো—বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের সেই বরনারীর সাময়িক সান্নিধ্য উপভোগের কথা তার মনেই রইলো না। কলকালি বললো, "হুজুর, বড় বিপদে পড়ে গেলাম। পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে পাইপ কিনবার জন্যে একশ টাকা আগাম নিয়েছিলাম। সে আর শোধ দেওয়া হয়নি। পণ্ডিতমশাই একদিন যখন খোঁজ নিয়েছিলেন, তখন মিথ্যে হিসেব দিয়েছিলুম। পণ্ডিতমশাই সরল মানুষ, উনি মানুষকে সন্দেহ করতে পারতেন না, আমার হিসেব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হুজুর, নিজের হিসেবে নিজে তো গড়বড় করা যায় না। আমি জানতাম, ওই একশ টাকা আমি বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটে এক রাত্রে নয়-ছয় করে এসেছি।"

একটু থামলো কলকালি। তারপর বললো, "একটা কিছু করুন, হুজুর। পণ্ডিতমশায়ের টাকাগুলো আমার বুকের মধ্যে পেরেকের মতো বিঁধছে। দেবতাকে ঠকিয়েছি জানতে পারলে বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীটের ওই মেয়েমানুষ আমাকে আর আস্ত রাখবে না।"

অমন যে অমন তেলকালিবাবু তিনিও আমাকে বললেন, "একটা কিছু করুন, স্যার। তিন পুরুষের খেস্টান হলেও, শ্রাদ্ধ-শান্তির কথা যে জানি না এমন তো নয়। বরদাপ্রসন্নবাবুর না-হয় তিন কুলে কেউ নেই—কিন্তু আপনিই যখন মুখাগ্নি করলেন তখন বাউনের ছেলে হিসেবে আপনার ঘাড়েই তো কিছুটা দায়িত্ব চাপলো।"

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বরদাপ্রসন্নর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের কর্মচারি আমরা সামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। তেলকালিবাবু বললেন, "আপান তো বাউনের ছেলে, গীতা থেকে খানিকটা পাঠ করুন।"

তাই করলাম। সবাই হাত জোড় করে উদার অনন্ত আকাশের তলায় বসে আমার অনভ্যস্ত কণ্ঠে গীতার বাণী শুনলো।

তারপর তেলকালিবাবু একখানা কালো বই হাতে এগিয়ে এলেন। ধরা গলায় বললেন, "পণ্ডিতমশাই পুজোর প্রসাদ বিলোতে এসে মাঝে মাঝে আমার ঘরে বসে পড়তেন; বলতেন, শোনাও দেখি তোমাদের বাইবেলের গপ্পো। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমিও একটু পাঠ করি।"

কার আপত্তি থাকতে পারে? সবার চোখেই জল। তেলকালিবাবু ততক্ষণে মথি লিখিত সুসমাচারের অংশ পড়তে শুরু করেছেন।

কাণ্ড বাধালো সহদেব। সে এসে হাত জোড় করে বললো, "হুজুর, আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি একটা কাজ করে ফেলেছি। আজ আপনারা সবাই আমার রান্না একটু খেয়ে যাবেন।"

খেতে বসে তেলকালিবাবু বললেন, "শ্রাদ্ধের দিনে সিঙি মাছের ঝোল আর ভাত! তোর মাথায় কী কোনো বুদ্ধি নেই সহদেব?"

সহদেব কথাটা কানেই তুললো না। বললো, আপনাকে আর এক পিস সিঙিমাছ দিই, স্যার?" তারপর মুহূর্তের জন্য অসহায়ভাবে সহদেব আমার মুখের দিকে তাকালো, তেলকালিবাবুর অভিযোগের উত্তর সে দিতে পারলো না।

কলকালি সেদিন চুপ করে বসেছিল। একবারও মুখ খোলেনি। কিন্তু সেও যে মনে মনে মতলব এঁটেছে তা দু-দিন পরেই জানতে পারলাম।

শকুন্তলা চাওলার মামলার তদ্বির করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাধা পড়লো। স্বয়ং পীপ বিশোয়াস আমার খোঁজ করলেন।

"আমাকে ভুলেই গেলেন, মিস্টার শংকর,"

পুরনো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

দুশ্চিন্তার প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে পপি বিশোয়াস এই ক'দিনেই সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা হয়ে উঠেছেন। পপি বিশোয়াসের চোখে-মুখে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের দীপ্তি, এই ক'দিনেই তিনি বয়সের কাঁটাকে কয়েক ঘর পিছিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "বেশ লোক আপনি! আপনাদের মাথার ওপর দিয়ে এতো হাঙ্গামা গেল অথচ আমাকে একটু খবর দিলেন না; আমার কাছে চাঁদাও নিলেন না। আমি কি আপনার পর?"

লজ্জায় চুপ করে রইলাম। পপি বিশোয়াস বললেন, "এর মধ্যে অবাক কাণ্ড, আপনাদের কলকালি—ওই যে লোকটা জলের কল সারায়। অন্য দিন ট্যাঁকে ডবল পয়সা না গুঁজলে কাজের কথাই তোলে না। কিন্তু আজ একেবারে উল্টো লোক! আমার বিশ্বাই হয় না।"

কী ব্যাপার? কলকালি আবার কী নতুন হাঙ্গামা বাধালো। আমি পরবর্তী খবর সংগ্রহের জন্যে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

পপি বিশোয়াস জোর করে আমার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিলেন। বললেন, "যত কাজই থাক আপনার আজ আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। ক'দিন খুবই ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছেন। আর ওই কলকালির ভিতরের ব্যাপারটা না-জানা পর্যন্ত মনের মধ্যে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে।"

পপি বিশোয়াস নিজেই এবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা মিষ্টির বাক্স বার করে আনলেন। বাক্সটা আমার সামনের টেবিলে রেখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমাকে আসল খবরটা দিতে হবে।"

"কী খবর জানতে চাইছেন?" পপি বিশোয়াসের এই অহেতুক কৌতূহল আমার কখনও পছন্দ হয় না, কিন্তু ও'র ব্যবহারে এমন সরলতা আছে যে রাগও করতে পারি না।

"কার খবর আবার? আপনার ওই কলকালির। রাতারাতি লোকটার হলো কী?" পপি বিশোয়াস কপট উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

কলকালি হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে কী করে বসলো? এই সব লোককে নিয়ে আমার চিন্তার শেষ কোনোদিন হবে না।

পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার কাছে কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলবেন। আপনাদের ওই কোর্ট-কাছারির সত্যি কথা নয়—জেন ইন সত্যি। শুনেছিলুম, আপনাদের এই কলকালি একজন প্রেমিক লোক। ভবানিপুরের কোন ঘাটের কাছে নাকি বহুদিন লাভ-অ্যাফেয়ার্স চালিয়ে যাচ্ছে।"

এসব খবর যে গোপনে-গোপনে মিসেস পপি বিশোয়াসের কানেও পৌঁছে গিয়েছে তা আমার আন্দাজ ছিল না। এ-বিষয়ে আমার নিজস্ব কোনো বাড়তি কৌতূহল নেই।

কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াসের মতো সংসারের আগুনে বারবার দগ্ধ মহিলাদেরও এই প্রেমের কাহিনীতে কৌতূহলের সীমা নেই। 'অল দি ওয়ার্ল্ড লভস দ্য লাভার'—বলতেন সত্যসুন্দরদা। কথাটা আজও আমাদের এই পঙ্কিল পরিবেশেও মিথ্যে হয়নি।

পপি বিশোয়াস বললেন "কী ব্যাপার, বলছেন না কেন? কলকালি কি শেষ পর্যন্ত ওই বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীটে বিয়ে-থা করে বসলো নাকি?"

"তার আগে আমাকে বলুন, আজ সকালে কলকালি কী এমন কাণ্ড করলো, যার থেকে আপনার মনে এইসব প্রশ্ন উঠছে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "এখানে আমারও তো কিছুদিন হলো। এখানকার হালচাল মোটামুটি আমিও বুঝে নিয়েছি; আপনাদের ওই কলকালির চরিত্রটা বুঝতে আমার বাকি নেই। আর সবাইকে ডোন্ট-কেয়ার করা যায়, কিন্তু কলকালিকে সন্তুষ্ট না রেখে এখানে দু'দিন বসবাস করা যাবে না—পাইপ এবং কলের ... থাকলে ভিজিটরদেরও খুব অসুবিধে হয়।"

অপরিচিত টয়লেট বুঝে ঢুকে আচমকা ফুটো সিস্টার্নের জল মাথায় এবং দেহে স্প্রে হলে যে কোনো অতিথির মুড যে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে তা বোঝালেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন কলকালি এতোদিন এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছ থেকে বেশ কিছু পয়সা নিয়মিত আদায় করে চলেছে।

কিন্তু আজ একেবারে উল্টো পুরাণ! "একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে!" মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস।

"আজ কলকালি কোনো পয়সা চাইলো না। বরং মিষ্টির এই প্যাকেটটা আমার হাতে তুলে দিল। কেন মিষ্টি কিছুই বললো না। বরং নিজেই কলঘরে ঢুকে সিস্টার্ন পাইপ এবং বিবককগুলো সারালে। তারপর একটি পয়সাও দাবি না করে চলে গেল।"

মিষ্টির বাক্স খুলে দেখলুম বরদাপ্রসন্নর প্রিয় ছানার গজা এবং লবঙ্গলতিকা রয়েছে। পুজোর প্রসাদ হিসেবে অনেকবার ওই দুটি মিষ্টির সদ্ব্যবহার করেছি।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "নিশ্চয় কোনো স্পেশাল ব্যাপার। কারণ মিষ্টির ডিসট্রিবিউশন লিস্টে শুধু আমি একা নই। দেখলুম, কলকালির থলিয়ায় আরও অনেকগুলো বাক্স রয়েছে।"

কলকালি যে পুরনো অপরাধ স্খালনের জন্যে এই পথ বেছে নেবে তা আমি আন্দাজ করিনি। মিসেস বিশোয়াসকে গোড়ার ইতিহাস না প্রকাশ করেই বললাম, "বিশেষ কোনো কারণ নেই। বরদাপ্রসন্নর তো আর কেউ নেই—তাই একজন পুরনো সহকর্মী হিসেবে কলকালি তার দায়িত্বের বোঝা বইবার চেষ্টা করছে।"

মিসেস বিশোয়াস আমার কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। অনাত্মীয় সহকর্মীকে যে এখনও এমনভাবে ভালবাসা যায় তা বোধ হয় তাঁর কল্পনাতীত ছিল।

মিসেস বিশোয়াস বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। রঙীন প্রজাপতির মতো যে চঞ্চলভাব আজ এখানে এসেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করছিলাম তা হঠাৎ যেন অদৃশ্য হলো। ঝলমলে জামাকাপড় পরা এক বিমর্ষ রমণীমূর্তি আমার সামনে অসহায়ভাবে বসে আছেন।

মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তিনি যেন কিছু বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না।

"কিছু বলবেন?" আমি জানতে চাই।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "এই [illegible]দাপ্রসন্ন বাবুর ব্যাপারটা দেখেশুনে হঠাৎ [illegible] সম্বন্ধে আমার চিন্তা হচ্ছে, মিস্টার শংকর। বরদাপ্রসন্নবাবুর তো আপনজন কেউ ছিল না, কিন্তু কেমন সসম্মানে চলে গেলেন তিনি। এখন আমি ভাবছি আমার কথা। আমার কী হবে বলুন তো? আমার না আছে আপনজন, না আছে তেলকালি, কলকালি, সহদেবের মতো সহকর্মী। আমার লাইনে যারা আছে তাদের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি—তারা পরস্পরকে ঘেন্না করে চান্স পেলে হিংসের জ্বলে পুড়ে মরে, আমার দেহটা তারা কুকুর দিয়েও খাইয়ে দিতে পারে।"

"আঃ, মিসেস বিশোয়াস, কী সব বলছেন আপনি,' আমি ওকে সামলাবার চেষ্টা করলাম।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কী জানি ভাই, আমা[র] ভীষণ ভয় করছে। এখানেও কষ্ট, আবার মরার পরে[ও] আমাদের মতো মেয়ের জন্যে নরক যন্ত্রণা তো লেখা আছে।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "একটু [দে]খবা করবেন, মিস্টার শংকর।' যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যা[য়] পুলিসে যেন আমার বডিটা টানা-হেঁচড়া না-কর[ে]। আমার হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে এই কাগজের টুকর[ো] রইলো। আমি লিখে রাখছি, আমার কিছু হলে [যে]ন আপনাকেই বডি দিয়ে দেয়। আপনি যা ভাল বোঝে[ন] করবেন," এই বলে মিসেস বিশোয়াস রঙীন রুমা[লে] চোখের জল মুছতে লাগলেন। [ক্রমশ

ময়না তদন্ত নিখিলচন্দ্র সরকার

আজ সকাল থেকেই এলোমেলো বাতাস। তার সঙ্গে বৃষ্টি। কখনো মুষলধারে। কখনো বা ঢিমে-তালে। বাতাস মাঝে মাঝে লাট্টুর মতন পাক খাচ্ছে। যেন কি এক নেশা করেছে। আর সেই নেশায় দেখতে দেখতে বেপরোয়া, দুরন্ত হয়ে উঠছে। থেকে থেকে আকাশ ফাটিয়ে বাজ পড়ে। বিদ্যুৎ চমকায়। নদী আজ উথাল-পাথাল। ঢেউয়ের সাঁ সাঁ ডাক। জলের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে। খেয়া বন্ধ। যারা আশায় আশায় খেয়াঘাটে এসেছিল, তারা অনেকেই অপেক্ষা করে করে এক সময় ঘরে ফিরে গেছে। এমন দিনে কে আর নৌকো ছাড়ে। কার এত বুকের পাটা! নোনা হাওয়া গায়ে কামড় বসিয়ে পালিয়ে যায়। আবছা কালচে অন্ধকারে সব যেন ঢাকাঢুকি।

এমনি করেই ভাঁটা শেষ হয়েছে। জোয়ারের শুরু। দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা সামান্য ধরেছিল। আকাশের মেঘও সামান্য পাতলা হয়েছিল। চটকা হাওয়া পাক খেতে খেতে সাঁ সাঁ শব্দে চলে যাচ্ছে। মাতলামো ক্রমশই বাড়ছে। ধূসর মেঘ উড়ে উড়ে যাচ্ছিল।

খেয়াঘাটে বেশ কয়েকটা পান-বিড়ি-চায়ের দোকান। সব খোলেনি। সুদর্শন হাতী খানিকক্ষণ দোকান খোলা রেখেছিল। দিনের মেজাজ বুঝে, সেও ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। সুরেন কামিলার দোকানটা তখনো খোলা। ও এখানেই থাকে। দোকানের ঝাঁপ অনেকখানি টানা। চটকা বাতাস বেড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। নদী যেন ফুঁসছে। দেখতে দেখতে নদীর চেহারা আবার বদলে যাচ্ছে। পেটের টানে তখনো বাইরে কেউ কেউ ঘুরে মরছে। মাছটাছ ধরছে। নদীর ধারে কাছে একটা গাঙচিলও নেই। একটা কাদাখোঁচাও চোখে পড়ছে না। বাবলার ডালে কাক ভিজছে।

যুধিষ্ঠির এ ঘাটের বুড়ো অভিজ্ঞ মাঝি। সেও অনেকক্ষণ ধরে এখানেই ঘোরাঘুরি করছে। ঘরে যেতে মন চায় না। ভানুমতীর কথায় আজকাল জ্বালা ধরে। সোহাগের কথা ও আজ একেবারেই ভুলে গেছে। ঘরে অভাব আর অভাব। মাঝে মাঝে বাইরে এসে নদীটা দেখে। আকাশের দিকে তাকায়। বাতাসের মর্জি বোঝার চেষ্টা করে। আবার সুরেনের দোকানে এসে বসে। বিড়ি ধরায়। চা খায়। কথায় কথায় সুখ দুঃখের নানা গপ্প করে। চোখে ঘোর।

এরই মধ্যে ঝাঁপ ঠেলে ভেতরে একজন লোক ঢুকল। গুণধর রানা। ছাতাটা বন্ধ করে সে এক-পাশে ওটা রেখে দিল। অনেকটা ভিজে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ হাত মুছল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি একটা গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। যুঁইফুলের গন্ধ। ধুতিটা হাঁটু অব্দি ওঠানো। সুরেনকে ভাল করে একটা চা করতে বলল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে মিটিমিটি হাসি। সে ওকে চেনে।

গুণধর বসল। তাকাল একবার। এতক্ষণ সে খেয়ালই করেনি। চোখ দুটো তার খুশিতে ভরে উঠল। মনে মনে সে যেন যুধিষ্ঠিরকেই খুঁজছিল। উৎসাহ বোধ করল। সিগারেট ধরাল গুণধর। যুধিষ্ঠিরের দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল। সুরেনকে আরো একটা চা করতে বলল। পরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে গুণধর বলল, 'তুমার কথাই ভাবতিছি যুধিষ্টিদা।'

যুধিষ্ঠির ফুঁক ফুঁক সিগারেট টানে। গামছাটা সে আরো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলে, 'সকালথে বোটঘাট বন্ধ। আইজ আর পারিতে পারবানি।'

মুহূর্তে গুণধরের মুখের ওপর থেকে উৎসাহটা মুছে যায়। ওর মন খারাপ হয়। মনে মনে খানিকক্ষণ ও কি যেন ভাবে। সিগারেটের টুকরোটা দু-আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের চোখে চোখে একবার তাকাল। সুরেন চায়ের গ্লাস বাড়িয়ে দেয়। গ্লাসটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল গুণধর। পরে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তুমার ভরসাতেই যে আইলি গো যুধিষ্টিদা। তুমি হাইল ধরলে ঝড়টড় কুনখুঁআ পালিবে।' কতবার ত আমানুকে ঝড়টড়েই লিয়াসুস।

যুধিষ্ঠির মুখ টিপে হাসে। চা খায়। সিগারেটের টুকরোয় মাঝে মাঝে জোরে জোরে টান মারে। এসব কথা মনের মধ্যে আজো যেন কি-রকম এক সুখ ছড়ায়। শুনতেও ভাল লাগে। মুহূর্তে কত কি তার মনে পড়ে। অন্যমনস্ক হয়। কপালে ভাঁজ পড়ে। কথাটা তো আর মিথ্যে নয়। হাতের মুঠোয় যতক্ষণ তার হাল ধরা থাকে ততক্ষণ সে অন্য মানুষ। বিপদ-আপদ ঝড়ঝাপ্টা কি তার ওপর দিয়ে কম গেছে! সেই ছেলেবেলা থেকেই বাপের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় নৌকোয় তার দিন কেটেছে। তার বাপও ছিল এ-ঘাটের ডাকসাইটে মাঝি। হাতে ধরে ধরে তার বাপ তাকে সব শিখিয়েছে। জল চিনিয়েছে। বাতাস বুঝতে শিখিয়েছে। আরো কত কি! জলের রহস্য কি আর কিছু কম! বাতাসের ভেতরেও কত জাদু। এমনি করেই তার চোখ-কান একটু একটু করে ধারাল হয়েছে। জলের রঙ দেখে সে বুঝতে পারে ঝড়টা আর কত দূরে আছে, বাতাসের গন্ধেও ঝড়ের আবছা চেহারাটা সে মনে মনে অনেকটা অনুমান করে নিতে পারে। কোন্ বাতাসটা ছাড়তে হবে, কোন ঢেউটা সামাল দিতে হবে, কোথায় চোরা স্রোত, কোথায় ঘূর্ণি, এ সবই কষ্ট করে বুঝতে হয়েছে। তবু কি তার বোঝা শেষ হয়েছে! নিজের মধ্যে এখনও কত সময় সংশয় উঁকি মারে। এরপরেও দুম করে অনেক সময় নতুন নতুন বিপদ এসে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। মাথা ঠান্ডা রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে সেই বিপদ সে কাটিয়েছে। একবার তো মাঝগাঙেই নৌকার পালটা ফট ফট করে ছিঁড়ে গেল। মুহূর্তে নৌকো প্রায় উল্টোয় আর কি। যাত্রীদের ভেতরে কান্নাকাটি, বিলাপ। কয়েকটা পাক খেয়ে নৌকো আবার বশে এল। এমনি করেই একটু একটু করে সে পাকা অভিজ্ঞ মাঝি হয়েছে। ঝড়টড় তখন সে আর গ্রাহ্য করে না। কতবারই তো সে বড় বড় ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। তুফানের মধ্যেই নৌকো ছেড়েছে। এই নদী জল আকাশ বাতাস ঝড় যেন তখন তার কাছে অন্য এক নেশা। বয়েসটাও তখন কম। দেহে মনে যৌবনের জোয়ার। বুক টান টান। চোখের ঘোর। দুরন্ত সাহস।

সে-সব দিনের কথা মনে হলে আজো যেন যুধিষ্ঠিরের ভেতরটা অবশ অবশ লাগে। এক ধরনের কষ্ট জমে থাকে বুকের চারপাশে। সবে তখন সে বিয়ে করেছে। ঘরে টাটকা ডাগর ডোগর বউ। নাম ভানুমতী। বউয়ের গায়ে কোরা কাপড়ের মতন একটা মিষ্টি মিষ্টি, নেশা নেশা গন্ধ। সেই গন্ধও তাকে ঘরে আটকে রাখতে পারত না। জলের নেশা কি আর সোজা নেশা! তারপর একটা একটা বছর তার জীবন থেকে কখন টুপ টুপ করে ঝরে গেছে। ঘরে এখন একগাণ্ডা ছেলেমেয়ে।

সব সময়ই চোখাচোখি। ভানুমতীও সুযোগ পেলেই কথার হুল ফোটায়। এখন তার বয়েস হয়েছে। উদ্যমও আগের মতন আর নেই। ঘোর কেটেছে। আর যেন পারে না। চোখে ভাল দেখে না। কানও আগের মতন আর তত সজাগ নয়। ধার কমে গেছে। সব শব্দও সে বুঝতে পারে না। গোল-মাল হয়ে যায়। জলের রঙ দেখেও ঝড়ের সঠিক চেহারাটা অনুমান করতে আজকাল মাঝে মাঝে তার ভুল হয়। শরীরেও নানা উপসর্গ, অস্বস্তি। প্রায়ই জ্বরজ্বারি হয়। সামান্য পরিশ্রমেই আজকাল কাহিল হয়ে পড়ে। দম পায় না। হাঁপ ধরে যায়। হজমটজমেও গণ্ডগোল। এসব কাজ তার আর ভাল লাগে না। এবার ছেড়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচে। কিন্তু উপায় নেই। পেটের টান যে বড় টান। ঘরে বউ, ছেলেমেয়ে। ওরা তো আর তাকে ছাড়বে না। দুদিন যদি সে পড়ে থাকে, তাহলে অন্ধকার। একেবারে উপোস। তখন তার কথাটা কেউ একবার ভাবে না। কিন্তু পরক্ষণই আবার মনে হয়েছে, এ কাজ ছেড়ে দিয়েই বা সে অন্য আর কি কাজ করবে! সারা জীবন ধরে তো সে এই শিখেছে। ঝড় হোক, জল হোক, লোক পারাপার করাই তো তার জীবিকা, জীবন। এই বোটঘাটেই তার যৌবন কখন একদিন ফুরিয়ে গেল। কত লোকই তো তার চোখের ওপর দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে গেল। এই গুণো জানারই কি আর অবস্থা ছিল একদিন! দুবেলা পেটভরে খেতেও পারত না। গুণোর বাপ তো বউ ছেলেকে খাওয়াতে না পেরে এক মহাজনের ঘরে ওদের বন্ধক রেখে কোথায় বিবাগী হয়ে গেল। আর সেই অভাগা ছেলেটাই আজ রাতারাতি কত কি করে ফেলল! সব কেমন ভেল্কিবাজির মতন মনে হয়। পুরুষের ভাগ্য নাকি এরকমই। এখন গুণো মস্ত ধনী। তার সব অতীত মুছে গেছে। এখন তার খাতিরই আলাদা। তার নৌকোয় চড়েই না ও কতবার এপার-ওপার করেছে! এখন কাকদ্বীপে ও বিরাট পাকাবাড়ি করেছে। এই লাট অঞ্চলে ওর অনেক জমিজমা। আগে বিড়ি খেত। এখন সিগারেট খায়। গায়ে ভাল দামী জামাকাপড়। হাতে অনেকগুলো সোনার আংটি। এখন ওকে সমীহ করে কথা বলতে হয়। ও কি করে এত-টাকাপয়সা করল, যুধিষ্ঠির বুঝতে পারে না। অনেক রকমের ব্যবসা আছে ওর। কাকদ্বীপ বাজারে ওর এখন বিরাট এক ওষুধের দোকান। আসলে টাকা রোজগারের গোপন কিছু পথটথ ও জেনে গেছে। সেও যদি এরকম কিছু একটা পেত! ও এখনো মাঝে মাঝে এখানে আসে। ফুল-ডুবির বলাই দাসের ডবকা বউটাকে ও রেখেছে। বলাই দাসের মাথাটাই একদিন খারাপ হয়ে গেল। ও যে কোথায় উধাও হয়ে গেল কেউ জানে না। গুণোর সঙ্গে নাকি বউটার অনেকদিনের পীরিত। মেয়েছেলে রাখা কি আর চাট্টিখানি কথা। ওর এখন অনেক পয়সা। পয়সা থাকলেই মেয়েছেলে নিয়ে এরকম ফুর্তি করা যায়। বউটার খাওয়া-পরার দুর্ভাবনাও গেছে। শুধু গুণধর! এমনি আরো কত। ক'জনের আর সে নাম করবে।

অথচ সে যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে আছে। বরং আরো খারাপ হয়েছে। ঘরের অভাব অশান্তি কলহ দিন দিন বেড়েছে। কিন্তু মনটাকে সে কিছুতেই স্বার্থপর, শক্ত, নোংরা করতে পারেনি। লোকের বিপদের সুযোগ সে কখনো নিতে পারেনি। নিতে চায় না। নিরাপদ জায়গায় লোক পেঁছে দেওয়াই যে তার কাজ! মুখ ফুটে কারো কাছে সে কিছু চাইতে পারে না। একবার এই গুণো জানাই তো তাকে এসে খুব করে ধরেছিল। সেদিনও এরকমই দুর্যোগ। খেয়া বন্ধ। ওপারে পেঁছে দেওয়ার জন্যে ওর কত কাকুতি-মিনতি। গুণোর সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল। অনেক টাকার মাল-পত্তর। ওপারে পেঁছে না দিলে খুব নাকি ক্ষতি হয়ে যাবে। কি আর সে করে! তার মন সায় দেয় না। তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে ওদের পেঁছে দিয়েছে। এসব কথা কি এখন আর ওর মনে আছে! এমনি আরো কতজনের [illegible]। খুশি হয়ে যা দিয়েছে, তাই সে নিয়েছে।

দেখতে দেখতে চোখের ওপর কত কি বদলে গেল। নদীটা সরতে সরতে অনেক দূরে সরে এসেছে। এখন জোয়ারের জলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয়। নদীর বুকে চর। ভাঁটার সময় কাক-দ্বীপের ওখানে বিরাট চড়া জেগে ওঠে। খালে নৌকো নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকে না। খেয়া-ঘাটও অনেকখানি ভেতরে সরে এসেছে। কচুবেড়ে ঘাটের আগের চেহারা আর নেই। নদীর পাড় ভাঙছে। এখানে এখন রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে। দ্বীপের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বাস চলে। এ-ঘাটে লঞ্চ চালু হয়েছে। নৌকোয় আর সহজে লোক উঠতে চায় না। এতে অনেকেই মার খাচ্ছে আজকাল। ব্যাপারীরা এখানে ঘন ঘন আনাগোনা করছে। এ জায়গার ওপর ওদের লোভ পড়েছে। এখানকার ফসল-টসল ব্যাপারীরা চট করে ওপারে নিয়ে চলে যায়। আগে আগে এখানে কত মানুষ মুখ হয়েছে। এখন ওসব তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আজকাল কত নতুন নতুন লোকজন এখানে আসছে, যাচ্ছে। কাউকেই সে চেনে না। আগে একটা নতুন মুখ দেখলে বুঝতে পারত। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সব খবরাখবর জানতে পারত। এখন আর তার উপায় নেই।

এসব ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে যুধিষ্ঠিরের। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ চোখে একবার তাকাল সে। ঠোঁটের কোণে ম্লান এক-চিলতে হাসি। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিল। সিগারেটের টুকরোটা টানল বারকয়েক। অনেক ছোট হয়ে এসেছে। টুকরোটা ফেলে দিল এবার। গামছা দিয়ে মুখটা মুছে নিতে নিতে সামান্য বিমর্ষ গলায় যুধিষ্ঠির বলল, 'অখন আর সাহস পাই নি। ওসব ন্যাশা ভালও নয়।' একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল ও। খানিক পরে আবার বলল, 'এই দেখ না, আর বছর, হঁ, অ্যামন দিনেই ত একটা নৌকাডুবি হইল। দশ-পনরটা লোকও মরল।' বলতে বলতে যুধিষ্ঠির চায়ের গ্লাসটা রেখে দিল একপাশে। শীত করছিল তার। গামছাটা আবার টেনেটুনে নিল।

গুণধর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আইজকার নাই পারিলেই নয় যুধিষ্টিদা। নাহিলে কি আর এরকম দিনে ঘরের সুখ ছাড়া কে বারায়!' ওর চোখে-মুখে গলার স্বরে এক ধরনের অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা।

যুধিষ্ঠির ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, বলল, 'আমার তততাউ অবাক লাগেঠে।'

'সে ত বুঝলি, কিন্তু যাব কি করা্যা!'.. ওকে সামান্য বিমর্ষ, চিন্তিত দেখায়।

গুণধর মাথা নাড়ে। যুধিষ্ঠির খানিকটা নরম হয়েছে বুঝতে পেরে সে হেসে ফেলল। কি যেন ভাবল একটু সময়। গলায় সামান্য জোর দিয়ে ফের সে বলল, 'তা জানি না। তুমি যা লুব, তাউ দুব।'

যুধিষ্ঠির ওর মুখের দিকে তাকায়।

গুণধর আগের কথার জের টেনে আবারো বলল, 'হঁ গো যুধিষ্টিদা, তুমি কি লুব, কও।'

যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকে। সামান্য যেন বিব্রত বোধ করে। কত সে চাইতে পারে! এসব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বড় কম। কিছু চাইতে গেলেই তার এক ধরনের আড়ষ্টতা। সঙ্কোচ। বাপের কথাটা মনে পড়ে যেত। তার আর সাহস হত না। বাপ বলত : তকে ত হাত ধর‍্যা বেবাক শিখিলি।' একটা কথা মনে রাখবু, কুনদিন লোকের বিপদ আপদের সুযোগ লুবু নি। তাহিলে মা গঙ্গা তকে ছাড়বে নি। হঁ। গাঙের রাগ বড় রাগ রে।

সংসারের ঘা খেয়ে খেয়ে মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠির কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে। ছটফট করে। তবু বাপের কথাটা সে আজো অমান্য করেনি। গুণো জানা কি আজ তাকে লোভ দেখাচ্ছে? ও কি পুরনো দিনগুলোর কথা সব ভুলে গেছে? আজ না হয় ওর পয়সা হয়েছে। এরকম ঝড়জলের দিনে কতসময়ই তো সে ওদের কথা রেখেছে। কে আর কত দিয়ে

ফেলেছে তাকে। মাঝে মাঝে আজকাল তার খুব রাগ হয়। নিজের জন্যে সে খুব একটা ভাবে না। বউ ছেলেমেয়ের কথা ভেবেই কখনো সখনো এরকম বিপদের ঝুঁকি সে নিয়েছে। নিতে হয়েছে। ভানুমতী আবার এসব জানতে পারলে খুব রাগারাগি করে। অভিমানে ঠোঁট ফোলায়। এরকম পয়সা ও চায় না। মানুষটাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে ওরও বুক কাঁপে। ও আগে এমন ছিল না। অভাবে অভাবে মাথাটাই যেন ওর কিরকম হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির আবেগ বোধ করে। কিন্তু কি করবে। অনেক সময় এ ছাড়া আর কোন উপায়ও থাকে না তার। সেও জানে, এরকম করতে গিয়ে একদিন যে-কোন বিপদে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু ঘরের কথা মনে হলে তারও বুকটা ফেটে যায়। দুঃখে বেদনায় ভেতরটা টনটন করে। সে বউ ছেলেমেয়েকে পেট-ভরে দুবেলা দু মুঠো খাওয়াতে পারে না, এর চেয়ে অক্ষমতা আর কি। ওদের সামান্য আবদারটাও সে রাখতে পারে না। কেমন পুরুষ সে। মাঝে মাঝে নিজের ওপরই ধিক্কার জন্মে। এরকম বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। বউয়ের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে। সেলাই করে করে পরছে। আর পারছে না। ভানুমতী অনেকদিন মনে করিয়ে দিয়েছে। এখন আর করায় না। যুধিষ্ঠির বউয়ের দিকে তাকাতে পারে না। কটা টাকা হলেই সে ওর একটা শাড়ি আনবে আগে। অনেকদিন ধরেই সে এটা ভেবে রেখেছে। তা আর হয়ে উঠছে না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এসব কথা মনে হলে দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। টনটন করে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। ওরা যেন তার জন্যেই এত কষ্টে আছে। লোকের বিপদ তো তার কি। এসবের সুযোগ না নিয়ে সে এমন কি পুণ্যি করছে। তার বাবা তাকে ভুল শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে তার মন ভীষণ খিঁচড়ে যায়। রুক্ষ, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। টাকার মুখ দেখতে হলে মনটাকে এত নরম রাখলে চলে না। সবই সে বোঝে। বুঝেও কিছুই করতে পারে না। এই অক্ষম আক্রোশ ওকে যেন আরো অসহায় করে তোলে।

যুধিষ্ঠির মনে মনে কি যেন একটা ভেবে নিল। মুখের ওপর এক টুকরো হাসি টেনে বলল, 'কি দুব কও শুনি।'

'তুমিই কও না যুষ্টিদা।'

'না, তুমি কও।' গলার স্বর নরম। সামান্য কুণ্ঠিত ভঙ্গি।

গুণধর চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। মনে মনে কি একটা হিসেব করল। পরে সিগারেটের টুকরোটায় কটা টান মেরে হাসি মুখ করে বলল, 'যাও। কুড়িটা টাকা পাব।'

যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। সে ভেবেছিল, গুণা হয়ত আরো কিছু বেশী বলবে। এতে তার মন ঠিক ভরল না। এরকম দিনে ডিঙি নিয়ে যাওয়াটা কি সোজা ব্যাপার! কত ধকল। কত ভয়। প্রতিটি মুহূর্ত চোখ-কান সজাগ রেখে চলা। সে জানে, আর একটু চাপ দিলে গুণা আরো বেশী দেবে। ওপারে যাওয়াটা ওর কাছে আরো বেশী জরুরী। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছু বলতে পারল না। খানিক পরে সে শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'বাতাসটা একটু থমথমিয়া হইতে দও।'

কি ভেবে যুধিষ্ঠির ঝাঁপ ঠেলে বাইরে এল। আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে মেঘে ঠাসা। আরো যেন কালচে দেখাচ্ছে। বাতাসের গোঁ-গোঁ কাতরানি। সত্যি, এরকম দিনে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। কিন্তু উপায় কি! এদিকে তার হাতে যে একটা পয়সাও নেই। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতেও তার মন চাইছে না। মুহূর্তে ভানুমতীর করুণ, দুঃস্থ মুখটা মনে পড়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলোর সামান্য একটা সাধও তো সে পূর্ণ করতে পারে না। বাপ হয়ে তারও কষ্ট কি কম। বুকের ভেতরে অনেক দুঃখ, চাপা যন্ত্রণা।

যুধিষ্ঠির আরো ক-পা এগিয়ে গেল। নদীর জল ফুলছে, ফোঁস ফোঁস শব্দ। সামনের দিকে তাকায় ও। চোখের কোলে কি এক রহস্য উঁকি মারে। জলের দিকে একদৃষ্টে সে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে, আবার পারেও না। কান খাড়া করে বাতাসের গোঙানি শোনে। কি যেন, ওই জানে। কেন যেন তার অস্বস্তি বাড়ে। মুখের ওপর আতঙ্কের ছায়া। তবু মনে মনে সে ঠিক করে নিল, এর মধ্যেই বেরোবে। ভাবতে ভাবতে কাকে যেন খুঁজতে গেল। একজন দাঁড়ী না হলে সে কি করে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল। সঙ্গে গোষ্ঠ। অনেক বলে টলে ওকে রাজী করিয়েছে। এই ঝড়জলের মধ্যেই ওরা দুজনে কাদা ঠেলে খালের কাছে এল। একটা ডিঙি টেনে নিয়ে এসে ঘাটের কাছাকাছি রাখল। দমকা হাওয়া বুঝি ডিঙিটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ভীষণ দোল খাচ্ছে। নদীতে ডিঙি ডোঙা কিছু নেই। মোটা কাছিকাছা ছিঁড়ে যায় যেন। ডিঙিটা নোঙর করা। যুধিষ্ঠির গোষ্টকে বলল, 'ছুগসাটা চাপি দে রে।'

গোষ্ঠ হোগলার একটা ছই করে ছিল। ডিঙিটা ঠিক ঠাক করে ওরা ওপরে উঠে এল। কলের জলে পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। দৌড়ে সুরেনের দোকানে এল। একেবারে ভিজে গেছে। গামছা দিয়ে গা মাথা মুছল। চায়ের কথা বলে ওরা বিড়ি ধরাল। যুধিষ্ঠির গুণধরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'ডিঙি লিয়াসসি ঘাটে। আকাশটা আর একটু দেখি।'

গুণধর খুশি হল। চায়ের দাম ওই দিয়ে দিল।

ঘরে তখন আরো একজন লোক বসে আছে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। যুধিষ্ঠির চিনতে পারল। থানার বড়বাবু। মাস ছ-সাত হয় এখানে এসেছে। খুব রাগী, কড়া মেজাজের লোক। নাম সত্যেশ্বর হাজরা। এরই মধ্যে ওঁর দাপটের পরিচয় অনেকেই পেয়েছে। যুধিষ্ঠির মাথাটা অনেকখানি নিচু করে প্রণাম করল। বিনীত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবু কাই যাব?'

'বুঝতেই তো পারছ মাঝি।'

যুধিষ্ঠির সামান্যক্ষণ নীরব থেকে আবার জিজ্ঞেস করে, 'থানার নৌকার কি হইল বাবু?'

'মাঝির মেয়ের নাকি খুব অসুখ। খবর পেয়েই ও বাড়ি চলে গেছে।'

যুধিষ্ঠির সহাস্যে মাথা নাড়ে, 'ও।'

সত্যেশ্বর তেরছা চোখে চেয়ে শুধোলেন, 'কি, যাবে নাকি?'

যুধিষ্ঠির হাসি হাসি মুখ করে বিনম্র ভঙ্গিতে বলল, 'আপনামনে যাবার সাজা করসে, হ্যাঁ বাবু, যাব।'

গুণধর মুচকি হাসে, বলে, 'আমরা যাবার তরেই ত আসসি গো যুষ্টিদা।'

সত্যেশ্বরবাবু এবার গুণধরের মুখের দিকে তাকালেন। হাসলেন কি ভেবে। বললেন, 'জানাবাবুর আবার এই ঝড় মাথায় নিয়ে ওপারে যাওয়ার কি হলো?'

গুণধর কি ভেবে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে সত্যেশ্বরবাবুর দিকে এগিয়ে দেয়। হাত কচলায়। চোখ পিট পিট করে। পরে নরম গলায় বলে, 'ওপারেই ত আমার ঘর সংসার বড়বাবু।'

সত্যেশ্বরবাবু একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধরালেন। প্যাকেটটা আবার ওর হাতে তিনি ফিরিয়ে দিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে একসময় বললেন, 'তা জানি, তবে এপারের টানও তো কিছু কম নয়। হাঁ হাঁ.... আপনি মশায় বেশ আছেন।'

'হেঁ হেঁ, আপনি ত সবই জানেন দেখছি বড়বাবু।'

'হ্যাঁ—, আমাদের তো সব খবরই কিছু কিছু রাখতে হয়।' সত্যেশ্বরবাবু সিগারেট টানতে টানতে ভুরু কোঁচকান। কি যেন ভাবেন। গুণধর জানার মুখের ওপর দৃষ্টিটা স্থির রাখতে রাখতে তিনি বললেন, 'আপনার ব্যবসাপত্তর কিরকম চলছে বলুন।'

গুণধরের মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই আবার সামলে নিয়েছে নিজেকে। একটা ঢোক গিলে ও ভীষণ অনুগত ভঙ্গিতে বলল, 'হেঁ হেঁ, তা আপনাদের দয়ায় মন্দ নয় বড়বাবু।'

'থাক, আর বিনয়ের দরকার নেই। চলুন এক-সঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

সত্যেশ্বরবাবু এবার যুধিষ্ঠিরের দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন, 'কি হে মাঝি, আর কত দেরি করবে? এইবেলা নৌকো ছাড়। এখনো সামান্য আলো আছে, পরে তাও যে আর থাকবে না।'

'হ্যাঁ হ, তুমানে সব চলা আস বাবু।' বলে যুধিষ্ঠির গোষ্ঠকে একটা ঠেলা মারল। চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা তাড়াতাড়ি করে রেখে দিয়ে উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। নিচে নামতে নামতে গোষ্ঠ হাঁক পাড়ল, 'হেঁই কাকদ্বীপ কাকদ্বীপ, ছাড়িয়াল, কে যাব চলা আইস।' বাইরে তখনো বৃষ্টির কুঁচি উড়ছে। তখনো পাতলা মরা মরা আলো ছাড়া ছাড়া হয়ে পড়ে আছে।

এমন সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে আরো একজন খেয়াঘাটে এল। গায়ে প্লাস্টিকের রেন-কোট। মাথায় টুপি। এসেই টুপিটা খুলে ফেলল। মাথা ভিজে গেছে। রেন-কোটও খুলল। জল ঝরছে ওটার গা বেয়ে। রুমাল দিয়ে মুখ মাথা মুছল। শীর্ণ চেহারা। চোখে ভারী চশমা। চশমার কাচে রেণু রেণু বৃষ্টির দানা। মাথায় চুল কাঁচা পাকা। একটু উস্ক-খুস্ক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মোটা গোঁফ। পরনে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি আর পাজামা। পাজামা পায়ের কাছে ভাঁজ করা। চশমাটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করল।

সত্যেশ্বরবাবু লোকটার দিকে তাকালেন। দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। লোকটার চোখদুটো বড় উজ্জ্বল। মুখের ওপর লেখাপড়া জানার একটা ছাপ আছে। মনে মনে তিনি কি যেন ভাবলেন। আজকাল এখানে নতুন নতুন কিছু পলিটিক্যাল লোকের আনাগোনা বেড়েছে। এরকম একটা গোপন খবর তাঁর কাছে আছে। এদের নিয়েই আসলে ঝামেলা। একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। আলাপ করতে দোষ কি। সত্যেশ্বরবাবু লোকটার দিকে অপলকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'আপনার পাঞ্জাবিটাও তো অনেকখানি ভিজে গেছে।'

লোকটি একবার চেয়েই চোখ সরিয়ে নেয়। নির্বিকার ঢংয়ে বলে, 'আর বলেন কেন।'

সত্যেশ্বরবাবু তখনো ওর দিকে চেয়ে আছেন। খুঁটিয়ে তিনি কি যেন দেখছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, এরকমই একজন লোককে কোথায় যেন তিনি দেখেছেন। মনে মনে অনেক হাতড়ে বেড়ালেন তিনি। কোথায়, কোথায়? তবু যেন স্পষ্ট করে কিছু পেলেন না। আরো একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে তিনি বললেন, 'আপনিও কি ওপারের যাত্রী?'

'সেরকমই তো ইচ্ছে।' নির্লিপ্ত ভঙ্গি।

গুণধর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো, কিছু একটা বলা দরকার। লোকটাকে দেখতে দেখতে সেও বলল, 'ভালই হয়েছে আমাদের আরো একজন বাড়ল।'

সত্যেশ্বরবাবু বললেন, 'আর একটু দেরি করলেই নৌকোটা আর পেতেন না।' 'না পেলে খুব ক্ষতি হত। এ ভালই হয়েছে।' লোকটি কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল। চুরুটটা ধরাতে গিয়ে অনেক কটা কাঠি খরচ করতে হলো তাকে। একটু শীত শীত করছিল যেন। কড়া করে এক গ্লাস চা দিতে বলল।

সত্যেশ্বরবাবুর মনে তখনো সন্দেহ। তিনি বাইরে একটা অকপট সারল্যের ভান করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

লোকটি চুরুটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে ওঁর কৌতূহল দেখে হাসল সামান্য। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কে যে কখন কোথায় থাকবে, তা কি আর কেউ বলতে পারে।' গলার স্বরে এক ধরনের হেঁয়ালি।

'সে তো অনেক উচ্চমার্গের কথা।' সত্যেশ্বর-বাবু মুচকি হাসলেন। তিনিও বুঝলেন, লোকটি তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইছে। তিনি চুপ করে থাকলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির ফের হাঁক মারল, 'কাই গো অন্যমনে, তুমাহেল আর দেরি করনি, চলো আইস।'

'চলুন, আর দেরি নয়।' সন্তোষবরবাবু তখনো যেন হাল ছাড়তে নারাজ।

'চা-টা খেয়ে নিই আগে।'

'চলুন তাহলে বড়বাবু।' গণেশর ছাতা ফুটিয়ে বাইরে এল।

সন্তোষবরবাবু ছাতা মেললেন। বাতাসের ধার তখনো কিছু কম নয়। ছাতা উল্টে যায় আর কি। পা টিপে টিপে তিনি নেমে এলেন। গণেশরের কোন কষ্ট হলো না নামতে। এসব পথঘাট কাদাটাখা তার খুবই চেনা, অভ্যস্ত।

যুধিষ্ঠিরের হাতে এখন হাল। লোঙর তুলে ফেলেছে। এখুনি ডিঙি ছাড়বে। মনে মনে সে ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করে নিল। ওই লোকটা এবার তাড়াতাড়ি করে নেমে এল। যুধিষ্ঠির একবার তাকাল ওর দিকে। লোকটাকে সে এর আগেও কয়েকবার এখানে যাতায়াত করতে দেখেছে। মোটের ওপর এখানকার লোক নয়। কিন্তু এখানে ও কার কাছে আসে, কেন আসে, এসব কিছুই সে জানে না। জানতেও চায় না। জেনে তার কি লাভ। সে তো এখন অনেককেই চেনে না। তবে লোকগুলোর বুকের পাটা আছে। এই ঝড় মাথায় নিয়েও ওরা বেরিয়ে পড়েছে। সে ভেবে পায় না, হঠাৎ ওপারে ওদের এমন কি দরকার পড়ে গেল। কে জানে। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। তবে এতে তারই খানিকটা লাভ হয়েছে। দিনের মতিগতি এরকম না হলে কি কেউ আর এতগুলো টাকা এমনি এমনি দিত?

গোষ্ঠ সবে নৌকোটা একটু বাইরে ঠেলে দেওয়ার জন্যে হাত তুলেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে বছর চব্বিশ পঁচিশের একটা জোয়ান ছেলে ঘাটে এল। ও তখনো চিৎকার করছে, 'মাঝিদা দাঁড়াও, ছাড়নি, ছাড়নি।'

বুড়ো মাঝি অবাক হয়। এ আজ হলো কি! আর দেরি করা যায় না।

ছেলেটা ততক্ষণে নেমে এসেছে। জামাটামা ওর ভিজে গেছে। কেমন উদ্ভ্রান্তের মতন দেখাচ্ছে ওকে। চোখ বড় বড়। ও হাঁপাচ্ছিল। বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে মুখের ওপর একটা ভয় যেন থমকে আছে।

কি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না। সবাই একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে।

ছেলেটা একটু দম নিল। ওর চোখের দৃষ্টি তখনো খানিকটা ঘোলাটে। খানিক পরে থেমে থেমে ও বলল, 'আপনারা কি জানেন, এই একটু আগে এখানে একটা খুন হয়েছে।' 'খুন? কোথায়? কে খুন করেছে? কাকে খুন করেছে?' সবাই যেন চমকে ওঠে। মুখের ওপর আতংক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ খুন, নৃশংসভাবে খুন। ফুলডুবির বাঁশের সাঁকোটার ঠিক নিচে এই খানিকক্ষণ আগে একটা ছেলে খুন হয়েছে। কেন, আপনারা কি কোন চিৎকার টিৎকার শোনেননি?' ও একটু বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে থাকে। 'নাঃ।' গলার স্বরগুলো কেমন জড়া-জড়ি হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির মুহূর্তের জন্যে অনামনস্ক হয়। তার চোখে মুখেও ভয়। ভয় গোষ্ঠরও। বুকের ভেতরটা তার ধড়াস ধড়াস করে। মা গো, কে আবার এরকম করা খুন হঠে? যদি তার চেনা হয়? মাথাটা কেমন একটু ঝিম ঝিম করে গোষ্ঠর।

যুধিষ্ঠির বড় বড় চোখ করে তাকায় ছেলেটার দিকে। কি একটা কথা মনে করতে করতে ও বলল, 'হ', গটে চিৎকার একবার কানে আইল বটে, কিন্তু আর কিছু শুনতে পাইলি নি। দমকা হাওয়ায় আর কিছু বুঝা গেল নি।' কথা বলতে বলতে ও ছেলেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ছেলেটাকে তার চেনা লাগছে। ঘোটঘাটে অনেকবারই দেখেছে। এখানকারই ছেলে। তবে কোন গাঁয়ে বাড়ি, কার ঘরের ছেলে এসব কিছু সে জানে না। হাঁ, সেও একটা চিৎকার খানিক আগে শুনেছে। ... তাহলে কোন ... হয়নি? কে খুন করতে পারে? এই লোকটাই বা কে? মানুষ চেনা কি আর সোজা ব্যাপার। খুনীও কি তার নৌকোয় করে পালাচ্ছে? এসব সাত-পাঁচ ভাবনা খালি মনের মধ্যে উঁকি মারছে। তার অস্বস্তি হয়। সে খানিকক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারল না। সে এবার গোষ্ঠর দিকে তাকায়। একটু পরে ঘোর লাগা মানুষের মতন করে সে টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে, 'কিরে গোষ্ঠ, একবার দেখ্যা আসবু নাকি?'

গোষ্ঠর মুখ শুকিয়ে যায়। বুকের ভেতরটা তখনো তার ঠক ঠক করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুট গলায় ও বলল, 'না বাবা, আমি যাবনি, আমার খুব ভয় লাগছে।'

সন্তোষবরবাবু উসখুস করলেন একটু। এদিকে দিনের মেজাজ আরো রুক্ষ, রাগী কোন ছোকরার মতন উদ্ধত, অবিনীত। কপালে কি আছে কে জানে। কাল সকালেই কোর্টে তাঁর হাজিরা চাই। এও এক খুনের কেস। তাঁর সংগে জরুরী কিছু ফাইলপত্তর রয়েছে। তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আর দেরি করো না মাঝি। এবার নৌকো ছাড়।'

'হ' বাবু, এই ত ছাড়লি।'

গণেশরও তাড়া দেয়, 'হ', খালি খালি আর দেরি করঠ কেনি গো যুধিষ্টিদা। এবার নৌকা ছাড়্যা দাও।'

যুধিষ্ঠির বিড় বিড় করে বলল, 'কে খুন হইল, চিনা জানা কিনা, কুন জানতে পারলি না।' বলেই সে হালটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নৌকোর মুখ অন্যদিকে করল। চোখের পলকে নৌকোটা অনেকখানি বাইরে চলে এল। বাতাসের ক্ষ্যাপামি আরো বাড়ছে যেন। শব্দে কানে তালা লাগে। যুধিষ্ঠির ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ঢেউ কাটাচ্ছে। চোখ মুখের ভাব অন্য রকম। গোষ্ঠকে সে নির্দেশ দিল, 'লে, পাউলে হাত কর।'

গোষ্ঠও দ্রুত ভঙ্গিতে বলল, নাচকানিটা ধর।'

যুধিষ্ঠির হাল ঘোরাতে ঘোরাতে জোরে জোরে বলল, 'হিঁচাগুলা ঠিক করা বাঁধছু ত?'

'হ'।' গোষ্ঠও তাড়াতাড়ি করছে। তার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই।

'লে, মুড়া ছুপ।'

বাতাসে সব কথা বোঝা যায় না। শব্দগুলো মুখ থেকে পড়তে না পড়তেই ভেঙে ভেঙে যায়। নৌকোটা টাল খেয়ে ছুটতে লাগল। গোষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে এসে পালের দড়ি ধরে বসে থাকল।

যুধিষ্ঠির ওকে সাবধান করে দিল, 'দ্যাবান হাতে ধর্যা রাখবু। ঝুঁকা আছে।' বলতে বলতে চোখ দুটো কেন তার ঘোলা ঘোলা হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নৌকোটা টাল ... খেতে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ওঠা-নামা করছে। মাঝে মাঝে আবর্ত। সাঁ সাঁ বাতাস। ঝটকা, হাওয়া হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে নৌকোর ওপর। জলের দিকে তাকালে ভয় হয়। ঢেউ উঠছে, ভাঙছে। যুধিষ্ঠির শক্ত করে হালটা ধরে রাখে। জলের ওপর মলিন মুমূর্ষু আলোর একটা পোঁচ তখনো কোন রকমে লেগে আছে। তার মুখের ওপর এক ধরনের কষ্ট, যন্ত্রণা। খানিক পরে বিষণ্ণ গলায় যুধিষ্ঠির বলল, 'দ্যাখতে দ্যাখতে দিনকাল কত পাল্টি গেল বড়বাবু। আগু আগু দেখতি, কোন গাঁয়ে যদি একটা খুনটুন হইত ত তিন চারটিয়া গণ পুলিসের লোকে ঘেরা ফেলিত। রীতিমত বিচারটিচার হইত। খুন করা কো রেহাই পাইত নি তখন। আর অখন? কুত্তা-ছাগলের মতন লোকগুলাকে মারেঠে গো, তবু তার কুন বিচার নাই, আইজকাল এ কি অবস্থা হইল দেশের।'

গণেশর একটু নড়েচড়ে বসল। তার মুখের ওপর কতগুলো জটিল, হিজিবিজি রেখা ফুটে উঠল। চোখ দুটো চকচক করছে। ভেতরে ভেতরে তারও অস্বস্তি। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'খুনটা ত হইল, কিন্তু তুমানে কও ত লোকটা গেল কাই?' বলে সে ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। চোখে সন্দেহ।

সত্যেশ্বরবাবুও চেয়ে আছেন ছেলেটার দিকে তাঁর চোখেও একটা সন্দেহ ক্রমশই ভারী হতে থাকে। একটু গম্ভীর, রহস্যের গলায় তিনি বললেন, 'সেই তো কথা, খুন করে খুনী তো আর এখানে চুপচাপ বসে থাকবে না। নিশ্চয়ই পালাবে। আর পালাতে গেলে এই পথেই পালাবে।'

ছেলেটি অপ্রস্তুত। সে বুঝতে পারছে, তাকে এরা অন্য রকম চোখে দেখছে। তাকেই আবার খুনীটুনী ভাবছে না তো? তার গলা শুকিয়ে আসে।

এমন সময় চুরুট টানতে টানতে লোকটি তার কাঁধে হাত রাখে। ছেলেটি তাকায়। লোকটির মুখে মিটিমিটি হাসি। দৃষ্টি অপলক। চুরুটটা দাঁতে চেপে রেখেছে।

ছেলেটা এবার চমকে ওঠে। খানিকক্ষণ সেও ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'গণাদা না?'

'তাহলে ঠিকই চিনতে পেরেছ।' এবার হেসে ফেললেন গণপতিবাবু।

'আপনাকে যে এখানে দেখব, আমি তো ভাবতেই পারিনি।'

'আমিও প্রথমটায় তোমায় চিনতে পারিনি। তোমার নাম বিবেক না?'

হ্যাঁ, আমার নাম বিবেক।'

গণপতিবাবু হাসলেন সামান্য, বললেন, 'তোমাদের কথা আমার খুব মনে পড়ে বিবেক।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হন। মুখের ওপর মলিন ছায়া তির তির করে।

বিবেক স্বস্তি বোধ করে। তবু একজন চেনা লোক পাওয়া গেল। বুকে যেন তার বল এল। এই লোকগুলোর তাকানোর মধ্যেও এখন অনেকটা পরিচ্ছন্নভাব এসেছে।

নৌকোটা আবার একটা টাল খেল। একটা চটকা বাতাস হামলে পড়ল নৌকোর ওপর। যুধিষ্ঠির জোরে জোরে বলল, 'এই, দ্যাবান ঠিক কর্যা ধরা গোন্ট। সলাক দুবুনি একদম।' ঝড়ো হাওয়া শব্দগুলোকে লুফে নিয়ে চলে গেল। সাঁই সাঁই ডাক। জলের ভীষণ টান। শেষ আলোটাও যেন মুছে গেল। দূরের কিছু আর দেখা যায় না। সব কেমন ঘোলাটে। ছইয়ের মধ্যে ওরা চারজন। গণপতিবাবুর মুখের চুরুট নিবে গেছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার। মুখগুলো অস্পষ্ট। যুধিষ্ঠির এবার ভেতরের লোকগুলোকে উদ্দেশ করে বলল, 'বাবু, তুমানুকের একজন একটু বাউপ্‌রে উঠ্যা বস।'

গুণধর ওপরের দিকে সরে গেল। এরই মধ্যে সত্যেশ্বরবাবু সিগারেট ধরালেন। আগুনটা কখনো নিবু নিবু, কখনো জ্বলজ্বলে। সিগারেট টানতে টানতে সত্যেশ্বরবাবু একটা প্রশ্ন আবার ছুড়ে দিলেন, খুনীটা তাহলে পালাল কোনদিকে?'

বিবেক হাসল। নিজেকে সে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'আমি যদি বলি, খুনী এখানেই আছে!'

সত্যেশ্বরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বলেন কি?'

গুণধরের মুখটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। যুধিষ্ঠিরও চমকে উঠল। খুনী তাহলে এই নৌকোতেই আছে? বলে কি! কিন্তু কে সে? সব চিন্তাভাবনাগুলো যেন আউলাঝাউলা হয়ে যায়। কিছুই বুঝতে পারছে না। সকলের মুখের ওপরই কৌতূহল। সবাই চুপচাপ।

বিবেক খানিকক্ষণ পর স্পষ্ট গলায় সত্যেশ্বরবাবুর কথার জবাব দিল, 'আপনি বলুন না, কথাটা কি আমার মিথ্যে?'

সত্যেশ্বরবাবু উত্তেজিত হন। ঘন ঘন সিগারেটে তিনি টান দেন। অসহিষ্ণু গলায় তিনি বললেন, 'কি বলছেন যা তা?'

'ভাল করে একবার ভেবে দেখুন তো আপনি।'

সত্যেশ্বরবাবু ভীষণ চটে গেছেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন আমার সংগে?

বিবেক মোটেই রাগ করল না। শান্ত গলায় ও বলল, 'কেন, আমার কথাগুলো কি আপনার কাছে ঠাট্টার মতন শোনাচ্ছে?' হাসল ও।

'এসব হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট করে বলুন না, কি বলতে চান।' রাগে গলা তাঁর কাঁপছিল।

গুণধরও রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কি বলছেন, ভেবে বলছেন ত?'

'আমি ভেবেই বলছি।' বিবেক চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

নৌকোটা লাফাতে লাফাতে চলেছে। কখনো একটা ধার একেবারে কাত হয়ে পড়ছে, আবার সোজা হচ্ছে। একটা জায়গায় নৌকোটা কয়েকটা পাক খেয়ে গেল। হয়ত কোন চোরা টানায় পড়েছিল। গুণধর ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল।

বিবেক কি একটা ভাবতে ভাবতে বলল, 'আমি আপনাদের সকলকেই চিনি যে!'

সত্যেশ্বরবাবু অবাক হলেন একটু। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি চেনেন আমাকে?'

'চিনি সত্যেশ্বরবাবু। ভাল করেই চিনি। আপনি এখানে আসার আগে কলকাতার একটা থানার সেকেন্ড অফিসার ছিলেন, তাই না? প্রমোশন নিয়ে এখানে এসেছেন। অনেক আগেই তো আপনার পদোন্নতি হওয়া উচিত ছিল।' ওর গলায় সামান্য ঠাট্টা, খোঁচা ছিল।

'আপনি কি ওদিকেই থাকেন নাকি?'

'এক সময় থাকতাম। সেজন্যেই তো আপনাকে ভালো করে জানি।'

ওর এই হেঁয়ালির কথাবার্তা সত্যেশ্বরবাবুর ভাল লাগছিল না। তিনি সামান্য তপ্ত গলায় বললেন, 'বেশ তো, বলুন না কি বলতে চান।'

'আপনি তো আমাকেই খুনী বলে সন্দেহ করছিলেন, সেজন্যেই বললাম কথাটা।' গলায় কৌতুক।

'সন্দেহ তো নয়, বলছিলাম খুনীও এই পথ দিয়েই পালাবে।'

বিবেক হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনিই বলুন না সত্যেশ্বরবাবু, সব খুনীই কি আর সত্যি সত্যি পালায়?'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝার তো কিছু নেই, এ খুব সোজা সরল কথা।'

সত্যেশ্বরবাবু এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মশায় আমাকেই খুনীটুনী ঠাওরাচ্ছেন নাকি?'

বিবেক এবার গম্ভীর হলো। বলল, 'আপনিই বলুন না, এরকম ভাবাটা কি আমার খুবই অন্যায়?'

কথাটা খট করে তাঁর কানে লাগল। ছোকরা বলে কি। সাহস তো ওর কম নয়। সিগারেটের টুকরোটা তিনি ফেলে দিলেন। তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। এরকম কথা আজ পর্যন্ত বলতে কেউ সাহস করেনি। মনে মনে ছেলেটার ওপর তিনি ভীষণ চটে গেছেন। ঝাঁঝালো গলায় তিনি বললেন, 'আপনার মশায় মাথাফাতা খারাপ, তাই যা খুশি বলে যাচ্ছেন।'

বিবেকের মুখের ওপর ম্লান একটু হাসি। একটু চুপ করে স্পষ্ট গলায় ও বলল, 'মনে করুন তো, খুব বেশীদিনের কথা নয়। নিশ্চয়ই মনে আছে, মনে থাকারই কথা। আপনি, হ্যাঁ আপনি, একদিন ঠিক সন্ধ্যের মুখে কতগুলো ছেলেকে থানায় ধরে আনলেন। অনেক মারধর করলেন। জেরার পর জেরা। ঠিক সেদিনেরই ঘটনা। হ্যাঁ। তখন অনেক রাত হয়েছে। ছেলেগুলোকে আবার টেনে আনলেন। একটা ভ্যান তখন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ইশারায় কি কথা বললেন আপনারা। মনে পড়ছে সত্যেশ্বরবাবু? ছেলেগুলোকে ভ্যানে পুরলেন। ওরা নিরস্ত্র। আর আপনারা কয়েকজন সশস্ত্র লোক রাস্তাঘাট ফাঁকা। মাঝে মধ্যে দু-একটা ট্রাক যাচ্ছে। হঠাৎ ভ্যানটা একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। আপনাদের চোখে মুখে তখন এক আদিম উল্লাস। হঠাৎ কি ভেবে, একটা ছেলেকে ভ্যান থেকে আপনি নামতে বললেন। ছেলেটা নামল। ওর চোখ মুখে ভয়ের লেশমাত্রও নেই। ছেলেটাকে চলে যেতে বললেন আপনি। অবাক কান্ড! ওকে ছেড়ে দিলেন আপনি? তার জন্যে এই অন্ধকার আর নির্জনতা কেন? ছেলেটা কাঁপা পায়ে এগিয়েছে। আপনি তখন কি করলেন মনে পড়ছে? হ্যাঁ, আপনি পেছন থেকে ওকে গুলী করলেন। একটা নয়, পর পর তিনটে। কি এরপরও বলবেন আমার মাথা খারাপ? ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সেই রাত বড় ভয়ংকর ছিল। আরো একজনকে এভাবেই খতম করলেন। বাকি দুজনকে কি মনে করে আবার ফিরিয়ে আনলেন।' এ পর্যন্ত বলে চুপ করে থাকল ও।

সত্যেশ্বরবাবু বিচলিত বোধ করছিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও, বোঝা যাচ্ছিল তিনি অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ পর একটু কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি বললেন, 'এসব খবর আপনি কি করে জানলেন?'

বিবেক এবার হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'এখনো বুঝতে পারলেন না, ওই বেঁচে যাওয়া দুজনের মধ্যে আমিও একজন।'

সত্যেশ্বরবাবু চুপ করে থাকলেন কিছু সময়। পরে ফের বললেন, 'এটাকে খুন বলছেন কেন? এটা তো আইনের ব্যাপার।'

'আইন?' বিবেক প্রায় চিৎকার করে উঠল। ওর বুকের ভেতরটা যেন তখনো তোলপাড় করছে। একটুক্ষণ নীরব থেকে আবার ও বলল, 'আপনাদের খেয়ালখুশিই তো তখন আইন। বেশ তো, আমরা অন্যায় করেছি, তার জন্যে তো আদালত ছিল সত্যেশ্বরবাবু। বিচার করতেন আমাদের। এরকম করে আপনারা কত ছেলেকে খুন করেছেন বলতে পারেন? এত পাপ করেও আপনি ভাবছেন, সবই কর্তব্যের খাতিরে করেছেন। এটাই আপনার কাছে সান্ত্বনা। এজন্যে একবারও আপনার অনুশোচনা হয় নি। বুক কাঁপে নি।' বিবেক কথা শেষ করে কি যেন ভাবে।

সত্যেশ্বরবাবুও চুপ করে থাকেন। এ নিয়ে আর কথা বলতে তাঁর ইচ্ছে হলো না। এখন আফসোস হচ্ছিল, কেন যে তিনি সেই রাতে দুটো ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন! সেদিনই শেষ করে দিলে পারতেন। ভেতরে ভেতরে রাগে তিনি ফুলছিলেন।

নৌকোটা ভীষণ দুলছে। যুধিষ্ঠির মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিল, 'বাবু তুমানে চুপচাপ বস্যা রও। মোটে লড় নি।' বাতাসের দাপাদাপি বাড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এখন আর ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। নৌকো ঢেউয়ের মাথায় টাল খেতে খেতে ছুটছে।

সবাই চুপ করে আছে। একটু পরে বিবেক বলল, 'আজ এই খানিক আগে যে ছেলেটা খুন হলো, ওকেও আমি চিনি। হ্যাঁ, ও চাঁপাতলার বিনোদ মাইতির বড় ছেলে। নাম শুভংকর। আপনারা কি কেউই ওকে চিনতেন না? মুখে দাড়ি। মাথা ভরতি চুল। একটু রোগা রোগা চেহারা। কি চিনলেন না এখনো? আমার সংগে ও একসময় স্কুলে পড়ত। ক্লাস নাইন-এ উঠেই পড়াশুনো ও ছেড়ে দিয়েছিল। খুব গরীব ওরা। পরে একটা ওষুধের কারখানায় কিছুদিন ও কাজ করেছিল। ক'দিন পরেই কাজটা ও ছেড়ে দিয়েছিল। আবার গাঁ-য়ে ফিরে এসেছিল ও। ও আসলে খাপ খাওয়াতে পারে নি। কাজটা ও কেন ছেড়ে দিয়েছিল, আমাকে কিন্তু সব বলেছে। আপনি তো ওকে চিনতেন গুণধরবাবু?' বিবেক চুপ করে থাকল অল্পক্ষণ।

গুণধর আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হওয়ার ভান করে ও বলল, 'আমি ওকে চিনতাম? বলেন কি? না না, আপনি ভুল করছেন। ও নামের আমি কাউকে চিনি না।'

বিবেক মুচকি হাসল। গলায় জোর দিয়ে বলল, 'শুভ, কিন্তু আমায় সব বলেছে। কাকদ্বীপ বাজারে আপনার তো একটা ওষুধের দোকান আছে। তাছাড়া ওষুধের একটা কারখানা আছে না আপনার?

গুণধর এবার আমতা আমতা করে। একটা ঢোক গিলে ও বলে, 'এই সামান্য ছোটখাট একটা প্রতিষ্ঠান।' বিনীত ভঙ্গি।

সেখানে কি কি জিনিস তৈরী হয়, তা আমি জানি। শুভ কাজটা কেন ছেড়েছিল, এবার বুঝতে পারছেন ?'

না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' ওর গলা কাঁপে।

বিবেক শব্দ করে হাসল। পরে বলল, 'আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, আপনার কারখানায় জাল ভেজাল ওষুধ তৈরী হয় ? গোপনে গোপনে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাচার হয়। আপনার ওষুধের দোকান থেকেও এরকম অনেক জাল ওষুধ বিক্রী হয়েছে, এখনো হয়।'

'মিছে কথা, আপনার একটা কথাও সত্যি নয়।' গলার স্বর বিকৃত, রুষ্ট।

এটাও কি মিছে কথা গুণধরবাবু, আপনি একবার ধরা পড়েছিলেন। অনেক কিছু পেয়েছিল ওরা। আপনার তো জেল হয়ে যাওয়ার মতন অপরাধ। আপনি তো ভাল করেই জানেন, আপনার সেই বিশুদ্ধ খাঁটি ওষুধ খেয়ে সেবার অনেকগুলো লোক মরেছিল। ভুলে গেলেন। কিন্তু কিছুই হলো না আপনার। কেন হলো না, তাও আপনি ভাল করেই জানেন। সবার মুখ কি করে বন্ধ করতে হয়। সেই গোপন কথাটা আপনি জানতেন। আপনার বাহাদুরী আছে বলতে হয়।'

গুণধর আর পারছিল না। এবার চিৎকার করে উঠল, 'চুপ করুন, সব আপনার বানানো কথা।' ভেতরে ভেতরে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কে এই বিবেক ? ও এত খবর জানল কি করে ? শুভংকর এক সময় তার ওখানেই কাজ করত। ওর মতিগতি ভাল ছিল না। সেই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ও তার ব্যবসার অনেক গোপন খবরটবর জানত। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আবার কোত্থেকে কি বেরিয়ে যায়! বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। সে ভয় পেয়ে যায়।

বিবেক একটুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলল, 'আপনি কি বলাই দাসের কোন খবর রাখেন ?'

গুণধরের অস্বস্তি বাড়ে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না আমি কিছু জানি না।' ভেতরে ভেতরে ও ছটফট করছিল।

সবাই চুপচাপ। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার ছুটোছুটি। নদীর ফোঁসফোঁসানি। নৌকোর ভেতরে অন্ধকার। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির হাঁ করে কথা শুনছে। খানিকক্ষণ পর বিবেক মুখের একটা শব্দ করল। ধীরে ধীরে বলল, 'সবাই জানে, বলাই দাস পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়।' চুপ করে থাকল ও।

গুণধর চমকে ওঠে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে তার! গলাটা চট চট করে। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে তার। মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে।

বিবেক আগের কথার জের টেনে ফের বলল, 'বলাই দাস খুন হয়েছিল। ঠিক এখানে নয়, মৌসুমীদ্বীপে ওকে নাকি শেষবারের মতন দেখা গিয়েছিল।'

গুণধরের গলা জড়িয়ে আসে। টেনে টেনে ও বলে, 'আমি ওসব কিছু জানি না, জানি না।' জিভটা তার আঠা আঠা লাগে। কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির অবাক। গোষ্ঠর মুখেও কথা নেই, গুণার বিক্রম তাহলে কিছু কম নয়। ওষুধের ব্যবসা ছাড়াও ও এক সময় গাঁজাটাজা পাচার করত। এখন করে কিনা তা সে জানে না। একেই বলে কীর্তিমান পুরুষ। লোকটাকে তার এখন ঘেন্না করতে ইচ্ছে করছে।

নৌকো দুলছে। যুধিষ্ঠির অন্যমনস্ক হয়। হাতের মুঠি সামান্য আলগা হয়ে পড়ে। নৌকো আচমকা ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি খায়। বুড়ো মাঝির অন্যমনস্কতা ভাঙে। আবার শক্ত হাতে হালটা সে চেপে ধরে। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। আর কিছু দেখা যায় না। যুধিষ্ঠিরের কপালে ভাঁজ পড়ে। সেও আর ভাল দেখতে পাচ্ছে না। শব্দে শব্দে কান যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। [illegible] মারে। ঠিক ঠিক যাচ্ছে ত ?

বিবেক আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পরিবেশটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

গণপতিবাবু ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন। নিবে গেল কাঠি। সেই আলোয় দেখা গেল ওদের মুখগুলো যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। আলোটা ওদের চোখে সূঁচের মতন লাগছে। আরো কয়েকটা কাঠি খরচ করে তিনি চুরুট ধরালেন।

বিবেক বলল, 'আপনার সঙ্গে আর যে কখনো দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি গণাদা।'

'আমিও তোমাকে দেখে কম অবাক হইনি বিবেক।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিবেক বলল, 'অবাক হওয়ারই তো কথা গণাদা। আমার তো বেঁচে থাকার কথা নয়! সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আপনি তো বুঝতে পেরেছিলেন গণাদা যে এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের সাবধান করে দিলেই পারতেন। কেন দিলেন না গণাদা ? আমরা তো আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

গণপতিবাবু চুরুট টানছিলেন ধীরে ধীরে। তিনি এর কি জবাব দেবেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। শেষে কোনরকমে বললেন, 'বিশ্বাস কর, আমার কাছেও সঠিক কোন খবর ছিল না।'

'আপনি কিন্তু ঠিক বললেন না গণাদা। আমরা যে ক'জন বেঁচে থাকলাম, পরে জেনেছি, আপনি অনেক আগেই আমাদের ফেলে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। কেন এরকম করলেন বলতে পারেন ? আপনার কথা আর কাজের মধ্যে যে এতটা অমিল, তা আগে জানা ছিল না আমাদের।' বিবেকের গলা ধরে আসে। আবেগে ভরপুর। তার দম যেন ফুরিয়ে আসে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বলল, 'জানেন গণাদা, সেই রাতে ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। আপনি তো বিপ্লবকে ভাল করেই চিনতেন, খুবই ভালবাসতেন ওকে। এমন প্রাণবন্ত, বেপরোয়া আর ক'জন হয়। বন্ধুদের মধ্যে সকলের আগে বিপ্লবই খুন হলো। তারপর আরো অনেকে। রক্তে রক্তে ভেসে গেল পথঘাট। আমিও শেষ হয়ে যেতাম। এক ভদ্রমহিলা আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। ওদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন, আমি ওঁর ছেলে। বিবেকের গলা কাঁপছিল। চুপ করে থাকল অল্পক্ষণ। বাতাস বুঝি হোগলার ছইটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। নৌকো ভীষণ দুলছে। ক্ষীণ গলায় ও আবার বলল, 'গণাদা আপনার এই হঠকারিতা আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে। আপনি আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারলেন না, পারলেন না।' ওর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

গণপতিবাবু কি যেন একটা বল[illegible] গেলেন। বলা হলো না। নৌকোটা টলছে। একটা চটকা বাতাস নৌকোটাকে অনেকটা কাত করে ফেলেছে। যুধিষ্ঠির চিৎকার করে উঠল, 'গোষ্ট রে, পশ্চিমে আবার মেঘ বুসল।' ও ভয় পেয়েছে। মুখের ওপর আতঙ্ক। দুরন্ত গতিতে একটা ঝড় ছুটে আসছে। মুখ শুকিয়ে যায়। বুক কাঁপে।

গোষ্ঠ, শঙ্কিত গলায় বলল, 'যুষ্টিদা, ডুবা চড়াটাকাটি উঠ্যা যাও।' 'না বাতাস আছে, গোছ দুব নি। জাতে উঠ্যা যাই। চড়া ধারে যাইয়া পাউল ফেলি দুব।' শীতে কাঁপছিল যুধিষ্ঠির। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। নৌকো টালমাটাল। যুধিষ্ঠির আর বুঝি পারে না। গলা দিয়ে তার স্বর বেরোয় না। এই লোকগুলোকে কি শেষ পর্যন্ত সে কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে ? তার চোখে মুখে আকুলতা, ছটফটানি। এই আকাশ, নদী, বাতাস, ঝড় সবার কাছেই সে এক এক করে প্রশ্ন করল। ঘরের কথা মনে পড়ে। ভানুমতীর মুখটা ভেসে উঠল। বাপের কথাও মনে পড়ে, গাঙের রাগ, বড় রাগ। কিন্তু কেন, কেন এই কোপ ? তার মাথা ঝিম ঝিম করে। হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসে।

কলকাতার তৃতীয় বইমেলা

আনন্দ বাগচী

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লির 'প্রগতি ময়দান'-এ দশ দিনব্যাপী তৃতীয় বিশ্ব বইমেলা শেষ হতে না হতেই ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছিল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত কলকাতার তৃতীয় বইমেলা। রবীন্দ্র সদনের উল্টোদিকে দুই লক্ষ বর্গফুট এলাকা নিয়ে মেলা বসেছিল তবু মনে হচ্ছিল আরও বেশী জায়গা থাকলে এই জমজমাট দর্শকের ভিড় কিছুটা স্বচ্ছন্দ হতে পারত। স্টলগুলো আরও বড় হলে এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে সাজালে এই অকল্পনীয় জনসমাগমকে ব্যবসায়িক দিক থেকে কাজে লাগানো যেত। মেলার শেষ চারদিন অগণিত দর্শক এবং ক্রেতা এসেছেন কিন্তু ছোট স্টলগুলো এই ভিড়ের চাপে মার খেয়েছেন। অধিকাংশ মানুষই তাঁদের দোকানে ঢুকে বই দেখার সুযোগ পাননি। নিজের নিজের স্টলের অঙ্গসজ্জার দিকে এবার প্রকাশকদের ঝোঁক বেশী ছিল, সাধ্যমত সকলেই কমবেশী সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের দোকান, অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। কারণ মেলায় স্টল নেওয়ার অর্থ যে কেবল বেশী বই বিক্রী করার নগদ সুযোগ নেওয়া নয়, নিজের মর্যাদা এবং প্রচার বাড়ানো এবং সারা দেশের মানুষের সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় একথা তাঁরা গত ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালের দুটি মেলার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিয়েছিলেন। মেলার কর্তৃপক্ষ ন্যূনপক্ষে একশো বর্গফুট এবং ঊর্ধ্বে যত খুশী আয়তনের জমি ভাড়া দিয়েছিলেন। প্রতি বর্গফুটের ভাড়া ছিল পাঁচ টাকা। এর বিনিময়ে তাঁরা তিনদিকের টিনের বেড়া এবং ছাদের ত্রিপল জুগিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন স্টল পিছু দুটি করে আলোর পয়েন্ট বিনামূল্যে। এর ওপর ভেতর বাইরের সাজসজ্জা, আসবাবপত্র, গেট, গালিচা, আরও আলো সব নিজের নিজের খরচে। কিন্তু অধিকাংশ বাংলা বইয়ের স্টলেই যতখানি সাজসজ্জা চোখে পড়ল ততখানি বই সাজানোর-দেখানোর রুচি এবং কৌশল চোখে পড়ল না। চোখে পড়ল না স্বতন্ত্র করে তাঁদের কোনো চরিত্র। সুপরিকল্পিতভাবে মেলার জন্যে বিশেষ ধরনের বই আনা এবং তাকে উপযুক্তভাবে দেখানো এবং যোগ্যতার [illegible] ক্রেতার হাতে ধরিয়ে দেবার কোনো প্রচেষ্টাই চোখে পড়ল না। এইদিক থেকে বৈশিষ্ট্যহীন ও ব্যক্তিত্ব বর্জিত হওয়ায় প্রায় কাউকেই আলাদা করার চেষ্টা বৃথা।

তবু বলব এবারের কলকাতার বই মেলা তার ঠাটে-ঠমকে-জলুসে 'অন্তরঙ্গতায় বই পাগল প্রাণবন্ত দর্শকের লাগাতার উপস্থিতিতে যেন দিল্লির বিশ্ব বই মেলাকেও হার মানিয়েছে। পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষী গ্রন্থের পাশাপাশি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী ফ্রান্স, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মিলিয়ে এগারশো প্রকাশক এই মেলার দুশোটি স্টল ও প্যাভেলিয়নে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মেলার একটা উৎসব-উৎসব হাওয়া বইছিল এবং তাতে লেগেছিল আন্তর্জাতিক চেহারা ও মেজাজ। গত বছর প্রদর্শনীতে পঁয়ষট্টি হাজার টাইটেল জমা পড়েছিল, এবার সেখানে জমা হয়েছিল এক লক্ষ তের হাজার বই, আর বিশ্ব বইমেলায় এবার এসেছিল ২ লক্ষ বই। মেলার সভাপতি সুপ্রিয় সরকারের মতে এবারে দর্শকের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বই বিক্রী হয়েছে ছয় লক্ষ কপির মত, টাকার পরিমাণে যেমন তাঁরা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন, পঞ্চাশ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুধু বই বাজারেই বিক্রী হয়েছে ৮ লক্ষ টাকার বই।

এবারের মেলায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শেষ তিন দিন ধরে বসা বই বাজার। বড় বড় চারপাশ খোলা প্যান্ডেলে এই বইয়ের শস্তা বাজার মেলার প্রায় সমস্ত মানুষকেই টান দিয়েছিল। ভাল-মন্দ, নতুন-পুরোনোর, [illegible] বাজারে হরেক রকমের বইয়ের স্তূপ ক্রেতার ডাকের অপেক্ষায় ছিল। কোথাও নীলামের মত, দর হাঁকাহাঁকি চলছিল, তবে ডাক সব সময়ই নিম্নমুখী। একশো তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের বই পঁচিশ-তিরিশ টাকায় বিক্রী হয়েছে। কেউ ঠকেছেন, কেউ জিতেছেন যার কপালে যেমন শিকে ছিঁড়েছে। কেউ অন্যের মত বই কিনেছেন, কেউ মনের মত বই খুঁজে নিয়েছেন। বই বিক্রী হয়েছে পঞ্চাশ পয়সা থেকে একশো পঁচিশ টাকা দামের মধ্যে। কর্তৃপক্ষের চেষ্টার বাইরে থেকে আসা এক যোগ্য বিচারক মণ্ডলী স্টলগুলির মান নির্ণয় করে দেন। সেই হিসেবে স্টল ও প্যাভেলিয়নগুলিকে ১ম ও ২য় দুটি করে পুরস্কার দেওয়া হয় ২রা মার্চ। এছাড়াও সব মিলিয়ে একটা বিশেষ পুরস্কার ছিল, সেটি পেয়েছেন আনন্দ পাবলিশার্স। প্যাভেলিয়নে ১ম হয়েছেন রূপা, ২য় স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার। স্টলে প্রথম হয়েছেন শিশু সাহিত্য সংসদ, ২য় টমসন প্রেস।

সরকার মেলার জায়গার দরুন কোনো ভাড়া নেননি, প্রবেশ করও মকুব করে দিয়েছিলেন। মেলার কর্তৃপক্ষ প্রবেশ মূল্য ৩৫ পয়সার বদলে ৩০ পয়সা ধার্য করেছিলেন এবার। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল একাধিক মানের অতিথি নিমন্ত্রণপত্র এবং অজস্র ছাড়পত্র। বিগত দুটি বছরের কার্যকলাপের একটা নিরিখ দেওয়া যাক।

		১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮
১।	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা—			
	(ক) প্রত্যক্ষ	৬৭	১৩০	২০০
	(খ) পরোক্ষ	৪০০	৭০০	১১৫০
২।	দর্শকের সংখ্যা	১,১২,০০০	১,৯৬,০০০	৩,০০,০০০
৩।	মোট বিক্রয়	১৫,০০,০০০	৩৫,০০,০০০	পঞ্চাশ লক্ষের বেশী
৪।	প্রদর্শিত গ্রন্থ সংখ্যা (টাইটেল)	৩৫,০০০	৬৫,০০০	১,১৩,৪০৭
৫।	প্রদর্শিত গ্রন্থ : মোট মজুত	১,৭০,০০০	৭,০০,০০০	৫,২৬,০০০
৬।	যোগদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৭	১৮৩	২০৫
	যোগদানকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৪,০০০	১৮,০০০	২৯,০০০
৭।	(ক) প্রবেশপত্রধারী দর্শক সংখ্যা	৬৪,০০০	৯৭,০০০	×
	(খ) অতিথি সংখ্যা	২৫,০০০	৪০,০০০	×
	(গ) অংশগ্রহণকারীদের কর্মী সংখ্যা	৭,০০০	২০,০০০	×
	(ঘ) গ্রন্থমেলার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্যদের সংখ্যা	৯,০০০	২১,০০০	×

এ থেকেই এ বছরের মেলার তুলনামূলক ক্রমোন্নতি সহজেই অনুমেয়। এ বছরের সব হিসাব এখনও যায়নি। পাওনা যায়নি বিদেশী ও ভারতীয়

মেলা প্রাঙ্গনের দৃশ্য

অন্যান্য ভাষার বইয়ের তুলনায় বাংলা বইয়ের বিক্রী কি রকম হয়েছে। তবে বাংলা বইয়ের বিক্রী যে ইংরেজী বইয়ের তুলনায় অনেক কম হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে শিশু-সাহিত্য, রান্নাবান্না, ঘর সাজানোর বই, শিল্পকলা ও স্থাপত্য সংক্রান্ত বইয়ের ওপরেই ঝোঁক ছিল বেশী। সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে কবিতার বই, ক্লাসিক পর্যায়ের পুরনো বই এবং ডিকসনারী সিরিজের। আর মানচিত্র। বাঙালী প্রকাশক দুচার জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু নিজেদের মোট বিক্রীর আর্থিক পরিমাণ বলতে দেখলাম অনেকেই ইতস্তত করেন, এড়িয়ে যান। লক্ষণটা অবশ্য ভাল বিক্রীরই ইঙ্গিত দেয়। আনন্দ পাবলিশার্স-এর ষাট হাজার টাকার মত বিক্রী হয়েছে, মিত্র ও ঘোষের ৪০ হাজার, বিশ্ববাণীর ২২ হাজার এবং কলকাতার এক ইংরেজী গ্রন্থ বিক্রেতার ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। যদিও আনন্দ পাবলিশার্সের বই বিক্রীর চেষ্টার চেয়ে গ্রন্থ প্রদর্শনের দিকেই নজর ছিল বেশী। আমার অন্তত তাই ধারণা।

কলকাতার বই মেলার মেজাজ আলাদা, চরিত্র আলাদা। এবার শীতে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন যে হয়নি সেকথা এই বইমেলায় আগত অনেক মানুষের মতিগতি এবং কেনাকাটার ধরন দেখে আর একবার মনে হল। অনেকেই যে ঘর সাজাবার জন্যে বই কিনছেন তা বুঝতে দেরী হল না। সবচেয়ে ভাল লাগলো এই দেখে এখানে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সকলেই কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বই কিনছেন, বই দেখছেন। পকেটে পয়সা থাক বা না থাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই ঘাটবার এমন অবাধ অধিকার আর কে দিতে পারত এই বইমেলা ছাড়া! মেলায় এসেছিলেন সব রকমের, সব অবস্থার মানুষ। এসেছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, উদাসীন অধ্যাত্মবাদী, সন্ন্যাসী, এসেছিলেন আড্ডাবাজ-রসিক, কালচার-ওয়ালা কালচার-ওয়ালী স্বামী-স্ত্রী, শিল্পী-লেখক-সাংবাদিক, স্বাক্ষর-শিকারী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং বইচোরের দল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্টলেও ভালই ভিড় দেখা গিয়েছে। ক্রাইস্ট ডিসাইপলস, আহমদিয়া, রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ভক্তি-বেদান্ত প্রভৃতিও দর্শককে টেনেছেন। বিক্রী হয়েছে অরবিন্দ আশ্রমের বই, জগদীশচন্দ্রের গীতা, আর চলমান লিটল ম্যাগাজিন। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে তো একটানা হুমড়ি খাওয়া ভিড়। এবারের মেলায় খাবারের দোকান ছিল, ব্যাঙ্ক ছিল, পোস্টাপিস ছিল। এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলো ছিল।

॥ ২ ॥

তখনও দিনের আলো আর গাছের মাথায় রোদ ছিল।

মেলা-ফিরতি বই বাগানো মানুষের স্রোত কাটিয়ে যেই রবীন্দ্র সদনের কোনাতক পেঁছোচি, অমনি চমক লাগল, আরে একি, সেনেট হল নাকি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরক্ষণেই ভাবলাম, সে তো কবেই ভেঙে গুড়িয়ে মুছে ফেলা হয়েছে কলকাতার বুক থেকে। ক্যালকাটা বুক ফেয়ার এবার সেনেট হলের আদলে বিশাল বিশাল থাম্বাওয়ালা তোরণ দ্বার বানিয়ে অনেক প্রবীণ শিক্ষক বাঙালীর বকে প্রথম ঠোক্করটা দিলেন। একপাশে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির পতাকা মাথা উঁচিয়ে আছে। চোখ ফিরে এল মাটিতে, সেখানে গিজ-গিজ করছে মানুষ, রঙবেরঙের নারী-পুরুষ জমে আছে ঢালু জায়গায়। তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দ মিছিলের মত অতি দীর্ঘলাইনগুলো নানা দিকে বাঁক নিয়েছে, চট করে তার ল্যাজা-মুড়ো খুঁজে পাওয়া শক্ত। একটা লাইনের উৎস মুখ খুঁজতে খুঁজতে প্রায় রেসকোর্স হয়ে ফেললাম। এক একটা লাইনে কত কত লোক কে জানে। এক হাজার দেড় হাজার, দু' হাজার হতে পারে। লাইনে দাঁড়িয়ে মাঝে-মধ্যে নড়ছি চড়ছি, পা বদল করছি কিন্তু কতটা এগোচ্ছি বুঝতে পারছি না। তাই থেকে থেকে পেছনে তাকাচ্ছি, দেখছি কত দ্রুত আমার পেছনে অসংখ্য 'ফলোয়ার' দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে মনে তবু আপসোস, আজ বুঝি আমার ধরাতে [illegible] মেলার ভেতরে ঢোকা আবার অন্য দিনের জন্যে তোলা থাকবে। কিন্তু না, আমার আশংকা করার মত তেমন কিছু ঘটলো না।

রূপা অ্যান্ড কোং

মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকে তক্ষুণি কোন প্যাভেলিয়ানের ভিড়ের ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছে করল না। ভেতরে বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। লাউড স্পীকারে প্রিয় গানের কলি গমগমিয়ে বাজছে। কাছেই গিল্ডের অফিস-মণ্ডপের বারান্দা থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করা হচ্ছে। সামনেই এক টুকরো তোলা ফুলের মালঞ্চ। প্রসাধনের ইন্টিমেট গন্ধ রেখে রেখে চলে যাচ্ছে বহুরূপী নারী-পুরুষের দল। গান থামতেই টুকরো টুকরো ঘোষণা। হারান-প্রাপ্তি এবং নির্দেশের স্থানীয় সংবাদ। মাইক্রোফোন আছে আর কেউ হারায়নি, কিছু হারায়নি এমন হয় না। সাঁত্রাগাছির কোনো এক সৌভাগ্যবান দাদা হারিয়ে যেতে পেরেছেন বউদিদির নজরবন্ধনী থেকে। ক্ষণকালের জন্য অবশ্যই। আমাদের সংসারী যুগলবন্দীদের এই একটিই তো কেতাবী বিচ্ছেদ। বই আর বউ। একটি পড়বার অন্যটি শোনবার। বিমর্ষ কৌতূহলে কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইলাম, না আমার নামটি কোনো বচন-সুন্দরীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল না। মেলার কর্তৃপক্ষ জানেন না আমি হারিয়ে গেছি, হারিয়ে গেছি সেই কবে থেকে। ঈষৎ দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম, মেলার চৌহদ্দি এক চক্কর ঘুরে আসতে হবে আগে।

'আরে কি আনন্দ!' ক্যালকাটা পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট থেকে বেরিয়ে এল বহু পুরোনো এক চেনা হুঙ্কার। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কি, আমাদের আনন্দ কিনা?'

গলার স্বরের সঙ্গে মুখ মেলাতে পারছিলাম না। মাথায় নিষ্কলঙ্ক টাক, মউচাকের মত ঝুলে পড়া দাড়ি গোঁফে মুখের সমস্ত রেখা ঢাকা, চোখে ছুরির মত ধারালো চশমা। ধুতি পাঞ্জাবী, কাঁধে শান্তি-নিকেতনী ঝোলা, এই বিশাল পুরুষটি আমার অতীত বর্তমান দুইই ঝাপসা করে দিল। বিস্ময়ভাবে মাথা নাড়লাম।

'আমি ওরিএন্টাল সেমিনারির বুদ্ধরে বুদ্ধু!'

বুদ্ধ! সেই বেঁটে খাটো, বরাবর ফার্স্ট বেঞ্চের ফিপথ বয় বুদ্ধসুন্দর! আমি বললাম, 'তোকে এখনো খুঁজে পাচ্ছি না!' বলে ওর পাশে দাঁড়ানো ঠোঁট টিপে হাসা যুবতীটির দিকে আড়চোখে আর একবার তাকালাম।

'পাবি না। মিসিং স্কোয়াডে খবর দিলেও পাবি [illegible] করে ফের বলল, 'ইলা, আমার মেয়ে।'

'হা ঈশ্বর!' আমি পকেট চাপড়ালাম, 'এতগুলো বছর আমাদের পিকপকেট হয়ে গেছে! আমরা যে বুড়ো হয়ে গেলাম রে! ফতুর হয়ে গেলাম।'

তারপর পুরনো বন্ধুদের খবরাখবর আর পুনঃপুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ বিনিময় করে বিদায় নিলাম। তিরিশ বছর পরে ধূমকেতুর মত একবার যাদের সঙ্গে দেখা হয়, জীবনের বাকি বিশ-পঁচিশ বছরে কি আর একবারও দেখা হবে? কে জানে! তবে এই বই মেলায় এসে দেখা হল আরও দুচার জনের সঙ্গে। দেখা হল নবকুমার শীলের সঙ্গে, সে এখন সাধুসন্ত মানুষ হয়ে গেছে। দেখা হল ইন্ডিয়ান অক্সিজেনের কুনাল বাগচীর সঙ্গে, সগৃহিণী বই কিনতে এসেছে। সবচেয়ে অবাক হলাম ভবানীপুরের অরুন্ধতী মাসীকে দেখে। মেলার মাঠে তিনি বোধহয় পিকনিক সারতে এসেছেন। তাঁর লটবহরের পরিমাণ দেখে চক্ষু স্থির, প্রায় অর্ধেক হেঁসেল তিনি এখানে তুলে এনেছেন। রাশি রাশি স্টেইনলেস স্টীলের কাপ-ডিশ-ডেকচি, জায়েন্ট সাইজের টিফিন কেরিয়ার, ফ্লাস্ক, আরও হ্যানা ত্যানার সঙ্গে অন্ততঃ হাফ ডজন কাচ্চা-বাচ্চা আর নানান বয়সী দেড়-ডজন মেয়ে-পুরুষের কেন্দ্র-মনি হয়ে তিনি বসে গেছেন। সকলকে হাতে হাতে খাবার যোগাচ্ছেন। আমি সন্তর্পণে পাশ কাটালাম।

'মাত্র দশ মিনিটে আপনার মুখ আপনি ফেরত পাবেন,' ঠিক মনে পড়ছে না, এই রকমই একটা হাতে লেখা পোস্টার দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দুটি যুবক প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বসে পোর্ট্রেট আঁকছে। প্রতি ছবি পেন্সিল ড্রইং দশ টাকা, কালার পনের টাকা। সামান্য কিছু কৌতূহলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিল্পী আর তাদের টু-সীটারদের দেখছে। জড়িত গলার আওয়াজ কানে যেতেই তাকিয়ে দেখি ভিড়ের একপাশে একজন তার হতকুচ্ছিত দেখতে সঙ্গীকে হাত ধরে টানছে, 'মাইরী বলছি সোন্দর করে এঁকে দেবে, মাইরী বলছি!'

সঙ্গী ছাদনা তলায় দাঁড়াতে অনিচ্ছুক ব্যাচেলারের মত সভয়ে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে আর বলছে, 'মাইরী না, ভগবানের দিব্যি না! মুখ খারাপ করতে পারবো না। আর্টের প্যাঁচে পড়ে জিওগ্রাফী পাল্টে যাবে!'

গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র দুটির বুকের পাটার তারিফ করতে করতে অন্যপথ ধরলাম। দেখা হয়ে গেল দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে। রীতিমত গম্ভীর মুখে বই মেলা সমীক্ষা করে বেড়াচ্ছে,

স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানী

হাতে খান কয়েক বই। দুর্লভ হাসি হেসে আমাকে বলল, 'এসে গেছ তাহলে?'

জবাবী হাসি হেসে ওর হাতের কোটলারের বইখানার দিকে তাকালাম। মার্কেটিং-এর ওপরে লেখা। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে ও নিজের থেকেই বলল, 'মাত্র সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় কিনলাম বইখানা। আসল দাম একশো পঁয়তাল্লিশ।'

দিব্যেন্দুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতেই হিমানীশ গোস্বামী, হাতে মিনি আনন্দবাজার পত্রিকা। হাফ পঞ্জিকার সাইজে ম্যাপ লিথোয় ছাপা, সুন্দর। গম্ভীর মুখে বললেন, 'দিব্যেন্দু আর কি সস্তায় কিনেছে, এই দ্যাখ'—

রোববারের একটা পুরো কাগজ, অফসেটে ছাপা।

'কতয় পেলেন?'

'বিনি পয়সায়। এখনো কিছু কপি আছে, আনন্দ পাবলিশার্স-এ যা।'

'এর থেকে বেশী দামী কিছু কেনেননি?' আমি জানতে চাই।

'হাঁ, শঙ্খ ঘোষের কবিতার বই। ষাট পয়সা দাম। সন্দীপন চ্যাটার্জির খুঁটির জোর আছে, হাজার কপি বিক্রী করে ফেলেছে এরই মধ্যে।'

কথাটার মানে বুঝতে পারলাম একটু পরে। সত্যিকারের একটা বাঁশের খুঁটির সামনে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত বিক্রেতা সন্দীপন কোকাকোলার মত কি একটা বোতল টানছিল। আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল, 'সে কি এখনো আমাদের বই কেনোনি! এই দেখ আমার বইয়ের দোকান'—বলেই নমস্কার করার ভঙ্গিতে পোস্টার ঝোলানো বাঁশ-স্থানটি দেখিয়ে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্দীপন, তুমি কি বারেন্দ্র?'

'কস্মিনকালেও না। আমি চ্যাটার্জি।'

'তাহলে তুমি এ কর্ম করলে কি করে?'

'কি কর্ম?'

'সবাই মেলায় স্টল দিয়েছে, তুমি বাঁশ দিলে!'

সেই কখন থেকে মেলার মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আলো জ্বলে উঠেছে, জম্পেশ হয়ে উঠেছে মেলার ভেতরটি। ঘোড়ার মুখের খবরের মত এক একটা বইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়েছে চাপা গুজবের মত। কিছু সিউডো-আঁতেল অমনি ছুটছে সেই বই কিনতে। একটা হিট নাম শুনলাম 'ফ্রিজম অ্যাট মিড-নাইট'। শুধু 'বিকাশ' থেকেই নাকি একশো কপি ওই বই বিক্রী হচ্ছে প্রতিদিন।

বই দেখার চেয়েও বই-ক্ষ্যাপা মানুষদের দেখতে আমার ভাল লাগছে। কারণ বই দেখতে হলে অভিমন্যুর মত যে জিমনাস্টিক কৌশল জানা থাকা চাই, তা আমার নেই। মেলায় যাঁরা এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই এই মফস্বলবাসী আমার থেকে অনেক বেশী স্মার্ট, অনেক বেশী ড্যাশিং-পুশিং, মহিলা সম্পর্কে কোন শুচিবাই নেই। কলকাতার অফিস টাইমের ট্রামে-বাসে প্রত্যহ দুবার করে গলে-বেরিয়ে তাঁতের মাকুর মত তাঁরা শরীর পাকিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং এই মেলার ভিড় তাঁদের কাছে ছেলেখেলার সামিল। মাথায় ছোট, বহরে বড় আমি—তদুপরি আর একটা বাইফোকাল অসুবিধে। পিনকুশনের মত ঠাসা বুকশেলফগুলোর কাছে যদি বা পৌঁছাই, বই আর লেখকের খাড়াই নাম পড়তে নজর হড়কে যায়, কিছুক্ষণের জন্যে ডবল-ট্রিপ্‌ল ধাঁধা দেখতে থাকি, ওপরে নিচে ছাগলের মত ঘাড় তুলে, নামিয়েও অ্যাঙ্গেল সেট করতে পারি না। তার চেয়ে এই ভাল। মিনি-ম্যাক্সি-স্ল্যাক্স-বেলবটস-লুঙ্গি-বেনারসীর পাশা-পাশি এই জমানার পুরুষকার, ইন্টার ন্যাশন্যাল পারমুটেশন কম্বিনেশন দেখা, দেখা কাঁচি-মুচির কফটেল। কিছু মানুষের মুখের ইংরাজী কুইজ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রিয়রোল, স্মোকলেস পাইপ আর দাঁতনমার্কা চুরুট উপভোগ করতে করতে বুক বাজারের হাঁক-ডাক, ফণ্টানাড়া নিলাম দেখছিলাম। হঠাৎ ঘাড়ে ম্যানি-কিওরকরা নখের লোমহর্ষক এক খোঁচা খেয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'এখানে টিন টিন পাওয়া যায়?' প্রায় সারসের মত গলা বাড়িয়ে দিলেন ভিড়ের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা।

সব স্টলে ঢোকা হয়নি আমার, আবার মফস্বলের ট্রেন ধরতে হবে তাই তাড়া। তবু যাদের স্টলগুলিতে ঢুকে বই আর সাজসজ্জা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তাদের মধ্যে আছেন রূপা এণ্ড কোং, স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার, অ্যালায়েড পাবলিশার্স, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বিকাশ, শিশু সাহিত্য সংসদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রভৃতি। আনন্দ পাবলিশার্সের নাম বাঙালীর মুখে মুখে। বাইরে প্যাভেলিয়ানের গায়েই এক বিশাল ফ্রেমের মধ্যে তাঁদের প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থের মলাট অ্যাবস্ট্রাক্ট কোলাজ ছবির মত করে পেন্ট করে দিয়েছেন। ভেতরে তাঁদের নির্বাচিত লেখক-লেখিকা ও কবির এনলার্জড ফটোর সঙ্গে তাঁদের পাণ্ডুলিপির মনোজ্ঞ সংযোজন। কাছে থেকেও যাঁরা দূরে সেই মনের মানুষদের এইভাবে ঘন-সান্নিধ্যে এনে ফেলার পরিকল্পনাটিও অভিনব। অটোগ্রাফার্থীরা যেভাবে তক্কে তক্কে ঘুরছে তা দেখে মনে হল এঁরা যদি লেখক এবং তাঁদের লেখার পাণ্ডুলিপির ফটো অ্যালবাম সুলভমূল্যে উপহারের উপযোগী করে বিক্রী করতেন তবে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এক তরুণ দম্পতিকে এই দোকানে দেখা গেল শিশু পুত্রকে নিয়ে দোটানায় পড়েছেন। তাঁদের ইচ্ছে একটু সময় নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখেন কিন্তু ছেলের এক বায়না, 'আমি ইংলিশ বুকস্ কিনবো, তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে!'

সাহেব ইস্কুলে ছেলে পড়ানো মধ্যবিত্ত সমাজের টীকা-চিত্র বলে মনে হল ঘটনাটা, আমরা সত্যি সত্যিই ওদের এ কোথায় নিয়ে এসেছি।

বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের সামনে দাঁড়িয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন প্রকাশ বাংলা অভিধানের বিষয়ে কথা হচ্ছিল সহিত্য আকাদেমীর

থমসন প্রেস

বই বাজারের একটি নিরিবিলি মুহূর্ত

শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে। এমন সময় আমার বন্ধু ছুটে গেলেন তাঁর পরিচিত এক প্রকাশক বন্ধুকে দেখতে পেয়ে। ভদ্রলোক প্রায় আধমন-টাক বই নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছিলেন। ধরা-পড়ে-যাওয়া লজ্জিত হাসি হাসলেন দেখা হতে, বললেন, 'বাজারে নাম লেখাতে চলেছি।'

ব্যাপারটা পরে শুনলাম। অনেক প্রকাশক মেলায় নিজেরা স্টল নিতে পারেননি। বুক সেলারদের স্টলে তাঁরা নিজের নিজের বই দিয়েছেন। টাইটেল পিছু পাঁচ টাকা দক্ষিণায়। এই ভিড়ের চাপে যাঁদের তেমন বিক্রী হয়নি খরচ ওঠাতে তাঁরা বই বাজারের শরণ নিচ্ছেন। নগদ কড়ি যা পাওয়া যায় তাই লাভ। বই বাজারে মুড়ি মিছরির সব এক।

॥ ৩ ॥

বাঙালীর জীবনে বইয়ের স্থান ফুলেরও আগে। এই বই দিয়েই তার জীবনের প্রথমপাঠ শুরু হয়েছিল একদিন, এই বই দিয়েই তার মহাপ্রস্থানের পর্ব শেষ হবে। পাঠ্য কেতাবের পাশাপাশি নিষিদ্ধ অপাঠ্য বইয়ের মেলা জমে উঠেছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই গ্রামার-ট্রানশ্লেসনের খোলা মলাটে লোমহর্ষক নভেলের গায়ে সিংহচর্মের মত পরিয়ে কত অভিভাবক-ঠকানো প্রহর গেছে তার। এই বই-ই তার ওপরে ওঠার মই, এই বই বেয়ে বেয়ে সে জীবনের ওপর তলায় উঠে এসেছে ধাপে ধাপে। পরিণত বয়সে এই বই-ই তার চার-দেওয়াল, তার ঘরের ইনডোর ডেকোরেশন, তার স্থায়ী আমানত, তার মাথার ওপরের ছাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সুখের দিনের, দুখের দিনের বন্ধু। এর মধ্যেই সে মুখ লুকিয়েছে, এর মধ্যেই তার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন। অন্যেরা যখন ডালে ডালে চলে, সে চলে বইয়ের পাতায় পাতায়।

অর্থাৎ বাঙালী ঘরমুখো জাত কিনা জানি না তবে সে যে বইমুখো তাতে সন্দেহ নেই। বাইরে তার যতখানি দেখা যায় তার অনেক বেশী সে অদৃশ্য, সে মনেমনের মানুষ। অথচ ইদানীং এ হেন বাঙালীকেও কেউ কেউ বই-কুণ্ঠ বলে কটুক্তি করেন। বাঙালী নাকি আজকাল আর বই কেনে না, বই-বই বাই তার ঘুচে গেছে। আমরা ছোটবেলায় একটা মজার বাক্য শুনেছি—ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে। ইদানীং তাহলে কি বাঙালী কেবল জ্ঞানবানের কোঠায় উঠেছে? সে কি শুধুই বই পড়ছে, বই কিনছে না? তার বিয়ে-সাদি-প্রেমপর্বে এবং জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বই দেওয়ার রেওয়াজ নাকি উঠেই গেছে। অন্ততঃ প্রকাশকরা তাই বললেন। তাঁদের বিক্রি-বাটার যে হিসেব তাঁরা বছরান্তে লেখকের চোখের সামনে হাজির করেন, আড়ালে শোনা যায় এমন কয়েকখানা বই বাদে তা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মুদ্রণের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, প্রথম মুদ্রণের এগারশ বই কাটাতেই কয়েক বছর লেগে যায়। বছরে একশো থেকে পাঁচশোর মধ্যেই গড়পড়তা বিক্রী ওঠানামা করে।

বই-বাজারের এই মানচিত্র কতদূর সত্যভাষী জানি না তবে সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশ কি একশো বছর আগের বই বিক্রীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ইদানীংকালে বই বিক্রী যে কমে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ লোকসংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে এবং পুস্তকের সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে সরকারী অনুগ্রহ পুষ্ট ও বিভিন্ন অফিস-ক্লাবের লাইব্রেরীর সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় পুস্তক প্রকাশকের সংখ্যা পাঁচশোর বেশী, শুধু গ্রন্থ বিক্রেতার সংখ্যাও হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বছরে নতুন পুরনো বই মিলিয়ে অন্তত পৌনে দু হাজার বই প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু বাংলা বই কাটতির সংখ্যা সেই অনুপাতে বেড়েছে কই? আজ থেকে আশী একশো বছর আগেও বাংলা বই-এর এক একটা মুদ্রণ গড়ে দু হাজার কপির কাছাকাছি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি অনেকগুলি করে সংস্করণ দেখে গেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন মাস তের দিন। বই কেনার নেশা এবং অভ্যাস তবে কি ইদানীং বাঙালীর কমে গেল? যদি গেল তাহলে কেন গেল, কি কি কারণে গেল তা খতিয়ে দেখে বাঙালীর গ্রন্থরুচি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা লেখক-প্রকাশক-পাঠক নির্বিশেষে সকলেরই করা উচিত। বই বাজারের এই সাম্প্রতিক মন্দার কারণ সম্পর্কে আমি অনেককেই প্রশ্ন করেছি। লেখক-প্রকাশক উভয়ের কাছ থেকেই কিছু এলোমেলো উত্তর পাওয়া গেছে। কেউ সিনেমা এবং টেলিভিশনকে দায়ী করেছেন, কেউ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং সামাজিক নৈরাশ্যকে। কেউ কেউ বাংলা বইয়ে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং বাঙালীর ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস এর কারণ হিসেবে দেখাতে চান। কারও মতে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাবে বাংলা বই বাঙালী ক্রেতাকে ঠিকমত টানতে পারছে না। কেউ কেউ লেখকদের দায়ী করেছেন। বলছেন, কালজয়ী হবার মত লেখা দূরে থাক দীর্ঘজীবী হবার মত লেখাও ইদানীং নজরে পড়ে না। লেখকের রচনায় শুধু গতানুগতিক একঘেয়েমি দেখা দিয়েছে। সততা নিষ্ঠা এবং জীবনের বেদনাবোধ এ যুগের লেখায় কোথায়? লেখাকে সবাই অর্থোপার্জনের সহজ উপায় হিসেবে গ্রহণ করছেন, সিনেমার দিকেই সকলের নজর, নজর বড়বড় কাগজের বিশেষসংখ্যাগুলির দিকে। রাতারাতি অর্থ এবং যশ গুছিয়ে নেবার সুযোগ এখন তাঁদের নাগালের মধ্যে। লাখোপতি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় প্রভূত ঢক্কা নিনাদের পর যে মূষিক প্রসব হচ্ছে বছরের পর বছর তাতে পাঠক মাত্রেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। যে বই একবার পড়লেই ফুরিয়ে যায় কিংবা যে বই একবারও আদ্যপান্ত পড়বার উপযুক্ত মনে হয় না তাদের দ্বিতীয় দফা গাঁটের কড়ি খরচা করে কে আর ঘরে এনে তুলতে চায়। আসলে গ্রন্থই সেই বন্ধনহীন গ্রন্থি যা সাতপাকের মতই বহুপাকে আমাদের বেঁধে রাখে। সারাজীবন নিবিড়ভাবে ঘর করবার মত বই যদি পাঠকের নাও জোটে তবু এমন বই চাই যার সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নিজেকে মানিয়ে নেওয়া চলে, অন্ততঃ পায় কথায় তালাক দেওয়া চলে না।

ওপরের মতামতগুলো এলোমেলো হতে পারে কিন্তু সবগুলোর মধ্যেই যে আংশিক সত্য লুকিয়ে আছে এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করা যায় না লেখকের দায়িত্ব, প্রকাশকের কর্তব্য, অস্বীকার করবার উপায় নেই বড় বড় সংবাদ সাময়িক পত্রিকার শুভ ভূমিকা। লেখক এবং পাঠক দুই-ই তৈরি করার দায় তাঁদের। জনরুচি গঠন করে তুলতে হবে তাঁদের, সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের হাতে সহজে এবং সুলভে তুলে দিতে হবে তাঁদের বহু আশার, বহু শ্রমের ও ভাবনার এই উৎপাদন। প্রকাশনা মুদিখানা নয়, মুনাফাখোরের ব্যবসা নয়, মোটা হতের দাঁড়িপাল্লায় ওজনদরে বিক্রী হয় না এর মাল। বই কাটানোই বড় কথা নয়, মানুষের মনে বই ধরানোই বড় কথা একথা প্রকাশকদের ভুলে গেলে চলবে না। শিক্ষা-সভ্যতার পথিকৃৎ তাঁরা, দূরে দাঁড়িয়ে যে মানুষের সহমর্মী হওয়া যায় না একথা তাঁরা বিস্মিত হবেন কেন। সুস্থ সমাজ-তাত্ত্বিকের চোখ এবং মন দিয়ে তাঁরা পাঠকদের স্তর নির্ণয় করুন, তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদার সমীক্ষা করে, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা ও মানসিকতা বিচার করে প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনুন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বই আরও বেশী করে বের করুন, সুনির্বাচিত অনুবাদের সংখ্যা বাড়ুক, দর্শনের বই, বিভিন্ন বিষয়ী প্রবন্ধের গভীর গ্রন্থ আরও চাই। চাই ভাল উপন্যাস, গল্প ও কবিতার বই। সংখ্যায় বেশী ছাপুন, এক একটা মুদ্রণ অন্ততঃ পাঁচ হাজার। গ্রন্থ নির্মাণের খরচ কিভাবে কমানো যায় মাথা খাটিয়ে তার উপায় বের করুন। এ বিষয়ে লেখকদের সঙ্গে সহযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা অবুঝ নন, তাঁরা বইয়ের বেশী বিক্রী চান, বেশী অর্থ কিন্তু কম বিক্রী নিশ্চয়ই না। বইয়ের দাম কমুক, মুদ্রণের সংখ্যা বাড়ুক। যেখানে ১৫% কিংবা ২০% রয়্যালটি নিচ্ছেন সেখানে শতকরা ৫ অংশ নিতেও তাঁদের আপত্তি থাকবে না যদি জানেন তাঁদের বই দ্রুত এবং অধিক সংখ্যায় বিক্রী হবে, ভালভাবে বিজ্ঞাপিত হবে এবং ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন না। তেত্রিশ'শ ছেপে তাঁদের এগারশ বলা হবে না এবং সময়মত ঠিক ঠিক টাকাটা

পেয়ে যাবেন। পাঠক-ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ের রকমারী বই তাঁদের চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে। বইয়ের একটা সাক্ষাৎ সম্মোহন আছে, বিজ্ঞাপনে বই দেখা আর নিজের চোখে বই দেখা এক ব্যাপার নয়। সেই সঙ্গে চাই প্রকাশকের সুপরামর্শ, বই নির্বাচনে সহ-যোগিতা। পাঠকের মন অনেক সময়ই সুপ্ত কিংবা অন্যমনস্ক থাকে, বই হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালে তবেই বইয়ের অভাববোধ জেগে ওঠে। পাঠক-ক্রেতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে, নেড়েচেড়ে বই দেখতে দিয়ে তাঁদের আকৃষ্ট করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সিগনেট প্রেসের কথা বারবার স্মরণ হচ্ছে। তাঁদের বুকশপে গিয়ে বাঙালী পাঠক যত আনন্দ পেয়েছেন, বইয়ের মর্যাদা বুঝতে পেরেছেন এমন আর কোথায় পেয়েছেন জানি না। একই সঙ্গে সে যুগের বসুমতী সাহিত্য মন্দির আর সিগনেট প্রেসের আদর্শ নিয়ে যদি আজকের ছোট-বড় সমস্ত প্রকাশকরা পাঠক-সাধারণের কাছে এগিয়ে আসেন তাহলে আজকের গ্রন্থ-ক্রেতাদের ক্ষুধা এবং রুচি দুই-ই ফিরবে। কেবল মনোরঞ্জন নয়, মনের স্ফূর্তি বাড়ানোর দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রকাশকই বই বোঝেন না শুধু ব্যবসা বোঝেন। লেখক এবং পাঠকের প্রকৃত মূল্য, উপযুক্ত সম্মান তাঁরা দিতে পারেন না। প্রকাশনায় নতুন ভাবনা, নতুন ধারার পরিকল্পনা অথবা গ্রন্থ নির্বাচন তাঁদের নেই। পত্রপত্রিকার উচ্ছিষ্ট ভোজনেই তাঁরা ব্যস্ত, তাই গতানুগতিক সাহিত্যের বাইরে তাঁরা ভাবতে নারাজ। এ অভিযোগ অবশ্যই সকলের বিরুদ্ধে নয়, মুষ্টিমের দু-চারজন প্রকাশক যথেষ্ট দুঃসাহস এবং দূর-দৃষ্টির পরিচয় ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। তাঁরা সত্যিই ধন্যবাদার্হ।

যে বটতলা কথাটা আমরা সব সময় প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি, একদিন বাঙালীর জীবনে সেই বটতলার অবদান খুব সামান্য ছিল না। শস্তা রোমান্স আর রমরমে প্রেমের উপন্যাস বটতলার প্রকাশকরা যেমন ছেপেছেন, তেমনি সেই সঙ্গে বহু বিচিত্র বিষয়েও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এখনো পুরনো পঞ্জিকার পাতা ওল্টালে এমন সব বইয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। বাংলা বইয়ের দিগন্ত তখন রীতিমত প্রসারিত ছিল।

বই পড়তে পড়তেই পড়ুয়া তৈরি হয়। কিন্তু ভাল বই পড়বার যারা সুযোগ পেল না, গাইড পেল না, বই খুঁজে নেবার তারা কিভাবে পাঠক তৈরি হবে। ধরা যাক, এখন যাদের বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা চব্বিশ-পঁচিশ তারা বাংলা সাহিত্যের পাঁচ থেকে দশ বছরের পাঠক। অর্থাৎ পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বয়স্ক-সাহিত্য পড়ার বয়স তাদের ওই সময়ের বেশী নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাহিত্যে যখন তাদের চোখ ফুটেছে ততদিনে বাংলা সাহিত্যের অনেক ভাল ভাল বই-ই আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছে। উনিশ শ তিরিশ সালের আগেই যে সমস্ত লেখক গত হয়েছেন তাঁদের অনেক ভাল ভাল বইও আরও দশ পনের কি কুড়ি বছর বাংলা বইয়ের বাজারে বেঁচে ছিল। তারপর আউট অব প্রেস আউট অফ মাইন্ড হয়ে গেছে। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় তাদের সামান্য উল্লেখ ছাড়া আর কিছু আজকের সদ্য যুবক পাঠকরা দেখতে পায় না। পত্র-পত্রিকায় তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় না। সে-যুগের পাঠকরাও মুখ বুজেছেন, সেইসব পুরনো, প্রায় ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে এমন বইগুলো নিয়েও আর প্রকাশ্যে আলোচনা হয় না। সুতরাং আজকের তরুণরা সাহিত্যের একটা বড় অংশের স্বাদ এবং অভিজ্ঞতা থেকেই বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের বোধ এবং বিচারের মাপকাঠি তাদের অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এই মিসিংলিংক দুই জেনারেশনের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যবধান ঘোচাতে পারল না। অথচ আজকের সদ্য যুব-সমাজ আগামী তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের সক্রিয় পাঠক হয়ে থাকবে। অর্থাৎ বাংলা বইয়ের ক্রেতা। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী এই বিপুল সংখ্যক খরিদ্দার বই ব্যবসায়ীর কাছে নিতান্ত উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

এদের সার্থক পাঠক করে গড়ে তুলতে পারলে গ্রন্থ জগৎ অত্যন্ত লাভবানই হত।

আরও ছোটদের অর্থাৎ বালক ও কিশোরদের দিকে তাকানো যাক। শিশু বা কিশোররা আজকের দিনে একদিক থেকে সৌভাগ্যবান। আমাদের ছোট-বেলায় এত বই ছিল না, এত পত্র-পত্রিকা ছিল না এবং সকলের ওপর পড়াশোনার এমন স্বাধীনতা ছিল না। অভিভাবকরাও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বই কিনে দিতেন না। গল্পের বই ছিল লুকিয়ে পড়ার জিনিস। সেই প্রায় নিষিদ্ধ বস্তু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার স্বাদই ছিল আলাদা, ঘরে ঘরে তখন এমন রেডিও টেলিভিশন পৌঁছায়নি, বাইরেও খেলার মাঠ ছাড়া আর দ্বিতীয় আকর্ষণ কিছু ছিল না। ফলে এই গল্পের বই যেমন আমাদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে তেমনি মগজ ঠেসে দিয়েছে মনগড়া কল্পনায়। আজকের শিশুরা ছবিতে ছবিতে ভরপুর বই আর পত্র-পত্রিকা পায়। মুদ্রণের কি পারিপাট্য আর সৌষ্ঠব সেগুলির। কিন্তু তারা বই দেখতেই শিখছে। বই পড়তে শিখছে না। চোখ আর মনের মধ্যে ফাঁক থাকছে না, অতি অল্প

আনন্দ পাবলিশার্স

সময়ের মধ্যেই তাদের বই পড়া হয়ে যাচ্ছে, বিনা আয়াসে। বই পড়া মানেই ছবি পড়া। চোদ্দ আনা ছবির সঙ্গে দু-আনা কথা। ভাবনা, চিন্তা কি কল্পনা করবার অবকাশ তাদের রাখা হচ্ছে কই। গল্প পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে, সেই পরিপার্শ্বে, সেই চরিত্রগুলির যে ছবি আগের দিনের শিশুরা মনে মনে এঁকে নিয়ে শিহরণ অনুভব করত, আজকের দিনে তার সুযোগ কই। ছবির ফিচার কাহিনীগুলির প্রতি কোনো কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য, এই পদ্ধতি আমাদের শিশুদের দৃষ্টিশক্তিকে ক্রমশ ক্ষীণ করে দিচ্ছে কিনা বিশেষজ্ঞদের সেটা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। বাণিজ্যের দিক থেকে দেখলে পণ্যের ক্ষীণায়ু হয়ত চাহিদা বাড়ায়, লাভজনক হয়, কিন্তু নীতির দিক থেকে নয়। বই অনেকক্ষণ ধরে পড়া যায়, অনেকবার পড়া যায়, কিন্তু ছবির গল্প এক-বারেই এবং অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। তখন আরো-র প্রশ্ন আসে, আরও চাই, নতুন কিছু চাই। সুতরাং পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিম্বা গল্পের ক্ষেত্রে এই স্বল্প ভাবণ পদ্ধতি শিশুদের স্মার্ট করছে বটে, কিন্তু সচ্ছল করছে না। তারা আরও কথা বলুক, ভাবুক এবং লিখুক—কল্পনাশক্তি খোলতাই হোক, নিজেদের নানাভাবে প্রকাশ করতে শিখুক। নইলে ভবিষ্যতের গ্রন্থ-জগৎ কাদের পাবে?

বাঙালী আজ বই-কুণ্ঠ গ্রন্থি-বিমুখ—এই কটূক্তি সুতরাং ক্ষমার অযোগ্য। সব দিক তলিয়ে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাঙালী ক্রেতা আজ বিভ্রান্ত। তারা অনেকেই কি চায় তা জানে না, এবং তাদের

অনেকে যা চায় তা পায় না। প্রেম এবং প্রেম বই অনেক সময়েই নাগালের বাইরে, হয় দুষ্প্রাপ্য, নয় দুর্মূল্য।

বই কেনার ব্যাপারে এক পুরনো গল্প। এক মহিলা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে সমস্ত কাউন্টার তছনছ করে দিয়েছেন, কিছুই তাঁর মনে ধরছে না, পছন্দ হচ্ছে না অথচ কিছু একটা তিনি কিনতে চান। কারণ, স্বামীকে জন্মদিনে উপহার দেবেন। কাউন্টারের ওপিঠের মনখরা হয়রান। রাশি রাশি জিনিস দেখাচ্ছে, যা দেখাচ্ছে, মহিলা একবাক্যে তা নাকচ করে দিচ্ছেন। তাঁর মুখে এক কথা : ওঃ ওটা তো বাড়িতেই রয়েছে!

দোকানের বৃদ্ধ মালিক অবশেষে ভদ্রমহিলার ব্যাপারে নাক গলালেন। নিরুপায় হয়ে বললেন, খরিদ্দার হচ্ছে লক্ষ্মী, তাই আপনাকে তো শুধু হাতে ফেরাতে পারি না। কিছুই যখন পছন্দ হচ্ছে না, তখন আপনি বই নিন।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন, স্যরি বই আমার চলবে না।

—আপনি জানে না ম্যাডাম, হাই সোসাইটিতে বই দেওয়া-নেওয়া আজকাল খুব চলছে।

—তা জানি। ভদ্রমহিলা হেসে ফেলে বললেন, আসল ব্যাপার কি জানেন, বইও একখানা আমাদের বাড়িতে আছে।

বৃদ্ধ নিজের টাক চুলকে বললেন, জানতাম। ওই দামী বইটা কিন্তু যত্ন করে রেখে দেবেন।

এবার অবাক হবার পালা মহিলার। চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করে জানলেন? বলুন তো কি বই?

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, চেক বই।

কিন্তু এবারের এই বইমেলা কি কেবল দশদিনের উৎসব-সজ্জা এবং হুজুগের মধ্যেই ফুরলো, না বাংলা বইয়ের প্রকাশকেরা এই গ্রন্থমুখী উচ্ছ্বাসের যথাসাধ্য সুযোগ নিতে পারলেন সেটাই আমাদের জ্ঞাতব্য। নিকট ভবিষ্যতে আমরা কলকাতার বিশ্ব বইমেলার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি, কলকাতার জনসমাবেশ ও তার চরিত্র নিশ্চয়ই সে দাবী করতে পারে। কিন্তু বাংলা গ্রন্থ-জগতের আশু সংকট মোচনের জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারী সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কি সমাধান খুঁজে বার করলেন, কি সংকল্প এবং সিদ্ধান্ত নিলেন তা জানতে ইচ্ছে করে। ক্রেতা-পাঠক এবং গ্রন্থ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা থাকলে বোধহয় ভাল হত। এবং আগামী মেলায় সাধারণ মানুষের আরও কাছে পৌঁছুবার এবং শুধু মেলার জন্যই বিশেষভাবে কি ধরনের বই প্রকাশ এবং সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তার ভাবনা-চিন্তার এখনই সময়। ফটো—তপন দাস

[illegible] দুঃখের প্রতিভা বসু

পোস্টাফিসে ঠিকানা বদল বলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে অনেকগুলো চিঠি পেলাম। ছেলে-মেয়েদের চিঠি, বন্ধুর চিঠি, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণেরও অনেক চিঠি।

কোথাও থেকে ফিরে এসে চিঠি পেতে যে কী ভালো লাগে। বহু পূর্বে আমার মা বাবার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার কথা মনে পড়লো আমার। এখন যেমন ছেলে-মেয়ের চিঠির জন্য ব্যাকুল হই, তখন ঠিক এমনি করে তাঁদের চিঠির জন্যই ব্যাকুল হতাম। দিন কেমন পালটে যায়, হৃদয় কেমন উলটো পালটা কাজ করে। তবে কি এটাই সত্য যে ভালোবাসা নামের বস্তুটা চঞ্চলা লক্ষ্মীর মতো কেবলই তার পাত্র বদল করে? তা নইলে এক সময় মানুষ যার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, আবার কালক্রমে তাকেই হনন করার ইচ্ছে জাগে কেন? একবার আমার এক বন্ধু অনেক কাল বাদে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। আমি খুব খুশি হয়ে উঠেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেলাম। সমস্ত চেহারায় কোথাও সাধব্যের চিহ্ন ছিলো না। সিঁদুর বিহীন অলঙ্কারহীন তো বটেই, পরনেও ধবধবে সাদা ভয়েল, সাদা ব্লাউস। অবশ্য এটাকে ফ্যাসানের প্রতীকও বলা যায়, না-ও তো হতে পারে? কিন্তু সে নিজে থেকে যতোক্ষণ কিছু বলছে না ততোক্ষণ জিজ্ঞাসাও করতে পারি না। একথা ওকথার পরে সে বললো 'আচ্ছা রানুদি, কতো লোক তো কতো ভাবে মরছে রোজ, চাপা পড়ছে, হার্টফেইল করছে, লাহিড়িকে কি দধীচির হাড় দিয়ে তৈরী করেছে যে তার কখনো মরণ হয় না?'

একথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। আমি বললাম ছি, এটা কী বলছো তুমি?'

সে বললো, 'যা বলছি ঠিক বলছি, লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।'

এর পরে আর আমি সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারলাম না। বন্ধুটি কী ভাবে পাগল হয়ে বিয়ে করেছিলো আমি জানতাম, কতো সুখী হয়েছিলো তখন তা-ও আমি দেখেছি ওদের নতুন সংসারে গিয়ে। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এতোকাল বাদে এই ভয়ানক কথা। তখনো হিন্দুবিবাহে ডিভোর্স সিদ্ধ হয় নি, বাধ্য হয়ে একসঙ্গে থাকছে আর একে অপরের মৃত্যু কামনা করছে।

ভাইবোনে ভালোবাসার মধ্যেও এমন নিষ্ঠুরতার নজির অসংখ্য। অবশ্য সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বেশী বলে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা শূন্য হয়ে গেছে নিশ্চয়ই তা নয়, কিন্তু আবেগ এতোটাই স্তিমিত হয়ে যায় যে মনের উপরতলায় প্রায় দেখাই যায় না তাঁদের। দেশে আমি যেমন আমার সন্তানদের রেখে এসেছি তেমনি তো আমার পিতামাতাও আছেন সেখানে। ছেলেমেয়ের কথা ছাড়া তাঁদের কথা আর কতেটুকু ভাবি। তাঁদের চিঠি আসুক না আসুক সন্তানদের চিঠি আমার চাই-ই চাই। না পেলেই সব সুখে বালি।

আমি আমার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে, অতি আদরে মানুষ, আমার বিবাহের পরে বিচ্ছেদ সহ্য করতে তাঁদের কতোই না কষ্ট হয়েছিলো! আমিও সেই কষ্টের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম। যতোই প্রাপ্তি ঘটুক তবুও পিতামাতার জীবন থেকে তাঁদের পদবী থেকে বিচ্যুত হবার বেদনা আমাকে যথেষ্ট অভিভূত করেছিলো। ঢাকা থেকে কলকাতা সহজ দূর নয়, ছেড়ে ছেড়ে যতোবার এসেছি, রেলিং ধরে স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে পদ্মার জলে আমার অনেক চোখের জল গিয়ে মিশেছে। তারপর শুধু চিঠির প্রত্যাশা।

যব পরেই আমরা পুরী গিয়েছিলাম, এই চিঠি নিয়ে কী হাঙ্গামা। তখন ইংরেজ আমল, ডাক চলাচলের এমন দুর্দশা ছিলো না, চিঠি ঠিক মতো ডাকে দিলে ঠিক দিনে গিয়েই পৌঁছুতো। সেই ঠিক দিনে আমার কাছে ওঁদের কোনো চিঠি এলো না। সেদিনও এলো না, পরের দিনও না, তারপরের দিন আমাদের কোনারকমন্দির দেখতে যাবার কথা। ম্যানেজার গাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন গাড়ি এসে বসে আছে, ম্যানেজার তাড়া দিচ্ছেন, বলছেন, 'বেরিয়ে পড়ুন, নইলে জোয়ার এসে যাবে।'

জোয়ারের সঙ্গে আমাদের বেরিয়ে পড়ার যে কী সম্পর্ক বুঝতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে যাত্রা শুভ অশুভের কথা বিবেচনা করে কুসংস্কার বশতই নিশ্চয় একথা বলছেন। তিনি যাই বলুন, আমরা তাঁর কথা মতো কোনোমতেই বেরিয়ে পড়তে পারছিলাম না এই কারণে যে তখনো ডাক আসেনি। ডাক এলে চিঠিটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুলে জোয়ার এলেও যাত্রা নিশ্চয়ই অনেক বেশী শুভদায়িনী হবে।

ভাগ্য মন্দ। ডাক এলো চিঠি এলো না। বুদ্ধদেব বললেন, 'কাল ফিরে এসে টেলিগ্রাম করবো, আজ চলো, সব ঠিক করেছি, জিনিসপত্র তোলা হয়ে গেছে, গাড়িওলা নিশ্চয়ই রেগে যাবে না গেলে। ক্ষতিপূরণও চাইবে। আমাদের জন্যেই তো অন্য ভাড়া নেয়নি বেচারা?'

তখন পুরী থেকে কোনারক যেতে হলে গরুর গাড়িতে যেতে হতো। ট্যাক্সি বা বাস এসবের কোনো প্রশ্নই ছিলো না, তার পথও ছিলো না। সময় লাগতো প্রচুর। বেলায় রওনা হবার দরুন গাড়িওলা 'জোয়ারো আসি যাবু, সোনধা লাগি যাবু' এই সব বলে গজর গজর করছিলো। আমাদের উঠিয়ে সে প্রাণপনে গাড়ি হাঁকালো। আস্তে আস্তে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি কাঁচা রাস্তায় পড়লো, কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠ মাঠ ছাড়িয়ে জনহীন প্রান্তর। অরণ্যও বলা যায়।

এই অরণ্য পেরিয়ে একটি নদীও আমাদের পার হতে হবে। সেই নদীর নাম নিয়াকিয়া নদী। নদীতে গোড়ালি ভেজে কি ভেজেনা এমনি জলের গভীরতা। গাড়ি তার উপর দিয়েই পার হয়ে যায়। 'পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি।'

কিন্তু আমাদের গাড়ি পার হতে পারলো না। গাড়ির চালকটি তার গরুর ল্যাজে মোচড় দিয়ে যতোই হই হই করুক না কেন জঙ্গলে প্রান্তর পার হয়ে নদীর ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গেল আকাশে পূর্ণ শশী উদিত হলেন। আর সেই মুহূর্তে গাড়োয়ান ভয়ার্তস্বরে বলে উঠলো, 'জরবোনাছো কর্‌চি'।

'কী হলো?' আমরা সচকিত হয়ে উঠে বসলাম। মাঠ-ঘাটের উঁচু নিচু পথে গরুর গাড়ির ছো-নৃত্য এতোই প্রচণ্ডভাবে আমাদের আন্দোলিত করছিলো যে এই শহুরে শরীর থেকে হাড়মাংস প্রায় খসে পড়ার অবস্থা। শুয়ে বসে ঢুলে কোনো রকমেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তার মধ্যেই আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো।

লোকটি তার স্বদেশী ভাষায় যা বললো তার মূল বক্তব্যটি এই যে, তখনি বলেছিলাম তাড়াতাড়ি চলো, নইলে জোয়ার এসে যাবে, এখন ঠ্যালা বোঝো। আজ রাত্রে আর নদী পার হওয়া যাবে না।

"কেন?"

'সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছো না? আকাশে চাঁদ উঠেছে না? এখন কি আর নিয়াকিয়া নদী সেই নিয়াকিয়া? দেখ গিয়ে কী বিশাল তার বুক, কতো তার স্রোত।'

তা হলে জোয়ারের আসল অর্থ এই? আমরা উদ্বিগ্ন হলাম। আকাশে চাঁদ উঠলে সমুদ্র এমন উত্তাল হয়ে ওঠে এই অনুভূতিও আমাদের আবিষ্ট করল। কী মহান প্রেম কী মহান দৃশ্য, কী মহান লীলা ঈশ্বরের!! আমরা নিঃশব্দে গাড়ির পিছন দিক দিয়ে একটু এগিয়ে ছইয়ের বাইরে মুখ
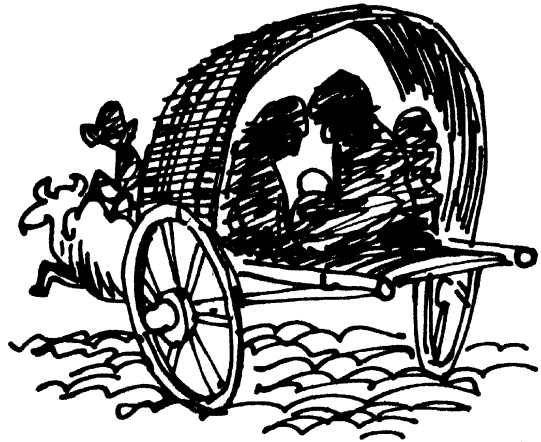
বাড়িয়েছিলাম, লোকটা প্রচণ্ড জোরে এমন একটা ধমক লাগালো যে কেঁপে গেলাম।

'জান জঙ্গল থেকে এখন শের বেরিয়ে আসতে পারে?'

'বাঘ! এখানে বাঘ আছে নাকি?'

'না নেই। তোমাদের জন্যে সব অন্য জঙ্গলে চলে গেছে।'

এতোক্ষণ যে বিনয়ের অবতার ছিলো, হঠাৎ তার এই চোখ রাঙানিতে আমরা হকচকিয়ে গেলাম।

বীররস কিন্তু সেখানেই শেষ হলো না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তারপরে দেখি শেরের ভয়ে সে ছইয়ের ভিতরে ঢুকতে চায়। ঐটুকু তো পরিসর, দুজনেই ঠাসাঠাসি। আর কী শীত। দুটো কম্বল গায়ে দিয়েও ঠকঠক করে কাঁপছি অমন দশাসই তৃতীয় লোকটাকে কোথায় বসাবো গায়ে গা ঠেকিয়ে?

চোখ বড়ো বড়ো করে সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ধরে বুদ্ধদেবকেই বেশী বকছিল। ভাষা বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু রাগটা বোঝা যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমর হাত ভর্তি সোনার চুড়ি গলায় হার সেই মতলবেই কি ভিতরে আসতে চায়? সেজনাই কি আমার রক্ষকটির উপরই ওর বেশী রাগ?

আসবার আগে সব অলংকারই খুলে রেখে আসার কথা ছিলো, ঐ চিঠি চিঠি করে সব কথাই ভুলে গেছি। এখন উপায়?

বুদ্ধদেবের ভয় কম। ভয়ের কথা তাঁর মনেই আসে না কখনো। বিপদের কথাও না। লোকটির আস্ফালনে যে খুব মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তা-ও বোধহয় নয়। শীতের প্রাবল্যে ছইয়ের পিছনে যে পর্দাটি আমরা ঘিরিয়ে নিয়েছিলুম, সেটি সরিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েছিলেন বাইরে, হাতের সিগারেটের লাল আলোটা টক-টক করছিলো। আমি ফিসফিস করলাম, 'দেখছো, লোকটা কেমন করছে।'

'ইডিয়েট। করুক। বাঘ না হাতি। তুমি আবার ভয় পাওনি তো, ওর কথায়?'

'না, আমি বাঘের ভয়ে কাতর হইনি, লোকটাকেই ভয় করছে আমার।'

'ওকে আবার ভয় কিসের? এই, তুমি এতো চ্যাঁচামেচি করছো কেন? চুপ করো।'

বুদ্ধদেব যতো জোরে ওকে একথা বললেন, সে-ও ততো জোরেই একটা কড়া জবাব দিল।

এইবার বুদ্ধদেব রেগে উঠলেন। লোকটাও সমান [illegible] হয় যেন তেড়ে আসছে। আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে লোকটির দিকে ফিরে খুব ঠাণ্ডা অথচ কড়াভাবে বললাম, 'শোনো, বাবু পুলিসের লোক—'

'এাঁ—।'

'পুলিসের লোকেদের কাছে সর্বদাই পিস্তল থাকে—বাঘই আসুক আর চোর ডাকাতই আসুক, সকলকেই মরতে হবে গুলি খেয়ে। সেজন্য আমাদেরও কোনো ভয় নেই, তোমারও বাঘের ভয়ে অস্থির হতে হবে না।'

আমার এই মারাত্মক মিথ্যা ভাষণে বুদ্ধদেব একেবারে থ। কিন্তু লোকটি সংগে সংগে ভেজা মুড়ির মতো মিইয়ে গেল। তারপর আর একটি কথা নয়। রাত চারটা পর্যন্ত গাড়ি নিঃশব্দে থেমে রইলো নিয়াকিয়া নদীর ধারে। আস্তে-আস্তে রাত কাটলো, সমুদ্রের গর্জন স্তম্ভিত হলো, ভাটার টানে ফিরে গেল জল, চাঁদ ডুবলো, দিগন্ত রঞ্জিত করে সূর্যের আগুন দেখা দিল বরাভয় নিয়ে। আমরা নিয়াকিয়া নদী পার হলাম।

ঝাউবনের মধ্যে সুন্দর একটি ডাক-বাংলো ছিলো। সাহেব সুবোরা গিয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে। আমরাও গিয়ে সেখানে উঠলাম। সংগে সবই ছিলো। চা চিনি কণ্ডেন্সড্ মিল্ক কাপ প্লেট টিপট, রুটি ডিম কলা মাখন খেজুর—ম্যানেজার বলেছিলেন, 'চাল ডালও নিয়ে যাবেন, আজ রাত্তিরে খেতে হবে, কাল দুপুরে খেতে হবে—' আমরা আনিনি, এমনিতেই লেপ-তোশকের ভিড় গাড়ির ভিতরটা আকণ্ঠ, তার উপর এসব ভজকট অসম্ভব।

অসম্ভব শব্দটা অবশ্য বুদ্ধদেবের। যা নিচ্ছিলাম তাই তাঁর অসম্ভব মনে হচ্ছিলো, কিন্তু কোনারকে তখন যে কিছুই সম্ভব ছিলো না সে কথাও তাঁর অবিদিত ছিলো না। তবে একান্ত প্রত্যক্ষ বস্তু বিছানা ব্যতীতও যে এতো কিছু সংগে এসেছে সেটা অবিদিত ছিলো। ডাক-বাংলোর চৌকিদার জল ফুটিয়ে দিলে যখন চায়ের সংগে এই সব খাদ্যের সংযোগ হলো তখন মহা খুশী। রাত্তিরে তো অনাহার গেছে, বিকেলে একবার গরুর গাড়ি থামিয়ে পথে নেমে স্পিরিট-স্টোভ জ্বালিয়ে চা করেছিলাম, বিস্কুট সহযোগে সেই চা-পান ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। জুটবে কী! যা বিশ্রি একটা রাত কাটলো। লোকটা সত্যি কেমন ভয়ানক হয়ে উঠছিলো। অথচ এখন? আমাদের সংগে সমান জলযোগ করে পান খাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতে কেমন হাসছে।

সূর্যমন্দির প্রদক্ষিণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। বুদ্ধদেব বললেন, 'এসো একটা দিন থেকে যাই।'

থাকা যেতো। আমারও খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু কাল রাত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতির পরে আর অজানা অচেনা জায়গায় রাত কাটাতে ভরসা হলো না। দিনের গাড়োয়ান রাত্রিবেলা যা হয়ে উঠেছিলো, দিনের চৌকাদারও যে সেই রাত্রিতে তার ব্যতিক্রম হবে না ঠিক কী? আমরা ছাড়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে যতোদূর পর্যন্ত চোখ যায় আর একটি লোকও তো দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় অন্য কোন গ্রহে এসে ছিটকে পড়েছি।

'তোমার বড্ড ভয়, ওরকম করলে দেশ ভ্রমণ হয় না।' তারপরেই হঠাৎ ঝাউবন কাঁপিয়ে প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠে বললেন, 'আচ্ছা, কাল কী করে তুমি ও রকম একটা কথা বানিয়ে বললে? আমাকে একটা পুলিশ সাজিয়ে দিলে? তার উপর পিস্তল—' হাসতে হাসতে অস্থির।

হাসুক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল রাত্রে লোকটার মাথায় কোনো দুর্বুদ্ধি চেপেছিলো।

ম্যানেজার যা বলেছিলেন ঠিক নয়, ডাক-বাংলোর চৌকিদার আমাদের বেলা এগারোটার মধ্যেই গ্রাম থেকে মুর্গি এনে ঝোল-ভাত করে দিল। চান করার জন্য জল দিল বাথরুমে। আসলে 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' প্রবাদই সত্য। টাকা দিলে সব হয়। এবং সেই টাকাটা সে খুব ভালো হাতেই নিল। নিলে ও দিল যে সেটাকেই ভাগ্য মানলাম। তারপর রওনা হয়ে পড়লাম খুব তাড়াতাড়ি। দুপুরের রোদ থাকতে থাকতেই যাতে বন-জংগল-প্রান্তর পেরিয়ে লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারি সেটাই উদ্দেশ্য ছিলো। তা হলো। এবং গরুর গাড়ির লোকটি ঠিক আগের মতোই বিনীত আনত হয়ে গাড়ি চালালো। হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় রাত। আর এসে পৌঁছোনো মাত্রই পুরী হোটেলের ম্যানেজার পেট মোটা দুখানা চিঠির খাম এনে হাতে দিলেন। দুখানাই মা-বাবার। কী জানি কী কারণে ঠিক দিনে না এসে একসংগে দুখানা এসেছে। আর সেই চিঠি পেয়ে এবং পড়ে কী আনন্দ, কী আনন্দ।

বিশেষজ্ঞ বলেন স্মৃতি দুর্মর। সত্যিই তাই। তা না হলে এতো কাল বাদে, সেই কোনারকের স্মৃতি উথলে উঠলো কেন? কবেকার কোন্ লণ্ঠন জ্বালা অতি মলিন পুরী হোটেলের বাঙালী ম্যানেজারের সংগে নিউ ইয়র্ক শহরের এই উজ্জ্বল আলোকিত হোটেলের জর্মান সাহেবটিকে একাত্ম বলে বোধ হলো কেন? আর চিঠি? চিঠি আজও সন্তানদের খবর নিয়ে যে আনন্দ বহন করে, এনেছে সেদিনও মা-বাবার খবর নিয়ে সেই আনন্দই বহন করে এনেছিলো। সেই সুখেরই পুনরাবৃত্তি এই সুখ। আমার পাত্র পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু স্মৃতির যে কোনো স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান নেই সেটা অবিসংবাদী সত্য বলে মেনে নিতে হলো। লাটাইয়ের মতো, ঘুড়ি উপরে উঠলেই হলো, সুতো সে টেনেই নেবে যতোক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়। আমার গুটিপোকা থেকেও সব স্মৃতির সুতো বেরিয়ে আসছে। একের এর এক। একের পর এক। সব কি লিখে শেষ করা যায়? বলার ধৈর্য—থাকলেও শুনবে কে?

দণ্ডনীয় অপরাধ

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

মানুষ অমরত্ব থেকে বঞ্চিত। এটা অবশ্য একটা চমকপ্রদ বিবৃতি নয়। সময় উত্তীর্ণ হলে প্রত্যেক জীবকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হবে। বিধাতার, যদি তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার মতো মানসিক দুর্বলতা না থাকে তবে প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান লংঘন করতে পারবেন কেউ, এর কখনও এতটুকু নড়চড় হবে না। করুণা, ক্ষমা ও অনুরাগ, দৈন্য, দুঃখ ও অবজ্ঞায় ভরা এই বসুধায় জীবনের প্রথম প্রভাত থেকে এভাবেই আবর্তিত হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু উপাখ্যান। সে জন্যই স্বাভাবিক কারণে মৃত্যুতে সমগ্র সমাজে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ব্যক্তি অথবা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নিকট সেই মৃত্যু যত শোকাবহই হোক না।

ঠিক কথা, প্রত্যেক মৃত্যুতে অবক্ষয় হয় প্রবহমান জীবনের; মৃত বঞ্চিত করে চালিকা জীবনকে। সমাজ তাতে ব্যথিত হলেও অভিভূত হয় না। কেন না, এটা অবিদিত নয় যে মানুষ নশ্বর, জীবন অবিনশ্বর। লয় যা হয় তা সৃষ্টি-স্থিতির প্রয়োজনে, তার বিরুদ্ধে সেটা উদ্ধত প্রতিবাদ নয়। এই বিষয়ে সচেতন বলেই কোন মৃত্যু সমাজকে অনাবশ্যক আলোড়িত করে না। ব্যক্তিজীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু এবং স্থিরতার সংগেই তা গৃহীত হয়। অবশ্য মৃত্যুকে জয় করবার বাসনা, ব্যক্তিজীবনকে চিরস্থায়ী করবার প্রয়াসে তিল-মাত্র শৈথিল্য দৃষ্ট হয় না। সম্ভব হলে জন্ম-মৃত্যু আবর্তনের অনুশাসন এখনি পালটে দিত। সেটা সম্ভব নয় বলেই, অন্তত এখনও, এই অমোঘ বিধি সমাজ সহ্য করছে।

একবারে বিপরীত মনোভাব পরিলক্ষিত হয় অন্য এক ক্ষেত্রে। যেখানে জীবন-ঐকতানের অন্তিম লয়, এর স্বাভাবিক উপসংহার হিসাবে মৃত্যুর আবির্ভাব হয় না, আচমকা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া হয় চলার গতিতে। সমাজের ভারসাম্য তাতে বিচলিত হয়, বাঁধ-ভেংগে যায় অভ্যস্ত স্থৈর্যের। অক্ষম রোষে বিক্ষুব্ধ হয় সমাজ যখন মৃত্যুর ভেতর দেখা যায় সুচিন্তিত সংকল্পের প্রতিফলন। সাদামাটা ভাষায়, মানুষ যখন আত্মহত্যা করে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সমাজের ভিতে নাড়া দেয়। নিজ জীবন যে ব্যক্তি স্বহস্তে হত্যা করে তার প্রতি সমাজের ক্ষমা নেই, না আছে কণামাত্র সমবেদনা। তা নেই এই জন্য যে তার কাজ একান্ত অশুভ ও অবৈধ, সে দুর্বৃত্ত। তাই বা কেন, মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের জীবন-স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় সে নিন্দনীয়। কেন না, সেই অধিকার সে আত্মসাৎ করে যা সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তার। আত্মঘাতী অপরাধী তো বটেই, তার অপরাধ দন্ডনীয়। বিচারের কাঠগড়ায় তাকে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলেও কৃতকর্মের অপবাদ থেকে সমাজ তাকে রেহাই দেবে না। এর ফল ভোগ করতে হয় তার প্রিয়জনকে। ভোগ করতে হয় এই জন্য যে জীবিতদের বদ্ধমূল ধারণা আত্মহত্যা পুরোদস্তুর দুষ্কর্ম, এটা সভ্য জীবনের পবিত্রতাকে ব্যংগবিদ্রূপ করে। অন্য সকল যুক্তিতর্ক ছাড়া, টমাস জি ম্যাসারিক-এর মতে, আত্মঘাতীর সবিশেষ অনৈতিকতার অভিব্যক্তি তার নিরাশ্বাস ও হতাশা, তার প্রতীতির অভাব। সে অবিশ্বাসী, তার বিশ্বাস নেই যে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব।

হয়ত অবান্তর হবে না যদি বলা হয়, আত্মহত্যা-কারী সম্পর্কে এই অভিমত, স্থান বা সময়ের পরি-প্রেক্ষিতে, সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সুদূর ঐতিহাসিক কাল থেকে আত্মহত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মনো-ভাবের—নৈতিক, সদসৎ ও অন্যতর—পার্থক্য অনস্বী-কার্য। প্রাচীন গ্রীসের কথাই ধরা যাক। এথেনস যখন মানবসমাজের নীতিশাস্ত্র ও ভব্যতা, চারুকলা, সাহিত্য ও দর্শনের দীক্ষক ছিল, সেখানকার প্রত্যেক নাগরিক আত্মহত্যাকে দুষ্কৃতি বলে গণ্য করত না। হোমার ... তার রচনায় এই সম্পর্কে যা উল্লেখ আছে তা আত্মহত্যার প্রতি ধিক্কার নয়। তাঁর কাব্যে, ম্যাসারিকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, প্রায়শ আত্মহত্যার উল্লেখ নজরে পড়ে।

এমন গ্রীসবাসীর সংখ্যা অবশ্য কম ছিল না যাঁরা অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর মতো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের চিন্তায় আত্মহত্যা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আবার পোরিগ্রিনাস, জেনো, ডিমসথেনিস ও লাইকারগাস-এর ন্যায় স্মরণীয় বিদগ্ধজনেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা কেবল অন্যের আত্মহত্যার অধিকার সমর্থন করে ক্ষান্ত হননি, নিজেরাও আত্মঘাতী হয়ে-ছিলেন। এথেনস-এর ন্যায়সংহিতা বা সিভিল কোড অনুযায়ী আত্মহত্যা অপরাধ নয়। এই বিষয়ে রোমান-দের ভিন্ন অভিমত ছিল, তা নয়। স্টোইক এবং সিনিক দার্শনিকরা অনুকম্পার সংগে বিচার করতেন এই সমস্যার। বলতে কি, পরবর্তীকালে রোমান স্টোইকরা বিশদভাবে আত্মহত্যার এক সদর্থক দর্শন রচনা করেন। প্লিনি বলতেন, আত্মহত্যা মানুষের পূর্ণতার সাক্ষ্য। কোন ইতস্তত না করে সেনেকা এই বক্তব্য রাখতেন যে, ভার্জিলউ ই এইচ লেকির ভাষায়, জীবন আনন্দদায়ক হলে অবশ্যই বেঁচে থাকা উচিত। তা যদি না হয়, উৎসে প্রত্যাবর্তনের অধিকার আছে প্রত্যেক ব্যক্তির। লুক্রেশিয়াস, সেনেকা, ক্যাটো এবং ব্রুটাস সেই খ্যাত-নামা রোমানদের অন্যতম যাঁরা নিজেদের প্রাণনাশ করে-ছিলেন।

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রত্যূষে সিক্সথ কম্যানডমেনটের নির্দেশ পরিপন্থী কোন ব্যাপারে এর কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না। ইউরোপে রেনেসাঁস, নবজাগরণের সংগে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। জন ডোন-এর বায়থানা-টোস-এ আত্মহত্যার সমর্থন রয়েছে। নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে তার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের বোঝা বহনে বাধ্য করার বিপক্ষে ছিলেন ডেভিড হিউম। সমকালীন আরও অনেক মনীষী সরল ভাষায় আত্মহত্যার ন্যায্যতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। সোপেনহাউয়ার-এর বিবেচনায় আত্মহত্যা মনুষ্যেতর প্রাণীর ওপর মানুষের বিশেষ অধিকারের ইংগিত বহন করছে। স্পষ্ট ভাষায় ফিকসটে বলেছেন, স্বেচ্ছা মৃত্যু বা আত্মহত্যা প্রকৃতির ওপর মানুষের ভাবনাচিন্তার সার্বভৌমের সর্বোত্তম প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-সংরক্ষণের অবিরাম প্রচেষ্টা চলেছে; কিন্তু এর পুরো-পুরি বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয় স্বেচ্ছায় জীবন-নাশের সিদ্ধান্তে।

ভারতবর্ষে আত্মহত্যার প্রতি মনোভাবে সমর্থন-সূচক যুক্তি বরাবর বিদ্যমান। স্মরণাতীত কাল থেকে এটা স্বীকৃত যে আত্মবলিদানের অধিকার অলংঘনীয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যের উল্লেখ করে বলা যায়, আত্মহত্যা কখনও গর্হিত কাজ হিসাবে গণ্য হয়নি। ভীষ্ম স্বেচ্ছা-মৃত্যুবরণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিলেন; সীতার আত্মোৎসর্গ আত্মহত্যারই নামান্তর। সেই সংগে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে শাস্ত্রপুরাণের ভূরি-ভূরি নির্দেশের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও তা রাজ-পুত মহিলাদের জহরব্রত (আত্মসম্মান রক্ষার্থে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবনাবসান) পালনে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অন্যান্য অনেক রাজপুত মহিলাদের মতো পদ্মিনী যেভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। জাতির ইতিহাস, তার সাহিত্য, রূপকথা ও লোকপ্রবাদ সেই আত্মবিসর্জনকে সাহস, সংকল্প ও আত্মত্যাগের এক অতুলনীয় গাথারূপেই বর্ণনা করেছে যুগ যুগ ধরে। সতীদাহও এক ধরনের আত্মহত্যা (অবশ্য যেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাধ্যতা-মূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় না), যার পিছনে সমাজের সমর্থন ও উৎসাহ ছিল এবং যাতে সে পবিত্র-তার শিরোপা চড়িয়েছে। অবস্থা বিশেষে আত্মহত্যা জৈন সম্প্রদায়ের কাছে অনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হয়নি।

প্রাচীন হিন্দু বিধানে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়াগে ত্রিবেণী সংগমে আত্মহত্যার অনুমোদন ছিল। পরবর্তী-কালে প্রয়াগের অনুকরণে অন্যান্য তীর্থস্থানে স্বর্গ-প্রাপ্তির আশায় আত্মহত্যার প্রচলন হয়। যাঁরা এই

জনের 'ধর্মীয়' আত্মহত্যা করতেন তাঁদের নৌকাযোগে কোন পবিত্র নদীসঙ্গমে নিয়ে গিয়ে সময়োপযোগী অনুষ্ঠানের পর সলিল সমাধি দেওয়া হত। হিন্দু ধর্মীয় বিধানে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দুর্বহ ক্লেশ থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার অনুমতি ছিল। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগসুখের মোহ-মুক্ত ব্যক্তির আত্মহত্যার অধিকারও স্বীকৃত হত। এই সম্বন্ধে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল সেমিনার অন সুইসাইড'*, আত্মহত্যা সম্পর্কে *জাতীয়* সেমিনারে বিস্তৃত আলোচনা করেন আর ডি শ্রীবাস্তব। সমকালীন অবস্থার আলোচনা স্বভাবতই হরিবিষ্ণু কামাথের বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবে। কনসটিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে ভারতবর্ষের খসড়া সংবিধানের ওপর তর্কবিতর্কের সময় কামাথ সুপারিশ করেন যে *আত্মহত্যার অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া* উচিত। প্রসংগত, *জাপানে আত্মহত্যা একটা প্রথা হয়ে* দাঁড়িয়েছে। ওদেশে আত্মহত্যা অপ্রীত মনের এক সর্বস্বত অভিব্যক্তি। *নিঃসন্দেহ, যে হারাকিরি করে,* জেনাল তোজো হোক বা ইউকিও নিসিমা, তার সম্পর্কে অশ্রদ্ধাজনক উক্তি খুব বেশি সংখ্যক জাপানী করবে না।

প্রশ্ন উঠবে, কী কারণে ব্যক্তিবিশেষ হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ নে দেয় তার জীবনযাত্রায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার গেই কেন সে সমাপ্ত করে দেয় তার যাত্রা। গতানুতিক ভাষায়, কেন মানুষ আত্মহত্যা করে। প্রশ্নটা তের মতোই পুরাতন। এর জবাব দেবার বহু চেষ্টা য়েছে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের শুরু থেকেই। জও হচ্ছে। প্রশ্নের সমস্ত দিক জ্ঞানীগুণীরা খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন, গবেষণা হয়েছে নেক এই সম্পর্কে। কিন্তু এখনও তাঁরা এমন কোন ত্তর দিতে সমর্থ হননি, যা যুক্তির কষ্টিপাথরে চাই করা যেতে পারে। একটি বিষয়ে তাঁরা মোটামুটি কমত বলে বোধ হয়। আর তা হচ্ছে, এরিক ফ্রোমের ষায়, আত্মহত্যার সমস্যাটা বড় জটিল। নির্দিষ্ট কোন কটি উপাদানকে এর নিমিত্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ।

এই বক্তব্য সম্পর্কে বাদানুবাদ বিদগ্ধ মানুষজনের ছে একটা উদ্দীপক অনুশীলন হতে পারে। কিন্তু তে আত্মহত্যার প্রশ্নটিকে ঘিরে যে গভীর রহস্য ছে তা উদ্ঘাটিত হবে না। বিশেষ একটি হেতুকে আত্মহত্যার জন্য দায়ী করলে এই বহুমাত্রিক সমস্যাকে কমাত্রিক সমস্যারূপে দেখা হবে। কে অস্বীকার রবে সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রূপ-রস-রঙে ভরা ই পৃথিবী মধুময়; মধুময় এর আকাশ, আলো ও তাস; বসন্তের মাধুর্য, বর্ষার সঙ্গীত ও শরতের নগ্ধ শ্যামলিমা। কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুন্দর নবজীবন। জীবনের উষ্ণতাকে অনুভব করা, এর ক অভিজ্ঞানকে বিস্ফারিত বিস্ময়ে অবলোকন করা— ক কথায় শুধু বেঁচে থাকাই পরম সুখ। তাকে স্থায়ী করতে, জীবনকে ধরে রাখতে হেন কাজ নেই করতে মানুষ অনাগ্রহী। হতে পারে সেই জীবন তন্ত্রী, তবুও জীবন-তৃষ্ণা চিরন্তন। শুধু দিনযাপনের গ্লানি, সমস্ত উপেক্ষা, অপমান, ব্যর্থতা ও অপূর্ণ আশার পুঞ্জীভূত অবসাদ সত্ত্বেও জীবনের প্রতি নুষের সীমাহীন আসক্তি। এটা কঠিন বাস্তব।

এর অবশ্য ভিন্ন একটা দিক আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) ১৯৭৬-এ কাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিদিন ১০০০ রুষ ও নারী, এর মধ্যে ১১০জন ভারতীয়, আত্মহত্যা রে। আর আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথের সংখ্যা র অপেক্ষা প্রায় আট গুণ বেশি। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুলিস গবেষণা ও য়ন ব্যুরোর এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ১৬৭—১৯৭৪ এই আট বছরে গড়ে প্রতি এক লক্ষ াকের ভেতর বছরে দশ জন আত্মহত্যা করে। ১৯৭৪ ল থেকে প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তার গে এই জায়গাটায় ছিল গুজরাটের অধিবাসীরা। ১৭৫-এ ইনসটিটিউট অফ ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ফরেনসিক সায়ান্স—এঁরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করেন—কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে প্রতি বছর মোট আত্মহত্যার প্রায় ষাট শতাংশ পুরুষ। মোট আত্মহত্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের বয়স ২৮ বছরের নীচে এবং শতকরা প্রায় ষাট জনের বয়স তিরিশ পার হয়নি। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক। ইনসটিটিউট অফ ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড *ফোরেনসিক সায়ান্সের অধ্যাপক কে এস শুক্লার অভিমতে এদেশে আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণগুলির* অন্যতম হচ্ছে ভয়াবহ দুরারোগ্য ব্যাধি, শ্বশুরালয়ের লোকজনদের সংগে ঝগড়াবিবাদ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, দারিদ্র্য; শতকরা ৪ ভাগ আত্মহত্যার জন্য দায়ী ব্যর্থ প্রেম, শতকরা ২.৪ ভাগ আত্মহত্যার কারণ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা। প্রতিবেদনটি যে মোটেই সুখপাঠ্য নয় তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অন্য দিকে, যদি বলা হয় যে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে অধিক সংখ্যক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত—দণ্ডসংহিতার আরও স্থূল ব্যাখ্যায়, তাদের মানসিক ভারসাম্যের সাময়িক অবলুপ্তি ঘটেছে—তা হলে অনেক দুশ্চিন্তার লাঘব হয়, সমাজচিত্তও অযথা বিচলিত হয় না। কিন্তু সেটা ওই দুরূহ বিষয়টির যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার সহায়ক হবে না। মনোবিদের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে তিনি চোখকান বুজে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করবেন মানবমনের গভীরে, এবং চিকিৎসক বলবেন আত্মহত্যা একটা বিকৃত অবস্থা। এ সম্পর্কে রেমং আর-র বক্তব্যের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে। আরং বলতে চান যে চিকিৎসক ও মনোবিদদের মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যা সমস্যার অনুধাবন করেছেন তাঁরা এটাকে মনোবিদ্যাগত অথবা মানসিক ব্যাধিজনিত সমস্যারূপে ব্যাখ্যা করবার দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁদের মতে বেশির ভাগ আত্মহত্যাকারী এই কাজ সংঘটনের সময় মনোবিকারগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। তাদের ভাবপ্রবণতা বা মনোগত বিকৃত অবস্থা পূর্বাহ্নেই আত্মহত্যার প্রতি তাদের অনুরাগী করে দেয়।

আত্মহত্যার মামুলী কারণগুলির কোনওটি এমিল ডুর্কহাইম গ্রহণ করতে নারাজ। প্রসংগত, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসাবে সমাজবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ডুর্কহাইম সর্বপ্রথম আত্মহত্যার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেন। যে সমস্ত সামাজিক শক্তি আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে সেগুলি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন ডুর্কহাইম। তাঁর বিবেচনায় আত্মহত্যার মুখ্য হেতু সামাজিক, মনোবিদ্যাগত। তিনটি টাইপে তিনি আত্মহত্যাকে শ্রেণী বিভক্ত করেছেন—ইগোইস্টিক সুইসাইড বা অহমপ্রসূত আত্মহত্যা; অলট্রুইস্টিক সুইসাইড বা পরার্থবাদসম্মত আত্মহত্যা; এবং অ্যানোমিক সুইসাইড। ইগোইস্ট নরনারী মুখ্যত নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তায় বিভোর এবং কোন সামাজিক গোষ্ঠীর সংগে তারা সংহত নয়। এদের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। অলট্রুইস্টিক সুইসাইড সাধারণত তখনই হয় যখন কোন ব্যক্তির সংগে সমাজের ইনটেগ্রেসনের অর্থাৎ সংহতির আধিক্য দেখা দেয়। আর অ্যানোমিক সুইসাইড তখন ঘটে যখন প্রচলিত সামাজিক বন্ধনগুলি ভেংগে পড়ে, রাষ্ট্রের কাছে গৌণ হয় প্রকৃত সামূহিক সংঘটন এবং যথার্থ সামাজিক জীবন বিনাশ পায়। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ডুর্কহাইমের বক্তব্য আত্মহত্যার সমস্যা সম্পর্কে অবশ্য শেষ কথা নয়। নানান দিক থেকে এই প্রশ্নের বিচার করেছেন সমাজবিৎ সমেত অন্যান্য অনেক পণ্ডিতব্যক্তি। কিন্তু আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়ে গেছে প্রচুর এবং কোন দুটি মতের ভেতর পারস্পরিক মিল নেই। আলবের কামু, তিনি আত্মহত্যার বিরোধী, আত্মহত্যাকে 'এ গ্রেট ওয়ার্ক অফ আর্ট', একটা মহৎ শিল্পকর্মের সংগে তুলনা করেছেন। সৃজনী শিল্পকর্মের মতোই আত্মহত্যার ভাবনা প্রথমে আশ্রয় নেয় মানবমনের অবচেতনে। ক্রমে সেটা দানা বাঁধে, তারপর ভেসে ওঠে চেতনায়। তখন হঠাৎ একদিন সে পাড়ি দেয় চির অজানার উদ্দেশে। আবার এমন মানুষের অভাব নেই যারা আত্মহত্যা করে এই চিন্তায় যে পৃথিবীটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন; ঈশ্বরের প্রতিচিত্রের প্রতিফলন নেই এর কোথাও। অথবা এই ভাবনায় যে মানুষের প্রজ্ঞা সত্তার সেখ... যে জন্য প্রমিথিয়াস অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

পুনরাবৃত্তি হবে জেনেও বলতে হয়, আত্মহত্যার পিছনে বিশেষ একটি হেতুর সন্ধান করা নিরর্থক প্রয়াস। অনুমান এইমাত্র করা যায় যে, নিজ সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি সহানুভূতির সংগে গৃহীত না হয় তবে সেটাকে আংশিকভাবে মনোসমাজবিদ্যাগত কারণ বলা যায় যা আত্মহত্যার *সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।* বুঝতে কষ্ট হয় না যে বর্তমান যুগে মানুষ তার নিজ সৃষ্টির শিকার, সুদূর অতীতে যেমন সে ছিল প্রকৃতির। যে যুগে অযৌক্তিকতার নিকট যুক্তি পরাজিত; যখন যুদ্ধ, মৃত্যু ও মানব মননের দ্রুত সম্প্রসারিত সংকটের বিষণ্ণ ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষের কাছে জীবন ঠিক ততটা অর্থবহ নাও হতে পারে যতটা দাবি করা হয়। এই অবস্থায় আশা ও নিরাশার মধ্যে অপাস্রিয়মান সন্ধ্যালোকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি এই উপসংহারে পৌঁছতে পারে যে, যে-জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পূর্বনির্দিষ্ট, তাকে ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম উদ্দেশ্যহীন। এই অনুভূতি ও আত্মহত্যার মধ্যে বিভাজক রেখা নেহাৎ সূক্ষ্ম।

স্মরণাতীতকাল থেকে আত্মহত্যা একটি বহুবিতর্কিত সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মতো কতকগুলি রাষ্ট্রের দণ্ডসংহিতা সোজাসুজি বলে দিয়েছে আত্মহত্যা ও আত্মহত্যার চেষ্টা উভয়ই দণ্ডনীয় অপরাধ। অতএব আত্মহত্যাকারীকে নাগালের ভেতর না পেলেও আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রয়াসীকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির হতেই হবে। সমাজরচিত দণ্ডবিধি প্রচলিত রীতিনীতির কোন ব্যতিক্রম সহ্য করবে না। কেন এবং কী উদ্দেশ্যে ওগুলির প্রচলন হয়েছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক, অন্তত রাষ্ট্রশক্তি তাই মনে করে। তা যাই হোক, যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আত্মহত্যাকে দণ্ডনীয় অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করা কেবল হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নয়, একান্ত অযৌক্তিক। সে জনাই বোধ হয় ১৯৭১ সালে ইন্ডিয়ান ল' কমিশন লোকসভার নিকট প্রদত্ত প্রতিবেদনে আত্মহত্যার প্রয়াসীর প্রতি একটু ক্ষমাশীল হতে আবেদন রাখেন। সহজবোধ্য ভাষায় ল' কমিশন বলেন, 'it is a monstrous procedure to inflict further suffering on an individual who had already found life so unbearable, his chances of happiness so slender that he has been willing to face pain and death in order to cease living'——জীবন যে ব্যক্তির কাছে এতই অসহনীয়, সুখের সম্ভাবনা এতই ক্ষীণ যে মুক্তির জন্য যন্ত্রণা ও মৃত্যু বরণে ইচ্ছুক তাকে আরও কষ্ট দেওয়া একটা বীভৎস রীতি।

হেতু আত্মহত্যার যাই হোক, এটা সমাজের সামূহিক বিবেকের বিরুদ্ধে অসংযত আ... নয়। মূলত আত্মহত্যা মানব অস্তিত্বের একটা সমস্যা—'এ প্রবলেম অব হিউম্যান এক্জিসটেনস'। সর্বনাশা পদক্ষেপের পূর্বে মানুষের মনের গহনে কী দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেটা নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধান চলেছে বহু যুগ যাবৎ। এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। বোধ হয় সম্ভাব্য আত্মহত্যাকারীর জীবন সম্পর্কে 'মাইক্রো ভিউ' কোন এক সময় স্ফীত হয়ে যায় এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে শেষোক্তের আধিপত্য বজায় থাকে। নৈরাশ্যের সুড়ংগপ্রান্তে কোন আলোকবিন্দু দৃষ্টিগোচর হয় না। আর তখনই আত্মহত্যায় ইচ্ছুক ব্যক্তি বহতা জীবনস্রোত থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিতে মনস্থ করে। লুই আই ডাবলিনের উক্তি সম্ভবত এখানে অবান্তর হবে না—আত্মহত্যা সম্পর্কিত বহু পঠন-পাঠন এবং মনঃসমীক্ষণের প্রচুর উৎকর্ষ সত্ত্বেও এই বিষয়টি এখনও আগের মতোই দুর্বোধ্য। মনোরাজ্যের মধ্যগত ও বহিস্থ অনেকগুলি হেতু এমন জট পাকিয়ে আছে যে কোন একটিকে আত্মহত্যার প্রধান কারণরূপে নির্ধারণ করা যায় না। যায় না এই জন্য যে, প্রত্যেক সাধারণ সংজ্ঞাকে নাকচ করে দেয় পরবর্তী আত্মহত্যার ঘটনা। পরিশেষে, সম্পূর্ণ নিরাভরণ ভাষায় এই বক্তব্য পুনরায় পেশ করতে চাই যে, আত্মহত্যা ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট-এর সমস্যা নয়।

বিজ্ঞান

শিশু এবং জনস্বাস্থ্য

শৈশব থেকে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেকে যদি সচেষ্ট হন তা হলে অনেক রোগই কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়। আর এর জন্যে দরকার: এক, বিশেষ ধরনের আচরণ; দুই, বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে কিছু কিছু খবর জেনে রাখা।

এই দুটি বিষয় মনে রেখে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে শিশুদের কি আমরা কাজে লাগাতে পারি না? প্রশ্নটি তুলেছেন আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক (ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগ্যানাইজেশন বা 'ইউনেসকো') সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সে সম্পর্ক বড় নিকটের। ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে তারা খেলা করে, পরস্পরের হাসিকান্নার তারা অংশীদার হয়। ছোট্ট ভাই অথবা বোন তার নিজের আর 'ছোট্ট' ভাই অথবা বোনটিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয় কখনও কখনও। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় প্রতিটি পরিবারে। এইভাবে চলতে চলতে তাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে অদ্ভুত এক মমত্ববোধ, সমব্যথী চরিত্র। একটু সচেষ্ট হলেই, তাদের এই চরিত্রকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়।

অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান, পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে, আরও বাড়বে। আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য-কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই সব কেন্দ্রের কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। দেখা গেছে, খুব সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে চললে বহু রোগের আক্রমণ থেকেই দূরে থাকা সম্ভব। এমন কি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন সমস্যা দেখা দিলে কিভাবে তার সমাধান করতে হয়, সব সময় তার জন্যে যে জটিল জ্ঞানের প্রয়োজন তাও ঠিক নয়। দরকার খুঁটি-নাটি কিছু অভিজ্ঞতা এবং উদ্যোগ। এবং যেহেতু ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে, একটু চেষ্টা করলেই স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে তাদের আমরা ব্যবহার করতে পারি।

এ কথা ভেবেই সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিকল্পনা রচনায় ব্রতী হয়েছে। যার উদ্দেশ্য

দিদি তার খুদে বোনটির পুষ্টি পরীক্ষা করছে শাকির-ফিতের সাহায্যে

উন্নয়নশীল দেশের গ্রাম এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষক এবং স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাদের বয়েস পাঁচ বছর বা তারও নিচে। এই আদর্শের কথা মনে রেখে ইউনেসকো আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালটিকে 'চাইল্ড টু চাইল্ড প্রোগ্রাম'-এর বছর হিসেবে পালন করার পরি-কল্পনা নিয়েছে। এতে সহযোগিতা করবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এর উচ্চমণ্ডলীয় শিশুবিশেষজ্ঞ ডঃ ডেভিড মরলি মন্তব্য করেছেন: কাজটি কিন্তু খুবই সহজ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের নতুন কোন আইডিয়া দিন। দেখবেন টপ করে সেটা ওদের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। ওরা তখন নিজেরাই সেই আইডিয়া নিয়ে নানারকম কল্পনা করতে শুরু করে দেয়। স্কুলে, বাড়িতে, যেখানে সুযোগ পায় তা নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। বাড়িতে ছোট ছোট ভাইবোন পেলে তো কথাই নেই।

অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই। ধরুন, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোন রোগ নিয়ে কথা বললেন। কথা বললেন, অপুষ্টি হলে কারোর শরীরে কি ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় সে সম্পর্কে। শিখিয়ে দিলেন, কি করে থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর মাপতে হয়, বড়ির সাহায্যে জল বিশোধন করতে হয়, ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে কিভাবে জামাকাপড় পরতে হয়, এমন সব পদ্ধতি। শিখে নেওয়ার পর দেখবেন, ওইসব শিশুরা নিজেদের ভাইবোনের ক্ষেত্রে এসব বিদ্যে বেশ তৎপরতার সঙ্গেই কাজে লাগাচ্ছে।

প্রসঙ্গত ডঃ মরলি এক ধরনের ফিতের কথা উল্লেখ করেছেন। নাম—শাকির ফিতে। ইরাকের জনৈক বিশেষজ্ঞ ডঃ শাকির আদলের নাম অনুসারে ওই ফিতের অমন নামকরণ করা হয়েছে। কোন শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে কি, না, ওই ফিতের সাহায্যে সহজেই তা জানা যায়। এটি আসলে খুব সরু এক ফালি এক্স-রে ফিল্ম। শিশুর বাহুর ওপর দিকে জড়িয়ে দিতে হয়। পরে ফিতের রঙ পালটাল কি না, তা দেখে অপুষ্টিতে কে ভুগছে, কে ভুগছে না বলে দেওয়া যেতে পারে।

'আমাদের অভিজ্ঞতা, ঠিকমত শিখিয়ে দিতে পারলে প্রাথমিক স্কুলের অনেক ছেলেমেয়েই এ কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারে।' বলেছেন ডঃ মরলি। তাঁর সতীর্থেরা এমন কথাও বলেছেন, ধরুন পরিবারে কারোর পেটের অসুখ হল। উদরাময় ইত্যাদি। কিংবা কলেরা। এসব রোগে শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। কম সময়েই রোগী দুর্বল এবং মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে লবণ এবং চিনি (গ্লুকোজ) জলে গুলে খেতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। কিভাবে এ কাজটি করতে হয় শিশুদের সেটা শিখিয়ে দিয়ে দেখা গেছে এ ব্যাপারে মোটেই তারা অপারগ নয়।

তাঁদের বক্তব্য, পরিবারে ছোট্ট কোন শিশুর নিউমোনিয়া হয়েছে। অনেক সময় তার প্রাথমিক প্রকোপ পরিবারের বড়দের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু ওই শিশুর দাদা অথবা দিদি, যারা নিজেরাও শিশু বয়েসে কিছু বড়, এই যা—প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তাদের সঙ্গে পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের সম্পর্ক আরও নিকটের। তারা পরস্পর খেলাধুলো করে। পাশা-পাশি থাকে। ঠিকমত প্রশিক্ষণ পেলে যথাসময়ে ছোট্ট শিশুটির রোগটি ধরা মোটেই তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। নুন-জল দিয়ে চোখ ধুলে চোখ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচে। শিশুদের এই তথ্যটি শিখিয়ে দিন। দেখবেন, প্রয়োজনে ছোট ছোট ভাইবোনদের চোখ নিজেরাই নুনজল দিয়ে ধোয়াতে শুরু করেছে। অথবা ধরুন, শাকসবজির পাতা। এতে ভিটামিন এ থাকে প্রচুর। কিভাবে এদের সংরক্ষিত করে যখন সবুজ শাকসবজি পাওয়া যায় না তখন এদের ভিটামিন এ-র উৎস হিসেবে কাজে লাগাতে হয়, এ ব্যাপারটাও শিশুদের শিখিয়ে দেওয়া তেমন কঠিন কিছু নয়। উল্লেখ্য ভিটামিন এ চোখের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এর অভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। চেষ্টা করলে শিশুদের শাকপালার বাগান তৈরির ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করা যায়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় শিশুদের পেঁপের বাগান তৈরিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পেঁপে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি-র অন্যতম উৎস।

প্রচলিত খেলাধুলো, গল্প অথবা পুতুল-নাচ, প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন রোগ, তাদের উপ-সর্গ এবং প্রতিরোধের উপায়—এমন অনেক তথ্যই তো স্কুলের ছেলেমেয়েদের শেখানো যেতে পারে। অনেক সময় সরকারী স্বাস্থ্যকর্মীরাও বুঝতে পারেন না কোন সংসারে ছোট ছোট শিশুর সংখ্যা কত। ফলে ওইসব শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবরাখবর পাওয়া তাদের পক্ষে কখনও কখনও সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। পরিবারের খুদে ভাইবোনরা কখন কে অসুস্থ হল, মোটামুটি কি ধরনের উপসর্গ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেসব জেনে নিয়ে যদি তারা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীকে জানায়, দ্রুত রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সেটাও কম লাভজনক হবে না।

শিশুদের এ ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কি ধরনের পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা করার জন্যে এই এপ্রিলেই লণ্ডনে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করছেন চিলি, ইন্দোনেশিয়া, জামাইকা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, পাপুয়া, নিউগিনি, ফিলিপিনস এবং সুদানের কয়েকজন প্রতিনিধি। এর অব্যবহিত পরেই বিষয়টি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সাসেকস-এর ফিটলওয়ার্থে বসবে আরও একটি আলোচনা-সভা। এই সভায় বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মিশর, মালেশিয়া, শ্রীলংকা এবং অন্যান্য দেশের চল্লিশজন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করবেন।

কুমেরু মহাদেশের চিংড়ি

পৃথিবীতে যত বরফ তার শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগই জমে থাকে কুমেরু মহাদেশে। যার ইংরেজী নাম আনটার্কটিকা। আর সেই বরফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেখানকার শীতল পরিবেশে বাস করে খাবারের বৃহত্তম উৎস। নাম ক্রিল। ক্রিল এক ধরনের চিংড়ি।

ক্রিল প্রচণ্ডভাবে বংশবৃদ্ধি করে। একসময়ে এদের বাড়বাড়ন্ত ছিল অনেক বেশী। আবার সেই-রকম মারাও পড়ত। মারা পড়ত তিমির মুখে। কারণ, ক্রিল তিমির প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া পেঙ্গুইন, সীল এবং কোন কোন মাছও ক্রিল খেয়ে জীবনধারণ করে।

কিন্তু মানুষ-শিকারীর কবলে পড়ে কুমেরু মহাদেশের সাগরের জলে তিমির সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। বিজ্ঞানীদের হিসেব, এক সময়ে প্রতি বছর শুধু তিমির পেটেই যেত ১৮ কোটি টন ক্রিল। বছরে এই পরিমাণ এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টনে। যার অর্থ, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বেশ কিছু পরিমাণ ক্রিল আগের তুলনায় এখন
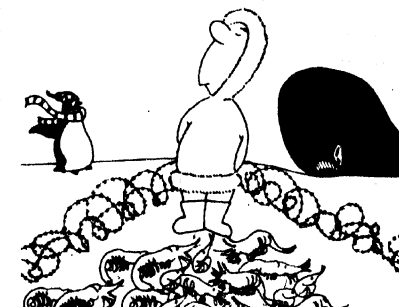
কুমেরু মহাদেশের ক্রিল মানুষের প্রয়োজনে

অব্যবহার্য অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বছরে সেখানে এখন ক্রিলের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১০০ কোটি টনের মত। এ থেকে বছরে ১০ কোটি টন ক্রিল মানুষের প্রোটিন ঘাটতি মেটানোর জন্যে অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়। কেউ কেউ আশংকা করছেন, এইভাবে ক্রিল ধরলে ওইসব অঞ্চলের অন্যান্য প্রাণীর খাবারে টান পড়বে। যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্য হারাতে পারে। অনেকের ধারণা অবশ্য উল্টো। তাঁরা মনে করেন, এতে করে অন্যান্য প্রাণী মোটেই না খেয়ে মরবে না। বরং, কুমেরুর প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থল-ভাগে যাঁরা বাস করেন (অবশ্যই মানুষ) ওই ক্রিল তাঁদের প্রোটিন সমস্যা যোগাতে সাহায্য করবে।

সমরজিৎ কর — কার্টুন: ইউনেসকো

এই পাগল করা খেলা

প্রণবেশ সেন

কালে কালে কতই হল, সেই অ্যামিবা মানুষ হল। সব কিছুই বিবর্তনের সিঁড়ি পেরিয়ে চলেছে। এমন কি যে ফুটবল নিয়ে আজ ক্ষান্ত-পিসীর দিদিশাশুড়ী থেকে আরম্ভ করে বোল-না-ফোটা দুই-তিন বছরের বাবু সোনাটা পর্যন্ত মত্ত-মাতাল সে ফুটবলও কিন্তু হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন নয়। তারও হয়ে-ওঠা আছে। আর এরই উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়লে আমরা পৌঁছে যাই,—কোথায় ? হায়রে ফুটবলের কোন জীবনী নেই! না থাকুক। তবুও যেটুকু যা এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে তা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আনলে মোটা-মুটি একটা আভাস মিলবে।

কবে থেকে ফুটবল খেলা শুরু ? নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ, সুপ্রাচীন মিশরীয়দের কবর খুঁড়ে গোল বলের মত আকৃতির যে জিনিসটাকে দেখতে পেয়েছেন, তাকেই ফুটবল বংশের আদি-পুরুষের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। গ্রীসের কারো কারো হাতে খেলার ছলে বলের মত যে বস্তুটা এক হাত থেকে আর এক হাতে চক্কর মেরে বেড়াতো তাকেই ফুটবলের উৎস ভেবেছেন কেউ কেউ। আরেক পক্ষের মতে—উঁহু, গ্রীস বা মিশর নয় ; ব্রিটেনই এ-খেলার জন্মদাতা। শত্রুপক্ষের যোদ্ধার ছিন্ন মস্তক নিয়ে যে খেলা চলতো—ওই বীভৎস ব্যাপারটাই ফুটবলের আদি পর্ব। এতেও কিন্তু ফুটবলের জন্মকথা ফুরোয় না। একদল প্রাজ্ঞ মনে করেন রোমানরা যে Harpastum খেলার প্রবর্তন করেছিলেন সেইটেই আদি ফুটবল। আর ঐ রোমানরাই ব্রিটেনে খেলাটা নিয়ে এসেছিলেন। বল বৈচিত্র্যের ইতিবৃত্তেও কম রমণীয় নয়। একসময় কোন কোন প্রাণীর ব্লাডারটা ফুলিয়ে বল তৈরী করা হত। কোন কোন সময়ে ফুটবলের আকৃতি ছিল ক্রিকেট বলের মতো। সেণ্ট কলম্বোতে একসময় এমন একটি বল নিয়ে খেলা হয়েছিল সেটি ছিল রুপোর পাতে মোড়া, আর তাতে লেখা ছিল 'Town and country do your best, for in this Parish I must rest,'

আর সে সময়ে খেলার নিয়ম কানুনের কোন বালাই ছিল না। কোন কোন খেলাতে খেলোয়াড়দের সংখ্যা থাকতো ১৫০ পর্যন্ত, আর গোলের একটা পোস্ট থেকে আর একটা পোস্টের দূরত্ব হ'ত প্রায় সিকি মাইল। ১৬০২ সালে রানী এলিজাবেথের আমলে গোল পোস্টের মধ্যবর্তী স্থানের দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল থেকে চার মাইল। মাঠের আয়তনও তেমনি ছিল যোজন জুড়ে। সারা সপ্তাহ খেলা হ'ত না, বেছে নেওয়া হত একটা দুটো দিন। সেই দিনটিতে অন্য কিছু করবার উপায় থাকতো না কারো। দোকান পাট বাজার রাস্তা ঘাট সব বন্ধ থাকতো। যে যেমন খুশী খেলতো, বিধি নিষেধের বাঁশী বাজতো না। অনেক সময় তো রক্তারক্তি কাণ্ড পর্যন্ত হয়ে যেতো। একজন ফরাসী দর্শক ইংরেজদের এই খেলা দেখে হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকে মন্তব্য করেছিলেন—"ইংরেজরা যদি একে খেলা বলে, তবে তারা লড়াই বলবে কাকে ?" এ বর্ণনা কিন্তু খুব বেশী দিন আগের নয়, ১৮০১ সাল নাগাদ। মেয়েরাও ফুটবল খেলতো ওই প্রাচীন কালে। মিড্‌লোথিয়ানে এ খেলা হ'ত। একপক্ষে থাকতো বিবাহিতা মেয়েরা আর একপক্ষে কুমারীরা। এসব খেলায় অধিকাংশতেই নাকি জিততো বিবাহিতারা।

ফুটবলের সেই আদ্যিকালেই এই খেলাটা এতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তখনকার দিনে রাজা রাজড়াদের রাতের ঘুম শিকেয় উঠেছিল। ১৩৮৮ সালে দ্বিতীয় রিচার্ড ফতোয়া জারী করলেন যে, রবিবার আর ছুটির দিনগুলোতে টেনিস বা ফুটবল খেলা চলবে না। সুস্থদেহী তরুণদের অভ্যাস করতে হবে তীরন্দাজীর। তাঁর ভয় ছিল ফুটবল যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে সেখানকার যুবকরা তীর ধনুক ছোঁড়া ভুলে যাবে। ফলে ক্ষুন্ন হবে ইংল্যাণ্ডেরই নিরাপত্তা।

এর দুশো বছর পর—১৫৯৮ সালে রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় আরেক কাণ্ড ঘটলো। ১৪ বছরের এক বালককে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হোল। ছেলেটির নাম এডমণ্ড ফারিয়ার। ম্যাজিস্ট্রেট তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো শুনলেন। দোষ করেছিল ছেলেটি।

ফুটবল থেকেই এসেছে রাগবী ফুটবল শিল্পীর চোখে তারই উনবিংশ শতকের ছবি

কিন্তু যেহেতু আসামী একটি কচি ছেলে, তাই অপরাধ ভয়ংকর হলেও, দয়ালু ম্যাজিস্ট্রেট, তার প্রথম অপরাধ বিবেচনা করে তাকে নামমাত্র শাস্তি দিলেন। তাঁর রায়ে বলা হোল ফারিয়ারকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কোমর থেকে ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন করে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হবে। আর এই চাবুক চলবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে। কি অপরাধ ছিল তার ? ফারিয়ার ফুটবল খেলেছিল। আমরা নিঃসন্দেহেই এই এড্‌মণ্ড ফারিয়ারকে ফুটবলের প্রথম শহীদ আখ্যায় ভূষিত করতে পারি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এডমণ্ড ফারিয়ারের মতো বাচ্চা ছেলেরাই কিন্তু ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকাংশে। আগেই তো বলেছি গোড়ার দিকে ফুটবলে ধরা বাঁধা নিয়মকানুন তেমন একটা ছিল না। অনেকটা আকস্মিক ভাবেই এই নিয়ম-কানুনের ব্যাপারটা এসে গেল। ১৮২৩ সালে নভেম্বরে রাগবি স্কুলের মাঠে ১৫ বছরের আরেক বালক উইলিয়াম ওয়েব এলিস বল খেলতে নেমে বলটা হাতে নিয়ে দৌড়তে লাগলো। এই ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুরকমের ফুটবল খেলা চালু হয়ে গেল। একটা রাগবি আরেকটা অ্যাসো-সিয়েসন ফুটবল, মানে, যে ফুটবল আমরা সাধারণতঃ খেলে থাকি। তাও কিন্তু একদিনে হয়নি। এলিসের ঐ কাণ্ডর ৪০ বছর পর লণ্ডনের এক ট্যাভার্নে বেশ কিছু সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী প্রথম ফুটবল খেলার নিয়ম রচনা করতে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত হোল এই আজকের ফুটবল।

তা আমাদের দেশে এই ফুটবল এলো কবে ? এর উত্তরে বলতে হয়, ইংরাজরা যেদিন সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছিলো, সেইদিন। কি, সঠিক দিন তারিখ চাই, তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। কেউ কেউ মনে করেন বোম্বাইয়ে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাটি হয়েছিল মিলিটারী ও আইল্যাণ্ড অব বোম্বাইয়ের মধ্যে। আর কোলকাতায় এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৮ সালে ইটোনিয়ান্স ও রেস্ট দলের মধ্যে। আবার আই এফ এ-র মতে প্রথম ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালের এপ্রিলে, কোলকাতারই ফোর্ট-উইলিয়ম এলাকায় ক্যালকাটা ক্লাব অব সিভিলিয়ান্স এবং Gentlemen of Brrackpore দলের মধ্যে। আর ১৮৭২ সালে, যে-ভারতীয়, ফুটবলে প্রথম পা ছোঁয়ালেন এবং ক্লাব গড়লেন তিনি নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তাঁকেই চিহ্নিত করা হয়েছে এদেশী ফুটবলের জনক বলে। যেভাবেই আসুক আর যেই আনুক না কেন, এই খেলাটি, বিদেশী এই খেলাটি আজ পুরোপুরিভাবেই স্বদেশী। এদেশী কোটি কোটি মানুষের কাছে এই ফুটবল জীবন সর্বস্ব ধন।

"গোল" এই শব্দটিকে ঘিরে কি ভালোবাসা সব কাণ্ডই না ঘটে যায়। মাঠ জোড়া হাজার হাজার দর্শকের কণ্ঠে "গোল" এই আওয়াজের প্রচণ্ড বিস্ফারণে আকাশ কাঁপে বাতাস কাঁপে পায়ের নীচে মাটি কাঁপে। ছাতা ওড়ে, জুতো ওড়ে, জামা ওড়ে, ওড়ে রুমাল। পটকা ফাটে, বিউগল বাজে, বাজে কাঁসর। ছেলে নাচে, জোয়ান নাচে, বুড়ো নাচে, এমনকি যে মেয়েরা, তারাও নাচতে চায়। আর এসবই শুধু এই একটি শব্দের জন্য। আর এ "গোল" যদি জয় পরাজয়ের ফয়সালা করে তবে তো কথাই নেই—স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে দাও হাজার মশালের আলো, পাড়ায় পাড়ায় তুলে দাও পতাকা। এ ছবিটা বাইরের, কিন্তু বড় খেলার দিন ঘরে বাইরের ভেদ থাকে না। ঘরেও পারিবারিক হাততালি, আনন্দে নেচে ওঠা, হাতের কাছের রেডিও, টি ভি সেটটাকে নিজের দল জিতলে সাত রাজার ধনের মতো মনে করা, আর হারলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই বলে দাঁত কড়মড় করা। মাঠ আর ঘরের মাঝখানের যে জায়গাটুকু সেখানেও ঐ এক চিত্তির। হই-হই রই-রই কারো মুখে খই ফুটছে, কারো মুখে দেঁতো হাসি। বাস আসছে এবং কি আশ্চর্য খালি বাস, তবুও সাবধানী পথিক থমকে দাঁড়ালেন—'এটা থাক, রীলেটা একটু শুনে যাই, পরের বাসে যাবো।' পরের বাসটা চলে গেল, ওঠা গেল না, শুধু ঐ দুই অক্ষরের শব্দ

গো' তারই প্রতীক্ষায়। আশ্চর্য এক বিশল্যকরণী এই শব্দ—সব ভুলিয়ে দেয়—দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অনটন, স্ট্রাইক, লকআউট, রাজনীতির মার প্যাঁচ, বেকারীর মর্মান্তিক জ্বালা, পরীক্ষা ফেলের বেদনা, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া—সবকিছু।

ছবিটা কি শুধু আমাদের দেশেরই ? না, ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের খেলা শুরুর পর ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড যখন ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে প্রথম ঐ খেলায় ফাইনালে উঠলো, সেদিন গোটা ব্রিটেনে অধিকাংশ রাস্তাই জনহীন হয়ে পড়েছিল। কোথায় গিয়েছিলেন সব ? কোথায় আবার ? হয় মাঠে, না হয়তো যে যার ঘরে রেডিও শুনতে কিংবা টেলিভিশন দেখতে। মিউনিখ বিশ্বকাপের খেলায় টি ভি লাইসেন্স ফি বাবদ পশ্চিম জার্মানী সরকারের আয় হয়েছিল এককোটি আশি লক্ষ মার্কের মতো। আর ব্রাজিলে পর্যটকদের আকর্ষণ করা হোত পেলে কবে কোথায় খেলবেন তার বিজ্ঞাপন দিয়ে। হয়তো আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, ফুটবল কি করে মানুষকে পাগল করে, তার।

ফুটবল কি শুধু পাগলই করে ? তা কিন্তু নয়, ফুটবল মাঠের কারুকাজ মানুষের মনে সৃষ্টি-সুখের উল্লাসও এনে দেয়। এদেশে এখনও হয়তো ততটা নয় কিন্তু বিদেশে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফুটবল ইতিমধ্যেই বেশ একটা বড় এলাকা দখল করে নিয়েছে। কয়েক বছর আগে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখে যখন বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হোল, তখন সেখানকার তরুণ শিল্পীরা ফুটবলকে তাঁদের শিল্পকর্মের মোটিভ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হ্যানোভার গ্যালারীতে এসব ছবির একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। সে ছবিগুলির কোনটিতে ফুটবল মাঠকে স্বর্গোদ্যান হিসেবে দেখানো হয়েছে, কোথাও বা তা মানুষের শৈশব বা যৌবনের প্রতীক। একজন শিল্পী চন্দ্রাভিযান বোঝাতে চেয়েছেন সমকালীন

পাগল করা খেলায় দর্শকরা পাগল

অবক্ষয়ে প্রায় গলিত এক মানুষকে দিয়ে বল ধরাবার চেষ্টা করে। বল এখানে চাঁদের প্রতীক।

আমাদের দেশে ফুটবল নিয়ে এক-আধটা নাটক হয়েছে, সিনেমা হয়েছে, উপন্যাসও হয়েছে। তবু যাকে বলে সৃষ্টির প্রেরণা, ফুটবল এখনও তা হতে পারেনি। তা হলেও, একথা মানবো যে, ফুটবলকে ভালোবাসায় ফুটবলের জনপ্রিয়তায় আমরা কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই। এইতো ক'দিন আগে, চব্বিশ বছর পর ৩৪তম জাতীয় ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হোল কোলকাতায়। বাংলা এ খেলায় জিতলো। জিতলোই শুধু নয়, এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নিজের স্থানকে এমন একটা শীর্ষে তারা প্রতিষ্ঠিত করলো যেখানে আরোহণ করতে অন্য কোন দলের এখনো অনেক সময় লাগবে। ফাইনালে জেতার সুবাদে বাংলা দু-দুবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করলো—অর্জন করলো সতেরবার চ্যাম্পিয়ন হবার এবং ছাব্বিশ বার ফাইনালে ওঠার গৌরব। এ যাবৎ চৌত্রিশটি ফাইনালে মোট গোল হয়েছে একশো পাঁচটা। এর মধ্যে বাংলার দেওয়া গোল হয়েছে ৪৯টি। এই নিয়ে পাঁচবার কলকাতায় সন্তোষ ট্রফির খেলা হল—তাতে পাঁচবারই বিজয়ী বাংলা দল। ৩৪তম জাতীয় ফুটবলে এবারে মোট খেলা হয়েছে ৪৩টা, তাতে গোল হয়েছে ১৪২টা। এর মধ্যে বাংলা বিপক্ষকে দিয়েছে বত্রিশটা গোল। বাংলা দলের বিরুদ্ধে হয়েছে দুটো গোল। তার মধ্যে একটা আত্মঘাতী। এবারের আসরে কোন একটি দলের সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় গোল দেবার কৃতিত্বও বাংলা দলের। প্রথম খেলাতেই তারা গুজরাটকে হারিয়েছিল ১১—০ গোলে। এ সব কৃতিত্বের সংগে জুনিয়র ও সাব-

জুনিয়র খেলাতেও বাংলা দলের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবার তথ্যটি যোগ করলে দাঁড়ায়, ফুটবল আর বাংলা সমার্থক। সুতরাং এই খেলা জেতায় ৫ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে কলকাতায় যে আনন্দ উল্লাসের বান ডেকেছিল তার কারণটা বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। তবুও বলবো, খেলার মান কি খুব একটা ভাল হয়েছিল? ফাইনালে বাংলা দল গোটা পনের কর্নার পেল, গোল হতে পারতো এমন এমন গোটা সাতেক সুযোগ সৃষ্টি করলো। কিন্তু বাস্তবায়িত হল মাত্র তিনটি গোল। প্রথম দিনে দেখলাম একের পর এক গোলের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলা দলের খেলা শেষ হল। আমরা দেখলাম কারো পা চলে তো মাথা চলে না, কারো দেহ দৌড়ায় তো বুদ্ধি এগোয় না। কেউবা আবার শুরু করেন শেষ হবে কোথায় তা না জেনে। এই কি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ফুটবল? তাহলে যে-খেলায় শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধির প্রখরতা, মনঃসংযোগের দৃঢ়তা, নির্ভুল নিশানা তীব্রগতি, ও উদ্দেশ্যমুখিনতার সমন্বয় ঘটে, যে খেলায় দু-পক্ষই সমানতালে খেলেন অথচ তারই ফাঁকে গতির সামান্য হেরফেরে, রিফ্লেক্স-এর একটু তারতম্যে গোলের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নিখুঁত নিশানায় বল জড়িয়ে যায় গোলে—সে খেলা কি ধরনের? কেরালা-পাঞ্জাবের প্রথম দিনের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত খেলার আভাস রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ একটিই। বাকী সব খেলাই সাত-আটটি সুযোগ পেয়ে এক-একটা গোল করার মত। না—এতে সুখ নেই।

বিশ্বকাপে আমরা খেলিনি। বিগত কয়েকটি অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় আমাদের কোন পাত্তা নেই। এশিয়ান গেমস এর '৫১ '৬২ সালের জয়ের পর আর কোন জয় নেই আমাদের। মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও স্মরণীয় কিছু করিনি আমরা। গড়ে প্রতি দু' মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে একটি করে গোল করে স্কটিশ কাপ ম্যাচে AROBROATH এর মত ৩৬—০ গোলে জেতার কোন নজীর নেই আমাদের। STAIN এর মত একটি খেলায় ১৬টি গোল করবার কৃতিত্বও নেই আমাদের কোন খেলোয়াড়ের। পেলের মত গোটা জীবনে তেরশ' মত গোল করার কথা আজও আমাদের কল্পনায় আসে না। ইউসেবিও, ইয়াসিন, বেকেনবাওয়ার—এসব তো আমাদের কাছে কল্পলোকের নাম। তবুও আমরা ফুটবল পাগল। বেশী নাম করা খেলোয়াড়রা আমাদের কাছে দেবতুল্য। কে কোন্ দলে যাবেন তা দেখতে গিয়ে আমরা রক্তে রাজপথ ভেজাতেও দ্বিধা করি না। পেলের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে যে হই হই রব উঠেছিল তারও কোন নজীর নেই এদেশে।

কেমন যেন লাগে এই ফুটবলের জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা। শুধু কি খেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গুণেই এই জনপ্রিয়তা? সমালোচকরা বলেন, এদেশে খেলার মান কমে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে তো জনপ্রিয়তাও কমা উচিত। সময় নষ্ট করবার মত সময় হাতে প্রচুর—তাই কি মাঠে ভিড়? খানিকটা সত্যি কিন্তু পুরোটা নয়। ব্যাপারটা কি? একটু ডুব দিতে ইচ্ছে করছে গভীরে, বলতে ইচ্ছে করছে শুধু খেলা নয়, খেলাটার সঙ্গে মানুষের কেমন যেন একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে এল সেদিন তার পরিবেশটা ছিল প্রতিকূল। প্রতিপদে লড়াই করতে হয়েছে বিপদের সঙ্গে আর এই বিপদগুলোর পরিচয়ও সঠিকভাবে জানা ছিল না তাদের। তাই প্রধানত আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষকে দৌড়-লাফ, তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ, শিকার প্রভৃতি শিখতে হয়েছিল এবং শারীরিক ও মানসিক পটুতা বাড়াবার জন্য প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এমনি করেই নাকি খেলার উদ্ভব। এবং তা মানুষের জীবনের একটি আবশ্যিক অঙ্গেও পরিণত হয়ে যায়। আজকের দিনে আত্মরক্ষার জন্য খেলার প্রয়োজনীয়তা হয়তো অনেক অংশে কমে গেছে, কিন্তু তাগিদটা ভিতরে ভিতরে রয়েই গেছে। তাছাড়া অন্য একটা দিকও আছে। একটা প্রশ্ন সামনে রেখে এগিয়ে যাই—এই যে ফুটবলপ্রীতি এর কি কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে? হলফ করে বলতে পারব না। তবে কেন যেন ভাবতে ইচ্ছে করছে—আছে। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত যে গোটা সৃষ্টিটাই একটা কার্যকারণ শৃঙ্খলায় বিধৃত। আকস্মিকতার তেমন কোন স্থান নেই। একটা ছন্দ শৃঙ্খলায় সব কিছু আবর্তিত হয়ে চলেছে সৃষ্টি-ধ্বংস, জীবন-মৃত্যু সব কিছু। এই শৃঙ্খলাকে বুঝতে গিয়ে কবিরা আবিষ্কার করেছেন ছন্দকে আর বিজ্ঞানীরা গণিতকে। গণিতের শুরু শুনেছি শূন্য অর্থাৎ জিরো থেকে। (আর এই শূন্য ভারতীয়দেরই আবিষ্কার।) এও শুনেছি যে, মেক্সিকোর সুপ্রাচীন রেড-ইন্ডিয়ানদের কাছে গোলক বা বলের একটা বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। তাঁরা একে জীবনের উৎস—সূর্যের প্রতীক বলে মনে করতেন। আমাদের আদি পুরুষের প্রথম প্রণামটিও নিবেদিত হয়েছিল—জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম-এর প্রতি, এমনি কোন ধারণা কি আমাদের অবচেতনে এখানো কাজ করে চলেছে? তা না হলে আমাদের জনপ্রিয় সব খেলারই উপকরণ শূন্য বা গোলাকৃতি কেন? ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ভলি, ওয়াটারপোলো—সব কিছুরই প্রধান উপকরণটি গোলাকার। তাহলে কি গোলককে ভালবেসেই আমরা ফুটবলকে এতটা ভালবেসেছি? উত্তরটা থাক—বিশেষজ্ঞদের দেবার জন্য।

হাবিব এখনও ...

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিহার্য"। হেডিংয়ের না বলা অংশটুকু লেখার প্রথম শব্দেই শেষ করলাম। যুক্তি আর তর্কোয় পরে আসছি। আপাতত শুধু এটুকু বলি, চৌত্রিশতম জাতীয় ফুটবল দেখতে দেখতে যে সত্যটুকু বাংলার ক্রীড়ামোদীদের পাঁজরে গেঁথেছে 'হাবিব এখনও অপরিহার্য' বাক্যটিতেই তার পরিপূর্ণতা। হাবিব মাঠে না থাকলেই বোঝা যায় হাবিব কি এবং কতটা। ব্যাপারটা দাঁত না থাকলে দাঁতের মর্ম বোঝার মতই নির্ভেজাল সত্যি।

বাংলার মাটি বাংলার জলে যেমন একটা প্রাণ-জুড়োনো গন্ধ আছে, কলজে দুর্বল ক'রে ঘ্রাণ নিলেও যাতে তৃপ্তির আশ মেটে না, বাংলার ফুটবলে আছে তেমনি এক জাদু—যার ছোঁয়ায় আমরা সম্মোহিত হই। বিদেশের সঙ্গে টেক্কা দিতে নাই বা গেলাম, মোল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত তা তো মেনেই নিয়েছি। ওই মসজিদ-তক্ পোঁছতেই হরেক ফন্দিফিকির। তারই মায়াজালে আমরা সম্মোহিত হই।

ইস্, হাবিব যদি থাকত—গোছের ভাবটা ভনভন্ করতে থাকে, বাংলা-কর্নাটক খেলার শেষ থেকেই। এর আগে গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে ছেলেখেলা করে বাংলা যখন তাঁবুতে ফিরছে আমার এ-পাশ ও-পাশ, মাঠের আনাচে-কানাচে, টি ভি-র সামনে বসে থাকা অবাক চোখগুলোয় তখন কোই পরোয়া নেহি-র নিশ্চিন্ততা। টগবগ করছে তখন তেজ আর তারুণ্য। ছ গোলের বদলা দেখতে সে সময় বাংলাপ্রেমীদের রাতের ঘুম উবে গেছে।

হতাশা আর আক্ষেপ কিছু স্মৃতি বয়ে আনে: কর্নাটক ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে। মাঝে বিশ মিনিটের বিরতি। মিনি স্টেডিয়ামের নিচে কফির গেলাস হাতে বছর পাঁচেক আগে খেলা ছেড়ে দেওয়া জনৈক ফুটবলারের গলায় তাই আক্ষেপের সুর, শোনা গেল—'ইস্, হাবিব যদি মাঠে থাকত।' তিনি স্মৃতি-মন্থন করছিলেন। হাবিব থাকলে বারবার অন্ধের মতো বেড়া টপকাতে গিয়ে ধাক্কা খেতে হত না। হাবিব থাকলে একটা খেলায় যতগুলো 'ওপেন ক্রিয়েট' হয়, না থাকলে সংখ্যাটা অর্ধেক কমে যায়। হাবিব যে কী যারা ওর সঙ্গে খেলেছে তারাই জানে।

মনে পড়ে আমার এক উঠতি স্টপার বন্ধুর কথা। দু বছর ধরে সে তখন এক না-ছোট না-বড় টিমে খেলছে। হাবিব তখন মোহনবাগানের সম্পদ। মোহনবাগান ম্যাচের দিন মাঠে নামার আগে সেই দলটির কোচ আমার স্টপার বন্ধুটিকে পাখি-পড়ানো পড়িয়েছেন : হাবিবকে একদম বল ছুঁতে দেবে না বুঝলে? জোঁকের মত ওর পায়ে পায়ে ঘুরবে। মনে রেখ হাবিব একটা বল ধরা মানেই একটা গোল। চোর-পুলিশ খেলা জান তো? এ ম্যাচে হাবিব চোর আর তুমি পুলিশ। পাকড়াও করতে পারলেই প্রমোশন, এটা মনে রেখ।

স্টপার বন্ধুটি কোচের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে এক সময় হঠাৎই আবিষ্কার করেছিল হাবিবের সঙ্গে সেও মোহনবাগান পেনাল্টি বক্সের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। বল তখন তার নিজস্ব অরক্ষিত জায়গায় এই গোল হয় সেই গোল হয় ভাবে ঘোরাঘুরি করছে।

এই হাবিব। দুটো পায়ের সঙ্গে বুদ্ধিও যার সমান তালে ছোটে।

সেই ছেষট্টি সালে হাবিব যখন ইস্টবেঙ্গলে আসে তখন আমরা কি ভেবেছিলাম কিশোর হাবিব দিন দিন ফুলে ফেঁপে এই অ্যাত্তো বড়টা হতে পারবে? অথচ প্রথম বছর থেকেই হাবিব টেরর। সেই থেকে আজও হাবিব গান্ডীবের সবচেয়ে ভয়ংকর এবং ভয়াল শরটি। ছেষট্টি থেকে এই আটাত্তরেও দলবদলের পালায় গমগমানি আলোচনা হয় হাবিবকে নিয়ে। হাবিব যে দিকে, পাল্লার ঝোঁকা দিক নিঃসন্দেহে সেইটিই। সুদীর্ঘ বারো বছর এই একই খেলা দেখলাম। হয়ত আরও দু-এক বছর দেখব। তারপর?

চুনী-বলরাম কলকাতার মাঠ ছাড়ার পর আমরা দুঃখিত এবং শংকিত হয়েছিলাম। অবশ্যই জায়গা-পূরণের চিন্তায়। এটা ঠিক এ পৃথিবীতে কারোর জন্যেই কোন কিছু আটকায় না। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে ওঁদের জায়গায় এর পরেও অনেকে জারসি গায়ে মাঠে নেমেছেন। অথচ আমরা তেমন রিপ্লেস-মেন্ট পেলাম কই? ওঁদের পরে বাংলার মাঠে খুখু স্ট্রাইকার বলতে আমরা কাদের পেয়েছি? নাম উচ্চারণ করার আগেই ঠোঁটের ডগায় যে দুটি নাম তিরতির করে নাচে পরিমল ও হাবিবই তাঁদের পরিচয়। পরিমল বিলীন বহুদিন আগেই। একা কুম্ভ বলতে এখন ওই হাবিব। আজ তাই আমরা আবার চিন্তিত। এবারের চিন্তা হাবিবের শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে। মাঝে মাঝেই মনে জট পাকায়। চিন্তার সেই জটে আমি বা আমরা দিশেহারা হই। এখনও এই পূর্ণ তিরিশেও তাই আমরা যখের ধনের মত হাবিবকে আঁকড়ে ধরেছি। নিংড়ে নিংড়ে বার করছি তার অবশিষ্ট সব চাতুর্য এবং শিল্প। হাবিবকে বিদায় জানাতে আমাদের অনীহার কারণও একটাই—আরও একটা হাবিব তৈরি হয়নি বলে।

এবং এ জন্যেই প্রতি বছর দলবদলের খেলায় প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে কলকাতা উদগ্রীব হয় হাবিব নামক কাৎলাটি কোন জালে ধরা দিল জানতে। কলকাতা জয়ের প্রথম বছরটি থেকেই এই একটি দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে যাচ্ছে। এবং সেই থেকেই এই একটি মাত্র খেলোয়াড়ই কলকাতার তিনটি ক্লাবকেই বছরের পর বছর 'ডিকটেট' করে আসছে। জানি, বড় ক্লাবগুলোর ভ্রূ এইবার কুঁচকে উঠল। কি রকম?

ব্যাপারটা এই রকম। 'হাবিব' শব্দটি উচ্চারণের সংগে সংগেই আরও একটি চার বর্ণের সমষ্টি প্রায় আপনিতেই উচ্চারিত হয়ে যায়। শব্দটি 'আকবর'। হাবিব-আকবর—ভ্রাতৃপ্রেমের এক বলিষ্ঠ উদাহরণ। ভাইকেও কলকাতার মাঠে প্রতিষ্ঠিত করতে হাবিবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিদারুণ পরিশ্রম, মাঠের ভেতর-বাইরে অহরহ কঠোর শাসন এবং ভর্ৎসনা খোলা চোখে সকল ফুটবল অনুরাগীরাই দেখে আসছে। দু-ভাইকে কাছ থেকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন দাদা-অন্ত-প্রাণ আকবর দিনের পর দিন কী প্রচণ্ডভাবে হাবিবকে মান্যগণ্য করে এসেছে। এবং এতশতের সুবাদেই আকবর আজ আকবর হতে পেরেছে, মাঝে-মধ্যে সেজেছে 'বাদশাহ্'।
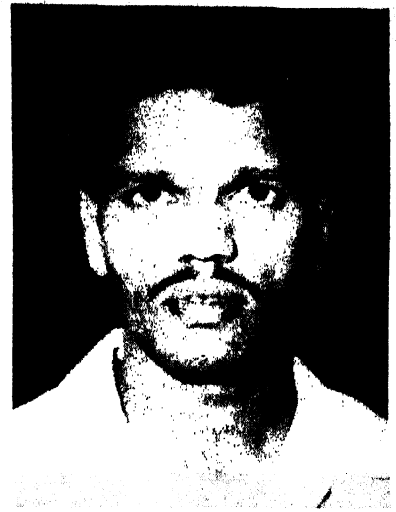
বলরাম

কলকাতায় আসার প্রায় পর থেকেই হাবিব-আকবর যখনই যে দলে খেলেছে একসঙ্গে। অথচ বহু ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু হাবিবের প্রয়োজনেই আজও হাবিব-আকবর মানিকজোড় হয়ে একই দলের সুখ-দুঃখের অংশীদার। তিন প্রধানই জানে হাবিব টিমটিম করলেও আজও সে নিভে যায়নি। এবং কখন যে তার প্রদীপের শিখায় ঘি পড়বে তা বোঝাও দুঃসাধ্য। টোপ তাই গিলতেই হয়। হাবিব জাদুকর যখন তখন ভেল্কি দেখায়। কে জানে পনেরো মিনিট মাঠে থেকেই হাবিব বিপক্ষের জাল নড়াবে কিনা? বলতে পারে না কেউ। হাবিবের সাধ, সাধ্য এবং ক্ষমতাকে এই আটাত্তরেও তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার মত বুকের পাটা কোন দলেরই নেই। হাবিব রাবণের শক্তিশেল, হাবিবকে তাই দলে চাই।

অথচ সেই ছেষট্টিতে কিশোর হাবিবের দু পায়ে কী দেখেছিলেন কিংবদন্তীর এক বৃদ্ধ? সেই বৃদ্ধকেই জিজ্ঞেস করা ভাল। লেক মারকেট অঞ্চলে এক দোতলায় অশীতিপর কিংবদন্তীর বাঁ পায়ে এখন ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। থাই বোন ফ্র্যাকচার। কমপ্লিট রেস্ট।

হাবিবের কাছ থেকে অব্যর্থ গোল বাঁচাচ্ছেন গোলকিপার

জে সি গুহ বারো বছর পেছনে তাকালেন। স্মৃতি ক্রমে স্পষ্ট হল। 'তুমি ওকে নিয়ে লিখবে? লেখ আর নাই লেখ, জেনো ছেৎবাট্টিতে ওর পা দেখে আমি ওকে দলে টানিনি। ওর মনে ছিল বড় ফুটবলার হওয়ার বাসনা, বুকে ছিল দম আর সারা শরীরে ছিল লড়ার জন্য যা প্রয়োজন তা—কষ। প্রচণ্ড কষ ছিল হাবিবের মনে। লড়ব, লড়ে জিতব, হারার জন্য নামিনি এই ওর মনে সব সময় খেলে বেড়ায়। সেই কষ এখনও আছে। তখন ওর বয়স মোটে সতেরো। এবং সেই সতেরো বছর থেকে আজও, টানা বারোটি বছর ধরে মে-জুনের চাঁদিফাটা গরমে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের উগ্র সমর্থকদের গনগনে চোখ আর রোষের সামনে সারা বছর ধরে ফুটবল খেলে আজও হাবিব টিকে আছে মনের ওই কষটুকুকেই মূলধন করে।'

*

ফুটবলের বোদ্ধা এবং যোদ্ধা দু-তরফেই ইতিমধ্যে আমি কিন্তু প্রো হাবিব বা অন্যভাবে লিখতে গেলে হাবিব প্রতিষ্ঠানটির ফড়ে বনে গেছি। এবার আমায় বুঝতে হবে।

জাতীয় ফুটবলের জন্য বাংলা দল ঘোষিত হল। দলে যথারীতি হাবিব নেই। চিন্তা দানা বাঁধে সেখানেই। দলের অন্য সব অঞ্চল সুরক্ষিত এবং শানানো। গণ্ডগোল মাঝখানটা নিয়ে। শ্যাম আর আকবর। এদের পরেই দলে আসার মত নাম করতে গেলে মিহির।

বাংলা নামটায় এতদিন পর্যন্ত একটু আত্মতৃপ্তি পেতাম। কর্নাটকের সঙ্গে খেলার পরেই সে ভাবটা ঘুচল। গৌতম-প্রসূন এবং অন্যান্যরা দেদার বল পাঠিয়েছে—শ্যাম-আকবর সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। প্রতিদিনের খেলা শেষে মোহনবাগান মাঠে তিল তিল করে একটা চাওয়া দানা বেঁধেছে। ...... হাবিব কোথায়? সুদূর হায়দরাবাদেও হাবিবের বুকে নিশ্চয় তাকে চাওয়ার এই ইচ্ছেগুলো ফুটে উঠছিল।

অন্তত একটি বিষয়ে বাংলা কারোর পেছনে থাকতে অনিচ্ছুক। বিষয়টি ফুটবল। টানা বিশ দিন ধরে মোহনবাগান মাঠ তখন কয়েকজন পাঞ্জাটিজ স্ট্রাইকারের খেলা দেখে চোখে আঙুল ঘষছে। ইন্দার, হরজিন্দর, জেভিয়ার পায়াস, নাজিব—এই নামগুলো তখন দুধের-বাচ্চা থেকে দুঁদে সাংবাদিকদের ঠোঁটে আর কলমে। অন্তত, ফুটবলের এই পোজিশনে সেই মুহূর্তে গোঁড়া বাংলাপ্রেমীরাও বাংলা দলের কোন খেলোয়াড়ের নাম উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। শুধু আফসোস কাঠ আর কংক্রীট ভরিয়ে রেখেছিল—'আমাদেরও একজন আছে—সে দলে নেই'—গোছের একটি বাক্য।

জে সি গুহকে বললাম : আপনারা ভাগ্যবান। পৃথিবীতে আগে এসে আপনারা বেশিরভাগ ভাল জিনিসগুলোই উপভোগ করলেন। যে কোন ভাল সৃষ্টিই অতীতে হয়, বর্তমানে হয় শুধু তার মূল্যায়ন। শিল্প-সাহিত্য-খেলাধুলো সব বিষয়-গুলির শ্রেষ্ঠ সময় আমরা ফেলে এসেছি। দারুণ এক আশাবাদীও মাথা নাড়িয়ে, ঘুষি পাকিয়ে ক্রমে ক্রমে এ সত্যটিকেই মেনে নেবে। কে দত্তের গোলরক্ষা নামক শিল্পটি আমরা চাক্ষুষ করতে পারিনি, দেখিনি গোষ্ঠ পালের প্রাচীর কতটা মজবুত ছিল। আমেদ সাত্তার সালে ধনরাজ আপ্পারাও মেওয়ালাল ভেঙ্কটেশ ইত্যাদি ইত্যাদিদের পায়ের জাদু আর বুদ্ধির দৌড়, ধ্যানচাঁদ নামক এক জাদুকরের স্টিকের ভেল্কি, সি কে মুস্তাক লালা ভিন্নুর চোখ জুড়োনো শিল্প সবই আমরা স্বপ্নে দেখতে পাই। মাঝে মধ্যে আমরা কিছুটা সরব হতে সচেষ্ট হই। চুনী পি-কে বলরাম আমাদের, বিশ্বনাথ গাভাসকার বেদী তারপর আর পারি না। আপনারা হেসেহ তাড়িয়ে দেন। বলেন, ওরে, সেই স্ট্যানডার্ডের নিরিখে এরা পাতেই পড়ে না। ও'রা ছিলেন অনন্য।

চুনী-পিকে-বলরাম ইত্যাদিদের ফেলে এসে আমরা যাদেরকে আঁকড়ে রেখেছিলাম সুধীর-নাঈম-পরিমল-সমরেশ-গৌতম-প্রসূন-হাবিবই তাদের নাম। একে একে নিবিছে দেউটির মতই এদের কেউ নিবেছে, কেউ নিবু নিবু। অখণ্ড গভীর শূন্যতা এক, তারপর খাঁ খাঁ করে গড়ের মাঠে নিঃশ্বাস ছড়াবে। আমি আর আমরা শঙ্কিত হই। এবেলার কিশোরদের জন্য অন্তত কিছুই কি থাকবে না, ওবেলায় গিয়ে যাতে তারা অনুজদের বলতে পারে—আমরা ভাগ্যবান, জানিস, ক খ গ ঘ ঙ-দের খেলা আমরা দেখেছি! ওঃ কী দারুণ খেলা, তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। আমি বা আমরা তখন সাদা চুলে হাত বুলিয়ে মুচকি হেসে বলব : ইস্, তোরা যদি চুনী-পিকে-বলরামকে দেখতিস...।

ঈশ্বরের প্রতি : হে ঈশ্বর, যা কিছু মহান সবই তোমার সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা এবং বুঝদাররা বলেন, সমস্ত কিছুর উৎকর্ষই নাকি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সাধারণ জমির উর্বরতা যেমন দিনকে দিন কমে যায়, এই পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির মত খেলাধুলো নামক জমিটিতেও আগের মত ফসল আর ফলছে না। আমাদের এই বাংলাকে তো তুমি বরাবরই বিরাট বিরাট ফুটবলার উপহার দিয়ে এসেছ। ইদানীং তোমার কার্পণ্য বড়ই প্রকট। বাংলার ফুটবলে অন্যান্য অঞ্চলগুলি চলনসই গোছের হলেও ভাল স্ট্রাই-কারের এখন বড়ই অভাব। হাবিবের বয়স হয়েছে। ওর পরে তো আর কাউকে দেখি না। তুমি এক কাজ কর। তোমার ভাঁড়ারে যতটুকু ভাল সার অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে, চুনী-বলরাম চাই না, অন্তত আর একটা হাবিব আমাদের উপহার দাও। আবার বছর বারো যাতে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম জয় : সিরিজ ড্র

ইংলণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট সিরিজ অনেকবারই অমীমাংসিত থেকে গেছে। এমন কি ইংলণ্ডের ক্রিকেটে যখন দারুণ রমরমা তখন ডগলাস জার্ডিন এবং ওয়্যালি হ্যামণ্ডের শক্তিশালী দলও নিউজিল্যাণ্ডকে সিরিজের কোনো টেস্টে হারাতে পারেনি। কিন্তু এবারের অষ্টাদশ সিরিজের আগে দুই দেশের মধ্যে যে ১৭টি সিরিজ খেলা হয়েছে তার সামগ্রিক ফলে ইংলণ্ডের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। মোট ৪৭টি টেস্টের মধ্যে জয় ছিল ২৩টিতে, ড্র হয়েছিল ২৪টি টেস্ট। নিউজিল্যাণ্ড কোনো টেস্টেই ইংলণ্ডকে হারাতে পারেনি। এবার কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের সেই গ্লানি দূর হয়েছে। ৪৮ বছরের মধ্যে ইংলণ্ড প্রথম হার স্বীকার করেছে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ৪৮তম টেস্টে। দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা শুরু হয় ১৯২৯-৩০ মরসুম থেকে। এবার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ড জিতলেও ছয় দিনের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ড্র হওয়ায় সিরিজও অমীমাংসিত থাকে ১—১ খেলায়। সুতরাং পাকিস্তানে তিনটি টেস্ট ড্র করার পর নিউজিল্যাণ্ড সফরে ইংলণ্ড তার ক্রিকেট মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি।

যাই হোক আগামী জুন থেকে আগস্টের মধ্যে নিজেদের দেশের মাঠে এই দুই দেশের সংগে ইংলণ্ডকে ছয়টি টেস্ট খেলতে হবে। প্রথম তিনটি পাকিস্তানের সংগে, পরের তিনটি নিউজিল্যাণ্ডের সংগে। দেশের মাঠে ইংলণ্ড অবশ্যই বাড়তি সুবিধা পাবে। তা ছাড়া এই সফরের মাধ্যমে দু-তিনজন খেলোয়াড়কে তৈরীও করে নিয়েছে ইংলণ্ড। বিশেষ করে ইয়ান বথাম এবং জিওফ মিলারকে। এই দুজন টনি গ্রেগ এবং ডেরেক আণ্ডারউডের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন এ কথা অবশ্যই বলব না। তবে ব্যাটে বলে দুজনই চমৎকার খেলেছেন। মাত্র ২ রানের জন্য মিলার পাকিস্তানের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি পাননি। নিউজিল্যাণ্ডে দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি পাননি ১১ রানের জন্য। ইয়ান বথাম কিন্তু পাকিস্তানে কোন টেস্ট না খেলেও নিউজিল্যাণ্ডে জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। প্রতি ম্যাচেই ভাল রান পেয়েছেন, তিনটি টেস্টে পেয়েছেন ১৭টি উইকেট। ছয় ইনিংসের মধ্যে চার ইনিংসে পেয়েছেন পাঁচটি করে। ইংলণ্ডের পক্ষে আর একটি সেঞ্চুরি ক্লাইভ র‍্যাডলের, যিনি আহত অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলির বদলে পাকিস্তানে খেলতে আসেন। উল্লেখ্য, সিকান্দার বখতের বলে হাতের হাড় ভেঙে যাওয়ায় ব্রিয়ারলিকে প্লাস্টার বাঁধা হাত নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হয় তৃতীয় টেস্টের আগেই। ফলে বয়কট হন পাকিস্তানের সংগে তৃতীয় টেস্ট এবং নিউজিল্যাণ্ড সিরিজে ইংলণ্ডের অধিনায়ক।

মনে হচ্ছে এই গ্রীষ্ম মরসুমে ইংলণ্ডকে অধিনায়ক সমস্যায় পড়তে হবে। অধিনায়ক না হওয়াতেই পৃথিবীর এক নম্বর ওপেনিং ব্যাট হিসাবে স্বীকৃত বয়কট টেস্ট ক্রিকেট থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে নেতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন। সে নেতৃত্ব ছাড়তে নারাজ। ওদিকে মাইক ব্রিয়ারলি ইংলণ্ডে বলেছেন তিনি অধিনায়কত্ব চান। দেখা যাক নির্বাচকরা কীভাবে সমস্যার সমাধান করেন। সংক্ষেপে তিনটি টেস্টের কথা বলা যাক।

প্রথম টেস্ট ওয়েলিংটন : ১০—১৫ ফেব্রুয়ারি

(টসে জয়ী বয়কট : নিউজিল্যাণ্ডের জয় ৭২ রানে)

প্রথম দিন অত্যন্ত মন্থর ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যাণ্ড করে ৩ উইকেটে ১৫২ রান। দ্বিতীয় দিন ২২৮ রানে নিউজিল্যাণ্ড ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ড করে ২ উইকেটে ৮৯। ইংলণ্ডেরও মন্থরতা-দুষ্ট ব্যাটিং। প্রমাণ অধিনায়ক বয়কটের দীর্ঘ ১৮৭ মিনিটে মাত্র ৩৬ রান। তৃতীয় দিন ২১৫ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৩ রানে অগ্রগামী নিউজিল্যাণ্ড শেষ পাঁচ ওভার খেলে বিনা উইকেটে করে ১২ রান।

জিওফ বয়কট আগের দিন ৩৬ রানে নট আউট ছিলেন। আরও ৪১ রান করে তিনি আউট হন। কিন্তু ৭৭ রান করতে মোট সময় নেন সাড়ে সাত ঘণ্টা।

চতুর্থ দিনের খেলা প্রথম টেস্টকে ফলের দিকে এগিয়ে দেয়। মাত্র ১৬৪ রানের মধ্যে দুই দল ১৮টি উইকেট হারায়। নিউজিল্যাণ্ড ১১১ রানে ১০টি এবং ইংলণ্ড ৫৩ রানে ৮টি। অর্থাৎ আগের দিনের ১২ রান নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১২৩ রানে, ইংলণ্ড ৫৩ রান তুলতেই ৮টি উইকেট হারিয়ে পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। জয়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের মাত্র ১৩৭ রানের প্রয়োজন ছিল। বোলার সহায়ক পিচে প্রধানত উইলিসের বলে যেমন নিউজিল্যাণ্ডের শেষ ৯টি উইকেট পড়ে ৪৮ রানের মধ্যে, তেমন ইংলণ্ডেরও ৮জন আউট হয় হ্যাডলি ও কলিঞ্জের সুইং বলে।

শেষ দিনের খেলা হয় মাত্র ৫০ মিনিট। ইংলণ্ড বাকি দুটি উইকেটে ১১ রান যোগ করে ৬৪ রানে ইনিংস শেষ করে। হার স্বীকার করে ৭২ রানে। ক্রিকেট ইতিহাসে ইংলণ্ডের একটি অগৌরবের দিন। নিউজিল্যাণ্ডের কাছে প্রথম হার স্বীকারের জন্যই শুধু নয়, ইংলিশ ক্রিকেটের ব্যাটিং-মান উন্মোচিত হবার কারণেও। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সর্বনিম্ন ইনিংস ছিল ১৮১, ১৯২৯-৩০ সিরিজে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে। এবার ইনিংস শেষ হল ৬৪ রানে।

মার্ক বার্জেসকে ভাগ্যবান অধিনায়ক বলা যেতে পারে। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্টেই তিনি নিউজিল্যাণ্ডকে এক বড় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সংক্ষিপ্ত স্কোর :

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ২২৮ (রাইট ৫৫, বিভান কংডন ৪৪, রবার্ট অ্যাণ্ডার্সন ২৮, রিচার্ড হ্যাডলি ২৭; ক্রিস ওল্ড ৬—৫৪, ইয়ান বথাম ২—২৭ উইলিস ২—৬৫)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২১৫ (বয়কট ৭৭, রূপ ৩৭, মিলার ২৪, রোজ ২১; রিচার্ড হ্যাডলি ৪—৭৪ কলিঞ্জ ৩—৪২, কংডন ২—১৪)

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১২৩ (অ্যাণ্ডার্সন ২৬, হাওয়ার্থ ২১, রাইট ১৯; উইলিস ৫—৩২, বথাম ২—১৩, হেণ্ড্রিক ২—১৬)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৬৪ (বথম ১৯, ফিল এডমণ্ডস ১১ ; রিচার্ড হ্যাডলি ৬—২৬, কলিঞ্জ ৩—৩৫)

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রাইস্টচার্চ (২৪ ফেব্রু:—১মার্চ)

(টসে জয়ী বয়কট : ইংলণ্ড জয়ী ১৭৪ রানে।

স্কোর থেকে দেখা যাবে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা এবং ইংলণ্ডের বোলারদের আশাতীত সাফল্যই এ টেস্টের ফল নির্ণয় করে দেয়। অবশ্য ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের তৈরি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বোলাররা কাজ হাসিল করে। সামারসেটের অলরাউণ্ডার ইয়ান বথাম তার জীবনের চতুর্থ টেস্টে করেন প্রথম সেঞ্চুরি। মুখ্যত বোলার হিসাবে পরিচিত মিলার এবং এডমণ্ডসের ব্যাটিংও প্রশংসার দাবি রাখে।

ইংলণ্ডের ৪১৮ রানের বড় ইনিংসের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড এক সময় ফলো-অনের সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে। প্রধানত পার্কারই ফলো-অন বাঁচিয়ে দেন ৪ ঘণ্টা উইকেটে টিকে থেকে। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৫৩ রান করে। ২৩৫ রানে ইনিংস শেষ হওয়ায় ইংলণ্ড ১৮৩ রানে এগিয়ে থাকে এবং চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৯৬ রান করে মোট ২৭৯ রানে এগিয়ে যায়। শেষ দিন ইংলণ্ড আর ব্যাট না করায় জয়ের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের ২৮০ রানের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু উইলিস, বথাম এবং এডমণ্ডস তিন ঘণ্টার মধ্যে তাদের ১০৫ রানে শেষ করে দিয়ে ১৭৪ রানে ইংলণ্ডের জয় এনে দেয়।

এ টেস্টে ক্রিকেটের নীতিকথা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠে এবং দুই দেশের সম্পর্কেও একটু চিড় ধরে। চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ইনিংসে চ্যাটফিল্ডের বোলিং রান-আপের সময় ডেরেক র‍্যাণ্ডল ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে যান দ্রুত রান করার প্রচেষ্টায়। চ্যাটফিল্ড যখন দেখলেন র‍্যানডল ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গেছেন তখন বল না করে উইকেট ভেঙে দিলেন। আম্পায়ারের গত্যন্তর ছিল না। ক্রিকেট আইনে ওটা রান-আউট। কিন্তু ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা ওই ধরনের আউটে স্বভাবতই অখুশি হন। শেষদিনে আবার বল করার সময় উইলিস এবং বথাম উইকেটের মধ্যে ঢুকে পড়ায় আম্পায়ার দু-জনকে সতর্ক করে দেন। ইংলণ্ড এ ঘটনাকেও ভাল মনে নিতে পারে নি। ঘটনার প্রতিবাদ করে বয়কট একটি বিবৃতিও দিয়েছেন।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৪১৮ (ইয়ান বথাম ১০৩, জিওফ মিলার ৮৯, ফিল এডমণ্ডস ৫০, বব টেলর ৪৫, গ্রাহাম রূপ ৫০ ; হ্যাডলি ৪—১৪৭, কলিঞ্জ ৩—৮৯।

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৩৫ (অ্যাণ্ডার্সন ৬২, পার্কার নট আউট ৫৩, কলিঞ্জ ৩২, বার্জেস ২৯ ; বথাম ৫—৭৩, এডমণ্ডস ৪—৩৮)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উই: ডিক্লে: ৯৬ (বথাম নট আউট ৩০, বয়কট ২৬ ; কলিঞ্জ ২—২৯)।

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১০৫ (হ্যাডলি ৩৯, অ্যাণ্ডার্সন ১৫ ; বব উইলিস ৪—১৪, ইয়ান বথাম ৩—৩৮, এডমণ্ডস ২—২২)।

তৃতীয় টেস্ট—অকল্যাণ্ড (৪ মার্চ—১০ মার্চ)

(টসে জয়ী মার্ক বার্জেস। ফল ড্র)

দুটি টেস্টে ১—১ সমান হবার পর ছয়দিনের শেষ টেস্ট ড্র হওয়ায় সিরিজও ড্র থেকে যায়। দিন হিসাবে ছয়দিন খেলা হলেও বৃষ্টি এবং মন্দ আলোর জন্য প্রায় একদিন সময় নষ্ট হয়ে যায়। তবু দুই দল মোটামুটি ভাল রান করায় এ টেস্টে জয়পরাজয়ের মীমাংসা হত কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড ব্যাট করার সুযোগই পায়নি।

নিউজিল্যাণ্ড অধিনায়ক মার্ক বার্জেস সিরিজে এই প্রথম টসে জেতেন। বার্জেস নিজে এই টেস্ট সবচেয়ে ভাল ব্যাট করেন। জিওফ হাওয়ার্থের সেঞ্চুরি এবং উইকেটকীপার জক এডওয়ার্ডসের অর্ধ-সেঞ্চুরির ফলে নিউজিল্যাণ্ড করে ৩১৫ রান। উত্তরে ইংলণ্ডের ৪২৯ রানের মধ্যে সেঞ্চুরি করেন ক্লাইভ র‍্যাডলে, যিনি আহত অধিনায়ক ব্রিয়ালির পরিবর্তে ইংলণ্ড থেকে ছুটে এসেছিলেন। ৩৩ বছর বয়সী র‍্যাডলে ব্রিয়ালির মিডলসেক্স কাউন্টিরই খেলোয়াড়। জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি করেন। তাঁর ১৫৮ সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। ব্যাট করেন দশ ঘণ্টা ধরে। ইংলণ্ড অধিনায়ক জিওফ বয়কট প্রথম টেস্টে ৭৭ রান করার পর ব্যাটে রান পাচ্ছিলেন না। এ টেস্টে ৫৪ রান করেন কিন্তু পাঁচ ইনিংসের মধ্যে চারবার আউট হন বাঁ-হাতি পেসার রিচার্ড কলিঞ্জের বলে। ৪২৯ রানের বড় ইনিংস সত্ত্বেও ইংলণ্ড শেষ পাঁচটি উইকেট হারায় মাত্র ৩৯ রানে। নিউজিল্যাণ্ডের ন্যাটা স্পিনার স্টিফেন বুক এক সময় ১৫টি বলে একটিও রান না দিয়ে ৩টি উইকেট পান এবং শেষ পর্যন্ত পান ৬৭ রানে ৫টি উইকেট।

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে হাওয়ার্থ আবার সেঞ্চুরি করেন। টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন এ পর্যন্ত পৃথিবীর ২৩ জন ব্যাটসম্যান। হাওয়ার্থের নিউজিল্যাণ্ডের মাত্র একজন—গ্লেন টার্নার। ১৯৭৩-৭৪ সিরিজে টার্নার দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। হাওয়ার্থ করলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এটি ছিল দুই দেশের মধ্যে ৫০তম টেস্ট। এখন ফল ইংলণ্ডের জয় ২৪, নিউজিল্যাণ্ডের ১ এবং ড্র ২৫।

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩১৫ (জিওফ হাওয়ার্থ ১২২, জক এডওয়ার্ডস ৫৫, মার্ক বার্জেস ৫০ ; ইয়ান বথাম ৫—১০৯, লিভার ৩—৯৬, উইলিস ২—৫৭)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৪২৯ (ক্লাইভ র‍্যাডলে ১৫৮, বয়কট ৫৪, গ্রাহাম রূপ ৬৮, বথাম ৫৩, র‍্যানডল ৩০ ; স্টিফেন বুক ৫—৬৭, রিচার্ড কলিঞ্জ ৪—৯৮)।

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৮ উইকেটে ৩৮২ (জিওফ হাওয়ার্থ ১০২, অ্যাণ্ডার্সন ৫৫, এডওয়ার্ডস ৫৪, পার্কার নট আউট ৪৭, রাইট ২৫ ; মিলার ৩—৯৯, এডমণ্ডস ৩—১০৭, লিভার ২—৫৯)।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা। অমিতা সেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। দাম : ছয় টাকা।

শ্রীমতী অমিতা সেন হলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠা কন্যা, আজন্ম শান্তিনিকেতনে পালিতা আশ্রমকন্যা। বইখানি তাঁর আশ্রম জীবনের কাহিনী।

৩৭ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন পৃথিবী থেকে চলে গেলেন, তাঁর খ্যাতির সামগ্রীগুলি আর পার্থিব সম্পত্তি সব ফেলে রেখে গেলেন। তাঁর ছবি, গান, গল্প, নাটক, নাচ, প্রবন্ধ—সঙ্গে করে কিছু নিলেন না। নিলেন শুধু তাঁর অমর আত্মা আর ভক্তের ব্যক্তিত্বটুকু। যতদিন বাংলা ভাষার চর্চা থাকবে, পণ্ডিতরা, সাহিত্যানুরাগীরা তাঁর সাহিত্য-কীর্তির আর শিল্প-রচনার নানান অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যানা করে, তাঁর গৌরব বাড়াতে না পারলেও, নিজেদের বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করবেন। কিন্তু মানুষটার ব্যক্তিগত দিকটি কতকগুলি স্মৃতিকথা আর কিংবদন্তীর জালে ঢাকা পড়ে থাকবে। তাঁর

জীবনের ঘটনার পারম্পর্য সাল-তারিখ সুদ্ধু নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ থাকলেও, মাঝখান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে যে মানুষটা ছিল সে হয়তো বাদ পড়ে যাবে।

তাঁর গলার স্বর, চোখের দৃষ্টি, হাতের স্পর্শ কে ধরে রাখতে পারে? তবু মাঝে মাঝে অকস্মাৎ একেকটি বই হাতে আসে, যার পাতার মধ্যে থেকে সেই বড় চেনা, বড় শ্রদ্ধা-করা মানুষটি হঠাৎ বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ান। দু-চারটি তুচ্ছ ঘটনা—যার সঙ্গে সাহিত্যের হয়তো সম্বন্ধ নেই—কটি সাধারণ কথা, কিন্তু তারই কোমল উষ্ণতা লেগে রবীন্দ্রনাথের সত্তা আবার এসে আমাদের চোখের সামনে রূপ ধরে। নাম করা সাহিত্যিকদের যা সাধ্য নয়, কবি-সান্নিধ্য-ধন্যা কোনো একজন আশ্রমকন্যা অনায়াসে পেরেছেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বিশ্বকবি নন। বিশ্বকবির সঙ্গে ছোট মেয়ের কি বা সম্পর্ক? তিনি তাঁর গুরু, তাঁর পিতার গুরু, হাতে করে তাঁকে তিনি মানুষ করেছেন; আশৈশব তাঁর আদর্শে তিনি বড় হয়েছেন, সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে তাঁর কাছে ছুটে গেছেন, তাঁর প্রসন্নতায় ধন্য হয়েছেন, যখন তিনি রুষ্ট হয়েছেন চোখে অন্ধকার দেখেছেন। এ-দেখা যে-সে দেখা নয়, এ হল অতি স্নেহের, অতি অন্তরঙ্গের দেখা। সাজগোজ করে, জনসভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখা নয়, পাশাপাশি বাড়িতে থেকে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বারোমেসে আট-পৌরে দেখা। এর চোখে ধুলো দেওয়া বড় শক্ত। শৈশবের চোখ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্মভেদী এবং সৎ ও সৎ-সাহসী। যা দেখে তা হয়তো সব সময় বলতে পারে না, কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটি সুদ্ধ দর্শনীয় মানুষটিকে আপদমস্তক দেখে এবং মনে রাখে। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক, নির্মম; কারণ দর্শকের মন অনাবিল, নির্মল; তার বিচার কাঁচা কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তার ফলে দেখার মানুষটি যেমন, ঠিক তেমনি হয়ে ফুটে ওঠে। ছোট মেয়ে যা দেখে তাকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিতে তার মিথ্যা নেই। এমনি চোখে দেখা একজন ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ, এই লেখার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠেন। বইয়ের পাঠক মুগ্ধবিস্ময়ে উপলব্ধি করে যে অপোগণ্ডের সাদা চোখে দেখা মানুষটির চরিত্রের আর ব্যক্তিত্বের গৌরব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। গুরু-দেবের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো খুঁত থাকলে, তার চোখে পড়েনি।

সামনে থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর ওপর যে আলো পড়ে তাতে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে, কিন্তু চার পাশ থেকে যদি আলো ফেলা যায়, পদ্ম-কাটা হীরের মতো তার শত ফলক থেকে আলো ঠিকরোয়। এমনি পাশ থেকে আলো পড়েছিল শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাধুরীলতার চিঠি' বইখানির মধ্যে দিয়েও। কিন্তু সেখানে লেখিকা কতকগুলি স্বাভাবিক দাবির জোরে বল পেয়েছিলেন; বর্তমান রচনায় লেখিকার সে স্পর্ধা ছিল না, গুরুদেবকে সমালোচনার পাত্র করার কথা সে ভাবতেই পারে নি। এ-দিক দিয়ে তিনি একাকী নন; যে-সব আশ্রমকন্যার কথা তিনি বলেছেন, তারা সকলেই তাঁর দলে: অজিত চক্রবর্তীর মেয়েরা, নন্দলাল বসুর মেয়েরা, নেপালচন্দ্র রায়ের বাড়ির মেয়েরা, শ্রীমুকুল দে-র বোনেরা এমনি আরো অনেকে। এঁরাও হলেন আশ্রমকন্যা, এঁদের অভি-ভাবকরা প্রায় সকলেই আশ্রমের কর্মী, এঁদের সঙ্গে লেখিকা বড় হয়েছেন, এঁরা তাঁর বন্ধু, সখী, ভগ্নী। আজকালকার জগতে এই মধুর সম্বন্ধটি গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। এই নিরহংকার, মমতাময় ঈর্ষাবিহীন মনোভাব ক্রমে বিরল হয়ে আসছে। আশ্রম-গুরু বিদায় নেবার পর আশ্রমেও একে খুঁজে পাওয়া দায়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিককার চিত্রটি ভারি মনোহর। তবে সব কথা

লেখিকার [illegible] নেওয়া নয়, তিনি মাত্র ১৯১৪-১৫ সালে জন্মেছিলেন। হয়তো মা-মাসির কাছে, বড় বোনদের কাছে, মাতৃস্থানীয়া প্রতিবেশিনীদের কাছে শোনা। তাতে তার মূল্য একটুও কমে যায়নি। আমি নিজে রবীন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গভাবে দেখেছি সত্তর বছর বয়সে, ১৯৩১ সালে, তখন তিনি উত্তরায়ণবাসী, বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ, আমাদের মধ্যে আর তাঁর মধ্যে একটি অদৃশ্য ব্যবধান হাঁ করে থাকত। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মননশীলতার সাহায্যে তাকে পার হতে পারলেই তাঁর স্নেহের স্পর্শ পাওয়া যেত। কিন্তু অসময়ে মাস্টারমশাইদের বাড়ি গিয়ে, তাঁদের ঘুমন্ত শিশুদের সরিয়ে বিছানার কোণায় বসে রবীন্দ্রনাথ গল্প করে যাচ্ছেন—এ জিনিস আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল। আশ্রমকন্যারা বড় ভাগ্যবতী।

বইখানি শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতি দিয়ে ভরা নয়। এর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সহজ, নির্মল মন দিয়ে লেখিকার নিজেরই অজান্তে কবির মর্মস্পর্শী মূল্যায়ন করা হয়ে গেছে। পেশাদার সমালোচকরা যা চেষ্টা করেও পারেন না, সাহিত্যে অনভিজ্ঞা এই আশ্রম-কন্যা তা খুব সহজেই পেরেছেন। নিজেও নৃত্যশিল্পে পটীয়সী, মুনশীয়ানা নিজেরও কিছু কম নয়, তাই সমালোচনার হাতখানি বড় দক্ষ, কিন্তু সমবেদনায় কোমল, পালকের মতো হালকা। শিল্পের দিক থেকে শান্তিনিকেতনে কি কাজ হয়েছে তার সুন্দর চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বীজ অঙ্কুরিত হওয়া থেকে গাছে ফল ধরার কাহিনী।

ভূমিকায় বলা হয়েছে 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রযোজিত 'দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মারক বক্তৃতা'র আকারে পাঠ্যাংশের রচনা হয়েছিল। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও সহানুভূতির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যার বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়নি সে হল যে-সব অল্পখ্যাত আশ্রম কর্মীর সেবায় ও যত্নে শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল, তাদের কথা। নিজের বাবার কথাও যথেষ্ট বলা হয়নি এবং নিজের ব্যক্তিগত বন্ধু ও পারিবারিক বন্ধু ছাড়া আরো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা। তবে একটা ৯৫ পৃষ্ঠার বইতে কি তা কখনো সম্ভব হতে পারে?

এই বইখানি আরো হৃদয়স্পর্শী হত যদি অত বেশি চিঠিপত্র, কবিতা, প্রবন্ধাদি থেকে উদ্ধৃতি বাদ দেওয়া হত। এ বই যারা পড়বে তাদের কাছে শ্রীমতী অমিতা সেনের মন্তব্য ও বক্তব্যই হল মুখ্য। এমন কি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তার স্থান অন্যত্র। এটি হল অমিতা সেনের ব্যক্তিগত জবানী। আদালতে পড়া কথা বা শোনা কথা গৃহীত হয় না।

ভাষা সুস্পষ্ট, সামান্য আড়ষ্ট। সে সময়কার অনেক আলোকচিত্র লেখিকার কাছে থাকা সম্ভব। তার থেকে পাতায় পাতায় সাদা-কালো ছোট ছোট স্কেচ দিলে বইটি আরো ভালো। শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ ও শ্রীখালেদ চৌধুরীর আঁকা মলাটখানি অপূর্ব। এ বই আলমারিতে তুলে ভুলে যাবার জিনিস নয়, এ পড়লে অন্যকে পড়াতে ইচ্ছে করে। কাজেই সুদৃশ্য মলাটের স্পাইনটি কাপড়ের ও ভিতরের হিঞ্জটি কাগজের হওয়াতে, সবশুদ্ধু মলাটটি খুলে আসার ভয় আছে। সবাই পড়ুক এ বই, রবীন্দ্রনাথকে আরো ভালো করে বুঝুক, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সম্বন্ধে জানুক, এই আশা করি।

লীলা মজুমদার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

পঙ্কজকুমার স্মরণে

গত ১৩ মার্চ রবীন্দ্রসদন আয়োজিত পঙ্কজকুমার মল্লিকের স্মরণ সভায় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ পঙ্কজকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—আজকে পরলোকগত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে আহূত এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি চিরকালই শান্তিনিকেতন-বাসী। সেই কারণে, প্রথমদিকে পঙ্কজ-বাবুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ আমার ঘটেনি। আমি তাঁকে প্রথম জেনেছি বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন তিনি গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে

সুপ্রতিষ্ঠিত। রেকর্ড ও চলচ্চিত্রে তাঁর গান তখন শুনেছি। তাঁর কণ্ঠে গীত রেকর্ড ও চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীত এবং আধুনিক গান আমার শুনতে ভালও লাগত। এভাবে গানের সূত্রে, দূর থেকে তাঁকে আমি প্রথম চিনে-ছিলাম।

কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, তা বলি। পূজনীয় গুরুদেবের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বের একটি ঘটনা। নিউ থিয়েটার্সের দ্বারা প্রযোজিত 'পরিচয়' নামক চলচ্চিত্রের পঙ্কজবাবু তখন সংগীত পরিচালক। একদিন তিনি সদলে শান্তিনিকেতনে এসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতিক্রমে গুরুদেবের সঙ্গে

গল্পটিতে তাঁর গান চলচ্চিত্রের পরিচালক ব্যবহার করতে চান। তিনি, গুরুদেবের কাছে তাঁকে পাঠিয়েছেন গল্পে ব্যবহারযোগ্য কিছু গান গুরুদেবের নির্দেশমত নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষায়। পংকজবাবু, গুরুদেবকে পরিচয়ের গল্পটি মুখে শুনিয়েও ছিলেন। গল্পটি শোনার পর, গুরুদেব, আমাকে খবর দিয়ে আনিয়ে পংকজবাবুকে বলেছিলেন, গল্পের উপযোগী গান ক'টি আমার সংগে পরামর্শ করে এবং আমার কণ্ঠে গানগুলি শুনে তাঁদের পছন্দমত তাঁরা যেন তা বেছে নেন। গুরুদেবের নির্দেশমত আমরা উত্তরে একসংগে বসি এবং পংকজবাবু গীতবিতানের তিন খণ্ড থেকে নানা প্রকার গান আমার কাছে শুনে, তার থেকে মোট প্রায় ১০টি গান তিনি চলচ্চিত্রের জন্যে নির্বাচন করেন। পরের দিন তিনি সেই গানগুলির ব্যবহারের অনুমতি গুরুদেবের কাছ থেকে নিয়ে কলকাতায় সদলে ফিরে যান। গানগুলি 'পরিচয়'-এ গেয়েছিলেন, কে এল সাইগল এবং শ্রীমতী কানন দেবী।

সে দিনের সেই প্রথম পরিচয়েই পংকজবাবুর যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তার স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে যুগে পংকজবাবু গায়ক, সুরকার এবং সংগীত পরিচালক হিসেবে কেবল বাঙালীদের মধ্যেই যে খ্যাতনামা ছিলেন তা নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁর সেই খ্যাতি সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তিনি যতক্ষণ আমার সংগে ছিলেন, ততক্ষণ আমার সামনে যেভাবে তাঁর জীবনটিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন, তাতে ছিল না সংগীত জগতে তাঁর খ্যাতির এতটুকুও আভাস।

পরবর্তী যুগে, গুরুদেবের দ্বারা প্রচারিত, লালন ফকির ও গগন হরকরার দুটি বাউল গান পংকজবাবু আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর ইচ্ছা, রেকর্ডে গান দুটি গাইবেন। আমি যখন তাঁকে শেখাতাম, তখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগেই তা শিখতেন। গুরুদেবের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটিতে সুর যোজনা করে পংকজবাবুকে শিখিয়ে দেবার জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, পংকজবাবু কি আমার দেওয়া সুরের গান রেকর্ড করবেন? কিন্তু আমার সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল ছিল তা প্রতিপন্ন হয়, যখন তিনি গভীর মনোযোগের সংগেই গানটি শিখলেন এবং রেকর্ডে গাইবার পূর্বে আমাকে ভাল করে কয়েকবার নিজে থেকেই শোনালেন।

এইভাবে প্রতিবারই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন, একজন সাধারণ গায়ক রূপে। তাঁর নিজের গুণপনা বা খ্যাতির কথা তাঁর মুখে কখনো শুনিনি, বা তাঁর আচরণে তা প্রকাশও পেত না।

একবার, কোন এক সংগীতের আসরে আমরা দুজনেই গান গাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হই। আমার গানের সময়, আমার সহকারী যন্ত্রীর পরিবর্তে তিনি নিজে যখন আমার গানের সংগে হারমোনিয়াম বাজাবার অনুমতি চাইলেন তখন আমি নিজে যেমন অভিভূত হয়েছিলাম, তেমনি সেদিনের শ্রোতারাও বুঝেছিল তিনি কোন প্রকৃতির মানুষ।

আর একটি মহৎ গুণের জন্য পংকজবাবুকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তা হল পূজনীয় গুরুদেবের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি রবীন্দ্র সংগীতকে তাঁর জীবনে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এরই জোরে। তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্র-সংগীত শুনে কিছু বিরূপ সমালোচনা কখন যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু তার জন্য পংকজবাবুকে কখনো দুঃখ প্রকাশ করতে শুনিনি। এর একমাত্র কারণ হল, তাঁর মনে রবীন্দ্র-সংগীতের মাধুর্যরসের গভীর প্রভাব। সেই রসে তাঁর মন এমন মগ্ন ছিল যে, বাইরের নিন্দা সেখানে প্রবেশের কোন সুযোগ কখনই পেত না।

আধুনিক গানের সুরকার হিসেবে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। কিন্তু, আমি লক্ষ করেছি এ পথে, পূজনীয় গুরুদেবকেই তিনি পদ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে, গুরুদেবের গানের রচনারীতিকে অবলম্বন করেই তিনি বিভিন্ন কবিদের কবিতায় সুর যোজনা করতেন। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের ভারতীয় সংগীতের সুরের উপর নির্ভর করেই তিনি কবিতার কথার সংগে সুর যোজনার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষণিক চটকদারী ইউরোপীয় হালকা ঢং-এর গানের মোহে আকৃষ্ট হয়ে সেই সব সুরের অনুকরণের চেষ্টা তিনি করতেন না। নিজের দেশের অফুরন্ত সুরের ভাণ্ডারই ছিল তাঁর সুরসৃষ্টির মূল উৎস। সেখান থেকেই বারে বারে সুর সংগ্রহ করেছেন এবং কবিদের রচিত কাব্যকে তিনি খুবই সার্থকতার সংগে সেই সুরের সাহায্যে নিজের মত করে সাজিয়েছেন। আজকে, পংকজবাবুর স্মরণোৎসবে প্রার্থনা করি, প্রকৃত শিল্পীজনোচিত তাঁর এই গৌরবময় জীবনের স্মৃতি আমাদের মনে যেন চির জাগ্রত থাকে।

মুনাওয়ার আলীর গান

সাংগীতিকের বসন্ত উৎসবের দ্বিতীয় বৈঠকে (মার্চ ৪) শোনা গেল ওস্তাদ মুনাওয়ার আলী খাঁর গান। আসরে পাওয়া গেল পাতিয়ালা তথা বড়ে গুলাম আলী খাঁ গায়কীর পূর্ণ বিকাশ, এই গায়কীর বা ঘরানার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি এবং একটি উচ্চাংগের অপ্রচলিত রাগ। প্রথমটি ঠাসা ছিল তিন ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানটির আনাচে-কানাচে, দ্বিতীয়টি ছিল এই ওস্তাদের প্রথম পুত্র রাজা আলী খাঁর কণ্ঠ-সহযোগী রূপে আবির্ভাব এবং তৃতীয়টি রাগ মালানি-বসন্ত (মালতি-বসন্ত বা বসন্ত-মালতি নয়)।

অনুষ্ঠানের প্রথম বিলম্বিত খেয়ালটি ছিল ইমন রাগে অর্থাৎ প্রচলিত স্বরসংগতিতে নতুন স্বাদ দেওয়া ও নতুন স্বরসংগতি রচনা করাই ছিল শিল্পীর পরিপক্কতার পরীক্ষা। মুনাওয়ার আলীর বিস্তার ও সরগমের কাজ দুটো চাহিদাই মিটিয়ে দিয়েছিল নিপুণভাবে। সরগমের কাজ লয় ও ছন্দের উত্থান-পতন ও স্বরসংগতির উপভোগ্য জটিলতা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। বিলম্বিতটির দ্বিতীয়ার্ধে এবং

দ্রুত খেয়াল ও তারানা।৮৩ঃ ঐলেশ কাজও ছিল সুরেলা, সুনিপুণ ও সুগঠিত।

দ্বিতীয় বিলম্বিত খেয়ালটি ছিল মালানি-বসন্ত রাগে। রাগটির আরোহণ স গ ম, গ ক্ম ধ ন র্স এবং আরোহণ র্স ন ধ ক্ম গ ম গ র-স্ (র-স বেহাগের মত)। এর থেকে বোঝা যায় যে রাগটি আসছে শুদ্ধ—বসন্ত থেকে এব- গ ক্ম ধ ন র্স বসন্ত থেকে এবং গ ক ধ ন র্স আরোহণ, দুই মধ্যমের মিলন এড়িয়ে যাওয়া এবং বেহাগ-সুলভ অবরোহী শুদ্ধ ঋষভের ছোঁয়ার গুণে জনক রাগটি থেকে স্বতন্ত্র। এই মধ্যমের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য রাগটিকে মালতি-বসন্ত বা বসন্ত-মালতির হাত থেকে বাঁচায় এবং শুদ্ধ ঋষভটি অবরোহণের শেষে তিনটে স্বরে কৌশি-ধ্বনির ছায়া আসতে দেয় না। মুনাওয়ার আলীর মেজাজী বিস্তারের কাজে রাগটির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তিনি দুই মধ্যমের ব্যবহারে বিশেষ পার-দর্শিতা দেখান। দ্বিতীয়ার্ধের তানকারিও হয়েছিল অতি উৎকৃষ্ট। দ্রুত খেয়ালটিতে আরো ভাল তানকারি ছিল এবং সরগম-বিস্তার সওয়াল-জবাবে রাজা আলী খাঁ প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন।

এরপরে শোনা গেল হিন্দোল-বাহার নামক এক অপ্রচলিত রাগে একটি দ্রুত খেয়াল। রাগটির-চলন হিন্দোলেরই মতো শুধু জায়গায়

জায়গায় অতি-সূক্ষ্ম স্পর্শ-স্বর হিসাবে বাহারের শুদ্ধ ঋষভ, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম এবং কোমল গান্ধার লাগানো হয়। এই স্পর্শ স্বরের ব্যবহার অতি-সূক্ষ্ম হওয়ায় খুব মন দিয়ে না শুনলে রাগটিকে খাঁটি হিন্দোল থেকে আলাদা করা যায় না। এবং এই কারণেই রাগটিকে রাগ আখ্যা দেওয়া যায় না। শেষের পাঞ্জাব অঙ্গের দুই ঠুংরী ও দাদরাটি শিল্পী দক্ষতার সঙ্গে গেয়েছিলেন। তবলা সঙ্গত করেছিলেন ওস্তাদ সৌকত আলী খাঁর পুত্র আসলাম খাঁ এবং ঠুংরী পর্বে এঁর লগ্গি বাদন ভাল লেগেছে।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

লালকুঠি

ছবির আরম্ভতেই দেখা যায় উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য চা-বাগান অঞ্চলে নির্জন স্থানে মধ্যযুগীয় একটি লালরঙের প্রাসাদ। এই লালকুঠিতে রাত ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবতী মোমবাতি হাতে 'কে যায় রে, কে যায় রে' বলে গান গেয়ে সারা বাড়িটা পরিক্রমা করছে। তারপরই এক যুবককে খুনের দৃশ্য, যুবতীর কান-ফাটানো আর্ত চীৎকার: কয়েক জোড়া সন্দিগ্ধ চোখের উঁকি মারা—দেখে মনে হবে ভৌতিক কোন কাহিনী। পরদিনই দেখা যায় পূর্ব-রাতের যুবতীর সামনে উপস্থিত চা-বাগানের নবনিযুক্ত ম্যানেজার অজয়। বোঝা গেল যুবতী ওই এস্টেটের একমাত্র মালিক রুনু সেন। রুনু (তনুজা) যেভাবে নবনিযুক্ত ম্যানেজারের (রঞ্জিত মল্লিক) কাছে তার প্রভুত্ব প্রকাশ করলো তাতে ওকে পূর্বরাত্রের নিশিতে-পাওয়া মেয়ে বলে মনেই হয় না। অজয় অফিসে যোগ দেওয়ার পর যেসব চরিত্রের দেখা মেলে

তাদের চলনে-বলনে কেমন যেন একটা রহস্যের প্রলেপ মাখানো। এর পরই সময়ের অতিক্রমণ বোঝাতে একটি গানের (গীতিকার মুকুল দত্ত) অবতারণা এবং গান শেষ হবার আগেই দেখা গেল অজয় ও রুনুর বিবাহ হয়েছে এবং তাদের একটি পুত্রসন্তানও লাভ হয়েছে। রুনু ও অজয়ের সখ্যতা, প্রেম এবং পরিশিষ্টে পরিণয় ক্ষেত্রে এমন গোঁজামিলের উদ্দেশ্য কাহিনীর (রচয়িতা বাত্রা মহেন্দ্র) মূল লক্ষ্য আতঙ্ক ও বিভিষীকাময় রহস্যঘন ঘটনাবলী দ্রুত দর্শকসমক্ষে উপস্থিত করা। পরিচালক (কনক মুখোপাধ্যায়) সাসপেন্স বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু সে-কাজে অনেক ফাঁক ও ফাঁকিও ধরা পড়ে যায়। পরিচালক এ-ছবির 'ভাগ্যবিধাতা' ড্যানির প্রসঙ্গে চলে আসার ব্যস্ততায় ঘটনার পারম্পর্য ও সঙ্গতি রক্ষা উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

রুদ্ধশ্বাস ঘটনার প্রবাহ দেখা যায় রুনু তার প্রথম প্রেমিক দীপকের (অনিল ধাওয়ান) হত্যাকারী মনে করে এক ব্যক্তিকে মোটর চাপা দেওয়ার পর: আর এটাকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যা বলে প্রমাণ সহ উপস্থিত হয় শোমন (ড্যানি)। শয়তানের এক প্রতিমূর্তি। রুনু ও অজয়কে ভয় দেখিয়ে ওদের বাসায় শোমন নিজের আস্তানা গাড়ে। রুনু চায় না তার ছেলে সমীর (মাস্টার পার্থ) যেন শোমনের খপ্পরে পড়ে। সমীর কিন্তু অচিরেই শোমনের বন্ধু হয়ে যায়। কার্যকারণের সঙ্গে বিক্ষিপ্তসম্পর্ক নানা ঘটনার শেষে জানা যায় যে, রুনুর পিতা ও তার প্রেমিক দীপককে হত্যার জন্য দায়ী তারই কাকা মিঃ সেন (উৎপল দত্ত)—উদ্দেশ্য সম্পত্তি হস্তগত করা। মোটর দুর্ঘটনাকে খুন হিসেবে প্রতিপন্ন করানোর জন্য শোমন তারই দ্বারা নিয়োজিত। মিঃ সেন তার উদ্দেশ্য ত্বরান্বিত করতে সমীরকে অপহরণ করে অজয়কে ফোনে জানিয়ে দেয় যে দুঘন্টার মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের কাগজে সই করে নির্দিষ্ট স্থানে না নিয়ে এলে সমীরকে আর পাওয়া যাবে না। এ সংকট থেকে উদ্ধার করলো সমীরের বন্ধু শোমন নিজের প্রাণের বিনিময়ে। পরিশিষ্টটা শোমন ও সমীরের সখ্যতাকে সেন্টিমেন্টের জারকে একটু বেশী চোবানো হয়েছে। অনিল ধাওয়ান 'অতিথিশিল্পী'—তাঁকে রুনুর প্রথম প্রেমিক রূপে মূকাভিনয় করতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে ঐ নামী শিল্পীর মানও বাড়েনি, ছবির আকর্ষণও নয়।

ছবির তিন-চতুর্থাংশ শোমন তথা ড্যানিকে ঘিরে। আর ড্যানিও বেশ দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে গিয়েছেন। প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে বোম্বাই ছবিসুলভ মারদাংগা ব্যাপারে একাই সে একশ'—আর কি অলৌকিক ক্ষমতা তার একের পর এক বলবান শয়তানকে ঘায়েল করায়! এ ছাড়া ড্যানি যে উঁচু দরের চরিত্রাভিনেতা সেটা স্বীকৃতি পাবে।

গৃহে রুনুদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য শার্সি বা ঘুলঘুলির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে জোড়া জোড়া চোখ, রুনু, শোমন, অজয় ও পার্থ প্রভৃতি ছাড়া আর সব চরিত্রের কথাবার্তার মধ্যে সর্বক্ষণ একটা রহস্য ও আতঙ্কের আমেজ কোন অমঙ্গলজনক ঘটনার প্রতি দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে তুললেও নিটোল একটি রহস্য কাহিনী বলতে মন ভরার মতো কৃতিত্বের পরিচয় পরিচালক দিতে পারেননি। কিন্তু ক্যামেরা (অশোক মেহতা) এবং সঙ্গীতকে (সুরযোজনা: স্বপন-জগমোহন) আর সেই সঙ্গে বিচিত্র সব শব্দের ব্যবহারে পরিচালক রহস্য-রোমাঞ্চের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলায় সক্ষম হয়েছেন। বোম্বাইয়ে তোলা বাংলা ছবি, এর মূল কাহিনী হিন্দীতে—ছবিখানি দেখতে যাবার আগে মনকে সেই ভাবেই প্রস্তুত করে নেওয়া ভাল। আলোকচিত্র গ্রহণে অশোক মেহতার কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোরকুমার ও আশা ভোঁসলের গানও ভাল লাগবে।

পঙ্কজ দত্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

মীরা মুখোপাধ্যায়
(১৯২৩—)

জন্ম তাঁর মধ্য কলকাতার বনেদী এক পরিবারে। বিবাহসূত্রে সুনয়নী দেবীর সঙ্গে আত্মীয়তাও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে তাঁর জীবনে নেমে এল দুঃখের দিন। তাঁর অসাধারণ মনোবলের জন্যেই পুরুষপ্রধান সমাজে নিজের স্থান ক'রে নিতে পেরেছেন। এর জন্যে তাঁকে যে বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। অন্য কেউ হলে ঘৃণায় দুঃখে কাজ করা ছেড়ে দিতেন।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিটি দেখুন। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ভাস্কর হায়নরিষ কিরখনারের করা। যে-দেশে বড় শিল্পীর দুষ্প্রাপ্য শুভেচ্ছাবাণী থেকে বিজ্ঞাপনমূল্য নিংড়ে নেওয়া হয়, সেই দেশে কিরখনারের অভিনন্দনের এই শৈল্পিক অভিব্যক্তি তিনি তোরঙ্গের সুড়ঙ্গে গোপন ক'রে রেখেছিলেন। আমাকে একরকম জোর ক'রে উদ্ধার করতে হলো। শিল্পের জন্যে নিবেদিত-প্রাণা এই আশ্চর্য নারীর প্রচারবিমুখতা তুলনারহিত। তিনি অসাধারণ গায়িকাও। একসময় দিল্লি রেডিও স্টেশনে খেয়াল গাইতেন। কিন্তু একসময় উভয়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন এল তখন তিনি ভাস্কর্যের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। যামিনী রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতে তিনিই একমাত্র জীবিকার জন্যে শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এই জেদ আর আত্মবিশ্বাসের জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে, কখনো দুবেলা জোটেনি আহার। সম্প্রতি দিল্লির পঞ্চতারকা 'মৌর্য' সরাইখানা তাঁর 'অশোক' (দেশের প্রচ্ছদে প্রকাশিত) কিনেছে। সুতরাং অন্নচিন্তাচমৎকারা থেকে কিঞ্চিৎ নিশ্চিত হয়ে দ্রুত আরেকটি বড় কাজে হাত দিয়েছেন। ইদানীং তিনি কোনো প্রদর্শনী করেন না। কিন্তু মাসের দ্বিতীয় শনিবারে যে কেউ তাঁর ১২এ পদ্মপুকুর রোডের স্টুডিওতে এসে কাজ দেখে যেতে পারেন।

১৯৩৭-৪১তে তিনি অবনীন্দ্রনাথের ওরিয়েন্টাল স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৪৭-৫২-তে দিল্লি পলিটেকনিকে ভাস্কর্যের পাঠ নেন। ১৯৫২-য় শান্তিনিকেতনে ইন্দোনেশীয় শিল্পগুরু আফিন্দীর কাছে চিত্রশিক্ষা করেন। ১৯৫৩-৫৬-তে পশ্চিম জার্মানীর বৃত্তি পেয়ে সেদেশে যান। একবছর তৈলচিত্র শেখেন অধ্যাপক প্লোতের কাছে। পরবর্তী তিন বছর তিনি বিখ্যাত ভাস্কর টনি স্টেডলারের কাছে ভাস্কর্য শেখেন মুনিকের একাডেমী বিল্ডেন কুনাস্তেতে। ফিরে এসে কার্সিয়ং-এর ডাও হিলে (৫৭-৫৮) এবং কলকাতার প্রেট মেমোরিয়ালে (১৯৫৯-৬০) তিনি শিল্পকলা শিক্ষিকা ছিলেন।

ইউরোপীয় কাজে সুদক্ষ হবার পর দিশী রীতি শেখার জন্যে তাঁর মন প্রবল আকুলতা এল। এইসময় ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরলেন। [illegible] গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরে ঢালাইয়ের কাজ শিখলেন। আমি এই পর্বকে বলি মীরা মুখোপাধ্যায়ের বনবাসপর্ব, অজ্ঞাতবাসপর্ব। মীরা বাঈয়ের মতোই তিনিও সাধনার জন্যে নিজেকে সঁপে দিলেন। ১৯৬০-এ তিন মাস বাস্তার জেলার ঘড়ুয়া লোক-শিল্পীর কাছে শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৬১-তে হ্যান্ডিক্রাফট বোর্ডের বৃত্তি পেয়ে দক্ষিণী লোকশিল্পীর কাছে কাজ শিখতে ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, এবং পূর্ব ভারতীয় ডিজাইন সেন্টারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ঢোকরা এবং বিহারের মালোর লোকশিল্পীদের কাছে কাজ শেখেন। ১৯৬২-৬৫ অধ্যাপক নির্মল বসুর আগ্রহাতিশয্যে তিনি অ্যানথ্রোপলজিকাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার সিনিয়র

রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে ভারতীয় ধাতু কারিগরের ওপর গবেষণা করার জন্যে মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, তামিলনাদ, কর্ণাটক, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং নেপালে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'ট্র্যাডিসানাল মেটাল ক্রাফটসম্যান' ভারত সরকারের মুদ্রণালয়ে যন্ত্রস্থ। ১৯৬৫-৬৬তে ম্যাকস মুলার ভবনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ কলকাতার পূর্বা-ঞ্চলিক ডিজাইন সেন্টারে কাজ করেন। ১৯৬৭ সালের লোকধাতুকারদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ থেকে তিনি নিজের স্টুডিওর বাইরে কাজ করেননি।

১৯৭৭-এ পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কয়েক মাসের জন্যে সেদেশে যান। ১৯৭৮-এ বারোদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে তাঁর নিজস্ব ঢালাইয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে আসেন। এ বছরের পরে এবিষয় বক্তৃতা দেবেন আহমেদাবাদ। একক প্রদর্শনী—১৯৫২, ৬০, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৩, কলকাতা। ৭০ দিল্লি। ৭২ হায়দ্রাবাদ। ৭৩ বোম্বাই। এছাড়া সোসাইটি অব কনটেম্পরারী আর্টিস্ট এবং ক্যালকাটা পেনটারসের সঙ্গে তিনি ক্কচিৎ যৌথ প্রদর্শনী করেছেন।

'ওরা মুক্ত' (মিশ্রধাতু ৩'×২'×১' —ওজন দশ কে জি)—শবর ধনুক নিয়ে পাখি শিকার করছে। আকাশের পাখি-গুলো ধনুকের মধ্যে বিধৃত। কিন্তু তবু আকাশ অনেক বড়। পাখিগুলো মুক্ত। মীরা মুখোপাধ্যায়ের জগতে রাজা অশোক থেকে এই শবর পর্যন্ত যাঁরাই আক্রমণকারী তাঁরাই •

REGD. NO. WB/CC/184/74

বিমল অনুসন্ধান ও বিকাশ
অনুসন্ধান ও বিকাশ বিশেষজ্ঞ ৫৬ জনের,
নিত্য নতুন চিন্তা সংযোজন,
আপনার রুচিমাফিক হাজার রকম,
বিমল করছে পরিবেশন।
VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT
স্যুটিংস

অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলুন—বাঞ্ছিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার দিয়ে

কামাবেন ? নানা, সে তো পুরুষদেরই সাজে! একে তো মেয়েদের কোমল চামড়া ব্লেড দিয়ে কেটে-ছড়ে যাওয়ার ভয় বেশী, তার ওপর কামানোর পর গজিয়ে ওঠে শক্ত খোঁচা লোম!

তাহলে ? অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলার জন্যে ব্যবহার করুন, বাঞ্ছিত ক্রীম—কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার। অ্যান ফ্রেঞ্চ চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, তাই আপনার চামড়া থাকে রেশমী কোমল—কয়েক সপ্তাহ ধরে!

অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার লেবুর সুগন্ধে আর ফুলের সুগন্ধে পাওয়া যায়। আপনার পছন্দমত বেছে নিন।

অ্যান ফ্রেঞ্চ* হেয়ার রিমুভার, অবাঞ্ছিত লোম দূর করতে বাঞ্ছিত ক্রীম

* Licensed User of TM ; Geoffrey Manners & Co. Ltd.

176-HR-244 Ben

।। মিত্র-ঘোষ-এর সগর্ব ঘোষণা ।।

৫০ টাকার স্মরণীয় গ্রন্থ মাত্র ২০ টাকায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

সেই অবিস্মরণীয় অনন্য গ্রন্থ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অখণ্ড সংস্করণ

আগামী ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে

এই সুলভ সংস্করণে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থটির **সম্পূর্ণ চারটি খণ্ড একটি খণ্ডে** বোর্ড বাঁধাই ডাস্ট জ্যাকেটে মোড়া সুদৃশ্য প্রচ্ছদে প্রকাশিত হচ্ছে। আনুমানিক ১০০০ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র ২০৲। মুদ্রণ সংখ্যা সীমিত।

ডাকযোগে নিতে হলে ডাকব্যয় ৩.৭৫ পয়সা সহ মোট ২৩.৭৫ পয়সা মানিঅর্ডার করে আমাদের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই বই V. P. P. যোগে পাঠানো যাবে না।

পুস্তক বিক্রেতাগণের পক্ষে সর্বোচ্চ কমিশনের হার শতকরা ২০ টাকা (২০%)

।। ১লা বৈশাখের বিশেষ সুযোগ ।।

যে সমস্ত সাধারণ ক্রেতা ডাকযোগে ও কাউন্টারে ১লা বৈশাখ এই বইটি সংগ্রহ করবেন, মাত্র ঐ দিনের জন্য তাঁরা বইখানি ১৮ টাকায় পাবেন। সেক্ষেত্রে ডাকযোগের ক্রেতারা ঐ দিনের মধ্যে টা. ২১.৭৫ পয়সা পাঠাবেন।

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

মূল্য কুড়ি টাকা

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

সমরেশ বসুর
আনন্দধারা ৬৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
রক্তের বিষ ৭.৫০

গল্পের যাদুকর গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কথা কল্পনা কাহিনী ১৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
অজ্ঞাতবাস ১০৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৩৪৯২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৮৭৯১

চিঠিপত্র

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাকাল

গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক জায়গায় লিখেছেন ডঃ সুশীল দে তাঁর 'Chaitanya and Baishnabism' বইয়েতে দেখিয়েছেন যে চৈতন্যদেবের শিষ্যরা মহা পণ্ডিত ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের কোনো পাণ্ডিত্য ছিল না বললেই হয়। আমার বক্তব্য তাই যদি হয়, তাহলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রথম ও প্রধান শিষ্য ঈশান নাগরের রচিত "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে ঠিক বিপরীত যুক্তি দেখতে পাই কেন?

ঈশান নাগর তাঁর গ্রন্থে শ্রী গৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাসের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখতে পাই, নিমাই পাঁচ বছর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং বারো বছর কঠোর সাধনার পর সতেরো বছর বয়সে তাঁর বিদ্যার্জন শেষ করেন। কোন অধ্যাপকের কাছে নিমাই কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, তার বিবরণ ঈশান নাগর এরূপ দিয়েছেন:

১। নবদ্বীপ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ—২ বছর। সাহিত্য ও অলঙ্কার—২ বছর। ২। শ্রীবিষ্ণু মিশ্রের নিকট স্মৃতি ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন—২ বছর। ৩। শ্রীসুদর্শন পণ্ডিতের নিকট ষড় দর্শন অধ্যয়ন—২ বছর। ৪। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের নিকট তর্কশাস্ত্র পাঠ—২ বছর। ৫। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন—২ বছর। মোট—১২ বছর। এই বারো বছর মহাপ্রভু যাহা আয়ত্ত করেছিলেন তা কল্পনাতীত। তবে এটা ঠিক তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। এছাড়া মহাপ্রভু আরবী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন এবং কোরান শরিফের অর্থও উপলব্ধি করেছিলেন। এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখতে পাই।

শীতল রঞ্জন গায়েন
কলিকাতা-৫৫

'রামমোহনের দুই ভৃত্য': লেখকের জবাব

আমার লেখা প্রবন্ধ 'রামমোহনের দুই ভৃত্যে'র ওপর নির্মল দাস ও দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দুটি চিঠি লিখে (১৪ সংখ্যার 'দেশ') যে বক্তব্য, উপস্থাপিত করেছেন, তার বিপরীতে এবং আমার প্রবন্ধের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি আমি তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই সবিনয়ে জানাই, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরিদাসের নামকরণের পিছনে রামমোহনের 'আপন নাম' যে লুকিয়ে আছে, এ তথ্য আমার বানানো নয়। এ তথ্যের প্রধান উৎস হল, নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' নামক একটি বই। রত্নের সূত্রে...নন্দমোহন ছিলেন রামমোহনের আত্মীয়, পুরোহিত। পারিবারিক সূত্রেই তিনি এ তথ্য পেয়েছিলেন, 'রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরত্নের পূর্ব নাম শম্ভু, এবং রামহরিদাসের পূর্ব নাম হরিদাস।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই তথ্যটির ভেতর কোনো ভুল আবিষ্কার করেন নি। বরং পাদটীকায় এটিকে উদ্ধৃত করে এই সংবাদকে সমর্থন করেছেন। —রামমোহনের মৃত্যু-শতবর্ষের কাছাকাছি সময়ে নানা তথ্য আবিষ্কারে ব্রত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম রামমোহন সম্পর্কে নানা রকম বিতর্কিত এবং বিকৃত সংবাদ পরিবেশণ করেন। সেই নানা বিতর্কের একটি হল রামরত্নের নাম বিষয়ক। ব্রজেন্দ্রনাথ Board of Revenue Proceedings থেকে রামরত্নের যে চিঠিটি উদ্ধার করেছেন, এ চিঠিটিকে নিশ্চয় কেউ-ই জাল বলবেন না। কিন্তু এর বক্তব্য যে অভ্রান্ত তা কে বলল?

পিছনের পটভূমিটা একটু দেখা যাক। রামরত্ন একজন পাচক। সাহেবরা তাকে 'সারভেন্ট' বলে উল্লেখ করেছেন। বেচারি ইংরেজি তো দূরের কথা, দু ছত্র বাঙলা লিখতে পারতো কি-না, আমাদের ঘোরতর সংশয় আছে। রামমোহনের সান্নিধ্যধন্য বলেই বেণ্টিংকের কল্যাণে বেচারি পেয়ে গেল 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে'র চাকরি এবং পরে 'রায় বাহাদুর' খেতাব। —কিন্তু এ সবের যে সে আদৌ যোগ্য নয়, ন' বছরের মাথায় তার চাকরি চলে যাওয়ায় তা খুব সহজেই প্রমাণ হল। —'বোর্ড অব রেভিনু্'র প্রোসিডিং দেখে বোঝা যাচ্ছে, তার সম্পর্কে তদানীন্তন সরকারের অনেকগুলি জিজ্ঞাসা ছিল। সম্ভবত কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে রচিত ঐ জিজ্ঞাসা। ওদের ভেতর একটি ছিল নাম ভাঁড়ানোর অভিযোগ—যার জবাবে রামরত্নকে বলতে হয়েছিল query of the subject of my name' ইত্যাদি। —আমার প্রশ্ন, সরকারী তরফ থেকে এসব 'কুয়েরি' কখন আসে? কেন আসে? আর যদি-বা আসে, উত্তরদাতা কী চাকরী যাতে বজায় থাকে সেইরকম উত্তর দেয় না? —রামরত্ন যদি নাম ভাঁড়ানোর কথা লিখতেন, তা হলে কী তাঁর চাকরি বজায় থাকত? —এ ব্যাপারে রামরত্নের মত লোক কারোকে দিয়ে জবাব লিখিয়ে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। সুতরাং আইনের চোখে রামরত্নের এ স্বীকারোক্তি গ্রাহ্য হলেও, গবেষকরা এই অনৃত ভাষণ কী গ্রহণ করতে পারবেন? নন্দমোহনের দেওয়া তথ্য যে প্রকৃত সত্য এটাই কী ঘুরিয়ে প্রমাণ হচ্ছে না?

বিলাত যাত্রার অনুমতিপত্রে যে নাম দেওয়া আছে, প্রাসঙ্গিকভাবে সে তথ্যও আসে। এখানেও আমার প্রশ্ন অনুমতিপত্রে নাম কে ভরে দিয়েছিলেন? —রামমোহন না তাঁর ঐ সঙ্গীসহযাত্রীরা? রামমোহন যদি তাঁর ঐ চাকরদের নামগুলি ভরে দিয়ে

তা দিয়েছিলেন? এমন কী এসব অংশে তাঁর বেতনভোগী কোনো সরকার বা কেরানীরা যদি কেউ করে থাকেন, সেটা কী খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে? মোটকথা, চাকর-বাকরদের নাম নিখুঁতভাবে কে মনে রাখে? অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর লেখা রামমোহনের জীবনীতে রামহরিদাসকে 'Ram hari Mukerjya' বলে উল্লেখ করেছেন। —তাই এসব দেখে আমার মনে হয়, এ বিষয়ে খুব সচেতন, স্পষ্ট কোন ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা ছাড়া নন্দমোহনের মতকে চট্ করে ওড়ানো যাবে না। অন্তত ব্রজেনবাবুও তা পারেন নি।

১৩৩৬ সনের 'প্রবাসী'তে ব্রজেনবাবু রামমোহন নিয়ে নানা বিতর্কের সূত্রপাত করলেও, পরে তাঁকে অনেক ব্যাপারে মত বদল করতে হয়েছিল। এদের নামের ব্যাপারে নতুন কোনো কথা না-বললেও পরে ১৩৪২ সালে ঐ 'প্রবাসী'তেই তিনি কবুল করলেন, 'রামমোহন রায়ের পুরোহিত নন্দমোহনের কথা অমূলক নহে। যাত্রার পর রামমোহন যে তাঁহার কোন-কোন সংগীর নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পরে বাঙলা সরকারের কানেও গিয়াছিল,' (পৃঃ ৫৪৪)। অন্তত নাম পরিবর্তন যে হয়েছিল এই সত্যকে ব্রজেনবাবু কেবল মেনে নিয়েছেন, তাই নয়, এই সঙ্গে নতুন যুক্তি এবং কিছু নতুন তথ্যের সংযোজনও তিনি করেছেন: 'পাছে বিলাত যাওয়ার জন্য সংগীদের জাতি গিয়াছে বলিয়া কোন গোল হয়, সে জন্য রামমোহন সাধারণের নিকট উহাদের প্রকৃত নাম গোপন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সংগীদের নাম যাত্রার পূর্বে কোনরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে কোন বাধা উপস্থিত হয়, এই জন্য যাত্রার দিনই সরকারের নিকট হইতে তাহাদের বিলাত যাত্রার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল', পৃঃ ৫৪৪।

না, এরপরে আমার কোনো মতামত এইসঙ্গে যোগ করতে চাই না। কেবল একটি জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে চাই। 'রামরত্ন' যদি পরিবর্তিত হয়ে 'রামরত্ন'ই থাকে, তা হলে পরিবর্তনটা হল কী করে? —পোশাকী নাম দিয়ে ডাক নাম ঢাকা দেওয়া? —এটা কী কোনো যুক্তি হল? অন্তত এ যুক্তি খাড়া করে রামহরি কী বাঁচল?

দেবীপ্রসন্নবাবুকেও এটি একটু ভাবতে অনুরোধ জানাই। 'রামদাস' নয়, বেচারির প্রকৃত নাম যে 'হরিচরণ দাস' ছিল, এ বিষয়ে কেউ বিতর্ক তোলেন নি। নানা সূত্রে এটি প্রমাণিত। পরে প্রভুর নামে নামাঙ্কিত হয়ে, হয়েছে সে রামহরিদাস, 'চরণ' তার কাটা গেছে। এর পরে তাকে যিনি যে-নামেই ডাকুন না কেন, লোকটিকে বদলানো যাচ্ছে না। তবে 'হরি'টাকে বাদ দিলে বেচারির আদি নামটাই ছাঁটাই হয়ে যায়, এই যা দুঃখ।

পরিশেষে ছবির কথায় আসা যেতে পারে। ভৃত্যযুগলের ছবি প্রবন্ধের ভেতর ছেপে দিলে, 'দুই ভৃত্যে'র প্রসঙ্গ যে বিশেষ তাৎপর্যবাহী আমি একমত। কিন্তু তাই বলে 'রামমোহনের প্রতিমায় তেমন কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না', এ মতের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা, 'ঐ দুই ভৃত্য' কার? —রামমোহনের নয় কী? তা হলে রামমোহন অপ্রাসঙ্গিক হলেন কী করে? তা ছাড়া ওঁর যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, এটিকে একটি বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। ব্রিস্টল মিউজিয়ামে রক্ষিত এই ছবিটিকে, আর্নোজ ভেলে নির্মিত রামমোহন-সমাধির পরেই Another monument বলে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকে। H. P. Briggs এর আঁকা এই ছবিটি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং এখানেই শেষ করলাম।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

বিশ্ব বই মেলা

'তৃতীয় বিশ্ব বই মেলায়' বাংলা বই-এর যে চিত্রটি সুনীত ঘোষের লেখা থেকে আমরা পাই তা রীতিমত উদ্বেগজনক। শুধু উদ্বেগজনক নয়, বাংলা বই প্রকাশনের যে দীন-মলিন চিত্রটি আমরা 'বিশ্ব বই মেলায়' দেখিয়েছি তা মর্মান্তিক এবং লজ্জাজনক। লেখক প্রশ্ন করেছেন, 'অপরাধী কে?' আমার মনে হয় বিশেষভাবে কারো অপরাধ খুঁজতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ একক ভাবে কেউ অপরাধী নন। গরীব বাঙালীর পকেটে এত পয়সা নেই যে বই কেনার বিলাসিতা দেখাতে পারে! আবার প্রকাশককে যদি বলা হয় তাহলেও শোনা যাবে, বই-এর তেমন বিক্রী না থাকলে দাম কমানো যায় না। সমস্যাটা তাই চক্রাকারে থেকে যাচ্ছে। পাঠক ক্রেতার দাবী বই-এর দাম না কমলে বই কেনা যায় না এবং প্রকাশকের দাবী বইয়ের বিক্রী বাড়ুক, বইয়ের দাম কমানোর কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যে-কোন সচেতন বাংলাভাষার পাঠকেরই ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশককে দোষ দিয়ে লাভ নেই কিন্তু তাঁদের আরও দায়িত্ব নিয়ে এবং দরদ দিয়ে সমস্যাটার সমাধান করা উচিত। অপর পক্ষে বাংলাভাষার পাঠকরা, তারা যদি প্রকাশকের ত্রুটি নিয়ে শুধু মাথা ঘামান এবং সব দায় এড়িয়ে থাকতে চান তবে সমস্যাটা সমাধানের পথ খুঁজে তো পাবেই না বরং বাংলা বইএর নাভিশ্বাস আরো সংকটাপন্ন অবস্থায় এসে ঠেকবে।

দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
আদ্রা/পুরুলিয়া

দুর্গাদাস

"দেশ বিনোদন" সংখ্যায় শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "সেই নায়ক দুর্গাদাস" জীবনীতে ৩ জায়গায় ভুল আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহা সংশোধন হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

(১) ৮৭ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে

ঘটনাটি ঘটে "জানকীনাথ মুখো-পাধ্যায়ের গোলাবাড়িতে" ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নহে।

(২) ঐ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে প্রথম অনুচ্ছেদে "জন্ম ৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৩।" ৩রা ডিসেম্বর নহে।

(৩) ৯২ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণকে হীরের হার দান—১ম কলমে শেষ ছত্রের আগের ছত্রে—আমি ব্রাহ্মণ। "বাস দক্ষিণ গরিয়ায়" নহে হইবে "ডায়মণ্ডহারবারের নিকট ময়দা গ্রামে" এবং পরেও ঐ পৃষ্ঠার ২য় কলমের প্রায় মাঝামাঝি "দক্ষিণ গরিয়ার" উল্লেখ আছে উহা হইবে "ময়দা গ্রামে"।

আমি দুর্গাদাসবাবুর নিকট-আত্মীয় এবং তাঁহার জীবনীর বেশীর ভাগ ঘটনা আমিই সুধীরঞ্জনবাবুকে যোগাইয়াছি। প্রতি বৎসর ৫ই ডিসেম্বর আমরা তাঁহার জন্মদিন পালন করিয়া আসিতেছি এযাবত।

দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৭

চিত্রকলা

রুশী চিত্রপ্রদর্শনী প্রসঙ্গে সন্দীপ সরকার লিখেছেন '১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লবের পর' রুশী চিত্রকর ওয়াসিলি ক্যান্‌দিনস্কি (১৮৬৬—১৯৪৪ খৃঃ) প্রমুখ 'সকল শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল'। কিন্তু যতদূর জানি মস্কো শহরে বিমূর্ত চিত্ররীতির ঐ অন্যতম প্রবক্তার জন্ম হলেও ১৮৯৬ সাল থেকে তিনি ছিলেন দেশছাড়া। জার্মানীর মুানিখ শহরেই তাঁর চিত্রকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ঐ দেশেই ১৯১০-এ ওকালতি ছেড়ে তিনি সারা-সময়ের জন্যে চিত্র-চর্চা ও অংকনে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বছরেই বিশুদ্ধ বিমূর্ত-রীতিতে আঁকা (অ্যাবস্ট্রাকট এক্সপ্রেসানিজম) তাঁর একটি ছবি তুমুল আলোড়ন তোলে। প্রথম দিকে আঁকা তাঁর ছবি-গুলিতে অবশ্য জার্মান শিল্পী ফ্রানজ ফন স্টুকেরের "জুগেন্ড—স্টিল" চিত্র-আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল (দ্রঃ 'মিনিঙ অব আর্ট,' 'হার্বার্ট রীডা', পৃঃ —১৬৫; পেঙ্গুইন বুকস (১৯৫৯)। ১৯১১-তে ক্যানদিনস্কি "ব্লাউয়ে রেইটের" (দি ব্লু রাইডার) নামে চিত্রকর গোষ্ঠী ঐ মুানিখ শহরেই গড়ে তুলেছিলেন; তাঁর সহযোগী ছিলেন মার্ক এবং ক্লে, মার্ক ভালবাসতেন ঘোড়া আর ক্যান-দিনস্কি অশ্বারোহী; আর নীল রঙ ছিল উভয়েরই প্রিয়। তাই ঐ গোষ্ঠীর নাম হয়েছিল "নীল অশ্বারোহী"র দল! মুানিখ থেকেই ১৯১২ সালে বার হয় ক্যানদিনস্কির লেখা 'অন দি স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট' নামে প্রখ্যাত ম্যানিফেস্টোটি (ইংরাজি অনুবাদ ১৯১৪-এ)। ১৯১৪ সালে ক্যান-দিনস্কী রুশ সরকারের আমন্ত্রণে স্বদেশে ফিরলেও বেশি দিন সেখানে থাকতে পারেননি। ১৯২১-এ তিনি আবার ফিরে এলেন জার্মানীতে। ১৯৩৩-এ গেলেন ফ্রান্সে। তাঁর সেরা চিত্রকর্মগুলিও নিউইয়র্কে (গুগেনহাইম চিত্রশালা), আমস্টার্ডাম প্যারী ও তাই '১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লব' প্রবাসী ক্যানদিনস্কির শিল্পী জীবনে কতটা উত্তেজনা' সঞ্চার করেছিল সেটা বিবেচনার বিষয়। বোধহয় শ্রী সরকার ব্যাপারটা তেমন তলিয়ে না দেখেই উৎসাহ বশে লিখে ফেলেছেন।

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা

বাংলা বানান

১১ মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব' প্রবন্ধটি পড়লাম। এর আগেও দেশ পত্রিকায় বাংলা বানান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি আবার বাংলা বানানের একটি রাজপথ নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন, "মূর্ধন্য-ষ বাংলায় উচ্চারিত হয় না, অতএব ষ বাদ যাবে। লেখা হবে আশাঢ়, বরশন, ভাশা"। আমার মনে হয় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে বানানগত সারল্য অর্থগত দিক দিয়ে বিভ্রান্তি আনবে। যেমন, (১) 'বর্শা' ও বর্ষার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না; (২) 'বিষ' ও বিশ এক হয়ে যাবে; (৩) 'শোল' ও 'ষোল'র ক্ষেত্রেও একই অসুবিধা। প্রাবন্ধিক এক জায়গায় লিখেছেন, "ঙ এবং ং দুটির কাজই ঙ-দিয়ে করা যায়, অতএব অনুস্বার (ং) বাদ যাবে"। ক-বর্গের আগে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা বিকল্পে ঙ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঠিক হবে না। কারণ, অনুস্বার এবং ঙ এই দুটির-ই ব্যবহারগত আলাদা আলাদা সুবিধা আছে। যেমন 'বাঙলা' অপেক্ষা বাংলা লেখা সহজ। আবার রং-এর অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ।

সম্প্রতি ইংরাজী ST ধ্বনির জন্য 'স্ট' হরফের পরিবর্তে স্ট হরফটি সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ উচ্চারণগত দিক দিয়ে 'স্ট' লেখা শ্রেয়তর। কারণ 'স' দন্তবর্ণ অথচ 'ট' মূর্ধন্য বর্ণ। দন্তবর্ণ ও মূর্ধন্য বর্ণ কি একত্রে উচ্চারণ সম্ভব?

অভিজিত চক্রবর্তী
কলকাতা-২

চা শিল্পে বাঙ্গালীর উত্থান ও পতন

২১শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমানস দাশগুপ্তের চা-শিল্পে বাঙগালীর উত্থান ও পতন শীর্ষক প্রবন্ধের দু-একটি তথ্যগত ত্রুটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

(১) শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন' রায় গ্রুপে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী জয়গোবিন্দ গুহ, পূর্ণচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র সেন, শশিকুমার নিয়োগী ইত্যাদি অনেকে—' এর মধ্যে তৃতীয় নামটি প্রকৃতপক্ষে অন্নদাচরণ সেন। ইনি আমার পিতা-মহ। এঁর নাম আর এক জায়গায়ও বিকৃত হয়ে আনন্দচন্দ্র সেন হয়েছে।

পপ্পু নিপলের গুণাবলী
ধরার জন্যে চাই
মায়ের চোখ

...লিখেছেন 'যে দিদি শৈশবে অনেক আদরযত্ন দিয়ে তাঁকে বড় করেছিলেন সেই স্বর্গত দিদির স্মরণে প্রতিষ্ঠা করলেন কমলা চা-বাগান এবং আর এক দিদির নামে করলেন সারদা চা-বাগান' —প্রকৃতপক্ষে শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়ের একমাত্র দিদির নাম সারদা। যাঁর নামে সারদা চা-বাগান। কমলা চা-বাগান পরে রায়দের হাতে আসলেও ঐ বাগান স্থাপন করেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। এঁর পুত্র শ্রীমুকুলেশচন্দ্র সান্যাল জলপাইগুড়ির সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকার সম্পাদক।

অরিন্দম সেন
জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞান কংগ্রেস

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' সংখ্যায় 'আমেদাবাদ বিজ্ঞান কংগ্রেস অনেককে হতাশ করেছে' এই শিরোনামে শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয় উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তাতে মনে হয় ঐ অধিবেশনকে অকারণ হেয় করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের তিনি মোটামুটি চার ভাগে করে বিশেষ দুটি শ্রেণী সম্পর্কে অনর্থক কটুক্তি করেছেন। এঁরা নাকি বন্ধুর চাপে ভিড বাড়ানোর জন্য উপস্থিত হন। (নইলে হল ফাঁকা যায়) এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফোড়ন কাটেন এবং এরা পেশায় বিজ্ঞানী নন ও বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার ব্যাপারেও এঁদের নাকি কোন ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তি নেই। এর একমাত্র কারণ কম খরচে দেশ ভ্রমণ; কেননা চাঁদা দিলেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক সভ্য হওয়া যায় ও রেলের কনসেসন মেলে।

এমন অনেক প্রতিনিধি আছেন যাঁরা যথেষ্ট অভাবের মধ্যে দিন যাপন করেন। তাঁরা যদি বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে আশেপাশের দু-একটা জায়গা দেখে ফেরেনও, তবে মূল অধিবেশন কি করে তার জন্য ব্যাহত হতে পারে এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে; কেন না, এই ভ্রমণ সম্পূর্ণ পৃথক একটি পর্ব এবং মূল অধিবেশন সফল বা বানচাল হওয়ার সঙ্গে এই ভ্রমণের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ নেই। রেল কনসেসন পাওয়ার জন্য যে কোন ভ্রমণার্থীর সামনেই অজস্র সহজতর পন্থা খোলা রয়েছে। অনুৎসাহী ব্যক্তিরা আর যাই হোক বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই শুষ্ক আবহাওয়ার গন্ধ শুঁকে রেল কনসেসন পাবার চেষ্টা করবেন না।

সৌমেন কুমার বসু
কলকাতা।

মীরাবাঈ

গত ২১শে জানুয়ারী, '৭৮, অতুল্য ঘোষের লেখা 'কণ্টকল্পিত'-তে শ্রীঘোষ লিখেছেন মীরাবাঈ রাণা-কুম্ভের পত্নী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজই মীরার স্বামী। ১৪৬৮ খৃস্টাব্দে রাণাকুম্ভের মৃত্যু হয়। মীরার পিতা মেড়তিয়া-রত্নসিংহ ভূমিষ্ঠ হন ১৪৭৪ খৃস্টাব্দে। সুতরাং তাঁর কন্যা মীরার পক্ষে রাণাকুম্ভের স্ত্রী হওয়া কি খুবই কষ্টকল্পিত নয়?

সর্বোপরি, মেড়তা রাজ্যের রাঠোর তয়ারিখীতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে—মীরা ভোজরাজের সহধর্মিণী।

কর্নেল টডের অ্যানালস অব রাজস্থান-এ মীরাকে কুম্ভের পত্নী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রাজস্থানের ঐতিহাসিক — মুনশী দেবীপ্রসাদ, গৌরীশংকর হীরাচন্দ্র ওঝা প্রভৃতি প্রমাণ করেছেন যে রাণা সংগ্রামের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজই মীরার স্বামী।

প্রবীর মিত্র
রাণাঘাট

স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা

আপনাদের পত্রিকার ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে সুবল গঙ্গোপাধ্যায় মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার প্রসঙ্গে 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়' বলে যে গানটির উল্লেখ করেছেন, তার রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাস (1855-1918)। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার জয়দেবপুর গ্রামের গোবিন্দ দাস স্বভাব কবি বলে সুখ্যাত ছিলেন। আজীবন তাঁকে নানা কারণে বৈষয়িক ও মানসিক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো। অশেষ দুঃখ ভোগের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

গানটির পূর্ণ বয়ান আমার সংগ্রহে আছে। স্থান সংকুলানের সমস্যার কথা ভেবে সেটা উদ্ধৃত করলাম না।

তরুণ রায়
কলকাতা-৩২

ভ্রম সংশোধন

'দেশ' পত্রিকার ১১ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পংকজকণ্ঠ' রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পংক্তিতে × চিহ্নিত স্থলে † চিহ্নিত 'রেকর্ড-সংকেত' অধ্যায়ে জিই ডিই স্থলে জিই ভিই, এম এ স্থলে এস এ এবং থিওই স্থলে বিওই পড়তে হবে। পি১১৯১২ নং যন্ত্রে 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' গানের এবং সেভেন ই আর ই ৩নং যন্ত্র রেকর্ডের বিবরণে রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রাকর প্রমাদবশত বাদ গেছে।
কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

প্রকাশিত হল

শ্যামলকুমার চক্রবর্তীর

উত্তেজনাকর ইতিহাস

ছাত্র-যুব কংগ্রেসঃ কীর্তি ও কেলেঙ্কারি

দাম ১৫.০০

পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেসের শক্তির উৎস ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস। ওদের নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সাধুতা ও সাহস এককালে মানুষকে মোহিত করেছিল। তেমনই সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের জমানায় ওদের আত্মকলহ, দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলুম ও মস্তানি মানুষকে হতবাক করে দেয়। ছাত্র-যুব কংগ্রেসের এই কীর্তি থেকে কেলেঙ্কারিতে পৌঁছনোর ইতিহাস যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনই বিস্ময়পূর্ণ। আনন্দ-বাজার পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার শ্যামলকুমার চক্রবর্তী প্রভূত পরিশ্রমে ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের উত্থান-পতনের এই বিচিত্র ইতিহাস রচনা করেছেন। দীর্ঘ কয়েক-বছর যাবৎ এই যুব-ছাত্রনেতা-দের ছায়ার মতো অনুসরণ করে বহু নেপথ্যকাহিনী ফাঁস করে দিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে প্রকৃত গবেষকের মতো আনুপূর্ব ঘটনা বিশ্লেষণ করে এই নতুন যদুবংশের ধ্বংসের কারণও অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। কেন সুব্রত ও লক্ষ্মী কংগ্রেসভবন থেকে প্রিয়রঞ্জনের লেখা চিঠি চুরি করলেন, কেন সিদ্ধার্থশঙ্কর তাঁর নিজের বাড়িতে গলা টিপে ধরেছিলেন এক যুব-নেতার —এই জাতীয় অজস্র অজানা তথ্য এই বইকে এক উত্তেজনাকর ইতিহাস করে তুলেছে।

সুবোধ ঘোষের

বিশিষ্ট উপন্যাস

বসন্ততিলক

দাম ৫.০০

এক নকল জীবনের অহংকার অকস্মাৎ-আগত ঘূর্ণি-হাওয়া হয়ে হঠাৎ একদিন ঝড় তুলেছিল হাওয়ানগর সরিয়াড়িতে। কিন্তু এই অহংকারের আত্মম্ভরী ঘূর্ণি সরিয়াড়ির অটল জীবনকে ক্ষণিক এলোমেলো করে দিলেও টলাতে পারল না। আর তখনই আক্রোশের শিলাবৃষ্টি হয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইল তাকে। কিন্তু ঔদার্য ও প্রেমের ছত্র বিস্তৃত হয়ে সেই নির্মম নিষ্করুণ আক্রমণকে প্রতিরোধ করে-ছিল, গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ব্যর্থতায়। উপন্যাস-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন সুবোধ ঘোষের 'বসন্ততিলক'।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

কালকেতু ৭.০০ বাসরদত্তা ৪.০০ বন উপবন ৬.০০ জিয়া ভরলি ৮.০০ ভারত প্রেমকথা ১৫.০০ সেই অদ্ভুত অভ্রধ্বনি (কিশোর-সাহিত্য) ৫.০০

ছোটদের বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

ছেলেদের বিবেকানন্দ

দাম ২.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)-এর

রাজার রাজা

দাম ৭.০০

শৈলেন ঘোষের

ছপ্লোকে নিয়ে গপ্পো

দাম ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

আমাদের নিবেদিতা

দাম ৬.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ধাঁর নাম ঘনাদা

দাম ৫.০০

সত্যজিৎ রায়ের

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

দাম ৫.০০

পাপু (সুব্রত সরকার)-এর

পাপুর বই

দাম ৬.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

তিন নম্বর চোখ

দাম ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঘণ্টাদার কাবলু কাকা

দাম ৫.০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর

ছড়ায় মোড়া কলকাতা

দাম ৪.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

পাঁচ মুণ্ডির আসর

দাম ৬.০০
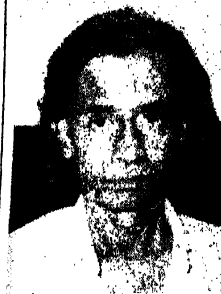
বুদ্ধদেব বসুর

উজ্জ্বল উপন্যাস

বিপন্ন বিস্ময়

দাম ৮.০০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধী-নতার পরবর্তী বছরগুলিতে নাগরিক বাঙালী জীবনে ও চিন্তাধারায় যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে তারই আলেখ্য এঁকেছেন। শুধু পরিবর্তন নয়—সব পরিবর্তনের অন্তরালে একটি স্থির কেন্দ্র-বিন্দুও লেখকের সন্ধান। সেই কেন্দ্রবিন্দু—লেখক বোধ হয় বলতে চান—মানুষের হৃদয়, তার প্রেম বা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে তার একাত্ম-বোধ। সেই একাত্মবোধ সব সময় আসে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না, তবু সেরকম কয়েকটি মুহূর্তের জন্যেই নায়ক-নায়িকা তাঁদের জীবন সার্থক বলে মানছে।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইক্ষ্বাকু সেন্নিন (নাটক) ৪.০০ অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (নাটক) ৫.০০ পুনর্মিলন (নাটক) ৪.০০ কালসন্ধ্যা (নাটক) ৩.০০ কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৬.০০ গোলাপ কেন কালো (উপন্যাস) ৫.০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ইন্দ্রমিত্রের

প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

দাম ৫.০০
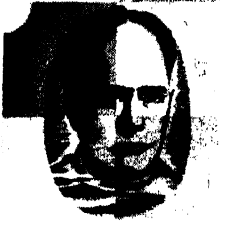
কখনো বলতেন 'এঁড়ে বাছুর।' কখনো বা 'ঘাড় কেঁদো'। ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগরকে তাঁর বাবা এই সব নামে ডাকতেন। ঘাড় কেঁদো মানে, যে ঘাড় একবার বাঁকালে সহজে সোজা করবে না। এঁড়ে বাছুরও বস্তুত তাই। জেদী আর একগুঁয়ে। ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে। তাই তাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে উল্টো কাজটি করতে বলতেন তাঁর বাবা। তাতেই চমৎকার কাজ হত। কেননা, যা বলা হবে তা তো আর করবেন না বিদ্যাসাগর। উল্টো কাজ করতে বললে তাই সোজা কাজ পাওয়া যেত বালক বিদ্যাসাগরের জীবনের এমন মজাদার বহু ঘটনার গল্প ইন্দ্রমিত্র উপহার দিয়ে-ছেন এই বইতে। ইন্দ্রমিত্রের পাঠক জানেন, তিনি কী পরিমাণ অধ্যবসায়ী গবেষক। প্রামাণিক ঘটনা ছাড়া অন্য-কিছুতে তিনি বিশ্বাসী নন। এই জীবনীগ্রন্থেও তিনি সেই গবেষণারই পরিচয় রেখেছেন। ছোটদের হাতে তাই নির্ভয়ে তুলে দেওয়া যায়।

ইন্দ্রমিত্রের আর একটি কিশোর-গ্রন্থ :

শরৎ কথামালা ১০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

দেশ দেশ ৪৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা
২৫ চৈত্র ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গীত-জীবনের স্মৃতিকথা
রাগ-অনুরাগ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প
গাজনতলা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনা
পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

একটি 'বিধিসঙ্গত অহংকার'

মানুষের জীবনের প্রয়োজনে নৈতিক আদর্শের যে তাত্ত্বিক পরিচয় বিবৃত ও ব্যাখ্যাত করেছেন মনস্বী অ্যারিস্টটল, তার প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ আজও মোটামুটি অটুট আছে বলে অনেক দার্শনিক মনে করেন। অ্যারিস্টটলের নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা একেবারে বিচলিত ও খণ্ডিত করে দেবার মতো কোন তাত্ত্বিক অভ্যুদয় দর্শনের জগতে দেখতে পাওয়া যায়নি, যদিও অংশত সেই তত্ত্বের কিছু-কিছু প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অহংকার ভাল নয়, কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে 'বিধিসঙ্গত অহংকার' (ইংরজী ভাষায় 'লেজিটিমেট প্রাইড) ভাল। এবং সেটা জীবনের মর্যাদাগত একটি প্রয়োজনও বটে।

তত্ত্বের প্রসঙ্গ ছেড়ে এইবার সাম্প্রতিক একটি ঘটনার প্রসঙ্গে এসে ভারতীয় জীবনের মর্যাদাগত একটি সত্যতর যৌক্তিক স্বরূপ বিচারিত হতে পারে। ঘটনা এই যে, চীন থেকে এক শুভেচ্ছা মিশন ভারতে এসেছেন ও চলে গিয়েছেন। ভারতীয় জীবনের সকল পরিচর্যার, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রের নানা সংস্থার দ্বারা তাঁরা অভিনন্দিত হয়েছেন। ভারতীয় জনজীবনের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে তাঁরাও মুক্তকণ্ঠে শুভেচ্ছার বাণী উচ্চারিত করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে, যে ডাঃ কোটনিশের স্মৃতিরক্ষা কমিটির আহ্বানে চীনা শুভেচ্ছা মিশন ভারতে এলেন ও চলে গেলেন, সেই ডাঃ কোটনিশকে ভারতের জাতীয় জীবনের একটি 'বিধিসঙ্গত অহংকারে'র প্রতীক বলে মনে করা চলে। আরও সরল করে বলা চলে, তিনি ভারতীয় জাতির মহান্ আত্মমর্যাদাবোধের একটি স্মরণীয় কৃতিত্বের প্রতীক। দেশ তখন পরাধীন, এবং মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে চীনের গণবিপ্লব তখন কঠিন ও দুরূহ এক সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সেদিন জওহরলাল নেহরুর চিন্তানুপ্রাণিত নীতির সঙ্কেত মান্য করে নিয়ে চীনে যে 'কংগ্রেস মেডিকেল মিশন' প্রেরণ করেছিলেন, ডাঃ কোটনিশ তারই অন্তর্গত সেবক-চিকিৎসকদের অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। গণবিপ্লবের চীন সেই লগনে ভারতীয় জাতির আন্তরিক শুভেচ্ছার স্পর্শ লাভ করেছিলেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতির পরাধীন অবস্থার অন্য একটি ঘটনার লগ্নে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের কালে ও ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গণমুক্তি বাহিনীর সাহায্যে সেবার অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে ছিলেন। বিপ্লবের অন্যতম নেত্রী এবং সংগ্রামের নায়িকা লা পাসিওনারা সেদিন তাঁর পুলকিত অন্তরের কৃতজ্ঞতার আবেগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তাঁর খোঁপাতে জড়িয়েছিলেন।

দুই ঘটনা ভারতীয় জাতীয়তার একটি ঐতিহাসিক মহত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত করে। স্বয়ং পরাধীন, এবং সেই পরাধীন ভারত গণমুক্তি ও বিশ্বমানবতার সম্মান ও প্রয়োজনে তার সেবাময় উৎসর্গ নিবেদিত করতে ভুলে যায়নি। আর-একটি বিশেষ স্মরণীয় সত্য, পরাধীন ভারতেরই জীবনের দৃশ্যে বিশ্ববাসী এই সত্যের পরিচয় পেয়েছে ও বিস্মিত হয়েছে যে, সেই ভারতের কবি বস্তুত পুণ্যশীল এক পরিব্রাজক হয়ে সারা বিশ্বের পথে ঘুরেছেন, এবং বিশ্ব-মানবতার বাণী শুনিয়েছেন।

ঘটনাগুলি ভারতীয় জাতির প্রাণে যদি কোন অহংকার সঞ্চারিত করে, তবে সেটা হবে 'বিধিসঙ্গত অহংকার,' জাতির আত্মমর্যাদার বনিয়াদ যার প্রেরণা ছাড়া নির্মিত হতে পারে না। জাতির প্রাণে আত্মধারণার মেরুদণ্ড সর্বদা বিনত ও বিনীত হয়ে থাকবে, এটা জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠতার নিদর্শন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এহেন চারিত্রিক সংস্কারকে দুর্বলতার পরিচয় বলে মনে করতেন। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর চিন্তার ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন, যেটা কারও কারও মতে রূঢ় প্রকারের নীতিতত্ত্ব বলে সমালোচিত হতে পারে। তাঁর মতে জাতির পক্ষে আত্মমর্যাদাবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ঘৃণা করার প্রয়োজন হয়। বঙ্কিমের উক্তির সঙ্গে কলহের কোলাহল প্ররোচিত না করে বরং এই ধারণা করাই উচিত যে, তিনি বস্তুত অ্যারিস্টটল-কথিত 'বিধিসঙ্গত অহংকারের' অনুরূপ একটি অহংকারের তত্ত্ব বিবৃত করেছেন।

এক বিদেশিনী মহিলা স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন—জাতি হিসাবে আপনারা কোন্ কৃতিত্বের গর্ব দাবি করতে পারেন? স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতীয় জাতি কোনদিনও কোন বিদেশকে আক্রমণ করেনি, এটাই আমাদের জাতীয় গর্ব। বলা বাহুল্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য অনুসরণ করে যে-কোন ভারতীয়ের প্রাণের জিজ্ঞাসা এই সত্যে উপনীত হবে যে, বিধিসঙ্গত অহংকার বর্জন করবার কোন সার্থকতা নেই। ভারতীয় জীবনের যত 'অকৃত কার্য,' অকথিত বাণী ও অগীত গানের জন্য ভারতীয় জীবনে যেমন আত্মসমালোচনার প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়, তেমনই ভারতীয় জাতির পক্ষে এই বিধিসঙ্গত অহংকারও অনুভব করতে হয় যে, সেদিন ভারতই চীনে মেডিকাল মিশন পাঠিয়েছিল, চীন কোন মেডিকাল মিশন ভারতে পাঠায়নি। চীন-ভারত মতবিরোধের ব্যাপারে যে-সব ভারতীয় ভারতকে একটু বেশি করে এবং চীনকে একটু কম করে দোষী মনে করেন, তারা অত্যন্ত ভুল করেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কিন্তু খুবই নির্ভুল। অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত চীনের সঙ্গে মতবিরোধের যথার্থ সমাধান হবে না।

হায় ঈশ্বর!!
দুষ্টচক্র যে আবার
ফিরে এলো!!!

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

অন্ধকার সাপ্লাই করপোরেশান

॥ তিন ॥

ওই গন্ধমাদনটা আবার কি! ঘাড়ে করে নিয়ে এলে বিশ্বাস। তোমার কি কোনো সময় অসময় জ্ঞান নেই হে। দেখছো না, জনসংযোগ বিজ্ঞাপন লিখছি।

আজ্ঞে এটাও জনসংযোগ। জনসাধারণের অভিযোগ।

জনসাধারণের অভিযোগ! দপ্তর অধিকর্তা বিকৃত গলায় বললেন—দাও সব ফেলে দাও গঙ্গার জলে। এই কললোলিনী-তিলোত্তমা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিনী ভাগীরথী। সব ব্যাটাই তার অ্যাডভানটেজ নিচ্ছে, আমরা কেন নোবোনা বিশ্বাস! করপোরেশান সারা কলকাতার ময়লা ঢালছে। দুধারের কল-কারখানা, তেল-কালি-ভুসো ছাড়চে। আকাশ-মানব-মানবীরা দেহনির্যাস ত্যাগ করছে। তুমি বিশ্বাস, এতই অপদার্থ, ওই রাবিশগুলোকে 'গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল' করে দিতে পারছো না! আমার মত একটা সিনিয়ার অফিসারের কাছে বয়ে এনেচো ওই রাস্তার লোকগুলোর কিছু চোতা! জানো, আমি 'ম্যান অন দি স্ট্রীটে'র চে কত ওপরে! জানো, আমি মাসে কত টাকা মাইনে পাই! পাঁচ হাজার মাত্র! আমি তোমার মত বাঙলা খাইনা, আগে খাঁটি স্কচ খেতুম এখন খাই দেশী-বিলাইতি। আমার মিসেস, তোমার মিসেসের মত হাত পুড়িয়ে রাঁধে না, ডাল পুড়িয়ে গালাগাল খায় না, বিছানা তোলেনা, পাতেও না, মশারি খাটায় না। কেন খাটায় না বলতো। দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি।

আজ্ঞে, হয় মশা নেই, না হয় মশারি নেই।

হো হো হো। কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি! তোমা-দের মত বুদ্ধুরা আছে বলেই আমাদের মত ধূর্তদের রাজত্ব চলছে। বুদ্ধুকা দেশ মে ধূর্তকা রাজ। জানোনা মূর্খ, কলকাতায় আর একটি করপোরেশান আছে—যাহার নাম মশা সাপ্লাই করপোরেশান'। মনে পড়েছে! রাখুন, আবর্জনাগুলো ওই কোণে। এখুনি একটা ডিকটেশান নিন।

চেয়ারম্যান, মশা সাপ্লাই করপোরেশান, আমাদের অন্ধকার সাপ্লাই করপোরেশানের তরফ থেকে আপনার সুযোগ্য পরিচালনার, আপনাদের সহযোগিতার জন্যে ধইন্যবাদ। ধইন্যবাদই লিখবেন, কারণ চেয়ারম্যানের দেশের উচ্চারণে আমি যতটা সম্ভব কাছাকাছি যেতে চাই। নিন লিখুন। আমাদের অন্ধকার, আপনাদের মশা, কলকাতার জীবনকে স্কচ হুইস্কির জ্বালা দিয়েছে। মশা ছাড়া অন্ধকার, অন্ধকার ছাড়া মশা মানায় না। হরের পাশে গৌরী, রাধার পাশে কৃষ্ণ। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা সাপ্লাই করে, ফাইলেরিয়া দিন, ম্যালেরিয়া দিন। কলকাতার মানুষ হাঁটিতে চায় না। না হেঁটে হেঁটে মোটা-মোটা বাবুদের রোগা রোগা পা। একমাত্র গোদই কলকাতার টপ হেভি মানুষকে মেরামত করে দিতে পারে। কতদিন কেঁপে কেঁপে জ্বর আসেনি। কেঁপে জ্বর, তার ওপর কম্বল, তার ওপর স্ত্রী, তার ওপর কুইনিন, তার ওপর সকালের রোদ, তার ওপর পানসে বার্লি, সে যে জীবনের সেই হারিয়ে যাওয়া স্বাদ! ম্যালেরিয়া না হলে লিভার খারাপ হবে না সহজে। লিভার খারাপ না হলে অনবরত খিদে পাবে। খিদে পেলে, খরচ হলে দেনা হবে। দেনা হলে, দুর্ভাবনা হবে। ভাবনা হলে শরীর যাবে। অতএব এদেশের সমাধান একটাই—অন্ধকার, মশা, মশাবাহিত পদ-গোদ আর ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া হলে পিলে হবে, পিলে হলে ভুঁড়ি হবে, ভুঁড়ি হলে পেট আলগা হয়ে খস খস করে প্যান্ট খুলে পড়ে যাবার অস্বস্তি থাকবেনা। হাতে হাত মেলান দাদা। দেশের জন্যে আমরা কিছু করে যাই। স্বামীজী বলেছিলেন—দাগ রেখে যা। এসো দাদা—দাগ রেখে যাই। সব জায়গা দাগরাজি করে যাই। হুতোমের ক্যালকাটাকে ফিরিয়ে আনি—দিনে মশা, রেতে মাছি। ঝাঁক ঝাঁক মাছিও বাজারে ছাড়ুন। ওলাওঠা ছিল বলেই না, শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর ভাল ভাল সাহিত্য, চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেই ওলাওঠা চাই দোস্ত। ঘোর ঘন অন্ধকার কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ওলাওঠা। অন্ধকারে হাহাকার। ফুলের মত খই ছড়াতে ছড়াতে, নেচে নেচে, দেশহিতব্রতী যুবকেরা অনবরতই একের পর এক চলেছে-স্যালো হরি, হরি বোল। লং লিভ আওয়ার কো-অপারেশান। ইতি, গুণমুগ্ধ।

কি একটা শব্দ হচ্ছে হে, নাকডাকার মত। ওই যে স্যার সায়েব। বল কি হে সায়েবেরও নাক ডাকে! তবে দাও। দাও তবে তোমার নসির ডিবে, সশব্দে এক টিপ নি। জাগিওনা ওকে। আহা বুড়োকে ঘুমোতে দাও। স্বপন যদি মধুর এত। লে আও ওই রাবিশ আবর্জনা। ওই সবিনয় নিবেদনের কায়দায় সব উত্তর দিয়ে দোবো। নাও কলম ধর।

কি লিখেছেন ভদ্রলোক। পর পর দুমাস একটাকা করে বিল পেয়েছি। বেশ! তৃতীয় মাসে চক্ষু ছানাবড়া। কেন বাবা। দুশো বারো টাকার পেন্সলায় একটি বাঁশ মেরেছেন। লিখুন জবাব—বেশ করেছি। ট্যাঁকে পয়সা নেই, অত আলোর সখ কেন। বেশি তড়পালে মিটার খুলে নিয়ে আসা হবে। দ্বিতীয় অভিযোগ, গত চারমাস মিটার ঘরের চাবিই খুলতে হল না অথচ প্রতিমাসে বেশ কায়দার বিল আসছে, রিডিং ডেট সমেত। ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে। লিখুন, ভগবানে যখন বিশ্বাস আছে, ভূতকেও বিশ্বাস করতে শিখুন। আপনার এলাকার মিটার ইনস্পেকটার, মাস ছয়েক হল পটল তুলেছেন। পয়সার অভাবে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হয়নি। সেই ভীষণ কর্তব্য পরায়ণ ভদ্রলোক এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কড়া নেড়ে আপনাকে বিরক্ত না করে সেই *ইনস্পেকটার রিডিংও নিচ্ছেন, আমাদের কম্পিউটার বিলও করছে।

তৃতীয় অভিযোগ, আমার চোদ্দ থেকে ষোল হচ্ছিল ইদানীং চল্লিশে চলে গেছে। লিখুন, এই তো সংসারের নিয়মরে ভাই। আপনার বয়সও তো এক সময় ষোল ছিল, দেখতে দেখতে চল্লিশ কি হল না! জীবনের ধর্মই বেড়ে চলা। চুল বাড়ে, দাড়ি বাড়ে, গাছ বাড়ে, ছেলে বাড়ে, বিলও বাড়ে।

নেকস্ট। সেদিন রাতে মাছের মুড়ো খাইতে-ছিলাম। ঝপ করিয়া লোডশেডিং হইয়া গেল। স্ত্রী মোমবাতি হাতে যখন আসিলেন তখন দেখিলাম পাতে মাছের মুড়ো নাই। কতদিন পরে একটি ঘৃতযুক্ত মুড়ো পাতে পড়িবার সৌভাগ্য হইল, আপনাদের হৃদয়হীনতার জন্য ভাগ্যে সহিল না। কেলে বেড়ালে মারিয়া দিল। ফরাসী দেশ হইলে ক্ষতি পূরনের মামলা করিতাম, বাংলা বলিয়া বাঁচিয়া গেলেন। লিখুন—যে দেশের মানুষ এক-বেলাও খাইতে পায় না, সেই দেশে রাতের বেলা মুড়ো বিলাস। লজ্জা করেনা। বেড়াল, বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে উচিত কাজ করিয়াছে। আপনার নাম ও ঠিকানা ইনকামট্যাকসে পাঠাইতেছি। এতকাল ঘুঘুই দেখিয়াছেন এইবার ফাঁদ দেখিবেন, কেমন! মুড়োর পয়সা ডানহাতে আসছে, কি বাঁ হাতে আসছে, এইবার পরিষ্কার হবে।

কি লিখেছেন? বৌ বদল। সে আবার কি রে বাবা! আমাকে যে মেয়ে দেখানো হয়েছিল, বিয়ের সময় লোডশেডিং হওয়ায় আমার জোচ্চর শ্বশুর, অন্ধকারে, প্যাঁচামুখো বড় মেয়েটাকে পিঁড়েতে বসিয়ে, কায়দা করে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। দোষ কার! এখন আমি কি করব। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা!। চুল ছিঁড়বো।

লিখুন—দোষ কারো নয় গো মা। তুমি স্বখাত সলিলে পড়েছো মানিক। আজকাল বিয়ে দুপুর-বেলা চেয়ারে বসেই করা উচিত। যা পেয়েছো চাঁদ তার সঙ্গেই মানিয়ে চল। বৌ একটা হলেই হল। ব্যবহার তো এক।

এরপর। অন্ধকারে ঘর ভুল করে ভ্রাতৃবধূর ঘরে...। লিখুন, অসভ্যতা করলে লাইন কেটে ফাঁক করে দোবো রাসকেল। বাকি। সব এক উত্তর—চিঠি পেয়েছি, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বিদ্যুৎ ঈশ্বরের দান। জবাব দিহি করতে হয় তাঁর কাছে করব। ক্লিয়ার আউট।

সায়েব ও সায়েব। মিস্টার চার্চিল। চোখ চাইতেই তাঁর ঠোঁটে ধরা চুরুট থেকে অটোমেটিক আবার ধোঁয়া বেরোতে লাগল। চলুন আমাদের কণ্ট্রোলরুমে। দেখাই কিভাবে আমরা অতি সহজে আলো থেকে অন্ধকারে চলে যাই। ওকাকুরার ছবির নিখুঁত ওয়াশের মত। যেন গ্লাইডারে রাইডার।

এই আমাদের কণ্ট্রোলরুম ডিরেক্টার। মাসে কেটে কুটে হাজার পাঁচেক পান। সংসার চলে না সায়েব! এসব কাজে মাথা চাই। মাথার চানকা চাবুক চাই। পেটে না ঢাললে, গ্যাঁজলা মাথায় গিয়ে ধাক্কা মারে না। ধাক্কা না মারলে এদেশে বড় আলসা লাগে। হা, আ, আউ। দেখছেন হাই উঠচে কি রকম। যাকগে, বলুন, কি দেখাতে হবে। এঁকে অপারেশানটা দেখান তো।

তিনজন ঝকঝকে ল্যামিনেটেড মিটিং টেবিলে বসলেন। চার্টস, ম্যাপস, গ্রাফস। শুনুন, অন্ধকার এইভাবে হয়। পঁচিশ বছরের নিখুঁত একটা পরি-কল্পনা চাই। আপনাদের সময় কিছু ডিফেকটিভ ব্যবস্থার ফলে কলকাতার লোক এখনো আলোর উৎপাতে পীড়িত হচ্ছে। সেসব ত্রুটি এখন মেরামত করতে হচ্ছে। জেনারেটারের নাট-বল্টু আলগা করে, টিউবে ছেঁদা করে, বাস্ট করিয়ে, নানা ভাবে ওই যন্ত্রদের বিদ্রূত তৈরির একগুঁয়ে স্বভাবকে বাগে আনতে হচ্ছে। কি কল বসিয়ে গিয়েছিলেন মাইরি! ভেঙেও শা ভাঙে না।

এরপর পরিসংখ্যান চাই। প্রথমে একটা সমীক্ষা—৭০-এ এই চাই, ৮০-তে এই চাই, ৯০-তে এই চাই। সেসব এমন পণ্ডিতদের দিয়ে করাতে হবে যা হবে, ফার, ফার, ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড, অ্যাকচুয়াল ডিমাণ্ড। এইবার লম্বা চৌড়া প্রতিশ্রুতি, শিল্প এস, ঠেলে এস, ঢেলে এস, সব গ্রামে, জ্বালো জ্বালো আলো জ্বলো। তার মানে মইটি সাপ্লাই কর, ঠেলেঠুলে গাছে তোলো, তারপর হালে 'নো পানি', মইটি সরিয়ে নিয়ে হড়কে পড়।

এইবার কিছু নদী পরিকল্পনা বানাও। সব আধখ্যাচড়া। বিদেশ থেকে, বেশি দামে, বাতিল করা জল বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র এনে ঢোলসহরত করে বসাও। এদিকে শিল্প বানাও। তাহলে কি হল সায়েব—পর্বতপ্রমাণ চাহিদা তৈরি করে মূষিক প্রমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কর। প্রশাসনের মাথাটা হেভি করে দাও। তলার দিকটা বাঙালীর পায়ের মত লিকপিকে করে রাখো। 'লেবার'রা কাজ করবে, লেঙটি পরে ঝুপড়ীতে থাকবে, আর আমরা থাকবো সুশীতল থার্মস ফ্লাস্কের মত ঘরে, ববি মার্কা বৌ. উডহাউসের ইংলণ্ডের ফ্যাট পিগ মার্কা, একটি কি দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে। শিক্ষাটা তোমাদের কাছেই পেয়েছি। আর সেইটাই হল সব শিক্ষার সেরা শিক্ষা। নিমেষে, অন্ধকারের উৎসটা ওইখানেই।

বসেছে, বসেছি মগডালে, ওরা সব উৎক্ষিপ্ত, অসন্তুষ্টের দল তলা থেকে চালার করাত, ভারতের এই তো বরাত। করে নিয়েছি লাখ বেলাখ, আর আমাদের পায়টা কে। তোদের ল্যাঠা সামলা তোরা, আমাদের তো দিন শেষ!

কি বুঝলে সায়েব।।

চুরুটটা ঠোঁটে রেখে, মোটাসোটা চার্চিল বললেন—সেই আদিসত্য ওরে আমার 'নেটু'—লর্ড সেড—লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট, নাও হি সেজ, লেট দেয়ার বি ডার্কনেস, এণ্ড ডার্কনেস ফর এভার। গুডবাই।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শুধু বিঘে দুই

অশোক রুদ্র

উপেনের তো তবু নিজের দুই বিঘা জমি ছিল। কিন্তু এক বিঘা জমিও নেই, এক কাঠা জমিও নেই সম্পূর্ণ নিঃস্ব ভূমিহীন গ্রামবাসীর সংখ্যা ১৯৭১-৭২ সনে সারা ভারতবর্ষে ছিল চার কোটির মত। এদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর এবং তাদের পরিবারভুক্ত। এছাড়া উপেনের মতো ছিটেফোঁটা জমি আছে এরকম লোকের সংখ্যা ছিল বিশ কোটির মত। এদের দুই-তৃতীয়াংশের জমির পরিমাণ ছিল তিন বিঘার কম। বাদবাকি এক-তৃতীয়াংশের জমির পরিমাণ ছিল তিন বিঘা থেকে সাড়ে সাত বিঘার মধ্যে। এই চব্বিশ কোটির মত লোকই ভারতবর্ষের দরিদ্রতম অধিবাসী। যুগ যুগ ধরে এরাই সর্বভাবে নিপীড়িত ও শোষিত। 'চরমপন্থী কে' প্রবন্ধে আমি যে দারিদ্র্য সীমার কথা আলোচনা করেছি এরা আগাগোড়াই সেই সীমার অনেক নীচে থেকে গেছে এবং উত্তরোত্তর গভীর থেকে গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে। এরাই প্রকৃত অর্থে সর্বহারা, ছিটেফোঁটা জমি এবং এক-আধটা হাল-বলদ এদের কারো কারো থাকলেও এরা নিঃসম্বল, নিঃসহায়। এরা সমাজের অন্তেবাসী, সমাজ এদের জন্য কিছু করেনি যদিও এদেরই শ্রমের উপর ভিত্তি করে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা প্রবন্ধে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার প্রসংগ আলোচনা করেছিলাম। সেই প্রবন্ধে মূলত কৃষি ব্যবস্থার সীমানার বাইরে শহর ও মফস্বলে তরুণ বেকারদের কথাই বিশেষ করে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে এই দরিদ্রতম চব্বিশ কোটি ভারতবাসীর কথা বেশী আলোচনা করি নি। তার কারণ এই নয় যে এদের মধ্যে বেকার সমস্যা নেই। বেকার সমস্যা আছে বইকি, খুব বেশী রকম ভাবেই আছে। তবে শহরে ও মফস্বলের চাকুরে ও চাকরি সন্ধানীদের মধ্যে এই সমস্যাটা যে আকার নেয় এদের মধ্যে তা সে আকার নেয় না। ফলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংজ্ঞার ব্যবহার করে যখন পরিসংখ্যানবিদেরা এদের মধ্যে বেকারের হারের পরিমাপ করতে যান তখন তাঁরা যা পান তা হয় খুব হাস্যকর। দেখা যায় যে, এদের মধ্যে বেকারের হার অতি সামান্য, এমন কিছুই বলবার মতো নয়। তার কারণ এদের কাছে সমস্যাটা কর্মাভাবের। যাদের ছিটে-ফোঁটা জমি আছে তাদের সে জমিটুকু চাষ করতে যে পরিমাণ সময় ও শ্রম লাগে তারপরে তাদের প্রচুর সময় ও শ্রম উদবৃত্ত পড়ে থাকে। এই সময় ও এই শ্রম ব্যবহার করে এদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুরির কাজ করে অর্থোপায় করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই পরিমাণ ক্ষেতমজুরির কাজ কোথায়? ভূমিহীন ও সামান্য ছিটে-ফোঁটা ভূমি সম্বলিত ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুসারে ছিল পাঁচ কোটির মত এবং তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা গণনা করলে ক্ষেত-মজুরির উপর নির্ভরশীল জনগণের সংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ কোটির মত। এত ক্ষেতমজুরকে কাজ দেওয়ার মত কাজের সুযোগ আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় হয় না। বছরে কয়েক মাস মাত্র এদের অধিকাংশ মোটামুটিভাবে কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারে। বাদবাকি সময়ে তাদের কাজ থাকে না। চেয়েচিন্তে নানান রকম ছুটকো কাজ করে গাছের ফল, মাঠের ঘাসপাতা, পুকুর বা জলা থেকে ধরা শামুক-গুগোল প্রভৃতি খেয়ে এবং সর্বোপরি ধনী কৃষকদে[র] কাছ থেকে আহার্য ধার করে এরা কোনোমতে প্রাণ ধারণ করে। এদের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যা ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে একটিই সমস্যার আকার ধারণ করে যা হল কোনোমতে বেঁচে থাকার সমস্যা।

আমি 'দেশে'র অন্য একটি প্রবন্ধে (কারো পৌষমাস প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বন্টন-বৈষম্যের কথা আলোচনা করেছিলাম। সে প্রবন্ধেও এই চব্বিশ-পঁচিশ কোটি দরিদ্রতম কৃষিনির্ভর পল্লীবাসীদের কথা আলোচনাই করি নি। তাদের কথা আর কি আলোচনা সেখানে করব। যে কয়টি আর্থিক নীতির বিশ্লেষণ ও আলোচনা সেই প্রবন্ধে করেছিলাম তাদের কোনোটিতেই জনগণের এই অংশের কথা হিসেবের মধ্যেই রাখা হয় নি। সেই সব নীতিগুলোর দ্বারা বৈষম্যমূলক বন্টনের দরুন লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হয় শহরাঞ্চলের নানান শ্রেণীর লোক, যেমন শিল্পপতি, কলকারখানার শ্রমিক, চাকুরে মধ্যবিত্ত, বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনের ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায় ও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা। ক্ষেতমজুর ও ক্ষুদে চাষীদেরই মত সব হিসেব থেকে বাদ পড়ে যায় সমাজের আরেক শ্রেণীর অন্তেবাসীরা যারা শহর ও মফস্বল অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প ও বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের গন্ডীর বাইরে অসংঘবদ্ধ অবস্থায় যে যেমন পারে নানান রকমের খুচরো কাজ কারবার করে কোনোমতে জীবন ধারণ করে। এবং কেউ রিক্‌শা টানে, কেউ মুটে মজুরের কাজ করে, কেউ ফুটপাতে বা ট্রেনের কামরায় দু-দশটা ফাউনটেন পেন বিক্রী করার চেষ্টা করে, আবার কেউ বা এমন ছোটো ছোটো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যেখানে একসঙ্গে বড়জোর চার-পাঁচজন শ্রমিক কাজ করে। এরা আয় করে এত সামান্য মজুরি এবং পরিশ্রম করে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যার তুলনায় বড় বড় কল-কারখানার শ্রমিকদের জীবনমানকে যথেষ্ট উন্নত বলে মনে করতে হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বহারাদের কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব না। এদের কথা এই আলোচনায় ভুলে যাওয়া উচিত হবে না বলে এদের উল্লেখ করে রাখলাম (পাঠককে অনুরোধ করি স্মরণ রাখতে যে আমি সর্বহারা কথাটিকে শব্দার্থে ব্যবহার করছি, মার্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী industrial proletariat বোঝাচ্ছি না।)

[illegible]

বর্ণনা করেছি। কথাটা কি ঠিক? এরা কি সত্যিই নিঃসহায়? এদের জন্য কি সত্যিই কেউ কিছু করতে চায় না? চায় বই কি। রাষ্ট্র চায়, সব রাজনৈতিক দলগুলিই চায়। এদের কথা মনে করেই তো রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। এদের জন্যই তো 'গরিবী হটাও' ধ্বনি তোলা হয়েছে, এদের কথা মনে করেই বেকার সমস্যা নিরসনের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, এদের মংগলার্থেই রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপক ভূমি সংস্কারের দাবী রেখেছে। এদের নাম করেই রাজনৈতিক দলের নেতারা ভোট সংগ্রহ করেন।

তবে কি না সংকল্প আর কর্ম, নীতি ও আচরণ, প্রতিজ্ঞা করা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা এদের মধ্যে কোনো সংগতি না রাখাই ভারতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। অতএব গত আটাশ বছরের পরিকল্পনা ভিত্তিক আর্থিক উন্নয়নের উদ্যোগে এই দরিদ্রতম পল্লীবাসীদের জন্য কিছুই যে করা হয়নি তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর রাজনৈতিক দলগুলিও যে নানাবিধ আন্দোলন করে শুধু কলকারখানার শ্রমিকদের এবং শহুরে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে দরিদ্র পল্লীবাসীদের জন্য কিছুই করেনি তাও সহজবোধ্য। কারণ এই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এইসব অন্যান্য সংঘবদ্ধ শ্রেণীর প্রভাব বলশালী কিন্তু দরিদ্রতম পল্লীবাসীরা এদের কার্যকলাপে কোনো অংশই গ্রহণ করে না।

ভূমি সংস্কারের আন্দোলনের মারফত এই দরিদ্রতম শ্রেণীর উন্নয়নার্থে কোন লক্ষ্যই কি রাখা হয়নি? রাখা হয়েছে বইকি। কিন্তু সেসব লক্ষ্য এমনই যে তাদের পূরণের কোনো সম্ভাবনাই নেই এবং সেই কারণেই তার জন্য কোনো চেষ্টাও করা হয়নি। তিন ধরনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এক, ক্ষেত মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত লক্ষ্য। দুই, ভূমিহীনদের ভূমি পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব। তিন, এদের কর্মাভাব ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বছরের কোন কোন সময়ে বিশেষভাবে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদের মধ্যে কিছু কর্মসংস্থান করা ও আয় বিতরণ করার ব্যবস্থা। এই তিন ধরনের লক্ষ্যই কেন কাগজপত্রেই থেকে গেছে, সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমল থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের পশ্চিম বাংলার নূতন সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব পর্যন্ত কখনও কেন এই লক্ষ্যগুলির কোনোটিরই পূরণের সম্ভাবনা দেখা গেল না তা এবার এক এক করে আলোচনা করব।

প্রথমেই নেওয়া যাক মজুরির কথা। মাঝে মাঝেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরির হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কাগজেপত্রেই থেকে গেছে। ন্যূনতমের হারের অর্ধেক বা তারও কম মজুরিতে মজুরেরা কাজ করেছে। প্রশাসন বাধা দেয়নি, মজুরেরা আইন আদালত করার কথা ভাবতেও পারেনি এবং দেশের কোথাও কোনো রাজনৈতিক দলই আন্দোলন ও সংগ্রামের মারফত কোনো একদল মজুরেকেও ন্যূনতম মজুরি পেতে সাহায্য করেছে এমন জানা যায়নি। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে এখন ন্যূনতম মজুরির হার দৈনিক আট টাকারও বেশী। কিন্তু এমন কোনো অঞ্চল কি আছে যেখানে মজুরেরা এই মজুরি পাচ্ছে? যে সব অঞ্চলে ক্ষেত মজুরদেব নিয়ে আন্দোলনের চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে আন্দোলনের নেতারা দাবী করছেন মজুরিকে পাঁচ-ছয় টাকা পর্যন্ত তোলা গেছে। এ জাতীয় আন্দোলন হচ্ছেও খুব বেশী জায়গায় নয়। এর কারণ অনুসন্ধানে বেশী দূর যেতে হয় না। মজুরির হার বাড়ালে যারা মজুরি দেয় তাদের স্বার্থে আঘাত করা হয়। কৃষিজীবী জনগণের মধ্যে ক্ষেত-মজুরের অংশ পশ্চিমবাংলায় শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ, সারা ভারতবর্ষে শতকরা আটত্রিশ ভাগ। ক্ষেতমজুর যারা নয় তাদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ মাঝারি আয়ের কৃষক, এক ক্ষুদ্রতর অংশ ধনীকৃষক এবং আরেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বৃহৎ পরি-মানের জমির মালিক, কৃষিজাত ধনের বৃহত্তর অংশই এদের করায়ত্ত, পল্লীসমাজের এরাই হর্তাকর্তা। এরা সকলেই কমবেশি পরিমাণে মজুর নিয়োগ করে। অন্যান্য দেশের কৃষকেরা তখনই মজুর নিয়োগ করে যখন তাদের পরিবারের লোকেদের শ্রমে নিজ খামারের সব কাজ করে উঠতে পারে না, বাড়তি শ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জাতিপ্রথা ও নানাবিধ কুসংস্কারের দরুন ক্ষেত খামারের অনেকানেক কাজ বিশেষ বিশেষ জাতিভুক্ত শ্রমিক ছাড়া অন্য কেউ করবে না। ফলে মাঝারি আয়তনের কৃষকেরা তো বটেই এমনকি ক্ষুদ্র চাষীদেরও এক বড় অংশই বিশেষ বিশেষ খামারের কাজ মজুর খাটিয়ে করে থাকে এবং সেই সময়ে নিজেরা স্রেফ বসে থাকে। সুতরাং মজুরি বাড়লে ধনী-কৃষক তো বটেই মাঝারি ও ক্ষুদ্র আয়তনের অনেক চাষীরই আঁতে লাগবে। কোন রাজনৈতিক দলই এমন কোন কাজ করবে না যাতে ভোটের সময় কৃষকদের ভোটে টান পড়তে পারে। সুতরাং ভোটের রাজনীতিতে আস্থাশীল কোন দলই মজুরি বাড়ানর পথে পা বাড়াবে না। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে ভোটের অংকের হিসাবে ক্ষেত মজুরদেরও তো গুরুত্ব পাওয়ার কথা, কারণ কৃষিজীবীদের মধ্যে তাদের অংশ তো প্রায় অর্ধেক। এর উত্তর বোধহয় এই যে, এরা সংখ্যায় গুরু হলেও অর্থনৈতিকভাবে এরা এতই দুর্বল, প্রাণধারণের জন্য গ্রামের ধনী কৃষকদের উপর এরা এতই নির্ভরশীল, এদের রাজনৈতিক চেতনা এতই কম এবং এরা এতই অসংঘবদ্ধ যে এরা রাজনৈতিক দলগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অপর-দিকে ধনী ও মাঝারি কৃষকেরাই পল্লীরাজনীতির স্তম্ভস্বরূপ। ভোটের অংকের হিসাবে ক্ষেতমজুরদের অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু ধনী ও মাঝারি কৃষকদের মন যুগিয়ে চলতেই হয়।

এবারে পরীক্ষা করে দেখা যাক জমি পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটাকে। সব রাজনৈতিক দলই এই এক মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার করে যাচ্ছেন যে তাঁরা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বিতরণ করে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলবেন। এই প্রস্তাবটি একটি বৃহৎ ধাপ্পা। দেশে কি পরিমাণ কৃষিযোগ্য ভূমি আছে, তার

বিতরণের বিন্যাসই বা কিরকম, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বা কত এইসব বিষয়ে সামান্য ধারণাও আছে এমন যে-কোনো ব্যক্তি একটু গুণ ভাগ করে হিসেব করলেই দেখতে পাবেন যে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার মতো জমির পরিমাণ এত কম যে, ঐ উপায়ে সমস্যার গায়ে আঁচড়টুকুও কাটা যাবে না, যে হিসাবটার কথা বলছি তা এতই সরল যে, রাজনৈতিক দলেরা তা করতে পারেন না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেই কারণেই আমি এই প্রস্তাবটিকে রাজনৈতিক দলদের স্বারা প্রচারিত একটি ধাপ্পা বলে বর্ণনা করেছি।

ভূমি সংস্কারের কথাবার্তায় দুই উপায়ে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বিতরণের কথা আলোচিত হয়েছে। জমির যে ঊর্ধ্বসীমা (সিলিং) বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশী জমি যাদের আছে তাদের থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হবে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, এ হল প্রথম প্রস্তাব। ভূমিহীন যেসব কৃষক অন্যের জমিতে ভাগচাষ প্রথায় বা অন্য কোনো বর্গাদারী প্রথায় চাষ করে তাদের চাষের জমির স্বত্ব তাদেরই দেওয়া হবে এ হল দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কিন্তু এ দুয়ের কোনো উপায়েই ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র পরিমাণ জমির মালিক ক্ষেত মজুরদের বিশেষ কোনো উপকার যে করা যাবে না তা একটু অংক কষলেই দেখা যায়। এই রকম অংক রাজনৈতিক দলগুলি না করে থাকলেও কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ করেছেন। যেমন, পরিকল্পনা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ডঃ মিনহাস দেখিয়েছেন যে, যদি জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমাকে কুড়ি একরে রাখা যায় এবং সেই সীমার ঊর্ধ্বের সব জমি বাজেয়াপ্ত করে পাঁচ একরের চেয়ে কম জমি চাষ করে এমত ক্ষুদ্রচাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তো এদের আগে যে জমি ছিল এবং নূতন করে যে জমি পাইয়ে দেওয়া হল তা জড়ো করার পরও মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াবে আধ একরের মত মাত্র এবং গড়ে এক একটি চাষী পরিবারের খামারের আয়তন দাঁড়াবে আড়াই একর মত। আড়াই একর জমিতে চাষ করে পরিবারের লোকেদের শ্রমের এবং একজোড়া হাল বলদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়। এবং সেই জমির উৎপাদনে একটি চাষী পরিবার ভালভাবে খেয়েপরেও বাঁচতে পারে না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই অংক কষতে গিয়ে ডাঃ মিনহাস্ ধরে নিয়েছেন সম্পূর্ণ রকমে ভূমিহীন যারা তাদের মধ্যে এক কাঠা জমিও বিতরণ করা হবে না। অর্থাৎ ভূমিহীন যারা তারা

ভূমিহীনই থেকে যাবে, এবং তাদের সংখ্যা বেড়েই যাবে কিন্তু ছিটেফোঁটা জমি-জমা আছে যাদের তাদের আরও খানিকটা করে জমি দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্বয়ংনির্ভর করে তোলার সীমায়িত প্রস্তাবও যদি গ্রহণ করা হয় তো সে প্রস্তাব কার্যকরী করার মতোও যথেষ্ট পরিমাণ জমির সংস্থান নেই। এই একই সমস্যাকে অন্য এক দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রবীণ অর্থনীতি-বিদ্ অধ্যাপক ডাণ্ডেকার। তাঁর বিখ্যাত 'পভার্টি ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি প্রতি ভূমিহীন ক্ষেতমজুরকে অতি সামান্য পরিমাণ করে জমি দিতে হলে কি পরিমাণ জমি ঊর্ধ্বসীমার উপর থেকে বাজেয়াপ্ত করে বিতরণ করতে হবে তার হিসেব করেছেন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে যাদের অল্পস্বল্প জমি আছে তাদের মধ্যে কোনো জমি বিতরণ করার কথা তিনি চিন্তাই করেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে ঐ সামান্য পরিমাণ করে জমি বিতরণ করতেও যে পরিমাণ জমি লাগবে তা জোগাড় করতে হলে মালিকানার ঊর্ধ্বসীমাকে এখন যা আছে তার থেকে অনেক নীচে নামাতে হবে। যেমন, কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রতি ভূমিহীনকে মাত্র আধ একর করে এবং বিহার ও পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে মাত্র এক একর করে জমি বিতরণ করতে হলেও ঊর্ধ্বসীমাকে হতে হবে সাড়ে সাত একর থেকে পনেরো একরের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজেদের দেওয়া হিসেবেই দেখা যাক। সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক পত্রিকার ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাচ্ছি। ১৯৫৩ ও ১৯৫৫-র 'ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগের ফলে এ পর্যন্ত দশ লক্ষ আটাত্র হাজার কৃষি জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে; তার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমি ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার একর জমি বিভিন্ন আদালতে ইনজাংশনে আটকে আছে, আর এক লক্ষ পঁচিশ হাজার জমি কৃষির পক্ষে অনুপযোগী।" এই মুখপত্র অনুসারে এই রাজ্যে প্রায় কুড়ি লক্ষ পরিবার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এবং আর পনেরো লক্ষ পরিবারকে বলা হয়েছে 'প্রান্তিক চাষী'। "পরিবার পিছু এক একর করেও জমি দিতে হলে মোট প্রয়োজন পঁয়ত্রিশ লক্ষ একর জমি। সেখানে বিলি করা হয়েছে মাত্র ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমি। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাক এত বেশী যে বিগত চব্বিশ বছরে ভূমি সংস্কারের কাজে প্রাক্তন সরকারের ব্যর্থতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।" কিন্তু বর্তমান সরকার এই ফারাক ভরাবার উপায় কি বার করেছেন? ওই মুখপত্র থেকেই আবারও উদ্ধৃতি দিচ্ছি "এ রাজ্যে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার চেয়ে বেশী জমির মালিক এমন বড় রায়তের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার। এদের মধ্যে ১২৫১ জনের প্রত্যেকের দখলে জমি রয়েছে একশো একরেরও বেশী। আর পঞ্চাশ একরের চেয়ে বেশী করে জমি আছে ৪৪৮১ জন রায়তের।" একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে যে এই সমস্ত উদ্বৃত্ত জমিই যদি বাজেয়াপ্ত করা যায় তো তাও পাঁচ লক্ষ একরের বেশী হবে না। ইনজাংশনে আটকে আছে যে এক লক্ষ ষাট হাজার একর তাকেও যদি এর সংগে যোগ দেওয়া হয় তো তা নিয়েও সাত লক্ষ একর হয় না। সুতরাং পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণে প্রাক্তন সরকারের চেয়ে বর্তমান সরকার অধিকতর সাফল্য আশা করেন কোন হিসাবে? দ্রৌপদী একবার এক কণা তণ্ডুলের সাহায্যে দুর্বাসা মুনি ও তাঁর কয়েক সহস্র অনুচরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য নিতে হয়েছিল। বর্তমান সরকারের কি সেরকম কোনো কৃষ্ণসখা আছেন যাঁর সাহায্যে সাত লক্ষ একর জমি দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পরিবারের জমির ক্ষুধা মেটাবেন?

তাহলে দেখা যাচ্ছে জমির ঊর্ধ্বসীমা এখন যা আছে তাকে অনেক নীচে নামালেও এবং সীমার ঊর্ধ্বের যে জমি বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়ে এসেছে তা কার্যকরী করা হলেও ভূমিহীন কৃষকদের বা ছিটেফোঁটা জমি আছে এমন দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক ভাবে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলার সম্ভাবনা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কিন্তু এই সরল ও নিদারুণ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে বেশীরভাগ রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিয়েই যাচ্ছেন যে ভূমিহীন ও স্বল্পভূমির মালিক কৃষকদের তাঁরা জমি পাইয়ে দেবেন। তাঁরা সব সময় হইচই করছেন এই বলে যে মালিকানার ঊর্ধ্বসীমাকে কার্যকরী করা হচ্ছে না, সীমার ঊর্ধ্বের জমি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না। হচ্ছে না যে সে কথা ঠিকই, কিন্তু সীমা সংক্রান্ত আইনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলেও তার স্বারা যে সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধানও হবে না সেই কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তার কারণ এই সব রাজনৈতিক দলের অধিকাংশই মিথ্যার কারবারী। জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে জন-গণের ভোট পাওয়ার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট।

ভাগচাষী বা বর্গাদারদের জমির স্বত্ব পাইয়ে দেওয়ার যে প্রস্তাব সে সম্বন্ধেও একই বিচার প্রযোজ্য। এই বিশেষ প্রস্তাবকে ভূমি সংস্কারের আলো-চনায় অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এর প্রবক্তারা এমনভাবে কথা বলেন যেন এই ভূমি সংস্কারটি কার্যকরী করতে পারলে কৃষি ব্যবস্থায় একটা বিপ্লবই ঘটে যাবে। সুতরাং এরকম বিপ্লব যে ঘটছে না তার জন্য তাঁরা দায়ী করেন বর্গাদার সংক্রান্ত আইনের বহু ফাঁককে এবং আইনের প্রয়োগে শিথিলতাকে। কিন্তু এই দৃষ্টিভংগী কতটা বাস্তব ভিত্তিক? বর্গাদারদের সমস্যাটা যে এক প্রধান সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই একমাত্র বা প্রধানতম সমস্যা নয়। কৃষির জমির যে অংশ বর্গাদারী প্রথায় চাষ হচ্ছে তা শতকরা ২৭ ভাগের বেশী নয় এবং বর্গাদার নয় এবং বর্গাদারদের চেয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও স্বল্প ভূমির মালিক কৃষকদের সংখ্যা অনেক বেশী। অবশ্য দরিদ্র ক্ষুদ্র চাষীদের এক বৃহৎ অংশই বর্গাদার এবং বর্গাদারী আইনের মাধ্যমে তাদের উন্নতিসাধন সম্ভব। কিন্তু একই বর্গাদারী আইনের মারফত শুধু দরিদ্র কৃষক নয় ধনী ও মাঝারি কৃষকেরাও যে অধিকতর মাত্রায় উপকৃত হতে পারে সে কথাটা প্রায়শই ভুলে যাওয়া হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান অনুসারে (NSS এর [illegible]th round দ্রষ্টব্য) ১৯৬০-৬১ সালে যত জমি বর্গাদারী প্রথায় চাষ হচ্ছিল তার অর্ধেকই ছিল দশ একর বা তিরিশ বিঘা ও ততোধিক জমির মালিকদের হাতে। সুতরাং বর্গাদারী আইনকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলে ক্ষুদ্রচাষীদের যে পরিমাণ উপকার করা হবে ঠিক সেই পরিমাণে মাঝারি ও ধনী কৃষকদের শক্তিশালী করে তোলা হবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীরা যে পরিমাণ জমির উপর স্বত্ব অর্জন করবে তা দিয়ে তারা সত্যি কতটা উপকৃত হবে? এবারে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করছি যে বিষয়টি হল অর্থনৈতিক চাপে পড়ে ক্ষুদ্র চাষীদের নিজ জমি চাষ করতে অপারগ হয়ে জমিকে মাঝারি ও ধনী কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া। এই বিষয়টির দিকে কিছু অর্থনীতিবিদ তথ্যভিত্তিক যুক্তি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষভাবে পশ্চিমবাংলার অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ও অধ্যাপক রণজিৎ লাহিড়ীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। এঁদের দু-একটি প্রবন্ধের উল্লেখ এই লেখার অন্তিমে পাঠসূচীতে দিয়েছি। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। এঁদের বিশ্লেষণ থেকে যে চিত্র পরিস্ফুট হয় তা এই প্রকার। পশ্চিম বাংলায় ক্ষুদ্র পরিমাণে জমির মালিকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা কমেছে। ক্ষুদ্র মালিকের সংখ্যা বাড়ার কারণ বোধহয় এই যে, ভূমিসংস্কার আইন অনুসরণ করে কিছু ভূমিহীনদের মধ্যে কিছু ভূমি বিতরণ করা হয়েছে। কিছু ক্ষুদ্র বর্গাদারদের ভূমির স্বত্ব পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা যে কমেছে তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে দরিদ্র কৃষকেরা নিজ জোতে চাষ করতে উত্তরোত্তর অপারগ হচ্ছে। সুতরাং তারা হয়তো তাদের জমি কিছু পরিমাণে বিক্রী করে দিচ্ছে; কিন্তু এই বিক্রী করার ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ হলে ক্ষুদ্র জমির মালিকদের সংখ্যা কমত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই সংখ্যা কমছে না বরং বাড়ছে অথচ ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা কমছে। এর একটাই ব্যাখ্যা সম্ভব—ক্ষুদ্র জমির মালিকেরা

তাদের জমি বর্গাপ্রথায় চাষ করার জন্য মাঝারি ও ধনী কৃষকদের দিয়ে দিচ্ছে। তা যে ঘটছে তার প্রকাশ দুইভাবে পাওয়া যায়। মাঝারি ও ধনী কৃষকদের জোতের সংখ্যাও যেমন বাড়ছে তেমনি তাদের জোতের গড় আয়তনও বাড়ছে, এবং ভূমির বণ্টন বৈষম্যও এর ফলে আগের তুলনায় বাড়ছে। জমির মালিকানা সম্বন্ধে এ কথা যেমন প্রযোজ্য আবার বর্গাদারী প্রথায় নিয়ে চাষ করা জমি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা প্রায়শই ভুলে যাওয়া হয়। কথাটি হল এই যে, জমির মালিকানার উপর ঊর্ধ্বসীমা রাখা আছে কিন্তু কি পরিমাণ জমি বর্গাপ্রথায় নেওয়া যাবে তার কোনো সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে জমি বর্গাপ্রথায় নিয়ে নিজ জমির সংগে যুক্ত করে জোতের পরিমাণ বাড়িয়েই যাওয়া যেতে পারে। পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনো কোনো অঞ্চলে ঠিক এই পন্থাই মাঝারি ও ধনী কৃষকেরা অনুসরণ করছে। এবং বর্গাদারী আইন প্রণয়ন করে এই মাঝারি ও ধনী কৃষক বর্গাদারদের প্রচুর সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র বর্গাদারদের বিশেষ কোনো উপকার হয়নি। বর্গাদারই হোক আর জমির মালিকই হোক ক্ষুদ্র চাষীদের নিজ জোত তুলে দিয়ে ক্ষেতমজুর হয়ে যাওয়া বা কৃষি ছেড়ে অন্য জীবিকার অনুসন্ধানে যাওয়ার কথা আগেই বলেছি। এদেরই মধ্যে ভূমিহীন ক্ষুদ্র বর্গাদারদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়ায় এই শ্রেণী পশ্চিম বাংলায় প্রায় অবলুপ্ত হচ্ছে। জাতীয় পরি-সংখ্যান অনুসারে ভূমিহীন বর্গাদারদের অংশ কৃষি জনগণের শতকরা ষোলো ভাগ থেকে শতকরা তিন ভাগে নেমে যায় ১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৬১-৬২ এর মধ্যে।

ক্ষুদ্র চাষীরা যে উত্তরোত্তর নিজ জমি চাষ করতে অপারগ হচ্ছে তার কারণও সহজেই বোধগম্য। জাতীয় পরিসংখ্যান (NSS 26th round) থেকে দেখা যায় যে আধ একর ও ক্ষুদ্রতর জোতের চাষীদের শতকরা নিরানব্বই ভাগেরই হালও নেই লাঙলও নেই। এবং যে সব চাষীর জোতের আয়তন ১/২৫ একর থেকে ২.৫০ একর পর্যন্ত তাদেরও প্রায় সিকি ভাগের না আছে হাল না আছে বলদ। আর আজকাল চাষ করতে শুধু হাল বলদ হলে চলে না, রাসায়নিক সার, সেচের জল, উন্নত জাতের বীজ প্রভৃতি এমন অনেক উপাদানের ব্যবহার হচ্ছে যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যয় যারা বহন করতে পারে সেই সম্পন্ন চাষীরা এগিয়ে আসছে ক্ষুদ্র জমির মালিকেদের থেকে ভাগ বা ঠিকা প্রথায় জমি নিয়ে চাষ করার জন্য।

এবারে আমরা কর্মাভাবগ্রস্ত দরিদ্র পল্লীবাসীদের জন্য বিশেষ কর্মকাণ্ডের প্রকল্প করে তাদের মধ্যে আয় বিতরণের যে প্রস্তাব তার কথা আলোচনা করব। বর্তমান পশ্চিমবংগ সরকার খুব হইচই করে প্রচার করছেন যে তাঁরা 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে সমর্থ হয়েছেন ফলে ক্ষেতমজুর ও অন্য দরিদ্র পল্লীবাসীদের অনশনেও থাকতে হচ্ছে না, ধনী কৃষকের ঋণের ফাঁদেও পড়তে হচ্ছে না। একটু বিচার বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এও একটি বিরাট ধাপ্পা। এই বিশেষ প্রকল্পটির ধারণা এক 'অতি পুরাতন ভাব' কোনো নব আবিষ্কারও এর সম্পর্কে করা হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে গত পঁচিশ তিরিশ বছর যাবৎই অনেক লেখা-জোখা হয়েছে অনেক কথা বলা হয়েছে। দেশময় কোটি কোটি লোক কাজের সুযোগ না পেয়ে বসে আছে এবং ধারদেনা করেও অর্ধাহারে থাকছে। এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারলে অর্থনীতির পক্ষে উন্নতিকারী কত কাজই করানো সম্ভব। একই কালে তাদের বেকার সমস্যার নিরসন হবে, তারা খেয়ে পড়ে বাঁচতেও পারবে আর মহাজন ধনী কৃষকদের ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। সরকারের বাজেটে কিছু টাকা এই খাতে দেখিয়ে দিয়ে যদি এতবড় সমস্যার একটা এত চমৎকার সমাধান—"শূন্যে আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল"—সমাধান সম্ভব হতো তো দেশের মংগলের জন্যে চিন্তার কোনো কারণই থাকতো না। এবং এই পথে সমাধানের জন্য স্বাধীনতার পরে তিরিশ বৎসর অপেক্ষা করতেও হত না। এত সহজ উপায়ে সমস্যাটার যে সমাধান হয়নি তার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে এর জন্য যে পরিমাণ বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মাত্র ব্যবস্থা বাজেটে সম্ভব। দেশব্যাপী এই জাতীয় প্রকল্পের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় আবশ্যক হতে পারে তার এক হিসাব অধ্যাপক দাণ্ডেকার তাঁর পূর্বে উদ্ধৃত পুস্তকে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে দরিদ্র-তমদের সকলকে নয়, সর্বনিম্নস্তরের শতকরা দশভাগ পল্লীবাসীকে দারিদ্র্যে অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে, যদি বাদবাকী দরিদ্রদের মধ্যে কর্মের বিনিময়ে আয় বিতরণ করে তাদের ন্যূনতম জীবনমানের সংস্থান করতে হয় তো ১৯৬৯ সালে লাগতো বছরে এক হাজার কোটি টাকা (১৯৬৮-৬৯ সালের দ্রব্যমূল্যে)। তার পরের প্রায় দশ বছরে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রব্যমূল্যও সাংঘাতিক বেড়েছে। ফলে এখন নূতন করে হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে যে এক হাজার কোটির জায়গায় লাগবে দু-হাজার কোটি টাকা। এই হারে ব্যয়বরাদ্দ করলে ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে রাখতে হয় দশহাজার কোটি টাকা। অন্যান্য খাতের থেকে সরিয়ে এত বড় অংশের বরাদ্দ কোন পরিকল্পনাতেই রাখা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে রাখা হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় আরও কিছু বেশী পরিমাণে টাকা রাখা হয়েছিল, কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং সরকারীভাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তাও সব ব্যয় করা সম্ভব হয়নি এবং যা ব্যয় করা হয়েছিল তারও বিশেষ সদ্ব্যবহার হয়নি। কেন অসদ্ব্যবহার হওয়া অবশ্যম্ভাবী তার আলোচনা একটু পরেই করছি। তার আগে বর্তমান পশ্চিম-বংগ সরকার কি করছেন তার দিকে একটু তাকিয়ে দেখা যাক। 'পশ্চিমবংগ' পত্রিকার ১৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় দেখছি কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবংগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ১১,২০০ মেট্রিক

কাজ করানো হচ্ছে। এবং এই উপায়ে নাকি গত বছরের শেষে যখন ক্ষেতে খামারে কাজ একেবারেই নেই এইরকম দুই মাস কাল দরিদ্র পল্লীবাসীদের অনাহার ও মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কথাটা বোঝা একটু কঠিন, কারণ ১১০০০ মেট্রিক টনকে দু-মাসে ষাট দিনে বিতরণ করলে দিনে দুই লক্ষ টনের কম বিতরণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং যদি এই অঙ্ক ঠিক হয়ে থাকে তাহলে পঁয়ত্রিশ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে মাত্র দুই লক্ষকে এই সাহায্য দেওয়া গেছে। অপরদিকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যেই যদি এই গমের বিতরণ করা হয়ে থাকে তাহলে দু-মাস নয় তাদের সাহায্য করা হয়েছে মাত্র সাড়ে তিনদিন।

সমস্যাটা কিন্তু শুধু টাকা পয়সার নয়। কিছু টাকা পয়সা ঢাললেই যে সমপরিমাণ কাজ পাওয়া যাবে তা মোটেই ঠিক নয়। গ্রামের কোটি কোটি কর্মাভাবগ্রস্ত লোকেদের শ্রমের প্রয়োগে যে গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি সম্ভব তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু 'সেই' রকমের সৃজনশীল কার্মকান্ডের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সে রকম কোনো পরিকল্পনা ভারতবর্ষে কেউ কোথাও এখনও করেনি, এক নিমেষে তা করাও সম্ভব নয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এরকম কোনো পরিকল্পনা এখনও করে ওঠেন নি। সুষ্ঠু, সুচিন্তিত, সুব্যবস্থিত পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে আমলাতন্ত্রের হাতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য দাও বলে গম ও টাকা তুলে দিলে তা কতটা দরিদ্র চাষীদের কাছে পৌঁছবে আর কতটা অন্যান্য নানা প্রণালীতে প্রবাহিত হয়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের নিজ স্বীকৃতি প্রণিধানযোগ্য। আগেই বলেছি, চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রামে কর্মনিয়োগের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল পঞ্চাশ কোটি টাকা। এই সম্পর্কে পরবর্তীকালে পরিকল্পনা পরিষদই লিখেছেন যে এই ব্যয় দ্বারা অধিক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি, এবং তার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন "the bulk of the expenditure about 80% was incurred on communications. সুধী পাঠক নিজেই বুঝে নিন এখানে কমিউনিকেশনস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে। পথঘাট, সেচ ইত্যাদি যেসব কৃষির উন্নতিকারী কার্যকলাপের কথা বলা হয়ে থাকে তা নিশ্চয় নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর আমলা, রাজনৈতিক দলেদের ছোটো বড় দাদারা এবং তাদের অনুচর পরিচর নন্দী-ভৃঙ্গীদের কথাই মনে হয় বলা হয়েছে।

তাহলে দেখলাম মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা করাই হচ্ছে না, ভূমি বিতরণ ও বর্গাদারী জমিতে স্বত্ব দেওয়ার প্রস্তাব ও খাদ্যের বিনিময়ে কর্মের প্রকল্প মারফত দরিদ্রতম পল্লীবাসীদের উপকার খুব সামান্যই করা যেতে পারে এবং সে উপকারটুকুও দেওয়া যেতে পারে তাদের এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশকে। ব্যাপকভাবে এই দরিদ্রতম শ্রেণীর কোনো উন্নতিসাধন সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও এই প্রস্তাব ও প্রকল্পগুলিকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলে একটি কুফল অবশ্যম্ভাবী। তা এই যে এই দরিদ্রতম চাষী ও ক্ষেতমজুরেরা হবে রাজনৈতিক দলগুলির দাবার ঘুঁটি। সবাইকে যখন জমিও দেওয়া যাবে না কাজও দেওয়া যাবে না, কয়েকজনকে মাত্র যখন দেওয়া যাবে, তখন খেলাটা দাঁড়াবে এই 'আমার পার্টিকে ভোট দাও, এককাঠা জমি পাইয়ে দেবো', 'আমার পার্টির পতাকা ধরে কলকাতায় চলো শহীদ মিনারে জড়ো হতে, কয়েকদিনের মাটি কাটার কাজে ঢুকিয়ে দেব অথবা মাটি না কেটেও কয়েক কেজি গম ও কয়েকটা টাকা পাইয়ে দেব।'

আমার বক্তব্য এখন পর্যন্ত পুরোপুরিই নেতিবাচক হয়েছে। আমার কি অস্তিবাচক কোনো বক্তব্যই নেই? আছে বইকি। আমার মতে পল্লী ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের ভিত্তিকে হতে হবে যৌথকৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে করতে হবে সমবায় ভিত্তিক। এইটুকু এককথায় বলে অবশ্য কিছুই বলা হল না। যৌথ-কৃষি ও সমবায় আন্দোলনের কথা তো নূতন কিছু নয়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালের সমাজচিন্তায় এর উপর যথেষ্টই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি কিভাবে এই প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত আছে বুঝতে হলে বুঝতে হবে কোন কোন রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাবের গুরুত্ব উত্তরোত্তর কমিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ভুলেই যাওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখি সমাধানের ভিত্তি হিসাবে যে যৌথ উদ্যোগের কথা আমি বলছি তা সংসদে আইন পাশ করে, বা শহীদ মিনারে লোক জড়ো করার রাজনীতি মারফত কখনোই সম্ভব হবে না। তার জন্য প্রয়োজন হবে সংঘবদ্ধ ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য দরিদ্র চাষীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামের।

কী ধরনের যৌথ উদ্যোগ এবং কি ধরনের সংগ্রাম তার আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধের অবতারণা করতে হবে। এই প্রবন্ধে এবং 'দেশে' পূর্বে প্রকাশিত অন্য কয়েকটি প্রবন্ধে যে প্রশ্নের জবাব আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা হলো বকরূপী ধর্মের ভাষায় 'বার্তা কি?' বকরূপী ধর্ম আরও একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কঃ পন্থাঃ।' বলাই বাহুল্য পন্থার সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে সংবাদ মূল্যহীন। অন্য প্রবন্ধে এই পন্থার আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

পাঠসূচী :

1. B. S. Minhas, Planning and the Poor.
2. V. M. Dandekar and Nilkantha Rath, Poverty in India.
3. R. K. Lahiri, Land Reforms in West Bengal—Some Implications
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)
4. R. K. Lahiri, Emerging Rural Class Structure, econ, December-January, 1974.
5. A. Ghosh & K. Dutt, Development of Capitalist Relations in Agriculture.

শূন্যযান

সন্তোষকুমার ঘোষ
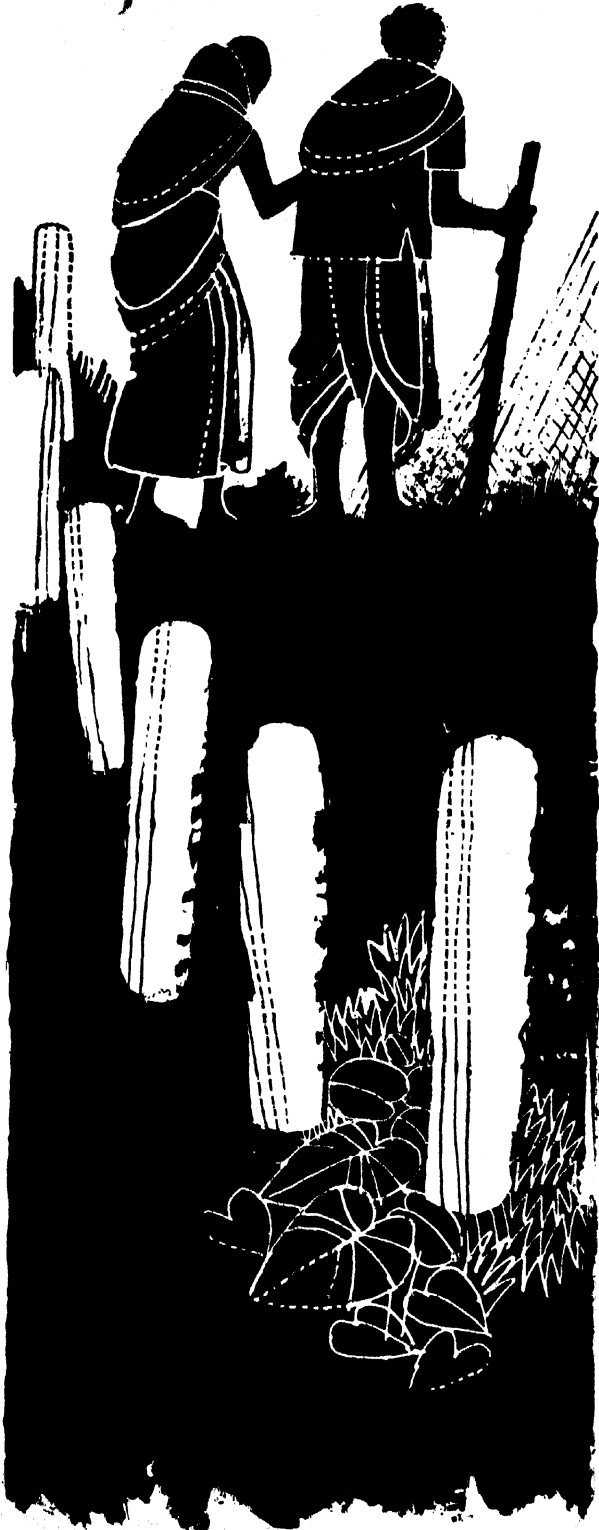
অনীতা তাকে বকল। তুমি যেখানে সেখানে থুতু ছিটোও কেন বলো তো? সারা ঘর নোংরা হয়ে যায়।

লোকনাথ ফোকলা দাঁতে হাসল। —বয়েসের দোষ। কী করি বলো তো? যেমন পেচ্ছাপ, তেমনই থুতু, এখন আর ইচ্ছেমতো সামলাতে পারিনে।

অনীতা হাসল। বিশ্রী। অন্তত সেই হাসির ঝিলিকে লোকনাথের মনে হল বিশ্রী। দাঁতে এত মিশি, এত? বুক মানে কি শুধু বোঁটা? ঊরু মানে খালি দুটো ঢ্যাঙোস ঢ্যাঙোস ঠ্যাং? অথচ মেয়েদের শরীর নিয়ে, এমন কি অনীতার খাঁচাটাকে নিয়েও একদিন লালায়িত জিভে কত না রস ঝরেছে! চোখের দু-দুটো মণি হয়ে গেছে চারশো পাওয়ারের বাল্‌ব।

মেয়েদের শরীর, মেয়েদের শরীর। আর কিছু না থাকুক পুরুষের চেটে চেটে নেওয়া চোখ আছে। লোকনাথ তার চব্বিশটা দাঁত মেলে (বত্রিশটা আর নেই তাই চব্বিশটা) হাঁ করে একটা দীর্ঘশ্বাস না ছেড়ে পারল না। হাপর যেমন ছাড়ে। তবে হাপরে আগুনও থাকে এই কটকটে হাঁ করায় কোনও আগুন নেই।

নাই থাক, তবু বাতাস আছে। হাওয়া, হাওয়া, ফুরফুরে হাওয়া। যে-হাওয়ায় একদিন সমস্ত রোম এবং সংগোপনে আরও অনেক কিছু চনমন করে উঠে দাঁড়াত। সেই হাওয়া আজ নেই।

কিংবা আছে। লোকনাথরা আর তা টের পায় না। তাদের শরীরের রোম রেডিও বা টিভি-র অ্যানটেনার মতো খাড়া হয় না। আগে হত। কখন হত? ধরা যাক, ছোটনাগপুরের এবড়ো খেবড়ো জমি যখন পাড়ি দিচ্ছে, তখন মেয়েরা. মাইরি মেয়েরা, তাদের দেহের নরম-গরম, শক্ত-কোমল ছায়া নিয়ে আতুর চোখে দিব্যি বাংলাটা কী যেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, উদ্ভাসিত হত।

মেয়েরা বন্ধু কিংবা বান্ধবী। তাই বলে তাদের অবয়ব এমন বন্ধুর প্রাকৃতিক মানচিত্র হবে কেন?

আজ অনুভূতিতে এই সব নেই। মানে চামড়ায় নেই। চামড়ায় যা নেই. তা চালান হয়ে গেছে মগজে। সুতরাং লোকনাথ খুব সুস্থির, সুস্থিত আর সংযত হয়ে পিছনের সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে।

যেভাবে আমরা নদীর ওপারে গিয়ে এপারের দৃশ্য-ট্রিশ্য দেখি। একটু ঝাপসা, একটু কুয়াশা, তবু তো দেখি।

এত কথা অনীতাকে বলা যাবে না বলেই লোকনাথ অনীতার ধমকের জবাবে শুধু বলল, বয়স গেছে। বলেছিলে না? প্রকাণ্ড এই হলঘরটায় থুতু ছিটোনোর সাফাই হিসেবে বয়সকে দাঁড় করানো। হা-হা। বয়সকে কেউ এর আগে মোক্তার হিসেবে ভেবেছে?

লোকনাথ বলেছিল বয়েসের দোষ আর সংগে সংগে গুলতি থেকে ছিটকোনো গুলির মতো অনীতা বলে উঠল, বয়সকে দোষ দিচ্ছ? কিন্তু বয়স কি তোমার আর আছে?

ফোকলা দাঁতে ফ্যাসফেঁসে গলাতেও এই তেড়িয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। দেওয়া যেত, যদি এক থাপ্পড়ে। কিন্তু থাপ্পড় মারবে যে-হাত, সেই হাতও তো কুঁচকে প্রায় কুমীরের পিঠের চেহারা নিয়েছে! রগগুলো যেন নদী-নালা। কবুজি চিমসে।

লোকনাথ সুতরাং ওই হা-হা হলঘরে হাসতেই থাকল। যখন জবাব নেই, যখন মারার উপায় নেই, তখন হাসি ছাড়া আর গতি কী? হাসতে হবেই। হোক না যার দিকে ছুঁড়ে মারা সেই হাসি, তার দাঁতে মিশি, তার সমস্ত শরীর বঙ্গদেশের মতো সমতল!

তবে ওই সমতট, সমতল বঙ্গদেশই তাকে স্তোক দিল। অনীতা বলল, আচ্ছা, তোমার না হয় সাড়ে তিন কাল গিয়ে আধকালে ঠেকেছিল, তাই তুমি এখানে এলে। কিন্তু আমি তো তোমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট, আমাকে এখানে আসতে হল, বলতে পার কী জন্যে?

লোকনাথ বলতে পারল না। পারল না বলেই ফের হাসল। চব্বিশটি দাঁতে যতটা হাসি বিকশিত করা যায়, ঠিক ততটা।

হাসতে হাসতে সে বলল, তুমি বোধ হয় খুব পাপ করেছিলে, তাই।

ছাড়বার পাত্রী নয় অনীতা। সংগে সংগেই বলল, যদি করে থাকি, তবে তোমার সংগে। আমার সোয়ামির সংগে তো করিনি! সোয়ামির সংগে যা যা হয়ে থাকে, সে-সব কি পাপ? সে-সব তো পুণ্যি! প্রয়াগের কুম্ভমেলার গংগাজলে চান করাও যা, সোয়ামির সংগে শোয়াও তা-ই। কর্তব্য।

লোকনাথকে তখন কথায় পেয়েছিল। তাই বলল, অনেকটা ঠিক বলেছ বটে, কিন্তু প্রয়াগের জলে পেটে বাচ্চা আসে, এটা তো কখনও শুনিনি।

—অথচ দুটোই সংগম। দুজন এক স্বরে বলল।

আর ঠিক তখনই দেখল, আশেপাশে যারা ছিল, তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা পাশাপাশি ছিল, লোকনাথ আর অনীতা। লোকনাথ ফাঁসফেঁসের বদলে চিত্তকে স্থির করে কণ্ঠস্বরকে ফিসফিস করে বলল, আচ্ছা, এটা কি সহমরণ? তুমি তো আমার বিয়ে-করা বউ ছিলে না। তবু আমারই সংগে এখানে এলে কেন, এবং কী করে? আমাকে বাঁচাতে?

—তোমাকে বাঁচায় কারুর বাপের সাধ্য নেই। অ-নেক চেষ্টা করেছি। অ-নেক! পারিনি বলেই শেষ পর্যন্ত আমিও এলুম।

—কী করলে? বিষ খেলে না গলায় দড়ি? দড়ি-কলসি অবিশ্যি হতে
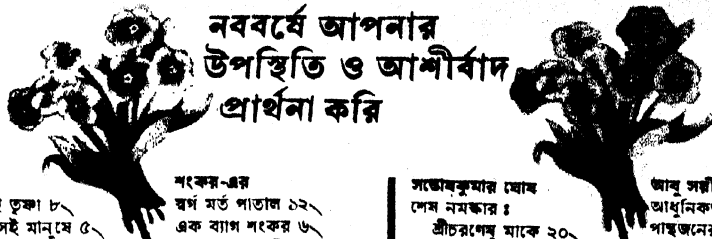
নববর্ষে আপনার উপস্থিতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি

কালকূট
মিটে নাই তৃষ্ণা ৮৲
হারায়ে সেই মানুষে ৫৲
আরব সাগরের জল লোনা ১০৲
নির্জন সৈকতে ১০৲

বুদ্ধদেব বসু
প্রভাত ও সন্ধ্যা ৮৲
রুক্মি ৬৲ প্রেমপত্র ৬৲

প্রফুল্ল রায়
আমাকে দেখুন (১ম পর্ব) ১২৲
আমাকে দেখুন (২য় পর্ব) ১০৲
একাকী অরণ্যে ১০৲
শীর্ষবিন্দু ১০৲ নয়না ৪৲
সুখের পাখি অনেক দূরে ১০৲
রৌদ্রঝলক ১০৲
আমার নাম বকুল ৭৲
নিজের সঙ্গে দেখা ১০৲
সেনাপতি নিরুদ্দেশ ৫৲
পূর্ব পার্বতী

চাণক্য সেন
গেরিলা ১০৲ মধ্য পঞ্চাশ ৬৲
এখনও অমৃত ৮৲
*সতী দাস কলকাতায় বেঁচে আছেন ৮৲
কালের ইতিহাস ১০৲

বিমল কর
এই প্রেম, আঁধারে ৫৲
হৃদয় মন ৪৲

শচীন ভৌমিক
হাউসফুল ১২৲

সুনীল চৌধুরী
পাহাড় পাহাড় খেলা ১০৲
সুন্দর দুর্গমের পথে ৬৲
হিমালয়ের গহনে নির্জনে ৮৲

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনের আতঙ্ক ৮৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
আনন্দমেলা ৫৲
মায়া মৃদঙ্গ ৬৲
বনের আসর ৪৲

বিক্রমাদিত্য
ইনফরমার ১৪৲
ডবল এজেন্ট ১৪৲
গোল্ড স্মাগলিং ১০৲
নতুন যুগের স্পাই ১৪৲

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী
আবর্তন ১৬৲
বাপি-রহস্য ১০৲

নটরাজন
স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ৮৲

শ্রীপারাবত
রাণাদিল ১২৲
রাজপুত নন্দিনী ৫৲
মমতাজ দুহিতা জাহানারা ৭৲
সিংহদ্বার ৬৲ চিতোরগড় ৮৲

কল্হন
কাঁটাতারের বেড়া ৭৲
অনধিকার প্রবেশ ৮৲

শ্রীজয়জিৎ
তাইহোকু থেকে ভারতে (নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য) ২০৲

শংকর-এর
স্বর্গ মর্ত পাতাল ১২৲
এক ব্যাগ শংকর ৬৲
সম্রাট ও সুন্দরী ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্য
সোনালী ৬৲ ডার্লিং ৫৲
পিকাডিলী সার্কাস ১৪৲
রবিবার ৫৲
ম্যাডাম ৫৲
হরেকৃষ্ণজুয়েলার্স ৪৲
ককটেল ৮৲
আকাশ-ভরা সূর্য-তারা ৬৲
মোগলসরাই জংশন ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বাসকশয়ান ১০৲ ফয়সলা ৭৲
পুরুষোত্তম ১০৲
মেঘের মিনার ৮৲
দুটি প্রতীক্ষার কারণে ৮৲
আনন্দরূপ ১০৲
খনির নতুন মণি ১২৲
অপরিচিতের মুখ ৭৲
রূপের হাটে বিকিকিনি ১০৲
সিকেপিকেটিকে ৫৲

বুদ্ধদেব গুহ
লবঙ্গীর জঙ্গলে ৮৲
চবুতরা ৭৲ স্বগতোক্তি ১০
প্রথমাদের জন্য ৬৲
দূরের দুপুর ৭৲

পরিতোষ মজুমদার
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ১২৲

প্রবোধকুমার সান্যাল
পর্যটকের পত্র ১৫৲

সুবোধকুমার চক্রবর্তী
কেরালার উপকূলে ৫৲
কাশ্মীরী বাহার ৬৲

বাসুদেব বসু
নেফা সুন্দরী নেফা ৫৲
রহস্য নিজেই যখন দিশেহারা ৭৲

বেদুইন
মহানায়ক লেনিন ১০৲
মহারাজের চোখে বাংলাদেশ ৫৲

মনোজ দত্ত
পাক ভারত যুদ্ধ ৭৲

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে ৫৲

চিরঞ্জীব সেন
আমি U.A.R. এজেন্ট ১০৲
রাতের জোনাকী ৭৲

নিশাচর
খুনী কে? ৫৲
ডেথ-ট্র্যাপ ৭৲

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী
টেক ওভার ৭৲

সুবোধ ঘোষ
এসো পথিক ৪৲

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
সীমাহীন ৪৲

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
নায়ক একাকী ৮৲

সন্তোষকুমার ঘোষ
শেষ নমস্কার: শ্রীচরণেষু মাকে ২০৲
সুধার শহর ১২৲
দূরের নদী ৫৲

রমাপদ চৌধুরী
দ্বিতীয়া ৬৲

সমরেশ বসু
আম মাহাতো ৬৲
প্রাণ প্রতিমা ৫৲ পথিক ৭৲
অবশেষে ১০৲ স্বর্ণচঞ্চু ৪৲
হৃদয়ের মুখ ১০৲
কামনা বাসনা ৪৲
বি. টি. রোডের ধারে ৮৲
রক্তিমবসন্ত ৭৲
ছায়া ঢাকা মন ৬৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সোনালি দিন ৭৲
বন্ধুবান্ধব ৭৲
প্রকাশ্য দিবালোকে ৮৲
গভীর গোপন ৬৲
ব্যক্তিগত ৫৲
কেন্দ্রবিন্দু ৪৲
দর্পণে কার মুখ ৫৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমার সম্ভবের কবি ৫৲
শৈল ভবন ৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিপিনের সংসার ১০৲

আশাপূর্ণা দেবী
মধ্যে সমুদ্র ৭৲

প্রতিভা বসু
সকালের সুর সায়াহ্নে ৮৲
সমুদ্র পেরিয়ে ১০৲
সোনালি বিকেল ১০৲

বিমল মিত্র
চার চোখের খেলা ৬৲

শঙ্কু মহারাজ
হিমতীর্থ হিমাচল ১০৲
রাজভূমি রাজস্থান ১৪৲
পুণ্যতীর্থ প্রভাস ১০৲
লীলাভূমি-লাহুল ১০৲
গঙ্গা-যমুনার দেশে ১০৲
ভাঙা দেউলের দেবতা ১০৲

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
বহুরূপে দেবতা তুমি ১২৲
সম্মোহন ১২৲ অশরীরী ৭৲
যক্ষিণী ১২৲ তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী ১২৲

গজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত ১০৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
পিঞ্জরের গান ১২৲
সুখের ঠিকানা ৬৲

গৌরকিশোর ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা ৫৲ এই দাহ ৪৲

সম্রাট সেন
সিরাজের পরে ৬৲

উত্তমকুমার
আমার আমি ৭৲

আবু সয়ীদ আইয়ুব
আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১২৲
পান্থজনের সখা ১২৲
গালিবের গজল থেকে ৮৲
পথের শেষ কোথায় ১২৲

কিরণশশী দে
রবীন্দ্রসংগীত সুষমা ১২৲

আশুতোষ ভট্টাচার্য
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ৫৲
বাংলার লোক সাহিত্য ।। প্রবাদ ।। ২৫৲
গীতিকবি শ্রীমধুসূদন ১৫৲

অম্বুজ বসু
একটি নক্ষত্র আসে ২২৲ (জীবনানন্দ দাস সম্পর্কিত)

সুশীলকুমার গুপ্ত
নজরুল-চরিতমানস ২৬৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ২০৲
পদাবলী-পরিচয় ১০৲

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ২০৲

মণি বাগচি
যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ ১৬৲

দীপ্তি ত্রিপাঠী
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ২০৲

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
কালের প্রতিমা ২৫৲

শঙ্খ ঘোষ
ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ ১২৲
কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক ১০৲

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র ৩০৲

নীরোদ রায়
ফটোগ্রাফি ৮৲
ফটো সাংবাদিকতা ৮৲
চিত্রগত কাহিনী ৮৲

আবু সয়ীদ আইয়ুব
গালিবের গজল থেকে ৮৲

দিনেশ দাস
কাস্তে ৩৲ অসঙ্গতি ৪৲

শঙ্খ ঘোষ
বাবরের প্রার্থনা ৪৲
দিনগুলি রাতগুলি ৪৲
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৮৲

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা ৫৲
কবিতার তুলো ওড়ে ৫৲
শ্রেষ্ঠ কবিতা ১২৲

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ কবিতা ১০৲

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৮৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৮৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র
দুনিয়ার ঘনাদা ৬৲

গিরিধারী কুণ্ডু
দুষ্টু টুসটুসি ৪৲

সমুদ্র গুপ্ত
স্বদেশকুট রুদ্রপ্রাণ ৬৲

ভূপেন ভট্টাচার্য
বিচিত্র রূপকথা ৫৲

সুধীর রায়চৌধুরী
মেলা থেকে ঝামেলা ৫৲

পরিচয় গুপ্ত
ভৌতিক শিকার কাহিনী ৪৲

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জুল ভের্নের যত ঝক্কি যত ঝামেলা ১০৲
জুল ভের্নের শ্রেষ্ঠ গল্প ৭৲

দিলীপ দত্ত
উইকেট থেকে বাউণ্ডারি ৫৲

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ওভারবাউণ্ডারি ১২৲

জয়ন্ত দত্ত
হাউজ দ্যাট ৪৲

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
রুম নাম্বার ১১১ ৫৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
নিহত নায়িকা নিহত নায়ক ১০৲

বুদ্ধদেব বসু
শ্রেষ্ঠ কবিতা ১২৲

শান্তনু দাস সম্পাদিত
কালের কবিতা ১৫৲

অমিয় চক্রবর্তী
কবিতা সংগ্রহ ১৬৲

মণীন্দ্র রায়
কাব্য সংগ্রহ ১২৲

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
কাব্য সংগ্রহ ২৫৲

লালা মিশ্র
শায়েরি ৪৲

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
পুরুলিয়া থেকে প্যারিস ১৫৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর ১০৲

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে ৫৲

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যে মা ৪৲

যোগীন্দ্রনাথ বসু
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত

সাধনকুমার ভট্টাচার্য
এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
বাংলার লৌকিক দেবতা

ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রভাতকুমার: জীবন ও সাহিত্য ১২৲

দে'জ পাবলিশিং
c/o দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩
ফোন: ৩৪-৫০৩৫
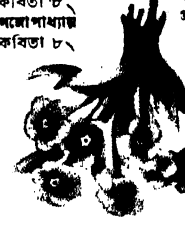
পারে। জানো, আমি এমন হতচ্ছাড়া, কর্নাস দেখলেই তোমাদের দিব্যি সুডোল গড়নটা মনে পড়ে যায়। বলো, কোন্‌টা তুমি বেছে নিয়েছিলে ?

এখনও জেরা মুখপোড়া ? দেখছিস না, সক্কলে রেলিং-এর ওদিকে চলে যাচ্ছে ?

হঠাৎ ফোকলা মুখেও কী করে যেন লোকনাথের গলা গাঢ় গদগদ হয়ে গেল। সে তুই-তোকারি করল না। আস্তে আস্তে গভীর করে বলল, ভেবো না অনীতা, সকলেই যায়, সকলকেই যেতে হয়। ভেবো না অনীতা, আমরাও যাব।

—মাইরি বলছ একসঙ্গে যাব ?

—কোনও কথা দিতে পারছি না। তবে জানি যে, যাব। এগোব।

॥ দুই ॥

পাশপোরট্‌ অফিসার হাঁকলেন, আপনাদের খাতাপত্তর কই ? সেসব না দেখিয়েই যে বেশ তুড়ুক গলে যাচ্ছিলেন ?

লোকনাথ—ফোকলা দাঁতই তার সহায়—বলল, এগুচ্ছি না পিছোচ্ছি, তা তো জানি না ! শুধু যাচ্ছি।

পাশপোরট্‌ অফিসার বললেন, এই বেড়া ডিঙোতে হলেও একটা বই চাই। আপনার আছে ? ওনার আছে ? সব দেখেশুনে তবে আমরা স্ট্যামপো মেরে দিই।

লোকনাথ অমায়িক পিছন দিকে হাত বাড়াল। সেখানে উঠে এল অনীতার পাশবই।

ঠক ঠক দুটো ছাপ মেরে অফিসারবাবু বললেন, ঠিক আছে। আপনারা যে মরেছেন, তাতে ভুল নেই।

উজবুক লোকনাথ—সঙ্গে সঙ্গে বলল, মরেছিলাম তো আগেই। যখন আমরা এ ওর প্রেমে পড়ি।

অফিসারবাবু খুব জ্যোৎস্না হাসলেন। প্রেমে পড়লে মরে তো সবাই। বাঁচে আর ক'জন ? কিন্তু বলুন তো, লোকে খালি প্রেমে পড়া বলে কেন ? প্রেম কি শুধুই পড়া ? ওঠা নয় ? প্রেমে ওঠা তবে কেন বলা হয় না ?

অফিসারবাবু ঠকঠক স্ট্যামপো মেরে লোকনাথ আর অনীতার প্রতি আবার চাঁদিনী হলেন।

॥ তিন ॥

ওরা এগোতে যাচ্ছিল। তক্ষুনি একটা বেড়া, একটা বাধা।

—কোথায় যাচ্ছেন ? খুব ঘড়ঘড়ে গলায় একটা তথ্‌মা-আঁটা লোক জিগ্যেস করল।

—কোথাও যাচ্ছি না তো ! কিংবা কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমরা শুধু এসেছি।

—হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হবেন ?

—শুনেছিলাম তো। তাই নিয়ম।

—এলেই যাওয়া যায় না। হাওয়ায় হাওয়া হওয়া কি চাট্টিখানি ?

—আমরা তো পুলিস কনট্রোল পার হয়ে এলাম। জমা দিলাম আমাদের পাশপোরট।

—কিন্তু আপনাদের মালপত্তর ? তার হিসেব তো দেননি ! ওজনও করেননি। এভাবে অন্তত এই হাওয়াই জাহাজে ওঠা যায় না। জেনে রাখুন।

ঘড়ঘড়ে গলাওয়ালা সেই লোকটা নির্বিকার, ভাবলেশহীন বলল, বলে গেল, এর পর আছে 'কাসটমস'।

—হেলথ কাউন্টার নেই ? লোকনাথ জিগ্যেস করতে পারত। তবে করল না, কারণ সত্যিকার শরীর থাকলে তবে তো হেলথ ! অফিসার কড়া গলায় বললেন, কী আছে আপনাদের সঙ্গে ?

—একটা সুটকেস আর একটা ফোলিও ব্যাগ। বিশ্বাস করুন এই শুধু এই।

অফিসার বলল, তবু খুলতে হবে।

লোকনাথ খুলল। সেভিংসেট, টুথপেস্ট আর ব্রাস। দুই একটি ম্যাগাজিন। বলল, দেখলেন তো শুধু এই।

গ্রাম্ভারী গলায় অফিসার বললেন, দেয়ার আরও বাকি আছে। কিংবা আপনারা দেখান নি। আরও তুলুন।

—ভাবছেন, তুললে জবরদস্ত কাস্টমস অফিসার আপনি আরও হুলুস্থুলু অনেক ব্যাপার দেখতে পাবেন ?

অফিসার এতক্ষণ বাদে মানবিক অমায়িক হাসলেন। বললেন,—দেখতে না পাই, বুঝতে পারব। অদৃশ্য কোনও কিছু যদি আপনি এবং আপনার সঙ্গী মহিলা নিয়ে যেতে চান, তাও আটকাব। এখনও বলুন, এমন কিছু আছে, আছে, আছে ?

চিৎকার করে উঠল লোকনাথ। বলল, আছেই তো। আসবাব আছে। আমার সঙ্গিনী মহিলাটি কতটুকু আনতে পেরেছেন, জানি না। তিনি আনতে চেয়েছিলেন কি না তাও আমার জানা নেই। কিন্তু সরাসরি বলছি,—আমি এনেছি। অনেক খুইয়েও আমার আছে। আমার চাওয়া, আমার মোহ, আমার পাপ, আমার উচ্চাশা, আমার ভালোবাসা। সব নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনারা দেখতে পবেন না।

অফিসার খুব করুণাময় হেসে বললেন, দেখতে না পেলেও আমরা অনেক

কিছু টের পাই। আপনার চাওয়া-টাওয়া, আপনার মোহ, পাপ কামনা আর ভালোবাসা।

—সবগুলোই কাস্টমসে আটকায় ?

—সবগুলোই এই কাস্টমস অফিসার আমরা আটকাতে পারি।

—দারুণ বেড়া তো!

—এই শেষ বেড়া যে। লোকনাথ অপাঙ্গে অনীতার দিকে তাকিয়ে বলল, বৈধ পাসপোর্ট না থাকলে বিবিধ কারণে ওরা তোমাকেও হয়ত আটকাতো।

অনীতার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিল না। সে শুধু হাসল।

তখন লোকনাথ সটান এগিয়ে গেল আবার সেই কাস্টমস অফিসারের দিকে। বলল, সব ডিক্লেয়ার করেছি। যা ডিক্লেয়ার করিনি তাও আপনি আন্দাজ করে নিয়েছেন। আমার আসক্তি আর পাপ ? আমার মোহ আর উচ্চাশা আমার ভালোবাসা ?

অফিসার বললেন, ভালোবাসার সাতখুন মাপ। যান না, নিয়ে যান না। ভালোবাসাকে সঙ্গে নিলেও এই শরীরে সেটাকে তো আর পাবেন না।

আমরা অশরীরী প্রেমেও বিশ্বাস করি।

—যেখানে যাচ্ছেন, অমায়িক হেসে অফিসার বললেন, সেখানে দেখবেন কথাটার অর্থই নেই। অশরীরী প্রেম ? দেহহীন চামেলি ? ওসব এই জগতের রক্তমাংসের শিরায় চনমন খেলে। যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভালোবাসাকে স্মাগল করে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলব না। কারণ শরীরই যেখানে নেই সেখানে অশরীরী কোনও টানাপোড়েন, ভালোবাসাটাসার কোনও দাম নেই। সেখানে কিছুতেই কিছু হয় না। সত্যি বলতে কি ইচ্ছেই হয় না।

লোকনাথ আর অনীতা বলল, তবে সেখানে আছে কী ?

অফিসার আবার হাসলেন, বললেন, যা আছে তা নিজেদের খুঁজে আর বেছে নিতে হয়। কেউ পায় নীল নীল, কেউ বেগনি, কেউ হলুদ কেউ রামধনুর সবকটা রঙ—যে যা পায়। আসক্তি-টাসক্তির কথাই ওঠে না, কারণ সেই হয় হরিৎ নয় পীত ওই ইন্দ্রধনু শূন্যে কেউ বিশেষ করে কিছু চায় না। কাউকে তো নয়ই।

—তবে আমরা পাশ বা এই গেট থেকে খালাস ? লোকনাথ বলল। সে তখনও অনীতার কাঁধে তার হাত রেখেছিল।

অফিসারবাবু ফের স্ট্যাম্পো মেরে দিলেন। যেমনই হোক, পাশ বা খালাস আছে।

বেড়ার ওদিকে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে লোকনাথ বলল, আপনি খালি মোহ আর আসক্তির তল্লাসি করেছিলেন অফিসার সাব। তলায় যেটা ছিল সেটা আর নাড়াচাড়া করে দেখেন নি।

অফিসার বললেন, দেখেছি। আপনার লেখা অনেকগুলো কাগজ তো! ওগুলোতে শুধু নিজের কথা। রাগ অনুরাগ ক্ষমা আর বিস্মরণ। চান তো এসব চোতাকাগজ সঙ্গে নিয়েও ওপারে যেতে পারেন। কারুর কিছু যাবে আসবে না।

বেড়া ডিঙিয়েছিল বলেই এতক্ষণ বাদে হো হো করে প্রাণ খুলে হাসতে পারল লোকনাথ। বলল, কাগজগুলো আপনার কাছে রয়ে গেল তো রয়েই গেল। অন্তত আমার ওগুলোতে আর কাজ নেই। কাকে ঘৃণা করেছি, কাকে করেছি ক্ষমা, এসব বিবরণ অতঃপর—বলুন তো কী ? —অবাস্তব।

বলতে বলতে লোকনাথের গলা গাঢ় হয়ে গেল। যা পেরিয়ে এলাম সেখানে কত কাম, কত কামনা, কত বাস কত বাসনা। শুধু ভোগ অথবা দুর্ভোগ। আঘাতহানা কিংবা পদাঘাত। সব পেরিয়ে এলাম। জানেন, নিজেকে দারুণ হালকা লাগছে।

অফিসার কী বলতে যাচ্ছিলেন, লোকনাথ তাকে বাধা দিয়ে অনীতাকে বাহু বিস্তারে নিজের আরও সংলগ্ন করে স্ফূর্ত বলে গেল : যা পেয়েছি, যা পাইনি যাদের নিয়েছি, যাদের নিইনি, কিংবা ছোট করে বলতে গেলে যারা নেয়নি আমাকে, তাদের সব বৃত্তান্ত আপনার কাছেই জমা থাক। অনেকের সম্পর্কে আর বিরুদ্ধে অনেক লেখা আছে এবং থাক আমার কলমে। বেড়ার এদিকে এসে আমার কারুর সম্পর্কে কিছুমাত্র রাগ অনুরাগ নেই।

লোকনাথ থামল না। বলেই গেল, ওই লেখায় কার হিত কার অহিত আমি তো জানি না, কোনও অভিমান, কোনও অভিযোগ নেই।

অফিসার বললেন, কিন্তু কাগজগুলো যে আমরা নষ্ট করে দেব।

লোকনাথ বলল, কাগজগুলো নষ্ট করতে পারেন করুন না, আমার আর কোনও মায়া নেই। কিন্তু সত্যকে নষ্ট করার শক্তি কার ? সেই সত্য রইল। আর কাগজগুলোও যদি আপনাদের নিয়মের আগুন থেকে বাঁচে তবুও কি সেগুলো বাঁচবে ? বাঁচে যদি তবে নিজের প্রাণশক্তির জোরে। কোনওদিন নিজের কষ্ট, অভিমান উজাড় করে রক্ত ঢেলে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, লিখেছি, লিখছি এই ব্যাপারটাই আসল কথা। তার মধ্যে সারবস্তু যদি কিছু থাকে তবে কোনওদিন কেউ হয়ত তার দু'এক পাতা কুড়িয়ে কিছু পাবে। ভুল বললাম অফিসার সাহেব—আমিও টের পাব। আমি আজ মরলাম, কাল বাঁচব। আজ কারুর কাজে লাগল না। কাল কেউ হয়ত তার মধ্যে চকচকে একটা সোনা দেখে ফেলল। দেখে যদি তবে তারই মধ্যে আমি বাঁচব। পুনর্জন্মতত্ত্ব সেখানে সেই অর্থে সত্য হবে। এবার বলুন তো, আমার সুটকেসে সেই হিজিবিজি লেখালেখির কোনও হদিশ পেয়েছেন ?

—পেয়েছি। অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন।

—তা হলে কোনও প্রার্থনা তো জানাই নি। শুধু এটুকু বলছি, দয়া করে ওই কাগজগুলো পোড়াবেন না। অন্তত অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেও আমাকে বাঁচতে দিন।

—পোড়াব না। অফিসার প্রগাঢ় আশ্বাস দিলেন। আর সেই মুহূর্তে বায়ুর মতো হালকা চপল হয়ে গেল লোকনাথ। বলল, আঃ এবার আমি একেবারে মুক্ত। আপনাদের শূন্যযানে চড়তে আমার আর কোনও বাধা নেই। প্লেনটা ঠিক কটায় টেকঅফ করছে বলুন তো ?

॥ ছয় ॥

অফিসার কী বলেছিলেন ? তিনি কি বলেন, প্লেন টেক্ অফ্ করতে ঘন্টা দুই দেরি ?

লোকনাথ বলে থাকবে আপনাদেরও তবে দেরি হয়! আচ্ছা বলুন তো, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে ? অফিসার তাঁর চাপা গলায় কী বললেন স্পষ্ট হল না।

অনেক পরে, তখন নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট যাবতীয় প্লেন ছেড়ে গেছে কি না গেছে, ঠিক নেই, লোকনাথ অনীতাকে বলল, "জানো, আমাদের এ-যাত্রা যাওয়াই হল না! সব ফ্লাইট মিস্ করেছি।"

—করলে কেন ?

—ইচ্ছে করে। তুমি তো জানো না, অফিসারের সঙ্গে আমার কানে কানে চুপি চুপি কী কথা হল। উনি বললেন, যেখানে যাচ্ছি—ওঁরা সব জানেন তো—সেখানে নীল ছাড়া কোনও রঙ নেই। আমি যে লালও চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যে বেড়ার ওদিকে সব চেহারা দেখতে পাচ্ছি, সব সাদা সাদা। সব ভুতুড়ে। কেন রাগ নেই, শ্লেষ্মা নেই, পিত্ত নেই। টাইট পোশাক আর বিলকুল সাদা। সারকাসের ক্লাউনদেরই যা থাকে, যা সাজে। আমি বললাম, ওদের নোখ নেই কেন ? আর ওদের দাঁত ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। অফিসার কী বললেন জানো ? ওদের আর নোখ, দাঁত-টাতের দরকার নেই যে! আমি বললাম, তবে কি ওরা আঁচড়ায় না, কখনও কামড়ায় না ? অফিসার অল্প অল্প হেসে বললেন, দরকারই হয় না। ওখানে ওরা শুধু ভালোবাসে। জানো অনীতা, এই ভালোবাসার নাম আমার কাছে মেনে নেওয়া বলে মনে হল।

—তারপর ? অনীতা জিজ্ঞেস করল।

—পর বলে তো কিছু নেই, এখনটাই শুধু আছে। আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে নদীও কি আছে ? অফিসার বললেন আছে। স্রোত ? নেহাত

নির্লজ্জ, তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, নেই। যেখানকার জল বরাবর সেখানেই টলটল করে। করেই চলে।

লোকনাথ বলেই চলল, জল বয় না থেমেই থাকে শুনে আমি ভয় পেলাম। আবার জানতে চাইলাম, নদী তো বুঝলাম, কিন্তু সমুদ্দুর ? অফিসার কী অমায়িক জানো অনীতা, বললেন, আছে। খাসা, নীল, টলটলে। আর তাতে একটুও নুন নেই। অনীতা, নুন আছে বলে সমুদ্রের জল আমরা দেখি কিন্তু চাখি না, কিন্তু নুন নেই শুনে আমার ভিতরটা নুনে পুড়ে গেল।

অবশেষে যখন শেষ ফ্লাইটটাও নেই, কাসটমসের এদিকে লোকজনও বিশেষ দেখা যায় না, তখন মানুষ হিসেবে, মানুষ বলেই গলা একটু চড়িয়ে লোকনাথ বলল, ভালোই হল অনীতা, শেষ প্লেনটাও যে ছেড়ে গেছে! ওই দেশের নিষ্কলঙ্ক নীলে যেতে আমার একটুও সাধ নেই জানো ? আমি বরং লাল, হলুদ, সবুজ—এই সব রঙ মিলিয়েই বাঁচতে ভালোবাসি। সবটাকে, সাতটাকে মিলিয়ে সাদা করে দিই। কিংবা—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকনাথ—পারলে আবার সেই রক্তাক্ত, কর্দমাক্ত পৃথিবীতেই ফিরে যাই। যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ। যেখানে আমরা এ ওকে চাই, যাকে ভালোবাসা বলে তা-ই, তবু কখনও কখনও নোখ দিয়ে আঁচড়াই, যখন জাপটে ধরি, তখনও দাঁত বসাই।

—যেখানে যাবার কথা, সেখানে কিছু নেই ?

কিচ্ছু না অনীতা, কিচ্ছু না। দেখছ না ওদের এলুমিনিয়মে রঙ করা মুখ! দেখছ না, ওদের নোখ নেই, দাঁত নেই।

—আছে, সব আছে। অনীতা ঢাকা গলায় বলল। ওরাও হয়তো আর উপায় নেই বলে, আর জীবন নেই বলে নোখ-দাঁত, আঁচড়ানো-কামড়ানোর সব সাধ ঢেকে রাখে!

—তবে ওদের ভিড়ে আমরা যাব কেন ? লোকনাথ বলল। বরং এখানেই থাকি না কেন! এই কাসটমসের বেড়ার এপারে ? এখানে কিছু পেলে খাব, না পেলে ঘুমোব, সাটাচাটি, আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়াকামড়ি সব চলবে, আর—আর, হয়তো-বা অনীতা, আমরা পরস্পরে প্রবেশও করব।

—মানে, আমরা থাকব ? অনীতা জিজ্ঞেস করল।

—আমরা থাকব। প্রগাঢ় প্রতিধ্বনি করল লোকনাথ।

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ৬ ॥

আবু তালেব যা আশংকা করছিলেন, তাই হল। খাদু শেখকে ডাকাতি, ঘরে আগুন দেওয়া, নারীহরণ এবং খুনের প্রচেষ্টা, এই ক'টা সুস্পষ্ট অপরাধ ঘটাবার অভিযোগে দায়রায় চালান করা হল। এবং এইসব অপরাধ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা এবং ষড়যন্ত্রের দায়ে বেছে বেছে সাজ্জাদ, বশীর, জমিরুদ্দী, খালেক, নাজিম, এদেরও গ্রেফতার করা হল।

সফীকুল ভেবেছিল খোন্দকার ফরিয়াদী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ওরফে পুনুনু সাকিরার পক্ষ হয়ে লড়বেন। কেন না এই মামলার তদ্বির করছেন মেন্দা। কিন্তু তা হল না। দিগীন মিত্তির মামলাটা নিলেন এবং খোন্দকার তাঁর পরামর্শদাতা হলেন। সফীকুল প্রমাদ গণল। একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। দিগীন মিত্তির খোন্দকার এক হয়ে যে মামলা লড়েন, তার সামনে এ জেলায় দাঁড়াবে কে? আবু তালেব আর সফীকুল সৈয়দ সাহেবের কাছে ছুটল। সৈয়দ সাহেবও চিন্তায় পড়লেন। দেড় মাসের মাথায় ইলেকশন। সৈয়দ সাহেব আর আবু তালেবের মাথায় সেই চিন্তা। আর সফীকুল ভাবছে তার বাজানের কথা। সে উকীল অথচ তার বাজান হাজতে। সে উকীল হয়েও তার বাজানকে জামিনে বের করে আনতে পারছে না। সৈয়দ সাহেব সফীকুলকেই আসামীপক্ষে দাঁড়াতে বললেন। এবং সেই সংগে একটা চাল চালতে পরামর্শ দিলেন। সফীকুলকে বললেন, সে একটা চিঠি লিখে খোন্দকারকে অনুরোধ করুক এই মামলাটায় আসামীর পক্ষে দাঁড়াতে। দেখা যাক কী জবাব তিনি দেন। হ্যাঁ তিনি করবেন না, জানা কথা। হয়ত চিঠির উত্তরও তিনি দেবেন না। তা হোক। যাই উনি করুন না, সেটাকে ইলেকশনে ওর বিরুদ্ধে হয়ত কাজে লাগানো যাবে।

এঁরা যাই করুন, সফীকুল দেখল, তাতে ইলেকশনে এঁদের কতটা লাভ হবে, সেই কথাই খালি তুলছেন। যেন খাদু কি তার বাজান ফাঁসিতে লটকালে ইলেকশনে যদি এঁদের লাভ বেশী হয়, তবে এরা হয়ত চাইবেন যে, তবে ওরা ফাঁসিতেই ঝুলুক। সফীকুল বিরক্ত হল। আবু তালেব সৈয়দ সাহেবের কথায় খুব উৎসাহ বোধ করল। সফীকুল সাফ বলে দিল ওতে কোনোদিক থেকেই কোনো লাভ হবে না। এই মামলার সংগে পলিটিক্সকে জড়াতে তার ইচ্ছে নেই। এদের গ্রেফতারের পিছনে পলিটিক্যাল মতলব আছে, সে কথা মানছে সফীকুল। কিন্তু সেটা যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যাবে না, তখন ওকথা ভেবে আর কী? তার চাইতে কাজের হবে, এই মামলায় খাদু ছাড়া আর যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের কারোরই যে এর সংগে যোগ নেই, এই কথা প্রমাণ করা। খাদু যেহেতু কবুল করেছে, সে একটা গ্যাঙের সংগে পুনুনুর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল এবং সে তার কথা ফিরিয়ে নিতে রাজী নয়, অতএব তার ব্যাপারে অন্যভাবে অগ্রসর হতে হবে। তার কথা সৈয়দ সাহেব এবং আবু তালেব দুজনেই শেষ পর্যন্ত মানলেন, কিন্তু ভাব দেখে মনে হল, কথাটা তাদের মনঃপুত হয়নি।

দুদিন ধরে ফটিক বেল পিটিশন্ মুভ্ করার চেষ্টা করল। পারল না। সরকারপক্ষ প্রবল আপত্তি তুললেন। ফরিয়াদীর অপহৃতা পুত্রবধু এখনও নিখোঁজ। তার সন্ধান পাবার জন্যই আসামীদের কাস্টোডিতে রাখা দরকার। এটা একটা ভাইটাল্ ব্যাপার। দায়রা জজ সরকারপক্ষের আপত্তি মেনে নিলেন। এবং খাদু ছাড়া অন্যান্য আসামীদের জামিনের জন্য যে আবেদন সফীকুল দাখিল করেছিল, জজসাহেব তা খারিজ করে দিলেন।

এই উপলক্ষে সফীকুল এবং দিগীন মিত্তিরের সংগে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেল। সফীকুলের বক্তব্য ছিল দুটো। এক, আসামীর জবানবন্দী। তাতে সে সাজ্জাদ ইত্যাদি আসামীদের নাম কোথাও করেনি। তার মক্কেলরা যে এই অপরাধের সংগে জড়িত এমন প্রমাণ পুলিসও দাখিল করতে পারেনি। কারণ এদের কেউই তার সংগে জড়িত ছিল না। এ পর্যন্ত কোনও গোল নেই। কিন্তু খাদু বলেছে, তার সংগে লোক ছিল। তারা কারা, খাদু সেকথা কিছুতেই বলছে না। পুলিস বলেছে তাদের হাতে বিশ্বাস করার মত প্রমাণ এবং সাক্ষী আছে যে ধৃত আসামীরাই খাদুর মদতদার। সফীকুল পুলিসকে চ্যালেন্‌জ করেছিল, তাদের হাতে যদি সাক্ষী প্রমাণ থাকে তো তারা পেশ করুক। দিগীন মিত্তির এক কথায় তা উড়িয়ে দিলেন। এখন সেসব সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করলে তদন্তের ক্ষতি হবে। সফীকুলের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, আসামীদের অ্যালিবাই। ঘটনার সময় খাদু ছাড়া অন্যদের কেউই গ্রামে ছিল না। নির্বাচনী মিটিং-এ বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ত ছিল। সব চাইতে বড় কথা, ফরিয়াদী পূর্ণচন্দ্র ওরফে পুনুনু খাদুকে যেমন নির্দ্বিধায় সনাক্ত করেছে অন্যদের কিন্তু তেমন করতে পারেনি। কিন্তু তার এ যুক্তিও জজ সাহেব গ্রহণ করেননি। আসামীদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করে তাদের জেল হাজতে রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তার এই ব্যর্থতা তাকে অত্যন্ত দমিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না যে, তার বাজান জেল হাজতে আটক রয়েছে। আর সে উকিল হয়েও সে তার বাপকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। এই ভাবনা তাকে অস্থির করে ছাড়ছে। বার লাইব্রেরি সে চষে ফেলল, যদি সে তার লড়াইয়ের কোনও নূতন সূত্র পায়। কিন্তু লাইব্রেরির তাক ভর্তি সাজানো বাঁধানো বই-গুলো তাকে কোনও সাহায্যই দিল না। আম্মার মুখখানা কেবল মনে পড়ছে তার। চাঁদবিবি বড় মুখ করে বলেছিল, তার ছাওয়াল বাড়ি থাকলে সাজ্জাদকে পুলিসে হাজতে পুরতে পারত না। চাঁদবিবি দুনিয়ার কিছুই জানে না। আইন-কানুনের মারপ্যাচ যে কোথা দিয়ে ঘোরাফেরা করে তা চাঁদবিবি বুঝবে কি করে? কিন্তু তার আব্বু? পুলিস হাজতে ওঁদের সংগে দেখা হয়েছে তার। কিন্তু কোনও রকম চাঞ্চল্য বা ভয় তার মধ্যে দেখেনি সফীকুল। বশিরকেই বরং হম্বি-তম্বি করতে দেখল। বলল, মেন্দা খোন্‌কার মিয়াকে জেতাবে বলেই তাদের এই মামলার সংগে জুড়ে দিয়েছে। সাজ্জাদ শুধু বলেছিল, আল্লাহ্ যা করাবেন তাই হবে। তুই বেশী ছটফট করিস নে। তার মানে তার বাপ তার মনের যন্ত্রণা টের পেয়েছে? ফটিক তার আম্মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। আনতে চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদবিবি আসেনি। গোরু বাছুর দেখবে কে?

হাজী সাহেবও ঘুরে গেলেন একবার। বলে গেলেন, মামলার খরচ তাঁর। এবং শুধু বলা নয়, তার ব্যবস্থাও করে গেলেন। চাঁদবিবির জন্য সফীকুল যেন কোনও চিন্তা না করে, সে আশ্বাসও দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ সফীকুলের মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক মেরে গেল। পুনুনুর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে আড়াই মাস আগে। ডাকাতির পরদিনই খাদু থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং সে এই অপরাধের সংগে জড়িত, এই মর্মে থানায় জবাবনন্দী দাখিল করে। পুলিশ তার দুদিন পরে পুনুনুর এজাহার নথিভুক্ত করে। পরে একটু সুস্থ হবার পর পুনুনু তার কথা বদলায়। কি খাদু শেখের স্বীকারোক্তিতে আর কি পুনুনুর প্রথম এজাহারে, যা কিনা মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর সমান, কোথাও সাজ্জাদদের নাম নেই। শুধু তাই নয়, পুলিস এতদিন এদের গ্রেফতারও করেনি। খাদুর মামলা দায়রায় চালান দেবার ঠিক আগে-আগে পুলিস এদের গ্রেফতার করেছে। এফ আই আর-এ তো ওদের কারো নামই ছিল না। তবে সফীকুলের মক্কেলরা জামিন পাবে না কেন? দিগীন মিত্তির বিরোধিতা করছেন আর খোন্দকার তাকে মদত দিচ্ছেন বলে? এই কেস্‌টার ব্যাপারে সে মন্মথবাবুর পরামর্শ নেবে স্থির করল।

মৌলভী জয়নুদ্দী এসে অনুযোগ করলেন, "ব্যাপারটা কি কন্ দিনি উকিল ছাহেব! আঁ, নাওয়া-খাওয়া যে অ্যাকেবারে ছাড়ে দেলেন। বলি, আরশিত এর মধ্যি ভুলুক দিয়ে নিজের চিহারাখান কি দেখিছেন অ্যাকবার? চোখ মুখ যে শুকোয়ে উঠল, তার কী? বিটি আসে আমাগোর কবে কী?"

সফীকুল ম্লান হাসল। জবাব দিল না।

"না না হাসলি চলবে না।" মৌলভী জয়নুদ্দী বলে উঠলেন, "কাল রাত্তিরি আপনি কিছুই খান নি। রাত্তিরির খানা জামিল য্যামন দিয়ে গিছিল, আজ বিয়ানে আবার থালা ভর্তি খানা ত্যামনই ফিরোয়ে নিয়ে গেছে। ছবি বিটির খালা তাই দেখে খুব দুঃখ কত্তিছিলো। খোঁজউনিতি ক'লো, কন তো ব্যাপারডা কী? শরীর টরির ভালো আছে তো?"

এবার সফীকুল আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "বড্ড ঝামেলায় আছি। আবুদু, বশির, ওদের কাউকেই জামিনে বের করে আনতে পারলাম না। জামিনযোগ্য মামলাতেও যদি জামিন না পাই, তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? অথচ আমি জানি, খোন্‌কার দাঁড়ালেই জামিন হয়ে যেতো।"

"কথাডা বড্ড শক্ত।" জয়নুদ্দী বললেন, "জবাব দিয়া মুশ্‌কিল। তবে কি জানেন, অ্যাখন মুছলমানগের সুমায়ডা বড্ড খারাপ যাতিছে। ইছলাম বিপন্ন। বোঝলেন। আমাগের পক্ষে সুমায়ডা বড়ই সাংঘাতিক। আল্লাহ মালিক যা করেন।"

"আচ্ছালা-মু আলায়কুম।" আবু তালেব দুজনকেই ছালাম জানিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ফটিক এবং মৌলভী জয়নুদ্দী দুজনেই বলে উঠলেন, "ওয়া আলায়কুমুচ্ছালাম।"

মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসু চোখে আবু তালেবের দিকে চাইতেই সফীকুল পরিচয় করিয়ে দিল, "জনাব আবু তালেব চৌধুরী, আমাদের ওদিকের একজন বড় কৃষক নেতা। আর ইনি হলেন, আমার আশ্রয়দাতা জনাব মৌলভী জয়নুদ্দী সাহেব।"

"বুঝিছি।" মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "আপনিই খানবাহাদুরির বিরুদ্ধি ইলেকশনে দাঁড়াইছেন?"

আবু তালেব হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, "জে না। আমি ইলেকশনে দাঁড়াইনি। তবে যিনি দাঁড়াইছেন তিনিউ আবু তালেব। তিনি হলেন মৌলভী আবু তালেব আর আমি হলাম আবু তালেব চৌধুরী।"

সফীকুল একটু অবাক হল। মৌলভী সাহেব তো খোঁজ রাখেন বেশ।

মৌলভী ছাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কাজডা ভাল হয় নি। মৌলভী ছাহেব হয়ে আজকের জমানায় হিন্দুগের মদত কেউ দিতি পারে, এ আমি ভাবতিউ পারিনে। অ্যাখন ইউনিটি চাই। মুছলমানগের মধ্যি শক্ত ইউনিটি চাই। না হলি ইছলাম বিপন্ন হবে। এই কথাই কতিছিলাম।"

সফীকুল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবু তালেব ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ইউনিটি তো আমরাও চাই।"

"তাই না কি?" মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "তাইলি আর কথা কী? আপনারা মৌলভী ছাহেবরে উইন্ন কত্তি কন। খান বাহাদুরীর ভাই বলে বুকি জড়ায়ে ধত্তি কন। মুছলমানে মুছলমানে ইউনিটি হয়ে যাক। মুছলমানের অ্যাক ক্যান্ডিডেটই দাঁড়াক। তালি লোকে বোঝবে যে হ্যাঁ, মুছলমানরা অ্যাখন অ্যাক হইছে। মুছলমান আবার আগোয়ে যাবে।"

সফীকুল এই সরল বিশ্বাসী লোকটার কথা-বার্তায় উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। মৌলভী জয়নুদ্দী খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান সাহেবকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। প্রায়ই আফসোস করতেন, মুছলমান হয়ে তিনি মুছলমানকে দেখেন না। তাঁর ছেলে মনু মিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোরডে চাকরি না পাওয়ার ফলে দেশ ছেড়ে বর্মা মুলুকে চলে যেতে বাধ্য হল। এই আফসোস কতদিন যে করেছেন জয়নুদ্দী তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর আজ সেই মৌলভী সাহেবই খোন্দকারকে কেমন অনায়াসে সারটিফিকেট দিয়ে যাচ্ছেন।

"বোঝলেন মিয়া," মৌলভী জয়নুদ্দী বললেন, "অ্যাখন মুছলমানে মুছলমানে লড়াই করার মানেই হল হিন্দুগের সুবিধে কয়ে দেওয়া। অ্যাখন আমাগের খুব হিসেব করে কাজ করার সুমায় আসে গেছে। ইছলামের সামনে আজ বড় বিপদ।"

আবু তালেব হাসতে হাসতে বললেন, "আমি আপনার সাথে একমত।"

"এক মত!" মৌলভী সাহেব খুব খুশী হয়ে বলে উঠলেন, "তবে আর কথা কী? আল্লাহর তরফের থে ইরশাদ হইছে যে এখেনে অ্যামন করে আপনার সাথে আমার দ্যাখা হবে। এর কি আর নড়চড় হতি পারে। তালি আমি খোনকাররে জানায়ে দিই যে গোল মিটে গেছে। মৌলভী ছাহেব উইন্ন কত্তিছেন? কী কন?"

"দ্যাখেন মৌলভী ছাহেব, আপনি একজন শ্রদ্ধেয় লোক," আবু তালেব ঠোঁটের হাসি বজায় রেখে বলে চলল, "আপনারে কই, নিজিগির মধ্যি রেষারেষি আমাগেরও পছন্দ হয় না। আপোসে যদি অ্যাকজন সরে দাঁড়ান, তালি সব চাইতি ভাল হয়। আমরাও সিডা চাই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সরে দাঁড়াবেন কিডা? যার পিছনে টাকার জোর বেশী তিনি? না যাঁর পিছনে আদর্শ এবং সমর্থকের জোর আছে তিনি?"

মৌলভী জয়নুদ্দীর উথলে ওঠা উৎসাহ এই প্রশ্নে অনেকটা চুবসে গেল। তিনি আমতা আমতা করতে থাকলেন। দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলোলেন।

তারপর বললেন, "দেখতি হবে, কারে দিয়ে কামডা ভাল হয়। ইবার মুছলমানরা কাউনছিলি মেজরিটি হবে বলে শুনতিছি। তালি তারাই তো মন্ত্রী হবে। তাই না? তালি তো চৌকশ লোকই পাঠাতি হয়। তাই না? যারে তারে তো মন্ত্রী হবার জন্যি পাঠানো যায় না। আসল কথা হলো কওমের খেদমত এই কাজ কাউনছিলি যায়ে করার মত এলেম যার আছে, তারেই আমাগের পাঠাতি হবে। খোন্দকার এই সেদিন কথাটা কলেন। তা মিথ্যে তো আর কন নি।"

অনেকক্ষণ হাবুডুবু খাবার পর হঠাৎ ডাঙায় পা ঠেকলে লোকের মনের অবস্থা যেমন হয়, শেষের কথাটা বলতে পেরে মৌলভী জয়নুদ্দীরও সেই রকম বোধ হতে লাগল।

তিনি উৎসাহিত হয়ে কথাটা দোহরালেন। "কাউনছিলি যায়ে মুখ খুলতি হবে তো। দেখতি হবে, যারে পাঠাবো তার সে এলেম আছে কিনা। কেননা কওমের ভবিষ্যৎ কাউনছিলিই ঠিক হবে।"

"মৌলভী ছাহেব," আবু তালেব ধীরভাবে বললেন, "খোন্দকারের কথাটা শুনতি খুব ভাল। কিন্তু আসলে উডা অচল আধুলী। ক্যান তা আপনারে কই। কাউনসিলি আগে কি মুছলমান ঢোকেনি। ঢুকিছে। এমন কি মন্ত্রীও হইছে। মানাবর আলহাজ্ব সার আবু মোহাম্মদ আবদুল করিম গজনভী ছাহেবের মতন মুছলিম নেতা কি সেচমন্ত্রী হন নি? মানাবর খাজা নাজিমুদ্দীন ছাহেব কি শিক্ষা দফতরে ওজারতি করেন নি? নবাব কে জি এম ফারুকী কি কৃষি ও সমবায় দফতরের মন্ত্রী ছিলেন না? কাউনসিলি যায়ে কথায় চোটে তুবড়ি ফাটাবার এলেম এনাগের কি কম ছিল? না, ছিল না। বরং ঐ এলেমডাই ছিল, আর কিছু ছিল না। তাই মুছলমান চাষী মুছলমান সেচমন্ত্রীর আমলে চাষের জল পায়নি। প্রচন্ড খরায় ক্ষেতের ফসল খানিকটা গজায়ে উঠে ঝামড়া-পুড়া হয়ে মাঠেই ঝরে গেছে। মুছলমান সমবায় মন্ত্রীর আমলেই শত শত মুছলমান চাষীর বন্ধকী জমি মহাজনের হাতে চলে গেছে। সে সুমায় বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মুছলমান এবং কলকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যানসেলারও মুছলমান এবং তাও আবার সার হাছান ছোহরাওয়ারদির মতন অ্যামন অ্যাকজন সুযোগ্য ভাইস চ্যানসেলার, সেই সুমায়ও মুছলমানের ছাওয়ালেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কী সুবিধে পাইছেন, তা মৌলভী ছাহেব, আপনার মত একজন আলেমই আমার চাইতি ভাল কতি পারবেন।"

আবু তালেবের কথা খন্ডন করতে পারছিলেন না দেখে জয়নুদ্দী এতক্ষণ মনে মনে গরম হচ্ছিলেন। আচ্ছা ত্যাদড় লোক তো! অ্যামনভাবে কথা কয় যে তার আর কাটান দেবার জো থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্তে আবু তালেব তাঁকে একজন আলেম বলে মেনে নিল অমনি তাঁর সব রাগ জল হয়ে গেল। লোকটা জানে শোনে বেশ। বেশ আদব-তমিজ দুরস্ত।

মৌলভী জয়নুদ্দী বলে উঠলেন, "ইডা আপনি লাখ কথার অ্যাক কথা কইছেন। নাজিমুদ্দীনির কথা আর কবেন না। দিনাজপুরীর শিক্ষা সম্মেলনে আমি গিছিলাম। নাজিমুদ্দীন শিক্ষামন্ত্রী। উনিও গিছিলেন। উনি কলেন, সরকারী চাকরির সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, মুছলিম যুবকেরা যেন সে কথাডা ইয়াদ রাখেন। অতএব চাকরি পাব না বলে তারা য্যানো উচ্চশিক্ষা থেকে নিজিগেরে বঞ্চিত করে না রাখেন। শুনিছেন কথা। জমি জিরেত বন্ধক রাখে কি বেচে দিয়ে ছাওয়ালরে বি এ এম এ পাশ করালাম। অ্যাখন মন্ত্রী কচ্ছেন যে তারা য্যানো চাকরির ভরসায় ল্যাখাপড়া না করেন। তালি মুছলমানের ছাওয়ালগুলো ল্যাখাপড়া শিখে করবে কী? ঘুড়ার ঘাস কাটবে?"

সফীকুল এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল। সে ভাবল, চাকরি। ঘুরে ফিরে সেই চাকরি। এই চাকরিই না আজ হিন্দু মুসলমানে গুতোগুতির প্রধান কারণ। আর তার জন্যই রাজনীতির এত আড়ম্বর! এত বিদ্বেষ! এত জল ঘোলা! অনেক অনেক দিন আগে মেজোবাবু তাকে বলেছিলেন, ফটিক মিয়া, দেখবে হিন্দু আর মুসলমান, এদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা যত বাড়বে, সাম্প্রদায়িকতাও তত বাড়বে। কারণ হিন্দু আর মুসলমান এই দুই শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হবে চাকরি আর রাজনীতির সীমাবদ্ধ পরিসরে। এই গুতোগুতি কেবল চেয়ারের দখল নিয়ে। হয় কেরানীর চেয়ার আর না হয় মন্ত্রীর চেয়ার। এই তো। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে, চেতনাকে, বোধকে দেশের বৃহত্তর আঙিনায় প্রসারিত করে না দিই, সমগ্র দেশকে যদি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং নিরানন্দের কবল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে না যাই, তেমন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ না করি, এবং তাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সুযোগ আদায়ের যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু আর মুসলমান শুরু করেছে, এর মধ্যে কোনও কল্যাণ আমি দেখতে পাইনে, এ বিচ্ছেদকেই বাড়িয়ে দেবে।

...একদিন আসতেও পারে যেদিন হিন্দু মুসলমানের গলায় আর মুসলমান হিন্দুর গলায় খাঁড়া সাঁড়াই ছুরি বসাতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু তাতেও কি এ সমস্যার সমাধান হবে ঠিক? না। কারণ চাকরির সংখ্যা কখনোই অসীম করা যাবে না, রাজনৈতিক মসনদের সংখ্যাও না।

আবু তালেব হাসলেন। বললেন, "জালি বুঝে দেখেন।"

"বুঝে আর দ্যাখব কী?" মৌলবী জয়নুদ্দী বললেন, "হাড়ে হাড়ে বুঝতিছি। বড় ছাওয়াল মনু চাকরী চাকরী কৱে দেশছাড়া হয়ে গেল।"

আর দ্যাখ ফাটক, আমাগের নেতাদের কান্ড। যেখানে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, ওঁরা সেইখানে মিলন মিলন করে চেঁচাচ্ছেন। মেজো-বাবুর গলার ধীর স্বরটা সফীকুলের মনে বেজে উঠল। এটা স্রেফ ভন্ডামী। স্রেফ চালাকি। যারা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় নেমে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মিলনটা হয় কি করে? তবে কি হিন্দু মুসলমানে মিলনের ক্ষেত্র নেই? সফীকুল জিজ্ঞেস করেছিল। মেজোবাবু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আছে। তবে তা আছে সমগ্র দেশের আঙিনায় ছড়িয়ে। দেশ থেকে অভাব, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা এবং নিরানন্দ দূর করার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেই সহযোগিতার আহ্বান আছে। মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হবে সেখানে, যেখানে কর্মের উদ্যোগ আছে। উপর থেকে রাজনীতির দন্ড নেড়ে এ কাজ সমাধা করা যাবে না। নিজেকে যুক্ত করতে হবে কর্মের সংগে এবং কাজ শুরু করতে হবে নিচের থেকে।

"বাংলার কৃষকের অর্থাৎ মোছলেম জন-সাধারণের প্রধান সমস্যা হচ্ছে রোগ ও ঋণ।" আবু তালেব বললেন।

সফীকুলের বাংলার কৃষকের অর্থাৎ মোছল-মানের, এই কথাটা কানে খট্ করে লাগল। সে আবু তালেবকে বলে উঠল, "বাংলার কৃষকের অর্থাৎ হিন্দু কৃষকেরও প্রধান সমস্যা হচ্ছে রোগ ও ঋণ।" তার কথায় খানিকটা ঝাঁঝ ফুটে উঠল। "হিন্দু কৃষক কি আপনাদের চোখে কৃষক নয়?"

আবু তালেব সফীকুলের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসলেন। বললেন, "জে। ঠিকই কইছেন। হিন্দু কৃষকউ কৃষক এবং তারউ প্রধান সমস্যা হতিছে রোগ ও ঋণ।"

সফীকুল বলল, "তাহলে এই কথাটা আপনারা বলেন না কেন? এদিকে তো আপনারা বলে চলে-ছেন, বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু কয়েদী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান।"

"জে বলি।" আবু তালেব কথাটা শান্তভাবে বললেন। "প্রজা আন্দোলনরে গড়ে তুলার জন্য কথাডা ঐভাবে পাড়তি হয়।"

"কিন্তু কথাটা তো আংশিক সত্য। সবটা না বললে লোকে কি বুঝবে? বুঝবে বাংলার হিন্দুমাত্রই জমিদার আর মুসলমান মাত্রই প্রজা। হিন্দুমাত্রই মহাজন আর মুসলমান মাত্রই খাতক। কিন্তু একথা তো সত্য নয়।"

"আলবত সত্যি"। মৌলভী জয়নুদ্দী বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন। "বাংলায় হিন্দুগের আশী পারছেনট্ হচ্ছে জমিদার আর বিরেনব্বুই পারছেনট হচ্ছে সুদখোর মহাজন। ইরাই তো আমাগের শুষে খাচ্ছে। তা সে কথাডা কতি দোষ কী?"

"দোষ কিছু নয়", সফীকুল বলল। "দোষ আপনাগের দেখার বা বলার, যা বলেন তাই। মৌলভী সাহেব বাংলার হিন্দুদের শতকরা আশীজন জমিদার নয়, জমিদারদের শতকরা আশীজন হিন্দু, তেমনি হিন্দুদের শতকরা বিরানব্বই জন সুদখোর মহাজন নয়, কাবুলী মুসলমানও এদেশে সুদ আদায়ের জন্য আমার আপনার গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করে, আর তখন শরা-শরীয়ত খেলাপ করার জন্য তাদের মাথায় আল্লাহর আযাব নেমে আসে না, সে যাই হোক, সত্য হচ্ছে এই যে শতকরা বিরানব্বই জন হিন্দু সুদখোর নয়. সত্যটা বোধ হয় এই যে সুদখোর মহাজনদের শতকরা বিরানব্বই জন হিন্দু। তাই না?"

আবু তালেব শুধরে নিলেন, "জে। তাই বটে।"

মৌলভী জয়নুদ্দী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, "আরে ও অ্যাকই কথা। হিন্দু মাত্রই সুদখোর।"

"জে না।" সফীকুল বলল, "না মৌলভী সাহেব। এক কথা নয়। হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজন সংখ্যায় কত হবে? মোট হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগই হোক বড় জোর? কী বলেন আবু তালেব সাহেব?"

আবু তালেব বললেন, "জে। তাই হবে। কিছু সামান্য বেশীউ হতি পারে।"

"তবে", সফীকুল বলল, "এইবার বলুন, শতকরা আশি পঁচাশি ভাগ হিন্দুই প্রজা, খাতক এবং চাষী কি না?"

"জে।" আবু তালেব স্বীকার করলেন। "তা সত্যি।"

"তাহলে আপনারা প্রজা আন্দোলন গড়ার জন্য নির্বিচারে এই যে নিরন্তর বলে চলেছেন, বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, এতে কি একথা মনে হয় না যে বাংলায় চাষী খাতক প্রজা, এদের মধ্যে হিন্দু নেই?"

আবু তালেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, মৌলভী জয়নুদ্দী ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বললেন, "আমাগের অ্যাত সুক্ষ্ম বিচারে যাওয়ার দরকারডা কী, আমি তো সিডাই বুঝিনে। উরা কি কোনও বিষয়ে আমাগের রেয়াত করে। তবে আপনারে কই উকিল ছাহেব। আমাগের আর অত সুক্ষ্ম বিচার করার দরকার নেই। টিট্ ফর ট্যাট, আমি তো মনে করি, মুছলমানগের বাঁচতি হলি হিন্দুগের সাথে অ্যাখন এই সম্পক্কো পাতাতি হবে। টিট্ ফর ট্যাট। সব হিন্দুরি জমিদার আর মহাজন বলা হইছে বলে আপনি নারাজ হতিছেন কিন্তু হিন্দুরা যখন ইসকুল পাঠ্য বইর মধ্যি সব মুছল-মানেরে চোর বানায়ে দ্যায়, কই কোনও হিন্দুরি তো তা নিয়ে কথা কতি শুনিনে? বছর দুই আগে আমি খুলনেয় আমার শালার বাড়ি গিছিলাম। গরমের ছুটিতি তার মাজে মেয়ে হুগলীর থে বাপের বাড়ি আইছিল। অ্যাকদিন সকালে উঠে শুনি আমার শালার মেয়ের ঘরের নাতিডে বেশ জোরে জোরে পড়তিছে, মুশলমান হইলেও হুশেন শাহো সেই টাকাগুলি লইয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহা প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গল্পডার নাম বোধহয় সততার পুরস্কার কিম্বা ঐ কছমের কিছু একটা হবে। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হোচ্ছেন শাহ বাহমনীরী নিয়ে এই গল্পডা ফাঁদা হইছে। ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছেলেন বলেই নাকি তাঁর বংশের নাম হইছে বাহমনী। শুনিছেন কথা! মুছল-মান হইলেও হোচ্ছেন শাহ্ অ্যাত বড় অ্যাকটা সততার কাজ করে ফেলিছেন! এখেনে মুশলমান হইলেও, এ কথাডা বলা ক্যান্? তার মানে মুছলমানের পক্ষে যিডা সাধারণ অভ্যেস, সেই অসততা আর পরাস্ব-অপহরণের লোভ হোচ্ছেন শাহ দমন করি পারিছেন। তালি বুঝে দ্যাখেন মুছলমান সম্পক্কে হিন্দু লেখকের ধারণাড কী? মুছলমান হইলেও! আঁ! কথাডা মনে পড়লি আমি আর রাগ সামলাতি পারিনে। শুধু এই অ্যাকখান ইসকুল পাঠ্য বই নয় উকিল ছাহেব। আরউ আছে।"

মৌলভী জয়নুদ্দী এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তার গলার দুটো রগ ফুলে উঠল।

"বঙ্গবাণী কী লিখিছিল জানেন? বঙ্গবাণী তো দেহি স্বদেশীওলাগের গীতা বেদ বাইবেল। রামপুরির নবাব কাশী হিন্দু ইউনিভারসিটির অ্যাককালীন অ্যাক লক্ষ টাকা দান এবং বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বৃত্তি দেবেন বলে ঘোষণা করিছেলেন। তা সেই খবরডা বঙ্গবাণীতি কী ভাবে ছাপা হইছিল জানেন? আমি মুখস্থ করে রাখিছি। এই শোনেন। মুছলমান হইলেও তিনি অর্থাৎ কিনা রামপুরির নবাব ছাহেব, সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারেন বলিয়া তাঁহার নিকট বিধর্মী বলিয়া কেহ হেয় বা তুচ্ছ নয়। আচ্ছা কন, এই লেখাডা পড়লি যে-মুছলমানের শরীরি মানুষির চামড়া আছে তার খুন টগবগ করে ফোটবে কি ফোটবে না? কই, কোনও শিক্ষিত হিন্দু তো বঙ্গবাণীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেনি! তালি কি মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিবার দায় হিন্দু সম্প্রদায় অ্যাকা মুছলমানগের উপরই ছাড়ে দেছেন? মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিবার দরকার হিন্দুগের নেই। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবার শিক্ষে দেছেন কারা? হিন্দুরা! হায় আল্লাহ! মুছলমানগের সম্পক্কে হিন্দুগের মনে সত্যিকারের ধারণাডা যে কী সিডা এই মুছলমান হইলেও কথাডার মধ্যি দিয়েই ফুটে বের হতিছে। ওগের সংগে আমাগের কী করে মিল হবে, কন্? হাতে হাত মিলোতিউ যে দুখোন হাত লাগে।"

মৌলভী জয়নুদ্দীর মর্মবেদনা এমন আন্তরিক-ভাবে ফুটে উঠল যে সফীকুলের আর তর্ক করতে ইচ্ছে করল না। কেননা সফীকুল তো জানে যে মৌলভী সাহেবের এই আবেগের পিছনে যে তথ্যগুলো রয়েছে তা অকাট্য। যেদিন থেকে মুছলমানরা ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেছে মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের কাছ থেকে শিক্ষিত মুছলমান আঘাত খেতে শুরু করেছে। তার নিজের জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। তাকে হেড মাস্টারের স্থায়ী পদ দেওয়া হয়নি, তাকে হার্ডিনজ হসটেলে সীট দেওয়া হয়নি। তার একমাত্র কারণ তো এই যে মুছলমান।

নিচের দিকে যেখানে এতটা ফাঁক সেই ফাঁক বুজোবার চেষ্টা না করে পলিটিকসের ময়দানে মিলন মিলন বলে আওয়াজ তুললে কী ফল হবে? সফীকুল ভাবতে লাগল। এটা তার কাছে একটা বড় প্রহেলিকা। তবু অন্ধ বিদ্বেষ সমাধান আনতে পারে না। সে এটা বোঝে। বিদ্বেষ বিচার-বিবেচনাকে খেয়ে ফেলে। তাই সফীকুল বিদ্বেষকে এড়াতে চায়। এড়িয়ে চলে।

আবু তালেব মৌলভী সাহেবকে একটু হেসে বললেন, "আমরা কিন্তু আমাগের কথার থে সরে গিইছি। কথাডা ছিল, নিজিগের মধ্যি খেয়োখেয়ি কীভাবে বন্ধ করা যায়।"

মৌলভী সাহেব কথাটা লুফে নিলেন।

"মুছলমানরে যদি বাঁচতি হয় তালি সবাইরি অ্যাক হয়ে লড়তি হবে। মুছলমানরে মুছলমান হতি হবে। আমাগের শত্তুররা য্যান্ আমাগের দুর্বলতার সুযোগ নিতি না পারে। অ্যাকতাই বল। বোঝলেন তো।"

সফীকুল জিজ্ঞাসা করল, "আমাগের শত্রু কে?"

মৌলভী সাহেব বললেন, "হিন্দু। এতে আবার সন্দেহ আছে না কি?"

সফীকুলের হঠাৎ কেন যেন স্যার আবদুর রহমানের একটা উক্তি মনে পড়ে গেল। সে তখন মাস্টারি করে, কথাটা সেই তখন শুনেছিল। সেই থেকে কথাডা মনে গেঁথে আছে। স্যার আবদুর রহমান কোনও একজন হিন্দু নেতার মুখের উপর বলেছিলেন, লুক হিয়ার, ইউ ফরগেট দ্যাট উই হিন্দুজ হ্যাভ গট ওনলি ওয়ান এনিমি, দি ব্রিটিশারস, টু ফাইট, হোয়ার অ্যাজ উই মুসলিমস হ্যাভ গট টু ফাইট থ্রি এনিমিজ : দি ব্রিটিশারস অন দি ফ্রন্ট, দি হিন্দুজ অন দি রাইট অ্যান্ড দি মোল্লাজ অন দি লেফট। দেখুন আপনারা হিন্দুরা এ কথাটা ভুলে যান যে আপনাদের শুধু একটা শত্রু, ব্রিটিশ, তার সংগেই আপনাদের লড়াই করতে হবে, সে ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের লড়াই করতে হবে তিনটে শত্রুর সংগে : আমাদের সামনের শত্রু ব্রিটিশ, ডাইনের শত্রু হিন্দু আর বাঁ দিকের শত্রু মোল্লারা। আজ সফীকুলের মনে হল স্যার আবদুর রহমানের কথার তাৎপর্য সে যেন বুঝতে পারছে। তার সামনের শত্রু ব্রিটিশ, তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হবার

মনে মনে তারা হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষার পথ জুড়ে তো হিন্দুরাও দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত সেই শ্রেণীর হিন্দু, যারা তাঁদের সম্পর্কে "মুসলমান হইলেও" ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু মৌলভী জয়নুদ্দীর সামনে আর কোনও শত্রু নেই। শত্রু একটাই। হিন্দু। এবং এই মনোভাব আজ অধিকাংশ মুসলমানই পোষণ করেন। সফীকুল এই কারণেই কারও সঙ্গে মিলতে পারে না। তার কাছে মেজোকর্তা, কি শত্রু ? না না। সে একথা ভাবতেও পারে না।

আবু তালেব বললেন, "অ্যাট্টা সুজা কথা আপনারে জিজ্ঞেস করি, এই ইলেকশনে একই কেন্দ্রে যেখেনে দু তিন জন মুসলিম ক্যানডিডেট দাঁড়ায়েছেন, সেখেনে অ্যাকভাডা হবে কিসির ভিত্তিতে ?"

তারিণী মাসটার কি আমার শত্রু ? ফটিক নিজেই তার প্রশ্নের জবাব দিল, না না।

"কিসির ভিত্তিতে মানে ? অ্যাকজন মাত্তর ক্যানডিডেট সেখেনে থাকবেন, আর সবাই উইড্র করবেন।"

মন্মথবাবু কি আমার শত্রু ? না না।

"যিনি থাকবেন, তিনিই বা ক্যান থাকবেন ? আর যারা উইড্র করবেন, তারাই বা ক্যান উইড্র করবেন ? এর নিরিখডা কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?"

"নিরিখডা খুবই সুজা। মুছলমানের স্বার্থ যে দ্যাখবে, শুধু সে-ই ক্যানডিডেট হবে।"

"আপনি যত সুজা ভাবতিছেন মৌলভী ছাহেব, ব্যাপারডা আসলে অত সুজা না।"

মিঃ পালিত আমার শত্রু ? না না না।

"ব্যাঁকা দেখতিছেন কনে, তালি সিডা কন ?"

"অ্যামন কোনও ক্যানডিডেটের কথা ভাবতি পারেন আপনি যিনি আপনারে কবেন যে তিনি মুছলমানের স্বার্থ দ্যাখবেন না ? সব্বাই তো কবেন যে তিনিই মুছলমানের স্বার্থ সবার চাইতি বেশি দ্যাখবেন। তাই না ?"

"আরে তিনি কালই তো হলো মা—"

মিস পালিত ? মিস পালিত কি আমার শত্রু ?

"আমাগেরঐ বিচার করে দেখতি হবে যে কিডা ভালো আর কিডা মন্দ ?"

মিস পালিত তো হিন্দু। মিস পালিত কি আমার শত্রু ? এই প্রশ্নটাই ফটিকের কাছে হাস্যকর লাগল।

"বিচার তো করবেন বোঝলাম। তা ক্যানডিডেটের বিচার যে করবেন, কী দেখে ?" আবু তালেব জিজ্ঞাসা করলেন ? "ক্যানডিডেটের ছুরৎ দ্যাখবেন ? তার খানদান দ্যাখবেন ? না তার প্রোগ্রাম দ্যাখবেন ?"

এই কারণেই সফীকুল হিন্দুমাত্রকেই "এনিমি অন দি রাইট" বলে ভাবতে পারে না। নিশ্চয় এমন হিন্দু আছে "আমাদের শত্রু কে" একথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র জবাব দেবে, কেন, মুসলমান। এবং তাদের সবাই যে মতলববাজ একথা ভাবারও মানে হয় না। মৌলভী জয়নুদ্দীর মত সোজা-বুঝের লোকও যথেষ্ট আছেন হিন্দুদের মধ্যে। যারা ভীত, যারা ত্রস্ত মুসলমানদের ভয়ে।

মৌলভী জয়নুদ্দী এবার প্যাঁচে পড়ে গেলেন। কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না।

মোল্লাজ আর অন আওয়ার লেফট। সফীকুল মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, তাঁরা আছেন। কিন্তু এই বিভেদ সৃষ্টির দায় কি একমাত্র মোল্লাদের ? সফীকুলের মন এই সহজ সমীকরণে সাড়া দিল না। তার চাইতে মেজোকর্তার উক্তিটাই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরি এবং রাজনীতি, এই দুই-এর অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব।

"প্রোগ্রামই হল ক্যানডিডেটের ভালো মন্দ যাচাই করার প্রকৃত কষ্টি পাথর।" আবু তালেব বলল, "মৌলভী ছাহেবই যখন কথাডা তুলিছেন তখন তাঁর কাছেই আমাগের আর্জি যে আপনিই সালিশ হন, দুই পক্ষের প্রোগ্রাম দ্যাখেন, বিচার করেন, তারপর আপনার বিচারে যে ক্যানডিডেটরে নীরেস বলে মনে হবে তারে উইড্র করাতি কন। কী কন, ফটিক ভাই।"

মৌলভী ছাহেব "ইডা ভাবে দ্যাখার কথা, ইডা ভাবে দ্যাখার কথা," বলে চিন্তিত মনে মাথা নাড়তে লাগলেন।

তখন আবু তালেব সফীকুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওগের জামিনির কদ্দুর কী করলেন ?"

সফীকুল বলল, "এখেনে আর কিছু হবার নয়। হাইকোরটে মুভ করতে হবে। কলকাতায় যেতে হবে বুঝলেন ?"

"তালি ভাই আর দেরী করবেন না," আবু তালেব বললেন "আপনি কলকাতায় চলে যান। যায়ে যা করবার চটপট সারে ফেলেন। ইলেকশানের আগে আপনার বাজান, বশির আর অন্যাগেরে বের করে আনতিই হবে।"

মৌলভী ছাহেব এবার একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। দাউদ বলেছে সফীকুলের বাপ ওদিকের একজন পাণ্ডা এবং খোন্দকারকে হারাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অতএব তার মুক্তি মানেই খোন্দকারের বিপদ বাড়া। এই মুহূর্তে তিনি চাইছিলেন না যে খোন্দকারের বিপদ বাড়ুক। কেন না তিনি দাউদের মত ছেলেকে ঢালাও ঠিকের কাজ দিয়েছেন। এবং সোয়াস্তির কথা যে শেষ পর্যন্ত সইফুল দাউদকে শাদী করতে রাজী হয়েছে। তথাচ সাজ্জাদ মোল্লার মত একজন ঈমানদার মুছলমান বিনা দোষে হাজতে পচছে, এটাও তার দেল সায় দিচ্ছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর দেলটা খচখচ করতে লাগল। (ক্রমশ)
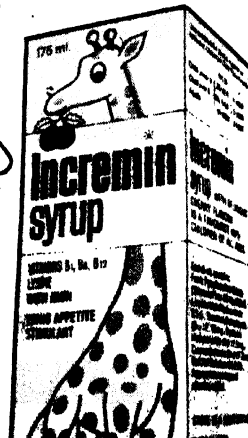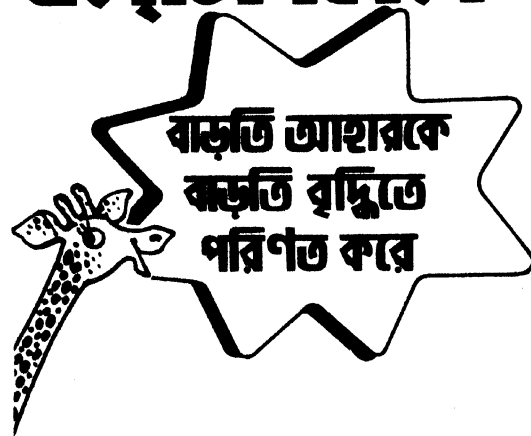
বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার সাহিত্য-সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন, আর একটি চিঠির কথা শুধু মোটামুটি বক্তব্য সহ উল্লেখ করে গেছেন। যে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন, তার একটা অংশ এই—

'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইল, আমাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসংগতি থাকিতে পারে।'

কৃষ্ণকান্তের উইল বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২তে। বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে যে বলেছেন, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময় কিছুদিনের জন্য তাঁকে কলকাতা থেকে অতি দূরে যেতে হয়েছিল, সেটা হল, ঐ সময় তিনি উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

এই চিঠির প্রসংগে আর একটা কথা—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু বইয়ের ক্ষেত্রেই আগে কাগজে প্রকাশিত হলে, পরে বই করবার সময় আগের লেখার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। আবার বই-এর বিভিন্ন সংস্করণেও সংশোধন করেছেন। যেমন—আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১২৮৭—৮৯ সালের বংগদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বংগদর্শনে যা প্রকাশিত হয়, পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় তার কিছু পরিবর্তন করেন। আবার দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ও পরিবর্তন করেন। এমন কি পঞ্চম সংস্করণের সময়ও একটা পরিচ্ছেদ (আগের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ বাদ দেন।

গিরিজাবাবু তাঁর বইয়ে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটির কথা উল্লেখ করেছেন এবার সেই চিঠিটির সম্বন্ধে কিছু বলছি—

গিরিজাবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময় উপন্যাসগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী এই তিনটিকে প্রথম স্তরে, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে তৃতীয় স্তরে, বাকি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতিকে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এইরূপ স্তর বিভাগের হেতু সম্বন্ধে গিরিজাবাবু বলেছেন—'প্রথম স্তরের উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই উপন্যাসগুলি লিখেন নাই। .... পাঠকের চিত্তরঞ্জন মাত্র এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল ...। লোকশিক্ষাই তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।....মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা উভয় স্তরের উপন্যাসেরই লক্ষ্য। তবে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে সে সমস্যা যত স্থূল, যত সাধারণ—তৃতীয় স্তরের সমস্যা সেরূপ নহে। ধর্মপথে যাঁহারা একটু অগ্রসর, তৃতীয় স্তরের উপন্যাস তাঁহাদিগেরই উপযোগী।.......'

গিরিজাবাবু তাঁর বইয়ে এইরূপ স্তর বিভাগ করে আলোচনার পর শেষে লিখেছেন—'আমরা এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলাম—আপনার এই শেষ উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে প্রথমের উপন্যাসগুলি বড়ই তরল প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়। —এই কথার উত্তরে গ্রন্থকার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—এ সম্বন্ধে তোমার যে মত অনেকেরই সেই মত।'

গিরিজাবাবু তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠিটির একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করলেও বা বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে একটি মাত্র বাক্যে বললেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে এই প্রসঙ্গেই হয়ত আরও কিছু কথা বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়েই গিরিজাবাবুকে আরও যে দু-একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলিও আজ আর পাওয়া গেল না। নষ্ট হয়ে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় একজন নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে যে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ঠাকুরদাস সেই প্রচারেরও লেখক ছিলেন। ঠাকুরদাস তাঁর 'সাহিত্য মংগল' নামক প্রবন্ধ পুস্তকটিতে কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এবং সাহিত্য ও ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

এই ঠাকুরদাসকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিটি এই—

নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদূর জানি, এ দেশীয় বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ে কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে ইহাও বক্তব্য যে, দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বালিকাদিগের স্বামিসংসর্গ অবিধেয়। এবং ইহা আমাদিগের

দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার-বিরুদ্ধ হইবে না। কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইন মতে সম্মতিদানের বয়স দশ বৎসর, দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

বাল্য-বিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। 'ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ' ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ি যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গন্ডগোল করা বৃথা।

আমার মতে আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইতি তাং ২৯ আশ্বিন ১২৯৮।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্মা

বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠিতে, 'বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলনের' কথা বলেছেন, সেই আন্দোলনের একটা বিরাট ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের কিছুটা হচ্ছে এই—

আগের দিনে আমাদের দেশে খুব অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার একটা রীতি ছিল। তবে এই বাল্যবিবাহ থাকলেও তখন স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের একটা বয়স নির্দিষ্ট ছিল। তখন গবর্নমেন্ট সহবাস সম্মতির আইনে বধূর বয়স দশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এই আইন চলাকালেই একবার এক পাষন্ড তার বালিকা বধূর উপর এমন অত্যাচার করে যে, তার ফলে বধূটির মৃত্যু হয়। তখন এই সংবাদটি নিয়ে কাগজে কাগজে খুব লেখালেখি চলতে থাকে। এই দেখে গবর্নমেণ্ট সহবাস সম্মতির আইন আবার নতুন করে তাতে বধূর বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বার করে দেন। সহবাস সম্মতির আইনে বধূর বয়স বার করে দেওয়ায়, দেশের লোক মহা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই নিয়ে বিরাট আন্দোলনও শুরু করে। দেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিত থেকে শুরু করে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত এই আন্দোলন নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন।

এই আন্দোলন সম্বন্ধে সেকালের এক ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় যা লিখে গেছেন, তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'...আইনসভায় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রও (হাইকোর্টের জজ) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ এ সকল প্রতিবাদে কর্ণপাত না, করিয়া বার বৎসর বয়স নির্ধারণ করিয়াই সহবাস সম্মতি আইন পাস করেন। দেশের সর্বত্রই ইহার প্রতিবাদ হয়। কলিকাতার স্থানে স্থানে, অবশেষে গড়ের মাঠে লোকারণ্যের মধ্যে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ হয়। চূড়ামণি (শশধর তর্কচূড়ামণি) মহাশয় জ্বালাময়ী ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। সভা ভঙ্গের পর যখন সেই লোক-প্রবাহ বড়লাটের বাড়ির (বর্তমানের রাজভবন) সম্মুখ দিয়া 'আইন চাই না', 'আইন চাই না' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, সে দৃশ্য এখনও পর্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ লোক বঙ্গবাসীতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। কয়েকটা প্রবন্ধের জন্য বঙ্গবাসীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল। পরে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখনকার রাজদ্রোহ আইন সুস্পষ্ট ছিল না। বঙ্গবাসীর এই মোকদ্দমা হইতে তাহাকে সুস্পষ্ট করা হয়। এখন অনেকে যে তাহার কবলে পড়িতেছেন, তাহা অবশ্য সকলে লক্ষ্য করিতেছেন।'

সহবাস সম্মতির আইনের প্রতিবাদে তখন বঙ্গবাসী পত্রিকা যেমন অগ্রণী হয়েছিল, তেমনি এই প্রতিবাদকে জোরদার করবার জন্য অমৃত বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁদের সাপ্তাহিক অমৃতবাজারকে দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় পরিণত করেছিলেন। তবে এঁদের রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়নি।

এই সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে বঙ্গবাসীকে তখন যে রাজদ্রোহের মামলায় জড়িত হতে হয়েছিল, তার ইতিহাস হচ্ছে এই—

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ইংরাজ গবর্নমেণ্ট যখন 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রবর্তনে উদ্যোগী, তখন বঙ্গবাসীতে পাঁচটি বিশেষ প্রবন্ধের মাধ্যমে এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বঙ্গবাসীতে ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হলে সরকার বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা রুজু করেন। এঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলে, এঁরা যথাসময়ে পুলিস কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি-দের পক্ষ থেকে তখন এ সম্পর্কে হাইকোর্টে আপীল করা হয়।

হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির কোর্টে এ নিয়ে শুনানী হলে, তিনি নির্দেশ দেন—অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কেউ এক লক্ষ টাকার জামিনে দাঁড়ালে, অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে পারি।

বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেনবাবু তখন কলকাতার বহু ধনী ব্যক্তির কাছে জামিনে দাঁড়াবার জন্য আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হয়ে যোগেনবাবু যখন খুবই চিন্তিত ও বিচলিত, ঠিক সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন স্বেচ্ছায় জামিনদার হতে এগিয়ে আসেন।

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যে আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্সকে। সে জানে, হরলিক্স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

HS548-B-2

হরলিক্স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্স একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

গঙ্গাপ্রসাদ জামিনদার হতে চাইলে সরকার পক্ষের কৌঁসিলী নাকি বিচারপতিকে বলেছিলেন—একলক্ষ টাকার জামিনদার হিসাবে এরূপ একজন 'নেটিভ' কবিরাজকে বিশ্বাস করা যায় না।

বিচারপতিও কবিরাজের সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে যখন সন্দেহ করছিলেন, তখন আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার জজ সাহেবকে বুঝিয়ে বলেন—ইনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। এঁর পশার ও প্রতিপত্তি প্রচুর। একলক্ষ টাকার জামিনদার হওয়ার মত সম্পত্তি এঁর আছে। এমন কি, প্রয়োজন হলে নগদে লক্ষ টাকাও যে-কোন মুহূর্তে বার করে দিতে পারেন।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টারের এই কথায় জজ অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি দেন। গঙ্গাপ্রসাদ স্বেচ্ছায় জামিনদার দাঁড়ানোর জন্য বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ যে সেকালের একজন ধনী কবিরাজই শুধু ছিলেন, তাই নয়, তাঁর পরোপকারের আরও নজির পাওয়া যায়, দুর্গাচরণ রায় প্রণীত বিখ্যাত 'দেবগণের মর্তে আগমন' বইটিতেও। ঐ বইয়ে বরুণ এক জায়গায় ব্রহ্মাকে বলছেন—'... গঙ্গাপ্রসাদও কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ইনি প্রত্যহ শত শত রোগীকে বিনামূল্যে মহামূল্য ঔষধ দান, বিস্তর ছাত্রকে আহার ও বিদ্যাদান করিতেন। ১৮৭৭ সালের কলিকাতা দরবারে ইনি গবর্নমেন্ট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—'অনেকেরই সম্ভবত স্মরণ আছে যে, বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে গবর্নমেন্ট একবার মোকদ্দমা স্থাপন করেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গবাসী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। জানি না, কি কারণে গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করা হয়। সাক্ষ্য দিতে হইবে শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন এবং টিটাগড়ে গিয়া জজ নরিসকে ধরিলেন। নরিস সাহেব দুর্দান্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। বুঝি এতটা তিনি অন্য কোন বাঙ্গালীকে করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শুনিয়া নরিস সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—সাক্ষ্য দিতে তুমি ভয় পাইতেছ কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন—আমি হাইকোর্টে কখন সাক্ষ্য দিই নাই। জেরা আমার সহ্য হয় না—আমার ক্রোধ সহজে উদ্দীপ্ত হয়—আমায় নিষ্কৃতি দান করুন।

নরিস সাহেব বলিলেন—বঙ্কিমবাবু তুমি স্থির জানিবে, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

সাহেব নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদ তখনও অবগত ছিলেন না। সংবাদটা আনিবার জন্য আমায় সবিশেষ উপদেশ দেন।'

গবর্নমেন্ট বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কি কারণে মামলা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে শচীশবাবু কোন কথা না বললেও সে মামলা যে গবর্নমেন্টের সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে লেখার জন্য রাজদ্রোহের মামলা তা জানা গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে কেন ভয় পেতেন, এ সম্বন্ধে তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন—জেরায় ভদ্রলোকের সম্মান থাকে না। আর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা বেরিয়ে আসে। এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন তাঁকে একটি হাসির গল্পও বলেছিলেন। গল্পটি এই—হুগলীর তৎকালীন বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নাকি জেরার চোটে এক সময় বলে ফেলেছিলেন, তাঁর পিতার মৃত্যুর দু-বছর পরে তাঁর জন্ম হয়।

বঙ্গবাসীর সঙ্গে মামলায় সরকার যে তাঁদের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন, তার কারণটা ছিল এই—

বঙ্কিমচন্দ্র একে তো সরকারী কর্মচারী, তার উপর তিনি ছিলেন তখনকার বাংলার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক, আর খুব ভাল ইংরাজীও জানতেন। এই সব কারণেই সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে লেখা বঙ্গবাসীর প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ভার দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কর্মচারী হিসাবে সরকারের সে অনুরোধ বা নির্দেশ পালন করতে বাধ্য ছিলেন। তাই অনুবাদ করেও দিয়েছিলেন। আর এই অনুবাদ করার জন্যই অনুবাদক হিসাবে সরকার বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁদের পক্ষের অন্যতম সাক্ষীও দাঁড় করিয়েছিলেন।

বঙ্গবাসীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের পক্ষে ব্যারিস্টার দিয়েছিলেন, তখনকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার জ্যাকসন সাহেবকে। একবার মোকদ্দমার আগের দিন রাত্রে বঙ্গবাসীর পরিচালকবর্গ জ্যাকসন সাহেবকে মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন। তখন রাত্রি প্রায় তিনটা।

সেই সময়েই একজন সাহেবের কাছে সংবাদ নিয়ে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন, সাহেব তখনও বঙ্গবাসীর কাগজপত্র নিয়ে মনোনিবেশ সহকারে পড়ছেন।

পরদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কথা শোনালে, তিনি বলেছিলেন—এমন নিষ্ঠা না থাকলে কি অত বড় হওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'-এ ইংরাজ কালেক্টরদের অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু তিনি সাধারণভাবে ইংরাজ জাতির কাজে নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় পেলে মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যাকসন সাহেবের নিষ্ঠার যেমন উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, তেমনি ইংরাজের কর্তব্যবোধ ও সময়ানুবর্তিতার একটি ঘটনায় তাঁর উচ্চ প্রশংসা করার কাহিনীটি প্রসঙ্গত এখানে বলছি—

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তারও কিছু আগের কথা। সেই সময় একদিন

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অপর তিন ভ্রাতা ঠিক করলেন, তাঁদের পিতাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটি গ্রুপ ফটো তোলাবেন। এই ঠিক করে বঙ্কিমচন্দ্ররা চারি ভ্রাতায় তাঁদের পিতাকে নিয়ে একদিন কলকাতায় বোর্ন এণ্ড শেফার্ড কি 'জনস্টোন এন্ড হফ্‌ম্যান' নামক একটি বিলাতী ফটোগ্রাফারের দোকানে এলেন এবং ফটো তোলালেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র ঐ সময় কলকাতায় কাজ করতেন এবং কাঁটালপাড়ার বাড়ি থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিলেন। তাই পূর্ণচন্দ্রই দোকানদারের বলা নির্দিষ্ট দিনে এসে দোকান থেকে ফটো নিয়ে যাবেন এরূপ স্থির হয়।

কয়েকদিন পরে ঐ নির্দিষ্ট দিনে পূর্ণচন্দ্র এসে কয়েক কপি বাঁধানো ফটো নিয়ে, সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টায় তাঁর বৈঠকখানায় বসে সবৃহৎ সটকার নলে মুখ দিয়ে সুগন্ধি তামাক সেবন করছিলেন। ঘরে তখন আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র ফটোগুলো নিয়ে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রাখলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ফটোগুলো নিয়ে দেখলেন।

তাঁর দেখা হলে, পূর্ণচন্দ্র এবার বলতে আরম্ভ করলেন—আমি দোকানদারের বলা নির্দিষ্ট সময় চারটা নাগাদ গিয়ে দেখি, দোকানের জানালা কপাট সব বন্ধ। কেবল নীচের তলায় এক কোণের একটা দরজা খোলা আছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় সেই খোলা দরজার পাশে টুলে বসা এক দরোয়ান বললে—ভিতরে আসুন। —শুনে আমি ঐ পাশের দরজা দিয়ে নীচের তলায় গেলাম। দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। ঘর নীরব। কিছু বুঝতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠলাম। সেখানেও দেখি ঐ রকম। কেউ কোথাও নেই। কেবল ঘন কাল রঙের পোশাকপরা একটি প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলা একখানি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনেই টেবিলের উপর এই ফটোগুলো। কাছে পিওনের মত একজন দাঁড়িয়েছিল।

মেম সাহেব আমাকে দেখে বললেন—আপনার জন্য আমি আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতাম। এখন চারটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।

আমি ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কাজের দিনে এখানে লোকজন নেই কেন?

তিনি বললেন—গত রাত্রে এই বাড়ির একজন মারা গেছেন। সমাধিস্থ করবার জন্য তাঁর শব কিছু পূর্বেই বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি কেবল আপনার অপেক্ষায় আছি। আমিও এখনি সমাধিক্ষেত্রে যাব।

শুনে আমি বললাম—তা এমন ঘটনায় আপনার অপেক্ষা না করলেও হত। আমি না হয় আবার কাল আসতাম।

উত্তরে সেই প্রৌঢ়া গম্ভীরভাবে বললেন—তা কি হয়। কথার খেলাপ হলে ফার্মের প্রেস্টিজ যাবে যে। পারতপক্ষে আমরা তা কখনই হতে দিই না।

পূর্ণচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র অমনি সবেগে তাঁর হাতের গড়গড়ার নল ফরাসের উপর আছাড় দিয়ে ফেলে, তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসলেন। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আবেগে বলে উঠলেন—এই জন্যেই, এই গুণেই তো ওরা আজ পৃথিবীতে এতবড় জাতি। ডিসিপ্লিন ওদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর আর কাজ ওরা ঠিক বোঝে। আমরা ঐ রকম কি?

একটু থেমে বলতে লাগলেন—দেখ পূর্ণ, আমরা নিত্য যা করি, তা তোমার দেখা ঐ ব্যাপারের সঙ্গে একবার তুলনা কর। ভদ্রলোকদের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে আমরা অনেক সময়েই অপরাহ্ণে তাঁদের খাওয়াই। কোন মিটিং-এর সময় তিনটা ধার্য থাকলে, তা আরম্ভ হতে কখনো কখনো পাঁচটা বেজে যায়। সন্ধ্যার সময় নাচ গান বা অন্য কিছুর ব্যবস্থা থাকলে কোথাও কোথাও রাত্রি দশটা এগারটায় তা আরম্ভ হতে দেখি। কারও সঙ্গে কোন কিছুর সম্বন্ধে চুক্তি করলে যে সব সময়েই আমরা তা ঠিক রাখবার চেষ্টা করি, এমন নয়, ইত্যাদি। এ জাতির ভরসা কি? এ বড় বিষম পাঁক। পাঁক থেকে উঠতে না পারলে, একেবারে পাতাল, কোনরকমে উঠলেই স্বর্গ।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিটির কথায় আবার ফিরে আসছি। সরকারের সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে লিখে বঙ্গবাসী যখন মামলায় জড়িত, প্রায় সেই সময়েই ঠাকুরদাস বঙ্গবাসীতে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেন। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই বঙ্গবাসীর লেখক হিসাবে তিনি বঙ্গবাসীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাস বঙ্কিমচন্দ্রেরও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই সূত্রেই মনে হয়, সরকারের সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কি মত, তা জানবার জন্য ঠাকুরদাস বঙ্কিমচন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও উত্তরে ঠাকুরদাসকে ঐ চিঠিটি লিখেছিলেন।

আজ ভাবতেও বিস্ময় লাগে যে, মাত্র সাতাশি বছর আগে স্বামী স্ত্রীর সহবাসের আইনে স্ত্রীর বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বারো করায় তখন দেশে কী মার মার কাট কাট রব উঠেছিল। অথচ আজ একরূপ প্রতিটি পরিবারেই বিশ-পঁচিশ-এর আগে মেয়েদের বিয়েই হচ্ছে না। আর এই বয়সে বিয়ে হচ্ছে শুধু শহরেই নয়, পল্লীবাংলারও প্রায় ঘরে ঘরেই।

ঠাকুরদাসকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি পড়ে তাই দেখা যাচ্ছে, সমসাময়িক কাল বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি শুধু স্বচ্ছই ছিল না, তখনকার হাইকোর্টের জজ রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়েও তিনি ছিলেন অনেক বেশী উদার, চিন্তাবিদ ও প্রগতিশীল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

জয়পুরের জন্মদিনে

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধে। জয়পুর। এসেছি কিছুক্ষণ হলো। হোটেলে নামমাত্র জিরিয়ে নিয়ে এই শহরের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্যে বেছে নিয়েছি একটি প্রাত্যহিক বাজার। এক বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক আসার সময় বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর একটি জয়পুরী ঝুলির শখ। এই মুহূর্তে আমি এমন একটি ঝুলির সন্ধানী যেটি হবে কলাকৌশলে নিঃসন্দেহে জয়পুরী। আমি কিন্তু ক্রমাগত বুঝতে পারছি যে জয়পুরের এই বাজারটি বড়া বেশি জটিল ও বিন্যস্ত। এবং এর অন্দরমহলের ঘূর্ণন কোনো বিদেশীর পক্ষে সহজে বুঝে নেয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এই তথ্যটি বুঝে ফেলতে আমার আরো একটি দিন লাগবে যে জয়পুরের প্রায় যে-কোন রাস্তায় পথ-হারানোর মতো স্বাভাবিক কাণ্ড আর কিছুই ঘটতে পারে না। রাস্তার নাম কোথায় যে গোপনে ঘোষিত থাকে, চোখে পড়বে না আপনার। এবং পড়েও কোনো লাভ নেই, কেননা রাস্তার নাম চৌরা-রাস্তা, গাঙ্গুরি বাজার, বা মোতি-কাতরা-কা বাজার, যাই হোক না কেন, এদের চেহারার মধ্যে এতদূর বৈষম্য আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব, যাতে একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে চিনে নিতে পারা যায়। গোলাপী-শহর জয়পুরের বাজার এলাকায় এমন একটি আকস্মিক বাড়িও দুর্লভ, যার গায়ের রং হলুদ, সবুজ কিংবা লোহিত। সমস্ত শহরটি এক ব্যাপক সংক্রামক গোলাপীর দ্বারা আক্রান্ত এবং প্রায় পোপ-এর কবিতার ধরনে এসব বাড়ির আঙ্গিক, বিন্যাস, ছন্দ একেবারে এক। আমাদের চোখ ও মনের পক্ষে নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক এই বৈচিত্র্যহীন সমীকরণ। কতিপয় বৃহৎকায় এমপোরিয়াম স্টোরসগুলির কথা বাদ দিলে, এখানকার খানদানী মার্কেটগুলিতে টুরিস্টদের জন্যে কোনো বাহ্যিক মনোহারী প্রচেষ্টা পর্যন্ত নেই। পথের দু-পাশে গোলাপী রঙের সারিবদ্ধ বাড়ি, আর তারই নীচে-নীচে ছোটো ছোটো সুপারির আকারে শ্রীহীন

বিপণিশ্রেণী। কোনোটি কাঠের খেলনার, কোনোটি পাথরের বাসনের, কোনোটি জুতো, বিছানার চাদর, গাড়ি কিংবা ওষুধের। কিন্তু দুপরিগুলির আকারে, অঙ্গ-সজ্জায় এবং রঙে কোনো উনিশ-বিশ সহজে দৃশ্য নয়। শুধু সাইন-বোর্ডের হিন্দি হরফগুলি পালটে-পালটে যায়—বিদেশীর চোখে প্রায় প্রতীকের মতো। তবে এই সব সাইনবোর্ড এবং আকাশলগ্ন বিজ্ঞাপনে অক্ষরের গঠন ও বিন্যাস প্রভেদহীনভাবে সাদামাঠা। মনে হয় না যে আধুনিক বিজ্ঞাপন-রীতির একটি কৃপণ স্রোতও রাজস্থানী ব্যাপারী-মহলের আটপৌরে সাবেক[১]-য়ানার কোনো দুর্বল ছিদ্রপথে ঢুকতে পেরেছে। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ক্যালিগ্রাফি বা টাইপোগ্রাফির যে কোনো আত্মীয়তা থাকতে পারে সে-বিষয়ে এঁরা এখনো সম্পূর্ণ অচেতন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য : জয়পুরের সাবেকী বাজারগুলিতে ইংরেজী সাইনবোর্ড আমার প্রায় চোখেই পড়েনি। এই নির্ভেজাল স্বদেশীয়ানা ও ইংরেজী-বিদ্বেষই বোধহয় উইন্ডোশপিং-এর মতো একটি নিখরচার পশ্চিমী-বিলাসকে রাজস্থানী বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার না-দিয়ে নির্ভেজাল বাণিজ্যকে নিছক মজার চণ্ডাজী মিশ্রণ থেকে মুক্ত রেখেছে। ফলে শহরের বাজারগুলি ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে চলেছে—ভিড় বাড়ছে, দোকান বাড়ছে, বাণিজ্য বাড়ছে। এবং এই ক্রমিক বৃদ্ধির ফলস্বরূপ যে সমগ্র জয়পুর শহরটিই অদূর ভবিষ্যতে একটি ব্যাপক বাজারে পরিণত হতে পারে সে আশঙ্কাও একান্ত অলীক নয়। কিন্তু কলকাতার নিউমার্কেট-এর মতো একটি বর্ণিল বাজার, যেখানে সারাদিন ধরে ঘুরেফিরে একটি নিটোল ছুটির মেজাজ পুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে, এবং তা পারে ইচ্ছে করলে একটি কানাকড়িও না খসিয়ে—এমন কোনো স্বপ্ন বিলাসের লোভনীয় প্রাঙ্গণ জয়পুরের বাজার আজো ভাবতে পারেনি। এখানে সাজানো-গোছানো উইন্ডো বা শো-কেসই বিশেষ চোখে পড়ে না। আসলে সওদার রীতিটাই এখানে অন্যরকম। কলকাতার বড়বাজারের সঙ্গে হাবভাবে কোথায় যেন একটা আদল আসে। এখানে যে-কর্তব্যের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি ক্রমে নিশ্চিত হয়ে যাই, তা হলো আপনাকে মনে-মনে ভেজে নিতে হবে যে আপনার লক্ষ্যবস্তুটি কি

—বিখ্যাত বাঁধুনি শাড়ি, অথবা কাঠের খেলনা; উজ্জ্বল, কঠোর নাগরা, অথবা মসৃণ ধবল পাথরের বাসন; অথবা সূক্ষ্ম, বর্ণময় মিনের অলঙ্কার। তারপর আপনাকে বেছে নিতে হবে ঠিক দোকানটি, চোখেমুখের সমস্ত উৎসুক আগ্রহকে একটি আপাত ব্যাজারভাবে লুকিয়ে রেখে, কেননা কোনো বিশেষ পণ্যবস্তু সম্পর্কে ক্রেতার আগ্রহ প্রকাশ পেলেই সেটির মূল্য একেবারে নাগালের ডিঙি-মারা ডগায় উঠে যেতে দেখলাম একাধিকবার। অধিকাংশ দোকানেই বসার জন্যে কোনো উচ্চাসন নেই। রয়েছে বহু পদচিহ্নে ধূসর একটি গদি, যেখানে আপনি আপনার গরম প্যান্টের আড়ষ্ট ইস্ত্রির বিরুদ্ধে আসীন হলে আপনার সামনে থরেথরে প্রদর্শিত হবে ঈপ্সিত সামগ্রী। একটির পর একটি দোকানে এই অভিন্ন অভিজ্ঞতা আমায় অন্তত ক্লান্ত করছে না—প্রায় প্রতিটি বস্তুই আমার অনভ্যস্ত চোখের পক্ষে এমনি আকর্ষণীয়ভাবে অভিনব এবং আমার মধ্যবিত্ত পকেটের পক্ষে এমনি ঈর্ষণীয়ভাবে সুদূর! একটি পাথরের ফুলদানী কিংবা কৃষ্ণমূর্তি, যা এমনি নিখুঁতভাবে শিল্পীত যে আপনার পক্ষে কিছুক্ষণ চোখ ফেরানো অসম্ভব হয়ে উঠবে—এদের মূল্যের অঙ্ক সাত-আট হাজার পর্যন্ত চলে যেতে পারে। কারা এসব বিরল মরীচিকার সন্ধানী ও ভাগ্যবান ক্রেতা? আমার এই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে একাধিকবার, যখন দেখেছি কোনো দুর্লভ ফুলদানী কিংবা রক্তবর্ণ মখমল-আবৃত কোনো রূচামান কেদারার পাশে একটি ত্রিকোণ ফলকে এমনি এক ঘোষণা : মূল্য মাত্র ৩০,০০০্। ক্রেতা শিকাগোর শ্রীমতী বারবারা লেভি, কিংবা মিচিগান-এর জেসেল।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে রয়েছে দিল্লি এবং আগ্রার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি। অথচ জয়পুরী বাজার সম্পূর্ণভাবে এদের প্রভাবমুক্ত। দিল্লি-আগ্রার ধুরন্ধর ব্যাপারীদের ব্যবহারিক সৌকুমার্য স্পষ্টতই জয়পুরী বণিকদের অনুকরণীয় নয়। রাজধানীর জনপথ কিংবা গ্রেটার কৈলাসে, অথবা আগ্রার সম্ভ্রান্ত সদরবাজারে ঝটিকা-সওদার সময় আপনার কণ্ঠে ক্রমাগত ক্ষুরের স্পর্শ অনুভব করতে-করতেও যে উপরি-পাওনাটি আপনার জুটে যাবে তা হলো কিঞ্চিৎ হাসি, সৌজন্য, বিনতির বিনি-

ময়। নিশ্চিতভাবে এ সমস্তও একান্ত ব্যবসায়িক কায়দা, এসব কিছুর প্ররোচনা দিচ্ছে কুটিল বাণিজ্যিক ধান্দা,—কিন্তু সওদার বিল চুকিয়ে দেবার পর যখন কখনো-কখনো ফিরতি খুচরোর সঙ্গে আপনার হাতে আসে এক কাপ এলাচিত ও ধূমায়িত চা, কিংবা ফেনিল বোতলে সোনালি শীতল সেভেনটি-সেভেন, যা দিল্লি এবং আগ্রায় অধুনালুপ্ত কোকো-কোলার বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং যা কলকাতায় এখনো অপ্রাপণীয়—সেই সংক্ষিপ্ত আপ্যায়নও আপনার ছুটির মেজাজকে নিঃসন্দেহে ইন্ধন জোগায়। তবে উল্লেখ না-করে উপায় নেই যে জয়পুরী-বাজারগুলি, তাদের ব্যবহারিক নিরুত্তাপ সত্ত্বেও, বাণিজ্যে প্রতিবেশী বাজারগুলির সক্ষম প্রতিযোগী। বরং সমস্ত জয়পুর-শহরটিকে একটি ক্রম-বর্ধমান বাজার বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিটি জন-পথের নামের সঙ্গে সেখানে প্রায় আবশ্যিকভাবে সংলগ্ন একটি করে বাজার : চানদপোল বাজার, ত্রিপোলিয়া বাজার, রামগনজ বাজার, সুরয-পোল বাজার, কিষাণপোল বাজার, জোহারি বাজার, মোতি বাজার, দরওয়াজা বাজার—যেন প্রতিটি পথ নিরন্তরভাবে কাঞ্চনলিপ্সু, এবং এই একমুখো ছুটের কোনো জিরেন নেই। জয়পুরী-বণিকদের কুবেরসিদ্ধির মূলেই রয়েছে তাঁদের এই নিরলস পরিশ্রম ও ধান্দা। এমন কি আয়োজিত সফরের সময়ে সরকারী টুরিস্ট বাসের পরি-চালক-যুবকটি পর্যন্ত যাত্রীদের কাছ থেকে মাথাপিছু তিন টাকা করে সংগ্রহ করে অবলীলায় পকেটে রেখে দেন!

এই সুযোগ-সন্ধানী বাণিজ্যের অবশ্য আমরা কোনো প্রতিবাদ করি না—পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় ও মৃদু কৌতুকের মধ্যে গাইড-এর এই পেশা-দারী চাতুর্য গৃহীত হয়ে যায়। তার কারণ হয়তো সমগ্র জয়পুর জুড়ে এই মুহূর্তে যে খুশি ও উৎসবের আব-হাওয়া পরিব্যাপ্ত, তারই ব্যাপক সংক্রাম। ১৯৭৮-এ জয়পুর তার দ্বিশত-পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে। দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা এসেছেন এই জন্মদিনের উৎসবে। অগ্রিম-কক্ষ সংগ্রহ না-থাকলে হোটেলের পর হোটেল আপনাকে বিমুখ করবে। অবশ্যই সংবাদপত্রে-তথ্যচিত্রে-দূরদর্শনে—পর্যটন-বিভাগীয় পত্রিকায় বহু-

বিজ্ঞাপিত এই জন্মদিন-উৎসবের আহ্বানে প্রত্যাশিত সাড়া জেগেছে। তবে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে এখন যাঁরা নিজেদের 'ট্রিপি' বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁরাই এই শহরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আদৃত। জয়পুরের চোখে এঁদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ভারতীয় পর্যটকদের তুলনায় শতগুণ অধিক। হিপিদের সঙ্গে ট্রিপিদের প্রভেদ স্পষ্ট-ভাবে প্রতীয়মান এঁদের পরিচ্ছদ ও ব্যবহারিক চারুতায়—এঁদের চুল খাটো ও সযত্নে বিন্যস্ত, উচ্চারণ ঋজু, দৃষ্টি হাশিশ্-অনাক্রান্ত, এবং এঁদের মেয়েরা অধিকাংশই অন্তর্বাস পরেন। এবং হিপিদের তুলনায় এঁরা অনেক বেশি বিত্তবান ও কেনাকাটায় আগ্রহী। ক্যালিফোর্নিয়ার রিচার্ড-রেনস-এর কথাই ধরা যাক। বছর চৌত্রিশ বয়েস। জয়পুরের জন্মদিন-উৎসবে এসেছেন বান্ধবী কৌশল্যা সাহীয়ার-এর আমন্ত্রণে। দু-বছর ধরে শুধু চিঠির মাধ্যমে এঁদের আলাপ, বন্ধুতা, পারস্পরিক সুষমার বিনিময়। চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎ এই প্রথম। রিচার্ড জয়পুরের প্রতিটি বাজার থেকে সংগ্রহ করেছে একটি-দুটি স্মারণিক—মার জন্যে জয়পুরী বিছানার চাদর, বাবার জন্যে পাথরের ছাইদান, দুই বোনের জন্য ঘাগরা, মিনের অলংকার, মনোমুগ্ধকর বাঁধনি শাড়ি, রিচার্ড দেশে ফিরছেন একা নয়, সঙ্গে নিচ্ছেন কৌশল্যাকে। অতএব তাঁর ভগ্নীদ্বয়ের পক্ষে বাঁধনির যথাযথ ব্যবহার শিখে নেয়া কঠিন হবে না।

মাত্র দু-দিন এসেছি জয়পুরে। একটি শহরের আত্মীয় হয়ে ওঠার পক্ষে মাত্র দু-রাত্রির সহবাস যথেষ্ট নয়। তবে এই ব্যাপ্ত উৎসবের আকার ও চরিত্র থেকে এইটুকু বুঝতে পারছি যে, আমাদের মতো বাঙালীর সঙ্গে এই ঋজু, কঠোর, রাজপুতদের মূল প্রভেদটা কোথায়। উৎসব উপলক্ষে পথে-পথে আলোর সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়েছে। শহরের কোনো-কোনো বাড়ির খুপরির মতো গবাক্ষে জড়ানো রয়েছে শীতের-হাওয়ায় কুঁকড়ে-যাওয়া হলুদবর্ণ ফুলের মালা। কোনোকোনো বিপণির প্রবেশপথে উড়ছে বিচিত্রবর্ণের ও ছাঁটের ঘুড়ির-কাগজ। এবং জোহরি-বাজার সরগরম করে অনর্গল প্রবহমান হিন্দি-চলচ্চিত্রের হিট্-সং। জয়পুর-জয়ন্তীর এই দেশব্যাপী প্রবল হুজুগকে কাজে

লাগিয়েছে সবচেয়ে বেশি এমপোরিয়াম স্টোরসগুলি। বিদেশী ক্রেতাদের জন্যে সেখানে এক গুচ্ছ ধূপকাঠির মূল্য পঁচিশ টাকা পর্যন্ত উঠতে দেখলাম! একটি ক্ষুদ্রকায় মশলার-কৌটোর জন্যে আপনাকে দিতে হবে মাত্র তিনশো টাকা! তবু এই উৎসব প্রাঙ্গণে দুটি বাঙালীগণের একান্ত অভাব—একটি বাঙালী-বিধুরতা, অন্যটি বাঙালী-সৌজন্য। কিংবা বাঙালীর উৎসব প্রাঙ্গণে মেয়েদের নম্র সঞ্চরণ, কল্লোলিত গুঞ্জন, চাপা কৌতুক—যা কিছুই আমাদের সংবেদনায় চকিতে তরঙ্গ তোলে, সে-সব এই মরুপ্রদেশের অন্তঃপুরে অবিদ্যমান। রাজপুত ব্যবহারে যেমন কাঠিন্য, রাজপুত সংলাপে তেমনি দ্রবতার অভাব লক্ষণীয়। রাজস্থানী হিন্দি কিংবা মেওয়ারি আমি যতই শুনছি, ততই এই ভাষান্বয়ের প্লাসটিক-ধর্মিতা বিষয়ে আমি সন্দিহান হয়ে পড়ছি।

রাতে, ঘুমচোখে, অপ্রত্যাশিতভাবে, বাথরুমের জানলায় আমি দেখতে পাই চিলতে আকাশ। এখানে রাত্রি কি নির্মল নীল, নক্ষত্রেরা কী বাঙ্ময় উজ্জ্বল! মনে পড়লো জয়সলমীর কিংবা বারমের-এর আকাশে নক্ষত্রদের কেমন ডাইনীচোখের মতো দেখায়। জয়পুর রাত্রির জ্যোতি-র্মালা তুলনায় অনেক বেশি স্পর্শময় ও মৃদুভাষী। এখানে কবি ও প্রেমিকারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান! অবশ্য রাজস্থানী সাহিত্যের যেটুকু আমার কাছে অনুবাদে চুঁইয়ে এসেছে, তাতে মনে হয় এই অলীক নিসর্গকে আধুনিক কবিতার পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে নেবার মতো কবির জন্যে এখনো এই মরু ও পার্বত্য অঞ্চলের সাহিত্য অপেক্ষমান।

এখনো দুদিন থাকছি জয়পুরে। ঠিক করেছি আয়োজিত সফরের সুযোগ নেব শেষ দিনটিতে। হাওয়া-মহল, অম্বর প্যালেস, সিটি প্যালেস—প্রতিটি পর্যটকের পক্ষে এই আবশ্যিক ত্রয়ী : সরকারী তত্ত্বাবধানে এদের একদিনেই সেরে ফেলা যায়। কিন্তু এদের জন্যে আমার এই মুহূর্তে কোনো তাড়া নেই। আমি বরং চলতি শহরের আরো কিছু খুঁটিনাটি জেনে নিতে চাই, শব্দ পেতে চাই শহরের জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের, আর একবার অন্তত চলে যেতে চাই সেই বিদেশী-বিমুখ অন্দরমহলে, যেখানে এক নেপথ্য ব্যস্ততায় লিপ্ত রয়েছেন জয়পুরের হাজার কারিগর, এবং বিরল কিছু শিল্পী—তৈরি করছেন আকাশি-নীল কাচের-বাসন বা ব্লু-পটারি, কিংবা আশ্চর্যসূক্ষ্ম মিনের অলঙ্কার, কিংবা সানগানেরি-শাড়ি।

যে-কোনো একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ুন আপনি, দেখবেন জয়পুর, সরকারী পর্যটন-দপ্তরের সমস্ত বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও, যে-কোনো ভারতীয় শহরের মতোই সংকীর্ণ, জনবহুল, দরিদ্র, অপরিষ্কার। আমার মতো আজীবন কলকাতাবাসীর কাছেও এ-শহরের জঙ্গমতা ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি নিরন্তর জনস্রোত। কিন্তু এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিতে যে জয়পুর কলকাতার মতো এতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি, এই যে সেখানে প্রত্যেকের জন্যে অন্তত কুলিয়ে যাবার মতো জায়গা জুটে যাচ্ছে, তার কারণ এই শহরের একান্ত ব্যবহারিক গঠন ও পরিকল্পিত বিন্যাস। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, কী কঠোর এক নিয়ন্ত্রণ কাজ করেছে সমগ্র শহরটির পরিকল্পনায়।

শহরের কেন্দ্রে রয়েছে বিখ্যাত বাজারগুলি এবং বাণিজ্যমহল। প্রতিটি জনপথ—সব জটিল ঘূর্ণনের শেষে—একত্র হয়েছে এখানে। সমস্ত শহরটি মোট নটি ধাপে এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিস্তৃত হয়ে আছে। শহরের উত্তরাংশে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও হর্ম্যশ্রেণী। এ-অংশের নাম চোক্‌রি সারহাদ। অন্যান্য যে আটটি স্তরে জয়পুর বিছিয়ে আছে তাদের নাম চোক্‌রি রামচন্দ্রজী, চোক্‌রি গঙ্গাপোল, তোপখানা হাজুরি, ঘাট দরওয়াজা, চোক্‌রি বিশ্বেশ্বরজী, চোক্‌রি মুদিখানা, তোপখানা দেশ ও পুরানা কস্তী। একটি প্রাচীন মানচিত্রে এ-শহরের ক্রমিক বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপটি আমরা বুঝতে পারি : জনপথ-গুলি ক্রমাগত উত্তরাংশে শুরু হয়ে চলে গেছলো শহরের কেন্দ্রস্থ দুটি উঠোন বা চৌপারস্-এর দিকে—যার দু-পাশের রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিলো অভিন্ন আকারের একশো-বাহাত্তরটি দোকান নিয়ে এক ঋদ্ধিশালী বাজার। এই পুরোনো মানচিত্রটি গঙ্গাপোল থেকে অম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রবল ও প্রহরীপ্রতিম প্রাচীরেরও সাক্ষী। শুধু শহরের দক্ষিণ অংশে প্রবেশের জন্যে উন্মুক্ত ছিলো তিনটি দরজা—রাম পোল, শিব পোল, (আধুনিক নাম শারগানের গেট) এবং

কিষাণ পোল (আধুনিক নাম আজমিরি গেট)। কিন্তু একটি মাত্র প্রাচীরের প্রহরাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি বলে শহরের অনতিদূরে তৈরি হলো একটি নতুন দুর্গ—সুদর্শনগড়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই দুর্গটিকেই আমরা এখন নাহারগড় বা টাইগার ফোর্ট নামে সহজে চিনতে পারি।

১৭২৭-এর ১৮ই নভেম্বর। জয়পুরের জন্মদিন। প্রথম পাথরটি সযত্নে শুইয়ে দিলেন মহারাজা সওয়াই জয় সিং। পণ্ডিত জগন্নাথ সম্রাট—যিনি রাজগুরু এবং এই পত্তন-উৎসবের প্রধান—করলেন মন্ত্রপাঠ। পবিত্র পৌরোহিত্যের প্রণামী পেলেন আট বিঘে জমি। এর জন্যে তাঁকে কর দেয়ার দায় থেকেও পরিত্রাণ দেয়া হলো। এই উৎসব উপলক্ষে মোট খরচ হলো এক হাজার তিরাশি টাকা পাঁচ আনা—এই তথ্যটুকু জানা গেল বিকানীর রাজস্থান সরকারের আরকাইভস বা সংরক্ষণাগার থেকে। কিন্তু এই উৎসবের পরে আরো এক বছরের জন্যে দীর্ঘায়িত হলো আয়োজনপর্ব। ১৭২৮ সালে শুরু হলো সেই পটু ও নিরলস পরিশ্রম এবং চললো এক নাগাড়ে প্রায় পনেরো বছর ধরে, বলা যায় ১৭৪৩-এ জয় সিং-এর মৃত্যু পর্যন্ত, এবং তারও পরে কিছুদিন—আর এমনিভাবে, হাজার হাজার নেপথ্যচারী কর্মীর সাহিক আত্মত্যাগ আর একটিমাত্র মানুষের প্রতিভার পৃষ্ঠ-পোষকতায় রচিত হলো জয়নগর—ভারতবর্ষের সেই প্রথম পরিকল্পিত সুশৃংখল শহর, যার নাম পরিবর্তিত হয়ে পরে হলো জয়পুর।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই শহরের পত্তন থেকে শুরু করে, এক দীর্ঘ, জটিল বিবর্তনের পথ পার হয়ে, পরিণতির তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছনো পর্যন্ত যাঁর পরিব্যাপ্ত কল্পনা, প্রখর মেধা এবং নিচ্ছিদ্র বাস্তববোধকে আমরা নানা দিকে স্রোতস্বল দেখি তিনি এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনায় এক তিরিশ বছরের বাঙালী ছোকরা এবং সুপরিণত অন্তিমে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক কীর্তিমান, ভগ্ন-স্বাস্থ্য বাঙালী প্রৌঢ় যাঁর কপালে একাধিকবার জুটেছে সরকারী খেতাব, যাঁকে পুরস্কৃত করেছেন স্বয়ং মহারাজা জয় সিং। কিন্তু এ যেন তাঁর সব অবিচল নিষ্ঠা, অমোঘ পরিশ্রম, অনন্য পরিকল্পনা আর অকল্পনীয় সাফল্যের জন্যে হাতে হাতে
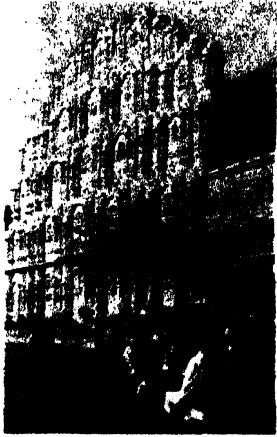
পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেয়া, যাতে ভবিষ্যতের কাছে তাঁর কোনো প্রত্যাশা না থাকে, যেন জয়পুরের ইতিহাস কোনো কালে এই বাঙালী রাজকর্মচারীর প্রতি ঋণবোধে না বিব্রত হয়ে পড়ে।

নাম বিদ্যাধর চক্রবর্তী। বাঙালী ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৬৯৭। মহারাজ দ্বিতীয় সাওয়াই জয় সিং-এর (১৬৯৯-১৭৪৩) নজরে পড়লেন দৈবাৎ। কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য, যিনি সম্ভবত বিদ্যাধরের এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি—তাঁরই সঙ্গে বিদ্যাধর একদিন রাজপ্রাসাদে বেড়াতে এসেছেন মাত্র, যেহেতু কৃষ্ণরাম একজন খ্যাতিমান স্থপতি এবং তাঁরই পরামর্শে নতুনভাবে পরিমার্জিত ও বিন্যাসিত হচ্ছে অম্বরের প্রাসাদ। এই মুহূর্তে জয় সিং ও কৃষ্ণরামের আলোচনার বিষয় একটি সম্ভাব্য সোপানশ্রেণী, যা হবে শৈলী ও চটকদারিতায় মোতি মহলের উপযোগী। কৃষ্ণরাম সঙ্গে এনেছেন তাঁর পরিকল্পিত একটি সিঁড়ির ছক। এবং তাঁর সঙ্গে এসেছেন বিদ্যাধর। কৃষ্ণরাম পরিকল্পিত সোপানশ্রেণী জয় সিং-এর মনে ধরলো না। অথচ কোনো কিছুর জন্যে বেশি দিন অপেক্ষা করা এই যুবক নৃপতির স্বভাব বিরুদ্ধ। আকস্মিকভাবে কৃষ্ণরামের পক্ষে যা একেবারেই অবিশ্বাস্য তাই ঘটলো। তাঁর নাবালক, অশিষ্ট আত্মীয়টি বলে বসলো মাত্র এক দিনের মধ্যে মোতি মহলের উপযোগী একটি সোপানশ্রেণীর ছক সে তৈরি করে দিতে পারবে। পরের দিন সত্যি সত্যিই ছকটি তৈরি হয়ে গেল—এমন এক সোপানশ্রেণী যা নিঃসন্দেহে রমণীয় ও উদ্ভাবনায় চমক লাগানো, কিন্তু শুধু তাই নয়, যা নিখুঁতভাবে ব্যবহার্যও। জয় সিং-এর সঙ্গে বিদ্যাধরের সেই প্রথম সংযোগ।

একজন রাজপুত নৃপতি, অন্য জন এক বাঙালী স্থপতি—অথচ উভয়ের প্রতিভা ছিলো আশ্চর্যভাবে পরস্পরের পরিপূরক। জয় সিং-এর কল্পনা, উৎসাহ, বৈদগ্ধ্যের সাহচর্যে যে-সব ভাবনা ও পরিকল্পনা ধীরে ধীরে পুষ্টি পায়, তাদের বাস্তব রূপান্তর ঘটায় বিদ্যাধরের বিস্ময়কর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা। জয়পুর—ভারতবর্ষের প্রথম পরিকল্পিত শহর। এর পিছনে যতোখানি রয়েছে জয় সিং-এর কল্পনা, প্রতীচ্যের আধুনিক শহরগুলি বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের পঠন ও ভাবনা, এবং তাঁর মেধা ও দূরদৃষ্টি, ঠিক ততোখানিই আছে বিদ্যাধরের নিরন্তর সৃষ্টিশীলতা—জয় সিং-এর যে কোনো আপাত অবাস্তব ভাবনাকে মুহূর্তে শুষে নিয়ে সেটিকে একটি কঠোর ব্যবহারিক রূপ দিতে তিনি সর্বদা তৎপর ও নিপুণ। ফলে, এই দুই প্রতিভার দ্বারা পালিত হয়ে, ক্রমে পুষ্টি পেলো এমন এক শহর যেটি এই মরু ও পার্বত্য অঞ্চলের দুর্নিবার গ্রীষ্ম ও শীতকে কব্জা করার পক্ষে যথেষ্ট—প্রাসাদ, প্রতি দিনের ব্যবহার্য বাড়ি, সারিবদ্ধ দোকান ঘরগুলির গঠন এমনি যে গ্রীষ্মের রোদ্দুর সরাসরি সেখানে ঢুকতে পারে না, বাধা পায় ঝুলন্ত কার্নিশ, বারান্দা কিংবা মনোরম পাথরের জালিতে। আবার শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়ার কাছেও জয়পুরের ব্যূহ অভেদ্য—অন্দরমহলের আরাম শীতকালেও অটুট থাকে। মাত্র দু-বছর সময়ের মধ্যে জয়পুরের প্রাথমিক কাজ শেষ করলেন বিদ্যাধর। প্রতিটি পর্যায়ের কাজ ও সংস্কারসাধনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখেন তিনি, এবং সেই সঙ্গে নতুন পর্যায়ের কাজ শুরু হলে তাঁর পরিকল্পনাটিকে জয় সিংহের অনুমতি কিংবা সমালোচনার জন্যে পেশ করেন। বিদ্যাধর-কৃত এসব ছকের কিছু কিছু এখনো সিটি প্যালেস মিউজিয়াম-এ রক্ষিত আছে।

এইভাবে তৈরি হলো অলংকরণে ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিহীন একটি শহর—রয়েছে প্রাসাদ, হাভেলি, বাজার, গেরস্থের সহজ সুরম্য কুটির, দেবালয় ও উপাসনা মন্দির, আয়না-চিকন জনপথ, সরু সরীসৃপ পায়ে-চলার পথ, এমন কি পথের মাঝে উজ্জ্বল, মনোহর, ছোটো ছোটো অবকাশ-উদ্যান পর্যন্ত। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না বিদ্যাধর—তৈরি করলেন বিস্তৃত, মসৃণ, বর্ণ ও বিন্যাস এমন নিপুণ এক রাজপথ যেখানে স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারে জয় সিং-এর স্তরে স্তরে সজ্জিত রথ—ইন্দ্র-বিমান। এবং লক্ষ্য রাখলেন যেন না মহারাজার এই প্রমোদ ভ্রমণ পথের দু পাশে উত্তেজনা ও কৌতুকের অভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। তৈরি হলো জলাশয়, বিচিত্র বিন্যাসের কুঞ্জবন, রঙিন ফোয়ারা, এমন কি গেরস্থ বাড়ির দেয়ালে পর্যন্ত প্রসাধনের অভাব রইলো না। সন্ধ্যার পরে জয়পুরের রূপান্তর ছিলো আরো এক বিস্ময়—সারিবদ্ধ

রোশনাই, যেন সমগ্র শহরটিই একটি প্রমোদ ভবন, আর চারধারের এই দীপালীকে ছাপিয়ে শুধু আলো দিয়ে আঁকা একটি প্রাসাদের পরিলেখ—নাম চন্দ্রমহল। এটিও তৈরি হয়েছে বিদ্যাধরের পরিকল্পনা মতো। এখানে মহারাজার চন্দ্রালোকিত রাত্রি যাপনের সব আয়োজন ও ব্যবস্থা পরিপাটি করে রেখেছেন তিনি। কোনো সুদূর নদী থেকে প্রত্যহ ব্যবহার্য জলেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন বিদ্যাধর।

তবু এই বিশাল কীর্তির পরিপ্রেক্ষিতেও বিদ্যাধরের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, অন্তত যতক্ষণ না তাঁর পরিকল্পিত রাজপ্রাসাদের সমগ্র চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার হচ্ছে—তৈরি হয়েছে সারিবদ্ধ শকটের জন্যে বগিখানা; সুসজ্জিত হস্তীযূথের জন্যে পিলখানা; অরণ্য-ভ্রমণ বিষয়ক সব দায়িত্ব গ্রহণকারী একটি পৃথক কার্যালয়—শিকারখানা একটি বিলাসবহুল উষ্ণ-স্নানাগার; মূল্যবান রত্নরাজি সংরক্ষণের জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ; এবং এই প্রাসাদের মধ্যেই রয়েছে আর এক মায়াবী বিলাসভবন, শুধুমাত্র রাণীর প্রসাধন কিংবা অবকাশরঞ্জনের জন্যে। কিন্তু এততেও বিদ্যাধরের প্রতিভা আঁটলো না; জয় সিং-এর অর্থ ও উৎসাহে এবং এই বাঙালী নৃপতির প্রণোদনায় তৈরি হলো জয়পুরের জন্তরমন্তর।

দিনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলো-ছায়ার স্থান পরিবর্তনের সূক্ষ্মবিচারী এই সময় নির্ধারণের যন্ত্রগুলি ইলেকট্রনিক ঘড়ির যুগে একেবারে অচল। কিন্তু প্রতিটি যন্ত্রের গঠনে আধুনিক অ্যাবস্ট্র্যাকট্ কম্পোজিশান-এর চরিত্র-লক্ষণ আবিষ্কার করে আমরা বিস্মিত হই। সন্দেহ থাকে না যে, শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎসাহেই এই জন্তর-মন্তরটি রচিত হয়নি। এবং আজও যে এটি আমাদের কাছে পুরোনো হয়ে যায়নি, তার কারণ এর আবেদন এখন বিশুদ্ধভাবে নান্দনিক। কি অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যে প্রতিটি যন্ত্রের বিশেষ গঠন ও অবস্থানের মাধ্যমে সমগ্র প্যার্টানটির ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, সেটি সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যদি বিশাল 'সম্রাট' যন্ত্রটির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সমগ্র জন্তর-মন্তরটিকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখি।

কিন্তু শুধুমাত্র জয় সিং-এর অর্থ ও আকাশচারী উৎসাহ এবং বিদ্যাধরের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ঐতিহাসিক সমন্বয়েই তৈরি হয়নি এই জন্তরমন্তর। এই সৃষ্টির নেপথ্যে কাজ করেছে এক অনাম্নী সুন্দরীর অনুপ্রেরণা—যার কাছে সব রাজকর্ম কিংবা গুণী-সান্নিধ্যের সব বিদগ্ধ আনন্দ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসেন জয় সিং, কেন না এই সরল কিশোরীর পঠনের পরিধি যতো কম, কৌতূহল ও অন্বেষা ততো বেশি। পাহাড় থেকে সমুদ্র, অরণ্য থেকে আকাশ—সর্ব বিষয়ে এই কিশোরীর সমান উৎসাহ। এবং যিনি তার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানেন, সেই মেধাবী নৃপতিই তার কৈশোরকে স্বপ্নের ইন্ধন, প্রণয়ের যোগ্য।

নৃপতি প্রেমিকের সঙ্গে রাত্রি-যাপনের সময়ে হয়তো গবাক্ষপথে নক্ষত্রমালার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলো এই কিশোরী—যে-প্রশ্নের কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান জয় সিং-এর জানা ছিলো না। এবং এই প্রশ্নেরই সূত্র ধরে তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন সূর্য-সিধান্ত নামের একটি সুপ্রাচীন (চতুর্থ শতাব্দী) সংস্কৃত গ্রন্থের নাসির-উদ্দীন-আল্ তুলসি-কৃত ফার্শি অনুবাদে। এই পুস্তকে তাঁর কিশোরী প্রেমিকাকে খুশি করার মতো দু-একটি অব্যর্থ সমাধান হয়তো জয় সিং পেয়েছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থেরই অভিঘাতে এই তীক্ষ্ণধী ভূপতির মনে উদ্দীপ্ত হলো নক্ষত্র—মহাকাশ—সূর্য—সময় বিষয়ক যোজন-বিস্তৃত কৌতূহল। এবং যেসব মৌলিক প্রশ্ন তাঁর সামনে শেষ পর্যন্ত একের পর এক দেয়াল তুলে দাঁড়ালো, সেগুলি অবশ্যই তাঁর কিশোরী প্রেমিকার ভাবনা ও আয়ত্তের অতীত, কিন্তু এদেরই লম্বা দাবির চাপে জয় সিং-এর পঠনের পরিধি বিস্তৃত হতে হতে পৌঁছে গেলো টলেমির বিখ্যাত গ্রন্থ সিনট্যাকস্ইস্ পর্যন্ত। টলেমির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মূল গ্রীক রচনার আরবি অনুবাদ পর্যন্ত জোগাড় করলেন। পণ্ডিত জগন্নাথ সম্রাট—যিনি বহু ভাষাবিদ এবং গণিত ও বিজ্ঞানে বিদগ্ধ—তাঁরই [illegible] আরবি, ফার্সি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি পাঠ করতে থাকলেন জয় সিং। এবং একই সঙ্গে গুজরাটি পণ্ডিত জয় বিনোদের

কাছে গণিতচর্চা শুরু করলেন তিনি। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত পুণ্ডরীক রত্নাকরেরও ডাক পড়লো উপবাস ও নানাবিধ ধর্মীয় কৃচ্ছ্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও যাথার্থ্য দেবার জন্যে। এ ছাড়া সংস্কৃত অনুবাদে পিয়েরে দে লা হায়ার ও উলুগ বেগ-এর গণিতচর্চার সঙ্গেও পরিচিত হলেন এই বিদগ্ধ ও জ্ঞানান্বেষী নৃপতি। কিন্তু এই সবও তাঁর অন্বেষণের পক্ষে মনে হলো নিতান্ত সামান্য। কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও—এ'দের সব আবিষ্কার ও ভাবনার সানুপুঙ্খ বর্ণনার জন্যে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পাঠালেন ইয়োরোপে। মহম্মদ শারিফ এবং মহম্মদ মেহ্দি—এ'রা প্রেরিত হলেন আরব দেশগুলিতে পুরোনো পুঁথির সন্ধানে। পর্তুগাল-এর রাজার সঙ্গে করলেন পত্র ও প্রীতির বিনিময়। ফলে ১৭৩০ সালে পর্তুগাল থেকে এলেন পাদ্রী ম্যানুয়েল দ্য ফিগুইরেডো—সঙ্গে নিয়ে এলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু ইয়োরোপীয় গ্রন্থ, এবং নক্ষত্রচর্চার জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি অভিনব যন্ত্র। জয় সিং সম্রাট মহম্মদ শাহ-কে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করে তুললেন, এবং উভয়ের উৎসাহে দিল্লির জন্তরমন্তরটি তৈরি হলো ১৭২৪ সালে। এই ক্লান্তিহীন ও ব্যাপ্ত কর্মব্যস্ততা ও অন্বেষণের মাঝেও এই যুবক ও বৈজ্ঞানিক নৃপতি তাঁর কিশোরী প্রেমিকাকে কিন্তু কখনই বিস্মৃত হন না—তাঁর সব বিস্তৃত ভাবনার ও জটিল পঠনের চমক নিয়ে তিনি বারংবার ফিরে আসেন এই কিশোরীর কাছে, শরীর ও প্রণয়ের প্রত্যাশী হয়ে (মুলুক রাজ আনন্দ-এর এই উক্তিটি এখানে উল্লেখ্য : "সমস্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও, জয় সিং তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন অবকাশ উপার্জনের এক আশ্চর্য ক্ষমতার মাধ্যমে—এই অবকাশের কিছুটা তিনি ব্যয় করেন ঐকান্তিক সারস্বত সাধনায়; বাকিটুকু তাঁর প্রেমিকার সহবাসে, প্রেমচর্চায়।"

কথায় কথায় এতদূরে চলে এসেও আমি ভুলে যাইনি—যা আমি একটু আগেই বলেছি—যে, এই মুহূর্তে আমার গন্তব্য জয়পুরের সেই নিভৃত অন্দরমহল যেখানে আয়োজিত সফরের সুযোগভোগী পর্যটকরা প্রায় কখনোই তাঁদের দায়িত্বহীন দৃশ্য দর্শনের ঝোড়ো ঘূর্ণন থেকে চ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েন না—অথচ এখানেই, এই ক্লান্তিহীন ব্যাকস্টেজে আমরা দেখা পাই জয়পুরের হাজার কারিগর এবং বিরল কিছু শিল্পী, যাঁরা তৈরি করেন আকাশি-নীল কাচের বাসন, লোভনীয় মিনের গয়না, অনিন্দ্য-সুন্দর সানগানেরি প্রিনটস।

জয়পুরের ব্লু-পটারির উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত হয় আছে এক মজার কাহিনী। চন্দ্রমহলের উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মহারাজা সওয়াই জয় সিং। এই মুহূর্তে তাঁর অভিনিবেশ ও উত্তেজনার বিষয় কোনো গ্রহ, নক্ষত্র বা সূর্য নয়—একটি স্বর্ণালংকৃত বহুমূল্য ঘুড়ি, যেটি আগ্রার আচনেরা অঞ্চলের গরীব গ্রামবাসীদের একটি দুর্ধর্ষ ঘুড়ির সঙ্গে এখন জটিল প্যাঁচে ক্রমাগত এক উৎকণ্ঠিত ভবিষ্যতের দিকে লাট খাচ্ছে। আচনেরার সাধারণ অধিবাসীদের অনেক দিনের প্রার্থনা জয় সিং যেন তাদের সঙ্গে পতংগ-যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেন, কেননা এই-ভাবেই তাদের আবিষ্কৃত অভিনব মাঞ্জার শক্তিপরীক্ষাটা নির্ভুল ভাবে হতে পারে। মহারাজাকে যদি তারা ঘুড়ির যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে তাহলে তাদের মাঞ্জা যে শক্তিশালী তাতে আর সন্দেহ থাকে না—এবং তখন এই অভিনব মাঞ্জার গোপন তথ্যটুকু মহারাজাকে নিবেদন করতেও তাদের আপত্তি নেই।

যুদ্ধ চলে—জয় সিং-এর পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য ভাবে, যেহেতু তিনি ভাবতেই পারেন নি যে কোনো সামান্য, অখ্যাত আচনেরা গ্রামের ঘুড়ি তাঁর ঘুড়ির সঙ্গে শক্তি আর সাহসের যুদ্ধে এতক্ষণ ধরে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু আরো এক বিস্ময়কর অঘটন ঘটলো মুহূর্তের মধ্যে—জয় সিং-এর ঘুড়িটি গেলো কেটে, এবং আচনেরা গ্রামের মাঞ্জায় যে অবিশ্বাস্য শক্তি আছে তাতে আর কারো সন্দেহ রইলো না। তারপর জয় সিং-এর ক্রোধ প্রশমিত করতেই হয়তো আচনেরার অধিবাসীরা এই ঘুড়ি-যুদ্ধের গোপন তথ্যটি মহারাজার কাছে নিবেদন করলো—তারা তাদের গ্রামে তৈরি করে এক ধরনের আকাশি নীল কাচের বাসন, যেরকমটি রাজস্থানের কোথাও তৈরি হয় না, আর এই কাচের বাসন তৈরি

করতে তাদের কারখানায় ধুলোর মতো পড়ে থাকে যেসব গুঁড়ো কাচ, তারই সাহায্যে তৈরি হয়েছে আচনেরার এই অভিনব মাঞ্জাসুতো।

আকাশি-নীল কাচের বাসন—কথা গুলি মন্ত্রের মতো কাজ করলো, জয় সিং দেখতে চাইলেন কয়েকটি নমুনা। এবং এইসব স্ফটিক পাত্রের সূক্ষ্ম-শিল্পিতা এবং কবৈভবে মুগ্ধ হলেন তিনি, এ-ধরনের স্ফটিক পাত্র তিনি আগে কোথাও দেখেছেন বলে মনে পড়লো না। আগ্রার এই বিখ্যাত, দরিদ্র স্ফটিক শিল্পীদের নিমন্ত্রণ জানালেন তিনি জয়পুরে—যেখানে তারা পাবে তাদের পরিশ্রমের আর্থিক মূল্য; বিত্তবান, শহুরে খরিদ্দার; সব রকম পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ; এবং সর্বোপরি স্বয়ং জয় সিং-এর পৃষ্ঠপোষকতা। আগ্রার শিল্পীরা চলে এলেন জয়পুরে—ক্রমশ-ক্রমশ আকাশি-নীল কাচের বাসনে ভরে উঠলো জয়পুরের বাজারগুলি—দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হলো ব্লু-পটারির খ্যাতি।

প্রাচীনতম ব্লু-পটারির নিদর্শন পাওয়া গেছে মিশরে। এটি প্রায় সাত হাজার বছরের পুরোনো। সম্ভবত ব্লু-পটারির শুরু হয়েছিলো ব্যাবিলন আর অ্যাসিরিয়ার যুগ্ম প্রভাব-ঋদ্ধ মেসোপোটেমিয়ায়। শেষ পর্যন্ত ব্লু-পটারি পৌঁছলো পারস্যে। তারপর মুঘল আমলে পারস্য থেকে ভারতবর্ষে। প্রথমে মুলতান থেকে লাহোর, এবং পরে আগ্রা পেরিয়ে দিল্লি পর্যন্ত। এবং এই ক্রমিক প্রসারের পথে ভারতীয় ব্লু-পটারির চরিত্রে নানান আমূল পরিবর্তন দেখা দিলো। ফলে, পারস্যের প্রভাব ক্রমাগত অস্পষ্ট হয়ে এসে ভারতীয় ব্লু-পটারির একটি একান্ত নিজস্ব স্টাইল দেখা দিলো। কিন্তু এই একান্ত নিজস্ব স্টাইলের গোপন চাবিকাঠিটি ছিলো চুরামান পরিবারের নিশ্ছিদ্র সংরক্ষণে। এই চুরামান পরিবারের অন্তর্গত কয়েকজন কারিগরই জয় সিং-এর আমন্ত্রণে এসেছিলেন আগ্রা থেকে জয়পুরে—এবং এঁদের বিশেষ ফরমুলাটি, যার দ্বারা এঁরা ভারতীয় ব্লু-পটারির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন—সেটি তাঁরা পৃথক পরিবারভুক্ত কারিগরদের কাছ থেকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখলেন। সুতরাং চুরমান লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্লু-পটারিও দীর্ঘদিনের জন্যে প্রায় উবে গেলো। যে-দুই মহিলার একান্ত প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে ব্লু-পটারির আধুনিক উজ্জীবনের জন্যে দায়ী তাঁরা হলেন মহারাণী গায়ত্রী দেবী এবং ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস বোর্ড-এর শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়। এঁদের উৎসাহ, সাহায্য ও পরামর্শ এবং কৃপাল সিং শেকাওয়াট-এর মতো শিল্পীর প্রতিভা—এই বিরল সমন্বয় ব্যতীত ভারতবর্ষে ব্লু-পটারির পুনর্জন্ম সম্ভব ছিলো না।

জয়পুরে—কিংবা বলা যায় সমস্ত রাজস্থান জুড়েই, মিনের গয়নার এতো বেশি প্রাদুর্ভাব এবং এদের অধিকাংশই এতো সস্তা ও মনোযোগী দৃষ্টির সামনে এমনি স্থূল যে, মনে হতে পারে এ-বস্তু পর্যটকের সন্ধানী কৌতূহলের অযোগ্য। কিন্তু সামান্য মূল্যের মেকি গহনার ভিড়ের মধ্যে একাধিকবার এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চোখে পড়েছে একটি নেকলস, টিকলি, ঘড়ির ব্যাণ্ড, কিংবা ছোট্টো একটি পান-মশলার কৌটো—যার স্বর্ণিল কিংবা খাঁটি সোনার শরীরে আশ্চর্য নিখুঁত মনোরম মিনেকারী চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এসব বস্তুর দাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইথারস্পর্শী মনে হতে পারে। কিন্তু রাজস্থানী ঘরানার এখানেই যে নির্ভুল ও সোচ্চার প্রকাশ—তাতেও সন্দেহ থাকে না।

মিনের অলংকারে জয়পুরে বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে ষোড়শ-শতাব্দীতে। মূলে ছিলো রাজা মান সিং (১৫৯০-১৬১৫)-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও বাণিজ্যিক দূরদৃষ্টি। পাঁচটি প্রসিদ্ধ মিনকার পরিবারকে তিনি লাহোর থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন অম্বরে। শুধু মিনের কাজ নয়, রাজপরিবারের জন্যে এঁরা তৈরি করলেন আগ্রা, দিল্লি, কাশী, গুজরাট থেকে আহৃত রত্নরাজি দিয়ে বহুমূল্য ও অভিনব অলঙ্কার। এরপর মিরজা রাজা রাম সিং-এর রাজত্বকালে (১৬৬৭-১৬৮৯) স্বয়ং সম্রাট শাহজাহান-এর নিজস্ব রত্নাকারদের কেউ কেউ চলে এলেন জয়পুরে। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুকিম-পরিবারের কারিগরেরা, যাঁদের কতিপয় বংশধর এখনো জয়পুরী রত্নকারদের অন্যতম। অবশ্য জয়পুরী অলংকারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হলো সওয়াই জয় সিং-এর ব্যবস্থাপনায়। তিনি জয়পুরী অলংকারের ক্রমিক পরিমার্জন ও পরিবর্তনের জন্য তৈরি করলেন 'কাপা-

দাওয়ারা' নামের এমন এক গবেষণা বিভাগ যেখানে নানাবিধ গহনার আকার, ব্যবহারিকতা, ডিজাইন প্রভৃতি বিষয়ে অভিনব ভাবনার সুযোগ ও উৎসাহ পাবেন কারিগরেরা। কাপাদওয়ারাকে আবার তিনটি বিভাগে ভাগ করা হলো কিরাকিরিখানা, শুধুমাত্র রত্নালংকারের উদ্ভাবন ও পরিমার্জনার জন্যে; জারগারখানা, শুধু সোনা ও রুপোর গহনা বিষয়ক গবেষণার জন্যে; এবং তোষাখানা, শুধু পরিচ্ছদে রত্ন ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতিগুলি আবিষ্কারের জন্যে। সমগ্র কাপাদওয়ারার ব্যাপক ও সযত্ন প্রচেষ্টায় তৈরি হলো জয়পুরী অলংকার-শিল্পের এক-একটি চূড়ান্ত নিদর্শন—রত্নখচিত তলোয়ার; মিনে ও সোনার কাজে অনন্য মঞ্জুষা; অলংকৃত মদের পাত্র। এইসব অমূল্য সম্পদ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে, ইংলন্ডেশ্বরীর নিজস্ব আহরণ থেকে হায়দ্রাবাদের সালার জাং মিউজিয়াম পর্যন্ত, প্রায় সর্বত্র।

জয়পুরের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট নগর শানগানের। জয়পুরী বাজারে চড়া দামে শানগানেরি প্রিনটস্ কেনেন পর্যটকরা—বিশেষ করে বিদেশ থেকে যাঁরা আসেন। অথচ এই স্রোতস্বল দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের একটি নগণ্য অংশও শানগানের পর্যন্ত চুঁইয়ে আসেন না। এলে জয়পুরী বাজারের অর্ধেক মূল্যে তাঁরা শানগানেরি প্রিনটস্ পেতেন এখানে, এবং সেই সঙ্গে একদল দরিদ্র, নেপথ্যচারী শিল্পী-সম্প্রদায়ের দেখা পেতেন তাঁরা।

শানগানের পৌঁছলাম সুনসান দুপুরবেলা। শীতের বাতাসে পথের দু-পাশে ধুলো উড়িয়ে যেখানে গাড়ি এসে থামলো সেটাই একই সঙ্গে বাজার আর শিল্পী-পাড়া। পথের দু-পাশে ছোটো ছোটো দোকানে নারী-পুরুষ পাশাপাশি কর্মব্যস্ত—কেউ শাড়ির গায়ে মারছে বিভিন্ন প্রকার নকশার ছাপ, কেউ তৈরি করছে রং, আর মেয়ের দল এই বিপণি-সারির পিছনে উন্মুক্ত মাঠে শীতের নরম রোদে মেলে দিচ্ছেন সবেমাত্র অলংকৃত ভিজে-ভিজে শাড়িগুলি। জয়পুরের বাজার থেকে এসব শাড়ি শুধু সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে তাই নয়, বিক্রীত হচ্ছে বিদেশী ক্রেতাদের কাছেও। সারা ভারতবর্ষেই শানগানেরি প্রিনটস-এর আলাদা কদর—এদের বৈশিষ্ট্য রং আর ডিজাইনের অভিনব সমন্বয়ে। প্রায় পনেরো শো কারিগর শানগানেরি

প্রিনটস-এর কাজে যুক্ত রয়েছেন। এঁরা কিন্তু কল্পনাতীতভাবে দরিদ্র। এখনো শানগানেরি নকশায় একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের চাদর অলংকরণের মজুরি পনেরো পয়সার বেশি নয়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট শানগানেরি শাড়ি জয়পুরের বাজারে ষাট-সত্তর টাকায় বিক্রী হচ্ছে। এমনি একটি শাড়ি-ছাপানোর মূল্য হিসেবে কারিগর পান টাকা চারেক।

এমনি এক দরিদ্র শানগানেরি শিল্পীর কুটিরে দেখলাম এক অভিনব শাড়ি। শাড়িটির সারা শরীর জুড়ে রাগমালা প্রিনটস, আর দু-পাশের পাড়ে সূক্ষ্ম মিনের কাজ। এ-শাড়ির মূল্য কত হতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত। কিন্তু এই দরিদ্র শিল্পী এটিকে বাজারে ছাড়বেন না—কোনো মূল্যেই না। সারা দুনিয়ায় এমনি শাড়ি এই একখানিই আছে, এবং সেটি আছে এই দরিদ্র শিল্পীর কন্যার বিবাহে যৌতুক হিসেবে প্রদত্ত হওয়ার জন্যে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জয়পুরের জন্মদিন-উৎসবে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে যে-জিনিস প্রায় অবিরলভাবে বিক্রীত হচ্ছে তা হলো শানগানেরি শাড়ি আর রাগমালা প্রিনটস। জয়পুরী মিনিয়েচার-পেনটিং-এর মধ্যে রাগমালাই সারা বিশ্বে সবচেয়ে আদৃত। এক-একটি ভারতীয় রাগকে বিভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন রাজস্থানী শিল্পী—এবং সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে ও রঙের নির্ভুল ব্যবহারে বিভিন্ন রাগের বিশেষ মেজাজটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। রাজস্থানী মিনিয়েচার পেনটিং, বিশেষ করে রাগমালার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো অতি সূক্ষ্ম আঁচড়ের টানাপোড়েন এবং লাল, সবুজ ও সোনালি রঙের ব্যবহার। রাজপুত পেনটিং-এ মুঘল প্রভাব অনস্বীকার্য। মিনিয়েচার পেনটিং-এ পারস্যের অবদান সহজে লক্ষণীয়। কিন্তু জয়পুরী শিল্পী যে-বিষয়টিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সৃষ্টিশীল সেটি হলো কৃষ্ণলীলা, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, ঝুলন, হোলি, শ্রীরাধার বিরহ। জয়পুরের জন্মদিন উৎসবে সর্বত্র যে-জিনিসটি লক্ষ্য করলাম তা হলো এই পরিব্যাপ্ত কৃষ্ণ-কাল্ট—এই শহরে এক সঙ্গে এমনি অসংখ্য কৃষ্ণপট আমি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে নেই।

আগেই বলেছি, জয়পুরে আমাদের শেষ দিনটির জন্যে হাতে রেখেছি সেই অতি-আবশ্যিক ত্রয়ী : হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস, অম্বর প্যালেস। পথের ওপর রয়েছে আর একটি দ্রষ্টব্য—যন্তর-মন্তর, যার কথা ইতিমধ্যেই লিখেছি। এই শেষ দিনটিতে সুযোগ নিয়েছি সরকার-আয়োজিত সফরের। একেবারে বাসের জানলার পাশে, ত্রিপোলিয়া বাজারের পথে, এসে দাঁড়ালো হাওয়া-মহল। দৈর্ঘ্যে পাঁচতলা। এই জালির কাজ করা প্রাচীরটি তৈরি করেছিলেন সওয়াই প্রতাপ সিং (১৭৭৯-১৮০৩) চারধারের এই সংকীর্ণ বাজার, ধুলো, হট্টগোল ও গুমোট ভিড়ের মধ্যে হাওয়া-মহল বড় বেশি বেমানান, বিচ্ছিন্ন।

সিটি প্যালেস-এর অন্তর্ভূত এক মায়াবী প্রাসাদের নাম চন্দ্রমহল। সঙ্গে সংলগ্ন মুবারক মহল, রানী কা মহল, শোভা-নিবাস, রাজেন্দ্রপল্, এবং দিওয়ানী-আম। সবকিছুই এক বিস্তীর্ণ বিলাসের সাক্ষী। মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব যেদিকে চোখ যায়, চোখে পড়বে। কিন্তু এই প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে রাজপুত বৈশিষ্ট্য। অম্বর প্যালেসে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেলো। বুক-ফাটানো খাড়ায়ের পথ পেরিয়ে যখন প্রাসাদের বিশাল চত্বরের ওপর এসে দাঁড়ালাম, পাহাড়ের অনেক নীচে জলাশয়-ঘেরা জলমহলকে দেখাচ্ছে যেন পুতুলের বাড়ি। এই খাড়াই পথে হাতীর পিঠে যাঁরা উঠছেন তাঁদের কষ্ট অনেক কম—কিন্তু এই কষ্টের পরিবর্তে আমরা যা পাচ্ছি হাতীর পিঠে গেলে তা পেতুম না। আমাদের সঙ্গী হয়েছে এক জয়পুরী বাদক—তার হাতে অভিনব তারের যন্ত্রটির নাম আমার অজানা, কিন্তু সে যে সুরটি ধরেছে সেটি এই পাহাড়ি দেশের পড়ন্ত বিকেলবেলার একান্ত অন্তরঙ্গ। ভালো লাগছে এই আস্তে-আস্তে ওঠা, মাঝে-মাঝে দমছুট্ হয়ে জিরিয়ে নেয়া, আবার ওঠা। এবং এক মধ্য-বয়স্কা বাঙালী গৃহিণী অবশ্য আমাদের ক্রমাগত অবাক করে দিচ্ছেন—এই খাড়াই পথে তাঁর অবিশ্বাস্য দ্রুতির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো কেউই নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রত্যককে যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত করে আঁকা-বাঁকা খাড়াই পথে ক্রমশ মিলিয়ে গেলেন।

ফেরার পথে মনে পড়লো গতরাতের ঘটনাটা। আমরা যে-হোটেলে আছি সেটি সর্বতভাবে উপযোগী হয়ও,

আমাদের একটি মারাত্মক কষ্টের মধ্যে ফেলেছে—সেটি হলো নিরামিষ আহারের সঙ্গে রাম সেবনের কষ্ট, কেননা হোটেলটি বিচ্ছিন্নভাবে নিরামিষ। আমরা গতরাত্রে এই হোটেলে পাঞ্জাবি-দোকানের তন্দুরি-চিকেন সমেত রাম সেবন করেছি অতীব গোপনে। নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে হাড়কাঁপানো শীত। কিন্তু চিকেন এবং রাম—একটির দুর্বার সুবাস, অন্যটির শূন্যবক্ষ বোতল, উভয়েই বিজ্ঞাপনের মতো কাজ করে। সুতরাং আমরা ধরেই নিয়েছি, হোটেলে ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বিতাড়িত হতে হবে। এবং আজকের রাতটা ছাদ-হীন অবস্থায় কোথায় কাটাবো সেই ভাবনা ক্রমাগত চেপে বসছে আমাদের ওপর।

হোটেলে ফেরার পর কিন্তু আমাদের অবস্থায় কোনো পরিবর্তন হলো না। সন্ধে বেলায় চা পর্যন্ত এলো ঠিক সময়ে। তবু আরো কিছুক্ষণ আকস্মিক অঘটনের জন্যে দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করলাম। রাতের খাবার এলো ঠিক নটায়। বেয়ারা সেই মৃদুভাষী সুদর্শন যুবক, গতরাত্রে যার পরিবেশিত নিরামিষ আহারের সঙ্গে আমরা মিশিয়ে নিয়েছিলাম সুগন্ধী, ভরপুর, মাখন-মসৃণ তন্দুরি-মুরগী। খাবার সাজিয়ে দিলো টেবিলে, দিলো নিয়ম মতো জল, লেবু, নুন, আচার। কিন্তু [illegible] জিজ্ঞেস করলো কেউ পৃথক দাম দিয়ে দই নেবো কিনা, জানতে চাইলো কাল আমরা কখন রওনা হচ্ছি, আর কেমন লাগলো জয়পুর। আর তারপর, একটু থেমে, মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে, পরিষ্কার বাংলায়, একেবারে বাঙালী কণ্ঠে জানালো, কাল রাতে আমাদের একা একা মুরগী আর রাম খাওয়া একেবারে উচিত হয়নি, আজ রাতে যেন তার জন্যেও কিছুটা ভাগ রাখতে আমরা না ভুলি। সেও বাঙালী। নাম প্রতুল বারুই। গত আট বছর ধরে সে রাজস্থানের হোটেলে-হোটেলে ভাগ্যান্বেষণে ক্রমাগত ঘুরছে। প্রতুলের হাতে আমরা পুরো একটা বোতল তুলে দি। প্রতুল না থাকলে জয়পুরের জন্মদিন উৎসবের এই শেষ পর্যায়টি আমাকে একটু অন্যভাবে লিখতে হতো। এবং সে-স্মৃতি সততই সুখের হতো না।

আলোকচিত্র : অসিত পোদ্দার

ল্যাংস্টন হিউজ্‌ ঃ
আমি এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি

বিষ্ণু দে

এক জগতের স্বপ্ন দেখি
যেখানে মানুষ আর কাউকেই অবজ্ঞা করে না
যেখানে জগতে প্রেমই আনে স্বস্তি-সুখ
আর শান্তি সব পথে আনে শোভা।

স্বপ্ন দেখি জগতের যেখানে সকলে
জানে, বোঝে মধুর মধুর মুক্তি-পথ
যেখানে গৃধ্নু আর শোষণ করে না চেতনাকে
অথবা লুব্ধতা আমাদের দিনমান দগ্ধ করে না।

আমার স্বপ্নই এক বিশ্ব—কিবা কালো বা শ্বেতাঙ্গ
যে কোনো জাতিই তুমি হও
সকলেই ভাগ পাবে মর্ত্যের ঐশ্বর্য,
এবং প্রত্যেক মানুষ হবে স্বাধীন—

যেখানে দুর্দশার মাথা হবে নত।
এবং আনন্দ, মুক্তাবিন্দুর মতো
সব মানুষের প্রয়োজন মেটাবে।
সেই আমার স্বপ্ন—
আমাদের সবার জগত!

দ্বিপ্রহরের আগন্তুক

শান্তিকুমার দাস

মনেতে আজ ব্যাকুলতার ভিড়
দু চোখ ঢাকে নিকষ কালো টিলা
অলস বেলা কেবলি খায় চিড়
স্বপ্ন যেন সাগর জলে শিলা।

বৃথাই গণি প্রহর বারেবার
ঘড়ির কাঁটা অনড় হয়ে থাকে
রেখা রঙের জটিল সংসার
বুকের ভেতর জমাট বেঁধে থাকে।

দ্বিপ্রহরের দুয়ারে খিল তোলা
স্মৃতির ভেতর প্রায়ান্ধ এক মাছি
প্রথম প্রতিশ্রুতি কি যায় ভোলা
স্বপ্নে মরি, স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি।

মনেতে আজ ব্যাকুলতার ভিড়
দিন দুপুরে ঘনিয়ে আসে রাত;
বাজতে থাকে বিষণ্ণ গম্ভীর
তোমার কাঁকন, তোমার করাঘাত।

তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো

নবনীতা দেব সেন

বিশল্যকরণী নেই,
ধমণীতে রক্ত আছে, দেবো—
তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো!

যদি অন্ধ হয়ে যাই
যদি আর এই চোখ তোমাকে না দ্যাখে
সমস্ত পৃথিবী যদি তালাচাবি বন্ধ হয়ে যায়
আমার তা হোক—
তুমি শুধু তীব্র চক্ষু তোলো।

যদি বধিরতা আসে, আসুক আমাতে—
তোমার স্বরের ওই তরল আগুনে
যদি না সেঁকতে পারি বুকের পাঁজর
আমার তা হোক—
তুমি শুধু তীক্ষ্ন কান মেলো।

আমি চুপ করে থাকি যদি চিরদিন
যদি মূক হয়ে যাই
বাকী সব কথাগুলি আজীবন রয়ে যায়
বুকের বালিতে বন্দী, অন্তঃসলিলা
আমার তা হোক—
তুমি শুধু দীপ্র মুখ খোলো।

তুমি নেত্রপাত করলে
এ পৃথিবী পুনর্যৌবনা...
তুমি যদি কান পাতো
মন খোলে আকাশবাতাস...
তুমি উচ্চারণ করলে
শ্রবণে উৎকর্ণ হয় নদী ও পাহাড়...

আমি যদি নিদ্রামুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে যাই
পৃথিবী গড়িয়ে পড়ে দশ আঙুলের ফাঁকে
আধো-খাওয়া আপেলের মতো
আমার তা হোক—
তুমি শুধু মোহনিদ্রা ভাঙো।

বিশল্যকরণী নেই, ধমণীতে রক্ত আছে, দেবো—
তোমার পৃথিবী তুমি জেগে উঠে
জিষ্ণু হাতে ধরো ॥

অরণ্যদেব

শুরু হল : বদ্বীপের বোম্বেটে ॥ ২

কণ্টকবল্লিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ৪৫ ॥
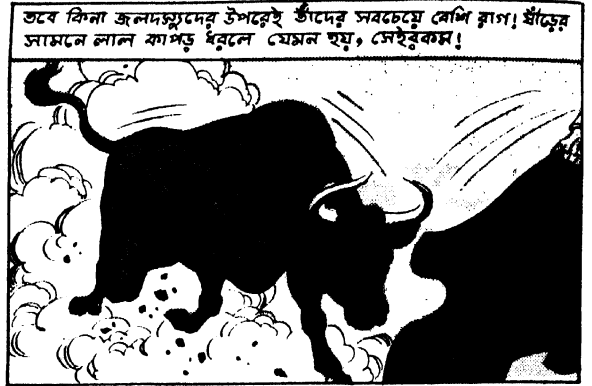
খানিকটা দূরে দেখা গেল কয়েকজন লোক একটা ইলেকট্রিকের পোস্ট মাটিতে বসাচ্ছে। একটু কথাবার্তার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল খুঁটিটা বসানো হয়েছে এবং সেই দল থেকে একজন আমাদের কাছে আসছে। কাছে আসতে দেখি বক্সী সাহেব। শ্রীনগরের আদরের ডাক বক্সী সাহেব। পহলগাঁও-এর যে বাড়িতে উনি থাকতেন সেই বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ। মুখ্যমন্ত্রী এতক্ষণ অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ইলেকট্রিকের খুঁটি বসাচ্ছিলেন। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। এর আগে শ্রীনগরের বাড়িতে গানবাজনা হয়েছে। গাইয়ে-বাজিয়েদের সঙ্গে নিজেও সোৎসাহে যোগদান করতেন। একসময় জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। স্বাধীনতার পর জম্মু-কাশ্মীরে আইন পরিষদে যখন জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন বক্সী সাহেব পায়ের আঘাতে শয্যাগত ছিলেন। শেখ সাহেব তখন জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হত)। আইন পরিষদের গর্ভগৃহে একটি ইজিচেয়ার পাতা এবং সব বক্তাই একবার করে বক্সী গোলাম মহম্মদের নাম করছেন। বাইরেও প্রবল উত্তেজনা। সবাই বক্সী সাহেব বক্সী সাহেব বলে ধ্বনি দিচ্ছে। খানিক বাদে লোকজন ধরাধরি করে ওঁকে নিয়ে এল এবং উনি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় রইলেন। কক্ষে তখন প্রবল উত্তেজনা। সকলে টেবিল চাপড়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন।

এই পহলগাঁয়ে 'কামরাজ প্ল্যান' রচিত হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা ছিলেন জওহরলাল, বিজু (পট্টনায়ক) এবং বক্সী গোলাম মহম্মদ। কামরাজের সঙ্গে সাত-আট মাস বাদে হায়দ্রাবাদে রাষ্ট্রপতি নিলয়ে জওহরলালের আলোচনা হয় এবং তখন নামকরণ হয় কামরাজ প্ল্যান। এই পহলগাঁও ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। এইখান থেকেই চন্দনবাড়ি হয়ে অমরনাথ যেতে হয়। পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। কয়েক বছর আগে অকস্মাৎ বরফের ঝড় ওঠায় বহু সহস্র তীর্থযাত্রীর প্রাণ দিতে হয়। অমরনাথ এক অদ্ভুত তীর্থ। অমরনাথের গুহা ষোল হাজার ফুটের উপর। এই দেবস্থানটি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উঁচুতে।

এই তীর্থের পথই সব থেকে বিপদসঙ্কুল; কিন্তু যাত্রীর বিরাম নেই। রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়েছিল দেখেছিলুম; কতটা যাওয়া যায় তা আমার জানা নেই। বছরে একটা নির্দিষ্ট তিথিতে কাশ্মীররাজের রাজছত্র নিয়ে পাণ্ডারা এগিয়ে যান—সঙ্গে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। সেদিন অমরনাথ যাবার রাস্তা খোলা হয়। সেই অনুষ্ঠান এখনও আছে।

কাশ্মীর নিয়ে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এখন তা নেই বললেই চলে। হানাদাররা আসার পরেই আমার শ্রীনগর যাবার সুযোগ হয়। শ্রীনগরের পাওয়ার হাউস পুড়ে গিয়েছিল। এবং শ্রীনগরের মধ্যের খানিকটা অংশেও হানাদাররা ঢুকে পড়েছিল। বল্লভভাইয়ের বিচক্ষণতায় যে অংশ এখন জম্মু-কাশ্মীর বলে পরিচিত তা রক্ষা পায়। কাশ্মীরের খানিকটা অংশ এখনও হানাদারদের কবলে। হানাদাররা যে নির্যাতন চালায় তা থেকে হিন্দু মুসলমান কেউই বাদ যায়নি। হিন্দু বা মুসলমান—এ'রা সমভাবেই নির্যাতিত হয়েছিলেন।

হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ আছে হজরতবল মসজিদে। হঠাৎ কেশ অন্তর্ধান হয়। তাই নিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লালবাহাদুর সে সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন। কেশের অন্তর্ধান নিয়ে কাশ্মীরে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। অবশ্য কিছু দিন বাদেই এই পবিত্র কেশের উদ্ধার হয় এবং তা হজরতবল মসজিদেই আছে। হজরতবল মসজিদটি ডাল লেকের ধারে। শ্রীনগর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়েরই এই জায়গাটি পবিত্র স্থান। সম্রাট শাজাহান মসজিদটি তৈরি করিয়েছিলেন। যখন এই মসজিদের আঙিনায় বসেছিলুম তখন কত দিনের কথা মনে হচ্ছিল। এই পবিত্র কেশ ছিল মদিনার সৈয়দ আবদুল্লার কাছে। কেশ হস্তান্তর হবার উপক্রম হওয়ায় সৈয়দ আবদুল্লা ভারতবর্ষের বীজাপুর চলে আসেন। আওরঙ্গজেব যখন বীজাপুর দখল করেন তখন আবদুল্লার বংশধর বীজাপুর থেকে জাহানাবাদে পালিয়ে যান। পরে কেশটির অধিকারী হন নুরুদ্দিন আশোয়ারী নামে একজন ব্যবসায়ী। এই নুরুদ্দিন আশোয়ারী যাচ্ছিলেন কাশ্মীরে। পথে আওরঙ্গজেবের লোকেরা তার কাছ থেকে কেশটি নিয়ে আজমীঢ়ে রাখেন। হঠাৎ একদিন আওরঙ্গজেব নুরুদ্দিনের ছেলে মদানীশকে ডেকে পাঠান। তিনি মদানীশকে বলেন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কেশটি মদানীশকে ফেরত দিয়ে দেন। তখন মৃত নুরুদ্দিনের শেষ ইচ্ছামত কেশটি নিয়ে আসা হয় কাশ্মীরে এবং রক্ষিত হয় একটি ছোট জায়গায়। পরে সেখানে ভিড় এত বাড়তে থাকে যে, সেটিকে এনে শাজাহানের তৈরি বিরাট মসজিদ হজরতবলে রাখা হয়। কাশ্মীরের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের অনেক তফাত। এবং বহু তীর্থ আছে যেখানে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে আরাধনা করে। অমরনাথ আবিষ্কার করেছিল গুজর মুসলমানেরা। তারা এখনও অমরনাথের পূজা করে এবং অমরনাথের থেকে যা আয় হয় তার একটা বিশেষ অংশ এই গুজর সম্প্রদায় পায়। গুজরদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তারা সাধারণত বাস করে দশ হাজার বার হাজার

ফুট উপরে এবং বৃত্তি প্রধানত মেষপালন। কাশ্মীরের জনসাধারণের দারিদ্র্য অপরিসীম। এবং ভিক্ষাবৃত্তি একটা পেশার মত। বহু বছর আগে দেখেছিলুম উলার হ্রদের আশেপাশের গ্রামবাসীদের প্রধান আহার্য ছিল পানিফল। যারা এক বেলা খেত তাদের পানিফলের রুটি, যাঁরা দু বেলা খেত তাদেরও তাই। উলার হ্রদটি তের মাইল লম্বা। চওড়া সাত মাইল। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে প্রায় আটাত্তর বর্গমাইল জলে ঢাকা। এটি ভারতের বৃহত্তম হ্রদ।। আবার শুনেছি পৃথিবীর কোথাও পানীয় জলের এত বড় হ্রদ নেই। চারদিকে অসংখ্য পুরাকীর্তি আছে। সবই ভগ্নস্তূপ এবং ধ্বংসাবশেষ। আর আছে আনার গাছ।

কত হাজার যে আনার গাছ আছে তা বলা শক্ত। বাজারে যেসব ডালিম আসে তার দ্বিগুণ আয়তনের লাল টকটকে আনার অনেকেরই লোভের সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের কাহিনী অনেকেরই জানা—বেশ মজার মজার অনেক গল্প আছে। বিশেষ করে জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানকে ঘিরে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য তৈরি হয়েছিল শালিমার উদ্যান। সেইখানে নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে সব রাজকার্য থেকে সরিয়ে রেখে আনন্দসাগরে ডুবিয়ে রাখতেন আর নিজে ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। নুরজাহানের নিজের বাগান ছিল মানসবল হ্রদের ধারে। সেই বাগানটি এখন পরিত্যক্ত। আর নিষাদবাগানটি তৈরি করেছিলেন মমতাজের পিতা শাজাহানের শ্বশুর। কথিত আছে যে, শাজাহানের শ্বশুর এই বাগানটি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করায় শাজাহান বাগানে জল আসার পথ বন্ধ করে দেন। পরে বাধ্য হয়ে শ্বশুরমশাই বাগানটিকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করেন। এর কাছেই একটি বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্যামাপ্রসাদ যখন কাশ্মীর যাওয়া স্থির করেন সেই সময় হরেনদার (ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী) দিল্লীর বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে হরেনদার দেখা হয় এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। হরেনদা শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর আপত্তির কারণ ছিল শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্য। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর হরেনদা গভীর শোকগ্রস্ত হন। এবং বারবার বলতেন, 'আমি শ্যামাপ্রসাদকে আটকে দিইনি কেন।' আমার যত দূর মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ বোধ হয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন যখন উনি ১৯৪৫-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। এবং ঘটনাটি ঘটে ব্যারাকপুর মহকুমার কোনও নির্বাচনী সভার কাছে।

উলার থেকে বারামুলার পথ। কাশ্মীরে গেলেই একবার বারামুলায় যেতেই হয়। এইখানে শহীদদের স্মৃতি উপলক্ষে ফলক আছে। ১৯৪৭-এর ২৭শে অক্টোবর হানাদারদের রুখতে বহু শিখ বীর প্রাণ দেন। তাঁদের নেতা ছিলেন রণজিৎ রায় নামক একজন শিখ কর্নেল। তাঁরা অসাধারণ সাহস দেখিয়ে হানাদারদের প্রতিহত করেন এবং নিজেদের প্রাণ দেন। এটা উল্লেখযোগ্য, এই অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয় একজন বাঙালী ব্রিগেডিয়ার এল পি সেনের নেতৃত্বে। এই বারামুলায় কি নিদারুণ অত্যাচার যে হয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। এইখানেই ছিলেন মকবুল শেরওয়ানী। এই মকবুল শেরওয়ানী কায়েদে আজম জিন্নাকে বলেছিলেন, 'কাশ্মীরে আছে শুধু কাশ্মীরী। হিন্দু বা খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমান—এরা সবাই কাশ্মীরী।' হানাদারেরা মকবুল সাহেবকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে এনে সদর রাস্তায় তাঁর গায়ে বেত্রাঘাত করে এবং অসীম নির্যাতন করে। তাঁর রক্তে বারামুলা পূত পবিত্র হয়ে আছে। এই বারামুলার কাছেই সম্রাট কনিষ্ক প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন করেন। হিউ এন সাঙের বর্ণনা থেকে তা পাওয়া যায়। কাশ্মীরে আর একটি ভাল গল্প প্রচলিত আছে। সম্রাট হর্ষবর্ধন যখন কাশ্মীর আক্রমণ করতে আসেন কাশ্মীর রাজ্যে তখন গোঁড়া সনাতনী ধর্ম। কাশ্মীরের তৎকালীন রানী যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় এবং যুদ্ধজনিত রক্তক্ষয় ও মৃত্যু বন্ধ করার জন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনকে কাশ্মীরে রক্ষিত বুদ্ধদেবের দন্ত উপহার দেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন কাশ্মীর জয় না করেই ফিরে যান।

রাষ্ট্রনীতি সমীক্ষাঃ ফারাক্কা চুক্তি

জয়ন্তকুমার রায়

১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ সরকার গঙ্গার জল বাঁটোয়ারা এবং বণ্টনযোগ্য জলের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছেন তাকে সংক্ষেপে 'ফারাক্কা চুক্তি' নাম দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাপারে মধ্যকালীন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নীতি সমীক্ষকের দৃষ্টিতে ফারাক্কা চুক্তি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নানা বিতর্কের সূচনা করেছে : (১) ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ; (২) কেন্দ্র-প্রদেশ (বা কেন্দ্র-রাজ্য) সম্পর্ক। সমস্ত বিতর্কের পর্যালোচনা করলে কখনও কখনও মনে হবে যে, ফারাক্কা চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনীতি প্রহেলিকায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গার জল ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের আলাপ-আলোচনা চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ অনুপাতহীন দাবি পেশ করে, এবং নিজস্ব দাবিতে অটল থাকে। ফলে, আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটা লক্ষণীয় যে, অচল অবস্থার অবসান ঘটে তখনই যখন ভারত সরকার স্থির করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের মোটামুটি প্রায় সব দাবিই মেনে নেওয়া হবে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ঢাকায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সংগে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে জগজীবন রাম জিয়াউর রহমানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানান। ঐ সিদ্ধান্তের মর্মার্থ হল যে, ভারত বাংলাদেশের দাবিগুলি মেনে নিয়ে একটি চুক্তি করতে রাজী। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা জানাবার আগে জগজীবন রাম ঢাকায় অবস্থানকারী ভারতীয় বিশেষজ্ঞ বা বিদেশ দফতরের কোন প্রশাসকের সংগেই আলোচনা করেননি। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এবং এভাবে নেওয়া হল, তার কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। দূর ভবিষ্যতে মহাফেজখানার দলিল অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেলে সম্পূর্ণ কারণ জানা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে অধুনা-লভ্য তথ্য অনুযায়ী ঐ কারণ আবিষ্কারের একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে যে ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, তার ফলে ভারতের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি হতবুদ্ধিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। বহু বৎসর ধরে ভারতের বিদেশ দফতরের কর্মকর্তারা গংগার জল ভাগাভাগি নিয়ে যেসব তথ্য ও যুক্তি স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করেছেন সেগুলিকে অকস্মাৎ বিসর্জন দেওয়া হল। এর জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোন কারণ দেখানোর প্রয়োজনও কেন্দ্রীয় সরকার বোধ করলেন না।

অতীতে ভারতের বৈদেশিক দফতর কি ধরনের তথ্য ও যুক্তি ব্যবহার করতেন তার উদাহরণ হিসেবে একটি বিখ্যাত পুস্তিকা বেছে নেওয়া যাক। এটির নাম 'ফারাক্কা বাঁধ'। যদিও পুস্তিকাতে প্রকাশনার তারিখ উল্লেখ করা নেই, সকলেই জানেন যে, ১৯৭৬ সালে বৈদেশিক দফতরের প্রচার শাখা এটিকে প্রকাশ করেন, এবং সারা পৃথিবীতে, বিশেষত জাতিপুঞ্জে, পরিবেশন করেন। যুক্তি-তথ্যে মজবুত পুস্তিকাটির মতে কলকাতা বন্দর ও পূর্ব ভারতের দশ কোটি জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক ঋতুতে ফারাক্কা বাঁধ মারফত ন্যূনতম ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথী-হুগলীতে প্রবাহিত করা অত্যন্ত জরুরী। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই মাস সময়কে শুষ্ক ঋতু বলে বোঝানো হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসের চুক্তি অনুযায়ী উপর্যুক্ত দুই মাস ভারতের ভাগে আসবে সর্বাধিক ২৫,৫০০ কিউসেক এবং সর্বনিম্ন ২০,৫০০ কিউসেক। একই সময়ে সর্বাধিক ৩৮,০০০ কিউসেক এবং সর্বনিম্ন ৩৪,৫০০ কিউসেক যাচ্ছে বাংলাদেশের ভাগে।

তা ছাড়া, শুষ্ক ঋতুর সীমানির্দেশ করতে গিয়েও ভারত সরকার একটি উদ্ভট কাজ করেছেন। অতীতে সংবাদপত্রের বিবৃতিতে বা যৌথ সরকারী প্রতিবেদনে ভারত ও পাকিস্তান (এবং পরে ভারত ও বাংলাদেশ) মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে-র মাঝামাঝি সময়টুকুকেই শুষ্ক ঋতু বলে মেনে নিতেন। কিন্তু নভেম্বর ১৯৭৭ চুক্তিতে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শুষ্ক ঋতু হিসেবে চিহ্নিত। ভারত সরকার শুষ্ক ঋতুর এই সংজ্ঞা কেন মেনে নিলেন সেটা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসাধ্য।

আরও অসাধ্য হল শুষ্ক ঋতুর পাঁচ মাস দুই দেশের মধ্যে যেভাবে গংগার জল বাঁটোয়ারা হবে তার ব্যাখ্যা নির্ণয় করা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র দশ দিন (১—১০ জানুয়ারী) ভাগীরথী-হুগলীর ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো হবে—অর্থাৎ ৪০,০০০ কিউসেক জল সরবরাহ করা হবে। শুধু এই তথ্যটুকু মনে রাখলেই বোঝা যায় যে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়ী ফারাক্কা চুক্তিকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থত্যাগের উদাহরণ বলে বর্ণনা দিয়ে সত্যকে বিকৃত করেছেন। পৃথিবীর আর কোন বন্দর নিয়েই বোধ হয় এত অনুসন্ধান-গবেষণা হয়নি যতটা হয়েছে কলকাতা বন্দরকে নিয়ে। তাই কলকাতা বন্দরের
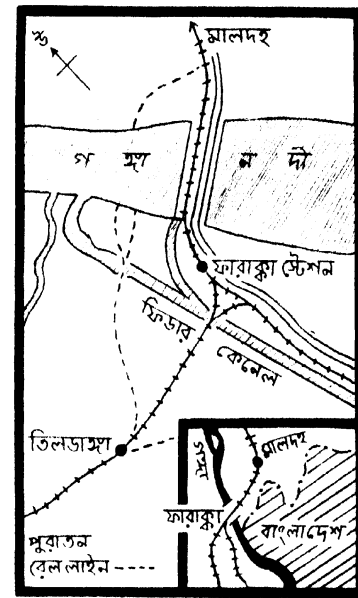
ন্যূনতম প্রয়োজন কি তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে। ভারতীয় এবং অভারতীয় গবেষকদের মতে, কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করতে গেলে অন্তত ৪০,০০০ কিউসেক জল ফারাক্কা বাঁধ মারফত ভাগীরথী-হুগলীতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। বহু বৎসর যাবৎ আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় ভারত সরকার এই তথ্য মেনে চলছিলেন। হঠাৎ ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তিতে কেন ভারত সরকার বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করলেন তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ জনসাধারণকে এখনও জানাতে পারেননি। প্রসংগত মনে রাখা উচিত যে, ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় তাতে অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা বন্দর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিকেই ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানাননি। উপরন্তু, মধ্যকালীন ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে জগজীবন রাম একটি অবিশ্বাস্য উক্তি করে বসেন। তিনি বলেন যে, ফারাক্কা সমস্যার ওপরে বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য বিরক্তিকর। জগজীবন রামের এই মন্তব্য স্মরণ করলেই বোঝা যাবে যে, কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত অগ্রাহ্য করাই ভারত সরকার স্থির করেছিলেন। সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে একটি আজব উদাহরণ।

ভারত সরকারের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ এই ধরনের অযৌক্তিক পথ গ্রহণ করায় এক দিকে নানা ন্যায়-বিচারহীন শর্ত ফারাক্কা চুক্তিকে কলংকিত করল, অপর দিকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিগণ অসমর্থনীয় চুক্তিকে সমর্থন জানাবার চেষ্টায় কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করলেন। এই দুই বিষয় নিয়েই একটু বিশদ আলোচনায় আসা যেতে পারে।

*

একটি নদীর জল দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগি করার ভিত্তি হিসেবে কতকগুলি বিশেষ তথ্যের ব্যবহার অপরিহার্য। সেগুলি হল নদীর পরিবাহক্ষেত্র, অববাহিকার জনসংখ্যা, প্রধান পথের ব্যাপ্তি, এবং সম্ভাব্য জলসেচক্ষেত্র। ভারতের অভ্যন্তরে রয়েছে গংগা নদীর পরিবাহক্ষেত্রের ৯৯ শতাংশ, অববাহিকাস্থ জনসংখ্যার ৯৪ শতাংশ, প্রধান পথের ৯০ শতাংশ, এবং সম্ভাব্য জলসেচক্ষেত্রের ৯৪·৫ শতাংশ। কিন্তু এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ফারাক্কা চুক্তি রচিত হয়েছে। তাই শুষ্কতম দিনগুলিতে (২১-৩০ এপ্রিল) এই চুক্তি ভারতকে দিচ্ছে মাত্র ২০,৫০০ কিউসেক, আর বাংলাদেশকে দিচ্ছে ৩৪,৫০০ কিউসেক। আবার, সর্বনিম্ন শুষ্কতার দিনগুলিতে (১—১০ জানুয়ারী) বাংলাদেশের প্রাপ্য ৫৮,৫০০ কিউসেক, আর ভারতের প্রাপ্য ৪০,০০০ কিউসেক। ফারাক্কা চুক্তির এই ধরনের শর্তগুলি আরও বিস্ময়কর মনে হয়, যখন আমরা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি নজর রাখি। অতীতে ভারত সরকারের একটি প্রধান বক্তব্য ছিল যে, শুষ্কতম দিনগুলিতে কলকাতা বন্দরের জন্য ৪০,০০০ কিউসেক জল টেনে নিলেও বাংলাদেশের জন্য আরও ২৩,০০০—২৬,০০০ কিউসেক থাকবে। এই পরিমাণ জল বাংলাদেশের প্রয়োজনের অনেক বেশী—এ কথা স্পষ্টভাবে উপর্যুক্ত ফারাক্কা বাঁধ পুস্তিকায় বিবৃত আছে। গবেষণাভিত্তিক এই বিবৃতি ভারত সরকার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন ফারাক্কা চুক্তির শর্ত নিরূপণের সময়ে। আরও একটি জরুরী তথ্য এই চুক্তির শর্ত নিরূপণে অবহেলিত হয়েছে। কলকাতা বন্দরের জন্য গংগা নদীর জল ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশের বিকল্প রয়েছে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীরাশির বিপুল সম্পদে। ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্ভাব্য শক্তি প্রায় অতুলনীয়। এদের জল ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ডকে ত্রিশ ফুট গভীর জলের নীচে রাখা যায়। কিন্তু ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনে এসব তথ্যের প্রভাব অনুপস্থিত।

বাংলাদেশের সংগে চুক্তি করতে গিয়ে ভারত সরকার যে কূটনৈতিক অপটুতার পরিচয় দিয়েছেন তার চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে ফারাক্কা চুক্তির নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্তে। চুক্তির অন্তর্গত তফসিলে জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়কে দশ দিন করে পনেরোটি ভাগে বিভক্ত রেখে প্রতি দশ দিনের জন্য পৃথকভাবে জল বণ্টনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। দৃষ্টান্ত, ১১ থেকে ২০ এপ্রিল বাংলাদেশের ভাগে আছে ৩৪,৭৫০ কিউসেক, আর ভারতের ভাগে ২০,৭৫০ কিউসেক; স্পষ্টত, ঐ দশ দিনে প্রত্যাশিত মোট জল প্রবাহের পরিমাণ ৫৫,৫০০ কিউসেক। ধরা যাক, ঐ দশ দিনে (বা অন্য যে-কোন দশ দিনে) প্রত্যাশিত মোট জলপ্রবাহের তুলনায় বিদ্যমান মোট জলপ্রবাহ এত কমে গেল যে, বাংলাদেশের হিস্যা চুক্তির তফসিলে নির্দিষ্ট পরিমাণের ৮০ শতাংশের নীচে নেমে এল। ঐ অবস্থায় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারতকে এমনভাবে জল সরবরাহ করতে হবে যাতে বাংলাদেশের হিস্যা কিছুতেই তফসিলে নির্দিষ্ট পরিমাণের ৮০ শতাংশের নীচে না যায়। এভাবে গংগা নদীর জল ব্যবহারে বাংলাদেশের কর্তৃত্বই মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও গংগা নদী সম্পর্কে পরিবাহক্ষেত্র ও অন্যান্য মূল তথ্য বিচার

শীলা সিং
সেক্টর ২১
চণ্ডীগড় ।

প্রিয় বিনাকা,

আমার স্বাভাবিক রং ফর্সা। কিন্তু নতুন চাকরী নেবার পর থেকেই, যেহেতু আমায় বেশীরভাগ সময় বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, আমি লক্ষ্য করছি যে আমার রং ক্রমশই ময়লা হয়ে যাচ্ছে এবং মৌলিক ফর্সা রংয়ের তুলনায় তা খুবই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। আপনি কি এর কোনও সহজ উপায়ে প্রতিকারের কথা বলতে পারেন?

আপনাদের অনুগত
শীলা সিং (শীলা সিং)

রূপ-বিকাশের এমন ভালো পরামর্শ আপনি আপনার মেয়েকেও দিতে চাইবেন।

আপনার ত্বককে রোদের প্রখরতা, শহরের ধুলো, ঝুলকালি থেকে রক্ষা করা দরকার। বাইরে যাবার আগে সারামুখে বিনাকা ভ্যানিশিং ক্রীম এর প্রলেপ লাগান। ইহা আপনার ত্বককে রোদ এবং ঝুলকালি থেকে রক্ষা করবে এবং ত্বককে সারাদিন মসৃণ ও কোমল রাখবে। আপনি যখন কাজ করতে ব্যস্ত তখন ইহাও কাজ করে চলে এবং আপনার মৌলিক ফর্সা রং রক্ষা করে।

বিনাকা ভ্যানিশিং ক্রীম 'মেক-আপ' করার ভিত্তি হিসাবেও আদর্শ। ইহা অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বকেরও চকচকে-ভাব দূর করে এবং সুন্দর রং-রূপ ফুটিয়ে তোলে। ইহা আপনাকে আরও সতেজ ও নবীন এবং প্রাণোচ্ছল রাখে। সুতরাং নিয়মিত বিনাকা ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহারের অভ্যাস করুন বিশেষ করে যখন আপনাকে বাইরে যেতে হয়।

CIBA-GEIGY

ভ্যানিশিং ক্রীম

Rediffusion/CV/520 Ben.

করলে গংগার জল ব্যবহারে ভারতকে প্রাধান্য না দেওয়াটা হতবুদ্ধিকর।

কোন রাজনীতিক যদি সার্থকভাবে নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব পালন করতে চান, তাঁকে নানাবিধ জাতীয় সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কলকাতা বন্দরের সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতারা এই সমস্যা উপলব্ধি করায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক শতাব্দী যাবৎ ভাগীরথী ছিল গংগার প্রধান পথ। প্রায় ২০০ বৎসর আগে গংগার গতিপথে পরিবর্তন হয়, এবং ভাগীরথীর বদলে পদ্মা গংগার প্রধান পথে রূপান্তরিত হয়। ফলে হুগলী নদীতে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পলি জমতে থাকে। কলকাতা বন্দর সমুদ্র থেকে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর ওপরে অবস্থিত। জোয়ার-ভাটা-নির্ভর হুগলী নদীতে সমুদ্রস্রোত বিপুল পরিমাণ বালি জমা করে। অথচ গংগা থেকে প্রাপ্ত জলরাশির পরিমাণ ক্রমশই কমতে থাকে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বৎসরে প্রায় ৪০ দিন হুগলীতে জোয়ার আসত। বর্তমানে প্রতি বৎসর আনুমানিক ১৬০ দিন জোয়ার আসে। অর্থাৎ হুগলীতে স্তূপীকৃত বালির পরিমাণ দশকের পর দশক এত বেড়ে গিয়েছে যে, কলকাতা বন্দর বহুপ্রকার জাহাজের পক্ষে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বৎসরে প্রায় ৩০০ দিন ২৬ ফুট গভীরতা-সম্পন্ন জাহাজ কলকাতা বন্দরে আনাগোনা করতে পারত। ১৯৬১ সাল নাগাদ বৎসরে এক দিনের জন্যও এই প্রকারের জাহাজ কলকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়নি। তা ছাড়া, কলকাতা শহর পানীয় জলের জন্য হুগলীর ওপর নির্ভরশীল। হুগলীর জলে লবণতা এত বেড়ে গিয়েছে যে, কলকাতা শহরে পানীয় জল সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছে। কলকাতা বন্দরের অবনতির ফলে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা দিয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক অবক্ষয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী হুগলী ছিল তার তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাণসঞ্চারক। এখন হুগলী শীর্ণ; তার সঞ্জীবনীশক্তি প্রায় লুপ্ত। এর ভয়ানক প্রকাশ ঘটেছে কলকাতার সর্বত্র। ভিক্ষার্থী-বোঝাই পথঘাট, তীব্র বেকারসমস্যা, নাগরিক জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তুর চরম অভাব, এবং বৃদ্ধিশীল সামাজিক বিরাগ কলকাতা শহরকে মুমূর্ষু করে তুলেছে। অনেক পৌর বিশেষজ্ঞ কলকাতাকে 'নরক নগর' আখ্যা দিয়েছেন।

এ সব দুর্যোগময় সম্ভাবনার কথা ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের অজানা ছিল না। প্রশংসনীয় বিজ্ঞতার সংগে তাঁরা ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের মুহূর্তেও কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য নিপুণ প্রয়াস করেছেন। সিরিল র‍্যাডক্লিফের বংগ-বিভাগ প্রতিবেদনে কলকাতা বন্দরের এবং তদুপরি নির্ভরশীল অঞ্চলগুলির সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা ছিল। কলকাতা বন্দর সংরক্ষণের জন্য গংগার জল অধিকতর পরিমাণে হুগলীতে প্রবাহিত করার অপরিহার্যতাও র‍্যাডক্লিফ উল্লেখ করেছেন। এ জন্য ফারাক্কায় গংগার ওপর বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এতই স্পষ্ট ছিল যে, র‍্যাডক্লিফ দেশবিভাগের মূল নীতি লংঘন করেও ফারাক্কাকে পশ্চিমবংগে অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। ফারাক্কা মুসলমান-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হওয়ার ফলে র‍্যাডক্লিফের নির্দেশে পুরো মুর্শিদাবাদ জেলাই পশ্চিমবংগের ভাগে আসে। (পাকিস্তানকে অবশ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে হিন্দু-প্রধান খুলনা জেলা দেওয়া হয়। গংগাকে ভিন্নমুখী করে ভাগীরথী-হুগলীতে সঠিক জলস্রোত টেনে আনার জন্য ফরক্কার ওপর পশ্চিমবংগের কর্তৃত্ব বজায় রাখা নিতান্ত জরুরী। র‍্যাডক্লিফ পরিষ্কার করে লিখেছেন যে, এভাবে হুগলীকে সজীব না করতে পারলে পশ্চিমবংগের স্বাস্থ্য ও শিল্প ধ্বংস হবে।

গভীর দুঃখের সংগে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, কলকাতা বন্দর সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে প্রজ্ঞা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিক নেতারা তার মর্যাদা দিতে পারেন নি। দেশবিভাগের মুহূর্তে কলকাতা বন্দরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদেশী শাসকরা যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, ত্রিশ বৎসর পরে ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তির দ্বারা সেই সুযোগ স্বদেশী শাসকরা নষ্ট করেছেন। উপরন্তু, ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিকরা এই আজব চুক্তিকে সমর্থন জানাতে গিয়ে যেসব বিভ্রান্তি-কর মন্তব্য করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, কলকাতা বন্দরের রক্ষাকর্মে তাঁদের আগ্রহ নিতান্তই অল্প।

উদাহরণস্বরূপ লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী বাজপায়ীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি ফারাক্কা চুক্তি সমর্থন করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির ওপর দায়িত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। মুজিবুর-ইন্দিরা চুক্তি অনুসারে শুষ্ক ঋতুতে হুগলী বিধৌত করার জন্য ১১,০০০ থেকে ১৬০০০ কিউসেক জল গংগা থেকে টানা যেত। বাজপায়ী দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের এই প্রতিশ্রুতি বর্তমান সরকারের আদানঃ প্রদানের সামর্থ্যকে সীমায়িত রেখেছে। একাধিক কারণে বাজপায়ীর এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। প্রথমত, উপর্যুক্ত মুজিবুর-ইন্দিরা চুক্তি ছিল নিতান্ত সাময়িক। ঐ চুক্তিকে কোন মতেই স্থায়ী প্রতিবন্ধ বলে দোষ দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রনীতি সমীক্ষকের দৃষ্টিতে পূর্ববর্তী সরকারকে অভিযুক্ত করা একটি প্রচলিত রাজনৈতিক কৌশল; কিন্তু এই কৌশলের স্বাভাবিকত্ব মেনে নিলেও চুক্তির দ্বারা জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াটা সহজে মানা যায় না। দ্বিতীয়ত, বাজপায়ীর সরকার প্রমাণও করেছেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের অংগীকার তাঁদের সামনে প্রতিবন্ধ নয়। তাই ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তি অনুযায়ী ভারতের ভাগে যে জল আসবে তার ন্যূনতম পরিমাণ ২০,৫০০ কিউসেক; পক্ষান্তরে মুজিবার-ইন্দিরা চুক্তিতে এই পরিমাণ ছিল ১১,০০০ কিউসেক।

অধিকন্তু, বিদেশ দফতরের সংগে যুক্ত সংসদীয় পরামর্শদাতা সমিতির কাছে বাজপায়ী ফারাক্কা চুক্তির সমর্থনে মন্তব্য করেছেন যে, ৪০,০০০ কিউসেক ছিল ভারতের 'সর্বোচ্চ দাবি'। এই মন্তব্যের দ্বারা অতীতে আন্তর্জাতিক আলোচনায় ভারত সরকারের বক্তব্য এবং কলকাতা বন্দরের সমস্যাকে সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুষ্ক ঋতুতে কলকাতা বন্দরের সর্বনিম্ন প্রয়োজন ৪০,০০০ কিউসেক—বহু বৎসর যাবৎ এটাই ছিল সরকারী বক্তব্যের ভিত্তি। হঠাৎ ১৯৭৭ সালের শেষে 'সর্বনিম্ন প্রয়োজন'কে 'সর্বোচ্চ দাবি' আখ্যা দিলে তাকে অপলাপ ছাড়া আর কিছু বলা মুশকিল। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন হলেও জোর দিয়ে বলা উচিত যে ভারত ও বিদেশের অসাধারণ যোগ্যতাবান বিশেষজ্ঞগণ সুদীর্ঘ কালের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে উপযুক্ত 'সর্বনিম্ন প্রয়োজন'-এর মাত্রা নির্দেশ করেছেন।

ফারাক্কা চুক্তির সমর্থনে বাজপায়ী আরও একটি মন্তব্য করেছেন যার বিশদ সমালোচনা প্রয়োজন। বাজপায়ীর মতে, শুষ্ক দিনগুলিতে, যেমন ২১ থেকে ৩০ এপ্রিল, যখন বন্টনযোগ্য মোট জলপ্রবাহের পরিমাণ ৫৫,০০০ কিউসেক, তখন ভারতের ভাগে ৪০,০০০ কিউসেক-এর দাবি অবিশ্বাস্য। এই যুক্তির সমালোচনায় নানাবিধ বক্তব্য রাখা যায়। প্রথমত, এই যুক্তির দ্বারা ভারত সরকারের দীর্ঘকাল গৃহীত একটি তথ্য খণ্ডিত হল। এই তথ্য অনুযায়ী শুষ্ক ঋতুতে বাংলাদেশের কখনই ১৫,০০০ কিউসেকের চেয়ে বেশী পরিমাণ জল প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, যাঁরা কলকাতা বন্দর রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কখনই চাননি যে, বাংলাদেশের স্বার্থ বিপন্ন হোক। কিন্তু বহু দিন ধরে ভারত সরকার বলে আসছেন যে, কলকাতা বন্দরের জন্য ৪০,০০০ কিউসেক হুগলীতে প্রবাহিত করলেও বাংলাদেশের জলসেচ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য পর্যাপ্ত জল গংগায় থাকবে। এই মূল বক্তব্য প্রায় বর্জন না করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তিতে স্বাক্ষর দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার একটি অপ্রীতি-কর পরিস্থিতিতে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন: হয় তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে গংগার জল ভাগাভাগি নিয়ে ভুল কথা বলে এসেছেন, নতুবা তাঁরা ১৯৭৭ সালে ভুল করেছেন। তৃতীয়ত, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাকে স্বা[...] জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক মুখ্যমন্ত্রী পশ্চি[...] বংগের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে একটি [...] দিয়েছিলেন। ঐ পত্রে বলা ছিল যে, ফারাক্কা বাঁধ তৈ[...] হলে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার প্রকোপ কমে যা[...] চতুর্থত, ফারাক্কা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শু[...] ঋতুতে, অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে মে [...] অবধি, ভারত যা জল পাবে [...] পরিমাণ সর্বনিম্ন প্রয়োজনের তুলনায় এত [...] যে, জুন থেকে ডিসেম্বর মাস অবধি হুগলীর [...] উন্নতি হবে, আপেক্ষিকভাবে তার চাইতে বে[...] অবনতি ঘটবে শুষ্ক ঋতুর পাঁচ মাসে। অর্থাৎ স[...] বৎসরে স্তূপীকৃত পলি-বালির পরিমাণ ক্রমাগ[...] বেড়েই চলবে, যদিও ফারাক্কা বাঁধের লক্ষ্য ছিল [...] পরিমাণকে ক্রমাগত কমানো। এই ভীতিকর তথ[...] বাজপায়ীর উপযুক্ত মন্তব্যে পুরোপুরি অবহেলিত।

এতক্ষণ এ প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছে তা থে[...] মনে হয় যে, ফারাক্কা চুক্তির সমর্থনে একটি যু[...] প্রয়োগ গভীর আলোচনার দাবি করতে পারে। সে[...] হল এই যে, ফারাক্কা চুক্তির ফলে ভারত ও বাং[...] দেশের পক্ষে গংগার জলপ্রবাহ বাড়াবার জন্য এব[...] দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত স[...] হবে। এই পরিকল্পনার ফলে গংগায় এত বেশী [...] আনা যাবে যে, জল ভাগের ব্যাপারে দুই দে[...] অতপার্থক্য অবান্তর হয়ে পড়বে। প্রথমে আত্মত্যা[...] দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভারত হয়তো বাংলাদেশের [...] এত সদিচ্ছা উৎপাদন করতে পারবে যে, একটি দী[...] মেয়াদী পরিকল্পনা রূপায়িত হবে, এবং ঐ পরিকল্প[...] সাফল্যের দরুন ভারতকে ভবিষ্যতে আর [...] স্বীকার করতে হবে না। লোকসভায় বাজপা[...] আশ্বাস দিয়েছেন যে, আস্থা জ্ঞাপন করলে তারপ[...] আস্থা অর্জন করা যায়। ফারাক্কা চুক্তির নবম ধা[...] বলা আছে যে, তিন বৎসরের মধ্যে ভারত-বাংলা[...] যৌথ নদী কমিশন শুষ্ক ঋতুতে গংগায় জলপ্র[...] বাড়াবার একটি পরিকল্পনা রচনা করবেন।

কিন্তু এ বিষয়ে যে ভারত সরকার অবাস্[...] প্রত্যাশা পোষণ করছেন এই আশংকার সমর্থনে না[...] বিধ যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। প্রথমত, ইতিপূর্বে[...] ভারত সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের [...] অকপট প্রচেষ্টা করেছেন। ব্রহ্মপুত্রের সংগে গং[...] যোগসাধনের একটি পরিকল্পনা ভারত সরকার তৈ[...] করেছিলেন। বিশ্ব ব্যাংক ১৯৭২ সালের প্রতিবেদ[...] এই পরিকল্পনাকে সবিশেষ কার্যকর এবং স[...] বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই পরিকল্প[...] নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং এটা কল্প[...] করা শক্ত যে, ১৯৭৭-এর চুক্তিতে ভারতের শুভেচ্ছ[...] প্রকাশে বাংলাদেশ এতই মোহিত হবে যে, সে দী[...] মেয়াদী পরিকল্পনা রচনায় ভারতের সংগে স[...] যোগিতা আরম্ভ করবে। দ্বিতীয়ত, ভারত অকৃ[...] প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শনে ব্যগ্র হ[...] ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষর করল, এটা বলা বোধ হয় অন[...] হবে। ১৯৭১ সাল থেকে বহু ব্যাপারে ভারত বাং[...] দেশকে সাহায্য দিয়েছে বা তার সংগে সহযোগি[...] করেছে। অল্পকাল পূর্বে মুক্তি-সংগ্রামে বাংলাদে[...] জন্য ভারত যে শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়াছে তার প[...] প্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে নতুন কোন সদিচ্ছাস[...] স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন বোধ হয় স্বীকার করা যায় [...] তৃতীয়ত, গত কয়েক বৎসর বাংলাদেশের সংগে বাণি[...] বাড়াবার চেষ্টায় ভারত ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থ[...] অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারতের এসব চেষ্টা[...] বাংলাদেশ অবৈধ হস্তক্ষেপ বা অসাধু কর্তৃত্ব ফলা[...] অপপ্রয়াস বলে সন্দেহ করে। বাংলাদেশের শাস[...] গোষ্ঠীর এই মানসিকতার মূলে অনেক ঐতিহাসি[...] অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান (যার আলোচনা বর্ত[...] প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন)। গংগার জল ভাগাভাগি নি[...]

আপনার সাথে জোচ্চুরী করা হচ্ছে

ওটা আসল স্যানফোরাইজড্ লেবেল দেওয়া কাপড়ই নয়!

সাবধান!

কিছু অসৎ লোক কেবলই চেষ্টা করছে কি করে আপনাকে ঠকিয়ে আপনার কষ্টার্জিত টাকা নিজেদের পকেটে পুরবে। তারা কাপড়ের ওপর নকল ট্রেডমার্কের লেবেল লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে আপনি নকলের সঙ্গে আসল 'স্যানফোরাইজড্' লেবেলের ছাপ গুলিয়ে ফেলেন।

আপনি যখনই এই নকল ট্রেডমার্কের কাপড় কিনছেন তখন সেই কাপড়ের তৈরী পোষাক যে কুঁচকে খাটো হয়ে যাবে না, তার কোনও গ্যারাণ্টীই থাকছে না।

কেনবার আগে দেখে নিন… স্যানফোরাইজড্ লেবেল লাগানো আছে কিনা

'স্যানফোরাইজড্' লেবেল একমাত্র সেই কাপড়েই লাগানো হয় যা' অনেক কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কাপড় কোঁচকানো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০টি কাপড়ের মিল এই লেবেল ব্যবহার করছেন।

এরপর যখনই কাপড় কিনবেন, দেখে নেবেন তাতে 'স্যানফোরাইজড্' লেবেল লাগানো আছে কিনা। এই লেবেল কাপড় কোঁচকানো থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতীক।

"স্যানফোরাইজড্" রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট পীবডি অ্যাণ্ড কোম্পানী ইনক্. (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সীমিতবদ্ধ) দ্বারা প্রচারিত। স্বত্বাধিকারী এই ট্রেডমার্ক স্বয়ং ব্যবহার করেন কিম্বা পরীক্ষার পর কুঁচকে খাটো হবে না এই দৃঢ় শর্ত পূরণ করে এমন একমাত্র পরীক্ষিত কাপড়ের জন্য রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীদের এর ব্যবহারের অনুমতি দেন।

CHAITRA–SS–67 BEN

কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে ভারত এই মানসিকতাকে দূর করতে সক্ষম হবে না। চতুর্থত, ঐসব সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে উৎসাহিত হননি ; ফলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত শরণার্থীর আগমন অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারেও ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-ব্যাখ্যাতারা চমকপ্রদ কেরামতির পরিচয় দিয়েছেন। এক দিকে বিদেশ দফতর বলেছেন যে সাধারণত যত শরণার্থী ভারতে এসে থাকে তার বেশী আসছে না। অপর দিকে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বিদেশ দফতরের এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে প্রেরিত বার্তায় শরণার্থীর ভিড় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পঞ্চমত, ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার জল বণ্টন সম্পর্কে মধ্যকালীন চুক্তি সম্পাদিত হবার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে সংঘটিত কিছু বিক্ষোভের জন্য জিয়াউর ভারতকে দোষী ঘোষণা করে বসেন।, অথচ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে তীব্র দলাদলিই ছিল এই বিক্ষোভের কারণ। ১৯৭৭ সালের ১৮ অকটোবর ভারতস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনারকে বাজপেয়ী তলব করেন এবং জিয়াউর-এর উপযুক্ত কাজ সম্পর্কে বিধিবৎ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ষষ্ঠত, ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জিয়াউর-এর ভারত সফরকালে গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরির কাজে বাংলাদেশ জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রকল্পের আলোচনায় বাংলাদেশ নেপালকেও সামিল করতে চায়। ভারত অবশ্য ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করলে মনে হবে যে, ফারাক্কা চুক্তির সমর্থনে শেষ যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল সেটিও এত দুর্বল যে, অগ্রহণীয়। এই শেষ যুক্তিটি ছিল একটি প্রত্যাশা—ফারাক্কা চুক্তির দরুন বাংলাদেশে যে সদিচ্ছার প্রাবল্য দেখা দেবে তার ফলে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে পৌঁছানো সহজ হবে। যেহেতু এই যুক্তি (বা প্রত্যাশা) ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হচ্ছে, সেহেতু ভারত সরকার কেন ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন তার কারণটি হেঁয়ালিই রয়ে গেল। যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় কারণের অনুসন্ধান ব্যর্থ হল, তখন রাষ্ট্র-নীতি সমীক্ষকের চেষ্টা হবে দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে ঐ কারণ খুঁজে বার করা। হয়তো ভারতে কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যে ফারাক্কা চুক্তির ব্যাখ্যা অনুসন্ধান সার্থক হবে। এই সম্পর্কের কিছু কিছু উপাদানের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময়েই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বুঝতে পারেন না, বা বুঝেও উদাসীন থাকেন। আবার, কেন্দ্রীয় সরকার এক প্রদেশের তুলনায় অপর প্রদেশের স্বার্থরক্ষায় অধিকতর মনোযোগ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা না করেই কেন্দ্রীয় সরকার ফারাক্কা চুক্তিতে সই দেন। এই চুক্তি স্পষ্টত কলকাতা বন্দরের স্বার্থবিরোধী! এই বন্দর ব্যবহারকারী পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দশটি প্রদেশও চুক্তির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বলা বাহুল্য যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিই হবে সর্বাধিক। সংগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফারাক্কা চুক্তি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ; প্রধানমন্ত্রী দেশাই-এর মতে, এই অসন্তোষ 'প্রত্যাশিত'। দেশাই-এর এই বক্রোক্তি অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা প্রকট হল যে, প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে (যেমন—কলকাতা বন্দরের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলিকে) উপেক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্নিহিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যখন কোন প্রাদেশিক সমস্যা ও জাতীয় সমস্যা অভিন্ন হয় (যেমন হয়েছে কলকাতা বন্দরের সমস্যার ক্ষেত্রে) তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ অভ্যাস অটুট থাকতে পারে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বন্দরকে অবহেলা করেছেন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার চেয়েছিলেন যে, ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্পটি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ফারাক্কা বাঁধের স্থান হয়নি।। ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয় ১৯৬০ সালে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অনু-মোদন মেলে ১৯৬২ সালে। বাঁধের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৩ সালে, অথচ প্রথম দুই-তিন বৎসর কর্তাব্যক্তিদের কাজে ঐকান্তিকতার অভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট ছিল। এই ধরনের নানাবিধ কারণে বাঁধ নির্মাণে বিলম্ব ঘটে, নির্মাণের খরচা অনেক বেড়ে যায়, এবং দেশের লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় বহু কোটি টাকা। লোকসভার এস্টিমেটস্ কমিটি এ ব্যাপারে তাঁদের রিপোর্টে অনেক বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। শুরুতে কথা ছিল যে, ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণ কাজ ১৯৬৮ সালে সমাপ্ত হবে। পরে এই তারিখ ১৯৭০-৭১ সালে পিছিয়ে দেওয়া হয়। ফারাক্কা খালের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৩-৬৪ সালে; কিন্তু কিছু কিছু অংশের দরপত্র ১৯৬৬ সালের আগসট মাসের পূর্বে চাওয়া হয়নি ; চূড়ান্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনে আরও এক বৎসরের বেশি সময় ব্যয় হয়। এই খালের কাজও শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৬৮ সালে ; প্রথমে এই তারিখ পিছানো হয় ১৯৭১ সালে, পরে আবার আরও দুই বৎসরের জন্য কাজ সমাপ্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিতভাবে কলকাতা বন্দরের ক্রম-বর্ধমান সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যই সূচিত করে। ১৯৬০-এর দশকে ঐ ঔদাসীন্য প্রায় চক্রান্তে পরিণত হয় এমন সন্দেহের পর্যাপ্ত অবকাশ আছে। ঐ দশকে কেন্দ্রীয় সরকার খাল-সেচ ব্যবস্থার জন্য ফারাক্কার উজানে (যেমন উত্তরপ্রদেশে) প্রচুর পরিমাণে গঙ্গার জল ভিন্নমুখী করার অনুমোদন দেন। কোন কোন বিবরণী অনুযায়ী এই জলের পরিমাণ ২০,০০০ কিউসেক আবার কিছু বিবরণী অনুসারে এর পরিমাণ ৩০,০০০ কিউসেক। এমন অভিযোগও আছে যে, জায়গায় জায়গায় বিনা অনু-মোদনে বা গোপনে গঙ্গার জল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ অতিশয় নিন্দনীয়, কারণ উপযুক্ত স্থানগুলিতে (যেমন উত্তরপ্রদেশে) ভূতলের জলসম্পদ এত বেশী যে, নতুন করে খাল কেটে গঙ্গার জল টেনে আনা প্রয়োজনীয় নয়। মধ্যকালীন ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে কথোপ-কথনে প্রধানমন্ত্রী দেশাই আভাস দিয়েছেন যে, ঐসব খাল-সেচ ব্যবস্থাগুলি রদ করে গভীর নলকূপ খনন করা যেতে পারে, যার ফলে ফারাক্কায় আগত জল-প্রবাহের পরিমাণ বাড়ানো যাবে।

আলোচনার এই পর্বে মনে হচ্ছে, গঙ্গার জল ব্যবহারে ভারত কেন বাংলাদেশের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তার ব্যাখ্যার সূত্রটি খুঁজে পাওয়া গেল। এটা সহজেই অনুমেয় যে, শুষ্ক ঋতুতে ফারাক্কায় ৪০,০০০ কিউসেক আবার ফারাক্কার উজানে আরও ২০,০০০-৩০,০০০ কিউসেক গঙ্গার জল টেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সংগতভাবে প্রবল আপত্তি তুলেছিল। ঐ বাড়তি ২০,০০০-৩০,০০০ কিউসেক জল যদি না টানা হয় তা হলে বাংলাদেশের দাবি এবং কলকাতা বন্দরের প্রয়োজন যুগপৎ মেটানো হয়তো সম্ভব। আন্তর্জাতিক আইন সংস্থাগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে বাড়তি ২০,০০০-৩০,০০০ কিউসেক জল সরাবার অভিযোগ এনে বাংলাদেশ ভারতকে অসুবিধায় ফেলতে পারত। সম্ভবত, এটা না করে বাংলাদেশ অভিযোগের ত্রাস সৃষ্টি করে ভারতকে বাধ্য করেছে দীর্ঘদিনের বক্তব্য বর্জন করে বাংলাদেশের দাবি মেনে নিতে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল ফারাক্কা চুক্তির মত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এক চুক্তি।

এই পর্বে আমরা যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা সেটি অত্যন্ত দুরূহ। তথ্যাভাবে এ বিষয়ে কিন্তু আলোচনা সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরিক আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণের সং তথ্যের আদানপ্রদানে ভারত সরকার একেবারেই আগ্রহ মন। তাই ওয়ানচু রিপোর্ট (যাতে দেশে কালো টাকা পরিমাণ ও অন্যান্য জরুরী ব্যাপারে আলোচনা আছে বা হেন্ডারসন-ব্রুকস রিপোর্ট (যাতে ভারত-চী বিরোধের ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লে আছে) বৎসরের পর বৎসর অপ্রকাশিত থাকে। ভার সরকারের এটা বোধগম্য নয় যে, তথ্য গোপন করা রাষ্ট্রনীতি নির্মাণে বা পরিচালনায় নানাবিধ গলদ দে দেয়, এবং গোপনীয়তার ফলে ঐ গলদ দূর করা কঠিন হয়। দীর্ঘদিন গলদ ঢেকে রাখলে বিপর্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত-চীন সম্পর্ক পর্যালোচ করলেই (যদিও এ প্রবন্ধে তা নিষ্প্রয়োজন) অনায়া এই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। এমন কি, অমিত শক্তি আমেরিকাও যে ভিয়েতনামে সর্বনাশা বিপত্তি সম্মুখীন হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছি জনসাধারণের কাছ থেকে ভিয়েতনাম সংক্রান্ত ত গোপন রাখার বিশেষ প্রয়াস। এসব ব্যাপার ভার সরকারের অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গোপনীয়তা মারফত নিরাপ অনুসন্ধান ভারত সরকারের অভ্যস্ত কর্মধারা। অতএ একজন রাষ্ট্রনীতি সমীক্ষকের এই সন্দেহ হও স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশের সংগে সম্পর্কের ব্যাপা ভারত সরকার নানা তথ্য গোপন করছেন এবং তা ফলে নীতি প্রণয়ন বা রূপায়ণে গলদ ঘটছে।

*

প্রত্যেক ভারতীয়—বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাস —মনে-প্রাণে কামনা করবেন যে, ভারত সরকার বাংলা দেশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলু এবং, এই মহৎ কর্মে ফারাক্কা চুক্তি তাঁদের সহায় হোক কলকাতা বন্দরের ক্ষতির সম্ভাবনায় বিক্ষুব্ধ পশ্চিম বঙ্গের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রী দেশাই স্মরণ করি দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূ সম্পর্ক গড়ে তোলাও তাঁদের কর্তব্য। ফারাক্কা প্রক এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ—দেশাই কি এগুলি নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যে-কো রাষ্ট্রনীতি সমীক্ষকের দৃষ্টিতে লক্ষচ্যুত হওয়াটা রাষ্ট্র নীতি পরিচালকের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের বিক্ষোভ প্রশমিত করতে গি দেশাই এই মারাত্মক ভুলটি করে বসেছেন। ফারাক্ক প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করা এব ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দশটি প্রদেশে অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন ফারাক্কা প্রকল্পের লক্ষ্য ছি না। এই দুই লক্ষ্যকে গুলিয়ে ফেলা রাষ্ট্রনী পরিচালকদের চূড়ান্ত অক্ষমতার সাক্ষী। তা ছাড় ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ ও খালে সদ্ব্যবহার না করে বাংলাদেশকে গঙ্গার জল ভো করার কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিলেই সৌহার্দ্য স্থাপি হবে—এই ধারণা ভিত্তিহীন। এই ধারণার মূলে আ অতিসরলীকরণের স্বভাব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিল গতিপ্রকৃতি যাঁরা প্রণিধান করেন তাঁরা কখন এরকম ধারণা পোষণ করবেন না। তাঁরা বরং বলবে যে, একটি বিষয়ে (যেমন—বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা জল নিয়ে) মতবিরোধ থাকলেও অন্যান্য বিষ কূটনৈতিক কুশলতা অর্জন করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা যায়। এ চেষ্টার জন্য জাতীয় স্বার্থ (যেমন, কলকাতা বন্দরে স্বার্থ) জলাঞ্জলি দেওয়া মোটেও অপরিহার্য নয় ভারত সরকার কি সেই চেষ্টা আরম্ভ করতে সক্ষ হবেন ?
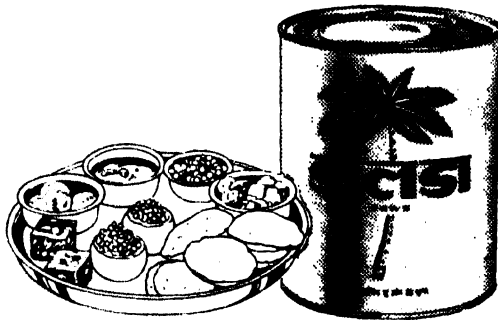
আলোচিত্র : অর্ধেন্দু ব

শংকর

॥ ১৬ ॥

ভরত সিংজী মামলার ব্যাপারে আমাকে খুব সাহায্য করলেন। আইনপাড়ার গোপন কানুনগুলো দীর্ঘদিনের সাধনায় তিনি যে এমনভাবে আয়ত্ত করেছেন তা আমার জানা ছিল না। উকিল মুহুরী পেস্কার পেয়াদা সাক্ষী সাবুদের নিজস্ব তালিকা তিনি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে বোতাম টিপলেই কাজ শুরু হয়ে যায়—যা করতে আমার লাগতো দশ সপ্তাহ তাই দশ ঘণ্টায় হয়ে যায়। আইনের রথ হাওয়া গাড়ির মতো বায়ুবেগে চলতে পারে না বলে যাদের বিশ্বাস তাদের একবার ভরত সিংজীর সংগে যোগাযোগ করা উচিত।

"প্যানেলে শুধু উকিল-মুহুরী রাখলেই কাজ হয় না, মিস্টার শংকর—আপনার নিজস্ব পেস্কার-পেয়াদা সাক্ষীসাবুদও রাখতে হয়." ভরত সিংজী আমার কাছে রহস্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

উকিল মুহুরী না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ।

"সাক্ষীসাবুদই তো আজকাল সবচেয়ে ডিফিকাল্ট। কোথায় আপনি জেনুইন সাক্ষীর জন্যে খোঁজখবর করবেন? তাঁর সন্ধান পেলেও ঠিক সময় তাঁকে কীভাবে যথাস্থানে হাজির করবেন—আজকাল গৃহস্থ লোকের সময়ের যে বিশেষ অভাব। ঘরের খেয়ে আদালতে গিয়ে সত্যিকথা বলবার উৎসাহ কারও নেই। তাই এই মাইনে-করা সাক্ষীর প্যানেল রয়েছে—প্রতি মাসে কিছু কিছু মাসোহারা দিতে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক সময়ে সাক্ষীর অভাব হচ্ছে না।"

ভরত সিংজী বললেন, "খুবই অভিজ্ঞ সাক্ষী এইসব—একটু রিহার্সল দেওয়ালেই ফার্স্ট ক্লাশ সার্ভিস পাওয়া যায়। জেরার তোড়ে এদের কাহিল করা প্রায় অসম্ভব, মিস্টার শংকর। বাঘা বাঘা উকিলরা হার মেনে বসে পড়েন।"

ভরত সিংজী কেমন সহজে গোপন কথা বলে চলেছেন। সরকারী মহলে এসব খবর পেঁছুলে যে কী ফল হতে পারে তা ভদ্রলোক নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন না।

কিন্তু ভরত সিংজী মোটেই দমলেন না। লাল-লাল দাঁতগুলো আর একবার বিকশিত করে ভরত সিংজী বললেন, "আপনি কোন্ যুগে রয়েছেন, মিস্টার শংকর? পাখী-পড়ানো সাক্ষী না-থাকলে পুলিসের কী অবস্থা হবে একবার ভেবেছেন? জেলখানা একেবারে খালি হয়ে যাবে, একটি কেসেও আসামীর শাস্তি হবে কিনা সন্দেহ। অনন্ত কাল ধরে এই সিস্টেম চলে আসছে—এর টেকনিক্যাল নাম 'পকেট সাক্ষী'।"

"আগেকার যুগে তবু পকেট সাক্ষী নিজের পকেটেই থাকতো। এখন সব সময় পুলিসের অত হাঙ্গামা পোষায় না।" ভরত সিংজী এবার মনে হচ্ছে বাড়তি কিছু খবরাখবর দেবেন। কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় তাঁর খেয়াল হলো, আমি বাইরের লোক।

ভরত সিংজী আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "টপ সিক্রেট খবর—মরে গেলেও আমার মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোয় না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা—এখন আপনি আমার 'ফ্রেন্ড', আমার ঘর কা আদমী, আপনার কাছে কিছুই চাপবো না। আপনার এসব জানা দরকার—কারণ এতোদিন আইনপাড়ায় এবং সায়েবপাড়ায় ঘোরাঘুরি করেও আপনার কোনো জ্ঞান হয়নি!"

কেমন শান্তভাবে ভরত সিংজী আমার অভিজ্ঞতাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কিন্তু আমি রাগ করতে পারলাম না। হাইকোর্টের গায়ে টেম্পল চেম্বার্স-এর তিন তলায় সায়েব ব্যারিস্টারের অফিসে আইনের যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম তার সংগে উঁচু মহলের এই নিচু আইনের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোপনে-গোপনে আর এক বিচিত্র আইনের রাজত্ব বহুদিন ধরে এই দেশে চলে আসছে, তাকে অস্বীকার করবার মতো দুঃসাহস কার আছে?

ভরত সিংজী বললেন, "আপনাকে জানাতে লজ্জা নেই, এই অধমকে পুলিস ফ্রেন্ডদেরও মাঝে-মাঝে পকেট সাক্ষী সাপ্লাই দিয়ে হেল্প করতে হয়। আইভি ডান্সিং স্কুলে গতকাল যে পুলিস রেড হয়েছে তার খবর আজকের কাগজে দেখেছেন তো? টেন লেডি ডান্সিং টিচার অ্যান্ড ম্যানেজার অ্যারেসটেড। খুব শক্ত এইসব পাবলিক প্লেস অ্যাটাক করা। সবাই জানে ডান্সিং ট্রেনিং-এর নামে এইসব জায়গায় কী হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলবার, বা কিছু করবার সাহস কারও নেই। সরকার বুঝে-সুঝে এমন নিয়মকানুন করেছেন যে অর্ডিনারি পুলিস অফিসাররা ওখানে নাক গলাতে পারবেন না, অন্তত একজন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অফ পুলিসকে চাই।"

ভরত সিংজী একটু থামলেন। আমার মুখের ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে ভরত সিংজী আবার শুরু করলেন, "শুধু অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হলেই কাজ হবে না। টোপ চাই।"

"টোপ?"

ফিক করে হেসে ফেললেন ভরত সিংজী। "খুব ডিফিকাল্ট অ্যালাইনমেন্ট এই টোপের। মুখটা অচেনা হবে। পুলিস তাকে কখানা সই-করা নোট দেবে। এমনভাবে সইকরা যে হঠাৎ নোট দেখলে সই খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সেই নোট নিয়ে টোপ অর্ডিনারি খদ্দের সেজে ডান্সিং ইস্কুলে যাবে, লেডি টিচার পছন্দ করবে। তারপর স্পেশাল কিছু খরচাপাতি করে, টিচার এবং ম্যানেজারকে বোঝাবে যে ওয়েস্টার্ণ ডান্স শেখবার জন্যে এখানে আসেনি। এখানে সে এসেছে অন্য উদ্দেশ্যে—যে উদ্দেশ্যে অনেকেই এখানে এসে থাকে।"

আমি অবাক হয়ে ভরত সিংজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ভরত সিংজী বলে চলেছেন, "টোপের দায়িত্বটা কত সিরিয়াস বুঝছেন তো? অন্য ভিজিটররা যা করতে আসেন পুলিসের খরচায় ওঁদেরও সেই এক অভিজ্ঞতা কিনতে হয়। তারপর এক সময় বাঁশি বেজে ওঠে। হই-চই করে পুলিস ঢুকে পড়েন, কোনো জিনিস আর জানতে বাকি থাকে না। ম্যানেজারের ক্যাশ বাক্স সার্চ করে সইকরা নোট পাওয়া যায়, লেডি টিচারের কাছেও সই-করা নোট বেরিয়ে পড়ে, সেই সংগে টোপের হাটে হাঁড়ি-টোপকে এরপর কোর্টেও যেতে হয়, সেখানেও সাক্ষী দিতে হয়।"

ভরত সিংজী বললেন, "স্পেশাল রিকোয়েস্টে আমাকে গতকাল দুজন টোপ সাপ্লাই করতে হলো। এইসব কাজে মাইনে করা সাক্ষীদের পাঠাতে ইচ্ছে করে না আমার, কিন্তু উপায় কী?"

পুরনো কথার জের টেনে ভরত সিংজী বললেন, "সোস্যাল সার্ভিস করতে হলো।"

আমিও ভরত সিংজীর কথা বিশ্বাস করছি দেখে মৃদু বকুনি লাগালেন তিনি। "আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি কী করে থ্যাকারে ম্যানশনে কাজ করছেন?"

আমি একটু বিব্রত হয়ে ভরত সিংজীর দিকে তাকালাম। ভরত সিংজী আবার বকুনি লাগালেন, "আমি সোস্যাল সার্ভিস বললাম আর আপনি মেনে নিলেন? মোটেই সোস্যাল সার্ভিস নয়, ওটা তো মিটিং কা বাত। ওই যে-বাড়িতে ডান্সিং ইস্কুল রয়েছে ওটার মালিক নাগরচান্দ সুরজলাল। কোনো-রকমে একটা কেসে ফাঁসিয়ে ওদের জেলে পাঠাতে পারলে আমাদের আর দেখে কে?"

আমার পিঠে এক চাপড় মারলেন ভরত সিংজী। "আর বোকা সাজবেন না, মিস্টার শংকর। একই গেম খেলছি আমরা যে-গেমে আপনি

শকুন্তলা চাওলাকে আইটি অ্যাক্টে জেলে পাঠালেন। কি ক্লিন গেম খেললেন আপনি—কেউ আপনার কথা জানতে পারলো না, অথচ যা চাইলেন তাই হয়ে গেল।"

ভরত সিংজীকে আমি বোঝাতে গেলাম, শকুন্তলা চাওলাকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারে আমি কোনো গেমই খেলিনি, ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গিয়েছে। কিন্তু ভরত সিংজী ওসব কথা কানেই তুললেন না। ভারী গলায় হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "নাউ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? আমার উকিল মুহুরীরা আপনাকে সবরকম সাহায্য করছে তো?"

এ বিষয়ে সত্যিই আমার কোনো অভিযোগ নেই। সমস্ত কাজ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

মিস্টার ভরত সিং তবু বললেন, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি নিজেই খোঁজখবর নেবো আজ। কোর্টের ব্যাপারই হলো, সব সময় উকিল-মুহুরীর, সামনে ক্লায়েন্টের মুখ দেখিয়ে থাকতে হবে। যদি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তো অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরে আসবে এবং মামলা আর এগুবে না।"

ভরত সিংজী এতো ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু সেদিনই খবরাখবর নিয়ে আমার সংগে আবার যোগাযোগ করলেন। বললেন, "আপনার স্টার এখন খুব ফেভারেবেল, মিস্টার শংকর।"

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা আমার ওপর অকস্মাৎ সদয় হয়েছেন তা ভাববার কোনো কারণ নেই। অস্বস্তিকর একঘেয়েমি আমার সমস্ত শরীরকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু ভরত সিং আমাকে ছাড়লেন না।

মৃদু বকুনি লাগিয়ে তিনি বললেন, "আপনি যদি লাকি না হন, তা হলে কে লাকি? শকুন্তলা চাওলার মামলা যেভাবে বোম্বাইমেলের স্পিডে এগোচ্ছে তা লাকি স্টার ছাড়া কখনও হয় না। আমার তো লোভ হচ্ছে, আমার বরুণা প্রপার্টিজের মামলাগুলোয় আপনাকে জড়িয়ে রেখে আপনার লাকি স্টারের বেনিফিট কাজে লাগাই!"

ভরত সিংজী এবার ব্যাখ্যা করলেন, "আপনার গুডলাক অস্বীকার করে উপায় নেই। শকুন্তলা চাওলা অ্যান্ড পার্টি যে উত্তর দিয়েছে সেটা আমি মিস্টার ঘটকের ওখানে পড়ে এলাম। ওকে উত্তরই বলে না। পুওর মিসেস চাওলা বোধ হয় জেল থেকে তেমন কোনো ভাল ল'ইয়ারকে এনগেজ করতে পারেন নি! কিংবা উকিলকে ঠিক মতন ব্রীফ করেন নি।"

"মানে?"

মানে খুবই সিম্পল। আপনি নিজেও উকিলের বাবু ছিলেন, আপনারও আঁতে লেগে যেতে পারে। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, আমাদের সুরজলালজী বলেন, উকিল হলো গরুরগাড়ির বলদের মতো। সব সময় পিছনে লেগে থেকে হ্যাট-হ্যাট না করলে বেস্ট জিনিস বেরোয় না।"

কী অদ্ভুত সব আইডিয়া। আইনপড়ার বিশেষজ্ঞদের কানে এসব কথা পৌঁছয় কিনা জানতে ইচ্ছে হয়।

ভরত সিংজী বললেন, "শকুন্তলা চাওলার ডিফেন্স খুবই উইক। যেখানে নিজের বিজনেসের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেখানে মিসেস চাওলা গডেস দুর্গার মতো টেন হ্যান্ডস নিয়ে ফাইট করবেন ভেবেছিলাম।"

সামান্য একখানা বাড়িতে মিসেস চাওলার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে কেন, আমি বুঝতে পারছি না।

ভরত সিং ফোঁস করে উঠলেন। "কী বলছেন, মিস্টার শংকর? বিজনেস প্রেমিসেস না থাকলে বিজনেসের আর রইলো কী? বিশেষ করে এই ধরনের স্পেশালিস্ট বিজনেস—কত বছর ধরে একটা জায়গায় গুডউইল তৈরি করতে হয়, দেশে বিদেশে নাম ছড়াতে কত সময় লাগে।"

একটু থেমে ভরত সিং বললেন, "পুলিসের সংগে গোলমাল নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজ ঝগড়া হয়েছে কাল ভাব হতে বাধা কী? কলকাতার কত বার-এ, কত রেস্তোরাঁয়, কত ডানসিং স্কুলে, কত বিউটি সেলুনে কতবার পুলিস এলো, মেয়েদের ভ্যানে তুললো, মালিককে পাকড়িয়ে থানায় নিয়ে এলো, কাগজে একটু-আধটু খবর ছাপা হলো, তারপর আবার সব কিছু ব্যাক-টু নর্মাল। ঐ মিসেস চাওলাই তো বলতেন, পুলিস এবং আমরা মেড্ ফর ইচ আদার। আমাদের না হলে পুলিসের চলে না, আবার পুলিস না হলে আমাদের চলে না।"

সমস্ত সমস্যার ওপর অভিজ্ঞ ভরত সিংজী অভিনব আলোকপাত করছেন। ভরত সিংজী আবার শুরু করলেন, "যা-বলছিলাম। দুটো পুলিস এসেছে, কাস্টমসের রেড হয়েছে এটা বড় খবর নয়। বড় খবর পুলিসের কাটা খাল দিয়ে আপনার মতো কুমীরের ঢুকে-পড়া। বিজনেস প্রেমিসেস যেতে বসেছে অথচ মিসেস চাওলা ওই রকম উইক ডিফেন্স পুট আপ করছেন ভাবা যায় না!"

"পুওর মিসেস চাওলা!" সহানুভূতি প্রকাশ করলেন মিস্টার ভরত সিং। এর ওপরে আমাদের মিস্টার ঘটক যে-খেলা খেলেছেন!"

উকিল মিস্টার ঘটক আবার কী নতুন চাল দিলেন? বিষয়টা এখনও আমার অজ্ঞাত।

মিস্টার ভরত সিং-এর মুখ আত্মবিশ্বাসের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তাঁর নির্বাচিত উকিল যে একটা কাজের কাজ করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। মিস্টার ভরত সিং বললেন, "অদ্ভুত বুদ্ধি এই মিস্টার ঘটকের। কেসটা উঠছে জজ মিস্টার খাসনবীশের আদালতে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কেসটা ওখানেই ঠেলেছেন মিস্টার ঘটক। এর মানে বুঝছেন?"

জজের কাছে কেস উঠছে এর মানে না বুঝবার কী আছে ?

কিন্তু মিস্টার ভরত সিং সন্তুষ্ট হলেন না। "আই অ্যাম স্যরি টু সে, ব্যাপারটা আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি মিস্টার শংকর।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম।

মিস্টার ভরত সিং এবার জয়ের হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "ভীষণ মরালিস্ট জজ এই খাসনবীশ। আই-টি অ্যাক্টে ভাড়াটের জেল হয়েছে শুনলে, অন্য কোনো আর্গুমেন্ট কানে তুলবেন না—এক অর্ডারে ভাড়াটে বিদায় করে দেবেন। কী রকম জজ জানেন এই খাসনবীশ ?"

বুঝছি জজদের ব্যাপারেও মিস্টার ভরত সিং অনেক রিসার্চ করেন। মিস্টার ভরত সিং তা অস্বীকার করলেন না। "অবশ্যই রিসার্চ করতে হয়। না-হলে মামলা-মোকদ্দমা চালাবো কী করে ?" মন্তব্য করলেন মিস্টার ভ্যঁত সিং। "এই খাসনবীশ জজের কথাই ধরুন না কেন ? লাস্ট ইয়ারে আই টি অ্যাক্ট অনুযায়ী দু-মাস সশ্রম জেলের বিরুদ্ধে এক পার্টি ওঁর কোর্টে আপীল করলো। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো।. জজ সাহেব যেমনি শুনলেন কাঁচ কাঁচ মেয়েদের ভাঙিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল, অমনি শো-কজ নোটিশ ছাড়লেন, কেন তোমার শাস্তি বাড়ানো হবে না কারণ দেখাও। আপীল করে আইনকে কলা দেখাতে গিয়ে উলটো ফল হলো, খাসনবীশ আসামীর জেলের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন।"

ভরত সিং সানন্দে বললেন, "এই সব জেনেশুনেই তো মিস্টার ঘটক তাঁ বির করিয়ে শকুন্তলা চাওলার উচ্ছেদের মামলাটা ওর ঘরে ফেলিয়েছেন—দেখুন না এবার কী ফল হয় !"

ভরত সিংকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, "আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো ভাষা আমার নেই। আপনি যেভাবে সাহায্য করছেন, এইভাবে কেউ সাহায্য করে না।"

ভরত সিং হেসে বললেন, "আপনাকে আমি লাইক করে ফেলেছি। এবং একবার যাকে আমি পছন্দ করি, তার জন্যে আমি সব করি। আপনি এতো কিন্তু কিন্তু করছেন কেন মিস্টার শংকর ? হয়তো আপনার সামান্য কাজে লাগছি আমি, কিন্তু দরকার হলে আপনার কাছ থেকেও আমি হেল্প পাবো না কি ?"

মামলা দ্রুতবেগে চলছে এবং মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে ফলাফল জানতে পারা যাবে। জজ খাসনবীশ সম্বন্ধে মিস্টার ভরত সিং-এর ঘোষণা ভুল প্রমাণিত হয় নি। তিনি বেশ কড়া প্রকৃতির মানুষ। এবং মামলাকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে টেনে নিয়ে যাবার বিরোধী। মিসেস চাওলার উকিল বিভিন্ন অছিলায় যথাসম্ভব সময় নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু জজ খাসনবীশ সোজা জানিয়ে দিয়েছেন—কোনো কারণেই এই মামলা আর মুলতুবী রাখা চলবে না।

মিস্টার ভরত সিং আমাকে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। মিস্টার ঘটককে আমি বলে দিয়েছি, অন্য পক্ষের উকিল যেন আর একটা দিনও না নষ্ট করতে পারে।"

এর পরেই আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। বোকার মতো আমি নিবেদন করেছিলাম, "আপনি আমাদের জন্য এতো করেছেন, অথচ আপনার জন্যে আমরা হয়তো কিছুই করতে পারবো না।"

সেইদিনই মিস্টার ভরত সিং আমার কাছে ফিরে এসেছিলেন। দু-একটা আজে-বাজে কথার পর মিস্টার ভরত সিং বললেন, "মিসেস পপি বিশোয়াসকে চেনেন আপনি ?"

"এ-বাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন—না চিনে উপায় কী ?"

আমার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন না ভরত সিং। বললেন, "ওসব মামুলী কথা ছাড়ুন, মিস্টার শংকর। আমি জানি ভদ্রমহিলা আপনাকে খুব বিশ্বাস করেন। আপনার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ওঁর।

"আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, মিস্টার সিং, আমার সম্বন্ধে ওঁর কী ধারণা তা মাপজোক করতে আমি বিশেষ উৎসাহী নই। কারণ ও'র বিরুদ্ধেও উচ্ছেদের মামলা আনতে হতে পারে আমাকে। বাড়ির মালিককে কিছু না-বলেই উনি সাবটেনানসি দিয়ে বসেছেন।"

"আরে মিস্টার শংকর, অতো রাগ করবেন না। দুদিন পরেই তো অনেকগুলো ফ্ল্যাট খালি পেয়ে যাচ্ছেন—তখন আপনাকে দেখে কে ? এক আধজন মিসেস পপি বিশোয়াসকে না হয় একটু সহ্য করলেনই। তিনি তো আপনার কোনো ক্ষতি করছেন না," মিস্টার ভরত সিং এবার করুণা ও ক্ষমায় বিগলিত হয়ে উঠলেন।

মিস্টার ভরত সিং একার বললেন, "ইউ হ্যাভ টু ডু মি এ ফেভার। নাথিং ভেরি স্পেশাল। মিসেস বিশোয়াসের কাছে আমার সম্বন্ধে একটু বলে দেবেন—জাস্ট পুট ইন এ ওয়ার্ড। ভরত সিংকে আপনি তো চিনে গেছেন—সেইটুকু বলে দিলেই যথেষ্ট।"

ভোরবেলায় থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটে ব্যাল-কনিতে বসে মিসেস পপি বিশোয়াস সূর্যসেবা করছিলেন। কোনো রকম দ্বিধা না করে মিসেস বিশোয়াস সেখানেই আমাকে নিয়ে গেলেন। বল-লেন, "শরীরে প্রত্যহ একটু সূর্যের আলো লাগাবেন, মিস্টার শংকর। তা হলে কোনো রকম রোগবিয়োগ হবে না। সাহেব-মেমেরা আজকাল কীরকম সূর্য-হ্যাংলা হয়েছে জানেন তো ? গায়ে একটু আলো লাগাবার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে সমুদ্রের ধারে বসে থাকছে। অথচ আমরা সূর্যের দেশের লোকরা রোদ এড়িয়ে থাকতে পারলেই বাঁচি।"

মিসেস পপি বিশোয়াস দীর্ঘ তনুদেহের ওপর একটা ঢোলকা গাউন পরে নিয়েছেন। বোধ হয় আমি আসবার আগে ওটি খুলে রেখেই সূর্যস্নান করছিলেন তিনি।

সূর্যস্নানের প্রশংসায় আবার মুখর হয়ে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। চোখের কালো চশমাটা একটু মুছে নিয়ে তিনি বললেন, "সূর্যস্নানের মূল্য একদিন আমরা আবার বুঝবো। হাজার হোক সূর্যের রহস্য তো আমাদের থেকে তো কেউ বেশী বোঝে নি। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড অতো তো সায়েব লোক। কিন্তু সকালে উঠে সূর্য প্রণাম করতেন : 'ওং জবাকুসুমসঙ্কাশং অর্কস্যমহাদ্যুতি... শুনে শুনে আমারও মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।"

বেতের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "দেখবেন, একদিন আমরা আবার সূর্যের নজরে পড়বার জন্যে ছটফট করবো।"

"সব চেয়ে মজা কি জানেন ?" মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "দেখছি, সান বেদিং-এর সময় আমার সিগারেটের নেশা কমে যায়। এই দেখুন না, আধঘন্টার ওপর বসে আছি অথচ একটাও সিগারেট খাইনি !"

মিসে বিশোয়াস এবার সূর্য প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন, "সূর্যের গুণের শেষ নেই, মিস্টার শংকর। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, কাগজে পড়লাম, সূর্যের আলো দেহে লাগালে মেয়েদের বয়স কমে যায়। আপনি লেডি পাকড়াশির নাম শুনেছেন তো ? উনি রিসেন্টলি সূর্যস্নানের জন্যে আলাদা বেদিংরুম তৈরি করিয়েছেন বাড়ির ছাদে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, হঠাৎ আমার মাথায় এই ভূত চাপলো কেন ?"

খিলখিল করে হেসে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। "নিশ্চয় একটা কোনো উদ্দেশ্য আছে, মিস্টার শংকর। বিনা উদ্দেশ্যে পপি বিশোয়াস যে কোনো কাজ করে না তা তো আপনার এতোদিনে জানা উচিত।"

"তা থাকগে আমার কথা। আপনার কোনো দরকার আছে কিনা বলুন ?"

মিস্টার ভরত সিং-এর কথাটা কীভাবে তুলবো—ঠিক করতে না পেরে আমি মাথা চুলকোতে লাগলাম। [-ক্রমশ]

পণ্ডিচেরীর দিনগুলো

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ চার ॥

আমাদের আশ্রম জীবনের প্রথম পর্বে যবনিকা পড়ল ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে।

পাঁচ তারিখ ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে বাবা গিয়েছিলেন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। আমরা তখনো ঘুমিয়ে। নিচের ঘর থেকে হঠাৎ কানে এল বাবার আর্তস্বর : "শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করেছেন।"

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি এই ঘটনার তাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে। কিন্তু কী বিরাট আলোড়ন তুলল আমাদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ওই নীড়ে এই ঘটনাটি, কী পরিবর্তন এল দৈনন্দিন কান্নাহাসির ওই পৌষ-ফাগুনের মেলায়—তা লিখতে গিয়ে বারেবারে মনে হয়েছে কিছু না লেখাই বরং ভাল বুঝি।

পুরো বারো দিন বারোটি রাত শ্রীমায়ের দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। কি করে যে তা কাটালাম আজো ভেবে পাই না।

...প্রথম দিন, কাকপক্ষী জাগার আগেই আশ্রমে গিয়ে দেখলাম—নিষিদ্ধ ওই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত, পালঙ্কে শয়ান শ্রীঅরবিন্দ।

কে বলবে তিনি নেই ?

বুকের উপরে ন্যস্ত হাতদুটি দেখে সর্বাঙ্গে জাগল আনন্দের শিহরন : ননীর মতো স্নিগ্ধ অথচ স্বচ্ছ ত্বক ভেদ করে দেখা যাচ্ছে অস্থি-রেখাগুলি, এক্সরে দিয়ে তোলা ছবি যেন। মন্দাকিনীর মতো প্রবহমান শ্মশ্রু-গুম্ফ-কেশদাম অনুসরণ করে দৃষ্টি পড়ল ওপর সূক্ষ্ম হাসিতে দীপ্ত মুখমণ্ডলে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে বিশ্বাস জাগল, একটু ভালভাবে চাই যদি এখুনি উনি ঘুম ভেঙে উঠে বসবেন।

কিন্তু হুঁস হল সংগে সংগে—বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। উনি আর তখন আমাদের শ্রীঅরবিন্দ নন। টেলিগ্রামে, বেতারে, পত্রিকায় সংবাদ পেয়ে দূর দূর থেকে এরোপ্লেনে, ট্রেনে, মোটরে করে ছুটে আসছেন ভক্ত, অনুরাগীর দল। আশ্রমের প্রবেশ-দ্বার অবারিত। হাজার হাজার অনুসন্ধিৎসু দর্শকের লাইনে আমরা তখন অস্তিত্ববিহীন, নীরবে গিয়ে বারে বারে দু চোখ ভরে দেখছি মহাপ্রয়াণের ওই রূপ।

আগের রাতে ১-২৬ মিনিটে যাঁরা শ্রীমায়ের আহত সিংহিনীর দৃপ্ত বয়ানের সামনে নত-নয়নে নেমে এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ মুখে মুখে আমাদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গেলেন : শ্রীমা চান না কেউ সাধারণের মতো শোকে অভিভূত হক শ্রীমা চান না কেউ অনাহারে থাক, শ্রীমা চান না কেউ বিশ্রাম বা নিদ্রা অবহেলা করুক।

কিন্তু খাব কোন্ প্রাণে ? বিশ্রামই বা নেব কোন্ বিবেকে ?

খুবই মায়া লাগছিল শ্রীমায়ের জন্য। কত না নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন তিনি। চেতনার পশ্চাৎ-ভূমিতে দেখলাম একটা সংকল্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে : যত খেসারৎই দিতে হক, শ্রীমাকে ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না, তাঁকে খুসী করতে নিয়োগ করব এই জীবন।

দেহান্তরের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সংকারের নিয়ম স্মরণ করাতে ফরাসী সরকারের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আশ্রমে এলেন, পরীক্ষা করে তাঁরা অবিসম্বাদী ইস্তাহার জারি করলেন যে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে অক্ষম—শ্রীঅরবিন্দের দেহে যা ঘটছে। চারদিন ও পনেরো ঘণ্টা প্রায় অবিকৃত রইল দেহের জ্যোতি।

অবশেষে ৯ই ডিসেম্বরের দিন বিকেলের দিকে শ্রীমার নির্দেশে শ্রীঅরবিন্দকে সমাহিত করা হল আশ্রমেরই চত্বরে : শিয়রে রইল পূর্বদিগন্ত আর বঙ্গোপসাগর।

ওই সময়ে, কোথা থেকে উড়ে এসেছিল জার্মান এক সাহেব, নাম তার কাপলান। ভীমকায় চেহারা, অসুরের মতো শক্তি, অফুরন্ত কর্মক্ষমতা : ৫ই থেকে ৯ই ডিসেম্বরে আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকদের সংগে হাত লাগিয়েছিল ওই সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে ; পনেরো-ষোল ঘণ্টা অবিশ্রান্ত তাকে দেখেছি মাটি খুঁড়তে, ইট গাঁথতে, চুন-বালি-সিমেণ্ট দিয়ে মসলা মাখতে—একাই একশ জনের মুরোদ নিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দকে সমাধিস্থ করবার অনতিকাল পরেই, যেমন এসেছিল, তেমনটি গায়েব হয়ে গেল কাপলান। আর তার দেখা পাইনি, শুনিনি তার কথা।

সনাতনপুরের অধিবাসীদের খারাপ লাগতে পারে জেনেও একটি বৃত্তান্ত এখানে উহ্য রাখতে নারাজ আমি। ব্যক্তিগত হলেও এইসব ছোটখাট উদাহরণ দিয়ে দিয়ে হয়তো বা সামগ্রিক একটা ধারণা জাগাতে সক্ষম হব—ভক্তদের প্রতি, সন্তানদের প্রতি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের করুণা কতটা ব্যাপক ছিল।

বৃত্তান্তটি এই। বারোদিনের নেপথ্য-বাসের সময়েই একদিন শ্রীমা খবর পাঠালেন আমাদের বাড়িতে : শ্রীঅরবিন্দ এসে তাঁকে বলেছেন, "তেজেন ভীষণ ভেঙে পড়েছে—তাকে সামাল দেওয়া দরকার !

*

১৯৫০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে একক কাণ্ডারীর ভূমিকায় শ্রীমা শুরু করলেন আশ্রম জীবনের নূতন পর্বের অভিযান।

এই বারোটি দিনের অভিজ্ঞতা আমাদের অন্তরে যেন এনে দিল এক বিপ্লব। অজানা এক দায়িত্ববোধ নিয়ে সবাই উপস্থিত হলাম শ্রীমায়ের কাছে। দিনটা ছিল আশ্রমের সবার প্রিয় শিশু মহেন্দ্র পাটিলের জন্মদিন। ওই শিশুটির হাতে ফুলের তোড়া দিতে গিয়ে শ্রীমায়ের মুখে ফিরে এল আমাদের বহু পরিচিত হাসিটি।

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন কখনো-সখনো, একটি থান ইট ও একখানি মাদুরই সাধনার জন্য যথেষ্ট ; তার অতিরিক্ত যা-কিছু পাই, ভগবানের কৃপা গণ্য করে কৃতজ্ঞ-চিত্তে যেন গ্রহণ করি, এবং সেসব থেকে বঞ্চিত হলেও যেন অসুখী না বোধ করি।

বিলাস ব্যসনের পক্ষপাতী শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন না। শুনেছি যে আশ্রম শুরু করবার আগে সাধারণ সুতির কাপড়ই পরতেন শ্রীমা, ছিঁড়ে গেলে স্বহস্তে রিফু করে নিয়ে। তারপরে সবার সাধনার পরিচালনা যখন গ্রহণ করলেন তিনি, শ্রীঅরবিন্দের আগ্রহাতিশয়ে তাঁকে সুন্দর বসন পরিধানে রাজি করানো যায়—অলক্ষ্মী দূর করবার জন্য।

এবং লক্ষ্মীর সংসারেই, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরে, মায়ের ক্ষেতের চাল, শাক-সবজি, মায়ের গোয়ালের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি আমরা। কোনদিন বুঝতে পারিনি ক্রমবর্ধমান তাঁদের ওই একান্নবর্তী সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে তাঁদের কি পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হত। শ্রীঅরবিন্দের অবর্তমানে কিন্তু শ্রীমাকে পড়তে হল বিষম দায়ে।

অতি স্বল্পজীবী অনেক চাকুরেও শ্রীঅরবিন্দের নামে প্রতি মাসে সামান্য দু-চার টাকা করে পাঠাতেন ; বিন্দু থেকেই ছোটখাট সেই সিন্ধু সহায় হত আশ্রমের বিশাল ব্যয়ভার লাঘবে। রাতারাতি সে সব বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে শ্রীমা বিক্রী করতে লাগলেন তাঁর গহনা, শাড়ি—আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। এমন সময় গিয়েছে, তাঁর সচিবেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন—পরদিন কি খেতে দেওয়া হবে ! শ্রীমা ডাক দিয়েছেন বিপদবারণ মধুসূদনদাদাকে। শূন্য ভাঁড়ার ক'দিনের জন্য আবার পূর্ণ হয়েছে। হাসি ফুটেছে সচিবদের মুখে।

এইসব মুহূর্তে আরো নিবিড়ভাবে ইচ্ছে হয়েছে শ্রীমাকে সেবা করতে। সংকটের মধ্যে গাঢ় হয়েছে আমাদের বন্ধন।

ধীরে ধীরে শ্রীমা এইসব দুরবস্থার রাহু থেকে কী পরিশ্রমের ফলে আশ্রমে ফিরিয়ে আনলেন সাচ্ছল্য, সে ইতিহাস না জেনেই নিন্দুকে তাঁর কীর্তির করেছে কত না কদর্থ, অন্ধের মতো উপেক্ষা করেছে তাঁর আজীবন নিষ্ঠায় গড়া মানব-হিতার্থে সাধনা।

*

অলৌকিক নানা শক্তি নিয়ে কারবার করতেন কলকাতার সেই ভদ্রলোক। নামটা ধরা যাক গৌরাঙ্গ উপাধ্যায়। একদিন ও-সব পাটোয়ারি ছেড়ে দিয়ে আসল অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন।

"তেজেনদা, আপনি একটু ভিড়িয়ে দিন মায়ের কাছে। নইলে আর কিছুই ভাল লাগছে না।" ওঁর এই অনুরোধে শ্রীমায়ের চরণে ওঁকে পৌঁছে দিলেন আমার বাবা। শ্রীমায়ের কাজে নেমে গেলেন ভদ্রলোক। অমন শক্তিশালী আধার, কিন্তু গণ্ডারের মতো বর্ম নিয়ে বিচরণ করত তাঁর 'আমি আমি' গন্ধওলা সত্তাটা। অল্পে অল্পে সে সবও খসে পড়তে লাগল। নিয়মিত বাবার সংগে এবং প্রণবদার সংগে পত্রালাপ চালু রেখে শ্রীমায়ের ইচ্ছার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। আশ্রমের প্রয়োজনের সময়ে গৌরাঙ্গের হাত দিয়ে কত সময়ে এসে গিয়েছে ভাল রকম প্রণামী। শ্রীমায়ের মূর্তি খাস কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করে নৈষ্ঠিক পুজোর আয়োজন করে ফেললেন গৌরাঙ্গবাবু। যেন আলাদিনের প্রদীপ-ঘষা দত্যি !

যতদিন উনি মায়ের চরণে বাধ্য শিশুর মতো নিজেকে সমর্পিত রেখেছিলেন, কত অসাধ্যই দেখেছি সাধিত হয়েছে গৌরাঙ্গবাবুর হাত দিয়ে। আবার একদিনের অনবধানতায় পুরনো অহংকার চাগিয়ে উঠল, "আমিই কর্তা, আমিই সব—অন্যেরা আমার অধীন !" তাসের প্রাসাদের মতো ধসে পড়ল গৌরাঙ্গ-বাবুর সমস্ত বিভূতি। ভেঙে গেল তাঁর কর্মসংস্থান।

এ-রকম কত জনকে দেখেছি, কত জনের কথা শুনেছি—বেড়ালছানার মতো যাদের তুলে নিয়ে শ্রীমা পৌঁছে দিয়েছেন ব্রহ্মপদে ; আবার বানরছানার মতোই কেউ কেউ হাত ফসকে হয়েছেন অধোগামী।

এককালে শ্রীমাও অলৌকিকের গবেষণা কম করেননি।

সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সে তিনি আলজিরিয়াতে যান পর পর দু-বছর, তাঁর দাদার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী মাক্স ও আলমা তেওঁ'র সংগে অত্যন্ত চমকপ্রদ সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তেওঁ-দম্পতি ছিলেন খুব প্রাচীন এক ঘরানায় দীক্ষিত সাধক-সাধিকা।

শ্রীমায়ের মুখে এসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম। এবং আরো কিছু জানবার লোভে ১৯৬৯ সালে আমি দক্ষিণ ফ্রান্সে যাই শ্রীমায়ের যৌবনের বান্ধবী মাদাম দাভিদ-নীলের আমন্ত্রণে। মাদামের বয়স তখন একশ' এক বছর, কিন্তু স্মরণশক্তি তখনো প্রখর, তেমনি বাক্যে চিন্তায় বুদ্ধির ছটা। ১৩৭৬ সালের 'দেশ'-এ এবং 'সানডে স্ট্যান্ডার্ডে' সেই সাক্ষাৎকারের কিছু বর্ণনা আমি প্রকাশ করেছি। তার দু-বছর পরে জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে একবার বক্তৃতা দিতে গিয়ে আলাপ হল "কোল্ (রেডিও) ইস্রায়েল"-এর পরিচালিকা মাদাম তেমানলিস-এর সংগে। ধান ভানতে শিবের গীত মনে হলেও সে প্রসংগটি পাড়ছি

আমায় ইণ্টারভিউ করবার সুবাদে হঠাৎ মাদাম বললেন : "আমাদের প্রবীণ দার্শনিক শ্মুয়েল ব্যার্গমানের কাছে শুনলাম যে, আপনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ?"

"কিছু বেশি। তাঁর আশ্রয়েই শৈশব-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে।"

"শ্রীমাকে চেনেন তা হলে?"

"নিজের মায়ের মতো।"

"১৯০৬-৭ সালে শ্রীমা যখন আলজিরিয়া যান, আমার শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল তেওঁ-দম্পতির বাড়িতে। আমার নাম বললেই উনি চিনতে পারবেন—"

"তা পারবেন!" বলে মাদামকে শোনালাম নোগুচি-পুত্রের কাহিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানে কবি নোগুচির সঙ্গে শ্রীমায়ের ভালই পরিচয় ছিল; তাঁর পুত্রের বয়স তখন বোধ করি তিন কি চার। শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তরের পরে, একদিন দর্শনার্থীর ভিড়ে শ্রীমা হঠাৎ এক জাপানী প্রৌঢ় ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, "এর আগে কোথায় যেন দেখেছি?........ওহো, তুমি কবি নোগুচির পুত্র নও?"

জেরুসালেম থেকেই শ্রীমাকে আমি মাদাম তেমানলিসের নিবেদন পাঠাই।

দাভিদ-নীল ও তেমানলিস উভয়েই খুব ভালভাবে জানতেন শ্রীমায়ের অলৌকিক অভিজ্ঞতার নানা বিবরণ। সেসব শুনতে শুনতে মনে পড়ছে আমাদের যোগ ও তন্ত্রের অন্তর্সন্ধির কথা। কিন্তু এঁরা দু-জনেই খুব জোর দিয়ে বলেন যে, শ্রীমা অল্পকালের মধ্যে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে দেন কারণ তাঁর ধারণা হয় যে, তাঁর সত্যকার কাজে এ সবের স্থান নেই। অবশ্য এসব ক্ষমতা চিরদিনই তাঁর আয়ত্তে ছিল—তার সংখ্যাতীত নজির পাই আমরা দিলীপকুমার রায়, অম্বুভাই পুরাণী, উপেন বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীদের রচনায়। শ্রীঅরবিন্দও এসব শক্তি নিয়ে বহু নাড়াচাড়া করেছেন এবং ওয়াকিবহাল ছিলেন শ্রীমায়ের অধিবিদ্যায় উৎকর্ষ সম্বন্ধে।

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সত্তায় সূক্ষ্ম অনেক ক্ষমতা সুপ্ত আছে, অনুশীলনের সাহায্যে তাদের মধ্যমে মানুষ হদিস পেতে পারে দৃশ্যাতীত শ্রবণাতীত স্পর্শাতীত অনেক জগতের। টেলিভিশন আবিষ্কারের দু হাজার বছর আগে অন্ধ রাজার পাশে বসে এভাবেই কি দিতে পারেননি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিবরণী?

স্বচক্ষে দেখেছি—হঠাৎ শ্রীমায়ের ডান চোখটা লাল হয়ে জল ঝরতে লাগল। মিনিট কুড়ি বাদে মোটাকাকা (চারুপদ ভট্চায) এলেন, তাঁর ডান চোখ রুমালে চাপা: টেনিস খেলতে খেলতে একটা বল এসে তাঁর চোখে লেগেছে। শ্রীমাকে কিছু জানাবার আগেই শ্রীমার চোখ দেখে তিনি হতবাক। শ্রীমা হেসে বললেন: "তাই বলি, কোথা থেকে এল আমার এই যন্ত্রণা!"

*

শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য কত-না প্রস্তাব এল শ্রীমার কাছে। মর্মর মন্দির কেউ প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী সমাধির উপরে। কেউ বা চাইলেন পণ্ডিচেরীর নাম পালটে দিতে।

শ্রীমা নীরবে সবার কথাই শুনে গেলেন মন দিয়ে।

তারপরে ১৯৫১ সালের সূচনায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সাধনায় শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করত। বিলেত থেকে ফিরেই তিনি বরোদায় অধ্যাপনা শুরু করেন, কলকাতায় যান জাতীয় কলেজের দায়িত্ব নিয়ে; পণ্ডিচেরীতেও তাঁর প্রথম জীবনের শিষ্যদের তিনি অভিহিত করতেন শিক্ষার্থী বলে। এবং আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবেও মানবতার সামনে মেলে ধরেছেন নূতন শিক্ষার এক আহ্বান, যার সাহায্যে সে নবযুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

অতএব, শ্রীমায়ের অভিমত, শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিরক্ষার প্রশস্ততম পন্থা হবে তাঁর নামে পণ্ডিচেরীতে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। বিপুল সমর্থন পেল শ্রীমার এই পরিকল্পনা। আহূত হল কনভেনশন: বিদেশ থেকে এলেন খ্যাতনামা বহু বিশেষজ্ঞ; স্বদেশ থেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কালিদাস নাগ প্রভৃতি অনেকেই।

শ্রীঅরবিন্দের প্রাক্তন সহযোগী হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ (এবং প্রায় এই সময়েই সমাগত অবিনাশ ভট্টাচার্য) পেলেন শ্রীমায়ের সাদর সম্বর্ধনা; যেন এঁরা সবাই পূর্ব-পরিচিত।

এবং শ্রীমায়ের বিশেষ ভাল লাগল শ্যামাপ্রসাদকে।

এঁদের ক-জনের কাছেই কটা দিন ঘোরাঘুরি করতে পেরেছিলাম, বিশেষত হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে কথায়-বার্তায় সেদিন আমার মনে একটা বাসনা স্পষ্ট হয়ে দানা বাঁধল: ভারতের রানেসাঁসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদান নিয়ে গবেষণার আগ্রহ। মুখের কথায় যেভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ যে উপস্থিত অনেক গুরুজন তাঁকে অনুরোধ জানালেন ওটি লিখে ফেলতে, সেই অনুরোধ রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকেননি উনি, 'গল্প-ভারতী'তে ওটি ছেপে এক কপি পত্রিকাও আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে সম্ভবত তাঁর জীবনের প্রায় শেষ অবধি। তার কিছু আভাস দিয়েছি 'গল্প ভারতী'র পৃষ্ঠায়—উনি ইহলোক ছাড়বার পরেই।

অবি ভট্টাচার্য ও হেমেন্দ্রপ্রসাদের কথা আমার মনে যে উৎসাহ দিয়েছিল তাতে ইন্ধন জোগালেন, এসে ডঃ তারকনাথ দাস। ইনি ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' দলের কর্মভার নিয়ে মার্কিন দেশে যান এবং অক্লান্ত চেষ্টায় যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তার কল্যাণেই প্রতিষ্ঠা পেল পরে 'গদর' আন্দোলন; সশিষ্য তারক দাস (অধর নস্কর, গণেশ দত্ত কুমার ও সতেন সেন) 'গদর' দলের মুখ্য নায়কদের অন্যতম। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পরে দেশে ফিরেই তারক দাস এলেন শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

তাঁর রাতের আহারের ব্যবস্থা শ্রীমা করালেন আমাদের বাড়িতে।

খেতে বসে উনি আহ্নিক ও আচমন করলেন দেখে আমার মা বললেন, "কাকা, দেখে কে বলবে এত বছর আপনি দেশে ছিলেন না।"

উনি জবাব দিলেন : "শ্রীঅরবিন্দ আর যতীনদার সঙ্গ করে এটুকু শিখেছিলাম—স্বধর্মে নিধনই শ্রেয় ! ...."

সেদিন অনেক রাত অবধি উনি আমাদের সঙ্গে নানা গল্প করলেন। আমাদের অত আগ্রহ দেখে ওঁদের আমলের ইতিহাস সম্বন্ধেও মূল্যবান বহু প্রসঙ্গের সেদিন অবতারণা করলেন। এবং আমায় বললেন, "যতীনদার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি যা জানি, তোমাকেই এত বছরের মধ্যে প্রথম বললাম ; আরো বহু বাকি থাকল, পরে চিঠিপত্রের মাধ্যমে অল্পে অল্পে পাঠাব।" কিন্তু জানতাম না যে অতি শীঘ্রই তাঁর ডাক এসে যাবে পরলোক থেকে।

প্রায় এই সময়েই আর এক বুড়ো এলেন আমাদের আশ্রমে।

সাদা ধবধবে চুটকি দাড়ি। ভাবে গম্ভীর এই বৃদ্ধের সরোদ শুনে সুখী হয়ে শ্রীমা আরও বার-কয়েক ওঁকে আমন্ত্রণ জানান বাজাতে।

আশ্রমে এসে উনিও বেশ প্রীত হয়েছেন মনে হল। রোজ বিকেলে উনি টেনিস মাঠে যেতেন শ্রীমায়ের খেলা দেখতে। তারপরে ঘাড় ধরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে অস্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে নমাজ পড়তেন কিছুক্ষণ। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে প্রবীণ এই আচার্যের মৌন আরাধনা আমায় মুগ্ধ করত।

নমাজ সেরে একদিন আমার পাশে এসে বসলেন। গল্প জমল। জানতাম, কী অসামান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি। তবু কৌতূহল জাগল পরখ করবার। তখন বছর দেড় মাত্র এস্রাজের চর্চা করছি।

"আচ্ছা, আপনি এস্রাজ বাজাতে পারেন ?"

"তবে তোমায় বলি, দাদা। তাঁর কৃপায় কোনও যন্তরে কেউ যদি একটু সা-রে-গা-মা'টা দেখিয়ে দেয়, তারপরে আর সে-যন্তর অচেনা লাগে না।"

কথার মোড় ফিরিয়ে মুরুব্বি-চালে জিগ্যেস করলাম, "আশ্রম কেমন লাগছে !"

"ওরে বাবা, মায়ের কাছে কি খারাপ লাগে কারো ? আরো যখন বড় হবে, বুঝতে পারবে মা কে, মা কী !"

উপদেশের মতো শোনাল বলেই, অথবা আমি ওই বয়সে মা কে, মা কী ভাল বুঝতে পারি না, এই আভাস দেবার জন্য—কথাটা ভাল লাগল না। উনি যেন সেটা অনুমান করেই আমার পিঠে একটা হাত রাখলেন।

তারপরে উনি কতকটা আপন মনেই যেন বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন : "তুমি তো গান-বাজনা ভালবাস ? তোমার মাস্টারকে জিগ্যেস কোর—যে যে রাগে মা তীব্র হন, কিভাবে দিনের আলো ফিকে হয়ে যায় মাধুর সেই আলোয়। দিনের শেষ প্রহরে যদি শোন, পূরবী কিংবা মারোয়া, দেখবে বাইরের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্তরে কেমন জ্বলে ওঠে মা-র আলো। ...... মাঝরাতে মা-র নাম 'প্রীতি'—তখন গুণীর যন্তরে বাজতে থাকে কল্যাণ। ...."

কথাগুলো সেদিন আবোল-তাবোল, কেমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি লেগেছিল। একটু দয়া হল, বুড়ো মানুষ, বোধ হয় মাথায় ছিট আছে। তাঁর ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারিনি, কিন্তু বক্তব্যটা ভুলতে পারিনি। এবং যত বয়স বেড়েছে, সেই স্মৃতির আলোয় বাইশটি শ্রুতির মনস্তাত্ত্বিক অবদান খুঁজতে খুঁজতে ততই চমৎকৃত হয়েছি। আজ মনে হয় অপূর্ব এক স্বপ্নরাজ্যের চাবিকাঠি সেদিন তিনি আমার অপোক্ত অনুসন্ধিৎসু মনকে বুঝি দিয়ে ফেলেছিলেন।

আর একদিন ওই বুড়ো দাদুর সঙ্গে আমি বেড়াচ্ছিলাম। তখন বাতিক ছিল অটোগ্রাফ সংগ্রহের। কিছু লিখে দিতে ওঁর আপত্তি নেই দেখে পকেট থেকে খাতাটি বার করলাম।

উনি লিখে দিলেন : "হরি, তুম্ দীনকে দুঃখ হরণ !"

স্বাক্ষর : আলাউদ্দীন খান।

এমনিভাবে বন্ধুত্ব করেছিলাম কয়েক বছর পরে অশীতিপর তরুণ শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ওঁর "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ" খুবই ভাল লাগত আমার। আশ্রমে উনি যখন থেকে গেলেন, সমুদ্রের ধারে প্রায়ই সন্ধেবেলা দুই জনে বসে গল্প করতাম। দারুণ বর্ষাতেও আমাদের সমুদ্র-প্রীতি মিইয়ে যেত না। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করেই একদিন শিখেছিলাম আপাতদৃষ্ট দিগন্তের ওপারে আর একটা দিগন্ত অবলোকন করতে। এবং একসঙ্গে যেতাম আমরা আড্ডা দিতে 'দিগন্ত'-কবি নিশিকান্তের বাগানে, যেখানে "দিগন্ত রেখা দ্বিখণ্ড করি দাঁড়ায়েছে তাল-তরু"।

✱

কনভেনশন-অনুষ্ঠানের ক-মাসের মধ্যেই আশ্রমের প্রধান ভবনের সামনে প্রকাণ্ড উঠোনসমেত ছ-সাতটি দোতলা বাড়ির সমষ্টিতে শ্রীমা উদ্বোধন করলেন শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র। পুরনো বিদ্যালয় থেকে আমরা উঠে এলাম এখানে।

ক্রমবর্ধমান আশ্রমের সঙ্গে নবযুগের এই নালন্দার পরিচালনায় শ্রীমায়ের নৈপুণ্য কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। কারো কারো মতে দক্ষিণেশ্বরে, শান্তিনিকেতনে, সবরমতীতে যে সাধনার পত্তন হয়েছিল, তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হল এখানে। এই শিক্ষায়তনের আকর্ষণে আসতে লাগলেন দিকপাল অধ্যাপকেরা : আমাদের শরীর-তত্ত্বের ক্লাস নিতে লাগলেন ডাঃ চোলকার (কোর্টনিসের অমর কাহিনীর এক নায়ক) ; প্লেটো ও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার ক্লাস শুরু করলেন সৈয়দ মেহদী ইমাম ; ফরাসী-ভারতে স্বাধীন-ভারতের কনসাল সনৎকুমার ব্যানার্জী চাকরি ছেড়েছুড়ে আমাদের পড়াতে লাগলেন ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীঅরবিন্দের মানব-ঐক্যের আদর্শ ; প্রৈভেলিয়নের ছাত্র ওয়েলিংকার দিতে লাগলেন প্রাচীন ইতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা ; শ্যাম-কাম্বোজে ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ধারক-বাহক সুজান কার্পেলেস

এলেন তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নের ক্লাস নিতে (এঁর কথা তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় বাঙালী পাঠক-পাঠিকা একাধিক বার পড়ে থাকবেন এবং অধমের 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও পেয়ে থাকবেন এঁর রসবোধের পরিচয়) ; চীনা-বিভাগে এলেন হু শুঃ ; এমনি আরো কত নাম করব ?

পুরনো সাধক ও ভক্তদের মধ্যে শ্রীমা মনস্তত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় রাখলেন ডঃ ইন্দ্র সেনকে ; দর্শন বিভাগে নরেন দাশগুপ্তকে ; শরীর-বিজ্ঞানে ডাঃ প্রভাত সান্যালকে ; ইতিহাসে শিশিরকুমার মিত্রকে ; বিজ্ঞানে পবিত্র (পি বি স্যাঁত-হিলের)-কে ; গণিতের বিভাগে রইলেন ডঃ এম ভেঙ্কটরামন (আন্নামালাই থেকে প্রতি সপ্তাহে আসতেন তিনি) ; ইংরেজি বিভাগে তেহমি মসসওয়ালা ; সমাজবিজ্ঞানে কিশোর গান্ধী। আরো অনেক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হল যেমন যেমন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আসতে লাগলেন।

১৯৫৪ সালে পণ্ডিচেরী স্বাধীন হল। ফলে সাধারণের পক্ষে যেমন সুগম হয়ে গেল আশ্রম, তেমনি আনাগোনা শুরু করলেন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের গুণমুগ্ধ নেতৃবৃন্দ : রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে শ্রীমায়ের চরণে নিবেদন করলেন অন্তরের ভক্তি : একাধিক বার এলেন জবাহরলাল, কামরাজ, ধেবর, ইন্দিরা, দিবাকর, মুনসী, দেশমুখ প্রভৃতি ! ....

চারুদার প্রসঙ্গ আগে তুলেছি। ডাইনিং রুমে অন্ন বিতরণের পর্ব শেষ করে শ্রীমার কাছে উনি পেলেন খেলার মাঠে প্রবেশ পথের অভ্যর্থনা-দায়িত্ব। সচরাচর ওখানেই শ্রীমা একান্তে সাক্ষাৎ করতেন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সঙ্গে।

ইন্দিরাকে নিয়ে একবার সবেমাত্র নেহরু আমাদের খেলার মাঠে ঢুকেছেন—চারুদাকে জানানো ছিল, সুতরাং নির্বিঘ্নেই তা সম্পন্ন হল। কিন্তু বাদ সাধলেন উনি—যখন দেখলেন নেহরুর পিছু পিছু জেলে সর্দারের মতো চেহারা তামিল প্রথায় ধুতি ভাঁজ করে হাঁটুর ওপরে জড়ানো একজন ঢোকবার মতলব করছে।

তাকে আটক করে চারুদার জেরা চলল : "আপনার গেট-পাস আছে ? নেই ? তাহলে তো ঢুকতে দিতে পারিনে—"

ওই পরিস্থিতি দেখে কে একজন ছুটে গিয়ে চারুদাকে সতর্ক করল : "ও চারুদা, করছেন কি ? উনি যে কামরাজ—"

"কামরাজ আবার কে ?" ধমক দিলেন চারুদা।

"কামরাজ নাদার,, কংগ্রেসের সভাপতি। মায়ের সঙ্গে উনিও দেখা করতে এসেছেন।"

জিভ কেটে চারুদা সুর নরম করে বললেন, "তা হলে ঢুকতে দিই ?" বলে কামরাজকে জিগ্যেস করলেন, "আপনি তা হলে শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছেন ?"

ততক্ষণে নেহরু ফিরে এসে কামরাজকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন চারুদার হাত থেকে !

চারুদা মন্তব্য করলেন, "আমাদের ডাইনিং রুমের কলা-সরবরাহ করে যে লোকটা, তার ভাই-টাই ভেবেছিলাম। আগে থেকে তো বলবে, নইলে আমি কি করে বুঝব ?"

*

লাটু মহারাজের কমণ্ডলু আমার নেই।

শ্রীমায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মাটির ভাঁড়ে সঞ্চিত যে গঙ্গাজল দিয়ে আমি গঙ্গার পুজো করতে চেয়েছি, ঝাঁজি আর কীটাণুর আওতা থেকে তাকে বিমুক্ত রাখতে পারিনি। কিন্তু অপরিস্রুত এই ভাঁড়ের জলের আনাচে কানাচে একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে শ্রীমায়ের শিক্ষার কিছু পঙ্কবীজেরও সন্ধান।

নিত্য খেলার সহচর ভেবে যাঁর কাছে কাটিয়েছি শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অবিস্মরণীয় দিনগুলি, তাঁকে ভালবাসলেও সমীহ করেছি, ভয় করেছি, লক্ষ্য করেছি তাঁর চরণতীর্থে জগতের যাওয়া-আসা। আমাদের ঘরে ঘরে ছিল শ্রীঅরবিন্দের পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থাবলী ; অন্তরেও ছিল তাঁর হিমালয়তুল্য উপস্থিতি। তার পাশে কখানা মাত্র চটি বই লিখেছেন শ্রীমা, সম্প্রতি তাঁর মুখের কথাগুলি যেমন যেমন রেকর্ড করা ছিল, লিপিবদ্ধ করে বেশ ক-খণ্ড গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে যে শ্রীমাকে পাওয়া যায়, তা আমাদের রক্ত-মাংসে দেখা দ্বিভুজা অন্নময়ী মায়ের আংশিক পরিচয় মাত্র।

আপন দৃষ্টান্ত দিয়ে অতি সহজভাবে শ্রীমা আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন মহান জীবনের মূল কয়েকটি সূত্র। অল্প কথায় দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার পঙ্ক সার (quintessence) তাঁর যোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারি যাতে। আর আমাদের বাহ্যিক আচরণের মোড়কে গুহ্য ছিল যে আন্তর ব্যক্তিত্ব, তাকে নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে শ্রীমা এগিয়ে গিয়েছেন সাধনার পরিণতির পথে। ডিমের আড়ালে ছানা যেমন বাড়তে থাকে তা দিতে দিতে, তেমনিভাবেই বোধ হয় আমাদের দুষ্টুমি আর আমাদের প্রবৃত্তির খোলার তলায় শ্রীমা গড়ে তুলছিলেন আসল মনুষ্যত্বের প্রতিনিধিদের। কিন্তু এখনো দীর্ঘদিন লাগবে কাঁচা আমি থেকে পাকা আমির পর্যায়ে পৌঁছতে।

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ধরন এমন ছিল যে, উদার অবাধ মুক্তির স্বাদই সেখানে ছিল প্রকট। স্বতঃস্ফূর্ত সরলতার মধ্যে নিহিত আছে যে সৌন্দর্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বুকে শ্রীমা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাকে। আন্তরিকতা, অকপট নিষ্ঠা যার আছে, তার সামনে আধ্যাত্মিক জীবন চির উন্মুক্ত—বুঝিয়েছিলেন শ্রীমা। তাঁর বাহ্যিক প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে আচারে অনুষ্ঠানে এই আন্তরিকতাই আমাদের জীবনকে সেদিন দিতে পেরেছিল রমণীয়, কাম্য, সুন্দর হবার অধিকার, দিতে পেরেছিল দুর্লভ এক তাৎপর্য।

আর একটি কথার উপরে জোর দিতেন শ্রীমা। ভক্তের কাছে কোনও প্রত্যাশা ভগবানের নেই ; কিন্তু ভগবান বিগলিত হয়ে যান যদি ভক্তের হৃদয়ে দেখেন কৃতজ্ঞতার ভাব। কৃতজ্ঞতাই কৃতার্থ করে ভগবানকে। ভক্তের অন্তরের সবচেয়ে বড় অর্ঘ্য, সে যদি সত্যিই উপলব্ধি দিয়ে বলতে পারে : "তোমার গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে !"

অধ্যাত্ম সাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে পর্বতে আশ্রয় নেবার প্রয়োজন আর নেই। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন জগৎ সংসারকে ভগবানের উপস্থিতি দিয়ে দিব্য থেকে দিব্যতর করে তুলতে। ধান চাষ করতে করতে, দু-হাজার লোকের জন্য ভাত রাঁধতে রাঁধতে, বাসন মাজতে মাজতে, তাঁত বুনতে বুনতে চালাতে হবে সাধনা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আশ্রম। আমরা ভুলিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলতেন সেই ছুতোর মেয়েদের কথা : "ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে, এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দেয়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে.......কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের ওপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।" পণ্ডিচেরী আশ্রমের অনেকেই শ্রীমায়ের করুণায় মনের বারো বা চোদ্দ বা সাড়ে পনেরো আনা অর্পণ করতে পেরেছিলেন দিব্য-জীবনের সংকল্পে।

ঈশ্বরে মন রেখে কর্মের মাধ্যমে তাঁর সেবা করাই আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্য। এই কাজ সুষ্ঠু করবার জন্য মানসিক যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তারও সূত্রগুলি শ্রীমা দিয়েছেন আমাদের : সত্যে অনুরাগ নিয়ে, ধীর-স্থিরভাবে বিঘ্ন বিপদ উপেক্ষা করে আপন আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়া চাই অধ্যবসায় সমেত ; জয়ে-পরাজয়ে অবিচল রাখতে হয় অন্তরের প্রসন্ন প্রফুল্ল ভাব ; আপন সাফল্যে গর্বিত না হয়ে, অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ না ভেবে সবার গুণেরই সমাদর করা দরকার ! ....

বইমুখে সকাল-সন্ধ্যে বসে থাকে যে ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষা পাশের উপযুক্ত মুখস্থ শক্তি নিয়ে। তাদের পরিবর্তে প্রাণশক্তিতে বুদ্ধিতে সজীব সপ্রতিভ চৌকস ছেলেমেয়ের কদরই তাঁর কাছে ছিল অধিক—যারা খেলাধুলো, গান-বাজনা, শিল্প সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত সর্বত্রই খুঁজে নিতে জানে যথার্থ রস। শ্রীমায়ের মতে এরাই আদর্শ সন্তান।

দিব্য-জীবনের অতি দুরূহ তত্ত্ব তিনি একদিন উদঘাটন করলেন নাবালকদের ক্লাসে : পাথর থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে পশু, পশু থেকে মানুষে ক্রমেই মূর্ত হচ্ছে যে চেতনা, বিবর্তনের পথে সেই চেতনা আজ পরিগ্রহ করতে চায় মানুষের চেয়ে উন্নততর একটি রূপ। মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবে—যতখানি পার্থক্য দেখা যায় পশুর সঙ্গে মানুষের। চিন্তাশীল, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, বাকপটু মানুষকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে এই নব-মানবতা হয়ে উঠবে পরম সুন্দরের, পরম শিবের, পরম সত্যের জ্ঞানে দীপ্ত আধার। সেই দীপ্তির নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন—অতি মানস চেতনা। ইতি ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-মহানগরী লুতেসিয়া বা পারী অথবা প্যারিস। ॥ শেষ ॥

আমরা দুজনা ভুলি নাই
আসর জমাতে লিম্‌কা চাই

ভাষার সূক্ষ্মতা ও সংস্কার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোনো সাহেব যখন বাংলা শিখতে শুরু করেন, তখন, গোড়ার দিকে, তাঁকে কতকগুলি সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই ভাষার অনেক কিছুই মেলে না। হ্রস্বই দীর্ঘঈ, হ্রস্বউ দীর্ঘউ, ণ ন, শ ষ স রেফ চন্দ্রবিন্দু হসন্ত ইত্যাদি দেখে তিনি দিশাহারা হয়ে যেতে পারেন। তাঁর বাঙালী শিক্ষক লজ্জিত বিব্রত মুখে বলেন, সত্যিই আমাদের ভাষায় অনেক গণ্ডগোল।

শুধু সাহেব কেন, আমাদের নিজেদের শিশুরাই যখন প্রথম লিখিত ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে, আজও তাদের হিমসিম খেতে হয় কয়েক বছর। বানান ভুলের ভীতি শৈশবের অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রাখে। তখন অনেকেরই মনে হয়েছে, তিনটে স যদি না থাকতো কিংবা দুটো ন!

এখন কথা হচ্ছে, শিশু বা বিদেশীদের শিক্ষার সুবিধার জন্য কোনো ভাষার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না। এরকম প্রস্তাব বারবার শোনা গেছে, সম্প্রতি আবার উঠেছে। প্রস্তাবটি অতিশয় অদ্ভুত। শিশু বা বিদেশীদের সুবিধার্থে ভাষার অতি সরলীকরণ সে ভাষায় সমূহ ক্ষতি করতে পারে। কারণ, ভাষা তো শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, পরিণতবুদ্ধি মানুষের জন্যও, বা জন্যই, প্রধানত। অশিক্ষিত ব্যক্তিরা, শিশুরা বা বিদেশীরা ভাঙা ভাঙা ভাষায়, সীমিত সংখ্যক শব্দ নিয়ে, ভুল ব্যাকরণেও মোটামুটি কাজ চালিয়ে দেয়। কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও শিল্প নির্মাণ করেন পরিণত বুদ্ধির এবং পরিশীলিত মানুষেরা। তাঁদের জন্যই ভাষা বাঁচে এবং শ্রীসম্পন্ন হয়। কঠিন পরিশ্রম ও অভিনিবেশ ছাড়া কেউ কোনো ভাষাই সম্পূর্ণ রপ্ত করতে পারে না। যে কারণে, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ভাষা-অভিজ্ঞ নন। চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ, ভৌত বিজ্ঞানী বা যন্ত্র-কলাকুশলীরা অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কীর্তিমান হলেও ভাষাজ্ঞানে দীন হতে পারেন। এঁরা হয়তো ভাষা অধ্যয়নে সময় পাননি। অথচ এঁদের সকলের সুবিধের জন্য একটি উন্নত ভাষাকে লঘু ভাষায় পরিণত করা ফিলিস্টিনিজমেরই নামান্তর।

কিছু কিছু ব্যবহারিক সুবিধের জন্য বানান সংস্কারের দাবি ওঠে। কিন্তু ছাপার হরফ বা টাইপ রাইটারের কথা চিন্তা করে আমাদের বানানের নিয়ম সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে, এটা একটা অদ্ভুত কথা। একটি জীবন্ত ভাষায় লিখিত রূপের প্রয়োজনেই ছাপার হরফ ও টাইপ রাইটারের ব্যবহার। এগুলিকেই সে ভাষার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। মানুষের জন্য পোষাক না পোষাকের জন্য মানুষ? বানান রীতির গুরুতর পরিবর্তন ভাষার মূল কাঠামোকে আঘাত করে। একটা ভাষা বা বানান পদ্ধতি গড়ে ওঠে বহু-কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এর গতি বড় বিচিত্র। কোনো বিশেষ একজন বা কয়েকজন লোক মিলে হঠাৎ ভাষার ওপর দর্জিগিরি করা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। কোনো ভাষাই এই স্বৈরতন্ত্র সহ্য করে না। ভাষার শারীরিক পরিবর্তন হয় খুব আস্তে আস্তে, পরিবর্তন হয়েই চলেছে, কিন্তু তক্ষুণি তক্ষুণি সেটা অনুভব করা যায় না। যেমন পৃথিবী ঘুরছে, আমরা বুঝতে পারি না। খুব সন্তর্পণে মাঝে মাঝে দুটো একটা পরিবর্তনের চেষ্টা করে করা হয়, বটে, তাতেও লক্ষ রাখতে হয়, ভাষার শরীরে যেন আঘাত না লাগে। রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুনীতিকুমার প্রমুখ সেই রকমই একটি কাজ করেছিলেন চল্লিশ বছর আগে। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

সংস্কৃত এবং বাংলা এখন দুটি আলাদা ভাষা, একথা ঠিক। আলাদা কিন্তু সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নয়। ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলা যেমন দুটি আলাদা রাজ্য। ভারত ও বাংলাদেশ যেমন দুটি আলাদা দেশ। রাজনৈতিক ভাবে এইসব রাজ্য বা দেশের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতি বা ভাষার ক্ষেত্রে সে-রকম তাড়াহুড়ো কোনো কাজ হয় কি? স্বৈরাচারীরাই শুধু সেরকম চেষ্টা করে এবং ভুল করে।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক এখন জননী আর দুহিতার নয়, কিন্তু কোনো একটা রক্তের সম্পর্ক রয়েই গেছে। হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করা, আমার মতে, বাতুলতা। সংস্কৃত উচ্চারণ থেকে বাংলা উচ্চারণের অনেক দূরে সরে আসা মানে এই নয় যে মাঝখানে একটা প্রাচীর তুলে দিতে হবে। অন্তত এখনো সে সময় নিশ্চয় আসেনি। আরও দু'চার শো বছর পর অপরিচয়ের দূরত্বে যদি কেউ কারুকে আর না চিনতে পারে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবে।

সংস্কৃত এবং বাংলা উচ্চারণে অনেক তফাৎ হয়েছে, এবং বাক্য গঠন রীতির অনেক বদল হলেও বাংলা ব্যাকরণ এখনো সংস্কৃতের অনুসারী। শুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ বলে কিছু আছে নাকি? সে-রকম ব্যাকরণ রচনার কথা আজও কেউ চিন্তাও করেনি। বাংলা শব্দের বানানকে আমরা সম্পূর্ণ সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্ত করে তখনও সংস্কৃত অনুসারী ব্যাকরণ পড়ে যাবো? এ যে এক ভয়াবহ অবস্থা!

সংস্কৃতের কাছে আজও আমাদের কোথায় টিকি বাঁধা আছে, সেকথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। শব্দ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমরা এখন যে-কোনো ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করতে পারি। আরবী, ফার্সী, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষা থেকে হাজার হাজার শব্দ এসেছে, এখনো আসছে। মানুষ কখনো গ্রহান্তরে বসতি স্থাপন করলে এবং সেখানে মানুষের মতন কোনো প্রাণী থাকলে তাদের কিছু কিছু শব্দও আমরা বাংলায় নিতে পারবো। কিন্তু বাহির বিশ্ব বা বহির্বিশ্ব থেকে শব্দ আহরণ করাই একটা ভাষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন শব্দ তৈরি করতেও হয়। লেখকরা অনেকেই কিছু কিছু নতুন শব্দ উপহার দিয়ে যান তাঁদের ভাষাকে। বাংলায় নতুন শব্দ তৈরি করতে গেলে এখনো আমাদের অনেকখানিই নির্ভর করতে হয় সংস্কৃতের ওপর। সংস্কৃত শব্দ ভেঙে অনবরতই নতুন শব্দ বেরিয়ে আসছে। যদিও আজকাল ইস্কুল থেকে সংস্কৃত শিক্ষা হটিয়ে দেবার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, আমরা আজকাল খুব কমই সংস্কৃত শিখি, তবু সেই ভাঙাচুড়ো সংস্কৃতজ্ঞান থেকেও মাঝে মাঝে এক একটি নতুন শব্দ আবিষ্কারের আনন্দ পাই। এই আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দ যে কতখানি, তা শুধু ভাষাজীবীরাই বুঝবেন।

পরিভাষা খোঁজবার জন্য আমরা এখনো সংস্কৃতের দ্বারস্থ হই। এর অভিজ্ঞতা সব সময় সুখকর হয় না। অনেক সময় অকারণ খটোমটো শব্দ এনে ঝঞ্ঝাট বাড়ানো হয়। আবার একথাও ঠিক, এরই মধ্যে থেকে কয়েকটি শব্দ আমাদের মনোমতন হয়ে যায়, এবং থেকে যায়। এবং সরাসরি যাকে আনা হবে, তার সঠিক বানানও রাখতে হবে। Isobar এর প্রতিশব্দ সমপ্রেষ রেখা। এটাকে শমপ্রেশ রেখা লিখলে কারুর মানে বোঝার সাধ্য থাকবে?

মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দের চেহারা আস্তে আস্তে বদলায়। সেইভাবেই তদ্ভব শব্দগুলি এসেছে। কিন্তু কোনো একদিন মিটিং করে সমস্ত শব্দের বানান একেবারে মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে, এটা একটা অবাস্তব কথা।

সম্প্রতি জগন্নাথ চক্রবর্তী দেশ পত্রিকায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব এনেছেন।

কেনই বা সব শব্দ মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী হবে? শিশু এবং অনুদামীদের সুবিধের জন্য? ভাষার নানান রকম সূক্ষ্মতা এবং গোপন সৌন্দর্য সব ছেঁটে ফেলে তাকে করে ফেলতে হবে অতি সরল এবং নিরেট?

উচ্চারণ বলতেই বা কি বোঝায়? কার উচ্চারণ? কোন সময়ের উচ্চারণ? বাংলার সব জেলার মানুষের উচ্চারণ যে এক নয়, সে সম্পর্কে কিছু বলাই বাহুল্য। এখানে নিশ্চয়ই স্ট্যাণ্ডার্ড বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর এবং হুগলির অববাহিকার ভাষা, অধুনা যা কলকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষা বলে

স্বীকৃত। কিন্তু এই কলকাতার ভাষারই কি কোনো নির্দিষ্ট উচ্চারণের স্ট্যান্ডার্ড আছে? উনিশশো সাতচল্লিশের পর রাশি রাশি বাঙালের প্রাদুর্ভাব হলো এই শহরে। প্রথমে ছিল ঢেউ, তারপর শুরু হলো বন্যা। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, যোধপুর প্রভৃতি কলকাতার নতুন বসতিগুলো ভরে গেল বাঙালে। বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেল এক তাণ্ডব! এখন কলকাতাবাসীদের তুলনায় বহিরাগতদের সংখ্যা নিশ্চিত অনেকগুণ বেশী। চল্লিশ বছর আগেকার কলকাতার সুমধুর অনেক শব্দ, যেমন, নেবু, নংকা, নুচি ইত্যাদি এখন আর শোনাই যায় না প্রায়। পরিশীলিত উচ্চারণে এইচি, খেইচি, ভাঁড়িয়ে ইত্যাদি চাপা পড়ে গেল অন্যরকম চ্যাঁচামেচিতে। বললুম আর বল্লাম, দেখেছিলুম আর দেখেছিলাম ইত্যাদিতে তৈরি হলো জগাখিচুড়ি। ওমিয়োবাবুরা রাতারাতি হয়ে গেলেন অমিয়বাবু!

তিরিশ বছর কেটে গেলেও কলকাতার উচ্চারণে এখনো পুরোপুরি সমতা আসে নি। এখনো আমরা নিশ্চিন্ত নই যে ছাত বলবো, না ছাদ! কাক না কাগ? ইট না ইঁট? একই শব্দের দু'রকম উচ্চারণ আভিধানিক স্বীকৃতি পেতে পারে না বা পাওয়া উচিত নয়। বিশেষত বাংলায় এরকম শব্দের তালিকা সুদীর্ঘ। ইংরেজি ফরাসী অভিধানগুলিতে প্রত্যেকটি শব্দের পাশে উচ্চারণ নির্দেশ দেওয়া থাকে, বাংলা ভাষাকে কি সেই স্তরে আনা যাবে? যদি একটিমাত্র উচ্চারণকেই নির্দিষ্ট করা যায় তা হলে কোন্‌টা নেবো? যদি ছাত, কাক বা ইট-এর স্বপক্ষে ভোটো দেওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে খাঁটি কলকাতাবাসীদের ওপর বাঙালদের আধিপত্যের উদাহরণ। আমি নিজে বাঙাল হয়ে এই নতুন ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির সমর্থন করতে পারি না। অথবা অনুকরণ করতে হবে সেই সংস্কৃত মূল শব্দের। সেটাও তো এক ধরনের পিছু হটা।

উচ্চারণ এইভাবে ঘন ঘন বদলায়। যেভাবে হিন্দী সিনেমার প্রভাব ও ইংরেজি স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাবার নেশা বাড়ছে, তাতে আগামী পনেরো বছরের মধ্যে যে বাংলা উচ্চারণ আবার অনেকখানি বদলে যাবে না, তার কোনো ঠিক আছে? বদলাবেই যে, এটাই বরং বলা যায়। ইতিমধ্যেই অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের মুখে আশোক, আরুণ, স্বপ্নিতা এই ধরনের নামের উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং, খাঁটি মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান সংস্কার করতে গেলে কুড়ি-তিরিশ বছর অন্তত অন্তর অভিধানগুলি পুরো পাল্টে ফেলতে হবে এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্ররচনাবলী ছাপতে হবে আমূল বদলে।

উচ্চারণের বৈচিত্র্য অনেক সময় ভাষার মধ্যে মজা আনে। গল্প শোনা যায়, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে বিড়াল, তবু বরিশাল জেলার ছাত্র সেটাকে পড়ল নেকুর। প্রায় এর কাছাকাছি উদাহরণ অন্য ভাষায় আছে অনেক। লেখা আছে ককবার্ণ কিন্তু উচ্চারণ হয়ে গেল কোবর্ণ, কিংবা স্পষ্ট লেখা থাকে হোম তবু স্যার অ্যালেকের পদবী হিউম। আর ফরাসী শব্দের বানান দেখে ফরাসী উচ্চারণ শিখতে যায় যদি কেউ, তাহলে প্রথম বেশ ক'দিন সে নাকানি চোবানি খেয়ে মরবে।

হঠাৎ কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন না করে, সামান্য সামান্য সংস্কারের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করলে বরং বাংলা ভাষার বেশী উপকার হবে। ফরাসী আকাদেমির ধাঁচে বাংলা ভাষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান থাকার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেকেই অনুভব করি। কোনো নতুন শব্দ ফরাসীতে ব্যবহৃত হতে শুরু করলে এই আকাদেমি তার সঠিক বানানটি ঠিক করে দেন। আমাদের শাড়ী শব্দটি ফরাসী ভাষায় স্বীকৃত হলে, তার বানান নির্দেশের ঘোষণা কাগজে দেখেছিলাম। আমাদের বাংলার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই ভূমিকা নিতে পারতো। কিন্তু নেয়নি, এখন আর আশাও করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বজনমান্য হতে হবে। এই দলাদলি ও স্বজনপোষণের দেশে সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান গড়া সম্ভব কিনা আমি জানি না। হলে ভালো হতো। বিশেষত, হলে, হ'লে, হোলে এই ধরনের বানান বিভ্রাটের ক্ষেত্রে একটা সমতা আনার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরকম কাজ যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

শ, ষ, স-এর বদলে একটা শ, য-জ এর বদলে শুধু জ, ণ ন এর মধ্যে শুধু ন আর হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান লোপ পাইয়ে দেবার কথাও অনেকেই আগে আগে বলেছেন। এর নবতম প্রবক্তা জগন্নাথবাবু, তিনি আরও একটু এগিয়ে এসে বলেছেন এগুলির উচ্চারণে কোনো তফাৎ-ই নেই। কোনো তফাৎ নেই? কোনো বালকের কাছে না থাকতে পারে, শিক্ষাহীন গ্রাম্য লোকের কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু ভাষাকে যারা ভালোবাসেন, ভাষার প্রতি যাঁদের মনোযোগ রয়েছে, তাঁদের কাছেও নেই? এটা কি ঠিক কথা হলো?

প্রাণ আর গান এই দুটি শব্দের ণ ও ন এর উচ্চারণ কি এক? জগন্নাথবাবু বৈয়াকরণ বটে কিন্তু তিনি কবিও, তাঁর কানে নিশ্চয়ই এই আলাদা উচ্চারণ বাজবে। বিষাণ আর নিশান এর শেষ দুটি অক্ষরের উচ্চারণ দুটি শব্দেই এক রকম হতে পারে? তফাৎটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু তফাৎ আছেই। এই সূক্ষ্মতা মুছে ফেলে বাংলাভাষাকে একটা মোটা দাগের ভাষা করে তোলার জন্য আমাদের এত ব্যস্ততা কিসের?

দিন আর দীন, এর উচ্চারণ এখন পর্যন্ত এক নয়, কিছুতেই নয়, কোনো সুদূর অতীতে হবে হয় তো। দীনবৎসল, কোনো রাজা সম্পর্কে এই বিশেষণটি প্রয়োগের পর প্রশ্ন উঠেছিল যে, তিনি গরীবদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, না তাদের বেছে বেছে রোগা মানুষ দমন করেন। দিনবৎসল, এই বানানে এরকম কোনো মজা পাওয়া যাবে?

যুক্তাক্ষর ভেঙে সর্বক্ষেত্রে হসন্ত ব্যবহারের প্রস্তাব দেখে শনিবারের চিঠির সেই পুরোনো রসিকতাটা মনে পড়লো। ছাপার যন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে হসন্ত ভেঙে উড়ে বেরিয়ে যায়, তা আমরা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানি। সেই সুবাদে শনিবারের চিঠিতে লেখা হয়েছিল, সটেশন আর সটিমার। এ কি সটাইল রে বাবা।

বিজ্ঞান

মায়ের দুধ

জন্মশাসন এবং শিশু মৃত্যু

মায়ের দুধের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি কোন সম্পর্ক আছে?

আছে। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে জন্ম শাসনের তেমন ব্যবস্থা নেই এবং শিশুরা খুব কম বয়েসেই মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয় সে সব অঞ্চলে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। শিশু-মৃত্যুর হারও। সম্প্রতি 'সায়ানস পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (শিরোনাম ব্রেস্ট ফিডিং অ্যান্ড পপুলেশন গ্রোথ) একথা বলেছেন ডঃ জন নডেল। ডঃ নডেল মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-সংখ্যা গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক এবং সমাজ বিজ্ঞানী।

'শিশুদের মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারটা খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা।' বলেছেন আর

মায়ের বুকের দুধের বিকল্প বোতলের দুধ। এই দুধ কখনও কখনও নানা কারণে শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবে দেখা দেয়।

এক জন সমাজ বিজ্ঞানী। নাম বি ভালকুইস্ট। তাঁর বক্তব্যঃ জন্মের পর শিশুর মুখে প্রাথমিক খাবার হিসেবে যা পড়ে, তা হল মায়ের দুধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গেল শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলিতে। ইউরোপের সাতটি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে আমরা দেখেছি, জন্মের পর পরবর্তী তিন মাস খুব কম সংখ্যক শিশুই তাদের মায়ের বুকের দুধ পেয়ে থাকে। যারা পায়, তাদের মধ্যেও অনেকে নির্ভর করে পরিপূরক হিসেবে কৃত্রিম খাদ্যের ওপর। এবং ওই একই ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যাচ্ছে। সেখানে সমস্ত শিশুই জন্মগ্রহণ করে হাসপাতালে অথবা নার্সিং হোমে। মায়ের সঙ্গে যে কয়দিন তারা সেখানে বাস করে তখন অনেকের ভাগ্যেই মায়ের দুধ তবু কিছুটা মেলে। কেউ কেউ পুরোপুরি মায়ের দুধ খেয়েই জীবন ধারণ করে তখন। কিন্তু যে মুহূর্তে মা হাস-পাতাল অথবা নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেলেন, বঞ্চনার শুরু। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৬ সালে মার্কিন দেশে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শতকরা ৬৫টি শিশু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সৌভাগ্য পেত। ১৯৫৬ সালে এই হার এসে দাঁড়ায় ৩৭ শতাংশে। এবং ১৯৬৬ সালে আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২১ শতাংশে।

'তবে ইদানীং কিছুটা পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে।' বলেছেন ডঃ নডেল। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে কিছুটা বিপরীত অভিজ্ঞতাও আমরা পেয়েছি। কিছু কিছু মায়ের মধ্যে সন্তানকে নিজের বুকের দুধ খাওয়ানর প্রবণতা তুলনামূলকভাবে আবার যেন বাড়ছে। বাড়ছে মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং যে সব মা যথেষ্ট শিক্ষিত তাঁদের মধ্যে। অবশ্য তার মানে এই নয়, সামগ্রিক ভাবে বুকের দুধ খাওয়ানর রেওয়াজটা বেড়েছে। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে বরং বলব, মায়ের দুধ পাওয়ার মত শিশুর সংখ্যা কিন্তু কমছে।'

*

ইউরোপের কথাই ধরা যাক। উনিশ শতকের শেষের দিকেও সেখানকার মায়েরা যতদিন সম্ভব বুকের দুধ খাইয়েই শিশুদের মানুষ করতেন। কোন কারণে নিজের বুকের দুধে অভাব ঘটলে তাঁরা নির্ভর করতেন ধাই-মা'র ওপর। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর। দিনে দিনে একের পর এক কল-কারখানা বসল। চাহিদা বাড়ল কর্মীর। চাহিদার যোগান দিতে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও পাল্লা দিতে শুরু করলেন। ফলে অনেক মায়ের পক্ষে শিশুদের বুকের দুধ যোগান তখন আর সম্ভব হত না। এই পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ায়, ভুরটেনবুর্গ, বাদেন, স্যাকসোনি, বোহেমিয়া এবং অস্ট্রিয়ায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখা গেল ওই সব অঞ্চলের মায়েদের পক্ষে নিজেদের বাচ্চাদের বেশিদিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ান আর সম্ভব হচ্ছে না। পরিবর্তে তাদের যোগান হল যব, বার্লি প্রভৃতির মণ্ড এবং চিনির জল।

বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হল কৃত্রিম শিশু খাদ্যের জোয়ার। বড় বড় কারখানায় উৎপাদন শুরু হল টিনে বোঝাই শিশুখাদ্য। চল হল বোতলের সাহায্যে শিশুদের খাওয়ানর রেওয়াজ। অফিসে এবং কল-কারখানায় যে সব মায়েরা কাজ করেন শুধু তাঁরাই নন, গৃহবন্দী হয়ে যাঁদের জীবন কাটাতে হয় তাঁরাও দেখলেন 'বোতল' তাঁদের যেন অনেকটা সুবিধে করে দিয়েছে। গৃহস্থালির কাজের সময় শিশু কাঁদে। অতএব বাজারে দুধ জলে গুলে বোতলে বোঝাই কর। তারপর দাও শিশুর মুখের মধ্যে গুঁজে। ব্যস! শিশুর কান্নাও থামল, তাকে খাওয়ানর ব্যাপারটাও সহজ হয়ে গেল।

এ ধরনের ব্যাপার গোড়ার দিকে শহর এবং শিল্পাঞ্চলেই দেখা গিয়েছিল বেশী। তারপর হয়ে দাঁড়াল ফ্যাসানের মত। আধুনিকতার তালিকায় শিশুদের 'বোতলে দুধ' খাওয়ানর রীতিটি আসন গেড়ে বসল। সমাজে এক শ্রেণীর মায়ের কাছে বুকের দুধ খাওয়ানর ব্যাপারটা 'অসভ্য কাণ্ডে'র মত হয়ে দাঁড়াল। আর তার সঙ্গে এসে জুড়ল ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন। নানা রকম যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন তাঁদের তৈরি শিশুখাদ্য খুবই আদর্শ খাবার। বিজ্ঞাপনের তোড়ে অনেক মা'র আগ্রহ সেদিকে ঝুঁকল। তাঁরা মনে করলেন, শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে গেলে ওই সব কৃত্রিম খাবার অপরিহার্য। ক্রমে প্রয়োজনের চেয়ে ফ্যাসানটাই দাঁড়াল বড় হয়ে। বুকের দুধের দিকে নজর দাঁড়াল কম। বলা-বাহুল্য শহরকে অনুকরণ করতে গিয়ে এই

স্বাস্থ্যরক্ষায় টাকা খাটান—হকিন্স®-এ রান্না করুন

হকিন্স আপনার পরিবারের সকলকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর খাবার যোগায় কারণ হকিন্স-এ রান্না করা খাবারে অনেক বেশী পুষ্টিগুণ বজায় থাকে। সেন্ট্রাল ফুড এণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট-এর বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার এক নিরীক্ষায় জানা যায় যে প্রেসারে রান্না ক'রলে কয়েকটি পুষ্টিকর পদার্থ, বিশেষতঃ ভিটামিন আর প্রোটিন খাবারে ভালোমত বজায় থাকে।

এছাড়াও হকিন্স আপনাকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেয় কারণ, এতে রান্না হয় ১২২° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে, যে উত্তাপ বীজাণুশূন্য করে, ফলে, খাবারেও কোন বীজাণু থাকে না। আপনি হয়তো জানেন না—সাধারণতঃ যে উত্তাপে রান্না হয়, অর্থাৎ ১০০° সেন্টিগ্রেড (যে উত্তাপে জল ফুটতে শুরু করে), সে উত্তাপে বীজাণুমুক্ত করা যায় না। তা'র জন্যে চাই হকিন্স প্রেসার কুকারের ১২২° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ।

রন্ধনপ্রণালীর একটি সহজ, সচিত্র বই ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। এতে ১২৭টি রন্ধনপ্রণালী দেওয়া আছে যেগুলি পূর্বেই আস্বাদিত। আপনার সুস্বাদু রান্নার গুণে আপনি পরিবারের সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠবেন কারণ, এভাবে রান্না করা খাবার খেলে তাঁদের সকলের স্বাস্থ্য আরো ভালো হ'য়ে উঠবে।

সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রান্না করুন

হকিন্স প্রেসার কুকারে রান্না ক'রতে অর্দ্ধেকেরও কম সময় লাগে। হকিন্স-এ, বেশীর ভাগ অন্য প্রেসার কুকারের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না হয় কারণ এর

ডিজাইন,এমন যে ভেতরে বাষ্প চলাচলের পরিসর অনেক বেশী।

বছরে ২০০ টাকা বাঁচান

বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে হকিন্স-এ রান্না ক'রলে আপনি ৫৩% কেরোসিন বা অন্য যেকোনো জ্বালানী—যেমন, গ্যাস, কয়লা বা বিদ্যুত বাঁচাতে পারেন। তার মানে, শুধুমাত্র জ্বালানীতেই আপনি প্রতি বছরে ২০০ টাকার চেয়েও বেশী বাঁচাতে পারেন। অর্থাৎ প্রথম বছরেই আপনার হকিন্স তার দাম উশুল ক'রে দেয়।

খাবার-দাবারের ওপরেও আপনি পয়সা বাঁচাতে পারেন :

মোটা চাল-ডাল বা একটু ছিবড়ে মাংস, সস্তা হ'লেও, ভাল ক'রে গ'লতে চায়না ব'লে আপনিও সেসব রান্না ক'রতে চান না। হকিন্স ব্যবহার ক'রলে আপনি এসবও নরম ও সুস্বাদু ক'রে রান্না ক'রতে পারেন।

মেরামতির খরচ বাঁচায়

হকিন্স-এর ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে কম। হকিন্স-এর গ্যাসকেট আর সেফটি ভাল্‌ভ সাধারণ প্রেসার কুকারের চেয়ে টেকে বেশী।

হকিন্স প্রেসার কুকার পাঁচ বছরের জন্য গ্যারান্টী দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে, যে-সব অংশ গ্যারান্টীর আওতায় পড়ে, তা বদলে দেওয়া হয়। সব সময়েই আপনি বিনাপয়সায় হকিন্স-এর সার্ভিস পাবেন। ভারতের সব বড় শহরেই হকিন্স-এর অনুমোদিত সার্ভিস কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রের, ফ্যাক্টরীতে তালিম পাওয়া মেকানিকদের কাছ থেকেই আপনি চটপট, যোগ্যতাপূর্ণ সার্ভিস পাবেন।

হকিন্স—সবচেয়ে নিরাপদ প্রেসার কুকার

হকিন্স-এর বিশেষ ডিজাইনের জন্যে এই প্রেসার কুকার সম্পূর্ণ নিরাপদ—দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। এর ঢাকনা পাশের দিকে না খুলে নীচের দিকে, অর্থাৎ কুকারের ভেতর দিকে খোলে। বাষ্পের চাপ নিরাপদ মাত্রায় নেমে না গেলে চেষ্টা ক'রলেও ঢাকা খোলা যায় না। সেফটি ভাল্‌ভ হ্যাণ্ডেল বারের নীচে থাকায় তা দিয়ে বাষ্প নীচের দিকে বেরিয়ে যায়। ফলে, দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

বলুন তো, এখন হকিন্স না নিয়ে কি থাকতে পারবেন?

আপনার সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে বিশ্বাসী ডীলারের কাছ থেকে হকিন্স কিনুন। অথবা, এখানে লিখুন : প্রেসার কুকারস্‌ এণ্ড এ্যাপ্‌লায়েন্সেস্‌ লিঃ, পি ও. বক্স ১৫৪২, বোম্বাই-৪০০ ০০১

® হকিন্স ও হকিন্স-ইউনিভার্সাল হল রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক।

আপনার দেহমন, টাকাকড়ি'র মঙ্গলচিন্তায়-হকিন্স

PCA. 77-2415 BG-B

সেরেল্যাক দিয়ে আপনার শিশুকে সুস্থ, সবল ও দীপ্তিমান করে তুলুন

আপনার বাচ্চার তিনমাস বয়সের পর থেকেই দরকার দুধ ছাড়া আরও কিছু। তখনই তার দরকার সেরেল্যাক। কারণ সেরেল্যাকে আছে খাঁটি ঘন দুধ, খাদ্যশস্য আর চিনি। এর ফলে, সেরেল্যাক সবরকমে পুষ্টিকর। তাছাড়া, সেরেল্যাক খেতেও চমৎকার। এর স্নেহজাতীয় পদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট আপনার শিশুকে সুস্থ করে গড়ে তোলে, এর প্রোটিন তাকে সবল করে এবং এর ভিটামিন ও লৌহ উপাদানে সে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে।

তৈরি করা সহজ, আপনাকে শুধু মেশাতে হবে একটু জল।

আগে থেকে ফোটান জলে সেরেল্যাক মিলিয়ে নিন

ভাল করে মিশিয়ে নিন

শিশুদের খেতে দিন

শিশুদের জন্য প্রথম সুষম শক্ত আহার

CLC-CAS-1/78 BEN

মানসিকতা শেষ পর্যন্ত গ্রামের মায়েদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

এটা অবশ্য এক দিক। সমস্যাও যে নেই তাও ঠিক নয়। যেমন, অনেক মা বাচ্চাদের দুধ দিতে পারেন না, শারীরবৃত্তীয় কারণে তাঁদের বুকে দুধের অভাব বলে। কোন কোন সময় চিকিৎসকরাই মায়েদের বারণ করেন বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে। বিশেষ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা যদি রোগাক্রান্ত অবস্থায় থাকেন, তখন। পাছে মায়ের রোগ শিশুতে গিয়ে বর্তায় সে কথা ভেবেই এ ধরনের নিদেন দিতে তাঁরা বাধ্য হন। এমন ক্ষেত্রে কৃত্রিম শিশু-খাদ্য মুখ্য 'বিকল্পে'র ভূমিকা গ্রহণ করে। এমন নানান কারণে আজকের দিনে অনেক শিশুই মায়ের বুকের দুধ আর পায় না।

'বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানর সঙ্গে মায়ের সন্তান ধারণ ক্ষমতার যেন যোগ রয়েছে।' বলেছেন ডঃ নডেল।

এ ধরনের সন্দেহ আজকের নয়, খুবই পুরনো। ডঃ নডেলের বক্তব্য, দেখা গেছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোন সন্তান যদি বেশিদিন ধরে মায়ের দুধ খায়, সেই মায়ের পরবর্তী সন্তান সম্ভাবনার সময় বিলম্বিত হয়। এর যথাযথ কারণ এখনও অজানা।

তবে কেউ কেউ মনে করেন, আসলে ব্যাপারটা হল এই। বাচ্চারা যখন মায়ের বুকের দুধ খায়, চোষার সময় স্তনের বোঁটায় এক ধরনের শিহরন ঘটে। এর ফলে মায়ের দেহে প্রোল্যাকটিন এবং আরও কয়েকটি হরমোন নিঃসৃত হয়। যার প্রভাবে ডিম্ব-কোষ তৈরির ব্যাপারটা বাধা পায়। এই বাধাই সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বিলম্বিত করে।

সম্প্রতি আরও একটি ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন গবেষকরা। তাঁরা দেখেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি কোন মায়ের সন্তানকে বুকের দুধ যোগানর ক্ষমতা বেশিদিন ধরে চলে, তাহলে তাঁর প্রসবের পর পরবর্তী 'মাসিক'-এর সময়টিও আসে দেরিতে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে যারা সন্তানকে বুকের দুধ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের গর্ভে প্রসবের ওই প্রথম 'মাসিকে'র অনেক পরে সন্তান আসে। তবে এটা প্রত্যয় মাত্র। এ প্রত্যয় প্রমাণ সাপেক্ষ।

মায়ের বুকে দুধের অভাব ঘটলে এবং কখনও কখনও আধুনিক জীবন যাত্রা ও স্বাস্থ্যের দরুন প্রসবের পর গড়ে দুই মাসের মধ্যেই 'মাসিক' শুরু হয়। কারোর কারোর কিছুটা দেরিতেও আসে। তবে যে সব মা বেশিদিন সন্তানকে বুকের দুধ দেন এই সময়টি তাঁদের ক্ষেত্রে দীর্ঘতর হয়। গড়ে ১৮ মাস। কখনও তারও বেশী। ইন্দোনেশিয়া, জাইর, সোমালিয়া এবং বাংলাদেশে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্যটির সপক্ষে সমর্থনও পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ নডেল তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এক, শিশু যখন মায়ের বুকের দুধ খায়—যদি অনেকক্ষণ ধরে খায়; দুই, যদি সে কিছুক্ষণ অন্তরই মায়ের দুধ খেয়ে থাকে এবং তিন, বুকের দুধ খাওয়ার সময় সে স্তনের বোঁটা ভীষণভাবে চুষতে থাকে—এমন ক্ষেত্রে মায়ের প্রসবের পরবর্তী মাসিকের সময়টি অনেক বেশি বিলম্বিত হয়। যে সব মা সন্তানকে বুকের দুধও দেন আবার বোতলের দুধও খাওয়ান তুলনামূলকভাবে তাঁদের ডিম্ব-কোষ সৃষ্টির ক্ষমতা ত্বরান্বিত হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বুকের দুধের বদলে সন্তানকে বোতলের দুধ খাওয়ানর ব্যবস্থা করলে এবং সেই সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে একটি সন্তানের পর মায়ের কোলে পরবর্তী সন্তান আসার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ১৪ ভাগ কমে যায়। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা শুধু সে ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যেখানে মায়েরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার

পাঁচ মাস পরে শুরু হয়। পরিবর্তে মায়ের পুষ্টি যদি এমন পর্যায়ে থাকে যে, বেশিও নয় আবার কমও নয় এবং পরবর্তী মাসিকের কাল সতের মাসের মত বিলম্বিত সে ক্ষেত্রে একটি সন্তানের পর পরের সন্তানটি কোলে আসার সম্ভাব্য সময় গড়ে শতকরা ৪০ ভাগ কম হতে দেখা গেছে।

ডঃ নডেলের মন্তব্য : উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশুখাদ্য হিসেবে মায়েরা নিজেদের বুকের দুধই কাজে লাগান বেশী। হয়ত এর জন্যেই ওই সব দেশের অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে একবার সন্তান ধারণ করার পর পরবর্তী সন্তান ধারণের সময়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে, যদি না তারা অপুষ্টির শিকার হয়।

অর্থাৎ ডঃ নডেল যা বলতে চেয়েছেন তার সার কথা, মা যদি অপুষ্টিতে না ভোগেন এবং তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে দীর্ঘ সময় তাঁর বুকের দুধ খাওয়ার সুযোগ পায়, সে ক্ষেত্রে ওই মা দ্বিতীয় সন্তানের জননী হবেন দেরিতে।

*

মায়ের বুকের দুধের ভূমিকা আরও একটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক বছর আগে পাঞ্জাবের খান্না জেলায় ভূমিষ্ঠ হল কুড়িটি শিশু। অনিবার্য কারণে তারা আর মায়ের বুকের দুধ পেল না। ফলে জন্মের পর থেকেই তাদের খেতে দেওয়া হল কৃত্রিম খাবার। বোতলের দুধ, ইত্যাদি। বছর না ঘুরতে দেখা গেল ওই শিশুদের মধ্যে উনিশজনই মারা গেছে। তুলনায় যারা মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার দেখা গিয়েছিল ১২ শতাংশ। চিলিতে দেখা গেছে, জন্মের পর যে সব শিশুদের তিন মাস বয়েস পর্যন্ত সেখানে বোতলের দুধের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, তাদের মৃত্যু হার যারা বুকের দুধ খেয়েছে, তাদের মৃত্যু হারের চেয়ে তিন গুণ বেশী। এ ব্যাপারে ১৯৭৫ সালে গুয়াতেমালা শহরে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন ডঃ জে ডি ডবুরে নামে জনৈক বিশেষজ্ঞ। তিনি লক্ষ্য করেছেন, এই শহরের যে সব শিশু জন্মের পর প্রথম ছয় মাস মায়ের দুধ খেয়েছে, পরবর্তী ছয় মাসে তাদের মধ্যে মৃত্যুহার যারা প্রথম ছয় মাস বোতলের দুধের ওপর নির্ভর করেছিল, তাদের চেয়ে অনেক কম। দেখা গেছে, শেষোক্ত শিশুদের মৃত্যু হার প্রথমোক্ত শিশুদের চেয়ে গড়ে ৬ থেকে ১৪ গুণ বেশী।

মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সব চেয়ে বড় সুবিধে এই, এই দুধ পুষ্টির দিক দিয়ে আদর্শ-স্থানীয়। অন্তত শিশুর জীবনের প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত তো বটেই। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বুকের দুধ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এছাড়া এই দুধে এমন কিছু কিছু উপাদান থাকে, যারা শিশুকে রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ব্যবসায়ীরা যত বিজ্ঞাপনই দিন, মায়ের দুধের তুলনায় তাঁদের তৈরি শিশুখাদ্যের মান অনেক নিচে। এর সঙ্গে আছে আরও কিছু সমস্যা। যেমন, যে বোতলে শিশুকে কৃত্রিম দুধ খাওয়ান হয়, অনেক সময় দেখা যায়, সব সময় তাদের ঠিক মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় না। ওই বোতলে খাওয়ানর দরুন শিশু নানারকম সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মায়েরা কোন কোন সময় নিয়ম-মাফিক কৃত্রিম দুধ শিশুর উপযোগী করে তৈরি করতে পারেন না। পটুতার অভাবে অথবা ধৈর্য না থাকায়। ফলে ওই দুধ শিশুদের ক্ষতিই করে। এগুলিও শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

ডঃ নডেল তাঁর প্রবন্ধে একথাও বলেছেন, যে সব মায়েরা বেশি দিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ানোর সুযোগ পান, তাঁদের গর্ভপাত হয় কম। তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাও কম দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাডমিন্টনে কিং-এর রাজ-খেতাব

কথায় বলে বার বার তিনবার। তৃতীয়বারেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য করায়ত্ত হয় না। যেমন বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় মাইকেল ফেরেরার ক্ষেত্রে। তিনবার রানার্স হয়ে চতুর্থবার বিলিয়ার্ডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতের মাইকেল ফেরেরা। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় লিয়েম সুই কিং কিন্তু তৃতীয়বারেই ব্যাডমিন্টন রাজ-খেতাব পেলেন অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে। ১৯৭৬-এর ফাইনালে হেরেছিলেন স্বদেশের অসাধারণ খেলোয়াড় রুডি হরতনোর কাছে, ১৯৭৭-এর ফাইনালে ডেনমার্কের ফ্লেমিং ডেলফস-এর কাছে। এবার হরতনোকে হারিয়েই খেতাব জিতেছেন।

অল ইংলণ্ড খেতাব জয়ের অর্থ ব্যাডমিণ্টনে বিশ্ব শ্রেষ্ঠের সম্মান লাভ। উইম্বলডনে টেনিস চ্যাম্পিয়ন হবার মতই মর্যাদা। ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিস আয়োজিত মাস্টার্স টুর্নামেণ্ট কয়েক বছর ধরে চালু হলেও এখনো উইম্বলডন বিজয়ীকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন বিজয়ীর সেই মর্যাদা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে, ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হওয়া সত্ত্বেও। কেননা, ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপের একটিমাত্র প্রতিযোগিতাই অনুষ্ঠিত হয়েছে গত বছর সুইডেনের মালমো শহরে। সে প্রতিযোগিতায় আবার চীনের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেনি। বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রুডি হরতনেরাও অনুপস্থিত ছিলেন। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ফ্লেমিং ডেলফস, ফাইনালে স্বদেশের স্বেন প্রীকে পরাজিত করে। সেবার মাসখানেক আগে ডেলফস জিতেছিলেন অল ইংলণ্ড খেতাব। তারপর প্রথম অফিসিয়াল ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের সুবাদে ডেলফস পান অবিসংবাদী বিশ্বশ্রেষ্ঠের সম্মান। সেই ডেলফসকেই এবার কোপেনহেগেনে ডেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পরাজিত করেছেন লিয়েম সুই কিং। অল ইংলণ্ডে অবশ্য ডেলফসের মুখোমুখি হননি। হরতনো সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারান ডেলফসকে। ফাইনালে হরতনোকে স্ট্রেট গেমে হারান লিয়েম সুই কিং। অল ইংলণ্ডের সপ্তাহখানেক আগে ডেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন ফাইনালে সুইডেনের টমাস কিলস্টরমে হারিয়ে। সুতরাং, লিয়েম সুই কিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। একমাত্র প্রশ্ন তুলতে পারে চীন, সাংগঠনিক কোন্দলে যারা অল ইংলণ্ডে কোনবার অংশ গ্রহণ করেনি এবং ব্যাডমিণ্টনে বিশ্বশ্রেষ্ঠ বলে যাদের দাবী।

সত্যি কথা, ব্যাডমিণ্টনে চীন এখন পৃথিবীর নব জাগ্রত শক্তি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূরই শুধু এগিয়ে যায়নি, ৭৬-এর নভেম্বরে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি খেতাবের মধ্যে ৬টি খেতাব জিতে এবং তার আগে তেহরান এশিয়ান গেমসে সিনিয়র ও জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রমাণ করেছে ব্যাডমিণ্টনে চীনের স্থান ইন্দোনেশিয়ারও উপরে। হায়দরাবাদে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চীনের এক নম্বর খেলোয়াড় হো চিয়া-চ্যাং-এর কাছেই লিয়েম সুই কিংকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য দেশগত প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ৩—২ ম্যাচে হারিয়েছিল চীনকে। চ্যাং দেশগত প্রতিযোগিতায় খেলেননি। খেললে ইন্দোনেশিয়া জিততে পারত কিনা সন্দেহ। হায়দরাবাদে শীর্ষ-বাছাই-এ ইন্দোনেশিয়ার হল সুমিরাত দেশগত প্রতিযোগিতার দুটি খেলায় হেরেছিলেন চীনের ফ্যাং কাই-সিংয়াং ও লুয়েন চিনের কাছে। তাই চীনা খেলোয়াড়দের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যাডমিণ্টনের বিশ্ব দরবারে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছে না চীন। এখন তো চীনের জন্যই বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন সংস্থা দুটুকরো হয়ে গেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে হংকংয়ে প্রথম ওয়ার্লড ইনভিটেশন টুর্নামেণ্টের পর এশিয়া ও আফ্রিকার ১৯টি দেশকে নিয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ার্লড ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন। ইউরোপ প্রভাবিত ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনও বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। ব্যাডমিণ্টন খেলায় এশিয়ার চার প্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভারত ও মালয়েশিয়া কিন্তু নতুন ফেডারেশনে যোগ দেয়নি, টমাস কাপ উবের কাপ এবং অল ইংলণ্ড খেলার অধিকার হারানোর ভয়ে।

যে কারণে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন দুভাগ হল সেটা অনেকেরই জানা। এখানে আলোচ্য নয়। প্রশ্ন অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা হলেও যে প্রতিযোগিতায় চীনের খেলোয়াড়রা অনুপস্থিত সে প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বলা যায় কিনা। সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী না বলার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনই আদি এবং মূল সংস্থা। এখনো দলেও অনেক ভারি। ভারত সহ এশিয়ার চারটি দেশও সেই সংস্থার সদস্য। সুতরাং, লিয়েম সুই কিংকেই ব্যাডমিণ্টনের কিং বলে মেনে নিতে হচ্ছে। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ যখন ফিফার বাইরে ছিল তখন কি উরুগোয়েকে ফুটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে মানা হয়নি?

যাক সে কথা। খেলার কথায় আসা যাক। ২২ বছর বয়সী খেলোয়াড় লিয়েম সুই কিং কয়েক বছর ধরেই বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের এক বড় নাম। এ বছর খেলছেনও টপ ফর্মে। অল ইংলণ্ডের আগে কোপেনহেগেনে ফ্লেমিং ডেলফসকে পরাজিত করা সত্ত্বেও লিয়েমকে কিন্তু সিডিংয়ে উপরে স্থান দেওয়া হয়নি। ছিলেন চারজনের সঙ্গে পাঁচ নম্বর বাছাই। অথচ যে

ডেলফস ও কিলস্টরমকে হারিয়ে লিয়েমের ডেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সেই ডেলফস ও কিলস্টরমকে দেওয়া হয়েছিল বাছাইয়ে তৃতীয় স্থান। হরতনো ও স্বেন প্রী ছিলেন শীর্ষ বাছাই। কিন্তু প্রতি খেলাতেই লিয়েম সুই তার অসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলেন স্ম্যাশ, প্লেসিং, ড্রপ শট ও কোর্ট ক্র্যাফ্টে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কোন গেম দেননি। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড অনগ্রী প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা বাদ দিচ্ছি। তৃতীয় রাউণ্ডে ১৫-৮ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে হারান ডেনমার্কের নামী খেলোয়াড় এলো হ্যানসনকে, কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই ও ১৯৭৫-এর অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন স্বেন প্রীকে ১৫-১০ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে, সেমিফাইনালে স্বদেশের হল সুমিরাতকে ১৫-১১ ও ১৫-১৩ পয়েণ্টে এবং ফাইনালে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের প্রবাদ পুরুষ রুডি হরতনোকে ১৫-১০ ও ১৫-৩ পয়েণ্টে। সুমিরাত ছাড়া কেউই কিংয়ের সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারেননি।

লিয়েম সুই কিং একদিন ব্যাডমিণ্টনের রাজ-সিংহাসনে বসবেনই। কিন্তু তার অভিষেকের মধ্যেই রাজত্ব হারালেন রুডি হরতনো। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অগ্রগণ্য হরতনো ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ টানা ৭বার অল ইংলণ্ড খেতাব জেতেন। ৭৫এ স্বেন প্রীর কাছে ফাইনালে হেরে আবার চ্যাম্পিয়ন হন ৭৬এ। ৭৭এ অল ইংলণ্ডে খেলেননি ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকায়। অনেকেই আশা করেছিলেন এবার তিনি নবম খেতাব পাবেন। কিন্তু কালের ধর্মে বয়স তাকে কামড়ে ধরেছে। ২৮ বছর বয়সে কিং-এর সঙ্গে শেষ ধাপে পাল্লা টানা সম্ভব হয়নি, যদিও সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমিং ডেলফসকে। তবু মনে হয় বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের শীর্ষে আবার ফিরে আসা হরতনোর পক্ষে শক্ত হবে।

অল ইংলণ্ড এবার মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গ্রেট ব্রিটেনের গৃহবধূ গিলিয়ান গিলকস, ফাইনালে জাপানের ছাত্রী সায়রী কোণ্ডোকে হারিয়ে। সায়রী কোণ্ডো এর আগে অল ইংলণ্ডে খেলেননি। সম্ভবত মালমো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল খেলার ফলে একই দেশের হিরো জাকির সঙ্গে তাকে বাছাই তালিকায় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল। মালমোর চ্যাম্পিয়ন ডেনমার্কের ভেণ্টস্ট লেনে কোপেন ও গিলিয়ান গিলকস সিডিংয়ে পেয়েছিলেন যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান। জাপানের হিরো জুকি গতবার এবং মোট চারবারের অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন। গিলিয়ান গিলকসের খেতাব শুধু ৭৬-এ। সেমিফাইনলে গিলকসের কাছে হেরে যান হিরো জুকি। সায়রী কোণ্ডো ফাইনালে ওঠেন কানাডার ওয়েণ্ডি ক্লার্কসনকে হারিয়ে, যে ক্লার্কসন কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও শীর্ষ বাছাই লেনে কোপেনকে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল ২১ বছর বয়স্ক জাপানী ছাত্রী ২৭ বছরের গৃহবধূ গিলকসকে ফাইনালে যথেষ্ট বেগ দেবেন। কিন্তু প্রথম গেমে একটির বেশি পয়েণ্ট পাননি। দ্বিতীয় গেমে কিছুটা লড়ে ৯ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে চারজন ইন্দোনেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জুজুন ও জোহান ওয়াজাদি ১৫-১২ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে হারান ক্রিশ্চিয়ান হাদিনতা ও আদে চন্দ্রাকে। মেয়েদের ডাবলসেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জাপানের চার কন্যা। মাৎসুকো তকুদো ও মিকিকো তাকাদা ১৮-১৬ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে পরাজিত করেন এতাস্কো উয়েনো ও ইউনেকুয়াকে।

ভারত থেকে এবার শুধু প্রকাশ পাড়ুকোনকে অল ইংলণ্ডে খেলতে পাঠানো হয়েছিল। পাঠানো হয়েছিল বললে একটু ভুল বলা হবে। অর্থাভাবে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশকে পাঠাতে পারেনি। মোদি পেনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অর্থানুকূল্যে এবং ভারত সরকারের অনুমোদনে প্রকাশ গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে। প্রথম রাউণ্ডে সুইডেনের এস কার্লসনকে ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে কানাডার পি টায়রনকে ১৫-৫ ও ১৫-৭ পয়েণ্টে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রকাশ হেরে যান ফ্লেমিং ডেলফস-এর কাছে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রকাশ প্রথম গেমটি জেতেন ১৫-৫ পয়েণ্টে অতি সহজে। দ্বিতীয় গেম হারেন ৮-১৫ পয়েণ্টে এবং মীমাংসাসূচক শেষ গেম হারেন ১১-১৫ পয়েণ্টে।

আন্তর্জাতিক খেলায় ম্যাচ পয়েণ্টের মুখে পৌঁছে প্রকাশের হেরে যাবার অনেক নজির আছে। সবচেয়ে বড় নজির ১৯৭৬-এর নভেম্বরে নেহরু ব্যাডমিণ্টনের ফাইনালে। তাইল্যাণ্ডের বান্দিত জইয়েনকে মীমাংসাসূচক শেষ-গেমে হারাতে পারেননি ১৭-১৪ পয়েণ্টে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। বান্দিত জিতেছিলেন ১৮-১৭ পয়েণ্টে। মাত্র এক পয়েণ্টের জন্য প্রকাশ খেতাব হারিয়েছিলেন। কয়েক মাস ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ অল ইংলণ্ডে স্ট্যামিনার পরিচয় দিতে পারলেন না। গতবার সুইডেনের এরিকসন ইংলণ্ডের রলফ এবং জাপানের সুদাকে পর পর হারিয়ে প্রায় একইভাবে হেরে গিয়েছিলেন লিয়েম সুই কিংয়ের কাছে।

আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এই প্রকাশ পাড়ুকোনের বিরুদ্ধেই বোধ হয় কিং তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় ম্যাচ খেলেছিলেন হায়দরাবাদে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে। র‍্যালি, ভলি, ড্রপশট, প্লেসিং, সার্ভিস—সব কিছুর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কিং জিতেছিলেন ১৫-৮ ও ১৫-৩ পয়েণ্টে। তার চেয়েও বড় কথা প্রথম গেমে ৮-০ ও দ্বিতীয় গেমে ৬-০ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনই অনেকে কল্পনার তুলিতে কিংয়ের গায়ে ভবিষ্যৎ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কথাটি লিখে দিয়েছিলেন।

মুকুল

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পাদক : নরেশ গুহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৯। বারো টাকা।

'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র এটি চতুর্থ সংস্করণ। তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিলো ১৯৬৯-এ, দ্বিতীয় ১৯৬০-এ, এবং সেই ঈষৎ বৃহদাকৃতি প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩-তে; তাই খুব দেরি হয়নি বোধ হয় এই সংস্করণের, বিশেষত এটি যখন সত্যিকার অর্থে নতুন 'সংস্করণ', নেহাৎ পুনর্মুদ্রণ মাত্র নয়। বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু হলো ১৯৭৪-এ, ৭৪-৭৫-এর জায়গায় ৭৭ : স্বভাবমন্থর কাব্য প্রকাশনার পক্ষে নিশ্চয়ই তা মারাত্মক অপরাধ নয়, এমনকি এই কাব্যোন্মাদ বঙ্গদেশেও। আর কোনো মৃত কবির পক্ষে অত তাড়াহুড়ো 'সংস্করণের' প্রয়োজনও হয়তো সত্যিই নেই, পরিবেশবিজ্ঞানীরা যা-ই বলুন না কেন। তবু দে'জ-কে সাধুবাদ দিই যে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পাঠক কেউ-কেউ বেঁচে থাকতে-থাকতে, এবং প্রথম সংস্করণের স্মৃতি বিলক্ষণ ধূসর হয়ে যাবার আগেই, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র এই চূড়ান্ত সংস্করণ তাঁরা প্রকাশ করলেন। এই সুচারু ও সমনস্ক প্রকাশনার জন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' যে প্রকৃতপক্ষে 'শ্রেষ্ঠ' কবিতা নয়, নির্বাচিত কবিতা মাত্র, এবং কবির জীবৎকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বনির্বাচিত কবিতা, সেই সূত্র বুদ্ধদেব বসু নিজেই আমাদের ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে। কিন্তু এই নির্বাচনেরও একটি নিয়ম থাকে, যাতে ক'রে কেবল যে কবির সামগ্রিক চেহারাই ফুটে ওঠে তা নয়, সেইসঙ্গে তার উদ্‌বর্তনের সব ক-টি পর্যায়ও ধরা পড়ে। অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' পাঠ করে আমরা বলতে পারবো তিনি কেমন কবি এবং কোন-কোন ধাপ পেরিয়ে এসেছেন; কী বিবর্তন ঘটেছে তাঁর ছন্দে, তাঁর শব্দ ব্যবহারে, তাঁর মানসজগতে। এবং বুদ্ধদেব বসুর মতো কবির পক্ষে এই উদ্‌বর্তনের প্রশ্ন নিতান্তই জরুরী : যাঁরা শুধু তাঁর প্রথম যুগের কবিতা পড়েছেন তাঁরা হয়তো জানেন না যে তাঁর শেষ যুগের কবিতার স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর যাঁরা 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে তাঁর কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছেন তাঁরা হয়তো অনেকে বিশ্বাসই করবেন না যে 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী'র লেখকও বুদ্ধদেব বসুই। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র কাজ এই দুই বা তিন বুদ্ধদেবকে এক বুদ্ধদেব হিসেবে পরিবেশন করা। (এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র আদর্শ পাঠক বোধ হয় তিনিই যিনি আগে কোনো কবিতাই পড়েননি বুদ্ধদেবের, আর বলা বাহুল্য যিনি জানতেনও না যে বুদ্ধদেব যেমন নিজের কবিতা লিখেছেন তেমনি অন্যের কবিতার অনুবাদও করেছেন।) আর তাই, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র চতুর্থ সংস্করণে যে-দশটি কবিতা যোগ করেছেন শ্রীনরেশ গুহ—এবং প্রধানত যে-কারণবশত এটি একটি প্রকৃত সংস্করণ হয়ে উঠেছে—সেই কবিতা ক-টি বিষয়ে আমাদের এ-ই মাত্র বিচার্য, তারা সুনির্বাচিত কিনা। দুটি কবিতা আগে ছিলো, আগে মানে প্রথম সংস্করণে; দ্বিতীয় সংস্করণে তাদের বর্জনের কারণ নতুন কবিতার সংযোজন—তাদের পুনরুদ্ধার তাই বিবেচনারই কাজ হয়েছে, বিশেষত যখন কবিতা দুটি, 'যামিনী রায়কে' ও 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', এমন এক সময়ের রচনা যখন এমনকি বুদ্ধদেব বসুর মতো সমাজ বিষয়ে আপাত-উদাসীন কবিও রীতিমত সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তৃতীয় কবিতাটি বিশুদ্ধ সংযোজন, এবং সেই সংযোজনের সমর্থনে তাঁর মুখবন্ধে সম্পাদক যে-যুক্তি দেখিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এর সময় বুদ্ধদেব বসু

কিছু আখ্যান কবিতাও লিখেছিলেন, অনেকটা 'পলাতকা'-র ধরনে; 'একদিন : চিরদিন'-এ যে-সব আখ্যান-আশ্রয়ী কবিতা আছে ঠিক তাদের মতো নয়—মানের প্রশ্ন তুললে তাদের চাইতে লঘু। বুদ্ধদেব বসুর বিবর্তনে এই কবিতা ক-টি কতটা জরুরী ছিলো জানি না, তবে প্রকরণের বৈচিত্র্যের আরো একটি উদাহরণ হিসেবে 'উদ্বাস্তু'-এর সংযোজন সমর্থনযোগ্য। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে 'শিল্পীর উত্তর', 'একদিন : চিরদিন'ভুক্ত 'মৃতেরা' এবং 'স্বাগত বিদায়'-এর ('শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র তৃতীয় সংকরণ যখন বেরোয় তখনো শেষ এই দুই পর্যায়ের কবিতাগুলি গ্রন্থিত হয়নি;, চিহ্নিত ছিলো 'পরবর্তী কবিতা' হিসেবে) 'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু' ও 'দুই কুকুর'-ও বিশুদ্ধ সংযোজন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে বুঝতে, বিশেষ করে শেষ দিকের বুদ্ধদেবকে বুঝতে, কবিতা চতুষ্টয় এতটাই সহায়ক যে তাদের সংযোজন বোধ করি সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু 'একদিন : চিরদিন' ও 'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর পর্যায়দ্বয় থেকে বুদ্ধদেব নিজেও হয়তো আরো দু-তিনটি কবিতা বেশি নিতেন।

এই তো গেলো সাত। আর যোগ হয়েছে দুই নাটক থেকে দুটি অংশ : 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-র প্রথম কোরাস 'গাঁয়ের মেয়েরা', অন্য কিছুর জন্য না-হলেও কেবল ছন্দসিদ্ধির জন্যই যে পঙক্তি কতিপয় স্মরণযোগ্য, এবং শেষ নাটক 'সংক্রান্তি'-র সূচনা (যার শেষ পঙক্তিটি মুদ্রণের অনভিপ্রেত অনবধানতার ফলে পৃষ্ঠা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে)। নাটকের কোনো অংশকে আলাদা করে উপভোগ করা যায় কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশেষত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—প্রথমটি কোরাস বলে হয়তো তুলনায় একটু বেশি সম্পূর্ণ—কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে এর নজির আছে। তবে একটা বিষয়ে আমি ঈষৎ আপত্তি করতে চাই, তা হলো 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ' এই নামকরণ। অনুরূপ নামকরণ যে বুদ্ধদেব বসুর নিজের হাতেও হয়নি তা নয়, যেমন 'অনুবাদ ও অনুলিখন' পর্যায়ে 'মেঘদূত' থেকে যে-অংশ বেছে নেওয়া হয়েছিলো তার—তার একান্ত সম্পাদকীয় কারণেই হয়তো বা—নাম রাখা হয়েছিলো "'মেঘদূতে' যক্ষপ্রিয়া," কিন্তু এক্ষেত্রে নামকারক বুদ্ধদেব নিজে নন। তদুপরি এটা কি সত্যিই বিলাপ, বিশেষত 'বিলাপ' বলতেই যখন 'মহাভারতে'র সেই পুনরাবৃত্তিপ্রধান পঙক্তিসমূহের কথা মনে পড়ে যায়? হয়তো 'প্রার্থনা' বলা যেতো, কিন্তু বলার কি বাস্তবিকই কোনো প্রয়োজন ছিলো—"কাব্যনাট্য 'সংক্রান্তি' থেকে : ধৃতরাষ্ট্র" বললেই, তো যথেষ্ট হতো। দশম সংযোজন 'অনুবাদ ও অনুলিখন' পর্যায়ে শংকরাচার্যের 'স্তোত্র'। অনুবাদ যে কেবল বিদেশী কবিতারই করেননি বুদ্ধদেব, প্রাচীন ভারতীয় কবিতারও করেছেন, তার অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে এটা দেবার হয়তো খুব দরকার ছিলো না, তবু কবিতাটি কোনো গ্রন্থে নেই বলেই বোধ হয় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা সংগত হয়েছে।

এই সংযোজন ক-টি ছাড়াও আরো দুটি কাজ করেছেন শ্রীনরেশ গুহ যা উৎকৃষ্ট সম্পাদনা কর্মের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। তাদের একটি হচ্ছে কবিতাগুলির রচনার তারিখ উল্লেখ—যে-সব স্থলে বুদ্ধদেব পরিমার্জনা করেছিলেন সেখানে আদি রচনার সঙ্গে পরিমার্জনারও তারিখ উল্লেখ। (সূচীপত্রে অধুনালুপ্ত পুস্তিকাগুলির উল্লেখ খুব সমীচীন হয়েছে।) অন্যটি, অনুবাদের মূল শিরোনাম মুদ্রণ। বাংলা নামের নিচেই তা দেওয়া হয়েছে, ফলে কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছে করলেই মূল খুলে দেখতে পারেন; অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র 'অনুবাদ ও অনুলিখন' অংশ মূলানুগভাবে পড়তে হলে এখন আর আলাদা করে অনুবাদ গ্রন্থগুলি পড়বার প্রয়োজন নেই। এছাড়া, কবিতাগুলিকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়েও সম্পাদক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, হয়েছেন বুদ্ধদেব বসুকৃত মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রচলন ক-টিকেও অবিকল রেখে। কোনো মুদ্রিত কবিতার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত যে মুদ্রণের নির্ভুলতা সে-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতোই যে তাঁর এই সম্পাদক সচেতন, তা আমাদের অশেষ ভাগ্যের কথা।

যৌবনেই বুদ্ধদেব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, বিখ্যাত এবং কুখ্যাতও। 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী' রীতিমত আলোড়ন তুলেছিলো, এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এখনো তাঁদের কৈশোরে পঠিত ঐ কবিতাগুলির কোনো-কোনটি

... উপায় ... পারেন। সেই তুলনায় তাঁর একেবারে শেষের কবিতাগুলির তেমন ... হয়নি। কিবো হয়েছে, কিন্তু ... হয়নি। তবে এটাই হয়তো স্বাভাবিক. কবিমাত্রেই 'ইতিহাস' হয়ে ওঠেন তাঁদের যৌবনের রচনার জন্য, যে-রচনা কোনো-না-কোনোভাবে সমগ্র কাব্য-রীতির অন্তত একটুখানিও মোড় ফেরায়। অথচ একজন কবি তো সেই-টুকু করেই তার লেখা বন্ধ করে দেন না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটে। আর তাঁর সেই পরবর্তী ধাপ-গুলি তিনি অনেক সময়ই পেরোন একটু একান্তে—যেন কেউ জানলোই না সে প্রৌঢ় কবি আবার আরেকটা বিপ্লব ঘটালেন। অথচ এই 'ব্যক্তিগত' বিপ্লব-সমূহের পরিচয় ব্যতিরেকে কোনো কবিকে সত্যিই সম্পূর্ণ চেনা যায় না। বুদ্ধদেব বসু তাই কেবল 'শাপভ্রষ্ট দেবদূত' নন 'লোলচর্ম কুৎসিত লম্পট' 'বন্ধ্য কবি'ও; 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কিংবা 'স্বাগত বিদায়'-এর কবিতা-গুলি যাঁরা পড়েননি তাঁদের বুদ্ধদেব-পাঠ অসম্পূর্ণ।

যৌবনে বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য ছিলো স্বভাবস্বাচ্ছন্দ্য। মাঝে মাঝে কৃশ হয়েছে বটে কবিতা, কিন্তু প্রবণতা ছিলো সোচ্ছ্বাস স্ফূর্তিরই দিকে। মধ্য চল্লিশে এসে পরিবর্তন ঘটলো; কবিতা হয়ে উঠলো কঠিন, ঘন, নিরালম্ব, যেন আত্মপ্রকাশ নয় আত্মগোপন করাই কবির আসল অভিপ্রায়। বিস্তার এলো বটে আবার, একেবারে শেষে, কিন্তু সেই প্রথম যুগের বিপুলতা ... ছিলো আবেগ, ব্যাপ্তি এবার মূলত বোধের। এই পর্যায়বিভাগ অনেকটা যেন রিলকের মতো—'প্রহরপুঁথি'-র উচ্ছ্বাস অতিক্রম করে নতুন কবিতার 'বস্তু'-র আবিষ্কার, আর 'নতুন কবিতা'-র তদেকাত্মক 'বস্তুত্ব' পেরিয়ে 'এলিজি'-'সনেটে'র মন্ময় সাংগীতিকতা। অর্থাৎ, প্রথম যুগের বুদ্ধদেব যেন ছিলেন একটু অধিকমাত্রায় 'কবি', 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ এসে সেই 'কবিত্ব' তিনি বর্জন করলেন এবং 'স্বাগত বিদায়'-এ যদিও আবার 'কবিত্ব' এলো, সেই 'কবিত্বে'র সঙ্গে কোনো কিছুর কোনো বিরোধ নেই আর, কোনো অতি-রিক্ত সম্মানের আর প্রয়োজন নেই তার। 'কবিত্ব'ও হয়ে উঠলো কর্ম, নিরন্তর নিরলস কর্ম। আর সেই কর্মের উপমা পেলেন বুদ্ধদেব মাছ-ধরায়, গণিকা-বৃত্তিতে।

পর্যায় বদলেছে বটে, কিন্তু আগা-গোড়া এক বেদনায় আকীর্ণ তাঁর কবিতা। সেই বেদনার বয়স বেড়েছে, যা ছিলো যৌবনের তীব্রতা তা-ই হয়ে উঠেছে প্রৌঢ়ত্বের স্থৈর্য, কিন্তু যদি বলতে হয় তাঁর কবিতা থেকে শেষ পর্যন্ত কী প্রাপ্তি ঘটে আমাদের, তাহলে মানতেই হবে তা ঐ বেদনাই। কেউ-কেউ বলেন, তাঁর কবিতা তেমন সমাজসচেতন নয়, এমনকি কিয়দংশ সমাজবিরোধীও হয়তো। কিন্তু যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, এ নেহাৎই এক ত্বরিত অমনস্ক বিচারমাত্র। পুঁজিবাদী সমাজে বেদনা ... জনিত যে-সুখ সেই সুখে অনাগ্রহ। যথার্থ সমাজচেতনার সাক্ষ্য কেবল সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নয়, অন্তত মার্ক্স নিজে তা বলবেন না। বরং প্রগতির পরিপন্থী হয়েও অনেক সময় পুরোপুরি সমাজসচেতন হওয়া যায়।

বুদ্ধদেব বিষয়ে আরেকটি জনশ্রুতি আছে, তাঁর কবিতার নাকি তেমন প্রভাব পড়েনি পরবর্তী কবিদের উপর।

'চল্লিশে'র কবিদের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ খাটে না, কিন্তু 'পঞ্চাশের' 'ষাটের' 'সত্তরের' কবিদের শুনতে পাই আচ্ছন্ন করে আছেন জীবনানন্দ। কিন্তু আমার ধারণা জীবনানন্দ এক ভিন্ন ধরনের কবি, ভাষা তাঁর কাছে কোনো কিছুর বাহন নয়—না আবেগের না প্রজ্ঞার—ভাষাই তাঁর চৈতন্য যাতে নিখিল প্রপঞ্চের উদ্ভাস ঘটে। পর-বর্তীদের মধ্যে এই ঐকান্তিকতা কিয়ৎ পরিমাণে হয়তো বা বিনয় মজুমদারে আছে, অন্য প্রায় সকলেই কিঞ্চিদধিক সামাজিক, অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে তাঁরা কিছু-একটা ব্যক্ত করেন; আর এই সামাজিকতায় রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের মধ্যে, 'পঞ্চাশে'র 'ষাটে'র 'সত্তরে'র পূর্বসূরীদের মধ্যে, যিনি সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক এবং ফলত অগোচর হলেও যাঁর প্রভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, তিনি বোধ হয় সুধীন্দ্রনাথ নন, অমিয় চক্রবর্তী নন, নন বিষ্ণু দে, তিনি বুদ্ধদেব বসু।

অমিয় দেব

এলামনি শিল্প প্রদর্শনী

গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে অনুষ্ঠিত ঐ কলেজের 'এলামনি অ্যাসো-সিয়েশনের' তৃতীয় 'বার্ষিক প্রদর্শনী' বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখবার নেই। এই কলেজের প্রাক্তনীদের মধ্যে অনেকেই আজ বিখ্যাত—তাঁদের কারো কারো ছবি বা ভাস্কর্য আছে এই প্রদর্শনীতে। কিন্তু তাঁদের কেউ-ই প্রতিনিধিত্বমূলক, সার্থক শিল্প-নমুনা পাঠান নি। গোপাল ঘোষের দুটি গ্রামীণ কুটীরের ছবি সুন্দর, কিন্তু তার সুন্দরতর ছবি আমরা অনেকদিন ধরে দেখে আসছি। সত্যেন ঘোষালের ছবিটি কিছুটা অ্যাকশন-পেনটিং ও 'ড্রিপ'-টেকনিকে আঁকা—যেন উড়ো হাওয়া এসে এলোমেলো রং ছিটিয়ে গেছে জমিতে, কিন্তু ছবি হিসেবে যথেষ্ট সার্থক নয়। সুনীল দাসের নবনবোন্মেষশালিনী সৃজনী-শক্তি আমাকে সর্বদাই মুগ্ধ করে—কিন্তু তাঁর অর্ধ-বিমূর্ত বৃত্ত ও কৌণিক রেখার যে ছোট্ট ছবিটি টাঙানো হয়েছে, সেটি বৃহত্তর ক্যানভাসে আরো বেশি খুলতো মনে হয়। একই মোটিফে আঁকা তাঁর বড়ো ছবি যে কতো আকর্ষণীয় হতে পারে, তার প্রমাণ অন্যান্য প্রদর্শনীতে আমরা সম্প্রতি পেয়েছি। বিকাশ ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি 'ভিক্টর' সুন্দর, এই পর্যন্ত। শ্যামল দত্ত রায়ের, জলরঙে-আঁকা

পাহাড়ের ওপর জলপাতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে—পাহাড় পর্যন্ত কত-গুলো অসমান সিঁড়ির ধাপ, এবং দূরে সম্ভবত একটি মোটর-সাইকেল অপেক্ষমান। ছবিটি সুন্দর, কিন্তু প্রতীকটি যথেষ্ট গভীর নয়। অমরেন্দ্র-লাল চৌধুরীর দুটি "ওয়্যান" নয়ন-রঞ্জক। রথীন মৈত্র-র "ডায়ামণ্ডস অফ দ্য ডেড ল্যাণ্ড"ও তাই। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এচিং' চলনসই রকমের ভালো। লালুপ্রসাদ শা গ্রাফিক-শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত—তাঁর গ্রাফিকের নমুনাটি সুন্দর, কিন্তু তাঁর ছবিতে আমরা নতুনতর আয়তন আশা করি এখন। করুণা সাহার তেলরঙের "এ রেড টিউন" (?)-এর রঙের ব্যবহার বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো। এই প্রদর্শনীতে যে ছবিটি আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে, তা হলো গণেশ হালুই-এর 'ডেড ফিশ।' পুরু তুলট কাগজের পুরোটাই প্রায় সবুজ রঙে ঢাকা—নিচে এককোণে প্রায়-অদৃশ্য মাছের কাঁটা, এবং ওপরে সনাতন-রীতিতে আঁকা লতাপাতার আড়ালে দু-একটি মুখ। টেক্‌শ্চারের দিক থেকে সুন্দর সংকেতময়তার দিক থেকেও, অনিলবরণ সাহা "প্লোন ইন বনডেজ" ছবিতে একটি চেয়ারের (সিংহাসন?) ওপর একটি ঘড়িকে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু তাতে ছবিটি সুররিয়ালিস্টিক হয়নি। মনে হয়, কেউ ভুল করে একটা ঘড়ি চেয়ারের ওপর ফেলে গেছে। সনৎ করের ছবির একটা বিশিষ্ট চরিত্র আছে (তা গ্রাফিকই হোক, বা অন্য ছবিই হোক)—প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই সটান দড়ির মতো টানটান, ঊর্ধ্বগামী আবয়বিক রেখা চোখে পড়ে। এই প্রদর্শনীতে তাঁর ড্রইং "ক্রাউড" দেখেও এই কথা মনে হলো। তরুণ শিল্পী তাপস সরকারের কালি-দিয়ে-আঁকা স্বতঃস্ফূর্ত আঁকিবুকি ('ফ্যানাটিক') আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেখে ভালো লাগলো। পুরোনো, বাস্তবানুগ রীতিতে ছবি আঁকেন ইনি—কিন্তু নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে অত্যন্ত সুদক্ষ। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অবহেলিত শিল্পী। যদিও ছবিটির দাম (সাড়ে তিন হাজার টাকা) একটু বেশি মনে হলো।

অন্যদের মধ্যে শিবপ্রসাদ কর-চৌধুরীর 'ইভনিং ক্লাউডে'র জ্যামিতিক পরিচ্ছন্নতা খুবই আকর্ষণীয়। তিলক মণ্ডল প্রতিশ্রুতিময় শিল্পী, কিন্তু এই প্রদর্শনীতে তাঁর ক্লাউন ও প্রেমিকাদের ছবিতে যথেষ্ট মৌলিকতা খুঁজে পেলাম না। মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কম্পোজিশন'কে কাব্যধর্মী ছবি বলা যায়। সুন্দর। অশোক ভৌমিক বীভৎস রসের সংগে তাল-মান-ছাড়া কল্পনা মিশিয়ে নতুন এক ধরনের ছবি আঁকছেন। ওঁকেও আমার খুব প্রতিশ্রুতিবান শিল্পী মনে হয়। মনোজ মিত্রর 'হর্নস অফ এ ডিলেমা'য় একটি সর্পভুক ব্যাঙের ছবিতে বড়ো বেশি অলংকরণ চড়ানো হয়েছে। রথীন রায়ের আঁকার হাত ভালো, এবং জোরালো হাতে তিনি রেখা টানতে পারেন, ত্তু কল্পনাশক্তির অভাবে থেকে যায়। প্রবীর দাশগুপ্তর 'ড্রইং' পাকা হাতের কাজ।

ভাস্কর্যের নমুনা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। উমা সিদ্ধান্তর অর্ধ-বিমূর্ত 'কম্পোজিশন' অবশ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নিরঞ্জন প্রধান আশানুরূপ কাজ পাঠাতে পারেননি। অবি সরকারের কাঠের 'ফিলজফার' মন্দ নয়। ক্রাফ্‌টের কিছু নমুনা বরং বেশ ভালো লাগলো।

ছবি যেভাবে টাঙানো হয়েছে, তাতে আমার আপত্তি আছে। দুটো ঘর ঠাসা ছবি ও অন্যান্য শিল্প নমুনা। কোথাও কোথাও একটার ওপরে আরেকটা ছবি। কিছুটা ফাঁকা জায়গা যে ছবি দেখবার জন্যেও প্রয়োজন একথা কি প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ বিস্মৃত হয়েছিলেন? অতো ছবি না টাঙালেই হতো।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

'লেভেণ্ট' আর্টিস্ট সারকেল

এই দলের সকলে এখনও ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের সান্ধ্য বিভাগে পাঠ নিচ্ছে। আমি প্রথমে পদর্শনীতে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস, ১১—২৫ ফেব্রুয়ারী) ঢোকবার সময় ভেবেছিলাম গতানুগতিক কাজ দেখব। কিন্তু প্রদর্শনীর ভেতরে গিয়ে আমার মতটা পালটে গেল। এ'দের মধ্যে বিমূর্তবাদের লড়াইয়ের কোনো ছাপ দেখলাম না। বরঞ্চ আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে অনুশীলনের চেষ্টাটা নজরে পড়ল।

অরুণ সমাদ্দারের 'বিদ্রোহী' ছবিতে বর্ণলেপনের দুর্বলতা সত্ত্বেও অংকন এবং রচনার দিকটা ভালোই লাগল। অরুণের আর একটি কাজ 'সানাই'-এর মধ্যেও রচনার বৈশিষ্ট্য আছে।

অশোক আদকের কাজ আমার মোটেও ভাল লাগেনি।

দীপক দাশ গরুরগাড়ি যাত্রীদের গ্রাম্য পথে চলার দৃশ্যটা আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু তিনটে ছবির নাম-করণ—'দীপক-১', দীপক-২, দীপক-৩—একটু বাড়াবাড়ি মনে হলো। তবে ওর আর একটি ছবিতে দুটি মেয়ে—তার রঙ এবং মুখশ্রী এবং মুখের আকার সুন্দরভাবে এঁকেছে কিন্তু তার সংগে হাত এবং পা সঙ্গতিরক্ষা করেনি। ছবিটির কিন্তু সম্ভাবনা ছিল। তবে এর কালো-সাদা অংকন নীরদ মজুমদারের ঘরানার কাজ।

রাধাবল্লভ মণ্ডল তাঁর রূপবন্ধ নিয়ে বড্ড বেশি বিশ্লেষণ করাতে নান্দনিক দিক থেকে চক্ষুপীড়াদায়ক।

শৈবাল দত্তের আর একটু অনুশীলন করা দরকার। তার কাজে প্রতিশ্রুতি আছে।

সাধন চক্রবর্তীর "মহাশক্তি"র ছবিতে দুর্গার রূপারোপের সংগে বাস্তব রীতিতে আঁকা সিংহটা আদৌ খাপ খায় নি।

সুনীল রায়ের "ল্যাণ্ডস্কেপ" ছবিটার রঙ দুর্বল কিন্তু "রেজাল" ছবিটার মধ্যে তার রচনা এবং রূপবন্ধ সর্বদিক দিয়ে একটা মৌলিকত্ব আছে। জলো, হলদে এবং নীলের পরিবেশ করে রচনাটা সমৃদ্ধ করেছে সে।

সুভাষ রায়ের ছবিগুলি রেখা-ভিত্তিক এবং আলংকারিক কিন্তু সেই অনুপাতে রঙের বিন্যাস ভাল হলে রচনাগুলো সুসমঞ্জস্য হতো।

আটজন শিল্পীর দল। সকলের বয়স বেশি নয় এবং সকলেই শিক্ষার্থী। বড় বড় তৈলচিত্র নিয়ে রচনার যে সমস্যা তার সম্মুখীন এরা হয়েছে সেটা আমার ভাল লাগছে।

রথীন মৈত্র

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

পিয়ানোতে রাগসঙ্গীত

পিয়ানোতে রাগসঙ্গীত কি রকম মানায় তা আমরা ভি বালসারার বাজনা শুনে অনেকটা জেনে গিয়েছি কাজেই আমাদের আলিয়ঁস ফ্রঁসেস আয়োজিত পরেশ সেনগুপ্তর পিয়ানোয় রাগ-সঙ্গীত বাদন (মার্চ ৪) কোনো মতেই একটি অভিনব ঘটনা মনে হয়নি। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ অর্থাৎ ইমন রাগে আওচার, জোড় এবং বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎগুলিই আমার পক্ষে শোনা সম্ভব হয়েছিল এবং এর থেকেই বোঝা গেল পরেশ সেনগুপ্তর মার্গ সঙ্গীতের বাদন-শৈলীর সংগে পরিচয় কত সামান্য। তাঁর পিয়ানো পদ্ধতিও প্রাথমিক ধরনের বলেই মনে হল।

আলাপচারির পিয়ানোয় প্রায় অসম্ভব কাজেই আওচারের বিষয় বিশেষ কিছু না বললেও চলে। প্রথাগত জোড় বাদনের সংগে শিল্পীর পরিচয় না থাকায় জোড়টি অতি ক্লান্তিকর হয়েছিল এবং কাঠামোর দিক থেকে কাঁচা এবং ছন্দের দিক থেকে বৈচিত্র্যহীন নকশাই খালি শোনা গিয়েছিল। বিলম্বিত গৎটিকে গৎ বলা ঠিক হবে না কারণ বন্দেশ বলে এতে কিছু ছিল না—শিল্পী খালি ন র স বাজিয়ে সমে আসছিলেন, আর কিছু না। পিয়ানোতে গৎকারি কত উপভোগ্য হতে পারে তা যাঁরা ভি বালসারার বাজনা শুনেছেন তাঁরা জানেন। পরেশ সেনগুপ্ত দ্রুত জোড়ে যে অনুন্নত এবং বৈচিত্র্যহীন নকশা বাজিয়ে ছিলেন তাই বাজিয়ে চললেন বিলম্বিত গতে। দ্রুত গতেও সেই একই জিনিস শোনা গেল, কিন্তু লয় বাড়াতে জিনিসটি আসলে কি তা বোঝা গেল : কণ্ঠা উল্টো খালা। যাহোক দ্রুত গতে একটা প্রাথমিক গোছের এক কলির বন্দেশ ছিল (খালি স্থায়ী, মাজা ও অন্তরা ছিল না।) দু-একটা অতি সরল মোহরা ও তারপরণধর্মী কাজও ছিল।

নীহারাংশু গুপ্ত

আজ বসন্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মহিলাদের সংস্থা য়ুনিভার্সিটি উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালকাটা। সমগোত্র আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে এটি যুক্ত। এই সংস্থাটি নানান কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম করেন। যেমন, বিদেশী বৃত্তির জন্য নামের সুপারিশ, দুঃস্থ ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা, মেয়েদের সংস্কৃতিতে ও শিক্ষায় উৎসাহ দান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা ইত্যাদি। গত ৯ মার্চ বিড়লা আকাদমী হলে এঁরা একটি বাসন্তী-সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এই সংস্থার কল্যাণ-তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ।

অনুষ্ঠানটির নাম ছিল—আজ বসন্ত। ফুলের স্তবক, ভাঙা গাছের ডাল, পাতাবাহার গাছ—টুকরো-টুকরো ভাবে বসন্তের পরিবেশ তৈরী করেছিল মঞ্চে। এর সংগে ছিল দুটি হারমোনিয়াম। একটি শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের জন্য, অন্যটি শ্রীঅর্ঘ্য সেনের। এঁরা দুজনেই ছিলেন সেই সান্ধ্য বাসরের আমন্ত্রিত শিল্পী।

প্রথমে গান শোনালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গানের নির্বাচনে বসন্ত মুখ্য হয়ে ছিল না ঠিকই। প্রথমে দু-খানি রজনীকান্তের গান পরে পাঁচটি অতুলপ্রসাদী, এবং সব শেষে চারখানি দ্বিজেন্দ্রগীতি শোনালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে ছিল চিরবসন্তের স্পর্শ। এই গানগুলিতে তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তা প্রতিটি গানেই প্রমাণিত হচ্ছিল। সতেজ, সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ তাঁর কণ্ঠে বারবার শোনার মতো এগারো খানি গান অনুষ্ঠানের মর্যাদা যে বাড়িয়ে দিয়েছিল, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের পর অর্ঘ্য সেন। এই ধরনের অভিজাত আসরে অর্ঘ্য যেন দ্বিগুণ মেজাজ পান। তিনি শোনালেন বোলটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত। বসন্তকেই মুখ্য বিষয় করে রবীন্দ্রসংগীতের একটি ভাবানুক্রমিক আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন অর্ঘ্য সেন। খুব কৌশলে প্রকৃতির সংগে প্রেম মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মূল বিষয়ের সংগে তা এমন-ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, অবাক মানতে হয়। কে জানত, 'এসো আমার ঘরে এসো' বা 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে' কিংবা 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না' এমন নিঃশর্ত স্বাভাবিকতার ফাগুন বাতাসের অরূপ বাণী হয়ে উঠবে সযত্ননির্বাচিত গানের সম্ভারে, হয়ে উঠবে লহরে লহরে নূতন-নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি।' অর্ঘ্য সেন শুধু যে তাঁর উদাত্ত সুরেলা মেজাজী গায়কীতেই সেদিন গান শোনালেন তাই নয়, রবীন্দ্র সংগীতের এই নিষ্ঠাবান শিল্পীর গানের মর্মও যে সমান অন্বিষ্ট—তার প্রমাণও অনায়াসে রাখলেন তিনি। যখন অর্ঘ্য গাইছিলেন—'মোর দানে নেই দীনতার লেশ। যত নেবে তুমি না পাবে শেষ' —তখন তাঁর আত্মনিবেদনের সংগে শ্রোতাকেও একাত্ম হয়ে যেন সে-কথাই অন্যভাবে স্বীকার করতে হয়েছিল।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

দ্য জিপসি ক্যাম্প ভ্যানিশেস ইনটু দ্য ব্লু

রঙিন ছবি। এক একটি ফ্রেম যেন

এক একটি পিকচার-পোস্টকার্ড। পরিচালক এমিল লতিয়ানুর হাতে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত সুযোগ। রয়েছেন স্বেতলানা তোমা'র মতো সুন্দরী নায়িকা, যাকে একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কবিতার মতো মনে হয়। আর রয়েছেন সার্জি ভ্রনস্কির মতো ক্যামেরাম্যান, যিনি লতিয়ানুর প্রতিটি দৃশ্য-ভাবনাকে নিখুঁতভাবে রূপ দিয়েছেন। রঙের সচেতন এবং কোনো কোনো দৃশ্যে স্তিমিত ব্যবহার ঈর্ষণীয়ভাবে ভালো। সন্ধেবেলার আকাশের রং, কিংবা রাত্রিবেলার অরণ্য-দৃশ্যের অন্ধকার আমাদের বাস্তববোধকে জ্বালাতন করে না। এছাড়া ছবিটির গীতিধর্মিতা যে শেষ দৃশ্যাবলীর রক্তপাতী ঘটনাতে এসে হোঁচট খেয়ে অহেতুক বিঘ্নিত হচ্ছে, এমনও নয়। বরং এই আচমকা ধাক্কাটার জন্যেই ছবিটা তবু কিছুটা বেঁচে যায়।

কিন্তু তবু এই রুশ ছবিটিকে মহৎ-সিনেমার পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না—যদিও কোনো-কোনো দৃশ্যভাবনায় প্রতিভার উদ্ভাস অনস্বীকার্য। আর ফটোগ্রাফি? শুধু সে-জন্যেই ছবিটিকে একাধিকবার দেখা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র একটির পর একটি পারপল্ প্যাসেজ পাশাপাশি সাজিয়ে গেলেই যেমন মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না, তেমনি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো একটির পর একটি দৃশ্য সাজিয়ে মহৎ সিনেমারও সৃষ্টি হয় না। তা যদি হতো, তা হলে সিদ্ধার্থ কিংবা ফ্রেন্ডস্-কে আমরা অবলীলায় মহৎ সিনেমা বলতে পারতাম। দোষটা ভ্রনস্কির নয়। লতিয়ানুর দৃশ্য-ভাবনার মধ্যেই এক ধরনের বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় আছে—যেমনটা দেখা যায় আঠারো বছর বয়েসে লেখা প্রেমের কবিতায়। লতিয়ানু যদি তাঁর কল্পনা আর ইমোশানকে আর একটু শাসনে রাখতে পারতেন, তা হলে 'দ্য জিপসি ক্যাম্প' অন্য জাতের ছবি হতে পারতো—কেননা গোর্কির কাহিনী, স্বেতলানা তোমা'র মতো সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী, ভ্রনস্কির মতো প্রতিভাবান ক্যামেরাম্যান,—এই সমন্বয় বড় কম নয়।

গোর্কি-রচিত কাহিনীর নায়ক লুইকো জোবার (অভিনয়ে গ্রিগরি গ্রিগোরিউ)—এক বন্ধনহীন, ভ্রাম্যমাণ জিপসি। এবং এক প্রতিভাবান অশ্বচোর। জোবার-এর প্রতি এক বৃদ্ধ জিপসির উপদেশ : "এড়িয়ে চলো মেয়েদের। সব মেয়েই সর্বনেশে।" কিন্তু রাডার সঙ্গে জোবার-এর দেখা হয়ে যায় অকস্মাৎ, এবং এই অনন্যার আকর্ষণ জোবার-এর পক্ষে দুর্নিবার নিয়তির মতো। জোবার রাডাকে বিয়ে করতে চায়। বিবাহ-সভায় রাডা জানায়, জোবার যদি তার সামনে নতজানু হয়ে তার সম্মতি ভিক্ষে করে, তবেই সে জোবারকে বিয়ে করতে রাজি হবে। জোবার এই অপমান সহ্য করতে পারে না। রাডার বুকে সে ছুরি বসিয়ে দেয়। পিছন থেকে রাডার বাবা জোবারকেও ছুরি মেরে হত্যা করে। কাহিনীর এখানেই শেষ। কিন্তু ছবিটি আরো কিছুক্ষণ চলতে থাকে, যেখানে আমরা আরো একবার পূর্ব-ঘটিত কিছু প্রেম-দৃশ্যের স্মৃতিমেদুর রোমন্থন দেখি।

একদিকে যেমন [illegible] ওঠে না, অন্যদিকে ছবিটিকে আমরা ফেলতেও পারি না। ফলে ছবিটিকে ভুলতে ভুলতেও আমরা মনে রাখি—টুকরো-টুকরো কয়েকটি দৃশ্য আমাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। যেমন ডুবন্ত সূর্যের আলোয় একটি শিথিলগতিতে উড়ন্ত ঘোড়া; জ্যোৎস্না প্লাবিত একটি আরণ্যক একলা নদী; সেই অবিস্মরণীয় নৃত্যদৃশ্য যেখানে রাডা একই সঙ্গে কামনা ও কবিতার প্রতীক; সূর্যাস্ত রাঙা আকাশের তলায় নগ্ন রাডার দু-হাত বাড়িয়ে সেই দিগন্ত-ছোঁয়া আহ্বান, "এসো, আমার মধ্যে নিমগ্ন হও, আমি তোমার, শুধুই তোমার"; এবং এরই পূর্ব দৃশ্যে ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে রাডা—উন্মুক্তবক্ষা, উন্মীল, ভরপুর।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটকে**

তিন বিজ্ঞানী

জ্ঞান শুধু অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যায় না, অনেক সময় আলোকিত আগামীকালকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই পৃথিবীতে অর্জিত জ্ঞান যদি মানুষের কল্যাণ না এনে মানুষেরই জীবন নিয়ে জুয়া খেলায় মাতে, তবে পাগলা গারদই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়—এই ভালো এই উন্মাদ আশ্রমের অজ্ঞানতার অন্ধকার। খাঁচার বাইরের মানুষগুলো যখন স্বার্থান্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে মাতে, তখন মনে হয় পাগলা গারদের উন্মাদেরাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অনুভব সংস্থা মঞ্চস্থ করলেন ফ্রেডারিখ ডুরেনমার্ট-এর Die Physiker অবলম্বনে তিন বিজ্ঞানী। লোভ, স্বার্থের কাছে কিভাবে মানবিকতা আস্তে আস্তে পরাভূত হয় ডুরেনমার্ট-এর নাটকে তাই বিষয়বস্তু। মানুষ এখানে অসহায় জন্তুর মত, যে সব কিছু জেনে-শুনেও স্বার্থ নামে ময়াল সাপের মুখে নিজেকে সমর্পণ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার সমাজ কিংবা রাষ্ট্র অনেক সময় সাহায্য করে আত্মসমর্পণে, বি[illegible] বিক্রীত হয়। এই পরাজিত মানবতা চিত্রণে ডুরেনমার্টের নাটক হয়ত অনেক সময় অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু নাটকীয়তায় অমোঘ। প্রতিটি নাটকেই শেষ পর্যন্ত দর্শক উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে থাকেন।

নাটকীয় উৎকণ্ঠা ডুরেনমার্ট-এর নাটকের প্রাণ। এই উৎকণ্ঠা বজায় রাখার জন্য প্রচণ্ড অভিনয় ক্ষমতা প্রাথমিক মূলধন হওয়া দরকার। সার্বিক অভিনয়ে ঘাটতি থাকলে, নাটকীয় গতি ব্যাহত হয়। অনুভব গোষ্ঠী এই প্রযোজনা মঞ্চায়নে প্রচুর যত্ন নিয়েছেন, কিন্তু অনেকের অভিনয়ের সীমায়িত ক্ষমতা নাটকটিকে বিশ্বাসযোগ্য হতে দিল না, এবং অনেক সময় প্রচণ্ড নাট্যমুহূর্তও দর্শক অনুভূতিতে কোন ছাপ ফেলতে পারে না নিতান্ত নিরাসক্ত হয়ে নাটক দেখে যেতে হয়, কোন রকম ইনভলভ-মেন্ট ঘটে না শ্রবণে এবং দর্শনে, কোথাও না। নাটকের নিজস্ব গতিও

সংলাপের দীর্ঘসূত্রিতায়।

নির্দেশক রতন চক্রবর্তী নাটকটির মূল ভাবনাটি পরিচ্ছন্নভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকের অভিনয় গতানুগতিক হওয়ার জন্য, প্রচণ্ড অসহায়তা শুধু মাত্র কল্পনাবিলাস হয়ে থাকে। নাটকের শুরু থেকে পর পর তিনটি খুন হয়, সব খুনই শুধু মাত্র ঘটে যায় কোন রেখাপাত করে না। তিনজন বিজ্ঞানীর চরিত্রে রতন চক্রবর্তী, অসীম ভাদুড়ী ও তাপস দত্তগুপ্ত আপ্রাণ চেষ্টায় যে নাট্যভূমি তৈরী করেন, সহযোগীরা সেখানে ফসল তুলতে পারেন না। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় সম্পূর্ণ টিম-ওয়ার্ক যখন জোরালো হবে, তখন অনুভব গোষ্ঠীর এই দুরূহ প্রযোজনা বাংলা নাটকে একটি উজ্জ্বল প্রযোজনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

প্রথম সূত্রপাতে খুনের পর নাটক যখন দুর্বার সাসপেন্স নিয়ে এগোনোর কথা তখন ক্রিমিন্যাল ইনসপেকটর বিবেক সেনগুপ্ত, 'ফাঁস দিয়ে নার্সকে হত্যা করেছে' বলতে গিয়ে 'নার্স দিয়ে ফাঁসকে হত্যা করেছে'। এই ধরনের ছেলেমানুষী করে ফেলেন। পাদ্রীর ভূমিকায় শান্তজিৎ সেনগুপ্ত শুধু সংলাপ বলে গিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। ডুরেনমার্ট-এর নাটকে মহিলা চরিত্রের প্রাধান্য, এবং প্রধান ভূমিকায় এমন একজন মহিলা থাকেন, যাঁর চরিত্র অনেকটাই পুরুষালি। ডাঃ ঝা-এর ভূমিকায় অনুরাধা দাশগুপ্ত একটি

উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি করে বাংলা নাটকে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন অনায়াসে। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন কিন্তু পুরুষালি ভাব আনার জন্য চরিত্রটি দাঁড়িয়ে গেছে মহিলা শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত সাজাহান নাটকে ঔরংগজেবের মত, বাচনে এবং মুদ্রায়। গীতা ভট্টাচার্যের অভিনয় প্রথাগত, এই দুরূহ নাটকের চরিত্র তিনি ছকে ফেলে নিয়েছেন। আর মিসেস রোজ-এর ভূমিকায় স্বপ্না রায় কোনক্রমে মুখস্থ বলেন, ফলে মফিজের বেদনা, হতাশা সবটাই 'অভিনয়' হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দুটি মহিলা চরিত্রে স্নিগ্ধা দত্ত এবং বাসনা সেন মোটামুটি।

এই নাটকের আলো ও মঞ্চের দায়িত্ব পিণ্টু বসু অসাধারণ কাজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নাটকের মেজাজ যতটা আলো ও মঞ্চে এবং শব্দে (হিমাদ্রী ভট্টাচার্য) আনা গেছে তাতে বোঝা যায় কি প্রচণ্ড সম্ভাবনা এই প্রযোজনার আছে। সব ত্রুটি শুধরে নেওয়া অসম্ভব কিছু কাজ নয়, তাই মনে হয় তিন বিজ্ঞানী একটি ভিন্ন স্বাদের প্রযোজনা হিসাবে স্বীকৃতি পাবেই। মূল নাটকের রূপান্তর করেছেন নীহার ভট্টাচার্য। বহুক্ষেত্রেই বিদেশী গন্ধ মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি অনেকটা সেই কারণেও অনেক নাটকীয় সংঘাত, অনুভূতি অধরা থেকে যায়। একটা কথা পরিস্কার, বিদেশী নাটকের চর্চা আমাদেরই শিল্পকে বর্ধিষ্ণু করবে কিন্তু চারা লাগানোর মত জমি সব সময় তৈরী হয় না। ফলে ফুল ফোটার আগেই গাছটি বিবর্ণ হয় নিষ্পত্র হয়।

অমরেশ মিত্র

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

ছোট্ট খোকা মস্ত বীর

ছোটদের উপযোগী নৃত্যনাট্য 'ছোট্ট খোকা মস্ত বীর'। সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন মঞ্চে এই নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় চিলড্রেনস কয়ার আগাগোড়া আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আন্তরিকতা থাকলেও সম্বল ছিল সামান্য। ফলে, কোন রকমে কিছু মুখোশ তৈরী করে, সেট বানিয়ে চিলড্রেনস কয়ার শিশু শিল্পীদের মঞ্চে নামিয়ে দেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই শিশু শিল্পীরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়, নৃত্য, হাবভাব ও মুক্ত অবাধ হাঁটা-চলার ছন্দে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলে। কাব্যের তান বেশি, তাই নাটক স্থিতি-

শীল হয়ে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সেই কলংক থেকেও নাটকটিকে মুক্তি দিল শিশু শিল্পীরা। নাটকের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে সামগ্রিক পারফরমেনস। এই পুরনো কথাটি মুক্তাঙ্গন মঞ্চের অভিনয় দেখে সেদিন নতুন করে মনে পড়ল।

'ছোট্ট খোকা মস্ত বীর' নৃত্যনাট্যের উপজীব্য পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প। পশুরাজ সিংহের খাবার যোগানোর জন্য প্রতিদিন বনের একটি প্রাণীকে জীবন দান করতে হত। বনের পশু পাখিরা এ নিয়ে মনে মনে উত্তেজিত হলেও প্রবল পরাক্রমশালী পশুরাজের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে পারত না। শেষ পর্যন্ত বনের প্রাণীদের দুশ্চিন্তামুক্ত করল ছোট্ট একটি খরগোশ। তার সাহস ও বুদ্ধির কাছে সিংহকে পরাভব মানতে হল। এই সাদামাটা, প্রচ্ছন্নভাবে বক্তব্যপ্রধান গল্পকে শিশুদের উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে নৃত্যনাট্যের রূপ। ঘটনা সংস্থান কাল্পনিক হলেও অনু-

[illegible] মঞ্চে। আরো, [illegible] ছিল না। কিন্তু আগেই বলেছি, [illegible] শিল্পীরা।

প্রথমেই বলতে হবে খোকা খরগোশ ও সজারুর কথা। শ্বেতা ভট্টাচার্য ও সোমদত্তা রায়চৌধুরী এই দুটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে। ভালুক, বাঘ, হরিণ, ময়ূর, বানর, বক, সিংহ, শেয়াল পঞ্চতন্ত্রের গল্পের পাতা থেকে সরাসরি উঠে আসে মঞ্চে। কস্তুরী মজুমদার, শর্মিষ্ঠা বোস, দেবযানী চ্যাটারজি, নীলিমা বিশ্বাস, দীপান্বিতা বিশ্বাস, চৈতালী সরকার, চন্দনা মুখারজি ও সুতপা দাশের অভিনয় ছিল চরিত্রানুগ। আমরা শুধু নৃত্যনাট্যই দেখিনি, কয়েকটি চরিত্রের কিছু কিছু অভিজ্ঞতারও অংশীদার হয়েছিলাম। পরিচালক শচীন ভট্টাচার্য এদিক থেকে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। রচনার দিক থেকে গান ছিল দুর্বল। কিন্তু তার জন্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে উমা ব্যানারজি, তাপসী গাঙ্গুলী ও তুষার সরকারের দক্ষতা চাপা পড়ে যায়নি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **ইন্দ্রজাল**

আবার প্রদীপ, আবার ইন্দ্রজাল

আবার ফিরে এসেছেন প্রদীপ। ফিরেছেন সেই মহাজাতি সদনেই। প্রদীপ ওরফে জুনিয়র পি সি সরকারের এবারের শো পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি নয়। কিছু সংযোজন, কিছু সংশোধন, কিছুটা সংস্কারসাধন। কোনো সৎ ও সার্থক শিল্পীই এক জায়গায় থেমে থাকেন না। প্রদীপও যে শিল্পী হিসেবে সৎ এবং গতিশীল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবারের দুটি খেলার সংস্কারসাধনে। একটি 'জাহাজঘাটার গোলমাল'-এ, অন্যটি 'হিউম্যান বম্ব'-এ। দুটি খেলাতেই নতুন করে মাথা ঘামাতে হয়েছে তাঁকে, টেকনিক্যাল কিছুটা পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। সেই আলোচনার গভীরে না গিয়েও বলা যায়, খেলা দুটিতে দর্শকের দিক থেকে সংশয় ও অনুমানের যৎসামান্য সূত্রকেও তিনি পুরোপুরি সরিয়ে দিতে পেরেছেন। সংশোধন ঘটেছে বহু খেলার প্রেজেনটেশনেও। আরও নিখুঁত, আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তাঁর সযত্ন প্রয়াসের চিহ্ন বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পুরনো খেলা কিছুই বাদ দেননি। শুধু এই প্রতিবেদক যেদিন গিয়েছিলেন, সেদিন, অনিবার্য কারণে, 'পারপেণ্ডিকুলার সারিং' খেলাটি দেখানো যায়নি, কিন্তু এই বর্জন সাময়িক কারণের জন্য। খেলাটি এখন আবার দেখাচ্ছেন প্রদীপ।

নতুন সংযোজন বলতে, 'হাতি অদৃশ্য করার খেলা।' শুধু হাতি অদৃশ্য নয়, যে-খাঁচা থেকে হাতিটি অদৃশ্য হচ্ছে, সেখানে একটি ঘোড়ারও আবির্ভাব ঘটছে। এই কল্পনা প্রদীপের নিজস্ব। এর আগে সিনিয়র সরকারও
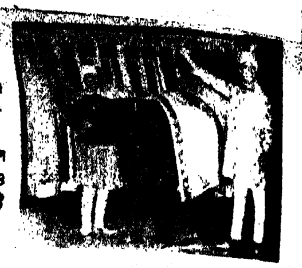
হাতি অদৃশ্য করার খেলা দেখিয়েছেন, তারও আগে দেখিয়েছেন হুডিনি। এখন যিনি বিশ্বের জাদুমঞ্চের সব থেকে চাঞ্চল্যকর নায়ক সেই আমেরিকার জাদুকর ডাগ হেনিং-ও তাঁর টেলিভিশন শো-তে 'হাতি অদৃশ্য করার' একটি আশ্চর্য খেলা রেখেছেন। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসের 'জেনি'তে (জাদু-পত্রিকা) সেই খেলাটির সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ডাগ হেনিংয়ের নানান সূক্ষ্ম কল্পনাপ্রবণ রোমাঞ্চকর নিজস্ব নতুন খেলার অন্যতম এই খেলাটিতেও তাঁর শোম্যানশিপের চূড়ান্ত প্রকাশ। প্রদীপও নিশ্চিত জানেন সে-কথা। জানেন বলেই কোনও রকম অনুকরণে না গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় হাতি অদৃশ্য করার খেলাটি তৈরী করেছেন, তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয়ও এই নতুন খেলায় অবশ্যই জড়ানো রয়েছে, অদৃশ্য হবার আগের মুহূর্তেও এক ঝলক হাতীটিকে দেখা যায়। কিন্তু খেলাটির সামগ্রিক আবেদন—দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়—এখনো পুরোপুরি সাথক হয়ে ওঠেনি। আরও বড়ো মঞ্চে খেলাটি কেমন দেখাবে জানি না, কিন্তু এখন যেভাবে দেখানো হচ্ছে তাতে বড়ো বেশী স্টেজের কোণ ঘেঁষে থাকচে খাঁচা, খাঁচাটিও প্রথমাবধি বড়ো বেশীরকম ঢাকাচাপা দেওয়া। পিছনের পরদা সরে যাওয়াও পরিচ্ছন্নতার প্রতিবন্ধক। হুডিনি যখন হাতি অদৃশ্য করার খেলা দেখাতেন, তখন একটা চলু ঠাট্টার গল্প জাদুকর-মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। গল্পটা নেহাৎই গল্প। তবু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। আরম্ভে দুজন সহকারী একটা খালি খাঁচা ঠেলে নিয়ে এলেন মঞ্চে। একটা মস্ত জ্যান্ত হাতিকে ঢোকানো হল সেই খাঁচায়, খাঁচাটিতে কাপড় চাপা দেওয়া হল। জাদুকর 'ওয়ান-টু-থ্রি' বলা মাত্র কাপড় সরিয়ে দেখানো হল—হাতি অদৃশ্য। হাততালি আর হাততালি। জাদুকর মাথা নীচু করে সেই অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, এমন সময় দেখা গেল, কুড়ি জন সহকারী মঞ্চে ঢুকে সেই 'শূন্য' খাঁচাটিকে ভেতরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন! তাতেও খাঁচা তেমন নড়তে চাইছে না। প্রদীপকে ধন্যবাদ, তিনি এই রকম কোনো মজার পরিস্থিতি তৈরী করেন নি। কিন্তু যা করেছেন, তাও তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষে মানানসই নয়। প্রদীপ অবশ্য এ খেলায় বড়োদের চোখ বুজে থাকতে বলেছেন, কিন্তু তাই কি সম্ভব? তবে তিনি তো সংস্কারে বিশ্বাসী, সুতরাং আগামী দিনে খেলাটিকে নিখুঁত চেহারায় হাজির করবেন, এ-বিশ্বাস নিশ্চিত রাখা যায়।

আমার পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়ই চাই!

হরির বড্ড তাড়া, খাবার সময় নেই···
কমপ্লান হল নিমেষে আহার।
একজিকিউটিভ, পর্যটক, অফিস-যাত্রী
—তাড়াহুড়ো করা সব স্বামীদের
পক্ষেই আদর্শ!

রবি খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করে···
ওর পুষ্টির যতই অভাব হোক না কেন,
সুস্থ সবল রাখবার জন্যে অন্য কোনো
স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় ওকে কমপ্লানের ২৩টি
একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণের
'সম্পূর্ণ' পুষ্টি দিতে পারে না।

মা'র অসুখ করেছিল —
খেতে চান না
কমপ্লান খেলে উনি চটপট সেরে
উঠবেন। 'সম্পূর্ণ' পুষ্টির জন্যে এটি
ডাক্তাররাই বেশী খেতে বলেন।

আমি এত ক্লান্ত
যে খেতেই পারি না
রোজ এক কাপ কমপ্লান আমাকে
সুস্থ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর রাখে,
অজ্ঞাত পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা করে।

একমাত্র কমপ্লান-ই হল স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্যে ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণে ভরপুর সম্পূর্ণ আহার!

একমাত্র কমপ্লান-এই আছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে
নির্ধারিত অনুপাতে প্রোটিন, ভিটামিন,
খনিজ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট ও অন্যান্য একান্ত
প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান যা প্রতিদিন
আপনার শরীরের জন্যে দরকার।

চকলেট আর
এলাচ-জাফরানের
মুখরোচক স্বাদগন্ধেও
পাওয়া যায়!

প্রোটিন — নিকোটিনামাইড
কার্বোহাইড্রেট — কলিন
ক্যালসিয়াম — ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট
লিপিড — পাইরিডক্সিন (বি৬)
ফসফরাস — ভিটামিন বি১২
সোডিয়াম — ফলিক অ্যাসিড
ক্লোরাইড — ভিটামিন সি
(পি এস যুক্ত) — ভিটামিন ডি
পটাসিয়াম — ভিটামিন ই
আয়রন — ভিটামিন কে
আয়োডিন — এছাড়া আছে, শরীরের
ভিটামিন এ — স্বাভাবিক ক্রিয়া
ভিটামিন বি১ — বজায় রাখার জন্যে
রিবোফ্ল্যাভিন — ট্রেস এলিমেন্ট

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®
সারা দুনিয়ায় নির্ভরযোগ্য

CASGC-27-234 BEN

কিন্তু ঝলমলে সুন্দর চুলের জন্যে ব্যবহার করুন সানসিল্ক

সান সিল্ক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অনিট ঘোষ

প্রচ্ছদ পরিচিতি—"কুমারীর মন" (পেতলের পাত আর অ্যালুমিনিয়মের রিবেট—১০×৩০×২২ সেঃ মিঃ) টুকরো টুকরো নানা আকারের পাত জুড়ে জুড়ে নারী দেহের সরল ও বঙ্কিম অংশের মৌলিক আকারকে ধরতে চেয়েছেন অনিট। মনে হচ্ছে গতিশীল অনুভূমিক রেখা এঁকেবেঁকে খাড়া উঠে নেমে যেন ফুটিয়ে তুলছে বিমূর্ত জ্যামিতিক অথচ ছন্দিত রূপবন্ধ। মূর্তির সঙ্গে চারপাশের শূন্যস্থানের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কুমারীর দেহের ছটফটানি হয়তো কেউ এঁর মধ্যে দর্শন করতে পারেন।

সম্পাদকীয়

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৫
শনিবার ৩ বৈশাখ ১৩৮৪

ধর্ম মহাসম্মেলন

বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন : আধুনিক কালে ধর্ম সম্বন্ধে অনাগ্রহের বিস্তার সত্ত্বেও এমন আশা করবার যুক্তি আছে যে, ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুরাগের একটি নতুন অভ্যুদয় বিশ্বের জনমানসের প্রকৃতি প্রভাবিত করবে। ভারতের মাদুরাই-য়ে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান অবশ্যই বিশ্বের ধর্ম-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ঘটনা বলে বিবেচিত হতে পারে, সে ঘটনার আকার-প্রকার সামান্য হোক বা না হোক। নেপালাধীশ শ্রীবীরেন্দ্র এই ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। নেপালের রাজতন্ত্রের নৈতিক আদর্শ হিসাবে নৃপতির পক্ষে ধর্মের রক্ষা সাধনের কর্তব্য বিহিত আছে। সুতরাং নেপালধীশের পক্ষে ধর্ম-মহাসম্মেলনের আহ্বানে সাড়া দেওয়া বস্তুত একটি আদর্শিক কর্তব্যেরই অনুষ্ঠান। ঘটনার সংবাদ দেশের ও বিদেশের জনমত চমকিত করবার মতো কোন আবেগ বহন করে না। তবু স্বীকার করতে হয় যে, এ ধরণের ধর্ম-সম্মেলন যেন বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনার প্রবল নিনাদের মধ্যে মানবীয় চিন্তার সবচেয়ে প্রাচীন এক দিব্য উপলব্ধির বাণীকে জাগিয়ে রাখবার একটি সদাগ্রহশীল প্রয়াস। ধর্মের নাম নিয়ে মানবীয় জনজীবনে অনেক অনাচার, অন্যায় এবং শোষণের ব্যাপার ঘটেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে এহেন গ্লানির কাহিনীর অভাব নেই। তেমনই বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের একটি বড় স্বীকৃতি এই যে, ধর্মের নামে নানা জাতির জীবনে ভাব ভাবনা ও নৈতিক মহত্ত্বের নবজাগৃতিও সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের বড় সহায়ক হয়েছে ধর্ম।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধর্মের নামে বিশ্বজীবনে মারামারি ও কাটাকাটির ব্যাপারটাও কিছু কম হয়নি। বহু মনীষী ও ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, উদ্‌ভ্রান্ত ও উগ্র ধর্মবাদিতার প্রক্রিয়া এখন তার অন্তিম অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ধর্মে-ধর্মে বিরোধের পরিবর্তে ধর্মে-ধর্মে সৌহার্দ্যের সঞ্চার মানবীয় জীবনের একটি সাংস্কৃতিক আচরণে পরিণত হয়েছে। ধর্মের প্রেরণা ক্ষীণ হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরাও ধর্ম মহাসম্মেলনের মতো অনুষ্ঠানকে বিশ্বজীবনের শান্তি ও সৌহার্দ্যের আহ্বায়ক ঘটনা হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রসঙ্গত ভারতের শিক্ষিত সাধারণের অনেকে চিকাগোর সেই বিশ্ব ধর্ম-মহাসম্মেলন এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করতে পারেন। স্বামীজীর বাণীতে প্রচারিত হয়েছিল যে, বেদান্ত কোন বিশেষ দেশিক অথবা জাতিক জীবনের উপযোগী ধর্মের তত্ত্ব নয়, বিশ্বমানবের উপযোগী ধর্মের তত্ত্ব। বলাবাহুল্য, স্বামীজীর প্রচারিত এই তত্ত্বটি ধর্মকে বিশ্বমানবীয় ঐক্যের সহায়ক একটি ঐতিহাসিক সম্বল বলে ধারণা করবার অনুকূল যুক্তি বহন করেছে।

রাজা রামমোহন সম্পর্কে অনেকের অভিমত এই যে, তিনি তুলনামূলক ধর্মালোচনার প্রথম প্রবর্তক। লক্ষ্য করতে হয়, পরবর্তীকালে তুলনামূলক ধর্মালোচনা বস্তুত একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রে পরিণত হয়ে বিশ্বের জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ঐক্য ও মিলনের দ্যোতক একটি প্রেরণা সঞ্চারিত করেছে। ধর্মে-ধর্মে আর বিরোধের কোলাহল নয়, পরস্পরের প্রচারিত তত্ত্বকে ঠিক-ঠিক বুঝে নেবার আন্তরিক বিচার বড় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের নানা স্থানে বিভিন্ন ধর্মের মহাসম্মেলনে এই বিচারের সঙ্গত ও স্বাভাবিক রূপায়িত প্রকাশ। ধর্ম সাধারণ জনজীবনের পক্ষে আফিং-এর কাজ করে; মনীষীর এই মন্তব্যটি বাদ-বিসম্বাদ ও প্রতিবাদের অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এবং দেখতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বজীবনের ব্যাপক ও বৃহত্তর স্বরূপ আজও কোন-না-কোন প্রকারের আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে চলেছে।

আশা করলে বোধহয় ভুল হবে না যে, ধর্মের পক্ষে বিশ্বজীবনে নতুন গৌরবে পুনর্বাসিত হবার সঙ্কেত স্পষ্টতর হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বজীবনই নতুন করে শুদ্ধতর এক ধর্মে পুনর্বাসিত হবে। আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং নাস্তিক্য আগ্রহের মানুষটিও স্বীকার করবে যে, ভারতীয় মনীষার এই নতুন অভ্যুদয়ের মধ্যে ধর্মাচার ও ধর্মবিশ্বাসের বিরাট ভূমিকা আছে। মনীষীরা সকলেই ধর্মানুরাগী। এই ধর্মানুরাগ ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার পক্ষে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অধিগত করবার কোন বাধা হতে পারেনি।

কোন-কোন সমালোচকের অভিমত : প্রথম মহাযুদ্ধকাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকাল পর্যন্ত বিশ্বজীবনের বিচার ও বিবেকের উপর দিয়ে দুঃসহ এক সন্দেহের ঝড় বয়ে গিয়েছে। শোণিতাক্ত হিংস্রতার দুই নিদারুণ মহোৎসবের প্রকোপে পড়ে বিশ্বের বহুজনের মনে ধর্ম সম্বন্ধে অনাস্থার ভাব প্রবল হয়েছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাসের সম্বলটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে। কিন্তু এমন ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্নেরও অভাব নেই। এবং সাধারণভাবে একটি সত্য অনুভব করতে ও স্বীকার করতে অসুবিধে নেই। বিশ্বের নানা স্থানে বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা ও বিচার এক-একটি সম্মেলনের আশ্রয়ে পরিচালিত হতে দেখে ধারণা করবার এই বাস্তবতা-সম্মত যুক্তিই পাওয়া যায় যে, ধর্মে-ধর্মে সৌহার্দ্যের একটি ঐতিহাসিক ক্রিয়া জাগ্রত হয়েছে। ভারতের দেবানাম্‌ প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপির একটি উল্লেখ প্রসঙ্গত স্মরণ করা চলে—পূজেতিয়েব চ পরপষন্ড। অপরের ধর্ম-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা কর। সুতরাং বলতে হয়, ধর্ম-মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান সার্থক হবে, যদি এক ধর্মের মানুষকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবার মতো প্রেরণা উদ্বোধিত করা হয়। নিতান্ত বুঝাবুঝি ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার চেয়ে মহত্তর ঘটনা হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা। আধুনিককালে ভারতের মহাত্মা গান্ধী ধর্ম-সমন্বয়ের তথা ধর্মে-ধর্মে শ্রদ্ধান্বিত ও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ সংস্থাপনার এক ঐতিহাসিক ক্রিয়ার সূচনা করে গিয়েছেন। সর্বধর্মের পক্ষ থেকে প্রার্থনার অনুষ্ঠান আহ্বান করে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক কর্তব্যের এবং ভাবনার প্রচার পরিচালিত করতেন।

দৃশ্যপট

প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য বিধানসভাগুলিতে এখন নির্বাচন হওয়া উচিত কিনা?

একপক্ষ বলছেন, নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। আর একপক্ষ বলছেন, কেন তা হবে?

এক্ষেত্রে দু পক্ষের দুরকম বক্তব্য হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ দুপক্ষের স্বার্থ দুরকম। যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের কথা। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা নিশ্চয়ই চাইবেন এখন এ রাজ্যে নির্বাচন হোক। কারণ তাহলে তাঁরা জিতবেনই। এই জয়ের অঙ্ক থেকেই তাঁরা এখন নির্বাচন চাইছেন।

আবার তামিলনাড়ুতে নিশ্চয়ই এখন জনতা পার্টি নির্বাচন চান না। কারণ লোকসভার নির্বাচনে যা ফলাফল হয়েছে তাতে আন্না ডি এম কে জোট এখন তামিলনাড়ুতে কিছুতেই জিততে পারবেন না। অবশ্য জনতা পার্টি এখন মুখ ফুটে বলতে পারছেন না যে তাঁরা তামিলনাড়ুতে নির্বাচন চান না। এ ব্যাপারে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত। তাই জনতা পার্টি এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তামিলনাড়ুতে নির্বাচনে যেতে বাধ্য। এই জন্য তাঁরা নতুন করে জোট বাঁধার কথাও ভাবছেন। এবার তাঁরা সঙ্গে আন্না ডি এম কে-কে পেতে চান।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেস বিপর্যস্ত। তাই এই সব রাজ্যে জনতা পার্টি এবং বিরোধীরা এখন নির্বাচন চাইছেন।

কংগ্রেসও তাতে আপত্তি জানাচ্ছে। কারণ এখনই এইসব রাজ্যে নির্বাচনে যাওয়ার মত মনোবল কংগ্রেস নেতাদের নেই।

*

জয়প্রকাশ যে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনের দাবি করেছেন সেটা অবশ্য নীতিগত প্রশ্ন। তিনি বলছেন, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের রায় ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছে। সুতরাং এইসব রাজ্যের কংগ্রেস সরকারগুলির পদত্যাগ করা উচিত।

'রাইট অব রিকলের' নীতিতে বিশ্বাস করেন জয়প্রকাশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর বিধানসভা নির্বাচনের দাবি ন্যায়সঙ্গত। সন্দেহ নেই, উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের বহু রাজ্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। সুতরাং এইসব রাজ্যে কংগ্রেস সরকারগুলির ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।

কংগ্রেসীরা কেউ কেউ বলছেন, জয়প্রকাশের যুক্তি ধোপে টেঁকে না। কারণ নির্বাচন হয়েছে লোকসভায়, রাজ্য বিধানসভায় নয়। কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে এই নির্বাচনে কংগ্রেস তার সব কৃতকর্মকে ইস্যু করেছিল? এটা কি সত্যি নয় যে সব রাজ্যেই কংগ্রেসীরা বলেছিলেন যে কংগ্রেস দেশকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাই তাদের কংগ্রেসকেই ভোট দেওয়া উচিত? এটা কি ঠিক নয় যে রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও জনসাধারণকে বলেছিলেন আপনারা আমাদের সমর্থন করুন?

মানুষ কি তাঁদেরও প্রত্যাখ্যান করে দেয়নি? মানুষ কি তাঁদের কথাও অগ্রাহ্য করেনি? মানুষ কি ওইভাবে তাঁদের উপরও অনাস্থা জানায়নি?

কংগ্রেস দলগতভাবে গিয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে। নির্বাচকমণ্ডলী সেই দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর যদি কেউ বলেন যে এই সরকারগুলির পদত্যাগ দাবি করা এবং পুনরায় নির্বাচনের দাবি তোলা অন্যায় তাহলে তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এর চেয়ে ভাল আর কোন্ পথে জনমতের যাচাই হতে পারে?

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারগুলি যদি পদত্যাগ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ না দিতে চান সে কথা অন্য। কিন্তু একথা বলা মোটেই ভুল নয় যে বিভিন্ন রাজ্যে জনগণ তাঁদের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে।

*

এই কংগ্রেসী রাজ্যসরকারগুলি যদি এখন নিজে থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনের সুযোগ করে না দেন তাহলে কি তাঁদের বরখাস্ত করা উচিত হবে? তাহলে কি কেন্দ্রীয় সরকারের ওইভাবে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে?

আমার মনে হয় সেটা করা মোটেই উচিত হবে না। আইনসঙ্গতভাবে যতদিন তাঁরা থাকতে পারেন ততদিনই তাঁদের থাকতে দেওয়াই উচিত। তাঁরা সংবিধান সংশোধন করে প্রতিটি রাজ্য বিধানসভার আরও এক বছর করে দিয়েছেন। এটা তাঁরা অন্যায় করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা অন্যায়ের প্রতিকার আর একটা অন্যায় দিয়ে করা উচিত নয়। তা করলে অন্যায় শুধু বাড়তেই থাকে।

জনতা সরকার যদি সংবিধান সংশোধন করে বিধানসভার আয়ু আবার পাঁচ বছর করতে পারেন তাহলে তাতে কোনও অন্যায় হবে না। তাহলে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় অবিলম্বে নির্বাচন হতে পারবে। সে পথেও জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু বরখাস্ত করে নির্বাচন করা অত্যন্ত অন্যায় হবে।

দলত্যাগের মাধ্যমে পাল্টা সরকার গঠনের চেষ্টা করাও অত্যন্ত অন্যায় হবে। জনতা পার্টির এখন যাঁরা নেতা তাঁরা কংগ্রেসের এই কাজের সমালোচনা বরাবর করে এসেছেন। তাঁরা বরাবর বলে এসেছেন দলত্যাগের মাধ্যমে সরকার গঠন করা অত্যন্ত অন্যায়। তাঁরা বরাবর অভিযোগ করে এসেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার হাতে থাকার ফলে কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে এই অন্যায় কাজ করেছে। আর এখন যদি তাঁরাও কেন্দ্রীয় সরকারে বসে একই ধরনের কাজ করেন তাহলে সেটা আরও বড় অন্যায় করা হবে।

এখন তাই ওরা নিজেরা যদি পদত্যাগ করে নির্বাচনের সুযোগ করে দেন তা হলে সেটা হবে সবচেয়ে ভাল। তাতে কংগ্রেস দলের মর্যাদাও বাড়বে। কংগ্রেস দল জনমতকে শ্রদ্ধা করে কিনা, তাহলে লোকে সেটা বুঝবে। তা না হলে সংবিধান সংশোধন করে বিধানসভাগুলির আয়ু আবার পাঁচ বছরে কমিয়ে এনে নির্বাচন করা যেতে পারে। এ ছাড়া যদি অন্য পথ ধরা হয় তা হলে অন্যায় করা হবে। বরখাস্ত করা বা দলত্যাগে উৎসাহ দেওয়া ভুল হবে। সেটা কংগ্রেসের পথই যাওয়া হবে। তাতে জনতা সরকারের মর্যাদা বাড়বে না।

৪-৪-৭৭

সব্যসাচী গুপ্ত

গোঁয়ার্তুমি

রোডেশিয়াতে ৫৫ লাখ লোকের বাস। তাদের মধ্যে সওয়া দু লাখের চামড়া কটা। তার ওপর তারা কেউ এ এলাকার খাস বাসিন্দা নয়—তারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে রোডেশিয়ায়। যাদের দেশ তারা গেছে ভেসে—দই মারছে বাইরে-থেকে-আসা সাদা চামড়া নেপোর দল। দেশটা তাদের তাঁবে, ব্যবসা বাণিজ্যও চালাচ্ছে তারাই, আর নিজ বাসভূমে পরবাসীর অধম হয়ে কোনো মতে দিন গুজরান করছে যাদের দেশ সেই কালা আদমীরা। সাদা মানুষরা কেবল ফুর্তি লুটছে আর বুটের নিচে পিষে মারছে কালা আদমীদের। মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রোডেশিয়ার কালা আদমীদের নেই। উৎকট বর্ণবিদ্বেষী ধলারা তাদের ঘেন্না করে। কুকুর-বেড়ালের ওপর ধলাদের যে দরদ কালো মানুষদের জন্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। কালাদের ছায়াও ধলারা মাড়ায় না বললেই হয়। খানাপিনা দূরে থাকুক এক সঙ্গে চলাফেরা করাও বারণ, এমন কি খেলাধুলো করাও। একসঙ্গে লেখাপড়া কী কাজকর্ম করার কথা তো ওঠেই না। এ বিদ্যেয় রোডেশিয়া পাঠ নিয়েছে তার দক্ষিণী প্রতিবেশী দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত চেলা যে রোডেশিয়া তাতে ভুল নেই।

রোডেশিয়া ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ। আইনের বিধানে আজও তাই। তবে বারো বছর হলো বিলিতী শাসনের আওতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে স্বাধীনতা কেবল সাদা মানুষদের জন্যে কালাদের তার ভাগ দেওয়া হয়নি। আসলে রোডেশিয়ার ধলা সরকার তো পরাধীনতার শেকল ছিঁড়তে চান নি—চেয়েছিলেন সাদা মানুষের শাসন পাকাপাকি কায়েম করতে চিরদিনের জন্যে। তাঁদের মতলব কালাদের গোলামীর কায়েমী বন্দোবস্ত করা। লোক দেখানো কিছু অধিকার অবিশ্যি কালাদের তাঁরা দিতে রাজী। কিন্তু তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চায় বরাবরই ধলার দল। এরকম ব্যবস্থা আগে হয়তো চলতো কিন্তু একালে যে ও ধরনের অবিচার, অত্যাচার অচল তা আর সকলে বুঝলেও বুঝছে না দক্ষিণ আফ্রিকা আর রোডেশিয়ার সাদা মানুষেরা। দুনিয়া যে পালটে গেছে—গোটা আফ্রিকায় যে স্বাধীনতার ঢল নেমেছে সে খবর আজও ও দু দেশের রাজধানী প্রিটোরিয়া আর সলসবেরিতে পৌঁছয় নি। বর্ণবিদ্বেষী দু সরকার তাই আজও খোয়াব দেখছেন কালাদের গরু শুয়োরের মতো খেদিয়ে আটকে রেখে তাঁরা ধলাদের প্রভুত্বের জুড়ি-গাড়ি দিব্বি হাঁকিয়ে যাবেন।

দেশে দেশে তাঁদের ভাই বেরাদাররা তাঁদের বোঝাতে চাইছেন যে তাঁরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছেন। পরামর্শ দিয়েছেন কালাদের সঙ্গে আপস করে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষে পেতে। রোডেশিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা ইংরেজরা তো মানেইনি কোনো দেশই নয়। তলে তলে তাকে অবিশ্যি অনেক ধলা দেশ মদত দিচ্ছে। নইলে এতদিন অচল হয়ে পড়তো রোডেশিয়ার চলতি চাকা। জাতিপুঞ্জের নির্দেশে রোডেশিয়ার সঙ্গে সব দেশেরই ব্যবসা বাণিজ্য বারণ। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলোর মুখে এক আর মনে আর বলে এখনও টিঁকে আছে রোডেশিয়াতে বর্ণবিদ্বেষী ধলা সরকার। তবে যত দিন যাচ্ছে তত তার অবস্থা সঙীন হয়ে উঠছে। রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথ মুখে বড়াই করলেও মনে মনে প্রমাদ গুণছেন। তবু এমনি তাঁর গোঁ যে কিছুতেই তিনি তাঁর জেদ ছাড়বেন না—রফা করতে রাজী হচ্ছেন না দেশের কালা আদমীদের সঙ্গে।

সবাই তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছে কালা আদমীদের সঙ্গে ঝগড়া আর না করে একটা মিটমাট করতে। দেশটা তো তাদেরই—সরকার তাদেরই চালানো উচিত—কদ্দিন আর তাদের ন্যায্য দাবি তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন? সে কথা স্মিথ কানে তুলছেন না। আপসের যে ব্যবস্থা বিলেতের শ্রমিক সরকার উদ্যোগী হয়ে করেছিলেন—তাতে মার্কিনীদেরও সায় আছে—তা এক রকম বানচাল করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি করে তিনি গদি রাখতে পারবেন এ কেবল মিছে আশার ছলনা। রোডেশিয়ার কালা আদমীরাও আর ঘুমিয়ে নেই। তারা তাদের পাওনা আদায় করে নিতে চায়—আপসে না হলে জোরজবরদস্তি করে। দুটো জোট গড়ে উঠেছে মুক্তি যোদ্ধাদের। একটার নাম জাপু আরেকটার জানু। ধলাদের কবল থেকে মুক্তি পেলে রোডেশিয়ার নাম হবে জিম্বাবুই। দেশ-বিদেশের সরকারী খাতায় ইতিমধ্যেই এ নাম চালু হয়ে গেছে। এও ঠিক হয়ে গেছে, দেশের সংবিধানের খোল নলচে পালটে কালাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেশ শাসনের ভার। ইয়ান স্মিথ সহজে রাজী না হলে তাঁকে বাধ্য করানো হবে বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে।

চট করে নরম হবেন এমন বান্দা ইয়ান স্মিথ নন। তিনি সমানে ল্যাজে খেলে চলেছেন। কালা নেতাদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছেন কিন্তু কোনো আপস হয়নি কেননা, রফা করার ইচ্ছে তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁর অত্যাচারে মুক্তিযোদ্ধারা মুষড়ে পড়েন নি। যত দিন যাচ্ছে তত জোরদার হয়ে উঠছে তাঁদের গেরিলা লড়াই। জানু আর জাপু মিলে এখন একটা যুক্ত পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট অর্থাৎ দেশপ্রেমীদের মোর্চা গড়ে তুলেছে। সে ফ্রন্ট চায় না যে, দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাক। কিন্তু তার নেতারা নাচার। স্মিথ যদি পথে না আসেন তা হলে তাঁকে জোর করে গদি থেকে টেনে নামানো ছাড়া উপায় নেই। গেরিলাদের দুনিয়ার কাছে খেলো করার অনেক কায়দা করছেন স্মিথ। তাঁর গুপ্তঘাতকেরা খুনখারাপি করছে আর তার দোষ চাপাবার চেষ্টা তিনি করছেন গেরিলাদের ওপর। ৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানী সলসবেরি থেকে ৩০ মাইল দূরে একটা ক্যাথলিক গির্জের ওপর হামলা চালায় রুশী অস্ত্র নিয়ে একদল গুণ্ডা। স্মিথ রটিয়েছিলেন এটা গেরিলাদের কাজ। আসলে কিন্তু খুনীরা ছিল তাঁরই চর। গেরিলাদের বদনাম দেওয়ার জন্যে ওটা ছিল তাঁর একটা চাল।

তাঁর চালাকি কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। তাঁর রটনা কেউ বিশ্বাস করেনি এই জন্যে যে, ক্যাথলিক পাদরিরা জাতে সাহেব হলেও তাঁদের টানটা মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। গেরিলারা এমন গোঁয়ার নয় যে, বন্ধুদের খুন খারাপি করে বর্ণবিদ্বেষীদের হাত শক্ত করবে। আগেও ও ধরনের চাল স্মিথ চেলেছেন। তাঁর কাছে ঘুষ খেয়ে অমন অপকর্ম মাঝে মাঝে করেছে কিছু কালা আদমী। কিন্তু তাদের কুকীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। তবু স্মিথ হাল ছাড়েন নি। তিনি তালে আছেন দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি বাধিয়ে দিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে যাতে গেরিলা-দের ওপর চটে যায় বিদেশী রাষ্ট্রগুলো। আর যদি তিনি কালাদের মধ্যে কোন্দল লাগিয়ে দিতে পারেন তা হলে তো বাঁচেন শত্রু বাঘে মারবে। তাদের এক পক্ষকে মদত দিতে যদি রুশীরা আসরে নেমে পড়ে কিংবা আর কোনো কম্যুনিস্ট দেশ তা হলে হয়তো আমেরিকা তাঁর দলে ভিড়ে যাবে। মনে হচ্ছে স্মিথ জেগে স্বপ্ন দেখছেন। কালাদের ক্ষমতা দখল তিনি রদ করতে পারবেন না যাই করুন না কেন। আর পারবেন না ধলাদের মুলে হাবাত হওয়া ঠেকাতে। সমঝে চললে কিন্তু বারো আনা গেলেও চার আনা তাদের থাকবে।

দেবরাজ

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল...

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না!
জীবন রইলো পড়ে বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ভেজা ভূমি
তার কিছু দূরে নদী—
জল নিতে এসে কোনো সলাজ কুমারী
দেখে এক গলা-মোচড়ানো মরা হাঁস।
চোখের বিস্ময় থেকে আঙুলের প্রতিটি ডগায়
তার দুঃখ
সে সময় অকস্মাৎ ডঙ্কা বাজিয়ে লাগে জ্যোৎস্নার উৎসব
কেন, তার কোনো মানে নেই।
যেমন বৃষ্টির দিনে অরণ্য শিখরে ওঠে
সুপুরের আকাশের সংস্করণ ছবি
আর তার খুব কাছে মধুলোভী আচমকা নিশ্বাসে পায়
বাঘের দুর্গন্ধ!

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না!

কবির ঘুম

অজিত বাইরী

কেননা বিনিদ্র তিনি বহুকাল
এইখানে ঘুমাবেন তিনি শান্ত, সেই কবি

কয়েদখানায় কেই বা আটকে রাখবে আর
সবুজ ঘাসের ওপর বিছনো অমল দু'হাত
সাড়ে তিন হাত ভূমির ওপর
ফার্ণের নরম ছায়া।

এইখানে ঘুমাবেন তিনি শান্ত
বুকের নীচে আহা সেই মমতার মাটি
মাথার ওপর কটি নক্ষত্র
ধরে রাখবে বিশাল আকাশ।

আর ঝরবে বৃষ্টি, গভীর গন্ধে
ভরে যাবে ঘাস
আর কাছাকাছি খেলবে দুটি হরিণ শিশু।

চোখের পাতায় পৃথিবীর প্রান্তর
এইখানে ঘুমাবেন তিনি শান্ত:
জ্যোৎস্নায় সুরভিত রাতের বাতাস।

শহরে এপ্রিল

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এপ্রিলে কোকিল ডাকে প্রচলিত স্বরে—
বসন্ত এসেছে বোঝা যায়।
গাছপালা শূন্য এ-পাড়ায়
কেউ একটা কোকিল পুষেছে চিত্তবিনোদনকারী।
এপ্রিল নিষ্ঠুর মাস যে বলেছে, অসত্য বলে নি;
ভোর রাত্রে আউপাতালি হাওয়া
এক জানলা দিয়ে ঢুকে,
থেমে,
অন্য জানলা দিয়ে যাবার সময়
দেখে যায় ব্যবধান, ছিমছাম মশারি,
জেনে কষ্ট পায়
শহরের মানুষের রকম-সকম
কিছুটা বিচিত্র।

মাঠ নেই, নদী নেই, ঢালাও আকাশ নেই—
তবে, ঘরে-ঘরে, চিত্র আছে,
কন্দকাটা পুষ্প সমারোহ আছে, আর
প্রকৃতির অনন্য বিকল্প আছে : নারী।
সুন্দর প্রচ্ছদে মোড়া, স্বভাবে কৃপণ,
সতত সন্ত্রস্ত মন আত্মরক্ষা করার চিন্তায়।

এদিকে কোকিল ডাকে প্রহরে প্রহরে
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, একা-একা প্রাণ জ্বলে যায়?

বৈতরণী

রাজলক্ষ্মী দেবী

স্মৃতি দিয়ে সেতুবন্ধ হয় না এখানে।
হাতে নিয়ে বর্তমান,—মন্ত্রঃপূত ফুল,
গহন জন-মনের ঘোর বৈতরণী
পার হ'তে হয়।

হেথা বৃষের লাঙ্গুলে
মুঠো ক'রে,—খরস্রোতে বাড়ালে চরণ,
দুর্গম দুস্তর গিরি, মরু ও কান্তার
স্বপ্ন-ভ্রম হয়। কবে কোথায় কখন
পার্থিব কান্ডারী করেছিলো নৌকো পার?

এ নদীতে ইতিহাস ভেসে যায়। আসে
তরণী,—সমস্ত স্মরণের অবলোপ।
নিরাকাশ অন্ধকারে মসীকৃষ্ণ বারি
উথ্‌লায়,— মূঢ় মত্ত জনতা-র কোপ।

পোস্ট মর্টেম

শৈবাল মিত্র

এক সূক্ষ্ম লজ্জা বুকের মধ্যে প্রায়শ জেগে ওঠে। অনুভূতিটা অতি গভীর এবং গোপন। পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ আমূলে অস্তিত্বকে সেটা ময়াল সাপের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেয়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

আঠারো শো একত্রিশ সালের কথা।

তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে লড়াই করছেন ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। ঠিক তখনই রাজা রামমোহন রায় খসড়া করছেন, ভারতে ইংরেজ শাসনকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা। এ-দেশের নুনের ব্যবসাতে একচেটিয়া ইংরেজ মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। ফলে ছ লাখ শ্রমিক বেকার হয়। নীলকর সাহেবদের অবাধ চাষ-আবাদের ছাড়পত্র দেওয়ার দরবার করতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স।

রাজা রামমোহন আমাদের জাতীয় নেতা।

স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আঠারো শো পঁয়ষট্টিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বার হয়। তারপর একটানা প্রায় পঁচিশ বছরের উজ্জ্বল সাহিত্যজীবন। এই সময়টা জুড়ে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং আরো অনেক কৃষক সংগ্রাম হয়েছে সারা দেশে। বঙ্কিমের লেখায় তার কোনো চিহ্ন নেই। আনন্দমঠে ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলা হলো। ইংরেজ বিরোধিতার গন্ধ থাকায় 'নীলদর্পণ' নাটককেও প্রথমে তিনি কড়া সমালোচনা করেছিলেন। এ-দেশে নীলচাষ উঠে যাওয়ার পর সেই বঙ্কিমই নীলদর্পণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটককে নিষিদ্ধ করার জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন তিনি। রুশোর "সাম্য" বইটার তিনি অনুবাদক। 'সাম্য' জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী কালে কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই বই তিনি বাজার থেকে তুলে নিলেন। ইংরেজের সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিমূলক আইনের প্রতিবাদে আঠারো শো তিরানব্বই সালে চৈতন্য লাইব্রেরিতে এক সভা হয়। রবীন্দ্রনাথেরও সেখানে প্রবন্ধ পড়ার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র আগেভাগে দেখতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের লেখা। প্রবন্ধের নিরীহত্ব বোঝার পরই তিনি সভায় গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন অবসরপ্রাপ্ত রায়বাহাদুর।

স্মরণীয়, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সারা দেশে কয়েক ডজন দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন কোটি লোক মারা গিয়েছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মহাকবির পদ্য স্কুলে আমাদের পাঠ্য ছিল। শুনেছি, তিনি ভয়ানক আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর লেখা "ভারত সঙ্গীত" কবিতাটি সে যুগে মুখে মুখে ফিরতো। এই কবিতার জন্যে রাজরোষে পড়েছিলেন তিনি। অপরাধ ধোয়ার জন্যে আঠারো শো পঁচাত্তর সালে 'প্রিন্স অব ওয়েলস'-এর ভারত ভ্রমণের সময় রাজকুমারের গুণগান করে তিনি লিখলেন 'ভারতভিক্ষা' কবিতা। অপরাধ মার্জনা হলো। কিছু নগদ টাকাও পেয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনও 'পলাশীর যুদ্ধ' লেখার প্রায়শ্চিত্ত করলেন এই উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতা লিখে।

ইতিহাস পড়ি, আর ওই লজ্জাটা বুকের মধ্যে শোঁয়াপোকার মতো ঘোরে, বিষ ছড়ায়। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তখন বুঝি লজ্জা হজম করা পৃথিবীর কঠিনতম কাজ।

ট্রামে, বাসে গরুছাগলের মতো গাদাগাদি হয়ে নিয়মিত যাতায়াত করি। এই সব মুহূর্তে নিজেকে বা আশপাশের সহযাত্রীদের আর মানুষের মতো লাগে না। সামান্য বসার জন্যে হ্যাংলামি, ধস্তাধস্তি, ঝগড়া, মেয়েদের অসম্মান ইত্যাদি দেখতে দেখতে চোখ সয়ে গেছে। এই সেদিন এক স্কুলে পড়া ছেলে তার মায়ের বয়েসী এক মহিলাকে, যিনি বেশ মোটা, দেখে মন্তব্য করলো— 'কে তুমি হস্তিনী, আগে তো দেখিনি।' বেশ চেঁচিয়ে সুর করে সে গানটা গাইলো। চুপচাপ শুনে গেলুম। অস্তিত্বের সেই শেকড়টার মধ্যে কি এক অসহায় বিপন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভাবি, ঈশ্বর আমায় অন্ধ, বধির করে দাও।

বন্ধুর নতুন গাড়িতে চাপার সুযোগ হলো একদিন। গাড়ির জানলায় মুখ রেখে চলমান ভিমরুলের চাকের মতো বাস ট্রাম চোখে পড়ে। শুধু হাত, পা, নাক, কান; মাথার স্তূপ। ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো মানুষ। একটাও গোটা মানুষ নেই। সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতায় কেমন সিঁটিয়ে যাই। মিনমিনে ঘাম জমে কপালে। নিজের মনে বিড়বিড় করি, আমার যেন কোনদিন গাড়ি না হয়।

মায়ের চোখে ছানি পড়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সকাল ন'-টা থেকে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকি। মায়ের রোগা, দুর্বল শরীর কড়া রোদে ঝলসাতে থাকে। মা ক্লান্ত হয়, চোখ মুখ শুকিয়ে যায়। আমারও পা টাটায়, ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু বাসে ওঠা অসম্ভব। কিছু ধুলো, কিছু ধোঁয়া ছিটিয়ে 'মার মার' করে গাড়ি ছুটে চলে। চমৎকার প্রাইভেট গাড়িতে সাজানো গোছানো নারী পুরুষ। গাড়ির ভেতরে কখনো মায়ের বয়েসী মহিলাকে আরামে বসে থাকতে দেখি। মায়ের মুখের দিকে নজর পড়ে। প্রার্থনা করি, মা যেন এই সব ভাগ্যবতী মহিলাদের না দেখে। কিন্তু একটা গাড়িও মায়ের চোখ এড়ায় না। ছানিপড়া চোখে মা সব দেখে। বুকের মধ্যে সিরসির করে। আমি আকাশ দেখি। আকাশ মানুষকে লজ্জা দেয় না।

বছর কয়েক আগে উত্তর কলকাতার নিম্নবিত্ত এলাকায় থাকতুম। পুরোনো পাড়া, অনেক বস্তি আছে। পাকা বাড়ি, বেশির ভাগ রঙ ওঠা। রাস্তায় চেনা, অচেনা মানুষজনের আধমরা চেহারা, জামাকাপড়ের হালও খারাপ। পরিষ্কার নতুন পোশাক চাপিয়ে রাস্তায় বেরোতে অদ্ভুত সঙ্কোচ হতো। অপরাধী লাগতো নিজেকে। আমার একমাত্র গরমের সুটটা সারা শীতে দু-তিনবার বার করে শুধু হাত বুলিয়ে তুলে রেখেছি।

পাড়ার বস্তি কমিটি আমায় ধ'রে ক'রে একবার সভাপতি বানালো। বস্তির অবস্থা দেখার জন্যে বার কয়েক ঢুকতে হলো ভেতরে। অসাড় চোখে সব দেখলুম। তারপর বস্তির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। রাস্তার কলে বস্তির মেয়েরা জল নেয়, বাসন মাজে, স্নান করে পুরুষেরা। ড্যাব ড্যাব করে তারা আমাকে দেখে। আমি পাকা বাড়িতে থাকা সভাপতি। তাদের চোখে চোখ পড়লেই ভাবি, ধরণী, দ্বিধা হও।

সম্প্রতি কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায়, অভিজাত এলাকায় আছি। আমার সেই সব পোশাক, সাবেধন নীলমণি সুট্‌ এখানে অচল। গায়ে চাপালে লোকে, বিশেষত স্ত্রীলোকে, টেরিয়ে দেখে হাসাহাসি করে। বড় লজ্জা লাগে। চারপাশের ঝকঝকে নতুন

বাড়ি, ঝলমল নারী পুরুষ, হাল ফ্যাশানের সাজগোজের মধ্যে মনে হয়, আমি যেন খুব দুঃখী, সেকেন্ড হ্যান্ড মানুষ। কত তাড়াতাড়ি এ-পাড়া ছাড়বো, এখন সারাক্ষণ তাই চিন্তা করি। কিন্তু কোথায় যাবো, কোন মহল্লায়, যেখানে কোনো দৃশ্য বা শব্দ আমায় খোঁচাবে না?

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি নামী দামী নীতি আর দর্শন পড়াই কলেজে। পৃথিবীর আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সমালোচনায় বুকনি ছোটাই। লেখার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অধিকার, বিভিন্ন সময়ে ওই সব দেশে কিভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সে কাহিনীও বলতে হয়। হিটলার, মুসোলিনী, তোজোর মুণ্ডুপাত করি। অথচ আরো জলজ্যান্ত, উত্তপ্ত এক উদাহরণ গলার কাছে এসে আটকে থাকত সেদিন পর্যন্ত। গিলতে কিংবা উগরোতে পারতাম না।

শ... হাসি-হাসি মুখে 'চমৎকার

আছি, তোফা আছি' ভঙ্গিতে কাজে যাই, দোকান-বাজার করি, নেমন্তন্নবাড়িতে কব্জি ডুবিয়ে হাঘরের মতো গলা পর্যন্ত বোঝাই করি। ক্লান্ত 'লিবিডো' নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি মাঝরাতে।

ইতিহাস পড়াতে গিয়েও সেই অবস্থা।

গত দুটো মহাযুদ্ধের সর্বনাশা ক্ষয়-ক্ষতি আর সংকটের ছবি তুলে ধরতে হয়। যুদ্ধ মানেই দারিদ্র্য, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, বন্দী-শিবির, কালোবাজার, মুনাফার জন্যে লুঠপাট, নিয়ম-নিষেধের কাঁটাতারে ঘেরা এক অসহনীয় অবস্থা। ব্যাখ্যার মাঝখানে হঠাৎ কোনো দুর্বিনীত ছাত্র জিজ্ঞেস করে—'স্যার, যুদ্ধ ছাড়া কি এই ধরনের সংকট হয় না?'

জবাব দিই—'না।'

ছেলেটা মুচকি হেসে বলে—'আমাদের দেশে তো তাহলে এখন বিরাট যুদ্ধ হচ্ছে।'

বুকটা ধক্ ক'রে ওঠে।

'বাজে ব'কো না'—ধমক লাগাই। সঙ্গে সঙ্গে সেই ময়াল সাপটার পেষণ শক্ত হয়। হাড়পাঁজরা মড়মড় করে। ছেলেটা নিজের মনে বলে—'ফল আছে অথচ গাছ নেই, বড়ো মজার ব্যাপার।'

তখন আমার বলতে ইচ্ছে হয়—'তুমি ঠিক, গাছ ছাড়া ফল হয় না। কিন্তু তোমার বাপঠাকুর্দারা ওই ফলটাকেই দেখেছে, গাছ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গাছ চেনার বড়ো বিপদ হে। গাছের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। আমিও ভুলে গেছি। মেনে নাও, বৎস। এটাই নিয়ম।'

এই লজ্জাটা ক্রমশ দ্বিতীয় সত্তার মতো হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীর ফ্যাকাশে মুখ, মেয়ের জীর্ণ জামাকাপড়, সব কিছু আমার ভেতরের এই অনুভূতিকেই ঘন করে তোলে।

মাসের শেষ দিকে এক সন্ধ্যের কাহিনী।

তলানি কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলুম। মেয়ের নতুন ক্লাসের বই কিনতে হবে। স্কুলে দিদিমণিরা চোখ রাঙাচ্ছে রোজ। সন্ধ্যের আবছায়ায় রাস্তায় দাঁড়ালে নিজেকে পরিষ্কার দেখা যায় না। তখন আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই। অনেকটা মানুষের মতো হয়ে উঠি। সৎ, আদর্শবান শিক্ষকের বুজরুকি খসে গিয়ে তখন আমার মধ্যে একটা ধারালো আকাঙ্ক্ষা জাগে। ফুচকা খাই, চেটেপুটে মহিলা দেখি। কচিৎ রঙীন—হুই। ওই ধরনের এক ইচ্ছে সেই সন্ধ্যেতেও পেয়ে বসছিলো। খালি হাতে রাত প্রায় সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরলুম। মা, মেয়ে জেগে বসে আছে আমার জন্যে। কোনো কথা বললো না

তারা। একটা নিষ্কম্প নীরবতা ফেটে পড়বে যেন। নাকে-মুখে কিছু গুঁজে চোরের মতো বিছানায় শুই। সারারাত ঘুমোতে পারি না। বিছানা, বালিশ ভরতি উন্মুখ, তীক্ষ্ণ কাঁটা। যে যন্ত্রণা ভোলার জন্যে ঘোর হয়ে থাকতে চাই, সেটা ফিকে হয়ে যায়। দ্বিগুণ কষ্ট জাগে। গত সাত বছরে আমার চেনাজানা কয়েক শো বন্ধু মারা গেছে। রোগে, দুর্ভিক্ষে নয়। কি জানি কেন! সেই ময়াল সাপটা আমায় রেহাই দেয় না।

ইতিহাস, সমাজ, সংসারের সঙ্গে রোজ দূরত্ব বাড়ে। আর ওই লজ্জার নাগপাশে ধুলো হয় আমার হাড়, মেরুদণ্ড। পুরুষানুক্রমিক পাপ এক জন্মের অনুতাপে কাটে না। চোখের নীচে ধারাবাহিক লজ্জার কালো ঝুল জমে। ইতিহাস, সমাজ, সংসার থেকে নিয়মিত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বুঝি, এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই। আমি নির্ভেজাল ফালতু।

এবং তখন আমি লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাই। মেয়েছেলে, প্রেম, যৌনসমস্যা নিয়ে জগাখিচুড়ি আলাপ ফাঁদি: আলাপের জাবর কাটি।

এক বন্ধু লেখক বলে—'ধুর, শ্লা, কিস্সু হলো না। এ-দেশে নিদেনপক্ষে একটা বড়ো যুদ্ধ-ফুদ্ধ হলে হয়তো আমি হেমিংওয়ে যা রেমার্ক হতে পারতাম।'

মনে মনে বলি—'শালা, তোমার চোদ্দ পুরুষ পালিয়ে বেঁচেছে। তুমি তো কোন হরিদাস পাল! সাত বছরে তোমার কোনো বন্ধু, পরিচিত মুখ মারা পড়েনি? রাস্তায়-ঘাটে কখনো রক্তের দাগ তুমি দেখনি? রতিযুদ্ধে ব্যস্ত থাকলে এস[illegible] দেখা যায় না।'

রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকেও উনিশ শো আট সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো। উত্তাল বঙ্গভূমি। রবীন্দ্রনাথ তখ 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন। নোবে পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর চোখে পড়ে স্বদেশ, বিদেশের যুদ্ধের রূপ। সূ[illegible] সেনের ফাঁসির দিন রবীন্দ্রনাথ [illegible] করছিলেন আমার বড়ো জানতে ই[illegible] করে। অথবা উনিশ শো ত্রিশের গোড়া[illegible] যখন গুলিতে আহত প্রীতিলতা বিষ খে[illegible] আত্মহত্যা করলো, কিংবা ভগত [illegible] দাঁড়িয়ে আছে ফাঁসির দড়ির সামনে, [illegible] সেই দিনগুলোতে রবীন্দ্রনাথের [illegible] কবিতাগুলো আমার ভীষণ পড়ার ই[illegible]

আমি এই সব মহত্ত্বের উত্তরাধিকার[illegible] তাই যুদ্ধের মধ্যে থেকেও যুদ্ধকে দেখ[illegible] পাবো না, এটাই তো স্বাভাবিক। [illegible] আমার লজ্জা কাটে না কেন?

অসময়ের কলিংবেল শুনে নিশ্চয়ই ভাবছ, এখন আবার কে এলো! এটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই অসময়। কারণ নিখিল অফিসে চলে গেছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে—নটা নাগাদ। গোগো এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। ও আসার আগেই তুমি রান্নাবান্নার কাজ সেরে নিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই এখনও কিচেনে ব্যস্ত। গোগো এসে পড়লেই তুমি আর সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পার না, তখন ওকে নিয়ে তোমার লাগতে হয়।

আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি কিচেন থেকেই 'কে—' বলে রেসপন্স করেছ।

কিন্তু, বুলু, আমি তো রাস্তা থেকেই—'বুলু, আমি মারিফ কিংবা রুথ' বলে চেঁচিয়ে তোমাকে আমার পরিচয় জানাতে পারি না। তাছাড়া, দুপুরবেলা রাস্তা থেকে চিৎকার করে একজন মহিলার পক্ষে নিজের পরিচয় জানানটা শোভনও নয় বোধ হয়। তার ওপর আবার তোমাদের এই যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কের মত জায়গায়। এই সময় এখানকার যেকোন বাড়িতে কেউ নক করলে, উলটো দিকের বাড়ির বারান্দা থেকে কেউ না কেউ একবার দেখে নেয়। সেটা আমার একদম ভাল লাগে না।

তুমি অবশ্য আমাকে দেখে অখুশী হবে না। কিন্তু একটু অবাক হবে। কেননা, প্রথমত এই সময়, দ্বিতীয়ত—আমি একা। আমি এতদিন তোমাদের বাড়িতে যখনই এসেছি—সন্ধ্যাবেলা এবং প্রশান্তর সঙ্গে।

একদিন বোধ হয় সানডে মর্নিং-এ এসেছিলাম। কিন্তু প্রশান্ত ছাড়া আজই আমি প্রথম এলাম। ভাব একবার, ওয়াইফ হিসাবে আমি কিরকম ইণ্ডিয়ানাইজড্ হয়েছি। হাজব্যাণ্ড ছাড়া তোমাদের এখানে আসতেও ভাল লাগছিল না।

কিন্তু কি করব, বল। প্রশান্ত ত সেই বীরভূমের মেলায় গান গাইতে গিয়ে এখনও ফিরল না। অথচ ও ছাড়া ওর পিসীমার বাড়িতে আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। শুধু নিজের ঘরটায় বন্দী হয়ে ত আর সারা দিনটা কাটান যায় না। তারপরও স্কুলেও এখন পরীক্ষা চলছে বলে আমার পাঁচদিন ছুটি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো? তুমি দরজা খুলতে আসছ না কেন এখনও। বোধ হয় মাঝপথে কোন রান্না থামিয়ে আসতে পারছ না! ওই ত, নীচের বারান্দার দরজাটা খুলে তুমি আর একবার বললে, কে—। আমি এখন তোমার আসার পায়ের আর শাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি ভেতর থেকে ছোট্ট ভিউফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দেখে নিলে আমাকে?

ভেতর থেকেই কাঁচটায় চোখ লাগিয়ে বুলু দেখতে পেল রুথকে। ওর সেই ঢোলা জিনের বেলবটম আর ওপরে ঢোলা পাঞ্জাবির মত হাফহাতা টেরিকটনের শার্ট। কাঁধে ঝোলান লম্বা, শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। ওর টকটকে ফর্সা রং যেন একটু অ্যানিমিক, একটু কটা আর রুক্ষ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা লালচে চুলগুলো সবসময়ই অবিন্যস্ত। বুলুর ধারণা, রুথ-এর মুখে মেমসায়েব-সুলভ গ্ল্যামারও নেই আবার বাঙালীদের মত লাবণ্যও নেই। বরং একটা রুক্ষতা বয়সের ছাপের সঙ্গে মিশে থাকে। চোখেও যেন একটা উদাসী আর দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে সব সময়।

কিন্তু স্ট্রাকচারটা সত্যিই সুন্দর। অমন ক্ষীণ কটি আর দীর্ঘাঙ্গী আমাদের এখানকার মেয়েরা হয় না। মনটাও খারাপ না, এবং রুথ বুদ্ধিমতী। বাংলা কথাবার্তা কিছু কিছু বুঝতে এবং বলতে পারলেও, যেখানেই ও অসুবিধা বোধ করে—একদম চুপ করে যায়। আর ওর চুপ করে যাওয়াটা দেখেই অন্যেরা বোঝে—রুথ-এর অসুবিধা হচ্ছে। তখন ওকে আবার সেই জায়গাটা ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রুথ পরিস্থিতির সঙ্গে খুব সুন্দর মানিয়ে নিতে পারে।

এই অসময়ে রুথকে একা দেখে বুলু একটু অবাকই হল। ও ভেবেছিল হয়ত পিওন এসেছে কোন রেজিস্টার্ড চিঠি নিয়ে কিংবা মা হয়ত পাঠিয়েছে কাউকে কোন খবরটবর দিয়ে।

গোগো স্কুল থেকে ফিরলে বুলু আগেই বুঝতে পারে—ওর কলিংবেল বাজান, দরজা ধাক্কা দেওয়া এবং চিৎকার করা সব একসঙ্গে শুনে।

কিন্তু রুথ-এর আসাটা ও আন্দাজ করতে পারেনি। খারাপও লাগল না। কেননা, একা একা রুথ-এর সঙ্গে ও একটু ইংরেজী বলতে পারে নিঃসংকোচে। ভাল বলতে পারে না বলে, অন্য সকলের সামনে

বুলু একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে। ত ছাড়া নিখিল অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত বুলুকে ত প্রায় চুপচাপই থাকতে হয়। বেরুতে ত আর পারে না। কাজ করতে করতে কথা বলার গল্প করার একটা লোক পেলে খারাপ লাগে না। রুথ্-ও এ বাড়িতে ভীষণ ফ্রী আর এটা-ওটা নিয়ে খুব গল্পও করতে পারে।

—কি গো, কি ব্যাপার। হঠাৎ একদম দুপুর বেলা একলা চলে এলে যে! এসো, ভেতরে এসো। বুলু দরজাটা খুলে বিস্ময়ের সঙ্গে একরাশ আন্তরিকতার হাসি ছড়িয়ে দিল।

রুথ্ মাথাটা নীচু করে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল—সরি বুলু, আনটাইমলি এলে, মনে হচ্ছে তোমাকে ডিস্টার্ব করলুম।

বুলু ভেতর দিকে যেতে যেতে, ওর হলুদ লাগা হাতটা কাপড়ে মুছে নিল। রুথএর একটা হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে বলল—রুথ্, এটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি আবার সেই বিলিতি ফর্মালিটি করছ। আমার এখানে তোমার আবার টাইমলি, আনটাইমলির কি আছে?

রুথ্ চোখ থেকে ঢাউস কালো চশমাটা খুলে ফেলল। ওটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল—অ্যাকচুয়ালি আমি বাড়িতে বসে বসে বড্ড বোর ফিল করছিলুম। প্রশান্ত ত জানই ওর সেই সব টিম নিয়ে বীরভূম গেছে। বাড়িতে পিসীমা-পিসে-মশায়ের সঙ্গে আমি আর কি গল্প করব। তার-পরেই গলার সুর পালটে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, নিখিল এর মধ্যে আর আসেনি কেন বলত?

—ওর কথা আর বোলো না। কোথায় যায়, না যায় আমি কি আর সব জানি।

—তুমিও ত যেতে পার মাঝে মাঝে গোগোকে নিয়ে।

—আমি সংসার করছি।

বুলু, রান্নাঘরের মধ্যেই একটা ছোট টুল দিল রুথকে বসতে। ওর রান্নাঘরটা বেশ প্রশস্ত আর খুব পরিচ্ছন্ন। সাংসারিক ব্যাপারে বুলু ভীষণ গোছান গৃহিণী আর রান্নাঘরটাই যেন তার প্রমাণ। সব সময়ই রান্নাঘরটা দেখে মনে হবে যেন আগে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এতটুকু বাড়তি জল কিংবা কুটনোর খোসা কিছু পড়ে নেই। ছাদে দেয়ালের কোণায় একটুও ঝুল ঝোলা নেই। দেয়ালের সঙ্গে লাগান আলমারিটার মধ্যে ডাল মশলাপাতির কৌটো-গুলো সুন্দরভাবে পাশাপাশি সাজান। ওগুলোর কোনটার মধ্যে সরষে কলাই জিরে, কিংবা মটর ডাল আছে—সব বুলুর নখ-

দর্পণে। রান্নার জন্য একটা উঁচু কেবিনেট করা আছে—একপাশে গ্যাস সিলিন্ডার, কয়লা ব্যবহার করা বুলু ছেড়েই দিয়েছে। রান্নাঘরের জানালাগুলোতেও খুব মিহি জাল লাগিয়ে নিয়েছে—যাতে পোকামাকড়, মাছি ঢুকতে না পারে কিন্তু আলো বাতাসটা আসে।

রুথ্‌-এর জন্য বুলু একটু কফির জল চাপিয়ে দিল। রান্নাবান্নার জিনিসপত্র এদিক ওদিক খুটখাট করতে করতে বলল—

—আমার কথা আর বোলো না। সংসারের সবদিক দেখতে গিয়েই আমার সময় চলে যায়। তার ওপর কাল থেকে আবার গোগোর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। নিখিলও কয়েক-দিন থেকে কি-সব অফিসের কাজে একটু বেশী ব্যস্ত। আমার আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

কথা বলতে বলতে বুলু কাজও করে যাচ্ছিল। ও ধনেপাতা দিয়ে রান্না করা পাবদা মাছের ঝোলটা কাঁচের প্লেটে তুলতে তুলতে বলল—তার চেয়ে তুমিই তো আমাদের এখানে চলে আসতে পার যে কটা দিন প্রশান্তদা না ফিরছে।

রুথ্‌ ওর কাজকর্ম আর রান্নাঘর খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল—তাহলে তো দারুণ হয়। গ্র্যান্ড! গলার স্বরটা একটু পালটে আবার বলল—তোমাদের এখানে এলে আমার আর যেতেই ইচ্ছে করে না।

বুলু কফির জলটা নামিয়ে ফেলল। রুথ্‌কে জিজ্ঞেস করল—এখন কি খাবে বল, কফির সঙ্গে। দর্পণে কিন্তু আর ফিরতে পারবে না। আমি আজ সারা দুপুর তোমার সঙ্গে ইংরিজী বলা অভ্যাস করবো।

বুলু, তোমার মনটা সত্যি ভীষণ সরল। আমাকে বড্ড বেশী আপন করে নিয়েছ। মনে হচ্ছে না নিলেই ভাল হত।

জিজ্ঞেস করছ কি খাব? কিন্তু কি করে বলব বল তো সত্যি কথাটা! কি করে তোমাকে বলব যে আমার ভয়ানক খিদে। ভীষণ খেতে ইচ্ছে করে যখন তখন। আমি তো আর তোমাকে সোজাসুজি বলতে পারি না যে আমি খাওয়ার জন্যই এই অসময়ে তোমার এখানে এসেছি। প্রশান্ত থাকলে হয়তো একটু সুবিধে হত কিন্তু ইদানীং ওর কথা আমি ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। আমার এত খিদের কথা ওকেও আমি বলতে পারতাম না। আর সেখানে ওর পিসীমার কাছে বারবার খাওয়ার কথা বলাতে অসম্ভব। আর লুকিয়ে যে কিছু খাব, সে সাহস আমার নেই।

কিন্তু তুমি তো দেখছি শুধুমাত্র কয়েকটা সল্টেড বিস্কুট আর ঘরের তৈরী একটা সন্দেশ দিচ্ছ। সন্দেশটা নিখিলের খুব প্রিয় খাবার, তাই না? সত্যি, তোমরা পার বটে। কিন্তু বুলু, তোমাকে তো বলতে

পারছি না—ওই খাবার আমার কাছে কিছুই না। খুবই সামান্য। ঐ তো তোমার আলমারির ভেতরে কয়েকটা ডিম বার করে রেখেছ ফ্রিজ থেকে। বুঝতে পারলে না বোধ হয় তোমাকে ডিমের দাম জিজ্ঞেস করে একটা হিন্ট্ দিলাম তুমি তো একটা ডিমও দিতে পারতে আমাকে ফ্রাই করে।

অবশ্য বুঝবেই বা কি করে? দিয়েছ, এই অসময়ে তাই যথেষ্ট। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে তোমরা কখনও কিছু খেতে চাও না।

কফিটা দাও বুলু, আর কতক্ষণ ওটা চিনি দিয়ে স্টার করবে? যা হয়েছে, দাও। ওটার অনেক ফুড ভ্যালু আছে। কারণ, অনেকটা দুধ ওতে দিয়েছ আমি দেখেছি। থ্যাংক য়্যু।

বুলু, এইমাত্র তুমি যখন নীচু হয়ে জাগে করে জল নিলে, আমি তোমাকে পিছন থেকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। তুমি কি বুঝতে পারো, আজকাল আমি তোমাকে কিরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি! তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, তোমার বুক, পেট এখন কিরকম ফ্ল্যাবি; কোমর আর হিপটা একদম সমান। কোন কার্ভেচার

নেই। তবে, মুখটা তোমার সত্যিই সুইট। বোধ হয় অরও সুইট লাগে তোমার কপালের ওই বড় লাল টিপটার জন্য। খুব পান খাওয়া ধরেছ আজকাল। সন্ধ্যার সময় তে দেখি বেশ সেজেগুজে থাক। নিখিলের ভাল লাগে? কতদিন এরকম একটানা ভাল লাগতে পারে?

নিখিল তো দিব্যি স্লিম আর স্মার্ট। তও কি তোমাকে ওর খুব ভাল লাগে? তোমাদের রাত্তিরে বিছানার সম্পর্কটা কি এখনও হট? তোমার মধ্যে নিখিল কি পায় বল তো? বাইরে থেকে দেখে অবশ্য তোমাদের রিলেশানটা অ্যাপারেন্টলি ভালই মনে হয়। না হওয়ারও কারণ নেই। নিখিল তো ভালই আর্ন করে। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। মাত্র একটি বাচ্চা।

প্রশান্ত যদি আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হত ভাল হত। তাহলে হয়তো আমাদের ভেতরের সত্যিকারের সম্পর্কটা এরকম জলে ভেসে থাকার মত হত না। অবশ্য আমি বুঝতে পারি, ওর টেম্পারামেন্টটাই ওই-রকম। সম্ভবত ইংলন্ডে একটা ফাংসনে দেখে, ওকে আমার সেই কারণেই তখন ভাল লেগেছিল। শুধু তাই বা কেন, ব্যক্তিগত ব্যাপার সব জেনেও, আমিই ওকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েছিলাম। আমরা বড্ড হুইমজিক্যাল।

বুলু আলমারিটা বন্ধ করে দিল। রুথকে হাত ধরে টেনে তুলল।

—এই চলো, ঘরে গিয়ে বসি। রান্নাঘরের কাজ শেষ। আচ্ছা, তুমি কি স্নান করে এসেছ? তোমার গরম জল লাগবে?

রুথ বলল, না, আমি স্নান করব না। বেটার তুমি সেরে নাও। আমি একটু ম্যাগাজিন ওলটাই আর তোমাদের অ্যালবাম দেখি।

একটু চুপ করে থেকেই ও আবার বলল, এই তোমাদের টেলিফোনটা ঠিক আছে?

—দেখ। ও কখন ঠিক থাকে, কখন খারাপ হয় কেউ জানে না।

গোগোর স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। স্নানটা করে নিতে পারলে ভালই হয়। একটা কাজ সারা হয়ে যাবে।

বুলু আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ বার করে নিল। একটা অ্যালবাম রুথকে দিয়ে বলল—এটা দেখ। আমাদের বিয়ের সব ছবি আছে এটাতে।

বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ও আবার ফিরে এলো কি মনে করে। রুথ ওদের বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল। বুলু আবার এসে বলল—এই তোমার যে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, গিয়েছিলে? কি বলল?

রুথ ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলল। উঠে বসে বলল—ও ইয়েস, তোমাকে বলাই হয়নি। বিশেষ কিছু না, তবে বেশ অ্যানিমিক। কয়েকটা রুটিন ইনভেসটিগেশন করতে বলেছেন আর দু একটা আয়রন, ভিটামিনস এইসব মেডিসিন দিয়েছেন।

একটু থেমে আবার বলল—আসলে আমিই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, এত মাথা ধরছিল কয়েকদিন থেকে। তুমি যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো।

হ্যাঁ যাই। —বুলু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

দেখ রুথ, তুমি যতই মেমসায়েব হও, আমাদের বাঙালী মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এই যে তোমার মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, আয়রন, ভিটামিনস রুটিন ইনভেস্টিগেশন করা...সবই কি তোমার একটা বিশেষ অসুস্থতার দিকে নির্দেশ করছে না! ওটা কি আদৌ অসুস্থতা।

তোমার অবশ্য বলার উপায় নেই জানি। কেননা ছোটবেলায় মামস হওয়ার

জন্য উৎপাদন ক্ষমতা নেই আমরা জানি। ডাক্তার টেস্ট করে বলেছিলেন, স্পার্ম হেলদি নয়। আরও জানি, ঐ কারণেই প্রশান্তদার আগের পক্ষের বউ—মীত, ওকে ছেড়ে এখন বিকাশ দত্তকে বিয়ে করে ডানলপে থাকে। তুমি অবশ্য এসব জেনেশুনেই প্রশান্তদাকে বিয়ে করেছিলে। কারণ তুমি কোন সময়েই ছেলেপুলে চাও না। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিসার্চ নিয়েই তোমার কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। তাছাড়া সে বয়সও তোমার নেই যে নতুন এনার্জি নিয়ে আবার ছেলেপুলে মানুষ করবে। আমরা ভেতরের খবরগুলো জানতাম বলেই ভেবেছিলাম—যাক ভালই হল। প্রশান্তদার পাগলাটে, বাউন্ডুলে জীবনে একটা বৈচিত্র্য এলো।

কিন্তু নাটের গুরুটি কে বল ত? তুমি ত আজকাল অনেকের সংগেই মেশো। প্রশান্তদাও সে ব্যাপারে মোটে বদার করে না। আর উনি ত প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমিও এখন আর কম যাও না। তোমার ত স্কুলেরই সেক্রেটারি এবং অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সংগে বেশ দহরম-মহরম। ওর কাছ থেকে আরও জানলাম, তুমি বেশ কয়েকবারই আশিষ দে দীনেশ ছেত্রি, দিলীপ চক্রবর্তী, ত্রিপাঠি, তরুণ ঘোষ এদের সংগেও যথেষ্ট ঘুরেছ।

প্রশান্তদা অবশ্য তাতে কিছু মনে করে না। বরং তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরে এবং স্বল্প রোজগারের জন্য প্রশান্তদার যেটুকু 'অনিবার্য' কমপ্লেকস গ্রো করেছে, তাতে তুমি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্তিতে থাকায়, সেটাই খানিকটা কেটে যায়। আমার ত ধারণা, প্রশান্তদা নিজের অক্ষমতার জন্য, জীবনের একটা অন্যরকম মানে আর ছক তৈরি করে নিয়েছে। কিছুতেই বিশেষ কিছু যায় আসে না।

...এতবার করে কাকে টেলিফোন করছ, রুথ! ভাবছ, আমি শাওয়ারের জল পড়ার আওয়াজে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তাই না? লাইন পেয়েছ বুঝি? তুমি কি সেই নাটের গুরুটির সংগে কথা বলছ নাকি?

কথা অবশ্য বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি বাথরুম থেকে সব কিছু শুনতে পাই। ওই ত শুনতে পাচ্ছি, গোগো এসে পড়েছে। নীচে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কারেন্ট চলে গেছে বলে বেল বাজাতে পারছে না। তুমি রিসিভারটা রেখে দিয়ে দরজা খুলতে গেলে।

রুথ, তুমি কিন্তু বড্ড বোকা। ভাবছ আমার স্নান সারতে অনেক দেরী হবে। মোটেই না। আমি খুব তাড়াতাড়ি করেছি কারণ গোগো আসবে, আমি জানি।

রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেছ। গোগো ত তোমাকে দেখেই গলা জড়িয়ে ধরবে। সুতরাং তোমার ওপরে আসতে একটু দেরী হবে। আমি একবা রিসিভারে তোমার মত গলা করে ছোট্ট ক 'হ্যালো' বলে দেখি না, চেষ্টা করে নাটে গুরুটি কে?

আমাদের বাঙালী মেয়েদের কিরক কুচুটে আর কৌতূহলী মন দেখেছ?

রুথ সিঁড়ি দিয়ে চটি ফটফট কর করতে নীচে নামছে। বুলু ভেজা চুলে গোছার ওপর তোয়ালেটা জড়িয়ে নি পাশে রাখা রিসিভারটা কানে লাগাল। ম মনে ঠিক করে নিয়ে ঠিক রুথের মত গ করে বলল—হ্যাল-ও-ও...।

—রুথ, ডিয়ার! প্লিজ ফর গড সে ডোণ্ট বি সো মাচ ইমোশনাল। ইট'স নাঁ আই টেল য়ু—জাস্ট অ্যা ম্যাটার অব মিনিটস ওনলি টু ইভাকুয়েট ইট। চুপচাপ বাড়িতে থাক। ডো কাম টু প্লেস। আই উইল সি য়ু ইন দ্য ইভি

উত্তেজনা আর ভয়ে মেশান কতকগ তোতলান শব্দ। বুলুর ভীষণ চেনা। চিরকালের হাড়েমজ্জার ভেতরে বিয়ের পর থেকে বিগত এগারো বছর ঐ গলার স্বর ওর শরীরের মনের প্র কণায় ছড়িয়ে আছে। কানের মধ্যে এ বাজছে।

বুলুর পা দুটো ভীষণ কাঁ থর থর করে। ঝাপসা চোখের সামনে দেখতে পেল না। শিথিল হাত থেকে ভারটা ঠক করে পড়ে গেল ক্র্যা পাশে। পায়ের কাঁপুনিতে মনে হল, মেঝে নেই।

সিঁড়িতে গোগোর বুটজুতোর ধ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিসব কথা বলতে ওপরে উঠে আসছে। বুলু শর্ব অনেক কষ্ট করে বাথরুমের দিকে ঘোরাল।

বিশ্ববিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি শুধু বিজ্ঞানী তৈরি?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেই নয়, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রম প্রবর্তনের পর এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশেও অনেকে এখন রীতিমত সোচ্চার। যাঁরা পুরনো আমলের বিজ্ঞানের পঠন পাঠনের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের প্রশ্ন : হচ্ছেটা কি? স্কুলের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ওপর বিজ্ঞান পড়ানর নাম করে বিষয়বস্তুর যেন হিমালয় পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সে কি বোঝা। রসায়ন, জীব-রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, তার সঙ্গে পরিবেশ বিজ্ঞান—দেখলে মনে হয় সব যেন খিচুড়ি কান্ড। উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা গবেষণার ক্ষেত্রে এ সব পড়ে কতখানি লাভবান হবে এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা?

অভিযোগ করেছেন নতুন এই পাঠক্রম পড়ানর দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁরাও। বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেক কিছু অপরিচিততর সংযোজন এবং তাদের সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকায় বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। প্রশ্ন তাঁদেরও : এ ধরনের বিজ্ঞান পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কতটা উপকৃত হতে পারবে? উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণায় কতটা সাহায্য করবে নতুন এই পাঠক্রম?

ঠিক এ ধরনের উৎকণ্ঠা এবং প্রশ্নকে সামনে রেখেই ২১ এবং ২২ মার্চ কলকাতার বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র হয়ে গেল। উদ্যোক্তা কলকাতার মার্কিন তথ্য দপ্তর এবং বিড়লা মিউজিয়াম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দুজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞান-শিক্ষাবিদ। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ শ্রীমতী মারজোরি গার্ডনার এবং স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক ডঃ পল দাহার্ট হার্ড। আর ছিলেন আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান প্রশাসক এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বর্তমান লেখকও তাঁদের মধ্যে একজন।

মার্কিন দেশের স্কুলগুলিতে পড়ান হচ্ছে এমন কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক সঙ্গে করে এনেছিলেন ডঃ গার্ডনার। দু রকমের বই। টেকস্ট বুক বা প্রচলিত অর্থে যাদের

বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে মার্কিন দেশের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করছেন ডঃ মারজোরি গার্ডনার। বাঁ পাশে তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয়ের ওপর নিজস্ব মন্তব্যের জন্যে নোট করছেন প্রথম অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক বলি তাই। আয়তনে যথেষ্ট বড়। ৫০০ থেকে ৭০০ পাতার। আর এক ধরনের বই যথেষ্ট পাতলা। ৫০ পাতার মত। বইগুলি পড়ান হয় ওদেশের নিম্ন মাধ্যমিক ছেলেমেয়েদের। সবাইকে।

কয়েকটি চটি বই-এর ওপর নজর পড়তেই রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি। বইগুলির নামকরণ করা হয়েছে অদ্ভুত-ভাবে। যেমন, 'কিচেন ফিজিকস', 'হার্ট আটাক', 'হার্ট অভ এনভায়রনমেন্ট', 'হার্ট অভ ম্যাটার', ইত্যাদি।

'কিচেন ফিজিকস'-এর পাতা ওলটাতে শুরু করলাম। ভূমিকায় লেখা, বইটি ৭ থেকে ৯ বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে। প্রথম পাতায় একটি রান্নাঘরের ছবি। নানা রকম খাবার দাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটি পাত্রের ওপর রয়েছে কয়েকটি ডিম। ছবির নিচে প্রশ্ন : ডিমগুলির আকৃতি কি রকম? প্রশ্নের নিচে কয়েকটি উত্তরও রয়েছে : গোল? চ্যাপ্টা? উপবৃত্তাকার? তার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছে : কোনটি সঠিক উত্তর? এইভাবে প্রতিটি পাতায় নানা রকম ছবি। ডিমকে সিদ্ধ করা হচ্ছে। নিচে প্রশ্ন : জলের তাপমাত্রা কত? ১৫০ ডিগ্রি? ১০০ ডিগ্রি? ৫০ ডিগ্রি? শূন্য ডিগ্রি? ইত্যাদি। সেই সঙ্গে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা।

পরিস্কার বোঝা যায়, এক একটি ছবি দেখে, ছবির নিচেকার প্রশ্ন এবং তাদের সঠিক উত্তর খুঁজতে গিয়ে ছাত্ররা কৌতূহলী হবে এবং একে একে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে উপবৃত্ত কাকে বলে, তাপযন্ত্র কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, জল কত ডিগ্রি তাপাঙ্কে ফোটে এমন অনেক তথ্য। অর্থাৎ সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান।

এবার খুললাম 'হার্ট অভ এনভায়রনমেন্ট'। কিভাবে পরিবেশ দূষিত হয় ৯ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েরা যাতে বুঝতে পারে বইটি সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। এখানেও এক-এক পাতায় ছবি। ছবির নিচে প্রশ্নোত্তর। যেমন প্রথমেই একটি ছবিতে দেখান হয়েছে একটি দেশলাই কাঠি। তার নিচে প্রশ্ন : কাঠির ডগায় কি আছে? নিচে এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর। আর একটি ছবিতে দেখান হয়েছে কাঠিটি জ্বলছে। নিচে প্রশ্ন : জ্বলার ফলে কি কি শক্তি পাওয়া গেল? আর কি কি উপাদান? এরপর ছবির সাহায্যে বোঝান হয়েছে : বাতাসের অকসিজেন কাঠিটি জ্বলতে সাহায্য করছে। জ্বলার পর তৈরি হচ্ছে নানারকম গ্যাসীয় এবং কঠিন উপাদান। গ্যাসীয় উপাদান বাতাসে মিশছে। হাওয়া দূষিত করছে। এই ভাবে বোঝান হয়েছে কাঠি জ্বলার সময় পদার্থবিদ্যা এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য। ছাত্ররা শিখছে, পরিবেশ দূষণ বুঝতে হলে পদার্থ-বিদ্যা এবং রসায়ন উভয়েরই জ্ঞান দরকার।

পর পর ছবির সাহায্যে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঠিক এই ভাবেই বোঝান হয়েছে, কি কি কারণে হৃদরোগ হয়। এ

ব্যাপারে রক্তের ভূমিকা কী? হৃদরোগে আক্রান্ত হলে কি কি উপসর্গ দেখা দেয়, এমন সব তথ্য।

ডঃ গর্ডনার বললেন, এ সব চটি বই, ইংরেজিতে যাদের বলা হয় মড্যুলার, তৈরি করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকরাই। কতকটা 'করে দেখ'র পদ্ধতিতে লেখা। এক-একটি বই হাতে কলমে অনুশীলন করার পর ছেলে-মেয়েরা খুব কম সময়ে একই সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান প্রভৃতির নানা রকম দিক সম্পর্কে বুঝতে শেখে। বুঝতে শেখে, কোন বিজ্ঞানই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন নয়। পরস্পরের সঙ্গে যোগ রয়েছে। একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে এই সব বই যথেষ্ট সাহায্য করে। কম সময়ে।

*

বলতে বাধা নেই, বর্তমান শতাব্দীর চারের দশকেও অনেকেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন। পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এ দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি কত রকম বিষয়েরই সঙ্গে। যেমন, উদ্ভিদ রসায়ন। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি বা পারমাণবিক রসায়ন, বাইও-কেমিস্ট্রি বা জীব-রসায়ন, স্পেস বাইওলজি বা মহাকাশ জীববিদ্যা, জিও-কেমিস্ট্রি বা ভূ-রসায়ন। প্রভৃতি।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। উদ্ভিদের কথাই ধরা যাক। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বলতে এক সময়ে বোঝাত গাছের শ্রেণীবিভাগ, তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শারীরবৃত্তিয় গঠন, প্রভৃতি। অবশেষে আবিষ্কৃত হল, গাছের পাতায় ক্লোরোফিল নামে যে সবুজ কণা থাকে, তার সাহায্যে এবং সূর্যের আলোর স্পর্শে গাছ বাতাসে মিশে থাকা কার্বন ডাই-অকসাইডকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করে শর্করা জাতীয় পদার্থ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই এটা হয়। অতএব গাছ প্রসঙ্গে জানতে গিয়ে এসে গেল রসায়ন শাস্ত্রের কথা। এই রাসায়নিক ব্যাপারটি ঘটে আবার সূর্যের আলোর সংস্পর্শে। অতএব এবার এল পদার্থবিজ্ঞান। সূর্যের বর্ণালীর ঠিক কোন অংশ এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি ঘটায় সে খবর তো একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানই দিতে পারে।

ক্রমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পুষ্টি, এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল মানুষ। মাটিতে বীজ পুঁতলে গাছের চারা জন্মায়। চারা জন্মাতে গেলে মাটিতে জল দিতে হয়। কিভাবে এবং কতটা জল দিলে অঙ্কুর বের হওয়ার কাজটা সহজতর হবে? এল জল-বিজ্ঞান। দেখা গেল, গাছের পুষ্টি নির্ভর করে মাটির উপাদানের ওপর। জন্ম নিল আর এক ধরনের বিজ্ঞান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় সয়েল কেমিস্ট্রি বা মৃত্তিকা-রসায়ন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কিত রয়েছে। আর এই বোধ যত স্পষ্টতর হচ্ছে, কৃষিবিজ্ঞান, বন-বিজ্ঞান প্রভৃতির ওপর নানারকম গবেষণা চালিয়ে মানুষ খাদ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সমর্থ হচ্ছে। এ কথা বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞান যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ বা অন্বেষণ নয়, এ উপলব্ধি না জাগাতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝে ওঠা শক্ত হয়। এ কথা ভেবেই শিক্ষাবিজ্ঞানীরা এখন বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানশিক্ষা পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন। এমন ধরনের শিক্ষা যা প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞান সম্পর্কে

সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। কৌতূহলী করে তুলতে পারে।

এ-ধরনের প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য দুটি। প্রথমত নিজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কাজে লাগান। যেমন, পুষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ খাবার দরকার। কেন দরকার তা জানা থাকলে প্রতিটি মানুষ এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। যেমন, প্রচুর সার এবং জল দিলেও গাছের বৃদ্ধি হবে না, যদি না গাছের ওপর সূর্যের আলো গিয়ে পড়ে। উদ্ভিদের জীবনে সূর্যের আলোর এই যে ভূমিকা তার সঠিক তাৎপর্যটি জানা থাকলে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হয়। বিদ্যুৎ শক্তি কি, কি ভাবে ব্যবহার করলে এই শক্তি বিপদের কারণ হয় না, এই জ্ঞানটুকু শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, কলা এবং বাণিজ্যের ছাত্রেরও নিজের নিরাপত্তার জন্যেও জেনে রাখা উচিৎ। আর এর জন্যেই দরকার প্রতিটি মানুষের জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলে আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানও শক্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এমন এমন ক্ষেত্রে, যেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন অথবা জীববিদ্যাকে পৃথক করা শক্ত হয়, ভূতত্ত্ব বুঝে নিতে গেলে দরকার রসায়নের জ্ঞান, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্ত্রোপচার করতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রকৌশলগত ধারণা। যেমন ধরুন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনেক ক্ষেত্রে জীবদেহে রাসায়নিক পরিবর্তন আনে। আবার ওই পরিবর্তন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটায়। এ ধরনের ঘটনা বুঝতে গেলে দরকার বিকিরণ কাকে বলে সে সম্পর্কে জ্ঞান। এটা পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপার। জীবদেহে কি ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন হল এর জন্যে জানা দরকার রসায়ন। শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন বুঝতে গেলে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। বোঝাই যাচ্ছে একটি বিষয়ের সঙ্গে আরও কত বিষয় জড়িত। এসব পরিষ্কার বুঝে ওঠার জন্যে এবং বোঝার পর গবেষণার কোন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা যাতে জন্মায় তার জন্যেও আজ একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কের কথা মনে রেখে বিজ্ঞান শিক্ষা পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

*

'না। বিজ্ঞান পড়ে সবাই যে বিজ্ঞানী হবেন, এমন কোন কথা নয়। মার্কিন দেশে বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্যে এখন বিজ্ঞান পড়ে শতকরা ১৫ থেকে ১৮ জন। শতকরা ৮২ থেকে ৮৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী কি তাহলে বিজ্ঞান পড়বে না?' বললেন ডঃ গার্ডনার।

ডঃ গার্ডনার বললেন, বিজ্ঞানের যুগে বাস করে এ ধরনের চিন্তা পৃথিবীর কেউই ভাবতে পারেন না। আমাদের লক্ষ্য, প্রতিটি মানুষ তার পছন্দ এবং প্রবণতা অনুযায়ী বিজ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন হোক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টি জীবনে কতটা প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন নিজের স্বার্থেই সে সব কথা জানা দরকার।

দরকার বৈজ্ঞানিক সচেতনতা। ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে, 'সায়ান্টিফিক লিটারেসি'। বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতির ওপর ধারণা।

আর এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে আগে জানা দরকার শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁরা নিজেরা সে ব্যাপারে কতটা প্রস্তুত।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাইক্লোট্রন-বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞান শিক্ষাবিদ ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, নতুন এই পাঠক্রম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। আজকের যুগে বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান এবং বিস্তৃত জ্ঞান না থাকলে কারোরই চলে না। সবাই যে বিজ্ঞানী হবেন, এমন নয়। কেউ হয়তো বাণিজ্য পড়লেন, কেউ কলা। হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর দায়িত্ব গিয়ে পড়ল কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা দপ্তর ইত্যাদির ওপর, প্রশাসক হিসেবে। কোন বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিজস্ব মতামত দেবার দরকার হতে পারে তাঁর। তিনি তখন বলবেন, 'আমি বিজ্ঞান জানি না, কি বলব?' —এটা চলতে পারে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের প্রধান এবং বিজ্ঞানের ডীন ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব এখন বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান প্রতিটি মানুষেরই থাকা দরকার। অন্তত সেই সব বিষয়ের ওপর, যেমন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুষ্টি, পরিবেশ বিজ্ঞান, শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, যাদের সঙ্গে সর্বসাধারণের নিজস্ব স্বার্থ যথেষ্ট জড়িত।

ডঃ গার্ডনার বললেন, মার্কিন বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু বারো ক্লাসই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারও প্রথম দুই বছর পর্যন্ত যে কোন ছাত্রছাত্রী তার সাধারণ জ্ঞান বাড়ানোর মত নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে। 'স্পেশালাইজেশনের' প্রশ্ন ওঠে তার পর। বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার উপযুক্ত

বিষয় তারপর সে বেছে নিতে পারে।

※

আলোচনাচক্রের মূল বক্তব্য, এক, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান বা প্রকৌশল এ ধরনের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ছাত্রদের ভাগ করা ঠিক হবে না। দুই, যতটা সম্ভব বিস্তৃত এবং পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে নিয়ে যাতে বিজ্ঞানের ওপর পড়াশুনো চালানো যায়, সেটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। তিন, ছাত্রদের যে কোন বিষয় পড়ান অথবা প্রশিক্ষণ দেবার আগে শিক্ষকরা যাতে করে ওই কাজে উপযুক্ত হতে পারেন দরকার তার ব্যবস্থা। চার, পঠন পাঠন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়মিত অভিমত জানা দরকার। পাঁচ, দরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা। দরকার মাঝে মাঝে শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা। যা বিজ্ঞান শিক্ষা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে, তা জানতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। এতে করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়বস্তুর ওপর ধারণা প্রসারিত করা সহজ হয়।

সমরজিৎ কর

॥ ৪৫ ॥

আমার কথা শুনে পাপ বিশোয়াস যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কী বললেন? জেঠমলানিরা আপনাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে?"

পপি বিশোয়াস অবশ্যই আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন, আমি জেঠমালানির সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করে তাঁর সঙ্গে রসিকতায় নেমেছি।

আমি পপি বিশোয়াসের কাছে সব কথা ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী নই। কে এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছিলেন, জেঠমালানিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী, এসব খবর এই মহিলাকে জানাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না।

আমি এবার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, "মিসেস বিশোয়াস, আপনাকে তো বলেইছি, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে আমাদের ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

আমি ভেবেছিলাম পপি বিশোয়াস এবার খুব রেগে উঠবেন, আমাকে গরম-গরম কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। পপি বিশোয়াস আদুরে গলায় বললেন, "ঘরখানা খুব দরকার ছিল আমার। ওঁরা কী-সব গোলমাল বাঁধিয়েছেন বুঝতে পারছি না। জেঠমালানিদের ওপর খুব রেগে গেলাম আমি। অনেক দিন এই-ভাবে হেনস্তা হই নি।"

পপি বিশোয়াসের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলাম। পপি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "অন্য সময় হলে মোটেই রাগ করতাম না। কিন্তু আজ বেশ বিপদে পড়া গেল। আমার পার্টি এই কন্ডিশনে আসতে রাজী হয়েছেন যে ওঁকে আমার ওখানে বা আমার এয়ার-কন্ডিশন বাটিকে তোলা হবে না।"

পপি বিশোয়াস বোধ হয় শেষ আশা ত্যাগ করেন নি। তাই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন কীরকম লোক রে, বাবা! কলকাতা শহরে এতো সব হোটেল রয়েছে কেন? ভাত ছড়ালে বিছানার অভাব তো হয় না এই শহরে।"

আমি কোনো মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি এই ধরনের কথাবার্তায় এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে আসছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

কিন্তু পপি বিশোয়াস এই মুহূর্তে লজ্জা-শরম নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি বললেন, "হোটেলে একদিকে যেমন ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঢোকা যায়, অন্যদিকে তেমনি হাজার হাঙ্গামা।"

মিসেস বিশোয়াসের কথাবার্তার ভঙ্গীই আলাদা। তিনি সগর্বে আমাকে শুনিয়ে দিলেন, "হোটেলের বিজনেসে আমি নেই, মিস্টার শংকর। হাজার হোক আমার একটা পোজিসন আছে—আমি তো আর বাজারে নামি নি।"

দ্রুত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "লাস্ট মোমেণ্টে যখন বিপদে পড়েছি, তখন না-হয় মান সম্মান নিজের ব্যাগে পুরে কোনো হোটেলেই যেতাম। কিন্তু আমার গেস্ট বোধ হয় রাজী হবেন না। হোটেলে ওই যে নাম লেখালেখির ব্যাপার আছে না। আর আমি নিজে মশাই, ওই মিথ্যে নামটাম ভাঁড়িয়ে হোটেলের খাতায় সই-পত্তর রাখতে চাই না।"

বেনামে ঘর নেওয়া তো হোটেলে প্রায়ই হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারে মিসেস বিশোয়াসের মতো অভিজ্ঞ মহিলার কী আপত্তি থাকতে পারে বুঝছি না।

মিসেস বিশোয়াস এবার সে-রহস্যও ব্যাখ্যা করলেন। "আপনি হয়তো বলবেন, যে-ব্যাপার আকচার হচ্ছে, তা করতে আমার লজ্জা কী?"

একটু থামলেন পপি। তারপর বললেন, লজ্জা নয়, মিস্টার শংকর। হাঙ্গামা। আমি নাক মলে দিব্যি করেছি, স্বনামে বেনামে হোটেলের খাতায় কখনও সই করবো না! কিছুদিন আগে মিস্টার রাজনের স্পেশাল রিকোয়েস্টে নিজের নাম পাল্টে হোটেলে ঘর নিলাম—তারপর কী ফ্যাসাদ। সায়েবটা যে ফরেন এক্সচেঞ্জ টেক্সচেঞ্জে গোলমাল করেছে আমি জানবো কী করে? খোঁজ করতে করতে পুলিশ একদিন ক্যাক করে

এসে আমাকে ধরলো। বললো, তুমিও নাম ভাঁড়িয়ে ওই সায়েবকে মদত দিচ্ছো।"

"বুঝুন, মিস্টার শংকর! আমি নিজের কাজকর্ম সামলাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি--আমি কোন দুঃখে জাল-জোচ্চুরির ব্যবসায় ঢুকতে যাবো? হোটেলের ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ মশাই কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঠিক আমার কাছে হাজির হয়েছে। হোটেলের কে বলে দিয়েছে ভগবান জানেন। লোকটা এসে সোজা বললো, তুমি অমুক দিন অমুক ঘরে নাম ভাঁড়িয়ে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ছিলে এবং সেখানে অমুককে লুকিয়ে রেখেছিলে। হোটেলের খাতায় তোমার জাল সইও রয়েছে।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "আম তো অবাক। দিনক্ষণ সব মিলে গেল। শুধু আমার গেস্টের নামটা ছাড়া। তাও হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। সায়েবটাকে কালো গাড়িতে সঙ্গে করে এনেছিল পুলিস। আমি ওই কালো গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি দিয়েই চিনতে পেরেছি।—আমারই গেস্ট দু'হাতে লোহার বালা পরে বসে আছেন।"

"তারপর?" আমি বেশ চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করি। পাঁপ বিশোয়াসরা যে এই ধরনের বিপদে পড়ে যান তা আমার ধারণা ছিল না।

পাঁপ বিশোয়াস বললেন, "ভাগ্যে ওই অফিসারের সংগে আমার অনেকদিনের জানা-শোনা। আগে দু-একটা কেসে সিক্রেটলি ওঁকে হেল্পও করেছিলাম। এবারেও আমার খুব রাগ হলো সায়েবটার ওপর। ওখানেই চিৎকার করে বললাম, 'লজ্জা করে না? নিজের দেশ ছেড়ে আমার দেশে এসে চুরি জোচ্চুরি করছো।' অফিসারকে বললাম, 'আমার কোনো দোষ নেই, ভাই। আমি সরল বিশ্বাসে অতিথি সেবা করেছি, চোর জোচ্চোর কথাটা তো কারও পাশপোর্টে লেখা থাকে না।' পুলিস আমার কিছু করতে পারতো না কিন্তু হোটেলে মিথ্যে নাম লিখিয়ে ওদের জালে জড়িয়েছি।"

"তারপর?" আমি নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না।

পাঁপ বিশোয়াস বললেন, "তারপর আর কী! অফিসারকে বললাম, আমাকে রক্ষে করুন ভাই, আমি যা জানি সব বলে দিচ্ছি। আমি নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে লোকটাকে যিনি ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলেন সেই মিস্টার রাজনের নাম পর্যন্ত বলে দিলাম। রাজনের খবর পেয়ে অফিসার খুব খুশী। আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বোধ হয় কোর্টে পুলিশের হয়ে সাক্ষী দিতে হবে।"

"সাক্ষী দেওয়া আর এমন কী শক্ত?" আমি নিজের আদালতী অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করলাম।

কিন্তু পাঁপ বিশোয়াস আমার কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। "কী বলছেন, মিস্টার শংকর! পুলিশের সাক্ষী দেওয়ার থেকে খারাপ কাজ পৃথিবীতে নেই। সময়ের কোনো হিসেব-পত্তর থাকে না, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজারের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তীর্থকাকের মতো বসে থাক। এক এক সময় গা ঘুলিয়ে ওঠে। সময়ও নষ্ট, সম্মানও নষ্ট। লোকে আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকায়, দুষ্টু উকিলগুলো মক্কেলের উস্কানিতে এমন সব কোশ্চেন করে যে মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হয়।

"কিন্তু কোনো উপায় নেই", মুখ বেঁকালেন পাঁপ বিশোয়াস। "এই কেসে আমাকে পুলিশের সাক্ষী দিতেই হবে। যদিও আমরা যে-লাইনে আছি সেখানে গেস্টকে কোনো রকমেই বিপদে না-ফেলবার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। নিজের ক্ষতি হোক, কিন্তু খরিদ্দারের যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে খদ্দের তো নিজের ক্ষতি করে বসে আছেন—সুতরাং শুধু শুধু আর নিজের ক্ষতি করি কেন?"

পাঁপ বিশোয়াস জানালেন, "পুলিশ অফিসারকে কথা দিয়েছি এবং নিজেও নাক কান মলা খেয়েছি, আর কখনও বেনামে হোটেলের ঘর বুক করে নিজের বিপদ ডেকে আনবো না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন পাঁপ বিশোয়াস। ভদ্রমহিলাকে আগে যতটা জাঁদরেল মনে হয়েছিল, এখন ততটা মনে হচ্ছে না। ওঁর ওপর আমার বিরক্তিও ক্রমশ কমে আসছে। এতো বাহার ও উজ্জ্বলতার মধ্যেও পাঁপ বিশোয়াসের কথাবার্তায় কোথায় যেন অসহায়তার সুর বাজছে।

পাঁপ বিশোয়াস সংসারের অনেক ব্যাপারে এতো অভিজ্ঞ হয়েও কেন যে এই-ভাবে আমার সংগে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন জানি না।

তিনি বললেন, "এখন বুঝছেন তো কেন আমি হোটেলের ধারে কাছে ঘেঁষতে চাই না। মাথায় থাকুন আমার লম্বা-চওড়া প্র্যাকটিস—আমি নিজের ফ্ল্যাটে এবং আমার বাড়িতে যতটুকু পারি কাজকর্ম চালিয়ে যেতে চাই। শুধু আজকে আমি পুরনো বন্ধুত্ব রাখতে গিয়ে ফেঁসে গেলুম—অথচ আপনি সব জেনেশুনেও আমাকে একটুও সাহায্য করছেন না।"

আমি করজোড়ে পাঁপ বিশোয়াসের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, "আমার সামান্য চাকরি—এখনও পোক্ত পাকা হয়নি। মালিক-দের বিনা অনুমতিতে আমি কীভাবে ঘর ছেড়ে দিই আপনাকে?"

পাঁপ বিশোয়াস আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী বলছেন, মিস্টার শংকর? বাড়ির মালিকের সংগে বাড়ির কী সম্পর্ক?"

এবার আমার অবাক হবার পালা। "আপনি কি বলছেন, মিসেস বিশোয়াস? মালিকই তো সব!"

পাঁপ বিশোয়াস পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কতদিন এখানে চাকরি করছেন?"

"এই মাস কয়েক।" আমি উত্তর দিলাম।

(এ দি জব ১৬৬)

গালে হাত দিলেন পপি বিশোয়াস। "ওমা! ক-মাস কাজ করেও আপনি এখনও বলছেন, বাড়ি হচ্ছে মালিকের।"

মাথা নাড়লেন পপি বিশোয়াস। "কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না! কয়েকখানা বাড়ির সঙ্গে আমার কাজ-কারবার রয়েছে। এখানে তবু আপনি একজন টেম্পোরারি ম্যানেজার রয়েছেন। জেনে রাখুন বড়লোকেরা কখনও ভাড়াটে বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায় না। কলকাতায় বাড়ি মাত্রই দারোয়ানের। আমি যে-বাড়িতে থাকি, সেখানে আমাদের বুটিক—সর্বত্র দারোয়ানই সর্বেসর্বা। খোদ ম্যানেজার হিসেবে আপনি যখন রয়েছেন, তখন সামান্য একটা ব্যাপারে মালিকের কথা তুললে কে বিশ্বাস করবে বলুন?"

পপি বিশোয়াস আমাকে নরম করে তুলছেন। ক্রমশ ওঁর সম্পর্কে মনের মধ্যে একটু মায়াও জন্মাচ্ছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে পপি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন কিনা কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আমার ওপর রাগ দেখালেন না। অনেক সময় নষ্ট করেও তিনি যে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারেন নি, তার জন্যে কোনো অভিযোগও নেই তাঁর। বরং আরও সহজ হয়ে যাচ্ছেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

নিজের মনেই বললেন, "কী ফ্যাসাদে পড়লুম বলুন তো। আমার অনেকদিনের জানা-শোনা মিস্টার আচারিয়া নিজে ফোনে রিকোয়েস্ট করলেন, তারই স্পেশাল নমিনি। নিজে এসে তিনি গেস্টকে ইনট্রোডিউস করে দিয়ে যাবেন। তবে আমার ওখানে নয়। অন্য কোথাও। আমিই তখন বললাম, 'আধ ঘণ্টা পরে ফোন করুন—আমি দেখি কোথায় ব্যবস্থা করা যায়।' আমি তখন মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে ফোনে পাকা কথা বলে নিলাম—উনি বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না।' আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে মিস্টার আচারিয়াকে পাকা কথা দিলাম। বললাম, সোজা এই থ্যাকারে ম্যানসনে চলে আসতে।"

পপি বিশোয়াস আমার দিকে করুণভাবে তাকালেন। "প্লিজ, মিস্টার শংকর, আপনি হাইকোর্টের জজদের মতো গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। বাঙালী মেয়েদের একটু সাহায্য করুন। আমার বিপদটা বুঝুন—কথা যখন দিয়েছি তখন কথার খেলাপ করতে চাই না। রাত্রিবেলায় কোথায় অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়বো। আপনি ঘরখানা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দিন।"

অসহায় বাঙালী মেয়েদের কথা তুলে পপি বিশোয়াস আমার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করলেন।

পপি বললেন, "আপনার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ফ্ল্যাট যদি খালি হয়েও থাকে, তাহলে আজ রাত্রেই তো ভাড়া দিচ্ছেন না আপনি। আর আজ তো মাসের শেষ তারিখ—আপনি নিশ্চয় আজকের ভাড়া আদায় না-করে ভাড়াটেকে মুক্তি দেন নি।"

পপি বিশোয়াসের মুখটা এবার করুণ হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওঁকে আমি কিছুতেই অনাত্মীয়া বলে ভাবতে পারছি না। এই বিরাট নগরীর হাজার হাজার ফ্ল্যাটে যে-সব অনাচার আজ রাত্রে আরম্ভ হবে, তা বন্ধ করবার কোনো শক্তিই যখন আমার নেই, তখন পপি বিশোয়াসকে বিব্রত করেই বা আমার কী লাভ?

রাজী হতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, মিসেস বিশোয়াস। আপনাকে সাহায্য করবার ইচ্ছে আমার। কিন্তু, আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন—যদি পারমিশনটা করিয়ে আনতে পারি।"

সানন্দে পপি বিশোয়াস আমাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। "আপনার টপাটপ উন্নতি হোক। দেখবেন, আপনার খুব ভাল হবে। একদিন আপনি ভরত সিং-এর মতো হবেন।"

"তিনি আবার কে?"

"ওমা! আপনি ভরত সিং-কে জানেন না। ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজার ছিলেন। এখন বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেক্টর হয়েছেন। নাগরচাঁদ সুরজমালের নাম শুনেছেন তো। ওঁদেরই তো বরুণ প্রপার্টিজ।"

ভরত সিং-এর অপরিচিত মুখটা আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠছে। ফুলচন্দন পড়ুক পপি বিশোয়াসের মুখে—আমি যেন সত্যিই একদিন ভরত সিং-এর মতো কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে পপি বিশোয়াসকে সামান্য একটু সাহায্য করা ছাড়া আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই।

[illegible] কিন্তু ওঁকে সাবধান করে দেওয়া [illegible] বললাম, [illegible] অনেকেই খবর পাবেন। তবে [illegible] আপনাকে জোর করে বলতে পারছি না। যদিও আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনিও ইতিমধ্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন।"

পীপ বিশোয়াসকে বিদায় করে আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। পীপ হয়তো ভাবলেন, আমি কায়দা করে মালিকদের বুড়ী ছুঁয়ে রাখবার জন্যেই সময়টা চেয়ে নিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে মালিকদের কথা আমি ভাবতেও পারছি না। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট যে খালি হয়েছে, সে খবরও তাঁরা এখনও জানেন না। এ-সব ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহ আছে বলেও মনে হয় না।

এই অবস্থায় কী কর্তব্য? কাকে পরামর্শ করা যায়? অগতির গতি একটি নামই আবার মনে পড়লো এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাই-কোর্ট পাড়ায় ছুটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গণপতিবাবু এখনও ওপাড়ায় রয়েছেন নিশ্চয়। অ্যাটর্নি আপিসের আসল কাজকর্ম তো হাইকোর্ট বন্ধ হবার পরে বিকেলেই শুরু হয়।

একবার মনে হলো সামান্য ব্যাপারে আমি বেশী মাথা ঘামাচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পীপ বিশোয়াসকে চাবি দেওয়ার জন্যে পৃথিবীর কাউকে পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমার। হাজার হোক থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার আমি। যে-কাজ এ-বাড়ির দারোয়ানরা দিনের পর দিন নিঃশব্দে করে এসেছে, তার জন্যে আমি এই মুহূর্তে গণপতিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে চলেছি কেন?

কিন্তু মনের মধ্যে একটা অতি সাবধানী মন এই মুহূর্তে জেগে বসে রয়েছে। সে বললো, "একবার না-হয় গণপতিবাবুর সঙ্গে কথা বললে। [illegible] তো তাঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি। [illegible]— নিজস্ব [illegible] দেখা-সাক্ষাৎ করতে বাধা কী?"

চৌরঙ্গীর মোড় থেকে ডালহৌসির ট্রামে উঠে বসেছি। অফিস পাড়ায় ভিড় এখনও শেষ হয় নি—কিন্তু আমি উল্টো মুখে চলেছি, যেদিকের ট্রামে একদম ভিড় নেই।

দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে এই মনোহারিণী কলকাতাকে কয়েক মাস দেখিনি। অনেক-দিন পরে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে এসপ্ল্যানেডে বেরিয়ে মনটা নানা বিচিত্র চিন্তায় ভরে উঠলো। ঘরমুখো অফিসের লোকদের দিকে তাকিয়ে আজ সেই পুরোনো দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি না—যতই সামান্য হোক, আমারও এখন একটা চাকরি আছে। আমারও একটা আশ্রয় আছে। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে কেউ কেউ আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষার মিনতি করছে।

রাজভবনের উত্তর দিকে ট্রাম থেকে নেমে আমি দ্রুতবেগে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। গভরমেণ্ট প্লেসের অফিস-পাড়া এখনও জনশূন্য হয় নি। চাকুরে লোকদের ভিড়ে আজ আমি অতি সহজে মিশে যেতে পারলুম। মনে মনে বললাম, আমি তোমাদেরই লোক—যতই ছোট হোক, আজ আমারও একটা চাকরি আছে। সেই চাকরিসূত্রেই শলা-পরামর্শের জন্যে আমি এখন অ্যাটর্নি-পাড়ায় চলেছি।

বৃদ্ধ ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের ম্রিয়মান আলোগুলো অনেক আগেই জ্বলে উঠেছে। দিশী আপিসের সদা-অবহেলিত স্বল্প-বেতনের বয়োবৃদ্ধ কর্মচারির মতো ল্যাম্প-পোস্টগুলোর যেন কিছুতেই কাজে মন বসছে না। অথচ চাকরিতে ইস্তফা দেবারও উপায় নেই।

সিন্‌হা অ্যাণ্ড লায়ন, অ্যাটর্নি আপিসে এখনও পুরোদস্তুর কাজ চলছে। ভিতরের ঘরে অ্যাটর্নি শিখীন্দ্র সিন্‌হা কোনো ক্লায়েণ্টের সঙ্গে কনসাল্টেশন চালাচ্ছেন। তাঁর ভারি ও চড়া গলা আপিসের দরজা পেরোবার আগেই কানে ভেসে আসছে।

গণপতিবাবু চোখে চশমা লাগিয়ে কী একটা দলিল মেলাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই গণপতিবাবু সানন্দে বললেন, "ঠিক টাইমে এসে গিয়েছো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তুমি না এলে হয়তো আমি নিজেই ছুটতাম।"

আমার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন গণপতিবাবু। তারপর যথাসম্ভব গলা নামিয়ে ফিস-ফিস করে বললেন, "এ-সব কী শুনেছি?" [ক্রমশ]

শিল্পকলা প্রসঙ্গ

[illegible]

বিদেশী দূতাবাস এবং প্রচার দপ্তরের কল্যাণে এমন ধারণা হতে পারে সহজে যে আমাদের দেশে শুধু ছাপা ছবি (Graphics) আঁকা হচ্ছে। আসলে ছাপা ছবি তুলনায় শস্তা বলে বাঁধা খরচ কম পড়ে। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে নামকরা ভাস্কর বা চিত্রকরের ছাপা ছবি প্রদর্শিত হয় অনেকে এটা খেয়াল করেন না, যেমন ভাসারালি এবং তাঁর বন্ধুদের সেরিগ্রাফ সম্প্রতি প্রদর্শিত হলো (১২—২০ মারচ আকাদেমি অব ফাইন আর্টস)। সেরিগ্রাফ হলো সিল্ক-স্ক্রীন প্রক্রিয়ায় ছবি ছাপা। অবশ্য এক্ষেত্রে শিল্পী নিজের হাতে ছাপেন।

ভিকটর ভাসারালি (জন্ম ১৯০৮) হাঙ্গেরিয়ান হলেও ১৯৩০-এ ফরাসী নাগরিক হন। এই প্রদর্শনীতে আছেন এমন কিছু শিল্পী যাঁরা ভাসারালির চেয়ে বয়সে বড়—যেমন জোসেফ এল্‌বারস (১৮৮৮), সোনিয়া ডেলোনে (১৮৮৫) জ্যাঁ (বা হানস) আর্প (১৮৮৭), হারবিন (১৮৮২-১৯৬০), লুই কাশসাক (১৮৮৭)। কেউ কেউ তাঁর সতীর্থ বা সহকর্মী যেমন মাইকেল সিওফোর (১৯০১), ওলে বেয়ার্ত লিং (১৯১১), রিচার্ড মর্টেনসেন (১৯১০)। কেউবা তাঁর কাজ দেখে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত যেমন যীশু রাফেল সোটো (১৯২৩), আইভান পিসিলজ (১৯২৪), জুলিও লা পার্ক (১৯২৫) প্রমুখ। এঁরা অনেকেই জাত ফরাসী নন। এলবারস জার্মান এবং বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। বেয়ার্তলিং-এর জন্ম ডেনমার্কে। আর্পের জন্ম স্ট্রেসবোর্গে। সোনিয়া ডেলোনের জন্ম ইউক্রেনে। কার্লোস ক্রুস ডিয়াজ এবং সেটো জাতে ভেনেজুয়েলীয়। লুই কাশসাকের জন্ম হাংগারী। রিচার্ড মর্টেনসন জাতে ডেন। পিসিলজ যুগোস্লাভীয়। সিউফোর বেলজিয়ামের লোক। এই প্রদর্শনীই প্রমাণ ছাপা-ছবি আঁকা হচ্ছে সব দেশে। শস্তা বলে চাহিদা বেশী।

প্রথমে ভাসারালির কথাই ধরা যাক। এঁকে বলা যেতে পারে 'অপটিকাল আর্টের' জনক। দক্ষ হাতে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দৃশ্যমান সব কিছুকে সাজিয়ে নিই। রঙ এবং রূপবন্ধের আকার প্রকার আমাদের অক্ষিগোলকে আঘাত করার পরে কীভাবে মগজে তথ্যগুলো সাজানো হয়। দেখার প্রক্রিয়ার সমস্ত উপাদানকে তিনি ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। গ্যয়টে বলেছেন, 'optical illusion is optical truth'। ভাসারেলি আলো এবং আকারকে গতিময় করে উপস্থাপন করার ব্যাপারে ওস্তাদী দেখিয়েছেন। নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে ছান্দসিক জ্যামিতিক আকার কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে সব বিষয় তাঁর ভাবনা। বৃত্তসমান্তরাল বা চতুষ্কোণকে নানাভাবে সাজিয়ে তিনি সমতল অত্যুজ্জ্বল ও স্তিমিত রঙ দিয়ে রাঙিয়ে কম্পমান বর্ণময় গতিবেগ তৈরি করেন। স্নুইভেনের মতো নানা রঙের আকার পরস্পর সম্পৃক্ত হবার পর সামনে থেকে যদি নেহাত মণ্ডনধর্মী কাজ মনে হয় তো পাশ থেকে মনে হয় রঙীন ঘুলঘুলি যার ভেতর দিয়ে ঢুকে আমরা কাঁহা কাঁহা মুলুকে অদৃশ্য হয়ে যাই। কিংবা দুটো কালো বৃত্ত রঙধনুর ঢেউয়ের চাপে পরস্পরের কাছে আসছে। দেখার এই কম্পনের জন্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

দর্শকদের [illegible] এলবারসের মৌলিক কাজ দেখলাম (এখানে তাঁকে অন্যের মতো নকল করেন এমন অনুগে সেরিগ্রাফ আঁকিয়ে আছেন)। তাঁর 'হমেজ টু দ্য স্কোয়ারের' সেরিগ্রাফ সংস্করণ ছিল। কালো ধূসর চতুষ্কোণ বড় হতে হতে কালচে ছাই, কালচে কমলা হয়। বা হলদে চতুষ্কোণ হালকা কমলা হতে হতে হালকা নীল হয়। দেখে মনে হয়, বড় চতুষ্কোণে ছোট হতে হতে শেষে অন্তহীন একটা জায়গায় প্রস্থান করছি বা বর্ণের হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যে ক্রমে পথ হারাচ্ছি। পটের শূন্যতা এবং পটের ত্বককে রঙ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন। বর্ণের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার দ্বার তিনি হাট করে খুলে দিয়েছেন।

জ্যাঁ আর্প আধুনিক শিল্পের অন্যতম মহানায়ক। ১৯০৯ সালে এঁর সঙ্গে পল ক্লীর সুইৎসারল্যাণ্ডে, ১৯১২ সালে মিউনিকে কানডিনস্কীর এবং ১৯১৪ সালে ম্যাক্স জাকেব, এপলিনেয়ার পিকাসোর, মদিগলিয়ানী এবং ডেলোনের সঙ্গে

পল্লীতে দেখা হয়। আর্প জাঁর সঙ্গে দাদাবাদের প্রজনক (১৯১৭) এবং একাধারে ভাস্কর, চিত্রকর এবং কবি। তাঁর লাল প্রতিবেশে সাদা কালো ডিমকে সাজানো বা কালো পশ্চাদপটের মধ্যে মাছের আদি-রূপে —আদিম জীবজগতের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করে। এই সব গতিশীল ডিম্বাকৃতি যেন প্রতীক এবং জীবনের প্রাথমিক প্রতিভাস।

রবার্ট এবং সোনিয়া ডেলোনে রঙের পারস্পরিক সহবাস, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কেলি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। কানাডিনস্কী বা কুপকাও এ বিষয়ে একই পথে এগিয়েছেন। এঁদের কাজকে কবি এপলিনেয়ার নাম দিয়েছিলেন 'অরফিজম' (বার্লিন, ১৯১২)। কিউবিজিমের রঙ বিষয়ে অতিশয় সংযমের বিপরীতে ডেলোনে দম্পতি দাঁড়ালেন। এখানে সোনিয়ার 'র‍্যাবো', 'আলার্মে' এবং 'জারা' নামে তিনটে বিখ্যাত সেরিগ্রাফ প্রদর্শিত। উক্ত সমতল রঙের প্রতিবেশে বৃত্ত, চন্দ্রকলা প্রভৃতি আকারকে কৌশলে উপস্থাপন করে পরিপূরক আর সমধর্মী রঙের নানা রকম খেলায় মেতেছেন। হয়তো চৌকো ঘর ঢেউয়ের মত পাশাপাশি সাজিয়ে রূপবন্ধ তৈরি করেছেন। যেটা আশ্চর্য সেটা হলো ছাপা ছবির দক্ষ হাত। দেখে মনে হয়, পোস্টার রঙ দিয়ে আঁকা, কারণ বুনোটের মধ্যে তুলির কাজের কম্পন বজায় রেখেছেন।

দুই কাশসাকের মৌলিকতা কম নয় তবু কাশিমীর সেলভিচের কথা মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর ছবি দেখলে। সেটা অবশ্য কিছু পরিমাণে মোর্টেনসনের ছবি সম্বন্ধেও সত্যি। এঁরা সকলেই খুবই দক্ষ এবং বর্ণ দিয়ে সুরের ঐকতান রচিত হলেও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে মানুষহীন বিমূর্ত জ্যামিতিক রঙের জঙ্গলে কেউ যেন আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। যেন দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই। নতুন চাক্ষুষী অভিজ্ঞতার ধাঁধা জেগে যাবার পরে, বিশেষত রঙের বিস্ফোরণ, বিচ্ছুরণ, কম্পন, গতি আর স্থিতি থাকা সত্ত্বেও যেন হৃদয় নেই। বহু ক্ষেত্রেই। মন্ডন এখানে খুবই অলক্ষ্যে করা হয়। অতি সূক্ষ্ম এবং প্রায় অপ্রত্যক্ষ। তবু ঘর সাজাবার সামগ্রী হয়েছে অনেক ছবি। নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্র সভ্যতার পরিবেশে এবং দুই যুদ্ধের মৌল নাস্তি আর বিষাদের মধ্যে, মূল্যবোধহীন অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মানুষ অন্তর্জাত প্রয়োজনে এমন ছবি আঁকতে পারেন। যাঁরা এঁর অনুকরণ করেন তাঁরা এর বাইরেটা নিতে পারবেন শুধু, ভেতরটা নয়। বাইরেটা নিয়েও ভেতরটা সমৃদ্ধ করা যায় দেশজ অভিজ্ঞতা আর বোধে, তবে তেমন প্রতিভাবান শিল্পী কম। অন্ধ অনুকারকদের দলই বেশি।

দুটি একক প্রদর্শনী

হায়দ্রাবাদের ইউনিস এম হাফিজের প্রদর্শনীতে মাঝারি এবং বড় কাজ ছিল (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ১৪—২০ ফেব্রুয়ারি)। হাফিজ খুব সম্প্রতি কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। তাঁর বয়স বেশী নয়। কিন্তু তাঁর কাজে চিত্রকরসুলভ মেজাজ স্পষ্ট। গত কয়েক বছরে কলকাতার বাজারে যে সাফল্য দেখে তরুণ শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তা বহুলাংশে unpainterly। হাফিজ রঙ দিয়ে ক্যাম্বিসের পটকে আক্রমণ করেছেন, পটের ত্বককে খেটে বশীভূত করতে চেয়েছেন এবং স্বীকার করতে হবে সীমায়িতভাবে সফলও হয়েছেন। তাঁর কাজে আসক্তি স্পষ্ট। বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্যস্থির না থাকায় ভ্রষ্ট হয়েছেন। বাস্তব, সদবাস্তব, প্রথাসিদ্ধ নিসর্গ দৃশ্য ছিল—হরেকরকম কাজ আর প্রতিটি ধরনে তাঁর নিজের আবেগ দর্শকের মধ্যে অনেকটাই সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। যদিও সনাক্তকরণ করার মতো শৈলী কিন্তু তৈরি করতে পারেননি। হাফিজের পুরুষালী তুলি-চালনার ভঙ্গী ভাল লাগে। বিষয়ের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত তিনি। কীভাবে আঁকবেন তা ভালই জানেন কিন্তু কী আঁকবেন তা স্থির করতে পারছেন না।

পনেরোটা কাজের মধ্যে রাস্তায় মরে পড়ে থাকা নগ্ন নারীর ছবিটা চোখে ধরে। চুলগুলো শিকড়ের মতো মাটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করার চিন্তাটা ভাল। এ ছাড়া আছে নিসর্গ চিত্র, আত্ম-প্রতিকৃতি, কিউবিস্টিক কাজ। নানা ধরনের কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

রতন রাই (জন্ম [illegible] দার্জিলিং) মীরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছবি আঁকায় এম এ। অবনীন্দ্রনাথ কি পিকাসো, মনসিয়ার কি পরিতোষ সেন, বেন সাহান কি রামকুমার এঁরা কেউ শিল্পকলা নিয়ে বি এ, এম এ পড়েননি। এই সব ডিগ্রী দেবার রীতি দেখলে মনে হয়, ছবি আঁকার পক্ষে দুর্দিন উপস্থিত। পাবলো পিকাসো, এম এ, পি এইচ ডি—ভাবলেই রোমহর্ষ হয়।

রতন রাই হিমালয়ের নিসর্গের আবহ ধরেছেন তাঁর রেখাচিত্র এবং জল রঙের ছবিতে (ডেকর সার্ভিস)। কাঠমাণ্ডু উপত্যকা। হিন্দু-বৌদ্ধ তীর্থ। হিমালয়ের শীত আর বসন্তের আলো-হাওয়া। বাজার আর উৎসব। যেমন ইন্দ্রযাত্রার সময় রথে করে কুমারী দেবী, গণেশ আর ভৈরবনাথের মূর্তি—মন্দির থেকে এনে শহুত সাজানো হয়। দুটো রেখাচিত্রে এই উৎসবের লোকায়ত দিকটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তেমনি ললিতপুরের লাল মচেন্দ্র-নাথের (অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ) বিগ্রহ আর রথযাত্রার মেলার ভিড়, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের আবহ, চিত্রলেখ রেখার নৃত্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। আছে বাগমতী নদীর শংখমূল ঘাটের মন্দির এবং স্নানার্থিনী। বা কাঠমাণ্ডু উপত্যকার ওপাশে 'ওয়াশে' করা হিমালয় আর দ্রুত রেখা দিয়ে সামনের জমি ভরেছেন। ললিতপুরের দরবারের চত্বর—নৃত্যশীল সমাপ্তিরেখা দিয়ে দ্রুত কাজ করেছেন কখনো বা। ছবিগুলো মাঝে মাঝে সচিত্রীকরণের ওপরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ছবিতে এই উপমহাদেশের সনাতনী রূপ ছিল যা দেখে মন ভরে যায়।

রতন রাইয়ের কিছু 'বাগানবিলাস' পুষ্প পর্যবেক্ষণের ছবি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে। চীনা চিত্রলেখ রেখা দিয়ে শূন্যস্থান বাদ রেখে এঁকেছেন। সবুজ পাতার ওপর রঙের আলো ছায়া, ছায়াসুষমার খেলা, রঙ আলতো গড়িয়ে থামিয়ে দেওয়া। আবছা স্বপ্নের মতো, স্বচ্ছ জলরঙ, কখনো ছোপ ছোপ রঙ দিয়ে ভরা। গাছের ডাল হঠাৎ কীভাবে বেঁকে উঠে যায় নারীর দেহের মতো ছন্দিত ভঙ্গিতে। সাদা পরিবেশে লাল, কমলা, হলুদ ফুলের সমারোহ। রতন রাইয়ের ছবি অন্য রকম।

সন্দীপ সরকার

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

॥ ৫ ॥

৭ই তারিখেই আমরা বিকেলে বাজার থেকে ফিরে নিষিদ্ধ নগরী দেখতে গিয়েছিলাম। দিল্লী বা আগ্রা ফোর্টের মত দেওয়াল-ঘেরা প্রাসাদগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, দর্শনীয় বস্তু। প্রথম গেটটির নাম 'স্বর্গীয় শান্তির সিংহদ্বার' (gate of heavenly peace)। তারপর একটি চত্বর পেরিয়ে একটি গৃহ, আবার একটি গেট, তারও ঐরকমই সুন্দর নাম। একটি নাম মনে পড়ছে—সামঞ্জস্যের দ্বার (gate of Harmony)। আর তারপর আবার একটি গৃহ। এই রকম পর পর অনেকগুলি চত্বর, গেট ও প্রাসাদ। এগুলি সবই কাঠের তৈরী—রঙীন গালা দিয়ে ঢাকা বর্ণাঢ্য। খুব সুন্দর স্থাপত্য। কিন্তু স্থাপত্যে ভারতকে হারানো শক্ত। সেদিন ছিল বড় ঠাণ্ডা, আর হু হু করে উত্তরে বাতাস বইছে। শুনলাম সে বাতাস সাইবেরিয়ার হিমস্পর্শ নিয়ে আসছে। ভারি জবরজঙ্গ কোট, মাথা মুখ মোড়া শাল, নড়বড়ে পা নিয়ে বড়ই মুশকিল হচ্ছিল—কখনও মং, কখনও লী আমাকে ধরে ধরে পার করছিলেন। ক্রমেই এমন অবস্থা হল যে, স্থাপত্য দেখার সাধ মিটে গিয়ে নিজেই স্থাপত্যে পরিণত হই আর কি! মিউজিয়াম না দেখেই আমরা রণে ভঙ্গ দিতে চাইছিলাম, কিন্তু ওদের দেখাবার সাধ খুব। এদিকে ফিউডালিজমের এত নিন্দা করে, কিন্তু সে-সময়কার শিল্পবস্তু ওদের গর্বের বিষয়। চীনারা তাদের অতীতকে বাতিল করেনি, তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। শুধু কোনো কিছু সুকর্ম দেখাবার সময় বারবার করে বলে, এ-সমস্ত আমাদের দেশের 'মেহেনতী' জনতার দান। এ-সমস্তই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের ফল। ওরা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাজমহল শাজাহানের তৈরী নয়। যারা পিঠে পাথর বয়ে এনেছে তাদের। কৃতিত্ব তাদের। এই কথা বার বার বলে ওরা তাদের মর্যাদা দেয়, যারা এতদিন ছিল অনাদৃত। 'যারা কেহ নয়, যারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে', ওরা বলে সভ্যতার ইতিহাস রচনা তাদেরই হাতে। স্থাপত্য দেখার সাধ ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়ায় আমরা কোনো মতে পালালুম।

৮ তারিখ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তৈরী হয়ে আমাদের অপটিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট ফ্যাকটরী দেখতে যাবার কথা। এই শীতে অত ভোরে উঠতে বেশ আলস্যি লাগছিল। কিন্তু উপায় কি? চীনারা খুব ভোরে ওঠে। ভোর পাঁচটায় সমস্ত শহর জেগে উঠে একসারসাইজ করে। অল্পবয়সীরা দৌড়ায়। বৃদ্ধেরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করে। এই শীতে বাইরে পার্কে ও ফুটপাথে তাদের ব্যায়াম করতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তৈরী হয়ে চালে-ডালে মেশানো বড় বাটির দু-এক বাটি সুপ ও নুডল মাংস সহকারে খেয়ে তারা কাজে বেরিয়ে পড়ে। ইয়োরোপে বা আমেরিকায় এত ভোরে ওঠা কেউ ভাবতে পারে না। ফ্রান্সে তো ন'টা পর্যন্ত সারা শহর অচৈতন্য। খুব আশ্চর্য লেগেছিল ফ্রান্স থেকে জার্মানী গিয়ে। সামান্য একটু দূরেই কি পরিবর্তন। জার্মানরাও প্রত্যুষে ওঠে। আমরা ফ্রান্সের কায়দায় বেলা অবধি ঘুমোব ভাবছি, ভোর ছ'টায় রাজমিস্ত্রী এসে জানলার বাইরে খটাখট কাজ শুরু করল। আমাদের গরম দেশেও আজকাল বিলাতী কায়দায় অভ্যস্ত লোকেরা সকাল আটটা ন'টা অবধি ঘুমানোটা সাহেবিয়ানার নিদর্শন মনে করেন। অ্যামেরিকায় তো দেখলুম বড় বড় প্রফেসররা পর্যন্ত বেলা বারোটা অবধি ঘুমোন; রাত একটা অবধি হয় কাজ করেন, নয় মদ্য সহিত after dinner রসালাপ করেন। আমি একবার আমার এক বান্ধবীকে ভোর সাতটায় টেলিফোন করে অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। তিনি তন্দ্রাজড়িত ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—'হ্যালো'। আমি বললাম, 'ঘুম ভাঙালাম না কি?' তিনি বললেন, 'এত ভোরে ঘুমোনো ছাড়া আর কি করছিলাম তোমার মনে হয়?' এই বিস্ময়কর ঘটনা জনে জনে বলেও তাঁর তৃপ্ত হয়নি! চীনেরা যেমন ভোরে ওঠে, তেমনি সন্ধ্যা ছ'টায় নৈশভোজন শেষ করে তারপর আর কেউ কিছু খায় বলে মনে হল না। সিনেমা বা বালে দেখে রাত ন'টায় ফিরলে তখন একটু গরম চা ছাড়া আর কিছু নয়।

অগত্যা আটটার মধ্যে তৈরী হয়ে সাড়ে আটটায় আমরা বেরিয়ে পড়লুম অপটিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট ফ্যাকটরী দেখতে। সেদিন সকাল ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা 'ছাং আনলু' আট-ন' মাইল লম্বা। ছাং আনলু অর্থাৎ দি রোড অফ এভারলাস্টিং পাস। তা পথটি 'চিরশান্তির পথ' বলা ভুল নয়। হট্টগোল অন্য শহরের তুলনায় কম। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া তাই ভিড় কম। গাড়ি নেই বললেই হয়। এম্বাসির গাড়ি ছাড়া সাধারণ লোকের নিজস্ব গাড়ি নেই। শুধু আছে সরকারী ট্যাক্সি। তা ছাড়া চলেছে সাইকেলের স্রোত, ট্রাক ও বাস। চিরশান্তির পথ থিয়েনান মেন স্কোয়ার দিয়ে স্বর্গীয় শান্তির সিংহদ্বারের সামনে দিয়ে চলে গেছে দূরে। দুধারে কোনো জায়গায় বিজ্ঞাপন দেখা গেল না। চীন দেশে কোনো শহরেই বিজ্ঞাপন দেখলুম না। প্রয়োজনমত জিনিস তৈরি হচ্ছে—সরকারের পরিকল্পনা

ওয়াং পিন নানকে নবজাতক রবীন্দ্রসংখ্যা উপহার দিচ্ছি। শ্রীনারায়ণন ডান দিক থেকে চতুর্থ

অনুযায়ী। কমপিটিশনের বালাই নেই; কারণ, লোককে ঠকিয়ে নিজের জিনিস কিনিয়ে নিতে হবে না, বা লোভ দেখিয়ে কেনাতে হবে না। লোভটা কমাবার চেষ্টাই তে চলছে। তার সংগে বুঝতে পারলাম, কদর্য বিজ্ঞাপনের অভাবেই রাস্তাটা চিরশান্তির পথ মনে হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে রয়েছে উজ্জ্বল অক্ষরে মাও-সে-তুং-এর বাণী। লেখাগুলি ছবির মত সাজনো, পথকে সুশোভিত করেছে। লেখাটা তো পড়তে পারছি না, তাই আমার মনটা ক্ষুন্ন। বিজ্ঞাপনের কথায় আমার অ্যামেরিকার কথা মনে পড়ল। প্রতিযোগিতার কুৎসিত চেহারা ওখানেও অনেকের মনে আসছে। অ্যামেরিকার তরুণ ছেলেমেয়েরা অনেক রকম নূতন কথা ভাবছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের কোনো নেতা নেই। এমন কেউ নেই যাকে তারা মানে, শ্রদ্ধা করে ও ভালোবসে; যার নির্দেশে সন্দেহের অবসান হয়। বিজ্ঞাপনের কথায় আমার বন্ধুজনের মতামত খুব স্পষ্ট। অল্পবয়সী সুন্দর ছেলে জন। কমার্সিয়াল আর্ট পাস করেছে—কিন্তু বেকার। সে আমাকে বললে যে, সে একটা বড় ফার্মে Commercial artist-এর

কাজ করত। কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে। তার খরচ চলে কি করে জানতে চাইলে সে নির্বিকারভাবে বললে, আমার ল্যান্ডলর্ড আমায় মাঝে মাঝে ভাড়া খাটায় (hires me!) কথাটা ঠিক বুঝলাম না। একদিন দেখি সে কাঠের সিঁড়ি সাবান-জল দিয়ে ধুচ্ছে। "এ কি করছ, জন?" "আজকে আমার ল্যান্ডলর্ড আমায় ভাড়া খাটাচ্ছে—এরকম মাঝে মাঝে করতে হয়!" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি অত ভালো কাজ ছাড়লে কেন?" সে বললে যে, "অ্যাডভার্টাইজিং-এর কাজ করতে গেলে অনেক মিথ্যা বলতে লিখতে হয়। কেন আমি ঐ কম্পানীটার পেট মোটা করবার জন্য মিথ্যা কথা বলতে যাব।" "এইজন্য তুমি অত ভালো চাকরি ছেড়ে এই কাজ করছ?" জন একটুও দুঃখিত নয়। সে বললে, "চাকরিটা ভালো কিসে? মিথ্যা কথা বলা ভালো? আর সিঁড়ি ধোয়াটা খারাপ কেন? আমার মনে কোনো গ্লানি নেই।" আমেরিকাতে আরো দু-একটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে জনের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করে দেখেছি; তারাও আশ্চর্য নয়—বলে, ঠিকই তো।

সেদিন চো যখন বললে, 'না, আমাদের বিজ্ঞাপনের দরকারই হয় না,' তখন মনে হল এ রাজ্যে জন সুখে থাকত।

চিরশান্তির পথ দিয়ে অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাকটরীর দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম মাও-সে-তুং ও স্টালিনের যুগ্ম ছবি রাস্তার পাশে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। পরে আরো অনেক জায়গায় স্টালিনের ছবি দেখেছি। তবে সেদিন রৌদ্রালোকিত জনপথের ধারে হঠাৎ তাঁর ছবি দেখে মনের মধ্যে ধক করে উঠল। চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। ১৯৫৫ সালে মস্কোতে যেখানে সেখানে স্টালিনের যে সব মর্মরমূর্তি ছিল, আজ তার চিহ্ন নেই। এবং লেনিনের পাশে শায়িত বাকস-বন্দী যে মৃতদেহ দেখেছিলাম, তাও উৎপাটিত হয়ে গেছে। এরা মৃতদেহ এরকম পৌরাণিক যুগের মত রক্ষা করতে চায় কেন, বুঝি না। শুনেছি মাও-সে-তুং-এর দেহও নাকি রাখবে! কোথায় সেই বিরাট সত্তা, আর কোথায় কাঁচের বাক্সে বন্দী একখানা শব! চীনারা অনেক বিষয়ে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব দেখালেও এটা আদিম যুগের বুদ্ধি। এখানে যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগই প্রধান হয়েছে। "যাহা রমণীয় থাক মরে" এই সত্যটি অগ্রসরতার বীজ মাত্র।

যাক্, অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাকটরীতে এসে পৌঁছনো গেল। কর্মকর্তারা, আসলে কর্ত্রীরা—কারণ এটি প্রধানত মহিলাদের দ্বারা চালিত প্রতিষ্ঠান—আগে থেকে তৈরী ছিলেন। গাড়ি থেকে নামতে চোখে পড়ল অতি সুন্দর সচিত্র অভিনন্দন-বাণী দেওয়ালে আঁটা আছে: "ডাঃ কোটনিস স্মৃতি সমিতি স্বাগতম।" শুনলাম ওখানকার কর্মীরাই করেছে। পাশের দেওয়ালে প্রায় সাত-আট গজ লম্বা ও দেড় গজ চওড়া 'ওয়াল নিউজপেপার'—হাতে লেখা দেওয়ালপত্র। এগুলি এত নিখুঁতভাবে নানা রঙের কাগজে লেখা আর মাঝে মাঝে কার্টুন যে, বিশ্বাস করা যায় না এগুলি আর্টিস্ট-এর আঁকা নয়। অবশ্য যে এঁকেছে সে নিশ্চয়ই আর্টিস্ট, তবে সে ঐ

ফ্যাকটরীর কর্মচারী। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই এরকম বড় বড় দেওয়ালপত্রে সচিত্র লেখার লোকের অভাব নেই। এবং হাতের লেখাও দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মাঝে খুব দেওয়ালের লেখনের প্রচলন হয়েছিল, বোধ হয় চীনের অনুকরণে। কিন্তু তা শহরকে নোংরা করে ফেলেছিল। অশুদ্ধ বানানে অপটু হাতে বেশির ভাগ লেখা নিষ্ঠার অভাবকেই প্রকাশ করত। তবে টালিগঞ্জের দিকে কয়েকটি নিপুণ হাতে লেখা প্রাচীর-পত্রও দেখেছিলাম। যা হোক, চীনের ঐ প্রাচীরপত্রগুলোর মধ্যে 'গ্যাং অফ ফোর'-এর ছবি ছিল—একটা বেলচায় করে চারজনকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে!

এই ছবিগুলোর ফোটো তোলবার চেষ্টা করা হল; কিন্তু আমিও ছবি তুলতে অভিজ্ঞ নই, আর দীনেশও তার ক্যামেরাটি আয়ত্ত করতে পারছিলেন না। তাই আমাদের সে চেষ্টা বিফল হল!

অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাকটরীতে ঢুকে সাদা চাদরপাতা টেবিলের দুধারে আমরা বসলাম। একধারে আমরা—অভ্যাগতরা; অন্য দিকে কারখানার কর্মকর্তারা। যথারীতি গরম তোয়ালে ও যুথী সুরভিত চা, সিগারেট পরিবেশিত হল। তারপর আমাদের ঐ কারখানা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানানো হল। সব কমিউনিস্ট দেশেই ঠিক এই নিয়মে দেখানো হয়। এখানে বসেই মাও-সে-তুং চীনের হৃদয়ে কি আসনে প্রতিষ্ঠিত সে কথা প্রথম যেন বুঝতে পারলাম। মনে হয় ১৯৪৯ সালের পরে অর্থাৎ লিবারেশনের পরে মধ্যেই মধ্যেই তিনি এক-একটি নূতন ও বৃহৎ কর্মের সূচনা করেছেন—দেশের মানুষকে ডাকার মত ডাক দিয়েছেন। সব প্রতিষ্ঠানের মতই কালচারাল রেভলিউশনের পর থেকে এখানে একটি রেভলিউশনারি কমিটি আছে। তার মধ্যে কর্মীরা আছেন। ডিরেকটর একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার। তাঁর অলিভ রঙের জামার উপর লাল তারকাচিহ্নই পিপলস আর্মির পরিচয়। রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান একজন মহিলা। নাম—লি সি সুই। প্রথমে অভ্যর্থনা জানানো হল। তারপর গ্যাং অফ ফোর-এর নিন্দা ও পতনের সংবাদ দেওয়া হল। ধরে নিতে হবে, এ একেবারে নিয়মিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও সভায় হবেই। তারপর শ্রীমতী লিউ এই কারখানার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

১৯৫৮ সালে মাও-সে-তুং তাঁর দেশবাসীকে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানালেন। এই সময়কে বলা হয়—the year of the great leap forward! যা বাংলায় 'বৃহৎ লম্ফ' নামে অনূদিত। অর্থাৎ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া; সমস্ত সাংগঠনিক কাজে ও উৎপাদনের কাজে তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। সে বছর

থেকেই চীনের সর্বতোমুখী উৎপাদন-কর্ম উৎসারিত হয়ে গেল।

এই সময়ের সর্বত্যাগী আন্দোলন চলল দেশের মানুষকে, আপামর জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য। সমস্ত কাজে নিজেদের হাত লাগাতে হবে। মাও-সে-তুং একটি বাক্য বললেন, "রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া চীনের উৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।" এই বলে তিনি 'great leap forward'-এর বিপুল আন্দোলন শুরু করলেন। যখন জনতার মধ্যে কর্মশক্তি উদ্দীপ্ত হয়, যখন তারা কোনো কাজের মধ্যে নিজেকে সার্থক করে, তখনই তারা নিজের উপর আস্থাবান হয়। 'রেভলিউশন' অর্থই দ্রুত পরিবর্তন এবং সেটাই "leap"।

এই অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্যাকটরী সেই 'বৃহৎ লম্ফের' একটি প্রত্যয়জনক নমুনা। লিন-সু-সুই ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বলতে শুরু করে বললেন—চেয়ারম্যান মাও মেয়েদের প্রতি একটি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন—"এসো নারী, তুমিই অর্ধেক আকাশ"। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল চীনা নারীশক্তি। তাদের পায়ের বাঁধন অনেক আগেই খুলে গিয়ে থাকলেও মনের বাঁধন তখনও যথেষ্ট খোলেনি। বিপুল কর্মযজ্ঞে সমান দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা নিজের মনুষ্যত্বের ও নিজের শক্তির প্রতি আস্থাবান হল। যখন লিন-সু-সুই ঐ সুন্দর বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, তখন তাঁর মুখে আমি একটি দীপ্তি দেখতে পেলাম, আর আমার মনেও একটু আলো জ্বলে উঠল। আমি মাও-সে-তুং-কে একটু বুঝতে পারলাম। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার মধ্যেই মানুষকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্রশক্তি আছে। আমার অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা মনে এল। কিছু দিন আগেই মহিলা সাহিত্যসভায় কোনো এক মুখ্যমন্ত্রীর এক ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ শুনেছিলাম—নারীজাতির বন্দনা। তার অসারতা তখনই শ্রোতাদের ক্লান্ত করেছিল। যে কথা সত্য হয়নি, যে কথা সত্য করবার কোনো অভিপ্রায়ই যেখানে নেই, সেখানে বাক্যরাশি সফেন বুদ্বুদ মাত্র। ভাষার নূতনত্বও মানুষকে নাড়া দেয়। আমি তো ভাবতে পারি না যে, এরকম একটা কার্যকরী পরিকল্পনা করবার সময় কোনো রাজনৈতিক নেতা আকাশের কথা ভাববেন! সূচ্যগ্র ভূমির জন্য তাঁরা নিম্নমুখী হয়ে তড়পাচ্ছেন। ঊর্ধ্ব আকাশের কথা, তাঁদের মনেই পড়বে না।

মাও-সে-তুং-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ এলাকার আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা চশমার কাঁচ ও চশমার ফ্যাক্টরী তৈরির কারখানা করবেন স্থির করলেন। এইসব মেয়েরা কাজ কিছুই জানতেন না, কোনো বাড়িও পাওয়া গেল না, ঘরে ঘরেই কাজ শুরু হয়ে গেল—যেমন করে আমরা মহিলা সমিতি করি। কিন্তু মহিলা সমিতির কাজ তো সূচীশিল্পেই শেষ হয়ে যায়। তারপর সেই রুমাল, হ্যাণ্ড-ব্যাগ আর কাঁথার বোঝা বিক্রি করার ঝঞ্ঝাটে হয়রান হতে হয়। কিন্তু এদের হঠাৎ এরকম একটা দুরূহ কঠিন কাজের ঝোঁক পড়ল কেন, এ দায়িত্ব নেবার ভরসাই বা এলো কোথা থেকে, কি জানি। যা হোক, সেই গৃহস্থ বধূদের কোনো পূর্বের শিক্ষা বা বিদ্যা ছিল না। অন্তত এই বিষয়ে তারা কিছু জানত না।

লিন-সু-সুই বললেন, আগে এসব জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আসত। চেয়ারম্যান বললেন, "স্বনির্ভর হও।" তাঁর সেই বাণীই আমাদের সকলকে এই কঠিন কাজে উৎসাহিত করল। তিনিই আমাদের সকল কাজের প্রেরণা। কুসংস্কার ভেঙে মুক্তি পাবার ইচ্ছাও তিনিই সঞ্চারিত করেছেন আমাদের মধ্যে। ত্রিশটি মহিলা মিলে এই কাজ শুরু হয়। তখন না ছিল অর্থ, না ছিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, না ছিল কোনো দক্ষ কারিগর। অনেকদিন পর্যন্ত তাদের বিনা-মূল্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে কিছুটা জায়গা নিয়ে এক-একটা কাজ হত।—আগে [illegible] দেশে বানানো মানে ছিল বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে জোড়া দেওয়া। কিন্তু স্বয়ংনির্ভর হওয়ার অর্থ কাঁচ তৈরি করার জিনিস, যন্ত্রপাতিও বানানো। প্রথম হাতে বানানো পাথরের যাঁতায় পেষাই করা হত। এখন সেখানে সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। ত্রিশটি মহিলা যে প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন,

এখন সেখানে ৫২০ জন কর্মী কাজ করছেন। এর মধ্যে পঁচাত্তর ভাগ স্ত্রীলোক। এই ফ্যাক্টরীর কাজের একটু বিশদ বিবরণ দেব। কারণ, এইটিই আমরা ও-দেশের কর্মোদ্যোগের প্রতীক বলে ধরে নিচ্ছি। ফ্যাক্টরীর কাজ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি—অপটিক কাচ তৈরি। দ্বিতীয়—মেটাল প্রসেসিং, তৃতীয়—ফিনিশিং বা শেষকৃত্য। যেসব মেয়েরা কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা ছিল না। কাজ করতে করতে সময় পেলেই পড়াশুনো করতেন। দরকারমত প্রয়োজনমত কাজের সংগে পড়াশুনো চলার ফলে তাঁরা স্বয়ংশিক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম তাঁরা তৈরি করতেন খনিতে ব্যবহার্য লণ্ঠনের কাচ। ১৯৬৪ সালে তাঁরা কুড়িগুণ বা চল্লিশগুণ ম্যাগনিফাইং বা বড় করবার মত কাচ তৈরি করতে পারলেন। ক্রমে ক্রমে নানারকমের কাচও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতে লাগল। চারশোগুণ বড় দেখাবে এরকম মাইক্রোস্কোপ ১৯৭৩ সালে তৈরি হল। এখন ব্যাকটেরিয়া দেখার মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে, যা কোনো বস্তুকে ষোলো শো গুণ বড় দেখাবে।

সারি সারি মাইক্রোস্কোপ সাজানো ছিল। অনেকে পরীক্ষা করে দেখলেন। একটা যন্ত্র দেখাল—তার নাম পোলারো মিটার। চিনি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার হয়। এখানে বীট থেকে চিনি তৈরির প্রচলন আছে শুনলাম। এইসব জিনিস পূর্বে কখনই এখানে তৈরি হত না। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। বিদেশীরা সুযোগ পেয়ে যথেচ্ছ দাম আদায় করে নিত। এখন এই যে সব জিনিস তৈরি হচ্ছে, যথা পোলেরো মিটার হলোগ্রাফ, তা খুবই জটিল। লেসার বীমের জন্যও খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। একটি ঘরে দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট রূপোলী কাচের গোলা নিয়ে কাজ করছে। এই লেসার বীম খনির কাজে লাগবে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি কোনটা কত তৈরী হবে তা সরকার থেকেই নির্দেশ করে দেয় এবং সরকার কিনে নেয়। ১৯৭৩ সালে গভর্নমেন্ট এঁদের পোলেরো মিটার তৈরির অনুমতি দেয়। তারপর তিন মাসের কঠিন পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তাঁরা এটি তৈরি করে ফেলেন।

ঘরে ঘরে এইসব যন্ত্রপাতি দেখতে দেখতে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে, কোনোরকম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়া ঘরের বউরা মিলে এরকম কাজের সূচনা করল কি করে। একজন মহিলা গর্বের সংগে বললেন, এখন এখানে যেসব যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে তা কোনোমতেই চীনের অন্যত্র যা ব্যবহার হয় তার থেকে ন্যূন নয়। প্রথমে তাদের প্রতিষ্ঠানটি কো-অপারেটিভ ছিল; এখন সম্পূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান বাড়িটি নার্সিং শিক্ষার স্কুল ছিল। তারা অন্যত্র উঠে গেলে এঁরা পেয়েছেন। বাড়িটি এমন কিছু শৌখিন নয়। কিন্তু কাজটা এত জটিল যে, আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে দিল। যেখানে মেটাল প্রসেসিং হচ্ছে নানারকম যন্ত্রের বহিরঙ্গের জন্য, সেখানে কু চাং লিন নামে একটি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের ভদ্রলোককে দেখলাম। সে পূর্বে মিলিটারীতে ছিল। প্রায় বিশ বৎসর সেখানে কাজ করে এখন এই কারখানায় ঢুকেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কোনো ডিগ্রী আছে কি না, সে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে কি না। সে নির্দ্বিধায় বললে, এখন এখানে কাজ করছি, করতে করতেই কাজ শিখছি। তার জন্য ডিগ্রীর দরকার নেই। তবে পরে কাজ শেখা হলে সে কিছুদিনের জন্য ইউনিভার্সিটিতে যাবে। আমার মনে হল, এরা যেন জগৎটা উল্টে দিয়েছে। আগে ডিগ্রী, তার পর তো চাকরি! এ দেখছি আগে চাকরি, তারপর ডিগ্রী!

আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, 'ক' ঘণ্টা কাজ করতে হয় এ-দেশে?' 'আট ঘণ্টা।' 'ওভারটাইম আছে?' প্রথমটা তারা বিস্মিত হল; তারপর বললে, 'না, আট ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট। তবে যদি কোনো প্রয়োজন হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লোক শ্রমদান করে। মাও-সে তুং বলেছেন— 'Be masters of the industries; do not be slaves of money' (প্রতিষ্ঠানের প্রভু হও; অর্থের দাস হয়ো না)।' কথাটা এক মুহূর্তে আমাকে বিমর্ষ করে দিল। অতীতের 'ঘেরাও' উৎসবের কথ মনে পড়ল। কত প্রতিষ্ঠান উঠে গেল। বড় বড় প্রতিষ্ঠান ভেঙেচুরে শ্মশানভূমিতে প্রেতের নৃত্য হল। না চালক, না চালিত কেউ কি বুঝল যে প্রভু হতে গেলে দাসত্বের বন্ধনমোচন চাই। উভয়পক্ষই যেখানে অর্থের দাস সেখানে প্রতিষ্ঠান কর্ণধারহীন। এই-বারে আমরা প্রশ্ন করলাম, উচ্চতম বেতন ও নিম্নতমের মধ্যে পার্থক্য কী? এই প্রশ্নটা দেশে ফিরে আসবার পর আমাকে বহু লোক জিজ্ঞাসা করেছেন, তাই উত্তরটা পূর্ণভাবেই লিখছি। যদিও চীন দেশ ভ্রমণ করতে করতে ক্রমেই এ প্রশ্নটা আমার কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে গেছে। কারণ সে-দেশে বেতনের পার্থক্যের উপর কিছুই নির্ভর করে না—মানসম্মান, সুখ বা যশ।

একটি মহিলা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। মনে হল তিনি বিদেশীদের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত। তিনি বললেন, মাইনের তারতম্য আছে। সর্বোচ্চ এক শো ইউয়ান আর সর্বনিম্ন চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। তোমাদের এরকম ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাইনে বড়ই কম; কিন্তু আরো বেশি মাইনে দিলে এত লোকের চাকরি হবে কি করে? কাজের তো কোনো অভাব নেই। প্রত্যেক পরিবারে চার-পাঁচজন খাটিয়ে লোক থাকে। কেউবা 'হোয়াইট কলার', কেউবা 'ব্লু কলার', কর্মী। অর্থাৎ, কেউ লেখাপড়ার কাজ করে, কেউ হাতের কাজ করে। জিনিসের দাম কখনই ঊর্ধ্বমুখী হয় না। ইনফ্লেশন নেই। মাইনে ছাড়া বাড়ি, ইলেকট্রিক ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সুবিধে রয়েছে। কাপড়চোপড়, রেইনকোট, চিকিৎসার খরচ—নিজের ও নিকট আত্মীয়ের বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বললেন, তাঁর নিজের পরিবারের পাঁচজন কাজ করছে, তাই তিনি যথেষ্ট সচ্ছল। বার্ধক্যের সম্বল হিসাবে টাকা জমাবার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। কারণ, অবসর নিলে যা মাইনে পাচ্ছেন তার শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ পেনসন পাবেন। পুরুষরা ষাট বছর বয়সে অবসর নেয়, মেয়েরা পঞ্চাশে। কর্মী মেয়েরা ছাপ্পান্ন দিন মেটারনিটি ছুটি পায়। একথা শুনে আমার পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' মনে পড়ল। ক্ষেতে কাজ করতে করতে গাছের আড়ালে সন্তানের জন্মদান করেই আবার কাজে লেগে পড়া! সেই চীন কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছে! কর্মী মেয়েদের সন্তানদের বয়স অনুসারে নার্সারির ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া স্নানের ব্যবস্থা ও মাসে দুবার চুল কাটার ব্যবস্থা আছে। শীতের দেশে স্নানের ব্যবস্থা নিখরচায় পাওয়া খুবই ভালো। মেয়েদের অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রোগে, শোকে উৎসবে বিনা সুদে ধার পাওয়া যায় তো

বটেই, সংস্কারের খরচও মেলে। প্রতি মাসে বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট পাওয়া যায়। সপ্তাহে একদিন ও বছরে উনষাট দিন পুরো মাইনেতে ছুটি সব কর্মীর পাওনা। তারপরে যে সংবাদটি সবচেয়ে চমৎকৃত করে দিল সে হচ্ছে ওখানে কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই। আমাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, স্ট্রাইক হয় কিনা। জানা গেল কনস্টিটিউশনে স্ট্রাইক করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নূতন চীন প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোনো স্ট্রাইক হয়নি। কি কাজ হবে, কেমন করে হবে—সমস্ত সমস্যা সকলে মিলে একত্র হয়ে আলোচনা করে স্থির হয়।

আপিসের খাতা লেখা কর্মী আর হাতুড়ি পেটা কর্মীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যালয় রয়েছে, ফাঁক পেলেই পড়ে নেবার জন্য। এইসব কর্মীদের মধ্যে যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার যোগ্য হয় তাকে অন্যান্য কর্মীরা নির্বাচন করে পাঠায়। ১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪টি কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে।

জিনিস তৈরি ও বিক্রির মধ্যে কোনো সমস্যার উদ্ভাবন হয় না। কারণ, যে জিনিস যতটা দরকার ততটাই তৈরী হয়। এখন এঁরা বিশেষভাবে লক্ষ করছেন 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলের' দিকে। যে ভদ্রমহিলা আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি এখানে নানা পলিটিকাল কথা শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—কালচারাল রেভলিউশনের পরে উৎপাদনের উন্নতি। ১৯৬৪ সালে যা ছিল, ১৯৭৪-এ তার চেয়ে ছয় গুণ বেশী উৎপাদন হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় শুনেছি নির্ধারিত সীমা বহু গুণে ছাড়িয়ে গেছে। মিসেস পাংওয়েন য়ু নামে এক বৃদ্ধা খুব জোরের সঙ্গে বললেন, চেয়ারম্যান বলেছেন, Grasp revolution and increase production—বিপ্লব এগিয়ে নাও, উৎপাদন বাড়াও। আমি ভাবছি, এরা কোন ভাষায় কথা বলছে! আমাদের তো বিপ্লব মানে ঘেরাও কর, উৎপাদন ধ্বংস হোক। যাক, সেদিন মিসেস পংওয়েন Comprador philosophyর ব্যাখ্যা করলেন। বাইরে থেকে সাহায্য আনার ঝোঁক—সেটা গর্হিত। ভিতরের শক্তিকে খর্ব করে। তাই আমরা আর বাইরের সাহায্য নিই না। এটা একটা মত ঠিকই, কিন্তু একে কি করে ফিলসফি বলা যায় তা বুঝলাম না।

অনেক তথ্য সংগ্রহ করে আমরা যখন গাড়িতে উঠতে যাব তখন সহসাই আমাদের দোভাষী লি আমাকে বললে, চেয়ারম্যান বলেছেন—'Give as much as you can, take as much as you need' (তোমার যতটা শক্তি দাও, যতটুকু দরকার নাও)। সে কেন ঠিক তখন এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করল, জানি না। তবে সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞ মহিলাদের উৎসাহে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অবিশ্বাস্য রহস্যের আভাস পেলাম। একটা কিছু বুঝতে পারলাম, যা বহু খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য তথ্যের তালিকায় পাইনি।

গাড়িতে বসে আমার কেবল মনে হতে লাগল, আমরা কি শুনেছি, কি দেখছি। স্রষ্টা মাও সে-তুং কি বন্দুকের নলে বারুদ পুরেছিলেন, কাস্তে হাতুড়ি পেটাচ্ছিলেন, না মানুষ তৈরি করছিলেন? শক্তির উৎস কি। বন্দুকের নল, না মানুষ?

(ক্রমশ)

আলোচনা

ছবির মেলা প্রসঙ্গে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের মাসান্তিক সমীক্ষা বেশ আকর্ষণীয় রূপ পায়। তবু মাঝে মাঝে পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন উদ্যত হয়। যেমন এবারের কলকাতা চারুকলা মেলা সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগেছে।

কলকাতা চারুকলা মেলা শুরু হয়েছিল যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আজ আর তা নেই। তখন পেশাদার চিত্রকররা চেয়েছিলেন মধ্যবিত্তর মধ্যে চারুকলার প্রচার ও প্রসার হোক। কিন্তু কটি বছরে দেখা গেছে মধ্যবিত্তরা ছবি থেকে দূরে রয়েছেন। মেলায় মধ্যবিত্তদের দেখতে পেলেও ছবি কিনতে তাঁরা আসছেন না। আসছেন একদল ছবির ব্যবসায়ী। তাঁরা অল্প দামে চিত্রকরের কাজ নিয়ে যাচ্ছেন কিনে। চিত্রীরা সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল গ্যালারীতে রেখে সাধারণ মানুষের কাছে যতটা পৌঁছতে পারেন এবং শিল্পীর দিক থেকেও সেখানে যেসব সম্ভাবনা থাকে, সেই ছবি এখানে ব্যবসা-য়ীকে দিলে তাঁরা প্রথম সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। ছবির সঙ্গে বহু চিত্রকরের জীবিকার ব্যাপারটাও তো জড়িত।

কথা ছিল, আর্ট ফেয়ারে প্রতি বছর নতুন নতুন কমিটি হবে। সেই ধরনের যাঁরা দায়িত্ব নেবেন যাঁরা মৌলিক উদ্ধর্মী ক্ষমতাশালী চিত্রকর। এবং কলকাতার প্রবীণ নবীন চিত্রকররা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। মেলার সব কিছু নির্ভর করবে তাঁদের মানসিকতার উপর। প্রথম দিকে এভাবেই মেলা হয়ে উঠেছিল রূপময়। পরে সেটা আর হয়নি। মেলার দায়িত্ব নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা চিন্তার দীনতার জন্যেই হোক বা কর্মনৈপুণ্যের অভাবের জন্যেই হোক মেলাপর্বকে এত দুর্বল ও দায়সারা গোছের করে ফেলেছেন যার ফলে কলকাতার বহু চিত্র-অনুরাগীর কাছেই মেলা আজ গুরুত্ব হারাচ্ছে। প্রথম কয়েক বছর মেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে যে জমাটি ব্যাপার দেখা যেত আজ সেট কোথায়? তখন শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ কবি লেখক বন্ধুরা আসতেন। অন্যরকম আবহাওয়া তৈরী হত। আর এখন অনেকেরই অভিমত, আর্ট ফেয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ছবির বাজার, তাও একেবারে নীরস।

আসলে এ ধরনের ব্যাপারের জন্য দরকার অন্য ধরনের মানসিকতা, কিছু পাগলামো। শিল্প টিল্প নিয়ে আলোচনা বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন করা ভাল, কিন্তু ভিড় বাড়াবার জন্যে সেতারসরোদের অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠের আসর বসিয়ে লাভ কি? কোথায় গেলো ইনস্ট্যান্ট পোর্ট্রেট মডেলিং আর তেলরঙে পোর্ট্রেট? যে যাদুকাঠিতে লোকে মুগ্ধ বিস্ময়ে জড়ো হয় তা চিত্রকরদের অনেক আছে, তবু অনধারার কিছু লোক হাজির করে দর্শকের মন ভরাবার কোন মানে হয় না। মোদ্দা কথা, সংগঠকদের কাজে ও চিন্তায় বৈচিত্র্যহীনতার জন্যেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা চাই, মেলা-অঙ্গন প্রতি বছর সুন্দর করে সাজানো হোক। সমস্ত কাজে প্রতিবার আসুক বৈচিত্র্য। এমন সংগঠক-দেরই প্রয়োজন যাঁরা মেলাকে প্রাণবন্ত রূপ দিতে পারবেন। কলকাতার ক্ষমতাশালী চিত্রকরদের ছবি থাকুক একদিকে সাজানো, লোকে শুধু দেখবে, অন্যদিকে থাকুক তাঁদের ড্রইং গ্রাফিক ও অল্প দামী ছবি বিক্রির বাজার। নয়তো যেহেতু টিকিটের দাম ১৯ পয়সা সেজন্য সেতার, কবিতা আর গান শোনাতে হবে তার কোন মানে নেই। গত বারের মেলা যেমন ছিলো সাজানো, বা যেসব অনুষ্ঠান ছিল—এবারও তাই। উপরন্তু আরো ম্লান। এরকমই যদি চলতে থাকে তাহলে কলকাতা চারুকলা মেলার

কোনরকম সার্থকতাই থাকবে না। সময় থাকতে এ ব্যাপারে ভাবা প্রয়োজন নয় কি?

রমাপ্রসাদ দত্ত
কলকাতা-৩৫

প্রবাসে বাঙালী

এবারকার 'দেশ' কাগজের (২ এপ্রিল, ১৯৭৭) আলোচনা বিভাগে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের চিঠিখানি পড়ে তাঁর সর্বভারতীয় মনোভাবের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় 'দৃষ্টিকোণ' বিভাগে 'প্রবাসে বাঙালী'র লেখক অমিতাভ ভট্টাচার্যের বাঙালী প্রীতি এবং বাঙালীয়ানার প্রতি আকর্ষণের মধ্যে একটা "উগ্র কলোনিয়াল মনোবৃত্তি"র গন্ধ কিভাবে খুঁজে পেলেন, জানি না। অমিতাভবাবুর লেখাতেই শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের একটি উক্তি রয়েছে—'...একটু দূরে থাকলে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে একটু বেশী চেনা যায়, বোধ হয় একটু বেশী অনুরাগও জন্মায়'। বোঝা গেল মীনাক্ষী দেবী বাংলাদেশকে বা বাংলার সংস্কৃতিকে সেই দূরত্ব থেকে কখনো দেখেননি। অনুমান করছি উনি রাজধানীর বাঙালী; আর সেইজন্যেই কলকাতার একটি নবীন বাঙালীর বাঙালীত্বের প্রতি তাঁর এত রাজকীয় তিরস্কার!

আমি নিজেও অমিতাভবাবুর দলে—অর্থাৎ আমি কলকাতার মেয়ে। স্বামীর চাকুরির খাতিরেই বর্তমানে দিল্লীতে প্রবাসী। আমাদের এই দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছি, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যে, বাংলা গান শোনার জন্যে, বাঙালী রান্নার স্বাদ পাওয়ার জন্যে মন যদি উতলা হয়, তাহলে নিজের ঘরের সীমানার মধ্যেই যতটা সম্ভব সেই পরিবেশ গড়ে নেওয়া ভালো। বাইরে খুঁজতে গেলে প্রাদেশিকতাবিরোধী, সর্বভারতীয় মনোভাবাপন্ন এক শ্রেণীর বাঙালীর সঙ্গে দেখা হবার এবং সংঘাত ঘটবার সম্ভাবনা থাকে পদে পদে। এরা কলকাতার নামে নাক সিঁটকে তোলেন, বাংলা পড়তে না জানাকে লজ্জার বলে মনে করেন না এবং কলকাতার বাঙালী দেখলে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব দেখান।

জীবিকার তাগিদে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক দিল্লীতে আছেন। দিল্লীতে কিছুদিন থাকলেই এটা দেখা যায় যে, তামিল, তেলুগু, মালয়ালী, পাঞ্জাবী এবং অন্যান্যরা নিজেদের ভাষা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতটা সচেতন। তাঁরা তাঁদের প্রাদেশিক পরিচয় নিয়েই দিল্লীর

মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। দিল্লীতে থেকেও এই সত্যটা না জানা সত্যি বিস্ময়ের।

সবশেষে আর একটি কথা সবিনয়ে বলতে চাই। আমার স্বামীর সর্বভারতীয় প্রশাসনের চাকরির দরুন আমাকে দিল্লী এবং ভারতবর্ষের অন্য দু একটি রাজ্যে ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু 'সর্বভারতীয় কাজে' যোগ দিতে হলে যে আগে নিজেদের প্রাদেশিক আত্মপরিচয় বিলুপ্ত করে দিতে হয়, এই খবরটি নতুন জানলাম!

মীনাক্ষী দেবীর মানসিকতা যদি অন্যান্যদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তাহলে বাংলার বাইরে বাঙালী সংস্কৃতি মুছে যেতে সময় লাগবে না।

সুদেষ্ণা বসাক
নিউ দিল্লী ২২

॥ ২ ॥

আমার লেখা 'প্রবাসে বাঙালী'র বিরুদ্ধে সমালোচনা করে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় যে চিঠি লিখেছেন (২ এপ্রিল) তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন থাকত না যদি সেটি এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মনোভাব না ব্যক্ত করত।

বাংলার শিল্প সংস্কৃতিকে অবাঙালী-দের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার মধ্যে লেখিকা 'উগ্র কলোনিয়াল মনোবৃত্তির' কি পরিচয় পেলেন বুঝতে পারলুম না। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষিত-সংস্কৃতিবান ব্যক্তির তো একান্ত কর্তব্য অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকেদের সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির পরিচয় ঘটানো। শিল্প-সংস্কৃতির এই বিনিময়ের মধ্যেই তো রয়েছে সর্বভারতীয় "কালচারাল ফিউসনের" ইঙ্গিত। অল ইন্ডিয়া সার্ভিস-এ যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই এর গুরুত্ব বোঝেন। অবাঙালীরা মুসৌরীর অ্যাকাডেমীতে 'শ্যামা' যেই চোখে দেখেছিল, আমরাও তেমনি মুগ্ধভাবে দেখেছিলুম কেরালার 'ওনাম', কিংবা তামিল কিংবা পাঞ্জাবীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো। এই ব্যাপারে 'উগ্র কলোনিয়াল মনোবৃত্তি' কিংবা 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' ইত্যাদি বিশেষণ-গুলোর প্রয়োগ দেখে সন্দেহ হয় লেখিকা ঐ কথাগুলোর অর্থ বুঝে লিখেছেন কি না।

মুশকিলটা হল, বাঙালীয়ানা ষোল আনা বজায় রেখেও যে সম্পূর্ণভাবে 'সর্বভারতীয়' হওয়া যায় এবং অবাঙালীদের কাছে শ্রদ্ধার আসন পাওয়া সম্ভব (অবাঙালীদের ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য)—এটি লেখিকা যেই শ্রেণীভুক্ত

তাদের অনেকেই হয় জানেন না কিংবা বিশ্বাস করেন না। 'সর্বভারতীয়' হওয়ার প্রচেষ্টায় যাঁরা বাঙালীয়ানা সর্বপ্রথম ত্যাগ করেন—এরকম ব্যক্তি যদি সংখ্যায় অল্প হতেন তা হলে দুঃখের কিছু ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙালীয়ানকে 'উগ্র বাঙালীয়ানা' বলা এবং তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত ব্যক্তির সংখ্যা প্রচুর। যে-কোন প্রদেশের লোক যখন জানতে পারে যে, সারাটা কর্মজীবনই তাকে বাইরে কাটাতে হবে, স্বাভাবিক কারণেই তার দুঃখবোধ হয়। এটি শুধুমাত্র বাঙালীর নয়, এটি প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রত্যেকটি স্বাভাবিক মানুষের মনোভাব। "পুরোনো আবাস ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে..." এ শুধু মহাকবির উক্তি নয়, এ এক হৃদয়-নিঃসৃত সত্য। সর্বভারতীয় কাজে যে নবীন প্রশাসকরা সদ্য যোগদান করে, স্বাভাবিক এই মানসিক বৃত্তিগুলো তাদের মধ্যে থাকবে না—লেখিকার এটি আশা করা কি চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় না? এ ছাড়া, অত্যন্ত হালকা সুরে শ্রীকাকুলামের এবং অন্যান্য জায়গার নানা ঘটনার যে বর্ণনা আমি দিয়েছিলুম, মনে হয় লেখিকা তার স্পিরিট-টি একেবারেই ধরতে পারেননি। ধরতে পারলে হয়তো তিনি "নবীন প্রশাসক" সম্পর্কে এতটা উদ্বিগ্ন হতেন না এবং দু'হাত তুলে (জানি না, লেখিকা এটিকেও আক্ষরিক অর্থে ধরবেন কি না) এত অবান্তর বিশেষণ শূন্যে ছুঁড়তেন না।

অমিতাভ ভট্টাচার্য
কলকাতা

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন' শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম কিস্তিতেই লেখিকা কিছু (প্রাসঙ্গিক কিনা বিচার্য) রাজনৈতিক কথাবার্তা নিয়ে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। লেখিকা পুরনো 'প্রবাসী'র পাতায় সারি সারি কম্যুনিস্টদের কর্তিত নরমুণ্ড শোভিত অনেক ছবি দেখেছেন। ওই ধরনের অনেক ছবি সত্যিই 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল কিনা সেই প্রশ্ন রেখে ওই সারি সারি কাটা নরমুণ্ড প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখব। চীনে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল অনেকদিন। সে যুদ্ধ অহিংস ছিল না, সহিংসই ছিল। আর এমন কথাও সত্য নয় যে এক পক্ষ সহিংস এবং অপরপক্ষ অহিংস ছিলেন। ভালমন্দের প্রশ্ন না তুলেই লেখিকাকে প্রশ্ন করব—পৃথিবীর ইতিহাসে কবে কোথায় কোন যুদ্ধে ন্যায়নীতির পতাকা উড়েছে। যুদ্ধ মানেই তো হিংসা আর হত্যা। যুদ্ধ ছাড়াই কিন্তু কম্যুনিস্ট দেশে বিধর্মীদের নয়, সধর্মী কমরেডদের সারি সারি নয়,—

[illegible] পাহাড় [illegible] উঠেছে। [illegible] গল্প নয় [illegible] ইতিহাস। এই নরমুন্ড শিকারে শুধু সাধারণ মানুষ নয়—দলের অনেক তথাকথিত প্রধান নেতার মাথা প্রায়ই গড়াগড়ি গেছে এবং আজও যাচ্ছে। 'প্রবাসী'র বিস্মৃত পাতার নরমুন্ডের ছবি নয়, স্বচক্ষে কাটা নরমুন্ডই আমরা দেখেছি—আমাদের দেশেই [illegible] কথা [illegible] বছর আগেই। সেই নরমুন্ড যাঁরা কেটেছিলেন তাঁদের [illegible] কিন্তু কম্যুনিস্ট-চীনের কাছ থেকেই আমদানী করা ছিল। লেখিকা মংপু আর কালিংপঙে বসে—আর একটা বই পড়ে তিব্বতের মানুষের কথা জেনে যে-সৃষ্টিকে [illegible]—তাঁর সেই শক্তির প্রশংসা করে [illegible]—একটা দেশে কষ্ট আর কিছু কুসংস্কার আছে বলেই সে দেশের স্বাধীনতা একজন শক্তিশালী প্রতিবেশী গ্রাস করবে এ কেমন ন্যায়নীতির লজিক?

সঞ্জয় রায়
কলিকাতা-৭

॥ ২ ॥

মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন' ২৬।৩।৭৭-এর দেশের পাতায় কিছুটা অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর জনৈক ক্যাপটেন (যিনি ১৯৬২র চীন-ভারত যুদ্ধে চীনে যুদ্ধবন্দী ছিলেন) এমন করে চীনকে চিনিয়ে দিলেন (মৈত্রেয়ী দেবীকে) যেটা সত্যি যুক্তিহীন। যুদ্ধ বন্দীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো হয় সেটা আগে জানতাম না। যুদ্ধবন্দীদের প্রতিকূল অবস্থাটা মৈত্রেয়ী দেবীর বোধ হয় জানা নেই; এটাও হয়ত জানেন না (হয়ত জানবার প্রয়োজন মনে করেননি) কত যে পদস্থ ভারতীয় অফিসার ও ভারতীয় সৈন্য (আসাম রাইফেলস সৈন্যবাহিনীর) প্রথম প্রথম যুদ্ধবন্দী হয়ে বন্দীশিবিরে যাবার পথে চীন সৈন্যের নৃশংস বেয়নেটের খোঁচায় প্রাণ হারিয়েছেন।

এটা গেল সামরিক লোকদের উপর; সাধারণ মানুষের উপর নগ্ন বর্বর অত্যাচার আমি নিজ [illegible] [illegible] প্রদেশে [illegible] এসেছি (১৯৬২)। [illegible] দেখেছি [illegible] ও অপর দুইজন [illegible] সমস্ত শরীরে চীনা সৈনিকদের [illegible] সাক্ষ্য ছিল। ও'রা ২৯ দিন বন্দী শিবিরে ছিলেন। ও'রা আরো বলেছিলেন, অত্যাচারের পর শিবিরের ডাক্তারদের দিয়ে ওদের ক্ষত জায়গা চিকিৎসা করা হত। আমি পাহাড়িয়া আদিবাসীদের কাছ থেকেও চীনা সৈন্যের অত্যাচারের কথা শুনেছি (কিন্তু নারীর উপর নয়)। আদিবাসীরা অতি দুঃখের সঙ্গে বলেছিল ওদের মোমফার (বৌদ্ধ মন্দির) দেবতা তুলা পারো ইতককে চীনা সৈনারা তুলপেটে লাথি মেরে হত্যা করেছিল। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তিনি কিছুটা রঞ্জিত করে লিখুন, অতিরঞ্জিত যেন করবেন না।

সিধু দত্ত
আগরপাড়া

॥ ৩ ॥

'অচেনা চীন' প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা আগ্রহ সহকারে পড়ছি। ২৬ মার্চ ৭৭ সংখ্যায় তার বক্তব্যের সারসত্যের মধ্যে কিছু কিছু বিতর্কের সূচনা করেছেন কিন্তু তিনি তা থেকে পাশ কাটিয়ে একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গির মধ্যে চৈনিক ভাষ্য পরিবেশন করেছেন। চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের মত বিষয়কে টেনে এনে সহানুভূতির সুরারোপে বিষয়টিকে লঘু করতে চেয়েছেন। সুরটা যত না যুক্তিগ্রাহ্য, ভাবাবেগের অভিব্যক্তি তা থেকে অনেক বেশী।

... [illegible] ... প্রয়োজনবোধে ... প্রয়োজন ... একটুও ... ”

কোন রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের উপর চড়াও হয় তখন তার প্রয়োজন বোধ আপন ইচ্ছা অনুসারেই হয়ে থাকে। অপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না। আর প্রয়োজন যেখানে, নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করে তখন ব্রিটিশ-কৃত সীমানা কেন, যে কোন সীমানায় যুক্তিই অচল। আমাদের ক্ষেত্রে যেটা সহজ হয়েছে, বন্ধুদের ক্ষেত্রে সেটা সহজ হয়নি।

চীন ভারত সংঘর্ষের সময় অনেক বুদ্ধিজীবী মহলে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। 'দেশ' পত্রিকায় সেদিন অনেক বুদ্ধিজীবী তাঁদের অভিমত জানিয়ে ছিলেন। সবাই যে একই সুরে কথা বলেছিলেন তাও নয়। অনেকে একদিন পরেই নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট দেশ অন্যদেশ আক্রমণ করতে পারে না। সেদিন তাদের অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী এই 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধার দলে ছিলেন না। ভালই হয়েছে তা হলে অচেনা চীনকে আজ আমরা চিনতে পেতাম না।

মগজ ধোলাই প্রসঙ্গের অবতারণা করে একটি ক্যাপটেনের জবানবন্দীতে আষাঢ়ে গল্পের আমেজ এনেছেন। নিচু পদের কোন সৈনিকের জবানবন্দী নিলে হয়ত শুনতে পেতেন ১৯৫৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের সেই লোমহর্ষক ঘটনা যা ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে। সেটি লেখিকাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। **A few chinese soldiers tied an Indian policeman to a horse's tail and dragged him all over the place to amuse themselves.**

রতন দাশগুপ্ত
ব্যারাকপুর

ঘর চাই

জেনেটিকস প্রসঙ্গে শ্রীমতী পুষ্প মিত্রের ধারণায় ত্রুটি রয়েছে। জেনেটিকসের কোন সূত্রই আজও প্রমাণ করতে পারেনি যে একটা species-এর একটা sex-এর বুদ্ধিবিকাশের পথ যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় বহুদিন ধরে, তাহলে পরবর্তীকালে সেই sex-এর বুদ্ধি বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। বরং নারী যে কর্মজগতে পুরুষের সমতুলনীয় তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের হেলেন কেলার, মেরী কুরী, পার্ল বাক, রেজিয়া সুলতানা, মার্গারেট থ্যাচার, লাই ক্যারল, আগাথা ক্রিস্টি, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ বহু মহিলা আছেন যাঁরা অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে অনেক কম সুযোগ পেয়েও

নিজেদের স্বাধীন কর্ম-জগৎ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে নিতে দ্বিধা করেননি।

আসলে যে কোন মানুষের বড় হওয়ার পেছনে থাকে অনলস পরিশ্রম আর ধৈর্য। অন্তত একটা ব্যাপারে মেয়েরা যে ছেলেদের ওপর অনায়াসে টেক্কা দিয়েছে সে ব্যাপারে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। সব কাজেই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী 'প্র্যাকটিক্যাল' ও ছেলেদের তুলনায় তাদের অহেতুক ভাবাবেগ কম। যদিও নারী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণ দৈহিক ও মানসিক পার্থক্যবশত নারী-পুরুষের কর্মজগৎ ঠিক এক নয়, তবুও পুরুষদের মধ্যে প্রত্যেকে যেমন নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্মজগৎ খুঁজে নিতে পারে, নারীকে সেরকম সুযোগ দেওয়া হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন নারীর স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও কর্মধারার পথ খুলে দেওয়া। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থকতা এখানেই। সেই জন্যেই ভারতীয় নাগরিকদের জাতীয় কর্তব্যের অন্যতম একটি হল: "....renounce any practice darogatory of the dignity of women".

কল্যাণ গুহ
খড়গপুর

দৃশ্যপট

দেশ ২৬ মার্চ ১৯৭৭-এ দৃশ্যপট প্রসঙ্গে নবারুণ গুপ্তের লেখা পড়ে আমার একটি কথা বলার আছে।

রাস্তার মাঝখানে বাস আটকে বাস সুদ্ধ সমস্ত লোককে নাসবন্দী করা না হল এটা কী বিশ্বাসযোগ্য? যদি এ রকম সত্যিই কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে হয়ে থাকে তাহলে তা উত্তর ভারতেই সীমিত থাকবে কেন? কেন্দ্র-সরকারের আদেশ উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের জন্য ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত নাসবন্দী করাতে হলে চাই শিক্ষিত ও দক্ষ ডাক্তার, এ কাজ তো পুলিশ বা মিলিটারীর দ্বারা হয় না যে তাদের হুকুম করলেই তা হবে। তা ছাড়া বাস ভর্তি লোককে জোর করে কিছু করানো যায় কী?

শুক্লা গোস্বামী
বারাণসী

'দেশ'-এর অঙ্গসৌষ্ঠব

আনন্দমেলা, আনন্দলোক, Sunday ইত্যাদি পত্রিকার কাগজ, ছাপা কতো সুন্দর, কিন্তু দেশ পত্রিকার সেই গতানুগতিক বিধবার বেশ। দেশ পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠবকে ঐ সব পত্রিকার পর্যায়ে নিয়ে যেতে আপত্তি কী? ঐ সঙ্গে দু চারখানা রঙীন ছবি? দাম একটু বেশী পড়ে, পড়ুক না।

সমীর পাল
শিবপুর, হাওড়া

বোদলেয়ার কলকাতায় এসেছিলেন

পূর্ণেন্দু পত্রী

॥ পটভূমি ॥

বোদলেয়ারের তখন টগবগে আঠারো। বয়সেই কৈশোর। মনে মনে যুবা। সদ্য পাস করেছেন বাকালোরিয়া অর্থাৎ বি-এ। তবে স্বচ্ছন্দে নয়। বিপিতা কর্নেল ওপিক তাঁকে প্যারিসের এক নামকরা লিসে অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়ার সময় অধ্যক্ষকে সগর্বে জানিয়েছিলেন—'মঁসিয়, একটা মূল্যবান উপহার এনেছি আপনার জন্যে।' সেটা ছিল ১৮৩৬। তিন বছর পরে সেই স্কুল থেকেই বিতাড়িত। পড়াশুনোয় যে খারাপ ছেলে তা নয়। বরং অসম্ভব বুদ্ধিমান। পুরস্কার পান ল্যাটিন আর গ্রীকে। পদ্য লেখেন ল্যাটিনে। কিন্তু অন্য বিষয় খাটতে রাজী নন। অলস এবং অবাধ্য। ইতিহাসকে বলেন অর্থহীন। কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের দিকে শকুনের মত নজর। সাঁৎ বোভ, গোতিয়ে এই সব অশ্লীল লেখা নিয়েই যত মাথাব্যথা। আর আচার-আচরণেও ক্রমশ ফুটে উঠছে এক ধরনের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা। অবশেষে একদিন কর্নেল ওপিকের হাতে পৌঁছল অধ্যক্ষের চিঠি। আপনার এ-ছেলেকে এখানে রাখলে আমাদের স্কুলের সুনাম ডুবে যাবে। চিঠিতে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। শোনা যায়, পরীক্ষার টেবিলে স্যাকার্টুকির নোট পাওয়া গিয়েছিল তাঁর কাছে।

কর্নেল ওপিক ছেলেকে নিয়ে এলেন সেখান থেকে। ভর্তি করিয়ে দিলেন এক প্রাইভেট স্কুলে। সেখান থেকেই বোদলেয়ারের বিএ পাশ। যে সপ্তাহে ফল বেরোল পরীক্ষার, সেই সপ্তাহেই ওপিকের পদোন্নতি ঘটল কর্নেল থেকে মেজর জেনারেলে। একই সঙ্গে নিজের এবং বিপিতার জীবনের এই সার্থকতায় ডগোমগো হয়ে বোদলেয়ার চিঠি লিখলেন ওপিককে।

"এই মাত্র খবরের কাগজে আপনার সুখবরটা পড়লাম। আমার পক্ষ থেকেও আপনাকে সুখবর দেওয়ার আছে একটা। আমি উত্তীর্ণ হয়েছি পরীক্ষায়, গতকাল বিকেল চারটেয়। সব মাঝামাঝি ধরনের। বাঁচিয়ে দিয়েছে ল্যাটিন আর গ্রীকের ভালো নম্বর। আপনার প্রমোশনের সংবাদে আমি সত্যিই খুশী। আর দশ জনের কাছ থেকে আপনি যে সব অভিনন্দন পাবেন তার চেয়ে এটা ভিন্ন। এটা হল পিতার প্রতি পুত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপন। এই সম্মান অনেক দিন আগে থেকেই পাওনা ছিল আপনার। আমার কথা শুনে কি মনে হচ্ছে, আমি একজন পরিণত মানুষের ঢঙে কথা বলছি? যেন আমি আপনার সমবয়সী অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ? না, মোটেই তা নয়। আসলে আমি শুধু জানতে চাই, আমি খুশী, ভীষণ খুশী।"

পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক বিরাট শূন্যতা, যার নাম ভবিষ্যৎ। যেন আঁচড়হীন এক প্রস্থ সাদা কাগজ। কি লিখবেন সেখানে? কি আঁকবেন? ভর্তি হবেন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে? নাকি চাকরি-বাকরি? মাসান্তে মাইনে। তারপর সুখের জীবন, সোনার সিঁড়ি।

না। বোর্ডিং জীবনের দীর্ঘকালীন খাঁচা থেকে বেরিয়ে কোন নতুন গারদে নয়। এবার চাই মুক্তি আর অবসর। বোদলেয়ারের মনের আয়নায় যখন এই রকম জলরঙের রঙ্গীন ছবি, তাঁর মা এবং বাবা তখন এঁকে চলেছেন অন্যরকম তৈলচিত্র।

বোদলেয়ার বুদ্ধিমান ভিতরে। দীপ্তিমান বাইরে। ওদিকে ডিউক অব অর্লিন্স আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, সুতরাং ওকে অনায়াসেই ভর্তি করে দেওয়া যাবে বৈদেশিক দপ্তরের চাকরিতে। সম্মানের চাকরি। মাথা খুঁড়লেও সব কপালে জোটে না।

বোদলেয়ারের বয়সী যে-কেউ যখন লাফিয়ে উঠতে পারতো রুপোলী চাঁদের মত গোলাকার এই সৌভাগ্যটিকে মুঠোয়

ধরবার জন্যে, বোদলেয়ার তখন উদাসীন কণ্ঠস্বরে জানিয়ে দিলেন, চাকরি-বাকরি সইবে না আমার ধাতে। জেনারেল ওপিক হতাশায় নীল। মা করলিন দ্যুফে রেগে লাল।

—তাহলে কি হতে চাস তুই?

বোদলেয়ার জানিয়ে দিলেন তাঁর জবাব।

—লেখক। ভিকটর হুগো, স্যাং-বোভ, মুসেং এ'রা যেমন লেখক, তেমনি। মা এবং বাবা দুজনেই আঁতকে উঠলেন উত্তর শুনে। এর চেয়ে বোদলেয়ার যদি বলতেন সার্কাসের ক্লাউন হতে চান তিনি, অনেক কম চমকাতেন তাঁরা। এই আঘাত কোনদিনই ভুলতে পারেন নি মা দ্যুফে। বোদলেয়ারের মৃত্যুর ৩০ বছর পরে এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

'কী সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন, যেদিন চার্লস প্রত্যাখ্যান করল আমাদের প্রস্তাব। আমাদের সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু চার্লসের ব্যাপারে আমাদের সংসার যেন ডুবে গেল হতাশায়। কী দুঃখ, কী অসম্ভব শোকের দিন! চার্লস যদি সেদিন তার বাবার কথায় সায় দিতো, তার জীবনটা হয়ে যেতো অন্য রকম।'

জেনারেল ওপিক মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন ব্যাপারটা নিয়ে। বোদলেয়ার এখনও অপরিণত। ভাবছে ফেলে-ছড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে মহা আনন্দ। বছর দুই সময় তাকে এখনও দেওয়া যেতে পারে, মুক্তির স্বাদ কতখানি তেতো সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝে নেওয়ার জন্যে। তারপর একদিন সে নিজেই ফিরে আসবে স্বাভাবিক জীবনে, বাস্তবের পৃথিবীতে।

অতএব আলগা হল ওপিকের হাতের শক্ত লাগাম। বোদলেয়ার চলে এলেন ল্যাটিন কোয়ার্টারে। যাদের রক্তে সাহিত্যের নেশা, যারা কবিতার জন্যে মাতাল, স্কুল জীবনের পালা চুকতে না চুকতেই তারা ছুটে আসে এখানে, উচ্ছৃংখল জীবন-যাপনের স্রোতে অবিরল সাঁতার কাটার লোভে। এখানে প্রত্যহ সাহিত্যের আসর, কাফের আড্ডা, সন্ধ্যেয় বল নাচ। এখানে বান্ধবীদের হাত ধরে ফুটপাথ বদল করতে করতে হেঁটে যায় উল্লসিত ভীড়। তদের কালো ভেলভেটের টুপিতে গুচ্ছে লাল রিবনের গুচ্ছ। তাদের উচ্চকিত হাসি আর কলরবে ল্যাটিন কোয়ার্টারের শুকনো গাঙে যেন বন্যার জোয়ার। বোদলেয়ার যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই শুনে আসছেন এই স্বর্গ-রাজ্যের সংবাদ। এই তোলপাড় সমুদ্রের বিশদ বিবরণী। এখন তিনি নিজেই হয়ে গেলেন তার একটা ঢেউ। ল্যাটিন কোয়ার্টারে বোদলেয়ারের দিনগুলো যেন প্রজাপতির পাখা। যেমন রং‍ে, তেমনি চঞ্চল। নাচ-গান, পান-ভোজন,

সাহিত্যের তর্ক-বিতর্ক এই দিয়ে মোড়া। বন্ধু পেয়েছেন দুজনকে। প্রেরো আর লেভাভেসিয়ো। তিনজনে মিলে অভেদ আত্মা। এক সংগে চলে সাহিত্য আলোচনা, একজনের কবিতা বাকী দুজনকে না শোনালে কারো শান্তি নেই।

ল্যাটিন কোয়ার্টার আরও দুটো উপহার তুলে দিলো তার হাতে। একটা চিত্রকলা সম্পর্কে আগ্রহ। আরেকটা প্রেম।

১৮৪০। লুভরে গিয়ে প্রথম দেখলেন দেলাক্রোয়ার প্রদর্শনী। সেই থেকে শুরু হল চিত্রকলার উৎসাহ। পরবর্তী জীবনে সামগ্রিকভাবে চিত্রকলা আর বিশেষভাবে দেলাক্রোয়ার প্রতি তাঁর যে বিপুল আগ্রহের প্রকাশ ঘটবে, অজস্র রচনার মধ্যে, তারই প্রথম অঙ্কুর দেখা দিল ঐ সময়ে।

অতঃপর প্রেম। ইতিমধ্যে তিনি বেশ পাকা করে তুলেছেন আফিম আর সিদ্ধির নেশাটাকে। আর সেই সময়ে তাঁর তরুণ জীবনের দরজায় এসে কড়া নাড়ল একটি ট্যারা মেয়ে, যার নাম লুসেৎ। এই লুসেৎ-ই তাঁর জীবন অথবা শরীরকে উপহার দিল সেই বিকৃত ব্যাধি, যা একদিন হয়ে দাঁড়াবে তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

এই প্রসংগে মনে পড়ে যায়, ফরাসী দেশের শিল্পকলার আর এক ঈশ্বরকে। জাঁ ককতো। তিনিও স্কুল-পালানো ছেলে। তিনিও স্কুল থেকে বিতাড়িত, অসৎ আচরণ এবং অক্ষম অধ্যয়নের অপরাধে। আবার ঠিক বোদলেয়রের মতই বুদ্ধিমান, পাঠ্যক্রমের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তিনিও উচ্চশিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন প্রাইভেট স্কুল থেকে। তিনিও অপরিণত বয়সে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক রমণীর স্নেহ-ক্রোড়ে। সেই রমণীটি ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। যার খবর শুনে ককতো জননী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এই বলে —হায়! শেষকালে কিনা একটা বুড়ো মেয়ে-মানুষের সংগে!

বোদলেয়ারের সংগে ককতোর কৈশোর-কালীন জীবনের তফাত কেবল একটা জায়গায়। বোদলেয়ার যা কিছু করেছেন সবই নিজের নামে, স্বপরিচয়ে। ককতো বেনামীতে। একজন সহপাঠী মারা গিয়ে-ছিলো জলে ডুবে। ককতো তার পরিচয় পত্রটাকেই নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন কিছুদিন। তারই বেনামীতে বোহিসেবী জীবনের যত কিছু বারণ-না-মানা খেলা-ধুলো।

১৮৪০ এর ডিসেম্বর। সেদিন প্যারিসের রাজপথে প্রবল ভীড়। লুই-ফিলিপের ছেলে দেশে ফিরছেন নেপো-লিয়নের ভস্মাধার নিয়ে। দুই অন্তরংগ বন্ধুর সংগে বোদলেয়ারও সেদিন ভীড়ের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্ট দাঁড়িয়ে। শোভাযাত্রা শেষ হলে তিনবন্ধু আর পা বাড়াল না ল্যাটিন কোয়ার্টারের দিকে। পা বাড়াল বোদলেয়ারের নিজের বাড়ির দিকে, যেখানে থাকেন তাঁর মা-বাবা। সেদিন দুই বন্ধুকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বোদলেয়ার।

মাদাম ওপিক তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন নিজের সম্ভ্রান্ত ব্যবহারে। বসতে দিলেন সাজানো ঘরে। খেতে দিলেন সুস্বাদু খাদ্য। পুত্রের বন্ধু বলেই মমতায় বিগলিত তিনি। কিন্তু তখনও অনুমান করতে পারেন নি, তার মোহভংগ হবে কত দ্রুত।

ঘরের মধ্যে বোদলেয়ার গল্প-গুজব, হাস্য-পরিহাস করছিলেন তাঁর বন্ধুদের সংগে। তারই কিছু টুকরো কথা কানে এসে গেল মাদাম ওপিকের। শুনে শিউরে উঠলেন তিনি। একি তাঁর ছেলের মুখের কথা? নাকি তাঁর ছেলের মুখে ভর করেছে কোনো অপদেবতা? ধর্মের বিরুদ্ধে অশ্লীল, অমার্জিত ভংগীতে কথা বলছে সে। পাপ এবং দুর্নীতির পক্ষে সরব সমর্থন তার। বন্ধুদের অংগ-ভংগী, আচার-ব্যবহার নোংরা, ভদ্রতাহীন। চার্লস তাহলে ধ্বংসের পিচ্ছল পথে তলিয়ে যেতে বসেছে নাকি?

তখুনি স্বামীর কাছে কিছু ভাঙলেন না। স্বামীর কানে পৌঁছলে আর রক্ষে থাকবে না। তিনি গোপনে যোগাযোগ করলেন পরিবারের আইনজ্ঞ ও পরামর্শ-দাতা আসেলের সংগে। বোদলেয়ারের বাবদে গচ্ছিত টাকা-পয়সারও হিসেব নিকেশের ভার ছিল তাঁরই হাতে। আসেলকে তিনি পাঠালেন ছেলের কাছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি এখনো ফেরানো যায় পাঁকের তলা থেকে।

বোদলেয়ার সব শুনলেন। কিন্তু কানে তুললেন না। তাঁর তখন সেই বয়স, যখন যে-কোন সুপরামর্শই পচা খাবারের মত পরিত্যাজ্য।

আর লুকোতে পারলেন না মাদাম ওপিক। সব জানালেন স্বামীকে।

জেনারেল ওপিক প্রয়োজনে কঠোর। তিনি স্থির করলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কি করা

যায়? ভাবতে ভাবতে মাথায় এল, প্যারিসের বাইরে, কোনো দূরে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে ওকে। মাদামও রাজী হয়ে গেলেন প্রস্তাবে। হ্যাঁ ঠিকই, প্যারিসের এই নোংরা বাতাস থেকে তাকে যদি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে অন্য কোন স্বাস্থ্যকর দেশের খোলা-হাওয়ায় কিছু দিন রাখা যায়, মাথার পোকাগুলো ঝরে যাবে। কোথায়, কোন দেশে পাঠানো হবে তাহলে? দেশ এবং জায়গা স্থির হয়ে গেল। ভারতবর্ষ কলকাতায়।

বোদলেয়ারকে জানানোর আগে তিনি নিজের ছেলেকে খবরটা দিলেন আগে, চিঠির মারফৎ।

'চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে তোমার ভাইকে বাঁচানোর সময় ঘনিয়ে এসেছে এখন। তার স্বভাব-চরিত্র চাল-চলন সবই এখন জানা হয়ে গেছে আমার প্রায় পুরো-পুরি। বিপদটা খুব ছোট মাপের নয়। তবে এখনো চিকিৎসার সময় পেরিয়ে যায় নি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে সব বলবো, কি ধরনের মানসিক এবং শারীরিক অধঃ-পতন ঘটেছে তার।

'আমার মতে, শুধু আমার নয়, আমাদের পরিবারের পরামর্শদাতাদের মতেও, তাকে এখুনি প্যারিসের পিছল রাস্তা থেকে সরিয়ে আনা দরকার। তারাও আমাকে জানিয়েছে, দূর সমুদ্র যাত্রায়, ভারতবর্ষের দিকে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারলে, নতুন দেশের পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় সে সুস্থ হয়ে উঠবে। তার মতিগতির পরিবর্তন ঘটবে অন্য দেশকে জানার মধ্যে দিয়ে। সে হয়তো কবি হিসেবেই ফিরে আসবে; কিন্তু এমন একজন কবি যার প্রেরণা নয় প্যারিসের নালা-নর্দমা।'

জেনারেল ওপেক চাইলেন একটা ছোট-খাট মন্ত্রণা-সভা গড়তে। তার কারণ বোদলেয়ার এখনো অপরিণত। সুতরাং নিজের টাকা-পয়সার উপর এখনো তার দখলদারি জন্মায় নি। আর অন্যদিকে তার এমনই উড়নচণ্ডে খরচ যে, এর মধ্যে এদিকে ওদিকে দেনা করে বসেছে প্রায় তিন হাজার ফ্রাংকের মত।

ভারতবর্ষে যেতে খরচ পড়বে প্রায় চার হাজার ফ্রাংক। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল সে টাকাটা খরচ করা হবে বোদলেয়ারেরই নিজস্ব তহবিল থেকে। জেনারেলের পক্ষে আর কানাকড়ি খরচ করা সম্ভব নয়। কেননা তাঁকে ইতিমধ্যেই শোধ করতে হয়েছে চার্লসের যা-কিছু দেনা, নিজের পকেট থেকে।

আগে মেঘের গন্ধ পেলে এমন বজ্রাঘাতে স্তম্ভিত হতেন না বোদলেয়ার। সংবাদ শুনেই খেপে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। আমি কি এখনো সেই স্কুলের ছেলে রয়ে গেছি নাকি? আমার সঙ্গে এক বিন্দু পরামর্শ না করে কেন তাহলে নেওয়া হল এমন সিদ্ধান্ত! না, আমি প্যারিস ছেড়ে একপাও নড়ছি না কোথাও।

তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল। তার পিছনে জেনারেল ওপিকের মিষ্টি-কথার চতুরালি ছিল যতখানি, তার চেয়ে বেশী ছিল নেরভালের পরামর্শ অথবা প্রেরণা। এখানে নেরভালের সঙ্গে আমাদের অল্প একটু পরিচয় হয়ে যাওয়া দরকার।

'জেরার্দ' দ্য নেরভাল, কুড়ি বছর বয়সে প্রথম খণ্ড ফাউস্টের আশ্চর্য অনুবাদ প্রকাশ করলেন। এই অনুবাদ বিষয়ে গ্যেটে নেরভালকে লেখেনঃ 'আপনার অনুবাদ পড়ে আমার অভূতপূর্ব আত্ম উপলব্ধি ঘটেছে।'

...একুশ বছরের যুবক পেত্রাস-বরেল (Petrus Borel)-এর নেতৃত্বে গোতিয়ে, নেরভাল ও অন্যান্য তরুণ কবিরা 'ছোটো গোষ্ঠী' (ল পেতী সেনাকল) গঠন করলেন। (প্রাচীনপন্থী লেখকদের ছিল 'গোষ্ঠী' ল সেনাকল; তা থেকে বিচ্ছেদ বোঝানোর জন্য এই নামকরণ।) সাহিত্যে ও রাজনীতিতে নিজেদের চরমপন্থী বলে ঘোষণা করলেন এঁরা. কিন্তু তারুণ্যের প্রত্যক্ষতম পরিচয় দিলেন বেশ, প্রসাধন ও ব্যবহারের অভি-নবত্বে।...পেত্রাস বরেল বাড়ি বদল করে, তাঁর আড্ডার নাম দিলেন 'তাতার শিবির', গোষ্ঠীর নতুন নাম হল 'তরুণ ফ্রান্স'।

'তরুণ ফ্রান্স' নিজেদের ঘোষণা করলেন লুই-ফিলিপের ও ফিলিস্টাইনদের শত্রু বলে, সমাজের কোনো শাসন তাঁরা মানবেন না, সব প্রথা ভাঙবেন। ...সভেরা মধ্যযুগীয় পোশাক পরে মেঝেতে বসে, করোটিতে সুরাপান করেন। এই ফ্যাশনের প্রবর্তন করেন লর্ড বায়রন, ফ্রান্সে সেটি চরমে নিয়ে যান নেরভাল, যিনি একটি করোটি হাতে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে সগর্বভাবে ঘোষণা করতেন যে এটি তাঁর বাবার

(অথবা মার) মাথার খুলি, সংগ্রহ করার জন্যে হত্যা করতে হয়েছিলো।'

—বুদ্ধদেব বসু

নেরভাল ছিলেন অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী। ঘুরেছেন অনেক জায়গায়। অল্প কিছুদিন আগে বেড়িয়ে এসেছেন অস্ট্রীয়া থেকে। পকেটে পয়সা নেই, তবুও। নেরভাল বোদ-লেয়ারকে বোঝালেন, ভুল করেও এমন সুযোগ ছেড়ো না। এতে একটা সুবর্ণ সুযোগ। ভারতবর্ষ, সে তো মানুষের স্বপ্নের দেশ। সৌন্দর্য সুষমার শেষ নেই সেখানে। প্রাচ্য দেশ, সে তো আমার কাছে স্বর্গের মত লোভনীয়।

বোদলেয়ার রাজী হয়ে গেলেন।

১৮৪১। ৯ জুন। জাহাজের নাম 'দক্ষিণ আকাশ'। গন্তব্য, কলকাতা। যখন প্রস্তুতি চলেছে যাত্রাপর্বের, সেই সময়ে জেনারেল ওপিক একটা চিঠিতে (প্রাপকের নাম জানা যায়নি) লিখছেন—

'বিশেষভাবে আমার সৎ-ছেলের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তার মাকেও অসুখী করে তুলেছিল কিছু ঘটনা, যা অনেকদিন যাবৎ আমার কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি শক্ত হাতে সবটা সামলাতে পেরেছি। চার্লস এখন প্যারিসের বিষাক্ত বাতাসের বাইরে। আমার যুক্তি তর্কের কাছে মাথা নুইয়েছে সে। এখন সে বর্দো-য়। সেখান থেকে এ মাসের দশ তারিখে চাপবে কলকাতামুখো জাহাজে। এটা কুড়ি অথবা পনেরো মাসের একটা বেড়ানো। খুবই ভাগ্য ভাল আমাদের যে, জাহাজের যিনি ক্যাপটেন, তিনি ইম-পিরিয়াল নেভির একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। চার্লসের কোনরকম অসুবিধে হবে না, এ বিষয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নিজের ছেলেদের যেমন চো[illegible] দেখেন, সেইরকমই দেখবেন [illegible]। তাঁর নিজের ছেলেরাও ঐ জাহাজে থাকছে। যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে চার্লস খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে আমাদের। আমর তাকে যে নতুন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছি, মনে হচ্ছে সে ভালভাবেই উতরে যাবে।'

॥ ভ্রমণ ॥

বেশ একটা তাজা মন নিয়েই জাহাজে চেপেছিলেন বোদলেয়ার। নেরভাল বলেছে, ভারতবর্ষ স্বর্ণ দেশ। এই দেশের আকাশ এবং প্রকৃতি নিশ্চয়ই আমাকে জোগান দেবে কবিতার অফুরন্ত উপমা এবং উপকরণ। পনেরো অথবা কুড়ি মাস পরে যখন প্যারিসে ফিরবো, তখন আমি পৃথিবী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অন্য এক মনুষ।

কিন্তু জাহাজের মধ্যে একটা কি দুটো রাত পোয়াতে না-পোয়াতেই মনের মানচিত্র

বদলে যেতে লাগল তাঁর। বন্ধুদের হারিয়ে, সাহিত্যের মুখরিত আড্ডা হারিয়ে এ কোথায় ভেসে চলেছি আমি? আর কাদের সঙ্গে? কারা এরা? না বোঝে সাহিত্য না শুনেছে কোন আধুনিক লেখকের নাম? সাহিত্য ছাড়া আর কি আছে আমার, যা নিয়ে আমি মিশতে পারি অন্যের সঙ্গে?

সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বাবার পুরনো বন্ধু, জাহাজের ক্যাপটেন সালিজের উপর। যেন ক্যাপটেনই এই সব ষড়যন্ত্রের মূলে। তাই ক্যাপটেনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই যেন তিনি উঠে পড়ে লাগলেন জাহাজের প্রত্যেকটি যাত্রীর কাছে নিজের বিদ্বেষ-বিরক্তিটা পৌঁছে দিতে। ঐ জাহাজেই ছিল ক্যাপটেনের ছেলে। বোদলেয়ারের সমবয়সী। ক্যাপটেন চেয়েছিলেন, ওদের মধ্যে গড়ে উঠুক বন্ধুত্ব, সমবয়সের ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদানে। বোদলেয়ারের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেটা। কেননা বয়সের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত তিনি। তাঁর মনের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার ইমারত এই বয়সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে ঊর্ধ্বমুখী। শুধু মাত্র সমবয়সী বলেই কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হবে, এমন ধারণা তাঁর কাছে মূর্খতারই আরেক নাম।

জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীই মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন। চলেছে নিজেদের ছেলেপুলে নিয়ে। বোদলেয়ার তাদের সঙ্গে শুরু করে দিলেন নির্মম ঠাট্টা-বিদ্রূপ। ধর্ম বলতে তারা যা বোঝে, পাপ বলতে তাদের যা ধারণা, সামাজিক ন্যায়-নীতি সম্বন্ধে জন্মাবধি তাদের যা বিশ্বাস, সব কিছুই বিদ্ধ হতে লাগল বোদলেয়ারের বেপরোয়া অগ্নিবাণে। শিউরে উঠলেন বয়স্ক যাত্রীরা। সামান্য একটা অপরিণত ছেলের মুখে কী অকথ্য উক্তি এসব! নিজেদের ছেলেদের চরিত্র রক্ষার তাগিদে তাঁরা তাদের সাবধান করে দিলেন, কেউ মিশোনা ঐ অকাল-পক্কের সঙ্গে।

বিশাল জাহাজে বোদলেয়ার একা। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা তাঁর মনে নিয়ে এল অনুতাপ। সহযাত্রীদের সঙ্গে এতখানি দুর্বিনীত আচরণ উচিত হয়নি তাঁর। মনে যখন বিবেকের এই কামড়, মুখে তখন অহংকারী ভঙ্গী। আর সেই সময়ের অগাধ নিঃসঙ্গতা তাঁকে কেবলই মনে করিয়ে দিতে থাকে প্যারিসের স্মৃতি। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় তখন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির।

তাঁর সবচেয়ে সার্থক এবং সুখ্যাত জীবনীকার স্টারকির মারফতে আমরা খবর পাই, বোদলেয়ারের মৃত্যুর পরে লেখা ঐ জাহাজেরই জনৈক সহযাত্রীর একটি রচনার:

"It describes his association with the ardent Negro nurse of a creole family returning home—his first experience of a coloured

women. However, he seems to have wearied of her passionate pursuit, and the captain was obliged to request her to remain in her cabin."

কেপ অব গুড হোপ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে পোঁছে সহসা জাহাজ পড়ল ঝড়ে। ভাঙল মাস্তুল। জাহাজের প্রায় ডুবি-ডুবি অবস্থা। এই সময়ে বোদলেয়ার নাকি দেখিয়েছিলেন অসাধারণ সাহসিকতা। জাহাজটাকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর পিছনে নাকি অনেকখানি বিচক্ষণ তৎপরতা জুগিয়েছিলেন তিনি। কোনমতে জাহাজ এসে ভিড়ল মরিসাসের বন্দরে। বোদলেয়ারের জন্যে শহরের ভিতরে একটা হোটেল ভাড়া করে দিয়ে ক্যাপটেন ব্যস্ত হয়ে গেলেন জাহাজ-মেরামতির কাজে। বোদলেয়ার খুঁজতে লাগলেন দুটো জিনিস। প্রথমটি হল, বই। দ্বিতীয়টা হল, স্থানীয় সাহিত্যিকদের আস্তানা। খুঁজতে খুঁজতে পরিচয় হয়ে গেল ব্রাগার্দ দম্পতীর সঙ্গে।

দিনরাত সেখানেই চলল অবিরল সাহিত্য আলোচনা। জাহাজের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে এখন পেয়েছেন মুক্ত হাওয়ার স্বাদ। ফুটন্ত কেটলির জলের মত মনের ভিতর-কার সমস্ত রাগ, ঘৃণা বিদ্বেষ, যা তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক অনিবার্য হিংস্রতার দিকে, সব এখন জুড়িয়ে বরফের মত শীতল। ব্রাগার্দ দম্পতীর অবারিত আতিথ্য আর মাদাম ব্রাগার্দের মাতৃবৎ স্নেহ, বোদলেয়ারকে ফিরিয়ে দিল মনের প্রশান্ত। ব্রাগার্দ দম্পতী মুগ্ধ হলেন তাঁর বিস্ময়কর বাকাচ্ছটায়। তাঁরা ভেবে নিলেন ইনি নিশ্চয়ই ফরাসী দেশের একজন খ্যাতনামা কবি। বোদলেয়ারের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানত কবিতা। এবং তিনি নিজেও একদিন কতবড় কবি হতে চান, তার জল্পনা-কল্পনা। মুগ্ধ ব্রগার্দ দম্পতী অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অল্পবয়সী ছেলের আত্মায় পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এমন পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ এসে জমা হল কিভাবে?

পাম গাছের ছায়ার নীচে মরিসাসের দিনগুলো কানায় কানায় ভরে উঠেছিল এক তরল সুখে। কিন্তু মরিসাসের জন্যে বরাদ্দ ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের বিশ্রাম। তিন সপ্তাহ ফুরিয়ে এল যেন এক নিমেষ। সুখের দিনই সবচেয়ে দ্রুতগামী। হোটেলের দরজায় একদিন কড়া নাড়লেন ক্যাপটেন। চলো, জাহাজ তৈরী কলকাতায় যাওয়ার জন্যে।

আবার জাহাজ? আবার সেই সব যাত্রীদের সঙ্গে ওঠ-বোস, যাদের হৃৎস্পন্দনে সাহিত্যের সামান্যতম অনুভূতিটুকুও অনুপস্থিত? ক্যাপটেনকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বোদলেয়ার জানালেন:

—না। আর একপাও কোথাও নড়ছি না। রাজি নই আমি। আমাকে এখুনি পাঠিয়ে দিন প্যারিসে, যে কোন ফিরতি বোটে।

ক্রুদ্ধ ক্যাপটেন জানালেন, তুমি যদি এরকম অসঙ্গত আচরণ কর, তাহলে ফিরে যাওয়ার জন্যে একটা পাই-পয়সাও আমি দেব না তোমাকে। বোদলেয়ার জানালেন:

—চাই না পয়সা। এই মরিসাসে থেকেই, আমি আমার প্রতিভার জোরে যেভাবে পারি উপার্জন করে নেবো প্যারিস পারানীর কড়ি।

না-যাওয়ার পক্ষে আরো একটা মোক্ষম যুক্তি খাড়া করলেন তিনি। আমার বাবা-মা চেয়েছিলেন কিছুদিন প্যারিস ছেড়ে আমি দূরে থাকি। এই তো থাকা হল। তাঁদের ইচ্ছা তো পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ফিরতে দোষ কি?

ক্যাপটেন তবুও নাছোড়বান্দা। তাঁর ভয় অন্যত্র। জেনারেল ওপিক যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে তিনি পেয়ে যেতে পারেন পদমর্যাদাসম্পন্ন কোনো একটা ভাল কাজ। অসন্তুষ্ট হলে সে ভরসা ক্ষীণ। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত তৈরী হল একটা সন্ধি প্রস্তাব। বোদলেয়ার এখন ক্যাপটেনের সঙ্গে জাহাজে চেপে যাবেন রেয়ুনিয়ঁ পর্যন্ত। সেখান থেকে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে প্যারিস মুখো জাহাজে।

তাই ঘটল। রেয়ুনিয়ঁতে কয়েকটা দিন কাটাতে হল জাহাজের অপেক্ষায়। সেই ফাঁকে লিখে ফেললেন একটা সনেট, মাদাম ব্রগার্দ-এর জন্যে। কিন্তু দ্বিধায় পড়লেন সেটাকে সরাসরি তাঁর কাছে পাঠাতে। অবশেষে মসিয়ঁ ব্রাগার্দকেই লিখলেন একটা চিঠি। সেই চিঠির ভিতরেই রইল সনেটটা।

"যখন মরিসাসে ছিলাম, আপনি আমাকে আপনার স্ত্রীর জন্যে একটা কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। আপনাদের ভুলিনি। কোন এক রমণীকে মনে রেখে কোনও এক তরুণের লেখা কবিতাটিকে সেই রমণীটির কাছে পৌঁছে দেবার সবচেয়ে সঠিক এবং শালীন মাধ্যম হওয়া উচিত তাঁর স্বামী। তাই সেটি

আপনার কাছেই পাঠাচ্ছি। শোভন মনে হলে তাকে দেখবেন।

"আপনাদের ছেড়ে এসে একদিনও ভুলতে পারিনি আপনাদের স্মৃতি। জীবনে কোনদিনও ভুলব না আপনাদের সঙ্গে কাটানো অপূর্ব সকালগুলোকে। যদি প্যারিসকে এতখানি ভালবাসা আগে থেকেই দেওয়া না থাকতো, যতদিন খুশী রয়ে যেতাম আপনাদের সঙ্গে। আরো প্রচুর ভালবাসা পেতাম আপনাদের কাছ থেকে। আর প্রমাণ দিতাম আমাকে আপনাদের যতটা অদ্ভুত বা বিচিত্র মনে হয়েছে, আমি তা নই।

এই হল আমার সনেট :

সুগন্ধী দেশ, সূর্যকিরণে স্নাত
সেখানে দেখেছি, বেগনী গাছের ঘন
চাঁদোয়ার নীচে
পামেরা ঝরায় তোমার দুচোখে
আলস্যঘন সুখ
পৃথিবী জানে না ক্রেয়লের এক রমণী
কী রূপবতী।

উষ্ণ এবং শ্যামাঙ্গী, তার কালো-
রূপখানি জানে
কীভাবে মাথাটি হেলিয়ে বসবে
অভিজাত সুষমায়
দীর্ঘ এবং সুঠাম তনুটি হাঁটে
শিকারীর মত
হাসিতে শান্তি, দু নয়নে বরাভয়।

তোমার রূপের যোগ্য ভুবনে, হে রমণী,
যাবে নাকি?
সবুজ লোয়ারে অথবা যেখানে
চিরবহমান সেন?
প্রাচীন প্রাসাদ প্রাণ ফিরে পাবে
তোমার জ্যোৎস্না পেলে।

কবির হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবে শত
সনেটের সুর
ছায়াতরুমূলে, তোমার চোখের মায়াবী
স্পর্শ পেলে
কবি হয়ে যাবে কেনা-গোলামের চেয়ে
আরো ক্রীতদাস।

আশা করি ফ্রান্সে দেখা হবে।
মাদামের জন্যে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

উপরের সনেটটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু আমাদের জানিয়েছিলেন—

"এটি বোদলেয়ারের প্রথম যৌবনের রচনা; তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের প্রথম প্রসূন। যাঁর উদ্দেশে লেখা হয়েছিলো, তিনি ছিলেন মরিসাস দ্বীপের বাসিন্দা। সেখানে তিন সপ্তাহ অবস্থানকালে এই মহিলা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে বোদলেয়ারের বন্ধুতা হয়। মহিলাটি জাতে ফরাসি কিন্তু মরিসাসের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের আখ্যাও ক্রেয়ল।"

১৮৪১। ৪ নভেম্বর। রেয়ুনিয়ঁ থেকে জাহাজ ছাড়ল প্যারিসের দিকে মুখ করে।

॥ প্রত্যাবর্তন ॥

যতটা আশংকা ছিল, তার চেয়ে বেশী কিছু ঘটল না প্যারিসে পা দিয়ে। বাবা এবং মা দুজনেই বিক্ষুব্ধ। বোদলেয়ার এবং তাঁদের মাঝখানে ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে খাড়া হয়ে উঠল একটা শক্ত দেয়াল, সম্পর্কহীনতার অথবা রূঢ় সম্পর্কের। আর এই চিড়-খাওয়া পারিবারিক জীবনটাকে ভুলবার জন্যেই তিনি বেছে নিলেন এক উপায়। কাফেয় বসে, কফির আসরে বন্ধুদের কাছে অনর্গল প্রাচ্য-ভ্রমণের গল্প বলে যাওয়া।

চিরকালই বক্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি-

মান। বন্ধুমহল চিরকালই তাঁর সঙ্গপিয়াসী, ঐ একটি কারণে। তৎক্ষণাৎ, এ কবার মহফিলের মধ্যে, এক ঝলক, অপরূপ কোন রূপকথা অথবা ভয়ংকর কোন উপাখ্যান অথবা পৈশাচিক কোনো দৃশ্য রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল পরিমাপহীন। বয়স্কদের মনে ঘা মেরে চমকে দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত আমোদ পেতেন তিনি। মুখে সবসময় ভদ্রতার ছাপ থাকত না। পায়ের উপর পা।

—দেখো, আমি হলাম অবসরপ্রাপ্ত রাজাকের ছেলে। সুতরাং আমি কি বলছি, তা আমি জানি।

—এটা সেই সময়ের কথা, যখন বাবাকে খুন করলাম আমি।

আচ্ছা, ম্যাককে শ চীজটা খেলাম, একটা বাচ্চা ছেলের মাথার ঘিলুর গন্ধ পাচ্ছ কি না জানতে...

এই রকমই ছিল তাঁর দৈনিক কথোপকথনের ধারাবাহিকতা।

একদিন কথা বলতে বলতেই চোখ পড়ে গেল পাশের টেবিলের এক সুন্দরীর দিকে। মাঝপথে গল্প থামিয়ে তিনি ঘুরে তাকালেন মহিলাটির দিকে। বিনয় যতখানি মোলায়েম হতে পারে, সেইভাবে তিনি মহিলাকে বললেন :

—মাদমোয়াজেল, সোনালী ধানের গুচ্ছের মত দেখতে আপনাকে। আমার আলোচনা আপনি শুনছিলেন গভীর আগ্রহে। আপনি কি জানেন, এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি করতে? দাঁত দিয়ে কামড়ে খাই আপনার সাদা মাংস। আর আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে জানাই কীভাবে ভালবাসবো আপনাকে। আপনার হাত দুটোকে শক্ত করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেবো আমার ঘরের কড়িকাঠে। তারপর আপনার পায়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসবো পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে। চুম্বন করবো আপনার শ্বেত-শুভ্র পা দুখানি।

মহিলাটি অবশ্য সবটা শুনতে পান নি। কড়িকাঠ পর্যন্ত শুনেই টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন প্রাণভয়ে। কিন্তু বোদলেয়ারের বন্ধুরা ওঠেনি। তাঁরা শাশ্বত শ্রোতা।

প্রিয় বন্ধু আসলিনোকে শুনিয়ে বোদলেয়ার এখন শুরু করলেন তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের বিবরণ।

—জানো তো কলকাতায় গিয়েছিলাম আমি। শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষের অনেকখানি ভিতরেও চলে গিয়েছিলাম একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে জুটে গিয়ে। অবশ্য অনেক নির্যাতনও সইতে হয়েছে যাত্রীদলের হাতে। একবার তো পড়েছিলাম জলদস্যুদের হাতে। যা উৎপীড়ন সইতে হয়েছে। কিছুদিন তো কেটেছে নাবিকগিরি করে।

বন্ধুরা শোনে। এবং বিশ্বাস করে। আর একই কাহিনী বলতে বলতে বদলে যায়। ভীষণ হয়ে ওঠে ভীষণতর, শ্বাস রোধকারী। আবার রোমাঞ্চকর বর্ণনাও হাজির হয়। ঝলমলে পোশাক পরে, যে পোশাক প্রতিদিনই নতুন।

"These tells were all believed by his friends and many of them were repeated subsequently as true facts by biographers. These stories which he told were like those told by Sinbad the sailor or Ulysses when at last he came home to Ithaca. Simple and gullible young men like Banville beleved every word that fell from his lips, and he has related some of them in his 'Souvenirs' as authentic." Starkie

বাঁভিল লিখেছেন, ভারতবর্ষ থেকে আশ্চর্য সব রান্না শিখে এসেছিলেন তিনি। সে সব যখন বোঝাতেন, তাঁর চোখ মুখ ঝলসে উঠতো এক অপরূপ দীপ্তিতে। একবার এক আফ্রিকান পরিবারে কিছুদিনের জন্যে ছিলেন পেয়িংগেস্ট হিসেবে। তাঁর ভাল লাগল না বাড়ির ভিতরকার পরিবেশ, যা গতানুগতিক আর সংস্কারাচ্ছন্ন। একদিন এক নিগ্রো রমণীর সঙ্গে চলে গেলেন এক পাহাড়ে, ফরাসীর এক বর্ণও বুঝত না যে। সেই আদিম পরিবেশে নিগ্রো রমণীটি তাঁর জন্যে রান্না করল মশলাদার এক অপূর্ব রান্না। খেতে দিল মাজা বাসনে। আর তাঁকে ঘিরে নাচতে লাগল একদল নগ্ন নিগ্রো, সানন্দে এবং সরবে।

বোদলেয়ার কলকাতায় যাননি, এর পক্ষে রয়েছে তাঁর বাবা এবং মায়ের সাক্ষ্য। রয়েছে তখনকার লেখা চিঠিপত্র। রয়েছে আদালতে তাঁর অছিদের জোগানো দলিল।

বোদলেয়ার কলকাতায় গিয়েছিলেন এঁর পক্ষে রয়েছেন তাঁর বন্ধুরা। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় যাঁর মত, তিনি হলেন মার্শেল রুফ। বোদলেয়ার কলকাতার বিষয়ে আমাদের যত কিছু শুনিয়েছেন তার সবটাই সত্যি, এই হল রুফের সুস্পষ্ট ভাষণ। অবশ্যই গিয়েছিলেন কলকাতায়। এবং এ বিষয়ে যার মন্তব্যের গুরুত্ব সবচেয়ে

বেশী হওয়া উচিত, তিনি অবশ্যই বোদলেয়ার। বোদলেয়ার তাঁর বিশ্বাস থেকে এক পা নড়েন নি কোনদিন। কলকাতা এবং ভারতবর্ষ দুটোই তাঁর দেখা।

স্টার্কি এর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে লিখেছেন:

"He had, however, a talent for description, for evoking lands which he had only seen in imagination, and the fact that he found an audience ready to appreciate his gifts, only added to the zest of his excitement and spurred him on to further efforts. When he had told the story several times he could no longer separate what was true from what was fiction, and he later never remembered that he had not, in reality, gone to Calcutta."

প্রসঙ্গত মনে পড়ে আর এক দিগ্বিজয়ী ভ্রমণকারীর নাম, মার্কো পোলো। তাঁর জীবনেও ঘটেছিল এমনি অপবাদ। যে দেশে যাননি, লিখেছেন সে দেশের বিবরণ।

মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত দেশবাসীর কাছ থেকে সবচেয়ে সম্মানের আখ্যা পেয়েছিলেন যা, তা হল, 'দা লায়ার'। তাঁর মৃত্যু শিয়রে ছুটে এসেছিল ধর্মযাজকের দল। বলো, যা লিখেছো সব মিথ্যে। ওরে মূর্খ, পৃথিবী যদি বলের মত গোল হবে তাহলে আমাদের প্রভু যীশুখৃষ্ট সেখানে পা ফেলবেন কি করে? আবার এও সত্যি যে, নিজের ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি এমন কিছু জায়গার বিবরণ দিয়েছেন যেখানে যান নি কোনদিন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় সে জায়গাটার প্রকৃতি এবং মানুষ জীবন্ত। মার্কো পোলোও বাংলাদেশে আসেনি কোনদিন। কিন্তু 'বেঙ্গল' নিয়ে লিখেছেন।

তাঁর নিজের দেশ, ইতালী, এবং পৃথিবী তাঁকে সম্মানিত করেছিল সত্যদ্রষ্টা বলে, তাঁর দুঃসহ এবং নির্যাতিত মৃত্যুর পর।

আমরা এখন ফিরে যাবো বোদলেয়ারেরও মৃত্যুদিনের দিকে। জীবনের প্রায় শেষ পর্বে পা দিয়েছেন তিনি। ব্যাধিত, যা যুগপৎ শারীরিক এবং মানসিক, তিনি তখন ছিন্নভিন্ন এবং অক্ষম।

১৮৬৫। বেলজিয়াম থেকে ফিরে এলেন প্যারিসে, একেবারে হঠাৎ। রেল স্টেশনে বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত বোদলেয়ারকে চিনতে পেরে গেলেন তরুণ কবি কাতুল মাঁদেস। মাঁদেস বুঝতে পেরেছিলেন তিনি নিঃসম্বল। তার উপর এখন রাত্রি। তাই নিয়ে এলেন নিজের বাসায়। সেদিন রাত্রে লিখে সারা জীবনে কত রোজগার করেছেন তার হিসেব কষতে লাগলেন। আর সেই দিনই মাঁদেসকে বললেন:—

যদি আবার শক্তি ফিরে পাই, দীর্ঘ একটা কবিতা লিখবো ভারতবর্ষকে নিয়ে। এখন আমি কেবল স্বপ্ন দেখি সূর্যের আর উত্তাপের আর শান্তির। তাঁর সম্ভ্রান্ত কণ্ঠস্বরে তিনি সেদিন মাঁদেসকে শুনিয়েছিলেন কি থাকবে তাঁর সেই ভারতবর্ষীয় কবিতায়। থাকবে শোচনীয় সৌন্দর্য, আর প্রদীপ্ত সূর্যালোকের জন্যে বিষাদ।

শুতে যাওয়ার সময় হয়ে এলো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। মধ্য রাতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেল মাঁদেসের। তিনি শুনতে পেলেন বোদলেয়ারের কান্না। তিনি কাঁদছেন আর কান্না থামানোর জন্যে চেষ্টা করে চলেছেন বৃথা। পৃথিবী ঘুমিয়ে রয়েছে জেনেই, পৃথিবীর অগোচরে তিনি সেদিন ভেঙে পড়েছিলেন এই অপ্রতিরোধ্য কান্নায়। কাছে যেতে সাহস পায়নি বিভ্রান্ত মাঁদেস। তাঁর কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। চিরকালের বেহিসেবী বেপরোয়া মানুষের এমন নিঃসঙ্গ আর্তি অথবা আর্তনাদ, মাঁদেসের কাছে ছিল বিস্ময়কর আর অপ্রত্যাশিত। পরের দিন সকালে মাঁদেসের যখন ঘুম ভাঙল, তখন বোদলেয়ার নেই। পরিবর্তে পড়ে আছে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—'বিদায়'।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ ॥ শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ। তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল। কলকাতা বাহাত্তর। আট টাকা।

এগার বছর ধরে স্কুলে ও পলিটেকনিকে শিক্ষকতা এবং সাম্প্রতিক কয়েক বছরের শিক্ষা সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মানুষ গড়ার ইতিকথা'র লেখক শ্রীতাপস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সদ্য-প্রকাশিত 'শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ' বইটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা বিষয়ে আন্তরিকভাবে কিছু ভাবতে চেষ্টা করেছেন।

সেই চিন্তা ও চেষ্টার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থের আটটি অংশে অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে। প্রথম অধ্যায়টি প্রস্তাবনার মতো। কয়েকটি তথ্যপঞ্জীর সহায়তায় তাপসবাবু সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে নিতে চেয়েছেন। গণতন্ত্র ও নিরক্ষরতার অবিশ্বাস্য সহাবস্থান সম্ভব হচ্ছে তার অন্য যে প্রধান কারণ এই যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাধিগ্রস্ত। এই ব্যাধির ভয়াবহতা, প্রাক্-ইংরেজ আমলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, অতি সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঠিক অবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষা-পরিচালকদের কে কী ভাবছেন প্রভৃতি নানা প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে তাপসবাবুর আন্তরিকতা সাত ফর্মার এই ছোট বইটিতেও স্পষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে ইংরাজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার সন্ধান ও পরিচয়চেষ্টা। কী ভাবে উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে সারা দেশে বিকীর্ণ দেশী শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটলো অথচ উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থাও রিকেটি শিশুর মতো হয়ে গেল—সেই নিদারুণ জাতীয় ট্রাজেডি এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই লেখকের আলোচ্য হয়েছে। দেশের বারো আনা মানুষ, গ্রামের মানুষের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় শহুরে বুদ্ধিজীবীর শোকাবহ বিচ্ছেদের সেই হলো সূচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায়ের "পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক স্তর বিভাগ ও শিক্ষা" নামে একটি সমীক্ষা পত্রের পর্যালোচনা। চতুর্থ অধ্যায়টিতে কোঠারী কমিশনের (১৯৬৫-৬৬) ও উপাচার্য সম্মেলনের (১৯৬৭) সুপারিশগুলির ভিত্তিতে ঘোষিত (১৯৬৮, ২৪ জুলাই) জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত সতেরো দফা মোল উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষিত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, গবেষণার মান নিম্নাভিমুখী, শিক্ষকতার মানও সামগ্রিকভাবে তাই, পরীক্ষার নামে প্রহসন, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব, শিক্ষার্থী-সমাজের দায়িত্বহীনতা এবং পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় : এই সূত্রটিকে সামনে রেখে পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জননী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে রবীন্দ্র-ভারতী, বিশ্বভারতী, যাদবপুর কল্যাণী বর্ধমান—এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির—ইউ জি সি পরিদর্শকদলের রিপোর্টভিত্তিক আলোচনায়—অগ্রসর হয়েছেন লেখক।

নব্য কৌলীন্যের পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বাজেট-এর সিংহভাগ বরাদ্দ করে আমরা কি কখনও শিক্ষিতের হার বাড়াতে পারব?—এই সঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করে, সপ্তম অধ্যায়ে লেখক রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর অনেক মন্তব্যই তীব্র এবং আবেগপ্রসূত হলেও সেগুলির অন্তর্নিহিত সততাটুকু উনবিংশ শতাব্দী থেকেই মনীষীগণের দ্বারা বারংবার উচ্চারিত এবং বলাই বাহুল্য, উপেক্ষিত অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখকের উপস্থাপিত একুশটি প্রশ্ন এবং শিক্ষামন্ত্রী প্রদত্ত উত্তর বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কাটাছাঁটা সোজা কথায় উত্তর দিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু।

বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধগুলির দ্রুত গ্রন্থনে অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বোধ থেকেই যায়, 'শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ'

গ্রন্থটির গুরুত্ব উপযুক্ত গ্রন্থপরিচয় থেকেই স্পষ্ট হবে। প্রসঙ্গ, সমালোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিত—সর্বত্রই এই গুরুত্ব অনুভবগম্য। শুধু দুঃখের কথা এই যে, গত এক শ' বছর ধরে এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে এবং মুখে তার গুরুত্ব স্বীকার করতে আমরা যতটা অভ্যস্ত হয়েছি, কার্যত ততটা অগ্রসর হতে আমরা প্রস্তুত নই। এই পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি আমরা অনেকেই বুঝি কিন্তু তার বৈপ্লবিক সাংস্কারসাধনে কোথাও দ্বিধা আছে। রংরিপুর কাজ ও চেষ্টা সব সময়েই চলেছে, কিন্তু সেটাই যে যথেষ্ট নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

—জ্যোতির্ময় ঘোষ

উপন্যাস

ঈশ্বর পাটনী। চিত্ত সিংহ। সুজনী, ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০০৪। নয় টাকা।

দেবী দুর্গার অপর নাম অন্নদা। অন্নদার স্বামী শিব। খামখেয়ালী স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ অন্নদা এক রাত্রে রেগে-

রেগে বেরিয়ে পড়েন বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য। পথে নদী পার হতে তিনি ওঠেন নৌকায়। পারাপারের সঙ্কট কু জুড়ে মাঝির সঙ্গে দেবী অন্নদার সংসার বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় দেবীর কথা বলা এবং চোখের সামনে অন্যান্য অলৌকিক ক্রিয়া দেখে আস্তে আস্তে মাঝি ঈশ্বর পাটনী দেবীকে চিনতে পারে। শেষ অংকে দেবী পারাণির কড়ি দিতে চাইলে ঈশ্বর পাটনী দেবী অন্নদাকে জানায় তার সেই অসাধারণ শাশ্বত প্রার্থনা—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

কবিশ্রেষ্ঠ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের এই আখ্যান থেকে চিত্ত সিংহ আলোচ্য গ্রন্থ ঈশ্বর পাটনী'র কাহিনীসূত্র নিয়েছেন। দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং মহিমা বিকাশে ব্যবহৃত অন্নদা-মঙ্গলের ঈশ্বর পাটনীকে আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সম্পূর্ণ নিজস্বতা নিয়ে উপস্থাপিত করেছেন মূল আখ্যানের কিছু পরিবর্তন করে। ধর্মীয় আলাপের পরিবর্তে এখানে ঈশ্বর পাটনীর পারিবারিক জীবন, তার সাংসারিক যন্ত্রণাভোগ, লোভ, ত্যাগ, সামাজিক দায়িত্ববোধ—সবকিছু মিলিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনীর বিষয়বস্তু। বইটি পড়ার পর মনে হয় এই ঈশ্বর পাটনী কোনো পুরাণের চরিত্র নয়। অন্নদামংগলে ঈশ্বর পাটনী সামান্য মাঝি হলেও এখানে সে আজকের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। অন্ন-বস্ত্র জোটানোর পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। লোভের ফাঁদে কখনো সে নিজের অজ্ঞাতে জড়িয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই চরম অনুশোচনার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করে যেহেতু জীবনের মূল্যবোধগুলি তার কাছে সদাজাগ্রত। আজকের পৃথিবীতে এই শ্রেণীর অসংখ্য মানুষের মতোই সে পরিশ্রম, সহনশীলতা ও মেধার সাহচর্যে যখন নিজের পার্থিব ভোগবাসনা মেটাবার অবস্থাকে আয়ত্ত করে ঠিক তখন হারিয়ে ফেলে তার ভোগের স্পৃহা। ফলে জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে সন্তানের ব্যথায় কাতর ঈশ্বর পাটনী এবং আমার পিতার প্রার্থনা বোধহয় কোনোদিনই ভিন্ন হবে বলে মনে হয় না। 'ঈশ্বর পাটনী' পড়তে পড়তে এ কারণেই মনে হয়, এই বই হালফিল বাংলা ভাষায় লেখা নিছক পুরাণ কাহিনী নয়। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আজকের গল্প যা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। যা আমাদের বহুপঠিত, বহু শ্রুত— তাকেই পুনর্বার লেখক নতুন রূপ সজ্জায় আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্রের উপস্থাপনা এবং লৌকিক ভাষার এক আশ্চর্য গতিময় ব্যবহারে তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত উপভোগ্য। লেখকের কৃতিত্ব এখানেই। গতানুগতিক গল্প বলা ধরনের একঘেয়ে উপন্যাস পড়তে পড়তে ক্লান্ত পাঠক 'ঈশ্বর পাটনী' থেকে নিঃসন্দেহে কিছু নতুনত্ব খুঁজে পাবেন।

প্রদীপচন্দ্র বসু

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোনো নতুন দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়নি বলা বাহুল্য, এমন কি নিজস্ব নির্দিষ্ট ভূখণ্ড কোনটি তাও ততটা স্পষ্ট নয় এখনো, তবু গৌতম চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **কলম্বাসের জাহাজ** (উলুখড়, হাওড়া, পাঁচ টাকা) সম্পূর্ণভাবে [illegible] বছরের রচনা এই বইতে। স্বভাবতই প্রথম দিকের অস্থির, এলোমেলো, সন্ধানী কিছু প্রচেষ্টার কাঁচা চিহ্ন ছড়িয়ে থাকবে, থেকেছেও; কিন্তু পাশাপাশি এমন দু-একটি কঠিন পরীক্ষার এবং সফলতার নমুনাও রয়েছে যে, কিছুটা বিস্ময়ই জাগায়। এই সাফল্য বিশেষ করে মুগ্ধও করে এইজন্যে যে, ছন্দ-মিলের প্রতি নতুন কবিদের আস্থা যখন প্রায় অদৃশ্য, তখন এক অতি-তরুণ কবি কি করে মেতে উঠলো ছন্দ-মিলেরই এক দুরূহ খেলায় এবং কিছু-কিছু ক্ষেত্রে অভাবনীয় চমক তৈরী করতেও হলেন পারঙ্গম, জানি না। যেমন, 'প্রণয়-গান

কবিতার (পৃঃ ১৫) অষ্টম পঙ্‌ক্তির তৃতীয় পর্বের মধ্যখণ্ডন, 'সে' কবিতার সপ্তম ও অষ্টম অংশের চমক-লাগানো মিল, 'কাল-মৃগয়া'র সাবলীল মন্দাক্রান্তার প্রয়োগ, 'দেবী ও জলদস্যু'র অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিল, 'প্রণয়-গান' (পৃ ৩৮) ও 'নিজের জন্যে চোদ্দ-লাইন'-এ ভিন্নতর পদ-বিন্যাস—কোনোটাই খুব সহজ ছিল না। কিন্তু গৌতম চৌধুরী খুব সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছেন এই সব পরীক্ষায়।

তাঁর মুখ্য বিষয় প্রেম, চালচিত্রে অবশ্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে দুঃসময়ের মুখচ্ছবি আঁকা হয়েছে। যেমন—'তোমার চোখের সামনে কবির ছেলে কবি হয়ে যায়/ প্রধানমন্ত্রীর ছেলে প্রধানমন্ত্রী' (জার্নাল ছিয়াত্তর); কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তিনি ততটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নন, যতটা ছন্দ-মিলের অটুট দুর্গে। বিষয়ের গভীরতায় ও গাম্ভীর্যে ডুব-সাঁতারে অভ্যস্ত হলে 'কলম্বাসের জাহাজ' ছেড়েও অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড তিনি কালক্রমে অধিকার করতে পারবেন।

*

জ্যোৎস্নাময় বসুর উপন্যাস **সিকিদিরি** (লিপিকা, কলকাতা-৯, সাত টাকা)। রাঁচী থেকে হাজারীবাগ রোড ধরে মাইল পনের গেলে ওরমাঝি। সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকের একটি রাস্তা মিশেছে 'সিকিদিরি'তে। 'সিকিদিরি'তে তৈরী-হওয়া 'পাওয়ার-হাউস'কে কেন্দ্র করে নানান জায়গা থেকে জড়ো-হওয়া কিছু মানুষের সমাজকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। ঠিক গড়ে উঠেছে বললে ভুল হবে, বলা উচিত বর্ণনা করেছেন এর লেখক।

জ্যোৎস্নাময় বসুর লেখা থেকে মনে হয় এমন কোনো প্রত্যক্ষ সমাজ তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। ফলে গল্পটি তার জানা। কিন্তু জানা গল্পকেও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, করে তুলতে হয় আকর্ষণীয়। তেমন কোনো আকর্ষণীয় বা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা এই রচনার কেন্দ্রে নেই। নারী-পুরুষের নানাভাবে জড়িয়ে ধরার কয়েকটি দৃশ্যও এই লেখায় রয়েছে। কিন্তু কথাবার্তার পরই একান্তে নারী-পুরুষ জড়িয়ে ধরেছে একে অন্যকে। কখনো আলতোভাবে। কখনো তীব্রভাবে। কিন্তু তাতেও মূল কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়নি।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা পরিচয়

দি ক্যালকাটা মিউনিসিপল গ্যাজেট। অমল হোম, স্পেশাল নাম্বার ১৯৭৬। সম্পাদক: রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মূল্য ২.৫০।

১৯৭৬ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের এই বিশেষ সংখ্যাটি স্বর্গত অমল হোম বিষয়ক। এই একটি কৃতী মানুষ যিনি বাঙালী বিদ্বান-সমাজে এবং গুণীজন সান্নিধ্যে তাঁর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে নানাভাবে এই সেদিনও পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যাঁকে স্নেহচ্ছায়ায় বরণ করেছিলেন। সংখ্যাটি শ্রীযুক্ত হোমের স্মৃতিচারণায় বহু গণমান্য ব্যক্তির লেখনী স্পর্শে উজ্জ্বল। লেখকদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, সুধীরকুমার মিত্র, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, রাধারানী দেবী প্রমুখ। সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে সযত্নে সংগ্রহযোগ্য।

কি ছিল কি হয়েছে ...

আমি একজন বেহালার বাসিন্দা। চাকুরীজীবী। রোজ বাসে-ট্রামে অফিস-বাজার করি। রোজ গণ্ডগোল হত কারণ রোজ ট্রাফিক জ্যাম, না হলে ট্রাম-আউট লাইন নাইলে অ্যাকসিডেন্ট। বছর খানেক হল অবস্থা পালটেছে। কারণ রাস্তাটা এখন অনেকাংশে এত চওড়া যে জ্যাম অ্যাকসিডেন্ট আর হয় না। অবশ্য ট্রাম বাসের সংখ্যা বাড়লে ভাল হত কিন্তু এখন বেহালাটা যেন কেমন চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী দেখায়। পাশেই বিদ্যাসাগর হাসপাতালও ভাল...

চেতলা ছিল যেন বৈতরণীর অন্য পাড়ে.. অর্থাৎ আদি গঙ্গার ওপারে একটা অনগ্রসর অঞ্চল। সম্প্রতি চেতলায় যতীন দাস সেতু হওয়ায় বালীগঞ্জ ভবানীপুর চৌরঙ্গী আর দূরে নয়, চেতলা আর ফেলনা নয়। এমন কি বস্তিগুলিও আর নারকীয় নয়...

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে ব্রীজ পেরোতে না পেরে ফিরে এসেছেন বহু ভুক্তভোগী। কারণ বিরাট ট্রাফিক জ্যাম-জট। গত দু বছর সাবওয়ের কল্যাণে (আর সম্প্রতি উড়ালপুলের একাংশ খোলায়) সে দুর্ভাবনা এখন কম।

উল্টাডাঙ্গার অরবিন্দ সেতু। বেশ কয়েক বছর তপস্যার ফল কিন্তু এই একটি কাজের ফলেই এই এলাকার লোকেরা সত্যি খুশী।

চোখে দেখা না গেলেও পানীয় জলের সরবরাহ অনেক বেড়েছে (প্রায় দ্বিগুণ)।

অনেক নালা-নর্দমা বসানো হয়েছে;

হাজার তিনেক হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যা বেড়েছে

অনেক রাস্তা চওড়া আলোকময় আর অনেক পার্ক এখন সবুজ..

(অন্যান্য অনেক সংস্থা কলকাতা উন্নয়নের কাজে নেমেছে; ওপরের ফিরিস্তি শুধু সি এম ডি এর কাজের।)

কি হচ্ছে?

এক কথায়। অনেক কিছু।

বালীগঞ্জ থেকে কসবা যেতে আর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংএ আটকাতে হবে না। কেননা রেল লাইনের ওপর তৈরী হচ্ছে ওভার ব্রীজ...

শিয়ালদায় আর প্রাণ হাতে করে চলতে হবে না অথবা অসহ্য ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়তে হবে না—কারণ তৈরী হচ্ছে ছোট উড়াল-পুল আর নতুন বাজার..

হাওড়ায় নতুন বাকল্যাণ্ড (বঙ্কিম সেতু) তৈরি হলে হাওড়ার লোকের প্রচুর সুবিধে হবে...

হাওড়াতেই বিরাট পানীয় জলের প্রকল্প চলছে—আর মল শোধনের আধুনিক ব্যবস্থা...

গার্ডেনরীচের জল প্রকল্প শেষ হলে কলকাতা বেহালা গার্ডেনরীচ ইত্যাদি জায়গার জলের সমস্যার সত্যিকারের সুরাহা হবে..

মানিকতলা আর উল্টাডাঙ্গা রেল ব্রীজে তিনটে করে ফোকর হবে—একটি দিয়ে দোতলা বাস যাবে।

আরও তিনটি বড় এবং নতুন রাস্তা হচ্ছে যেমন কোণা এক্সপ্রেসওয়ে বারাকপুর-কল্যাণী আর ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাই পাস. তিনটি নতুন শহর পরে কলকাতায় কসবার পেছনে, হাওড়ায় কোনাতে আর গড়িয়ার কাছে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে। (আরও অনেক কিছু হচ্ছে আরও অনেক অনেক কিছু করছেন। ওপরের কাজগুলিতে হাত দিয়েছেন সি এম ডি এ।)

* * * * *

এত কাজের পরেও অনেক কাজ বাকী থাকছে। সবচেয়ে বড় যে কাজ সেটা হল সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে না তোলা। জঞ্জাল যাতে যত্রতত্র না জমে, জলের অপচয় যাতে না হয় (সি এম ডি এ মাথা খুঁড়ছে রাস্তার কলের পাইপগুলির মুখ কি সত্যিই বন্ধ করা যায় না?) ফুটপাথ যাতে অবরুদ্ধ না হয়..

ভাল কথা সবাই বলতে পারে (খারাপ কথাও)। কিন্তু ভাল কাজ কি সবাই করতে পারে? (অবশ্য খারাপ কাজ সবাই পারে...তাই না?)

বাংলায় সত্তরটি গেজেট' এবং ইংরেজীতে 'ক্যালকাটা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার' সি এম ডি এ ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কোলকাতা-১৭ থেকে সংগ্রহ করুন। দাম—এক টাকা

কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট দ্বৈরথ

একদিনের সিঙ্গল উইকেট ক্রিকেট অন্যান্য দেশে তো বটেই, বোম্বাইতেও চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু কলকাতায় এই প্রথম ক্রিকেটের দ্বৈরথ অনুষ্ঠিত হল এপ্রিলের তিন তারিখে ন'জন নামী ক্রিকেটারের সমাবেশে।

ষোলোজনকে নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা শুরুর আগে দুটি প্রাথমিক পর্বের খেলা হয়। প্রথমে রমেশ সাকসেনা কিছু অনবদ্য মার মেরে ৩০ রান করে রাকেশ ট্যান্ডনের বিরুদ্ধে। বোম্বাই-এর উঠতি তারকা রাকেশ কিন্তু মাত্র ১ রান করেই ফিরে যায়। দ্বিতীয় খেলায় রাজেন্দ্র জাদেজা ৩২ রান করে। জবাবে বাংলার উইকেটকিপার সম্বরণ ব্যানার্জি করে অপরাজিত ২৮। এর পর সাকসেনা, জাদেজা এবং আরো ১৪ জনকে নিয়ে শুরু হয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা।

তুমুল অভিনন্দন কুড়িয়ে বাংলার প্রণব নন্দীর বিরুদ্ধে ব্যাট করতে আসে কারসন ঘাউড়ি। কিন্তু মাত্র ৭ রান করে সে ফিরে যায়। অনেকের আশা ছিল, ঘাউড়ি ভয়ংকর বল করে প্রণবকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু সে আবার হতাশ করে। প্রণব ৯ রান নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। পরের খেলায় সুরিন্দর অমরনাথ করে ১৫ রান। জবাবে অলোক ভট্টাচার্য ১৮ রান নিয়ে আরেকজন টেস্ট তারকার পতন ঘটায়।

গোপাল বসুর নিখুঁৎ ২৭ রান জয়সীমা অতিক্রম করার আশা জাগিয়ে-ছিল। কিন্তু ১৯ রানের মাথায় বাউন্ডারী লাইনে ক্যাচ তুলে জয়সীমা বিদায় নেয়।

ব্রিজেশ প্যাটেলকে মাত্র তিন রানে বোল্ড আউট করে এবং তিনটি বলে সেই রান তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যায় আবদুল ইসমাইল।

এরপর মাঠে নামে বিশ্বনাথ। প্রথম বলে চার মেরে এবং দ্বিতীয় বলে আউট হয়ে সে ফিরে যায়। দলজিৎ সিং ৮ রান তুলে নেয় এক ওভারেই।

রমেশ সাকসেনা তিন ওভারে ২৭ রান করে বোম্বাই-এর সিঙ্গল উইকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রাজেন্দ্র জাদেজাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। জাদেজা ৯ রানে আউট হয়ে যায়।

সৈয়দ কিরমানি ব্যাট করতে নামে অনেক আশা জাগিয়ে। কিন্তু বাংলার বরুণ বর্মণ সেই আশা নির্মূল করে মাত্র ১ রানে কিরমানিকে ফিরিয়ে দিয়ে। বরুণ ২ রান নিয়ে ম্যাচ জিতে যায়।

একে একে টেস্ট তারকারা খসে পড়তে থাকায় মহীন্দর অমরনাথকে নিয়েও সকলে চিন্তায় পড়ে। কিন্তু মলয় ব্যানার্জির অপরাজিত ১৪-র জবাবে নিখুঁত ১৫ রান নিয়ে মহীন্দর কোয়ার্টার ফাইনালে যায়।

প্রণব নন্দীর ১৫ রানের উত্তরে অলোক ভট্টাচার্য অনায়াসে ১৯ রান নিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

পরের কোয়ার্টার ফাইনালে ইসমাইলের প্রথম ওভারেই গোপাল বসুর ব্যাট ঝলসে ওঠে। এক ওভারে ১৭ রান। কিন্তু অদ্ভুত খেলা ক্রিকেট। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই গোপাল আউট! ইসমাইল যেমন তেমন করে ১৯ রান তুলে সেমি-ফাইনালে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় কোয়ার্টারটি ছিল বিহারের ঘরোয়া ব্যাপার। রমেশ সাকসেনা আবার মারের ফুলঝুরি দেখিয়ে করে ৩৫ রান। রমেশ তিনটি ইনিংসে তিনটি ছয় মারে। প্রথম খেলায় গোপাল বসুও একটি ওভার বাউন্ডারী হাঁকায়। যাই হোক, রমেশের ৩৫ রানের জবাবে দলজিৎ করে অপরাজিত ৩৮ রান।

শেষ কোয়ার্টারে ফাইনালে বরুণ কোনোরকমে ১০ করে। মহীন্দর অমরনাথ দেখেশুনে ১৩ রান নিয়ে সেমিফাইনালে যায়।

ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। শুরু হল সেমিফাইনালের খেলা।

বাংলার একমাত্র বেঁচে থাকা প্রতিনিধি অলোক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামে আবদুল ইসমাইল। ব্যকরণকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইসমাইল নেয় ৪ ওভারে ৩৬ রান। ইতিমধ্যে ইসমাইলের প্যান্ট ছিঁড়ে যায়। কিন্তু অলোককে ১৫ রানে ফিরিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে ওর হয়নি।

পরের সেমিফাইনালে যুদ্ধ হয় বাঘের সংগে বাঘের। মহীন্দরের অপরাজিত ৩৫-এর মুখে দাঁড়িয়ে দলজিৎ অবিচল থাকে। কিন্তু অসাধারণ খেলেও হেরে যায় ২৬ রানে অপরাজিত থেকে।

এবার ফাইনাল। মাইকে পিয়ার্সন সারিটার কণ্ঠস্বরও ক্লান্ত। তবু মহীন্দর এবং ইসমাইল মাঠে এল শেষ লড়াই লড়তে।

ইসমাইল অনবদ্য বল করে মহীন্দরকে তিন ওভারে মাত্র ১২ রানে বেঁধে রাখল। কিন্তু খেলাটা হল ক্রিকেট এবং মহীন্দর হল লালা অমরনাথের ছেলে। শেষ ওভারে ১৮ রান নিয়ে মহীন্দর ইসমাইলের মুখের "স্মাইল" মুছে দিল। শেষ বলে মহীন্দর স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে একটি ছয় পায়। আবদুল ইসমাইল মাত্র ২ রানে আউট হয়ে যেতেই সুদৃশ্য টৌলিরামা ট্রফি মহীন্দর অমরনাথের হাতে চলে যায়।

সেরা ফিল্ডসম্যানের পুরস্কার ৫০০ টাকা পায় উইকেটকীপার দেবাশিস চক্রবর্তী। কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে গোপাল, প্রণব, সাকসেনা এবং বরুণ প্রত্যেক পায় ৫০০ টাকা। সেমিফাইনালে পরাজিত অলোক ভট্টাচার্য এবং দলজিৎ সিং জিতে নেয় ১০০০ টাকা। ইসমাইল ২০০০ এবং মহীন্দর ৩০০০ টাকার চেক নিয়ে দিনটি শেষ করে। দিনের শুরুতেই সুরিন্দর অমরনাথ যখন অলোক ভট্টাচার্যের কাছে হেরে প্যাভেলিয়নে ফিরছে, বিশ্বনাথ বলে : "হার্ড লাক!" সুরিন্দর হাসতে হাসতে বলে, "নট অ্যাট অল! মহীন্দর থাকছে। ট্রফিটাতো ও-ই নিচ্ছে!"

পড়ন্ত বিকেলে সেই একই হাসি দেখা গেল সুরিন্দরের মুখে, যখন সুদৃশ্য টৌলিরামা ট্রফি ঝকঝক করছে মহীন্দরের হাতে।

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন

এ বছর অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টনে বিজয়ীর খেতাব পেয়েছে ডেনমার্কের ২৫ বছর বয়সী খেলোয়াড় ফ্লেমিং ডেলফস, ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিংকে ১৫-১৭, ১৫-১১ ও ১৫-৮ পয়েন্টে পরাজিত করে। মেয়েদের বিজয়িনীর সম্মান জাপানের হিরো জুকির। জুকি ফাইনালে ৭—১১, ১১—৩ ও ১১—৭ পয়েন্ট পরাজিত করে ডেনমার্কের মেয়ে লেনে

ফ্লেমিং ডেলফস-এর এটি প্রথম অল ইংলন্ড খেতাব, হিয়ো জ্যাকির চতুর্থ। এর আগে জ্যাকি চ্যাম্পিয়ন হন ৬৯, ৭৪ ও ৭৫ সালে। এশিয়ান ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন প্রতিযোগিতা বয়কট করায় এইবার জ্যাকি অল ইংলন্ডে অংশ নেয়নি।

ডেনমার্কের ৮ বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং গতবার অল ইংলন্ড ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার রুডি হারতোনোর কাছে পরাজিত স্বেন প্রী ছিলেন এবারের সবচেয়ে ফেভারিট। কিন্তু সেমিফাইনালে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয় লিয়েম সুই কিংয়ের কাছে। হারতোনো এ বছর অল ইংলন্ডে খেলেনি। খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমিং ডেলফসকে গত জানুয়ারীর [illegible] ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী লিয়েম সুই কিংয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল ৩-১৫ ও ৮-১৫ পয়েন্টে। সেই কিংকে হারিয়ে তার খেতাব জয়ের মূলে রয়েছে দুই মাসের কঠোর অনুশীলন।

একলব্য

খোখো খেলায় বাংলার সেরা মেয়ে

অল্প জায়গায় এবং বিনা উপাদানে যে সব খেলাধুলোর দেহের পুষ্টি এবং মনের আনন্দ সাধন করা যায় তার মধ্যে কবাডি এবং খোখো চমৎকার খেলা। গ্রামীণ খেলাধুলোর উপর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক গুরুত্ব আরোপ করছেনও বহুদিন থেকে। রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। এ বছরের রাজ্য বাজেটেও গ্রামীণ খেলাধুলোর জন্য পৃথকভাবে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে খোখো খেলার প্রচলন বেড়েছে। কিন্তু তবু অন্যান্য খেলার সঙ্গে খোখো পা মিলিয়ে এগোতে পারছে না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে দুচারটি মেয়ে বাংলা দেশের খোখো খেলাকে সজীব রেখেছে তাদের মধ্যে প্রথম নাম—মীনা দাস।

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে একবার দলগত চ্যাম্পিয়ন, দুবার রানার্স, ১৯৭২ থেকে এই ১৯৭৭ পর্যন্ত জাতীয় খোখোতে বাংলার অপরিহার্য মেয়ে এবং শেষবারের অধিনায়িকা। খোখো খেলার সুবাদেই পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু।

বয়স একুশ বছর। এ বছর বি এ পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে এবং হেস্টিংসের পোস্ট গ্রাজুয়েট ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজে ভরতি হবার আবেদন করে বসে আছে।

মধ্যবিত্ত ঘরের পাতলা গড়নের মেয়ে। মাথায়ও বেশী উঁচু নয়। দেখলে মনে হবে শরীরটা ধকল সইবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়। কিন্তু খোখো কোর্টে দেখলে ধারণাটা একেবারেই বদলে যাবে। ওই রোগা মেয়েটিকেই তখন মনে হবে গতি, শক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। খোখো খেলায় যে গুণের অধিকারী বা অধিকারিণী হলে খেলোয়াড়কে প্রথম তিনজন ধাবকের দায়িত্ব দেওয়া, মীনার মধ্যে সে সব গুণই বর্তমান। তাই গত পাঁচ বছর মীনাকে বাদ দিয়ে বাংলার মেয়ে দল গড়ার কল্পনা করতে পারেননি পরিচালকেরা।

ছোটবেলা থেকে বেশ ডানপিটে মেয়ে। বাল্য কেটেছে বেহালায়। স্কুলের মাঠে দৌড় ঝাঁপ করত। কিন্তু মন ভরত না। বাড়ির কাছাকাছি কোন ক্লাবও ছিল না যেখানে মনের সুখে বান্ধবীদের সঙ্গে খেলাধুলো করে। মীনার যখন বয়স বছর পনেরো তখন বাবা চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ইন্দ্রাণীর শীল লেনে এসে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন, যে বাড়ির কাছেই নবারুণ সঙ্ঘের খেলার আখড়া। ড্রিল, কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য খেলার মধ্যে ওখানে খোখোই মুখ্য খেলা। নবারুণ সঙ্ঘের প্রধান সংগঠক দিলীপ রায় আবার ছিলেন খোখো খেলার জাতীয় কোচ। কাজে কাজেই কোন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সম্ভাবনা দেখলেই তিনি তাকে তৈরি করার কাজে লেগে যেতেন। ক্লাবে যোগ দেবার পর মীনার মধ্যেও তিনি সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন। সেটা ১৯৭২ সালের কথা। তখন সামনেই রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ। দল গড়ার তোড়জোড় চলছে। মাত্র কয়েক মাসের প্রশিক্ষণে মীনা বেশ পটু হয়ে উঠেছে। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে ওই নতুন মেয়েটিই হল নবারুণ সঙ্ঘের অধিনায়িকা। এবং বলা বাহুল্য, মুখ্যত ওরই ক্রীড়া দক্ষতায় রাজ্য প্রতিযোগিতায় সঙ্ঘ পেল তৃতীয় স্থান। ধাবক দলের প্রথমা মীনাকে ওই খেলার সুবাদেই বাংলা দলে স্থান দেওয়া হল পুনের বারামতীর জাতীয় প্রতিযোগিতায়।

জাতীয় আসরে বাংলার মেয়ে দল অবশ্য সুবিধা করতে পারেনি। মীনা দেখল মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের মেয়েদের খেলার সঙ্গে বাংলার মেয়েদের খেলার মানগত পার্থক্য অনেকখানি। বারামতীর খেলার অভিজ্ঞতা মীনাকে আরও দক্ষ হবার, আরও এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা জোগাল। ওই বছর জাতীয় স্কুল গেমসেও মীনা ছিল বাংলা দলের সহ অধিনায়িকা। সেখানেও তেমন ঠাঁই না পেয়ে বুঝতে পারল তার কিছুই শেখা হয়নি। বাংলায় একটু ভাল খেলে হাততালি মেলে কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হাততালি পেতে হলে অনেক ভাল খেলতে হয়।

—"ওর পর থেকে খোখো খেলার সাধনায় মেতে উঠলাম। ভাবলাম যে খেলাটিকে বেছে নিয়েছি সে খেলায় যদি সারা ভারতে নাম করতে না পারি তবে মিছিমিছি পরিশ্রম করে লাভ কি?"

মীনা দাস

—"পড়াশুনো, সংসারের কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়েই কি খেলায় মেতে উঠলে?"

—"না, তা কেন করব? সংসারের কাজকর্ম অবশ্যই কিছু কিছু করেছি। লেখাপড়াতেও ফাঁকি দিইনি। আপনাদের আশীর্বাদে পড়াশুনার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে কখনও যেতে হয়নি। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম খোখো খেলায় নাম করবই।"

৭৩-এ মীনার নেতৃত্বেই নবারুণ সঙ্ঘ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হয় এবং পাতিয়ালার জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার ফল ভাল না হলেও মীনার খেলা সর্বভারতীয় তারিফ আদায় করে। ৭৪-এ দিল্লিতে সর্বভারতীয় আমন্ত্রণ খোখো প্রতিযোগিতায় ইন্টালি মণিমেলার রানার্স হওয়ার মূলে যেমন অধিনায়িকা মীনা দাসের অবদান ছিল অনেকখানি, তেমন বরোদায় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলের সেমিফাইনাল খেলার ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব

কম নয়। অনেকের মতে গুজরাট ও বাংলার সেমিফাইনাল খেলাটি ছিল ৫৪র জাতীয় আসরের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা এবং কোচ দিলীপ রায়ের মতে মীনা অত্যন্ত ভাল খেলেছিল। এই খেলাকে ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য ৮৩-র ইন্দোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় এবং কানপুরের জাতীয় খোখোতেও মীনার খেলা বহু বিশেষজ্ঞের তারিফ আদায় করেছে।

"হেস্টিংসে পোস্ট গ্রাজুয়েট ফিজিক্যাল এডুকেশনে ভর্তি হতে চাইছ কেন"—এই প্রশ্নের জবাবে মীনা বলল, "আমরা আর কতকাল খেলব? যেটুকু শিখেছি তার সঙ্গে আর একটু পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক বিদ্যা শিখে আগামী দিনের মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।"

স্কুল জীবনে মীনাকে অনেক সহপাঠিনীদের টিকাটিপ্পনি সহ্য করতে হয়েছিল খোখো খেলার জন্য। কিন্তু কলেজের বন্ধু বান্ধবীর কাছে ওর পরিচয় খোখো খেলার বড় দিদি নামে।

মুকুল

উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য/মুক্তিস্নান/পরিচালনা : সলিল সেন

অজস্র ধন্যবাদ/ইয়ং স্টারস্

'অজস্র ধন্যবাদ' পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর রসবোধ এবং দুঃসাহসের জন্যে। এপ্রিলের প্রথম দিবস (এই দিন ছবিটি মুক্তি পেয়েছে) আমরা সবাই একটু ভয়-ভয় সতর্ক থাকি, এবং তা সত্ত্বেও কেউ-কেউ এই সার্বজনীন বোকা-বানানোর দিনে এদিক-ওদিক অমনস্ক মুহূর্তে ফেঁসে যাই। কিন্তু এই ১লা এপ্রিলেই যদি কেউ আমাদের সব সাবধানী পাঁচিল নস্যাৎ করে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে এই মাগগীগণ্ডার দিনেও শত-শত বাঙালী স্ব-ইচ্ছায় গাঁটের কড়ি খরচ করে ১৪ রীল-এর একটি

আংশিক-রঙীন প্রতারক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার মত নির্বোধ. তখন তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। অবিশ্যি সিনেমার নামে শুধু মননহীন মনোরঞ্জনের এ-রকম ব্যাপক ব্যবস্থা করার মতো প্রতিভা রাতারাতি গজিয়ে ওঠে না। যেমন গাছ-ছোলা দিয়ে 'বিশুদ্ধ পেস্তা-বরফি' তৈরি করতে প্রয়োজন দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা তেমনি দুটি সুদর্শন নায়ক রঞ্জিত মল্লিক ও বম্বের শৈলেন্দ্র সিং), একটি সুদর্শনা নায়িকা (অপর্ণা সেন), খান দশেক গান, এবং একটি পানসে, অনুভাষী প্রেমোপাখ্যানের নির্বোধ সমন্বয়ে একটি ছবিকে খাড়া করতে লাগে কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ ব্যবসায়িক, হিসেবী চাল। এবার দেখা যাক, অজস্র ধন্যবাদের আগাগোড়া কিভাবে কয়েকটি পুরোনো ব্যবসা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি অতি দুর্বল কাহিনীকে কোনো রকমে একটি ১৪ রীল-এর ছবি হিসেবে খাড়া করা হয়েছে।

প্রথম চাল : একটি নায়ক-নায়িকা সর্বস্ব বোকা-বোকা প্রেমের গল্প। প্রথম অংশের নায়ক শৈলেন্দ্র সিং এবং শেষার্ধের নায়ক রঞ্জিত মল্লিক। ভাবনা বলে কোনো বস্তু এঁদের জীবনে নেই। এবং নেই কোনো রকম দ্বন্দ্ব বা স্ট্রাগল। নায়ক-দ্বয় শুধু চুলের পাট ঠিক রাখেন, জুলপি নিখুঁতভাবে ছাঁটেন এবং কথায়-কথায় গান করেন। ভালো কথা, 'অজস্র ধন্যবাদ' কিন্তু মিউজিক্যাল নয়, কেননা ছবিতে গান থাকলেই সে-ছবি মিউজিক্যাল-এর পর্যায়ে ওঠে না। এবং নায়িকা অপর্ণা সেনকে আগাগোড়া ভালো দেখায়। তাঁর উইগ-এর বিন্যাস কখনো নষ্ট হয় না। এবং তাঁর ঠোঁটের গাঢ় রং চা খাবার পরও এতটুকু হালকা হয়ে যায় না।

দ্বিতীয় চাল : প্রেম, জীবন, সঙ্গীত, এই তো ছবির বিষয়বস্তু, কিন্তু এই তিনটির কোনোটাই মুহূর্তের জন্যেও জীবন্ত অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না, পাছে নির্জলা নির্বাধ আনন্দের মধ্যে ভাবনার দাবী অনধিকার প্রবেশ করে। অর্থাৎ প্রেম, জীবন, সংগীত বিষয়ে ছবিটি

আগাগোড়া আমাদের প্রতারণা করে, কিংবা, কয়েকটি বেসিক ইমোশানস নিয়ে ছেলে-খেলা করে মাত্র! যে-তিনটি ছেলেমেয়েকে আমরা দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি তারা কোনোভাবেই জীবনের সঙ্গে, বেঁচে থাকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, আর নয় বলেই তাদের প্রেম, এবং তাদের গান মিথ্যে। কোনো পর্যায়ের মানুষী অভিজ্ঞতায় এসব গৃহীত হতে পারে না।

অপর্ণা সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায়/অজস্র ধন্যবাদ

তৃতীয় চাল : এ-ছবির ফটোগ্রাফি। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ আমার ভালো লাগে। কিন্তু এ-ছবিতে তিনি ক্যামেরাকে এতো মিথ্যে বলতে বাধ্য করলেন কেন? পরিচালকের নির্দেশে? নিশ্চয় তাঁর ওপর কড়া আদেশ ছিলো এমন ছবি তোলার যাতে নায়ক-নায়িকাকে সব সময়ে ফরসা-ফরসা সুন্দর দেখায়। জানি, ফরসা-ফরসা প্রেমিক-প্রেমিকা দেখতে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীর বড় ভালো লাগে, কিন্তু স্বাভাবিক চামড়ার রঙ যদি আড়াই ঘণ্টা ধরে একেবারেই না দেখতে পাওয়া যায় তাহলে কি মনে হয় না একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? আর অজস্র ধন্যবাদের রঙীন অংশগুলোর ঐ অবস্থা হল কি করে? বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ-এর ত্রুটি, না কালার ফিল্ম-এর বিশ্বাসঘাতকতা? তবে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট, রূপসজ্জায় অনন্ত পাই (বম্বে) এবং গৌর দাস একেবারে কেচ্ছা করেছেন, বিশেষ করে রঙীন অংশে। মানুষের চামড়ার রং বড় সুন্দর, বড় জীবন্ত। ছবিটির রঙীন অংশে সে-চামড়ার রং একেবারে অসহনীয় কদর্য!

চতুর্থ চাল : এ-ছবির গান। কণ্ঠ-সংগীতে খ্যাত-খ্যাত শৈলেন্দ্র সিং, মহম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। এ সব নাম শুনেই তো অনেকে হাততালি দেবেন। তারপর দশ-দশটা গান। অতএব পরিচালকের দায়িত্ব অনেক কমে গেল। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এবং দেবাংশু মুখোপাধ্যায় দুজন মিলে চিত্রনাট্য লিখেছেন। আর যেখানেই দেখেছেন ব্যাপার গোলমেলে একটা করে গান ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ক্যামেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং মিড-ক্লোজ আপ বা বিগ-ক্লোজ আপে নায়কেরা গান গেয়ে যান। এর জন্যে তো রবীন্দ্র সদনে কোনো গানের আসরে গেলেই হত, সিনেমা কেন? সিনেমায় দশটা কেন, প্রয়োজনে একশোটা গানও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র গান শোনার জন্যে তো কেউ সিনেমায় যান না। উত্তীর্ণ গানের ছবিতে গানটাও একটা ভিসুয়াল অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। অজস্র ধন্যবাদে গানের সঙ্গে ক্যামেরার কোনো আত্মীয়তা নেই। গানের দৃশ্যগুলির কম্পোজিশান ভীষণ নাটুকে এবং সিনেমার ভাষায় পঙ্গু।

পঞ্চম চাল : এ ছবির ইনটেলেকচুয়ালিটি। ভাবতে পারেন এ-ছবির রঙীন অংশে কিছু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে? যেমন একটি শূন্যে অবস্থিত সিঁড়ি দিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে, শৈলেন্দ্র এবং অপর্ণার ওঠা-নামা! যেমন, বিরাট-বিরাট তাসের দেওয়াল ধরে শৈলেন্দ্রর গান কিংবা অপর্ণার দিবাস্বপ্ন! যাঁরা জীবনে কিছু ভালো ছবি দেখেছেন তাঁদের কাছে অন্তত এসব দৃশ্যের বোধহীন নাবালকতা হাস্যকর মনে হবে। আমি শুধু অজস্র ধন্যবাদের ইনটেলেকচুয়াল

স্ট্যানডার্ড নিয়ে একটি কথাই বলবো। ছবির গোড়াতে পর্দার ওপর লেখা ভেসে ওঠে: ছবিটি রঙীন হয়ে উঠবে নায়িকার মনে যখন রং লাগবে। এর পর 'আমরা কোন শতাব্দীতে আছি?' এই প্রশ্নটি করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই বলার থাকে না।

পরিশিষ্ট : ছবিটি বাণিজ্যে কত দূর দৌড়বে? এক শ্রেণীর শূন্যমন বাঙালী দর্শক তো আছেনই যাঁরা শুধু সুন্দরী নায়িকা আর সুন্দর নায়ক দেখতে সিনেমায় যান। এঁদের বয়স ১৫ থেকে ৬৫ যা হোক কিছু একটা হতে পারে। কিন্তু এঁদের সমষ্টিগত বয়েস ১৮ থেকে ২০র মধ্যে। এবং মাপা-ঝুলপি, কাটা চুল, অক্ষত মেক-আপ, বাক-সর্বস্ব কিছু মোম-মোম নর-নারীর পেলব প্রণয়ে এঁদের যে একটা উইশ ফুলফিলমেনট-এর ব্যাপার আছেই সেটুকু বোঝার জন্যে কোনো এক-ডুব অভিজ্ঞ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়েই যথেষ্ট, কোনো অতলান্ত ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুং-এর প্রয়োজন হয় না।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন : ২৬ মার্চ 'রামের সুমতি'র আলোচনায় নাম-বিভ্রাট ঘটে গিয়েছে। আসলে হবে রামের ভূমিকাভিনেতার নাম মাস্টার শান্তনু এবং গোবিন্দর ভূমিকায় মাস্টার দীপংকর।

বোম্বাই থেকে

বোমবাইয়ের চলচ্চিত্রের সংশ্লিষ্ট অনেকেই একজোটে জনতা পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছে। বহু প্রযোজক, অভিনয়শিল্পী এবং খ্যাতনামা কলাকুশলী নির্বাচন সভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন দেব আনন্দ, বিজয় আনন্দ ও আমোল পালেকর। সবচেয়ে বড় সভা হয়েছিল নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে জুহুতে। উপরোক্ত তিনজন ছাড়া সেই সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্রীরাম বোহরা ডি সি গোয়েল, প্রাণ, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং ডানী ডেনজোনপা। বিদ্যুৎ সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বক্তৃতা বন্ধ হয়নি।

জি পি সিপ্পী সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প কংগ্রেসের পিছনে দাঁড়াবে বলে কথা দিয়েছিলেন। ফলে এখন অল ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্রডিউসার্স কাউন্সিলের সভাপতি পদে থাকা তাঁর পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাউন্সিলের সদস্যরা তাঁর আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আর যে সব নামকরা ব্যক্তি কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন দিলীপ-কুমার ও জনি ওয়াকার। তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছে সংবাদপত্রের পাঠকদের তা এখন অজানা নেই। ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অমিতাভ বচ্চনেরও কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেবার কথা ছিল। হাওয়া বুঝে অমিতাভ চুপিসাড়ে মরিসাসে ছুটি কাটাতে চলে যায়।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বিশেষ-ভাবে উদগ্রীব ছিল রায়পুরের ফলাফল জানতে। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন বিদ্যাচরণ শুক্লা। কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য-মন্ত্রী হিসেবে শ্রীশুক্লা খুবই অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। জরুরী অবস্থা চলাকালে তিনি প্রযোজক ও শিল্পীদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। কিশোরকুমারকে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়া তো হালফিলের ব্যাপার। তাছাড়া অশুভ পরিণামের ভয় দেখিয়ে দূরদর্শনে নতুন ছবি দেখাতে বাধ্য করাও তাঁর এক কীর্তি। সেন্সার নীতি ও আচরণবিধির প্রয়োগ আর সেই সঙ্গে কতক প্রযোজকের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সমালোচনার ঝড় তোলে। সুতরাং শ্রীশুক্লর পরাজয়ের সংবাদে চলচ্চিত্র মহলে যে উল্লাস ফেটে পড়বে তা আর বিচিত্র কি! বেশ কয়েকদিন ধরে এই উপলক্ষে উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।

নতুন তথ্যমন্ত্রী শ্রীআদবানির কাছ থেকে প্রযোজকরা অনেক কিছুই আশা করছেন। হয়তো অনেক সমস্যার সমাধানও হবে। কিন্তু কালো টাকা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা কোন সরকারই কি বরদাস্ত করতে পারবেন? প্রযোজক এবং শিল্পীরা নতুন সরকারের কাছ থেকে কিছু লাভ করবার আগে নিজেদের 'ঘর' পরিচ্ছন্ন করে তোলায় সচেষ্ট হলে ভাল হয় না কি?

—সুরঞ্জন

নৃত্য

চমৎকার ওড়িশী, খারাপ কথক

রানী কর্নার ওড়িশী আমি বছর পাঁচেক আগে দেখেছিলুম। ফের দেখলাম বুধবার, মার্চ ৩০, কলামন্দিরে। যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমীর সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত এই নাচে রানী কর্নাকেও বাঝতে একটু সুবিধে হল। পাঁচ বছর আগের সে রানী কর্না আর নেই, এখন অনেক তৈরী, ভাবগম্ভীর এবং বুদ্ধিদীপ্ত এক শিল্পীকে আমরা পেলাম। বলতে বাধা নেই, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী ছাড়া বিশেষ আর কারো ওড়িশী আমার ইদানীং ভাল লাগেনি। রানী কর্নাকেই সে তুলনায় অনেক ভাল লাগল। ভাল লাগল আরও ঐ কারণে—রানী ক্রমশ ওড়িশীর ভাবরসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তবে পুরো নাচের আসরটা হয়ত অনেক বেশি মূল্যবান হত যদি বিরতির পর শিল্পী কথক না নাচতেন। ভাব এবং প্রয়োগ উভয় তরফেই রানী

রাণী কর্না : ওড়িশী নৃত্যে

কর্নার কথক অতি তুচ্ছ স্তরের। ওঁর ওড়িশীর পাশে ওঁর কথক সত্যিই বিসদৃশ, বিরক্তিকর।

ওড়িশীর পর্যায়ে রানী নেচেছিলেন মঙ্গলচরণ, সাবেরি পল্লবী, অষ্টাপদী এবং দশাবতার। প্রত্যেকটি নিবেদনই মনোগ্রাহী কারণ রানীর ভঙ্গিমাগুলি এবং সে ভঙ্গিমায় পৌঁছানোর আয়োজন ওড়িশী নাচের আধ্যাত্মিক সুরগুলোকে ধরতে পেরেছে। যেমন ধরা যাক ওঁর মালকোষ, বাগেশ্রী এবং দুর্গা রাগের মঙ্গলাচরণ। রাগের ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় ভাবের প্রয়োগ। সেই ভাবরসে রানী কর্নার একের পর এক মুদ্রা রাগ এবং মঙ্গলাচরণের তাৎপর্যকে শুধু ব্যাখ্যাই করেনি, মর্মস্পর্শীও করেছে। এবং সেই নাচ হল ওড়িশী বা ভারতনাট্যমের মত নাচের মনের পরিবেশটাই তৈরী হয় না। তবে সত্যিকারের মুগ্ধ হলাম সাবেরি পল্লবীতে যেখানে শিল্পী এক তালের চক্রে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের নিপুণ পাখোয়াজের বোলের চমৎকার প্রবাহ দিয়েছেন তাঁর নাচে। অষ্টাপদীতেও এই তৈরীর মজা আমরা পেয়েছি। দশাবতারের কাটকাটা মুদ্রা বদ দিলে নাচটা ভালর পর্যায়ে। এই নাচের সঙ্গে রীতা লাহিড়ীর গান

ভালাই লেগেছে, তবে আরও ভাল হওয়ার যথেষ্ট অবসর আছে। সারেংগী, সেতার সে তুলনায় নিম্নমানের।

কত্থক নাচের আগাগোড়াই বিস্বাদ লেগেছে। ভাব এবং তৈরী দুই দিকেই রানীর নাচ দুর্বল। ও'র নাচের পরণ, টুকরোগুলো সাদামাঠা, গত্‌ভাব বা ঠুংরী কি তরাণাও সে তুলনায় ভাল কিছু না। কত্থকের যেটা সবচেয়ে মন কাড়ে দর্শকের, মানে ভাব তা'তে রানী কর্নার কোনই দখল নেই। নাচের লয়কারীতেও ও'কে তেমন মজা ছড়া'তে দেখলাম না। দুনী লয় তো কোন কাজই উনি করলেন না। দ্রুতের দিকে ও'র যাতায়াত কম। তাই মনে হচ্ছিল কত্থকটা উনি প্রোগ্রাম থেকে বাদ দিলেই ভাল হত।

রানী কর্নার কত্থককে আরও ম্লান করেছে ও'র তবলিয়া জুম্মন খাঁ। শিল্পীর ওড়িশী নাচের সময় কেলুচরণের অসামান্য পাখোয়াজ তখনও কানে বাজছিল। এখনও তার স্মৃতি ঝাপসা হয়নি। তবে শিল্পীর গোটা নাচের সময়ই আমাদের কানের ওপর অত্যাচার করে গেছেন প্রদীপ ঘোষ। ও'র অদ্ভুত বারীন্দ্রিক ঢঙের বাংলা এবং অকথ্য উচ্চারণের ইংরেজী ঘোষণাগুলি (ভীষণ দীর্ঘ সে সব) নাচের এফেক্টগুলো ক্রমশ বানচাল করে যাচ্ছিল।

—শংকরলাল ভট্টাচার্য

আমজাদ আলি খাঁ

সংগীত

কলিকাতা সঙ্গীত সমাবেশ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত কলিকাতা সঙ্গীত সমাবেশের রাত্রিব্যাপী আসরটিকে একটি আদর্শ সংগীতানুষ্ঠান বলা যায়। শিল্পী ছিলেন খালি চারজন এবং প্রত্যেকেই ছিলেন প্রথম সারির—পণ্ডিত যশরাজ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা দেবী ও আমজাদ আলী খাঁ। সাধারণ রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের মত হাজার ছোটখাট শিল্পীর ভিড় এতে ছিল না কাজেই প্রত্যেক শিল্পীই গাইবার বা বাজাবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ বেহেরাম খাঁ মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের শেষ অংশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় প্রথম শিল্পী পণ্ডিত যশরাজের বিলম্বিত খেয়াল শুনতে পাইনি। বাহার রাগে দ্রুত একতাল খেয়ালটিতে দুই নিষাদের খেলা, দুনি গমক তান ও সরগমের কাজ ভাল হয়েছিল। আড়ানা রাগে দ্রুত খেয়ালটিতে ধৈবতের ওপর বড় বেশী জোর দেওয়ায় রাগটির সঙ্গে বেশীরভাগ সময় দরবারী কানাড়ার কোন পার্থক্য থাকছিল না। তবলা সংগতকার মহাপুরুষ মিশ্র ভাল বাজিয়েছিলেন এবং কিছু দুনি গমক তানের তুখোর জবাব দিয়েছিলেন।

পরের অনুষ্ঠান ছিল স্বনামধন্য সেতারী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং ইনি দরবারী কানাড়া রাগে একটি সুরেলা, সুসম্বদ্ধ ও সুগঠিত আলাপ দিয়ে শুরু করেন। স্বর-বিস্তার খালি ধীর ও স্থির ছিল না—প্রত্যেকটি স্বরগুচ্ছ থেকে যথাসম্ভব আবেগ নিংড়িয়ে বার করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি স্বরে ছিল আশ্চর্য প্রাণ। সূক্ষ্ম কম্পিত স্বরের দীপ্তিতে ও লম্বা মীড়, আশ, মূর্ছনা ও গিটকিরির মিনাদ আলাপের প্রত্যেকটি অংশ জ্বল-জ্বল করছিল।

এছাড়া ছিল অতিকোমল ও তীব্রকোমল গান্ধার ও ধৈবতের নিপুণ ব্যবহার—র জ্ঞ (অতিকোমল) র স দ (মন্দ্র জ্ঞ (তীব্র-কোমল)—ও জোনপুরির এলাকায় যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত না যাওয়ার আলী-অকবরী মজা। প দ ণ স, দ ণ প (স ছাড়া সব মন্দ্র সপ্তক)—এই স্বর সমাবেশের প্রথম চারটি স্বর খুব তাড়াতাড়ি বাজানো হয়েছিল এবং ধৈবতে আন্দোলন ছিল না। কাজেই মনে হচ্ছিল যেন জোনপুরির ছায়া এসে গেল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরবারী কানাড়ার পকড় দ ণ প বেজে ওঠায় এই ছায়ার গর্ভমৃত্যু হল। রাগ রূপায়ণের এই দুর্গম পথে একমাত্র মহৎ শিল্পীরাই হোঁচট না খেয়ে চলতে পারেন, কাজেই আনন্দের

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়/দস্যুসর্দার রত্নাকর/পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আজ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প মহৎ শিল্পের চৌকাঠ পার হয়ে গেছে।

জোড়টি একই স্তরের হয়েছিল এবং এতে তিন সপ্তক ব্যাপী সঞ্চারী বর্ণের কাজ, উচ্চমানের তান-তোড়া ও উল্টো ঝালা ছিল। মারুবেহাগ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ দুটিতে সুন্দর বিস্তারের কাজ, উচ্চাঙ্গের লয়কারী ও তানকারী থাকলেও কল্যাণ অঙ্গের স্বরসমষ্টির বড় অভাব ছিল। প স (তার) মীড় দিয়ে অন্তরায় যাওয়া এবং কয়েকটি তেহাইয়ের শেষে এই মীড়টি ব্যবহার করা ছাড়া শিল্পী কোন কল্যাণ অঙ্গের কাজ করেননি।

ভাল তবলা সঙ্গত করেছিলেন স্বপন চৌধুরী এবং তার কায়দা ও রেলাগুলিতে বক্র ছন্দের মজা ঠাসা ছিল।

বেনারসের শিল্পী গিরিজা দেবীর আভোগী কানাড়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল দুটিতে খোলা স্বরের মাদকতা, পরিচ্ছন্ন বিস্তার এবং সুরেলা সরগম, দৌড়তান ও চৌগুণতান ছিল। কিন্তু তিনি এই রাগের পকড় ম্ভ ম র স প্রায় ব্যবহারই করেননি। তিলং টপ্পা, খম্বাবতি হোরি, কাফি ভজন ও ভৈরবী ঠুংরি নিপুণতা ও শিল্পবোধের সঙ্গে গাওয়া হয়েছিল।

আসরের শেষ শিল্পী সরে দিয়া আমজাদ আলী খাঁ তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন অপ্রচলিত বসন্ত-পঞ্চম রাগে আলাপ ও জোড় দিয়ে। রাগটি শুদ্ধবসন্ত—স ম, গ ম ধ ন স (তার) ন ধ ক্ম ম গ ক্ম গ ঋ স —ও পঞ্চমের সংযোজন দ্বারা সৃষ্ট। পঞ্চমের আরোহণ হচ্ছে স ম, গ ম ধ ন স (তার) এবং অবরোহণ—ন ধ প ম গ ম স ঋ স! এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বসন্ত-পঞ্চমের আরোহণ ঠিক এই দুই রাগের মতই হবে—অর্থাৎ আরোহণে কোমল ঋষভ কড়ি মধ্যম ও পঞ্চম বর্জিত হবে। সঞ্চারী বর্ণে শুদ্ধ বসন্তের কায়দায় দুই মধ্যম লাগান যাবে এবং ক্ম ন ধ ব্যবহার করা যাবে। অবরোহণে পঞ্চমের কায়দায় ন ধ প ম এবং শুদ্ধ-বসন্তের কায়দায় ধ ক্ম ম দুইই হবে এবং দুটি স্বরসমষ্টিই লাগাতে হবে পর পর

গিরিজা দেবী

যাতে রাগটি কোন সময়েই একেবারে শুদ্ধ-বসন্ত বা পঞ্চমের মত না শোনায়। এই রাগরূপ সেনীঘরে দু-একটি বিরল ধ্রুপদ গানে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রংগবিদ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এইভাবেই বসন্ত-পঞ্চম বাজাতেন।

কয়েকটি ধ্রুপদে ক্ম ধ ন স আরোহণও পাওয়া যায়; কিন্তু যেহেতু এই আরোহণ ব্যবহার করলে বসন্ত-পঞ্চমের খুব নিকটস্থ রাগ ললিত-পঞ্চমের উত্তরাঙ্গের সঙ্গে এই রাগের উত্তরাঙ্গের পার্থক্য রক্ষা করা যায় না, সেহেতু এই ধ্রুপদগুলিকে মেনে নেওয়া যায় না।

দুঃখের বিষয় আমজাদ আলী খাঁ তাঁর সুরেলা ও সুসম্বন্ধ আলাপে মুক্ত ক্ম ধ ন স আরোহণই ব্যবহার করেছিলেন এবং উত্তরাঙ্গটি ললিত-পঞ্চমের উত্তরাঙ্গ বলেই মনে হচ্ছিল। অবশ্য অবরোহণে দুই রাগের মিলন ভালই হয়েছিল। জোড়টি নিপুণ গমক, মীড়খণ্ড, কৃন্তন ও ত্রিসপ্তক গায়কী অঙ্গ তানকারীর মহিমায় জমে উঠেছিল।

বিলম্বিত গৎটি ছিল ললিত রাগে এবং গভীর মীড়-অংশে বিস্তার পর্ব মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। রাগরূপও সবসময় সুরক্ষিত হয়েছিল। ললিত রাগ বাজাতে গিয়ে কোন শিল্পী সাধারণত রাগভ্রষ্ট হন না কাজেই বিচক্ষণ পাঠক ভাবতে পারেন রাগরূপ সুরক্ষার উল্লেখ আবার হল কেন? যাঁরা এই প্রশ্ন তুলবেন তাঁরা হয়ত জানেন না যে এই রাগেও আজকাল নামকরা ওস্তাদেরা ভুল করেছেন—সবরঙ্গ সংগীত সম্মেলনের শেষ বৈঠকে (রবীন্দ্রসদন, ১৯শে ফেব্রুয়ারি) বোম্বাইয়ের সেতারী ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খাঁ বার বার ম গ ঋ স অবরোহণ বাজিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য ললিতের অবরোহণের শেষাংশ তীব্রমধ্যম কেন্দ্রিক—গ ঋ গ ক্ম গ ঋ স। আমজাদ আলী সবসময়ই শেষোক্ত অবরোহণ ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর ছন্দের কাজ ও তান-তোড়া খালি নিপুণই হয়নি—এগুলি তিন, চার আবর্তন লম্বা ছিল এবং প্রথাগত তন্ত্রকারীর কায়দায় ঠিক মুখড়ার আগে শেষ হচ্ছিল, সমের ওপর নয়। এতে গৎকারী কঠিন হলেও শিল্পসুলভ হয়—হালিম জাফরের তথা-কথিত 'জাফরখানি' বাজে কোন কাজই এক আবর্তনের বেশী লম্বা হয় না এবং বিস্তার ব লয়কারী সবসময়ই সমের ওপর শেষ হয়, মুখড়ার ঠিক আগে নয়। এতে গৎকারী বড় বেশী সহজ হয়ে যায় এবং শুনতে ক্লান্তিকর লাগে। আমাদের সৌভাগ্য যে ওস্তাদ হালিম জাফর ছাড়া আর কেউ 'জাফরখানি বাজ' বাজান না, তাহলে তন্ত্রকারী একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

দ্রুত তিনতাল গতে আমজাদ আলী উচ্চাঙ্গের দুনি, দৌড় তানকারী ও তারপরানের কাজ করেছিলেন। ঝালার কাজ ছিল বলিষ্ঠ ও সুরেলা এবং অন্তিম পর্যায়ের প্রচণ্ড লয়তেও তিনি নায়কি ও চিকারির সমতা রক্ষা করে গিয়েছিলেন—হালিম জাফরের মত গোঁজামিল গোছের নায়কি-জুড়িতে ডিরি-ডিরি বাজিয়ে শ্রোতাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেননি।

শংকর ঘোষের তবলা সঙ্গতে সমঝদারী ছিল এবং তিনি সাথ সঙ্গত পর্বে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। আমজাদ আলী ভৈরবী রাগে আওচার ও ভাটিয়ালি গৎ বাজিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

—নীলাক্ষ গুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
[illegible]
প্রকাশিত

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরায় ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

টেলিফোন
২৩-১১৮০
২৩-৮৫৮১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১১.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	x
আমাদের লন্ডন অফিস মারফৎ (লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

প্রাসাদ থেকে বেরোবার সময়েও ওকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিলাম!
ঘ্রঁর্‌র্‌র্‌... ঘ্রঁর্‌র্‌র্‌...
অথচ জেগে থাকাই ওর কাজ!

সম্রাট ফিরে এসেছেন!
না, তিনি ভালই আছেন।
কোথায় তিনি?
কেউ জানে না...

সপ্তদশ শাসকের কাহিনী।
মহারাজ, কোথায় ছিলেন আপনি?
এখন বলব না।
সম্রাট জুনকর ফিরে এসেছেন, কিন্তু খুব বেশী কথা বলছেন না।

সম্রাট জুনকর আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। কত বড় সৌভাগ্য আমার!
সত্যি আমির, আপনি ভাগ্যবান

কী, ক্রীতদাসদের এখনও শাস্তি দিচ্ছ?
তুমি... আপনি সম্রাট?

তোমার মুখ আমি ভুলিনি!
দয়া করুন, সম্রাট!
দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করো!

আজ থেকে আমার রাজ্যে দাস-প্রথার অবসান হ'ল।
৪/২৭

এই সবই আমার পূর্বপুরুষের সময়ে হয়েছিল।
দারুণ ব্যাপার!
আশ্চর্য!
এরপর : নতুন কাহিনী ২০

VOLTAS

এখন পাবেন
সত্যিকারের
অটোম্যাটিক ডিফ্রস্টিং
ভোল্টাস ওপাল-১৬০
অটো-ডি অপ্‌শন সমেত

সবচেয়ে সেরা ফ্রিজই কিনুন

অটো-ডি থেকে কত লাভ দেখুন ঃ

না কোনো বোতাম,
না বোতাম
টেপার দরকার!

'ফ্রিজ' প্রতি রাত্রে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়, আপনা থেকে চলতে শুরু করে আর ফ্রিজের জমাবরফ আপনা থেকে গলে যায়।

ট্রে খালি করার
ঝামেলাই নেই!

এর ভেতরেই আপনা থেকে জল উবে যাবার অসাধারণ ব্যবস্থা আছে। আপনি অবাক হয়ে ভাববেন জল গেল কোথায়?

বিজলী
খরচও কম

জল আপনা থেকে উবে গিয়ে আপনার কষ্ট তো কমিয়ে দেয়ই, 'ফ্রিজ' ঠাণ্ডা রাখে অনেক দক্ষতার সঙ্গে। ফলে প্রতিমাসে আপনার বিজলী খরচ হয় অনেক কম।

ভোল্টাস লিমিটেড

ভোল্টাসের

CPV-316-234 BEN
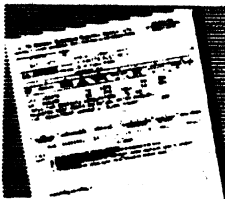
অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য.
মনোহর. রেশম কোমল. স্নিগ্ধ সুন্দর.
LUX
LUX
SUPREME

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা

এর মানে হ'ল সম্পূর্ণ সুরক্ষা। আপনি এর জন্যে যে মূল্য দেন উপকৃত হন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

মাসের ওই পাঁচটা দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্য বিশেষ ধরণের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, যাঁর ওপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন: এটি হ'ল কেয়ারফ্রী সুরক্ষা। স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে জগদ্বিখ্যাত জনসন এণ্ড জনসন তৈরী করেছেন এই কেয়ারফ্রী, যেটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বিশেষ ওয়াণ্ডাররর‍্যাপ কভার

এর জন্য কেয়ারফ্রী অবিকৃত অবস্থায় থাকে... সাধারণ ন্যাপকিনের মত কুঁচকে যায় না। তাছাড়া এটি সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় বলে, আপনার ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে এবং কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।

নীলরঙা প্ল্যাস্টি-শীল্ড রক্ষাকবচ

কেয়ারফ্রী-র তলা আর অন্য পাশ রক্ষাপ্রদ পলিথিন দিয়ে ঘেরা—যার ফলে ছিটিয়ে পড়ার বা কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।

বাড়তি শুষে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন জিনিষ

ভালভাবে শুষে নেয়, নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।

প্রান্তে টুকরো কাপড় যাতে খাপ খাইয়ে পরা যায়

একমাত্র কেয়ারফ্রী বিশ্বাসযোগ্য দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়, যাতে আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যের একটি কেয়ারফ্রী বেল্ট।

সহজে ফেলে দেওয়া যায়

কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন নিরাপদে সহজেই ফেলে দিতে পারা যায়, কেননা ফ্লাশ করলেই জলের মধ্যে সব অদৃশ্য...তাই আপনি যখন ঘরের বাইরে থাকেন, কিম্বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এটি প্রকৃত সহায়।

কেয়ারফ্রী সুরক্ষা: যে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

Carefree
SANITARY NAPKINS

© J&J 76

কেয়ারফ্রী: যুগপৎ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা

*স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্র্যাণ্ড। কেয়ারফ্রী এবং জনসন এণ্ড জনসন হ'ল ইউ এস এ-র জনসন এণ্ড জনসন-এর ট্রেডমার্ক।

Johnson & Johnson

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : নিখিলেশ দাস

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "শৃঙ্গার" (৪৮"×৭২" তৈলচিত্র)—একটি বড় প্যানেলে তিনটি খোপে তিনটি মিথুন মূর্তির ভঙ্গী ধরেছেন নিখিলেশ রেখাজালের মধ্যে। পটভূমি সবুজ রঙে স্নাত এবং জোরটা এখানে অঙ্কনের ওপরেই দেওয়া হয়েছে। এই দেহের স্বপ্ন ও দাহ দুই-ই তুলে ধরার জন্যে হয়তো কিছু উষ্ণ লালের ছোপ লাগিয়েছেন নিখিলেশ। অথচ ছবির মূল সুর কিন্তু নিস্তরঙ্গ, অবসাদ বা বিষাদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের
দুটি কাহিনী

ফেলুদা এণ্ড কোং

দাম ৮·০০

ফেলুদার দুটি নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে 'ফেলুদা এণ্ড কোং'-এ : 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' আর 'গোসাইপুর সরগরম'।

স্বনামধন্য রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলির বিখ্যাত উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নিয়ে হিন্দী ছবি তৈরী হচ্ছিল। তারই শুটিং দেখতে বোম্বাই গিয়েছিল ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ু। আর, তাইতেই পাকাল জট। সে জট শেষ পর্যন্ত গড়াল খুন অবধি।

'গোসাইপুর সরগরম'-এর রহস্য অবশ্য খুন নয়—খুনের আশংকা নিয়ে।

দুটি অ্যাডভেঞ্চারেই, বলা বাহুল্য, ফেলুদা বিজয়ী। তার এই জোড়া-জয় তার জোড়া-অনুচর তোপসে-জটায়ুর মতো নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করবে তার অজস্র অনুরাগী পাঠককে।

ফেলুদার আর সব বইয়ের মতোই 'ফেলুদা এণ্ড কোং'ও যথারীতি আগাগোড়া ঝকঝকে বাইনো টাইপে ছাপা ; আর, তার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচুর ইলাস্ট্রেশন এবং দারুণ প্রচ্ছদ॥

প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব গুহর

একটি আধুনিক ও জটিল
প্রেমের উপন্যাস

যাওয়া আসা

দাম ৬·০০

প্রসাদগুণ ও গভীরতা—এই দুই গুণই যেসব স্বল্পসংখ্যক লেখকের লেখায় পরিলক্ষিত হয়, বুদ্ধদেব গুহ সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। তাঁর নিয়মিত পাঠকমাত্রই জানেন যে, শুধু রোমান্টিক লেখাই নয়, যে লেখাই তিনি লিখুন না কেন, সেই লেখা পড়া মাত্রই ফুরিয়ে যায় না। তাঁর যে-কোনও বই শেষ করার পর বহু দিন পর্যন্ত পাঠকমনে তার রেশ থেকে যায়।

এই উপন্যাসের নায়ক সবুজ একজন সাধারণ সরকারী কর্মচারী। বিষণ্ণ, উদভ্রান্ত, রাজনৈতিক দলগুলির গদি আঁকড়ে থাকার রাজনীতিতে বিমর্ষ। তার জীবনে অর্থকষ্ট, ক্লান্তি, উপরওয়ালা, সন্দেহ, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি সবই ছিল। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে যা ভাস্বর হয়ে ছিল, তা প্রেম ; ক্ষমা। এবং তার স্বল্পবাক আশ্চর্য স্ত্রী হাসি।

একদিন সন্দেহ ও বিরক্তিতে দাম্পত্য নীড় ছেড়ে উড়ে গিয়েছিল সবুজ অন্য পাখির আকাশে। ফিরে আসতে চেয়েছিল তারপর দ্রুত ডানায় আবার তার নিশ্চিন্ত নীড়ে। কিন্তু ফিরতে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল তার।

একজন আধুনিক, জটিল, অনুভূতিপ্রবণ মানুষের এই চলে যাওয়া আর ফিরে আসা নিয়েই তাঁর নতুন উপন্যাস 'যাওয়া আসা'॥

প্রকাশিত হল

আনন্দ বাগচীর

নতুন কবিতার বই

উজ্জ্বল ছুরির নীচে

দাম ৫·০০

আকাশব্যাপী চিমনি-চুড়া, ধোঁয়াধুলোর প্রেত জ্যোৎস্নার পিছল পিচ্ছিল সবুজ শ্যাওলা, শীতের ময়লা রোদ্দুর, বোতল ভাঙা কাঁচ, টিয়ার গ্যাস—যা কিছু, সমসাময়িক ঘটনার বর্ণিল রঙী শিরতোলা শব্দাবলী, তাই আনন্দ বাগচীর প্রণয়পদাবলী। পুরোনো ছোপ-ধরা কলকাতার আঁকাবাঁকা অলিগলি, বিস্কুট রঙের শীর্ণ হাজার বাড়ি-বারান্দা, সেখানকার মুখ-শুকনো মানুষজন, তাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দ—এসবই তাঁর চলচ্চিত্রবিলাসী কবিতার অভিরাম উপমা, অবিরাম উপকরণ। কখনও তিনি স্বপ্নের ফেরিওলা, কখনও হাতে বিদ্রূপের বাঁকানো ছুরি, শেয়ালের লংকাগুঁড়ো, কালো অন্ধকার কাপড়ে ঢাকা মেঘের নীচে আনন্দ দেখান তড়িৎ-শিহরন, নক্ষত্রন, তার চতুর ম্যাজিক। কোথায় যেন তাঁর কাব্যে আছে কটু বারুদের গন্ধ, বিস্ফোরণের পরবর্তী স্তব্ধ থমথমে ভাব, ছড়ানো আছে ফৌজী কামুফ্লাজের চোরা কাঁটাতার। নরম নারীর স্মৃতিমুখ, দুঃখের ছেড়ে যাওয়া। ভালো লাগার ভালো লাগা। প্রতিশ্রুতির চিরকুট। চোখ ঝাপসা করা কথার পাখনা। সব মিলিয়ে বাংলা কবিতার বিগত কুড়ি বছরের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা এই আনন্দ বাগচী। তাঁর সাম্প্রতিক চিন্তার রূপান্তর 'উজ্জ্বল ছুরির নীচে' কবিতা-ক্ষুধার্তদের কাছে এক সংবাদ এবং আবশ্যিকভাবে পরীক্ষাসাপেক্ষও॥

প্রকাশিত হল

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৬
শনিবার ১০ বৈশাখ ১৩৮৪

কবি ইকবাল

উর্দু ভাষা ভারতের ঐতিহাসিক জীবনের একটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। সুতরাং উর্দু সাহিত্য বিশেষভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বড় সম্বল। সম্প্রতি কবি সার মহম্মদ ইকবালের প্রতিভা ও কাব্যকৃতির বিচার ও আলোচনার যে অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে, সেটা পরোক্ষভাবে উর্দু সাহিত্যের উন্নত সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষের স্মরণ এবং স্বীকৃতির অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হতে পারে। উর্দু ভাষাকে অন্যতম ভারতীয় ভাষা হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করাই ভারতের জাতীয় নীতি, যে-নীতি সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী দেশের সরকারী অভিমতের ও আচরণের নিয়ামক হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে, কবি সার মহম্মদ ইকবাল কি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের আপনজন নন? তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেছিলেন বলেই কি তাঁকে পাকিস্তানের কবি বলে মনে করতে হবে? ভারতে যাঁরা উর্দু ভাষার এবং উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি ও সাংস্কৃতিক জন, তাঁরা নিশ্চয়ই ইকবালকে পাকিস্তানের কবি বলে মনে করেন না। অনাভাষী সাধারণ ভারতীয় জনই বা কেন ইকবালকে পাকিস্তানের কবি বলে মনে করবেন? প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয়, ইকবালের সাহিত্য পাকিস্তানে (যেখানে কোন প্রাদেশিক অধিবাসীরই মাতৃভাষা উর্দু নয়) যতটা অনুশীলিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে, ভারতে তার তুলনায় বেশী ছাড়া কম অনুশীলিত ও সমাদৃত হয় না। ভারতীয় সাংস্কৃতিকের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয় যে, ইকবালের চিন্তা, বিশ্বাস ও কবিত্বের সৃষ্টি হয়ে সারা ভারতের প্রাণে দেশপ্রেমের বিশাল আবেগ সঞ্চারিত করেছিল একটি সঙ্গীত—সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা। সেই সঙ্গীতের প্রেরণা ভারতীয় দেশপ্রেমিকের প্রাণে ও জীবনে আজও আছে।

পরবর্তী কালে কবি ইকবালের কোন-কোন রচনার বক্তব্য অবশ্য ভারতীয় জাতীয়তার পরিপোষক নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করতেই হয় যে, কবি ইকবাল ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্ব ও মহিমার একজন প্রধান উদ্গাতা।

চিশ্‌তিনে জিস জমিনমেঁ
পয়গামে হক শুনায়া।
নানকনে জিস চমনমেঁ
ওহদৎকি গীত শুনায়া ॥

সাধক চিশ্‌তি যে দেশের মাটিতে থেকে সত্যের বার্তা শুনিয়েছেন, নানক যে-দেশের কুঞ্জে বসে ঐক্যের গান শুনিয়েছেন...সে দেশ তো এই হিন্দুস্তান, এই ভারত। দ্বিতীয় একটি প্রধান সত্য এই যে, কবিত্বের ও কাব্যের গৌরব ও রম্যতার বিচারের জন্য কবির মত ও মতবাদের মূল্য তথা গুরুত্ব খুবই সীমায়িত। হেন কবি নেই, যাঁর সব অভিমতের সমর্থন তাঁর প্রবল ভক্তের পক্ষেও অনুভব ও ব্যক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মতান্তর ঘটাবার মতো অনেক উক্তি ও উল্লেখ কোন কবির রচনাতে না থেকে পারে না। কিন্তু সেজন্য সার্থক কাব্যকৃতির মর্যাদা লঘু হয়ে যায় না।

ইকবালের প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠানে একটি অভিমত সর্ববাদী সম্মতির মর্যাদা নিয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে। সেই অভিমত এই যে, কবি ইকবাল পাশ্চাত্তের সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রকারে পরিচিত হয়েও প্রভাবিত হননি। তাঁর সাহিত্যে পশ্চিমের ভাব কল্পনা ও অভিরুচি অনুকৃত হয়নি। বড় কবির এবং বড় মনস্বীর প্রতিভাগত বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিদেশীয় ভাব ও কল্পনাকে আহরণ করেন, দাস্যভাবে বিনত হয়ে অনুকরণ করেন না। ভারতের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস তথা নবোন্মেষ এই রীতিতে নিষ্পন্ন হয়েছে। আধুনিক ভারতের চিন্তানায়ক সকল মনস্বী পাশ্চাত্তের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাব চিন্তা ও রীতিনীতির মহৎ প্রকাশ স্বচ্ছন্দে আহরণ করেছেন, অনুকরণ করেননি।

কবি সার মহম্মদ ইকবাল তাই প্রতিভা হিসাবে একটি সম্মানীয় ও বাঞ্ছিত আদর্শের প্রতীক। তিনি ক্যাপিটাল রচয়িতা কার্ল মার্কসের মতবাদ এবং পশ্চিমী ডেমোক্রেসী, উভয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ভৎর্সনা নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর মতে কার্ল মার্কস হলেন, 'বে-জিবরইল মহাপুরুষ'। তিনি চেয়েছেন, 'ডেমোক্রেসীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে জ্ঞানী সাধকের ভক্ত হও।' বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত সম্পর্কে অনেকের মনে নানা আপত্তি প্রশ্নায়িত হবে। কিন্তু একটি সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কবি ইকবাল পশ্চিমের কোন মতবাদের দ্বারা 'প্রভাবিত' হননি।

ভারতীয় সাংস্কৃতিকের পক্ষে ভুলে যাওয়া খুবই ভুল যে, কবি ইকবালের উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্যে একদিন ভারতের সমন্বিত সংস্কৃতির তথা কম্পোজিট কালচারের আভাসিক সত্যটি সংজ্ঞায়িত হয়েছিল।

সুনী পড়ি হ্যায় মুদ্দতসে
দিলকী বস্তি।
আ, এক নয়া শিবালা
ইস দেশ মেঁ বসা দেঁ ॥

যুগ যুগ ধরে এই প্রাণের মাটি শূন্য হয়ে রয়েছে। আয়, এক নতুন শিবালয় এই মাটির উপর স্থাপিত করি। ইকবাল চেয়েছেন, এই শিবালয়ের কলস আকাশ স্পর্শ করুক, সব তীর্থের চেয়ে বড় হোক এই তীর্থ। মানবতার প্রতি তাঁর আহ্বান—মিসলে বু কয়দ হ্যায়, গুঞ্চেমেঁ পরেশাঁ হো যা। কুঁড়ির ভিতরে বন্ধ হয়ে রয়েছে যে গন্ধ, সে গন্ধ তুফান হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। মানবতার এই বন্ধনমুক্তির উদ্গাতা ইকবাল জীবনের জন্য প্রেমের পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের অভিষেক চেয়েছেন—ইস মহমিল খালি কো ফির শাহিদে লয়লা দে। শূন্য উটের হাওদাতে আবার লায়লীকে বসিয়ে দাও।

দৃশ্যপট

সাধারণত প্রায় সর্বত্রই যা ঘটে থাকে কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে—জরুরী অবস্থার সব দায়দায়িত্ব এখন তিনচারজন লোকের উপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন সারা ভারতের প্রগতিশীল কংগ্রেসীরা যেন তাঁরা কিছু করেন নি, সব করেছেন ওই তিনচারজন লোক। ওই তিনচারজন হলেন সঞ্জয় গান্ধী, বংশীলাল, ওম মেহেতা এবং বিদ্যাচরণ শুক্লা।

কংগ্রেসীদের অভিযোগটা যে শুধু এদের বিরুদ্ধে নয় তাও পরিষ্কার। তাঁদের আসল অভিযোগটা হল শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে। অবশ্য প্রথমেই তাঁরা প্রকাশ্যে শ্রীমতী গান্ধীর নাম বলতে সাহস পান নি। প্রথমে বলেছেন শুধু ওই চারজনের কথা। তারপর আস্তে আস্তে নিয়ে এসেছেন শ্রীমতী গান্ধীর নাম। তাঁদের অভিযোগ হল, সব দায়িত্ব শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর সমর্থনপুষ্ট একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর। এরাই নাকি সব কিছু করেছেন। আর সবাই নাকি ধোয়া তুলসিপাতা। আর সকলের নাকি কোনও দায়িত্বই নেই।

এই কাজটা সবচেয়ে বেশি করছেন কংগ্রেসের সি পি আই-পন্থীরা। এরাই এখন সবচেয়ে বেশি সরব। এরাই এখন দাবি তুলছেন ইন্দিরা-সঞ্জয় গোষ্ঠীকে কংগ্রেস থেকে বের করে দিতে হবে।

এদের লক্ষ্যটা অবশ্য খুব পরিষ্কার। এই সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীরা এখন কংগ্রেসটা দখল করে ফেলতে চান। কংগ্রেস দখল মানে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল। দলের ভেতরে যাঁরা সি পি আই বিরোধী বলে পরিচিত তাঁদের তাঁরা বের করে দিতে চান। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই এখন বিশেষ করে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের ঘাড়ে সব দায় দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা চলছে।

*

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে জরুরী অবস্থা চালু করে মানুষের সব গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মূল দায়িত্ব শ্রীমতী গান্ধীর। কারণ তিনিই তখন ছিলেন প্রধান-মন্ত্রী। তাঁর অনিচ্ছা থাকলে কিছুতেই এ জিনিস হতে পারত না। কিন্তু তা বলে এটা মানা সম্ভব নয় যে তিনি ছাড়া আর কোনও কংগ্রেসী নেতা এই জিনিস চান নি, এটাও মানা সম্ভব নয় যে তিনি এবং তাঁর পুত্রের গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ জুলুমবাজী চালান নি। জরুরী অবস্থার সুযোগে অধিকাংশ কংগ্রেসীই জুলুমবাজী চালিয়েছেন। জরুরী অবস্থার সুযোগে আমলারাও যথেচ্ছ আচরণ করেছেন। আমি এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে থানার দারোগা হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কোনও গরীবকে মিসায় আটক করেছে।

যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের কথা। জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় তিনি সিংহ অবতার সেজেছিলেন। যাকে তাকে ডেকে ধমকেছেন, জানো আমি কত শক্তিশালী? জানো এই জরুরী অবস্থার কাগজপত্র কে তৈরী করে দিয়েছে, জানো প্রথম গ্রেফতারীর তালিকা কে রচনা করেছে? যাঁরা ভয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি তাঁদের ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা তা করেন নি তাঁদের বিরুদ্ধে জরুরী অবস্থার সুযোগে যথেচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনিই বিজয় সিংহ নাহারকে সি আই-এর চর বলে, চক্রান্তকারী বলে দল থেকে তাড়িয়েছেন। তিনিই তাঁকে যাঁরা সমালোচনা করেছেন সেই সব সাংবাদিককে জেলে পুরেছেন। এহেন ব্যক্তিও এখন বলছেন সব কিছুর জন্য ইন্দিরা গান্ধী ও তস্য পুত্র দায়ি! এহেন ব্যক্তিও এখন বলছেন আমি জরুরী অবস্থার ব্যাপারে কিছুই করিনি।

অথবা ধরুন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চন্দ্রজিৎ যাদবের কথা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বহুগুণাকে তাড়াবার সময় তিনি ইন্দিরা-সঞ্জয়ের দক্ষিণহস্ত। আবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে যুব কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সরাবার সময়ও তিনি সঞ্জয় গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত। প্রিয়বাবুই তখন বলতেন, চন্দ্রজিৎ গুণ্ডা দিয়ে সভা দখল করে আমাকে সরাবার প্রস্তাব পাশ করাল। এহেন ব্যক্তিও এখন বলছেন, সব কিছু করেছে ইন্দিরা ও সঞ্জয়, এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত!!

আর সেই 'ইন্দিরাই ভারত' শ্লোগানের জনক দেবকান্ত বরুয়া। তিনিও এখন বলছেন, সব কিছু করেছে ইন্দিরা ও তাঁর পুত্রের গোষ্ঠী। তিনিও বলছেন, তাঁদের শাস্তি হওয়া চাই। তিনি নাকি এখন বন্ধু-বান্ধবদের এমনও বলছেন যে সঞ্জয় গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল।

ইন্দিরা গান্ধী জিতলে কিন্তু এঁরাই সবাই তাঁর জয়ধ্বনী দিতেন! এঁরা সবাই তাঁদের বিরোধিদের মুণ্ডুপাত করতেন এবং তাঁদের আবার জেলে ঢোকাতেন।

*

রাজনীতি বড় বিচিত্র জিনিস। সুযোগ-সন্ধানীই রাজনীতিতে বেশী। কাজ গোছানোর জন্য নানা লোক নানা পরিস্থিতির সুযোগ নেন। আবার কাজ হয়ে গেলে যাঁর কাছ থেকে সুযোগ নেন তাঁরই মুণ্ডুপাত করেন। হাতে যিনি যখন ক্ষমতা পান তিনিই সিংহ অবতার হন। আবার ক্ষমতা চলে গেলে তিনিই অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেন। এই গুণটা আবার নব কংগ্রেসীদের মধ্যেই বেশি।

ধরুন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কথা। বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশন যখন হল তখন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীরাই এখানের কংগ্রেসের প্রধান। সেই সুযোগে তাঁরা এমন ব্যবস্থা নিলেন যাতে প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত বসু, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর কোনও ছেলে বিধাননগর কংগ্রেসের ধারে কাছে না যেতে পারে। বেশ কিছুদিন পরে আবার অবস্থা পাল্টাল। কমল নাথের মাধ্যমে প্রফুল্লকান্তি ঘোষ সঞ্জয় গান্ধীকে গিয়ে ধরলেন এবং তাঁর ভাইদের নিয়ে মাসের পর মাস গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর ওখানে ধরনা দিলেন। প্রথমে একটাই আবেদনঃ প্রিয় গোষ্ঠীকে সরিয়ে রাজ্য যুব কংগ্রেসটা আমাদের হাতে তুলে দাও। সেই আবেদন মঞ্জুরও হল। প্রিয়বাবু হটলেন দিল্লিতে, এখানে হটলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রধান হলেন প্রফুল্লকান্তিবাবুর একান্ত অনুগত ভাই বারিদবরণ দাস। এমনও বলা হল যে কুমুদ ভট্টাচার্যকে মিসায় গ্রেফতার করতে হবে। তারপর এল আর এক পর্ব। সিদ্ধার্থবাবু প্রফুল্লকান্তিবাবুদের জব্দ করার জন্য কমল নাথের মাধ্যমে বরকত গণি খান চৌধুরীকে পাঠালেন সঞ্জয় গান্ধীর কাছে। ক্রমে দেখা গেল বরকত গণি খান চৌধুরীই সঞ্জয় গান্ধীর ঘনিষ্ঠতম। তখন ক্রমে ক্রমে সবাই এক হলেন বরকত গণি খানের বিরুদ্ধে। সিদ্ধার্থবাবু, প্রফুল্ল-কান্তিবাবু, প্রিয়বাবু, লক্ষ্মীবাবু সব বরকতের বিরুদ্ধে একজোট!

নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল শ্রীমতী গান্ধী পরাজিত তখন সবাই খোলাখুলি নামলেন তাঁর এবং তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে। এবং তৎসহ যাতায়াত শুরু করলেন জগজীবন রাম ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে!

রাজনীতি বড় বিচিত্র জিনিস। বিশেষ করে নব কংগ্রেসীদের রাজনীতি। আসলে এরা সবাই জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন। এঁরা সবাই যাকে তাকে মিসায় ধরিয়েছেন। এখন আবার এঁরাই সব দোষ চাপাবার চেষ্টা করছেন শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ছেলের উপর। কি বিচিত্র রাজনীতি নব কংগ্রেসীদের!

১১-৪-৭৭

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

হাঁসজারু

সংসদীয় গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর বিলেতে। সেখানেই তার জন্ম, সেখানেই সে বেড়ে উঠেছে, তার নিয়মকর্মও সেখানেই। দুনিয়ার যেখানেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি সে সবই তারই বংশধর—সাক্ষাৎ না হলেও তার ধর্মপুত্তুর তো বটেই। বিলেত থেকেই সে গণতন্ত্রের পাঠ সবাই নিয়েছে। নকলও সবাই তারই ধরণ ধারণের করে। কোনো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের রেওয়াজ নিয়ে কথা উঠলে সবাই বিলিতী নজির খোঁজে। ফয়শালাও হয় তাই দিয়েই। এতকাল সে সব নজির ছিল পাকা-পোক্ত। কালের হাওয়ায় সে সবও কিন্তু পালটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বলতে গেলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটাই বদলে গেছে। তার ভিতটা এখন তেমন আর মজবুত নেই। তার একটা কারণ হচ্ছে প্রধান খুঁটিটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। সে খুঁটিটা হচ্ছে যাকে বলা হয় টু পার্টি সিস্টেম—দু দলের রাজনীতি। বিলেতে পালা করে দুটো দল দেশ শাসন করে। একটা হল শাসক দল, অপরটা বিরোধী। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গড়ে, সংখ্যালঘু দল তার সমালোচনা করে।

মৌরসী পাট্টা নিয়ে বিলেতে কোনো দল গদিতে বসে না—গদি আঁকড়েও কেউ থাকে না। নির্বাচনে জিততে পারলেই পাঁচ বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত। ত ছাড়া আয়ারাম-গয়ারামের বালাই ওদেশে নেই। কাজেই কোনো মন্ত্রিসভারই সুখের ঘরে আচমকা আগুন লাগে না। অকাল নির্বাচন হয় তাই কমই। নেহাৎ কারে না পড়লে কোনো প্রধানমন্ত্রীই মেয়াদ ফুরোবার আগে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের ঢাকে কাঠি দেন না। অন্তত এতদিন এই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু কালের গতিকে এরও হেরফের হচ্ছে। বরাবরই বিলেতে রাজনীতির আসরে মূল গায়েন ছিল দুটো দল—পালা করে তারাই আসর জমাত। সেকালে ছিল হুইগ আর টোরি তারপর হলো তাদেরই রকমফের, টোরি বা কনজারভেটিভ অর লিবারাল। কিন্তু শনিতে ধরলো লিবারাল দলকে। তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না বটে কিন্তু ক্ষয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে ক্ষমতায় নতুন দাবিদার হয়ে দাঁড়ালো লেবার পার্টি অর্থাৎ শ্রমিক দল। এক সময়ে মনে হয়েছিল বিলেতে বুঝি ক্ষমতার দাবীদার হয়ে দাঁড়াবে তিন। তা হলেই কিন্তু গোল বাধতো। না থাকতো রাজনীতিতে স্থিতি, না চলতো বাঁধা নিয়মে পাঁচ বছর অন্তর পালা বদল, রকে যেমন প্রবেশ ও প্রস্থান।

দুটোর বেশী তিনটে দল হলেই যে সংসদীয় গণতন্ত্র অচল হয়ে যাবে এমন নয়। বিলেত ছাড়া অমন নিখুঁত ব্যবস্থা কোথাও নেই বললেই চলে। বিলেতেও সাবেক নিয়মে চিড় ধরেছে। লিবারালদের বোল-বোলাও গেছে বটে কিন্তু তারা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। সরকার গড়বার সাধ্যি তাদের নেই, আর কখনও হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যেটুকু শক্তি তাদের আছে তাতেই তারা বেকায়দায় ফেলেছে দুই প্রধান—কনজারভেটিভ আর লেবারকে। আরও একটা ফ্যাকড়া হালে দেখা দিয়েছে। গোটা কয়েক ছুটকো দলও ভোটের লড়াইয়ে কিছু কিছু আসন ছিনিয়ে নিচ্ছে দু বড় তরফের কাছ থেকেই। তাতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাওয়া বড়দের পক্ষে ক্রমেই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্য যে সব দেশে অনেক দল সেখানে একটা দলের সরকার গড়বার মতো সংসদে ভোটের জোর থাকে না। পাঁচজনে মিলেজুলে সেখানে গড়ে কোয়ালিশান সরকার অর্থাৎ পাঁচ-শরিকী মন্ত্রিসভা। এ ধরনের সরকার টেঁকে না। ঘড়ি ঘড়ি পালা বদলায়।

বিলেতে মিশ্র অর্থাৎ কোয়ালিশান সরকার গড়ার দরকার হয়নি এক লড়াই কিংবা নিদারুণ সঙ্কটের সময় ছাড়া। লড়াই মিটে গেলে কিংবা সংকট চুকলেই আবার যে কে সেই হয়েছে—এক দলের সরকার ফিরে এসেছে। হালে নির্বাচন লড়াইয়ে কেল্লাফতে করে গদি দখল করেছে হয় রক্ষণশীল অর্থাৎ কনজারভেটিভ নয় লেবার অর্থাৎ শ্রমিক। ফারাকটা কিন্তু ক্রমশ কমছে। তাতে তেমন কিছু এসে যেত না যদি আসন ভাগাভাগি হতো দু প্রধানের মধ্যেই। কিন্তু মাঝ থেকে ভাগ বসাচ্ছে লিবারালরা তো বটেই অন্য ছোটো দলও। তাতে ফাঁপরে পড়েছে বড়রা। এখন শ্রমিকরা বিলেতে শাসক দল। দু নম্বর দল রক্ষণশীলদের চেয়ে তাদের আসন বেশী। কিন্তু ওদুটো দল ছাড়া বেশ কিছু আসন রয়েছে ছুটকো দলগুলোর দখলে। তাদের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে লিবারাল। তাদের আছে কমন্সে ১৩টা আসন। এ ছাড়া আছে ওয়েলস, স্কটল্যান্ড আর উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের আঞ্চলিক দল। ওরা আগে পাত্তা পেত না। কিন্তু বিলেতেও আঞ্চলিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

বিলেতে শেষ নির্বাচন হয়েছে আড়াই বছর আগে। তাতে রক্ষণশীলদের হারিয়ে দিয়েছিল শ্রমিকরা কিন্তু অতি কষ্টে। কমনস্ সভায় তাদের গরিষ্ঠতা হয়েছিল মোটে তিন। তারা পেয়েছিল ৩১৯টা আসন। রক্ষণশীলরা ২৭৬। বাকী সবাই মিলে ৪০। এই সামান্য পুঁজি নিয়েই তারা তাল ঠুকে আসরে নেমে পড়েছিল এই ভরসায় যে অনায়াসে না হলেও তাদের নৌকো তারা চালিয়ে নিতে পারবে পুরো পাঁচ বছরই। কিন্তু দেশের হালচাল যা তাতে তাদের নৌকো ক্রমাগত ঠেক খাচ্ছে। আর্থিক অবস্থা কিছুতেই সামলাতে পারছে না শ্রমিক দল। যা তারা করতে চায় তাতে হয় চটে খেটে খাওয়া মানুষের দল নয় মালিকরা। একটা আপস করা খুবই শক্ত। দেশে জিনিসের দাম বাড়ছে, বেকারিও। বিরাট ঘাটতি বৈদেশিক বাণিজ্যে। পাউণ্ডের মানমর্যাদা গেছে, তার দাম হুহু করে পড়ছে। কুলীন মুদ্রা বলে দুনিয়ার হাটে সে আর গণ্য নয়। কোনো-মতে মান বাঁচিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে টাকা ধার নিয়ে। তার ওপর আর এক বিপত্তি। উপনির্বাচনে শ্রমিক দল হেরে হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছে। যে সব জায়গায় কস্মিনকালেও রক্ষণশীলরা জেতেনি সে সব জায়গাও হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে শ্রমিক দলের। শেষ যে উপনির্বাচন হয়েছে স্টেচফোর্ডে তাতেও দল হেরেছে।

তারা এখন কমনস সভায় সংখ্যালঘু। তাদের হাল দেখে রক্ষণশীলরা ভেবেছিল শ্রমিকদের ঘায়েল করার এই মওকা। তাদের প্রধান শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তা নাকচ হয়ে গেছে ২৩ মার্চ এক আধ ভোটে নয় ২৪ ভোটে। কিন্তু যা করে প্রধানমন্ত্রী ক্যালাহান জিতেছেন তাতে এক নতুন নজির তৈরি হয়েছে বিলেতে। তিনি লিবারাল নেতা ডেভিড স্টীলের সঙ্গে চুক্তি করেছেন এই বলে যে লিবারালরা সরকারকে সমর্থন দিলে সরকারী নীতি ঠিক করার আগে সে দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। তার মানে সরকারী নীতি এখন আর এক দলের থাকছে না তা হচ্ছে দু দলের। ঠিক হয়েছে নিয়ম করে দু তরফের পরামর্শ সভা বসবে এর পর। গোটা কয়েক লিবারালদের প্রস্তাব শ্রমিকরা মেনে নিতেও বাধ্য হয়েছে। এই করে ফাঁড়া কাটিয়েছেন ক্যালাহান সরকার—মাস ছয়েক অন্তত এভাবে তাঁরা চালাবেন। এ নয়া ব্যবস্থা শরিকী সরকারও নয়, আবার শরিকী সরকারও। মন্ত্রিসভায় ঠাঁই না পেলেও নীতি ঠিক করার অধিকার তো লিবারালরা পেয়েছে। এখন কী আর বিলিতী সরকারকে শ্রমিকদের এক দলীয় সরকার বলা যায়?

[illegible]

সংসার

যোগব্রত চক্রবর্তী

গত ১ এপ্রিল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় যোগব্রতর পরলোকগমন ঘটেছে। সঙ্গের এই চিঠি আর কবিতাটি আমাদের হাতে পৌঁছল ৫ এপ্রিল। ডাকঘরের ছাপ অর্থাৎ কবিতাটি পাঠাবার তারিখ অস্পষ্ট হলেও মনে হচ্ছে ১ এপ্রিলই সে কবিতাটি পোস্ট করেছিল। তার এই অভাবিত বিদায় আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

শ্রদ্ধেয় সাগরদা,

আপনার পত্রিকার জন্য একটা কবিতা পাঠালাম। পছন্দ হলে ছাপবেন। আমার কথা আপনাকে নতুন করে বলবার নেই—শুধু বলি সত্যি বড় কষ্টে আছি। প্রণাম জানবেন

আপনাদের
যোগব্রত

তিনটে শালিক ঢোকে গেরস্থের ঘরে
বলে, সুখবর আছে......
ঠিক তখনই সোনালী আলো জাল ফেলে
পুকুরের জলে।

হাত ধরে হেঁটে যাওয়া পথে পথে
ঘাস থেকে তুলে নেওয়া শিশিরের স্বাস্থ্যপ্রদ কণা
কে না জানে প্রেমিকার অপার মহিমা......

সকালে চায়ের কাপে ঠোঁট রেখে একটি মানুষ শুধু বুঝে নেয়
চারদিকে কত আছে দেনা......

একটু পুড়ুক

কবিরুল ইসলাম

যতো কেন বোঝাবার চেষ্টা করো তাকে
থুবড়াতে চাও হাত দিয়ে দুচোখ
জাড় পাথরের মতো যার ব্যবহার ছিলো
সে বালক সূর্যাস্তে পোড়াতে চায়
নিজের কপাল
যেমন লণ্ঠনে পোড়ে শিশুর আঙুল

আহা, একটু পুড়ুক!
কেবল কথায় কোনো দরজা খোলে না॥

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

আমি সুখে আছি:
বেড়ে ওঠা নিঃসঙ্গ সবুজ পাহাড়ের বৃষ্টিভেজা ছয় ঋতু নিয়ে
মনে হয় আমি সুখেই আছি।
তুমিও দাঁড়াও না বিশাল মেঘের দেয়াল ধরে।
খোলা বাতাসের ঝড়ে ছুটে যাওয়া মেঘের মতো
স্পর্শ করে দ্যাখো সুখের এ শরীর।

আমি তো-সুখেই আছি:
আকাশ রেখায় ভাসমান বৃষ্টি কণার মতো
তুমিও এসে দাঁড়াও মেঘ-কুয়াশার অস্থির ঘরে।

সে আসে না তবু।

এইভাবে

দিব্যেন্দু পালিত

স্বপ্ন-সন্ধানী কবি গৌহাটি বেড়াতে গিয়ে ফিরবে না আর
কেশর-ফোলানো ঘোড়া সূর্যের লালের নীচে গিয়ে
দেখাবে সৌন্দর্য তাকে; যা আসলে দুষ্প্রাপ্য কবিতা—
তেমন বোধ্য নয়; পরবর্তী কবিদের হাতে
এইভাবে এসে পড়বে গোপন যাত্রার নির্দেশ।

ছড়ানো অক্ষরগুলি বেঁধে নিয়ে চৈত্রের হাওয়ায়
একজন তরুণ কবি মগ্ন হবে জলে—
নিজেকে মাছের মতো ভাবতে গিয়ে হয়ে যাবে মাছ;
কবিতার চেয়ে ঢের কার্যকর জেলেদের হাত।

তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে আমাকে তুলে দিয়ে
একজন জ্যোতিষী বলবে, শুক্রবারে ফেরা
তোমার বরাতে নেই, আজ যাও, শনিবারে ফিরো।
তারই কথামতো উঠবে সমস্ত কলকাতা জুড়ে কালবৈশাখী—
অপমানে ক্রুদ্ধ জেট পালাতে পালাতে থামবে নাগপুরে এসে।

ঝড়কে শাসন ক'রে বইয়ের গন্ধে মুখ ঢেকে
নিজের অজ্ঞাত তালে তুলে নেবে সাগনায়েড—সেও এক কবি।
নিজর্দা পানের খিলি মুখে পুরে সাদা মুখ ভাসাবে হাসিতে
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন : কি-রকম গণনা মেলে না?
একটি কবিতা লিখে আমাকে এড়াতে পার তুমি!

কলম

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

উজ্জ্বল কলম, তুমি কার?
জৌলুশে পালিশে রঙে—অপেক্ষায় চাপা কাচঘরে
কুমারী মেয়ের মতো মূর্খ, তুমি কার?
মেধাবী বয়স্ক হাতে প্রাথমিক স্পর্শ পাবে, না কি
অসহিষ্ণু শিশুর আঙুল
অক্ষর লেখাবে ভাঙাচোরা
অথবা মনস্ক যুবা প্রগাঢ় বাসনা আঁকবে
কাগজের নীলিমায় প্রেমিকার নামে—
তুমি জানো? মহার্ঘ কলম
অম্লানিন্যে অর্থহীন, নির্বিশেষ পণ্য হয়ে আছ
কবে, কার হবে?

কেউ জানে

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

সামনে সে নেই, কোথাও দেখিনি আমি
সমুদ্র মিশিয়ে তাকে নিয়েছে কি নীলে?
আগুন খেয়েছে শুষে? কিছুই জানি না
সে সুন্দর, নির্মাণের শিল্প যে মধুর
এখন সামনে নেই, আছে কি আড়ালে
কেউ জানে? জানো যদি আমাকে শেখাও
উদগ্রীব আছি খুব, মন বড়ো টানে—

দৃষ্টিকোণ

লেখকের জীবিকা

সুব্রত সেনগুপ্ত

সাহিত্যের সমস্যা কি তা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু সাহিত্য রচনা করেন যিনি সেই সাহিত্যিকেরও তো অনেকরকম ব্যক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে। আর তার সবগুলোই যে সরাসরি লেখা সংক্রান্ত তা নয়। একজন লেখক হয়তো স্বাস্থ্যবান নন বলে মনে মনে সুখী নন। আরেকজনের গায়ের রং যথেষ্ট ফর্সা নয় বা অনেকের তুলনায় তিনি কম লম্বা বলে হয়তো দুঃখ পান। লেখকরা সব সময় শুধু গভীর দুঃখে দুঃখী তা ভাবার কোনো কারণ নেই। বিশেষ কোনো মেয়ের কাছে পাত্তা না পেলে, অফিসে ওপরতলার বকুনি শুনতে হলে, প্রিয় দল খেলায় জিততে না পারলে একজন লেখকও যে-কোনো অ-লেখকের মতই কষ্ট পান। এমন কি বাড়ি থেকে বেরনোর সময় হাতের কাছে গেঞ্জি খুঁজে না পেলে তিনিও কম বিরক্তি বোধ করেন না।

সংসারের প্রায় সবরকম ঝামেলা একজন লেখককে সহ্য করতে হয়। তার মধ্যে লেখকের জীবিকার সমস্যা ধরা যাক। জীবন-ধারণের জন্য তাকে কিছু একটা করতেই হয়। একজন লেখকের কাজ কি হওয়া উচিত?

যে-কোনো ব্যবসায় প্রয়োজন হয় মূলধন, মজুর এবং মাল-মসলা। সাহিত্য-ব্যবসায় মজুর লেখকের হাত। মালমসলা তাঁর ভেতর ও বাইরের অভিজ্ঞতা আর মূলধন তাঁর লেখার ক্ষমতা। এইসব ছাড়াও ব্যবসায় একজন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়। সাহিত্যের জন্য লেখকের কামনা এখানে উদ্যোক্তার ভূমিকা নেয়। একটি কৌতুক-গল্প শুনেছি, একজন ব্যবসায়ী এক সাহিত্য-ব্যবসায়ীকে বলেছিলো, আপনার কিরকম লাভের ব্যবসা! এক পয়সা মূলধন নেই, শুধু কিছু কাগজ আর একটা কলম হলেই হয়ে গেলো। আর আমরা এত টাকা আর বুদ্ধি খাটিয়েও বিশেষ মুনাফা তুলতে পারছি না।

কিন্তু আমাদের ভাষায় রচিত সাহিত্যের যেরকম প্রচার তাতে এমন কি জনপ্রিয় লেখকরাও কোনো ব্যবসায়ীর ঈর্ষার যোগ্য মুনাফা তোলা দূরে থাকুক, জীবিকার জন্য শুধু লেখার ওপর নির্ভর করতে সহসা সাহস পান না।

ফ্রাসোঁয়া সাগার প্রথম উপন্যাস ফ্রান্সেই সাত লক্ষের বেশী বিক্রি হয়েছিলো। চৌদ্দটি ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছিলো। আমেরিকায় তাঁর প্রথম দুটো বই কুড়ি লক্ষের বেশী বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি অবশ্য স্যামুয়েল বেকেটেরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্তী কালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের উপন্যাস 'মলয়ের' নিজের করা ফরাসী অনুবাদ প্রথম চার বছরে বিক্রি হয়েছিলো পঁচানব্বই কপি।

আমাদের ভাষার অধিকাংশ জনপ্রিয় লেখকও লেখা ছাড়া অন্য কোনও জীবিকার ওপর নির্ভর করেন।

ফরাসী লেখক জর্জ সিমনঁ যিনি স্বনামে এক শ' পঞ্চাশের বেশী, ছদ্মনামে আরও অনেক বেশী গ্রন্থের প্রণেতা এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও সুলেখক হিসেবে সংবর্ধিত, একবার বলেছিলেন, লেখাকে একটা পেশা হিসেবে ভাবা হয়, আমার মনে হয় না এ কোনো পেশা। আমার মতে, লেখক হওয়া যার পক্ষে জরুরী নয়, যিনি মনে করেন তিনি অন্য কিছু করতে পারবেন, তাঁর অন্য কিছু করা উচিত। লেখা কোনো পেশা নয়, বরং সুখহীনতার একরকম জীবিকা'।

একজন শিল্পীর পক্ষে সুখী হওয়া হয়তো কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু লেখা যার পক্ষে জরুরী তিনি কি করবেন? কি ধরনের জীবিকা একজন লেখকের পক্ষে ভালো? উইলিয়াম ফকনারের মতে, লেখকের পক্ষে সবচাইতে ভালো কাজ, কোনো বেশ্যালয়ের বাড়িওলা হওয়া। তা হলে তার থাকাখাওয়ার কোনো চিন্তা থাকবে না। কাজও বিশেষ করতে হবে না। লেখার পক্ষে যেটা সবচাইতে ভালো সময় সেই সকালবেলা সে বেশ শান্ত পরিবেশ পাবে। যে আবহাওয়ায় লেখকের রক্তের চাপ বেড়ে যায়, হতাশা আর উত্তেজনায় বেশির ভাগ সময় চলে যায়, লেখকের পক্ষে তা ক্ষতিকর— কিন্তু এই পরিবেশে লেখক শান্তি আর একাকিত্ব—দুটোই পাবেন।

একজন কবি অবশ্য অত দূরে না গিয়ে অনেকটা এইরকম বলেছিলেন যে, একজন লেখকের কাজ হওয়া উচিত কোনো বড় অফিসের এক কোণে।

কিন্তু অফিসের এক কোণে নয়, বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। আমাদের দেশেই কাউকে জমি-দারি দেখাশোনা করতে হয়েছে, কেউ কেউ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জি-নীয়ারও কেউ কেউ ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই যে রামপ্রসাদ সেনের মতো হিসেবের খাতায় কালীকীর্তন লিখেছেন তা নয়। অনেকেই যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি-সাহিত্যিক বললেই একটা আত্মভোলা, উদাসীন চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন কবি কূটনৈতিক বিভাগের মতো জটিল বিভাগে কাজকর্ম করেছেন। কবি অক্তাভিও পাজ আমাদের দেশেই ছিলেন তাঁর দেশের প্রতিনিধি। এক সাক্ষাৎকারে পল ক্লোদেল বলেছিলেন যে, অনেকে ভেবে অবাক হয় যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিকই নন, তিনি একজন লেখক, কূটনীতিক, ফরাসী রাষ্ট্র-দূত এবং কবি। কিন্তু আমি এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাই না। যুদ্ধের সময় আমি সৈন্যদের জন্য গম, টিনের মাংস আর শুয়োরের চর্বি কিনতে দক্ষিণ আমেরিকা গিয়ে আমার দেশের প্রায় দু শ' মিলিয়ন ফ্রাঁ বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি।

পল ক্লোদেল জাপানে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ক্লোদেল ঐ সাক্ষাৎকারে ডাডা এবং সুররিয়েলিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তার প্রতিবাদে সুররিয়েলিস্টরা ১ জুলাই ১৯২৫ সনে ক্লোদেলের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লেখেন। তাতে মন্তব্য করা হয়, একজনের পক্ষে একই সঙ্গে ফরাসী রাষ্ট্রদূত এবং কবি হওয়া সম্ভব নয়।

র‍্যাঁবো স্পষ্টই বলেছেন,

কখনও আমি কাজ করবো না......
কাজ করতে আমার বিরক্তি আসে......
আমরা কখনও কাজ করবো না,

আমাদের দেশের অনেক লেখককেই জীবিকার জন্য দিনের (হয়তো রাতেরও) একটা দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ লেখার বাইরে অন্য কোনো ধরনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে হয়। অর্থাৎ যে-কোনো কেরানী বা অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার বা হিসাবরক্ষককে যে-রকম পরিশ্রম করতে হয়, একজন লেখককেও তাঁর জীবিকার জন্য

সেখানেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। এ ছাড়া বান্ধবী বা স্ত্রীকে সময় দেওয়া, অন্যান্য সাংসারিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। অবশিষ্ট থাকলো কয়েক ঘণ্টা সময় আর ক্লান্ত শরীর ও মন।

অনেকে বলতে পারেন যে, সাহিত্যের চিন্তা কখনও থেমে থাকে না। সাহিত্যের খাতিরেই সাহিত্যিককে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

কিন্তু এ কথাও ঠিক, লেখকের চিন্তা করার, চিন্তাকে কাজে লাগাবার, এমন কি কোনো কিছু না করার জন্যও যথেষ্ট সময় দরকার। একজন অ-লেখক ইঞ্জিনীয়ার বা হিসাবরক্ষককে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেই চলে। কিন্তু ঐরকম কাজে নিযুক্ত একজন লেখককে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য একইরকম পরিশ্রম করতে করতে মনে রাখতে হবে, ওটা তাঁর আসল কাজ নয়। অবস্থাটা অনেকটা রামকৃষ্ণের গল্পের বড়মানুষের বাড়ির দাসীর মতো। দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের নিজের ছেলের মতো মানুষ করছে। সে কাউকে বলে, আমার রাম, কাউকে বলে আমার হরি। কিন্তু বেশ জানে, এরা তার কেউ নয়।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

ভারতীয় পুরাণ এবং বর্তমান কাল

আকাদমী অব ফাইন আর্টস—১৮ই এপ্রিল। আজ শুরু হলো সজল রায়ের প্রদর্শনী। চলবে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত। শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করেন তাঁরা সাধারণ দর্শকের কাছে নানা কারণে ছবির মাধ্যমে ঠিক পৌঁছতে পারছেন না। একালে পাঠকেরা যেমন কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছিলেন, এখন তেমনি কিছু দর্শক ছবির বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ আনছেন। অবশ্য নিয়মিত ছবি দেখার পরে যদি এই অভিযোগ আনা হতো তাহলে শিল্পীরা দর্শকদের কথা শুনতেন। শিল্পীদের কেউ কেউ কিন্তু মনে করেন যে দর্শক এবং ছবির মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা উচিত। সজল রায় এতোকাল সামাজিক ছবি এঁকেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এইসব ছবি এতো সোচ্চার হয়ে ওঠে, বক্তব্যের ভারে নুয়ে পড়ে যে শৈল্পিক দিকটা হয় ক্ষুণ্ণ। সজল রায় ভারতীয় পুরাণের আদলে সমকালীন ঘটনা দেখার চেষ্টা করেছেন। প্রচেষ্টার অভিনবত্বের জন্যে তিনি সাধুবাদ পাবার যোগ্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ছবি শিল্পের শর্ত মেনে চলেছে বলে আমার মনে হয়নি।

ছবির পেছনে তাঁর অনেক ভাবনা-চিন্তা আছে বোঝা যায়। কিন্তু তিনি যেন রাতারাতি তাঁর সকল অভ্যাস এবং মুদ্রাদোষ ত্যাগ করে নতুন ভাবে শুরু করার চেষ্টা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্য শিল্পগুরুদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি মহেঞ্জোদাড়ো, অজন্তা, মন্দির ভাস্কর্য, পট চিত্র এবং লোকশিল্পের কাছে এসেছেন। তৈলচিত্র এঁকেছেন কিন্তু ফিকে থেকে গাঢ় পর্যায়ক্রমে বর্ণকে না চাপিয়ে সমতল করে চাপিয়েছেন অধিকাংশ সময়। অনেক সময় পৌরাণিক গল্পের অদল বজায় রাখতে গিয়ে সচিত্রকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের তৈরী নানা অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ঠিক সার্থক ছবি প্রায়শ আঁকা হয়নি। তবু এমন প্রচেষ্টার পর ব্যর্থতা ভাল, সহজ সার্থকতার চেয়ে।

'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'-এ অজন্তার মতো করে মানবজমিন আঁকা হয়েছে, যদিও ছবি মূলত বারের মধ্যে ক্যাবারের দৃশ্য। বড় বড় পাইপের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' হয়। চারপাশে অসংখ্য শিশু আকাশ থেকে পড়তে থাকে যেন, আর বসুধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তরুণ সঞ্জয়ের হাত ধরে চলে। সঞ্জয়ের দুচোখে টি. ভি। দুশ্য অত্যাচার শিশুর হাঁ-এর মধ্যে পৃথিবী

অভিমন্যু —সজল রায়

—'বিশ্বরূপ দর্শন'। ভূমিহীন চাষী 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু' হয় মহানগরের ফুটপাতে। 'কাল সন্ধ্যা'-তে বস্ত্রহীন হাত-পা বাঁধা রমণীকুল হাহাকারে ভরে তোলে আকাশ-বাতাস।

মোট বারোটা ছবি। তার মধ্যে মোটের ওপর 'অভিমন্যু' ছবিটা সবচেয়ে ভাল। সেই কৈশোর উত্তীর্ণ নিষ্পাপ দুঃসাহসী সশস্ত্র তরুণ আর তাকে ঘিরে অরিন্দম মুখোশ পরিবৃত সব মহারথী। পেছনে দুর্গ আর ওপরে নীল আকাশ। লাল পশ্চাদপট আর সামনে নানারকম সবুজ। ছবিটার মধ্যে একটা বিয়োগান্ত সুর আছে।

ভাঙা চোরা সিঁড়ি পেরিয়ে তিনি শেষে নিশ্চয় পৌঁছবেন অভিষ্টে।

সমকালীন শিল্পকলার বার্ষিকী

পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক নৃত্য, নাটক, সংগীত এবং শিল্পকলা আকাদমী আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনী হয়েছে মার্চ মাসের শেষে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। অথচ কলকাতার নামী দামী অধিকাংশ শিল্পী নেই। বড় বড় দলগুলোর কোনো শিল্পী নেই। না ভুল বললাম। কোন এক ভুল-চুকে আছেন দুটি দলের দুজন ভাস্কর —আছেন বিপিন গোস্বামী আর মানিক তালুকদার। প্রতিশ্রুতিবান তরুণ শিল্পীদের কেউ কেউ যদিও আছেন তবুও সেই অর্থে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিমূলক প্রদর্শনী এটিকে বলা গেল না।

বয়সে তরুণ নন এমন শিল্পী আছেন এবং তাঁরা পুরস্কৃতও হয়েছেন। নির্মল দত্ত শেওলা সবুজ রঙের মধ্যে সমাহিত মাছের ছবির সহজ ভঙ্গী ধরেছেন। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঈষৎ চিত্রণধর্মী লোকশিল্প ঘেঁষা কাজ 'বসন্ত সঙ্গী' এবং শানু লাহিড়ীর 'জন্মের দেখা' ছবির কাব্যরসে আপ্লুত হতে হয়। যদিও এসব তাঁদের পক্ষে নতুন কিছু নয়।

তরুণদের অনেকেই পুরনো কাজ দিয়েছেন — যেমন পরেশ শিকদার। লোকনীতি নাথনের প্রায় সমতলভাবে চাপানো তৈলচিত্র গাছ আর একটা কুণ্ডলী পাকানো কুকুরের ছবিটা এক ধরনের কল্পমায়ার সৃষ্টি করে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রচনা' কালচে প্রতবেশে দেহী মানুষ আর উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ রঙের সমন্বয় করা কাজ মন্দ লাগে না। বেবি দত্তের লাল নীল চতুষ্কোণ ঘিরে নীল আকাশ আর কিছু মন্ডনধর্মী ভঙ্গীতে আঁকা পাখি দেখলে মনের গুমোট ভাবটা হালকা হয়। রথীন রায়ের কিউবিবরুপ ভঙ্গীতে রূপবন্ধের কাজে দক্ষতা থাকলেও নতুনত্ব নেই। গোপীনাথ দাস জলরঙ আর কালিতে করা ছবিতে হাওয়ার মাঠে দুটো ছোট্ট পাখির ওড়ার দৃশ্যটা এঁকেছেন খুব যত্ন নিয়ে। মানব বড়ুয়ার রেখাচিত্র 'মা আর ছা'—দুটো ভৌতিক দেখতে পাখি—ভালোই লাগে। আর অশোক ভৌমিক রেখাচিত্র রঙের সংগে করলেও, ভয় হয় তিনি ক্রমশ সদবাস্তব জগতে প্রস্থান করছেন।

ভাস্কর্যে সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপিন গোস্বামীর 'আয়না হাতে লাঞ্ছিত নারী' বস্তুপুঞ্জের ভার আর ঘনত্বের জন্য। ছোট্ট কাজ কিন্তু বিশালতা আছে। আর ভাল লাগে মানিক তালুকদারের কাজ
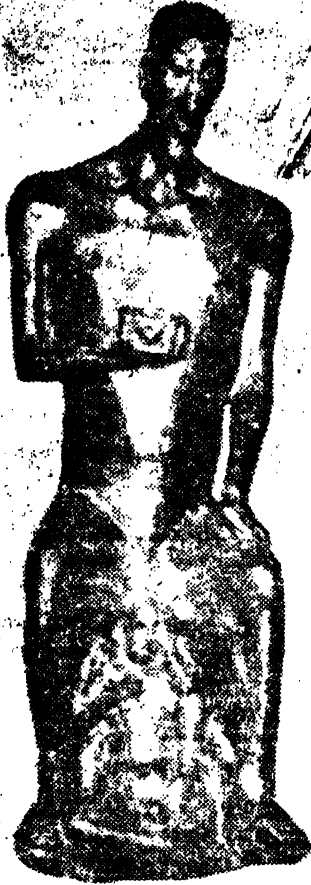
ভিক্ষাপাত্র —সুধীর ধর

(দেশের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত)। অবশ্য সুধীর ধরের 'শূন্য ভিক্ষাপাত্র' খুবই সংবেদনশীল। হাত-পা মুখ ঈষৎ দীর্ঘায়িত করে এবং জায়গা বিশেষে চেঁচে বাদ দিয়ে এক ধরনের বন্য আদিম উপজাতীয় রূপারোপের দিকে ঝুঁকেছেন। জিতেন্দ্রনাথ রায়ের গাছের মতো উঠে যাওয়া শরীরী কাজটা জোরালো।

ছাপা ছবির ক্ষেত্রে হরেন দাস আর রেকৃষ্ণ বাগের কাঠখোদাই দক্ষ হাতের কাজ। ...বে নির্মলেন্দু দাসের 'গ্রীষ্মকাল' ইণ্টাগ্লিও ...জটা চমৎকার। মাঝখান থেকে খাড়াভাবে ...টকে দ্বিধাবিভক্ত করে একদিকে সাদ...মির ওপর সবুজ, কালো, নীল, কমলা ...ঢ় থেকে ফিকে করে লাগিয়েছেন। অন্যদিকে ...চ্ছ রঙের পাশে অনচ্ছ খয়েরী রঙ। তেমনি ...পন মিত্রের সেরিগ্রাফ ভালোই লাগে।

একটা ঘরের মধ্যে ছবি গাদাগাদি করে ...নানো হয়েছিল এবং অর্ধেক কাজ ছিল ...ন্মমানের। পশ্চিম বাংলায় প্রতিনিধি...লেক প্রদর্শনী বলা চলে না। যদিও যোগ্য ...জই মোটামুটি পুরস্কৃত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সমাচার

জি কে পণ্ডিতের প্রদর্শনীতে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ২১-২৭ মার্চ) মোট ...ড়টা তেল রঙ করা ক্যানভাস ছিল। একটা ...খাড়ী পটকে চওড়ায় পেতে নিয়ে সরল বা ঈষৎ সর্পিল রেখা দিয়ে ভাগ করে নিয়ে ...মতল রঙ চাপিয়ে তার ওপর কালি দিয়ে ...নুষ জন ঘরবাড়ি এঁকেছেন, আঁকিবুকি কেটেছেন। অনুচিত্রের রূপবন্ধন এবং ...ডনকে তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা ...রেছেন। কিন্তু রঙ নিয়ে হাত খুলে খেলেননি, সুতরাং নীরস ছবি দেখে বিরস বদনে ফিরতে হয়। এর মধ্যে একটি কাজের আধখানা ভাল লেগেছে।—'মাটির নীচে চকচকে শিকড়'—শেওলা সবুজ রঙের ক্রম আলো আঁধারীর মধ্যে হলুদ আর খয়েরী মানুষের হাত-পা সব শিকড়ের মতো মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। বাকী আধখানার মেজাজ মেলেনি। রঙ মিলিয়ে মিষ্টি ছবি এঁকেছেন নেহাৎ বিক্রীর কথা মনে রেখে।

গীতশ্রী রাহার কাজ (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ২৮শে মার্চ—৩রা এপ্রিল) দেখে মাথা ঝিমঝিম করে। এমন কাজ যে কেউ টানাতে পারেন সাহস করে তা ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ঋতু সংগীত বা নৃত্যনাট্য থেকে দুটি পংক্তি আবার নীচে লিখে রাখা হয়েছে। যেমন ধরুন একটা মেয়ের মুখ তার পিঠে পেখম—নীচের দেওয়ালের ওপর লেখা 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে'। ভাবনার অভিনবত্ব দেখে টুপি খুলে অভিবাদন করতে হয়। ক্যাটলগে 'ঋতু সংগীতের' পাশে বন্ধনীর ভেতর লেখা হয়েছে (Nature), কী ভাগ্যিস 'নৃত্যনাট্যের' পাশে Dance Drama লেখা হয়নি।

প্রেমের স্বপ্ন —জি কে পণ্ডিত

দুজন আর্ট কলেজের শিল্পীর একটি যৌথ প্রদর্শনীর (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ২১ মার্চ—২৭শে মার্চ) নাম ক্যাটলগে ছাপা হয়েছে de Shilpo—পাড়াগাঁয়ের একটা মিষ্টির দোকানে দেখছিলাম de la Sweet Shop। দীপক দাস আর ভোলানাথ রায় দুজনের বয়স অল্প (জন্ম ১৯৫৪) এবং ক্যাটলগে তাঁদের ছবির জন্যে আমাদের "Kind Stare"-এর আবেদন করেছেন। এঁদের দুজনের বড় বড় তেল রঙে কাজ ছিল। যদিও এঁদের অংকন, রচনা, রঙ চাপানোর ধরন পরিচিত দুর্বল হাতের অনুকরণ প্রাধান্য। এর মধ্যে 'ঘড়ির দোকানের' ঘড়ি লাঠাই বৃদ্ধ মুসলমান দোকানদারের চোখের করুণ অভিব্যক্তি, বাচ্চা ছেলেটা আর মোটা করে রঙ চাপিয়ে চকচকে পালিশ করার কায়দাটা জমেছে। এমনি একটা কাজ ক্যানভাস পরিবৃত 'শিল্পীর স্টুডিও—সামনে নগ্ন মডেল। রঙ, আলো-ছায়া—সব মিলিয়ে আবহ তৈরী হয়েছে। ভোলানাথ রায়ের ঘোড়ার রঙীন রেখাচিত্র ভাল, যদিও বিজন চৌধুরীর ছাপ পড়েছে। একটি ছবিতে কাচ-চিত্রের মতো উজ্জ্বল সিক্ত রঙ চাপিয়ে মেয়েদের মুখ এঁকেছেন। এঁরা বড় বড় কাজ করেছেন এবং দক্ষভাবে কিন্তু গতানুগতিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ওপরই এঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

—সন্দীপন
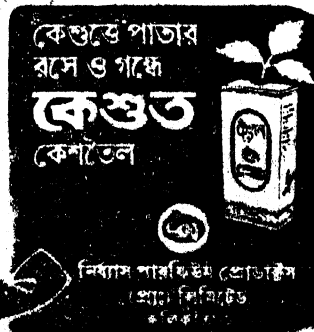
পুতুল সদরে দাঁড়িয়ে তানীর ছাগল দোয়ানো দেখছিল। আর তানীদের দড়ির চারপাই-এ বসে পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলের পাল, গুলতানি করা ছেলের পাল পুতুলকে দেখছিল।

পুলিন ঠিক সেই সময়টাতেই গলির মুখে ঢুকলো। গলি আবার কী? হাত-তিনেক, প্যাচপ্যাচে কাদাওঠা কানা একটা খোঁদল একটা বড় বাড়ির মাজা ভেঙে দুফাল করে ঢুকে গেছে। গলিটা যে দেয়ালে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে তার গা থেকে তানীদের ছোট্ট চালা। তানী থাকে, তানীর ঘুঁটেওয়ালী মা থাকে আর মুটেবাপ। আর ছাগলটা। দু পাশের টালখাওয়া জানলা, ছাদ থেকে ঝুঁকে আছে দু-চার জন। চা খাচ্ছে, গল্প করছে। আকাশের ঘুড়িওড়া দেখছে। যারা এক পো আধ-পো দুধ নেবে তারা তানীর দু উরুর মধ্যে চেপে রাখা দুধের ছোটো বালতিটায়, ফেনায় ফেনায় ফেঁপে ওঠা দুধের ফিনকি দেখছে।

আবার—ফিরে ফিরে ঠিক পুতুলকেও দেখছে।

সত্যি, কে বলবে বল দেখি। এই পুতুল কি সেই রোগা পুতুল? হারাণের বিয়ের সময়কার সেই সিড়িঙ্গে মেয়েটা? হারাণের বউ-এর সঙ্গে পুতুলও ক'দিন তার দিদির সঙ্গে থাকতে এসেছিল। তখন পুলিন তাকে স্টেট খোলাম-কুচির খেলাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। সত্যি এই খোলামকুচি নিয়ে আপন মনে কি সুন্দর সব খেলা যায়। একটা কিছু ভেবে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া আর লুফে নেওয়া। চিত হলে ফলে যায় আর উপুড় হলেই বি-ফলে! আর খেলতে খেলতে কেমন ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্ন তৈরী হতে আরম্ভ করে আর গল্পের টানেল খুঁড়ে খুঁড়ে, তারা চলতে থাকে ভিতর ভিতরে।

এই বাড়িটায় পৌঁছাতে হলে বড় রাস্তা থেকে গুনে গুনে পাঁচটা বাঁক।

অথচ তাতেই কত তফাত।

বড় রাস্তায় কত আলো, কত শব্দ, ট্রাম বাস মিনি জামা কাপড়ের দোকান-পাট, গোল দিঘীতে সাঁতার, ট্রানজিস্টারে খেলার রিলে। আর এখানে। এই গলিতে?

বাড়িগুলো সব খণ্ডবিখণ্ড, ছন্নছাড়া নষ্ট দাঁতের সারি হয়ে নড়বড় দুলছে। সামনের বরষার ভার সইবে কিনা সন্দেহ।

তবু পুলিনের মন খারাপ করে দেয় কচিৎ কখনো শ্রীহীন বাড়িগুলোয় লেগে থাকা একটি আধটি সাহেবী আমলের পোর্সিলিনের টালি, খানিকটা খানিকটা পঙ্খের কাজ, কখনো জানলার শার্সিতে আটকে থাকা রঙীন কাচের টুকরো লেগে থাকে। এসব বড় কষ্টের মত বেঁধে পুলিনকে। যেমন বেঁধে পুতুল।

বড় বেশি শরীর পুতুলের শরীরে। বড় উগ্র। আগে যখন কাছে আসত পুতুল একটা ফিকে লেবুতেলের সুবাস লাগত পুলিনের নাকে। গা থেকে উঠতো গাঁ-দেশের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। এখন মনে হয় পুতুলের চাপ চাপ চুলের ভারে কেবলই বরফা গ্যাঁত্রা শরীরে ঘাম আর বাসন মাজার গন্ধ। তবু কখনো, কচিত্ত কখনো, পুতুলের চাউনিতে, হাসিতে একটি দুটি সূক্ষ্ম পঙ্খের কাজ, কার্নিকের —দেখতে পায় পুলিন। আজও এক ঝলক দেখল।

সদরের এজমালি দরজার সামনে খানিকটা জমা জলের ওপর পিশু পোকা উড়ছে। তার ওপর পাতা ইঁটের ওপর পা ফেলে ফেলে পুলিন পুতুলের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলো। তার পুতুলের শাড়ি থেকে উনুন ধরানোর গন্ধ পেল।

সদরের অন্ধকার গর্তটার মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমটা কিছু দেখাই যায় না। ভিজে ভিজে অন্ধকার, প্রায় ঝুলের মত গায়ে লাগে। ক্রমশ চোখ সয়ে এলে, তবেই পাশের প্যাসেজ বেয়ে উঠে, উঠান ঘুরে নিজের আস্তানায়, অর্থাৎ এই মহলের শেষপ্রান্তে যেতে পারে পুলিন।

কি ছিল আগে এ মহলটা? উঠানের পাশের জমির সঙ্গে সমান ছোট ছোট খুপরিতে বোধ হয় ঘোড়ারাই থাকত এখন এক-একটি খুপরিতে এক-একটি পরিবার। মাঝখানের উঠোনটার আর কোনো অস্তিত্বও নেই। কেটে কেটে নীচু নীচু দেওয়াল তুলে, খুপরি ঘরের সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মানে প্রত্যেকটা ঘরের রান্নার জায়গা, আর বাসন মাজার জায়গা।

এ সময়টা বাড়ি ফিরলেই পুলিন দেখে, নিজের নিজের খোপের সামনে, বাসন মাজতে, কিংবা কাপড় কাচতে বসেছে মেয়েরা। উঠছে এঁটো বাসনের গন্ধ, কুলকুলিয়ে ওঠা যার যার আলাদা উনুনের ধোঁয়া। আড়চোখে খুপরির ভিতরের আবছা অন্ধকারে উঁচু তক্তপোশ, বাকস প্যাঁটরা বিছানায় টাল, কখনো হতভম্ভ শিশু দেখা যায়। উঠোনের এপাশের, অর্থাৎ খুপরিগুলোর উত্তরদিকের

প্যাসেজ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা এত বাইরের লোক যাতায়াত করে যে মেয়েরা কেউ মুখ তুলে চেয়েও দেখে না। কিংবা হয়তো তাদের আর কিছু দেখবারই ইচ্ছে বাকি নেই।

পুলিনের তো সবাইকেই এক রকম মগ্ন হয়। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। বেরঙা শাড়ি পরা ভাঙা চোপা কতকগুলো মেয়েমানুষ। এদের মধ্যে পুতুলের দিদি নিমগ্নাও আছে।

এদের প্রত্যেকের মধ্যেই পুলিন তার মায়ের কিছু কিছু অংশ দেখতে পায়। এমনকি পুতুলের মধ্যেও পায়।

কোন অংশটা? কে জানে, এখনো ঠিক পরিষ্কার করে ধরতে পারেনি পুলিন।

পুলিন প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের দৈর্ঘ্যটা পেরিয়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঘর। বোধ হয় একসার ঘরের মাঝের দেওয়াল ভেঙে নেওয়া হয়েছে। এখানে সারাদিন ধরে চলে ঘটাং ঘটাং! একটা ছোট প্রেস। একদিকে কম্পোজিটার-দের খোপ। একদিকে মেশিন। আর পিছনে টালকরা কাগজ আর গালির উঁচু সরু গলির মত জায়গাটা, ফুট চারেক মত হবে। হয়তো, সেই লম্বা ফালিটা পুলিনের। লম্বায় অনেকখানি হলেও, চওড়ায় সরু। পুলিনের এই ফালির একপাশে কাগজের দেওয়াল, আর এক পাশে নোনা-ধরা এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল। দেওয়ালটা এত নড়বড়ে যে কখন খসে পড়ে, এই ভয়ে কেউ থাকতে চায় না। ভয় করার কারণও আছে। এই তো গত বর্ষাতেই সেই কাণ্ডটা ঘটেছিল। বাড়িটার সিলিং এত উঁচু যে ওপরে তাকাতে ঘাড় ভেঙে যায়। ওপরটা ঝুলকালো। নোনা-ধরা দেওয়ালের গা দিয়ে একটা সংকীর্ণ ইঁটের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে একটা বন্ধ দেয়ালের কাছে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত খাঁজকাটা খাঁজকাটা সিঁড়ি একটা দেয়ালের গায়ে হঠাৎ হারিয়েই বা গেল কেন? পুলিন মাঝে মাঝে কথাটা ভাবত। হঠাৎ একদিন, ঘোর বর্ষায় সেই বন্ধ দেওয়াল থেকে ঠিক একটা দরজার মাপে খানিকটা অংশ খসে পড়েছিল নীচে। ভাগ্যিস পুলিন তখন পাশের প্রেসে বসে চা খাচ্ছিল! না হলে অক্কা পেয়ে যেত সেদিনই।

তা যাই হোক গে, পুলিনের আস্তানার ওপর দিকের অনেকটাই এখন উদোম। তাতে পুলিনের ইতরবিশেষ নেই। বৃষ্টি পড়লে একটা পর্দার মত গুটোনো তেরপল ফেলে দেয়। বরং খাঁজকাটা সিঁড়ি দিয়ে ভাঙা খোঁদলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দারুণ মজা। প্রেসের লোকেরা বলেছিল, সেকেলে বাড়ি তো, হয়তো তখন ওই দেওয়ালের ওপারে কোনো গুপ্তঘর বা গুমঘরের চোরাই জায়গা ছিল। কিন্তু এখন?—পুলিন উঠে গিয়ে দেখেছে শুধু খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো চাতাল দেওয়াল কামড়ে পড়ে আছে। সেইখানে—নাঃ থাক! ওটা পুলিনের একার ব্যাপার। ওখানে পুলিনের সঙ্গে কেবল পুলিন-ই।

পুলিনকে আসতে দেখে হারাণ ছাপাখানা থেকে গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল—বাজারে যাবে নাকি?

পুলিন তার আস্তানার দিকে এগোতে এগোতে বলল, যাবো, তুমি তৈরী হও, আমি এক্ষুনি আসছি। প্রেসের আলোকিত ঘরটা পেরিয়ে নিজের আস্তানার মুখের কাছে এসে পুলিন নর্দমার ধারে বালতির তোলা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে নিল। তারপর চটের পাট করা থলিতে পা মুছে

তার নিজের আড়ালটিতে ঢুকলো। সারা জায়গাটা জুড়ে মাদুর পাতা। পায়ের তলায় মাদুর কাঠির চিকন চিকন স্পর্শ। আরশলা ইঁদুর মশাকে মেরে মেরে তাড়িয়েছে। ধুনো দেয়। ফ্লিট দেয়। তাড়াতে পারেনি শুধু নোনা ইঁট আর পুরানো কাগজের গন্ধ। ...এখানে এলেই তার মন তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যায়। পুলিন পরিচ্ছন্ন। দড়িতে তার জামা কাপড় গুছানো। তার ছোট টিনের বাকস। গোটানো বিছানা। আর দপ্তরীর কাজের জিনিস। এ ছাড়া রান্নাবান্নার স্টোভ আর বাসনপত্র। নিজের সরু ফালির সেই অন্ধকার কুয়ো থেকে ওপরের আলোময় খোদলটার দিকে তাকাল পুলিন। এখন তার সামনে সেই লুপ্ত দরজার ভাঙা আয়ত-ক্ষেত্রটায় অপরাহ্নের বেগুনে ফুল-রাঙা আকাশ উঠে দাঁড়িয়েছে। আহা!

পুলিনের চোখ দুটি যেন ভরে গেল। ছোট্ট একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে পুলিন আস্তে আস্তে সেই বিপজ্জনক সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল। যেন সে মন্দিরে যাচ্ছে!

মানুষের সংসারের গন্ধ, বদ্ধতা, স্টেশনের ঘটাং ঘটাং পেরিয়ে, তানীর ছাগলের গলার ঘন্টাধ্বনি তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আর সে যত ওপরে উঠতে লাগল, তার চোখে মুখে হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগতে আরম্ভ করল।

ছোটবেলা পুলিনদের বস্তীর পাশের খোপে থাকত ধোপানীদের দাদিবুড়ি। দাদিবুড়ি ফোকলা ফোকলা দুপা ছড়িয়ে কেবল দেহাতের গল্প করত। তাদের দেহাতের পার্বতী মন্দির। সাদা, চুনকাম করা। নদীর ধারে। যে যায় সে একবার ঘন্টাটা একবার করে বাজিয়ে চলে যায়। চারপাশের গেঁহুর ক্ষেত। সোনালী হলুদ। খয়েরী কাঁচ ডানার ফড়িং উড়তে থাকে।

বেগুনে ফুল রঙের পশ্চাদপটে একটা রাঙা টবে দুলছে গাছটা। কি সুন্দর নধর তার শরীর। পুলিনের গানে বাধা। সব-পাতা মুখস্থ। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। গাছটার বড় একলা লাগে হয়তো। এবার বাজারে গেলে, গাছওয়ালা বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কোথায় কোন বনে? কোন বাগানে? পুলিন পরম মমতায় ঘটির জলে এক একটি পাতা আলাদা করে মুছে মুছে দিল। তারপর মনে মনে বলল,—নাও, তোমার মাথায় আলাদা করে বৃষ্টি ঝরিয়ে দিচ্ছি। স্নান করতে করতে উজ্জ্বল আর ঝলমলে হয়ে উঠতে লাগল গাছটা। পুলিনকে সে দুলে দুলে নিজের ডালের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা সুকুমার পত্র-মুকুল দেখাতে লাগলো। নতুন ডাল হবে, তারই লজ্জা কুঁড়ি। ডালে ডালে থোপায়

থোপার মুঠিরে উঠছে ফুল্ল কুসুম গুচ্ছ। কুঁড়ির মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে গন্ধ-মধু।

আজ রাতে যখন ফুটে উঠবে, তখন গন্ধে গন্ধে পুলিন পাগল হয়ে উঠবে।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে পুলিনের সারাগায়ে কাঁটা উঠতে থাকে। আকাশের বেগুনে ফুল-রঙ, তখন আর আরক্ত।—কই, তুমি কোথায়?

নীচ থেকে পুতুলের কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে উঠে আসতে থাকে। পুলিন চমকে ওঠে। আর তখনই তার হাত লেগে কয়েকটা পাতা খসে পড়ে। পুলিন নীচু হয়ে তুলতে গিয়ে দেখে পাতাগুলো ঈষৎ বিবর্ণ, হলদে। পুলিন থমকে দাঁড়ায়। তার মুখও বিবর্ণ হয়ে যায়। এখন তো বর্ষাকাল। এখন তো পাতা খসে না।

—কই, তুমি বাজারে যাবে না? জামাই-বাবু ডাকছে! নীচেটা অন্ধকারে একাকার। ওপর থেকে পুতুলকে ঠাহর করা যায় না। পুলিন সেই অলক্ষ শব্দটা লক্ষ করে বলল,—বল, যাচ্ছি—

দেয়াল ধরে ধরে অভ্যস্ত পায়ে নেমে এলো পুলিন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল।
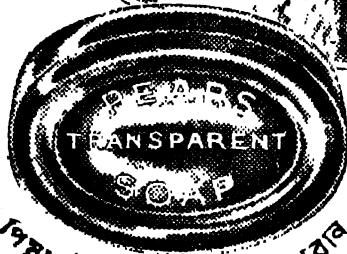
পুতুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একবার পুলিনকে আর একবার খাঁজকাটা সিঁড়িটাকে দেখে সে বলল,—খুব সাহস তো? তুমি ওই অত সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে?

সত্যি, অদ্ভুত সরু, আর বিপজ্জনক সিঁড়িটা। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। সহজে বোঝা যায় না। পুলিনের সারা ঘরে চোখের দৃষ্টিটা ঘোরাতে ঘোরাতে পুতুল এবার তাকালো সেই উঁচুতে, খোলা অন্তরীক্ষের। তখনই ওপর থেকে একটা শক্তিহীন পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলো।

—ওটা হাস্নুহানা না?

পাতাটা হাতে তুলে নিল পুতুল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলল,—বাঁচবে না!

পুলিন হত্যাকারীর মত তাকালো পুতুলের দিকে। তারপর বাজারের থলিটা তুলে নিল।

বাজারের মুখে এসে পুলিন বলল,—পুতুলের কি ব্যবস্থা হল?

—কাল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি!

পুলিন বলল,—যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো!

—নিজের বউ বলে পরিচয় দিতে হল! তিনটি ছেলেপুলে আছে বলতে হল।

—চুকে বুকে গেলে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিও!

হারাণ মাথ নাড়ল। কথাটা পুলিন কেন বলছে হারাণ জানে। এমন কি পুতুলের ঝিরি ঝিরি যৌবন নিয়ে হারাণের বউ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। পুতুল আসার পর থেকেই যেন এই গলিতে, এই পাড়ায় সারাক্ষণ যেন মাংস রান্না হচ্ছে। অথচ পুতুল যাবেই বা কোথায়? হারাণ পুলিনকে সব কথা বলে। সব কথা বললে যদি কেউ বন্ধু হয়, তাহলে অবশ্যই হারাণ পুলিনের বন্ধু। কলকাতার কাছে মফস্বলে হারাণের বউ পুষির বাপের বাড়ি। মাস তিনেক আগে পুতুলকে হাট করে ফেরবার পথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কারা! তারপর রেল-লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে যায়। এখন আর তাকে কলকাতায় না এনে উপায় নেই। হারাণ পুলিন আর পুষি ভেবেছিল কেউ জানবে না। বুদ্ধি করে কাজ হাসিল করতে পারলে পুতুল দিব্যি কুমারী বনে ফিরে আসবে। কিন্তু বকুল আসবার পর থেকেই চারপাশের আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ খেলছে। সকলের মন, চোখ, চিন্তা সব যেন দৌড়োচ্ছে নাভির দিকে। এমন কি পুতুলেরও।

এমন কি হারাণেরও।

বাজারের কাছ বরাবর এলেই পুলিনের মনে হয় সে যেন যন্ত্রের কনসার্ট শুনছে। কত মানুষ। কত জিনিস। জিনিস সাজানোর মধ্যে কত কারিকুরি। বাজারের কাছে এলে

তখন মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। শীতের দিনে মায়ের শাড়ির দোলাই বেঁধে, মায়ের কণ্ঠে আঙুলটি ধরে, সে বাজার কুড়োতে আসত। ফেলা কপিপাতা, পচা টমেটো ধসা আলু।

—কি ভাবছ পুলিন?

—ভাবছি এসব কায়দা যদি তখনকার কালে থাকত, তাহলে আমার মা হয়ত আমাকে জন্ম দিত না।.....

কিন্তু মনে মনে নিজেকে আসল কথাটা বলায় পুলিন।

—আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়। আমার মা হয়তো কোন উঁচু ঘরের মেয়ে ছিল। মায়ের একটি দুটি কথা, টুকরো টুকরো আচরণ?

হারাণ বলল,—ভালোই হত। আমরা তাহলে জন্মাতাম না। এত কষ্টও পেতাম না।

—না, না, এই জন্ম বড় ভালো। এই জন্মে বড় পারিয়েছে। না, না, মা তাকে চেয়েছিল। মা তাকে জন্মাতে দিয়েছিল। পুলিন এ কথাটা রক্তে রক্তে বোঝে। নাহলে তার জীবন এত আনন্দের হত না। এত আনন্দ।

বাজারের মুখে এসে পুলিন দেখলো সেই গাছওয়ালা বুড়োটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তুরীয় হয়ে বসেছিল। পাশে কট্‌ মাটির মঠোয় ভরা গাছ।

পুলিনের একবার ইচ্ছে হ'ল সে মাথা নীচু করে বুড়োকে বলে—ও বুড়ো! তোমার মেয়ে ভালো আছে!

কিন্তু ততক্ষণে হারাণ খানিকটা এগিয়ে গেছে আর পুলিনেরও পুতুলের কথা মনে পড়েছে—বাঁচবে না।

পুলিন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল,—ও বুড়ো, তুমি কোথার থেকে গাছ আনো?

—হেই কাকদ্বীপ!

কথাটা কোনো মতে বলেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। পুলিন মনে করতে চেষ্টা করল তার বন্ধু রথীনাথ কাকদ্বীপ সাইডের কত নম্বর বাসটির ক্লীনার?

বাজার পুলিনের বড্ড ভালো লাগে। মাটির বুক ফাটিয়ে বেরোনো এইসব ফল-পাকড়। ফসল দেখলেই পুলিনের ভালো লাগে। কোনো কিছু হয়ে ওঠা দেখলেই। ডালায় সাজানো পুরুষ্টু বেগুনগুলো। আহা গা দিয়ে যেন লাবণ্য ঝরে ঝরে পড়ছে। যেন পাম্প করে কেউ যৌবন ঠেসে দিয়েছে শরীরে। সবুজ লেসের মত গোছা গোছা সরষে শাক। এবড়ো-খেবড়ো গা করলা, হালকা বাসন্তী পাতিলেবু। এত সব তরি-তরকারী দেখার পর মা রাঙা আলুর সঙ্গে মাষকলাই সেদ্ধ করে দিত। কখনো কপি-পাতা কুচোনোর সঙ্গে ভাত।

বস্তির সেই ছোট্ট খুপরি। উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকত মা। মায়ের টান ছাঁদের মুখখানি জ্বলজ্বল করত আগুনের আভায়। চোখের কোলে গভীর গর্ত। এখন পুলিন বোঝে কত অল্প বয়স ছিল মার। কত সুন্দর ছিল মা। ওই অতটুকু ঘরে নানা রকম মানুষের সঙ্গে উঁচু তক্তপোশে শুয়ে থাকত মা। তলায় লুকিয়ে রাখত পুলিনকে। তাদের মা ও ছেলের অদ্ভুত গোপন খেলা ছিল একটা। অন্য লোককে লুকিয়ে কখনো কখনো মা নিজের হাতটা নামিয়ে দিত পুলিনের কাছে। পুলিন সেই হাতটি নিজের চোখে গালে বোলাত। লোকটা বুঝতেই পারত না যে, পুরো দাম দিয়েও সে একটা হাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আর তখনই পুলিন বুঝতে পারত তার মা, তার হাতের মধ্যে দিয়ে নেমে এসে গুটিশুটি হয়েছে পুলিনের কাছে। পুলিন জানত তার মা নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে মড়ার মত দেহটার থেকে। সেই থেকেই সে ক্রমে ক্রমে শিখে নিয়েছিল কি করে মনকে দেহ থেকে আলাদা করে নিতে হয়। তাই পুলিন কখনো তার মাকে ঘেন্না করতে পারেনি। কারণ সে জানত, তার মা এ সব কিছুতেই জড়িত নেই। ওই বস্তি, পচা জল-জমা পায়খানা, পুরুষের বাসনা কামনা, ঘাম, মশামাছি, কাটা কাপড়, ফাটো চাল—সব তার মা ইচ্ছে করলে সরিয়ে দিতে পারে।

কি করে?

এই যেমন তারা মায়েপোয়ে, ঠিক শোবার আগে হাত পা ধুয়ে—গরম হলে রাস্তায় কল থেকে জল এনে পরিষ্কার করে গা হাত পা মুছে বিছানায় শুত। তারপর গল্পের জগত। অনেককাল আগের সব গল্প। পুরোনো দিনের। সুখের দিনের। পুলিন তাই রাস্তায়, গলিতে, আর পাঁচটা ছেলের মত খেলেধুলে বেড়াতে পারেনি। কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়ত সে। চুল আঁচড়ানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে। সে যে অন্যরকম তা সবাই বুঝত। তাই একবার স্কুলে তার ঘোর জন্ডিকার হলে মাস্টারমশাইরা নিজেরাই তাকে কোলে করে বস্তিতে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা মাকে আপনি আপনি করছিলেন। এটা পুলিন তখনই লক্ষ করেছিল। একজন মাস্টারমশাই বলেছিলেন—সন্ধের সময় ওকে নাইট স্কুলে পাঠান না কেন? ও সময়টা আপনি তো...

মা বলেছিল,—এটা তো আমার পেশা এতে তো কোনো লজ্জা নেই বাবু! ও সব জানুক। তাতে কী?

মাস্টার মশাইদের একজন জিজ্ঞেস করেছেন—আপনি কি এখনকার? মানে এখানেই জন্মটন্ম?

মা বলেছিল—না, আমি অনেক দূরের মানুষ! রংপুরের!

সেই পুলিন জেনেছিল। তার মা রংপুরের।

হারান বলল—কি হে? তুমি কিছু কিনবে না?

পুলিন বলল, অ্যাঁ? হ্যাঁ, কিনব। বাইরে থেকে কম দামে কিছু তরিতরকারী কিনব। আচ্ছা, হারাণ তুমি আলুর ডাল খেয়েছ?

—আলুর আবার ডাল কী?

—মা রাঁধত! আলু সেদ্ধ করে, গলিয়ে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে—প্রচুর মটরশুঁটি

দিয়ে। কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে! আমাদের রংপুরের রান্না।

'আমাদের রংপুর' কথাটা খুব জোর দিয়ে বলল পুলিন।

হারাণ বলল, বাঃ বেশ ত!

আসলে পুলিন কোনোদিন রংপুরে যায়নি।

আসলে পুলিনের মা কোনোদিন আলুর ডাল রাঁধেনি।

এসব তার আর তার মায়ের কিছু নিজস্ব খেলা। মা যখন শেষের দিকে, লোকের বাড়ি বাড়ি—বাসন মাজত, তখন ফিরে এসে স্নান করতে যেত। পুলিন ততক্ষণে ঘর ঝেড়ে মুছে বিছানা পেতে রাখত। মা ধোবানীর উনুনে কিছু কয়লা ফেলে দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি করে নিত। কিংবা মুড়ি কিনে আনত। তাই খেয়ে ওরা ঝাঁপ ফেলে দিত। তারপর মা বলত,—এবার পুলিন?

পুলিন বলত—হাঁ মা!

—কি বাজার করলি বল?

বাজার কুড়োতে যেত রোজ পুলিন। বাজারের সেরা তরিতরকারি মাছ মাংস সে দূরে থেকে দেখত। সেই সব তরি-তরকারি মাছ মাংসর নাম সে তোতাপাখির মত আউড়ে যেত।

মা বলত—বেশ—বেশ বাজার হয়েছে।

বাঃ কপিট কি সরেষ। টমেটোগুলো কি নিটোল! আহা, বাজারের সেরা কড়াইশুঁটি এনেছিস বাবা! কি ভালো!—কটা উনুন জ্বালব বলতো? তিনটেই জ্বালি...হ্যাঁ রে সরবতি লেবু এনেছিস? এই দ্যাখ সরবতি লেবুই আনিস নি?—যা যা শিগগির রাজার বাগান থেকে ছিঁড়ে আন। অঢেল আছে।

তারপর শুয়ে শুয়ে দুজনের মিছি-মিছি রান্না হত। খাওয়া হত। খেয়ে দেয়ে রেলে চাপা হত। 'খুপরিটা হত রেলের কামরা, আর ওদের তক্তপোশটা হত বাঙ্ক। স্টেশনে স্টেশনে গরম চা খাওয়া হত। পুলিনের জন্যে বাড়তি গরম দুধ। বেশির ভাগ দিনই ওরা পুরী যেত। একটা না-দেখা সমুদ্রের বালিয়াড়িতে অজস্র না-দেখা ঝিনুক কুড়োতো।

ঝুপঝুপ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হারাণ ছাতাটা খুলে বলল, মনে পড়ছে—আমার বিয়ের দিনে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল। তুমি আর আমি বিয়ের বাজার করতে বাজারে এসেছিলাম।

—ও হ্যাঁ, তাই তো!

মনে পড়ে গেল পুলিনের। বছর দুই আগেই তো হারাণের বিয়ে হয়েছিল। এমনি বৃষ্টি বাদলার দিনে। হঠাৎ সেদিন সেই বুড়ো গাছওয়ালাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাহস করে একটা হাস্নুহানার ছোট্ট চারা কিনে ফেলেছিল।

হারাণ হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,—গাছ! কোথায় রাখবে? গাছের জায়গা কোথায়? মরে যাবে।

পুলিন মনে মনে বলেছিল, তুমি একটা আস্ত বউ পুষতে পারো আর আমি একটা গাছ পুষতে পারব না! এখন তাই হারাণের বউ আর গাছটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে পুলিন।

মুখে কিছু বলে না।

বিয়ের সময় ওই পুতুলের মতই ঝকঝকে চেহারা ছিল পুষির। প্রথম দিকে স্যাঁতস্যাঁতে রোদহীন দালানে থেকে সত্যিই হাস্নুহানা গাছটা নেতিয়ে পড়ছিল। যদি না হঠাৎ দেওয়াল ধ্বসে গিয়ে চাতালটা বেরিয়ে পড়ত—তা হলে গাছটা হয়তো সত্যিই মরে যেত।

কিন্তু পুতুল যে আজ তার বুকের মাঝখানে একদম গজাল গেড়ে দিল। বলল, আর বাঁচবে না গাছটা!

হঠাৎ পুলিনের মনে পড়ল। তার বন্ধু ক্লিনার রঘুনাথ কাকদ্বীপগামী কোন বাসে কাজ করে?

রাতে শোবার আগে সদরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল হারাণ আর পুলিন। হারাণ যেন কেমন অযথা ছটফট করছিল। ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। প্রেস এখনই বন্ধ

হয়েছে। কেবল পৃথিবী খামোখা কাজ বাড়াচ্ছে। আর উঠোনের পাশের প্যাসেজে বসে পুতুল একমনে খোলামকুচি নিয়ে খেলা করছিল।

পুলিন ভিতরে ঢুকতেই পুতুল বলল—তোমার গাছটা কাছ থেকে দেখে এলাম।

পুলিন বলল—ওই সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে তুমি ওপরে উঠেছিলে?

—হ্যাঁ, এখন জোছনায় ভাসছে, কিন্তু বাঁচবে না। সব শেকড়। সব শেকড়। আজ মরলেও মরবে। কাল মরলেও মরবে।

পৃথিবীর ছেলেটা কেঁদে উঠতেই উনুনে সাজানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। কম পাওয়ারের বাল্বের হলদে আলোয় পুলিন এক ঝলকে যা দেখলো, তা কেবল শেকড় শেকড় আর শেকড়। হাতে গলায় বুকে কণ্ঠায় নিম্নমুখী স্তনে কেবলই শেকড়।

পৃথিও ছেলেকে দুধ দিতে দিতে বলল—হ্যাঁ, মাটির চেয়ে সত্যিই শেকড় বেশি হয়ে গেলে গাছ বাঁচে না।

পুলিন পুতুলকে পেরিয়ে গুটি গুটি নিজের আস্তানায় গেল হাত মুখ ধুয়ে। খালি গায়ে, পরিষ্কার একটা ধুতি দু'পাট করে পরে সে ঠিক ওপরের সেই ফাঁকা আয়তক্ষেত্রটার বুকে রোজ তার বিছানাটা পাতল। এখনো মায়ের তৈরি কাঁথাটা সবার ওপরে পাতে। যদিও কাঁথার ওপরের নরম কাপড়টা ছেঁড়াছেঁড়া হয়ে গেছে। একটু বাদেই—চাঁদের চৌকোণা আলোটা সরে সরে এসে পড়ল বিছানায়। পুলিন হাতটা লম্বা করে দিল। তার হাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল হাস্নুহানার ছায়াটা। ফুটন্ত হাস্নুহানার গন্ধে মাত হয়ে যাচ্ছিল পুলিনের ছোট্ট খোদলটা। একটি সুগন্ধি সুন্দরী সবুজ মেয়ের ছায়া বুকে মেখে নিয়ে শোয়ার তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে এলো তার।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পুলিনের। হাসনুহানার ছায়াটা তখন তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পুলিন ঘুম চোখেই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

চাতালের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো একা।

তখন চাঁদ একেবারে মাথার ওপর। নিঝুম, নিশুতি। ঝলমলে সবুজ রাংতার মত ঝলমল করছে হাস্নুহানা গাছটা। সারা গায়ে যেন জরির কল্কা দেওয়া সবুজ বেনারসী। কপালে চাঁদের শোলার সিঁথি মোর। একটা ষোল বছরের যুবতীর সব সুগন্ধ আর সবলতা নিয়ে নিজের ভবিষ্যত না জেনে খিলখিল করে হাসছে।

চাপা গলায় পুলিন বলল—আমি তোমায় কিছুতেই মরতে দেব না। তুমি থাকবে। বেঁচে থাকবে!

কিন্তু ক'দিন বাদে?

শিউরে উঠলো পুলিন। সে দেখতে পেলো নুয়ে পড়া হলদেটে একটা মনমরা গাছের ছবি। কেবল শিকড়! কেবল শিকড়! পুলিন দ্রুত নীচে নেমে এসে প্যাসেজে বেরিয়ে চোখে মুখে জল দিতে গিয়ে দেখে পুতুল প্যাসেজের ময়লাটে চাঁদের আলোয় একা একা বসে খোলামকুচি নিয়ে খেলছে। পুলিন কাছে এসে দাঁড়াতেই একটু সিঁটিয়ে গিয়ে বলল,—তুমিও কি জামাইবাবুর মতো আমাকে বিরক্ত করবে? কালই তো চলে যাবে। আর কেন?

পুলিন বুঝতে পারল হারাণ নিশ্চয়ই পুতুলকে...থাকগে...পুলিন কথা ঘোরাবার জন্য বলল,—তুমি বুঝি খুব খোলামকুচি নিয়ে খেলো পুতুল?

—হ্যাঁ বেশি! সেই যে তুমি যেমন ভাবতে শিখিয়েছিলে?

—ঠিক তেমন করে। যেমন এই যে

চিৎ হলে রাজপুত্তুর
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে সোনার সংসার
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে রাঙা খোকা
উপুড় হলে......

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠল পুতুল—উপুড় হলে সব শেষ!

কিন্তু পুলিন অন্ধকারে হেসে উঠল। তার মায়ের কথা মনে পড়ল। তার মা যে বেঁচে গিয়েছিল শুধু—

মা জগৎ বানাতে পারত।

পুতুলও জগৎ বানাতে শিখেছে।

পুলিন আস্তে আস্তে পুতুলকে তুলে নিল। পুলিনের ধরার ভঙ্গী দেখে পুতুল কোনোরকম ভয় পেলো না। পুলিনের কাঁধে ভর দিয়ে পুতুল পুলিনের খোপে গেল। চাঁদের ঢল নামা বিছানায় পুতুলকে শুইয়ে দিয়ে পুলিন বলল,—কাল আমরা কোথায় যাবো বলো তো?

—হাসপাতালে।

—না! আমরা যাবো কাকদ্বীপ! বাসে চেপে। তুমি, আমি, আর ও'—

হাস্নুহানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো পুলিন!

—তারপর? সানন্দে বলল পুতুল।

পুলিন বুঝলো পুতুল সব ভুলে গিয়ে একমনে তার গল্প শুনছে।

—তারপর কাকদ্বীপে গিয়ে একটা ভালো জায়গায় ভালো মাটি যেখানে, খুঁজে নিয়ে ওকে রেখে আসব—কেমন?

পুতুল ঝিলমিলে চোখে বলল,—আমি খুঁজে দেবো। আমি ভালো মাটি চিনি! তারপর?

—তারপর আমরা একটা চিহ্ন দিয়ে আসবো!

—হ্যাঁ, সে বেশ হবে। আমরা মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাবো। ও অনেক মাটি পাবে। শেকড় ছড়িয়ে বাড়বে। নতুন নতুন গাছ দেবে!

পুলিন চাঁদের আলোমাখা পুতুলের ছোট্ট কপালটি ছুঁয়ে বলল,—এবার সত্যি করে বলো তো খোলামকুচি চিৎ হয়েছিল?

—না উপুড়?

—কখন?

—যখন রাঙা খোকা চেয়েছিলে।

পুতুল পুলিনের বুকে মুখ রেখে বলল,—সত্যি কথা বলবো?

—হ্যাঁ!

—চিৎ!

বিশ্ববিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে রইস আমেদ কি ভাবছেন ?

বিজ্ঞান এবং সমাজকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ভাবার দিন চলে গেছে। সামাজিক কল্যাণে বিজ্ঞানের ভূমিকা কতখানি এবং সেই ভূমিকা আরও কতখানি প্রশস্ত করা যায় এটাই আজকের দিনে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল লক্ষ্য। হ্যাঁ, সমাজ মানেই তো মানুষ। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার বস্তুনিষ্ঠা এবং মানসিক প্রয়োজন—সমাজের মধ্যেই এ সব প্রতিভাত হয়। বিকশিতও। আজকের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল লক্ষ্য এই বিকাশের কাজটিকেই সর্বজনীনভাবে আরও সহজতর করা। আরও অর্থবহ করা।

বললেন ডঃ রইস আমেদ। নতুন দিল্লির ন্যাশনাল কাউনসিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর পরিচালক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষণ এবং শিক্ষণ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এখন তিনি শিরোনাম।

কয়েকদিন আগে নতুন দিল্লিতে তাঁর সরকারী বাসভবনে বসে ডঃ রইস আমেদের সঙ্গে এ দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। ছুটির দিন। আশেপাশে তাই ব্যস্ততার কোন চিহ্ন ছিল না। কাউনসিলের চৌহদ্দির এক পাশে তাঁর বাসভবন। সেখানে গিয়ে হাজির হতেই ভেতর থেকে আহ্বান এল। পরস্পর প্রীতি বিনিময়ের পর তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে রসায়নের কি যেন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। আমি গিয়ে সেই আলোচনার ফাঁকে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আমার মাথায় তখন তিনটি প্রশ্ন। এক, সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে একটা আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে হাতেকলমে অনুশীলনের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা যাতে অনেক বেশি সুযোগ পায় তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে যে সব পাঠক্রম এবং কার্যাবলী অনুসৃত হচ্ছে তা কতখানি কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয়েছে? দুই. নতুন শিক্ষা-

নতুন বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষণের প্রশ্ন তুলতেই যেন চিন্তিত হলেন ডঃ রইস আমেদ। মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ থেকে বললেন, এ কাজে যাঁরা ব্রতী তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়াটাই এখন বড় রকমের সমস্যা।

ক্রমের তাৎপর্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা কতখানি অবহিত? যাঁরা অবহিত নন, তাঁদের অবহিত করার ব্যাপারে সর্বজনীন স্তরে কতটা চেষ্টা এ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়েছে? তিন, বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী বিজ্ঞানের পাঠ্য-পুস্তক রচনায় প্রচুর ত্রুটির খবর আমরা রাখি। বলছি না, এ সব ত্রুটির পেছনে ওই সব বই-এর রচয়িতাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানই একমাত্র কারণ হিসেবে কাজ করছে। অনেক সময় দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তকের মলাটে লেখক হিসেবে নাম লেখা থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা নামকরা বিজ্ঞানীর। কিন্তু লেখকদের দিক থেকে যথাযথ অভিনিবেশ, পরিকল্পনা এবং সতর্কতার অভাব থাকায় ওই সব পাঠ্য-পুস্তকের কোন কোনটি অসম্পূর্ণ, অযথার্থ এবং ভুলভ্রান্তির আকারে পর্যবসিত হয়ে থাকে।

ডঃ আমেদ বললেন, যতদূর সম্ভব যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে দেশের কৃতী বিজ্ঞানীদের দিয়ে স্কুলের বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক রচনার ব্যাপারে ন্যাশনাল কাউনসিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি) বেশ কয়েক বছর আগে হাত দিয়েছিল। এ ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য ছিল দুটি। এক, যে যে বিষয়ের ওপর বই লেখা হবে, লেখক সেই সেই বিষয়ে যথেষ্ট পারঙ্গম কিনা সে দিকে লক্ষ রাখা। দুই, বই লেখার কলা কৌশল, ভাষা, এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লেখক কতটা পারদর্শী সেটাও বিবেচনা করা। বলা বাহুল্য, এই দুটি আদর্শ সামনে রেখে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্ত বই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের দিয়ে আমরা লিখিয়েছি। গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র-পরিচালিত স্কুলগুলিতে ওই সব বই নিয়মিত পড়ানো হচ্ছে। তাতে আমরা ভাল ফলও পাচ্ছি।

ডঃ আমেদ বললেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা খুবই জটিল ব্যাপার। যথেষ্ট সতর্কতা এবং তৎপরতার প্রয়োজন। দরকার যথাযথ সৃজনশীলতা, যা পাঠ্য বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহলী করে তুলতে পারে, তাদের নিজস্ব কল্পনা প্রবণতার বিকাশ সাধন সাহায্য করে। এ কথা ভেবেই রাম শ্যাম যদু মধুর বই যাতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্থান না পায় তার জন্যে দেশের কোন কোন রাজ্য সরকার নিজ থেকেই স্কুলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর নাম উল্লেখযোগ্য। স্কুলের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত যাবতীয় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দায়িত্ব তাঁদের। কোন কোন রাজ্য আবার এন সি ই আর টি'র বইই, যা ইংরেজী ভাষায় রচিত, সরাসরি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে ভাল ফল পেয়েছেন।

না, পাঠ্যপুস্তকই শুধু নয়। আরও নানা রকম বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেছেন এন সি ই আর টি। এইসব বই-এর আকার ছোট। কোনটি পাখির ওপর লেখা কোনটি জন্তুর ওপর। কীট পতঙ্গ অথবা প্রকৃতির নানারকম সম্পদের ওপরও ছোট ছোট বই

প্রকাশ করেছেন এন সি ই আর টি'র কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি বই-এ সুন্দরভাবে অলঙ্করণের কাজ করা হয়েছে। সহজ সরল ভাষা। লেখকরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতী। সুকুমারমতি ছেলেমেয়েরা এই সব বই পড়ে দেশের প্রাণী একং উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে কত কিছুই না জানতে পারে। কথা ছিল বইগুলি প্রকাশিত হবে ইংরেজী ভাষায়। তাই করা হয়েছে। কথা ছিল রাজ্য সরকার এগিয়ে এসে এসব বই এবং পাঠ্যপুস্তক আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। সস্তায় বিতরণ করবেন। কোন কোন রাজ্য করেছেও। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর। এ ব্যাপারে কোন উৎসাহই এখান থেকে দেখান হয় নি। এন সি ই আর টি'র জনৈক বিজ্ঞানী বললেন, কি বলব, মশায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দিয়ে আমরা হন্যে হয়ে গেছি। কোন উত্তরই পাওয়া যায় না।

এ সব প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেছিলাম, ডঃ রইস আমেদের সঙ্গে।

ডঃ আমেদ বললেন, অভিযোগ নয়। নব-পরিকল্পিত বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে সমস্যা অনেক। প্রথম সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার। এই উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা পাওয়াই তো এখন বড় রকমের সমস্যা।

খানিকটা ক্ষুব্ধ হলেন যেন তিনি। বললেন, কি দিচ্ছি আমরা তাঁদের? পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় দশ শতাংশ খরচ করা হয় শিক্ষার জন্যে। কোনও কোনও উন্নয়নশীল দেশেও এই খরচের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ছয় থেকে সাত শতাংশের মত। অথচ আমাদের দেশে খরচ হয় মাত্র তিন শতাংশের কাছাকাছি। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন এ-দেশে এখনও একটা বড় রকমের সমস্যা। এ ছাড়া শিক্ষাবিস্তারের কাজটি সুষ্ঠু এবং ফলপ্রসূ করার জন্যে আরও নানারকম উদ্যোগের প্রয়োজন। সে সব করতে গেলেও দরকার টাকা। কিন্তু দেশের অনেক কিছুতেই টাকা খরচ হয়। টান পড়ে শুধু শিক্ষা খাতে। এভাবে চললে আধুনিক শিক্ষা ধারা সর্বসাধারণের মধ্যে পেঁৗছে দেওয়া কতটা সম্ভব?

প্রশ্ন : ডঃ আমেদ, পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে 'করে দেখা'র মাধ্যমে নানা বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। যেমন, কিছুদিন আগে দেখছিলাম পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে একটি দেশলাইকাঠি দেওয়া হয়েছে ছাত্রকে। কাঠিতে কি কি বস্তু আছে জিজ্ঞেস করা হল তারপর। অবশেষে কাঠিটি জ্বালিয়ে বলা হল—কি তৈরী হল এই প্রজ্বলনের ফলে। তারা বাতাসে মিশে কি ভাবে বাতাসকে দূষিত করছে, ইত্যাদি। আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, সমস্যা প্রভৃতি বোঝানোর ব্যাপারে এ ধরনের উদ্যোগ কি নিতে পারি না?

ডঃ আমেদ : তা পারা যাবে না কেন? তবে আমাদের অ্যাপ্রোচটা আলাদা। পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ধরে নিই, মানুষ নিজেও পরিবেশের অঙ্গ। নিজের প্রয়োজনেই পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট প্রসারিত হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, স্কুলের ছেলেমেয়েদের গাছ অথবা উদ্ভিদ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। কি ভাবে এ কাজটি আমরা করব? এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা হবে এই রকম। ছেলেমেয়েদের আমরা গাছপালার মধ্যে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে নিজেরাই তারা চিনে নেবে উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে গাছের বিভিন্ন অংশ। জানবে, কোন গাছ আমাদের খাদ্য, কোন গাছের ফল অথবা মূল আমাদের খাদ্য। গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায়। কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। আবার নানারকম আসবাব তৈরির কাজেও লাগে। শেখানো হবে গাছের পাতা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় শর্করাখাদ্য তৈরি করে। গাছ মাটি শক্ত রাখে। কোনও জায়গায় মরুভূমি হতে দেয় না। গাছের ফুলে মধু পাওয়া যায়। গাছের ফুলে মধু খাওয়ার জন্যে বসে কত রকম কীট পতঙ্গ। এই কীট পতঙ্গ পরাগ বিস্তার করে গাছের বংশ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আবার কোনও কোনও পতঙ্গ গাছ এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। গাছপালা সংরক্ষণ না করলে আবহাওয়া গরম হয়। শুষ্ক হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব বুঝতেই পারছেন, শুধু গাছ নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একজন [illegible] বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, [illegible] হতে পারে। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে শেখে, উদ্ভিদ বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে আরও কত রকম জ্ঞান জড়িত। উদ্ভিদের সঙ্গে তার নিজের জীবনের সম্পর্কও বা কতখানি।

[illegible] কেন? তাদের পথঘাট সম্পর্কে [illegible] করার জন্যে হয়তো নিয়ে যাওয়া হল গ্রামের কোনও রাস্তায়। সেখানে গিয়ে তাকে বোঝানো হল, কিভাবে তৈরি হয় এই পথ। পথ তৈরির জন্যে কি ভাবে মাটি ব্যবহার করা দরকার। কোথায় কোথায় সেতু বসলে বর্ষার জল নিকাশের সময়

পথটি ভাঙবে না। পথের সংরক্ষণ না হলে পথ নষ্ট হবে। যানবাহন, না চললে এক জায়গার মালপত্র অন্যত্র যেতে পারে না, তাতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই ভাবে বিজ্ঞানের যে কোন একটি দিককে সামনে রেখে বিস্তৃত দিকগুলি কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নানান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নিজেরা তারা যাতে ভাবতে পারে, উদ্ভাবনায় সক্ষম হয়, আজকের স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার এটাই মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন : এ ধরনের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দরকার শুধু উৎসাহই নয় যথেষ্ট কল্পনাপ্রবণ এবং বিস্তৃত জ্ঞান আছে এমন ধরনের শিক্ষক-শিক্ষিকা। এ ধরনের শিক্ষক শিক্ষিকা গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনারা কী করছেন? শুধু তাই নয়, এ ধরনের শিক্ষণ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত থাকবেন তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দরকার। দরকার মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ এবং নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। একবার বি এড বা বি টি ডিগ্রি পেলেই চলে না। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় রিফ্রেশ

করে দেওয়া। তার জন্যে কি করছেন আপনারা?

ডঃ আমেদ ঃ এ কথাও আমরা মনে রেখেছি, মিঃ কর। আমরা জানি কোনও এক সময়ে একজন শিক্ষক একবার প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন, তা দিয়ে সারা জীবন শিক্ষকতা করা চলে না। বিরাট দেশ এই ভারত। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক একটি অঞ্চলের স্বরূপ এবং সমস্যা এক একরকম। কোনও অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী আসছে মুখ্যত চাষী পরিবার থেকে। কোনও অঞ্চলে আসছে শহর থেকে। ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের মানসিকতা, যোগ্যতা ভিন্নতর। তা ছাড়া কোনও শিক্ষাই পাথরে আঁকা ছবি নয় যে, একবার যা আঁকা হল তার আর রদবদল নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পালটায়। শিক্ষা ধারাও সেই সঙ্গে যাতে পরিবর্তিত হয় সেটা দেখা দরকার। এ কথা ভেবেই কিছু দিন অন্তর অন্তর ভারতের প্রতিটি শিক্ষক যাতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের কাজে উপযুক্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পান তার জন্যে দেশের সর্বত্র প্রশিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র তৈরিও হয়েছে। কথা আছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে এ ধরনের কেন্দ্র তৈরি করা হবে মোট ১০০টি এক-একটি জেলায়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলায় যাতে এ ধরনের কেন্দ্র তৈরী হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ কয়েক মাস আগে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রে শিক্ষণ বিষয়ক গবেষণার কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষককে আপনি আহ্বান জানান। গবেষণা বলতে এ-ক্ষেত্রে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

ডঃ আমেদ ঃ আমি বলতে চেয়েছি, শুধু বি এ, এম এ পাশ করলেই তো ভাল শিক্ষক হয় না। শিক্ষণ একটি কলা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনেকে আছেন নিজেদের পরিবেশ এবং পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে শিক্ষণের ব্যাপারটাকে কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি দেখছেন। তিনি হয়তো একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হতে পারেন। কিন্তু শিক্ষণ পরিকল্পনায় তাঁর মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব রয়েছে। আমি বলছিলাম, এ সব শিক্ষক শিক্ষিকারা এগিয়ে আসুন, নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার জন্যে গবেষণা করুন। তার জন্যে যতটা সম্ভব সাহায্য আমরা দেব। আমার বিশ্বাস, শিক্ষকতার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এ ভাবে তাঁরা যদি এগিয়ে আসেন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এবং তাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার কাজটি সহজতর হবে।

শুধু তাই নয়, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত মননের ক্ষেত্রেও যে গতিশীলতা এনে দেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এতে করে তাঁদের পেশাগত জীবনের স্থিতিশীলতা ঘুচবে। নিত্য নতুন ভাবনা চিন্তার খোরাক তাঁদের মধ্যে সচল মানসিকতা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসবে।

ডঃ আমেদের কথা শুনে আর একটি কথা মনে এল। এই সঙ্গে আরও একটি দিকের কথাও ভেবে দেখা দরকার। এমন শিক্ষক শিক্ষিকাও আছেন যাঁরা উচ্চতর ডিগ্রির অধিকারী। অথচ যাঁরা জ্ঞানের প্রকাশে এবং শিক্ষণের কাজে যথেষ্ট ব্যর্থ। আবার এমন অনেককে দেখাও যায় যাঁদের ডিগ্রির মান ততটা বড় নয় অথচ শিক্ষক হিসেবে যিনি প্রচণ্ড সার্থক, উল্লেখযোগ্য পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে রেখাপাত করেন। প্রথম দল অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শুধু ডিগ্রি দেখিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হন বেশি। আর দ্বিতীয় দল যথেষ্ট উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হন। এই বৈষম্য যাতে দূর করা যায়, কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে কতটা ভাবছেন? কাজের সার্থকতা যদি মূল লক্ষ্য হয়, সেই সার্থক কাজটি যিনি করলেন তাঁকে পুরস্কৃত না করা গেলে শুধু স্ট্যাম্প মেরে কিছু করা যায় কি?

সমরজিৎ কর

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

॥ ৬ ॥

অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে আমাদের যাত্রার আয়োজন শুরু হল। সেইদিনই অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর আমরা হোপেই প্রদেশে সিজিয়াচুয়াং যাব। সেখানেই ডাঃ কোটনিসের স্মৃতিভবনের দ্বার উদ্ঘাটন হবে ৯ ডিসেম্বর। সেটি তাঁর চৌত্রিশতম মৃত্যুদিন। আমাদের বলা হল ৩।৪ দিনের মত জিনিস নিয়ে বাকি সব হোটেলে রেখে যেতে। ডাঃ বসু বারবার বললেন, খুচরো জিনিস ফেলে গেলেও খোয়া যাবার ভয় নেই। আমি তাই হোটেল-ঘরের হ্যাঙ্গারে দুটি কোট ঝুলিয়ে রেখে গেলাম। একটি আমার দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া লন্ডনে কেনা একটা পাতলা 'সামার' কোট। ওটা কেন নিয়ে গিয়েছিলাম জানি না। আর দ্বিতীয়টি পিকিং-এ পূর্বের দিনে কেনা তুলো-ভরা কোট। আর একটা ব্যাগে ভরে খুচরো জিনিসপত্র। সংগে নিলাম ওদের দেওয়া দুর্বহ ও বিশাল কোটটি। শুনেছি ওখানে আরো ঠান্ডা হবে। আমরা ট্রেনে যাব ছয় ঘণ্টার পথ। স্টেশনে গিয়ে দেখি ইয়োরোপীয়ানরাও এসেছেন। সপত্নীক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর অ্যাটাচি শ্রীমেননও চলেছেন। আর চলেছেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা ওয়াং পিন নান—বৈদেশিক মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান, যাকে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলব ভেবেছিলাম। তাঁর সংগে তাঁর দক্ষ সুদর্শন দোভাষীকেও দেখলাম। এঁর নাম কুং সে সিন (Ku Tze hsin)। ইনি বললেন, আমার উপহার দেওয়া বইটি Tagore the man behind his poetry পড়ে ফেলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি কোনো সাহিত্যিক জীবিত আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনতেন? তিনি বললেন, একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা আছেন, তাঁর নাম মিসেস সি পিন সিন (Mrs Hsel Pin Sin), তিনিই রবীন্দ্রনাথের রচনা চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। শুনেই আমার মনটা তাঁর সংগে দেখা করবার জন্য উতলা হল। কুং সে সিন বললেন যে, খোঁজ করলে অবশ্যই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি প্রসিদ্ধ লেখিকা। আমার জাপানের টমিকো কোরার কথা মনে পড়ল। জাপানেও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদিকা ও ঠাকুর সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী একজন মহিলা। এঁর সংগে আমার দেখা হবার ও বন্ধুত্ব হবার সুযোগ হয়েছিল। মেয়েরাই দেখছি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারক। কুং সে সিন বললেন, একদিন চীনের মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যের সংগে খুবই পরিচিত ছিল এবং অনেকে তাঁর কবিতার অনুকরণ করে লিখত। তখন আমার মনে হল 'পরিনু চীনের বাস' কবিতাটা একে শোনাই। আমি লী-কে বললুম, তোমায় যে কবিতাটা টাইপ করতে দিয়েছেন, হয়েছে? সে বললে, না, এখনও হয়নি। আমার বেশ রাগ হল, এ ছেলেটা তো অবাধ্য! আমি ভ্রূকুটি করলাম, কেন হয়নি? তা হলে বললে না কেন, আমি কপি করতাম। সে খুব অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগল, কালকেই তিন কপি টাইপ করে দেবে। এবং দিয়েও ছিল।

দুই আমির সংগে স্টেশনে বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হল, কিন্তু তার একটাও দেখছি না। সম্ভবত ওঠেনি। সবাই ট্রেনে উঠে গেল। স্টেশনে চলন্ত সিঁড়ি জ্ঞানসিংকে খুব আনন্দিত করেছিল। তিনি এটা চীনের একটা বিশেষ কৃতিত্ব মনে করেছিলেন। ট্রেনে প্রথম প্রশ্নোত্তরের সুবিধা পেলাম। ইতিমধ্যে মং-এর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে। মানুষটির পরিচয় পেয়েছি। বয়স পঞ্চাশোর্ধ, মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। আমাদের দলে [illegible] খুব গুরুগম্ভীর। ফাঁক পেলে দীনেশ আর আমি একটু হেসে নিতাম। [illegible] দলে ভিড়ল এবং আমাকে ক্ষেপাতে শুরু করল। দীনেশ আর আমি তাকে [illegible] ধরলাম। দীনেশ জানতে চায় ওখানে বিচার-ব্যবস্থা কি রকম। আমি জানতে চাই Family Planning। আমাকে কেউ যেন বলেছিল—কমিউনিস্ট দেশে Family Planning [illegible] করে না। কিন্তু জানলাম, তা নয়। এরা খুব ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। এবং তার প্রথম চেষ্টা হচ্ছে বোঝানোর মাধ্যমে দেওয়ালে ত্রিকোণ চিহ্ন এঁকে, শহরে শৌখীন সভায় বক্তৃতা করে নয়। গ্রামে গ্রামে কমিউনের মাধ্যমে। ওদের সুবিধা [illegible] এই যে, প্রচারযন্ত্রটা খুব কার্যকরী। কমিউনের কর্মীটি যেমন চাষ [illegible],

পদ্মপালন সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, পর্যালোচনা করে, যেমন কোনো কর্মপদ্ধতি আলোচনা করে তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেয়। কমিউনের কমিটি সাধারণ মানুষের থেকে, 'work team' বা কর্মিদল থেকে নির্বাচিত। নির্বাচনের সময়ই তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মেছে। কোনো কথা যুক্তি দিয়ে বললে তা বুঝতে এবং বোঝাতে পারে। কাজেই, ব্যাপকভাবে বোঝানোর কাজটা হয়। এবং যেহেতু কমিউনের সভ্যরা সেই গ্রামেরই নির্বাচিত ব্যক্তি, তারা বাইরে থেকে প্রচার করতে আসছে না, সেহেতু তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়। আমাদের সোস্যাল ওয়ার্কাররা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতে গ্রামে যান কি না জানি না, গেলেও তাঁদের সঙ্গে গ্রামের লোকের অন্তরের যোগের অভাবহেতু তারা সেসব পরামর্শ বড়লোকী পরামর্শ বলে অগ্রাহ্য করে। শহরে বস্তিতেও যখন সোস্যাল ওয়ার্কাররা যান, তাঁরাও ভালো জামা-কাপড় পরে বাইরে থেকে আসেন। তাঁদের বোঝানোটাও তাই বহিরঙ্গ ব্যাপার—তা এতটুকু মনে দাগ কাটে না। তারপর আমাদের একটা প্রধান প্রতিবন্ধক ঈশ্বরনির্ভরতা, অর্থাৎ, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি'। আমাদের পাশের বস্তির করিম, যার বারোটি সন্তান জন্মেছে, তাকে বলতে সে বললে, 'যে বৃক্ষে যে কটি ফল ফলবার তা ফলবেই।' এই রকম উচ্চ দার্শনিক চিন্তা শুনলাম তারা জন-সাধারণের মধ্য থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে—যেমন বিদায় করেছে কনফিসিউ-য়াসকে। কালচারাল রেভলিউশনের একটি প্রধান যুদ্ধ ছিল কনফিসিউয়াসের সঙ্গে। কলকাতায় যখন কালচারাল রেভলিউশনের তাণ্ডবের কথা আমাদের কাগজে পড়তাম মনে হত চীনে একটা পাগলামি চলেছে। তখন একজন অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, দেখছেন না, চীনে ওরা কনফিসিউয়াসেরও পিছনে লেগেছে! আমাদের ছেলেরাও তারই অনুকরণে বিদ্যাসাগরের মুণ্ড উড়িয়ে দিয়েছে (বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছিল)। অর্থাৎ, যা কিছু মাননীয় তার মানহানি করা। এ-কথাটা সকালবেলা উঠেছিল। অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরীর মহিলারা কথ সূত্রে কনফিসিউয়াসবিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করায় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন? তখনই আমাদের দলের কেউ কেউ আমায় থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ও-সব অত্যন্ত সাধারণ কথা—তাঁরা পরে বুঝিয়ে দেবেন। আমি তাতে সন্তুষ্ট হইনি। কারণ, এই সব সবজান্তেরা নিজেরা অনেক কিছু জানেন বটে, কিন্তু ভারতের মানুষকে তো কিছুই বোঝাতে পারেননি, পারলে ভারত-চীন

সম্পর্কটা এত কটু হত না! যা হোক, এবার মং নিজেই কথা তুললে। সে বললে, "এইবারে তোমার কনফিউসিয়াসের প্রশ্নটার উত্তর দেব। ঐ পশ্চাৎমুখী উপদেষ্টার কথাগুলি আগে আমরা নাকচ করেছি, তবে নতুন যুগের সমস্যা লোককে বোঝা না গেছে। তিনি বলেছিলেন, যত সন্তান ততই পুণ্য। এই বিশ্বাস যদি বদ্ধমূল হয় তা হলে তুমি জন্মনিয়ন্ত্রণ করাবে কি করে?"

আমি বললাম, "তা হোক, তাই বলে তোমরা ঐরকম জ্ঞানী পুরুষকে এত নিন্দা করবে?" মং বললে, "তুমি কনফিউসিয়াস পড়েছ?" আমার বিদ্যার উপর-এ একরকম কটাক্ষপাত হলেও আমি ভেবে দেখলাম সত্যই তেমন কিছু পড়িনি। তা নাই বা পড়লাম, সবই কি পড়ে জানতে হবে নাকি! আমি বললাম, "আমি তো বৌদ্ধ-শাস্ত্র ত্রিপিটক পড়িনি, তাই বলে কি শাক্যমুনিকে জানি না (ওরা বুদ্ধদেবকে শাক্যমুনি বলে)? আর তা ছাড়া কনফিউ-সিয়াসের সময় তো মার্কস জন্মাননি—তো সে বেচারা সোসালিজম জানবে কি করে?" মং বললে, "জানা, অতি পুরাকালেও এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাঁদের মুখ সামনের দিকে ফেরানো—যাঁদের উপদেশ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা যে যুগের মানুষ হোন, সর্বদাই শ্রদ্ধার পাত্র থাকেন। আর অনেক আছেন যাঁরা কিছু কিছু জ্ঞানের কথা বললেও তাঁদের অনুসরণ করলে মানুষ পশ্চাৎমুখী হয়।" এ-কথা শুনে মংকে আমার বেশ বিজ্ঞ বলেই মনে হল। কারণ, আমার দুটো দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। কতকাল আগে চণ্ডীদাস বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এ হচ্ছে সেই সামনের দিকে মুখ ফেরানো কথা। তারও বহু যুগ আগে বোধ হয় মহাভারতেই আছে যে, "যে লোক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রাখে, স্তেন সঃ—সে চোর।" খুব সম্ভব এর চেয়ে উন্নততর মানবতার বাণী মার্কস বা লেনিনও বলতে পারেননি। আর ওদিকে দেখ ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙালীর মেয়ের লেখাপড়া শেখাটা তাঁর কাছে সর্বনাশ। "আর কটা দিন সবুর কর, পাবেই পাবে দেখতে পাবে, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে!" কিংবা হেমচন্দ্রর 'ঐ যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে।' সবচেয়ে বঞ্চিত, সবচেয়ে উপদ্রুত দুর্বল মানুষের প্রতি বিদ্রূপ! আর 'দি গ্রেট ল গিভার' পরমপ্রাজ্ঞ মনু—তিনি বলে বসলেন, শূদ্রের কানে বেদ গেলে গরম সীসা ঢেলে দিতে হবে! আর মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর যেসব মতামত তা মানলে আজকে আর আমাকে কলম ধরতে হত না। 'এই সব কথা আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, বলি। কিন্তু লী কোথায়

পালিয়েছে, চৌ বেচারা অনুবাদ করে করে হয়রান হচ্ছে—তাই ওকে আর কষ্ট দিলাম না। মং বললেন, "কনফিউসিয়াস বলেছিলেন, দরিদ্রেরা মূর্খ, ধনীরা জ্ঞানী। কিংবা, স্ত্রীলোকের স্থান উনুনের পাশে। এসব কথা মানলে বা এসব কথার মূল উৎপাটন না করলে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়া সম্ভব কি?" আমার মনে হল, আমাদের দেশে তো মার্কস আর মনুর সহাবস্থান। ফলে, সমগ্র সমাজকে কোনো বিষয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এত কঠিন। মং বলছিলেন, "কমিউনের স্তরে জনসাধারণকে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সুযোগসুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।"

"এত ঘুরেছে কে?"

"কেন, বেয়ার-ফুট ডাক্তার! ঐ ডাক্তাররা দাঁড়িয়ে থেকে বড়ি খাইয়ে তবে আসে। কারণ, অসাবধানী কেউ হয়তো ফেলে রাখবে বা ভুলে যাবে।" আমি জানতে চাইলাম, মুসলমানেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাঁদের ধর্ম কি বলে। শুনে আশ্চর্য হলাম মুসলমানেরা এই সর্বান্ত শুয়োর-খেকো দেশে শুয়োর খায় না। কিন্তু তাদের ধর্মের ঐটুকুই তারা জানে, আর কিছুই না। না নামাজ, না রোজা। পাঁচটা স্তম্ভের সবই ধসে গেছে। তবে জাকাতটা বোধ হয় অন্যরূপে সরকার আদায় করে নিচ্ছে। মুসলমানরাও জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি করে না। মং খুব জোরের সঙ্গে বললেন যে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং না হলে কোনো প্ল্যানিংই সফল হবে না। আর আমাদের প্ল্যানড ইকনমি, তার মধ্যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং না হলে তো সবই বানচাল। কাজেই, এ বিষয়ে আমরা প্রথম থেকে সচেতন। চীন দেশে প্রায় নয় শত মিলিয়ান মানুষ—এর মধ্যে বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া সকলেরই কর্মসংস্থান আছে।

ইতিমধ্যে শ্রীনারায়ণের স্ত্রী এসে বসেছিলেন। তিনি নানারকম গল্প শুরু করলেন। ওদিকে সু এসে বললে যে, রুই আলি আমায় ডাকছেন। রুই আলি জানতেন, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ব্যগ্র। ট্রেনে তাঁর ঘরে এলাম। আমার সঙ্গে ডাঃ বৎসলা কোটনিসও এলেন। আমি প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বিয়ে করেননি কেন। ভদ্রলোক খুব আমুদে। বললেন, এখন সময় হয়েছে, কিন্তু এখন কেউ তাকে বিয়ে করবে না। কিন্তু এক সময় ঠিকই করত, কিন্তু তখন তাঁর সময় ছিল না। চীনের সর্বব্যাপী যুদ্ধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেই তাঁর সমস্ত সময়টা কেটে গেল। এঁর কাছেও আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা তুললাম। এ বিষয়ে জানবার আগ্রহ আমার এত বেশি, কারণ আমি মনে করি আমাদের দেশে এই সমস্যাটির সর্বাগ্রে সমাধান দরকার। কিন্তু কোনো সামাজিক সমস্যাকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না. এদিকে বুদ্ধি পরিস্কার করতে হলে ধর্মান্ধতা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূরে করতে হবে। রুই আলি বললেন, এখন মৃত্যুর হার এত কমে গেছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজন। আগে দুর্ভিক্ষে, মারীতে হাজার হাজার লোক মারা যেত—গ্রেট ওয়ালের কাছে ফেলে দিয়ে যেত নিরন্ন পীড়িত মানুষকে। আর আজ তো অন্নে, বস্ত্রে, চিকিৎসায় মানুষ সুস্থ ও সবল। আমি তাকে বললাম—কি কি প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ সফল হচ্ছে, খুলে বলুন। প্রথমত তিনি বললেন, আগে কুড়ি বছরের ছেলে ও আঠারো বছরের মেয়ের

বিয়ে হতে পারত, এখন ছেলে তিরিশ বছর ও মেয়ের বিশ বছরের আগে সরকার বিয়ের লাইসেন্স দেবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম হলে অবিবাহিত বাপ-মায়ের সন্তান হয় না? চৌ বললে, "ষ্ট্যান্ডার্ড বেআইনী তা নয়!" আমি ভ্রুকুঞ্চিত করলাম, "এই চৌ, ঐ শব্দটা বলো না। কোন শিশু সম্বন্ধে আমরা ও কথাটা ব্যবহার করি না।"

"সেটা ঠিকই, বাচ্চার তো কোনো দোষ নেই।" আমি বললাম, "তিরিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে না দিলে বাপেরও খুব দোষ নেই।" রুই আলি হাসছিলেন, "যাই হোক, এখানে অবিবাহিত নরনারীর সন্তান-জন্ম নিষিদ্ধ হয়।" আমি বললাম, "আমাদের দেশেও হয়, তবে ইয়োরোপে নয়—তারা পারমিসিভ।"

"অত পারমিসিভ হলে এখানে চলবে না।"

"কিন্তু অবিবাহিত মায়ের সন্তানের কি হবে?"

"কি আর হবে, ভালই থাকবে। মা দেখবে, নয়তো কমিউন দেখবে।" তা ছাড়া রুই আলি আরো বললেন যে, "অ্যাবরসন" আইনসংগত। প্রত্যেক হাসপাতালেই ব্যবস্থা আছে। তিনি নিজে দেখেছেন একটি মেয়ে ঢুকল ও মিনিট পনেরোর মধ্যে অ্যাবরসন করে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এজন্য তার স্বামীর মতের প্রয়োজন হবে কি না। তিনি বললেন, ব্যাপারটা তার, এতে তার স্বামীর মতের প্রয়োজন কি? তা ছাড়া আরো জানলাম যে, চীন দেশে ভ্রূণহত্যা কোনো দিনই নিষিদ্ধ ছিল না। এইখানে আমাদের সঙ্গে পার্থক্যটা খুব বেশি। কারণ, আমাদের দেশে 'ভ্রূণহত্যা' চিরকাল মহাপাপ বলে গণ্য। মনের ভিতরে এর প্রভাব শিকড় গেড়ে আছে। আমি নিজেকে খুব সংস্কারমুক্ত মনে করি, কিন্তু মনে মনে এর সমর্থন করতে পারি না। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য কতদূর যাবে? যা হোক, আরো শুনলাম যে, "বেয়ার-ফুট বা খালিপদ ডাক্তাররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখে কোন্ বাড়িতে কতজন ছেলেপিলে আছে এবং সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা কতটা। সেই অনুসারে ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে আসে। রুই আলি আরো বললেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটার মধ্যে কোনো নৈতিক প্রশ্ন এরা আনছে না। ধর্মীয় তো নয়ই। প্রয়োজন অনুসার ব্যবস্থা। যেমন হান জাতি, যারা মানডেরিন ভাষা বলে, অর্থাৎ প্রধান চীন জাতি, তাদের মধ্যেই জনসংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু মাইনরিটিদের মধ্যে বাড়ছে না। ওরা মাইনরিটি অর্থে উপজাতি বোঝায়। উপজাতি বা ট্রাইব। যেমন তিব্বতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না, তুর্কী সঙ্কিয়াংদের মধ্যেও না। এদের এত জমি আছে যে, চাষ করে উঠতে পারে না। চোয়াং, মিও প্রভৃতি উপজাতির বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে। তাদের বংশ বাড়লে ক্ষতি নেই। হাইনান দ্বীপের লি জাতি, উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ার লি জাতি ও অন্যান্য ছোট ছোট উপজাতিদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত উপজাতিরা ধীরে ধীরে সভ্যতার বাতাসে পৃথিবী থেকে এমনিই কমে যাচ্ছে। তাই তাদের সম্বন্ধে এখন এ সব ব্যবস্থা হচ্ছে না। যদিও সভ্যতার সমস্ত সুবিধাগুলি তাদের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা হচ্ছে। আমি বুঝলাম যে, চীনও আমাদের মত বহু-জাতি বহু-ভাষা অধ্যুষিত জাতি। কাজেই, এই দুই পুরাতন ঐতিহ্যবাহী দেশের মধ্যে মিল অনেক।

এরপর রুই আলির সঙ্গে রুশ-চীন সম্পর্ক নিয়ে কথা হল। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা আলোচনা। সে কথা পরে অন্য প্রসঙ্গে লেখা যাবে। শুধু একটা কথা আমার কানে বড্ড লাগল—রুই আলি বললেন, "তোমার মতে রুশরা জগতে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছে। তা হলে কেন প্রতি ছয় মাসে একটা করে সাবমেরিন ও দুই মিলিয়ন নিউক্লিয়ার মিসাইল বানাচ্ছে। এইভাবে রণসম্ভার বাড়ানোটা কি তোমার মতে শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ?" আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি তো কিছুই জানি না, রুশীয়রা কত অস্ত্র বানাচ্ছে, আমেরিকানরাই বা কত, চীনরাই বা কি করছে! কিন্তু, এইভাবে যে ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং যে-কোনো দিন একটা বিস্ফোরণে মহাসর্বনাশ ঘটে যেতে পারে; তাও আমরা শুনেছি। আমি রাশিয়াতেই যুদ্ধবিরোধী কথা অনেক শুনেছি। তবে এত শান্তি সম্মেলনের অর্থ কি—সব কি ভাঁওতা?

হরলিক্স

প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায় দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু; যা আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্সকে। সে জানে, হরলিক্স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিক্স পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

কাকে জিজ্ঞাসা করি? রুই আলি তো তার মতে স্থির যে, রাশিয়াও যুদ্ধবাজ হয়ে উঠছে। আর কোসাগিনও তো আমার সঙ্গে আলোচনায় বসবে না, তাই বিমর্ষ মনে রুই আলির দেওয়া রাম-ভরা ফ্রেঞ্চ চকোলেটের মত সুস্বাদু চকোলেট খেতে খেতে পাশের ঘরে চলে গেলুম। বৎসলা বললে, "তুমি পারোও বটে—এতে প্রশ্নও তোমার মনে আসে! ঝাড়া দু'ঘণ্টা প্রশ্নের বোম্বারডমেণ্ট!"

আমরা যখন সিজিয়াচুয়াং স্টেশনে ঢুকছি তখন রাত্রি ন'টা। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ডাঃ বসু বললেন, "নামবার সময় একটু 'অরগানাইসড ভাবে' নামতে হবে। ওরা নাকি নিউজরীলের জন্য সিনেমা-ছবি তুলবে। তাই আমি ও আমার স্ত্রী প্রথম নামবো। তারপর বৎসলা ও মুংগেশ কোটনিস। কারণ, ও'দের ভাইয়ের প্রাধান্যে ও'রাও বিশিষ্ট। তারপর জ্ঞানসিং ধিংড়া। কারণ, তিনি ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির দিল্লী শাখার সভাপতি। তারপর আপনারা যে যেমন খুশি।" আমি তাতে খুবই নিশ্চিন্ত। ভাঙা পা, পর্বতপ্রমাণ কোট, এর হাত ধরে ওর কাঁধে ভর দিয়ে আমার অবতরণ যে একেবারেই সিনেমা স্টারের মত দর্শনযোগ্য হবে না এ সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম।

স্টেশনে নেমে দেখি হু হু করে হিমস্পর্শ, বাতাস বইছে, ঝিরঝির বরফ পড়ছে, ঠাণ্ডা একেবারে অস্থিভেদ করে যাচ্ছে। খুব ভিড়, স্টেশনে আলো কম। শুধু সিনেমা তোলবার জন্য তীব্র আলো এক একটা ছোট ছোট বৃত্ত আলোকিত করছে। আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন হোপেই প্রদেশের রেভলিউশনারী কমিটির চেয়ারম্যান। এ আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির মতই। এর মধ্যে একটি বর্ষীয়সী চীনা মহিলা, হ্রস্বদেহ খুব সবল ও দৃঢ়—এগিয়ে এসে বৎসলাকে আলিঙ্গন করলেন। ইনি কোচিন লান—কোটনিসের স্ত্রী। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি প্রকাণ্ড গেস্ট হাউসে। লাউঞ্জ বা বসবার ঘরটি খুব লম্বা। এক প্রান্তে বড় বড় সোফা। সেখানে বিশিষ্টরা বসেছেন। আর দু'লাইনে এক-একজনের বসবার সোফা। দুটি সোফার মাঝে মাঝে একটি করে টেবিল। তাতে যথারীতি চায়ের পেয়ালা প্রত্যেকের জন্য সাজানো আছে। আর আছে নানারকম টফি, বাদাম, আখরোট ও বড় বড় রঙ্গীন রসালো আপেল। গরম তোয়ালে পরি-

বেশনের পর চা এল। চা-এর কাপে হাত সেঁকতে সেঁকতে অভ্যর্থনা শুনতে লাগলাম। অভ্যর্থনা করলেন সিজিয়াচুয়াং-এর রেভলিউশনারি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। বেঁটে ছোটখাট মেয়ে আর বিনুনি আছে বলে আরো ছোট লাগে। চীনে অল্পবয়সী মেয়েরাই লম্বা চুল রাখে ও বিনুনি বাঁধে। বয়স্করা চুল কেটে ফেলে। খোঁপা বড় একটা দেখিনি। গেস্ট হাউস লোকজন ভর্তি। বুঝলাম এরা সবাই স্মারক উদ্ঘাটন উৎসবের জন্য এসেছে।

বেশির ভাগ মানুষই জলপাই রঙের ইউনিফর্মে, কাঁধের কাছে লাল চিহ্ন। সবাইয়েরই একরকম চিহ্ন। এঁরা সব পিপলস লিবারেশন আর্মির লোক। এঁদের মধ্যে কাজের তারতম্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু পদের তারতম্যের কোনো বাহ্য লক্ষণ নেই। কে সেনাপতি, আর কে পদাতিক, তা সাজে বা ব্যবহারে কিছু বোঝা যাবে না। এক সঙ্গে খাওয়া-বসা, একরকম পোশাক, কোনো ডেকোরেশন ঝকমক করছে না কারো অঙ্গে। তা ছাড়া সবচেয়ে ভালো

লাগে যে, সৈন্যরা সাধারণ লোকের সংগে কাজে-কর্মে মিশে আছে সমাজে পরগাছার মত নয়। যুদ্ধ করবার জন্য জিয়ানো মাছের মত এদের পোষা হচ্ছে না—জুতো পালিশ, বোতাম পালিশ, আর 'সোলজারস ক্লাবে' আড্ডা দিয়ে জীবন কাটাবার উপায় নেই। শস্যক্ষেত্রে চাষ করছে, ফ্যাক্টরীতে কর্ম-সমিতিতে কাজ করছে, নানা প্রতিষ্ঠানে নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছে। ইংরেজ আমল থেকে আমাদের মাইনে-করা বা যাকে বলে "মার্সিনারি আর্মি" দেখা অভ্যাস। সৈন্য দেখলে আমরা একটু দূরে সরে যাই। পিপলস রেভলিউশনারি আর্মি বা পিপলস লিবারেশন আর্মি বলতে কি বোঝায় তা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। এই প্রসংগে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে যাব—অর্থাৎ, বার্লিনের কাঁটাতারের বেড়া পার হব ১৯৬২ সালে। ডেমক্রেটিক জার্মানীর প্রবেশদ্বারে রুশ ও পশ্চিম জার্মানীর দ্বারে অ্যামেরিকান সৈন্য। দুবার করে আমার পাসপোর্ট দেখবে। আমি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কে!" দোভাষী রুশ সৈন্যর দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উল্টে বললে, এরা হচ্ছে 'লিবারেশন আর্মি', আর অ্যামেরিকান সৈন্যর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললে, ওরা হচ্ছে 'অকুপেশন আর্মি'। তফাত কিছু দেখতে পাচ্ছ? বুঝতে পারলাম, বিভক্ত জার্মানীর বুকের উপরে এই দুই বিদেশী সৈন্যর উপস্থিতি একইরকম বিরক্তিকর। যা হোক, এখানকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে বা বয়স্ক উচ্চপদস্থ সৈনিক, সবাই ঘরের লোকের মত মিলে মিশে রয়েছে। এটার খুবই দূরপ্রসারী ফল আছে নিশ্চয়। এই উৎসবে এত মিলিশিয়া আসবার কারণ ডাঃ কোটনিস নিজে সৈন্যদের সংগেই কাজ করেছেন।

এইখানে ভারতীয় 'মেডিকেল মিশন' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। ভারতে যখন স্বাধীনতার প্রয়াস জন-সাধারণের মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নানা প্রয়াসে অভিব্যক্ত হচ্ছে তখন বিশ্বের সব দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগে তার একটি একাত্মবোধ জন্মানো স্বাভাবিক। স্পেনের গৃহযুদ্ধেও দেখেছি অনেক দেশ থেকে স্বেচ্ছাবাহিনী গিয়েছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচরিতের সহায় হতে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সেখানে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছে। এত বেশী লোক গিয়েছিল যে, অনেক সময় তা পরিহাসের বিষয় হয়েছিল। আমার মনে আছে ঐ সময় একজন ইংরাজ ভদ্রলোক কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলেন, "স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে পনেরোজন ইংরেজ মরেছে, কুড়িজন ফরাসী, দশজন ইটালীয়ান ইত্যাদি ও একজন স্প্যানিয়ার্ড"। তারপর তাঁর সহাস্য মন্তব্য—"পরের ব্যাপারে নাক গলানোর উচিত সাজা (Serves him right for butting in।) তা ঠাট্টাতামাশা যাই হোক, পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ সময় থেকে একটা নূতন ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। যদি একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের মিত্র শক্তিরূপে যুদ্ধে সহায় নাও হয়, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ন্যায়যুদ্ধের বা ধর্মযুদ্ধের সামিল হবার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হওয়া। চীনের উপর জাপানী আক্রমণও ভারতের মানুষকে তেমনি বিচলিত করেছিল। একে তো চীনের সংগে আমাদের দীর্ঘদিনের ভালো সম্বন্ধ, তার উপরে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা—দুই মিলে ভারতের নেতৃবৃন্দ চীনের প্রতি সহানুভূতির একটা বাস্তব রূপ দেবার কথা চিন্তা করেন। সকলেই তারা পাঠিয়েছেন ভারতীয় ডাক্তারের একটি দলকে চীনের মুক্তিকামী মানুষের সাহায্যার্থে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে বোধ হয় ১৯২৬-এর কাছাকাছি সময় ইংরেজরা তাদের দখলের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক দল ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, আমাদের এমনই অবস্থা যে, আমরা নিজেরা পরাধীন আবার আমাদেরই মানুষ অন্যকে পরাধীন রাখতে সহায্য করবে! আমার যত দূর মনে পড়ে, তারা ছিল শিখ সৈন্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। শুধু তো জাপানীই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ইয়োরোপের সমস্ত শক্তিশালী লোলুপ জাতিরা চীনের নানা অংশ দখল করে বসে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে লুটপাট ও অত্যাচার চালিয়েছে। এবারে ১৯৩৭ সালে জাপান 'সভ্য' হয়েই সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ চীনের উপর আক্রমণ করল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ চ্যাংকাইশেককে লিখেছিলেন, 'আপনাদের প্রতিবেশী যে জাপান শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য আপনাদের দেশের কাছে ঋণী, তার নিজের

মঙ্গলের জন্যই আপনার দেশের সঙ্গে যার বন্ধুত্ব করা উচিত, সে হঠাৎ পাশ্চাত্য জগতের ইম্পিরিয়ালিজমের রোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্ব দেশের মহৎ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার যে সুযোগ পেয়েছিল তা নষ্ট করে ফেলল।"

যে ডাক্তারদের দলটিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উৎসাহে ভারতীয় কংগ্রেস চীনে পাঠালেন তাঁদের নেতা ছিলেন ডাঃ অটল। ইনি স্পেনের যুদ্ধেও গিয়েছিলেন। অতিশয় সৎ ও মহৎ এই ডাক্তার পরে ১৯৫৮ সালে আবার চীন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর চীনের প্রতি ভালোবাসা এত গভীর যে, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি যাবার সুযোগ পেয়ে নিরস্ত হলেন না। আর সেইখানেই মারা গেলেন। শ্যনৌহ, চৌ-এন-লাই ও চু-তে, যিনি সেনাপতির সর্বোচ্চ পদাধিকারে ছিলেন, তাঁরা তাঁর শবাধার বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সমাধি আমরা দেখে এসেছি। ঐ দলে ডাঃ বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস ও আরো দুজন ছিলেন। তখন উত্তর চীনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড শীত। শীত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলে চলে এলেন। কেবলে ডাঃ কোটনিস রয়ে গেলেন। তিনি সর্বরকমের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায় হলেন। কঠিন পরিশ্রমে, অনিয়মে, অত্যাচারে শরীর ভেঙে পড়ল। তাঁর ঘন ঘন মূর্ছা হত ও একদিন মারা গেলেন সেই রোগেই। ইতি-মধ্যে তিনি একটি চীনা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। মাত্র এক মাসের ছেলে রেখে ডাঃ কোটনিস মারা যান। ছেলেটির নাম রাখা হয় 'ইনহুয়া', অর্থাৎ ইন্ডিয়া চায়না। এই ছেলেটিও পঁচিশ বছর বয়সে মাত্র দু দিনের অসুখে মারা যায়। অনেক কষ্ট পেয়েছেন কোটনিস-পত্নী কোচিন লান। যদিও তিনি আর একবার বিবাহ করে-ছিলেন, এই পরিবারের প্রতি মমতা তাঁর কম হয়নি। কতটুকুই বা দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু স্বভাবে তিনি বৎসলাকে আপন করে নিলেন তাতে বোঝা গেল এই পরিবারের জন্য তাঁর হৃদয়ে একটি স্থান অটুট রয়েছে! চীনের মানুষও তো ডাঃ কোটনিসকে কোনো দিন ভোলেনি! প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিবস পালিত হয়। আর হয় ডাঃ বেথুনের। ডাঃ বেথুন একজন কানাডিয়ান। তিনিও একজন মহৎপ্রাণ স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি। তিনিও স্পেনের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারপর চীনের যুদ্ধে যুদ্ধার্তদের সেবা করতে আসেন এবং কোটনিস আসার পূর্বে ইনিও ক্ষত চিকিৎসার সময়ে আঙুলে সেপটিক হয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ইনি শুনেলাম যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ করেছিলেন। সে হচ্ছে 'ব্লাড ট্রান্সফিউসন'। তার আগে চীন দেশে এরকম প্রক্রিয়া জানা ছিল না। চীনেরা তাদের এই দুই সুহৃদকে ভোলেনি। একটি পার্কের মধ্যে ডাঃ বেথুনের বিরাট মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে। আর তাঁর স্মৃতি ভবন আগেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এবারে ৯ ডিসেম্বর ডাক্তার কোটনিসের মৃত্যুদিনে তাঁর স্মৃতিভবন উদ্ঘাটন হবে। সেই উদ্দেশেই আমাদের এদেশে আসা।

নতুন স্মৃতিভবনের দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব। আমরা গাড়ি করে সভাগৃহের কাছে পৌঁছলাম। চারিদিকে নিস্পত্র বৃক্ষ। এদিকে ওদিকে বরফ ছড়ানো। শীতের কনকনে বাতাস। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। লাল সবুজ কাগজের পতাকার মালায় ধূসর বৃক্ষরাজি রঙীন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে পথ জুড়ে লাল রেশমের উপর চীনা ভাষায় ও হিন্দীতে লেখা ঝুলছে 'চীন-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ এবং স্বাগতম ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির অতিথিবৃন্দ'। পাতা-ঝরা পপলার উইলো বার্চের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলেছি। গাছগুলি শুধু ভাঙা

দিয়ে তাদের পরিচয় দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি মানুষের ফুল ফুটেছে। এতক্ষণ যাদের দেখছিলাম, তাদের অলিভ রঙের পোশাক আর ধূসর-নীলের একঘেয়ে চেহারা। এইবার দু দিকে রঙগীন গাল, রঙগীন জবলজবলে পোশাক, হাতে রঙগীন ফুলের তোড় (কাগজের ফুল), আর ঘণ্টা লাগানো লাল ফিতে বাঁধা ডুগডুগির মত একটা বাজনা বাজিয়ে তালে তালে সুরেলা গলায় শিশুমুখের অভ্যর্থনা চোখ আর মন জুড়িয়ে দিল। এরা সব কিনডারগার্টেন আর প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়ে। এরা গানের সুরে বলছিল, "স্বাগতম ভারতীয় অতিথিবৃন্দ, স্বাগতম।" চীনের শিশুরা বড় সুন্দর। ফোলা ফোলা রঙগীন গাল, হাসিমুখ। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। তারপরে তারা বড় সপ্রতিভ।

সভা-গৃহে ঢোকার মুখে বারান্দায় মস্ত বড় ক্রিসনথিমামের ঝাড়। শীতের দাপটে একটু মুষড়ে পড়া, তবু ফুলে দেখতে ভালো লাগল। এ সময়ে কোথাও তাজা ফুল নেই। যাঁরা এই উৎসবের আয়োজন করেছেন সেই স্মৃতিভবন কমিটির কর্মীরা ছাড়াও সরকারী অভ্যর্থনাও আমরা পেলাম। লুই-সে-হুয়া হচ্ছেন হোপেই প্রদেশের রেভলিউশনারি কমিটির চেয়ারম্যান, অর্থাৎ এই প্রদেশের উচ্চতম ব্যক্তি। তিনি এবং মিলিটারী প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। সভা-গৃহের ভিতরে কয়েক হাজার লোক যে যার স্থানে বসে আছে। তাদের মধ্যে ডাক্তার, নার্স ও মিলিশিয়ার প্রাধান্য দেখা গেল। আমরা ঢুকতে সমগ্র জনতা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি-ধ্বনি করে আমাদের অভ্যর্থনা করল। আমরা ডায়াসে বসলাম। সামনেই দেখতে পেলাম দেওয়ালে প্রকাণ্ড করে লেখা জবলজবল করছে হিন্দী ভাষায়ঃ "দুনিয়াকো জনতাকো মহান একতা জিন্দাবাদ"। ওয়াংপিন নান, লুই সে হুয়া, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (তাঁর নাম মনে নেই), মিলিটারী জেনারেল—সকলেই ভাষণ দিলেন। উত্তর দিলেন আমাদের পক্ষ থেকে ডাঃ বাসু ও নারায়ণন। সকলেরই লিখিত ভাষণ। তবে যত দূর মনে পড়ছে নারায়ণন লিখিত ভাষণ দেননি। বক্তৃতার মধ্যে দুটি কথা পরিষ্কার হল। এক—ডাঃ কোটনিস চীনের মানুষের কাছে বড় আপন। তিনি আন্তর্জাতিকতার প্রতীক। আর একটি—এঁরা ভারতের বন্ধুত্বকামী। স্বার উদ্ঘাটন উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁরা ভারতবর্ষকেই সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। একজন বক্তার মধ্যে মাও-সে-তুং-কে উদ্ধৃত করে বললেন, 'চেয়ারম্যান বলে-ছিলেন—"আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব গঙ্গা ও হোয়াং হো-র মত চিরপ্রবহমান, পর্বতের মত চিরসবুজ। এই দুই দেশের মধ্যে মেঘ জমলেও তা কখনো স্থায়ী হতে পারে না"।

ওদের চেয়ারম্যান সর্বদাই কবিতার ভাষায় কথা বলেন—আমার বড় ভালো লাগে। মাও-সে-তুং-কে উদ্ধৃত করে আরো কেউ কেউ বললেন, "ডাঃ কোটনিস উষ্ণ দেশ থেকে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে এসে-ছিলেন আমাদের বরফ-জমা শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।" বক্তারা আরো বললেন, তাঁর মৃত্যুর পরে মাও-সে-তুং বলেছিলেন, "আমাদের ভারতীয় বন্ধু দূর দেশ থেকে চীন দেশে এসেছিলেন জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য! এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ইয়েনান প্রদেশ ও পূর্ব চীনে তিনি আহত ও রুগ্নের সেবা করেছেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটায় আমাদের সৈন্যরা একজন যোগ্য সহকারী হারাল আর দেশ হারাল একজন প্রকৃত বন্ধু। আমরা তাঁর আন্তর্জাতিকতার কথা কখনো ভুলব না।" চীনেরা বেশ কবিত্ব করে কথা বলে। কেউ বা বললে, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে একটি সঙ্গীত বাজিয়ে গিয়েছেন।

যাঁরা যাঁরা বললেন তাঁদের বক্তৃতার কপিগুলি না থাকায় সমস্ত কথা আমি শোনাতে পারলাম না। তবে এটা ঠিক যে, এই উৎসবটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-চীনের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটা দূর করে দেবার এটা আন্তরিক প্রয়াস। আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীনারায়ণের বক্তৃতা ভালো হয়েছিল। যে বন্ধুত্বের হস্ত এঁরা প্রসারণ করেছেন, আমাদের পক্ষ [থেকে] সেটি ধারণ করবার উপযুক্ত মানুষ হান। সব সময় তো সরকারী প্রতিভূরা তেমন হন না।

সভা-শেষে আমরা 'স্মৃতিভবন' দেখতে গেলাম। সত্যিই দেখবার মত মিউজিয়াম হয়েছে। ঢুকতেই প্লাসটার অফ প্যারিসে গড়া ডাঃ কোটনিসের ঘোড়সওয়ার মূর্তি। তার পর তাঁর জীবনের ঘটনা ছবিতে সাজানো। প্রথমেই একটি লেখা রয়েছে ঃ "ডাঃ কোটনিস তাঁর প্রাণ ও জীবন দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের একটি সঙ্গীত রচনা করেছেন......তাঁর নাম ভারত-চীন মৈত্রীর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।" ঐখানে আমরা জানতে পারলাম, তিনি যখন চীনের যুদ্ধে আর্তের চিকিৎসার জন্য যান তখন মানবতার কারণেই গিয়েছেন; তখন তিনি রাজনীতি

বিষয়ে সজাগ ছিলেন না। ওখানে যাবার পর অত কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। চীনা ভাষাও শেখেন। তাঁর হাতের লেখা একটি চীনা পত্রও বাঁধানো রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর চিত্র। ফটোগ্রাফের সংখ্যা যথেষ্ট হলেও তাতে একটি মিউজিয়াম হয় না। তাই তাঁর চীনাবাসকালীন জীবনের ঘটনার নানা কাহিনীর বড় বড় ছবি আঁকানো হয়েছে। দূর দূর গ্রামে লোক পাঠিয়ে তাঁর পরিচিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই সব ছবির মালমসলা তৈরি হয়েছে। একটি মেয়ে সাদা একটা ছড়ি দিয়ে প্রত্যেকটি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ করে বলতে লাগল। যদিও এক-একটা গ্রুপ ছবির সামনে চেয়ার গোছানো ছিল, আমরা বসে বসেই শুনছিলাম, তবু মাঝে মাঝে যে হাঁটতে হচ্ছিল তাতেই আমার তো পা ব্যথা। এই বিরাট আয়োজন দেখে আমি বিস্মিত। দেখতে দেখতে ক্রমেই এ-কথা বুঝতে পারলাম যে, এ আয়োজন দু-চার দিনের ব্যাপার নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এর জন্য অনেক মানুষ মিলে পরিশ্রম করেছেন; বহু টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম, যখন ভারত-চীন সম্পর্ক খুবই বিষাক্ত তখনও কিন্তু এঁরা কোটনিসের স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশের এ আয়োজন করে চলেছে। দেশের মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার এটি একটি প্রমাণ, যুক্তি-নির্ভরতারও প্রমাণ। আমার মনে পড়ে গেল চীন-ভারত যুদ্ধের সময়কার পাগলামির কথা। চীনেরা আরশোলা খায় বলে ছড়া লেখা হল! সব-চেয়ে মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার এক-দিন, যা কখনো ভুলব না। 'সুদক্ষিণা' নামে একটি মহিলা কো-অপারেটিভ দোকান ১৯৬১ সালে আমি সংগঠিত করি। একদিন দোকানে ঢুকে দেখি একটি ভদ্রলোক অর্থাৎ ভালো কাপড়চোপড় পরা যুবক ও গুটি দুই মহিলা খুব তড়পাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, "এখনও আপনারা দোকানে 'চীনা সস্' রেখেছেন! সব ফেলে দিন।" আর কর্মী মেয়েটি বিপন্নভাবে বলছে, পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে, ফেলে দিলে লোকসান হবে। তাঁরা ঘৃণাপূর্ণভাবে বলছেন, টাকাটাই সব, দেশ-প্রেম বলে কিছু নেই?" আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, জড় বস্তু কখনো জীবকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারে না। সয়াবীনসস চৌ-এন-লাই বা মাও-সে-তুং-কে যুদ্ধে প্রেরণা দেয়নি। ঐ বোতলগুলি কমিউনিস্টও নয়।

ডাঃ কোটনিস স্মৃতিভবন থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন এ-কথা আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, যখন ভারত-চীন সম্পর্ক বিষাক্ত ছিল তখনও তাঁরা কোটনিসের স্মৃতিকে একটি উজ্জ্বল তারার মত সামনে রেখে মানুষে মানুষে মৈত্রীর সম্পর্ককে ম্লান হতে দেননি। এতে সেদেশের নেতৃত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা হল। ডাঃ কোটনিস মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানা ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগের মধ্যে সে-কথা স্মরণ রাখতে পারা উন্নততর মনুষ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

(ক্রমশ)

আরও বেশী কোকোর পুষ্টি

আরও বেশী কোকোর স্বাদ

নতুন

বোর্নভিটা অধিক কোকোসহ!

অন্য যে-কোনো মল্ট-যুক্ত খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে বোর্নভিটায় সবসময়েই কোকো বেশী ছিল। এখন বোর্নভিটায় আরও বেশী কোকো থাকায় বোর্নভিটা আরও অনেক বেশী পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

বোর্নভিটার কোকো রক্ত গ'ড়ে-তোলায় আয়রণে সমৃদ্ধ, এছাড়াও এতে আছে ভিটামিন বি এবং ডি আর ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত খনিজ পদার্থ। শুধু তা'ই নয়-বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

আপনার বাচ্চাদের বোর্নভিটা রোজই খাওয়ান, দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত বয়সে মূল্যবান যে-সব পুষ্টিগুণ দরকার—বোর্নভিটা সে-সব যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার...ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে!
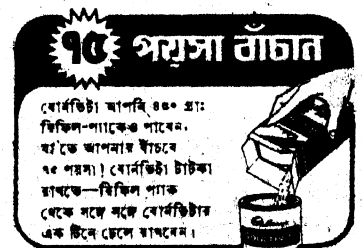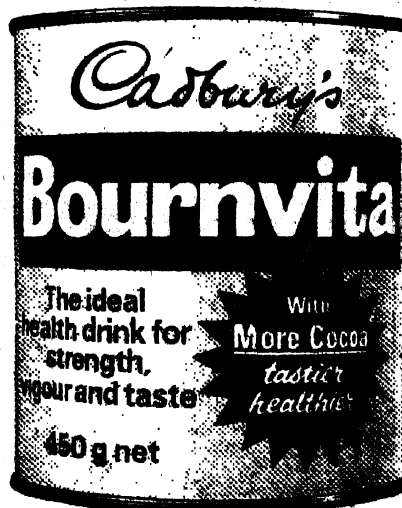
অধিক কোকো, অধিক পুষ্টি, অধিক স্বাদ

OBM-6714 BEN.

আলোচনা

শরৎচন্দ্রের সম্পাদক হওয়া

গত ২-৪-৭৭ সংখ্যা 'দেশে', শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'শরৎচন্দ্রের সম্পাদক হওয়া' নামক নিবন্ধটি পড়িয়া বিগত ৫৫ বছর আগের একটি আনন্দ স্মৃতি আমার মনের পটে পুলকের সঞ্চার করিল। লেখক যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, তৎকালে বিহার শরীফে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সেই সময় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব, রায় সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাহাদুর তৎকালীন বিহার শরীফের এস ডি ও ছিলেন। আর শচীনবাবুর এক কাকা গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্থানের মুন্সেফ এবং আর এক কাকা সত্যেন্দ্রনাথ তথায় সরকারী হাসপাতালের অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন ছিলেন। শচীনবাবু বিহার শরীফে ইঁহাদের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন। আমার পিতৃ পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, বলাই বাহুল্য। শচীনবাবু খুব ভাল গান গাহিতে পারিতেন। আমার পিতৃদেব তাঁর গান শুনাইবার জন্য তাঁহাকে আমাদের বাড়ি নিয়া আসিতেন। সেই সময় আমি তাঁহার কণ্ঠে গীত গান শিখিয়াছিলাম। সেই ছেলে বেলায় শেখা গানগুলি আমি এই ৭২ বছরেও করি। পদগুলি সব পুরো মনে নাই যদিও তবু যতটা পারি গাহিয়া আনন্দ পাই অদ্যাপি। হঠাৎ তাঁহার ঐ লেখাটি পড়িয়া আমার সব স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। এতদিন ঐ ভদ্রলোক কোথায় আছেন কেমন আছেন, ও ঠিকানা না জানা থাকায় কোনরূপ কিছু জানিতে বা জানাইতে পারি নাই। এখন দেশ মারফত তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

শ্রীমতী রীনা দাশগুপ্ত
কলকাতা-৭৪

ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ার

গত ২৬ মার্চ, ১৯৭৭-এর দেশ পত্রিকায় 'এই কলকাতায়' শীর্ষক রচনাটির অন্তর্গত ছবির মেলার মধ্যে ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ারের আলোচনা প্রসঙ্গে মেলায় ২টি পত্রিকার স্টলের কথা যে কিছুটা উল্লিখিত হয়েছে তার জন্য উৎসাহিত বোধ করছি। কিন্তু সংবাদের নিম্নলিখিত অংশটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :—

"কণ্ঠস্বর ও গাঙেয় পত্র দুটি স্টল করেছিলেন শিল্প সংক্রান্ত পুঁথি ও পত্র পত্রিকার। কণ্ঠস্বর পত্রিকা তাঁদের সমস্ত প্রকাশনীর একটি 'জনতা সেট' ভালো ডিসকাউন্টে বিক্রি করেছিলেন এখান থেকে।"......

এই প্রসঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে গাঙেয় পত্র ছাড়া অপর স্টলটি ছিলো কণ্ঠস্বরের নয়—কবিসেনা পত্রিকার এবং দ্বিতীয়ত কবিসেনা স্টল থেকে যে 'জনতা সেট'টি ভালো ডিসকাউন্টে বিক্রি হয়েছে সেটির প্রকাশক 'প্রকল্পনা সাহিত্য' —কণ্ঠস্বর নয়। কণ্ঠস্বর প্রকাশনীর বই-পত্র কবিসেনা স্টলে থাকে এবং ছিলো, কিন্তু কণ্ঠস্বরের 'জনতা সেট' বলে কিছু ছিলো না। ৫ মার্চের দেশ-এ কবিসেনার বিজ্ঞাপনেও আর্ট ফেয়ারে কবিসেনার স্টলের কথা উল্লিখিত আছে।

চন্দন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য
কলকাতা-৩৪

প্রবাসে বাঙালী

দেশ ১৯ চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবাসে বাঙালী' প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের চিঠি পড়ে খুবই মর্মাহত হলাম। উনি তরুণ লেখকের উগ্র বাঙালীআনার কথা উল্লেখ করে নিজেই বাঙালী বিদ্বেষ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক। "দুজনেই মনে মনে ঠিক করে নিলুম ভারতের যে প্রান্তেই যাই—বাঙলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে যাব"—এই কথাটায় শুধু লেখকের বাংলার সংস্কৃতি ও বাঙালীর প্রতি প্রীতিই প্রকাশ পায়—উগ্র বাঙালীয়ানা বা কলোনিয়াল মনোবৃত্তির কণামাত্র প্রকাশ

ঘটে না। এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদূরে পাশ্চাত্ত্যে বাঙলার সংস্কৃতির যে প্রচার করেছিলেন তাতে তাঁর বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-ও প্রীতিই প্রকাশ পেয়েছিলো। লেখিকার উক্তি অনুযায়ী বঙ্গ সংস্কৃতি-প্রেমিক সব ব্যক্তিই উগ্র প্রাদেশিক বলে বিবেচিত।

আমাদের মতে অমিতাভ ভট্টাচার্যের লেখা 'প্রবাসে বাঙালী' দেশ পত্রিকার মত প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ারই যোগ্য। আমরা প্রবাসী বাঙালী হয়ে তাঁর রচনায় আমাদের মনের কথাই খুঁজে পাই।

ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য
'আমেদাবাদ'

অচেনা চীন

শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী লিখিত অচেনা চীনের এক অংশে (২৬শে মার্চ দেশ) উনি লিখেছেন চীনারা বৃটিশের কৃত ভারত চীন সীমানা মানতে চায়নি। তাই তারা আলোচনার মাধ্যমে ভারত চীন সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল। যাই হোক আমরা দেখেছিলাম শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হলো। উনি লিখেছেন চীন প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে একটুও বেশী এগোননি তাঁরা। আমার মত স্বল্প বুদ্ধির লোক তাহলে এইটুকুই বুঝতে পারে এককালে ভারত-চীন সীমারেখা নির্ধারণ করেছিল বৃটিশ এবং পরবর্তীকালে সেই সীমারেখা নির্ধারণ করলো চীন, রাজনীতির এই থিয়েটারে ভারতের ভূমিকাটি তবে কি?

লীলা বসু
কলি-৭০০০৫৩

॥ ৪৬ ॥

গণপতিবাবুর প্রশ্ন করার ধরনটা আমাকে একটু চিন্তিত করে তুললো। আমার সম্বন্ধে তিনি এতোদূরে থেকে কী বা শুনতে পারেন?

থ্যাকারে ম্যানসনের কাজকর্মে এখনও পর্যন্ত সাধ্যমতো সৎ পথে থাকবার চেষ্টা করেছি। সহকর্মী কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিনি। কারও প্রতি বিশেষ দুর্বলতাও দেখাই নি। সুতরাং আমার চিন্তা করবার কী থাকতে পারে, যদি-না আমার সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা গুজব স্বার্থপর মহল থেকে ইচ্ছে করেই বিশেষ কয়েকটি জায়গায় রটনা করা হয়ে থাকে।

নিজের মনোবল যখন ফিরে পাচ্ছি ঠিক সেই সময় সীমার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নিজের দায়িত্বের বাইরে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কারও সুখ-দুঃখের সঙ্গে যদি সামান্য একটু জড়িয়ে থাকি তার নাম সীমা। সুলেখা সেন যে গোপনে একদিন আমার ঘরে রাত্রিবাস করেছে সে-খবর শেষ পর্যন্ত পাঁচ কান হয়েছে নাকি? যত দূর জানি ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপনে হয়েছে, কিন্তু রামসিংহাসন চৌরাশিয়া এবং তাঁর সাগরেদদের সদাসতর্ক দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত আমরা এড়াতে পেরেছি, এমন গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়।

সুলেখার দুঃখময় জীবনে কিছুক্ষণের শান্তি আনবার জন্যে যা করেছি তার জন্যে আমি মোটেই লজ্জিত নই। এই সম্পর্কে যতই কুৎসা রটুক আমি ভয় পাই না। আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি বক্তব্য মনে মনে সাজিয়ে ফেললাম—গণপতিবাবু ঐ প্রসঙ্গ তোলা মাত্রই আমি আসল ব্যাপারটা ওঁকে শুনিয়ে দেবো।

কিন্তু আমার আশঙ্কা সত্য নয়। গণপতিবাবু সুলেখা অথবা সীমা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই তুললেন না।

বরং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সগর্বে বললেন, "সাবাস, শংকর। এই তো চাই।"

গণপতিবাবু কী কারণে আমাকে এইভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তা আন্দাজ করতে পারছি না।

কিন্তু কোনোরকম ব্যাখ্যা না করেই গণপতিবাবু বললেন, "বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়—তুমি যে হরি উকিলের ছেলে এ-কথা ভুললে চলবে কেন?"

সুযোগ পেলেই গণপতিবাবু আমার স্বর্গত পিতৃদেবের কথা তোলেন। কিন্তু আজ তাঁর এই বিশেষ আনন্দের কারণ কী তা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না।

গণপতিবাবু আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "যদি আমার কিছু বাড়তি পয়সা-কড়ি থাকতো তা হলে তোমাকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রেখে আইন পড়াতাম।"

আইন পড়তে গেলে বি-এ পাস করতে হয়। আমি কোনোক্রমে আই-এ পাসের সার্টিফিকেট পকেটস্থ করে মা-সরস্বতীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে চুকিয়ে এসেছি। সে-কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গণপতি-বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। যা বললাম না—লেখাপড়া করবার এতো ইচ্ছা ছিল আমার কিন্তু ঈশ্বর আমার ওপর দয়া-পরবশ হলেন না কেন?

গণপতিবাবু আমার কথাতে নিরুৎসাহ হলেন না বললেন, "আই-এ পাস তো কী হয়েছে? দেখি, দুটো পয়সা একস্ট্রা রোজগারের চান্স এখনও রয়েছে। ভগবান যদি দয়া করেন, তাহলে তোমাকে বি-এ এবং বি-এল দুটোই পাস করিয়ে এনে গুরুঋণ শোধ করবো।"

গণপতিবাবুর মহৎ হৃদয়ের আরও একটা পরিচয় পেয়ে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে এই মুহূর্তে। সারা-জীবন সেবা করেও এইসব মানুষের ঋণ আমি শোধ করে যেতে পারবো না।

গণপতিবাবু আমার চোখের কোণে কৃতজ্ঞতার জল দেখে নিজেও অভিভূত হলেন। বললেন, "গ্যাটম না-চাপিয়েই তুমি তো বড় বড় উকিলকে লজ্জা দেবার মতো বিদ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছো।"

গণপতিবাবুর কথা মোটেই সত্যি নয়, আমাকে সংসার পথে উৎসাহিত করবার জন্যেই যে তিনি এইসব কথা বললেন তা বুঝবার মতো সামান্য বুদ্ধি এখনও আমার ঘটে রয়েছে।

গণপতিবাবু বললেন, "সাধে কি আর তোমার তারিফ করছি। এই ক'মাসে তুমি হ্যাটট্রিক করলে। একখানা নয়, দুখানা নয়, তিনখানা ফ্ল্যাট খালি করেছো—এটা কী সোজা ব্যাপার। যারা এ-লাইনে আছে একমাত্র তারাই বুঝবে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়াও এর থেকে সহজ।"

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গণপতিবাবু হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যাবৃত মনে হলো। আমার মুখ বন্ধ করে নিজে কেবল কথা বলে যাবার অধিকার গণপতিবাবু কখনও নেন নি।

গণপতিবাবু এবার চিৎকার করে বললেন, "আমি একটু ফর্ব্স-মণ্ডল-এর আপিসটা ঘুরে আসছি। আপনি এখনও আছেন তো শিখীনবাবু?"

কাঠের পার্টিশানের অপর দিকে ভারী

[illegible] অ্যাটর্নি শিখীন্দ্রবাবু জানিয়ে [illegible] তিনি এখনও অনেকক্ষণ থাকবেন।

[illegible] "থাকুন স্যর, [illegible] আপনার সঙ্গে [illegible] ফেলতে চাই।"

[illegible] আপিসের সামনে এসে আমি [illegible] কিন্তু ওখানে ঢোকবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না গণপতিবাবু।

সোজা বললেন, "এখন ফক্স-মণ্ডলের আপিসে যাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না! এখন তোমার সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা রয়েছে।"

হেস্টিংস স্ট্রীট ও ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের মোড়ে রিলায়েন্সের বিশ্ববিদিত খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লেন গণপতিবাবু। তারপর দেখে-দেখে এমন একটা কোণ নির্বাচন করলেন যেখানে চুপি-চুপি কিছু কথাবার্তা বলা যায়।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে গণপতিবাবু বললেন, "বেঁচে থাক আমার রিলায়েন্স — কনফিডেনশিয়াল কথাবার্তা বলার এমন চমৎকার জায়গা খুব কম আছে।"

লায়ন অ্যান্ড সিনহার অফিস ঘর ছেড়ে গোপন কথা বলবার জন্যে কেন এই বাজারে চলে এলেন গণপতিবাবু তা এখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য।

গণপতিবাবু ইতিমধ্যে পরিচিত বেয়ারাকে দু'খানা করে গরম সিঙাড়া এবং চায়ের অর্ডার দিলেন।

চা খেতে-খেতে গণপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ফক্স মণ্ডলে আপনার কাজ সারলেন না?"

নিস্পৃহভাবে গণপতি উত্তর দিলেন, "কাজ থাকলে তো সারবো! আমি স্রেফ তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলবার জন্যে লায়ন অ্যান্ড সিনহা থেকে বেরিয়ে এলাম।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা ওই মিস্টার আর সি ঘোষকে কীভাবে ম্যানেজ করলে? আজকাল তো বশীকরণ করলেও ভাড়াটে নরম হয় না—মক্কেলের ছোট ছেলেকে পরিবার ছাড়বে কিন্তু ভাড়া-করা ঘর ছাড়বে না!" এই বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন গণপতিবাবু।

পর মুহূর্তেই গণপতিবাবুর খেয়াল হলো রসিকতাটা একটু উগ্র হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "রাগ করলে না তো? তা তুমিও আর ছোটটি নেই—চাকরি-বাকরি করছো। এবং শাস্ত্রেও বলছে, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রেঃ বন্ধুবদাচরেৎ।"

পরিবার সংক্রান্ত রসিকতা নিয়ে আমি ব্যস্ত হচ্ছি না, আমি ভাবছি ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের খবর এর মধ্যে কী করে গণপতিবাবুর কানে এসে হাজির হলো?

গণপতিবাবু সে-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করলেন না। বরং আর সি ঘোষ সম্পর্কে বাড়তি কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জানতে চাইলেন, "কী হয়েছিল? ঘোষের সঙ্গে মালিকদের খিটিমিটি লাগলো কেন? নিশ্চয় টাকা কড়ি নিয়ে গোলমাল বেধে ছিল, কিংবা ঘোষকে চাকরি থেকে রিটায়ার করতে বলেছিল।"

আমি বললুম, "এসবের কিছুই হয়নি। বেচারা আর সি ঘোষ খুব কষ্ট পেয়ে প্রতিশোধ নিলেন।"

"প্রতিশোধ?" চমকে উঠলেন গণপতিবাবু।

"প্রতিশোধ ছাড়া আর কী বলা যায়। জেঠমালানিরা ওঁর জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে একটা সুখের সংসারকে তছনছ করে দিলেন। মিস্টার ঘোষের পক্ষে তা সহ্য করা আর সম্ভব হলো না। তিনি কী আর প্রতিশোধ নিতে পারেন? উত্তেজনার মাথায় যত-নষ্টের-গোড়া ফ্ল্যাটখানাই ছেড়ে দিলেন।"

গণপতিবাবু মন দিয়ে শুনে যাচ্ছেন আমার কথা। তিনি বললেন, "হুঁ।"

আমি বললাম, "প্রতিশোধ ছাড়াও আর একটা জিনিস থাকতে পারে। তার নাম অনুশোচনা। পাকেচক্রে তিনিও মেয়ের সর্বনাশের ভাগীদার হয়েছেন—তাঁরই নাম-লেখা ফ্ল্যাটে অধঃপতিত হচ্ছেন তাঁর জামাই, এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর নাটকীয়তা আছে যা কোনো লোকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "তা তোমার পক্ষে ভালোই হয়েছে। বিষে বিষক্ষয় একেই বলে। তুমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছো।"

আমাকে আবার প্রতিবাদ করতে হলো। "আমি কিছুই করি নি। কাটা আপনি-আপনি উঠে আমার টেবিলে জমা হয়ে গেল। খোদ আর সি ঘোষ আমার ঘরে ঢুকে বললেন, "এই নিন আপনার চিঠি—আমি এই ফ্ল্যাট রাখতে চাই না।"

"আর চাবি?" চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন গণপতিবাবু।

"চাবিটাও সুলেখা তো সহদেবের কাছে রেখে গিয়েছিল। সহদেব অতশত না-বুঝে সেটা আর সি ঘোষকে দিয়েছিল এবং তিনি সোজা সেটি আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেলেন।"

গণপতিবাবু বললেন, "ভালই হয়েছে। চাবিটা না-পেলে কোনো লাভই হতো না তোমার। কেউ যদি বললো, তোমার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তাহলেই ছাড়া হলো না। সেই সঙ্গে ঘরের দখল ফেরত দেওয় দরকার।"

আমার মনে পড়লো যাবার আগে সুলেখা এই চৌত্রিশ নম্বরের চাবি আমার জিম্মায় রেখে যেতে চেয়েছিল।

গণপতিবাবু বললেন "ওর মধ্যে জড়িয়ে না-পড়ে খুব ভাল করেছ। কেন তা পরে বুঝবে।"

আইনের জটিল মারপ্যাঁচ অভিজ্ঞ গণপতিবাবু বললেন, "বুঝেছি তোমার কেসটা। তুমি নিশ্চয় ভাবছো, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মালপত্রগুলোর কী গতি হবে?"

চোখ বন্ধ করে দু মিনিট ভাবলেন গণপতিবাবু। তারপর চোখ খুলে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই। খোদ ভাড়াটে যদি স্বেচ্ছায় ভাড়া ছেড়ে চলে যায় এবং যাবার সময় কিছু মালপত্তর ভুলে ফেলে রেখে যায় তাহলে আমরা কী করতে পারি? তুমি পুলিসে খবর দিয়ে দাও—ওরা এসে লিস্ট তৈরি করে মাল নিয়ে চলে যাক।"

পুলিস! তার মানেই তো আবার চিন্তা। গণপতিবাবু এবারও উদ্ধার করলেন। বললেন, "আমি যখন আছি তখন তোমার কোনো চিন্ত নেই। সাব-ইনসপেকটর হারানিধি হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার সঙ্গে অনেকদিন জানাশোনা—অতি অমায়িক ভদ্রলোক। আমি চিঠিও লিখে দিতে পারি, ফোনেও কথা হতে পারে।"

পপি বিশোয়াসের সামান্য অনুরোধের কথাটা কায়দা করে গণপতিবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কিন্ত তার আগে মালপত্তর সম্পর্কে মতামতটা জেনে নেওয়া যাক।

গণপতিবাবুকে বললাম, "পুলিসের হাঙ্গামায় না গিয়ে মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে যোগাযোগ করলে কী হয়? মালগুলো যখন ওঁদেরই, তখন ওঁদেরই নিয়ে যেতে বলি।"

"খবরদার নয়", সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন গণপতি সামন্ত। বললেন, "জল

অনেক দূর গড়িয়েছে, জেঠমালানিরা অত সহজ লোক নয়। সেই জন্যেই তো বললাম, তোমাকে খুঁজছি। তেমন দরকার হলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতম আম নিজেই।"

হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে গণপতি-বাবুর কথাগুলো। উনি কী সবজান্তা নাকি? জেঠমালানিদের হাঁড়ির খবরগুলো উনি যোগাড় করলেন কী করে?

গণপতিবাবু বললেন, "সব সময় কী খবর জোগাড় করতে হয়? কুষ্ঠির জোর থাকলে, সময় ভাল চললে দরকারি খবর হাওয়ায় ভেসে চলে আসে।"

গণপতিবাবুর কথাগুলো এখনও আমি বুঝতে পারছি না। গণপতিবাবু আমার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, "হরি উকিলের ছেলে এবং বারওয়েল সায়েবের খাসমুন্সী হলে কী হয়, মনটা এখনও কাঁচা হয়ে আছে তোমার —ঘড়িয়ালদের মারপ্যাঁচ তোমার মাথায় এখনও ঢোকে না।"

গণপতিবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আজ আমার আলিপুরে একটা মামলা ছিল। হাইকোর্ট থেকে কাউনসেল নিয়ে গিয়ে-ছিলাম পঞ্চাশ মোহর ফি দিয়ে। কিন্তু এমনই ব্যাড লাক, অন্য পার্টির উকিল গিরিজা গুহ মশায়ের শাশুড়ী মারা যাওয়ায় কোর্টে এলেন না, কেস অ্যাডজোর্নড্ হয়ে গেল। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল—পুরো ফি গুনে দিয়ে কাউনসেলকে ফিরিয়ে আনতে হলো।"

আমি গণপতিবাবুর মুখের দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। গিরিজা গুহ মশায়ের শাশুড়ী বিয়োগের সঙ্গে আমার ঘটনার কী সম্পর্ক তা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

গণপতিবাবু এবার বললেন, "অগত্যা লায়ন অ্যান্ড সিনহার অফিসে চলে এসে নিজের টেবিলে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভাবছিলাম। এমন সময় জেঠমালানি-একটা লোক, বোধহয় মুনিমজী হবেন, শিখীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আর্জেন্ট পরামর্শের জন্যে অফিসে হাজির হলেন।"

"জেঠমালানিদের অ্যাটর্নি বুঝি লায়ন অ্যান্ড সিনহা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু বললেন, "বিরাট লোক, ওঁদের বিরাট ব্যাপার। খুব বড় বড় লোকদের একখানা গাড়ি, একখানা বাড়ি, একখানা ফোন, একখানা বউ, একখানা অ্যাটর্নিতে কাজ চলে না! জেঠমালানিদের তিন চারজন অ্যাটর্নি আছে—যখন যার কাছে দরকার তার কাছে চলে যায়। আমাদের শিখীন্দ্র-বাবু যে আবার এইসব বাড়িফাড়ি ব্যাপারে একসপার্ট।"

গণপতিবাবু এরপর যা বললেন তা মোটামুটি এইরকম:

জেঠমালানিদের কর্মচারি, নাগেশ্বর প্রসাদজী সবিনয় শিখীন্দ্রবাবুকে জানালেন, তাঁদের এক কর্মচারি রমেশচন্দ্র ঘোষের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই মাথা খারাপ অবস্থায় সে কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেক কাণ্ড করে বসেছে।

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "ওকে এখনই বরখাস্ত করুন, যাতে কোম্পানির ক্ষতি না হয়।"

নাগেশ্বরপ্রসাদজী নিবেদন করলেন, আমাদের মালিক তো শিবের মতো লোক। সরল মনে অনেক জিনিস তিনি কর্মচারি-দের নামেই লিখিয়ে রেখেছেন। যেমন এই থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়া-করা ফ্ল্যাট। কোম্পানির গেস্টটেস্ট এলে এখানে তুলতে হয়। এখন আর সি ঘোষ এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার চিঠি লিখে দিয়ে এসেছেন বাড়ির মালিকের আপিসে।

শিখীন্দ্রবাবু জানতে চাইলেন, মালিকের সঙ্গে কোনো যোগসাজস ছিল কিনা।

নাগেশ্বরজী বললেন, মালিকের সঙ্গে নেই। তবে নয়া এক 'মেনজার' এসেছেন; এই আদমী সিধা আদমী নয় এবং তার সঙ্গে কিছু যোগসাজস থাকতে পারে।

নাগেশ্বরজীর ইচ্ছা আর সি ঘোষের নামে ইনজাংশন দিয়ে তাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার কাজ থেকে বিরত করা।

আলাপ আলোচনায় শিখীন্দ্রবাবু আলোর পথ দেখলেন না। তিনি বললেন, ফ্ল্যাট মিস্টার ঘোষের নামে, তিনি ক্যাশে ভাড়া দিয়ে আসছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাট যদি ছেড়ে দিয়ে থাকেন তাহলে ইনজাংশন দেবার কথা ওঠে কী করে? ইনজাংশন দেওয়া উচিত ছিল ঘটনা ঘটবার আগে।

নাগেশ্বরজী বললেন, সেক্ষেত্রে

মালিকের ইচ্ছে ওই মেনজারের নামে ইনজাংশন দিতে।

সেখানেও গোলমাল। শিখীন্দ্রবাবু বললেন, ফ্ল্যাট ছাড়বেন না আপনারা। বাড়িওয়ালাই জোর করে আপনাদের তুলুক।

নাগেশ্বরজী প্রশ্নের সঙ্গে জানালেন ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেখানে মালিকদের কোনো লোক নেই। চাবিও মালিকের হাতে চলে গিয়েছে, যদিও মালপত্তর কিছু ওই ঘরেই রয়েছে।

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, ওইসব মালপত্তর যে আপনার মালিকের তার কোনো প্রমাণ আছে?

নাগেশ্বরজী জানালেন, মালপত্তর অবশ্যই মালিকের। কিন্তু ওইসব জিনিস কে আর এক নম্বর টাকায় কিনে কোম্পানির খাতায় লিখে রাখে বলুন?

"তার অর্থ আর সি ঘোষ যদি বলেন ওইসব চেয়ার টেবিল খাট বিছানা আমার, তাহলে আপনাদের কিছু করবার নেই?" শিখীন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন।

শিখীন্দ্রবাবু এরপর রাগ করলেন, "আপনাদের সায়েব এতো বুদ্ধিমান লোক, এতো লোককে চরাচ্ছেন তিনি, আর এত বড়ো একটা ফ্ল্যাটের দখল এইভাবে ছেড়ে দিলেন? ওখানে একটা চাকর বা দারোয়ান তো রাখতে পারতেন।"

নাগেশ্বরজী হাত কামড়াতে লাগলেন। বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টার চাকরের খরচ বাঁচাতে গিয়ে এই ভুল হয়ে গিয়েছে।"

গণপতিবাবু বললেন, "এরপর নাগেশ্বরজী শুকনো মুখে বিদায় হলেন—আমি ভাবলাম তোমার ফাঁড়া কাটলো। কিন্তু ওমা! আধঘণ্টা পরেই স্বয়ং জেঠমালানি নিজেই শিখীন্দ্রবাবুর চেম্বারে গোপন পরামর্শের জন্যে প্রবেশ করলেন।"

জেঠমালানি আফসোস করলেন লোক না রেখে তিনি ভুল করেছেন। সেই সঙ্গে জানালেন, ফ্ল্যাটগুলো এমন বিশ্রীভাবে তৈরি যে ভিতরে কোনো থার্ড পার্সন রাখলে প্রাইভেসী থাকে না। লেডি গেস্টরা অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়ে যান—বাধ্য হয়ে জেঠমালানিজীকে পার্ট-টাইম শুখা চাকরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

"শুখা ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন বোধগম্য নয়। গণপতিবাবু বললেন, "শুকনো! শুকনো চাকর-বাকর মানে স্রেফ মাইনে পাবে, বাড়িতে তোমার খাবার-দাবারের বালাই থাকবে না। কলকাতার সায়েবরা ওইরকম চাকর-বাকর পছন্দ করেন। ওঁরা টেবিলে-চেয়ারে বসে চপ কাটলেট চিবোবেন, আর বাড়ির ঝি-চাকর শুকনো পেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে।"

গণপতিবাবুর কাছেই শুনলাম, জেঠমালানিজীর সঙ্গে শিখীন্দ্র সিংহের বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। জেঠমালানি বললেন, "ওই ফ্ল্যাটটি আমার পক্ষে এখনই ছাড়া খুব ক্ষতিকর হবে। আমার বিজনেসের জন্যে ভদ্রপল্লীতে একখানা গেস্ট হাউস খুব দরকার। যে-করেই হোক একটা পথ বার করতে হবে।"

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "গোড়াতেই যে গলদ হয়ে বসে আছে। আর সি ঘোষ চিঠি লিখুক কিছু এসে যায় না—কিন্তু ফ্ল্যাটের দখলই যে বেহাত হয়ে বসে আছে।"

জেঠমালানি যাবার আগে বললেন "তাহলে বলছেন, যে করেই হোক ফ্ল্যাটের মধ্যে তাড়াতাড়ি কাউকে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলেই ব্যাপারটা আমার দিকে ঘুরে যাবে।"

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "ফ্ল্যাট আপনার দখলে থাকলে অবশ্যই আপনি অনেক জোর পাবেন।"

"আমাকে আপনি স্যার, চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিন।" এই বলে জেঠমালানি ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

গণপতিবাবু এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "লোকটার শেষ কথাগুলো আমার মোটেই ভাল লাগলো না, শংকর।"

গণপতিবাবুর মন্তব্য শুনবার আগেই আমার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

[ক্রমশ]

সবার সেরা ...

উষা টেবিল পাখা একেবারে আধুনিক ডিজাইনে তৈরী, পার্টগুলি সুবিন্যস্ত, ব্লেডগুলির গঠন নিখুঁত, মিনাকারীর মত অপূর্ব এর বোতামগুলি, রঙের প্রলেপ প্রান্তভাগ পর্যন্ত একেবারে সমান করে লাগানো। উষা টেবিল পাখাগুলি দেখতে বড়ই মনোরম, যে কোনও সুসজ্জিত ঘরের শোভা বাড়িয়ে তোলে, আর পাওয়া যায় নানা চোখ-জুড়ানো রঙে। আপনার কাছে পৌঁছুবার আগে এই পাখাকে কঠোর কোয়ালিটি কণ্ট্রোল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। সত্যি উষা পাখা সবচেয়ে আধুনিক গড়নের—সৌন্দর্যে, কার্যক্ষমতায়, রঙের বাহারে, সব দিক থেকে।

টেবিল পাখা

JEW-351B

বিমান ভ্রমণের ভূমিকার পরে

'স্মৃতি সততই সুখের'

প্রতিভা বসু

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সকাল আটটায়, বেলা এগারোটায় প্লেন দমদম বিমান-বন্দরের মাটি ছাড়লো।

আই এ সি প্লেন। ছোটো, কিন্তু বন্দোবস্ত ভারি সুন্দর। দেখতে দেখতে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেল। ওঠার সময় কোটি কোটি অর্বুদ অর্বুদ ভ্রমরের গুঞ্জন, তাদের সমবেত ঐক্যতান বাদনে অস্থির করে তুললো শ্রবণ, কানের পর্দা থরহরি কম্পমান।

পরিজনকে ছেড়ে আসার দরুন মনটা স্বভাবতই কাতর ছিলো, কখন আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

ঊর্ধ্বে উঠে আকাশের ঔজ্জ্বল্য দেখে মুগ্ধ হলাম। রৌদ্রের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অপার্থিব সুখ অনুভব করলাম। নিচে পড়ে রইলো বিশ্বচরাচর, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল মাঠ ঘাট নদী নালা খাল বিল সব একাকার।

যন্ত্রআন্ত্রি চলছিলো খুব। বারে বারে ট্রে ভর্তি মুখরোচক খাদ্য নিয়ে এয়ারহস্টেসটি সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙালী মেয়ে, অল্প বয়েস, দেখতে সুশ্রী, হাসিটি মিষ্টি।

তারই মধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। লাঞ্চ সাঙ্গ করে এক কাপ কফি নিয়ে জানালা দিয়ে আকাশে তাকিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা হিম হয়ে এলো। আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম প্লেনটা নিচে পড়ে যাচ্ছে। কলের পাখায় আকাশে ওড়া এই আমার প্রথম। সভয়ে সকলের দিকে তাকালাম, দেখলাম কারো মুখেই কোনো বিকার নেই। আমার সঙ্গীটিরও নয়। নিশ্চিন্ত মনে বই পড়ছেন।

সবাইকে এতো শান্ত দেখে ভেবে পেলাম না কী করবো। ভেবে না পাবার মতো কারণ অবিশ্যি মুহুর্মুহু ঘটছিলো। প্লেনটা নিচে পড়ে যেতে যেতে আবার ফস করে উঠে গেল উঁচুতে, আবার পড়ে যেতে থাকলো। আবার উঠলো, তারপর আবার, আবার। কে একজন বললো, 'বড্ড ব্‌ম্প করছে।' এর নাম বাম্প করা! অন্যজন বললো 'নামছে।' নামছে! খানিক পরেই চোখের সামনে আলোর অক্ষরে লেখা ফুটলো, ফাসন ইয়োর বেল্ট।'

চকিত স্বরে বললাম, 'বেল্ট বাঁধতে বলছে কেন? কী হলো?'

বুদ্ধদেব সামনে তাকিয়ে বললেন, 'সে কী? এসে গেলাম?' বই বন্ধ করলেন।

এসে গেলাম? এসে গেলাম কী? এই তো রওনা হলাম কলকাতা থেকে। বিদেশ যাত্রার প্রথম বন্দর আমাদের ব্রহ্মদেশ। সে দেশ কি তবে কলকাতা থেকে এতো কাছে? কই, আমি তো জানতাম না! সে তো জানি সাত দিনের পথ। উড়ো জাহাজে উঠেও আমি জলের জাহাজের সময়ই মাপছিলাম।

মনটা অনেক পিছনে চলে গেল। ইংরেজ আমলে আমাদের দু এক ঘর আত্মীয় বাস করতেন সেখানে। দু তিন বছর পর-পর জল পথে সাতদিন কাটিয়ে দেশে ফিরতেন তারা, প্রভূত জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন, আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতাম। রব উঠে যেতো 'রেংগুন থেকে অমুক এসেছে।' রেংগুন থেকে আসা প্রায় বিলেত থেকে আসার মতই।

একজন অমুকের নাম ছিলো পল্টু ঘোষ, আমার পিসেমশায়ের ভাই। তাঁর সম্বন্ধে একটি ভারি মজার গল্প শুনতাম তখন। তিনি নাকি আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে একদিন নিজের চেহারার দৈন্য দেখে রাগে উত্তেজনায় চিৎকার উঠে বলেছিলেন, 'মা, শালির জন্যই আমার এই দশা।' অবশ্য গল্প গল্পই, আদতে আমি তাঁকে কখনো অত খারাপ দেখতে বলে ভাবতাম না। আমার বালিকা বয়সে যেবার তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তিনি বয়স্ক। যেমন মিষ্টি কথা তেমনি মধুর ব্যবহার। এবং তা মৌখিক নয়, আন্তরিক। রেঙ্গুনে অ্যাডভোকেট ছিলেন দু হাতকে দশ হাত বানিয়েও অর্থ বিত্তের থই পাননি। পিসেমশায় ছিলেন ইস্কুল মাস্টার, সন্তান সংখ্যা দশ থেকে চোদ্দোর মধ্যে বলাই বাহুল্য ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোতো না। এই ভদ্রলোক এলে বাড়িতে একেবারে বিলাসিতার বন্যা বয়ে যেতো। শুধু বাড়িতেও কুলোতো না, প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মাসিক ভাড়ায় বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে পিনিস ভাড়া করে রাখতেন। পিসিমাকে কুটোটি নাড়তে দিতেন না। বলতেন, 'যে দু মাস আমি আছি, সে দু মাস তুমি শুধু খাবে বেড়াবে বিশ্রাম করবে।'

দেওরের আদরে বারো মাস রান্নাঘরের তাপে পোড়া পিসিমার মলিন হয়ে যাওয়া ফর্সা রং ছাইচাপা আগুনের মতো ফুটে বেরুতো, মুখে আর হাসি ধরতো না। আমার অতি শান্ত স্নেহশীল পিসেমশায়ও মৃদু মৃদু হাসতেন, সস্নেহে তাকাতেন ভাইয়ের দিকে। তখনকার দিনের সংসারে পিতার মৃত্যুর পরে সবচেয়ে বড়ো ভাইয়েরা তো অসহায় মা আর ছোটো ভাইবোনদের সর্বদাই স্নেহে যত্নে পালন করতেন, কিন্তু এমন প্রতিদান আর কে কবে দিয়েছে তাঁর ভাই পুটুর মতো!

পুটুর বেশী মনোযোগ তাঁর বৌঠানের দিকেই। তিনি বলতেন, 'দাদা তো দানাপানি যোগাড়ের জন্য সর্বদাই বাইরে, ঘরে আমরা বৌঠানের আদরেই মানুষ। কতো বিরক্ত করেছি, রাগ করেছি, মতলব করে জ্বালিয়েছি, বৌঠানের মুখে কোনোদিন এতোটুকু অসন্তোষ দেখিনি। বৌঠান আমাদের জন্য কোনোদিন একটা ভালো জিনিস মুখে দিতে পারেননি, ভালো কাপড় পরতে পারেননি, একটু বসে গল্প করারও সময় ছিলো না। আমরা তো কম ভাইবোন
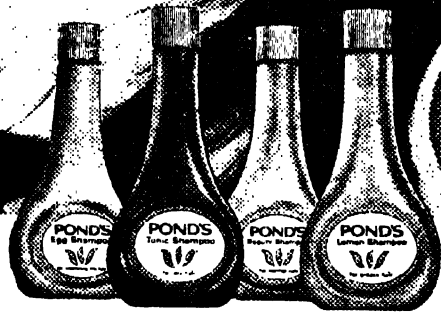
ছিলাম না. সকলের প্রতিই সমান যত্ন, সমান মমতা। অবশ্যি আমি ছোটো ব'লে আমার উপরই বেশী টান ছিলো। না বোঠান?' বলতে বলতে বোঠানের দিকে তাকিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

আর তাঁর স্ত্রী, আমি যাঁকে ছোটো পিসিমা বলতে শিখেছিলাম. সেই ছোটো পিসিমাকেও দেখেছি, বড়োজায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর করছেন, ঢাকার পিকচার হাউসে সিনেমা দেখতে যাবার জন্য জোর জবরদস্তি করছেন, নয়তো সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে এনে পরাচ্ছেন। পিসেমশায়ের জীর্ণ পোশাকও একেবারে ধোপদুরস্ত। ছেলেমেয়েরা নতুন জামা কাপড় ফিটফাট। যেন মন্ত্রবলে বদলে যেতো সব। আমার পিসতুতো দাদা, নাকি টেনে পড়তো তখন তার একটু বেলায় ওঠার অভ্যেস ছিলো, সকালবেলা উঠে পিসেমশায় ডাকতেন, 'পচু বাবা পচু, তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছ? তোমার কাকু যে তোমাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন। ওঠো বাবা, একদিন তো চিরদিনের মতোই ঘুমুতে হবে, যতোক্ষণ পারো একটু বেশীক্ষণ জেগে থাকো মানিক—'

পিসিমা ভুরু কুঁচকে বলতেন, 'ছন্নী, এমন ক'রে নাকি কেউ বলে নিজের ছেলেকে?' পিসেমশায় রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন চায়ের জন্য, হাসতে হাসতে বলতেন, 'রাগ করো কেন? কথাটা কি মিথ্যা বলেছি?'

আমার মা আর দিদা অর্থাৎ ঠাকুমা দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসে কেবল ওঁদের আলোচনাই করতেন। বলতেন, 'রেঙ্গুনে টাকার খনি আছে, যে যায় সেই রাজা।'

অন্য একজন পিসেমশয়ের চাকরি ছিলো না, বি এ পাশ ক'রে, বিয়ে ক'রে কোনোরকমেই কিছু যোগাড় ক'রে উঠতে পারছিলেন না। সবাই বললো, আরে রেঙ্গুনে যাও, রেঙ্গুনে যাও বড়োলোক হয়ে আসবে।

ঢাকা থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া তো বড়ো চাট্টিখানি কথা নয়? ভেসে পড়ার পাথেয় সংগ্রহ করা দস্তুরমতো কষ্টকর। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হলো না, হতাশ হবে সকালের কাছে ধারদেনা করে সেই পিসেমশায় ওই সুদূরেই পাড়ি দিলেন। এবং সত্যি সত্যি এক বছর বাদে তিনিও বেশ ধনী ব্যক্তির মতো হালে চালে ফিরে এলেন। আমার জন্য বর্মী সিলকের খুব সুন্দর একখানা শাড়ি এনেছিলেন, অন্যদের জন্যেও জুতো ছাতা লুঙ্গি—আরো কতো কী।

বর্মা আমার আবাল্যের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের দেশে টুনি পাখির মতো এমন ফড়ুৎ করে এসে গেলাম! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

আমরা দুজনে দূরে দেশের যাত্রী, এই আমাদের শুরু। দু রাত এখানে কাটিয়ে হংকং যাবো, তারপর জাপান যাবো। জাপান থেকে মার্কিন মুলুকে। তবে কি সব স্বপ্নের দেশগুলোই এমন অনায়াসে ধরা দেবে আমার কাছে?

দেশে যাবার স্মৃতিও আমার কাছে জলযান। জলযানের সময়টাই মনের মধ্যে শক্ত হয়ে এঁটে আছে। আমার বিয়ের আগে একজন আমাকে জাহাজ থেকে একটা চিঠি লিখেছিলো, আমি তার চোখের জল ছুঁতে পেরেছিলাম। গ্লাসগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছিল সে, আমি তাকে কলকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে বম্বেগামী জাহাজে তুলে দিয়েছিলাম। বম্বে থেকে জাহাজে উঠে এক মাস ধ'রে সে ভেসেছিলো, এক মাস ধ'রে সে প্রত্যেক বন্দর থেকে চিঠি লিখেছিলো, এক মাস ধরে তার চোখের নোনা জল আর সমুদ্রের নোনা জল একাকার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এ যে ভোজবাজি। মন যে একটু তৈরী হবারও সময় দেয় না। চলচ্চিত্রের ছবির মতো পলকে পলকে দৃশ্য বদল।

আমাকে হকচকিয়ে বন্‌বন্ করতে করতে নেমে এলো প্লেন, শব্দ ক'রে মাটি ছুঁলো, ঝড়ের বেগে চক্কর মেরে থামলো এসে নির্দিষ্ট জায়গায়। আস্তে আস্তে ডিম্বাকৃতি পেটের ভিতর থেকে নামতে লাগলো যাত্রীরা। আমরাও নামলাম। মাসটা জানুয়ারী, কিন্তু নেমেই ঘেমে

উঠলাম গরমে। বার্মা এমন গরম দেশ নাকি?

রেঙ্গুনে বিমানবন্দরটির চেহারা দমদম বিমান বন্দরের চাইতে সম্পূর্ণই আলাদা। বাংলা দেশের স্থাপত্যের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সব বাড়ির ছাদই খোলা ছাতার মতো। সব ছাদই নানা রংয়ে রঙিন। বাড়ি-গুলো সব নিচু নিচু। এয়ারপোর্টটি দোতলা।

সেদিন আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিলো, নীলে নীল। উজ্জ্বল রোদে ঝক ঝক করছিলো চারদিক। জায়গাটা এতো পরিচ্ছন্ন যে মনে হচ্ছিলো সিঁদুর পড়লে সিঁদুর তুলে নেয়া যায়।

ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশ সিংহল সবই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিলো। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কারও স্বাধীন রাষ্ট্র। এখন বার্মায় আমরা বিদেশী। ব্রহ্ম-সরকার বিদেশীদের প্রতি খুব কড়া নজর রাখছিলেন। বিশেষত বাঙালী বংশোদ্ভূত সন্তানদের। অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখ-তেন তাদের। আর সেই সন্দেহ অমূলকও ছিলো না।

কাস্টমস-এ এসে খুব হয়রান হতে হলো। দেখবার জন্যে প্রত্যেকটা জিনিস তছনছ করছিলো। নিষিদ্ধ বেড়িংয়ের ওপিঠে বন্ধু পূর্ণেন্দু বসু এবং তাঁর স্ত্রী মায়া এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে যে কদিন থাকবো, তাঁদেরই অতিথি আমরা।

ভদ্রলোক এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বেশ বিশিষ্ট বাসিন্দাও বটে। বর-সায়ী মহলে তাঁর নাম মান সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের বেশী। আমাদের বাতিব্যস্ত হতে দেখে কী ভাবে ঢুকে পড়লেন সেখানে। সবত্রই ফাঁকির বন্দোবস্ত আছে, সম্ভবত সেই ফোকরেই মাথা গলিয়েছিলেন।

তিনি এসে কী ইশারা ইঙ্গিত করতেই হাসুহানা বাকস প্যাটরা বন্ধ হয়ে গেল সব। আসল স্যুটকেসটা খুললোই না।

'চলুন চলুন কী কাণ্ড! কতোক্ষণ ধরে জ্বলাচ্ছে।' বলতে বলতে আমাদের বার করে নিয়ে এলেন।

রাস্তায় এসে চারদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। একেবারে ছবির শহর, রঙিন ছবি। আমি চীন দেখিনি, কিন্তু ধারণা আছে। ধারণার উৎস অবশ্য ইতি-হাস নয়, চীনে রেস্তোরাঁ। তাদের আলো, তাদের রঙের ব্যবহার সাজাবার ঢং, তাদের আপ্যায়ন পরিবেশন, চেরা চোখ হাসির মাহাত্ম্য কিছুই অচেনা নয়। শুধু এখানে বাড়ির মাথার উপর থরে থরে রঙিন গোল ছাঁদের চালগুলোই কলকাতায় নেই। নইলে বার্মার সঙ্গে তাদের মিল খুব স্পষ্ট।

প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিদেশে থাকা কালীনও দেখেছি কোনো চীনা বা জাপানীর বাড়িতে গেলে, সেই সৌরভ বেশ বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। শুধু ভারতীয়রাই একান্ত ভাবে ইংরেজদের বশংবদ। পোশাক পরিচ্ছদ জীবনযাপন পাশ্চাত্য সব তাদের অনু-করণে তৈরী। অনুকরণীয় জাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা অধ্যবসায় পরিশ্রম স্বদেশ আত্মনাত্মীনতা এ সবের সঙ্গে সংস্রব না রেখে অন্য সব গ্রহণের স্পৃহা দীনতারই নামান্তর।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, দরজা খুলে ধরে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'মিস্টার বোস তো এর আগেও এসেছেন, মিসেস বোসের বোধ হয় এই প্রথম?'

হেসে বললাম, 'মনে মনে অনেকবার এসেছি, অনেক রাস্তার নাম জানি ধাম জানি, চেহারা জানি কিন্তু সশরীরে এই প্রথম।'

পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, তিনিও মিসেস বোস, ভালোমানুষ এবং সরলতার প্রতি-মূর্তি, আমার হাত ধরে বললেন, 'সুন্দর না?'

আমি অকৃত্রিম ভাবে বললাম, 'খুব।'

পূর্ণেন্দুবাবুদের মতো এ রকম অতিথিপরায়ণ মানুষ অবিরল নয়। বাড়ি আসতে আসতে এখানকার অবস্থান মাত্র একদিনের জেনে দুজনই ভীষণ আপত্তি করতে লাগলেন।

বললাম, 'একদিন কোথায়? দু রাত তো। আমরা তো পরশু সকালে যাবো।'

'তার মানেই একদিন। আজকে তো বেলা প্রায় গত।'

এ-রাস্তা সে-রাস্তা বেয়ে বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। আমার যদ্দুর মনে পড়ে বসার ঘর একতলায়। তার পাশ দিয়েই দোতলার কাঠের সিঁড়ি। দোতলায়

থাম চার-পাঁচ ঘরের মধ্যে আমাদের জন্যে যে ঘরটি নির্দিষ্ট ছিলো, সে ঘরে এসে ঢুকলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'একটু হাত পা ছড়িয়ে বসুন, চা নিয়ে আসছি।'

চায়ের টেবিলে বললেন, 'বেরুবেন নাকি?'

'কোথায়?'

'চলুন শহরটা ঘুরিয়ে আনি। এখানকার বাঁশের জিনিস তো বিখ্যাত যদি কিছু কেনেন তাও হ'তে পারে। অবশ্য ক্লান্ত থাকলে—'

এইমাত্র এই প্রথম ছেলেমেয়েদের ছেড়ে এসেছি, তক্ষুনি তাদের জন্যে কিছু কিনে নিদর্শন পাঠাতে মন ব্যস্ত হয়ে উঠলো বললাম, 'ক্লান্ত একেবারেই নই। এই তো কলকাতা ছিলুম, এই তো এখানে এসে চা খাচ্ছি। শহর তো দেখতেই হবে। সেই সঙ্গে দোকানপাটগুলোও দেখা হয়ে গেলে মন্দ কী? তবে, যদি কিছু কিনি ছেলেমেয়েদের জন্যই কিনবো, কিন্তু পাঠাবো কী করে?'

মায়া বললেন, 'আমি কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতা যাচ্ছি, আপনি আমার কাছে রেখে গেলে আমিই নিয়ে যেতে পারি।'

সমস্যা তাতেও মিটলো না। আমাদের কাছে ডলার ছাড়া তো আর কোনো মুদ্রাই নেই।

এই সমস্যারও সমাধান করলেন মায়া। বললেন, 'যা লাগে আমি না হয় দিয়ে দেব, অত ভাবছেন কেন?'

'তা অবশ্য ঠিক, কলকাতা গেলে ওরাই আপনাকে টাকাটা ফেরত দিতে পারবে।'

'চলুন তা হলে।'

'চলুন।'

এতোক্ষণ বুদ্ধদেব চুপ করে ছিলেন। এবার শঙ্কিত ভাবে বললেন, 'না না, রাণুকে আপনি দয়া করে কোনো দোকানে-টোকানে নিয়ে যাবেন না, তবেই হয়েছে।'

বস্তুবাদী বলে আমার দুর্নাম আছে। আমিও তা অস্বীকার করি না। সুযোগ সুবিধে মতো কিনতে দিতে রাখতে জমাতে আমি খুব ভালোবাসি। আমার সংসারে আমার এই স্বভাব বেশ কাজে লাগে। আমার উপর নির্ভরশীল পরিজনেরা তাতে সুখে থাকে, সচ্ছন্দে থাকে, খরচ এবং উদ্বেগ দুটোরই যথেষ্ট সাশ্রয় হয়। বুদ্ধদেবও সেটা সহাস্যে স্বীকার করেন, কিন্তু সংগ্রহের পরিশ্রমে নারাজ। দোকান বাজারের নাম শুনলেই তাঁর গায়ে জ্বর আসে। অবশ্য এটা সংগ্রহ নয়, শখ। এই মুহূর্তে সন্তানদের জন্য কোনো উপহার না পাঠালে বিশ্বভুবন ধ্বংস হয়ে যাবে না। তা ছাড়া কিনবোই যে এমনও কোনো প্রতিজ্ঞা ছিলো না। আমি তাঁর আতংক দেখে হাসছিলাম, মায়া কৌতুক বোধ করছিলেন, মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা উদারচেতা হয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন আপনাদের সঙ্গে দোকান-বাজারেই যাই। ছাতা জুতো যা কিনতে চায় রাণু কিনুক।'

পূর্ণেন্দুবাবু বাঁচালেন। বললেন, 'আরে না না, এখন বেরুবে কোথায়? সাড়ে সাতটার মধ্যে আমাদের নিয়ে ওখানে পৌঁছতে হবে। এখন বেরুলে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

পূর্ণেন্দুবাবু আমাদের জন্য একটি বিখ্যাত বর্মী রেস্তোরায় মস্ত বড়ো এক নৈশভোজের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। বার্মা শহরের অনেক রথী মহারথীরা সেখানে নিমন্ত্রিত। সবাই-ই বণিক, সকলের ঘরেই অচলা লক্ষ্মী। এবং সবাই-ই ঐ দেশের। মাত্র একজন বাঙালী মহিলা ছিলেন, আর একজন পর্তুগীজ মেয়ে। তার বাড়ি হংকং। বার্মার পরেই আমরা হংকং যাচ্ছি শুনে মহা খুশি। আমার পাশে এসে বসে, আমার কোলের উপর হাত রেখে হংকং বিষয়ে সে অনর্গল কথা বলতে লাগলো। আমি অপলক নয়নে একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম, একবার তার হাতের দিকে তাকাতে লাগলাম। একেবারে ক্ষীরের পুতুল।

ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনেক। ঘরে ঢুকে এবার ক্লান্ত লাগলো। রওনা হবার ব্যস্ততায় কদিন থেকে আমার এক ফোঁটা বিশ্রাম ছিলো না। আর সেদিন তো ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয়েছে। মনে হলো ঘুমোতে পারলে বাঁচি। হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে আরাম করে হাত পা ছড়াতেই মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ঘরে পাখা ছিলো না, কী যে গরম তা বলা যায় না। অর্থাৎ মশারী না ফেললে মশা, ফেললে গরম। রাতটা একেবারে হা হুতাশ করেই কাটলো।

সকাল বেলা চায়ের পাট সেরে রান্নার ব্যবস্থা করে মায়া বললেন, 'বুদ্ধদেববাবু আর পূর্ণেন্দু আসুন, চলুন আমরা বেরোই।'

গাড়িতে উঠে বললেন, 'প্রথমে প্যাগোডায় যাই, সেখানে উঠতে নামতে অনেক দোকান পাট আছে, দেখতেও পাবেন কিনতেও পাবেন। বহুশ্রুত প্যাগোডা দেখার আকাঙ্ক্ষায় আমার আর কেনার গরজ রইলো না, গাড়ি এসে পদতলে দাঁড়ানো মাত্রই, খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠে এলাম উঁচুতে, উঁচুতে উঠে মালভূমির মতো সমতল আঙিনায় সুউচ্চ মন্দিরের গাঢ়ভাবে সোনার জল করা চুড়াটি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কাছে কারুকার্য খচিত দরজার বৃহৎ পাল্লাটি অর্ধউন্মুক্ত ছিলো। ভিতর থেকে একটা মদির গন্ধের ঝাপটা এসে মুহূর্তে মনটাকে পবিত্রতায় ভরে দিল। ছবিটা এখন আমার স্মৃতিতে ঝাপসা ঝাপসা, মনে হয় শ্বেত পাথরের প্রশস্ত একটা বারান্দা ছিলো, আমরা সিঁড়ির ধাপে বসেছিলুম। দরজাটি খুলে গেল, একজন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে হাসলেন, আমি ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলাম। ঢং ঢং করে ড্রামের গম্ভীর নিনাদে ভরে গেল পাহাড়,
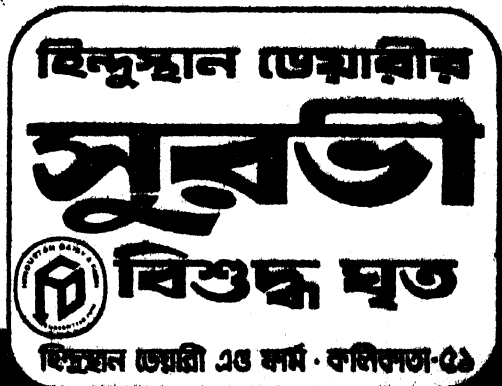
সন্ন্যাসীরা মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। হৃদয়মন ক্ষণেকের জন্য পরম সত্তায় বিলীন হলো।

দুপুরে বাড়ির ভাত খেয়ে বিশ্রাম। রাত্রিতেই আবার আর এক নৈশভোজের ব্যবস্থা। এই পার্টি দিচ্ছেন ওখানকার এক বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি। বাঙালী বিষয়ে তাঁর অসীম কৌতূহল। বাঙালী লেখক বিষয়ে অসীম ভক্তি।

বিশাল এক প্রাসাদের মালিক। বসার ঘরটি তিন ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত হয়েছে নানা আকৃতির কারুকার্যখচিত বর্মী পার্টিশন দিয়ে। কোনো পার্টিশনে জালির কাজ, কোনো পার্টিশন লাক্ষার রংয়ে রঞ্জিত, কোনো পার্টিশনে মিনে করা ছবির বাহার। একটি হাতির দাঁতের পার্টিশনও শোভা পাচ্ছিলো কোণের দিকে।

গৃহকর্তা মখমল জাতীয় গভীর রংয়ের লম্বা পোশাকে রাজার মতো এগিয়ে এসে নিচু হয়ে হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিশাল কক্ষটিতে মন্দ জন-সমাগম ছিলো না। আমরা যেতে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে আবক্ষ আনত হলেন। পুরুষ-দের সকলের মুখেই দাড়ি গোঁফহীন, কারো কারো থুতনিতে পাতলা লম্বা দাড়ি। গায়ের রং হলদে, ঠোঁট আর চোখ একই ধরনের। ফং ফং করে ইংরিজিতে বললেন, 'কম ইন, কম ইন।'

এটা যে 'কাম ইন', বুঝতে সময় গেল আমার। ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর আধিক্য সাংঘাতিক। ছেলেদের গলা খাদে এবং মোটা। মেয়েদের গলা সরু এবং মাজা। প্রত্যেকেই জাতীয় পোশাক পড়েছেন। মেয়েদের বুক থেকে সিল্কের লুঙ্গি নেমে গেছে পায়ের পাতায়, পা দুখানা ছোট্ট; পায়ের কজ করা খড়ম জাতীয় জুতো গুলোই নজরে পড়লো। কালো কুচকুচে চুলে উঁচু করে বাহারে খোঁপা বেঁধেছে, খোঁপায় পাখা গোঁজা। হেসে হেসে সরু গলায় কংকং করে আদর জানালো।

মাথার উপরে সব কাট্‌গ্লাসের আলোর ঝাড়, ঘরের এ কোণে ও কোণে বাগান, বাঁশ ঝোপ, বিশাল ট্যাংকে আশ্চর্য সুন্দর মাছ। ঘরের মধ্যেই নন্দন কানন। তারপরেই ঝলসে উঠলো মদের গ্লাস। ড্রইংরুমের তিনভাগের একটি ভাগ অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বার কাউন্টারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিলিতি মদের ছড়াছড়ি।

আমি এর আগে আর কখনো কোনো বার-কাউন্টার দেখিনি। এতো মদ একসঙ্গে দেখিনি। আমার স্বামীর নামে আমি বিবাহের পূর্ব থেকে জেনে এসেছি তিনি মদ্যপান করেন, কিন্তু কুড়ি বছরের মধ্যে কোনোদিন তাঁকে পান করতে দেখিনি, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। বোতল-গুলো হরেক চেহারা নিয়ে এক একটি মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো। ঘরের অন্য অংশে আরামদায়ক রঙিন আসনে বসে সকলেই সকলের স্বাস্থ্যপানে সংগত হলেন। আমাকেও দেড়শো বছরের পুরোনো কোনো দ্রাক্ষারসের মধুর পানীয় হাতে ধরিয়ে দিয়ে গৃহকর্তা হুঁ হুঁ করে হাসতে লাগলেন।

হাসিই এদের মুখের শোভা। মুখ কখনো ম্লান করে থাকে না।

নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টাধ্বনি হলো। খাবার ডাক। ডাইনিং হলটি কাচে মোড়া। মাঝ-খানে এ-মাথা ও-মাথা শ্বেত পাথরের মস্ত টেবিল, বসবার আসনগুলো বাঁশের তৈরী, টুকটুকে লাল। শ্বেত পাথরের চারপাশে ঐ লাল চেয়ারগুলোকে সাদা দুধ-গরদ শাড়ির চারদিকে নকশি কাটা লাল পাড় বলে ভ্রম হচ্ছিলো।

ধীরে ধীরে নাম দেখে সবাই এসে আসন নিলেন। চামচেসহ চিনে মাটির সুপ প্লেট সাজানো আছে, দুজন পরিচারিকা প্রকাণ্ড এক সোনার মতো পিতলের গামলার দুপাশের দুই কড়া ধরে সুপ নিয়ে এলো, অন্য একজন পরিচারিকা কাঠের হাতা ভর্তি করে করে সেই সুপ পরিবেশন করতে লাগলো। এতে গরম সুপ যে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল টেবিল।

সুপ খাওয়া শেষ হতেই বদলে গেল প্লেট, চামচে, তারপর থেকে যে কী এলো আর এলো না তার হিসেব নেই। মাত্র তেইশ পদ খাইয়েছেন বলে গৃহস্বামী লজ্জায় লাল হয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

মনে হয় ভদ্রলোক বিপত্নীক, অথবা স্ত্রী তখন অন্যত্র কোথাও ছিলেন। কেননা আদর অভ্যর্থনা ভদ্রতা সবই তিনি একা করছিলেন। পাঁচ ছজন মহিলা অবশ্য ছিল, তারা পরিচারিকা। শুধুই কিন্তু পরিচারিক ভাবতে অসুবিধে হচ্ছিলো, সাজে-সজ্জায় ব্যবহারে এতোই নিখুঁত তারা! একজন মোটা হেড পরিচারিকা ছিলো, সে ঘুরে দেখছিলো কাকে কী দেয়া দরকার, অধীনস্থ চারজন ছুটে-ছুটে তার হুকুম পালন করছিলো।

খাওয়া শেষ হলে দেখা গেলো, যতটা খাওয়া হয়েছে, ফেলা গেছে তার দ্বিগুণ। তখন গৃহস্বামীর লজ্জা সামান্য কমলো।

ড্রইংরুমের দুটি অংশ দেখে এসেছি, এবার তৃতীয় অংশে বসে অদ্ভুত এক ছায়াস্নিগ্ধ গাছতলায় বসার সুখ অনুভব করলুম। আলোর কারসাজিতে দেয়ালের ছাবতে এবং বসবার আসনের কারুকলায় এমন এক বিশ্রামের আবহাওয়া তৈরী করে রেখেছে যে গুরুভোজনের পর দেহের শৈথিল্য আলস্য ঢলে পড়ার আরাম পায়।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। পাখা হাতে সোনালি মেয়ে-আঁকা লাল টুকটুকে এক মুঠো হাত উঁচু গোল টেবিলে, যে টেবিল ঘরের প্রায় আট ফুট বাই আট ফুট অংশ জুড়ে আছে তা ভর্তি ফল আর মিষ্টি। 'খাও, খাও, খেতেই হবে। অত লজ্জা করলে চলবে না।' হাতে হাতে ওয়াইনের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। এবার আমার পাশে যে মহিলা বসলেন, শোনা গেল তিনি দু দুবার বিশ্বভ্রমণ করেছেন। আমাদের কাছে ও দুখানা 'রাউণ্ড দা ওয়র্ল্ড' টিকিট আছে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

পার্টি ভাঙতে কিছু রাত হলো। ফেরার পথে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী মায়া বললেন, 'তা হলে কালই যাবেন?'

আমি হাসলাম।

উনি বললেন 'কোনোরকমেই কি আর একটা দিন থেকে যাওয়া যায় না?'

'সব জায়গাতেই যে তারিখ নির্দিষ্ট হয়ে আছে।'

'কিন্তু আপনি তো এ শহরের কিছুই দেখলেন না, কিছুই জানলেন না, এদের নাচ, গান, সাধারণ জীবনযাত্রা—'

তা ঠিক। যে দেশে সোনার খনি আছে, যে দেশ থেকে পন্টু ঘোষ তাঁর দাদা বৌদির প্রতি কৃতজ্ঞতার সমস্ত নিদর্শন নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির আয়নায় যে দেশকে দেখতে দেখতে স্বপ্নলোকে বিরাজ করেছি, সে দেশের সঙ্গে কি দুই রাত্রি ভোজনেই চেনা জানা হয়ে যায়? হয় না, হতে পারে না। তা হলে কি এখানে আসা বৃথাই হলো?

সহসা সব ছাপিয়ে এই দুটি নতুন বন্ধুর জন্য অন্তরে বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করলুম। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিলো; আমার সঙ্গে এই প্রথম।

পূর্ণেন্দুবাবু গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ ফেরালেন 'এটা কিছুই হলো না মিসেস বোস, আর একবার আসতে হবে।' মায়া আবেগের সঙ্গে হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'সত্যি।'

আর পরের দিন সকাল আটটায় যখন এয়ারপোর্ট ছাড়লুম, পূর্ণেন্দু বসু আর মায়া বিষণ্ণ মুখে রুমাল উড়াতে লাগলেন, আমি তো বিধুর হয়ে উঠলাম। মনে মনে বললাম, এই দেশে না এলে আর এঁদের সঙ্গে কেমন করে দেখা হতো? যে ভদ্রলোক কাল কতো আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, তিনিও তো এই দেশেরই প্রতিভূ? সর্বোপরি সেই বৌদ্ধ মন্দির? তার গন্ধ শব্দ মন্ত্র? মুহূর্তের জন্য হলেও যা আমার সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়েছিলো?

তবে আর দুঃখ কিসের? এই তো এতো বছর পরেও, সেকথা আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনি, বার্মার স্মৃতি এখনো হৃদয়ে অম্লান। এমন ছোটো জীবনে এই সংগ্রহই বা কম কী?

পুস্তক পরিচয়

খেলা ঃ ক্রিকেটের কাহিনী

ক্রিকেট অমনিবাস। শংকরীপ্রসাদ বসু। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দু খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দাম একত্রে (১৬·০০+১৬·০০)=৩২·০০।

ক্রিকেট সম্পর্কিত শংকরীপ্রসাদ বসুর যাবতীয় রচনা দু খণ্ডে, লাইনো টাইপে, দুষ্প্রাপ্য বহু ছবি দিয়ে ছাপানো হয়েছে। যারা শংকরীপ্রসাদের লেখার সঙ্গে এককালে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে পুরোনো স্বাদের লেখাগুলো চেখে দেখার লোভ নিশ্চয় বাড়বে। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, শংকরীপ্রসাদ ফিরে এসেছেন ক্রিকেট রচনায়। না, তিনি ফিরে আসেন নি। তবে খাঁটি বৈরাগ্যও যে এসেছে তা মনে হয় না। এলে 'অমনিবাস'-এ নতুন করে চড়ার ইচ্ছেটাই তাঁর হত না। 'নিবেদন' অংশ পড়ে মনে হয়, অন্য কোনো বড় স্বার্থে আত্মত্যাগ করায় ক্রিকেটার্থে তিনি বৈরাগী সেজেছেন। তবে অমনিবাসের ব্যাকুল হাতছানিতে 'ছোট রাজের রাজকুমার, খেলার রাজার রাজা' রনজির সম্পর্কে একটি ছোটখাটো উপভোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ বইও নতুন করে লিখে জুড়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে উপভোগ্যতম অংশ হল 'খেলার রাজা কবির রাজা'। শান্তিনিকেতনে ক্রিকেট খেলা। রবীন্দ্র একাদশ বনাম শাস্ত্রী একাদশ। এই খেলায় রবীন্দ্রনাথ দর্শক, উৎসাহী প্রশ্নকর্তা এবং মন্তব্যকার। অবশ্যই রাবীন্দ্রিক ভাষায়। এই কাল্পনিক 'স্বপ্নদা' খেলাটির বিবরণ পড়ে সুবিবেচক রাবীন্দ্রিকরা নিশ্চয় চটবেন না।

ক্রিকেট অমনিবাসের প্রথম খণ্ডে আছে তিনটি বই। ইডেনে শীতের দুপুরে, রমনীয় ক্রিকেট এবং বল পড়ে ব্যাট নড়ে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে চারটি বই। ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট, নট আউট, সারাদিনের খেলা, লাল বল লারউড। 'ইডেনে শীতের দুপুরে' বইটিতে ক্রিকেটের প্রথম নেশার ছোঁয়া এবং ক্রিকেট লেখকের আবির্ভাবের একটু ছোট গল্প। তারপর ভারতের বিভিন্ন সময়ের ভালো ভালো ক্রিকেটারদের ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য-ব্যর্থতাভরা নানা কীর্তির কাহিনী। পংকজ রায়, সুঁটে ব্যানার্জি, মন্টু ব্যানার্জি, এন চৌধুরী, মুস্তাক আলী, অমরনাথ, বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে, মোদী, উমরিগর, ফাদকর, মানকড়ের খেলোয়াড় জীবনের উদ্দীত সব ছবি। সব শেষে, ইডেন গার্ডেনস-এ ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলার পঞ্চমাঙ্কের নাটক 'নাটকীয়ভাবে' বলা হয়েছে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে নানা ইতিহাস, গালগল্প, গুজব, রসিকতা মিলে এক অনবদ্য উত্তেজক ব্যাপার। 'রমনীয় ক্রিকেট'ও গল্পগুজব রসিকতার ভেতর দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের পুরোনো খেলার ইতিহাস, ম্যাচের উত্তেজনা, দর্শকদের নানা প্রতিক্রিয়া, মেয়েদের ক্রিকেট দেখা—ক্রিকেট মাঠ যাঁরা রমনীয় করে রাখেন, ক্রিকেট-পত্নীদের জীবন, বাঙলায় লেখা ক্রিকেট সাহিত্য, ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট এবং ভারত বনাম পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচের রোমহর্ষক বিবরণ, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত টাই-হওয়া ব্রিসবেন টেস্টের [illegible] দেখে ব্র্যাডম্যান স্বীকার [illegible] টেস্টম্যাচ', পুরোনোকালের [illegible] নানান খেলার বিবরণ এবং শেষে [illegible] লেখা চিঠিতে অন্ধের দুঃখ—এক কথায় সব মিলিয়ে ক্রিকেটের [illegible] চরিত্র [illegible] বিন্যস্ত উপন্যাস। 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে'র মধ্যেও অনেকগুলি ক্রিকেট [illegible] চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। ডবলু [illegible] থেকে ব্র্যাডম্যান পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট, ক্রিকেটের চরিত্র হৃদয়ের গোপন কথা, নানান ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত গল্প। 'নট আউটে' পুরোনো সব বিখ্যাত খেলায় মন-কেমন-করা গল্প। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটার বিষয়ক কবিতা ও কবিতাংশের উদ্দীপ্ত রস। তারপর 'সারাদিনের খেলায়' তারিয়ে তারিয়ে পড়ার মতো মেজাজী গল্প। শেষে শংকরীপ্রসাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'লাল বল লারউড'।

জারউডের জীবনকাহিনী-বস্তি লাইনের শিকারী এবং শিকার যিনি একই দেহে। মূলত এক অসাধারণ খেলোয়াড়ের ট্র্যাজিক জীবনের সংহত নাটকীয় পরিণতির কাহিনী বলেই এই বই পাঠকের একাগ্রতা কেড়ে নিয়েছে। বোধ হয় বিচ্ছিন্ন অসংখ্য কাহিনীর বদলে একটি মঞ্চ উত্তপ্ত জীবনের অজ্ঞাত প্যাভেলিয়নের দিকে প্রস্থান অনেক গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

উপন্যাস

টেক ওভার। প্রিয়রঞ্জন দাস মুনসী। দে'জ পাবলিশিং : কলি-৯ : সাত টাকা।

পটভূমি, কয়লা খান জাতীয়করণের অব্যবহিত আগের ওপারের একটি খনি। উপাদান, কর্তব্যনিষ্ঠ একদল কর্মী ষড়যন্ত্রকারী লোভী বিদায়ী মালিকপক্ষ তাদেরই নিযুক্ত করা একদল পোটোয়া, উৎকোচ লোভী সরকারী কর্মচারী, প্রেম মৃত্যুহত্যা নাশকতা, ব্যাভিচার ত্যাগ নিষ্ঠা। প্রিয়বাবু বেশ শক্ত-হাতে টান টান করে ঘটনার একটি ছিদ্রহীন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন। সংযত, কোথাও অতিকথন নেই, অতিরঞ্জন নেই, সমস্ত চরিত্রের ভারসাম্য ওজনে মাপা। লয় বেশ দ্রুত। সময় সময় থ্রিলারের মেজাজ জমে উঠেছে।

বিয়োগান্ত এই উপন্যাসের নায়ক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত। ভিলেন অনাদি আঢ্য, মালিকপক্ষের সর্বদর্শী লোক। টেক-ওভার অর্থনীতির স্বার্থে, শ্রমিক স্বার্থে, শোষণের অবসানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ভিমরুলের চাকে ঘা। ষড়যন্ত্রের নায়ক অনাদি মালিক পক্ষেরই আত্মীয় অনাদি আর তার দলবল চায় সমস্ত অ্যাসেট আত্মসাৎ ক'রে সরকারের হাতে একটা ছোবড়া তুলে দিতে। তার এই কাজের সঙ্গী সিকিউরিটির উজাগার সিং, অ্যাকাউন্টেন্ট পারচেজ অফিসার, অণ্ডালের স্টেশান মাস্টার শ্রমিক ইউনিয়ানের কালুরাম প্রভৃতি।

অনাদির সাপের মত সাংঘাতিক চরিত্রটি প্রিয়বাবুর হাতে বেশ খুলেছে। পড়তে পড়তে যখনই অনাদি এসেছে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে একটা ভীতির ভাব, এই বুঝি একটা সর্বনাশ ঘটে যায়। নায়ক সুশান্তর নিরাপত্তার জন্যে এক উদ্বেগ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অনাদি খু করতে পারে, ব্ল্যাকমেল করতে পারে, সংস ছারখার করে দিতে পারে।

সুশান্ত, পঙ্কজ। যুলখোর স্টেশ মাস্টারের উদার আদর্শবাদী সন্তান। স বিবাহিতা স্ত্রী সাবিত্রীর জীবনেও ট্র্যাজিডি উপাদান। অনেক ঘাটের জল খেয়ে মানুষ সামাজিক পরিচয়ের তলায় সে মানুষে জঘন্যতম লালসার ক্ষত বহন করে চলেছে সুশান্তর দাম্পত্য জীবনে তারই অপরাং মনের ছায়া দুলছে। সংগ্রামী সুশান্তর নিঃস জীবনের একমাত্র সাথী বাল্যবন্ধু শিক্ষ নবীন। নিরাপত্তায় নবীন, ভাঙা সংস জোড়া লাগাতে নবীন।

টেকওভারের বলি অসং নিরীহ শ্রমিক, লোভী কর্মচারী, ব সুশান্তও। শেষ পর্যন্ত খনি সাবো টে সুশান্ত মারা গেল। সাবিত্রী সব পেয়ে হারালো। সুশান্ত মৃত্যু দিয়ে আগামী দিনে অর্থনীতির স্বপ্ন তৈরি করে দিয়ে গেল একটানে পড়ে শেষ করার মত উপন্যা টেকওভার।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্য

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শুধু তোমার জন্য (পরিবেশক: প মিতা, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) ছ-জন কবি একত্র রচনা সংকলন। সংকলনটি সম্পাদ করেছেন বিভূতিভূষণ মণ্ডল। সম্পাদকস অন্তর্ভুক্ত ছ' জন কবিই যে সুন্দরব অঞ্চলের অধিবাসী, এই বইয়ের ভূমি থেকে সে-কথা জানা গেল।

অবশ্য ভৌগোলিক পরিবেশ এই কবি দের কবিতায় আলাদাভাবে কোনো ছ রেখে যায়নি। নামকরণও কিছুটা বিভ্রান্তি কর। 'শুধু তোমার জন্য'—এই নামে রোমান্টিক অভাস, প্রেমের পরিমণ্ড প্রত্যাশিত, সমস্ত কবিতার সেই সুর বজ থাকেনি। ভিয়েতনামে যে রাত কেটে গে লাওস নামপেনে যে লড়াই চলছে—এ কথ যেমন জানিয়েছেন এক লেখক, তেমনি তে নুন-ঝাল-ডাল-রেশনের হিসেব মেশানো জীবন প্রার্থনা করেছেন একজ কেউ লক্ষ করেছেন যে, 'শান্তির পায়রা উড়ে যায় বিশ্বের সুনীল আকাশে'; কে জানিয়ে দিয়েছেন সরাসরিভাবে—আক আকাশ-ছোঁয়া স্বর্গসুখ: জেনে আত্মস্ব ভাবতে তিনি পরাঙ্মুখ।

প্রেম সবচেয়ে বেশী জায়গা পেয় দুর্গা বর্মণের রচনায়। 'শুধু তোমার জ নামটি তাঁর লেখা থেকেই গৃহীত। এ কবিতায় এক ধরনের অনাড়ম্বর আন্তরিক

পাওয়া গেল। কবিতার বিন্যাসেও তাঁর নিজস্ব রুচির ছাপটি স্পষ্ট। বিভূতিভূষণ মণ্ডল ঠিকানাবিহীন অলীক হরিণকে যে-ভাবে অনুসন্ধান করেছেন 'সখ' কবিতায় তা জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এরই অন্যতর সংস্করণ বলা যায়। হিমাংশু মিস্ত্রী দু-একটি পংক্তি বেশ জোরালো।

ভূমিকায় উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যের বিস্তর চিহ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন। নানান উদ্ধৃতি ও উল্লেখ তাঁর আরম্ভের 'আরম্ভে'। তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"ওই সব কবিতায় যুক্তি-শৃঙ্খলার বদলে প্রধান হয়ে উঠেছে আবেগশৃঙ্খলার আনুগত্য।" উল্টোটাই সত্যি নয় কি?

*

যমজ কন্যার একজন সাঁওতাল পরগণার আদিম পরিবেশে বড় হচ্ছে, অন্যজন কলকাতার ফ্যাশনদুরস্ত কেতায়—এই নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন জহর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির নাম **মেঘের কোলে রোদ** (জ্যোতি প্রকাশন, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা)। গল্পটি ভেবেছিলেন ভালো, কিন্তু রচনায় কোনো কুশলতা দেখাতে পারেননি এই নবীন কথাকার।

*

অভী সেনগুপ্ত **হিমস্বরে পৃথিবীকে** (তাম্রলিপি, কলকাতা ১৩, দু টাকা) নামের কবিতা-পুস্তিকায় এমন কয়েকটি রচনা রয়েছে যা কবিতা সম্পর্কে ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। যেমন, 'এক-এক বিকেলে।' "রাণা যাক অল্প দূরে। প্রায়ই আসে, আমিও যাই। ওর স্বামী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নাতি, সাজানো সংসার...ছেলের বিয়ে দিলো এই শ্রাবণে, আমিই তো সাজালাম অধিবাসের তত্ত্ব—" এই ভাবে যে কোনো কবিতা এগিয়ে যেতে পারে জানা ছিল না। শুধু লাইন ভেঙে দিলেই কি কবিতা? 'উপত্যকার ঘোড়াতে তো লাইন ভাঙারও প্রয়োজন মনে করেননি অভী সেনগুপ্ত, তবু এই রচনার আত্মায় কবিত্বের স্পর্শ সব-ছাপিয়ে ঠিকই অনুভব করা যায়।

আসলে কোথায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা মুক্তি এই কবি এখনো তার হদিশ পাননি। তাই তাঁর রচনায় কবিতা ও গদ্য এখনো এলোমেলো ও অস্থির ভাবে মিশে রয়েছে। ভালো গদ্যও কবিতার সঙ্গে, কিন্তু কবিতা নয়। 'হিমস্বরে পৃথিবীকে', 'প্রতিমস্তরতা শেখো', 'ভিতর ঝালিম থেকে' অথবা 'ফিরে আসো মৎস্যকন্যা' যে-কবিস্বর আভাস তাই কিছুটা তীব্রতর হয়ে ফুটেছে 'সুবাতাস কিংবা পরী হয়ে রাখে ঋণী' নামের কবিতায়। 'নাই', বা 'ছায়া রাখছিলাম' জাতীয় সাধু শব্দ, এই রচনার মেজাজের সঙ্গে [illegible]।

এবারের বিশ্ব টেবল টেনিস

বিশ্ব টেবল টেনিসে চীনের আধিপত্য সর্বজনবিদিত। ১৯৫৯ সালে ডর্টমান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণের পর থেকে চীনা খেলোয়াড়রাই বিশ্ব আসর সরগরম করে রেখেছে। মাঝে অবশ্য দুটি চ্যাম্পিয়নশিপ স্টেকহোম (১৯৬৭) ও মুনিখের (১৯৬৯) বিশ্ব আসরে চীন অংশগ্রহণ করেনি। তবু এবারের বার্মিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত ৮টি বিশ্ব আসরে যোগ দিয়ে ২৪টি খেতাব জিতেছে। চীনের অভ্যুত্থানের আগে টেবল টেনিসের বেশীর ভাগ খেতাব কব্জা করে এশিয়ার আর একটি দেশ জাপান। তাই এশিয়ার প্রাধান্য খর্ব করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলিও ১৯৫২ সাল থেকে কোমর বেঁধে সংগ্রাম করছে। কিছু কিছু খেতাব ছিনিয়েও নিয়েছে। গতবার অর্থাৎ ১৯৭৫এ কলকাতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দেখেছি চীন দলগত প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে সোয়েদলিং কাপ এবং কর্বিলন কাপ পেলেও হাঙ্গেরীর খেলোয়াড় ইস্তাভবন জুনিয়ার হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ডবলসের খেতাব পেয়েছিলেন হাঙ্গেরী জুড়ি জুনিয়ার ও গার্গেলি। মিক্সড ডাবল খেতাব গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ায়। এছাড়া ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়ার ড্রাগুটিন সুরবেক ও অ্যান্টন স্টিপানসিচ সুইডেনের শেল জোহনসন ও স্টেলান বেংগসন, চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলান অরলোয়াস্কি প্রভৃতির অনুপম ক্রীড়া সৌন্দর্য এখনো যেন চোখের উপর ভাসছে। এবার বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা সমানভাবে সংগ্রাম করলেও মোট সাতটি খেতাবের মধ্যে ছয়টি এসেছে এশিয়ায়। শুধু মিক্সড ডাবলসের খেতাবটি পেয়েছে ফ্রান্স। উল্লেখ্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফরাসীর এই প্রথম একটি খেতাব।

বার্মিংহামে ৬১টি দেশ (কলকাতায় যোগ দিয়েছিল ৬২টি দেশ) নিয়ে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মেয়েদের দলগত প্রতিযোগিতার ফাইনালে চীন যথাক্রমে ৫—০ হারায় জাপানকে, ৩—০ হারায় গতবারেরই রানার্স দক্ষিণ কোরিয়াকে। উল্লেখ্য সোয়েদলিং কাপের ফাইনালে চীন ৬১, ৬৩, ৬৫, ৭১ ও ৭৭—মোট পাঁচবার হারাল জাপানকে। কোনবার জাপান এবারের মত সোজাসুজিভাবে হার স্বীকার করেনি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার জাপানেরই ৩০ বছর বয়সী খেলোয়াড় মিৎসুরো কোনো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন চীনের এবং ইউরোপের নামী খেলোয়াড়দের একে একে পরাজিত করে। মিৎসুরো কোনো টেবল টেনিসের অবশ্যই গালভরা নাম। ইন্দ্রপতন ঘটানোর অনেক নজির আছে। কিন্তু কোনবার বিশ্ব খেতাব পাননি।

দু বছর আগে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে বসে অনেককেই কোনোর জন্য আপসোস করতে দেখেছিলাম। সত্যিই অসাধারণ খেলছিলেন চতুর্থ রাউণ্ডে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে। চতুর্থ রাউণ্ডে হারিয়েছিলেন ১৯৭১-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের স্টেলান বেংগসনকে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ড্রাগুটিন সুরবেককে যে সুরবেক স্বকীয় ক্রীড়ামাধুর্যে ১০ দিন ধরে স্টেডিয়ামের টেবিলে সৃষ্টি করেছিলেন ইন্দ্রজাল। কোনোর ওই চোখ জুড়ানো খেলার পর কেউই ভাবতে পারেনি, সেমি ফাইনালে সাদামাটা খেলোয়াড় ইস্তাভন জুনিয়রের কাছে তিনি স্ট্রেট গেমে হেরে যাবেন। আপসোসটা সেই কারণেই। বেংগসন ও সুরবেকের বিরুদ্ধে খেলা দেখে মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোন খেলোয়াড় কোনোর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এখন আন্দাজ করা কষ্টসাধ্য নয় বার্মিংহামে কোনোর হাতে সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মারের চমক ফিরে এসেছিল, সে চমকে পরাজিত হয়েছিলেন সুরবেক ও বেংগসন।

বার্মিংহামে চতুর্থ রাউণ্ডে কোনো হারান ফ্রান্সের এক নম্বর খেলোয়াড় প্যাট্রিক বিরশোকে, যে বিরশো আগের রাউণ্ডে হারিয়েছিলেন আগের বারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন জুনিয়ারকে। কোয়ার্টার ফাইনালে কোনোর কাছে হারেন বেংগসন পাঁচসেটের চাঞ্চল্যকর লড়াইয়ে। খেলার ফল ছিল ২০-২২, ২১-১৮, ২৩-২৫, ২১-১৫ ও ২১-১৯। এই স্কোরই বলে দেবে লড়াইটা ছিল কত তীব্র। সেমি ফাইনালে চীনের নামী খেলোয়াড় লিয়াং কো-লিয়াংয়ের বিরুদ্ধে কোনোর জয় অবশ্য স্ট্রেট গেমে। ফাইনালে চীনের এক নম্বর একুশ বছর বয়সী হুয়ো ইয়াও হুয়ার কাছে প্রথম গেমটি হারার পর পরের তিনটি গেমেও সহজ জয়।

ইয়াও হুয়ার চেয়ে কোনো ৯ বছরের বড়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার প্রশ্নে হুয়াই

ছিল সবচেয়ে ফেভারিট। কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরীর ক্লাম্পারের সঙ্গে যেভাবে লড়েছিল তাতে সবাই ধরে নিয়েছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে কোনো কিছুতেই জিততে পারবেন না। খেলার সময় ৩০ বছরের কোনোর শ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রমাণিত জাপানের সংগ্রাম শক্তি চীনের চেয়ে বেশী।

মেয়েদের ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার সেই 'ডল পুতুল' পাক ইয়ং সুন পর পর দুটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হারাল চীনের এক নম্বর মেয়ে চ্যাং লীকে।

১৯৭২এ উত্তর কোরিয়ার একটি দল প্রথম ভারতে খেলাতে এসেছিল তখন আমরা প্রথম দেখেছিলাম ওই মেয়েটিকে ইডেনের অস্থায়ী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। তখন পাক ইয়ং সুনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। খেলা দেখে আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ডল পুতুল নেচে নেচে খেলে আর চাবুকের মত স্ম্যাশে দর্শক চিত্ত জয় করে নিয়েছিল। তখনই ওকে ভবিষ্যৎ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে কল্পনা করে নিয়েছিলাম। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলতে বেশী দেরী হয়নি।

বার্মিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপে যেমন অপ্রত্যাশিত ফল প্রচুর ঘটে গেছে তেমন প্রচুর খেলাও হয়েছে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে। ডাবলসের সেমি-ফাইনালে চীনা জুড়ি লি চেন-সী ও লিয়াং কো-লিয়াং এবং সুইডেনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুড়ি বেঙ্গসন-জোহানসনের খেলায় পর্যাপ্ত চমক। সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালে লিয়াং কো-লিয়াং এবং সুরবেকের খেলাতেও। স্বল্প স্থানের মধ্যে ফল এবং পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তাই ফাইনালের ফলগুলিই নীচে দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ১৯৭৯ সালে ৩৫তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ংয়ে।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—মিৎসুরে কোনো (জাপান) ১৭-২১, ২১-৯ ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে পরাজিত করে চীনের কুও ইয়াও-হুয়াকে। **মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল**—উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়ং সুন ২১-১৫, ২৪-২২ ও ২২-২০ পয়েণ্টে চীনের চ্যাংলীকে পরাজিত করে। **পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল**—চীনের লি চেন-সী ও লিয়াং কো-লিয়াং স্বদেশীয় হুয়াং লিয়াং ও লু উয়ান সেংকে ২২-২০, ২১-১৮ ও ২১-১১ পয়েণ্টে হারায়। **মিক্সড ডাবলস ফাইনাল**—ফ্রান্সের সেক্রেটিন ও ক্লড বার্গারিটা ২১-১৭, ২১-১৪ ও ২১-১৭ পয়েণ্টে পরাজিত করে জাপানের টোকিও টাসাকো ও স্যাচিকো ওকোটোকে। **মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল**—উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়ং ওক ও চীনের ইয়াং ইঙ্গ ২১-১৮, ২৬-২৪, ১৬-২১ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে দুই চীনা মেয়ে চু ইয়াং-উন ও উই লী-সিয়েকে হারায়।

ভারতের ব্যর্থতা—প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বার্থপার্থক্যের ফলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পুরুষ দল পাঠানো হবে না বলে আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত নীরজ বাজাজ, মানজিৎ দুয়া, কামাত জয়ন্ত ও ভি চন্দ্রশেখরকে বার্মিংহাম পাঠানো হয়। ভারতের মেয়ে দলকে আগেই পাঠানো হয়েছিল গুয়েরনসিতে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখান থেকে মেয়েরা বার্মিংহামে আসে। মেয়ে দলে ছিলেন শৈলজা শালোখে, উষা সুন্দররাজ এবং ইন্দু পুরী। কিন্তু কি কমনওয়েলথ টেবল টেনিস, কি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ কোন প্রতিযোগিতায় ভারত ভাল ফল করতে পারেনি। বার্মিংহামে পুরুষ দল দ্বিতীয় ক্যাটাগরির খেলায় এ গ্রুপে তৃতীয় এবং মেয়ে দল দ্বিতীয় ক্যাটাগরির এ গ্রুপে রানার্স হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় উল্লেখ করার মত কৃতিত্ব নেই।

একলব্য

জ্যাক রাইডার এবং কিছু স্মৃতি

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক এবং নির্বাচক সমিতির সদস্য জ্যাক রাইডার গত ৩ এপ্রিল মেলবোর্ন হাসপাতালে মারা গেছেন। পৃথিবীর টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ দু-একজন খেলোয়াড় এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু জীবিত অধিনায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

মার্চের মাঝামাঝি সময়ে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত শতবার্ষিকী টেস্টে সমাগত ২১৭ জন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে দুই বন্ধু রাইডার এবং ইংলণ্ডের পার্সি ফেণ্ডার (৮৪) ছিলেন বিশেষ সম্মানীয় অতিথি। শতবার্ষিকী টেস্টের দুই দিন পরে রাইডার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন। সেখানেই তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়।

ক্রিকেট বিশ্বের এক বনেদী নাম জ্যাক রাইডার। ভারতীয়দের কাছে স্মৃতি জাগানো নাম। পুরনো দিনের ক্রিকেটের আলোচনায় এখনো রাইডারের নাম উচ্চারিত হয়। বহু ঘটনাবহুল খেলার নজির টানা হয়। কারণ রাইডারের নেতৃত্বে বেসরকারী অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে এসেছিল ১৯৩৫-৩৬ মরসুমে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সংগে ভারতের সেই প্রথম পরিচয়। অবিভক্ত ভারতে অস্ট্রেলীয় দলের

৩৫—৩৬এ ইডেন টেস্টে দুই অধিনায়ক রাইডার ও নাইডু

ছবি রাখাল ভট্টাচার্যের সৌজন্যে

পূর্ণ সফরে মোট খেলা হয়েছিল ২৩টি। তার মধ্যে ছিল ৪ দিনব্যাপী চারটি বেসরকারী টেস্ট। রাইডারের দল জিতেছিল ১১টি খেলায়, হেরেছিল তিনটিতে। কিন্তু টেস্ট সিরিজে জয়ী হতে পারেনি। প্রথম দুটি টেস্ট জেতে রাইডারের দল, পরের দুটি ভারতীয়রা। এবং বলা বাহুল্য, সেই প্রথম ভারতের টেস্ট জয়ের স্বাদ, যদিও বেসরকারী টেস্ট। তার আগে অবশ্য ভারত মাত্র ৪টি টেস্ট খেলেছে ইংলণ্ডের সংগে—একটি ইংলণ্ডে, তিনটি ভারতে।

প্রথম অস্ট্রেলীয় দলের ভারত সফরে আমাদের দেশের ক্রিকেট ক্ষেত্রে যেমন অসাধারণ সাড়া জেগেছিল, তেমন পর্দার অন্তরালে ঘটেছিল কর্মকর্তাদের কোঁদলের কদর্য চিত্র। ঘোঁট পাকাপাকির ফলে চারটি বেসরকারী টেস্টে অধিনায়ক হয়েছিলেন তিনজন। বোম্বাই টেস্টে পাতিয়ালার মহারাজা, কলকাতার টেস্টে সি কে নাইডু, লাহোর ও মাদ্রাজ টেস্টে ওয়াজির আলি। দলাদলি এবং কোঁদলের ফলেই অসাধারণ বোলার অমর সিং কলকাতায় উপস্থিত থেকেও টেস্টে খেলেননি। সে কথা থাক, রাইডার এবং তাঁর দলের কথায় ফিরে আসি।

রাইডারের দলের সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দার সিংয়ের উদ্যোগে এবং কোচ ফ্রাংক টেরাণ্টে[র] মাধ্যমে। ফ্রাংক টেরাণ্টের জন্ম অস্ট্রেলিয়ায় রাইডারের ভিক্টোরিয়া দলেরই খেলোয়া[ড়] ছিলেন। পরে ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করেন তারও পরে ভারতে আসেন কোচ হয়ে পাতিয়ালা ও কোচবিহারের কোচ ছিলেন।

রাইডার যখন ভারতে আসেন তখ[ন] টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। একটি দেরিতে, ৩১ বছর বয়সে তাঁর টেস্[ট] অভিষেক হয়েছিল। ২০টি টেস্টে দু[টি] সেঞ্চুরি এবং একটি ডাবল সেঞ্চুরি স[হ] করেছিলেন ১৩৯৪ রান। গড় ৫১·৬০

সেঞ্চুরি ১৯২১-এ কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৪২, ১৯২৪-২৫-এ অ্যাডিলেডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নট আউট ২০১ এবং ১৯২৮-২৯-এ মেলবোর্নে ১১২।

৩৫-৩৬-এ ভি রিচার্ডসনের নেতৃত্ব অস্ট্রেলিয়া দল যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারী সফরে। আর জ্যাক রাইডার ভারতে নিয়ে আসেন প্রবীণ ও নবীন খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া একটি শক্তিশালী দল। রাইডারের নিজের বয়স তখন ৪৬ বছর। সহ-অধিনায়ক চার্লি ম্যাকার্টনি, যাকে গভর্নর জেনারেল অফ ক্রিকেট বলা হত, ৪৯ বছরের প্রায় বৃদ্ধ। উইকেট কিপার এলিসের বয়স ৪৪। অসাধারণ বাঁ-হাতি স্পিন বোলার আয়রনমংগারের বয়স ৪৮। ফ্রাঙ্ক টেরান্টের ৫৪। অল রাউণ্ডার অক্সেনহ্যামের অবশ্য ৩৭। তাই রাইডারের দলকে অভিহিত করা হয়েছিল "ওল্ড হর্সেস অ্যাণ্ড কোল্টস" নামে। কুইন্সল্যাণ্ডের অল-রাউণ্ডার অক্সেনহ্যাম সফরে পেয়েছিল ১০১টি উইকেট, মাত্র ৮·১৯ গড়ে। ৯·৮০ গড়ে টেস্টে পেয়েছিলেন ১৩টি উইকেট। ওর নাম মাহাত্ম্যে একটি প্রবাদ রটে গিয়েছিল—যেহেতু উনি একাধারে অক্স (ষাঁড়) এবং হ্যাম (শুয়োর) সে-হেতু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যাটসম্যানের কাছেই দুষ্পাচ্য। কেউই ওঁর বল হজম করতে পারেননি। তখন তো ভারতে প্রচুর নামী মুসলিম ক্রিকেটারের সমাবেশ। যেমন ওয়াজির আলী, নাজির আলী, মহম্মদ হোসেন, বাকা জিলানি, আমির ইলাহি, মুস্তাক আলী, আব্দুল আজিজ। উল্লেখ্য, সেলিম দুরানীর পিতা আব্দুল আজিজ ছিলেন কলকাতা টেস্টে ভারতীয় দলের উইকেট কিপার।

জ্যাক রাইডার কত বড় ক্রিকেটার ছিলেন ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্টের কষ্টি-পাথরে অনেক আগেই তা প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯২৪-২৫ সিরিজে অ্যাডিলেড টেস্টে তাঁর নট আউট ২০১ রান ছিল তখন পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটের স্মরণীয় ইনিংসের অন্যতম। প্রয়োজনে প্রলয়ংকর হয়ে উঠতে পারতেন। আবার স্থিতধী হয়ে ব্যাট করার ক্ষেত্রেও তাঁর জুড়ি কম ছিল। কিন্তু কেউ কি ভাবতে পেরেছিল ৪৬ বছর বয়সে ভারতে এসেও ওই রাইডার ব্যাটিং অ্যাভারেজে শীর্ষস্থান পাবেন? টেস্ট এবং টেস্টের বাইরেও সব খেলা মিলিয়ে? বিশেষ করে নিসার, অমর সিং, সুটে ব্যানার্জি, সেবরাজ পুরী, আমির ইলাহি, সি এস নাইডু, বাকা জিলানি প্রভৃতি নামী বোলারদের বিরুদ্ধে?

৪টি সেঞ্চুরিসহ সফরে করেছিলেন ২৭ ইনিংসে ১১২১ রান (গড় ৪৮·৭)। টেস্টের ৭ ইনিংসে একটি সেঞ্চুরিসহ ২৭৩ রান (গড় ৪৯·৫০)। বোম্বাই টেস্টে ১০৪ রান করেছিলেন ২০৫ মিনিটে। অমৃতসহরে দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১১৫ রান মাত্র ১২০ মিনিটে।

সুটে ব্যানার্জি বলছিলেন, শুধু ব্যাটিংয়েই দক্ষতা নয়। চমৎকার চেঞ্জ বোলার ছিলেন। মিডিয়াম পেসের উপর অফকাটার দিতেন। তা ছাড়া আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম ওই বয়সেও তাঁকে স্লিপে ফিল্ড করতে দেখে।

প্রকৃত অর্থে একজন পরিপূর্ণ ক্রিকেটার ছিলেন। ইডেনে প্যাভেলিয়নের সিঁড়ির উপর অটোগ্রাফের জন্য তাঁকে সবাই ঘিরে ধরেছে। তিনি হাসি মুখে সই করে যাচ্ছেন আর চীৎকার করে বলছেন, কাম অন বয়েজ—এই ছবিটি অনেকের আনন্দচিত্র হয়ে আছে। একমুখ হাসি নিয়ে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিও।

মুকুল

জয়িতা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক রবিবার, পরিচালনা : নীতীশ মুখোপাধ্যায়   ফটো : দেশ

রঙ্গজগৎ

ধরুন আপনি একজন বাংলা ছবির পরিচালক। ছবি তৈরির জন্যে যা মালকড়ি লাগবে আপনি—যেহেতু আপনি সব কড়ি না ফেলে কি করে তেল মাখাতে হয় জানেন—তা মোটামুটি জোগাড় করে ফেলেছেন। অর্থাৎ আপনি অন্তত দু-একজন ব্যক্তিকে বেশ ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছেন যে আপনি এমন একটি পবিত্র কর্ম করতে চলেছেন যার পেছনে তাঁরা আর্থিক মদত দিলে লাভবান হবেন। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করতে গেলে বলতে হয়, আপনি বোঝাতে পেরেছেন যে আপনি এমন একটা রগরগে

[illegible]

গল্প সাজপোশাকে গরগরে, কিংবা সেনটিমেনট-এ হড়হড়ে, কিংবা গানে-গানে ঘ্যানঘেনে, কিংবা প্রেমের রসে প্যানপনে করে পর্দায় আনতে পারবেন যে সে ছবির পিঠে নিশ্চিন্তে বাজী ধরা যায়। এ-সবের জন্যে টালিগঞ্জে বিনামূল্যে ফরমুলা পাওয়া যায়, যা আপনি চোখ-কান একটু খোলা রাখলেই পেয়ে যাবেন। ধরা যাক, আপনি সবচেয়ে নিশ্চিন্ত পথে এগোতে চান, অর্থাৎ একটি প্রেমের গল্প নিয়ে ছবি করতে চান। প্রথম প্রশ্ন হল প্রেম মানে কি?

কেননা আপনি নিজে প্রেমের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হলে টালিগঞ্জীয় প্রেমের ছবি আপনি কোনোদিন করতে পারবেন না। এবার বলি, টালিগঞ্জীয় অভিধানে প্রেমের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রূপ বা জাত আছে, যেমন কমিক প্রেম, ট্র্যাজিক প্রেম, ড্রয়িং-রুম প্রেম, বিপ্লবী প্রেম ইত্যাদি। আপনাকে প্রথমেই ঠিক করে ফেলতে হবে আপনি কোন জাতীয় প্রেম নিয়ে ছবি করতে চান। সব্যসাচী যেমন বিপ্লবী প্রেমের ছবি, অজস্র ধন্যবাদ যেমন কমিক প্রেমের ছবি, আবার যেমন বহ্নি-শিখা ট্র্যাজিক প্রেম আর সুচিত্রা-উত্তমের প্রায় যে-কোনো ছবিই যেমন ড্রয়িংরুম-প্রেমের ছবি। ছবি বিশ্বাসের পর ড্রয়িংরুমের জন্যে ড্রেসিং গাউন পরা একজন খানদানি বাবা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নায়িকার বাবা) পাওয়া যাচ্ছে না বলে ড্রয়িংরুম প্রেমের ছবি তোলা আজকাল একটু অসুবিধে।

আপনি যদি একটু 'এক্সপেরিমেন্টাল' পরিচালক হন তাহলে আপনার প্রেমের ছবিতে আপনি বর্ণসংকর ঘটাতে পারেন, অর্থাৎ কমেডি, ট্র্যাজেডি (সিরিও কমিক না কি-যেন একটা বলে আজকাল) বিপ্লব, ড্রয়িংরুম সব কিছু আনতে পারেন, কেননা কোথায় যে ব্যবসা লুকিয়ে আছে তা তো আপনি ছাই নিজেই জানেন না। সুতরাং এক্সপেরিমেন্টাল হওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু একটা দিকে লক্ষ রাখবেন, আপনার প্রেমের

ছবিটি যেন নিতান্তভাবে পবিত্র হয়। এর জন্যেও আপনাকে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করে রাতের সুখনিদ্রা নষ্ট করতে হবে না, যেহেতু পবিত্র প্রেমের রেডিমেড ফরমুলাও টালিগঞ্জে পাওয়া যায়। বাঙালী সুখী পরিবাররা ছবি দেখতে আসেন। অতএব সেকস-এর অসুখ তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন না, এমন কিছু রাখবেন না আপনার ছবিতে যাতে তাঁদের কলকাতার রাস্তায় অতর্কিত গর্তে পড়ার মতো ধাক্কা খেতে হয়। সংসারের ঝামেলা থেকে তাঁরা ছুটে এসেছেন টালিগঞ্জের প্রতিশ্রুত প্রেমের হাইওয়েতে, সুতরাং স্মুথ ড্রাইভিং, প্লিজ! টালিগঞ্জের পবিত্র প্রেমের ফরমুলাটা অনেকটা এই রকম : নায়ক-নায়িকা দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা প্রাথমিক কিছু ঝগড়া রাগের পর প্রেমে পড়ে, অর্থাৎ নায়িকা একটু ছুটে-ছুটে চলে, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে গান শোনে কিংবা ক্রমাগত পর্দা-জুড়ে চন্দ্রমল্লিকা ফুটতে থাকে। কিংবা একরাশ হুস্‌হুড়ে সমুদ্দুর সৈকতে লাফিয়ে পড়ে। এর পর, নায়ক-নায়িকার ভালোবাসা কত গভীর সেটা বোঝাবার জন্যে একটি উপ-নায়কের কিংবা উপ-নায়িকার আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণের বিভ্রান্তির পর নায়ক বা নায়িকা আবার পুরানো জায়গায় ফিরে আসে। প্রেমের পথে বাধা অন্যভাবেও আসতে পারে—যদি নায়িকার একটি ড্রেসিং-গাউন পরা, অহরহ চুরুট বা পাইপ-খাওয়া বাবা থাকে, যার সামনের এবং জুলপির চুল ক্রীম-প্রলেপে একটু পাকা হলে ভালো হয়। বাবাটি ব্যারিস্টার কিংবা বিজনেস টাইকুন হলে তো কথাই নেই। তার একমাত্র কাজ হল একটি পুরো মধ্যবিত্ত ফোরান-এর মতো ব্যবহার করা। এই ধরনের ব্যবার একটি সম্প্রতিক উদাহরণ পাওয়া যাবে অজস্র ধন্যবাদ ছবিতে। অবশ্যই বাস্তবে নারী-পুরুষের সম্পর্কে যা-কিছু থাকে সে সবের কিছুই থাকবে না বাংলা প্রেমের ছবিতে, কেননা সে-সব বস্তু, যাই বলুন, অতীব অশ্লীল। সন্দেহ নেই বাংলা প্রেমের ছবিগুলি অন্তত প্লেটোকে খুশি করতো।

কিন্তু আপনি যদি গোড়াতেই বলে বসেন প্রেমের ছবি আপনি করবেনই না, তা হলে? তা হলে আর কি, এ-জীবনে ছবি করার ইচ্ছে আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। কেন? যেহেতু প্রেম ছাড়া টালিগঞ্জে ছবি-ই হয় না—কোনো না কোনোভাবে প্রেম আসবেই। রোম্যান্টিক প্রেম যদি বাদও দেন, ঈশ্বর প্রেম, মাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম, এদের পাশ কাটিয়ে যাবেন কি করে? আর মাতৃপ্রেম, দেশপ্রেমের ছবিতে রোম্যান্টিক প্রণয় থাকবে না, এমন কথা কে বললো? কিন্তু আপনি যদি এমন একটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে ফেলেন যে যেখানে নায়ক-নায়িকা বলেই কিছু নেই এবং এমন কিছুই ঘটছে না যাকে আমরা কোনোভাবে নাটকীয় বলতে পারি, অর্থাৎ আপনার স্ক্রীপ্ট-এ মামুলি ঘটনার পরিবর্তে আসে ভাবনা, কথা আর অর্থহীন অজস্র কথার বদলে আসে কিছু একেবারে ভিসুয়্যাল, অতল-স্পর্শী মুহূর্ত—তা হলেই সর্বনাশ। ও-পথে পা বাড়াবেন না, এ-কথা বারবার বলে আপনাকে আমরা সাবধান করে দিতে পারি, কিন্তু এ-কথাও জানি যে আপনার প্রতিভা আপনাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আপনি ভাগ্যবান, অর্থাৎ আপনার প্রতিভা একেবারেই টালিগঞ্জের মাপে-মাপে, অর্থাৎ আপনি একটি প্রেমের ছবি শেষ পর্যন্ত তৈরি করতে পারবেন। গত দু-তিন বছরের বাংলা ছবিগুলি আপনি দেখেছেন এবং বুঝে নিয়েছেন যে টালিগঞ্জ গত অনেক বছর একটি-মাত্র ছবিই নানান পরিচালক পরিচালনা করেছেন। এ-ছবির নাম 'বাংলা প্রেমের ছবি।' শুধু আপনার ছবিটি তৈরি করার আগে আপনার কতকগুলি প্রাথমিক কর্তব্য আছে। এক, আপনাকে ভুলে যেতে হবে যে চলচ্চিত্রের জগতে একের পর এক বিস্ফোরণে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আশ্চর্য দুর্লভ রত্ন। এ-সব খবর থেকে, ধারণা থেকে, বীজাণু থেকে যত দূরে থাকবেন ততই আপনার পক্ষে মঙ্গল। দুই, আপনাকে যোগাড় করতে হবে এমন একটি চিত্রনাট্য যেখানে বাণিজ্যিক বারুদ ঠেসে দেবার মতো দেদার ফাঁক থাকবে। ঢুকিয়ে দাও মোটরড্রাইভ করতে করতে নায়ক-নায়িকার ডুয়েট গান, ঢুকিয়ে দাও বাড়ির ঝি-চাকরের প্রণয় দৃশ্য, ঢুকিয়ে দাও মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ভৃত্যদের গানের আসর যেখানে সবাই মান্না দে, মহম্মদ রফির মতো জাতো

মান গায়! তিনি, আপনাকে যোগাড় করতে হবে এমন একজন মেক-আপ ম্যান যে সব সময়ে বিনাভক্তে নায়ক-নায়িকাকে চুনকাম করবে, ফরসা-ফরসা, না হলে প্রেমিক-প্রেমিকা কিসের? চাই, আপনার চাই এমন একজন হেয়ার ড্রেসার যে নারকোল ছোবড়া নিয়ে কাজ করতে আপত্তি করবে না, আর এমন একজন ড্রেস-ডিজাইনার যে উনবিংশ শতকের রাঁধুনীকে ব্রা-পরাতে দ্বিধা করবে না, আর সর্বোপরি আপনার চাই এমন একজন ক্যামেরাম্যান যে শুধু বোঝে 'ম্যারো আলো তোলো ছবির' ব্যাপারটা। মিড-ক্লোজ-এ শুধু আলুভাতের মতো তকতকে, চরিত্রহীন ছবি তুলে যাও—তাকেই তো বলে চরিত্রবান প্রেমের ছবি?

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

এহি হ্যায় জিন্দগী

ছবির শেষে প্রযোজক বি নাগি রেড্ডি শুধু দেবনাগরী ভাষায় গীতার যে মহান উপদেশটি দর্শকের প্রতি বিতরণ করেছেন তার সারার্থ: কর্ম করে যাও, ফলের আশা কোর না। কিন্তু তিনি নিজে যে চলচ্চিত্র-কর্মগুলি করেন তা বেশ ভাল করে অংক কষে ফলাফল হিসেব করেই করেন। এর আগে "জুলি" ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আলোচ্য ছবিতেও তাই। তিনি বেশ ভালই জানেন ভারতীয় দর্শকের গরিষ্ঠ অংশের ধর্মের প্রতি আনুগত্য কতখানি। সুতরাং মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে গীতার বাণী সহ শ্রীকৃষ্ণকে তুলে এনে ইদানীংকালের জনপ্রিয়তম নায়ক সঞ্জীবকুমারের মুখোমুখি যদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তবে তার ফলাফলের পাল্লাটি শ্রীনাগি রেড্ডির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য।

এ-ছবির সঞ্জীবকুমার খেটে খাওয়া মানুষ। সততা এবং পুরুষাকারে বিশ্বাসী। পুজো-আচ্চা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তার কাছে ভণ্ডামীর নামান্তর। পৃথিবীর নানা অন্যায় এবং অসাম্যের জন্য দায়ী করে ভগবানকে। কিন্তু মানুষের কৃত অন্যায় তাকে উত্তেজিত করে না আদৌ। সে যে হোটেলে কাজ করে তার মালিক অন্যায়ভাবে খরিদ্দারের টাকা ঠকিয়ে নিলে প্রতিবাদ করে না। কিন্তু কোন খরিদ্দার যদি মালিকের সঙ্গে তঞ্চকতা করে তখন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

এ-হেন চরিত্রকে দিয়ে ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায় কি? পরিচালক কে এস সেতুমাধবন ছবিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে লড়াইয়ে এনে ফেলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই খেলায় সঞ্জীবকে মাত্র ক'বছরে কোটিপতি করে দিয়েছেন। আর তারপরই তার জ্ঞানচক্ষু

সীমা, সঞ্জীবকুমার/**এহি হ্যায় জিন্দগী**

উন্মিলিত হবার পালা। দরিদ্র সঞ্জীবের অর্থ না থাক একটি সুখের সংসার ছিল। কিন্তু ধনী সঞ্জীবের তা রইল না। এই খেলায় শ্রীকৃষ্ণই শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন। তিনি সঞ্জীবকে উপদেশ দিলেন: অর্থই অনর্থের মূল। অহং বর্জন কর। কর্ম করে যাও সৎপথে, ফলের আশা কোরো না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর সঙ্গে ছবিতে অনেক অতি-নাটকীয় ঘটনা আছে। প্রেম আছে, সেকস আছে, দুশমনি আছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র তিনখানি গান আছে। হিন্দী ছবির পক্ষে এটা একটা সাহসের ব্যাপার বইকি।

ছবিটিকে অন্য দিক থেকে ভাবা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে যদি সঞ্জীবের বিবেক ভেবে নেওয়া যায় তবে এ-ছবিতে খানিকটা বুদ্ধির ব্যাপার আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু ছবিটা অত উচ্চ স্তরে উঠতে পারে নি। কারণ, প্রযোজক দর্শককে মজা দেবার এবং কিছু চমক দেবার কথাটাই ভেবেছেন বেশ করে। সেই চমকের খাতিরেই ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ এসেছে। ইন্দররাজ আনন্দ রচিত চোখা চোখা সংলাপ সেই চমকের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

সঞ্জীব খুবই ভালো অভিনয় করেছেন। ছবির ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। হিন্দী ছবিতে এখন সঞ্জীব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অন্য ভাল অভিনয় সীমা এবং ডেভিডের। উৎপল দত্ত নিজেকে ক্রমশ কমার্শিয়াল হিন্দী ছবির ছাঁচে ঢালাই করে নিচ্ছেন। আশা ছিল, তাঁর মত শক্তিশালী অভিনেতা হিন্দী ছবির জগতে কিছু কন্ট্রিবিউট করবেন। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। রাজেশ রোশনের গানের সুর তেমন আহা-মরি কিছু নয়। কিন্তু আবহ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

—রবি বসু

বিষয়: গান্ধী হত্যা

চমকে দেয়ার মতো ছবি, ভাবিয়ে তোলার মতো ছবি, ধাক্কা দেয়ার মতো ছবি। এক কথায় দুঃসাহসী ছবি বলা যেতে পারে, কেননা বিষয়বস্তুর মধ্যে বারুদ পোরা আছে। এবং এমন অনেক ব্যাপার, ঘটনা, কথাবার্তা আছে যেটাকে ভুল বুঝলে আমাদের রাগ হওয়া ও অস্বাভাবিক হবে না। ছবির ভাষা ইংরেজি। এক ঘণ্টার ছবি। নাম, আট ফাইভ পাস্ট ফাইভ। প্রযোজনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে একটি মূল চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিমল আহুজা। পরিচালনায় কুমার বাসুদেব। ক্যামেরার ব্যাপারটা দেখা-শোনা করেছেন কমল বসু। কিছু কিছু জায়গায় এডিটিং-এর জন্যে ছবিটার টেনশন বেড়েছে। এ জন্যে অমিত বসু অভিনন্দনীয়। কিন্তু এমন যে একটা তীব্র প্রাবন্ধিক ছবি সম্ভব হল তার জন্য বিপুলভাবে দায়ী জুল ভেলানির অসামান্য চিত্রনাট্য। সংলাপ ছাড়া এ চিত্রনাট্যে আর বিশেষ কিছু-ই নেই। এবং সেটাই স্বাভাবিক, যেহেতু চিত্রনাট্যটি গড়ে উঠেছে ললিত শেগল-এর 'হত্যা-এক-আকার কি' নামের একটি নাটককে আশ্রয় করে। জুল ভেলানি তাঁর চিত্রনাট্যে আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি ঘনবদ্ধ ভিস্যুয়াল প্রবন্ধ। এবং সেখানেই তাঁর চূড়ান্ত সফলতা। ছবিটি ভারতবর্ষের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৬৯) শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র হিসেবে গান্ধী পুরস্কার পেয়েছিল।

১৯৪৮-এর ১৩ই জানুয়ারির বিকেল পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়। এ-ছবিতে ইতিহাসের গান্ধীজী কোথাও উপস্থিত নেই। তবু হত্যার পূর্বমুহূর্তে গান্ধীজীর বিচার হয়, বিচার করেন স্বয়ং হত্যাকারী (অভিনয়ে বিমল আহুজা), এবং তিনটি প্রতীকী চরিত্র—অভিনয়ে ইফতেকার আমেদ, ডেভিড, আর জুল ভেলানি। জুল ভেলানির অভিনয় বলা যেতে পারে এক-ধরনের দ্বৈত-ভূমিকায়। তিনি অনুপস্থিত গান্ধীজীর ব্যারিস্টার এবং তাঁকেই আবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় সর্বযুগের মানবাত্মার প্রতীক হয়ে। ভেলানির অভিনয় এক কথায় সংহতিতে অনবদ্য।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

চলো সাগরে/কবচকুণ্ডল

আধুনিক নাট্যচেতনায় প্রথমাবধি যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, সচেতন থিয়েটার কর্মীর দায়িত্ব সক্রিয়—তিনি, বিজন ভট্টাচার্য। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি একান্তভাবেই থিয়েটারের লোক, তাই অনিবার্যভাবেই সংগ্রামী। নবান্ন, গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবীগর্জন, আজ বসন্ত, গর্ভবতী জননী থেকে চলো সাগরে পর্যন্ত যে পরিক্রমণ, সেখানে লক্ষ করলে যুগের সঙ্গে পা ফেলে, ফর্ম-এর অনেক ভাঙচুর পাওয়া যাবে, কিন্তু কনটেন্ট মূলত এক—রূঢ়, কঠিন বাস্তব। পরিবেশ ও মানুষ সর্বদাই দেশজ।

আপোসহীন এই সংগ্রাম। সকলের সহযাত্রী হিসেবে তিনি সর্বতোভাবে এক্সপেরিমেন্টকে স্বাগত জানান; কিন্তু আধুনিক নাটকের আপোস রফাকে তিনি সমর্থন করেন না। প্রচুর হাসির মোড়কে বিপ্লব অথবা রঙবাহার কিছু গান বাজনা দিয়ে সমাজ চেতনার পুলটিস (তাঁর মত সংগীতজ্ঞ থিয়েটার জগতে খুব কম) দিয়ে তাঁর নাটক ভরানো থাকে না। যে বিরাট ক্যানভাসে তিনি জীবনকে আঁকতে চান, সেখানে লোকরঞ্জনী প্রক্রিয়া হয়তো তাঁর বক্তব্যের প্রতিকূল হত। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "আমি যা দেখি না, আমি তা লিখি না।" এই দেখাটি বড় নির্মম। অন্ধকার গহ্বরগুলি বড় স্পষ্ট তাই হয়তো লোকনন্দন নয়; বেদনা বড় তীব্র, তাই বোধ হয় অসহনীয়। সীমিত অভিজ্ঞতায় অনেক কঠিন বাস্তব হয়তো অজানা, তাই আতঙ্কিত চোখে অনেক নাট্যমুহূর্ত শুধুই মেলোড্রামা।

আরতি ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়/পূর্ণতৃষ্ণা/পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন থিয়েটারে কবচকুণ্ডল প্রযোজিত "চলো সাগরে" একটি রাজনৈতিক নাটক। এই ধরনের নাটক বাংলায় লেখা হয়েছে খুব কম। চারটি রাজনৈতিক শিকারের ট্রাজেডি, একটি নাটকে গাঁথা। চারটি ঘটনাই বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন সময়ে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে কতভাবে রাজনৈতিক ট্রাজেডি ঘটে যায় এবং সেই বিয়োগান্ত ঘটনার সাক্ষী এক মাদারি খেলোয়াড় দর্শকদের কাছে ঘটনাগুলি সংযুক্ত করেন।

আগেই বলেছি যে, বিরাট ক্যানভাসে বিজন ভট্টাচার্য জীবনকে ধরবার প্রয়াসী, সেখানে বহু চরিত্রের আনাগোনা (ব্যতিক্রম "আজ বসন্ত")। এই নাটকে চরিত্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। প্রতিটি পর্ব সম্পূর্ণ আলাদা হলেও দ্বৈত ভূমিকার সংখ্যা খুব কম। জীবনের বিশাল মিছিল যেখানে দেখানো উদ্দেশ্য সেখানে বোধ হয় কোন "প্রক্সি" চলে না। মনে পড়ে মরা চাঁদ নাটকে দুটি বিরাট কণ্ঠসাপেক্ষ ভূমিকা বিজন ভট্টাচার্য একাই অভিনয় করেছিলেন! কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্য ছিল একই শিল্পের দুটি রূপ দেখানো। কীর্তনীয়া হিসাবে একজন শুদ্ধ শিল্পের পূজারী, আর একজন লোকলক্ষ্মীর কৃপার জন্য মগ্নচৈতন্য।

'চলো সাগরে' প্রযোজনায় এই বিরাট শিল্পী সমাবেশ অনেক জায়গায় সুনিয়ন্ত্রিত নয়। ব্যাক স্টেজের কাজেও প্রচুর গাফিলতি তাই প্রায়শই ফাঁকা ফাঁকা লাগে, অর্থাৎ ডকুমেনটেশন থেকে যায়, নাটক গড়ে ওঠে না। প্রথম তরঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য, দেবু মিত্র দ্বিতীয় তরঙ্গে অশোক চক্রবর্তী, হারাধন মজুমদার, শেখর সাহা, তৃতীয় তরঙ্গে তীর্থপতি ঘোষ, প্রিয়ব্রত ব্যানার্জি, মিনতি দে, ইরা ভঞ্জ, চতুর্থ তরঙ্গে অসিত মুখার্জি, প্রীতেশ লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া খুব কম লোকই মনে দাগ কাটতে পারেন। প্রস্তুতিও অনেকের সম্পূর্ণ নয়, অনেকের সংলাপ আটকে যায়, অনেকেই আড়ষ্ট। তৃতীয় তরঙ্গে তপন ঘোষ যে কৃত্রিম অভিনয় করেন, তাতে স্বাভাবিকত্ব বিড়ম্বিত হয় এবং ট্রাজেডিও অননুভূত থেকে যায়। বিস্ময়কর অভিনয় সূত্রধার মাদারির ভূমিকায় বিশ্বনাথ ব্যানার্জির ও অত্যন্ত স্বাভাবিক বিশ্বস্ত চরিত্রায়ণ ছেকরার ভূমিকায় অভিজিৎ ঘোষের।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মণ্ডনি হচ্ছে এই প্রযোজনার একটি নতুন এক অনুকরণীয় ভঙ্গিতে আঁকা চারটি ছবিতে চারটি ঘটনা বোঝানো হয়েছে। ঝোলানো ছবির পাশ দিয়ে প্রবেশ. প্রস্থানের পথ, উইংস দিয়ে নয়। সঙ্গীত সম্পাদনায় অনেকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে কিন্তু রেকর্ডিং সর্বাংশে ত্রুটিপূর্ণ—কিছুই বোঝা যায় না। শুধু গলায় পল্লব দাশ মাঝে মাঝে যে গান করেন, সেই গান অনেক বেশি সুখপ্রদ। এই বিরাট মিছিলের প্রতিটি চরিত্র বাস্তবিক হয়ে উঠেছে রূপদক্ষ শক্তি সেনের নৈপুণ্যে।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে মাঝে মাঝে প্রতীক কিছু কম্পোজিশন থাকে ব

কে এক লহমায় ললিতকলার অন্যান্য শাখার সংগে একাত্ম করে দেয় (দেবী অর্জুনের কাশ্মীর নাচের সেই বিরল মুহূর্ত স্মর্তব্য)। এই নাটকেও জন বুলের নাচের সংগে জ্বলন্ত ভারতবর্ষ, শেষ দিকে অসহায়, হৃতাশ্বাস, নিরালম্ব মানুষের ঘূর্ণিপাক, কালিন্দীকে ক্রুশকাঠে বয়ে আনা, সুষম কম্পোজিশনে মাঝে মাঝে স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত সাহায্য করেছে। —দেবাশিস দাশগুপ্ত

সাজাহান

এক-একটি সন্ধ্যা কখনও কখনও অন্যরকম হয়ে ওঠে। গতানুগতিকতামুক্ত। সম-সময় থেকে দূরে ইতিহাস-সিক্ত অনুভূতির কাছে পৌঁছে দেয়। ৯ মারচ কলামন্দিরের কয়েক ঘণ্টায় সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করে কলিকাতা পুরসভা কর্মাধ্যক্ষ সমিতি সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কতখানি কিং লিয়র, "সাজাহান" নাটকে কতখানি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং—সেই কূটতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বিষয় হল কলকাতা পুরসভার অফিসারস্ ক্লাব কতখানি দ্বিজেন্দ্রলালকে রেখে এই নাটক উপস্থাপিত করেছিলেন। বিশেষ করে বিখ্যাত সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-ধারা যখন এই ঐতিহাসিক নাটকটিরও ইতিহাস।

নিশ্চয় কোনও আত্মবিড়ম্বনাকারী দর্শক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদ পুরুষদের অভিনয়ের সংগে কলকাতা পুরসভার অফিসারদের অভিনয়ের তুলনা করবেন না। কটি শৌখিন প্রযোজনার কাছ থেকে যে আশা সম্ভব তা-ই নিয়েই নাটক দেখবেন। বু দর্শকরা এই প্রত্যাশার অতিরিক্ত যে ছু পেয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তাতে সন্দেহ না কারো। আর নাট্যপ্রয়োগের অন্যান্য লি, যা আধুনিক মঞ্চসম্মত হয়েও র আবহ সৃষ্টিকারী, তা অবশ্যই ও শৌখিন চাহিদা ছাপিয়ে উপচে পড়ে। মঞ্চ, আলোকপাত, পোশাকের মহার্ঘতা এই মন্তব্যের সমর্থক। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রজকীয় চাল-চলন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংলাপের উচ্চারণ ইত্যাদি সেই অনুভূতিরই পরিপূরক।

অভিনয়ও মনে দাগ কেটে যায়। অন্তত কয়েক জনের। যেমন পরিচালক নির্মাল্যকুমার মুখারজির অভিনয় সাজাহানের ভূমিকায়। সেই পংগু অথচ অন্তরে উত্তাল, শোকে মুহ্যমান অথচ স্নেহে ক্ষমাসুন্দর সম্রাট। নির্মাল্যকুমার মুখারজির অভিনয়ে এর প্রত্যেকটি দিক পরিস্ফুট। জাহানারার ভূমিকায় ছবি রায়চৌধুরীও অনবদ্য। একই সংগে সমব্যথায় কাতর এবং ব্যক্তিত্বময়ী। ঘাসে মুখ দিয়ে চরতে চরতে একবার মুখ তুলে তাকানোর নাম দার্শনিকতা —এই গভীর উচ্চারণ দিলদারের তথা শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের। দু'দশক আগে তিনি ছিলেন সুজার ভূমিকায়, এখন তাৎপর্যময় দিলদার। ঔরংজীবের জটিলতা চমৎকার ফুটিয়েছেন জিতেন্দ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। মৃত্যুর সম্মুখে নিরাসক্ত দারার অভিনয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য চমৎকার করেছেন। যশোবন্ত সিংহ : সুনীলকুমার সেনগুপ্ত অত্যন্ত সপ্রতিভ, প্রশান্তকুমার দাস এবং আরতি দাসের সুজা ও পিয়ারা আকর্ষণীয়। এছাড়া সু অভিনয় করেছেন অচিন্ত্যকুমার সরকার, গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈরঞ্জনা রায়চৌধুরী, অজয়কুমার লালা, অমিতাভ লালা, তপন সিংহ প্রমুখ।

কয়েকটি নাটকীয় প্রয়োগও মনে ছাপ রাখে। যেমন একাধিক স্থির মুহূর্ত, নেপথ্যে দুবার কোরাণ-পাঠের শব্দ, সাজাহানের উম্মত্ততা বোঝাতে ঝড়-বৃষ্টি-গর্জনের আবহাওয়া প্রভৃতি। মনু দত্ত তাজমহল বা আকাশের দৃশ্যও সুন্দরভাবে রচনা করেন। —রাধানাথ মণ্ডল

রবীন্দ্রসন্ধ্যা

'সুরঝর্না'র 'রবীন্দ্রসন্ধ্যা'য় (রবীন্দ্র-সদন : ২৭ মার্চ) তেমন অভিনবত্ব কিছু ছিল না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চারজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকেই মুখ্যত হাজির করিয়েছিলেন তাঁরা। সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে নিষ্প্রাণ পরিবেশক ছিলেন শেষোক্ত শিল্পী। এই অনুষ্ঠানে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনে মনে হচ্ছিল, যেন পরবর্তী কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মভোলা এক শিল্পী আপন মনে রেওয়াজ করে চলেছেন। 'আমি কান পেতে রই' কিংবা 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি'র মতো ক্ষিপ্র ছন্দের গানেও যে কীভাবে উদাসীন শীতল স্রোত অনুপ্রবিষ্ট হল, অনুমান করা কঠিন। সুমিত্রা সেন-এর কণ্ঠে 'আহা তোমার সংগে প্রাণের খেলা'র প্রত্যাশিত মেজাজ আসেনি। বিশেষত টপ্পার দানা বাদ দিয়ে দেন তিনি। কিন্তু 'বনে যদি ফুটলো কসুম', 'দুঃখ যদি না পাবে তো' এবং 'এই উদাসী হাওয়ার পথে-পথে' গান তিনটি তাঁর কণ্ঠের স্মিত মাধুর্যে চমৎকার শুনিয়েছে। সুচিত্রা মিত্র-র পরিণত পরিবেশন-শৈলীতে আটখানি গানই রসোত্তীর্ণ। তাঁর 'ডাকে বারবার' কানে লেগে থাকে। সুবিনয় রায়-এর অস্থিরতার ভঙ্গি প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত। কিন্তু কণ্ঠের অসামান্য লাবণ্য তাঁর ক্ষেত্রে সব-কিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর 'আমার প্রাণের পরে' এবং 'কখন বসন্ত গেল' পূর্ণ মেজাজের পরিবেশন।

দুজন নতুন শিল্পীও ছিলেন সেদিন। একজন, শ্রীমতী রমা সিংহ। কণ্ঠের অতিরিক্ত কম্পন তাঁর গানের অন্তরায়। অন্য শিল্পী অলোক বটব্যাল-এর কণ্ঠ সতেজ, গভীর এবং স্ফূর্ত। কিন্তু তাঁর শেষ গানটির (ক্ষমিতে পারিলাম না) নির্বাচন মেনে নেওয়া গেল না। নাটকের যে-কোনো সংলাপই আলাদাভাবে কি গান? তা যদি হত, তা হলে এই গানটিকেও রবীন্দ্রনাথ গীতবিতানে পৃথক জায়গা দিলেন না কেন, যেমন দিয়েছেন বহু গানের ক্ষেত্রে, যা নাটকেও ব্যবহৃত?

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলকাতা-১ হইতে
প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮০
২০-৬৬৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১৬৯.০০ টাকা	৫৯.০০ টাকা	x
আমাদের লন্ডন অফিস মারফত (লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব লী ফক

কেউ যদি কখনও গভীর
অরণ্যে হারিয়ে যায়···
তারপর হঠাৎ এই রকমের
একটা পাহাড়-চুড়া দেখে…
নতুন গল্প

অরণ্যদেব অরণ্যদেব
কিংবা সোলা-কাঠের ঢাকে অরণ্যদেব — অরণ্যদেব ডাক শুনতে পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে অরণ্যদেবের রাজত্বে এসে গিয়েছে।

অরণ্যদেবের স্বর্গ দ্বীপে সকল
জীবজন্তু শান্তিতে বসবাস করে।

অত্যাচারীরা তাঁর খুলি-গুহা ও খুলি
সিংহাসনের নাম শুনলে ভয় পায়…
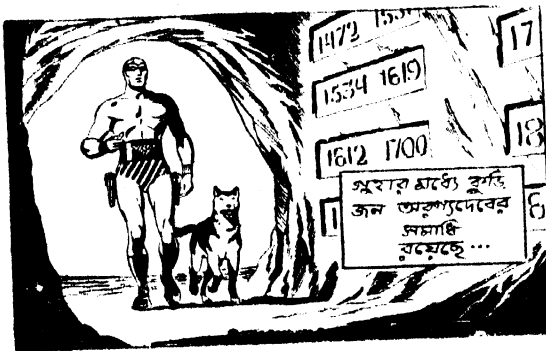
1472
17
1534 1619
18
1612 1700
গুহার মধ্যে কুড়ি
জন অরণ্যদেবের
সমাধি
রয়েছে…

… আর রয়েছে হীরা-জহরত-মণি-মাণিক্য

তাঁর সংগ্রহশালায় আছে রাজা আর্থারের তলোয়ার,
রোলাণ্ডের শিঙা, আলেকজাণ্ডারের পানপাত্র,
হোমারের বীণা…
9/5
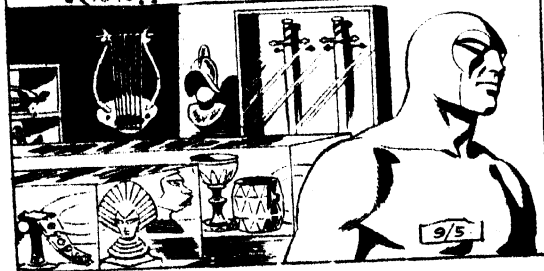
তাঁর একটি আংটি শত্রুতার প্রতীক,
অন্যটি বন্ধুত্বের…
১
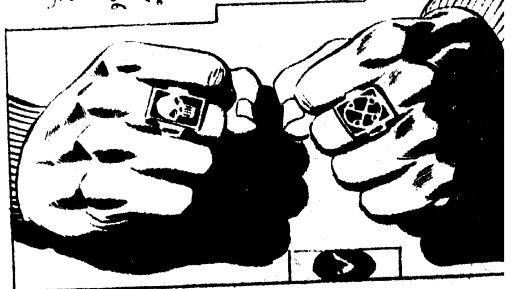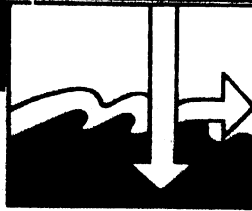
সেই দুই জন...আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে যারা ছেয়ে থাকে মন

এক তো তুমি...

সত্যি, বিনাকা গ্রীনের নির্মল সজীবতা ছেয়ে থাকে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে...আর তুমিও ঘিরে থাকো আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে। আমি তোমায় ভালবাসি...আর ভালবাসি বিনাকা গ্রীন। কারণ, ক্লোরোফিল মেশানো বিনাকা গ্রীনের প্রাকৃতিক দুর্গন্ধনাশক উপাদান আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে ছড়িয়ে দেয় ফুলের মিষ্টি গন্ধ...আঃ...কি সুন্দর। তোমার সাথে একসাথে আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুলের গন্ধের পুলক।

আর এক বিনাকা গ্রীন...

ফুলের সুরভি
শ্বাসপ্রশ্বাসে...
মধুর পুলক
ভেসে আসে

CIBA-GEIGY

Rediffusion/CG/503